প্রতি সংখ্যা ।৶০ আনা।
বার্ষিক মূল্য ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা

আর্থিক উন্নতি

ধনবিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্র

শ্রীবিনয়কুমার সরকার
সম্পাদিত

৫ম বর্ষ—১৩৩৭

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস
৪৫ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট (সাদার্ণ ব্লক), কলিকাতা।

সূচীপত্র

বাংলার সম্পদ্

অ

আ

ই

ও

ঔ

ক

খ

গ

চ

জ

আর্থিক ভারত

দুনিয়ার ধনদৌলত

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

মোলাকাৎ

পত্রিকা-জগৎ

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধাবলী

আর্থিক উন্নতি

বৈশাখ—১৩৩৭ ৫ম বর্ষ—১ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

খাদ্যে ভেজাল

আসাম মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট অনুযায়ী ধুবড়ী মিউনিসিপ্যালিটী ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বন্ধের জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য কয়েকজন ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করাও হইয়াছে। বাঙ্গালার অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটী কি কোনরূপ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ভেজালের মারাত্মকতা দূর করিতে পারেন না? ভেজালে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। দুধ, তৈল, চাউল, ময়দা, ঘৃত, চিনি, খাবারের ও রুটীওয়ালার দোকানের সর্ব্বপ্রকার খাদ্যেই ভেজাল মিশান আছে। কঠোরভাবে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে জনসাধারণের স্বাস্থ্য কোন প্রকারেই রক্ষিত হইবে না। এই ভেজাল দ্রব্যাদি খাইয়া দিন দিন লোকের উদরাময়াদি সংক্রামক রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতা এবং ভেজাল মিশ্রনকারী দুর্ব্বৃত্তদিগকে অর্থদণ্ডের সহিত কঠোর কারাদণ্ড প্রদান না করিলে কখনও এই পাপ দূরীভূত হইবে না। কোন কোন উৎকোচগ্রাহী ভেজাল-পরীক্ষাকারীকেও অনুরূপ দণ্ড প্রদান করা বিধেয় মনে করি।

কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর, নোয়াখালীর চৌমোহানী এবং নোয়াখালী সদরের অনেক বড় বড় মুদীদোকান ও আড়ত ভেজাল দ্রব্য আমদানি ও বিক্রয় করার প্রধান আড্ডা। এইসকল আড্ডার বিলোপ ও আড্ডাধারিগণের কঠোর শাস্তির বিশেষ প্রয়োজন। এদিকে আমরা স্বাস্থ্য বিভাগ ও মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(নোয়াখালী হিতৈষী)

দামোদর বাঁধের অবস্থা

দামোদর নদের বামপার্শ্ব দিয়া যে বাঁধ বর্দ্ধমান রাজবাড়ী হইতে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহা বর্দ্ধমান বিভাগের কয়েকটী জেলার, বিশেষতঃ হাওড়া ও হুগলী জেলার অধিকাংশ পল্লী এবং তৎসংশ্লিষ্ট শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র-

গুলিকে দামোদরের ভীষণ প্লাবন হইতে এযাবৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই বাঁধটা পাবলিক্ ওয়ার্কস বিভাগের বেঙ্গল নর্দ্দান ড্রেনেজ অ্যাণ্ড এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট দামোদর ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমানে হাওড়া জেলার আমতা হইতে অনূন দশ মাইল উত্তরে নয়াচক, কল্যাণচক, মল্লিকচক এবং সিমচক এই পল্লী চারিটীর মধ্যবর্ত্তী উল্লিখিত বাঁধের প্রায় দেড় মাইল ব্যাপী অংশটীর অবস্থা যেরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। ইহার কারণ এই যে, আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রবল বন্যা-স্রোতে নদীর বাম দিকের কিনারায় ক্রমাগত ধস্ পড়িয়া উহার তীরভূমির অস্তিত্ব একেবারেই লোপ পাইয়াছে। এইবারে নদীর স্রোত বাঁধের সেই দেড় মাইল দীর্ঘ অংশটীকে সাংঘাতিকরূপে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। গত বর্ষায় বন্যাস্রোতে বাঁধের গুরুতর ক্ষতি হওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণের মনে বাঁধ ভাঙ্গিবার একটা দারুণ আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে। পুনরায় বিগত শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে এবং পরে পর পর দু'টী বড় রকমের বন্যা হওয়ায় বাঁধের ঐ অংশে বড় বড় ধস্ পড়িয়া উহার অবস্থা অতীব শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে ঐ কয়েকদিন স্থানীয় জনসাধারণকে যে কতদূর উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করিতে হইয়াছে তাহা যথার্থই অবর্ণনীয়। এই বাঁধটী যদি এই স্থানে হঠাৎ দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়, তবে উর্দ্ধে প্রায় ১২ মিঃ পরিমিত জল অপরপার্শ্বে সবেগে পতিত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে; তাহাতে স্থানীয় জনসাধারণকে তাহাদের স্ব স্ব আত্মীয় স্বজন, গবাদি গৃহপালিত পশু এবং যাবতীয় ধনসম্পদ্ লইয়া কতদূর যে বিপন্ন হইতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। বর্ত্তমানে বাঁধটী রক্ষা করিতে হইলে যাহাতে স্রোতের গতি নদীর বিপরীত দিক্ দিয়া প্রবাহিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিলে বিশেষ সুবিধা হইবে। এ বিষয় এই বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট স্থানীয় জনসাধারণ বহুবার আবেদন জানাইয়াছে। ইহাতেও এই বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্রোতের গতি ভিন্ন দিক্ দিয়া ফিরাইয়া বাঁধ রক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। অতঃপর যাহাতে ভিন্ন দিক্ দিয়া নদীর স্রোতের গতি ফিরাইয়া বাঁধের উক্ত অংশটী রক্ষা করিবার সুব্যবস্থা হয় তদ্বিষয়ে স্থানীয় প্রজাসাধারণ হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বঙ্গীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। (বঙ্গবাণী)

জলকষ্ট

জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত শক্তিপুর, পাঠকপাড়া গ্রামবাসিগণ গত চারি বৎসর যাবৎ ভীষণ জলকষ্টে পতিত হইয়াছে। উক্ত স্থান হইতে ভাগীরথী প্রায় দুই মাইল দূরে প্রবাহিত। তদুপরি আজ তিন বৎসর হইতে দেশে সুবৃষ্টির অভাবপ্রযুক্ত খালবিল পুষ্করিণী প্রভৃতিতে আদৌ জল নাই। পানীয় জলের ত কথাই নাই, সাধারণ আচরণীয় জলেরও একান্ত অভাব। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এমত অবস্থায় বর্ত্তমান সনেই একটী কূপ নির্ম্মাণ না করিলে গ্রামখানি অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। একটী ৬ ফুট ব্যাসের কূপ নির্ম্মাণ করিতে আনুমানিক ৭০০৲ টাকা খরচ পড়িবে। মুর্শিদাবাদের সদর সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রামবাসিগণের হস্তে কূপ খননার্থ ৩৫০৲ টাকা দিয়াছেন শুনিয়াছি। বাকী ৩৫০৲ টাকার অভাবে কূপ খনন কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। লালগোলার পুণ্যশ্লোক দানবীর মহারাজা রাও যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর শক্তিপুর পাঠকপাড়া গ্রামের দুঃস্থ ব্যক্তিগণের অভাব মোচনের জন্য একটী কূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলে গ্রামবাসিগণের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধিত হইবে ও তাঁহার কীর্ত্তি গ্রামবাসিগণ মধ্যে বংশপরম্পরাক্রমে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। মহারাজা বাহাদুর ৬ ফুট ব্যাসের একটী কূপ উক্ত গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলে গ্রামবাসিগণ ইতঃপূর্ব্বে সদর সবডিভিসন্যাল অফিসার বাহাদুরের নিকট যে ৩৫০৲ টাকা পাইয়াছে তাহা গ্রামের উন্নতিকল্পে অন্য কোনও কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

(কান্দীবান্ধব)

কাল্না সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

দশম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

১। ভূমিকা

আমরা পঞ্চায়েৎমণ্ডলী কাল্না কেন্দ্র সমবায় সমিতির

দশম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী সায় (১) জমা খরচ হিসাব (২) উদ্বর্ত্ত পত্র এবং (৩) লাভ লোকসানের হিসাব পেশ করিতেছি।

২। কার্য্য পরিচালকমণ্ডলী ও বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণ

পঞ্চায়েৎ মণ্ডলী উপবিধি অনুসারে তাঁহাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করিবার জন্য এবং মামুলী কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য চেয়ারম্যান, ডেপুটী চেয়ারম্যান, সম্পাদক, সহঃ সম্পাদক, শ্রীযুক্ত মহম্মদ এসরাইল, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া একটী কর্ম্মী সমিতি গঠিত ছিল।

সমিতির অধীনে নিম্নলিখিত বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত আছেন :—

কর্ম্মচারী	মাসিক বেতন
১। প্রধান কর্ম্মচারী ও হিসাবরক্ষক	৪৩৲
২। সহকারী কর্ম্মচারী (প্রবেশনার)	২৫৲
৩। প্রথম সুপারভাইজার	৩৮৲
৪। দ্বিতীয় সুপারভাইজার	৩৬৲
৫। তৃতীয় সুপারভাইজার	৩২৲
৬। একজন পিওন	৮৲

৩। সাধারণ উন্নতি

সমিতির কার্য্য ক্রমশই বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, তাহা পরবর্ত্তী বিবরণসমূহ হইতে স্পষ্ট জানা যাইবে।

৪। অংশগত মূলধন

সমিতির মঞ্জুরী অংশগত মূলধন ১,০০,০০০৲ টাকা। তাহা ১০,০০০ অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০৲ টাকা। ১৯২৬—২৭ সনের শেষে অংশগত মূলধন ২৯,৪৩০৲ টাকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে ২৭৭টী নূতন শেয়ার বিক্রী হওয়ায় বর্ষশেষে তাহা ৩২,২০০৲ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

৫। কার্য্যকরী মূলধন

বর্ষশেষে মোট কার্য্যকরী মূলধন ২,৭১,৬৬২॥৵৩ টাকা। তন্মধ্যে আমানত ১,৮৯,৬০৩৵৬ টাকা এবং গৃহীত কর্জ্জ ৪৬,০০০৲ টাকা।

সমিতি এক বৎসরের মেয়াদে ব্যক্তিগত আমানতের উপর শতকরা বার্ষিক ৭৲ হিসাবে বৎসরে ছয়মাস অন্তর, দুইবার (১লা জানুয়ারী ও ১লা জুলাই) সুদ আদায় দিয়া থাকেন। আমানতকারীর বিশেষ আবশ্যক হইলে সমিতি তিন মাসের সুদ কাটিয়া লইয়া আমানতের তারিখের তিন মাস পরে অথচ মেয়াদ মধ্যে ঐ আমানতের যে কোন অংশ বিবেচনামত ফেরৎ দিতে পারেন।

৬। কর্জ্জ দাদন

আলোচ্য বর্ষে সংযুক্ত সমিতিগুলিকে মোট ৫৭,৪৮৮৲ টাকা কর্জ্জ দাদন করা হইয়াছিল। বর্ষশেষে মোট দাদনী ঋণের পরিমাণ ২,৫১,৯৬১।৵৬ টাকা, তন্মধ্যে খেলাপী ৮৩,২৭০৲ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৩৩·৪।

৭। সংরক্ষিত তহবিল

পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিলে ১০,০৩১৲ টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল। পঞ্চায়েৎমণ্ডলীর নির্দ্দেশমত আলোচ্য বর্ষের লাভ হইতে তাহাতে আরও ৩,৬৪১৲ টাকা রাখিলে তাহা মোট ১৩,৬৭২৲ টাকায় পরিণত হইবে।

৮। লাভ ও তাহার বণ্টন

আলোচ্য বর্ষে ৫৯৪।৶২ পাই নিট লাভ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের জের অপ্রযুক্ত লাভ ১৬৪।১০ পাই তাহাতে যোগ করিয়া মোট বিভাগযোগ্য লাভ ৫২৫৮॥৵১০২ পাই দাঁড়াইতেছে। পঞ্চায়েৎমণ্ডলী নিম্নলিখিতমত তাহার বিভাগ প্রস্তাব করেন :—

১। সংরক্ষিত তহবিল	২৩৪১৲ টাকা
২। ইমারত তহবিল	২০০০৲ টাকা

৩।	নাজাই তহবিল	৩০০৲ টাকা
৪।	সেক্রেটারীর বোনাস	১৫০৲ টাকা
৫।	ধনরক্ষক ও সহঃ সেক্রেটারীর বোনাস	৭৫৲ টাকা
৬।	কর্ম্মচারী ও ৩ জন সুপারভাইজারের বোনাস	১৪৯৲ টাকা
৭।	লভ্যাংশ বার্ষিক শতকরা ৩৵০ হিঃ	১২৪৩৷৵১০২
৮।	অপ্রযুক্ত লাভ আগামী বৎসরে জের টানা হইল	
		৫২৫৮৷৵১০২

৯। কর্ম্মচারিগণের প্রভিডেন্ট ফণ্ড

পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্মচারিগণের প্রভিডেন্ট ফণ্ডে ৫২৮০ টাকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে এই ফণ্ডে কর্ম্মচারিগণের দেওয়া ৬২॥৵০ ও সমিতির দেওয়া মায় সুদ ৬৮৵৯ টাকা। বর্ষশেষে উক্ত তহবিলে মোট জমা ১৮৩॥৯ টাকা।

১০। পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষা

মাননীয় শ্রীযুক্ত রেজিষ্ট্রার বাহাদুর একবার ও শ্রীযুক্ত এসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার বাহাদুর দুইবার এই সমিতি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সার্কেল ইন্সপেক্টর খোন্দকার আলি মহ্‌সিন সাহেব এই সমিতির হিসাব পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

১১। নূতন সমিতি গঠন

আলোচ্য বর্ষে ২৮টী ঋণদান সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সমিতিগুলি অনারারি অর্গানাইজর মহাশয় সুপারভাইজরগণের সহায়তায় গঠিত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব বৎসরের শেষে সংযুক্ত সমিতির সংখ্যা ১১৫ ছিল। আলোচ্য বর্ষে ১৮টী নূতন সমিতি কেন্দ্র সমিতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং বর্ষশেষে সংযুক্ত সমিতির সংখ্যা ১৩৩টী।

১২। সংযুক্ত সমিতিসমূহের পরিদর্শন ও অডিট

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার বাহাদুর ৩টী সমিতি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বসু এবং অডিটার শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ রায় কতকগুলি সমিতি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সুপারভাইজারগণ পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত সমিতিগুলিই পরিদর্শন করিয়াছিলে। অডিটার শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ রায় সমিতির সুপারভাইজারগণের সাহায্যে সমস্ত সমিতিগুলি অডিট করিয়াছিলেন।

১৩। সভা

আলোচ্য বর্ষে একটা সাধারণ সভা ও ১২টী পঞ্চায়েৎ সভা ও ৯টী কর্ম্মী সমিতির সভা হইয়াছিল। পঞ্চায়েৎ সভায় উপস্থিতির হার শতকরা ৭৬.৩।

১৪। সংযুক্ত সমিতিগুলির কার্য্য-পদ্ধতির সমালোচনা

(ক) ক্রমোন্নতি

অসীম দায়িত্ববিশিষ্ট গ্রাম্য ঋণদান সমিতিগুলির মধ্যে—

"এ" শ্রেণীভুক্ত	...	৩টী
"বি" শ্রেণীভুক্ত	...	৩টী
"সি" শ্রেণীভুক্ত	...	৬৬টী
"ডি" শ্রেণীভুক্ত	...	১৮টী
"ই" শ্রেণীভুক্ত	...	৭টী
শিক্ষানবিশ	...	৩০টী
মোট	...	১২৭টী

সসীম দায়িত্ববিশিষ্ট সমিতিগুলির মধ্যে—

ঋণদান সমিতি	...	২টী
ষ্টোর্স	...	১টী
ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি	...	৩টী

অসীম দায়িত্ব-বিশিষ্ট গ্রাম্য ঋণদান সমিতিগুলির সমষ্টিগত তুলনামূলক অবস্থা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

	১৯২৬—২৭	১৯২৭—২৮	বৃদ্ধি
সংখ্যা	১০৯	১২৭	১৮
সভ্য-সংখ্যা	৩,১৫৮	৩,৬৬৭	৫০৯
অংশগত মূলধন	৩২,৪৪৮৸৶১০	৩৭৭,৭৮৯৶১০	৫,৩৪০।৴০
আমানত ও কৃত ঋণ	২,২৫,৮০১৴১০২/৩	২,৬৫,৪৮৯৶৯	৩৯,৬৮৮।৴১০২/৩
সংরক্ষিত তহবিল	১৬,৮২১॥৴৮	২৪,১৯৭৴১০২/৩	৭,৩৭৫॥৴২২/৩
কার্য্যকরী মূলধন	২,৭৫,০৭১॥৴৪২/৩	৩,২৭,৪৭৫৸৴৫২/৩	৫২৪০৪।৴১
কর্জ্জ দাদন	২,১৭,৪৫৮৸৶৪	২,৮০,৪৫৬৶১১	৬২,৯৯৭।৭
লাভ	৮,০৭৭৻৬	৮০৮৩॥৶১	৬॥৴৭

(খ) সংযুক্ত সমিতিগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য

অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতিগুলির সভ্যগণ কর্ত্তৃক খেলাপী ঋণের পরিমাণ ১,৩৯,৪৭১॥৶১১ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৪৯·৭। পূর্ব্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ শতকরা ৩৮·৮ ছিল। সুতরাং খেলাপী ঋণের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

১৩৩৪ সালের ভীষণ অজন্মা ইহার প্রধান কারণ বটে, কিন্তু সভ্যগণের কর্ত্তব্যবোধের অভাব এবং পঞ্চায়েৎগণের কুদৃষ্টান্তও ইহার অন্যতম মুখ্য হেতু। এজন্য আমরা সংযুক্ত সমিতিসমূহের সভ্যগণকে বিশেষতঃ পঞ্চায়েৎগণকে অনুরোধ করিতেছি ও সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, ব্যাঙ্কগুলিকে স্থায়ী করিতে হইলে সভ্যগণ কর্ত্তৃক নিয়ম প্রতিপালন একান্ত আবশ্যক, অন্যথা সমবায় চিরস্থায়ী ও ক্রমোন্নতিশীল হইলেও তাঁহাদের ব্যাঙ্কগুলির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যাহাকে যে উদ্দেশ্যে এবং যে পরিমাণে ঋণ দেওয়া যাইতে পারে অতঃপর পঞ্চায়েৎগণ তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন, আশা করি।

১৫। সাধারণ মন্তব্য

কালনা মহকুমায় সমবায় সমিতির সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। সুতরাং সর্ব্বত্রই তাহাদের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ, তাহাদের দ্বারা প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে। যেখানেই সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, সেখানেই সুদের হার কমিয়াছে ও কৃষককুল মহাজনদিগের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছে।

কিন্তু সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কেবল স্থানে স্থানে ইহার ক্ষীণ রশ্মি অনুভূত হইতেছে মাত্র। তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত আশান্বিত। মনে হয় অচির-কাল মধ্যেই কিরূপে স্বাবলম্বন ও মিতব্যয়িতা সহকারে "ফলপ্রসূ" ঋণ গ্রহণ করিয়া আমরা ক্রমশঃ নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করিব।

আলোচ্য বর্ষ এ প্রদেশের পক্ষে একটী অতি দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। কাল্না মহকুমাও ইহার ফল হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে। মহকুমার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা এবং ইহাতে সকল প্রকার ফসলই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু অনাবৃষ্টি হেতু কৃষক তাহার ভূমিতে শস্য রোপণ করিতে পারে নাই। সামান্য মাত্র আউশ ধান ও পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। আমন ধান একেবারেই রোপিত হয় নাই। আলু কাল্না থানার একটি প্রধান ফসল। কিন্তু জলাভাবে তাহার আবাদ একেবারেই হয় নাই। বস্তুতঃ, এরূপ দুর্ব্বৎসর আমাদের মধ্যে কেহ চক্ষে দেখে নাই। মহকুমার চাষ আবাদ এবং অন্যবিধ সকল কার্য্যই এক প্রকার বন্ধ ছিল, ফলে মজুরী করিয়াও কেহ কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে নাই। অনেককে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাইতে হইয়াছিল।

ইহার ফল কেন্দ্র সমিতিকেও বিশেষ ভোগ করিতে

হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কেন্দ্র সমিতি অত্যল্প মাত্র প্রদত্ত ঋণের আসল ও সুদ আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অবশ্য প্রাথমিক সমিতির সভ্যগণের সম্যক্ দায়িত্ববোধ থাকিলে আরও বেশী টাকা আদায় করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহা হইতে কয়েকটী বিষয় বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে। প্রথমতঃ, মহকুমাবাসী সাধারণ গৃহস্থের এক বৎসরের সংস্থানও থাকে না; দ্বিতীয়তঃ কেবলমাত্র চাষের উপর নির্ভর করিয়া অভাব মোচন একপ্রকার অসাধ্য; তৃতীয়তঃ, মহকুমার লোক ক্রমশঃ শ্রমবিমুখ হইয়া পড়ায় এবং চাষ কার্য্য ভাড়াটিয়া মজুর দ্বারা সম্পাদন করিতে থাকায় চাষের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে; চতুর্থতঃ, এক্ষণে আর নিয়মিত সুবর্ষা না হওয়ায় সেচের জলের অভাব হইয়াছে।

প্রথমোক্ত তিনটী কারণ আমাদিগকে ক্রমশঃ দূর করিতে হইবে। শ্রম-মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না। ক্রমশঃ আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে।

কিন্তু শেষোক্ত কারণ দূর করা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। নিকটে জল ভাণ্ডার না পাইলে জল-সরবরাহ সমিতি স্থাপন করিয়া কোন লাভ নাই। প্রস্তাবিত দামোদর খালের 'ক্ষেত্র' মধ্যে কালনা মহকুমার তিনটী থানাই গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। তজ্জন্য সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আমরা শ্রীযুক্ত রেজিষ্ট্রার বাহাদুরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি।

কেন্দ্র সমিতির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বসু সমিতির উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার স্থান পূরণ হওয়া আপাততঃ সম্ভবপর মনে হয় না। দেশের কৃতবিদ্য ও উদ্যমশীল যুবকগণ উত্তরোত্তর সমবায়ক্ষেত্রে যোগদান করিলে আমরা সুখী হইব।

সমিতির সহঃ সম্পাদক এবং ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায় আগ্রহ সহকারে সমিতির কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ-যোগ্য।

সমিতির অন্যান্য ডিরেক্টরগণ বিশেষ যত্নের সহিত সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

সমিতির এক্স-অফিসিও চেয়ারম্যান কালনার ভূতপূর্ব্ব সবডিভিসন্যাল অফিসার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মৈত্র, এম্, এ মহাশয় তাঁহার আন্তরিকতা এবং অমায়িকতার গুণে সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান এক্স-অফিসিও চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার, এম্, এ মহাশয় ইতি-মধ্যেই আমাদিগের মনে প্রভূত আশার উদ্রেক করিয়াছেন। আমরা আশা করিতেছি যে, তাঁহার আমলে প্রত্যেক সমিতিই অধিকতর দক্ষতা অর্জ্জন করিতে এবং সমবায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে।

কালনা কেন্দ্র সমিতির জন্য কিঞ্চিন্ন্যূন ৩/০ বিঘা জমি অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে সরকার বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। বোধ হইতেছে যে, বর্ত্তমান ১৯২৯ সনের মধ্যেই আমরা তাহাতে দখল পাইব।

এক্ষণে এই রিপোর্ট পেশ করিয়া এক্স-অফিসিও চেয়ার-ম্যান ব্যতীত আমরা অন্যান্য পঞ্চায়েৎগণ স্ব স্ব পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম।

আইনতঃ পরীক্ষিত হিসাব

(১৯২৭ সনের জুলাই হইতে ১৯২৮ সনের জুন পর্য্যন্ত)

জমা		খরচ	
১। অংশ বাবদ	২,৭৭০৲	১। ঋণ পরিশোধ ও আমানত ফেরৎ	
২। আমানত ও কর্জ্জ গ্রহণ		(ক) অন্যের	৫৪,৬৪৭৵০
(ক) অন্যের নিকট হইতে	৫৯,৭১২৶৩	(খ) প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের	২১,০০০৲
(খ) প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক হইতে	৬১,০০০৲	২। কর্জ্জ দাদন	৫৭,৪৮৮৲
৩। কর্জ্জ আদায়	২৩,৯৩৩৷৵৯	৩। ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ও আমানত	

জমা

৪। আমানত ফেরৎ	
(ক) প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক	
চল্‌তি হিসাব হইতে	২৯,৪৯৭॥৴৬
(খ) পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হইতে	৪০০৲
৫। বিবিধ আদায়	
(ক) সুদ আদায়	৮,১৯১৸২
(খ) ভর্ত্তি ফিঃ	৯০৲
৬। অন্যান্য	
(ক) ডিস্‌কাউণ্ট	৩৬৫৸৵৯
(খ) প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক হইতে লভ্যাংশ	৯০৪॥০
(গ) বিবিধ	১০৮॥৴০
(ঘ) গত বৎসরের পোষ্টেজ আদায়	২৸/০
(ঙ) অডিট ফি আদায়	৭৯৫৸৴০
(চ) অগ্রিম দাদন ফেরৎ	১৪২৲
(ছ) লভ্যাংশ আদায়	৮৸৴৪
(জ) খাতাপত্রের দাম	৪৪৫৸৬
(ঝ) প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে	৬২॥৵০
(ঞ) প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে দান	৬৮৵৯
মোট	১,৮৮,৪৯৪॥৴০
৭। মজুত তহবিল	৩,১৪৪॥/৯
সর্ব্বমোট	১,৯১,৬৩৯৷৯

খরচ

(ক) প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক চলতি হিসাবে	২৭,৩৬২৲৯
৪। খরচ	
(ক) কর্জ্জ ও আমানতের সুদ	১৩,৯১২৷৵০
(খ) লভ্যাংশ প্রদান	২১১॥/০
(গ) বোনাস	২০৲
(ঘ) আসবাব খরিদ	২৪৮৷০
(ঙ) সরঞ্জামী	২,১৮৭৵০
(চ) অন্যান্য	
(১) ডিস্‌কাউণ্ট ফেরৎ	১৸০
(২) অগ্রিম দাদন	২৭২৲
(৩) সংযুক্ত সমিতির অডিট ফি	১,৬৩৬৵০
৫। অডিট ফি	৩৫০৲
৬। অন্যান্য	
(ক) খাতাপত্র খরিদ	৩৪৩৸৬
(খ) প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে দান	৬৮৵৯
৭। বিবিধ	২৬৭৲৬
মোট	১,৮০,০১৫৸৴৬
৮। উদ্বৃত্ত তহবিল	১১,৬২৩৷/৩
সর্ব্বমোট	১,৯১,৬৩৯৷৯

উদ্বর্ত্ত পত্র

(১৯২৮ সনের ৩০শে জুন তারিখে)

দেনা

১। অংশগত মূলধন	৩২,২০০৲
২। ব্যক্তিগত আমানত	১,৮৯,৬০৩৵৬
৩। প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক হইতে	
(ক) কর্জ্জ	৪০,০০০৲
(খ) প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক হইতে	
ক্যাস ক্রেডিট	৬,০০০৲

পাওনা

১। মজুত তহবিল	১১,৬২৩৷/৩
২। ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট	
(ক) প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে অংশ	৬,৭০০৲
৩। আমানত	
(ক) প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক চলতি	৬১৩৸/১১
(খ) পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে	১০০৵০

দেনা		পাওনা	
৪। সুদ দেয়	৮,১০৩।৶৩	৪। সংযুক্ত সমিতিগুলিকে কর্জ্জ দাদন	২,৫১,৯৬১।/৬
৫। লভ্যাংশ	১,৮৭৭॥/৫	৫। সুদ পাওনা	১৯,৯৯৭।৬
৬। বোনাস দেয়	১৮৮৲	৬। ষ্টকের মূল্য	৮৬০।০
৭। সরঞ্জামী দেয়	২২২৶৬	৭। অন্যান্য বাবদ	
৮। অন্যান্য বাবদ		(ক) রবার ষ্ট্যাম্প	১।০
(ক) কর্ম্মচারিগণের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড	১৮৩॥৯	(খ) মজুত বিক্রয়যোগ্য খাতা ফারম্	৩৭৫৵১
(খ) অতিরিক্ত অডিট ফি যাহা পারুলডাঙ্গাকে ফেরৎ দিতে হইবে	১৫৲	(গ) মজুত বিক্রীত খাতা ফরমের মূল্য প্রাপ্য	১২১।৪২
৯। সংরক্ষিত তহবিল	৩,৬৬১৲	(ঘ) ডিস্‌কাউণ্ট প্রাপ্য	৭৩॥০
১০। লাভ হইতে গঠিত অন্যান্য তহবিল		(ঙ) প্রাপ্য অগ্রিম দাদন	২৬০৲
(ক) ইমারত তহবিল	৫,৭২০৲	(চ) সমিতিগুলির নিকট অডিট ফি প্রাপ্য	১,০৪৫।/৬
(খ) নাজাই তহবিল	৬৫০৲	সর্ব্বমোট	২,৯৩,৭৩২॥৶৩২
১১। অপ্রযুক্ত লাভ	২১৪।১০		
মোট	২,৮৮,৬৩৮।৩		
১২। লাভ	৫,০৯৪।৶২		
সর্ব্বমোট	২,৯৩,৭৩২॥৶৩২		

লাভ লোকসানের হিসাব

লোকসান		লাভ	
১। প্রদত্ত ও দেয় সুদ	১৪৯৭॥/৯	১। অর্জ্জিত সুদ	২১,৬৫০।৶৮
২। প্রদত্ত দেয় সরঞ্জামী	২,১১৭॥/৩	২। ফরম আদি বিক্রয় হইতে	২০৬।৶১০২
৩। আসবাবাদির মূল্যের ঘাটতি	২০৲	৩। অন্যান্য বাবদ	
৪। অডিট ফিঃ	৩৫০৲	(ক) ভর্ত্তি ফি	৯০৲
৫। অন্যান্য বাবদ		(খ) প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে প্রাপ্ত ও প্রাপ্য লভ্যাংশ	৪৩৫॥০
(ক) প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে দান	৬৮৵৯	(গ) প্রাপ্ত ও প্রাপ্য ডিসকাউণ্ট	৪০০৲
(খ) বিবিধ	২৬৭৻৬	(ঘ) বিবিধ	১০৮॥৶০
মোট	১৭,৭৯৭।৵৩	সর্ব্ব মোট	২২,৮৯১৸/৩২
৬। খাঁটি লাভ	৫,০৯৪।৶২		
সর্ব্ব মোট	২২,৮৯১৸/৩২		

নলকূপ

মেদিনীপুর জিলার খড়ার, হড়পালা অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ নলকূপ নির্ম্মাণ করাইয়া কলেরা আদি সংক্রামক পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। জেলা বোর্ড এ বিষয়ে মনোযোগ করিতেছেন না কেন? স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য হেল্থ্ অফিসার এবং তাঁহার সামন্তের অভাব নাই, কিন্তু বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাবে কত রোগের উৎপত্তি হয় তাহা কি মেম্বারগণ চিন্তা করেন না? কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে জেলাবোর্ড ডাক্তার পাঠাইয়া হতভাগ্যগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু সংক্রামকতার আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য নলকূপের ব্যবস্থা করিলে আর ডাক্তার প্রেরণের প্রয়োজন হয় না, সংক্রামকতার জড় মরিয়া যায়। খড়ার অঞ্চলে নলকূপ হওয়ায় তথায় কলেরা একেবারে লোপ পাইয়াছে। পানীয় জলের দোষেই কলেরা সংক্রামক হইয়া পড়ে, ইহা নিতান্ত অর্ব্বাচীনেও বুঝে।

মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটীতেও কলের জলের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে মেদিনীপুরে বর্ষার সময়ের কলেরার উৎপাত নিবারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাশয়, উদরাময়, চক্ষু উঠা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বাড়িয়াছে। অপরিমিত ক্লোরিন, ফটকিরি প্রভৃতি জলে ঢালাই ইহার কারণ। ইহার ফলে সহরময় সহসা নানা প্রকার রোগের আবির্ভাব দেখা যায়। অধিবাসিগণের কর্ত্তব্য প্রত্যেক বাড়ীতেই নলকূপ করা। নলকূপের বিশুদ্ধ জলের তুলনা নাই। নানা ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে নলকূপের জল পান করাই শ্রেয়ঃ। (মেদিনীপুর হিতৈষী)

কলিকাতার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিখারীর দল

কলিকাতায় কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বহু ভিখারী রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে ভিক্ষা করিয়া ফিরে। এই সব ভিখারীকে সহর হইতে সরাইয়া অন্য কোন স্থানে রাখার বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়, ইহা অনেকে বলিয়া থাকেন। সহরে এই সব রোগীকে দেখিয়া অনেকে অনেক কড়া কথাও বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের কঠিন সমস্যা কেহ সেরূপ চিন্তা করিয়া দেখেন না। তাহাদের সম্বন্ধে প্রতীকার ব্যবস্থা করার পূর্ব্বে কয়েকটা বিষয় বিশেষ করিয়া জানা দরকার।

প্রথম কথা হইতেছে—কুষ্ঠগ্রস্ত ভিখারীরা কোথা হইতে আসে?

বাঙ্গালায় প্রায় ১ লক্ষ লোক কুষ্ঠরোগে ভোগে। তন্মধ্যে এক কলিকাতাতেই আছে ৩ হাজার। তাহাদের মধ্যে যাহাদের একটু সঙ্গতি আছে তাহারা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে না। যাহাদের নিজেদের খাটিয়া খাইতে হয় তাহারা যদি এই রোগে শেষটা পঙ্গু হইয়া পড়ে, তবে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে ভিক্ষা করিতে হয়। কলিকাতার সম্পদে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা কলিকাতাতে আসিয়াই ভিড় করে এবং পথে পথে, দ্বারে দ্বারে সাধারণের কৃপার পাত্র হইয়া ভিক্ষালাভ করে।

অন্য দেশ হইতে আগত

একমাত্র বাঙ্গালা হইতেই যে এই রোগগ্রস্ত ভিখারীর দল কলিকাতায় আসিয়া জমা হয় তাহা নয়, পরন্তু বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ হইতেও ইহারা কলিকাতায় আসে।

এইসব ভিখারীকে যদি জোর করিয়া সহর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে এরূপ মনে করা একান্ত ভুল। কেন না এক দলকে তাড়াইয়া দিলে অপর দলের আসিতে বেশী বিলম্ব হইবে না। মোট কথা, যত দিন লোকে ভিক্ষা দিবে, যত দিন ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে কড়া আইন না হইবে, তত দিন এই সব অভাগা ভিখারীর দল ভিক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে কড়া আইন করা বর্ত্তমানে অসম্ভব।

তাহারা দ্বিতীয়তঃ কোথায় বাস করে?

বস্তীতে বহুজনের বাস

সাধারণতঃ, তাহারা বস্তীতে বাস করে। বস্তীর পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গৃহের সুস্থ ব্যক্তিরাও এই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। অনেকে বলিতে পারেন, ইহাদিগকে

বস্তীওয়ালারা যদি বাড়ী ভাড়া দিতে না চাহেন, তাহা হইলে ইহাদিগকে সরান যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নয়। রোগীরা অনেকে এক সঙ্গে বাস করে এবং তাহারা একখানা ঘরের জন্য ৬৲।৭৲ টাকা ভাড়া দিতে প্রস্তুত। অন্য ভাড়াটিয়ারা হয়তো ঐ ঘরের জন্য ৪৲।৫৲ টাকার বেশী ভাড়া দিতে চাহে না। কাজেই বাড়ীওয়ালা লাভ পাইলে বেশী কেন বাড়ী ভাড়া দিবে না? সহরের নানাস্থানে যদি রোগীরা ছড়াইয়া থাকে তাহা হইলে বিপদ আরও বেশী। অনেকে বলিয়া থাকেন মিউনিসিপ্যালিটী যদি ইহাদের জন্য সহরের বাহিরে বাস-স্থানের বন্দোবস্ত করেন এবং সহরের ভিতরে রোগীরা যে ভাড়া দিয়া থাকে সেই ভাড়াতেই যদি মিউনিসিপ্যালিটির বাড়ী ভাড়া পায়, তাহা হইলে হইতে পারে। রোগীরা সেখানে বাস করিবে এবং প্রতিদিন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বাসে করিয়া সহরের ভিতরে আনিয়া ভিক্ষা করিতে দিতে হইবে। ইহা করিলে বর্ত্তমান অবস্থার অনেক উন্নতি হইবে। মিউনিসিপ্যাল সীমানায় কোন রোগী বাস করিতে পারিবে না এবং সীমানার মধ্যে যদি কোন বাড়ীওয়ালা বাড়ী ভাড়া দেন তাহা হইলে তাঁহার অর্থদণ্ড হইবে, এইরূপ আইনও করিতে হইবে। কারণ, এখন দেখা যায় মেছুয়াবাজারে ৫০ জন কুষ্ঠ রোগী কুটীরে বাস করিতেছে।

প্রকৃত প্রতীকার

উপরের দুইটি উপায় ছাড়া অন্য কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা কি হইতে পারে না?

রোগীদিগকে বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া কোন লাভ নাই। রোগের মূল কি তাহাই প্রথমে দেখিতে হইবে। রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা করার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই রোগ যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে তজ্জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা দিতে হইবে, যে থানায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী, সেই থানা নির্ব্বাচন করিয়া সেখানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং রোগীদিগকে চিকিৎসার জন্য সেখানে আহ্বান করিতে হইবে। এইরূপ করিলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেড়শত দুইশত রোগী আসিয়া জুটিবে। রোগীদের সঙ্গে যাহারা যাইবে তাহাদিগকেও পরীক্ষা করিলে হয়ত দেখা যাইবে তাহাদের কাহারও কাহারও রোগের প্রথমাবস্থা। এমনি করিয়া পল্লীর নানা লোকের রোগ ধরা পড়িয়া যাইবে এবং চিকিৎসার পন্থাও স্থানীয় ডাক্তাররা শিক্ষা করিয়া ফেলিবেন।

উপরি উক্ত পন্থায় রোগ যে একেবারে দূরীভূত হইয়া যাইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে সংক্রমণ বন্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে রোগ অনেক কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা সরকার এজন্য একটি "সার্ভে পার্টি" নিয়োগের বিষয়ে গত দুই বৎসর ধরিয়া বিবেচনা করিতেছেন। তজ্জন্য প্রতি বৎসর ১২ হাজার টাকা করিয়া ৫ বৎসর ব্যয় করিতে হইবে। বর্ত্তমানে অর্থের অভাব হওয়ায় ঐ উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় সম্ভবপর হইতেছে না। কুষ্ঠরোগ যে বাড়িয়াই চলিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাজসাহী জিলায় বিগত ১৯২১ সনে ১৪৫ জন কুষ্ঠ রোগী ছিল। এ বৎসরে ৫৫১ জন রোগী গণনা করা হইয়াছে। বাঙ্গলার এই কুষ্ঠরোগ-সমস্যা যেরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এদিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া উচিত।

(বঙ্গবাণী)

কৃষকের অবস্থা

পটাশপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—বর্ত্তমান বৎসর আমাদের এতদঞ্চলের কৃষকের অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রায় অধিকাংশ স্থলে বিঘা প্রতি ৩/০ হইতে ৫/০ মণের বেশী ধান্য জন্মায় নাই। ধানের দর ১৷৷০ টাকা হইতে সর্ব্বোচ্চ ২৲ টাকা। টাকায় ১২।১৩ সের ভাল চাল। কিন্তু মাছের সের ৷৷০ আনা, বেগুনের সের ৵০ আনা। এইরূপ অন্যান্য শাকসব্জীও দুর্ম্মূল্য। হাল বকেয়া খাজনা ও সুদ পরিশোধ করিতে হইবে বলিয়া অধিকাংশ ধান বিক্রী করিতে হইতেছে। যে চাল না হইলে জীবন বাঁচে না। তাহার ৬।৭ সের চাল না বেচিলে বাজারের এক সের পচা মাছ কেনাও চলে না। অথচ এই মাছ না

হইলে খাওয়া চলে না। সুতরাং ধানের দর না থাকায় এতদঞ্চলবাসীর পক্ষে ইহা দুর্ব্বৎসর বলিতে হইবে। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে আরও দুর্ব্বৎসর। এবম্প্রকার দুর্ব্বৎসরে আপন ওজন বুঝিয়া না চলিলে এতদঞ্চলবাসীর রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

(নীহার—কাঁথি)

বাঙ্গালার সেচ-ব্যবস্থা ও ম্যালেরিয়া

মিশরের খ্যাতনামা সেচতত্ত্ববিশারদ ইঞ্জিনিয়ার স্যর উইলিয়াম উইলকক্স কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাঙ্গালার সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি দেখাইয়াছেন যে, সেচ-বিভাগ সুব্যবস্থা করিলে এক দিকে যেমন দেশকে শস্য-সম্পদে সম্পদশালিনী করিয়া তুলিতে পারেন, অপর দিকে তেমনি দুরন্ত ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতেও উদ্ধার করিতে পারেন। বর্ষায় নদীর প্লাবনের জল নিয়মিতভাবে শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত করাইতে পারিলে তদ্দারা এক দিকে নদীর পলিমাটিতে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইবে অপর দিকে আবদ্ধ পচা ময়লা জল আবর্জ্জনা এবং তৎসঙ্গে ম্যালেরিয়ার বীজ ধৌত হইয়া যাওয়ায় দেশ ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে। তিনি বলেন, নদীর ধারে উচ্চ বাঁধ বাঁধিয়া দিয়া প্লাবনের পথ বন্ধ করিলে প্রথমতঃ শস্যক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-শক্তি নষ্ট হয়, দ্বিতীয়তঃ, ম্যালেরিয়া বর্দ্ধিত হয়, তৃতীয়তঃ, ভয়ঙ্কর প্লাবনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কারণ বাঁধ দিয়া নদীর জল আবদ্ধ করিয়া রাখিলে হয়ত কোন সময়ে প্রবল বারিপাতের ফলে জল বৃদ্ধি পাইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তখন যে প্রবল জলস্রোত স্থল-ভাগের দিকে প্রবাহিত হইবে তাহার সম্মুখে যাহা পড়িবে তাহাই ভাঙ্গিয়া যাইবে। অধুনা এইরূপ প্লাবনের সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। বাঙ্গালার প্রাচীন নৃপতিগণ ভাল করিয়াই জানিতেন যে, জমি উর্ব্বরা রাখা, ম্যালেরিয়া বিতাড়ন করা এবং নদীতে যাহাতে অপরিমিত জল না জমে তাহার বন্দোবস্ত করা—এই তিনটী বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্লাবনের সাহায্যে জলসেচের জন্য তিনি নিম্নলিখিত উপায় নির্দ্দেশ করেন :—

(১) নদীতীর হইতে ক্রমশঃ নিম্নগামী স্থলভাগের উপর সুদীর্ঘ খাল খনন করা—যাহাতে এই খালের মধ্য দিয়া যথেষ্ট পরিমাণ নদীর জল প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে বৃষ্টির জলের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদ্দারা স্থলভাগ উর্ব্বর হইবে এবং দেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইবে।

(২) যথোপযুক্ত দূরে দূরে এই সমস্ত খাল খনন করিতে হইবে।

(ক) যাহাতে সমগ্র স্থলভাগ উপযুক্তরূপে প্লাবনের জলে ডুবিয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) যাহাতে এই সমস্ত খালের মধ্য দিয়া নদীর জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া পুষ্করিণীগুলি পূর্ণ করিতে পারে, জলের আগাছা ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, মশক বিনাশ করিতে পারে এবং পরিষ্কার পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(গ) ভূগর্ভে যে জলস্রোত প্রবাহিত হয় নদীনালা না থাকিলে তাহা শুকাইয়া যায়। উপরি উক্ত খালের দ্বারা এই ভূগর্ভস্থ জলস্রোতের সহায়তা করিতে হইবে।

(৩) খাল এবং কানোয়ারগুলি অগভীর এবং প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই বালিমাটীযুক্ত নদীর জল অনায়াসে এই নালা দিয়া প্রবাহিত হইতে পারিবে এবং বালুকাযুক্ত নদীর তলদেশের জল তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(৪) বর্ষাকালে অতিরিক্ত বারিপাতের ফলে নদীতে যে অতিরিক্ত জল জমে, তাহা এই সমস্ত খাল ও কানোয়ার দ্বারা বাহির করিয়া নিতে পারিলে ভবিষ্যতে আশঙ্কা দূর হইবে—আকস্মিক প্লাবনের ভয় আর থাকিবে না।

তিনি আরও বলেন যে, বাঙ্গালা দেশে এরূপ অনেক খাল ও কানোয়ার আছে, এগুলিকে ইঞ্জিনিয়ারদের অনেকে শাখানদী কেহ কেহ সিঞ্চনের খাল বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলি বঙ্গের প্রাচীন শাসন-

কর্ত্তাদের চেষ্টাতেই খনিত হইয়াছিল—এগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন হয় নাই।

সরকারী সেচবিভাগ প্রাচীন সেচপ্রণালীর ব্যবস্থা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া এযাবৎ ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়া আসিতেছেন। তাই দামোদর নদের তীরে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে—যাহার ফলে এক বৎসরে ৫৪ স্থলে সেই বাঁধ ভগ্ন হইয়াছে। অথচ সময় থাকিতে ৪।৫ স্থলে ছিদ্র রাখিয়া খাল করিয়া দিলেই প্লাবনের ধ্বংসলীলা হইতে দেশ বাঁচিয়া যাইত। বাঙ্গালা দেশে মাদ্রাজের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করা হইয়াছে। বাঙ্গালার প্রাচীন নদীনালাগুলির সংস্কার না করিয়া প্লাবনের সাহায্যে সিঞ্চনের অনুপযুক্ত করিয়া পুনরায় সেগুলিকে কৃত্রিমতাদ্বারা সিঞ্চনের উপযুক্ত করার চেষ্টা হইয়াছে। নদীর তীরে উচ্চ বাঁধ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ছিদ্রপথ রাখা হয় নাই। ইহার ফলে পুরাতন খালগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং প্লাবনের দ্বারা শস্যক্ষেত্র ডুবাইয়া দেওয়ার যে ব্যবস্থা তাহার বিঘ্ন হইয়াছে।

স্যার উইলিয়াম উইলকক্স যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন নদীনালাগুলি হাজিয়া মজিয়া যাওয়াতেই যে দেশের উর্ব্বরতা শক্তি দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই সব নদীনালা খনন করাইয়া দেশের সর্ব্বত্র জলস্রোত প্রবাহের সুব্যবস্থা করিলে যে দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদ উভয়ই ফিরিয়া আসিবে তাহা খুবই আশা করা যায়।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সম্ভাবিত আয়-ব্যয় (১৯৩০-৩১)

আয়

হাল ও বকেয়া ট্যাক্স আদায়	২৮১৫০০৲
গাড়ী ও পশ্বাদির ট্যাক্স	৮০০০৲
ব্যবসাদির উপর ট্যাক্স	২০০০৲
ফেরি ও খালের উপর টোল	১৯৫০০৲
জলের রেট	১০২৮৫০৲
পায়খানা ট্যাক্স	১৮৩১০০৲
পাউণ্ড, গাড়ী ও ড্রাইভার ফি, পেট্রোলিয়াম ফি ইত্যাদি	৪৪০০৲
মিউনিসিপ্যাল সম্পত্তি হইতে আদায়	৮৪১১৫৲
গভর্ণমেন্ট দান ও গ্রাণ্ট	১৭৪৪৬৲
স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইতে	৭২০০৲
অন্যান্য কারণে	৬৫০০৲
বিবিধ	৭০০০৲
ঋণ	৬০০০০৲
অগ্রিম ও ডিপজিট	৭০০০৲
মোট	৮৫৪১১১৲
গত বৎসরের উদ্বৃত্ত তহবিল	৪৭৮৮৯৲
মোট	৯০২০০০৲

ব্যয়

সাধারণ কার্য্যনির্ব্বাহ এবং ট্যাক্স আদায়ী খরচ	৪৫৩২০৲
সাধারণের সুবিধার্থ	৪৯৫৮৮৲
স্বাস্থ্য	৫৪৩৩৪১৲
শিক্ষা	২৮৫৮৮৲
সাধারণ বিষয়ে দান	২১৪০৲
বিবিধ	১৯৮২৪৲
ঋণ ইত্যাদি	১৫০৪১০৲
মোট ব্যয়	৮৬১০৯১৲
সম্ভাবিত উদ্বৃত্ত তহবিল	৪০৯০৯৲
মোট	৯০২০০০৲

বাঙ্গালা দেশে পাঠশালা

বাঙ্গলার জেলাবোর্ড সকলের অধীন ৪৭ হাজার ৯ শত পাঠশালা আছে। ইহার মধ্যে ১১ হাজার ৯ শত ৭৫টী বালিকা বিদ্যালয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা ১৬ লক্ষ ১৫ হাজার ১ শত।

টাঙ্গাইলে খালের সংস্কার

করটীয়ার জমিদার মেহেদি আলী খানাপণি সাহেব কৃষি, স্বাস্থ্য ও জলপথে চলাচলের সুবিধার জন্য করালিয়াপাড়া গ্রামে একটি খাল পুনঃ খনন করিয়া দিয়াছেন। যুবক জমিদার খানপণি সাহেব স্বহস্তে খনন কার্য্য করেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার তিন শত প্রজা এই কার্য্যটী শেষ করিতে যথাশক্তি পরিশ্রম করে। প্রায় ৫০ খানা পতিত জমি এই খাল খনন করায় আবার কৃষিযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই খাল বন্ধ হইয়া যাওয়াতে কয়েক হাজার চাষী চাষাবাদের জন্য গৃহ ছাড়িয়া আসাম চলিয়া গিয়াছিল। (টাঙ্গাইল হিতৈষী)

বঙ্গদেশে রাজপথের উন্নতি

প্রাদেশিক রাস্তা সংস্কার বোর্ড চট্টগ্রামে ৫ লক্ষ, কুমিল্লায় ২॥০ লক্ষ, ঢাকায় ৫ লক্ষ, যশোহরে ৪॥০ লক্ষ, পাবনায় ৫ লক্ষ, এবং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের জন্য ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উহাদ্বারা কাঁচা রাস্তা পাকা করা হইবে, পুল নির্ম্মাণ করা হইবে ও ভগ্ন রাস্তার সংস্কার করা হইবে।

যাদবপুরে কৃষিশিক্ষা

যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্‌নলজি (পূর্ব্বের নাম বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট) কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হইতে ৯২ বিঘা জমি গ্রহণ করিয়া কৃষি কলেজ স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কর্পোরেশন মাসিক ২০০৲ শত টাকা খাজনায় এই জমি কলেজকে প্রদান করিবেন। কর্পোরেশন প্রতি বৎসর ২টী ছাত্রকে ঐ কলেজে কৃষি বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠাইবেন।
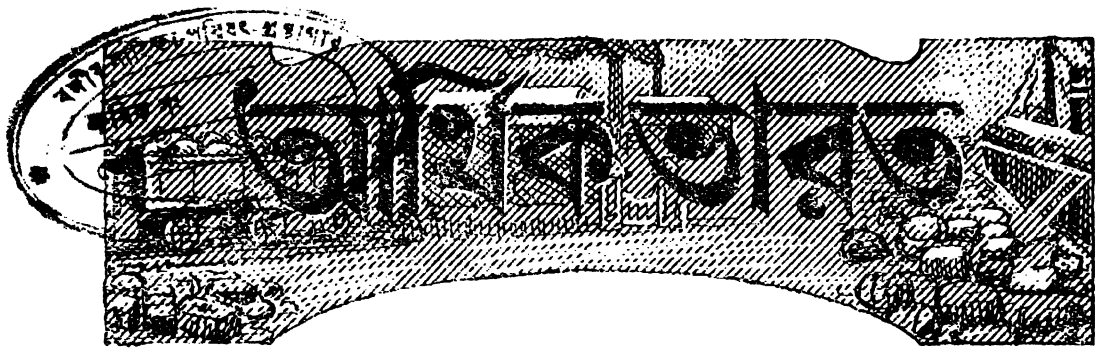
ভারতীয় জাহাজ-কোম্পানী বাড়াইবার চেষ্টা

ভারতীয় উপকূল-বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজের করতলগত রাখিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে যে বিল উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা সিলেক্ট কমিটি হইতে কি মূর্ত্তি লইয়া বাহির হইয়াছে, তাহার পরিচয় গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। বিলটীর ভিতরকার কথা সংক্ষেপে নীচে দেওয়া গেল :—

ভারতীয় উপকূল-বাণিজ্যের জন্য প্রতি বছর মোট কত টনেজের জাহাজ দরকার, তাহা সপরিষদ বড়লাট আন্দাজ করিয়া ঠিক করিবেন। ইহার পর, তাঁহার আন্দাজটা সাধারণের নিকট প্রচার করিবেন। যদি কাহারও কিছু বলিবার থাকে তাহা শুনিয়া সেই আন্দাজটা শোধরাইয়া লওয়া হইবে। তাহার পর, যে সব জাহাজ ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যে রত হইতে চায়, তাহাদিগকে লাইসেন্সের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। বিনা লাইসেন্সে কেহ উপকূল-বাণিজ্যে লাগিতে পারিবে না। লাইসেন্সের আবেদনের সময় যে জাহাজের জন্য লাইসেন্সের প্রার্থনা করা হইতেছে, তাহা ভারতীয় কর্ত্তৃক চালিত কিনা তাহা খুলিয়া বলিতে হইবে। আবেদনের সময় জামিন দিতে হইবে। জামিন ৫০,০০০৲ টাকার বেশী হইবে না। একটী পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তারিখে যে সব জাহাজ ভারতীয়-চালিত থাকিবে, কেবল প্রথম বছরে তাহারাই লাইসেন্স পাইবে। দ্বিতীয় বছরে মোট আবশ্যক টনেজের ১/৪ ভাগ, তৃতীয় বছরে ১/২ ভাগ, চতুর্থ বছরে ৩/৪ ভাগ এবং পঞ্চম বছরে ও তাহার পরে সমস্তটাই ভারতীয়-চালিত জাহাজ পাইবে। চতুর্থ বছর পর্য্যন্ত ভারতীয়-চালিত জাহাজকে মোট বাণিজ্যের যত অংশ দেওয়া যাইতেছে তত জাহাজ যদি আবেদন না করে, তাহা হইলে অ-ভারতীয় জাহাজকেও লাইসেন্স দেওয়া চলিবে। উপকূল-বাণিজ্যের জন্য যদি লাইসেন্স-ওয়ালা জাহাজ আদবে না পাওয়া যায়, অথবা যদি লাইসেন্স-ওয়ালা জাহাজগুলা উপকূল-বাণিজ্যের পক্ষে যথেষ্ট না হয়, অথবা সাধারণের স্বার্থের জন্য যদি দরকার হয়, তাহা হইলে উপকূল-বাণিজ্যে ঊর্দ্ধতম ৩ মাস যাবৎ লাগিবার জন্য স-পরিষদ্ বড়লাট 'পারমিট' দিতে পারেন।

বিনা লাইসেন্সে উপকূল বাণিজ্যে রত হইলে অথবা লাইসেন্সের সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে অথবা জানিয়া শুনিয়া কোন মিথ্যা কথা বলিলে ৬মাস কারাবাস বা ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তিই হইতে পারে।

যদি কোন কোম্পানীকে শাস্তি দিতে হয় তাহা হইলে কোম্পানী চালনার ভার যাঁহার উপর (যেমন ম্যানেজার অথবা সেক্রেটারী) তিনিও শাস্তি পাইবেন। তবে, এরূপ লোক যদি প্রমাণ করেন যে, তাঁহার অজ্ঞাতে বা অসম্মতিতে এই আইন ভঙ্গ করা হইয়াছে তাহা হইলে তিনি শাস্তি পাইবেন না।

"ভারতীয়-চালিত জাহাজ" কথার অর্থ—

(১) গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত জাহাজ ;

(২) কোন "ভারতীয়"র অধিকৃত (অথবা নিযুক্ত হইলে, নিযুক্ত ও অধিকৃত) জাহাজ ;

("ভারতীয়" কথার অর্থ বৃটিশ ভারতের প্রজা, অথবা ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের রাজা বা প্রজা)

(৩) কোন ভারতীয় কোম্পানীর অধিকৃত (অথবা নিযুক্ত হইলে, নিযুক্ত ও অধিকৃত) জাহাজ ;

এরূপ ভারতীয় কোম্পানীর ভারতে স্থাপিত ও

রেজিষ্ট্রীকৃত হওয়া চাই; যদি "কোম্পানী" হয় ইহার শতকরা ৭৫ ভাগ ষ্টক ভারতীয়ের হাতে থাকা চাই; যদি কর্পোরেশন" বা "পার্টনারশিপ" হয়, ইহার শতকরা ৭৫ ভাগ মূলধন ও ইহার লাভের শতকরা ৭৫ ভাগ পাইবার অধিকার ভারতীয়ের থাকা চাই; কোম্পানীটী ভারতীয়দের স্বার্থেই চালিত হওয়া চাই; ইহার চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টার ভারতীয় হওয়া চাই এবং ডিরেক্টারদের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতীয় হওয়া চাই; ভোট দিবার অধিকারের ৭৫ ভাগ ভারতীয়দের হাতে থাকা চাই। যদি এমন কোন চুক্তি বা বন্দোবস্ত থাকে যাহাতে কোন ভারতীয় কোন অ-ভারতীয় লোকের জন্য ভোট দিতে বাধ্য, তাহা হইলে ভোটটী ভারতীয়ের দিবার অধিকার আছে বলিয়া ধরা হইবে না।

"উপকূল-বাণিজ্য" কথার অর্থ—যদি কোন জাহাজ এডেন বা পেরিম ছাড়া যে কোন ভারতীয় বন্দর হইতে, এডেন বা পেরিম ছাড়া যে কোন বন্দরে মাল বা যাত্রী বহিতে রত হয়, তাহা হইলে উহা ভারতীয় উপকূল-বাণিজ্যে রত আছে বলিয়া ধরা হইবে।

বিলাতের গভর্মেণ্টের জাহাজ, ভারত-গভর্মেণ্টের জাহাজ এবং যে কোন বিদেশী রাজা বা রাষ্ট্রের জাহাজ (যদি তাহা ব্যক্তিগত লাভের কাজে নিযুক্ত না হইয়া সাধারণের কাজে নিযুক্ত হয়) এই আইন কর্তৃক শাসিত হইবে না।

ভারতের ঋণ

ভারতবাসী প্রতি ব্যক্তির গড়ে দৈনিক আয় ছয় পয়সা, সুতরাং বৎসরে আয় ৩৪৶১০। হাউস অব্ কমন্সে ভারতসচিব মিঃ ওয়েজউড বেন বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের নিকট ভারতের দেনা লোক পিছু গড়ে ৪২৲ টাকা। তাহা হইলে সারা বৎসরে ভারতবাসী যাহা আয় করে তদপেক্ষা তাহার ঋণ শতকরা প্রায় ২২ টাকা বেশী। অথচ ভারতসচিব বলিয়াছেন যে, ভারত পৃথিবীর মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতার জন্য ভাগ্যবান।

ভারতের জন্য ঋণ

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, ভারতবর্ষের জন্য যে ঋণ গৃহীত হইয়াছে, তাহার জন্য সাতগুণ অধিক টাকা দিবার দরখাস্ত পড়িয়াছিল। এ জন্য ঐ সকল ঋণদাতারা যে পরিমাণ ঋণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহাদিগের আবেদনের সহিত তাহার একটা অনুপাত স্থির করিয়া ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে। যাহারা ১০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারা ১৪,৭০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ঋণের বণ্ড পাইবেন; কিন্তু যাঁহারা হাজার পাউণ্ড বা তদপেক্ষা কম টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহারা এক শত পাউণ্ডের অধিক টাকার বণ্ড পাইবেন না।

ঋণ গৃহীত হইবার অব্যবহিত পরেই বণ্ডের ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছিল। প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে অর্থাৎ শতকরা প্রায় এগার আনা অধিক মূল্য দিয়া লোকে ভারতের ঋণের বণ্ড লইয়াছিল।

সিগারেটে দেশের অর্থ-শোষণ

প্রতি বৎসরই এ দেশে বিদেশী তামাকের সিগার ও সিগারেট প্রভৃতির আমদানি বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারী হিসাব হইতে এ সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায়, নিম্নে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি।

বিগত পাঁচ বৎসরে সিগারের আমদানি বৃদ্ধির নমুনা:—

খৃষ্টাব্দ	মূল্য
১৯২৪-২৫	১,৭৪,৮৫৯৲
১৯২৫-২৬	২,০৫,২৭৭৲
১৯২৬-২৭	১,৬৬,৭৬৯৲
১৯২৭-২৮	২,০০,৮৬৪৲
১৯২৮-২৯	২,৭৪,২১৮৲

ঐ পাঁচ বৎসরে সিগারেটের আমদানি যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার পরিচয়:—

খৃষ্টাব্দ	মূল্য
১৯২৪-২৫	১,২০,৮৩,৪২৩৲

খৃষ্টাব্দ	মূল্য
১৯২৫-২৬	১,৫৮,৮০,৭২১৲
১৯২৬-২৭	১,৯৪,৬১,১৪৮৲
১৯২৭-২৮	২,৩৯,৯৬,৩১৯৲
১৯২৮-২৯	২,৪০,৯০,২৬০৲

এইরূপে এদেশে বিগত পাঁচ বৎসরে সর্ব্বপ্রকারের বিদেশী তামাক যত টাকার আমদানি হইয়াছে সরকারী রিপোর্ট অনুসারে তাহার হিসাবঃ—

খৃষ্টাব্দ	মূল্য
১৯২৪-২৫	১,৯৭,৮৮,৩৯৫৲
১৯২৫-২৬	২,১৩,৩৫,৫৪৩৲
১৯২৬-২৭	২,৫৬,১০,৬৬৯৲
১৯২৭-২৮	২,৯১,৩২,৩৪৬৲
১৯২৮-২৯	২,৯৪,৫৯,৫২৮৲

বঙ্গদেশে সিগার ও সিগারেট কাট্‌তির হিসাবঃ—

খৃষ্টাব্দ	মূল্য
১৯২৪-২৫	৪৭,৩০,৯৪৯৲
১৯২৫-২৬	৪৭,৩০,৯৪৯৲
১৯২৬-২৭	৫৬,৩২,২৩৯৲
১৯২৭-২৮	৭৬,০১,৯৩২৲
১৯২৮-২৯	৭৮,৬৮৮৩৩৲

মাদক দ্রব্যে সরকারের আয়

সমগ্র ভারতে মাদক দ্রব্য হইতে সরকারের মোট ২০ কোটি টাকা আয় হইয়া থাকে। আবগারী বাবদে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আয় হয় মাদ্রাজে, ইহার পরিমাণ ৫ কোটি টাকার উপর। তাহার পরে বোম্বাইয়ের স্থান। ১৯২৬-২৭ সনে বোম্বাইয়ে ৪ কোটি টাকার উপর আবগারী আয় হইয়াছে। বাংলা দেশে গত ৫ বৎসরের আবগারীর আয় ও ব্যয় নিম্নরূপ ছিলঃ—

	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
১৯২৪-২৫	২ কোটি ১৫ লক্ষ	১১ লক্ষ
১৯২৫-২৬	২ কোটি ২৮ লক্ষ	২৫ লক্ষ
১৯২৬-২৭	২ কোটি ২৫ লক্ষ	২৪ লক্ষ
১৯২৭-২৮	২ কোটি ২৪ লক্ষ	২৩ লক্ষ
১৯২৮-২৯	২ কোটি ২৫ লক্ষ	২৩ লক্ষ

ভারতে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী (জানুয়ারী ১৯৩০)

১৯৩০ সনের জানুয়ারী মাসে ভারতে মোট ৭৫টী জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী রেজিষ্টারী করা হয় এবং ইহাদের মোট অথরাইজ্‌ড পুঁজি ২,৬৫ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ব মাসে ৭৬টী কোম্পানী ১,৮৪ লক্ষ টাকা পুঁজি লইয়া রেজিষ্টারী হয়। এবং পূর্ব্ব বৎসরের জানুয়ারী মাসে ৮৭টী কোম্পানী ৫,৪৬ লক্ষ টাকা পুঁজি সহ রেজিষ্টারী হইবার সংবাদ পাওয়া যায়। আলোচ্য মাসে হায়দারাবাদে ২টি কোম্পানী ৮৭ লক্ষ টাকা পুঁজি সহ এবং মাদ্রাজে ১২টী কোম্পানী ৭৩ লক্ষ টাকা পুঁজি সহ রেজিষ্টারী হয়। আলোচ্য মাসে যতগুলি জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী রেজিষ্টারী হয় তাহাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় হইতেছে হায়দারাবাদের জেনারেল ডেভেলপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন। ইহার অথরাইজড্‌ পুঁজির পরিমাণ ৮৬ লক্ষ টাকা।

আলোচ্য মাসে মোট ১১টী লিমিটেড্‌ কোম্পানী মোট ২৬ লক্ষ টাকা অথরাইজড্‌ পুঁজি সহ ব্যবসা উঠাইয়া দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটা লিকুইডেশনে গিয়াছে, কোনটা বা ব্যবসা পরিচালনায় অক্ষম হইয়া কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ১৯৩০ সনের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে যে পাঁচটি কোম্পানী ১,৪৬ লক্ষ টাকা অথরাইজ্‌ড পুঁজি লইয়া লিকুইডেশনে গিয়াছিল তাহাদের ব্যবসা আলোচ্য মাস হইতে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

যতগুলি জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী পূর্ব্ব হইতেই খাড়া ছিল আলোচ্য মাসে তাহাদের অথরাইজড্‌ পুঁজি মোট নিট্‌ ২৫,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১নং তালিকা

বৃটিশ ভারতে এবং মহীশূর, বড়োদা, হায়দারাবাদ, ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ১৯৩০ সনের জানুয়ারী মাসে যতগুলি জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী রেজিষ্টারী হইয়াছে এবং ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩০ সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত দশ

মাসে এবং ১৯২৮-২৯ সনের ঠিক ঐ সময়ে কত কোম্পানী রেজিষ্টারী হইয়াছে তাহার হিসাব একত্রে নীচের তালিকায় দেখান হইয়াছে :—

কোম্পানীর শ্রেণী-বিভাগ	জানুয়ারী				এপ্রিল হইতে জানুয়ারী দশ মাসের সংখ্যা			
	১৯২৯		১৯৩০		১৯২৮-২৯		১৯২৯-৩০	
	কোম্পানীর সংখ্যা	পুঁজি (হাজার টাকা)	কোম্পানীর সংখ্যা	পুঁজি (হাজার টাকা)	কোম্পানীর সংখ্যা	পুঁজি (হাজার টাকা)	কোম্পানীর সংখ্যা	পুঁজি (হাজার টাকা)
১। (ক) ব্যাঙ্কিং, লোন কোং	৩৬	৯১,৪০	৩০	১০০,৬০	২৩৪	৩১৯,৮৩	২২৭	৩১,৪৪,১৮
(খ) ইনশিওরেন্স কোং	৩	২,৪০	৭	৯,৬০	১৩	৩৯,২০	৫০	৮,২৮,১৬
২। যানবাহন কোম্পানী	১	২০০	২	১,৫১	২০	১৬০,০০	৩৪	২,১৮,৮৫
৩। বাণিজ্য ও উৎপাদন-কারী কোম্পানী	৩৩	১৮১,৩০	২৫	৪৭,৮০	২১৫	৯৬৮,৩৯	২৩৭	৬,১১,০৭
৪। মিল্ এবং প্রেস	৮	৬১,০৬	২	২,০০	৩০	২৪০,৫১	৩৬	২,৩২,৭৮
৫। চা প্রভৃতি কোং	২	৬,০০	৫	১১,৫০	২৪	৩৩,৫৮	২৯	৭৩,১৫
৬। খনিজ প্রভৃতি কোং	২	২০০,৭৫	—	—	৮	২৬৩,৪৫	৯	১,০০,২০
৭। সম্পত্তি জমি ও ইমারত সম্বন্ধীয় কোং	—	—	—	—	৮	১৫৩,৩৫	৬	৩,৬১
৮। মদ্য প্রস্তুতকারক ও শোধক কোং	—	—	—	—	১	১,০০	—	—
৯। চিনি-উৎপাদনকারী কোং	—	—	—	—	১	১০,০০	—	—
১০। হোটেল, থিয়েটার ও রেস্তোরা	১	১,০০	৩	৪,৯৬	১৪	৩২,৮৬	২৫	৯৭,০১
১১। অন্যান্য	১	২	১	৮৫,৭১	১২	১৫,২৩	১০	১,২৯,৩২
মোট	৮৭	৫৪৫,৯৩	৭৫	২,৬৪,৬৮	৫৮০	২২,০৭,৪০	৬৬৩	৫৪,৩৮,৪২

২নং তালিকা

১৯৩০ সনের জানুয়ারী মাসে এবং ১৯২৯-৩০ ও ১৯২৮-২৯ সনের এপ্রিল হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত দশ মাসে কতগুলি জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী কার্য্য বন্ধ করিয়াছে, লিকুইডেসনে গিয়াছে অথবা অন্য ভাবে কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে নীচের হিসাবে তাহাই দেখান হইয়াছে :—

কোম্পানীর শ্রেণী-বিভাগ	জানুয়ারী ১৯২৯ কোম্পানীর সংখ্যা	জানুয়ারী ১৯২৯ পুঁজি (হাজার টাকা)	জানুয়ারী ১৯৩০ কোম্পানীর সংখ্যা	জানুয়ারী ১৯৩০ পুঁজি (হাজার টাকা)	এপ্রিল হইতে জানুয়ারী দশ মাসের সংখ্যা ১৯২৮-২৯ কোম্পানীর সংখ্যা	১৯২৮-২৯ পুঁজি (হাজার টাকা)	১৯২৯-৩০ কোম্পানীর সংখ্যা	১৯২৯-৩০ পুঁজি (হাজার টাকা)
১। ব্যাঙ্কিং লোন ও ইন্সিওরেন্স কোং	—	—	—	—	২৫	৪১৫,৩০	২১	২৫৮,৯৭
২। যানবাহন ও মাল চলাচল কোং	—	—	—	—	৬	'৫৬,১০	৫	'২৭,৫০
৩। বাণিজ্য ও উৎ-পাদনকারী কোং	১৫	২১৭,৮৭	৬	৯,০০	১০৩	৬১৭,৯৯	১০৫	৩৯৭,৪৮
৪। মিল্ এবং প্রেস্	২	১১,০০	৩	১১,৩৯	১৯	১৯২,৬৫	২৪	২৪৯,০৯
৫। চা প্রভৃতি কোং	—	—	—	—	৬	৩৪,৬০	৪	৯,০০
৬। খনিসংক্রান্ত কোং	১	৬,০০	১	৬,০০	১০	৯২,৫০	৭	৩০,৩৫
৬। সম্পত্তি জমাজমি ও ইমারত সংক্রান্ত কোং	—	—	—	—	৩	১০০,০০	১	১০০,০০
৮। মন্ত্র সংক্রান্ত কোং	—	—	—	—	—	—	—	—
৯। চিনি সংক্রান্ত কোং	—	—	—	—	২	১০,০০	১	১০,০০
১০। হোটেল, থিয়েটার প্রভৃতি কোং	১	৫	১	১০	৫	৩,৪৮	৫	২,৬২
১১। অন্যান্য	—	—	—	—	৩	২,২০	৩	২,২৫
মোট	১৯	২৩৪,৯২	১১	২৬,৪৯	১৮২	১৪,২৪,৮২	১৭৫	১০,৭৩,৫৩

ভারত ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড্

ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত পঞ্চবার্ষিক লাভ-বণ্টনের হিসাব (ভেলুয়েশন রিপোর্ট) একখণ্ড আমরা পাইয়াছি। গত ১৯২৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে তন্মধ্যে জীবন বীমা বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব করিয়া বিলাতের একচুয়ারিস্ মেসার্স বেকন অ্যাণ্ড উড্রো যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা পাঠে দেখা যায় যে, কোম্পানীর কার্য্য পূর্ব্বের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, যথা :—

	১৯২৩	১৯২৮
পলিসীর সংখ্যা	১০,৬৬২	২৪,৭৯৬
বীমার পরিমাণ	১,৮৭,১১,৫২৮	৫,১৩,৮১,৪৯৩
বাৎসরিক প্রিমিয়াম	৯,৫৫,৮১৭	২৫,৬৬,১৮৯
জীবনবীমা ফণ্ড	৪৩,৪২,০৭৭	৮৭,৩৭,৬৫০

হিসাব পরীক্ষার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, কোম্পানীর ১২,৩০,৬৯৩৲ টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে এবং কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ একচুয়ারিস্‌দিগের উপদেশানুযায়ী প্রতি হাজারে বাৎসরিক আজীবন বীমায় ২৫৲ টাকা এবং এণ্ডাউমেন্ট বীমায় ২০৲ টাকা, লভ্যাংশ (বোনাস) ঘোষণা করিয়াছেন।

এত উচ্চ হারে বোনাস্ দেওয়া কোম্পানীর পক্ষে অতিশয় গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

সুদের হার সম্বন্ধে রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, মোটের উপরে শতকরা ৫,৫১১ সুদ লাভ হইয়াছে। ইহা অতিশয় সন্তোষজনক। মৃত্যুর হার উক্ত পাঁচ বৎসরের হিসাবে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কম হইয়াছে। যে মৃত্যুসংখ্যা ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহার চেয়ে শতকরা প্রায় ৩৫টী কম হইয়াছে। ইহার দ্বারা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বীমার প্রস্তাব বিশেষ সতর্কতার সহিত গৃহীত হয়—যাহা সকল কোম্পানীরই করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

আমরা ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীগুলির উন্নতি চিরকালই প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি; বিদেশী কোম্পানী যাহাতে এ দেশ হইতে আর অর্থ শোষণ করিয়া না নিতে পারে তজ্জন্য স্বদেশের হিতকামী ব্যক্তি মাত্রেরই আন্তরিক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর মত অন্য সব দেশীয় কোম্পানীগুলি জীবন বীমাক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করুক, ইহাই আমাদের কামনা।

(জীবনবীমা)

ভারতবাসীর কেরোসিনের টিন

ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক কি পরিমাণে টিনের পাত্র ও বাসনকোসন ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা যিনি ভারতের গ্রামে গ্রামে ও বাজারে বাজারে ঘুরিয়াছেন তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সকল টিন প্রায়শঃ মিস্ত্রীরা কেরোসিনের টিন হইতেই কাটিয়া লয়। কেরোসিনের টিন ভারতের কুটীরশিল্পের উপাদান যোগাইতেছে।

'টিন' বলিতে প্রকৃতপক্ষে ইস্পাতের পাতলা পাত বুঝায়। ভারতের ইস্পাত বিহার প্রদেশের টাটানগরে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ইস্পাতের উপর একপ্রকার কোমল পালিস ধরানো হইয়া থাকে। প্রথমে লৌহপিণ্ড ৪০০০ ডিগ্রীবিশিষ্ট অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। তৎপরে উহা হইতে যে লৌহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে খাদ মিশ্রিত করিয়া পরিশেষে পাতে পরিণত করা হয়। এই পাত উৎপন্ন হইলে ইহাকে টিনপ্লেট কোম্পানীর কারখানায় প্রেরণ করা হয়।

এই কারখানায় পাতগুলি আকার অনুযায়ী কর্ত্তন করা হইলে পর পুনরায় ভাপযোগে দগ্ধ করা হয় এবং এই প্রকার বহু প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিশেষে উহাকে পাতলা পাতে রূপান্তরিত করা হয়। পরিশেষে ইহাতে সালফিউরিক এসিড যোগ করা হয়। তৎপরে এই পাতগুলিকে এনিলিন পাতে সাজাইয়া রাখা হয় এবং ২২ ঘণ্টাকাল অগ্নিকুণ্ডের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে পাতগুলি নমনীয় হয়। তৎপরে পুনরায় পাতগুলিকে একে একে পালিস করা হয়, এসিডে সিক্ত করা হয় ও ধৌত করা হয়। পরিশেষে দস্তা ক্লোরাইডে ধৌত করিয়া টিনে পরিণত করা হয়। ইহাকে রোলার ট্যাঙ্কে রাখা হয়। তৎপরে খারাপ পাতগুলিকে বাছিয়া ফেলা হয়। বাকীগুলিকে কাটিয়া চৌকা আকারে পরিণত করা হয়। তৎপরে পাতগুলিকে প্যাক করিয়া বেশ আঁটিয়া দেওয়া হয়। এই প্যাকেটগুলি বর্ম্মা-সেলের যেসকল কারখানা আছে ঐ সকল কারখানায় প্রেরণ করা হয়। এইসকল কারখানা বন্দরে বন্দরে অবস্থিত। উক্ত পাতগুলিকে কারখানায় কেরোসিনের টিনের আকারে পরিণত করা হইয়া থাকে।

উল্লিখিত উপায়ে পাত প্রস্তুত করিতে সর্ব্বসমেত ১১ দিন লাগে। টিনপ্লেট কারখানায় ৬ দিনে কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। জগতে এই জাতীয় যতগুলি কারখানা আছে, তাহাতে যে কাজ হয় তাহার তিন গুণ কাজ একই সময়ে এই কারখানায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকার উন্নত প্রণালীতে কার্য্য করিবার পদ্ধতি এখানে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই কারখানার অট্টালিকা সুউচ্চ, মেঝে সুশীতল ও বাহিরের নির্ম্মল বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। এতদুপরি শ্রমিকদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৫ জনকে কোম্পানী নিজ ব্যয়ে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে দিতেছেন। শ্রমিকদের বাসা যেরূপ সাধারণতঃ চারিটি দেওয়ালের উপর ছাদ

চাকা থাকে, এই কারখানার শ্রমিকদিগের বাসা সেরূপ নহে। এই সকল বাসা উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত।

(বার্ম্মা শেল বুলেটিন)

চর্ম্ম-ব্যবসায়ের উন্নতি

চর্ম্ম ব্যবসায় ভারতে অর্থাগমের এক প্রধান উপায়। ভারতের চর্ম্ম যাহাতে উৎকৃষ্ট হইতে পারে, গভর্ণমেণ্ট তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। কিন্তু অর্থ ভিন্ন উন্নতিবিধান করা সম্ভব নয়। তাই এই প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, চামড়া রপ্তানি ট্যাক্সের কিয়দংশ ভাল চামড়া তৈয়ারীর জন্ত ব্যয় করা উচিত।

ভারতীয় কলের সূতা ও কাপড়

গত এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে ভারতীয় কলগুলিতে সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল ৫২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড; কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল ৩৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। ঐ ৮ মাস সময়ে সমুদ্রপথে ভারতীয় কলের সূতা রপ্তানি হইয়াছিল ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। পূর্ব্ব দুই বৎসরই ইহা অপেক্ষা কম রপ্তানি হইয়াছিল। ১ হইতে ২৫ নম্বর পর্য্যন্ত মোটা সূতা গত নভেম্বর মাসে ৬ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ সময় ঐরূপ নম্বরের সূতা ১ লক্ষ ১১ হাজার পাউণ্ড মাত্র আমদানি হইয়াছিল। মাঝারি রকমের ২৬ হইতে ৪০ নম্বর পর্য্যন্ত সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড; সরু সূতা (৪০ নম্বরের ঊর্দ্ধে) প্রস্তুত হইয়াছিল ১১ লক্ষ ৮ হাজার পাউণ্ড। ঐ দুই রকমের সূতা বিদেশ হইতে আমদানি হইয়াছিল যথাক্রমে ১৫ লক্ষ ২৯ হাজার ও ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার পাউণ্ড।

(পঞ্চায়েৎ)

ভারতে হাজার কোটি পাউণ্ড বিলাতী পুঁজি

ভারতে যে কি পরিমাণ বিলাতী পুঁজি খাটিতেছে তাহার একটা আংশিক আভাস পাওয়া যায় রপ্তানি বাণিজ্যের বহর পর্য্যালোচনা করিলে; কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে বিদেশী পুঁজি যে কত প্রকারে এদেশে আস্তানা গাড়িতেছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন ব্যাপার তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে আবার তাহা নিছক কল্পনামূলক হইয়া দাঁড়ায়।

বাস্তবিক পক্ষে অ-ভারতীয়দের পুঁজি নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায়ে ভারতভুমিতে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে :— (১) সরকারী ঋণের সাহায্যে; (২) মিউনিসিপ্যালিটি এবং অন্যান্য পাবলিক প্রতিষ্ঠানকৃত ঋণরূপে; (৩) ভারতের বাহিরে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর শেয়াররূপে এবং ভারতস্থ জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর শেয়াররূপে; (৪) জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী ছাড়া অন্যান্য নানাপ্রকার শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে।

ভারতীয় ঋণের প্রকার-ভেদ

উপরে যে চার প্রকার ঋণের উল্লেখ করা গেল তাহার মধ্যে শেষোক্ত প্রকার ঋণটী নিতান্ত গোলমেলে ধরণের। তবে এই খাতেই বিদেশী পুঁজি জমায়েৎ হইয়াছে সব চেয়ে বেশী। শেষের তিনটীর বেলায় কিছু কিছু মাপজোক মিলে। কিন্তু একমাত্র সরকারী ঋণ ছাড়া অন্যান্য পুঁজির মাপজোক হয় খুব বেশী পুরাতন, না হয় নিতান্ত মোটামুটি ধরণের। ঠিক মাপজোক করা খুব শক্ত ব্যাপার।

গবর্মেণ্টের হিসাবের খাতায় কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট, প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটী এবং অন্যান্য পাবলিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। পোর্ট ট্রাষ্ট, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ঋণের পরিমাণ সম্বন্ধেও অনেকটা খাঁটি তথ্য মিলে। এই সমস্ত ঋণের সংস্থান হইয়াছে প্রধানতঃ বিলাতী পুঁজি-ওয়ালাদের দ্বারা। তবে সম্প্রতি এই সমস্ত ঋণের কতকটা অংশ ভারতীয়দের তাঁবেই ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখনও এই সমস্ত ঋণের অধিকাংশই বৃটিশের হাতে। বৃটিশজাতি ছাড়া অন্যান্য জাতির মিলিত অংশ এখনও বৃটিশের অংশকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

১৯২৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-সচিবের

হিসাবে প্রকাশ গবর্ণমেণ্টের ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ২৬১,০০০,০০০ পাউণ্ড। এ ছাড়া রেলওয়ে বাবদ যে ধার করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ ১২০,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই ঋণের জন্যও দায়ী ভারত সচিব।

ভারতের সমর ঋণ

সরকারী ঋণ এবং রেলওয়ে ঋণ ছাড়া ভারতবর্ষের আর এক প্রকার ঋণ আছে। লড়াইয়ের সময় ভারত স্বেচ্ছায় লড়াইয়ের খরচের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছে। তাহারই জের স্বরূপ এখনও বিলাতের ট্রেজারির নিকট ভারতবর্ষের ১৭,০০০,০০ পাউণ্ড ঋণ রহিয়াছে। এই ঋণ ৫% বৃটিশ ওয়ার ঋণেরই একটী অংশ বিশেষ।

উপরের এই সমস্ত ঋণ লওয়া হইয়াছে স্বর্ণমানের সাহায্যে। এ ছাড়া টাকাতেও ঋণ লওয়া হইয়াছে। এই শেষোক্ত উপায়ে যে পুঁজিওয়ালারা কত টাকা খাটাইতেছে তাহার ঠিক বিবরণ পাওয়া মুস্কিল ব্যাপার। তবে কলিকাতা বা বোম্বাইয়ের মত বড় বড় নগরের পোর্ট ট্রাষ্ট বা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট হইতে যে সমস্ত ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকারী ঋণ এবং অন্যান্য পাবলিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ বাবদ বিলাতী পুঁজির পরিমাণ প্রায় ৩৯৮,০০০,০০০ পাউণ্ডের কাছাকাছি।

ব্যবসা-বাণিজ্যে বিলাতী পুঁজি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাবদ যে কি পরিমাণ বিলাতী পুঁজি এদেশে খাটিতেছে তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না। ১৯০৯ সনের একটী হিসাবে প্রকাশ, ব্যবসা বাবদ এদেশে বিলাতী পুঁজি খাটিতেছে কমসে কম ৫০,০০০,০০০ কোটী পাউণ্ড। বর্ত্তমানে এই পুঁজি নিতান্ত কম পক্ষে যে ৭৫,০০০,০০০ কোটী পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীগুলি দুই ধরণের। কতকগুলি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর কার্য্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ভারতের বাহিরে। ১৯২৬-২৭ সনের শেষে যে সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে উহাতে প্রকাশ, এই ধরণের যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ৮৫৬টী। উহাদের পুঁজির পরিমাণ ৫৬৮,০০০,০০০ পাউণ্ড, এ ছাড়া ডিবেঞ্চার আছে। মোট ডিবেঞ্চারের পরিমাণ ১২৪,৬০০,০০০ পাঃ। নিম্নের তালিকায় এ সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া গেল :—

কোম্পানীর পরিচয়	আদায়ী মূলধন (পাঃ)	ডিবেঞ্চার (পাঃ)
ব্যাঙ্কিং, লোন এবং ইনসিওরেন্স	১২৩,০০০,০০০	৭,০০০০০০
জাহাজী কোম্পানী, ডক ইত্যাদি	৩৭,০০০,০০০	১৪,০০০,০০০
রেলওয়ে ও ট্রামওয়ে	৩৩,০০০,০০০	৩৮,০০০,০০০
ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং	৩১২,০০০,০০০	৬০,০০০,০০০
চটকল	৪,০০০,০০০	২০০,০০০
চা কোম্পানী	২৬,০০০,০০০	২,০০০,০০০
অন্যান্য প্ল্যাণ্টেশান কোম্পানী	৩,০০০,০০০	২০০,০০০
খনি	২১,০০০,০০০	২,০০০,০০০
অন্যান্য কোম্পানী	৯,০০০,০০০	১,২০০,০০০
	৫৬৮,০০০,০০০	১২৪,৬০০,০০০

এই সমস্ত কোম্পনীর মূলধনের অতি অল্প অংশই ভারতবর্ষে খাটিতেছে। বিশেষতঃ ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স এবং জাহাজ কোম্পানীগুলির অতি নগণ্য অংশ মাত্র এদেশে খাটিয়া থাকে।

চটকল ও বিলাতী পুঁজি

চটকলগুলির মধ্যে কতকগুলি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত ভারতের বাহিরে; আবার কতকগুলি টাকার পুঁজি লইয়া এই দেশেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই দুই প্রকার চটকলেই ভারতীয় পুঁজির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী এবং ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। অ-ভারতীয়দের দ্বারা চালিত মিলগুলিতেও অধিকাংশ পুঁজির অধিকারী ভারত-সন্তান। ও দিকে বোম্বাই অঞ্চলে কিন্তু অনেকটা উল্টা ব্যাপার। সেখানকার

বড় বড় তুলা, কাপড়, লোহা-লক্কড়, হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক কলকারখানা এবং কোম্পানীর পরিচালক ভারতবাসী, কিন্তু অংশীদারের তালিকায় যথেষ্ট অ-ভারতীয়ের নাম মিলিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে চা, প্ল্যান্টেশান, খনি, এবং আরও নানা প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান বাবদ মোট বিলাতী পুঁজি খাটিতেছে কমসে কম ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। অর্থাৎ গবর্মেণ্ট ঋণ এবং গবর্মেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আধা-সরকারী এবং পাবলিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ ছাড়া কেবল মাত্র শিল্প ব্যবসায় এবং কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে মোট বিলাতী পুঁজির পরিমাণ ১৭৫,০০০,০০০ পাউণ্ড।

উপরের এই অঙ্কের সহিত পূর্ব্বোক্ত ৩৯৮,০০০,০০০ পাউণ্ড যোগ করিলে মোট ৫৭৩,০০০,০০০ পাউণ্ড পাওয়া যাইতেছে। নিম্নে ইহার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া গেল :—

	পাউণ্ড
গবর্মেণ্টের ষ্টার্লিং ঋণ বাবদ	২৬১,০০০,০০০
সরকারী গ্যারাণ্টি বিশিষ্ট রেলওয়ে ঋণ বাবদ	১২০,০০০,০০০
৫% ওয়ার লোন বাবদ	১৭,০০০,০০০
ভারতে রেজেষ্টারিকৃত কোম্পানীতে বিলাতের পুঁজি	৭৫,০০০,০০০
ভারতের বাহিরে গঠিত কোম্পানীসমূহে বিলাতী পুঁজি	১০০,০০০,০০০
	৫৭৩,০০০,০০০

এই সমস্ত কোম্পানী ছাড়া আরও অনেক কোম্পানী আছে যাহার ফলভোগ ভারতবর্ষের অদৃষ্টেই জুটিতেছে। এই সমস্ত কোম্পানীর লাভ অনেক সময় আবার ভারতবর্ষেই খাটান হইতেছে। এই ধরণের বিলাতী পুঁজি সুদ্ধ ধরিলে মোট বিলাতী পুঁজির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৬০০,০০০,০০০ পাউণ্ডের উপর।

ইতিপূর্ব্বে ষ্ট্যাটুটারি কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে, ভারতে বিলাতী পুঁজি খাটিতেছে ১,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। কিন্তু পূর্ব্বে যে সমস্ত মাপ-জোক দেখান হইল তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় ইহা ভ্রান্ত ধারণা। তবে এদেশে বিলাতী পুঁজির পরিমাণ নিতান্ত কম পক্ষে ৭০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ধরিলে কিছুই অন্যায় করা হইবে না। আর ইহা খাঁটি সত্য যে, ভারতের মত আর কোন দেশেই এত অধিক পরিমাণে বিলাতী পুঁজি খাটে না।

সমৃদ্ধির পথে ফরাসী রাষ্ট্র

১৯২৮ সনে ফ্রান্সের শিল্প-বাণিজ্য সকল দিক্ দিয়া অভূতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই সনে যখন বিলাত বেকার-সমস্যা দূর করার জন্য অস্থির, তখন ফরাসী রাষ্ট্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ম্মরত রাখিবার জন্য ১,৫০০,০০০ বিদেশী শ্রমিক আমদানি করিয়াছে।

ইহার দুই বৎসর আগে ফ্রান্সের শিল্প-জগতে এক বিরাট দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়। ফরাসী রাষ্ট্র তখন মুদ্রার স্থিতীকরণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। মুদ্রার স্থিতীকরণের ফলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর সহিত ফ্রাঁয়ের অনুপাত ২৪০ হইতে একেবারে ১২০তে নামিয়া যায়। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে কিছু দিনের জন্য এই বিষম দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়; এবং অনেকগুলি ফরাসী ফ্যাক্টরীও বন্ধ হইয়া যায়। এই সময়ে প্রায় ২৫।৩০ লাখ বিদেশী মজুর ফ্রান্সে কাজ করিতেছিল। কলকারখানা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ইহাদের অনেকে বেকার হইয়া পড়ে। ফরাসী রাষ্ট্রকে অগত্যা বাধ্য হইয়া এই সকল বেকার মজুরের দলকে তাহাদের আপন আপন দেশে পাঠাইয়া দিতে হয়। অবস্থা যেরূপ দাঁড়ায় তাহাতে মনে হইতেছিল যে, ফ্রান্সের ভাগ্য আর পরিবর্ত্তিত হইবে না। সৌভাগ্যক্রমে ফ্রান্সের এই দুর্ভাগ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। গত সন হইতে ফরাসী জাতি অভূতপূর্ব্বে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

বিলাত দেশটা ধনবিজ্ঞান বিদ্যায় আসলে বড় বেশী সমঝদার নয়। বিলাতের সাধারণ মানুষের ধারণা ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতিলাভ মানুষের ক্ষমতার অতীত। এমন কি বিলাতের বাঘা বাঘা ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণও মনে করেন, জল-হাওয়ার পরিবর্ত্তন যেমন অজ্ঞাত কারণে ঘটিয়া থাকে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি অবনতিও তেমনি এমন কতকগুলি প্রাকৃতিক কারণে ঘটিয়া থাকে যাহা সম্পূর্ণরূপে মানুষের বোধশক্তির অতীত। কিন্তু এই সমস্ত পণ্ডিতগণ ভুল-ক্রমেও ধারণা করিতে পারেন না যে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি অবনতি রাষ্ট্রের দ্বারা কিরূপ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। বিলাতের এই যে বর্ত্তমান বেকার-সমস্যা ও ব্যবসা বাণিজ্যের অবসাদ ইহার মূলে নিহিত আছে এমন কতকগুলি সরকারী নীতি, বিলাতী পার্ল্যামেণ্টের আইন কানুনই যে সকলের একমাত্র জনয়িতা। মার্কিণ যে আজ অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধির অধিকারী তাহার কারণও মার্কিণ রাষ্ট্র-প্রবর্ত্তিত কতকগুলি সরকারী নীতি। ফরাসীর এই বর্ত্তমান সমৃদ্ধির মূলেও নিহিত রহিয়াছে কতকগুলি সরকারী নীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিলাতের রাষ্ট্র নিয়ন্তাগণের কর্ত্তব্য এই সমস্ত গোড়ার কারণগুলি সমঝিয়া দেখা। এই সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি তথ্যের অবতারণা করা যাইতে পারে। এইগুলি পাকড়াও করিতে পারিলে দেশোন্নতির অনেক কিছু হদিশ মিলিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বেশী বিদ্যাবুদ্ধি জাহির না করিয়া মাত্র সহজ বুদ্ধি-দ্বারাও এই আর্থিক সমস্যার অনেকদূর সমাধান করা যাইতে পারে। যুদ্ধের পর শিল্প-বাণিজ্য-জগৎ মাত্র দুইটী জিনিষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে—সংরক্ষণ শুল্ক ও কারেন্সি-ঘটিত আইন। প্রথমতঃ শুল্ক বা ট্যারিফ জিনিষটাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। দুনিয়ায় কেবলমাত্র বিলাতেই

আমদানি বাণিজ্য সম্বন্ধে অবাধ নীতি অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে।

দুনিয়ার সকল দেশের, বিশেষতঃ মার্কিণ ও জার্ম্মাণ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস এই ট্যারিফ হারের পরিবর্ত্তন বা উঠানামা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফ্রান্সেও এই ট্যারিফ হারের উঠানামা চলিয়াছে বিগত একশ বছর ধরিয়া। বিলাতের প্রতিযোগী দেশগুলি সকলেই ট্যারিফ-রক্ষিত দেশ। সুতরাং স্বতই মনের মধ্যে প্রশ্ন উদয় হয়, এই সংরক্ষণ শুল্ক নীতিই কি বিলাতের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির ঐশ্বর্য্যের কারণ? ইহাই যদি জাতীয় সমৃদ্ধির কারণ হয় তবে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যে কোন দেশ সংরক্ষণ নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সেই দেশই সমৃদ্ধিশালী হইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে ইহা খাঁটি সত্য নয়। উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে, মার্কিণ রাষ্ট্রে সর্ব্বোচ্চ সংরক্ষণ শুল্ক বসাইবার পর ১৯২০ সন হইতে ১৯২৩ সন পর্য্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম অবনতির যুগ সূচিত হয়। এই কয় বৎসরের মধ্যে মার্কিণ দেশে ৭,০০০,০০০ লোক বেকার হইয়া পড়ে। শিল্প ব্যবসার প্রতিষ্ঠানগুলি দেউলিয়া হইতে আরম্ভ করে। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট এই আর্থিক দুর্য্যোগের ধাক্কা, সামলাইতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। ফ্রান্স দেশেও এই কারণে ১৯২৬ সনের শীত ও হেমন্ত ঋতু ব্যাপিয়া মহা আর্থিক দুর্য্যোগ চলিতে থাকে। বিলাতের সাগর পারের ডমিনিয়ানগুলিতেও ব্যবসা বাণিজ্যের দুর্য্যোগ দেখা গিয়াছে। অথচ এই ডমিনিয়ানগুলির সমস্তই সংরক্ষণ শুল্ক নীতি দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র ট্যারিফ প্রথা দ্বারাই একটী জাতির সমুদয় লোকের কর্ম্মের সংস্থান হইতে পারে না।

এইতো গেল ট্যারিফ বস্তুর কথা। এখন মুদ্রাঘটিত ব্যাপারটী সমঝিয়া দেখা যাউক। ১৯২০ হইতে ১৯২৩ সন পর্য্যন্ত মার্কিণ ব্যবসা জগতে যে দুর্য্যোগ দেখা যায়, ঠিক সেই সময়ে—১৯২০ সনের গোড়ায় আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড কারেন্সি সম্বন্ধে সঙ্কোচ নীতি প্রবর্ত্তন করে। আবার দেখা যায় ১৯২৬ সনে যে সময়ে সঙ্কোচ নীতি প্রবর্ত্তন করা হয় ঠিক সেই সময়ে ফ্রান্সের ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি সুরু হইতে থাকে।

বিলাতেও বহুদিন ধরিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের অধোগতি দৃষ্ট হইয়াছে। কোয়্যালিশান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কারেন্সি কমিটির উপদেশ অনুযায়ী পুনরায় "স্বর্ণমান" স্থাপনের অব্যবহিত পরেই এই দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়। শুধু বিলাত, মার্কিণ কি ফ্রান্স বলিয়া কথা নাই, দুনিয়ার সর্ব্বত্রই ব্যবসা বাণিজ্যের অধোগতির গোড়ায় এই একই সত্য নিহিত রহিয়াছে। এই সত্যটীর সরল ভাষায় সহজ অর্থ এই: যেখানে কারেন্সির সঙ্কোচ সাধন করা হইয়াছে সেইখানেই ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষতি হইয়াছে, আবার যেখানে শিল্প বাণিজ্যের সহায়তাকল্পে কারেন্সি প্রয়োজনানুযায়ী প্রসারিত করা হইয়াছে সেখানেই সমৃদ্ধির যুগ দেখা দিয়াছে।

সমস্ত দেশেই ট্যারিফ প্রথার কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই ব্যবসা বাণিজ্যের এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং দেশের শুল্কনীতি যেমনই হউক না কেন, কারেন্সির পরিবর্ত্তনানুসারে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ট্যারিফ চড়াহারেই হউক, মাঝারি ধরণেরই হউক ও অল্পহারেই হউক কিংবা একেবারে না-ই থাকুক তাহাতে বড় একটা আসে যায় না। একমাত্র কারেন্সির সঙ্কোচ দ্বারাই বাণিজ্য-হ্রাস ঘটিয়া থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যের ইহাই সার্ব্বজনীন দস্তুর। সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল যুগেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। সুতরাং এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া শেষ সিদ্ধান্ত-স্বরূপ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কারেন্সির সহিত শিল্প-সমৃদ্ধির অতি নিগূঢ় যোগাযোগ বা সম্বন্ধ রহিয়াছে।

১৯২৩ সনের প্রথমভাগে ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং এর উপদেশানুসারে ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড সঙ্কোচ নীতি পরিহার করিয়া কারেন্সি সম্প্রসারণ করেন। এই কারেন্সি সম্প্রসারণের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের অধোগতির অবস্থা কাটিয়া গিয়া ক্রমে এক নূতন সমৃদ্ধির যুগের সূচনা হইতে থাকে। ফ্রান্স দেশেও এইরূপ ঘটিয়াছে। ১৯২৬

সনে ফ্রান্সে ফ্রাঁয়ের দাম যদিও চড়াইয়া দেওয়া হয় তথাপি শেষ পর্য্যন্ত প্রতি পাউণ্ড ১২৪ ফ্রাঁয়ের সমান এই অনুপাতে ফ্রাঁয়ের মূল্যের স্থিতীকরণ সম্পাদিত হয়। ইহাতে ফ্রাঁয়ের মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্বের মূল্যের এক-পঞ্চমাংশে পরিণত হয়। কার্য্যতঃ প্রত্যেক দেশই আপন আপন সিক্কা যুদ্ধের পূর্ব্বের মূল্যে ফিরাইয়া আনিতে নারাজ হয়। কেবলমাত্র মার্কিণ আপন সিক্কার দর যুদ্ধের পূর্ব্বের দরে ফিরাইয়া আনে। মার্কিণের পক্ষে ইহা করা সম্ভবপর হইয়াছিল; কারণ যুদ্ধের মধ্যে দুনিয়ার অর্দ্ধেক সোনা মার্কিণ দেশে জড় হয়। সুতরাং মার্কিণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন-মাফিক কারেন্সি সম্প্রসারিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ রাষ্ট্রের এই কার্য্য বুদ্ধিমানের মত হয় নাই। 'সিক্কার দুর্ম্মূল্যতা ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি বিধায়ক' এই কথার চেয়ে বড় ভুল ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আর নাই। মার্কিণ সাধ করিয়া এই ভুল করিয়া বসিয়াছিল।

কারেন্সি সঙ্কোচ করা যে কতদূর অনিষ্টকর তাহা বৃটিশ ইলেকট্রিক অ্যাণ্ড অ্যালায়েড ইণ্ডাষ্ট্রীজ অ্যাসোসিয়েশানের কার্য্যবিবরণী পাঠে আরও পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। এই বিবরণীতে লিখিত আছে :—

গত ৯ বৎসর ধরিয়া ক্রেডিট যেরূপ ক্রমাগত বাধা-প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে তাহাতে বিলাতী কলওয়ালাগণের পক্ষে নিজের দেশে মাল বিক্রয় করিবার উপায় একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শিল্প-ব্যবসার এই যে দুর্গতি এ জন্য দায়ী ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড। ১৯২০ সনের হেমন্ত কালে এই ব্যাঙ্ক তৎকালীন গবর্মেণ্টের সহায়তায় এই ভুল চাল চালিয়া বসে। এখন পর্য্যন্ত এই দুর্গতির শেষ হয় নাই। ইহার ফলে বিলাতের জনসাধারণের ক্রয়শক্তি সত্যসত্যই অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই ক্রয়শক্তির হ্রাসের জন্য সকল প্রকার শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে ইহা লইয়া যথেষ্ট অনুসন্ধানাদি করা হইয়াছে; কিন্তু এই সমস্ত অনুসন্ধান আর না করাই ভাল। এখন দেশের অর্থ-সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থাগুলির পুনরালোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এদিকে নজর বড় একটা দেওয়া হয় নাই, কিন্তু প্রকৃত দাওয়াইয়ের সন্ধান যে এইখানেই মিলিবে তাহা কেহই ভাবিয়া দেখিতেছে না। দেশের এই শিল্প-অবনতি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার জন্য ঘটিয়াছে কিনা তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

১৯২০ সনের পর হইতে প্রধান প্রধান শিল্পদ্রব্যগুলির দর কমাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। ইহার ফলে প্রধান প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই দর কমান ব্যাপারটী এমন অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে যে, আর একটু অগ্রসর হইলেই এই প্রধান প্রধান শিল্পগুলি সমূলে বিনষ্ট হইবে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের অতিমাত্রায় হুঁসিয়ার হওয়ার জন্য বিলাতের শিল্পজগতে আজ হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে। আজ বিলাতী কলওয়ালাগণ মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে যে, আর তাহাদের রক্ষা নাই। তাহারা নিরুপায় হইয়া দেখিতেছে যে, তাহাদের উন্নতির পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এই ত গেল বিলাতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা। বেলজিয়াম এবং ইতালি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে কারেন্সির সহিত শিল্প-বাণিজ্যের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বেলজিয়াম দেশ ইতালির মত চড়া সংরক্ষণ-শুল্ক দ্বারা রক্ষিত নয়। সেইজন্য বেলজিয়ামকে সময়ে সময়ে "অবাধ-বাণিজ্য-নীতির" দেশ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বেলজিয়াম প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দেশ নয়। কারণ এখানে সকল রকম পণ্যদ্রব্যের উপরেই অল্পবিস্তর শুল্ক বসান আছে, বিশেষতঃ বেলজিয়ামের প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য যেগুলি সেই সমস্ত পণ্য রপ্তানির উপর রীতিমত শুল্ক বসান আছে। যুদ্ধের পর, গ্রেট্‌ব্রিটেন ফ্রাঁ এবং লিয়ার এই দুই প্রকার সিক্কা প্রাগ-যুদ্ধ স্বর্ণমানের অনুপাতে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু বেলজিয়াম ও ইতালি গ্রেটব্রিটেনের এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করে না। পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর সহিত বেলজিয়ান ফ্রাঁর বর্ত্তমান অনুপাত ১:১৭৫ এবং ইতালিয়ান লিয়ারের অনুপাত ১:৯২.৪৬। যুদ্ধের জন্য প্রত্যেক যুদ্ধনিষ্ঠ রাষ্ট্রই অজস্র ওয়ারবণ্ড ছাড়িতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের সময় এই সকল ওয়ারবণ্ড সস্তা সিক্কায় বিক্রী হয়। যুদ্ধের পরবর্ত্তী

বিলাতী গবর্মেণ্ট কারেন্সি সঙ্কোচ করিয়া সিক্কা দুর্ম্মূল্য করিয়া ফেলে। যুদ্ধের সময়ে বিলাতী সিক্কার যে দর ছিল এখন প্রায় তাহার দ্বিগুণ দর হইয়াছে। বিলাতের এই মিত্র-স্থানীয় দেশ দুইটী কিন্তু বিলাতের পন্থা অনুসরণ করিয়া সিক্কার দর চড়াইয়া করদাতাগণের স্কন্ধে ওয়ারবণ্ড শোধ দেওয়ার জন্য দ্বিগুণ বোঝা চাপায় নাই।

প্রকৃত পক্ষে এক গ্রেটবৃটেন ছাড়া আর সকল রাষ্ট্রই যুদ্ধের পর আপন আপন শিল্প-ব্যবসায়ের প্রয়োজনানুযায়ী কারেন্সি এবং ক্রেডিট্ যোগান বর্দ্ধিত করিয়াছে।

বর্ত্তমান শিল্প-জগতে ফ্রান্সের সফলতার কারণ প্রধানতঃ দুইটী, প্রথম ফ্রান্সের সংরক্ষণ ট্যারিফ, দ্বিতীয় উহার সস্তা কারেন্সি ব্যবস্থা। ইহা ছাড়াও ফ্রান্সের শিল্প-সমৃদ্ধির আর একটা কারণ আছে, তাহা ফ্রান্সের ব্যাঙ্ক-প্রথা। এই ব্যাঙ্ক-প্রথার দ্বারা ফরাসী বণিক এবং কলকারখানার মালিকগণ কম সুবিধা ভোগ করে না।

একজন ফরাসী কুঠিয়াল কোন ফরাসী ক্রেতার নিকট মাল পাঠাইবার সময় মালপত্রের মূল্য বিল করিয়া পাঠায়। ক্রেতা এই বিল গ্রহণ করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট তারিখে মূল্য পরিশোধ করিবে বলিয়া বিলের উপর লিখিয়া নাম সই করিয়া দেয়। ফরাসী ব্যাঙ্ক এই সমস্ত বিল গ্রহণ করে এবং কুঠিয়ালের হিসাবের খাতায় এই বিলের হিসাব ঠিক করিয়া রাখে, সময়মত তাগাদা করিয়া বিলের দাম আদায় করিয়া লইয়া কুঠিয়ালের নামে জমা দিয়া রাখে। এই প্রথার দ্বারা কোটি কোটি ফ্রাঁয়ের কারবার একরূপ সিক্কার সংস্পর্শে না আসিয়াও সম্পন্ন হইয়া যায়। শিল্প-ব্যবসার সহায়তাকল্পে এই ব্যাঙ্ক-প্রথা কারেন্সির মতই কার্য্যকরী। বিলাতের অন্তর্ব্বাণিজ্যের সহায়তাকল্পে এই প্রথার প্রবর্ত্তন-সম্বন্ধে অনেকে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে বটে; কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। বিলাতী ব্যাঙ্কওয়ালারা ফরাসী ব্যাঙ্ক-ওয়ালাগণের মত সাহসীও নয় কর্ম্মতৎপরও নয়। তা ছাড়া, বিলাতী সওদাগর ও ব্যবসাদারগণ অত্যন্ত রক্ষণশীল। ফরাসীদেশের এই ব্যাঙ্ক-প্রথা বিলাতে চালাইতে চইলে লোককে এই সম্বন্ধে শিক্ষিত ও সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য জোর প্রচার-কার্য্যের দরকার।

কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা, ফরাসী শ্রমিকের উদ্ভাবনী শক্তি বেশী এবং ফ্রান্সে মজুরির হারও সস্তা সেই জন্য ফ্রান্স দেশ এতদূর সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। ফ্রান্সে বিলাতের তুলনায় ব্যবসা বাণিজ্য কম বাধাবিঘ্নের মধ্যদিয়া অগ্রসর হয়, ইহা সত্য কথা। ফ্রান্সের ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিলাতের ট্রেড ইউনিয়নগুলির মত অত্যাচারী নয়। আবার ফরাসী মজুর "স্বর্ণমানের" হিসাবে বিলাতী মজুরের চেয়ে যে কম মজুরি পায় ইহাও সত্য। কিন্তু কোন দেশের স্থানীয় হাটবাজার স্বর্ণমানের দ্বারা পরিচালিত বা শাসিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, ফরাসী মজুর ঘণ্টায় ৫ ফ্রাঁ হিসাবে মজুরি পাইয়াও ঘণ্টায় দেড় শিলিং উপার্জ্জনক্ষম বিলাতী মজুরের চেয়ে ভাল খাবার ভাল বাসগৃহ এবং ভাল পোষাক পরিচ্ছদের সংস্থান করিয়া লয়। অথচ আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় মানদণ্ডের মাপে ফরাসী শ্রমিকের মজুরির হার ঘণ্টায় মাত্র ১০ পেঃ, প্রতিযোগী বিলাতী মজুরের মজুরির হার সেখানে ২০ পেঃ। বিলাতী অর্থনীতিবিদগণের চোখে এই অসামঞ্জস্যটী আদৌ ধরা পড়ে না। সিক্কার ক্রয়শক্তি কেবলমাত্র সোনার সহিত ইহা কি সম্বন্ধে রহিয়াছে তদ্দারাই নিরূপিত হয় না; সিক্কার প্রকৃত ক্রয়শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যে দেশের সিক্কা সেই দেশে ঐ সিক্কার বিনিময়ে কি পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারা যায় তদ্দারা।

এক আউন্স সোনার বিনিময়ে সকল দেশে একই প্রকার জিনিষ ঠিক সমান পরিমাণে ক্রয় করিতে পারা যায় না। এমন কি যেসকল দেশে "স্বর্ণমান" প্রচলিত সেই সকল দেশেও সোনার ক্রয়-শক্তির এই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক দেশেই জিনিষের মূল্য নিরূপিত হয় প্রচলিত কারেন্সির মোট পরিমাণের ও বিক্রয়ার্থ উপস্থিত দ্রব্য-সম্ভারের মোট পরিমাণের পারস্পরিক অনুপাত দ্বারা। সুতরাং ফরাসী, জার্ম্মাণ বা ইতালীর মজুর "স্বর্ণমানের" হিসাবে বিলাতী মজুরের চেয়ে কম মজুরি পাইতেছে বলিয়াই যে তাহারা নিকৃষ্টতর প্রণালীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে এরূপ ধারণা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বরং ষ্ট্যাটিষ্টিক্স ঘাঁটিলে দেখা যায় যে, যে সমস্ত দেশের কারেন্সি

স্বর্ণমানে নিম্নে অবস্থিত সেই সমস্ত দেশে পণ্যদ্রব্য-উৎপাদনের সুবিধা ঘটিয়াছে বেশী, দুনিয়ার বাজারে উচ্চতর কারেন্সি-বিশিষ্ট দেশগুলি পণ্যদ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধে নিম্ন কারেন্সি-বিশিষ্ট দেশগুলির নিকট ক্রমাগত হারিয়া যাইতেছে।

বিলাতের পরম দুর্ভাগ্য যে, বিলাতের রাষ্ট্রনিয়ন্তা এবং সরকারী ধনাগারের কর্ম্মকর্ত্তাদেরই মত বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্য-ধুরন্ধরগণও একশ' বছরের পুরাতন কতকগুলি ভ্রান্ত মতবাদ এবং কর্ম্মপন্থা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। বিলাত আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি চালাইতে কোন দেশের চেয়ে কম ওস্তাদ নয়। বিলাতের অফুরন্ত কর্ম্মশক্তি এখনও তিলমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। মালপত্রও তৈয়ার হইতেছে উৎকৃষ্ট ধরণের এবং প্রভূত পরিমাণে; কিন্তু দেশের আর্থিক ব্যবস্থা এখনও একেবারে সেকেলে ধরণের—মান্ধাতার আমলের। লোহালক্কর এবং কয়লা-শিল্পে ফ্রান্স যে কতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার চমকপ্রদ বিবরণী সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। ইহাতেও বিলাতের চোখ ফোটা উচিত ছিল। লোহালক্কড় এবং কয়লা-শিল্প বিষয়ে যে বিরাট আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতা চলিতেছে তাহাতে এখন বিলাত চতুর্থ স্থানে নামিয়া গিয়াছে, অথচ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের স্থান ছিল সকলের উপরে।

দুনিয়ার মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের এবং পরের অবস্থার মধ্যে যেন আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সুতরাং বিলাতে যুদ্ধের পূর্ব্বে যে হারে জাতীয় ধনদৌলত বাড়িত এখন সে হারে বাড়িলে চলিবে না। বর্ত্তমানে বিলাতের সম্পদ্ প্রভূত পরিমাণে বাড়িবার দরকার। এই দেশকে যদি দেউলিয়া হওয়ার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়, বিষম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে জাতীয় সম্পদ্ বাড়াইয়া দেশের মধ্যে অতিরিক্ত ধনদৌলতের সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু এই অতিরিক্ত ধনদৌলতের সমাবেশ প্রাগ্-যুদ্ধ কারেন্সি ব্যবস্থাদ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে না। প্রাগ-যুদ্ধ কারেন্সি দ্বারা মাত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে যে হারে বিলাতের জাতীয় সম্পদ্ বাড়িত সেই হারে বাড়ানই সম্ভবপর। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপার তলাইয়া না বুঝিয়াই কারেন্সি কমিশনের কমিটি ১৯১৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ফতোয়া জারি করিয়া বলেন যে, আর্থিক অবস্থার সাম্যবিধান বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই সমীকরণের অর্থ জাতীয় ধনদৌলতের বৃদ্ধির হার প্রাগ-যুদ্ধ অবস্থায় ফিরাইয়া আনা। এই অপূর্ব্ব যুক্তিবাদের দ্বারা আরো বুঝায়, বিলাতের রাষ্ট্র যুদ্ধের পরে যে সকল পুনর্গঠন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, জনসাধারণের বসতবাটীর অভাব দূরীকরণের জন্য যে সমস্ত মোসাবিদা খাড়া করিয়াছেন সে সমস্তই প্রত্যাহার করা। এই বিচিত্র ব্যবস্থার আর একটী উদ্দেশ্য দেশে অল্প বেতনের ব্যবস্থা করা এবং দলে দলে জনসাধারণকে বেকার করিয়া দেওয়া। কমিটি এবং সরকার কি এই অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে এতদুর মাথা ঘামাইতেছেন?

কমিটি আরো নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বিলাতের বৈদেশিক বাণিজ্য বিলাতের জাতীয় কারেন্সির "স্বর্ণমান" রক্ষার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এই উক্তি ঠিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মার্কিণ রাষ্ট্র এক সময় মাত্র কাগজের কারেন্সি দ্বারা কাজকর্ম্ম চালাইয়াছিল। এই কাগজের কারেন্সির আমলে মার্কিণের বৈদেশিক বাণিজ্যের কিছুই ক্ষতি হয় নাই। একটী দেশে রৌপ্য-সিক্কা প্রচলিত, অন্য দেশের সিক্কা হয়তো কাগজের, না হয় সোনার; অথচ এই দুইটী দেশের মধ্যে বহুবর্ষব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে কোনরূপ অসুবিধাই উপস্থিত হয় না। কারণ বৈদেশিক বাণিজ্য বার্টার ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং সোনার কারেন্সি হউক আর কাগজের কারেন্সিই হউক, ব্যালান্স স্থির করিতে কিছুই কষ্ট হইবে না। কাগজের কারেন্সির সহিত অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের বিনিময় যে ভাবে সম্পাদিত হয়, সোনার সহিত বিনিময়ও সেই ভাবে সম্পাদিত হইবে। কয়লা, লোহা, গম ইত্যাদি সাধারণ পণ্য দ্রব্যের বিনিময়ের বেলায় কাগজের কারেন্সির যদি মূল্য কমিয়া না যায়, তবে সোনার সহিত বিনিময়ের বেলাতেই বা কাগজের কারেন্সির মূল্য কমিয়া যাইবে কেন? সুতরাং কারেন্সি সোনার হউক, রূপার হউক,

আর কাগজেরই হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হইতেছে এই যে, কারেন্সি ব্যবস্থা এরূপ হওয়ার দরকার যাহাতে সকল প্রকার পণ্য দ্রব্যের মধ্যে মূল্যের সমতা রক্ষিত হয়।

"স্বর্ণমান রক্ষা করাই বিলাতের রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত"—এই মতবাদটী কমিটি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই স্বর্ণমানের সহিত দেশোন্নতির কি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে কমিটি আদৌ তাহা খোলসা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। বিলাতের বড় বড় যে কোন একটী শিল্পের পরিবর্ত্তে লণ্ডনকে গোটা দুনিয়ার সিক্কার বাজারে উচ্চ পদে বাহাল রাখিবার প্রচেষ্টা বাতুলের প্রয়াস ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৃটেনের পক্ষে উহার লোহা, ইস্পাত, এঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল অথবা জাহাজী ইত্যাদি শিল্পের যে কোন একটী বলিদান করার চেয়ে আর্থিক জগতে লণ্ডনের মানমর্য্যাদা বা উচ্চ আসন হাজার বার রসাতলে যাওয়াও শ্রেয়ঃ। দুনিয়ার কর্জ্জদাদনের কেন্দ্রস্থানীয় হইবার জন্য মার্কিণ অথবা জার্ম্মাণি কি উহাদের একটি প্রধান শিল্প নষ্ট করিতে উদ্যত হইত? কখনই নহে। এরূপ করা একরূপ অভাবনীয় ব্যাপার। লণ্ডনের আর্থিক সমৃদ্ধির দ্বারা বিলাতের শিল্প-বাণিজ্যের কোনরূপ সুবিধা হইয়াছে কিনা তাহা প্রতিপন্ন করার দরকার। শুধু কাগজ কলমের সাহায্যে বুলি আওড়াইলে চলিবে না। অন্তপক্ষে সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই প্রতীতি হয় যে, সিক্কার বাজারে লণ্ডনের এই শ্রেষ্ঠ পদবী কেনা হইয়াছে বিলাতের শিল্প-বাণিজ্য সমস্তই বলিদান দিয়া।

মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"আমাদের এগিয়ে যেতে হ'বে, নতুবা ধ্বংস অনিবার্য্য।" বিলাতের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ঠিক এমনই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর্থিক জগতে বিলাতকে অগ্রগামী হইতে হইলে বিলাতের শিল্প-ব্যবসা সমস্তরই পুনর্গঠন এবং বৃদ্ধি করার দরকার। কিন্তু কমিটির অনুমোদিত সিক্কার অল্পতায় এই কার্য্য-সাধন সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। প্রাগযুদ্ধ কারেন্সি ব্যবস্থার পুনরবতারণায় দেশের যে কি ঘোর দুর্দ্দিন ও আর্থিক বিপত্তি উপস্থিত হইবে সে সম্বন্ধে সজাগ হওয়া বিলাতের প্রত্যেক স্বদেশভক্ত ভবিষ্যদ্দর্শী সন্তানের অবশ্যকর্ত্তব্য এবং ইহাদের সকলের একযোগে এরূপ আন্দোলন করার দরকার যাহাতে বিলাতী গবর্মেণ্ট কমিটীর নির্দ্দেশানুসারে বিলাতের সর্ব্বনাশ-সাধন না করিয়া বসেন।

ল্যাঙ্কাশিয়ারের তুলার ব্যবসা

ল্যাঙ্কাশিয়ারেই বিলাতের তুলার ব্যবসা কেন্দ্রীভূত; কিন্তু তাই বলিয়া এই ব্যবসার ফলভোগী মাত্র ক্ষুদ্র ল্যাঙ্কাশিয়ারই নহে; গোটা বিলাতের অর্থনৈতিক জীবনে এই ব্যবসা বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তুলাজাত দ্রব্য বিলাত হইতে এত বেশী রপ্তানি হয় যে, ইহার সহিত অন্যান্য রপ্তানিদ্রব্যের তুলনা করাই যায় না। যুদ্ধের আগে বিলাত হইতে যত মাল বিদেশে রপ্তানি হইত তাহার ২৫% মাল ছিল তুলাজাত দ্রব্য। ১৯২৮ সনে এই অঙ্ক দাঁড়ায় ২০%। কয়লা, অন্যান্য বয়নজাত দ্রব্য, লোহালক্কড় এই তিনটী জিনিষের মধ্যে এক একটি এক এক বৎসর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত; কিন্তু কোনটীই তুলার জিনিষের অর্দ্ধেক পরিমাণে রপ্তানি হয় নাই। বস্ত্রবয়ন-শিল্পে আবহাওয়ার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এ হিসাবে ল্যাঙ্কাশিয়ারের মত স্থান দুনিয়ার আর কোথাও নাই। ল্যাঙ্কাশিয়ারের প্রাধান্য এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত গোটা দুনিয়ার তুলাজাত উৎপন্ন দ্রব্যের বিলাত একাই ৪০% হইতে ৯০% পর্য্যন্ত রপ্তানি করিত; কিন্তু বর্ত্তমানে গোটা দুনিয়ার মোট রপ্তানিতে বিলাতের হিস্যা মাত্র ৫০%। সমস্ত কাঁচা মাল বিদেশ হইতে আমদানি করিয়াও যে বিলাত এইরূপ রপ্তানি করিতেছে ইহা বিলাতের কম বাহাদুরি নয়। যুদ্ধের সময় বিলাত হইতে অনেক দেশে জিনিষ রপ্তানি বন্ধ হয়, এই অবসরে অনেক দেশে তুলা-শিল্পের পত্তন হয়। যুদ্ধের পরে তুলার বাজারে মাল অতিমাত্রায় দেখা দেয় এবং বিলাতী কলওয়ালা দেখিতে পায় যে, কাপড়ের বাজারে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়া গিয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের আগে যেখানে ৬০০।৭০০ কোটী গজ কাপড়

বিদেশে রপ্তানি হইত, এখন মাত্র সেখানে এই ৪০০ কোটী গজ কাপড় বিদেশে যাইতেছে।

জার্ম্মাণির যন্ত্রশিল্প

জার্ম্মাণি মেশিনারী শিল্পে গত জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে অভূতপূর্ব্ব উন্নতিলাভ করিয়াছে। কারণ এই দুই মাসে জার্ম্মাণি হইতে গড়ে ১৩,০০৩ টন ওজনের এবং ২৬০ লক্ষ রাইখ্‌স্ মার্ক মূল্যের মেশিনারি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৮ সনের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসের রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ১২০২৬ টন ও ৭৫৬৩ টন, মূল্য ২২৮ লক্ষ রাইখস মার্ক ও ১৫ লক্ষ রাইখস মার্ক। মার্কিণ প্রতিযোগী জার্ম্মাণির এই অপূর্ব্ব বাণিজ্য-প্রচেষ্টা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া মার্কিণ মেশিনারি-শিল্প সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। জার্ম্মাণি কতকগুলি উচ্চস্তরের মেশিনের দর কমাইতে সমর্থ হইয়াছে। বাজারে এই সমস্ত জার্ম্মাণ মেশিন আমেরিকান মেশিনের চেয়ে শতকরা ৩৫ টাকা কম দরে বিক্রী হইতেছে।

মিশরে জার্ম্মাণ সামুদ্রিক তারের আদর

গত বৎসর কতকগুলি জার্ম্মাণ ফার্ম্ম মিশর হইতে সামুদ্রিক তারের (কেব্‌ল্) অর্ডার পাইয়াছে এবং এই অর্ডার অনুসারে মিশরে কিছু কিছু মালও পাঠাইয়াছে। আরও কয়েকটা দেশ হইতে তার প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মাণ তার দামে অত্যন্ত সস্তা হইলেও জিনিষ অত্যন্ত ভাল। এইজন্য মিশরের পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিসভা জার্ম্মাণ তারই পছন্দ করিয়াছে। জার্ম্মাণি যদি বিদেশ হইতে এই তারের বেশী বেশী অর্ডার পায় তাহা হইলে জার্ম্মাণি এই শিল্পে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে।

জার্ম্মাণ টেক্‌নিক্যাল সিনেমা ফিল্মস্

বার্লিন এবং মিউনিক সহরস্থ ফিল্মকন্ট্রোলিং আফিস হইতে ১৯২৮ সনে ৩৩২টী ফিল্ম নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই ফিল্মগুলির মোট দৈর্ঘ্য ১৭৯,৮২৫ মিটার। সিনেমাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করিয়া এই ফিল্মগুলিতে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নিম্নের তালিকা দেখিলে ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে।

টেকনিক্যাল বিভাগ	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (মিটার)
স্থপতি বিদ্যা	২৮	১৬,৬৪০
আলোকপ্রদান, গ্যাস জলের কল (মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কস)	৫	২,৪৫৮
খনিবিদ্যা	৮	৩,৪৩১
ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে শিক্ষা	৩৫	১৮,৫৯৫
কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রী	১৭	১৩,১২৬
লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প	১২	৪,৫২৯
ইলেক্‌ট্রো-টেক্‌নিক্‌স্	৪০	২০,০১১
প্রেসিশান মিকানিকস্ অপ্‌টিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রী	৪	২,০৭৬
সৌখিন দ্রব্য ও খেলনা	২	৪৫১
গ্রাফিক ট্রেড	২৩	১৫,১৬৭
কাষ্ঠ খোদাই শিল্প	৬	২,৬২৯
মেটালার্জ্জি	১	১৬৫
মৃণ্ময়পাত্র, প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাচ, চিনামাটি	১৬	৮,৬৪০
যুদ্ধবিদ্যা	২	১,১১৯
আর্টস ও ক্রাফ্‌ট্‌স্	৭	২,৭৬১
কৃষি ও ভূমিকর্ষণবিদ্যা	১৬	৮,৬৪০
চামড়া ও রবার-শিল্প	৬	২,৪৭৯
মেশিন এঞ্জিনিয়ারিং	৪০	২৩,৪১৪
ধাতু-শিল্প, লৌহ ছাড়া	৫	৩,৪৯৯
খাদ্য দ্রব্য	৩৫	১৫,৮৯৫
কাগজ-শিল্প	৭	২,৬১৮
জাহাজ নির্ম্মাণ শিল্প	১	২৩৪
বয়ন শিল্প	৩২	১১,১৬৪
সড়ক ও যানবাহন	৫২	৩১,৭৫৩
বিবিধ	৬	১,৯৬৮

শেষের হেডিংটীতে এমন কতকগুলি শিল্পের কথা বলা হইতেছে যাহা প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার ধরাবাঁধা শিল্পের

গণ্ডীর ভিতর আসে না। ১৮২৯ সনে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় টেক্‌নিক্যাল ফিল্মগুলি ৩৩% বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মোট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ৫৬%।

জার্ম্মাণিতে প্রস্তুত নূতন ধরণের দেশলাইয়ের বাক্স রাখিবার আধার

দেশলাই জিনিষটা অত্যন্ত হারাইয়া যায়। কাজের সময় এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষটা অনেক সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জন্য গৃহিণীগণ কম নাকাল হন না। গৃহিণীগণের এই দুঃখ মোচনের জন্য উইল্‌হেলম বেণ্ডার রোজেনবুর্গ নামক একটি জার্ম্মাণ ফার্ম্ম এক নূতন ধরণের 'ম্যাচবক্স হোল্ডার' প্রস্তুত করিয়াছেন। এই হোল্ডারে বা আধারে একত্রে দশটী বাক্স রাখা যাইবে। একেবারে মাত্র একটি—সর্ব্বনিম্নস্থ বাক্সটী—বাহির করা যাইবে। এই হোল্ডারটীর দামও সস্তা এবং দেখিতেও বেশ সুদৃশ্য। আশা করা যায় হোল্ডারের বেশ কাটতি হইবে।

আধুনিক গৃহস্থালীর মেশিন

জার্ম্মাণি দুনিয়ার বাজারে মেশিন সরবরাহ করিয়া থাকে এবং এই জার্ম্মাণ মেশিনের কথা উঠিলে সাধারণতঃ বড় বড় মেশিনের কথাই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঘর-গৃহস্থালীতে ব্যবহারোপযোগী আধুনিক জার্ম্মাণ কলগুলিও ক্রমে ক্রমে লোকের প্রিয় সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং গৃহস্থালীর কল-শিল্পও দিন দিন জার্ম্মাণির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিল্প হইয়া পড়িতেছে। ঘর-গৃহস্থালীর কলকব্জা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু বিদ্যুতের সাহায্যে এই সমস্ত কল চালাইতে না পারিলে তেমন পড়তা পড়িতে পারে না। বিজলী আলোর জন্য যে লাইন থাকে তাহার সহিত সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র ইলেক্‌ট্রো মোটরের সহিত রান্নাঘরের কলগুলি জুড়িয়া দিলেই রান্নাঘরের খাটনি অত্যন্ত কমিয়া যাইবে। এই জার্ম্মাণ মেশিনটী মোটেই ভারি নয়, বেশ হাল্‌কা ধরণের। বিজলী ইস্ত্রী যেমন যে কোন বিজলীর লাইনের সহিত একটি মাত্র ছিপির সাহায্যে সংলগ্ন করিয়া কাজ চালান হয়, এই কলও সেইরূপ অল্প আয়াসেই কাজে লাগাইতে পারা যাইবে।

গৃহস্থালীতে যে নিংড়ান যন্ত্র পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত তাহা লইয়া অনেক ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। এই কল আগে অনেক জায়গা জুড়িয়া থাকিত। কিন্তু জার্ম্মাণ নিংড়ান বা মোচড়ান যন্ত্র এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, ইহা অতি অল্প আয়াসেই নাড়া চাড়া করিতে পারা যাইবে এবং এই যন্ত্র টেবিলরূপেও ব্যবহার করা যাইবে।

সম্প্রতি রুটি কাটা যন্ত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে চাপ দেওয়া ছুরি বিশিষ্ট কল ব্যবহৃত হইত কিন্তু এখন গোল ছুরি বিশিষ্ট যে কল ব্যবহৃত হইতেছে তাহার সুবিধা এই যে, অতি মোলায়েম কেকগুলিও স্বচ্ছন্দে ইহার দ্বারা কাটা চলিবে, চাপ লাগিয়া জিনিষ চ্যাপ্টা হইয়া যাইবে না। এই কল জায়গা জুড়িয়া থাকিবে অল্প এবং ইহা মুড়াইয়া একপাশে রাখিয়া দেওয়াও চলিবে।

অন্যান্য নবাবিষ্কৃত গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতির মধ্যে নূতন ধরণের ছুরি পরিষ্কার করা বুরুস্ ও নানাধরণের পেষণ যন্ত্র, বরফের কল, ধুইবার কল ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যুৎ-চালিত গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি হোটেল, হাঁসপাতাল, সেনানিবাসের রন্ধনশালা ও জাহাজ ইত্যাদির বৃহৎ বৃহৎ রন্ধনশালায় ব্যবহার করিলে যথেষ্ট সুবিধা পাওয়া যাইবে। যে সমস্ত স্থানে অত্যধিক পরিমাণে রন্ধন করিবার দরকার, সেখানে কিরূপ যন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে ইহা এতদিন যন্ত্রনির্ম্মাতাগণের মস্ত বড় ধান্ধা হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্যা দূর করিতে পারিয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে রন্ধন করিলে আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রন্ধন করাতো হইবেই, অধিকন্তু মানুষের শ্রমেরও লাঘব হইবে ঢের। এই ধরণের বড় বড় যন্ত্রপাতির রেওয়াজ ইতিপূর্ব্বেই কায়েম হইয়াছে। জ্যাম জেলি প্রভৃতি নানাজাতীয় সংরক্ষিত আহার্য্য বস্তু তৈরী করিতেও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে।

জার্ম্মাণির তৈল-শিল্প

তৈল-নিষ্কাশন জার্ম্মাণির আর একটী প্রয়োজনীয় শিল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিন দিন এই শিল্প বাড়িয়া যাইতেছে। ফলে দুনিয়ার অর্থ-নৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে এক নূতন প্রগতির সঞ্চার হইয়াছে। জার্ম্মাণির এই শিল্পের পরিমাণ এবং মূল্য দুই-ই অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহার বাৎসরিক মূল্য প্রায় ২৫ শত কোটি রাইখ্স্ মার্ক। হাইড্রলিক অয়েল প্রেসার এবং অন্যান্য উপায়ে তৈল নিষ্কাশন করিবার জন্য জার্ম্মাণি ১৯২৮ সনে যে পরিমাণ তৈলবীজ এবং ফল আমদানি করিয়াছে তাহার মূল্য ৯০ কোটি রাইখ্স্ মার্ক। জার্ম্মাণির সমগ্র আমদানির ইহা ৬%। জার্ম্মাণি এই শিল্পের জন্য ২৪ কোটি টন কাঁচামাল আমদানি করিয়া ৮০০,০০০ টন তেল এবং ১৬ কোটি টন খইল উৎপন্ন করিয়াছে। ইহাতেই যে জার্ম্মাণি এই শিল্প সম্বন্ধে শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে তাহা নহে; এই শিল্প আরও বিরাটভাবে গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা জার্ম্মাণির আছে।

যুদ্ধের পর জার্ম্মাণির যে দারুণ দুরবস্থা আসিয়াছিল, এই শিল্পের কল্যাণে জার্ম্মাণি সে অবস্থা প্রায় সামলাইয়া লইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণির তৈল-উৎপাদন শক্তি ২০ লক্ষ টনে গিয়া পৌছিয়াছিল। দুনিয়ার বাজারে সর্ব্বত্র বিষম প্রতিযোগিতার ফলে এই শিল্প তখনও সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল না। যুদ্ধের মধ্যে ওলন্দাজগণ এই শিল্পে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ওলন্দাজগণ তখন যে কেবলমাত্র ইংরাজ, জার্ম্মাণ বা সুইডিস্ মার্গারিণ কন্সার্ণ-গুলিকে তেল যোগাইতেছিল তাহা নয়, ওলন্দাজ জাতি স্বদেশেও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক প্রলেপ এবং আহার্য্য দ্রব্যাদি উৎপাদনের বিরাট শিল্প গড়িয়া তোলে। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণিই তৈলশিল্পে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে; গোটা ইউ-রোপের তৈল-শিল্পের ৪৫% এখন জার্ম্মাণির হাতে। এখন জার্ম্মাণি বৎসরে ২৫ লক্ষ টন কাঁচামাল হইতে তৈল বাহির করিতে পারে এবং করিতেছেও তাহাই। শিল্পের জন্য জার্ম্মাণি কিরূপ তৈল বীজাদি আমদানি করিতেছে তাহা নিম্নের তালিকায় বেশ বুঝা যাইবে।

	১৯২৮	১৯২৭
	(টন)	(টন)
চিনাবাদাম	৫৯৩,৯০১	৪২২,০৯৭
সর	৮৪৭,৭২৩	৫৭৬,০৯৬
পামনাট	২৯৭,৩৬৭	২৭৩,৭১৬
মসিনা	৪৪২,৯৮৫	৩৯৯,১৯০
কোপ্রা	২০০,৭৫৯	১৮৭,৪৬৯

উপরের তালিকায় তৈলশিল্পে কিরূপ কল ব্যবহৃত হয় এবং জার্ম্মাণ তৈল-শিল্পের গতি কোন পথে তাহার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। জার্ম্মাণিতে যে খইল উৎপন্ন হয় তাহার সিকিভাগ বিদেশে রপ্তানি হয় (১৯২৮ সনে ৪৪১,২২১ টন, ১৯২৭ সনে ৩১৬,২১৮ টন এবং ১৯১৩ সনে ২৯৪,১৭৪ টন)। সাধারণতঃ সর হইতে বেশীর ভাগ খইল উৎপন্ন হয়, কারণ সরে তেলের পরিমাণ মাত্র শতকরা ১৬ হইতে ১৭ ভাগ এবং বাকী সমস্ত খইল; অন্যপক্ষে কোপ্রায় তেলের ভাগ শতকরা ৬২ হইতে ৬৩ পামনাটে ৪৪%, এবং চিনাবাদামে (খোসাযুক্ত এবং খোসা ছাড়ান) ৪০%। সুদূর প্রাচ্যের কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং জাপান প্রধানতঃ সরের জন্মভূমি। এই তিন দেশের সহিত জার্ম্মাণির ক্রম-বর্দ্ধনশীল বাণিজ্যের অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় জার্ম্মাণিতে এই তেলবীজের আদর কি ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৯১৩ সনে জার্ম্মাণি হইতে তেল রপ্তানি হইত ৭০,০০০ টন, ১৯২৮ সনে রপ্তানি ১৮০,০০০ টনে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু খইল রপ্তানি কমিয়াছে; ১৯১৩ সনে খইল রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮২৮,৫৪৯ টন, ১৯২৮ সনে দাঁড়াইয়াছে ৫৪৬,৬২২ টন। এই খইল রপ্তানি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জার্ম্মাণি কৃষিকার্য্যের জন্য এই খইল ভাণ্ডার এখনও ভালরূপে ব্যবহার করিতে শিখে নাই।

জার্ম্মাণি পশুর পয়লা নম্বরের আহার্য্য সংস্থানের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। খইল পশুর খাদ্য হিসাবে অতি উচ্চদরের মাল। এই খইল প্রস্তুতের জন্য জার্ম্মাণি উঠিয়া পড়িয়া

লাগিয়াছে, কারণ দেশে যে খইল উৎপন্ন হয় তাহা দেশের পক্ষে প্রচুর নয়। সুতরাং জার্ম্মাণ তৈল-শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে গৃহপালিত পশুর আহারের উপযোগী যত প্রকার খইল উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহা করা; সেইজন্য যতপ্রকার ফল বা বীন হইতে সম্ভব তেল প্রস্তুত করা হইতেছে। কি উপায়ে উৎকৃষ্ট অথচ দামে সস্তা পশুর খাদ্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহাই এখন জার্ম্মাণির মস্ত বড় ধান্ধা। কৃষির সহিত বিজ্ঞানের সমন্বয়-সাধন হিসাবে জার্ম্মাণি দুনিয়ায় 'একমেব অদ্বিতীয়ম্'। জার্ম্মাণ-শিল্পের আর একটী বিশেষত্ব এই, জার্ম্মাণি কেবলমাত্র বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়াই শিল্প প্রতিষ্ঠা করে না; দেশের মধ্যেই যাহাতে উপযুক্তরূপ খরিদ্দার মিলে সেইদিকে নজর রাখিয়া জার্ম্মাণি কলকারখানা কায়েম করে। জার্ম্মাণির তৈল-শিল্পও এই একই ভাবে দ্রুতগতি উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছে। দেখিতে গেলে, মার্কিণ দেশ এখনও জার্ম্মাণির মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিল্প-বহুল দেশে পরিণত হইতে পারে নাই। মার্কিণ শিল্পগুলি এক মুখো, সবদিকে তাল রাখিয়া চলিতে এখনও মার্কিণ "ব্যবহারিক অর্থ-নীতি-বিদ্‌গণ" শিখে নাই। সেইজন্য আমেরিকা তৈল-শিল্পে আদৌ মনোনিবেশ করে নাই। মার্কিণ জার্ম্মাণি হইতে তেল আমদানি করে এবং পশুর খাদ্যের জন্য দেশজাত ভুট্টা, কাপাসের বীজ ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

জার্ম্মাণির তৈল-শিল্পের দ্রুত উন্নতির আর একটী কারণ এই যে, জার্ম্মাণির 'মার্গারিণ' শিল্পটী অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। বিদেশ হইতে মাখন আমদানি হয়, এবং ঘরে ঘরেও যথেষ্ট মাখন প্রস্তুত হয় ইহা সত্ত্বেও এই শিল্পটী ফাঁপিয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণিতে যেখানে ২০০,০০০ টন মার্গারিণ উৎপন্ন হইত এখন সেখানে উৎপন্ন হইতেছে কমসে কম ৪৫০,০০০ টন। জার্ম্মাণি-জাত তেল এবং চর্ব্বির ৮৪% যাহাতে মার্গারিণ শিল্পে ব্যবহৃত হইতে পারে আইনের সাহায্যে এমন ব্যবস্থা কায়েম করিয়া রাখা হইয়াছে।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণিতে সাবান, মুখমণ্ডলে ব্যবহারের নানাপ্রকার রং ইত্যাদি সৌন্দর্য্য-বিধানের সামগ্রী উৎপাদনের বহর অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। এইসমস্ত জিনিষ প্রস্তুতের জন্যও যথেষ্ট তৈল ব্যবহৃত হইতেছে।

উপকূল-বাণিজ্য সংরক্ষণ বিল

গত ২রা জানুয়ারি বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব্ কমার্সের সভার একটী অধিবেশন হইয়াছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল ভারতের উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ বিল। চেম্বার হলে সভার অধিবেশন হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বিলটীর অনুমোদন করিয়া একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে সেই বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল ঃ—

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে হাজীর বিল উত্থাপিত হওয়ার পর পরিষদের ভিতরে এবং বাহিরে সর্ব্বত্র তুমুল বাদ-বিতণ্ডার আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং জনসাধারণকে আর নূতন করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। লড়াই-য়ের আগেও একবার এ সম্বন্ধে প্রস্তাব উঠিয়াছিল। লড়াইয়ের পরে "ইণ্ডিয়ান মার্কেণ্টাইল মেরিণ কমিটি" নামে ভারতীয় নৌ-বহর গঠন সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান কমিটী গঠিত হয়। এই কমিটি এক রিপোর্টও প্রকাশ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে সেরূপ গরজ দেখান না। সুতরাং এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার ছয় বৎসর পরে মিঃ হাজী বাধ্য হইয়া এই নূতন বিল পরিষদে উপস্থিত করেন। কিন্তু এ বিল সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীর দল অযথা আক্রমণ সুরু করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, এই বিল জাতিবিদ্বেষ-প্রণোদিত এবং পক্ষপাতদুষ্ট। কিন্তু আসলে মিঃ হাজীর উদ্দেশ্য সেরূপ নহে। তিনি চান ভারতীয় নৌ-বহর গড়িয়া তুলিতে এবং এজন্য তিনি ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ কখনই নিন্দাভাজন হইতে প্যারেন না। এই বিল সম্পর্কে যে বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রবল ঝটিকা আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমি আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা হইবে।

ভারতের ঘাড়ে পক্ষপাতিত্বের মিথ্যা অপবাদ

হাজীর বিলের বিরুদ্ধে এক নম্বর অপবাদ—ইহা পক্ষ-পাতিত্ব দোষে দুষ্ট, ইহার উদ্দেশ্য শ্রেণীগত পার্থক্য সৃজন এবং বৃটিশ জাতির ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট করিয়া দেওয়া। কিন্তু দীনহীন ভারতের পক্ষে সেরূপ উদ্দেশ্য স্বপ্নের মতই নিতান্ত অলীক ব্যাপার নয় কি? পক্ষান্তরে ভারতের যত্র তত্র "ইউরোপীয়ানদের জন্য" এবং "কালা আদমীর জন্য" নানাপ্রকার পৃথক ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভেদ-নীতি রেলে ষ্টীমারে সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বত্র তার মার্কামারা ছাপ দিয়া রাখিয়াছে। ভারতের পক্ষে কিন্তু এইরূপ ভেদমূলক ব্যবস্থা করা নিতান্ত অন্যায় নয়। কারণ স্বদেশীয় এবং বিদেশীয়দের মধ্যে ভেদরেখা টানা আইন-বহির্ভূত নয়। যাঁরা এ দেশে অস্থায়িভাবে বাসা বাঁধিয়া থাকিতে চান, দেশের প্রকৃত মঙ্গল করিতে গেলে তাঁদের কিছু অসুবিধা হইবেই। কিন্তু ভারতবাসী যদি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিত তবে তাহা অবশ্যই দোষের হইত। হাজীর বিলে কিন্তু তেমন কোন উল্লেখ নাই।

অন্যান্য দেশে এরূপ ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে

হাজীর বিলরূপ ব্যবস্থার দ্বারা ভারতবর্ষ যে সৃষ্টি-ছাড়া কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা নহে। আরও অনেক দেশে এইরূপ নজীর মিলিবে যথেষ্ট। উদাহরণ-স্বরূপ বৃটিশ কলম্বিয়ার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই দেশে অন্যান্য জাতি দূরে থাকুক ভিন্ন প্রদেশের লোককেও ব্যবসা পত্তন করিতে দেওয়া হয় না। চিলি দেশে দেশবাসীর বিনা অনুমতিতে কোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় নাই। দেন্মার্ক, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি, ম্যানিভোবা, নিউজিল্যাণ্ড, নিউসাউথওয়েলস, কুইন্সল্যাণ্ড এবং সুইডেনে বিদেশী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা পরিচালনের পক্ষে অনেক কড়া কড়া আইন কানুন প্রচলিত আছে। রুমাণিয়া দেশটী আবার সকলের উপর টেক্কা মারিয়াছে। সে দেশে কোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মূলধনের দুই-তৃতীয়াংশ রুমাণিয়ান হওয়া চাই এবং ডিরেক্টার সভায় তিন ভাগ রুমাণিয়ান ডিরেক্টর থাকা চাই। রুমেণিয়ান গবর্ণমেণ্ট আপন এলাকায় দেশীয় কোম্পানীর এইরূপ একচেটিয়া অধিকার-ভোগের ব্যবস্থা করিয়া ক্রমে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য একদম রুমাণিয়ান ব্যবসা বাণিজ্যে পরিণত করিতে চান। বৃটিশ জাতি নিজেরাই জানেন কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে "অ্যাংলো-রুমাণিয়ান ড্যানিয়ুব নেভিগেশন কোম্পানী"র আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

বিলাতও পক্ষপাতশূন্য নহে

বিলাত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে অবাধ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া জগতের সমক্ষে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই তথাকথিত অবাধ নীতির দেশেও ভেদনীতি বেশ পরিষ্কার দেখা যায়; কারণ কোন বিদেশীয় বিলাতী জাহাজ ও বিলাতের কয়লার খনির মালিক হইতে পারে না। এই সমস্তের মালিকগণের বিদেশীয়দের নিকট স্বত্ব হস্তান্তর করিবার কোন অধিকার নাই। বিলাতী জাহাজওয়ালা কোন বৃটিশ জাহাজে ভারত গবর্ণমেন্টের মালপত্র চালান দিতে পারে না; এবং এইরূপ করিতে হইলে ভারত সেক্রেটারির মত গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। দুনিয়া ব্যাপিয়াই এইরূপ চলিতেছে। কিন্তু স্বার্থসাধন করিতে এবং জাতিগত পার্থক্যের প্রাচীর উত্তোলন করিতে সাদা ইউরোপের জুড়িদার দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যাইবে না। এশিয়ায় এসম্বন্ধে অতি কমই নজির আছে। এ সম্বন্ধে এক বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই দৃষ্টান্ত মিলিবে গণ্ডায় গণ্ডায়। উদাহরণ স্বরূপ অষ্ট্রেলিয়ার কেরামতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯০১ সনের পোষ্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট দ্বারা অষ্ট্রেলিয়ার ডাক জাহাজগুলি কেবলমাত্র সাদা নাবিক দ্বারাই পরিচালিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কুইন্সল্যাণ্ড ১৯০৪ সনের ১৩নং আইনে এশিয়াবাসীর পক্ষে ঐ প্রদেশে চাষবাস নিষিদ্ধ হইয়াছে। সাউথ আফ্রিকা এ বিষয়ে সকলের সেরা। ঐ খানে এসিয়াবাসীর বা অন্যান্য অ-শ্বেতকায়ের পক্ষে জমি জায়গা করা বা বসবাস করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৯০৮ সনে ট্র্যান্সভাল গোল্ড অ্যাক্ট দ্বারা সাউথ আফ্রিকার অনেক সহরে ভারতবাসীকে দোকান খুলিতে দেওয়া হয় না।

জাহাজী ব্যবসা বেদখল করার অপবাদ ভিত্তিহীন

বিরুদ্ধবাদিগণ আর একটি মস্ত অপবাদ হাজীর বিল সমর্থন-কারীদের মাথায় চাপাইয়াছে। তাহাদের মতে ক্রমশঃ বিলাতের জাহাজী ব্যবসাটী ভারতবাসী কাড়িয়া লইবে। কিন্তু এই অপবাদ একেবারে ভিত্তিহীন। বিল-সমর্থকগণ এই মুহূর্ত্তেই বিলাতী জাহাজ কোম্পানীগুলিকে দেশছাড়া করিতে বা গভর্ণমেন্টের সাহায্যে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে চাহিতেছেন না। তাঁহারা চান ক্রমে ক্রমে বিদেশী জাহাজগুলি উপকূল বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করুক এবং দেশী জাহাজ ক্রমশঃ সেইস্থান অধিকার করিতে থাকুক। বিলাত এবং ভারত দুইটী রাষ্ট্রই জাতি-সঙ্ঘভুক্ত এবং জাতি সঙ্ঘের একটী নিয়মে লিখিত আছে যে, কোন দেশের পক্ষে সেই দেশের উপকূল বাণিজ্য সেই দেশের জাহাজের জন্য সংরক্ষিত থাকিতে পারিবে। ভারতবর্ষ এতদিন ধরিয়া বিদেশীয়দিগকে এই সুবিধা ভোগ করিতে দিয়া আসিতেছে। তাই বলিয়া যে চিরদিনই তাহাদিগকে এই সুবিধা ভোগ করিতে দিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই।

অতঃপর আমরা এই সুবিধা একাকী ভোগ করিতে থাকিব। বিদেশীয় জাহাজের মালিকগণ বলিতে পারেন যে ইহা অত্যন্ত অন্যায়। ব্যবসাবাণিজ্যের পথ বন্ধ করিয়া

দেওয়া ও পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা একই কথা। কিন্তু এই যুক্তিবাদ দাঁড়াইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ ভারতের উপকূল-বাণিজ্যরত দুই একটী বিলাতী জাহাজ কোম্পানীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। দি এসিয়াটিক ষ্টীম্ ন্যাভিগেশান কোম্পানী এবং দি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ন্যাভিগেশান কোম্পানী নামক বিলাতী কোম্পানী দুইটী বহুদিন ধরিয়া ভারতের উপকূল-বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে। এই দুই কোম্পানীর হিসাবের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, এই কোম্পানী দুইটী ব্যবসায় যে পুঁজি নিয়োজিত করিয়াছে, তাহার চেয়ে বহুগুণ বেশী লাভ করিয়াছে। এই দুই কোম্পানীর মৌজুত তহবিলে প্রচুর অর্থ জমা রহিয়াছে। সুতরাং এই দুই কোম্পানী তাহাদের এই পুঁজি বিরাট দুনিয়ার যে কোন ব্যবসাক্ষেত্রে খাটাইয়া লাভের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিবে। তাহাদের ষ্টীমারগুলিও তাহাদের থাকিবে। ভারতের উপকূলবর্ত্তী জাহাজ যাতায়াতের পথে তাহাদের কোন অধিকার নাই, উপকূল বাণিজ্যও তাহাদের জন্য একচেটিয়া নহে। কেবল মাত্র ষ্টীমারগুলিই তাহাদের। সুতরাং তাহাদের অন্যায় ক্ষতি সাধনের কথা উঠিতে পারে না। কিন্তু এদেশের ক্ষতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে ব্যবসা করিতে দেওয়া হইবে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারত সরকার যদি ভারতীয় উপকূল বাণিজ্য হইতে বিলাতী জাহাজগুলিকে তাড়াইয়া দেন তাহাতে বাজেয়াপ্ত করার মত অন্যায় কিছু করা হইবে না।

অন্যত্র এ ব্যবস্থার উদাহরণ

এই সাধারণ এবং অতি সহজ সত্যটী দুনিয়ায় অনেক জাতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিয়াছে। সেইজন্য আমেরিকা, রুশিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, এবং বেলজিয়াম বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষিত করিয়াছে। সম্প্রতি চিলি, পেরু এবং তুরস্কেও এই ব্যবস্থা কায়েম হইয়াছে। মিঃ হাজীও তাহার বিল দ্বারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে চান। ইতালি, জার্ম্মাণি, স্পেন এবং জাপানে এ সম্বন্ধে মোটা সরকারী অর্থসাহায্য করা হইয়াছে। ইতালীয় গবর্মেণ্ট এই জন্য অল্প সুদে ৪৫ কোটী লিয়ার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। স্পেন গবর্মেণ্ট একটী স্বদেশীয় জাহাজ কোম্পানীকে ১৪ খানি জাহাজ কিনিয়া দিয়াছেন। জার্ম্মাণির ব্যবস্থা আরও আশ্চর্য্যজনক। ১৯২০ সনে জার্ম্মাণির বড় জাহাজ বলিতে একখানিও ছিল না। তখন জার্ম্মাণির মোট জাহাজের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬ লক্ষ টন। আজ জার্ম্মাণ ৪০ লক্ষ টন জাহাজের মালিক। জার্ম্মাণির নবনির্ম্মিত ব্রিমেন' জাহাজখানি আটলাণ্টিক মহাসাগরের সেরা জাহাজ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। জাহাজ-জগতে জাপানের অবস্থা নিতান্ত খাটো নয়। দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে ভারতবর্ষকে নৌ-বহর স্থাপন সম্বন্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

ভারত আপন প্রাপ্য বুঝিয়া লইতে চায়

উপকূল বাণিজ্য সম্পর্কে আমরা যে ভেদনীতির জন্য ওকালতি করিতেছি তাহা যে ন্যায়ধর্ম্মানুমোদিত তাহা বিরুদ্ধবাদিগণ বেশ বুঝেন। এ বিষয়ে তাঁহারা নিজেরাও ধরা দিয়াছেন। যুদ্ধের সময় বা ঠিক অব্যবহিত পরে যখন জাপানী জাহাজ কোম্পানীগুলি ভারতের উপকূলে বিলাতী জাহাজগুলিকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই সময় বৃটিশ বোর্ড অব্ ট্রেড্ তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়া বলে, ভারতের উপকূল আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। জাপানের উপকূলে কোন বিদেশী জাহাজের প্রবেশ নিষেধ, সুতরাং আমরাই বা জাপানী জাহাজকে ভারতের উপকূলে স্থান দিব কেন? বিলাতে অ্যাসোসিয়েটেড্ চেম্বার্স এইজন্য ভারতে এবং বিলাতে তুমুল আন্দোলন চালাইতে থাকে— যাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-গঠনে বিলাতের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়। কিন্তু বিদেশীদের ভাবা উচিত যাহা তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা তাঁহারা তাহাই পাইবার অধিকারী, তদতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করা তাঁহাদের পক্ষে মহাভ্রম। যদি তাঁহারা বেশী কিছু চান তাহা হইলে এই ভারতভূমিতেই তাঁহারা ঘর বাঁধিয়া বসবাস করিতে থাকুন, তাঁহারা ভারতের অধিবাসী

হউন। দুনিয়ার সমস্ত দেশেই স্বদেশী এবং বিদেশীদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর কায়েম করা হইয়াছে, সুতরাং ভারতবর্ষেই বা হইবে না কেন ? মার্কিণ মুলুকে কতকগুলি বৈদেশিক মানুষ (সকলে নহে) মার্কণের অধিবাসী হইবার পর সমস্ত প্রকার সুবিধা পাইয়া থাকে। আইরিশ ফ্রি ষ্টেটে বিলাতী মানুষকেও সমস্ত সুবিধা দেওয়া হয় না; তবে আবেদন নিবেদন করিলে আইরিশ মানুষ বনিয়া যাইয়া তবে বিলাতের লোক আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের অধিবাসীর সুবিধা ভোগ করিতে পারে। ভারতবর্ষও অনুরূপ ব্যবস্থা আপন এলাকায় কায়েম করিতে চাহে।

দি অ্যাসোসিয়েটেড্ চেম্বার্স আর একটী অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, আজ যদি ভারতবর্ষকে উপকূল ব্যাণিজ্য সংরক্ষণ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে আগামী কল্য ভারত চা, কফি, কেরোসিন তেলের উপর তাহার লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, এবং আরও কত কি চাহিয়া বসিবে ? আর এই আবদারের শেষ সীমা যে কোথায় গিয়া ঠেকিবে তাহা ভগবানই জানেন। কিন্তু ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, ভারত রাজনীতি এবং অর্থনীতি কোন ক্ষেত্রেই অন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী বা পক্ষপাতী নহে। ভারত কাহারও প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। ভগবান ভারতভূমিকে অতুলনীয় প্রাকৃতিক সম্পদে ভূষিত করিয়া সৃজন করিয়াছেন। সুতরাং ভারতের পক্ষে অপরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আপনার ভুঁড়ি মোটা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই এবং হইবেও না। কিন্তু ভারতকে তাহার আপন প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে হইবে। ভারতের নিজের বাণিজ্য নৌবহর চাই-ই, এবং ইহার প্রাথমিক উপায় স্বরূপ ভারতের উপকূলস্থ জাহাজ-পথে কেবল মাত্র স্বদেশী জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থাই কায়েম করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে বড় লাটের সহিত বোঝাপড়া চলিতেছে। কিন্তু এই ব্যাপারটি লইয়া দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইতেছে এইরূপ ভাবিলে চলিবে না। ইহা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার, এবং ভারতের ব্যবস্থা পরিষদের রায় এর সম্বন্ধে চরম ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ব্যাপারটী এখন সম্পূর্ণরূপে জাতীয় ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।

আসামে কুলি চালান

১৯০১ সনে "আসাম লেবার অ্যাণ্ড ইমিগ্রেশান অ্যাক্ট" বিধিবদ্ধ হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কে এই আইন জারি করা হইয়াছে। ১৯২৯ সনের জুন মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরের বার্ষিক রিপোর্ট বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মর্ম্ম নিম্নরূপ :—

গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য সনে কুলি চালানের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছে। বাঙ্গালার বীরভুম বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান এবং মেদিনীপুর, এই কয় জেলায় কুলি সংগ্রহ করা হয়। গ্রেডেড্ সর্দ্দারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০৪ জন (ইহার মধ্যে সর্দ্দারণীর সংখ্যা ১০৪ জন)। পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ সর্দ্দারের সংখ্যা ছিল ৫১২ জন। স্থানীয় লাইসেন্স্-প্রাপ্ত এজেণ্টগণ এই সমস্ত কুলি-সংগ্রহ ব্যাপারের পরিদর্শনাদি করেন।

পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ এজেণ্টের সংখ্যা ছিল ১১ জন এবং আলোচ্য সনে ১০ জন। কুলি চালান দেওয়া হয় পূর্ব্ব বৎসরে ৯১২ জন এবং আলোচ্য সনে ৯৯৩ জন। বীরভুম হইতে সবচেয়ে বেশী কুলি আসে,—কম সে কম ৮৪৬ জন। বাঙ্গালা এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে মোট ১৯,৫৬৫ জন কুলি গোয়ালন্দে জাহাজে চড়ে (বোম্বাই প্রদেশ হইতে আগত কুলিও ইহার ভিতর আছে)। পূর্ব্ব বৎসরে কুলি আসিয়াছিল ১২,৬৮৮ জন।

"টি ডিষ্ট্রিক্ট লেবার অ্যাসোসিয়েশান" পরিচালিত আসানসোল, খড়্গপুর, নৈহাটি এবং গোয়ালন্দে অবস্থিত কুলিদের বিশ্রাম-গৃহগুলি পরিদর্শন করিয়া দেখা যায় যে, কুলিদের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক।

চালান দেওয়ার সময় কুলিদের মধ্যে ৮ জন মারা যায়; দুইজন আসানসোলের বিশ্রামাগারে, ৪ জন নৈহাটীতে এবং ২ জন গোয়ালন্দে। আগত কুলিদের মধ্যে ৯ জন চম্পট দেয় (৫ জন খড়্গপুর হইতে, এবং ৪ জন গোয়ালন্দ হইতে)।

আসাম যাইতে অনিচ্ছুক বলিয়া একজনকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়; এবং অসুস্থতা নিবন্ধন ১৪ জনকে আলোচ্য বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত গোয়ালন্দ হাঁসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়। গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত জাহাজে পরিভ্রমণ পর্য্যন্ত বা চাঁদপুর হইতে রেলপথে ভিন্ন ভিন্ন চা বাগানে গমন পর্য্যন্ত পথি মধ্যে আর একটী কুলিও পলায়ন করে নাই বা মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই।

আসামে কুলি চালান দেওয়া ব্যাপারে আয়ের পরিমাণ ৬৯৭৲ টাকা হইতে ৭৫০৲ টাকা দাঁড়ায় এবং খরচ ১৬,৭৫৬ টাকা ৪ আনা হইতে ৯,৩৪১ টাঃ ৮ আঃ ৬ পাইএ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। খরচ কমিবার কারণ, আলোচ্য সনে গোয়ালন্দস্থ 'অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ এমিগ্রেশান অ্যাণ্ড দি এমবার্কেশান এজেণ্টের কোয়ার্টারের জন্য বা অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের ছুটি ও বেতনাদি বাবদ কোনরূপ খরচপত্র করা হয় নাই।

কান্দী ব্যবসায়ী সমিতির অধিবেশন

কান্দী ব্যবসায়ী সমিতির পরিচালকবর্গের একটী অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে:—

(১) এই সমিতি সাধারণের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ভেজাল ঘৃত তৈলাদি বিক্রয় নিতান্ত গর্হিত বলিয়া মনে করেন, সুতরাং এই মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে যাঁহারা তৈলঘৃত বা তৈলঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি বিক্রয় করেন, তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক বিশুদ্ধ দ্রব্যাদি আমদানি করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

মফঃস্বলের দোকানদারেরা অধিক লাভের প্রত্যাশায় সাঁইথিয়া ও সালার প্রভৃতি স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত সুলভে ভেজাল দ্রব্য আনয়ন করিয়া বিক্রয় করায় অত্রস্থ ব্যবসায়িগণের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং তৎপ্রতিকারকল্পে অত্র মহকুমার সর্ব্বত্র যাহাতে ভেজাল নিবারিত হয় তজ্জন্য জেলার হেলথ্ অফিসার বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছেন, এবং এই মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে ভেজাল খাদ্য নিবারণের জন্য চেয়ারম্যান্ বাহাদুরকে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিতেছেন।

(২) ইতিপূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটী হইতে অত্র বাজারে যে দুইটী আলো দেওয়া হইয়াছিল ইতিমধ্যে তাহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে; সুতরাং এই সমিতি মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান্ বাহাদুরকে উক্ত আলো দুইটী এবং তৎসহ মেছুয়াবাজার, পুরাতনহাট ও পাঁচগেছিয়ায় একটী করিয়া আরও তিনটী আলো দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

ফরাসী ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গ

[ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সহিত আমার কথোপকথনের সারমর্ম্ম।—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

প্রঃ—ফ্রান্সের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে ত আজ পর্য্যন্ত কিছু বল্লেন না ?

উঃ—আজ সে সম্বন্ধেই কিছু বলবার মতলব আছে।—ফ্রান্সে কমর্শিয়্যাল-ব্যাঙ্কগুলি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আলাদা করে কোন আইন করা হয় নি। সেখানকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইনের দ্বারাই এরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে,—তবে ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স" এবং আরও ৮টা ঔপনিবেশিক ফরাসী ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে বটে।

প্রঃ—ফরাসী ব্যবসায়িক আইনগুলির মধ্যে ব্যাঙ্কসংক্রান্ত বিষয়ে লক্ষ্য করবার মত কি কি ব্যবস্থা রয়েছে ?

উঃ—ফ্রান্সে কোন যৌথ প্রতিষ্ঠান কারবার খোলবার আগেই তার নাম, ধাম, উদ্দেশ্য, মূলধনের পরিমাণ, ডিবেঞ্চর ইত্যাদি সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় সেখানকার সরকারী সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে আইনতঃ বাধ্য। তবে এসব প্রকাশ করবার পরেও যদি প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোন গলদ থাকে, সে জন্য গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় না।

প্রঃ—তারপর ?

উঃ—কোন যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হ'লেই কমপক্ষে ৭জন লোক একত্র হওয়া চাই। কোম্পানীর মূলধনের সমষ্টিপরিমাণ যদি দু'লক্ষ ফ্রাঙ্ক হয় তবে তার শেয়ারের দাম ২৫ ফ্রাঙ্কের কম হ'লে চলবে না,—আর তারও দাম সম্পূর্ণ আদায় হওয়া চাই।

প্রঃ—এক ফ্রাঙ্কের দাম কত ?

উঃ—সে প্রায় দশ আনা হবে।

প্রঃ—আচ্ছা, মূলধন যদি দু'লক্ষ ফ্রাঙ্কের বেশী হয় ?

উঃ—সে ক্ষেত্রে প্রতি শেয়ারের দাম একশ' ফ্রাঙ্ক বা তার বেশী হওয়া দরকার—আর তারও অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ আদায়ী হওয়া চাই,—নইলে কারবার আরম্ভ করতে দেওয়া হয় না।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—আরও একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ফরাসী যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত শেয়ার শুধু দানসই করেই হস্তান্তরিত করা চলে। তার জন্য আর কোন রকম লেখাপড়া বা রেজিষ্ট্রেসন করা—কিছুরই দরকার হয় না।

প্রঃ—প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যপদ্ধতি বা হিসাব পরিদর্শন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা আছে ?

উঃ—সে সম্বন্ধে ফরাসী আইনে বিশেষ কড়াক্কড় নিয়ম নেই। অডিটার অর্থাৎ হিসাব-পরীক্ষকগণ অংশীদারদের বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে মাত্র একবার এদের কাগজপত্র তলব করতে পারে, যদিও কোম্পানীর দেনা এবং সম্পত্তি-বিষয়ক হিসাবগুলি এদের যখন তখন দেখবার ক্ষমতা আছে।

প্রঃ—ফ্রান্সে যেসব বিদেশী যৌথ প্রতিষ্ঠানের শাখা

অফিস আছে তারাও কি এই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ?

উঃ—হাঁ, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে এ ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এরা নিজ নিজ অনুষ্ঠানপত্রগুলি ফরাসী ভাষায় তর্জ্জমা করে প্রকাশ করতে বাধ্য।

প্রঃ—বুঝেছি, এবার তা'হলে ফরাসী ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত বলুন।

উঃ—ফ্রান্সে কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যপোষক যে সমস্ত ব্যাঙ্ক রয়েছে তাদের দু'টি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলিকে বলা হয় 'দি গ্রেট ক্রেডিট এস্‌টাব্লিশমেন্টস্ অর্থাৎ প্রধান কর্জ্জ প্রতিষ্ঠান, আর এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ককে "লোকাল অ্যাণ্ড রিজান্যাল অর্থাৎ মফঃস্বল এবং জেলা ব্যাঙ্ক বলা হয়ে থাকে।

প্রঃ—প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা কত ?

উঃ—ফরাসী দেশে মাত্র পাঁচটা ব্যাঙ্ককে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে, তাদের নাম হচ্ছে "ক্রেদি লিঅনে", "সোসিয়েতে জেনিরেলে", "কম্‌তয় ন্যাশিওনেল দে'সকম্‌তে", "ক্রেদি ইন্‌দাস্ত্রিয়েল এ কমার্শিয়েল" ও "ব্যাঙ্ক ন্যাশিওনেল দি ক্রেদিত"। শেষোক্ত ব্যাঙ্কটী ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্কগুলির কারবার চলছে কি ভাবে ?

উঃ—এদের কারবারের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আছে। খাঁটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের মত টাকা আমানত দেওয়া বা কর্জ্জ দেওয়া সে'ত এরা করেই—তা'ছাড়া নানা প্রকার প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহ করবার ব্যাপারেও এরা যথেষ্ট সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

প্রঃ—কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক হিসেবে এরা কি কাজ করছে ?

উঃ—ব্যবসা-সংক্রান্ত বিল কেনা, কি শেয়ার বাজারে দালালদের ধার দেওয়া, শেয়ার এবং ষ্টক জামিনে ধার দেওয়া বা হাওলাতকারীকে চলতি জমা হিসেব খুলে কর্জ্জ দেওয়া—এ সবই এরা করে থাকে। বহির্বাণিজ্যের সহায়তা করবার জন্য লড়াইয়ের আগে আমদানি-কারকের পক্ষে বিলের উপর দায় স্বীকার করাও এদের এক কাজ ছিল। তা'ছাড়া অবস্থা অনুসারে জামিন রেখে বা বিনা জামিনেই এরা ব্যবসায়ীকে বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে হাওলাত দেয়। গভর্ণমেন্ট ট্রেজারির অল্পকালস্থায়ী ঋণ-স্বীকার পত্রও এরা কিনে থাকে।

প্রঃ—তাত বুঝলাম, কিন্তু এর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি ?

উঃ—এদের বিল কেনা-বেচা সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। এই ব্যাঙ্ক ক'টার ফ্রান্সে এবং ফ্রান্সের বাইরেও বিস্তর শাখা অফিস রয়েছে,—তাতে এদের পক্ষে বিল সংক্রান্ত কারবার চালানো খুব সহজ হ'য়ে পড়েছে। লণ্ডনের বিল কেনার ওপরই এদের ঝোঁক বেশী। কিন্তু বিল কেনাবেচার সুবিধা করে দেবার জন্য যাতে এই নিয়ে ফ্রান্সে ফটকাবাজী ব্যাপার না চলতে পারে সেজন্য এরা বাজার চলতি সুদেরও প্রায় শতকরা ½ ফ্রাঙ্ক বেশী বাটা সুদ আদায় করে থাকে।

প্রঃ—তাতে কি সুবিধা হয়েছে ?

উঃ—এর ফলে বিদেশে আমানতি সুদের হার একটু চড়ে গেলেই যে ফ্রান্স থেকে বিল মারফৎ টাকা বেরিয়ে যাবে, তা সম্ভব হয় না।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—তারপর বিলের ওপর দায়স্বীকার করা সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। ফান্সের প্রধান কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান-গুলির কারবার অনুপাতে তারা যে পরিমাণ টাকার জন্য বিলের ওপর দায়স্বীকার করে তা খুব বেশী নয়।

প্রঃ—কেন, ব্যাঙ্কগুলির এত বিদেশী শাখা অফিস রয়েছে—তবু তারা বিস্তৃতভাবে এরকম কারবার চালাতে ইতস্ততঃ করছে কেন ?

উঃ—কেন তা বলা কঠিন,—তবে এই জন্যই সম্প্রতি ফ্রান্সে "ব্যাঙ্ক ফ্রাঙ্কে দি আক্‌সেপ্‌ট্যানসেস্" নামক একটা বিশেষ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন চলেছে। এর নির্দ্ধারিত মূলধন ১০ কোটি ফ্রাঙ্ক হবে—এই স্থির হয়েছে। টাকাটা কতকগুলি ফরাসী এবং

বেলজিয়ান ব্যাঙ্ক মিলে যোগাবে। এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যই হবে বিলের ওপর দায়স্বীকার সংক্রান্ত সকল রকম কাজের সহায়তা করা।

প্রঃ—এত গেল কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানগুলির কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কাজ,—তারপর বিবিধ প্রতিষ্ঠানের মূলধন যোগানো সম্বন্ধে এরা কি করছে?

উঃ—সেটাই হচ্ছে এসব ব্যাঙ্কের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য—আর সে সম্বন্ধে সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই কাজে এসব ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ টাকার কারবার করছে তার অধিকাংশই ফ্রান্স থেকে বিদেশে বেড়িয়ে যাচ্ছে। এমনি ভাবে কত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে তা এই থেকেই বুঝতে পারবে যে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এক বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সে যত সিকিউরিটি বিক্রী হয়েছিল তার শতকরা ৮২·৬ ভাগই ছিল বিদেশী সিকিউরিটি।

প্রঃ—এত টাকা দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাতে কোন বাধা দেওয়া হয় নি?

উঃ—ফ্রান্সের জনমত এ রকম কারবারের যথেষ্ট প্রতিবাদ করেছে। ব্যাঙ্কগুলি যে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির দিকে মনোযোগ না দিয়ে কেবলমাত্র তাদের ব্যবসা-বুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই অধিক লাভের আশায় বিদেশী সিকিউরিটি কিনছিল সে কথা নিয়ে কম আন্দোলন হয় নি। কিন্তু কোন রকম কড়া ব্যাঙ্কিং আইন না থাকবার জন্য এদের কার্য্য-পদ্ধতিকে সংযত করা হয় নি।

প্রঃ—তারপর?

উঃ—অনেকদিন পর্য্যন্ত এমনি ব্যাপার চলতে থাকে। শেষে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এক আইন করে দেওয়া হয় যে, ফ্রান্সে আর বিদেশী সিকিউরিটি বিক্রী করা চলবে না। কিন্তু এই আইনও বেশী দিন বজায় থাকে নি। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একে রদ করে দেওয়ার ফলে আবার পূর্ব্বাবস্থা ফিরে এসেছে।

প্রঃ—কেন, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এরকম কারবার বন্ধ করে দেবার জন্য একটা আইন করে দিলেই ত পারে?

উঃ—সে বিষয়ে কতগুলি মতবৈষম্য রয়েছে বলেই গভর্ণমেণ্ট এ রকম ব্যবস্থা করতে সাহস পাচ্ছে না। ব্যাঙ্কগুলির তরফ থেকে একটা যুক্তি হচ্ছে এই যে, সেখানকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতিশীল এবং নিরাপদ নয় বলেই তারা বিদেশী সিকিউরিটি কিনে তাদের টাকা লগ্নী করতে বাধ্য হচ্ছে। এ সম্বন্ধে এদের যুক্তি হ'ল এই যে, আমানতকারীদের কাছ থেকে যে টাকা আদায় হয় তা কোন অব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠানকে ধার দেবার ফলে যাতে নষ্ট না হতে পারে সেদিকে নজর রাখাই হচ্ছে তাদের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যের বিষয়। এই অবস্থায় বিদেশে টাকা লগ্নী করাই যদি তাদের পক্ষে অধিক নিরাপদ হয় তবে আপত্তি করবার কি কারণ থাকতে পারে?—তা' ছাড়া এমনিভাবে বিদেশে টাকা খাটিয়ে তারা অনেক বেশী সুদও অর্জ্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রঃ—কিন্তু দেশের বাইরে টাকা লগ্নী করা সত্যিই কি সব সময় খুব নিরাপদ হতে পারে?

উঃ—তাত নয়ই, এ রকম ব্যবস্থা করবার ফলেই ত লড়াইয়ের পর ফরাসী ব্যাঙ্কগুলির বিস্তর টাকা মারা গেছে। রুষ, তুর্কীস্থান, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের বিবিধ শিল্প-কারখানা ফেল পড়বার জন্য এদের অনেক সিকিউরিটির টাকাই নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রঃ—তবে আর প্রতিষেধক আইনের বিরুদ্ধে ফরাসী ব্যাঙ্কগুলির যুক্তি টেঁকে কি করে?

উঃ—লগ্নীর টাকা নিরাপদ রাখা সম্বন্ধে এরা যে যুক্তি দেয় সেটা নিতান্তই আজগুবি। আসল কথা হচ্ছে এই যে, দেশের বাইরে বেশী সুদ পাচ্ছে বলেই এরা বিদেশে টাকা লগ্নী করছে। তবে অনেক লোকসান দিয়ে দিয়ে এখন এরা বিদেশী লগ্নীর পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়ে আনছে।

প্রঃ—নিশ্চয়ই তাই। দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠান উন্নতিশীল নয় বলে এরা যে যুক্তি দেয় তার বিরুদ্ধে ত একথা বলা যেতে পারে যে তাদের অর্থসাহায্য না করলে তারা আদৌ উন্নতিশীল হবে কি করে?

উঃ—তাত বটেই।

প্রঃ—তারপর এই প্রধান কর্জ্জ প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে আর কি জানবার আছে বলুন।

উঃ—এদের সম্বন্ধে আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এদের বিস্তৃত শাখা প্রতিষ্ঠা। যে পাঁচটা ব্যাঙ্কের কথা উল্লেখ করেছি, লড়াইয়ের আগে এদেরই শাখার সংখ্যা হয়েছিল প্রায় ২ হাজার। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে এখন বিবিধ ব্যাঙ্কের মধ্যে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বৃহত্তর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান করবার উদ্যোগ চলেছে। ফ্রান্সে এখনও এই আন্দোলনের হাওয়া পৌঁছায় নি। সেখানে আজও শাখা-প্রতিষ্ঠার ব্যাপার সমানভাবেই চলেছে। এমন কি মফঃস্বল জায়গাগুলিতে, যেখানে আগে থেকেই স্থানীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেখানেও ফরাসী প্রধান কর্জ্জ প্রতিষ্ঠান কয়টী বর্ত্তমান স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলিকে আয়ত্ত না করে পৃথক শাখা প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের কারবার চালাচ্ছে।

প্রঃ—কিন্তু এমনি না করে স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলিকে আয়ত্ত করে নেওয়াই কি ভাল হ'ত না?—তাতে হয়ত সময় এবং অর্থব্যয় দুই-ই সংক্ষেপ করা সম্ভব হত,—নয় কি?

উঃ—এ বিষয়ে ফরাসী ব্যাঙ্ক-ধুরন্ধরেরা কেউ কেউ তাই বলছেন বটে।

প্রঃ—তারপর শুধু শুধু একটা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করেই বা কি লাভ?

উঃ—কিছুই লাভ নেই,—বরং যথেষ্ট লোকসানই হচ্ছে বলতে হবে। প্রধান কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানগুলি মফঃস্বলে যে শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করে, তারা স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে টক্কর দিতে গেলে সহজেই পারবে কেন? সেখানকার লোকজন, বাজার, ব্যবসা সব সম্বন্ধেই বিলক্ষণ খবরাখবর রাখা চাই ত! কাজেই শাখা অফিসগুলিকে ব্যাঙ্ক-দালালের সাহায্য নিয়ে কাজ করতে হয়, আর তার জন্য যে পরিমাণ কমিশন দিতে হয় তাও নেহাৎ কম নয়। এমনি না করে যদি স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলিকেই আয়ত্ত করে তাদের পরিচালকবর্গ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীকে কাজে বহাল রাখা হত তাহ'লে কারবার বিস্তারের জন্য প্রতিযোগিতাও করতে হ'ত না—কিংবা ব্যাঙ্ক-দালালের সাহায্য নেবারও প্রয়োজন হ'ত না।

প্রঃ—আচ্ছা, শাখা-অফিসগুলি ব্যাঙ্ক-দালালের কমিশন দিয়েও স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াচ্ছে কি করে?

উঃ—দাঁড়াচ্ছে কি বলছ!—বরং এদেরই টক্কর সামাল দিতে না পেরে এখন অনেক মফঃস্বল-ব্যাঙ্ক তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—তার কারণ হ'ল শুধু টাকার জোর, আর কিছু নয়। প্রধান ব্যাঙ্কগুলির এত টাকা রয়েছে, আর তা এত বিভিন্ন রকমে খাটান হ'চ্ছে যে কমিশনের টাকা তারা তুচ্ছ বলেই মনে করে। এই টাকা দিয়েও তারা যে নূতন কারবার পাচ্ছে তাতেই তাদের প্রচুর লাভ থাকে। স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির ত খুব বেশী টাকা থাকবার কথা নয়!—তারা এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পারবে কেন?

প্রঃ—আচ্ছা, এরকম শাখা-অফিস প্রতিষ্ঠা করবার জন্য প্রধান ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ কিছু সুবিধা হচ্ছে কি?

উঃ—এতে একটু সুবিধা আছে বৈ কি! কোন স্থান-বিশেষের ব্যাঙ্ক কেবল সেখানকার আশেপাশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকেই কর্জ্জ দিয়ে থাকে। এতে যদি সেই স্থানের শিল্পগুলির কখনো অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটে তবে ব্যাঙ্কেরও সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যে ব্যাঙ্কের অনেকগুলি শাখা অফিস গোটা দেশে বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে তার টাকা লগ্নী করবার ব্যাপার এ রকম একই স্থানের কৃষি-শিল্পের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে না। এ ছাড়া এদের আর একটা সুবিধা আছে। কোন হুজুকে মেতে আমানতকারীরা তাদের টাকা দাবী করে বসলে স্থানীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে দাবীর টাকা

মিটিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান ব্যাঙ্কের সহসা এরকম বিপদ হ'বার সম্ভাবনা নেই। তার কোন একটা শাখা অফিসে আমানতকারীরা টাকা দাবী করতে এলে সে তার অন্যান্য শাখা অফিসের উদ্বৃত্ত টাকা থেকে দাবীর টাকা মিটিয়ে দিতে পারে। টাকা তুলে নেবার হুজুকটা একেবারে দেশব্যাপী না হয়ে পড়া পর্য্যন্ত এ রকম ব্যাঙ্কের বিড়ম্বিত হবার আশঙ্কা থাকে না।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—এই শাখা-বিস্তারের ব্যাপার লড়াইয়ের সময় কিছুদিন স্থগিত ছিল। ফ্রান্সের অনেক স্থানই তখন শত্রু পক্ষের হস্তগত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ থেমে যাবার পর আবার শাখা প্রতিষ্ঠার ওপর ঝোঁক পড়েছে। তার ফলে মফঃস্বল শাখাগুলির আমানতি টাকা এখন ক্রমশঃই বৃহৎ নগরগুলিতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বর্ত্তমানে ফরাসী প্রধান ব্যাঙ্কগুলি অনেক দেশেই শাখা কিংবা এজেন্সী অফিস প্রতিষ্ঠা করেছে। তার ফলে বিদেশে টাকা লগ্নী করা পর্য্যন্ত এখন এদের পক্ষে অনায়াস-সাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়েছে।

প্রঃ—আচ্ছা, ফরাসী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের" সঙ্গে এই বৃহৎ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির কি রকম সম্বন্ধ রয়েছে?

উঃ—"ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স" ফরাসী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হলেও, তার এই শক্তিমান ব্যাঙ্কগুলির ওপর যথেষ্ট প্রতিপত্তি নেই। এদের বিদেশী কারবার এখন এত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, দেশের আভ্যন্তরীণ টাকার বাজারের ওপর এরা বড় নির্ভরশীল হয়ে থাকে না। তা' ছাড়া এই ব্যাঙ্কগুলির টাকার জোরও এত বেশী যে, কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য নেবার দরকারও এদের হয় না। "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের" সঙ্গে এরা যে টক্কর দিয়ে চলতে পারছে তার আরও একটা কারণ রয়েছে এই যে, "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের" মত এদের কারবার বিষয়ে কোন নিয়ন্ত্রণ-মূলক আইন করা হয় নি।

প্রঃ—"ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স" সম্বন্ধে কি কি ব্যবস্থা রয়েছে?

উঃ—এই ব্যাঙ্কটী ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। গোড়া থেকেই একে নোট বের করা এবং বিল ভাঙাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়—তখন এর মূলধন ছিল মাত্র ৩ কোটি ফ্রাঙ্ক। প্রথম এটা একটা খাঁটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে। ফরাসী গভর্ণমেন্ট এই ব্যাঙ্ক পরিচালনের ওপর কখনো হস্তক্ষেপ করেনি বা একে কোন রকম অসাধারণ ক্ষমতাও দেয়নি।

প্রঃ—কেন, একে ত নোট বের করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল?

উঃ—নোট বের করবার ক্ষমতা থাকলেও তাতে এর একচেটিয়া অধিকার ছিল না। ফ্রান্সে আরও দু'টো ব্যাঙ্ক তখন নোট বের করেছিল।

প্রঃ—তারপর?

উঃ—১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে আর দুটি ব্যাঙ্ক তাদের কারবার বন্ধ করে দেয়। তখন "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সে"রই শুধু নোট বের করবার ক্ষমতা বজায় থাকে। এই সময় এর মূলধন বাড়িয়ে ৪ কোটি ফ্রাঙ্কের বেশী করে দেওয়া হয়। নেপোলিয়ন তখন এই ব্যাঙ্কটিকে একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছিলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে একে এই ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, এই ব্যাঙ্ক যে কোন সহরে শাখা অফিস খুলে নোট প্রচলন করতে পারবে। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই ব্যাঙ্কের প্রাধান্য অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। তারপর ১৮১০ থেকে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সের বিভিন্ন নগরীতে কতকগুলি স্বাধীন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়;—এদের সবারই নোট বের করবার ক্ষমতা ছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই স্বাধীন ব্যাঙ্কগুলির নোট বের করা বন্ধ করে দিয়ে "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সে"র পূর্ব্বতন একচেটিয়া ক্ষমতাটাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে কম করে ৯টা ব্যাঙ্কের "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সে"র সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে যায়, আর "ব্যাঙ্ক

অব্ ফ্রান্সের" মূলধন বেড়ে গিয়ে ৯ কোটী ফ্রাঙ্ক অতিক্রম করে যায়। এই সময় থেকেই ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। গভর্ণমেণ্টের অনেক কর্জ্জের টাকা এই ব্যাঙ্কই যুগিয়েছে।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্কটি কি তা'হলে এখন একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়েছে?

উঃ—না, এর মূলধনের স্বত্ব সম্বন্ধে বলতে হয় যে, এটা এখনও একটা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানই রয়েছে। কিন্তু তা হ'লেও এই ব্যাঙ্কটি যে বর্ত্তমানে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীন হয়ে পড়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। গভর্ণমেণ্টের টাকাকড়ি এখন এই ব্যাঙ্কেই গচ্ছিত থাকে,—তা ছাড়া গভর্ণমেণ্টের কর্জ্জ নেওয়ার ব্যাপার বা অন্য কোন রকম লেনদেন সব এই ব্যাঙ্কের মারফৎই চলছে। এই ব্যাঙ্ক পরিচালনের জন্য একজন "গভর্ণর" ও দু'জন "ডেপুটি গভর্ণর" আছেন,—তাঁরা সবাই ফরাসীরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক দীর্ঘকালের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস-গুলির ম্যানেজার নিয়োগ করাও গভর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচন-সাপেক্ষ ব্যাপার।

প্রঃ—ব্যাঙ্কটির পরিচালন সম্বন্ধে অংশীদারদের কোন ক্ষমতা নেই কি?

উঃ—হাঁ, সে সম্বন্ধেও একটা ব্যবস্থা আছে। ব্যাঙ্কের সব চেয়ে বেশী দামের শেয়ার যারা কিনছে এমনি দু'শ অংশীদার মিলে একটা পরিচালন-সমিতি গঠন করে থাকে,—তার নাম "জেনারেল কৌন্সিল" বা সাধারণ পরিষৎ। এর মেম্বর-সংখ্যা ১৫। এই অংশীদার-গণ ব্যাঙ্কের ৩ জন হিসাব-পরীক্ষক ও নির্ব্বাচন করে দেয়।

প্রঃ—গভর্ণরেরা তাহলে এই কৌন্সিলের সঙ্গে সহযোগিতা করেই ব্যাঙ্কটী পরিচালন করছে?

উঃ—হাঁ, কিন্তু প্রয়োজন হ'লে কৌন্সিলের মতামত অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতাও তাদের আছে।

প্রঃ—বুঝেছি, আচ্ছা "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের" নোট বের করা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা রয়েছে?

উঃ—এই ব্যাঙ্কের নোট বের করবার ব্যবস্থা ফরাসী ব্যাঙ্কিং সিষ্টেমে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। ফ্রান্সে চেকের ব্যবহার এখনও খুব প্রসার লাভ করে নি। নোট দিয়েই সেখানকার যত লেনদেন চলছে। ব্যাঙ্কের নোটের জন্য কি পরিমাণ রিজার্ভ ফণ্ড রাখতে হবে সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কোন ব্যবস্থা করে দেয় নি। কিন্তু এই ব্যাঙ্ক কত নোট বের করতে পারবে সে সম্বন্ধে একটা পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে দেওয়া আছে বটে। প্রয়োজনমত এই নির্দ্ধারিত পরিমাণকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রঃ—নোটের টাকা দেবার জন্য ব্যাঙ্ক কোন রকম সিকিউরিটি মজুদ রাখতে বাধ্য থাকে না কি?

উঃ—না, কিন্তু সে রকম কোন ব্যবস্থা না থাকলেও এই ব্যাঙ্কটী সাধারণতঃ তার নোটের শতকরা ৬০ থেকে ৭৫ ভাগ পর্য্যন্ত সোনারূপো রিজার্ভে মজুদ রাখে।

প্রঃ—"ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স" কি পরিমাণ নোট বের করছে?

উঃ—যুদ্ধের আগে তার পরিমাণ ছিল ৫২০ কোটী ফ্রাঙ্ক। লড়াইয়ের খরচ চালবার জন্য একে অনেক বেশী নোট বের করতে হয়েছে। তার ফলে এখন এই ব্যাঙ্কের নোটের পরিমাণ প্রায় ৪,৮৫০ কোটী ফ্রাঙ্ক হবে।

প্রঃ—এখন এই ব্যাঙ্কের কত মূলধন রয়েছে?

উঃ—প্রায় ১৮ কোটী ২৫ লক্ষ ফ্রাঙ্ক।

প্রঃ—ব্যাঙ্কটীর আর কোন বিশেষত্ব আছে কি?

উঃ—"ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সে"র এখন প্রত্যেক জেলায় একটি করে শাখা-অফিস প্রতিষ্ঠা করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই শাখা-অফিস সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এদের সহায়তায় "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স" এখন বিস্তৃতভাবে একটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কাজ চালাচ্ছে। বিল কেনা থেকে আরম্ভ করে সামান্য টাকার লেনদেন করা বা কোন ব্যক্তি-বিশেষের জন্য হিসেব খোলা কিছুই এ বাদ দেয় না। যুক্তরাষ্ট্র কিংবা

ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের" এ বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

প্রঃ—আচ্ছা আপনি "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সে"র নোটের পরিমাণ সম্বন্ধে যা বল্লেন এই বিপুল পরিমাণ নোটের টাকা দিবার মত তার যথেষ্ট নগদ সোনা আছে কি ?

উঃ—না, তা নেই বটে, কিন্তু তার জন্য যতটা বিপদ হওয়া স্বাভাবিক বলে মনে হয় তা হবার মত ভয়ও এই ব্যাঙ্কের নেই। ফ্রান্সে ধাতুমুদ্রার প্রচলন-ব্যবস্থাই তাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করছে ?

প্র—কি রকম ?

উঃ—তার কারণ,—ফ্রান্সে আভ্যন্তরীণ লেনদেন সম্বন্ধে কার্য্যতঃ এখনও দ্বি-ধাতুর প্রচলন রয়েছে। ব্যাঙ্ককে তার নোটের বিনিময়ে যে কেবল সোনাই দিতে হবে তা নয়, রূপো দিয়েও সে তার নোটের দায় মেটাতে পারে। ফরাসী ব্যাঙ্ক-মহলে এই প্রকার আর্থিক ব্যবস্থার প্রভাব বড় কম নয়। বিদেশী কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার সুদের হার একটু চড়িয়ে দিলেই যে এ দেশ থেকে সোনা বেড়িয়ে যাবে তেমন হবার সম্ভাবনা নেই। ফরাসী ব্যাঙ্ক কিন্তু তার সুদের হার চড়িয়ে বিদেশ থেকে সোনা আনবার ব্যবস্থা করতে পারে।

প্রঃ—বহির্বাণিজ্যের জন্য ত সোনা ছেড়ে দিতে হয় ?—না হলে বাণিজ্য চলে কি করে ?

উঃ—হাঁ, তা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তার জন্য একটা বাটা আদায় করবার ব্যবস্থা আছে। এ জন্যও ফ্রান্স থেকে চট করে সোনা বেরিয়ে যেতে পারে না।

প্রঃ—কিন্তু সোনাই হোক্ আর রূপোই হোক্ ১,৮৫০ কোটী ফ্রাঙ্কের নোটের জন্য যে ফণ্ড রাখা দরকার তা ত বড় কম নয় ?

উঃ—তা ত নয়ই, তবে যে এত নোট বের করা হয়েছে সেও কেবল লড়াইয়ের জন্যই। আর তার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্টই ব্যাঙ্কটীকে দায়মুক্ত করে দেবার ব্যবস্থা করেছে ? যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গেই গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করে দিয়েছিল যে, "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স" তার নোটের জন্য সোনা দিতে বাধ্য থাকবে না, তা সে যে জন্যই হোক। ব্যবসায়িক বা অন্য কোন রকম লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্কের নোটই অবশ্যগ্রাহ্য বলে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রঃ—তা হলে কি ফ্রান্সে এখন আর সোনা দেওয়া হচ্ছে না ?

উঃ—হাঁ, কিছু দিন হল এ রকম ব্যবস্থা আবার করা হয়েছে বটে।

প্রঃ—তা সম্ভব হল কি করে ? ফ্রান্সের সোনার পুঁজি হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছে নাকি ?

উঃ—না, এখন প্রতি ফ্রাঙ্কের স্বর্ণ-মূল্য লড়াইয়ের আগের চেয়ে অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে,—প্রায় দু'ভাগের একভাগ বল্লেই চলে। কাজেই সোনার পরিমাণ খুব না বাড়িয়েও এরকম ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—এবার ফ্রান্সে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সব ব্যাঙ্ক রয়েছে তাদের কথা বলছি, শোন। ফ্রান্সে যে সব বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক রয়েছে তাদের কোনটী কোন দেশের ব্যাঙ্ক সে সব তাদের প্রতিষ্ঠার আগে বিশেষ করেই যাচাই করে নেওয়া হয়। এদের হেড অফিস কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা দেখেই এসব ব্যাঙ্কের দেশ নির্দ্ধারণ করা হয় না। এদের পরিচালকবর্গ ও অংশীদারদের জাতীয়তা অনুসারেই এদের দেশ নিরূপণ করা হয়ে থাকে। যে সব দেশের সঙ্গে ফ্রান্সের সদ্ভাব আছে সে সব দেশের ব্যাঙ্ক ফ্রান্সে শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করলে তারা খাঁটি ফরাসী ব্যাঙ্কের সঙ্গে সমভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

প্রঃ—কোন কোন বিষয়ে এদের ফরাসী আইন মেনে চলতে হয় ?

উঃ—বিদেশী ব্যাঙ্কের শাখা-অফিসগুলি যে আইনের বশবর্ত্তী হয়েই প্রতিষ্ঠিত হোক্ না কেন, ফরাসী আইন অনুসারে যদি কখনো তাদের কারবার বন্ধ করে দেবার মত অবস্থা হয়ে পড়ে, তবে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট নিজেই তার কারবার বন্ধ করে দিতে পারে। এ

বিষয়ে ফরাসী ব্যাঙ্কের সঙ্গে এদের কোন পার্থক্য করা হয় না। ফরাসী ব্যাঙ্কের মত এরাও শেয়ার বাজারে কারবার চালাতে পারে। "ক্লিয়ারিং হাউস" বা ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশ-প্রতিষ্ঠানের মেম্বর হবার অধিকারও এদের আছে। তা ছাড়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস থেকে এদের নামও এখন গভর্ণমেণ্টের "কমার্স" বা বাণিজ্য বিভাগের রেজেষ্টারীতে তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে।

প্রঃ—এ রকম বিদেশী শাখা-ব্যাঙ্কের সংখ্যা এখন কত হবে?

উঃ—১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এদের সংখ্যা ছিল ১১, তারপর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এদের সংখ্যা প্রায় ৪০ দাঁড়িয়েছিল।

প্রঃ—এদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে দেখছি।

উঃ—হাঁ, ফ্রান্সে নানাদেশের সিকিউরিটি বিক্রীর সুবিধা রয়েছে বলে সেখানে বিদেশী ব্যাঙ্কের কারবার চালাবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—এ ত গেল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের ব্যাপার,—তারপর ফ্রান্সে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যবসায় হিসেবে যে সব ব্যাঙ্ক চলেছে তাদের কথাও উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ "রথচাইল্ড ব্রাদার্স" নামক ফার্ম্মের নাম করা যেতে পারে। এই ফার্ম্মটী এখন বিস্তর টাকা ফ্রান্সের বাইরেই লগ্নী করছে। ফ্রান্সের অনেক রেল কোম্পানীকে এই ফার্ম্মটী টাকা যুগিয়েছে। তা ছাড়া ফরাসী বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানেও এর মূলধন খাটছে।

প্রঃ—এত শুধু একটা ফার্ম্মেরই কথা বলছেন?

উঃ—না, রথ্‌চাইল্ডের মত বড় না হ'লেও এই ধরণের ছোটখাটো আরও অনেক ফার্ম্ম আছে।

প্রঃ—তারপর আর কি কি রকমের ব্যাঙ্ক আছে?

উঃ—ফ্রান্সে আর এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক রয়েছে,—তার নাম "ব্যাঙ্ক দি আফেয়ার"। সাধারণতঃ কয়েকজন পুঁজি-পতি মিলেই এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে থাকে। কাজেই এদের সবারই বিস্তর মূলধনের জোর রয়েছে। আমানতি টাকার ওপর এরা বড় নির্ভরশীল হয় না।

প্রঃ—এ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক কি রকম কারবার করে থাকে?

উঃ—ব্যবসায় কিংবা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী মূলধন যোগানোই হচ্ছে এদের প্রধান কাজ। সেজন্য এরা বিবিধ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ষ্টক বাজারে বিক্রী করবার ব্যবস্থা করে থাকে।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—তারপর মফঃস্বলের স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এই ব্যাঙ্কগুলি ইদানীং তাদের ব্যবসা বিস্তারের দিকে মন দিয়েছে। সেজন্য এদের মধ্যে কোন কোন ব্যাঙ্ক বিভিন্ন স্থানে এজেন্সী অফিস প্রতিষ্ঠা করেছে। এই ধরণের ব্যাঙ্কগুলিকে এখন আর মফঃস্বলের স্থানীয় ব্যাঙ্ক না বলে ফ্রান্সের "রিজান্যাল" বা জেলা বিস্তৃত ব্যাঙ্ক বলা যেতে পারে।

প্রঃ—স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই কি?

উঃ—সে কথাই বলতে যাচ্ছি, এই—ব্যাঙ্কগুলি এখন পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কতকগুলি প্রাদেশিক সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, তাদের নাম প্রাদেশিক "ব্যাঙ্ক সিণ্ডিকেট"। শুধু তাই নয়, এই প্রাদেশিক সঙ্ঘগুলিকেও সংযুক্ত করে একটা আরও ব্যাপক সঙ্ঘ গঠিত হয়েছে,—তাকে বলা হয় "সেণ্ট্রাল সোসাইটী অব্ প্রভিনশিয়াল ব্যাঙ্কস্" বা প্রাদেশিক ব্যাঙ্কসমূহের কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ।

প্রঃ—প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির কি কাজ?

উঃ—এদের বিস্তর মূলধন থাকবার জন্য এরা দীর্ঘকালের জন্য টাকা কর্জ্জ দেয়। তা ছাড়া ফরাসী গভর্ণমেণ্ট কিংবা কোন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান-বিশেষের কর্জ্জস্বীকারমূলক বণ্ড বা প্রতিজ্ঞা-পত্রগুলিও বাজারে চালাবার জন্য এরা যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে।

প্রঃ—কেন্দ্রীয় সঙ্ঘটি তা' হলে কি করে?

উঃ—এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের টাকা যোগানো বা গভর্ণমেণ্টের কর্জ্জের টাকা সংগ্রহ করবার ব্যাপারে সহায়তা করা। তার জন্য

এরাও নানাবিধ সিকিউরিটি কেনাবেচা করে থাকে।

প্রঃ—আচ্ছা ফ্রান্সে জমি-বন্ধকী কারবার চালাবার জন্য কোন ব্যাঙ্ক রয়েছে কি?

উঃ—এ সম্বন্ধে দুটী বিশেষ প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য। এরা ঠিক সরকারী প্রতিষ্ঠান না হ'লেও এদের সম্বন্ধে একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই যে, এই দুটী ব্যাঙ্ক আপনা থেকেই গড়ে ওঠে নি। দু'টী পৃথক আইন পাশ করে এদের প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে।

প্রঃ—এরা কি ভাবে কারবার করছে?

উঃ—এর একটি প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে "ক্রেদিত ফোঁশিয়া"। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের এক বিশেষ আইন ব্যবস্থা অনুসারে এর প্রতিষ্ঠা হয়,—সেই আইন কায়েম করবার প্রায় ৫ বৎসর পর। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নানাবিধ ভূ-সম্পত্তি বন্ধক রেখে টাকা কর্জ্জ দেওয়া। এরকম কর্জ্জ দেওয়ার জন্য গোড়ায় একে বণ্ড বা প্রতিজ্ঞাপত্র বের করে টাকা সংগ্রহের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ থেকে সে ক্ষমতা রদ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রঃ—এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনের ভার রয়েছে কার ওপর?

উঃ—এর প্রায় দু'শ ধনী অংশীদার আছে,—তারাই এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনের জন্য একটী "বোর্ড" গঠন করে থাকে।

প্রঃ—এর সঙ্গে ফরাসী গভর্ণমেন্টের কোন সম্বন্ধ নেই কি?

উঃ—এই বোর্ডের গভর্ণর এবং ডেপুটী গভর্ণর উভয়েই গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হয়ে থাকেন।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—তারপর আর একটি প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে "ক্রেদিত আগ্রিকোল"। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা হয়। বিনা বন্ধকে কৃষকদের ধার দেওয়াই এর উদ্দেশ্য।

প্রঃ—এও কি বণ্ড বের করে টাকা সংগ্রহ করে?

উঃ—না, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "ক্রেদিত্ ফোঁসিয়া"র সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটীকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে শুধু "ক্রেদিত্ ফোঁসিয়া"কেই ডিবেঞ্চার বের করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

প্রঃ—"ক্রেদিত ফোঁসিয়া" কি পরিমাণ ডিবেঞ্চার বের করতে পারে?

উঃ—তার মূলধনের প্রায় বিশগুণ।

প্রঃ—তা' হলে জমিবন্ধকী কারবারের জন্য ফ্রান্সে বেশ ভাল বন্দোবস্তই রয়েছে বলতে হবে। আচ্ছা, কৃষকদের আপাত প্রয়োজনের জন্য কর্জ্জ দেওয়া সম্বন্ধে ফ্রান্সে কোন ব্যবস্থা করা হয় নি কি?

উঃ—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের এক আইনের ফলে ফরাসী কৃষকদের সাহায্য করবার জন্যই এক শ্রেণীর ছোট ছোট ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছে—এদের বলা হয় "মিউচ্যুয়াল ক্রেডিট ব্যাঙ্ক" বা সমবায় ঋণ ব্যাঙ্ক। অনেক সময় এদের মফঃস্বল ব্যাঙ্ক বা মফঃস্বলের স্থানীয় ব্যাঙ্ক বলেও পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রঃ—ফরাসী কমার্শিয়্যাল ব্যাঙ্কের প্রসঙ্গে আপনি এদের কথাই বলছিলেন কি?

উঃ—না, সে সব রিজান্যাল ব্যাঙ্ক পুরাপুরি কমার্শিয়্যাল ব্যাঙ্ক,—কৃষিশিল্পের অর্থ সাহায্যের দিকে তারা তত নজর দেয় না; কিন্তু এখন যে মফঃস্বল-ব্যাঙ্কের কথা বলছি তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হ'ল চাষের টাকা যোগান দেওয়া। কাজেই দেখতে পাচ্ছ যে রিজান্যাল ব্যাঙ্ক বলতে দুই প্রকার প্রতিষ্ঠান বুঝায়, এক শ্রেণীর উদ্দেশ্য হ'ল ব্যবসার সাহায্য করা—আর এক শ্রেণী চাষবাসের সাহায্য করে থাকে।

প্রঃ—বুঝেছি, আচ্ছা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এদের সম্বন্ধে যে আইন করা হয়েছিল তাতে কি কি ব্যবস্থা রয়েছে?

উঃ—তাতে একটা বিশেষ নিয়ম রয়েছে এই যে, কেবল ফরাসী "অ্যাগ্রিকালচারাল সিণ্ডিকেট" বা কৃষক সঙ্ঘগুলিই এ রকম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারবে আর তাদের মেম্বরই শুধু এই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কর্জ্জ নিতে পারবে।

প্রঃ—কৃষকসঙ্ঘগুলির মেম্বর হওয়া সম্বন্ধে কোন আইন ছিল কি?

উঃ—খাঁটি কৃষক বা পশু প্রজনন ব্যবসায়ী ইত্যাদি ছাড়া আর কারো মেম্বর নির্ব্বাচিত হবার নিয়ম নেই।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—তারপর এই আইন অনুসারে যে সব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তাদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এরা মেম্বরদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন করতে পারে না। কেবল তাদের আমানতি টাকার ওপর শতকরা ৪ ফ্রাঙ্ক পর্য্যন্ত সুদ দেওয়া হয়ে থাকে। মেম্বরগণ সকলেই ব্যাঙ্কের দেনার জন্য একত্র দায়ে আবদ্ধ থাকে।

প্রঃ—এগুলি ত তা'হলে সমবায় সমিতির মতই প্রতিষ্ঠান দেখ্‌ছি?

উঃ—বস্তুতঃ তাই।

প্রঃ—তবে এদের সমবায় সমিতি না বলে ব্যাঙ্ক বলা হয় কেন?

উঃ—সে শুধু ফরাসী আইনেরই একটা খেয়াল, আর কিছু নয়। এদেশে টাকাপয়সা লেনদেনকারী কোন প্রতিষ্ঠানকেই সমবায় সমিতি আখ্যা দেবার নিয়ম নেই।

প্রঃ—আচ্ছা ফ্রান্সে এ রকম কতগুলি "সমবায় ব্যাঙ্ক" আছে?

উঃ—১৯১০ খৃষ্টাব্দে এদের সংখ্যা হয়েছিল ৩,১৫০।

প্রঃ—এদের সম্বন্ধে আর কি জানবার আছে, বলুন।

উঃ—এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সে কৃষক সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্য আরও যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্সের" একচেটিয়া ক্ষমতাগুলি পরিবর্ত্তন করা হবে কিনা সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার উদ্যোগ চলতে থাকে। এই সময় ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কের পূর্ব্বতন ক্ষমতাগুলি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এই চুক্তি করে যে ফ্রান্সে কৃষির উন্নতি এবং বিস্তারের জন্য "ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স"কে কিছু টাকা কর্জ্জ দিতে হবে। তার ফলে এই ব্যাঙ্ক গভর্ণমেণ্টকে ৪ কোটী ফ্রাঙ্ক ধার দিয়েছিল।—আর সেই সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই যে, যত দিন ব্যাঙ্কের অসাধারণ ক্ষমতাগুলি প্রত্যাহৃত না হবে ততদিন গভর্ণমেণ্ট এ টাকা পরিশোধ করবার জন্য বাধ্য থাকবে না।

প্রঃ—গভর্ণমেণ্ট এই ৪ কোটী ফ্রাঙ্ক নিয়ে কি করেছে?

উঃ—তার সবটাই ফ্রান্সের বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্ককে ধার দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আরও ৬ কোটী ফ্রাঙ্ক এই একই উদ্দেশ্যে দান হিসেবে আদায় করে নিয়েছে। সে টাকা কোন দিনই পরিশোধ করবার দরকার হবে না।

প্রঃ—তারপর?

উঃ—এর পর এক পরিবর্ত্তন ঘটে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। এই বৎসর এমন একটি আইন করা হয় যাতে কৃষকদের ঋণ-সংগ্রহের জন্য আরও সুবিধে করে দেওয়া হয়।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—এই আইনে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই যে, নিজ নিজ শস্য জামিন রেখে যদি কোন কৃষক স্থানীয় "জাষ্টিস অব্ পিস" বা পৌর সমাজপতির নিকট প্রতিজ্ঞাসূচক বিল সই করে দেয় তবে সেই দলিলের ওপর সে যে কোন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা কর্জ্জ নিতে পারবে। ব্যবসায়িক বিলের মত এই দলিলগুলি যে কোন ব্যাঙ্কের কাছে ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায়। যে আবাদী শস্য জামিন দেওয়া হয় তা যে সত্যিই ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত রাখতে হয়, তা নয়। সাধারণতঃ হাওলাতকারীর কাছেই তা থেকে যায়। এতে সাধারণ কৃষকের মস্ত একটা সুবিধে হয়েছে এই যে, বাজারে বাড়তি দাম না পাওয়া পর্য্যন্ত তারা নিজেদের উৎপন্ন শস্য না বেচে কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—কিন্তু এতেও সম্পূর্ণ সুবিধা হয় নি। গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকলেও সোজাসুজিভাবে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে কর্জ্জ দেওয়া তার পক্ষে একটু সমস্যামূলক ব্যাপার হয়ে পড়ল। এই ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলির সিকিউরিটীর উপর নির্ভর করে কর্জ্জ দেওয়া অন্ততঃ

গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে আর সমীচীন বলে বিবেচিত হ'ল না। তাই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দেই আর একটি আইন কায়েম করা হয়। এরই ফলে ফরাসী "রিজান্যাল" বা জেলা ব্যাঙ্কগুলির উদ্ভব হয়েছে। এই ব্যাঙ্কগুলিই এখন কর্জ্জ দেওয়ার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট এবং সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের কাজ করছে।

প্রঃ—এই জেলা ব্যাঙ্কগুলির গঠন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা রয়েছে?

উঃ—আগে যে সব সমবায় ব্যাঙ্কের কথা বলেছি তাদের কারবারের গণ্ডী ছিল এক একটা গ্রাম। এখন প্রত্যেক জেলার অন্তর্ভুক্ত সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে একত্র করেই এই "রিজান্যাল" বা জেলা ব্যাঙ্কগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারাই কেবল রিজান্যাল বা জেলা ব্যাঙ্কের মেম্বর নির্ব্বাচিত হতে পারে, তারাই এর মূলধন যোগায়। আসল জেলা ব্যাঙ্কগুলিও সমবায় প্রতিষ্ঠান।

প্রঃ—এখন তা হলে গভর্ণমেণ্ট সোজাসুজি সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আর ধার দিচ্ছে না?

উঃ—না, এখন গভর্ণমেণ্টের যা কর্জ্জ দেওয়া তা সব জেলা ব্যাঙ্কদেরই দেওয়া হয়ে থাকে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি দরকার মত এই জেলা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার পায়।

প্রঃ—গভর্ণমেণ্টের কোন বিভাগ থেকে এ রকম কর্জ্জ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উঃ—এর জন্য ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে একটা পৃথক বোর্ড গঠন করা হয়েছে, তার নাম "ক্রেদিত আগ্রিকোলে"। এ বোর্ডটী ফরাসী গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

প্রঃ—আচ্ছা ফ্রান্সে জেলা-ব্যাঙ্ক কতগুলি আছে,—আর তাদের মূলধনের পরিমাণই বা কত?

উঃ—১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এদের সংখ্যা হয়েছিল ৯৫। তখন এদের মূলধন ছিল প্রায় ১ কোটী ৩৫ লক্ষ ফ্রাঙ্ক। গভর্ণমেণ্ট যে টাকা কর্জ্জ দিয়েছিল তা মূলধনের প্রায় সাড়ে তিন গুণ হবে।

প্রঃ—জেলা ব্যাঙ্কগুলি টাকা আমানত নিতে পারে কি?

উঃ—হাঁ, চলতি হিসেবে টাকা নিতেও এরা অভ্যস্ত—তা ছাড়া নানা রকমে টাকা লগ্নী করবার ক্ষমতাও এদের আছে।

প্রঃ—বুঝেছি, তারপর বলুন।

উঃ—এতক্ষণ যে সব আইনের কথা বলছি তাতে শুধু অল্পকালস্থায়ী কৃষিঋণের ব্যবস্থাই করা হয়েছে। কৃষকদের বিস্তৃতভাবে কর্জ্জ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বটে, কিন্তু তারা তিন মাসের অতিরিক্ত কালের জন্য কর্জ্জ পেত না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আর একটা নূতন আইনের সৃষ্টি হয়।

প্রঃ—তাতে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উঃ—এই আইনের ফলে জেলা ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্ককে ২৫ বৎসরের জন্য দীর্ঘকাল-স্থায়ী কর্জ্জ দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তার জন্য বছরে শতকরা ২ ফ্রাঙ্কের বেশী সুদ আদায় করতে দেওয়া হয় না, তা ছাড়া সমবায় ব্যাঙ্ককেই যে এ রকম কর্জ্জ দেওয়া হত, তা নয়; এর জন্য বিশেষ তিনটী শ্রেণীর ব্যাঙ্ক নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয়েছিল।

প্রঃ—সেগুলি কি শ্রেণীর ব্যাঙ্ক?

উঃ—প্রথমতঃ, যে সব ব্যাঙ্ক নানাবিধ কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন, রক্ষণ বা বিক্রয়ের সহায়তা করবার জন্য গড়ে উঠেছিল তাদের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিসংশ্লিষ্ট গৃহ, কারখানা বা গুদাম নির্ম্মাণের সাহায্য করবার জন্য যে সব ব্যাঙ্ক ছিল তাদেরও এই অবস্থায় কর্জ্জ দেবার নিয়ম করা হয়েছিল। তা ছাড়া কৃষি সরঞ্জাম ও যন্ত্রের ব্যবহার-সহায়ক সমবায় ব্যাঙ্কগুলিও এই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

প্রঃ—এরকম ভাবে টাকা কর্জ্জ দেবার জন্য কোন পরিমাণ নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয় নি কি?

উঃ—হাঁ, সমবায় ব্যাঙ্কগুলির আদায়ী মূলধনের দ্বিগুণ পর্য্যন্তই কর্জ্জ দেবার নিয়ম করা হয়েছিল, তার বেশী নয়।

প্রঃ—কতগুলি সমবায় ব্যাঙ্ক এরকম কর্জ্জ পেয়েছে, আর তার জন্ত কত টাকাই বা দেওয়া হয়েছে ?

উঃ—১৯১০ খৃষ্টাব্দে এদের সংখ্যা হয়েছিল ১,২৮০ তখন এরা যে কর্জ্জ পেয়েছিল তার পরিমাণ হবে প্রায় ৪৪ লক্ষ ফ্রাঙ্ক।

প্রঃ—কর্জ্জের পরিমাণ ত খুব বেশী হয় নি ?

উঃ—তা বটে,—তারপর শোন বলছি, এখনও শেষ হয় নি। ১৯১০ খৃষ্টাব্দেই আবার একটা নূতন আইন করা হয়। তাতে ব্যক্তি বিশেষকেই দীর্ঘকাল স্থায়ী কর্জ্জ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি তখন থেকে তাদের মেম্বরদের ১৫ বৎসরের অনধিককালস্থায়ী কর্জ্জ দিতে পেরেছে। টাকাটা অবশ্য তারা জেলা ব্যাঙ্কের মারফৎ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকেই পেত। আর গভর্ণমেণ্টও এই কারণেই জেলা ব্যাঙ্কগুলিকে ২০ বৎসরের জন্ত তাদের আদায়ী মুলধনের দ্বিগুণ পর্য্যন্ত টাকা ধার দিয়েছে।

প্রঃ—এই আইনে মেম্বরদের কর্জ্জ দেওয়া সম্বন্ধে আর কি কি ব্যবস্থা হয়েছে ?

উঃ—কোন একজন মেম্বরকে উর্দ্ধ-সংখ্যায় ৮ হাজার ফ্রাঙ্ক পর্য্যন্ত ধার দেবার নিয়ম করা হয়েছিল, তার জন্তও বছরে শতকরা ৩' ফ্রাঙ্কের বেশী সুদ আদায় করা এই আইন অনুসারে নিষিদ্ধ। কিন্তু এতে কেবল মাত্র কৃষকদের জমিজমা খরিদ বা তার কোন রকম স্থায়ী উন্নতি করবার জন্তই ধার দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্রঃ—হাওলাতকারীকে কোন কিছু জামিন বা বন্ধক দিতে হয় কি ?

উঃ—নিশ্চয়ই, এজন্ত সম্পত্তি কিংবা জীবন বীমার চুক্তিপত্র বন্ধক রাখবার নিয়ম করা হয়েছে।

প্রঃ—কর্জ্জের টাকাটা পরিশোধ করবার জন্ত এই আইন কি ব্যবস্থা করেছে ?

উঃ—তার জন্ত এই ব্যবস্থা রয়েছে যে, কর্জ্জের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর দেয় নির্দ্ধারিত পরিমাণ টাকার দাবী মিটিয়ে দেনার টাকা দফায় দফায় পরিশোধ করলেই চলবে।

প্রঃ—তারপর ?

উঃ—এর পর লড়াই শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নি। শেষে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কৃষি-ঋণ-সহায়ক আর একটা উল্লেখযোগ্য আইন করা হয়েছে। এতে পূর্ব্বতন আইনগুলির ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের কোন কোন বিষয়ে পরিবর্দ্ধন করা হয়েছে।

প্রঃ—কি রকম ?

উঃ—এখনও ফ্রান্সে তিন রকম কৃষি-ঋণ পাওয়া যাচ্ছে—প্রথমতঃ অল্প-কালের জন্য, দ্বিতীয়তঃ—দীর্ঘ অথচ অনতিদীর্ঘকালের (অর্থাৎ প্রায় ১০ বৎসরের) জন্ত, তৃতীয়তঃ—সুদীর্ঘ কালের জন্ত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর কর্জ্জের মধ্যে আবার পূর্ব্বতন পার্থক্যভেদ রয়েছে, কারণ সুদীর্ঘকাল-স্থায়ী কর্জ্জ যে শুধু সমবায় ব্যাঙ্কগুলিই পেয়ে থাকে এমন নয়, ব্যক্তিগত ভাবেও এ রকম কর্জ্জ পাওয়া এখন সুলভ হয়ে পড়েছে।

প্রঃ—পূর্ব্বতন ব্যবস্থাগুলির পরিবর্দ্ধন করা হয়েছে কি কি উপায়ে ?

উঃ—সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এখন তাদের আদায়ী মূলধনের ছয়গুণ টাকা কর্জ্জ নিতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবেও এখন কোন একজন মেম্বরকে ২৫ বৎসরকাল-স্থায়ী কর্জ্জ দেওয়া হয়—আর এখন তার জন্ত উচ্চতম পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হয়েছে ৪০ হাজার ফ্রাঙ্ক।

প্রঃ—আচ্ছা, এ সমস্ত আইন অনুসারে যত টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ কত হবে ?

উঃ—তা এই থেকেই বুঝতে পারবে যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা হয়েছিল ৭৫০, আর তাদের তখন পর্য্যন্ত কর্জ্জ দেওয়া হয়েছিল ৫ কোটি ৭০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক। ব্যক্তিগতভাবেও এই বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় ৮ হাজার মেম্বরকে গড়ে প্রায় ৬ হাজার ফ্রাঙ্ক কর্জ্জ দেওয়া হয়েছিল।

"দি জার্ণ্যাল অব্ ইকনমিক অ্যাণ্ড বিজ্‌নেস্ হিষ্টরি"

অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাস বিষয়ক এই পত্রিকাখানি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের "দি গ্রাজুয়েট্ স্কুল অব্ বিজ্‌নেস্ অ্যাড্‌মিনষ্ট্রেশান" হইতে নূতন প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৯২৮ সনের নভেম্বর মাসে। প্রকাশক হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (কেম্ব্রিজ, মাসাচুসেটস্), মূল্য বার্ষিক ৫ ডলার। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বিষয়: (১) "আমেরিকার সম্পদ এবং ১৫০৩ হইতে ১৬৬০ সনের আণ্ডালুসিয়ান মূল্যসমূহ; লেখক ই, জে, হ্যামিল্টন; (২) "বিলাতী ব্যাঙ্কিংএর প্রাথমিক যুগের কয়েকটা স্কীম", লেখক, আর, ডি, রিচার্ডস্; (৩) "ঔপনিবেশিক সওদাগর টমাস হান্সের কথা", লেখক এডোয়ার্ড ইডেল্‌ম্যান্; (৪) "রোমের আর্থিক ইতিহাস সম্বন্ধীয় একটা নূতন পুস্তক," লেখক টেনি ফ্র্যাঙ্ক; (৫) "আধুনিক পুঁজিবাদ সমস্যার ইতিহাস এবং তত্ত্বসম্বন্ধীয় আলোচনা", লেখক, এফ, এইচ্, নাইট; (৬) "১৮১৮ হইতে ১৮২৩ সনের দাস-প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলনের কয়েকটা আন্তর্জ্জাতিক দিক্", লেখক, টি, পি, মার্টিন; এবং (৭) একটা শর্করা ক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত পত্রাবলী, লেখক ই, এফ, গে।

"ভাণ্ডার"

সমবায় জীবন বীমা সমিতি

অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় এ দেশে জীবন-বীমার প্রচলন একান্তই অল্প। ধনী এবং মধ্যবিত্তদের মধ্যে জীবন-বীমার অল্পবিস্তর চলন হইয়াছে, কিন্তু গরীবদের মধ্যে প্রকৃত জীবন-বীমা একেবারে নাই বলিলেই চলে।

এই অভাব দূর করিবার জন্য, বিশেষ করিয়া নিখিল বঙ্গদেশের সমবায়ীদের হিতার্থে সমবায় জীবন-বীমা সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। গত ত্রয়োদশ প্রাদেশিক বঙ্গীয় সমবায় সম্মেলনে সমবায় জীবন-বীমা সমিতি স্থাপন করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। বঙ্গীয় সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার সাহেবের অর্থ-সাহায্যে এবং পরামর্শে এবং বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের উৎসাহে এবং সাহায্যে এই জীবন-বীমা সমিতির সংগঠন সম্ভব হইয়াছে।

গরীবদের জন্য সমবায়-নীতি-মূলক অল্প টাকার জীবন-বীমা প্রচলন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, বিশেষতঃ বাঙ্গালার মত অস্বাস্থ্যকর প্রদেশে। অল্প টাকার জীবন-বীমার আফিসের খরচা সাধারণ বীমা হইতে অনেক অধিক, অস্বাস্থ্যকর দেশ বলিয়া বাঙ্গালার অধিবাসীদের মৃত্যুর হার বেশী এবং আয়ু অল্প এবং অন্যান্য সকল রকম ব্যবসা হইতে জীবন বীমার আনুষ্ঠানিক খরচ (প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স) বেশী এবং সমবায়-নীতি-মূলক সমিতি দ্বারা এই খরচের সংকুলান করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য। এই জন্য বোম্বাই প্রদেশে সমবায়মূলক জীবন বীমা সমিতি গঠিত হইয়াও কাজ করিতে পারে নাই। রেজিষ্ট্রার সাহেব ডেভেলপমেন্ট ফণ্ড হইতে বহু টাকা না দিলে এবং বঙ্গীয় সংগঠন সমিতির সহানুভূতি ও অর্থ-সাহায্য না পাইলে এ প্রদেশে জীববীমা সমিতি স্থাপন সম্ভবপর হইত না। রেজিষ্ট্রার সাহেবের পরিচিত এক জন জীবনবীমা বিশেষজ্ঞের পরামর্শে বাঙ্গালাদেশের উপযোগী কয়েক প্রকারের জীবনবীমা লইয়াই প্রথম কাজ আরম্ভ

হইয়াছে। সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিই (কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কস্) বাঙ্গালায় সমবায় প্রচেষ্টার মেরুদণ্ডস্বরূপ এবং এইসকল ব্যাঙ্কের সহানুভূতি এবং সাহায্যে সাধারণ জীবনবীমা কোম্পানীর ন্যায় অল্প ব্যয়ে এই সমবায় জীবনবীমা সমিতি কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে। বাঙ্গালা সরকার গত ১৯২৯ সনের ২৬শে ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটে এই সমিতিকে প্রভিডেণ্ট জীবনবীমা আইনের সকল বিধিনিষেধ হইতে অব্যাহতি দিয়া একটি ইস্তাহার জারি করিয়া বাঙ্গালার সমবায় প্রচেষ্টাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

এই সমিতির মূলধন দশ লক্ষ টাকা, তাহা এক টাকা মূল্যের দশ লক্ষ অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক বীমাকারীকেই অন্ততঃ একটি অংশ গ্রহণ করিয়া সভ্য হইতে হইবে। যে কোন সমবায় সমিতি কি সমবায় সমিতির সভ্য অংশ ক্রয় করিয়া সভ্য হইতে পারেন, কিন্তু কেহ ১০০০৲ টাকার অধিক অংশ ক্রয় করিতে পারিবে না। প্রত্যেক সভ্যকে অংশ প্রতি ৵০ ভর্ত্তি ফিস দিতে হইবে। জীবনবীমা সমিতির প্রাথমিক খরচ অত্যধিক বলিয়াই এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেণ্ট্রাল বোর্ডের সভ্য-সংখ্যা ১৮। প্রত্যেক বিভাগ হইতে তিনজন নির্ব্বাচিত হইবেন এবং কলিকাতা হইতে তিনজন। প্রথম সেণ্ট্রাল বোর্ডের সভ্যগণ রেজিষ্ট্রার মহোদয় দ্বারা মনোনীত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে সাধারণ সভায় সেণ্ট্রাল বোর্ডের সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইবেন।

কলিকাতায় এই সমিতির প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত। কলিকাতা হাওড়া এবং সহরতলীতে অথবা যেখানে কোন কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক নাই, সেই সকল স্থান প্রধান কার্য্যালয়ের এলাকাধীন বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেক্রেটারীর তত্ত্বাবধানে থাকিবে। মফঃস্বলে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কই এই জীবন বীমা সমিতির প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিবে। কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ২৫০ কি ততোধিক অংশ ক্রয় করিলে সেখানে জীবনবীমা সমিতির স্থানীয় সভা গঠিত হইবে এবং এই সভার উপরই জীবনবীমার কার্য্যের ভার থাকিবে। প্রথম স্থানীয় সভার সভ্যগণ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মনোনীত করিবেন এবং পরবর্ত্তী সভায় সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইবেন। সাধারণতঃ স্থানীয় সভায় পাঁচজন সভ্য থাকিবে, তন্মধ্যে দুইজন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি, অবশিষ্ট ৩ জন বীমাকারী অংশীদারদের প্রতিনিধি। সভ্যদের মধ্যে একজন ডাক্তার থাকিলে ভাল হয়। প্রত্যেক স্থানীয় সভার এক জন সেক্রেটারী থাকিবে এবং তাহার উপরই কার্য্যভার ন্যস্ত থাকিবে। প্রত্যেক সভ্য নির্দ্দিষ্ট হারে সভার উপস্থিতির জন্য রাহা খরচ পাইবেন। স্থানীয় সভাই সুপারভাইজার, গ্রাম্য সমিতির সেক্রেটারী বা অন্য সমবায়ী কর্ম্মীদের মধ্য হইতে এজেণ্ট নিযুক্ত করিবেন এবং আফিসের কার্য্যের জন্য কেরাণী নিযুক্ত করিবেন। স্থানীয় সভা কেরাণী ও এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া প্রধান কার্য্যালয় হইতে অনুমোদিত করিয়া লইবেন।

স্থানীয় আফিসের খরচের জন্য আদায়ী প্রিমিয়ামের শত করা পাঁচ টাকা (কিন্তু ইহা মাসে ২৫৲ টাকার কম কিংবা ১৫০৲ টাকার অধিক হইবে না) দেওয়া হইবে। স্থানীয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে ইনসিওরেন্স সোসাইটীর নামে হিসাব থাকিবে এবং সকল আদায়ী টাকা তাহাতে জমা রাখা হইবে। প্রধান কার্য্যালয় হইতে আবশ্যকীয় সকল খাতাপত্র সরবরাহ করা হইবে।

প্রত্যেক স্থানীয় সভার উপর জীবনবীমার আবেদনপত্র অনুমোদন করিবার ভার থাকিবে। কেহ জীবনবীমা-প্রার্থী হইলে তিনি জীবনবীমার আবেদনপত্র, অংশ ক্রয় করিবার দরখাস্ত এবং অন্যান্য ফর্ম্ পূর্ণ করিয়া এজেণ্টের হাতে দিবেন এবং স্থানীয় সভার কোন এক সভ্যের সহিত প্রার্থীর সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিবেন। যদি জীবনবীমাপ্রার্থী সহর হইতে বহুদূরে থাকে এবং শীঘ্র তাহার সহরে আসা সম্ভব না হয় তবে স্থানীয় সভা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর ভার দিতে পারেন। তারপর স্থানীয় সভা জীবনবীমার আবেদনসংক্রান্ত সকল কাগজপত্র প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠাইবেন এবং আবেদন মঞ্জুর হইলে জীবনবীমাকারীর নিকট হইতে প্রথম কিস্তির টাকা এবং অংশের মূল্য আদায় করিবেন। কাজের সুবিধার জন্য কিস্তির টাকা বায়না হিসাবে আদায় করা যাইতে পারিবে। প্রথম কিস্তির টাকা আদায় হইলে, প্রধান কার্য্যালয় হইতে একখান বিশেষ রসিদ দেওয়া হইবে এবং সেই সময় হইতে সমিতি জীবন-

বীমার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। যথাসময়ে জীবনবীমাকারীকে অংশপত্র এবং জীবনবীমার পলিসি পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। অন্যান্য কিস্তির পূর্ব্বে এজেন্টগণের মারফত বীমাকারীকে সংবাদ দেওয়া হইবে। বীমাকারীদের সুবিধার জন্য ইংরাজী কি বাংলা মাসের প্রথম তারিখই কিস্তির দিন ধার্য্য হইবে এবং ৩০ দিনের মধ্যে কিস্তির টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। জীবনবীমার প্রিমিয়াম বাৎসরিক, ষাণ্মাসিক কিংবা মাসিক কিস্তিতে দেওয়া যায় এবং জীবন-বীমাকারীর সুবিধা মত মরশুমের সময় কার্য্য করা হইবে।

এই সমিতিতে জীবনবীমা করিতে হইলে ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হয় না। সুস্থ ১৮ হইতে ৪৫ বৎসরের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০ বৎসর বয়স্ক যে কোন পুরুষ এই সমিতিতে জীবন বীমা করিতে পারে। পাছে কেহ নিজের স্বাস্থ্যহীনতা গোপন করিয়া এই সমিতিতে জীবন বীমা করে এই জন্য জীবনবীমা করিবার প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইলে বীমার সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া হয় না, তবে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইলে সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া যাইবে।

নিম্নে সমিতিতে প্রচলিত বীমার বিবরণ ও হার দেওয়া হইল। অন্যান্য তথ্যের জন্য সমিতির অনুষ্ঠানপত্র দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষে সমবায় মূলক জীবনবীমার এই প্রথম উদ্যম; ইহাতে বহু বিঘ্ন আছে। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারীদের সাহায্য এবং সহানুভূতিতে এবং বঙ্গদেশের সমবায় কর্ম্মচারীদের সমবেত চেষ্টায় এই সমিতি শীঘ্রই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

১নং বীমা

নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রিমিয়ামে সমগ্র-জীবন-বীমা

বিবরণ:—যে কোন ১৮ বৎসর হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি এইরূপ জীবনবীমা করিতে পারে। যাহারা মধ্যবয়স্ক এবং এখন পর্য্যন্ত জীবনবীমা করেন নাই তাহারা এই বীমার সাহায্যে অল্প সময়ে পরিবারের সংস্থান করিতে পারেন। অল্পবয়স্ক ব্যক্তি, যাহার আয় আপাততঃ কম কিন্তু ভবিষ্যতে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার পক্ষে এই বীমা বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ অল্পবয়সে প্রিমিয়ামের হার কম এবং অল্পখরচেই পরিবারের সংস্থান হয়। ভবিষ্যতে যখন উপার্জ্জন বাড়িবে তখন বৃদ্ধবয়সের সংস্থানের জন্য অন্য প্রকারের বীমা করা যাইতে পারে।

১৫ বৎসর প্রিমিয়াম দিয়া ১০০৲ (একশত টাকার) সমগ্র-জীবন-বীমা করিতে প্রিমিয়ামের হার

বীমাপ্রার্থীর বয়স (আসন্ন জন্মদিনে যত বৎসর পূর্ণ হইবে)	বাৎসরিক প্রিমিয়াম	ষাণ্মাসিক প্রিমিয়াম	মাসিক প্রিমিয়াম
১৮—২০	৩৸০	১৸৶০	×
২৫	৪৶০	২৴০	×
৩০	৪॥৶০	২৷৴০	×
৩৫	৫৷০	২॥৶০	×
৪০	৫৸৶০	২৸৶০	॥০
৪৫	৬॥৶০	৩৷৴০	॥৴০

১০ বৎসর প্রিমিয়াম দিয়া ১০০৲ একশত টাকা সমগ্র জীবনবীমা করিতে প্রিমিয়ামের হার

বীমাপ্রার্থীর বয়স (পরবর্ত্তী জন্মদিনে যত বৎসর পূর্ণ হইবে)	বাৎসরিক প্রিমিয়াম	ষাণ্মাসিক প্রিমিয়াম	মাসিক প্রিমিয়াম
১৮—২০	৫৲	২॥০	×
২৫	৫॥০	২৸০	×
৩০	৬৲	৩৲	॥০
৩৫	৬৸০	৩৷৶০	॥৴০
৪০	৭॥০	৩৸০	॥৶০
৪৫	৮॥০	৪৷০	৸০

বিশেষ দ্রষ্টব্য—১। বীমার পরিমাণ-হ্রাসবৃদ্ধির সহিত প্রিমিয়াম হারাহারি কম বেশী হইবে।

২। কোন প্রিমিয়ামে পাই বা পয়সা থাকিবে না। হিসাব মতে প্রিমিয়ামে পাই পয়সা হইলে উহা সকল ক্ষেত্রে বাড়াইয়া পরবর্ত্তী আনায় লইয়া যাইতে হইবে। যথা ২৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি ১৫ সংখ্যক প্রিমিয়ামে ৫০৲ টাকার সমগ্র-জীবন-বীমা করিলে, তাহার ষাণ্মাসিক প্রিমিয়াম ১৲১০ না হইয়া ১৴০ হইবে।

৩। কোন প্রিমিয়াম ॥০ আট আনার কম হইবে না।

কোন ২০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি ১০টি প্রিমিয়াম দিয়া ১০০৲ টাকার সমগ্র-জীবন-বীমা করিলে মাসিক প্রিমিয়াম দিতে পারিবে না—কারণ এ ক্ষেত্রে মাসিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ ।৶৮ অর্থাৎ ।৶০; ইহা ॥০ আট আনার কম, কিন্তু ঐ ব্যক্তি ২০০৲ টাকার ঐরূপ জীবনবীমা করিলে মাসিক কিস্তিতে প্রিমিয়াম দিতে পারিবে। ২০০৲ টাকার বাৎসরিক প্রিমিয়াম ১০৲, মাসিক প্রিমিয়াম ৸৶৪ পাই অর্থাৎ ৸৶০।

২নং বীমা

দ্বিগুণ জীবনবীমা

যে কোন ১৮ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি এইরূপ জীবনবীমা করিতে পারে। ইহাতে ইচ্ছানুরূপ ১২, ২০ কি ২৫ বৎসর স্থায়ী জীবন-বীমা করা যাইবে; কিন্তু বীমা-কারীর বয়সের সহিত বীমার স্থায়িত্ব-কাল যোগ করিলে ৬০ এর অধিক হইবে না। যথা ৪০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি ২০ বৎসরের জন্য জীবনবীমা করিতে পারিবে, কিন্তু ৪১ বৎসর বয়স্ক হইলে ২০ বৎসরের জন্য না করিয়া ১৫ বৎসরের জন্য জীবনবীমা করিতে হইবে। কেহ এইরূপ ১০০৲ টাকার জীবনবীমা করিলে বীমার কাল উত্তীর্ণ হইলে ২০০৲ পাইবে। বীমাকালের মধ্যে বীমাকারীর মৃত্যু ঘটিলে তাহার উত্তরাধিকারী ১০০৲ অথবা প্রদত্ত প্রিমিয়ামের পরিমাণ অধিক হইলে উহার সমান টাকা পাইবে।

উপরোক্ত জীবনবীমা অল্পবয়স্ক সুস্থ যুবকদিগের বিশেষ উপযোগী; ইহা দ্বারা সহজেই বৃদ্ধবয়সের বিশেষ সংস্থান হয় এবং পরিবারের অন্নাধিক ব্যবস্থা থাকে। ইহা সঞ্চয়ের দিক্ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবনবীমা।

১০০৲ টাকার জীবনবীমা করিয়া বীমা কাল অন্তে ২০০৲ টাকা পাওয়ার প্রিমিয়ামের হার

বীমাপ্রার্থীর বয়স	বীমার কাল	বাৎসরিক প্রিমিয়াম	ষাণ্মাসিক প্রিমিয়াম	মাসিক প্রিমিয়াম
১৮—৪৫	১৫ বৎসর	১১॥০	৫৸০	১৲
১৮—৪০	২০ বৎসর	৮৲	৪৲	॥৶০
১৮—৩৫	২৫ বৎসর	৬৲	৩৲	॥০

এইরূপ বিশেষ জীবনবীমার পরিমাণ ১০০৲ টাকা হইতে ২৫০৲ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে।

বিশেষ সংস্থান জীবনবীমা

এই বীমা জীবনবীমা-জগতের রত্নস্বরূপ; ইহা দীর্ঘকাল গবেষণার ফল। এরূপ একটি বীমার সাহায্যেই বৃদ্ধবয়সের এবং পরিজনবর্গের সংস্থান হয়।

কেহ ১০০ টাকার বীমা করিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল প্রিমিয়াম দিলে, বীমার মেয়াদ অন্তে বীমাকারী ১০০৲ নগদ এবং ১০০৲ টাকার একটি দায়শূন্য জীবনবীমা পত্র বা পেড-আপ পলিসি পাইবে। এই শেষোক্ত পলিসির জন্য আর প্রিমিয়াম দিতে হইবে না, এবং বীমাকারীর অভাবে তাহার উত্তরাধি-কারিগণ ঐ পরিমাণ টাকা পাইবে। পলিসির নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে বীমাকারীর মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারি-গণ চতুর্থ বৎসর হইতে যত টাকা প্রিমিয়াম দেওয়া হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক এবং ১০০৲ (জীবনবীমার পরিমাণ) পাইবে।

৩নং বীমা

২৫ বৎসরের বিশেষ সংস্থান বীমা

২০০৲ টাকা নগদ এবং ২০০৲ টাকার পেড-আপ্ পলিসির প্রিমিয়ামের হার

জীবনবীমা প্রার্থীর বয়স	বার্ষিক প্রিমিয়াম	ষাণ্মাসিক প্রিমিয়াম	মাসিক প্রিমিয়াম
১৮—২০	১০৲	৫৲	৸৶০
২৫	১০॥০	৫।০	৸৶০
৩০	১১।০	৫॥৶০	৸৶০
৩৫	১২॥০	৬।০	১৶০

৪নং বীমা

২০ বৎসরের বিশেষ সংস্থান বীমা

২০০৲ নগদ এবং ২০০৲ পেড্ আপ্ পলিসির প্রিমিয়ামের হার

বীমাপ্রার্থীর বয়স	বার্ষিক প্রিমিয়াম	ষাণ্মাসিক প্রিমিয়াম	মাসিক প্রিমিয়াম
১৮—২০	১২৸০	৬৶০	১৶০
২৫	১৩।০	৬॥৶০	১৶০
৩০	১৪৲	৭৲	১।৶০
৩৫	১৫৲	৭॥০	১।০
৪০	১৬॥০	৮।০	১।৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—সমশ্রেণী বা সহকর্ম্মী ২০ বা ততোঽধিক ব্যক্তি একসঙ্গে জীবনবীমা করিলে প্রিমিয়ামের হার কম হয়; এ সম্বন্ধে সমিতির হেড্ আফিসে লিখিলে সবিশেষ জানান হইবে।

১। "দি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব্ দি সোশ্যাল সায়েন্সেস্" (সমাজ বিজ্ঞানসমূহের বিশ্বকোষ)। প্রধান সম্পাদক, এড্‌উইন আর এ সেলিগম্যান। সহকারী সম্পাদক, আলহ্বিন্ জনসন্। ম্যাকমিলান কোম্পানী, নিউ ইয়র্ক। ১৯৩০। প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৭+৬৪৬। ৭·৫০ ডলার।

সেলিগ্‌ম্যানের অক্ষয় কীর্ত্তি

এই অভিধান যে কিরূপ প্রকাণ্ড তা এক খণ্ড চোখে না দেখিলে কিছুতেই বুঝা যাইবে না। সেলিগ্‌ম্যান অর্থশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব ও কর সম্বন্ধে কেতাব লিখিয়া দেশ বিদেশে অশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি হইবে এই কোষখানা। ইহা তাঁর নামকে অমর করিয়া রাখিবে।

কেতাবখানার মাত্র এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ ১৫ খণ্ড বাহির হইবে।

পিছনের শক্তি

কেতাব বাহির হইতেছে সেলিগ্‌ম্যানের নামে বটে, কিন্তু সেলিগ্‌ম্যান ইহা একা সম্পাদন করিতেছেন না। বস্তুতঃ, এরূপ একটা কঠিন কাজ একা কেন দশজনেও করা সম্ভবপর নহে, ইহাতে বহু লোকের বহুদিনের সহযোগিতা দরকার হয়। যোগ্য লোক যত বেশী জুটিবে, তাদের পরিশ্রমের ফলও তত উৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

কেতাবের টাইটেল পেজের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রধান সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদক ছাড়া নিম্নলিখিত নাম কটিও আছে।

ম্যানেজিং এডিটর : ম্যাক্স লের্নার, পি এইচ ডি। সহকারী সম্পাদকগণ : (১) আইডা এস্ ক্রাহেন, (২) এলিস সি ক্লাইন, (৩) সোলোমন কুজনেটস্, (৪) ক্লারা ডব্লিউ মেয়ার, (৫) কোপেল এস পিন্‌সন, (৬) উইলিয়াম সিয়েগল এবং (৭) এলিজাবেথ টড্।

দেখা যাইতেছে যে, কেতাবখানিতে স্ত্রী-হস্তের কারিকুরীরও যথেষ্ট অবকাশ রাখা হইয়াছে। অগ্রসর আমেরিকা এত বড় একটা কাজে নারীদের হাতেও সমভাবে দায়িত্বভার তুলিয়া দিয়াছে।

পরপৃষ্ঠায় আছে পরামর্শদাতা সম্পাদকদের নাম। আমেরিকান : নৃতত্ত্ব—আলফ্রেড এল ক্রোয়েবের ; অর্থশাস্ত্র—এডউইন ফে গে, জেকব এইচ হল্যাণ্ডার, এডউইন জি নোর্স ; শিক্ষা—পল মনরো ; ইতিহাস—সিডনি বি ফে, আর্থার এম্ শ্লিসিঙ্গার ; আইন—রস্কো পাউণ্ড ; দর্শন—জন ডিউয়ি ; রাষ্ট্রতত্ত্ব—চার্লস এ বিয়ার্ড, ফ্রাঙ্ক জে গুড্‌নো ; মনস্তত্ত্ব—ফ্লয়ড এইচ অলপোর্ট ; সমাজ-সেবা—পোর্টার আর লী ; সমাজতত্ত্ব—উইলিয়াম এফ ওগবার্ণ, ডব্লিউ আই টমাস ; সংখ্যা বিজ্ঞান—আরভিং ফিসার, ওয়াল্টার এফ্ উইলকক্স।

বিদেশী : ইংল্যাণ্ড—আর্ণেষ্ট বার্কার, জন মেনার্ড কেইনস, স্তর জোশিয়া ষ্ট্যাম্প, আর এইচ টনি ; ফ্রান্স—শার্ল রিষ্ট, এফ্ সিমিয়াঁদ ; জার্ম্মেণী—কার্ল ব্রিঙ্কমান, এইচ শুমাখের ; ইতালি—লুইজি আইনাদি, আগস্তো গ্রাজিয়ানি ; সুইট্‌সারল্যাণ্ড—ডব্লিউ ই র‍্যাপার্ড।

তারপর পাই বিভিন্ন সোসাইটী হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নাম—এঁরাই জয়েণ্ট কমিটী। কমিটী এইরূপ :

১। আমেরিকান নৃতত্ত্ব এসোসিয়েশন—রবার্ট এইচ লোই ও ক্লার্ক হ্বিসলের।

২। আমেরিকান সমাজ-সেবকদের এসোসিয়েশন—ফিলিপ ক্লাইন ও ষ্টুয়ার্ট এ কুইন্।

৩। আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশন—ক্লাইভ ডে ও ফ্রাঙ্ক এ ফেটের।

৪। আমেরিকান হিষ্টরিকাল এসোসিয়েশন—কার্ল বেকের ও সি এইচ হেরিং।

৫। আমেরিকান পোলিটিকাল সায়েন্স এসোসিয়েশন—উইলিয়াম বি মুনরো ও জন এইচ লোগান।

৬। আমেরিকান মনস্তত্ত্ব এসোসিয়েশন—জিওর্জিনা এস গেট্‌স ও মার্ক এ মে।

৭। আমেরিকান সমাজতত্ত্ব সোসাইটী—হ্যারি ই বার্ণেস ও এইচ বি উলষ্টন।

৮। আমেরিকান ষ্ট্যাটিষ্টিকাল এসোসিয়েশন—মেরি হ্যান্ ক্লীক ও আর এইচ কোট্‌স্।

৯। এসোসিয়েশন অব্ আমেরিকান্ ল স্কুল্‌স—এডউইন ডব্লিউ প্যাটারসন ও ই ডি ডিকিনসন।

১০। ন্যাশানাল এডুকেশন এসোসিয়েশন—এডওয়ার্ড এল থর্ণডাইক ও জে এ সি চ্যাণ্ডলার।

এই সব পরামর্শদাতা ও প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে শুধু একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা দরকার। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ মহলে নামজাদা লোক—লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং এঁদের লেখা বা পরামর্শ বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিযুক্ত হইবে তা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

একটি বোর্ড অব্ ডিরেক্টারস্ গঠিত হইয়াছে। তাতে আছেন: বিশেষজ্ঞ—ফ্রান্জ্ বোয়াস্, ওয়াল্টার হুইলার কুক, জন ডিউয়ি, জন এ ফেয়ারলি, কার্লটন জে এইচ হেইস্, জেকব এইচ হল্যাণ্ডার, আলভিন্ জনসন, ওয়েস্‌লি সি মিচেল, জন কে নর্টন, উইলিয়াম এফ্ ওগবার্ণ, মেরি হ্যান ক্লীক, এড্উইন আর এ সেলিগ্ম্যান, মারগারেট ফ্লয় ওয়াশবার্ণ।

সাধারণ—জেম্‌স কুজেনস্, ডুইট্ ডব্লিউ মরো, হন জে রাস্কব, মর্টিমার এল্ শিফ্, রবার্ট ই সাইমন, সাইলাস্ এইচ ষ্ট্রন, পল এম্ ওয়ারবুর্গ, ওয়েন ডি ইয়ং।

সেক্রেটারি—মেরি ই শ্রেসন।

আগে সম্পাদকীয় বিভাগের নানা ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছি, পরামর্শদাতা সম্পাদকদের নামও করা গিয়াছে, কিন্তু আর এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের নামও উল্লিখিত হইয়াছে—এঁদের বলা হইয়াছে এডিটরিয়েল কনসালটেন্টস্ অর্থাৎ সম্পাদকগণ যাঁদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। টানা ৪ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া এদের নাম ঠাসিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজী বর্ণমালা অনুসারে নামগুলি সাজান হইয়াছে। একবার চোখ বুলাইলেই দেখা যাইবে যে, প্রতি বর্ণমালার অন্তর্গত নামের সংখ্যা অনেক। অতএব এইরূপ লোকের মোট সংখ্যা যে কয়েক শত হইবে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা

সম্ভবতঃ উপরের বর্ণনা হইতে এইরূপ একটা কেতাব প্রণয়নে কয়টা মাথা খাটিতেছে তার একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুষ্ঠানটি যদিও বিশেষ করিয়া আমেরিকান, তবু দেশবিদেশের চিন্তাবীরদের হাতের কাজও ইহাতে আছে। সেলিগম্যান ভূমিকাতে এমন কথাও বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের রাজ্যে আন্তর্জ্জাতিকতার দাবীই তিনি মানিয়া চলিয়াছেন। তথাপি একথা সত্য, আইডিয়াটা মাথায় আসিয়াছে আগে আমেরিকানের, টাকা যোগাইয়াছে আমেরিকানরা এবং বেশীর ভাগ পরিশ্রম করিয়াছে আমেরিকানরা।

বহু ব্যক্তি খাটিয়াছে বটে, কিন্তু এই বহু ব্যক্তিকে এলোমেলোভাবে বাছা হয় নাই। আগাগোড়া কাজটা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিধিবদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। সেইজন্য এই কেতাবের মাল মসলা যোগাড় করিবার জন্য বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান করা হইয়াছিল।

উপরে আমরা এইরূপ বিভিন্ন ১০টি প্রতিষ্ঠানের নাম করিয়াছি। আমেরিকার এই প্রতিষ্ঠানগুলি কিরূপ শক্তিশালী সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা বাঙ্গালীর ছেলের মাথায় নাই। আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশন সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। সেজন্য ইহার সভ্য, প্রকাশিত পুস্তিকা, গ্রন্থ ও পত্রিকা সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান অনেকের থাকিতে পারে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকেও তুল্যমূল্য জ্ঞান করিতে হইবে। অর্থাৎ এই দশটি বিভিন্ন বিদ্যার শাখায় খাটিবার মত ও আগ্রহ বোধ করিবার মত

লোকের সংখ্যা আমেরিকায় প্রচুর রহিয়াছে। তবু কি আমরা বলিব আমেরিকা শুধু ধনেই বড়, অন্য ঐশ্বর্য্য তার নাই ?

বর্ত্তমান "মন্তি" ব্যাপারে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের একটা বড় রকম পরিচয় পাই। আজিকার দিনে জ্ঞানের রাজ্য বহুদিকে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। প্রতি বিস্তার শাখা ও প্রশাখার সংখ্যা অনেক। কোন লোকের পক্ষে একটি বিদ্যাকে আয়ত্ত করা দূরে থাক্, তার শাখা প্রশাখাগুলিকেও সমগ্র জীবনের পরিশ্রমের ফলে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সম্ভবপর নহে। অথচ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বনিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। এক বিদ্যার বিভিন্ন শাখা অথবা বিভিন্ন বিদ্যার সমভূমিতে দাঁড়াইবার অবকাশ কোথায়? এরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যদি বিদ্যার আদানপ্রদান না হয় তবে একটা সমন্বয় সাধন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির মিলনেই শুধু বিদ্যা-সমন্বয় সম্ভবে না। প্রথমতঃ, একই বিদ্যার বিভিন্ন মহলে বহু ব্যক্তি অবিরত প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে। ইহাদের একটা সাধারণ মিলনভূমি থাকা চাই, যেখানে ইহারা নিজ নিজ পরিশ্রমের ফল পরস্পর মিলাইয়া দেখিতে পারিবে, যেখানে একে অন্যকে সমালোচনা দ্বারা ও অন্য প্রকারে নব নব সত্যের সন্ধানে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করিতে পারিবে। আমেরিকায় এই প্রকার প্রতিষ্ঠান গণ্ডা গণ্ডা রহিয়াছে। ইহারা নব তেজে তেজীয়ান হইয়া ছুটিয়া চলে। সেইজন্য প্রতি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিমাসে অসংখ্য গবেষণাত্মক প্রবন্ধ ইত্যাদি বাহির হওয়া সম্ভবপর হয়।

আমেরিকান প্রতিষ্ঠানসমূহের একযোগে এক উদ্দেশ্যে কাজ করিবার একটা মস্ত দৃষ্টান্তস্থল বর্ত্তমান কেতাব। সেই দিক্ হইতে এই প্রতিষ্ঠানগুলিও অমর হইয়া থাকিবে।

বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের ফিরিস্তি

একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার এই যে, বর্ত্তমান বিশ্বকোষ খানা ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের অভিধান, কোন একটা বিশেষ বিজ্ঞানের অভিধান নহে। কোন্ কোন্ বিজ্ঞানকে সামাজিক বিজ্ঞান বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং কেন ধরা হইয়াছে ?

এই কেতাবে যে সব বিজ্ঞানকে সামাজিক বিজ্ঞান বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাদের নাম এই :

(১) নৃতত্ত্ব, (২) অর্থশাস্ত্র, (৩) শিক্ষা, (৪) ইতিহাস, (৫) আইন, (৬) দর্শন, (৭) রাষ্ট্রবিজ্ঞান, (৮) মনস্তত্ত্ব, (৯) সমাজহিত, (১০) সমাজতত্ত্ব, (১১) সংখ্যা বিজ্ঞান।

পৃথিবীর ঘটনাবলীকে মোটামুটি দুই প্রকারে ভাগ করা চলে (১) জাগতিক বা প্রাকৃতিক ঘটনা, (২) মানস-লোকের ঘটনা। আমাদের চারিদিকে প্রকৃতির রাজ্যে নানা ঘটনা ঘটিতেছে। এইসকল ঘটনার মর্ম্ম কতকগুলি বিদ্যার সাহায্যে উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করা হয়, সেগুলিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা যায়। আর মনোলোকের ঘটনাবলী যে সব বিদ্যার অধ্যয়নের বিষয় সেগুলিকে বলা চলে মানসিক বিজ্ঞান।

মানসিক বিজ্ঞানসমূহও আবার দুই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) মানুষ যখন একা, (২) দল বা সমাজের অন্তর্গত মানুষ। লজিক বা ন্যায়শাস্ত্র প্রতি মানুষের কতকগুলি চিন্তার ধারাকে লইয়া পরীক্ষা করে—সেখানে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অভাব রহিয়াছে। কতকগুলি অভাব প্রতি মানুষের নিজস্ব। আর কতকগুলি অভাব সমাজ-গত অর্থাৎ সমাজের অন্য দশ জনের সঙ্গে শুধু তার সে অভাব মিটিতে পারে। পূর্ব্ব ক্ষেত্রে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা হয় না। সুতরাং যে সব মানসিক বিজ্ঞান সমাজের অন্তর্গতরূপে ব্যক্তির কার্য্যাবলীর বিশ্লেষণ করে সেই সব মানসিক বিজ্ঞানকে সামাজিক বিজ্ঞান সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে।

মানব জাতির সাধারণ অভাবসমূহ অত্যন্ত বিচিত্র। সুতরাং এই সব অভাব পূরণের নিমিত্ত দলবদ্ধ কার্য্যাবলীও অত্যন্ত বিভিন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। এই দলবদ্ধ কার্য্য-প্রণালীসমূহ যে পরিমাণে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, সেই পরিমাণে সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সামাজিক বিজ্ঞানগুলিকে মোটামুটি তিন শাখায়

ভাগ করা যাইতে পারে: (১) সম্পূর্ণ সামাজিক বিজ্ঞান, (২) অর্দ্ধ সামাজিক বিজ্ঞান ও (৩) সামাজিক অর্থ বিশিষ্ট বিজ্ঞান।

সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সামাজিক বিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি। তার নীচে, বিশেষতঃ গ্রীকদের চোখে, অর্থশাস্ত্র। তৃতীয় যে বিজ্ঞানকে গ্রীকদের সময় পর্য্যন্ত টানিয়া লওয়া যায় তা হইতেছে ইতিহাস। চতুর্থ বিজ্ঞান জুরিস্‌প্রুডেন্স। রাষ্ট্রনীতি, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস, আইন—প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে মর্য্যাদা ও অভিমান ছিল। কিন্তু এক্ষণে এই সব ক্ষেত্রে নব নব সত্যের আবিষ্কারের পর হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যেকেই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত।

উপরি উক্ত চারিটি বিজ্ঞান হইল প্রাচীন বিদ্যা। কিন্তু কতকগুলি বিদ্যা আছে যেগুলি বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। নৃতত্ত্ব, অপরাধ-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও সমাজ-সেবা-তত্ত্ব এই প্রকার বিদ্যা। গোড়া হইতেই এগুলির স্বাতন্ত্র্য তেমনভাবে প্রচারিত হয় নাই। সুতরাং ইহাদিগকে এক সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া গণনা করিতে কোন বেগ পাইতে হয় নাই।

এই গেল সম্পূর্ণ সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের কথা। অর্দ্ধ সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ দুই প্রকারের—(১) এগুলি উদ্ভবের সময় সামাজিক ছিল ও এখনও কতকটা অংশে সামাজিক, (২) উদ্ভবের কালে স্বতন্ত্র থাকিলেও এক্ষণে কতকটা অংশে সামাজিক। উভয় প্রকার বিদ্যাই বিভিন্ন পথে ভ্রমণ করিয়া এক স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

প্রথম প্রকারের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা হইল এথিক্‌স বা নীতিশাস্ত্র। নীতিশাস্ত্র মূলতঃ ব্যক্তির বিবেকের কথা হইলেও নব নব দলের সহিত মিশ্রণের ফলে নূতন নূতন সামাজিক নীতি-সমস্যার উদয় হইতেছে। দ্বিতীয় বিদ্যা শিক্ষা। সমাজের দল ছাড়া হইয়া শিক্ষালাভের কোন সার্থকতা নাই, সামাজিক কর্ত্তব্য শিখাইবার প্রয়োজনও আছে। শিক্ষা এক্ষণে অনেক দিক্ দিয়াই অংশতঃ সামাজিক বিজ্ঞান।

দ্বিতীয় প্রকারের বিদ্যা হইল দর্শন ও মনস্তত্ত্ব। দর্শন পূর্ব্বে খুব ব্যাপক বিদ্যা বিশেষ ছিল। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের অন্তর্গত বহু বিষয় লইয়া বিভিন্ন বিজ্ঞানের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে, দর্শনও এক্ষণে সামাজিক বিজ্ঞানরূপে পরিগণিত। মনস্তত্ত্ব যে সামাজিক বিজ্ঞানরূপে উন্নীত হইয়াছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব এই দুই বিদ্যার উদ্ভব হইতেই পাওয়া যাইবে।

সামাজিক অর্থবিশিষ্ট বিজ্ঞান হইল বায়োলজি বা প্রাণতত্ত্ব, ভুগোল, ভেষজ, শব্দ-তত্ত্ব ও কলা। প্রাণতত্ত্ব বা ভুগোল মানুষের সম্পর্ক-বিরহিতভাবে আরম্ভ হইলেও এক্ষণে প্রভূত পরিমাণে মানবের সামাজিক অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইতেছে। অন্যগুলির কেন্দ্র বরাবরই মানুষ ছিল এবং সে মানুষ উত্তরোত্তর সামাজিক মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩-৭)।

প্রথম খণ্ডের লেখকগণ

বিশ্বকোষখানার জন্য যে বহু লোকের পরিশ্রম দরকার হইতেছে তা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শুধু প্রথম খণ্ড খানা প্রকাশ করিবার জন্য খাটিয়াছেন ১৬৩ জন লোক। এই সব লোক কি ধরণের, তার আভাষ দিবার জন্য যদৃচ্ছাক্রমে কয়েকটি মাত্র নাম নীচে দেওয়া যাইতেছে

(১) ম্যাক্স অ্যাড্‌লার, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়

(২) রিকার্দো বাচি, রাজকীয় ধনবিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিজ্ঞান পরিষৎ, রোম

(৩) কার্ল ব্রিক্‌মান, হাইডেলবের্গ

(৪) ডি এইচ্ বুকানন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

(৫) ডেভিড্ ফেয়ারচাইল্ড, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ

(৬) পি সারগান্ট ফ্লোরেন্স, বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়

(৭) রোল্‌ফ্ গ্রাবোয়ার, বার্লিন

(৮) কার্লটন জে এইচ্ হেইস্, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

(৯) আলভিন্ জন্‌সন, সামাজিক গবেষণার নয়া স্কুল

(১০) হ্যারোল্ড জে লাস্‌কি, লণ্ডনস্থ অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রতত্ত্বের স্কুল

(১১) পল লুইস্, প্যারিস্

(১২) বার্টিল ও'লিন, ষ্টকহল্‌ম হোগ্‌সুকোলা

(১৩) জে এইচ্‌ রিচার্ডসন, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিস্‌

(১৪) তাইজো তোদা, তোকিয়ো ইম্পিরিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়

কিঞ্চিৎ পরিচয়

প্রথম খণ্ডের মোট ৬৪৬ পৃষ্ঠার মধ্যে বিশ্বকোষ প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে ৩৫৩ পৃষ্ঠা হইতে। প্রথমকার ৩৪৯ পৃষ্ঠা গিয়াছে বিভিন্ন বিষয়ের পরিচয় দিতে ও ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে। নিম্নে এই ৩৪৯ পৃষ্ঠায় কোন্‌ কোন্‌ বিষয় কে আলোচনা করিয়াছেন তার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

এই গেল কেতাবের সূচনা। তারপর কেতাব আরম্ভ হইয়াছে। যে ১১টি সামাজিক বিজ্ঞানের নাম করা হইয়াছে তাদের প্রত্যেকের অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দ ইংরেজী বর্ণানুক্রমে ধরিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাকেই স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বলিয়া বিবেচনা করা চলে। অত্যল্প পরিসরের মধ্যে সোজা ভাষায় যত মাল ঠাসা যায় তা করা হইয়াছে। কোন শব্দের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আয়তন ধরিয়া দেওয়া হয় নাই। প্রয়োজনের তাগিদটাই মানা হইয়াছে। এক একটি শব্দ লইয়া এক একজন লোক আলোচনা করিয়াছেন। যথা :—

ব্যবসাগত আকস্মিক আঘাত ও মৃত্যু (পৃঃ ৩৯১-৪০১) লিখিয়াছেন রবার্ট এম্ উড্‌বারি।

এমিলি অ্যাকোলাস, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা, লিখিয়াছেন জার্জসওয়েল ইত্যাদি।

বিভিন্ন বিজ্ঞানের অন্তর্গত চিন্তাবীরদের জীবনচরিতে গিয়াছে কোষের ⅙ অংশ স্থান।

এই মহাভারতের তুল্য মূল্য কোষখানার দিকে বাঙ্গালীর ছেলের নজর পড়িবে কি? পড়িলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে বলিয়া মনে করি।
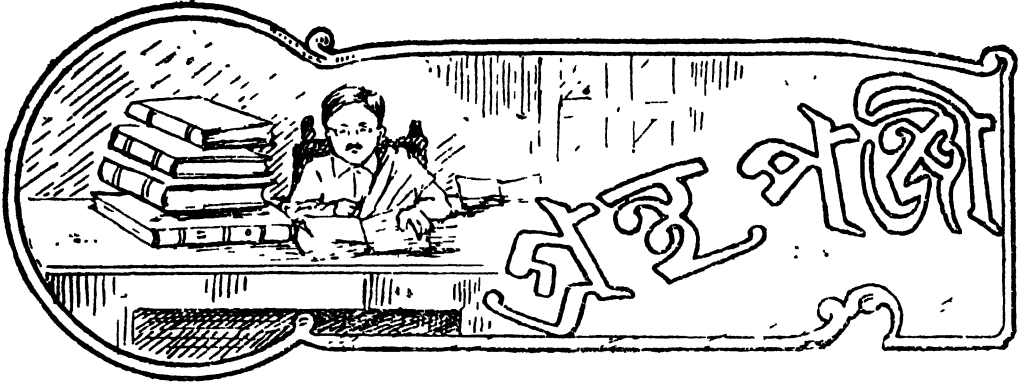
১। "প্রিন্সিপে দ' একোনোমি নাশ্চিনালে এত্‌ আঁতারনাশ্চিনালে" (জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক অর্থশাস্ত্রের মূলকথা)। ল্যান্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অধ্যাপক লুসিয়েন ব্রোকার্ড প্রণীত। ১ম খণ্ড। রেক্যুল সিরে, প্যারিস। ১৯২৯। পৃঃ ১৫+৫০৩। ৫০ ফ্রাঁ।

২। "আলগেমাইন ফোক্‌স্‌হ্বির্টশাফ্‌ট্‌স্‌লেরে" (রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি)। ব্রেস্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুরিস্‌প্রুডেন্স ও দর্শনের অধ্যাপক ডক্টর এ হেসে প্রণীত। গুষ্টাহ্ব ফিসার, য়েনা। ১৯২৯। পৃঃ ৭+১৪৭। রে-মা ৬·৫০।

৩। "ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল এফিসিয়েন্সি অ্যাণ্ড সোশ্চাল ইকোনমি" (শিল্পে পটুতা ও সামাজিক অর্থ-ব্যবস্থা), নাসৌ ডব্লিউ সিনিয়র। হেনরি হোল্ট অ্যাণ্ড কো, নিউ ইয়র্ক। ১৯২৮। পৃঃ ২৩+৩৭৫; ৬+৪২২। ৮ ডলার।

৪। "ইকোনমিক রিকভারি অব্‌ ইয়োরোপ অ্যাণ্ড ইম্‌প্রুভ্‌ড্‌ পারচেজিং পাওয়ার ফর্‌ অ্যাগ্রিকালচার্যাল প্রডাক্টস্‌" (ইয়োরোপের আর্থিক আরোগ্যলাভ ও কৃষিজাত দ্রব্য-ক্রয়ের নিমিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সামর্থ্য), এইচ্‌ বি স্মিথ। গবর্ণমেন্ট প্রিন্টিং অফিস্‌, ওয়াশিংটন। ১৯২৯। পৃঃ ২২। ১০ সেন্ট।

৫। "দি নেক্সট্‌ টেন ইয়ার্‌স ইন্‌ বৃটিশ সোশ্চাল অ্যাণ্ড ইকোনমিক পলিসি" (বৃটিশ সামাজিক ও আর্থিক নীতির আগামী দশ বৎসরের কথা), জি ডি এইচ্‌ কোল। ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কো, লণ্ডন। ১৯২৯। পৃঃ ২১+৪৫৯। ১৫ শি।

৬। "ক্যানাডিয়ান্‌ ট্রেড্‌ ইনডেক্স" (ক্যানাডিয়ান্‌ বাণিজ্যের সূচী সংখ্যা), ১৯২৯ সনের সংখ্যা। ক্যানাডিয়ান্‌ ম্যানুফ্যাক্‌চারার্‌স্‌ এসোসিয়েশন, টোরোন্টো। পৃঃ ৮৮৪। ৬ ডলার।

৭। "রিসেন্ট সোশ্চাল চেঞ্জেস্‌ ইন্‌ দি ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স সিন্‌স্‌ দি ওয়ার অ্যাণ্ড পার্টিকুলারলি ইন ১৯২৭" (যুদ্ধের পর বিশেষতঃ ১৯২৭ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কি কি সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে)। সম্পাদক, উইলিয়াম্‌ এফ্‌ ওগবার্ণ। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, শিকাগো। ১৯২৯। পৃঃ ১৩+২৩০। ৩ ডলার।

৮। "দি লিগেল এফেক্‌ট্‌স্‌ অব্‌ রিকগ্‌নিশন ইন ইণ্টারন্যাশনাল ল (আন্তর্জ্জাতিক আইনে স্বীকারের আইনগত ফলাফল), জন জি হের্‌ভে। পেনসিলহ্বেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস্‌, ফিলাডেলফিয়া। ১৯২৮। পৃঃ ১৪+১৭০। ৩ ডলার।

৯। "এন্ট্‌হ্বোলুণ্ডনাযেরের-মাটেরিয়ালিস্‌মুস্‌ উণ্ড মার্কসিস্‌মুস্‌" (জড়বাদ ও মার্কস্‌বাদের বিবর্ত্তন কথা), ইউজেন ডিট্‌ৎসজেন। জুরিখ্‌, লাইপৎসিগ্‌ ও ষ্টুটগার্ট। পৃঃ ১০৭। রে-মা ৪·৮০।

১০। আমেরিকন্‌ প্রডিউস্‌ মার্কেট্‌স (আমেরিকার ফসলের বাজার), কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক হেনরি ই এডমান কর্ত্তৃক প্রণীত। ডি সি হিথ অ্যাণ্ড কো, বোষ্টন। ১৯২৮। পৃঃ ৪৪৯। ৩.৪০ ডলার।

১১। টেক্সটাইল ইমপোর্টস্‌ অ্যাণ্ড এক্সপোর্টস্‌ (বয়ন শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি) ১৮৯১-১৯২৭। যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট প্রিন্টিং অফিস্‌, ওয়াশিংটন। ১৯২৯। পৃঃ ৯+৩৯২। ৬০ সেন্ট।

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, এম্, এ

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর স্থান যে কত সঙ্কীর্ণ তাহা লইয়া কিছুদিন হইতে একটা আলোচনা চলিয়াছে। ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই; কারণ যাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের কিছুমাত্র খবরও রাখেন, তাঁহারাই জানেন যে, ব্যবসায়ের ছোট বড় সকল হাটেই ভিড় বাঙ্গালীর নহে—ভিড় হয় ইয়োরোপীয়, না হয় অ-বাঙ্গালী অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসাদারগণের। ঐতিহাসিক হিসাবে বাঙ্গালীর ব্যবসায়-পর্ব্বতা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। হয়ত ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সুযোগ-লাভের জন্য বাঙ্গালী-ব্যবসায়-পরাঙ্মুখ হইয়াছে—হয়ত কর্ণওয়ালিশ-প্রতিষ্ঠিত ভূমি-বন্দোবস্তের জন্যই বাঙ্গালীর উদ্যম ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে খাটে নাই। আজ জাতির আর্থিক সঙ্কট এত ঘোরতর যে, ইতিহাসের দিক্ দিয়া এ প্রশ্ন বিচার করিলে ইহার কোন প্রতীকার হইবে না। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে গল্‌তি কোথায়—কেন বাঙ্গালীর কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়-প্রচেষ্টা সফল হয় না, ইহাই বিশেষভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। কারণ আজ কিংবা বিগত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে সব বাঙ্গালী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আছেন বা ছিলেন, তাঁহাদের উদ্যম ও চেষ্টা যদি সফল হইত, তবে আরও অনেক বাঙ্গালী যে ব্যবসায়ে ভবিষ্যতে ব্রতী হইতেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে গল্‌তি কোথায়—ইহার গড়ন ও বাঁধুনীর মধ্যে ক্ষীণ অংশটী কোথায় তাহাই আমাদের বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, ইহাই বলা যাইতে পারে যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আজ পর্য্যন্ত যথেষ্ট কৃতী বাঙ্গালী আসেন নাই। আধুনিক ব্যবসায়ে সফল হইবার জন্য যে ব্যবসায়ীর যথেষ্ট চরিত্র-বল, সংগঠন-ক্ষমতা ও তীক্ষ্ণ ধী আবশ্যক এই স্থূল কথাটাই বাঙ্গালাদেশে এখন পর্য্যন্তও লোকের ভাল করিয়া জানা নাই। এতদিন যাহারা জীবনের অন্য ক্ষেত্রে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহারাই বেশীর ভাগ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নামিয়াছেন। কাজেই বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন আজিও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটা অতীত অভিজ্ঞতা বা ট্রাডিশান নাই; ব্যবসায় একবার চল্‌তি হইয়া গেলে তাহা চালাইবার জন্য তত কৃতিত্ব আবশ্যক হয় না, যত আবশ্যক হয় একটী ব্যবসায়কে প্রথম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। এই তীক্ষ্ণধী কৃতী বাঙ্গালী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নাই বলিয়াই আজ বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে দেখিতে পাই গতানুগতিকতার পরাকাষ্ঠা। বাঙ্গালী বুঝিলেন চা-বাগান লাভের ব্যবসায় কিংবা বীমা কোম্পানী করিলে প্রচুর অর্থের উপর ক্ষমতা লাভ করা যায়। অমনি চারিদিকে ১০ হাজার ১৫ হাজার টাকা লইয়া অনেক বাঙ্গালী চা-কোম্পানী কিংবা বীমা কোম্পানী রেজিষ্ট্রী করিতে লাগিলেন; কিংবা যে বাঙ্গালী কয়লার খাদ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তিনি ব্যবসায়ের বিস্তার করিতে হইলে নূতন কয়লার খনিরই পত্তন করিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর দূরদর্শিতারই অভাব বুঝিতে পারা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর গঠন-ক্ষমতার একান্ত অভাব। ব্যবসায়কে সুপ্রতিষ্ঠ কিংবা বিস্তৃত করিতে হইলে ইহাকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ একটি প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করাই আবশ্যক; কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালীর অতি কম ব্যবসায়ই এই প্রতিষ্ঠান-গৌরব দাবী করিতে পারে। প্রত্যেক ব্যবসায়ই একান্তভাবে ব্যক্তি-কেন্দ্রগ বা স্বত্বাধিকারীর দৃষ্টির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ইহার প্রথম ফল এই যে, ব্যবসায় কখনো সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না—যিনি ব্যবসায়ের পত্তন করেন তাঁহার অভাবেই ব্যবসায়ের অবসান হয়। শুধু তাহাই নহে, এ প্রকার মালিক-সর্ব্বস্ব ব্যবসায় আধুনিক অবস্থায় কখনো যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিতে পারে না। মানুষ মাত্রেরই স্বাস্থ্যের ভালমন্দ আছে, তাহার অসংখ্য

পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য রহিয়াছে; কাজেই কোন ব্যবসায়ের মালিকের শ্যেন দৃষ্টি দিনের পর দিন অব্যাহত ভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার ব্যবসায়ে রাখা সম্ভবপর নহে। কাজেই এই প্রকার মালিকসর্ব্বস্ব ব্যবসায়ের হানি অনিবার্য্য। ইহার বিস্তার যে একেবারেই সম্ভব নয় তাহাও অতি সহজে অনুমেয়। অনেক বাঙ্গালী ধনীর সঙ্গে ব্যবসায় বিস্তারের আলোচনায় উত্তর পাইয়াছি, "নিজে আর দেখিতে পারি না"। বলা বাহুল্য ব্যবসায়কে সংগঠন করিবার যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহাদের নিজ দৃষ্টির অপ্রচুর সুযোগের জন্য ব্যবসায় হইতে পশ্চাৎপদ হইবার কোন কারণ নাই। ব্যবসায়কে এই প্রকার মালিক-সর্ব্বস্বরূপে ধরিয়া লওয়া হয় বলিয়াই আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালীর অনেক ব্যবসায়ই পারিবারিক কিংবা গোষ্ঠি প্রতিষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ব্যবসায়ে যদি কোন প্রকার লিবারেলিজম থাকে তবে তাহার মানে এই যে, ব্যবসায়-ক্ষমতা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না। অনেক বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে দেখিতে পাই এই অতি স্থূল সত্যটির উপর দৃষ্টি নাই এবং ফলে ব্যবসায়ের উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে। যদি যথাসম্ভব কৃতী ও চরিত্রবান অনাত্মীয় ব্যক্তিকে ব্যবসায়ের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট করিয়া ইহাকে একটা পরিবার-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তোলা যাইত, তাহা হইলে সেরূপ ব্যবসায়ের এই প্রকার হানি হইত না।

তৃতীয়তঃ, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধে এক অমূলক ধারণা বর্ত্তমান। অনেক ব্যবসায়ী মনে করেন যে, বয়ন-ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য না জানিলে কেহ কাপড়ের কল চালাইতে পারেন না। সাবান প্রস্তুত করিবার প্রণালী না জানিলে সাবানের কারখানা খোলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য যে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দেশে বিশেষজ্ঞের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, কিন্তু ধনীর বিশেষজ্ঞ হইবার প্রয়োজন নাই। স্বদেশী যুগে দেশে 'টেক্‌নিক্যাল এডুকেশনের' সাড়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক বাঙ্গালী যুবক বিদেশ হইতে বহু দ্রব্যের নির্ম্মাণ-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিলেও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর স্থান প্রশস্ত হয় নাই। তাহার কারণ বাঙ্গালী ধনীর ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধে অত্যধিক ভীতি। অনেক সময় বিশেষজ্ঞরা ব্যবসায় চালাইতে গিয়াছেন, তাহাতে সুফল হয় নাই। যিনি বিশেষজ্ঞ তিনি যদি ব্যবসায়ের ভার গ্রহণ করেন, কিংবা যিনি ব্যবসায়ী তিনি যদি বিশেষজ্ঞ হইতে চান তবে দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আমাদের জানা আছে একটি শিক্ষিত বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ না হইয়াও মোজা গেঞ্জির কল করিয়া যথেষ্ট লাভ করিতেছেন; অপর একটি ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ার না হইয়াও কলকব্জার আমদানি কারবার করিয়া যথেষ্ট অর্থবান হইতেছেন; সম্প্রতি কোন ধনী বাঙ্গালী রসায়ন কিংবা চিকিৎসা শাস্ত্রের কিছু না জানিয়াও ঔষধ তৈরীর কারবারে এবং ঔষধের আমদানি কারবারে যথেষ্ট লাভবান হইতেছেন। এই প্রকার দৃষ্টান্ত দু'একটি নহে প্রচুর পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। ফলকথা ব্যবসায় চালাইবার জন্য ব্যবসায়ীর পক্ষে শিল্প-বিশেষজ্ঞ হওয়া একান্ত আবশ্যক নয়।

আর এক কথা। বাঙ্গালী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আসিতে অনেক সময়ই অসম্মত। কারণ অনেকেই এমন বয়সে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন যখন তাঁহার উপার্জ্জন আশু প্রয়োজনীয়। কিন্তু ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন করিয়াই তাহাতে লাভবান বা আশানুরূপ অর্জ্জন করিবার সুবিধা হয় না। যাঁহারা জীবনে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের ঊর্দ্ধতম ২০ বৎসর বয়সেই ক্ষেত্রে নামিয়া যাওয়া উচিত। তবে মুস্কিল এই যে, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমনি যে, এই অল্প বয়সের মধ্যে আমরা আমাদের চরিত্রের ও মনের যথেষ্ট খোরাক লইয়া জীবনে প্রবেশ করিতে পারি না। সে যাই হউক, আমাদের বক্তব্য এই যে, বেশী বয়সে আমরা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হই বলিয়া কোন ব্যবসায়কে ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে বড় করিয়া তুলিবার ধৈর্য্য ও অবকাশ পাই না। অথচ ব্যবসায়ের কোন অভিজ্ঞতা না লইয়া একেবারে বৃহদাকারে ব্যবসায় করিতে যাইয়া অনেক বাঙ্গালী বিফল হইতেছেন।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর জাতিগত যে কয়েকটী দোষের জন্য ব্যবসায়ে সফলতা হয় না উপরে আমি শুধু

তাহারই আলোচনা করিয়াছি। ইহা ব্যতীত মূলধনের অভাব ও অন্যদেশীয় ব্যবসায়িগণের সহানুভূতির অভাব প্রভৃতি অনেক কারণও আছে, যাহাতে তাহাদের ব্যবসায়ের সফলতা প্রতি পদে ব্যাহত হইতেছে। কিন্তু এ সব কারণের জন্য বাঙ্গালীর নিজের কোন দোষ নাই। যেখানে তাহার নিজের গলতি আমি শুধু সেই দিক্‌টা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের আর্থিক সমস্যার প্রতিকারের জন্য আজ দলে দলে তরুণবয়স্ক, সুশিক্ষিত, সংগঠন-ক্ষমতা-সম্পন্ন যুবক ব্যবসায়কে স্বেচ্ছায় জীবনোপায় বলিয়া বরণ করিয়া লউন। কিন্তু জীবিকার্জ্জনের অন্য সব পথ বন্ধ দেখিয়া এবং জীবনের বহু মূল্যবান সময় অনর্থক নষ্ট করিয়া পরিশেষে একান্ত অনিচ্ছায় কেহ ব্যবসায়ে নামিবেন না।

দারিদ্র্যের নির্ব্বাসন

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম, এ, বি, এল, এফ, আর, ই, এস্,

সমাজে যখন কোনও লোক অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হয়ে ওঠে এবং তার উপস্থিতি সমাজে বিশৃঙ্খলা আন্‌তে পারে এমন আশঙ্কা হয়, তখন দেশের শাসক তার শাস্তি দেন—নির্ব্বাসন। আবার যখন দেশের মধ্যে কোনও ব্যাধি প্রবলভাবে দেখা দেয় তখন দেশবাসিগণ চিকিৎসকের সাহায্যে রোগের চিকিৎসা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা করেন; ফলে হয় রোগের নির্ব্বাসন। ইটালি দেশে ম্যালেরিয়া অত্যন্ত প্রবল ছিল। নানারূপ স্বাস্থ্যকর নিয়ম প্রবর্ত্তনের ফলে ম্যালেরিয়া ইটালি থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছে। আমাদের দেশেও নানারূপ চেষ্টা হয় রোগ দূর করবার জন্যে। ম্যালেরিয়া দেশ থেকে বিতাড়িত করবার জন্যে নানারূপ সমিতি হয়েছে। দেশবাসিগণ সম্মিলিত হয়ে কাজ কর্‌লে হয়তো এই সব সমিতির উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। কিন্তু এমন কি কোন উপায় নাই যাতে দারিদ্র্য-ব্যাধিকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করা যেতে পারে? দারিদ্র্যের মত এমন প্রবল ব্যাধি—এমন সমাজ-শৃঙ্খলানাশক জিনিষ আর আছে কি? ম্যালেরিয়া বা কলেরার ন্যায় দারিদ্র্যেরও প্রতিষেধক আছে। এই প্রতিষেধকের ব্যবহার হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশে—সেখানে তাঁরা ব্যবস্থা করেছেন দারিদ্র্যের নির্ব্বাসন।

অসুখ করলে চিকিৎসার জন্যে ভাবনা নাই, বেকার বসে থাক্‌লেও অন্নাভাব নাই, বৃদ্ধ বয়সে মাসিক বৃত্তিলাভ, স্ত্রীর প্রসবের সময় আর্থিক সাহায্য, কার্য্যকালে আঘাত পেয়ে পঙ্গু হ'লে তার জন্যে মাসিক বৃত্তি, মৃত্যু হ'লে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য অর্থ-সাহায্য—এই সবের জন্য যদি এমন আইন বাঁধা থাকে যে, এগুলির জন্যে ভাবতে হবে না, তবে সমাজের উপর দারিদ্র্য-রাক্ষসের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হয়ে পড়ে, দারিদ্র্যের নির্ব্বাসনের পথ প্রশস্ত হয়। এই সব ব্যবস্থাই পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত হয়েছে, এর ফলেই সেখানকার লোকে সাধারণতঃ অচিকিৎসায় বা অনাহারে প্রাণত্যাগ করে না, তাই সেখানে রাস্তাঘাটে ক্ষুধিতের ক্রন্দনধ্বনি শোনা যায় না, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি রাস্তায় শুয়ে ভিক্ষা করে না, রাজপথে কাঙ্গালের মৃতদেহ ধূলিবিলুণ্ঠিত হয়ে থাকে না। গত বৎসর আমি যখন বিলাত থেকে দেশে ফিরি তখন আমার কয়েকটী বিদেশী বন্ধু কলম্বোতে জাহাজ থেকে তীরে নেমেছিলেন ভারতবর্ষ দেখ্‌তে। তাঁরা রাজপথে অর্দ্ধ-উলঙ্গ ব্যাধিক্লিষ্ট ভিখারীদের কাতরধ্বনি শুনে শিউরে উঠেছিলেন। মানুষের যে এ রকম দুর্দ্দশা হতে পারে তা তাঁদের কল্পনায় আসে না। ভারতের রাজপথের এই সব দুঃখের মত দৃশ্য ইংলণ্ড বা ইউরোপের আর কোন দেশে দেখা যায় না। মনে হয় যেন পাশ্চাত্য দেশগুলি দারিদ্র্যকে নির্ব্বাসন দিয়েছেন আর দারিদ্র্যরাক্ষস

সেখান থেকে পালিয়ে এসে ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

পাশ্চাত্যদেশ থেকে দারিদ্র্যকে যে বিতাড়িত করা হয়েছে তার মূলে কিন্তু কোন যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিক নাই। তাদের তপস্যার ফলে কোন দেবতা এসে বর দিয়ে যাননি যাতে আপনা হতেই এসব হয়ে যায়। ব্যবসায়-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মূলে রয়েছে বীমার নীতি। যে বীমা-প্রণালী দ্বারা এই কার্য্য সাধন হয় তাকে বলে সোশ্যাল ইন্‌শিওরেন্স বা সামাজিক বীমা।

প্রধানতঃ সামাজিক বীমা যেসকল দৈব দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :—

১। কারখানার কার্য্যে দুর্ঘটনা অর্থাৎ নানারূপ বিপদ-সঙ্কুল কার্য্যে অঙ্গহানি বা দৈহিক অনিষ্ট,

২। নানারূপ অসুস্থতা,

৩। কার্য্যে অসমর্থতা,

৪। বার্দ্ধক্য,

৫। আকস্মিক মৃত্যু,

৬। বেকার অবস্থা।

জাতিসঙ্ঘ (লীগ অব্ নেশনস) এই সমস্ত দৈব দুর্ঘটনার বিষয় উল্লেখ করে একখানা পুস্তিকাতে লিখেছেন :—যাহারা দৈহিক শ্রম বা মস্তিষ্ক চালনা করে জীবিকা অর্জ্জন করে তাদের সর্ব্বদাই এই সকল বিপত্তির আশঙ্কা থাকে। কোন কারণে বেকার থাকতে হলে তারা সহজেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। উপার্জ্জিত অর্থ সম্পূর্ণই যদি দৈনন্দিন সাংসারিক কার্য্যে ব্যয়িত হয়ে যায় তা হলেও এইরূপ উদ্বেগের কারণ থাকে,—ইহার ফলে কার্য্যে উৎসাহ, মানসিক শান্তি, এমন কি কর্ম্মপটুতা পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়, অবশেষে সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্যেই ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে।

জাতিসঙ্ঘ স্থাপিত হবার পর থেকে তার অন্তর্ভুক্ত ইনটারনেশানাল লেবার অরগেনিজেশন বা আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সমিতি এই সামাজিক বীমার প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচলন করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। ১৯১৯ সনে চেকো-শ্লোভাক গবর্ণমেণ্ট প্রথম সামাজিক বীমার কাজ গ্রহণ করার জন্য এই সমিতিকে অনুরোধ করেন। তারপর অনেক আলোচনার পর ১৯২১ সনের জুলাই মাসে কর্ত্তৃপক্ষ সমিতির ডিরেক্টারকে এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করতে বলেন; ফলে সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে জেনেভাতে এ বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদের একটি সভা হয়। সামাজিক বীমার কাজ ভালভাবে করার জন্য এই সভা একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করেন। বর্ত্তমানে ১৪টি দেশের ২৪ জন প্রতিনিধি এই কমিটিতে আছেন—বেলজিয়াম, চেকো-শ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, এস্থোনিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড, ইটালী, হলাণ্ড, নরওয়ে, পোলাণ্ড, স্পেন, সুইডেন, ও সুইজারল্যাণ্ড। এ সমস্ত দেশে সামাজিক বীমা সম্বন্ধে যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করা হয় তাহা এবং এ বিষয়ে শ্রমিকদের মতামত এই সব দেশের প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন এবং কোন সমস্যা উপস্থিত হ'লে পারদর্শী ব্যক্তিরা তাহার সমাধানের চেষ্টা করেন। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সমিতির যে সব বাৎসরিক সভা হয় তাতে বিভিন্ন দেশকে এই সব প্রণালী সম্যকরূপে অনুধাবন করবার জন্য অনেকবার অনুরোধও করা হয়েছে।

এখন এই সামাজিক বীমার দ্বারা দেশের লোকেরা কিরকম সুবিধা পাচ্ছে তা দেখা যাক। প্রধানতঃ ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

ইংলণ্ডে অচিকিৎসায় কোন লোক মারা যায় না। যারা প্রভূত অর্থশালী তারা চিকিৎসার জন্য অর্থব্যয় করতে পারে, তাদের ভাবনা নাই। কিন্তু গরীব লোকের কি হবে? তার জন্য রয়েছে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবীমা বা নেশানেল হেল্‌থ ইন্‌শিওরেন্স। ১৯১১ সনে এই আইন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। বৎসরে যার ২৫০ পাউণ্ডের কম আয় তাঁকেই এই বীমা কর্‌তে হয়; তবে যারা হাতের কাজের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে তাদের যত আয়ই হোক, এই বীমা করতে হয়। এই বীমার কাজ করবার জন্য অনেক অনুমোদিত সমিতি বা কোম্পানী আছে। বীমা-কারী কোম্পানীর কাছ থেকে একখানা কার্ড পায়। প্রতি সপ্তাহে দেয় চাঁদা পোষ্টাফিস হতে বিশেষ টিকিট

কিনে তাতে লাগাতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় পরে এই কার্ড কোম্পানীতে পাঠাবার 'নিয়ম'। চাঁদার হার—প্রতি সপ্তাহে বীমাকারীকে দিতে হয় ৯ পেন্স এবং তিনি যাঁর অধীনে কাজ করেন তাঁকে দিতে হয় ৯ পেন্স; মোট ১ শিলিং ৬ পেন্স। স্ত্রী লোকের পক্ষে ৭ পেন্স ও ৬ পেন্স, মোট ১ শিলিং ১ পেন্স। এই চাঁদা থেকে যে টাকা আদায় হয়, তাঁর উপর পুরুষদের চাঁদার ২/৯ অংশ ও স্ত্রীলোকদের ১/৪ অংশ গবর্ণমেণ্ট দান করেন। এইরূপে প্রাপ্ত অর্থ থেকে নিম্নলিখিতরূপ সাহায্য দেওয়া হয়।

কোন লোকের অসুখ হ'লে তাঁর জন্য সে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ পায়। ডাক্তার বাড়ীতে এসে ব্যবস্থা দিয়ে যাবে এবং ডাক্তারখানায় সেই ব্যবস্থাপত্র দিলে বিনামূল্যে ঔষধপত্র দেবে।

রোগের ব্যবস্থা তো হ'লো, কিন্তু অসুস্থ হ'লে অনেক সময়েই তো রোজগার বন্ধ, তখন উপায়? তার জন্যে যতদিন অসুস্থতা থাকে প্রতি সপ্তাহে কিছু টাকা বৃত্তি হিসাবে দেওয়া হয়, যাতে তার সংসার চ'লে যায়।

স্ত্রীর যদি সন্তান হয় তবে তার অনেক ব্যয় আছে। যার আয় সামান্য তার পক্ষে এই ব্যয় বহন করা কষ্টকর। কাজেই প্রসবের সময় বীমা কোম্পানী খরচপত্র বাবদ টাকা দেবে।

পূর্ব্বোক্ত ন্যাশানাল হেলথ ইন্‌শিওরেন্স আইনে এই সব বৃত্তি বাধ্যতামূলক। এ ছাড়া অনেক কোম্পানী অতিরিক্ত সুবিধা দিচ্ছেন, যথা, দাঁত খারাপ হ'লে দাঁত বাঁধিয়ে দেবে, চোখ খারাপ হ'লে চশমা দেবে, স্বাস্থ্যহানি হ'লে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যবস্থা করে দেবে। এসব অতিরিক্ত সুবিধার জন্য কিন্তু অতিরিক্ত চাঁদা দিতে হয় না। এক চাঁদাতেই সব বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

তারপর হচ্ছে বেকার সমস্যা। বর্ত্তমান সমাজে সকলকেই কাজ করে খেতে হয়। কিন্তু সকলেরই তো কাজ জোটে না। অনেক লোককে বেকার বসে থাকতে হয়। তখন তাদের অন্নসমস্যার সমাধানের কি হবে? ইংলণ্ডে আগে অনেক শ্রমিক-সঙ্ঘের নিয়ম ছিল যে, কোন সদস্য বেকার হ'লে তাকে ভরণ-পোষণের খরচ দেওয়া হ'তো। কিন্তু এ সুযোগ তো সকলের ভাগ্যে জুটতো না! কাজেই ১৯১১ সনে বাধ্যতামূলক বেকার বীমা করা হ'লো। এখানেও কার্য্যপ্রণালী অনেকটা স্বাস্থ্যবীমার মতো। তবে এখানে কোন কোম্পানীর ভিতর দিয়া কাজ নাই। শ্রমিক-বিভাগের মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এর কাজ হয়। পরিচালনার ভার থাকে এমপ্লয়মেণ্ট একস্‌চেঞ্জের উপর। তবে স্থানে স্থানে ট্রেড ইউনিয়ান বা শ্রমিক সঙ্ঘরাও একাজ করে থাকে। স্বাস্থ্য বীমার মত বেকার বীমাতেও পোষ্টাফিসে বিশেষ টিকিট কিনে কার্ডে লাগাতে হয়। এখানে চাঁদার হার প্রতি সপ্তাহে—

	যাঁর অধীনে কাজ করেন	যিনি কাজ করেন	গবর্ণমেণ্ট
পুরুষ	৮ পেঃ	৭ পেঃ	৮ পেঃ
স্ত্রীলোক	৭ পেঃ	৬ পেঃ	৬ পেঃ
বালক	৪ পেঃ	৩½ পেঃ	৪½ পেঃ
বালিকা	৩½ পেঃ	৩ পেঃ	৪½ পেঃ

যদি কেহ কাজ হারায় এবং বিশেষ চেষ্টাতেও কাজ না পায়, তবে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বা ট্রেড ইউনিয়নএ তার নাম লিখিয়ে যেতে হয়। তা হলে যতদিন বেকার অবস্থা থাকবে প্রতি সপ্তাহে একটা বৃত্তি দেওয়া হবে।

পুরুষ	...	১৮ শিলিং
স্ত্রীলোক	...	১৫ শিলিং
বালক	...	৭½ শিলিং
বালিকা	...	৬ শিলিং

যে ব্যক্তি বেকার হবে তার পরিবারের পোষ্যদের জন্যও বৃত্তি দেওয়া হবে। বর্ত্তমান জগতে শ্রমিকেরা বলে 'কাজ অথবা খোরাক' অর্থাৎ তাদেরকে হয় কাজ দিতে হবে, নতুবা তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা চাই। তারা যদি চেষ্টা করে ও কাজ না পায় তবে কি তারা না খেয়ে মরবে? গবর্ণমেণ্টকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বেকারবীমার ফলে পাশ্চাত্য জগতে কেউ না খেয়ে মরে না।

লোক যখন সমস্তজীবন কাজ করে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়, তখন তাঁর কর্ম্মক্ষমতা থাকে না। বার্দ্ধক্যে তার প্রতি সমাজের অবশ্যই কর্ত্তব্য আছে। কাজেই ইংলণ্ডে

নিয়ম আছে ৭০ বছর বয়স হবার পর কোন লোকের অভাব থাকলে সে ঘরে বসে গবর্ণমেন্ট থেকে মাসিক বৃত্তি পাবে। এই বৃত্তির হার তার আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করবে।

যাকে কাজ করে সংসার চালাতে হয়, তার মৃত্যু হ'লে তার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের কি হবে? তাদের জন্যও বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। বিধবা ও অনাথ বালকবালিকারা না খেয়ে মরবে না।

এ ছাড়া অনেক শ্রমিকের কারখানার কাজে দুর্ঘটনা ঘটে। কারও হাত পা কারও চোখ নষ্ট হয়। এ সবের জন্য শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আইন প্রবর্ত্তিত হয়েছে। কাজের ফলে যদি দৈব দুর্ঘটনা ঘটে, তবে মালিককে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সুখের বিষয় ভারতবর্ষে এই আইনটি প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

এতো গেল আইন দ্বারা সুবিধার ব্যবস্থা। দেশের গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য অনেক বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করেছেন। এ ছাড়া দেশের লোকেরা স্বেচ্ছায় অনেক ব্যবস্থা করেছে, যাতে দারিদ্র্য সমাজকে দৃঢ় হস্তে আকড়ে ধরতে না পারে। মৃত্যুর পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা প্রায় সকলেই করে রাখেন। প্রতি সপ্তাহে সামান্য কিছু চাঁদা দিলেই মৃত্যুর পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সব ব্যবস্থা হয়। ইংলণ্ডে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচ কোটী এইরূপ বীমাপত্র বা পলিসি আছে। কাজেই মনে হয় কেহই বাদ নাই।

এ ছাড়া জীবনবীমা করা নেই এমন লোক পাওয়া শক্ত। প্রায় সব লোকেই অন্ততঃ সামান্য টাকার জন্য জীবনবীমা করে রাখে। অকস্মাৎ মৃত্যু হ'লে আমাদের দেশের মত পরিবার পথে দাঁড়ায় না। ইংলণ্ডে অনেক ফ্রেণ্ডলি সোসাইটী (বান্ধব সমিতি) নামক প্রতিষ্ঠান আছে, দেশের লোকেরা স্ব ইচ্ছায় তার সদস্য হ'ন। সেখান থেকেও অসুখে সাহায্য, অভাবে বৃত্তি এবং মৃত্যুতে নগদ টাকা পাওয়া যায়। এই রকম করে পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা দারিদ্র্য রাক্ষসের আগমনের পথ চারিদিকে রুদ্ধ করে রেখেছে।

জাতি-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘে বিভিন্ন দেশের এই রকম সামাজিক বীমা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং যাতে এই সব প্রণালী সমস্তদেশেই প্রবর্ত্তিত হয় সে জন্য চেষ্টাও করা হয়। গত বৎসর যখন সুইজারল্যাণ্ডে গিয়েছিলুম তখন জেনেভাতে শ্রমিকসঙ্ঘের আফিসে এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান করবার সুযোগ পেয়েছিলুম। শ্রমিকসঙ্ঘের কর্ম্মচারী মিঃ কুরিয়ান যখন আমাকে সব বিষয় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তখন আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা প্রায় সব দেশেই তো দারিদ্র্য নিবারণের ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষ কোথায়? তিনি বল্লেন, "ভারত তো কেবল যাত্রা সুরু করেছে, তাদের ওখানে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন হয়েছে।" ক্ষুধিতের ক্রন্দনধ্বনি, পীড়িতের আর্ত্তনাদ ভারতের পল্লীতে যে বিভীষিকার সঞ্চার করেছে তার নিবারণের চেষ্টা কোথায়? আমার মনে হয় যতদিন পর্য্যন্ত সামাজিক বীমা প্রণালী ভারতবর্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত না হয় ততদিন ভারতের উন্নতি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। "দারিদ্র্য-দোষঃ গুণরাশিনাশী।" দারিদ্র্যের নিবারণ ব্যতীত সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতে যেদিন অন্নবস্ত্রের অভাব দূরীভূত হবে, পীড়িতের চিকিৎসার সুব্যবস্থা হবে, সেইদিনই ভারতবাসীর মনে শক্তি সঞ্চারিত হবে। সেইদিন "ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

বাংলার লবণের ব্যবসা

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম, এ

বাংলায় লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠার অসুবিধা

গোটা ভারতবর্ষে বাংলা, বিহার, আসাম এবং বার্ম্মা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রদেশেই অল্পবিস্তর লবণ উৎপন্ন হয়। বিদেশে চালান দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর না হইলেও অন্ততঃ ঐ সমস্ত প্রদেশে আপন আপন এলাকায় ব্যবহারোপযোগী লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু বাংলা এবং অপর তিনটী প্রদেশে এক রত্তি লবণও উৎপন্ন হইবার উপায় নাই। লবণ উৎপাদনের প্রধান বাধা আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল নহে; দুরন্ত বর্ষার জন্য সমুদ্রের জল শুষ্ক করিবার উপায় নাই; তাহার উপর আবার বঙ্গোপ-সাগরের মারাত্মক ঘূর্ণীবাত্যা আছে। আবহাওয়ার গতিক তো মন্দ আছেই, এ ছাড়া অর্থনৈতিক অসুবিধা, টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার অভাব ইত্যাদি নানা উপসর্গ জুটিয়া যাওয়ায় বাংলার পক্ষে লবণ-শিল্প কায়েম করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলা এবং উড়িষ্যার উপকূলে লবণ-শিল্প কায়েম করা যাইতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে নানা প্রকার সরকারী এবং বে-সরকারী অনুসন্ধানও করা হইয়াছে। এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, মাত্র পুরী জেলার পূর্ব্বদিকস্থ সমুদ্রোপকূলে লবণের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। চিল্কা হ্রদের তীরবর্ত্তী স্থান সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক; কিন্তু সেখানেও নাকি অনেক খরচ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। কম সে কম এক কোটি টাকার নীচে এই স্থানে আধুনিক কারখানা কায়েম হইতে পারে না। অন্য পক্ষে কাথিয়াওয়াড়ের উপকূলে মাত্র ১০ লাখ টাকায় এই ধরণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। খাঁটি বাংলা দেশে কিন্তু লবণ-শিল্পের উপযোগী ভাল স্থান নাই বলিলেই হয়।

বাঙ্গালার লবণের ব্যবসায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্থান

প্রতি বৎসর বাংলা দেশে প্রায় ১৫০ লক্ষ মণ লবণ আমদানি হইয়া থাকে, এবং আমদানিকারী দেশগুলি প্রধানতঃ অ-ভারতীয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রায় সমস্ত লবণই অ-ভারতীয় দেশসমূহ হইতেই আসিত; কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও কিছু কিছু লবণ বাংলা দেশে আসিতেছে; ১৯২৪-২৫ সন পর্য্যন্ত কেবল মাত্র অ-ভারতীয় দেশসমূহ হইতেই বাংলা দেশে লবণ আসিয়াছিল। প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলির নাম নিম্নরূপ:—

	১৯২৪-২৫ সন %
বিলাত	১৭·৩৮
এডেন	৩৩·১৩
জার্ম্মাণি	৫·৫৭
স্পেন	৪·৭১
তিউনিস (উঃ আফ্রিকা) ...	·৯১
ইতালীয় পূঃ আফ্রিকা ...	৭·৭৩
মিসর	২৭·১
ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড ...	৩·৪৪
অন্যান্য দেশ	·০১

১৯২৪-২৫ সনের এই হিসাবে দেখা যাইতেছে, বাংলার লবণ ব্যবসায় অ-ভারতীয় রপ্তানিকারকদেরই জয় জয়কার। ১৯২৭ সন হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলি হইতে বাংলার রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নে ১৯২৭-২৮ এবং ১৯২৮-২৯ সনের তালিকা দেওয়া গেল।

১৯২৭-২৮ সন

	মণ	মোট আমদানির শতকরা অংশ
বিলাত	২০,৩৫,৩৫৯	১৪'০২
জার্ম্মাণি	৭,১৪,০৯৪	৪'৯২
স্পেন	২০,৯০,১৯৪	১৪'৩৯
মিসর	২৫,৫৪,৩৪০	১৭'৫৯
ইতালীয় পূঃ আফ্রিকা,	১২,৯৭,৪১২	৮'৯
এডেন	৪৭,৫৮,২৫১	৩২'৭৫
ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড	১,৯৬,৩৪০	১'৩৫
বোম্বাই	৮,৭৮,৭৮৬	৬'০৫
মোট	১,৪৫,২৪,৭৭৬	১০০'০০

১৯২৮-২৯

	মণ	শতকরা অংশ
বিলাত	১৭,৭৯,৩৬৬	১১'৮৩
জার্ম্মাণি	৬,০৭,৯১০	৪'০৪
স্পেন	১৬,৪৭,০১৮	১০'৯৫
মিসর	২৩,৩১,৪৬৯	১৫'৫১
ইতালীয় পূঃ আফ্রিকা	১৩,০৫,০৫০	৮'৬৭
এডেন	৫৩,১৩,৬৪৯	৩৫'৩৪
ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড	২,৯২,২৭০	১'৯৪
বোম্বাই	৪,৯২,৭৭২	৩'২৮
করাচী	২,০৫,৯৫৭	১'৩৭
টিউনিস	৬,৬২,২৯৫	৪'৪০
ওখা (কাথিয়াওয়াড়)	৬০,৩৭৫	'৪১
রুমাণিয়া	৩,৩৯,২৩৫	২'৩৫
মোট	১,৫০,৩৭,৩৬৬	১০০'০০

উল্লিখিত এই দুইটী হিসাবের তালিকায় দেখা যাইতেছে, যে, বাংলায় লবণ রপ্তানি বাণিজ্যে বিলাত ও জার্ম্মাণি ক্রমশঃ হারিয়া যাইতেছে। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী দেশগুলির অবস্থাও তাহাই। পক্ষান্তরে কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্ত্তী রুমাণিয়া দেশটী লবণ-শিল্পে হঠাৎ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আফ্রিকার দেশগুলির এবং এশিয়ার এডেনের লবণ রপ্তানির বৃদ্ধি দেখা যায়। এই বৃদ্ধির কারণ কি ? মাল চলাচলের জন্য জাহাজ ভাড়া নিতান্ত কম দিতে হয় না। ইউরোপ অধিকতর দূরবর্ত্তী বলিয়া বাংলার বাজারে লবণ পাঠাইয়া আর বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছে না। এডেন এবং ভারতবর্ষ যেরূপ গতিতে লবণ উৎপাদন করিতেছে, তাহাতে মনে হয় কিছুদিন পরে আফ্রিকার দেশগুলিকেও ভারতের বাজার হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। এডেন পার হইয়া কোন লবণের জাহাজকেই আর বাংলার উপকূলভাগে আসিয়া ভিড়িতে হইবে না।

ভবিষ্যৎ লবণ রপ্তানিকারক এডেন ও ওখা

বাংলার লবণ ব্যবসায় এই যে পরিবর্ত্তন তাহা নিতান্ত সুখের বিষয় বলিতে হয়। ১৯২৪-২৫ সনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে এক ছটাক লবণ বাংলায় আসিত না। ১৯২৭-২৮ সনে কিন্তু বাংলার লবণ আমদানি বাণিজ্যে ভারতের হিস্যা দেখা যায় ৬'০৫%। বোম্বাই হইতেই এই লবণ রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৮-২৯ সনে এই হিস্যা আবার কিছু কমিয়াছে। মোট হিস্যা ৫'০৬%। বোম্বাই হইতে এই সনে কম রপ্তানি হইয়াছে, পক্ষান্তরে করাচী বন্দর হইতে রপ্তানি হইয়াছে প্রায় ২ লক্ষ মণ, অর্থাৎ বাংলায় মোট আমদানির ১'৩৭%। আর একটী ভারতীয় বন্দর হইতেও বাংলায় লবণ আসিয়াছে। বন্দরটীর নাম ওখা। ইহা বড়োদা রাজ্যের অন্তর্গত এবং কাথিয়াওয়াড় উপকূলে অবস্থিত। এই বন্দরটীর এখনও নিতান্ত শৈশবাবস্থা। গোটা বাংলা, বিহার, আসাম এবং বার্ম্মার লবণের বাজার হস্তগত করিবার অভিপ্রায়েই এই বন্দর এবং ইহার নিকটে একটী বিরাট আধুনিক লবণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও লবণ উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত স্থান হইতে প্রধানতঃ রেলপথে লবণ চালান দিতে হয়; কিন্তু রেল মাশুলের হার যেরূপ বেশী তাহাতে লবণ বেচিয়া লাভ থাকে না। কিন্তু ওখা হইতে লবণ চালান দিতে হইলে সমুদ্রপথে কলিকাতা বা চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত মাল চালান দেওয়া যাইবে। জাহাজের ভাড়া রেলমাশুলের তুলনায়

অনেক কম। ওখার নিকটবর্ত্তী স্থান এডেনের মতই লবণ প্রস্তুতের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। আবার এডেন বন্দর হইতে যেমন নৌকায় করিয়া জাহাজে মাল পৌঁছাইয়া দিতে হয়, তথায় সেরূপ করিতে হইবে না। একেবারে জাহাজ আসিয়া বন্দরে ভিড়িবার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং ওখাতে খরচ পড়িবে কম। কলিকাতা হইতে ওখা বন্দরের দূরত্বও এডেন হইতে ৮৭৯ মাইল কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বন্দর একটী বিশাল লবণ রপ্তানিকারক বন্দরে পরিণত হইবে। তবে এডেন লবণ যে একেবারে বাংলা দেশ হইতে বিতাড়িত হইবে তাহা নহে। দেখিতে গেলে এডেন বন্দরের সহিত ওখার প্রতিযোগিতা বাধিবার কোনই কারণ নাই। এডেনের পক্ষে যে পরিমাণ মাল রপ্তানি করিবার শক্তি তাহা প্রায় শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ওখার মাত্র শৈশবকাল। অন্যান্য দেশ হইতে যে সমস্ত লবণ আসে প্রকৃত পক্ষে তারই সহিত লড়াই বাধিবে ওখার লবণের। মোট কথা, ভবিষ্যতে বাংলা অঞ্চলের লবণ যোগাইবে ওখা এবং এডেন।

বাংলায় ব্যবহৃত লবণের পরিচয়

বাংলা প্রদেশে সাধারণতঃ দুই প্রকার লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে: (১) পাঙ্গা বা সিদ্ধ লবণ এবং (২) করকচ। করকচ লবণ সূর্য্যের উত্তাপের সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। করকচ লবণও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) গোটা এবং (২) চূর্ণ। ওখা বন্দরে বর্ত্তমানে এই করকচ শ্রেণীর লবণই প্রস্তুত করা হইতেছে। বোম্বাই এবং মাদ্রাজ হইতেও বাংলায় লবণ আসে; কিন্তু এই লবণ নিকৃষ্ট ধরণের এবং প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোম্বাই অঞ্চলে আর এক প্রকার শাদা লবণ প্রস্তুত হয়, ইহার নাম কুপ্পা বা ঘাসিয়া। এই লবণ অত্যন্ত পাতলা, এবং চালান দিতে গেলে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং বাংলা দেশে এই লবণের আদৌ চলন্ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে করকচ এবং পাঙ্গা লবণ খুব জমাট এবং ভারি; ঐগুলি জাহাজে বা রেলে চালান দিবার পক্ষেও বেশ সুবিধাজনক।

বাংলার লবণের ব্যবসার পরিচয়

বাংলাদেশে লবণ আমদানি হয় কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম বন্দরে। ১৯২৮-২৯ সনের আমদানি লবণের কলিকাতার হিস্যা ১,৩২,০১,২২৬ মণ অর্থাৎ ৮৭·৭৮%, এবং চট্টগ্রামের হিস্যা ১৮,৩৬,১৪০ মণ অর্থাৎ ১২·২২%। ১৯২৭-২৮ সনে এই দুই বন্দরের হিস্যা ছিল যথাক্রমে ৮৮·৬১% এবং ১১·৩৯%। এই সমস্ত লবণ দুই উপায়ে বিক্রী হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, সরাসর জাহাজ হইতে; দ্বিতীয়তঃ, সরকারী গোলা হইতে। এইরূপ গোলা একটী শালখিয়ায় এবং আর একটী চট্টগ্রামে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ১৯২৮-২৯ সনে ১,২৩,৩৮,৯০২ মণ লবণ বিক্রী হইয়াছে এবং লবণ শুল্ক আদায় হইয়াছে ১,৫৪,৪৬,৯২৭ টাক পক্ষান্তরে চট্টগ্রামের বিক্রী ১৭,৯৯,৭২১ মণ, শুল্ক আদায় ২০,৮৯,৮৮৬ টাকা।

বিদেশী পরিচালিত লবণের ব্যবসা

বাংলাদেশের লবণ আমদানি প্রধানতঃ বিদেশীর হাতে। আমদানিকারকগণের একটী বিরাট সমিতি আছে; এই সমিতির নাম সল্ট ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশান অব্ বেঙ্গল। লবণের দর এই সমিতিই স্থির করিয়া দেয়। সমিতি ইউরোপীয়দেব লইয়াই গঠিত; সুতরাং ইহারা যে বিলাতের টানই টানিবে এইরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক নাও হইতে পারে। মাঝে ওখা হইতে প্রেরিত লবণের মূল্য নাকি এই সমিতি জোর করিয়া কমাইয়া দেয়। এই অপরাধের কৈফিয়ৎস্বরূপ সমিতি বলে যে, সেবারে কতকগুলি দেশ হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে লবণ আমদানি হইয়াছিল। লবণের দরের সমতা রক্ষা করিবার জন্যই সমিতি সমস্ত দেশের লবণেরই দর কমাইয়া দেয়। ওখা সম্বন্ধে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ইহারা করে নাই।

গোরক্ষা ও গোপালন

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র
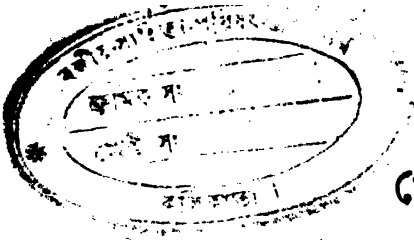
বাঙ্গালা সরকারের রিপোর্টে প্রকাশ এবং আমরা সকলেই জানি পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালাদেশের গরু সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, এখানকার গাভী গড়ে দৈনিক ৴১ সের দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশের গোজাতির এইরূপ অধঃপতনের কারণ বাঙ্গালী জাতির গোপালনে শৈথিল্য ও অযত্ন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় চেষ্টা ও যত্ন করিলে অন্যান্য দেশের ন্যায় গোজাতির প্রভূত উন্নতি করিয়া অর্থাগমের পথ করিতে পারিতেন। আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত ধনী সম্প্রদায় যদি ইউরোপীয় ধনী লোকদের ন্যায় গোশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া গোজাতির উন্নতি করিয়া সাধারণকে শিক্ষা দিতেন তাহা হইলে আমাদের দেশের গোজাতির এরূপ অধঃপতন হইত না। আমাদের দেশের সবই বিপরীত। আমাদের যেসকল ছেলেরা বুদ্ধিমান তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিতে ভগ্নস্বাস্থ্য এবং উদ্যমহীন হইয়া চাকুরীর জন্য লালায়িত হয়। আর যাহারা অশিক্ষিত ও মুর্খ তাহাদের উপর কৃষি, ব্যবসা প্রভৃতির ভার। অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা দূ'রে থাকুক, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও খুব কম লোকই কৃষি ও গোপালন সম্বন্ধে চর্চ্চা করেন। গোপালন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে, যাহা প্রত্যেক গৃহস্থের জানা প্রয়োজন। অনেক উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজের সহিত কথা কহিয়া দেখিয়াছি তাঁহারা ফারমার না হইলেও পশুপালন ও সাধারণ কৃষি বিষয়ে অনেক তথ্য জ্ঞাত আছেন। মনে হয় উহারা বুঝি ফারমার, নতুবা এ সব তথ্য কিরূপে জ্ঞাত হইলেন! আমাদের দেশের অনেকের ধারণা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কৃষিক্ষেত্র বা গোমহিষাদি পশু নাই, সে দেশের লোকেরা কল কারখানা, মোটরগাড়ী ইত্যাদি লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সামান্য গৃহস্থ হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত সকলেরই পশুশালা, ও কিচেন গার্ডেন আছে। যাহার যতটুকু জমি আছে তাহাতেই সে বৈজ্ঞানিক কৃষি কার্য্য করে। সেখানে পশুপালনে ও কৃষি বিষয়ে লোকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় সম্রাটও যোগদান করেন। কৃতিত্বানুযায়ী পারিতোষিক বিতরণ হয়।

প্রাকৃতিক নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ইউরোপীয় দেশসমূহে গোজাতির অবস্থা এরূপ উন্নত যে সেখানকার গাভী দৈনিক গড়ে ৷৷০ মণ দুগ্ধ প্রদান করে। কিন্তু আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে প্রাকৃতিক অবস্থা গোজাতির উন্নতির অনুকূল হইলেও এবং আহারের যথেষ্ট বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আমাদের শৈথিল্য ও অযত্নের জন্য এখানকার গাভী দৈনিক গড়ে ৴১ সেরের অধিক দুগ্ধ প্রদান করে না একথা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বঙ্গদেশের গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ও গোচারণের জমির পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে। গোপালন সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতির ন্যায় অন্য কোন জাতির শৈথিল্য দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা। ধনী ও নির্ধন শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়কে গোপালনের কথা বলিলে অনেকেই নানা অসুবিধার উল্লেখ করেন। সাধারণ অশিক্ষিত সম্প্রদায় ঐরূপ না বলিলেও কতকটা অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত, কতকটা অভাববশতঃ গোপালন করিলেও বিশেষভাবে যত্ন লওয়া ও ভাল ষাঁড়ের দ্বারা প্রজনন করান এবং প্রত্যহ গরুকে পরিষ্কার করা প্রভৃতির প্রতি মনোযোগ করে না। কাজেই গোজাতির এই অবনতি। গোজাতির উন্নতি করিতে হইলে, আমাদের মতে—বিশেষজ্ঞরাও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—ভাল জাতির গোবৎস হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। অবনতির প্রথম কারণ যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। দ্বিতীয় কারণ—ভাল ব্রিডিংএর বন্দোবস্ত না থাকা। তৃতীয়

কারণ—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখা। ৪র্থ কারণ দলাই মলাই অর্থাৎ গ্রুমিং না করা। পঞ্চম কারণ পরিষ্কার বাসস্থান না রাখা। ষষ্ঠ কারণ মশা, মাছি, ডাঁস ইত্যাদি কীটের দংশন হইতে রক্ষা না করা এবং মধ্যে মধ্যে স্প্রে দ্বারা জীবাণু-নাশক কোনরূপ লোশন্ গরুর গাত্রে প্রক্ষেপ না করা। বাঙ্গালাদেশে গোচারণের যে জমি আছে তাহাতে এখানকার গরুর ৬ মাসের খাবার হয় এবং অবশিষ্ট ৬ মাস সেগুলি প্রায় অনাহারে থাকে। গোজাতির উন্নতি করিতে হইলে প্রত্যেক ২টী গরুর জন্য ১/০ বিঘা জমিতে গম, বাজরা, মাষকলাই, খেঁসারি, কিংবা যব চাষ করিতে হইবে। ঐ ১/০ বিঘা জমিতে তখন ফসল পাওয়া যাইতে পারে। তাহার খরচ মাত্র জমির খাজানা ৩০৲ পড়ে। উহাতে ২টী গরু ১ বৎসর দৈনিক ১০ সের হিসাবে খাইতে পারিবে। কারণ ঐরূপ চাষের দ্বারা গম বিঘা প্রতি ১৫০ মণ, কলাই ৫০ মণ, যব ৫০ মণ অর্থাৎ মোট ২৫০ মণ জিনিষ পাওয়া যাইবে।

মাসিক প্রত্যেক গরুর জন্য খরচ—

ভুষি ইত্যাদি—।০ = ১।০
শস্য— /২॥০ = ৯।৵০
খইল— /১ = ৩৸০
লবণ— ৵০ = ।১০
চাউল কিংবা যবের মণ্ড—/১ = ৩৸০

১৮।৶১০

আন্যান্য খরচ .২৲

২০।৶১০

৩০০ দিনে অর্থাৎ ১০ মাসে—২০৪/০

মাসিক দুগ্ধের হিসাব—

দৈনিক /৮ সের হিসাবে ৬/০ মণ দুগ্ধের মূল্য

১০৲ মণ দরে— ৬০৲
৩০০ দিনে অর্থাৎ ১০ মাসে—৬০০৲
বাদ খরচ—২০৪/০

লাভ ৩৯৫৸৴০

বাঙ্গালাদেশে গরুকে বিচালি খাইতে দেওয়ার প্রচলন আছে, বিচালি গরুর পক্ষে অতি অপদার্থ খাদ্য। বাঙ্গালা-দেশের গরু ঐ বিচালি খাওয়ায় অভ্যস্ত। সেই জন্য পশ্চিমাঞ্চলের অতি উৎকৃষ্ট গরুও বাঙ্গালাদেশে আসিয়া সেরূপ দুগ্ধ প্রদান করে না; এমন কি অনেক সময়ে আর প্রসবও করে না।

বাঙ্গালায় উত্তম দুগ্ধবতী গাভী তৈয়ারী করিতে হইলে পশ্চিমাঞ্চলের উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভীর বৎস সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিলে ঐ সকল বৎস বাঙ্গালাদেশের জল, বাতাস ও খাদ্যে অভ্যস্ত হইবে। সেই সকল বৎসকে উৎকৃষ্ট সিন্ধু কিংবা হিসার কিংবা বিলাতী বলবান যণ্ডের দ্বারা প্রজনন করাইলে উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী হইবে এবং ঐ সকল গাভী গড়ে অন্ততঃ /৫ সের দুগ্ধ দৈনিক প্রদান করিতে সক্ষম হইবে।

আমরা বাঙ্গালার শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগকে গোপালন কার্য্যে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। গো-জাতির উন্নতি করিতে পারিলে আমরা স্বাস্থ্য ও সম্পদ্ লাভ করিব এবং আমাদের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে। শিক্ষিত যুবকেরা এই কার্য্যে অগ্রসর হইলে দেশের বেকার সমস্যারও কথঞ্চিৎ সমাধান হইবে।

গোপালন বিষয়ে কাহারও কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে "দি বিরাট গোগৃহ এণ্ড ফারমিং কোং লিঃ" ১০এ, কার্ত্তিক বসু লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় লিখিলে আমরা সকল বিষয় জ্ঞাত করাইব।

শ্রমিকদিগের ক্ষতিপূরণ

শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু, এম, এ, বি, এল

শ্রমিকদিগের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আইন করিবার জন্য ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ১৯২০ সনে প্রথম উদ্যোগী হন, এবং এ বিষয়ে জনসাধারণের মত কি তাহা জানিবার চেষ্টা করেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, কারখানা ইত্যাদির মালিক এবং শ্রমিক সঙ্ঘ, সকলেই একবাক্যে এই প্রকার আইনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও বলেন যে, ভারতের মজুর অন্যান্য দেশের মজুরদের তুলনায় একটু পৃথক। কারণ এদেশের মজুর সাধারণতঃ কারখানার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আসে না; তাহারা আসে বহুদূরের কোন গ্রাম হইতে, কিংবা একেবারে ভিন্ন প্রদেশ হইতে। যেমন বাংলা দেশের চটকলের কুলী আসে বিহার, উড়িষ্যা বা যুক্ত প্রদেশ হইতে; আসামের চা বাগানের কুলী বাংলার পশ্চিম প্রান্ত, বিহার উড়িষ্যা, যুক্ত-প্রদেশ, এমন কি সুদূর মধ্যপ্রদেশ হইতেও আসে। ইহারা নিজেদের দেশ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া আসে না, অনেকের স্ত্রী পুত্রাদি দেশেই থাকে, এবং কিছু উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিবার আশা প্রত্যেকেই রাখে। তাহার উপর অধিকাংশ মজুরই অজ্ঞ ও নিরক্ষর, এবং কারখানা প্রভৃতিতে ডাক্তারের ব্যবস্থাও খুব কম।

১৯২২ সনে সিমলায় একটা কমিটির অধিবেশন হয় এবং তাহাতে এই সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়। এই কমিটিতে ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য, কারখানার বিশিষ্ট মালিক, মজুরদের বড় বড় নেতা, ডাক্তার এবং জীবন বীমা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইহাদের অভিমত অনুসারে ১৯২২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রমিকদিগের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আইনের এক পাণ্ডুলিপি পেশ করেন। ১৯২৩ সনের মার্চ্চ মাসে ইহা যৎসামান্য সংশোধিত হইয়া পাশ হয় এবং পর বৎসর জুলাই মাস হইতে বলবৎ হয়। ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য কে দায়ী হইবে, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কত হইবে এবং ইহা কাহাকে দেওয়া হইবে, সমস্ত বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার ভার কোন বিচারকের উপর না দিয়া আইন দ্বারাই স্থিরীকৃত হইবে বলিয়া ঠিক হয়। ইহাদ্বারা যদিও আইনের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হয়, তথাপি ইহাতে মোকদ্দমা-প্রিয়তা কিছু কম হইবে বলিয়া মনে হয়। মজুর ও মালিকদিগের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য পৃথক বিচারালয় বা ট্রিবিউনাল গঠনের ব্যবস্থাও করা হয়। এই ট্রিবিউনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল চলিতে পারে; কিন্তু এইপ্রকার আপীলের ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ।

এই আইনের অধীনে আসে কারখানার, ইমারত-সংক্রান্ত ব্যবসায়ের, খাদের, রেলের ও বন্দরের কুলী, মজুর, মিস্ত্রী প্রভৃতি কর্ম্মী এবং অন্যান্য কতকগুলি ছোট ব্যবসায়ে লিপ্ত শ্রমিক। আইন পাশ হইবার সময় ইহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ। ইহা ছাড়া যে ব্যবসায়ে বিপদের সম্ভাবনা আছে সেই প্রকার ব্যবসায়ের কর্ম্মীদিগকে এই আইনের গণ্ডীর ভিতর আনা যায়, এবং এ পর্য্যন্ত এইরূপ অনেক ব্যবসায়ই আইনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই জন্য শ্রমিকদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়—কারখানা ইত্যাদিতে কাজ করিতে করিতে এবং সেই কাজের জন্যই যদি মৃত্যু হয় বা কোন দুর্ঘটনার জন্য অঙ্গহীন হইয়া অক্ষম হয়, অথবা এই মৃত্যু বা অক্ষমতা সেই কার্য্যজনিত কোন পীড়া দ্বারা হয়। কোন্ কোন্ কার্য্যে পীড়া হইবার সম্ভাবনা তাহা গভর্ণমেণ্ট স্থির করিতে পারেন এবং আবশ্যকমত তাহা আইনের ভিতরে আনিতে পারেন। ১৯২৮ সনে এই আইনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়।

আইন তৈয়ারী হইবার সময়ে অনেকে অনেক প্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়

উহা অনেকাংশেই অমূলক। আইন অনুসারে কাজ বেশ ধীর ভাবেই হইতেছে। তবে দেখা যাইতেছে যে, অনেক স্থানে মজুরগণ এই আইনের উপকারিতা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, এবং অনেকটা সেই জন্যই ক্ষতিপূরণের দাবীর সংখ্যা আশানুরূপ হইতেছে না। কারখানা, রেল, খাদ, ডক ও ট্রাম, এই কয়টী প্রধান ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণের হিসাব হইতে দেখা যায়, ১৯২৪ সনের শেষ ছয় মাসে ৪০০০, ১৯২৫ সনে ১১,০০০, ১৯২৬ সনে ১৪,০০ এবং ১৯২৭ সনে ১৫,৫০০ জন ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২৭ সনে এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।

ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্ম্মঘট

১৯২০ সনে মাদ্রাজের এক মিলের মালিক স্থানীয় শ্রমিকসঙ্ঘের নেতার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট ও ক্ষতিপূরণ বাবদ নালিশ রুজু করেন। যদিও পরে এই মোকদ্দমা আপোষে মীমাংসা হইয়া যায়, তথাপি ট্রেড ইউনিয়নের কার্য্যাদি কতদূর পর্য্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে আইনের আবশ্যকতা সকলেই উপলব্ধি করেন। এসেম্ব্লিতে মিঃ যোশী এ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব করেন, এবং গবর্ণমেণ্ট অনেক আলোচনার পর ১৯২৪ সনে ট্রেড ইউনিয়ন আইনের এক পাণ্ডুলিপি সাধারণের মতামতের জন্য প্রচার করেন। ১৯২৫ সনে উক্ত বিল এসেম্ব্লিতে পেশ হয় এবং ১৯২৬ সনে যথারীতি আইনে পরিণত হয়।

আইনের দ্বারা এই স্থির হয় যে, যে ট্রেড ইউনিয়ন রেজেষ্টারী হইবে তাহাকে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে। রেজেষ্টারী হইলে কিন্তু ইহার ফাণ্ড আইন অনুসারে খরচ করিতে হইবে এবং তাহার জন্য রীতিমত হিসাব রাখিতে হইবে।

আইনের প্রথম যে সংশোধন হয় তাহার দ্বারা ফাণ্ডের টাকা রাজনৈতিক ব্যাপারে খরচ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়; অবশ্য যে ট্রেড ইউনিয়নের তহবিল এইরূপ ভাবে খরচ করিতে পারা যাইবে তাহা আইনতঃ রেজেষ্টারী হওয়া চাই।

যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন রেজেষ্টারী হয় নাই তাহারা যাহাতে ফৌজদারী মামলার দায় হইতে অব্যাহতি পায় তাহার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় তাহা নামঞ্জুর হয়।

১৯২৪ সনে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ধর্ম্মঘটের মীমাংসা সম্পর্কে আইনের একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া সাধারণের মতামতের জন্য প্রচারিত করেন। ১৯২৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ঐ বিল ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হয়। ইহা দ্বারা ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তাহার বিচার করিবার জন্য দুই প্রকার বিচারালয় স্থাপিত হইবার প্রস্তাব থাকে—একটি 'অনুসন্ধান আদালত' অপরটী 'মীমাংসা সমিতি'। প্রত্যেক ধর্ম্মঘটের জন্য এই প্রকার বিচারালয় স্থাপিত হইতে পারে। সাধারণে যাহার দ্বারা উপকৃত হইতে পারে এরূপ ব্যবসায়ের মজুরগণ যদি এক মাসের লিখিত নোটিশ না দিয়া ধর্ম্মঘট করে তাহা হইলে তাহারা এই আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে। প্রয়োজন হইলে অন্যান্য ব্যবসায়কেও (যথা রেল) এই আইনের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে পারা যাইবে।

কোনও ধর্ম্মঘটের সহিত সহানুভূতি স্বরূপে যদি অপর কোন ধর্ম্মঘট হয় এবং তাহাদ্বারা জন সাধারণকে বিপদগ্রস্ত বা গভর্ণমেণ্টকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার ধর্ম্মঘট এই আইনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইতে পারিবে এবং সেই ধর্ম্মঘটকারীদিগকে ১৯২৬ সনের ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইনের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইবে। কারখানা ইত্যাদির মালিকগণ যদি অন্যায় রূপে মিল বন্ধ করেন তাহা হইলে এই ব্যবস্থা তাহাদের উপরও প্রযোজ্য হইবে।

এই আইনের দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং অনেকের মতে ইহা দ্বারা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ব্যবস্থাপক সভার ভারতীয় সদস্যগণ এবং শ্রমিকদিগের নেতাগণ একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করেন। যদিও এদেশে এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি হয় তৎসত্বেও গত বৎসর ইহা আইনে পরিণত হইয়াছে।

১৯২৪ সনে প্রসিদ্ধ শ্রমিকনেতা মিঃ যোশী ব্যবস্থাপক

সভায় একটি বিল পেশ করেন। ইহা দ্বারা স্ত্রী মজুরদিগের প্রসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে কাজ করা বন্ধ করিবার এবং প্রসবের জন্য কিছু খরচ দিবার প্রস্তাব হয়। গভর্ণমেণ্ট বলেন যে, বর্ত্তমানে এ প্রকার আইনের কোন আবশ্যকতা নাই। অবশেষে ইহা অধিকাংশের মতে অগ্রাহ্য করা হয়।

ভারতের জন-সংখ্যা ও তাহার সংস্থান

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এ কথা নূতন নহে। শতকরা ৯০ জন এই ভারতবর্ষে কৃষি হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহার পর এদেশে দুর্ভিক্ষ কমিশন এবং কৃষি কমিশন আসিয়াছে, তাহারা সকলেই এই কথারই পুনরুক্তি করিয়া গিয়াছে। চিন্তাশীল লোকে ইহাও বলিয়াছেন যে, শুদ্ধমাত্র বর্ত্তমানেই যে ভারতবর্ষে কৃষি সর্ব্বপ্রধান তাহা নহে, ভবিষ্যতেও থাকিবে।

সেন্সাস রিপোর্টেও ইহাই দেখা যায়। ১৯১১ সনের সেন্সাসে দেখিতে পাই ব্রিটিশ ভারতে ২৪৭০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৭৮০ লক্ষ লোক চাষ করিয়া প্রাণধারণ করে। পূর্ব্বকার এবং পরবর্ত্তী সেন্সাস রিপোর্ট মিলাইয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, জমির চাহিদা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। তাহার উপর আবার আর এক রব উঠিয়াছে "গ্রামে গিয়া চাষ করিয়া খাও" ইহারও কিছু ফল যে হয় নাই তাহা নহে—জীবনযুদ্ধে সর্ব্বপ্রকারে পরাভূত হইয়া অনেকে অবশেষে কৃষক হইয়াছে ইহাও জানা গিয়াছে। এই সমস্ত লইয়া দেখা যায় যে চাষের চাহিদা বাড়িয়া চলিতেছে।

কিন্তু ইহাতে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, এই অবস্থা হইতে বিশেষ ভয়ের চিহ্ন সূচিত হইতেছে। অনেকে যেমন বলেন যে, অনেক জমি এখনও পড়িয়া আছে, কেবল—চাষ করিবার অপেক্ষা, তাঁহারা ঠিক ইহার বিপরীত বলেন।

কোন পক্ষকেই অস্বীকার করা চলে না; সুতরাং আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে এখন দেশের কি করা উচিত এবং চাষের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত কিনা ইহা আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, আমাদিগের জন-সংখ্যার ভাব কিরূপ? উহা বাড়িতেছে, না কমিতেছে অথবা স্থির আছে, এবং জমির উৎপাদনী শক্তিই বা কিরূপ আছে তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর ফসল জন-সংখ্যার কতদুর সংস্থানোপযোগী তাহা পরীক্ষা করিব।

ভারতবর্ষে জন্মসংখ্যা অধিক কিন্তু সেই অনুপাতে মৃত্যুসংখ্যাও অধিক। সেইজন্য জনসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। এমন কি ১৯১৮ সনে মৃত্যুর হার জন্মহারের প্রায় দ্বিগুণ উঠিয়া গিয়াছিল এবং ঐ সনে মৃত্যুসংখ্যা পল্লীগ্রামেই খুব বাড়িয়াছিল। ১৯০১ সন হইতে ১৯১১ সনের মধ্যে ২০,৭৯৫,৩৪০ জন লোক বাড়িয়াছে অর্থাৎ শতকরা ৭·১ বাড়িয়াছে। ১৯১১ সন হইতে ১৯২১ সনের মধ্যে ৩৭৮৬০৮৪ জন লোক বাড়িয়াছে অর্থাৎ শতকরা ১·২ বাড়িয়াছে। বৃদ্ধির হার প্রায় শতকরা ৬ কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিবার কিছু নাই। তাহাও আবার শুদ্ধ বাংলা দেশ ধরিলে জন্মহার বৃদ্ধি হয়, কারণ ১৯২৮ সনের মৃত্যু-সংখ্যা বাংলা দেশের বাহিরেই খুব বেশী দেখা যায়।

জন-সংখ্যার অবস্থা এইরূপ। এখন দেখা যাক জমির উৎপাদিকা শক্তি কিরূপ। ১৯১৫ সন হইতে ১৯২৫ সন অবধি প্রতি বৎসরে যতখানি জমিতে ধান চাষ করা হয় এবং তাহাতে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহার হিসাব করিলে দেখা

যায় যে, উৎপাদিকা শক্তি সমান আছে, বরং ১৯২০ সনের পর হইতে যে ফসল হইয়াছে তাহার সহিত ২০ সনের আগের ফসলের তুলনা করিলে মনে হয় যে, উৎপাদিকা শক্তি কিছু কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য তাহার অনেক কারণ আছে, কিন্তু সে কারণ ত চিরকালই বর্ত্তমান থাকিবে—দুর্ভিক্ষ ও বন্যা ত আমাদের ভাই-বোন ; সুতরাং উর্ব্বরতা কমিয়া গিয়াছে একথা যেমন জোর করিয়া বলা চলে না, সেইরূপ উহা বাড়ে নাই ইহাও অস্বীকার করা চলে না।

ইহাই হইতেছে আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা। আমার মনে হয় ইহাতে কিছু ভয়ের চিহ্ন সূচিত হইয়াছে। বৎসরান্তে ফসল সমান রহিয়াছে অথচ জন-সংখ্যা অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং ইহাতে চলিবে না ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যতদূর সম্ভব চাষের উন্নতি করিলে দেশের পক্ষে তাহা কতটা উপযোগী হইবে ইহা চিন্তার বিষয়।

বর্ত্তমানে বৎসরান্তে কত ফসল পাওয়া যায় এবং তাহাতে বর্ত্তমান লোক-সংখার কতদূর পোষণ হয় প্রথমে তাহাই দেখিতে হইবে।

জনসংখ্যা:—

৯৯,৮৩২,০৯৬	পুরুষ—১৫ বৎসরের	উর্দ্ধবয়স্ক
৯৪,৬৫৭,০৭৭	স্ত্রীলোক „	„
১২৪,৪৫৩,৩০৭	বালক বালিকা „	নিম্নবয়স্ক
৩১৮,৯৪২,৪৮০	মোট জন সংখ্যা	

ইহাদের জন্য যত ফসলের প্রয়োজন হয় তাহার হিসাব নিম্নরূপ :—

পুরুষ পিছু	২ পাঃ হিঃ	৩৩,২৭৭,৩৬৫ টন
স্ত্রীলোক পিছু	১½ পাঃ হিঃ	২৭,০৪৪,৮৭৯ টন
বালকবালিকা পিছু	১ পাঃ হিঃ	২০,৭৪২,২১৮ টন
সর্ব্বশুদ্ধ		৮১,০৬৪,৪৬২ টন

যদি ৩১৮,৯৪২,৪৮০ জন প্রাণীকে নিত্য দুই বেলা খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ উপরিউক্ত পরিমাণ শস্যের প্রয়োজন।

এখন আমরা মোট কত ফসল পাই? ১৯০০ সন হইতে ১৯২২ সন অবধি গড়পড়তা হিসাব করিয়া এইরূপ অঙ্ক দাঁড়ায়—

	(মিলিয়ন টন হিঃ)	(রপ্তানি হয় ঐ হিঃ)
ধান	৩২·৩	২·২
গম „ „	৮·৭	১·৩
বার্লি „ „	৩·৩	×
ভুট্টা „ „	২·৫	×
ছোলা „ „	৪·৮	×
অন্যান্য „ „	২৪·৪	১·০
সর্ব্বশুদ্ধ উৎপন্ন ফসল „	৭৬·০	৪·৫

কিন্তু উহা হইতে আমাদিগকে বাদ দিতে হইবে :—

নষ্ট বাবদ শতকরা ১০ হিসাবে	৭·৬ মিঃ টন
পশুখাদ্য বাবদ	১২·২ মিঃ টন
বীজের বাবদ	২·০ মিঃ টন
পূর্ব্বোক্ত রপ্তানি বাবদ	৪·৫ মিঃ টন
মোট	২৬·৩ মিলিয়ন টন

তাহা হইলে খরচ বাদে ব্যবহারের জন্য থাকে ৪৯·৭ মিঃ টন। অথচ আমাদিগের প্রয়োজন আমরা দেখাইয়াছি কিঞ্চিদধিক ৮১ মিঃ টন। ইহাতে মাত্র অর্দ্ধেক লোকের সংস্থান হয়।

এই অনটনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া অনেকে অনেক কথাই বলেন। প্রথম কথা উঠে যে, দেশে যত জমি পড়িয়া আছে তাহা যদি চাষ করা হয়, তাহা হইলে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমস্ত জমি চাষ করিলে সকল অভাব দূর হইতে পারে। আমার মতে এই দুইটাই ভ্রমাত্মক। প্রথমতঃ দেখা যাকৃ কি পরিমাণ জমি পড়িয়া আছে।

১৯২১—২২ সনে দেখিতে পাই :—

সার্ভে অনুযায়ী জমির পরিমাণ	৬০৬,৬১৯,০০০ একর
বন	৮৫,৪১৯,০০০ „
চাষযোগ্য পতিত জমি	১৫১,১৭৩,০০০ „
চাষের জন্য অপ্রাপ্য	১৫৩,১৭৮,০০০ „

অনুর্ব্বর	...	৫০,৫৫৪,০০০	„
চাষী	...	২২৩,১৮৪,০৭০	„

দেখা যাইতেছে যে, এখন যতখানি জমি চাষ করা হয় কিছু কম প্রায় ঐ জমিই পড়িয়া আছে। যদি উহা চাষ করা হয় তাহাতে কত ফসল হইবে তাহাই দেখা যাক্। প্রথম বারে এই নূতন জমি হইতে পুরাতন জমির $\frac{2}{3}$ অংশ ফসল পাওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে ৭৬ মিঃ টনের $\frac{2}{3}$ অংশ হয় ৫০·৬ মিঃ টন এবং ইহা হইতে বাদ যাইবে ২৬.৩ মিঃ টনের $\frac{2}{3}$ অংশ অর্থাৎ ১৭·৮ মিঃ টন। এমন কি, যদি প্রথম বারের মত আমরা ধরিয়া লই যে, রপ্তানি ঐ ৪·৫ মিঃ টনেই স্থির থাকে (যদিও উহা অসম্ভব) তাহা হইলেও আমাদের বাড়তি হয় মাত্র ৩২·৮ মিঃ টন। যদি সারা ভারতবর্ষ ময় চাষ করা হয় তবে (৪৯·৭+৩২·৮) মিঃ টন অর্থাৎ ৮২·৫ মিঃ টন ফসল পাওয়া যায়। তাহাতে উপস্থিত জনসংখ্যার পোষণ হয় মাত্র। কিন্তু লোক-সংখ্যা যদি বাড়ে তখন সংস্থান হইবে কিরূপে?

এই অন্নাভাবের ফলে যাহা অনিবার্য্য তাহার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়াছে। জীবনধারণের প্রণালী ভয়াবহ ভাবে অবনত হইয়া গিয়াছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, সকল দিক্ হইতে অবনতির চিহ্ন দেখা দিয়াছে।

তারপর, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চাষ করিলে ফসল অনেক বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু তাহা বেশী দিনের জন্য নহে। অন্ততঃ ইহা এমন কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত নহে যে, ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোন কথা বলা যাইতে পারে। যে ইউরোপে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম এবং বৃদ্ধি তাহার পানেই যদি তাকাইয়া দেখি তাহা হইলে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির পরিণাম দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। ইউরোপে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহাতে আজ আর সেখানকার অধিবাসীদের উদরপূর্ত্তি হয় না; সেখানকার লোক বাঁচিয়া আছে এশিয়া এবং আমেরিকার উপর নির্ভর করিয়া। ইংলণ্ডের অবস্থা যে আরও শোচনীয় ইহা কাহারও অবিদিত নাই।

কথা উঠিতে পারে,—আমেরিকাই বা কিরূপে এত ফসল উৎপন্ন করে? ইহার কারণ আছে এবং ইহাও সত্য যে বিজ্ঞান-সম্মত উপায় অবলম্বন একটী কারণ; কিন্তু যাহা স্থায়ী এবং মুখ্য কারণ তাহা হইতেছে এই যে, আমেরিকার আয়তন সুদীর্ঘ এবং ইহার ইতিহাস দীর্ঘ দিনের নহে। ১৯০০ সনে আমেরিকাতে গড়পড়তা এক বর্গমাইল পিছু মাত্র ২৫ জন লোক থাকিত। তৎস্থলে ভারতবর্ষে কোচিন অঞ্চলে বর্গমাইল পিছু ৬৬২ জন লোক। বেলজিয়াম এবং ইংলণ্ডে উহা অপেক্ষা কম লোক থাকে। কেহ কেহ বলেন ঘনীভূত কৃষির (ইনটেনসিভ্ এগ্রিকালচার) প্রয়োজন। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চাষ করা অর্থে ঘনীভূত কৃষিই বুঝায়। কিন্তু বেশীদিন যে তাহাতে চলে না, একথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, শুদ্ধ কৃষিকার্য্য দ্বারা কোন দেশ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তাহার সহিত অর্থাগমের অন্য কোন উপায় প্রয়োজন এবং কৃষি অপেক্ষা ব্যবসায়ের উপর ঝোঁক দেওয়া বেশী প্রয়োজন। আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিত আর, এ, সেলিগম্যান এই মত সমর্থন করেন।

বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, যে আমেরিকা অত প্রচুর ফসল উৎপন্ন করে সেইখানকার চাষের অবস্থাই দেখা যাক।

	১৮৮০	১৮৯০	১৯০০	১৯১০	১৯২০
চাষ	৪৪·৩	৩৭·৭	৩৫·৭	৩৩·২	২৬·৩
প্রফেশন	৩·৫	৪·১	৪·৩	৪·৪	৫·২
গার্হস্থ্য বা ব্যক্তিগত					
চাকুরী	১৯·৭	১৮·৬	১৯·২	৯·৮	৮·২
ব্যবসা ও যানবাহন	১০·৭	১৪·৬	১৬·৪	১৬·৬	১৭·৬
শিল্প	২১·৮	২৫·০	২৪·৪	২৭·৮	৩০·৮

(সংখ্যাগুলি হইতে তিনটী শূন্য বাদ দেওয়া হইয়াছে)

উপরের তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমেরিকা এখন চাষ ছাড়িয়া ব্যবসায়ে মন দিয়াছে। বস্তুতঃ বাঁচিয়া থাকিতে হইলে উহার অপেক্ষা ভাল পন্থা আর নাই। জাপানে একবার এই অত্যধিক লোক-সংখ্যার সমস্যা বড় বিষম হইয়া দেখা দিয়াছিল। তখন হাল চালাইয়া সে সমস্যার সমাধান হয় নাই। তাহারা উত্তর আমেরিকার

উপকূলে বাড়তি লোক চালান করিতে লাগিল। ইহাতে দ্বিবিধ সুবিধা হইল; প্রথমতঃ দেশে লোক কমিয়া গেল; দ্বিতীয়তঃ অন্যদেশে জাপানের লোক-সংখ্যা বাড়িয়া জাপানের প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করিল। উত্তর আমেরিকা আজ এই জাপানী প্রভুত্ব কমাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এই ইমিগ্রেশন আমাদের দেশে চলিতে পারেনা, কেন তাহা পরে বলিতেছি।

এইরূপ ক্ষেত্রে যদি কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে লোকসংখ্যা সংস্থানোপযোগী করিয়া স্থির রাখাই শ্রেয়ঃ। ব্যবসায় অবলম্বন করিলেও জন্মনিরোধ-প্রণালী খুবই ভাল এবং যাহাতে সমাজের নিম্নস্তরের ভিতরেও ইহার প্রসার হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত; কারণ তাহাতে শিশু-হত্যা, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি কতক পরিমাণে নিবারিত হইবে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়াও ইহার অনেক উপকারিতা আছে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করা অত্যন্ত কঠিন। অর্থের কথা ছাড়িয়া দিলাম কারণ উহার সমস্যা অত্যন্ত জটিল। কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী প্রভৃতিতে কিছু উপকার হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু পূর্ব্ব-পুরুষকৃত ঋণভার যাহা চাষীর জন্মের সহিত তাহার স্কন্ধে ন্যস্ত রহিয়াছে তাহা কিরূপে শোধ হইবে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সামান্য "তকাভি"তে সাময়িক উপকার হইতে পারে, কিন্তু যাহাতে চাষীদের প্রকৃত উপকার হয় তাহা আমাদের দেশে হইবার উপায় নাই। ওয়াচার প্রসিদ্ধ ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক কনট্রোভারসির কথা অনেকেই জানেন। গভর্ণমেণ্টের তাহা দিতে হাত সরিল না কেন? তাহার পর শিক্ষার কথা—উপস্থিত যাহা আছে তাহাতে চলিতে পারে না। পুসাতে রিসার্চ ইনষ্টিটিউট খুলিয়া বাঙ্গালা-দেশের চাষীর কোন উন্নতি হয় না। হইতে যে পারে না তাহা নহে, তবে সে আশা সুদূরপরাহত। সেখান হইতে যাঁহারা শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হন তাঁহারা যদি অহঙ্কার ছাড়িয়া দিয়া গরীব চাষীর সহিত কাজ করিয়া তাহাদিগকে হাতে কলমে শিক্ষা দেন তাহা হইলে বাস্তবিকই প্রভূত উপকার হয়। ঔপন্যাসিক শরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'দত্তা'তে ইহার আভাষ দিয়াছেন। ঐরূপ আদর্শ এদেশে বহুল প্রচারের অনেক মূল্য আছে। কিন্তু ভারতে কৃষি বিদ্যালয়ের সংখ্যা অতি অল্প। তাহা যে কত সামান্য তাহা বুঝা যায় যদি আমরা অন্য দেশের সহিত তুলনা করিয়া দেখি। সমগ্র ভারতে ৬টা কৃষি কলেজ ও ১৬টা কৃষি স্কুল এবং একটা কৃষি গবেষণাগার আছে। ইহার মোট ছাত্র সংখ্যা ১১৫০। ফ্রান্সে ৭১টা কলেজ ও ২২০০ ছাত্র; বেলজিয়ামে ৭০টা কলেজ ও ৫০০০ ছাত্র এবং ডেনমার্কে ৯৯টা কলেজ ও ৯৫০০ ছাত্র। ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

জন-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে দেশের অশেষ কল্যাণ হয়, কিন্তু এদেশে তাহা হইবার নহে। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য না পাইলে কোন বড় কাজই করা যায় না কিন্তু এদেশে ঐ বস্তুটা সুলভ নহে।

গভর্ণমেণ্ট কিছুদিন আগে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্তকে নিযুক্ত করিলেন কেন এত দাম চড়িতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য। কৃষ্ণলাল দত্ত অনুসন্ধান করিয়া বলেন যে, শস্যের অভাবের জন্য দাম বেশী হইয়াছে। বাহিরে না পাঠাইয়া যদি সমস্ত ফসল ভারতবর্ষেই খরচ করা হয় তাহা হইলে চলিতে পারে। গভর্ণমেণ্ট ইহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন "ভুল ডেটা লইয়া হিসাব করা হইয়াছে। আমরা যাহা দিতেছি তাহা সত্য।" এই বলিয়া তাহারা প্রথমতঃ প্রচার করিলেন যে, জন-সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ফসল সমান ভাবে চলিতেছে—ফসল কমে নাই। দ্বিতীয়তঃ বলিলেন যে, কিনবার ক্ষমতা বাড়িলেই হইল, ফসল থাকুক অথবা নাই থাকুক। ফসলের দাম বাড়াতে চাষীদের বেশী আয় হইতেছে; সুতরাং উহাই ভাল।

বলা বাহুল্য পয়সা লইয়া মানুষ জীবন ধারণ করে না, পয়সা দিয়া সে তাহার ব্যবহার্য্য জিনিষ ক্রয় করে মাত্র; কিন্তু যদি সমস্ত বস্তুরই দাম বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কিনিবার ক্ষমতা বাড়িল কোথায়?

কেহ কেহ বলেন যে, যাহা রপ্তানি হয় তাহা বাড়তি মাল; কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে "বাড়াতি মাল" আমাদের দেশে নাই।

সমস্ত আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বেশী দিন থাকা যাইবে না—আমরা দেখিয়াছি যে, এখনও কিছু জমি পড়িয়া আছে; কাহারও মতে খালি জমি আর নাই। এ অবস্থায় যতশীঘ্র সম্ভব শিল্পোন্নতি করিতে হইবে এবং তাহার সঙ্গে জন্ম-নিরোধ অভ্যাস করিতে হইবে।

ওলন্দাজাধিকৃত পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চায়ের চাষ ও ব্যবসা

বিগত তিন শত বৎসর হইতে ওলন্দাজাধিকৃত পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, বিশেষতঃ জাভায় চায়ের চাষ চলিয়া আসিতেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অবশ্য ইহার ফলাফল কখনও খুব ভাল দেখা গিয়াছে আবার কখনও মন্দও দেখা গিয়াছে। প্রথমাবস্থায় কিছুতেই চাষে সুফল পাওয়া যাইতেছিল না এবং সে সময় গবর্ণমেণ্ট ইহার উন্নতি-কল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দুরবস্থা এখন কাটিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে চায়ের চাষ এবং ব্যবহারোপযোগী করার প্রণালী উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছে। হেক্টার (প্রায় আড়াই একার) প্রতি উৎপাদনের হারও বর্ত্তমান সময়ে খুব সন্তোষজনক। চায়ের পরিমাণ ও কোয়ালিটি সম্বন্ধে উন্নতি করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ খুবই চেষ্টা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষা বিবরণীর নিম্নপ্রদত্ত ১নং তালিকা দেখিলে পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চায়ের কত উন্নতি হইয়াছে এবং ব্যবসা হিসাবে ইহার মূল্য কত বেশী তাহার অনেকটা ধারণা করা যাইবে।

১নং তালিকা

জাভা হইতে চা রপ্তানি

বৎসর		দাম ফ্লোরিণ (=১ সিঃ ৮ পেঃ)
১৮৮৫	...	১,৬৯৫,০০০
১৮৯০	...	২,২৪৭,০০০
১৮৯৫	...	২,৬৪৯,০০০
১৯০০	...	৪,১৯৭,০০০
১৯০৫	...	৭,১১৫,০০০
১৯১০	...	১১,৫০৩,০০০
১৯১৫	...	৪৬,৪১৫,০৬০
১৯২০	...	৩৫,২১৯,০০০
১৯২১	...	২০,০৬২,০০০
১৯২২	...	৩৪,৫৬১,০০০
১৯২৩	...	৬৪,৪৫১,০০০
১৯২৪	...	৮০,৬৮২,০০০
১৯২৫	...	৬৩,৬২১,০০০
১০২৬	...	৭১,২২৭,০০০

সুমাত্রা দ্বীপের মোট উৎপাদনের মূল্যের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ ওলন্দাজ পুঁজি। বাকী ৪০ ভাগ বৃটিশ পুঁজি। এই বৃটিশ পুঁজির মধ্যে সামান্য জার্ম্মাণ পুঁজিও মিশান আছে বলিয়া জানা যায়।

বিগত ৪১ বৎসরে চা রপ্তানি বৃদ্ধি

বিগত ৪১ বৎসরের মধ্যে এখানকার চা রপ্তানির মূল্য ১,৬৯৬,০০০ ফ্লোরিণ হইতে ৭১২২৭,০০০ ফ্লোরিণে উঠিয়াছে। উহার মধ্যে বাজার-দরের বৃদ্ধি ধরা হইয়া থাকিলেও উপরি উক্ত বৃদ্ধির পরিমাণ খুবই সন্তোষজনক সন্দেহ নাই।

আলোচ্য সময়ের শেষের দিকের সংখ্যার মধ্যে সুমাত্রা হইতে চা রপ্তানির হিসাব যোগ করা আছে। ঐ সময়ের শেষ ভাগ হইতেই সুমাত্রায় প্রথম চা চাষ আরম্ভ হয়।

সমগ্র ওলন্দাজাধিকৃত পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ১৯২৪ সনে মোট ৯৩,৬০০,০০০, ফ্লোরিণ মূল্যের চা বিদেশে

রপ্তানি হয়। এই সংখ্যাকে মোট রপ্তানির শতকরা ৬ ভাগ ধরা যাইতে পারে।

চায়ের ব্যবসায় ওলন্দাজ ও অন্যান্য বিদেশী পুঁজি

জাভা দ্বীপে চা ব্যবসায় শুধু ওলন্দাজ পুঁজি ছাড়া অন্যান্য বিদেশী পুঁজিও কি পরিমাণ খাটিতেছে তাহার খবর ২নং তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে।

২নং তালিকা

পুঁজি		অনুপাত
ওলন্দাজ	...	৭৬.২%
বৃটিশ	...	১৬.৮%
ফরাসী ও বেলজিয়ান	...	৩.৮%
জার্ম্মাণ	...	২.৬%
জাপানী	...	০.৬%

চাষের জমির সংখ্যা ও পরিমাণ

১৯২৭ সনে ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে মোট ২৯৫ খানি জমিতে চাষ হয়, ইহার মধ্যে সুমাত্রার সংখ্যা ২৬ খানি। ২৯৫ খানি জমির মধ্যে ৯৬ খানি জমিতে কেবল চায়ের চাষ হয়। বাকী ১৯৯ খানিতে চায়ের সঙ্গে সিনকোনা, রবার প্রভৃতিরও চাষ হইয়াছে। ইহার মধ্যে আবার ৪২ খানি জমিতে চায়ের সঙ্গে যে অন্যান্য জিনিষের চাষ হইয়াছে তার বেশীর ভাগই রবার (৯০%)। এ নিয়ম চা চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া মনে হয় না। চায়ের আবাদটা জাভা দ্বীপেই বেশী হয়, বিশেষতঃ ইহার পশ্চিমাংশে চায়ের জমি বেশী দেখা যায়। এদিকে সর্ব্বসুদ্ধ ২৩৫টা চায়ের ক্ষেত আছে। সুমাত্রা দ্বীপের পূর্ব্বাংশে ১৯টা চায়ের ক্ষেতে চা চাষ চলিতেছে। এ ছাড়াও কয়েক বৎসর ধরিয়া সুমাত্রা দ্বীপের অন্যান্য অংশেও চায়ের জমি খুব বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯২৩ সন হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত এই দুইটী দ্বীপে চায়ের চাষ কেমন বাড়িয়া গিয়াছে তাহা নিম্নপ্রদত্ত ৩নং তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

৩নং তালিকা

জাভা ও সুমাত্রায় চা-চাষের জমি

বৎসর	জাভা (হেক্টার)	সুমাত্রা (হেক্টার)	মোট (হেক্টার)
১৯২৩	৪৯৯,০০০	৬৩,০০০	৫৬২,০০০
১৯২৪	৪৭৩,০০০	৫৯,০০০	৫৩২,০০০
১৯২৫	৪৬৮,০০০	৫৯,৩০০	৫২৭,৩০০
১৯২৬	৪৬২,৮৫৮	৬২,৩১৬	৫২৫,১৭৪
১৯২৭	৩৯৯,৯৯১	৬৭,১৪০	৪৬৭,১৩১

১৯২৩ সন হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যে জাভায় চা চাষের জমি ২৬১ হইতে বাড়িয়া ২৬৯ তে উঠিয়াছে এবং সুমাত্রায় ২৮ হইতে কমিয়া ২৬ এ নামিয়াছে। মোট চায়ের জমির শতকরা ৩৭·৬ ভাগ জমিতে চা রোপিত হইয়াছে।

জাভা ও সুমাত্রায় চা উৎপাদন

১৯২০ সন হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত মোট চা উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টন) ৪ নং তালিকায় দেওয়া হইয়াছে।

৪নং তালিকা

ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চা উৎপাদন

বৎসর	জাভা	সুমাত্রা	অন্যান্য	মোট
১৯২০	৩৪,৭১১	৫,৮০৫	৭,৬১৫	৪৮,১৩১
১৯২১	২৪,০৫১	৪,৮২০	৩,৩৮৮	৩২,২৫৯
১৯২২	৩০,৬০৩	৬,৪১৭	৫,৮২২	৪২,৮৪২
১৯২৩	৩২,২০২	৭,৬৮২	৮,৯৪৬	৪৮,৮৩০
১৯২৪	৩৫,৯৫৩	৮,২৪৫	১২,৭০৪	৫৬,৯০২
১৯২৫	৩২,৮৮৯	৮,০১৮	১১,৭৭৫	৫২,৬৮২
১৯২৬	৩৮,৯৮০	৮,৫৫৮	১৫,৩৮২	৬২,৯২০
১৯২৭	৪৩,৪৬৭	৮,৩৬৮	১৩,২৪৩	৬৫,০৭৮

মোট উৎপাদনের কিছু অংশ জাভা দ্বীপের অধিবাসীদের অধিকৃত বাগান হইতে পাওয়া যায়। এই প্রকারের বাগান দ্বীপের পশ্চিম অংশেই বেশী দেখা যায়। এই সমস্ত বাগানে যে সমস্ত চায়ের কাঁচা পাতা তোলা হয়, তাহা সমস্তই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট চা-কেন্দ্রে চা পাট করিবার জন্য বিক্রী করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকারের চা-কেন্দ্রের কোন

কোনটার মোটেই চায়ের জমি নাই। এই কেন্দ্রগুলি হইতে চায়ের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য এবং দামের পড়তা কম করিবার জন্য দেশী বাগানগুলির সমস্ত চা কিনিয়া লওয়া হয়।

চা রপ্তানির সীমানা

ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চা দুনিয়ার কোন কোন দেশে কি পরিমাণ রপ্তানি হয় নিম্নপ্রদত্ত ৫ নং তালিকায় ১৯২৬ সনের হিসাব দেখিলে সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইবে।

৫নং তালিকা

১৯২৬ সনে ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চা রপ্তানির সীমানা ও পরিমাণ নিম্নরূপ :—

দেশ	ওজন (কিলো)	দাম (ফ্লোরিণ)
হল্যাণ্ড	৬৮,২৩২,০০০	৯৪,৬৪০,০০০
বিলাত	২৭,৯৩১,০০০	৩৮,২০০,০০০
জার্ম্মাণি	১২১,০০০	১৬৯,৫০০
ফ্রান্স	১১৪,৩০০	১৯,৭৯২
সুইজার্ল্যাণ্ড	১৩,২৫৯	৯২২
স্পেন	৬১৭	৪,৭৪৪
ডেনমার্ক	৩,০০০	৬,৯৪৯
ইয়োরোপীয় রুশিয়া	৩২৩,০০০	৪০৮,৫০০
বলকান রাষ্ট্র	১৫,৫৭১	২৩,৪৮৩
ইয়োরোপীয় তুরস্ক	৮৬,৮৪৬	১২৪,৪০২
ইংরেজাধিকৃত স্থানসমূহ	১,১৩৮	১,৭৭০৭
কানাডা	২৬৭,০০০	৩৬৮,০০০
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	২,৫৬৮,০০০	৩,৬৫৬,০০০
মধ্য আমেরিকা	৬,৫২৯	৮,৪৯৯
দক্ষিণ আমেরিকা	৪৬৯,০০০	৬৮৪,০০০
মিসর	৫৭,০০০	৭৯,০০০
আলেকজেন্দ্রিয়া	৪,৫৪০	৬,৮১১
সৈয়দ বন্দর	৪৪,৪২৪	৬২,৮৭৪
সুয়েজ	১,২৩০	১,৫৯২
বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা	১৯১,৫০০	২০৫,০০০
পর্ত্তুগীজ „ „	১,৫৪২	২,৩৭৩
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪০৮,০০০	৫৪৪,০০০
আরব	৪,৪৪৭	৫,৯১৪
এডেন	৭৯৬	১,১৩৪
মেসপটমিয়া	১২০,৮৪৩	১৬৯,৪৫৩
পারস্য ও আফগানিস্থান	২,০০১	২,৬০২
বৃটিশ ভারত	১,২১৮,০০০	১,১২৭,০০০
পেনাঙ্গ	২৯,২০০	২৬,০০০
সিঙ্গাপুর	৩২৪,০০০	৩৩৭,০০০
চীন	৬১০,০০০	৫৩৮,০০০
এসিয়াটিক রুশিয়া	৮৬৯,০০০	১,২০৭,০০০
জাপান	৪,৪৫০	৬,৪৩৩
অষ্ট্রেলিয়া	৯,৩৮০,০০০	১৩,৪৮০,০০০
সাবাঙ্গ	৪,০৯৯	৫,৯৭০
ট্যাণ্ডজঙ্গ পিনাঙ্গ	২,২৮৮	৩,৪৫২
নিউজিল্যাণ্ড	৯,১৪৫	১৫'৫৪৯

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

প্রাপ্তি স্বীকার

পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত পুস্তকপত্রিকাদির প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে :—

১। ইন্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ

২। ডায়চে ব্যাঙ্ক উণ্ড ডিসকোন্টো গেসেলশাফ্‌ট্

৩। কুর্‌স্ সোয়াঙ্কুঙ্গেন আন ডোর্ বেরলিনের ব্যর্থ

৪। ডেমাগ সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতির ইতিহাসমূলক প্রকাণ্ড ছবির বই।

নূতন গবেষক

পরিষদের বিগত অধিবেশনে নিম্নোক্ত ভদ্রলোকদ্বয় গবেষক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু, এম, এ, বি, এল,

শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, এম, এ।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল বি,এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৭ — ৫ম বর্ষ—২য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

বাঙ্গালায় নূতন ধান

ঢাকা সরকারী পরীক্ষাক্ষেত্রের গবেষণার ফলে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার ধান্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের ফলন খুব বেশী এবং ইহাদের চাষে কৃষকগণ বিশেষ লাভবান হইবে।

(ক) শালী ধান্য

(১) ঢাকা নং ১—ইন্দ্রশাইল। মাঝারি রকমের রোয়াধান, সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পাকে। পূর্ব্ব উত্তর বঙ্গের যে সকল জমি উর্ব্বরা ও যাহাতে নবেম্বর পর্য্যন্ত রস থাকে সেই সমস্ত জমির পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহা ভাওয়ালের নিম্ন জমিতে উৎকৃষ্ট ফলে। উচ্চ জমি অর্থাৎ যেখানে সাধারণতঃ কার্ত্তিকশাইল জাতীয় ধান উৎপন্ন হয় কিংবা দো-ফসলি জমি ইহার আবাদের পক্ষে উপযোগী নয়।

উপযুক্ত আবহাওয়ায় এই ধান শাইল ধান অপেক্ষা বিঘা প্রতি ১/ মণ বেশী ফলে।

(২) ঢাকা নং ৫—দুধসর। এই ধান অনেকাংশেই উপরোক্ত ১নং ধানের মত। কেবলমাত্র ইহা ১নং ধান হইতে ৮।১০ দিন পূর্ব্বে পাকে। ইহা ১নং ধানের উপযোগী জমি হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও হাল্কা জমিতে ভাল হয় এবং অধিক ফলে।

(৩) ঢাকা নং ১৫—ঝিঙ্গাশাইল। ইহা ১নং ও ২নং ধান অপেক্ষা মিহি। একই রকম অবস্থায় ইহা ২নং ধানের সঙ্গে সঙ্গেই পাকে ও সমান ফলে। ১নং ও ২নং অপেক্ষা ইহার চাউল ভাল। ইহার খড় অতি নরম, কাজেই অতি সহজেই এই ধানের ঝাড় শুইয়া পড়ে। ইহা এবং উপরোক্ত দুই রকম ধানই স্থানীয় ধান অপেক্ষা সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ১/মণ বেশী ফলে।

(৪) ঢাকা নং ৭—তিলক কাচারি। এই ধান খুব মোটা ও ইহার ফলন খুব বেশী; ১ নং ধান অপেক্ষা দেরীতে

পাকে। ১নং ধানের জমিও ইহার পক্ষে উপযোগী; তবে অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতেও ইহার ফলন ভাল হয়। ইহার ফলন খুব বেশী এবং যাহারা কেবল ফলনই চায় তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত।

(৫) চুঁচুড়া নং ১—নাগরা ৬৮। ইহা পশ্চিম বঙ্গের নাগরা ধানেরই একটি নির্ব্বাচিত জাত। ইহা চুঁচুড়া কৃষি-ক্ষেত্রে উপর্য্যুপরি ৪ বৎসরই স্থানীয় ধান অপেক্ষা একর প্রতি ১/ হইতে ২/ দুই মণ বেশী ফলন দিয়াছে।

(খ) আশু ধান্য

(৬) ঢাকা নং ২—কটক তারা। ইহা মাঝারি গোছের মিহি ধান। সাধারণতঃ ইহা ৪ মাসে পাকে। ইহা উচ্চ জমিতে ছিটাইয়া বোনা হয়। ইহা উচ্চ উর্ব্বরা জমিতে কোন রবিশস্যের সহিত পাল্টাপাল্টি ভাবে ভাল হয়। মধুপুর জঙ্গল অঞ্চলের উচ্চ জমিতে ইহার ফলন ভাল হয়। ইহা দেরীতে পাকে বলিয়া দো-ফসলি ধানী জমির উপযোগী নহে, তবে খুব শীঘ্র পাকে এমন কোন শাইল ধান ইহার পরে লাগান যাইতে পারে।

(৭) ঢাকা নং ৪—সূর্য্যমুখী। সকলাংশে ইহা কটক-তারার মত।

(৮) ঢাকা নং ৬—চারণক্। ইহা উচ্চ ও হাল্‌কা জমির উপযোগী আউশ ধান। চারণক্ খুব সরু এবং কটকতারা ও সূর্য্যমুখী অপেক্ষা আগে পাকে। ইহার ফলন প্রচুর।

উপরোক্ত সকল জাতীয় ধানই ফলন ও গুণের জন্য চাষের-উপযোগী। উপযুক্ত আবহাওয়ায় এই সকল ধানের ফলন চাষীদিগের ধান অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে।

বরিশালের বালাম ধান ও বাঁকুড়া বীরভূম অঞ্চলের ধানের বৈজ্ঞানিক নির্ব্বাচন-কার্য্য চলিতেছে। আশা করা যায় শীঘ্র এইসকল অঞ্চলের উপযোগী উন্নত জাতীয় ধান আবিষ্কৃত হইবে।

বীজ বিতরণ প্রণালী

নিম্নোক্ত নানা কারণে বীজবিতরণ-কার্য্য সমস্যাসঙ্কুলঃ—

(১) চাষীরা সাধারণতঃ তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনায় বীজ নিজেরাই রাখে, প্রতি বৎসরই তাহাদিগকে বাহির হইতে বীজ আনিতে হয় না। অতএব পাটের বীজের ন্যায় বীজ-ধানের কোন নির্দ্দিষ্ট চাহিদা নাই।

(২) চাষীরা সাধারণতঃ গুণ ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে ২।৩ রকম ধান বুনিয়া থাকে। অতএব অনেক জায়গা ব্যাপিয়া কেবল মাত্র একই রকমের ধান বিতরণ করা সম্ভবপর নয়। ঐ কারণেই তাহাদের বীজ-ধান মিশ্রিত হইয়া যায় ও ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

(৩) পাটের বীজ অপেক্ষা ধানের বীজ দামে সস্তা ও আকারে বড় বলিয়া দুরদেশে সরবরাহ করার খরচ পোষায় না। রেল-ভাড়া প্রভৃতি খরচ অনেক বেশী পড়ে বলিয়া অবশেষে বীজ-ধানের দাম অনেক বেশী হইয়া পড়ে।

যদি গ্রাম্য কৃষি সমিতি, জিলাবোর্ড বা স্থানীয় মাতব্বর চাষীদের দ্বারা গ্রামেই বীজ-ক্ষেত্র স্থাপিত হয় তাহা হইলেই এই সমস্যার সহজে সমাধান হইতে পারে। এই সকল বীজক্ষেত্রে এক বৎসর অন্তর সরকারী কৃষিক্ষেত্র হইতে বীজ লইবে এবং উহা হইতে বীজ উৎপন্ন করিয়া পর বৎসর বুনিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গোলাজাত রাখিবে, পরে প্রতিবেশীদের নিকট উহা বিক্রয় করিবে কিংবা স্থানীয় বীজের বদলে দিবে। যদি বদলে দিতেই হয় তাহা হইলে আর গোলাজাত করিবার প্রয়োজন হয় না, একেবারেই শস্য কাটিবার পর ক্ষেত্র হইতে বিতরণ করা যাইতে পারে।

এই ব্যবস্থানুযায়ী ১৯২৫ সন হইতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং ১৯২৬-২৭ সনে এইরূপ বীজ-ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৭০ দাঁড়াইয়াছে। তাহার মধ্যে ১২৯টীর প্রত্যেকটীর আয়তন ৫ বিঘার বেশী। বীজ সংরক্ষণই চাষীদের পক্ষে প্রধান সমস্যা। যতটা বীজ স্থানীয় চাষীদের পক্ষে কেবল মাত্র বুনিবার জন্য প্রয়োজন ততটা পর বৎসর বুনিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গোলাজাত রাখিতে হইবে; নতুবা বীজধান অন্য-ভাবে খরচ হইয়া যাওয়া সম্ভব। কিন্তু সাধারণ চাষীরা ইহা করিতে পারে না। আশা করা যায় সরকারী সমবায়-বিভাগ চাষীদের এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবে। দৃষ্টান্ত

স্বরূপ ২১১ জায়গায় সমবায়-বিভাগ স্থানীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে সরকারী বীজ তাহাদের মেম্বারদের মধ্যে বিতরণ ও পরে সমগ্র বীজ গোলাজাত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে বীজ ক্রয় করিয়া এই সর্ত্তে বিতরণ করে যে, প্রত্যেক গ্রাহক ফসল কাটার পর সমপরিমাণ ধান উপরন্তু আরও এক চতুর্থাংশ ফেরৎ দিবে। এই সমস্ত বীজ ব্যাঙ্ক মজুত করিয়া পুনরায় ঐ একই সর্ত্তে পর বৎসর বিতরণ করে কিংবা বিক্রয় করে। এইরূপ ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জ এবং রাজসাহীর নওগাঁও এলাকায় আউশ ধান ও বগুড়া জেলায় আমন ধান সম্বন্ধে চলিতেছে। যতদূর সম্ভব সমবায়-বিভাগের স্থানীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের সহযোগেই বীজ-ক্ষেত্র স্থাপিত হওয়া উচিত; কারণ তাহা হইলে তাঁহারা বীজক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত বীজসমূহ পর বৎসর বোনার সময় পর্য্যন্ত যাহাতে গোলাজাত থাকে তাহার সুবন্দোবস্ত নিকটবর্ত্তী ব্যাঙ্কসমূহের সাহায্যে করাইয়া দিতে পারিবেন।

উপরুক্ত বিভিন্ন জাতীয় ধান সম্বন্ধে কিংবা সরবরাহের নিমিত্ত বীজ উৎপন্ন করা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ঢাকস্থিত বাঙ্গালার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট কিংবা সরকারী কৃষি ফার্মে উদ্ভিদতত্ত্ববিদের নিকট জানা যাইবে।

(কৃষক)

বঙ্গে রবিশস্য

সমগ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জমিতে গ্রীষ্মকালীন ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহার তুলনায় গত পাঁচ বৎসরের গড়ে বঙ্গদেশে ঐরূপ জমির পরিমাণ শতকরা ০'৫ ভাগ। বঙ্গদেশে ৩২১৬১০০ একর চৈতালী শস্যের জমি আছে। এ বৎসর ২৮,৪৪,৩০০ একর জমিতে চৈতালী শস্য জন্মিয়াছে। গত বৎসর হইয়াছিল ২৭,৫৯,১০০ একর জমিতে। ইহার মধ্যে ৩,৯৯,৮০০ একর জমিতে বোরো ধান্য হইয়াছে। উহা গত বৎসর ৩,৯৭,৫০০ একরে জন্মিয়াছিল। এ বৎসর ২,৯৫,৪০০ একর জমিতে তামাক হইয়াছে। গত বৎসর হইয়াছিল ২,৯১,২০০ একর জমিতে।

জামালপুরে কৃষির অসুবিধা

বৃষ্টি না হওয়াতে জামালপুর (ময়মনসিংহ) অঞ্চলে জমি চাষের এবং বীজ বপনের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। পূর্ব্বে যে বীজ বপন করা হইয়াছে তাহাও ধ্বংসের পথে দাঁড়াইয়াছে।

(শান্তিবার্ত্তা)

জলপাইগুড়ী জেলায় পাটের অবস্থা

প্রায়ই বৃষ্টিপাত হওয়ায় পাট বুনানের নিমিত্ত জমি প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। যদি মধ্যে মধ্যে এইরূপ বৃষ্টিপাত হয় তবে পাটের ফসল ভাল হইবে না।

জলপাইগুড়িতে ধান্যের মূল্য

হৈমন্তিক ধান্যের প্রতি মণ ২।০ হইতে ২॥০ পর্য্যন্ত দরে ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে।

(জনমত)

কাঁচড়াপাড়ায় কৃষিশিক্ষা

মিঃ ডব্লিউ, ই, আলেকজাণ্ডার নামক একজন স্কটল্যাণ্ড-বাসী ভদ্রলোক কাঁচড়াপাড়ায় ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালকদের হাতেকলমে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিতেছেন। মিঃ আলেকজাণ্ডারের প্রকাণ্ড কৃষি-ক্ষেত্র আছে। তাহা ছাড়া তিনি মুরগী, হাঁস, পাঠা ইত্যাদির চাষ করেন। বালকগণ পরম উৎসাহে ইহার নিকট শিক্ষা করিতেছে।

বঙ্গে নৌকাডুবি

১৯২৮-২৯ সনে বঙ্গদেশে ষ্টিমারে ও নৌকায় যতগুলি ধাক্কা লাগিয়াছে তাহার সংখ্যা ও ফলাফল ইত্যাদি নিম্নরূপ :—

ধাক্কার সংখ্যা	...	৫৩
নৌকা-ডুবি	...	৩৩
সারেঙ্গের দোষে ধাক্কা	...	৮
নৌকার দোষে	...	৯
দুর্ঘটনা	...	২৫

ষ্টিমার কোম্পানী খেসারত দিয়াছেন ৪৫৯২৲

আসামে টিনের ভাড়া কমিবে

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ৫০ মণ ও তদূর্দ্ধ ওজনের ঢেউ তোলা টিনের ভাড়া কমাইয়া দিতেছেন। ইহাতে আসামে ঢেউ তোলা টিনের দাম কমিবে। বঙ্গদেশের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা হয় নাই।

বাংলা দেশের রাস্তার উন্নতি

গত ২১শে মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মিঃ ডবলিউ এইচ টম্‌সনের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী শ্রীযুত কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় বলেন যে, প্রাদেশিক রোড বোর্ড আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির উন্নতির জন্য নিম্নোক্তরূপ অর্থব্যয় করিবেন,—

রাস্তার নাম	টাকা
ডায়মণ্ডহারবার রোড	৬৭০০০০৲
কলিকাতা-যশোহর রোড (বারাসত পর্য্যন্ত)	৫০০০০০৲
গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (শ্রীরামপুরের উপরের পুল ব্যতীত)	১০০০০০০৲
চট্টগ্রাম-আরাকান রোড (সমস্ত রাস্তার পুল সমেত)	৫০০০০০৲
বীরভূমের ইলাম বাজার-দুবরাজপুর রোড (আড়ঘোই পুল সমেত)	৩৫০০০০৲
ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল রোড	৩৭৫০০০৲
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রোড	৪৫০০০০৲
ময়নামতী-বরকান্তা রোড	২৯০০০০৲
পাবনা-ঈশ্বরদী রোড	৫০০০০০৲
দুয়ার্স রোড (পুল মেরামত সহ)	২৫০০০০৲
বর্দ্ধমান-আরামবাগ রোড	৫০০০০০৲
মাগুরা-ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা রোড	৩০০০০০৲

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ইহাও বলিয়াছিলেন যে, রোড বোর্ডের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বাংলা গবর্ণমেণ্ট তৎসম্বন্ধে ভারতগভর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়াছেন।

ইছামতী নদীর সংস্কারের আবশ্যকতা

ঢাকা জেলার ইছামতী নদীর পরিসর অল্প হইলেও দৈর্ঘ্যে ইহা ক্ষুদ্র নয়। এই নদী ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া শ্রীনগর, সেরাজদিঘা, নবাবগঞ্জ, হরিরামপুর ও ঘিওর থানা দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার তীরে বহু প্রসিদ্ধ গ্রাম ও হাটবাজার অবস্থিত। নানাকারণে এই নদী ভরাট হইয়া যাওয়ায় এইক্ষণ বৎসরে ২।৩ মাসের অধিককাল লোকে ইহার জলপান করিতে পারে না। বর্ষা ঋতু শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার জল পানের অযোগ্য হয় এবং নদীর মধ্যে বহু স্থান শুষ্ক হইয়া যায়। ফলে নদীর তীরবাসীদিগের দিন দিন স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে, এবং বাণিজ্য ও যাতায়াতের সর্ব্ববিধ অসুবিধা ঘটিতেছে।

বিশুদ্ধ জলবায়ু ও বিশুদ্ধ খাদ্যে মানুষের পরমায়ু বর্দ্ধিত হয় একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু ইছামতী নদীর তীরবাসিগণ এই বস্তুগুলি হইতে সর্ব্বদা বঞ্চিত থাকিয়া ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। বর্ষা ঋতু শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইছামতী নদীতে নানাস্থানের খাল, বিল, মাঠ হইতে পচা, পাটপচা, কচুরী প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ-পচা জল প্রবাহিত হয়। ঐ পচা জলের দুর্গন্ধে তৎকালে যাতায়াত করা কষ্টকর হইয়া উঠে। নদীর জল স্থানে স্থানে ঘোর লাল, নীল, সবুজ, কাল—বিবিধ রং ধারণ করে। পচা জলের দুর্গন্ধে নদীর বহু মৎস্য মরিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে মশককুল দ্রুত বেগে বৃদ্ধি পায় এবং মানব শরীরে দংশন করিয়া ম্যালেরিয়ার বীজ পুরাইয়া দেয়। মৎস্য ধরিবার উদ্দেশ্যে অনেকে নদীর মধ্যে বহু স্থানে বৃক্ষাদির শাখা-প্রশাখা, পত্র সম্বলিত ডালপালা ফেলিয়া রাখে। মৃত জীব জন্তুর দেহও নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। দাহ কার্য্যাদিও ইহার তীরেই সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে ইছামতীর জল দুষিত হয়। অভাব ও অজ্ঞতানিবন্ধন বাধ্য হইয়া অনেকেই ঐ দুষিত জল পান করিয়া থাকে।

নানা স্থানে যাতায়াতের জন্য, বিশেষতঃ জেলার সদরে মামলা মোকদ্দমা বা ব্যবসাদি কাজে যাইতে হইলে পৌষ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত নৌকা বা অন্য কোন

রূপ যানবাহনাদির সুযোগ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সময় নদীতে লঞ্চ চলাচল একেবারে বন্ধ থাকে এবং গহনার নৌকাগুলিও তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ঘাট হইতে বহু দূরে সরিয়া অবস্থান করে। বড় বড় নৌকা যাতায়াত করা দূরের কথা সামান্য ক্ষুদ্র একখানি ডিঙ্গি নৌকাও ইছামতী নদী দিয়া যাতায়াত করিতে পারে না। কাজেই এই সময় ব্যবসাবাণিজ্যের গতিরোধ হইয়া যায়। ইহার ফলে নদীর তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীদিগকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্তু প্রভৃতি অত্যধিক মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ইছামতী নদীর সংস্কার-কার্য্য সত্বর সম্পন্ন হইলে ৫টী থানার অধিবাসিবৃন্দের স্বাস্থ্য, বাণিজ্য ও যাতায়াতের সর্ব্বতোভাবে সুবিধা হইবে। (পঞ্চায়েৎ)

বাঙ্গালার নদী হইতে বিদ্যুৎ

বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার ও তাহা মানুষের প্রয়োজনে প্রয়োগ করাতে জগতে নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। ফলে নানা বিষয়ে খরচ কমিয়া গিয়াছে, শ্রমেরও লাঘব হইয়াছে। এই শক্তি তৈয়ার করিতে যে খরচ হয় তাহা কমাইবার জন্য চেষ্টার বিরাম নাই। দেখা গিয়াছে যে, কোন একটি বস্তু যদি চালাইয়া দেওয়া যায় তবে সেই চালিত বস্তুর সাহায্যেই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইতে পারে। কিন্তু সে বস্তু চালাইতে হইলে বাষ্প বা অপর শক্তির দরকার। তাহার খরচ আছে। প্রাকৃতিক কোন বস্তুর সাহায্য লইয়া যদি এ কার্য্য হয় তবে সে খরচের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে একটী জল-প্রপাতের নীচে ষ্টীমারের চাকার ন্যায় চাকা বসাইয়া সেই ঘূর্ণিত চাকা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হইতেছে। প্রথম টাটা কোম্পানী এই কার্য্য করিতেছিলেন, এখন আমেরিকার এক কোম্পানীর সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে জলপ্রপাত নাই, কিন্তু খরবেগশালিনী নদী রহিয়াছে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার এ, টি, ওয়েসটন তিস্তানদীর স্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল

গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের আয় ২,৬৪,৪৬২ টাকা হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ব ৬ মাসের আয় ২,২২,৬৯৪ টাকা হইয়াছিল। ১৯২৮ সনের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর এই ৬ মাসের আয় হইয়াছিল ১,৭০.৯৩২ টাকা। বঙ্গলক্ষ্মীর আয় ক্রমশঃ বেশী হইতেছে, ইহা শুনিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইবে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট ৯,৬১,৪৫২ টাকা ও ম্যানেজিং এজেণ্টদের নিকট ১০,৭৬,৯৬৮ টাকা দেনা আছে। মিঃ বি, কে, লাহিড়ীর নিকট ও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের নিকট পাওনা টাকাগুলি যদি পাওয়া যাইত তবে বঙ্গলক্ষ্মী আর ঋণভারে জর্জ্জরিত হইত না।

ময়মনসিংহ জেলার আমদানি পণ্য

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সহরে মটরকার ছিল না; কিন্তু এক্ষণে মটর ও বাসের সংখ্যা করা দুরূহ—সাইকেলের ত কথাই নাই। এইরূপ গ্রামোফোন, শেলাইয়ের কল, টর্চ্চলাইট, ডিট্জ বা ফায়ার হেণ্ড লণ্ঠন ঘরে ঘরে বিরাজিত। এসব ছাড়া নিম্নলিখিত জিনিষ বিদেশ হইতে আমরা পাইয়া থাকি: কাপড়, লবণ, চিনি, জুতা, ছাতা, নানাবিধ কল, ছুরী, কাঁচি, ক্ষুর, কড়াই, কোদাল প্রভৃতি, নানারূপ কাঁচের জিনিষ, এনামেল ও এলুমিনিয়ামের জিনিষ, চুরুট, কাগজ, কলম, কালী, পেন্সিল, সুই, সূতা, সাবান বিস্কুট, চিনামাটীর বাসন, খেলনা, ঔষধ, ডাক্তারী যন্ত্রপাতি, পুস্তক, এসেন্স, ফিতা, ক্যানভাস, কেরোসিন, করোগেট আয়রণ, টিনের পাত, অয়েলক্লথ, রং, বার্ণিশ, দিয়াশলাই, বিলাতীমাটী, শ্লেট, নানাবিধ কাঠের জিনিষ, ব্যাটবল, ফুটবল ইত্যাদি খেলার সরঞ্জাম, টিনের খেলনা, চামচ, আয়না, চিরুণী, কৌটা, বোতাম, ব্রাস, টুথপাউডার, বালি নানাবিধ যন্ত্র, আরও বহু জিনিষ।

কাবুল ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে নিম্নলিখিত জিনিষ পাইয়া থাকি। মুগ, মাষ, খেসারী, মসুরী, মটর, ছোলা, অরহর, ঠিকুরী প্রভৃতি কলাই ও ডাইল, কবিরাজি

ঔষধের উপাদান, আলু, তিল, পেয়াজ, রসুন, লঙ্কা, গোলমরিচ, লবঙ্গ প্রভৃতি মসলা, গম, যব, গুড়, চিনি, মিছরি, আম, কমলালেবু, বেদানা, পোস্ত, কিসমিস, বাদাম, আখরোট, চিনাবাদাম, কুল, পেয়ারা, লাক্ষা, ধুপ, চূণ, আলকাতরা, মাদুর, সোডা, তামাক, তুলা, চা, নানাবিধ কাঠ, নারিকেল, তিল-সরিষা-রেড়ী-তিসির তৈল, সৈন্ধব লবণ, গোলাপজল, আতর, ঔষধাদি, আদা, হরিদ্রা, কাপড় ইত্যাদি।

বঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে পাই—নারিকেল, সুপারী, কাপড়, গঞ্জি, ঔষধ সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈল, সাবান, কাচের জিনিষ, লোহার জিনিষ, আয়না, চিরুণী, আলু, পটল, কপি, তামাক, গুড়, চাউল, কাঠ ও কাঠের জিনিষ, মাটীর পুতুল ও বাসন, পান, গাঁজা, পিত্তলের ও কাঁসার বাসন প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত আসাম হইতে পাটী, পান, কচু, কচুমুখী, আদা, আনারস ইত্যাদি।

(ময়মনসিংহ সমাচার)

কুটীর-শিল্প ও বাঙ্গালা সরকার

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিল্প-বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় খাঁ বাহাদুর ফারোকী বলেন, শিল্প বিভাগের কাজ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, যথা—অনুসন্ধান, কুটীর-শিল্প, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প শিক্ষা, গ্রামে শিল্প দ্রব্য প্রদর্শন ইত্যাদি। কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন। সমবায় নীতিতে কাজ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কলিকাতা সমবায় দোকানকে ৫০ হাজার টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহারা ছোট ছোট কুটীর-শিল্পকে সাহায্য করিবেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য দিবার জন্য কাউন্সিলের আগামী অধিবেশনে একটী বিল উপস্থিত করা হইবে। শিল্প-বিভাগে যে মোট ৮ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা খরচ হইবে, তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকাই যাইবে শিল্প-শিক্ষার জন্য। কুটীর শিল্পের যে সকল বস্তু তৈয়ার হয় তাহা যাহাতে বিক্রয় হয় গভর্ণমেণ্ট তজ্জন্যও চেষ্টিত হইবেন।

বেকার-সমস্যায় শিল্প-বিভাগ

সম্প্রতি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শ্রম-শিল্প-বিভাগ হইতে একখানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি অর্থোপার্জ্জনের সদুপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাহারা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল্প-বিভাগ, ১ নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পুস্তিকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

বলা বাহুল্য, বাংলার সাধারণ বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণের জন্য এই ব্যবস্থা। যিনি যে পরিমাণ সাধারণ শিক্ষালাভ করিবেন, তিনি ভবিষ্যৎ অন্ন-সংস্থানের তদনুরূপ উপায় নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন। এখানে যেসকল সরকারী বা আধা-সরকারী অথবা সরকারের সাহায্য-পুষ্ট প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা করা যাইতেছে, সেগুলি অনেক দিন হইল স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কথা সাধারণের সুপরিচিত না থাকায়, বাংলার তরুণ সম্প্রদায় এই সকল বিদ্যালয়ের সাহায্য পায় না। আমরা এই উদ্দেশ্যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের নাম নিয়ে উল্লেখ করিতেছি। সরকারের শ্রম-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই উপদেশ দিতেছেন যে, যাহারা এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক তাহারা যেন অল্প বয়সেই এই সকল বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে।

প্রতিষ্ঠানগুলি এই—১। শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়; এখানে স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; এই বিদ্যালয়ে সুতা কাটা, রং করা এবং কাপড় বোনা শিক্ষা দেওয়া হয়। ২। বহরমপুর রেশম বয়ন বিদ্যালয়। এখানে রেশম রং করা শিক্ষা দেওয়া হয়। পাবনা, মালদহ, বাঁকুড়া টাঙ্গাইল, জোরওয়ারগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, সিউড়ী ও খুলনায় এই জাতীয় বয়ন বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে বয়ন শিক্ষা দেওয়া হয়। উহা ছাড়া আরও ২০টী বয়ন বিদ্যালয় আছে, সেখানে নিরক্ষর লোকেরাও শিক্ষা করিতে পারে। ৩। শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ৪। ঢাকার আসানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ৫। কাঁচড়াপাড়া টেকনিক্যাল স্কুল। ৬। কলিকাতা

টেকনিক্যাল স্কুল। ৭। খড়্গপুর বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে এপ্রেণ্টিস নৈশ বিদ্যালয়। ৮। ইছাপুর টেকনিক্যাল স্কুল। ৯। বরিশাল টেকনিক্যাল স্কুল। ১০। মৈমনসিংহ টেকনিক্যাল স্কুল। ১১। পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল। ১২। বর্দ্ধমান টেকনিক্যাল স্কুল। ১৩। রাজসাহী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল। ১৪। বগুড়া ই, আই, স্কুল। ১৫। কুমিল্লা টেকনিক্যাল স্কুল। ১৬। রংপুর টেকনিক্যাল স্কুল। ১৭। ফরিদপুর ব্যাপ্টিষ্ট মিশন ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল। ১৮। খুলনা করনেশন টেকনিক্যাল স্কুল। ১৯। বিষ্ণুপুর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল। ২০। ধানবাদ খনি বিদ্যালয়; এতদ্ব্যতীত রাণীগঞ্জ, টোপোসি শঙ্করপুর, দিশেরগড়, কালীপাহাড় ও চারণপুরে কিছু কিছু খনি বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ২১। কুমিল্লা ময়নামতী সার্ভে স্কুল। ২২। কলিকাতা, ইটালি ক্যানাল সাউথ রোড, বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট। ২৩। জমসেদপুর টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট। ২৪। কানপুর টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট।

বাংলার স্বাস্থ্য

সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের ১৯২৮ সনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলার স্বাস্থ্য যে কিরূপ শোচনীয় তাহা এই রিপোর্ট পর্য্যালোচনা করিলে অতি সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

১৯২১ সনের সেনসাসে বাংলা প্রদেশের লোক-সংখ্যা হইয়াছিল ৪৬৪২২২৯৩ জন, আলোচ্যবর্ষে ১৩৭৫৬৮০টি শিশুর জন্ম হইয়াছে, ইহার পূর্ব্ব বৎসর জন্ম হইয়াছিল ১২৮৬৮৬৩ জনের অর্থাৎ আলোচ্যবর্ষে পূর্ব্ববৎসর হইতে প্রায় ১০০,০০০ জন্ম-সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এই বৎসরে মোট মৃত্যু ঘটিয়াছে ১১৮৯০১৫ জনের। তার পূর্ব্ব বৎসর মরিয়াছে ১১৮৯৩৭০ জন। সুতরাং মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই বলিলেই চলে।

প্রাদেশিক জন্মহার ২৭·৭ হইতে ২৯·৬তে উঠিয়াছে এবং পাঁচ বৎসরের গড়পড়তায় প্রাদেশিক জন্মহার ২৮·৮ হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাংলার জন্মহার কম। গ্রাম্য অঞ্চলের জন্মহার ৩০·৪ আর সহর অঞ্চলের জন্মহার ২০·৪ অর্থাৎ সহর হইতে গ্রামের জন্মহার প্রায় শতকরা ৫০ বেশী। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সহরের স্বাস্থ্য হইতে গ্রামের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ছিল হাজার করা ২২৮·৩, ১৯২৭ সনে সেই স্থলে হইয়াছে হাজার করা ১৭৮ এবং আলোচ্যবর্ষে হইয়াছে ১৮·১ অর্থাৎ আলোচ্যবর্ষে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা পূর্ব্ববৎসর হইতে সামান্য কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন ঢাকার মেটার্নিটি অ্যাণ্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট প্রভৃতিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতা ও ঢাকা সহরে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস করিয়াছেন। ইহাদের কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

আলোচ্যবর্ষে কলেরা রোগে মৃত্যু অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯২৭ সনে কলেরায় মারা যায় ১১৮৩৭৭ জন, সেই স্থলে ১৯২৮ সনে মারা গিয়াছে ১৩৬২৪৫ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১৬টী মৃত্যু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গত পাঁচ বৎসরের গড়ের প্রায় দ্বিগুণ মৃত্যু এই বৎসর ঘটিয়াছে।

এই রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে নূতন প্রবর্ত্তিত কলেরা রোগের ইনজেক্সন ও জলাশয়ের জল সংশোধন করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৮ জন মেডিকেল অফিসার ৫ জন সবএসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও ১০০ জন অতিরিক্ত সেনিটারি ইনসপেক্টার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড মিউনিসিপালিটী প্রভৃতিকে সাহায্য করার জন্য সরকার হইতে নিযুক্ত হইয়াছিল। বিস্তৃত প্রদেশের পক্ষে এই ব্যবস্থা যে নিতান্ত অপ্রচুর তাহা বলাই বাহুল্য। লোক-শিক্ষার জন্য সরকারী প্রচার বিভাগ ও স্থানীয় সেনিটারী ইন্স্পেক্টারগণ দ্বারা বক্তৃতা ও ম্যাজিক লণ্ঠন প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পুরী রথযাত্রী ও গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের কলেরা ইন্জেকসনের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে কলেরা ইনজেকসনের বীজ পূর্ব্ব বৎসর হইতে অনেক বেশী ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯২৭ সনে ১২৯৯৬৩০ কিউবিক সেণ্টিমিটার বীজ ব্যবহৃত হয় আর আলোচ্যবর্ষে সেই স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে ২৩০৪৪৫৭ কিউবিক সেণ্টিমিটার অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। ১৯২৭ সনে মোট ৭৮১৮৭২ জন লোককে

কলেরায় ইন্‌জেকসন দেওয়া হয়, আর আলোচ্যবর্ষে দেওয়া হয় ১৯৪১০২৩ জনকে। বঙ্গদেশে এই ব্যবস্থা নূতন বলিয়া অনেকে ইহা নিতে চায় না।

গত ৫ বৎসর ধরিয়া বসন্ত রোগের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯২৫ সনে এই রোগে মারা যায় ৪২৫১৪ জন আর আলোচ্যবর্ষে মারা গিয়াছে ৪৩৫৫৮ জন। মালদহ জেলায় সবচেয়ে বেশী প্রকোপ হইয়াছিল। সেখানে সকলকেই টিকা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। আলোচ্যবর্ষে ২০৫২২১৭ জনকে নূতন এবং ৩২২৯২০২ জনকে পুনরায় টিকা দেওয়া হয়, মোট টিকা দেওয়া হয় ৫২৮১৪১৯ জনকে। এই বৎসর শিশু-মৃত্যু বাদে মোট জন্ম-সংখ্যা ছিল ১১২৬৮১২। তন্মধ্যে মাত্র শতকরা ২৪ জন টিকা নিয়াছিল, কারণ অভিভাবকগণ অতি অল্প বয়সের ছেলে মেয়েকে টিকা দিতে চাহেন না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কয়েক বৎসর ধরিয়া টিকা দেওয়ার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কলেরা ও বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এই উভয়বিধ টিকাই নেওয়া আবশ্যক।

১৯২৬ সনে ম্যালেরিয়াতে মারা যায় ৪৫৮২০৮ জন, ১৯২৭ সনে মারা যায় ৪২৯১৪৩ জন, আর ১৯২৮ সনে মারা গিয়াছে ৩৬৮৬৯১ জন। ১৯২৭ সনে কালাজ্বরে মৃত্যু হয় ১১৮৫৫ জনের আর আলোচ্য বর্ষে সেই স্থলে মৃত্যু হইয়াছে ১০৭৪৬ জনের। জ্বররোগে মোট মৃত্যু ঘটে ১৯২৭ সনে ৭৮৯০০৬ জনের সেই স্থলে আলোচ্যবর্ষে মৃত্যু ঘটে ৭৫২০০৭ জনের। সুতরাং এই বিষয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ কতক পরিমাণ সাফল্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক জিলার প্রতি থানায় একটী করিয়া স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। ১৯২৮ সনে মোট কেন্দ্র ছিল ২৭২, সেইস্থলে এখন প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

(ময়মনসিংহ সমাচার)

বর্দ্ধমান বিভাগে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু

	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
বর্দ্ধমান জেলা	১৭,৭৬২	১৫,১৭৮	১১,৭৫১
বীরভূম	৯৪০	২,৯৭৫	৫,১০২
বাঁকুড়া	২,৪৮৬	৩,৪৫৬	৭,২৩৫
মেদিনীপুর	২২,৫৮৪	১৯,৯২৯	১৭,৪৩৯
হুগলী	১৩,৬২৪	১৩,৫৮৭	১০,১০৬
হাওড়া	৫,৫৮৬	৪,৩৬৭	১০,১০৬

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া ও হাওড়ায় অত্যন্ত বাড়িয়াছে। মোটের উপর বর্দ্ধমান বিভাগে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু কমে নাই।

(শক্তি)

ভারতে তামাকের ব্যবসা

সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে যত তামাকের পাতা উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৯০ ভাগ হয় এক ভারতবর্ষে। পৃথিবীতে যত তামাক উৎপন্ন হয় ভারতে তার শতকরা ২০ ভাগ উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় একশত কোটি পাউণ্ড তামাক পাতা উৎপন্ন হয়; কিন্তু ইহা সত্বেও ভারতের রপ্তানি ব্যবসা মোটেই আশাজনক নহে। গত বৎসর ভারতবর্ষে ২৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ভার্জিনিয়া তামাক এবং ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকার সিগারেট আমদানি হইয়াছে। সিগারেট প্রস্তুত করিবার পক্ষে ভারতবর্ষজাত তামাক উপযোগী নহে। পাইপে ধূমপান করিবার জন্ত যে তামাক ব্যবহৃত হয় তাহাই প্রধানতঃ ভারতবর্ষের তামাকপাতা হইতে প্রস্তুত হয়। সিগারেটের বেশী প্রচলন হওয়ায় পাইপের তামাক বা চুরুটের চাহিদা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে ভারতের রপ্তানি ব্যবসার বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা। সিগারেটের উপযোগী ভাল তামাকপাতা উৎপাদনের জন্ত বাংলার বুড়ীর হাটে পরীক্ষা-কার্য্য চলিতেছে।

রেল দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা

১৯২৮-২৯ সনের ভারতীয় রেলওয়ে সমূহের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, আলোচ্যবর্ষে বিভিন্ন প্রকারের রেল দুর্ঘটনায় ৩,৩১৮ জন নিহত এবং ৭১৮৭ জন আহত হইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে ৩০৭০ জন নিহত এবং ৬২৬৫ জন আহত হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় যে, হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

কৃত্রিম তার্পিণ

আগ্রা ও অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশে তার্পিণ ও রজন তৈয়ারী করিবার কারখানা আছে। তথাকার জঙ্গলের গাছ হইতে ইহা বাহির করা হয়। গত বৎসর তথায় প্রায় ৩০ হাজার মণ রজন তৈয়ারী হইয়াছে। ইহার কাটতি প্রচুর। ইহাতে ভারত অর্থশালী হইতেছে। কুমাউনের অধিবাসীরা এই ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জন করিতেছে। বঙ্গদেশে নীলের চাষ যেমন কৃত্রিম নীল তৈয়ারী হওয়ায় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তেমনি সুইডেনের কৃত্রিম তার্পিণের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের তার্পিণের ব্যবসা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই কৃত্রিম তার্পিণে যুক্ত প্রদেশের এই ব্যবসায় অত্যন্ত অনিষ্ট হইতে পারে।

ডাক বিভাগের সরকারী বিবরণ

(১৯২৮-২৯)

ক্ষতি	...	৫৩,৮৩,৬২৯৲
কর্ম্মচারীর সংখ্যা	...	১১২,৭১৪
পোষ্ট আফিসের সংখ্যা	...	২২,৮২০
মেল লাইন	...	১৬৬,৯৪১ মাইল
ডাকযোগে প্রেরিত মালের সংখ্যা		১৩৮৬ মিলিয়ন
রেজেষ্ট্রীকৃত জিনিষের সংখ্যা		৫৪ মিলিয়ন
ষ্ট্যাম্প বিক্রয়	...	৬২·৫ মিলিয়ন টাকা
মণি-অর্ডার	...	সংখ্যা ৪০ মিলিয়ন, টাকা ৯৩৩ "

ভিঃ পিঃ	...	২৮৬ মিলিয়ন টাকা	কুইনান বিক্রয়	১৩৭১৫ পাউণ্ড
ইনসিওরেন্স	...	সংখ্যা ৫.৭ মিলিয়ন, টাকা ১৬৫৮ মিলিয়ন	সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট	সংখ্যা ২০২০৮৩২ টাকা ৩৪৫ মিলিয়ন

১৯২৯ সনে ভারত ও ব্রহ্মদেশের সহিত জাঞ্জিবারের ব্যবসা-বাণিজ্য

১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে জাঞ্জিবারের সহিত ভারত ও ব্রহ্মদেশের আমদানি রপ্তানির সেই বৎসরের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইয়াছে :—

প্রধান সামগ্রী	পরিমাপ	ভারত ও ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানি		নিজস্ব মাল ভারতে ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানি		ভারত ও ব্রহ্মদেশে পুনঃ রপ্তানি	
		পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
সুতির কাপড়চোপড় :—							
কোড়া	গজ	১,৯৯৪,৬৪২	৪,৯৮,০৬৮	—	—	১৩,৫০০	৩,৭৫০
ধোলাই	„	৩৩,০১৩	১০,৫৭৬	—	—	৩১,৯০৯	৭,৮৬৩
ছাপান	„	১৯,৮৪৭	৮,৪২৫	—	—	৬,৫৬০	২,৫২০
রঙ্গীণ টুকরা	„	১,৩০১,৩৯২	৩,৫৫,১৬৩	—	—	৭,৭৯৭	৩,৪০৬
সুতার কল	„		৭৮,০২১	—	—	—	৩,২৯৬
চাউল	হন্দর	৪০১,৯১৮	৩৮,০১,৪০৩	—	—	২	১৭
গমের ময়দা	„	৫৮,৬৭৫	৬,৬৯,৪২৬	—	—	—	—
রৌপ্য মুদ্রা	আউন্স	৪৬৮,৭৫০	১২,৬০,৭২৬	—	—	৭,৩০৭	১২,০৩০
ঘী	পাউণ্ড	১৬১,৮০৩	১,৫৬,৯০৪	—	—	—	—
বাহারী কাঠ	টন	—	—	—	—	—	১০
টাটকা শাকসব্জী	হন্দর	১০,৬১৩	৭৫,৫২৯	—	—	—	—
হোসিয়ারী	—	—	১,৫৯৭	—	—	—	—
গম	হন্দর	৫,২৯৩	৬০,৮৯৬	—	—	—	—
চা	পাউণ্ড	৫৩,৯৪৪	৪০,৪১৬	—	—	—	—
ডাল	হন্দর	৬,৯৮৩	৮০,২২৬	—	—	—	—
লোহা লক্কড়	„	১৭৬	৮,৭১৫	—	—	—	—
চিনি	„	৯১৯	৮,৮৪২	—	—	—	—
বস্তা ও থলে	ডজন	৩৪,৬৫৮	২,২০,২৬৩	—	—	—	—
লবঙ্গ	হন্দর	—	—	৬৩,৬৯৭	৪৩,৩৮,৫২৮	১৮	১,৫৩৬
হাতীর দাঁত	„	—	—	—	—	১১৫	১,৪৩,১৪৮
কলম	„	—	—	৪২২	৫,৬৯১	—	—
অন্যান্য জিনিষ	—	—	৯,৩৬,৫২৮	—	১৬,২৭৬	—	৭৭,৯৩৭

বৃটিশভারতে মোটরগাড়ীর রেওয়াজ বৃদ্ধি

১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত গোটা বৃটিশ ভারতে রেজেষ্টারীকৃত নানাপ্রকার মোটরযানের সংখ্যা মোট ১৭২,৬৮০ খানি দাঁড়াইয়াছিল। দেশীয় রাজ্যসমূহের মোটরগাড়ীর সংখ্যা ইহাতে ধরা হয় নাই। এই সমস্ত গাড়ীর মধ্যে মোটর গাড়ীর সংখ্যা ১১৬,৬২৫ খানি; মোটরলরী প্রভৃতি ভারি গাড়ীর সংখ্যা ৩০,১৮১ খানি। ১৯২৮-২৯ সনের মত এত মোটর যান ভারতে আর কখনও আমদানি হয় নাই। ১৯১৩-১৪ সনে মোটর যান আমদানি হয় ২,৮৮০ খানি; কিন্তু ১৯২৮-২৯ সনের আমদানির সংখ্যা ১৯,৫৬৭। ১৯২৮-২৮ সনের আমদানি মোটর যানের মূল্য ৪,২১ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ ১৯২৭-২৮ সনের চেয়ে ৩০% বেশী। আলোচ্য সনে ভারি যাত্রি-বাহী মোটর বাস এবং মোটরলরী আমদানি হইয়াছে ১২,৭৯০ খানি। এই সংখ্যা ১৯২৬-২৭ সনের প্রায় দ্বিগুণ এবং ২৯২৭-২৮ সনের দেড়গুণ; ১৯২৮-২৯ সনে এই জাতীয় মোটর যান আমদানির মূল্য ২১৬৷৷ লাখ টাকা। পেট্রল বিক্রয়ও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বিগত দশবৎসরের তুলনায় আলোচ্য সনে পেট্রল ক্রয়ের পরিমাণ ১১০ লক্ষ গ্যালন হইতে একেবারে ৬২০ লক্ষ গ্যালনে পৌছিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, বৃটিশ ভারতে মোটর যোগে গমনাগমন এবং মাল চলাচলের রেওয়াজ কিরূপ বাড়িয়া যাইতেছে।

মোটরগাড়ী আর বিলাসের সামগ্রী নহে

ভারতের এই মোটর সম্পদ্ এমন কিছু হাতী ঘোড়া নয়। মার্কিণের তুলনায় মোটর সম্পদে ভারতের এখনও নিতান্ত শৈশব কাল। কিন্তু যেরূপ ভাবে মোটর ট্রান্সপোর্ট বাড়িতেছে তাহাতে মনে হয়, মোটর গাড়ী আর ভারতবাসীর বিলাসের সামগ্রী নহে। ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে ইহা একটী অত্যাবশ্যক সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাবতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষিকার্য্যের অগ্রগতির ফলে ভারতে শীঘ্রই নবযুগের আবির্ভাব হইবে। রাস্তাসড়ক এবং সমবায় সমিতিসমূহের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদিগের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। এখন জমিজমার তাহার কোন স্বত্ব নাই; কিন্তু ভবিষ্যতে কৃষকই জমিজমার মালিক হইয়া দাঁড়াইবে।

মোটরযানই কৃষকের অবস্থা ফিরাইবে

প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগের অবস্থা ফিরাইবে এই মোটর যানই। বাসের কল্যাণে কৃষক স্থানীয় বাজারগুলির পরিচয় লইয়া, সেই অনুসারে ক্ষেতে ফসল বুনিতে পারিবে। ফসল পাকিবার পর কোন্ বাজারে বেচিলে দু'পয়সা বেশী সংস্থান হইবে তাহারও হদিস এই বাসের কল্যাণে কৃষক জানিতে পারিবে। যখন প্রত্যেক কৃষকের মাল লরী বোঝাই হইয়া বাজারে বাজারে পৌঁছিবে সেদিনের এখনও ঢের দেরী। খোদ ইউরোপও এখনও এ অবস্থায় পৌঁছে নাই। তবে ইউরোপে বাজার এবং রেলরাস্তা চাষীর ক্ষেত হইতে যেখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ, ভারতবর্ষে সেখানে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের পথ। মোটর ট্রান্সপোর্ট বৃদ্ধি পাইলে ভারতে নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রের আবির্ভাব হইবে এবং চাষীরাও ক্রয়-বিক্রয়ের যথেষ্ট সুবিধা পাইবে।

ভারতীয় মিলে স্বদেশী সূতার ব্যবহার

ভারতের যে যে কাপড়ের কলে স্বদেশী সূতা ব্যবহৃত হয় তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) স্বদেশী মিল কোম্পানী, বোম্বে।

(২) টাটা মিল, বোম্বে।

(৩) মেকেঞ্জি পেটিট মিল, বোম্বে।

(৪) জুবিলি মিল লিমিটেড্ বোম্বে।

(৫) বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, বেঙ্গল।

(৬) আকোলা কটন মিল কোং, আকোলা।

(৭) কেশরাম কটন মিল, বেঙ্গল।

(৮) নিউ বড়োদা মিল কোঃ, বড়োদা।

(৯) জিয়ানজিয়ারো কটন মিলস, গোয়ালিয়র।

(১০) রতিলাল হীরাভাই স্পিনিং এণ্ড উইভিং, আমেদাবাদ।

(১১) কল্যাণমল ভাহুতী মিল লিমিটেড, ইন্দোর।

(১২) নরনারায়ণ স্পিনিং এণ্ড উইভিং, গোয়া।

(১৩) সীতারাম স্পিনিং এণ্ড উইভিং, কোচিন ষ্টেট।

(১৪) সিটি অব্ আমেদাবাদ স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং।

(১৫) আমেদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং, আমেদাবাদ।

(১৬) মহারাজা মিলস কোঃ লিমিটেড, বড়োদা।

(১৭) মোরারজি গোকুলদাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং।

(১৮) ব্রোচ ফাইন কাউন্টস স্পিনিং এণ্ড উইভিং, বোম্বে।

(১৯) দি গর্ডেন স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফেকচারিং।

(২০) প্রেম স্পিনিং এণ্ড উইভিং লিঃ।

(২১) হীনসোয়াদ পালিত মিল, বোম্বে।

(২২) আর, বি, বংশীলাল আমিরচাঁদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং, ওয়ার্দ্ধা সি, পি।

(২৩) বোম্বে মিলস কোঃ লিঃ, বোম্বে।

(২৪) গুজরাট কটন মিলস কোঃ লিঃ, আমেদাবাদ।

(২৫) আর, এস, রইলকচাঁদ মেহেতা স্পিনিং মিলস, ওয়ার্দ্ধা।

(২৬) নিউম্যানেকচক স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোঃ লিঃ, আমেদাবাদ।

(২৭) স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস, দিল্লী।

(২৮) মোরাদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ, মোরাদাবাদ।

(২৯) আমেদাবাদ জুবিলী স্পিনিং এণ্ড ম্যানুঃ কোঃ, আমেদাবাদ।

(৩০) রায়পুর ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ লিঃ, আমেদাবাদ।

(৩১) মডেল মিলস লিঃ, নাগপুর সিটি।

(৩২) আরাদয় স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোঃ লিঃ, আমেদাবাদ।

(৩৩) কানপুর কটন মিলস কোঃ, কানপুর।

(৩৪) আলোকা মিলস লিমিটেড, আমেদাবাদ।

(৩৫) আমেদাবাদ ম্যানুঃ এণ্ড ক্যালিকো প্রিন্টিং কোঃ লিঃ, আমেদাবাদ।

(৩৬) ঢাকেশ্বরী কটন মিল, ঢাকা।

(সম্পাদক, স্বদেশী বোর্ড, বি, পি, সি, সি)

কয়েকটী ক্ষুদ্র রাজ্যের তুলনায় ভারতবর্ষ

দেশের নাম	শিক্ষিত (শতকরা)	মৃত্যুহার (হাজার করা)	গড় আয়ু (বৎসর)	জনপ্রতি দৈনিক আয়
সুইজারল্যাণ্ড	৮৫	৮·৫	৬৩	২৵৹
ফিনল্যাণ্ড	৮২	১১	৬৫	১৸৵৹
আয়ারল্যাণ্ড	৭৮	১৪	৫১	৩৵৹
রুমানিয়া	৬১	১৬	৫০	১৸৹
তুরস্ক	৫২	১৬	৪৮	১৷৵৹
আফগানিস্থান	২৭	১৭	৪৫	১৷৹
ভারতবর্ষ	৫·২	২৫.২	২৩	৴১০

(দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতি)

ভারতীয় চাষের ফিরিস্তি (১৯২৮-২৯)

বৃটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির (দেশীয় রাজ্য সহ) মোট জমির পরিমাণ ৬৭ কোটী একর। গ্রামের রিপোর্টগুলির আলোচনায় একটু তফাৎ দেখা যায়। উহাতে প্রকাশ এইরূপ জমির পরিমাণ ৬৬ কোটী ৭০ লক্ষ একর। এই মোট জমির মধ্যে আবাদের অযোগ্য জমি ২০৷ কোটী একর। ইহার মধ্যে বনজঙ্গলের পরিমাণ ৮ কোটী ৭০ লক্ষ একর। আবাদযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ ১৫৷৷ কোটী একর। পতিত জমি ৪ কোটী ৯০ লক্ষ একর। সুতরাং সমস্ত বাদ সাদ দিয়া মোটের উপর এই সনে কৃষকগণ ফসল বুনিয়াছে মোট ২২ কোটী ৮০ লক্ষ একর জমিতে। কোন কোন জমিতে একাধিকবার শস্য উৎপাদন করা হইয়া থাকে। সুতরাং শস্য উৎপাদনের হিসাব অনুসারে মোট আবাদী জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬ কোটী ২০ লক্ষ একর, অর্থাৎ আলোচ্য সনে ১৯২৭-২৮ সনের তুলনায় ২% বেশী জমিতে শস্য উৎপাদন করা হইয়াছে।

আলোচ্য সনে ৫ কোটী একর জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; ১৯২৭-২৮ সনে সেচ হইয়াছিল ৪ কোটী ৩০ লক্ষ একর জমিতে। ইহার মধ্যে খালের সাহায্যে সিঞ্চিত হইয়াছে ২ কোটী ৬০ লক্ষ একর, কূপের সাহায্যে ১ কোটী ৩০ লক্ষ একর, পুষ্করিণীর সাহায্যে ৬০ লক্ষ একর এবং অন্যান্য উপায়ে ৫০ লক্ষ একর। একাধিকবার ফসল উৎপাদনের হিসাব লইয়া আলোচ্য সনে মোট সিঞ্চিত জমির পরিমাণ ৫ কোটী ৪০ লক্ষ একর। ইহার মধ্যে ধানের জমি ১ কোটী ৮০ লক্ষ একর, গমের ১ কোটী একর, যব, জোয়ার, বাজরা, এবং ভুট্টার জমি ৭০ লক্ষ একর, অন্যান্য খাদ্য শস্য ও দালের জমি ৬০ লক্ষ একর, ইক্ষুর ২০ লক্ষ একর, কার্পাসের ৪০ লক্ষ একর এবং অন্যান্য অ-খাদ্য শস্যের জমি ৫০ লক্ষ একর।

আলোচ্য সনে ২১ কোটী ১০ লক্ষ একর জমিতে খাদ্য শস্যের আবাদ হইয়াছে (একাধিকার ফসল বোনা জমি ধরিয়া) এবং অ-খাদ্য শস্য আবাদ হইয়াছে ৫ কোটী ১০ লক্ষ একর জমিতে। মোট আবাদ করা জমির মধ্যে ধানের আবাদের পরিমাণ ৩১%, মিলেট্‌ ১৪%, গম ১০%, তৈলবীজ ৭%, তূলা ৬%, ছোলা ৫%, যব ৩%, ভুট্টা ২%, এবং পাট ১%। নিম্নলিখিত শস্যের আবাদ বৃদ্ধি হইয়াছে :— ধান (+৪০ লক্ষ একর এবং বৃদ্ধির পরিমাণ প্রধানতঃ বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যায়), তূলা (+২০ লক্ষ একর এবং বৃদ্ধি প্রধানতঃ পাঞ্জাব, বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ ও বেরার অঞ্চলে), রাই ও সরিষা (+১০ লক্ষ একর, বৃদ্ধি প্রধানতঃ পাঞ্জাবে)। অন্য পক্ষে মাত্র বাজরার আবাদই খুব কমিয়াছে (—১০ লক্ষ একর, হ্রাস পাইয়াছে প্রধানতঃ বোম্বাই অঞ্চলে)।

নিম্নের তালিকায় ১৯২৮-২৯ সনের আবাদের বিস্তৃত হিসাব প্রদত্ত হইল :—

জমির পরিচয়	জমির পরিমাণ (হাজার একর)
সরকারী হিসাবে জমির পরিমাণ	৬৬৯,৯৮৩
গ্রাম্য রিপোর্ট অনুসারে জমির পরিমাণ	৬৬৭,৪৭৩
বনের পরিমাণ ...	৮৭,০৯৩
চাষের অযোগ্য জমি ...	১৪৮,৩৭০
আবাদযোগ্য অনাবাদী জমি ...	১৫৪,৭০২
পতিত জমি ...	৪৯,১৪২
মোট আবাদী জমি ...	২২৮,১৬৪
সিঞ্চিত জমি ...	৪৯,৭৪০

খাদ্য শস্যের আবাদ

	(হাজার একর)
ধান ...	৮১,১৩২
গম ...	২৪,৯২৬
যব ...	৭,৫৫৩
জোয়ার ...	২০,৫৩৪
বাজরা ...	১২,৯৫২
রাগী ...	৩,৯০৪
ভুট্টা ...	৬,০১২
ছোলা ...	১৩,৬২৫
অন্যান্য রবিশস্য ...	২৯,৬৫১
মোট	২০০,২৬৯
আক ...	২,৬৭৫
অন্যান্য খাদ্যশস্য ...	৭,৮৫২
মোট খাদ্য শস্য	২১০,৭৯৬

অ-খাদ্য শস্যের আবাদ

	(হাজার একর)
মসিনা ...	২,০৯২
তিল ইং ...	৩,৬৬৮
রাই ও সরিষ ...	৪,২৮৭
চিনাবাদাম ...	৫,৪০১
নারিকেল ...	৬৫০
রেড়ী ...	৫৩৩
অন্যান্য তৈলবীজ ...	১,২৫৫
মোট তৈলবীজ	১৭,৮৮৬
তূলা ...	১৬,৫৯৭
পাট ...	৩,০৬২

অন্যান্য তন্তু	...	৬৫৭
নীল	...	৮১
আফিং	...	৪৯
কফি	...	৮৭
চা	...	৭৬০
তামাক	...	১,১৪৯
গরুর আহার্য্য	...	৯,১৭৭
অন্যান্য অ-খাদ্য শস্য	...	১,৭৭৪
মোট অ-খাদ্য শস্য		৫১,১৮৯
খাদ্য ও অ-খাদ্য মোট শস্য		২৬১,৯৮৫

ভারতে গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত

১৯২৮-২৯ সনে আধুনিক প্রক্রিয়ায় গুড় সংশোধন করিয়া চিনি প্রস্তুত করিবার ৩৩টী কারখানা ছিল। এই সমস্ত কারখানায় ১৯টীতে এই সনে আদৌ কাজকর্ম্ম হয় নাই। বাকী ১৪টীর চিনি প্রস্তুতের হিসাব পাওয়া গিয়াছে। এই ১৪টীর মধ্যে যুক্ত প্রদেশে ৭টী, বিহার-উড়িষ্যায় ২টী, মাদ্রাজে ৩টী এবং পাঞ্জাবে ২টী অবস্থিত।

১৯২৭-২৮ সনে ১৯টী কারখানায় কাজের হিসাব মিলিয়াছিল। এইগুলির মধ্যে ৫টীর কাজ ১৯২৮-২৯ সনে বন্ধ ছিল।

নিম্নের তালিকায় ১৯২৮-২৯ সনে গুড়, গুড় হইতে প্রস্তুত চিনি এবং চিটাগুড়ের উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল। যুক্ত প্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা, মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাব, প্রদেশের পৃথক পৃথক তালিকাও দেওয়া হইল :—

	১৯২৮-২৯	১৯২৭-২৮
যুক্ত প্রদেশ		
গুড়	৭,০[illegible]৬০	১৬,৯৬,৬৪৪
গুড়ের চিনি	৩,৬২,৮৪৮	৮,০০,৮৭৯
চিটা	২,৯১,৮৫৭	৭,১৪,১৩৫
বিহার ও উড়িষ্যা		
গুড়	১,৬০,১২৪	৩,০০,৪৫২
গুড়ের চিনি	৭৩,৭০৫	১,৫১,২৯৪
চিটা	৬৮,২৮১	১,১৭,১৫০
মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাব		
গুড়	৭,০১,২২৫	৭,৬৪,৮১৬
গুড়ের চিনি	৪,০৮,২৯২	৪,৬৪,৭৫৩
চিটা	২,১৭,৫৬১	২,২৯,০২৮
ভারতের মোট উৎপাদন		
গুড়	১৫,৯১,৬১০	২৭,৬১,৯১২
গুড়ের চিনি	৮,৪৪,৮৪৫	১৪,১৬,৯২৬
চিটা	৫,৭৭,৬৯৯	১০,৬০,৩১৩

আক হইতে চিনি প্রস্তুতের পরিমাণ

১৯২৮-২৯	১৮,৫২,৩২২ মণ বা ৬৮০৫০ টন
১৯২৭-২৮	১৮,৪৫,৪৫২ মণ বা ৬৭,৮০৮ টন

সুতরাং দেখা যাইতেছে, উভয় প্রণালীতে প্রস্তুত মোট চিনির পরিমাণ :—

১৯২৭-২৮ সনে	২৬,৯৭,১৬৭ মণ বা ৯৯,০৮৮ টন
১৯২৮-২৯ সনে	৩২,৬২,৬৭৮ মণ বা ১১৯৮৬৩ টন

নিম্নের তালিকায় ভারতের দশ বৎসরের চিনি উৎপাদনের হিসাব প্রদত্ত হইল :—

	আক হইতে (মণ)	গুড় হইতে (মণ)	মোট (মণ)
১৯১৯-২০	৬,২৮,৯২০	১২,১১,২৭৪	১৮,৪০,১৯৪
১৯২০-২১	৬,৬৯,২৯১	১৩,২৪,৬৪৫	১৯,৯৩,৯৩৭
১৯২১-২২	৭,৫৩,৬৩৮	১৩,০৩,৪৩৩	২০,৫৭,০৭১
১৯২২-২৩	৬,৫১,৪১৫	১৩,৬৮,১২৬	২০,১৯,৫৪১
১৯২৩-২৪	১০,৪৪,৮৫৬	১৫,৩৮,৩০৪	২৫,৮৩,১৬০
১৯২৪-২৫	৯,২১,৯৫০	৯,১৬,১২১	১৮,৩৮,০৭৮
১৯২৫-২৬	১৪,৪৫,০৬১	১০,৪৭,৪২০	২৪,৯২,৪৮১
১৯২৬-২৭	১৭,১৬,৪২৬	১৫,৯১,৯৯৭	৩৩,০৮,৪২৩
১৯২৭-২৮	১৮,৪৫,৭৫২	১৪,১৬,৯২৬	৩২,৬২,৬৭৮
১৯২৮-২৯	১৮,৫২,৩২২	৮,৪৪,৮৪৫	২৬,৯৭,১৬৭

নিম্নের তালিকায় চিনির কুঠি এবং গুড় হইতে চিনি প্রস্তুতের কারখানার কয়েক বৎসরের তুলনামূলক সংখ্যা প্রদত্ত হইল :—

বৎসর	আক হইতে চিনি প্রস্তুতের কলের সংখ্যা	গুড় হইতে চিনি প্রস্তুতের কারখানার সংখ্যা
১৯২৪-২৫	২৩	১৩
১৯২৫-২৬	২৩	১৯
১৯২৬-২৭	২৫	২২
১৯২৭-২৮	২৬	১৯
১৯২৮-২৯	২৪	১৪

দক্ষিণ আমেরিকার বৈদেশিক ঋণ

অতি অল্প দিন হইতে দক্ষিণ আমেরিকার রিপাবলিকগুলির অর্থনৈতিক প্রগতি আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই সমস্ত দেশ শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে অতি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। শিল্প-বাণিজ্যের প্রকৃত উন্নতি বিধানের জন্য আবশ্যকীয় পুঁজি কিন্তু এই সমস্ত দেশে আদৌ নাই। এমন কি অতি প্রয়োজনীয় পূর্ত্তকার্য্যাদির মত সাধারণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য আবশ্যকীয় অর্থেরও এই সমস্ত দেশে দারুণ অভাব। ফলে দক্ষিণ আমেরিকাকে আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেন কারবারের কেন্দ্রগুলির নিকটে হাত পাতিতে হইয়াছে। বিদেশ হইতে কর্জ্জকরা অর্থ দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে বাজেটের ঘাটতি পূরণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থায়ী পাবলিক ওয়ার্কসের জন্য এই সমস্ত বিদেশী অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যয়ে সেরূপ আশু ফললাভ কিছুই হয় নাই। তবে ইহার ফলে দক্ষিণ আমেরিকার রিপাবলিকগুলির যে সাধারণ আর্থিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদেশী পুঁজির গুণাগুণ

লড়াইয়ের পূর্ব্ব হইতেই দক্ষিণ আমেরিকা বৈদেশিক পুঁজিওয়ালাদের নিকট মাথা নত করিয়াছিল। লড়াইয়ের মধ্যে এবং লড়াইয়ের অব্যবহিত পরে যখন এই বিদেশী পুঁজির আমদানি বন্ধ হইয়া যায়, তখন দক্ষিণ আমেরিকা কম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় নাই। ব্যবসা বাণিজ্য এবং পূর্ত্তকার্য্য সমস্তই একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। যুদ্ধের ফলে ইউরোপ হইতে পুঁজি পাওয়ার আশা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিকে মার্কিণের দ্বারস্থ হইতে হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে মার্কিণ এক কপর্দ্দকও পুঁজি যোগায় নাই, কিন্তু এখন নিউইয়র্কই দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান বা একমাত্র পুঁজির বাজারে পরিণত হইয়াছে। অল্প দিন হইতে লণ্ডনও এই অঞ্চলে আবার পুঁজি যোগাইতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার বৈদেশিক ঋণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

দক্ষিণ আমেরিকায় রাষ্ট্র, প্রদেশ এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ক্রমশঃ ঋণের বহর বাড়াইয়াই চলিতেছে। ১৯১২ সনের তুলনায় ১৯২৮ সনে দক্ষিণ আমেরিকার ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াছে ১১২ কোটী ডলার। এই পুঁজি কেবল মাত্র নিউইয়র্কই যোগাইয়াছে। নিম্নের তালিকায় দক্ষিণ আমেরিকার ১৯১২ এবং ১৯২৮ সনের ঋণের তুলনামূলক পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

দক্ষিণ আমেরিকার বৈদেশিক ঋণ

(জাতীয়, প্রাদেশিক এবং মিউনিসিপ্যাল)

	ইউরোপ ১৯১২, ৩১শে ডিসেম্বর (ডলার)	ইউরোপ ১৯২৮, ৩১শে ডিসেম্বর (ডলার)	যুক্তরাষ্ট্র ১৯২৮, ৩১শে ডিসেম্বর (ডলার)	মোট (ডলার)
আর্জেন্টিনা	৪০১,০১৭,০০০	২৯২,৬৩৯,০০০	৩৭৭,৯৬৭,০০০	৬৭০,৬০৬,০০০
বলিভিয়া	—	—	৬১,৩০৯,০০০	৬১,৩০৯,০০৯
ব্রেজিল	৫৬৪,৪৭৪,০০০	৭৫০,৯৬৫,০০০	৩২৬,০৫১,০০০	১,০৭৭,০১৬০০০
চিলি	১৭৫,৪২৫,০০০	১৪১,১০৫,০০০	১৪৬,৩৯৯,০০০	২৮৭,৫০৪,০০০
কলম্বিয়া	১২,৮৩৭,০০০	১০,১৪৪,০০০	৫৯,৩৯২,০০০	৬৯,৫৩৬,০০০
ইকুয়াদোর	৫৮৭,০০০	৩৪৫,০০০	৫০৬,০০০	৮৫১,০০০
পারাগোয়ে	৩,৭১৩,০০০	৪,৩৪৩,০০০	—	৪,৩৪৩,০০০
পেরু	৮,৫২৫,০০৯	১৭,৮১৩,০০০	৮৯,৩৫৩,০০০	১০৭,১৬৬,০০০
উরুগোয়ে	১২৮,৫৬৮,০০০	১০৫,৯১৬,০০০	৪৭,৪৯৬,০০০	১৫৩,৪১২,০০০
ভেনিজুয়েলা	২০,৮৯৬,০০০	৬,২৩৯,০০০	—	৬,২৩৯,০০০
মোট	১,৩১৫,০৪২,০০০	১,৩২৯,৫০৯,০০০	১,১০৮,৪৭৩,০০০	২,৪৩৭,৯৮২,০০০

এই তালিকায় প্রত্যেক রিপাবলিকের এবং গোটা দক্ষিণ আমেরিকার সরকারী বৈদেশিক দেনার পরিচয় দেওয়া হইল। ১৯১২ সনে একমাত্র ইউরোপই এই সমস্ত দেশের উত্তমর্ণ ছিল এবং সমগ্র ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৩০ কোটী ডলার।

নয়া কর্জ্জের বাজারের পরিচয়

১৯২৮ সনে দক্ষিণ আমেরিকার সরকারী ঋণের পরিমাণ ২২৪ কোটী ডলার। ইউরোপ গড়ে এই ঋণের অর্দ্ধেকের ভাগীদার এবং অপর অর্দ্ধেকের ভাগীদার যুক্তরাষ্ট্র। বর্ত্তমানে ইউরোপের সিকার বাজারের অবস্থা নিশ্চল, সুতরাং নূতন পুঁজি যোগাইয়াছে প্রকৃতপক্ষে নিউইয়র্ক। কেবলমাত্র ব্রেজিল দেশটী ইউরোপ হইতে নূতন পুঁজি পাইয়াছে। লণ্ডন ব্রেজিলকে প্রায় ২০ কোটী ডলার ঋণ দান করিয়াছে, কিন্তু ইউরোপের নিকট অন্যান্য দেশের ঋণের বহর কমিয়াছে।

নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইল উহাতে দক্ষিণ আমেরিকায় নূতন ও পুরাতন কর্জ্জের বাজারের তুলনামূলক পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

১৯১২ সন ও ১৯২৯ সনের তুলনামূলক তালিকা

(+বৃদ্ধি ; —হ্রাস)

	ইউরোপ (ডলার)	যুক্তরাষ্ট্র (ডলার)	১৯২৮ সনের মোট (ডলার)
আর্জেন্টিনা	—১০৮,৩৭৮,০০০	+৩৭৭,৯৬৭,০০০	+২৬৯,৫৮৯,০০০
বলিভিয়া	—	+ ৬১,৩০৯,০০০	+ ৬১,৩০৯,০০০

	ইউরোপ (ডলার)	যুক্তরাষ্ট্র (ডলার)	১৯২৮ সনের মোট (ডলার)
ব্রেজিল ...	+১৮৬,৪৯১,০০০	+৩২৬,০৫১,০০০	+৫১২,৫৪২,০০০
চিলি ...	— ৩৪,৩২০,০০০	+১৪৬,৩৯৯,০০০	+১১২,০৭৯,০০০
কলম্বিয়া ...	— ১,৬৯৩,০০০	+ ৫৯,৩৯২,০০০	+ ৫৭,৬৯৯,০০০
ইকোয়াদোর ...	— ২৪২,০০০	+ ৫০৬,০০০	+ ২৬৪,০০০
পারাগোয়ে ...	+ ৬৩০,০০০	—	+ ৬৩০,০০০
পেরু ...	+ ৯,২৮৮,০০০	+ ৮৯,৩৫৩,০০০	+ ৯৮,৬৪১,০০০
উরুগোয়ে ...	— ২২,৬৫২,০০০	+ ৪৭,৪৯৬,০০০	+ ২৪,৮৪৪,০০০
ভেনিজুয়েলা ...	— ১৪,৬৫৭,০০০	—	— ১৪,৬৫৭,০০০
মোট	+ ১৪,৪৬৭,০০০	+১,১০৮,৪৭৩,০০০	+১,১২২,৯৪০,০০০

এই তালিকা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ইউরোপের স্থান ক্রমে ক্রমে যুক্তরাষ্ট্র দখল করিয়া লইয়াছে।

দেশ হিসাবে ঋণের পরিমাণ

দক্ষিণ আমেরিকার রিপাবলিকগুলির বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ যে ঐ সমস্ত দেশের লোক-সংখ্যার অনুপাতে নহে নিম্নের তালিকা দেখিলেই ইহা উপলব্ধি হইবে।

মাথাপিছু ঋণ (১৯২৮)

(জাতীয়, প্রাদেশিক এবং মিউনিসিপ্যাল)

দেশ	মোট ঋণ (ডলার)	লোক-সংখ্যা	মাথাপিছু ঋণ
আর্জ্জেন্টিনা	৬৭,৬০৬,০০০	১০,৯২২,০০০	ইউ, এস ৬১.৪০
বলিভিয়া	৬১,৩০৯,০০০	৩,৬০০,০০০	১৭.০৩
ব্রেজিল	১,০৭৭,০১৬,০০০	৩৮,৫০০,০০০	২৭.৯৭
চিলি	২৮৭,৫০৪,০০০	৪,৪০০,০০০	৬৫.৩৪
কলম্বিয়া	৬৯,৫৩৬,০০০	৮,১০০,০০০	৮.৫৮
ইকোয়াদোর	৮৫১,০০০	২,১০০,০০০	০.৪০
পারাগোয়ে	৪,৩৪৩,০০০	৮৫০,০০০	৫.১১
পেরু	১০৭,১৬৬,০০০	৬,৩০০,০০০	১৭.০১
উরুগোয়ে	১৫৩,৪১২,০০০	১,৮০০,০০০	৮৫.২৩
ভেনিজুয়েলা	৬,২৩৯,০০০	৩,১০০,০০০	" ২.০১
মোট	২,৪৩৭,৯৮২,০০০	৭৯,৬৭২,০০০	ইউ, এস ৩০.৬০

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ০.৪০ ডলার হইতে ৮৫.২৩ ডলার। উরুগোয়ের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ সব চেয়ে বেশী এবং ইকুয়াদোরের সব চেয়ে কম। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ অব্ ব্রেজিলের লোক-সংখ্যা সব চেয়ে বেশী, ঋণের পরিমাণও সব চেয়ে বেশী; কিন্তু লোকসংখ্যা ৩৮৫ লক্ষ থাকায় জনপ্রতি ঋণের পরিমাণ ২৭.৯৭ ডলার অর্থাৎ গোটা দক্ষিণ আমেরিকার মাথাপিছু গড়ের প্রায় সমান। অন্য পক্ষে চিলি এবং আর্জ্জেন্টিনার জনপ্রতি ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৫.৩৪ ডলার এবং ৬১.৫০ ডলার। সুতরাং এই দুই দেশ সর্ব্বোচ্চ ঋণগ্রস্ত দেশগুলির কোঠায় পড়িয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির এই ভিন্ন ভিন্ন ঋণভার দেখিয়া বুঝা যায় কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি কিভাবে চলিয়াছে; ঐ সমস্ত দেশের অধিবাসীর কর্ম্মতৎপরতাই বা কিরূপ এবং বিদেশের সিক্কার বাজারে ঐ সমস্ত দেশের ক্রেডিটই বা কিরূপ জন্মিয়াছে।

সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির জনপ্রতি গড় ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩০ ডলার। উরুগোয়ে, আর্জ্জেন্টিনা

এবং চিলি,—এই তিনটী দেশের ঋণ এই গড় ঋণের অনেক বেশী—প্রায় দ্বিগুণ। জন-বহুল ব্রেজিল দেশটার ঋণ, এই গড়ের কিছু কম—২৮ ডলারের কাছাকাছি। অন্যান্য রিপাবলিকের গড় ঋণ এই গড়ের প্রায় অর্দ্ধেক বা তাহারও অনেক নীচে। পেরু এবং বলিভিয়া রাজ্যের জনপ্রতি গড় ঋণ ১৯২৮ সনে ১৭ ডলার। লড়াইয়ের পূর্ব্বে এই দুই রাষ্ট্র একরূপ কর্জ্জ করে নাই বলিলেই হয়। এই দুই দেশকে কর্জ্জ দাদন করিয়াছে প্রধানতঃ নিউইয়র্ক। ১৯১২ সনে পেরু ইউরোপের নিকট অতি অল্প ঋণ করিয়াছিল, বলিভিয়া কিন্তু আদৌ করে নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশগুলির ঋণের অঙ্ক দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, ঐ সমস্ত দেশগুলির প্রত্যেকটীর আর্থিক হালচাল কিরূপ এবং আন্তর্জ্জাতিক সিকার বাজারে ঐগুলির ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতাই বা কিরূপ জন্মিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকার ঋণের একাল ও সেকাল

দক্ষিণ আমেরিকার ঋণ-সম্পর্কে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার মত আছে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির অবস্থা সমস্তই একরূপ নহে, সুতরাং সমগ্র দেশগুলির ঋণের অবস্থা এবং সর্ত্ত যে একই রূপ হইবে সেরূপ আশা করা ভুল। তবে লড়াইয়ের পূর্ব্বের এবং পরের অবস্থার মধ্যে একটা মস্ত সামঞ্জস্য আছে দেখা যায়। লড়াইয়ের আগে একশ' বা তাহার কাছাকাছি কর্জ্জ দাদন করিয়া ৫% হিসাবে সুদ আদায় করার ব্যবস্থা ছিল। লড়াই বাধিবার কিছুকাল আগে, একশ'এর স্থানে ৯০।৯৫ হিসাবে কর্জ্জদান করিয়া সুদ লওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ৪॥%। যে সমস্ত রিপাবলিক, প্রদেশ বা মিউনিসিপালিটীর অবস্থা খারাপ ছিল সেগুলির নিকট ১% হইতে ১॥% অতিরিক্ত সুদ আদায় করা হইয়াছে।

যুদ্ধের অবসানে কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপের বাজার লড়াইয়ের পর বন্ধ হইয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার পক্ষে অল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করিবার পন্থাও রুদ্ধ হইয়া যায়। এখন একমাত্র উত্তমর্ণ মার্কিণের নিউইয়র্ক। কিন্তু পূর্ব্বের মত আর সুবিধায় ঋণ জুটিয়া উঠিতেছে না। ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বের মত অবস্থা আর নাই। ১৯২১ হইতে ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার উন্নত দেশগুলির নিকট নিউইয়র্ক ৭% হইতে ৭॥% হারে কর্জ্জ দাদন করিয়াছে। এবং অবনত রাষ্ট্রগুলির নিকট একশ'র কাছাকাছি বণ্ড গ্রহণ করিয়া ৮% হারে কর্জ্জদাদন করিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে শতকরা ৯৫ হারে ঋণদান করিয়া উন্নত রাষ্ট্রগুলির নিকট ৬% হারে সুদ আদায় করিবার ব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, এবং অবনত রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সুদের হার দাঁড়াইয়াছে ৭%। লড়াইয়ের পর সিকার বাজারে এই যে চড়া হারে সুদ লইবার প্রথা কায়েম হইয়াছে তাহার অবশ্য কারণ আছে। দুনিয়া জুড়িয়া সর্ব্বত্র স্থায়ী ভাবে খাটাইবার মত পুঁজির অভাব দৃষ্ট হইয়াছে। এই অভাবের জন্য দক্ষিণ আমেরিকার কষ্ট বাড়িয়াছে অত্যন্ত বেশী। কারণ এই সমস্ত দেশের আর্থিক উন্নতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে, সর্ব্বত্র মাল উৎপন্ন হইতেছে যথেষ্ট, কিন্তু মাল চালান দিবার জন্য যথেষ্ট যানবাহনের ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্ট এইজন্য দারুণ পুঁজির অভাব অনুভব করিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্বত্র রেলসড়ক বা অন্যান্য প্রকার যানবাহনের অভাব দেখা যায়। লড়াইয়ের পরে এই সমস্ত দেশের ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নতি হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং অবিলম্বে যানবাহনের উপায় করার দরকার।

আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বর্ত্তমানের উত্তমর্ণগণ দক্ষিণ আমেরিকার নিকট কর এবং শুল্ক ব্যবস্থা প্রতিভূ লইয়া ঋণ আদায় করিবার সুরাহা করিয়া লইতেছে। বড় বড় রিপাবলিকগুলি এখন এ সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত। তবে অবনত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যেগুলির রাজনৈতিক অবস্থা এখনও সাম্যাবস্থায় উপনীত হয় নাই, সেইগুলির নিকট এইরূপ গ্যারাণ্টি বা প্রতিভূ এখনও লওয়া হইতেছে।

গবর্মেণ্ট ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার অনেক বে-সরকারী শিল্প-ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানও বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি আরব্ধ হইয়াছে এবং উৎপাদনও বাড়িয়াছে যথেষ্ট। দেশগুলির

এই সার্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্ত গবর্ণমেণ্টগুলিকেও নানাবিধ পূর্ত্তকার্য্যে লিপ্ত হইতে হইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক পুঁজির বাজারের মধ্যে নিউইয়র্কই এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুনিয়ার যেখানে পুঁজির টান পড়িতেছে সেখানেই এই বাজার হইতে পুঁজি সংগ্রহের চেষ্টা করা হইতেছে। অনেক দেশের পক্ষে বিদেশী পুঁজি একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিরই পুঁজির টান অত্যন্ত বেশী। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক পুঁজির বাজারে টানও খুব পড়িয়াছে এবং সর্ব্বত্রই চড়া হারে সুদ লওয়ার রেওয়াজ কায়েম হইয়া পড়িয়াছে।

১৯২৯ সনের আর্থিক অবস্থা

আর্থিক অবস্থার অস্বাভাবিকতা

১৯২৯ সন অনেক দিক্ দিয়া একটী উল্লেখযোগ্য বৎসর। এই সনের একটী বিশেষত্ব সিক্কার দুর্ম্মূল্যতা; কারণ পাঁচ পাঁচ বার ব্যাঙ্ক-হারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। একবার এই হার চড়িয়া গিয়া ৬½% পর্য্যন্ত দাঁড়ায়। আমেরিকান ষ্টক এক্‌স্‌চেঞ্জের বাজারে নানারূপ উদ্ভট জল্পনা-কল্পনাই এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ। নিউইয়র্কের কর্জ্জের বাজারে কিছুদিন ধরিয়া দালালগণকে কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছিল ৮% হইতে ১৫% পর্য্যন্ত হারে। সময়ে সময়ে দালালদের ২০% পর্য্যন্ত সুদ টানিতে হইয়াছে। ইহার ফলে ইউরোপের বড় বড় পুঁজির বাজার হইতে নিউইয়র্কে পুঁজি চালান যাইতে থাকে। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি আপন আপন স্বর্ণের রিজার্ভ বাঁচাইয়া রাখিবার জন্ত অনবরত ডিস্কাউণ্টের হার বাড়াইতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে নিউইয়র্কের সিক্কার বাজারের এই অতি অস্বাভাবিক স্ফীতির ফলে বছরের শেষের দিকে লণ্ডনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। নিউইয়র্কে সুদের হারও নামিয়া যায়। চড়া হারে সুদ পাইবার আশায় ইউরোপের পুঁজির কেন্দ্রগুলি হইতে যে গাদায় গাদায় পুঁজি চালান যাইতেছিল তাহার গতি আবার ফিরিয়া যায়। এমন কি জাহাজ বোঝাই হইয়া সোনা আবার ইউরোপে আসিতে থাকে। নিউইয়র্কে সুদের হার কমিবার জন্ত অন্তান্ত পুঁজির কেন্দ্রের অবস্থা খারাপ হইয়া যায় বটে, কিন্তু লণ্ডনের সুবিধা হইয়া যায়। পরিবর্ত্তন এতদূর গড়ায় যে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে বিলাতী ব্যাঙ্কের হার তিন তিনবার কমিয়া যায়।

বৎসরের আর একটী বিশেষত্ব—ইয়ংপ্ল্যান

এই বৎসরে শ্রমিক সরকার আবার বিলাতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কায়েম হন। জার্ম্মাণির যুদ্ধক্ষতি পূরণের জন্ত নূতন মোসাবিদা করা হয়। এই মোসাবিদা ইয়ংপ্ল্যান নামে পরিচিত হইয়াছে। নিউইয়র্কের অস্বাভাবিক আর্থিক অবস্থার জন্ত কেবল যে সিকিউরিটির মূল্য কমিয়া যায় তাহা নহে, লণ্ডনকেও ইহার অল্পবিস্তর ফলভোগ করিতে হয়। আরও অনেক পুঁজির কেন্দ্রের দুর্ব্বলতা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হইয়া উঠে।

শেয়ার মার্কেটের দুর্দ্দশা

সম্প্রতি এক নূতন ধরণের পুঁজি-ব্যবসায়ীর উদ্ভব হইয়াছে। ১৯২৮ সনে এবং তাহার পর হইতে শিল্প-সংক্রান্ত শেয়ার মার্কেটে কারবারের ভীষণ ভিড় লাগিয়া যায়। এই সমস্ত নূতন ব্যবসায়ী এই অবসরে অনেক নূতন নূতন কোম্পানী এবং কারবার ফাঁদিয়া বসে। ইহারা অতি অল্প মূল্যে শেয়ার ছাড়িবার ব্যবস্থা করে, ফলে অনেকে প্রলুব্ধ হইয়া শেয়ার কিনিতে থাকে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। দু'দিনের মধ্যে এই ব্যবস্থার অসারতা প্রতিপন্ন হইয়া যায়; ফলে আলোচ্য সনের শেষে ষ্টক এক্‌স্‌চেঞ্জের বাজারে ভীষণ ভাটা দেখা দেয়। উদ্ভট রকমের কল্পনার ফলস্বরূপ শেয়ারের দাম অসম্ভবরূপে নামিয়া যায়।

সিক্কার বাজার

১৯২৭ সনের ২১শে এপ্রিল হইতে ব্যাঙ্কের হার দাঁড়ায় ৪½%। গোটা ১৯২৮ সন ধরিয়া এই অবস্থাই বাহাল থাকে। ১৯২৯ সনও আরম্ভ হয় এই অবস্থার মধ্যে। আমেরিকা এবং জার্ম্মাণিতে সোনা তুলিয়া লইয়া যাওয়ার জন্ত ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের সোনার ষ্টক্ কমিয়া ১৫০,০০০,০০০ পাউণ্ডে

পরিণত হয়। সুতরাং ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ব্যাঙ্কের হার ৪॥% হইতে ৫॥% এ পরিণত হয়। কিন্তু ইহা সত্বেও আমেরিকার সোনার চাহিদা সমান তালে চলিতে থাকে। বৎসরের শেষের দিকে ফ্রান্স দেশও আশঙ্কার স্থল হইয়া পড়ে। আমেরিকার সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের দেনা চুকাইবার জন্য এই দেশ লণ্ডন হইতে গচ্ছিত সোনার কিয়দংশ তুলিয়া লয়। সুতরাং লণ্ডনকে এই দুইটী শক্তিশালী দেশের সোনার চাহিদা পুরণ করিতে হয়। আমেরিকায় সিক্কার হার চড়িয়া যাওয়ায় জার্ম্মাণিকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিছুকাল ধরিয়া জার্ম্মাণিও লণ্ডন হইতে অনেক সোনা তুলিয়া লইতে থাকে।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের ডিরেক্টারগণ কিন্তু আর ব্যাঙ্কের হার চড়ান নাই। আমেরিকায় সোনার চাহিদা আস্তে আস্তে কমিতে থাকে, ফ্রান্স কিন্তু সোনা টানিতে থাকে অসম্ভবরূপে। সুতরাং অবস্থা ভীষণ হইয়া পড়ে। এক দিকে ফ্রান্সে সোনার টান, আর এক দিকে আমেরিকায় জল্পনা-কল্পনার ফলে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক অবস্থার টলটলায়মান ভাব, এই দোটানায় পড়িয়া বিলাতের অর্থনৈতিক ধুরন্ধরগণ একরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে বাধ্য হইয়া ব্যাঙ্কের হার চড়াইয়া দিয়া ৬॥% করিতে হয়। নিউইয়র্কের ষ্টকের বাজার হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ইউরোপের বড় বড় এক্সচেঞ্জগুলিকে ইহার ফল ভোগ করিতে হয়।

ব্যাঙ্কহারের ক্রমিক হ্রাস

ব্যাঙ্কের হার ৬॥% করায় সোনার ষ্টক কমিয়া গিয়া ১৩১,০০০,০০০ পাউণ্ড দাঁড়ায়। হার আরও কমাইয়া দিয়া দেখা যায় অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। ক্রমে ব্যাঙ্কের হার ৬% হইতে ৩১শে অক্টোবর ৫॥% এবং ১২ই ডিসেম্বর ৫%এ পরিণত হয়। আমেরিকার ষ্টক এক্সচেঞ্জে উদ্ভট জল্পনা-কল্পনার আবির্ভাব হওয়ায় বিলাতকে বাধ্য হইয়া এই নীতি অবলম্বন করিতে হয়, এবং ইহাতে ফলও পাওয়া যায়। সুতরাং ১৯২৯ সনের শেষের দিকে অবস্থা ভালই দাঁড়ায়। গ্রীষ্মকালে এবং হেমন্তকালে কিন্তু অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। সুদের হার বেশ কমিয়া যায়, এবং ইয়োরোপের দেশগুলি বিলাতের দেখাদেখি সরকারী ডিস্কাউন্টের হার কমাইয়া দেয়।

সিক্কার গড় হার

নিম্নের তালিকায় লণ্ডনের সিকা এবং বিলের গড় দৈনিক মূল্যের ১৯২৯ এবং ১৯২৮ সনের তুলনামূলক পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

গড় দৈনিক হার

	ব্যাঙ্কের হার (শতকরা)			ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখার হার (শতকরা)			৭ দিনের কর্জ্জ (শতকরা)			৩ মাসের বিল (শতকরা)		
	পা	শি	পে	পা	শি	পে	পা	শি	পে	পা	শি	পে
১৯২৯	৫	৯	১১	৩	৯	১১	৪	১১	২	৫	৫	৩
১৯২৮	৪	১০	০	২	১০	০	৩	১১	০	৪	৩	১
পার্থক্য	০	১৯	১১	০	১১	১১	১	০	২	১	২	২

নয়া পুঁজি এবং চেক পরিশোধ

১৯২০ সনের আর্থিক অবস্থার অস্বাভাবিকতার জন্য নয়াপুঁজি দাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। মিড্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক হইতে প্রকাশিত ষ্ট্যাটিষ্টিক্সএ প্রকাশ, এই সনে নয়াপুঁজির পরিমাণ ২৫৩,৭৪৯,০০০ পাঃ। ১৯২৮ সনে ৩৬২,৫১৯,০০০ পাঃ নূতন পুঁজি বাহির হইয়াছিল এবং ১৯২৭ সনে ৩১৪,৭১৪,০০০ পাঃ। আলোচ্য সনের প্রথমার্দ্ধে নয়াপুঁজির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৯৫,৫৪৪,০০০ পাঃ। শেষের ছয় মাসে কিন্তু নয়াপুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৫৮,২০৫,০০০ পাঃ। আর্থিক জগতের এই অধোগতি সত্বেও কিন্তু লণ্ডনের ব্যাঙ্কার্স ক্লিয়ারিং হাউসের কারবার অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। এতদিন পর্য্যন্ত ধারণা ছিল ১৯২৮ সন এই হিসাবে সর্ব্বোচ্চ। ১৯২৯ সন এই সনকেও হারাইয়া দিয়াছে। আলোচ্য সনে মোট চেক পরিশোধের পরিমাণ ৪৪,৮৯৬,৬৭৭,০০০ পাঃ। ১৯২৮ সনের তুলনায় এই সনে চেক পরিশোধ বেশী

৬৯১,৯৪৮,০০০ পাঃ অর্থাৎ ১'৫% বেশী। এই চেক পরিশোধ বৃদ্ধির কারণ অল্প মেয়াদের কর্জ্জের বাজারের দৈনিক কারবার বৃদ্ধি।

রৌপ্যের মূল্য-হ্রাস

আলোচ্য সনের ডিসেম্বর মাসে রৌপ্যের দর অত্যন্ত কমিয়া যায়। ১৯০৩ সনের জানুয়ারী হইতে রৌপ্যের দর আর কখনও এত কমে নাই। রৌপ্যের দর দাঁড়ায় ২১১/১৬ পেঃ স্পট এবং ২১৫/৮ পেঃ আউন্স ফরোয়ার্ড। ১৯২৪ সন হইতে রৌপ্যের দর ক্রমাগত কমিয়া আসিতেছে, এবং ১৯২৮ সনে এই হ্রাস সর্ব্বনিম্ন সীমায় উপনীত হয়। ১৯২৯ সনে একেত রৌপ্যের উৎপাদনই অত্যন্ত কম হইয়াছিল তাহার উপর আবার ভারত, বিলাত এবং ফ্রান্সে অত্যধিক পরিমাণে রৌপ্য চালান যায়। এই জন্যই রৌপ্যের বাজারের অধোগতি দাঁড়ায় এবং চীন দেশের কতকগুলি বাজারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে।

বিলাতের সরকারী আয়

১৯২৯ সনে সিকার দুর্ম্মূল্যতার জন্য বিলাতের বিরাট দেনা, বিশেষতঃ ট্রেজারিবিলরূপী দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করিবার জন্য বিলাতকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। সরকারী ঋণের সুদ কমাইবার চেষ্টাও সফল হয় নাই সিকার দুর্ম্মূল্যতার জন্য। ১৯২৯ সনের সরকারী বাজেট বিলাতবাসীর নিকট সন্তোষজনক। এই সনে চায়ের উপর শুল্ক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়, এইজন্য আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করা হয় সমগ্র বৎসরের পক্ষে ৬,২০০,০০০ পাঃ। তবে কর্জ্জ পরিশোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশের মধ্যে অল্পবিস্তর বাক্-বিতণ্ডার আবির্ভাব হয়। আলোচ্য সনে মোট সরকারী আয় ৭৪৬,০৬০,০০০ পাঃ মোট ব্যয় ৭৪১৯৬৪০০০ পাঃ; সুতরাং উদ্বৃত্ত হয় ৪,০৯৬,০০০ পাঃ। বৎসরের শেষভাগে গভর্মেণ্ট সমাজের নানাপ্রকার হিতসাধন করিবার জন্য একটি মোসাবিদা স্থির করিয়াছেন, এজন্য আরও খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে। ট্রেজারি বিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০৪,০০০,০০০ পাঃ। সুতরাং নূতন করিয়া ঋণগ্রহণ করা মুস্কিল ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

সমাজের হিত-সাধন ব্যাপারে ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য এবং ১৯৩০ সনের প্রারম্ভে কয়েকটী ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্য ৫% হারে ঋণ লইবার কথা স্থির হয়। এই ঋণের পরিমাণ অনির্দ্দিষ্ট রাখা হয় এবং ঋণের জন্য ঋণ দাতাকে ১০০% করিয়া দিতে হইবে স্থির হয়। এই সময়ে সুদের বাজার অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইলেও গবর্মেণ্ট যে এই হারে সুদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত উদারতার কথা বলিতে হইবে। ইহার ফলে অন্যান্য সরকারী ঋণের পক্ষে বাজার অত্যন্ত মন্দা হইয়া যায়। ১৯৩০ সনের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে ৩ কোটী পাউণ্ড মূল্যের ট্রেজারি বণ্ড এবং এক্সচেকার বণ্ডের পরিশোধের সময় উপস্থিত হয়। এক্সচেকারের চ্যান্সেলার অর্থের টানাটানির জন্য অবস্থা যে কিরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারেন। সুতরাং তিনি শতকরা ½% কম হারে ৩০,০০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করেন।

পুরাতন ঋণের পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর সাধনের জন্যই এই নয়া কর্জ্জ-গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৩০ সনের ১৫ই জানুয়ারী হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শতকরা একশ হিসাবে ৫% ওয়ার লোন হোল্ডারগণকে তাহাদের ঋণ বদলাইয়া লইবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। ৫½% ট্রেজারি বণ্ড মে মাসের শেষে পরিশোধের কথা। বণ্ড প্রতি শতকরা ১৫ শিঃ হিসাবে ক্যাশ দিয়া এই সমস্ত বণ্ডও ৫% হারের নূতন কর্জ্জে পরিণত করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। এই ব্যবস্থা সন্তোষজনক প্রমাণিত হইয়াছে। সর্ব্বতোমুখী আর্থিক দুরবস্থার সময়ে এই ব্যবস্থা রীতিমত উদার বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে।

ষ্টক এক্সচেঞ্জ

১৯২৯ সনে ষ্টকের বাজারেও নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন দেখা দেয়। সিকার দুর্ম্মূল্যতা ইহার একটা কারণস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। ১৯২৮ সনে নূতন নূতন কোম্পানীর

শেয়ার প্রভূত পরিমাণে বিক্রী হইয়াছিল। ১৯২৯ সনে কিন্তু নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিয়া শেয়ার বিক্রয় করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। এই সনে অনেক কোম্পানী একেবারে পুঁজিশূন্য হইয়া পড়ে। সুবিধাজনক আর্থিক অবস্থায় এই সমস্ত কোম্পানী লাভ দেখাইতে পারিলেও কঠিন অবস্থায় পড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। আর্থিক জগতে এমন সাংঘাতিক অবস্থা আর কখনও দেখা যায় নাই। বৎসরের শেষের দিকে আমেরিকার ষ্টক একস্‌চেঞ্জের দুর্দ্দশা ঘটায় অবস্থা কঠিনতর হইয়া পড়ে।

অবস্থা যে কি দাঁড়াইয়াছিল তাহা ব্রোকারগণকে দেয় কর্জ্জের সুদের হার দেখিলেই বুঝা যাইবে। এই সুদের হার সাধারণতঃ শতকরা ৮ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত দাঁড়ায়। সময়ে সময়ে এই হার শতকরা ২০ পর্য্যন্ত ঠেকিয়াছে। উদ্ভট জল্পনা কল্পনার ফলে ষ্টক মার্কেটের অবস্থা যে কি ভীষণ হইয়াছে তাহা আরও পরিষ্কার বুঝা যাইবে ব্রোকারদের মোট দেনার পরিমাণ দেখিয়া। এই দেনার পরিমাণ ১,৩৭০,৮০০,০০০ পাঃ অর্থাৎ বিলাতের লড়াইয়ের পূর্ব্বের জাতীয় দেনার দ্বিগুণেরও বেশী।

ষ্টক এক্স্‌চেঞ্জের এই দারুণ অবস্থায় ওয়াল ষ্ট্রীটে যে বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই বটে, কিন্তু ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলাণ্ডের ৬॥% হারের প্রভাব আমেরিকার জুয়াক্রীড়ক জনসাধারণের মনের উপর প্রচণ্ড আধিপত্য বিস্তার করে। বিক্রয় করিবার অর্ডারে শেয়ারের বাজার ভরিয়া যায় এবং শেয়ারের দামও অত্যন্ত কমাইয়া দেওয়া হয়। মাত্র একদিনে ২৯শে অক্টোবর তারিখে নিউ-ইয়র্কের ষ্টক এক্‌স্‌চেঞ্জে শেয়ার বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩,৪৮৫,৩০০। কিছুদিন ধরিয়া এক ভীষণ আশঙ্কার অবস্থা চলিতে থাকে। ইউরোপের বড় বড় পুঁজির কেন্দ্রে শেয়ারের দাম ভীষণ কমিয়া যায়। লণ্ডনকে নানা দিক্‌ হইতে আগত লিকুইডেশানের তাল সামলাইতে হয়। আমেরিকার সিকিউরিটি সম্বন্ধে বিলাতের জনসাধারণের যদিও সেরূপ মুখ্য স্বার্থ কোনকালেই নাই, তবুও নিউইয়র্কের বুল মুভমেণ্ট একদম ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়ায় লণ্ডনকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। এই খাতে ক্ষতিও হয় অনেক। ক্ষতিপূরণের জন্য, অর্থাৎ সময়মত দালালদের কর্জ্জ শোধ করিবার জন্য নানাপ্রকার সিকিউরিটি বেচিয়া ফেলিতে হয়। এই সমস্ত সিকিউরিটিগুলির অনেকক্ষেত্রে এই ব্যাপারের সহিত কোন যোগাযোগও ছিল না। ফলে সিকিউরিটি সমূহের বাজার দর অত্যন্ত নামিয়া যায়।

এই সমস্ত সিকিউরিটির মধ্যে অনেক বিলাতী ব্যাঙ্ক এবং ইনসিউরেন্স কোম্পানীর শেয়ার এবং অনেক ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টের ষ্টক আছে। এই সমস্ত বস্তুর বাজারদর নামিয়া যাওয়ায় বৎসরের শেষের দিকে অবস্থা অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃত ক্ষতির ইয়ত্তা করা সুকঠিন ব্যাপার। ব্যাঙ্কার্স ম্যাগাজিনে যে ৩৬৫ প্রকার রিপ্রেজেণ্টেটিভ সিকিউরিটির উল্লেখ আছে সেইগুলির দর নামিয়া যায় প্রায় ৩৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯২৮ সনের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে এই সমস্ত সিকিউরিটির (হাজার হাজার সিকিউরিটির মধ্যে মাত্র কয়েক শত) বাজারদর ছিল ৭,০৬৯,৬০৩,০০০ পাঃ; পক্ষান্তরে ১৯২৯ সনের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের মূল্য ৬,৭১৯,৮২৮,০০০ পাঃ। ১৯২৭ সনের জুলাই মাসের পর হইতে ১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসের দরই সর্ব্বনিম্ন।

যাহা হউক, এহেন দুর্ব্বৎসরেও লণ্ডন ষ্টক এক্‌স্‌চেঞ্জ কোনরূপে তাল সামলাইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ইহার গায়ে কোনরূপ আঁচড়ের দাগ দেখা যায় নাই। ইহা লণ্ডন ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের পক্ষে বাহাদুরির বিষয় সন্দেহ নাই। তবে হ্যাট্রি নামধেয় কোম্পানীগুলির এবং ওয়েকফিল্ড কর্পোরেশন ষ্টকের শেয়ার সমূহের মীমাংসাকরা সম্বন্ধে কোন দিন ধার্য্য করা সম্ভবপর হয় নাই। গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই-সকল শেয়ার এইরূপ আটকা পড়িয়া আছে। মোটের উপর ১৯২৯ সন ষ্টক এক্সচেঞ্জের পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। আর এমন দুর্ব্বৎসর ষ্টক এক্সচেঞ্জের জীবনেতিহাসে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে।

দি কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক

কার্ত্তিক সংখ্যা "আর্থিক-উন্নতি"তে দেখিলাম যে, লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক ও ইণ্ডো-বার্ম্মা ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক মাত্র সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিবার সুবিধার জন্য চেকের চলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কলিকাতার "দি কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ" এবং "বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ" এই দুই ব্যাঙ্কেও উক্তরূপ ব্যবস্থা আছে। আমাদের সুদের হার ৪½ টাকা। তা ছাড়া আমাদের সুবিধা এই যে, আমরা মাসের যে কোনোও দিনেই টাকা জমা দিলে তার সুদ দিয়া থাকি; অবশ্য প্রতি জমা ১০৲ টাকা হওয়া চাই। এই সুদ দৈনিক জমার উপর দেওয়া হয়।

এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে আমরা লোকের সহানুভূতি পাইতেছি। সবাই ইহা বিশেষ কার্য্যকর ও সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিতেছেন। এই সেভিংস ব্যাঙ্কের চেক্ অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহ চল্‌তি হিসাবের চেকের মতো গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী
ম্যানেজিং এজেণ্টস্, "দি কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ"

ময়মনসিংহে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি

বিগত ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ময়মনসিংহ ভূম্যধিকারী সভার এক অধিবেশনে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস, মহোদয় আহূত হইয়া সভ্যগণের সহিত কৃষি, গোজাতি ও স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদির উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার সারগর্ভ উপদেশে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মন্তব্য গৃহীত হয় যে, এ জেলায় নিম্নলিখিত কার্য্যসমূহ সাধনের জন্য প্রবল আন্দোলন প্রবর্ত্তন উদ্দেশ্যে যাহাতে সত্বর কার্য্যকর উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তজ্জন্য কর্ম্মপদ্ধতি প্রণয়নার্থ একটী সবকমিটী গঠিত হউক :—

(১) কৃষিকার্য্যের উন্নতি।

(২) গো-পালন ও গো-জাতির উন্নতি (কৃষিকার্য্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া)।

(৩) স্বাস্থ্য, আর্ত্তের প্রাথমিক সহায়তা, পরিবারে সেবাশুশ্রূষা, খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ, গৃহশিল্প, পারিবারিক মিতাচার এবং শিশু-মঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বয়স্কা নারীগণের শিক্ষা।

এই কমিটি বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন যে, এই উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য অন্যান্য উপায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত উপায় দুইটী অবলম্বিত হইতে পারে কিনা—

(১) শিক্ষা, প্রচার কার্য্য ও উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের জন্য একটী সাময়িক পত্র প্রকাশ।

(২) প্রচার ও প্রদর্শনী দ্বারা লোক-শিক্ষার জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ।

ইতালীতে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের ডিরেক্টার খ্যাতনামা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ইতালীর বিবিধ বিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভারতের অর্থনীতি ও ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইতেছে এবং তাঁহারা আগ্রহের সহিত অধ্যাপক সরকারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাসমূহ শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছেন। ইতালীর সংবাদপত্রসমূহ এই ভারতীয় অধ্যাপককে আন্তরিক ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

অধ্যাপক সরকার তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাই ইতালীয় ভাষায় প্রদান করিয়াছেন।

দার্জ্জিলিং প্লান্টার্স' অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা

গত ১৫ই মার্চ্চ তারিখে দার্জ্জিলিং ক্লাবে দার্জ্জিলিং প্লান্টার্স' অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কর্‌নেল লিট্‌ল। নিম্নে ইঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

১৯২৯ সনের অবস্থা

দার্জ্জিলিং জেলায় চা-উৎপাদনের পক্ষে ১৯২৯ সন মোটের উপর ভালই গিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া গড়ে যে পরিমাণ চা উৎপন্ন হইয়াছে ১৯২৯ সনে তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। ভবিষ্যতেও চা উৎপাদনের হার দার্জ্জিলিং জেলায় অপরিবর্ত্তনশীল থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। কারণ, প্রধানতঃ দুই উপায়ে উৎপাদন বাড়িতে পারে—প্রথমতঃ, আবাদ বাড়াইয়া, দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক প্রথার সাহায্যে। দার্জ্জিলিং অঞ্চলে এ দুইটীর কোনটীই সম্ভবপর নয়। কারণ জমি আর এক ছটাক পাওয়ার উপায় নাই। অন্য পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রথায় উৎপাদন বাড়াইতে গেলে চায়ের গুণ নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। প্রাকৃতিক উপায়েও উৎপাদন-বৃদ্ধির কোন আশা নাই। কারণ লাল মাকড়সা, মশা ও অন্যান্য নানা প্রকার ব্যাধি যদি কৃপা প্রদর্শন করিতে বিরত না হয়, তবে অতিরিক্ত উৎপাদন হইবে বলিয়া ভীত হইবার কোনই কারণ নাই।

১৯২৯ সনে চায়ের বাজার

১৯২৯ সনেও লণ্ডনের বাজারে দার্জ্জিলিং চা সমান আদরে বিকাইয়াছে। এজন্য দার্জ্জিলিং চা-বাগিচার সুযোগ্য ম্যানেজারগণকেই প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তাঁহারা দার্জ্জিলিং চায়ের গুণ রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট আছেন।

নীলামের বাজারে দেখা যায়, মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে দার্জ্জিলিং চায়ের মূল্যের উঠানামা হইতেছে। মূল্যের পরিবর্ত্তন চায়ের গুণাগুণের উপরেই যে নির্ভর করে তাহা নয়। গোটা দুনিয়ার চায়ের বাজারের যোগান এবং টানের উপরেই দার্জ্জিলিং চায়েরও মূল্য নির্ভর করে। তবে মোটের উপর আশা করা যায়, দার্জ্জিলিং চা যদি খারাপ না হইয়া পড়ে, তবে ইহার মূল্য কোনদিনই কমিবে না। গত দুই তিন বৎসর দার্জ্জিলিং চায়ের যে মূল্য-হ্রাস দেখা গিয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, দুনিয়ার সর্ব্বত্রই চায়ের দাম কমিয়া গিয়াছিল।

চায়ের বাজারের দুর্য্যোগের কারণ, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের জাভা এবং সুমাত্রা দ্বীপ। এই দুই দ্বীপে খারাপ চা প্রচুর উৎপন্ন হইয়া দুনিয়ার বাজার ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। এই চায়ের দামও খুব সস্তা। ইহার পাল্টা জবাবস্বরূপ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে ১৯২৯ সনে ১৯২৮ সনের চেয়ে ৩ কোটী পাউণ্ড বেশী চা উৎপন্ন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও অবস্থার কোনরূপ উন্নতি দেখা যায় নাই।

১৯৩০ সনে চা-উৎপাদন হ্রাসের প্রয়াস

অতিরিক্ত উৎপাদন বন্ধ করিবার মানসে ভারতবর্ষ, সিংহল এবং ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চা-করগণ মিলিত হইয়া একটী রফা করিয়া ফেলিয়াছিল। আশা করা যায়, এই সমঝোতার ফলে ১৯৩০ সনে গোটা দুনিয়ায় ১০% কম চা উৎপন্ন হইবে। নিকৃষ্ট চা যে হারে কমান হইবে উৎকৃষ্ট চা কমাইবার হার তাহার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম হইবে। যে সমস্ত বাগানে কি একরে ৪০০ পাউণ্ডের কম চা উৎপন্ন হয় সেগুলিতে উৎপাদন হ্রাস করা হইবে না। সুতরাং দার্জ্জিলিংএর চা-বাগিচাগুলির এই সমঝোতার ফলে বিশেষ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। সকলে মিলিত হইয়া এই যে উৎপাদন-হ্রাসের জন্য চেষ্টা করিতেছেন ইহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে। অতিরিক্ত মাত্রায় মাল মজুত না হইতে পাইলে উৎপাদনকারিগণ দু'পয়সা লাভ পাইবে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আসল প্রতিকার এ ব্যবস্থায় মিলা সম্ভবপর নয়। এই ব্যবস্থায় বড় জোর সাময়িক সুফল প্রসব করিতে পারে। উৎপাদন কমান ভাল ব্যবস্থা নয়। চাই

দুনিয়ায় চা-খোরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। দুনিয়ার চা-শিল্পের প্রকৃত মঙ্গল চা-খোরদের সংখ্যা-বৃদ্ধির উপরই নির্ভর করিতেছে।

চা-খোরের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য ইংরেজের মাথা-ব্যথা

চা-করগণের প্রতিষ্ঠিত টি-সেস্-কমিটি বলিয়া একটী প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠান বা সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য দেশ-বিদেশে চায়ের প্রচার। চা-প্রচারক সমিতিটি দুনিয়ার সর্ব্বত্র চা-খোরদের সংখ্যা-বৃদ্ধি করিবার জন্য উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়াছেন। মার্কিণ মুল্লুকে প্রচারের জন্য সমিতি ফি বৎসর ৫০ হাজার পাউণ্ড হিসাবে অর্থব্যয় করিতেছেন। এই প্রচারের ফলও দেখা গিয়াছে। দুনিয়ার এই বিশাল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী জাতটার মধ্যে চায়ের পিপাসা জাগাইতে পারিলে সমিতির অর্থব্যয় সার্থক হইবে বলিয়া মনে হয়।

জার্ম্মাণিতে চায়ের প্রচার

জার্ম্মাণদিগকে চা-খোর করিয়া তুলিতেও সমিতি চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য লণ্ডন কমিটি বার্ষিক ১০ হাজার পাউণ্ড বরাদ্দ করিয়াছেন। তিন বৎসরকাল এই ব্যয় করিবার কথা। সুতরাং আরও এক বৎসর এই অর্থব্যয় করা হইবে। এই প্রচারের ফলাফল সম্বন্ধে কলিকাতায় এখনও বিশেষ কিছু টের পাওয়া যায় নাই। তবু আশা করা যায়, জার্ম্মাণির মত বিরাট এবং ধনবান দেশে চায়ের চলন বাড়াইতে পারিলে চাকরদের কপাল খুলিয়া যাইবে। টি-সেস্ কমিটি আরও অনেক স্থানে অর্থব্যয় করিবার মতলব করিয়াছেন।

ভারতে চা-প্রচারের ব্যয় পৌনে আটলক্ষ টাকা

ভারতে চায়ের কাটতি বাড়াইবার জন্য টি-সেস্ কমিটি প্রথমে বৎসরে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিত। দুই বৎসর আগে আরও ২৫ হাজার টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ১৯২৯ সনে বরাদ্দ দাঁড়ায় পৌনে সাত লক্ষ। ১৯৩০ সনে কিন্তু এই বরাদ্দ বাড়াইয়া পৌনে আট লক্ষ করা হইয়াছে। রেলওয়ে ষ্টেশনে ষ্টেশনে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চায়ের কাটতি বাড়াইবার চেষ্টা করা হইতেছে। বার্ম্মা মুল্লুকে রীতিমত প্রচারক দল পাঠান হইয়াছে। বার্ম্মা-বাসীর ইতি পূর্ব্বেই চায়ের নেশা ধরিয়াছে। এই নেশা আরও মসগুল করিবার জন্য কমিটি এখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। গরীব মানুষও যাহাতে চা-খোর হইতে পারে সেইজন্য ছোট ছোট প্যাকেটে করিয়া সস্তায় চা বিক্রয় করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। মোট কথা, কমিটি বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, এত বড় ভারতবর্ষের লোকদিগকে যদি চা-খোর করিতে পারা যায়, তাহা হইলে শ্বেতাঙ্গ চা-কর-দিগকে আর দেশ বিদেশে বাজার ঢুঁড়িয়া অস্থির হইতে হইবে না।

দার্জ্জিলিং চা-বাগিচায় কুলিদের জীবনযাপন

দার্জ্জিলিং জেলায় চাবাগানের কুলিদের অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক। চা-বাগিচাগুলি আরও কতকগুলি কুলি চায়। কিন্তু এই সমস্ত কুলি খাস নেপাল এবং সিকিমের লোক হইলেই ভাল হয়। দার্জ্জিলিং হইতে অন্যত্র কুলি চালান দেওয়া সম্বন্ধে দার্জ্জিলিং চাকরদের ঘোর আপত্তি। ইঁহারা অন্যত্র-চালান-দেওয়া অনেক কুলি আবার দার্জ্জিলিং-এর চাবাগিচায় ফিরাইয়া আনিয়াছেন। দার্জ্জিলিংএ কুলিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটী 'লেবার সাবকমিটি' আছে। এই কমিটি মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া অনেক চাবাগানের ম্যানেজারকে সায়েস্তা করিয়া দিয়াছেন। তবে সাধারণতঃ মাথায় হাত বুলাইয়াই বেশীর ভাগ সময় কার্য্যোদ্ধার করা হইয়াছে।

বাংলা গবর্ণমেণ্ট কারখানা মজুরদের সম্বন্ধে নূতন আইন জারি করিয়াছেন। পূর্ব্বে ২০ জন কুলি যেখানে খাটিত মাত্র সেই সকল কারখানাই আইনের আমলে আসিত। অতঃপর দশজন কুলি খাটে এরূপ কারখানা বা ফ্যাক্টরিকে এই আইনের আমলে আসিতে হইবে। আশা করা যায় এই নয়া ব্যবস্থায় কাহারও সেরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না।

চা-বাগিচায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা

এতদিন পর্য্যন্ত স্কটস মিশনই চা-বাগিচার কুলিদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। সম্প্রতি চা-বাগিচায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং উন্নতিকল্পে ইঁহাদের সহিত প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশানের কমিটি এবং সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন মোসাবিদা স্থির করা হয় নাই; তবে আশা করা যায়, এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই একটা সুবন্দোবস্ত হইবে। উপযুক্ত শিক্ষকের যোগাড় করাই সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার বিবেচিত হইতেছে।

হুইট্‌লি কমিশনের তদন্ত

চা-বাগিচার কুলিদের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে লেবার কমিশনের দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। গত জানুয়ারি মাসে কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ হুইট্‌লি সদলবলে ডুয়ার্স অঞ্চলে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উভয় প্রকার চা-বাগিচাগুলিই পরিদর্শন করেন। কিন্তু ভারতীয় মজুরদের সম্বন্ধে তদন্ত করা নিতান্ত সোজা ব্যাপার নয়। আরও অনেক শীতকাল ধরিয়া এইরূপ অনুসন্ধান চালাইতে হইবে। আগামী শীতকালে এই কমিশনের সদস্যগণ যদি দার্জ্জিলিং অঞ্চলে আসেন তবে বেশ ভাল হয়।

চা-বাগানে যাতায়াতের রেল ও সড়কের অবস্থা

চা-বাগিচাগুলিতে এখনও যাতায়াতের বিস্তর অসুবিধা বর্ত্তমান। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে এবং ই, বি, রেলওয়ের কর্ত্তাগণ চা-বাগিচাগুলির অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এজন্ত তাঁহাদিগকে অসংখ্য ধন্তবাদ। চা-করদের তরফ হইতে দার্জ্জিলিং হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত মোটর গাড়ীর সাহায্যে ডাক আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিবার জন্ত সরকারী ডাক বিভাগের মতেরই সমর্থন করা হইয়াছে। সোনাদা এবং রাংবং উপত্যাকা পর্য্যন্ত টেলিফোনের ব্যবস্থা করিবার জন্তও গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ১লা এপ্রিল তারিখে সরকারী নূতন আর্থিক বৎসরের প্রারম্ভে এসম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির হইবার কথা।

চা-বাগিচাগুলিতে যাতায়াতের জন্ত উপযুক্ত সড়কের ব্যবস্থা করাও এক মস্ত বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দার্জ্জিলিং পাহাড়ে জায়গা; সুতরাং এখানে সড়কের ব্যবস্থা করা নিতান্ত সোজা ব্যাপার নয়। বর্ত্তমানে মাত্র দার্জ্জিলিং শিলিগুড়ি রাস্তায় মোটর চলাচল করিতে দেওয়া হয়। এই রাস্তায় মোটর কোথায় কিরূপ গতিতে চলিবে তাহাও নিরূপিত আছে। আজকাল বাগানে বাগানে ছোট সাইজের হালকা মোটরগাড়ীর রেওয়াজ খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং সরকারের পক্ষ হইতে অন্যান্য ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তাগুলিতেও মোটর চলাচলের হুকুম দেওয়া উচিত।

কলিকাতার ভারতীয় চা-কর সমিতি

দার্জ্জিলিং চাকর সমিতি, কলিকাতার ভারতীয় চা-কর সমিতির সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ চালাইয়া আসিতেছে। দার্জ্জিলিং সমিতির কিন্তু একটা অভিযোগ আছে। কলিকাতার এবং লণ্ডনের বাজারে নীলামে চা বিক্রয় করিবার সময় তরাই অঞ্চলের চা-ও দার্জ্জিলিং চা-রূপে লেবেল মারিয়া বিক্রয় করা হয়। তরাই অঞ্চলের চা দার্জ্জিলিং চা হইতে নিকৃষ্টতর। সুতরাং এইভাবে চা বিক্রয় করার জন্ত দেশবিদেশে সর্ব্বত্র এই দার্জ্জিলিং চায়ের সুনাম নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে কলিকাতার চা-বিক্রয়ের দালাল সমিতি এ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া চলিবেন। বাজারে লইয়া গিয়া জিনিষ বিক্রয়ও এক মস্ত সমস্যা; এ সম্বন্ধেও উৎপাদকগণকে বিশেষ হুসিয়ার হইয়া চলিতে হইবে।

বিজ্ঞান বিভাগ

চা-বাগানের সহায়তা-কল্পে একটা সরকারী বিজ্ঞান বিভাগও খোলা হইয়াছে। টকলই ষ্টেশনে এতদর্থে নির্ম্মিত সরকারী গবেষণাগারের নিকট একটা অতিথিশালাও

নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই অতিথিশালায় অবস্থান করিয়া যে কেহ সরকারী বৈজ্ঞানিকের নিকট আবশ্যকীয় তথ্যাদি জানিয়া লইতে পারেন। এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড হইতে এই ষ্টেশনে লেবরেটরি বাংলো ইত্যাদি সমস্ত নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। কিন্তু আসল কথা হইতেছে এই যে, একটী বড় আড্ডায় এইরূপ একটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গবেষণাগারের ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইল না। এইরূপ একটী গবেষণাগারের আবশ্যকতা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু চা-বাগিচাগুলির চৌহদ্দির নিকটে অনেক বেসরকারী বৈজ্ঞানিক থাকার নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ প্রকৃত উপকার স্থানীয় বিশেষজ্ঞদিগের নিকটেই পাওয়া সম্ভবপর।

ভারতীয় "চেম্বার অব্ কমার্স" সমূহের মিলিত সভা

গত ১৪ই, ১৫ই এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী সহরে ভারতীয় চেম্বার অব্ কমার্স অর্থাৎ বাণিজ্য সমিতিগুলির একটী মিলিত সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নিম্নে সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটী প্রস্তাবের মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

বিনিময় অনুপাত ও স্বর্ণমান

বর্ত্তমানে ভারতের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। বিশেষতঃ কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দুর্য্যোগ সব চেয়ে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। চেম্বার অব্ কমার্স সমূহের মিলিত সভা অর্থাৎ ফেডারেশান ভারত সরকারকে এ সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত হইতে বলিতেছেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট টাকার দাম ১শিঃ ৬পেঃ একেবারে বাঁধিয়া দিয়াছেন। এবং এই দাম স্থির রাখিবার জন্ম অপূর্ব্ব গোঁ ধরিয়া বসিয়া আছেন। ফেডারেশানের মতে সরকারের এই ব্যবস্থাই ভারতের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ। এই সরকারী ব্যবস্থার ফলে টাকার বাজারে দারুণ টানাটানি অনুভূত হইতেছে; লোকেও মাল আটকাইয়া বা বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। সরকারেরও ক্রেডিট্ বা বাজার-সম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ফেডারেশানের মনে আশঙ্কার উদয় হইয়াছে যে, যদি গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থা আরও কিছুদিন বাহাল রাখেন তবে কাগজের কারেন্সির জন্ম এবং আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন চালাইবার জন্ম যে সামান্ম সোনা মজুত আছে তাহাও ফুরাইয়া যাইবে; সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বৈদেশিক ঋণের বহর ভীষণ ভাবে ফাঁপিয়া উঠিতে থাকিবে। শেষ পর্য্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াইতে পারে যে পেপার কারেন্সি ভাঙ্গান আর সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই ভীষণ অবস্থার কড়া প্রতীকার অবশ্য কর্ত্তব্য।

কিন্তু প্রতীকারের উপায় কি? ফেডারেশানের মতে একমাত্র স্বর্ণমানের প্রতিষ্ঠা দ্বারাই এই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে। স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় টাকশালেই যথেষ্ট স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতের মজুত সোনার ষ্টক বাড়িয়া যাইতে বাধ্য।

গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে রৌপ্য বিক্রয়ের ফলে রৌপ্যের বাজার-দর খুব নামিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ভারতবাসীর সঞ্চিত অর্থের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। ফেডারেশানের মতে ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে রৌপ্য বিক্রয় একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

আয়-করের সংশোধন

ভারতের বণিক্ সম্প্রদায় বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া অনবরত ভারতীয় আয়কর আইনের সংশোধনের জন্ম আবেদন করিয়া আসিতেছেন। সংশোধক প্রস্তাব দুইটী এই—

(১) কোন বৎসরে ক্ষতি হইয়া গেলে সেই ক্ষতি পূরণের জন্ম পরবর্ত্তী ছয় বৎসর আয়করের হ্রাস করিতে হইবে।

(২) ভারতীয় আয়কর আইনের ৪২ এবং ৪৩ ধারার সংশোধন করিতে হইবে। অর্থাৎ বৃটিশ ভারতের কমিশন এজেণ্টের লাভ বা তাহার প্রাপ্য সুদের উপর কোন আয়কর থাকিবে না।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়

বণিক্ সম্প্রদায়ের এই প্রস্তাবে আদৌ কর্ণপাত করিতে-ছেন না।

ফেডারেশান অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট "রুপী টেণ্ডার সিষ্টেম" কার্য্যে পরিণত করিতে নারাজ হইয়াছেন। ফেডারেশনের মতে লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়ান ষ্টোর ডিপার্টমেণ্টটী ভারতীয় ষ্টোর ডিপার্টমেণ্টেরই একটী শাখারূপে গণ্য হওয়া উচিত। ভারতবর্ষ হইতেই ইহার শাসন হওয়ার দরকার এবং আমদানি দ্রব্যের সমস্তই ভারতীয় ষ্টোর ডিপার্টমেণ্টের দ্বারা আমদানি হওয়া দরকার।

আভ্যন্তরীণ জলপথ-সমস্যা

ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথসমূহের উন্নতির জন্য সরকারী তদন্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আভ্যন্তরীণ মাল এবং যাত্রীর চলাচল সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের দরকার।

উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ আইনের মত ভারতের নদীপথ সম্বন্ধেও এমন আইন কায়েম করার দরকার যাহাতে বিদেশী কোম্পানীগুলি ক্রমে ক্রমে ভারতের নদীখাল হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে পারে, এবং তাহার স্থান ভারতীয় কোম্পানীর জাহাজ ষ্টীমার অধিকার করিতে পারে। এই জন্য রীতিমত লাইসেন্স প্রথার সৃজন করিতে হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক মজুর কন্‌ফারেন্স

জেনেভা সহরে আন্তর্জ্জাতিক মজুর কন্‌ফারেন্সের ত্রয়োদশ অধিবেশনে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় মজুরদের তরফ হইতে একজন অ-ভারতীয়কে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। ফেডারেশান এই সরকারী ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। ফেডারেশানের প্রবল বিশ্বাস যে, ভবিষ্যতে কেবলমাত্র ভারতবাসীই ভারতীয় শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতি-নিধিরূপে আন্তর্জ্জাতিক মজুর কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিয়া ভারতীয় মজুরদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিবে।

ভার্সেলের সন্ধি অনুসারে এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক সভা সমিতিতে কোন বৈদেশিকের পক্ষে অন্য কোন দেশের প্রতিনিধি হওয়ার উপায় নাই। সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট আন্ত-র্জ্জাতিক মজুর কন্‌ফারেন্সের বিগত অধিবেশনে স্পষ্টাক্ষরে বলেন যে, এই অ-ভারতীয় প্রতিনিধি, ভারতের স্বদেশী-বিদেশী সকল শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্ব্বাচনের ফলে প্রেরিত হইয়াছেন। ফেডারেশান গবর্ণমেণ্টের এই আচরণের জন্য দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন।

পাট বাছাই সম্পর্কে সরকারী কর্ত্তব্য

ফেডারেশানের মতে, পাটের গুণাগুণ নির্দ্ধারণের জন্য কোন ধরাবাঁধা নীতি না থাকার দরুণ পাট-উৎপাদনকারী কৃষকগণকে এবং অনেক পাট-ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত ক্ষতি এবং অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ফিলিপাইন দ্বীপে শণ বাছাই করিবার জন্য একটি সমিতি আছে। ভারতবর্ষেও পাট বাছাই করিবার জন্য অনুরূপ একটী বোর্ড কায়েম করার দরকার। এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য ফেডারেশান ভারতগবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

তুলা-শিল্প

ভারতের তুলা-শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শিল্প-সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা না করা হইলে ভারতের দারুণ আর্থিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ফেডারেশান এই দিকে ভারতগবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

ভারতের চর্ম্মশিল্প

ফেডারেশানের মতে চর্ম্মশিল্পেও সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের দরকার। এইজন্য কাঁচা চামড়া রপ্তানির উপর মূল্য হিসাবে ১৫% শুল্ক বসাইতে হইবে। ভারতে প্রস্তুত চামড়ার জিনিষ রপ্তানির উপর বা ট্যান করা চামড়া রপ্তানির উপর কোন শুল্ক বসান হইবে না।

চামড়া ট্যান করিবার জন্য ওয়াটল্ বার্ক দরকার হয়। ভারতের চর্ম্মশিল্পের জন্য এই বস্তু বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ভারতের চামড়া ট্যানিং শিল্পের

সুবিধা-কল্পে এই চিজের উপর আমদানি শুল্ক রহিত করিবার জন্যও ফেডারেশান ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

ইম্পিরিয়্যাল কন্‌ফারেন্স ও বাণিজ্য-জাহাজ সম্পর্কীয় আইন

(ক) গত অক্টোবর মাসে বাণিজ্য জাহাজ সম্পর্কীয় আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। ভারতীয় চেম্বার অব্ কমার্স-গুলির তরফ হইতে ভারতগবর্ণমেণ্টকে জানান হয় যে, ভারতীয় বণিক্‌গণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ঐ সভায় একজন বে-সরকারী ভারতবাসীকে প্রতিনিধিরূপে পাঠান হউক। ভারতগবর্ণমেণ্ট কিন্তু চেম্বার অব্ কমার্সসমূহের এই অভিমত সম্বন্ধে আদৌ কর্ণপাত করেন নাই। ফেডারেশান এই জন্য গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

(খ) সুতরাং ফেডারেশান হইতে প্রস্তাব করা হইতেছে, ঐ সাম্রাজ্যিক সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর সহিত ভারতবাসীর, তথা ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের কোন সহানুভূতি নাই, এবং ঐ সমস্ত প্রস্তাব ভারতের পক্ষে আদৌ খাটিবে না, এবং ফেডারেশান আরও আশা করিতেছেন, ভারতগবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই ভারতের জনমত পদদলিত করিয়া ভারতের বাণিজ্য-জাহাজ সংস্থাপন সম্বন্ধে ব্যবস্থাপরিষদে কোন বাধা প্রদান করিবেন না।

বাণিজ্য-নৌবহর

(ক) ফেডারেশানের মতে ব্যবস্থা পরিষদে প্রস্তাবিত উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ বিলে কোনরূপ পক্ষপাত-নীতি অবলম্বন করা হয় নাই। ইহাতে কোন সম্প্রদায় বিশেষের জাহাজ বাজেয়াপ্ত করিয়াও লওয়া হইবে না। সুতরাং ভারতবর্ষে এইরূপ বিলের আশু প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফেডারেশান আশা করিতেছেন যে, ভবিষ্যতে এই বিলটী নিশ্চয়ই আইনে পরিণত হইবে।

(খ) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যেও যাহাতে ভারতীয় জাহাজসমূহ যোগদান করিতে পারে। ভারত গবর্ণমেণ্টের এমন ব্যবস্থাও করা উচিত। ফেডারেশান ভারতে জাহাজ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছেন।

(গ) ইতিপূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে শিক্ষাদানের জন্য বোম্বাই বন্দরে "ডাফরিণ" নামক একখানি ট্রেনিং জাহাজের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ফেডারেশানের মতে বঙ্গোপসাগরেও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আর একখানি ট্রেনিং জাহাজের বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। এই সমস্ত ট্রেনিং জাহাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় যুবকগণ ভবিষ্যতে যাহাতে জাহাজে চাকুরি পায় গবর্ণমেণ্টের এমন ব্যবস্থাও করা দরকার।

(ঘ) ফেডারেশান ডেফার্ড রিবেট প্রথার সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি জানাইতেছেন। আর অণুমাত্র বিলম্ব না করিয়া গবর্ণমেণ্টের এই সর্ব্বনাশকর প্রথা দূরীভূত করা উচিত।

পোর্ট ট্রাষ্টসমূহের গঠন-প্রণালী

অতঃপর ভারতীয় পোর্টট্রাষ্টগুলির চেয়ারম্যান একজন বেসরকারী ভারতবাসী হওয়ার দরকার। পোর্ট ট্রাষ্ট বোর্ডের মেম্বারগণের শতকরা ৭৫ জন ভারতবাসী থাকিবেন। এই সমস্ত মেম্বার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং অন্যান্য প্রতিপত্তি-শালী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন।

ভারতের বীমা ব্যবসায়

ফেডারেশানের মতে, বীমাকারিগণের এবং বীমা কোম্পানীগুলির হাতে ঋণগ্রহণকারিগণের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য বীমা কোম্পানীগুলির নিয়ন্ত্রণ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য অতি সত্বর কতকগুলি আইনকানুন পাশ করার দরকার। এই সম্পর্কে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে ফেডারেশানের তরফ হইতে নিম্নলিখিত হদিসগুলি বাতলান হইতেছে :—

(ক) এই দেশে সম্পাদিত বীমাকার্য্যসমূহের তত্ত্বাবধানের জন্য একটী বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল স্থাপন করিতে হইবে।

(খ) এই দেশে বীমা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বৈদেশিক বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে এই বোর্ড অব্

কণ্ট্রোলের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচিত হইবে।

(গ) বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলিকে ব্যবসায় করিবার পূর্ব্বে এই বোর্ডের নিকট প্রবেশমূল্যস্বরূপ কিছু দর্শনী দিতে হইবে। বীমা কোম্পানীর প্রাপ্ত মূলধনের শতকরা একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রবেশ মূল্যরূপে আদায় করা হইবে। শতকরা কত অংশ দিতে হইবে তাহা বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে। এই প্রবেশ মূল্য ছাড়া বিদেশী বীমা কোম্পানী-গুলিকে বাৎসরিক চাঁদাও কিছু দিতে হইবে। বোর্ডের আবশ্যকীয় খরচ এইরূপ চাঁদা হইতে সংগৃহীত অর্থে সঙ্কুলান করা হইবে।

(ঘ) বিদেশী কোম্পানীগুলিকে ব্যবসা করিবার পূর্ব্বে আপন আপন নিয়মাবলী এবং অন্যান্য দলীল দস্তাবেজ বোর্ডের নিকট হাজির করিতে হইবে।

(ঙ) বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলিকে ফি সন তাহাদের ব্যালান্স শিট্ বোর্ডের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(চ) বিদেশী কোম্পানীগুলিকে বোর্ডের নিকট কিছু অর্থ গচ্ছিত রাখিতে হইবে। গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে। বিদেশী কোম্পানীগুলিকে তাহাদের প্রিমিয়াম লাভের কিয়দংশ ভারতবর্ষে খাটাইতে হইবে। এবং কত অংশ খাটাইতে হইবে তাহা বোর্ড স্থির করিয়া দিবে। এইরূপে খাটান অর্থ বিদেশী বীমা কোম্পানীর পক্ষে ভারতবর্ষে ইহার মজুত তহবিলরূপে গণ্য হইবে।

(ছ) বিদেশী বীমা কোম্পানীর পক্ষে বীমা সম্পর্কে ভারতীয় আইনকানুন মানিয়া চলা অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচিত হইবে।

(জ) যে সমস্ত বীমা কোম্পানী তাহাদের পৃথক বার্ষিক ব্যালান্স শিট বাহির করিতে ইচ্ছুক, শুধু তাহারাই ভারতে ব্যবসায় চালাইবার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন করিতে পারিবে।

(ঝ) ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক কোন কোন স্থানে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের এজেন্টরূপে কার্য্য করিতেছেন। ফেডারেশান এজন্য যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং আশা করিতেছেন যে, ভবিষ্যতে ঐ ব্যাঙ্কের সমুদয় শাখা-ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির এজেন্টরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ভারতের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

(ঞ) ফেডারেশান্ ভারতের দেশী বিদেশী সমস্ত ব্যাঙ্কের নিকট এই আবেদন জ্ঞাপন করিতেছেন যে, অতঃপর সকলে যেন ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির পলিসি গ্রহণ সম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তি না করেন। পলিসি গ্রহণের পূর্ব্বে অবশ্য সকলে বীমা কোম্পানীর অবস্থা সম্যকরূপে খতাইয়া লইতে পারিবেন। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলিও যেন ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিকে বৃটিশ বীমা বলিয়া গ্রাহ্য করেন; 'ভারতে স্থাপিত এবং টাকায় মূলধন বলিয়া যেন অতঃপর উহারা ইহাদিগকে অবহেলা না করেন।

(ট) ফেডারেশান ভারতের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, এবং সওদাগর সকলের নিকট এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিকে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করেন। কারণ তাঁহাদের সহায়তায় ভারতের পুঁজি শিল্প-ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইতে পারিবে, এবং এইরূপে ভারতের আর্থিক উন্নতি দেখা দিবে।

ভারতে বিদেশী কোম্পানী

ফেডারেশানের মতে ভারতীয় জনসাধারণের গোচরীভূত করার জন্য ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সমুদয় বিদেশী কোম্পানীগুলির পক্ষে আপন ব্যালান্স শিট প্রকাশ করার দরকার। এই জন্য রীতিমত আইন বিবিবদ্ধ করিতে হইবে।

ট্রেড্ কমিশনারের নিয়োগ

ফেডারেশানের মতে প্রধান প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে ৬ জন ট্রেড্ কমিশনার নিয়োগ করিতে হইবে। উহারা ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থ সম্বন্ধে অবহিত থাকিবেন। এই সমস্ত ট্রেড্ কমিশনার কেবলমাত্র ভারতবাসী হইতে পারিবেন। লণ্ডনের ভারতীয় ট্রেড্ কমিশনারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটী উপদেশক সমিতি গঠন করিতে হইবে। এই সমিতি ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তরফ হইতে নির্ব্বাচিত হইবে।

ব্যাঙ্ক-বিস্তারে ইতালি

[ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার সহিত আমার কথোপকথনের সারমর্ম।—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

প্রঃ—আজ ইতালির ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি ?

উঃ—ইতালির ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথম এ দেশের যে সব ব্যাঙ্ক নোট বের করে তাদের কথা দিয়ে সুরু করতে হয়।

প্রঃ—বেশ, আগে তাই বলুন।

উঃ—কিন্তু এসব ব্যাঙ্কও যে কি রকম ক'রে তাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পৌচেছে তারও একটা ইতিহাস আছে।—আগে তাই বলছি শোন। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ইতালিতে কম করে দুটো ব্যাঙ্কের নোট বের করবার ক্ষমতা ছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাত্র দুটো ব্যাঙ্ক নোট বের করত, তাদের নাম ছিল "বাঙ্কা ন্যাৎসিওনালে সারদা" ও "বাঙ্কা ন্যাৎসিওনালে টুস্কানা।" এই সময় আরও দুটো ব্যাঙ্ক নোটের মতই এক রকম দায়-স্বীকার-পত্র বের করত,—তাদের নাম "ব্যাঙ্ক অব্ নেপলস্" ও "ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলি"। এদের প্রতিজ্ঞা-পত্রগুলি ঠিক নোটের সামিল না হলেও, তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে লেনদেন করা চলত এবং পত্রের অধিকারীকে রীতিমত সুদও দেওয়া হত। শেষে ইতালির গির্জ্জার সম্পত্তিগুলি যখন রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হয় তখন আরও একটা ব্যাঙ্ক নোট বের করতে আরম্ভ করে,—তার নাম, "বাঙ্কা রোমাণা"। এ সমস্তই আমি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের কথা বলছি।

প্রঃ—তারপর ?

উঃ—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে "ব্যাঙ্ক অব্ নেপলস" ও "ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলি" ও সেই সঙ্গে "ক্রেডিট ব্যাঙ্ক অব্ টাস্কানি" বলে আর একটা ব্যাঙ্ক এক সঙ্গে নোট বের করতে আরম্ভ করে। এ রকম ব্যাঙ্কের সংখ্যা এই বৎসরই ছ'টায় এসে দাঁড়ায়।

প্রঃ—এখনও এরা সবাই নোট বের করছে ?

উঃ—না, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে "বাঙ্কা রোমাণা" ফেল পড়ে যায় —আর ঐ বৎসরই "ব্যাঙ্ক অব্ নেপলস্" ও "ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলি" বাদে যে তিনটা ব্যাঙ্কের কথা উল্লেখ করেছি তাদের সংযুক্ত করে "বাঙ্কা দা ইতালিয়া" প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রঃ—তখন থেকে তাহ'লে "বাঙ্কা দা ইতালিয়া", 'ব্যাঙ্ক অব্ নেপলস" এবং "ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলি" কেবল এই তিনটা ব্যাঙ্ক নোট বের করেছে ?

উঃ—হাঁ,—তারপর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের এক আইন দিয়ে এরা কি পরিমাণ নোট বের করতে পারবে তাও নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয়। এই আইনে যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাতে প্রত্যেক ব্যাঙ্কেরই নোটের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হত তাদের আদায়ী মূলধনের একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে। শেষে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের একটা নূতন আইন দ্বারা এই ব্যবস্থা রদ করে দেওয়া হয়।

প্রঃ—এই নূতন আইনে নোট বের করা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হয়েছিল ?

উঃ—এতে ব্যাঙ্কগুলি সোনা মজুদ না রেখেও উর্দ্ধসংখ্যায়

কে কি পরিমাণ নোট বের করতে পারে তাই নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয়।

প্রঃ—এ রকমভাবে ব্যাঙ্ক তিনটা কি পরিমাণ নোট বের করেছিল ?

উঃ—১৯১০ খৃষ্টাব্দে এদের নোটের সমষ্টি পরিমাণ হয়েছিল ৯০ কোটি ৮০ লক্ষ লিরা। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি সরকারী অনুমতির জোরে নোটের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আগের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়।

প্রঃ—একটা লিরার বিনিময়-মূল্য কত ?

উঃ—সে প্রায় দশ পয়সা হবে।

প্রঃ—আচ্ছা, এই ব্যাঙ্কগুলির নোট বের করবার ব্যাপারে আর কোন বিশেষত্ব ছিল কি ?

উঃ—হাঁ, একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, এরা দরকার হলে গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারিকে হাওলাত দিতে পারত, আর সেজন্য আলাদা করে নোটও ছাপতে পারত। এ রকম হাওলাতি নোটের জন্যও প্রত্যেক ব্যাঙ্কের একটা পরিমাণ নির্দ্দেশ করে দেওয়া হ'য়েছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এ রকম নোটের পরিমাণ হয়েছিল ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ লিরা।

প্রঃ—বুঝেছি। তারপর বলুন।

উঃ—তারপর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটেছে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে,—তখন ফাসিষ্টদের প্রভাব ইতালি গভর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করছিল। এই সময় "ব্যাঙ্ক অব্ নেপল্‌স্" ও "ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলি"র নোট বের করবার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। তখন থেকে নোট বের করবার ক্ষমতা শুধু "বাঙ্কা দা ইতালিয়ার"ই একচেটে অধিকার হ'য়ে দাঁড়ায়।

প্রঃ—কিন্তু এর সঙ্গে ফাসিষ্ট প্রভাবের কি যোগ রয়েছে ?

উঃ—তা না হ'লে এ রকম নোট বের করবার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া সহজ ব্যাপার হ'ত না।

প্রঃ—কেন ?

উঃ—তার কারণ "ব্যাঙ্ক অব্ নেপল্‌স্" এবং "ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলি" এই দুইটা ব্যাঙ্ক বরাবর ইতালির দুইটী বিভিন্ন প্রদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কারবার চালাচ্ছিল। যেখানে প্রাদেশিকতার ভাব প্রবল সেখানে এ রকম ব্যাঙ্কের ক্ষমতা নষ্ট করতে চাইলেই নানারকম আপত্তি হ'বার সম্ভাবনা থাকে। ইতালিতেও তাই হয়েছিল এবং ইতালিয়ান গভর্ণমেণ্ট লোকমতকে অগ্রাহ্য করে এই ব্যাঙ্ক দু'টার কারবারে হাত দেয় নি। রাজনৈতিক চাল হিসেবে সব সময় এরকম করা প্রশস্তও নয়। কিন্তু ফাসিষ্ট গভর্ণমেণ্ট যে এসব কারণ তুচ্ছ করতে পেরেছিল—তার কারণ ইতালিতে এরকম শক্তিমান গভর্ণমেণ্ট অনেককাল ছিল না। মুসোলিনি-নিয়ন্ত্রিত ফাসিষ্টতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা শক্তিমান্ অধিকতর সমৃদ্ধিশালী ইতালি সৃষ্টি করা। তার জন্য এই দেশের শাসন-ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করবার ব্যাপার চলেছে। "ব্যাঙ্ক অব্ নেপল্‌স্" ও "ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলির" নোট বের করবার ক্ষমতা রদ করে দেওয়া এই তন্ত্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হযেছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, —শুধু "বাঙ্কা দা ইতালিয়াকে" একটা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে গড়ে তোলা—আর তার হাতে দেশের ব্যাঙ্ক-পরিচালনার ভার ন্যস্ত করে দেওয়া।

প্রঃ—উদ্দেশ্য যাই হোক, এতে নেপল্‌স্ এবং সিসিলির ব্যাঙ্কগুলি দুর্ব্বল হয়ে যায় নি কি ? এরা ত নোট ছাপিয়ে নিজ নিজ প্রদেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যেরই সাহায্য করছিল ; এদের নোট বের করা বন্ধ করবার ফলে সেখানকার কৃষি-শিল্পেরই ক্ষতি হয়েছে। তাই যদি হয়, তবে ত কোনমতেই একে সঙ্গত বলা চলে না। প্রদেশকে দুর্ব্বল করে একটা রাষ্ট্র শক্তিমান্ হয় কি করে ?

উঃ—তা বটে, কিন্তু প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলি যাতে দুর্ব্বল হয়ে না পড়ে সে জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে। "ব্যাঙ্ক অব্ নেপল্‌স্" ও "ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলি" এখন নোট বের করতে পারে না বটে,—কিন্তু দরকার হলেই এরা "বাঙ্কা দা ইতালিয়ার" কাছে বিল ভাঙ্গিয়ে টাকা যোগাড় করতে পারে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—কৃষি, শিল্প কিংবা ব্যবসা

সংক্রান্ত বিল বা' সময়সাপেক্ষ দায়মূলক নিদর্শনপত্র বাবদ এই ব্যাঙ্কগুলি টাকা ধার দেয়। তাতে ব্যাঙ্কের নগদ টাকার পরিমাণ কমে যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু দরকার মত সেই বিলগুলি ভাঙ্গিয়ে যদি অন্য কোন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করা চলে তা'হলে আর এ বিষয়ে কোন অসুবিধা থাকে না। "বাঙ্কা দা ইতালিয়া" এখন এই সুবিধাটাই করে দিয়েছে—এর আগে অবশ্য "ব্যাঙ্ক অব্ নেপলস্" এবং "ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলি" দুটো ব্যাঙ্কই প্রয়োজন মত নোট ছাপিয়ে নগদ টাকার কাজ চালিয়ে নিতে পারত।

প্রঃ—বুঝেছি, কিন্তু ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থার ফলে নূতন কি সুবিধা হয়েছে?

উঃ—এতে দুটো বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটেছে—একটা হচ্ছে এই যে, এখন দেশের টাকার বাজার নিয়ন্ত্রিত করছে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ "বাঙ্কা দা ইতালিয়া" এখন সমগ্র দেশের টাকার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করছে, কারণ নোট বের করবার অধিকার আর কোন ব্যাঙ্কের নেই। দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন হয়েছে এই যে, "বাঙ্কা দা ইতালিয়া" "ব্যাঙ্ক অব্ নেপলস" ও "ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলির" চলতি নোটগুলির দায় ও সেই সঙ্গে তাদের নোট বাবদ রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা আয়ত্ত করে নেবার পর থেকে এদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। তার ফলে এখন "ব্যাঙ্ক অব্ নেপলস" ও "ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলি"র রিজার্ভ ফণ্ডের অনেক টাকাই দক্ষিণ ইতালির উন্নতি করিবার জন্য খাটানো হচ্ছে। মোট কথা "বাঙ্কা দা ইতালিয়া" এখন একটা পুরাদস্তুর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হয়ে পড়েছে।

প্রঃ—বুঝেছি, আচ্ছা এই ব্যাঙ্কের মূলধন, কারবার এবং পরিচালনা সম্বন্ধে কি কি ব্যবস্থা রয়েছে?

উঃ—"বাঙ্কা দা ইতালিয়া" একটা যৌথ প্রতিষ্ঠান, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এর মূলধনের পরিমাণ হয়েছিল ৫০ কোটি লিরা। ব্যাঙ্ক পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়েছে এক পরিষদের ওপর,—তার নাম 'সুপীরিয়র কৌন্সিল' বা প্রধান সমিতি। গভর্ণমেণ্টের অনুমতি নিয়ে এই সমিতিই ব্যাঙ্কের গভর্ণর বা পরিচালক নিযুক্ত করে থাকে। সাধারণ অংশীদার বৈঠকের ব্যাঙ্ক-পরিচালন সম্বন্ধে কোন ক্ষমতা নেই,—তবে সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা তার আছে বটে।

প্রঃ—ব্যাঙ্কের উপর গভর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন ক্ষমতা রয়েছে কি?

উঃ—হাঁ, ইতালিয়ান গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই ব্যাঙ্কের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। সেখানকার অর্থসচিব সর্ব্বদাই এই ব্যাঙ্কের কার্য্যপদ্ধতি পরিদর্শন করছেন। বিশেষ করে ব্যাঙ্কটীর নোট বের করবার ব্যাপারের ওপরই গভর্ণমেণ্টের কড়া নজর রয়েছে। অর্থসচিব তাঁর অধীন কয়েকজন স্পেশ্যাল ইন্সপেক্টরের সহায়তায় এই পরিদর্শনের কাজ চালাচ্ছেন। তা' ছাড়া এজন্য একটি পরামর্শ-সভা গঠন করা হয়েছে, অর্থসচিব নিজেই তার সভাপতি।

প্রঃ—এই সভার মেম্বর নির্ব্বাচিত হয় কি করে?

উঃ—ইতালির ব্যবস্থা পরিষদের ৬ জন মেম্বর ও ইতালির গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত ৫ জন মেম্বর নিয়ে এই সভা গঠন করা হয়ে থাকে।

প্রঃ—বাঙ্কা দা ইতালিয়া তাহ'লে গভর্ণমেণ্টেরই তাঁবে রয়েছে বলতে হবে?

উঃ—হাঁ, তা'ছাড়া এই ব্যাঙ্ককে অর্থসচিবের কাছে প্রতি দশদিন অন্তর তার লেনদেন-সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠাতে হয়।

প্রঃ—বুঝেছি, এবার তা'হলে ব্যাঙ্কটির কারবার সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—আজকাল "বাঙ্কা দা ইতালিয়া"র সবচেয়ে বড় কাজ হ'ল লিরার বিনিময়-মূল্য নিয়ন্ত্রিত করা। লড়াইয়ের সময় য়ুরোপের আর পাঁচটা দেশের মত ইতালিতেও তার নোটের বদলে সোনা পাওয়া যেত না। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে 'বাঙ্কা দা ইতালিয়া' আবার সোনা দিতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু তার জন্য এই ব্যাঙ্ককে বিশেষ হুসিয়ার হয়ে ইতালিয়ান লিরার বিদেশী বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রিত করতে হচ্ছে।

প্রঃ—কেমন করে ?

উঃ—এ জন্য এই ব্যাঙ্ক নির্দ্ধারিত মূল্যে সোনা কিনতে কিংবা বেচতে আরম্ভ করেছে। দেশে সোনার একটা মূল্য নির্দ্ধারণ করে দেওয়ার মানেই হচ্ছে দেশের চলৎসিক্কার বিদেশী বিনিময়-হার নির্দ্দেশ করে দেওয়া। ইতালির চলৎসিক্কা হচ্ছে লিরা।

প্রঃ—চলৎসিক্কা কি ?

উঃ—দেশে যে টাকা দিয়ে দেনা-পাওনা মিটান আইন-গ্রাহ্য তাকেই চলৎসিক্কা বলা হয়।

প্রঃ—চলৎসিক্কা কি স্বর্ণ-মুদ্রা নয় ?

উঃ—না, স্বর্ণমুদ্রা চলৎসিক্কা হতে পারে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই যে চলৎসিক্কাকে স্বর্ণমুদ্রা হতে হবে, এমন নয়। ভারতবর্ষের কথাই ভেবে দেখ না কেন, এদেশে চলৎসিক্কা হচ্ছে রূপোর টাকা। সে ত স্বর্ণমুদ্রা নয়, অথচ দেনাদার এই রূপোর টাকা দিয়েই তার দেনা মিটাচ্ছে। সোনা দিয়ে সে তার দেনা পরিশোধ করতে বাধ্য নয়।

প্রঃ—তবে ত চলৎসিক্কা কাগজের তৈরী অর্থাৎ নোটও হতে পারে—গভর্ণমেণ্টের হুকুম থাকলেই হ'ল।

উঃ—তা ত পারেই।

প্রঃ—কিন্তু এক দেশের গভর্ণমেণ্ট এরকম হুকুম করলেই অন্য দেশের লোক তা নেবে কেন ?

উঃ—তাই ত বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য সোনা চাই। আজকাল সভ্য জগতে সোনাটাই আন্তর্জ্জাতিক দ্রব্য-বিনিময়-সহায়ক অর্থে প্রতিপন্ন হয়েছে কিনা, সেজন্য দেশের চলৎসিক্কা হয় স্বর্ণমুদ্রা হওয়া দরকার, নয়ত তাকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনার সামিল নির্দ্ধারণ করে দিতে হয়।

প্রঃ—১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের আগে ইতালিয়ান লিরার তাই ছিল না কি ?

উঃ—না, লড়াইয়ের সময় অনেক দেশেরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা গভর্ণমেণ্ট দেশের যত সোনা আটক করে রেখেছিল যাতে তা একেবারে বেহাত হয়ে না যায়।

প্রঃ—তা'হলে দেশের লেনদেন চলে কি করে ?

উঃ—নোট ছাপিয়ে, কিংবা নিকৃষ্ট ধাতু-মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়ে।

প্রঃ—কিন্তু তা'হলে বহির্ব্বাণিজ্য চলেছে কি করে ?

উঃ—লড়াইয়ের সময় বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ এমনই অনেক কমে গিয়েছিল,—যেটুকু চলেছে, তাও অনেক কেরামতি করে চালাতে হয়েছে।

প্রঃ—কি রকম ?

উঃ—দেশের মধ্যে অবশ্যগ্রাহ্য নোটেরও একটা দ্রব্য-বিনিময় মূল্য আছে ত ? সে মূল্যটা ঠিক কি হবে তা অবশ্য চলতি নোটের সমষ্টি পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। সমষ্টির পরিমাণ যত বাড়াবে প্রতি চলৎসিক্কার দ্রব্য-বিনিময় মূল্য তত কমে যাবে। কমবেশী যাই হোক একটা থাকবেই। লড়াইয়ের সময় যখন অনেকগুল দেশেই সোনা আটক করে নোটের সাহায্যে লেনদেন চালাবার ব্যবস্থা করা হয় তখন প্রত্যেক দেশেরই চলৎসিক্কার দ্রব্য-বিনিময় মূল্য দেশের নোটের সমষ্টি-পরিমাণের অনুপাতে নির্দ্ধারিত হয়েছিল; সে সময়ে বিভিন্ন দেশের এই দ্রব্য-বিনিময়-মূল্য তুলনা করেই তাদের চলৎসিক্কার পরস্পর বিনিময় হার নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। আর সে হিসেবেই তাদের বহির্ব্বাণিজ্য চলেছে।

প্রঃ—কিন্তু সোনা রপ্তানি যদি বন্ধ করে দেওয়া হ'ল,— তবে দেশের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা চালাবার পক্ষে কি অসুবিধা হতে পারত ?

উঃ—কিন্তু তাও যে সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক দেশেরই তখন লড়াইয়ের জন্য বিস্তর টাকা দরকার। এত টাকা হঠাৎ আসবে কোত্থেকে ?—গবর্ণমেণ্ট তার টাকা সংগ্রহ করে হয় ট্যাক্স আদায় ক'রে, নয় ত অপর কোন দেশ থেকে ধার নিয়ে। লড়াইয়ের সময় এই দু'রকম ভাবেই টাকা সংগ্রহ করতে কোন গভর্ণমেণ্ট কসুর করে নি। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের

সময়ে ধার পাওয়া সহজ নয়—আর ট্যাক্স বাড়াবার পক্ষেও ত একটা সীমা আছে! শেষে কোন রকমেই যখন কুলোয় নি—তখন গভর্ণমেণ্ট ক্রমাগত নোট বের করে তার লেনদেনের ব্যাপার চালিয়ে নিয়েছে।—কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত গভর্ণমেণ্ট নিজেই এরকম নোট বের করেছে—আবার কোন কোন দেশে গভর্ণমেণ্ট নিজে এ রকম না করে হয়ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে বেশী পরিমাণে নোট বের করবার জন্য নানারকমে উৎসাহিত করেছে।

প্রঃ—কিন্তু ক্রমাগত নোট বাড়াতে থাকলে শেষে গভর্ণমেণ্ট কিংবা ব্যাঙ্ক নোটের বদলে স্বর্ণমুদ্রা কিংবা সোনা দেবে কোত্থেকে? যুদ্ধের সময়টা না হয় নানা রকম বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে কেটে গেল, কিন্তু যুদ্ধ থামলে নোটের টাকা দিতে হবে ত?

উঃ—সেই ত হয়েছে মুস্কিল! যুদ্ধ থামবার পর অনেক গভর্ণমেণ্টই হিসেব করে দেখল যে দেশে নোটের পরিমাণ এত বাড়ান হয়েছে যে, তার বদলে সোনা দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। ইতালিতেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল। শেষে নোটের পরিমাণ যথা-সম্ভব কমিয়েও যখন কোন ফল পাওয়া যায় নি, তখন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার ফলে এখন দেশের আভ্যন্তরিক লেনদেনগুলি কাগজী নোটের লিরা কিংবা নিকৃষ্ট ধাতু-মুদ্রার সাহায্যে চলছে,—তবে বহির্ব্বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত প্রত্যেক লিরার বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনা দেওয়া হচ্ছে সে ত পূর্ব্বেই বলেছি।

প্রঃ—লিরার বিনিময়ে কি পরিমাণ সোনা দেওয়া হয়?

উঃ—এক শত লিরার বিনিময়-মূল্য হচ্ছে ৭৯,১৯,১১৩ 'গ্রাম' সোনা—এই থেকে তার হিসেবটা বের করে নিতে হবে।

প্রঃ—আভ্যন্তরীণ লেনদেনের জন্য সোনা চাইলে পাওয়া যায় না কি?

উঃ—তাও যায়, তবে তার জন্য দাবীর একটা ন্যূনতম পরিমাণ নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। তার চেয়ে কম মূল্যের নোট নিয়ে দাবী করলে ব্যাঙ্ক সোনা দিতে বাধ্য নয়। বর্ত্তমান ভারত গভর্ণমেণ্টও ঠিক এমনি ব্যবস্থা করেছে।

প্রঃ—কেন, এরকম করবার কারণ কি?

উঃ—তার কারণ হচ্ছে এই যে, দাবীর একটা ন্যূনতম পরিমাণ নির্দ্দেশ করা থাকলে খুব বেশী লোক নোটের বদলে সোনা চাইতে পারবে না।

প্রঃ—কিন্তু তাতেই বা আপত্তি কি?

উঃ—তা না হলে ব্যাঙ্ক হঠাৎ এত সোনা পাবে কোথায়? এত সোনা দিতে পারবে না বলেই ত এ রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রঃ—বুঝেছি, কিন্তু সেজন্য "বাঙ্কা দা ইতালিয়া"র লিরার বিনিময়মূল্য নিয়ন্ত্রিত করার দরকার হয় কেন? আর ইদানীং এটাই যে ব্যাঙ্কের একটা প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে তারই বা কারণ কি?

উঃ—ইতালিতে এখন সোনা পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু কি পরিমাণ সোনা দেশ থেকে বেরিয়ে যাবে তা নির্ভর করে লিরার বিনিময়-মূল্যের ওপর। ইতালির পক্ষে এখন অনেক পরিমাণে সোনা দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কাজেই 'বাঙ্কা দা ইতালিয়াকে' এখন লিরার বিনিময়-হারের ওপর কড়া নজর রাখতে হচ্ছে।

প্রঃ—কিন্তু এই ব্যাঙ্কের পক্ষে বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয় কি করে?

উঃ—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কমাত্রেই বিল ভাঙ্গাবার বাটাসুদের দ্বারা চলৎসিকার বিনিময়হার নির্দ্ধারণ করে থাকে,—"বাঙ্কা দা ইতালিয়া"ও তাই করেছে। বাটাসুদ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটা নিয়ম হচ্ছে এই যে, বাটা কম হলেই বিদেশী বিল ভাঙ্গাবার চেষ্টা চলতে থাকে আর তার ফলে দেশ থেকে সোনা বেরিয়ে যায়।

প্রঃ—বাটাসুদ চড়িয়ে দিলে কি হয়?

উঃ—তা হলে বিদেশ থেকেই সোনা আসবার সম্ভাবনা

থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মাত্রেরই বাটাসুদের সঙ্গে তার আমানতি সুদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। দুটোই একসঙ্গে ওঠানামা করে। কাজেই বাটা-সুদের সঙ্গে যখন আমানতি-সুদও চড়তে থাকে, তখন আমানত রাখবার জন্ম বিদেশ থেকে টাকা অর্থাৎ সোনা আসতে থাকে।

প্রঃ—তবে ত সব সময়েই সুদ চড়িয়ে রাখা ভাল।

উঃ—না, কেবল সোনা আমদানি রপ্তানির ওপর চোখ রাখলেই ত চলবে না! আমানতি সুদ চড়াতে গেলেই ব্যাঙ্কের হাওলাতি-সুদও চড়ে যাবে, আর অন্তে দেশেরই ব্যবসা-শিল্পের লোকসান হবে। সেটা ত মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। অথচ সোনার আমদানি রপ্তানির দিকে চোখ না রাখলেই বা চলে কি করে? ব্যাঙ্ক যখন তার নোটের বদলে সোনা দেবার দায় স্বীকার করেছে তখন তার সোনার পুঁজির ওপরেও লক্ষ্য রাখতে হবে বৈ কি! তাই ত বলছিলাম যে, 'বাঙ্কা দা ইতালিয়াকে' এখন খুব হুসিয়ার হয়ে তার সুদের হার নিয়ন্ত্রিত করতে হচ্ছে।

প্রঃ—বুঝেছি, আচ্ছা বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কের নোট বাবদ রিজার্ভ ফণ্ড রাখবার জন্ম কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উঃ—আগে ফণ্ডে নগদ টাকা মজুদ না রেখেও ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ নোট বের করতে পারবে তার জন্ম একটা পরিমাণ নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয়েছিল। এখন সে ব্যবস্থা রদ করে দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে এই ব্যাঙ্ককে তার সমস্ত নোট এবং দাবীমাত্র-পরিশোধনীয় দেনার সমষ্টি পরিমাণের শতকরা ৪০ ভাগ সোনা কিংবা স্বর্ণমূল্য রিজার্ভফণ্ডে মজুদ রাখতে হয়। রিজার্ভফণ্ডের এই অনুপাত রক্ষা না করেও ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত নোট বের করতে পারে বটে, কিন্তু সে রকম করতে গেলেই একে একটা ট্যাক্স দিতে হয়।

প্রঃ—ট্যাক্সটা কি হারে আদায় করা হয়?

উঃ—তার হিসেবটা খুব সরল নয়, তবু বলছি, শোন। অতিরিক্ত পরিমাণ নোট যদি নির্দ্ধারিত পরিমাণের শতকরা দশভাগ বেশী হয়, তবে তার ওপর ব্যাঙ্ক নিজে তার হাওলাতকারীর কাছে যে হারে সুদ আদায় করে, তার ঠিক দশমাংশ অতিরিক্ত হারে ট্যাক্স ধার্য্য হয়ে থাকে। হিসেবটা একটু অঙ্ক-পাতের মধ্যে ফেললেই সহজ হয়ে আসবে। ধর কোন একটা সময়ে ব্যাঙ্কের একশ লিরার নোট ব্যবহার হচ্ছে, আর তার জন্ম সে নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে চল্লিশটী লিরা—তা সে মুদ্রাই হোক বা তার সমান মূল্যের সোনাই হোক—রিজার্ভফণ্ডে মজুদ রেখেছে। এখন মনে কর যে, হঠাৎ এই ব্যাঙ্কের দশ লিরার নোট বের করা দরকার হয়ে পড়ল, অথচ রিজার্ভফণ্ড বাড়াবার উপায় নেই, আরও ধরে নেও যে, ব্যাঙ্ক তখন কর্জ্জ দিতে হলে শতকরা দশ লিরা সুদ আদায় করে। এমনি অবস্থায় যদি সে অতিরিক্ত দশ লিরার নোট বের করে, তবে তার ওপর শতকরা ১১ লিরা হিসেবে ট্যাক্স আদায় করে নেওয়া হবে। এখন এই দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমি প্রথম যা বলেছি তা মিলিয়ে নাও, তাহলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—না, আরও একটু বলবার আছে। ওপরের দৃষ্টান্তে অতিরিক্ত পরিমাণ নোট দশ লিরা না হয়ে যদি দু দফায় বিশ লিরা হয় তা হলে কিন্তু সুদের হার আরও একটু বেশী হবে। নিয়ম হচ্ছে এই যে অনুপাতে অতিরিক্ত ক্রমশঃ বর্দ্ধমান প্রত্যেক দশ ভাগের জন্তই উল্লিখিত হিসেবে ট্যাক্স আদায় করা হবে।

প্রঃ—তাতে ট্যাক্সের হার বাড়বে কেন?

উঃ—ট্যাক্স দিয়ে অতিরিক্ত নোট বের করতে গেলেই ব্যাঙ্ক তার সুদের হার চড়াতে বাধ্য হবে। তার ফলে সুদের অতিরিক্ত দশমাংশ অর্থাৎ যে অনুপাতে ট্যাক্স ধার্য্য হয়ে থাকে, তাও চড়ে যাবে। এমনি

করে অতিরিক্ত নোটের পরিমাণ যত বেশী হতে থাকবে ট্যাক্সের হারও তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে।

প্রঃ—এত গেল নোটের ব্যাপার;—তারপর টাকার বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মত বাঙ্কা দা ইতালিয়ার কোন প্রভাব রয়েছে কি?

উঃ—এই ব্যাঙ্ক যে ভাবে লিরার বিদেশী বিনিময়-মূল্য নিয়ন্ত্রিত ক'রে দেশের সোনার পুঁজি সংরক্ষণ করছে সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এরই সহায়তায় ইতালির আভ্যন্তরীণ টাকার বাজারের ওপর বাঙ্কা দা ইতালিয়া এখন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। তা ছাড়া দেশের ব্যাঙ্ক-মহলের ওপর প্রভুত্ব করবার জন্য একে সোজাসুজি ভাবেই কতগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—ইতালির যাবতীয় যৌথ-ব্যাঙ্কের কার্য্যপদ্ধতি পরিদর্শন করবার ক্ষমতা এখন এই ব্যাঙ্কের হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। ইতালিতে কোন নতুন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা বা বর্ত্তমান ব্যাঙ্কের পরস্পর সংযুক্ত হওয়া সেখানকার অর্থসচিবের অনুমতিসাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু কার্য্যতঃ এই সব কারণে যখন তাঁর কাছে কোন আবেদন করা হয়, তখন তিনি বাঙ্কা দা ইতালিয়ার পরামর্শ নিয়েই যা-কিছু ব্যবস্থা করে থাকেন। এ থেকেই এই ব্যাঙ্কের প্রকৃত প্রভাব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করে নিতে পারবে।

প্রঃ—আচ্ছা, বাঙ্কা দা ইতালিয়া সাধারণতঃ কি কি কাজ করে থাকে?

উঃ—খাঁটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক যা করে থাকে, তাই।—এর কাছে বিল বা সিকিউরিটি ভাঙ্গিয়ে নেওয়া চলে, তবে সে সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আছে। কেবল ৪ মাসের অনতিরিক্তকালস্থায়ী বিলই এর কাছে ভাজিয়ে নেওয়া চলে,—তাও আবার তাতে কম পক্ষে দু'জনের অনাদায়ে দায়সূচক পিছসই থাকা চাই। তা' ছাড়া এই ব্যাঙ্কে ইতালির ট্রেজারির অল্পকালস্থায়ী ঋণসূচক প্রতিজ্ঞাপত্র বা বিল, অথবা ব্যবসায়িক গুদাম-প্রতিষ্ঠানের পণ্যপ্রাপ্তি স্বীকার-মূলক রসিদও ভাঙ্গিয়ে নেওয়া চলে। তারপর গভর্ণমেন্টের বণ্ড, ট্রেজারি বিল, গভর্ণমেন্টের দায়-সম্বন্ধ বেসরকারী সিকিউরিটি, বিদেশে স্বর্ণমূল্যে আদায়ী বিল, মূল্যবান ধাতু, রেশম এবং গুদাম রসিদ ইত্যাদি জামিন রেখেও এই ব্যাঙ্ক টাকা কর্জ্জ দিয়ে থাকে;—তবে এ রকম কর্জ্জ ৪ মাসের অতিরিক্ত কালের জন্য দেওয়া হয় না।

প্রঃ—এ ছাড়া আর কোন রকমে টাকা লগ্নী করে না কি?

উঃ—হাঁ, নগদ টাকা বেশী হলেই তা দিয়ে গভর্ণমেন্টের বণ্ড কিংবা গভর্মেন্টের দায়সম্বন্ধ বিবিধ সিকিউরিটি কিনে রাখে,—তাতে যা সুদ পাওয়া যায়।

প্রঃ—আমানতে টাকা রাখার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উঃ—চলতি এবং স্থায়ী আমানত দু'রকম হিসেবেই টাকা রাখবার নিয়ম আছে।—কিন্তু আমানতি জমার হিসেব খুলে ধার দেবার ব্যবস্থা নেই।

প্রঃ—সে আবার কি রকম ব্যবস্থা?

উঃ—তা যেদিন ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে আলোচনা করব সেদিন বুঝিয়ে বলব।

প্রঃ—আচ্ছা, জমি বন্ধক দিয়ে কি এই ব্যাঙ্কের কাছে ধার নেওয়া যায়?

উঃ—না, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকেই এ রকম কর্জ্জ দেওয়া এই ব্যাঙ্কের পক্ষে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রঃ—বুঝছি, তারপর?

উঃ—খাঁটি কমার্শিয়্যাল ব্যাঙ্কের মত কারবার করলেও বাঙ্কা দা ইতালিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই যে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে এই ব্যাঙ্ক বিভিন্ন প্রদেশে ইতালিয়ান গভর্ণমেন্টের ট্রেজারির কাজ চালাচ্ছে।

প্রঃ—এর লাভ বণ্টন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা রয়েছে?

উঃ—ব্যাঙ্কের লাভ যদি শতকরা ৫ লিরার অতিরিক্ত অথচ ৬ লিরার কম হয় তবে অতিরিক্ত পরিমাণ লাভের এক-তৃতীয়াংশ ইতালিয়ান গভর্ণমেন্ট পেয়ে থাকে।

কিন্তু লাভের পরিমাণ শতকরা ৬ ডলারের বেশী হলেই বুঝতে হবে যে, অতিরিক্ত লাভের অর্দ্ধেকই গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য।

প্রঃ—আচ্ছা, বর্ত্তমানে "ব্যাঙ্ক অব্ নেপ্‌লস্" ও "ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলির" কি অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে ত কিছু বলেন নি?

উঃ—"ব্যাঙ্ক অব্ নেপলস্" এখন একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর তাঁবে প্রায় ৫ কোটি লিরা মূলধন খাটছে।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্কটী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি করে?

উঃ—এই ব্যাঙ্কের পরিচালন-ভার যার ওপর ন্যস্ত রয়েছে তার পদবী হ'ল "ডাইরেক্টর জেনারেল"। ইনি ইতালিয়ান গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারি-বিভাগের সচিব কর্ত্তৃক নিয়োজিত হ'য়ে থাকেন।

প্রঃ—ইনি কি একলাই ব্যাঙ্ক পরিচালন করছেন?

উঃ—না, এই ব্যাঙ্কের জন্যই একটি পরিচালক-সমিতি গঠন করা হয়েছে। ইনি তার অন্যতম মেম্বর এবং সভাপতি।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—কিন্তু এই সমিতির হাতে যে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রয়েছে তাই চরম নয় জেনো। এর ওপরেও একটা পৃথক সমিতি আছে,—তার নাম "জেনার‍্যাল কাউন্সিল"। ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কারবারের ওপর হস্তক্ষেপ না করলেও এই "কাউন্সিল" সর্ব্বদা পরিচালক-সমিতির কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করছে।

প্রঃ—কাউন্সিলের মেম্বর হয় কারা?

উঃ—এতে স্থায়ী এবং নির্ব্বাচনসাপেক্ষ দুই শ্রেণীর মেম্বরই রয়েছে। শেষোক্ত শ্রেণীর মেম্বরগণ নেপলস সহরের বিবিধ প্রাদেশিক এবং ব্যবসায়িক-সঙ্ঘ ও মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়ে থাকেন।

প্রঃ—পরিচালক-সমিতির মেম্বর নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা রয়েছে?

উঃ—এর পাঁচজন মেম্বর "জেনার‍্যাল কাউন্সিল" থেকে 'কাউন্সিলের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হন,—এঁদের পদবী হল "ডেলিগেট" বা প্রতিনিধি। এ ছাড়া এই সমিতিতে আরও দুইজন মেম্বর আছেন—তাঁদের পদবী "ডাইরেক্টর" বা পরিচালক। এঁরা দু'জন ইতালির গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হন।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ কি কি কারবার করে থাকে?

উঃ—প্রধানতঃ এটা একটা কৃষি-সহায়ক ব্যাঙ্ক—তবে এ বন্ধকী কারবারও করে। তা ছাড়া সেভিংস ব্যাঙ্কের পৃথক হিসেব খুলে এ টাকাও আমানত রেখে থাকে।

প্রঃ—তারপর,—"ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলির" কারবার চলছে কি ভাবে?

উঃ—এই ব্যাঙ্কটি ঠিক "ব্যাঙ্ক অব্ নেপলসের" প্রণালীতেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দু'টী ব্যাঙ্কের কারবারও চলছে একই প্রণালীতে।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্কটীতে মূলধন খাটছে কত?

উঃ—সে প্রায় সওয়া কোটি লিরা হবে।

প্রঃ—আচ্ছা, আপনি বলছিলেন যে, এই ব্যাঙ্ক দু'টী এখন সরকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে,—তার মানে কি?

উঃ—তার মানে হচ্ছে এই যে, এখন এদের মূলধনে কোন বেসরকারী অংশীদার নেই। এরা এখন সকল রকমে খাঁটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের কর্ম্মচারিবৃন্দকেও এখন গবর্ণমেণ্টের সাধারণ চাকুরের সামিল বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

প্রঃ—তা হ'লে এদের যে লাভ হয়—তা যায় কোথায়?

উঃ—তা অনেক সময় ব্যাঙ্কেরই মূলধন বাড়াবার জন্য মজুদ থাকে, কিংবা ইচ্ছা করলে গবর্ণমেণ্ট তা কোন সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানের জন্যও খরচ করতে পারেন।

প্রঃ—বুঝেছি। এবার ইতালিতে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সব ব্যাঙ্ক রয়েছে তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলুন।

উঃ—আচ্ছা, তাই বলছি শোন। ইতালিতে নানাবিধ ভূসম্পত্তি বন্ধক রেখে কর্জ্জ দেবার জন্য এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক রয়েছে—তাদের নাম "ল্যাণ্ড ক্রেডিট অর্থাৎ

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক। এদের সম্বন্ধে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দেই বিশেষ এক আইন কায়েম করা হয়।

প্রঃ—তাতে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

উঃ—এখন কোন ব্যাঙ্ক বা কোম্পানী জমিবন্ধকী কারবার করতে চাইলে তাকে ইতালিয়ান গভর্ণমেণ্টের জাতীয় অর্থনৈতিক-অবস্থা-নির্দ্ধারক বিশেষ বিভাগের অনুমতি নিতে হয়।

প্রঃ—এই বিভাগটির উদ্দেশ্য কি ?

উঃ—এর মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নেই। ইতালিয়ান গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বাণিজ্য এবং মজুর-নিয়ামক বিভাগগুলিকে যুক্ত করেই এই বিভাগটী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—এই ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে দুইটী পৃথক শ্রেণী-বিভাগ আছে। এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক সমস্ত ইতালিতে বিস্তৃত ভাবে কারবার করছে, এদের প্রত্যেকেরই মূলধন কম পক্ষে ৫ কোটী লিরা হওয়া চাই। আর এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে কারবার চালিয়ে থাকে।

প্রঃ—তাদের মূলধন বোধ হয় অনেক কম ?

উঃ—হাঁ, এদের মধ্যে যেগুলি খাঁটি ব্যাঙ্ক তাদের মূলধন ২ কোটি লিরা হলেই চলতে পারে,—আর এদের কারবারও একটা জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রঃ—কেন এই শ্রেণীর মধ্যে ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য রকম প্রতিষ্ঠান রয়েছে নাকি ?

উঃ—হাঁ, ইতালির ভূস্বামীরা নিজেদের মধ্যে কর্জ্জ নেবার সুবিধার জন্য কতকগুলি সমিতি গঠন করেছে। আইনতঃ এই সমিতির সদস্যদের ভূসম্পত্তির সমষ্টি মূল্য ৫ কোটী লিরা হওয়া দরকার। এই প্রতিষ্ঠান গুলিকেও বন্ধকী ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

প্রঃ—বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি কি ধরণের কারবার করে ?

উঃ—কোন ভূসম্পত্তির প্রথম বন্ধকীস্বত্ব পেলে এরা তার ধার্য্য মূল্যের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত টাকা ধার দেয়। টাকাটা দফায় দফায় শোধ করবার নিয়ম। হাওলাতকারীর সুবিধার জন্য এরা অনেক সময় উত্তমর্ণের বন্ধকীস্বত্ব কিনে নিয়ে হাওলাতকারীকে কর্জ্জের টাকা দফাবন্দোবস্তে শোধ করবার ক্ষমতা দিয়ে থাকে। কর্জ্জের টাকা এরা নগদও দিতে পারে কিংবা তার জন্য হাওলাতকারীর নামে একটা চলতি হিসেব খুলে টাকাটা জমা করে নেবার ব্যবস্থাও আছে।

প্রঃ—"ল্যাণ্ড ক্রেডিট ব্যাঙ্ক"গুলি তাদের মূলধন সংগ্রহ করে কি করে ?

উঃ—তার জন্য এরা ঋণসূচক দীর্ঘকাল-স্থায়ী বণ্ড বের করে থাকে। এরা যে পরিমাণ টাকা কর্জ্জ দেয় ঠিক সেই পরিমাণের জন্যই বণ্ড বের করে থাকে। এ থেকেই বুঝতে পারছ যে, এই ব্যাঙ্কগুলি কেবল মধ্যস্থতার কাজই করছে। বণ্ড বেচে এরা ইতালিয়ান বণিকদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে, আর সে টাকাই ভূস্বামীদের কর্জ্জ দেওয়া হয়।

প্রঃ—বণ্ডের ওপর ব্যাঙ্কগুলি কি পরিমাণ সুদ দেয়।

উঃ—সেটা টাকার বাজারের টান যোগান অনুযায়ী শতকরা ৩½ থেকে ৫ লিরা পর্য্যন্ত ওঠানামা করে। সমস্ত বণ্ডের সুদ ও তার অংশ পরিমাণের আসল টাকা প্রতি ৬ মাস অন্তর কিস্তিতে কিস্তিতে দেওয়ার নিয়ম। বণ্ডগুলি এমনি কায়দা করে বের করা হয় যে, হাওলাতকারীদের কাছ থেকে যা আদায় হয়ে থাকে তা থেকেই এ সব দাবীর টাকা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

প্রঃ—ইতালিয়ান গভর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্দ্ধারক বিভাগটী কি ভাবে এ সব ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিদর্শন করে ?

উঃ—এই ব্যাঙ্কগুলির পরিচালক সমিতি যে সব ব্যবস্থা করেন সে সম্বন্ধে যাবতীয় রিপোর্ট এই বিভাগের কাছে দাখিল করবার নিয়ম আছে। উক্ত বিভাগের সচিব ইচ্ছা করলে এ সব পরিচালক সমিতির ব্যবস্থা রদ করে দিতে পারেন। ব্যাঙ্কগুলিকে এঁর কাছে প্রতি ছ'মাস অন্তর তাদের কারবারের বিবরণ ও

নিকাশপত্র পেশ করতে হয়। তা'ছাড়া ইনি যখন তখন ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য-পদ্ধতি তদন্ত করতে পারেন।

প্রঃ—এসব ত হ'ল ভূস্বামীদের কর্জ্জ দেবার ব্যবস্থা। তারপর ইতালিতে খাঁটি কৃষি-সহায়ক কর্জ্জ দেবার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উঃ—এর জন্য দু'টি পৃথক ব্যবস্থা আছে। ইতালিতে গভর্ণমেণ্ট নিজেই কৃষির সাহায্যের জন্য বিস্তর টাকা কর্জ্জ দিয়ে থাকে। তা'ছাড়া এ জন্য অনেকগুলি সমবায় ঋণ-সমিতিও গড়ে উঠেছে।

প্রঃ—গভর্ণমেণ্টের কর্জ্জ দেওয়া সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা রয়েছে?

উঃ—এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে কয়েকটী আইনের কথা উল্লেখ করা দরকার। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এক আইন করে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, "ব্যাঙ্ক অব্ নেপলস্" তার সেভিংস ব্যাঙ্ক বিভাগ থেকে কৃষি-সহায়ক কর্জ্জ দিতে পারবে। এ ছাড়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে একটী পৃথক আইন করে "ব্যাঙ্ক অব্ সিসিলি"তে একটী বিশেষ কৃষিঋণ-বিভাগ খোলা হয়েছে। তারপর একেবারে বিস্তৃতভাবে কৃষিঋণ দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের আইনে।

প্রঃ—এই শেষের আইনটীতে কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?

উঃ—এখন গভর্ণমেণ্ট গো-মেষ কিংবা কৃষি-যন্ত্রপাতি কেনবার জন্য পাঁচ বৎসরের অনধিককাল স্থায়ী কর্জ্জ দিয়ে থাকে। কৃষিজ পণ্য গুদামে রাখলে তার রসিদের ওপরেও গভর্ণমেণ্ট টাকা ধার দেয়। তা'ছাড়া কোন কৃষকসঙ্ঘ তার মেম্বরদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কেনবার জন্য বা তাদের কৃষিজ পণ্য সঙ্ঘের সহায়তায় বিক্রয় করবার জন্য ধার চাইলেও কর্জ্জ দেবার ব্যবস্থা আছে।

প্রঃ—এসব কর্জ্জের জন্য কোন জামিন দিতে হয় কি?

উঃ—না সাধারণ প্রতিজ্ঞাপত্র রেখেই কর্জ্জ দেওয়া হয়।

প্রঃ—কর্জ্জের উপর সুদ আদায় করা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা রয়েছে?

উঃ—কি হারে সুদ নেওয়া হবে তা জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা-নির্দ্ধারক বিভাগের সচিব স্থির করে দেন। এ সম্বন্ধে একটা নিয়ম রয়েছে এই যে, গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কর্জ্জ নিয়ে যদি কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘ তৃতীয়পক্ষকে ধার দেয় তবে সে গভর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারিত সুদের উপর মাত্র শতকরা ২ লিরা বেশী আদায় করতে পারবে, তার বেশী নয়।

প্রঃ—এ ত গেল কৃষকদের চাষবাস করবার জন্য কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু তারা যদি তাদের আবাদী জমির কোন রকম স্থায়ী উন্নতি করবার জন্য টাকা ধার চায় তা হ'লেও কি তাদের কর্জ্জ দেবার নিয়ম আছে?

উঃ—হাঁ, তার জন্যও পৃথক ব্যবস্থা আছে। আবাদী জমির সাধারণ কোন উন্নতি করবার প্রয়োজন হ'লে হ্যাণ্ড নোট রেখেই টাকা দেওয়া হয়। তবে খরচ-সাপেক্ষ বিশেষ কোন রকম পরিবর্ত্তন করতে গেলে,—যেমন ধর, খাল কেটে ক্ষেতে জল সেচন করা, বা ক্ষেতের উপর দিয়ে রাস্তা তৈরী করা, কিংবা অনাবাদী জমিতে বন প্রতিষ্ঠা করা,—এই ধরণের কোন কাজের জন্য কর্জ্জ চাইলে জমি রেহাণ দিতে হয়।

প্রঃ—গভর্ণমেণ্ট কি শুধু জমির অধিকারীদেরই কর্জ্জ দেয়?

উঃ—না, দরকার হ'লে কৃষি-প্রজাদেরও কর্জ্জ দেবার নিয়ম আছে।

প্রঃ—বুঝেছি, তারপর যে সব কৃষি-ব্যাঙ্ক রয়েছে, তারা কি ধরণের কারবার করছে?

উঃ—ইতালির বিভিন্ন বিভাগে কতকগুলি স্পেশ্যাল বা অসাধারণ ঋণ-সরবরাহক ব্যাঙ্ক আছে। এরাও কৃষকদের চাষের বা তাদের আবাদী জমির উন্নতি-সাধনের জন্য টাকা কর্জ্জ দেয়। তবে কৃষকদের সঙ্গে এদের সোজাসুজি কোন লেন-দেন চলে না। তার জন্য বিস্তর স্থানীয় কৃষি-ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কগুলি প্রাদেশিক অসাধারণ ব্যাঙ্কের এজেন্ট হিসেবে কাজ

করে। তা ছাড়া অসাধারণ ব্যাঙ্কগুলি নিজ নিজ বিভাগের মধ্যে কৃষি-ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে কোন কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজও করছে।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বাণিজ্যপোষক ব্যাঙ্ক, সমবায়-সমিতি, সেভিংস ব্যাঙ্ক বা কৃষক-সঙ্ঘগুলি দরকার হ'লে এই ব্যাঙ্কের কাছে তাদের কৃষি-ঋণ-সূচক বিবিধ-প্রতিজ্ঞাপত্র বা বিল ভাঙ্গিয়ে নিতে পারে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাগুলি পাকা করে নিয়ে তাকে আরও পরিবর্দ্ধিত করা হয়েছে। এই খৃষ্টাব্দে যে আইন কায়েম করা হয়েছে তার ফলে কৃষিঋণ-সূচক বিল বা পত্রগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী বাজার-চল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রঃ—এ রকম পরিবর্ত্তন সম্ভব হ'ল কি করে?

উঃ—তার একটা কারণ এই যে, এখন এ রকম কর্জ্জের টাকা ঋণী কৃষকের আবাদী শস্য, গো-মেষ বা কৃষি-যন্ত্রপাতি, যাই হো'ক না কেন, একটা কিছুর উপর দাবী-সূচক বলে গণ্য হ'য়ে থাকে।

প্রঃ—কৃষি-ব্যাঙ্কগুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি ভাবে?

উঃ—ল্যাণ্ড ক্রেডিট ব্যাঙ্কগুলির মত এরাও ইতালিয়ান গভর্ণমেণ্টের জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা-নির্দ্ধারক বিভাগের শাসনাধীন রয়েছে।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—এবার ইতালিয়ান সেভিংস ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বলছি, শোন। ইতালিতে এই ধরণের ব্যাঙ্ক প্রথম স্থাপিত হয় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। কোন সমিতি বা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠান যদি বাঙ্কা দা ইতালিয়া বা ইতালিয়ান "কাসা দেপোজিতি এ প্রেস্তিতি"র কাছে হাজার লিরা গচ্ছিত রাখে তা'হলে তারা আইন-সঙ্গত দলিল ইত্যাদি প্রস্তুত করে সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

প্রঃ—"কাসা দেপোজিতি এ প্রেস্তিতি" ব্যাপারটা কি?

উঃ—সে সম্বন্ধে পরে বলছি।

প্রঃ—আচ্ছা, এ সব ব্যাঙ্কের কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে?

উঃ—সাধারণ লোকের সঞ্চয় বাড়াবার জন্যই এই ব্যাঙ্কগুলির সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কের সঙ্গে এর তফাৎ রয়েছে এই যে, এরা মেম্বরদের চাঁদার ওপর কোন রকম সুদ দেয় না। এদের পরিচালকবর্গও কোন প্রকার লভ্যাংশ গ্রহণ করতে পারে না।

প্রঃ—তাহ'লে এদের যা লাভ হয় তা খরচ হয় কি করে?

উঃ—প্রয়োজন হলে তা কোন সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় করা হয়।

প্রঃ—এদের পরিচালনের ভার রয়েছে কার ওপর?

উঃ—এরাও গভর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক অবস্থা-নির্দ্ধারক বিভাগের তাঁবে রয়েছে।

প্রঃ—এরা সাধারণতঃ কি ধরণের কারবার করে?

উঃ—সেভিংস ব্যাঙ্কএর যা কাজ, তাই। আমানতে টাকা নেওয়াই এদের প্রধান কাজ। তবে আমানতি টাকাটা লগ্নী করা সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড় নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে। জমি বন্ধকী কারবার এবং অন্যান্য দীর্ঘকালস্থায়ী কর্জ্জ দেবার জন্য এরা নিজ নিজ টাকার মোট পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত খাটাতে পারে। কৃষিঋণ দেওয়া, মিউনিসিপ্যালিটিকে হাওলাত দেওয়া কি মজুরদের বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করবার জন্য কর্জ্জ দেওয়া—এসব ক্ষমতাও এদের আছে।

প্রঃ—এরা তা হ'লে অনেক কাজ করছে বলতে হবে।

উঃ—হাঁ, এদের আরও শক্তিমান করে তোলবার জন্য ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এক ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার ফলে যে সব ব্যাঙ্কের আমানতি টাকার পরিমাণ ৫০ লক্ষ লিরার কম ছিল তারা বৃহত্তর ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। তা ছাড়া এখন বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সেভিংস ব্যাঙ্কগুলিও পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। এর জন্য একটা পৃথক ফণ্ড করে সঙ্ঘ-বদ্ধ ব্যাঙ্কগুলিকে প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতালির সেভিংস-ব্যাঙ্ক এখন বিশ্ব-বিখ্যাত হয়ে পড়েছে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মিলান সহরে এক আন্তর্জ্জাতিক সঞ্চয়-পরিষদের বৈঠক বসে।—তার ফলে এক আন্তর্জ্জাতিক সঞ্চয়-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। বর্ত্তমানে ২৭টী বিভিন্ন দেশের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৪,৬৫০টী সেভিংস ব্যাঙ্ক এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছে। সাধারণ সম্প্রদায়ের সঞ্চয়-বৃদ্ধির জন্ম আন্দোলন করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

প্রঃ—ইতালিতে পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক নেই ?

উঃ—আছে বৈ কি,—সে সম্বন্ধেই বলতে যাচ্ছি। ইতালিতে পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে; তখনও সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় নি। যে সব জায়গায় অন্য কোন ব্যাঙ্ক ছিল না সেখানে টাকা আমানত রাখবার সুবিধা করে দেবার জন্তই পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইতালির সেভিংস ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এ সব ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণভার গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারি-বিভাগের ওপর রাখা হয় নি। এর জন্ম একটা পৃথক সমিতি গঠন করা হয়েছে—তারই নাম হচ্ছে "কাসা দেপোজিতি এ প্রেস্তিতি"। এর মেম্বর-সংখ্যা ৬,—তারা সবাই ইতালিয়ান ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য। গভর্ণমেণ্টের হিসাব-পরীক্ষক বোর্ডের একজন ডাইরেক্টরও এতে যোগদান করে থাকেন। ব্যবস্থা-পরিষদ্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত এক স্থায়ী কমিশন এই সমিতির কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করে থাকেন। এই সমিতি নিজেও ব্যাঙ্কের কাজ চালিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন পোষ্ট্যাল ব্যাঙ্কের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করাই হচ্ছে এর বিশেষত্ব।

প্রঃ—পোষ্ট্যাল ব্যাঙ্কগুলিতে যে আমানত রাখা হয় তার ওপর সুদ দেওয়া সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা রয়েছে ?

উঃ—কি হারে সুদ দেওয়া হবে তা গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব নির্দ্দেশ করে দেন। একটা মাত্র হিসেবে আমানতের পরিমাণ ২০ হাজার লিরা অতিক্রম করে গেলে অতিরিক্ত পরিমাণের উপর সুদ দেওয়া হয় না।

প্রঃ—তারপর, আর কি রকম ব্যাঙ্ক আছে ?

উঃ—এবার ইতালিয়ান বন্ধকী ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বলছি, শোন। এই ব্যাঙ্কগুলি সম্বন্ধে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এক আইন কায়েম করা হয়। এদের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এরা ব্যাঙ্কিংএর কাজ করে লোককে যে শুধু অর্থ-সাহায্যই করছে, তা নয়,—সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে অনেকেই হাওলাতকারীর জিনিষপত্র রক্ষা করেও তাদের অনেক উপকার করছে। নানারকম অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে এরা টাকা কর্জ্জ দিয়ে থাকে। বর্ত্তমানে ইতালিতে এরকম ৫৪টা ব্যাঙ্ক আছে।

প্রঃ—এদের কারবারের আয়তন কি রকম হবে ?

উঃ—১৯২৫ খৃষ্টাব্দেই এদের কাছে প্রায় ৮০ কোটি লিরা আমানত ছিল।

প্রঃ—আচ্ছা, ইতালিতে সমবায়-ঋণ-ব্যাঙ্ক নেই কি ?

উঃ—নিশ্চয়ই আছে।

প্রঃ—তাদের সম্বন্ধে কি জানবার আছে ?

উঃ—ইতালিয়ান সমবায়-ব্যাঙ্কগুলির মেম্বরদের দায় সম্বন্ধে একটা সীমা-নির্দ্দেশ করা আছে। এদের মেম্বর হওয়া খুব সহজ। ৫০ থেকে ১০০ লিরা মূলধন যোগাতে পারলেই এদের মেম্বর হওয়া যায়,—তাও দফায় দফায় প্রতিমাসে ১ লিরা করে দিলেই চলে।

প্রঃ—এ সব ব্যাঙ্কের কাজের বহর কেমন ?

উঃ—সে সম্বন্ধে কয়েক বছর আগের কথা বলছি তা থেকেই অনুমান করতে পারবে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইতালিতে ৮২৭টা সাধারণ সমবায়-ঋণ-সরবরাহক ব্যাঙ্ক ছিল, তার মেম্বর-সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ লক্ষ, আর মূলধনের পরিমাণ হয়েছিল প্রায় ৪৬ লিরা। এদের সকলের এক সঙ্গে আমানতে ছিল ৪১৭ কোটি লিরা।

প্রঃ—এদের কাজের বহর ত তা হলে কম নয় ?

উঃ—এ ছাড়া একেবারে মফঃস্বলের জায়গাগুলিতেও বিস্তর সমবায়-ঋণ-সমিতি রয়েছে। ইদানীং এদের সংখ্যাই সাড়ে তিন হাজার অতিক্রম করে গিয়েছে।

প্রঃ—এদের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ?

উঃ—এরা কেবল চাষী মেম্বরদের অর্থাগম-সহায়ক কাজের জন্যই ধার দেয়। তার জন্য কোন প্রকার সম্পত্তি বন্ধক দেবার দরকার হয় না,—তবে যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয় তার জন্য মেম্বরদের সকলেরই একত্র দায় থাকে। অংশীদারদের মধ্যে লাভ বণ্টন করবার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু যতদিন না রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা মূলধনের এক-চতুর্থাংশের সমান হ'য়ে দাঁড়ায় ততদিন বাৎসরিক মুনাফা থেকে শতকরা ২০ লিরা রিজার্ভ ফণ্ডে তুলে রাখতে এরা বাধ্য থাকে।

প্রঃ—আচ্ছা, সমবায়-ঋণ-সমিতিগুলির মধ্যে কোন কেন্দ্রীয় সমিতি গড়ে ওঠে নি কি ?

উঃ—সে কথাই বলতে যাচ্ছি। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দেই এরকম একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, তার নাম দেওয়া হয়েছিল "দা ইন্‌স্তিতুতো ন্যাৎসিওনালে দা ক্রেদিতো।" গোড়ায় ইতালিয়ান গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কিছু টাকা মঞ্জুর পেয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তখন এর আদায়ী মূলধন ও গভর্ণমেণ্টের দান সব এক সঙ্গে মিলে হয়েছিল প্রায় ২২ কোটি লিরা। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানটীর অনেক সংস্কার করা হয়েছে। তাতে এর নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করে দেওয়া হয়েছে। এখন এর নাম "জাতীয় শ্রমিক ও সমবায় ব্যাঙ্ক।" এই ব্যাঙ্কের কাজ এখন সমবায়-সমিতির সাহায্য করাই নয়, সেই সঙ্গে বিবিধ শ্রমিক-সহায়ক ব্যাঙ্ককে, এমন কি নূতন উপনিবেশ স্থাপনের জন্য পর্য্যন্ত এ ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিচ্ছে।

প্রঃ—ইতালিয়ান সাধারণ যৌথ-ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আর কি জানবার আছে ?

উঃ—যৌথ-ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে দুইটী শ্রেণী-বিভাগ আছে। এদের মধ্যে কতকগুলি বাণিজ্য-পোষক—আর কতকগুলি শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক।

প্রঃ—এদের কার্য্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে সে সম্বন্ধে ত আগেই কিছু কিছু বলেছেন ?

উঃ—হাঁ, পূর্ব্বেই বলেছি যে, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এদের সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যবস্থা করা হয়েছে,—তার আগে এরা সাধারণ বাণিজ্য-বিষয়ক আইন অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হত। এই খৃষ্টাব্দে যে আইন করা হয় তার ফলে এখন কোন যৌথ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করতে হলে কিংবা বর্ত্তমান ব্যাঙ্কগুলিকে সংযুক্ত করতে চাইলে অর্থ-সচিবের অনুমতি নিতে হয়। কোন যৌথ-ব্যাঙ্ক যদি সমস্ত ইতালিতে বিস্তৃতভাবে কারবার করতে চায় তাহলে তার মূলধন কমপক্ষে ৫ কোটি লিরা হওয়া চাই; রিজান্যাল বা বিভাগ-বিশেষের ব্যাঙ্ক হলে তার মূলধন ১০ কোটি লিরা হওয়া দরকার, আর প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির মূলধন ৫ কোটি লিরা হলেই চলে। নূতন আইনে যৌথ-ব্যাঙ্কের রিজার্ভফণ্ড সম্বন্ধে এবং এরা ব্যক্তি বিশেষকে কি পরিমাণ ধার দিতে পারবে সে সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রঃ—এ সব ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করছে কে ?

উঃ—পূর্ব্বেই শুনেছ যে, ইতালিয়ান বাঙ্কা দা ইতালিয়া এই ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করে থাকে।

প্রঃ—আচ্ছা, ইতালিতে বিদেশী ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

উঃ—এরকম বিদেশী শাখা-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইতালি গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিবের অনুমতি নেওয়া চাই। তিনি অনুমতি দেবেন কিনা, বা কি সর্ত্তে অনুমতি দেবেন,—এসব যে দেশের ব্যাঙ্ক ইতালিতে শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, সে দেশের গভর্ণমেণ্ট সেখানকার ইতালিয়ান ব্যাঙ্কের শাখার উপর কি ধরণের আইন জারি করেছে, তার উপর নির্ভর করে। কাজেই বুঝতে পাচ্ছ যে, ব্যাপারটা খুব সরল নয়; এর মধ্যে বেশ একটু রাজনৈতিক চাল আছে।

"ভেল্ট হ্বির্টশাফ্ট্লিখেস্ আর্খিহ্ব্"
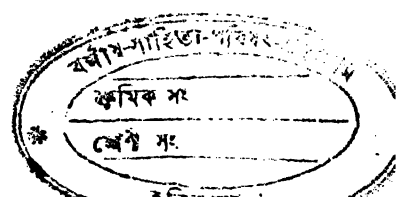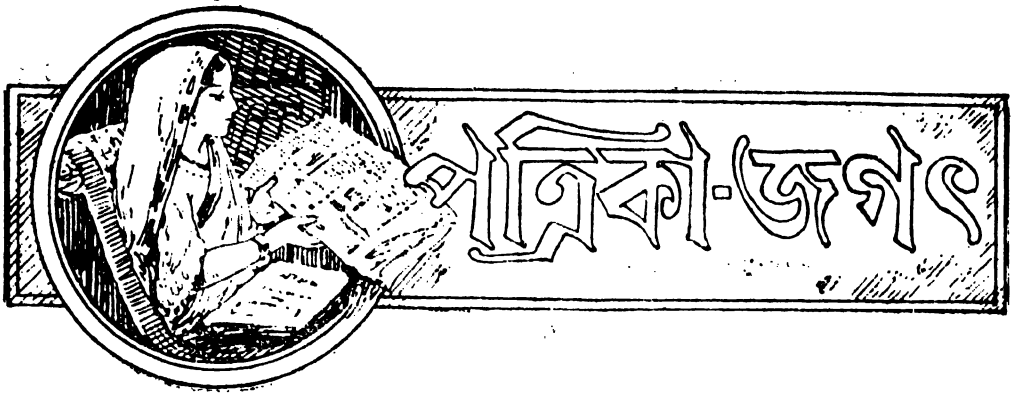
কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁবে আর্থিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা ও যানবাহন-তত্ত্ব পঠন পাঠনের জন্য এক পরিষৎ কায়েম আছে। এই অতিকায় পত্রিকাকে তার মুখপত্রস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। এর যে কোন একটা সংখ্যার সূচীপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিলে অর্থশাস্ত্র পাঠের জার্ম্মাণ ধরণধারণের কিঞ্চিৎ আন্দাজ পাওয়া যাইবে। পত্রিকার সম্পাদক কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাঃ বার্ণহার্ড হার্ম্মস্। চলিতেছে ৩০।৩১ বৎসর যাবৎ। প্রকাশকের ঠিকানা-দেব্লাগ্ ফোন গুষ্টাহ্ব্ ফিশার, য়েনা, জার্ম্মাণি। এই পত্রিকার একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ফরাসী ও ইংরেজীতে লিখিত প্রবন্ধ, সমালোচনা ইত্যাদিও প্রতি সংখ্যায় ২।১টি করিয়া স্থান পায়।

একণে ১৯২৯ সনের জুলাই মাসের পত্রিকাখানার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। এই পত্রিকা তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। ভাগগুলি এই :—

(১) প্রবন্ধাবলী, ১১১ পৃষ্ঠা

(২) বিবৃতি, দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতির আলোচনা ৩১৬ পৃষ্ঠা

(৩) সাহিত্য (বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত আর্থিক সাহিত্য), ১২৮ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ আবার নানা অংশে বিভক্ত। জুলাই মাসের পত্রিকা হইতে এই অংশগুলি বুঝান যাইতেছে।

(১) যে পাঁচটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে সেগুলির নাম :

জাতীয় অর্থনীতি—বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর হেবেব্নের সোম্বাট, ১৮ পৃষ্ঠা

অর্থশাস্ত্রের ফিজিওলজি বা রূপপ্রতিষ্ঠার কথা—টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আর, হ্বিলব্রাণ্ড্ট্, ৩২ পৃষ্ঠা

যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী আর্থিক প্রণালী ও নীতিসমূহের মর্ম্মকথা (ইংরেজী)—জর্জ্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর জন ডোনাল্ডসন, ২৯ পৃষ্ঠা

মধ্যযুগে ফ্লোরেন্সের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য—ফ্লোরেন্সের অধ্যাপক ডক্টর আর, ডেহ্বিড্সন, ১৭ পৃষ্ঠা

আর্থিক সংখ্যাবিজ্ঞান সম্বন্ধে ১৯২৮সনের ১৪ ডিসেম্বরের আন্তর্জ্জাতিক বোঝাপড়া—জেনিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর হ্বিলিয়াম্ ই রাপার্ড, ১৭ পৃষ্ঠা

(২) ১। বিশ্ব-অর্থশাস্ত্রে, বিশ্ব অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস ও বিশ্ব-আর্থিক নীতির গড়ন ও সত্ত্ব

টান্ যোগানের সংখ্যা-বিজ্ঞানমূলক বিশ্লেষণ-তত্ত্বানুসন্ধান—ডক্টর হ্বাসিলি লিওনটীফ, ৫৩ পৃষ্ঠা

যুদ্ধের পূর্ব্বাবধি ইংরেজের বহির্ব্বাণিজ্যে গড়নের পরিবর্ত্তন ও সত্ত্বের আন্দোলন—ডক্টর কোন্রাড্ ৎসহ্বাইগ্, ৫১ পৃষ্ঠা

আর্থিক সংখ্যাবিজ্ঞান সম্বন্ধে ১৯২৮ সনের ১৪ই ডিসেম্বরের আন্তর্জ্জাতিক বোঝাপড়া—ডক্টর হ্বিলিয়াম ই রাপার্ড, ১৮ পৃষ্ঠা

২। বিভিন্ন দেশের অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান, অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস ও আর্থিক নীতি

বিগত শত বৎসরে ইহুদী জনগণের চলাচল—
য়াকোব লেষ্টশিন্‌স্কি, ৩৪ পৃষ্ঠা।
ট্রান্স আর্ডানিয়ার আর্থিক কথা—ডক্টর কুর্ট
গ্রুনহ্বাল্‌ড্‌, ৯ পৃষ্ঠা।

৩। আন্তর্জ্জাতিক পণ্য চলাচল, রাষ্ট্রীয় বিদেশ
অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতি
লিটানীর ১০ বৎসরের বহির্ব্বাণিজ্য ১৯১৯-
১৯২৮ ডক্টর নেহেমিয়া রবিন্সন, ২১ পৃষ্ঠা।

৪। যানবাহন ইত্যাদি
যুদ্ধের পর দুনিয়ায় জাহাজ নির্ম্মাণের প্রসার—
ডক্টর হের্‌মান্ ষ্টাইনেট, ডান্‌ৎসিগ্‌, ৫০ পৃষ্ঠা।
পোষ্ট অফিস্ ও দ্রুতগামী বাহক সম্বন্ধে আন্ত-
র্জ্জাতিক বিবৃতি, ডক্টর মাক্স রোশার, ৩৭পৃষ্ঠা।

৫। শ্রমিকের বাজার, সামাজিক রাষ্ট্রনীতি, লোক-
চলাচল, উপনিবেশ শ্রমিকের কার্য্যকাল
নির্দ্ধারণ বিষয়ে আন্তর্জ্জাতিক আইন
কানুন—এইচ, ফেহ্‌ লিঙ্গের, ৮ পৃষ্ঠা।

৬। আন্তর্জ্জাতিক আইন, বিশ্ব আর্থিক নীতি
বাণিজ্য-বিবৃতি ১৯২৫-১৯২৮—হেরমান জে
হেল্‌ড্‌, ৩৪ পৃষ্ঠা।

(৩) এই ভাগে অনেক কেতাবের সমালোচনা স্থান পাইয়াছে। সমালোচনার দুই অংশ—কতকগুলি বইয়ের শুধু নাম ধাম করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, অন্যগুলির ছোট বড় আলোচনা আছে। ৩৮ খানি বহি দ্বিতীয় শ্রেণীর।

দুটি বড় সমালোচনা { আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ।
স্বর্ণমানের আর্থিক তত্ত্ব ও দর সূচীসংখ্যাকরণ

সমালোচিত পুস্তকগুলি শ্রেণী অনুসারে সাজান হইয়াছে। শ্রেণীগুলির নাম—

১। তত্ত্বগত সামাজিক অর্থশাস্ত্র ও সংখ্যাবিজ্ঞান।
২। আর্থিক তত্ত্বের ইতিহাস, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি,
লোক-তত্ত্ব, আর্থিক ভূগোল।
৩। বিশ্ব অর্থতত্ত্বের জ্ঞান ও বিশ্বরাষ্ট্রীয় অর্থনীতি
৪। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিমূলক আইডিয়া ও চিন্তা
৫। উৎপাদন ও বাণিজ্য। পণ্যের বাজার
৬। যানবাহন
৭। মুদ্রা ও পুঁজির বাজার। ব্যক্তিগত পণ্য-বিনিময়
৮। আর্থিক সংগঠন ইত্যাদি
৯। মজুর বাজার, লোক চলাচল, সামাজিক রাষ্ট্রনীতি
১১। কোষতত্ত্ব। আন্তর্জ্জাতিক ঋণ
১২। সমাজতত্ত্ব। আন্তর্জ্জাতিক সভ্যতা সংস্পর্শ
১৩। আন্তর্জ্জাতিক আইন। জমিজমা সংক্রান্ত আইন
১৪। ইতিহাস, বিশ্বরাষ্ট্র, উপনিবেশ রাষ্ট্রনীতি উপরি-

উক্ত ১৪।১৫টি পরিচ্ছেদ আবার একদিকে কতকগুলা বড় বড় অধ্যায়ের অন্তর্গত। যথা

১ম অধ্যায়ে প্রথম ৪টি পরিচ্ছেদ আছে।
২য় অধ্যায়ে ৫-১১ পরিচ্ছেদ আছে।
৩য় অধ্যায়ে ১২-১৫ পরিচ্ছেদ আছে।

অন্যদিকে প্রতি পরিচ্ছেদ আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা শাখায় বিভক্ত। কোন কোন পরিচ্ছেদে ৬।৭টি পর্য্যন্ত শাখা আছে।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে জার্ম্মাণরা অর্থশাস্ত্র বলিতে কি বোঝে ও উহাকে কোন্ চোখে দেখে। অর্থ শাস্ত্রকে এই জাত কিরূপ সূক্ষ্মরূপে ভাগ করিয়াছে তা বর্ণনা করা সহজ নহে। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জার্ম্মাণরা অর্থশাস্ত্রের উপর তাদের হাতের ছাপ খুব স্পষ্ট করিয়া রাখিয়া দিতেছে। তাদের আলোচনা-প্রণালী ইংরেজদের চেয়ে অনেকটা স্বতন্ত্র। যদি সাদৃশ্য খুঁজিতে হয়, আমেরিকানদের সহিত ইহাদের কিছু কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে। অর্থশাস্ত্রকে একেবারে শেষ পর্য্যন্ত ঘাঁটিয়া দেখিবার বাসনা দুই জাতের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান আছে। সেইজন্য গোটা বিদ্যাটাকে অসংখ্য চুলচেরা ভাগে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন অংশের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে ইহাদের বাঁধে না। এই দুই জাতের দানের পরিমাণও সামান্য নহে।

"তত্ত্ববোধিনী" চৈত্র, ১৩৩৬

চা-পান, না বিষপান ?

৩৩ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে যদি ১৬॥০ কোটী ভারতবাসী অর্থাৎ অর্দ্ধেক লোক প্রত্যহ ১ পয়সার চা পান করে বলিয়া ধরা যায়, তবে প্রতিদিন ২৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মাসে ৭॥০ কোটী টাকা অথবা বৎসরে ৯০ কোটী টাকা আমরা চা-পানে নষ্ট করি। এদিকে ভারতবাসীর গড়ে দৈনিক আয় ৬ পয়সা মাত্র। চা-বিষ প্রাতঃকালে খালি পেটে সেবন করিয়া আমরা অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ভুগি। চা-পানের ফলে ভাত প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য বেশী খাওয়া যায় না। ১ পয়সার চায়ের লোভে আমরা আয়ুহ্রাসের ব্যবস্থা করি। (সঞ্জীবনী ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬)।

পূর্ব্ব কথা

আমাদের বেশ মনে পড়ে, দেশে, অন্ততঃ এই কলিকাতায় চা কি প্রকারে ছুঁচের আকারে ঢুকিয়াছিল। এখন কিন্তু ইহা কালের আকারে বাহির হইতেছে। এক সময়ে দেখা গেল, চায়ের কাটতি বড়ই কমিয়া গিয়াছে। ইংরাজ বণিকমহলে এবং সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন সুরু হইল—কিসে চায়ের কাটতি বাড়ানো যায়। সেই সময়ে টি-সেস্ আরম্ভ হইল কিনা মনে পড়ে না, অন্ততঃ টি-সেস্ হইতে কাটতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করাই স্থির হইল। তখন এক মস্ত বিলাতী কোম্পানি নেতৃস্বরূপে এই আন্দোলনের ভার লইলেন। প্রথম প্রথম এক মহা রব উঠিল যে, যে কেহ চায়ের দোকান খুলিবে, সাহেবরা সেই দোকানের ভাড়া দিবে, যদি লোকসান হয় তাহা পুরাইয়া দিবে এবং সমস্ত সরঞ্জাম যোগাইবে। এত প্রলোভন এই দুর্ভাগ্য দরিদ্র দেশের কয়জন অতিক্রম করিতে পারে ? সহরের চারিদিকে হু হু করিয়া চায়ের দোকান বসিতে লাগিল। যখন এই সমস্ত দোকানের পসার বেশ জমিয়া গেল, তখন শুনি ১ পয়সায় দুই প্যাকেট চা, এবং কিছুদিন পরে ১ পয়সায় ১ প্যাকেট খুব ভাল চা বিক্রয় হইতেছে। এই পয়সা-প্যাকেট চায়ের কি কাটতি! যে চায়ের জন্ম ধনীরা লালায়িত, সেই চা যখন সকলেই এত সস্তা পাইতে লাগিল, তখন কি আর রক্ষা আছে ?

ত্রিবিধ লাভ

চায়ের দোকানে চা তো দিনরাত চড়ানোই থাকে—মধ্যবিত্ত লোকেরা দোকানে বসিলেন, পাঁচজনের সঙ্গে খোসগল্প, অশ্লীল তামাসা জুড়িয়া দিলেন; ইতিমধ্যে দোকানদার সেই সিদ্ধ চায়ের জল ঢালিয়া তাহাতে টিনের অসার দুধ ও চিনি মিশাইয়া চা প্রস্তুত করিয়া হাজির করিল। চা-পায়ী ভাবিয়া দেখিলেন না যে, তিনি চা খাইতেছেন, না তীব্র বিষ গলাধঃকরণ করিতেছেন। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অনেক চা-বিক্রেতা এক-জনের খাওয়া চায়ের অবশিষ্ট অংশ সেই চা-কুণ্ডে ফেলিয়া "হিন্দু" চা প্রস্তুত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। ইহার ফলে চা-সেবী ত্রিবিধ স্বর্গসুখ লাভ করেন—(১) ঘরের কড়ি স্বেচ্ছায় উড়াইয়া দেওয়া, (২) বিষ পান করা এবং (৩) মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হওয়া। চা-পানের একটু মজা আছে। চা-পানের ফলে অজীর্ণ রোগ চোরের মত দেহে প্রবেশ করে এবং দুর্ব্বলতা আনয়ন করে; দুর্ব্বলতা আসিলেই চায়ের স্থায় মাইল্ড ষ্টিমিউলেণ্ট বা নরম উত্তেজক কিছু দরকার হয়—এইরূপে রোগেরও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। চা-পান না ছাড়িলে দাঁড়াইবে এই যে, যে দিক্ দিয়া হউক, চায়ের দাম হিসাবে অথবা রোগের ঔষধ হিসাবে, বিলাতকে পয়সা দাও, দেশে দারিদ্র্য আন এবং জীবন্মৃত হইয়া দিন যাপন কর।

কুলীকাহিনী

আজকালকার কয়জন জানেন, বোধ হয় কেহই জানেন না যে, চা-বাগানের কুলীদের প্রতি চা-করেরা কি ভীষণ অত্যাচার করিত। আজকাল যেমন নারীধর্ষণের ব্যাপার সংবাদপত্র খুলিলেই দেখা যায়, সেকালেও চা-করদের পদাঘাতে কুলীদিগের প্লীহাফাটা, বিচারে আসামী বে-কসুর খালাস পাওয়া এবং কুলীরমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার-

কাহিনী সংবাদপত্র খুলিলেই দেখা যাইত। ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত নির্ভীকহৃদয় ও শক্তিমান দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি স্বয়ং কুলী হইয়া চা-বাগানে কাজ করিয়া স্বচক্ষে কুলীদের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে সঞ্জীবনী আজ নারীনিগ্রহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, গাঙ্গুলী মহাশয়ের ঐ সকল "কুলী-কাহিনী" সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া ঐ সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সঞ্জীবনীর আন্দোলনের ফলে চা খাওয়া খুব কমিয়া গিয়াছিল। তখন সে দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িল। আড়কাঠির বে-আইনী কুলী-চালানের বিরুদ্ধে আইন হইল; পূর্ব্বের অপেক্ষা বিচার-বিভ্রাট অনেক কমিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কুলী ও কুলীরমণীদের প্রতি অত্যাচারও অনেক কমিয়া গেল।

চা-পানের কুফল

চা-পানের কুফল ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস গত অগ্রহায়ণের 'বঙ্গলক্ষ্মীতে' সুন্দর বিবৃত করিয়াছেন। আমরা তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—উহা আমাদের উপরোক্ত কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে।

"চা-পানের সর্ব্বনেশে অভ্যাস হলে উহা ক্রমশঃ বেড়ে যায়—দশ-বারো বার চা না হলে চলে না। অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা ভয়ানক অনিষ্টকর। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন দেখলেন বিলাতে চায়ের জন্য স্বাধীন চীনের উপর নির্ভর করতে হয়, তাঁরা অধীন ভারতে চা উৎপন্ন করবার মতলব আঁটলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারতে চায়ের চাষ করবার জন্য চীন থেকে চা এবং চীনা শ্রমজীবী আনালেন। তিনি সতীদাহ নিবারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু চায়ের অপব্যবহারের দরুণ কত পরিবারের যে কত মর্ম্মদাহ ভবিষ্যতে হতে পারে, তা তিনি অনুভব করেন নাই। * * * ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে আসামোৎপন্ন চা চীনের চায়ের সমকক্ষ হয়েছিল। প্রথমে দেশীয় লোকেরা চা খেতেন না; এখন চা একটা নেশায় পরিণত হয়েছে। ১৮৬৪ সনে এদেশ থেকে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়। এখন প্রতি বৎসর ৩৫ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়। দেশে চা ধরাবার জন্য এণ্ড্ যুল কোম্পানী কেরাণীদের টিফিনের ছুটির সময় পাঁচ সিকে খরচ করে চা খাওয়াত; তারপর খরচ করত দশ আনা, তারপর চার আনা। তারপর যখন দেখলে নেশা ধরেছে, তখন আর কিছুই খরচ করতে হল না। এখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সকলে চা খায়। মুটে মজুর সকলেরই এখন চা না খেলে চলে না।"

আর্থিক লাভ ক্ষতি

আপাততঃ বোধ হয়, এত বড় ব্যবসায়ে ভারত লাভবান হয়; কিন্তু লাভ কত এদেশে থাকে, আর বিদেশে কত যায়, তার খতিয়ান করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, যদি বা ভারতের কিছু লাভ থাকে, সে লাভ অতি সামান্য। "সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, ভারতবর্ষে চায়ের ব্যবসায়ে ৪৮ কোটী টাকা মূলধন খাটছে। এর মধ্যে ৩৭ কোটী টাকা বিলাতী। অবশিষ্ট মূলধনের মালিক অধিকাংশ বিলাতের লোক। এদেশের মালিক অতি অল্প। লাভ প্রায় শতকরা একশত কি দুইশত। আমাকে একজন চা-বাগানের মালিক বলিয়াছিলেন—এবৎসর দুর্ব্বৎসর, লাভ শতকরা পঞ্চাশ মাত্র। যদি শতকরা পঁচিশও ধরা যায়, ৩৭ কোটী বিলাতী মূলধনের দরুণ প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে ৯॥০ কোটী টাকা যায়। তা ছাড়া বিলাতী ম্যানেজারদিগকে প্রায় ৫ কোটী টাকা দিতে হয়। অর্থাৎ এই ব্যবসায় ভারতবর্ষ বিলাতী বণিকদিগকে প্রতি বৎসর ১৪॥০ কোটী টাকা দিয়া থাকে। সরকারী বিবরণী বলে—৩৪০ চা বাগানে ৩১৫ জন বিদেশী ম্যানেজার।

"প্রায় ৮॥০ লক্ষ শ্রমজীবী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিদেশী বণিকদের অর্থকোষ পূর্ণ করছে। তার প্রতিদানে পায় মাথা পিছু ৭॥০ টাকা। দৈনিক চারি আনাতে কি একটা মানুষের জীবন ধারণ চলে? অত্যাচার—অনাচারের কথা ছেড়ে দাও, ইতিহাস তার সাক্ষী। স্থানে স্থানে সরকারী বে-সরকারী রেলওয়ে

ষ্টেশনে 'টী-সেস এসোসিয়েশনের' অনুরোধ-পত্র ঝুলছে। এক পেয়ালা চা খাও, কোন কষ্ট থাকবে না। মাতাল হবে না অথচ মস্তানন্দ পাবে, শরীর সুস্থ, সবল ও কার্য্যক্ষম হবে, ইত্যাদি। সহসা আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিদেশী বণিকদের এত উদ্বেগ কেন? সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

"চায়ের দরুণ বছরে ১৪।০ কোটী তো তাঁদের উদরে যায়, তা ছাড়া এই ভারতেই ৪ কোটী টাকার চা বিক্রী হয়। তা ছাড়া ঐ চায়ের মোহিনী শক্তি বৃদ্ধি করতে হলে দুটী বিদেশী জীবন-নাশক পদার্থ আবশ্যক—বিলাতী টীন-বদ্ধ দুগ্ধ এবং জাভার চিনি। যার যত নেশা তার তত বেশী কড়া চা এবং অধিক দুধ ও চিনি চাই। টিনভরা দুধের দরুণ ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ থেকে বিলাতে ৪০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা গিয়েছিল; ১৯২৬-২৭ সনে সেই অঙ্ক উঠেছিল ৭৫ লক্ষের কোঠায়। এক পাউণ্ড চা প্রস্তুত করতে হলে ৩½।৪ সের চিনি চাই। বিদেশী চিনি নইলে অনেকের মুখে চায়ে তার লাগে না। ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশী চিনির দরুণ বিদেশে প্রতিবৎসর এদেশের ৪ কোটী টাকা বেরিয়ে যায়, দেশী চিনি ময়লা বলিয়া আমরা ঘৃণা করি। তা ছাড়া, এই দেশী চিনি প্রকৃষ্ট প্রণালীতেও প্রস্তুত হয় না। জাহাজে বিদেশী চিনির যে সব বস্তা বিক্রী হয়, সেই বস্তায় চিনির যে সব ময়লা লেগে থাকে, তাহাই জাল দিয়ে চিনি বের করে যে অপরূপ পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম দেশী চিনি। এই তো গেল দুধ-চিনির কথা। চায়ের জন্য বিলাতী পাত্র চাই। প্রতি বৎসর ভারতে ১ কোটী টাকার বিলাতী পেয়ালা আসে। এর এক-তৃতীয় কি এক-চতুর্থ অংশও যদি চায়ের জন্য ব্যবহার হয়, তাহলেও অন্তত ২৫।৩০ লক্ষ টাকা এই বাবদে বিলাতে যায়। তবেই দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বশুদ্ধ চায়ের দরুণ দেশ থেকে ১৯ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা চলে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্যহানি

"চা স্বাস্থ্যেরও কিরূপ হানিকর তাহাও বলি। চা চলতি হবার পূর্ব্বে ইংরাজ-জাতি বেশী বলবান ও সুস্থ ছিল। বোয়ার যুদ্ধের সময় দশলক্ষ ইংরাজ সৈন্য হবার অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। অবশ্য তার কারণ শুধু চা নয়। চা খেতে খেতে যখন নেশা জমে তখন খুব কড়া চা নইলে চলে না। এই প্রকার কড়া চায়ে যে বিষ থাকে, তা থেকে জন্মায় পাকাশয়ের প্রদাহ, অম্বল, অজীর্ণতা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ প্রভৃতি। কেহ কেহ ১৪।১৫ পেয়ালা চা খেয়ে সমস্ত দিন কাটিয়ে দেয়। কেহ কেহ এত গরম চা খায় যে জিভ পুড়ে যায়, এই অত্যুষ্ণ চায়ের দরুণ পেটের ভিতর ঘা হয়। আজকাল অনেকের এই রোগটা প্রবল হয়েছে। তার দরুণ পেট কেটে চিকিৎসা করতে হয়।

"আর এক বিপদ সংক্রামক রোগ। পাত্রগুলি তো আর গরম জলে সিদ্ধ করে বিষমুক্ত করবার অবকাশ বা অভিপ্রায় থাকে না। গরমি বা যক্ষ্মারোগী চুমুক দিয়ে চা খেয়ে যাচ্ছে, তার পরেই আর একজন এসে সেই পাত্রে চা পান করে রোগটী সঞ্চয় করল।

"আর একটী দিক্ আছে সঙ্গদোষ। ঐ চায়ের দোকানে যত বকাটে ছেলের আড্ডা হয়। ঐ খানেই যত অসৎ প্রবৃত্তির উৎপত্তি"।

এই সেদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, কোন সুপ্রসিদ্ধ বিলাতী কোম্পানীর কমবেশী প্রায় ৫০টী সিন্দুক চা নষ্ট করা হইল। ইহার কারণ কি? কারণ—ঐ সিন্দুকগুলির চায়ে আর্সেনিক বিষ পাওয়া গিয়াছিল!! ইহা কি প্রকার ভয়াবহ কথা, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আমাদের প্রশ্ন এই যে, খুব অল্প পরিমাণে ঐ বিষ চায়ের সঙ্গে মিশাইলে কি উহার স্বাদ বা গন্ধ ভাল হয়, অথবা চায়ে সহজে পোকা ধরে না, অথবা নেশা ভাল জমে? এতগুলি সিন্দুকে আর্সেনিক পাওয়ায় আমাদের সন্দেহ হয় যে ইহা দৈবাৎ ঘটে নাই, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশ্রিত। তবে, হইতে পারে যে, এই কয়টা সিন্দুকে উহা কিছু বেশী পরিমাণে মিশানো হইয়াছিল—এই বেশীটুকু হয়তো দৈবাৎ হইতে পারে। আমাদের অনুরোধ এই যে, কর্পোরেশন এই আর্সেনিক মিশ্রিত হইবার মূল অনুসন্ধান করুন। তাহা হইলে

চায়ের কারখানার অনেক রহস্য নাকি প্রকাশ হইয়া পড়িবে এইরূপ শোনা যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা শুনিয়াছিলাম যে, আর একটী চায়ের মস্ত বড় কোম্পানি তাঁহাদের চায়ে আফিমের জল ছিটাইয়া দিতেন—তাহা হইলে একবার যাঁহারা তাঁহাদের চা খাইবেন, তাঁহারা সহজে আর তাঁহাদের চা ছাড়িয়া অন্য চা ধরিতে চাহিবেন না। আমার এক বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি যে তিনি যখন ছাত্রজীবনে এক হোষ্টেলে থাকিতেন, তখন একজন সেই হোষ্টেলের সম্মুখে এক চায়ের দোকান খুলিল। দোকানে লোকে লোকারণ্য—এমন চা নাকি অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তখন বন্ধু—ইনি চা খাইতেন না—সন্ধান লইতে উদ্যত হইলেন এত প্রশংসার কারণ কি। শেষে কোন প্রকারে চা যেখানে প্রস্তুত হয়, সেই কোটরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, চায়ের জল ফোটাইবার সময়ে উহাতে "পোস্তর ঢেঁড়ি" (আফিমের ফলের বীচি) ফেলিয়া দেওয়াই ঐ চায়ের প্রতি ছেলেদের এত ঝুঁকিবার কারণ। উহা জানিয়া ছেলেরা ঐ চায়ের দোকান পরিত্যাগ করিল।

আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, রেলওয়ে ষ্টেশনে একজনের খাওয়া চায়ের অবশিষ্ট অংশ মূল চা-কুণ্ডে ঢালিয়া "হিন্দু" চা প্রস্তুত হইল এবং তাহাই চা-পায়ীদের পয়সার বিনিময়ে উপাদেয় পেয়রূপে বিতরিত হইতে লাগিল। শুধু চা নয়, আমি এক চায়ের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম—সেখানে লেখা আছে—চা, ঘোলের সরবৎ প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকাল—একজন এসে ঘোলের সরবৎ চাহিল। দোকানদার ঘোলের নামধারী সাদা বিষ ঢালাঢালি করিয়া তাহাকে খাইতে দিল। লোকটীকে দেখিয়া বোধ হইল মেথরশ্রেণীর—তাহা না হইলেও ঐ প্রকার কোনও নিতান্ত নীচশ্রেণীর নিঃসন্দেহ। সে খানিকটা খাইয়া অল্প কিছু অংশ গেলাসে রাখিয়া চলিয়া গেল। দোকানদার সেই পরিত্যক্ত অংশটুকু নিঃসঙ্কোচে ঘোলের কুণ্ডের মধ্যে ঢালিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে কেরাণীশ্রেণীর এক দুর্ভাগ্য জীব আসিয়া সেই ঘোলের সরবৎ চাহিল, দোকানদার অমনি তাহার সেই অমৃতভাণ্ড বা ঘোলকুণ্ড হইতে অমৃত ঢালিয়া তাহাতে পচা গোলাপী আতর ও একটু গোলাপী রংয়ের বিষ ঢালিয়া এক গেলাস বিষ প্রস্তুত করিয়া দিল। কেরাণী বাবুটীও উহা পান করিয়া স্বর্গের সুখ অনুভব করিয়া চলিয়া গেলেন। এইভাবে সংক্রামক রোগের বীজ যে কি প্রকার দ্রুতবেগে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা কয়জন লক্ষ্য করিতেছেন ?

চায়ের পরিবর্ত্তে অন্যবিধ পানীয়

প্রবীণ ডাক্তার সুন্দরীমোহন বাবু বলেন যে, চায়ের বদলে গম কড়া করিয়া ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া রাখিয়া দাও ; তাহাই ফুটন্ত জলে দিয়া দুধ ও গুড়ের সঙ্গে খাও। চিনির ভিতর সার কিছুই নাই। তদপেক্ষা গুড় শতগুণে পুষ্টিকর। আমরাও শুনি যে, আজকাল অল্প খরচে চিনির মিষ্টতা বাড়াইবার জন্য স্যাকারীণ ব্যবহৃত হয়। পড়িয়াছিলাম যে, এই পদার্থ বেশী ব্যবহার করিলে কর্কট রোগ (ক্যান্‌সার) হয়।

গম গুঁড়ার ব্যবস্থা করিলে চর্ব্বি-মিশানো বিস্কুটও ব্যবহার করিতে হয় না। সুন্দরীমোহন বাবু যে ভাবে গম গুঁড়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বিলাতী গ্রেপনাট নামক পদার্থের ব্যবহারেরই অনুরূপ। তাঁহার মতে প্রতিদিন টাটকা মুড়ি নারিকেল দিয়া এবং কল-যুক্ত (অঙ্কুরিত) ছোলা আদা ও গুড় দিয়া খাওয়া উচিত।

আমাদের মনে হয় আরামের একটা কল্পনাই চা-পানবৃদ্ধির অনেকটা সহায়তা করিয়াছে। আমার কয়েকজন বন্ধু চা খাইব না বলায় আমি দুধে চিনি ও গরম জল দিয়া তাঁহাদিগকে যেই বলিলাম যে জার্ম্মাণি হইতে আগত একপ্রকার সাদা চা আনিয়াছি, তখনই তাঁহারা তাহাতে চায়ের সুগন্ধ ও সুস্বাদ অনুভব করিলেন, এবং বলিলেন সম্ভবতই তাঁহাদের অম্বল অজীর্ণতা প্রভৃতি ভাল হইয়া গেল। সমস্ত নেশার প্রধান মূল হইল কল্পনা। আমরা আশাকরি তরুণসমাজ চা, সিগারেট প্রভৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়া দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"দি নিউ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল রিভ্‌লিউশন অ্যাণ্ড ওয়েজেস্" (নয়া শিল্প-বিপ্লব ও মজুরি), ডব্লিউ জেট্ লোক। ফুঙ্ক ও হ্বাগ্‌নালস্, নিউ ইয়র্ক। ১৯২৯। ৯+৩০৮। ২·৫০ ডলার।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের গোড়া হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে শিল্প-বিপ্লব দেখা দিয়াছে তার গুরুত্ব ঢের বেশী। যুদ্ধের পর শিল্প-ব্যবসায় ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই স্রোতকে উল্টা দিকে প্রবাহিত করিবার চেষ্টার ফলে আজিকার নয়া শিল্প বিপ্লব দেখা দিয়াছে। ১৯২৩ সনের প্রথম কিছুকাল অবধি বাণিজ্যের পরিমাণ অব্যাহত রাখিবার জন্য মজুরি-হ্রাস নীতি অনুসরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৩ সনের গোড়া হইতেই একদল ব্যবসা-পতি ও সরকারী চাকুরোর (এঁদের মধ্যে বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট হুহ্বারও ছিলেন) প্ররোচনায় একটা পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। হুহ্বার্ বলিলেন, মজুরি-হ্রাস প্রাচুর্য্যের পথ নয়; মজুরকে আরও বেশী তঙ্কা দাও তবেই সে আরও বেশী জিনিষ কিনিতে সমর্থ হইবে। "চাই ব্যবসায় অপচয় নিবারণ, উৎপন্ন দ্রব্যের গুণাগুণ নির্দ্দেশ ও অধিকতর যন্ত্রপাতির ব্যবহার।" তার ফল হইবে এই যে, "মজুরির হার যেরূপ খুসী বাড়ান চলিবে, খাদকের পক্ষে মজুরি ও অন্যান্য দফায় খরচ ও দর হ্রাস করা সম্ভব হইবে, অথচ মুনাফার হার কম হইবে না। এই সব যুগান্তকারী প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার দরুণ অভূতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যময় বর্ত্তমান যুগ আরম্ভ হইয়াছে (পৃঃ ৪)।

অন্যদিকে মনিব ও মজুর উভয়েরই মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—আগেকার মজুরি-তত্ত্ব ও মজুরি-নীতি ত্যক্ত হইয়াছে। মনিবের চোখে মজুর এখন শুধু উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র নয়, দ্রব্যের খাদকও বটে। মজুরেরাও দ্রব্যের উৎপাদক হওয়ার অর্থ কি বুঝিতে পারিয়াছে, তাদের উৎপাদন-ক্ষমতা ও সামাজিক হিতসাধনের ভিতর কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তা' সমঝিতেছে (পৃঃ ২২২)। "মোট ফল হইল এই যে, মনিব বুঝিয়াছে শিল্প হইতে ক্রমাগত লাভ পাইতে হইলে ক্রয়-ক্ষমতা সর্ব্বদা বৃদ্ধি পাওয়া চাই। তাহারা মজুরি-বৃদ্ধির অসীম সম্ভাবনাকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছে, শুধু খরচ বাড়িবে না ও মুনাফার একটা নির্দিষ্ট হার অবশিষ্ট থাকা চাই। সঙ্ঘবদ্ধ মজুরও এই মতের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে ও যথোপযুক্ত 'পুরস্কার' পাওয়া পর্য্যন্ত ঈপ্সিত ফলের জন্য সহযোগিতার অঙ্গীকার দিয়াছে...(পৃঃ ২২২-২২৩)।

এই গেল লোকের কল্পিত অভূতপূর্ব্ব শিল্প-বিপ্লবের তত্ত্ব। লোক অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, এখন পর্য্যন্ত এমন কোন কার্য্যকরী প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই যদ্দ্বারা ব্যবসার আদায় বাড়িতে থাকিলে মজুররাও তার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ নিশ্চিতরূপে পাইবে। তারপর শ্রম-বাঁচোয়া প্রণালী অনুসরণের অর্থ বেকার বাড়ানো। ইহাও আর একটি সমস্যা। লোকের মতে বর্ত্তমান সমৃদ্ধির বড় সমস্যা এই দুইটা মাত্র।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবিকই কি এত বড় একটা শিল্প-বিপ্লব দেখা দিয়াছে? কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুম্‌নার এইচ্ স্লিখ্‌টার ১৯২৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসের আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ পত্রিকায় এই কেতাবের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, না দেখা দেয় নাই। সমালোচকের ২।১টা যুক্তি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

সত্য বটে, আমরা একটা শিল্প-বিপ্লবের ভিতর দিয়া যাইতেছি; কিন্তু এ বিপ্লব দু'শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে খুব দ্রুত কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাত মনে হয় না।

খনি ও রেল দুটা বড় ব্যবসা। এ দুটিতে জন প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ১৯২০ সনের আগে যেরূপ দ্রুতবেগে বাড়িতেছিল তারপর হইতে তত দ্রুতবেগে বাড়িতেছে না। লোকোমোটিভের গড়পড়্‌তা ক্ষমতা ও বাক্স গাড়ীর গড়পড়্‌তা আয়তন ১৯২০-২৭ সনের মধ্যে যে ভাবে বাড়িয়াছে ১৯২০ সনের আগে তার চেয়ে দ্রুতবেগে বাড়িয়াছিল। ১৯১৯ সনের পর হইতে ম্যানুফ্যাক্‌চারিং শিল্পে অধিকতর দ্রুত পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে বটে। ১৯০৯ হইতে ১৯১৯ সনের মধ্যে প্রতি ফ্যাক্টরি-শ্রমিকের গড় উৎপাদন-ক্ষমতা ৫% কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৯ হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যে তা ৩৬% বাড়িয়াছে। তাছাড়া ১৯১৯ সনের পর হইতে নিয়োজিত প্রতি অশ্বশক্তির গড় উৎপাদন কম দ্রুতবেগে হ্রাস পাইতেছে। ১৮৯৯ হইতে ১৯১৯ সনের মধ্যে উহা ২৭% হ্রাস পাইয়াছিল, আর ১৯১৯ হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যে হ্রাসটা হইয়াছে ৪%।

তথাপি এমন সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হইবে না যে, ম্যানুফ্যাক্‌চার শিল্পে কোন নূতন টেক্‌নিক্যাল বিপ্লব ঘটিতেছে। প্রথমতঃ, ১৯১৯ সনের সহিত তুলনা করিতে যাওয়াটাই ভুল, কারণ ঐ বৎসর অস্বাভাবিক কারণে মজুর-প্রতি ও নিয়োজিত অশ্বশক্তি প্রতি ফ্যাক্টরি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত লৌক ১৯২৩ খৃষ্টাব্দকে নয়া শিল্প-বিপ্লবের বৎসর বলিয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু ১৯২৩এর পর হইতে দেখা যাইবে পরিবর্ত্তনের গতিটা অনেকখানি মন্দা। ১৯১৯ হইতে ১৯২৩এর মধ্যে প্রতি ফ্যাক্টরি-শ্রমিকের উৎপাদন পরিমাণ ২৪% বাড়ে। কিন্তু ১৯২৩ হইতে ১৯২৭এর মধ্যে উহার বৃদ্ধি মাত্র ১১%। ১৯১৯ হইতে ১৯২৩এর মধ্যে প্রতি অশ্বশক্তি হইতে আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়াছিল ১২%, কিন্তু ১৯২৬—১৯২৭ সনে ঐ বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র ৯%।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯১৯ হইতে ১৯২৭এর মধ্যে ম্যানুফ্যাকচার শিল্পের তথা-কথিত টেক্‌নিক্যাল বিপ্লবটা দরের উঠানামার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। দরের পরিবর্ত্তনে কম এফিসিয়েণ্ট কল-কারখানা হাত গুটাইতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ সকল কলের মালিককেই বিশেষভাবে কর্ম্মতৎপরতা দেখাইতে হইয়াছে। ১৯২০ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাইকারী সমস্ত দর ও দীর্ঘ-স্থায়ী সুদের হার বাড়িতেছিল। এই বৃদ্ধির সুযোগে অত্যন্ত খারাপ ও অনুপযুক্ত কারখানাগুলিরও টিকিয়া থাকা সম্ভবপর হইয়াছিল। তারপর ৭ বৎসরের ভিতর অকৃষি পাইকারী দর ⅓ অংশ ও সুদের হার ⅐ অংশ কমিয়া গিয়াছে। তার স্পষ্ট ফল দেখা দিয়াছে কারখানার সংখ্যা হ্রাস ও পতনের হার বৃদ্ধিতে। ১৯১৯ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফ্যাক্টরির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতেছিল, ১৯১৯ হইতে ১৯২৭এর মধ্যে উহা ১১% হ্রাস পায়। ১৯২৩-২৭ এই পাঁচ বৎসরে গড়ে ফ্যাক্টরির সংখ্যা ১৯১০-১৪ পাঁচ বৎসরের চেয়ে ২০% বেশী ও ১৯১৫-১৯১৯ পাঁচ বৎসরের চেয়ে ১০% কম; কিন্তু ঐ দুই ৫ বৎসরে কারবার ফেল মারিয়াছে যথাক্রমে ৩৫% ও ২৯% বেশী।

তৃতীয়তঃ, প্রতি সহর ১৯১৯ হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যে যে বেশী উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তার অনেকখানিই মজুরদের ব্যক্তিগত এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধির দরুণ ঘটিয়াছে। ১৯১৯ হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যে কারখানা শ্রমিকের সংখ্যা ৭% কমিয়া যাওয়ার অর্থ ব্যবসায়ীরা কম উৎপাদনশীল মজুরদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিস্তিবন্দীতে কিনিবার প্রথার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পীস ও বোনাস শ্রমিকদের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে—কারখানার প্রায় ৫০% লোক এই শ্রেণীর। ১৯২৬ সন সব চেয়ে সুবৎসর—সে বৎসরেও মজুর "টার্ণওভার" বা হাতফিরৃতি ১০০% হইতে ৫০% এ নামিয়া যায় ও এফিসিয়েন্সি বাড়ায়। সব চেয়ে আশার কথা এই যে, মনিবেরা কাজের স্থায়িত্ব বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন। এটা একটা বড় কথা। স্থায়ী কাজ হইলে মজুরের মনোভাবও বদ্‌লাইয়া যায়, তাড়াতাড়ি কাজ হারাইবার ভয় থাকে না বলিয়া কাজের প্রতি তার দরদ জন্মে ও সে নিজের পটুতা বাড়াইবার চেষ্টা করে।

দর নামিতে থাকিলে অথবা স্থির থাকিলে ট্রেড

ইউনিয়ন-পন্থীরা কেন বলে যে মজুরি নির্দ্ধারণের পক্ষে খাওয়া পরার খরচাটা ধরিলেই যথেষ্ট হইবে না, তা বুঝা যাইবে। এও বুঝা যাইবে যে, প্রতি মজুরের কার্য্যশক্তি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইলে সে তার উৎপাদন-ক্ষমতা অনুযায়ী মজুরি বৃদ্ধির দাবী করিবে। কিন্তু শ্রীযুক্ত লোক বলেন, উৎপাদন পটুতা (—এফিসিয়েন্সি) তত্ত্ব মনিবেরাও স্বীকার করিয়াছে। মজুরি নির্দ্ধারণের জন্য মনিবেরা যাহা খরচা বাদ দিয়া উৎপাদন ক্ষমতার দিকে চাহিবে, ওদিকে যাহা খরচা তখন কমিতেছে বা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে ও মজুরের কার্য্যশক্তি বাড়িতেছে—এ কথাটা আশ্চর্য্যজনক বটে। লোকের যুক্তি এই যে, মনিবেরা বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্যবসার দ্রুতবৃদ্ধি হেতু মালের জন্য বৃহত্তর বাজার রাখিতে হইলে মজুরি চড়া রাখা চাই-ই। সমালোচক বলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারা মজুরি নির্দ্ধারণ করিবে এরূপ ব্যবসা-পতির সংখ্যা বিরল। ১৯২২ সনের শেষভাগে ও ১৯২৩ সনের গোড়ায় ফ্যাক্টরি মজুরি দ্রুতবেগে বাড়িয়াছে, কিন্তু তা স্বাভাবিক কারণে, টানযোগানের ক্রিয়ার ফলে ঘটিয়াছে—ব্যবসায় বুম হওয়ায় মাল ও লোকের টান বাড়িয়া গিয়াছিল। ১৯২২ এপ্রিল হইতে ১৯২৩ এপ্রিলের মধ্যে ফ্যাক্টরি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়াছিল ৩২%, অপূরিত অর্ডার ৬৪%, কৃষি ব্যতীত পাইকারী দর ১৬%, ফ্যাক্টরিতে কাজ ২৩%। ১৯২৩ এর পর হইতে বাড়ী নির্ম্মাণ, মুদ্রাঙ্কণ, রেলপথে খুব অল্প ক্ষেত্রেই মজুরি বাড়িয়াছে। এই সব ব্যবসাতেও ট্রেড্ ইউনিয়ানের চাপের ফলে বাড়িয়াছে। ১৯২৩এর পর ফ্যাক্টরি মজুরদের ঘণ্টা প্রতি আয় বাড়িয়াছে। তার কারণ পীস রেটে বেশী আদায় হইয়াছে। দর পড়িলে বা ফ্যাক্টরিতে কাজ কমিয়া গেলেও যে মজুরি হ্রাস করা হয় নাই তার কারণ খুঁজিতে হইবে অন্যত্র। একটা কারণ, ম্যানেজাররা প্রতি শ্রমিকের কার্য্যশক্তি বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া মনিবেরা সহরের উৎপাদন শক্তি দ্বারা মজুরি নির্দ্ধারণ করিবার কল্পনা কোথাও করে নাই।

বলা বাহুল্য, মতানৈক্য সত্ত্বেও সমালোচক কেতাব খানির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাতে ডেভিস্, গ্রীন, ওয়েন ডি ইয়ং, জুলিয়াস্ এম্ বার্ণেস্, এড্ওয়ার্ড এ-ফিলেনে, স্যাম এ লিউইজোহন, স্যামুয়েল এম্ ভোক্লেন, লিউস্ ই পিয়ার্সন্‌স্ এব্ ম্যাথিউ হোলের ন্যায় শিল্পপতিদের মতামত-সূচক মুখনির্গত বাক্যাবলী স্থান পাইয়াছে। ন্যায়সঙ্গত মজুরির ধারণা গত ১৫ বৎসরে কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনাটা বিশেষ মূল্যবান্।

১। "এ ষ্টাডি অব্ ইনটারেষ্ট রেট্‌স" (সুদের হার সম্বন্ধে গবেষণা), কারিন কক। পি এস কিং অ্যাণ্ড সন লিমিটেড, লণ্ডন। ১৯২৯। পৃঃ ১০+২৫২। ১২ শি ৬ পে।

২। "দি ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট" (বিদেশী বিনিময় বাজার), হুগ্ এফ্ আর মিলার। দ্বিতীয় সংস্করণ। এড্‌ওয়ার্ড আর্নোল্ড অ্যাণ্ড কো, লণ্ডন। পৃঃ ৮+১৫২। ৮ শি ৬ পে।

৩। "এ হিষ্টরি অব্ মডার্ণ ব্যাঙ্কস্ অব্ ইস্যু" (নোট বাহির করিবার ক্ষমতাযুক্ত নবীন ব্যাঙ্কসমূহের ইতিহাস), চার্লস এ কোনাণ্ট। ৬ষ্ঠ সংস্করণ। জি পি পুটনাম'স সনস্, নিউ ইয়র্ক, পৃঃ ১৪+৮৪২।

৪। "দি প্রিন্সিপল্‌স অব্ হ্বেজেস" (মজুরীর মূল তত্ত্ব), ডক্টর উইলেম এল ভাল্ক। পি এস কিং অ্যাণ্ড সন লিমিটেড লণ্ডন। ১৯২৯। পৃঃ ১৫২। ৮ শি ৬ পে।

৫। "হ্বেজেস্ অ্যাণ্ড দি ষ্টেট্" (মজুরি ও রাষ্ট্র), ই এম্ বার্ণস্। ৪৫০ পৃঃ। ১৬ শি।

৬। "ষ্ট্যাটিষ্টিকাল অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্ট ফর বৃটিশ ইণ্ডিয়া" (বৃটিশ ভারতের সংখ্যামূলক তথ্যসমূহ) ১৯১৮-১৯ ও ১৯২৭-২৮। গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সেণ্ট্রাল পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ। ১৯৩০। পৃঃ ১২+৭৪৪। ২৸৴০

৭। "দি ইণ্ডিয়ান ইয়ারবুক" (ভারতের সালতামামি) ১৯৩০। সম্পাদক, ষ্টানলি রীড ও এস্ টি শেপার্ড। টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া অফিস্, বোম্বাই। পৃঃ ২৯+১০৩৩। ৫৲ টাকা।

৮। "দি লিগেল এফেক্‌ট্‌স্ অব্ রিকগ্‌নিশন ইন্ ইণ্টারন্যাশনাল ল" (আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকারের আইনগত ফলাফল), জন জি হের্ভে। পেনসিলহ্বেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ফিলাডেলফিয়া। ১৯২৮। পৃঃ ১৪+১৭০। ৩ ডলার।

৯। "জাপান অ্যাণ্ড দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্" (জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র) ১৮৫২-১৯২১। ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস অধ্যাপক জে পেসন ট্রীট প্রণীত। ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯২৮। পৃঃ ৯+৩০৭। ৩.৫০ ডলার।

সম্পাদকের চিঠি

১৯০৫ সন হইতে ভারতীয় আর্থিক চিন্তার ধারা

প্রিয় সহকর্ম্মিগণ,

গ্রন্থকার, গ্রন্থ-প্রকাশক ও সম্পাদক হিসাবে আপনারা ধনবিজ্ঞানের নানা শাখার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। আপনাদের জানাইতে চাই যে, সম্প্রতি যখন আমি বিলাত, ফ্রান্স, চেকো-স্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইতালি, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড ও জার্ম্মাণিতে নানা বিষয়ের গবেষণায় ও বক্তৃতায় ব্যাপৃত ছিলাম, তখন ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত নানা ব্যক্তি ভারতীয় লেখকদের আর্থিক আলোচনাসমূহের বিবরণ ইংরাজী অথবা কোন 'কন্টিনেন্টের' ভাষায় লিখিতে আমাকে অনুরোধ করেন; ইঁহাদের অনুরোধে আমার বহুদিনের পোষিত ইচ্ছা আরও দৃঢ় হইয়া উঠে।

এখন আমি জার্ম্মাণিতে আছি। সেই জন্য আমি বইটী জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিতে ইচ্ছুক। প্রস্তাবিত বইটীর নাম ইংরাজীতে অনুবাদ করিলে দাঁড়াইবে—"ইণ্ডিয়ান ইকনমিক থট্‌ সিন্স নাইন্টিন-ফাইভ্"। গ্রন্থপঞ্জী ও জীবন-কথা সম্বন্ধীয় প্রাথমিক গ্রন্থরূপেই ইহা রচনা করা যাইতেছে। আর্থিক তত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে আমার পরবর্ত্তী আলোচনা-কারীদের নিকট ইহা বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তিস্বরূপে গণ্য হইবে। এই বই লিখিবার জন্য আপনাদের কাছে পরামর্শ ও মালমশলা প্রার্থনা করিতেছি।

আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রন্থকারই দুইটী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন—কোন ভারতীয় ভাষা ও ইংরাজী ভাষা। সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় আর্থিক চিন্তা গড়িয়া তুলিবার পক্ষে ইংরাজী ভাষার চেয়ে ভারতীয় ভাষায় লেখাই, কেবল জন-সাধারণের উপর নহে, কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর উপরও অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও প্রবল ভাবে কাজ করিয়া থাকে।

ভারতীয় আর্থিক চিন্তার প্রাথমিক গ্রন্থ হিসাবে পুস্তকটীকে বিশেষ মূল্যবান করিয়া তুলিতে হইলে ইহাতে স্থান পাওয়া উচিত—প্রধানতঃ ভারতীয় নানা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলার বিবরণ এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতীয়দের লিখিত ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলার বিবরণ।

তা ছাড়া, স্কুল-কলেজে বিদ্যাদানের কাজে নিযুক্ত লেখকদেরই অবদানকে আর্থিক চিন্তা হিসাবে গণ্য করা হইবে না। নিম্নলিখিত শ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করা হইবে:—(১) জমিদার, অন্য শ্রেণীর জমির অধিকারী, চাষী কলকারখানা যানবাহন, ব্যাঙ্কিং বীমা বা কোন প্রকার ব্যবসাতে নিযুক্ত উচ্চ বা নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ; (২) গভর্মেন্টের রাজস্ব, টেকনিক্যাল, বা শাসন-বিষয়ক কাজে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ; (৩) সাধারণের সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যেমন—রাজনৈতিক নেতা, সমাজ-সেবক, শ্রমিক নেতা, সংবাদপত্র-সেবী ইত্যাদি।

অনেক গ্রন্থকার মারা গিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থগুলার প্রকাশকরা বা তাঁহাদের বন্ধুগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিবেন এটুকু আশা করিতে পারি না কি?

যাঁহারা আমার আলোচ্য বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের লেখার দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন ও তাঁহাদের লেখা আমাকে যোগাইবেন, এই অনুরোধ করা যাইতেছে।

এই পত্র যাহাতে সু-প্রচারিত হয় তাহার জন্য সম্পাদক ও পুস্তক-প্রকাশকদের অনুরোধ করা যাইতেছে। যদি সম্ভব হয়। আমার যে গ্রন্থখানা লেখা হইতেছে তাহার কোন কোন অধ্যায় প্রবন্ধরূপে সম্পাদক মহাশয়রা প্রকাশিত করিতে পারেন।

কোন্ কোন্ বিষয়ে খবরাখবর চাই তাহা নীচে বলা যাইতেছে। যাঁহারা নিজেদের বা নিজ বন্ধুদের জন্য রিপোর্ট দিবেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে দরকার বুঝিলে আরও

আর্থিক খবরাখবর যোগাইতে পারিবেন। রিপোর্টগুলা কিন্তু সজ্জিপ্ত হওয়া চাই এবং সেগুলা আলোচ্য বিষয়ের সীমার বাহিরে যেন না যায়।

ব্যবসা, সাহিত্য অথবা বিজ্ঞান চর্চার খাতিরে যে সব ইয়োরোপীয়, মার্কিণ ও জাপানী গ্রন্থকারগণ ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষ পড়াশুনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা উপসংহারে স্থান পাইবে। এ বিষয়ে তাঁহাদেরও সহযোগিতার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে।

গ্রন্থকারদের জীবনী ও লেখা-বিষয়ক কিরূপ খবরাখবর চাই

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইংরাজীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে:—

১। নাম (পুরাপুরি বানান করিতে হইবে)।

২। জন্মস্থান (জেলা, প্রদেশ বা রাষ্ট্র)

৩। জন্মের তারিখ

৪। মাতৃ-ভাষা

৫। ভাষা—(ক) যে ভাষায় লেখক লিখিয়া থাকেন ;
(খ) যে ভাষায় তিনি গবেষণা চালাইয়াছেন ;

৬। পেশা—(স্বাধীন জমিদারী, অথবা কৃষি শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কোন পেশা ; বাণিজ্য-আফিসে চাকুরী ; সরকারী চাকুরী ; ডাক্তারি, ওকালতি অথবা অধ্যাপনা ইত্যাদি)।

৭। সামাজিক অভিজ্ঞতা (জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর ডিরেক্টার-গিরি অথবা চেম্বার অব্ কমার্সের সভ্য-গিরি ; শিক্ষা, বিজ্ঞান অথবা সমাজ-সেবা সম্বন্ধীয় সমিতি সমূহের পরিচালনায় যোগদান ; পল্লী বা জেলা বোর্ড, অথবা কাউন্সিল, কন্ফারেন্স, কংগ্রেস প্রভৃতির সহিত লিপ্ত থাকা ; ভারত বা ভারতের বাহিরে ভ্রমণ অথবা গবেষণা চালানো ; অর্থনৈতিক অথবা অন্য কোন পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা, ইত্যাদি)।

৮। কি কি লেখা, প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের দ্বারা গ্রন্থকার তাঁহার আলোচনা-প্রণালী, মালমশলা বা মূল বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।

৯। গ্রন্থাবলী (তারিখ অনুযায়ী পর পর সাজাইতে হইবে)। কয়েকটা কথার দিকে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে :—

(ক) যে সমস্ত লেখা সত্যসত্যই ছাপানো ও প্রকাশিত হইয়াছে কেবল সেই গুলারই নাম করিতে হইবে।

(খ) যে সব প্রেসে আছে বা কেবল টাইপে ছাপা সেগুলা উল্লেখ করার দরকার নাই ;

(গ) দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকায় যে সব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার তালিকা দিতে হইবে। যে সব লেখা পরে কোন বইয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিংবা কোন বইয়ে ঢুকাইবার সম্ভাবনা আছে, কিংবা কোনরূপে কোন বইয়ে কাজে লাগাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা খুলিয়া বলিয়া দিতে হইবে। যে সব পত্রিকায় লেখা বাহির হইয়াছে সেগুলার নাম কি, তাহা কোথা হইতে প্রকাশিত, তাহার কোন্ বর্ষের কোন্ মাসে প্রবন্ধগুলা বাহির হইয়াছে, তাহাও জানাইতে হইবে।

(ঘ) যে সব পুস্তিকা ছাপা হইয়াছে সে সবেরও নাম করিতে হইবে। সাধারণ সমিতির সম্মুখে যে সব বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে বা কোন কমিটির সম্মুখে যে সব সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাও জানানো দরকার। বক্তৃতা বা সাক্ষ্যগুলা ইংরাজীতে পাওয়া না গেলে তাহার উল্লেখের দরকার নাই।

(ঙ) ভারতীয় ভাষায় যে সব লেখা বাহির হইয়াছে তাহাও নোট করিতে হইবে। কোন্ ভাষায় লেখা হইয়াছে, লেখাটীর নাম ইংরাজীতে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহাও জানাইতে হইবে। যেখানে নামটা হইতে বইয়ের ভিতরের কথা আন্দাজ করা অসম্ভব, সেখানে একটী অতিরিক্ত নাম অথবা সূচীপত্রের একটা সজ্জিপ্ত-সার জুড়িয়া দেওয়া চলিতে পারে।

(চ) গ্রন্থকার কি কি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিতে যেন কোন রকমে ভুল না হয়।

(ছ) গ্রন্থের একের বেশী সংস্করণ হইলে, প্রথম সংস্করণ উল্লেখ করিবার সময় ব্র্যাকেটের মধ্যে তাহা জানাইতে হইবে।

(জ) প্রকাশের সময়, প্রকাশকের নাম, পৃষ্ঠার সংখ্যা (বই ও প্রবন্ধ দুয়েরই) এবং বইয়ের "আকার" সম্বন্ধেও জানাইতে হইবে।

(ঝ) চিন্তার ধারা অনুযায়ী অথবা অন্য কোন মাপকাঠি লইয়া গ্রন্থকার নিজেই যেন নিজের লেখার শ্রেণী-বিভাগ না করেন। লেখা, বই, পুস্তিকা, বক্তৃতা ইত্যাদি যেন কেবল প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী পর পর নাম করা হয়।

এই আলোচনায় কি কি শ্রেণীর লেখা স্থান পাইবে, তাহা বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ যে ভাবে ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তুকে ভাগ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যাইবে :—

(১) কৃষি-সম্বন্ধীয় ধনবিজ্ঞান; (২) শিল্প সম্বন্ধীয় ধনবিজ্ঞান; (৩) ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় ধনবিজ্ঞান (অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য যানবাহন, ব্যাঙ্কিং, বীমা, বিনিময়-হার ইত্যাদি); (৪) সামাজিক ধনবিজ্ঞান (লোক-সমস্যা, সাধারণ স্বাস্থ্য, মিউনিসিপ্যাল ও গ্রাম্য জীবন, জীবনযাত্রা প্রণালী, বিভিন্ন পেশা-বিভাগ, শ্রম-পটুতা ইত্যাদি); এবং (৫) রাষ্ট্র সম্পর্কীয় ধনবিজ্ঞান (জমিজমা, মুদ্রা, ব্যবসার গড়ন, আমদানি-রপ্তানি, ব্যাঙ্ক, মজুর প্রভৃতি সম্বন্ধীয় আইন কানুন ও রাজস্ববিজ্ঞান এই বিভাগের আলোচ্য বিষয়)।

বৈজ্ঞানিকভাবে উক্ত প্রত্যেকটী বিষয় দুই দিক্ হইতে আলোচনা করা হইবে :—

(১) আর্থিক দুনিয়া, (২) আর্থিক ভারত।

এঞ্জিনিয়ারিং রসায়ন চিকিৎসা-বিজ্ঞান (বিশেষতঃ সাধারণের স্বাস্থ্য-তত্ত্ব) আর্থিক জীবন ও চিন্তার ভিত্তি ও প্রাথমিক কথা বলিয়া ধরা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

গ্রন্থকারেরা তাঁহাদের রিপোর্ট যেন টাইপ করিয়া পাঠান এবং তাহার নকল যেন নিজেদের কাছে রাখেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

যাঁহারা তাঁহাদের প্রবন্ধ বা গ্রন্থের কপি পাঠাইতে পারেন তাঁহাদের তাহা পাঠাইতে বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে। এই সব গ্রন্থ বা প্রবন্ধ আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়নে এবং মিউনিকের টেখ্‌নিশে হোখ্‌শুলেতে (যেখানে আমি ব্যাভেরিয়া গভর্মেণ্টের শিক্ষা-সচিবের নিমন্ত্রণে বক্তৃতা দিতে ব্যাপৃত আছি) বক্তৃতা দিতে যে যথেষ্ট সাহায্য করিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

একথাও এখানে বলা চলিতে পারে যে, আমার এই বই লেখা উপলক্ষ্যে যে সব বই ও প্রবন্ধ জড় হইবে, সেগুলা জার্মাণির কোন বিজ্ঞান পরিষদের লাইব্রেরীতে দেওয়া হইবে এবং সেগুলা সেখানে সাধারণের ব্যবহারের জন্য রক্ষিত হইবে। 'ভারতীয় আর্থিক চিন্তা ইয়োরামেরিকার বিজ্ঞান-পরিষৎ ও বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলার কাছে এখনও উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করে নাই'—এই কথা বলিলেই বোঝা যাইবে আমার এই প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা কতদূর।

ভারতীয় ভাষার লেখা নামও সাদরে গৃহীত হইবে। কিন্তু সেগুলার ভিতরে প্রবেশ আমার পক্ষে অসম্ভব—কারণ আমার দৌড় বাংলা ও হিন্দী পর্য্যন্ত।

নমস্কার ও ধন্যবাদ জানিবেন। ইতি

আপনাদের সুহৃৎ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

"আর্থিক উন্নতি", "জার্ণাল অব্ দি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স" ও "ইণ্ডিয়ান কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি" প্রভৃতির সম্পাদক; বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষণাধ্যক্ষ।
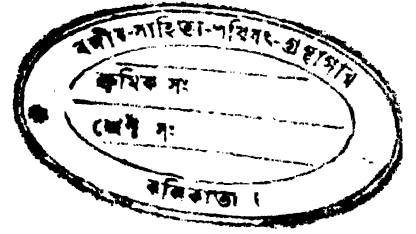
ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপন

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ, এম্, এ

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মাল-বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য যে কত অধিক তাহা এখনো আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা দ্রব্য-নির্ম্মাতা বা ম্যানুফ্যাক্চারার তাহারাও যে বিজ্ঞাপনে খুব আস্থাবান তাহা মনে করাও শক্ত। তবে ইহা সত্য যে পাশ্চাত্য জগতেও শিল্প-বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় দ্রব্য-নির্ম্মাতারা বিজ্ঞাপনে যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করিতেন না। ঐতিহাসিক ভাবে দেখিতে গেলে বলা চলে যে, বাজারে বিক্রয়যোগ্য একই প্রকার জিনিষের যত প্রতিযোগিতা বাড়িয়াছে, দ্রব্য-নির্ম্মাতৃগণ বাধ্য হইয়া ততই বিজ্ঞাপনের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

অনেকের ধারণা যে বিজ্ঞাপনে অর্থ-ব্যয় করা অর্থ নষ্ট করা মাত্র। যত টাকা দিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তত টাকা খরচ কমাইয়া দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিলে বাজারে মাল বিক্রয় হইবে বেশী। কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক না হইলেও যে ভাবে এ মতটী ব্যক্ত করা হয় তাহা একেবারেই অগ্রাহ্য। ইহা সত্য যে, যে মালের বিক্রয় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে করা হইবে তাহার দাম যত কম হইবে বিক্রয় ততই বাড়িতে থাকিবে। তা ছাড়া বিজ্ঞাপনে অর্থব্যয়েরও মাল-বিশেষে, বাজার-বিশেষে এবং অনেক সময় কাল-বিশেষে একটা সীমা আছে, যাহা অতিক্রম করিলে মালের পড়তাই বাড়িয়া যায়, বিক্রয় বেশী হয় না। কিন্তু এ সব হইতেছে, 'বিশেষ' বা অসাধারণ অবস্থার ব্যাপার; আপাততঃ এই সকল দৃষ্টান্তের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া এ কথা খুব বলা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞাপনে অর্থব্যয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় না। কারণ, প্রথমতঃ, উৎপন্ন হইলেই ত আর জিনিষ বিক্রি হয় না—প্রতি দ্রব্যের জন্যই একটী বিশেষ বিক্রি-ব্যবস্থা আছে। বাজারে মাল চালাইতে হইলে তাহার জন্য অর্থব্যয় করা চাই—নহিলে কোন ক্রেতা নির্ম্মাতার ফ্যাক্টরী হইতে মাল লইয়া যাইবে না। এমন কি কোন খুচ্‌রা বিক্রেতাও ফ্যাক্টরী হইতে মাল যোগাড় করিতে আসিবে না। বিজ্ঞাপনের ব্যয় এই বিক্রি-ব্যবস্থার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয়েরই অঙ্গীভূত। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞাপনে অর্থব্যয় করিয়া যদি বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায় তবে উৎপন্ন দ্রব্যপ্রতি নির্ম্মাতার পড়তা কমিয়াই যায়, বাড়ে না। অর্থনীতির স্থূল তত্ত্বগুলির সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনে খরচ বৃদ্ধি পায় এই যুক্তি সেই ব্যবসায়ীরাই দিয়া থাকেন যাঁহারা বিজ্ঞাপনের আর্থিক মর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই। তারপর, এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁহারা বিজ্ঞাপন যে কি তাহা ভাল করিয়া বুঝেন না। এই সব ব্যবসায়ীদের অনেকে বিজ্ঞাপনে বহু অর্থব্যয় করিয়া নিরাশ হইয়াছেন এবং অবশেষে বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞান সম্বন্ধেই হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন-প্রদান কেবল কতকগুলি বিনুনি কথার ফাঁকা আওয়াজ করাই নয়। ক্রেতার ঝোঁকে যেমন তেমন করিয়া দুটো কুচ্-কাওয়াজ করিলে খরিদ্দার শিকার করা যায় না। প্রকৃত বিজ্ঞাপন একটী পূর্ব্ব-কল্পিত অভিযান—এর পথঘাট গোড়া থেকেই বাঁধিয়া নিতে হয়; কোন্ সুড়ঙ্গের পথে প্রবেশ করিয়া কোন্‌খানে নিষ্ক্রান্ত হইলে ক্রেতার সম্মুখীন হইতে পারা যাইবে তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া আগেই ঠিক করা দরকার। চিন্তা না করিয়া যখন তখন যেমন তেমনভাবে বিজ্ঞাপন দিলে কাজত হয়ই না বরং তাহাতে প্রচুর অর্থনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

উপরে বিজ্ঞাপনকে অভিযানের যে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে একটী ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। আয়োজন-হিসাবে বিজ্ঞাপন চালান

সামরিক অভিযানের সঙ্গে তুলিত হইলেও ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য যে, বিজ্ঞাপনের সফলতা তখনই যখন ইহা জনসাধারণকে সম্মোহিত করিতে পারে—যখন অভিভূত করিতে পারে তখন নয়। ক্রেতার মনকে অধিকার করিবার একমাত্র উপায় তাঁহার নিকট আবেদন করা বা তাহাকে সাজেস্‌শান দেওয়া, কোনপ্রকার মানসিক বলপ্রয়োগ করা নয়। মানসিক বলপ্রয়োগে ক্রেতার মনে ক্রয়-ইচ্ছা না জন্মাইয়া বরং ক্রয়-বিমুখতাই জন্মাইয়া দেয়। এই ইচ্ছা-জন্মানেরও মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া একটা বিশিষ্ট নিয়ম আছে। বিজ্ঞাপনে প্রথম জন্মাইতে হইবে ক্রেতার মনোযোগ, তারপর অনুরাগ, তারপর ক্রয়েচ্ছা, পরিশেষে ক্রয়-চেষ্টা।

এসব কথা অনেকের জানা নাই বলিয়াই এদেশে সংবাদ পত্রের স্তম্ভে আমরা বিজ্ঞাপনের এত উদ্ভট নিদর্শন দেখিতে পাই। অনেক বিজ্ঞাপন-দাতাই দেখিতে পাই চীৎকার করিয়া বিজ্ঞাপিত জিনিষের গুণ-কীর্ত্তন করেন। ফলে বিজ্ঞাপন মানে দাঁড়াইয়াছে বিশেষণের ছড়াছড়ি আর অত্যুক্তির কসরৎ। আবার কোথায়ও দেখিতে পাই বিজ্ঞাপনদাতারা "অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা" "সুবর্ণ সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ" ইত্যাদি উত্তেজনাকারক শিরোনামা বা হেড্‌লাইন ব্যবহার করিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। সম্প্রতি দেখিতেছি উদ্ভট রকমের চেহারা প্রভৃতি দিয়াও এই প্রকার চেষ্টা কখন কখন করা হয়। বলা বাহুল্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেই বিজ্ঞাপন কৃতার্থ হইতে পারে না। তা ছাড়া, অনেক বিজ্ঞাপনদাতাই বিজ্ঞাপন স্থানের স্বল্প কলেবরের মধ্যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ লিখিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। ইঁহারা ভাবিয়া ও দেখেন না যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের সমগ্র বংশ-তালিকা বা গুণের ফিরিস্তি লইবার অবকাশ কত কম। তা ছাড়া, অনেক সময় বেশী পাঠ্য-সামগ্রী থাকার দরুণ বিজ্ঞাপন দুরূহ-পাঠ্য হইয়া দাঁড়ায়। সব চাইতে আমাদের দেশীয় বিজ্ঞাপনে যে জিনিষটার বেশী অভাব সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের সজ্জা বা "লে আউটের" অভাব। বিজ্ঞাপন এক হিসাবে মুখ্যতঃ ছবিমাত্র। এই কথাটা আমাদের বিজ্ঞাপনদাতাদের বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক। অবশ্য বাংলাতে বিজ্ঞাপনের বিশেষ অসুবিধা এই যে, বাংলা অক্ষরের চেহারার বৈচিত্র্য এবং আকারের পার্থক্য অতিশয় অল্প। ইংরাজী অক্ষরের এই হিসাবে সম্পদ্ অপর্য্যাপ্ত। ফলে বাংলাতে বিজ্ঞাপনের চিত্র-সজ্জা (ডিজাইন) তত ভাল হয় না যতটা ইংরাজীতে হয়। তবুও যিনি বিজ্ঞাপন-বিদ্ তিনি এই কলার বহু-কৌশল ব্যবহার করিয়া বাংলা-বিজ্ঞাপনকেও অনেকটা চিত্র-সজ্জা দান করিতে পারেন—ইংরাজীতে ত কথাই নাই। তবে কথা এই যে অক্ষর-ব্যবহার, ব্লক-ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপার এত বিশেষজ্ঞানসাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সাধারণ ব্যক্তি—যিনি বিজ্ঞাপন-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন নহেন—তাঁহার এই সকল বিষয় জানা আছে বলিয়া আশা করা যায় না। সেদিন দেখিলাম কোন এক তিন আনা দামের পুস্তকের বিজ্ঞাপন-দাতা বিজ্ঞাপনে পঞ্জিকায় ছবি দিয়াছেন এবং বাংলা দৈনিক কাগজের স্তম্ভে দিয়াছেন তাহারই এক হাফ্‌টোন ব্লক। ব্যাপারটা কতটা যে অশোভন হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। লাইন ব্লক করাইতে হইলে পূর্ব্বে চিত্র করাইবার যে খরচ তাহা বাঁচাইবার জন্ম বিজ্ঞাপন-দাতা ঐরূপ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কোন কোন কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাই কোম্পানীর নাম অপেক্ষা কর্ম্মচারীর নাম কিংবা দ্রব্যের নাম অপেক্ষা স্বত্বাধিকারীর নাম বৃহত্তর অক্ষরে ছাপা হইয়াছে। বলাবাহুল্য এই সব স্থলে বিজ্ঞাপনে-জ্ঞানের অভাবই সূচিত হয়।

বিজ্ঞাপন শুধু খবরের কাগজেই নয় আরও অনেক প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বত্রই বিজ্ঞাপনের রীতি দেখিয়া মনে হয় আমাদের দেশে যথার্থ বিজ্ঞাপন প্রদানের নিয়মকানুন আজ পর্য্যন্ত লোকের জানা নাই। অথচ বিজ্ঞাপনই হইল বিক্রয়-ব্যবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

ক্রয়শক্তি ও জীবনবীমা

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, বি, কম

অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা যদিও কিছুই নয়, তবু এই বিংশ শতাব্দীতে এর যতটুকু উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে তার জন্য জীবনবীমার গৌরব কতখানি? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বতঃই একথা মনে হবে যতটা তার প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক কমই আমরা তাকে দিয়ে থাকি।

প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর লোক জানেন যে কি ক'রে এই বীমা কোম্পানীগুলি দেশের কোটি কোটি মধ্যবিত্ত ও মজুর শ্রেণীর কাছ থেকে অল্প পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করে এনে বড় বড় পুঁজি তৈরি করে, আর তারই সাহায্যে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে ওঠে। এমনি ভাবে বীমাকোম্পানী যে টাকা লগ্নী করে তাতে পরোক্ষভাবে এরা গোটা দেশেরই আর্থিক উন্নতির সহায়তা করে বুঝতে হবে। অবশ্য আমাদের দেশের বীমা কোম্পানীগুলি এখনও খুব শক্তিমান হয়নি বলে এ পর্য্যন্ত তাদের যথেষ্ট পুঁজি জমে ওঠেনি, যা থেকে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে—বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে—প্রায় সমস্ত ব্যবসার মূলধনই, সেখানকার বীমা কোম্পানী যুগিয়েছে। দিন আনে দিন খায় এমন সব লোকের টাকাও যে ব্যবসা বাণিজ্যে খাটানো যেতে পারে এতো বীমা কোম্পানীই সম্ভবপর করে তুলেছে। অজ্ঞ দরিদ্র মজুরশ্রেণী তাদের সামান্য সঞ্চয় কোন ব্যবসা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে লগ্নী করতে ভরসা পায় না, কারণ তাতে অনেক বিপত্তি হ'বার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বীমা-কোম্পানীর হাতে যখন তাদের কষ্টসঞ্চিত টাকা এসে জমা হয়, তখন তার সাহায্যে ব্যবসা-শিল্প ও পুষ্ট হ'তে পারে, অথচ যাদের টাকা—সেই মজুর শ্রেণীর কোন বিপদেরও সম্ভাবনা থাকে না।

বর্ত্তমান যুগে খুব ভাল ব্যবসার তাৎপর্য্যই হচ্ছে জনসাধারণের খুব বেশী কেনবার শক্তি। হঠাৎ যদি এই ক্রয়শক্তি খুব কমে যায় তবে ব্যবসার প্রত্যেকটি বিভাগ ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং অনেক মহাজনেরই দোকানপাট তুলে ফেলতে হয়।

তাই আমাদের দেখতে হবে যে, কি হ'লে দেশের এই "ক্রয়শক্তি" বাড়তে পারে। অনেকে বলেন যে, দেশের লোকের আয়ের সংস্থান হ'লেই "ক্রয়শক্তি" বাড়বে। আয়ের সংস্থান খুব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের উন্নতির কারণ ও জিনিষটা নয়—ওটা দেশের উন্নতির ফল। "ক্রয়শক্তি" বাড়ানোর জন্য যা সব চেয়ে বেশী দরকার সেটা হচ্ছে বিশ্বাস—একটা সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস বা পরস্পর আস্থা। পরস্পরের মনে বিশ্বাস না থাকলে একদিনেই ব্যবসা-জগৎ অচল হয়ে যেত। মানুষের মনে এই বিশ্বাসকে গড়ে তোলবার জন্য বীমা কোম্পানীর চেয়ে আর কোন্ প্রতিষ্ঠান বেশী সহায়তা করেছে?

জীবনবীমা সম্বন্ধে জনসাধারণের কিছু জ্ঞান হওয়ার পুর্ব্বে কোন বুদ্ধিমান লোকই তার আয়ের প্রায় সবটাই খরচ করে ফেলতে সাহস করত না, যেমন আজকালকার কোটি কোটি লোক করছে। উপার্জ্জনের সবটাই যদি খরচ হয়ে যেত তা'হলে তার অকালমৃত্যুতে পরিবার পরিজনের কি দুরবস্থাই না হোত। নিঃসম্বল অবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর কি উপায়ই বা তাদের থাকত। তাই অকালমৃত্যুতে তার পরিবার-বর্গের ভবিষ্যতে যাতে ভরণপোষণের কোন কষ্ট না হয় তার জন্যই বাধ্য হয়ে তাকে আয়ের বেশী ভাগই বাঁচাতে হোত। আর সেজন্য অত্যধিক ব্যয়সঙ্কোচ করবার ফলে তার দৈনন্দিন জীবন অস্বাচ্ছন্দ্যে ভরে উঠত।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে জিনিষটা বুঝাতে চাইলে হয়ত খুব

অবান্তর হবে না। ধরা যাক্ যে জীবন বীমার প্রচলন হবার আগে কোন লোক বছরে ৩০০০৲ টাকা রোজগার কচ্ছিলেন এবং তিনি মনে ক'রলেন যে তার মৃত্যুর পর তার পরিবার পরিজনের হাতে কম পক্ষে ১০,০০০৲ টাকা থাকা উচিত যাতে তাঁর অবর্ত্তমানেও তাদের দিনগুলি সহজভাবে চলে যেতে পারে। এখন তিনি যদি ১০০০৲ এক হাজার টাকা অর্থাৎ আয়ের এক-তৃতীয়াংশও জমাতেন তবু ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা জমাতে তার দশ বছর লাগতো এবং এই দশ দশটা বছর হোত তার কাছে দুঃখ ও অশান্তিময়। সর্ব্বদাই তাঁর ভয় হোত এই বুঝি মৃত্যু দ্বারে হানা দিচ্ছে, যা তাঁর ইচ্ছে ছিল কার্য্যতঃ শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তা সম্ভবই হ'ল না! মরবার সময়ও তাঁর এই ভাবনা রয়ে গেল যে পরিবারের জন্ম কিছু সংস্থান করা হ'ল না। পরিবারের জন্য ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা তিনি করে যেতে পারলেন না বটে; কিন্তু চিন্তা ভাবনা তাঁকে করতেই হল। এখন আর একটা দৃষ্টান্ত কল্পনা করা যাক্।—কোন একজন লোক উপরের দৃষ্টান্তে যে লোকের কথা বলা হয়েছে বর্ত্তমানে তারই সমান উপার্জ্জন করেন এবং তিনিও চান যে তাঁর অকালমৃত্যুতে সংসার চালানোর জন্যে তাঁর পরিবারের ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা মজুদ থাকে। তার জন্য তিনি বীমার আশ্রয় নিলেন। ২০০৲ দু'শ টাকা থেকে ৪০০ চারশ টাকার মধ্যে (টাকার পরিমাণটা নির্ভর করবে তাঁর বয়স ও তাঁর নির্দ্দিষ্ট বীমা পলিসির উপর) খরচ করে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন এই ভেবে যে তার মৃত্যুর পর বীমা কোম্পানী তার পরিবারকে দশ হাজার টাকা দেবেই। এই ভাবে কাজ করবার জন্য আগের দৃষ্টান্তের লোকটীর চেয়ে বছরে তার প্রায় ৬০০৲ ছয়শ টাকা থেকে ৮০০৲ আটশ টাকার মত বেশী বেঁচে যাচ্ছে। তা'ছাড়া আরও একটা সুবিধে হবে। যেখানে পূর্ব্বোক্ত লোকটীর ১০,০০০ দশ হাজার টাকার সংস্থান ক'রতে লাগছিল দশ বছর সেখানে এই লোকটীর লাগবে মাত্র আধঘণ্টা। যে মুহূর্ত্তে বীমা কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি হ'য়ে গেল সেই মুহূর্ত্তেই স্থির হয়ে গেল যে, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দশহাজার টাকা পাওয়া যাবে—তা তিনি বীমা কোম্পানীকে বীমার ধার্য্য টাকার শতকরা দু' টাকাই দিন আর এক টাকাই দিন্। এই যে ছয়শ টাকা থেকে আটশ টাকার মত উদ্বৃত্ত টাকাটা তিনি দৈনন্দিন জীবনে পূর্ব্বোক্ত লোকটীর চেয়ে বেশী খরচ ক'রতে সমর্থ হয়েছেন—এই খরচ করার সামর্থ্য যখন কারও হয় তখন আমরা বলি যে লোকটীর "ক্রয়শক্তি" বেড়েছে। এই ক্রয়শক্তি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেরই পুষ্টিসাধন করবে।

বর্ত্তমান যুগের একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, দ্রব্য-বিনিময়ের অনুপাতে নগদ অর্থের ব্যবহার হয় খুব সামান্যই। প্রায় সমস্ত ব্যবসাই চলেছে "ক্রেডিট" বা বিশ্বাসমূলক কতকগুলি নিদর্শনপত্রের উপর। জীবন বীমা এবং অন্যান্য বীমার কাজই হচ্ছে এই বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল ক'রে তোলা। জীবন বীমা না থাকলে ব্যবসা চালানোর জন্য অনেক ব্যবসাদারেরই কর্জ্জ পাওয়া কঠিন হোত; অগ্নিবীমার অভাবে কোন ব্যাঙ্কই বাড়ীঘরের উপর টাকা ধার দিতে সাহস করত না এবং কম্পেন্‌সেশন্ বা ক্ষতিপূরণ বীমা ব্যতীত মজুরদের হঠাৎ মৃত্যুতে তাদের পরিবারের "ক্রয়শক্তি" একেবারে অনেকখানি কমে যেত। তাহ'লে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বীমা লোকের মনে বিশ্বাস জন্মায়, আর একথা তো সকলেই জানেন যে, বর্ত্তমান ব্যবসাজগতে বিশ্বাস একটা অপরিহার্য্য সম্পদ্।

কাজেই এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, কোটি কোটি বেতনভুক্ কর্ম্মচারী ও মজুরদের মন থেকে বীমা শুধু তাদের পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের চিন্তা ভাবনা দূর করে দিয়ে তাদের জীবন সুখ ও শান্তিময় করেই ক্ষান্ত হয়নি—সঙ্গে সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির পথ সুগম করে দিয়ে তার আর্থিক সমস্যাও সহজ সরল করে তুলেছে।

ওলন্দাজাধিকৃত পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চায়ের চাষ ও ব্যবসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রপ্তানি ব্যবসার কতকগুলি বিশেষত্ব

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে সব চেয়ে বেশী চা রপ্তানি হয় হল্যাণ্ডে। এই রপ্তানির বেশীর ভাগ মাল আমষ্টার্ডম্ বাজারে না গেলেও অন্যান্য জায়গায় মাল চালান হইয়া যায়। ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে মোটা পরিমাণে চা বরাবর লণ্ডনেও রপ্তানি হয়। এই বন্দর হইতে পরে বিভিন্ন স্থানেও এই চা রপ্তানি করা হয়। হল্যাণ্ড হইতেও কিছু চা এখানে চালান হইয়া আসে। ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপ হইতে বিলাতে চা রপ্তানি দিন দিন বাড়্তির দিকে চলিয়াছে দেখা যাইতেছে। এ ছাড়া অষ্ট্রেলিয়াতেও এখানকার চা কম রপ্তানি হয় না। এখানকার বাজারে ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপের চা বেশ পশার জমাইয়া ফেলিয়াছে। আমেরিকায় রপ্তানির পরিমাণও বেশ উল্লেখযোগ্য। তবে ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চা'র কোয়ালিটি অনুসারে দুনিয়ার বাজারে ইহার যত পশার জমান উচিত ছিল তা এখনও হইয়া উঠে নাই। এখানকার বৃটিশ কলোনি হইতে কিছু কিছু চা ভারতেও আসে। এগুলি বেশীরভাগ এদেশী লোকেই কেনে।

লড়াইয়ের পূর্ব্বের মত রুশিয়ায় এখনও তত বেশী চা রপ্তানি হইতেছে না।

দুনিয়ার চায়ের তুলনায় ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপের চা উৎপাদন

দুনিয়ার চায়ের বাজারে ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় চা কোন স্থান পাইয়াছে তাহা জানিতে গেলে নীচের ৬নং তালিকা দেখা দরকার। এই তালিকায় দুনিয়ার মোট রপ্তানি চায়ের পরিমাণ এবং ইহার মধ্যে ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপের চা-রপ্তানির পরিমাণ কত তাহা দেখান হইয়াছে।

৬নং তালিকা

বৎসর	দুনিয়ার চা (মেট্রিক্ টন্)	ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপের চা রপ্তানি (মেট্রিক টন্)	দুনিয়ার চায়ের শতকরা অংশ
১৯২০	১৯৭,৬০০	৪৬,৩০০	১৫'৬
১৯২১	২৯৯,৬০০	৩৫,৯০০	১২'০
১৯২২	৩১০,৪০০	৪১,৬০০	১৩'৪
১৯২৩	৩৫৭,১০০	৪৮,২০০	১৩'৫
১৯২৪	৩৭৪,২০০	৫৫,৯০০	১৪'৯
১৯২৫	৩৭১,৫০০	৫০,২০০	১৩'৫
১৯২৬	৩৬৯,৬০০	৬১,৭০০	১৬'৭
১৯২৭	——	৭৫,৮০০	——

দুনিয়ার চা-প্রধান দেশের রপ্তানি

১৯২৪, ১৯২৫ এবং ১৯২৬ সনে দুনিয়ার চা-প্রধান দেশগুলির রপ্তানির পরিমাণ ৭নং তালিকায় দেওয়া হইয়াছে :—

৭নং তালিকা

দেশ	১৯২৪ (মেঃ টন)	১৯২৫ (মেঃ টন)	১৯২৬ (মেঃ টন)
বৃটিশ ভারত	১৫৮,০৬৫	১৫৩,০০০	১৬২,৫৬৩
সিংহল	৯২,৯৫৫	৯৫,১৫৯	৯৭,২০০
চীন	৪৬,৩২৩	৫০,৩৭৯	২৬,৮০০
জাপান	১০,২৪২	১২,৬১৮	১০,৭৮৪
ফর্ম্মোজা	৮,৩৮৪	৯,৬৬০	১০,১০৮
ওঃ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপ	৫৫,৯২৩	৫০,১৮৯	৬১,৬৫৩
নায়ানা	৪৮০	৫২৪	৫০০

বিভিন্ন বৎসরে বৃটিশ ভারত, সিংহল, চীন, জাভা ও সুমাত্রার চা রপ্তানি কিরূপ কম বেশী হইয়াছে তাহা ৮নং তালিকায় দেখান হইয়াছে।

নীচের হিসাবে ১৯০৫ সন হইতে ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত উপরোক্ত দেশগুলির রপ্তানির উঠানামা মেট্রিক টনে দেখান হইয়াছে:—

৮নং তালিকা

বৎসর	বৃটিশ ভারত	সিংহল	চীন	জাভা	সুমাত্রা
১৯০৫	৯৮,৪১৪	৭৭,৭৫০	৮৩,০৫৩	১১,৫৮৫	১০৩
১৯১০	১১৬,৪২৩	৮৪,৮৬৪	৯৪,৪৮০	১৫,৩৩৭	১৩৩
১৯১৫	১৫৪,৫৫৬	৯৭,৫৬৫	১০৭,৭৯৭	৪৭,০৭৮	৬,৭৫১
১৯১৬	১৩২,৮৩৭	৯৪,৪৭২	৯৩,৩০৬	৪৫,৪৮৭	১,৫৭১
১৯১৭	১৬৩,৭২৭	৮৮,৬৩৫	৬৮,১২৩	৩৬,৪৬৭	১,৫৪২
১৯১৮	১৪৮,২৯৭	৮২,০৯১	২৪,৪৫৬	২৭,৭৩৫	২,২২২
১৯১৯	১৭৩,৪৪৩	৯৪,৬৮৮	৪১,৭৬০	৫০,৬২৮	৪,৪৫১
১৯২০	১৩০,৫৩৬	৮৩,৮৮৬	১৮,৪৮৬	৪১,২৬২	৫,০০৮
১৯২১	১৪৪,১৭৫	৭৩,৩৭১	২৬,০৯৪	৩১,৩০৬	৪,৫৫৭
১৯২২	১৩৩,৭৯৪	৭৮,০০০	৩৪,৮৭১	৩৫,০৭৯	৬,৪৭৩
১৯২৩	১৫৬,৫২৭	৮২,৬০০	৪৮,৫১২	৪০,৮৫৬	৭,২৫৮
১৯২৪	১৬৩,৩০০	৯২,৯৫৪	—	৪৮,০৮৬	৭,৮৩৬

উপরের ৮নং তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বৃটিশ ভারতের চা রপ্তানি কিছু বাড়িয়াছে—সিংহলের রপ্তানি কিছু বাড়িলেও তেমন সন্তোষজনক নয়।

চা-উৎপাদনকারী দেশসমূহের রপ্তানির তুলনা

চীনের চা রপ্তানি অনেক কমিয়া গিয়াছে। দেশের আভ্যন্তরিক কতকগুলি গোলমালের দরুণ রপ্তানিতে এ মন্দা দেখা গিয়াছে। এমন কি এখানকার চাষীরা চায়ের চাষে তেমন লাভ না হওয়ায় এ চাষ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতেছে।

জাভার ও সুমাত্রার চা রপ্তানি খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এখানে নূতন রোপিত গাছে উৎপাদন খুব বেশী হইতেছে। শুধু তাহা নয়, এখানকার প্রতি হেক্টার জমিতে ফসলের পরিমাণও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং এখানকার চাষে অনেক আধুনিক প্রণালী ও জমির সার ব্যবহৃত হইতেছে ফলে চায়ের উৎপাদন আশাতীত বাড়িয়া গিয়াছে। জমিতে রাসায়নিক সার প্রদানে চায়ের উৎপাদন কিছু বাড়ে বটে, তবে সার খুব বেশী পরিমাণে দেওয়া দরকার এবং গত ৩।৪ বৎসর হইতে অথবা বলিতে গেলে ঠিক ১৯২৪ সন হইতে এই সারের প্রচলন খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

ব্যাটেভিয়া চা-ক্রেতা সঙ্ঘ

উপরোক্ত হিসাব এবং তথ্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জাভা ও সুমাত্রার চা-ই দুনিয়ার বাজারে বেশ ভালভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বৃটিশ ভারত ও সিংহলের চায়ের স্থানও বেশ পাকা বলিতে হইবে।

দুনিয়ার চায়ের সেরা বাজার হইতেছে লণ্ডন ও আমষ্টার্ডাম। ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন জাতীয় চা এই দুই বাজারেই বেশী কাটে। এই সমস্ত চা রপ্তানিকারীদের কাছ হইতে বরাবর ব্যাটেভিয়াতে চালান হইয়া আসে। এখানে অনেকগুলি বড় বড় রপ্তানিভবন

আছে এখানে কলোনির বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকারের মালের চালান আনিয়া গুদামজাত করা হয়। এই সমস্ত মালের মধ্যে চা-ই প্রধান। এই সমস্ত ভবনের সহিত চায়ের ব্যবসা করিতে হইলে ব্যাটেভিয়া চা ক্রেতা সঙ্ঘের ভিতর দিয়া লেখালেখি করাই ভাল। কারণ এই সঙ্ঘ ব্যবসা হিসাবে চা-সংক্রান্ত সমস্ত খবরাখবর ভাল করিয়া জানেন।

লণ্ডন ও আমষ্টার্ডামের বাজারে চায়ের মূল্য

লণ্ডন ও আমষ্টার্ডাম বাজারে ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চায়ের দর লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, জাভা ও সুমাত্রার চায়ের দর লণ্ডনের বাজারে বৃটিশ ভারত ও সিংহলের চায়ের দর অপেক্ষা অনেক নীচে থাকে। ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় চায়ের দর বিলাতের বাজারে সব সময়ে ১০ হইতে ২০ সেণ্ট (ওলন্দাজ) পর্য্যন্ত কম থাকে। বিভিন্ন দেশের জিনিষের দরের এরূপ কম বেশী হওয়াটা নেহাৎ অস্বাভাবিক নয়, কারণ সাধারণতঃ দেখা যায় সব দেশের জিনিষের কখনও কোয়ালিটি এক হয় না। এই কোয়ালিটীর ভাল মন্দের দরুণ দামেরও পার্থক্য হইয়া থাকে। সুতরাং বৃটিশ ভারত ও সিংহল হইতে যদি পয়লা নম্বরের চা বিলাতের বাজারে বেশী আমদানি হয় তাহা হইলে পড়তায়ও অন্যান্য চা অপেক্ষা ইহার দর যে একটু বেশী হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অন্য দিকেও তেমনি জাভা হইতে পয়লা নম্বরের চায়ের আমদানি বিলাতে অপেক্ষাকৃত কম হইলে পড়তায় এখানকার চায়ের দর একটু কমিয়াই যায়। সুতরাং এ দরের কম বেশী দেখিয়া ব্যবসার দিক্ দিয়া বিশেষ কিছু তারতম্য বুঝা যায় না। এ বিষয়ে হিসাবের অঙ্ক ধরিয়া দেখিলে ব্যাপারটা আরও ভাল বুঝা যাইবে—

লণ্ডন বাজারে বৃটিশ ভারতের চায়ের দর :—

১৯২৬ সনে	১ শিলিং ৭·৪২ পেঃ
১৯২৭ „	১ „ ৭·০১ „

ঐ একই সময়ে আমষ্টার্ডামে চায়ের গড়ে দর ছিল :—

১৯২৬ সনে	৯৩ৄ সেণ্ট (ওলন্দাজ)
১৯২৭ „	৮১ৄ „ „

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপের চায়ের দর ১৯২১-১৯২৭ সনে যাচাই করিলে দেখা যায় যে ঐ সময়ের মধ্যে দাম একটু একটু বাড়িয়াছে।

চায়ের দর বাড়িবার কারণ

চায়ের দর যে এই ভাবে বাড়িতেছে ইহার কারণ সর্ব্বপ্রকার জিনিষের সাধারণ দুর্ম্মূল্যতাই নহে, চায়ের কোয়ালাটিরও ক্রমিক উন্নতি হইতেছে। এই শেষোক্ত কারণটা যে কতদূর সত্য তাহা পনর বিশ বৎসর পূর্ব্বের চায়ের দরের সহিত আধুনিক দর তুলনা করিলে ভাল করিয়া বুঝা যায়। চায়ের চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পাট করা পর্য্যন্ত সকল বিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কোয়ালিটিরও অনেক উন্নতি হইয়া গিয়াছে। এই উন্নতির পথ ধরিয়া চলিলে কালে চায়ের কোয়ালিটির আরও যে উন্নতি হইবে এ বিষয়ে জোর করিয়া বলা যায়।

ভারতের চিনি-শিল্প

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ

পুরাকাল হইতেই ভারতবর্ষ সুতির কাপড়চোপড় ও চিনি রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। বর্ত্তমান সময়ে এই দুইটী জিনিষের রপ্তানির পরিমাণ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে ভারতের পণ্যের মধ্যে ইহাদের প্রধান স্থান দেওয়া চলে। ইক্ষুর আদি জন্মস্থানই ভারতবর্ষ এবং বহুদিন হইতে এই দেশ দুনিয়ার চিনির চাহিদার মোটা অংশ যোগাইয়া

আসিতেছে। ভারত যে শুধু আকের আদি জন্মভূমি তাহা নহে, বড় বড় নামজাদা ব্যক্তির অভিমত অনুসারে ইহাই জানা যায় যে, প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতেই কি করিয়া আকের রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয় তাহা প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং সেই সময় হইতে ভারতের চিনি দুনিয়ার বাজারে সেরা স্থান অধিকার করিয়া আছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং পৌরাণিক প্রবাদ ছাড়িয়া দিলেও খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণেতা পাণিনির গ্রন্থাবলীতে প্রথম চিনির (গুল অথবা গুড়) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পরেই খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম ও মহাবীরের সমসাময়িক চরকের পুথিতে ইক্ষুরসের পরিচ্ছন্নতা অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দুই শতাব্দী পরে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যের এবং সুশ্রুতের পুথিতে চিনি ও আকের রসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী ভারতবর্ষ হইতে ক্রমে চীনে ছড়াইয়া পড়ে। চীন সাহিত্যে প্রথম চিনির উল্লেখ সম্ভবতঃ খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে দেখা যায় এবং চিনির বিস্তৃত বিবরণ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দেখা যায়। তবে ইক্ষু খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেও চীন দেশে বর্ত্তমান ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। চীন দেশ হইতে "ফা হীন্" প্রথম ভারতে আসেন খৃষ্টীয় ৩৫০ সনে। তাহার ঐ সময়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে আসিয়া প্রথম যখন তিনি দক্ষিণ ভারতে পদার্পণ করেন, তখন বাঁশ, খেজুর গাছ ও ইক্ষু এই তিনটীই তাহার নিকট পরিচিত ছিল। চীন সাহিত্যে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে লিখিত আছে যে চীন সম্রাট টাই-সুঙ্গ (৬২৭-৬৫০ খৃষ্টাব্দ) চীন হইতে ভারতবর্ষের মগধ রাজ্যে চিনি প্রস্তুত প্রণালী শিখিবার জন্ম লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইক্ষু এবং ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী যেমন ভাগীরথীর সমতল ক্ষেত্র হইতে চীন দেশে প্রচারিত হইয়াছে, তেমনি ইহা পশ্চিমাভিমুখেও অনেক দূর গিয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, প্রধানতঃ আরবদেশীয় বণিকদের দ্বারাই ইক্ষু ও চিনি প্রস্তুত প্রণালী প্রথম মিশরে প্রচারিত হয় এবং সেখান হইতে দক্ষিণ ইয়োরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। খৃঃ পূঃ ৩৫০ সনে মহাবীর আলেকজেণ্ডারের সৈন্যগণ এদেশে আসিয়া ইক্ষু ও চিনি খাইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ইক্ষুরসকে তাহারা বলিত "মৌমাছি ছাড়া মধু।" ইয়োরোপবাসীর পক্ষে ইহাই প্রথম ইক্ষু ও চিনি ভক্ষণ। ঐতিহাসিক তথ্য হইতে জানা যায় ক্রুসেড্ এর সময় হইতে ইয়োরোপের সহিত প্রাচ্যের চিনির ব্যবসা প্রথম সুরু হয়; পরে এই ব্যবসা কালে কালে বাড়িয়া সমগ্র ইয়োরোপের সহিত প্রাচ্যের একটা বড় ব্যবসায় পরিণত হয়।

বীট্‌চিনি

বহু শতাব্দী ধরিয়া আকের চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই বেশী জন্মে। ঠিক ব্যবসা হিসাবে যে পরিমাণ আক জন্মান দরকার তাহা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ্জিয়ার অথবা ইয়োরোপের দক্ষিণ স্পেনের উত্তরে জন্মিতে পারে না। বীট্‌চিনি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই বেশী জন্মে, সুতরাং পশ্চিম ইয়োরোপের এবং উত্তর আমেরিকার প্রদেশ সমূহেই ইহার ফলন বেশী। যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও ইক্ষু এবং বীট্ বেশ জন্মে। তবে বিভিন্ন অবস্থানুযায়ী এ সমস্ত দেশে ফলনের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। নেপোলিয়ানের রাজত্বকালে যখন প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়োরোপীয় জাতিগণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া লইল, তখন ফ্রান্স বিদেশের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া ইয়োরোপের মাটিতে বীটের চাষ করিয়া দেশের বীট্‌চিনি শিল্পটা খুব বাড়াইয়া তোলে। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণি হইতে বীটের চাষ পূর্ব্বদিকে রুশিয়া, দক্ষিণে ইতালি এবং উত্তর দিকে নরওয়ে সুইডেনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বাজারে বীটচিনির আমদানি যদিও খুব বেশী দিনের কথা নয় তবুও ইহা ইতিমধ্যে ইক্ষুচিনির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ইক্ষু-

চিনি ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের বীটচিনির মধ্যে গত ৮০ বৎসর ধরিয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। ১৮৮২-৮৩ সনে বীটচিনি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহার পরে কখনও কখনও ইক্ষু-চিনির উৎপাদন বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে সত্য, তবে ইহা কখনও বীটচিনিকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। বীট-চিনির উৎপাদনের সহায়তার জন্য বরাবর এই চিনির রপ্তানি সম্বন্ধে বাউন্টি, ড্রব্যাক্ প্রভৃতি অনেক সুবিধা ইয়োরোপীয় গবর্ণমেণ্ট দিয়া আসিয়াছেন। ১৯০২ সনে ব্রুসেল্স্ কন্‌ভেন্সন্ বীটচিনির উৎপাদন-বিষয়ে এই প্রকারের পক্ষপাতিত্ব, অন্ততঃ কতকগুলি ইয়োরোপীয় দেশ হইতে দূর করেন। ফলে ইক্ষুচিনির উৎপাদন আবার বেশ বাড়িয়া উঠে। ১৯০০-০১ সনে ২,৮৫০,০০০ টন ইক্ষু চিনির উৎপাদন হয়। ১৯১০-১১ সনে এই সংখ্যা বাড়িয়া ৮,৪৩৩,০০০ টনে উঠে। লড়াইয়ের সময়ে বীটচিনির উৎপাদনে অনেক বিঘ্ন ঘটায় ইহার উৎপাদন ১৯১৩-১৪ সনের ৮,৬৩৫,০০০ টন হইতে ১৯১৯-২০ সনে ৩,২৫৫,০০০ টনে নামিয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে চিনির উৎপাদন আবার বাড়িয়া উঠায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাও আগের মত বাড়িয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর বীটচিনির উৎপাদন দুনিয়ার মোট চিনির অর্দ্ধেকেরও বেশী হইয়াছিল, ১৯১৩ সনে অর্দ্ধেকের কিছু নীচে নামিয়াছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়াইয়াছে। ইয়োরোপের বীটচিনির উৎপাদন ১৯১৯-২০ সনে সর্ব্বনিম্ন কোঠায় নামিয়াছিল, বর্ত্তমানে একটু একটু করিয়া আবার উঠিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বীটচিনির উৎপাদন যতদূর বাড়িয়াছিল, গত বাণিজ্য বৎসরে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বীটচিনির উৎপাদন হইয়াছে। বর্ত্তমান বাণিজ্য বৎসরে (১৯২৮-২৯) ইক্ষুচিনির উৎপাদন ১৯১৩-১৪ সনের উৎপাদন অপেক্ষা ৮ মিলিয়ন টন বেশী হইয়াছে। আর বীটচিনির উৎপাদন অর্দ্ধ মিলিয়ন টন বেশী হইয়াছে। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ বাদে ইক্ষু-উৎপাদনকারী দুনিয়ার অন্যান্য দেশগুলি ইক্ষুর চাষ ও ইক্ষুচিনি উৎপাদন বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক উন্নতি করিয়া ফেলিয়াছে। নীচের হিসাবের সংখ্যা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধের পূর্ব্ব সময় অপেক্ষা ইক্ষু এবং বীট উভয় চিনির উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতেও ইহা আরও বাড়িবে আশা করা যায়। বীটচিনির উৎপাদন দিন দিন পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যদিও ইক্ষুচিনির কাটতি বেশী রহিয়াছে, তবুও বীটচিনির সহিত ইহার প্রতিযোগিতা দিন দিন যেমন সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিতেছে তাহাতে বীটচিনির উৎপাদন শীঘ্রই সমান হইয়া যাইবে আশা করা যায়।

দুনিয়ার চিনি-উৎপাদন

বৎসর	মোট উৎপাদন (হাজার টন)	ইক্ষুচিনি (হাজার টন)	বীটচিনি (হাজার টন)
১৯০২-০৩	৯,৯০০	৩,৮৯০ (৩৯·৩%)	৬,০১০ (৬০·৭%)
১৯০৯-১০	১২,৭৬৬	৬,১৭৭ (৪৮·৩%)	৬,৫৮৯ (৫১·৭%)
১৯১২-১৩	১৫,৫৯৭	৬,৭০৬ (৪৩·৯%)	৮,৮৯১ (৫৬·১%)
১৯১৮-১৯	১৩,৪৮৫	৯,৬০২ (৭১·২%)	৩,৮৮৩ (২৮·৮%)
১৯২৪-২৫	২২,০৬৬	১৩,৭৫০ (৬২·২%)	৮,৩১৬ (৩৭·৮%)
১৯২৭-২৮	২৩,১৬৭	১৪,০১৮ (৬০·৫%)	৯,১৪৯ (৩৯·৫%)
১৯২৮-২৯	২৫,৪১৭	১৫,৮৮৮ (৬২·৪%)	৯,৫৭৯ (৩৭·৬%)

বর্ত্তমান সময়ে ইক্ষুচিনির উৎপাদনে কিউবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার পরেই জাভা ও ভারতবর্ষের স্থান। বাকী দেশগুলির মধ্যে হাওয়াইএর উৎপাদন সবচেয়ে বেশী। বীটচিনির উৎপাদনে বর্ত্তমানে জার্ম্মাণি ও চেকোশ্লোভাকিয়াই প্রধান। কিউবা ও জাভার ইক্ষুচিনি উৎপাদন অপর্য্যাপ্ত বাড়িয়া যাওয়াতেই ইক্ষুচিনির মোট উৎপাদন এত বাড়িতে পারিয়াছে। জাভার উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এখানকার চিনির উৎপাদন বৎসর বৎসর ক্রমান্বয়ে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯২৩-২৪ সনে জাভায় মোট চিনির উৎপাদন ছিল ১'৯ মিলিয়ন টন, সেস্থলে ১৯২৮-২৯ সনে ৩'২ মিলিয়ন টন হইয়াছে। ইক্ষুচিনির বৎসর প্রতি উৎপাদনের হার ১৯১৪-১৯১৮ সনে যেমন ছিল ১৯২১-১৯২৯ সনে তাহা অপেক্ষা বাড়িয়াছে। যুদ্ধের পর কিছুকাল ইয়োরোপ ব্রুসেল্‌স্ কনভেন্‌সনের অভিমত গ্রহণ করিতে পারে নাই, তারপর যখন শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও সংরক্ষণের যুগ আসিল আবার বীটচিনির উৎপাদন পুরাদমে আরম্ভ হইয়া মাত্রা পূর্ব্ব সীমায় পৌঁছিল। সুতরাং চিনির উৎপাদনের অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে ১৯০২ সনের মত দাঁড়াইয়াছে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ডাঃ জি, মিকুস্ ইকনমিক্ কমিটির (লীগ অব নেশানস্) একটী মেমরেণ্ডামে বলিয়া গিয়াছেন যে, দুনিয়ার ইক্ষুচিনির মোট সরবরাহের মাত্র ১/৫ ভাগ বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে। ১৯২৮-২৯ সনের দুনিয়ার বাজারে কোন দেশ হইতে কত চিনি সরবরাহ হইবে ডাঃ গীলিং তাহার নিম্নলিখিতরূপ একটী এষ্টিমেট করিয়া দিয়াছেন :—

	(হাজার টন)
নেদারল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম	১৫০
চেকোশ্লোভাকিয়া	৫০০
জাভা	৪৭৫
কিউবা	১,৭৫০
দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা	১৮০
স্যাণ্টো ডোমিনগো	৩০০
মোট	৩,৩৫৫

ডাঃ গিলিংএর এষ্টিমেট অনুসারে আরও জানা যায় যে, বর্ত্তমান বাণিজ্য-বৎসরে যে মাত্র ৩'৩ মিলিয়ন টন উৎপাদন হইবে তাহাতে বাজারের চাহিদা অনুসারে মোট চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ কম পড়িতে পারে। ইক্ষু ও বীটচিনির শিল্প দুইটী পাশাপাশি এত বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের উৎপাদন চাহিদা অপেক্ষা এত বেশী হইয়া যাইতেছে যে, উভয় চিনির মূল্যই অসম্ভবরকম কমিয়া গিয়াছে। নীচের বাজার দরের হিসাব দেখিলে এবিষয়ে অনেকটা ধারণা করিয়া লওয়া যায়।

বিলাতে কাঁচা চিনির বাজার-দর

বৎসর	হন্দর প্রতি গড় মূল্য (শিঃ)	চিনির মূল্যের সূচী-সংখ্যা	সাধারণ পাইকারী মূল্যের সূচী-সংখ্যা
১৯০৯-১৩	১১.৭¾	১৯৯	—
১৯১৩	৯.৮¾	১০০	১০০
১৯২১	১৮.৩½	১৮৮	১৯৭
১৯২২	১৫.৩½	১৫৭	১৫৯
১৯২৩	২৬.৯	২৬৫	১৫৯
১৯২৪	২১.৯	২২৪	১৬৬
১৯২৫	১২.৯	১৩১	১৫৯
১৯২৬	১২.৩	১২৬	১৪৮
১৯২৭	১৩.৯	১৪১	১৪২
১৯২৮	১১.৭½	১১৯	১৪০
১৯২৯*	৯.৩	৯৫	১৩৮

চিনির বাজার কি পরিমাণ পড়িয়া গিয়াছে এবং চিনির দরের উঠানামা কত তাড়াতাড়ি হয় তাহা উপরের তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। দরের দ্রুত উঠানামা এবং পড়তি বাজার অতি শীঘ্র সম সুরে উঠা চিনির বাজারের স্বাভাবিক নিয়ম। দুনিয়ার বাজারে চিনির সরবরাহে এই মন্দা পড়িবার প্রধান কারণ চিনির উৎপাদন ও কাট্‌তির মধ্যে অসামঞ্জস্য। সুতরাং চিনির বাজারের অবস্থা ফিরাইতে হইলে হয় চিনির কাট্‌তি যাহাতে বাড়ে তাহা

* প্রথম পাঁচ মাসের গড় হিসাব।

চেষ্টা করা দরকার, না হয়। চিনির উৎপাদন সম্ভব মত কমাইয়া দেওয়া দরকার, কিংবা দুই দিকের উন্নতি এক সঙ্গে সাধন করা দরকার।

বর্ত্তমান সময়ে খাদ্য হিসাবে চিনির মূল্য খুবই বেশী হওয়ার দরুণ চিনিশিল্পের এই মন্দাবস্থায় দুনিয়া বেশ ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। আবার দুনিয়ার বাজারে চিনির দরের উঠা নামা অনুসারেই ভারতের বাজার দরে কম বেশী দেখা যায়। সুতরাং ভারতের চিনির বাজার পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে আগে দুনিয়ার বাজারের অবস্থা দেখা দরকার। দুইটী বিষয়ের উপর ভারতের চিনি-শিল্পের উঠানামা প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে। (১) ভারতের চিনি-উৎপাদন, (২) ভারতের চিনির ব্যবসা।

ভারতের চিনি-উৎপাদন

ভারতবর্ষ যেমনি দুনিয়ার মধ্যে সর্ব্বপুরাতন এবং সম্প্রতি সর্ব্বপ্রধান চিনি-উৎপাদনকারী দেশ, তেমনি অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের ইক্ষুর কোয়ালিটী ও চিনি প্রস্তুত প্রণালী সর্ব্বাংশে সেরা। ফলে মালের ফিনিশ্ও এখানে অনেক ভাল হয়। ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত প্রায় ৩,০০০,০০০ একার জমিতে আকের চাষ হয়। ১৯২৭-২৮ সনের পরে ভারতের ইক্ষু চাষের হিসাব আর পাওয়া যায় নাই। ঐ সনে ভারতে মোট ২,৯৫৮,০০০ একার জমিতে আকের চাষ হয়। কোন প্রদেশে কত জমিতে ইক্ষুর চাষ হয় তাহার একটা মোটামুটি হিসাব নীচে দেওয়া গেল। অবশ্য বৎসর বৎসর এ হিসাবের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে :—

মাদ্রাজ	১০৬,০০০ একার
বোম্বাই (সিন্ধু প্রদেশ ও রাজ্য-গুলি ধরিয়া)	১০৭,০০০ ”
বাঙ্গালা	২০৯,০০০ ”
যুক্তপ্রদেশ এবং আগ্রা ও অযোধ্যা	১,৬০২,০০০ ”
পাঞ্জাব	৪৯৬,০০০ ”
বিহার ও উড়িষ্যা	২৮৯,০০০ ”
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২৩,০০০ ”
আসাম	৪১,০০০ ”
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪৩,০০০ ”
দিল্লী	৬,০০০ ”
মহীশূর	৩৪,০০০ ”
বড়োদা	২,০০০ ”
মোট	২,৯৫৮,০০০ একার

এই মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ ইণ্ডো-গ্যাঞ্জেটিক সমতল ভূমিতে জন্মে। এই সমতল ভূমি হিমালয়ের পাদদেশ দিয়া পশ্চিমে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে বিহার উড়িষ্যার অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

উৎপাদন

ভারতের শতাব্দীর উপর পুরাতন চিনির ব্যবসার অভিজ্ঞতায় যতদূর জানা যায়, তাহাতে এখানে প্রতি একার জমিতে ১২ হইতে ২০ টন পর্য্যন্ত ইক্ষুরস এবং প্রতি একারে প্রায় এক টন করিয়া চিনি উৎপাদন হয়। ইণ্ডিয়ান সুগার কমিটি ১৯২১ সনের বিবরণীতে প্রকাশ করেন যে, ভারতের প্রতি একার জমিতে গড়ে ১'০৭ টন চিনি উৎপন্ন হয়, কিউবাতে ১,৯৬ টন, জাভাতে ৪'১২ টন এবং হাওয়াইতে ৪.৬১ টন উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত ব্যাপার অনুসারে বিচার করিতে গেলে, তুলনায় ভারতের উৎপাদন আরও কম বলিয়া জানা যায়। ভারতে যে চিনি উৎপন্ন হয় তাহার শতকর ৯৯ ভাগ গুড়ের আকারে পাওয়া যায় এবং এই গুড় হইতে পরিষ্কার চিনি শতকরা ৫০ ভাগের বেশী পাওয়া যায় না। অথচ অন্যান্য দেশের ইক্ষুরস হইতে শতকরা গড়ে ৯০ ভাগ পর্য্যন্ত পরিষ্কার চিনি পাওয়া যায়। সুতরাং প্রকৃত চিনির উৎপাদন ভারতে কিউবার এক তৃতীয়াংশ, জাভার ⅛ এবং হাওয়াইএর ⅑ অংশ।

হাওয়াইএর দ্বীপপুঞ্জেই চিনি-শিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ, বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা এবং পরিচালনা শক্তিগুণে

দুনিয়ার মধ্যে একার প্রতি চিনি উৎপাদন এখানে সব চেয়ে বেশী করা সম্ভব হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে এখানকার চিনির উৎপাদন একার প্রতি গড়ে ৪.৩ টন পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তবে সময় সময় কোন স্থানে একার প্রতি ১২টন পর্য্যন্তও চিনির উৎপাদন দেখা যায়। চাষের পক্ষে কিউবার মাটী খুব অনুকূল। এখানকার গরম আব্‌হাওয়ার সঙ্গে মাটীর সার খুব বেশী থাকায় ইক্ষুর উৎপাদন এখানে খুব বেশী হয়। তবে এতদিন যাবৎ কিউবার কৃষি-প্রণালী তেমন উন্নত ছিল না। সম্প্রতি ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখানে একার প্রতি ১৫ হইতে ২০ টন পর্য্যন্ত ইক্ষুর উৎপাদন দেখা যায় এবং চিনি গড়ে দুই টন উৎপন্ন হয়। ইক্ষুরস ও চিনির উৎপাদন-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির ব্যবহার বর্ত্তমান সময়ে কিউবাতে খুব বাড়িয়া গিয়াছে। জাভাতেও একার প্রতি গড়ে ৪০ হইতে ৪৮ টন ইক্ষু এবং ৪।৫ টন চিনি উৎপাদন হইয়া থাকে। এই তথ্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ইংরাজাধিকৃত ভারত চিনির উৎপাদন বিষয়ে অনেকটা পিছনে পড়িয়া আছে।

গুড় উৎপাদন

১৯২৭-২৮ সনে ভারতে মোট ২,৯৫৮,০০০ একার জমির চাষে ৩,২১৭,০০০ মিলিয়ন টন গুড় উৎপন্ন হয়। কোন প্রদেশে কত গুড় উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নীচে দেখান গেল :—

মাদ্রাজ	...	২৮৩,০০০ টন
বোম্বাই (সিন্ধুপ্রদেশ ও রাজ্যগুলি ধরিয়া)		২৯৮,০০০ „
বাঙ্গালা	...	২৩৬,০০০ „
যুক্ত প্রদেশ	...	১,৫৩৮,০০০ „
পাঞ্জাব	...	৩৮৫,০০০ „
বিহার ও উড়িষ্যা	...	৩০৯,০০০ „
আসাম	...	৪২,০০০ „
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ		৫৩,০০০ „
দিল্লী	...	৭,০০০ „
মহীশূর	...	৩২,০০০ „
বড়োদা	...	৪,০০০ „

১৯২৬-২৭ সনে ভারতের (ভারতীয় রাজ্যগুলি ধরিয়া) গুড় ও অপরিষ্কার চিনির মোট উৎপাদন ৩,০৬৯,০০০ টন। ভারতের গুড় উৎপাদনের সময় সাধারণতঃ নভেম্বর হইতে মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত বলিয়া ১৯২৬-২৭ সনের গুড় ১৯২৭ সনের এপ্রিল হইতে নভেম্বর মাসে চিনি উৎপাদনের জন্য পাওয়া গিয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনের গুড়ের উৎপাদন মোট ৩,০৪১,০০০ টন (১৯২৭-২৮ সনের রিভিউ অব্ দি সুগার ট্রেড্ ইন্ ইণ্ডিয়া দ্রষ্টব্য)। তিন মিলিয়ন টনের উপর গুড় উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমস্ত চিনির কারখানায় ১৯২৬-২৭ সনে ১২১,০২৬ টন পরিষ্কার চিনি উৎপন্ন হয়, ১৯২৫-২৬ সনে ৯১,৪০০ টন এবং ১৯২৪-২৫ সনে ৬৭,৪০০ টন চিনি ভারতে প্রস্তুত হয়। এই সংখ্যার মধ্যে ৬২,৯৪১ টন চিনি ইক্ষু হইতে আধুনিক কলে প্রস্তুত হয়, এবং ৫৮,০৮৫ টন গুড় হইতে উৎপন্ন হয়। ১৯২৫-২৬ সনে এই সংখ্যা দুইটী যথাক্রমে ৫২,৯৯৫ টন এবং ৩৮,৪০৯ টন ছিল। এ ছাড়া ভারতের দেশী প্রণালীতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ধরিলে ১৯২৬-২৭ সনে মোট উৎপাদন ১৭১,০২৬ টন এবং ১৯২৫-২৬ সনে ১৪১,৪০০ টন। ভারতের চিনির উৎপাদনের উন্নতি বর্ত্তমান সময়ে কত ধীরে ধীরে হইতেছে তাহা নীচের হিসাব হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

বৎসর	ইক্ষু হইতে উৎপাদন (হাজার মণ)	গুড় হইতে উৎপাদন (হাজার মণ)	মোট উৎপাদন (হাজার মণ)
১৯১৯-২০	৬২৯	১২,১১	১৮,৪০
১৯২০-২১	৬৬৯	১৩,২৫	১৯,৯৪
১৯২১-২২	৭৫৪	১৩,০৩	২০,৫৭
১৯২২-২৩	৬৫১	১৩,৬৮	২০,১৯
১৯২৩-২৪	১০,৪৫	১৫,৩৮	২৫,৮৩
১৯২৪-২৫	৯,২২	৯,১৬	১৮,৩৮
১৯২৫-২৬	১৪,৪৫	১০,৪৭	২৪,৯২
১৯২৬-২৭	১৭,১৬	১৫,৮৪	৩৩,০০

(৩৭ টন = ১০০০ মণ)

উপরের হিসাবের সহিত জাভা দ্বীপের চিনির উৎপাদন তুলনা করিয়া জাভার গত তিন বৎসরের চিনির উৎপাদন পাশাপাশি রাখিয়া ইহার উৎপাদন-বৃদ্ধির হার দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বৎসর			উৎপাদন (টন)
১৯২৬	...	...	১,৯৫৯,৯৪৮
১৯২৭	...	...	২,৩৫৯,০৫০
১৯২৮	...	...	২,৯৩৮,৭৫০

পরিষ্কার চিনি

ভারতে বৎসরে গড়ে ১৫০,০০০ টনের বেশী পরিষ্কার চিনি উৎপন্ন হয় না। ইহার কারণ ভারতের মোট উৎপাদনের বেশীর ভাগ কাঁচা (গুড়) অবস্থায়ই খরচ হইয়া যায়। ১৯২৫ সনে ভারতবর্ষে মোট ৪৬টী চিনির কারখানায় পরিষ্কার চিনি প্রস্তুত হইত। যতদূর দেখা যায় ভারতের চিনি-শিল্পটা দুইটী উত্তর দেশীয় প্রদেশ লইয়াই জড়িত। এই দুইটী প্রদেশের নাম বিহার ও উড়িষ্যা এবং আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশ। এই দুইটী প্রদেশের কারখানার সংখ্যা যথাক্রমে ১৫ ও ১৪। বাকী কারখানাগুলির মধ্যে মাদ্রাজে ৯টী, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে ৩টী করিয়া মোট ৬টী বর্ত্তমান। বাঙ্গালা ও ব্রহ্ম প্রদেশে উল্লেখযোগ্য মাত্র ১টী করিয়া চিনির কারখানার হিসাব পাওয়া যায়। এই কারখানাগুলির বেশীরভাগ খুব অল্প দিনের। ১৯০০ সনের পরে কাছাকাছি দুই এক বৎসরের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যে কারখানাগুলি গঠিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে মাত্র ২।১টী এ পর্য্যন্ত টিঁকিয়া আছে। মাদ্রাজের আস্কা কারখানা ১৮৬৫ সনে মেসার্স বিনি এণ্ড কোং দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এবং আজ পর্য্যন্ত ইহা ইক্ষু চিনি প্রস্তুতের উচ্চাঙ্গের কল কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান চিনির কারখানাগুলিকে তিনটী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে:—

(ক) শুদ্ধ ইক্ষুরস ও গুড় প্রস্তুতকারক কারখানা,

(খ) গুড় এবং চিনি উভয় দ্রব্য প্রস্তুতকারক কারখানা,

(গ) গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত ও পরিষ্কার করিবার কারকানা।

ভারতের চিনির ব্যবসা প্রধানতঃ ইহার উৎপন্ন গুড়ের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ভারতের গুড়ের ব্যবসার সহিত তুলনা করিয়া অর্থনীতি হিসাবে কাহার মূল্য বেশী তাহা আলোচনা করিয়া দেখা দরকার। এ বিষয়ে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতে উৎপন্ন চিনির হিসাবের মধ্যে ঝোলা গুড়ের হিসাব ধরা হয় নাই, অথচ এই ঝোলা গুড়ের মধ্যে এমন অনেক পদার্থ আছে যাহা হইতে কিছু পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইতে পারে। এই প্রকারে চিনির ব্যবসার পক্ষে ভারতের কতটা ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় ভারতের বাৎসরিক বিদেশী সাদা চিনির আমদানি দেখিলে তাহার যথার্থ ধারণা করা যায়। প্রতি বৎসর এদেশে বিদেশী চিনি গড়ে ৮০০,০০০ টন আমদানি হয়। ইহার মূল্য গড়ে ৯,৬০০,০০ পাউণ্ড। ইক্ষু-চাষের জমি যদিও ভারতে সব চেয়ে বেশী তবু যুদ্ধের পর হইতে ভারত দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিনি উৎপাদনকারী দেশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেছে না। ভারতে যে চিনি উৎপন্ন হয় তাহাতে তাহার নিজের চাহিদারই সংকুলান হয় না। উপরোক্ত হিসাব মত ভারতে ৩,০৪১,০০০ টন গুড় ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারেই হউক অথবা দেশী প্রণালীতেই হউক পরিষ্কৃত ১৭১,০২৬ টন চিনি প্রস্তুত হওয়া বাদে আর দুইটী উপায়ে ভারতবর্ষে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অবশ্য এ বিষয়ের কোন হিসাবপত্র পাওয়া যায় না। খেজুর গাছের ও তাল গাছের রস হইতেও বিস্তর চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই চিনি পরিষ্কৃত হইলে ইক্ষু অথবা বীট্‌ চিনি হইতে কোন অংশে খারাপ হয় না। এমন এক সময় ছিল যখন এই চিনিই কতক পরিমাণে বিলাতে রপ্তানি হইত।

ভারতে চিনি আমদানি

এ যাবৎ ভারতে কত রকমের এবং কি পরিমাণ চিনি

প্রস্তুত হয় তাহার আলোচনা করা হইল। এক্ষণে দেখা যাউক, এদেশে কত পরিমাণ চিনি আমদানি হয়। ভারতের নিজের উৎপাদন বাদেও ইহার চাহিদা কুলাইবার জন্য বিদেশ হইতে যে বিপুল সাদা চিনি আমদানি হয় তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতের ১৯২৮-২৯ সনের বাণিজ্য-বিবরণী হইতে প্রকাশ যে, ১৯২৭-২৮ সনে ঝোলা-গুড় বাদে সর্ব্বপ্রকারের চিনি ভারতে ৭২৫,৮০০ টন আমদানি হয়, ইহার মূল্য ছিল ১৪,৫০ লাখ টাকা। এই সংখ্যা ১৯২৮-২৯ সনে বাড়িয়া ৮৬৮,৪০০ টন ও ১৫,৮৬ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। এই সংখ্যার মধ্যে শুদ্ধ জাভা হইতে ১৯২৮-২৯ সনে ৮৫০,৮০০ টন আমদানি হয়, এবং তাহার পূর্ব্ব বৎসরের আমদানি ছিল ৬৯২,২০০ টন। চিরকালই জাভা ভারতের আমদানি চিনির সবচেয়ে বেশীর ভাগ সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। দিন দিন ইহার সরবরাহের পরিমাণ কি ভাবে বাড়িতেছে তাহা নীচের হিসাব হইতে বেশ ধারণা করা যায়।

জাভা হইতে ভারতের চিনি আমদানি

বৎসর	টন
১৯১৩-১৪	৫৮৩,০০০
১৯২২-২৩	৩৭১,১০০
১৯২৩-২৪	৩৬৮,৩০০
১৯২৪-২৫	৪৮০,২০০
১৯২৫-২৬	৬৫৬,৯০০
১৯২৬-২৭	৬১১,৭০০
১৯২৭-২৮	৬৯২,২০০
১৯২৮-২৯	৮৫০,৮০০

সমুদ্রের সহিত যোগাযোগ আছে ভারতের তেমন কতকগুলি প্রদেশে কি পরিমাণ জাভা চিনি ১৯২৮-২৯ সনে আমদানি হইয়াছে তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

বাংলা	৩৪৮,৭০০ টন	(৪১%)
বোম্বাই	১৯৩,৪০০ „	(২৩%)
সিন্ধু প্রদেশ	২০৬,৯০০ „	(২৪%)
মান্দ্রাজ	৬২,৩০০ „	(৭%)
ব্রহ্মদেশ	৪০,৩০০ „	(৫%)

জাভা ছাড়া অন্যান্য দেশের চিনি রপ্তানি

যুদ্ধের পূর্ব্বে চিনি রপ্তানিতে জাভার পরেই ছিল মরিশাসের স্থান। ১৯১৩-১৪ সনে মরিশাসের ১৩৯,৬০০টন চিনি ভারতে রপ্তানি হয়। ১৯২৩-২৪ সনে এই রপ্তানির পরিমাণ হঠাৎ ১৩,০০ টনে পড়িয়া যায় কিন্তু ঠিক পরের বৎসরেই রপ্তানি আবার ১৩৩,০০০ টনে উঠে। ১৯২৫-২৬ সনে এই দ্বীপের রপ্তানি আবার পড়িতে সুরু করে। ১৯২৬-২৭ সনে মরিশাস হইতে ভারতে মাত্র একশত টন চিনি আমদানি হয় এবং বর্ত্তমান সময়ে ভারতে চিনি-রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে মরিশাসের নাম খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। এই সমস্ত প্রদেশজাত চিনি বিলাত বেশী পছন্দ করার দরুণ মরিশাস যখন দেখিল জাভার মত প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত ভারতের বাজারে আঁটিয়া উঠা কঠিন, তখন তাহার নজর প্রতিদ্বন্দ্বিহীন বিলাতের উপরেই গিয়া পড়িল।

ভারতে বিদেশী চিনির আমদানির মধ্যে ১৯২৮-২৯ সনে সিংহল হইতে ৪,০০০ টন আসে, ১৯২৭-২৮ সনে আসে ২,৮০০ টন। হংকং ও চীন হইতে উক্ত দুই বৎসরে যথাক্রমে ২,১০০ টন ও ৩,১০০ টন চিনি ভারতে আসে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে চিনির আমদানি দিন দিন কমিয়া শূন্যের দিকে যাইতেছে। ১৯২৮-২৯ সনে মাত্র ১৬ টন চিনি ভারতে আসে, ইহার আগের বৎসরে আসে ৫০০ টন, এবং ১৯২৬-২৭ সনে আসে ১৫,০০০ টন। ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট হইতে চিনির আমদানি আলোচ্য সনে মাত্র ৯০০ টন হইয়াছিল, তৎপূর্ব্ব বৎসরে ১,২০০ টন আমদানি হয়। ১৯২৮-২৯ সনে বীটচিনির আমদানি ভারতে মাত্র ৮,৪০০ টন হয়, ১৯২৭-২৮ সনে হয় ১৮,০০০ টন। ১৯২৭-২৮ সনে রুশিয়া হইতে ভারতে ১১,৯০০ টন চিনির আমদানি হইলেও আলোচ্য বৎসরে উক্ত দেশ হইতে ভারতে মোটেই চিনি আসে নাই। আলোচ্য বৎসরে হাঙ্গেরী হইতে ভারতে ২,১০০ টন চিনি আমদানি

হয়, ১৯২৭-২৮ সনে হয় ২,৩০০ টন। যে জার্ম্মাণি হইতে ভারতে ১৯২৬-২৭ সনে ৪৯,২০০ টন এবং ১৯২৭-২৮ সনে ১,৬০০ টন চিনি আমদানি হইয়াছিল, ১৯২৮-২৯ সনে সেখান হইতে মাত্র ৩০০ টন চিনি এদেশে আসে। সেইরূপ চেকোশ্লোভাকিয়া হইতেও ১৯২৬-২৭ সন ও ১৯২৭-২৮ সনে যথাক্রমে ২৮,৮০০ টন ও ১,১০০ টনের জায়গায় আলোচ্য সনে মাত্র ৪০০ টন চিনি ভারতে আমদানি হয়। কিন্তু নেদারল্যাণ্ডের ব্যাপার অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনের ১০০ টনের স্থানে আলোচ্য বৎসরে আমদানি বাড়িয়া ১,৬০০ টনে উঠিয়াছে। বিলাত কিন্তু অদ্ভুত রকমে ইহার অংশ পোষাইয়া লইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে এখান হইতে ভারতে আমদানি চিনির পরিমাণ ৪০০ টন ছিল, আলোচ্য বৎসরে ৪,৮০০ টন হইয়াছে।

বিভিন্ন চিনির ঋতুভেদ

বীটচিনি সাধারণতঃ নভেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এদেশে আমদানি হয়। সময় সময়, এমন কি মে মাস পর্য্যন্ত ইহার আমদানি দেখা যায়। ইক্ষু চিনির আমদানি অল্প-বিস্তর বৎসর ভরিয়াই হইয়া থাকে, তবে ইহার বিশেষ সময় আগষ্ট হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত। বোম্বাই, করাচী, মাদ্রাজ এবং রেঙ্গুনের ভিতর দিয়া কলিকাতায় যদিও প্রচুর বিদেশী চিনির আমদানি হয়, তবুও ভারতের বিদেশী চিনির ব্যবসায় জাভা চিনির আমদানিতে কলিকাতারই প্রাধান্য। বীটচিনি এদেশে যা আমদানি হয় তাহার সমস্তই প্রায় ভারতের পশ্চিমদিকের বন্দরগুলির ভিতর দিয়া এদেশে ঢোকে। কাঁচা চিনি অথবা গুড়ের কাটতি বেশীর ভাগ উত্তর ভারতে দেখা যায়। বিদেশী পরিষ্কার চিনির কাটতি সমস্তটাই প্রায় বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরেই হইয়া থাকে—বিশেষভাবে বন্দর-সহরেই ইহার কাটতি বেশী দেখা যায়। তবে বর্ত্তমান সময়ে রেলপথের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চিনি উৎপাদন ক্ষেত্র উত্তর ভারতেও বিদেশী চিনি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইতেছে।

চিনির মূল্য

জাভা চিনির উৎপাদন সম্বন্ধে খবর বাহির হয় জুন ও জুলাই মাসে। সেই জন্য এই সময় চিনির বাজারদর অনেক উঠানামা করে। এ ছাড়া ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসেও চিনির দর উঠানামা করিতে দেখা যায়, কারণ ঐ সময় আমেরিকা ও কিউবার চিনি ফসলের সংবাদ বাহির হয়। ভারতের চাহিদা অনুসারে আগষ্ট হইতে নভেম্বর পর্য্যন্তও চিনির বাজার কিছু চড়া থাকিতে দেখা যায়। আবার ভারতের চিনি ফসলের ভবিষ্যতের উপর এই চাহিদা বেশীর ভাগ নির্ভর করে। দুনিয়ার বাজারে চিনির দর অনুসারে স্থানীয় বাজারের দর নির্দ্ধারিত হয়। দুনিয়ার বাজারে চিনির দর কেমন উঠানামা করিতেছে তাহা দেখিতে হইলে দুনিয়ার উৎপাদন ও চাহিদা প্রথমে লক্ষ্য করা দরকার। স্থানীয় বাজারে দরের উঠানামা দেখিয়াও দুনিয়ার বাজারের অবস্থা অনেকটা জানা যায়। ভারতের বাজারে চিনির দর শুধু ভারতের উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না, জাভার উৎপাদনের অবস্থার উপরও এখানকার দর অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণতঃ বৃটিশ ভারত, জাপান ও চীন দেশেই জাভা চিনির বেশীর ভাগ রপ্তানি হয়। তবে ১৯২০ সনের মত যে বৎসর চিনির বাজার খুব চড়া থাকে সে বৎসর প্রাচ্য দেশগুলির ক্ষতি করিয়াও জাভার চিনি বহু পরিমাণে ইয়োরোপে ও আমেরিকায় রপ্তানি হয়। সাধারণভাবে দেখিলে বৃটিশ ভারতই জাভার চিনির প্রধান খরিদ্দার। তবে ১৯২০ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ও ইয়োরোপের বাজারে খুব চড়া দামে চিনি বিক্রী হওয়ার দরুণ জাভার চিনি বহু পরিমাণে এ সমস্ত দেশে রপ্তানি হইয়াছিল।

১৯২৮-২৯ সনের বাজার-দর

১৯২৮-২৯ সনের বাজার-দর লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ বৎসরের শেষের নয় মাসে চিনির বাজার-দর প্রায় সমানই ছিল। প্রথম তিন মাসেই দরের কিছু উঠানামা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯২৮ সনের জুলাই

হইতে ১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত জাভা ২৫ ডি, এস এবং ইহার উপরের কোয়ালিটির চিনির দর মণ প্রতি সাড়ে নয় টাকার কাছাকাছি ছিল, ইহার উপরে নীচে বড় জোর দুই এক আনার মধ্যে উঠানামা করিতে দেখা গিয়াছে। এই বৎসরের মধ্যে একটা বিশেষ ব্যাপার ঘটে। জাভা হইতে যত চিনি সুয়েজের পশ্চিমে যে কোন বন্দরে গিয়াছে জাভা ট্রাষ্ট তাহার উপর একটা ডিস্‌কাউন্ট ধরিয়া দিয়াছেন। এই ব্যাপারের জন্য দুনিয়ার সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ ভারতে মস্ত একটা সমালোচনার সৃষ্টি হয়। কারণ এই সমস্ত চিনি আবার প্রাচ্য দেশে রপ্তানি হইতে লাগিল। ফলে সেই সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার ও ইয়োরোপের অনেক সস্তা পরিষ্কার চিনি ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিল। দুনিয়ার চাহিদা এই অতিমাত্রায় উৎপাদনের সমস্ত চিনি কাটাইতে পারিল না, ফলে চিনির বাজার-দর অনেক পড়িয়া গেল। এই বিপদ কাটাইবার জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার দেশসমূহে যাহাতে বিদেশী চিনির আমদানি না হইতে পারে সেজন্য টারিফের হার অতিমাত্রায় চড়াইয়া দেওয়া হইল। ১৯২৮-২৯ সনের বাজেটে বিলাতের চিনি-শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

চিনি রপ্তানিতে জাভার প্রাধান্য

ভারতে যত বিদেশী চিনি আমদানি হয় তাহার মধ্যে জাভার অংশের বৃদ্ধি একটা দেখিবার জিনিষ। ভারতের মোট আমদানি ৮৬৮,৮০০ টন চিনির মধ্যে জাভা ছাড়া অন্য দেশ হইতে মাত্র ১৮,০০০ টন আমদানি হয়। সুতরাং আমদানির প্রায় সমস্তটাই এক জাভা হইতে আসে। ১৯২৭-২৮ সনে বিদেশ হইতে ভারতের মোট ঝোলা গুড়ের আমদানি ৯৭,১১১ টন এবং মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা। এই আমদানিরও প্রায় সমস্তটা জাভা দ্বীপ হইতে আসে। এবৎসরে ঝোলা গুড়ের বাজার-দর অনেক পড়তি থাকায় পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে মূল্য অনেক নীচে ছিল। ভারতের প্রধান খাদ্যের মধ্যে একটী জিনিষের জন্য একটা মাত্র দেশের উপর এই নির্ভরতা দেশের অর্থনীতির দিক্ দিয়া খুবই ক্ষতিজনক সন্দেহ নাই। ভারত যদিও গত ১০।১৫ বৎসর ধরিয়া বিদেশ হইতে চিনি আমদানি করিয়া আসিতেছে, তবুও জাভার এই প্রাধান্য খুব বেশী দিনের নয়। ১৮৮০ সনের পূর্ব্বে জাভার চিনি নেদারল্যাণ্ডে খুব রপ্তানি হইত। হল্যাণ্ডে যখন চিনির চাহিদা কমিয়া গেল, তখন আবার এই সব চিনি ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হইতে লাগিল। পরে যখন এই দুইটী দেশে জাভার চিনির চাহিদা পড়িয়া গেল, তখন জাভা তাহার চিনি কাটাইবার জন্য দুনিয়ার অন্য বাজার খুঁজিতে লাগিল এবং তাহার পর হইতেই হংকং, জাপান, বৃটিশ ভারত এবং এশিয়ার অন্তর্গত অন্যান্য দেশে চিনি রপ্তানি আরম্ভ করিল। ইহার মধ্যে যে কোন দেশে কোন কারণে চিনির চাহিদা কিছু কমিয়া আসিলে জাভার উৎপাদনকারীরা চিনির কোয়ালিটি চাহিদামাফিক্ আরও উৎকৃষ্ট করিয়া অন্য বাজারে বেশী পরিমাণে চালাইবার মতলব আটিতে লাগিল। উৎসাহ, জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই তিনটীর সহায়তায় জাভা আজ দুনিয়ার বাজারে চিনি-উৎপাদনে এরূপ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

চিনির ব্যবসায় পুরাতন ভারত

উপরের অসহায় অবস্থার সঙ্গে তুলনায় বর্ত্তমানে ভারত যেমন চিনি-উৎপাদনে বেশ উন্নতি করিয়া ফেলিয়াছে, পুরাকালেও ভারতের চিনির বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেকর্ড হইতে জানা যায় যে, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে প্রায় ২০ পেটী চিনি পরীক্ষার জন্য আনিতে কতকগুলি জাহাজকে পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পাঠান হয়। ১৬১৬ সনে সুরাট হইতে সার টমাস রো'কে যে সম্ভাষণ দেওয়া হইয়াছিল তাহাতেও বাংলার চিনি সম্বন্ধে দেখা যায় "বাংলা হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে গম, রস ও চিনি ভারতের সর্ব্বত্র সরবরাহ হয় ইহা আমরা অস্বীকার করি না"। ক্রমে সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই সমগ্র ইয়োরোপে ভারতের চিনির প্রাধান্য গড়িয়া উঠে। নানা বাধা-বিপত্তি সত্বেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের চিনির সঙ্গে বিদেশী স্বার্থ জড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি

ভবিষ্যৎ লাভের জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহারা অনেক ক্ষতিও স্বীকার করিয়াছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম প্রথম দেখিলেন কাঁচা চিনি অপেক্ষা পরিষ্কার চিনির ব্যবসা ভাল চলে এবং কাঁচা চিনির জাহাজ ভাড়াও অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। কিছুদিনের মধ্যে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে চিনি পরিষ্কার করিবার কল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাল বিদেশে চালান দিবার অনেক সুযোগ সুবিধা হইয়া গেল এবং ফলে জাহাজ ভাড়াও অনেক কমিয়া গেল। তখন হইতে পরিষ্কার চিনির চালান একরকম বন্ধই হইয়া গেল, কারণ বিলাতি কলে চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য নানা দেশ হইতে শুধু কাঁচা চিনিই জাহাজ বোঝাই হইয়া আসিতে লাগিল। তখন হইতেই যদি ইংলণ্ড বরাবর অন্ততঃ ভারতের কাঁচা চিনিও খরিদ করিতে থাকিত তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত ভারতের ইক্ষুক্ষেত্র ও উৎপাদন বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী হইত। ইয়োরোপের চিনিশিল্প বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ব্যবসা অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। ভারতের সুগার টেক্‌নলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতায় এক জায়গায় বলা হইয়াছে "পঞ্চদশ শতাব্দীতে কানারীর চিনি-শিল্প বাড়িয়া ওঠে, তাহার পর ষোড়শ শতাব্দীতে আমেরিকা হইতে দুনিয়ার যাবতীয় চিনি সরবরাহ হইয়াছে। কিন্তু ভারত চিনি-উৎপাদনকারী দেশ হইয়াও দুনিয়ার চিনি সরবরাহে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না"।

চিনির ব্যবসায় ভারতের আধুনিক ইতিহাস

চিনির ব্যবসায় ভারতের আধুনিক ইতিহাস, ধরিতে গেলে ১৭৯১ সন হইতে সুরু হয়। ঐ বৎসরে হাইতি ও সান ডোমিনগোতে "ব্লাক্ রিবেলিয়ান" আরম্ভ হয়। ফলে চিনির মূল্য খুব দ্রুত বাড়িতে আরম্ভ করে। সুবিধা বুঝিয়া তখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত হইতে বিলাতে চিনি চালান দিতে থাকে। তাঁহারা চিনি-উৎপাদনকারী হিসাবে না নামিয়া মাত্র বণিক হিসাবেই ব্যবসায় নামিয়াছিলেন এবং ভারতের বাজার হইতে চিনি খরিদ করিয়া বিলাতে চালান দিতে থাকেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর এ সুযোগ বেশী দিন থাকে না, কারণ অবস্থা অনুকূল দেখিয়া অল্প কিছু দিনের মধ্যে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপগুলি নিজেদের চিনি চালান দিতে আরম্ভ করে। এই সময় হইতে নেপোলিয়ানের যুদ্ধ পর্য্যন্ত বৃটিশ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চিনির ব্যবসার সুদিন এবং এই লম্বা একচেটিয়া ব্যবসার ফলে আজ দুনিয়ার চিনির বাজারে এই দ্বীপপুঞ্জের প্রাধান্য এত বেশী।

ভারতে চিনির আমদানি-শুল্ক

১৮৭১-৭২ সন পর্য্যন্ত ভারতে বিদেশী চিনি তত আমদানি হয় নাই। উক্ত বৎসরে মোট ৫৬২,৫৫৯ হন্দর চিনি বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি হয়। ১৮৮১-৮২ সনে ৯৮২,২৬৬ হন্দর বিদেশী চিনি ভারতে আসে এবং ১৮৯১-৯২ সনে ২,৭৩৪,৬৯১ হন্দর চিনির আমদানির খবর পাওয়া যায়। এই সমস্ত চিনির অধিকাংশ ইক্ষুচিনি ও মরিশাস হইতে আমদানি। ১৮৯৫-৯৬ সন হইতে প্রধানতঃ জার্ম্মাণির বীটচিনির রীতিমত আমদানি সুরু হয়। এই বৎসর ভারতের মোট আমদানির পরিমাণ ২,৭৩০,৬৯৩ হন্দর, ইহার মধ্যে মাত্র শতকরা ৫'৭ ভাগ মরিশাসের ইক্ষু চিনি, বাকীটা জার্ম্মাণি এবং অন্যান্য চিনিপ্রধান দেশ হইতে আমদানি। ১৮৯৪ সনে ভারতে প্রথম চিনির উপর শতকরা ৫ টাকা হিসাবে আমদানি-শুল্ক ধার্য্য হয়। ১৯১৬ সন পর্য্যন্ত এই হার বজায় ছিল। ঐ বৎসর আমদানি শুল্ক বাড়াইয়া শতকরা ১০ টাকা স্থির করা হয়।

১৮৯০-৯১ সনে জার্ম্মাণি হইতে মোট আমদানি ৭০০,০০০ হন্দর। ১৯০৫-৬ সনে এই আমদানি বাড়িয়া হঠাৎ ৭১৮,০০০ হন্দরে উঠে। অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী হইতেও কম চিনি ভারতে আমদানি হয় নাই। ১৮৯৬-৯৭ সনে বৃটিশ ভারতের মোট আমদানি ২,৮৬১,৪০০ হন্দর এবং ইহার পরের বৎসরেই এই আমদানি বাড়িয়া ৪,৬০৮,৬৩০ হন্দরে উঠে। উভয় বৎসরেই আমদানির অধিকাংশ চিনি জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী হইতে আসে। এই অবাধ আমদানি বন্ধ করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৯ সনে

এক আইন জারি করেন। এই আইনের জোরে ১৮৯৪ সনের শতকরা ৫ টাকা আমদানি-শুল্ক বাদে সমস্ত বাউন্টিভুক্ত আমদানি চিনির উপর বাউন্টির সমান একটা অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের জন্মে। ঠিক পরের বৎসরেই এইজন্য জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়ার চিনির আমদানি পড়িয়া যাওয়ায় ভারতের মোট আমদানি ৪,০৭৭,৪৯৯ হন্দর হইতে ৩,৩৬০৮৬২ হন্দরে নামিয়া যায়। ইহার পরে ক্রমে ক্রমে ভারতে জার্ম্মাণির চিনির আমদানি বাস্তবিকই বন্ধ হইয়া যায়। বীটচিনির আমদানিও সঙ্গে সঙ্গে খুব পড়িয়া যায়, ইহার কারণ যে শুধু শুল্কাধিক্য তাহা বলা যায় না, কারণ এই সময়ে চিনির অতিরিক্ত মূল্যের দরুণ এবং পশ্চিম ভারতে একটা দুর্ভিক্ষের দরুণ ভারতবাসীর ক্রয়-শক্তি অনেক কমিয়া যাওয়ায় ভারতের বাজারে তখন বেশী চিনি কাটান সম্ভব হয় নাই, অথচ পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্তটুকু হইতে অনেক চিনি জমিয়া যায়। উপরোক্ত অতিরিক্ত শুল্ক যে ছয় বৎসর ধরিয়া বাহাল ছিল সে ছয় বৎসরে এই দফায় মোট ৯৪½ লক্ষ টাকা শুল্ক আদায় হয়। পরে ভারতের বাজার রক্ষার জন্য এই শুল্ক তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। এই অতিরিক্ত শুল্ক রদ হইবার পরের বৎসরেই ভারতে চিনির ব্যবসার অবস্থা আবার ফিরিয়া যায় এবং জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়া হইতে আবার বহুল পরিমাণে চিনির আমদানি হইতে আরম্ভ হয়। ১৯০১-২ সনে অষ্ট্রীয়া হইতে ভারতে ২,২৫৭,৯২৮ হন্দর চিনির আমদানি হয় এবং জার্ম্মাণি হইতে ৫৭৭,১৩৯ হন্দর চিনি আসে। জার্ম্মাণি হইতে আমদানি চিনির মধ্যে কতকগুলি চালান হাম্বুর্গের ভিতর দিয়া বহির্মিয়া হইতে আসিতে থাকে, কারণ অতিরিক্ত শুল্কের হার অষ্ট্রীয়া অপেক্ষা জার্ম্মাণির মালের উপর কম ছিল। জার্ম্মাণির ছিল হন্দর প্রতি ১ টাকা ৪ আনা ৭ পাই আর অষ্ট্রীয়ার ছিল ১ টাকা ৭ আনা ৪ পাই। এই ব্যাপার প্রকাশ পাওয়ায় পরে যখন মালের উৎপাদন-স্থানের স্বীকারপত্র দাখিল করিবার নিয়ম করা হয়, তখন আবার এই প্রকারের চালান বন্ধ হইয়া যায়। ক্রুসেল্‌সের অধিবেশনের পূর্ব্বে যতগুলি সভা সমিতি হয় তাহার প্রত্যেকটাতে প্রমাণিত হয় যে, বাউন্টি বাদে জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়াই সবচেয়ে বেশী লাভ করে। অষ্ট্রীয়াতে দেশের মধ্যেও যাহাতে অধিক মূল্যে চিনি বিক্রয় হয় চিনি-উৎপাদনকারীদের সহিত যোগাযোগ করিয়া তাহাই ঠিক করা হয়। ফলে অষ্ট্রীয়া খরচের পড়তা অপেক্ষাও কমে চিনি রপ্তানি করিবার সুযোগ পায় এবং লাভের মাত্রাও ইহাতে বেশ বাড়িয়া যায়। এইরূপ অসদুপায়ের প্রতিযোগিতা দূর করিবার জন্য ১৯০২ সনের জুন মাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট এক নূতন আইন পাশ করেন। এই আইন অনুসারে উপরোক্ত প্রকারের সমস্ত লাভের উপর একটা অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করা হয়, এই শুল্কের হার জার্ম্মাণির মালে হন্দর পিছু ৩৶৯ পাই এবং অষ্ট্রীয়ার মালের উপর ২৸৶৯ পাই। ইহার ফল অবিলম্বেই প্রত্যক্ষ দেখা গেল। সেপ্টেম্বরের পর হইতে জার্ম্মাণি অথবা অষ্ট্রীয়া হইতে চিনি আমদানি বন্ধ হইয়া গেল এবং এই দুটী দেশ হইতে মোট আমদানির পরিমাণও অনেক কমিয়া আসে। কিন্তু অন্যান্য দেশ, বিশেষতঃ নেদারল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম তাহাদের সাধারণ আমদানি অপেক্ষা অনেক বেশী চিনি ভারতে চালান দেয়। ইক্ষুচিনির অধিকাংশই ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও হংকং হইতে আমদানি হয়। ১৯০১-২ সনের তুলনায় ১৯০২-৩ সনে মাত্র অর্দ্ধেক আন্দাজ বীটচিনি বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি হয়, এবং ইক্ষুচিনির অধিকাংশ মরিশাস্, জাভা ও চীন হইতে আসে এবং ইহার আমদানি শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

কৃষি

সারের আবশ্যকতা

উদ্ভিদ তাহার খাদ্য গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইলে তবে শস্য উৎপন্ন করিবে। মাটি আশ্রয় করিয়া উদ্ভিদ তাহারই ভিতর হইতে নিজ পুষ্টির উপযোগী পদার্থগুলি আহরণ করে। মৃত্তিকাতে ঐ পদার্থগুলির অভাব উপস্থিত হইলে উদ্ভিদ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শস্য উৎপন্ন করে না এবং অকালে মরিয়া যায়, যদিও বা শস্য জন্মায় তাহা নিকৃষ্ট এবং পরিমাণে অল্প হয়।

ইতর জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদ স্থানান্তরে গমন করিয়া নিজ আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে না, সে কারণে তাহার পুষ্টির উপযোগী বস্তুগুলি তাহার উৎপত্তি-স্থানের নিকটে মজুত থাকা আবশ্যক।

উদ্ভিদকে উহার উপযোগী আহার্য্যের যোগান দেওয়াই সার-প্রয়োগের উদ্দেশ্য। প্রাণী যে উপায়ে আহার করে উদ্ভিদ সেরূপে করে না। উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে যে পদার্থ চুষিয়া লয় তাহাই তাহার নিম্ন অঙ্গ হইতে উচ্চতর অঙ্গে ক্রমে সঞ্চারিত হইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে, কাজেই আহার্য্যগুলি তরল অবস্থায় না থাকিলে উদ্ভিদ তাহা ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না অর্থাৎ উদ্ভিদের পুষ্টির উপাদানগুলি যদি এরূপ প্রকৃতির হয়, যে সেগুলি সহজেই জলে গলিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে উদ্ভিদের পুষ্টি অতি শীঘ্র হইতে থাকে।

উদ্ভিদের আহার্য্যের তিনটি উপাদান

১। নাইট্রোজেন,

২। ফস্ফরিক এসিড,

৩। পটাশ।

মৃত্তিকায় ধাতব অংশে ফস্ফরিক এসিড ও পটাশ আর ভূমিতে পরিত্যক্ত বা নিক্ষিপ্ত উদ্ভিজ্জ বা জীবঘটিত পদার্থ হইতে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়।

মাটি হইতে আহার সংগ্রহ ব্যতিরেকে উদ্ভিদ শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা পত্রগুলির সাহায্যে বায়ু হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড নামক বায়বীয় পদার্থ আকর্ষণ করে; ঐ ক্রিয়ার বিবরণ ও উদ্ভিদ-জীবনে তাহার প্রভাবের বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তবে ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, মৃত্তিকা হইতে উপযুক্ত পরিমাণে আহার না পাইলে উক্ত ক্রিয়া স্ফুর্ত্তি পায় না ও পরিণামে ফলও সন্তোষজনক হয় না।

এক্ষণে নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক এসিড ও পটাশের প্রকৃতি এবং উদ্ভিদ-জীবনের উপর তাহাদের প্রভাব বিবৃত করা হইতেছে।

নাইট্রোজেন

ইহা মূলতঃ বায়ুজাতীয় পদার্থ, ভূমণ্ডলের উর্দ্ধভাগে যে বায়ু বিচরণ করিতেছে তাহার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ নাইট্রোজেন। বায়ুর অবস্থায় নাইট্রোজেন মানব বা ইতর প্রাণীর কোনও কাজে লাগে না এবং প্রকৃত পক্ষে উদ্ভিদ জীবনের উপর ঐ প্রকৃতির নাইট্রোজেনের বিশেষ প্রভাব নাই। কেবলমাত্র কলাই জাতীয় শস্যের শিকড়ের উপর এক প্রকার গুটি জন্মায়, তাহার অভ্যন্তরে এক জাতীয় জীবাণু পাওয়া যায়, তাহারা বায়ু হইতে অল্প অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া ভূমিতে সংলগ্ন করে। উদ্ভিদ জগতের বিস্তৃতির তুলনায় কলাই জাতীয় ওষধির সংখ্যা কম, সেই হেতু বায়ু প্রকৃতির নাইট্রোজেনের উপযোগিতার মূল্যও সামান্য। অপর বস্তুর সহিত মিলিত হইলে নাইট্রোজেন প্রাণী ও উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয়, কিন্তু যে অবস্থায় যুক্ত থাকিলে উহা প্রাণীর আহার্য্য সে অবস্থায় উহা উদ্ভিদের পক্ষে উপযোগী নহে। মানব এবং ইতর প্রাণী ফল ও ফসলরূপে উদ্ভিদ-অংশ আর মাংস, মৎস্য, দুগ্ধরূপে প্রাণীজ আহার হইতে নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উদ্ভিদের পক্ষে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। উদ্ভিদ কেবল মাত্র ধাতব

অর্থাৎ লবণ সদৃশ পদার্থ হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে সমর্থ; নাইট্রোজেনসম্পন্ন যে প্রকৃতির ধাতব পদার্থ সর্ব্ব-জাতীয় উদ্ভিদ ও সকল শ্রেণীর বৃক্ষের আহার্য্যরূপে সর্ব্বসময়ে উপযোগী বলিয়া কৃষিবিদ্ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা নাইট্রেট্। নাইট্রেট্ অব্ সোডাতে নাইট্রোজেন নাইট্রেট্ অবস্থায় থাকে, সে কারণ সাররূপে ইহার প্রয়োজনীয়তা অন্য প্রকৃতির নাইট্রোজেনাত্মক পদার্থ অপেক্ষা বেশী। গোবর ও খইল প্রভৃতি দ্রব্যে নাইট্রোজেন যে অবস্থায় থাকে তাহা উদ্ভিদ সম্যসম্য গ্রহণ করিতে পারে না; ধৈঞ্চা প্রভৃতি কলাই জাতীয় শস্য জন্মাইয়া মাটিতে পচাইয়া দিলে যে টুকু নাইট্রোজেন পাওয়া যায় তাহাও সম্যসম্য উদ্ভিদের কাজে লাগে না। সালফেট্ অব্ এমোনিয়া ও নাইট্রোলিম্ বা ক্যালসিয়াম সিয়ানামাইড নামক নাইট্রোজেনাত্মক রাসায়নিক পদার্থ দুইটি হইতেও উদ্ভিদ উহাদের প্রয়োগ মাত্রই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিবে না। নাইট্রেট্ ব্যতীত অন্য প্রকৃতির সারের নাইট্রোজেন যতক্ষণ ভূমিতে উপযুক্ত তাপ, রস এবং বিশিষ্ট প্রকারের জীবাণুর সহায়তায় নাইট্রেট্ অব্ সোডার মতন অবস্থায় পরিবর্ত্তিত না হয় ততক্ষণ উহা উদ্ভিদের আহারোপযোগী নহে; এই পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া হইতে থাকে। মাটির ঝরঝরে অবস্থা ও গরম আবহাওয়া ঐ পরিবর্ত্তনের অনুকূল। সেই হেতু ইহা অনুমান করা যায় যে, গ্রীষ্মের শেষে ভূমিতে অন্য প্রকৃতির নাইট্রোজেন নাইট্রেট্ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়া সঞ্চিত হয়, কিন্তু বর্ষার আগমনে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে উহা ধৌত হইয়া ভূমি হইতে বাহির হইয়া যায় অর্থাৎ বৎসরের যে সময়ে শস্য উৎপন্ন করা হইতেছে ও নাইট্রেটের বিশেষ প্রয়োজন, তখন ভূমিতে উহার অভাব ঘটে।

নাইট্রোজেন উদ্ভিদের জীবনে শক্তি সঞ্চার করে, ইহার প্রভাবে উদ্ভিদ্ দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও স্বাস্থ্যব্যঞ্জক আকৃতি ধারণ করে; যে ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন নাইট্রেট্ অবস্থায় দেওয়া হইয়াছে তথায় উদ্ভিদের পত্রের বাহুল্য, বর্ণের গাঢ়তা প্রভৃতি সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, আর বিনা নাইট্রেটে উৎপন্ন উদ্ভিদগুলির প্রতি তাকাইলে সেগুলি যেন নেহাৎ অভাবক্লিষ্ট ও শ্রীহীন বলিয়া বোধ হয়।

ফস্ফরিক এসিড

ইহার মূল উপাদান ফস্ফরাস; এই পদার্থের যেটি দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা লাল বর্ণের ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, কিন্তু হরিদ্রাবর্ণের ফস্ফরাস নিরাপদ নহে। ফস্ফরিক এসিড ও ফস্ফরাসের গুণের পার্থক্যের দরুণ ফস্ফরিক এসিড অন্য বস্তুর সহিত মিলিত হইলে মানবের ও উদ্ভিদের কাজে লাগে। প্রাণীর হাড় ও মৎস্যে ফস্ফরিক এসিড অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রস্তরসদৃশ কয়েক প্রকার খনিজ বস্তু আছে যাহাতে ফস্ফরিক এসিডের পরিমাণ প্রচুর, এইগুলি হইতে ব্যবসায়িগণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সুপারফস্ফেট্ প্রস্তুত করে; হাড়ের গুঁড়া ও গন্ধক দ্রাবকের (সালফিউরিক এসিড) সাহায্যে উক্ত প্রকৃতির সারে পরিণত হয় বটে কিন্তু অধিক ব্যয় হয় বলিয়া সাধারণতঃ উহা হইতে সুপারফস্ফেট্ প্রস্তুত করা হয় না।

লৌহ ধাতু নিষ্কাশন করিয়া খনিজ পদার্থ হইতে যে অংশ পরিত্যক্ত হয়, তাহাকে বেসিক শ্ল্যাগ বলে, উহাতেও ফস্ফরিক এসিডের পরিমাণ অল্প থাকে না।

এতদ্ব্যতীত মানবের বিষ্ঠা ও মূত্র, গোময়, শূকরের মূত্র ও বাদুড়, পায়রা, মুর্গী প্রভৃতি পক্ষীর মল হইতে অল্প পরিমাণ ফস্ফরিক এসিড পাওয়া যায়।

সর্ব্ববিধ ফস্ফেটাত্মক সারের মধ্যে 'সুপারফস্ফেট্' শ্রেষ্ঠ। এই জন্য ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহার সার উপাদান জলে গুলিয়া যায় ও সেই হেতু উহা উদ্ভিদকে শীঘ্র আহার্য্য যোগাইয়া থাকে।

বেসিকশ্ল্যাগ, হাড়ের গুঁড়া ও মৎস্যে যে অবস্থার ফস্ফরিক এসিড বর্ত্তমান তাহা জলে গলিয়া যায় না বটে, কিন্তু উদ্ভিদের শিকড় হইতে যে অম্লরস নির্গত হয় তাহাতে ঐ সকল পদার্থের কতক অংশ গলিয়া গিয়া সাররূপে কাজ করে।

উপযোগিতা হিসাবে ঐ কয়েকবিধ ফস্ফেটাত্মক সারের স্থান নিম্নরূপ হইবে:—

১ম। সুপারফস্ফেট্—যাহার সার-উপাদানের সমুদায়

জলে গুলিয়া যায় ও সেই হেতু ভূমিতে সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে ও সত্বর উদ্ভিদের কার্য্যে আসে।

২য়। বেসিকৃস্ল্যাগ—যাহার সার-উপাদানের অধিক ভাগ উদ্ভিদের জড় হইতে নিঃসৃত অম্লরসে গলিয়া যায়।

৩য়। হাড়ের গুঁড়া ও শুষ্ক মৎস্যচূর্ণ—ইহাদের সার উপাদানের অল্প পরিমাণ ঐ রূপে গলিয়া যায়; এই সার দুইটি ধীরে ধীরে কার্য্য করে।

৪র্থ। ফস্ফেট্ প্রস্তরচূর্ণ—যাহা বিলম্বে কাজ করে।

আমাদের মতে সুপারফস্ফেট্ ও হাড়ের গুঁড়া সর্ব্বপ্রকার ভূমিতে ব্যবহার করা যায়, পরন্তু বেসিকৃস্ল্যাগ ব্যবহার করিতে হইলে জমির তারতম্য ও ফসলের প্রকৃতির ভিন্নতা বিচার করিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

বাঙ্গালা দেশে মৎস্য আহার্য্য-সামগ্রী বলিয়া ইহার মূল্য অধিক ও সেই জন্য উহা সাররূপে ব্যবহার করিলে ব্যয় অধিক হইবে; যে স্থানে অল্প ব্যয়ে মাছ খরিদ করিতে পারা যায় বা যেখানে মাছের ব্যবহার হয় না তথায় হাড়ের গুঁড়ার পরিবর্ত্তে উহা প্রয়োগ করা যুক্তিসিদ্ধ হইবে; মৎস্য দ্বারা সার দিবার পূর্ব্বে উহা ভাল করিয়া শুকাইয়া উহায় তৈলাক্ত পদার্থ নষ্ট করিয়া পরে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। কোনও কোনও স্থলে মৎস্য জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়, পরে শুকাইয়া উহাকে সাররূপে ব্যবহার করা হয়, এরূপ করিলে ব্যয়ের ভাগ অল্প হইবে, কারণ মৎস্যের তৈল বিক্রয় হয়।

শূকর প্রভৃতি জন্তুর বিষ্ঠা ও মূত্র এবং পক্ষীর মল যথায় তথায় ফেলিয়া অপচয় না করিয়া ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করা উচিত। এইরূপ করিলে ফসলের উপকার হইবে। যদিও উহাদের ব্যবহারে একত্রে ফস্ফরিক এসিডের পরিমাণ বেশী পাওয়া যাইবে না, তথাপি ঐ গুলি নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়।

কলের সাহায্য ব্যতিরেকে হাড় চূর্ণ করা সম্ভব নয়। যাঁহাদের অস্থি স্পর্শ করিতে আপত্তি নাই তাঁহারা নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে হাড়কে নরম অবস্থায় পরিণত করিতে পারিবেন।

একটি প্রশস্ত ও গভীর গর্ত্ত করিয়া উহার তলদেশে আট আঙ্গুল পুরু করিয়া চুণ ছড়াইতে হইবে, যে চুণ জলে দিলে ফুটিয়া উঠে সেই চুণ ব্যবহার করিতে হইবে। চুণের স্তরের উপর ১২ আঙ্গুল গভীর করিয়া হাড়ের টুকরা সাজাইতে হইবে; হাড়ের স্তরের উপর পুনরায় ঐ রকমে চুণের আবরণ দিয়া পুনরায় তাহার উপর হাড় সাজাইতে হইবে। এইরূপে যতক্ষণ গর্ত্তটি প্রায় পূর্ণ না হয় ততক্ষণ চুণ, হাড় ও চুণ এইরূপে সাজানো আবশ্যক। ঐ গর্ত্তের এক কোণে একটি বাঁশ সোজা করিয়া সর্ব্বশেষে মাটি দিয়া গর্ত্তটি চাপা দিতে হইবে, পরে আস্তে আস্তে ঐ বাঁশটী উঠাইয়া লইলে বাঁশের স্থানে যে গর্ত্ত হইবে তাহাতে ততক্ষণ জল ঢালিতে হইবে যতক্ষণ না গর্ত্তটির উপর, নীচে ও পার্শ্বের সমস্ত স্থানে জল পৌছায়। গর্ত্তটি মাটি দিয়া ভর্ত্তি করিতে হইবে। ঐ অবস্থায় ৩।৪ মাস হাড় রাখিয়া দিয়া পরে উঠাইয়া লইলে উহা শীঘ্র চূর্ণ করা যাইবে।

হাড় ও মৎস্যে জৈব অবস্থায় নাইট্রোজেন অল্পমাত্রায় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সদ্যসদ্য উদ্ভিদের উপযোগী নয় বলিয়া কেহ কেহ হাড়ের অন্তর্গত কেবল মাত্র ফস্ফরিক এসিডকে প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া মনে করেন; উহা সঙ্গত বিবেচনা করিলে হাড় পোড়াইয়া তাহার ছাই ফস্ফরিক এসিডের নিমিত্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। হাড়ের ছাইতে ফস্ফরিক এসিড যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাহা সাধারণ হাড়ের টুকরা অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। হাড়ের ছাই বা চুণের প্রভাবে গলিত হাড় এবং নাইট্রেট অব্ সোডা আঁটাল মাটির পক্ষে ভাল সার।

ফস্ফরিক এসিডের প্রভাবে ফসল শীঘ্র পাকে। উদ্ভিদের শিকড়, কাণ্ড প্রভৃতি কাষ্ঠাংশ ইহার প্রভাবে বৃদ্ধি পায় ও শক্ত হয়, একারণ পোকা মাকড় সহজে উদ্ভিদের অনিষ্ট করিতে পারে না। উদ্ভিদের দেহে সঞ্চারিত রস হইতে শর্করা ও শ্বেতসার ফস্ফরিক এসিডের ক্রিয়া প্রযুক্ত প্রস্তুত হয়; এজন্য ইক্ষু ও আলুর ন্যায় ফসলে নাইট্রেট অব্ সোডার এবং এই সারের প্রয়োগ বিশেষ উপকারী।

পটাশ

এই সার পদার্থ মৃত্তিকাতে যে সকল কর্দ্দমের কণা আছে তাহাতে বিদ্যমান থাকে। কর্দ্দম-প্রধান মৃত্তিকাতে

উহার পরিমাণ অধিক, কিন্তু যে অবস্থায় উহা পাওয়া যায় তাহার সমস্ত অংশ উদ্ভিদের পক্ষে উপযোগী নয়। ভূমি বারবার কর্ষণ করিলে জলবায়ুর প্রভাবে মাটীর কণা ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে থাকে ও তৎসঙ্গে অল্প অল্প পরিমাণ পটাশ উদ্ভিদের শিকড় হইতে নিঃসৃত অম্লরসে গলিয়া যায়। উদ্ভিদের পক্ষে উপযোগী অবস্থার পটাশ সাধারণ প্রকৃতির মৃত্তিকা অপেক্ষা পলিময় মৃত্তিকাতে অধিক থাকে, এ কারণ পটাশের অভাব বাঙ্গালার নদী-প্রধান জেলার মৃত্তিকাতে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে।

ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নাইট্রেট্ অব্ সোডাতে সোডা নামক যে বস্তু আছে, তাহা কাদা-প্রধান মাটিতে আবদ্ধ পটাশকে সার অবস্থায় পরিণত করে; অতএব নাইট্রেট্ অব্ সোডা ব্যবহার করিলে মুখ্যতঃ উদ্ভিদকে সদ্যপ্রস্তুত অবস্থার নাইট্রোজেন সরবরাহ করা হয় ও গৌণতঃ কঠিন অবস্থার পটাশ-সম্পন্ন বস্তুকে সরল প্রকৃতির সারে পরিবর্ত্তিত করাইয়া উহাকে উদ্ভিদের আহার্য্যে পরিণত্ করা হয়।

এ দেশে প্রধানতঃ গোবর ও কাষ্ঠের ছাই প্রয়োগ করিয়া জমিতে পটাশ সারের যোগান দেওয়া হয়। বিলাতী পানা বা জল কচুরীতে পটাশসম্পন্ন পদার্থের অংশ সামান্য নহে। অতএব ঐ অনিষ্টকর উদ্ভিদ সংগ্রহ করিয়া তাহার ছাই সাররূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

তিনটি রাসায়নিক পদার্থ, সোরা, ম্যুরিয়েট অব্ পটাশ ও সালফেট অব্ পটাশ পটাশ-প্রধান সার। মূল্যের সুলভতা হেতু ম্যুরিয়েট অব্ পটাশ সাররূপে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আলু ও ইক্ষুর পক্ষে সলফেট অব্ পটাশ অধিক উপযোগী। সকল প্রকার ছাই ও এই তিনটি রাসায়নিক পদার্থে যে প্রকৃতির পটাশ পাওয়া যায় তাহা জলে গলিয়া যায়।

পটাশের সহায়তায় ফলে, শস্য, বীজ ও তাহাদের অন্তঃস্থিত স্বাদু পদার্থের গঠন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদের তন্তু দৃঢ় ও মসৃণ করিতে পটাশের প্রভাব দৃষ্ট হয় এবং উহা ফল, বীজ ও শস্যের ওজন বৃদ্ধি করে। যে বৃক্ষ ফলহীন অথবা যাহার ফল অধিকমাত্রায় অম্ল বা স্বাদহীন, পটাশ প্রয়োগের পর সেই বৃক্ষ সুস্বাদু ফল প্রসব করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে।

এই স্থলে চতুর্থ পদার্থ যাহা উদ্ভিদ নিজ দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ করে না বটে, কিন্তু যাহা মৃত্তিকার দূষিত অবস্থাকে শোধিত করিয়া তাহাকে উদ্ভিদের জীবন-ধারণের উপযোগী করে, তাহারই উল্লেখ করিব।

ঐ পদার্থটি চূণ

বারবার ফসল উৎপন্ন করিবার পর ভূমিতে, বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হয়, বিশেষতঃ, 'নাবাল' জমিতে ঘাস আগাছা পচিয়া মৃত্তিকা 'হাজিয়া' যায়। এইরূপ স্থলে মৃত্তিকার অম্ল দোষ দূর করিতে হইলে চূণ প্রয়োগ করা আবশ্যক। কর্দ্দম-প্রধান জমি 'আঁটাল' হয়, ঐরূপ মৃত্তিকার উপর জল পড়িয়া শুকাইয়া গেলে উহা রৌদ্রে ফাটিয়া যায়। উহাতে গভীর করিয়া লাঙ্গল দেওয়া যায় না, এজন্য উদ্ভিদের শিকড় বেশী দূর অবধি প্রসারিত হইতে পারে না। বায়ু ও জল ঐরূপ ভূমির মধ্যে অনায়াসে যাওয়া আসা করিতে পারে না বলিয়া বর্ষাকালে ঐ জমিতে জলরোধ হয় ও ফলে উদ্ভিদের শিকড়ের হানি হয় কিংবা রৌদ্র তাপে জমি শক্ত লইয়া রস-শূন্য হয়। এই প্রতিকূল অবস্থা নিবারণ করিতে হইলে মাটির কাদার কণাগুলি যাহাতে জড়াইয়া না যায় তাহা করিতে হইবে। চূণ প্রয়োগ করিলে মাটির 'আঁটাল' ভাব নষ্ট হইয়া নরম হইয়া যায়। যে জমিতে জল অতি শীঘ্র ভিতরে চলিয়া যায় তাহাতে রস রক্ষা করিতে হইলে প্রথমে চূণ ছড়াইয়া গোবর প্রয়োগ করিলে মাটির রস ধারণ করিবার শক্তি বাড়ে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোবর, খইল, সালফেট অব্ এমোনিয়া ইত্যাদি সারের নাইট্রোজেন নাইট্রেট্ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত না হইলে উদ্ভিদের পক্ষে উপযোগী হয় না, চূণের সাহায্য না পাইলে এই পরিবর্ত্তন হইবে না। চূণ তিন অবস্থায় পাওয়া যায়:—

(১) চূণা পাথর এবং শামুক, গেঁড়ি ইত্যাদি স্বাভাবিক চূণসম্পন্ন বস্তু। এইগুলি এসিডের সংস্পর্শে আসিলে বুদ্বুদ উঠিতে থাকে।

(২) প্রথমোক্ত দ্রব্যগুলি ভাঁটিতে পোড়াইলে কলি চুণ বা বাখারি চুণ প্রস্তুত হয়। উহা জলে দিলে ফুটিতে থাকে।

(৩) জল শুষিয়া লইবার পর কিংবা বায়ুর সংস্পর্শে বেশী দিন থাকিলে ২য় প্রকৃতির চুণ যে অবস্থাপ্রাপ্ত হয় তাহা গাঁথনির চুণ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকৃতির চুণের প্রথম অবস্থা ক্ষারস্বাদযুক্ত। এই দুইটি সাধারণতঃ জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। চুণ প্রয়োগের প্রয়োজন হইলে উহা বিঘা প্রতি ১।০ মণ হিসাবে দেওয়া উচিত; চুণ ঘনঘন প্রয়োগ করা উপযুক্ত নহে। সাধারণ অবস্থায় যে সকল ভূমিতে হাড়ের গুঁড়া বা তাহার ছাই অথবা সুপারফস্ফেট কিংবা বেসিকস্ল্যাগ নিয়ম মত ব্যবহার করা হয় তথায় অধিকন্তু চুণ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নাই।

কোনও কোনও জমিতে স্বভাবতঃই অধিক মাত্রায় চুণ পাওয়া যায়, ঐরূপ ভূমি রুক্ষ হয়; অধিক মাত্রায় গোবর প্রয়োগ করিয়া অথবা ধৈঞ্চা, শণ, কলাই প্রভৃতি জন্মাইয়া, জমিতে চষিয়া দিয়া, উহাদের পচাইলে এই প্রকার জমির উন্নতি হইবে।

জমিতে চুণ প্রভৃতি ক্ষার পদার্থ বিদ্যমান আছে কি না তাহা নির্ণয় করিতে হইলে রৌদ্রে শুষ্ক মাটীর চূর্ণ এক ছটাক লইয়া কাঁচের গেলাসে রাখিয়া তাহার উপর অর্দ্ধ গেলাস পরিমাণ পানীয় জল ঢাল। এক কাচ্চা পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক এসিড উক্ত গেলাসে ঢালিয়া মাটি ও জলের সহিত মিশাইয়া দাও। যদি অতি দ্রুত বুদ্বুদ উঠিতে আরম্ভ হয় ও সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যায় তাহা হইলে জানিবে যে জমিতে চুণ ও অন্য ক্ষারের অংশ অধিক পরিমাণ আছে। যদি কোনও বুদ্বুদ না উঠে বা গেলাসের গায়ে কান ঠেকাইলে কোনও শব্দ না শোনা যায় ত জানিবে জমিতে চুণ ছড়াইতে হইবে। হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অভাবে অধিক পরিমাণে পাতি লেবুর রস ব্যবহার করিতে পারা যায়।

মৃত্তিকার শ্রেণী-বিভাগ

১। বেলে মাটি—শতকরা ১০ ভাগের কম কাদা থাকে।

২। বেলে দো-আঁশ মাটি—শতকরা ১০ ভাগ হইতে ২০ ভাগ অবধি কাদা থাকে।

৩। দো-আঁশ মাটি—শতকরা ২০ ভাগের উপর হইতে ৩০ ভাগ অবধি কাদা থাকে।

৪। কাদাযুক্ত দো-আঁশ মাটি—শতকরা ৩০ ভাগের উপর হইতে ৫০ ভাগ অবধি কাদা থাকে।

৫। কাদা-প্রধান (কাদাটিয়া বা এঁটেল) মাটি—শতকরা ৫০ ভাগের অধিক কাদা থাকে।

৬। ক্ষার-প্রধান মাটি—শতকরা ৫ ভাগের অধিক চুণ ও অন্যান্য ক্ষার পদার্থ থাকে।

৭। উদ্ভিজ্জসার-প্রধান মাটি (যথা বিলের মাটি)—শতকরা ৫ ভাগের অধিক উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে।

(চিলিয়ান নাইট্রেট কমিটির রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

(উদ্বোধন)

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

প্রাপ্তি স্বীকার

পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত পুস্তকপত্রিকাদির প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইতেছে—

১। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট বুলেটিন নং ৪২—ইম্প্রুভ্মেণ্ট্স্ অন্ দি কান্ট্রি প্রসেস্ অব মেকিং সুগার ফ্রম্ গুড়। ডাঃ আর, এল, দত্ত ডি, এস্ সি, এফ্, আর, এস, ই এবং শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু, বি, এস্ সি প্রণীত।

২। বঙ্গদেশীয় কৃষি বিভাগের ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট।

৩। বুলেটিন্ নং ১, ২, ৩ অব্ দি ইণ্টারন্যাশন্তাল্ ম্যানেজ্মেণ্ট ইন্স্টিটিউট্ (জেনেভা)।

৪। প্রোটেকশন অব্ ওয়ার্কারস্ অপারেটিং মেটাল ওয়ার্কিং প্রোসেস্ (জেনেভা)।

৫। ডেমাগ্ নিউজ্ (ভলুাম ৪, ফেব্রুয়ারী ১৯৩০)

৬। রিভিউ অব্ দি সুগার্ ট্রেড্ ইন্ ইণ্ডিয়া ইন্ ১৯২৮-২৯ (পুসা হইতে প্রকাশিত)।
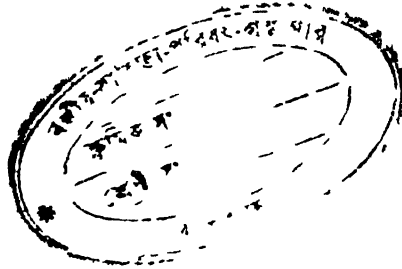
৭। ডায়চে বাঙ্ক উণ্ড্ ডিস্কন্টো গেসেলসাফ্ট্ (জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ, এপ্রিল ১৯৩০)।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল বি,এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা, সি আই ই

আষাঢ়—১৩৩৭ ৫ম বর্ষ—৩য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪
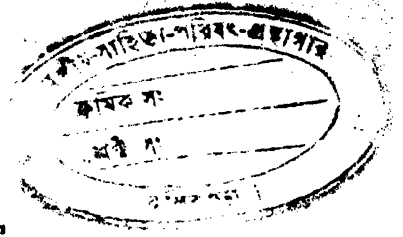
পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
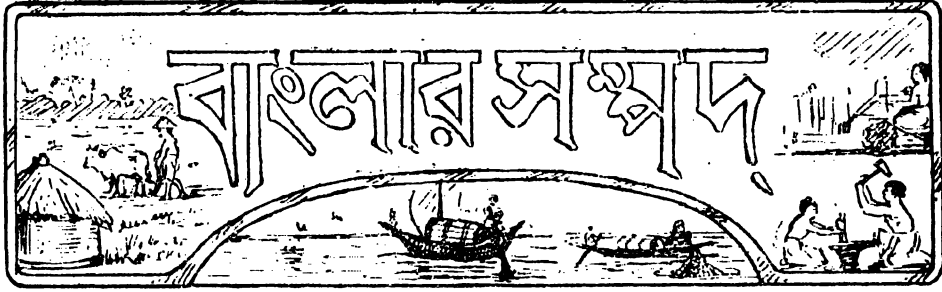
বাংলায় কাপড়ের কল

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে আরও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত না করিলে বস্ত্র-শিল্পের পুনরুন্নতিসাধন সম্ভব হইতে পারে না।

এই কার্য্যে বোম্বাই ভারতে অগ্রণী হইয়াছে। কিন্তু আজও বিলাত ও জাপান হইতে বৎসরে প্রায় ৬০ কোটী টাকার বস্ত্র ভারতে আমদানি হয়। অথচ এই দুই দেশের কোনটীতেই তুলা উৎপন্ন হয় না; উভয় দেশকেই বিদেশ হইতে তুলা লইতে হয়। লোক-প্রতি ব্যবহৃত কাপড়ের পরিমাণ লোকের আর্থিক অবস্থার অর্থাৎ কিনিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ২৫ বৎসরের গড় হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, লোক প্রতি ৮·৮০ গজ হইতে ১৬·২৮ গজ কাপড় ব্যবহৃত হইয়াছে। গড়ে ধরিলে বলা যাইতে পারে, এ দেশে প্রত্যেক লোক বৎসরে ১২·৫ গজ কাপড় ব্যবহার করে। বাঙ্গালার ৫ কোটী লোক প্রত্যেকে ১২·৫ গজ কাপড় কিনিলে বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর ৬২·৫ কোটী গজ কাপড় বিক্রী হয়। কাপড়ের দাম যদি প্রতি গজ ৪ আনা ধরা যায়, তবে এই কাপড়ের জন্য বঙ্গদেশকে বৎসরে প্রায় ১৫·৬২ কোটী টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই টাকা আমরা বাঙ্গালায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালাতেই রাখিতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা হইতেছে না। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর কাপড়ের কল বর্ত্তমানে ৩টী মাত্র; সে গুলিতে উৎপন্ন কাপড়ের বার্ষিক মূল্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বঙ্গলক্ষ্মী	২৮ লক্ষ টাকা
ঢাকেশ্বরী	১১ „ „
মোহিনী	১৩ „ „

অর্থাৎ বাঙ্গালার লোক, বিশেষতঃ বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় এ পর্য্যন্ত বস্ত্র-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার ফলে বাঙ্গালার জন্য প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় ১৫·৬২

কোটী টাকার কাপড়ের মধ্যে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার কাপড় বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর কলে প্রস্তুত হয়।

(শান্তিবার্ত্তা)

বাংলায় বিদেশী পণ্য

গত ১৯২৮-২৯ সনে কলিকাতার বন্দরে সর্ব্বসুদ্ধ মোট ৮৬,৬৫,৯৮,২০৪ টাকার বিদেশী পণ্যদ্রব্যের আমদানি হইয়াছে। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল ;—

দ্রব্যের নাম	মূল্য (টাকা)
জন্তু	১৪৪৭১৮৩
পোষাক	২৫৪৫১৫৮
অস্ত্রশস্ত্র	১৬২৩৫১৯
যন্ত্রাদির বেল্টিং	৩০৯৭৮৬২
পুস্তক প্রভৃতি	২৮৪৭২৬০
জুতা	২০৫১৬২০
বুরুশ	৪০৮৭১১
ইমারত তৈয়ারীর দ্রব্যাদি	৩০৯১৩০২
বোতাম	৮৯৪২৩০
বাতি	৪১১৪৮
বেত	১০৩২৯৭
রাসায়নিক দ্রব্য	১০০৭৯০৯৮
চীনামাটি	২১৯৪৯৩
ঘড়ি	৭০৩৪৩৮
কয়লা	৩৩৩০৬
কফি	৭৫৬৬০
ছোবড়ার দড়ি	৪৩৭০৭
প্রবাল প্রস্তর	৭৭৪৯২
দড়ি	২৩০৭১৬
কর্ক (ছিপি)	১৭১৭২৪
ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি	১২২৬৯৪৯
ঔষধাদি	৭১২১৩৭৫
রন্ধন করিবার মসলা	২২৭৩৮২২
মাটীর বাসন	১৬৫৬৫৯৬
বাজী	৩৫৯৪৭২
পশ্বাদির খাদ্য	১১৩৪১২
ফল ও শাকসব্জী	৩৬৪৭৭৬
আসবাবপত্র	৯২৫৪৪৭
কাচ প্রভৃতি	১৪৩১৯৯৬
শস্যাদি	৫১৭৩০০৩১
গঁদ প্রভৃতি	৫৬৮৪৪৪
লোম	২৫১৩০
লোহার জিনিষ	১৭৬৮৭২৫৪
কাঁচা চামড়া	১৪৩৪৭
বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি	১৪৫৩৭৯২
গানবাজনার যন্ত্র	১০১৬৫৯৬
জুয়েলারি	৪০৬৫১২
গালা	২৬০২১৬৮
তৈয়ারী চামড়া	২২৬৪০৪০
মদ্য	১০৩৯৮৭৩৫
যন্ত্রাদি	৬৯৩০৩১৫৬
জমির সার	৩০০৮৯৮৮
দিয়াশলাই	২৩৫৬৪৭
দিয়াশলাই তৈয়ারীর দ্রব্য	২৭২২
মাদুর	৫২৪৫৩
ধাতু এবং এলুমিনিয়াম	৩৫৫৭৭০৩
তাম্র	৩৫৮২১৫৬
জার্ম্মাণ সিলভার	৪৭৩০৬৯
লৌহ	৬৯৫৩৬৩
ইস্পাত	১০৩২৭৫৫৪
ধাতুর পাত	৪২৩৮৮০৯৩
সীসা	২৮৬০৮০
দস্তা	১৯৩৯৩৬
তৈল	৫৬৬৪৮৯৬৪
রং বার্ণিশ	৪৯৬১৫৩৫
কাগজ	১০৫৪০৩৬৬
ছাপান কাগজ	৮০৬৮০
রবার	৭০০৯৮৬৫
বীজ	২৬০০০৩

সাবান	...	...	২৭০২৮৪৫
ধূমপানের সরঞ্জাম	...	...	১৫৯৩৯৭
চিনি	...	...	৬১৯৯৫৫৩৯
ছাপান জিনিষ	...	...	১০২৫৫৮৮১
রংকরা জিনিষ	...	...	৫৮৮৩৪১৬
কাপড়	...	...	২১১১৩০১৮৭
রেশম	...	...	১৬৬৭৪১২
পশম	...	...	১১৪৯৪৮৭১
তামাক	...	...	১১৫২৫৪১৭
খেলনা	...	...	২০৬৭২৮০
ছাতা	...	...	২৮৮৬৪০৪
সাইকেল	...	...	৫১২১৪০২
গাড়ী	...	...	৫৬৭৯১৭
কাঠ	...	...	২৪০৪৫০৪
ডাকের জিনিষ	...	...	১১২৫৮০৩০

(সঞ্জীবনী)

বাংলার জনবল

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনবলবৃদ্ধির হার ক্রমশঃ নামিয়া আসিতেছে। ডাঃ বেণ্টলি বঙ্গদেশের ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় জনবলবৃদ্ধির দৌড়ে বঙ্গদেশ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সকল প্রদেশের শেষে।

প্রদেশ			প্রতি মাইলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার
পাঞ্জাব	...	...	২১'৬
যুক্ত প্রদেশ	...	...	১৪'১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ		...	১৩'২
বিহার ও উড়িষ্যা	...	...	১৩'০
মধ্যপ্রদেশ	...	...	১২'৮
মান্দ্রাজ	...	...	১১'০
বোম্বে	...	...	১০'৯
আসাম	...	...	৯'১
ব্রহ্মদেশ	...	...	৪'৬
বঙ্গদেশ	...	...	৪'১

মুর্শিদাবাদের আবহাওয়া

চিরদিনই চৈত্র বৈশাখে "কাল বৈশাখী" হ'য়ে থাকে। এবার কিন্তু তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। চৈত্র মাসটা ত কেবল ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি ব্যাধি-গণকে সঙ্গে করে এনে অন্য দিকে বোধ করি মন দিবারই অবকাশ পায় নি। তবে একদিন মাত্র তার মনে পড়েছিল তাই একবার হুড়মুড়ি ও পরে পশলা খানেক বৃষ্টি লাগিয়ে দিয়েছিল। তার পর সব চুপ চাপ। এই বৈশাখের ১৮টা দিন গেল, বৃষ্টির নাম নাই। গত বৎসর হ'তে দেশে ধান নাই। এবারও আউশ ধানের চাষ মাটী হতে চল্লো, এখনো বোনা হ'ল না। এই মাসের শেষের দিকে বোধ করি মাঠে ঘাটে কোথাও বিন্দু মাত্র খাবার জলও পাওয়া যাবে না। কৃষকমহলেও উদ্বেগের শেষ নাই। হবারই কথা—ছ মাসের মধ্যে বিন্দুপাত নাই।

(কান্দীবান্ধব)

বাংলার গ্রামে উচ্চ সুদের হার

ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি ঢাকায় গিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক মিঃ কে, বি, সাহা বলেন যে, গ্রামে সুদের হার অত্যন্ত বেশী। বন্ধকী ঋণের সুদ শতকরা ১৮৲ হইতে ২৪৲ টাকা কিন্তু ঋণ-কর্ত্তার অবস্থা অনুসারে ২৪৲ হইতে শতকরা ৭৫৲ টাকাও সুদ দিতে হয়।

নারায়ণগঞ্জে পাটের সংবাদ

এবার পাটের জমি গতবৎসর অপেক্ষা খুব কম চাষ হয় নাই। নীচু ও মাঝারি জমিতে চাষ শেষ হইয়াছে। পাটের চাষের পক্ষে এবারকার আবহাওয়া অত্যন্ত সুবিধা-জনক। মাঝে মাঝে বৃষ্টি ও রৌদ্র হওয়াতে পাটের চাড়াগুলি যেন লাফাইয়া উঠিতেছে। ইতিমধ্যে পাটের চাড়া অত্যন্ত লম্বা হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম নিড়ান শেষ হইয়াছে, অনেক জমিতে দ্বিতীয় নিড়ানও হইয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত প্রায় ৸৶ আনি জমিতে চাষ হইয়া গিয়াছে। নদীর জল গত বৎসর অপেক্ষা প্রায় ৬ ইঞ্চি বেশী।

পাটের আফিসগুলি আগামী মর্শুমের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় একটি বড় কোম্পানীর গোদনাইল স্থিত ব্রাঞ্চ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার ফলে অনেকের চাকুরী গিয়াছে। আফিসগুলি এবার জোর কাজ করিবে বলিয়া মনে হয় না। প্রকাশ ২।১টী বড় আফিস ৯৲-১০৲ দরে আগাম বিক্রয় দিয়াছে। ইহাতে মনে হয় এবার পাটের দর উহা হইতে বেশী হইবে না।

চা'র বাজার

উৎপন্ন চা-র পরিমাণ যাহাতে কম হয় সেই বিষয়ে চা-করগণ মনোযোগী হইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সরবরাহ অপেক্ষা চাহিদা বেশী হইলে দর বাড়ে, আবার চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ বেশী হইলে দর কমে ইহা অর্থনীতির অতি সহজ কথা। চা-ব্যবসায়িগণকে এই নীতি মানিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু চা-বাজারের প্রসার না হইলে কেবলমাত্র সরবরাহ কমাইলে ব্যবসায়ে লাভ হইবে না, চা-এর অপচয় হইবে মাত্র।

টী কোম্পানীর লাভ

(১) কাঠালগুড়ি টী কোম্পানী

গত ৩০শে মার্চ্চ সকালে সভায় শতকরা ৯০৲ অর্থাৎ প্রতি অংশে ৪৫৲ হিসাবে লাভ দেওয়া স্থির হইয়াছে। তন্মধ্যে শতকরা ৬০৲ অর্থাৎ প্রতি অংশে ৩০৲ হিসাবে লাভ গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখ হইতেই বিলি হইতেছে, বক্রী শতকরা ৩০৲ অর্থাৎ প্রতি অংশে ১৫৲ হিসাবে লাভ আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বিলি হইবে।

ম্যানেজার ১৩০০৲ পুরস্কার পাইয়াছেন এবং তিনি দীর্ঘকাল এই কোম্পানীর বাগানে কার্য্য করিয়া বিদায় লইলেন, এইজন্য তাহা ৬০০০৲ অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ (সদর ও বাগানের) প্রত্যেকে চারি মাসের মাহিয়ানা পুরস্কার পাইয়াছেন।

(২) খয়েরবাড়ী টী কোম্পানী

ঐ তারিখে সকালে সভায় শতকরা ৩০৲ অর্থাৎ প্রতি অংশে ১৫৲ হিসাবে লাভ দেওয়া স্থির হইয়াছে। তন্মধ্যে শতকরা ২০৲ অর্থাৎ প্রতি অংশে ১০৲ হিসাবে লাভ গত ৩রা এপ্রিল হইতে বিলি হইতেছে। বিক্রী শতকরা ১০৲ অর্থাৎ প্রতি অংশে ৫৲ হিসাবে লাভ আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বিলি হইবে।

ম্যানেজার ৮০০৲ পুরস্কার পাইয়াছেন। অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ (সদর ও বাগানের) প্রত্যেকে চারি মাসের মাহিয়ানা পুরস্কার পাইয়াছেন।

(৩) জলপাইগুড়ি টী কোম্পানী

ঐ তারিখে বৈকালে সভায় শতকরা ৯০৲ অর্থাৎ প্রতি অংশে ২২৫৲ হিসাবে লাভ দেওয়া স্থির হয় এবং তৎপর দিন হইতেই লভ্যাংশ বিলি হইতেছে।

ম্যানেজার ৯০০৲ পুরস্কার পাইয়াছেন। অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ (সদর ও বাগানের) প্রত্যেকে চারি মাসের মাহিয়ানা পুরস্কার পাইয়াছেন। (ত্রিস্রোতা)

বাংলাদেশের রাস্তার অবস্থা

(১)

ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ সাবডিভিসন্যাল টাউন সমগ্র মহকুমার ঠিক সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এই সহর নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ এই দুই মহকুমার সীমানায় অবস্থিত। নারায়ণগঞ্জ মহকুমা দুইটি সুবৃহৎ পরগণা নিয়া গঠিত—মহেশ্বরদী ও সোনার গাঁ। এই দুইটীর মধ্যে মহেশ্বরদী সমগ্র মহকুমার প্রায় ⅔ ভাগ ও সোনার গাঁ বাকী ⅓ ভাগ। মহেশ্বরদী পরগণার উত্তর প্রান্তে সর্ব্বসাধারণের চলাচলের জন্য কেবল মাত্র ১টী জিলা বোর্ডের রাস্তা কালীগঞ্জ হইতে নরসিংহদী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ইহা ভিন্ন এই সুবৃহৎ পরগণায় সর্ব্বসাধারণের চলাচলের জন্য দ্বিতীয় কোন রাস্তা নাই। আর সোনার গাঁ পরগণার ভিতর শুধু ১টা জিলা বোর্ডের সর্ব্বসাধারণের চলাচলের রাস্তা বৈদ্যের বাজার হইতে নারায়ণগঞ্জের পূর্ব্ব পার হবিগঞ্জের সহিত মিলিত হইয়াছে। এ ভিন্ন এই পরগণাতেও দ্বিতীয় রাস্তা নাই।

মামলা মোকদ্দমা, ব্যবসা, মালামাল আমদানি রপ্তানি,

নিত্য আহার্য্য দ্রব্য ও ব্যবহার্য্য সমস্ত প্রকার জিনিষপত্র আনা নেওয়া প্রভৃতি সকল কার্য্যের জন্য প্রতিনিয়ত নারায়ণগঞ্জ সহরে অতি কষ্টে যাতায়াত করিতে হয়। তাহার কারণ জিলা বোর্ডের রাস্তার অভাব ও সহরটী মহকুমার ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত না হইয়া একেবারে সমগ্র মহকুমার সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। মহেশ্বরদী পরগণার উত্তর প্রান্ত দিয়া কালীগঞ্জ হইতে নরসিংদি পর্য্যন্ত জিলা বোর্ডের ১টী রাস্তা ডাঙ্গা, আমদিয়া, পাঁচদোনা প্রভৃতি কতিপয় মৌজার সঙ্গে যুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি জিলা বোর্ড পাঁচদোনা হইতে মাধবদী পর্য্যন্ত ১টী নূতন রাস্তা মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত রাস্তার নির্ম্মাণ-কল্পে জমি একোয়ার করার দরুণ মাধবদী জমিদার বাড়ী হইতে জিলাবোর্ড ফণ্ডে যথোপযুক্ত অর্থদান করা হইয়াছে। শুনা যায়, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একোয়ার কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই জিলাবোর্ড রাস্তা নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় আড়াইহাজার পুলিশ ষ্টেশনের অধীন ব্রাহ্মণদী ইউনিয়ন বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বার-উদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে তথায় গমনকালীন মহেশ্বরদী পরগণার মধ্যভাগ ও দক্ষিণ অঞ্চলে যে জিলাবোর্ড ও লোকাল বোর্ডের প্রশস্ত সর্ব্বসাধারণের চলাচলের কোন প্রকার রাস্তা নাই তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন। সেই সভাতে উভয় পরগণার সমবেত বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে এই রাস্তার অভাব সম্বন্ধে চেয়ারম্যান মহাশয়কে বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে তিনি জমিদার, প্রজা প্রভৃতি সকলকে একযোগে এই রাস্তার জন্য আবেদন করিতে বলেন।

তদনুসারে গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে মহেশ্বরদী ও সোনার গাঁ পরগণাদ্বয়ের অফিসিয়াল, নন-অফিসিয়াল, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণ, স্থানীয় জমিদার, তালুকদার, প্রজাবর্গ জনসাধারণ সকলে একযোগে মিলিত হইয়া মাধবদী হইতে লাঙ্গলবন্ধ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের যাতায়াত করিবারও মালামাল আনা নেওয়ার সুবিধার্থ ১টী নূতন প্রশস্ত রাস্তা করিয়া দিতে জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রায় কেশবচন্দ্র বানার্জ্জি বাহাদুর এম, এল, সি মহোদয় সমীপে আবেদন করিয়াছেন। প্রস্তাবিত রাস্তার মধ্যে মধ্যে যেখানে গভীর খাল বিদ্যমান সেখানে কাঠের স্থায়ী পুল করিয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

(২)

গত সংখ্যায় কালনা-বৈদ্যপুর রাস্তা সম্বন্ধে লেখার পর জানা গেল যে, বৈদ্যপুরবাসী ডোনারগণ রাস্তার কাজ কবে হইবে নির্দ্দিষ্টরূপে জানিতে চাওয়ায় এবং অদূর ভবিষ্যতে কার্য্যারম্ভ না হইলে তাঁহারা যে টাকাটা জেলা বোর্ডের হাতে জমা দিয়াছিলেন তাহা শুধু শুধু ফেলিয়া না রাখিয়া ব্যাঙ্কে খাটাইবার কথা বলায়, জেলাবোর্ড ঐ টাকা ফেরৎ দিয়া কালনা-বৈদ্যপুর রাস্তা পাকা করিবার যে "স্কীম" হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়াছেন।

যাক্ এবার পল্লীবাসী নিশ্চিন্ত হইল! যথা পূর্ব্বং তথা পরং! সেই একগলা কাদা ভাঙ্গিয়া কালনায় যাতায়াত করিতে হইবে। কালনা মহকুমা হইতে যাঁহারা জেলা বোর্ডে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা দেশবাসীর নিকট এবার তাঁহাদের কার্য্যের কি কৈফিয়ৎ দিবেন?

কালনা-বৈদ্যপুর রাস্তার মত একটী প্রধান রাস্তা এ কয় বৎসরেও পাকা হইল না ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। টাকার টানাটানি কি যত এই অভাগা কালনা মহকুমার বেলায়? সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্কীম, বাতিল হওয়ার পর পল্লীবাসীকে জানাইবার জন্য কোন বিজ্ঞাপনও ছাপা হইল না। পল্লীবাসী শুধু একটা মিথ্যা আশায় ঘুরিয়া মরিবে কেন?

(পল্লীবাসী)

মেমারী-চকদীঘি রাস্তায় যানাভাব

ই-আই রেলের মেমারী ষ্টেশন হইতে দক্ষিণে এইচ্, বি কর্ডের মশাগ্রাম ও বি পি রেলের জামালপুরগঞ্জ ষ্টেশন দিয়া চকদীঘি পর্য্যন্ত জেলাবোর্ডের যে পাকা রাস্তা আছে তাহাতে পূর্ব্বে ৫০।৬০ খানি গোযান ও অশ্বযান চলিত। এক্ষণে মোটর গাড়ী আসিয়াছে, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অক্ষম হইয়া

অশ্বযানাদি উঠিয়া গিয়াছে। ফলে মোটর স্বামীরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে এবং ভগ্ন মোটর চালাইয়া ও ২।১ খানি মাত্র মোটর গাড়ীতে অসংখ্য যাত্রীকে ইটের মত বোঝাই করিয়া অর্থ লুটেন আর যাত্রিগণকে কষ্ট দেন। অভাব অভিযোগে ৪ বৎসরে এই হইয়াছে যে, উহা প্রকাশ হইলেই মোটর-স্বামিগণ দেখান যে অনেক মোটরবাস ও ট্যাক্সি আছে, ২।১ খানি তদন্তের সময় মেরামত হইতেছে, ২।৪ দিন মধ্যে তাহা চলিবে, তখন তাহার যাত্রী হইবে না। এইরূপে অভিযোগ সমস্ত ভাসিয়া যায়। তাহার ফল অনুমেয়। সন্ধ্যার পর যত ট্রেন মশাগ্রামে আসে তাহার যাত্রিগণ প্রত্যহই গাড়ী অভাবে অকথ্য কষ্ট পায়। হাবড়ার নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনের ডেলি প্যাসেঞ্জারগণ শিক্ষিত ও উপযুক্ত, সুতরাং আন্দোলন করিয়া ফললাভ করেন। এই সুদূর পল্লী-অঞ্চলে তাদৃশ যোগ্য লোক নাই, সুতরাং ফলও হয় না। রেল লাইন ভিন্ন এ কষ্ট দূর হইবার উপায় নাই। এইচ বি কর্ডের সহিত বি, পি, রেলের সংযোগ হইলে এ কষ্ট দূর হয়। ইহাতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ প্রভূত লাভবান হইবেন এবং অসংখ্য যাত্রী মরণযন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে।

শ্রীশিবকুমার মিত্র (রাজারামপুর)

ঢাকায় ঘাসের বাজার

সহরে গো-পালন অতি কঠিন ব্যাপার। তার উপর ঘাসের বাজারে একদল ফড়িয়ার উৎপাতে সাধারণের বিষম অসুবিধা হইয়াছে। ফড়িয়ারা বিনা পয়সায় লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। এদের প্রায় সকলেই মুসলমান। এরা ঘাসের নৌকা আসিবামাত্র একটা চুক্তি করিয়া লয়। ঘাসওয়ালারা ভয়ে চুক্তি করিতে বাধ্য হয়।

সেচ বিভাগের ঔদাসিন্য

সেচ বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, সেচবিভাগের কার্য্য বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ। উত্তর বঙ্গে কিছু কাজ করা হইবে বলিয়া আশা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, পাবনা ও ময়মনসিংহ জেলায় সেচ বিভাগ কোন কাজ করেন নাই; অথচ এই সকল স্থানেই সেচের বিশেষ প্রয়োজন। পূর্ব্ববঙ্গের নদী নালা খাল বিল সবই হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে এবং শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছে। শীতকালে, গ্রীষ্মকালে নদী-পথে চলাচল একেবারে বন্ধ। ইহাতে লোক যাতায়াত কিংবা জিনিষপত্র আনা নেওয়ার ভীষণ অসুবিধা হইয়াছে। জল-চলাচলের পথ রুদ্ধ হওয়ায় স্বাস্থ্যেরও খুব হানি ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। এই কারণে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারী-পূর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেচের অভাবে ব্যবসা বাণিজ্য স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই এতদঞ্চলের অবনতি ঘটিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার অনেক খাল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, টাঙ্গাইলের নদীতে বৎসরে ৫ মাসও জল থাকে না—নদীর মুখ বন্ধ।

✓ আদর্শ পল্লী

কাঁথি থানার অন্তর্গত ভণ্ডুবসান ও ভগবানপুর থানার অন্তর্গত জুখিয়া গ্রামকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করিবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে গত কয়েক মাস ধরিয়া নীরবে চেষ্টা হইয়াছে। কাঁথির কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ গত কয়েক মাসের চেষ্টায় জুখিয়া ও ভণ্ডুবসানকে বস্ত্রে স্বাবলম্বী ও গ্রাম্য সালিশীতে বিবাদ নিষ্পত্তি বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এই দুই গ্রাম হইতে গত কয়েক মাসের মধ্যে একটী মোকদ্দমাও আদালতে আসে নাই। জুখিয়াও ভণ্ডুবসান গ্রামে অবৈতনিক শিক্ষা প্রদান করিয়া নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টাও হইতেছে। একমাত্র জুখিয়া কেন্দ্র হইতে মাসিক প্রায় ৫ মণ চরকার সূতা উৎপন্ন হইতেছে। ভণ্ডুবসান ও জুখিয়ার আদর্শে আরও কতকগুলি গ্রাম অনুপ্রাণিত হইতেছে। (নীহার—কাঁথি)
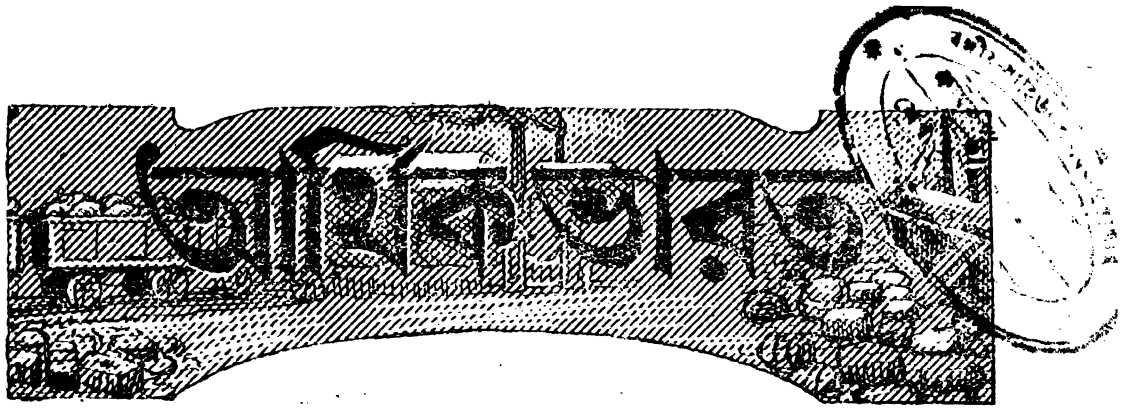
ভারতীয় কারেন্সির হ্রাস-বৃদ্ধি

১৯১৪ সনের প্রারম্ভে মোট কারেন্সি নোট উদ্বৃত্ত দেখা যায় ৬৪,৫৭ লক্ষ টাকার, এবং ১৯২০ সনে ১,৮২,৯১ লক্ষ টাকার। চলতি টাকার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই। গত বৎসরের বার্ষিক হিসাবে মোট কত টাকা টাকশালে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার খবর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কত টাকা চলতি হইয়াছে তাহা বলা কঠিন।

১৯২০ সন হইতে ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত কারেন্সি নোট বাহির করিবার হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে জানা যায় যে, ১৯২০ সনের জানুয়ারি মাসে দেশের মধ্যে যত নোটের প্রচলন করা হইয়াছিল, ১৯২৯ সনের ডিসেম্বরের মধ্যে তাহার চেয়ে ৩॥ কোটী টাকা কম মূল্যের নোট প্রচলিত হইয়াছে।

কারেন্সি নোটের সঙ্কোচসাধন বা সম্প্রসারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বা মাসে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম কানুন কায়েম করিয়া চলেন, তাহা নহে। কারেন্সির উঠানামা, বা সঙ্কোচন সম্প্রসারণ সাধিত হয় প্রাকৃতিক কারণে। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে গ্রীষ্মের সময়ে কারেন্সি সঙ্কোচিত হয়, শীতকালে আবার সম্প্রসারিত হয়। প্রায় অধিকাংশ সনেই কারেন্সির পরিবর্ত্তন এই ভাবে ঘটিয়া থাকে। আন্তর্জ্জাতিক চাহিদার উপর কাঁচা মাল রপ্তানি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, যখন প্রভূত পরিমাণ শস্যাদি চালান যায়, কিংবা যখন শস্যের দামও খুব চড়িয়া যায়, তখন, অনেক কারেন্সির দরকার হইয়া পড়ে। আবার যখন ফসলের সময় নয়, কিংবা ফসলের দাম সস্তা তখন কারেন্সির তত দরকার হয় না, সুতরাং সেরূপ কারেন্সি বাহির করাও হয় না। গবর্ণমেণ্টের কারেন্সিনীতি সম্পূর্ণরূপে দেশের অভাব বা চাহিদা অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কোন আকস্মিক ব্যাপারের জন্য যখন অনেক কারেন্সির দরকার বিবেচিত হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট ক্রয়বিক্রয়ের সুবিধার জন্য সাময়িকভাবে অতিরিক্ত মাত্রাতেই নোট ছাপিয়া থাকেন।

অল্প জলে চাষের ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রধানতঃ অনাবৃষ্টির দরুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অল্প জলে চাষের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভারতের কৃষকগণকে এই মহান অনর্থের হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। পুনার আট মাইল দূরে মাঁজরি নামক স্থানে এতদর্থে একটী সরকারী কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার দেখাশুনার ভার অর্পিত হইয়াছে একজন সরকারী বৈজ্ঞানিকের উপর।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে আরও তিনটী স্থানে এইরূপ কৃষিক্ষেত্র আছে। এই স্থানগুলির নাম আহম্মদনগর, বিজাপুর এবং শোলাপুর। গত ২০ বৎসরের মধ্যে এই তিনটী স্থানের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথাক্রমে ১২'৪৫, ২৩'২৮ এবং ২৫'৬২ ইঞ্চি। মাঁজরি পরীক্ষাক্ষেত্রে গড় বৃষ্টিপাত মাত্র ২০'৭৮ ইঞ্চি। অন্যান্য স্থানে বৃষ্টিপাত মাঁজরির চেয়ে বেশী হইলেও মাঁজরির কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনের হার অন্যান্য স্থানের প্রায় দ্বিগুণ। এই বৎসরে আহম্মদনগর জেলার কৃষকগণ জোয়ার ফসল হইল না বলিয়া চীৎকার করিতেছে; মাঁজরির সরকারী "শুকনো"

ক্ষেতে কিন্তু একর প্রতি ৫০০ পাউণ্ড জোয়ার ফলিয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে মাত্র একবার এই ক্ষেতের উৎপাদন খুব কম হইয়াছিল, কিন্তু সেবারেও ফলিয়াছিল একর প্রতি ৪৪৫ পাউণ্ড।

আহম্মদনগর জেলার কালেক্টার সাহেব এই নয়া চাষ সম্বন্ধে অগ্রণী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি গ্রামে গ্রামে বাজার সংলগ্ন স্থানে ছোট ছোট জমিতে এই নয়া চাষ সম্বন্ধে লোকশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই জেলায় প্রায় ২০টী স্থানে তিনি এইরূপ ক্ষেত কায়েম করিয়াছেন।

যাহা হউক মাঁজরি সরকারী কৃষিক্ষেত্রের তত্ত্বাবধানের ভার যোগ্য কর্ম্মচারিগণের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। এই ক্ষেত্র সরকারী কৃষি বিভাগের অন্তর্গত এবং ইহার পরিচালনের জন্য ফি সন ২০,০০০৲ টাকা বরাদ্দ রহিয়াছে। এই অর্থব্যয়ের জন্য লাভ পাওয়া যাইবে ঢের। মনে হয়, ২০ বৎসরের মধ্যে গোটা বোম্বাই প্রেসিডেন্সির চাষবাসের হালচাল পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে।

এই নয়া চাষের ব্যাপার নিতান্ত সাদাসিধে ধরণের, সমস্তই নির্ভর করে বৃষ্টির জলের উপর। ক্ষেতের উপর যে বৃষ্টির জল নামে তার কতকাংশ মাটীতে শুষিয়া যায় এবং বাকী অংশ ভোগ করে জমিতে বোনা ফসল। কৃষি গবেষণাগারে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে এই দুই প্রকারে ব্যয়িত বৃষ্টির জলের অনুপাত কিরূপ।

গবেষণায় আরও জানিতে পারা গিয়াছে যে, কোন্ ফসলে কতখানি জলের দরকার হয়। এক পাউণ্ড মসিনার বীজের আবাদের জন্য বৃষ্টির জলের দরকার হয় ১ হাজার পাউণ্ড; এক পাউণ্ড গম বুনিবার জন্য ৮৫০ পাউণ্ড জলের দরকার এবং ১ পাউণ্ড জোয়ার বুনিবার জন্য জলের দরকার ৪০০ পাউণ্ড। ১৯২৮ সনে মাঁজরি কৃষি ক্ষেত্রের এক প্রকার জমিতে ১,৩৬৮ পাউণ্ড জোয়ার বোনা হয়। ঐ সনে মাঁজরিতে বৃষ্টিপাত হইয়াছিল ২২·০৩ ইঞ্চি; এবং ফসল বুনিবার আগেই বর্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বৃষ্টির জল মাটির মধ্যেই ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ফলে ফসল ফলিয়াছিল সাধারণতঃ যাহা ফলিয়া থাকে তাহার প্রায় দ্বিগুণ।

এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবাদ করার অপর একটী নিয়ম লক্ষ্য করিবার আছে। কৃষকেরা সাধারণতঃ একর প্রতি ৬।৭ পাউণ্ড বীজ বপন করিয়া থাকে; পক্ষান্তরে এই গবেষণাক্ষেত্রে বীজ বোনা হইয়াছিল একর প্রতি ২।৩ পাউণ্ড। ফসলের সারিগুলি সাধারণতঃ ৯ ইঞ্চি ব্যবধানে স্থাপন না করিয়া ১৮ ইঞ্চি ব্যবধানে স্থাপন করা হইয়াছিল, এবং সারির মধ্যস্থ চারাগুলির মধ্যেও ১৮ ইঞ্চি ব্যবধান রাখা হইয়াছিল।

সাধারণতঃ দেখা যায়, বছরের গতি ভাল হইলে, অর্থাৎ প্রচুর বৃষ্টির ফলে সমস্ত বীজ হইতে চারা গজাইয়া উঠিলে, কৃষকগণ অনাবশ্যক চারাগুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। কারণ এরূপ না করিলে চারাগুলি সতেজ হয় না এবং সেরূপ বাড়েও না এবং ফসলও ভাল হয় না। অনাবৃষ্টি হইলে অবস্থা হইয়া দাঁড়ায় ভীষণ, চারাগাছ আদৌ সতেজ হয় না। সরকারী কৃষিক্ষেত্রের আবাদ এবং সাধারণ কৃষকের আবাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

মাঁজরি সরকারী কৃষিক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন মাটিতে গড়িয়া যাওয়ার জন্য জলের অপচয় কিরূপ হারে হইয়া থাকে তাহার মাপজোক স্থির করা হইয়াছে। আবাদের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে কিরূপ হারে এই অপচয়ের পরিবর্ত্তন হয় তাহারও মাপজোক করা হইয়াছে। এমন কি, কি পরিমাণে মাটি ধুইয়া চলিয়া যায় তাহাও স্থির করা হইয়াছে। এইজন্য জমির মধ্যে মধ্যে আলি বাঁধিয়া দেওয়ার দরকার।

মাঁজরির সরকারী কৃষি-বৈজ্ঞানিক মহাশয় আরও কত কি পরীক্ষা এবং গবেষণা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার পরীক্ষার সারমর্ম্ম দেওয়া হইল:—

১৮ ইঞ্চি গভীর জমি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ফসল কাটিবার পর পরই জমি ৯ ইঞ্চি কিংবা তার চেয়ে বেশী গভীর করিয়া কর্ষণ করিয়া লইতে হইবে। তারপর জমি সাট করিয়া ফেলিয়া প্রায় ৯ ইঞ্চি উচ্চ করিয়া পাই প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রত্যেকবার বৃষ্টি হওয়ার পরই নীচের

শুক্‌নো মাটী খুঁড়িয়া উপরে তুলিতে হইবে। এই উপায়ে জমির আর্দ্রতা রক্ষিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আগাছা তুলিয়া ফেলিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বীজ বপন মাটীর যথেষ্ট নীচে করিতে হইবে। কৃষকদের পক্ষে এইটী সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ৪।৫ ইঞ্চি মাটীর নীচে এবং ১৮ ইঞ্চি তফাৎ করিয়া বীজবপন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ফসল বাড়িবার সময় দুই মাসের মধ্যে বলদের সাহায্যেই হউক আর হাত দিয়াই হউক ৩।৪ বার ছোট লাঙ্গল দিয়া জমি খুঁড়িয়া দিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আগাছা তুলিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উপায়ে অতি অল্প জলের সাহায্যেই ফসল উৎপাদন করা চলিতে পারে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অনেক অংশে অতি অল্পই বারিপাত হয়, সুতরাং সেই সমস্ত স্থানে এই কর্ষণ-প্রণালী খুব কার্য্যকর হইতে পারে। সার দেওয়া না দেওয়া স্থির করিতে হয় ফসল বুঝিয়া এবং স্থানীয় অবস্থা দেখিয়া। এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি জেলার কৃষি-বিশেষজ্ঞের নিকট অক্লেশে মিলিতে পারে।

বিদেশে ভারতের ডিম রপ্তানি

রেলওয়ে ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় যুক্তপ্রদেশের পোল্‌ট্রী এসোসিয়েশন এক নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, প্রতি সপ্তাহে এই প্রদেশ হইতে ইংলণ্ডে ১২,০০০ ডিম রপ্তানি হইবে। ইহার প্রথম কিস্তি ২১০০০ ডিম ডাক জাহাজে বিলাতে রপ্তানি হইয়া গিয়াছে। যুক্ত-প্রদেশের পোল্‌ট্রী এসোসিয়েশনের এই চালানি ব্যবসা যদি ভাল চলে এবং লাভজনক হয়, তাহা হইলে কালে কালে বোম্বাইয়ের কাছাকাছি গুজরাট প্রভৃতি স্থানের গ্রাম্য প্রদেশের লোকসমূহ অনায়াসে এই ব্যবসা গ্রহণ করিতে পারে, কারণ বোম্বাইএর কাছে থাকার দরুণ তাহাদের জাহাজে ডিম পাঠাইবার অনেক সুবিধা আছে। বিলাতের বাজারে ভারতের ডিমের চাহিদা আজকাল খুবই বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে এই এসোসিয়েশন প্রতি সপ্তাহে বিলাতে ডিম পাঠাইতেছেন।

অহিফেন হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব (১৯২৭)

অহিফেন উৎপাদন ভারত গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসা। অহিফেন যখন ভারত গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে বিক্রয় করিবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির নিকট বিক্রয় করেন তখন এই বিক্রয়লব্ধ রাজস্বকে এক্‌সাইজ অপিয়াম বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এক্‌সাইজ অপিয়াম খাতে কেন্দ্রীয় গবর্ণ-মেণ্টের তহবিলে কোন রাজস্ব আদায় হয় না। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির স্ব স্ব তহবিলে এক্‌সাইজ অপিয়ামের রাজস্ব জমা হইয়া থাকে। ১৯২৬ সনে ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতে অহিফেন বিক্রয় সম্বন্ধে একটী নূতন রিজলিউশান পাশ করেন। আলোচ্য সন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। নিম্নে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির অহিফেন রাজস্বের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

অহিফেন রাজস্ব

১৯২[illegible]৬

মোট রাজস্ব

প্রদেশ	অহিফেনের লাইসেন্স ফি (টাকা)	অহিফেন বিক্রয় (টাকা)	মোট (টাকা)
মাদ্রাজ	৯,৫৭,১৮৩	৩৩,০৪,৮৬৭	৪২,৬২,০৫০
বোম্বাই	১২,৮০,৪৮০	২৭,৪৮,৫৬৯	৪০,২৯,০৪৯
বাঙ্গালা	১৫,৩৫,৩৩০	৩১,০৭,৩৮২	৪৬,৪২,৭১২
সংযুক্ত প্রদেশ	৭,৯৪,৭২৫	১৫,৮৯,৮১৫	২৩,৮৪,৫৪০
পাঞ্জাব	৯,৪৬,৩২০	২৪,৩১,৪৯৩	৩৩,৭৭,৮১৩
বার্ম্মা	১,৫০৮	৪৩,৩৬,৬০২	৪৩,৩৮,১১০
বিহার-উড়িষ্যা	৮,৩৪,১৫৬	২৫,৮৯,৪৫০	৩৪,২৩,৬০৬
মধ্যপ্রদেশ	১৬,৮৭,৫৩৮	২৬,৮৭,৫৬০	৪৩,৭৫,০৯৮
আসাম	২০,০৩,৩৬৮	২৪,৯০,৮১৯	৪৪,৯৪,১৮৭
মোট	১,০০,৪০,৬০৮	২,৫২,৮৬,৫৫৭	৩,৫৩,২৭,১৬৫

১৯২৬-২৭

প্রদেশ	অহিফেন বিভাগের খরচ টাকা	গড় লাভ টাকা	লাইসেন্স ফি আদায় টাকা	অহিফেন বিক্রয় টাকা	মোট টাকা
মাদ্রাজ	১৮,৯১,৭২৯	২৩,৭০,৩২১	১০,২০,৬৬৩	৩১,৭৬,৬০৬	৪১,৯৭,২৬৯
বোম্বাই	২০,৩১,১৫৮	১৯,৯৭,৯৮১	১১,১৪,১৫৯	২৭,৮৬,৫৫৯	৩৯,০০,৭১৮
বাঙ্গালা	১৩,২৯,৯১৬	৩৩,১২,৭৯৬	১৫,১৪,৯৪২	৩৩,১৫,৬৫৭	৪৮,৩০,৫৯৯
সংযুক্তপ্রদেশ	৮,৩৮,৪৮১	১৫,৪৬,০৫৯	৭,৭৯,৫৪৫	১৬,০৯,৭৭৯	২৩,৮৯,৩২৪
পাঞ্জাব	১২,৪৬,৬৪৫	২১,৩১,১৬৮	১০,৬৯,৭৫৪	২৫,৬৮,৪১৭	৩৬,৩৮,১৭১
বার্ম্মা	১৩,৬২,৮৯৯	২৯,৭৫,২১১	২,০৬১	৪০,০৭,১৮২	৪০,০৯,২৪৩
বিহার-উড়িষ্যা	১২,৫৫,৬৬০	২১,৬৭,৯৪৬	৮,৪৯,৭৯৪	২৬,৪৩,৬৫৬	৩৪,৯৩,৪৫০
মধ্যপ্রদেশ	১২,৯৬,৫৫৪	৩০,৭৮,৫৪৪	১৬,৫১,৪১৫	২৪,৮৭,৩৩১	৪১,৩৮,৭৪৬
আসাম	১১,৯৯,৫৪৮	৩২,৯৪,৬৩৯	১৭,৪৬,৮৮৪	২২,৪৫,০৪৭	৩৯,৯১,৯৩১
মোট	১,২৪,৫২,৫৯০	২,২৮,৭৪,৫৭৫	৯৭,৪৯,২১৭	২,৪৮,৪০,২৩৪	৩,৪৫,৮৯,৪৫১

১৯২৭-২৮

প্রদেশ	অহিফেন খাতে মোট গৃহীত রাজস্ব টাকা	অহিফেন খাতে মোট ব্যয় টাকা	নিট রাজস্ব টাকা
মাদ্রাজ	৪২,১০,৮৮৭	১১,০৬,০৪০	৩১,০৪,৮৪৭
বোম্বাই	৩৮,৩৫,১৩২	১২,১০,৮৯৭	২৬,২৪,২৩৫
বাঙ্গালা	৪৮,০৮,৩২২	১০,৫৪,৯৫০	৩৭,৫৩,৩৭২
যুক্তপ্রদেশ	২৪,৪১,৭৬৯	৬,০৪,১১০	১৮,৩৭,৬৫৯
পাঞ্জাব	৩৭,২৫,৫৪৫	৯,৮১,১৪৫	২৭,৪৪,৪০০
বার্ম্মা	৩৯,১৮,৫৯৪	৫,৭০,৮৮৬	৩৩,৪৭,৭০৮
বিহার-উড়িষ্যা	৩৫,১০,২৩৫	৮,৫৬,৪৩৩	২৬,৫৩,৮০২
মধ্যপ্রদেশ	৩৮,১৪,৭৮৯	৭,১৪,৪৮০	৩১,০০,৩০৯
আসাম	৩৮,২৬,০২৭	৫,৬৪,৭২০	৩২,৬১,৩০৭
মোট	৩,৪০,৯১,৩০০	৭৬,৬৩,৬৬১	২,৬৪,২৭,৬৩৯

রেলপথে কয়লা চালান

কয়লা চালান দেওয়ার সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯২৯ সনের ১লা জুন হইতে কয়লার উপর রেল মাশুল হ্রাস করিয়াছে। ফলে মাশুল ত কম আদায় হইয়াছেই উপরন্তু কয়লার চালানও কমিয়াছে। নিম্নে এ সম্বন্ধে একটী তালিকা প্রকাশিত হইল :—

১ম শ্রেণীর রেলপথসমূহে কয়লা চালান

কয়লা, কোক ও পেটেণ্ট ফিউয়েল

	সাধারণের জন্য		ফরেণ রেলওয়ে এবং হোমলাইনের জন্য	
	টন	আয়	টন	আয়
১৯২৮ সনের ডিসেম্বর হইতে ১৯২৯ সনের মে পর্য্যন্ত	৭,৯৯১,২৭৪	৩,৭১,১৬,৮৬৫	২,২৯৫,৭২১	১,৫৭,৬৯,৮৪৯
১৯২৯ সনের জুন হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত	৭,০৪২,২৭৪	৩,০৩,৮২,৬৩৫	১,৯১৮,৬২৫	১,২৪,১৪,৯২৮

	রেভিনিউ অ্যাকাউণ্টে ফিউয়েল		মোট	
	টন	আয়	টন	আয়
১৯২৮ সনের ডিসেম্বর হইতে				
১৯২৯ সনের মে পর্য্যন্ত	২,২১৩,৮৮৯	১,১৯,৮২,১২৫	১২,৫০০,৮৮৪	৬,৪৮,৬৮,৮৩৯
১৯২৯ সনের মে হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত	২,০৮২,০৮৭	১,০৫,৫৫,৫১৯	১১,০৪২,৯৮৬	৫,৩৩,৪৩,০৮২

আসামের কো-অপারেটিভ সোসাইটি

প্রভিন্‌সিয়াল ব্যাঙ্কের চাঁদার এবং পেড্‌আপ সেয়ার ক্যাপিটালের পরিমাণ ১৯২৯ সনে ১,৩৭,৪০০ টাকা ও ৬৬,৭০০ টাকা বাড়িয়া যথাক্রমে ১,৬১,০০০ এবং ৮০,০০০ টাকায় উঠিয়াছে। সভ্য ও সাধারণের নিকট হইতে জমা টাকার পরিমাণ বাড়িয়া ১,৯১,০১৫ টাকা হইতে ২,৮১,১৯৮ টাকায় উঠিয়াছে। বৎসরের প্রথমে ব্যাঙ্ক ৩০,০০০ টাকা করিয়া দুইটী স্থায়ী জমা (ফিক্সড ডিপোজিট) মাদ্রাজ আরবান ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও বিহার এণ্ড উড়িষ্যা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ এর নিকট হইতে নিজের ধারের দেনা শোধ করিবার জন্য গ্রহণ করেন। তবে বৎসরের মাঝামাঝি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের চাহিদা একটু মন্দা পড়ায় ব্যাঙ্ককে সমস্ত টাকা খরচ করিতে হয় নাই।

বৎসরের শেষ ভাগে ব্যাঙ্ক কিছু গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ও ক্যাশ সার্টিফিকেটও ক্রয় করেন, ইহাদের মূল্য (ফেস ভ্যালু) ৪৭,৮৭০ টাকা ১৪ আনা ৮ পাই। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্ক ১,৪১,২০০ টাকা ধার দেন এর পুরাতন ধারের ৯৮,২৪৫ টাকা ৮ আনা ২ পাই উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ব্যাঙ্কের ধার দেওয়া অর্থের মোট হইতেছে ৩,০০,৮৯৪ টাকা ৯ আনা ৫ পাই। এই টাকার শতকরা ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত শোধ দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কের কাজে আলোচ্য বৎসরে মোট ৭,৯৮৬/৯ পাই নিট্ লাভ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে নিট্ লাভ হইয়াছিল ৭,৪৫০/৬ পাই।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী পুঁজি ১৩,৮০,৩৮৯ টাকা হইতে আলোচ্য বৎসরে ১৬,৩৮,৭৫২ টাকায় উঠিয়াছে। সমস্ত গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত সমিতিকে সেণ্টাল ব্যাঙ্ক আলোচ্য বৎসরে ৪,৭৮,০২৩ টাকা ধার দেন। পূর্ব্ব বৎসর দিয়াছিলেন ৫,০৯,১৩৪ টাকা। এই প্রকারের সমিতির নিকট হইতে আলোচ্য বৎসরে পুরাতন ধারের ২,৭১,৩৪১ টাকা উদ্ধার করেন। পূর্ব্ব বৎসর উদ্ধার করিয়াছিলেন ২,৩৬,০২২ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে নৈসর্গিক অবস্থা তেমন সুবিধাজনক না থাকায়, শস্যের ফসল ততটা ভাল না হওয়ায় এবং মূল্য যথাসম্ভব কম থাকায় কৃষিজীবীদের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না।

যে সমস্ত সমিতি কৃষিজাত মাল উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহাদের বাদ দিয়া আলোচ্য সনে কৃষি-বিষয়ক ঋণদাতা সোসাইটির সংখ্যা ১১১৯টী হইতে ১,২৩২টীতে উঠিয়াছে। ইহাদের সভ্য-সংখ্যা ৪৮,১১৭ জন হইতে বাড়িয়া ৫২,৯২৪ জনে উঠিয়াছে। কার্য্যকরী পুঁজি ২২,৪৭,২৮৫ টাকা হইতে ২৫,৮৭,৯৩৫ টাকায় উঠিয়াছে।

এ প্রদেশের গ্রাম্য প্রাইমারী সোসাইটীগুলা টাকার জন্য সম্পূর্ণরূপে উত্তমর্ণ ব্যাঙ্কের মুখাপেক্ষী নহে। তাহাদের কার্য্যকরী পুঁজির বেশীর ভাগ নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া লয়। এই সমস্ত সোসাইটী নিজেদের সভ্যদের নিকট আলোচ্য বৎসরে ৭,৯৩,৭৮৮ টাকা ধার দেয়। পূর্ব্ব বৎসর দিয়াছিল ৭,৯৯,৮৮৩ টাকা। আলোচ্য বৎসরে ধারের টাকার মধ্যে ৪,৭০,০৮২ টাকা আদায় হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের আদায় ছিল ৪,৩২,২২৩ টাকা।

কৃষি ব্যাপারে সম্পর্কহীন ক্রেডিট সোসাইটীর সংখ্যা ৪০টী হইতে আলোচ্য বৎসরে ৪৭টীতে উঠিয়াছে। ইহাদের সভ্য-সংখ্যা ৮,৩৭২ হইতে ৯,৩৮২ জনে উঠিয়াছে।

কার্য্যকরী পুঁজির পরিমাণ ১৪,০০,২৭৭ টাকা হইতে ১৭,২৪,৩২৮ টাকায় উঠিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে এই সমস্ত সোসাইটি হইতে সভ্যদের ৭,৪৫,৯৫২ টাকার নূতন ধার দেওয়া হয়। পূর্ব্ব বৎসরে ৬,৩০,৩৯৬ টাকা সভ্যদের ধার দেওয়া হয়। আলোচ্য বৎসরে সভ্যদের নিকট হইতে ঋণের টাকা আদায় হইয়াছিল ৪,৫৫,২৮৫ এবং পূর্ব্ব বৎসরে হইয়াছিল ৪,০১,২৯৫।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ১৯২৮-২৯ সনের জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান

১৯২১ সনের সেন্সাস অনুসারে দেশীয় রাজ্য-বর্জ্জিত বিহার-উড়িষ্যার জনসংখ্যা ৩৪,০০৪,৫৪৬। আলোচ্য সনে এই প্রদেশের জন্ম-সংখ্যা ১,৩০১,৫২৯; ইহার আগের বছরের জন্মসংখ্যা ১,২৮০,১১৭; মৃত্যুর চেয়ে জন্ম ৪৪১,৩৩৬ বেশী। ১৯২৬, ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সনে জন্মের হার যথাক্রমে ৩৫'৪, ৩৭'৬ এবং ৩৮'৩। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হার আলোচ্য সনে ১৩'০; ১৯২৭-২৮ সনে ১২'৫।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অঙ্গুল জেলায় জন্মের হার সব চেয়ে বেশী (৫০'৬)। এবং সাঁওতাল পরগণায় সব চেয়ে কম (২৯'৮)। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির মধ্যে যুগসালাই, রেবেলগঞ্জ এবং লালগঞ্জে জন্মের হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; এই তিন মিউনিসিপ্যালিটিতে জন্মের হার যথাক্রমে ৬৪'৫, ৫০'১ এবং ৪৯'২। পক্ষান্তরে ধানবাদ দেওবর এবং ডুমকায় জন্মের হার সব চেয়ে কম; এই তিন স্থানে জন্মের হার যথাক্রমে ২'১, ৪'৪ এবং ৯'৬। এই প্রদেশের সহর-গুলিতে জন্মের হার ২৫'৮ এবং পল্লী অঞ্চলে ৩৮'৭।

আলোচ্য বর্ষে বিহার ও উড়িষ্যায় মোট মৃত্যু-সংখ্যা ৮৬০,১৯৩; ১৯২৭ সনে মরিয়াছিল ৮৫৩,০২৪ জন। ১৯২৬, ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সনে মৃত্যুর হার যথাক্রমে ২৫'৭, ২৫'১ এবং ২৫'৩। ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরের গড় মৃত্যু-হার ৩১'৫।

আলোচ্য সনে বিহার ও উড়িষ্যায় কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। এই সনে ১৯২৭ সনের চেয়ে এই রোগে ২৮,০৮১ জন বেশী লোক (মোট ৭৮,১০৩ জন) মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

জেলা হিসাবে সর্ব্বোচ্চ মৃত্যুর হার পুরীতে (৩১'১), কটকে (৩০'৯) ও প্যালামৌতে (২৯'৬); সব চেয়ে কম সিংভূমে (১৬'১), মানভূমে (১৬'২) ও সাঁওতাল পরগণায় (১৯'৫)। সহরগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে মৃত্যুর হার সব চেয়ে বেশী দৃষ্ট হইয়াছে :—গয়া (৪৬'০), রঘুনাথপুর (৩৬'৫), পুরী (৩৪'৬); সব চেয়ে কম ধানবাদে (২'৩), ডুমরাঁওয়ে (২'৯) এবং ডালটনগঞ্জে (৩'৭)।

রথ-যাত্রার পর পুরীতে দারুণ কলেরার আবির্ভাব হয়; এবং জুন মাস হইতে আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত থাকে। রথযাত্রার আগে কটকে কলেরা লাগিয়াছিল। পুরী জেলায় কলেরা লাগার জন্য বিদেশী তীর্থ-যাত্রীরাই দায়ী।

শিশু-মৃত্যুর হার পুরুষ ছেলের পক্ষে হাজার করা ১৯২'২ এবং মেয়ে ছেলের পক্ষে ১৫৮'২; ১৯২৭ সনে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯০'০ এবং ১৫৮'৮। মোট হাজার করা শিশু-মৃত্যুর হার ১৯২৮ সনে ১৩১'৮, ১৯২৭ সনে ১৩৩'৪। ইহার সহর অঞ্চলের হার ১৫৫'৬, এবং পল্লী অঞ্চলের ১৩১'২। এক বৎসরের কম বয়সের শিশু মৃত্যুর হার পুরুষের পক্ষে ৬৬'৭ এবং মেয়ের পক্ষে ৫৮'১ হইতে ৬২'৪ এবং ৫৪'৫তে নামিয়া গিয়াছে। অন্যান্য বয়স হিসাবে মৃত্যুর হার কমিয়াছে। ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে মৃত্যুর হার সব চেয়ে বেশী কমিয়াছে। তবে মোটের উপর, অন্যান্য বছরের মত আলোচ্য সনেও পুরুষের মৃত্যুহার নারীর চেয়ে বেশী; কারণ এই উভয় প্রকার মৃত্যু-হারের অনুপাত ১০৮ : ১০০।

আলোচ্য সনে সম্প্রদায় হিসাবে মৃত্যু-হারের পার্থক্য ঠিক অন্যান্য বৎসরের মতই দেখা যায়। মৃত্যুর হার হিন্দুর মধ্যেই বেশী (২৫'৮) এবং খৃষ্টানদের মধ্যে সব চেয়ে কম (১৬'০)। মুসলমানদের মৃত্যু-হার ২৩'৭ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ২১'৪।
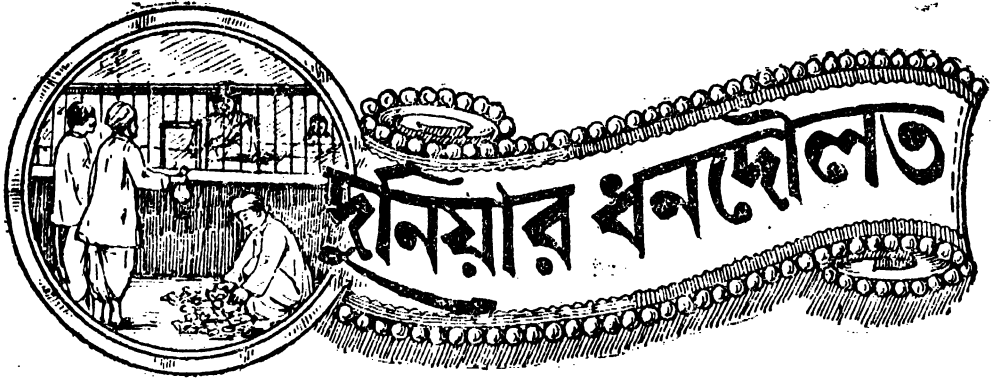
জার্ম্মাণির অর্থনৈতিক অবস্থা

২৬ লক্ষ বেকার

জার্ম্মাণিতে বেকার লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। জার্ম্মাণির বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থার ইহা একটী বিশেত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক সপ্তাহেই মনে হয়, এইবারই বেকার মানুষের সংখ্যা সর্ব্বোচ্চ হইল, কিন্তু পরের সপ্তাহেই পূর্ব্বের ধারণা ভুল হইয়া যাইতেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাহায্য-প্রত্যাশী বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬ লক্ষ। ১৯২৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসেও জার্ম্মাণিতে ঠিক এতগুলি লোককে বেকার হইতে দেখা গিয়াছিল। বিগত প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে জার্ম্মাণিতে শিল্প-প্রচেষ্টা শিথিল হইয়া পড়ে, তাহার উপর আবার দুর্য্যোগ দেখা দিয়াছে; কারণ জার্ম্মাণিতে শিল্প ব্যবসায় চালাইবার জন্ত আবশ্যক মত পুঁজি পাওয়া যাইতেছে না। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণির আবহাওয়ার অবস্থা খুব সন্তোষজনক। আশা হইয়াছিল যে, এখন শিল্প-প্রচেষ্টা বাড়াইয়া এবং আরও নানাপ্রকার উপায়ে সাহায্য প্রদান করিয়া বেকার লোকদের অন্নের সংস্থান করা সহজ হইবে; কিন্তু পুঁজির অভাবে সে আশা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

জার্ম্মাণ দেশে কতকগুলি কাজে সময়-বিশেষে লোকজন তত দরকার হয় না। এর জন্ত সময়ে সময়ে অনেক লোক বেকার হইয়া বসিয়া থাকে। জার্ম্মাণির মোট বেকার লোকের মধ্যে অর্দ্ধেক লোক এই সমস্ত কাজের জন্ত বেকার হইয়া বসিয়া আছে। গৃহ-নির্ম্মাণে মোতায়েন লোকজন বেকার হইয়াছে বেশী। তবে গত বৎসরের তুলনায় এইরূপে বেকার হওয়া লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। জার্ম্মাণিতে বর্ত্তমানে যে সব শিল্প সারা বৎসর সমানভাবে চলে, সেই সমস্ত শিল্পেও বেকার সংখ্যা বাড়িতেছে। জার্ম্মাণিতে শিল্প-বাণিজ্যের অধোগতি হইয়াছে সুতরাং জার্ম্মাণিতে বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে। ট্রেড্ ইউনিয়নগুলির ষ্ট্যাটিষ্টিক্স ঘাঁটিয়াও এই তথ্য পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত ষ্ট্যাটিষ্টিক্সে প্রকাশ, নানা প্রকার ধাতু-শিল্পে এবং মেশিনশিল্পে মোতায়েন মজুরের সংখ্যা গত বৎসরের চেয়ে বর্ত্তমানে অনেক কম।

জার্ম্মাণির ক্রয়-শক্তি কমিয়াছে

জার্ম্মাণিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধোগতি ঘটিয়াছে। এই অধোগতির পরিচয় কেবলমাত্র যে মজুরের বাজারের শোচনীয় অবস্থাতেই টের পাওয়া যাইতেছে তাহা নয়; জার্ম্মাণির উৎপাদন শক্তিও কমিয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে। ইহা সত্য যে, পিগ লোহার উৎপাদনে বিশেষ কোন তারতম্য নাই; ডিসেম্বর মাসে যেমন দেখা গিয়াছিল, ফেব্রুয়ারি মাসেও অবস্থা প্রায় সেইরূপই। তবে কয়লার উৎপাদন কমিয়াছে। রুঢ় প্রদেশে জানুয়ারি মাসে কয়লা উঠিয়াছিল ৪৪০,০০০ টন, কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে উঠিয়াছে ৩৯০,০০০ টন। ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের এবং রাইখস্ রেলপথ নির্ম্মাণের জন্ত আর সেরূপ অর্ডার পাওয়া যাইতেছে না। লোহার ব্যবসায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেরূপ ফল এখনও ফলে নাই। জার্ম্মাণির মেশিন-শিল্পেরও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সেরূপ অর্ডারও আসিতেছে না, এবং কাজকর্ম্মও কমিয়াছে

প্রায় ৬২%। খুচরা লোহার ব্যবসায় এবং ধাতু শিল্পের অবস্থাও খারাপ। এই সমস্ত শিল্পে বেকার-সমস্যা দারুণ হইয়া উঠিয়াছে, এবং আশঙ্কা হইতেছে যেন এই দুর্দ্দশা শীঘ্র দূর হইবার নয়। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণের কারখানাগুলির অবস্থাও এই একই রূপ। বিশেষতঃ, বয়ন-শিল্পের অবস্থা ভীষণ কাহিল। বিদেশ হইতে চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ার সেরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। জার্ম্মাণির মজুর-সম্প্রদায়ের ১৫% অর্থাৎ ২৫ লক্ষ মজুর বেকার হওয়ায় মাল উৎপাদন তো কম হইতেছেই, সঙ্গে সঙ্গে এই ২৫ লক্ষ লোকের ক্রয়-শক্তি নষ্ট হওয়ায় বিক্রয়ের বাজারের অবস্থাও জার্ম্মাণ শিল্পজাত দ্রব্যের পক্ষে শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। সাধারণতঃ বসন্তকালে বাজারের অবস্থা ভাল হয়। কারণ, এই সময়ে অনেক লোকের কর্ম্মের সংস্থান হইয়া থাকে; কিন্তু এবার যে অবস্থা বিশেষ ভাল হইয়াছে তাহা মনে হয় না।

জার্ম্মাণির আশা ভরসা

জার্ম্মাণির বর্ত্তমান ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ভবিষ্যতে জার্ম্মাণির ভাগ্যাকাশ অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু ইহা সত্বেও আশার ক্ষীণ আলোক-রেখা কোন কোন স্থানে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যাইতেছে। জার্ম্মাণিতে এই যে এত লোক বেকার হইয়া বসিয়া আছে; ব্যবসা বাণিজ্যের গতিই ইহার একমাত্র কারণ নয়। শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির রূপান্তরসাধন করা হইয়াছে। এবং ইহার জন্তই এত লোক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মাণিতে পুঁজির অভাব, তা ছাড়া জার্ম্মাণ মালের বাজারও মিলিতেছে না। সেই জন্য জার্ম্মাণির শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত হওয়ার দিকে ঝোঁক হইয়াছে। এইরূপ মিলন আগেও হইয়াছে। মিলিত হওয়ার কায়দাও অনেক। কিন্তু অবস্থা যেরূপ সাংঘাতিক তাহাতে এই ধরণের মিলনেও কুলাইতেছে না। আবার নয়া নয়া মিলন নয়া নয়া রূপে দেখা দিতেছে। ইহার ফলে অনেক কারখানা বন্ধ হইয়া যাইতেছে, হাজার হাজার মজুর বেকার হইয়া পড়িতেছে, অথচ মাল উৎপাদন সমানভাগে চলিতেছে। মাল উৎপাদনের খরচা কমাইবার জন্তই এই সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইতেছে। ইহাতে গোটা জার্ম্মাণ-শিল্পের কদর বাড়িতেছে। জার্ম্মাণিতে এই যে এত লোক বেকার হইয়া বসিয়া রহিয়াছে ইহা জার্ম্মাণির দুর্ভাগ্যের বিষয় নিশ্চয়ই; কিন্তু কেবল বেকার লোকের সংখ্যা দেখিয়া জার্ম্মাণির সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করিতে গেলে ঠকিতে হইবে নিশ্চয়ই।

জার্ম্মাণির বাজার-সম্ভ্রম অটুট

জার্ম্মাণির শিল্প-ব্যবসার যথেষ্ট অধোগতি ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও জার্ম্মাণিতে দেউলিয়ার সংখ্যা সেরূপ বাড়ে নাই বা জার্ম্মাণির বাজার-সম্ভ্রমও তিল মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তবে ইহা সত্য যে, দেউলিয়া হওয়ার সংখ্যা ক্রমে বাড়িতেছে। অনেক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করিয়া ফেল মারিতেছে। আপত্তিজনক বিলের সংখ্যাও বাড়িতেছে। বর্ত্তমানে এইরূপ বিলের সংখ্যা এত বেশী যে, ১৯২৫-২৬ সনের শীতকালের পর হইতে এমন আর কখনও ঘটে নাই। চলতি বিলের সংখ্যাও খুব কমিয়াছে। পূর্ব্ব বছর হইতে আলোচ্য সনে বিলের পরিমাণ দেড় মিলিয়ার্ড কম। মুদ্রার বাজারের অবস্থা ক্রমেই সচল হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারে বিলের স্থান ব্যাঙ্ক ক্রেডিট দখল করিয়া লইতেছে। আর বিলের প্রচলন হ্রাস পাওয়ার জন্ত স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শিল্পের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইতেছে।

জার্ম্মাণ শিল্পের পশ্চাদপসরণ

১৯২৮ সনে জার্ম্মাণিতে শিল্পদ্রব্য গাদায় গাদায় উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু আলোচ্য সনে জার্ম্মাণি শৃঙ্খলার সহিত অনেক কারবার গুটাইয়া লইয়াছে। এই পিছু হাঁটার ব্যাপারে দেখা যাইতেছে জার্ম্মাণি উৎপাদন সম্বন্ধে খুব হুসিয়ার হইয়া চলিতেছে। ইহাতে সুবিধা হইবে বলিয়াই মনে হয়। পুঁজির অভাবের জন্ত গাদায় গাদায় মাল উৎপাদন করিয়া মজুত করিয়া রাখার উপায় নাই; সেই জন্ত প্রয়োজনমাফিক মাল উৎপাদন করা হইতেছে; এবং

মালপত্র নানাস্থানে উৎপন্ন এবং বিক্রয় না করিয়া একস্থানে জমা করা হইতেছে। নানাপ্রকারে যুক্তি প্রয়োগ করিয়া জার্ম্মাণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি আত্মরক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছে। পুরাণো মাল ঘরে জমা হইয়া থাকার জন্য ভবিষ্যতে যে কলকারখানা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, জার্ম্মাণি আর সেটী হইতে দিতেছে না।

জার্ম্মাণির মুদ্রার বাজারের অবস্থা সহজ এবং সরল হইয়াছে। ইহাতেই বোঝা যাইতেছে জার্ম্মাণ-শিল্পের পশ্চাৎগতি বেশ শৃঙ্খলার সহিতই সাধিত হইয়াছে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারি, রাইখস ব্যাঙ্ক আবার ডিস্কাউণ্টের হার কমাইয়া দিয়াছে। আশা, ইহার ফলে কিছুদিনের জন্য শিল্পের অবস্থা বেশ সহজ গতিতেই চলিবে; কিন্তু রাষ্ট্র-পতিগণ সবদিকে হুসিয়ার হইয়া আয়ব্যয় না করিলে কিছুই হইবে না। কারণ, প্রথমতঃ উৎপাদন মজুরের পুঁজির সংস্থান হইবার সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে, আবার পুঁজির সংস্থান নির্ভর করে রাষ্ট্র-কর্ত্তাদের পুঁজির চাহিদার উপর। সুতরাং বর্ত্তমানে জার্ম্মাণির ব্যবসা বাণিজ্যের অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণির রাজনৈতিক হালচালের উপর। আর রাজনৈতিক অবস্থার সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থার যোগাযোগ এমন নিবিড় হইয়া জার্ম্মাণির জাতীয় জীবনে আর কখনও দেখা দেয় নাই।

আর একটী কথা হইতেছে এই যে, জার্ম্মাণি বলিয়া কোন কথা নাই, ছুনিয়া জুড়িয়া ব্যবসা বাণিজ্যের অধোগতি দেখা দিয়াছে। ইয়োরোপের বাঘাবাঘা শিল্প-প্রধান দেশগুলিতেই ব্যবসা-দুর্য্যোগ দেখা দিয়াছে। এমন কি সকল দেশের সেরা মার্কিণ মুল্লুকেরও একই গতি। তবে জার্ম্মাণির অবস্থা বিশেষ কাহিল। কারণ জার্ম্মাণির মত আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের যোগাযোগ এমন নিবিড় ভাবে কোন দেশের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে নাই। ছুনিয়ার সব দেশে জিনিষের দাম কমিয়া যাইতেছে। তবে জার্ম্মাণিতে সেরূপ কমে নাই। কারণ বৈদেশিক ঋণ এবং দেশের মধ্যে গঠনমূলক সামাজিক সংস্কারাদির জন্য জার্ম্মাণ রাষ্ট্রকে মোটা অর্থ যোগাইতে হইতেছে। সেইজন্য জার্ম্মাণ মালের চাহিদা এবং বাজার উভয়ের অবস্থাই বেশ ভাল। মোট কথা এই সমস্ত কারণের জন্য জার্ম্মাণ মাল পড়িয়া থাকিতেছে না।

মুদ্রা ও ষ্টক

কারখানায় মাল উৎপাদন কমাইবার ফলে জার্ম্মাণির মুদ্রার বাজারের অবস্থা বেশ সচল হইয়াছে। বিদেশের মুদ্রার বাজারের অবস্থা জার্ম্মাণির পক্ষে বেশ অনুকূল, সুতরাং জার্ম্মাণিতে পুঁজির অভাব তো হয়ই নাই, অধিকন্তু সময় সময় পুঁজির যোগান অতিরিক্ত মাত্রায় হইয়াছে। সুদের হার এবং ডিস্কাউণ্টের হার কমিয়া গিয়া যথাক্রমে ৮%, ৭% হইতে ৬% এবং ৫½%তে পরিণত হইয়াছে। শেয়ারের বাজারের অবস্থাও বেশ সন্তোষজনক। কিছুদিন পূর্ব্বে যে ভাঁটা দেখা দিয়াছিল তা আর এখন নাই। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই আবার শেয়ারের দর চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। জার্ম্মাণির রাজনীতি-ক্ষেত্রে ঘরোয়া ব্যাপার লইয়া বিবাদ আরম্ভ হওয়াতে শেয়ারের বাজারে আবার অসুবিধা ঘটিয়াছে।

ষ্টকের বাজারের উঠানামা দেখিয়া ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই। প্রথমতঃ, ছুনিয়াব্যাপী ব্যবসাবাণিজ্যের অধোগতি এবং দ্বিতীয়তঃ, জার্ম্মাণিতে ইয়ংপ্ল্যান লইয়া তুমুল রাজনৈতিক বাদবিতণ্ডা চলিতেছে। বাজেট মিলাইবার জন্য বড় বড় কর্ত্তারা হিমসিম খাইতেছেন। সুতরাং ষ্টকের বাজারের পরিবর্ত্তন ঘটা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক।

জগতের শতকরা ৫৪ ভাগ জাহাজ বিলাতে প্রস্তুত

১৯২৭ ও ১৯২৮ সনে বিলাতের জাহাজ-শিল্পের যে অবস্থা ছিল এখনকার অবস্থা তাহা অপেক্ষা অনেকটা ভাল। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনে জগতের মোট জাহাজের শতকরা ৫৩·৬ ভাগ বিলাতে তৈয়ারী হইয়াছিল। ১৯২৯ সনে শতকরা ৫৪·৫ ভাগ তৈয়ারী হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিলাতে জগতের শতকরা ৮২ ভাগ জাহাজ তৈয়ারী হইত। ১৯২৯ সনে বিলাত জগতের যতভাগ জাহাজ

তৈয়ারী করিয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইতে আর কখনও এত করে নাই।

এরূপ উন্নতি হইবার কারণ কি? বিলাত অনেকগুলা মালবাহী জাহাজ তৈয়ারীর অর্ডার পাইয়াছিল। তা ছাড়া, ৭৭টি তৈলবাহী জাহাজের অর্ডার পাইয়াছে—ইহার মধ্যে ২৫টী তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। শীঘ্র অনেকগুলা যাত্রিবাহী জাহাজের অর্ডারও পাইতে পারে। যাত্রিবাহী জাহাজের অর্ডার পাইলে কেবল জাহাজ-শিল্পের নয় অন্যান্য শিল্পেরও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা—কারণ যাত্রিবাহী জাহাজ তৈয়ারীর জন্য নানাশ্রেণীর ওস্তাদের দরকার হয়।

বিলাতের জাহাজ-শিল্পকে নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির সহিত যুঝিতে হইতেছে:—(১) অন্যান্য দেশের জাহাজ-শিল্প গভর্মেণ্ট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পায়; (২) বিলাতের জাহাজ-শিল্পের উপর যত করভার চাপানো আছে, অন্যান্য দেশে তত নাই; (৩) বিলাতের ও অন্যান্য দেশের জন্য বিলাতে যথেষ্ট যুদ্ধ-জাহাজ তৈয়ারী হইত, এখন যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা কমানো স্থির হওয়াতে অসংখ্য মজুর ও কলকব্জা যন্ত্রপাতি পড়িয়া আছে। (৪) কিস্তিবন্দীতে বিক্রয় প্রণালী চলিত হওয়ায় অনেক সময়ে নগদ দাম পাওয়া যাইতেছে না; অনেকক্ষেত্রে মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ দাম অগ্রিম পাওয়া যায়, বাকী অংশটা আদায় করিতে অনেক সময়ে ৬ বৎসরও লাগে।

এই সব বাধাবিপত্তির সঙ্গে বিলাতকে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। তবু বিলাতের জাহাজ-শিল্প উন্নতি করিতেছে এবং প্রতিযোগীকে পরাস্ত করিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ, বিলাতের জাহাজ-উৎপাদনের খরচা খুব কম—ফ্রান্সের তুলনায় অর্দ্ধেক, যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অর্দ্ধেকেরও কম। তা ছাড়া প্রতিযোগিতার চাপে পড়িয়া বিলাত এখনও নানাপ্রকার উন্নততর প্রণালী এবং শ্রম বাঁচাইবার জন্য উন্নত শ্রেণীর কলকব্জা অবলম্বন করিতেছে।

বেলজিয়ামের বহির্ব্বাণিজ্য

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে দুনিয়ার প্রত্যেক দেশেরই কিছু না কিছু অংশ আছে। দেশের আকার, লোকসংখ্যা এবং তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ, জলবায়ু ও কৃষি বিষয়ে নৈসর্গিক দান, বন ও ধাতু সম্পদের গুরুত্ব অনুযায়ী আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের অংশের গুরুত্ব-নির্ণয় হইয়া থাকে। বেলজিয়ামের অল্প জায়গার মধ্যে লোকের বসতি এত ঘন যে, ইহার উদ্বৃত্ত জমিতে উৎপন্ন ফসলে ইহার নিজের অধিবাসীদেরই পেট ভরিয়া খোরাক মিলে না। অন্য দিকেও তেমনি বেলজিয়ামবাসীরা জমির কাজ বেশী না পাওয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া তাহাতেই নিজেদের রুটীর সংস্থান করিয়া লইতেছে এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত মালপত্রই ব্যবসার জন্য দেশ বিদেশে চালান হইয়া যাইতেছে।

পরস্পর বাণিজ্যের লেন দেনের সুবিধার জন্য ভারত ও বেলজিয়াম উভয়েরই উভয়ের বাজার সম্বন্ধে খুব ভাল জ্ঞান থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক। ভারতের জিনিষের ক্রেতা হিসাবে বেলজিয়াম যদিও নিতান্ত ছোট নয় (১৯২৭-২৮ সনে ১০·৯৭ লক্ষ টাকার মাল বেলজিয়ামে চালান হয়) তথাপি নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি প্রধান প্রধান মাল বর্ত্তমানে যে পরিমাণে ভারতবর্ষ হইতে বেলজিয়ামে রপ্তানি হইতেছে তাহাদের কাটতি বেলজিয়ামের বাজারে আরও বাড়িবার খুবই সম্ভাবনা আছে। ভারতের কাঁচা পাট, কাঁচা তুলা ও শণের কাটতি বেলজিয়ামের কলগুলিতে বেশ ভালই আছে, চেষ্টা করিলে ইহাদের কাটতি আরও বাড়ান যায়। বর্ত্তমানে বেলজিয়াম দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে চামড়া আমদানি করিতেছে। এ সরবরাহ ভারত হইতে হইলেও হইতে পারে, অথচ ১৯২৭-২৮ সনে মাত্র ৩৪৫,০০০ টাকার এই শ্রেণীর মাল ভারত হইতে বেলজিয়ামে যায়। বেলজিয়ামের তেলকলগুলাতে ভারতের তৈল বীজেরও বেশ চাহিদা দেখা যায়। বেলজিয়ামে গবাদি পশুর সংখ্যার তুলনায় ইহাদের খাদ্য খুবই কম মিলে, সুতরাং প্রতি বৎসর শুদ্ধ এই গো-খাদ্যের জন্যই বিস্তর নিষ্পেষিত তৈলবীজ (খইল) এদেশে দরকার হয়। এ ছাড়া বেলজিয়ামের বাজারে ভারতীয় গালা, অভ্র, ব্রাস ও ঝাঁটার শলা, তুঁত, মৃজাপুরি ও জয়পুরি পশমী গালিচা প্রভৃতিও বেশ ভালভাবে চালান যাইতে পারে। বেল-

জিয়াম ভারতের ম্যাঙ্গানিজ ওরেরও খুব বড় খরিদ্দার। এই শ্রেণীর অন্য যে কোন ওরও চেষ্টা করিলে বেলজিয়ামের বাজারে বেশ ভালভাবে চালান যাইতে পারে।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে প্রত্যেক দেশই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই। খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচা মালে বেলজিয়ামের রপ্তানি একেবারেই নাই, কারণ এই শ্রেণীর মাল এখানে যত হয় তাহা সমস্তই দেশের অভাব মিটাইতে লাগিয়া যায়। তবে প্রতি বৎসর বেলজিয়াম বহু টাকার শিল্পজাত জিনিষ বিক্রয় করে। এদেশ বড় বড় কল কারখানা, কলিয়ারী, রেলরাস্তা, খাল ইত্যাদিতে সম্পূর্ণরূপে ভরতি, এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতেই বহুসংখ্যক মজুর দিবারাত্র খাটিয়া ভাল ভাল শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। বেলজিয়ামের লৌহ এবং ইস্পাত-নির্ম্মিত দ্রব্য ভারতের বাজারে খুব প্রসিদ্ধ। এখানকার কাচও ভারতের বাজারে বেশ চলিতেছে। এ ছাড়া বেলজিয়ামের অনেকগুলি কারখানায় অনেক নামজাদা মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল, বাইসিক্‌ল্, গোলা বারুদ ও অস্ত্র শস্ত্র, টায়ার, বিজলী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, তার এবং বাল্‌ব্, সর্ব্ব প্রকারের যন্ত্রপাতি, সুতির মাল, নকল রেশম, পশম ও সুতির শয্যা বস্ত্র, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রকারের মাল প্রস্তুত হইতেছে।

বেলজিয়ামের মালের একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহা বাজার দরের তুলনায় সস্তা ও মজবুত। অন্য সব শিল্প-প্রধান দেশ অপেক্ষা বেলজিয়ামে খাইখরচ অনেক কম। এখানকার কাষ্টম্‌সের শুল্কও অনেক কম। বেলজিয়ামের মজুরগুলাও কাজে খুব কষ্টসহিষ্ণু ও একনিষ্ঠ। এখানকার মাল চলাচলের ব্যবস্থাও খুব সুন্দর। দেশের আকার ছোট হওয়ার দরুণ বিভিন্ন স্থানের দূরত্বও অনেক কম। এখানকার এন্টোয়ার্প বন্দরের বহু মাইলব্যাপী মাল উঠা নামার বড় বড় মঞ্চের উপর বিভিন্ন দেশ হইতে বহুসংখ্যক জাহাজ মাল আনিয়া দিবারাত্র বোঝাই ও চালাই করিতেছে। এই সমস্ত কারণে বেলজিয়ামের শিল্পজাত মালের উৎপাদন-খরচা এত কম পড়ে। এবং শুদ্ধ এই কারণেই বেলজিয়ামের বহির্ব্বাণিজ্যের পথ সবদিক্ দিয়া খোলা।

সবচেয়ে বিশেষ জানিবার বিষয় এই যে, বেলজিয়ামের শিল্প-জাত রপ্তানি মালের ⅔ ভাগ মাল যে পাঁচটী দেশে যায় তাহাদের মধ্যে চারিটী দেশ শিল্প-প্রধান।

১৯২৭ সনের একটী হিসাব নীচে দেওয়া গেল :—

বেলজিয়ামের মাল	পাউণ্ড	বেলজিয়ামের মোট রপ্তানির শতকরা অনুপাত
বিলাত	২৭,৮৬৯,৯২০	১৮·২৭%
জার্ম্মাণি	২৫,৮৩৫,৭৪৮	১৬·৯৪%
ফ্রান্স	১৭,৫৫০,৯২৫	১১·৫০%
নেদারল্যাণ্ড	১৬,৫৩৩,০৯৭	১০·৮৪%
যুক্তরাষ্ট্র	১৩,৮৩৩,৫০৮	৯·০৭%
মোট	১৫২,৫৫২,০৮০	৬৬·৬২%

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, বেলজিয়ামের প্রধান প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যগুলি (ইস্পাত, লৌহ, তন্তুশিল্প রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ প্রভৃতি) বিলাতই বেশী কিনে। তার পরেই বেলজিয়ামের বড় খরিদ্দার জার্ম্মানি। সুতরাং দুনিয়ার সেরা দেশ দুটীই যখন বেলজিয়ামের বড় খরিদ্দার দেখা যাইতেছে, তখন এখানকার মাল যে দাম দিয়া কিনিবার উপযুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বেলজিয়ামের সহিত আমদানি রপ্তানি ব্যবসা-সংক্রান্ত কোন বিষয়ের প্রশ্নের জন্য কমিটি সেন্ট্রাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডি বেলজিক্, ৩৩ নং রিউডুকেল, ব্রুসেল্‌স্ এই ঠিকানায় আবেদন করিলে সঠিক জবাব পাওয়া যায়।

জাপানের যন্ত্রনির্ম্মাণ-শিল্প

কত অল্প দিনের মধ্যে জাপান কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে তাহার যন্ত্রনির্ম্মাণশিল্পের ভিতর। আমাদের দেশে একটি তুলার কল কি একটি পাটের কল কিংবা একটি কাগজের কল স্থাপন করিতে গেলে তাহার প্রত্যেকটি কল-কব্জা বিলাত হইতে কিংবা অন্য যে কোন বিদেশ হইতে আমদানি না করিলে চলিবে না। সেই বিদেশী কলনির্ম্মাতারা তাহাদের কলকব্জার জন্য যে দাম চাহিবে তাহাই আমাদিগকে দিতে হইবে। তাহারা যে

যন্ত্র দিবে, তাহাই আমাদিগকে হাত পাতিয়া লইতে হইবে। জিনিষ বাছিয়া পছন্দ করিয়া, দর-দস্তুর করিয়া ক্রয় করিতে আমরা পারিব না। কিন্তু জাপান অতি অল্প সময়ের মধ্যে এদিকে এত অগ্রসর হইয়াছে যে, ঐটুকু দেশে (জাপানের আয়তন বাঙ্গালা দেশের অপেক্ষা বেশী বড় নহে) নিজেদের প্রয়োজনীয় সকল জিনিষ—মায় কল-কব্জা পর্য্যন্ত তৈয়ার করিয়া লইতেছে—কোন বিষয়েই তাহাকে পরমুখাপেক্ষী—পরপ্রত্যাশী হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। এখন জাপান কল-কব্জা নির্ম্মাণের কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে, তাহাই শুনুন।

জাপানে এখন বিদ্যুতের সমস্ত সরঞ্জাম, মোটর গাড়ী, জাহাজের এঞ্জিন, কাগজের কলের যন্ত্রপাতি বিমানের এঞ্জিন প্রভৃতি নানা-রকম কল-কব্জা প্রস্তুত হইতেছে। জাপানের এই অভূতপূর্ব্ব উন্নতি বেশী দিনের কথা নহে—যুদ্ধের সময় হইতে ইহার আরম্ভ। ইহারই মধ্যে কলনির্ম্মাণের সকল তত্ত্ব জাপান আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। আর ইহা নূতন অথচ ক্রমবর্দ্ধনশীল শিল্পরূপে অন্যান্য নূতন শিল্প প্রচেষ্টার মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এখন সাধারণভাবে ব্যবসাবাণিজ্যর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যন্ত্রনির্ম্মাণশিল্পও কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কারণ, অন্যান্য জিনিসের ন্যায় যন্ত্রপাতির বাজারেও চাহিদা কমিয়াছে। তথাপি কোন কোন স্থান হইতে এই সকল মালের প্রচুর অর্ডার পাইবার আশা যথেষ্টই রহিয়াছে।

কলকব্জা নির্ম্মাণের জন্য ১৯১২ খৃষ্টাব্দে জাপানে ৩৮টা কোম্পানী ছিল। উহাদের মূলধন তখন ছিল ৫ নিযুত ইয়েন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে উহাদের সংখ্যা ১ শত ২৬ ও মূলধনের পরিমাণ ১ শত ১ নিযুত ইয়েন। আর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা ১ শত ৯৮ এবং মূলধনের পরিমাণ ২ শত ৩৪ নিযুত ইয়েন।

কলকব্জা নির্ম্মাণ শিল্পের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর হইয়াছে বিদ্যুতের সাজসরঞ্জাম নির্ম্মাণের কারখানা। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এই সকল বস্তু খুব বেশী পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। ইদানীং জাপানী সকল শিল্পই প্রসার লাভ করিতেছে। এইসকল শিল্পকেই ক্রমেক্রমে কেন্দ্রীভূত করা হইতেছে। বিদ্যুতের সাজ-সরঞ্জাম নির্ম্মাণ-কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কেন্দ্রীকরণ ব্যাপারের মূলধন কতকটা আসিয়াছে বিদেশ হইতে।

রেলের গাড়ী তৈয়ার করিবার জন্য যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই জাপানে অনেক কোম্পানী আছে। বর্ত্তমানে এরূপ কোম্পানীর সংখ্যা পাঁচটি। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রেলওয়ে উপকরণ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী কয় বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়াছে। এই মালের প্রধান খরিদ্দার সরকারী রেলওয়ে বিভাগ। বাজার মন্দা থাকা সত্ত্বেও ইহাদের লাভের অঙ্ক দিন দিন ফুলিয়া উঠিতেছে।

ইতঃপূর্ব্বে জাপানে তিনটা কোম্পানী মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ করিত। এখন দুইটি বিদেশী কোম্পানী আসিয়া জাপানে মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা খুলিয়াছে। তাহার মধ্যে ফোর্ড একটা। ইহাদের প্রত্যেকের মূলধন ৮০ লক্ষ ইয়েন। ইহাদের তুলনায় জাপানী মোটর-কার কোম্পানীগুলি খুবই ছোট।

এতদ্ব্যতীত খনির কাজের কল-কব্জা, সূতা কাটা ও কাপড়-বোনা কল, কাগজের কলের যন্ত্র-পাতি, জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা, জাহাজের এঞ্জিন, ইলেক্‌ট্রিক মোটর পাম্প, বিমান, সেতুর ফ্রেম, কপিকল প্রভৃতি কত না জিনিষ জাপানে তৈয়ার হয়।

(দৈনিক বসুমতী)

বিলাতের শিল্প-ব্যবসা (১৯২৯)

বিলাতের শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে ১৯২৯ সনটা মোটের উপর খুব ভাল যায় নাই। ১৯২৮ সনের তুলনায় ১৯২৯ সনে রপ্তানি কিছু বেশী হইয়াছে। কয়লা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশী রপ্তানি হইয়াছে; কোন কোন শিল্পজাত দ্রব্যও একটু আধটু বেশী রপ্তানি হইয়াছে বটে, কিন্তু বিলাতের রপ্তানি বাণিজ্য মোটের উপর সন্তোষজনক হয় নাই। ১৯২৯ সনের প্রথমভাগে মনে হইয়াছিল যে,

এবার বিলাতের বহির্বাণিজ্য অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইবে। প্রথম কয় মাসে ১৯২৮ সনের কয়েক মাসের তুলনায় রপ্তানি অত্যন্ত বেশীই হইয়াছিল, কিন্তু শেষের দিকে বয়নজাত দ্রব্যের রপ্তানি হঠাৎ কমিয়া গিয়া সমস্তই ওলট-পালট হইয়া যায়। রপ্তানি হ্রাসের কারণ, ল্যাঙ্কাশিয়ারে শিল্পের অবনতি এবং কিছুকাল ধরিয়া কম মাল উৎপাদন। ১৯২৯ সনের পক্ষে আশার কথা এই যে, এই সনে দারুণ বেকার-সমস্যা সত্ত্বেও বিলাতের ব্যবসা বাণিজ্যের গতির তালভঙ্গ হয় নাই।

বেকার-সমস্যা যথা পূর্ব্বং তথা পরং

বিলাতের বেকার-সমস্যা মিটে নাই। ১৯২৮ সনে যে অবস্থা ১৯২৯ সনের শেষ পর্য্যন্তও অবস্থা প্রায় তাহাই। ১৯২৯ সনের প্রারম্ভে ১৯২৮ সনের তুলনায় বিলাতে বেকারের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়; কিন্তু জুন মাসে ১৯২৮ সনের চেয়ে উহা কম হইয়া দাঁড়ায়; নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট বেকার লোকের সংখ্যা কমই থাকে। ডিসেম্বর মাসে কিন্তু অবস্থা প্রায় সমান হইয়া দাঁড়ায়। ডিসেম্বর মাসের ৩০শে তারিখে মোট বেকার লোকের সংখ্যা ১,৫২০,৭৩০ জন অর্থাৎ ১৯২৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের সংখ্যার চেয়ে মাত্র ১০,০০০ কম। বড় দিনের ক্রয়বিক্রয় সারা হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোককে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু ডিসেম্বরের শেষের দিকে আবার অনেক লোককে ভর্ত্তি করা হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিলাতের বেকার জন-সংখ্যা সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ ১৫ লক্ষের উপর মানুষ বেকার হইয়া বসিয়া থাকা নিতান্ত সামান্য কথা নয়। এই সমস্ত বেকার লোকের মধ্যে অনেক বীমাকারী মানুষ আছে। এইরূপ লোকের সংখ্যা ১৯২৮ সনের তুলনায় কিছু কম অর্থাৎ ১০·৮%এর স্থলে ১০·৫%। "পুরামাত্রায় বেকার" লোকের সংখ্যা কিন্তু পূর্ব্ববৎ ৮·২%। কেবলমাত্র অস্থায়িভাবে কর্ম্মচ্যুত লোকের সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। ১৬—৬৪ বৎসর বয়স্ক বীমাকারী লোকের সংখ্যা ১৯২৯ সনে ১০,১৯১,০০০ জন। ১৯২৮ সনে এই সংখ্যা ১০,০০৭,০০০ এবং ১৯২৭ সনে ১০,০০৩,০০০ ছিল। কয়লার খনি জাহাজ নির্ম্মাণ এবং জাহাজ মেরামত করিবার কর্ম্মশালায় নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা বাড়িয়াছে। অন্তপক্ষে তুলা-শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে।

একমাত্র দাওয়াই ব্যবসাবাণিজ্য-বৃদ্ধি

বেকারসমস্যা দূর করিবার জন্য বিলাতের কর্ত্তারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এজন্য নানাপ্রকার সাহায্য করার ব্যবস্থা অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু এই কঠিন ব্যাধি কেবলমাত্র ঝাড়া জল পড়ায় বা হাতুড়ে ঔষধে আর সারিতেছে না। ইহাতে অবস্থা আরও কাহিল হইয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যাঁহারা নানাপ্রকার সরকারী সাহায্য করিয়া বেকারসমস্যা দূর করিবার পক্ষপাতী তাঁহারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আসল রোগ এই সমস্ত ব্যবস্থায় দূর হইতে পারে না। চাই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার।

আলোচ্য সনে মজুরির হারের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। তুলা-শিল্পেই প্রধানতঃ মজুরি হ্রাস দেখা যায়। ১৯১৪ সনের তুলনায় জীবনযাত্রার খরচ বাড়িয়াছে ৬৪% অর্থাৎ ১৯২৮ সনের চেয়ে কিছু কম।

দরিদ্রদিগকে সাহায্য

বেকারসমস্যার জন্য বিলাতের জাতীয় ধনভাণ্ডারের অতি গুরু অপচয় ঘটিতেছে। দরিদ্র আইনের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করা হইতেছে বটে কিন্তু কোনই ফল ফলিতেছে না। ১৯২৮-২৯ সনে এই জন্য সরকারী ব্যয় হইয়াছিল ৪০,২৫০,০০০ পাঃ। ১৯২৭-২৮ সনে এই জন্য ব্যয় হইয়াছে ৪০,৮৯০,০০০ পাউণ্ড। ১৯২৯ সনে ১,১১০,২০৫ জন মানুষকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ প্রতি দশ হাজারে ২৮১জন মানুষ সাহায্য পাইয়াছে। ১৯২৮ সনে সাহায্যপ্রাপ্ত দরিদ্রের সংখ্যা ১,১৮১,৭৬৯ জন অর্থাৎ প্রতি দশ হাজারে ৩০১ জন। ১৯২৮-২৯ সনে এই হ্রাসের কারণ এই সনে বাহির হইতে সাহায্য গ্রহণকারী লোকের সংখ্যা কমিয়াছে। আর একটী আশার লক্ষণ এই যে, এই সনে

অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষা সাহায্য লওয়া বেকার শ্রেণীর লোকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

ব্যাঙ্ক-হার হ্রাসের ফলে ব্যবসার সুবিধা

আলোচ্য সনে ব্যবসাবাণিজ্য ফেল মারার সংখ্যা কমিয়াছে। রেলমাশুল কমাইয়া দেওয়ার জন্য ব্যবসায় সুবিধা হওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। আলোচ্য সনের প্রারম্ভে ব্যাঙ্কের হার অত্যন্ত চড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু শেষ-ভাগে এই হার কমাইয়া দেওয়ায় সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। বর্ত্তমান সিক্কার মূল্য ক্রমশঃ কমিয়াই যাইবে এইরূপ বোধ হইতেছে। কিছুদিন হইতে বিলাতের কতকগুলি ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে ভীষণ দুর্য্যোগ দেখা দিয়াছিল তাহা এই সস্তা সিক্কার কল্যাণে আংশিকভাবে দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ লক্ষণ আপাততঃই প্রকাশ পাইয়াছে। আলোচ্য সনে ব্যাঙ্কার্স চেক শোধভবন হইতে ৪৪,৮৯৬,৬৭৭,০০০ পাউণ্ড পরিশোধ করা হইয়াছে। ১৯২৮ সন এই চেক পরিশোধ ব্যাপারে সর্ব্বোচ্চ বিবেচিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২৯ সন এই সম্পর্কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে, কারণ ১৯২৯ সনে ১৯২৮ সন অপেক্ষা চেক পরিশোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে ১·৫%। অল্প মিয়াদের কর্জ্জের বাজারে কারবার বাড়িয়া যাওয়ার জন্যই প্রধানতঃ এই চেক পরিশোধ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। প্রাদেশিক সহরগুলিতে কিন্তু পরিশোধ কমিয়াছে ৪·৪%। পক্ষান্তরে মফঃস্বলের পরিশোধভবনগুলিতে চেক পরিশোধ বাড়িয়াছে মাত্র ১·২%।

বেকারসমস্যা-সমাধানের নূতন উপায়

বর্ত্তমান দুনিয়ার বাজারে বিলাতী শিল্পের অনেক প্রতিযোগী জুটিয়াছে। এই বিষম প্রতিযোগিতার মুখে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে বিলাতকে কম বেগ পাইতে হইতেছে না। বিদেশের বাজারে বিলাতী মালের সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার ফলে বিলাতে দারুণ বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি বিলাতের সেরা কারখানার মালিকগণ এক ঢিলে দুই পাখী মারার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সমস্ত মালিকগণ একজোট হইয়া দেশ-বিদেশে ব্যবসা চালাইবার পক্ষপাতী হইয়াছেন। ইহার ফলে অন্ত-র্ব্বাণিজ্যের সুবিধা তো হইবেই, বিদেশের বাজারেও আবার বিলাতী মালের সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে। সম্প্রতি বিলাতে কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রপাতি-নির্ম্মাতাগণ একজোট হইয়া কারবার চালাইবে স্থির করিয়াছে। বিদেশের বাজার-গুলিতে এইজন্য যথেষ্ট অনুসন্ধান করা হইয়াছে এবং মাল বিক্রয়ের জন্য সুন্দর সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং আশা করা যায় এই ব্যবস্থার ফলে বিলাতের অনেক হাজার ফাজিল বেকার লোকের অন্নের সংস্থান হইবে। বিলাতে গাদায় গাদায় মাল উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ বিরাট আকারের বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করিয়া উপায় কি? সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে যুক্তিপ্রয়োগ নীতিও (র‍্যাশনালিজেশান) আরব্ধ হইয়াছে। ১৯২৮ সন হইতে বিলাতের শিল্প-ব্যবসাক্ষেত্রের এইগুলি বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই উপায়গুলি অবলম্বনের ফলে বিদেশে বিলাতী মালের প্রসার-বৃদ্ধি হইবে এবং বেকার সমস্যারও আংশিক সমাধান হইবে।

সরকার কর্ত্তৃক ১৮৯,০০০ লোক নিয়োগের ব্যবস্থা

বিলাতের বর্ত্তমান গবর্মেণ্টও বেকার-সমস্যা দূর করিবার জন্য কম চেষ্টা করিতেছেন না। গবর্মেণ্ট এইজন্য কতক-গুলি কাজের মোসাবিদা স্থির করিয়াছেন। ইহাতে ব্যয় পড়িবে আড়াই কোটি পাউণ্ড, এবং কমসেকম ১৮৯,০০০ লোকের ১ বৎসরের জন্য কর্ম্মের সংস্থান হইবে। ফলে বেকার-সমস্যার কিঞ্চিৎ উপশম হইবে বটে, কিন্তু আসল রোগের কিছুই হইবে না। বিলাতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে কয়েকটী বড় বড় শিল্পের উপর। এই শিল্পগুলি বহুকাল হইতে বিলাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই শিল্পগুলি যদি আবার সমৃদ্ধি লাভ করে, তবেই বিলাত বেকার-সমস্যারূপ দারুণ অমঙ্গলের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

বিলাতী-শিল্পের দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা

বিলাতের শিল্প-প্রচেষ্টা ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে বাড়িয়া

যাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই বিলাতী শিল্পের এই দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ আরব্ধ হইয়াছে। ১৯২৯ সনের ১লা জুলাই পর্য্যন্ত যে হিসাবপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এইরূপ দেখা যায়। পরের ছয় মাস ধরিয়াও যে শিল্পের গতি এই একই দিকে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ ধারণা করার কারণও আছে যথেষ্ট। উত্তরাঞ্চলের চেয়ে দক্ষিণ অঞ্চলে বীমাকারী লোকের সংখ্যা দ্রুতগতি বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৩ সনে বীমার সংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯২৯ সনের জুলাই মাসে লণ্ডন ডিভিশনে বীমার সূচী সংখ্যা ধরিতে হইবে ১১৩'৬। ১৯২৮ সনের জুলাই মাসে লণ্ডন ডিভিশনে বীমার সূচী সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১১০'২। সাউথ ইষ্টার্ণ ডিভিশনের পক্ষে এই সূচী সংখ্যা যথাক্রমে ১২২ ও ১১৮'৪, সাউথ ওয়েষ্টার্ণ ডিভিশনের পক্ষে ১১৩ ও ১০৯'৮ এবং মিড্‌ল্যাণ্ডস্‌ এর পক্ষে ১০৯'৭ ও ১০৭। নর্দার্ণ সেক্‌শানের ডিভিশানগুলিতে অতি অল্প বৃদ্ধিই পরিলক্ষিত হয়, যথা:—নর্থ ইষ্টার্ণ ডিভিশানের পক্ষে ১০৪'৪ ও ১০৩'৫; নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ডিভিশান ১০৫'২ ও ১০৩'৯; এবং স্কটল্যাণ্ড ১০১'৬ ও ১০১'১। ওয়েলসের পক্ষে আবার সূচী সংখ্যা হ্রাসই পাইয়াছে। কারণ এই ডিভিশনের সূচী সংখ্যা যথাক্রমে ৯৭'৬ ও ৯৯'১।

বিলাতকে সাদার্ণ এবং নর্দার্ণ সেকশানে ভাগ করা হইয়াছে ওয়াশ হইতে সোজা পশ্চিমমুখো একটা রেখা টানিয়া। এই সাদার্ণ সেকশানের মধ্যে কেম্‌ব্রিজ, নটিংহাম এবং ডার্ব্বি নামধেয় শায়ারগুলি পড়িয়াছে। বিলাতের সমগ্র বীমাকারী মানুষের ৪৮% এখন এই সাদার্ণ সেক্‌শানের অধিবাসী। ইহার মধ্যে লণ্ডন এবং সাউথইষ্টার্ণ সেক্‌শানেই রহিয়াছে কমসে কম ২৬%, এবং ১৯২৮ সনে এইখানেই ছিল ২৫'৭%। উত্তরাঞ্চলের অনুপাতে দক্ষিণ অঞ্চলে বেকার লোকের সংখ্যা অর্দ্ধেক। উপরের এই সমস্ত মাপ জোক দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দক্ষিণ অঞ্চলে কিভাবে শিল্প-প্রসার ঘটিয়াছে। লণ্ডনের আশপাশের জেলাগুলিতেই বেশী শিল্প-প্রসার ঘটিয়াছে।

বিমানপোতের রেওয়াজ বৃদ্ধি

আলোচ্য সনে বিলাতে সরকার-পরিচালিত বিমানপোতের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছে। প্রায় ৩০টী সহরে নূতন বিমানপোতের আড্ডা স্থাপিত হইয়াছে। তা ছাড়া ক্রয়ডনে যাত্রিবাহী উড়ো জাহাজের সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং সাম্রাজ্যিক বিমানপথ সমূহের বিস্তার সাধন করা হইয়াছে। ইউরোপের সহিত বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিমান পথের যোগাযোগ সাধনের চেষ্টা চলিতেছে, সাম্রাজ্য মধ্যেও এইরূপ যোগাযোগ বা যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা কায়েম হইলে বিলাতের ব্যবসা বাণিজ্য এক নূতন শ্রীবৃদ্ধির পথে ধাবিত হইবে। লণ্ডন চেম্বার অব্‌ কমার্স হইতে সিভিল এভিয়েশান সেক্‌শান নামে একটী নূতন বিমানপোত বিভাগ খোলা হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, বিমান পথের সহিত বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্যের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

দেশব্যাপী বিজলী সরবরাহের ব্যবস্থা

আলোচ্য সনের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, এই সনে দেশব্যাপী বিজলী সরবরাহের ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে। আলোচ্য সনে শ্রমিককুলও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ডিসেম্বরের শেষ ভাগে ট্রেড্‌ ইউনিয়নের কর্ত্তাদের সহিত কারখানার মালিকগণের রফা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর কারখানাওয়ালারা মজুর নেতাদের সহিত মিলিত হইয়া ভবিষ্যতের কর্ম্ম-পন্থা নির্দ্ধারণ করিবে।

বিলাতের কার্পাস-শিল্প

১৯২৯ সনে ল্যাঙ্কাশিয়ারের কার্পাস-শিল্পের অবনতি ঘটে। এই সনে বিলাত হইতে কার্পাসের সূতা এবং বস্ত্র ১৯২৮ সনের তুলনায় কম রপ্তানি হইয়াছে। তবে এই সনে তুলা-শিল্পে যুক্তিপ্রয়োগের দিকে যথেষ্ট ঝোঁক দেখা গিয়াছে। এতদর্থে ইষ্টার্ণ টেক্‌ষ্টাইল্‌ অ্যাসোসিয়েশান নামে একটী সঙ্ঘও স্থাপিত হইয়াছে। বিদেশের বাজারে

এই সঙ্ঘ বিলাতের ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রশিল্প-পতির সহিত সহযোগিতা করিয়া কাপড় বিক্রয় করিবে। এই অ্যাসোসিয়েশানে বয়নকারী, কারখানাওয়ালা, সওদাগর, ধোলাইকারী, রঞ্জনকারী, জাহাজওয়ালা প্রভৃতি সকলেই আছে। ইহার এখনও নিতান্ত শৈশবাবস্থা বটে, কিন্তু ইতি মধ্যেই ইহার কর্ম্মতৎপরতায় সুফল পাওয়া গিয়াছে। বিদেশের বাজারে এই সঙ্ঘ কিছু মালও বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছে। বস্ত্র-শিল্পের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবসার অবনতি ঘটিয়াছে সব চেয়ে বেশী। বিলাতের কাপড়ের কলের মজুরগণ ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়াছিল। পরে উহা মিটমাট হইয়া যায়। সালিশী ব্যবস্থা করিয়া মজুরের মজুরির হার কিছু কমাইয়া দেওয়া হয়। মজুরগণ কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই। সুতরাং যে কোন মুহূর্ত্তে আবার ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইতে পারে। বিলাতের বস্ত্র-শিল্প অবনত হইয়া পড়িয়াছে বটে; কিন্তু আলোচ্য সনে কারখানার মালিকগণ কতকগুলি সুব্যবস্থা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছে। সুতরাং আশা করা যায় বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিলাতের বস্ত্র-শিল্পে যে দুর্য্যোগ দেখা দিয়াছে, তাহা ক্রমে কাটিয়া যাইবে।

বিলাতের পশম-শিল্প

বিলাতের পশম শিল্পের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়িতেছে। এক বৎসর আগে এই শিল্পের যে আর্থিক অবস্থা ছিল আলোচ্য সনে তাহার চেয়েও খারাপ অবস্থা। অন্যান্য দেশে শুল্কের হার চড়াইয়া দেওয়ায় মাঝারি এবং কম শক্ত বিলাতী পশমী কাপড়ের বিক্রয় একরূপ বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। বিলাতী সেরা পশমী কাপড়ের টান কিন্তু সর্ব্বত্র সমান, এমন কি সর্ব্বোচ্চ শুল্ক-বিশিষ্ট দেশসমূহেও। উৎপাদনের খরচা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাওয়ায় কারখানাওয়ালারা অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছে এবং বাধ্য হইয়া মজুরির হার কমাইবার চেষ্টা করিতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহারা সাফল্যলাভও করিয়াছে। ব্যবসার অবস্থা মন্দা। মাল-উৎপাদনের খরচাও অনেক সময় পোষাইতেছে না। তাহার উপর আবার ক্রমশঃ দর নামিয়া যাইতে থাকায় অবস্থা আরও কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। তবে পশমের দর কমিয়া যাওয়ায় কিছু আশা হইতেছে বটে, কিন্তু সাগরপারের বাজারগুলিতে পশমী কাপড়ের টান বাড়িবার কোনই লক্ষণ বোঝা যাইতেছে না। পুঁজি এবং কারখানা পরিচালন সম্বন্ধে গোটা পশমশিল্প আবার ঢালিয়া সাজিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত এই শিল্প তাল সামলাইয়া লইবে মনে হয়।

বিলাতের নকল রেশম-শিল্প

নকল রেশমের কাজ দুই প্রকারের, প্রথমতঃ, কেবলমাত্র নকল রেশমের কাজ; দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য তন্তুর সহিত এই তন্তু মিশাইয়া বস্ত্র উৎপাদনের কাজ। আলোচ্য সনে বিলাতে এই দুই প্রকার শিল্পই জমকাইয়া উঠিয়াছে। নকল রেশমের তন্তু-উৎপাদনকারিগণ কিন্তু এই সনে বেশ অসুবিধায় পড়িয়াছে। কারণ বৎসরের প্রথমভাগে নকল রেশমের তন্তু খুব জমা হইয়া পড়িয়াছিল; ফলে ছোটখাটো কলসার্ণগুলি অত্যন্ত কম দরে মাল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। নকল রেশম বয়নকারিগণের কিন্তু বেশ সুবিধা হইয়াছে। কারণ কমা নকল রেশম সংযোগে যে সমস্ত বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে তাহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী। উচ্চাঙ্গের নকল রেশমের কাপড়ের চাহিদাও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। মুস্কিল হইয়াছে মাঝারি ধরণের নকল রেশমের চিজ্ লইয়া। কারণ এই বস্তুর উপর লোকের টান আর সেরূপ নাই। সুতরাং ব্যবসায়িগণকে গুদাম সাফ করিবার জন্য এই বস্তুকে কমা চিজের দরে বিক্রয় করিতে হইয়াছে। নকল রেশম মিশ্রিত কাপড়চোপড়ের চাহিদাও বেশ সুবিধাজনক। কিন্তু কার্পাস-মিশ্রিত বস্ত্রের রপ্তানি ১৯২৮ সনের তুলনায় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। জাপান এ বিষয়ে বিলাতের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। নকল রেশম শিল্পের আর একটী অন্তরায় এই যে, এই শিল্পের বিরুদ্ধে শুল্ক-ব্যবস্থা ক্রমেই কঠিন করা হইতেছে। বিলাতে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ কিন্তু আদৌ আশাপ্রদ মনে হয় না। রেশমী বস্ত্র আমদানি করার উপর বিলাতে এখন শুল্ক আদায় করা হয়। এই শুল্ক যদি বন্ধও না করা হয় তবু ভবিষ্যতে বিলাতকে

প্রবল প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। আবার এই শুল্ক যদি একেবারে রদ করা হয় তবে ইউরোপ হইতে গাদায় গাদায় নকল রেশমের বস্ত্র আমদানি হইয়া বিলাত ভরিয়া যাইবে। তখন বিলাতের কারখানা-ওয়ালাদের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা মুস্কিল হইয়া পড়িবে।

বিলাতের কয়লা-শিল্প

গত বৎসরে বিলাতের কয়লা-ব্যবসার অবস্থা আবার খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। তবে গোটা বৎসর ধরিয়া কয়লা রপ্তানি বাড়িতে থাকায় অবস্থার কিছু উপশম হয়। দামও কিছু কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু লাভের বেলায় প্রায় শূন্য। খাদ হইতে কয়লা উত্তোলন সমান তালে চলিয়াছে। আর একটী আশার কথা এই যে, বিদেশে কয়লার টান সমান এবং সাধারণভাবে বাড়িয়াছে, কোন দেশ-বিশেষ হঠাৎ বেশী কয়লা আমদানি করে নাই। এই বৎসরে ফ্রান্স দেশে আবার যথেষ্ট কয়লা রপ্তানি হইয়াছে। জার্ম্মাণ, বেলজিয়ান এবং ওলন্দাজ বাজারে কয়লা বিক্রয় করিয়াও বিলাতের লাভ হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার কয়লার খনিতে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় নর্দাম্বারল্যাণ্ড কলিয়ারিগুলি বেশ মোটা লাভ করিয়াছে। গবর্মেণ্টের প্রস্তাবিত আইন অনুসারেই কয়লার ব্যবসায় চলিতেছে। কুলিদের খাদে কাজ করিবার সময় কমাইয়া দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। ইহাতে উৎপাদনের খরচা বাড়িয়া যাইবে। এই অতিরিক্ত ব্যয় কয়লার গ্রাহকদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া কয়লার রপ্তানির খরচ কমাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে অসুবিধা দূর হইবে বলিয়া মনে হয় না। যদি কোনরূপ বাধা বিঘ্নের সৃজন না করিয়া কয়লার ব্যবসাকে স্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া যাইতে দেওয়া হইত তাহা হইলে ১৯৩০ সনে কয়লা-শিল্পের অবস্থা বেশ উন্নতই হইয়া যাইত। খনির মালিকদের বেশ লাভ হইত এবং মজুরদের মজুরির হারও বাড়িয়া যাইত। কিন্তু এই অবস্থা আসিবে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিলাতের লোহালক্কড়

আলোচ্য সনে বিলাতের লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক। পূর্ব্ববর্ত্তী আট বৎসরের তুলনায় আলোচ্য সনে লোহালক্কড় তৈরীও হইয়াছে বেশী, রপ্তানিও হইয়াছে বেশী। পক্ষান্তরে বিলাতে লোহালক্কড় আমদানি কমিয়া গিয়াছে। লৌহ-শিল্পের এইরূপ সন্তোষজনক অবস্থাসত্ত্বেও মোটের উপর এই শিল্পের সমৃদ্ধির অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই। বিদেশের বড় বড় বাজারগুলিতে ইউরোপীয় প্রতিযোগীদের বিষম প্রতিযোগিতার মুখে বিলাতী লোহালক্কড়ওয়ালারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছে না। ১৯২৯ সনে বিলাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোহালক্কড় উৎপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু দুনিয়ায় যে হারে লোহালক্কড়ের ব্যবহার বাড়িয়া চলিয়াছে, বিলাতী লৌহ-শিল্প ঠিক তাহার সহিত তাল রাখিয়া যাইতে পারিতেছে না। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম এই তিনটী দেশ অত্যন্ত বেশী লোহালক্কড় উৎপন্ন করিতেছে। বিলাত এই তিনটী দেশের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কারণ বিলাতে উৎপাদনের খরচা বেশী পড়ায় বিলাতী মালের দামও অত্যন্ত চড়া হইয়া পড়ে। বিলাতের লৌহশিল্প দুনিয়ার বাজারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিলাতী সরকার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন। আশা করা যায় সরকারী অনুসন্ধান কমিটি অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আবিষ্কার করিবেন। বিলাতের ইস্পাত ব্যবসা সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা চলিতেছে। মোট কথা যুক্তিপ্রয়োগ ছাড়া এই শিল্পের কোন উন্নতির আশা নাই।

বিলাতের জাহাজ-শিল্পের মন্দগতি

আলোচ্য সনে বিলাতে জাহাজ তৈরী সেরূপ বাড়ে নাই। বাড়তি টনেজের পরিমাণ মাত্র ৪২,১০৭, এবং মোট তৈরীর পরিমাণ ১,৬৫২,২২৪ টন। জাহাজ তৈরী হইয়াছে ১৬৫ খানি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ছোট জাহাজের চাহিদাই বাড়িয়াছে। ক্লাইড্ এখনও জাহাজ-তৈরী-শিল্পে সর্ব্বোচ্চ স্থান দখল করিয়া আছে। ক্লাইডের

পরে টাইন্ এবং উয়্যারের স্থান। দুনিয়ার অর্দ্ধেক জাহাজ বিলাতের কারখানাতেই তৈরী হইতেছে। বড় বড় অয়েল ট্যাঙ্কার তৈরীতেও বিলাত সকলের উপরে। মেরিণ এঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটে নাই। তবে গুঁড়া কয়লা এবং বিজলী দ্বারা জাহাজ চালাইবার রেওয়াজ বাড়িয়াছে। গুঁড়া কয়লা ব্যবহার করিলে কয়লাও অল্প পোড়ে এবং জাহাজের গতিবেগও বর্দ্ধিত হয়। ১৯২৯ সনের শেষে অনেক জাহাজ-নির্ম্মাণের অর্ডার আসিয়াছিল বটে, কিন্তু ১৯৩০ সনে তেমন অর্ডার আসে নাই। তবে অবস্থা যেমনই হউক, কয়েক বৎসর পূর্ব্বের মত জাহাজ-নির্ম্মাণে আর ভাঁটা পড়িতেছে না।

জাহাজী ব্যবসার সুবৎসর

লড়াইয়ের পর দুনিয়ার জাহাজী ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়িয়া যায়। ১৯২৯ সনে এই ভাঁটার অবসান হইয়াছে। আদতে বৃদ্ধি কম হইলেও জাহাজ কোম্পানিগুলির পক্ষে আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে। তবে হঠাৎ বিশেষ উন্নতির আশা নাই। ক্রমে ক্রমে জাহাজ পরিচালনের ব্যবসা উন্নত হইয়া উঠিবে এই মাত্র আশা করা যায়। বিলাতের বহির্ব্বাণিজ্য আশানুরূপ হারে বাড়িতেছে না। বিদেশী জাহাজ কোম্পানির বেশী সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিলাতের জাহাজ কোম্পানিগুলিকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। কতকগুলি নূতন জাতি আপন আপন সওদাগরী জাহাজ করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে জাতীয় আন্দোলনের জন্য বিলাতের জাহাজী ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অন্য পক্ষে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী কতকগুলি রুশিয়ান বন্দর হইতে ভূমধ্যসাগরে কয়লা চালান দেওয়া হইতেছে। বিলাতী জাহাজী শিল্পের ইহাও একটা আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিলাতে মোটর-শিল্পের অগ্রগতি

আলোচ্য সনে বিলাতে সবচেয়ে বেশী মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, মোটর গাড়ীর কারখানায় লোকও খাটিয়াছে সব চেয়ে বেশী এবং লাভও বেশী হইয়াছে। উৎপাদনের খরচা যথেষ্ট কমান হইয়াছে। বিলাতে এত মোটর গাড়ী আর কখনও তৈরী হয় নাই। ১৯৩০ সনও বিলাতের মোটর-শিল্পের পক্ষে সুবৎসর হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। বিদেশের বাজারে যাহাতে সস্তায় বিলাতী মোটরগাড়ী বিক্রয় করা যাইতে পারে সেজন্য রীতিমত চেষ্টা করা হইতেছে।

১৯২৯ সনে বিলাতের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯২৯ সনে বিলাতের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা মোটের উপর নৈরাশ্যব্যঞ্জক। ১৯২৮ সনের তুলনায় এই সনের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে বিলাতের গায়ে বেশী বাধিয়াছে ৪০,৫৫৮,২৫৬ পাউণ্ড। ব্যবসার বিপরীত অবস্থার কারণ, বিলাতে কারখানাজাত মালের আমদানি বাড়িয়াছে, এবং বিলাত হইতে অনেক জিনিষের, বিশেষতঃ রবারের পুনঃ রপ্তানি কমিয়াছে। বিলাতের ক্ষেত্রজাত এবং কারখানা-জাত দ্রব্য রপ্তানি বাড়িয়াছে ৫,৯৭৫,৮৭৮ পাঃ। কিন্তু কেবলমাত্র কারখানাজাত দ্রব্য রপ্তানি প্রকৃতপক্ষে কমিয়াছে ৫,০৩৫,৯৫৯ পাঃ। এই হ্রাসের কারণ, বয়নজাত দ্রব্য এবং চামড়ার চিজ রপ্তানি কমিয়াছে। এই দুই চিজ এত কম রপ্তানি হইয়াছে যে, অন্যান্য শিল্প দ্রব্য রপ্তানি করিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ হয় নাই। এই দুই বস্তু ছাড়া অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের বিদেশে কাটতি বাড়িয়াছে। লোহা-লক্কড়ই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। চারি প্রকার শিল্পদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার শিল্পদ্রব্যেরই আমদানি বাড়িয়াছে। আলোচ্য সনে বিলাতে কাঁচামাল আমদানি এবং শিল্পদ্রব্য আমদানি প্রায় সমান সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতের কলগুলিতে ব্যবহারোপযোগী কাঁচামালের আমদানির চেয়ে বিদেশজাত শিল্পদ্রব্য আমদানি মাত্র ৫,২৪০,০০০ পাউণ্ড কম।

বিলাতের বস্ত্র-শিল্পের দুরবস্থা

আলোচ্য সনে বিলাতের মোট রপ্তানির মূল্য ৭২৯,৫৫৪,৯৬৭ পাঃ। উল্লিখিত রপ্তানি-বৃদ্ধির কারণ কয়লা রপ্তানি বৃদ্ধি এক কোটি টন, মোট কয়লা রপ্তানি

৬০,২৬৬,৬১৮ টন ; মূল্যের দিক্ হইতে বৃদ্ধি ৯,৫৫৮,০৭৯ পাঃ, মোট মূল্য ৪৮,৬১৬,৮১৩ পাঃ। ১৯২৮ সনের তুলনায় আহার্য্য, পানীয় এবং তামাকজাত দ্রব্য রপ্তানি বৃদ্ধির মূল্য ১,৩৯৯,৬৭৫ পাঃ, মোট রপ্তানির মূল্য ৫৫,৬৫৭,২২০ পাঃ; কাঁচামাল রপ্তানি বাড়িয়াছে ৮,৯২৫,১৮১ পাঃ, এবং মোট রপ্তানি ৭৯,০৭১,১৮৯ পাউণ্ড। পক্ষান্তরে শিল্পদ্রব্য রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে ৫,০৩৫,৯৫৯ পাঃ, এবং মোট শিল্পদ্রব্য রপ্তানি ৫৭৩,৮৩৩,৩৬২ পাঃ। বিলাতের রপ্তানি বস্তুর মধ্যে কার্পাসজাত দ্রব্যই সর্ব্বপ্রধান। এই চিজের রপ্তানি কমিয়াছে ৯,৮৫৩,২০৭ পাঃ, এবং মোট রপ্তানি ১৩৫,৪৪৯,০০৮ পাঃ। পশমী কাপড় এবং পশমী সূতা রপ্তানি কমিয়াছে ৪,০১৩,৩৩৬ পাঃ, এবং মোট রপ্তানি ৫২,৮৮৩,৯৬৬ পাঃ। অন্যান্য বস্ত্রের রপ্তানিও কমিয়াছে। অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু বস্ত্র-শিল্পের ক্ষতি তদ্দ্বারা পূরণ হয় নাই। ইঞ্জিন, জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি নানাপ্রকার যানবাহন রপ্তানি বৃদ্ধি ২,৯৯১,১৪৩ পাঃ (মোট রপ্তানি ৫০,২৪৮,৫৩৮ পাঃ); লৌহ ব্যতীত অন্যান্য ধাতু এবং ধাতব পদার্থ রপ্তানি বৃদ্ধি ১,৯১২,৯৮২ পাঃ (মোট রপ্তানি ১৮,২৮১,০৬১ পাঃ); লোহালক্কড় রপ্তানি বৃদ্ধি ১,২৩০,৬২১ পাঃ (মোট রপ্তানি ৬৮,০১৯,৮০৫ পাঃ); ইলেক্‌ট্রিকের সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধি ১,৫৪৮,১৫৫ পাঃ (মোট ১৩,১৭৭,২৯০ পাঃ); নানাপ্রকার কেমিক্যাল দ্রব্য, ঔষধ, রং ইত্যাদি বৃদ্ধি ১,২১৫,৬৮১ পাঃ (মোট ২৬,৬২৫,৯২৪ পাঃ)। অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের মধ্যে চিনে-মাটির বাসন, কাচ ইত্যাদি (১৪,০০৪,৫৪৬ পাঃ), অস্ত্র, মাটির জিনিষ (৯,৩৩২,৭৪৪ পাঃ) কাগজ এবং কার্ড বোর্ড (৯,৮০৯,৩৭৩ পাঃ) ইত্যাদি সমধিক উল্লেখ-যোগ্য।

চর্ম্মশিল্পের অবস্থা

বিলাতে আরও কতকগুলি শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি কমিয়াছে। এই হিসাবে বস্ত্রশিল্পের নীচেই চর্ম্মশিল্পের স্থান। মোট চর্ম্মজাত দ্রব্য রপ্তানি ৭,৯০৬,৮০০ পাঃ, এবং রপ্তানি হ্রাস ১,৪৬৩,১৪৬ পাঃ। কারখানায় প্রস্তুত তেল, চর্ব্বি ও রঞ্জন রপ্তানি ৮,৮০৯,৩৭৩ পাঃ, রপ্তানি হ্রাস ৩৫৭,০৭৯ পাঃ। বিলাতী রবারের বস্তু রপ্তানি হইয়াছে মোটের উপর ৩,৪০৪,৫৩৪ পাঃ এবং এই খাতেও রপ্তানি কমিয়াছে ৪০,৪২৪ পাঃ। আলোচ্য সনে বিলাতের পুনঃ রপ্তানি ১০৯,৭৪১,৭৫৯ পাঃ এবং ১৯২৮ সনের তুলনায় কমতি ১০,৫৪১,৪৮৫ পাঃ। খাদ্য, পানীয় এবং তামাক এবং কাঁচামালেরও পুনঃ রপ্তানি কমিয়াছে (কাঁচামাল হিসাবে ১২,১২৯,৩১৬ পাঃ, ইহার মধ্যে রবারই ৭,২৮৫,৬৬৯ পাঃ)। অন্য পক্ষে বিদেশী শিল্প-দ্রব্য আমদানি বাড়িয়াছে কমসে কম ২,৮৮২,২৮০ পাঃ এবং মোট আমদানি ২৮,৯০১,৫০০ পাঃ। আমদানি এবং রপ্তানির অঙ্ক কাটাকাটি করায় দেখা যাইতেছে, আলোচ্য সনে বিলাতের গায়ে ৩৮২,২৯৪,৩৩৬ পাউণ্ড বাধিয়াছে। ১৯২৮ সনে বাধিয়াছিল ৩৪১,৭৩৬,০৮০ পাউণ্ড। উপরের এই সমস্ত অঙ্ক সম্বন্ধে আর একটী বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। ১৯২৯ সনে মোটের উপর অনেক বেশী চিজের ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। সুতরাং শুধু মূল্যের অঙ্কগুলি দেখিলে ব্যাপার পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। কারণ ১৯২৮ সনের চেয়ে ১৯২৯ সনে জিনিষপত্র সস্তা হইয়াছিল। বোর্ড অব্ ট্রেড প্রদত্ত সূচীসংখ্যা পাঠে জানা যায় যে, আলোচ্য সনে ১৯২৮ সনের তুলনায় জিনিষপত্রের পাইকারী দর গড়ে ২·৭% কমিয়াছে।

রেলওয়ে কোম্পানীগুলির সহিত গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান বন্দোবস্ত

(১) কোম্পানীকে নিজ নিজ লাইনগুলির মেরামতের দিকে সর্ব্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যথেষ্ট পরিমাণ ইঞ্জিন, গাড়ী, কলকব্জা রাখিতে হইবে; ইঞ্জিনগুলির সুমেরামতের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে সর্ব্বদা চাহিদা-অনুযায়ী লাইনে ইঞ্জিন সরবরাহে বেগ না পাইতে হয়। লাইনের সর্ব্বপ্রকার কাজ চালাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মজুর ও কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে। ভারত সচিবের সন্তোষ অনুযায়ী উপরোক্ত বিষয়গুলির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) সাধারণের মঙ্গলের জন্য, অথবা লাইনের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য, ভারত সচিব যদি কোন প্রকার পরিবর্ত্তন অথবা উন্নতি সাধন সমীচীন মনে করেন, রেলওয়ে কোম্পানীকে অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) প্রতিবেশী রেলওয়ে কোম্পানীর গমন শক্তি বৃদ্ধির জন্য, পরস্পরকে নিজ নিজ উদ্বৃত্ত ইঞ্জিন অথবা গাড়ীর দ্বারা সাহায্য করিতে, যাতায়াত ও ইঞ্জিন গাড়ীর বিনিময়ের জন্য থ্রু টিকেটের ভাড়া স্থির বিষয়ে, এবং নিজ নিজ জংসন ষ্টেশনে অপর কোম্পানীর গাড়ী রাখিবার জন্য লাইনের যদি কোন প্রকার পরিবর্ত্তন, যোগ অথবা নূতন কোন ব্যবস্থার দরকার হয়, ইহার জন্য ভারত সচিব যে ব্যবস্থা বাতলাইয়া দেন কোম্পানীকে তাহাই মানিয়া লইয়া সেই মত কাজ করিতে হইবে।

(৪) ট্রেণ সার্ভিসও ভারত সচিবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্থির করিতে হইবে। কোম্পানীগুলির ভাড়ার হারের উপর সাধারণ শাসন রাখিবার জন্য, বিভিন্ন মালের শ্রেণী বিভাগের ভার ভারত সচিবের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সেই অনুসারে তিনি মালের ভাড়ার হারের ঊর্দ্ধতম ও নিম্নতম সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সীমার মধ্যে প্রত্যেক কোম্পানীকে ভাড়ার হার স্থির করিতে হইবে।

(৫) ভারত সচিবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক কোম্পানীকে আপন আপন হিসাবপত্র রাখিতে হইবে।

(৬) লাইন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েও কোম্পানীকে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটসের শাসন ও নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে। লাইনের কাজ পরীক্ষার জন্য হিসাব অডিট করিবার জন্য অথবা তাহার ক্ষমতার ভিতরে সমস্ত কাজ সুচারুরূপে চালাইবার জন্য ভারত সচিব যাহাকে ইচ্ছা নিযুক্ত করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ কোম্পানীর বোর্ডের সমস্ত কার্য্যকলাপের জন্য ভোট দিবার শক্তি দিয়া ভারত সচিব বোর্ডের একজন সরকারী ডিরেক্টর নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ক্যাপিটাল কিংবা রেভিনিউ অ্যাকাউণ্টে কোম্পানী যত টাকা খরচ করিবার আদেশ পাইবেন তাহার উপযুক্তরূপে বিলি ব্যবস্থার জন্য কোম্পানীকে ভারত সচিবের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে।

(৬) কোম্পানীর সমস্ত খরচের হিসাব ভারত সচিবের নিকট দাখিল করিয়া তাহার অনুমোদন লইতে হইবে।

কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের বাজেট

১৯২৯-৩০ সনের প্রকৃত আয়

পোর্ট ট্রাষ্টের বাজেটে প্রথমে আয়ের অঙ্ক ধরা হইয়াছিল ৩৪৩·২০ লক্ষ টাকা; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আয় দাঁড়াইয়াছে ৩৪৯·৩২ লক্ষ টাকা। আয়-বৃদ্ধির কারণ, কিং জর্জ্জ ডকে অতিরিক্ত বার্থ এবং শেডের ব্যবস্থা এবং কয়লা

রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি। তবে বন্দরে আমদানি এবং রপ্তানি এতদুভয়ের মিলিত টনেজের পরিমাণ প্রায় প্রস্তাবিত বাজেটের অনুযায়ীই হইয়াছে। কলিকাতার জেটিগুলিতে দেড় লক্ষ টন আমদানি কমিয়াছে; পক্ষান্তরে ডকগুলিতে এবং গার্ডেন রীচের জেটিগুলিতে ২০০,০০০ টন আমদানি বাড়িয়াছে। ডকগুলি হইতে জাহাজে কয়লা চালান ২,৫৫০০,০০০ টন বাড়িয়াছে; অর্থাৎ মূল বাজেটে অনুমিত কয়লা চালানের পরিমাণ হইতে বাড়িয়াছে প্রায় ২৯০,০০০ টন। মূল বাজেটে অনুমিত হিসাব অপেক্ষা আরও কয়েকটী চিজের রপ্তানি বাড়িয়াছে; যথা—গম, নানাপ্রকার বীজ, চা এবং ম্যাঙ্গানিজ। ডকগুলিতে আমদানির পরিমাণও বাড়িয়াছে। কাঁটাপুকুর ডিপোতে দেড় লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে, এবং কয়লা চালান বৃদ্ধি হওয়ায় রেলপথ হইতেও একলাখ টাকা অতিরিক্ত আয় হইয়াছে।

১৯২৯-৩০ সনের প্রকৃত ব্যয়

মূল বাজেটে ১৯২৯-৩০ সনের জন্য ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৩৭১·১২ লক্ষ টাকা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১·৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িয়া মোট ব্যয় দাঁড়াইয়াছে ৩৭৩·০০ লক্ষ টাকা। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং সিঙ্কিং ফাণ্ডের খাটান টাকার বাজার-দর কমিয়া যাওয়ার জন্য ৬ লক্ষ টাকা হ্রাস দেখা গিয়াছে। ব্যয় বৃদ্ধির ইহাও একটী কারণ। তবে এই দুই খাতে হ্রাসের অঙ্ক মাত্র কাগজে কলমেই রহিয়া যাইবে; কারণ সময়ে এই দুই ফাণ্ডের বাজার দর আবার সমতাপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য দুই লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছে, এবং কিং জর্জ্জ ডকে কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়িবার জন্যও বেশী খরচ করিতে হইয়াছে, সুতরাং সরঞ্জামি খরচ বাড়িয়াছে মোটের উপর ০·৫২ লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া সংস্কার কার্য্যাদির জন্য ০·৯৭ লক্ষ টাকা ও মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স্ বাবদ ০·৯৬ লক্ষ টাকা খরচ বাড়িয়াছে। পক্ষান্তরে ড্রেজিং চার্জ্জ বাবদ খরচ কমিয়াছে। প্রথমে ৩,২৫,০০০ টাকা ঋণে ড্রেজার ভাড়া করিবার কথা ছিল; কিন্তু তাহা আদৌ করা হয় নাই। সুদ এবং সিঙ্কিং ফাণ্ডের খরচা বাবদ ব্যয় কমিয়াছে, কারণ, মূল বাজেটে ৯০ লক্ষ টাকার যে ডিবেঞ্চার ঋণ গ্রহণ করার কথা স্থির হইয়াছিল তাহাও কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কে খরচের পরিমাণ মূল বাজেট অনুযায়ী হইয়াছে; যথা:—গুদাম হেফাজত রাখার খরচ, কুলি-খরচ, কারখানা চালাইবার ব্যয়, ইলেক্ট্রিক আলো এবং শক্তি সরবরাহের খরচ, পুলিশের খরচ, ইত্যাদি।

আলোচ্য সনে দেখা যাইতেছে, মূল বাজেটে প্রস্তাবিত ২৭·৯২ লক্ষ টাকা ঘাটতির স্থানে প্রকৃত পক্ষে ঘাটতি পড়িয়াছে ২৩·৬৮ লক্ষ টাকা। কিং জর্জ্জ ডক তৈরীর জন্য যে টাকা ঋণ হইয়াছে তাহার সুদের সংস্থান করিবার জন্যই এইরূপ ঘাটতি পড়িয়াছে।

প্রস্তাবিত ২৭·৯২ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণের জন্য ১৯২৮-২৯ সনের উদ্বৃত্ত ১৩·২৪ লক্ষ টাকার সহিত রেভেনিউ রিজার্ভ ফাণ্ড হইতে ১৭ লক্ষ তুলিয়া লইয়া যোগ করার কথা ছিল। ব্যাপার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৯-৩০ সনের শেষে দেখা যায় উদ্বৃত্ত তহবিল দাঁড়াইয়াছে ২৪·৬৮ লাখ টাকা। সুতরাং এই অর্থ হইতে প্রকৃত ঘাটতি ২৩·৬৮ লক্ষ টাকা পূরণ করিয়াও পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়া গিয়াছে।

১৯৩০-৩১ সনের প্রস্তাবিত আয়

১৯৩০-৩১ সনের জন্য আয় ধরা হইয়াছে ৩৫৭·৮৭ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ ১৯২৯-৩০ সনের আয়ের চেয়ে ৮·৫৫ লক্ষ টাকা বেশী। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া অতিরিক্ত হারে মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা ফিরিয়া পাওয়ার কথা, এবং এই জন্যই আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

১৯৩০-৩১ সনের আয় নিরূপণের সময় ধরা হইয়াছে যে, কলিকাতা বন্দরে জাহাজ-ষ্টীমারের আসা যাওয়া যেমন চলিয়াছে ঠিক সেই পরিমাণেই চলিবে এবং কিং জর্জ্জ ডক খুলিবার জন্য আয়ও সামান্য বাড়িবে।

১৯৩০-৩১ সনের প্রস্তাবিত ব্যয়

১৯৩০-৩১ সনের জন্য ব্যয় ধরা হইয়াছে ৩৭৬·২০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১৯২৯-৩০ সনের চেয়ে ৯·১৪ লক্ষ টাকা বেশী। এই প্রস্তাবিত ব্যয়ের তালিকা সিঙ্কিং ফাণ্ডের এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের খাটানো অর্থের বাজারদর কমিবার জন্য যথাক্রমে যে ৩·৮৪ লক্ষ টাকা এবং ২·১০ লক্ষ টাকা কম পড়িবে তাহা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যয় বৃদ্ধির কারণ, কিং জর্জ্জ ডকের জন্য ৬·৯১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে এবং ১৩০ লক্ষ টাকার নূতন ডিবেঞ্চার ঋণ গ্রহণের জন্য অর্দ্ধ বাৎসরিক সুদ এবং সিঙ্কিং ফাণ্ডের চার্জ্জ বাবদ সংস্থান করিতে হইবে ৩·৮৪ লক্ষ টাকার। ব্যয়ের তালিকার মধ্যে কিং জর্জ্জ ডকের কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ার জন্য ১·৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। গুদাম রক্ষার জন্য ব্যয়ের মধ্যে কয়লার মূল্য বৃদ্ধিও ধরা হইয়াছে। সংস্কারকার্য্যে ২·৭২ লক্ষ ব্যয় হ্রাস করা হইবে। কিং জর্জ্জ ডকের জন্য মজুরদের মজুরিবাবদ ১·৩৫ লক্ষ টাকা খরচ বাড়িবে। বিবিধ ব্যাপারে বিগত বর্ষেরই মত খরচ ধরা হইয়াছে। ড্রেজিং চার্জ্জের জন্য ১·৮৭ লক্ষ বেশী ব্যয় ধরা হইয়াছে; কারণ, "ক্রুইজার" ও "বুলি" নামক দুইখানি ড্রেজার, দুইখানি হপার বার্জ্জ এবং ক্রেন্ ড্রেজারগুলি মেরামত করিতে হইবে। ড্রেজার ভাড়া করা সম্বন্ধে ১·৭৫ লক্ষ টাকা খরচ কম হইবে। কারণ, গোটা ১৯৩০-৩১ সন ধরিয়া কিং জর্জ্জ ডকে ড্রেজিং কার্য্য কম হইবে।

কারখানা পরিচালনে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। কিং জর্জ্জ ডকের জন্য পুলিস, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স্, ইলেক্‌ট্রিক আলো এবং শক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধেও অতিরিক্ত খরচ পড়িবে। এই সনে মোটের উপর ১৮·৩৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে এই ঘাটতি পূরণের জন্য রেভিনিউ রিজার্ভ ফাণ্ড হইতে ১৯·০০ লক্ষ টাকা তুলিয়া লইতে হইবে।

নিম্নে আয়ব্যয়ের তালিকা দেওয়া হইল :—

	১৯২৯-৩০ সনের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট (লক্ষ টাকা)	১৯২৯-৩০ সনের প্রকৃত বাজেট (লক্ষ টাকা)	১৯৩০-৩১ সনের প্রস্তাবিত বাজেট (লক্ষ টাকা)
উদ্বৃত্ত তহবিল	১৩·২৪	২৪·২৮	১·০০
আয়	৩৪৩·২০	৩৪৯·৩২	৩৫৭·৮৭
	৩৫৬·৪৪	৩৭৪·০০	৩৫৮·৮৭
ব্যয়	৩৭১·১২	৩৭৩·০০	৩৭৬·২০
ঘাটতি	১৪·৬৮	উঃ ১·০০	ঘাঃ ১৭·৩৩
মজুত রাজস্ব তহবিল হইতে দেয়	১৭·০০	...	১৯·০০
জের	২·৩২	১·০০	১·৬৭

মজুত রাজস্ব তহবিল

১৯২৯-৩০ সনের প্রারম্ভে এই তহবিলে মোট জমার পরিমাণ ছিল ১৩১·১৩ লক্ষ টাকা। সিকিউরিটি বিক্রয়ে এবং সিকিউরিটির বাজার দর কমিয়া যাওয়ায় লোকসান দাঁড়ায় ৬·৩৫ লক্ষ টাকা। এই লোকসান বাদ দিলে দেখা যায় ১৯২৯-৩০ সনের শেষে মজুত রাজস্ব তহবিলে জমা ছিল ১২৪·৬২ লক্ষ টাকা। ১৯৩০-৩১ সনে সিকিউরিটি-গুলির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না বলিয়া ধরা হইয়াছে। সুতরাং বাজেটের ঘাটতি ১৯·০০ লক্ষ টাকা পূরণ করা হইলে ১৯৩০-৩১ সনের শেষে মজুত রাজস্ব তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১০৫·৬২ লক্ষ টাকা।

নয়া পুঁজির সংস্থান

১৯২৯-৩০ সনে কলিকাতা বন্দরে মোট ৮৫·০৯ লাখ টাকার স্থানে ৮১·৭৯ লাখ টাকার নূতন পুঁজি খাটিয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ৬০ লাখ টাকা ঋণের সংস্থান

করিয়াও আলোচ্য সনের বর্ষ-শেষে ১'৭৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া মনে হয়।

১৯৩০-৩১ সনে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ৬০ লাখ টাকা ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। এর পর আরও অন্যান্য খরচ আছে। শেষ পর্য্যন্ত এই সনে মোট ১৩৪'৬০ লাখ টাকার সংস্থান করিতে হইবে। এই জন্য ১৩০ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার ঋণ গ্রহণের দরকার। এবং ইহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এই সনে জমি বিক্রয় করিয়াও ৩ লাখ টাকার সংস্থান হইবে।

মোটামুটি যে যে বিষয়ে খরচ করা হইবে তাহার পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ছয় চাকাবিশিষ্ট আটখানি লোকোমোটিভ কিনিবার জন্য ৩'৭০ লাখ টাকা; কিং জর্জ্জ ডকের জন্য ১৭'৭৭ লাখ টাকা; কিং জর্জ্জ ডক সম্বন্ধে অন্যান্য কাজের জন্য ১৩'০৩ লাখ টাকা; খিদিরপুর ডকে নূতন ৮০ ফিট লক্-এণ্ট্রান্স নির্ম্মাণের জন্য ১০'১১ লাখ টাকা; একটা নূতন সাকসন ড্রেজারের উপর প্রথম কিস্তি শোধের জন্য ১০ লাখ টাকা; গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গৃহীত রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরিণ ডক্ ইয়ার্ডের জন্য ৯ম কিস্তি শোধ বাবদ ৪'৮০ লাখ টাকা।

ইণ্টার্‌কলেজিয়েট বোর্ড অব্ ইকনমিক্ এনকোয়ারি

কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ধনবিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষকগণ মিলিয়া এই বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাংলা দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা ও উহার ফলাফল প্রকাশ করা এবং ধনবিজ্ঞানের ছাত্রদিগের আলোচনার সুবিধা সৃষ্টি করিয়া দেওয়াই এই বোর্ডের উদ্দেশ্য। এই বোর্ডের মেম্বরগণ আপাততঃ বাংলাদেশের কারখানার নিকটস্থ মজুরদিগের গৃহসমস্যা ও গরু মহিষাদি সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্য-সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন। স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানের লেকচারার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই বোর্ডের বর্ত্তমান সম্পাদক। বোর্ডের ঠিকানা ৮এ কালুঘোষের লেন, কলিকাতা।

শান্তিনিকেতন কারুসঙ্ঘ

শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যে সকল ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করেন তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য তথাকার শিল্পিগণ এই সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন। এখানে সংবাদ দিয়া সকলেই অল্প আয়াসে নিজ নিজ প্রয়োজনমত শিল্পদ্রব্য বা তাহার নূতন ডিজাইন করাইয়া লইতে পারিবেন। বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত কারু-শিল্পসমূহের আয়োজন আছে :—

(১) ছবি :—জলবর্ণ, তৈলবর্ণ, বইয়ের ছবি ও বিজ্ঞাপন।

(২) মূর্ত্তি—মাটি এবং প্লাষ্টার অব্ প্যারিসের মূর্ত্তি বা ডিজাইন।

(৩) সূচীশিল্প।

(৪) বাটিসের কাজ—রুমাল, টেবিল ক্লথ, পরদা, হাতব্যাগের উপর বাটিসের কাজ।

(৫) প্রাচীর চিত্র—ফ্রেস্কো।

(৬) বাসন এবং গহনার নূতন ডিজাইন।

(৭) দারুশিল্পের নূতন ডিজাইন।

এতদ্ভিন্ন গৃহসজ্জার জন্য সকল রকম শিল্পদ্রব্যের ডিজাইন উপযুক্ত মূল্যে উপযুক্ত সময়ে করিয়া দেওয়া হয়।

কারুসঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত পুস্তক—সীবনী (সূচী-শিল্পের নানারূপ নূতন ডিজাইন)।

শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষ

ঐ সঙ্ঘের বিষয় বিস্তারিত জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখিতে হইবে—

সম্পাদক—কারুসঙ্ঘ কলাভবন,
পোঃ শান্তিনিকেতন
জিঃ বীরভুম।

জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক মজুর সম্মেলন

ভারসেলিসের সন্ধিপত্রের ৩৮৯ ধারা অনুসারে আগামী ১০ই জুন জেনেভাতে যে মজুর সম্মেলন বসিবে ভারত গবর্ণমেণ্টের এম্‌প্লয়ার এবং মজুর-সঙ্ঘের তরফ হইতে সেখানে হাজির থাকিবার জন্ত নিম্নলিখিত প্রতিনিধি কর্ম্মচারী প্রভৃতি মনোনীত হইয়াছেন :—

ভারত গবর্ণমেণ্ট তরফ হইতে মনোনীত—

ডেলিগেট্

(১) স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জি, কে, সি, আই, ই, ভারতের হাই কমিশনার

(২) ডাঃ আর পি, পারাঞ্জপে, ভারত কাউন্সিলের সভ্য।

বদলি ডেলিগেট্ ও পরামর্শদাতা

মিষ্টার এ লতিফ্, ও, বি, ই, এল্ এল্ ডি, বার-এট্-ল, আই, সি এস্

অ্যাড্‌ভাইসার (পরামর্শদাতাগণ)

(১) মিঃ জি, জি, ডিক্সন, ভারত আফিস্, লণ্ডন,

(২) মিঃ জে, এইচ্ ল্যাণ্ড্, ইন্‌স্পেক্টর অব্ মাইন্‌স্, ইণ্ডিয়া।

এম্‌প্লয়ারদের প্রতিনিধি স্বরূপ—

ডেলিগেট

মিঃ অমৃতলাল ওজা, এম্, এল, সি, চেয়ারম্যান, ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশান, কলিকাতা।

পরামর্শদাতাগণ

(১) মিঃ পি মুখার্জ্জি, প্রেসিডেণ্ট, পাঞ্জাব চেম্বার অব্ কমার্স, দিল্লী।

(২) মিঃ রামজিদাস ভাইসায়া, গোয়ালিয়ার চেম্বার অব্ কমার্স, লাস্কার, গোয়ালিয়ার।

(৩) মিঃ জে, কে, মেতা, ভারতীয় বণিক ভবন, বোম্বাই।

মজুরদের প্রতিনিধিস্বরূপ—

ডেলিগেট

(১) মিঃ এস্ সি জোসি, প্রেসিডেণ্ট গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলওয়ে কর্ম্মচারী সমিতি, বোম্বাই।

পরামর্শদাতাগণ

(১) মিঃ বি, শিব রাও, প্রেসিডেণ্ট মাদ্রাজ মজুর সমিতি, মাদ্রাজ।

(২) মিঃ কে সি রায়চৌধুরী এম্, এল, সি, প্রেসিডেণ্ট কাঁকিনাড়া মজুর সমিতি, কাঁকিনাড়া (বাংলা)।

(৩) মিঃ মহম্মদ উমার রাজার, সহকারী প্রেসিডেণ্ট, বোম্বাই তন্তু-মজুর সমিতি, বোম্বাই।

জীবনবীমা আন্দোলনের একাল ও সেকাল

বোম্বাই রোটারি ক্লাবে অনারেব্‌ল্ সার ফিরোজ সেথ্‌না জীবনবীমা সম্বন্ধে একটা অতি প্রয়োজনীয় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি বিলাত এবং মার্কিণ দেশে জনপ্রতি বীমার হার এবং জীবনবামা আন্দোলনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

এমন একদিন ছিল যখন মানুষ জীবনবীমা সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ ছিল। লোককে জীবনবীমার সুবিধা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিবার জন্ত রীতিমত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এখন আর সেদিন নাই। এখন ঘর-সংসারের মালিক প্রত্যেক লেখাপড়া জানা মানুষই বোঝে যে, তাহার পক্ষে জীবনবীমা করা নিতান্ত আবশ্যক ; তবে প্রকৃতপক্ষে সে জীবনবীমা করে কি না করে সে পৃথক কথা।

জীবনবীমার জন্মভূমি বিলাত

জীবনবীমা মাত্র সেদিনের ব্যাপার নয়। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ইহা জগতে বিরাজমান রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিলাতই জীবনবীমার আদি জন্মভূমি। ১৭০৫ সনে বিলাতে "দি অ্যামিকেব্‌ল্ সোসাইটি ফর এ পার্পিচুয়াল্ অ্যাসিওরেন্স অফিস" নামক একটা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই দুনিয়ার প্রথম জীবনবীমা কোম্পানী। ১৮৬৫ সন পর্য্যন্ত কোম্পানীটী চলে ; তাহার পর ইহা "নরউইচ ইউনিয়ন লাইফ্ অ্যাসিওর্যান্স সোসাইটী"র সহিত মিশিয়া যায়। "দি অ্যামিকেব্‌ল" যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আবেদনকারীর

পক্ষে বয়সের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল ১২ হইতে ৪৫ ; প্রিমিয়ামের হারও নির্দ্দিষ্ট ছিল। যে পরিমাণ অর্থ জমা থাকিত তাহার উপর ৫% প্রিমিয়াম দেওয়া হইত। ৪৫ বৎসর বয়স্ক জেমস্ ডডসন নামক একব্যক্তি জীবনবীমা করিবার আবেদন করে, কিন্তু তাহার আবেদন নামঞ্জুর হয়। তখন এই ব্যক্তি টমাস সিমসন নামক আর এক ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বয়স হিসাবে প্রিমিয়ামের হারের একটী তালিকা স্থির করে। তাহাদের এই চেষ্টার ফলে ১৭৬২ সনে লণ্ডনে "দি সোসাইটি ফর ইকুইটেবল অ্যাসিওরেন্স ফর লাইভ্স্ অ্যাণ্ড সারভাইভারশিপ" নামে একটী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত প্রথম বীমা কোম্পানী। কোম্পানীটী এখনও বর্ত্তমান আছে। এখন ইহা সাধারণ্যে "দি ওল্ড ইকুইটেবল্" নামে পরিচিত।

প্রধান প্রধান বীমা-কোম্পানী

প্রথম ডাচ কোম্পানী ১৮০৭ সনে, প্রথম ফ্রেঞ্চ কোম্পানী ১৮১৯ সনে, প্রথম জার্ম্মাণ কোম্পানী ১৮২৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকার প্রথম বড় ধরণের জীবনবীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪২ সনে। কোম্পানীর নাম "দি মিউচুয়াল লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী অব্ নিউইয়র্ক"। "ক্যানাডা লাইফ" ক্যানাডার প্রথম জীবনবীমা কোম্পানী; ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৭ সনে। বয়স হিসাবে "সান লাইফ অব্ ক্যানাডা" ক্যানাডার দ্বিতীয় জীবনবীমা কোম্পানী। কোম্পানীটী কেবল মাত্র ক্যানাডার সর্ব্ববৃহৎ কোম্পানী নয়, গোটা বিলাত এবং বিলাতের উপনিবেশসমূহের মধ্যে এতবড় জীবনবীমা কোম্পানী আর নাই। ১৯২০ সনে এই কোম্পানীটী মোট ১৩ কোটী ৪০ লক্ষ ডলারের উপর কারবার করিয়াছে। পক্ষান্তরে খাস বিলাতের বাঘা বাঘা বীমা কোম্পানীর কারবারের পরিমাণ ১ কোটী ৭৫ লক্ষ, দেড় কোটী এবং ১ কোটী ২০ লক্ষ ডলারের মত। (ভারতের প্রাচীনতম জীবনবীমা কোম্পানীটীর নাম "দি ওরিয়েন্টাল"। ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ৬০ বৎসর আগে। দ্বিতীয় কোম্পানীটীর নাম "দি এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া"। আমাদের পক্ষে রীতিমত গর্ব্ব করিবার বিষয় এই যে, এই দুইটী বীমা কোম্পানীই বোম্বাই সহরে অবস্থিত।)

অগ্রগামী উত্তর আমেরিকা

বিলাত জীবনবীমা কোম্পানীর জন্মভূমি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে; কিন্তু এই ব্যবসায় সেরা দেশ হিসাবে সম্মান পাইবার অধিকারী উত্তর আমেরিকা। অগ্নি, জাহাজ এবং দৈবদুর্ঘটনা-ঘটিত বীমা সম্বন্ধে না হইলেও জীবনবীমা সম্বন্ধে বিলাত এবং অন্যান্য দেশ মার্কিণ এবং ক্যানাডার নিকট অনেক বিষয় শিখিয়া লইতে পারে। দুনিয়ার সেরা জীবনবীমা অফিসগুলি উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত। এই সমস্ত বাঘা বাঘা জীবন বীমা কোম্পানীর মধ্যে আবার "দি মেট্রোপলিটান" শ্রেষ্ঠতম। এই জীবনবীমা কোম্পানীটীর মোট সম্পত্তির মূল্য বিলাতের পাঁচটী সেরা জীবনবীমা কোম্পানীর মিলিত সম্পত্তির চেয়েও বেশী। ১৯২৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই বীমা কোম্পানীটীর মোট সম্পত্তির মূল্য ছিল ৩,০১০,৫৬০,০৫১ ডলার অর্থাৎ ৬০ কোটী পাউণ্ড।

আমেরিকার এই শ্রেষ্ঠ জীবন বীমা কোম্পানীটীর কারবার যে কত বড় তাহা ১৯২৯ সনের হিসাব দেখিলে আরও পরিষ্কাররূপে বোঝা যাইবে। কোম্পানীটী প্রতিদিন ২,২৩৩টী দাবী পূরণ করিয়াছে। এই কোম্পানী প্রতিদিন ২০,৬৭৪টী হিসাবে নূতন পলিসি বাহির করিয়াছে বা পুরাতন পলিসি ঝালাইয়া নূতন করিয়াছে। টাকায় হিসাব দিলে ভারতবাসীর পক্ষে বোঝা আরও সহজ হইবে। নূতন পলিসি বাহির করা বা পুরাতন পলিসি নূতন করা ব্যাপারে দেখা যায় কোম্পানীর কারবারের বহর প্রত্যহ সওয়া তিন কোটী টাকা। ১৯২৯ সনে প্রতিদিন কোম্পানী পলিসিহোল্ডার-দিগকে ৬১ লক্ষ টাকা হিসাবে প্রদান করিয়াছে, এবং প্রতিদিন কোম্পানীটীর অ্যাসেট্স বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩১ লক্ষ টাকা। প্রতিষ্ঠানটী আর্থিক জগতের একটী আশ্চর্য্য বস্তু দেখা যাইতেছে। ১৯২৬ সনে নিউ ইয়র্কের মাডিসন স্কোয়ারে ইহার হেড্ কোয়ার্টারে আমি উপস্থিত ছিলাম। দেখিয়াছি কোম্পানীটীর হেড অফিসে ১২০০০ নরনারী খাটিতেছে

বর্ত্তমানে নিশ্চয়ই ইহার কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১৫,০০০ এর উপর দাঁড়াইয়াছে।

বিভিন্ন দেশে মাথা পিছু জীবন-বীমার হার

বিলাতে জনপ্রতি জীবন-বীমার হার প্রায় ৪০ পাঃ, ক্যানাডায় ১০০ পাঃ, কিন্তু মার্কিণ মুল্লুকে ১০০ পাউণ্ডেরও উপর। এই হিসাব ধরা হইয়াছে দুই বৎসর পূর্ব্বের। বর্ত্তমানে এই হার আরও বাড়িয়াছে নিশ্চয়ই। আমেরিকার এই অবস্থা কিসে হইল? মহাযুদ্ধের অবসরেই আমেরিকার এতদূর সম্পদ-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে মার্কিণের এক বৎসরের আয় বিলাত অথবা ফ্রান্সের সমগ্র জাতীয় সম্পদের সমান। দুনিয়ায় টেলিফোনের দুই-তৃতীয়াংশ, মোটর গাড়ীর চার-পঞ্চমাংশ, অধিকাংশ সোণা, বহুমূল্য প্রস্তর এবং জহরৎ মার্কিণে বিরাজমান। দুনিয়ার অর্দ্ধেকেরও বেশী সম্পদ মার্কিণমুল্লুকে জড় হইয়াছে। সুতরাং মার্কিণ ইচ্ছা করিলে অক্লেশে অধমর্ণ জাতিনিচয়ের নিকট উদারতা প্রকাশ করিতে পারে।

মার্কিণ মুল্লুকে জীবন-বীমার বহর

গোটা দুনিয়ায় যত জীবনবীমা করা হইয়াছে তাহার ৭০% এর অংশীদার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। ক্যানাডা এবং মার্কিণ এই দুই দেশ একত্র ধরিলে দেখা যায় এই দুই দেশের মোট জীবন বীমার বহর দুনিয়ার অবশিষ্ট অংশের মোট জীবন বীমার প্রায় দ্বিগুণ। দুনিয়ার যত কোটিপতি এবং বহুকোটিপতি জমা হইয়াছে মার্কিণ দেশে। পক্ষান্তরে বিলাতে এইরূপ কোটিপতি এবং বহুকোটিপতি না থাকিলেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রবল। দুনিয়ায় এক ফ্রান্স ছাড়া আর কোথাও এমন প্রভাব-প্রতি-পত্তিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নাই। কিন্তু তবুও কেন জীবন বীমা ব্যাপারে ফরাসী এবং ইংরেজ পেছনে পড়িয়া রহিয়াছে তাহা চিন্তার বিষয়।

আন্তর্জ্জাতিক রাজস্ব কমিশনারের প্রকাশিত বিলাতের ব্যক্তিগত বার্ষিক আয়ের ফিরিস্তিতে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে ১৯২৭ সনের ফিরিস্তি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বিলাতে যাহাদের সম্পত্তির আয় বার্ষিক ২০০০ পাউণ্ডের উপর তাহাদিগকে সোসিয়া-লিষ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুসারে সাধারণ ধনী শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। বিলাতে ১৯২৭ সনে এইরূপ ধনীর সংখ্যা ৯৪,৬৭৬ জন। "অসাধারণ ধনী"র বার্ষিক আয় ধরা হইয়াছে ১০০,০০০ পাউণ্ডের উপর। এইরূপ ধনীর সংখ্যা বিলাতে মাত্র ১৪৭ জন। আমেরিকার তুলনায় এই শেষোক্ত সংখ্যা নগণ্য মাত্র। কিন্তু সাধারণ ধনীর সংখ্যা হিসাবে বিলাত বিশেষ সৌভাগ্যবান। বাৎসরিক ২০০০ হইতে ৭২,০০০ পাউণ্ড আয়ের মানুষ বিলাতে আমেরিকার অনুপাতে অনেক বেশী।

বিলাতে জীবন-বীমার সুবিধা-অসুবিধা

উপরের এই সমস্ত মাপজোক দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে বিলাত যদি মার্কিণ এবং ক্যানাডার অনুকরণ করিয়া চলিত তাহা হইলে বিলাতবাসীর জনপ্রতি জীবনবীমার পরিমাণ ৪০ পাঃ হইতে নিশ্চয়ই বেশী হইত। বিলাতে লাইফ অফিসগুলির কাজকর্ম্ম নির্ভর করে সলিসিটার এবং ব্যাঙ্কারগণের উপরে। যে সমস্ত এজেণ্ট আছে তাহারা সব সময়েই বীমা কোম্পানীর পেছনে লাগিয়া থাকে না, অন্যান্য কাজ সমাধা করিয়া অবসরমত বীমা কোম্পানীর দালালী করিয়া দু'পয়সার সংস্থান করিয়া লয় মাত্র। আমেরিকান কোম্পানীগুলিতে এইরূপ এজেণ্ট একদম নাই। রক্ষণশীল বিলাতেও অবশ্য অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, তবে আবশ্যকমত তাড়াতাড়ি নয়। বিলাতের এজেন্সি কোম্পানীগুলির প্রধান গলদ এই যে, উহাদের তাঁবে জীবনবীমা সম্বন্ধে জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য সকল সময় খাটে এরূপ উপযুক্তসংখ্যক এজেণ্ট নাই।

বিলাতের জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে আমেরিকার মত দলে দলে বিশেষজ্ঞ দেখা যায় না। বিলাতী কোম্পানী-গুলি মনে করে আপসে আপ তাহাদের নিকট বীমাকারী আসিয়া হাজির হইবে। জীবন বীমার কি কি সুবিধা তাহা এজেণ্টের মারফতে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে এইসকল কোম্পানী প্রয়োজন বোধ করে না। সাধারণ

লোকে যদি এই সমস্ত মর্ম্ম বুঝিবার অবসর পায়, তাহা হইলে তাহাদের যে তাক লাগিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বীমা ব্যবসায় রীতিমত টেক্‌নিক্যাল্ বিদ্যা। ইহা ভালরূপে সমঝিবার জন্য রীতিমত বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। আমেরিকার বড় বড় বীমা অফিসগুলির আপন আপন ট্রেনিং বিদ্যালয় আছে। এমন কি সম্প্রতি জীবন বীমা শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটী কলেজ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় দুই বৎসর হইল কলেজটী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু গোড়াতেই যথেষ্ট ফলও পাওয়া গিয়াছে। এই কলেজে যে পাঠ্যনীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা জনসাধারণ এবং কলেজ মহল উভয়েরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। নয়া দুনিয়া আমেরিকায় জীবন বীমার এতদূর প্রসার বিশেষজ্ঞদিগের জন্যই হইতে পারিয়াছে।

ভারতে জীবনবীমা

ভারতে জীবন বীমার পরিমাণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। বিলাতে যেখানে মাথাপিছু জীবন বীমার হার ৪০ পাঃ, যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডায় যেখানে বিলাতের হারের আড়াই গুণ, ভারতবর্ষে সেখানে মাথাপিছু জীবন বীমার হার মাত্র ৫ টাকা। এই হিসাবও আবার বেশী পক্ষে ধরা হইয়াছে। আর বীমা করা হইয়াছে দেশী বিদেশী সব রকম বীমা অফিসে।

গত ১০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে জীবন বীমার প্রসার ঘটিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এদেশের লোক জীবন বীমার বড় একটা ধার ধারিত না। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের আবির্ভাব হয়, একথা সত্য; ভারতে জীবন বীমা সম্বন্ধে এই সত্য বিশেষরূপে প্রযোজ্য। ১৯১৮ সনে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ভারতবর্ষে ৬০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইউরোপের মহাযুদ্ধেও এত লোক মরে নাই। এই সংক্রামক ব্যাধির পর হইতে ভারতবর্ষে জীবন বীমা করিবার রেওয়াজ খুব বাড়িয়া চলিয়াছে।

ভারতে ঔষধ প্রস্তুত

গত ১০ বৈশাখ ৩৬নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে স্যার হরিশঙ্কর পালের সভাপতিত্বে ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির প্রতিনিধিগণ, বিলাতি ঔষধ ও যন্ত্রপাতির আমদানিকারকগণ এবং রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুতকারকগণের এক সভা হয়। ভারতে প্রস্তুত কোন্ কোন্ ঔষধ ও যন্ত্রপাতি নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায় এবং বিদেশ হইতে এই সকল দ্রব্য যাহা আসে তাহা দেশে তৈয়ারি হইতে পারে কিনা ইত্যাদি সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য বিখ্যাত চিকিৎসকগণ দ্বারা একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। ভারতীয় ঔষধ ও যন্ত্রপাতি যাহাতে ভারতে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয় তাহা প্রচারের জন্যও এই সভায় একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(সম্মিলনী)

বঙ্গীয় তন্তুবায় সম্মেলন

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত—

প্রথমেই চন্দননগরবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিই এই জন্য যে, তাঁহারা কলিকাতার মোহ হইতে দূরে যে কর্ম্মক্ষেত্র হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। কলিকাতায় যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্র করেন, তাঁহাদিগের মাথায় পাইয়া বসিয়াছে গোলদীঘি ও হাতপায়ে ঘুণ ধরাইয়াছে লালদীঘি। সমগ্র বঙ্গদেশের পক্ষে প্রকৃত শুভদিন সেইদিন, যেদিন লালদীঘি ও গোলদীঘির আওতা হইতে দূরে ধানের ক্ষেতের মুক্ত প্রান্তরে, নদীপুলিনের নিত্য চঞ্চল বেলাতটে ও বট-অশ্বত্থের বিরাট ছায়াতলে বাঙ্গালাদেশ তাহার সরল প্রাণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। আপনারা আজ সেই কার্য্যের সূচনায় অবসর প্রদান করিয়াছেন বলিয়া আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আর একটী কারণে আমি কৃতার্থ। বঙ্গদেশের সকল বাবুর দলই এখনও ফরাসডাঙ্গার কাপড় পরিধান করিয়া আভিজাত্য গৌরব জানাইতে চেষ্টা করে। অথচ যে নির্ম্মম অবহেলা ও কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙ্গালার লজ্জা-নিবারক তাঁতিকুলকে নিষ্পেষিত ও বিলুপ্তপ্রায় করিয়া দিনের পর দিন ও বৎসরের পর বৎসর বাঙ্গালার সমস্ত অধিবাসী প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে এবং আরও কতদিন করিবে তাহা

ভগবানই জানেন, সেই তাঁতিকুলের লজ্জাকে যদি সম্মানার্হ করিতে অগ্রসর হইবার অধিকার কাহারও থাকে, তবে আছে ফরাসডাঙ্গার, শান্তিপুরের ও ঢাকার। তন্মধ্যে একটী আজ অগ্রসর। আশা করা যায় আর আর সকলে নিজেদের সম্মানের দাবি উপস্থিত করিবেন।

আজ সমস্ত বাঙ্গালাদেশ মৃত্যুমুখে। আমাদের বাঁচিতে হইবে। আমাদের জাতীয় ব্যবসায় কেবল আমাদিগকে স্বাবলম্বী করিবে না, আমাদের প্রত্যেক গ্রামের মান ইজ্জৎ রক্ষা করিবে। তাহার জন্য চাই একদল কর্ম্মী যাঁহারা দিনের পর দিন অনুসন্ধান করিবেন, সুতা কত চাই, কত দাম হইলে সুবিধা হয়, কি করিয়া সুবিধা দরে পাওয়া যায়, একেবারে একস্থানের বা এক পল্লীর বা এক গ্রামের সকল তাঁতির সুতা এক সঙ্গে খরিদের বন্দোবস্ত করা যায় কি না, কাপড় করিতে সময় বাঁচান যায় কি না, পরিশ্রমের মাত্রা বাড়ান যায় কি না, তাঁতির ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল করা যায় কি না, অন্যথা স্থানান্তরে বসবাস উঠান যায় কি না, প্রস্তুত কাপড়ের চাহিদা কি, চাহিদা বাড়ানো যায় কি না, রকম বাড়ানো যায় কি না, নগদ টাকা কত ও কি রকম ভাবে তাঁতির ঘরে আসে, তাহা বাড়াইবার উপায় কি, এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিবেন ও জাতীয় পত্রিকায় তাহার অভিজ্ঞতার ফলাফল জানাইবেন। আমার মতে আমাদের জাতীয় পত্রিকার প্রধান ও মুখ্য কার্য্য ইহাই হওয়া উচিত। আর সমস্তই গৌণ।

আমাদের সম্মেলনের কর্ত্তব্যতালিকার মধ্যে আরও একটী কার্য্যকে আমি প্রধান বলিয়া বিবেচনা করি। সেটা হইল সমবায় প্রতিষ্ঠান, এই কার্য্যটী সম্বন্ধে প্রথম সম্মেলনে ডাঃ শরচ্চন্দ্র বসাক বলেন :—

"বস্ত্রের ব্যবসায় তাঁতির হাত হইতে মাড়োয়ারী ও অন্যান্য জাতির মহাজনের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এই ব্যবসায়টাকে আবার অধিকার করিতে হইবে। * * * এই ব্যবসায় অধিকারের একমাত্র উপায়, তন্তুবায় সমবায়-সমিতি স্থাপন।"

আমাদের স্বজাতীয় কেহ কেহ যদি এই ব্যবসায় আমাদের হাতে ফিরিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন তবে তাহা প্রশংসার্হ। কিন্তু সমবায় সমিতি স্থাপনের চেষ্টা এখনও ফলবতী হয় নাই।

কোন তন্তুবায় যুবক যেন কোনও দিন বিস্মৃত না হয় যে, গত ১৫০ বৎসরের ইতিহাসে এই তন্তুবায় জাতির যে অধঃপতনে ভারতের অন্যান্য জাতি সহায়তা করিয়াছে, তাহার ফলেই আজ ভারতের বর্ত্তমান দুর্গতি। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকার সাহেব কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের জাতির যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আজও সত্য—আমরা অতি নিরীহ অসহায়, ধর্ম্মপ্রাণ পরিশ্রমী জাতি। অথচ এই জাতির সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে সার উইলিয়ম জোন্স বলেন, বস্ত্রশিল্পে তাহারা পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করে। ১৮০৮-৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গড়ে ২ কোটি টাকার বস্ত্র ও ১৫ লক্ষ টাকার রেশমী বস্ত্র ভারত হইতে বিলাতে রপ্তানি হইত। আর আজ ৬৫ কোটি টাকার বস্ত্র বিলাত হইতে এদেশে আমদানি হইতেছে! আমাদের এই অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে দেশে কোনও শক্তি জাগ্রত হয় নাই এবং আজও নাই। অথচ এখনও আমাদের এই নিরীহ অসহায় ধর্ম্মপ্রাণ পরিশ্রমী জাতির ভিতর হইতে মানবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদানের উপাদানের অভাব হয় নাই। এখনও এই জাতি ভারতের সমগ্র অধিবাসীর লজ্জা নিবারণ করিতে সক্ষম। এখনও শিল্প-কীর্ত্তিতে পৃথিবীর সকল জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পটু।

তবে অভাব কিসের? অভাব প্রধানতঃ জাতীয় ইজ্জৎবোধের। আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ৭০০।৮০০ টাকা এককালীন ব্যয় ও মাসিক ৯০।১০০ টাকা ব্যয়ে যে যানবাহন সম্ভব, তাহার পরিবর্ত্তে দেশের লোক অকাতরে ২।৩ হাজার টাকা এককালীন ব্যয় ও মাসিক ১৫০ টাকা খরচে ২৫।৩০ হাজার মটর কার চালাইতেছে। এক পয়সার তামাকের বদলে দশ পয়সার সিগারেট ধোঁয়া করিয়া উড়াইতেছে এবং সিকি পয়সার আদা ছোলার জায়গায় অন্ততঃ চারি পয়সার চা পান করিতেছে। সুতরাং পয়সার জন্য দেশী কাপড়ের খরচা কুলাইতে পারে না ইহা কথার কথা। একবার যদি ধনীরা দেশী কাপড় পরা ইজ্জৎ বলিয়া বোধ করেন, তবে "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত-

দেবেতরো জনঃ” এই প্রাকৃতিক নিয়মে সমস্ত দেশে ঐ চাল চলিয়া যাইবে। প্রত্যেক তন্তুবায় যুবকের উচিত এই অবমাননা ও অবহেলা অতি মর্ম্মন্তুদভাবে প্রণিধান করা।

(তন্ত্র ও তন্ত্রী)

নিকট প্রাচ্যে বিলাতের এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

প্যালেষ্টাইন হইতে একজন ইংরেজ এঞ্জিনিয়ার স্বদেশে পদার্পণ করিয়াছেন। প্যালেষ্টাইন এবং সিরিয়া দেশে বিলাতের এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পদ্রব্য কিরূপ বিক্রয় হইতেছে সে সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, এই দুই দেশে বিলাতী তেল-এঞ্জিনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জার্ম্মাণি। বিলাতী এবং জার্ম্মাণ কলের মধ্যে দামের তারতম্য বিশেষ কিছুই নাই, অথচ বিলাতী কল জার্ম্মাণ কলের চেয়ে টেঁকসহি এবং ভাল। এই দুই দেশের লোক বিলাতী মালই বেশী পছন্দ করিতেছে। উহাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলো এবং শক্তি ব্যবহারের রেওয়াজ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং ইলেক্‌ট্রিক্ শিল্প দ্রব্য বিক্রয়ও ঐ দুই দেশে বেশ চলিবে। সেচের জন্য তৈলচালিত এঞ্জিন ব্যবহৃত হইবে এবং সেচন ক্ষেত্রের দুরবর্ত্তী স্থানসমূহে বৈদ্যুতিক আলো এবং শক্তির দরকার হইবে।

প্যালেষ্টাইন্ এবং ট্র্যান্সজর্ডানিয়ার মধ্যে গমনাগমনের জন্য মোটরগাড়ীর ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। বাগদাদ পর্য্যন্ত যাত্রী এবং মালপত্র লইয়া যাইবার জন্য কতকগুলি মোটর কোম্পানি আছে, এইরূপ আরও অনেক কোম্পানির দরকার। ইরাক এবং পারস্য দেশের মধ্যে গমনাগমনের জন্যও অনেক লরি এবং যাত্রিবাহী মোটর গাড়ীর দরকার। বর্ত্তমানে সিরিয়া এবং প্যালেষ্টাইনে বেশীর ভাগ আমেরিকান মোটরগাড়ীই ব্যবহৃত হইতেছে। আমেরিকান গাড়ীর ভিন্ন অংশও পাওয়া যায়, সুতরাং আমেরিকান গাড়ী মেরামত করার অনেক সুবিধা। সেই জন্য আমেরিকান গাড়ী বেশী ব্যবহৃত হইতেছে। বিলাতী গাড়ী আমদানি করিতেও অনেক বিলম্ব হয়। বিলাতী সিঙ্গ-সিলেণ্ডার গাড়ী এই দুই দেশের লোক বেশ পছন্দ করে। এই সকল দেশে সড়কের সংখ্যাও বাড়িতেছে, এবং এই সড়কগুলি রেলপথের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িতেছে।

সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে বিলাতী মালের কাট্‌তি বাড়াইতে হইলে ধারে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করার দরকার। বিশেষতঃ মেশিন এবং মোটরকার বিক্রয়ের বেলায় এরূপ ব্যবস্থা ছাড়া উপায় নাই। যেসকল ফার্ম্ম এঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে সেগুলিকে এরূপ অর্থ সাহায্য করার দরকার যাহাতে এই সকল ফার্ম্ম ধারে ব্যবসায় চালাইতে পারে। অন্যথা আর একটী উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। ধারে এবং বহুদিনের কিস্তিবন্দীতে বিক্রীত মালের দাম আদায়ের জন্য প্রতিভূ থাকিবে এমন একটী প্রতিষ্ঠান কায়েম করার দরকার। বিদেশী প্রতিযোগিগণ প্যালেষ্টাইনে লম্বা কিস্তি-বন্দীতেই মাল ছাড়িয়া থাকে। সুতরাং বিলাতী ফার্ম্ম-গুলিকে সফলতা লাভ করিতে হইলে এই সকল প্রতিযোগীর মতই সুবিধা দিতে হইবে, নতুবা উপায় নাই।
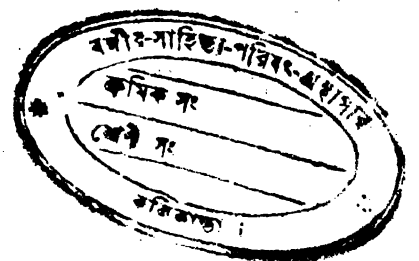
বিলাতী ব্যাঙ্কের গোড়ার কথা

[ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার সহিত আমার ব্যাঙ্ক-বিষয়ক কথোপকথনের সারমর্ম্ম।—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত]

প্রঃ—এতদিন অনেক দেশের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধেই ত আলোচনা করলেন,—এবার ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই কতকগুলি স্থূল বিষয় চোখে পড়বে, আগে সে বিষয়েই কিছু বলছি, শোন।

প্রঃ—কেন, এদেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় খুঁটিনাটি কিছু জানবার নেই কি ?

উঃ—না, যে স্থূল বিষয়গুলি বলতে যাচ্ছি, তাই এ দেশের ব্যাঙ্কিংএর বিশেষত্ব।

প্রঃ—আচ্ছা, তবে সে সম্বন্ধেই বিস্তারিত বলুন।

উঃ—তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কের কারবার একেবারে একমুখী হ'য়ে গেছে। এখানকার প্রায় সবগুলি ব্যাঙ্কই হ'ল কমার্শিয়াল অর্থাৎ বাণিজ্য-পোষক ব্যাঙ্ক। কৃষিশিল্প প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক নেই। আর একটা বিশেষত্ব হ'ল দেশের আভ্যন্তরীণ টাকা পয়সার বাজারে "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অসাধারণ প্রভাব। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার এই ছুটোই হ'ল সব চেয়ে বেশী লক্ষ্য করবার বিষয়।

প্রঃ—"ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" তার অসাধারণ প্রভাবটা খাটাচ্ছে কি করে ?

উঃ—সেটা বোঝাতে গেলে ইংলণ্ডের টাকা পয়সার বাজার সম্বন্ধে ছু'চার কথা বলে নেওয়া দরকার,—না হ'লে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারবে না।

প্রঃ—টাকা পয়সার বাজার বলছেন কাকে ?

উঃ—বাজার কথাটা সাধারণতঃ আমরা যে অর্থে ব্যবহার করে থাকি, এখানেও আমি সেই অর্থেই ব্যবহার করছি। বস্তুমাত্রের ক্রেতা বিক্রেতা একত্রিত হ'লেই আমরা তাকে বাজার বলে থাকি। তুলার বাজার, পাটের বাজার ইত্যাদি কথাগুলি এই অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। পাট তুলার মত টাকা পয়সারও একটা যোগান এবং চাহিদা আছে। সাধারণতঃ টাকা পয়সা ধার নিতে চায় ব্যবসাদার কি কারখানা ওয়ালা—আর টাকাটা যোগায় ব্যাঙ্ক কিংবা মহাজন। এদের সমষ্টিকেই টাকা পয়সার বাজার বলা যেতে পারে। আমাদের সাধারণ কথাবার্ত্তায় আমরা কিন্তু এখন বাজার বলতে চাহিদার চেয়ে যোগান ব্যাপারটা বুঝতেই অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি। বাজার কথাটার এই ব্যবহারিক অর্থ টাকা পয়সার বাজার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তাই টাকা পয়সার বাজার বলতে ব্যাঙ্ক কি মহাজন অর্থাৎ যে সব অনুষ্ঠান বা ব্যক্তি টাকা কর্জ্জ দেবার কারবার চালায় মুখ্যতঃ তাদেরই বোঝায়।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—হাঁ, তারপর যা বলতে যাচ্ছিলাম।—ইংলণ্ডের টাকার বাজারে পাঁচটা বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠান কারবার চালাচ্ছে। প্রথম "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড", দ্বিতীয় সাধারণ যৌথ ব্যাঙ্ক, তৃতীয় বিল দালাল এবং "ডিস্কাউণ্ট-হাউস", চতুর্থ "অ্যাকসেপটেন্স হাউস" পঞ্চম "ষ্টক একচেঞ্জ" অর্থাৎ শেয়ার বাজার।

প্রঃ—এদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বলবেন কি ?

উঃ—তাই বলছি, শোন। ইংলণ্ডের টাকাকড়ির বাজারের একেবারে নীচুর ধাপে রয়েছে সব বিল দালাল এবং 'ডিস্কাউন্ট হাউস'। সুতরাং এদের কথাই প্রথম বলা দরকার।

প্রঃ—বিল দালাল এবং "ডিস্কাউণ্ট হাউস" একই ধরণের কাজ করে ত ?

উঃ—তা করে বটে, তবু এদের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। কাজেই এদের কথাও আলাদা করে বলছি। বিল দালালদের মধ্যে দুটী পৃথক শ্রেণী আছে।—তার এক শ্রেণীর নাম "রাণিং ব্রোকার"। বিল কেনা-বেচা করবার সহায়তা করে দেওয়াই হ'ল এদের কাজ। সব ব্যবসাদারের পক্ষেই বিল বা বরাত চিঠি লিখে তা ব্যাঙ্কের কাছে ভাঙ্গিয়ে নেওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ ব্যাঙ্ক ত সব ব্যবসাদারের আর্থিক অবস্থার খবর রাখে না। কাজেই বিলগুলি কোন দালালের সহায়তায় ভাঙ্গিয়ে নেওয়া দরকার। "রাণিং ব্রোকার"রা এ বিষয়ে মধ্যস্থতার কাজ ক'রে বিল কেনা বেচার সহায়তা করে দেয় এবং সেজন্য একটা কমিশন আদায় করে নেয়। ইংলণ্ডে এই শ্রেণীর বিল-দালাল এখন খুব বেশী নেই।

প্রঃ—তা হ'লে এখন দালালি করছে কারা ?

উঃ—সে কাজ এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর দালালরাই চালাচ্ছে। এদের কারবার প্রথম শ্রেণীর দালালদের চেয়ে অনেক বেশী। কমিশন নিয়ে বিল কেনাবেচার সহায়তা করা এদের পেশা নয়। এরা নিজেরাই সোজা "রাণিং ব্রোকার"দের কাছ থেকে—কিংবা বিলাতী ব্যবসাদার বা বিদেশী মহাজনের ইংলণ্ডবাসী এজেন্টদের কাছ থেকে বিল কিনে নেয়। সেজন্য যে টাকা দরকার, তা যে এরাই সব যোগাতে পারে তা নয়,—অনেক সময়ই এদের যৌথ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে হাওলাত নিতে হয়। আবার অনেক সময় নিজেদের কেনা বিলগুলি বেচেও এরা যৌথ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে। ব্যাঙ্কের ওপর বিল দালালদের এই নির্ভরশীলতা একটা লক্ষ্য করবার ব্যাপার।

প্রঃ—"ডিস্কাউন্ট হাউস"গুলি তা হ'লে কি করছে ?

উঃ—এরাও বিল কেনা বেচা করে থাকে,—তবে এদের কারবারের আয়তন এবং গণ্ডী বিল-দালালদের চেয়ে আরও অনেক ব্যাপক। সেজন্য এদের ও অনেক বেশী টাকা দরকার হয়। তার কতক অংশ এরা ব্যবসাদারদের কাছ থেকে আমানত নিয়ে সংগ্রহ করে—তা ছাড়া ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার নেবার ব্যাপার ত আছেই।

প্রঃ—ব্যাঙ্কের কাছে না রেখে এদের কাছে লোক টাকা গচ্ছিত রাখে কেন ?

উঃ—এদের কাছে রাখলেও টাকা মারা যাবার ভয় নেই—তা' ছাড়া আমানতি হিসেবের ওপর এরা ব্যাঙ্কের চেয়ে একটু বেশী সুদ দেয়।

প্রঃ—তা হ'লে বিল দালালই বলুন আর ডিস্কাউন্ট হাউসই বলুন,—এরা সবাই হাওলাতি টাকার ওপর ভর করেই তাদের ব্যবসা চালাচ্ছে ?

উঃ—অনেকটা তাই বটে। হাওলাতি টাকার ওপর এরা যে সুদ দেয় তার চেয়ে একটু বেশী করে এরা বিলের ওপর বাটা সুদ স্থির করে। এই দুই প্রকার সুদ (অর্থাৎ হাওলাতি টাকার উপর দেয় সুদ এবং বিলের ওপর বাটা সুদ) এর মধ্যে যে তফাৎ, তাই এদের লাভ।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—এবার "অ্যাক্সেপটেন্স্ হাউস"গুলির কারবার সম্বন্ধে কিছু বলছি, শোন। বিলের ওপর দায় স্বীকার করে এরা যে কমিশন পায়, তাই হ'ল এদের রোজগার।

প্রঃ—বিলের ওপর এদের দায় স্বীকার করবার দরকার হয় কেন ?

উঃ—তার যথেষ্ট কারণ আছে। যার তার ওপর বিল বা বরাত চিঠি লিখলেই যে তা বাজার চল হ'বে তা মনে করো না। এর জন্য দু'চার জন নামজাদা লোক

থাকা চাই। ব্যাপারটা একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাচ্ছি শোন। ধর অধরচন্দ্র বসাক নামে কলকাতার একজন ধনী মহাজন স্থির করলেন যে, তিনি ধুতির ব্যবসা করবেন। ব্যবসার জন্য তাঁর ম্যানচেষ্টার থেকে মাল আনাবার দরকার হ'ল। এখন তিনি কি করবেন?

প্রঃ—তিনি ম্যানাচেষ্টারের কোন বস্ত্র-রপ্তানি-কারকে প্রয়োজন মত মালের অর্ডার দিয়ে লিখবেন যে, মাল চালান দিয়ে যেন তাঁর ওপর বিল লিখে তা ভাঙ্গিয়ে নেওয়া হয়।

উঃ—বিলটা ভাঙ্গানো হ'বে কার কাছে?

প্রঃ—কেন, যে কোন ব্যাঙ্ক, যার কলকাতায় শাখা অফিস আছে, তার কাছেই ভাঙ্গানো যেতে পারে।

উঃ—ব্যাঙ্ক বিলটা নেবে কোন ভরসায়?

প্রঃ—মালের চালান রসিদটা ব্যাঙ্কের জিম্বায় থাকলেই হ'ল। মালটা কলকাতায় আসবার আগেই রসিদটা কলকাতার শাখা অফিসে এসে যাবে। শাখা অফিস তখন অধরচন্দ্রের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিয়ে রসিদ ছেড়ে দেবে।

উঃ—কিন্তু অধরচন্দ্র যদি টাকা দিয়ে রসিদ নিতে রাজী না হয়?

প্রঃ—তা হ'লে মাল বিক্রী করেই ব্যাঙ্ক টাকা আদায় করে নেবে।

উঃ—বিক্রী করতে গিয়ে যদি লোকসান দাঁড়ায়?

প্রঃ—সে ক্ষেত্রে লোকসানের পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্ক রপ্তানি-কারের কাছে দাবী করবে।

উঃ—কিন্তু এসব ঝঞ্ঝাট ব্যাঙ্ক বইতে যাবে কেন? মাল কেনা বেচার দায়ই বা সে ঘাড়ে তুলে নেবে কেন? এসব ত ব্যাঙ্কের কাজ নয়!

প্রঃ—তা বটে, কিন্তু না করলেই বা চলে কি করে?

উঃ—চলবার আরও উপায় আছে। তুমি ব্যাপারটা যত সহজ করে দেখালে, আসলে কিন্তু তেমনি ঘটবে না; গোড়াতেই অনেক মুস্কিল বেধে যাবে।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—যেমন ধর ম্যানচেষ্টারের রপ্তানিকারই অধরচন্দ্রের অর্ডার-মাফিক মাল পাঠাইতে চাইবে না।

প্রঃ—কেন?

উঃ—সে অর্ডার পেয়েই অধরচন্দ্রকে জানাবে যে, অধরচন্দ্র বস্ত্র ব্যবসায়ে একেবারে নূতন লোক, তাকে বিলাতের কোন এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কই চেনে না, সুতরাং তার নামে বিল লিখলে সে বিল কোন ব্যাঙ্কের কাছেই ভাঙ্গানো চলবে না।

প্রঃ—তা হ'লে কি অধরচন্দ্রের পক্ষে বস্ত্র ব্যবসায় করা মোটেই সম্ভব হবে না বলতে চান?

উঃ—না, ঠিক তা নয়, তবে তাকে একটু ঝঞ্ঝাট বইতে হবে ঠিক।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—ধর কলকাতার বস্ত্র ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছে তার নামটা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে এমনি কোন লোকের নাম দিয়ে যদি অধরচন্দ্র মালটা আনিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করতে পারে তা হলে ত কোনই গণ্ডগোল থাকে না।

প্রঃ—আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

উঃ—কেন এর মধ্যে জটিল ব্যাপার ত কিছু নেই। ধর 'হুকুমচাঁদ হাজারীমল' কি 'কৃষ্ণদাস ল' এণ্ড কোম্পানী' —এমনি কোন ফার্ম্ম, যারা অনেক কাল বস্ত্র আমদানী ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে খ্যাতিলাভ করেছে, তাদের যদি অধরচন্দ্র রাজী করাতে পারে যে তাদেরই কারও নামে সে তার মালটা আনিয়ে নেবে, তা হলে ত ব্যাপারটা সহজেই চুকে যেতে পারে।

প্রঃ—কেন তাতে সুবিধেটা কি হবে?

উঃ—সুবিধে হবে এই যে, এর ফলে ম্যানচেষ্টারের রপ্তানি-কারের মাল চালান দেবার পক্ষে আর কোনই মুস্কিল থাকবে না। কারণ বিলটা যদি হুকুমচাঁদ কি কৃষ্ণদাস ল'য়ের ফার্ম্মের উপর লেখা হয় তবে যে কোন এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক (যার ক'লকাতায় শাখা অফিস আছে)এর কাছে বিলটা ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যেতে পারবে।

প্রঃ—তাতে হুকুমচাঁদই বলুন আর কৃষ্ণদাস ল'য়ের ফার্ম্মই বলুন তারাই ত আসলে বিলটার দামের জন্য দায়ী থাকবে?

উঃ—নিশ্চয়ই, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের কলকাতা অফিস চালান রসিদ ছাড়বার আগে বিল মাফিক টাকাটা তাদের কাছ থেকেই আদায় করে নেবে।

প্রঃ—কিন্তু এই ফার্ম্মগুলি অধরচন্দ্রের জন্য এ রকম দায় স্বীকার করতে যাবে কেন?

উঃ—শুধু শুধু কি আর করবে?—এ জন্য অধরচন্দ্রকে কমিশন বা অমনি একটা কিছু বাবদ টাকা দিতে হবে। নইলে ফার্ম্মগুলি তাদের নামে মাল আনতে দেবে কেন?

প্রঃ—কিন্তু তা হলেও অধরচন্দ্রের সঙ্গে এ রকম কোন ফার্মের বিশেষ জানাশোনা থাকা চাই নিশ্চয়ই—শেষ পর্য্যন্ত টাকাটা তার কাছ থেকেই আদায় হবে ত?

উঃ—নিশ্চয়ই সে জন্য টাকাটা এদের কাছেই গোড়া থেকে জমা রাখবার বন্দোবস্ত করা দরকার হতে পারে কিংবা কোন ব্যাঙ্ক, যেখানে হয়ত অধরচন্দ্রের বিস্তর টাকা আমানত হিসেবে মজুদ আছে, সেও টাকাটার জন্য জামিন থাকতে পারে। মোট কথা, বিলের টাকাটা নিশ্চিত আদায় করবার ব্যবস্থা করেই এরকম বিলের উপর দায় স্বীকার করা হয়।

প্রঃ—আপনি যা বলছেন তাতে ত মনে হয় যে কোন ব্যাঙ্কও ইচ্ছা করলে বিলের উপর দায় স্বীকার করাটা তার কারবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে।

উঃ—তা ত পারেই, তবে সব ব্যাঙ্কের পক্ষেই ত এ রকম কারবার চালানো সম্ভব নয়। ব্যাঙ্কটার অন্ততঃ এতখানি খ্যাতি থাকা চাই যাতে তার দায় স্বীকার পেলেই তার ওপর লেখা বিল সহজে বাজার চল হতে পারে। অনেক দেশের ব্যাঙ্কই এখন এরকম কারবার চালাচ্ছে।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—ইংলণ্ডের "অ্যাকসেপ্টটেনস হাউস"গুলির সম্বন্ধে আরও দু'একটা কথা বলবার আছে। সেখানকার কতকগুলি প্রসিদ্ধ আমদানিকার ব্যবসায়ীর ফার্ম্ম থেকেই এদের উৎপত্তি হয়েছে। কেন হয়েছে তা আমার "হুকুমচাঁদ" "কৃষ্ণদাস" এর দৃষ্টান্ত থেকেই বুঝতে পারবে। ইংলণ্ডে এই প্রতিষ্ঠানগুলির তাঁবে এখন প্রায় ৪ কোটি পাউণ্ড মূলধন খাটছে,—আর এরা এককালে যে টাকার জন্য বিলের উপর দায় স্বীকার করেছে তার সমষ্টি পরিমাণ হবে প্রায় ১২ কোটি পাউণ্ড।

প্রঃ—ইংলণ্ডের টাকাকড়ির বাজারের সঙ্গে সেখানকার "ষ্টক একসচেঞ্জ" বা শেয়ার বাজারের কি সম্পর্ক রয়েছে?

উঃ—শেয়ার বাজারে যে সব কেনা-বেচা চলে তার জন্য শেয়ার দালালরা অনেক সময়ই ব্যাঙ্কের কাছে টাকা ধার নিয়ে থাকে। বিশেষ করে চড়তি দরের সম্ভাবনা আছে মনে করলেই দালালরা এরকমভাবে বেশী টাকা ধার নেয়। হাওলাতি টাকার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে শেয়ারগুলি গচ্ছিত রাখতে হয়। শেয়ার দালালরা ব্যাঙ্কের কাছে কি পরিমাণ টাকা ধার চাইবে তা যে শুধু শেয়ারের কল্পিত বা সম্ভাবিত দরের ওপরেই নির্ভর করে, তা নয়; ব্যাঙ্ক যে হিসেবে সুদ আদায় করে তার ওপরেও এ রকম হাওলাতি টাকার পরিমাণ কতকটা নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

প্রঃ—যৌথ ব্যাঙ্কগুলির কারবার চলছে কি করে?

উঃ—প্রথমেই বলেছি যে ইংলণ্ডের যৌথ ব্যাঙ্কগুলি আসলে সবই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক। গোটা কয়েক অঙ্কের হিসেব থেকেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সমস্ত যৌথব্যাঙ্কের মূলধন এবং রিজার্ভফণ্ড বাবদ টাকা ছিল ১৩ কোটি পাউণ্ডের কিছু বেশী—আর সেই সময়েই ব্যাঙ্কগুলির অস্থায়ী এবং স্থায়ী আমানতে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ হয়েছিল প্রায় ১৭৭ কোটি পাউণ্ড। ব্যাঙ্কগুলির আমানতি টাকার পরিমাণ থেকেই বুঝতে পারছ

যে কেন এরা ব্যবসা বাণিজ্যের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে।

প্রঃ—এ থেকে তা বোঝা যাবে কি করে?

উঃ—আমানতি টাকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে দীর্ঘ দিনের জন্য কর্জ্জ দেওয়া চলে না;—আর সে রকম কর্জ্জ না দিতে পারলে কৃষিশিল্পের সহায়তা করাও সম্ভব নয়।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—তারপর এই ব্যাঙ্কগুলির টাকা লগ্নী করবার ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য করলেও এই সত্যটাই প্রমাণিত হবে। যেমন ধর ঐ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দেই এদের কেনা বিলের দাম হয়েছিল প্রায় ২৪ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড,—বিল দালালদের একদিন বা সপ্তাহকালের জন্য ধার দেওয়া হয়েছিল প্রায় ১৫ কোটি পাউণ্ড, অল্পকাল-স্থায়ী অন্যান্য কর্জ্জের পরিমাণ হয়েছিল ৯৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড—আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লগ্নী করা ছিল মাত্র ২৫ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড;—সেও যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা কৃষির জন্য লগ্নী করা হয়েছিল তাও নয়। তার মধ্যে ডিবেঞ্চর, গভর্ণমেণ্ট বণ্ড বা ট্রেজারী বিল সবই রয়েছে বুঝতে হবে।

প্রঃ—কিন্তু ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি শিল্প-কৃষি সম্বন্ধে এরকম উদাসীন হ'য়ে রয়েছে কেন;—আর আমানতি টাকার ওপর নির্ভরশীল হলেই বা কি? জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েও ত আপনি বলেছিলেন যে সেখানে বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি আসলে বাণিজ্যপোষক ব্যাঙ্ক হ'লেও তারা বিস্তৃতভাবে দেশের শিল্প বিস্তারের জন্য টাকা ধার দিয়ে সহায়তা করছে। ইংলণ্ডেও ত সে রকম ব্যবস্থা করা অসম্ভব ছিল না।

উঃ—তা বটে। কেন যে এ রকম ব্যবস্থা করা হয় নি তা বলা কঠিন,—হয়ত দেশটা শিল্পবিস্তারে অগ্রগামী হয়ে পড়েছিল বলেই—বা ইংলণ্ড বাণিজ্যপ্রধান দেশ বলেই এ রকম হয়ে থাকবে। সে যাই হোক, এখন একথা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-ধুরন্ধরেরা বেশ বুঝতে পেরেছে যে, এদেশের ব্যাঙ্কগুলি এ রকম একমুখী হয়ে পড়েছে বলেই দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা খুব শক্তিমান হতে পেরেছে। জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কি রকম করে হু হু করে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখেছ—জাপানও জার্ম্মাণির শিক্ষাটা যে কি রকম সমঝে নিয়েছে—তা তার ব্যাঙ্ক-বৈচিত্র্য থেকে বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই। দেশের আর্থিক উন্নতির ওপর ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার এই যে বিপুল প্রভাব এটাই আধুনিক ব্যাঙ্কজগতের সব চেয়ে বড় শিক্ষা। ইংলণ্ডও এখন সেটা বেশ বুঝতে পেরেছে। সেজন্যই কিছুদিন থেকে সেখানকার ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংস্কার এবং উন্নতি করবার প্রসঙ্গ গভর্ণমেণ্ট এবং ব্যাঙ্কমহল উভয়েরই মনোযোগ আকর্ষণ করছে। ইদানীং দু'একটা কমিটিও এর জন্য মাথা ঘামিয়েছে।

প্রঃ—আচ্ছা, বে-সরকারী চেষ্টা না হোক, দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা করবার জন্য গভর্ণমেণ্টও ত কোন রকম ব্যবস্থা করতে পারে?

উঃ—হাঁ, গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে একটু নজর দিয়েছে বটে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দেশীয় শিল্পে ব্যবসার সহায়তা করবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট "বোর্ড অব্ ট্রেড" বিভাগের তাঁবে "বৃটিশ ট্রেড করপোরেশন" নামদিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান কায়েম করে তার হাতে ২০ লক্ষ পাউণ্ড তুলে দেয়। কিন্তু রাজস্ব থেকে বিস্তৃতভাবে গোটা দেশের শিল্পের সহায়তা করবার জন্য কোন স্থায়ী ব্যবস্থা হ'তে পারে না। তার জন্যই একটা বিশেষ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠা দরকার। এতদিন বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তা থেকে এ কথাটা নিশ্চয়ই বুঝে থাকবে।

প্রঃ—ইংলণ্ডে কি তা হ'লে শিল্প-সহায়ক বা কৃষিসহায়ক বিশেষ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা চলছে না?

উঃ—না, এখন পর্য্যন্ত সে রকম কোন চেষ্টা হয় নি। এ পর্য্যন্ত যে চেষ্টা হয়েছে তা অনেকটা জার্ম্মাণ আদর্শেই।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—এখন যৌথ-ব্যাঙ্কগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ হ'য়ে বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে,—আর সেই সঙ্গে এরাই দেশের শিল্প বিস্তারের সহায়তা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এখন থেকে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা যতই বাড়বে, ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক সংস্কারের চেষ্টা ততই প্রবল হ'তে থাকবে।

প্রঃ—আচ্ছা, ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় প্রধান দুটো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা ত হ'ল এই।—তারপর আর একটা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সেখানকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি রকম করে গোটা দেশের ব্যাঙ্কমহলকে নিয়ন্ত্রিত করছে এবার সে সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—সেটাকেই বিলাতী ব্যাঙ্কব্যবস্থার সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য বলা চলে। অনেককাল থেকে ইংলণ্ড আন্তর্জ্জাতিক সোনার বাজার ব'লে খ্যাতি লাভ করে এসেছে। অর্থাৎ এদেশে সোনা আমদানি বা সোনা রপ্তানি করা সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণমূলক আইন করা হয় নি। অবাধভাবে সোনা আমদানি রপ্তানি করা চলত। কেবল বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় টাকা পয়সার বাজারে যাতে একেবারে বিপর্য্যয় না ঘটে তার জন্য সোনা রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পাউণ্ড ষ্টার্‌লিং বা ১ পাউণ্ডের নোট দিয়েই তখন লেনদেন চালিয়ে নেওয়া হয়েছে। অত্যধিক নোট ছাপাবার জন্য কয়েক বৎসর ষ্টারলিংএর সঙ্গে তার স্বর্ণমূল্যের সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। অর্থাৎ একটা পাউণ্ডের মধ্যে যে পরিমাণে সোনা থাকে তা কিনতে এক ষ্টারলিংএর বেশী লাগত। এই সময় আন্তর্জ্জাতিক টাকাকড়ির বাজারে প্রাধান্য লাভ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। আটলাণ্টিক মহাসাগরের ওপারে নিরবচ্ছিন্ন নিরাপদ থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় সমরলিপ্ত দেশগুলিকে বিস্তর টাকা কর্জ্জ দিয়ে বা অনেক টাকার মাল ধারে বিক্রী করে প্রচুর পরিমাণে সোনার মালিক হ'য়ে পড়ে। লড়াইয়ে যোগ দিয়েও তার সে সুবিধে নষ্ট হয় নি। কয়েক বৎসর অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছিল যে, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কেউই সোনা দেশ থেকে বের করে দিতে ভরসা পায় নি। সম্ভবও ছিল না, কারণ নোটের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তার বিনিময়ে সোনা দিতে গেলে অনেক গভর্ণমেণ্টই কুলিয়ে উঠতে পারত না। এই সময় আন্তর্জ্জাতিক সোনার বাজার কেন্দ্রীভূত হয় যুক্তরাষ্ট্রে। এতে ইংলণ্ডের গৌরব অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু সে অল্পদিনেই নিজেকে সাম্‌লে নিয়েছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি ইংলণ্ডে প্রকৃত স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার ফলে আবার এদেশ থেকে সোনার অবাধ রপ্তানি চলছে। আন্তর্জ্জাতিক সোনার বাজার হিসেবে যে গৌরব তার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ইংলণ্ড তা আবার প্রতিষ্ঠা করে নিচ্ছে।

প্রঃ—কিন্তু দেশ থেকে অবাধ সোনা রপ্তানির সুযোগ দিলে নিশ্চয়ই এমন কিছু ব্যবস্থা থাকা চাই, যাতে সব সময়ই যথেষ্ট সোনা মজুদ থাকতে পারে?

উঃ—নিশ্চয়ই, সেজন্যই "ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড'কে সর্ব্বদা সতর্ক হয়ে দেশের টাকাকড়ির বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। ঠিক কি রকম ভাবে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার সাধিত হচ্ছে তা বোঝাতে হ'লে কথাটা একটু বাড়িয়ে বলতে হয়; তাই বলছি, শোন। ইংলণ্ড থেকে সোণা বের করে নিতে হলে তা করতে হবে হয় সেখানে কোন বিদেশী সিকিউরিটি বিক্রী করে, নয়ত ইংলণ্ডের ওপর দাবীসূচক কোন বিল দিয়ে। এরকম সিকিউরিটি বা বিল কেনা বেচা করতে হলে ইংলণ্ডের কোন ব্যাঙ্ক বা বিল দালালের সহায়তা নেওয়া দরকার। এদের কাছে বিক্রী করবার জন্য যে পরিমাণ বিল এবং সিকিউরিটি বিদেশ থেকে আসে তা নির্ভর করে,—এরা যে দাম দিতে স্বীকৃত হয়, তারই ওপর। এখন এরা যে দাম দিতে স্বীকৃত হয়, তা এদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়,—তাও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রঃ—সেটাও একটু বুঝিয়ে বলুন।

উঃ—বিল এবং সিকিউরিটির দাম দুইই নির্ভর করে বাজার চলতি সুদের হারের ওপর। অষ্ট্রেলিয়ান এবং ইতালিয়ান ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যখন আলোচনা হয়েছে তখনই বলেছি যে, কর্জ্জ-সুদের সঙ্গে বিলের ওপর ধার্য্য বাটা-সুদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। দুইই এক সঙ্গে ওঠানামা করে কারণ বিল কেনার তাৎপর্য্য বিল বিক্রেতাকে ধার দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সিকিউরিটির দামের সঙ্গেও ব্যাঙ্কের সুদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, কিন্তু এ দুটো ব্যাপার উল্টো দিকে ওঠানামা করে। বাজার চলতি সুদের হার যখন চড়া থাকে তখন সিকউরিটির দাম নেমে যায় সুদের হার নেমে গেলে সিকিউরিটির দাম চড়তে থাকে, এই হ'ল নিয়ম। এ থেকেই বুঝতে পাচ্ছ যে ইংলণ্ডে সুদের হার নেমে গেলেই বিদেশ থেকে সিকিউরিটি কিংবা বিল আমদানি হ'তে থাকবে সেগুলি ইংলণ্ডে বিক্রী করবার জন্য। কারণ সুদের হার নরম থাকলেই বিল এবং সিকিউরিটি বিক্রেতাদের সুবিধে।—তাতে বিলের ওপর বাটা সুদও কম দিতে হয়, সিকিউরিটিও একটু সুবিধে দরে বিক্রী করা চলে। এখন তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, কেন ইংলণ্ড থেকে সোনা রপ্তানির ব্যাপার সেখানকার বাজার চল্‌তি সুদের ওপর নির্ভর করে।

প্রঃ—তা বুঝলাম। কিন্তু আপনি একটু আগেই বলছিলেন যে, ইংলণ্ডে সোনা আমদানি রপ্তানির ব্যাপার "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এর কর্ত্তৃত্বাধীন রয়েছে। তা হ'লে ত এই প্রমাণিত হয় যে, এই ব্যাঙ্কই ইংলণ্ডের বাজার চলতি সুদ নির্দ্ধারণ করে দিচ্ছে।

উঃ—হাঁ, "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এর সে ক্ষমতা রয়েছে ঠিক। কিন্তু সব সময়েই যে তার এই ক্ষমতা ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়, তা নয়। সাধারণ বাজার চলতি সুদ যৌথব্যাঙ্কগুলিই নির্দ্ধারণ করে দেয়, কিন্তু কোন সময় কোন কারণে যদি ইংলণ্ড থেকে অনেক পরিমাণ সোনা বেরিয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে তবে এই ব্যাঙ্ক তার ক্ষমতা ব্যবহার করে সুদের হার চড়িয়ে দিতে বাধ্য হয় যাতে বিদেশ থেকে আর বেশী বিল বা সিকিউরিটি না আসতে পারে।

প্রঃ—"ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এর পক্ষে এরকম সুদের হার বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় কি করে?

উঃ—বলছি। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি কারবার হিসেবে এক শ্রেণীগত অর্থাৎ তারা সবাই বাণিজ্য পোষক হ'লেও তাদের মধ্যে একটা স্তর বিভাগ রয়েছে। এই স্তরগুলির মধ্যে প্রত্যেকটা তার উপরিতন স্তরের ওপর নির্ভরশীল। একেবারে নীচের ধাপে রয়েছে ব্যাঙ্ক দালাল, তার ওপর "ডিস্কাউন্ট হাউস," তার ওপর যৌথ ব্যাঙ্ক,—আর সবার ওপর রয়েছে "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"। ব্যাঙ্ক দালাল ও "ডিস্কাউন্ট হাউস"গুলি যৌথ ব্যাঙ্কের ওপর নির্ভরশীল হয়ে তাদের কারবার চালাচ্ছে। পূর্ব্বেই বলেছি যে, এরা নিজ নিজ কারবার চালাবার জন্য বিস্তর টাকা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে হাওলাত নিয়ে থাকে। হাওলাতি টাকার ওপর এদের যে হারে সুদ দিতে হয় তারই ওপর হিসেব করে এরা বিলের ওপর ধার্য্য সুদের হার নির্দ্ধারণ করে। তা ছাড়া কোন কোন ব্যাঙ্ক নিজেই বিল কেনা বেচা করে থাকে। কার্য্যতঃ তা হলে যৌথব্যাঙ্ক-গুলিই বাজার চলতি বাটা সুদ স্থির করে দিচ্ছে বুঝতে হবে।

প্রঃ—তা হ'লে "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এর কর্ত্তৃত্ব রইল কোথায়?

উঃ—বলছি, শোন। এই যৌথ ব্যাঙ্কগুলিই কতকগুলি কারণে "ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড"এর কর্ত্তৃত্বাধীন হয়ে পড়েছে। এরা হাওলাত দেবার জন্য যে সুদ দাবী করে তা নির্ভর করে এদের রিজার্ভ ফণ্ডের জোরের ওপর, কারণ এদের হাওলাত দেবার পদ্ধতিটাও একটু অদ্ভুত।

প্রঃ—কি রকম?

উঃ—ইংলণ্ডে যৌথ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে নগদ টাকা ধার দেবার ব্যাপার এখন প্রথা-বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন কাউকে ধার দিতে হলে ব্যাঙ্ক হাওলাতকারীর নামে একটা হিসেব খুলে তাকে একটা চেকবই দিয়ে দেয়, উদ্দেশ্য এই যে, কর্জ্জের পরিমাণ টাকা হাওলাতকারী চেক লিখে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আদায় করে নেবে বা তা দিয়ে পাওনাদারদের দাবী মিটিয়ে দেবে। কেন দেবে বা এ রকম ভাবে ধার দিলে ব্যাঙ্কের কি সুবিধে হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে প্রথম দিনকার আলোচনাতেই অনেক কথা বলেছি। এখন কথা হল এই যে, ব্যাঙ্ক এরকম করে যে টাকা ধার দেয় তার পরিমাণ নির্ভর করে তার রিজার্ভ বাবদ মজুত টাকার ওপর, কারণ চেকের দাবী তাকে এই রিজার্ভের সাহায্যেই মেটাতে হয়। এই রিজার্ভ এবং চেকের দামের সমষ্টি পরিমাণের মধ্যে একটা শতাংশ অনুপাত হিসেব রক্ষা করা এখন বিলাতী ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একটা প্রথাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিজার্ভের টাকা কোন কারণে কমে গেলেই চেকের দায় কমিয়ে আনতে হয় অর্থাৎ আর টাকা ধার দেওয়া চলে না।

প্রঃ—কিন্তু হাওলাত দেবার জন্যই যে কেবল চেকবই দেওয়া হয়, তা ত নয়! যারা ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখে, তারাও ত ইচ্ছা করলে চেক লিখে টাকা তুলে নিতে পারে?

উঃ—নিশ্চয়ই, হিসেবের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে আমানতকারী এবং হাওলাতকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। ব্যাঙ্কের খাতায় দু'জনকেই আমানতকারী হিসেবে দেখান হয়,—দু'জনেই চেক লিখে যখন খুসী টাকা তুলে নিতে পারে।

প্রঃ—এরকম করবার কোন কারণ আছে কি?

উঃ—কারণ একটা আছে বই কি। ধর ব্যাঙ্ক যদি হাওলাতকারীকে নগদ টাকাই ধার দিত, আর হাওলাতকারী সেই টাকা ব্যাঙ্কের কাছে রেখেই বলত "টাকাটা আমার এখুনি দরকার হচ্ছে না। আপাততঃ এটা আমার নামে অস্থায়ী আমানতে জমা করে নেও, যখন দরকার হবে আমি চেক লিখে তুলে নেব,"—তা হ'লেওত ব্যাঙ্ক হাওলাতকারীর নামে আমানত হিসেব খুলতে বাধ্য হত—আর টাকাটাও সেই আমানত হিসেবে জমার ঘরে দেখাতে হত।

প্রঃ—কিন্তু আসলে সেত টাকাটা কর্জ্জই নিচ্ছে? তার প্রমাণ থাকল কোথায়?

উঃ—সে জন্য হাওলাতকারীর নামে পৃথক কর্জ্জের খাতার একটা হিসেব খুলে দেখানো হবে। কর্জ্জের টাকার পরিমাণ,—সে টাকা শোধ করবার তারিখ, দেয় সুদের হার, প্রতিজ্ঞাপত্র বা অন্য কোন রকম দলিল, যার ওপর ভর করে টাকাটা কর্জ্জ দেওয়া হয়েছে—সব কিছুর প্রমাণই সেই খাতায় থাকবে। কিন্তু সে যাই হোক, একথা ত অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, হাওলাতকারীকে চেক লিখে টাকা তোলবার ক্ষমতা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক একটা দায় স্বীকার করে নিচ্ছে। আইনের চোখে এ দায় এবং প্রকৃত আমানতকারীর চেক মেটাবার দায়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এর মর্ম্ম হল এই যে, ধার দেবার সময় ব্যাঙ্ক নগদ টাকা না দিয়ে তার বিনিময়ে একটা দায় স্বীকার করে নিচ্ছে। এই সমস্ত লেনদেনের পিছনে একটা প্রচ্ছন্ন চুক্তি আছে—ব্যাঙ্ক চেকের দায় মেটাতে বাধ্য, আর হাওলাতকারী নির্দ্দিষ্ট তারিখে সুদসহ তার কর্জ্জের টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য। এ রকম ধার দেবার অব্যবহিত পরেই ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশ-পত্র তৈরী করলে দেখা যাবে যে, চেকের দায়টা তার দেনার ঘরে পড়েছে, আর কর্জ্জের টাকাটা দেখানো হয়েছে তার সম্পত্তির ঘরে। দায়িত্বের দিক্ থেকে হাওলাতি আমানত প্রকৃত আমানতেরই সামিল। কাজেই রিজার্ভ বা মজুদের পরিমাণ এই দু'রকম আমানতের সমষ্টি পরিমাণের অনুপাতেই নির্দ্ধারণ করা হয়ে থাকে। তাই বলছিলাম যে, ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ হাওলাত দিতে পারবে, তা নির্ভর করে তার রিজার্ভ বা মজুত টাকার আয়তনের ওপর।

প্রঃ—কিন্তু সে সম্বন্ধে "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এর কি হাত আছে ?

উঃ—"ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" যে ভাবে এর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সেটাও একটা প্রথাগত ব্যাপার। ইংলণ্ডের যৌথ ব্যাঙ্কগুলি সকলেই এখন "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এর কাছে কিছু পরিমাণ টাকা গচ্ছিত রাখতে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছে। এরকম আমানতের পরিমাণ তাদের সম্পত্তির সমষ্টি মূল্যের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ হবে। এই আমানতি টাকাটা তারা নগদ টাকারই সামিল মনে করে এবং রিজার্ভ বা মজুত টাকার হিসেব করবার সময় তারা এই আমানাত টাকাটাকে এমনি মনে করেই কাজ করে থাকে। কোন কারণে যদি এই আমানতি টাকা কমে যায়, তা' হলে রিজার্ভের টাকাই কমে গেল বুঝতে হবে।

প্রঃ—এই আমানতি টাকাটাকে নগদ বলে মনে করা হয় কেন ?

উঃ—টাকাটা অস্থায়ী আমানতে থাকে,—দাবীমাত্রই পাওয়া যাবে বলেই তাকে নগদ টাকার সামিল মনে করা হয়।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—এখন "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" যদি এই আমানতি টাকা কমিয়ে দিতে পারে তা'হলেই সে যৌথ ব্যাঙ্কগুলির হাওলাত দেবার ক্ষমতাও খর্ব্ব করে দিতে সমর্থ হ'তে পারে বুঝতে হবে। বস্তুতঃ, কোন কোন সময় একে তাই করতে হয়।

প্রঃ—কিন্তু আমানতের টাকা সে কমাবে কি করে ?

উঃ—তার জন্য এই ব্যাঙ্ক যৌথ ব্যাঙ্ক এবং বিল দালালদের কাছে বিল বা প্রতিজ্ঞাপত্র বা অন্য কোন সিকিউরিটির বিনিময়ে ধার করতে আরম্ভ করে। এই ধার দেবার ফলেই শেষোক্ত ব্যাঙ্কগুলির যে টাকা "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডে" আমানতে গচ্ছিত থাকে তার পরিমাণ কমে যায়। ধর কোন একটা যৌথ ব্যাঙ্কই যদি ধার দিতে সম্মত হয় তা হ'লে "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" টাকাটা সেই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নগদ চেয়ে নেবে না,—তার নিজের হিসেব খাতায় উক্ত যৌথ ব্যাঙ্কের নামে আমানতে যে টাকা গচ্ছিত আছে তাই থেকেই কর্জ্জের পরিমাণ টাকা বাদ দেওয়া হবে। ফলে সেই ব্যাঙ্কের রিজার্ভের টাকা কমে যাবে।

প্রঃ—কিন্তু কোন যৌথ ব্যাঙ্ক যদি ধার না দেয় ?

উঃ—তা'হলেও শেষ পর্য্যন্ত এমনি অবস্থাই দাঁড়াবে। ধর কোন বিল-দালাল বা অন্য কোন লোক ধার দিতে রাজী হ'ল। তাদের কোন না কোন ব্যাঙ্কে হয়ত আমানতে টাকা গচ্ছিত আছে। ধার দেবার সময় তারা নিজ নিজ ব্যাঙ্কের ওপর "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"কে দেয় বলে চেক লিখে দিল। এতেও ব্যাঙ্কগুলির আমানতি টাকা কমে যাবে। কারণ "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" চেকের টাকা ব্যাঙ্কের কাছে দাবী না করে সেই ব্যাঙ্কের যে টাকা "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এ জমা রয়েছে, তাই থেকে বাদ দিয়ে দেবে।

প্রঃ—হাঁ, যৌথ ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভএর ওপর "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এর যথেষ্ট প্রতিপত্তি রয়েছে, তা এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু বাজার চল্‌তি সুদের ওপরেও যে এই ব্যাঙ্কের প্রভাব রয়েছে বলছিলেন, সেটা কি করে সম্ভব হচ্ছে, তাত ঠিক বোঝা গেল না।

উঃ—সেটা আলাদা কিছু ব্যাপার নয়। একই ভাবে রিজার্ভ এবং বাজার সুদ দুইই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। পূর্ব্বেই বলেছি যে, রিজার্ভ কমে গেলেই ব্যাঙ্ক তার হাওলাত দেবার ব্যাপার সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হয়। এই কর্জ্জ সঙ্কোচ করবার প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে সুদের হার চড়িয়ে দেওয়া। সুদের হার চড়িয়ে দিলে কর্জ্জের চাহিদা আপনিই কমে আসে। বিল কিংবা সিকিউরিটি কেনবার হুজুক আর থাকে না, কারণ চড়া সুদে ব্যাঙ্কের কাছে ধার নিয়ে বিল-দালালরা যে বাটা সুদ দাবী করবে তাও সঙ্গে সঙ্গে চড়ে যেতে বাধ্য হয়। তাই বলছিলাম যে, "ব্যাঙ্ক

অব্ ইংলণ্ড" ইচ্ছা করলে ব্যাঙ্কমহলে চলতি সুদও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

প্রঃ—'ইচ্ছা করলে' বলছেন কেন? "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" কি সব সময় এ রকমভাবে বাজার চল্‌তি সুদ নিয়ন্ত্রণ করে না?

উঃ—না, দরকারও হয় না। কেবল যখন অত্যধিক বিদেশী বিল বা সিকিউরিটি আমদানির ফলে দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা বেড়িয়ে যেতে থাকে তখনই কেবল এই ক্ষমতা ব্যবহার করবার দরকার হয়, এর আগেই সে কথা বলেছি।

উঃ—বুঝেছি।

প্রঃ—একটা কথা বলা হয় নি। "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" কোন কোন সময় সোজাসুজি ভাবেও বাজার চলতি সুদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বিল দালালরা যখন যৌথ ব্যাঙ্কের কাছে টাকা ধার পায় না, তখন নগদ টাকার জন্ত তারা "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এর কাছে নিজ নিজ কেনা বিল "রিডিস্কাউন্ট" অর্থাৎ পুনরায় বিক্রী করতে বাধ্য হয়। এই সময় 'রিডিস্কাউন্টিংএর' বাটাসুদ বাড়িয়ে দিয়ে "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" বিল-দালালদের বিলের ওপর আদায়ী সুদ চড়িয়ে দিতে বাধ্য করাতে পারে। বিল দালালরা সোজাসুজি "ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড"এর কাছে সাহায্য চাইলেই এমনি ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'তে পারে। নতুবা বাজার সুদ চড়াবার জন্ত পূর্ব্বে যে পদ্ধতির কথা বিবৃত করেছি, তাই অনুসরণ করতে হয়।

প্রঃ—কিন্তু সুদ চড়িয়ে দিলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হয় না কি?

উঃ—তাত একটু হয়ই। তবে স্থায়ী ভাবে ত আর এ রকম ব্যবস্থা করা হয় না! কেবল সোনা রপ্তানির বিপত্তি নিবারণ করবার জন্তই কিছুকালের জন্ত এ রকম ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। কর্জ্জের সুদ চড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমানতি হিসেবের ওপর দেয় সুদের হারও চড়ে যায়। তখন বিদেশ থেকে বিল বা সিকিউরিটি আমদানি না হয়ে বরং ইংলণ্ডে আমানতে বেশী সুদ অর্জ্জন করবার জন্ত বিদেশ থেকেই সোনা আমদানি হ'তে থাকে। এমনি করে দেশের সোনার পুঁজি যখন যথেষ্ট বেড়ে যায়, তখন আর সোনা রপ্তানির ভয়ও থাকে না,—আর তার জন্ত বাজার সুদ চড়িয়ে রাখবারও প্রয়োজন হয় না।

প্রঃ—আচ্ছা "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এর গঠন এবং নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা রয়েছে?

উঃ—এই ব্যাঙ্কটা ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হ'লেও এটা একটা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে এক বিশেষ সনন্দপত্রের জোরে এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই সনন্দপত্রের ব্যবস্থানুসারে ব্যাঙ্কটীর পরিচালনভার দুটি প্রধান কর্ম্মচারীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে,—তাঁদের পদবী হ'ল গভর্ণর ও ডেপুটী গভর্ণর। এঁরা এক পরিচালক সমিতির পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন। গভর্ণর ও ডেপুটি গভর্ণরকে নিয়ে সমিতির মোট মেম্বর সংখ্যা ২৪,—সমিতির সাধারণ মেম্বরদের পরিচয় হ'ল "ডাইরেক্টর।"

প্রঃ—সমিতির মেম্বর নির্ব্বাচন করে কে?

উঃ—ব্যাঙ্কের পাঁচশ' পাউণ্ড বা তার অতিরিক্ত মূল্যের "ষ্টক"এর মালিকরা এইসকল "ডাইরেক্টর" নির্ব্বাচন করে থাকে। সাধারণ যৌথব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা এড়াবার জন্ত "ডাইরেক্টর" নির্ব্বাচনের ব্যাপারে এখন এমনি একটা নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে, যাতে অন্ত কোন ব্যাঙ্কের পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট কোন লোক "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এর "ডাইরেক্টর" নির্ব্বাচিত হতে পারে না। তা না হলেও, যাদের "ডাইরেক্টর" নির্ব্বাচন করা হয় তারাও যে ব্যবসাবাণিজ্য-ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিমান লোক, তাতে সন্দেহ নেই। যারা ডাইরেক্টর নির্ব্বাচিত হয় তারা সকলেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রজা।

প্রঃ—এসব ডাইরেক্টরের নির্ব্বাচন কতদিনের জন্ত বলবৎ থাকে?

উঃ—গভর্ণর, ডেপুটি গভর্ণর থেকে আরম্ভ করে সব

"ডাইরেক্টর"ই এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু বৎসর কালের জন্য নির্ব্বাচিত হলেও এদের পুন-নির্ব্বাচিত হবার অধিকার আছে।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্কের পরিচালনায় গভর্ণমেণ্টের কোন হাত নেই কি?

উঃ—না, শুধু নোট বের করা আর প্রতি সপ্তাহে কার্য্য-বিবরণী প্রকাশ করবার ব্যাপারেই এই ব্যাঙ্ককে গভর্ণমেণ্টের আইন মেনে চলতে হয়। তা' ছাড়া আর সব কাজেই এর পুরো স্বাধীনতা আছে। এই ব্যাঙ্কের পরিচালনা সম্বন্ধে আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। শুধু গভর্ণমেণ্ট নয়, সাধারণ অংশী-দারদেরও এই ব্যাঙ্কের পরিচালনায় কোন হাত নেই। অংশীদারদের সাধারণ সভার নিয়মিত অধিবেশন হয় বটে, কিন্তু তাতে শুধু পরিচালক সমিতির মন্তব্যগুলিই পাস করিয়ে নেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এই পরিচালক সমিতিই "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এর কারবার নিয়ন্ত্রিত করছে।

প্রঃ—কিন্তু একটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে এতটা অবাধ ক্ষমতা দেওয়া ভাল হতে পারে কি? যে প্রতিষ্ঠানের ওপর সমগ্র দেশের আর্থিক উন্নতি অবনতি নির্ভর করে তার ওপর গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয় নয় কি? কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মাত্রেরই জাতীয় ভাব এবং আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত?

উঃ—তা বটে, কিন্তু "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" কোন বাঁধাধরা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হ'লেও এটা যে একটা খাঁটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মত কাজ করে যাচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। কেন যে এরকম সম্ভব হচ্ছে তা যাচাই করতে গেলে দেখবে যে, ইংলণ্ডে এমন কতকগুলি আদর্শমূলক প্রথা প্রতিষ্ঠালাভ করেছে যা কোন আইনের চেয়েই কম প্রবল নয়। সেখানকার যৌথ ব্যাঙ্কগুলির "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এ আমানতে রিজার্ভের টাকা গচ্ছিত রাখা যে একটা প্রথাচালিত ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়, সেকথা পূর্ব্বেই বলেছি। এ রকমভাবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের রিজার্ভের টাকা কেন্দ্রীভূত করবার জন্য ইংলণ্ডে কোন আইন করবার দরকার হয়নি,—অথচ এর জন্যই যুক্তরাষ্ট্রে আইন করবার দরকার হয়েছিল। ইংলণ্ডে এমনি কতকগুলি প্রথা রয়েছে বলেই ব্যাঙ্কের জন্য বিশেষ করে কোন আইন পাশ করবার দরকার হয়নি।

প্রঃ—কিন্তু "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" যে একটা জাতীয় প্রতি-ষ্ঠানের আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে তার কি প্রমাণ রয়েছে?

উঃ—প্রথম দেখ ইংলণ্ডে নোট বের করবার ক্ষমতা এখন এই ব্যাঙ্কেরই একচেটিয়া দখলে রয়েছে। গভর্ণ-মেণ্টের ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত লেনদেনও সব এই ব্যাঙ্কের মারফৎই চলছে। দেশের হিতাহিতের দিকে নজর রেখেই এই ব্যাঙ্ক প্রয়োজনমত সমস্ত ব্যাঙ্কমহলকে নিয়ন্ত্রিত করছে,—সোনা রপ্তানি ও টাকার সুদ নিয়ন্ত্রণের তাৎপর্য্যই হচ্ছে এই। কোন বিপর্য্যয় ঘটলে আর সব ব্যাঙ্ক এই ব্যাঙ্কেরই মুখ চেয়ে থাকে। এর পরেও যে এই ব্যাঙ্ক একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়, সে কথা বলা চলে কি? শুধু স্বার্থ আর মোটা 'ডিভিডেণ্ড' দেবার মতলবের দ্বারা যে ব্যাঙ্ক অনু-প্রাণিত হয়, তা কখনো এত গুরুতর দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিতে পারে না। শুধু জনসাধারণ নয় সমস্ত যৌথ ব্যাঙ্ক, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সকলেরই ব্যাঙ্ক হচ্ছে "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"।

প্রঃ—"ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"এর নোট বের করবার ব্যাপার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

উঃ—১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এর জন্য এক আইন পাশ করা হয়। তাতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" এবং আর যে দু'চারটী ব্যাঙ্ক তখন নোট বের করছিল, তাদেরই শুধু নোট বের করবার ক্ষমতা থাকবে। এই আইন পাশ হবার পর থেকে আর সবগুলি ব্যাঙ্ক নোট বের করা বন্ধ করে দেবার জন্য কার্য্যতঃ "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" এ সম্বন্ধে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। সমগ্র ইংলণ্ড এবং 'ওয়েলস্'এ এখন কেবল এই ব্যাঙ্কটাই নোট বের

করছে। এর নোট বের করা সম্বন্ধে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের আইন কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দিয়েছে!

প্রঃ—সেই নিয়মগুলি সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?

উঃ—এই আইনের ফলেই ব্যাঙ্কটাকে দুটা পৃথকভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তার একটার নাম "নোট বিভাগ"—আর একটার নাম "ব্যাঙ্ক বিভাগ"। দুটোর লেনদেনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। নোট বিভাগ এবং ব্যাঙ্ক বিভাগের রিজার্ভ ফণ্ড আলাদা করে রাখা হয়। এ দুটো বিভাগ যে পৃথক থাকতে পারে তা ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত থেকেই বুঝতে পারবে। এদেশে নোট বের করবার ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করছে "কারেন্সি কন্‌ট্রোলার", আর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ সম্পূর্ণভাবে না হলেও অন্ততঃ আংশিক ভাবে চালাচ্ছে "ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক"। দুটো বিভাগ পৃথক কর্ত্তৃত্বাধীন রাখলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা হীনশক্তি হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু এ দুটোর যে পৃথক সত্বা থাকতে পারে, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সেটাই লক্ষ্য করবার বিষয়।

প্রঃ—'নোট বিভাগ' সম্বন্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে কি?

উঃ—শুধু একটা ব্যবস্থা রয়েছে এই যে, একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নোটের জন্যই রিজার্ভ বাবদ সিকিউরিটি জমা রাখা চল্‌বে। তার বেশী নোট ছাপতে হ'লেই সমান মূল্যের সোনা রিজার্ভে মজুত রাখা চাই।

প্রঃ—সিকিউরিটি রেখে যে নোট ছাপানো হয় তার জন্য কত পরিমাণ নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয়েছে?

উঃ—গোড়ায় এর পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। অন্যান্য ব্যাঙ্ক নোট বের করা বন্ধ করে দেবার জন্য এখন তাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড।

প্রঃ—এর বেশী হলেই প্রত্যেক পাউণ্ড নোটের জন্য সোনা রাখতে হবে?—না হলে নোট বের করা চলবে না?

উঃ—না, তবে বিশেষ কোন বিপর্য্যয় ঘটলে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের আইনকে রদ করে দিয়ে কিছুকালের জন্য অতিরিক্ত নোট ছাপানো যেতে পারে বটে।

প্রঃ—ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুসারে নোট বাড়াবার উপায় নেই?

উঃ—না।

প্রঃ—তা হলে ত ইংলণ্ডের নোট বের করবার ব্যবস্থাকে সমর্থন করা চলে না!

উঃ—তাত নয়ই।—তবে এ জন্য যে মুস্কিল হ'তে পারত ইংলণ্ড তা এড়িয়ে চলতে সমর্থ হচ্ছে।

প্রঃ—কেমন করে?

উঃ—সেও এক চলিত প্রথার জোরেই সম্ভব হচ্ছে। নোটের অবাধ বিস্তার সম্ভব না হ'লেও—ইংলণ্ডের সাধারণ যৌথ ব্যাঙ্কগুলি প্রয়োজন মত কর্জ্জমূলক আমানতে চেকের দায় ঘাড়ে তুলে নিয়ে ব্যবসাদার কারখানাওয়ালাকে সাহায্য করতে পারছে। এ রকম ভাবে দেশের চল্‌তি অর্থের পরিমাণ বাড়ানো সম্বন্ধে কোন সীমা নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয় নি। কাজেই নোটের যথেচ্ছ প্রসারণের অভাব চেকের যথেচ্ছ প্রসারণের দ্বারা মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

প্রঃ—বুঝেছি।

উঃ—এই প্রসঙ্গে বিলাতী ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আরও দু'একটা কথা বলা দরকার মনে হচ্ছে। ইংলণ্ডে যৌথ-ব্যাঙ্কগুলির পরস্পর সম্বদ্ধ হ'বার চেষ্টা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। তার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হয় নি। এর ফলে ইংলণ্ডে প্রধান ব্যাঙ্কের সংখ্যা যেমন কমে গিয়েছে, শাখা ব্যাঙ্কের সংখ্যা তেমনি বেড়ে গিয়েছে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে গোটা ইংলণ্ডে প্রাইভেট-ব্যাঙ্কিং ফার্ম্মের সংখ্যা ছিল ৫৫৪—আর তাদের শাখা অফিসের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৮১। তারপর একশ' বছর ধরে ব্যাঙ্ক-সংযোগের যে আন্দোলন চলেছে, তাতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে দেখবে রয়েছে মাত্র ১৩টা যৌথ-ব্যাঙ্ক —আর এ কয়টী ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮,০৮১। এই যৌথ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম পাঁচটা বাঘা ব্যাঙ্কের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এদের নাম হচ্ছে 'মিড্‌ল্যাণ্ড', 'লয়েড্‌স্,' 'বার্কলেস্', 'ন্যাশানাল প্রভিন্সিয়াল' ও 'ওয়েষ্ট্‌মিনিষ্টার'। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এদের শাখা-সংখ্যা যথাক্রমে ২,০০০, ১,৭০০, ১,৬০০, ১,১০০, এবং ৯০০ অতিক্রম করে গিয়েছিল। এই সময় ইংলণ্ডে সমস্ত যৌথ ব্যাঙ্ক-গুলিতে যে টাকা গচ্ছিত ছিল তার পরিমাণ হয়েছিল ১৮০ কোটি ৬৮ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড—তার মধ্যে এই 'বাঘা বাঘা' পাঁচটা ব্যাঙ্কেই ছিল ১৫১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৩৫ হাজার পাউণ্ড। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক-সংযোগের ব্যাপার কোথায় এসে পৌঁচেছে, তা এই থেকেই বুঝতে পারবে।

প্রঃ—আচ্ছা, ইংলণ্ডে যৌথ-ব্যাঙ্কগুলির কারবার নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য কোন রকম বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয় নি কেন? সেকি শুধু চলিত প্রথাগুলির জন্যই?

উঃ—এইখানেই ইংলণ্ডের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের পার্থক্য রয়েছে। ইংলণ্ডবাসী মনে করে যে, কেবল আইন দিয়েই একটা শক্তিমান ব্যাঙ্কিং সিষ্টেম গড়া যায় না; তার জন্য চাই একদল বিচক্ষণ ব্যাঙ্ক-পরিচালক। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ইংরেজের অভিমত হ'ল এই যে, আইন শুধু সংযত করতেই পারে—একটা শক্তিমান ব্যাঙ্কিং সিষ্টেম গড়ে তুলতে যে কল্পনাশক্তি উদ্দীপনা বা উৎসাহ থাকা দরকার কোন আইনই তা সৃষ্টি করতে পারে না। তাই ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-গুলি সেখানকার সাধারণ যৌথ-প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত আইনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।
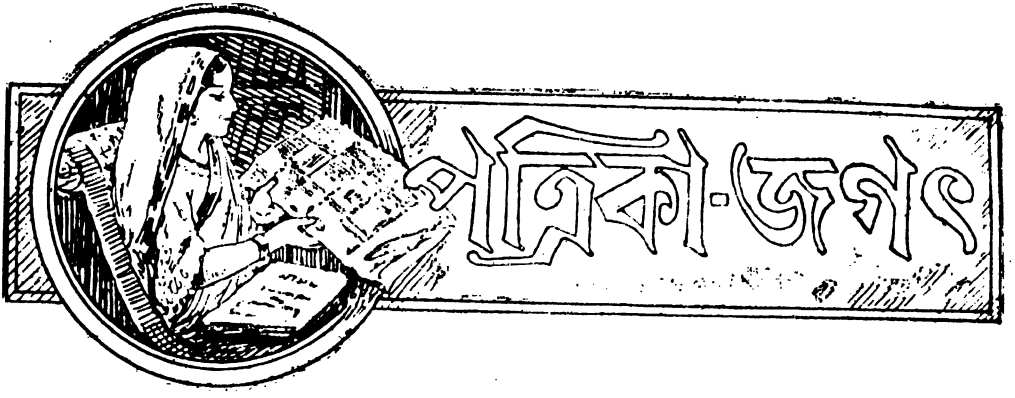
"ইকনমিক্ জার্ণাল" (মার্চ্চ, ১৯৩০)

বিলাতের বেকার-সমস্যা

বিলাতে বেকার সমস্যা আজকাল খুবই প্রবল। এই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যে নানা দিক্ থেকে নানাভাবে চেষ্টা চলছে। বিলাতের দু'জন প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানবিদ্ ঐ সম্বন্ধে কিভাবে চিন্তা করছেন তা আমরা এই প্রবন্ধে জানাতে চাই।

গত বৎসর অধ্যাপক হেনরি ক্লে (ইনি কয়েক দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন) একখানা বই লিখেছিলেন। তার নাম হচ্ছে "দি পোষ্ট ওয়ার আন্‌এম্প্লয়মেণ্ট ইন গ্রেট বৃটেন। এই বইয়ের সমালোচনা বেরিয়েছে এই বছরের মার্চ্চ মাসের "ইকনমিক্ জার্ণ্যালে"। সমালোচক—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডুইন ক্যানান। সমালোচনাটি বেশ দীর্ঘ। তা থেকেই বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্যানান ও অধ্যাপক ক্লের মতামত বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারা যায়।

অধ্যাপক ক্যানান প্রথমেই বলছেন, অল্পকালব্যাপী আর দীর্ঘকালব্যাপী এই দুই শ্রেণীর বেকার আছে। এই দুই শ্রেণীতে বেকারদের ভাগ করা দরকার। তার কারণ "অল্পকালের জন্য" বেকার হওয়া "দীর্ঘকালের জন্য" বেকার হওয়ার মত সাংঘাতিক নয়। মজুরদের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দীর্ঘকালের জন্য যদি বেকার থাকে সেটা যতটা ভীষণ, তাদের অধিকাংশই যদি কয়েকদিনের জন্য বেকার থাকে সেটা মোটেই ততটা ভীষণ নয়। এই কারণে বেকার সমস্যার গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে কতগুলা লোক কত বছর, দিন বা মাস বেকার হয়ে আছে তা জানা বিশেষ দরকার। তা ছাড়া অল্প কালের জন্য যে বেকার সমস্যা তার কারণ দীর্ঘকালস্থায়ী বেকারের কারণগুলা হতে সাধারণতঃ সম্পূর্ণ পৃথক। এই দুই প্রকারের লোকের দাওয়াই ঐ কারণে এক না হয়ে পৃথক। এই জন্যেও এদের আলোচনা পৃথক হওয়া দরকার।

এই সব কথা ব'লে অধ্যাপক ক্যানান কালের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বেকার ভাগ করার আবশ্যকতা বুঝিয়ে, বলছেন যে, অধ্যাপক ক্লে তাঁর গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আদবেই ভাল করে আলোচনা করেন নি। বিলাতে বেকারদের বেকার সমস্যা কত দিন যাবৎ চলছে তার একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অধ্যাপক ক্লের গ্রন্থে স্থান পায় নি।

অল্পকালস্থায়ী বেকার অবস্থা সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্যানানের বক্তব্য এই। যে সব শিল্পের বেশ শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে এবং যেগুলার বেকার বীমার বন্দোবস্ত সব চেয়ে ভাল, সেই গুলায়ই অল্পকালস্থায়ী বেকারের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যাচ্ছে। সেই জন্যে ক্যানান বলেন যে, এই শ্রেণীর বেকার অবস্থার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে বেকার বীমার প্রবর্ত্তন। যখন কারখানাওয়ালারা দেখে তাদের লাভ তেমন হচ্ছে না, তখন তাদের ইচ্ছা হয় যে, কয়েক জন লোক ছাড়িয়ে দিয়ে ব্যয়-সংক্ষেপ করি। যদি বেকার বীমা না থাকতো তা হ'লে লোক ছাড়াতে কারখানাওয়ালাদের ইতস্ততঃ করতে হ'ত। কারণ তা হ'লে মজুরদের সঙ্গে তাঁদের ঝগড়া বাঁধবার সম্ভাবনা। কিন্তু বেকার বীমা আছে বলেই কারখানাওয়ালারা জানে যে লোক ছাড়ালেই তারা বেকার বীমার ফাণ্ড থেকে সাহায্য পাবে। কাজেই লোকদের ক্ষেপবার সম্ভাবনা কম। এই কারণেই কারখানাওয়ালারা একটু দুঃসময়ে পড়লেই লোক ছাড়াতে দ্বিধা করে না।

বেকার বীমা বেকার সমস্যা বাড়িয়েছে আর এক রকমে। যদি বেকারেরা জানে যে, বেকার অবস্থায় তারা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সাহায্য পাবে, তা হলে তারা যে কোন কাজ পেলেই তাতে যোগ দিতে চায় না, আরও একটু ভাল কাজের জন্যে অপেক্ষা করবার শক্তি পায়। অবশ্য বিলাতে লেবার এক্সচেঞ্জ আছে; আর লেবার এক্সচেঞ্জ বেকারদের যোগ্য কাজ জুটিয়ে দিয়ে থাকে। কিন্তু লেবার এক্সচেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বেকার বীমা থাকার জন্যে বেকারেরা যে আরও ভাল কাজ পাবার জন্যে একটু অপেক্ষা করতে সাহসী হয় এবং তাতে বেকার অবস্থা আরও দীর্ঘ করে তোলে তাতে সন্দেহ নেই।

অল্পকালস্থায়ী বেকার অবস্থার দাওয়াই হিসাবে অধ্যাপক ক্যানান প্রস্তাব করেন যে, অন্ততঃ যে সময়টুকু বেকার থাকলে বেকার বীমার ফাণ্ড থেকে টাকা পাবার দাবী করা যায় সেই সময়টুকুকে আরও দীর্ঘ করে দেওয়া উচিত।

তার পর হচ্ছে দীর্ঘকালস্থায়ী বেকার সমস্যার কথা। এ রকম বেকার অবস্থার কারণ কি?

দীর্ঘকালস্থায়ী বেকার অবস্থা দেখা যায় বিলাতের প্রধান প্রধান রপ্তানি শিল্পগুলাতে। কয়লা, বস্ত্র ও এঞ্জিনিয়ারিং—এই কটা শিল্পেই বেকার সমস্যা প্রবল। এই সব শিল্পে বেকার সমস্যার কারণ সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্লে ও অধ্যাপক ক্যানান দুজনেই একমত। দুজনেই বলেন যে, এই সব শিল্পে উৎপন্ন মাল যে দরে বিদেশের বাজারে বেচলে এদের উৎপাদনের খরচা কুলায়, সে দরে এরা বেচতে পারছে না, তার চেয়ে কম দরে বেচতে বাধ্য হচ্ছে। সেই জন্যেই এই সব শিল্পের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, আর তার জন্যেই এই সব শিল্পে বেকার সমস্যা প্রবল।

দীর্ঘকালস্থায়ী বেকার অবস্থার কারণ সম্বন্ধে একমত হলেও তার দাওয়াই সম্বন্ধে অধ্যাপক ক্লে ও অধ্যাপক ক্যানানের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অধ্যাপক ক্লে বলেন যে, দুর্দ্দশাগ্রস্ত রপ্তানিশিল্পগুলাকে জীয়াইবার প্রধান উপায় হচ্ছে শিল্পগুলাতে যুক্তিযোগ প্রয়োগ করা অর্থাৎ শিল্পগুলা উন্নততর শাসন-প্রণালী ও কলকজার সাহায্যে চালানো, ছোট ছোট শিল্পগুলাকে বড় কারবারে পরিণত করা ইত্যাদি।

অধ্যাপক ক্যানান বলেন যে, যুক্তিযোগ প্রয়োগ করলে কিছু উন্নতি হবার সম্ভাবনা নেই। যুক্তিযোগ প্রয়োগ করলে মজুরপ্রতি উৎপাদন বাড়বে, তার ফলে কম মজুরে আগের সমান উৎপাদন চলবে। এর ফলে বেকারদের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না। তবে উৎপাদন-খরচা কমার জন্যে, ও কম দামে বেচার ফলে যদি চাহিদার পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পায়, তা হলে যুক্তিপ্রয়োগের আগে যত লোক কাজ পেত, যুক্তিপ্রয়োগের পরে তার চেয়ে বেশী লোক কাজ পেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তিপ্রয়োগের ফলে বেকার সমস্যা কমতে পারে কেবলমাত্র এক অবস্থায়—যখন চাহিদার পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পায়। বিলাতের দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্পগুলার মধ্যে কয়লা ও কাপড়ের শিল্পই প্রধান। এই দুই শিল্পেরই চাহিদা এরূপ শ্রেণীর নয় যে, দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ খুব বেশী বাড়বে। কাজেই যুক্তিপ্রয়োগ করলে বিলাতের দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্প-গুলার অবস্থা ফিরবার কোন সম্ভাবনা নেই।

বেকার সমস্যা সমাধানের আর একটা উপায় আছে—সেটা হচ্ছে যারা বেকার নয় তাদের মাইনে কমিয়ে দিয়ে যে মাইনেটা বাঁচবে তা দিয়ে বেকারদের মধ্য থেকে লোক নিযুক্ত করা। অধ্যাপক ক্যানান ও ক্লে দুজনেই এ পন্থা অবলম্বনের বিরোধী। অধ্যাপক ক্লে এর বিরোধী এই কারণে যে, এ পথ অবলম্বন করা একেবারে অসম্ভব, মজুরেরা কম মাইনে নিতে রাজীই হবে না। অধ্যাপক ক্যানান কিন্তু বলেন যে, এ পন্থা অবলম্বন শুধু অসম্ভব নয়, ও উপায়ে হাত দেওয়া আদবেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার কারণ এই—মাইনে কমিয়ে দিয়ে শিল্পগুলা যদি বেশী লোক পুষ্‌তে আরম্ভ করে, তার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে, উৎপাদন বাড়লেই দাম কমবে। অধ্যাপক ক্যানান বলেন যে, বিলাতের বিক্রী বেশীর ভাগ বিদেশের বাজারে, বিদেশীদের কাছে কম দাম নেওয়া কখনই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

বেকারের সংখ্যা কমাবার একটা তৃতীয় উপায় আছে। সেটা হচ্ছে—নতুন লোক দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্পগুলাতে যাতে না

ঢোকে, আর সেই শিল্পগুলা হ'তে মজুরদের সরিয়ে উন্নতিশীল শিল্পগুলাতে যাতে ঢোকে, তার ব্যবস্থা করা।

অধ্যাপক ক্লে এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী নন্। তিনি বলেন যে, যুদ্ধের পর থেকে মাত্র ৪ লাখ লোক এই রকমে আপনা হ'তে দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্পগুলাতে কাজ করা ছেড়েছে। গভর্মেণ্ট এই কাজ দ্রুত করবার জন্যে যে বোর্ড স্থাপন করেছিলেন, সেই বোর্ড ৮ মাসে মাত্র ২৮ হাজার লোককে সরাতে পেরেছে। সুতরাং এই প্রণালীতে কাজ ক'রে এ পর্য্যন্ত বিশেষ ফল পাওয়া যায় নি। তা ছাড়া, উন্নতিশীল শিল্পগুলা যতই উন্নতিশীল হোক্ না কেন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্পগুলাতে যত বেকার আছে তাদের স্থান দেওয়া উন্নতিশীল শিল্পগুলার পক্ষে অসম্ভব।

অধ্যাপক ক্যানানের মত ঠিক উল্টা। ইনি বলেন বিলাতের দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্পগুলা মরেই গেছে, তাদের আর জীয়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের অভাব নিবারণের জিনিষ অসংখ্য। সেইজন্য শিল্পের সংখ্যাও অগণিত। কতকগুলা রপ্তানি-শিল্প অধঃপাতে গেছে ব'লে বিলাতের চিন্তিত হবার কারণ নেই। বিলাত অন্য জিনিষ রপ্তানি করতে থাকুক—যে সব জিনিষের চাহিদা বিদেশের বাজারে এখনও আছে। যেমন, আফ্রিকার বাজার—এটা একটা প্রকাণ্ড বাজার। আফ্রিকার জন্যে নানা জিনিষ বিলাত তৈরী করতে পারে। তা ছাড়া, দেশের লোকের চাহিদা মেটাবার জন্যেও বিলাতের শিল্পপতিরা নানা জিনিষ তৈরী করতে পারেন আর তা তাঁদের বাধ্য হয়ে তৈরী করতে হবেই। তা না করে উপায় নেই। কারণ, প্রধান রপ্তানি-শিল্পগুলার ধ্বংস হলে রপ্তানির পরিমাণ কমবে। তার ফলে আমদানি কমবে। আমদানি কমলে বিলাতকে নিজের দেশে অনেক জিনিষ তৈরী ক'রে নিতে হবে।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক ক্লে বেকারের সংখ্যা কমাবার জন্যে জীর্ণ শিল্পগুলাকে নতুনভাবে গ'ড়ে তোলবার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু অধ্যাপক ক্যানান বলছেন, ওগুলা একেবারে মরতে বসেছে, ওদের আর জীবিত করা সম্ভব হবে না। তোমরা নতুন শিল্প ধর; তা ছাড়া বিদেশের বাজারের ওপর তোমরা এতদিন পর্য্যন্ত যে রকম একাগ্রভাবে নির্ভর ক'রে এসেছ তা আর চল্‌বে না, এখন ঘরের বাজারের দিকে দৃষ্টিপাত করো, আর দেশের মধ্যেই কতটা বেচাকেনা বাড়াতে পারো তার চেষ্টা দেখো।"

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত

"পল্লীস্বরাজ"

বাংলার পুষ্করিণীর দুরবস্থা

বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থানের জন্য বাংলা দেশের সমস্ত জেলা-বোর্ডগুলি গ্রামে গ্রামে নলকূপের ব্যবস্থা করিতেছেন। নলকূপের জল অম্ল, অজীর্ণ, কলেরা প্রভৃতি পীড়ায় অব্যর্থ ঔষধের মত কাজ করে, ইহার জলে বাহিরের কোন প্রকার বীজাণু প্রবেশ করিতে পারে না, পুষ্করিণী বা কুয়ার জল হইতে নলকূপের জল এই কারণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আজ বাংলা দেশে হাজার হাজার নলকূপ নির্ম্মিত হইতেছে। একটি পুষ্করিণী বা একটি ইন্দারা নির্ম্মাণ করিতে যত টাকার দরকার হয়, অনেক ক্ষেত্রেই নলকূপ নির্ম্মাণের খরচ তদপেক্ষা কম; নলকূপের সংখ্যা-বৃদ্ধির ইহা অন্যতম কারণ। গত পাঁচ বৎসরে ইহার সংখ্যা যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে মনে হয় পুষ্করিণী খনন বাংলায় ক্রমশঃ লোপ পাইবে।

নলকূপের বৃদ্ধির সঙ্গে নলকূপ-ঠিকাদারের সংখ্যাও বাড়িতেছে। আমাদের গ্রামের ৪০টি যুবক এই ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত বাংলা দেশে আমার ছাত্র-সংখ্যাই দেড় শতের উপর হইবে। যাঁহারা জলধারার প্রয়োগে নলকূপ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের সংখ্যাও কম নহে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়, নলকূপের সংখ্যা দিন দিন কিরূপ বাড়িয়া যাইতেছে। হুগলী, বর্দ্ধমান, যশোহর, ২৪ পরগণা এবং ফরিদপুর জেলায় যে অনুপাতে নলকূপ নির্ম্মিত হইতেছে, পুষ্করিণীর সংখ্যা তাহার হাজার ভাগের এক ভাগও বাড়িতেছে না।

যাঁহারা দেশের হিত চিন্তা করেন, তাঁহারা নলকূপের এই অতি বৃদ্ধি দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছেন। গ্রামে গ্রামে পুষ্করিণীগুলির দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। পুষ্করিণী গ্রামের

শোভা। পশুপক্ষী পুষ্করিণীর জল ইচ্ছা হইলেই পান করিতে পারে। নলকূপে সে সুবিধা নাই। পুষ্করিণীর মাছ বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় পুষ্করিণীর জল হইতে নিকটবর্ত্তী চাষের জমিতে সেচের কাজ চলিয়া থাকে। এই সকল অঞ্চলে পুষ্করিণীর অতিশয় দুরবস্থা হইয়াছে। পুষ্করিণী হইতে যে পরিমাণ জল দোনের সাহায্যে আহরণ করা যায় নলকূপ হইতে ঐ পরিমাণ জল সংগ্রহ করিতে হইলে ইঞ্জিন পাম্পের আবশ্যক হয়; সেজন্য তাহা সংগ্রহ করা সাধারণ চাষীর সাধ্যের অতীত। উৎকৃষ্টরূপে পুষ্করিণী খনন করা হইলে, ইহার জল নলকূপের জলের মত সুপেয় হইতে পারে। পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার না হইলে, ইহার স্থির জলে নানা প্রকার পোকা মাকড় এবং জলজ উদ্ভিদ জন্মিয়া দেশের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়।

সমস্ত দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে পুষ্করিণীগুলিকে নষ্ট হইতে দেওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে পল্লী-অঞ্চলের স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতির অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। কিভাবে পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার হয় তাহার উপায় চিন্তা করা দেশহিতৈষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যত পুষ্করিণী খনন করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছি না। নূতন পুষ্করিণী খনন কদাচিৎ আবশ্যক হয়। অন্ততঃ একটি পুষ্করিণী নাই এরকম গ্রাম কোথায়ও দেখা যায় না। ইহাদিগের পঙ্কোদ্ধার করিলে আবার গ্রামের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পঙ্কোদ্ধার করিবার কোন প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে দেশের মহাকল্যাণ সাধিত হইত। পুষ্করিণীর জলপূর্ণ অবস্থায় মাটী জলের সঙ্গে তরল করিয়া পঙ্কোদ্ধার করিতে পারিলে অত্যন্ত সুবিধা হইতে পারে। খাল বা নদী কাটিবার জন্য আজকাল যে সমস্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, পুষ্করিণী খননের পক্ষে তাহা উপযোগী নহে। এই সকল যন্ত্রপাতির আয়তন এত বড় এবং আড়ম্বর এত বেশী যে পুষ্করিণী খনন ব্যাপারে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে না। কোন আবিষ্কারক ঐ যন্ত্রগুলিকে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করুন। আট কি দশ ঘোড়ার অয়েল ইঞ্জিনে যাহাতে ঐ কল সম্যক প্রকারে চলিতে পারে যন্ত্রের অবয়বগুলি তাহার উপযোগী করিয়া তৈয়ারী করুন। জলের মধ্যে ইঞ্জিনের সাহায্যে মাটী কাটায় নিম্নলিখিতরূপ সুবিধা আছে:—

(ক) এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে বৎসরে বার মাসই পঙ্কোদ্ধার কার্য্য চলিতে পারিবে, বর্ষার জল এ কার্য্যের কোন অন্তরায় ঘটাইবে না।

(খ) বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় গভীর পুষ্করিণী খননের অন্তরায় আছে। সামান্য কাটিলেই পুষ্করিণীতে জল বাহির হইয়া পড়ে, নদীর জল আসিয়া খনন কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটায়। এছাড়া বর্ষার জলে কত পুষ্করিণীর খননকার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। জলের মধ্যে মাটী কাটার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইলে এই সমস্ত অন্তরায়ই খনন কার্য্যের সহায় হইয়া দাঁড়াইবে।

(গ) এইরূপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে পুষ্করিণী খনন বা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার নলকূপ নির্ম্মাণের ন্যায় একটি ব্যবসায়ে পরিণত হইবে, এবং মূলধন সংগ্রহ করিয়া ইহার জন্য যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। গ্রামবাসিগণ পুষ্করিণীর মাছের বিনিময়ে সুপেয় জলবিশিষ্ট পুষ্করিণীর মালিক হইতে পারিবেন। এইরূপে সহস্র সহস্র কর্ম্মী যুবকের অন্ন-সংস্থানের পথ উন্মুক্ত হইতে পারিবে।

যাঁহারা জলের মধ্যে মাটী কাটার যন্ত্র আবিষ্কার করিতে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগকে কতকগুলি বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। যত প্রকার খাল ও নদী কাটার যন্ত্র আছে তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার কি কি অংশ পুষ্করিণী খননের উপযোগী হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তার সঙ্গে সম্যক পরিচিত হওয়া আবশ্যক। এই জন্য ড্রেজিং সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক সংগ্রহ করিতে হইবে।

যাঁহারা "স্লাজার পাম্প"এর দ্বারা নলকূপ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা এই আবিষ্কার কার্য্যে অনেক সহায়তা করিতে পারেন। স্লাজার শব্দের অর্থ যাহার দ্বারা পঙ্কোদ্ধার করা যায় সেইরূপ একটি যন্ত্র। এই স্লাজার যন্ত্রটীকেই আকারে বৃহৎ করিয়া পুষ্করিণীর পাঁক তোলার যন্ত্রে পরিণত করা

যায়। আমি নিজেও ইহার গবেষণাকার্য্যে অবতীর্ণ হইতেছি। আশা করি আমার উপযুক্ত ছাত্রগণ ও অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহাদের চিন্তা এবং উদ্ভাবনী-শক্তির দ্বারা এই কাজে সাহায্য করিবেন।

শ্রীবিপদবারণ সরকার

"কৃষক"

১৩৩৫ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় অরণ্যে অর্থের সন্ধান সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম। আজ আরও কিছু লিখিতেছি।

অরণ্যে বয়ড়াগুটী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বয়ড়া ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়। যদি কয়েকজন মিলিয়া বয়ড়া সংগ্রহ করেন ও নানাস্থানে চালান দেন তবে লাভ হইবে সন্দেহ নাই। অরণ্যের গাছ (যাহা কাঠ বা গৃহের খুটির জন্য ব্যবহার হইবে না) পোড়াইয়া কয়লা করিয়া বিক্রয় করিলেও বেশ লাভ হইবে। কারণ আজকাল পল্লীগ্রামে ১৲ টাকা করিয়া কয়লার মণ বিক্রয় হয়। তৎস্থলে যদি ॥০ আট আনা মণ দরে বিক্রয় করা যায় তবে কেন লাভ হইবে-না ?

অরণ্যে কামরাঙ্গা, আমলকী প্রভৃতি ফলের গাছ প্রচুর আছে। কামরাঙ্গার আদর পল্লীগ্রামে খুব আছে, কাজেই ইহা বিক্রয় হইবে। ঔষধের জন্য আমলকী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহা শুকাইয়া গেলেও বিক্রয় হইবে। অরণ্যে শিমূল তুলার গাছ প্রচুর পরিমাণে আছে, এই তুলা সংগ্রহ করিবার কাজ কয়েকজন যুবক যদি আরম্ভ করেন তবে তাহারা টাকা পাইবেন নিশ্চয়ই। তুলা চালান দেওয়া যাইতে পারে, নতুবা কোন বাজারের দোকানদারের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারা যায়।

অরণ্যে মাঝে মাঝে ঝিল থাকে, তাহাতে ধান্য প্রভৃতি শস্য বপন করিলে বেশ ফসল হইবে।

অনেক অরণ্যে দেবদারু গাছ দেখা যায়। দেবদারু গাছ খুব মূল্যবান। দেবদারু কাঠ কলিকাতায় ১৬।১৭৲ টাকা মণ বিক্রয় হয়। দেবদারু চূড়াও কলিকাতায় ৭৲।৮৲ টাকা মণ বিক্রয় হয়। কেহ যদি দেবদারু গাছ আছে এমন অরণ্য বন্দোবস্ত লইয়া কাঠ কলিকাতায় চালান দেন তবে অবশ্য লাভ হইবে। যাহাদের চেষ্টা আছে, উদ্যম আছে তাহারা অনুসন্ধান করিয়া কোন অরণ্য বন্দোবস্ত লউন। ৫ বৎসর পরে আপনি বড়লোকও হইতে পারেন। তবে একটা কথা। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিলে অধিকতর সুফল পাওয়া যায় এবং ইহাতে মূলধন যোগাড় করাও সহজ হয়।

অরণ্যে পিপুল গাছও পাওয়া যায়। পিপুলের দর কলিকাতায় প্রতি মণ ৬০।৭০ টাকা। পিপুল ঔষধেও আবশ্যক হয়। কেহ যদি এই পিপুল সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বা অন্য কোন স্থানে চালান দেন তবে নিশ্চয়ই লাভ হইবে।

অরণ্যে রিঠা গাছ আছে। রিঠার মন ৭৲।৮৲ হিসাবে। রিঠা পশমী, রেশমী, এণ্ডি বস্ত্র ধৌত করিবার সময় আবশ্যক হয়। রিঠা সংগ্রহ করিয়া চালান দেওয়া যাইতে পারে।

শুঁট গাছ অরণ্যে পথে ঘাটে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শুঁটের মণ ১৮।১৯৲ হিসাবে বিক্রী হয়। শুঁটের মুল সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দিলে ২১৩৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইবে। কিন্তু পেটেণ্ট শুঁট তৈয়ার করিতে পারিলে লাভ বেশী হইবে। প্রথমতঃ শুঁট গুড়া করিবার জন্য কল বসাইতে হইবে। পরে মিহি গুড়া করিয়া তাহা উত্তম টিনের কৌটায় পূর্ণ করিতে হইবে। সুদৃশ্য লেবেল দেওয়া আবশ্যক। টিনের কৌটা পাইকারী দরে ক্রয় করিলে বেশী মূল্য হইবে না। সচিত্র লেবলও বেশী ছাপাইলে খরচ অপেক্ষাকৃত কম পড়িবে। কাজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে করিতে পারিলে ভাল হয়।

লাক্ষাচাষ একটী লাভজনক ব্যবসায়। পলাশ, কুল, অশ্বথ, পাকুড়, করঞ্চা. করবী গাছে লাক্ষার চাষ করিতে হয়। বাংলা, বিহার উড়িষ্যা, আসাম, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে লাক্ষা চাষ করা যায়।

লাক্ষা পলাশ বৃক্ষে চাষ করিলেই ভাল হয়। কুসুম বৃক্ষেও করা যায়। যদি একান্তই ঐ বৃক্ষ বহুল পরিমাণে অরণ্যে না পাওয়া যায় তবে অড়হর বৃক্ষেও ইহার আবাদ করা যাইতে পারে। লাক্ষা একপ্রকার কীট হইতে হয়। কুল গাছের কলম লাগাইয়াও ইহাতে লাক্ষার আবাদ করা হয়। লাক্ষা আশ্বিন ও চৈত্র মাসে পাওয়া যায়। লাক্ষাকীট-সংযুক্ত

ডাল বীজরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রতি ২০টা ডাল এক টাকায় পাওয়া যায়। একপ্রকার গাছের বীজ অন্য প্রকার গাছে লাগাইতে নাই। ইহাতে কোন ফল পাওয়া যায় না। আবাদ কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিতে হয়। গাছ প্রতি ন্যূন পক্ষে ৮।১০ সের লাক্ষা পাওয়া যায়। লাক্ষার দর প্রতি মণ ২৫৲ হইতে ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী মজুমদার

"ইয়ং ইণ্ডিয়া"

ভারতের দারিদ্র্য

জনপ্রতি গড়ে দৈনিক আয়		টাকা
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	...	৩৲
অষ্ট্রেলিয়া	...	২।০
গ্রেটব্রিটেন	...	২৶৪ পাই
ক্যানাডা	...	১॥৵৮ পাই
ভারতবর্ষ	...	৴৭ পাই

ভারতবাসীর উপার্জ্জনের পন্থা

অরগ্যানাইজড্ ইণ্ডাষ্ট্রি	...	১%
এডমিনিষ্ট্রেশান	...	২%
যানবাহন	...	২%
ব্যবসা	...	৬%
কৃষি	...	৭০·৯%

লোক-সংখ্যা

সহর	...	৩ কোটি ২৪ লক্ষ
গ্রাম	...	২৮ কোটি ৬৪ লক্ষ

সহর ও গ্রাম

সহর	...	২৩০০
গ্রাম	...	৭০০,০০০

বেকার

কৃষিজীবীরা বছরে ৪ মাস এবং কোন কোন জেলায় বছরে ৬ মাস কালও বেকার থাকে।

খাদি বনাম দেশী কলের কাপড়

উপরের অঙ্কগুলি হইতে আমরা তিনটী বিষয় জানিতে পারি: (১) ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র, (২) অধিকাংশ ভারতবাসী গ্রামে থাকে এবং কৃষিদ্বারা জীবিকার্জ্জন করে (৩) এই কৃষিজীবীদের মধ্যে বেকার-সমস্যা সাংঘাতিক সুতরাং ভারতের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে এবং ইহার কোটি কোটি দুঃস্থ অধিবাসীকে সুখ শান্তি দিতে হইলে, এই পল্লীবাসী বিপুল জনসঙ্ঘকে তাহাদের নিজ নিজ বাসস্থানে থাকিয়া করিবার মত কাজ যোগানো একান্ত আবশ্যক।

খাদি কেন ভারতকে রক্ষা করিতে পারে এবং কল কেন পারে না তাহার প্রথম কারণ এই যে, কলে কাজ করিতে হইলে লোকদের নিজ নিজ পল্লীভবন ত্যাগ করিয়া সহরে যাইয়া বাস করিতে হয়। কৃষিজীবীদের পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব; তারা চায় এমন কোন কাজ যাহা অবসর সময়ে বাড়ীতে বসিয়া করা যাইতে পারে। খাদি তাহাদিগকে এই কাজ দিতে পারে। খাদি কেন ভারতকে রক্ষা করিতে সমর্থ এবং মিলের কেন সে সামর্থ্য নাই তাহার দ্বিতীয় কারণ এই যে, চরকার সাহায্যে অল্প সময়ে এবং কম ব্যয়ে বিপুল পরিমাণে খাদি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কিন্তু কলের সহায়তায় যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রচুর অর্থ ও সময়ব্যয় সাপেক্ষ। তাছাড়া ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মিলে বিদেশী কলকব্জা ও বিদেশী নৈপুণ্য আবশ্যক।

উপরের কথাগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য নিম্নপ্রদত্ত সংখ্যাগুলি লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে।

২০,০০০ হাজার টাকুযুক্ত একটী আধুনিক কল স্থাপনের আনুমানিক ব্যয় ১৬,৬০,৯১৭ টাকা। এই টাকা ব্যয় করিয়া আমরা ৮৩০,৪৫৮টা চরকা পাইতে পারি। এই চরকাগুলির সাহায্যে উৎপন্ন সূতার পরিমাণ উক্ত কলে উৎপন্ন সূতার ৬।৭ গুণ হইবে। কলের প্রতি টাকুতে কী ঘণ্টায় ৬০০ গজ উৎপাদন ও দৈনিক ১০ ঘণ্টা কলের কার্য্যকাল, এবং হাতের (চরকার) প্রতি টাকুতে কী ঘণ্টায় ২৫০ গজ উৎপাদন ও দৈনিক ৪ ঘণ্টা উহার কার্য্যকাল ধরিয়া উপরিউক্ত তুলনা করা হইয়াছে। প্রতি চরকার মূল্য হইয়াছে, যদিও গ্রামে উহা ১৲, এমন কি ৸০ আনায়ও ২৲ টাকা ধরাপাওয়া যায়। (মীরা)

মাইগ্রেশন ল'জ অ্যাণ্ড ট্রিটিজ। ভলিউম্ থ্রী: ইণ্টার-ন্যাশনাল ট্রিটিজ অ্যাণ্ড কনহ্বেনশনস্ (লোক চালাচালি আইন ও সমঝোতা। তৃতীয় খণ্ড: আন্তর্জ্জাতিক সমঝোতা ও কনহ্বেনশন)। ১৯২৯, জেনেহ্বা। ৭ শি, ৬ পে।

লীগ্ অব্ নেশন্সের অন্তর্গত আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিসের তাঁবে উপনিবেশ, লোক চলাচল ইত্যাদি লইয়া কতকগুলি গবেষণা হইয়াছে। তন্মধ্যে আইন ও সন্ধি বিষয়ে যে তিন খণ্ড গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তার প্রথম খণ্ডে এমিগ্রেশন বা বহির্গমন, দ্বিতীয় খণ্ডে ইমিগ্রেশন বা বাহির হইতে আগমন বিষয়ক আইন কানুন লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে আছে ৪০৪ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৮৬, আর তৃতীয় খণ্ডে ৩৮৪। এক হিসাবে এই তিনটি খণ্ডকে এক গ্রন্থ বিবেচনা করিলেও প্রত্যেকটি খণ্ড আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। ইংরেজী বহিগুলি ইংল্যণ্ডে পি এস্ কিং অ্যাণ্ড সন লিমিটেড্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে কি আছে

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় কিঞ্চিৎ গ্রন্থ পরিচয় আছে। তাহা হইতে গ্রন্থের স্বরূপ কি এবং ইহার জন্ম কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তা বুঝা যাইবে।

প্রথমেই বলিয়া রাখা দরকার যে, এইরূপ গ্রন্থ প্রণয়নে পুরা তিন বৎসর দরকার হইয়াছিল।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোন্ লোককে দেশের ভিতর ঢুকিতে দিব বা কাহাকে দেশ হইতে বাহিরে যাইতে দিব সে ত ঘরোয়া ব্যাপার। তা লইয়া আন্তর্জাতিক সমস্যার উদয় হয় কি? বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে এক দেশের আচরণ স্বভাবতঃ অন্য দেশের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবান্বিত করে। আমাদের দেশের ফিজি, কেনিয়া প্রভৃতি সমস্যা শুধু দেশীয় সমস্যা বলা যায় কি? তদ্রূপ আমেরিকার এশিয়াবাসী-বহিষ্কার-নীতি কোন প্রকারে অন্য-দেশ-নিরপেক্ষ জ্ঞান করা চলে না। বস্তুতঃ, লোক চালাচালির যে নীতিই কোন দেশ গ্রহণ করুক্ না তাতে অন্য সব দেশের সঙ্গে সম্পর্কটা অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য, অর্থাৎ এ বিষয়ে কোন দেশই অন্য দেশের আচরণে একেবারে উদাসীন থাকিতে পারে না। সেই জন্য দরকার রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বোঝাপড়ার ও সন্ধি সমঝোতা ইত্যাদি কায়েম করিয়া বিভিন্ন দেশের ভিতর মৈত্রী বৃদ্ধির অথবা শত্রুতা-হ্রাসের চেষ্টার।

নবীন ও প্রাচীন রীতি

লোক চালাচালি বিষয়ে দেশে দেশে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নূতন নয়। ইহারও একটা ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা চলিতে পারে। দেখা যাইবে যে, যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমঝোতার সংখ্যা অনেক। কিন্তু আইনের মত সমঝোতাও চিরস্থায়ী হয় না। দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ঔপনিবেশিক আইনের উল্লেখ করা যাইতে পারে: (১) ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সুইডেনের মধ্যে (১৯২১ সনের আন্তর্জ্জাতিক বহির্গমন কমিশনের মতানুসারে ইহাই সকলের চেয়ে প্রাচীন মৈত্রী), (২) আমেরিকান্ উপনিবেশসমূহের বিদ্রোহের পর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত গ্রেটবৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর যে সমঝোতা (সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ১৯২৪ সনের বাহির হইতে আগমন আইনকে অযথা প্রয়োগ করার দরুণ সুপ্রীম কোর্ট এই সমঝোতার উল্লেখ করেন)।

এখন ত শত শত সমঝৌতা মোতায়েন আছে। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আজকাল এমন সপ্তাহ খুব কমই যায় যখন কোন না কোন আন্তর্জ্জাতিক সমঝৌতা স্থাপিত হয় না। আর এই সমঝৌতাগুলিও বহু বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। কোনটায় উপনিবেশের কথা থাকে, কোনটা বিদেশী মজুরদের সম্বন্ধে, অন্য কোনটা বা ঔপনিবেশিকদের বাসস্থান লইয়া। কোনটা লোক লাগাইবার, নির্ব্বাচন করিবার বা তত্ত্বাবধান করিবার বিভিন্ন প্রণালী বিষয়ক, অন্য কোনটা বা ঔপনিবেশিকদের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক। কোনটায় শুধু মজুরদের কথা থাকে, অন্য কোনটায় সকলপ্রকার বিদেশী সম্বন্ধেই আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। কোন সময়ে কোন এক বিশেষ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয়, অন্য সময়ে দুই রাষ্ট্রের সমস্ত বাণিজ্যিক ও আর্থিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক আইন স্থিরীকৃত হইয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমঝৌতা-গুলি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পন্ন হয়। কিন্তু কোন কোন সময়ে বহু রাষ্ট্রের পরস্পর জটিল সম্পর্কগুলি আলোচিত হইয়া থাকে। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, লীগ্ অব্ নেশন্‌স্ ও আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিসের উদ্ভবের পর হইতে এই প্রকার সমঝৌতার সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

গ্রন্থ রচনার প্রণালী

বর্ত্তমান খণ্ডে আন্তর্জ্জাতিক সমঝৌতা সমূহ স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, এ যাবৎ এ প্রকার যতগুলি সন্ধি হইয়াছে তার সবগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিতে হইলে অনেক বেশী স্থানের প্রয়োজন হয়। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে চুক্তিগুলির সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম মাত্র দেওয়া হইয়াছে। এগুলি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিতে গেলে আরও একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থের দরকার হয়। কিন্তু কোন সমঝৌতাকেই একেবারে বাদ দেওয়া হয় নাই। কাটাছাটা সম্বন্ধে কতকটা যথেচ্ছ নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বড় বড় রাষ্ট্রগুলি বিশেষ গুরুতর যে সব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মৈত্রীতে আবদ্ধ হইয়াছে তার কোনটাই বাদ পড়ে নাই। সেদিক্ দিয়া এ পুস্তকের মূল্য অনেক। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী মজুরদের সম্পর্কে প্রণীত কোন সমঝৌতাই বাদ পড়ে নাই।

এ গ্রন্থে বিভিন্ন আইন ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্তই বিভিন্ন বিষয়-ভাগ অনুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অর্থাৎ কোন্ সমঝৌতা কিরূপ তা বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া কোন্ সমঝৌতায় কোন্ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা আছে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং কোন একটা বিষয়কে বহু বিভিন্ন ধরণের সমঝৌতা ইত্যাদি হাতড়াইয়া তৈরী করিতে হইয়াছে, ইহা প্রায়ই দেখা যাইবে। ইহার ফলে একটা কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তা এই যে, আন্তর্জ্জাতিক সমঝৌতার বেলা যেমন এমন আর কোথাও বুদ্ধিবাদের চেয়ে সুবিধাবাদ বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। যে কোন প্রকার সমঝৌতা খাড়া করা হোক্ না অমনি সুযোগ জুটিয়া যায়, অমনি ধুম পড়িয়া যায় বাহিরে যারা আছে তাদের অবস্থা নির্ণয়ের, জাতীয়তা সম্বন্ধে কোন আইন-বৈষম্য থাকিলে তা দূর করিবার, যাতে ঔপনিবেশিকেরা দুঃস্থ সাহায্য পায় তদ্রূপ অবস্থার প্রবর্ত্তন করার, এবং কোন গবর্ণমেণ্টই তখন আর চুপ করিয়া থাকে না। কোন বাণিজ্যিক সমঝৌতাতে সামাজিক বীমা, মোকদ্দমা সাহায্য, ঔপনিবেশিকদের রক্ষণাবেক্ষণ, বহির্গামীদের যানবাহন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সর্ত্ত সন্নিবিষ্ট হয়, কোনটাতে মজুর নিয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যবস্থার কথা থাকে, কোনটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের সমস্যা সম্পর্কে হইলেও তার মধ্যে হয়ত এমন দু'তিনটী ধারা থাকে যাতে নানা দিক্ হইতে উপনিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য এক জায়গায় প্রকাশ করিবার জন্য এইরূপ সকল দলিল দস্তাবেজই ঘাঁটিতে হইয়াছে।

বহির্গমন সম্বন্ধে ও মজুর নিয়োগ সম্বন্ধে যে সব মৈত্রী খাড়া করা হইয়াছে সেগুলি এই গ্রন্থ রচনার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। সামাজিক দিক্ হইতে ইহাদের বিশেষ গুরুত্ব আছে এবং পরস্পর সম্বন্ধটাও ঘনিষ্ঠ বটে। সেইজন্য শুধু এই বিষয়টা আলোচনার কালে গ্রন্থরচনার সাধারণ প্রণালী মানিয়া চলা হয় নাই, সমঝৌতাগুলি একই স্থানে একে একে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে।

মালমশ্‌লা কোথা হইতে জুটিয়াছে ?

লোক চলা-চল একটী জগৎব্যাপী সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধানের জন্য বহু আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক পাতানো দরকার হয়। সে সব কোন গ্রন্থে আলোচনা করা সোজা ব্যাপার নয়। বহু পরিশ্রমের পর মাত্র মাল-মশ্‌লা সংগৃহীত হইতে পারে। ১৯২২ সনে আন্তর্জ্জাতিক মজুর সম্মেলনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, লোক চলাচল সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যতালিকা ও সংবাদ প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিসকে জানাইবে। সুখের বিষয় এই যে, গবর্ণমেণ্টসমূহ অক্ষরে অক্ষরে সে অনুরোধ পালন করিয়াছে। শুধু সভ্য-রাষ্ট্রেরাই যে খবর দিয়াছে, তা নয়। সভ্যশ্রেণীভুক্ত নয় এমন রাষ্ট্রও কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয় নাই। অফিস সরকারী বিবরণী ও সমঝোতার টেক্‌সট সংগ্রহ করিয়াছে বটে, কিন্তু এই সাহায্য ব্যতিরেকে অনেক ভুল থাকিয়া যাইত, তথ্যও অসম্পূর্ণ থাকিত।

এইরূপে বিপুল তথ্যরাশি সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথম দুই খণ্ডে ৬২ স্বাধীন রাষ্ট্র ও ডোমিনিয়ান, ২৪ কর্তৃত্বশীল প্রভিন্স বা প্রদেশ, ৯০ কলোনি, ৬ সাম্রাজ্য এবং ৯ ম্যাণ্ডেটেড্ টেরিটরির আইন কানুন স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা বহু রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ ১,০০০এর উপর সমঝোতা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, এই তিন খণ্ড পুস্তকে জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক উভয় প্রকার উপনিবেশ আইনই ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতির দিক্ হইতে আলোচিত হইয়াছে। এই স্থলে দুইটী কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে:—(১) এই তিন খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য অল্প কয়েকজন মাত্র লোক খাটিয়াছেন। (২) যাঁর উপর এই কাজের ভার ন্যস্ত ছিল, তিনি একজন স্ত্রীলোক; নাম—মাদাম মার্গারেত থিবা। ইনি ডক্টর উপাধিধারী। পরিচালক ছিলেন আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিসের ভূতপূর্ব্ব মাইগ্রেশন অফিস্ চীফ্ লুই হ্বারলেজ।

সূচীপত্রের ভিতর দিয়া গ্রন্থপরিচয়

অল্প পরিসরের ভিতর সমস্ত গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। এখানে তৃতীয় খণ্ডের বিস্তৃত সূচীপত্রটী মাত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে। আশা করা যায় তাহা হইতে তৃতীয় খণ্ড সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করা শক্ত হইবে না।

বলা বাহুল্য, এই প্রকার গ্রন্থের পরিশিষ্ট ও নির্ঘণ্টদ্বয় অতিশয় মূল্যবান্। বিস্তৃত সূচীপত্র হইতে বোঝা যাইবে বিদেশী মজুরদের সমস্যা আলোচনা বিশেষ ভাবেই করা হইয়াছে। বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে একত্রে এতখানি আইন কানুন বা আইন কানুনের চুম্বক আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। সে দিক্ হইতে আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিস্ ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব মালমশলার বিশেষ উপযোগিতা এই যে, এগুলি লইয়া বহু প্রকার গবেষণার কাঠামো তৈরী করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর ছেলে ইহা হইতে কি তৈরী করিতে পারে তার পরীক্ষা হওয়া দরকার। সে পরীক্ষা দিতে কেহ অগ্রসর হইবেন না কি ?
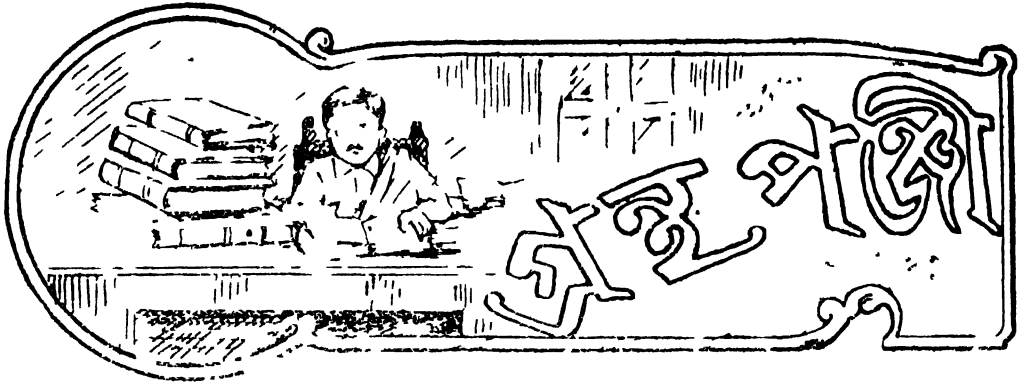
১। "দি জেপান ইয়ার বুক" (জাপান বাৎসরিকী)। ষড়্‌বিংশ বৎসর। ১৯৩০। ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াই টাকেনোবু প্রণীত। দি জেপান ইযার বুক অফিস্‌; উশিগোমে হারামাচি সামচোমে, তোকিয়ো। ১৯৩০। পৃঃ ১৪+৫০৬+১৮৮+১২। ১৫ ইয়েন।

২। "মাইগ্রেশন মুহ্বমেণ্টস্‌" (লোক চলাচল), ১৯২০-১৯২৭। নং ৪, ১৯২৯। ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অফিস্‌, জেনেহ্বা। ১৩০ পৃঃ। ২ শি ৬ পে।

৩। "দি ১৯২৯ এডিশন অব্‌ দি আমেরিকান্‌ ইয়ার বুক" (১৯২৯ সনের আমেরিকান্‌ বাৎসরিকী)। সম্পাদক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলবার্ট বুশনেল হার্ট। দি নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌ কোম্পানী, নিউ ইয়র্ক। ১৯৩০। ৮০০ পৃঃ। ৭·৫০ ডলার।

৪। "আইনে গেশিকূটে ডেব হ্বির্টশাফ্‌টলিখেন এন্‌টহ্বিক্‌লুঙ্‌ এঙ্গলাণ্ডস্‌" (ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক বিকাশের ইতিহাস), মুনশেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর লুয়ো ব্রেণ্টানো। গুষ্টাহ্ব ফিশার, য়েনা। প্রথম ভাগ, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, ১৯২৭, ৩৯৬ পৃঃ, ১৫ রে-মা। দ্বিতীয় ভাগ, বাণিজ্যবাদ (মার্কেণ্টালিজ্‌ম), ১৯২৭, ৪৫৩ পৃঃ, ১৭ রে-মা। তৃতীয় ভাগ, নব সংগঠন, প্রথমার্দ্ধ—১৯২৮, ৬+৬৬৬ পৃঃ, ২৫ রে-মা। দ্বিতীয়ার্দ্ধ—বৃটিশ সাম্রাজ্য, ১৯২৯, ৬+৬৪৮ পৃঃ, ২৫ রে-মা।

৫। "ডাস্‌ হ্বির্টশাফ্‌টস্‌লেবেন ডের্‌ আণ্টিকেন হ্বেল্‌ট্‌" (প্রাচীন দুনিয়ার বাণিজ্য কথা)। গুষ্টাহ্ব্‌ ফিশার, য়েনা। ১৯২৯। ৭+২৪২ পৃঃ। ১০ রে-মা।

৬। "দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক", ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, পি এইচ্‌ ডি। কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস, ১০৭ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৩০। পৃঃ ৪+২৯৪। ৲৷০।

৭। "বেঙ্গল ইরিগেশন" (বাঙ্গালার সেচ), শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার, এম এল্‌ সি। শ্রীসরস্বতী প্রেস, কলিকাতা। ১৯৩০। ৮+৭৫+২৫ পৃঃ।

৮। "দি মেথাডলজি অব্‌ রিসার্চ্চ ফলোড্‌ বাই দি বেঙ্গলি ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ অব্‌ ইকনমিক্‌স" (বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুসৃত ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী), শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম এ, বি এল। কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস, কলিকাতা। ১৯৩০। পৃঃ ২৮। ।০ আনা।

৯। "দি ফার্ষ্ট টেন ইয়ার্‌স্‌ অব্‌ দি লীগ্‌ অব্‌ নেশনস্‌" (জাতি সঙ্ঘের প্রথম দশ বৎসর), আর্থার সুইট্‌সার, কার্ণেগী এণ্ডাউমেণ্ট ফর ইণ্টারন্যাশনাল পীস্‌। ১৯৩০। ৩০ পৃঃ। ৫ সেণ্ট।

আর্থিক চিন্তার ইতিহাস

"সিনিয়র"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল্

ন্যাসো উইলিয়ম্ সিনিয়র (১৭৯০-১৮৬৪) কোন গোটা গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার এরূপ অদ্ভুত বিশ্লেষণ-শক্তি ছিল যে, তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা দ্বারাই ধন-বিজ্ঞান বিকাশের যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছে। অক্সফোর্ডে কিছুকালের জন্য তিনি অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন।

"অ্যান্ আউটলাইন অব্ পোলিটিক্যাল ইকনমি"ই (১৮৩৬) তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; "টু লেক্চার্স অন্ পপুলেশন্", "থ্রি লেক্চার্স অন্ দি রেট্ অব্ ওয়েজেস্" প্রভৃতি কয়েকটী পুস্তিকাও তিনি প্রণয়ন করেন। আমরা প্রধানতঃ প্রথম পুস্তকটীর উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার মতামত বিষয়ে আলোচনা করিব।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির গণ্ডী

সিনিয়র বলেন যে, রাষ্ট্রীয় ধনবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের আলোচনার বিষয় 'সুখ' নহে,—'ধন'; পর্য্যবেক্ষণ বা আত্মজ্ঞানপ্রসূত কতকগুলি সাধারণ প্রতিজ্ঞাকে মূলসূত্র ধরিয়া লইয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিতে বসেন, তাই এই সিদ্ধান্তগুলি সর্ব্বথা প্রযোজ্য বলিয়া বিবেচিত হয়; সুতরাং মূল সূত্রগুলি অভ্রান্ত হইলে, সিদ্ধান্তগুলিও নির্ভুল হইবে। তিনি অর্থশাস্ত্রের গণ্ডী অনেক অংশে সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং ধনবিজ্ঞানকে বস্তুনিরপেক্ষ ও আনুমানিক বিদ্যারূপে দাঁড় করাইয়াছেন। এ বিষয়ে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল ও জেভন্‌সের উপর তাঁহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

তাঁহার মতে চারিটী মূলসূত্র বা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা আছেঃ যথা, (১) স্বল্প ত্যাগ স্বীকার করিয়া অধিক ধনলাভ করিবার ইচ্ছা, (২) ম্যালথাস্ প্রতিষ্ঠিত জনবল-তত্ত্ব, (৩) শ্রম-শক্তি এবং ধনোৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের শক্তি অসীমভাবে বাড়িবার সম্ভাবনা, যদি ইহাদের সৃষ্ট বস্তুকে অপর কিছু উৎপাদনে নিয়োগ করা যায়, (৪) এবং জমি হইতে ক্রমশঃ হ্রাসশীল আদায়ের নিয়ম।

মূল্য

মূল্য বিষয়ে আলোচনায় ইঁহার প্রতিভা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মূল্য "কোন বস্তুর সেই গুণ যাহা বিনিময়ে লেন-দেনের যোগ্যতা দান করে।" যে শক্তি-পুঞ্জ মূল্যকে নির্দ্দিষ্ট করে তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) পণ্যের টাকার টান-যোগান এবং (২) সেই পণ্যের বদলে যে পণ্য পাওয়া যায় তাহার টান-যোগান। নানাবিধ বাধা-বিঘ্ন পরিমাণকে সীমাবদ্ধ করে, যোগান তাহারই সমান হয়। ইহা হইতে মনে হয় যে, সিনিয়র মনে করিতেন যোগানের সঙ্কীর্ণতাই মূল্য নিরূপিত করে। রিকার্ডো শ্রেণী-বিভাগকালে পুনঃসৃষ্টিযোগ্য পণ্যের কথা বলিতে গিয়া এ কথাটা বলেন নাই; সেই হেতু সিনিয়র রিকার্ডোর সমালোচনা করেন।

ঘোরালো যুক্তির কবল হইতে ধনবিজ্ঞানকে মুক্তি দিবার জন্য সিনিয়র প্রয়াস করিয়াছিলেন। তিনি টান-যোগানের ধারণাটা দর হইতে পৃথকভাবে করিতে চাহিয়াছিলেন।

অ্যাব্‌ষ্টিনেন্‌স্ ও পুঁজিগঠন

মালসৃষ্টির খরচার মধ্যে "ভোগ বিরতি" ভাবটীর স্থান নির্দ্দেশ করাই সিনিয়রের কীর্ত্তি। প্রতিযোগিতা সমান হইলে মালসৃষ্টির খরচামূল্যে পণ্য বিক্রয় হয়। ভোগ

বিরতি শব্দটীর দ্বারা এরূপ এক ব্যক্তির আচরণ ব্যক্ত করা হয় যিনি স্বীয় করায়ত্ত সকল কিছুকে অনুৎপাদকভাবে নিয়োজিত করিতে বিরত থাকেন অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক আশুব্যবহার্য্য পণ্য উৎপাদনের পরিবর্ত্তে দূর ভবিষ্যতে ব্যবহার্য্য পণ্য উৎপাদন করাটাই পছন্দ করেন। এই "সকল কিছু" পুঁজিগঠনের সহায়তা করে। এই খরচা ও শ্রমের ত্যাগরূপ বাধা বা বিঘ্ন উৎপন্ন মালের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে এবং এইরূপে যোগানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মূল্য নিয়মিত হয়।

রিকার্ডো তাঁহার প্রবন্ধাদির মধ্যে শ্রমকেই বিনিময় মূল্য নির্দ্ধারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মুনাফাটা মাত্র "অবশিষ্টাংশের দাবিদার"। রিকার্ডোর শিষ্য জেমস্ মিল ও এম কালোচ্ এক ধাপ অগ্রসর হইয়া সকল কিছুকেই শ্রমের মধ্যে টানিয়া আনেন। লডার্ডেল ইহার প্রতিবাদস্বরূপ শ্রম ও পুঁজিকে পৃথক্ চোখে দেখেন। ম্যালথাস মুনাফা ও মজুরিকে পৃথক্ খরচা রূপেই দেখেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত পুঁজি ও শ্রমকে উৎপাদনের খরচার উপাদান হিসাবে দেখিবার মত বিশ্লেষণ প্রয়াস বিকাশ লাভ করে নাই, সুতরাং শ্রমতত্ত্ব প্রাধান্য করিতেছিল।

সিনিয়র হয়ত জি, পি, স্ক্রোপের নিকটে ভাবটী পাইয়াছিলেন; কিন্তু এই ভাবের বিকাশসাধন ও ব্যাখ্যাদান তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। এই নূতন ভাবের জন্য তিনি ধনবিজ্ঞান সাহিত্যে স্মরণীয় হইবার যোগ্য।

খরচা ও ব্যয়: অতীত ও বর্ত্তমান শ্রম

খরচা ও ব্যয়ের মধ্যে সিনিয়র ভেদ রেখা টানিয়াছেন; খরচা ব্যক্ত করে আচরণ বা কনডাক্ট আর ব্যয় ব্যক্ত করে ঐ আচরণের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্য মজুরি ও মুনাফা।

তাঁহার মতে অতীত শ্রম মূল্য নিরূপণ করে না, বিনিময়ের সময়ে উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ ত্যাগ প্রয়োজন হয় তাহাই মূল্য নিরূপণ করে।

প্রয়োজনসাধন ক্ষমতা—টান

তাঁহার মতে প্রয়োজনসাধন-ক্ষমতার উপর টান বা চাহিদা নির্ভর করে। "যে কোন শ্রেণীর পণ্যের তৃপ্তি দিবার একটা সীমা আছে; এবং এই সীমায় উপস্থিত হইবার বহু পূর্ব্বেই তৃপ্তি তাড়াতাড়ি কমিয়া আসিতে থাকে। একই ধরণের দুটী বস্তু ক্বচিৎ একটীর দ্বিগুণ তৃপ্তি দিতে পারে; এবং দশটীর পক্ষে দুটীর পাঁচগুণ তৃপ্তি দিবার ক্ষমতা আরও কম।

সিনিয়র যোগানের সঙ্কীর্ণতাকেই মূল্যের প্রধান কারণ বলিয়া জানিতেন; তাই টান-যোগানের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধটার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কোন বস্তুর প্রয়োজনসাধন-ক্ষমতা বা টান প্রধানতঃ যে সকল বাধা বিঘ্ন যোগান সঙ্কীর্ণ করে তাহাদের উপরই নির্ভর করে।

একচেটিয়া

যোগান বিষয়ে সমান প্রতিযোগিতার অভাবকেই "মনোপলি" বা একচেটিয়া বলে। তাঁহার মতে উৎপাদনের উপাদানগুলি পাইবার সকলের অবাধ ও সমান সুবিধা থাকিলে একচেটিয়া থাকিতে পারে না। যেখানেই ইহার ব্যত্যয় হয় সেখানেই কোন প্রকারের না কোন প্রকারের মনোপলি আছেই। বিশেষতঃ, জমির বেলায় এ কথা খুব খাটে। প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে উৎপন্ন পণ্য "একচেটিয়া উৎপাদন"। আর যে ব্যক্তি এই প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজ কাজে লাগান তিনি হইলেন "মনোপলিষ্ট"।

সিনিয়র মনোপলির চারিটী শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, (১) মাল সৃষ্টির খরচা ন্যূন হওয়ার জন্য উৎপাদকের যে মনোপলি,—যেমন আর্করাইটের সূতা প্রস্তুতের সুবিধা; এক্ষেত্রে উৎপাদন অশেষভাবে বাড়ান চলে; (২) অ্যাবসলিউট মনোপলি বা একান্ত একচেটিয়া; ইহা বাড়ান সম্ভব নহে—যেমন কন্‌ষ্ট্যানটিয়া সুরা; (৩) তৃতীয়টি একান্ত হইলেও বাড়ানো সম্ভব, যেমন কপিরাইট; (৪) জমির মনোপলি—এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সমান থাকে না এবং নিজ ব্যবহারে লাগাইবার শক্তিও সসীম হয়।

এই শ্রেণী বিভাগের মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র আছে, সেটি উদ্বৃত্ত মূল্য বা বিশেষ নিজস্ব সুবিধা (ডিফারেন্শ্যাল অ্যাডভ্বানটেজ)। এই চতুর্ব্বিধ মনোপলির মধ্যে সর্ব্ব ক্ষেত্রেই আয় সৃষ্টি-খরচা হইতে অধিক, খাজনাও খরচার উদ্বৃত্তি। সুতরাং সিনিয়রের মতে খাজনা এক প্রকারের "মনোপলি" আদায়।

এই তত্ত্বের ভ্রমটুকু সহজেই ধরা পড়ে। সম্পূর্ণ সমান প্রতিযোগিতা একরূপ বিরল; অধিকন্তু সকল সময়েই একটা বিশেষ সুবিধা থাকেই, সুতরাং সিনিয়রের সংজ্ঞা অনুসারে মনোপলিটাই সাধারণ নিয়ম দাঁড়ায়। তাহা ছাড়া তিনি বিশেষ সুবিধা ও যোগান-সঙ্গতির মধ্যে পার্থক্যটা লক্ষ্য করিতে ভুলিয়াছেন। বিশেষ সুবিধা এবং যোগান-সঙ্গতি উভয়েই মূল্যনির্দ্ধারক (ইলাই—"সিনিয়রস থিওরি অব্ মনোপলি)"।

ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল আদায়

তাঁহার মতে ম্যানুফ্যাকৃচারের বেলায় শ্রমিকসংখ্যা যত বাড়ানো যাইবে ততই উৎপাদিকা শক্তির হার বর্দ্ধিত হইবে, খরচার মাত্রাও তুলনায় কমিয়া আসিবে এবং মাল মশলা কাজে লাগাইবার সুবিধাও বাড়িয়া যাইতে থাকিবে। ইহাই তাঁহার উর্দ্ধগ বা ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল আদায়ের নিয়ম। এই সিদ্ধান্তের কোনরূপ ব্যাখ্যা না দিয়া সিনিয়র কারখানাজাত দ্রব্যের দরের হ্রাসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন মাত্র।

উর্দ্ধগ আদায়ের ফলে কারখানাজাত পণ্যের বেলায় (১) টান বাড়িলে দর কমিয়া যায়; রুটির টান বাড়িলে দরও বাড়ে, কিন্তু লেসের টান বাড়িলে দর কমে, যেহেতু উৎপাদনের জন্য ক্রমেই উন্নত প্রণালী আবিষ্কৃত হয় এবং (২) ঐ পণ্যের উপর কর ধার্য্য করিলে টান ও উৎপাদন কমিয়া আসে ও দর বাড়িয়া যায়; এই বাড়তি দর ট্যাক্স বা করবৃদ্ধি অপেক্ষা অধিক হয়।

সমালোচনা

সমালোচনা করিবার সিনিয়রের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তিনি এই প্রতিভাবলে সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া দিতেন; কিন্তু নিজে কোন সত্যে উপনীত হইতে পারেন নাই। তিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াও পান নাই। তাই তিনি মনোপলি দর সম্বন্ধে কোন নিয়মের সন্ধান পান নাই বা উর্দ্ধগ আদায়ের ব্যাখ্যা দেন নাই, মাত্র আভাষ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। তাঁহার অনুমানগুলিও সকল ক্ষেত্রে অভ্রান্ত নহে; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, তিনি জমি, শ্রম ও ভোগ-বিরতিকে উৎপাদনের উপাদান বলিয়াছেন।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সভা ও ভারতবর্ষ

শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু, এম, এ, বি, এল

স্ত্রীমজুরদিগের মাতৃত্ব-সহায়ক ব্যবস্থা

১৯১৯ সনে ওয়াশিংটন আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে স্ত্রীমজুরদিগের সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বলা হয় যে, স্ত্রীমজুরদিগের প্রসবের সময় অর্থসাহায্য করা এবং প্রসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ছয় সপ্তাহ ও পরে ছয় সপ্তাহ ছুটী দেওয়া উচিত। তবে তাহাতে ইহাও বলা হয় যে, ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট উল্লিখিত প্রস্তাবটী একেবারে পাশ না করিয়া এ সম্বন্ধে যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া পরবর্ত্তী সম্মেলনে তাঁহাদের মতামত জানাইবেন।

এই প্রস্তাব অনুসারে ১৯২১ সনে গভর্ণমেণ্ট এক রিপোর্ট দাখিল করেন। গভর্ণমেণ্টের মতে সে সময়ে

উক্তরূপ অর্থ-সাহায্য বা কাজ বন্ধ রাখিবার জন্য কোন বাধ্যতামূলক আইন করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। কারণ, প্রথমতঃ, এ সম্বন্ধে ধারণা খুব কমই আছে। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত ক্ষেত্রে এ প্রকার আইন প্রয়োগ ও পরিদর্শন করা একরকম অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, এদেশের মজুর নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়—সেই জন্যে এ আইন এড়াইয়া চলা তাহাদের পক্ষে খুবই সহজ। তাহা ছাড়া এদেশে স্ত্রীলোক ডাক্তারের একান্ত অভাব।

এই প্রকার আইন গভর্ণমেণ্ট যে সমর্থন করেন তাহা প্রমাণ করিবার জন্য এক নিয়ম করেন যে, যে সকল স্ত্রীলোক সরকারী চাকরি করেন তাহারা প্রসবের সময় পুরা বেতনে তিন মাস পর্য্যন্ত ছুটী পাইবেন।

১৯২৪ সনে মিঃ যোশী উক্ত ওয়াশিংটন সম্মেলনের প্রস্তাবের অনুরূপ এক বিল ব্যবস্থাপরিষদে পেশ করেন কিন্তু তখনও গভর্ণমেণ্ট দেশের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিয়া উপরে লিখিত কারণেই এ বিল পরিত্যাগ করেন। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, কলকারখানার মালিকগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া স্ত্রী-মজুরদিগের মাতৃত্ব বিষয়ে সাহায্য করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাতে আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি কারখানাবহুল সহরে শিশুমৃত্যু এত বেশী যে, এ সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক আইন পাশ হওয়া বিশেষ আবশ্যক। আমাদের অপেক্ষা জাপান এ বিষয়ে অনেক অগ্রসর। সেখানে নূতন কারখানা আইন অনুসারে স্ত্রী-মজুরদিগকে প্রসবের পূর্ব্বে ৪ সপ্তাহ এবং পরে ৬ সপ্তাহ ছুটী দেওয়া হয়।

স্ত্রীলোকদিগের রাত্রিতে কাজ

ওয়াশিংটন সম্মিলনের বহু পূর্ব্বেই বার্ণ নগরে যে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন হয় তাহাতে স্ত্রী মজুরের রাত্রিতে কাজ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রস্তাব হয়। ভারতেও ১৮৯১ সনের কারখানা আইন দ্বারা এইরূপ কাজ নিষিদ্ধ করা হয়। কেবল যে, কারখানায় বৎসরের কয়েক মাস করিয়া কাজ হয় সেখানে পরিদর্শকের অনুমতি লইয়া রাত্রে কাজ করা যাইতে পারিত। কিন্তু সকল সময়ে এই আইন অনুসারে কাজ হইত না এবং হইলেও রাত্রিতে স্ত্রীলোকদিগকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ করিতে হইত। সেই জন্য ১৯২২ সনের কারখানা আইন দ্বারা রাত্রে স্ত্রী মজুরের কাজ একেবারেই নিষেধ করা হয়। কিন্তু খনির ভিতর রাত্রিতে স্ত্রীলোকদিগকে এখনও কাজ করিতে দেওয়া হয়। ইহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট আন্দোলন চলিতেছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে কিছু ব্যবস্থা করিবেন।

শিশু শ্রমিক

কারখানা-শিল্পের সৃষ্টির পর হইতেই কি বিলাতে কি এদেশে সকল স্থানেই শিশু মজুরের আধিক্য হয়। অল্প-বয়স্ক মজুরদিগকে প্রতিদিন ১০।১২ ঘণ্টা করিয়া খাটাইলে শুধু যে তাহাদের প্রতি অবিচার করা হয় তাহা নয়, ইহাতে সমস্ত জাতির মেরুদণ্ড দুর্ব্বল হইয়া যায়; কেননা আজ যে শিশু, দুদিন পরে সে প্রাপ্তবয়স্ক মজুরে পরিণত হইয়া শিল্পের উন্নতির সহায়ক হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে কারখানার মালিকগণ এ সম্বন্ধে একেবারেই অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আইন করার আবশ্যকতা প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন। বলিতে গেলে এই শিশু-মজুর সম্পর্কে আইন তৈয়ারী হইতেই সকল প্রকার কারখানা আইনের সূত্রপাত হয়।

১৮৯১ সনের কারখানা আইনের পূর্ব্বে এদেশে ৭ বৎসরের বালকবালিকাকে প্রতিদিন ৯ ঘণ্টা করিয়া খাটানো আইনবিরুদ্ধ ছিল না। এই ৯ ঘণ্টা পরিশ্রমের মধ্যে তাহারা অবশ্য এক ঘণ্টা ছুটী পাইত। অর্থাৎ প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা করিয়া কারখানায় কাটাইতে হইত। প্রত্যেক মাসে তাহারা ছুটী পাইত ৪ দিন। ১২ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া গণ্য করা হইত। এই প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদিগের পরিশ্রমের কোন সীমা আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত করা ছিল না। কি শিশু কি প্রাপ্তবয়স্ক কাহারও রাত্রিতে কাজ নিষিদ্ধ ছিল না।

১৮৯১ সনের কারখানা আইন দ্বারা এই প্রকার

অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন করা হয়। ইহাতে ৯ বৎসরের কমবয়স্ক শিশুদিগকে খাটানো আইনবিরুদ্ধ, এবং ১৪ বৎরের অধিক হইলে তাহাকে প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া গণ্য করা হইবে। শিশু শ্রমিকদিগকে প্রতিদিন ৭ ঘণ্টার বেশী খাটানো চলিবে না এবং তাহাও সকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে করিতে হইবে। যে কোনও দিন ৬ ঘণ্টা কাজ করিলেই তাহাদিগকে আধঘণ্টা বিশ্রামের সময় দিতে হইবে।

১৯১১ সনে যে আইন হয় তাহাতে এই ৭ ঘণ্টা কমাইয়া ৬ ঘণ্টা করা হয়।

ওয়াশিংটন সম্মেলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই প্রকার ব্যবস্থা ছিল। তারপর ঐ সম্মেলনের সময় মিঃ যোশী অন্যান্য দেশের শ্রমিকদিগের প্রতিনিধির সহিত মিলিত হইয়া শিশু শ্রমিকদিগের কাজ করিবার বয়স ১২ বৎসর নির্দ্ধারিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ও কারখানার মালিকগণের প্রতিনিধিগণের বিপক্ষতাচরণের ফলে তাহা সফল হয় নাই। গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্যর অতুল চাটার্জ্জি বলেন যে, এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে সময় দেওয়া উচিত; কেননা বাধ্যতামূলক শিক্ষার সহিত কারখানায় ভর্ত্তি হইবার বয়সের খুব নিকট সম্বন্ধ। যাহা হউক শিশুদিগের পরিশ্রমের সময় সমস্ত কারখানায় প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করিয়া হইবে বলিয়া স্থির হয় এবং ৫½ ঘণ্টা কাজ করিবার পর ½ ঘণ্টা বিশ্রামের সময় দেওয়া হয়।

১৯২৩ সনের খনি আইন এ সম্বন্ধে অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছে। ইহাতে বলা হয় যে, ১৩ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে খনিসংক্রান্ত কোন কাজ করিতে দেওয়া হইবে না এবং খনির নীচে শিশুদিগকে কাজ করিতে একেবারেই নিষেধ করা হয়।

১৯২২ সনের ভারতীয় বন্দর আইন দ্বারা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে বলা হয় যে, ডক, জেটি, প্রভৃতিতে ১২ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে মাল উঠাইতে নামাইতে নিষেধ করিবার জন্য আইন করা উচিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে ওয়াশিংটন সম্মেলনের যে প্রস্তাব ছিল তাহা গভর্ণমেণ্ট কোন কারণবশতঃ পাশ করিতে পারেন নাই।

উক্ত সম্মেলনে শিশুদিগের রাত্রিতে কাজ নিষেধ করিবার কয়েকটী প্রস্তাব হয়। তবে উহাতে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে ১৪ বৎসরের অধিকবয়স্ক শ্রমিক যাহারা কারখানায় কাজ করে তাহারা এই আইনের আমলে আসিবে না। এই প্রস্তাব পাশ করিতে গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, কারণ—১৮৯১ সনের আইন দ্বারা বহু পূর্ব্ব হইতেই শিশুদিগের রাত্রিতে কাজ নিষিদ্ধ ছিল। ১৯২১ সনে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সম্মেলনের উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

জগতে বীমার ব্যবসায়

১৯২৯-৩০ সনে উন্নতির ইতিহাস

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল

ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে তাহা জানিতে আমরা ব্যস্ত ঘটে, কিন্তু অতীতে যাহা হইয়াছে তাহা হইতেও আমরা শিক্ষালাভ করিতে পারি। সুদূর অতীতে যে সব ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহাও অনেক সময়ে একত্র করিয়া আমরা মনশ্চক্ষে উহার ফলাফল প্রত্যক্ষ করিতে পারি। গত ১লা এপ্রিল তারিখে আর্থিক জগতের যে বৎসর শেষ হইয়া গেল তাহাতে এমন সব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে—যাহা একত্র করিলে অনেক চিত্তাকর্ষক তথ্যের সম্মুখীন হওয়া যায়। এই বৎসরে আর্থিক জগতের বিভিন্ন দিকে আমরা বিভিন্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। এখানে

আমি একমাত্র বীমা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব এবং এই বিষয়ের একটা মোটামুটি বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

গত বৎসর সমগ্র জগতে ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে মন্দা পড়িলেও বীমার ব্যবসায় পূর্ব্বের ন্যায়ই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। যে দেশের দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সেই দেশেই গত বৎসর অধিক পরিমাণ টাকার বীমার কাজ হইয়াছে দেখিতে পাই। জনসাধারণ বীমার বিভিন্নমুখী প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই উপলব্ধি করিতেছে এবং প্রত্যহ উহার পতাকাতলে নূতন নূতন লোকের সমাবেশ হইতেছে।

বীমা-জগতে নূতন নূতন ভাবধারাও আত্মপ্রকাশ করিতেছে। উহার মধ্যে সব চেয়ে বড় বিষয় হইতেছে বীমাক্ষেত্রে জাতীয়তার অভিব্যক্তি। শুধু বীমা করিলেই চলিবে না—আপনাকে দেশী কোম্পানীতে বীমা করিতে হইবে"—সর্ব্বত্র এই রব উঠিয়াছে। বীমা কোম্পানীসমূহের কার্য্যনীতি সম্বন্ধেও নূতন পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে বীমা কোম্পানীগুলি মাত্র কোম্পানীর কাগজে টাকা খাটাইত, কিন্তু এখন অনেক বড় বড় কোম্পানী এই পন্থা পরিত্যাগ করিয়া সাহসের সহিত অন্যান্যভাবে টাকা খাটাইতেছেন। কোন বীমাকারী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে তাঁহাকে টাকা দেওয়ার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা জনসাধারণের মনোমত হইয়াছে এবং উহার ফলে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে জীবনবীমা খুব বেশী জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ডে সংবাদপত্র বীমাও খুব প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। কারণ নিয়মিতভাবে এক পেনি দামের সংবাদপত্র পাঠ করিলে অতিরিক্ত কিছু না লইয়াও সংবাদপত্র কোম্পানী পাঠকের পক্ষে মূল্যবান দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন। বিমানপোতের যে সব দুর্ঘটনা হয় তাহার দায়িত্ব গ্রহণ জীবনবীমা-ক্ষেত্রে একটা নূতন ব্যাপার। কিন্তু অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই এই দায়িত্ব-বহনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক কোম্পানী একবার মাত্র চাঁদা লইয়া বীমাকারীর জীবনের সকল প্রকার দায়িত্ব গ্রহণে বীমাপত্র প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহাও জনসাধারণের পক্ষে একটা সুবিধাজনক পন্থা বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

আমেরিকা

আমেরিকায় সকল ব্যাপারই বিরাট আকারে সম্পন্ন হয়। বীমা সম্বন্ধেও একথা সত্য। সেখানে এমন একজন লোকও নাই যিনি বীমা করেন নাই। এই দেশে মিঃ পিয়ে ডি ডুবাণ্ট নামক একজন ভদ্রলোক ১৪ লক্ষ পাউণ্ডের (প্রায় দুই কোটী টাকা) বীমা করিয়াছেন। আমেরিকায় মাথা পিছু গড়পড়তা বীমার পরিমাণ যত বেশী পৃথিবীর আর কোন দেশে তত বেশী নহে।

নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় বীমা কোম্পানী। ১৯২৯ সনে এই কোম্পানী প্রত্যহ গড়পড়তা ২২৩৩ জনের দাবীর টাকা মিটাইয়াছে। ২০৬৭৪ জনের জন্য ১১১৩৭২৯৬ ডলার পরিমিত টাকার (এক ডলার পৌনে তিন টাকার সমান) নূতন বীমা করিয়াছে এবং প্রত্যহ উহার সম্পত্তির পরিমাণ গড়পড়তা ১০৩৯৮৮১ ডলার করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কোম্পানীতে মোট ১৭৯৩৩৬০০৪৫২ ডলারের জীবনবীমা করা আছে। গত বৎসর এই কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ ফিক্সের মৃত্যু হয় এবং তৎস্থলে মিঃ একার এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি একজন বালক বেহারারূপে এই কোম্পানীতে প্রবেশ করেন। বর্ত্তমানে তিনি উহার সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

এই বৎসর আমেরিকাতে দুইজন অতি প্রসিদ্ধ লোক বীমার ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মিঃ কুলিজ আমেরিকা সাধারণতন্ত্রের সভাপতির পদ হইতে অবসর লইয়া নিউইয়র্ক ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একজন ডিরেক্টার হইয়াছেন এবং নিউইয়র্কের গবর্ণর মিঃ অল স্মিথ সভাপতি পদের জন্য নির্ব্বাচনে মিঃ হুভারের নিকট পরাজিত হইয়া মেট্রোপলিটানের ডিরেক্টার হিসাবে এই কোম্পানীতে যোগ দিয়াছেন।

আমেরিকার বীমা কোম্পানীগুলিতে এত অধিক অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে যে, এই অর্থ কিভাবে খাটান যাইবে তাহা কোম্পানীগুলির পক্ষে একটা মস্ত সমস্যা হইয়া দাড়াইয়াছে। ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে একমাত্র

নিউইয়র্ক প্রদেশে অগ্নি, সমুদ্র ও দুর্ঘটনা প্রভৃতি বিষয়ে যে সব কোম্পানী বীমার কাজ করে তাহাদের সকলের মোট বীমা তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১৫৭৪০৪৭৭৩০ ডলার। টরেণ্টোতে সম্প্রতি বীমাকোম্পানীসমূহের প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে নিউ-ইয়র্কের বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলবার্ট কনওয়ে এই মজুদ তহবিলের টাকা খাটান বিষয়ক সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। আমেরিকার প্রত্যেক প্রদেশে বীমা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্নরূপ আইন প্রচলিত আছে এবং এক এক জন করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রত্যেক প্রদেশের বীমার কাজ তত্ত্বাবধান করেন। প্রত্যেক প্রদেশকেই বীমা ব্যবসার বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে।

কানাডা

আমেরিকার তুলনায় উহার প্রতিবেশী কানাডা একটী নূতন দেশ। কিন্তু এই দেশেও বীমা ব্যবসায়ের অভুতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে। একশত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশ বীমার ব্যবসায়ে ইংলণ্ডের উপরই নির্ভর করিত। কিন্তু এক্ষণে কানাডা বীমাক্ষেত্র হইতে ইংলণ্ডকে বিতাড়িত করিয়াছে এবং অন্যান্য দেশেও এই বিষয়ে ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। কানাডার সর্ব্বত্র একই প্রকার বীমা আইন প্রচলিত এবং সমগ্র দেশে একই বিভাগ দ্বারা বীমা-ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে কানাডাতে ২৮টী কানাডিয়ান কোম্পানী ও ১৮টী আমেরিকান কোম্পানী বীমার কাজ করে। শেষোক্ত কোম্পানীগুলির মধ্যে মাত্র ১২টী নূতন নূতন ব্যবসায় করিতেছে। এই দেশে ১৫টী বৃটিশ কোম্পানীও আছে, কিন্তু উহার মধ্যে ৭টী মাত্র নূতন ব্যবসায় করিতেছে। একটী ইংরাজ সংবাদপত্রের মতে কানাডার কোম্পানীগুলি অধিকৃত দেশসমূহে যে ভাবে নূতন ব্যবসায় করিতেছে সেই তুলনায় কানাডাস্থিত ইংরাজ কোম্পানীগুলি নূতন কাজ পাইতেছে না। আর একজন সংবাদপত্রসেবী বলেন যে, কানাডায় কানাডিয়ান ও আমেরিকান কোম্পানীগুলি প্রতি বৎসর বহু নূতন কাজ সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু ১৯২৭ সনে কানাডাস্থিত ইংরাজ কোম্পানীগুলি পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ কম কাজ পাইয়াছে। কানাডার অনেক প্রদেশেই বর্ত্তমানে এই নিয়ম হইয়াছে যে, মজুর ক্ষতিপূরণ বীমার কাজ কানাডার গভর্ণমেণ্ট ছাড়া অন্য কোন বিদেশী কোম্পানী গ্রহণ করিতে পারিবে না।

মেক্সিকো

মেক্সিকোতেও বীমা ব্যবসায়ে জাতীয় ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং এই দেশের গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, যে সমস্ত বিদেশী কোম্পানী এই দেশে বীমার কাজ করিবে তাহাদিগকে মজুদ তহবিলের অর্দ্ধেক টাকা মেক্সিকো গভর্ণমেণ্টের কোম্পানীর কাগজে খাটাইতে হইবে। "সানলাইফ অব্ কানাডা" কোম্পানী এই সর্ত্ত পূরণ না করাতে মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট এই কোম্পানীর মেক্সিকোস্থিত ম্যানেজার মি, মাসির উপর মেক্সিকো দেশ হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ দেন এবং এই কোম্পানীকে মেক্সিকো দেশে বীমার কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। অবশেষে এই বিষয়ে একটা আপোষ-মীমাংসা হইয়াছে।

ইংলণ্ড

ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীগুলিও উন্নতি লাভ করিতেছে। তবে বিদেশে এই সব কোম্পানীর কাজ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডে সব চেয়ে বড় কোম্পানী প্রুডেনশিয়াল; উহার পরেই পার্ল ও সান বীম কোম্পানীর স্থান। ইংলণ্ডের অনেক কলোনীর অফিসগুলিও বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে বেশ কাজ করিতেছে। ১৯২৮ সনে কলোনীসমূহের কোম্পানীগুলি ইংলণ্ডে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২৮ ভাগ বেশী কাজ করিয়াছে, কিন্তু তখন ইংলণ্ডের কোম্পানী-গুলি মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ বেশী কাজ করিয়াছে। ইংলণ্ডে বাহিরে বৃটীশ কোম্পানীগুলি মাত্র ভারতবর্ষেই এখনও মনের আনন্দে ব্যবসায় চালাইতে সমর্থ হইতেছে।

ইংলণ্ডের শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হইবার পর হইতে ঐ দেশের বীমা কোম্পানীগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে

পরিণত করার বিষয় আলোচিত হইতেছে। বর্ত্তমানে অনেক আলোচনার পর সোসিয়েলিষ্ট গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়টি স্থগিত রাখিয়াছেন। ইংলণ্ডের লয়েড্‌স্ কোম্পানীর বীমা ব্যাপার সমগ্র জগতে বিস্তৃত। পৃথিবীর আর কোন দেশে এই ধরণের বীমাপ্রতিষ্ঠান নাই।

ফ্রান্স

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ফ্রান্স দেশেই ১৭৮৭ সনে সর্ব্বপ্রথম জীবনবীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সনে ফ্রান্স সরকার বীমা কোম্পানীগুলি টাকার সুদ কিভাবে হিসাব করিবে তাহার একটা সর্ব্বনিম্ন হার বাঁধিয়া দেন এবং বীমা কোম্পানীগুলির জন্য একটী মৃত্যু-হারের তালিকা করিয়া দেন। ফ্রান্সে প্রায় সমস্ত বীমা কোম্পানীই এই তালিকা ও সুদের হার অনুযায়ী প্রিমিয়ামের হার নির্দ্ধারিত করে বলিয়া এই দেশে বিভিন্ন কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার প্রায় একরূপ। আমেরিকার ন্যায় ফ্রান্সেও বীমা সম্বন্ধে অনেক কড়া আইন আছে এবং গবর্ণমেণ্ট বীমা ব্যবসায়ের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে বীমা কোম্পানীগুলিকে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া থাকে। ফ্রান্সে লা ন্যাশন্যাল, ইউনিয়ন ও জেনারেল—এই তিনটীই সবচেয়ে বড় বীমা কোম্পানী। এই তিনটি কোম্পানী পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিয়া থাকে এবং উহাদের পলিসির সর্ত্ত ও প্রিমিয়ামের হারও প্রায় এক প্রকার।

জার্ম্মাণি

জার্ম্মাণিতে সরকারী বীমা কোম্পানীগুলির সঙ্গে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিযোগিতা করিতেছে। জগতের আর কোথাও এই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দেশেও বীমা কোম্পানীগুলির খুব উন্নতি হইতেছে। যুদ্ধের পরে জার্ম্মাণি যে আর্থিক সঙ্কটে পতিত হইয়াছিল এখন তাহা কাটাইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ বীমা কোম্পানীগুলির প্রিমিয়াম বাদে মোট আয় আড়াই মিলিয়ার্ড মার্ক এবং মাথাপিছু গড়পড়তা বীমার পরিমাণ ২০০ মার্ক দাঁড়াইয়াছে।

গত বৎসর জার্ম্মাণির বীমা জগতে সব চেয়ে বড় ঘটনা ফ্রাঙ্কফোর্ট জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী নামক বড় বীমা কোম্পানীর পতন। এই কোম্পানীর টাকা ঠিকমত না যোটানোতেই এই ব্যাপার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যাহা হউক এলিয়াঞ্জ আণ্ড ষ্টাটগার্ডার নামক আর একটী বড় বীমা কোম্পানী এই কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তি ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কাজ চালাইবার কথাবার্ত্তা চালাইতেছে।

ইটালী

ইটালীকে লোকে বীমা ব্যবসায়ের জন্মভূমি বলিয়া থাকে। কারণ রোমানদের কলেজিয়া হইতেই বীমা ব্যবসায়ের উদ্ভব বলিয়া অনেকে মনে করেন। আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লা সপরিবারে ইটালীতে বাস করিতেছেন। তিনি এই দেশের ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে দশ হাজার পাউণ্ডের বীমা করিয়াছেন। গত ১৯২৯ সনের ৬ই জুন তারিখে ইটালিয়ান সিনেট দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া যাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে তাহাদের সাহায্যার্থ একটী জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। যে সমস্ত বীমা কোম্পানী দুর্ঘটনার জন্য বীমাপত্র বাহির করেন তাহাদের প্রত্যেককে এই কোম্পানীতে তাহাদের আয়ের শতকরা ৩ ভাগ জমা দিতে হয়। এই আয় দ্বারা কোম্পানী অনেক লোকের চিকিৎসা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে।

চেকো শ্লোভাকিয়া

এই নূতন রাজ্যটি বীমার ব্যবসায়ে বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানে এই দেশে ৪৬টী দেশী ও ২১টী বিদেশী বীমা কোম্পানী কাজ করিতেছে। এদেশের লোকের মাথাপিছু গড়পড়তা বীমার পরিমাণ ৯০০ ক্রাউন।

স্পেন

এই দেশে সম্প্রতি বীমার দালাল ও এজেণ্টদের জন্য একটা নূতন আইন প্রণীত হইয়াছে। আইনের ফলে প্রত্যেক দালাল ও এজেণ্টকে গবর্ণমেণ্টের নিকট নাম

রেজেষ্টারী করিতে হয়। না করিলে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যদি কোন এজেন্ট নিজের কমিশন হইতে বীমাকারীর প্রিমিয়ামের টাকা দেয় তবে তাহাকে এই আইনে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

তুরস্ক

কামালপাশার রাজ্য বিদেশীদের শোষণ বরদাস্ত করিতে পারে না। ১৯২৯ সনের ১লা আগষ্ট হইতে তুর্ক গবর্ণমেন্ট রি-ইনসিওরেন্স ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তুরস্কে যে সব বিদেশী কোম্পানী অগ্নিবীমার কাজ করিয়া থাকে তাহাদিগকে বাধ্যতামূলক হিসাবে তাহাদের দায়িত্বের অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকার জন্য পুনরায় তুর্ক সরকারের বীমা প্রতিষ্ঠানে বীমা করিতে হয়। এই ব্যবস্থার ফলে বিদেশী কোম্পানীগুলি সোরগোল তুলিয়াছে।

ভারতবর্ষ

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ বীমার ব্যাপারে এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। গত বৎসর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অনেকগুলি নূতন বীমার কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বীমা কোম্পানীগুলিতে ভারতবাসী মোট ১২০ কোটী টাকার বীমা করিয়াছে এবং এজন্য প্রিমিয়াম বাবদ বৎসরে প্রায় ৬ কোটী টাকা আয় হইয়া থাকে। ভারতীয় বীমা-জগতে ওরিয়েণ্টাল, এম্পায়ার, ভারত, হিন্দুস্থান ও ন্যাশন্যাল এই ৫টীই বড় কোম্পানী। এই কোম্পানীগুলির দ্রুত উন্নতি হইতেছে। ভারতের প্রায় সমস্ত বীমা কোম্পানীরই কাজ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বিদেশী কোম্পানীগুলি ক্রমেই হটিয়া যাইতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে হিন্দুস্থানের চেষ্টায় কলিকাতায় ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের প্রতিনিধিগণের একটী সম্মেলন হইয়াছিল। বর্ত্তমানে একটী ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। হিন্দুস্থানের শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটীতে একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহা ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে একটা গৌরবের বিষয়।

ভারতীয় বীমা আইনে যে সব গলদ আছে তাহা দূর করিবার পক্ষে গবর্ণমেণ্ট কোন চেষ্টা করিতেছেন না। তাঁহারা এই বিষয়ে ইংলণ্ডের বোর্ড অব্ ট্রেডের দিকে তাকাইয়া আছেন। উহারা একটী আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা যে কবে কার্য্যে পরিণত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। বিদেশী কোম্পানীসমূহের অবৈধ প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে এবং ভারতে যাহাতে গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটী বোর্ড গঠিত হয় তাহার চেষ্টা করিতেছে।

শ্যাম

ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের এই উদাসীনতার তুলনায় ভারতের পূর্ব্বদিকস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্য শ্যামে গবর্ণমেণ্ট বীমা বিষয়ে অনেক কাজ করিতেছেন। শ্যামদেশে ১৮১৮২ পাউণ্ড মূলধন না লইয়া কোন কোম্পানী বীমার কাজ করিতে পারে না এবং উহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের কাছে ৯০৯১ পাউণ্ড জমা দিতে হয়। প্রত্যেক কোম্পানীকে গবর্ণমেণ্টের কাছে বিস্তৃতভাবে কাজের হিসাব দিতে হয়। এদেশে যে সব কোম্পানী জীবনবীমার কাজ করে তাহাদিগকে প্রিমিয়ামের টাকার এক-তৃতীয়াংশ অথবা কমপক্ষে ৪৫৪৬ পাউণ্ড গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা দিতে হয়। এই দেশে বীমা ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আরও অনেক কড়া নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া

এই দেশটী ইংলণ্ড হইতে ২৫ গুণ বড়, কিন্তু উহার লোকসংখ্যা লণ্ডন সহরের লোকসংখ্যা হইতে অল্প কিছুমাত্র বেশী। এই দেশেও বীমা ব্যবসায়ের খুব উন্নতি হইয়াছে। এই দেশে মোট ৩৫ কোটী পাউণ্ডের বীমা করা আছে এবং মাথাপিছু গড়পড়তা বীমার পরিমাণ ৫৫ পাউণ্ড। প্রায় ৩৫টী কোম্পানী এই দেশে জীবন বীমার কাজ করিয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবতঃ মাত্র এই দেশেই আজীবন বীমার পরিমাণ মেয়াদী বীমার পরিমাণ অপেক্ষা বেশী।

এই দেশে বীমা সম্বন্ধীয় আইনও খুব সুন্দর। এই দেশের অধিকাংশ প্রদেশেই পৃথক পৃথক বীমা-আইন প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে সকল প্রদেশেই একই প্রকার আইন প্রচলিত হইয়াছে। উহার ফলে এই দেশে বীমা ব্যবসায়ের খুব উন্নতি হইতেছে।

জাপান

এই দেশে জীবন বীমাকে জনপ্রিয় করিবার জন্ম অনেক অভিনব পন্থা অবলম্বিত হয়। দেশের প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বীমা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেও সঞ্চয়ের অভ্যাস শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। নিপ্পন জীবন বীমা কোম্পানী এই দেশে সব চেয়ে বড়। উহার ক্রমেই অধিক উন্নতি হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট পোষ্টাফিসগুলির সাহায্যে একপ্রকার শিল্প-বীমার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই নিয়ম প্রচলিত হইলে খুব ভাল হয়।

উপসংহার

অতীতে বীমার অনেক উন্নতি হইয়াছে। ভবিষ্যতে উহার আরও বেশী উন্নতি হইবে। এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে যখন প্রত্যেকেই জীবনধারণের পক্ষে বীমাকে অত্যাবশ্যক মনে করিবে এবং বীমা দ্বারা সকল প্রকার বিপদ আপদের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিবে। তখনই জগৎ হইতে দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট নির্ব্বাসিত হইবে।

(জীবনবীমা)

রাষ্ট্রের ব্যয়

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি; বি,এ; এফ, আর, ইকন্, এস্ (লণ্ডন)

গৃহস্থালী থাকিলেই খরচ আছে—সে গভর্ণমেণ্টের গৃহস্থালীই হউক, আর ব্যক্তিগত গৃহস্থালীই হউক। আর এই খরচ মিটাইবার জন্ম সকল দেশে সকল সময়ে অর্থেরও প্রয়োজন হয়। তবে ব্যক্তির ও সরকারের খরচ যে একই রকম তাহা নয়। ব্যক্তির গৃহস্থালীতে খরচ যে যে খাতে হয় সরকারের খরচও যে ঠিক সেই সেই বাবদ হয় তাহা নয়। এই দুই রকম খরচের মধ্যে মিলও আছে, আবার গরমিলও ঢের। আর এই দুইয়ের ধরণ-ধারণেও প্রভেদ কম নহে। প্রথমতঃ, ব্যক্তি তার নিজের আয় বুঝিয়া খরচ করে। কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ঠিক উল্টা। রাষ্ট্র আগে ঠিক করে খরচ কি কি খাতে করিতে হইবে, তাই বুঝিয়া আয়ের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়তঃ, গৃহস্থের লক্ষ্য থাকে নিজের আয় হইতে সংসার খরচ মিটাইয়া যাহাতে দুই পয়সা বাঁচাইতে পারে। ঋণের ধার সে ধারিতে চাহে না। কিন্তু রাষ্ট্রের আয়ব্যয়ে মিল হওয়া চাই—সঞ্চয় যেন না হয়, ঋণও যেন না হয়। রাষ্ট্রের খরচের টাকা জোগায় করদাতা জনসাধারণ। রাষ্ট্রের খরচ মিটাইয়া যদি টাকা বাঁচে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই ফাল্‌তো টাকা করদাতাদের নিকট হইতে আদায় না করিলেও চলিত। তাহাদের করভার আরও কমানো যাইত। আবার বে-হিসাবী খরচ করিয়া রাষ্ট্র যদি দুই হাতে অতিরিক্ত ঋণ করিতে থাকে, তাহা হইলেও উহা নিন্দনীয়; কারণ সে ঋণ শোধ করিতে হইবে দেশবাসীকেই। তৃতীয়তঃ, গৃহস্থ খরচ করিবার সময় নজরে রাখে তাহার নিজের সংসারের লাভালাভ, আর রাষ্ট্রের খরচের উদ্দেশ্য থাকে সমাজের কল্যাণ। কাজেই ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের খরচের ক্ষেত্রেও পার্থক্য যথেষ্ট।

রাষ্ট্রের খরচ কি কি ?

রাষ্ট্রের খরচ যে সকল দেশে সকল সময়ে একই ছিল

বা আছে তাহা নহে। যুগে যুগে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লোকের ধারণা যেমন বদলাইয়াছে, তেমনি উহার খরচের দফাগুলির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনুপাতও ঠিক থাকে নাই। একই রাষ্ট্রের প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের খরচের মধ্যেই যে কেবল প্রভেদ তাহা নহে; বর্ত্তমান যুগেও মানুষের শিক্ষা ও চিন্তার গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধারণাও যেমন বদলাইতেছে, সরকারী খরচের খাতে এবং অনুপাতেও তেমনি পরিবর্ত্তন হইতেছে। কোনো কোনো রাষ্ট্রে বাহিরের শত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষা, দেশের ভিতরে শান্তিরক্ষা, কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও শিক্ষার বিস্তার এই সকল কাজই সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার কোনো কোনো রাষ্ট্র মনে করে প্রজাদিগের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য কিছু করা তাহার কাজ নহে, শুধু দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষা করিলেই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইল। কোনো রাষ্ট্রে হয়তো দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষার খাতে যথেষ্ট টাকা ব্যয় হইতেছে, অথচ শিক্ষা-বিস্তারের জন্য, তাহার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য খরচ নমো নমো করিয়া সারা হইতেছে। আবার হয়তো আর কোনো রাষ্ট্রে শেষের দফাগুলিতে টাকা ব্যয় হইতেছে জলের মত, দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষার প্রতি ততটা নজর নাই। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, সকল রাষ্ট্রে সরকারী খরচের তালিকায় অনেক বিষয়ে মিল থাকিলেও উহা আগাগোড়া ঠিক একই রকম নহে। যে রাষ্ট্রের চেষ্টা যত ব্যাপক, তাহার খরচও তত বেশী। আবার এই খরচ মিটাইবার জন্য তাহাকে টাকাও সংগ্রহ করিতে হয় অনেক। কোন্ কাজের জন্য কত খরচ হয়, এবং খরচের টাকা প্রজাদিগের নিকট হইতে কি কি বাবদ কত হারে আদায় হয় ইহার উপরই সমাজের কল্যাণ অনেকটা নির্ভর করে। তাহা হইলেই মনে প্রশ্ন জাগে—তবে কি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ঠিক করিবার কোনো মাপকাঠি নাই? এমন একটা মাপকাঠি নাই যাহা দিয়া বিচার করিয়া এক দুই তিন করিয়া বলা যায় যে, এইগুলি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য কাজ। আজ যাহা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা হইতেছে ৫০ বৎসর আগে হয়তো তাহা রাষ্ট্রের কাজ বলিয়া গণ্য হইত না। ব্যক্তি নিজের গরজেই উহা করিত। বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রের কাজ কি কি তাহা জানিতে হইলে কোন্ কোন্ যুগে রাষ্ট্রের কি কি কাজ ছিল, রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তখনকার লোকের কি রকম ধারণা ছিল তাহা বুঝা দরকার। আজকাল কি পূবের, কি পশ্চিমের সকল দেশের রাষ্ট্রেরই গড়ন, ধরণধারণ, কম-বেশী য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কাজেই আপাততঃ য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যের অভিব্যক্তি বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। আদিম যুগে য়ুরোপে রাষ্ট্রই ছিল সর্ব্বেসর্ব্বা। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বলিয়া কিছু ছিল না। সমস্ত সমাজের গড়ন ও চলন নির্ভর করিত সমাজের আইন-প্রণেতার মর্জ্জির উপর। তাহার পরের যুগে ব্যক্তির মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একটু একটু করিয়া জাগিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার বাহ্য প্রকাশ বা সুফল তেমন কিছু লক্ষ্য করা যায় নাই। মধ্যযুগের পরে যখন কেন্দ্রীকৃত সম্রাটগণের উদ্ভব হইল, তখন তাঁহারাও চাহিলেন আগের মতই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও আর্থিক জীবনের সব-দিক্‌টাই শাসন করিতে। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যেও আজ কালকার মত তখন স্বাধীনতা ছিল না। শ্রীযুক্ত জি, আরমিটেজ্ স্মিথ তাঁহার "প্রিন্সিপালস্ এণ্ড মেথাডস্ অব্ ট্যাক্সেশান" নামক বহিতে লিখিয়াছেন "যুগে যুগে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রশক্তি প্রথানুসারে ব্যক্তির উপরে যে শাসন চালাইয়া আসিয়াছে তাহাতে সামাজিক ও আর্থিক অধীনতার চোহারাই ফুটিয়া উঠিয়াছে বেশী করিয়া। শ্রম ও করের উপরে দেখিতে পাওয়া যায় জুলুমের প্রভাব; হরেক রকম বাঁধনে বাঁধা ছিল শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য ও শ্রম। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বেশীর ভাগ লোকের কাছে ছিল স্বপ্নের জিনিষ।" একদিকে ব্যক্তির জীবনের উপরে রাষ্ট্রশক্তির এই শাসন ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছিল, অপরদিকে ব্যক্তির মনে এই বাঁধন হইতে মুক্তি পাইয়া নিজের জীবনকে নিজের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে চালাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল। এই দুইয়ের সংঘর্ষের ফলে ষোড়শ শতাব্দী হইতে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের উপরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমিয়া আসিতে

লাগিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে লাভ হইল ব্যক্তির রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এমন করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার কর্ত্তব্য কিছু কিছু করিয়া কমিতে লাগিল। কিন্তু তখনও সমাজের আর্থিক জীবন ছিল রাষ্ট্রের মুঠার মধ্যে। আর্থিক কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ভর করিত রাষ্ট্রশক্তির উপর। সপ্তদশ শতাব্দীতেও আর্থিক জীবনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা কিছু ছিল না, রাষ্ট্রের হুকুম ছিল বড় কথা। এই আর্থিক স্বাধীনতা লাভ হইল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তখনকার মানুষ ভাবিতে শিখিল যে, শিল্প-বাণিজ্যের উপর সরকারের কর্ত্তামি অনেকটা কমানো দরকার। মানুষ যদি তাহার স্বাভাবিক স্বার্থের দ্বারা চালিত হইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে সমাজের কল্যাণ বেশী হয়। ব্যক্তির জীবনের উপর রাষ্ট্রের কর্ত্তামি কমাইয়া দিয়া প্রতি ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেও, সে তাহার স্বার্থের টানে স্বাধীনভাবে দশের সঙ্গে টক্কর দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করুক, দেখিবে সমাজের আর্থিক জীবন আরও উন্নত হইয়া উঠিবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আওতায় মানুষ স্বার্থের প্রেরণায় প্রতিযোগিতা করিয়া চলিলে তাহার শক্তির বিকাশ হয়, কাজের ক্ষমতা বাড়ে এবং সে নূতন নূতন বিষয়ে মাথা খেলাইয়া নানারকম আবিষ্কার করিয়া দেশের সম্পদ্ বাড়াইতে পারে। তাহাতে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকিলেও সমাজে শান্তি ও জ্ঞানের বিস্তার না থাকিলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে। কাজেই এই দুইটী কাজ আসিয়া পড়ে রাষ্ট্রের ঘাড়ে। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য কি হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া ইংল্যাণ্ডের অর্থশাস্ত্রী অ্যাডাম্ স্মিথ তাঁহার "ওয়েল্থ্ অব্ নেশন্স্" (জাতীয় সম্পদ্) নামক বহিতে লিখিয়াছেন—"স্বাভাবিক স্বাধীনতার রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের কেবলমাত্র তিনটি কাজ করা দরকার —(১) বাহিরের অন্যান্য স্বাধীন সমাজের অত্যাচার ও আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করা (২) সমাজের ভিতরেই একজন যেন আর একজনের উপরে অত্যাচার বা অবিচার না করে তাহা দেখা এবং (৩) ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণায় যে সকল কাজ কোনও ব্যক্তি করিতে চাহে না, সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য সেই সকল কাজ করা অথবা তজ্জন্য প্রতিষ্ঠান রক্ষা করা। যেমন পথ-ঘাট যান-বাহন, খাল, বন্দর, স্কুল, মন্দির, মস্‌জিদ ইত্যাদি।" এক কথায় বলিতে গেলে তখনকার লোকের মত ছিল যে, মানুষের জীবনকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে তাহার সুপ্ত শক্তির বিকাশ ও চর্চ্চার জন্য তাহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হইবে। সমাজের উন্নতির জন্য ব্যক্তির জীবনের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই মতবাদের প্রভাবেই রাষ্ট্রের কাজ কমিয়া আসিল, এবং ব্যক্তির কর্ত্তব্য বাড়িয়া চলিল। ইহার পর আর এক ধরণের চিন্তা মানুষের মাথায় খেলিল। সমাজ-তান্ত্রিকেরা বলিলেন "মানুষের মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য সমাজের অপরাপর লোকের সাহায্য পাওয়া একান্ত দরকার। এই সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে রাষ্ট্রের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে।" এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের কাজ ঠিক করিতে গেলে আর্থিক জীবনের সকল কাজকর্ম্মই রাষ্ট্রের হাতের মুঠায় আসিয়া পড়ে, ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়। স্নেহপ্রবণ পিতা যেমন পুত্রের ভবিষ্যৎ-কল্যাণ-কামনায় তাহার স্বাধীনতায় বাধা দেয়, তেমনি সমাজতন্ত্রপ্রবণ রাষ্ট্রগুলিও ব্যক্তির কল্যাণের জন্য তাহার স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটায়। কোনো কোনো রাষ্ট্র এই মতবাদের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে।

এখনকার সকল রাষ্ট্রই এই সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তি-তন্ত্রবাদের মাঝামাঝি থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইতেছে। তবে সকলেরই মূল নীতি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে মানিয়া চলা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যও বদলায়। কখনো উহার দুই একটা কাজ বাড়ে আবার কোনো সময়ে বা ব্যক্তিই নিজে গরজ করিয়া কোনো কোনো কাজ করে, রাষ্ট্র রেহাই পায়। আজকাল রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতায় তখনই হস্তক্ষেপ করে যখন সে ব্যক্তির শক্তি-সামর্থ্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির সুযোগ নষ্ট না করিয়া তাহার কল্যাণ করিতে পারে। কিন্তু গত য়ুরোপীয় কুরুক্ষেত্রের পর হইতে বড় বড় দেশের রাষ্ট্রের ঝোঁক দেখিতেছি সমাজতন্ত্রবাদের দিকে।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

এখন বাঙ্গালী জাতির অন্নসমস্যাই প্রধান সমস্যা। কি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, কি কৃষক, কি শ্রমজীবী সকলেরই এখন অন্নসঙ্কট উপস্থিত। বাঙ্গালীকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই অন্নসমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে।

বঙ্গদেশের প্রায় শতকরা আশী জন লোক কৃষিজীবী; তাহারা পল্লীগ্রামে বাস করে। বাকী বিশ জনের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধাংশ জমির উপস্বত্ব ভোগ অথবা চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অবশিষ্ট সকলে ব্যবসায় বাণিজ্যাদি দ্বারা প্রতিপালিত হয়। এই বিশ জনেরও অর্দ্ধেক পল্লীগ্রামে বাস করে।

প্রথমতঃ, কৃষকশ্রেণীর অবস্থা আলোচনা করা যাইতেছে। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলা জরিপ করা হইয়াছিল। সেটেলমেণ্ট অফিসার জ্যাক সাহেব জরিপ শেষ হইলে এই জেলার লোকের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহাতে এই জেলার সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। আমার বোধ হয় কৃষিপ্রধান ফরিদপুর জেলার যেরূপ অবস্থা, বাঙ্গালার অধিকাংশ জেলারই সেই-রূপ অবস্থা, সামান্য কিছু ইতরবিশেষ থাকিতে পারে। জ্যাক সাহেবের রিপোর্ট বিশ বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল, তাহার পর কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

কৃষকের আয়ব্যয়

জ্যাক সাহেব বলেন, ফরিদপুর জেলার একশটি কৃষক-পরিবারের মধ্যে মাত্র পঁয়ত্রিশটি পরিবার কেবল জমির উৎপন্ন হইতে বাঁচিতে পারে, পঁচিশটি পরিবারকে জমির আয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, বাকী চল্লিশটি পরিবারকে সারা বছর ধান কিনিয়া খাইতে হয়।

ভদ্র পরিবারের মধ্যে অর্দ্ধেক লোকের জমি জমা আছে, সিকি লোক চাকরীদ্বারা, অবশিষ্ট সিকি লোক ব্যবসা বাণিজ্য, ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী, তেজারতী প্রভৃতি উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করে। শতকরা আটজন লোক শিল্পকার্য্য (তাঁত বোনা ইত্যাদি) দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে।

যাহারা কৃষিকার্য্য করে তাহাদের একটী পরিবারের গড়পড়তা বার্ষিক আয় ২৮০৲ টাকা, যাহারা কৃষিকার্য্য করে না তাহাদের একটী পরিবারের গড়পড়তা বার্ষিক আয় ২৯৩৲ টাকা এবং এই উভয় শ্রেণীর গড়পড়তা, বার্ষিক আয় ২৮২৲ টাকা। প্রতি পরিবারে গড়ে পাঁচজন লোক সচরাচর ধরা হইয়া থাকে—একটী বয়স্ক পুরুষ, দুইটি স্ত্রীলোক, দুইটি বালকবালিকা; তাহা হইলে প্রতিজনের গড়ে বাৎসরিক আয় ৫৬৲ টাকা, প্রতিমাসে ৪।৶৮ পাই।

এই পাঁচটী লোকের প্রত্যেকে গড়ে মাসে ২৭॥০ সের চাউল খায়। যে সময়ে এই রিপোর্ট লেখা হইয়াছিল তখন চাউলের দাম পল্লীগ্রামে ৫৲ টাকা মণ ছিল, এখন ৭।০ টাকা হইয়াছে। সেই সময়ের দর ধরিলে, উক্ত পরিবারের তখন বৎসরে ২০৬।০ আনার চাউল কিনিতে হইত। কিন্তু কেবল চাউল খাইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না, তাহার সঙ্গে ডাল, তরকারী, মাছ, তেল, নুণ, মশলা ইত্যাদিও চাই। এতদ্ভিন্ন এই পাঁচটির পরিধেয় বস্ত্র ও শীতবস্ত্র কিনিতে হয়। আবার জমির খাজনা ট্যাক্স ইত্যাদিও আছে। সুতরাং ৫টি লোকের একটি পরিবারের বাৎসরিক আয় গড়ে ২৮২৲ টাকা হইলে তখনকার দিনেও ইহাতে কোন রকমে সংসার চলিতে পারিত না। এখন ত চাউলের দাম ও অন্যান্য জিনিষের দাম দেড়গুণ বাড়িয়াছে। যদি বল, চাউলের দাম ও পাটের দাম বৃদ্ধি হওয়াতে কৃষকদিগের আয়ও সেই পরিমাণে বাড়িয়াছে। কিন্তু সে কত লোকের? জ্যাক সাহেব বলিয়াছেন, শতকরা চল্লিশটি পরিবারকে ধান চাউল কিনিয়া খাইতে হয়।

জ্যাক সাহেব সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার হিসাবে পরিবারসমূহকে এই চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া তাহাদের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় দেখাইয়াছেন :

	শতকরা পরিবার সংখ্যা	বার্ষিক আয়	জনপ্রতি বার্ষিক আয়
সচ্ছল	৪৯	৩৬৫৲	৬০৲
অসচ্ছল	২৮	২৩৩৲	৪৩৲
দারিদ্র্য সীমার উপরে	১৮॥০	১৬৬৲	৩৪৲
দরিদ্র	৪॥০	১১৫৲	২৭৲

যাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া খায় তাহাদের উক্ত প্রকার আয় দেখান হইয়াছে ; অপর শ্রেণীর আয় জনপ্রতি যথাক্রমে ৮০৲, ৪২৲, ৩১৲ ও ২৪৲ টাকা।

কিন্তু আমরা উপরে যে হিসাব করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় একটি পরিবারের কেবল চাউলের খরচই বৎসরে ২০৬।০ টাকা। তাহা হইলে কৃষকদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক লোককে অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতে হয় এবং প্রায় সিকি লোকের একবেলার বেশী অন্ন জোটে না। যাহারা কৃষিকার্য্য করে না ও যাহাদের জমিজমা নাই তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কারণ তাহাদের "সচ্ছল" লোকদিগের বাৎসরিক আয় জনপ্রতি ৮০৲ টাকা রহিয়া গিয়াছে, অথচ চাউলের দাম পূর্ব্বাপেক্ষা দেড়গুণ বাড়িয়াছে।

কৃষকের ঋণভার

যখন চাউলের দাম ৫৲ টাকা মণ ছিল তখন কৃষক শ্রেণীর শতকরা ৩৯ জন এবং অপর শ্রেণীর শতকরা ২৭ জন ঋণগ্রস্ত ছিল। চাউলের দর বৃদ্ধি হওয়াতে এই ঋণগ্রস্ত লোকের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ নির্দ্দিষ্ট অল্প আয়ের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর।

মধ্যবিত্ত লোকের আয়ব্যয়

এই জেলায় ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোকের (১২,৭৭১ পরিবার) জমিজমা নাই। যাহাদের জমি নাই তাহাদের অর্দ্ধেক কেরাণীগিরি বা মুহুরিগিরি করেন, আর অর্দ্ধেক উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ শিক্ষক ইত্যাদি। জ্যাক সাহেব বলেন, যে সকল কেরাণী গভর্ণমেণ্টের চাকুরী করেন তাঁহাদের বেতন ইউরোপের অনেক দেশের কেরাণীর চেয়ে বেশী। এ কথা কতদূর সত্য জানি না। তবে এ দেশের সাহেব ও অর্দ্ধসাহেব কেরাণীরা গভর্ণমেণ্ট ও সওদাগরী আফিসে যে বাঙ্গালী কেরাণীর চেয়ে অনেক বেশী বেতন পান তাহা ত প্রত্যক্ষই দেখিতেছি। তাঁহাদের চালচলন অনেক উচ্চ ধরণের বলিয়া কম মাহিনায় তাঁহাদের পোষায় না। ইউরোপের নানা দেশে যাঁহারা কেরাণীগিরি করেন তাঁহাদের চালচলন কি ইঁহাদের চেয়ে কম ? গভর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণীদের সম্প্রতি মাহিনা বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহাদের অর্থকষ্ট অনেকটা দূর হইয়াছে স্বীকার করি। গভর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহের শিক্ষকদিগেরও কপাল খুলিয়াছে ; কিন্তু বে-সরকারী স্কুলসমূহের শিক্ষকগণের দুরবস্থার একশেষ! অনেক স্কুলেই গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণের মাহিনা ৩০৲।৪০৲।৫০৲ টাকার বেশী নহে। আইন ব্যবসায়ীদের উপর জ্যাক্ সাহেবের অত্যন্ত রাগ। তিনি বলেন, উকীল মোক্তারগণ "আলালের ঘরের দুলাল"। তাঁহাদের গুণপনার তুলনায় রোজগার অনেক বেশী। আমি মনে করি আধুনিক কালে অনেক সিভিলিয়ান সম্বন্ধে বরং এই মন্তব্য বেশী খাটে। মফঃস্বল কোর্টের কয়জন উকীল জজ ম্যাজিষ্ট্রেটদের চেয়ে বেশী রোজগার করেন ? আমি মনে করি একটা জেলায় বিশ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র দুই তিনটী উকীল ও হাকিমের মাসিক আয় হাজার টাকা ও তাহার উপরে এবং

৫০০৲ টাকা হইতে ১০০০৲ টাকা আয়—১৫।২০ জনের
৩০০৲ „ „ ৫০০৲ „ আয়—৫০।৬০ জনের
১৫০৲ „ „ ৩০০৲ „ আয়—১৫০।২০০ „
১০০৲ „ „ ১৫০৲ „ আয়—৪০০।৫০০ „

ইহার মধ্যে হাকিম, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কেরাণী, পুলিশ, প্রফেসর, মাষ্টার ইত্যাদি সব রকম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক পড়িতেছে। জমিদার ও তালুকদারদিগের ধরা হয় নাই।

ফরিদপুর জেলায় বার্ষিক ৫০,০০০৲ টাকা আয়ের জমিদার ৩।৪টার বেশী হইবে না (অবশ্য বিদেশবাসী জমিদার বাদে) ; ১০।২০।২৫ হাজার টাকা আয়ের জমিদার ২০।২৫টি হইবে ; অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই ক্ষুদ্র তালুকদার।

তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকেরই আয় ৫০০৲ হইতে ২০০০৲ টাকা হইবে। প্রজার নিকট হইতে বৎসরে ৫০৲ কি ১০০৲ টাকা খাজনা আদায় করিয়া তাহার অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দেয় এবং ২০।২৫ বিঘা খামার জমির উপস্বত্ব ভোগ করে, এইরূপ ক্ষুদ্র তালুকদারের সংখ্যাই এ জেলায় হাজার হাজার।

ব্যবসাদারদিগের অবস্থা

এই জেলায় মাদারীপুর, পালং, গোপালগঞ্জ, ভাঙ্গা, কাশীয়ানি, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী, পাংশা প্রভৃতি বন্দরে অনেক ব্যবসাদার আছে, তাহাদের কাহারও কাহারও কারবার খুব বড়। ইহারা ধান, চাউল, পাট, কাপড়, বাসন টীন, কাঠ প্রভৃতি জিনিষের ব্যবসায় করে। এই সকল ব্যবসাদারের মধ্যে প্রায় ৫০০ লোক ইন্‌কামট্যাক্স দেয়, অর্থাৎ তাহাদের বাৎসরিক আয় দুই হাজার টাকার উপরে। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ব্যবসাদার আছে, যাহারা ধান, চাউল, কাপড়, বেনেতি মসলা, তেল, নুণ, তামাক, চিনি মণিহারী দ্রব্য ইত্যাদি হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া মাসে ১৫।২০৲ টাকা লাভ করে। এই সকল ব্যবসাদার অধিকাংশ জাতিতে তিলি কিংবা সাহা। আজকাল অনেক নমঃশূদ্রও এই ব্যবসায় ধরিয়াছে। বারুই জাতি বরজে পান উৎপাদন করিয়া হাটে হাটে বিক্রয় করে। তাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। এ জেলায় মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের সংখ্যা খুব কম। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি ব্যবসায় ভাল বুঝে না, এই সকল ব্যবসায় চালাইতে হইলে যেরূপ শিক্ষার দরকার স্কুল কলেজে তাহারা সেরূপ শিক্ষা পায় না, বরং আধুনিক স্কুল কলেজের বিলাসিতার আবহাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া তাহারা ঐ সকল ব্যবসায়োচিত শারীরিক পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতাতে সম্পূর্ণ অপটু হইয়া পড়ে। একজন সাহা মহাজন বা মাড়োয়ারী তাহার দৈনিক বেচাকেনার হিসাবে একটি পয়সার গরমিল হইলে তাহা মিলাইবার জন্য হয়ত রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত খাটিবে, কিন্তু একজন কলেজ-পড়া বাবু "এক পয়সা ত জানে দাও" বলিয়া তাহা উপেক্ষা করিবে, এবং সেইরূপ অভ্যাস হওয়াতে পরে একশত টাকাকেও অগ্রাহ্য করিয়া অবশেষে এক হাজার টাকা লোকসান্ দিয়া বসিবে। ব্যবসায় ব্যাপারে এক পয়সাও একশত টাকার সমান মূল্যবান মনে করিতে হইবে, অর্থাৎ অভ্যাসই আসল বস্তু। ইংরেজীশিক্ষিত যুবকদিগকে ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে সেই মনের অভ্যাস অর্জ্জন করিতে হইবে।

কারুকার্য্য

এ জেলায় শিল্পকার্য্য অতি সামান্যই আছে। মুসলমান কারিগরেরা তাঁত বোনে, ছুতারমিস্ত্রীরা কাঠের কাজ করে, এতদ্ভিন্ন স্বর্ণকার, লোহার কামার, কুম্ভকার, মালাকার, চর্ম্মকার ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পী অনেক আছে। সাতৈর গ্রামে উৎকৃষ্ট শীতলপাটী প্রস্তুত হয়, কিন্তু এই শিল্প শ্রীহট্টের আমদানী সস্তা পাটীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়া লোপ পাইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে এ জেলায় অনেক সূত্রধর ছিল, তাহারা কাঠের উপর অতি সূক্ষ্ম খোদাই কার্য্য এবং মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারিত। এখন সেরূপ কারিগর প্রায় দেখা যায় না, কেবল বিষ্ণুদি নিবাসী শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিস্ত্রীকে রথের ঘোড়া ও সারথি, শিব, দুর্গা, গণেশ, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছি। গাজনা গ্রামের কুম্ভকারগণ ("দেউড়ী") উৎকৃষ্ট দেবদেবীর মৃণ্ময়মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত, এখন তাহাদের বংশ প্রায় লোপ পাইয়াছে। তবুও স্থানে স্থানে এখনও অনেক "দেউড়ী" আছে। ফরিদপুর সহরের নিকটেও অনেক গ্রামে রাজমিস্ত্রী আছে, তাহারা পাকা কোঠা নির্ম্মাণ করে। এই সকল শিল্পীদিগের মাসিক আয় সাধারণতঃ ৩০৲।৩৫৲ টাকা, বেশী দক্ষ হইলে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। আমি যে পূর্ণচন্দ্র মিস্ত্রীর কথা বলিলাম, তাহার মাসিক আয় ৩৫৲ টাকা এবং খোরাকী।

দিনমজুর বা শ্রমিকগণ

যাহারা দিনমজুরী করিয়া খায় এবং অন্য জেলায় যে সকল লোক "মুনিষ," "জনমজুর," "কামলা" ইত্যাদি নামে পরিচিত, ফরিদপুর জেলায় সেই শ্রেণীর লোক খুব কম,

সেইজন্য এই জেলায় সেই শ্রেণীর লোক বুঝায় এরূপ শব্দও প্রচলিত ছিল না—সম্প্রতি "কৃষাণ" শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। তাহার কারণ এ জেলায় সকলেরই কিছু-না-কিছু জমি ছিল, ভূমি-শূন্য লোক খুব কম। তবে মহাজনের কবলে পড়িয়া আজকাল এইরূপ অনেক লোকের উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও সহর বাজারের নিকটেই এরূপ কতক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সুদূর পল্লীগ্রামে কোন একজন কৃষক শ্রেণীর লোককে যদি বলা যায়, "তুমি আমার এই বাক্সটা মাথায় করিয়া লইয়া চল, তোমাকে ॥• আনা দিব," তবে সে বলিবে, "ক্যান্ তুমি নিজে মাথায় করিয়া নিতে পার না? আমি বুঝি তোমার চাকর!" এ জেলায় কুষ্টিয়া, মেহেরপুর প্রভৃতি স্থানের লোক আসিয়া মাটিকাটা, জঙ্গল আবাদ, পুষ্করিণী-খনন প্রভৃতি কাজ করে এবং ধান-কাটার সময় ঢাকা জেলা হইতে অনেক কৃষক আসিয়া ধান কাটে এবং পারিশ্রমিকস্বরূপ ধান লইয়া যায়। যাহাদের চাষের জমি নিতান্ত অল্প সেরূপ কোন কোন লোক আবার এ জেলা হইতে বরিশাল, খুলনা জেলার "ভাটী অঞ্চলে" ধান কাটিতে যায়। তবে কৃষকেরা দলগঠন (গাঁতা) করিয়া পরস্পরের ধানপাট নিড়ান ও ধানকাটার কাজ করে, তাহাতে অপমান বোধ করে না। যে সময়ে ক্ষেতে কোন কাজ থাকে না, তখন ইহারা আলস্যে কাল কাটায় অথচ পয়সা লইয়া কোন কাজ করে না। তবে কোন কোন লোক নৌকার মাঝিগিরি করে। ইহারা আরোহিগণের বাক্স বিছানা মাথায় করিয়া লইতে অপমান বোধ করে না, কিন্তু পয়সা লইয়া অন্য লোকের মোট বহিতে কিছুতেই সম্মত হইবে না। এইরূপ শারীরিক পরিশ্রমে অপমানবোধ শুভ লক্ষণ নহে, ইহা তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধির পরিচায়ক। এ জেলায় দিনমজুরের সংখ্যা কম বলিয়া শ্রমিকের মজুরীও অত্যন্ত বেশী। পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ দৈনিক ॥• আনা ও দুই বেলা খোরাকী না দিলে লোক পাওয়া যায় না। ইহারা বেলা ৬টা ৭টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করে, মধ্যাহ্নভোজনের পর ২ ঘণ্টা বিশ্রাম করে। সহরের নিকট দৈনিক হার ॥৶• আনা, কিন্তু খোরাকী দিতে হয় না। ইহারা বেলা ৮টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত কাজ করে। যেবার পাটের দর খুব বাড়ে সেবার এই সকল কৃষাণগণ দৈনিক একটাকা পাঁচসিকাও রোজগার করে।

পাটের চাষ

পাটের চাষ এই জেলায় এমন কি পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন জেলায় এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কৃষক, মজুর, জমিদার, মহাজন, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সচ্ছলতা এই পাটের মূল্যের উপর নির্ভর করে। জ্যাক্ সাহেব বলেন, ফরিদপুর জেলার কৃষকেরা পাট বেচিয়া বৎসরে বার কোটী টাকা রোজগার করে, অবশ্য সে ১৫ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন সাধারণতঃ পাটের দাম ৫।৬৲ টাকা ছিল। তাহার পরে যুদ্ধের সময় পাটের দর হঠাৎ কমিয়া গিয়া মণ ২।৩৲ পর্য্যন্ত নামিয়াছিল; পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ৩ বৎসর পূর্ব্বে অত্যন্ত বাড়িয়া ২০।২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু সে কেবল ১ বৎসরের জন্য। গত ৩ বৎসর আবার ৮।১০৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে, এখন ইহাকেই নরম্যাল প্রাইস বলা যায়। এই দরে পাট বিক্রয় করিয়া ফরিদপুরের কৃষকেরা এখন বৎসরে প্রায় ১৮ কোটী টাকা পাইতেছে। বিদেশ হইতে বৎসরে এতগুলি টাকা পাওয়া কেবল এক পাটচাষের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং পাটের চাষ তুলিয়া দেওয়ার জন্য হাজার আন্দোলন করিলেও লোকে তাহাতে কর্ণপাত করিবে না, আর সে রকম আন্দোলন সমীচীনও নহে। কারণ কেবল এক ধান-চাষের উপর নির্ভর করিলে কৃষকের কিছুতেই চলিতে পারে না। কেবল কৃষক বলিয়া নহে, অন্যান্য শ্রেণীরও চলিতে পারে না। আর বৎসর বৎসর এতগুলি টাকা বিদেশ হইতে যখন আসিতেছে তাহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আমরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি বিদেশী বণিকেরা নানা প্রকার পণ্য-দ্রব্য আমদানি করিয়া আমাদের টাকা লুটিয়া লইতেছে, কেবল একমাত্র পাটের দ্বারাই আমরা তাহার কথঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ করিতেছি। তবে এক কথা এই, বিদেশী

পাট খরিদ্দারদিগের ষড়যন্ত্রে কৃষকেরা তাহাদের উৎপন্ন পাটের সমুচিত মূল্য অনেক সময় পায় না। তাহার প্রতিবিধানের জন্ত কৃষকদিগের পাট বিক্রয়ের সমবায় গঠন করা কর্ত্তব্য।

জ্যাক্ সাহেবের সময়ে এক একর অর্থাৎ ৩ বিঘা জমিতে ৭৫৲ টাকা মূল্যের পাট হইত এবং সেই জমিতে পাট না বুনিয়া ধান বুনিলে ৩৭৸০ টাকা মূল্যের ধান হইত। এক বিঘায় গড়ে ৫ মণ পাট হইলে তাহার বর্ত্তমান মূল্য ৫০৲ টাকা, ও ৬ মণ ধান হইলে তাহার বর্ত্তমান মূল্য ২৫৲ টাকা। ধান ও পাটের চাষে এতটা প্রভেদ। আর পাট চার পাঁচ মাসের ফসল, ধান ছয় সাত মাসের ফসল। ধান আবাদে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি যে সকল বিপদ আছে, পাটের আবাদে তাহা নাই। সুতরাং নানা কারণে পাটের চাষই কৃষকদিগের পক্ষে অধিকতর লাভজনক। একজন কৃষকের যদি ১০ বিঘা জমি থাকে, আর তাহার ৫ বিঘাতে ধান ও ৫ বিঘাতে পাট উৎপাদন করে, তবে ফসল নষ্ট না হইলে সে পাট বিক্রয় করিয়া ২৫০৲ টাকা ও ধান বিক্রয় করিয়া ১৫০৲ টাকা, মোট ৪০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। কৃষক নিজহাতে চাষের সমস্ত কাজ করিলে এই আয় হইবে, কিন্তু একজন ভদ্রলোক যদি মজুরের দ্বারা সমস্ত কাজ করান, তবে তাঁহার কৃষাণ খরচ দিয়া বৎসরে ১৫০।২০০৲ টাকা লাভ দাঁড়াইবে কিনা সন্দেহ। এইজন্ত যাঁহারা লাঙ্গল খামার করিয়া শ্রমিকের সাহায্যে জমি চাষ করান তাঁহাদের মোটের উপর বেশী লাভ দেখা যায় না, বিশেষতঃ ফসলের মূল্য যখন কম হয়।

আমরা এইরূপে কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত লোক, ব্যবসাদার, চাকুরিজীবী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর আয়ব্যয়ের একটা রেপিড্ সারভে করিয়া দেখিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফরিদপুর জেলার যে অবস্থা, বঙ্গের সকল জেলারই প্রায় সেই অবস্থা। কারণ ধান্তাদির বাজার সর্ব্বত্রই একরূপ দাঁড়াইয়াছে এবং লোকের আয়ের পরিমাণও বাড়িতেছে না। বাঙ্গালা দেশের প্রায় অর্দ্ধেক পরিবারের বার্ষিক আয় গড়ে ৩৬৫৲ টাকা, এবং তাহাদের সচ্ছলভাবে চলে; বাকী অর্দ্ধেক পরিবারের মধ্যে কাহারও অসচ্ছলভাবে, কাহারও কষ্টে এবং কাহারও অতিকষ্টে দিন যাপন করিতে হয়।

প্রতিকারের উপায় কি?

কৃষক-শ্রেণীর বিষয়ই আগে চিন্তা করা যাক্। যে কৃষকের ১০ বিঘা চাষের জমি আছে তাহার ধানে ও পাটে বৎসরে প্রায় ৪০০৲ টাকা আয় হয়। একটি ভদ্র পরিবার পল্লীগ্রামে বাস করিলে এই আয়ে তাহার দেনা না হইয়া সচ্ছলভাবেই চলিতে পারে। আজকালকার বাজারে একজন ভদ্র-সন্তান বি-এ পাশ করিয়াও বৎসরে ৪০০৲ টাকা রোজগার করিতে পারে না। কিন্তু কৃষকদিগের ঋণ হয় কেন? তাহার কারণ কৃষকের অমিতব্যয়িতা ও দূরদৃষ্টির অভাব, আবার পূর্ব্ব বঙ্গে তাহাদের মামলা-প্রিয়তা। এই মামলাপ্রিয়তার মূলে আছে হিংস্র প্রকৃতি ও বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা বুঝাইতেছি।

রমজান সেখ এ বৎসর পাট বেচিয়া ৩০০৲ টাকা পাইয়াছিল। তাহার কতক টাকা দিয়া সে মহাজনের দেনা শোধ করিয়াছে, কতক টাকা নানা বাবদে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। কারণ নগদ টাকা হাতে আসিলে ইহাদের নানাপ্রকার অভাবও আসিয়া উপস্থিত হয়। যে ধান পাইয়াছিল তাহা চৈত্র মাসের মধ্যে খাইয়া ফেলিয়াছে। বৈশাখ মাসেই মাসিক টাকা প্রতি ⁄০ আনা সুদ স্বীকার করিয়া সে মহাজনের নিকট হইতে আবার ২৫৲ কর্জ্জ করিল। ইহাতে এই দুই মাস কষ্টে সৃষ্টে চালাইয়া আষাঢ় মাসে কিছু আউশ ধান পাইল এবং শ্রাবণ মাসে পাট বেচিয়া কিছু নগদ টাকা হাতে পাইল। তখন তাহাকে পায় কে? সে এক দিন হাটে যাইয়া একটা ইলিশ মাছের দাম বার আনা বলিল। তাহার প্রতিবেশী আরজান সেখ ঐ মাছের দাম চৌদ্দ আনা বলাতে রমজান এক টাকা দিয়া ঐ মাছ কিনিল, এবং আরজানের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"কি? আমি আব্বাচ মাতব্বরের বেটা, আমার দরাস করা মাছ তুই কিনতে চাস্। আমি তোর চেয়ে কম কিসে?" আরজানও

ক্রোধভরে একটা গালি দিল। তখন রমজান তাহার মাথায় লাঠির বাড়ি মারিল। আরজানের সঙ্গে আরও লোক ছিল, তাহারা লাঠি হাতে আসিয়া জুটিল। রমজানের আত্মীয়স্বজনও আসিয়া জুটিল। এইরূপে উভয় পক্ষে একটা মস্ত হাঙ্গামা হইল। তাহার ফলে উভয় পক্ষের চার পাঁচ জন লোকের মাথায় জখম হইল। পরে থানায় এজাহার দেওয়া হইল, পুলিশ আসিল, উভয় পক্ষের ঘুষ খাইয়া রমজান ও তাহার ছেলে বছিরুদ্দিনকে চালান দিল। এই মোকদ্দমা তিন মাস ঘুরিল, রমজান উকীল, মোক্তার আমলা প্রভৃতিকে ২০০৲ টাকা আক্কেল সেলামী দিয়া তিন মাস জেল খাটিয়া ঘরে ফিরিল। এই ব্যাপারে সে পাট বেচিয়া যে টাকা জমাইয়াছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া আরও ১০০৲ টাকা মহাজনের নিকট ঋণগ্রস্ত হইল।

অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন কৃষক-শ্রেণীর এইসকল দোষ সংশোধন করিবার জন্য চাই (১) বাধ্যতামূলক শিক্ষাবিস্তার (২) বাধ্যতামূলক অর্থসঞ্চয় এবং (৩) বাধ্যতামূলক বিবাদ-নিষ্পত্তি। বাধ্যতামূলক শিক্ষাবিস্তারের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ও স্কুল স্থাপন করা আবশ্যক। বাধ্যতামূলক সঞ্চয় শিক্ষার জন্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে। বাধ্যতামূলক বিবাদনিষ্পত্তির জন্য সালিশী পঞ্চায়েৎ স্থাপন করিতে হইবে; যে সকল কর্ম্মী যুবক এখন পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন ও উন্নতিবিধানের সঙ্কল্প করিতেছেন, আমি এই কয়েকটি বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

যে সকল কৃষকের জমি আছে তাহাদের অভাব-অনটনের জন্য তাহারা নিজেরা দায়ী। যাহাদের অধিক জমি নাই তাহারা যদি কায়িক শ্রম দ্বারা রোজগারের চেষ্টা করে তবে তাহাদের অভাব দূর হইতে পারে। শ্রমিকগণের মজুরির হার ক্রমেই বাড়িতেছে, সুতরাং তাহাদের জন্য ভাবনার বিশেষ কারণ নাই। কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্র-সন্তানগণের অন্নসমস্যাই ক্রমে অধিকতর কঠিন হইয়া পড়িতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া হাজার হাজার যুবক বেকার বসিয়া আছে। একজন গ্রাজুয়েট যদি এখন ৩০৲ টাকা মাহিনায় একটি চাকুরী পায় তবে সে নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করে। একটা ৫০৲ টাকা মাহিনার চাকরীর বিজ্ঞাপন দিলে তিন চারি শত দরখাস্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার মধ্যে সকলেই গ্রাজুয়েট, অনেকে এম এ পাশ, আবার দুই চারি জন এম-এ বি-এলও হইতে পারেন।

গভর্ণমেন্টের গত পাঁচসনা শিক্ষাবিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ১৯২৬-২৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪,২৯০ জন বালক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে পাশ হইয়াছিল ৭,৫৩৭ জন। বাকী সাত হাজার ছেলের মধ্যে যাহারা আবার পড়ে নাই তাহারা অবশ্যই চাকুরীর উমেদার হইয়াছে। আবার যাহারা পাশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যেও অনেক ছেলে আই-এ আই-এস-সি পড়িতে পায় নাই। ঐ সনে উক্ত দুই পরীক্ষা দিয়াছিল ৮২৬২ জন, তাহার মধ্যে ৩৮৩৩ জন পাশ করিয়াছিল। ঐ সনে ৪০৯৭ জন বি-এ ও বি-এস সি দিয়াছিল, তাহার মধ্যে ১,৬৫১ জন পাশ করিয়াছিল, বাকীগুলি কতক আবার পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিল, অবশিষ্টগুলি উমেদার হইয়াছে। এই এক বৎসরে যদি ১৬৫১ জন গ্রাজুয়েট বাহির হইয়া থাকে, তবে পাঁচ বৎসরে প্রায় ৮ হাজার গ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াছে। যাহারা আই-এ, আই-এস-সি, বি-এ, বি-এস-সি পাশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অতি অল্প ছেলেই মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাইতে পারিয়াছে। ঐ সনে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মাত্র ২০১ জন ছাত্র ছিল এবং ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ছিল ৪৪৩ জন, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছিল ৯৩৯ জন, বেলগাছিয়া কলেজে ছিল ৫৯৮ জন ট্রপিক্যাল স্কুলে ছিল ৭৯ জন। এতদ্ভিন্ন ক্যাম্বেলে ও ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ছিল খুব সম্ভব ৩।৪ শত। সুতরাং যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৎসর বৎসর বাহির হইতেছে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই চাকুরী পায়; কারণ চাকুরীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। অবশিষ্ট লোকেরা কি করিয়া খাইবে?

আমরা তাহাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আবার

গ্রামে যাইয়া বাস কর ও চাষ করিয়া খাও। একজন ভদ্রসন্তান জমিচাষের দ্বারা কিরূপ উপার্জ্জন করিতে পারে তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে হিসাব করিয়া দেখিয়াছি। ১০ বিঘা জমি চাষ করিলে ৪০০৲ টাকা মূল্যের ধান ও পাট হইতে পারে। কিন্তু যে নিজ হস্তে জমি চাষ করিতে পারে তাহার এই লাভ। যদি কৃষাণ দিয়া জমি চাষ করা হয় তবে শ্রমিকের মজুরি দিয়া ২০০৲ টাকা লাভ থাকিবে কিনা সন্দেহ। ফরিদপুরের সরকারী কৃষি অফিসে কয়েকটি ভদ্র সন্তানকে নিজ হাতে জমি চাষ করান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, যদি তাহারা কৃতকার্য্য হয় তবে তাহাদিগের প্রত্যেককে গভর্ণমেণ্ট খাসমহাল হইতে চাষ করিবার জন্য ২০ বিঘা জমি দেওয়া হইবে এরূপ প্রলোভন দেওয়া হইয়াছে। স্যার পি, সি, রায় ফরিদপুরে যাইয়া তাহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। এইরূপ শিক্ষাদান খুব আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। কিন্তু হাজার হাজার বেকারের সমস্যা ইহা দ্বারা মীমাংসা হইবে না। তবে ভদ্রসন্তানগণ যদি ইহাদ্বারা নিজ হাতে কৃষিকার্য্য করিতে উৎসাহিত হন তবে পল্লীগ্রামে নিজ নিজ বাড়ীতে বসিয়া তাঁহারা জমি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন। শিক্ষিত যুবকগণ কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলে তাঁহারা নানা প্রকারে কৃষি-কার্য্যের উন্নতিবিধান করিতে পারিবেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী কৃষিকার্য্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন। ফরিদপুর জেলায় বৃষ্টির অভাবে জমি চাষ হইতে পারে না, অথবা বোনা ফসল রৌদ্রে শুকাইয়া যায়, অথচ সেই ক্ষেতের নিকটেই বিলে অথবা নদীতে গভীর জল আছে। বগুড়া জেলায় দেখিয়াছি, এইরূপ স্থলে কৃষকেরা তাল গাছের ডোঙ্গার সাহায্যে ক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া ফসল রক্ষা করে, কিন্তু ফরিদপুরের কৃষকেরা তাহা জানে না, বুঝাইয়া দিলেও আলস্যবশতঃ কেহ তাহা করে না, কেবল "হায় আল্লা" বলিয়া আকাশের দিকে মেঘের অপেক্ষায় তাকাইয়া থাকে। একজন শ্রমশীল শিক্ষিত যুবক হাতে কলমে জল সেচন করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন এবং নিজের ফসলও রক্ষা করিতে পারেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় দেখিয়াছি ক্ষেতের মধ্যে অথবা জঙ্গলে বিস্তর বুনো কুলগাছ আছে। কৃষকেরা সেই সকল গাছে গালা উৎপাদন করে, তাহাতে একটা অতিরিক্ত লাভ হয়। একজন শিক্ষিত যুবক নদীয়া অথবা ফরিদপুর জেলায় গালার চাষ হইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন এবং আমার বিশ্বাস মুর্শিদাবাদে যখন গালার চাষ সম্ভব হইয়াছে তখন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী নদীয়া জেলায়, এমন কি ফরিদপুর জেলায়ও তাহা সম্ভবপর হইবে। তাহা হইলে ধান ও পাট ভিন্ন আরও একটী নূতন ফসল জমিতে উৎপন্ন হইয়া আয় বৃদ্ধি করিবে। এইরূপ উদ্যমশীল সুশিক্ষিত যুবকগণের দ্বারা কৃষিকার্য্যের অনেক প্রকার উন্নতি হইতে পারে।

তারপরে কেবল ধান ও পাট চাষের উপর নির্ভর না করিয়া এক বিঘা কি দুই বিঘা জমিতে বাগান করা যাইতে পারে। কলাগাছ লাগাইলে এক বৎসরেই তাহার ফল হয়। একটা কলাগাছে বৎসরে আট আনা আয় হয়। নারিকেল ও সুপারি গাছ খুব লাভজনক; একটা নারিকেল গাছে বৎসরে পাঁচ টাকা ও একটা সুপারিগাছে এক টাকা আয় হয়। এইরূপে দুই বিঘা জমিতে যদি একশত নারিকেল গাছ, ও দুইশত সুপারি গাছ লাগান যায় তবে কয়েক বৎসর পরে বছরে অন্ততঃ পাঁচ শত টাকা লাভ হইবে।

এইরূপে ক্ষেতের ফসল ও বাগানের ফল ভিন্ন গ্রামে বসিয়া একজন শিক্ষিত যুবক আরও নানা প্রকারে আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন। প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই ভাল স্কুল নাই। তিনি যদি একটা স্কুল করেন, তবে তাঁহার দ্বারা গ্রামে শিক্ষাবিস্তারে দেশের উপকার করা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও মাসে অন্ততঃ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। ইহার সঙ্গে আবার তিনি যদি কবিরাজী অথবা হোমিওপ্যাথি পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করেন তাহা দ্বারাও নিজের আয় বৃদ্ধি ও দেশের উপকার করা হইবে।

এইরূপে একজন উদ্যমশীল ও শ্রমসহিষ্ণু যুবকের পল্লী গ্রামে অনেক প্রকার অর্থোপার্জ্জনের পথ রহিয়াছে। তাঁহাকে কেবল চাকুরির মোহ ও সহরের মায়া ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ পল্লীগ্রামে বাস করিলে তাঁহারা পল্লীগ্রামের ও পল্লীবাসিগণের অশেষ-বিধ কল্যাণসাধন করিতে পারিবেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার চেয়ে বড় কাজ আর নাই।

(প্রবাসী)

চিত্র পরিচয়

রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা, সি, আই, ই

বাঙ্গালার ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা দীর্ঘকাল যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা গৌরবে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে ব্যবসা-বুদ্ধি ও সাধুতার সম্মিলন তাঁহার অসামান্য সাফল্যের কারণ, তাহা তাঁহার মৌলিক নহে—কৌলিক। সেই কৌলিক গুণ-রাশি তাঁহার দ্বারা অনুশীলনে পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা সাহেবের জন্ম হয়। তিনি লোকমান্য—কলিকাতার তৎকালীন ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের শিরোমণি মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা মহাশয়ের দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র। হিন্দু স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের পর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তিনি পিতার নির্দ্দেশে ব্যবসা-কার্য্যে মনোনিবেশ করেন এবং কেলী কোম্পানীতে শিক্ষা-নবিশির সঙ্গে সঙ্গে নিজ পরিবারের বিরাট ব্যবসায় যোগ দেন। এ দিকে তিনি স্বগৃহে ফরাসী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন।

মহারাজা দুর্গাচরণের মত বড় বাঙ্গালী ব্যবসায়ী তখন বঙ্গদেশে আর কেহ ছিলেন না। তিনি পুত্রের প্রতিভা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য অনুজ শ্যামাচরণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে তিনি বিশাল জমীদারীর সব কাজের ভার যুবক হৃষীকেশকে প্রদান করেন।

পরিবারের ব্যবসা (প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোম্পানী) ও জমীদারীর কাজও হৃষীকেশের উৎসাহ সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত রাখিতে পারিল না। তাই পিতার অনুমতি লইয়া তিনি বিগত শতাব্দীর অষ্টম দশকে কৃষ্ণদাস লাহা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতে লাগিলেন।

আজ বাঙ্গালায় তাঁহার মত অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী আর নাই। সেই জন্য সকল প্রতিষ্ঠানেই তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ লক্ষিত হয়।

তিনি বাঙ্গালার জমীদার সভা—বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদকরূপে বহুদিন তাহার কর্ণধার ছিলেন এবং পরে তাহার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন তাঁহার বন্ধু রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের সহিত একযোগে তিনি বঙ্গীয় বণিক সভা—বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া তাহার সভাপতিরূপে বিরাজ করিতেছেন। পরিণত বয়সেও এই প্রতিষ্ঠানের সকল কার্য্য তাঁহার নির্দ্দেশে পরিচালিত হয়। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা করপোরেশনের সদস্য, পোর্ট ট্রাষ্টের কমিশনার, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সদস্য, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের পরামর্শ সভার সভ্য ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় বণিকদিগের প্রতিনিধিরূপে মনোনীত হইবার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি স্বয়ং ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরকে মনোনীত করিতে বলেন। সরকার তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন। ২৪-পরগণা জিলা বোর্ডে যখন প্রথম বে-সরকারী সভাপতি নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনিই সে পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ট্রাষ্টী ছিলেন এবং বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশন প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর। সর্ব্বোপরি তিনি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টরদিগের অন্যতম এবং কলিকাতার গভর্ণর-দিগের সভাপতিত্বে মনোনীত হয়েন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বহু কার্য্যভার তাঁহার যোগ্য পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা ও কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহার হস্তে অর্পণ করিয়া অধ্যয়নেই অধিক সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু এখনও নানা প্রতিষ্ঠানের নানা কার্য্যে তাঁহার উপদেশ সাগ্রহে গৃহীত হয়।

তাঁহার মত কঠোর পরিশ্রমী ও বিলাসবর্জ্জিত জীবন-যাপনকারী ধনী বিরল। তিনি সত্যবাদী, সরলহৃদয় ও মধুরভাষী। তিনি হৃদয় ও মনের বিশালতায় সকলের আদর্শস্বরূপ।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল বি,এ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবণ—১৩৩৭

৫ম বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
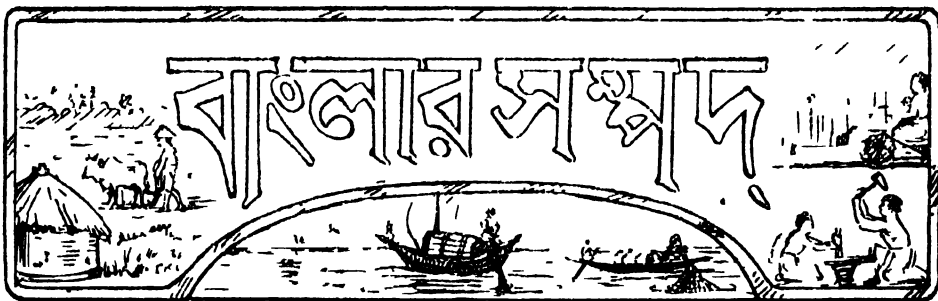
কালনার কৃষিসংবাদ

আজ কয়েকদিন ধরিয়া বৃষ্টির নাম নাই। মধ্যে মধ্যে মেঘ করিলেও বর্ষণ একেবারেই হইতেছে না। ফলে আউশ ধানের ও পাটের চাষের অবস্থা খুবই খারাপ। ২।৪ দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে এবারকার ফসল পাইবার আশা খুবই কম। (আষাঢ় ১৩৩৭)

কাঁথিতে বৃষ্টির অভাব

আষাঢ় মাস হইল, এখনও পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ায় লোকে চাষের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছে না। জলাভাবে তরীতরকারী আদিও ভালরূপ জন্মিতেছে না। তা'ছাড়া পানীয় জলের অভাবে মানুষ ও গবাদির বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

দামোদরের জল বিনামূল্যে সরবরাহ

দামোদর নদের পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য ও কৃষির উন্নতিকল্পে হুগলি জেলার ভাঙ্গামোড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত দামোদর সম্মেলনে গৃহীত ডাক্তার রায় গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের প্রস্তাবানুযায়ী সেচ বিভাগ নিম্ননির্দ্দিষ্টরূপে বর্ত্তমান বর্ষে জল সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন, সেচ বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বাহাদুরের ও দামোদর বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়ের পত্রে এরূপ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য দামোদরের পূর্ব্ব উপকূলস্থ বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জিলার ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতিগুলিকে ও জনসাধারণকে অবগত করান যাইতেছে যে, স্বাস্থ্যের উন্নতি-কল্পে ও প্রচুর মৎস্য উৎপাদনের জন্য কাণানদী, কাণাদামোদর,

গাঙ্গুলী, ধুসী ও ইডেন ক্যানেল প্রভৃতি দামোদরের জলসরবরাহের যে সকল পয়ঃপ্রণালী আছে, তাহাদের তীরবর্ত্তী গ্রামের পুষ্করিণী, ডোবা ও অন্যান্য জলাশয় পরিপূরণার্থ ১৯৩০ সনের ১৫ই জুন হইতে ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত দামোদরের পলি সার ও মৎস্য পরিপূর্ণ মূল্যবান প্রথম বন্যাজল বিনা পয়সায় সরবরাহ করা হইবে। উক্ত জল লইতে হইলে যে সকল জলাশয়ে জল লওয়া হইবে তাহার একটি মোটামুটি নক্সা ও নিকটবর্ত্তী ক্যানেল হইতে দূরত্বের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া সাবডিভিশন্যাল ক্যানেল অফিসার, ইদিলপুর, পোষ্ট কাঞ্চননগর (বর্দ্ধমান)—এই ঠিকানায় সত্বর আবেদন করিতে হইবে। আরও জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যদি জলের চাহিদা হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর এইরূপ বিনা পয়সায় জল সরবরাহ করা হইবে। কিন্তু উক্ত জল চাষের জন্য ব্যবহৃত হইলে ইডেন ক্যানেল আইনের ২৯ ধারা অনুসারে ১০,০০০ ঘন ফুট বা তদংশ পরিমাণ জলের জন্য ৵০ আনা হিসাবে মূল্য দিতে হইবে। শ্রীকালীকুমার মিত্র, সেক্রেটারী দামোদর সম্মেলন; কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি, ১-২ এ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনিকেতন-কৃষিক্ষেত্র

শ্রীনিকেতন কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য পূর্ব্বে মাত্র ৪৫ বিঘা জমি লইয়া চলিত। গত বৎসর বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষ চারিপাশের প্রায় ২৫০০ বিঘা পতিত জমি গ্রহণ করিয়াছেন। এ বৎসরের প্রথমেই শ্রীনিকেতনের নিকটবর্ত্তী ঐ সকল জমিগুলিতে চাষ দিয়া উহা ফসল বুনিবার উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। এইজন্য শ্রীনিকেতনে একটী কলের লাঙ্গল ক্রয় করা হইয়াছে। কলের লাঙ্গলের কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। এই সকল পতিত জমিতে জোয়ার বা অন্যান্য জাতীয় গো-খাদ্য চাষ করিবার পরিকল্পনা চলিতেছে।

বাঙ্গালায় কচুরীপানা

কচুরীপানার উৎপাতে বাঙ্গালার হাজামজা নদীগুলির যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা সহরবাসীরা বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না। এই সর্ব্বনাশকর জলজ উদ্ভিদ স্বল্পস্রোতবিশিষ্ট নদীর জল অতি শীঘ্র একেবারে ঢাকিয়া ফেলে এবং উহা পচিয়া জলকে এতদূর দুষ্ট এবং দুর্গন্ধময় করিয়া তোলে যে, সে জল খাইলে লোক পীড়াগ্রস্ত হয় এবং নদীর মাছ মরিয়া যায়। ইহাতে সমস্ত জল ঢাকিয়া ফেলে বলিয়া নদীর উপর দিয়া নৌকা চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং ইহার দ্বারা পণ্য চলাচলের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। ইহাতে ঐ সকল নদীতীরবর্ত্তী জনপদবাসীদিগের যে কি বিষম ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালায় মৎস্যাভাবের একটা বলবৎ কারণ এই কচুরীপানা। ইহাতে শস্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। কারণ, নদী-তীরস্থ উর্ব্বর জমি প্লাবিত হইলে, ঐ পানা সেই জমি ঢাকিয়া ফেলে, সুতরাং ধান্যাদি শস্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার কি প্রতীকারের কোন উপায় নাই?

একটা কথা এই সম্পর্কে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কচুরীপানা খুব ভাল সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। উহা গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া ছাই মাটীর সহিত পচাইয়া অথবা শুষ্ক করিয়া পোড়াইয়া উহার ছাইগুলি জমিতে দিলে অতি উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। খইল সার অপেক্ষাও ইহা ভাল বলিয়াই জানা গিয়াছে।

সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত পাতা গ্রামের নদীর ধারের একখানি জমিতে বহু পানা উঠিয়া পড়ে। জমির মালিক ঐ পানা উঠাইয়া ফেলিয়া দেওয়া অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনা করিয়া পানা সমেত জমিখানি দুইবার লাঙ্গল দিয়া পানাগুলিকে পায়ে করিয়া চাপিয়া মাটীর মধ্যে বসাইয়া দেন। জমিখানিতে সচরাচর খইল বা গোবর সার দিয়া বিঘা প্রতি ১২৷০ মণ আন্দাজ ফলন হইত। কিন্তু কচুরীপানা পচানীর সারের ফলে সেবার ১২৷০ মণের স্থলে বিঘা প্রতি ১৫৷০ ফসল হয়। আর একটা কথা, সেবার তাঁহার আবাদ ঐ কচুরীর কারণে খুব নাবী হইয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, ঐ পানার সারের গুণে মাঠের মধ্যে তাঁহার জমির

ফসল সর্ব্বাগ্রে হইয়াছিল। কাজেই উহা হইতে দেখা যায় যে, কচুরী পানা সাররূপে ব্যবহৃত হইলে যেমন জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয় তেমনি খরচও খুব অল্প হয়। আবার উহা জমিতে ব্যবহৃত হইলে নদী, খাল, বিল প্রভৃতি কচুরী-আক্রান্ত স্থানগুলি সহজেই পরিষ্কার হইয়া যায়। নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া শুধু চিৎকার করিলে চলিবে না। আমাদের দেশের অমঙ্গলগুলি আমাদেরই দূর করিতে হইবে। তজ্জন্য চাই প্রধানতঃ উদ্যম, নতুবা দেশ ছারখারে গেল বলিয়া হা হুতাশ করিলে ফল কিছুই হইবে না।

চায়ের বাজার (১৬ই জুন)

কোম্পানীর নাম	যত বাক্স	গড় দর টা আ পা
কমলা	৭৪	-৯-৮
নিউ দার্জ্জিলিং ইউনিয়ন	৪২	-৭-৫
ফতেমাবাদ	৬০	-৮-
আমবাড়ী	৬৫	-৯-৬
আঞ্জুমান	৭৬	-১০-৯
আটিয়াবাড়ী	১৫	-১০-৪
বেঙ্গল ডুয়ার্স	৩৯	-৮-৫
দেবপাড়া	৫৮	-১২-১
ঢেকলাপাড়া	৪৪	-১১-২
ডায়না	৬০	-১৫-৫
গোপালপুর	১১০	-১২-৫
ঐ	১২৩	-১০-
মালহাটী	২৩	-১১-৩
রহিমিয়া	৩৮	-১০-৩
ঐ	৫২	-৯-৬
সানিভ্যালি	২৯	-৯-২

কলিকাতায় বিদেশী বস্ত্রের আমদানি

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, কলিকাতায় গত বৎসর ৩০৯২ হাজার গজ কোরা বিদেশী কাপড় আমদানি হইয়াছিল, এ বৎসর তাহার স্থলে আমদানি হইয়াছে ২৬০৯ হাজার গজ। গত বৎসর বিদেশী ধোয়া কাপড় আমদানি হইয়াছিল ১৪৫৫ হাজার গজ, তাহার স্থলে এ বৎসর ২৩৩ হাজার গজ কাপড় আমদানি হইয়াছে। গত বৎসর ১৮৮২ হাজার গজ ছিট ও অন্যান্য বস্ত্র আসিয়াছিল, এ বৎসর আসিয়াছে ৭১৭ হাজার গজ।

বাংলার শিল্প*

অয়েল ক্লথ

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্, ৩নং নাজির আলি লেন, কলিকাতা, ১২নং চৌরঙ্গী

বি, বসু ব্রাদার্স, ঢাকা।

কলম ও পেন্সিল

এফ্. এন্ গুপ্ত এণ্ড কোং ১২নং বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা।

কাচ ও কাচের জিনিষ

বেঙ্গল গ্লাসওয়ার্কস্ লিঃ (চিম্‌নি) চার্চ্চ রোড, দম্‌দম্ ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট।

গ্রেট ইষ্টার্ণ গ্লাস লিঃ—৮।৫, টেঙরা রোড, কলিকাতা।

শ্রীগোবিন্দ গ্লাস ওয়ার্কস্ (চিম্‌নি)—রামরাজাতলা, হাওড়া।

কাঁচি ও ছুরি ইত্যাদি

বীরেন্দ্রচন্দ্র দাস—১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

জে, এন্ রায়—১৬১ বি, বকুল বাগান ষ্ট্রীট।

দেশলাই

সুন্দরবন ম্যাচ ফ্যাক্টরী—"আরতি"

কর এণ্ড কোং, সেস্থুন হাউস ৪নং লায়নস্ রেঞ্জ, কলিকাতা।

এডামজী ট্রেডিং কোং—৫৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয় দেশ্‌লাই কার্য্যালয়—১০৭নং উল্টাডাঙ্গা মেন রোড।

* বঙ্গদেশের শিল্পের তালিকা ও বিবরণ পাঠাইলে উহা 'আর্থিক উন্নতি'তে প্রকাশিত হইবে। সঃ আঃ উঃ

এম্, এন্ মেটা এণ্ড কোং—৬৫, এজ্রা ষ্ট্রীট।

পাইওনিয়ার ম্যাচ ফ্যাক্টরী—১৬, দমদম রোড।

সাবান

বেঙ্গল সোপ ওয়ার্কস, ম্যানেজিং এজেণ্টস সি, কে, সেন এণ্ড কোং ২৮, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল পারফিউমারী, ৪৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ক্যালকাটা কেমিকেল, বালিগঞ্জ—মার্গো সোপ।

গড্‌রেজ সোপ এণ্ড কোং, এজেণ্টস্—নাদিরসা প্রিণ্টার, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস্—বালিগঞ্জ, ৫০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা। 'বকুল' 'চন্দন' 'হোয়াইট রোজ'।

কামাইবার সাবান

বেঙ্গল পারফিউমারী—"হিমানী"।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল—"এণ্টিসেপটিক"।

ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস—'ক্যালসো'।

কামাইবার ক্ষুর

খান এণ্ড কোং, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কামাইবার পেষ্ট

জেম-লিনেন ষ্ট্রপ—ঢাকা।

চিরুণী, ব্রাস ও বোতাম

যশোহর কোম এণ্ড বাটন ফ্যাক্টরী

চিরুণী এজেণ্ট ডি, এন ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ৩১ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট।

ঢাকা বাটন ফ্যাক্টরী।

ব্রাস

ক্যালকাটা হর্ণ এণ্ড ব্রাস ম্যানুঃ কোং।

১৮নং আনন্দ পালিত লেন, ইটালি, কলিকাতা।

দত্ত এণ্ড কোং, ১১৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জুতার পালিস

বেঙ্গল কেমিক্যাল।

বেঙ্গল মিসেলেনী।

টুথ পেষ্ট

বেঙ্গল কেমিক্যাল—১৫নং কলেজ ষ্ট্রীট।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ।

বিহার মিসেলেনী—৩নং কলেজ ষ্ট্রীট।

টুথ পেষ্ট কোং।

টুথ পাউডার

বেঙ্গল কেমিক্যাল—এণ্টিসেপটিক।

ব্যাক টু ক্লিনিকাল ল্যাবরেটরী—কারবলিক ও এণ্টি-সেপটিক টুথ পাউডার।

এনামেলের বাসন

বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস লিঃ,
২১ মিশন রোড কলিকাতা।

চীনা মাটীর বাসন

বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেড—৪৫নং টেংরা রোড, কলিকাতা।

বার্লি ও বিস্কুট

কে সি বোস এণ্ড কোং, ২নং কালাচাঁদ সান্ন্যাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল বিস্কুট ফ্যাক্টরী লিঃ---২০।১২ জোড়াপুকুর স্কোয়ার) চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ, কলিকাতা।

লিলি বিস্কুট—পি, সেট এণ্ড কোং শ্যামবাজার।

বাংলায় যক্ষ্মা

যক্ষ্মা রোগ এদেশে ভয়াবহরূপে বিস্তার লাভ করিতেছে কেন? বাংলার পল্লিমাটিতে আসিলে সব রোগই

মৌরশী স্বত্ব লইয়া বসে। প্লেগ, ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি ভারতে আসিয়া সমূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এগুলি আমদানি রোগ, সুতরাং আমদানি মালের ন্যায় শীঘ্রই বিস্তার লাভ করিয়াছে ও রোগের বাজার একচেটিয়া করিতেছে। কিন্তু যক্ষ্মা এদেশে নূতন নহে, চিরকালই এদেশে ঐ রোগ ছিল, তবে এখন যেমন ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে পূর্ব্বে অবশ্য তেমন ছিল না। যক্ষ্মা পাপজ ব্যাধি, ইহার ঔষধ নাই, প্রকৃত যক্ষ্মা শিবের অসাধ্য,—এই ধারণা তখন লোকের ছিল, তাই যক্ষ্মা হইলে লোকে পাপক্ষয়ের ব্যবস্থা করিত, শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও দেবাশ্রয় করিত। এখন যক্ষ্মার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বাহির হইয়াছে,—ইনজেক্‌শন, রৌদ্রচিকিৎসা, সমুদ্র ও পর্ব্বতের উচ্চ তুঙ্গের বিশুদ্ধ বায়ুসেবন ইত্যাদি। কিন্তু সকল দেশেই যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব প্রবল হইয়াছে, সুতরাং বঙ্গে যে আরও প্রবল হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের মনে হয় ফেরঙ্গ রোগের ন্যায় যক্ষ্মাও সভ্যতার রোগ; তথাকথিত সভ্যতা যত বাড়িবে, যক্ষ্মা রোগও তত বাড়িবে—সভ্যতার সংস্পর্শ আসিলেই ফেরঙ্গ রোগের ন্যায় যক্ষ্মা রোগও সংক্রামিত হইবে। সভ্যদেশে ইহার প্রতিষেধক নানা উপায় অবলম্বন করা হয়। ইহার প্রতিবিধানে সকল সভ্য দেশের গবর্ণমেণ্ট মুক্তহস্ত। বঙ্গদেশে এই সভ্যতার সংস্পর্শ আছে, কিন্তু তাহার প্রতিষেধক নাই। তাই যক্ষ্মা সংক্রামকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে। আমাদের মনে হয় অনাচার অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা, অথাদ্যভোজন, অসংযম প্রভৃতি যক্ষ্মা রোগের বিস্তৃতির প্রধান কারণ। ডাঃ অমূল্যচরণ উকিল যক্ষ্মা রোগের গবেষণা করিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তিনি অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় এদেশে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বঙ্গের ম্যালেরিয়ার নিম্নেই যক্ষ্মার স্থান। এত লোক ম্যালেরিয়া ব্যতীত আর কোন রোগে মরে না। বাঙ্গালায় সাড়ে চারি কোটী লোকের মধ্যে আট লক্ষ লোক যক্ষ্মা রোগে ভোগে। এক কলিকাতা সহরেই ২৮০০০ হাজার যক্ষ্মা রোগী রোগ বিস্তৃতির সহায়তা করিতেছে; কেবলমাত্র অতি অল্পসংখ্যক রোগী চিকিৎসার ও হাঁসপাতালের আশ্রয় পাইয়াছে। ১৯২৯ সনে কলিকাতা ও হাওড়ায় ২৮৪৪ জন লোক যক্ষ্মারোগে মরিয়াছে, ইত্যাদি। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এথানে যাহাতে যক্ষ্মারোগনিবারণী সভা বিস্তৃত হয়, যক্ষ্মা-হাঁসপাতাল ও চিকিৎসাদির যাহাতে বন্দোবস্ত ব্যবস্থা হয়, সেজন্য তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন। সরকার যাহাতে এ বিষয়ে অবহিত হন ও মুক্তহস্ত হন সেজন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা বলি—ও-সব বলা-বলির কাজ নহে, নিজেরা যদি কিছু পার কর, তা যদি না পার লোকদের সাবধান কর,—তাহারা যেন সংযমবিহীন আচারবিহীন হইয়া সভ্যতার নামে পশুজীবনযাপন না করে, তাহা হইলে যক্ষ্মার কতকটা প্রতিষেধ হইবে। ইহাই যক্ষ্মার রক্ষামন্ত্র।

(বঙ্গরত্ন)

বাংলার জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী

১৯৩০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলায় মোট ৪৭টী নূতন জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে রেজেষ্টারী হইয়াছে। ইহাদের মোট অনুমোদিত মূলধন ১,৬৪,৬১,৫০০ টাকা। ইহাদের বিস্তারিত বিবরণী নিম্নে দেওয়া গেল :—

১৩টী ব্যাঙ্কিং	...	২১,৫০,০০০ টাকা
৫টী লোন	...	৬,২০,০০০ „
১টী মোটর সংক্রান্ত	...	৫০,০০০ „
২টী রসায়ন সংক্রান্ত	...	২,০০,০০০ „
২টী লৌহ ইস্পাত ও জাহাজ সংক্রান্ত		১,০০,১০০ „
১টী ইঞ্জিনিয়ারিং	...	১,০০,০০,০০০ „
২টী লোক-হিত সংক্রান্ত—গ্যাস, জল, বিজলীবাতি, যন্ত্রশক্তি ও টেলিফোন	...	৫,৫০,০০০ „
১টী বরফ এবং এ্যারেটেড ওয়াটার		২,০০,০০০ „
২টী এজেন্সি (ম্যানেজিং এজেণ্ট)		১১,৪০০ „
৭টী অন্যান্য ব্যবসা ও উৎপাদন সংক্রান্ত		১৯,১০,০০০ „
১টী চাউলের কল	...	১,০০,০০০ „

১টী অন্তবিধ পেষাই কল	...	৩০,০০০	„
১টী চা রোপণ সংক্রান্ত	...	২০,০০০	„
২টী অন্যান্য „ „	...	৩,২০,০০০	„
১টী কয়লার খনি	...	৫০,০০০	„
২টী অন্যান্য খনি-সংক্রান্ত	...	১,০০,০০০	„
১টী সম্পত্তি, জমাজমি ও ইমারৎ সংক্রান্ত		২,০০,০০০	„
২টী হোটেল, থিয়েটার ও আমোদ-প্রমোদ বিষয়ক	...	১,৫০,০০০	„
মোট		১,৬৪,৬১,৫০	টাকা

বাংলার কথা—আর্থিক তথ্য-সঙ্কলন

সংখ্যাতত্ত্বই ধনবিজ্ঞানের প্রাণ। যে দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে, সেই দেশে কত মানুষ আছে, তাহাদের কত জমিজমা আছে, তাহারা কত উৎপাদন করিতেছে, কত ভোগ করিতেছে, কত মরিতেছে, কত বাঁচিতেছে ইত্যাদি ব্যাপারগুলির যদি সংখ্যা নির্ণয় করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞান কোন আলোচনাই করিতে পারে না। সেইজন্য বাংলা দেশের কয়েকটী জেলার উপরি উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধীয় তথ্য নিম্নে সঙ্কলিত হইল :—

(১) বৰ্দ্ধমান

বর্দ্ধমান জেলার বিস্তৃতি ১৭,২২,২৪০ একর।* সহরের সংখ্যা ৬ এবং গ্রামের সংখ্যা ২,৮১১।

মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনের হিসাবানুসারে) ৮,১৪,২০০ একর।

গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৫৫'৯৩ ইঞ্চি। গাই গরু ও স্ত্রীমহিষের সংখ্যা ২,৪৪,৬৮৩। ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ৩,২৭,৯২৬। লাঙ্গলের সংখ্যা ১,২৯,১৪৯। ১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৭০,৬৫,৬১৪ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২ সনে	...	১৪,৮৬,৬৩৪
১৮৮১ „	...	১৩,৯৪,৪৩৯
১৮৯১ „	...	১৩,৯১,৮০০
১৯০১ „	...	১৫,৩২,৭১৬
১৯১১ „	...	১৫,৩৮,৩৭১
১৯২১ „	...	১৪,৩৮,৯২৬

১৯২৩ সনে হিন্দুর সংখ্যা ১১,২২,২৩১ ও মুসলমানের সংখ্যা ২,৬৬,২৮১। প্রতি বর্গমাইলে জন-সংখ্যা ৫৩২।

শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সনে)

মোট হিন্দুর	...	শতকরা	১১'২
„ মুসলমানের	...	„	৬'৮
„ হিন্দু পুরুষের	...	„	২০'৪
„ মুসলমান „	...	„	১২'৭
„ হিন্দু মেয়ের	...	„	১'৯
„ মুসলমান „	...	„	'৮

শিক্ষা

মোট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (১৯২৫ সনে) ১৭৬৫।

মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৫৯,৯৮৭।

বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ৩,৪৫,৮৫০।

বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালক-বালিকার (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) সংখ্যা (১৯২৫ সনে) ৬৩,২৪৫।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ২,৮২,৬০৫।

স্বাস্থ্য

হাজার করা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩০'২।

হাজার করা মৃত্যুর হার (১৯২৩ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২৫'৩।

* এক একর=বাংলা ৩ বিঘার কিছু বেশী।

হাজার করা মৃত্যুর হার (১৯২৩ সনে) মুসলমানের মধ্যে ২৫'১।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু

১৯১৫	...	৩৬,৯৫৭
১৯২২	...	২৬,০৩৭

কলেরায় মৃত্যু

১৯১৫	...	১,৮০৮
১৯২২	...	৭২৪

বসন্তে মৃত্যু

১৯১৫	...	১০৯৩
১৯২২	...	৯৫

শিশু-মৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু	...	২৬৬'৮
স্ত্রী-শিশু	...	২৪৫'১

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা	...	২৪

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	...	১০৩৮
কুষ্ঠ রোগী	...	১৬১৩
অন্ধ	...	১৫১৩
হিন্দু বিধবা	...	১,৫৬,৬৮১
মুসলমান „	...	৩১,৪৮৩

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমি রাজস্ব	...	৩০,২৯,২৩৬
ষ্ট্যাম্প	...	৭,৫২,৯০০
আয় কর	...	২,০৯,১৬৮
আবগারী	...	১,২৫,৭৭৮
আফিং	...	১,৬৬,১৭৯
অন্যান্য	...	৭০,৫২০
রোড ও পাবলিক সেস্		৮,২৭,২৫২
মোট		৬২,৬১,০৩৩

(২) বীরভূম

বীরভূম জেলার বিস্তৃতি ১১,২১,৯২০ একর। সহরের সংখ্যা ৩ এবং গ্রামের সংখ্যা ২,২৯৯। মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনের হিসাবানুসারে) ৫,৯০,৫০০ একর। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় ৫৬'০২ ইঞ্চি। গাইগরু ও স্ত্রীমহিষের সংখ্যা ২,২২,৬৮২। ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ২,৬২,৯০৫। লাঙ্গলের সংখ্যা ১,০৭,৭০৭।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১,০১,২০,৭৮৭ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৩৫,৫২,৬৫৬ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	...	৮,৫১,৪০৮
১৮৮১	...	৭,৯২,১৯২
১৮৯১	...	৭,৯৮,২৫৪
১৯০১	...	৯,০২,২৮০
১৯১১	...	৯,৩৫,৬৬৫
১৯২১	...	৮,৪৭,৫৭০

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৫,৭৬,৭৫০ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ২,১২,৪৬০। প্রতি বর্গ মাইলে জন-সংখ্যা ৪৮৩।

শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১)

মোট হিন্দুর	...	শতকরা ১১'৮
„ মুসলমানের	...	„ ৮'৫
„ হিন্দু পুরুষের	...	„ ২২'৫
„ মুসলমান „	...	„ ১৬'২
„ হিন্দু মেয়ের	...	„ ১'২
„ মুসলমান „	...	„ '৫

শিক্ষা

মোট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (১৯২৫ সনে) ১,০৯৫ ।

মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৩৭,৭০৮ ।

বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ২,০৩,৯৫২ ।

বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর) (১৯২৫ সনে) ৩৬,১৪৩ ।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ১,৬৭,৮০৯ ।

স্বাস্থ্য

হাজার করা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩৭·৩ ।

হাজার করা মৃত্যুর হার (১৯২৩ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২৮·২ এবং হাজার করা মৃত্যুর হার (১৯২৩ সনে) মুসলমানের মধ্যে ২৫·১ ।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু

১৯১৫	...	৩১,৯৩৮
১৯২২	...	১৫,৭৭২

কলেরায় মৃত্যু

১৯১৫	...	১৩৮৬
১৯২২	...	৭৩

বসন্তে মৃত্যু

১৯১৫	...	৪৪৭
১৯২২	...	৬৬

শিশু-মৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু	...	২৮২·৭
স্ত্রী „	...	২৫৭·৫

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা	...	১০

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	...	৫০৫
কুষ্ঠরোগী	...	১২৫৫
অন্ধ	...	৮০৭
হিন্দু বিধবা	...	৭৯,৩৪৭
মুসলমান বিধবা	...	২১,২১৬

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমি রাজস্ব	...	১০,২০,৪১৯৲
ষ্ট্যাম্প	...	৪,০১,০৭৭৲
আয়কর	...	৬৬,৬৩২৲
আবগারী	...	২,৯৬,০৪৭৲
আফিং	...	৪৮,১৯২৲
অন্যান্য	...	৪,৫০৮৲
রোড ও পাবলিক সেস		১,৪৩,২৫১৲
মোট		১৯,৭৯,৯২৬৲

(৩) বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার বিস্তৃতি ১৬,৭৭,৪৪০ একর ।

সহরের সংখ্যা ৪ এবং গ্রামের সংখ্যা ৩,৯৯৯ ।

মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনের হিসাবানুসারে) ৬,২৭,৮০০ একর

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৩·৩৪ ইঞ্চি ।

গাই গরু ও স্ত্রীমহিষের সংখ্যা ৩,০৯১৩৫ ।

ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ২,৯৭,৪৬২ ।

লাঙ্গলের সংখ্যা ১,১১,০২১ ।

১৯১৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ। ৫২,০৬,৯১,৯১০ মণ ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ২,৬৮,৬৬৮ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	...	৯,৬৮,৫৯৭
১৮৮১	...	১০,৪১,৭৫২

১৮৯১	...	১০,৬৯,৬৬৮
১৯০১	...	১১,১৬,৪১১
১৯১১	...	১১,৩৮,৬৭০
১৯২১	...	১০,১৯,৯৪১

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৮,৮০,৪৩৯ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ৪৬,৬০১।

প্রতি বর্গমাইলে জন-সংখ্যা ৩৮৮।

শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১)

মোট হিন্দুর	...	শতকরা	১২.২
,, মুসলমানের	...	,,	৯.৮
,, হিন্দুপুরুষের	...	,,	২৩.৪
,, মুসলমানের	...	,,	১৮.৪
,, হিন্দু মেয়ের	...	,,	১.১
,, মুসলমান ,,	...	,,	.৭

শিক্ষা

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা (১৯২৫ সনে) ১২০৪।

মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৪১,৬২০।

বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ২,৬৭,৫৫৭।

বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক (১৯২৫ সনে) ৪২,৪৬৯।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ২,২৫,০৮৮।

স্বাস্থ্য

হাজার করা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩৩.৭।

হাজার করা মৃত্যুর হার হিন্দুর মধ্যে (ঐ সনে) ২৪.৪ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৪.১।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	...	১৯১৫—২৩,০৩০ ১৯২২—১৫,৬৮৭
কলেরায় মৃত্যু	...	১৯১৫—২৬৫৩ ১৯২২—৫০০
বসন্তে মৃত্যু	...	১৯১৫—৯৫৬ ১৯২২—৫৫

শিশু-মৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজারকরা গড়)

পুং শিশু	...	২৩৪.১
স্ত্রী শিশু	...	২১৮.১

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা ... ১২

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	...	৭০৬
কুষ্ঠরোগী	...	২৭৫২
অন্ধ	...	১১৮৭
হিন্দু বিধবা	...	১,২৫,৫৬৮
মুসলমান ,,	...	৪৯৫৯

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমিরাজস্ব	...	৪,৮৮,৮৫৭
ষ্ট্যাম্প	...	৪,৪৩,৯৮৮৲
আয়কর	...	৩৮,১৯৫৲
আবগারী	...	২,২৫,৫২৫৲
আফিং	...	৫৯,৬০০৲
অন্যান্য	...	৬৫৭৲
রোড ও পাবলিক সেস		৮৬,০৭০৲
মোট	...	১৩,৪২,৮৮৬৲

শ্রীসুকুমার মিত্র

ভারতের তুলার কলের উৎপাদন

১৯২৯ সনের নভেম্বর মাসে ভারতীয় কলসমূহ হইতে মোট ৭৫০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ৫২০ লক্ষ পাউণ্ড কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯২৮ সনের ঐ মাসে সূতা এবং কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল যথাক্রমে ৬৩০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৪৪০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২৯-৩০ সনের সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৩ মাসে সূতা এবং কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে যথাক্রমে ২২১০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৫২০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২৯ সনের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত আট মাসে কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে মোট ৫২৮০ লক্ষ পাউণ্ড।

ভারতের সূতা উৎপাদন এবং রপ্তানি

বৃটিশ ভারত হইতে সমুদ্র-পথে ১৯২৯ সনের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত আট মাসে মোট সূতা রপ্তানি হইয়াছে ১৭০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সনের ঐ আট মাসে সূতা রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ১৬০ লক্ষ এবং ১২০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সনে ঐ আট মাসে ভারতীয় মিলসমূহে কি পরিমাণ মিহি মাঝারি এবং মোটা সূতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিদেশ হইতেই বা ঐ সমস্ত সূতা কি পরিমাণ আমদানি হইয়াছে নিম্নের তালিকায় তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

	১৯২৯		১৯২৮	
	উৎপাদন	আমদানি	উৎপাদন	আমদানি
	১০০০ পাঃ	১০০০ পাঃ	১০০০ পাঃ	১০০০ পাঃ
১ হইতে ২৫নং	৪২৭,৪০৩	৯৪৫	২৯৬,৫৩৩	৯০২
২৬ হইতে ৪০নং	৮৬,৫৩৯	১৩,৩৫৫	৬৭,৪০৪	১২,০৬৫
৪০নং এর উপর	৯,৭৬৩	৬,৬৭৮	৫,৮৬৯	৬,২৯৫

নিম্নের তালিকায় এপ্রিল হইতে নভেম্বর আট মাসে ভারতে কি পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিদেশ হইতেই বা কি পরিমাণ বস্ত্র আমদানি হইয়াছে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

	১৯২৯		১৯২৮	
	উৎপাদন	আমদানি	উৎপাদন	আমদানি
	১০০০পাঃ	১০০০পাঃ	১০০০পাঃ	১০০০পাঃ
কোরা এবং ধোলাই কাপড়	১,১৫৬,০৮৭	৮৯৩,৪৮৯	৮২৩,১২১	৮৮৮,১৭১
রঙ্গীণ কাপড়	৩৭২,৯১৩	৩২৫,১৩৬	২৫৪,৬৭৫	৩৫৯,৭১৮

আয়কর হইতে ১৭ কোটী টাকা রাজস্ব

ভারতের ইনকাম্‌ট্যাক্‌স ডিপার্টমেণ্টে ১৯২৮-২৯ সনে ইনকামট্যাক্‌স বাবদ ১২ কোটী টাকা এবং সুপার ট্যাক্‌স বাবদ ৫ কোটী টাকা, মোট ১৭ কোটী টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

১৯২৭-২৮ সনের তুলনায় আলোচ্য সনে দেড় কোটী টাকা বেশী রাজস্ব আদায় হইয়াছে। বকেয়া টাকার পরিমাণও কমিয়া গিয়াছে।

ভারতীয় ইনকাম্‌ ট্যাক্‌স্‌ আইন অনুসারে আগের বছরের আয়ের উপর পরের বৎসরে ট্যাক্‌স্‌ আদায় করা হয়। সুতরাং ১৯২৮-২৯ সনে গৃহীত ইনকাম ট্যাক্‌স হইতে ১৯২৭-২৮ সনের অবস্থা বুঝা যাইতেছে।

ভারতের সামরিক ব্যয়

নিম্নের তালিকায় ভারতবর্ষের কয়েক বৎসরের সামরিক ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইল :—

বৎসর	গ্রস্ কিংবা নিট ব্যয়	সেণ্ট্রাল কমিটির রিপোর্টে প্রকাশিত ব্যয়ের পরিমাণ	সংশোধিত ব্যয়ের অঙ্ক
		পাঃ	পাঃ
১৯১৬-১৭	নিট	২৪,৯৯৩,৮১১	২৪,৯৯০,৮১১
১৯১৯-২০	নিট	৫৭,৯৮৬,০৮৭	৫৭,৯৮৫,০৮৭
		টাকা	টাকা
১৯২৪-২৫	গ্রস্	৫৯,৬৬,৫৪,৮৭৭	৫৯,৬৬,৫১,৮৭৭
১৯২৫-২৬	গ্রস্	৬০,৩২,৩৭,০৪৫	৬০,৩৯,৩৭,০৪৫
১৯২৬-২৭	গ্রস্	৬০,৯১,৬৩,৮৯৯	৬০,৯১,৬৩,৮৮৯
১৯২৭-২৮	নিট	৫৫,৯৬,৯৫,৮৩৫	৫৫,৯৬,৯৫,৮২৫

১৯২৭ সনে সুতার উপর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি

১৯২৭ সনে ভারতবর্ষে সূতা আমদানির উপর শুল্ক বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়াছে প্রায় ১৫ লাখ টাকা। তবে এই টাকা হইতে দেশী তন্তুবায়দিগের সাহায্যার্থ কিছুই খরচ করা হয় নাই। শুল্ক বাড়াইবার জন্য দেশী তাঁতী-দিগের সুবিধা কি অসুবিধা হইয়াছে সে সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে অনুসন্ধান করা হইতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত শেষ রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

এই শুল্ক-বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য জাপানী মিলগুলির প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় কলগুলিকে রক্ষা করা। ৩১ নং হইতে ৪০ নং সূতা সম্বন্ধে জাপানী মিলগুলি ভারতীয় মিলগুলিকে খুব বেকায়দায় ফেলিয়া দিতেছিল। নিম্নে দুইটী তালিকা দেওয়া হইল। প্রথমটীতে কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদেশ হইতে ভারতে মিহি সূতা আমদানির এবং দ্বিতীয়টীতে ঐ কয় বৎসরের মধ্যে ভারতীয় মিলসমূহে মিহি সূতা উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল। সূতার উপর আমদানি-শুল্ক বাড়াইয়া দেওয়ায় ভারতীয় মিলসমূহের সুবিধা হইয়াছে কি অসুবিধা হইয়াছে তাহা এই তালিকা দুইটী ঘাঁটিলেই বেশ জানা যাইবে।

ভারতে ৩১ নং হইতে ৪০ নং পর্য্যন্ত সূতা আমদানির তালিকা নিম্নরূপ (হাজার পাউণ্ডে হিসাব দেওয়া হইল):—

বৎসর	জাপান	চীন	বিলাত	মোট (সকল দেশ হইতে)
১৯২৩-২৪	৯,৮৩৮	...	৮,০১৯	১৯,৮০৭
১৯২৪-২৫	১৯,১৯২	...	৬,৪২৮	২৭,৬৮৮
১৯২৫-২৬	২০,০৫৯	...	৪,৩১৮	২৬,২৯৪
১৯২৬-২৭	১৬,১২৩	৯১৫	৬,০১১	২৪,৪০৫
১৯২৭-২৮	৭,৭১৪	১০,৮৮৩	৭,১৭১	২৭,৩০৪
১৯২৮-২৯	২,২১৯	১০,৫৩৬	৬,১২০	১৯,৯৩৮
১৯২৯ (এপ্রিল ও নভেম্বর)	১,৭২৮	হিসাব পাওয়া যায় নাই	৪,৪৬৫	১৩,১২৪
১৯২৯-৩০ (৮মাসের হিসাব)	২,৫৯২	ঐ	৬,৬৯৭	১৯,৬৮২

ভারতীয় মিলসমূহে ৩১—৪০নং সূতা উৎপাদন নিম্নরূপ (হিসাব হাজার পাউণ্ডে দেওয়া হইল):—

বৎসর	বোম্বাইয়ের মিলসমূহ	বোম্বাইয়ের বাহিরের মিল সমূহ	ভারতের মোট মিল সমূহ
১৯২৩-২৪	৬,৬০৫	১৩,০৬২	১৯,৬১৭
১৯২৪-২৫	৭,৯৬১	১১,৪০৭	১৯,৩৬৮
১৯২৫-২৬	৫,৮৮৫	১৩,৮৫২	১৯,৭৩৭
১৯২৬-২৭	৯,২০১	১৮,৪৫৬	২৭,৬৫৭
১৯২৭-২৮	১২,২৮০	২১,৪৭৭	৩৩,৭৫৭
১৯২৮-২৯	৮,৫৬৭	২৮,৯২১	৩৭,৪৮৮
১৯২৯ সনের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত	৫,৬৪৫	১৬,৪৫৭	২২,১০২
১৯২৯-৩০ (৬ মাসের হিসাবের উপর)	১১,২৯০	৩২,৯১৪	৪৪,২০৪

১৯২৮-২৯ সনে বিহার-উড়িষ্যার আবগারী বিভাগের বিবরণ

আলোচ্য বর্ষে বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে আবগারী আইনের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তন-সমূহের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(ক) ১৮২৮ সনের ১লা এপ্রিল হইতে সম্বলপুর জেলায় এবং মানভূমের পল্লী-অঞ্চলে দেশী মদ খুচরা বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস।

(খ) ১৯২৮ সনের ১লা এপ্রিল হইতে সাঁওতাল পরগণায় দেশী মদ ৭০ ইউ, পি হইতে ৮০ ইউ, পি বৃদ্ধি।

(গ) ঐ তারিখ হইতে নেপাল সীমান্তের মদের দোকানে এবং গিরিডি কলিয়ারিতে যথাক্রমে ৭২'৫ ইউ, পি, এবং ৮০, ইউ, পি হিসাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

(ঘ) ১৯২৮, ১লা এপ্রিল হইতে সম্বলপুর এবং সিংভূম জেলায় দেশীমদ বিক্রয়ের উপর কর-বৃদ্ধি।

(ঙ) ১লা এপ্রিল হইতে মুঙ্গের, সম্বলপুর, হাজারিবাগ, রাঁচি, সিংভূম জেলায় দেশী মদের খুচরা বিক্রয় বৃদ্ধি।

(চ) ১লা এপ্রিল হইতে রাঁচি জেলার কতকগুলি স্থানে গৃহে পচুই মদ প্রস্তুতের অধিকার প্রত্যাহার করণ।

(ছ) ১লা এপ্রিল হইতে হাজারিবাগ জেলার কলিয়ারি অঞ্চলে ছয়টী নুতন পচুই মদের দোকান খোলা।

(জ) সাঁওতাল পরগণায় সমস্ত গাঁজা, ভাং এবং আফিংএর দোকানে, হাজারিবাগ জেলায় ৭১টী দেশী মদের দোকানে, এবং রাঁচি জেলায় ২৭টী দেশী মদের দোকানে স্লাইডিং স্কেল নীতি অনুসারে বিক্রয়-পদ্ধতি কায়েম করা হইয়াছে।

(ঝ) ১লা আগষ্ট হইতে সমগ্র বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে খুচরা গাঁজা বিক্রয়ের সীমা ৫ তোলার স্থানে ৩ তোলা করা হইয়াছে।

(ঞ) ১লা এপ্রিল হইতে ত্রিহুত বিভাগের জেলাগুলিতে গঙ্গার উত্তর পারে অবস্থিত মুঙ্গের এবং ভাগলপুর জেলার অংশসমূহে এবং পুর্ণিয়া জেলায় এক সের গাঁজা বিক্রয়ের উপর কর ৩০৲ টাকা হইতে বাড়াইয়া দিয়া ৩৫৲ টাকা করা হইয়াছে।

(ট) ১লা এপ্রিল হইতে পাটনা, গয়া, সাহাবাদ এবং সারণ জেলায় এবং নেপাল সীমান্তে অবস্থিত দোকানগুলি ছাড়া চম্পারণ, মুজাফ্‌ফরপুর, দারভাঙ্গা, মুঙ্গের, ভাগলপুর এবং পুর্ণিয়া জেলায় খুচরা গাঁজা বিক্রয়ের দর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(ঠ) পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দারভাঙ্গা জেলার সমস্তিপুর মহকুমার রোসোরাহ থানায় ১৯২৮ সনের ১লা আগষ্ট হইতে মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

(ড) পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য মানভূম জেলার কিয়দংশ সিংভূম জেলার আবগারী বিভাগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

(ঢ) পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পাটনা, সাহাবাদ সারণ এবং ভাগলপুর জেলায় সার্কেল সাব ইন্‌স্পেক্টরের স্থানে ইন্‌স্পেক্টর বহাল করা হইয়াছে। আলোচ্য সনেও এই ব্যবস্থা কায়েম থাকিবে।

(ণ) পাটনা জেলার দানাপুরে এবং সদর মহকুমায় পরীক্ষা করিবার জন্য গাছের উপর ট্যাক্স বসান হইয়াছে। আলোচ্য সনেও এ ব্যবস্থা কায়েম থাকিবে।

আবগারী বিভাগের আয়-ব্যয়

নিম্নে বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের আবগারী বিভাগের পাঁচ বৎসরের আয়ব্যয় প্রদত্ত হইল :—

	রাজস্ব	ব্যয়	ফেরত	মোট রাজস্ব	শতকরা ব্যয়
১৯২৪-২৫	১,৭৬,৪৮,৮৭৭	৯,৮১,৯৪৬	...	১,৬৬,৬৬,৯৩১	৫'৪৬
১৯২৫-২৬	১,৯৭,৩৭,১৩৭	২২,৬৮,৩৫৩	৭৫,৯৭৮	১,৭৩,৯২,৮০৬	১১'৪৯
১৯২৬-২৭	১,৯৭,৯৭,৭৫১	১৯,৭৯,৯৮২	৬৩,৭০৫	১,৭৭,৫৪,০৬৪	১০'০০
১৯২৭-২৮	১,৯৭,১৪,৭৩৭	১৯,০৯,৭৫৭	৭৩,৭০৫	১,৭৭,৩১,২৭৫	৯'৬৯
২৯২৮-২৯	১,৮৯,৯০,৭৭৩	১৮,০০,০১৩	৬৩,৮৭২	১,৭১,২৬;৮৮৮	৯'৪৮
আলোচ্য সনের সহিত আগের সনের পার্থক্য	—৭,২৩,৯৬৪	—১,০৯,৭৪৪	—৯,৮৩৩	—৬,০৪,৩৮৭	—০'২১

উপরের এই হিসাবের সহিত ইম্পিরিয়াল (ভারত গভর্ণমেণ্টের) হিসাবের ৭৬,২৮০৲ টাকা পার্থক্য আছে। ঐ টাকাটা সরকারী লবণ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের প্রকৃত হিসাব লইতে গেলে ১৯২৪-২৫ সনের হিসাবের সহিত আফিমের খরচ ধরিতে হইবে। আফিমের খরচ ধরিলে ১৯২৪-২৫ সনের আয়ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

আয়	...	১,৮৬,৬৯,৫০৭
ব্যয়	...	২০,০২,৫৭৬
নিট রাজস্ব	...	১,৬৬,৬৬,৯৩১
শতকরা ব্যয়	...	১০·৭৩

আলোচ্য সনে আবগারী রাজস্ব কম হইয়াছে। দেশী মদ এবং গাঁজা লোকে কম খাইয়াছে বলিয়াই রাজস্ব হ্রাস পাইয়াছে। আফিমের খরচ কমায় ব্যয়ও কমিয়াছে।

মহীশূরে রেশম-শিল্প

মহীশূর গভর্ণমেণ্টের রেশম বিভাগের ১৯২৮-২৯ সনের বিবরণীতে মহীশূরের রেশম-শিল্প সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে :—

তুঁতের চাষ

আলোচ্য বৎসরে মহীশূরের তুঁতের চাষ ১৯২৭-২৮ সনের ৫০·১৯৪ একর হইতে ৪৭·৭৬০ একরে কমিয়া গিয়াছে। এ বৎসরে চাষের জমির পরিমাণ এতটা কমিয়া যাওয়ার প্রথম কারণ ঋতুর প্রতিকূল অবস্থা, দ্বিতীয় কারণ সমস্ত শ্রেণীর রেশমের বাজার-দর অনেক পড়িয়া যাওয়া।

বিবরণীতে প্রকাশ যে, কতকগুলি বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলি বিদেশী তুঁতের চারা লাগান হয় এবং সে-গুলিতে ভাল ভাল তুঁত পোকার জন্ম হইতেছে। তাছাড়া মহীশূরের এবং চান্নপাৎনার কতকগুলি বাগানে তুঁতের চারার গোড়ায় সার দিয়া ফল কেমন পাওয়া যায় তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত না গভর্ণমেণ্টের রেশম বিভাগে উপযুক্ত উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ নিযুক্ত করা হয়, সে পর্য্যন্ত উক্ত বিভাগের তুঁতের চাষ যাহাতে নিয়মমাফিক হয় সে জন্য গভর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগ হইতে উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ লইয়া কাজ চালান হইবে।

চাষ বিস্তার

বড়ই সুখের বিষয় যে, রেশম বিভাগ লোকাল বোর্ড ও গ্রাম্য পঞ্চায়েৎদের সহিত মিলিত হইয়া তুঁত চাষের বিস্তারের জন্য খুব বেশী চেষ্টা করিতেছে।

এই বিভাগ হইতে প্রায় ৭০ গাড়ী তুঁত ও মহীশূর চান্নাপাৎনা ও কোলারের বাগান হইতে প্রায় ২৫০০ তুঁতের চারা চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলান হইয়াছে। মহীশূর ও চান্নাপাৎনার চারা বাগানের সঙ্গে কোলারের পুরাণ বাগানের ভিতর একটা নূতন চারা বাগান তৈয়ারী হইয়াছে।

রেশম নির্ম্মাণ

তুঁত হইতে রেশম বাহির করিয়া চাকায় জড়ান কার্য্য তদারক করিবার জন্য এই বিভাগে যে সহকারী সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট আছেন, তাঁহাকে এই সমস্ত ব্যাপার বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিবার জন্য ইয়োরোপের ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সরকারী খরচে পাঠান হইয়াছিল। কুড়ি জন ছাত্রকে এই বিভাগে রেশম-নির্ম্মাণ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য লওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মহীশূরের রেশম কারখানায় আরও দশটী রেশমের কল বাড়ান হইয়াছে। এই কারখানায় তৈরী রেশম আলোচ্য বৎসরে বেশ মিহি হইয়াছে এবং বড়ই সুখের বিষয় এই যে, আলোচ্য বৎসরে এখানকার কারখানায় তৈরী সমস্ত রেশমই বিক্রী হইয়া গিয়াছে। বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পাকান ও রঙ্গীণ রেশম বিক্রয়ের জন্য উত্তর ভারতে যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে বিক্রী বেশ ভালই হইয়াছে। রেশমের সুন্দর কোয়ালিটির দরুণ এখানকার রেশমের চাহিদা মহীশূর রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে সমানভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। এখানকার রেশমের কোয়ালিটি যদিও বেশ ভাল হইতেছে তবুও গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস যে, কয়েকটী বিষয়ে, বিশেষতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক্ দিয়া রেশম কারখানার উন্নতি-সাধনের জন্য অনেক কিছু করিবার আছে

এবং এই দিকে ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ এণ্ড কমার্সের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। রেশমের কোয়ালিটির উন্নতির জন্য এই বিভাগ হইতে রাজ্যের মধ্যে মহীশূরের "ডোমেষ্টিক্ মেশিন" যন্ত্রের ব্যবহার বাড়াইবার জন্য বিজ্ঞাপনের কাজ খুব ভালই চলিয়াছে। তবুও এখনও উন্নতির জন্য অনেক কিছু করিবার আছে। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে, বর্ত্তমানে ভাল রেশমের যেমন চাহিদা আছে এই অবসরে যতদূর সম্ভব উন্নতি করিয়া লওয়া দরকার। এ ছাড়া বর্ত্তমানে "ডোমেষ্টিক মেশিন" (গৃহশিল্পের অনুযায়ী রেশমের তাঁত) যেমন কম দামে বিক্রী হইতেছে এবং নতুন ধরণের গৃহ-তন্তুতে যে সূতা কাটিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অল্প চেষ্টাতেই মহীশূরের রেশমের বাজার বাড়ান অসম্ভব নয়। দেশের মধ্যে সমস্ত অকেজো চরকাগুলাকে উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে ভাল ভাল রেশমের সূতাকাটা কল প্রচলন করা দরকার। মহীশূরের রেশম ও রেশমী জিনিষপত্র কি উপায়ে ভালভাবে ইয়োরোপের বাজারে চালান যায়, সে বিষয়ে লণ্ডনস্থ মহীশূরের বাণিজ্য প্রতিনিধির সঙ্গে রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যের ডিরেক্টরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা দরকার।

গৃহকলের প্রচলন

সাধারণ চরকায় কাটা রেশম অপেক্ষা গৃহকলে কাটা রেশম অনেক ভাল হয়। এ ব্যাপারটা দিন দিন সাধারণের ভিতর জানাজানি হইয়া যাইতেছে। কয়েকটা বড় বড় রেশম-কেন্দ্রে ও প্রদর্শনীতে রেশম বিভাগ হইতে মহীশূরের গৃহকলের সূতাকাটা সাধারণকে দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তা ছাড়া ঐ সমস্ত প্রদর্শনীতে রেশম-নির্ম্মিত অনেক প্রকার কাপড়চোপড়ও দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে রেশম পাকাইবার জন্য এক প্রকার কলের পরীক্ষা চলিতেছে, এই কলটা কার্য্যকর হইলে ইহার সাহায্যে দেশী তাঁতেই অনেক ভাল রেশম প্রস্তুত করা যাইবে এবং ইহাতে তাঁতীরও যথেষ্ট লাভ হইবে।

বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে, মহীশূরের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি গবর্ণমেণ্টের এই বিভাগের সহিত সর্ব্ববিষয়ে রেশম-নির্ম্মাণ-ব্যাপারে যোগদান করিয়াছেন। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট ২৫টী গ্রামের পঞ্চায়েতের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ইহাদের অধিবাসী সমস্ত চাষী যাহাতে সুস্থ, রোগশূন্য তুঁতের চাষ করে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় রেশম-সঙ্ঘ

আলোচ্য বৎসরে মহীশূরের রেশম-সঙ্ঘের সভ্য-সংখ্যা বাড়িয়া ১৬১ জন হয়। এই সঙ্ঘ হইতে প্রতি মাসে একটী বিবরণী প্রকাশিত হয়। ইহাতে সমস্ত রেশম-কেন্দ্রের চাহিদার, রেশমের কোয়ালিটি সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকারের খবরাখবর ও বাজার-দর দেওয়া থাকে। রেশম-শিল্পের উন্নতিকল্পে কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে। গবর্ণমেণ্টের মতে এ সমস্ত সমস্যা একমাত্র এই রেশম-সঙ্ঘের চেষ্টাতেই দূর হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহার অধীন সমস্ত কয়টী প্রতিষ্ঠানেই জমা অপেক্ষা খরচ অনেক বেশী হইয়া যাইতেছে। এই সমস্ত নূতন প্রতিষ্ঠানগুলির পরীক্ষামূলক কাজকর্ম্ম ও শিক্ষামূলক বিজ্ঞাপন প্রভৃতির দিকে বেশী ঝোঁক দিবার দরুণ খরচ কিছু বেশী হওয়াই সম্ভব। তাই বলিয়া এই সমস্ত কলকারখানাগুলি যে নিজ নিজ খরচটা পর্য্যন্ত তুলিতে পারে না, ইহাও আশ্চর্য্যের কথা বটে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বিজ্ঞাপনের দিকে বেশী ঝোঁক দেয়, তাহাদেরও ব্যয় যাহাতে আয় ছাড়াইয়া না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। শুদ্ধ পরীক্ষার দিক্ দিয়া যে ব্যয়টা হয় তাহার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, তবুও বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ হাতের পরীক্ষাগুলির ফলাফল দেখিয়া এই দফায় কত টাকা খরচ করা যুক্তিসঙ্গত তাহা নিজেরাই বিচার করিয়া লইতে পারেন। আলোচ্য বৎসরে এ বিভাগের কার্য্যকলাপ দেখিয়া জানা যায় যে, মহীশূর রাজ্যের রেশমের উচ্চ পদের যতই শ্রেণী বিভাগ করা যাইবে ততই রাজ্যের রেশম-শিল্পের উন্নতি সাধিত হইবে। এবং এই জন্য রেশমের বীজের উন্নতি সাধন ও রেশমের সূক্ষ্ম আঁশ বাহির করিবার ব্যবস্থার দিকে গবর্ণমেণ্টে চেষ্টা প্রবল থাকিবে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে বিভিন্ন দেশ

	জনপ্রতি গড় আমানত (পাউণ্ড)	মূলধন ও রিজার্ভ (মিলিয়ন পাউণ্ড)
যুক্তরাষ্ট্র	৭৩	১০৫২
যুক্তরাজ্য	৫৭	১৮০
অষ্ট্রেলিয়া	৬৩½	৫৯
কানাডা	৪৪½	২৫
ভারতবর্ষ	¾	১৯

চীনদেশের তূলাশিল্প

১৯২৯ সন চীনের তুলা-শিল্পের পক্ষে বেশ সুবৎসর গিয়াছে। লড়াইয়ের পর তুলা-শিল্পের এমন উন্নতি চীন-দেশে আর কখনও দেখা যায় নাই। ১৯২৮ সনের মাঝামাঝি হইতে ১৯২৯ সনের গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত জনসাধারণের তরফ হইতে স্থানীয় মিলগুলিতে কাপড়ের যথেষ্ট অর্ডার আসিতে থাকে। জাপানের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন চলিতে থাকায় চীনদেশস্থ জাপানী মিলগুলি আদৌ অর্ডার পায় নাই। ১৯২৯ সনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে। পরে বয়কট প্রত্যাহৃত হওয়ায় জাপানী মিলগুলি চীনে আবার প্রচুর কাপড় রপ্তানি করিতে পারিয়াছে। চীনের বাজারে আবার জাপানী কাপড়ের একাধিপত্য কায়েম হয়। ১৯২৯ সনের শেষভাগে চীনা কাপড়ের চেয়ে জাপানী কাপড়চোপড়ই চীন দেশে বেশী বিক্রী হইয়াছে।

১৯২৯ সনে আর একটী সুবিধা দেখা দেয়। ইহা হইতেছে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের অভাব। তবে মজুরির হার চড়া থাকিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ কাপড় বিক্রয় করিয়া যে লাভ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে চড়া মজুরি দিয়াও মালিকগণের বেশ পোষাইয়াছে। ১৯২৯ সনে চীনা মিলগুলির লাভ হইয়াছে মিলপিছু ৬৩,০০০ ডলার হইতে ৪২২,০০০ ডলার পর্য্যন্ত।

চীনদেশে ১২০টী কাপড়ের কল

১৯২৯ সনে চীনদেশের কাপড়ের কলের সংখ্যা ১২০টী। এই সমস্ত কলে ৩,৬৬৪,১২০টী বুনাইবার টাকু, ১৮৫,৮৯৬ পাকাইবার টাকু এবং ২৯,৫৮২ তাঁত ছিল। মিলগুলির কুলির সংখ্যা ২৪১,৫১৯ জন; এবং তুলা কাটিয়াছে মিল গুলিতে মোট ১,০৮৯,৩৩৩,০০০ পাউণ্ড। ঐ বৎসরে মোট সুতা উৎপন্ন হইয়াছে ৮৮০,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে ১৪,৬৫০,০০০খানি (৫৮৬,০০০,০০০ গজ)। এই সমস্ত মিলের মধ্যে খাঁটি চীনা মিলগুলিতে তুলা কাটিয়াছে ৫৯,৫৩৩,০০০ পাউণ্ড, সুতা উৎপন্ন হইয়াছে ৫৪৯,১১৫,০০০ পাউণ্ড এবং বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে ২৪০,৩২২,০০০ গজ। ১৯১৫ সনে চীন দেশের সকল প্রকার মিলে দুই কোটী কি আড়াই কোটী পাউণ্ড সুতা উৎপন্ন হইয়াছিল এবং বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল চারি হইতে পাঁচ কোটী গজ।

চীনে তুলাশিল্পের ক্রমোন্নতি

চীন দেশে রাষ্ট্রই তুলাশিল্পের পথ-প্রদর্শক। সাংহাই

সহরে চীন গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং প্রথমে আধুনিক যন্ত্রাদিযুক্ত একটী কলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৬ সনে চীনদেশে মাত্র ১২টী কাপড়ের কল ছিল। এই সমস্ত কলে মাকু চলিত ৪১৭,০০০টী এবং তাঁত চলিত ২,১০০খানি। ইহার মধ্যে বিদেশীদের তাঁবে ছিল ১৫৮,০০০টী মাকু ও ৩৪০খানি তাঁত। ১৯১৫ সনে মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১টী, মাকুর সংখ্যা ১,০০৮,৯৮৬টী এবং তাঁত ৪,৫৬৪খানি। লড়াইয়ের সময় চীনের তুলাশিল্প খুব জাঁকিয়া উঠে। চীনা পুঁজিওয়ালারা দাঁও মারিবার আশায় বহু পুঁজি বস্ত্র-শিল্পে নিয়োজিত করে। কিন্তু ১৯২১ সনে বস্ত্র-ব্যবসায়ে দারুণ ভাঁটা দেখা দেয় এবং ১৯২৩ সনে রীতিমত দুর্য্যোগ উপস্থিত হয়। সুতরাং চীনা মালিক এবং টাকু দুইয়ের সংখ্যাই খুব কমিয়া যায়। চীনের অন্তর্দ্দেশে বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় ক্রমে চীনা পুঁজিওয়ালারা বড় বড় 'সন্ধি বন্দর'গুলিতেই তখন পুঁজি খাটানো নিরাপদ মনে করে।

তুলাশিল্পের কেন্দ্রস্থান সাংহাই বন্দর

এইরূপে সাংহাই বন্দর তুলাশিল্পের কেন্দ্রস্থানে পরিণত হইয়াছে। ১৯২৮ সনে চীনে ১২০টি কাপড়ের কল ছিল। ইহার মধ্যে চীনাদের অধিকৃত এক-তৃতীয়াংশ মিল, ৩০টী জাপানী মিল এবং বৃটিশ অধিকৃত ৩টী মিল সাংহাই বন্দরেই অবস্থিত ছিল। অবশিষ্ট চীনা এবং জাপানী মিলগুলি কিয়াংসু, চিলি, হুপে এবং আরও কয়েকটী প্রদেশে অবস্থিত। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে সাংহাই বন্দরে তুলাশিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছে। চাইনিজ মিলওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের মেম্বরগণের অধিকারভুক্ত মিলের সংখ্যা ১২টি হইতে ২৪টী এবং মাকুর সংখ্যা ২৫৩,৬৬৬টি হইতে ৭১১,৯৮৬টী দাঁড়াইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে জাপানী মিল বাড়িয়া ৭টী হইতে ৩০টী দাঁড়াইয়াছে এবং মাকুর সংখ্যা বাড়িয়া ২৬৩,৯৬৮টী হইতে ৯৪৮,২৬৮টী দাঁড়াইয়াছে।

চীনে তুলাশিল্পের সুবিধা

চীনদেশে তুলাশিল্পের প্রসারতা-লাভের যথেষ্ট সুবিধা বর্ত্তমান। এই বিশাল দেশের লোক-সংখ্যা ৪০ কোটীর উপর এবং ইহারা সকলেই কার্পাস বস্ত্র পরিধানে অভ্যস্ত। সেই চিরপরিচিত লম্বা নীল গাউন এখনও চীনাদের প্রধান জাতীয় পোষাকরূপে বর্ত্তমান। সুতরাং গোটা দুনিয়ার কার্পাসশিল্পের পক্ষে চীন দেশ যে একটী সুবৃহৎ বাজার তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দুনিয়ার তুলা-উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে চীন তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। মার্কিণ মুল্লুকে যত তুলা উৎপন্ন হয় চীন দেশে জন্মায় তাহার ষষ্ঠাংশ কি সপ্তমাংশ। চীনদেশের তুলার আঁশ ছোট, সুতরাং এই তুলা হইতে ২০ নম্বর পর্য্যন্ত সূতা উৎপন্ন হয়, এবং শুধু মোটা চাদর ইত্যাদি বস্ত্র প্রধানতঃ প্রস্তুত হইয়া থাকে। চীনদেশে উৎপন্ন তুলার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ চীনের মিলগুলিতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বাদবাকী তুলা বৃটিশ ভারত এবং মার্কিণ দেশ হইতে আমদানি করা হয়।

চীনের মত জনবহুল দেশে মজুরের জন্য বিশেষ ভাবনা নাই। চীনা মজুরকে শিক্ষা দিলে এরা কম কার্য্যদক্ষ হয় না। আর পাশ্চাত্য মজুরের মত অত কার্য্যদক্ষ না হইলেও অধিক সময় খাটাইয়া এবং অল্প বেতনের ব্যবস্থা করিয়া সে ক্ষতিপূরণ করা যাইতে পারে। চাইনিজ গভর্ণমেণ্ট সাংহাই বন্দরে শ্রমিকদিগের মধ্যে লেবার ইউনিয়ন আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রমিক-সমস্যা সম্পর্কে চাইনিজ গভর্ণমেণ্ট রক্ষণশীল ব্যবস্থানুসারে চলিতেছেন।

মোট কথা চীন দেশে তুলাশিল্পের যে বিচিত্র ভবিষ্যৎ দেখা দিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনটি বিষয় এ সম্বন্ধে চীনকে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছে,—প্রথমতঃ দেশের বিরাট বাজার, দ্বিতীয়তঃ প্রচুর কাঁচা মালের সংস্থান এবং তৃতীয়তঃ সস্তা মজুর।

চীনে তুলা আমদানির একাল ও সেকাল

১৯১৩ সনে চীনদেশে কার্পাস আমদানি হইয়াছিল ১৮,৩৮২,৪০০ পাউণ্ড, মূল্য ২,২৫৪,০০০ ডলার। পক্ষান্তরে ১৯২৪ সনে আমদানি হইয়াছে ২৫৭,৭৭২,০০০ পাউণ্ড, মূল্য ৪৮,৬৭০,০০০ ডলার। অধিকাংশ তুলা সাংহাই বন্দর

হইয়াই আসে। ১৯১৩ সনে এই বন্দরে তুলা আমদানির পরিমাণ ১৮,২৮৫,০০০ পাউণ্ড, এবং ১৯২৮ সনে ২১২,৭৮৪,০০০ পাউণ্ড। সাংহাই বন্দরে ১৯২৮ সনের আমদানির মধ্যে ভারতীয় তুলার পরিমাণ ১৩৬,৯২২,০০০ পাউণ্ড এবং আমেরিকান ৭৫,৩১৫,০০০পাউণ্ড। ১৯১৩ সনে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০,৭৫৬,০৩০ এবং ৩,৫০৮,০০০। ১৯২৮ সনে চীনের সরকারী বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাবে প্রকাশ,—বৃটিশ ভারত, আমেরিকা এবং জাপান হইতে চীনদেশ যথাক্রমে ১৩০,৮৯০,০০০, ৬৫,২৩১,০০০ এবং ৫৯,৬৯৮,০০০ পাউণ্ড তুলা আমদানি হইয়াছে।

চীনের তুলাশিল্পের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, চীনা মিলগুলিতে ক্রমে ক্রমে মিহি সূতা তৈরীর রেওয়াজ বাড়িতেছে। ১৯২১ সনে চীনের মিলগুলিতে ১৬ নম্বর পর্য্যন্ত সূতা প্রস্তুত হইত, কিন্তু ১৯২৮ সনে ২০ নম্বরের সূতা প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কয়েকটী কলে ৬০ নম্বরের সূতাও অল্পবিস্তর প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু ৪০ নম্বরের সূতা প্রস্তুত হইতেছে অনেকগুলি কলে।

সূতা আমদানির রেওয়াজ—লড়াইয়ের আগে ও পরে

চীনে স্বদেশী বস্ত্রশিল্প কায়েম হওয়ার পর হইতে এই দেশে বিদেশ হইতে সূতা আমদানির বহর খুব কমিয়া গিয়াছে এবং পক্ষান্তরে চীন হইতে বিদেশে সূতা রপ্তানি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

১৯১৩ সনে চীন বিদেশ হইতে ৫২,১৬৭,০০০ ডলার মূল্যের ৩৫৮,০৪৮,০০০ পাউণ্ড সূতা আমদানি করে। ইহার মধ্যে জাপান পাঠায় প্রায় ৪৪%, বৃটিশ ভারত ২৫% এবং হংকং ২৬%। হংকং হইতে আগত মালের অধিকাংশই বৃটিশ ভারতজাত এবং অল্প বিলাতী, এই সমস্ত মাল হংকং হইতে পুনরায় জাহাজ বোঝাই হইয়া আসিয়াছে। ১৯২৮ সনে চীনদেশে কোরা সূতা আমদানি হইয়াছে ৩৪,০৬,০০০ পাউণ্ড এবং অন্যান্য প্রকারের সূতা ৩,৯৭৩,০০০ পাউণ্ড। এই উভয় প্রকারের সূতার দাম যথাক্রমে ৯,৭৫০,০০০ ডলার এবং ২,১০৯,০০০ ডলার। উভয় প্রকারের সূতার মোট পরিমাণ ৩৮,০৪০,০০০ পাউণ্ড এবং মূল্য ১১,৮৫৯,০০০ ডলার। এই আমদানি সূতার মধ্যে জাপান পাঠাইয়াছে ৮১,৩৮,০০০ পাউণ্ড কোরা এবং ৩,৬৭৭,০০০ পাউণ্ড অন্যান্য প্রকারের; বৃটিশ ভারত ৩,৫৩১,০০০ পাউণ্ড কোরা ও ৪,০০০ পাউণ্ড অন্যান্য প্রকারের এবং হংকং ২১৬৪৬,০০০ পাউণ্ড কোরা এবং ১৩৩,০০০ পাউণ্ড অন্যান্য প্রকারের। বিলাত হইতে অতি অল্প সূতাই চীনে প্রেরিত হইয়াছে। ১৯২৮ সনে এই দেশ হইতে চীনে এবং হংকংএ মাত্র ১৭২৫,০০০ পাউণ্ড সূতা রপ্তানি হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হংকং হইতে রপ্তানি সূতার অধিকাংশই ভারতীয়।

চীন হইতে বিদেশে সূতা রপ্তানি

১৯১৫ সনে চীনদেশে প্রস্তুত সূতা বিদেশে রপ্তানি হয় ২,৬০০,০০০ পাউণ্ড। কিন্তু ১৯২৮ সনে চীন কমসে কম ১৫,৩২৯,০০০ ডলার মূল্যের ৪৬,৬৪৩,০০০ পাউণ্ড সূতা রপ্তানি করিয়াছে। এই সূতার মধ্যে মাত্র ২,০০০ ডলার মূল্যের ৫,৬০০০ পাউণ্ড কোরা সূতা। এই সনে চীনের প্রধান বাজার হংকং এবং ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ; এবং এই দুই বাজারে চীন সূতা পাঠাইয়াছে যথাক্রমে ২৯,০৬৯,০০০ ও ৩,৪৩৫,০০০ পাউণ্ড।

জার্ম্মাণির বৈদেশিক বাণিজ্য (১৯২৯) বেকার-ব্যাধির মহৌষধ—রপ্তানি বাণিজ্য

১৯২৯ সনের প্রারম্ভে জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। দেশ জুড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা অবস্থা এবং দারুণ বেকার-সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু জার্ম্মাণি রপ্তানি বাণিজ্য বাড়াইয়া এই দুই মহাব্যাধির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে। রপ্তানি বাড়িবার জন্য মাল আটকা পড়িয়া থাকে নাই; সুতরাং জার্ম্মাণি অল্প পুঁজি লইয়াই বেশ কারবার চালাইতে পারিয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যাও দূরীভূত হইয়াছে। বেকার-সমস্যা দূরীভূত করিবার জন্য রিলিফ ওয়ার্কই বল, আর সরকারী সাহায্যই বল, কোনটী রপ্তানি-বাণিজ্য-বৃদ্ধির

কাছে লাগে না। পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলি, দেখিতে গেলে, কৃত্রিম ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু আসল দাওয়াই হইতেছে রপ্তানি-বাণিজ্য-বৃদ্ধি। রপ্তানি-বাণিজ্য বাড়িয়া যাওয়ার ফলে জার্ম্মাণির দুর্দ্দশার অংশ অন্যান্য রাষ্ট্রের ঘাড়েই যেন চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য সনে মোটের উপর রপ্তানি বাড়িয়াছে ৯০ কোটী রাইখস্ মার্ক মূল্যের, আর বাড়তি রপ্তানির মধ্যে অধিকাংশই কারখানাজাত মাল। মোট কথা রপ্তানি বাড়িয়া যাওয়ার জন্য ১৯২৯ সনের মত দুর্ব্বৎসরেও জার্ম্মাণি তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা অটুট রাখিতে পারিয়াছে।

রপ্তানি বাণিজ্যের উপরেই জার্ম্মাণির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে

রপ্তানি-বাণিজ্য জার্ম্মাণির নিকট কতদূর প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়। রপ্তানি বাণিজ্যের উপরেই, দেখিতে গেলে, জার্ম্মাণির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ফি সন জার্ম্মাণিকে মোটা অর্থ দিতে হইতেছে। জার্ম্মাণির পক্ষে এই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা কেবলমাত্র রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের কাটাকাটির উপরেই নির্ভর করিতেছে। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের কাজ করিয়া, বিশেষতঃ জার্ম্মাণির বাণিজ্য নৌ-বহরের কল্যাণে, জার্ম্মাণির মোটা আয় হইতে পারে। বিদেশে জার্ম্মাণির অনেক পুঁজি খাটিতেছে; এই খাটান পুঁজি হইতেও ক্রমে ক্রমে জার্ম্মাণির আয় বাড়িতে পারে। কিন্তু জার্ম্মাণির পক্ষে তাহার শ্রেষ্ঠ মঙ্গল নির্ভর করিতেছে বিদেশী পুঁজির উপর। এই ধরণের পুঁজি যত জার্ম্মাণিতে আসিতে থাকিবে ততই জার্ম্মাণির কলকারখানাগুলির উৎপাদন বাড়িতে থাকিবে, সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণির রপ্তানি বাণিজ্যের বহর বাড়িয়া যাইতে থাকিবে। ফলে জার্ম্মাণির পক্ষে তাহার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করাও সহজ হইয়া আসিবে। জার্ম্মাণি ১৯২৯ সনে ৮০ কোটী রাইখ্‌স মার্ক ঋণ পরিশোধ করিয়াছে; এবং বর্ত্তমান সনে তাহাকে ১০০ কোটী রাইখ্‌স মার্ক শোধ করিতে হইবে। এই ঋণ শোধের পরিমাণ দেখিয়াই বুঝা যায়, জার্ম্মাণ রপ্তানির বহর কি পরিমাণ দাঁড়াইবে।

জার্ম্মাণির মুদ্রা-ব্যবস্থার স্থিতীকরণ সাধিত হইয়াছে। মুদ্রা স্থিতীকরণের পর হইতে জার্ম্মাণির রপ্তানি বাণিজ্য ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৫ সনে জার্ম্মাণি হইতে ৮৯০ কোটী রাইখ্‌স মার্ক মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়; ১৯২৯ সনের রপ্তানি দাঁড়াইয়াছে ১২৭০ কোটী রাইখস্ মার্ক মূল্যের অর্থাৎ ৪ বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণির রপ্তানি বাড়িয়াছে ৪০%। তবে কোন্ কোন্ জিনিষ কি কি পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। জার্ম্মাণির বৈদেশিক বাণিজ্যের বিবরণে ১৯২৯ সনে জার্ম্মাণি যে ৭৫ কোটী মার্ক ঋণশোধ করিয়াছে শুধু তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমদানি রপ্তানি কাটাকাটি হইয়া জার্ম্মাণির সুবিধা হইয়াছে কিনা তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

বৎসরে ১০% রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি

মোটের উপর দেখা যাইতেছে, বিগত ৪ বৎসরের মধ্যে ফি সনে জার্ম্মাণির রপ্তানি বাণিজ্য ১০% হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্ম্মাণির পক্ষে ইহা কম কথা নয়। জার্ম্মাণির ভাগ্য যে এরূপ ফিরিবে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহা ধারণারও অতীত ছিল। তবে এখন জিজ্ঞাস্য এই, এই রপ্তানি বৃদ্ধির কারণ কি? প্রথমতঃ ধরা যাইতে পারে, বিদেশের বাজারে জার্ম্মাণ মালের ব্যবহার বাড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, জার্ম্মাণ শিল্পের উন্নতি হইয়াছে; সুতরাং জার্ম্মাণি এখন অন্যান্য দেশের সহিত টক্কর দিবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী হইয়াছে। এই দুইটী আংশিকভাবে জার্ম্মাণির রপ্তানি-বৃদ্ধির কারণস্বরূপ নিঃসন্দেহে বিবেচিত হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা সুবিধাজনক হওয়াও জার্ম্মাণির রপ্তানি-বৃদ্ধির আর একটী কারণ। ১৯২৯ সনে জার্ম্মাণির রপ্তানি মালের মধ্যে লোহালক্কড়, বিশেষতঃ নানাপ্রকার মেশিনই প্রধান স্থান অধিকার করে। লোহালক্কড়ের রপ্তানি বৃদ্ধি হইয়াছে মোট

৫৪ কোটী রাইখস মার্ক মূল্যের অর্থাৎ গোটা রপ্তানি বৃদ্ধির অর্দ্ধেক। ১৯২৯ সনে জার্ম্মাণির লোহালক্কড় উৎপাদন সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু এই লোহালক্কড় এবং যন্ত্র-শিল্পের অতিরিক্ত উৎপাদনে এবং বিদেশের বাজারে অতিরিক্তমাত্রায় বিক্রী হওয়ায় বেশ বুঝা যাইতেছে, অনেক দেশে কলকারখানার রেওয়াজ বাড়িয়া চলিয়াছে। ঐ সমস্ত জার্ম্মাণ লোহালক্কড় এবং মেশিন আমদানিকারী দেশসমূহে নূতন নূতন কারখানা যে কায়েম হইয়াছে এবং অনেক কারখানার আয়তনও যে বাড়িয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জার্ম্মাণির ইহা ভয়ের কারণও হইয়া দাঁড়াইতেছে। জার্ম্মাণি মেশিন চালান দিয়া অনেক দেশের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতাই বাড়াইয়া দিতেছে। ইহাতে বিদেশের বাজারে জার্ম্মাণির শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধে অসুবিধা উপস্থিত হইবে। জার্ম্মাণির পক্ষে এই ব্যাপারটী তলাইয়া বুঝা নিতান্ত আবশ্যক।

বিদেশী বাজারসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি-নিবন্ধন গত ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসে জার্ম্মাণির রপ্তানি বাণিজ্য কিছু কমিয়াছে। অক্টোবর মাসে রপ্তানির মূল্য হইয়াছিল ১১৬৫০ লক্ষ রাইখ্‌স মার্ক; কিন্তু ডিসেম্বরে রপ্তানির মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১০০৫০ রাইখ্‌স মার্ক। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের এই অবনতির জন্য ১৯৩০ সনের প্রথম কয়েক মাসে জার্ম্মাণির অতিরিক্ত শিল্পদ্রব্য বিদেশে কম বিক্রী হইবার কথা। জার্ম্মাণির ব্যবসা-বাণিজ্য অনুসন্ধান সমিতি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, কয়েক মাসের মধ্যে যে সমস্ত দেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি সামলাইয়া লইয়াছে, সেই সমস্ত দেশ জার্ম্মাণির রপ্তানি মালের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অতঃপর জার্ম্মাণিকে বিদেশের বাজারে দারুণ প্রতিযোগিতার মুখে ব্যবসাবাণিজ্য চালাইতে হইবে। এই অবস্থায় জার্ম্মাণি কি করিতে পারে? জার্ম্মাণির পক্ষে সস্তায় মাল ছাড়িয়া বাজার ছাইয়া ফেলা চলিবে না; সুতরাং বাধ্য হইয়া জার্ম্মাণিকে অসুবিধাজনক দামে মাল বিক্রয় করিতে হইবে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্ম্মাণিকে বিদেশে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মাল বিক্রয় করিতেই হইবে। কিন্তু এই সম্পর্কে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। মালের পরিমাণও যেরূপ বাড়াইবার প্রয়োজন, আবার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও সুবিধাজনক হওয়া চাই। ১৯২৯ সনে মালের দাম চড়া থাকায় জার্ম্মাণি রপ্তানি-বাণিজ্যে বেশ সুবিধা করিয়াছিল। কিন্তু দেশের চৌহদ্দির মধ্যে মাল বেচিয়া জার্ম্মাণির যত লাভ হইয়াছে বিদেশে মাল বেচিয়া সেরূপ লাভ হয় নাই।

জার্ম্মাণির আমদানি বাণিজ্য

আমদানি রপ্তানি কাটাকাটি করিয়া ১৯২৯ সনে জার্ম্মাণির সুবিধা হইয়াছে। জার্ম্মাণির আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় জার্ম্মাণির অদৃষ্টে এই সুবিধা হইয়াছে। ১৯২৮ সনে জার্ম্মাণি মাল আমদানি করে ১৪০০ কোটি রাইখস মার্ক মূল্যের। ১৯৩০ সনে ৫০ কোটী রাইখ্‌স মার্ক কমিয়া মোট আমদানি হয়, ১৩৪০ রাইখস মার্ক মূল্যের। ১৯২৯ সনে জার্ম্মাণির কাঁচা মাল আমদানির পরিমাণ কমে নাই, তবে মূল্য কমিয়াছে। গত তিন বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণি ফি সন ৭২০ কোটী রাইখস মার্ক মূল্যের কাঁচা মাল আমদানি করিতেছে। গত দুই বৎসরের মধ্যে কাঁচা মাল বেশী মূল্যের আমদানি না করিয়াও জার্ম্মাণি ২০০ কোটী রাইখস মার্ক মূল্যের অতিরিক্ত শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিতে সমর্থ হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যের এই নয়া হালচালে জার্ম্মাণ রপ্তানি বাণিজ্যের গতি যে কোন পথে ধাবিত হইতেছে তাহা বেশ টের পাওয়া যাইতেছে। জার্ম্মাণিতেও কাঁচা মাল উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই কাঁচা মালের উৎপাদন সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে জার্ম্মাণ শ্রমিকের বাহুর শক্তি অমিত। শুধু জার্ম্মাণির কাঁচা মালদ্বারা এই শ্রমিকদের কাজ যোগানো সম্ভবপর নয়। সেইজন্য বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা মাল আমদানি করা আবশ্যক। আর হইতেছেও তাহাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জার্ম্মাণির রপ্তানি বাণিজ্য প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়াছে।

জার্ম্মাণিতে বিদেশী শিল্পদ্রব্য আমদানি

১৯২৯ সনে জার্ম্মাণিতে বিদেশ হইতে শিল্পদ্রব্য আমদানির পরিমাণ কিছু কমিয়াছে। জার্ম্মাণ জনসাধারণের ক্রয়-শক্তিও কিছু কমিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জার্ম্মাণি এই সনে ২২৫ কোটী রাইখস মার্ক মূল্যের বিদেশী শিল্পদ্রব্য আমদানি করিয়াছে। ইহাতে আমদানি রপ্তানি কাটাকাটি করিয়া জার্ম্মাণির পক্ষে লাভ কমিয়া তো যাইতেছেই, অধিকন্তু জার্ম্মাণিতে বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে জার্ম্মাণ শিল্পের অবস্থাও কাহিল হইয়া পড়িতেছে। ১৯২৭ সনে জার্ম্মাণিতে বিদেশী শিল্প দ্রব্য ঢোকে সব চেয়ে বেশী। সেই তুলনায় ১৯২৯ সনে মাত্র ১০% কম আমদানি হইয়াছে। দেশ-বিদেশের এই ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির সময়েও যে জার্ম্মাণিতে বিদেশী শিল্পদ্রব্যের প্রসার কমিতেছে না, ইহার কারণ কি? দামের তারতম্য ইহার একমাত্র কারণ। বিদেশীরা সস্তায় মাল ছাড়িতেছে; এবং এই ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে গুণের চেয়ে দামই বেশী কাজ করিতেছে। কারখানাওয়ালারাও কম চেষ্টা করিতেছে না। তাহারা যুক্তিপ্রয়োগ নীতি খুব জোরসে চালাইতেছে এবং ইহাতে ফলও দেখা দিতেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। প্রতিযোগী দেশগুলির সুবিধা এই যে, প্রথমতঃ, মাল-উৎপাদন সম্বন্ধে উহাদের স্থানীয় সুবিধা আছে; দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের খরচও তাহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প। সুতরাং জার্ম্মাণি ইহাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বিদেশী মালের উপর অবশ্য জার্ম্মাণি শুল্ক বসায় নাই। আমদানি হিসাবেও এই সমস্ত বিদেশী প্রতিযোগিতার কোন পরিচয় পাওয়ার উপায় নাই। কারণ বিদেশী পুঁজিওয়ালারা ক্রমে ক্রমে খোদ জার্ম্মাণ ভূমিতেই তাহাদের কারখানা কায়েম করিতেছে এবং কারখানার সংখ্যা বাড়াইতেও আরম্ভ করিয়াছে।

মোটের উপর বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণির রপ্তানি বাণিজ্য বেশ ভাল ভাবেই চলিয়াছে বলিতে হইবে। আমদানি রপ্তানি কাটাকাটি করিতে গেলে দেখা যায় জার্ম্মাণির পক্ষে রপ্তানি বাণিজ্যই বাড়িয়া চলিয়াছে।

জাভা চিনি

প্রতি বৎসর মে মাসেই জাভা চিনির কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৩০ সনের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে ইউনাইটেড্ জাভা সুগার প্রডিউসার্স এসোসিয়েশন হইতে এ বৎসরের চিনি উৎপাদনের প্রথম এষ্টিমেট প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী অনুসারে এ বৎসর উক্ত এসোশিয়েশনের সমস্ত কলে জাভা চিনির মোট উৎপাদন ২,৫১৮,৯২৪ টন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

	টন
উচ্চশ্রেণীর হেড্ চিনি	১,৭৩৫,৮৫৩
„ নরম „	৯৩,১৪
আস্কোভ্যাডোস হেড্ চিনি	৭৬৭,৩৪৯
ঝোলযুক্ত চিনি	৩৬,৪০৮
মোট	২,৫১৮,৯২৪

১৯২৯ সনের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে ভি, জে, পি চিনির যে এষ্টিমেট বাহির হইয়াছিল তাহাতে মোট ২,৭৫৫,০২৪ টন চিনির উৎপাদন অনুমান করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাত্র ২,৬৭৬,৭৪৮ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এষ্টিমেট অপেক্ষা ৭৮,২৭৬ টন চিনি কম হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরেও এষ্টিমেট অপেক্ষা কিছু কম হইবে আশা করা যায়।

উপরোক্ত এসোসিয়েশনের বাহিরে যত মিল আছে ১৯২৯ সনে প্রাথমিক এষ্টিমেট অনুসারে তাহাদের উৎপাদন ২৫০,০০০ মেট্রিক টন ধরা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের উৎপাদন ২৬৪,৩৫০ টন হইয়াছিল। সুতরাং ১৯২৯ সনে যে স্থানে প্রকৃত পক্ষে ২,৯৪১,০৯৮ টন মোট চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল, সে স্থানে ১৯৩০ সনে জাভার মোট উৎপাদন ২,৭৬৮,৯২৪ টন এষ্টিমেট করা হইয়াছে।

আফ্রিকার মোটর গাড়ী

গত বৎসর আফ্রিকায় সর্ব্বপ্রথম মোটরের সংখ্যা ৩ লক্ষের উপরে উঠিয়াছে। এবং ১৯৩০ সনের দুনিয়ার

মোটর সেন্সাসে প্রকাশ ১৯৩০ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে আফ্রিকায় মোট ৩১৯৩৬৫খানা গাড়ী এবং ৬০,০৩৮ খানা মোটর সাইকেল রাস্তায় চলাচল করে। এই সংখ্যার মধ্যে ১৯২৯ সনে ৪৪,১৯২ খানা মোটর গাড়ীর এবং ৬৮২১খানা মোটর সাইকেলের চলাচল বাড়িয়াছে বলিয়া জানা যায়। গত বৎসরের বৃদ্ধি—মোটর গাড়ীর বেলায় শতকরা ১৬ ভাগ হিসাবে এবং মোটর সাইকেলের বেলায় শতকরা ১২·৮ ভাগ হিসাবে ধরা যাইতে পারে।

আফ্রিকার এই মোটর গাড়ীর বাড়তির মধ্যে এখানকার মোটর ট্রাকের ব্যবহার দুনিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেক জায়গায় মোটরগাড়ী বাস ও ট্রাকের হিসাব স্বতন্ত্রভাবে নেওয়া হয় না বলিয়া সম্পূর্ণ হিসাব পাইবার উপায় নাই, তবে এইটুকু জানিলে যথেষ্ট হইবে যে, পূর্ব্বে আফ্রিকায় যত ট্রাকের ব্যবহার ছিল গত বৎসর তাহার প্রতি চারিখানায় একখানা করিয়া ট্রাক বাড়িয়াছে। অন্য কথায় বলিতে গেলে সমগ্র আফ্রিকায় শতকরা প্রায় ২৬·৬ ভাগ মোটর ট্রাকের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

আফ্রিকার কতকগুলি বিভাগে যাত্রী গাড়ীর সংখ্যা অপেক্ষা ট্রাকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্ত ট্রাক বেশীর ভাগ ব্যবসা বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে, খনির কাজে ও অন্যান্য ব্যবসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহারা প্রধানতঃ দেশী চালকদ্বারা চালিত হইয়া থাকে। মোটর গাড়ীর মালিক সাধারণতঃ শ্বেতাঙ্গরাই। তবে এরূপ গাড়ীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। আফ্রিকার এইরূপ কতকগুলি বিভাগের শেতাঙ্গ লোক-সংখ্যা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই সমস্ত স্থানে মোটর গাড়ীর স্বামিত্ব শ্বেতাঙ্গদের ভিতর এত নিবদ্ধ যে গড়ে প্রায় ২১৩ জন লোকের মধ্যে একখানা মোটর গাড়ী দেখা যায়। তবে মূল্য বিচার করিতে গেলে ট্রাকের শ্রেষ্ঠত্ব মানিতে হইবে।

ইউরোপের সমবায় প্রতিষ্ঠান

(১) চেকোশ্লোভাকিয়ার মদের ভাটী

১৯২৮-২৯ সনে চেকোশ্লোভাকিয়ায় মোট মদের ভাটীর সংখ্যা ৮৯৪টী; ইহার মধ্যে সমবায় প্রথায় পরিচালিত ভাটীর সংখ্যা ২৬৯টি। পাড়াগাঁ অঞ্চলেই অধিকাংশ মদের ভাটী অবস্থিত এবং এই সকলের তাঁবে জমি রহিয়াছে মোট ৫৬১,০০০ হেক্টেয়ার। ইহার মধ্যে ৫৪% অর্থাৎ ৩০২,০৩০ হেক্টেয়ার জমি সমবায় মদের ভাটী গুলির অধীন। চেকোশ্লোভাকিয়ার এই সমস্ত ভাটীর মোট উৎপাদন ৪৫৩,০০০ হেক্টোলিটার; ইহার মধ্যে সমবায় ভাটীগুলির উৎপাদন ২১৪,১৭২ হেক্টোলিটার। প্রাইভেট ভাটীগুলি সংখ্যায় বেশী, সমবায় ভাটীগুলি প্রায়ই আকারে বড়।

(২) হাঙ্গেরির কেন্দ্রীয় কারিগর সমবায় সমিতি

হাঙ্গেরিদেশে অনেক আগে কারিগরদিগের সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমস্ত সমবায় সমিতিভুক্ত কারিগর-দিগকে কর্জ্জদাদন, মালপত্র সরবরাহ, মেশিন ক্রয়ের সুবিধা, চাকুরি ঢুঁড়িয়া দেওয়া এবং উৎপন্ন মালপত্র বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য ১৯২৪ সনে একটী কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। কাঁচা মাল খরিদ এবং উৎপন্ন মাল বাজারে ফেলার জন্য প্রায় ৫৭টি সমবায় সমিতি এই কেন্দ্রীয় সমিতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। যাহারা অল্প স্বল্প মাল তৈরী করে সেই সমস্ত ক্ষুদে কারিগরগণের নিকট এই সমবায় সমিতিগুলি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ ব্যবসাবাণিজ্য যখন মন্দগতিতে চলে তখন সমবায় সমিতিগুলি এই সমস্ত ছোটখাটো কারিগরদিগকে উৎপন্ন মালের উপর কর্জ্জদাদন করিয়া এবং মেশিন সরবরাহ করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ, মফঃস্বল অঞ্চলে কারিগরদিগের পক্ষে এই কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিটি ছাড়া অন্য কোথাও ঋণ পাওয়ার উপায় নাই। কেন্দ্রীয় সমিতির আর একটী কৃতিত্ব এই যে, ইহা অনেক ক্ষেত্রে, কতকগুলি ব্যবসায় নিয়োজিত কারিগরদিগকে মাত্র ব্যক্তিগত জামিন লইয়া ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিটির আর্থিক অবস্থা আদৌ প্রয়োজনানুরূপ নহে। সমিতিটির হাতে মাত্র ২,৪০০,০০০ পেঙ্গো

কর্জ্জদাদন করার মত ছিল। এদিকে কর্জ্জগ্রহণের জন্য আবেদন পড়িয়াছিল ২০০,০০০খানি। সুতরাং সমিতি কেবলমাত্র ৩,০০০খানি আবেদনপত্র মঞ্জুর করিতে সমর্থ হইয়াছে। ব্যাপার বুঝিয়া হাঙ্গেরিয়ান গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিটীকে অর্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত সমবায় সমিতিগুলি সন্তোষজনকভাবে কাজ চালাইতেছে। কেন্দ্রীয় সমিতিটীর কর্ম্ম-তৎপরতায় মাল রপ্তানি খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। আর এই ব্যাপারটী সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণস্বরূপ "জয়েনার্স প্রডাকৃটিভ্" কো-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গত দুই বৎসরের মধ্যে এই সমিতিগুলি গৃহস্থালীর আসবাবপত্র রপ্তানি করিয়াছে ১,৬৮০,০০০ পেঙ্গো মূল্যের।

এই সমস্ত রপ্তানি দ্রব্য প্রধানতঃ ইতালি, জুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া এবং জার্ম্মাণিতে প্রেরিত হয়। অল্প স্বল্প মাল সুইজারল্যাণ্ড এবং রুমানিয়াতেও যায়। নমুনা-স্বরূপ কিছু কিছু মাল মার্কিণ দেশে এবং মিসরেও প্রেরিত হইয়াছে; আশা এই যে, এই দুই দেশ হইতেও রীতিমত অর্ডার পাওয়া যাইবে।

কেন্দ্রীয় সমিতির অন্তর্ভুক্ত আর একটী উল্লেখযোগ্য সমবায় সমিতি আছে। ইহা হইতেছে ইউনাইটেড সু-মেকার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি অর্থাৎ জুতা প্রস্তুতকারদের সমবায় সমিতি। এই সমিতিটীও রপ্তানি-বাণিজ্যে লিপ্ত আছে। সমিতিটী নানা প্রকার জুতা ইউরোপের রাজধানীগুলিতে এবং রাজ্যগুলিতে চালান দিয়া থাকে। সমিতিটীর অধীনে একটী বড় জুতার কারখানা আছে। কারখানায় লোক খাটে প্রায় ৩০০ জন। অল্প দিন হইল সমিতি ভিয়েনা সহরে একটী শাখা দোকানও খুলিয়াছে। এই দোকানে হস্ত-নির্ম্মিত, নিজ ফ্যাক্টরী-জাত এবং ছোট ছোট কারখানাজাত বুট এবং জুতা বিক্রয় হইবে।

(৩) খাদ্য শস্য গোলাজাত করিবার জন্য হাঙ্গেরিতে ৫০০টি সমবায় শস্যাগার

সম্প্রতি হাঙ্গেরিয়ান গবর্ণমেণ্ট খাদ্য সমবায় নীতিতে শস্য গোলাজাত করিবার জন্য নূতন আইন কায়েম করিয়াছেন। সেণ্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব্ ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ নামক প্রতিষ্ঠান এবং হাঙ্গেরিয়ান কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত "কিউচারা ট্রেডিয়া কোম্পানী" কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রতিষ্ঠান দুইটীর দ্বারা কৃষকদের পাইকারী দরে শস্য বিক্রয়ের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। কৃষকগণ প্রথমতঃ গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুলির নিকট মাল প্রদান করে। এই গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুলি কমিশন লইয়া কৃষকদের মাল বেচিয়া দেয়। সেণ্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব্ ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। কোন স্থানে শস্যের দর অযথা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে দেখিলে এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটির তরফ হইতে সমস্ত শস্য এমন দাম দিয়া ক্রয় করিয়া লওয়া হয় যাহাতে কৃষকের উৎপাদন-খরচা পোষাইয়া যায়। সমবায় প্রথায় শস্যাগার স্থাপনেরও যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে। এতদর্থে ৫০০টি শস্যাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই শস্যাগারগুলি কেন্দ্রীয় শস্যাগাররূপে বিবেচিত হইবে এবং প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় শস্যাগারে ৫।৬টি গ্রামের উৎপন্ন ফসল জমা হইতে থাকিবে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশ এইরূপ শস্যাগারে ছাইয়া ফেলা হইবে। এই ধরণের শস্যাগারে হাঙ্গেরিয়ান কৃষকের কি যে মঙ্গল সাধিত হইবে তাহা আর বলিবার নয়। বর্ত্তমানে বড় বড় ব্যাঙ্কের তাঁবে অনেক শস্যাগার আছে বটে, কিন্তু তাহাতে ছোট খাটো কৃষকদের কোনই সুবিধা হয় না। ব্যাঙ্কের শস্যাগারে মাল মজুত রাখিয়া বিক্রয় করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। ছোট ছোট কৃষকদের ইহাতে পোষায় না। পক্ষান্তরে গ্রাম্য সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি অল্প সুদে কৃষকগণকে ঋণদান করিয়া থাকে। কৃষকও সমবায় শস্যাগারে মাল মজুত রাখিয়া বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে পারে।

(৪) নরওয়ে দেশীয় কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের কার্য্যাবলী

লড়াইয়ের পরে নরওয়ে দেশে দারুণ দুর্য্যোগ দেখা দেয়;

সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অবনতি আরম্ভ হয়। ১৯২৯ সনে নরওয়ে প্রথম তাল সামলাইয়া লইয়াছে। এই বৎসরে নরওয়ের মুদ্রা ক্রোনের স্থিতীকরণ হইয়াছে। এই সনে কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন এবং পাইকারী বিক্রয় সমিতির কার্য্য-বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। মাল-উৎপাদন এবং বিক্রয় দুইই বাড়িয়াছে। ১৯২৮ সনে বিক্রয় মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ২৬,৪৬৭,৮৫০ ক্রোন, ১৯২৯ সনে দাঁড়াইয়াছে ২৯,২২২,৭৭৭ ক্রোন, অর্থাৎ ১০·৪% বিক্রয় বাড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাইকারী বিক্রয় সূচীও ১৫২ হইতে ১৫৭ দাঁড়ায়। সুতরাং মাল উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মোট মাল বিক্রয়ের মধ্যে খাঁটি নরওয়ে দেশের মাল বিক্রয় হইয়াছে ৮,২৬৯,৬১২ ক্রোন। সুতরাং মাল উৎপাদন যথেষ্ট হইয়াছে বলিতে হয়। বৃদ্ধির কারণ, অনেকগুলি নূতন নূতন কারবার খোলা হইয়াছে, যথা :— ময়দার কল, মার্গারিণের ফ্যাক্টরী ও জুতার কারখানা।

মার্গারিণ উৎপাদন ১১·৬% বাড়িয়াছে। ১৯২৮ সনে মার্গারিণ উৎপন্ন হইয়াছিল ২,৪০০,০০০ কিলোগ্রাম, ১৯২৯ সনে উৎপন্ন হইয়াছে ২৮০০,০০০ কিলোগ্রাম। মূল্যও বাড়িয়াছে ১০·৭%, কারণ মূল্য বাড়িয়া ৩,১৫৮,০৬৮ ক্রোন হইতে ৩,৩৭৫,০০০ ক্রোন দাঁড়াইয়াছে।

ময়দার কলে ১১,৩০০ টন শস্য গুঁড়া হইয়াছে, দাম ২,৮৩৯,০৩৮ ক্রোন। মিলটী এখন যে অবস্থায় আছে তাহাতে আর যোগান দিয়া কুলাইতে পারিতেছে না। ইতিপূর্ব্বেই মিলটী বাড়াইবার জন্য মোসাবিদা করা হইয়াছে।

সাবানের কলের উৎপাদনের মূল্য ১৯২৮ সনের ৮৮০,০০০ ক্রোনের স্থলে ১৯২৯ সনে ৯১০,৮০৬ ক্রোন দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সনে জুতার কারখানায় ৭৪,০৭৮ জোড়া জুতা প্রস্তুত হইয়াছে; দাম ১,০৭৮,১৯৮ ক্রোন।

তামাকের কারখানায় ১৯২৮ সনের উৎপাদনের মূল্য ৯,৬৬,০৪০ ক্রোন, ১৯২৯ সনের মূল্য ৯৯৮,৩৭০ ক্রোন। মাল-উৎপাদন কিন্তু সামান্য মাত্রায় বাড়িয়াছে।

ইউনিয়নের ব্যাঙ্কিং বিভাগে আমানতকারীর সংখ্যা ১৬,০০০ হইতে ১৭৩১৭তে উঠিয়াছে। মেম্বারগণ কর্ত্তৃক গচ্ছিত অর্থ বাড়িয়াছে ৫ লক্ষ ক্রোন।

"সামভার্কে" নামক বীমা সমিতি ২০,৩০০টী নূতন পলিসি রেকর্ড করিয়াছে (১৯২৮ সনে ১৮,৭৪৫টী) মোট বীমার পরিমাণ ১৯৩৫০০,০০০ ক্রোনার (১৯২৮ সনে ১২৭০০০০০০ ক্রোনার)। অন্যান্য বীমা কোম্পানী-গুলির কৃত বীমার পরিমাণ ১৫৮,৫০০,০০০ ক্রোনার। বীমা সমিতির নিজ পলিসির উপর প্রিমিয়াম পাইয়াছে ৩১৩,০০০ ক্রোনার; পলিসি পুনরায় বীমা করিবার উপর প্রিমিয়াম পাইয়াছে ৪৪,০০০ ক্রোনার অর্থাৎ মোট প্রিমিয়াম পাইয়াছে ৩৫৭০০০ ক্রোনার।

(৫) রুমাণিয়ার বিদ্যালয় সমবায় সমিতি

বহুপূর্ব্ব হইতে রুমাণিয়ার শিক্ষকগণ বৎসরের প্রারম্ভে ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকসমূহ একযোগে ক্রয় করিতে অভ্যস্ত। এই প্রচেষ্টা হইতে রুমাণিয়ার বিদ্যালয়-সমবায় সমিতিসমূহ জন্মলাভ করিয়াছে। কয়েকজন শিক্ষক ক্রমে ধারণা করেন যে, একযোগে ক্রয় করিবার জন্য ব্যবসার সুবিধা ছাত্রগণেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। সুতরাং তাঁহারা মিলিত হইয়া বিদ্যালয়-সমবায় সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯০৮ সনে শিক্ষামন্ত্রী মিঃ স্প্রু হারেট্ স্বয়ং আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এতদুদ্দেশ্যে নিয়মকানুন নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি একখানি ইস্তাহারও প্রচার করেন। এই ইস্তাহারে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, বিদ্যালয় সমবায় সমিতিসমূহ স্বেচ্ছাকৃত সমিতি হইবে। সমিতিসমূহকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। প্রত্যেক সমিতিকে নিয়মিত সম্পূর্ণ আয়ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করিতে হইবে। ১৯১৬-১৮ সনের বলকান যুদ্ধের সময় এই আন্দোলন চাপা পড়িয়া যায়; কিন্তু ১৯২৫ সনে ইহা আবার দেখা দিয়াছে।

বর্ত্তমানে রুমাণিয়ায় ৬০টী সমবায় বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাড়া, একটী ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে, একটী শিক্ষকদের ট্রেনিং বিদ্যালয়ে, একটী উচ্চ বাণিজ্য বিদ্যালয়ে

এবং বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়েও সমবায় প্রথা কায়েম হইয়াছে।

এই সমস্ত সমবায় সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য পাঠ্য পুস্তক ক্রয় করিয়া ছাত্রদিগকে তাহা সরবরাহ করা। বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমবায় সমিতি কিন্তু একটী রেস্তরাঁ, ও একটী চুল পরিপাটী করিবার আস্তানাও চালাইতেছে। ট্রেনিং বিদ্যালয়টী হইতে মেম্বরগণকে পরিধেয় বস্ত্রও সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

১৯২৯ সনের ১৪ই জুন তারিখে এই ধরণের ১৫টী বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া জানা গিয়াছে যে, লাভের এক অংশ বিদ্যার্থীদের শিক্ষার জন্য (স্কুল লাইব্রেরী স্থাপন, ভ্রমণ ইত্যাদি) এবং দাতব্য ব্যাপারে (গরীব ছাত্রদের সাহায্য দান) ব্যয়িত হইয়া থাকে।

সমবায় প্রচেষ্টাসমূহের নিয়ন্ত্রণের জন্য রুমাণিয়ায় যে জাতীয় অফিস আছে তাহা হইতে নানা প্রকার নিয়ম-পদ্ধতি কায়েম করিয়া এবং পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়া এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করা হইতেছে।

(৬) সুইডেন দেশের সমবায় প্রচেষ্টা

১৯২৯ সনে সুইডিস কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের মোট লাভ দাঁড়াইয়াছে ১৪১,৩২০,০০০ ক্রোন। এত বেশী লাভ আর কখনও হয় নাই। ১৯২৮ সনের তুলনায় আলোচ্য সনে ৬,০২৩,০০০ ক্রোন বেশী লাভ হইয়াছে; অথচ ১৯২৯ সনে জিনিষপত্রের পাইকারী দর যথেষ্ট পড়িয়া গিয়াছিল।

এই কো-অপারেটিভ্ ইউনিয়নের অধীনে যে সমস্ত শিল্প পরিচালিত হইতেছে তাহার মধ্যে মার্গারিণ্ ফ্যাক্টরিতে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ১৩,০৩৮,০০০ কিলোগ্রাম, মূল্য বাড়িয়াছে দশ লাখ ক্রোন্। ময়দা-উৎপাদন বাড়িয়াছে ৩৭,৫০০ বস্তা। রবার ফ্যাক্টরিতে রবার-পাদুকা এবং মোটর টায়ার দু'য়েরই উৎপাদন বাড়িয়াছে। মোট রবার পাদুকা প্রস্তুত হইয়াছে ১২৯৬,০০০ জোড়া, এবং মোটর টায়ার প্রস্তুত হইয়াছে ১৭,৫০০ খানি। সুপার ফস্ফেট কারখানায় ৫১,৩৮৯ টন সুপার ফস্ফেট প্রস্তুত হইয়াছে।

বাঙ্গালায় জলবিদ্যুতের ভবিষ্যৎ

ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ ইঞ্জিনিয়ার্সের বাৎসরিক সভায় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ডিরেক্টর অব্ ইন্‌ডাষ্ট্রিজ এক বক্তৃতা দেন, তার সারমর্ম্ম নিম্নরূপ :—

ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত উন্নতিতে বাঙ্গালা দেশ পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। দামোদর সেচ খাল, বালি ব্রিজ ও ভবিষ্যৎ হাওড়া ব্রিজ মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশ বড় বেশী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, বিশেষতঃ বিদ্যুৎকে কাজে লাগান হিসাবে আমাদের স্থান কোথাও নাই।

যুক্তপ্রদেশে দশ হাজার মাইলে বিদ্যুৎ

যুক্ত প্রদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের এক স্কীম কার্য্যে পরিণত হইতে যাইতেছে। তার ফলে দশ হাজার বর্গ মাইল জুড়িয়া ৪২টী বড় সহরের চেহারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। ১৩টা জলপ্রপাতকে সেচ-খালের জন্য কাজে লাগান হইবে। এই আয়তনের মধ্যে বিভিন্ন ছোট ছোট বৈদ্যুতিক প্ল্যাণ্টের সাহায্যে নানা জায়গার অভাব মোচন সম্ভবপর হইবে। আলো, বাতাস ও শীতলতা—সব দিক্ দিয়াই বিদ্যুৎ স্বাস্থ্যকর বটে। এই বিদ্যুতের সাহায্যে সহজে ছোট ছোট ক্ষেত্রে জলসেচন সম্ভবপর হইবে।

যুক্তপ্রদেশে যা হইতেছে, সেই জিনিষটাই অনেক বিস্তৃতভাবে পাঞ্জাব ও মান্দ্রাজে হইতেছে, মহীশূর রাজ্যেও কতক পরিমাণে হইয়াছে।

লাভজনক হইবে কি না ?

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বিদ্যুতের এইরূপ ব্যবহারে যত খরচ পড়িবে ততটা সুবিধা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এই সব সমস্যায় দূরদৃষ্টির দরকার। বিদ্যুতের ব্যবহারে বাঙ্গালা দেশের লোকেরা বাস্তবিক আর্থিক উপকার ও বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করিবে।

বাঙ্গালা দেশে নদীর জল ও বৃষ্টিপাতের অভাব নাই। কিন্তু এরূপ অনেক স্থান আছে যেখানে নদী নাই বা বৃষ্টির জল ধরা যায় না। বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে এই সব স্থানে নদী নালা খালের জল সরবরাহ করা যাইবে। লোকে যদি জানিতে পারে যে, জল-সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট উপকরণ রহিয়াছে, তবে তারা তার সুযোগ গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিবে না।

বাঙ্গালায় বিদ্যুতের ক্ষেত্র

জি আই পি রেলওয়েতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের আয়োজন হইতেছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে বোম্বাইয়ের মত জনবহুল স্থানের শিল্পবাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির আকাশকে নির্ধূম রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশেও তদ্রূপ কেন হইবে না ?

কুটীর ও বাজার-শিল্পের সুবিধার কথা অনেকে বলিয়া থাকেন। দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও কুটীর-শিল্পিগণ আশ্চর্য্যজনক দক্ষতার সহিত তাদের ব্যবসা চালাইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেকেহ দেশের খবর ভাল করিয়া রাখে ও অন্যান্য দেশের আধুনিক ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে, তার পক্ষে আমাদের দেশের কুটীর-শিল্প প্রণালীকে প্রশংসা করা সম্ভব নয়।

সহরগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য লোক-সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় নানাপ্রকারের কুফল দেখা দিয়াছে। গ্রাম্য দেশে বা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের চারিপাশে যদি ছোট ছোট শিল্প-ব্যবসা গড়িয়া তোলা যায় ত সহরের ঘেঁসাঘেঁসি কমিয়া

যায়। শিল্প-সহর গড়িয়া তোলার চেয়ে বাগান-সহর গড়িয়া তোলা বেশী আবশ্যক।

সফলতার উপায়

এইরূপ বাগান-ঘেরা সহর বিদ্যুতের বিস্তীর্ণ সরবরাহ দ্বারা সহজে তৈরী করা যাইতে পারে। আয়ার্ল্যাণ্ড ও উত্তর ভারতে তাহা করা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশেও তাহা হইতে পারে। শিলিগুড়ির ১৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে তিস্তা নদীর জল সেভোকে আসিয়া পড়িতেছে। এইরূপে প্রায় ২½ লক্ষ কিলোহ্বাট জল নষ্ট হইতেছে। যে শক্তি এক্ষণে পাহাড় ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট পাথরে, পাথর ভাঙ্গিয়া বালুতে পরিণত করিতেছে, তা দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারে। তিস্তায় হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক ষ্টেশন খাড়া করিয়া রেল, চা-বাগান, চাউলের কল, জুট প্রেস, সেচ পাম্প, জল-সরবরাহ, স্বাস্থ্যের স্কীম ও গ্রাম্য শিল্পসমূহ বিদ্যুতের সাহায্যে চালান যাইতে পারে। তিস্তা পাহাড়ে নদী, সারা বৎসর ধরিয়া বরফ গলিয়া নদী ভরাট থাকে, জলের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই।

বাঙ্গালার প্রস্তাবিত জলপথ বোর্ড

বাঙ্গালার জলপথ-সমস্যা সম্বন্ধে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টের সহিত বঙ্গীয় ইঞ্জিনিয়ার সমিতির পত্রবিনিময় হইয়া গিয়াছে। নিম্নে ইঞ্জিনিয়ার সমিতির অভিমত সংক্ষেপে বর্ণিত হইল:—

(১) বাঙ্গালা দেশের নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা, ড্রেনেজ, বাঁধনির্ম্মাণ, পয়ঃপ্রণালী-নির্ম্মাণ ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই এখন ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টের হাতে। এই সরকারী বিভাগ যদি রীতিমত দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় তাহা হইলে কোনই অসুবিধা হইতে পারে না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই বিভাগের কার্য্য কখনই সন্তোষজনক আকারে দেখা দেয় নাই। কারণ বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে, বিশেষতঃ মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার বিধি কার্য্যে পরিণত হওয়ার পর হইতে, এই বিভাগ নৌকা-চলাচল, ড্রেনেজ, বাঁধনির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যে আদৌ সন্তোষজনক ফল প্রদর্শন করিতে পারে নাই। অকৃতকার্য্যতার কারণ অনেক। নিম্নে তাহার কয়েকটী কারণ দেখান হইল:—

(ক) উপযুক্তসংখ্যক কর্ম্মচারীর অভাব।

(খ) এই বিভাগে কার্য্যে নিযুক্ত উর্দ্ধতন এবং নিম্নতন কর্ম্মচারীদের অযোগ্যতা এবং তাহাদের মধ্যে বিশেষ শিক্ষার অভাব।

(গ) অর্থাভাবে প্রস্তাবিত যোসাবিদাসমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার অসুবিধা।

প্রথম কারণটী সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই অবহিত হইয়াছেন। কিন্তু সমিতির মত এই যে, উপস্থিত যে সমস্ত মোসাবিদা কার্য্যে পরিণত করিবার কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ বিলম্বিত হইতেছে, সর্ব্বাগ্রে ঐ সমস্তগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে সমিতির অভিমত এই যে, অফিসারগণের মধ্য হইতে ও ১০ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি কর্ম্মচারীকে ইউরোপ এবং আমেরিকায় কিছু দিনের জন্য পাঠাইতে হইবে। এই সমস্ত কর্ম্মচারী ইউরোপ এবং আমেরিকায় যাহাতে বৃথা সময় নষ্ট না করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে সমস্ত দেশের নদীপথ, ড্রেনেজ প্রভৃতি সমস্যা বাঙ্গালা দেশেরই মত, সেই সমস্ত দেশ হইতে ১০ হইতে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার আমদানি করিয়া অল্প সময়ের জন্য বাঙ্গালা দেশের ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টে নিযুক্ত করিলেও বেশ ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকার সহিত বাঙ্গালার বিশেষ কোন মিল নাই; সুতরাং ইউরোপ আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারগণের মতামত সময়বিশেষে মাত্র প্রয়োজনীয় হইতে পারে। তৃতীয় কারণ সম্বন্ধে সমিতির বক্তব্য এই যে, সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রস্তাবিত মোসাবিদাগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না করিয়া অন্যান্য ব্যাপারে অর্থ ব্যয় করার সমর্থন সমিতি কোন মতেই করিতে পারেন না।

(২) ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্ট গোটা প্রদেশে কার্য্য করিয়া থাকে। এই ডিপার্টমেণ্ট

অন্য কোন প্রদেশেও কাজ করিবে ইহা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে।

(৩) বাঙ্গালার জলপথ সম্বন্ধে সমিতির অভিমত এই যে, সেতু-নির্ম্মাণের দ্বারা বাঙ্গলার জলপথসমূহের জল চলাচল ব্যাহত হইয়াছে। যে সমস্ত নদীতে সময়ে সময়ে প্লাবন দেখা দেয়, ঐ সমস্ত নদীর উপর 'পায়ার' সংযুক্ত ব্রিজ নির্ম্মাণ করার ফলে সময়ে সময়ে যথেষ্ট অনর্থ দেখা দিয়াছে। এই সমস্ত ব্রিজের জন্য ভাগীরথী, রূপনারায়ণ, দামোদর, গড়াই প্রভৃতি নদীর যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। রেলওয়ে বাঁধ, সেতু প্রভৃতির জন্য দেশের ড্রেনেজ-ব্যবস্থার দারুণ অসুবিধা হইয়াছে। উত্তর বঙ্গের বিগত দারুণ জলপ্লাবন এই জন্যই ঘটিয়াছে।

(৪) বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের যে অবস্থা তাহাতে বাঙ্গলার দুই-তৃতীয়াংশ স্থানে জলপথ, বাঁধ, ড্রেজেন ইত্যাদির জন্য উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানে ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের হাতেই এই সমস্ত কার্য্যের ভার আছে। সমিতির মতে আবার নূতন করিয়া জলপথের জন্য ওয়াটার-ওয়েজ ডিপার্টমেণ্ট নাম দিয়া আর একটী বিভাগ সৃজন করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ জলপথ এবং নদী প্রভৃতির সংস্কার করিতে গেলে বাঁধ, ড্রেনেজ ইত্যাদি বস্তুর সংস্কার-সাধন অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; সুতরাং ওয়াটার-ওয়েজ ডিপার্টমেণ্ট স্থাপন করিলে একই কাজ দুই দুইবার ঘটিবার সম্ভাবনা। আর ইহাতে সময় নষ্টও হইবে, কারণ দুই বিভাগ মিলিত হইয়া কাজ করিতে গেলে, পরামর্শ ইত্যাদি করিবার জন্য অনেক সময় লাগিবে। সুতরাং জলপথ ড্রেনেজ এবং বাঁধ একই বিভাগের হাতে ন্যস্ত থাকা আবশ্যক।

(৫) আর যদিও কোন নূতন বিভাগ খোলা হয়, তাহা হইলে তাহা বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধীন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৬) এতদর্থে যদি কোন বোর্ড স্থাপন করা হয় তাহা হইলে উহা মাত্র পরামর্শদাতারূপে গঠিত হওয়া উচিত। সমিতির মতে উহা নিম্নলিখিত প্রতিনিধিসমূহ লইয়া গঠিত হওয়া আবশ্যক :—

বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের ১ জন ও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের ১ জন, মোট ২ জন; ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ ইঞ্জিনিয়ার্স ইণ্ডিয়া ১ জন ও অ্যাসোসিয়েশন অব্ ইঞ্জিনিয়ার্স ১ জন, মোট ২ জন; ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডসমূহ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রত্যেক বিভাগ হইতে ১ জন, মোট ৫ জন; কলিকাতা কর্পোরেশন ১ জন; দি ওয়াটারওয়েজ অ্যাণ্ড ড্রেনেজ ডিপার্টমেণ্টস ১ জন; আই, জি, এস্ অ্যাণ্ড আর, এস কোং ১ জন; বেঙ্গল ষ্টীম নেভিগেশন সার্ভিস ১ জন; গবর্মেণ্ট নিযুক্ত ৩ জন; মোট ১৬ জন।

(৭) খরচপত্র নির্ব্বাহ সম্বন্ধে সমিতির মত এই যে, বাঁধ এবং ড্রেনেজ সম্পর্কে সমস্ত ব্যয় প্রাদেশিক সরকারী তহবিল হইতে করা হইবে। জলপথ সম্বন্ধে খরচপত্র মালবাহী নৌকা ষ্টীমার প্রভৃতির উপর ট্যাক্‌স্ বসাইয়া তুলিয়া লইতে হইবে। কারণ দেখিতে গেলে জলপথের সুবিধা প্রধানতঃ নৌকা এবং ষ্টীমারগুলি ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যে সমস্ত খাল বা নদীতে নৌকা এবং ষ্টীমার দুইই চলে, সেখানে শুধু ষ্টীমারের উপরেই কর আদায় করিতে হইবে। দেশের মধ্যে ক্রমে ক্রমে নৌকা লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। যাহাতে নদীতে নদীতে, খালে খালে, আবার নৌকা-চলাচল বাড়ে সে জন্য গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। সে জন্য পারতপক্ষে নৌকার উপর কোন প্রকার ট্যাক্‌স না আদায় করাই ভাল। আবার, নৌকা চলাচল বেশী হইলে রেল ও ষ্টীমারেরই সুবিধা। কারণ নৌকাগুলি মালপত্র এবং যাত্রী বহিয়া আনিয়া রেল ষ্টীমারেরই কুক্ষি পূরণ করিবে।

(৮) ইঞ্জিনিয়ার সমিতির মতে, এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি গবর্ণমেণ্টেরই নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মিলিবে।

(৯) কোন মোসাবিদা কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে তাহা ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়া লওয়া উচিত। কারণ জনসাধারণের সমক্ষে এই সমস্ত মোসাবিদা উপস্থিত করিলে এসম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদি হইতে পারিবে। তাহাতে যদি মোসাবিদার কোন স্থানে কিছু গলদ থাকে তাহা বাহির হইয়া পড়িবে। যে সমস্ত মোসাবিদা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই, বা কর্য্যে পরিণত

করিতে যাইয়া শেষ পর্য্যন্ত পণ্ড হইয়া গিয়াছে তৎসমুদয়ও জনসাধারণের প্রত্যক্ষীভূত করা ভাল। এ সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বিবরণীসহ সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ (১) বিদ্যাধরী নদী ড্রেজার দ্বারা খনন, (২) ঐ নদীতে পলি পড়া নিবারণ, (৩) টলি নালার পূর্ব্ব ধারটী স্লুইস দ্বারা বন্ধ রাখিবার চেষ্টা, (৪) ফরিদপুর জেলার কুমার নদী ড্রেজার দ্বারা খননের চেষ্টা, (৫) হুগলী জেলার ঘেসাপতি খাল খননের চেষ্টা ইত্যাদি মোসাবিদার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত নিষ্ফল মোসাবিদার পূর্ণ বিবরণী প্রকাশেরও একটা মূল্য আছে। কারণ লোকে এই অকৃতকার্য্যতার উদাহরণ হইতেও ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে শিক্ষা করিতে পারে।

কলিকাতার ধূম্র-নিবারণ সম্পর্কে নূতন প্রস্তাব

কলিকাতা সহরে কলকারখানাগুলির ধোঁয়া হইতে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে। এই ধোঁয়া-জঞ্জাল দূর করিবার জন্য বেঙ্গল স্মোক্ নুইস্যান্স কমিশন নামক একটি ধূম্র-নিবারণী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই সমিতিটীর কাজ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এইজন্য অর্থের দরকার। এই অর্থসংগ্রহের জন্য সম্প্রতি কমিশনের প্রেসিডেণ্ট বর্ত্তমান স্মোক নুইস্যান্স অ্যাক্‌ট অর্থাৎ ধূম্র নিবারক আইনের সংশোধন করিয়া কয়েকটী নূতন প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে এই কমিশন বার্ষিক ৪৪,০০০ টাকা খরচ করিয়া থাকেন। এই খরচের সমস্তই গবর্ণমেণ্ট বহন করিয়া থাকেন। এই খরচ বাড়াইয়া ৬৪,০০০ টাকায় পরিণত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এবং ইহা নিম্নলিখিত উপায়ে সংগৃহীত হইবে :—

		টাকা
বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট	...	৩২০০০
কলিকাতা কর্পোরেশন	...	১২,০০০
হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি	...	৪,০০০
টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি	...	১,৫০০
সাউথ সুবার্ব্বন মিউনিসিপ্যালিটি	...	১,৫০০
কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স	...	৪,০০০
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে	...	৩,০০০
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে	...	৩,০০০
বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে	...	৩,০০০

কমিশনের প্রেসিডেণ্ট তাঁহার নয়া প্রস্তাবের সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, কমিশনের কার্য্যপ্রচেষ্টা আরও বাড়াইবার প্রয়োজন ; এইজন্য আরও কতকগুলি লোককে নিয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য ধূম্র-নিবারণ সম্পর্কে কম পক্ষে ১⅓ লক্ষ টাকা খরচ করার দরকার। কমিশনের এলাকাভুক্ত স্থানের জন-সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। সুতরাং কম পক্ষে ২ লাখ টাকার দরকার। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সেই স্থানে খরচ হইতেছে মাত্র ৪৪,০০০ টাকা।

বর্ত্তমানে যে মোসাবিদা স্থির করা হইয়াছে তাহাতে দুইজন অতিরিক্ত ইন্‌স্পেক্টর, একটি অতিরিক্ত স্মোক অবজারভেটরি, অর্থাৎ ধূম্র পর্য্যবেক্ষণাগার এবং একজন অতিরিক্ত কেরাণী রাখার কথা স্থির হইয়াছে। এই খরচ বৃদ্ধির জন্য মোট বার্ষিক খরচ প্রায় ৬৪,০০০ টাকা পড়িবে। এই ব্যবস্থাও যথেষ্ট নহে, তবুও ইহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে এবং এই মোসাবিদা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে কমিশন কলিকাতা হইতে ধোঁয়া দূর করিতে অনেকটা সমর্থ হইবেন।

এই নয়া মোসাবিদায় তিনটী রেলপথকে টাকা খরচ করিতে বলা হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই অন্যায় হয় নাই ; কারণ, এই তিনটী রেলওয়ে হইতে কলিকাতায় যথেষ্ট ধূম্র জমা হইয়া থাকে, আর কমিশনের ফলভোগ ইহারাও অল্প-বিস্তর করিয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্টের নিকট যে চিঠি পাঠান হইয়াছে, তাহার একখানি নকল কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকটও পাঠান হইয়াছে।

কংসবণিক্ জাতির দারিদ্র্য

নিখিলবঙ্গ কংসবণিক্ সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণের আংশিক মর্ম্ম :—

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কতদূর হীন হইয়া পড়িয়াছে তাহা চিন্তা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। উদর পূরিয়া দুই বেলা আহারের সৌভাগ্য সকলের ঘটে না। বাস্তবিক এই দারিদ্র্য-ব্যাধিই আমাদের জন-সংখ্যা হ্রাসের প্রধান কারণ। এই দারিদ্র্য-দোষই আমাদের গুণরাশি-নাশের কারণ হইয়াছে। দরিদ্রতাই কংসবণিক্ জাতির পক্ষে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের অন্তরায় হইয়াছে। বাস্তবিক হিন্দু সমাজ যেরূপ অর্থের দাস হইয়া পড়িয়াছে, হিন্দু যেরূপ অর্থের পূজা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে অর্থের অভাবের জন্য ঘৃণা তাচ্ছিল্য-লাভ বিচিত্র নহে।

এই দুরবস্থা যে একদিনে হইয়াছে তাহা নহে, ইহা তিলে তিলে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এবং ইহা দূর করিয়া অবস্থার উন্নতি করাও এক দিনের কার্য্য নহে। যাহা হউক ইহার প্রতিকার-চেষ্টায় আর আপনাদের কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

রোগের প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইলে উহার কারণ অনুসন্ধান নিতান্ত আবশ্যক। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি। সুতরাং সমগ্র জাতির দরিদ্রতার কারণ আমাদের প্রত্যেকের দরিদ্রতা। যদিও পৃথক পৃথক ব্যক্তির অবস্থা-হীনতার কারণ এক না হইতে পারে, তথাপি জাতিগত বৈশিষ্ট্য আমাদের সকলের উপর কতকটা প্রভাব বিস্তার করিবেই। আমাদের আর্থিক দুরবস্থার কতকগুলি সাধারণ কারণ নিম্নরূপ :—

১। ব্যবসায়ে অবনতি

ইহার আবার কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, যথা, (ক) স্বজাতি-প্রীতির অভাব, (খ) ব্যবসায় দ্রব্যের বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের অভাব, (গ) পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের ফলে 'এনামেল', অ্যালুমিনিয়ম, চিনামাটী ও কাচের বাসনের প্রচলন ও আমদানি, (ঘ) ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে প্রচার বা বিজ্ঞাপন পদ্ধতির অভাব, (ঙ) বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা ও কৌশলের অভাব, (চ) জাতিগত উদ্যমহীনতা ও অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব, এবং (ছ) মহাজন ও শ্রমিকগণের মিলিতভাবে কার্য্য করিবার শক্তির অভাব।

২। জাতীয় শিল্পশিক্ষার প্রবৃত্তির অভাব

ইহার কারণ অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার ব্যক্তিগণের শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যের প্রতি অবজ্ঞা। ইহা অতীব নিন্দনীয়। পরিশ্রম মানবের অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম। কর্ম্মই বণিক্ জাতির সাধনা।

৩। অমিতব্যয়িতা

ইহা কংসবণিক্ চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ। অবস্থা ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করিবার কদভ্যাস (বিশেষতঃ, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মের সময়ে) কংসবণিক্‌গণের মধ্যে যে পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালার অপর কোন শ্রেণীর ভিতর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

৪। সঞ্চয়শীলতার অভাব

ইহাও আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের জাতিগত দোষ। শৈশবেই সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি না জন্মিলে পরিণত বয়সে সঞ্চয়ী হওয়া যায় না।

৫। ঋণ-প্রবণতা

ইহাও জাতিগত দোষ। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, ঋণ কত বড় অশান্তির কারণ এবং ইহা মানুষকে কিরূপ ভাবে চাপিয়া রাখে।

৬। শিক্ষার অভাব

সকল কার্য্যেই শিক্ষার আবশ্যকতা আছে। শিল্পই হউক আর ব্যবসায়ই হউক শিক্ষানবিশি না করিয়া তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ কদাচিৎ হইয়া থাকে। সুতরাং বালকগণকে অবস্থানুসারে ১২ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে

জাতীয় ব্যবসায়ে বা শিল্পে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত করিয়া দেওয়া অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য।

৭। গৃহপ্রিয়তা

একটি প্রচলিত কথা আছে, 'বিদেশে চণ্ডীর কৃপা'। কিন্তু আমরা দেশ ও ঘর ছাড়িতে বড় নারাজ।

৮। অসমসাহসিকতার অভাব

ইহা কতকটা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রকৃতিগত দোষ।

৯। অদৃষ্টবাদিতা ও সন্তুষ্টচিত্ততা সম্বন্ধে ভুল ধারণা

হিন্দুর ধর্ম্ম পুরুষকারকে বাদ দিয়া অদৃষ্টের অস্তিত্ব মানিতে শিক্ষা দেয় না। যে অভাব অভিযোগ মানুষ নিজের চেষ্টায় দুর করিতে পারে, সে অভাব অভিযোগ দুর করিবার চেষ্টা না করিয়া অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সন্তুষ্ট থাকা প্রকৃত সন্তোষের লক্ষণ নহে।

১০। জীবন বীমা বা সঞ্চয়ে সাহায্যকারী অন্যবিধ প্রতিষ্ঠানে যোগ না দেওয়া

স্ত্রীপুত্রের জন্য অবস্থানুরূপ অর্থ-সংস্থান করিবার প্রকৃষ্ট উপায় জীবন বীমা করা। আজকাল নানাবিধ বীমার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

১১। ভূসম্পত্তিতে অর্থ নিয়োগের অভাব

অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোকদিগের ভূসম্পত্তিতে টাকা খাটানো উচিত। ভূসম্পত্তি নষ্ট হইতেও অনেক সময় কাটিয়া যায়। ভূসম্পত্তিতে মান ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া থাকে। কংসবণিকগণের ভূসম্পত্তি করিবার দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই বলা যাইতে পারে।

১২। ব্যবসায়ান্তর-গ্রহণে অনিচ্ছা

ইহা আমাদের ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাব সূচিত করে। সুবিধা বুঝিলে এক পেশা ছাড়িয়া অন্য পেশা অবলম্বন করিতে হয়। নতুবা বর্ত্তমান অন্নসমস্যার দিনে কষ্ট পাইতে হইবে।

১৩। অর্থের যথাযথ নিয়োগ-সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব

লক্ষ্মী চঞ্চলা, অর্থাৎ অর্থ সচল বস্তু, উহাকে অচল করিতে নাই। উহাকে ফেলিয়া রাখিতে নাই, যাহাতে উহা কিছু প্রসব করিতে পারে, এরূপভাবে উহাকে খাটাইতে হয়।

কংসবণিক জাতির দারিদ্র্য-ব্যাধির অনেকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করা হইল। তবে একই ক্ষেত্রে যে সকল কারণ বিদ্যমান থাকে তাহা নহে। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থার প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ভাবে রোগী চিন্তা পূর্ব্বক স্বীয় ব্যাধির প্রতিকার নির্ণয় করিয়া যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার পাইয়া থাকে। তবে জাতিগত ব্যাধির নিরাকরণ জন্য চাই কর্ম্মিগণের সমবেত কার্য্য, চাই অবিশ্রান্ত প্রচার ও আন্দোলন, চাই ধনী কংসবণিকগণের অর্থ-সাহায্য, চাই যুবকগণের নিঃস্বার্থ স্বজাতি-সেবা।

আমাদের স্বজাতিবৃন্দের উন্নতিকল্পে স্থাপিত দুইটি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান — কংসবণিক কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক এবং কংসবণিক পত্রিকা—আমাদের জনসাধারণের সহানুভূতির অভাবে সুচারুরূপে প্রসার লাভ করিতেছে না, ইহা বড়ই পরিতাপের কথা। আমাদের মধ্যে অনেকেরই পাঁচ টাকা মূল্যের একটি অংশ ক্রয় করিবার সামর্থ্য নিশ্চয়ই আছে। ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে যে সুদের হার প্রচলিত, আমাদের ব্যাঙ্ক গত দুই বৎসর হইতে তদপেক্ষা উচ্চতর হারে লভ্যাংশ বণ্টন করিতেছে। বয়স্ক কংসবণিকগণের অর্দ্ধেক লোকও যদি প্রত্যেকে একটি করিয়া অংশ ক্রয় করেন, তবে এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কের মূলধন আশানুরূপ বাড়িতে পারে এবং তাহা হইলে ব্যাঙ্ক জাতীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। যে সকল তামা-পিতলের কারখানার মালিক অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধন লইয়া কার্য্য চালাইতেছেন, বাজারে মালের কাটতি না থাকিলে টাকার অভাবে তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়, এমন কি সময়ে সময়ে কারখানার কার্য্যও তাঁহাদিগকে বন্ধ করিতে হয়।

ঐরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্ক অল্প সুদে মজুত মালের টাকা প্রতি বার আনা, চৌদ্দ আনা পর্য্যন্ত মহাজনদিগকে অগ্রিম দিতে পারে। ইহাই ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের প্রকৃত কার্য্য। ইহা ব্যতীত বিশ্বাস রাখিয়া কার্য্য করিলে আমরা সময়ে সময়ে ওভারড্রাফটও পাইতে পারি অর্থাৎ যদি আমরা ব্যাঙ্কের সহিত নিয়মিতভাবে টাকা 'লেন দেন' করিতে থাকি, আমরা আমাদের গচ্ছিত টাকার নিয়মিত হারে সুদ ত পাইবই, অধিকন্তু বিশ্বাস রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে যে পরিমাণ টাকা আমাদের হিসাবে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিবে, দায়ে বেদায়ে তাহা অপেক্ষাও অধিক টাকা ধার পাইতে পারি। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নহে। আশা করি ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরগণ তাঁহাদের হস্তে সমর্পিত এই জাতীয় ব্যাঙ্কটি যাহাতে অচিরে একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তদনুরূপ প্রচার ও আন্দোলনের সুব্যবস্থা করিবেন।

ভারতে ব্রড্‌কাষ্টিং

সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট কমপক্ষে দুই বৎসরের জন্য ব্রড্‌কাষ্টিং কোম্পানী পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কোম্পানীর বাৎসরিক পৌনঃপুনিক খরচের পরিমাণ ২,৬৭,০০০৲ টাকা। কোম্পানী ক্রয় করিবার জন্য সরকারী রাজস্ব হইতে মোট ১,৪১,০০০৲ টাকা খরচ হইবে। গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ কলিকাতা এবং বোম্বাই সহরস্থ ব্রড্‌কাষ্টিং ষ্টেশনগুলি দখল করিয়া লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিবেন।

কার্য্য পরিচালনের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করিবেন। এই কমিটিতে দুইজন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ের দুইজন পাকা ব্যবসায়ী থাকিবেন এবং কমিটির সভাপতি হইবেন গবর্ণমেণ্টের শিল্প এবং মজুর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য। বর্ত্তমানে ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশনসমূহে যে সমস্ত কর্ম্মচারী এবং জিনিষপত্র আছে তৎসমুদয় গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতেছেন।

ভারতবর্ষে ব্রডকাষ্টিং ক্রমশঃ জনসাধারণের প্রিয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। ব্যবসায়ী মহলেও ইহার আদর দিনে দিনে বাড়িতেছে; কারণ বেতারযোগে দেশ-বিদেশের ব্যবসাবাণিজ্যের আধুনিকতম খবর এবং বাজারদর ইত্যাদি জানা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই এবং কলিকাতার বেতার ষ্টেশনগুলি খরিদ-দরে ক্রয় করিতেছেন। বেতার ষ্টেশনগুলিতে যে সমস্ত জিনিষপত্র আছে, তাহা মাত্র পুরাতন জিনিষের দরে খরিদ করা হইতেছে। এই জিনিষপত্র আবার অল্প দিনের মেয়াদে ক্রয় করা হইতেছে। ভবিষ্যতে আরও ব্যয়-সংক্ষেপ করা হইবে; কারণ পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মচারীদের দ্বারাই বেতার ষ্টেশনগুলির অনেক কাজ করাইয়া লইবার চেষ্টা করা হইবে।

যানবাহন চলাচলে যুক্তিপ্রয়োগ

স্যার ষ্টান্‌লি রীড় বোম্বাই সহরে একটী সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "ভারতবর্ষে যানবাহন চলাচল ব্যাপারে র‍্যাশন্যালিজেশন বা যুক্তিপ্রয়োগ আদৌ করা হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের মধ্যে সহযোগিতার অভাব দৃষ্ট হয়।

যুক্তিপ্রয়োগের স্বরূপ

"যানবাহনে যুক্তিপ্রয়োগের অর্থ এই যে, লোকে অল্প ব্যয়ে যত্র তত্র যানবাহনে আরোহণ করিয়া চলাফেরা করিতে পারিবে। এদিকে যানবাহনের মালিকদের ট্যাঁকে দু' পয়সা জমিতে পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের উন্নতি-বিধানের জন্য মালিকরা আরো পুঁজি ঢালিতে সমর্থ হইবে।

যুক্তিপ্রয়োগ ও প্রতিযোগিতা

"যুক্তিপ্রয়োগ করার মানে যেন কেহ প্রতিযোগিতা দূর করা মনে না করেন। দেখিতে গেলে প্রতিযোগিতাই উন্নতি-বিধানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। প্রতিযোগিতা না থাকিলে মানুষ জড়ের ন্যায় নিশ্চল হইয়া পড়ে, মগজ খেলাইতে চাহে না; তাহার উন্নতি লাভের সকল দুয়ার বন্ধ হইয়া যায়। একই কার্য্য যাহাতে অযথা দুই দুইবার সম্পন্ন না হয়,

তাহা করাই যুক্তিপ্রয়োগ নীতির প্রধান কার্য্য। কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন বাধা-বিঘ্ন-হীন এবং অপ্রতিহত গতি প্রতিযোগিতাতেই মানব-সমাজের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। কারণ এইরূপ প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে যোগ্যতরই টিঁকিয়া থাকিবার অবসর পায়। কিন্তু এই মতবাদ এখন মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই নীতি অনুসারে কার্য্য করিতে গিয়া ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বিলাতের একটী বিরাট শিল্প আজ মরণের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

"যানবাহনের কোম্পানীগুলির মধ্যে যেগুলিতে কিছুই লাভ হয় না সে গুলি, দেখিতে গেলে, জাতীয় সম্পদের অপচয় ঘটাইতেছে, জাতির জীবনী-শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কারণ ক্ষতি হওয়ার মানে অযোগ্যতা এবং মরণের পথে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মাশুল-হ্রাসের লড়াই

"যানবাহন চলাচল ব্যাপারে অবাধ প্রতিযোগিতা কিরূপ আকার ধারণ করিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় বিলাতে। বিলাতের সড়কে সড়কে অতিরিক্তমাত্রার মোটর বাস চলাফেরা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে বাধা দানের জন্য প্রায় ১,৩০০০ অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা মোটেই তাল সামলাইতে পারিতেছে না।

"একটী ভাল মোটর বাস কোম্পানী যেই প্রতিষ্ঠিত হইল, অমনি কোথা হইতে আরও দুই দশটা মোটর-বাসওয়ালা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হাজির! তারপর ক্রমাগত মাশুল-হ্রাস লড়াই। যদি কোম্পানীটীর পুঁজি খুব বেশী থাকে তবেই রক্ষা, নতুবা চক্ষু স্থির! অতিরিক্ত অকেজো গাড়ীর ভিড় হওয়ার জন্য রাস্তা বন্ধ হইয়া আসে, সুতরাং রাস্তা চওড়া করার দরকার হয়; আবার চওড়া করার সঙ্গে আরও অনেক অকেজো গাড়ী আসিয়া জুটে, আবার সড়ক বন্ধ হইবার উপক্রম হয়; এই ভাবেই ব্যাপারটী অগ্রসর হইতে থাকে, রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় দেখা যায় না।

"বিলাতে ট্রামওয়েগুলির সহিত বাস্‌সমূহ অবাধ প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। ট্রামওয়ে পরিচালনা করা অনেক অর্থব্যয় সাপেক্ষ। বিলাতের অনেক বড় বড় ট্রামকোম্পানী মোটর বাসের দৌরাত্ম্যে দেউলিয়া হইয়া ব্যবসা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

"বিলাতে রেল কোম্পানীগুলি পর্য্যন্ত মোটর বাসের উপদ্রবে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। মোটর বাস-গুলির সুবিধা এই যে, ঐ সকলকে সড়ক নির্ম্মাণ বা সংস্কারের জন্য তিলমাত্র ব্যয় করিতে হয় না; সুতরাং মাশুল কমাইয়া উহারা রেলওয়েগুলিকে ঘায়েল করিয়া ফেলিতেছে। রেল পথের অনেক লাভ এখন মোটর বাসের মালিকগণ অপহরণ করিয়া লইতেছে। বিলাতের আর্থিক জীবনে ইহার প্রভাব বড় কম কার্য্যকর হয় নাই। শীতকালের জন্য এবং ভারী-ভারী বস্তু চালান দেওয়ার জন্য রেলপথ অপরিহার্য্য। এদিকে যাত্রীর ভাড়ার অধিকাংশই মোটর বাস্‌গুলি ভোগ করে। তাহা হইলে রেলপথগুলি পুঁজি বাড়াইয়া কর্ম্ম-ক্ষমতা বাড়াইবে কেমন করিয়া? ফলে দাঁড়াইবে যে, ভারী জিনিষের উপরে রেল মাশুল চড়িয়া যাইবে। এবং ইহার ফলে বিদেশের বাজারে বিলাতী মাল চড়া দরে বিক্রয় করিতে হইবে অর্থাৎ বিলাতের রপ্তানি বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত প্রদান করা হইবে।

"ভারতবর্ষে দেখা যায়, যে-কেহ কর্জ্জ করিয়া একখানি ভাঙ্গা মোটর বাসের প্রথম কিস্তির টাকা যোগাড় করিতে পারিলেই অনায়াসে লাইসেন্স পাইয়া থাকে। ভারতের সড়কে সড়কে এই ধরণের খারাপভাবে তৈরী, খারাপভাবে পরিচালিত, খারাপভাবে রক্ষিত বিস্তর মোটর বাস্ দেখা যায়। দু'দিন পরেই এই সমস্ত চিজের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়; এবং মালিক অম্লান বদনে দেউলিয়া হইবার জন্য দরখাস্ত দাখিল করে।

"মোট কথা অবাধ প্রতিযোগিতার মুখে সুপরিচালিত এবং সুব্যবস্থিত কোন যানবাহন কোম্পানীই টিঁকিতে পারে না। কারণ কোনরূপ তালিকা নির্দ্দিষ্ট না থাকার জন্য এবং গন্তব্য স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৌছিবার ব্যবস্থা না থাকার জন্য যে-কেহ যা ইচ্ছা তাই করিতে পারে।

উপায় কি ?

"অবস্থা তো এই হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন উপায় কি ? বিলাতের মত ভারতবর্ষকে কয়েকটী ট্রাফিক এরিয়ায় চারিভাগে ভাগ করিতে হইবে। এই সমস্ত বিভাগে এক একজন কমিশনার থকিবে। ভারতের অবস্থা বিলাতের মত নয়; ভারতের পক্ষে আরও সাবধান হওয়ার দরকার। ভারতের সড়কসমূহ রীতিমত বৈজ্ঞানিক উপায়ে গড়িয়া তুলিতে হইবে। পেট্রলের উপর আদায়ী সেস হইতে যে সমস্ত সড়ক তৈরী করা হইবে তাহা দেশের প্রকৃত অভাব পূরণের জন্যই তৈরী হইবে। যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসম্পর্কে সিগন্যাল প্রদানের রেওয়াজ সমস্তই নিয়মিতভাবে হওয়ার দরকার।

"বড় বড় সহরে এতদর্থে যে ট্রাফিক-কর্ত্তৃপক্ষ সৃজন করিতে হইবে, তাহাতে মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ট্রাফিক পুলিস, ট্রামওয়ে, মোটর বাস্‌, রেলওয়ে, মোটর চালক, এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। জনসাধারণ বলিতে যাহারা রাস্তায় পদব্রজে চলাচল করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে।

"বড় বড় সহরের বাহিরে যে সমস্ত ট্রাফিক কর্ত্তৃপক্ষ থাকিবে, তাহা গবর্ণমেণ্ট, রেলওয়ে এবং অন্যান্য যানবাহনের এজেন্সি এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গদ্বারা পরিচালিত হইবে। এই সমস্ত প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে, অযথা প্রতিযোগিতা দূর করিয়া মানুষের চলাফেরার সুবিধা করিয়া দেওয়া। একই পথে কতকগুলি অতিরিক্ত যানবাহন যাহাতে চলিতে না পারে তজ্জন্য তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া। জনসাধারণের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে গোটা সমাজের কল্যাণ সাধিত হইতেছে কি না। সমাজের আবর্জ্জনাস্বরূপ আধা দেউলিয়া কতকগুলি মোটরবাসের মালিকের আয়ের পথ বন্ধ হইয়া গেলে দেশের এবং সমাজের কোনই ক্ষতি হইবে না।"

চীন দেশে উপকূল-বাণিজ্য সংরক্ষণের প্রস্তাব

চীনের ষ্টেট কাউন্সিলে জাহাজ পরিচালন এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্কে কতকগুলি নূতন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত আইনেও চীনের অভাব মিটিবে না। এই জন্য সাংহাই ন্যাভিগেশান অ্যাসোসিয়েশান এবং অন্যান্য জাহাজ কোম্পানী একত্র মিলিত হইয়া আরও কতকগুলি আইন পাশ করিবার জন্য চীনা ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন। জাহাজ-নির্ম্মাণ, জাহাজ সজ্জিত-করণ, জাহাজ রেজেষ্টারিকরণ, জাহাজ পরিদর্শন ইত্যাদি ব্যাপারের জন্যই প্রস্তাবিত আইনগুলি বিধিবদ্ধ করা হইবে। নিম্নে প্রস্তাবিত আইনগুলি প্রদত্ত হইল:—

১। কেবলমাত্র চীনাদের অধিকৃত জাহাজই চীনা পতাকা উড়াইবার অধিকার ভোগ করিবে।

২। বিশেষভাবে কৃত সন্ধি ব্যতিরেকে কোন বিদেশী জাহাজকেই বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত বন্দরগুলি ছাড়া অন্য কোন বন্দরে নঙ্গর করিতে দেওয়া হইবে না।

৩। বিশেষভাবে কৃত সন্ধি ছাড়া কোন বিদেশী জাহাজকেই চীনের আভ্যন্তরীণ জলপথসমূহে এবং চীনের উপকূলবর্ত্তী কোন দুই পোতাশ্রয়ে গমনাগমন করিতে দেওয়া হইবে না।

৪। জাতীয়তার চিহ্নজ্ঞাপক কোন সার্টিফিকেট বা নিদর্শন পত্রাদি না থাকিলে কোন জাহাজকেই চীনের এলাকাভুক্ত সমুদ্রবক্ষে গমনাগমন করিতে দেওয়া হইবে না।

নারীশিক্ষা সমিতির বার্ষিক বিবরণী (১৯২৮-২৯)

নারীশিক্ষা সমিতি মাত্র ১০ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহার অধীনে কলিকাতা এবং মফস্বলে ৪০টী বালিকা বিদ্যালয়, একটী হিন্দু বিধবা আশ্রম, এবং কুটীর-শিল্প শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় একটী শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে স্কুল-গুলিতে ছাত্রী-সংখ্যা প্রায় ১০০০; বিদ্যাসাগর বাণীভবনে ৩০ জন, এবং মহিলা শিল্পভবনে প্রায় ৮০ জন। ১৯২৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে কিন্তু স্কুলগুলিতে ছাত্রী-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল প্রায় ৪০০০, বিধবা আশ্রমবাসিনীর সংখ্যা ছিল ৮৫ জন এবং শিল্পভবনে শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা দাঁড়াইয়া-ছিল কমসে কম ২০০ জন।

এ ছাড়া সমিতি নানাস্থানে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে অন্তঃপুরবাসিনীদের সমক্ষে, মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, বসন্তরোগ নিবারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কর্পোরেশান হইতে ফি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য-সমিতি গঠনের পর, অনাবশ্যক বিবেচিত হওয়ায়, সমিতি এই সমস্ত বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এই সমিতি যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রথম বৎসরেই কলিকাতায় ৬টী স্কুল স্থাপিত হয়। কিন্তু তারপর দশ বৎসরের মধ্যে ৩৪টী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় কর্পোরেশনের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার জন্য এবং পল্লী-অঞ্চলে অর্থাভাবে এবং স্থানীয় লোকদের সহানুভূতির অভাবে অনেক স্কুল উঠিয়া যাওয়ায় আলোচ্য সনে স্কুলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মাত্র ২০টী। স্কুল-গুলি, ঢাকা, ফরিদপুর, হাবড়া এবং হুগলী জেলায় অবস্থিত; এবং ১০০০ ছাত্রীর মধ্যে মুসলমান বালিকার সংখ্যা মাত্র ৫০ জন।

পাড়াগাঁয়ে শিক্ষয়িত্রীর বড়ই অভাব। এই অভাব দূর করিবার জন্য বিদ্যাসাগর বাণীভবনের বিধবাগণকে শিক্ষয়িত্রীরূপে গড়িয়া তোলা হইতেছে। কয়েকজন বিধবা ইতিমধ্যে গ্রামে যাইয়া বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া বসিয়াছেন। এই আশ্রমে স্থান অত্যন্ত অল্প। আলোচ্য সনে ২০০ খানি আবেদন পড়িয়াছিল, সত্বর যদি আশ্রমের সম্প্রসারণ না করা হয় তাহা হইলে আবেদনকারিণীগণের পক্ষে বিফল-মনোরথ হওয়া ছাড়া আর উপায় রহিবে না।

পল্লীগ্রামে নারী যে কি দুর্ব্বিসহ জীবন যাপন করে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। নারীর পক্ষে শুধু ভাল খাওয়া পরা হইলেই যথেষ্ট হইল না, চাই এমন ব্যবস্থা করা যাহাতে তাহারা স্বাবলম্বী হইতে পারে। মহিলা-শিল্প-ভবন এই অভাব দূর করিবার জন্যই স্থাপিত হইয়াছে। এই শিক্ষালয়ে মহিলাদিগকে সেলাই, বোনান, জ্যাম ও জেলি প্রস্তুতপ্রণালী, বয়ন, রঞ্জন, ইত্যাদি অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। রেশম উৎপাদন ইত্যাদি অনেক কুটীর-শিল্প শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, কিন্তু অর্থাভাবে কাজ তেমন অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বিদ্যালয়ে স্থানাভাবও যথেষ্ট; অনেক আবেদনকারিণীকে নিরাশ হইতে হইতেছে।

আলোচ্য সনে সমিতির আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে, কোনরূপে খরচপত্রের সঙ্কুলান হইয়া গিয়াছে। আয়ের পরিমাণ ৩০,৯২১ টাকা, এবং ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৩৩,০৭৮ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে আলোচ্য সনে ঘাটতি পড়িয়াছে ২১৫৬ টাকা। সমিতির মোট সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৬৬,০০০ টাকা।

দেশের মধ্যে যাঁহারা নারীর প্রকৃত হিতৈষী তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে এই সমিতির সাহায্য করা উচিত। এই সমিতির আশ্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন বিধবা, দশ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ২০০ জন বালিকা এবং ১০০ জন দরিদ্র নারীকে শিক্ষা দিতে পারিবে। যদি ১০০ জন সদাশয় বাঙ্গালী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁহারা প্রত্যেকে ১ জন করিয়া বিধবাকে এই আশ্রমে শিক্ষা দিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে দেশের মধ্যে দশ বৎসরে ২০,০০০ বালিকা ও ১০,০০০ নারী শিক্ষার আলোক পাইবে। গরীব দেশের পক্ষে ইহা নিতান্ত কম কথা নহে।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপ (১৯২৯)

১৯২৯ সন আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেশ সুবৎসর গিয়াছে। প্রথমতঃ, মার্কিণ প্রবর্ত্তিত দৈনিক আট ঘণ্টা খাটাইবার রীতি বৃটিশ পার্ল্যামেণ্ট প্রায় মানিয়া লইয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এ সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহারও জারি করিয়াছেন। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রও অনুরূপ একটী বিল উত্থাপন করিয়াছেন। জার্ম্মাণি এবং বিলাত, এই দুইটী সেরা দেশ ওয়াশিংটন মোসাবিদা মানিয়া লইলে ফ্রান্সও মানিয়া লইবে এবং বাকী রাষ্ট্রগুলিও শির নোয়াইয়া ইহাদের অনুগমন করিবে। সুতরাং শীঘ্রই যে দুনিয়ার সেরা শিল্প-প্রধান দেশগুলিতে দৈনিক আট ঘণ্টা খাটাইবার রীতি কায়েম হইয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক-জগতে আর একটী মঙ্গলও আলোচ্য সনে সাধিত হইয়াছে। এই সনে দুই দুইবার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই দুই অধিবেশনে বেতনভোগী চাকুরো এবং নাবিকগণের পক্ষেও দৈনিক আটঘণ্টা খাটিবার রীতি কায়েম করা সম্বন্ধেও আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আশা হয়, ১৯৩০ সনের মধ্যেই এই ব্যবস্থা কায়েম হইয়া যাইবে।

গত জুন মাসে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সমিতির অধিবেশনে বেগার খাটান এবং মাইনে করা চাকুরোদের সম্বন্ধে আট ঘণ্টা খাটাইবার প্রথা সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা হয় এবং কারখানার দুর্ঘটনা-নিবারণ, ও জাহাজঘাটার দৈব দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কুলিমজুরদের রক্ষা সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার আলোচনা করা হয়। অক্টোবরের অধিবেশনে প্রধানতঃ নাবিকগণের সুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা চলে। জাহাজে কাজ করা সম্বন্ধে আট ঘণ্টা রীতি কায়েম করা, বন্দরে বন্দরে নাবিকগণের স্বাস্থ্যবিধান, এবং জাহাজের উপর রুগ্ন নাবিকের চিকিৎসা দান, সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা স্থির করা হয়। এই অধিবেশনে জাহাজের কর্ম্মচারী হওয়ার পক্ষে যে ভীষণ কড়াকড়ি প্রচলিত আছে, তাহার লাঘব করা সম্বন্ধেও আলোচনা চলে এবং স্থির হয় যে, নেহাৎ যতখানি শিক্ষা না হইলে কাজের অসুবিধা হয়, মাত্র ততখানি শিক্ষা হইলেই জাহাজের কর্ম্মচারীদের চলিবে।

অধিবেশন দুইটীর আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে বেগার প্রথা সম্বন্ধেই আলোচনা চলে সবচেয়ে বেশী। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের এ সম্বন্ধে মাথাব্যথা দেখিয়া ইউরোপের বাহিরের দেশগুলিরও বেশ ভাল ধারণা জন্মিয়াছে এই প্রতিষ্ঠানটী সম্বন্ধে। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান মাত্র ইউরোপীয় দেশসমূহ এবং অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের মধ্যেই ইহার কার্য্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে নাই। লড়াইয়ের সন্ধির অভিপ্রায়মাফিক প্রতিষ্ঠানটী গরীব দেশগুলির উপরও নেক নজর প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এতদর্থে শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর চীন, জাপান, ফরাসী ইণ্ডোচীন, এবং ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতেও শুভাগমন করিয়াছেন। প্রথমবারে চীনদেশে আসিয়াই ইনি শ্রমিক কন্‌ফারেন্সে রীতিমত প্রতিনিধিমণ্ডলী পাঠাইয়াছেন। ১৯২৯ সনের জুন অধিবেশনে এই কন্‌ফারেন্সে প্রায় ৫০টী রাষ্ট্র যোগদান করে। শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের জীবন-ইতিহাসে এতগুলি রাষ্ট্র আর কখনও যোগদান করে নাই। ইহার মধ্যে লাটিন আমেরিকান দেশ ১৫টী। ১৯২৬ সনের অধিবেশনে লাটিন আমেরিকার ৭টী মাত্র দেশ যোগ দিয়াছিল, এবং ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সনে যোগ দিয়াছিল মাত্র ১০টী।

১৯২৯ সনে এই আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কুলি-মজুরদের সুখ-সুবিধার জন্য ৫০টী নূতন নিয়মকানুন বা শর্ত্তও স্থিরীকৃত হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিস মাত্র আইনকানুন প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত নহে; শ্রমিককুলের প্রকৃত অবস্থা কি সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদিও যথেষ্ট করিয়াছে এবং এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলেই বিধিব্যবস্থা জারি করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই মজুর অফিস বয়ন-শিল্পে মোতায়েন কুলি-মজুরের সম্বন্ধে যে পুঁথি প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে অনেক দামী দামী হদিস আছে। এছাড়া মোটর-চালকদের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য, ফটোগ্রাফি ষ্টুডিওসমূহের জন্য, থিয়েটার আর্টিষ্ট, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি স্বাধীন জীবিকা-অবলম্বনকারী শিক্ষিত ব্যক্তি, গায়ক, বাদ্যকর, বেতনভোগী আবিষ্কারক, কর্ত্তব্যের খাতিরে কর্ম্মত্যাগী সাংবাদিক প্রভৃতির রক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে বীমা বা অন্যপ্রকার সাহায্য-ব্যবস্থা কিরূপ তৎসম্বন্ধেও নানা প্রকার অনুসন্ধানাদি এই মজুর অফিস কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠানটীর নিকট তথ্য-সংগ্রহের জন্য আবেদন-নিবেদনের বহর প্রত্যহই বাড়িয়া চলিয়াছে। আবেদনকারীর মধ্যে গভর্ণমেণ্ট, মজুর সমিতি, মালিক সমিতি, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠানই আছে। কিন্তু সকলের উপর টেক্কা মারিয়াছে ফোর্ড মোটর কোম্পানী। এই কোম্পানী তথ্যসংগ্রহ তো করিয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেও চেষ্টা করিয়াছে।

১৯২৫ সন হইতে এই প্রতিষ্ঠানটী খনিসমূহে খাটাইবার সময় মজুরির হার, পরিপার্শ্বিক অবস্থা,

ইত্যাদি সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান চালাইয়া আসিতেছে। এই অনুসন্ধানের ফলেই জাতি-সঙ্ঘ ১৯৩০ সনের ৬ই জানুয়ারী তারিখে কয়লা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্ম একটী টেক্‌নিক্যাল কনফারেন্স আহ্বান করিতে পারিয়াছেন। জাতি-সঙ্ঘের এই অধিবেশনে ইউরোপের কয়লা-উৎপাদনকারী দেশগুলি সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবার কথা।

মাদ্রাজ স্বদেশী প্রদর্শনীতে আচার্য্য রায়ের বক্তৃতা

মাদ্রাজ স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা দেওয়া হইল :—

ইউরোপে শিল্প-প্রদর্শনীতে বিভিন্ন প্রকার জিনিষ-সমূহের নমুনার এত অত্যধিক সমাবেশ হইয়া থাকে যে, ঐ জিনিষসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে একজনের যথেষ্ট সময় লাগে। কিন্তু ভারতে যখন ভারতজাত শিল্পের প্রদর্শনী হয়, তখন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত বিভিন্ন শিল্পের নমুনার অল্পতা দেখিয়া নিরাশ হইতে হয়। এই নিমিত্তই যখন আমি বিদেশ হইতে আমদানি করা জিনিষসমূহের পরিমাণ দেখিতে পাই তখনই অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়ি। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১৯২৭-২৮ সনে ভারতে বস্ত্র এবং চিনি ব্যতিরেকে মোট ৭০ কোটী কিংবা তদূর্দ্ধ টাকার দ্রব্যাদি আমদানি করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে—

সিগারেট (৩—৪ কোটী), ঔষধ পত্রাদি (২ কোটী), গাড়ী ও যন্ত্রাদি (মোটরগাড়ী সহ ৬ কোটী), শুধু মোটর গাড়ী (৩৷০ কোটী)।

এক্ষণে আমি শত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালার অবস্থার কথা কিছু বলিতে চাই। আমি মনে করি ইহাতে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। বস্ত্র-শিল্প সম্পর্কে বলা যাক। বাঙ্গালার বস্ত্রই যে শুধু বাঙ্গালাতে প্রস্তুত হইত এমন নহে। প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্র বাঙ্গালা হইতে রপ্তানিও করা হইত। কিরূপে এই বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হইল সেই পুরাণো একঘেয়ে কথার বর্ত্তমানে আমি আর উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। সেই সম্বন্ধে দু'এক জন লোকের মন্তব্য আমি উল্লেখ করিব।

"স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক সূতা কাটা হইত এবং তাঁহারা তাঁহাদের অবসর সময়ে কাজ করিতেন।"

"১৬৮৬ সনে ভারতীয় মসলিন যখন প্রথম ইংলণ্ডে রপ্তানি করা হয় তখন বিলাতী ফ্যাক্টরী এদেশে স্থাপিত হয়।"

"জেলায় দুইবার তুলার চাষ হইত, উহা এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর মাসে করা হইত।"

সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান দেশীয় শিল্পের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকাই মসলিনের যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই সময় মসলিন হিন্দুস্থানের আমীর ওমরাহগণ ব্যবহার করিতেন এবং উহা রাজদরবারে আদর পাইত। প্রাচ্যে এই মসলিনকে "প্রাতঃকালীন শিশির-বিন্দু" প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করা হইত। পরেও ঢাকাই মসলিনের যথেষ্ট আদর-প্রতিপত্তি ছিল, এমন কি আধুনিক কালেও, যখন ব্রিটেনে বস্ত্র-শিল্প যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল তখনও, কি সৌন্দর্য্যে কি সূক্ষ্মতায় এই মসলিন জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

পূর্ব্বকালে বস্ত্র-শিল্প দ্বারা বহু লোকের অন্নের সংস্থান হইত। ১৮২৪ সন হইতে বিলাতী বস্ত্রের আমদানি হইবার পরই এই শিল্পের ক্ষতি এবং ১৮২৮ সন হইতে ইহার ক্রমিক অবনতি ঘটে।

জেলার প্রত্যেক পরিবারে পূর্ব্বে সূতা উৎপাদন করা হইত এবং উহাতে বহু-লোকের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। বিলাতী সূতা সস্তা হওয়ায় ক্রমে লোকে সূতা কাটা পরিত্যাগ করে। এই প্রকারে ৬০ বৎসরের মধ্যে বস্ত্র-শিল্প অন্য জাতির হস্তে চলিয়া যায়।

বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম, উহা আপনাদের দেশ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য জানিবেন। ইহা উল্লেখ করা আমি একান্ত প্রয়োজন মনে করি যে, 'মসলিপটম' হইতেই মসলিন নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

এক্ষণে আমি চিনি সম্বন্ধে কিছু বলিব। ১৮৭১ সনেও বাঙ্গালা দেশ তাহার নিজ আবশ্যকীয় গুড় এবং চিনি

উৎপাদিত হইত; এমন কি, লণ্ডনেও বিশুদ্ধ চিনি রপ্তানি করা হইত।

মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাহার "যশোহর" নামক বহিতে লিখিয়াছেন:—

"যদিও চিনি জেলার সর্ব্বত্রই উৎপাদিত হয়, তথাপি পশ্চিম অংশেই উহার উৎপাদন অধিক হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলির নাম করা যাইতে পারে, যথা,—কোঁটচাদপুর, চৌগাছা, ঝিঁকরগাছা, ত্রিমোহনি, কেশবপুর, যশোহর, খাজুরা। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা এবং নলছিটিতেও চিনির আমদানি যথেষ্ট হয়। বাখরগঞ্জ জিলার মধ্যে নলছিটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান, নলছিটি অথবা ঝালকাঠিতে জেলার বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন "ধলুয়া" কাঁচা চিনি প্রেরণ করা হইত। কোটচাঁদপুর হইতেও "ধলুয়া" চিনি তথায় যাইত বটে, কিন্তু বেশীর ভাগই কলিকাতায় যাইত, কারণ কলিকাতাতে মাল-প্রেরণের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। কলিকাতায় দুই প্রকার চিনি আমদানি হইত: স্থানীয় লোকের আবশ্যক মত "ধলুয়া" চিনি এবং ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে রপ্তানির জন্য বিশুদ্ধ চিনি। এই বিশুদ্ধ চিনি কেশবপুর ও জেলার দক্ষিণ ভাগ হইতে আসিত।"

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে প্রায় ১৫ কোটী টাকার জাভা চিনি আমদানি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বাঙ্গালা দেশেই আসিয়া থাকে ইহার অর্দ্ধেক।

এইরূপে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনাধীনে দিনদিন আমাদের অর্থনৈতিক অবনতি ঘটিতেছে।

আমাদের দেশের যুবকগণের কোথায় অবনতি ও শিল্প-উন্নতির কোথায় অন্তরায়, সে সম্বন্ধে আমি এক্ষণে কিছু বলিব।

কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত আধুনিক যুবকগণের ব্যবসা চালাইতে হইলে তাহাদের চাই খুব বেশী টাকার মূলধন, সুসজ্জিত অফিসগৃহ, টেবিল, চেয়ার, ইলেকট্রিক লাইট, পাখা এবং মোটরগাড়ী ইত্যাদি। তাহাদের পরিধানে থাকিবে সাহেবী পোষাক! এইরূপ যুবকগণ যে মাসে ২৫৲ টাকা মাত্র উপার্জ্জন করিয়া তাহাদের সমগ্র জীবন নষ্ট করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মিঃ কার্নেগী তাঁহার প্রথম জীবনে তারের সংবাদ বিলি করিবার কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি কোটীপতি হন একথা সবাই জানে না। তিনি "এম্পায়ার অব বিজনেস" নামক বহিতে লিখিয়াছেন, "যুবকগণ তাঁহাদের জীবনের প্রথম ভাগেই কাজ আরম্ভ করিবে এবং সামান্য কাজেই প্রথমে নিযুক্ত হইবে, আমি নিজে প্রথমে আফিসের ঝাড়ুদার হইয়াছিলাম"।

হেনরি ফোর্ড, উইলিয়াম মরিস প্রভৃতি কেহই পুঁথিগত উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নাই এবং তাঁহারা এ বিষয়ে এক মত যে, ব্যবসায় জীবনে ইউনিভার্সিটির শিক্ষার ডিগ্রী একটা মস্ত বাধা—কারণ ইহাতে মূল প্রেরণা নষ্ট হইয়া যায়।

আবার জগতের বড় একজন সাবান-উৎপাদনকারীর কথা ধরুন। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে বোল্টনে এক মুচির দোকানে ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে এক বালক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উজ্জ্বল এক জোড়া চক্ষু ব্যতীত তাহার অন্য কোন বৈশিষ্ট্যই ছিল না। সেই বালকই একদিন ভাইকাউন্ট লিভার হইয়াছিলেন। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বোল্টনের এক বৃদ্ধের নিকট হইতে এই বর্ণনা আমি শুনিয়াছিলাম। সেই বৃদ্ধ ঐ বালক এবং তাহার পিতাকে ভাল করিয়া জানিত। সেই বালক বর্ত্তমানে একজন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী। মিঃ লিভার তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগেই শিক্ষার পরিবর্ত্তে অন্য জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরলোকগত মিঃ টাটা এলফিনষ্টোন কলেজে অল্প দিনই পড়িয়াছিলেন, অন্ততঃপক্ষে তিনি বিদ্যুৎ এবং ধাতুবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই পড়েন নাই। কিন্তু জামসেদপুর ও বোম্বাইয়ে ঐ বিষয় সম্পর্কে তাঁহার দুইটি সুবৃহৎ কারখানা রহিয়াছে।

এ ক্ষেত্রে আমি আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাও কিছু বলিব। আশা করি, আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস স্থাপন করি তখন আমার হস্তে আমার তিন বৎসর চাকুরীর জমা ৮০০৲ শত টাকা মাত্র ছিল। তখন আমার মনে এই মাত্র কল্পনা ছিল যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল রাসায়নিকগণ বাহির হইয়া

আসেন, তাঁহাদের যাহাতে একটা সংস্থান হয় তাহার একটা বন্দোবস্ত করিব।

আমাদের কলেজ হইতে যেসকল যুবকগণ বিজ্ঞান শিখিয়া বাহির হন, তাঁহারা ২৫।৩০ টাকার জন্য না ঘুরিয়া ছোট রকমের ট্যানারী ফ্যাক্টরী স্থাপন করিতে পারেন। এ সম্পর্কে আমি পুনরায় বাঙ্গালার কথা উল্লেখ করিব। কলিকাতার উপকণ্ঠে টেঙ্গরা এবং বেলিয়াঘাটাতে জাট মুসলমান এবং চীনাগণ কর্তৃক চালিত প্রায় ২৫০টি ট্যানারী ফ্যাক্টরী আছে, এই ব্যবসায়ে তাহারা বেশ দু' পয়সা রোজগার করে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসরই বহু শত বি, এস-সি, এম, এস-সি, ডি, এস-সি, প্রভৃতি বাহির হইতেছেন, কিন্তু জীবন-সংগ্রামে তাঁহারা সদ্যোজাত শিশুর মতই নিরুপায়।

"ট্যানিং" শিল্পের জন্য আপনাদের প্রদেশ প্রসিদ্ধ। এখান হইতে "অল্প ট্যান করা চামড়া" প্রচুর পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত মাদ্রাজে ক্রোম চামড়ার বহু ফ্যাক্টরী রহিয়াছে। মেসার্স চেম্বার্স এণ্ড কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে এই ট্যানারী পরিচালিত হয়। তথায় বুট ও অন্যান্য জুতার নিমিত্ত, জুতার সোলের নিমিত্ত এবং অন্যান্য বহু প্রকার চামড়া প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া বাঙ্গালোর, ত্রিচিনপল্লী, এবং মাদ্রাজেও একটী করিয়া ক্রোম ট্যানারী রহিয়াছে। এই সকল স্থানের চামড়া "ট্যান্" করিবার যথেষ্ট খ্যাতি রহিয়াছে।

চামড়া পাকা করা সম্পর্কে মাদ্রাজ যে শুধু ভারতের মধ্যেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহা নহে, অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলেও এ সম্বন্ধে তাহার স্থান অনেক উচ্চে।

যে "অল্প ট্যান করা চামড়ার" কথা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা অশিক্ষিত চামারগণ দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদি আমাদের দেশের যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া ঐ বিষয়ে গবেষণা ও কাজ করেন, তাহা হইলে এই চামড়া সম্পূর্ণ সংস্কৃত ও ব্যবহারোপযোগী করিয়া অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা যাইতে পারিত এবং তাহাতে আমাদের দেশে বহু কোটী টাকা আসিত।

আমার খুবই দুঃখ হয় যে, ভারত হইতে প্রায় ২৬॥ কোটী টাকার সর্ষপ, তিসি, বাদাম ইত্যাদি রপ্তানি হয়। তন্মধ্যে আপনাদের প্রদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে ১৪ কোটী টাকার উপর। প্রায় ১২ লক্ষ টন ওজনের সর্ষপ, তিসি ইত্যাদি রপ্তানি হয়। যখনই আমি মনে করি যে, ঐ সাথে ঐ ওজনের ⅔ অংশ খইল ইত্যাদি বাবদ বিদেশে চলিয়া যায়—যাহা গরুর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য ও সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে—তখনই আমার মনে হয় দেশের কি দুরবস্থা! এতদ্ব্যতীত বিদেশ হইতে ঐ তৈলের সারাংশ ভেজিটেবল ঘী প্রভৃতি আমাদের দেশে আসিয়া চড়া দরে বিক্রয় হয়। এ-সকল কথা চিন্তা করিলে দেখা যায় আমরা কতদূর অসহায়।

আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি ও নেতাগণ এই একমাত্র প্রতিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় বাড়াইতে হইবে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করিয়া নূতন ভাবে ছাত্রগণকে গড়িয়া তোল। অবশ্য ঐ কার্য্য অল্পে অল্পে অগ্রসর হইবে। গত কয়েক বৎসরে আপনাদের প্রদেশেই দুইটী নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হইয়াছে। উহার উদ্যোক্তাগণের দূরদর্শিতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে যুক্ত প্রদেশের কথাও বলিব। পূর্ব্বে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ই সমগ্র প্রদেশের প্রয়োজন মিটাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখিতে পাই যে, আরও প্রায় অর্দ্ধ ডজন বিশ্ববিদ্যালয় তথায় সৃষ্ট হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমি বিস্তৃত কিছু এখন আর বলিব না। কিছু দিবস পূর্ব্বে আপনাদের এখানকার কোনও এক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে "শিক্ষিত বেকার" নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, আমি কি বলিতে চাই।

"যুদ্ধের সময় হইতে মধ্য ইউরোপে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইবার জন্য একটা অদম্য ইচ্ছা জাগিয়াছে। ফলে, বৎসর বৎসর তাহাদের মধ্য হইতে বহু শিক্ষিত যুবক বাহির হইয়া আসিতেছে; কিন্তু

তাহাদের জন্য কোন চাকুরী জুটিতেছে না। ইহাতে একটা অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে মাত্র”—এফ, এম, কামরুপ্পা, “হিন্দু”, ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩০।

আপনারা অবগত আছেন যে, চীনাগণ ব্যবসার জন্য দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দলে দলে তাহারা মালয় উপদ্বীপে যাইতেছে। আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ লেখক মালয় উপদ্বীপের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এইমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্যবসার উন্নতির একটা প্রধান অন্তরায় রহিয়াছে উচ্চশিক্ষা।

“দেশের মধ্যে এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহেও ব্যবসায়ে চীনাগণ যে শুধু বড় হইয়াছে তাহা নহে তাহারা মালও যথেষ্ট উৎপাদন করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ টীন শিল্পের কথাই ধরুন। বাঁধা-ধরা নিয়ম কানুনের মধ্যে চীনাগণ এরূপ স্থানে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে ব্যবসায়ে পিছনে রাখিয়াছে।

“ইহা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা যে, এরূপ বিদেশে চীনাগণ কুলী মজুরের ন্যায় আসিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। অধ্যবসায় গুণেই তাহারা এত উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।”

(বেকার প্রণীত “এক্সপ্লেনিং চায়না” পৃঃ ১৮০)

চীনাগণ প্রথমে কুলী থাকিলেও পরে হয় কোটীপতি। ইউরোপীয়গণের চেয়েও চীনাগণের অধীনে অনেক বড় বড় রবারের কারখানা রহিয়াছে। ইহাদ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, পুঁথিগত বিদ্যায় কিছুই হয় না।

যদিও বাঙ্গালা দেশের বহু শিল্প সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে তথাপি আমি চরকারই উপাসক। কিজন্য আমি চরকার উপাসক তাহা আমি পুনরায় আপনাদের সমক্ষে বলিতেছি।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের বহু লোকেরই ব্যবসার দিকে ঝোঁক পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে আমেরিকা এবং ইউরোপকে আদর্শরূপে রাখা উচিত নয়। একথা ঠিকই বলা হইয়াছে “কি করিয়া পরিশ্রম বাঁচান যায় তাহা নিয়াই শিল্প-প্রধান দেশের অর্দ্ধেক লোক চিন্তা করে, বাকী অর্দ্ধেক লোক বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করে।”

ইংলণ্ডে বেকার-সংখ্যা ১৯ লক্ষ, এবং মিঃ টমাসের মতে জার্ম্মাণিতে ৩০ লক্ষের উপর, ইতালীতে ৫ লক্ষ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ।

কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ের অবস্থাই বর্ণনা করিতেছি। তথায় মাত্র কয়েকজন বণিক্ তাঁহাদের টাকার সংখ্যা বাড়াইতেছেন, আর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কোন রকমে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতেছে। তথাকার শিশু-মড়কের সংখ্যা হাজারে ৪০০ হইতে ৫০০ শত পর্য্যন্ত। বাঙ্গালার বিভিন্ন অংশে কতিপয় চাউলের কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ঠিক যে, এই সকল মিল দ্বারা স্বত্বাধিকারীরই পকেট ভর্ত্তি হয় বেশী; কিন্তু এরূপ একটী মিল দ্বারা বহু অসহায়া বিধবার মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়া হয়।

এক্ষণে মাঞ্চেষ্টারের কথা বলিব। কবডেনের সময় হইতে গত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত মাঞ্চেষ্টারের ভাল সময় ছিল; তাহার ধারণা ছিল যে, সমগ্র স্থান হইতে কাঁচা মাল আমদানি করিয়া বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া অন্যান্য দেশে উহা রপ্তানি করিবে। কিন্তু এখন চীন, জাপান, এমন কি ভারতেও বহু মিল স্থাপিত হইয়াছে। ফলে মেসার্স ম্যাকডোনাল্ড ও লয়েড জর্জ্জকে বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে।

সিগারেট, গাড়ী ইত্যাদি, সাবান ও সুগন্ধি দ্রব্য, গ্রামোফোন, খেলনা প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানি হয়, কিন্তু অল্প আয়াসেই এ সকল জিনিষ আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতে পারে।

অর্থবিজ্ঞানবিশারদ ছাত্রদের নিকট মাদ্রাজ ধনশালী দেশ নয় বলিয়াই পরিচিত; কিন্তু যদি কোন বিদেশাগত লোক আপনাদের সহর পরিদর্শন করেন এবং মোটর গাড়ী দোকানের ‘শো’ রুম প্রভৃতি দেখেন, তাহা হইলে তিনি মনে করিবেন যে, ইহা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগরী।

“আজকাল যাঁহারা মোটর গাড়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে তাঁহাদের প্রতি দশজনের মধ্যে একজনও এই খরচ চালাইতে পারেন না।” বিচারপতি মিঃ ক্রফোর্ড আধুনিক বিলাসিতার তীব্র সমালোচনা করিয়া উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বার্গেটে এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন যে, “নিজ

সম্পত্তি না থাকিলে একজন বিচারকও তাঁহার বেতনের উপর নির্ভর করিয়া মোটর গাড়ী কিনিতে পারেন না। কারণ তাঁহার বাৎসরিক বেতন শুধু ১,৫০০০ পাউণ্ড।" তিনি আরও বলেন, "ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয় যে, চাকুরীজীবী একটি বালিকার গ্লোভ্‌সের দাম প্রায় ৫ শিলিং, জুতার দাম এক পাউণ্ডের উপর, কোটের দাম ৫ গিনির উপর।"

যদি ইংলণ্ডের স্থায় সমৃদ্ধিশালী নগরীতেই উপরোক্ত মন্তব্য ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের দেশের কথা একবার ভাবুন—যে দেশের লোকের গড়পরতা দৈনিক আয় ২।৩ আনার বেশী নহে। বাস্তবিক পক্ষে সংক্রামক রোগের স্থায় আমাদের দেশের যুবকগণের মধ্যে বিলাসিতার বাসনা ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সম্প্রতি ভারতের খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে আমি তদন্ত আরম্ভ করিয়াছি। একজনের মনে স্বতঃই ধারণা হইবে যে, বাঙ্গালায় তাহার প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, প্রতিবৎসরে জনপ্রতি একমণ করিয়া চাউল ঘাটতি পড়ে। মিঃ লতিফ তাঁহার "ইকনমিক অ্যাস্পেক্ট অব্ ইণ্ডিয়ান রাইস এক্সপোর্ট ট্রেড" নামক বহিতেও এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা অনুযায়ী ভারতে মোট ৩৩·৫১ মিলিয়ন টন চাউলের প্রয়োজন হয় এবং উৎপন্ন হয় ৩২ মিলিয়ন টন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ম্মা হইতে ভারতে চাউল না আসিলে ফল অত্যন্ত শোচনীয় হইত।

লেফটেন্সাণ্ট কর্ণেল মিঃ ম্যাক্‌ফারসন রয়েল কমিশনের নিকট বলিয়াছেন যে, "ভারতে অন্যান্য অভাবের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই প্রধান। বৎসরে বৎসরে কলেরা ম্যালেরিয়া, আমাশয়, ক্ষয় প্রভৃতি রোগে হাজার হাজার লোক মারা যায় বটে; কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে মারা যায় তদপেক্ষা অধিক।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিলাসিতার উপকরণ যোগাইতে গিয়া আমরা যে সকল আহার্য্য ব্যবহার করিতে বাধ্য হই, তাহাতে পুষ্টিকর কিছুই থাকে না।

এই নিমিত্তই মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে, গ্রামে গ্রামে চরকার প্রচলন করিতে হইবে। মিঃ জ্যাক পূর্ব্ব বঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "কৃষকগণ ৩মাস পরিশ্রম করিয়া অবশিষ্ট ৯ মাস আলস্যে কাটায়।" সুতরাং তাহাদের জন্য দ্বিতীয় একটি ব্যবসায় থাকিলেও ভাল হয়।

চিরকাল আমি স্বদেশী জিনিষ পছন্দ করি, সুতরাং আপনারা এই প্রদর্শনীর নাম "স্বদেশী প্রদর্শনী" রাখায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

"স্বদেশীতে" কি লাভ তাহা খুব অল্প কথায়ই বুঝান যায়। যখনই বর্ত্তমান আন্দোলন আরম্ভ হইল তখন হইতে কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই সিগারেট বর্জ্জন করিয়া বিড়ি ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। ফলে এই হইল যে, অনেক বেকার যুবক, অনেক গুণ্ডা জুয়াচোর প্রভৃতি "বিড়ি" প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতার অলিতে গলিতে দেখা যায় যে, অনেক লোক দিনরাত পরিশ্রম করিয়া "বিড়ি" তৈয়ার করিতেছে ও দৈনিক এক টাকা কিংবা তাহারও অধিক উপার্জ্জন করিতেছে। আমি জানি না, আপনাদের দেশেও ঐরূপ আরম্ভ হইয়াছে কি না। আশা করি, দেশের সর্ব্বত্রই এরূপ হইবে। যদি প্রত্যেকেই "বিড়ি" ব্যবহার করেন তাহা হইলে দেশে প্রায় ৩.৪ কোটী টাকা থাকিয়া যাইবে।

(নবশক্তি)

ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি স্থাপনের সুফল

[মার্টিন কোম্পানীর রেলে চড়িয়া হাওড়া হইতে চাঁপাডাঙ্গা যাইতেছিলাম। পথে বঙ্গবাসী কলেজের আই, এস-সি শ্রেণীর একটী ছাত্রের (উক্ত লাইনে অবস্থিত কলিকাতা হইতে ২২ মাইল দূরবর্ত্তী ঝিঙ্গড়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামের অধিবাসী) সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁহার সহিত যেসব কথাবার্ত্তা হয় তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।—শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত]

প্রঃ—আপনাদের গ্রামে একটী ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি আছে বলিতেছিলেন, সে সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জানিতে আমি অত্যন্ত উৎসুক। সেইজন্য আপনাকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করিতে চাই। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী আছেন কি ?

উঃ—যথাসাধ্য উত্তর দিব। আপনি আপনার প্রশ্ন করুন না।

প্রঃ—আপনাদের সমিতির সভ্য কয়জন ?

উঃ—দেড়শত।

প্রঃ—ইহাদের মধ্যে ভদ্রলোক কয়জন, ছোটলোকই বা কয়জন ?

উঃ—ভদ্রলোক ৫০ জন এবং ছোটলোক ১০০ জন।

প্রঃ—আপনাদের গ্রামের মোট অধিবাসীর সংখ্যা কত ?

উঃ—৩০০ জন।

প্রঃ—তাহা হইলে ত দেখিতেছি গ্রামের শতকরা ৫০ জন আপনাদের সমিতির সভ্য; এতগুলা লোককে সভ্য করা হইল কি প্রকারে ?

উঃ—অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া হাতে পায়ে ধরিয়া তবে ইহাদের সভ্য করা হইয়াছে।

প্রঃ—সমিতির আয় কিরূপ ?

উঃ—মাসিক ৬০৲।৭০৲ টাকা।

প্রঃ—কে কিরূপ চাঁদা দেয় ?

উঃ—ভদ্রলোকেরা ৩৲, ২৲ বা ১৲ টাকা—যাঁহার যেমন সামর্থ্য তেমন দেন। ছোটলোকেরা প্রত্যেক মাসে তাহাদের দুই বা তিন দিনের রোজগারের টাকা দিয়া থাকে। অনেক ছোটলোক রোজগারের পয়সা না দিয়া শারীরিক পরিশ্রম করিয়া (যেমন জঙ্গল কাটা) চাঁদা দিয়া থাকে।

প্রঃ—ছোটলোকদের দলে ঢুকাইলেন কিরূপে ? তাহারা কি আনন্দের সহিত চাঁদা দেয় ?

উঃ—অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়া তবে তাহাদের ঢুকাইতে পারা গিয়াছে। চাঁদা এখন তাহারা আনন্দের সহিতই দেয়। কারণ সমিতির উপকারিতা এখন তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে।

প্রঃ—এই সব বুঝানো পড়ানোর কাজ করিল কাহারা ?

উঃ—এই সব কাজ প্রধানতঃ স্কুলের ছাত্রেরাই করিয়াছে; অবশ্য তাহারা জনকয়েক উৎসাহী বয়স্ক লোকের দ্বারাই চালিত হইয়াছে। ছাত্রেরা শুধু যে সাধারণ লোকদের মুখের কথায় বুঝাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা নিজ হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে উৎসাহের সহিত লাগিয়াছে। এই জন্যই ছোটলোক-দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলেদের এইরূপ খাটিতে দেখিয়াই ছোট লোকেরা বুঝিল যে, ব্যাপারটী একেবারে ভুয়া নহে।

প্রঃ—আপনাদের সমিতির টাকা কি কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় ?

উঃ—একটী দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিবার কথা আছে। সমিতির অর্দ্ধেক টাকা এই চিকিৎসালয় খুলিবার জন্ম ব্যাঙ্কে জমা থাকে। জঙ্গল পরিষ্কার করা, ডোবাগুলাতে কেরোসিন তৈল ঢালা এই সবের জন্ম বাকী টাকা খরচ করা হয়।

প্রঃ—ডোবাগুলাতে কেরোসিন তেল ঢালিবার উদ্দেশ্য কি ?

উঃ—তাহা হইলে ডোবাতে মশা জন্মাইতে পারে না।

প্রঃ—কিন্তু তাহাতে জল খারাপ হইয়া যায় না কি ?

উঃ—ডোবার পচা জল ব্যবহারের যোগ্যই নয়।

প্রঃ—আপনাদের গ্রামে খাবার জলের ব্যবস্থা কিরূপ ?

উঃ—অধিকাংশ লোকই আজকাল টিউব ওয়েলের জল ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রঃ—টিউব ওয়েল কি সমিতি তৈয়ার করাইয়াছে ?

উঃ—না, ওগুলা গ্রামের জন কয়েক অবস্থাপন্ন লোক তৈয়ার করাইয়াছেন। আমরাই ত ৪।৫টা তৈয়ার করাইয়া দিয়াছি। টিউবওয়েলগুলা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইলেও সাধারণকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়।

প্রঃ—ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্ম সমিতি আর কি কাজ করিয়াছেন ?

উঃ—একটি ছোট বায়স্কোপের কল কিনিয়া বায়স্কোপের সাহায্যে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো নাই। ব্যাটারী কিনিয়া বায়স্কোপ দেখাইতে হইলে খরচ বেশী পড়ে। তা ছাড়া আমাদের বায়স্কোপের কলটী যত ছোট তদনুযায়ী ফিল্ম্ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।

প্রঃ—রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র চাটার্জ্জি প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির সহিত আপনাদের কোন সম্পর্ক আছে কি ?

উঃ—আমাদের সমিতি উক্ত কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনেই কাজ করিতেছে।

প্রঃ—কেন্দ্রীয় সমিতির নিকট আপনারা কি সাহায্য পাইয়া থাকেন ?

উঃ—আমরা ম্যালেরিয়ার একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ এডওয়ার্ডস টনিক বটকৃষ্ণ পাল কোং'র নিকট ও ঐ সমিতির হাত দিয়া বিনা মূল্যে পাইয়া থাকি। এ ছাড়া সমিতির নিকট যেসব ঔষধাদি কিনি তাহা বাজারের সিকি মূল্যে পাইয়া থাকি। সমিতি আমাদিগকে ম্যালেরিয়া-সম্বন্ধীয় কয়েকটা মাসিক পত্র ও নানা পুস্তিকা বিনামূল্যে দিয়া থাকেন।

প্রঃ—আপনাদের সমিতি কয় বৎসর কাজ করিতেছে ?

উঃ—৪।৫ বৎসর।

প্রঃ—কাজের কোন সুফল পাওয়া গিয়াছে কি ?

উঃ—যথেষ্ট। গ্রামে আগে যত ম্যালেরিয়া হইত এখন তাহার ৮ ভাগের ১ ভাগে কমিয়া গিয়াছে। আগে গ্রামের লোক ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইত, এখন অনেকে আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। শুধু আমাদের গ্রামে নয়, এই অঞ্চলে আরও কয়েকটী গ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি স্থাপিত হওয়ার ফলে গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে বলিয়া আমার জানা অছে।
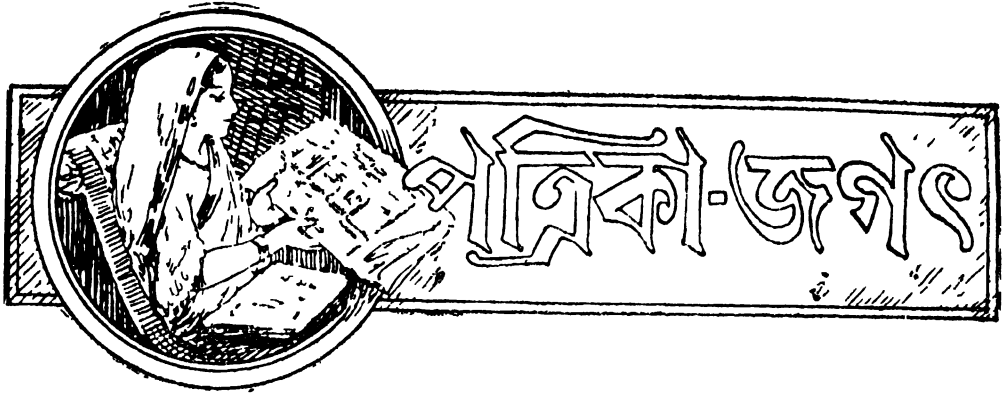
"কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট"
(২৬শে জুলাই, ১৯৩০)

কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত ট্রামওয়ে কোম্পানীর চুক্তি

১৯৩০ সনের শেষে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর চুক্তি শেষ হইবে। ট্রাম কোম্পানীর এজেন্ট সাহেব আবার নূতন করিয়া ৬০ বৎসরের জন্য চুক্তি লইবার আশায় কর্পোরেশনের দ্বারস্থ হইয়াছেন। কর্পোরেশন ইচ্ছা করিলে ১৯৩১ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ট্রামওয়ে কোম্পানী কিনিয়া লইতে পারেন। ১৯৩১ সন হইতে প্রতি ৭ বৎসর অন্তর অন্তর কর্পোরেশনের এইরূপ ট্রাম কোম্পানী ক্রয় করিবার পালা আসিবে। ট্রাম কোম্পানী ৬০ বৎসরের চুক্তির জন্য আবেদন করিয়া কর্পোরেশনের ক্রয় করিবার পথ বন্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছে। এখন কর্পোরেশন ট্রাম কোম্পানীর এই আবেদন গ্রাহ্য করিবে কি না তাহা চিন্তার বিষয়।

ট্রাম কোম্পানী ক্রয় সম্বন্ধে দুইটী জিনিষ বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, ট্রামওয়েকে মিউনিসিপ্যাল সম্পত্তিতে পরিণত করা ভাল হইবে কিনা; দ্বিতীয়তঃ, ট্রামওয়ে ক্রয় করিবার মত কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা আছে কিনা এবং ট্রাম চালাইয়া কর্পোরেশনের লাভ হইবে কিনা।

ট্রামওয়ের মত সাধারণের সুবিধাবিধায়ক প্রতিষ্ঠান মিউনিসিপ্যালিটীর করায়ত্ত হওয়া নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। তবে তর্কের খাতিরে বলা যাইতে পারে যে, কর্পোরেশনের কর্তারা ট্রামওয়ের জন্য মাথা ঘামাইতে থাকিলে অন্যান্য দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহেলা করিবে; ট্রামপথ পরিচালনে নানাপ্রকার গলদও ঢুকিতে পারে; অংশীদারদের লভ্যাংশ দেওয়ার বালাই না থাকায় ট্রামপথ পরিচালনে বিশৃঙ্খলা এবং ব্যয়াধিক্য হইবার সম্ভাবনা এবং প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন দূরীভূত হওয়ায় কাজে তেমন মনোযোগ না থাকিবার সম্ভাবনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ইহার উত্তর-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কর্পোরেশন বলিয়া কোন কথা নয়, অনেক একচেটিয়া বেসরকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে এমনই বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতে পারে।

ট্রামওয়ে মিউনিসিপ্যালিটি-পরিচালিত হওয়ার সুবিধা

ট্রামওয়ে কর্পোরেশনের হাতে আসিলে প্রথম সুবিধা হইবে এই যে, কলিকাতার সড়কে সড়কে দ্বিবিধ কর্তৃত্বের অবসান হইবে। মিউনিসিপ্যালিটির হাতে আসিলে ট্রামের ভাড়া কমিবে, সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম গাড়ীরও উন্নতি হইবে। ভিন্ন ভিন্ন সড়কের যানবাহন গতায়াতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে, অনেক খারাপ সড়কেও যানবাহনের ব্যবস্থা হইবে, কারণ মিউনিসিপ্যালিটির তো আর পুঁজি মারা যাইবে বলিয়া ভয় নাই; মিউনিসিপ্যালিটি যানবাহনের ব্যবস্থা করিবার জন্য বেসরকারী কোম্পানীর তুলনায় অল্পসুদে টাকা কর্জ্জ করিতে পারিবে। মিউনিসিপ্যালিটির হাতে ট্রাম আসিলে ট্রামের লাভ হইতে করদাতাগণের কর-ভারের লাঘব হইবে; এখন যেমন সমস্ত লভ্যাংশ মুষ্টিমেয় বিদেশী অংশীদারদের কুক্ষিগত হয় সে পথ রুদ্ধ হইবে।

কর্পোরেশনের হাতে ট্রামওয়ে আসিলে যে বিশেষ কোন লাভ হইবে না, এ ধারণা মিথ্যা। বিলাত বা অন্যান্য দেশের

ট্রামওয়ের অবস্থা পর্য্যালোচনায় এই ভ্রমাত্মক ধারণা বিদূরিত হইবে। ১৯২৬-২৭ সনে বিলাতের ৩০% বেসরকারী ট্রাম কোম্পানী খরচপত্রই সঙ্কুলান করিতে পারে নাই; পক্ষান্তরে মিউনিসিপ্যালিটী পরিচালিত ট্রামওয়েগুলির মধ্যে মাত্র ৭% এর এরূপ দশা ঘটিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি-চালিত ট্রামপথগুলির পরিচালন-ব্যয় দাঁড়াইয়াছে মোট আয়ের ৮১'৫০%। পক্ষান্তরে বেসরকারী কোম্পানীগুলির পক্ষে এই ব্যয় ৮৬'৪৯%; মিউনিসিপ্যালিটির ট্রামে মাইল প্রতি আয় ৩'২১ পেঃ, বেসরকারী কোম্পানীর পক্ষে মাইল প্রতি আয় ২'১২ পেঃ। ১৯২৬-২৭ সনে মিউ-নিসিপ্যালিটি-চালিত ট্রামগুলির লাভ দাঁড়াইয়াছে পুঁজির উপর ১১%, পক্ষান্তরে বেসরকারী ট্রামগুলির লাভ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ২'৬%।

বিলাতে ট্রামওয়েগুলি ক্রমশঃ মিউনিসিপ্যালিটিগুলির হাতে ছাড়িয়া দিবার ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ১৯২২ সনে বিলাতে ২৫০টী ট্রামওয়ের মধ্যে ১৭০টী ছিল মিউনিসি-প্যালিটির হাতে। গবর্ণমেণ্ট এবং ব্যবসায়িসমাজ এর জন্ম বিরুদ্ধাচরণ করিতে কম করে না। সুতরাং কলিকাতার ট্রামওয়েও কর্পোরেশনের হাতে আসাই মঙ্গলজনক। একে তো লভ্যাংশ যাইতেছে বিদেশীদের হাতে, দ্বিতীয়তঃ, বিদেশীদ্বারা পরিচালিত ট্রামওয়ের মহৎ দোষ এই যে, ইহা ক্রমাগত কলিকাতাবাসীর মত উপেক্ষা করিয়াই আসিতেছে।

ট্রামকোম্পানী কিনিবার খরচ

ট্রামকোম্পানীর চুক্তিনামায় শর্ত্ত আছে যে, কর্পোরে-শনকে নিট্ লাভের ২৫ গুণ ট্রামওয়ের মূল্যবাবদ দিতে হইবে; যে তারিখে বিক্রয় হইবে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৭ বৎসরের গড় হিসাব ধরিতে হইবে। ১৯২৪-২৭ সনে ট্রামকোম্পানীর বার্ষিক গড় লাভ দাঁড়াইয়াছে ১৮ লাখ টাকা, সুতরাং দাম হয় ৪॥ কোটী টাকা। ১৯২৮-৩০ সনে যদি লাভ কমিয়া যায়, তবুও বৎসরে গড়ে যে ১৫ লাখ টাকা লাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; সুতরাং ১৯৩০ সনের শেষে ট্রাম কোম্পানীর ক্রয়-মূল্য ৩'৭৫ কোটী টাকা হইবার সম্ভাবনা।

এই টাকার বদলে পাইবে কি? এজেণ্ট সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ট্রাম কোম্পানীর মোট সম্পত্তির দাম ২'০৭ কোটী টাকা। এছাড়া অনেক বাস্‌ও ট্রাম কোম্পানী কিনিয়াছে; সেগুলি নিশ্চয়ই ট্রাম কোম্পানী কর্পোরেশনকে দিবে না। মোট হিসাবেও অনেক গলদ আছে। তবুও দেখা যাইতেছে, যে সম্পত্তি আছে তাহার প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে কর্পোরেশনকে কিনিতে হইবে।

টাকা কেমন করিয়া মিলিবে?

তিন উপায়ে কর্পোরেশন টাকার যোগাড় করিতে পারেন: (১) বাজার হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া, (২) একটী ভারতীয় জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী গঠনে সহায়তা করিয়া, (৩) ক্রয়-মূল্য পোষাইবার জন্ম ট্রামওয়ে কোম্পানীর জন্ম নূতন করিয়া কর্পোরেশন ষ্টক বাহির করিয়া। বর্ত্তমানে ঋণ পাওয়া মুস্কিল। কেবলমাত্র ট্রামওয়ের সম্পত্তি এবং আয়ের উপর ঋণ করাও যায় না; সুতরাং কর্পোরেশনের আয়ের উপর টান পড়িবে। অন্ম পক্ষে কর্পোরেশন অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্ম ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না। বর্ত্তমানে কর্পোরেশনের পক্ষে ঋণ-গ্রহণও অসম্ভব। কর্পোরেশনের পক্ষে নূতন ষ্টক বাহির করাও অসম্ভব।

১৯২৭ সনে ট্রাম কোম্পানীর আয় হইয়াছে ৫১,১৪০০০ টাকা, ব্যয় ৩৬,২৮,০০০ টাকা, সুতরাং মোট লাভ ১৪,৮৬,০০০ টাকা। সুতরাং ৬% সুদে কর্পোরেশন যদি ৩'৭৫ টাকা কর্জ্জ করিয়া ট্রাম কোম্পানী ক্রয় করে তাহা হইলে ৭॥ লাখ টাকা ঘাটতি পড়িবে। এই সুদ ছাড়া ট্রাম চালাইবার জন্ম নানা প্রকার খরচ-বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ১৯৩১ সনে কর্পোরেশন ট্রামওয়ে কিনিতে পারে না। কর্পোরেশনের পক্ষে অন্যান্য দেশের মত লাভজনক উপায়ে ট্রাম কোম্পানীর সহিত চুক্তি করা ছাড়া উপায় নাই।

নূতন চুক্তি কিরূপ হওয়ার দরকার

কোম্পানী নূতন করিয়া যে চুক্তি করিতে চাহিতেছে

তাহাতে ৬০ বৎসরের জন্য চুক্তি প্রার্থনা করা হইয়াছে; তাছাড়া কলিকাতায় মোটরবাস্ চালাইবারও একচেটিয়া অধিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই ৬০ বৎসরের চুক্তি কিছুতেই মঞ্জুর করা যায় না। তাছাড়া বাস্ চালাইবার একচেটিয়া অধিকার দিলে ট্রাম কোম্পানীকে সায়েস্তা করিবার কোনই উপায় থাকিবে না।

নিম্নলিখিত শর্ত্তে ট্রাম কোম্পানীর সহিত চুক্তি করা যাইতে পারে:—(১) চুক্তির সময় ২১ বৎসরের বেশী হইবে না, (২) কোম্পানীটি টাকার পুঁজিতে ভারতীয় কোম্পানীতে পরিণত করিতে হইবে, (৩) ডিরেক্টরগণের অধিকাংশই ভারতীয় হইবে, এবং এক-তৃতীয়াংশ ডিরেক্টর কর্পোরেশন-মনোনীত হইবে, (৪) ভাড়া নির্দ্ধারণ, হিসাব-পত্র দেখা ইত্যাদি ব্যাপারে কর্পোরেশনের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে, (৫) কোম্পানীকে ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার ইত্যাদির কাজ শিখিয়া লইবার জন্য ভারতীয়দিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে, (৬) কোম্পানীর মূল্য বাবদ যে কোন সময়ের শেষে, মোট সম্পত্তির দাম বাদে আরও কিছু দিতে হইবে; এবং এই অর্থ কত হইবে তাহা উভয়পক্ষ মিলিত হইয়া নির্দ্ধারণ করিবে।

মোট কথা ৩'৭৫ কোটী টাকা ট্রাম কোম্পানীর মূল্য হইতেই পারে না। কারণ, কোম্পানীর মোট মুলধন ৯৫০,০০০ পাঃ; ইহার সাধারণ শেয়ারের দাম ৭,০০,০০০ পাঃ এবং প্রেফারেন্স শেয়ারের দাম ২৫০,০০০ পাঃ। ইহা ছাড়া ডিবেঞ্চার বাবদ কোম্পানীর ৫৯৪,০০০ পাঃ ঋণ আছে। বর্ত্তমান এক্স্‌চেঞ্জের বাজারে, প্রেফারেন্স শেয়ারগুলির জন্য ১,১২,৬৭,০০০ টাকা দিতে হইবে। বাকী ২,৬৪,৩৪,০০০ টাকা সাধারণ অংশীদারগণ ভোগ করিবে। সুতরাং তাদের মূলধনের ৩ গুণ মূল্য তাহারা পাইবে; অথচ বর্ত্তমানে ট্রাম কোম্পানীর সাধারণ শেয়ার বিক্রয় করিবার সময় রীতিমত ডিস্কাউন্ট দিতে হয়।

ট্রাম কোম্পানী যদি কর্পোরেশনের কথায় কর্ণপাত না করে তবে কর্পোরেশনের পক্ষে আরও সাত বৎসর চুপ করিয়া থাকাই ভাল। কারণ সাত বৎসর পরে আবার যখন ট্রাম কোম্পানী ক্রয় করিবার সময় আসিবে তখন কর্পোরেশনের পক্ষে সুবিধা হইবারই কথা। ভবিষ্যতে যানবাহনের রাজ্যে যুগান্তর আসিবারই সম্ভাবনা। ট্রাম-গাড়ী মন্থরগতিতে চলে, উহার এদিক ওদিক পাশ ফিরিবার উপায় নাই, তাহা ছাড়া, লাইন, উপরের তার, লৌহ প্রভৃতি অনেক কিছু বিরাট ব্যাপার ট্রাম চালাইবার জন্য দরকার। এমন দিন আসিতে পারে যখন দুনিয়ার ট্রাম গাড়ী অচল হইয়া যাইবে। টিউব রেলওয়ে এবং মোটরবাস্ ক্রমে ট্রামকে দেশছাড়া করিয়া দিবে। সুতরাং কর্পোরেশন যদি আরও ৭ বৎসর চুপ করিয়া থাকিতে পারে, তবে আরও সস্তায় ট্রাম কোম্পানী কিনিয়া লইবার অবসর পাইবে। ট্রাম কোম্পানী যদি কর্পোরেশনের কথা না শুনে, তাহা হইলে কর্পোরেশন আরও নানা উপায়ে ট্রাম কোম্পানীকে সায়েস্তা করিতে পারে। কর্পোরেশন যদি ট্রাম কোম্পানীর সহিত আড়ি করিয়া চলে তাহা হইলে ট্রাম কোম্পানীর লাভ আরও কমিয়া যাইবে; সুতরাং উহার কিম্মতও কমিয়া যাইবে। যদি নিতান্তই ট্রাম কোম্পানীর সহিত রফা না হয়, তাহা হইলে কলিকাতার ট্রাম কোম্পানীর এবং দুনিয়ার ট্রাম কোম্পানীগুলির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিবার জন্য কর্পোরেশনের পক্ষে একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের দরকার। তাহা হইলে ১৯৩৭ সনে নূতন ক্রয় করিবার সময় আগত হইলে কাজ করিবার বেশ সুবিধা হইবে।

মোট কথা জনসাধারণের সেবাই কর্পোরেশনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, এবং এইজন্য কর্পোরেশনকে সহরবাসীর যাতায়াতের অসুবিধা দুর করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান-বিশেষের স্বৈরাচার, অনাচার, অযথা লাভের পথ বন্ধ করিয়া দিয়া কর্পোরেশনকে সর্ব্বত্রই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে জার্ম্মানির যানবাহন-কোম্পানীগুলি আদর্শস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। জার্ম্মাণ কোম্পানীগুলি যে সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছে, কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী-গুলি মাত্র সেইরূপ সুখ সুবিধা ভোগেরই অধিকারী; তার চেয়ে বেশী সুখ সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া একশ'বার অন্যায়।

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

"লেবার গেজেট"
ভারতে ধর্ম্মঘট

"লেবার গেজেট" নামক পত্রিকায় "ভারতে ধর্ম্মঘট" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী দুই অংশে বিভক্ত। ১ম অংশে ১৯২১ সন হইতে ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা এবং বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রবন্ধটী মূলতঃ ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত একটী বুলেটিন অবলম্বন করিয়া লিখিত। এই সময়ের মধ্যে মোট ১,৫৯৮টী ধর্ম্মঘট ঘটিয়াছে। উহার মধ্যে ১টী ধর্ম্মঘট ৫টী প্রদেশ ব্যাপিয়া এবং আর একটী ৬টী প্রদেশ ব্যাপিয়া চলে। ধর্ম্মঘটসমূহে মোটের উপর ২,৭২০,১৩০ জন মজুর যোগদান করে এবং মোট ৭২,০৮২,৭৫৬ কার্য্যদিন লোকসান হয়।

ধর্ম্মঘটের আস্তানা বোম্বাই এবং বাঙ্গালা

উপরিউক্ত ধর্ম্মঘটসমূহের মধ্যে ৮০% জন্মলাভ করিয়াছে বাঙ্গালা এবং বোম্বাই প্রদেশে। এক কটন মিলগুলিতে মোট ৭৩০টী ধর্ম্মঘট ঘটে। ধর্ম্মঘটগুলির মধ্যে ১৯২০-২১ সনের শীতকালে কলকারখানা অঞ্চলে যে হাঙ্গামা দেখা দেয় ভারতবর্ষে এমন আর কখনও দেখা যায় নাই। ১৯২২ সন হইতে ১৯২৭ সন পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘটের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ১৯২৮ সন হইতে আবার ধর্ম্মঘট বাড়িতে থাকে। এই সনে কতকগুলি ধর্ম্মঘট দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া চলায় ফল সাংঘাতিক হইয়া পড়ে। ১৯২৮ সনের ধর্ম্মঘটসমূহের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, এই সনে ধর্ম্মঘট ব্যাপারে রীতিমত পিকেটিং চলে এবং ভয়-প্রদর্শনাদি করা হয়। ফলে উপদ্রব, রক্তপাত ইত্যাদি ঘটে।

ধর্ম্মঘটের মূলে ভাত-কাপড়ের দাবী

১৯২১ সনে এবং ১৯২২ সনে, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং জাতিবিদ্বেষই ধর্ম্মঘটের কারণস্বরূপ দেখা যায়। কিন্তু তাহার পর হইতে প্রধানতঃ ভাত কাপড়ের দাবীই শ্রমিক-বিপ্লবের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণতঃ মজুরির হার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। তবে স্থানে স্থানে নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার লইয়া শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট উপস্থিত হইয়াছে।

বাণিজ্য-বিরোধ আইনের কুফল

মোট ১,৫৯১টী ধর্ম্মঘটের মধ্যে ২৫৪টী অর্থাৎ প্রায় ১৬% ধর্ম্মঘট মজুরদের অনুকূলে মীমাংসিত হয়; এবং ২৬৪টী অর্থাৎ প্রায় ১৬% ধর্ম্মঘট মজুরদিগকে আংশিক সুবিধা প্রদান করিয়া মীমাংসিত হয়। প্রতি বৎসর ৫০% ধর্ম্মঘটে মজুররা কোনই সুবিধা পায় নাই। ১৯২১, ১৯২৪, ১৯২৫, ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সনে মজুরগণ ৩৩% ধর্ম্মঘটে এবং ১৯২২, ১৯২৩ এবং ১৯২৬ সনে মাত্র ২৫% ধর্ম্মঘটে আংশিক বা পূর্ণ সুবিধা আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯২৯ সনে ট্রেড্ ডিস্‌পিউটস্ অ্যাক্ট অর্থাৎ বাণিজ্য-বিরোধ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন পাশ হওয়ার আগে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও তাহাদের কর্ম্মচারিগণের মধ্যস্থতায় অনেক শ্রমিক-বিরোধ সহজে মিটিয়া যাইতে পারিয়াছে। এই বুলেটিনে এইরূপ ২২টী বিরোধ-মীমাংসার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই নয়া আইন পাশ হওয়ার ফলে এই ভাবে বিরোধ-মীমাংসার মূলে কুঠারাঘাতই করা হইয়াছে।

১৯২৯ সনের ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্

প্রবন্ধটীর দ্বিতীয় অংশে ১৯২৯ সনের শ্রমিক-বিপ্লবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই সনে মোট ধর্ম্মঘটের সংখ্যা ১৪১টী, ধর্ম্মঘটীর সংখ্যা ৫৩২,০১৬ জন, ক্ষতির পরিমাণ ১২,১৬৫,৬৯১ কার্য্যদিন। অধিকাংশ ধর্ম্মঘট ঘটিয়াছে বোম্বাই প্রদেশে এবং তুলার ও পশমের কলকারখানায়।

মোট ৫৫টী অর্থাৎ ৩৯% ধর্ম্মঘট ব্যক্তিগত কারণে ঘটিয়াছে। মজুরির হার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হওয়াতেও প্রায় উপরি উক্ত সংখ্যক ধর্ম্মঘট ঘটিয়াছে। খাটুনির সময়, ছুটি এবং বোনাস ইত্যাদি ব্যাপার সম্বন্ধে মাত্র ৫টী ধর্ম্মঘট ঘটিয়াছে।

১৯২৯ সনে ১৩৮টী ধর্ম্মঘটের মীমাংসা হইয়া যায়। ইহার মধ্যে ৫৮টী অর্থাৎ ৪২% ধর্ম্মঘটে মজুরগণ সুবিধা আদায় করিতে পারিয়াছে। মজুরগণ ইহার মধ্যে ৩১টী বিরোধে (২২·৪৬%) সম্পূর্ণ এবং ২৭টী বিরোধে (১৯·৫৭%) আংশিক সুবিধা আদায় করিতে পারিয়াছে।

১৯৩০ সনের মার্চ্চ মাসে মোট ৬টী বিপ্লব উপস্থিত হয়; ইহার মধ্যে বোম্বাই সহরে ১টী আহম্মদনগরে ৩টী এবং বিরামগাঁয় ১টী। আর একটী ধর্ম্মঘট দেখা দেয় জি, আই, পি, রেলওয়ের লাইন ষ্টাফে এবং ওয়ার্ক-সপে। এই সমস্ত ধর্ম্মঘটে মোট ১৭,৪৪২ জন মজুর লিপ্ত হয় এবং কার্য্যদিন নষ্ট হয় ৩৪২,৫৭০।

"নব শক্তি" (২৫শে জুলাই, ১৯৩০)

(১) দেশলাইয়ের ব্যবসা

ভারতে দেশলাই-নির্ম্মাণ-প্রচেষ্টা আজ নতুন নয়। কিন্তু ১৯২১ সনের আগে অনেক ছোট খাট কারবার এদিকে ওদিকে থাকলেও ব্যবসার জন্যে পরিচালিত কারখানার মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ছিল আহ্‌মেদাবাদের "গুজরাট ইস্‌লাম ম্যাচ ফ্যাক্টরী"। অন্যান্য ছোটখাট কারখানা দু'চার দিন চলেই বন্ধ হ'য়ে যেত। তার কারণ এই যে, অভিজ্ঞতা, মূলধন, কাঁচামাল (অর্থাৎ কাঠ) ভালরকম পরিচালন-ব্যবস্থা এই সকলের অভাব তো ছিলই; এর উপর সব চেয়ে বিরোধী ছিল বিদেশী প্রতিযোগিতা। ১৯২১ সন পর্য্যন্ত আমদানি-শুল্ক গ্রোস পিছু মাত্র বার আনা থাকাতে বিদেশী প্রতিযোগিতার বহর ছিল খুবই বেশী। সেই বিপুল প্রতিযোগিতার স্রোতের মুখে সামান্য মূলধন নিয়ে ভারতীয় অব্যবসায়ীদের দাঁড়ান এক রকম অসম্ভবই ছিল। কিন্তু ১৯২৩ সনে আমদানি-শুল্ক দ্বিগুণ হ'য়ে গেল—গ্রোস পিছু বার আনা থেকে দেড় টাকা। দেশী-ব্যবসা-সংরক্ষণ-নীতি অনুসারে গবর্ণমেণ্ট এটা করেন নি, একথা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। তাঁরা শুল্ক বাড়িয়েছিলেন রাজস্ব বাড়াবার জন্যে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে এটা দেশের কাজে এল। ১৯২২ সনের মার্চ্চ মাসে এই নূতন শুল্ক-আইন আমলে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপনের জন্য দেশে একটা হুড়াহুড়ি প'ড়ে গেল। সেই সময়ে বাক্সের সাদা কাঠ এবং সাদা কাঠির জন্য কোন শুল্ক দিতে হ'ত না। তাই প্রথম প্রথম জাপান থেকে এই কাঠ ও কাঠি আনিয়ে এখানে বাক্স তৈরি ক'রে বারুদ মাখিয়ে নেওয়া হত।

ফলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব গেল বিশেষ রকম ক'মে। এবং ১৯২৪ সনে এর প্রতিবিধানকল্পে এই দুটি জিনিষের আমদানির উপর নূতন শুল্ক জারি হ'ল—সাদাকাঠির উপর পাউণ্ড পিছু সাড়ে চার আনা এবং বাক্সের সাদা কাঠের উপর পাউণ্ড পিছু ছ'আনা। দেশীয় ব্যবসা এতে বাধা না পেয়ে বরং জোর পেল—কাঠ ও কাঠি দেশে তৈরির ব্যবস্থা চলতে লাগল। এই চেষ্টা যে কতকটা সফল হ'য়েছিল তা' বোঝা যায় আমদানির উপর এর প্রতিক্রিয়া দেখে। ১৯২১—২২ সনে আমদানির পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ৩৬·৮ লক্ষ গ্রোস; ১৯২৬—২৭ সনে সেটা গিয়ে দাঁড়াল ৬১·২ লক্ষ গ্রোসে; আর তার পরের বছরে সেটা নেমে এল ৪০ লক্ষে। গত বৎসর যে আরও কম দেশলাই বিদেশ থেকে আমদানি হ'য়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভারতের দেশলাইয়ের বাজার সুইডেনের একরকম একচেটে ছিল। অতএব তারই ক্ষতি হ'ল সব চেয়ে বেশী। এদিকে অত উঁচু হারে শুল্ক দিয়ে দেশী দেশলাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে তারা শেষে ভারতবর্ষে দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপন করবার সঙ্কল্প করলে এবং সে সঙ্কল্প তারা কার্য্যে পরিণতও করেছে।

যুদ্ধের আগে ভারতের বাইরে নানা দেশ থেকে দেশলাই আমদানি হলেও, আসলে আসত সুইডেন ও জাপান থেকে। ১৯১২—১৩ সনে সব সুদ্ধ দেড় কোটী গ্রোসের উপর বাক্স ভারতে আমদানি হয়েছিল। তার মধ্যে এক জাপান থেকেই এসেছিল ৭২·৯ লক্ষ গ্রোস এবং সুইডেন থেকে ৪২·২ লক্ষ গ্রোস। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে জাপানের খুব সুবিধা হয়ে গেল। ওই সুদীর্ঘ যুদ্ধের সময়ে এবং তার কিছুদিন

পরে পর্য্যন্ত ভারতের দেশলাইয়ের বাজার জাপান একচেটে করেছিল। ১৯১৮—১৯ সনে আমদানি দেশলাইয়ের সংখ্যা হচ্ছে ১ কোটী ১১'১ লক্ষ গ্রোস। এর মধ্যে জাপান সরবরাহ ক'রেছিল এক কোটী ৭'৪ লক্ষ গ্রোস; সুইডেনের ভাগ সেবারে ছিল দশ লক্ষেরও কম। কিন্তু ইতিমধ্যেই সুইডেনের ব্যবসাদাররা স্থির করেছিল যে, যেন-তেন-প্রকারেণ শুধু যে হৃতবাণিজ্য উদ্ধার করতে হবে তাই নয়, নতুন বাজার দখল করবারও চেষ্টা করতে হবে। ফলে ১৯২৬ সনে কয়েকজন ধনী ব্যবসাদার মিলে সুইডিস ম্যাচ কোম্পানী নাম দিয়ে একটা বৃহৎ কারখানা খুলে দিলে। এর পর থেকেই জাপানকে ক্রমে ক্রমে ভারতের বাজার থেকে হটতে হ'ল। ১৯২৩।২৪ সনে সুইডেন থেকে আমদানি দেশলাইয়ের সংখ্যা উঠিল ৫১'৬ লক্ষ গ্রোসে, আর জাপানের সংখ্যা নেমে এল ৫৫'৫ লক্ষ গ্রোসে। একদিকে সুইডেনে, আর দিকে ভারতে তৈরী দেশলাই—এই দুদিক্ সাম্‌লাতে জাপান একেবারে নাজেহাল হ'য়ে গেল। সেটা তার ১৯২৭ সনে ভারতে প্রেরিত দেশলাইয়ের সংখ্যা—মাত্র ৪'২ লক্ষ গ্রোস—দেখলেই বোঝা যায়। এইখানেই যদি ব্যাপারটার শেষ হত, তাহ'লেও তো ছিল ভাল। দামের পাল্লায় জাপান সুইডেনের কাছে শুধু যে ভারতেই হেরে গেল তা নয়, নিজের দেশেও তাকে সুইডেনের জন্য অনেকটা স্থান ছেড়ে দিতে হ'ল। দেখা যায় যে, ১৯২০ সনে জাপানী দেশলাইয়ের ব্যবসাতে সুইডেনের ভাগ ছিল ৮০%।

জাপানকে ভারত থেকে হটিয়েওত বিশেষ নিশ্চিন্ত হবার উপায় ছিল না। কারণ এইদেশেই দেশলাইয়ের কারবার দিনের পর দিন বেড়ে চলেছিল। সেইজন্যে সুইডেন ম্যাচ কোম্পানী ভারতের নানাস্থানে দেশলাইয়ের কারবার খুললে। টারিফ বোর্ডের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, এদের কারখানায় বছরে ৬০ লক্ষ গ্রোস দেশলাই তৈরি হয়। সেটা তো কিছুকাল আগের কথা। আমাদের ধারণা বর্ত্তমানে তাদের কারবার আরও ফলাও হয়ে উঠেছে। এদের কারবারে তৈরি দেশলাইয়ের নানারকম লেবেল্‌স আছে বটে; কিন্তু সকলের মধ্যেই 'উইমকো' ছাপ আছে।

১৯২১ সন থেকে উচ্চ আমদানি-শুল্কের সাহায্যে ভারতীয় ব্যবসা দিন দিন বেড়ে চললেও এই 'উইমকো'কে (ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানী) ভয় করবার অনেক কারণ আছে। এর মূলধন এবং সহায়-সম্পদের সীমা নেই। পৃথিবীর নানাদেশে এর কারবার। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো দেশে ইনি খণ্ডগ্রাসী আর বেলজিয়ামের পক্ষে ইনি সর্ব্বগ্রাসী রাহু হ'য়ে উঠেছেন। এঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বেলজিয়ামের নিজের ব্যবসা কোন অতলে তলিয়ে গেছে! এঁদের মনের গোপন কোণে বোধ হয় এই আশাই বলবতী যে, ভারতেও একদিন বেলজিয়ামের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে, তাঁদের বিজয়-দুন্দুভি বেজে উঠবে। এটা যে এঁদের অসম্ভব আশা সে কথাও তো জোর ক'রে বলা যায় না। তাই টারিফ বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছিল, এই অসম প্রতিযোগিতায় বাধা দেবার ব্যবস্থা করবার জন্য। অবশ্য টারিফ বোর্ড সে অনুরোধে বিশেষ কর্ণপাত করেন নি। কিন্তু তাঁরা রিপোর্টে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—"সুইডিস কোম্পানীর অস্তিত্বের ফলে ভারতীয় ব্যবসা চালান মুস্কিল হয়েছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তবে এই কোম্পানীর শক্তিসম্পদ্ খুব বেশী এবং অন্যান্য দেশে ইনি যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাতে এঁর ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালীর উপর বিশেষ চোখ রাখা দরকার। এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় ব্যবসার ক্ষতি করে সর্ব্বে সর্ব্বা হ'বার চেষ্টা যদি ইনি করেন, তা'হলে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সেই চেষ্টাতে বাধা দেওয়া—এ সম্বন্ধে এই কথাই আমরা বলতে চাই।"

সেই চরম বিপদের দিন হয়তো এখনো আসেনি; কিন্তু ইতিমধ্যেই অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে, সেটাও যে বিশেষ আশাজনক তা' মনে হয় না। ভারতে তৈরী দেশলাই সংখ্যায় ও পরিমাণে আগেকার চেয়ে বেড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনও সেটা সুইডেনের দেশলাইয়ের এক-তৃতীয়াংশ। বছরে ১ কোটী ৭০ লক্ষ গ্রোস

দেশলাই ভারতবর্ষে দরকার হয়। তন্মধ্যে ১ কোটী থেকে ১ কোটী ২০ লক্ষ গ্রোস দেশলাই সুইডেনের। এর মধ্যে কিছু সুইডেন থেকে আসে বাকীটা এইখানে তৈরি হয়। সুইডিস কোম্পানীর দেশলাইয়ের এত বেশী কাটতির একটা প্রধান কারণ এই যে, দেশী লোকেরা এখানকার কারখানায় তৈরি দেশলাই তত পছন্দ করে না। দেশী দেশলাইয়ের চেয়ে আমাদের দেশের লোকেরা যে "উইমকো" মার্কা দেশলাই বেশী পছন্দ করে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুইডেনের দেশলাই দেশী দেশলাইয়ের চেয়ে ভাল এ ধারণা ভুল। এই স্বদেশীর যুগে আত্মনির্ভরতার যুগে আমাদের দেশের লোক যদি তাঁদের এই অহেতুক ধারণাটা বদলে ফেলতে পারেন, তাহলে একটা বড় দেশী ব্যবসা দাঁড়িয়ে যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে টারিফ বোর্ড কি বলেন সেটা দেশের লোকদের শোনান উচিত মনে করি :—

"ভারতীয় দেশলাই আগেকার চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, ভারতীর কঠের রং একটু কালচে; তাই এ্যাস্পেন কাঠ থেকে তৈরি সুইডেনের দেশলাই কাঠির মত দেশী কাঠি তত ফর্সা হয় না। কিন্তু কাল্‌চে কাঠির দেশলাইয়ের উপর এ-দেশী লোকের একটা বিতৃষ্ণা আছে। তার কারণ, প্রথমে এ দেশে যখন দেশলাই তৈরি হয়েছিল তখন সে জিনিষ হয়েছিল অত্যন্ত খেলো। জ্বালতে গিয়ে হয় তার কাঠি ভেঙ্গে যেত, নয় মাথার বারুদ খসে যেত। আর বর্ষাকালে বারুদ এত স্যাঁৎসেঁতে হয়ে যেত যে জ্বলতই না। এর ফলে সাধারণের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, কালচে কাঠির দেশলাই মানে খেলো ও খারাপ দেশলাই। এছাড়া কুটীর-শিল্পের মত ছোটখাট কারবার যাঁরা চালান, তারা বড় বড় কারখানার বাতিল কাঠ থেকে দেশলাই তৈরি করেন। এর জন্যেও পূর্ব্বোক্ত ধারণা সাধারণের মনে এক রকম অচলপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা নানাভাবে ভারতীয় দেশলাই পরীক্ষা করেছি, বিশেষতঃ বর্ষাকালে। তার ফলে আমরা বলতে পারি যে, ভারতে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিচালিত যে সমস্ত বড় বড় কারখানা আছে তাতে তৈরি দেশলাই বাইরের জলুস কম হলেও কার্য্যতঃ ব্যবহারে বিদেশী আমদানি করা যে-কোন দেশলাইয়ের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়।

(২) বাঙ্গালায় পাট ব্যবসায়

বাঙ্গালা, বিহার-উড়িষ্যা এবং আসামের কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছে তাহার একটি আনুমানিক হিসাব বাঙ্গালা সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্তরিপোর্টে দেখা যায়, এ বৎসর (১৯৩০ সনে) ঐ সকল প্রদেশে গত বৎসর অপেক্ষা বেশী জমিতে পাট চাষ হইয়াছে। ইহা একটী দুঃসংবাদ বটে, কেননা যাঁহারা পাটের বাজারের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন বেশী পাট চাষের পরিণাম কৃষকের সর্ব্বনাশ, সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব্বস্তরের লোকেরও মরণ। গত বৎসর ৩৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৯ শত ৬৫ একর, এবং বর্ত্তমান বৎসর ৩৫ লক্ষ ৬ হাজার ৭ শত একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান বর্ষে গত বৎসর অপেক্ষা ৯১ হাজার ৭ শত ৩৫ একর বেশী জমিতে পাট উৎপন্ন হইয়াছে।

দেশের লোক আশা করিয়া বসিয়া থাকে—পাটের বাজার সুরু হইলেই টাকার আদান-প্রদান হইবে, জমিদার প্রজার, খাতক মহাজনের, ক্রেতা বিক্রেতার ঋণ পরিশোধ হইবে আবার দেশের একটা সুসময় ফিরিয়া আসিবে। চাষীও মনে করে আবার দু'সন্ধ্যা পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে। আমরাও আশা করি, আবার বাঙ্গালা দেশের চাষীর চির-মলিন মুখে দু'চার দিনের জন্ত হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিবে।

বলা বাহুল্য, পাটের ক্রয়-বিক্রয়-জনিত বিস্তর টাকা দেশে এ সময়ে আদান প্রদান হয়, এবং সেই টাকার উপর এ দেশের অপরাপর ব্যবসাবাণিজ্য অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু এ বৎসর একটা নূতনত্ব আছে,—তা' এই—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্তায় এবৎসর

পাটের কলওয়ালাদের চাহিদা তেমন হইবে না। সুতরাং পাট ব্যবসায়ীদের যে এ বৎসর দুর্ব্বৎসর তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাট জন্মে অবশ্য আমাদের দেশের মাটিতেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ মাটী যারা গায়ে মাখিয়া পাট চাষ করে তারা এই পণ্যের বিক্রয়লব্ধ লভ্যাংশের অতি অল্পই হস্তগত করিতে পারে। ইহারা যেন চিনির বলদ—বোঝা বহিয়াই মরে। যাহা হউক পাট আমাদের দেশের লোকের হাতে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ইহা কাঁচা মাল বলিয়াই অভিহিত হয়। কিন্তু ইহার শেষ পরিণতি হচ্ছে চট ও থলে। কিন্তু এই চট ও থলে উৎপন্ন হয় কলের সাহায্যে এবং এ দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে যত পাটকল আছে তার প্রায় সবই বিদেশী বণিক্‌দের। অবশ্য একটি কথা এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক—ভারতের পাট ব্যবসায়ের কথা বলিলে বাঙ্গালার কথাই বলা হয়। কেন না, বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশে পাট উৎপাদনের কোন কথা উল্লেখযোগ্য নহে এবং পৃথিবীর সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। কথাটা আরও পরিষ্কার হইবে বোধ হয় এই বলিলে যে, বাঙ্গালা দেশই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র পাট-উৎপাদক দেশ, আর ভারতের যে পাটকলের কথা আমরা বলিতে যাইতেছি তাহার প্রায় সবগুলিই বাঙ্গালা দেশে।

গত ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত হিসাবে দেখা যায় সর্ব্বসুদ্ধ এদেশে ৮৪টী পাটকল আছে। ইহারা অবশ্য প্রথম শ্রেণীর কল। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয়দের বলিতে একটি পাট কলও ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমানে এই ৮৪টী পাট কলের মধ্যে :—

বি, এন, ইলিয়াস´ কোং	...	১টী
বিড়লা ব্রাদার্স´	...	১টী
সুরজমল নাগরমল	...	১টী
স্যার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ	...	১টী
আদমজী কাজিদাউদ	...	১টী
রায় শেঠ হরদৎ রায় চামারিয়া	...	১টী
কস্তুরচাঁদ ভগবানদাস	...	১টী
দয়ারাম পোদ্দার	...	১টী
	মোট	৮টী

ভারতবাসীর টাকায় এবং ভারতবাসীর পরিশ্রমে ও ভারতীয়দের পরিচালনায় মোট আটটী পাট কল হইয়াছে। ভারতীয়দের পরিচালনায় একথা বলিলে বোধ হয় একটু ভুল হইবে—কেননা উপরের কোম্পানীসকলের দুই একটী কোম্পানী শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার রাখিয়া পরিচালনা-কার্য্যটী সমাধা করেন। অবশ্য ঐ সকল শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীরা বেতনভোগী চাকর মাত্র। ইঁহাদের সহায়তা ছাড়া পাটকল চলে কিনা আমাদের ততদূর অভিজ্ঞতা নাই—তবে তাহা হইলেও ইহাদিগকে ভারতীয় পরিচালনাধীন বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

উপরের আটটী কল ভিন্ন বাঙ্গলায় আরও ৪টি পাটকল তৈয়ারী হইতেছে—ইহাদের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে যে দেশের অনেক টাকা দেশে থাকিয়া যাইবে—অনেক কুলি মজুরের অন্ন করিয়া খাইবার সংস্থান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত বেকার বাবুদের কোন সুবিধা হইবে কিনা সন্দেহ। শেষোক্ত এই চারটী কলের মধ্যে ২টী বাঙ্গালীর টাকায় হইতেছে। ইহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

১। প্রেমচাঁদ জুট মিলস্।
২। ঢাকেশ্বরী জুট মিলস্।
৩। মগনলাল গগনচাঁদ জুট মিলস্।
৪। ব্রহ্মছত্র জুট মিলস্।

আমরা বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানিয়াছি, এই সকল পাট কলে (অর্থাৎ ৮৪টী পাট কলে) বার্ষিক একশত কোটী টাকার কারবার হয়। এবং এই সকল কলে সর্ব্বসমেত ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ভারতীয় শ্রমিক (নিম্ন শ্রেণীর কেরাণী বাবু সহ) খাটে। কিন্তু ইহাদের খাঁটি বেতন-তালিকা পাইবার উপায় নাই। তথাপি অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে ইহাদের বেতন খুব বেশী ধরিলেও এক কোটী টাকার হিসাব পাওয়া যায় অর্থাৎ ব্যবসায়ের এক শত ভাগের এক ভাগ, সুতরাং শতকরা এক টাকা মাত্র।

পাট হয় বাঙ্গালার সুদূর পল্লীতে, কিন্তু পাকা মালে অর্থাৎ চট বা থলিয়ায় পরিণত হয় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী চটকলসমূহে। পল্লীগ্রাম হইতে পাট রপ্তানি হইয়া কলে আসিতে অনেক হাত ঘুরিয়া আসে, তন্মধ্যে আড়ৎদার, দালাল, ফড়িয়া প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব-ভোগী ব্যবসায়ী আছেন। মিলের কর্ত্তৃপক্ষ অনেক সময় নিজেদের নিযুক্ত লোক দ্বারা মফঃস্বল হইতে সরাসরি পাট ক্রয় করেন। এইরূপে, উৎপন্ন পাটের প্রায় ৬০ ভাগ পাট তাহারা মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের একটী পয়সাও না দিয়া হস্তগত করেন। বাকি শতকরা ৪০ ভাগ পাট বিভিন্ন শ্রেণীর দালালদের হাত ঘুরিয়া আসিয়া পৌঁছে। এই শ্রেণীর মধ্যে কলিকাতার উল্টাডিঙ্গী, শোভাবাজার, বাগবাজার, চিৎপুর অঞ্চলের আড়ৎগুলি পর্য্যন্ত এক শ্রেণীর লোক বিনা মূলধনে পাটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। ইহারাই দালাল। অবশ্য ইউরোপীয় দালালদের কাজ আরও বিস্তৃত ও আরও লাভজনক, কিন্তু এই শ্রেণীর ভারতীয় দালালেরা এক ধনীর হাত হইতে অপর ধনীর হাতে পাট পৌঁছিয়া দিয়া মোট টাকার উপর একটা কমিশন পান। ইঁহাদের সকলের সারা বৎসরের আয় কত তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে আড়ৎদাররা ও দালালেরা একত্র বার্ষিক যত টাকা লাভ করেন তাহার পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৪ কোটী ২৫ লক্ষ। অবশ্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাঙ্গালায় বার্ষিক এক শত কোটী টাকা পাটের ব্যবসায়ের আয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং মহাজন ও দালালরা লাভ করেন মোট কারবারে ২৫ ভাগের ১ ভাগ।

পাটকলের অংশ বিক্রয় হইয়া থাকে। লিমিটেড্ কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া অবশ্যই একটা বাৎসরিক ডিভিডেণ্ড পাওয়া যায়। কিন্তু এই 'লভ্যাংশই' পাট কলের লাভ কত তাহা জানিবার একমাত্র পন্থা নহে। লভ্যাংশ যাহা দেওয়া হয় তাহা প্রকৃত লাভের টাকার যে কত ক্ষুদ্রতম অংশ তাহা সূক্ষ্ম ব্যবসায়বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কেহ বুঝিবেন না। ১৯২৬ সনে বাঙ্গালার পাট কলের ভারতীয় শেয়ার-হোল্ডাররা মোট পাইয়াছেন ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। বলা বাহুল্য ঐ বৎসর ৩১৵ দরে পাটের মণ বিক্রয় হইয়াছিল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রকৃত যাহা লাভ হয় তাহার শতকরা ১০ ভাগ লভ্যাংশস্বরূপ বা 'ডিভিডেণ্ড' ঘোষণা করা হয়। সুতরাং অনুমান করিয়া লইতে হইবে—ভারতীয় অংশীদাররা এদিকেও কত সামান্য লাভ পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হন।

এইরূপে ভারতীয় পাট ব্যবসায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর সংস্রব কতটা এবং আয় কত তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—

চটকলের অংশীদারদের লাভ	১'৫০	কোটী টাকা
মহাজন ও দালালদের প্রাপ্য	৪'২৫	কোটী টাকা
মজুর বা শ্রমিকদের বেতন	১	কোটী টাকা
কৃষকদের প্রাপ্য ...	৩৪	কোটী টাকা
মোট	৪০'৭৫	কোটী টাকা

[উপরে যে কৃষকদের প্রাপ্য ৩৪ কোটী টাকা দেওয়া হইল—তাহা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত হিসাব হইতে সংগৃহীত]।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, সমগ্র ভারতে যে পাটের ব্যবসায় হয়, এবং তাহাতে যে একশত কোটী টাকা আয় হয়, তন্মধ্যে ৪০ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা ভারত-বাসীর হাতে আইসে। স্মরণ রাখিতে হইবে—ইহা কৃষকদের প্রাপ্যসহ। অর্থাৎ ব্যবসায়ের যাহা পণ্য সেই পাটের মূল্য সমেত। কৃষকরা প্রতিমণ পাটে ৮৲ টাকা পাইয়া থাকে। পণ্যের মূল্য অবশ্য যাহাই হউক, এই কটা টাকা ঐ ভাগ্যহীনদের হস্তে আসিবেই। সুতরাং সে টাকাটার হিসাব ছাড়িয়া দিতেই হইবে। বিচার্য্য শুধু এই কারবারে পণ্যের মূল্য ছাড়া আর কত টাকা এদেশবাসীর হস্তগত হয়। মোট ৪০ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা হইতে পাটের দাম ৩৪ কোটী বাদ দিলে বাকী ৬ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা এদেশের মহাজন, আড়ৎদার, দালাল, কেরাণী ও শ্রমিক এই সকলে মিলিয়া পাইয়া থাকেন।

বাঙ্গালার কৃষককুল রক্ষণশীল। সহজে ইহারা নূতনত্বের

বশবর্ত্তী হইতে চাহে না। অবশ্য বাঙ্গালাদেশের জমির উর্ব্বরতাই এজন্য দায়ী।

পাট অবশ্য বাঙ্গালাদেশেরই পণ্য, কিন্তু ইহার বিক্রয়ের বাজার হইতেছে—ইউরোপ, আমেরিকা এবং কতকটা জাপান। বলা বাহুল্য জাপান ও আমেরিকার সওদাগরগণ ইংরেজ বণিকের হাত হইতেই পাট কিনিতে বাধ্য হন—সরাসরি ভারতের বাজার হইতে পাট কিনিবার অধিকার ইহাদের বা অপর কোন বৈদেশিক জাতির নাই।

গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপ ও আমেরিকার বণিকগণ দেখিলেন—কি এক অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক বিধানে ইহারা বাঙ্গালাদেশের এই পণ্য-বিশেষের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। সুতরাং উপায়ান্তর দেখিতে হইবে—অনুরূপ অপর কোন ফসল জন্মাইতে হইবে।

আমেরিকার ভূমিলক্ষ্মী তাঁহার সন্তানগণের সাধনায় মুগ্ধ হইয়া এ প্রচেষ্টার পুরস্কার দিলেন—পাটের অনুরূপ এক নূতন ধরণের ফসল জন্মিল। অদূর ভবিষ্যতে এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে, আজ পাট বাঙ্গালাদেশের একচেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া জগতের মাঝে বাঙ্গালা দেশ যে স্পর্দ্ধা করিতে পারে—কালক্রমে হয়ত সে সৌভাগ্য তাহার থাকিবে না।

গত কয়েক বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্ট পাটের বদলে অন্য কোনও জিনিষ ব্যবহৃত হইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষা করিতেছেন। তাহারা 'ডেকান হেম্প' নামক একজাতীয় শণ পরীক্ষা করিয়া "টাইপ নং ৩" নামক একজাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছেন। এখন ইহা ভারতের বিভিন্ন স্থানে উৎপাদন করিবার চেষ্টা চলিতেছে বটে, তবে বিহার প্রদেশেই ব্যাপক ভাবে পরীক্ষার প্রস্তাব চলিতেছে। এই গাছ হইতে ১০,১২ ফুট লম্বা তন্তু বাহির করা হইয়াছে—ইহার রং হালকা ও বেশ পরিষ্কার। ইহা খুব মজবুত। বিলাতে ইহার দর টন প্রতি ১৮ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৩৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। মাদ্রাজের বিমলিপট্টমের পাটের দর টন প্রতি ১২ পাউণ্ড ১০ শিলিং বা ১৬৫৲ টাকা এবং বাঙ্গালার এক নম্বর পাটের দর টন প্রতি ১৭ পাউণ্ড বা ২২১৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ এবং মাদ্রাজে এই "ডেকান হেম্পের" চাষ হইয়াছিল, এবং মাদ্রাজে ইহা হইতে দড়ি ও এক রকম চটও তৈয়ারী হইতেছে। এইবৃক্ষের প্রধান গুণ এই যে, যেখানে পাটের চাষ হয় না, সেইখানেই ইহার চাষ ভাল হইয়া থাকে।

তিন বৎসর পূর্ব্বে (১৯২৭) সনে ভারতের কৃষককুলের দুরবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্বা-ধীনে যে একটী কৃষি কমিশন বসে, এবং যাহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন লর্ড লিনলিথগো, সেই কমিশনের রিপোর্টের ৬৫ সংখ্যক প্যারায় নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে :—

"বর্ত্তমানে পাট ভারতেরই একচেটিয়া সম্পত্তি আছে, কিন্তু ভবিষ্যতেও যে ইহা এমনি থাকিবে, এমন কোন স্থিরতা নাই। কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন অভিনব কোন পণ্য দ্বারা ইহা স্থানচ্যুত হইতে পারে এমন আশঙ্কাও আছে এবং উক্ত পণ্যের মূল্য পাটের মূল্য অপেক্ষা কম হইলে তাহাই যে বাজারে প্রচলিত হইবে একথা বলাই বাহুল্য। এ সম্পর্কে ভারতের নীল চাষের উচ্ছেদের ইতিহাসই উক্তরূপ সম্ভাবনার পক্ষে জ্বলন্ত প্রমাণ। অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সর্ব্বদা সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। পাটের বর্ত্তমানের যে প্রতি-দ্বন্দ্বিহীন অবস্থা, এই অবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সর্ব্ব প্রযত্নে ইহার গুণবত্তার, উৎপাদনের এবং নির্ম্মাণ-প্রণালীর উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। এবং অপর জাতীয় তন্তুময় ফসল হইতে ইহার মূল্য যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখার অপরিহার্য্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অন্যথা অদূর ভবিষ্যতে বিষম সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, পাটের চাষ উঠিয়া যাইবে এবং বাঙ্গালার এই সম্পদের মূলে এমন কুঠারা-ঘাত হইবে যে, সে ক্ষতি সামলানো বাঙ্গালার পক্ষে দায় হইবে।"

"বাঙ্গালার কৃষককুল রক্ষণশীল" তাঁহারা উন্নত ধরণের চাষের পক্ষপাতী নহে—ফসল উৎকৃষ্টতর কেমন করিয়া

হইবে সে জন্ত যত্নবান নহে—অল্প জমিতে বেশী 'ফলন' ঘটাইতেও তারা মাথা ঘামায় না। তিন পুরুষ পূর্ব্ব হইতে একই জমিতে তাহারা এক প্রকার ফসলই বপন বা রোপণ করিয়া আসিতেছে। ফলে উক্ত জমির বুকে ঐ ফসলের খাদ্য ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যাওয়ার ফসলের 'ফলন' ত কম হইতেছেই, অধিকন্তু ঐ ফসল গুণবত্তায়ও হীন হইয়া পড়িয়াছে। কৃষিতত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, একথা শুধু পাট সম্বন্ধে নহে—সর্ব্বত্র সত্য।

সাধারণতঃ আমরা চাষীদেরই দোষ দিয়া থাকি, কিন্তু বাঙ্গালার সুদূর পল্লীতে যাঁহারা থাকেন বা পল্লী-কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে খবর রাখিবার যাঁহাদের সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন—বাঙ্গালার কৃষককুল—যাহাদের অসীম ধৈর্য্যের ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই বিপুল পণ্য-সম্ভার উৎপন্ন হইয়া দেশের আপামর সাধারণকে অর্থশালী করিতেছে—তাহাদের (১) বাসগৃহ —ভগ্ন কুটীর, (২) পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্রখণ্ড (৩) ক্ষুধার তাড়নায় দেহ শীর্ণ। ভূমিলক্ষ্মীর এই চিরলাঞ্ছিত সন্ততি-গণকে উপদেশ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যে পাটের কাঁচা টাকার জন্ত তাহারা বাস-গৃহের একাংশ পর্য্যন্ত পাট বপনে নিয়োজিত করিয়াছে, সেই পাটই ইহাদের 'কাল' হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার বোকা চাষী এই পাটের নেশা কাটাইতে না পারিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহার মাথার উপর হইতে দারিদ্র্যের বোঝা অপসারণ করিতে কেহ পারিবে না—তাহাদের এ ভীষণ ব্যাধি "শিবেরও অসাধ্য।"

শ্রীরমণীরঞ্জন গুহ রায়
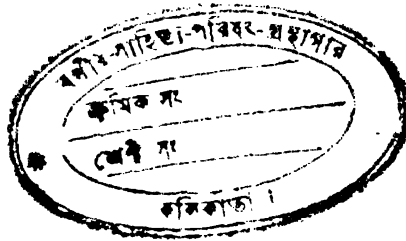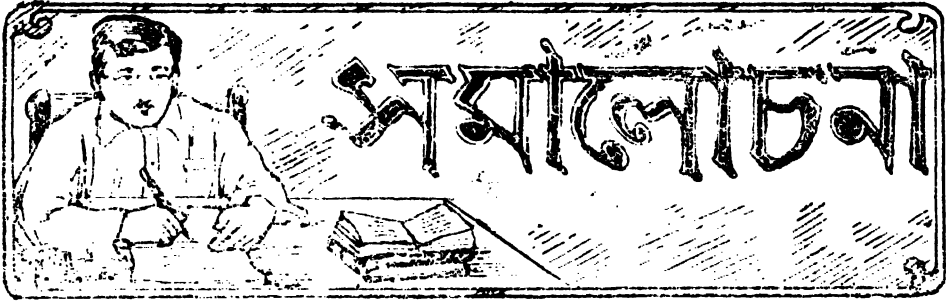
"ইরিগেশন ইন্ বেঙ্গল"

(বাংলায় সেচ-ব্যবস্থা)

[দেশবন্ধু সিরিজ পুস্তিকা নং ২ ; লেখক শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার, প্রকাশক এইচ, কে দাস, ৬ এ করপোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ৭৫ পৃষ্ঠা, ১৯৩০]

বাংলার মত কৃষিপ্রধান দেশের নাড়ীর যোগ রহিয়াছে সেচ বিভাগের কাজের সঙ্গে। গভর্ণমেণ্টও সেচের জন্য টাকা ব্যয় করেন যথেষ্ট, অথচ সেচ বিভাগের কাজের প্রণালী ও ফলাফল সম্বন্ধে অজ্ঞাত দেশের অধিকাংশ লোক। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ সেচ বিভাগের বিবরণীর দুর্মূল্যতা এবং জনসাধারণের উপযোগী তথ্যপূর্ণ সহজ প্রাপ্য সাহিত্যের অভাব। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় "ইরিগেশন ইন্ বেঙ্গল" (বাংলার সেচ-ব্যবস্থা) বইখানা লিখিয়া ইংরাজী জানা বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বইখানা সুলিখিত, তথ্যপূর্ণ এবং অল্পপরিসরে সমস্যা ও সমাধানের সহজ সমালোচনায় ভরপুর।

প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে বাংলা গভর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগের গঠন ও কাজের বিভাগ। সেচ-বিভাগের কাজকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ৩ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

১। সেচ

২। নেভিগেশন (বা নদীখালকে যানবাহন যাতায়াতের উপযোগী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা)।

৩। বাঁধ ও জলনিষ্কাশন

সেচ বিভাগের কাজের প্রস্তাব ও বিবরণ এবং উহাদের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা আলোচিত হইয়াছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। সেচ বিভাগের কাজের ফিরিস্তির প্রতিটী দফা বিশ্লেষণ করিয়া সরকার মহাশয় দেখাইয়াছেন প্রস্তাবগুলির দোষগুণ কি এবং কাজের লাভালাভই বা কোথায়। ইহার পরেই গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক, দামোদর, মেদিনীপুর, বক্রেশ্বর ও হিজলী খালের এবং মাদারিপুর ভিল পথ ও ড্রেজারের (মাটীকাটা জাহাজের) আর্থিক দিক্‌টা। সেচ বিভাগের ১৯২৭-২৮ সনের পর্য্যন্ত আর্থিক অবস্থা ইহাতে সমালোচিত হইয়াছে। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে লেখক সেচ-সমস্যা ও উহার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ১৯২৮ সনের কৃষিকমিশনের মত পুনরুল্লেখ করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, সেচ কেবল জমির উর্ব্বরতা ও ফসলের সহিতই যে জড়িত তাহা নহে, দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন ফসল ও পণ্যের চলাচল এবং দেশবাসীর স্বাস্থ্যও সেচের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকে। কাজেই সেচ-সমস্যার সমাধান কেবল একদিক্ হইতেই করিতে গেলে চলিবে না, অনেক বিষয় মাথায় রাখা দরকার হইবে। সারা বাংলায়ও সমস্যাটা একরকম নহে। উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বা মধ্য বঙ্গের অবস্থা, জমি শস্য স্বাস্থ্য খাল নদীর গভীরতা ও জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার ভেদে সেচ সমস্যা ও ব্যবস্থা ভিন্ন হইতে বাধ্য।

লিখিবার প্রণালী ও ভাষা সহজ ও মনোরঞ্জক। গ্রন্থকার সাধারণ পাঠকের মনকে পীড়া না দিয়া সুকৌশলে তথ্য সাজাইয়াছেন। কিন্তু আলোচনার ভিতর দিয়া একটা ঝাঁঝের পরিচয় বরাবর পাওয়া যায়।

সরকার মহাশয়ের মত উদ্যোগী অর্থশালী সুলেখক ব্যক্তি যদি 'বাংলার সেচ', 'বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা' প্রভৃতি পুস্তক

বাংলা ভাষাতেও লেখেন তাহা হইলে আরও অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী উপকৃত হইবে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

দেশ বিদেশের ব্যাঙ্ক

দেশ বিদেশের ব্যাঙ্ক ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, পি-এইচ, ডি, এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ কর্ত্তৃক প্রণীত ; ২৯১ পৃষ্ঠা ; মূল্য এক টাকা বার আনা ; হৃষীকেশ সিরিজ গ্রন্থ নং ১৫।

বাংলা ভাষায় লিখিত অর্থনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক নিতান্তই অল্প, বিশেষতঃ ব্যাঙ্কিং বিষয়ে। "দেশ বিদেশের ব্যাঙ্ক" এই হিসাবে বহুদিনের একটী অভাব দূরীভূত করিয়াছে। ব্যাঙ্কিংএর মত একটী জটিল দুর্ব্বোধ্য বিষয়কে সরল সহজ ভাষায় সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার এই প্রচেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এই পুস্তকে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনের সহিত কথা প্রসঙ্গে মুখ্যতঃ ৮টি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী দেশের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির তথ্য সংগ্রহ করিয়া সমগ্র ব্যাঙ্কিং বিষয়ের এক ধারাবাহিক ইতিহাস এবং তৎপ্রসঙ্গে যথোপযুক্ত তত্ত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।

জাতির আর্থিক উন্নতি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত বলিয়া 'ভারতে ব্যাঙ্কের প্রসার' লইয়াই আলোচনা সুরু হইয়াছে। ভারতে আজকাল যে অর্থ-নৈতিক সমস্যা জাগিয়াছে তাহার সমাধান করিতে কি উপায় অবলম্বন করা সঙ্গত এই প্রশ্নের উত্তরে দেখান হইয়াছে যে, আমাদেরও অন্যান্য দেশের মতই কৃষি শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রসারকল্পে দেশীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নতি সাধন একান্ত দরকার। কারণ "শেষ পর্য্যন্ত দেশের সবারই খোর-পোষ জোগাচ্ছে" কৃষি, শিল্প, আর বাণিজ্য।

উপরোক্ত বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণকল্পে বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কিং যে সব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার সর্ব্বত্রই কথক ও প্রশ্নকর্ত্তা তাহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। ব্যাঙ্কের সাহায্যে যেমন দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠে, তেমনি যাহাদের হাতে ব্যাঙ্ক-নিয়ন্ত্রণের ভার তাহাদের হঠকারিতার ফলে ঐগুলি অতি সহজেই ধ্বংসের মুখে পতিত হইতে পারে। এইজন্য ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই আইনের শাসন প্রায় সবদেশেই অল্পবিস্তর আছে ; তবে ডাক্তার লাহা দেখাইয়াছেন যে, এ বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেখানে আইনের বাঁধন তত বেশী না থকিলেও ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘের অসাধারণ কার্য্য-পদ্ধতির ফলে ব্যাঙ্কের কাজ অতি সহজেই চলিয়া যাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে একরকম শেষ কথাই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ক্যানাডা ও ইতালীর ব্যাঙ্ক সম্বন্ধেও যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করিয়া ডাঃ লাহা সর্ব্বসাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। জাপান ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় খুব হুসিয়ার ভাবে চলিতেছে। দেশীয় ব্যাঙ্কিং সিস্‌টেমের উন্নতিকল্পে জাপান গভর্ণমেণ্ট ১৯২৬ সনে একটী কমিশন নিযুক্ত করেন, তাহাদের কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। জাপানের ব্যাঙ্কগুলিকে বর্ত্তমানে মুখ্যতঃ তিনটী শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে এ দেশের স্পেশাল ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য। জাপানের ব্যাঙ্কিং বিষয়ে যতখানি তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে যে কোনও একখানি পুস্তকে তাহা পাওয়া দুষ্কর। ফরাসী ইংলণ্ড এবং জার্ম্মাণির ব্যাঙ্ক সম্বন্ধেও স্থূল কথাগুলি এক রকম সবই বলা হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে আলোচনা করা হইয়াছে 'আধুনিক ব্যাঙ্ক জগতের গতি' সম্বন্ধে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার সকল দেশে ঠিক একই রকমে হয় নাই বা ইহাও বলা চলে না যে, সকলের গতি ঠিক একই কোন আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। ডাঃ লাহা দেখাইয়াছেন যে, কতগুলি বৈষম্যের মধ্যেও আধুনিক ব্যাঙ্ক-জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই কতগুলা অতিকায় যৌথ ব্যাঙ্ক এবং তৎসঙ্গে পাশাপাশিভাবে প্রত্যেক অর্থনৈতিক স্বার্থ সংবদ্ধ সীমানার মধ্যে অন্ততঃ এক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান ব্যাঙ্ক-জগতের গতি নির্দ্দেশ করিতেছে। আর সর্ব্বত্রই চেষ্টা হইতেছে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-গুলিকে গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। এই ব্যবস্থার চরম পরিণতি দেখা যায় ১৯২৩

সনের আন্তর্জ্জাতিক পরিষদকর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং ইয়ং কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাসেল সহরে এক আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায়। এই গবেষণার কার্য্যকারিতা ও ফলাফল সম্বন্ধে বিচার সময়সাপেক্ষ।

ইতিহাস ও তথ্য সংগ্রহ হিসাবে পুস্তকখানি একেবারে সম্পূর্ণ হইয়াছে বলা যায় না। কারণ রুশিয়ার মত একটি দেশ একেবারেই বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তত্ত্বাংশ মোটামুটি সুন্দররূপেই সন্নিবেশিত হইয়াছে—তবে পরিচ্ছেদগুলির সংস্থাপনা ঠিক যথাযথভাবে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণের জন্য লেখা হইলেও কথক ও প্রশ্ন-কর্ত্তার পাণ্ডিত্য এবং দক্ষতা অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। অর্থনীতির কূটপ্রশ্নগুলিরও এত সুন্দর এবং সহজভাবে সমাধান করা হইয়াছে যে, যে কোন অর্থনীতির ছাত্র এই পুস্তক পাঠে স্বল্পায়াসে বিশেষ উপকৃত হইতে পারেন। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান, লোন অফিস, সমবায় সমিতি ও স্কুল কলেজের লাইব্রেরীতে এই পুস্তখানি রাখা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই বেশ হইয়াছে; কিন্তু দেশের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে পুস্তকখানির দাম কিছু বেশী হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত
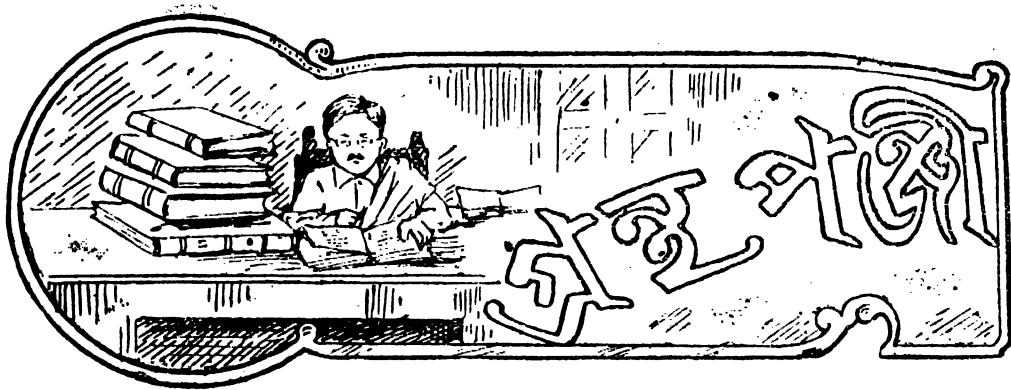
১। "দি রিকভারি অব্ জার্ম্মাণি" (জার্ম্মাণির পুনরুত্থান), কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক জেম্স্ ডব্লিউ অ্যাঞ্জেল। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, নিউ হেভ্‌ন্। ১৯২৯। ৪ ডলার। ২০+৪২৬ পৃঃ।

২। "আমেরিকান ফরেন রিলেশনস্" (অ্যান্যুয়েল সার্ভে) আমেরিকার পররাষ্ট্র সম্বন্ধ—বাৎসরিক জরীপ), চার্লস প হাওয়ার্ড। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, নিউ হেভ্‌ন্। প্রথম ভাগ, ১৯২৮। দ্বিতীয় ভাগ, ১৯২৯। ৫ ডলার।

৩। "দি ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট" (বিদেশী বিনিময় বাজার), এইচ্ এফ্ আর মিলার। দ্বিতীয় সংস্করণ। এডওয়ার্ড আর্ণল্ড অ্যাণ্ড কো, লণ্ডন। ১৯২৯। ৮ শি ৬ পে। ৮+১৫২ পৃঃ।

৪। "ইণ্টারন্যাশনাল ষ্ট্যাটিষ্টিকাল ইয়ার বুক" (আন্তর্জাতিক সংখ্যা-বিজ্ঞানমূলক বাৎসরিকী), ১৯২৯। নূতন সংস্করণ, চতুর্থ বৎসর। ২৫০ পৃষ্ঠা, ৭ শি ৬ পে।

৫। "গেসেল শাফ্‌ট্‌সলেরে" (সমাজ-তত্ত্ব) ওথমার স্পান। ফের্‌লাগ ফুইলে অ্যাণ্ড মেয়ার, লাইপৎসিগ। ১৯৩০। ২৮+৫৯২ পৃঃ।

৬। "ডাস্ ইশ্ উণ্ডডোর্ ষ্টাট" (ব্যক্তি ও রাষ্ট্র), ডক্টর পি, হার্ম্মস্। ফের্‌লাগ কুইলে অ্যাণ্ড মেয়ার, লাইপৎসিগ। ১৯৩০। ৩৬০ মার্ক। ১৪০ পৃঃ।

৭। "সোৎশিয়লিস্‌মুস্ উণ্ড লাণ্ডহ্বির্ট শাফট" (সামাজিকতাবাদ ও জমিজমাতত্ত্ব), ডক্টর ই ডেহ্বিড্। ফের্‌লাগ কুইলে অ্যাণ্ড মেয়ার। লাইপৎসিগ। ১৯৩০। ২০ মার্ক। ৭২৮ পৃষ্ঠা।

৮। "ডাস্ ইন্‌ষ্টিটুট্ ফুয়ের হ্বেল্টহ্বির্টশাফ্‌ট্ উণ্ড সীভের্কেফের আন্ ডোর্ যুনিহ্বার্সিটাট্ কিয়েল" (কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব আর্থিক তত্ত্ব ও যানবাহন তত্ত্ব বিষয়ক পরিষৎ), ডক্টর বার্ণহার্ড হার্ম্মস। ১৯৩০; ২১ পৃঃ।

ঋদ্ধি-গঠন

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম, এ, ডি, এল

বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আজ হাহাকার উঠিয়াছে—অন্ন নাই, অর্থ নাই। রবটা সবচেয়ে মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাদেরই ভিতর যাদের মুখ আছে। তাই মধ্যবিত্তের অন্নাভাব-সমস্যা লইয়া এত লেখাপড়া হইতেছে, এত বক্তৃতা, এত আলোচনা হইতেছে। কিন্তু যারা মুখর নয় অভাবের করালগ্রাস তাদের ছাড়িয়া দেয় নাই। বাঙ্গলার কৃষক ও শ্রমজীবী আজ অভাবে নিপীড়িত—এতটা অভাব এদেশে কোনও দিনই ছিল না।

অভাব হইতে আসিয়াছে যত অনর্থ। পেটে অন্ন নাই, তাই রোগের বিষের সঙ্গে লড়িবার শক্তি শরীরের নাই, রোগ নিবারণের জন্য যে আয়োজন দরকার তাহা করিবার সঙ্গতি নাই, রোগের চিকিৎসার উপযুক্ত বিধান করিবার উপায়ও নাই। তাই লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর নিবার্য্য ব্যাধিতে প্রাণ দিতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষীণ নির্ব্বীর্য্য ও উৎসাহহীন হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে, লক্ষ লক্ষ শিশু অকালে কালের করাল গ্রাসে পড়িতেছে। শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে না—যে টুকু শিক্ষা হইতেছে, তাহা পঙ্গু ও বন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে। অর্থের অভাবে আমাদের সামাজিক অভ্যুদয় সাধনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

শূন্য উদরে ব্যাধিক্ষীণ কণ্ঠে আমরা তবু গাহিতেছি—
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং—
মাতরম্।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রমেশচন্দ্র দত্ত বড়গলায় বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর দুর্ভিক্ষ হয় নাই। লর্ড কার্জ্জন উত্তরে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলায় যে দুর্ভিক্ষ হয় নাই সেটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল নয়। তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তবাদী বাঙ্গালী লর্ড কার্জ্জনের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

তখন এ দর্পের অবসর ছিল, এখন আর তাহা নাই। বৎসরের পর বৎসর এখন বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষের সংবাদে আমরা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখনও অক্ষত অব্যাহত; তবে কেন এমন হইল? "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" বাঙ্গলা আজ দুর্ভিক্ষের লীলাভূমি, অন্নহীনের আয়তন, ব্যাধিগ্রস্তের কারাগার হইল কেন?

তার কারণ এই যে, বাঙ্গলায় আগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ্ ছিল; আজ তাহা নাই। যাহা আছে, তাহা সকলের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। তার উপর সেই বিদুরের ক্ষুদ বণ্টনের অসাম্যে দারিদ্র্য ও অভাব ঘোরতর হইয়া উঠিতেছে।

দেশের সম্পদ্‌বণ্টনে ভাগের গুরুতর অসাম্য আছে—তাই আমি মোটরগাড়ী চড়ি, তোমার মুখে অন্ন উঠে না। চাষীর পরিশ্রমের মূল্যে জমীদারের "রোলস্ রয়" আসে, মহাজনের ভাণ্ডার ছাপাইয়া উঠে, উকীলের পত্নীর অঙ্গে অলঙ্কার ভার হইয়া উঠে—চাষী তার ক্ষুধার অন্ন পায় না। এমন যদি হইত যে, যারা সম্পন্ন তারা অধিক পরিশ্রমী, অধিক বুদ্ধিমান বা অধিক বিদ্বান, তবু এ অসাম্যের পক্ষে ওকালতি করা চলিত। কিন্তু তাতো নয়। কত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, গুণী অনাহারে মরিতেছে আর প্রাসাদে বসিয়া আরাম উপভোগ করিতেছে কত মূর্খ অকর্ম্মণ্য ও অলস ব্যক্তি।

এ অসাম্যের উপর আজ সবারই চোখ অল্পবিস্তর পড়িয়াছে। যারা অভুক্ত তাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে—ধনীর অপচয়-বহুল ধনভাণ্ডারে। তাই চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শ্রমিক ও কৃষক ধনীর অনর্জ্জিত ঋদ্ধির উপর বিষদৃষ্টিতে চাহিতেছে, কর্ম্মের অবসরে বঞ্চিত অপচীয়মান শক্তি রুষ্ট হইয়া চাহিতেছে সেই সব রুদ্ধ ধনভাণ্ডারের দিকে যেগুলির দুয়ার খুলিলে সম্পদ্ তাদের করায়ত্ত হইতে

পারে। সম্পদহীন শ্রমিকের যে দীর্ঘশ্বাস আজ পশ্চিমের বুকে প্রচণ্ড ঝড় তুলিয়াছে, রাশিয়ায় যাহা আজ এক ফুৎকারে অতীতকে ভাসাইয়া দিয়া সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, তাহা বাঙ্গলায় বা ভারতে এখনও মূর্ত্তি ধরে নাই; কিন্তু তার নিঃশ্বাস আসিয়া এখানে পৌঁছিয়াছে। সে নিঃশ্বাসের উত্তাপে ধনিক-সমাজের শান্ত আরাম বিচলিত হইয়াছে, যারা এ আরাম ভাঙ্গিবার আয়োজন করিয়াছে তাদের উপর তাঁরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

কিন্তু তলাইয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই বণ্টন-বৈষম্যই বাঙ্গলার দুর্দ্দশার চরম কথা নয়—তার চেয়েও বড় কথা এই যে, বাঙ্গলার মোট সম্পদই বড় কম। পাশ্চাত্য জগতে এমন কোনও দেশই নাই যার বিস্তার ও লোক-সংখ্যার অনুপাতে মোট সম্পদ্ এত কম। এইটাই বাঙ্গলার দৈন্য ও অভাবের গোড়ার কথা—বণ্টন-বৈষম্য শুধু তার বৃদ্ধির কারণ।

বাঙ্গলাদেশের আর্থিক দুর্দ্দশা আমাদিগকে যেমন ভাবে আঘাত করা উচিত ঠিক তেমনি ভাবে যদি সবার চিত্তে আঘাত করিয়া থাকে তবে সকলের চিন্তা, ধ্যান ও চেষ্টা নিবদ্ধ হওয়া দরকার এই মহাসমস্যার উপর—কি উপায়ে দেশের সম্পদ সম্যক বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, এত বৃদ্ধি করা যায় যাতে আমরা দরিদ্র জাতি না হইয়া পৃথিবীর অগ্রণী সম্পন্ন জাতিদের সমকক্ষ হইতে পারি।

সেই কথাটাই আমি আজ আলোচনা করিব। বাঙ্গলার ঋদ্ধি গড়িয়া তোলা যায় কিনা, আর কি উপায়ে তাহা করা যায় তার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সম্পদের উপাদানের আমাদের অভাব নাই। আমাদের বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রগুলি স্বর্ণগর্ত্ত—শুধু আমরা তাতে সোণা ফলাইতে জানি না। আমাদের পাঁচ কোটি অধিবাসীর সমগ্র শক্তির সুনিয়ত প্রয়োগে আমরা কত না সম্পদ সৃষ্টি করিয়া জগৎকে দান করিতে পারি। কিন্তু তবু আমরা নির্ধন। সম্পদসৃষ্টির উপাদান অজস্র আছে, যে সম্পদ আমরা সৃষ্টি করি তার চেয়ে বহুগুণ অধিক সম্পদ্ আমরা অনায়াসে সৃষ্টি করিতে পারি, যদি সুনিয়ত প্রণালীতে আমরা দেশের সমগ্র শক্তির অপচয়হীন প্রয়োগে তাহাকে ভূয়িষ্ঠ ফলপ্রসূ করিবার চেষ্টা করি।

ইংলণ্ডে আজকাল একটি কথার খুব চলতি হইয়াছে—"র‍্যাশান্যালিজেশন"। সেখানকার শিল্পাগারগুলির আর্থিক অবস্থার অবনতি দূর করিবার জন্য এই প্রতিকার উদ্ভাবিত হইয়াছে। "র‍্যাশান্যালিজেশন" মানে এক কথায় অপচয় নিবারণ। সুধীগণ স্থির করিয়াছেন যে, যে প্রণালীতে ইংলণ্ডে এখন সম্পদসৃষ্টি হইতেছে তাহাতে অনেক স্থানে অনেক শক্তি ও সম্পদের অপচয় হইতেছে। সেই অপচয়-নিবারণের জন্য সকল কারখানার শক্তির সমবায় ও সুনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টাই আজ ইংলণ্ডের শিল্পজগতে প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে।

ইংলণ্ডের সুগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত অতিকায় শিল্প-প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে যদি "র‍্যাশান্যালিজেশন"এর প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে, তবে আমাদের দেশে সমগ্র ধনোৎপাদন-চেষ্টার "র‍্যাশান্যালিজেশন"এর যে কত বেশী প্রয়োজন হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশে শক্তি ও উপাদানের অপচয়টাই নিয়ম—সুনিয়ত ব্যবস্থায় যে সম্পদ্ আমাদের দেশে উৎপাদিত হইতে পারে তার ক্ষুদ্র অংশমাত্রও আমরা সৃষ্টি করি না।

আমাদের সব চেয়ে বড় কাজ আমাদের কৃষি। কৃষি-সম্পদ সৃষ্টি করিবার জন্য আমরা যে ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার পদে পদে সম্পদের কি প্রকাণ্ড অপচয় হইতেছে।

প্রথমতঃ ধরুন এই কৃষিকার্য্য আশ্রয় করিয়া আছে আমাদের দেশে ৯২ লক্ষ লোক, আর তাদের উপর নির্ভর করে ২ কোটি ১৩ লক্ষ লোক। ইহারা আবাদ করে মোট ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমি। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি আবাদ করে গড়ে প্রায় ২½ একর বা ৭৷৷০ বিঘা জমি। একটু উন্নত প্রণালীতে সমবেতভাবে আবাদ করিলে ইহা অপেক্ষা অনেক কম লোকে এই সমস্ত জমি আবাদ করিতে পারে। তা ছাড়া প্রত্যেক পরিবার যে জমি আবাদ করে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়ান।

টুকরা টুকরা আবাদে শক্তির অপচয় হয় অপর্য্যাপ্ত।

একটা গ্রামের সমস্ত জমি যদি গ্রামবাসীরা সুনিয়ন্তভাবে যৌথ চেষ্টায় আবাদ করে তবে, বোধ হয়, যারা চাষে নিযুক্ত আছে তাদের অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোকে সবগুলি জমি অনায়াসে আবাদ করিতে পারে। উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে তার চেয়ে অনেক কম লোকেও এই কাজ চলে। অবশিষ্ট লোকের শক্তি অন্য কোন অর্থকরী চেষ্টায় নিয়োজিত করা যাইতে পারে।

তা ছাড়া জমির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার আমরা করিতে পারি না কতকটা এই ব্যবস্থার ফলেই। যে ব্যবস্থা করিলে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং ইহা হইতে যতদূর সম্ভব সম্পদ্ আদায় করা যাইতে পারে তাহা করিতে হইলে যে অর্থব্যয় প্রয়োজন, কোনও কৃষকেরই তাহা করিবার সঙ্গতি নাই। জল-সেচনের সুব্যবস্থা, সার দেওয়া, উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতির প্রয়োগ, কীটপতঙ্গাদি ঈতি হইতে ফসল রক্ষা করা কিংবা পূর্ণগ্রস্থ কৃষির কোনও আয়োজন করিবার মত অর্থ সঙ্গতি বা জ্ঞান আমাদের কৃষীবলের হইতে পারে না। কাজেই যে ভূমি হইতে উপযুক্ত উপায় প্রয়োগে বিশ মণ ফসল আদায় করা যাইতে পারে সেখানে আমরা চার পাঁচ মণ ফসল পাইয়াই অগত্যা সন্তুষ্ট থাকি।

তা ছাড়া বাঙ্গলা দেশের কোনও কোনও স্থলে এমন অবস্থা হইয়াছে যে, খালবিল, পথ, গোচর সব আবাদ হইয়া গিয়াছে। চলাচলের পথ নাই, নদীনালা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গরুর খাইবার ঘাস দুর্ল্লভ, ঘর ছাইবার খড় পাওয়া যায় না, মাছ দুর্দ্দৃশ্য হইয়াছে—কত কিছু অসুবিধা হইয়াছে। ইহাতে কয়েক মণ ধান বা পাট সৃষ্টি করিয়া আমরা মাছ নষ্ট করিয়াছি, গরুকে না খাওয়াইয়া জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। মৎস্য ও গোধন মস্ত বড় সম্পদ্—ধান পাটের লোভে আমরা সেগুলির সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছি।

অথচ এই বাঙ্গলা দেশেই—বিশেষতঃ উত্তর বাঙ্গলায় এমন অনেক জমি পড়িয়া আছে যার উপযুক্ত আবাদ হয় না শ্রমিকের অভাবে। যেখানে চাষীর অযথা সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া ভূমি দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, সেখানকার লোক যদি এই সব জায়গায় ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে সব দিক্ দিয়াই সুবিধা হয়—দেশের সম্পদ্ বাড়ে লোকেরও সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ সুবিধা হয়। কিন্তু সে দিকে কোনও বিশেষ চেষ্টা আমরা করিতেছি না। এক দিকে রাশি রাশি শক্তির অপচয় হইতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে জমি আবাদ করিয়া, আর এক দিকে মানুষের অভাবে জমির সম্যক আবাদ হইতেছে না।

সমস্ত জাতিটাকে যদি এক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় সবগুলি ক্ষেত্রকে যদি সমগ্র জাতির সম্পত্তি বলিয়া ধরা যায় এবং সবগুলি লোককে যদি সমগ্র জাতির সম্পদ-স্রষ্টা বলিয়া অনুমান করা যায়, এক কথায় যদি সমস্ত দেশটাকে একটা প্রকাণ্ড কারখানা বলিয়া ধরা যায়—তবে একথা বুঝিতে কোনও কষ্ট হইবে না যে, এই জাতির কৃষিসম্পদ্ সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা বিপুল অপচয়-বহুল। কৃষির দ্বারা আমরা যে সম্পদ্ সৃষ্টি করি তাহা ইহা অপেক্ষা বহু অল্প লোকের চেষ্টায় অনায়াসে লাভ করিতে পারি, যদি সমগ্র জাতির শস্য-উৎপাদন-চেষ্টাকে সুনিয়ত ও সংহত করা যায়।

তারপর এই কৃষিজাত সম্পদের বিনিয়োগে আমরা যে অপচয় করি সেও সামান্য নয়। আমাদের রাজশক্তি—যেটা সমগ্র জাতির সংহত শক্তি হওয়া উচিত, কিন্তু নয়—ধরিয়া লইয়াছেন যে, ভূমির একমাত্র প্রয়োজন কর আদায় করা। সুতরাং তাঁরা স্থির করিয়াছেন যে, ভূমি হইতে রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হইলেই তাঁদের ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়া গেল। এই প্রধান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁরা দেশের ভূমির ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তার উপর তাঁরা কৃষির উন্নতির জন্য যে চেষ্টা বা চেষ্টার অভিনয় করেন সেটা আমাদের উপরি পাওনা,—ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আকাঁড়া দেখিতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

রাজশক্তি যদি ভূমিকে কেবলমাত্র রাজস্বের উৎস বলিয়া কল্পনা না করিয়া দেশের সম্পদের খনি বলিয়া মনে করিতেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সম্পদ্ সৃষ্টির উপযোগী করিয়া তার বন্দোবস্ত করিতেন, তবে কিরূপ ব্যবস্থা সমীচীন হইত তার একটা দৃষ্টান্ত রাখিবার

নূতন কৃষিবিধি। তাঁদের ভাবিতে হইত যে, সমস্ত ভূমির সুব্যবস্থার দ্বারা কতখানি সম্পদ্ লাভ করা সম্ভব হইতে পারে এবং কিরূপ ব্যবস্থার দ্বারা সেই পরিমাণ সম্পদ্ লাভ করা সম্ভব। সেই প্রণালীতে বিচার করিয়া ভূমি-সম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম দাঁড়াইবে।

কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভূমির দিকে চাহিয়া ভাবিলেন,—কত রাজস্ব ইহা হইতে আদায় হইতে পারে এবং কি উপায়ে সেই রাজস্ব অতিশয় সহজে আদায় হইতে পারে? ফলে হইল জমীদারী বন্দোবস্ত। রাজস্ব আদায়ের কোনও হাঙ্গামা না পোহাইয়া তাঁরা জমিগুলি বাঁটিয়া দিলেন কতকগুলি জমীদারের ভিতর। বলিয়া দিলেন তোমরা জমির মালিক—ইহা লইয়া তোমরা যা খুসী কর—গোল্লায় যাও তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু রাজস্বটি তোমরা চুকাইয়া দিও।

এ ব্যবস্থায় তাঁদের একটু হিসাবের ভুল হইয়াছিল। জমির আয়ের খুব একটা বড় রকম আন্দাজ করিয়া তাঁর শতকরা নব্বই টাকা রাজস্ব ধার্য্য করিয়া তাঁরা ভাবিয়াছিলেন, জমির সব শাঁস তারা পাইবেন। ইহা হইতে জমিদার আর কিই বা পাইবে? কিন্তু এটা তাঁরা হিসাব করেন নাই যে, কালক্রমে ভূমির আয় বহুগুণ বাড়িয়া গেলে তার শতকরা নব্বই টাকাই যাইতে পারে জমীদারের পেটে। ভুলটা তাঁরা ধরিয়াছিলেন পরে—তাই বাঙ্গলার বাহিরে আর এ বন্দোবস্ত হয় নাই।

কিন্তু তখন তাঁদের প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল, যথাসম্ভব সহজ উপায়ে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা। কৃষির সৌকর্য্য সম্বন্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিস একটা সাধু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেও তার ভিতর স্বার্থের কোনও যোগ না থাকায় গভর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে কোনওরূপ মনোযোগ করা আবশ্যক মনে করে নাই।

জমির আয় যখন বাড়িয়া গেল তখন জমীদারেরা সরকারী নীতি অনুসরণ করিয়া হাঙ্গামা বাঁচাইবার জন্য তালুকদারী বন্দোবস্ত করিলেন, তারপর দরপত্তনী, সে পত্তনী, হাওলা নিম হাওলা, ওসত হাওলা প্রভৃতি বহুবিধ স্বত্বের সৃষ্টি হইয়া গেল—বাঙ্গলা দেশ ক্রমে ছাইয়া গেল অসংখ্য মধ্য-স্বত্ববান লোকে; চাষীর উপর চাপ বাড়ীয়া গেল—যখন তারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িল তখন শেষে হইল 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন'।

এটা সম্ভব হইয়াছিল শুধু এই জন্য যে, জমির মালিক বলিয়া যে জমীদারকে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, জমির সদ্ব্যবহার করিবার তাঁর শক্তি বা ইচ্ছা থাকিবার কথা নয়। সমগ্র জাতির উপজীবিকার মূল যে বিপুল সম্পত্তি তাঁদের যথেচ্ছ বিনিয়োগ করিবার অধিকার হইল, তাহা আপন হাতে আবাদ করিবার বা জাতির মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাঁটিয়া দিবার শক্তি বা আকাঙ্ক্ষা তাঁদের হইতে পারে না। আবাদ করিবে অন্য লোকে, ফসল জন্মাইবে তারা, জমির সম্যক ব্যবহার করিবে তারা, জমীদার শুধু ঘুরিয়া ফিরিয়া খাজনা বলিয়া তাদের কাছে তাদের অর্জ্জিত ধনের অংশ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইবেন। এইটুকুই যাঁর জমির সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর কাজেই জমির উপর কোনও দরদ হয় না—দরদ ও নজর থাকে খাজনার উপর, জমির বুক ফাঁড়িয়া ধন সৃষ্টি করিবার দায় থাকে তারই, যার সেই পরিশ্রম করিয়া নিজের উদরান্নের যোগাড় করিতে হয়। কালক্রমে যখন আয়ের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আলস্য আসিল, তখন খাজনার দায় জমীদারের হাত ছাড়িয়া পড়িল মধ্যস্বত্ববানের হাতে।

এমনই করিয়া জমির খাজনা আদায় করিবার জন্য, জমীদারীভুক্ত ভূমি হইতে যে তুচ্ছ ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা সরকার আদায় করেন তাহাই ঘরে তুলিবার জন্য যে এক বিরাট বাহিনীর সৃষ্টি করা হইল তাহার শ্রমের মূল্য বার্ষিক প্রায় দশ কোটি টাকা। অর্থাৎ ভূমির উৎপন্ন ফসল হইতে ১০ কোটি টাকা তুলিয়া লইয়া দেওয়া হইল এই লোক-সমষ্টির হাতে। ইহাদের মধ্যে জমীদার আছেন, সহস্র সহস্র মধ্যস্বত্ববান আছেন, জমীদারের কর্ম্মচারী আছেন, পাইক বরকন্দাজ আছে। ইঁহারা সমাজের অন্য কোনও কাজ এই ১০ কোটি টাকার মূল্যে করেন না, শুধু সওয়া দুই কোটি টাকা টেক্স তুলিয়া সরকারকে দেন। সওয়া দুই কোটি টাকা টেক্স তুলিবার মজুরী

১০ কোটি টাকা দেওয়া যে যে কোনও গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অপব্যয় সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট সরকারী খাসমহলে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা আদায় করেন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া। এই অনুপাতে আদায়ের খরচ ধরিলে ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা আদায় করিবার খরচ ৬০ লক্ষ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়, ১ কোটির বেশী তো কিছুতেই নয়। জমীদারের মুনাফার মধ্যে মাত্র এই ১ কোটি টাকা তাঁদের রাজস্বের তহশীলদারী কার্য্যের উপযুক্ত মূল্য। বাকী ৯ কোটি টাকা তাঁদের উপরি পাওনা।

অর্থনীতির হিসাবে এ ব্যবস্থার ফল এই যে, বাঙ্গলার কৃষিসম্পদ হইতে ৯ কোটি টাকা সম্পূর্ণ নিষ্ফলভাবে অপচয় হইয়া যাইতেছে। এই ৯ কোটি টাকা প্রকৃত সমাজ-সেবার শ্রমের মজুরী রূপে খরচ করিলে ইহা হইতে যে কত সুফল লাভ করা যাইত তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। বাঙ্গলা দেশের অপচয়বহুল শাসন-যন্ত্রের মোট বার্ষিক ব্যয় ১২ কোটি টাকা, শিক্ষার খরচ মাত্র ১৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা এবং প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সার্ব্বজনীন করিবার আনুমানিক ব্যয় মাত্র ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা; দেশের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার মোট ব্যয় ৪১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য আমরা ৫।৭ কোটি টাকা খরচ করিতে পারি এমন সম্পদ্ আমাদের নাই, কিন্তু ৯ কোটি টাকা আমরা এমনই করিয়া আলস্যের মূল্য রূপে জোগাইতেছি।

তারপর উৎপন্ন ফসলের ব্যবসায়ের কথা আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, এখানেও সেই প্রকাণ্ড অপচয়।

চাহিদা অনুসারে উৎপন্ন ফসল চালাই করিলে তার মূল্য বৃদ্ধি হয়। দেশে যত ধান বা পাট জন্মায় তাহা যদি যেখানে জন্মায় সেখানেই পড়িয়া থাকিত তবে তার মূল্য যাহা হইত, যেখানে সে বস্তু প্রয়োজন আছে সেখানে তাকে চালান দিলে সে তুলনায় তার মূল্য বহুগুণে বাড়িয়া যায়। এই মূল্যবৃদ্ধি মানে জাতীয় সম্পদবৃদ্ধি। গ্রামের সব পাট যদি গ্রামেই পড়িয়া থাকে তাতে শুধু তাহা সস্তায় বিক্রয় হইবে তাহা নহে, সে হইবে সেই পাটের একটা অপচয়, দেশের সম্পদের অপচয়। সুতরাং শুধু দেশের পণ্য নাড়াচাড়া করিয়াই বাণিজ্য দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারে।

আমাদের দেশের বাণিজ্য যে কত অপচয়মূলক তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে। আমাদের প্রধান ব্যবসা পাটের ব্যবসা এবং সেইটাই সবচেয়ে সুনিয়ত। অথচ তার মধ্যে কত অপচয়!

প্রথমতঃ দেশে পাট যারা উৎপাদন করে তারা যার যা খুসী করে। তাই পৃথিবীর সমগ্র পাটের চাহিদা যেখানে ১ কোটি বেল বা ৫ কোটি মণ; সেখানে চাষীরা যার যেমন খুসী পাট উৎপন্ন করিয়া মোটের উপর হয় তো ৫ কোটি ২৫ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন করিয়া বসে। তাতে পাটের বাজার-দর কমিয়া গিয়া ক্রমে এমন একটা অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পাট বিক্রয় করিয়া এখন কয়েক বৎসর হইল মজুরীও পোষাইতেছে না। যে পাট উৎপন্ন করিতে গড়ে মণকরা সাড়ে সাত টাকা কি ৮৲ খরচ হয় তাহা বিক্রী করিয়া চাষী পাইতেছে গড়ে ৬৲ টাকা ৬॥০ টাকা। অর্থাৎ পাট উৎপন্ন করিয়া চাষীর মণকরা প্রায় ১ টাকা লোকসান যাইতেছে। সমগ্র জাতির ইহাতে লোকসান হইতেছে অন্ততঃ ৫ কোটি টাকা। অথচ উৎপাদন সুনিয়ত করিয়া যদি প্রতি বৎসর টায় টায় ৫ কোটি মণ পাট উৎপন্ন করা যায়, কিংবা তার চেয়ে কিছু কম উৎপন্ন করা যায়, তবে এই পাট মণকরা ১৩৲ কি ১৪৲ টাকায় পৃথিবীর লোকে বে-ওজরে কিনিবে। তাহা হইলে যেখানে ইদানীং বৎসরে ৫ কোটি টাকা লোকসান হইতেছে, সেখানে জাতীয় লভ্য হইবে অন্ততঃ ২০ কোটি টাকার কম নয়। কেবল ব্যবস্থার অভাবে আমরা এই ২০।৩০ কোটি টাকার সম্পদলাভে বঞ্চিত হইতেছি। চাষী খাটিয়া মরিতেছে, পাট উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু বেহিসাবী উৎপাদনের ফলে সে পাটের দাম হইতেছে না, অর্থাৎ দেশের সম্পদ প্রায় ২০।৩০ কোটি টাকা পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে।

অথচ কতকটা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদন করিয়া

পাটের এই দুর্দ্দিনেও চটকলের মালিকরা চটের উৎপাদন নিয়মিত করিয়া লাভের মাত্রা বাড়াইয়া রাখিয়াছেন।

তাছাড়া পাটের ব্যবসায়ে যে শক্তি ও সম্পদের কত অপব্যয় হইতেছে তাহা বলিবার নয়। পাট গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার বাজারে আমদানি করিয়া মিলওয়ালা কি বিদেশী খরিদ্দারের কাছে বিক্রয় করাটাই হইল পাটের ব্যবসায়। এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন উপরে মুষ্টিমেয় বেলার আর তাঁদের নীচে বহুসংখ্যক আড়ৎদার, মহাজন প্রভৃতি, আর গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছে অসংখ্য ফড়িয়া। এই যে বিপুল লোকবল পাটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সংযোগ নাই, কর্ম্ম-সমবায় নাই, যে যেমন পারিতেছে পাট কেনা বেচা করিতেছে। আর পাটের মূল মহাজন যাদের হওয়া উচিত, সেই চাষীদের সঙ্গে ইঁহাদের খাদ্যখাদক সম্পর্ক ছাড়া কোনও সম্পর্কই নাই। এইরূপ অনিয়ত প্রণালীতে পাটের ব্যবসায় চলার ফলে হইতেছে এই যে (১) পাটের ব্যবসায়ে দেশের যে পরিমাণ লোকশক্তি নিযুক্ত হওয়া প্রকৃত পরিমাণে আবশুক, তার চেয়ে অনেক বেশী লোক এই ব্যবসায়ের উপর পড়িয়া রহিয়াছে—ব্যবসায়ের মুনাফায় কাজেই সবার কুলাইতেছে না। (২) আর একটা ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, যদিও পাট আমাদের দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি, এবং দুনিয়ার লোকের আমাদের কাছে পাট না কিনিয়া উপায় নাই, তবু চাষী ও ব্যবসাদারেরা সঙ্ঘবদ্ধ না থাকায় এবং বিলাতী খরিদ্দার ও মিলওয়ালারা সঙ্ঘবদ্ধ থাকায় পাটের দর নিয়ত হইতেছে মিলওয়ালা ও বিলাতী খরিদ্দারের খোস খেয়ালে—আমাদের দেশের চাষী বা ব্যবসাদারের দর বাঁধিয়া দিবার শক্তি নাই। ফলে, এখানকার উৎপাদক ও ব্যবসায়ী একজোট হইয়া সুনিয়ত প্রণালীতে উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারিলে পাটের যে মূল্য আদায় করিতে পারিত, পাটের মূল্য হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক কম। পাটের দাম যদি মণকরা ১ টাকা বেশী হয়, তবে দেশের সম্পদ্ বাড়ে ৫ কোটি টাকা। কাজেই এই কারণে পাটের দাম যত টাকা কম হইয়া যায় ততগুণ ৫ কোটি টাকা প্রতি বৎসর আমাদের দেশের ক্ষতি হয়।

সমস্ত দেশ যদি এক ব্যক্তি হইত, সমস্ত দেশের ব্যবসায় যদি এক মালিকের ব্যবসায় হইত, এবং সেই ব্যবসায়টা যদি সুনিয়তভাবে চালান যাইত, তবে এই একমাত্র পাটের ব্যবসায় হইতে দেশের বহু কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ হইত এবং পাটের ব্যবসায়ে যত সব অনাবশুক লোক নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে উৎপাদিকা বৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়া আরও বহুকোটি টাকার সম্পদ্ অনায়াসে উৎপন্ন করা যাইত। এই মানদণ্ডে বর্ত্তমান পাটের কারবারের মুনাফার হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে দেশ ধনী হইবার সুযোগে অযথা বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের কৃষি ও ব্যবসায় যদি 'র‍্যাশন্যালাইজ' বা সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়, তবে এই কৃষি ও ব্যবসায় হইতে প্রভূত পরিমাণে অতিরিক্ত সম্পদ্ আমদানি হইতে পারে। অতিরিক্ত অর্থ আসিলে তাহা হইতে সমাজের কল্যাণজনক বহু কর্ম্ম, যাহা এখন অর্থের অভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে, দেশের স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার উন্নতি করা যাইতে পারে। আর শিক্ষাদান স্বাস্থ্যবিধান ও দেশবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যে সকল প্রচেষ্টা হইবে, তাহাতে বহুসংখ্যক কর্ম্মহীন দেশবাসীর কর্ম্ম ও উপার্জ্জনের সুব্যবস্থা হইতে পারে। কেবল প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা হইলেই তাহাতে অন্যূন ১ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে, অন্যূন ৪০ হাজার লোকের ফলপ্রসূ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অবসর ঘটিবে।

একটা কথা এই যে, কৃষি ও ব্যবসায় 'র‍্যাশান্যালাইজ' করিলে তাতে লোকবল লাগিবে অনেক কম। সুতরাং এখন যত লোক এই কৃষি ব্যবসায় লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে তাদের অনেককে বেকার হইয়া পড়িতে হইবে। 'র‍্যাশন্যালিজেশন'এর কথা ভাবিতে গেলে এইসব লোকের জন্য কর্ম্মান্তরের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তেমন কর্ম্মের সুযোগের অভাব নাই। কত যে শিল্প কত যে ব্যবসায় আমাদের হাতের গোড়ায় পড়িয়া রহিয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। সুনিয়ত প্রণালীতে সেগুলি চালাইয়া লইলে তাতে বহু লোকের কর্ম্মের সুবিধা হইবে, বহু

পরিমাণে অর্থাগম হইবে। তার দুইএকটির মাত্র নমুনা আমি দেখাইব।

আমাদের দেশে গোধনের দুর্দ্দশার কথা ভাবিলে দুঃখ হয় যে, সম্পদের এত বড় একটা প্রকাণ্ড উৎস আমরা হেলায় শুকাইয়া ফেলিতেছি। দুধের চাহিদা আমাদের দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে আছে—তাহা মিটাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। ঘি মাখন আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া গেল, সুবিখ্যাত ঢাকার পনীর বাজারে বিকায় না। বিদেশ হইতে বহু পনীরের আমদানি হয়। গো-চর্ম্ম, অস্থি ও মাংস হইতেও যে সম্পদ্ হইতে পারে তাহাও সামান্য নয়।

আমাদের দেশে হিন্দুরা গরুকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করেন, গো-সেবা তাঁদের ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা পূজা যতই করি, গরুর মঙ্গল ও উন্নতির কোনও চেষ্টাই করি না। যো সো করিয়া যা' তা' খাওয়াইয়া শীর্ণকায় গাভী হইতে আমরা আধ সের হইতে ৫ সের পর্য্যন্ত যে টুকু দুধ পাই তাই আদায় করিয়াই চরিতার্থ। অথচ এই গো জাতির ভিতর সঙ্কলন ও সুপ্রজননের সহায়তায় দশ বারো বৎসরে আমরা উৎকৃষ্ট বহুদুগ্ধবতী গাভীর বংশে দেশ ছাইয়া ফেলিতে পারি। উপযুক্ত আহার ও পরিচর্য্যা বিধান করিয়া প্রতি গাভী হইতে ১০ সের হইতে আধমণ পর্য্যন্ত দুগ্ধ পাওয়া আমাদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। যথেষ্ট দুগ্ধ হইলে দেশের শিশুর দল অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে, দধি ক্ষীরাদিতে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে, আর দুগ্ধজাত স্থায়ী বেসাতী—নোনতা মাখন, পনীর, ঘনীভূত দুগ্ধ তৈয়ার করিয়া আমরা বিদেশে রপ্তানি করিয়া প্রচুর অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে পারি।

চাষের সুনিয়ম দ্বারা আমরা কৃষির জন্য আবশ্যক ভূমির পরিমাণ হ্রাস করিতে পারিলে গরুর খাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে উপযুক্ত ফসল জন্মাইয়া উৎকৃষ্ট গোধন পোষণ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি।

আমাদের দেশের গরু যে ক্ষীণকায় ও স্বল্পদুগ্ধবতী সেটা দেশের দোষ মোটেই নয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, বহু পরিমাণে অধিক দুগ্ধবতী সুবংশজাত গাভী আমাদের দেশে বংশানুক্রমে তাদের উৎকর্ষ বজায় রাখিতে পারে। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি, একটী হিসার গরুর তিনটী বাছুর সকলেই যে শুধু জননীর তুল্যই দুগ্ধবতী ও বলবতী ছিল তাই নয়, সুপ্রজননের প্রতি দৃষ্টি রাখায় বংশানুক্রমে তাদের দুগ্ধদানের শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের দেশে গোধন যে স্বল্প ধন তাহা দেশের দোষ নয়, গোধনের সৃষ্টি ও বর্দ্ধন বিষয়ে আমাদের উদাসীনতার দোষ।

একমাত্র গরু পালন করিয়া এবং গব্য বিক্রয় করিয়া যে কতদূর ঋদ্ধিলাভ হইতে পারে ডেন্‌মার্ক তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। ডেন্‌মার্কে সমবায় প্রণালীতে ডেয়ারী ফার্ম্মিং হওয়ায় সে দেশ দেখিতে দেখিতে যে কত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহার আলোচনা করিলে অবাক হইতে হয়। আমাদের দেশে সুনিয়ন্ত্র প্রণালীতে গোধনের সেবা ও পালন দ্বারা আমরাও অনায়াসে সেই সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং দেশের বহু বেকারের কর্ম্ম-সংস্থান করিতে পারি।

তা'ছাড়া আমাদের দেশের ভূমিতে যে তৈলপ্রদ বীজ জন্মায় তাহা আমরা অমনিই বিদেশে রপ্তানি করি আর বিদেশ হইতে আমদানি করি হয়ত সেই বীজেরই তেল। আমাদের বনজ সম্পদ্ হরীতকী ও গাছের ছাল রপ্তানি করি, বিদেশে গিয়া তাহা হইতে প্রস্তুত হয় চামড়া পাকাইবার মসলা। এমনি কত না কৃষিজাত ও বনজাত সম্পদ্ আমরা অপরিণত অবস্থায় কাঁচা মাল স্বরূপে বিদেশে রপ্তানি করি। এই সব কাঁচা মাল যদি আমরা পাকাইয়া লই, তবে দেশের সম্পদ্ বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। আর পাকা মাল করিয়া যা ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহাতে সম্পদসৃষ্টির নূতন উপাদান হইতে পারে। বীজ হইতে তেল বাহির করিলে যে খইল পড়িয়া থাকে তাতে গরুর খাবার হয়, জমির সার হয়। আমরা যে হাড়ের রপ্তানি করি তাহা জমিতে লাগাইবার মত করিয়া প্রস্তুত করিলে তাতে দেশের উর্ব্বরতা শক্তি বহু পরিমাণে বাড়াইতে পারি। দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লার ব্যবসা আমাদের মারা যাইতে বসিয়াছে। তার জন্য খনিওয়ালারা হাহাকার করিতেছেন। কিন্তু যে কয়লা তাঁরা লাভ রাখিয়া বেচিতে

পারিতেছেন না তাহা চোয়াইয়া যদি তাঁরা শুধু আলকাতরা, অ্যামোনিয়া, কার্ব্বলিক অ্যাসিড ও গ্যাস প্রভৃতি প্রস্তুত করেন তবে তাঁদের সম্পদের অবধি থাকে না, দেশের অনেক বেকার লোকেরও কর্ম্মসংস্থান হয়।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। যে কেহ এই সব বিষয়ের অনুশীলন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের দেশে যত সব কাঁচা মাল আছে তাহা আমাদের দেশের ফালতু শ্রমশক্তি লাগাইয়া পণ্য তৈয়ার করিলে আমাদের দেশের সম্পদ্ অনায়াসেই বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। বুদ্ধিমান গৃহস্থ তার সমস্ত সম্পদ্ ও উপায় যেমন গুছাইয়া ব্যবহার করিয়া আপনাকে সম্পন্ন ও সুখী করিয়া তোলে, তেমনই সুবুদ্ধি লইয়া সমস্ত জাতি যদি দেশের সব উপাদান ও সকল শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার করে তবে যে বাঙ্গলা আজ দীনাতিদীন সেই বাঙ্গলা বিশ্বের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ ধনী জাতি অনায়াসেই হইতে পারে।

আমাদের এই ঋদ্ধি গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন শুধু সংগঠনের—সমস্ত শক্তি ও উপাদানের সুনিয়ত বিন্যাসের—আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় একাজ করিতে আর একটা প্রকাণ্ড জিনিষের প্রয়োজন আছে—সে মূলধন। আর অমনিই ভাবে একটা জাতীয় সমবায় গড়িয়া তুলিবার জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন হইবে সে একটা বিরাট অঙ্ক।

কিন্তু সমগ্র জাতি যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে সুনিয়ত প্রণালীতে ঋদ্ধিগঠনে প্রবৃত্ত হয় তবে মূলধনের অভাবটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কেন না সমগ্র জাতির 'ক্রেডিট'এ মূলধনের কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

শিল্প ও ব্যবসায় বর্ত্তমান অবস্থায় নগদ টাকায় যতটা চলে তার চেয়ে অনেক বেশীগুণে চলে 'ক্রেডিট'এ। 'ক্রেডিট' মানে ভবিষ্যৎ সম্পদের বর্ত্তমান প্রয়োজনে ব্যবহার। ছয়-মাস কি এক বৎসর বাদে আমার লক্ষ টাকার সম্পদ সৃষ্ট হইবে একথা যদি সুনিশ্চিত হয়, তবে সেই ভবিষ্যৎ সম্পদের ভরসায় লোকে বর্ত্তমানে আমাকে আমার প্রয়োজনীয় বস্তু অনায়াসে ঋণ দিবে। এই 'ক্রেডিট' সংগঠিত করে ব্যাঙ্ক। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের চেষ্টায় দেশের সমবেত 'ক্রেডিট' কতকটা কেন্দ্রীভূত হইয়া ব্যবসায় ও বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়। একটা সুগঠিত ব্যাঙ্ক-সমবায়ের দ্বারা অর্থের অভাব অনেক পরিমাণে মিটিতে পারে।

সমস্ত জাতির 'ক্রেডিট'টা যদি নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই কৃষি শিল্প ও ব্যবসায়ে খাটান যায়, তবে নগদ মজুদ টাকার কোন প্রয়োজনই হয় না।

এখন একজন গৃহস্থের যদি এক হাজার মণ পাট থাকে, যার বাজার মূল্য ১০ হাজার টাকা, তবে তাহার নিকট হইতে পাট আনিতে হইলে তাকে ১০ হাজার টাকা দিতে হইবে। তাহার সে টাকার প্রয়োজন, কেন না তার মহাজনকে টাকা দিতে হইবে, জমীদারকে খাজনা দিতে হইবে, প্রয়োজনীয় জিনিষ সব কিনিতে হইবে, পরের বৎসরের চাষের জন্য আয়োজন করিতে হইবে, দুর্দ্দিনের জন্য অর্থ বাঁচাইতে হইবে। কিন্তু মনে করুন, সেই পাট সে বেচিল এমন একজন লোকের কাছে যার যথেষ্ট 'ক্রেডিট' আছে, এবং হয়তো সে সেই দেশের সমস্ত কারবারের মালিক। তখন সেই খরিদ্দার যদি তাকে টাকা না দিয়া ১০ হাজার টাকার 'ক্রেডিট নোট' দেয়, এবং মনে করুন সেই 'ক্রেডিট নোট লইয়া তার মহাজন সন্তুষ্ট হন, জমীদার খাজনা মিটাইয়া লন, সেই মহাজনের অন্য কারবার হইতে গৃহস্থ তার আবশ্যক সব জিনিষ পাইতে পারে, মজুর তাহা লইয়া কাজ করিতে রাজী হয়, তবে গৃহস্থের টাকা লইবার কোনও প্রয়োজনই থাকে না। আর খরিদ্দারও যথাসময়ে সেই পাট বেচিয়া তার ১০ হাজার টাকা মায় লাভ ওয়াশীল করিয়া লইতে পারে।

টাকা বা নোটও ঠিক এই ধরণের 'ক্রেডিট নোট' ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। টাকা চলে, কেন না আমরা টাকার বিনিময়ে ইচ্ছা করিলেই যে কোনও জিনিষ পাইতে পারি। টাকা শুধু সমস্ত দেশের নিয়ন্ত্রিত 'ক্রেডিট'এর প্রতীক। সুতরাং কেবল মাত্র সমস্ত দেশের 'ক্রেডিট'কে সুনিয়ন্ত্রিত করিলেই প্রত্যেক ব্যবসায় বা বাণিজ্যের জন্য আবশ্যক মূলধন অনায়াসেই পাওয়া যাইবে।

মনে করুন, একজন মহাজনের কারখানায় ১০ হাজার মজুর খাটিতেছে ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচামাল ও অন্যান্য

আবশ্যক জিনিষ আমদানি হইতেছে। টাকা দিয়া যদি মাল লইতে হয় এবং সব মজুরকে যদি নগদ বেতন দিতে হয়, তবে তাকে বৎসরে হয় তো ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করিতে হয়। সুতরাং ২৫ লক্ষ টাকার কার্য্যকরী মূলধন তাঁর দরকার। তার ফলে যে সম্পদ্ উৎপন্ন হইবে তাহার মূল্য হইবে কোটি টাকা। মহাজনের সেই কোটি টাকা উপস্বত্বের দিকে চাহিয়া সকলে তার 'ক্রেডিট নোট' টাকার মতই যদি গ্রহণ করে, তবে মহাজন ঘর হইতে এক পয়সাও বাহির না করিয়া কেবল মাত্র ২৫ লক্ষ টাকার 'ক্রেডিট নোট' দিয়া এই কোটি টাকার সম্পদ্ সৃষ্টি করিতে পারেন।

দেশের 'ক্রেডিট' যদি এমনই ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত বা র‍্যাশান্যালাইজ করিয়া লওয়া যায় তবে কাজেই মূলধনের অভাবে কোনও উৎপাদনবহুল শিল্প বা বাণিজ্য আটকাইয়া থাকিবার কথা নয়।

সুতরাং কেবলমাত্র সুনিয়মন দ্বারা—সমস্ত দেশের শক্তি ও উপাদান সংহত করিয়া সম্পদ্-বৃদ্ধির চেষ্টায় নিয়োজিত করিলেই ঋদ্ধি আমাদের করায়ত্ত।

আমাদের দেশে ধনসৃষ্টির প্রক্রিয়া এত প্রভূত পরিমাণে অপচয়বহুল এবং ইহাকে সুনিয়ত করিতে গেলে সে চেষ্টাটা এত বৃহৎ এবং বিস্তীর্ণভাবে করিতে হইবে যে, তার কল্পনাই কোনও ব্যক্তি-বিশেষ বা সঙ্ঘ-বিশেষের পক্ষে বাতুলতা বলিয়া মনে হইবে। ইংলণ্ডের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে সামান্য পরিমাণে র‍্যাশান্যালিজেশন অন্ততঃ উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় হইতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশের নিদারুণ প্রয়োজন শুধু 'র‍্যাশান্যালিজেশন'এ মিটিবে না।

ইংলণ্ডেও 'র‍্যাশান্যালিজেশন' দ্বারা কোনও স্থায়ী উপকার হইবে কিনা সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহের অবসর আছে। ইংলণ্ড এবং অন্যান্য সকল দেশের অর্থনীতিমূলক সমস্যার চরম সমাধান 'র‍্যাশান্যালিজেশন' নয় 'ন্যাশান্যালিজেশন'। সমস্ত দেশের সকল উপচার ও উপাদানকে সংহত ও সুনিয়ত করিয়া সমগ্র জাতির সংহত কর্ম্মশক্তির দ্বারা তার বিনিয়োগ ও জাতীয় প্রয়োজন অনুসারে উৎপন্ন সম্পদের বিভাগই একমাত্র প্রকৃত 'ন্যাশান্যাল' ব্যবস্থা। ব্যক্তিগত ধনবাদ বিশ্বাসী জগৎ এখনও এই চরম সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। এই সত্যের মূল তত্ত্বটা অনেককেই অল্পবিস্তর উপলব্ধি করিতে হইতেছে; কিন্তু ধনিকের স্বার্থের সহিত ইহার সংঘাতের জন্য ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে লোকে এখনও প্রস্তুত নয়। তাই নানাদেশে নানারূপ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে বর্ত্তমান ধনবাদের খুঁটিনাটি দোষ সংশোধন করিয়া এই 'অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎকে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টায়। 'র‍্যাশান্যালিজেশন' শুধু এমনি একটা চেষ্টা। ইহা 'ন্যাশান্যালিজেশন'এর অভিমুখে যাত্রাপথে একটা অস্থায়ী বিশ্রামাগার মাত্র।

বর্ত্তমান যুগে শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে কতকগুলি কথা অবিসম্বাদী সত্য রূপে স্বীকৃত হইতেছে। প্রথমতঃ, এখন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, কোনও দেশের শিল্পবাণিজ্য এখন কেবল মাত্র ধনিক বা ধনিক-সঙ্ঘের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, তার সঙ্গে সমস্ত জাতির স্বার্থ বিজড়িত আছে। সুতরাং শিল্পবাণিজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব, কর্ত্তব্য এবং অধিকার আছে। দ্বিতীয়তঃ, একথাও সকল দেশেই অল্পবিস্তর স্বীকৃত হইয়াছে যে, লোকে যাতে বেকার ও নিরুপার্জ্জন হইয়া না থাকে সে ব্যবস্থা করিবার জন্য রাষ্ট্র দায়ী। এই দুটি সত্য যদি অবিসম্বাদী হয়, তবে ক্রমে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, দেশের সমগ্র শিল্প-বাণিজ্যের নিয়মনের ভার রাষ্ট্রের হইবে। কেন না সমস্ত শিল্প বাণিজ্য জাতীয় প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিয়মিত করিতে না পারিলে বেকার-সমস্যা সমাধানের কোনও চরম ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিতেই পারে না। সুতরাং এই সব আধাআধি ব্যবস্থার দ্বারা ধনিক-শাসিত জগৎ 'ন্যাশান্যালি-জেশন'কে আজ যতই ঠেকাইয়া রাখুক, কালক্রমে সেই পরিণতিকেই ইহার মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

'ন্যাশান্যালিজেশন' মানে এই যে, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বার্থের দ্বারা গঠিত ও নিয়মিত না হইয়া সেগুলি গঠিত ও নিয়মিত হইবে জাতির নিয়ন্ত্রিত শক্তির দ্বারা সমগ্র জাতির স্বার্থের জন্য। ইহার ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থের নিরন্তর সংঘাতের স্থলে হইবে সকল

স্বার্থের সামঞ্জস্য-সংগঠন। একজন সুনিপুণ গৃহস্থ যেমন তার সকল সম্পদের হিসাব কিতাব করিয়া তার সুনিয়ত বিন্যাসের দ্বারা তার উপার্জ্জন নিয়মিত করে, তেমনই সমগ্র দেশের সকল সম্পদ্, সকল শক্তি নিয়মিত করিবে রাষ্ট্র। পশ্চিমের সকল দেশেই শিল্প-বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের আধিপত্য ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী শেষ ফল কোনও না কোনও প্রকারের 'ন্যাশান্যালিজেশন'। কিন্তু ইউরোপে সেটা দূরবর্ত্তী পরিণতি, আমেরিকায় তাহা এখন সুদূর পরাহত।

আমাদের দেশে অবস্থা ভয়াবহ। আমাদের দেশের কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যের আদ্যোপান্ত আমূল সংস্কার না করিলে আমাদের আশা নাই। আর সে সংস্কারের একমাত্র উপায় ন্যাশান্যালিজেশন। দেশের লোকের সদিচ্ছা ও চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া সে কাজ ফেলিয়া রাখিলে কোনও দিন তাহা হইয়া উঠিবে না। বিশ্বের অর্থনৈতিক সমাজের ভিতর আমাদের দেশের স্থান হীনাতিহীন। যত দিন যাইতেছে, আর সকল জাতি ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে আমরা প্রতিদিনই বেশী পিছাইয়া পড়িতেছি। আমাদের ভাণ্ডার ভরা ধন লইয়া আজ বিশ্বের দুয়ারে ভিখারীর অবজ্ঞাত ক্ষুদ্র স্থানের কাঙাল আমরা। এ কাঙালের বেশ ছাড়িয়া যদি আমাদের সম্মানের স্থান অধিকার করিতে হয় তবে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও স্বেচ্ছাকৃত সঙ্ঘবন্ধনের ভরসায় বসিয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না, সমস্ত জাতিকে কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে, সম্পদের সকল উপাদান গুছাইয়া ব্যবস্থা করিবার জন্য।

'ন্যাশন্যালিজেশন' ছাড়া ভারতবর্ষ—অন্ততঃ বাঙ্গলাদেশ কোনও দিনই তার দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। বাঙ্গলার সমস্ত সম্পদ্ জাতীয়ভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা জাতির মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট ও নিয়মিত করিলেই শুধু সম্ভব হইবে বাঙ্গলার ঋদ্ধি-গঠন।

বলা বাহুল্য 'ন্যাশন্যালিজেশন' শুধু তখনই সার্থক হইতে পারে, যখন রাজশক্তি হয় নেশনের নিয়ন্ত্রিত শক্তি। ভারতের স্বায়ত্তশাসন আজ আর সুদূর স্বপ্ন নয়। অচির ভবিষ্যতে ভারতীয় শাসনযন্ত্র যে দেশবাসীর হাতে আসিয়া পড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আমাদের স্মরণ করিবার প্রয়োজন যে, বিদেশীয়ের শাসন হইতে মুক্তিই জাতির পরমার্থ নয়। জাতীয় মঙ্গল সাধনের জন্য চাই সেই স্বদেশীয় শাসন ব্যবস্থা যাতে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধিত হইবে। কিসে সে মঙ্গল তাহাও ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

যদি দেশের প্রকৃত মঙ্গল আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে শুধু নিরুপাধিক স্বাধীনতার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ না হইয়া আমাদের চেষ্টা করা আবশ্যক হইবে এমন একটা শাসন-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাহার দ্বারা দেশকে দারিদ্র্যের গভীর পঙ্ক হইতে উত্তোলিত করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধি ও আর্থিক স্বাধীনতার দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। আমরা চাই একটি প্রকৃত 'ন্যাশান্যাল গভর্ণমেণ্ট', যাহা সাহস ও শক্তিসহকারে দেশের সকল উপাদান ও শক্তি সংহত করিয়া বর্ণজাতি-সমৃদ্ধি-নির্ব্বিশেষে প্রতি দেশবাসীর পরিপূর্ণ মঙ্গল ও অভ্যুদয়ের জন্য তাহা নিয়োজিত করিবে।

সেই স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রত্যেকে প্রকৃত স্বাধীনতা পাইবে, যাতে জাতীয় মঙ্গলের সকল উপাদান সমগ্র জাতির সংহত চেষ্টায় বিনিয়োগ করিয়া দেশের পরিপূর্ণ কল্যাণ সাধন করিবে।*

* বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত।

ষ্টক্ বাজারে দুর্য্যোগ ও ছোটখাট ষ্টক্-হোল্ডার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল

১৯২৯ সনের নভেম্বর মাসে আমেরিকার ষ্টক্ বাজারে যে বিপুল দুর্য্যোগ উপস্থিত হইয়াছিল সে খবর সংবাদপত্রের মারফৎ অনেকের জানা আছে। দিন দিন ষ্টক্-হোল্ডারদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া এই সঙ্কটের সময়ে অধিক সংখ্যক লোককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ক্রমশঃ আমেরিকাবাসীদিগের মধ্যে ষ্টক্ সঞ্চয় করার আকাঙ্ক্ষা কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে তাহারই একটা মোটামুটি আলোচনা এই প্রবন্ধে করা যাইবে।

এই সঙ্কটের সময়ে ষ্টক্ বাজারের হিসাব-বহিতে মুনাফার অংশটা শূন্য দাঁড়াইয়াছিল বলিলেই হয়। ইহার পূর্ব্বে কখনও এরূপভাবে মুনাফা লোপ পাইতে দেখা যায় নাই। আমেরিকার বাজারে সেই সময়ে অনেক লগ্নিকারক বা "ইনভেষ্টর" এরূপ একটা গুজব তুলিয়াছিলেন যে, ফটকা জুয়াড়ীদের মত তাঁহারাও বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে লগ্নিকারক ও ফটকাজুয়াড়ীর মধ্যে তফাৎ অল্পই, যেহেতু উভয়েরই লক্ষ্য থাকে মুনাফার প্রতি। গোড়ায় অনেকেই হয়ত কেবল টাকা খাটাইতে সুরু করেন, পরে ফটকা খেলাতে মন দেন। এইভাবে বহু সহস্র লোক ষ্টক্ বাজারে নামিয়া টাকা লোকসান দিয়াছেন বা সঞ্চয় করিয়াছেন, অথচ ইঁহারা নিজেদের লগ্নিকারক ছাড়া অন্য কিছু বলিতে চাহেন না। ষ্টক্ কেনাবেচার আকর্ষণ অনেক অংশে মদের নেশার মত; অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীবনটা এই নেশায় ভরিয়া উঠে।

আমেরিকার বড় বড় কর্পোরেশ্যনগুলি কর্ম্মচারীদের ষ্টক্ খরিদ করিতে নানা ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। জেনারেল মোটর কর্পোরেশ্যন "সেভিংস এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট" প্ল্যান অনুসারে বৎসরের প্রারম্ভে নূতন এক শ্রেণীর ষ্টক্ বাহির করিয়া থাকে; পাঁচ বৎসর পরে এই ষ্টক্ পাওনা হইয়া উঠিলে কর্ম্মচারী নিজের জমা দেওয়া টাকা, সেই টাকার সুদ এবং কোম্পানীর দেওয়া একটা অংশ পায়। জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানী কর্ম্মচারীদিগকে সুদের সাবসিডিয়ারী বণ্ড দেয় ও কর্ম্মচারী কাজে নিযুক্ত থাকা পর্য্যন্ত নিজের থেকে ২% দিয়া থাকে। প্রেসিডেন্ট সোপ বলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোম্পানী কর্ম্মচারী দিগকে ৫০,০০০ শেয়ার দেওয়ার মনস্থ করে; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ঐ সব শেয়ারের দর পড়িয়া যাওয়ায় কর্ম্মচারিগণ শঙ্কিত হইয়া উঠে এবং শেয়ার খরিদ করিতে নারাজ হয়। আর যাহারা খরিদ করিয়া এই দুঃসময়েও শেয়ারগুলি হাতে রাখিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই শেয়ারের দর চড়িলে সেগুলি বিক্রয় করিয়া দেয়। ইহা হইতে ছোট খাট ইনভেষ্টরদের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট খাট ইনভেষ্টরগণ বাজার দর পড়িয়া গেলে শঙ্কা বোধ করে আর চড়িলে মোটা টাকা মুনাফা মারিবার প্রয়াস পায়। কর্ম্মচারীদিগের মন হইতে এই শঙ্কা এবং লোভ দূর করিবার জন্য "জেনারেল ইলেক্ট্রিক এম্প্লয়িজ সিকিউরিটিজ কর্পোরেশ্যন" প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মোট টাকার ২৫% বা অমনই একটা কিছু জেনারেল ইলেক্ট্রিক ষ্টকে খাটান হয়, আর বাকীটা সাধারণের কাজে লাগে এমন যে সব কোম্পানী আছে তাহাতে খাটান হইয়া থাকে।

ইহা হইতে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, বড় বড় কর্পোরেশ্যনগুলি কর্ম্মচারীদিগকে স্বীয় ষ্টক দিতে নারাজ। প্রেসিডেন্ট সোপের মতে কর্ম্মচারীরা উপরি উক্ত বণ্ড খরিদ করিবার পর কোম্পানীর ষ্টক খরিদ করিলেই বুদ্ধিমানের কাজ করিবে। জেনারেল মোটরস্ এর বেলায়ও কর্ম্মচারিগণ সেভিংস এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট প্ল্যান অনুসারে টাকা খাটানোর পাঁচ বৎসর পরে কোম্পানীর সাধারণ ষ্টক খরিদ করিতে পারে।

এই ষ্টক্ দুর্য্যোগে ছোট খাট লগ্নিকারককে কাবু করিতে পারে নাই। এই সব ছোট খাট ষ্টক্‌হোল্ডার ষ্টক্ বাজারের উঠ্‌তি বা নাম্‌তিতে অধিক সংখ্যক ষ্টক্ খরিদও করে নাই বা বেচিয়াও দেয় নাই। পক্ষান্তরে, যখন দুর্য্যোগ উপস্থিত হইল তখন ইহারাই অধিক সংখ্যক ষ্টক্ খরিদ করিয়া দুর্য্যোগটাকে প্রবল হইতে দিল না। কোন শিল্প-ধুরন্ধর বলেন যে, তাঁহার মতে যে সব ইনভেষ্টর আতঙ্ক উপস্থিত হইলেও স্বীয় ষ্টক্ হস্তান্তরিত না করিয়া বরং অধিক সংখ্যায় খরিদ করে তাহারাই ষ্টক্ দুর্য্যোগে উদ্ধার-কর্ত্তা।

ছোটখাট ইনভেষ্টরগণের স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তার প্রমাণ নানাভাবে পাওয়া যায়। যত লোক ফট্‌কা খেলায় মাতিয়াছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস তত লোক মাতে নাই। বহু ষ্টক্ মালিক ষ্টকের হাত ছাড়া করার কথা কখনও ভাবেন নাই। দুর্য্যোগের পূর্ব্বে ষ্টকের দর অভাবনীয় রূপে চড়িয়া যাওয়ায় তাঁহারা ষ্টক্ বিক্রয় করিয়া মোটা লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করেন নাই; সুতরাং তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, ঐ লাভের (যাহা তাঁহাদের হইলেও হইতে পারিত) টাকাটা লোকসান গিয়াছে। মোট কথা, এই সব ষ্টকের মালিকদের এই দুর্য্যোগে কোন ক্ষতি হয় নাই। কোন তথ্যতালিকা নাই বলিয়া আমরা বলিতে পারি না, কত লোক ষ্টক্ বাজারে কেনা বেচা করিয়াছে—সুতরাং বহুশত লোক ষ্টক্ বাজারে কেনা বেচা করিয়াছে বলিলে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হয় না। ফেডারেল আয়-করের তালিকা দেখিয়া জনৈক লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঊর্দ্ধ পক্ষে ২৫০,০০০ চল্‌তি বা "একটিভ্" আর ৫০০,০০০ স্থির বা ইন্‌একটিভ্ ষ্টক্ বাজার হিসাব আছে। তহবিল বিভাগের হিসাব পরীক্ষক যোসেফ এস্ ম্যাক্‌কয় বলেন যে, ষ্টক্-হোল্ডার বা বণ্ড-হোল্ডার তত অধিক সংখ্যায় নাই যত অধিক সংখ্যায় আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই দুর্য্যোগে অনূ্যন ৫০,০০,০০০ হইতে ১,০০,০০,০০০ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। যদি আয়করের তালিকাটা সত্য বলিয়া ধরা হয়, তবে ৫০,০০,০০০ হইতে ১,০০,০০,০০০ লোকের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথাটা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাঁহারা ফটকা জুয়ায় মাতিয়াছিলেন তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন বুঝিবা সকলেই এই খেলায় মজিয়াছে।

আরও একভাবে ইহা বুঝা যায়। ১৯২৯ সনে নিউ ইয়র্ক ষ্টক বাজারে জেনারেল মোটরস্ ফটকা খেলার একটা মস্ত বিষয় ছিল। তথাপি সারা বৎসরে জেনারেল মোটর ষ্টকের এক-তৃতীয়াংশেরও কম ষ্টক বাজারে কেনা বেচা হয়। স্পেকুলেটারদের অনেকেই আবার একই ষ্টক বৎসরের মধ্যে দুই চারিবার হাতফের করেন। অধিকন্তু এই ষ্টকের অনেকটা অংশ কেবলমাত্র টাকা খাটান হিসাবেই ব্যবহার করা হইয়াছে, জুয়াখেলার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই আকস্মিক স্ফীতির দিনেও জেনারেল মোটর ষ্টক্ বা ষ্টক্-হোল্ডারদের অনেকেই ষ্টক্ বাজারের সম্পর্কে আসে নাই। শুধু যে জেনারেল মোটরস্ এর বেলায়ই একথা খাটে এমন নয়। রেডিও ষ্টক সারা বৎসরে ছয় বার আর অ্যানাকোণ্ডা ষ্টক তিনবার কেনা বেচা হয়, যদিও এই দুইটাই খুব একটিভ্ ষ্টক্। মণ্টোগমেরি ওয়ার্ড এবং ক্রিসলার ষ্টক কেনা বেচা হয় মোটমাট তিন কি চার বার। আমেরিকান টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের ৫,০০,০০০ ষ্টক্‌হোল্ডার থাকিলেও মাত্র ইহার অর্দ্ধেক অংশ সমস্ত বছরে কেনা বেচা হয়; পেন্‌সিলভিনিয়া রেলরোডের ২,০০,০০০ ষ্টক্‌হোল্ডার থাকিলেও মাত্র এক-তৃতীয়াংশ, এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল অব্ নিউ জার্সির মাত্র অর্দ্ধেক কেনা বেচা হয়। যে সময়ে লোকের মনে ষ্টক বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল সে সময়েও বড় বড় করপোরেশ্যনগুলির মাত্র শতকরা তিন ভাগ হাতফের করে। চরম দুর্গতির দিনে ষ্টক এক্সচেঞ্জে ১,৬০,০০,০০০ শেয়ার কেনা বেচা হয়। যদি ইহার সবগুলি জেনারেল মোটরসের বলিয়াই ধরা হয়, তাহা হইলেও ঐ কোম্পানীর মাত্র ½ অংশ লেনদেন করা হয়। সাধারণ ভাবে বলা চলে যে, বড় বড় করপোরেশ্যনগুলির মোট ষ্টকের শতকরা এক ভাগেরও কম হাতফের করে। যদি এই সনের এক মাসের একটা গড় হিসাব ধরা যায় তাহা হইলেও দেখা যায় যে, ঐ সময়ের মধ্যে যে ষ্টকটা কেনা বেচা করা হইয়াছে

তাহা তিন চারিটা বড় বড় করপোরেশুনের মোট পুঁজির অধিক নয়।

সুতরাং আঁকজোক কষিয়াও দেখান যায় যে, সকলেই বাজারের আনাচে কানাচে ঘোরা ফেরা করে নাই অথবা আমেরিকান ষ্টকহোল্ডারদের অধিকাংশই লগ্নিকারক ফটকা জুয়াড়ী নহে, অর্থাৎ ষ্টকের মালিকিয়ানা সাধারণতঃ পরিবর্ত্তন করে না, আরও একভাবে ইহা প্রমাণ করা চলে। দুঃস্থ কর্ম্মচারীদিগকে (অর্থাৎ ষ্টক খরিদ করিয়া যাহারা ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছে তাহাদিগকে) সাহায্য করা হইবে বলিয়া বহু কোম্পানী ঘোষণা করিলেও অতি অল্প লোকই এই সাহায্যের জন্য প্রার্থী হইয়াছিল। নিউ জার্সির ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ২৩৮০০ শত ব্যক্তি ষ্টক খরিদ করিলেও মাত্র ১২৯ জন সাহায্যের জন্য আবেদন করে। এই সাহায্যপ্রার্থীদিগের মধ্যে ৯০জন ২৬নং ব্রডওয়ে স্থিত হেড অফিসে চাকুরী করিত। ব্রডওয়ে ওয়াল ষ্ট্রীটের সন্নিকটেই অবস্থিত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যে সব কর্ম্মচারী ওয়াল ষ্ট্রীটের কাছাকাছি ছিল ষ্টক্ স্পেকুলেশনের হাওয়া তাহাদেরই স্পর্শ করিয়াছিল। অধিকন্তু কেনা ষ্টক্ বেচিয়া দেয় মাত্র ৬৫ জন কর্ম্মচারী। কোন করপোরেশুন-সভাপতি বলেন যে, ১৯২৯ সনের শেষাশেষি কর্পোরেশুনের ষ্টকের খাতায় ষ্টক্‌হোল্ডারদের নামের সংখ্যা ⅓ বাড়িয়া যায়; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বড় বড় ষ্টক্-হোল্ডারগণ ষ্টক্ বিক্রয় করিতে থাকে আর ছোট খাটরা সেই সুযোগে সেই দিকে টাকা লাগাইতে থাকে। বোধ হয় সকল করপোরেশুন সম্বন্ধে একথা খাটে। ষ্টক্ বাজারে দুর্য্যোগ উপস্থিত হওয়ায় ছোট খাট ইন্‌ভেষ্টরগণের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। এই দুর্য্যোগের সময় বহু ষ্টক্ দালাল সমস্ত টাকাটা নিজেই দিয়া দালাল নাম খারিজ করিয়া ষ্টকের মালিক হইয়া বসিয়াছিলেন।

দুর্য্যোগের অব্যবহিত পরেই ২৭শে নভেম্বর পেন্‌সিল্‌ভিনিয়া রেল রোড ৭২০,০০,০০০ ডলারের নতুন ষ্টক্ বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করে; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ৯৮·৫% বিক্রয় হইয়া যায় এবং এই বিক্রীত অংশের ৯৭·৮% এক কিস্তিতেই পাওয়া যায়; মাত্র দু লাখ শেয়ারহোল্ডার দুই কিস্তিতে দিবার সুযোগ গ্রহণ করেন। আমেরিকান্ টেলিফোনের দর ৩০০ শত পর্য্যন্ত উঠিলে অনেক দালাল ও ব্যাঙ্কার মনে করিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই দরটা ৫০০ শত পর্য্যন্ত উঠিবে। এই বিশ্বাসের উপর কেনা বেচা হইতে থাকে। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে দর ৩১০½ উঠার পর নভেম্বর মাসে ১৯৩½ এ নামিয়া যায় এবং আবার ক্রমশঃ ২৩০% পর্য্যন্ত দর উঠিতে থাকে। এই সময়ে ছোটখাট ইনভেষ্টরগণের অনেকেই ষ্টক্ খরিদ করে। এই সব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ছোট খাট ইনভেষ্টরগণ স্থির প্রকৃতির সবজান্তা স্পেকুলেটারদের মত চঞ্চল নহে।

ষ্টক কেনা বেচা বিষয়ে আর একটা কথা লক্ষ্য করিতে হইবে—নারীর অভ্যুদয়। ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে যে, দিন দিন অধিকতর সংখ্যায় নারী ষ্টকের মালিক হইয়া উঠিতেছেন। বহু শত বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, বিবাহিতা, অবিবাহিতা নারী স্বামী বা অপর কোন অভিভাবকের নিকট হইতে উত্তরাধিকারী সূত্রে বা যৌতুক হিসাবে পাইয়া ষ্টকের মালিক হইয়া উঠিতেছেন—এই ষ্টক্ হইতে যে আয় হয় তাহারই উপর বহুশত নারীর জীবিকা নির্ভর করে। যে পর্য্যন্ত এই ষ্টক্ হইতে একটা মোটামুটি আয় পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত নারী সহজে তাহা হাত ছাড়া করিতে চাহে না। ১৯২৯ সনের আকস্মিক বাজার-স্ফীতির সময়ে অনেক নারীর স্পেকুলেসনের পাগলামি হইয়াছিল; তথাপি যে সকল নারী প্রধানতঃ ষ্টক্ ডিভিডেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া ষ্টক আঁকড়াইয়া বসিয়াছিল তাহাদের তুলনায় এই জুয়াড়ী নারীর সংখ্যা অতি অল্প। নারী সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত ষ্টক্ লইয়া থাকে এবং ডিভিডেণ্ট ও সুদ অধিক কাম্য বলিয়া মনে করে; ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু ইহারই জন্য ষ্টক্ মালিকিয়ানা অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবার ঝোক দেখা যায়।

আমেরিকায় এইরূপে ষ্টক্ দুই চার জন মহাজনের হাত হইতে জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় নব নব সমস্যার উদয় হইয়াছে। কোন বিশেষ লোক বা বিশেষ মণ্ডলীর মালিক হিসাবে বিশেষ স্বার্থ না থাকায় পরিচালনার মধ্যে শিথিলতা আসিবার সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই মালিকিয়ানা সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ায় শাসন ও শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িতে পারে এবং তখন সাধারণের পক্ষে সেই জটিলতার মর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তৃতীয়তঃ, শেয়ারের মালিক বহু হইয়া পড়ার ফলে জনসাধারণের ঐ সব সঙ্ঘগুলির দোষ ও ক্রটীর প্রতি অবহেলার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া আশ্চর্য্য নহে। যদি ষ্টক্-হোল্ডারদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায় তবে খাদকের দিক্ হইতে সঙ্ঘের অন্যায় বা অবিচারের প্রতিবাদ কে করিবে ?

সংক্ষেপে এই সমস্যাগুলির উত্তরে বলা যায় যে, সঙ্ঘগুলির ষ্টক্-হোল্ডারদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইলে তাহারা বিচক্ষণ পরিচালক নিযুক্ত করিতে পারিবে। এই সব পরিচালকগণের দায়িত্বজ্ঞান যথেষ্ট থাকে। ব্যবসায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে সাধারণের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রসারণশীল শিল্পসমূহে অধিকতর পুঁজি প্রয়োজন হইতেছে বলিয়া ষ্টক্-হোল্ডারদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পুঁজি গ্রহণ করা অপেক্ষা ষ্টক্-হোল্ডারদের নিকট হইতে পুঁজি গ্রহণ করা সঙ্ঘগুলি অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করেন। বড় বড় কোম্পানীগুলি ছোট কোম্পানীগুলিকে আত্মসাৎ করিতেছে; ইহার জন্য কোম্পানীকে ষ্টকের পরিমাণ বাড়াইতে এবং পুরাতন শেয়ার-হোল্ডারদের অধিকতর ষ্টক্ বিক্রয় করিতে হইতেছে; সুতরাং জনসাধারণের টাকা খাটানোর পথ সুগম হইয়াছে। যে দেশের লোক ২৫০,০০,০০০ বা ৩০০,০০,০০০ মোটর গাড়ীর মালিক সে দেশের শেয়ার মালিকিয়ানা যে অশেষভাবে বাড়িতে পারে তাহা নিঃসন্দেহ।

বড় বড় ব্যবসায়ে পরিচালকদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয় সাধারণের মঙ্গলসাধন নহে, যে সব কোম্পানীর পরিচালনা তাহাদের হাতে সেইগুলির উন্নতিসাধনই তাহাদের লক্ষ্য, যেহেতু তাঁহাদের মতে কোম্পানীগুলি সমৃদ্ধিশালী হইলে জনসাধারণ লাভপরবশ হইবে। আমরাও বলি যে কোম্পানীগুলির মালিক-সংখ্যা যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। কেন না ইহা শিল্পের যুগ এবং একমাত্র এই উপায়েই জনসাধারণকে শিল্প-সভ্যতার অংশীদার করা যাইতে পারে।

কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের এবং জনসাধারণকে যত অধিক সংখ্যায় ষ্টকের মালিক করা যাইবে কোম্পানীর খরিদ্দারের সংখ্যা তত অধিক হইবে। ষ্টক্ মালিকিয়ানা সাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিবার ইহাও বিশেষ কারণ। বিক্রয়ের মাত্রা যে কতখানি বাড়ে বলা কঠিন, তবে বিক্রয় বাড়াইবার ইহা যে একটী উপায় তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। জেনারেল ইলেকট্রিক্ ষ্টকের কথাই ধরা যাউক। এই কোম্পানী-নির্ম্মিত ধোলাই কল, রেফ্রিজারেটার, ভ্যাকুয়াম, ক্লিনার, পাখা প্রভৃতি ক্রয় করিবার ইচ্ছাই এই কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারদের বেশী দেখা যাইবে। নারী ষ্টক্-হোল্ডারের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নারী গৃহিণী বলিয়া অনেক পণ্য নিজেই খরিদ করে। উপার্জ্জন-ক্ষেত্রে পুরুষের সকল মন নিবিষ্ট থাকে; কোন যন্ত্রপাতি খরিদ করার বেলায় সে ভাবিয়া দেখে না যে তাহা কোন্ কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত,—যে কোম্পানীতে তাহার দশটী শেয়ার আছে সে কোম্পানীর তৈয়ারী না হইয়া যদি অপর কোন কোম্পানীর তৈয়ারী হয় তবে সে তাহা গ্রাহ্য করে না, কেননা এই সামান্য লাভে তাহার কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু নারীর বেলায় একথা খাটে না। নারীর উপার্জ্জন শক্তি কম বলিয়া সামান্য দশটা শেয়ারের মূল্য তাহার কাছে অনেক; সুতরাং সে দেখিয়া শুনিয়া ঐ কোম্পানীর তৈয়ারী পণ্যই খরিদ করিবে, অন্য পণ্য নহে।

শেয়ারের দর কয়েক শত ডলার হইলে ধনী লোক ভিন্ন সাধারণ লোকের পক্ষে ষ্টকের মালিক হওয়া কঠিন। অনেক বড় বড় শিল্পে তাই শেয়ারের দর কমাইয়া দেওয়া হইতেছে বা মোটা টাকার একটা শেয়ারকে ভাঙ্গিয়া চার পাঁচটা ছোট শেয়ারে পরিণত করা হইতেছে। একথা সহজেই বোঝা যায় যে, একজন ছোটখাট ইনভেষ্টর ৫০ ডলার দরের পাঁচটা ষ্টকের শেয়ার খরিদ করিতে পারে, কিন্তু সে ২৫০ ডলার দরের একটী শেয়ার খরিদ করিবে না। এমনিই জটিল মানব প্রকৃতি।

দিন দিন ষ্টকের মালিকিয়ানার এরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে যে তাহার ফলাফল ভাল কি মন্দ তাহা ভবিষ্যতে বোঝা যাইবে।

রাষ্ট্রের ব্যয়

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ, তত্ত্বনিধি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাষ্ট্রের খরচের বিভাগ

বর্ত্তমান সময়ের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রের খরচের দফাগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :—(১) মুখ্য ও (২) গৌণ*। রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্ত্তব্যের জন্য খরচগুলিকেই উহার মুখ্য খরচ বলা যাইতে পারে, যথা (ক) দেশরক্ষা, অর্থাৎ সৈন্য সামন্ত, নৌবাহিনী ও আকাশযানের জন্য ব্যয়। (খ) দেশের ভিতরে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য ব্যয়। এইখাতে পড়ে পুলিশ, বিচার ও জেল প্রভৃতির খরচ। (গ) শাসনবিভাগের দেওয়ানী খাতে ব্যয়। ইহার মধ্যে পড়ে গভর্ণমেণ্ট বা শাসন যাঁহারা চালাইবেন তাঁহাদের বেতন ও ভাতা, সিভিল সার্ভিসের ও দপ্তরখানার (সেক্রেটারীয়েট) ব্যয়, ব্যবস্থাপক সভার খরচ এবং কিছু কিছু রাজনৈতিক দায়, যেমন অপর দেশে গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের বেতন ও সরঞ্জামি খরচ। কর সংগ্রহের খরচ ও এই খাতেই পড়ে। (ঘ) রাষ্ট্রের ঋণ। ঋণের কতক অংশ দেশের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হয়, আর কতক তাহা হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রের ঋণের মোট পরিমাণই মুখ্য খরচের খাতে পড়ে। কারণ রাষ্ট্রের আয়ের উপর ইহার দাবীই সর্ব্বপ্রধান।

রাষ্ট্রের গৌণ খরচের দফাগুলির মধ্যে পড়ে (১) সামাজিক ব্যয়, যথা—শিক্ষা, সার্ব্বজনীন স্বাস্থ্য, গরীবের দুঃখ মোচন, বেকার বীমা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয়। (২) ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণায় যে সকল কাজ কোনও ব্যক্তি করিতে চাহে না, অথবা করিলেও ভাল হয় না সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য সেই সকল কাজ করা অথবা তজ্জন্য প্রতিষ্ঠান রক্ষা করা, যেমন :—পথঘাট, রেল, খাল, বন্দর, জলসেচ এবং অন্যান্য সার্ব্বজনীন কাজ, ডাক ও টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, কৃষি ও শিল্প গবেষণার জন্য ব্যয়, খনি ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য তথ্যানুসন্ধান (সার্ভে), ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য যানবাহন ও আকাশযান। (৩) রাষ্ট্রের গৌণব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বিবিধ ব্যয়ের খাতে পড়িবে পেন্সন ও ওয়াপস।

দেশরক্ষা

প্রত্যেক রাষ্ট্রের মুখ্য খরচের প্রধান দফা—সামরিক ব্যয়। এই বাবদ খরচ প্রতি দেশেই কি রকমভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা নীচের হিসাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে :—

ইংলণ্ড

সন		ব্যয়
১৭৭৫	...	৩,৮১০,০০০ পাউণ্ড
১৮২৩	...	১৪,৩৫০,০০০ „
১৮৪৭	...	১৮,৫০০,০০০ „
১৮৫৭-৮	...	২৩,৫০০,০০০ „
১৮৬৮-৯	...	২৬,৮৯১,০০০ „
১৮৭৮-৯	...	৩০,২৫২,০০০ „
১৮৮৯-৯০	...	৩২,৭৮১,০০০ „
১৮৯৩-৪	...	৩৩,৫৬৬,০০০ „
১৮৯৫-৬	...	৩৭,৪০৭,০০০ „
১৯০০-১ (যুদ্ধ)	...	১২১,২৩০,০০০ „
১৯২৮-২৯	...	১১৪,৬০০,০০০ „
১৯২৯-৩০	...	১১২,৬১০,০০০ „

* জি, ফিণ্ডলে সিরাজ প্রণীত "দি সায়েন্স অব্ পাব্লিক ফিনান্স"। পৃঃ ৫০। রাষ্ট্রের খরচগুলিকে নানা পণ্ডিত নানা ভাবে ভাগ করিয়াছেন। কিন্তু কোনটাই দোষমুক্ত নহে।

জার্ম্মাণি

সন		ব্যয়	
১৮৭৩	...	১৯,২০০,০০০	পাঃ
১৮৭৬	...	২১,৯০০০,০০০	„
১৮৮৩-৪	...	২২,৭৫০,০০০	„
১৮৮৮-৯	...	৪১,৯০০,০০০	„
১৯০০-১	...	৩৯,০৯০,০০০	„
১৯০২-৩	...	৩৯,৯৪৬,০০০	„
১৯২৭-২৮	...	৩৪,৩৭৩,৪৭০	„
১৯২৮-২৯	...	৩৪,৪৬৮,৫৭৫	„

ইটালী

১৮৬২	...	৮,৫০০,০০০	„
১৮৬৯	...	৬,৮০০,০০০	„
১৮৭৫	...	৮,৭৬০,০০০	„
১৮৮০	...	১০,১২০,০০০	„
১৮৮৬	...	১৩,১২০,০০০	„
১৮৯০	...	১৪,৫০০,০০০	„
১৯০০-১	...	১৫,৩৭৭,০০০	„

ফ্রান্স

১৭৭৪	...	৪,৮৮০,০০০	„
১৮৩০	...	১২,৯৬০,০০০	„
১৮৪৭	...	১৯,৩২০,০০০	„
১৮৫৮	...	১৯,৯৬০,০০০	„
১৮৬৮	...	২৬,৩২০,০০০	„
১৮৭৮	...	২৯,২৪০,০০০	„
১৮৯০	...	৩৭,৬৪০,০০০	„
১৯০০	...	৩৮,৮৮০,০০০	„
১৯০২	...	৪১,১৫১,০০০	„

ভারতবর্ষ

১৮৬১-৬২	...	১৬,৯৪,৯৬,০০০	টাকা
১৮৭১-৭২	...	১৬,২৫,২২,০০০	„
১৮৮১-৮২	...	২০,৩৫,২৭,০০০	„
১৮৯১-৯২	...	২৩,৫১,৩৪,০০০	টাকা
১৯০১-২	...	২৫,৮৩,৩৭,০০০	„
১৯১১-১২	...	৩১,৩৫,২৫,০০০	„
১৯১৩-১৪	...	৩১,৮৯,৮৬,০০০	„
১৯১৪-১৫	...	৩২,৭১,৪৪,০০০	„
১৯১৫-১৬	...	৩৫,২৫,৪৬,০০০	„
১৯১৬-১৭	...	৩৯,৮৫,০১,০০০	„
৯৯১৭-১৮	...	৪৬,১৪,৫৫,০০০	„
১৯১৮-১৯	...	৭০,২৪,৫৩,০০০	„
১৯১৯-২০	...	৯১,০৩,০০,০০০	„
১৯২০-২১	...	৮৮,২৩,২৪,০০০	„
১৯২১-২২	...	৭৭,৮৭,৯৮,০০০	„

দেশরক্ষার খাতে খরচ একেবারে তুলিয়া দেওয়া যায় না। শত্রুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা না রাখিতে পারিলে শিল্পবাণিজ্য কেন, কোনোপ্রকার উন্নতিই সম্ভবপর নয়।

বাড়িয়াছে কেন?

সকল দেশেই যে খরচ একই ভাবে বাড়িয়াছে তাহা নহে, তবে গতিটা বৃদ্ধির দিকেই। এ্যাডাম্ স্মিথ তাঁহার "ওয়েল্‌থ্ অব্ নেশনস্" বহিতে প্রায় ১৫০ বৎসর আগে লিখিয়াছিলেন, "প্রতি সমাজই সভ্যতায় যত অগ্রসর হয় দেশ-রক্ষার খাতে উহার খরচ ততই বাড়িয়া চলে"। হইয়াছেও তাহাই। এখনো পৃথিবীর নানাদেশে মানুষের চরিত্র যে স্তরে রহিয়াছে তাহাতে জাতিতে জাতিতে রেষারেষি, কলহ ও যুদ্ধাদি অসম্ভব হয় নাই। কাজেই দেশরক্ষার ব্যয় তুলিয়া দেওয়া এখনও সম্ভবপর নহে। শত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষা করিয়া সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা না রাখিতে পারিলে শিল্প-বাণিজ্য কেন, সকল প্রকার উন্নতিই বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

বিভিন্নদেশে এই খাতে খরচ বাড়িবার একটি কারণ জিনিষপত্রের মূল্য-বৃদ্ধি। কিন্তু ভারতবর্ষ, গ্রেটবৃটেন, ক্যানাডা, জাপান, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে জিনিষ পত্রাদির দাম যে হারে বাড়িয়াছে তাহার চেয়েও বেশী হারে

বাড়িয়াছে দেশরক্ষার ব্যয়। দ্বিতীয় কারণ, শ্রমবিভাগ। সভ্যসমাজে শ্রমবিভাগ প্রচলিত হওয়াতে এখন আর সমাজের সকল মানুষই দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধাদি শিখিয়া তৈরী থাকে না। কতগুলি লোককে ঐ উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষা দিয়া তৈরী করিয়া রাখা হয়। তাহারা দেশের ধনসম্পদ উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে না। সামরিক কাজের জন্য যাহাদিগকে রাখা হয় তাহাদিগকে চল্‌তি মজুরীর চেয়ে কিছু বেশী দেওয়াই রেওয়াজ। সামরিক কাজের জন্য বিশেষ করিয়া কতগুলি লোককে না পুষিয়া যদি সমাজে সমর্থ ব্যক্তিমাত্রকেই সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা হইলে দেশরক্ষার খাতে ব্যয় অনেক কমিয়া যাইত। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যসমাজেই এখনো তাহা সম্ভব নহে। তৃতীয় কারণ, নূতন নূতন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার। বৈজ্ঞানিকদিগের কৃপায় ক্রমশই নূতন নূতন অস্ত্রশস্ত্র ও মানুষ মারিবার কল কৌশলাদি আবিষ্কৃত হইতেছে। সভ্য সমাজ এই সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্য লওয়াতে শান্তির সময়কার সামরিক খরচ এবং লড়াইয়ের খরচ দুইই বাড়িয়া চলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বুয়ার লড়াইয়ের সমসমকালে বিলাতের শান্তির সময়কার সামরিক খরচ ছিল বৎসরে ৪ কোটি পাউণ্ড। বিংশশতাব্দীর প্রথম দিকে এই খরচ ছিল গড়ে প্রায় ৫৷৷-৬ কোটি পাউণ্ড। দ্বিতীয় দশকের প্রথমার্দ্ধে (১৯১০-১৪) দেখি ৬৷৷০-৭৷৷০ কোটি পাউণ্ড।

লড়াইয়ের হিসাবেও খরচের বাড়তি নজরে পড়িবে।

সন	লড়াই	মোট খরচ
১৮৫৪-১৮৫৭	ক্রিমিয়ায় রুশ লড়াই	৭ কোটি ৩০ লাখ পাঃ (৩ বৎসরে)
১৮৯৯-১৯০৩	বুয়ার লড়াই	২৮ কোটি ১০ লাখ পাঃ (৪ বৎসরে)
১৯১৪-১৯১৮	বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র	৯৫৭ কোটি পাঃ (৫ বৎসরে)

সামরিক ব্যয় সোজাসুজিভাবে দেশের ধনসম্পদ্ বাড়ায় না, কিন্তু দেশকে নিরাপদ রাখিয়া গৌণভাবে ধনোৎপাদনে সহায়তা করে। এই গৌণ ফললাভের জন্য অপরিমিত ব্যয় যুক্তিসঙ্গত কি? দেশের সম্পদের অধিকাংশই যদি যায় সামরিক ব্যয়ে, তাহা হইলে ধনবৃদ্ধি হইবে কম। শান্তির সময়েও দেশে দেশে সমর-সজ্জার জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, এবং যে জনবল উহাতে আবদ্ধ থাকে তাহার কতক অংশও যদি মুক্ত করিয়া ধনবল ও জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য লাগানো যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর সুখ-সমৃদ্ধি আরও অনেক বাড়িতে পারে। জাতিসঙ্ঘের (লীগ অব্ নেশন্‌স্) যুদ্ধবিরতির চেষ্টা যদি কখনও সফল হয়, তাহা হইলে প্রতি দেশের সামরিক ব্যয় কমিতে পারে। কিন্তু যুদ্ধবিরতি তখনই সম্ভব, যখন বিশ্বসভ্যতা বিশ্বপ্রেম ও মৈত্রীর ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিবে।

(ক্রমশঃ)

চুরুট নির্ম্মাণ-প্রণালী

আজকালকার দিনে সিগারেট-বর্জ্জন খুব জোর চলিতেছে। কিন্তু এসব বর্জ্জনের পিছনে দেশী জিনিষ তৈরীর ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সাধারণে একটির পরিবর্ত্তে অন্যটী চাহিবে ও তাহাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে না পারিলে পুনরায় বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবে। যখন সিগারেট বর্জ্জন চলিতেছে সেই সময় সিগারেটের পরিবর্ত্তে চুরুট ও বিড়ী তৈরীর প্রচুর ব্যবস্থা হওয়া চাই। দেশের বেকার যুবকগণ চুরুট ও বিড়ী নির্ম্মাণের দিকে লাগিয়া গেলে দেশেও দেশী জিনিষের প্রচলন হইবে, তাহাদের সংসারেরও কিছু উন্নতি হইবে।

দেশের সর্ব্বত্রই প্রচুর তামাকের চাষ হয়, কিন্তু গুড়গুড়ির তামাকে ছাড়া এই তামাক পাতা যে অন্য কোন বিশেষ কাজে লাগে সেরূপ বোধ হয় না। চুরুট, বিড়ী বা সিগারেট তৈরী হইতে পারে এরূপ তামাকের চাষ দেশে হইলেও এই সমস্ত তৈয়ারী দ্রব্য প্রায়ই বিদেশ হইতে আমদানি হয়। লক্ষ লক্ষ টাকার সিগারেট যে বিদেশ হইতে আসিয়া আমাদের দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে—ইহাতেই বেশ বুঝা যায় যে, আমাদের দেশে তামাকের চাষের প্রয়োজন আছে ও আমাদের দেশীয় তামাক ব্যবহার করান যাইতে পারে। দেশীয় জিনিষের দিকে এখন লোকের সুনজর পড়িয়াছে ; এই সময়ে চুরুট ও বিড়ী যাহাতে দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে প্রত্যেক বেকার লোকেরই নজর দেওয়া উচিত। এই চুরুট ও বিড়ী তৈরী করার কার্য্য নিতান্ত সহজ ও সকলেই এই কাজে লাগিতে পারেন।

প্রথমতঃ, চুরুট প্রস্তুত করিতে হইলে তিন প্রকার তামাক পাতার প্রয়োজন : (১) ভিতরের মিকশ্চার তামাক (পাঁচমিশালি তামাক), (২) তার উপরের ছোট ছোট পাতা, (৩) সর্ব্বোপরি ঢাকা দেওয়ার পাতা। এই তিন প্রকারের মধ্যে তৃতীয় প্রকারের পাতার উপরই চুরুটের গুণাগুণ নির্ভর করিয়া থাকে। এই পাতাগুলি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা পরে বিবৃত করা হইবে, তবে সুমাত্রার তামাকই উপরের ঢাকা হিসাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিউবার পাতা মধ্যের পাতা হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। টার্কিস, হাবানা, বা ভার্জ্জিনিয়া তামাক সুগন্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত তামাকের চাষ হয়, তাহা সচরাচর নিকৃষ্ট, তবে আজকাল চাষের গুণে অনেকটা ভাল হইতেছে। চুরুটের পক্ষে ভারতবর্ষের মধ্যে গুন্টুরের তামাকই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, ব্রহ্মদেশের ডিমডুর ও সিনডাউক তামাকও অতি উত্তম। মতিহারী, রংপুর প্রভৃতির তামাক হুকার ও বিড়ীর তামাক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, চুরুটের পক্ষে ভাল নয়।

এই ত আমাদের দেশের তামাকের অবস্থা। ইহাতে দেখা যাইতেছে যদিও চুরুট ও বিড়ী তৈরী করিবার তামাক কিছু কিছু আমাদের দেশে এখনও পাওয়া যায়, সিগারেট তৈরী করিবার মত কোনও তামাক পাওয়া যায় না। যদি এখন কেহ এদেশে ভাল সিগারেট করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কেবলমাত্র কলকব্জা নয়, তামাকও বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় সে ব্যবসায়ে কেহ লাভবান হইতে পারিবেন না। চুরুট ও বিড়ী—যাহা আমাদের দেশের তামাকে প্রস্তুত হইতে পারে—সেই দিকেই নজর দেওয়া ভাল।

চুরুট তৈরীর প্রথম জিনিষ হইল তামাক। তামাকের ভালমন্দের উপর তৈয়ারী চুরুটের ভালমন্দ নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চুরুট করিতে তিন প্রকার তামাকের দরকার। তন্মধ্যে উপরের তামাক পাতাই সর্ব্বাপেক্ষা দামী। উপরের পাতাটী বড় ও পাতলা হইবে, কোনরূপ গন্ধ থাকিবে না ও রংটি বেশ মনোরম হওয়া চাই। এই পাতাটি চুরুট খাইবার সময় মুখে লাগে, অতএব গন্ধ থাকিলে কেহই তাহা খাইতে পছন্দ করিবে না। উপরের পাতায় শিরা না থাকিলেই ভাল হয়—না হয় ত' খুব ছোট ছোট শিরা থাকিবে। তামাক পুড়িবারও একটি গুণ আছে। আগুন লাগাইলে চুরুট ধরিতে বিলম্ব হইলে চলিবে না, তা ছাড়া উহা ধীরে, সমভাবে ও সম্পূর্ণভাবে পোড়া চাই। এই সমস্ত গুণ দেখিয়া তামাক কিনিতে পারিলেই তবে চুরুট ভাল হইবে। মধ্যস্থানে যে তামাক পাতা ব্যবহার করা হইবে তাহার সুগন্ধ থাকা বিশেষ দরকার।

গুন্টুরে ও রংপুরে সুমাত্রাজাতীয় তামাকের বীজ দ্বারা যে সমস্ত তামাকের চাষ হইয়াছে, সেই সব তামাক পাতা ব্যবহার করিলে ফল আশাপ্রদ হইবে।

চুরুটের সাধারণ আকৃতি সবই দেখিয়াছেন। গোড়া ও শেষ দিক্ অপেক্ষা মধ্যস্থলটি একটু মোটা হয়। ভিতরে তামাক পাতা লম্বালম্বি করিয়া সাজাইয়া বাঁধা হয়, উপরে পাতা দিয়া মোড়া থাকে। তামাক পাতা নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি সময়ে সময়ে ভাল পাতা পাওয়া না যায়, তাহা হইলে নিকৃষ্ট পাতাকেই তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইবে।

চুরুট নির্ম্মাণের পূর্ব্বে তামাক পাতাগুলি শিরা বাদ দিয়া ভিজাইয়া সুগন্ধ দ্রব্য দিয়া তৈরী করিতে হয়। বিশদ বিবরণ পরে লেখা হইবে।

তামাক পাতা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া প্রথমে ভিজাইতে হয়। ভিজান হইলে পাতাগুলি আর মড়মড়ে শুকনা থাকে না, ভিজান না হইলে পাতা গুড়া হইয়া যায় ও তাহা চুরুটের কাজে লাগে না। পাতাগুলি একটি একটি করিয়া মেঝের উপর সাজাইয়া দিয়া উপরে জলের ছিটা দিতে হয়। যতটা জল পাতাগুলি টানিতে পারে সেইরূপ জল দিতে হইবে। অত্যধিক পরিমাণে জল দিলে হইবে না। এইরূপ ২।১ দিন রাখিতে হইবে। সময়ে সময়ে জলের সহিত লবণ ও গুড় মিশাইয়া সেই জল ছড়ান হয়।

তার পরে তামাক পাতার মধ্যশিরা বাহির করিতে হয়। মধ্যস্থলে ভাজ করিয়া শিরাটি কাটিয়া লইবেন। পরে তামাক পাতাগুলি অবস্থাভেদে দৈর্ঘ্য ও শক্তি অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করিবেন: (১) উপরের ঢাকা (২) বাঁধিবার জন্য পাতা (৩) মধ্যের পাতা। উপরের ঢাকা দিবার পাতা লম্বা ও বড় হওয়া আবশ্যক। বাঁধিবার জন্য শক্ত পাতা, বাকিগুলি মধ্যের পাতা রূপে ব্যবহৃত হয়। উপরের পাতাটা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হওয়া দরকার। উহার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেইরূপ ভাবে কাজ করিবেন।

সিগারেট তামাকে রম, ভিনিগার প্রভৃতি দ্রব্য দিয়া গন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নেশা হয়। বোতলে করিয়া এক রকম গন্ধ দ্রব্য বিক্রয় হয় তাহাতেও এই রকমের জিনিষ থাকে। কম দামী বা খারাপ মদ, লেবু, ভিনিগার, মশলার আরক, প্রভৃতি দ্রব্যেরই বেশী ব্যবহার হয়। রুচি অনুযায়ী গন্ধ দ্রব্য কমবেশী লাগান প্রয়োজন। কম করিতে হইলে, জল কিংবা এলকহল মিশাইয়া পাতলা করিতে হয়। ইহা পিচকারী করিয়া তামাক পাতার উপর ছড়াইবেন। সচরাচর ২॥০ সের পাতায় এক আউন্স গন্ধ দ্রব্য লাগিবে।

সাধারণতঃ, তিন প্রকার চুরুট বাজারে বিক্রয় হয়, আকৃতি, ওজন ও তামাকের গুণাগুণ ভেদে এই প্রভেদ। প্রতি ১০০ চুরুটের ওজন প্রকারভেদে নিম্নরূপ :—

১নং ... ১২।০ ছটাক
২নং ... ১০॥০ ছটাক
৩নং ... ৭।০ ছটাক

ইহা ৩॥০ ইঞ্চি হইতে ৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং লম্বা অনুযায়ী কম বেশী মোটাও হয়।

উপরি উক্ত ১নং চুরুটের প্রতি এক শতটার জন্য প্রায় ৯ সের ভিতরের ও মধ্যের তামাক পাতা ও ২ সের উপরের তামাক পাতা আবশ্যক। যদি ধরা যায় যে, ।০ ভাগ তামাক খারাপ পাতা ও শিরার জন্য বাতিল হইয়া যাইবে, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এক হাজার ১নং চুরুট করিতে প্রায় ১৫ সের তামাকের দরকার। অন্যান্য প্রকারের চুরুটেও এই অনুপাতে তামাক লাগিবে।

চুরুট প্রায়ই হাতে প্রস্তুত হয়। এজন্য আবশ্যক (১) একটি ভাল ছুরি, (২) কাঠের ছোট টেবিল এবং (৩) গঁদ আটা।

তামাক পাতা বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া গুড় বা চিনির পাতলা রসে ভিজাইয়া লইতে হয়, পরে সমস্ত রাত্রি সেই ভিজা অবস্থায় চট বা অন্য ভারি থলে চাপা দিয়া রাখিতে হয়, যেন শুকাইয়া না যায়। সকালে পাতাগুলি বাহির করিয়া মধ্য শিরা কাটিয়া ফেলিবেন এবং সেই অর্দ্ধ পাতাগুলি অবস্থানুযায়ী ভিতরের ও উপরের পাতা হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে এইরূপে বাছিয়া লইতে হইবে। যে পাতাগুলির তৎক্ষণাৎ ব্যবহার হইবে না সেইগুলি শক্ত বাণ্ডিল করিয়া ঠাণ্ডা স্থানে রাখিতে হইবে। ভিতরের ব্যবহারের জন্য তামাক পাতাগুলি তারপর গন্ধ করিয়া লইবেন।

তামাক পাতাগুলি এইরূপে তৈয়ারী হইলে চুরুট প্রস্তুত করিতে হয়। ভিতরের তামাক পাতাগুলি লম্বা দিকে সাজাইবেন। ছোট তামাক গুঁজিয়া দিবেন না; তাহা হইলে, হয় ঠিক ভাবে পুড়িবে না, না হয় ধোঁয়া রীতিমত বাহির হইবে না। কাজ করিবার সময় এই সমস্ত দোষ যাহাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। ভিতরের

পাতাগুলি ঠিক ভাবে বাঁধিয়া সারি সারি রাখিবার পরে উপরে জড়াইবার পাতার বাণ্ডিল বাহির করিতে হইবে। সব চুরুটগুলি একসমান ভাবে কাটিয়া লইবেন ও সেই মত উপরের পাতা কাটিতে পারা যাইবে। সবগুলি যদি এক সমান হয় তাহা হইলে উপরের পাতা কাটার জন্য একটী টিনের ফর্ম্মা কাটিয়া লইয়া কাঠের টেবিলের উপর ফেলিয়া ছুরি দিয়া পাতাগুলি কাটিতে পারা যাইবে।

উপরের পাতা জড়াইবার সময় যে দিকে আগুন লাগাইতে হইবে সেই দিক্‌ হইতে প্রথম জড়াইবেন। সাধারণতঃ ময়দার আটা দিয়া পাতাটি আটকাইয়া রাখিবেন। শেষে সমস্ত চুরুটগুলি একমাপের হইল দেখিয়া ছাটিয়া দিবেন।

চুরুট প্রস্তুত হইয়া যাইবার পর অন্ততঃ ছয় মাস শুকনা স্থানে ঠাণ্ডায় রাখিয়া দিতে হয়। চুরুট পুরাতন হইলেই তামাকগুলির গন্ধ স্বাদ ভাল হইবে। অতএব যতদিন চুরুটগুলি রাখিয়া দিতে পারা যায় সেই হিসাবে উহার গুণাগুণ কম বেশী হয়।

বর্ষার সময় চুরুট রাখিবার ব্যবস্থার দিকে খুব নজর দিতে হইবে। সামান্য ভিজা হওয়াতেই চুরুটগুলি দাগী ও খারাপ হইয়া যাইতে পারে। টীনের বাক্সে হাওয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেই ভাল হয়।

(এদেশের কথা)

ভারতের চিনির ব্যবসায়

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম, এ

১। দুনিয়ার চিনির ব্যবসায়ের হালচাল

গোটা দুনিয়ায় ১৯২৬-২৭ সনে বীট এবং ইক্ষু এই উভয় প্রকার চিনির মোট উৎপাদন ২৩,৭৩৩,১৭২ টন। ১৯২৭-২৮ সনে ২৫,৩১৭,৪৬৬ টন অর্থাৎ ১৯২৬-২৭ সনের তুলনায় ১,৫৮৪,২৯৪ টন বেশী। ১৯২৮-২৯ সনে আরও ১,৮৫০,৭৬৬ টন বৃদ্ধি পায়। কেবল মাত্র ১৯২৬-২৭ সনে চিনি উৎপাদন হঠাৎ নামিয়া যায়, তা ছাড়া ১৯২৮-২৯ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে চিনি উৎপাদনের বহর ক্রমাগত বাড়িয়াই গিয়াছে। ১৯১৯-২০ সন হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত গোটা দুনিয়ার চিনি উৎপাদনের পরিচয় নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল :—

গোটা দুনিয়ার বীট এবং ইক্ষুজাত চিনি

				টন
১৯১৯-২০	...	...	...	১৫,৫০০,৯৩২
১৯২০-২১	...	...	...	১৬,৬৫২,৭৭৫
১৯২১-২২	...	...	...	১৭,৬৪৯,৬৮৭
১৯২২-২৩	...	...	...	১৮,৩৫৯,৪৮৪
১৯২৩-২৪	...	...	...	২০,০৯৬,০১২
১৯২৪-২৫	...	...	...	২৩,৬৮৭,৩৭৯
১৯২৫-২৬	...	...	...	২৪,৬১৪,১৫২
১৯২৬-২৭	...	...	...	২৩,৭৩৩,১৭২
১৯২৭-২৮	...	...	...	২৫,৩১৭,৪৬৬
১৯২৮-২৯	...	...	...	২৭,১৬৮,২৩২

দুনিয়ায় যে হারে চিনির উৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছে, চিনির চাহিদা কিন্তু তাহার সহিত তাল রাখিতে পারে নাই বা পারিতেছে না। সুতরাং চিনির দর খুব সস্তা হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই চিনির উৎপাদন হ্রাস এবং রপ্তানি হ্রাসের দিকে অনেক দেশে নজর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত চিনি-উৎপাদক দেশ এক জোট হইয়া কাজ না করায় এ প্রচেষ্টা এ পর্য্যন্ত সফল হইতে পারে নাই।

১৯২৮ সনে কিউবা দ্বীপে চিনির উৎপাদন হ্রাস করা হয়। এইজন্য জার্ম্মাণি চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোলাণ্ড দেশের সহিত চুক্তি করা হয় যে, কিউবা মাত্র ৪০ লক্ষ টন চিনি রপ্তানি করিবে এবং ঐদেশগুলি প্রত্যেকে ১৯২৭

সনের সমান চিনি বিদেশের বাজারে চালান দিবে; কিন্তু এতেও ফল পাওয়া যায় নাই। কারণ মার্কিণ এবং বিলাতের চিনিখোরগণ তেমন চিনি খায় নাই। আগের সনেরও অনেক মাল ঐ দুই দেশে জমা ছিল।

১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসের শেষে লণ্ডন সহরে লাল চিনি প্রতি হন্দর ১৩ শিলিং ৬ পেন্স দরে বিক্রয় হইয়াছে। ঐ সনের এপ্রিল মাসে বিলাতের সরকারী বাজেটে লাল চিনির উপর শুল্কের হার কমাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু আমদানি করা শাদা চিনির শুল্কের হার সমান রাখা হয়। ফলে বিলাতের বাজারে বৃটিশ চিনি সংশোধকগণ বেশ সুবিধা করিয়া লয় এবং আমেরিকা এবং ইউরোপ হইতে বিলাতে শাদা চিনি আমদানি অত্যন্ত কমিয়া যায়।

১৯২৮ সনের জুলাই মাসে জাভা দ্বীপে ৫ লক্ষ টন বেশী চিনি উৎপন্ন হয়। বাজারে গুজব রটিতে থাকে যে, কিউবা দ্বীপে ১৯২৯ সনে চিনি উৎপাদন সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা করা হইবে না, ফলে চিনির ব্যবসাতে অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ফেল মারে। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে চিনির দর বিলাতের বাজারে আরও নামিয়া যায়। এই সময় বিলাতে জাভার বাদামী রংয়ের অপরিষ্কৃত চিনি ১০৷৷ শিলিং দরে বিক্রয় হয়। অক্টোবর-মার্চ্চ মাসে বিলাতে ১২০,০০০ টন জাভার চিনি ১০ শিলিং ৩ পে দরে বিক্রয় হয়। ৬ই নভেম্বর তারিখে কিন্তু অপরিষ্কৃত চিনির দর প্রতি হন্দর ৯৷৷ শিলিংএ নামিয়া যায়। নভেম্বর মাসের শেষের দিকে দাঁড়ায় ১০ শিং ৩ পেঃ। ডিসেম্বর মাসে দর আবার ৩ পেনি কমে। ১৯২৯ সনের জানুয়ারি মাসের প্রথম ভাগে কিউবা দ্বীপ ঘোষণা করে যে, অতঃপর এই দ্বীপে চিনি উৎপাদন সম্বন্ধে সমস্ত বাধা দূর করিয়া দেওয়া হইবে। কিউবান এক্সপোর্ট কর্পোরেশন সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয়। সিক্কার বাজারে অনটন পড়ায় ১৯২৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাতে ব্যাঙ্কের হার ৫৷৷০ বাড়াইয়া দেওয়া হয়। আমেরিকান টারিফের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মার্চ্চ মাসে বাজারে জোর গুজব রটিতে থাকে। কিন্তু এই মাসের শেষে কিউবা দ্বীপে ৬ লক্ষ টন বেশী চিনি উৎপন্ন হওয়ায় বাজারের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়ে। চিনি-উৎপাদনকারী দেশগুলিতে চিনি উৎপাদনের বহর এইরূপে ক্রমাগত বাড়িতে থাকায় অনেক দেশ চিন্তিত হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ যে সমস্ত দেশে সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছিল না। বাজার চিনিতে ভর্ত্তি হইয়া যাইবার ভয়ে এই সমস্ত দেশ তাড়াতাড়ি আপন আপন শুল্ক-প্রাচীর আরও উচ্চ করিতে থাকে। দুনিয়ার চিনির বাজারের অত্যন্ত সঙ্কটময় অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। ব্যাপারটী ক্রমে জাতি-সঙ্ঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে জাতি সঙ্ঘের উদ্যোগে ১৯২৯ সনের প্রথম কয় মাসের মধ্যে শর্করা-সমিতির অধিবেশন হয়।

জাতি-সঙ্ঘের শর্ত্ত

জাতিসঙ্ঘ-প্রবর্ত্তিত শর্করা সমিতিতে কতকগুলি শর্ত্ত স্থিরীকৃত হয় বটে, কিন্তু এই শর্ত্তগুলি সম্বন্ধে সকলে একমত হইতে পারে নাই। শর্ত্তগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

(১) কয়েক বৎসরের জন্য চিনির উৎপাদন সমান ভাবে করার দরকার। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে রফা করা এবং সমঝোতা স্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(২) চিনি রপ্তানিকারী দেশগুলির মধ্যেও সমঝোতা স্থাপনের দরকার। বিক্রয় করা সম্বন্ধে তাহাদেরও হুসিয়ার হইয়া চলিতে হইবে।

(৩) ভিন্ন ভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ প্রাচ্য এবং গ্রীষ্ম-প্রধান দেশগুলিতে চিনির রেওয়াজ বাড়াইবার জন্য জোর প্রচার কার্য্য চালাইতে হইবে।

(৪) চিনির ব্যবসায় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য-সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় হদিশ বাতলাইবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিউরো স্থাপনও অত্যাবশ্যক।

১৯২৮ সনের এপ্রিল মাসে গোটা ভারতে চিনির ষ্টক অত্যন্ত কম দেখা যায়। কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, মান্দ্রাজ এবং রেঙ্গুন—এই সমস্ত বন্দরে এই সময়ে মোট মজুত চিনির পরিমাণ ৬১,৩০০ টন অথচ ১৯২৭ সনে ষ্টকের পরিমাণ ছিল ১২০,৫০০টন। ১৯২৭-২৮ সনের তুলনায় ১৯২৮-২৯ সনে আকের আবাদ হইয়াছে ১৩%

কম। এই সমস্ত কারণে এবং চিনির দর কমাইবার জন্য আলোচ্য সনে ভারতে ১৪৩,০০০টন বেশী চিনি আমদানি হইয়াছে।

২। ভারতে গুড় এবং চিনির উৎপাদন, আমদান এবং রপ্তানি

(১) গুড়

(ক) দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং বৃটিশভারতে ১৯২৮-২৯ সনে আক এবং খেজুর উভয় প্রকার গুড় উৎপাদনের পরিমাণ কমসে কম ২,৬৮৫,০০০ টন, ১৯২৭-২৮ সনে ৩,০৯৮,০০০ টন। এই সমস্ত গুড় এবং বন্দরের কিয়দংশ দেশীয় প্রথায় পরিষ্কৃত হইয়া চিনি প্রস্তুত হয়।

(খ) স্থলপথে আমদানি :—স্থলপথে ভারতবর্ষের সীমান্ত দেশগুলি হইতে আমদানির পরিমাণ অত্যন্ত কম, মোট ৫০০ টনের বেশী নয়।

(গ) স্থল এবং জলপথে রপ্তানি :—১৯২৭-২৮ সনে জলপথে ইক্ষু এবং খেজুরে গুড় রপ্তানি হয় ২,১৩৫ টন, মূল্য ৫৩৭,৬৫০ টাকা; ১৯২৮-২৯ সনে ১,৪৪৮ টন, মূল্য ৩,৪৮,৮৫০ টাকা। আলোচ্য সনে সিংহল দ্বীপে রপ্তানির পরিমাণ ১,১৮৩ টন, মূল্য ২,৬৫,১৫০ টাকা। স্থলপথে ভারত এবং বার্ম্মার রপ্তানি ১৯২৭-২৮ সনে ১১৪,৫২৬ মণ (৪,২০০ টন), ১৯২৮-২৯ সনে ১০৯,৭১৭ মণ (৪,০৩০টন)। এই সমস্ত গুড় প্রধানতঃ ভারতের সীমান্তস্থিত দেশগুলিতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

(২) চিনি

(ক) ভারতে চিনি তৈরী :— ১৯২৬-২৭ সনে ভারতবর্ষের আধুনিক কল এবং সেকেলে সংশোধনাগারগুলিতে মোট চিনি তৈরীর পরিমাণ ১২১,০২৮ টন এবং ১৯২৭-২৮ সনে ১১৭,০৪৮ টন। এই হ্রাসের কারণ এই যে, সংশোধনাগারগুলিতে চিনি প্রস্তুত কম হইয়াছে। নিম্নের তালিকায় ইহার পরিচয় দেওয়া হইল :—

	১৯২৭-২৮ টন	১৯২৬-২৭ টন
আক হইতে প্রস্তুত		
কারখানাজাত চিনি	৬৭,৬৮৮	৬২,৯৩১
গুড় হইতে সংশোধিত চিনি	৪৯,৩৬৪	৫৮,০৮৭

ইহা ছাড়া ভারতের দেশী চিনি আছে। এই দেশী চিনি আবার দুই প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, দেশীয় প্রথায়, দ্বিতীয়তঃ, উন্নততর খান্দেশ্বরী প্রথায়। এই উভয় প্রকারে প্রায় আরও ৫০০০০ টন চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং ভারতের মোট চিনি উৎপাদন ১৯২৬-২৭ সনে ১৭১,০২৮ টন এবং ১৯২৭-২৮ সনে ১৬৭,০৪৮ টন।

(খ) সমুদ্রপথে ভারত হইতে চিনি রপ্তানি :—আলোচ্য সনে ভারত হইতে সমুদ্রপথে চিনি রপ্তানি ৭৫৬ টন (দাম ২,৪৩,৮৪০ টাকা) হইতে ৬৪৪ টনে (দাম ১,৯৯,২১০ টাকা) কমিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে অপরিষ্কৃত চিনির পরিমাণ ৪৬১ টন ও মূল্য ১,০৬,৮৬০ টাকা।

(ক্রমশঃ)

চিত্র-পরিচয়

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষিত সমাজে মিঃ ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি নামে পরিচিত। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইঁহার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া ইনি বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

ইনি ১৮৭৩ সনের ২৪শে এপ্রিল ২৪ পরগণার খড়দহে জন্মগ্রহণ করেন। উমেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার গ্রাজুয়েট। কলেজের পাঠ শেষ করিবার পর ইনি গভর্ণমেণ্টের ক্লার্কশিপ, পাবলিক ওয়ার্কস ও মিলিটারী একাউণ্ট পরীক্ষায় উপস্থিত হন এবং সমস্ত পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের সহিত

উত্তীর্ণ হন। প্রথমে ইনি "মেসার্স আর্ণস থসেন কোংর" অফিসে এক বৎসরকাল চাকুরী করেন। এই অফিসে চাকুরী করিবার কালে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহাতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ের পথ সুগম হয়। অতঃপর এক বৎসর কাল তিনি গভর্ণমেণ্টের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে চাকুরী করেন এবং পরে ই, আই, রেলওয়ে কোম্পানীর এজেণ্ট অফিসে নিযুক্ত হন। স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিতে বাল্যাবধি অদম্য আকাঙ্ক্ষা থাকায় উমেশচন্দ্র চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কয়লার দালালী আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম ইহাতে ইনি বিশেষ অর্থ উপার্জ্জন করেন; কিন্তু কয়লার বাজার মন্দা হইয়া পড়ায় তাঁহাকে পুনরায় মেসার্স গ্রিণ্ডলে এণ্ড কোং ব্যাঙ্কারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে হয়। তিন বৎসর এই ব্যাঙ্কে চাকুরী করেন। অতঃপর এই চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় একটি কোল এজেন্সী খোলেন ও ক্রমশঃ যৌথভাবে ১৪টি কয়লার খনির এজেন্সী খোলেন এবং ইহার কমিশন হইতে বহু টাকা অর্জ্জন করেন।

বর্ত্তমানে উমেশচন্দ্র ১২টি কয়লার খনির মালিক। তন্মধ্যে কেবলমাত্র ৪।৫টি খনি অন্যকে দীর্ঘকালের জন্য লীজ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইঁহার লোহার ব্যবসায় আছে। ৬৪নং ষ্ট্রাণ্ড রোডে "ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী" নামে পরিচিত ইঁহার লোহার দোকান আছে। তা ছাড়া ইনি 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড সিলিং ওয়ার্কস্ কোম্পানী", "ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্রাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী" ও "বেঙ্গল সিলিকেট ওয়ার্কসে"র মালিক।

উমেশচন্দ্র জিওলজিক্যাল সোসাইটীর ও ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশনের সদস্য এবং ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। চারি বৎসরকাল ইনি কলিকাতা পোর্টের কমিশনার ছিলেন। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টেরও ইনি মেম্বর ছিলেন। পূর্ব্বে দুইবার ই, আই, রেলওয়ের এডভাইসরী বোর্ডে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স ও ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের প্রতিনিধিস্বরূপ কাজ করিয়াছিলেন এবং এখনও ঐ কাজ করিতেছেন।

ঝরিয়া খনির স্বাস্থ্যবোর্ডে থাকাকালে উমেশচন্দ্র অনেক কাজ করিয়াছেন। ইনি বেহার ও উড়িষ্যার প্রথম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ইণ্ডিয়ান কোল ট্রান্স-পোর্টেশন কমিটিতে কয়লা ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ইনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র আসানসোল খনিসমূহের স্বাস্থ্যবোর্ডের অন্যতম মেম্বর। রেলওয়ে রেট্স এড্ভাইসরি কমিটিতে তুলা ও তুলাজাত দ্রব্যের মাশুল হ্রাস করিবার জন্য ইনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তা ছাড়া ইনি ৫ বৎসরকাল ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল ও ২ বৎসরকাল মেডিকেল কলেজের পরিদর্শক কমিটির সদস্য ছিলেন। কলিকাতা পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির সভ্যরূপে গাড়ীর বোঝাই যাহাতে কম হয় সে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট ও ইণ্ডিয়ান কোল সমিতির সদস্য ছিলেন। হাজারিবাগ জেলা বোর্ড ও গিরিডি লোকাল বোর্ডের মেম্বর-রূপে ইনি সাধারণের উপকারজনক অনেক কার্য্য করিয়াছেন। যাহাতে বিদেশে বেশী কয়লা চালান হয় কোল গ্রেডিং বোর্ডের সভ্যরূপে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইনি রেড্ ক্রস সোসাইটি, সেণ্টজন এম্বুলেন্স ও কন্সিলিয়েসন বোর্ডেরও সদস্য।
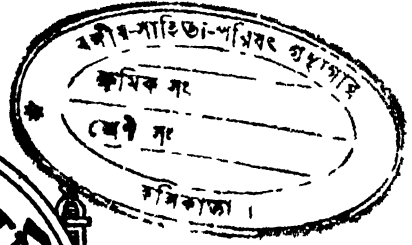
১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল বি,এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা

ভাদ্র—১৩৩৭

৫ম বর্ষ—৫ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমেব মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
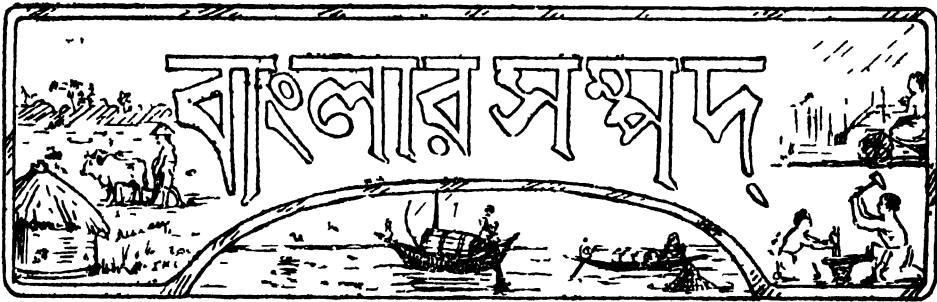
শ্রাবণে বাঙ্গালার কৃষির অবস্থা

(১) পাট

বঙ্গের সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ গত ১৬ই জুলাই এবারকার পাট চাষের এক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়,—এবার পাট চাষের পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে। আসাম, বঙ্গদেশ এবং বিহার-উড়িষ্যা —এই তিন প্রদেশে এবার সর্ব্বসমেত পাটের চাষ হইয়াছে ৩৫,০৬,৭০০ পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার সাত শত একর জমিতে। এক একর প্রায় তিন বিঘার সমান। অতএব মোটের উপর ১ কোটি ৫ লক্ষ ২০ হাজার ১ শত বিঘা জমিতে পাট হইয়াছে। গত বৎসর [illegible] চাষের জমি বৃদ্ধি পাইয়াছে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ১ শত বিঘা। বিহার-উড়িষ্যা ও আসাম বাদ দিয়া কেবল বাঙ্গালার ভিতরেই এবার ৯১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯ শত বিঘা জমিতে পাট চাষ হইয়াছে; গত বৎসর অপেক্ষা এবার চাষ বাড়িয়াছে মোট ১ লক্ষ ২৬ হাজার বিঘায়। কৃষি বিভাগের বিবরণে প্রকাশ,—প্রেসিডেন্সি এবং রাজসাহী বিভাগের সামান্ত অংশ ছাড়া বাঙ্গালার আর সকল অংশেই পাটের অবস্থা ভাল। গত জুন মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত খুবই ভাল অবস্থা গিয়াছে। পাটের চাষ এদেশে ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। চাষীরা পাট বেচিয়া এককালে অনেক নগদ পয়সা হাতে পায়; সেই কাঁচা পয়সার লোভই চাষ-বৃদ্ধির এক মাত্র কারণ। কিন্তু মোটের উপর পাটের চাষে তাহারা যে লাভবান হয় না তাহার প্রমাণের অভাব নাই। চাষীরা যে তাহা না বুঝে এমনও নহে। তথাপি কাঁচা পয়সার নেশাই তাহাদিগকে প্রতি বৎসর আরও বেশী করিয়া পাটের চাষ করিতে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে।

পাটের দর ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। এমন কি যুদ্ধের পূর্ব্বে যে দর ছিল এবার তাহা অপেক্ষাও কমিয়াছে। ঢাকায় মাল বুঝিয়া প্রতিমণ ৫।০ হইতে ৬৷৷০ দরে বিক্রয় হইতেছে। বিক্রমপুরে দর ৫৲ হইতে ৬৷৷০, নারায়ণগঞ্জ সদরে ৫৷৷০ হইতে ৬৷০ দরে পাট বিক্রী হইতেছে। বাজার ক্রমশঃ মন্দা, প্রায়ই ৩।৪ আনা দর নামিয়া যাইতেছে। দর আরও কমিয়া যাইবে বলিয়াই বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিতেছেন। পাট হইতে যে চট, থলে প্রভৃতি তৈয়ারী হয় তাহার বিক্রয় নাই, কাঁচা পাটও কম চালান যাইতেছে; এদেশের পাটের কলগুলিতে কাজ নাই। গত বৎসরের বহু লক্ষ গাঁইট পাট মজুত পড়িয়া রহিয়াছে। কলের মালিকেরা কলের কাজের সময় কমাইয়া দিয়াছেন; পূর্ব্বে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা করিয়া কাজ চলিত, এখন ৫৪ ঘণ্টা করিয়া কাজ হইতেছে। তাহার উপর আবার জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর তিন মাসে ৩ সপ্তাহ ছুটি। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, যাহারা পাট চাষ করে তাহারা যেমন, যাহারা পাটের কলে কাজ করে তাহারাও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। পাটের দর না থাকাতে স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্য সকলই অত্যন্ত মন্দা। যেরূপ দেখা যাইতেছে, পাটের দর অন্ততঃ ১০।১২ টাকা না হইলে মহা অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইবে।

(২) ধান

ঢাকা জেলায় পাট ও আউশ ধান কাটা চলিতেছে। অত্যধিক বৃষ্টির জন্য আমন ধানের ক্ষতি হইতেছে। চাউলের দাম ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

দিনাজপুরে ভাদই ধানের অবস্থা আশাপ্রদ, হৈমন্তিক ধানের চাষ বেশ চলিতেছে। ধানের দর ৩৷০ টাকা মণ।

জলপাইগুড়িতে হৈমন্তিক ধানের প্রতি মণ ২।০ হইতে ২৷৷০ পর্য্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে।

ডুয়ার্স অঞ্চলে কৃষির অবস্থা এবৎসর ভাল নহে। শ্রাবণ মাস অতীতপ্রায়, বৃষ্টিপাত হয় নাই। হৈমন্তিক ধান কেহই রোপণ করিতে পারে নাই। ভাদই ধানও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গত বৎসর শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে মোটেই বৃষ্টি ছিল না, কিন্তু আষাঢ় মাসে বৃষ্টি ছিল বলিয়া লোকে কিছু ধান রোপণ করিতে পারিয়াছিল। এবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস হইতেই বৃষ্টি নাই। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।

(৩) চা

চা'র দর ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। অবশ্য পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত ইহার যথেষ্ট সংস্রব আছে।

বঙ্গদেশের সেচ বিভাগ

নদীমাতৃক বাঙ্গালাদেশের নদ-নদী, খাল বিল প্রভৃতির দুর্দ্দশার কথা সকলেই জানেন। বারবার ভূমিকম্পের ফলে, রেল ও রাস্তা করিবার জন্য পাহাড়ের মত উচ্চ বাঁধ বাঁধিবার ফলে, জমীদারি বা আবাদী জমি রক্ষার্থে অযথা ভাবে বাঁধ বাঁধার জন্য, বড় বড় পুল নির্ম্মাণার্থে নদীগর্ভে বড় বড় থাম গড়িবার ফলে ও এদিকে ওদিকে এক মাইল ধরিয়া নদীর জলের স্রোত মন্দীভূত করিবার চেষ্টার ফলে আজ উত্তর ও মধ্য বঙ্গে গঙ্গার স্রোত মন্দীভূত হইয়াছে এবং ২৪ পরগণার নদীগুলি হাজিয়া মজিয়া যাইতেছে। ফলে বাঙ্গালা দেশের জলের যথেষ্ট নিকাশ না হওয়ায় ও তাহার উপরে কচুরি পানার উপদ্রবে বাঙ্গালা দেশে—

(১) সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে,

(২) ম্যালেরিয়ার উপদ্রব বাড়িয়াই চলিয়াছে,

(৩) লোকের আয়ু, কর্ম্মক্ষমতা কমিতেছে ও রোগ-প্রবণতা বাড়িতেছে এবং দৈন্যের করাল মূর্ত্তি দেখা দিতেছে,

(৪) জলযান চলাচলের ব্যাঘাত ঘটিতেছে,

(৫) জমির উর্ব্বরতার হ্রাস পাইতেছে।

বৎসরে এক ইঞ্চি করিয়া নদী-গর্ভ বুজিয়া আসার ফলে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতেছে। ১৯২৯ সনের নভেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট এই জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত করেন। সেই কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। ১৯০৭, ১৯১৪, ১৯২৫ সনে কমিটি গঠন

ও রিপোর্ট দাখিল হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চাষ-আবাদ-সম্পর্কিত রাজকীয় কমিশনও বসিয়াছিল এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসেও কমিটি বসিয়াছিল। তাঁহারাও রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন।

এখনও যদি গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ এ বিষয়ে অবহিত না হন, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের অদূর ভবিষ্যতে কি অবস্থা যে দাঁড়াইবে তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালা দেশের যে যে কার্য্য গবর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগ দ্বারা সাধিত হইয়াছে তাহা অতীব সামান্য; যথা—

(১) মেদিনীপুর ও ইডেন খালদ্বয় খনন করা হইয়াছে।

(২) শালবাঁধ ও আমজোড় খাল খনিত হইতেছে।

(৩) দামোদর খাল খনিত হইতেছে।

(৪) বক্রেশ্বর খাল খনিত হইতেছে।

(৪) বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় যে সকল বাঁধ আছে তাহাদিগকে রক্ষা করা হইতেছে (কিন্তু সুন্দরবন আবাদ করিবার জন্য বাঁধ বাঁধায় মধ্য বঙ্গের নদনদীর জলস্রোত মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে)।

(৬) মগরাহাট পয়ঃপ্রণালী খনন।

(৭) গোবরনালা (মুর্শিদাবাদ,) ও ভৈরব খাত (নদীয়া) খনন।

(৮) মাদারীপুর বিল।

(৯) হুগলী নদীর "চক"।

এইরূপ ঢিমে চালে চলিলে কাজ হইবে না, নূতন কমিটি একথা বলিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, মান্ধাতার আমলের চাল বর্ত্তমানে অগ্রাহ্য। তাঁহারা বলেন, নদীমাতৃক বঙ্গদেশে "সেচ" কার্য্য তেলা মাথায় তেল দেওয়া এবং এই জন্য তাঁহারা উক্ত বিভাগটিকে ঢালিয়া সাজিতে পরামর্শ দিয়াছেন। অবশ্য সেরূপ ঢালিয়া সাজায় ব্যয়-বাহুল্যের আশঙ্কা, সুতরাং নূতন করের ইঙ্গিতও যথেষ্ট আছে। কমিটি কলিকাতার ও বোম্বাইয়ের ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ন্যায় সমগ্র বঙ্গদেশের জলপথের ট্রাষ্ট নামক একটী সমিতি গঠনের পরামর্শ দিয়াছেন। সেই ট্রাষ্ট অনন্তকর্ম্মা হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশের জলপথের ও চাষ-আবাদের জরিপ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। তাঁহারা বর্ত্তমান বাঁধগুলির উপযোগিতা ও অবস্থা বিষয়েও অনুসন্ধান করিবেন। এই ট্রাষ্টকে অসীম ক্ষমতা দিবারও পরামর্শ আছে—যাহাতে দেওয়ানী আদালতগুলি এই ট্রাষ্টের কথার উপরে কথা বলিতে না পারে। ইহা স্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে। (হিতবাদী)

নারায়ণগঞ্জে ব্যবসা-বাণিজ্য

অন্যান্য বৎসর এসময়ে নারায়ণগঞ্জ সহর লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এবার অবস্থা তাহার বিপরীত। পাটের ব্যবসায় মন্দা হওয়াতে নূতন লোক এবার খুব কমই আসিতেছে। পাটের দর না থাকাতে অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্যও অত্যন্ত মন্দা। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন ব্যবসায়ী কাহারও এবার কাজ কর্ম্মে সুবিধা হইতেছে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর এই সময়ে শীতললক্ষা নদী নৌকা ও ষ্টীমারে পরিপূর্ণ থাকিত; এবার নৌকা ইত্যাদির সংখ্যা অত্যন্ত কম। ইহা হইতেই দেশের অবস্থা বুঝা যাইতে পারে। পাটের ব্যবসাটি ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কাজেই দেশের অবস্থাও ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে। নারায়ণগঞ্জ পূর্ব্ববঙ্গের পাট-ব্যবসার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র। এখানকার অবস্থা হইতেই এই দেশের কৃষক ও জনসাধারণের অবস্থা অনুমিত হইতে পারে।

বাঙ্গালার নূতন জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী

১৯৩০ সনের মে মাসে বাঙ্গালায় সর্ব্বসুদ্ধ ৩০টী নূতন জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অংশ লইয়া ও মোট ৯২,৫৩,০২০ টাকা অথরাইজড্ পুঁজি লইয়া ১৯১৩ সনের ভারতীয় কোম্পানীর এ্যাক্টের ৭ ধারা অনুসারে রেজিষ্টারী হইয়াছে। তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

৫ ব্যাঙ্কিং	...	৮,৫০,০০০ টাকা
২ লোন-সংক্রান্ত	...	৫,৫০,০০০

১ লগ্নি ও ট্রাষ্ট	...	২০,০০০ „
১ জীবন, অগ্নি ও সমুদ্র বীমা	...	৪,০০,০০০ „
১ মোটর ট্রাক্শন	...	২০,০০০ „
১ ছাপা, পুস্তক প্রকাশ ও মনিহারি সংক্রান্ত	...	১,০০,০০০ „
৩ এজেন্সি (ম্যানেজিং এজেন্ট কোম্পানীগুলি ধরিয়া)	...	৩৩,০০০ „
১ চায়ের বাক্স ও অন্যান্য বাক্স নির্ম্মাতা		২০,০০০ „
১ তামাক (চুরুট প্রভৃতি)	...	১০,০০,০০০ „
৯ অন্যান্য ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারী কোম্পানী	...	৫০,৪০,০০০ „
১ অন্যান্য মিল ও ছাপাখানা	...	২০,০০০ „
১ চা কোম্পানী	...	২,০০,০০০ „
২ হোটেল, থিয়েটার এবং অন্যান্য	...	১৫,০০,০০০ „
মোট		৯২,৫৩,০০০ টাকা

কলিকাতার বিদেশী বাণিজ্য (মে, ১৯৩০)

পূর্ব্ব মাস অপেক্ষাও আলোচ্য মাসে বিদেশের সহিত কলিকাতার বাণিজ্যের বহর অনেক কমিয়া গিয়াছে। মোট ব্যবসার মূল্য পূর্ব্ব মাসের ৫·৮১ কোটি টাকা হইতে ৫·৫৫ কোটিতে নামিয়া গিয়াছে। তবে রপ্তানি ৬·৬৭ কোটি টাকা হইতে ৭·৪৩ কোটিতে উঠিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের মে মাসের সহিত তুলনায় আলোচ্য মাসে আমদানি ১·০৪ কোটি এবং রপ্তানি ১·৩৩ কোটি টাকা কমিয়াছে।

আমদানি

আলোচ্য মাসে প্রধান আমদানি মালের মধ্যে কোন্ কোন্ দফার মূল্যে কম বেশী হইয়াছে তাহা ১৯২৯ সনের মে মাসের সহিত তুলনায় নিম্নে দেখান হইয়াছে।

		লক্ষ টাকা
সুতির মাল	...	১৩৮ (—২৯)
খনিজ তৈল	...	৪৩ (+৭)
চিনি	...	৩৬ (+১০)
লৌহ ও ইস্পাত	...	৩৫ (—৪১)
বিজলী-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি	...	১৪ (—৩)
তামাক	...	৪ (—৬)
শস্য, ডাল ও ময়দা	...	০ (—২৬)

তৈল ও চিনিতে যে সামান্য বাড়তি দেখা যাইতেছে তাহা দ্বারা অন্যান্য জিনিষের আমদানিতে যে ঘাটতি হইয়াছে তাহা পূরণ করা কোন মতে সম্ভব নয়। সুতির মালের বাজার একেবারে মন্দা। পাকান ও আল্‌গা সুতা পরিমাণে ৭৪৭,৯৮৪ পাউণ্ড হইতে ৫৭৭,৬৭৮ পাউণ্ডে এবং মূল্যে ১০ লক্ষ হইতে ৬ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে। সুতির সর্ব্বপ্রকারের কাপড়চোপড় পরিমাণে ৬১ মিলিয়ন গজ হইতে ৫৭ মিলিয়ন গজে নামিয়াছে। মূল্য নামিয়াছে ১৪৯ লক্ষ হইতে ১২১ লক্ষ টাকায়। খনিজ তৈলের আমদানিতে যেটুকু বাড়তি দেখা গিয়াছে তাহার কারণ আলোচ্য মাসে পারস্য, বোর্ণিও (ওলন্দাজ) এবং আজের বাইজান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে এই তেল আমদানি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। অথচ পূর্ব্বের বৎসরে কিছুই হয় নাই। সর্ব্বদিক্ হইতেই লৌহ ও ইস্পাতের আমদানি কমিয়া যাওয়াতে এ দফায় এত বেশী ঘাটতি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের মত আলোচ্য মাসেও অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা হইতে কোন গম আমদানি হয় নাই, এই কারণেই শস্য, ডাল ও ময়দার ঘরের সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে।

রপ্তানি

আলোচ্য মাসে প্রধান প্রধান রপ্তানি মালের কোন্ কোন্ জিনিষের মূল্য কিরূপ উঠানামা করিয়াছে ১৯২৯ সনের মে মাসের তুলনায় তাহা নীচে দেখান হইয়াছে।

		লক্ষটাকা
পাটের তৈয়ারী মাল	...	২৯১ (—১২০)
কাঁচা পাট	...	১১৮ (—১৫)
গালা	...	৪৫ (—১৯)
হাইড্ ও স্কিন	...	৩৫ (—১১)
চা	...	৩৪ (+৪)
শস্য, ডাল ও ময়দা	...	২৩ (+৭)

		লক্ষ টাকা
লৌহ (পিগ্)	...	২২ (সমান)
ম্যাঙ্গানিজ্ ওর	...	৮ (—২)

উপরের হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে, রপ্তানি মালের [শ]স্য, ডাল ও ময়দা, চা ও পিগ্ লোহা ছাড়া আর সমস্ত [দ]ফায় ঘাটতি পড়িয়াছে। বস্তা (বেশীর ভাগ জাভায় [র]প্তানি হইয়াছে) ও চটের (বেশীর ভাগ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে [গি]য়াছে)। বাজারদর পড়িয়া যাওয়ায় পাটের তৈয়ারী [মা]লের ঘরের সংখ্যা এত কমিয়াছে। কাঁচা পাট ও গালার [বা]জারদরও কম থাকার দরুণ এদের সংখ্যা এত [ক]মিয়াছে। কাঁচা পাট ও হাইডের প্রধান ক্রেতা [আ]লোচ্য মাসে জার্ম্মাণি ছিল। গালা, স্কিন এবং [ম্যা]ঙ্গানিজ্ ওরের বেশী চাহিদা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে দেখা [গি]য়াছে। শস্য, ডাল ও ময়দা দফার প্রধান পণ্য চাউল [বে]শীর ভাগ বাহেরিন দ্বীপপুঞ্জে রপ্তানি হইয়াছে। চায়ের প্রধান ক্রেতা বিলাত ও পিগ্ লোহার বড় খরিদ্দার বরা-[ব]রের মত আলোচ্য মাসেও জাপান ছিল।

বঙ্গদেশে সিগার ও সিগারেট কাট্‌তির হিসাব

খৃষ্টাব্দ	মূল্য
১৯২৪—২৫	৪৭,১০ ৯৪৯ৎ
১৯২৫—২৬	৪৭,৩৯,৯৪৯ৎ
১৯২৬—২৭	৫৬৩২,২৩৯ৎ
১৯২৭—২৮	৭৬,০১,৯৩২ৎ
১৯২৮—২৯	৭৮,৬৮,৮৩৩ৎ

কলিকাতায় ধূমের বিষ

কলিকাতার অধিবাসীদিগকে যে নিত্য কতরকম বিষ [খা]ইতে বাধ্য হইতে হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। খাদ্য [দ্র]ব্যের সহিত দুই বেলাই এই সহরের ১২ লক্ষ নরনারীকে ভেজালের বিষ উদরস্থ করিতে হয়। তাহার পর জলে বিষ, [ব]াতাসে বিষ, প্রতি শ্বাসে শ্বাসে নানাবিধ বিষ তাহাদের শরীরে [প্র]বেশ করিয়া থাকে। ধূম কলিকাতার একটা কুৎসিত বিষ। [ল]ক্ষ বাড়ীতে লক্ষ রন্ধনশালা। খুব কম করিয়া ধরিলেও, দুই বেলায় দুই লক্ষ উনানে পাথুরিয়া কয়লা পুড়িয়া থাকে। তাহার উপর ছাদে উঠিলেই দেখা যাইবে,—অসংখ্য কলের চিম্‌নি, রেলের ইঞ্জিন ও ষ্টীমারের চোঙের মুখ হইতে সর্ব্বদাই ধূমরাশি বাহির হইয়া বাতাসে মিশিতেছে। ঘর বাড়ী ঘন ঘন বলিয়া, ঘরের ধূম আকাশে উঠিতে পারে না, ঘরের ভিতরেই ঘনীভূত হইয়া থাকে। চিম্‌নির ধূম আকাশ আচ্ছন্ন করে, বাতাস তাহা বহিয়া লইয়া যাইতে পারে না। এই সব ধূমের হিসাব রাখিবার জন্য এক কমিশন আছে; তাহার নাম বেঙ্গল স্মোক নুইসেন্স্ কমিশন। সম্প্রতি এই কমিশন তাঁহাদের ১৯২৯ সনের বিবরণী প্রকাশ করিয়া-ছেন। এই রিপোর্টে তাঁহারা বলিয়াছেন,—শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত কলিকাতাবাসিগণ যে বাতাস গ্রহণ করেন তাহা দূষিত এবং সহরের কোন কোন অঞ্চলে এই বাতাস মানুষের পক্ষে অনুপযোগী। এক শ্বাস রোগে যত লোক মরে, অপর কোন রোগে তত অধিক লোক কলিকাতা সহরে মরে না। শ্বাস-রোগে মৃত্যুর মধ্যে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যাই অর্দ্ধেক। ঘনবসতিপূর্ণ সহরে বায়ু দূষিত হইলে সাধারণের স্বাস্থ্য অটুট থাকিতে পারে না।

যে স্থানে বাতাস ঘণ্টায় প্রায় ১২ মাইল হিসাবে চলাচল করে তথাকার বাতাস আপনা হইতেই শুদ্ধ হইয়া যায়। বাতাসের বেগ ইহা অপেক্ষা কম হইলে, বায়ু শুদ্ধ রাখিবার উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কলিকাতা সহরে বাতাসের বেগ গড়ে ঘণ্টায় দুই মাইল। ১৯২৯ সনের রিপোর্টে শ্বাস-রোগে মৃত্যু-হার ও বাতাসের বেগ তুলনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, যখন বায়ু চলাচল বন্ধ হইয়া দূষিত পদার্থে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া উঠে তখন সাপ্তাহিক মৃত্যুর সংখ্যা ৮০ হইতে ২৪০এ গিয়া ঠেকে। কারখানা, ষ্টীমার জাহাজ প্রভৃতি হইতে উদ্গত কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের পরিমাণ কমান হইয়াছে। এইগুলির ধুঁয়া প্রায় বড় বড় চিম্‌নী দিয়া নির্গত হয় বলিয়া বহু উর্দ্ধে থাকিয়া যায় ও তুলনায় ক্ষতিও কম করে। কিন্তু গৃহস্থ বাড়ী হইতে প্রত্যহ ১৫ লক্ষ মিনিট ধুঁয়া নির্গত হইয়া নীচের দিকেই থাকিয়া যায় বলিয়া ক্ষতির পরিমাণ অধিক হয়—মৃত্যুহার বাড়িয়া যায়, সাধারণের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে থাকে।

কলিকাতায় শীতকালে বাতাস চলাচল বন্ধ থাকে; তাই সমস্ত আকাশ কালো ধুঁয়ায় ভরিয়া থাকে। এই সময়ে শ্বাসরোগে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া যায়।

১০০টি চাউল-ছাঁটা কল কমিশনের কর্ম্ম-পরিধির অন্তর্ভুক্ত। বয়লার ষ্টীম্ দিয়া প্রথমে ধানগুলি ভিজাইয়া পরে শুষ্ক করা হয়; পরে ষ্টীম্ এঞ্জিন চালিত কলের সাহায্যে তুষ পৃথক করা হয়। এই দুই ক্ষেত্রেই প্রায় সম পরিমাণ ষ্টীম্ লাগে। "একজাষ্ট্ ষ্টীমের" সাহায্যে যাহাতে ধান বাষ্পে ভিজান চলে, কমিশন বহুদিন যাবৎ সেই চেষ্টা করিতেছিলেন, যেহেতু, তাহা হইলে জ্বালানির পরিমাণ অর্দ্ধেক হইয়া যাইবে ও কালো-ধুঁয়ার পরিমাণও অল্প হইবে। গত পাঁচ মাস হইতে একটি স্থানীয় চাউলের কলে হেগেন কর্পোরেশন নির্ম্মিত "একজষ্ট ষ্টীম্" পরিষ্কারক ব্যবহৃত হইতেছে। এই যন্ত্রটি ব্যবহারের ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধ-সময়ে ধান বাষ্পে ভিজান সম্ভব হইয়াছে, জ্বালানির পরিমাণ অর্দ্ধেক হইয়াছে এবং কৃষ্ণবর্ণ ধুম-উদ্গীরণ প্রায় সম্পূর্ণ রোধ হইয়াছে। অন্যান্য কলে এই যন্ত্র যাহাতে ব্যবহৃত হয় তাহার চেষ্টা কমিশন করিতেছেন।

গত বৎসর প্রত্যেক চিম্‌নি হইতে গড়ে ঘণ্টায় '৪৮ মিনিট ধুম নির্গত হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে তাহা দাঁড়াইয়াছে '৩ মিনিটে। কমিশন যখন এই কার্য্য গ্রহণ করেন তখন চিম্‌নি-নির্গত কালো ধুঁয়ার দৈনিক পরিমাণ ছিল ২০০,০০০ মিনিট, এখন দাঁড়াইয়াছে ৫,৫০০ মিনিট। চিম্‌নি হইতে নির্গত কালো-ধুঁয়ার ঘনতার অনুরূপ ঘনতা-বিশিষ্ট গৃহস্থালী হইতে নির্গত ধুঁয়ার দৈনিক পরিমাণ ১৫ লক্ষ মিনিট।

গৃহস্থালী-ধুঁয়া নিবারণের উপায় হইতেছে সস্তায় বিদ্যুৎ-শক্তি ও গ্যাসের সরবরাহ ও ধূম্রহীন জ্বালানির ব্যবহার।

খিদিরপুর ডক্ অঞ্চলে প্রায় ৫০০০০ টন কয়লা খোলা জায়গায় ছোট ছোট স্তূপ করিয়া পোড়াইয়া কোক কয়লায় পরিণত করা হইত; ইহার ফলে খিদিরপুরবাসী-দিগের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। পোর্ট কমিশনারগণ ইহা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই কার্য্যে হাত দিবার পূর্ব্বে দৈনিক প্রায় ৬০০ বিভিন্ন স্তূপে কয়লা জ্বালাইয়া কোক করা হইত; এখন এই সংখ্যা ৬ হইয়াছে। তেলকল ঘাটের কাছে প্রায় ৪০০০ টন কয়লা পোড়াইয়া কোক করা হইত; ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী কুলিমজুরদের কুটীরগুলি "কোল-ইয়ার্ড" হইতে দূরে সরাইবার পর হইতে ইহা বন্ধ হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইলে ধুঁয়া কমিয়া যাইবে। ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের সুবিধার জন্য "ক্যাল্‌কাটা ইলেক্ট্রিক্ সাপ্লাই কর্পোরেশন" শিল্পের জন্য প্রতি ইউনিটের রেট্ ২৷৷০ আনা হইতে ২ আনায় নামাইয়াছেন এবং "হিটিং রেট" (তাপের জন্য) ১½ আনার স্থলে ১ আনা করিয়াছেন।

ধূম্রহীন গ্যাসের যন্ত্রপাতি ব্যবহারেও ধুঁয়া নিবারিত হইতে পারে। গৃহস্থালী কাজের জন্য ব্যাপকভাবে গ্যাস ব্যবহার করাইতে হইলে গ্যাসের দর অল্প হওয়া আবশ্যক। কলিকাতা কর্পোরেশন যদি গ্যাস কোম্পানীকে "লাইটিং গ্যাসের" পরিবর্ত্তে "হিটিং গ্যাস" ব্যবহারের অনুমতি দেন, তবে জনসাধারণকে ওরিয়েণ্ট্যাল্ গ্যাস্ কোম্পানী অল্পদরে গ্যাস্ সরবরাহ করিতে সক্ষম হইবেন।

কলিকাতায় কর্পোরেশনের ব্যয়ে বাড়ী

কলিকাতায় বাড়ী-ভাড়া এত বেশী যে, এখানে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এবং শ্রমিক শ্রেণীর লোকেদের বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল লোক যাহাতে অল্প ভাড়ায় থাকিতে পারে, তজ্জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যয়ে বাড়ী তৈরী করিবার কথা হয় এবং এইজন্য একটি স্পেশাল কমিটিও নিয়োগ করা হইয়াছিল। এই কমিটি একটি স্কীম দিয়াছেন। কিন্তু বাজেটে টাকার ব্যবস্থা না থাকায় স্কীমটি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভায় ঠিক হইয়াছে যে, আগামী বৎসর এপ্রিল মাসে এই স্কীম অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে এবং তজ্জন্য টাকার ব্যবস্থাও করা হইবে।

কলিকাতায় বাড়ী-ভাড়া

মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকের কষ্ট দূর করিবার জন্য কলিকাতায় বাড়ী-ভাড়া যাহাতে কমে সেই চেষ্টা সুরু হইয়াছে। কলিকাতায় খাইখরচ, কাপড়চোপড়, জমি এবং বাড়ী তৈয়ারীর মাল মশলার মূল্য যুদ্ধের পরে যেমন ছিল, এখন তাহার চেয়ে অনেক কম; কিন্তু বাড়ীভাড়া সে অনুপাতে কমে নাই।

	১৯১৩ খৃষ্টাব্দের দাম	যুদ্ধের পরে বাড়তি দাম	বর্ত্তমান দাম
খাদ্য সামগ্রী ও কাপড়চোপড়	১০০	২৫০	১২৫
জমি ও বাড়ী তৈরী করিবার মালমশলা	১০০	৩০০	১২৫
বাড়ী-ভাড়া	১০০	৩০০	২৭৫

বাংলার কথা—আর্থিক তথ্য সঙ্কলন
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪) হুগলী

হুগলী জেলার পরিমাণ ফল ৭,৬০,৩২০ একর। সহরের সংখ্যা ১০ এবং গ্রামের সংখ্যা ২১৮৭। মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনের হিসাবানুসারে) ২,৮৫,৩০০ একর। অর্থাৎ মাথাপিছু ½ একর। গড় বার্ষিক বৃষ্টি-পাত ৫৭·১৫ ইঞ্চি। গাইগরু ও স্ত্রীমহিষের সংখ্যা ১,৫৬,২৫৯। ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ১,৭৮,৮৩৩। লাঙ্গলের সংখ্যা ৭৫,৯৪৩।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৫,৮০,৭১৩ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১৭,০৫,২৬২ মণ।

জনসংখ্যা

সন		
১৮৭২	...	১১,১৯,৩৯৭
১৮৮১	...	৯,৭৪,৭৭৩
১৮৯১	...	১০,৩৪,২৯৬
১৯০১	...	১০,৪৯,০৪১
১৯১১	...	১০,৯০,০৯৭
১৯২১	...	১০,৮০,১৪২

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৮,৮৪,৮০৯ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ১,৭৩,৬৩৩।

প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা ৯০৯।

শিক্ষিতের সংখ্যা
(১৯২১ সনের হিসাব)

মোট হিন্দুর শতকরা	...	১৩·৮
„ মুসলমানের „	...	১০·৩
„ হিন্দু পুরুষের „	...	২৩·৫
„ মুসলমান „ „	...	১৯·১
„ হিন্দু মেয়ের „	...	৩·৩
„ মুসলমান „ „	...	·৮

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ১৩৩৬। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৫০,৯২১। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সসম্পন্ন (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালিকার সংখ্যা ১৩,৩১,৮৪৭। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) ১৯২৫ সনে ৫২,৮৮৬।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ১২,২৫,৮৭৫।

স্বাস্থ্য

হাজারকরা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ২৮·৪। হাজার করা মৃত্যুর হার হিন্দুর মধ্যে (ঐ সনে) ২৪·৯ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৫·৬।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—২০,১৬৭ ১৯২২—১৭,৪০৫
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫—১৫৮৫ ১৯২২—৬৮৭
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫—১৬৭১ ১৯২২—১২২

শিশুমৃত্যু

(১০ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু	...	২৩০·৮
স্ত্রী „	...	২১৩·৪

ডাক্তারখানার সংখ্যা

ডাক্তারখানা	...	২১

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	...	৩৩৬
কুষ্ঠরোগী	...	১৬০
অন্ধ	...	৬৪৭
হিন্দু বিধবা	...	১,২৫,৬৭১
মুসলমান „	...	১৯,৩২৫

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমি রাজস্ব	...	১৩,৩১,৮৪৭৲
ষ্ট্যাম্প	...	৪,৫১,৫৯৫৲
আয়কর	...	১,২৭,০০৫৲
আবগারী	...	৮,৫৮,২৬৮৲
আফিং	...	২,৪৪,৪৯০৲
অন্যান্য	...	৭,৭৪৫
রোড ও পাবলিক সেস্	...	১,৯২,৪৩০৲
	মোট	৩১,৯৩,৩৭৮৲

(৫) হাওড়া

হাওড়া জেলার পরিমাণ ফল ২,২৬,৪০০ একর। সহরের সংখ্যা ২ এবং গ্রামের সংখ্যা ৮৬১। মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনের হিসাবানুসারে) ১,১০,৪০০ একর। অর্থাৎ মাথা পিছু ⅐ একর।

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬০·৩১ ইঞ্চি। গাই গরু ও স্ত্রী-মহিষের সংখ্যা ৮৯,০৮০। ষাঁড়, বলদ ও পুংমহিষের সংখ্যা ৭৪,২১৫। লাঙ্গলের সংখ্যা ২৯,৬৮৩।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৯,৯৫,২৮৯ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১০,৬৩,১৯৩ মণ।

জনসংখ্যা

সন		
১৮৭২	...	৬,৩৫,৮৭৮
১৮৮১	...	৬,৭৫,৩৯৪
১৮৯১	...	৭,৬৩,৬২৫
১৯০১	...	৮,৫০,৫১৪
১৯১১	...	৯,৪৩,৫০২
১৯২১	...	৯,৯৭,৪০৩

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৭,৯০,৭৪১ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ২,০২,৪৭৫। প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা ১৮৮২।

শিক্ষিতের সংখ্যা

(১৯২১ সনের হিসাবানুসারে)

মোট হিন্দুর শতকরা	...	১৬·৩
„ মুসলমানের „	...	৮·৫
„ হিন্দুপুরুষের „	...	২৭·৪
„ মুসলমান „ „	...	১৫·২
„ হিন্দু মেয়ের „	...	৩·৮
„ মুসলমান „ „	...	·৮

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ৯৬৩। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৪৮,৪৮০। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সসম্পন্ন (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা হুগলী জেলার যে সংখ্যা দেখানো হইয়াছে তাহার সহিত যুক্ত থাকায় পৃথক্ দেখানো সম্ভব হইল না। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) ১৯২৫ সনে ৫৩,০৮৬। বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা হুগলী জেলার যে সংখ্যা দেখানো হইয়াছে তাহার সহিত যুক্ত আছে।

স্বাস্থ্য

হাজার করা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ২৯'২। হাজার করা মৃত্যুর হার হিন্দুর মধ্যে (ঐ সনে) ২২'২ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৩'৫।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—৭৮৭২ ১৯২২—১০,৩২৩
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫—২৪৩০ ১৯২২—১৯৪২
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫—২৫৩৮ ১৯২২—৪২৫

শিশুমৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুংশিশু	...	২১৮'০
স্ত্রী-শিশু	...	১৯৬'৯

ডাক্তারখানার সংখ্যা

ডাক্তারখানা	...	১০

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	...	৫৫৬
কুষ্ঠরোগী	...	১৭২
অন্ধ	...	৭৪৯
হিন্দু বিধবা	...	৯১,৬৯১
মুসলমান „	...	১৭,১৪২

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমিরাজস্ব	...	×
ষ্ট্যাম্প	...	৪,৩৭,৯৪০৲
আয়কর	...	৪৫,০৫৩৲
আবগারী	...	৪,২২,৩৭৪৲
আফিং	...	১,২৬,৬৭৫৲
অন্যান্য পন্থা	...	১৯৮৩৲
পথ কর ও পাব্‌লিক্ সেস্	...	×
		১০,৩৪,৫৩২৲

(৬) মেদিনীপুর

মেদিনীপুর জেলার পরিমাণ ফল ৩৪১৯,০৪০ একর। সহরের সংখ্যা ৮ এবং গ্রামের সংখ্যা ১০,৩৪৩।

মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনের হিসাবানুসারে) ১৭,৪৫,৮০০ একর, অর্থাৎ মাথাপিছু ⅗ একর। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬০'০১। গাইগরু ও স্ত্রী মহিষের সংখ্যা ৫,২১,২৪৫। ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ৬,৭২,০৪৮। লাঙ্গলের সংখ্যা ২,৮৭,৮৮৮। ১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৮৭,৬৭,৯৪৫ মণ। ১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১৮,৬২,৭৭৫ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২—২৫,৪২,৯২০
১৮৮১—২৫,১৫,৫৬৫
১৮৯১—২৬,৩১,৪৬৬
১৯০১—২৭,৮৯,১১৪
১৯১১—২৮,২১,২০১
১৯২১—২৬,৬৬,৬৬০

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ২৩,৫১,৮৭০ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ১,৮০,৬৭২। প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা ৫২৮।

শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সন)

মোট হিন্দুর	শতকরা	১১'১
„ মুসলমানের	„	৭'৪
„ হিন্দু পুরুষের	„	২০'৯
„ মুসলমান „	„	১৪'২
„ হিন্দু মেয়ের	„	১'১
„ মুসলমান „	„	'৬

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ৩৯৯৭। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ১,২৭,০৩৭। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সসম্পন্ন (৬ হইতে ১৫ বৎসর

বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ৬,৯৫,৫১৪। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) ১৯২৫ সনে ১,২৬,৮১৭। বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৫,৬৮,৬৯৭।

স্বাস্থ্য

হাজার করা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ২৮'৭। হাজার করা মৃত্যুর হার হিন্দুর মধ্যে (ঐ সনে) ২৩'৫ ও মুসলমানের মধ্যে ২২'০।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু { ১৯১৫—৪৮,৭৬৫ / ১৯২২—৪৮,০৩৩

কলেরায় মৃত্যু { ১৯১৫—৪,৫১৪ / ১৯২২—২৬৬৭

বসন্তে মৃত্যু { ১৯১৫—৭১৬৪ / ১৯২২—১০১২

শিশু মৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু—২১৪'৪

স্ত্রী „ —২১০'৭

ডাক্তারখানার সংখ্যা

ডাক্তারখানা	...	২০

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	...	২১৪০
কুষ্ঠ রোগী	...	১২৮৮
অন্ধ	...	২৩২৬
হিন্দু বিধবা	...	৩,৩৫,১২২
মুসলমান বিধবা	...	১৭,৬৩৮

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমিরাজস্ব	...	২১,৬৮,৭৫০৲
ষ্ট্যাম্প	...	১১,৬৪,২৪২৲
আয়কর	...	১,১০,৮৩৭৲
আবগারী	...	৪,২২,৩৭৪৲
আফিং	...	২,৭৭,৫৮১৲
অন্যান্য	...	২৭,১৮২৲
পথকর ও পাব্লিক্ সেস্		৪,০২,২৮৭৲
মোট		৪৫,৭১,৩০৩৲

শ্রীসুকুমার মিত্র
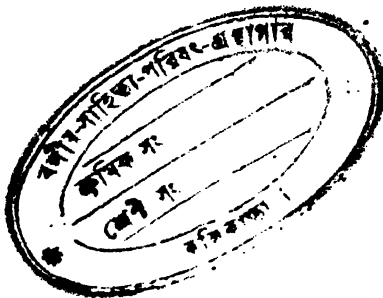
ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য (এপ্রিল, ১৯৩০)

আর্থিক বৎসরের প্রথম মাস এপ্রিল। কিন্তু এ মাসের ব্যবসা বাণিজ্য দেখিলে বৎসরকে খুব শুভ বলিয়া মনে হয় না। ভারতের সাগরপারের বাণিজ্যের অবস্থাও খুব কাহিল। একমাত্র চাউলের ব্যবসাটা একটু ভাল দেখা যায়। তাহার কারণ চাউলের রপ্তানি-শুল্ক কমাইয়া দেওয়াতে আলোচ্য মাসে অনেক চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

গত ২।৩ মাসে বাণিজ্যের গতি একটু ফিরিলেও আলোচ্য মাসে অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কতকটা কারণ স্বরূপ ভারতব্যাপী প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনকে ধরা যাইতে পারে। বিদেশী পণ্যের মোট আমদানি কমিয়া ১৮ কোটি টাকায় নামিয়াছে। ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাসে এই সংখ্যা ৬½ কোটি বেশী ছিল। ভারতীয় পণ্যের রপ্তানিও আলোচ্য মাসে গত ২৪ মাসের তুলনায় অতিশয় কমিয়া গিয়াছে। আলোচ্য মাসে মোট রপ্তানির পরিমাণ ২৪ কোটি টাকা। ইহাও গত বৎসরের ঠিক ঐ সময়ের তুলনায় ৩½ কোটি টাকা কম।

১৯২৯ সনের এই মাসে ৩½ কোটি টাকার ব্যবসা হইয়াছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানি আলোচ্য সনে কিছু বেশী হইলেও ব্যালান্স অব্ ট্রেডের হিসাবে কিছু কম দেখা যায়। আলোচ্য মাসের ব্যালান্স অব্ ট্রেড ৩,৫৫ লক্ষ টাকা এবং পূর্ব্ব বৎসরের এই মাসে ছিল ৮৮ লক্ষ টাকা। ১৯৩০ সনের মার্চ্চ মাসে ৫,০৩ লক্ষ টাকা।

বিদেশী পণ্যের মধ্যে খাদ্য, পানীয় এবং তামাকের আমদানি ১,৭৮ লক্ষ টাকা কমিয়া ২,৪২ লক্ষ টাকায় ঠেকিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেক দফায় কিছু না কিছু আমদানি কম দেখা গিয়াছে। শস্য, ডাল এবং ময়দার ব্যবসাতেও ১,০৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। শুল্ক গমের ব্যবসার পড়তির দরুণ এ সব জিনিষের ব্যবসা এত কমিয়া গিয়াছে। চিনির ব্যবসার গতি পূর্ব্বের মত আলোচ্য মাসেও নিম্নমুখী ছিল। ইহার মোট ব্যবসা ৬০ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। তৈরী মালের ব্যবসাও গত বৎসরের ১৭½ কোটি টাকার স্থানে আলোচ্য মাসে ৪ কোটি টাকা কমিয়া গিয়াছে। বরাবরকার মত তুলা ও তুলাজাত মালের ব্যবসা আলোচ্য মাসে সকল ব্যবসা অপেক্ষা বেশী কমিয়াছে। এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যবসাটা দিন দিন অবনতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। গত বৎসরের এই মাসে যে স্থানে ৪,৫৪ লক্ষ টাকা ছিল, আলোচ্য মাসে তাহা ২,১৯ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরেও তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১,১৯ লক্ষ টাকা কমিতে দেখা গিয়াছিল। লৌহ ইস্পাত ধাতুর ব্যবসা ৪৯ লক্ষ টাকা কমিয়া আলোচ্য মাসে ১৪৪ লক্ষে ঠেকিয়াছে আর অন্যান্য ধাতু মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। দ্রুতগামী গাড়ীর ব্যবসা ৬৭ লক্ষ হইতে ৫৭ লক্ষে নামিয়াছে। বলিতে গেলে এমন একটীও ব্যবসা নাই যাহা আলোচ্য মাসে বাড়তির দিকে গিয়াছে। কাঁচা মালের বাজারও এই অবস্থা হইতে রেহাই পায় নাই। এই দফার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী জিনিষের বিশেষ পড়তি দেখা গিয়াছে :—

খনিজ তৈল	...	১৮ লক্ষ টাকা
কাঁচা তুলা	...	১৩ „ „
কাঁচা পশম	...	১২ „ „

এই ত গেল আমদানির কথা। রপ্তানির বিষয়

আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কাঁচা মালের রপ্তানি আলোচ্য মাসে ২৮৯ লক্ষ টাকা কমিয়া ১১,৯৫ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। কাঁচা পাটের রপ্তানি ৬৬ লক্ষ টাকা কমিয়াছে, কাঁচা তূলার রপ্তানি ৫৪ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। তৈল বীজের রপ্তানিও যথেষ্ট কমিয়াছে। চীনা বাদামের রপ্তানি গত বৎসরের এপ্রিল মাসের ১½ কোটি টাকার তুলনায় আলোচ্য মাসে ৫০ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। তিসির রপ্তানি ৩৬ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। গালা ও রজনের রপ্তানি ৩৬ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। কাঁচা রেশমের রপ্তানি ৩৭ লক্ষ টাকা কমিয়া ২১ লক্ষে ঠেকিয়াছে।

খাদ্য, পানীয় ও তামাকের দফায় রপ্তানি ১২০ লক্ষ টাকা কমিয়া ৬,৫৫ লক্ষে ঠেকিয়াছে। চাউলের রপ্তানি কিন্তু ১,৩০ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ৫ কোটি টাকায় উঠিয়াছে। তৈরী মালের রপ্তানিও তেমন সন্তোষজনক হয় নাই। কারণ ১৯২৯ সনের এপ্রিলে যাহা ৭,০০ লক্ষ টাকা ছিল আলোচ্য মাসে তাহা কমিয়া ৫,৩১ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৮ সনের এপ্রিলে ইহা ৬,৭০ লক্ষ টাকা ছিল। পাট হইতে প্রস্তুত মালের রপ্তানি ১,২০ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। এই দফার রপ্তানি মূল্য মোট কম্‌তির ⅔ ভাগ কমিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মোট চটের রপ্তানি ১৯২৯ সনের এপ্রিলের ১৭৬ লক্ষ টাকার স্থানে আলোচ্য মাসে মাত্র ৯৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ১৯২৮ সনের এপ্রিলে এই সংখ্যা ২,৮৩ লক্ষ ছিল। আলোচ্য মাসে দক্ষিণ আমেরিকার চাহিদাও (১২ লক্ষ টাকা) গত বৎসরের তুলনায় অর্দ্ধেকেরও বেশী হইয়া গিয়াছে। চট থলের (বস্তা) রপ্তানি আলোচ্য মাসে ১১৩৯ লক্ষ টাকা হইয়াছে। এই সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের এপ্রিল হইতে ১৬ লক্ষ কমিয়াছে। এবং ১৯২৮ সনের এপ্রিল হইতে ৩৩ লক্ষ কমিয়াছে। এ ছাড়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য কমতি (২৪ লক্ষ টাকা) দেখা গিয়াছে সুতা ও সুতির কাপড়ের রপ্তানিতে।

দেশের বন্দরগুলিতে আলোচ্য মাসে জাহাজে করিয়া বিদেশ হইতে যত মাল আসিয়াছে তাহার ওজন পূর্ব্ব বৎসরের এপ্রিলের সংখ্যা হইতে ৮৫ হাজার টন কমিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার হইতেই বুঝা যায় আলোচ্য মাসে বিদেশী মালের আমদানি কতখানি কমিয়া গিয়াছে। আবার আমাদের বন্দর হইতে যত মাল বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছে তাহার পরিমাণও ১৯২৯ সনের এপ্রিল হইতে ৬৮ হাজার টন কমিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য মাসে এ দেশের রপ্তানি মাল কোন্ কোন্ দেশে কতখানি গিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জার্ম্মাণি ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেকে দেড় কোটি টাকা করিয়া কম মূল্যের জিনিষ লইয়াছে। এ ছাড়া নিম্নলিখিত দেশগুলিতেও নিম্নের হিসাব মত রপ্তানি কম হইয়াছে :—

ইতালি	...	৬০ লক্ষ টাকা
নেদারল্যাণ্ড	...	২৬ " "
বেলজিয়াম	...	১৯ " "
ফ্রান্স	...	২৪ " "

তবে চীন ও জাপানে আলোচ্য মাসে ভারত হইতে যথাক্রমে ১,৫২ লক্ষ এবং ২৯ লক্ষ টাকার মাল বেশী রপ্তানি হইয়াছে। বিলাতে ১৬ লক্ষ টাকার রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে।

দেশের আমদানির হিসাব দেখিলে দেখা যায়, বিলাতী মালের আমদানি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কমিয়াছে। আলোচ্য মাসে বিলাতী মালের আমদানি ৩ কোটি টাকা কমিয়া ৮,১৮ লক্ষে ঠেকিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার মালের আমদানিও ১,১৪ লক্ষ কমিয়া ২৭ লক্ষে ঠেকিয়াছে। আলোচ্য মাসে অন্যান্য যেসব দেশের মালের আমদানি যে পরিমাণ কমিয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

জাপান	...	৪৬ লক্ষ টাকা
জার্ম্মাণি	...	১৯ " "
জাভা	...	২৪ " "
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র		৪৩ " "

ভারতের আমদানি ব্যাপারে দুনিয়ার কোন দেশই আলোচ্য মাসে তেমন লাভবান হইতে পারে নাই।

ভারতের রাজস্ব প্রাপ্তি

এপ্রিল	১৯২৯	১৯২৯	১৯৩০
	টাকা	টাকা	টাকা
জমির রাজস্ব	২,৭৯,৯৮	২,৯৭,৯৫	২,৯৫,৪৩
লবণ "	৬৩,২৩	৬৯,৩৩	৬৩,১০
ষ্ট্যাম্প "	১,৩০,০২	১,৩৮,১৫	১,২১,৯৫
আবগারী "	১,৪৫,০৯	১,৫৫,০৭	১,৪১,৬৮
কাষ্টমস বিভাগের প্রাপ্তি,	৩,৯৩,৫৮	৪,৫৪,৬৩	৪,৩১,৮৯
ইনকাম ট্যাক্স (অতিরিক্ত ট্যাক্স, অধিক লাভ শুল্ক ধরিয়া)	৮০	৩০,৪৬	২৮,২১
বন বিভাগের রাজস্ব	১৭,০২	১৮,৮৮	১৮,৯৮
আফিং	১৩,৭৯	১৩,২৭	৩৪,৪৭

পণ্য রপ্তানি

(লক্ষ টাকায় হিসাব)

	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০	১৯২৮-২৯	১৯২৭-২৮
এপ্রিল	২৪৫৮	২৮,১০	২৫,৭৮	২৫৯৩
মে	—	২৬,৩৮	২৯,৭৮	২৪৯১
জুন	—	২৬,৭১	২৮,২৮	২২৭৮
জুলাই	—	২৫,৬৩	২৬,৮৪	২৬৩৮
আগষ্ট	—	২৭,৩৭	২৬,৯৩	২৭১৪
সেপ্টেম্বর	—	২৬,২৭	২৪,৮৪	২৭৯৩
অক্টোবর	—	২৬,২৬	২৯,৫১	২৫৮৭
নভেম্বর	—	২৭,৩৪	২৮,৩২	২৯১০
ডিসেম্বর	—	২৪,১০	২৬,৯৫	২৭৮৪
জানুয়ারী	—	২৬,৯০	৩০,৩৪	২৯৯৪
ফেব্রুয়ারী	—	২৪,৮০	২৮,৪৮	২৮৮৯
মার্চ্চ	—	২৮,০৬	৩১,৯১	৩১৯৮
মোট রপ্তানি		৩১৭,৯৩	৩৩৭,৯৬	৩২,৮৬৯

পণ্য আমদানি

(লক্ষ টাকায় হিসাব)

	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০	১৯২৮-২৯	১৯২৭-২৮
এপ্রিল	১৮,১০	২৪,৫৪	২২,০১	২২,৬০
মে	—	২১,২৩	২০,৩৭	২০,৬৯
জুন	—	১৬,৫২	১৮,৭৯	১৮,৮৪
জুলাই	—	১৯,০৬	১৮,৭৩	১৮,৬৫
আগষ্ট	—	২০,৩৪	২০,৪১	২১,২৮
সেপ্টেম্বর	—	১৯,২৩	২০,৭২	২১,১৭
অক্টোবর	—	১৯,২৪	২১,৬৪	২১,০৯
নভেম্বর	—	২২,৫০	২৩,২১	২১,৬৮
ডিসেম্বর	—	১৭,০৩	১৮,৪৯	২০,১৪
জানুয়ারী	—	২২,৯৪	২৬,৮৬	২২,২১
ফেব্রুয়ারী	—	১৭,৩২	১৯,৮৩	১৯,৭৩
মার্চ্চ	—	২০,৮২	২২,২৫	২১,৭৬
মোট আমদানি		২৪০,৪৬	২৫৩,৩১	২৪৯,৮৩

ভারতের কাষ্টম্‌স্ রেভিনিউ

১৯৩০ সনের মে মাসে ভারতের সমুদ্র ও ভূমি-সংক্রান্ত পণ্যের মোট কাষ্টমস্ রেভিনিউ (লবণ বাদে) ৪৩৫ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্বমাসের সংখ্যা ছিল ৪৩৭ লক্ষ টাকা এবং ১৯২৮ সনের মে মাসের সংখ্যা ছিল ৪২১ লক্ষ টাকা। ১৯৩০ সনের এপ্রিল ও মে মাসের মোট রেভিনিউ আদায় ৮,৭২ লক্ষ টাকা, পূর্ব্ব বৎসরের ঠিক ঐ সময়ের আদায় ছিল ৮,৮০ লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া আমদানি শুল্ক আদায় হইয়াছে ৬,৬৭ লক্ষ টাকা, রপ্তানি শুল্ক ৮১ লক্ষ টাকা, মোটর স্পিরিটের উপর আবগারি শুল্ক ৫২ লক্ষ টাকা, কেরোসিনের উপর ২২ লক্ষ টাকা এবং ভূমি কাষ্টমস্ ও বিবিধ শুল্ক ২০ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে আবার চিনি, খনিজ তৈল এবং সূতির বস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক ও মোটর স্পিরিট ও কেরোসিনের উপর শুল্ক অপেক্ষাকৃত বেশী আদায় হইয়াছে। এ ছাড়া লৌহ ও ইস্পাত, তামাক মদ্য, মোটর গাড়ী ও মোটর সাইকেল,

লোহালক্কড়, অন্যান্য ধাতু, কাটা সূতা, বোনা কাপড় (তুলা ও রেশম ছাড়া) তুলার সূতা, দেয়াশলাই কাটি, ভিনিয়ার, রেশম, কাপড়, কাগজ, মনিহারি জিনিষপত্র রবার টায়ার ও টিউব প্রভৃতির উপর আমদানি শুল্ক এবং পাট (কাঁচা ও তৈয়ারী অবস্থায়) ও চাউলের উপর রপ্তানি শুল্ক ও ভূমি সংক্রান্ত কাষ্টমস্ ডিউটি আদায় আলোচ্য দুই মাসে অনেক কমিয়া গিয়াছে। কতকগুলি অপ্রকাশ্য আমদানি মালের উপর সংরক্ষণকারী বিশেষ শুল্ক আলোচ্য দুই মাসে সর্ব্বসমেত ১৬১ লক্ষ টাকা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ষ্টোরের জন্য মালের উপর শুল্ককে সংরক্ষণ শুল্ক ধরিয়া মোট ৫ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের এই দুই মাসে এই শুল্কের পরিমাণ ১১ লক্ষ টাকা হইয়াছিল।

সরকারী ঋণ

সরকারী ঋণকে এদেশে কোম্পানীর কাগজ বলে। কোম্পানীর কাগজের উঠতি পড়তিতে টাকার বাজার উঠে নামে। সরকার শতকরা ছয় টাকা সুদে নূতন ঋণ বা কোম্পানীর কাগজ বাহির করিলেন। বর্ত্তমান আন্দোলনের দরুণ সরকারী রাজস্বের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিতে এই ঋণ-গ্রহণ। যুদ্ধের পরে এত বেশী সুদে ঋণ করা সরকারের পক্ষে আবশ্যক হয় নাই। পূর্ব্বে সরকারী ঋণে ৩ বা ৩॥৹ টাকা সুদের বেশী প্রয়োজন হইত না এবং তাহা বাহির হইবার অত্যল্প সময়ের মধ্যে উঠিয়া যাইত। যুদ্ধের সময় অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ সরকারকে ৪॥৹ টাকা কি ৫॥৹ টাকা (কার্য্যতঃ ৮৲) সুদের ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল,—যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সরকারকে ছয় টাকা সুদের ঋণ অত্যল্প সময়ের জন্য বাহির করিতে হইয়াছিল। সেই সব কারণে ৩॥৹ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর যে ভাবে নামিয়া গিয়াছিল, তাহা ভয়াবহ। এখনো তাহা পুরাদরে উঠে নাই, তাহার কারণ সরকার যুদ্ধের ঋণ বা 'ওয়ার বণ্ডের' টাকা ফেরৎ দিবার সময়ে ৪॥৹ টাকা সুদের ঋণ বাহির করেন, অনেকে 'ওয়ার বণ্ড' বদলাইয়া সেই ঋণ বা কোম্পানীর কাগজ গ্রহণ করেন। ৩॥৹ টাকার কোম্পানীর কাগজওয়ালাদের আশা হইয়াছিল, এই ৪॥৹ টাকার ঋণের কালপূর্ণ হইলে সরকার পুনরায় ৩॥৹ টাকা ঋণের কোম্পানীর কাগজ বাহির করিবেন, তখন ৩॥৹ টাকার কোম্পানীর কাগজওয়ালারা বাজারে তাহাদের কাগজের পুরা দর পাইবে। এই আশায় বুক বাঁধিয়া তাহারা দিন গণিতেছিল; কিন্তু সরকার ছয় টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ বাহির করাতে, তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। আবার ৩॥৹ টাকার ও ৪॥৹ টাকার কোম্পানীর কাগজের দর ভয়ানক কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এদিকে ব্যবসায়ের বাজার পড়িয়া যাওয়াতে বাজারে টাকার টান হইয়াছে; মহাজন টাকা মারা যাইবার ভয়ে ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিতেছে না, বরং ফেলা টাকা তুলিয়া লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। এই সময়ে সরকার ছয় টাকা সুদের ঋণ বাহির করিলেন, ইহাতে টাকার বাজার আগুন হইয়া উঠিবে,—ব্যাঙ্কের ধারের সুদের হার বাড়িয়াই যাইবে, মহাজনেরা যদি ধার দেয়, গলা কাটা সুদ আদায় করিবে। একেত ব্যবসায় লোকসান, তাহার উপর টাকার বাজারে টান ধরিলে, ব্যবসাদার অল্প সুদে টাকা না পাইলে বা মোটেই টাকা না পাইলে তাহাদের অচিরে লাল বাতি জ্বালিতে হইবে। ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, বোম্বাইয়ের 'কাগজে'র দালালগণ এই নূতন সরকারী ঋণে বিচলিত হইয়াছেন। তবে এটাও ঠিক, রাজ্য চালাইতে গেলে টাকার দরকার,—রাজস্ব যদি পড়িয়া যায়, বজেটের ধার্য্য টাকা পাওয়া না যায়, তাহা হইলে সকল শাসনতন্ত্রকেই ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। সে ঋণ দেশেও হইতে পারে, বিদেশেও হইতে পারে। সরকার দেশে ঋণ বাহির করিলেন, ইহাতে যদি প্রয়োজনীয় টাকা না উঠে, সরকারকে বিদেশে ঋণ চাহিতে হইবে। এদেশে যদি ৬৲ টাকা সুদে প্রয়োজনীয় টাকা না পান, বিদেশে ঋণ চাহিলে, হয়ত ইহা অপেক্ষা বেশী সুদ দিতে হইবে। ইংলণ্ডেই হউক বা অন্য দেশেই হউক সেই সুদের টাকা এদেশ হইতে দিতে হইবে, তাহার পর আসল আছে। ইহাতে দেশের আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট। সেই হিসাবে এদেশে ঋণ বাহির করিয়া ভালই করিয়াছেন। তবে সব চেয়ে

ভাল হইত, যদি সরকারকে ঋণ গ্রহণ করিতে না হইত, দেশের স্বাভাবিক অবস্থা থাকিত,—সরকার ইচ্ছা করিলে কি এখনো সেই অবস্থা আনিতে পারেন না ?

(বঙ্গবাসী)

ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়ের পরিচয়

গত মার্চ্চ মাসে ভারতে ৯৬টী জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী রেজেষ্টারি করা হইয়াছে। এই সমস্ত কোম্পানীর মোট মূলধন ৪৯১ লক্ষ টাকা।

কলকারখানার মধ্যে যুক্ত প্রদেশে ২ লাখ টাকা মূলধনে স্থাপিত লক্ষ্মী অয়েল মিলটাই উল্লেখযোগ্য। যানবাহন কোম্পানীর মধ্যে ৫ লাখ টাকা মূলধন লইয়া স্থাপিত ইণ্ডো-বার্ম্মা ষ্টীম ন্যাভিগেশান কোম্পানীটিই সর্ব্ববৃহৎ। কলিকাতা এবং মাদ্রাজে কতকগুলি ছোট ছোট বাস্ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দেখা যায়। ১০ লাখ টাকা মূলধনে লোয়ার গ্যাঞ্জেস্ যুম্না ইলেক্‌ট্রিসিটি ডিষ্ট্রীবিউটিং কোং এবং ৩ লাখ টাকা মূলধনে শিয়ালকোট ইলেক্‌ট্রিক্ সাপ্লাই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে।

এ ছাড়া আরও কতকগুলি ছোট ছোট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। যেমন ১ লাখ টাকা মূলধনে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান কেমিক্যালস্ কোম্পানী।

খনি সম্বন্ধে দেখা যায় মাত্র একটী কোম্পানী খোলা হইয়াছে। কোম্পানীর নাম নিউ সেগ্রাম কোল কোম্পানী। ইহা বাঙ্গালায় অবস্থিত ; মূলধন ১ লাখ টাকা। প্ল্যাণ্টেশানের মধ্যে রবার চাষের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা মূলধনে কোচিন মালাবার এষ্টেট্ নামে একটি কোম্পানী রেজেষ্টারী করা হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে ১৯২৯-৩০ সন ছিল সকলের সেরা। এই সনে কোম্পানী রেজেষ্টারি হইয়াছিল ৮৪২টী (১৯২৮-২৯ সনে ৭৩৩টী)। মোট পুঁজির বহর দাঁড়ায় ৬১ কোটী টাকা। ১৯২৩-২৪ সনের পর এমন বহর আর দেখা যায় নাই। ঐ সনে ৯১॥ লাখ মূলধনে ৬টী নেভিগেশান কোম্পানী, ৯০ লাখ টাকা মূলধনে ২টি রেল এবং ট্রাম কোম্পানী এবং ৫৩ লাখ টাকা মূলধনে ৩২টী মোটর কোম্পানী স্থাপিত হয়। সাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠান দাঁড়ায় ২১টী, মূলধন ১৫৯ লাখ টাকা; ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ১৪টী, মূলধন ১৩৫ লাখ টাকা, ট্যানারি ৪টী, মূলধন ৩৸০ লাখ টাকা এবং ছাপাইবার কল ৩২টী, মূলধন ২৮ লাখ টাকা।

ঐ সনে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫ লাখ টাকা মূলধনের ১৫টী ; কিন্তু চটকল স্থাপিত হয় ১০ লাখ টাকা পুঁজির মাত্র ১টী। চালের কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫টী, মূলধন ৪॥ লাখ টাকা ; ময়দার কল ১টী, মূলধন ১০ লাখ টাকা ; করাতের কল ১টি, মূলধন ১ লাখ টাকা ; তেলের কল হয় ৪টী, মূলধন ৪ লাখ টাকা।

খনি সম্বন্ধে ঐ সনে ২২ লাখ টাকা পুঁজির ৯টী কয়লার খনি ১০ লাখ টাকা পুঁজির ১টী মাইকার খনি এবং ৭০ লাখ টাকা পুঁজির ১টী পেট্রোলিয়াম কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। চা এবং অন্যান্য কোম্পানীর মোট পুঁজির পরিমাণ ১২২ লাখ টাকা এবং সংখ্যা ৩৭টী।

ভারতে যন্ত্র আমদানি

কিছুদিন হইতে ভারতবর্ষে ব্যবসাবাণিজ্যের অধোগতি চলিতেছে। এ সত্ত্বেও কিন্তু ভারতবর্ষে ১৯২৯-৩০ সনে যন্ত্র আমদানি বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। ১৯২৮-২৯ সনের তুলনায় আলোচ্য সনে যন্ত্র আমদানি হইয়াছে সামান্য কম ; ১৯২৭-২৮ সনে যন্ত্র আমদানির পরিমাণ ১৫,৯৩ লক্ষ টাকা ; ১৯২৮-২৯ সনে ১৮,৩৬ লক্ষ টাকা এবং আলোচ্য সনে ১৮,২২ লক্ষ টাকা।

অন্যান্য সনের মত আলোচ্য সনেও বিলাত হইতে যন্ত্র আমদানির পরিমাণই সব চেয়ে বেশী। ১৯২৭-২৮ সনে বিলাত হইতে যন্ত্র আসিয়াছিল ১২,৫৩ লক্ষ টাকার এবং আলোচ্য সনে আসিয়াছে ১৩,৬৮ লক্ষ টাকার। আলোচ্য সনে জার্ম্মাণি এবং মার্কিণ উভয়েই পাঠাইয়াছে সমান সমান—প্রত্যেকে ১৭৫ লক্ষ টাকার। জার্ম্মাণির যন্ত্র রপ্তানি অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু মার্কিণের যন্ত্রের বহর কমিয়াছে ৫০ লক্ষ টাকা। বেলজিয়ামের হিস্যার কোন পরিবর্ত্তন নাই—সেই ১১ লক্ষ টাকা। জাপানও দেখা যাইতেছে

ভারতে যন্ত্র রপ্তানি সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতেছে। কারণ ২ লাখ টাকার যন্ত্র হইতে আলোচ্য সনে ৬ লাখ টাকার যন্ত্র পাঠাইয়াছে।

এই সমস্ত যন্ত্রপাতির মধ্যে বয়নযন্ত্রই সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে; এই খাতে আমদানি হইয়াছে ৩৮২ লক্ষ টাকার; ইহার মধ্যে তুলার কল ২১১ লক্ষ টাকার এবং পাটের কল ১৪৩ লক্ষ টাকার। পশমের কল আমদানি বাড়িয়াছে; ২ লাখ টাকার স্থানে ৫॥ লাখ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ধোলাই এবং রঞ্জন কল আমদানি হইয়াছে ৩ লাখ টাকার। ছাপাইবার যন্ত্র আমদানি কিন্তু খুব কমিয়া গিয়াছে।

অ-বৈদ্যুতিক প্রাইম মুভার আমদানি যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে এই খাতে আমদানি হইয়াছিল ২০৮ লক্ষ টাকার; ১৯২৮-২৯ সনে আমদানি হইয়াছে ৩০৩ লক্ষ টাকার; কিন্তু ১৯২৯-৩০ সনে আমদানি হইয়াছে ৪১১ লক্ষ টাকার। অয়েল ইঞ্জিনের আমদানি বাড়িয়া চলিয়াছে, আলোচ্য সনে অয়েল ইঞ্জিন আমদানি হইয়াছে কমসে কম ৬৩০০টা। বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র আমদানি ২৩৬ লাখ টাকা হইতে ২৪০ লাখ টাকায় পৌঁছিয়াছে। কয়লার আমদানি হইয়াছে ১০৮ লাখ টাকার।

খনির যন্ত্রপাতির আমদানি কিন্তু খুব কমিয়াছে এবং এই কমতির কারণ নির্ণয় করা শক্ত। ১৯২৭ ২৮ সনে এই খাতে আমদানির বহর ছিল ১৫০ লক্ষ টাকা; ১৯২৮ সনে দাঁড়ায় ৮০ লক্ষ ট্যকা এবং আলোচ্য সনে দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৬১ লক্ষ টাকা।

ধাতুর কাজ করিবার যন্ত্র আমদানি ৩২ লক্ষ টাকা হইতে ৩৫ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। তেলের কল এবং তেল পরিষ্কারের কল আসিয়াছে ৪৩ লাখ টাকার; রেফ্রিজারেটিং মেশিনারি ২০ লাখ টাকার; চাল এবং ময়দার কল ২৩ লাখ টাকার; কাঠ খোদাই এবং কাঠ চিরিবার কল ৯ লাখ টাকার এবং কাগজের কল ৭ লাখ টাকার।

আলোচ্য সনে নানাবিধ সেলাইয়ের কল আমদানি হইয়াছে ৮৫ লাখ টাকার। তাহার মধ্যে বিলাত হইতে আসিয়াছে ৬০ লাখ টাকার।

চিনির কল আমদানির পরিমাণ ৯ লাখ টাকা, চায়ের কল আসিয়াছে ২৮ লক্ষ টাকার এবং টাইপরাইটার ২২ লক্ষ টাকার। এই সমস্ত মালের প্রধান বিক্রেতা মার্কিণ। কৃষি-কার্য্যের যন্ত্রপাতির বিচিত্র ভবিষ্যৎ দেখা যাইতেছে; এই যন্ত্র আমদানি ১৪ লক্ষ টাকা হইতে ১৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য যন্ত্রাদি আমদানির পরিমাণ ৩১১ লাখ টাকা।

যন্ত্র আমদানি সম্বন্ধে প্রদেশ হিসাবে বাঙ্গালার স্থান সর্ব্বোচ্চ, হিস্সা ৭২৩ লাখ টাকা, বোম্বাইয়ের ৫২৩ লাখ টাকা, সিন্ধুর ১৪৮ লাখ টাকা, বার্ম্মার ১৯২ লাখ টাকা এবং মাদ্রাজের ২৩৫ লাখ টাকা।

ভারতে কাঠ ও সারের অপচয়

গৃহস্থালীর কাজের জন্যে ভারতে কত পরিমাণ জ্বালানি দ্রব্যের ব্যবহার হয়? জনপিছু দৈনিক ২ সের হিসাবে ধর্‌লে ভারতে বছরে প্রায় ২০ কোটি টন জ্বালানি দ্রব্যের দরকার হয়। এর মধ্যে ৭½ লক্ষ টন হচ্ছে পোড়া কয়লা। আর ৩২½ লাখ টন হচ্ছে কাঁচা কয়লা। বাকীটা হচ্ছে কাঠ আর গোবর ইত্যাদি শ্রেণীর জিনিষ, যা সারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারতো। সারের পরিমাণ কাঠের তিন ভাগের এক ভাগ ধর্‌লে ভারতে প্রতি বৎসর ৫ কোটি টন সারের অপচয় হয়। কাঠের অপচয়ের পরিমাণও নিতান্ত কম নয়। এই অপচয় নিবারণ করা যায় কি করে? কয়লা ব্যবসায়ীরা উপদেশ দিচ্ছেন, "বেশী করে পোড়া কয়লা ব্যবহার করো, তা হলে দেশের সার ও কাঠের অপচয় নিবারিত হবে, দেশে উৎপন্ন একটা জিনিষের কাটতিও বাড়বে।" তাঁরা আশা করছেন যে, কাঠ ও সারের জায়গাটি পোড়া কয়লা ক্রমে অধিকার করতে পারে। আর এদিক্ থেকে দেখলে পোড়া কয়লার বাজার ভারতে সত্যিই সুবিস্তীর্ণ। গত ৮ বছরের মধ্যে পোড়া কয়লার ব্যবহার বেশ বেড়েছে। ১৯২১ সনে ভারতে ১৫১,৪১৭ টন পোড়া কয়লার ব্যবহার ছিল; ১৯২৯ সনে সেটা দাঁড়িয়েছে ৭৫৭,৭২৭ টনে। ভবিষ্যতে বাড়বার সম্ভাবনা আরও বেশী। তবে একটা

প্রধান বাধা হচ্ছে ভারত দেশটা নিতান্ত ছোটোখাটো নয়। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় কয়লা পাঠাতে হলে রেল ভাড়া বড় বেশী পড়ে যায়। সহরগুলা সংখ্যায় কম এবং বেশী দূরে দূরে হওয়াও একটা বাধা। ২০০ মাইলের বেশী মাল পাঠানো হলে রেলের ভাড়ার হার যদি কমানো হয় তা হলে এই বাধাটা অনেকটা কমবে।

মোটর গাড়ীর সংখ্যা-বৃদ্ধি—পেট্রলের বিপুল চাহিদা

১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত গোটা বৃটিশ ভারতে রেজেষ্টারীকৃত নানাপ্রকার মোটর যানের সংখ্যা মোট ১,৭২,৫৮০ খানি দাঁড়াইয়াছিল। দেশীয় রাজ্যসমূহের মোটর গাড়ীর সংখ্যা ইহাতে ধরা হয় নাই। এই সমস্ত গাড়ীর মধ্যে মোটর গাড়ীর সংখ্যা ১১৬,৪২৫ খানি, মোটর-লরী প্রভৃতি ভারি গাড়ীর সংখ্যা ৩০,১৮১ খানি। ১৯২৮-২৯ সনের মত এত মোটরযান ভারতে আর কখনও আমদানি হয় নাই। ১৯১৩-১৪ সনে মোটরযান আমদানি হয় ২৮৮০ খানি, কিন্তু ১৯২৮-২৯ সনের আমদানির সংখ্যা ১৯,৫৬৭। ১৯২৮-২৯ সনের আমদানি মোটর যানের মূল্য ৪২১ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সনে ভারি যাত্রিবাহী মোটরবাস এবং মোটরলরী আমদানি হইয়াছে ১২৭৯০ খানি। এই সংখ্যা ১৯২৬-২৭ সনের প্রায় দ্বিগুণ এবং ১৯২৭-২৮ সনের দেড়গুণ; ১৯২৮-২৯ সনে এই জাতীয় মোটরযান আমদানির মূল্য ছিল ২১৬॥ লাখ টাকা। পেট্রল বিক্রয়ও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বিগত দশ বৎসরের তুলনায় আলোচ্য সনে পেট্রল ক্রয়ের পরিমাণ ১১০ লক্ষ গ্যালন হইতে একেবারে ৬২০ লক্ষ গ্যালনে পৌছিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, বৃটিশ ভারতে মোটরযোগে গমনাগমন এবং মাল চলাচলের রেওয়াজ কিরূপ বাড়িয়া যাইতেছে।

ভারতীয় গমের উৎপাদন-বৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাস

ভারতে গমের দাম কমেছে। অনেকে ভাবছেন এর কারণ অষ্ট্রেলিয়া হতে রপ্তানি-বৃদ্ধি। কিন্তু কারণ তা নয়। ভারতের ব্যবহারের জন্যে প্রতি বছর ৮৮ হতে ৯০ লাখ টন গম দরকার হয়। ১৯২৭-২৮ সনের উৎপাদন ছিল ৭৭ লাখ টন, ১৯২৮-২৯ সনের উৎপাদন ছিল ৮৫ লাখ টন। ১৯২৯-৩০ সনে কিন্তু উৎপাদন বেড়ে ১ কোটি টনে দাঁড়িয়েছে। তার ফল হয়েছে এই যে, ভারত বিদেশ থেকে গম না এনে বিদেশে আবার গম পাঠাতে আরম্ভ করেছে। বিদেশের বাজারে পাঠাতে হলে বাইরের জগতে গমের দরের যে হার সেইটা ভারতীয় গমকে প্রভাবান্বিত করবেই। এই জন্যে দর কম্‌ছে। কিন্তু এতে চিন্তিত হবার কারণ নেই। কারণ অষ্ট্রেলিয়াতে ও আর্জ্জেণ্টীনাতে উৎপাদন কমে গেছে। অষ্ট্রেলিয়ার কম্‌তি শতকরা ২২ ভাগ। আর্জ্জেণ্টিনাতে ৩৫ লাখ টন কম জন্মেছে। এটা ভারতেরই সুবিধার কথা। কারণ বিদেশের বাজারে ভারতীয় গমের চাহিদা এখন বাড়্‌বে।

মাদ্রাজের চর্ম্মব্যবসায়

চর্ম্ম ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট লেদার ট্রেড্‌স্ ইনষ্টিটিউট্ নামক একটী শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শিক্ষালয়টী হইতে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় নাই। শিক্ষালয়টীর অকৃত-কার্য্যতা সত্ত্বেও মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট মনে করিতেছেন যে, এই প্রতিষ্ঠান হইতে নানারূপ গবেষণাদি করিয়া চর্ম্মব্যবসায় সম্বন্ধে জনসাধারণকে ব্যবহারিক উপদেশ দেওয়া চলিবে। সুতরাং অতঃপর শিক্ষালয়টী এইরূপ লোক-হিতকর উদ্দেশ্যেই পরিচালিত করা হইবে, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

সম্প্রতি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট চর্ম্মব্যবসায় সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটী কন্‌ফারেন্স বসাইয়াছেন। কনফারেন্সে সাউথ ইণ্ডিয়া স্কিন অ্যাণ্ড হাইড্ মার্চ্চেণ্টস্ অ্যাসোসিয়েশানের প্রেসিডেণ্ট বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, বর্ত্তমানে চর্ম্মব্যবসায় সম্পর্কে একটী প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সকলেরই সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। ভারতে ট্যান করা চামড়ায় কয়েক বৎসর হইতে ক্রমাগত দাগ দেখা যাইতেছে। বিদেশী কারখানাওয়ালারা অনেক চেষ্টা

করিয়াও এই দাগ তুলিতে পারিতেছে না। সুতরাং সকলেরই ধারণা, ভারতে ট্যান করিবার সময়েই এমন কোন দোষ জন্মে যে জন্য চামড়ায় এইরূপ দাগ পড়িয়া যায়। সাধারণতঃ রংএর দাগ এবং লবণের দাগ তুলিয়া ফেলিতে পারা যায়; কিন্তু জলের দাগ, এবং নানাপ্রকার ট্যান করিবার উপাদানের দাগ যে কেমন করিয়া উঠাইতে হয় তাহা এখন পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সরকারী চর্ম্ম-বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন গুম্‌রি চামড়ার দাগ নিবারণ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই সম্পর্কে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে বলা হয় যে, সরকারী শিল্প-বিভাগ হইতে চামড়া ট্যান করা সম্বন্ধে এবং উৎকৃষ্টতর উপায়ে চর্ম্মব্যবসায় পরিচালন সম্বন্ধে কতকগুলি অনুসন্ধান-কার্য্য চালান হইতেছে। ভবিষ্যতেও এইরূপ অনুসন্ধানাদি চলিবে; সুতরাং কতকগুলি বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারি-সম্বলিত একটী ইনষ্টিটিউট পরিচালন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানে ইনষ্টিটিউটে একটী লেবরেটরি আছে। এই লেবরেটরিতে জল এবং ট্যান করিবার উপাদানসমূহ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা হইতেছে। ইনষ্টিটিউটে একটি ট্যান-ইয়ার্ডও আছে। এইস্থানে অল্পবিস্তর চামড়া ট্যানিংএর পরীক্ষাও করা হইতেছে। ভারতবর্ষে চামড়া উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে; সুতরাং ট্যান করিবার খরচপত্র নির্দ্ধারণ এবং ট্যান করিবার উপাদানাবলী সংগ্রহ করা রীতিমত একটী সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। চামড়া ট্যান করিবার জন্য এখন প্রধানতঃ ওয়াটল্‌ই ব্যবহৃত হয়। ইনষ্টিটিউটের কর্ম্মচারিগণ চর্ম্ম-ট্যানকারীদিগকে ওয়াটল্‌এর সহিত অন্যান্য ট্যান্ করিবার উপাদান কি অনুপাতে মিশাইলে সবচেয়ে ভাল পাকা চামড়া পাওয়া যাইবে তৎসম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছেন। ইনষ্টিটিউট হইতে বাকল, জল, ক্রোম চামড়া, চুণের জল ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া লইবার সুবিধা দেওয়া হইতেছে এবং রপ্তানি করিবার জন্য ভেজাল ধরিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্নরূপ রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া চামড়া বিশ্লেষণ করিয়া লইবার ব্যবস্থাও ইনষ্টিটিউটে আছে।

গবর্ণমেণ্টের অভিলাষ এই যে, ইনষ্টিটিউট হইতে ঈদৃশ কার্য্যাদি পরিচালিত হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ইনষ্টিটিউটের কর্ম্মচারিগণের পক্ষে ইউরোপ এবং আমেরিকার ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজনীয়। কর্ম্মচারিগণ ইউরোপ আমেরিকার চর্ম্মবিদ্যা রপ্ত করিয়া লইয়া মাদ্রাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী চর্ম্মশিল্প কায়েম করিতে চেষ্টিত হইবেন। ইহার ফলে মাদ্রাজের চর্ম্মশিল্পীরা ইউরো-আমেরিকার উন্নততর চর্ম্ম-বিদ্যা হজম করিয়া লইবার অবসর পাইবে। ইনষ্টিটিউটের সংলগ্ন চর্ম্মাগার হইতে উন্নততর চর্ম্ম উৎপাদনের জন্য এবং চর্ম্ম তৈরীর খরচা কমাইবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য মধ্যে মধ্যে পরীক্ষাদি করা হইবে। ইহা ছাড়া সরকারী চর্ম্ম-শিক্ষালয়ের কর্ত্তারা মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলের চর্ম্মাগারগুলিতেও পদধূলি প্রদান করিবেন। চর্ম্মাগারগুলিতে যাইয়া ইঁহারা চর্ম্মশিল্পীদিগকে উন্নততর চর্ম্ম-নির্ম্মাণ-প্রণালী সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা দিবেন; চর্ম্মাগারগুলিতে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা আছে কিনা কিংবা ভেজাল দ্রব্য মিশ্রিত করা হইতেছে কিনা তৎসম্বন্ধে পরিদর্শন করিবেন এবং চর্ম্ম-নির্ম্মাণ সম্পর্কে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহা দূরীভূত করিবার উপায়াদিও বাতলাইয়া দিবেন।

ভারতের দেশলাই শিল্প

ভারতবর্ষে মোট দেশলাইয়ের কারখানা ৫১টি, তন্মধ্যে বৃটিশভারতে ৪৫টী এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে ৬টী।

দেশলাই শিল্পে ভারতবর্ষে যে মোট কত টাকা খাটিতেছে এবং ইহার মধ্যে দেশী পুঁজির পরিমাণ কত এবং বিদেশী পুঁজিই বা কত খাটিতেছে তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্যাবলী পাওয়া যায় না; তবে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীগুলি দ্বারা পরিচালিত দেশলাই কারখানাগুলিতে কত পুঁজি খাটিতেছে তাহার হিসাব পাওয়া গিয়াছে। দেশলাই-শিল্প পরিচালন করিতে গেলে কোথায় অতি আধুনিক মেশিন পাওয়া যায় এবং এ সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকাদি কোথায় পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে জানিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিল্প বিভাগীয় ডিরেক্টরের নিকট খোঁজ করিলে সমস্ত জানিতে পারা যাইবে।

১৯২৭-২৮ এবং ১৯২৮-২৯ সনের শেষে ভারতবর্ষের জয়েণ্টষ্টক ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানীগুলিতে কি পরিমাণ পুঁজি খাটিয়াছে তাহার পরিচয় নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক সংখ্যা	কোম্পানীর নাম এবং যে প্রদেশে অবস্থিত	১৯২৭-২৮		১৯২৮-২৯	
		অনুমোদিত মূলধন টাকা	আদায়ী মূলধন টাকা	অনুমোদিত মূলধন টাকা	আদায়ী মূলধন টাকা
	বাঙ্গালা				
১।	অরোরা ম্যাচফ্যাক্টরী	৩,০০,০০০	...	৩,০০,০০০	...
২।	কিশোরগঞ্জ ম্যাচফ্যাক্টরী	২০,০০০	...	২০,০০০	...
৩।	বেঙ্গল ম্যাচফ্যাক্টরী অ্যাণ্ড 'স' মিলস্	৫,০০,০০০	১২,৫৯৯	৫,০০,০০০	১২,৫৯৯
৪।	ইষ্ট বেঙ্গল অ্যাণ্ড আসাম ম্যাচফ্যাক্টরী	৫০,০০০	২,৩৩৯	৫০,০০০	৩,০০৫
৫।	ষ্ট্যাণ্ডার্ড ম্যাচওয়ার্কস্*	২০,০০০	৭,৫০০	২০,০০০	৭,৫০০
৬।	লুসিফার	১০০,০০৯	২৯,৫৮০	১০০,০০০	২৯,৫৮০
৭।	ইসলামিয়া ম্যাচফ্যাক্টরী	২০,০০০	...	২০,০০০	...
৮।	জলপাইগুড়ি ইণ্ডাষ্ট্রীজ	৫০,০০০	১১,৮১০	৫০,০০০	১১,৮১০
৯।	বেঙ্গল সেফটিম্যাচওয়ার্কস	১০০,০০০	৫,৯৪৮	১০০,০০০	৫৯,৪৮
১০।	আসাম ম্যাচকোম্পানী	৭০০,০০০	৪৯৯,৯২৫	৭০০,০০০	৫০০,০০০
১১।	নিউ সুন্দরবন ম্যাচফ্যাক্টরী	৫০০,০০০	...	৫০০,০০০	১০,৪৭০
১২।	স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানী (এই কোম্পানী ১৯২৩ সনের ২৫শে জুলাই তারিখ দেউলিয়া ঘোষণা করে)	৪০০,০০০	৯৩,২৮০	৪০০,০০০	৯৩,২৮০
১৩।	সুন্দরবন ম্যাচ ওয়ার্কস (এই কোম্পানী ১৯২৬ সনের ২৪শে অক্টোবর দেউলিয়া ঘোষণা করে)	১০,০০,০০০	১১৩,৯৮৭	১০,০০,০০০	১১৩,৯৮৭
১৪।	ভারত ম্যাচফ্যাক্টরী (১৯২৭ সনের ১০ই জুলাই তারিখ দেউলিয়া ঘোষণা করে)	২০,০০০	৩,৫৮৩		
১৫।	হিন্দুস্থান ইউনিয়ন ম্যাচ কোম্পানী			৩০০,০০০	
	বাঙ্গলায় মোট (যে সমস্ত কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছে সেগুলি ছাড়া)	২৩,৬০,০০০	৫৬৯,৭০১	২৬,৬০,০০০	৫৮০,৯১১
	মাদ্রাজ				
১।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানী	৮,০০,০০০	৬,৬০০	৮,০০,০০০	১৯,৮১৮
২।	মালাবার ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্চারীং কোং	৩,৯০,৯০২	২,১৭,৫৬৮	৩,৯০,৯০২	৩,৪৭,৫৬৮

* প্রাইভেট

ক্রমিক সংখ্যা	কোম্পানীর নাম এবং যে প্রদেশে অবস্থিত	১৯২৭-২৮		১৯২৮-২৯	
		অনুমোদিত মূলধন টাকা	আদায়ী মূলধন টাকা	অনুমোদিত মূলধন টাকা	আদায়ী মূলধন টাকা
৩।	সাউথ ইণ্ডিয়ান ম্যাচ ফ্যাক্টরী	৩,০০,০০০	১,৮৩,৭৮৫	৩,০০,০০০	১.৮৫,৪৪০
৪।	শ্রীব্রিজলাবন্দী ম্যাচফ্যাক্টরী (১৯২৯, ১লা নভেম্বর দেউলিয়া)	১,৫০,০০০	১,৯৬২	১,৫০,০০০	১৯৬২
	মাদ্রাজে মোট	১৬,৪০,৯০২	৪,০৯,৯১১	১৬,৪০,৫০২	৫.৫৪,৭৮৮
	বোম্বাই				
১।	গুজরাট ইসলাম ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারীং কোং	১,০০,০০০	৯৭,০৭০	১,০০,০০০	৯৭,০৭০
২।	বেলগাঁ ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্‌চারীং কোং	১,০০,০০০	৫৯,৮৮০	১০,০০০	৯৯,৮৮০
৩।	ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানী*	৭৫,০০,০০০	৪৭,০০,৮০০	৭৫,০০,০০০	৪৭,০০,৮০০
৪।	ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্‌চারীং সাপ্লাই কোং*	৫০,০০০	৪০,৫০০	৫০,০০০	৪০,৫০০
৫।	কেম্মেলদিন ম্যাচ কোম্পানী*	৩,০০,০০০	৯১,৭০০	৩,০০,০০০	৯১,৭০০
৬।	বার্ম্মা ম্যাচ কোম্পানী*	১০,০০,০০০	৭,৩১,৫০০	১০,০০,০০০	৭,৩১,৫০০
৭।	মান্দালয় ম্যাচ কোম্পানী*	৩,০০০০০	২,৭৭,৫১০	৩,০০,০০০	২,৭৭,৫১০
৮।	ইষ্টার্ণ ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্‌চারীং কোং	...	...	২,৫০,০০০	...
৯।	কার্লা ম্যাচ ওয়ার্কস†	...	...	১,৫০,০০০	...
	বোম্বাইয়ে মোট	৯৩,৫৩,০০০	৫৯,৭৮,৯৬০	৯৭,৫০,০০০	৫৯,৭৮,৯৬০
		পাঃ	পাঃ	পাঃ	পাঃ
	সুইডিস ম্যাচ কোম্পানী	১০,০০০,০০০	১০,০০০,০০০	১০,০০০,০০০	১০,০০০,০১০†
	বিহার ও উড়িষ্যা				
		টাঃ	টাঃ	টাঃ	টাঃ
	পুরীম্যাচ ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোম্পানী*	২০,০০০	৮,৫২৬	২০,০০০	৯,০৯৫
	মহীশূর				
১।	মাইসোর ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্‌চারীং কোং	২০,০০,০০০	৪,০৫,৩১০	২০,০০,০০০	৩,৯৮,২৬০
২।	কর্ণাটক ম্যাচ ফ্যাক্টরী	...	...	৫০,০০০	২,১৭২
	মহীশূরে মোট	২০,০০,০০০	৪,০৫,৩১০	২০,৫০,০০০	৪,০০,৪৩২

† ১৯২৮-২৯ সনের হিসাব পাওয়া যায় নাই, সেই জন্য ১৯২৭-২৮ সনের হিসাব দেওয়া হইল।

* প্রাইভেট

বোম্বাইয়ের বিদেশী বাণিজ্য

(ক) এপ্রিল, ১৯৩০

১৯৩০ সনের এপ্রিল মাসে বিদেশের সহিত বোম্বাই সহরের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের মোট মূল্য ১৬.১৮ কোটি টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের এপ্রিল মাসের তুলনায় এই সংখ্যা ২.২৭ কোটি অথবা শতকরা ১২ ভাগ কমিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ আলোচ্য মাসে বিদেশী পণ্য ভারতে যেমন অপেক্ষাকৃত কম আসিয়াছে তেমনি ভারতীয় মালও বিদেশে কম চালান হইয়াছে। তবে রৌপ্যেব আমদানি বেশ বাড়িয়াছে।

মোট আমদানি পণ্যের মূল্য ৬.৫৫ কোটি টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ইহা ২.১১ কোটি টাকা অথবা শতকরা ২৪ ভাগ কমিয়াছে। ইহার কারণ প্রধান প্রধান সমস্ত আমদানি মালই আলোচ্য মাসে কম আসিয়াছে। এই মালের মধ্যে যেগুলিতে ঘাটতি বেশী দেখা গিয়াছে, তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

সূতির কাপড়চোপড়	...	১৪৳ মিলিয়ন গজ মূল্য ৫৯.৭ লক্ষ টাকা
মোটর গাড়া (ওয়াগন, সাইকেল ও পাট ধরিয়া)	...	২২.৩১ লক্ষ টাকা
পাকান ও আলগা সূতা	...	১৳ মিলিয়ন পাঃ মূল্য ১৯.৪৩ লক্ষ টাকা
ধাতু ও ওর	...	১৩.১৮ „ „
কাঁচা তুলা	...	৪২১ টন মূল্য ১২.৫২ লক্ষ টাকা
চিনি	...	মূল্য ১০.৯ „ „ পরিমাণ ৩,৭৬ টন বাড়িয়াছে
সূতির অন্যান্য মাল	...	মূল্য ৬.৫৯ লক্ষ টাকা
লোহালক্কড়	...	মূল্য ৫.৫৫ লক্ষ টাকা
কাচের বাসন	...	„ ৪.৬২ „ „
নকল রেশম সূতা	...	⅓ মিলিয়ান পাঃ মূল্য ৪.০১ লক্ষ টাকা
খাদ্য	...	৩.২২ লক্ষ টাকা

অ্যানিলিন রংয়ের আমদানি ৯.৯৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। স্বর্ণের আমদানি ১.৫৬ হইতে ১.৫১ কোটি টাকায় নামিয়াছে। কিন্তু রৌপ্যের আমদানি ৫৩.৫৬ কোটি টাকার উপর ১.০৯ কোটি বাড়িয়াছে।

ভারতের মোট রপ্তানির পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের এপ্রিল মাসের ৭.২১ কোটি টাকার স্থানে আলোচ্য মাসে ৬.৫ কোটি টাকায় নামিয়াছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে মূল্য ৭১ লক্ষ টাকা অথবা শতকরা ১০ ভাগ নামিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ নিম্নলিখিত পণ্য কম রপ্তানি হইয়াছে :—

বীজ	...	১৩,১৩৮ টন মূল্য ১৬,০৫ লক্ষ টাকা
কাঁচা পশম	...	১½ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্য ১৩,৯১ লক্ষ টাকা
শস্য, ডাল ও ময়দা	...	৬,৩৭৪ টন মূল্য ১২.৬৯ লক্ষ টাকা
সূতির মাল	...	„ ১১.৪৮ „ „
পাকান ও আলগা সূতা	...	১ মিলিয়ন পাউণ্ড
	...	মূল্য ৮.৭৮ লক্ষ টাকা

তবে কাঁচা তুলার রপ্তানি পরিমাণে ৬,১৮২ টন ও মূল্যে ১০.৯৪ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। রৌপ্যের রপ্তানি মূল্য ২.০২ লক্ষ টাকা হইতে ১৫.০৮ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। বিদেশী পণ্যের পুনঃ রপ্তানি ৮.৫৫ লক্ষ টাকা কমিয়া ৩৭.৭ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে।

(খ) মে, ১৯৩০

১৯৩০ সনের মে মাসে বোম্বাইয়ের মোট বিদেশী বাণিজ্যের (আমদানি ও রপ্তানি) মূল্য ১৪.৪২ কোটি টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের মে মাসের তুলনায় এই মূল্য ২.৭৮ কোটি টাকা অথবা শতকরা ১৬ ভাগ কমিয়াছে। ইহার কারণ যেমন বিদেশী মালের আমদানি অনেক কম হইয়াছে, তেমনি এখান হইতেও ভারতীয় ও বিদেশী মালের চালান কম পড়িয়াছে। ধনদৌলতের আমদানি ও রপ্তানি কিছু বাড়িয়াছে বলিয়া জানা যায়।

আমদানি

আলোচ্য মাসে মোট আমদানি মূল্য ৬'২১ কোটি টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের মে মাসের তুলনায় এই মূল্য ২'০৬ কোটি অথবা শতকরা ২৪½ ভাগ কমিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান প্রধান মালের আমদানি কমিয়া গিয়াছে :—

সূতির কাপড়চোপড়	...	প্রায় ১৩½ মিলিয়ন গজ মূল্য ৪৯'৩ লক্ষ টাকা
চিনি	...	১৪'৫০৬ টন মূল্য ৩৪'৬৯ লক্ষ টাকা
কাঁচা তুলা	...	১'০৪৪ টন মূল্য ২৪'৪২ লক্ষ টাকা
ধাতু ও ওর	...	১৮'৭৪ লক্ষ টাকা
পাকান ও আল্‌গা সূতা	...	১৩৬'০০০ পাউণ্ড ৭'৭২ লক্ষ টাকা
নকল রেশম	...	½ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্য ৭'৬২ লক্ষ টাকা
লোহালক্কড়	...	৫'৮ লক্ষ টাকা
কয়লা ও কোক্	...	২৯,৩৫১ টন ৫'৬১ লক্ষ টাকা
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি	...	৫'৬ লক্ষ টাকা
সূতির অন্যান্য মাল	...	৫'৩৫ লক্ষ টাকা
কাচ ও কাচের বাসন	...	৪'৩৫ লক্ষ টাকা
মোটর গাড়ী (মোটর ওয়াগন, সাইকেল ও পার্ট ধরিয়া)	...	৪'৩৩ লক্ষ টাকা

এ ছাড়া নিম্নলিখিত মালগুলির আমদানি-বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে :—

খনিজ তৈল		+৪½ মিঃ গ্যালন +২৫'২১ লক্ষ টাকা

(কেরোসিন তৈলের আমদানি-বৃদ্ধিতেই এই বাড়তি হইয়াছে)

রেশমী মাল	...	+৭'৫৮ লক্ষ টাকা
অ্যানিলিন রং	...	+৪'৬৩ লক্ষ টাকা

স্বর্ণের আমদানি ৩১'৮৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ১'১৫ কোটি টাকায় উঠিয়াছে। রৌপ্যের আমদানি ৩৯'৭২ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ১'২৭ কোটি টাকায় উঠিয়াছে।

রপ্তানি

আলোচ্য মাসে বোম্বাইয়ের মোট রপ্তানি মূল্য ৫'৪৭ কোটি টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের মে মাসে এই মূল্য ছিল ৬'৭৬ কোটি টাকা। সুতরাং তুলনায় আলোচ্য মাসে এই মূল্য ১'২৯ কোটি অথবা শতকরা ১৯ ভাগ কমিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান প্রধান মালের রপ্তানি পার্শ্ববর্ত্তী হিসাব মত কমিয়া গিয়াছে :—

কাঁচা তুলা	...	৭,৩৩৬ টন মূল্য ১'২৭ কোটি টাকা
সূতির কাপড়চোপড়	...	১১'০৭ লক্ষ „
কাঁচা পশম	...	½ মিলিয়ন পাউণ্ডের উপর ৮'৬৩ লক্ষ টাকা
ম্যাঙ্গানিজ ওর	...	২৬,১৫৫ টন মূল্য ৭'৪৭ লক্ষ টাকা
শস্য, ডাল ও ময়দা	...	২,৩৭১ টন মূল্য ৪'৬১ লক্ষ টাকা

তবে বীজের রপ্তানি পরিমাণে ১৭,২৬১ টন এবং মূল্যে ৩৭'৯৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। রৌপ্যের রপ্তানি মূল্য ২'০৬ লক্ষ টাকা হইতে ৭'৪ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। বিদেশী মালের পুনঃ রপ্তানি ৪৭'১২ লক্ষ টাকা হইতে ২৪'৩২ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

১৯৩০-৩১ আর্থিক বৎসরের প্রথম দুই মাসের হিসাব হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্ব বৎসরের উক্ত সময়ের তুলনায় আলোচ্য মাসদ্বয়ে আমদানি ২'৯১ কোটি অথবা শতকরা ১৪ ভাগ এবং রপ্তানি ২'১৩ কোটি অথবা শতকরা ১৪ ভাগ কমিয়াছে। এই দুই মাসে বিদেশী স্বর্ণের আমদানি মূল্য ২৭'২১ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ২'৬৬ কোটিতে এবং বিদেশী রৌপ্যের আমদানি ৯৫'২২ লক্ষ বাড়িয়া ২'৩৬ কোটিতে উঠিয়াছে। আলোচ্য দুই মাসে বিদেশী পণ্যের আমদানি মূল্য ৪'১৪ কোটি টাকা কমিয়া ১২'৭৬ কোটি টাকায়

আসিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ নিম্নলিখিত জিনিষগুলির পার্শ্ববর্ত্তী হিসাব মত কম আমদানি হইয়াছে :—

সুতির কাপড়চোপড়	...	২৮২½ মিলিয়ন গজ
		১·০৯ কোটি টাকা
চিনি	...	১১,৪৩০ টন
		৪৫·৬ লক্ষ টাকা
কাঁচা তূলা	...	১·৪৬৫ টন
		৩৭·৩ লক্ষ টাকা
ধাতু ও ওর	...	৩১·৯২ লক্ষ টাকা
পাকান ও আলগা সূতা	...	প্রায় ½ মিলিয়ন পাউণ্ড
		২৭·১৬ লক্ষ টাকা
মোটর গাড়ী (মোটর ওয়াগন, সাইকেল ও পার্ট ধরিয়া)	...	২৬·৬৪ লক্ষ টাকা
সুতির অন্যান্য মাল	...	১১·৯৪ লক্ষ টাকা
নকল রেশম	...	⅔ মিলিয়ন পাউণ্ড
		১১·৬২ লক্ষ টাকা
লোহালক্কড়	...	১১·৩৫ „ „
মিল ও কলকব্জা	...	৯·৪৯ লক্ষ টাকা
কাচ ও কাচের বাসন	...	৮·৯৭ „ „

অন্য দিকে খনিজ তৈলের আমদানি +৪½ মিলিয়ন গ্যালন এবং মূল্য ২৫·৪৩ লক্ষ টাকা এবং অ্যানিলিন রংয়ের আমদানি মূল্য +১৪·৫৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে।

আলোচ্য দুই মাসে রৌপ্যের রপ্তানি মূল্য ১৮.৪ লক্ষ টাকা বাড়িয়া ২২·৪৮ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। তবে ভারতীয় উৎপাদনের রপ্তানি ২ কোটি টাকা কমিয়া ১১·৯৭ কোটিতে নামিয়াছে। ইহার কারণ নিম্নলিখিত মাল-গুলির কম রপ্তানি হইয়াছে :—

কাঁচা তুলা	...	১,১৫৪ টন
		১.১৬ কোটি টাকা
সুতির কাপড় চোপড় এবং কাঁচা পশম		২২.৫৪ লক্ষ টাকা
শস্য, ডাল, ও ময়দা	...	৮,৭৪৫ টন
পাকান ও আলগা সুতা	...	১⅓ মিলিয়ন পাউণ্ড
		১০.৪১ লক্ষ টাকা
ম্যাঙ্গানিজ ওর	...	৩৪,৪৬৩ টন
		১০·৩২ লক্ষ টাকা

কেবলমাত্র বীজের রপ্তানি পরিমাণে ৪.১২৩ টন ও মূল্যে ২৯,৯২ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে।

আলোচ্য দুই মাসে বিদেশী মালের পুনঃরপ্তানি ৩১.৩৬ লক্ষ টাকা কমিয়া ৬২.০২ লক্ষে নামিয়াছে।

মাদ্রাজের বিদেশী বাণিজ্য (মে, ১৯৩০)

১৯৩০ সনের মে মাসে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সমস্ত সামুদ্রিক বিদেশী বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯২৯ সনের মে মাসের তুলনায় আমদানির ঘরে ২৪.২১ লক্ষ টাকা বাড়তি এবং রপ্তানির ঘরে ৩২.২৫ লক্ষ টাকা কমতি হইয়াছে। তবে বরাবর যোগ দিয়া আসিলে দেখা যায় গতবৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় আমদানির ঘরে ১৮.১২ লক্ষ এবং রপ্তানির ঘরে ৮৭·৭৭ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৯ সনের মে মাসের হিসাবের সহিত তুলনাকালে দেখা যায় যে, আমদানি মালের নিম্নলিখিত কয়টীতে নিম্ন হিসাব মত বাড়তি হইয়াছে :—

রং ও ট্যান করিবার মসলা	...	+৩,৪৬,৭৮০ টাকা
মিল ও কলকারখানা	...	+১৯,৪২,৩৬৫ „
সালফেট অব এমোনিয়া	...	+২,২৭,০৩৮ „
জ্বালানি তৈল	...	+২,৪৫,৭৫৮ „
কেরোসিন	...	+১১,৯১,৭৩৮ „
চিনি	...	+৫,৭৫,৬৬৫ „

নিম্নলিখিত আমদানি মালে কমতি দেখা গিয়াছিল :—

তলোয়ারের খাপের জন্য মিশ্রিত ধাতু	...	—৪,৮৫,৭৩৭ টাকা
লৌহ ও ইস্পাত	...	—৩,৮৬,৪৯৩ „
তুলার সুতা	...	—৪,৮৯,২৫২ „
সুতির কাপড়চোপড়	...	—৬,২৬,৮৪২ „
কাঁচা তামাক	...	—৩,৬০,১৬০ „

রপ্তানির ঘরে নিম্নলিখিত মালে বাড়তি দেখা গিয়াছে :—

কফি	...	+২৫,৫৪,১২৬ টাকা

ছোবড়ার দড়ি	...	+২,০৮,২৯২ „
ট্যানকরা অথবা ড্রেসকরা		
গরুর চামড়া	...	+২,৩৩,০০৮ „
কাঁচা রবার	...	+৪,৩১,১৩০ „
রেড়ী বীজ	....	+১১,৯০,৮৩৩ „
কালো চা	...	+১৭,০৭,৯৬৬ „

নিম্নলিখিত মালের রপ্তানিতে কমতি দেখা গিয়াছিল :—

ট্যান করা অথবা ড্রেস করা		
ছাগলের চামড়া	...	—৩,৫২,০১৯ টাকা
চীনা বাদাম	...	—৫৪,৭৭,২৮৮ „
লঙ্কা	...	—১৫,৯২,৩১৬ „
কাঁচা তূলা	...	—১৩,৫৭,৬১৬ „

করাচীর বিদেশী বাণিজ্য (মে, ১৯৩০)

করাচীর কনট্রোলার অব্ কাষ্টমস্ ১৯৩০ সনের মে মাসে করাচীর বিদেশী বাণিজ্য সম্বন্ধে যে হিসাব বাহির করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, আলোচ্য মাসে উক্ত বন্দরে বিদেশী মাল আমদানির পরিমাণ মোট ২'০৫ কোটি টাকা। গত বৎসরের এই মাসের তুলনায় আলোচ্য মাসে ১২ লক্ষ টাকা আমদানি মূল্য কমিয়া গিয়াছে। আর মোট রপ্তানি ১'৭১ কোটি টাকা এবং ইহা গত বৎসরের তুলনায় কমিয়াছে ৭৮ লক্ষ টাকা। এপ্রিল এবং মে মাসের হিসাব বরাবর জুড়িয়া দেখা গিয়াছে, আমদানির দফায় গত বৎসরের তুলনায় ১.০৪ কোটি টাকা অথবা শতকরা ২০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং রপ্তানির দফায় ১'৮৪ কোটি টাকা অথবা শতকরা ৩৩ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য মাসে প্রধান আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কত হইয়াছে ও তাহারা কি ভাবে উঠানামা করিয়াছে গত বৎসরের মে মাসের সহিত তুলনা করিয়া তাহা নিম্নে দেখান হইয়াছে :—

আমদানি

মাল	পরিমাণ	মূল্য	বাড়তি অথবা কমতি — পরিমাণ	বাড়তি অথবা কমতি — মূল্য
সুতির মাল	—	৬৮,৬৭,০০৭	—	—৭,৪৮,৮১১
চিনি	১৬১৩২ টন	২০,৭২,২৯৯	+৪০৫	—৫,৬৯,৯৮৯
মিল ও কলকব্জা	—	৬,০৬,৫৮৫	—	—৫,১২,১৫৫
পশমী মাল	—	৩,৫০,৬৮৩	—	—৩,৫২,৮৯১
আলগা ও পাকান				
সুতা	—	১৭,৭০১	—	—২০,০৮১
তৈল	—	১৮,৮৮,১৭৬	—	+১৫,৪৮,৫:৯
ধাতু ও ওর	—	১৮,০৬,৬৮১	—	+৬,১২,৯২
গাড়ী	—	১০,৮৭,৯৮৩	—	+১,৭৯,৫১০
মন্ত	—	৫,৬৮,০২৪	—	+৪৩,৪৮২

সুতির মালের মধ্যে শুধু ধূসর ও রঙ্গীণ কাপড়ের আমদানিতেই ঘাটতি পড়িয়াছে। ধূসর বর্ণের সর্ব্বসমেত ৩৬৮,০০০ গজ (মূল্য ৬৯,৯৪৭ টাকা) আমদানি হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসরের মে মাসে হইয়াছিল ২½ মিলিয়ন গজ (মূল্য ৬ লক্ষ টাকা)। রঙ্গীণ কাপড়ের আলোচ্য মাসে আমদানি হইয়াছে ৬¾ মিলিয়ন গজ, মূল্য ১৮ লক্ষ টাকা, পূর্ব্ব বৎসরের মে মাসে হইয়াছিল ৯¾ মিলিয়ন গজ, মূল্য ২৭ লক্ষ টাকা। সাদা কাপড়ের আমদানি আলোচ্য মাসে হইয়াছিল ২১¾ মিলিয়ন গজ, মূল্য ৪৮ লক্ষ টাকা। এই দফায় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পরিমাণে ৫ মিলিয়ন গজ ও মূল্যে ৭ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। এপ্রিল ও মে মাসে সর্ব্বপ্রকারের সুতির কাপড় মোট ৫৯¾ মিলিয়ন গজ আমদানি হয়, ইহার মূল্য ১৪৪ লক্ষ টাকা। এই সংখ্যাগুলি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পরিমাণের দিক্ দিয়া শতকরা ৭ ভাগ ও মূল্যের দিক্ দিয়া শতকরা ১৫ ভাগ কমিয়াছে। আলোচ্য মাসে মোট ২৬০০০ টন আমদানি চিনির মধ্যে ১৪০০০ টনই জাভা হইতে আমদানি, বাকীটা জার্ম্মাণির বীট চিনি।

রপ্তানি

মাল	পরিমাণ	মূল্য	বাড়তি বা কমতি	
			পরিমাণ	মূল্য
	টন	টাকা	টন	টাকা
কাঁচা তূলা	১৫,৮০৩	১,০৫,৭৬,০৫৬	—৩,৭৬৪	—৭৬,২২,৭০৪
রেপ বীজ	৪,৭২৬	৮,৬৮,৭৫৬	—৪২৭	—২,৪৮,৫৫৬
কাঁচা চামড়া (হাইড)	৩১৪	৩,৩৫,৭৬৬	—৯৪	—১,৯৫,৯৭১
গমের ময়দা	১,৪৩২	২,৪৮,৪২৩	—৬৩৯	—১,৭২,৭৩১
বার্লি	৬২	২,৯৬৬	—৯৫	—১১,৩২৮
কাঁচা চামড়া (স্কিন)	৬০৬	৮,৭২,৭১০	+৩২৫	+৪,৫৫,২৯৫
কাঁচা পশম (ভারতীয়)	৫৩৪	১০,৪০,২০৪	+৯৩	+১,৬৮,৮৭১
,, (বিদেশী)	১৯৬	২,৯৮;২৪৭	+১১৬	+১,৪০,০৪৮
গম	১৩৭	৬২,৬৩১	+৪৭৯	+৫৩,০৯৯

উপরের হিসাব মত আলোচ্য মাসে কাঁচা তূলার রপ্তানিতে যে ৩,৭০০০ টন ঘাট্‌তি দেখা যাইতেছে তাহার কারণ উক্ত মাসে চীন ও জাপানের খরিদ অনেক কমিয়াছে। ৪,৯০০ টনের স্থানে চীন মাত্র ৫০০ টন ও ৬,০০০ টনের স্থানে জাপান মাত্র ১৯০০ টন খরিদ করিয়াছে। তবে অন্য দিকে বিলাত খুব বেশী মাল লইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের ১৪০০ টনের স্থানে আলোচ্য মাসে বিলাত ৩,৩০০ টন কাঁচা তূলা লইয়াছে। নেদারল্যাণ্ড হইতে চাহিদা কমিয়া যাওয়ার দরুণ রেপ বীজের রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে।

কাঁচা চামড়ার (স্কিন) রপ্তানি বাড়িবার একমাত্র কারণ আলোচ্য মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে বহুল পরিমাণে ছাগলের চামড়া লইয়াছে।
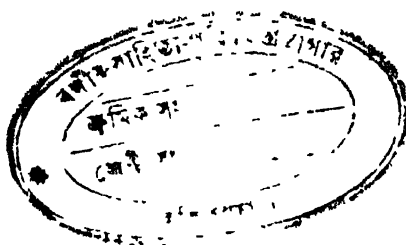
দুনিয়ার রবারের বাজার (৯ আগষ্ট, ১৯৩০)

দুনিয়ার বাজারে রবারের দর আজকাল খুব সস্তা। আধ সের রবারের দর এখন পেনিতে ঠেকেছে। অনেকদিন থেকে রবারের দর ক্রমেই কমছে। দর কমাতে রবার কোম্পানীরা মে মাসে রবার গাছ থেকে রস টানা বন্ধ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও দর ক্রমাগতই কমছে। এখন যা দর তাতে উৎপাদন করা ও বাজারে ফেলার খরচা পোষায় না। প্রত্যেক পাউণ্ড রবার লোকসানে বেচতে হচ্ছে। অনেক রবার কোম্পানী তাদের মজুরদের মাইনে কমাতে বাধ্য হয়েছে।

এত দর কম্‌বার কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে উৎপাদন-বৃদ্ধি। দুনিয়া যতটা রবার হজম কর্‌তে পারে তার চেয়ে বেশী রবার উৎপন্ন হচ্ছে।

যতটা দর কমেছে তার সমস্তটা যদি খাদকদের কাছ পর্য্যন্ত পৌছতো তা হলে চাহিদা বাড়্‌তো, বিক্রীও বাড়্‌তো, কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, পাইকারী দরই কমেছে, খুচরা দর কমে নি। অর্থাৎ দর-হ্রাসের সুবিধা খাদকদের পকেট পর্য্যন্ত পৌছোয় নি। সেই জন্য দর কমার সঙ্গে চাহিদা বাড়ে নি।

রবারের দর কম্‌ছে বটে, কিন্তু রবার কোম্পানীর শেয়ারের দর কমে নি। তার কারণ অনেক কোম্পানী উঁচু দরে আগে থাক্‌তেই বেচেছে। দ্বিতীয়তঃ, অনেক কোম্পানীর রিজার্ভ খুব মোটা, এই জন্যে শেয়ার কেন্‌বার শক্তিও বেশী। তৃতীয়তঃ, সকলেরই আশা যে রবারের যদি নতুন কোন ব্যবহার আবিষ্কৃত হয় বা মোটরের সংখ্যা খুব বাড়ে, রবার কোম্পানীগুলা সমৃদ্ধ হবেই। সম্প্রতি ডিভিডেণ্ড খুব কম হলেও এই আশার জোরেই শেয়ারের দাম বেশ উঁচু রাখা হয়েছে।

ভবিষ্যতে কোন উন্নতির আশা আছে কি? আছে নিশ্চয়ই; কারণ রবার একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ। এ না হলে মানুষের চল্‌বেই না। সুতরাং এর উৎপাদন খরচা না পোষালে এর উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু শীগ্‌গির কোন উন্নতির আশা নেই। কারণ এখনও রবারের প্রধান প্রধান আড়তে লণ্ডন, লিভারপুল ও নিউইয়র্কে ৬ মাসে যত দরকার হতে পারে তার চেয়েও বেশী রবার মজুত। রবার কোম্পানীগুলাও বাজার-দরের দিকে না তাকিয়ে উৎপাদন করেই চলেছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অজন্মা

এ বছর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভীষণ অজন্মা হয়েছে। গম ও অন্যান্য কয়েক প্রকার শস্যের উৎপাদন অত্যন্ত কমে গেছে। প্রায় ১০ লাখ পরিবার অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র লোক-সংখ্যার শতকরা ১২ ভাগ এর জন্যে ভুগ্‌বে। মানুষের আহার্য্যের অভাব নেই—জন্তুদের আহার্য্যেরই প্রধান অভাব। ৭½ লাখ ঘোড়া ও খচ্চর ৬০ লাখ গরু বাছুর, ও ১২০ লাখ শূয়র ও ভেড়াকে ভুগ্‌তে হবে। মানুষকে ভুগ্‌তে হবে দু' দিক্ দিয়ে—প্রথমতঃ, রোজগার কম্‌বে; দ্বিতীয়তঃ, জন্তুগুলাকে আগামী শীতকালে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বেশ খরচ কর্‌তে হবে।

গবর্ণমেণ্ট এর জন্যে দুটী উপায় অবলম্বন করছেন:—

(১) এই দুর্দ্দশার প্রতীকারের জন্য কি করা যেতে পারে

তার আলোচনা করবার জন্যে প্রেসিডেন্ট হবার যে সব প্রাদেশিক রাষ্ট্রে অজন্মা হয়েছে সেই সব প্রাদেশিক রাষ্ট্রের গবর্ণরদের একটা সম্মিলন আহ্বান করেছেন ; (২) ঐ সব প্রদেশে যাতে অল্প ভাড়ায় আহার্য্য, পানীয় ও জন্তু জানোয়ার নিয়ে যাওয়া চলে সে জন্যে রেলপথগুলাকে ভাড়া কমাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

বিলাতের শিল্প (১৯২৯)

১৯২৯ সনে বিলাতের প্রধান প্রধান শিল্পগুলার অবস্থা সাধারণতঃ খারাপ ছিল। কিন্তু দক্ষিণ দিকের কয়েকটা শিল্পের অবস্থা খুব সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটার নাম দেওয়া যাচ্ছে—মোটর তৈরী, বেতার, গ্রামোফোন তৈরী, বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন শিল্পের কয়েকটী শাখা, আসবাব তৈরী, নকল রেশম শিল্প, কাগজ-শিল্প, চিনি-শিল্প ইত্যাদি। লণ্ডনের কাছাকাছি কয়েকটা শিল্প ১৯২৯ সনে এত জোরসে চলেছে যে লোকের অভাব হয়েছিল, বাড়ী ঘর দোরও অনেক বাড়াতে হয়েছিল। অথচ বিলাতের প্রধান প্রধান শিল্পে (যেমন ইস্পাত ও কয়লা শিল্প) অনেক লোককে বেকার বসে থাকতে হয়েছিল।

বিলাতের বাণিজ্য-হ্রাস

গত এপ্রিল মাসে বিলাতের রপ্তানি বাণিজ্যের মূল্য ৪৬,৮৬১,৪৬১ পাঃ, অর্থাৎ ইহা মার্চ্চ মাসের তুলনায় ৭,০৮৪,৩৪৮ পাঃ এবং ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাসের তুলনায় ১৩,৩৮২৯৪৪ পাঃ হ্রাস পাইয়াছে। আমদানি বাণিজ্য দাঁড়াইয়াছে এই মাসে ৮৩,৯২২,৪০১ পাঃ, উহা মার্চ্চ মাসের তুলনায় ৯,৪৯৮,০৮১ পাঃ এবং ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাসের তুলনায় ২০,২০৬,৩৩০ পাঃ কম।

বারো মাস আগে ঠিক এই মাসে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা দেখিয়া বিলাতের ব্যবসায়ী মহলে যে আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল তাহা থামিয়া গিয়াছে।

বিলাতের এই বাণিজ্য-হ্রাসের দুইটী কারণ দেখা যায়। প্রথমতঃ, কতকগুলি জিনিষের দর কমিয়া গিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, এবারকার এপ্রিল মাসে ইষ্টারের ছুটি পড়িয়াছে।

আমদানি এবং রপ্তানি এই উভয় প্রকার বাণিজ্য হ্রাসের আর একটী বড় কারণ এই যে, বিলাতের বয়ন-শিল্পের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তুলা আমদানি কমিয়াছে প্রায় ৩,০০০,০০০ পাঃ; পশম আমদানিও কমিয়াছে ৪,৬০০,০০০ পাঃ। আহার্য্য বস্তুর মধ্যে খাদ্য শস্য আমদানি কমিয়াছে ৬,০০০,০০০ পাঃ এবং ময়দা আমদানি কমিয়াছে ৩,০০০,০০০ পাঃ। মাখন এবং আরও কতকগুলি খাওয়ার জিনিষ আমদানির উপর কোন শুল্ক ধার্য্য হয় নাই। আলোচ্য মাসে ডেন্মার্ক হইতে মাখন আমদানি কমিয়াছে। পক্ষান্তরে নিউজিল্যাণ্ড হইতে মাখন আমদানি বাড়িয়াছে। চিনি আমদানি কমিয়াছে। শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি বাড়িতেছিল; আলোচ্য মাসে তাহারও আমদানি কমিয়াছে ৪,৫৪০,০০০ পাঃ। রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে দেখা যায়, এক জীব-জানোয়ার রপ্তানি কিছু বাড়িয়াছে, তাহা ছাড়া আর সমস্ত বিলাতী চীজই বিদেশে কম রপ্তানি হইয়াছে। এমন কি আলোচ্য মাসে কয়লা রপ্তানি পর্য্যন্ত কমিয়াছে। শিল্পজাত এবং আধা-কারখানাজাত মালেরই রপ্তানি কমিয়াছে সব চেয়ে বেশী; এইখাতে বিলাতের রপ্তানি কমিয়াছে ১১,০০০,০০০ পাঃ। কিছুদিন লোহালক্কড় রপ্তানি বেশ বাড়িতেছিল; কিন্তু আলোচ্য মাসে বিলাতের এই চীজেরও রপ্তানি কমিয়াছে ১,০০০,০০০ পাঃ। বস্ত্র রপ্তানি কমিয়াছে ৪০০,০০০ পাঃ এবং পশমী কাপড় রপ্তানি কমিয়াছে ১,০০০,০০০ পাঃ।

এক বৎসর পূর্ব্বে রেল-ইঞ্জিন, জাহাজ মোটর গাড়ী প্রভৃতি যান-বাহন রপ্তানি বেশ জোরে চলিতেছিল; কিন্তু আলোচ্য সনে বিলাতের এই দফায় বাণিজ্য হ্রাস ঘটিয়াছে ৯০০,০০০ পাঃ।

১৯৩০ সনের প্রথম চারি মাসে বিলাতের আমদানি বাণিজ্য কমিয়াছে ৪২,৬৭৪,০০০ পাঃ এবং রপ্তানি বাণিজ্য কমিয়াছে ৩৮,৫৫০,০০৯ পাঃ।

বেকারের সংখ্যা বাড়্‌তির দিকে

বিভিন্ন সনে বিলাতে বেকারের সংখ্যা এই রকম :—

১৯২১ সেপ্টেম্বর	...	২,৫৮০,৪২৯
১৯২৭ „	...	১,০৫০,১১৭
১৯২৮ „	...	১,২৯৫,২৩৪
১৯২৯ „	...	১,১৬২,৯৪০
১৯৩০ জুন	...	১,৮৯০,০০০
„ আগষ্ট	...	২,০১১,০০০

দেখা যাচ্ছে যে, বর্ত্তমানে বেকার-সংখ্যা কেবল ১৯২১ সনের চেয়ে কম, কিন্তু অন্য সব সনের চেয়ে বেশী। লেবার পার্টি শাসন-যন্ত্র চালনার ভার নেওয়ার পর বিলাতে বেকারের সংখ্যা ৭½ লাখ বেড়েছে।

ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা যাচ্ছে বলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মাণিতেও বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা এখন ৬০ লাখ, জার্ম্মাণিতে ৩০ লাখ।

ইংলণ্ডের তুলা-শিল্পে সঙ্কট

বিলাতের কাপড়ের কলগুলার অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এক কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। কমিটি রিপোর্ট দিয়েছেন। রিপোর্ট পড়ে বিলাতের মাষ্টার কটন স্পিনার্স এসোসিয়েশন বল্‌ছেন, "কমিটিও শিল্পের দুরবস্থার জন্য সব দোষই শিল্পের আভ্যন্তরীণ গলদগুলার ওপরই চাপাতে চান। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, আমাদের অবস্থা খারাপ হওয়ার নানা বাহ্য কারণও রয়েছে, যেমন রূপার দাম কমে যাওয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলাতে মজুরদের বেশীক্ষণ খাটানো, নানাদেশে শুল্ক-প্রাচীরের বাধা, দেশের মধ্যে করের চাপ ইত্যাদি। তা ছাড়া শিল্পের প্রধান আভ্যন্তরীণ সমস্যা হচ্ছে খরচ কমানো যায় কিনা। কিন্তু খরচ কমাবার পথে প্রধান দুটা বাধা হচ্ছে এই যে, মজুরদের খাটাবার সময় বাড়ানো ও মাইনে কমানো সম্বন্ধে আমাদের হাত একেবারে বাঁধা।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের ঐশ্বর্য্য

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক অঙ্গ। এই দ্বীপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণতঃ লোকে উদাসীন। আকাশ যানে যাওয়াআসা করবার সুবিধা হওয়াতে ঐ দ্বীপের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের দিকে লোকের নজর যাচ্ছে।

মাছের ব্যবসাই এই দ্বীপের প্রধান ব্যবসা। বছরে ১ কোটি ২০ লাখ ডলার দামের মাছ এই দ্বীপ হতে রপ্তানি হয়। নানা শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কাঠ এর নানা স্থানে অজস্র পাওয়া যায়। কাঠের সরবরাহ প্রচুর চলে। এখানে কাগজের কলও মাথা খাড়া করেছে। এখানে দুটা প্রকাণ্ড কাগজের কল আছে। একটা বিলাতী কোম্পানীর তাঁবে—দৈনিক উৎপাদন ৩৫০ টন। অপরটা মার্কিণ কোম্পানীর তাঁবে—দৈনিক উৎপাদন ৪০০ টন। আর একটা স্থাপনের চেষ্টা চল্‌ছে। এইদ্বীপে নানা রকমের ধাতু পাওয়া যায়। লোহা প্রচুর পরিমাণ আছে। এখানকার একটা লৌহখনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তম। এর মধ্যে ৩৫০ কোটি টন লোহা আছে আন্দাজ করা হয়েছে। দস্তা, সীসা, তামা প্রভৃতিও যথেষ্ট আছে। অনেকগুলা জলপ্রপাত থাকার জন্যে বিজলী সৃষ্টি ক'রে উৎপাদনে লাগাবার বিশেষ সুবিধা আছে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য কি ক'রে শিল্প-বাণিজ্যের কাজে লাগানো যায় তার জন্যে জল্পনা কল্পনা চল্‌ছে।

আগামী বৎসরের লোক-গণনা

প্রতি দশ বছর অন্তর ভারতের লোক-গণনা হয়। শেষ লোক-গণনা হয়েছিল ১৯২১ সনে। এবার লোকগণনা হবে আগামী বছরে অর্থাৎ ১৯৩১ সনে।

আগামী বছরে ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬শে তারিখে ভারতের প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী ও ছেলের বয়স, ধর্ম্ম ও পেশার হিসেব নেওয়া হবে। স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যারও হিসেব নেওয়া হবে।

এই লোকগণনা সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে এই বছরের জানুয়ারী মাস থেকেই বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়েছে।

বাংলা দেশের লোকগণনায় মোট আড়াই লাখ কর্ম্মচারীর সাহায্য নেওয়ার দরকার হবে। এই আড়াই লাখ কর্ম্মচারীর অধিকাংশেরই কর্ত্তব্য হবে বাড়ী বাড়ী ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করা।

তবে সকল শ্রেণীর লোকেরই বাড়ী বাড়ী ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করা দরকার হবে না। ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের ছাপানো ফরম দেওয়া হবে, তাঁরা সেইগুলা পূরণ ক'রে গবর্ণমেণ্টের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

ছাপানো ফরম্ বিলি করার চেয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে কর্ম্মচারীদের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করলে তথ্যগুলা আরও নিখুঁত হয় দেখা গেছে। এই জন্যে ভারতীয় প্রথা বিলাতেও চালাবার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়।

লোকগণনার জন্যে যে দিন স্থিরীকৃত হয়েছে, তার আগেই একদিন তথ্য-সংগ্রহকারীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে প্রত্যেক বাড়ীর বাসিন্দাদের ধর্ম্ম, পেশা, বয়স প্রভৃতি সম্বন্ধে খোঁজ নেবেন। তারপর, ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬শে তারিখে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত বারোটার মধ্যে প্রত্যেক বাড়ী ঘুরে আগে হতে সংগৃহীত তথ্যগুলা চেক ক'রে নেওয়া হবে—যদি কেউ ঐ তারিখে বাড়ী ত্যাগ ক'রে অন্যত্র গিয়ে থাকে, তার নাম কেটে দেওয়া হবে, আর যদি কোন অতিথি সেদিন এসে থাকে তার পরিচয়ও সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া হবে।

২৬শে ফেব্রুয়ারীর যে গণনা সেটা সারতে হবে ৫ ঘণ্টার ভিতর। প্রত্যেক গণনাকারীর উপর তত সংখ্যক বাড়ীর ভার দেওয়া হবে যতটা ৫ ঘণ্টার ভিতর গণনা করা যায়। সহরে এক একজনের উপর ৪০টা পর্য্যন্ত বাড়ীর ভার দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু পল্লীগ্রামে বাড়ীগুলা আরও বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্ত্তী, সেই জন্য পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গণনাকারীর উপর কমসংখ্যক বাড়ীর গণনার ভার থাকবে।

নদীতে বা সাগরে জাহাজের মধ্যে যে সব যাত্রী বা নাবিক থাকবে, তাদের গণনার ভার দেওয়া হবে জাহাজের অধিকারীদের ওপর।

যারা মোটরে চ'ড়ে যাওয়া আসা করতে থাক্‌বে তাদের গণনা করবার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় চলমান 'পেট্রল' স্থাপন করা হবে। মোটর থামিয়ে তারা মোটরের আরোহীদের বয়স, পেশা প্রভৃতি সম্বন্ধে হিসেব নেবে। যে সব মোটরের আরোহী একবার হিসেব দেবে তাদের একটা 'চিহ্ন' দেওয়া হবে, যা দেখিয়ে তারা দ্বিতীয়বার গণনার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে।

অন্য অন্য বারে যে সব বিষয়ের সংখ্যা নেওয়া হয়, আগামী বছরে তার চেয়ে একটা বেশী বিষয়ের সংখ্যা নেওয়া হবে, সেটা হচ্ছে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে কে কে

বেকার হ'য়ে ব'সে আছেন এবং তাঁদের কি কাজ করবার যোগ্যতা আছে।

কল্‌কাতার লোক-গণনার জন্ত যা খরচ পড়্‌বে তা বাংলার গবর্ণমেণ্ট ও কল্‌কাতার মিউনিসিপ্যালিটি উভয়েই সমানভাবে বহন করবেন। কিন্তু কল্‌কাতা কর্পোরেশান এই সর্ত্তে খরচ বহন করতে স্বীকৃত হয়েছেন যে, কল্‌কাতায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্ত যে সব সংখ্যা-সংগ্রহ (ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্) দরকার, গবর্ণমেণ্ট লোক-গণনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব সংখ্যাও সংগ্রহ ক'রে দেবেন।

গত বারের গণনায় দেখা গিয়েছিল যে, কল্‌কাতার লোক-সংখ্যা বোম্বাইয়ের চেয়ে কম। এতে কল্‌কাতার অভিমানে বড় আঘাত লেগেছিল। ইতিমধ্যে কাশীপুর চিৎপুর, মাণিকতলা, গার্ডেনরীচ প্রভৃতি লোকালয় কল্‌কাতার অন্তর্গত ব'লে ধরা হয়েছে। এর ফলে, কল্‌কাতার লোক-সংখ্যা বোম্বাইয়ের চেয়ে এবার বাড়ে কিনা তা দেখ্‌বার জন্তে কল্‌কাতার অধিবাসীরা উৎসুক হ'য়ে আছে।

আগামী বছরে যে সব মাল-মশলা সংগৃহীত হবে সেগুলাকে শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজাতে ও প্রকাশিত করতে আরও ছ' বছর লাগ্‌বে।

ভারতের বর্ত্তমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থাটা কি তা নিখুঁতভাবে ধরা সম্ভব হবে এই সংখ্যা-সংগ্রহ থেকে। তা ছাড়া, এর সাহায্যে জানা যাবে যে, ভারত গত দশ বছরের মধ্যে কতটা এগিয়েছে বা পেছিয়েছে, আর ভারতের লোকবলের গড়নটাই বা কিভাবে বদলেছে। সুতরাং এই লোক-গণনার প্রয়োজনীয়তা অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের দিক্‌ থেকে যে কত বেশী তা সবাই বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

ভারতের খাল-দরিয়ায় 'শক্তি'

কলকব্জা চালাতে হলে 'শক্তি' চাই। এ শক্তি আসে কয়লা বা তেল থেকে। কিন্তু ভারতে কয়লা বা তেলের সরবরাহ প্রচুর নয়, সর্ব্বত্রও পাওয়া যায় না, বিশেষ বিশেষ স্থানেই পাওয়া যায়। এটা শিল্পোন্নতির পথে একটা বাধা বটে, কিন্তু বিশেষ দুঃখ করবার কারণ নেই। কারণ, ভারতে প্রবল স্রোত-সম্পন্ন নদ-নদীর সংখ্যা ঢের। এই সব নদ-নদী থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন ক'রে কলকারখানা চালানো যেতে পারে। এ দিকে প্রথম চেষ্টা হয় ১৯০২ সনে কাবেরী নদীর স্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন ক'রে। পরবর্ত্তী চেষ্টা হচ্ছে বোম্বাইয়ে টাটা কোম্পানীর দ্বারা। টাটাদের চেষ্টায় বোম্বাইয়ে যে প্রথম হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক স্কীম ১৯২৫ সনে কার্য্যে পরিণত হয় তার নাম 'লোনাভ্‌লা প্রোজেক্ট'। এর সাহায্যে ৪০,০০০ অশ্বশক্তির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বোম্বাইয়ে মিলগুলিতে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। তা ছাড়া, জি, আই, পি রেলের বোম্বাই-কল্যাণ বিভাগটিতে বৈদ্যুতিক রেল চালাবার প্রস্তাব হয়েছে। এই সব কারণে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। এই চাহিদা মেটাবার জন্যে টাটা কোম্পানী আরও কয়েকটা স্কীমে হাত দিয়েছেন, যেমন, অন্ধ্র নদী স্কীম, নিলামুল্লা স্কীম, কয়না নদী স্কীম ইত্যাদি।

পাঞ্জাবে শতদ্রু নদীর স্কীম টাকার অভাবে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। মাণ্ডি স্কীমও ছাড়্‌তে হয়েছে খরচের আধিক্য দেখে। কাশ্মীরে ঝিলাম নদী থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। নৈনিতাল ও শিলংএ নদীর স্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন ক'রে পারিবারিক কাজে তা লাগানো হচ্ছে।

দক্ষিণ ভারতে 'পাইকারা' স্কীম নামে একটা নতুন স্কীম মঞ্জুর হয়েছে। এর ফলে ২১ হাজার অশ্বশক্তির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এবং কইম্বাটুর, তিরুপুর ও নীলগিরি অঞ্চল বিজলীর যোগান পাবে।

দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে নদীর স্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা বেশ চলেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটু সাবধানে চলা দরকার। প্রথমতঃ, খাদকদের চাহিদার পরিমাণ বোঝা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, দেখা চাই যেন উৎপাদনের কলকব্জার জন্যে অযথা বেশী খরচ করা না হয়। তৃতীয়তঃ, বৃষ্টির পরিমাণ ও নদীর স্রোত সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া দরকার। চতুর্থতঃ, বাষ্পের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচা অনেক কমে গেছে। তার কারণ এই যে, এখন গুঁড়া কয়লাও বাষ্প উৎপাদনে লাগানো চলে।

বিহার-উড়িষ্যায় জল যোগান সমস্যা (১৯২৮-২৯)

(১)

বিহার উড়িষ্যা সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে একটী ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট আছে, তাহাতে একজন সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, দুইজন এক্জিকিটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার এবং ১ জন ড্রেনেজ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছেন। আলোচ্য সনে এই ডিপার্টমেণ্টের কার্য্যকলাপ অনেক বাড়িয়াছে। সেজন্য আরও একজন একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার, ৪ জন অস্থায়ী অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, ৮ জন ওভারসিয়ার এবং ৪ জন ড্র্যাফ্টস্‌ম্যান্ নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। কার্য্যের সুবিধার জন্য বিভাগের হেড্‌কোয়ার্টার্স পাটনা হইতে রাঁচিতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কারণ ঐ বিভাগ উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুর লইয়া গঠিত; এবং রাঁচি ঠিক এই বিভাগের মধ্যস্থানে অবস্থিত।

আলোচ্য সনে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মোট ৭,৪১,১৩২ টাকার কাজ হইয়াছে; ইহার মধ্যে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে বকেয়া কাজের জন্য ব্যয় হইয়াছে ৩,০৭,০১৪ টাকা। জলের কলের জন্য খরচ হইয়াছে ৩,৮৭,৪৭২ টাকা। এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক স্বাস্থ্য রক্ষা বাবদ খরচ হইয়াছে ১,০৪,৬০৫৲ টাকা। মোটের উপর পাবলিক হেলথ্ ডিপার্টমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে মোট কাজ হইয়াছে ১২,৩৩,২০৯ টাকার, অর্থাৎ ১৯২৭-২৮ সনের চেয়ে ১৩% বেশী।

৫,৯৯,৫০০৲ টাকার বিশদভাবে বর্ণিত মোসাবিদা এবং ১৬,৭২,৪৮৫৲ টাকার প্রাথমিক মোসাবিদা গবর্ণমেণ্টের নিকট অথবা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হইয়াছে। ৩০,৫৩,০০০৲ টাকার মোসাবিদায় হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে এবং ৩৬,২৪,৮০০ টাকার মোসাবিদায় কর্ম্মচারিবর্গ বহাল হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

আলোচ্য সনে এই বিভাগ পরিচালনার জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ২,২২,৫৭৯৲ টাকা; এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের কাজ করিয়া দিয়া মোট ৪৯,৫৬৩৲ টাকা বেতন বাবদ আদায় হইয়াছে;

(২)

পাটনা বাঁকিপুরে জল সরবরাহ করিবার জন্য বিদ্যুৎ-চালিত পাম্পিং প্ল্যাণ্ট স্থাপিত হইতেছে, কাজ এখনও শেষ হয় নাই। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সার্ভিস্ চৌবাচ্চা নির্ম্মিত হইয়াছে। মোট ব্যয় হইয়াছে ১,৩০,৮৪৮৲ টাকা। পাটনা জেনারেল হসপিটালে গরম জল এবং ইলেক্‌ট্রিক ষ্টিরালাইজারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খরচ পড়িয়াছে ৫৩,৫৭৭৲ টাকা; বাজেটে ব্যয় স্থির হইয়াছিল ৬৫,৮০০ টাকা। পাটনা আমলাতলায় ৯ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত টিউবওয়েল মাটির নীচে ৩৮১ ফুট বসান হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ঘণ্টায় ১০,৩০০ গ্যালন জল উঠে। চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারের হুকুম অনুসারে একটি সার্ভিস চৌবাচ্চা স্থাপনের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩৭,০১৩৲ টাকা। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘর বাড়ী এখনও নির্ম্মিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরগুলিতে জল-সরবরাহ করিবার এবং স্বাস্থ্য-রক্ষা বিধানের জন্য মাটির নীচে পাইপ ইত্যাদি বসানও হইতেছে। আলোচ্য সনে মোট ব্যয় পড়িয়াছে ৩৮,০৯০ টাকা। ১৯২৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পাটনা ভেটারেনারি কলেজের জলসরবরাহ এবং স্বাস্থ্যরক্ষাবিধান বাবদ ১৫,৯১৯ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। আলোচ্য সনে এতদর্থে ব্যয়িত হইয়াছে ২৩,২০২৲ টাকা। পাটনা, ফুলওয়ারি ডেয়ারি ফার্ম্মে ড্রেন বসাইবার জন্য আলোচ্য সনে মোট ১৬৯১২ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে।

ভাগলপুরে জল-সরবরাহ করিবার জন্য তিন স্থানে টিউবওয়েল বসান হইয়াছিল বটে, কিন্তু কোন স্থানেই উপযুক্ত পরিমাণে জল পাওয়া যায় নাই। সেই জন্য আপাততঃ টিউব-ওয়েল বসাইবার প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপায়ে জল সরবরাহ করা যায় কি না অনুসন্ধান করা হইতেছে।

১৯২৮ সনে পুরী সহরে টিউবওয়েল স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় ৩৮ বৎসরের চেষ্টার ফলে পুরী সহরের প্রয়োজন মাফিক জলের সংস্থান হইল। পুরীতে নরেন্দ্র সরোবরে প্রায় ৩২৮ ফুট মাটির নীচে টিউব বসান হয়। ১৯২৮ সনের জুলাই মাসে ৭ দিন ধরিয়া এই জল পরীক্ষা করা

হয়। পরীক্ষায় জানা যায় যে, এই জল সমুদ্র জলের মত রাসায়নিক উপাদান-বিশিষ্ট। ঘণ্টায় ৩০০০ গ্যালনের স্থলে জল উত্থিত হয় ২,১৪১ গ্যালন; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কন্‌ট্রাক্‌টারদের নিকট হইতে টিউবওয়েল গ্রহণ করেন নাই। কন্‌ট্রাক্‌টরগণের অনেক জিনিষপত্র লোকসান হইয়াছে।

কটক রাভেনসা কলেজে ড্রেন বসান শেষ হইয়াছে ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাসে। কটক মেডিক্যাল স্কুলে এবং জেনারল্ হসপিটালে জলের কল বসান হইয়াছে। জলের কল বাবদ খরচ ধার্য্য হইয়াছিল ৫০,৮০০৲ টাকা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খরচ পড়িয়াছে ৪২,৯৬০ টাকা। কটক মিউনিসিপ্যালিটিতে ড্রেন বসান হইতেছে। আলোচ্য সনে খরচ ধার্য্য হইয়াছিল ১,৪১,০০০, কিন্তু মাত্র ৪৯,১৮৮ টাকা খরচ হইয়াছে। কাঁকী মেণ্টাল হসপিটালের জন্য মোট ২৩,৩৩৪ টাকা খরচ করা হইয়াছে।

১৯২৮ সনের নভেম্বর মাসে সোনপুরের মেলায় ১৬টি ছোট ছোট পাম্পিং প্ল্যাণ্ট্ বসাইয়া জল সরবরাহ করা হইয়াছিল। জল সরবরাহ পূর্ব্বের অপেক্ষা ভালই হইয়াছিল। এই মেলাতে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক লোক যোগদান করিয়া থাকে। সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার স্থায়ী জল সরবরাহের ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। ১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাসে ভীটাতে যে মেলা বসিয়াছিল তাহাতে তিনটি টিউবওয়েলের সাহায্যে জল প্রদান করা হয়। জল প্রচুর পরিমাণে উঠিয়াছিল।

১৯২৭ সনের প্রথমভাগে গয়া সহরে জল-সরবরাহ করিবার জন্য কন্‌ট্রাক্টর যে টিউবওয়েল বসাইয়াছিল তাহা গ্রহণ করা হয় নাই; আবার নূতন করিয়া ৯০,০০০ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। মজঃফরপুর সহরের জলের কল এবং ড্রেনের জন্য যথাক্রমে ৩,৭০,৩০০ টাকা এবং ৭,৯৭,০০০ টাকার দুইটি মোসাবিদা ১৯২৮ সনের গ্রীষ্মকালে প্রস্তুত করা হইয়াছে। আরা সহরের ড্রেনগুলির সংস্কারের কথা-বার্ত্তা চলিতেছিল। তজ্জন্য জরীপও করা হইয়াছিল। ড্রেনগুলি জলের সাহায্যে ধুইয়া পরিষ্কার করা হইবে; কিন্তু ইহাতে খরচ বেশী হইবার সম্ভাবনা।

আরা সহরে জল-সরবরাহের জন্য বাহিয়ারা নামক স্থানে পাম্পিং কল আছে। কল হইতে জল বেশ ভালই পাওয়া যাইতেছিল বটে, কিন্তু একটি ফিল্টার করিবার আধার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শীঘ্র আধারটি মেরামত না করিলে অবস্থা শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা। নিকটবর্ত্তী নদী হইতে জল টানিয়া আনিবার কোনও কল নাই। নদী হইতে জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে একটি ছোটখাট ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠার দরকার। মাটির নীচ হইতে যদি বেশী দিন পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে জল না পাওয়া যায় তবে এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায় নাই।

ভাগলপুরে পাম্পিং এবং জল পরিষ্কার করিবার কলের কার্য্য সন্তোষজনক নহে। এই জন্য ১৯২৯ সনের অক্টোবর মাসে দুইটি বৈদ্যুতিক পাম্প বসাইবার কথা হইয়াছিল।

দালতনগঞ্জে রেলওয়ে কোম্পানীর প্রয়োজন-মাফিক জল-সরবরাহ হইতেছে না। তবে সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া কোল্ ফিল্ডস্ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে দালতনগঞ্জের জলকষ্ট নিবারণ হইবে বলিয়া মনে হয়।

গয়া সহরে পাম্পিং কলের ব্যবস্থা আছে; তবে বয়লার ইকনমাইজার প্রভৃতির অবস্থা ভাল নয়। জল রাখিবার স্তম্ভগুলির দিকে আদৌ নজর রাখা হয় না; সেই জন্য অনেক জল নষ্ট হইয়া যায়। জলের কলের সংস্কারের জন্য ৯০,০০০ টাকার একটি মোসাবিদা বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

মুঙ্গের সহরের পাম্প এবং ফিল্টারের অবস্থা বেশ ভাল। তবে কতকগুলি ব্যক্তি-বিশেষের বাড়ীতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে বলিয়া জল সরবরাহ কম হইতেছে। দুই বৎসর হইল একটি অতিরিক্ত ফিল্টার নির্ম্মিত হইতেছে বটে, কিন্তু মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের কর্ম্মচারিগণ অনভিজ্ঞ বলিয়া নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইতে বিলম্ব হইতেছে।

মজঃফরপুরের পাম্পিং কলও বেশ ভাল চলিতেছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কম্পাউণ্ডের এবং ওয়াটার ওয়ার্কসের নলকূপগুলি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করে নাই।

পাটনা বাঁকিপুরের বৈদ্যুতিক পাম্পটি বসান শেষ হয় নাই; সুতরাং এখনও পুরাতন ষ্টীম্ এঞ্জিনেই কাজ চালান হইতেছে। জলের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

ঝরিয়ায় জলের পাইপগুলিতে ছিদ্র হইয়া জল অপরিষ্কার হইয়া যাইত। জল প্রায় ৯০% অপরিষ্কার দেখা যাইত। পাইপের জয়েণ্টগুলি আটিয়া দেওয়ায় জল অপরিষ্কার হওয়া অনেকটা নিবারিত হইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশে তোপচাঁচীতে প্যাটার্সন ক্লোরোনোমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে জল খুব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সাপ্লাই লাইনে একটি নূতন রেকর্ডার স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রীষ্মকালে ঝরিয়ার ফিল্টারগুলিতে অত্যন্ত কাদা জমিয়া যায়। কর্দ্দম নিবারণের জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে। ঝরিয়ায় জলের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। সুতরাং শীঘ্রই আরো কতকগুলি ফিল্টার তৈয়ারের প্রয়োজন।

সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কয়েক স্থানে জলের পাম্প পরিদর্শিত এবং পরিচালিত হইয়া আসিতেছে :—

পাটনা মেডিক্যাল কলেজ হস্‌পিটাল।
„ গুলজারবাগ প্রেস।
„ গবর্ণমেণ্ট হাউস।
„ হাইকোর্ট।
„ ফুলওয়ারি ফার্ম্ম।
দ্বারভাঙ্গা মেডিক্যাল স্কুল।
„ বানোয়ারি হস্‌পিটাল, লাহেরিয়া সরাই
কটক জেনারেল হসপিটাল।
„ র‍্যাভেন্সা কলেজ।
ধানবাদ স্কুল অব্ মাইনস্।

কৃষি গবেষণার সাহায্য

কৃষি কমিশনের উপদেশের ফলে যে কৃষি-গবেষণা সমিতি হয়েছে তাঁরা কি সর্ত্তে সাহায্য বিতরণ করবেন তার নিয়মগুলা ঠিক হয়েছে। নিয়মগুলা এই রকম :—

(১) যে উদ্দেশ্যে টাকা চাই তাতে সমগ্র ভারতের স্বার্থ থাকা দরকার।

(২) বাড়ীঘরদোর জমিজমা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে জোগাতে হবে। কাউন্সিল কেবল যন্ত্রপাতি লোকজন জোটাবেন।

(৩) প্রথমবারে কোন সাহায্য ৫ বছরের বেশী দেওয়া হবে না।

(৪) যে খরচ সমিতির উপর চাপানো হবে, সেটা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সাধারণ খরচ কমিয়ে যেন চাপানো না হয়।

(৫) প্রস্তাবিত স্কীমে যে সব গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ আছে, তাঁদের চল্‌তি খরচের খানিকটা বইতে হবে।

(৬) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বা ভারত গবর্ণমেণ্ট ছাড়া যদি কেহ কোন স্কীমের কথা তোলেন তা হলে যে প্রদেশ থেকে স্কীমটী প্রস্তাবিত, স্কীমের পিছনে সেই প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন থাকা চাই।

ভারতের সরকারী ঋণ

১৯৩০ সনের ৮ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতার সেণ্ট-পলস্ কলেজের, ইকনমিক সোসাইটিতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে বক্তৃতার সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ হইল :—

গভর্ণমেণ্ট কখন সরকারী ঋণ গ্রহণে অধিকারী ?

প্রধানতঃ যখন সাধারণ রাজস্ব হইতে কোন ব্যাপারের জন্য অর্থের সঙ্কুলান হয় না, অথচ ব্যাপারটি অবশ্যকরণীয়, এবং বিলম্ব করিলে সমূহ বিপদ ও ভীষণ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী তখনই দেশের গভর্ণমেণ্ট ঋণ গ্রহণ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দেশের কল্যাণ-সাধনের জন্যই কোন গভর্ণমেণ্ট ঋণ গ্রহণ করিবার অধিকারী। যুদ্ধের জন্য দেশ ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় ; আর লড়াইয়ের ব্যয় জাতীয় অর্থের অপচয় বলিয়া আধুনিক লোকের ধারণা। তবুও যখন আত্মরক্ষার জন্য লড়াই অপরিহার্য্য হইয়া উঠে তখন আর ঋণ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ পরিচালনকে প্রকৃত পক্ষে জাতীয় অর্থের অপচয় বলা যায় না। যুদ্ধ ভিন্ন অন্যান্য কারণেও অপচয় ঘটিতে পারে। শুধু সরকারী রাজস্ব হইতে অপচয় করিলে তাহার ভার এক পুরুষের লোকদের ঘাড়েই চাপে ; কিন্তু সরকারী ঋণ গ্রহণ করিলে সমস্ত দায়িত্ব বহু পুরুষপরম্পরাক্রমে একটী গোটাজাতির উপরে ন্যস্ত

হইতে পারে, অর্থাৎ কেবল বর্ত্তমানের মানুষই এই দায়িত্বের বোঝা বয় না, অনাগত ভবিষ্যতেও যে সমস্ত মানুষ জন্মিবে তাহাদিকেও এই বোঝা বহিতে বাধ্য করা হয় সরকারী ঋণ দ্বারা। এহেন দায়িত্বমূলক কাজ করিবার সময় গভর্ণমেণ্টকে রীতিমত হুসিয়ার হইতে হইবে। সরকারী ঋণ গ্রহণ করা তখনই সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে যখন গৃহীত অর্থ এমন কোন ব্যাপারে ব্যয়িত হয় যদ্দ্বারা দেশের ধন-উৎপাদনে সহায়তা হয়। এই ধন-উৎপাদন গোটা জাতির হইতে পারে; এইরূপ না হইয়া যদি সম্প্রদায়বিশেষ, ব্যক্তিবিশেষ বা অঞ্চলবিশেষের ধন-উৎপাদনে সহায়তা করে, তাহাতেই গোটা জাতির বা দেশের পক্ষে কোন অসুবিধা হইতে পারে না। মোট কথা ধনোৎপাদনের সহায়ক হইলেই ঋণ-গ্রহণ সার্থক বিবেচিত হইতে পারে।

ভারতের বেলায় অন্যরূপ ব্যবস্থা

সমস্ত সভ্য এবং উন্নত দেশে দেখা যায় সেই সেই দেশীয় সরকার জাতির মঙ্গল-বিধানের জন্য, জাতির ধনোৎপাদনের সহায়তা করিবার জন্যই সরকারী ঋণ গ্রহণ করিতেছেন। দুঃখের বিষয় ভারতের বেলায় অন্যরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; ভারতবর্ষ শাসিত হইতেছে বাহিরের শাসক-শক্তি দ্বারা। সুতরাং ভারতের বেলায় অন্যরূপ ব্যবস্থা হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তবুও ভারতের সরকারী ঋণ বিশেষভাবে সমঝিয়া দেখিতে হইবে। বিশেষতঃ, বর্ত্তমানে এই ভাবে সমঝিয়া দেখিবার প্রয়োজন আরও বেশী বলিয়া অনুভূত হইতেছে। কারণ ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে রীতিমত দুর্য্যোগ দেখা দিয়াছে। সুতরাং এখন বিদেশে ভারতের বাজার-সম্ভ্রম কিরূপ এবং ভারতের ঋণগ্রহণের ক্ষমতাই বা কি পরিমাণ এই সমস্ত ব্যাপার বিশেষ ভাবে তলাইয়া দেখা নিতান্ত আবশ্যক।

সরকারী ঋণের ইতিকথা

ভারত গভর্ণমেণ্টের ঋণ সম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্ত্তমান বক্তৃতার উদ্দেশ্য। প্রদেশসমূহ এবং অন্যান্য পাবলিক প্রতিষ্ঠানসমূহেরও ঋণ আছে, সে সমস্ত ঋণের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই আছে এবং তাহা লইয়া আলোচনা চলিতে পারে বিস্তর এবং চলাও উচিত। যদি অন্য কেহ এই সামান্য আলোচনাদি করেন তবে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য বাহির হইয়া আসিবে।

গোটা ভারতবর্ষের সরকারী ঋণের আলোচনা—সে এক বিরাট ব্যাপার; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ভারতভূমিতে সরকারী ঋণ কথাটী একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। এই মহামান্য কোম্পানী সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী ঋণের সৃষ্টি করেন। সুতরাং ১৮৫৮ সনে যখন কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হইল তখন ভারতের করদাতাগণ এই কোম্পানীর নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইল দশ কোটী পাউণ্ড সরকারী ঋণ। কতকগুলি যুদ্ধ পরিচালনের জন্য কোম্পানীকে দেনা করিতে হয়। এই সমস্ত যুদ্ধে ভারতের কোন উপকার হয় নাই। যুদ্ধগুলির দ্বারা কোম্পানীর রাজত্বই সুদৃঢ়তর হইয়াছে। ১৭৯২ সনে কোম্পানীর ঋণ ছিল ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু ১৮৫৮ সনে ইহা দাঁড়ায় ৬ কোটী ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড। দেখিতে গেলে এই ঋণের বোঝা কোম্পানীর ঘাড়েই পড়া উচিত ছিল। এর পরে সিপাহী বিদ্রোহের আবির্ভাব হয়। এই বিদ্রোহ দমনের সমুদয় খরচও আবার ভারতের ঘাড়ে চাপান হয়। ফলে ভারতের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় দশকোটী পাউণ্ডেরও উপর। ক্ষতিপূরণ বাবদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ১ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করা হয়। এই অর্থও ভারতের ঋণের সামিল করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু বড়ই মজার কথা—আর মজার কথা কেন—রীতিমত হৃদয়বিদারক কাহিনী এই যে, সমস্ত দাম দিয়া ভারতবর্ষ সম্পত্তি খরিদ করিল, কিন্তু শেষকালে সম্পত্তির অধিকারী হইলেন বিলাত! সুতরাং ভবিষ্যতে বিলাতের ভারতীয় অর্থনীতি যে কিরূপ হইবে তাহা এই গোড়া হইতেই টের পাওয়া গিয়াছে।

ভারতের ১১৩২ কোটী টাকা ঋণ

আবিসিনিয়ান এবং চৈনিক যুদ্ধের ব্যয় ভারতের ঘাড়ে

চাপিয়াছে। এই সমস্ত লড়াইয়ের খরচের সহিত ষ্টেট্ রেলওয়ে, ইরিগেশন ওয়ার্কস, দুর্ভিক্ষের রিলিফ কার্য্য, এক্সচেঞ্জ রক্ষার খরচ ইত্যাদি যোগ করিলে দেখা যায়, গত শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের সরকারী ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২১ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড (এই এক্সচেঞ্জের জন্য ভারতকে কম ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে না; বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গত দুই পুরুষ কাল ধরিয়া ভারতের সহিত বিলাতের মুদ্রাবিনিময় ব্যাপারের অনুপাতই স্থির হইল না)। এদিকে ১৯৩০ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে আমাদের জাতীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৫ কোটী পাউণ্ড; অর্থাৎ ১৮ পেন্স টাকার মূল্য ধরিলে জাতীয় ঋণ ১১৩২ কোটী টাকা। বর্ত্তমানের এই বিশাল জাতীয় ঋণের কারণ ইউরোপীয় মহাসমর; এই মহাসমরের সময়েই ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমতঃ, ১৯১৫-১৭ সনের মধ্যে ভারত সরকারের বাজেট পূরণ করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করা হয়, দ্বিতীয়তঃ, বিলাতকে ১০ কোটী পাউণ্ড যুদ্ধের জন্য চাঁদা প্রদানের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধের পর গত দশ বৎসরের মধ্যে আরও ২০ কোটী পাউণ্ডের উপর নূতন ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নয়া কর্জ্জ গ্রহণ করা হয় ৫ বৎসর ধরিয়া সরকারী বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য। কারণ সামরিক এবং বেসামরিক উভয় প্রকার সরকারী কার্য্যের জন্য খরচের বহর অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৬ সনে ভারতের অনুৎপাদক ঋণের পরিমাণ কমিয়া গিয়া মাত্র ২২॥০ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হয়, কিন্তু ১৯২৪ সনে এই ধরণের ঋণ বাড়িতে বাড়িতে ১৯ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হয়। বৃদ্ধির কারণ লড়াইয়ের মধ্যে এবং পরে অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যয়-বৃদ্ধি। ১৯১৬ সনে ভারতের এই অনুৎপাদক ঋণ একেবারে লোপ করিয়া ফেলিবার একটী সুযোগ বা অবসর মিলিয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট সে সুযোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৯১৬ সনের পর হইতে এদেশের ঋণের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষের সরকারী ঋণ কেবলমাত্র যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত যুদ্ধ ভারতের ভিতরে বাহিরে যেখানেই হউক না কেন, ইহার ফলে কেবলমাত্র বিলাতের প্রভুত্ব দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষের এক রত্তিও সুবিধা হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের পূর্ব্বেও এই অবস্থা ছিল এবং এখনও তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের এই সমস্ত ঋণের পরিমাণ পাউণ্ডের হিসাবে দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে এই সমস্ত ঋণ বিলাতেই তোলা হইয়াছে তাহা নয়। ভারতের মোট সরকারী ঋণের ৫৫% ভারতবর্ষেই গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং ৪৫% সরকারী ঋণ ভারতের বাহিরে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সরকারী ঋণের বিস্তৃত বিবরণ

গভর্ণমেণ্ট ভারতের জনসাধারণের নিকট যে সমস্ত ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা লোন এবং বণ্ড এই দুই আকারে দেখা যায়। ইহার মধ্যে কতকগুলির মেয়াদ শেষ হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণরূপে গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন। কতকগুলির মেয়াদ শেষ হইবে অনেক বৎসর পরে এবং কতকগুলির মেয়াদ অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে। এই ধরণের লম্বা মেয়াদের সরকারী ঋণের পরিমাণ ১৯৩০ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে দাঁড়াইয়াছে ৪০৫·৩১ কোটী টাকা। ইহা ছাড়া অল্প দিনের মেয়াদের কর্জ্জ আছে। এই সকল ট্রেজারি বিল নামে সুপরিচিত।

ট্রেজারি বিলের স্বরূপ এই যে, ইহার মেয়াদ বারো মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। তিন মাস, ছয় মাস, নয় মাস এবং বার মাস—ট্রেজারি বিল প্রধানতঃ এই কয় প্রকারের হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের আয় প্রধানতঃ বৎসরের শেষের তিন মাসেই বেশীর ভাগ হইয়া থাকে। এদিকে খরচ কিন্তু বার মাস সমান ভাবে হয়। সুতরাং অসময়ে টাকার সংস্থান করিবার জন্যই ট্রেজারি বিলরূপ কর্জ্জ গ্রহণ করা হয়। গভর্ণমেণ্টের এই নীতির নিন্দা করা যায় না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই ট্রেজারি বিলরূপ অস্ত্রের সাহায্যে ভারতের টাকার বাজার নিয়ন্ত্রিত করিতেও চেষ্টা করেন। ট্রেজারি বিলের সাহায্যে এইরূপে টাকার বাজার তথা ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের সরকারী চেষ্টা কখনই সফল হইতে

দেখা যায় না; আর ইহাতে সুফলও কিছু হয় না। লাভের মধ্যে এই হয় যে, ব্যাঙ্কারদের সহিত গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট মনান্তর উপস্থিত হয়। ১৯৩০ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ট্রেজারি বিলের দ্বারা গভর্ণমেণ্টের ঋণের পরিমাণ ২৪ কোটী টাকা হওয়ার কথা। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত সরকারী বাজেটে ইহারই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ৩১শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ এক মাসে ট্রেজারি বিলের বৃদ্ধি হইয়াছে ১০ কোটী টাকা পরিমাণ।

জনসাধারণের নিকট ঋণগ্রহণ ছাড়া গভর্ণমেণ্ট অন্য উদ্দেশ্যে ট্রেজারি বিল ব্যবহার করিয়া থাকেন। নোটের রিজার্ভের জন্যও গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারি বিল বাহির করিয়া থাকেন। ১৯৩০ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে এই ধরণের ট্রেজারি বিলের পরিমাণ ৩৪'৫০ কোটী টাকা হইবার কথা; কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে ২৯ কোটী টাকার ট্রেজারি বিল বাহির করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কারেন্সির সঙ্কোচ করিবার জন্যই এই ৫ কোটী টাকা কমাইয়াছেন।

গভর্ণমেণ্ট আবার ব্যাঙ্কারও বটে। গভর্ণমেণ্ট নাকি জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস আনয়ন করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত এবং এই অর্থ পরে নানা প্রকার লাভজনক ব্যবসায়ে খাটানও নাকি গভর্ণমেণ্টের আর এক ধান্ধা। গভর্ণমেণ্ট এতদুদ্দেশ্যে পোষ্ট অফিস্ সেভিংস ব্যাঙ্ক বিভাগ খুলিয়াছেন। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের সহিত পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেটের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থরূপে সরকারী দেনার পরিমাণ ১৯৩০ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ৩৭'৪৮ কোটী টাকা, পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট বাবদ দেনা ৩৫'২৫ কোটী হইবার কথা। ১৯৩০ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে এই দুই খাতে দেনার পরিমাণ ছিল ২৩'২০ কোটী এবং ৩'১৩ কোটী টাকা।

ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের এবং রেলওয়েসমূহের ব্যাঙ্কাররূপেও বিরাজিত। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির এবং রেলওয়েসকলের ভিন্ন ভিন্ন ফাণ্ড হইতে উদ্বৃত্ত তহবিলও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত থাকে। এ হিসাবে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট অনেক অর্থ জমা হইয়াছে। এক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বাবদই গভর্ণমেণ্টের নিকট জমা হইয়াছে ৬৫'৬৫ কোটী টাকা, রেলওয়ে রিজার্ভ এবং ডিপ্রিসিয়েশান ফণ্ডে ৩১'৭৭ কোটী টাকা, এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহের উদ্বৃত্ত তহবিল ১০'১৭ কোটী টাকা।

উপরিউক্ত পাঁচটী খাতের ঋণের পরিমাণ একত্র করিলে দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের টাকায় কৃত ঋণের পরিমাণ মোট ৬৪৪'১৩ কোটী টাকা।

বিলাতের নিকট ভারতের ঋণ ৪৮৭'৫৯ কোটী টাকা

ভারতবর্ষ ছাড়া লণ্ডনের বাজারেও ভারত গভর্ণমেণ্ট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই ঋণ দুই প্রকারের, অল্প দিনের মেয়াদের এবং বেশীদিনের মেয়াদের; এবং মোট ঋণের পরিমাণ ২৮৯০'৪ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা ছাড়া আরও কয়েক প্রকার ষ্টার্লিং ঋণ আছে যথা:—ষ্টার্লিং ট্রেজারি বিল ৬ লক্ষ পাউণ্ড, রেলওয়ে অ্যানুইটিজ্ ৫১৮'৬ লক্ষ পাউণ্ড, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ২৬'৬ লক্ষ ষ্টার্লিং। ইহা ছাড়া যুদ্ধের সময় ভারতের বিলাতকে দেওয়া ১০ কোটী পাউণ্ডের উপঢৌকন আছে। এই উপঢৌকন বাবদ নাকি এখনও ১৬১'৩ লক্ষ পাউণ্ড বাকী আছে। এই সমস্ত যোগ করিলে বিলাতের নিকট ভারতের মোট দেনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৫৬'৯ লক্ষ পাউণ্ড; অর্থাৎ বিলাতের নিকট ভারতের মোট দেনা ৪৮৭'৫৯ কোটী টাকা।

ভারতের সরকারী ঋণ আর এক দিক্ দিয়াও বিচার করা চলে। ভারতে ৩৪ কোটী টাকার এবং লণ্ডনে ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের ট্রেজারি বিল ৬ মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। চিরস্থায়ী ঋণের পরিমাণ ভারতবর্ষে ১৭৫'৫ কোটী টাকা এবং লণ্ডনে ১৭৭২ লক্ষ পাউণ্ড। 'চিরস্থায়ী' এই হিসাবে বলা হইতেছে যে, মেয়াদ শেষ হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণরূপে গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে। মেয়াদ শেষ করিবার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট বণ্ড-হোল্ডারগণকে রীতিমত নোটিশ দ্বারা জ্ঞাত করাইয়া থাকেন। এই দুই প্রকার ঋণ ছাড়া আরও নানা মেয়াদের সরকারী ঋণ বর্ত্তমান আছে।

ইহার মধ্যে এই সনের সেপ্টেম্বর মাসে ১৫·৩ কোটী টাকার, ১৯৩১ সনে ৭·১৪ কোটী টাকার, ১৯৩২ সনে ১৪·৪১ কোটী টাকার, ১৯৩৩ সনে ২১·৪৬ কোটী টাকার, ১৯৩৪ সনে ২৫·৯৮ কোটী টাকার, ১৯৩৫ সনে ১২·৭৮ কোটী টাকার, ১৯৩৬ সনে ৯·৯ কোটী টাকার, ১৯৩৭ সনে ১৯·৫৪ কোটী টাকার মেয়াদ শেষ হইবে। ষ্টার্লিং লোনের মধ্যে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে মাত্র ১৯৩২ সনে ২০৯ লক্ষ পাউণ্ডের মেয়াদ শেষ হইবে। সুতরাং ১৯৩৭ সনের মধ্যে ভারতে এবং লণ্ডনে মোট ১৫৪·৩৭ কোটী টাকার ঋণের মেয়াদ শেষ হইবে।

গভর্ণমেণ্টের খাটান অর্থের পরিমাণ ৯১৪·৭০ কোটী টাকা

পূর্ব্বের হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৩০ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে গভর্ণমেণ্টের মোট ঋণের পরিমাণ ১,১৩২ কোটী টাকা। পক্ষান্তরে গভর্ণমেণ্টের অনেক টাকা খাটিতেছে। যে যে ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের টাকা খাটিতেছে তাহার পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) রেলওয়েসমূহে অর্থ খাটিতেছে ৭৩১·৯০ কোটী টাকা।

(২) অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ২৩·০৫ কোটী টাকা।

(৩) প্রদেশসমূহে লাগান পুঁজি ১৪২·৪৫ কোটী টাকা। এবং

(৪) দেশীয় রাজ্যসমূহকে প্রদত্ত এবং অন্যান্য ব্যাপারে সুদ লইয়া কর্জ্জদাদন ১৭·৫৭ কোটী টাকা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুদের উপর গভর্ণমেণ্টের ৯১৪·৯৭ কোটী টাকা খাটিতেছে। ইহা ছাড়া ট্রেজারি একাউণ্ট বাবদ ক্যাশ, বুলিয়ন এবং সিকিউরিটি সমূহের মূল্য ৩৯.৭৩ কোটী টাকা। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের ১,১৩১·৭২ কোটী টাকা ঋণের মধ্যে ৯৫৪·৭০ কোটী টাকার সম্পত্তি আছে। মাত্র ৪০ কোটী টাকা ছাড়া বাদ বাকী সমস্ত অর্থই লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োজিত রহিয়াছে। যে ঋণের উপর কোন সম্পত্তি নাই অথচ তাহার সুদ দিতে হইতেছে এইরূপ ঋণের পরিমাণ ১৭৭·০২ কোটী টাকা। বাজেটের ঘাটতি পূরণ, রিভার্স কাউন্সিলের জন্য ঋণ স্বীকার, যুদ্ধের সময় বিলাতকে চাঁদা ইত্যাদি বাবদ গভর্ণমেণ্ট অনুৎপাদক ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে এই ধরণের ঋণের পরিমাণ যাহাতে কমিয়া আসে সেজন্য গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকেন। ১৯২৩ সনের ৩১শে মার্চ্চ হইতে ১৯৩০ সনের ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট অনুৎপাদক ঋণ ২৭ কোটী টাকা কমাইয়াছেন।

১৯২৩ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে মোট পাবলিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৮৮১·৭৪ কোটী টাকা, তন্মধ্যে ঘরোয়া ঋণ ৪৭৬·৪৩ কোটী টাকা এবং ষ্টার্লিং ঋণ ৪০৫·৩১ কোটী টাকা। ১৯২৪ সনের ৩১শে মার্চ্চ টাকার ঋণ ১০·৫ কোটী টাকা এবং ষ্টার্লিং ঋণ ২৭ কোটী টাকা বাড়ে। ১৯২৫ সনের ৩১শে মার্চ্চের বাজেটে দেখা যায়, টাকার ঋণের পরিমাণ ২৮ কোটী টাকা এবং ষ্টার্লিং ঋণ ২৩ কোটী টাকা। পরের তিন বৎসরে নূতন বিদেশী ঋণ আদৌ গ্রহণ করা হয় না। ভারতবর্ষ হইতে ঋণ আদায় করিয়াই সমস্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন করা হয়।

১৯২৫-২৮ সনের মধ্যে ঘরোয়া ঋণ বাড়িয়াছে ৫২ কোটী টাকার; পক্ষান্তরে ষ্টার্লিং ঋণ বাড়িয়াছে মাত্র ৪·৫ কোটী টাকার। অতঃপর অবস্থা আবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে কর্জ্জ না পাওয়ায় এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ আবার ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াছে। বর্ত্তমানে মোট ঋণ বাড়িয়াছে ২৪৯·৯৮ কোটী টাকার অর্থাৎ ২৮·৩৫% ; তন্মধ্যে টাকার ঋণ বৃদ্ধি ১৬৭·৭০ অর্থাৎ ৩৫·০৯% এবং ষ্টার্লিং ঋণ বৃদ্ধি ৮২·২৮ কোটী টাকার অর্থাৎ ২০·২৫%। মোট কথা দেখা যাইতেছে ১৯২৫-২৮ সনের মধ্যে ভারতবর্ষ অর্থঘটিত ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হইয়াছিল; এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষকে লণ্ডনের নিকট হাত পাতিতে হয় নাই। এবং গভর্ণমেণ্ট বোধ হয় ঘরে ঘরে সমস্ত অভাব মিটিয়া গেলে পরের দ্বারস্থ হওয়া যে সমীচীন নয় তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

প্রস্তাবিত শাসনসংস্কার বনাম সরকারী ঋণ

ভবিষ্যতে যে শাসন-সংস্কারের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তাহাতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অনেক রূপান্তর-সাধন অবশ্যম্ভাবী। তিন বিষয়ে নূতনত্ব ঘটিবার কথা :—

(১) প্রভিন্সিয়াল অটোনমি অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন।

(২) সাধারণ রাজস্ব হইতে রেলওয়ে রাজস্বের স্বতন্ত্রী-করণের ফলে রেলওয়েগুলির জন্য স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা।

(৩) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান কায়েম করা। প্রদেশ-গুলিতে স্বায়ত্ত-শাসন আরম্ভ হইলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির ব্যাঙ্কার হওয়া আর চলিবে না। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির যে সমস্ত উদ্বৃত্ত তহবিল এখন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট জমা আছে তাহা প্রদেশগুলিকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। রেলওয়ে-গুলিতে স্বায়ত্তশাসন আরব্ধ হইলে রেলওয়েগুলির সমুদয় গচ্ছিত অর্থ, যথা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ডিপ্রিসিয়েশান ফাণ্ড রিজার্ভ ফাণ্ড ইত্যাদি সমস্তই রেলওয়েগুলির নিকট প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে যদি প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে পেপার কারেন্সি রিজার্ভ বাবদ সিকিউরিটির পরিমাণ কমাইতে হইবে এবং সঙ্গে আরও মূল্যবান সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মোট কথা এই তিন বিষয় বাবদ গভর্ণমেণ্টকে ৬০ হইতে ৮০ কোটী টাকার সংস্থান করিতে হইবে। সুতরাং গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া লম্বা মেয়াদের কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া এই অর্থ তুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গভর্ণমেণ্টের এই বিপুল ঋণজাল সম্পর্কে স্বতঃই নিয়োক্ত কয়েকটী প্রশ্ন মনের মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্টের ক্রেডিট্ পলিসি কিরূপ? ইহা কি বিজ্ঞান-সম্মত? ইহাদ্বারা কি গভর্ণমেণ্টের স্বার্থ পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হইতেছে? ভারতের জনসাধারণের মঙ্গলার্থ ইহা নিয়োজিত কি না? দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স প্রভৃতির মঙ্গলসাধন করিয়া ইহা গোটা জাতির বাজার-সম্ভ্রম (ক্রেডিট্) সুদৃঢ় করিতে সহায়তা করিতেছে কি না? বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে গোটা জাতির ক্রেডিট্ গভর্ণমেণ্টের ক্রেডিট্ পলিসির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জাতির ক্রেডিট বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে: (১) সরকারী বাজেটের সমতা রক্ষিত হইতেছে কি না? (২) ঋণ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্র তাহা লাভজনক ব্যাপারে খাটাইতে চেষ্টা করে কি না? (৩) ঋণের পরিবর্ত্তে ঋণ শোধ হইয়া যাইতে পারে এইরূপ সিঙ্কিং ফাণ্ডের ব্যবস্থা আছে কি না, অর্থাৎ যে সমস্ত পুঁজি খাটিতেছে তদ্দারা ঋণ শোধ হইবার উপায় আছে কি না?

ঋণ-পরিহারের ব্যবস্থা

ভারতবর্ষের ক্রেডিট্ পলিসি কিরূপ হইলে রাষ্ট্রের তথা দেশের অবস্থা উন্নত হইতে পারিবে এ সম্বন্ধে স্যার বেসিল্ ব্ল্যাকেটকে প্রথম এবং প্রধান সমঝদার বলা চলিতে পারে। রাজস্ব-সচিবগণের মধ্যে তাঁহার প্রথম মাথা খেলে যে, ভারতবর্ষের সরকারী বাজেটের সমতা রক্ষা না করিলে চলিবে না; এবং লাভজনক উপায়ে খাটান ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা হইবে না। সিঙ্কিং ফাণ্ডের ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং ক্রমশঃ বর্ত্তমান ঋণ মোচন করিবার জন্য ইনি একটী মোসাবিদা স্থির করেন। এই মোসাবিদা "অ্যাভয়ড্যান্স অর রিডাক্‌শন অব্ ডেট" অর্থাৎ ঋণ-হ্রাসের ব্যবস্থা" নামে সুপরিচিত। এই মোসাবিদা কায়েম হয় ১৯২৫-২৬ সনে। এই মোসাবিদা দ্বারা ৮০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সমুদয় দেনা পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়। আমাদের যুদ্ধের দেনা পরিশোধ করার ব্যবস্থা হয় ৫০ বৎসরের মধ্যে, ৫ বৎসরের ঘাটতির দরুণ দেনা ২৫ বৎসরের মধ্যে, এবং দিল্লীর নয়া রাজধানী নির্ম্মাণের দরুণ দেনা ১৫ বৎসরের মধ্যে। এই সম্পর্কে ১৯২৪ সনের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে গভর্ণমেণ্ট একটী রেজলিউশান পাশ করেন। প্রথমতঃ, পরীক্ষাস্বরূপ পাঁচ বৎসরের জন্য ফি সন ৪ কোটী টাকা করিয়া দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়। এই সঙ্গে ১৯২৩ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে পরিমাণ দেনা ছিল প্রতি বৎসরের শেষে তাহার তুলনায়

যে পরিমাণ দেনা-বৃদ্ধি দেখা যাইবে তাহারও ৳ অংশ শোধ করিবার কথা স্থির হয়।

১৯২৫-২৬ সনে প্রথম এই ব্যবস্থা অনুসারে ৪'৭৮ কোটী টাকা দেনা শোধ দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সনে ৬ কোটী টাকার উপর দেনা শোধ করা হইবে। এই ব্যবস্থা অতি সুন্দর ফল প্রসব করিয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যে স্বর্ণ-ঘটিত সিকিউরিটির (গিল্ট-এজ্) দাম অত্যন্ত চড়িয়া যায়। ভারতের গিল্ট-এজ্ মার্কেটের কারবার অত্যন্ত জাঁকিয়া উঠে। সাড়ে তিন টাকা সুদের রুপি পেপার, যাহার দাম ৫০ টাকারও নীচে ঠেকিয়াছিল, তাহার দাম ১৯২৬ সনের মে মাসে ৭৯ টাকায় পরিণত হয়। ১৯৪৫-৫৫ লোনের দাম একেবারে ১১০ টাকায় পৌঁছে। গভর্ণমেণ্টও যথেষ্ট সুবিধা ভোগ করিতে থাকেন। পূর্ব্বে যে স্থলে মায় ট্যাক্স্ গভর্ণমেণ্টকে শতকরা ৬॥ টাকা হারে কর্জ্জ করিতে হইত, সেইস্থলে জনসাধারণের নিকট মায় ট্যাক্স্ শতকরা ৪৬ টাকা হারে গভর্ণমেণ্ট কর্জ্জ পাইতে থাকেন। যে সমস্ত কর্জ্জের মেয়াদ শেষ হইয়াছিল তাহা অল্প সুদে শোধ যাওয়ায় গভর্ণমেণ্ট অনেক সঞ্চয় করিতেও সমর্থ হন।

কিছুদিন ধরিয়া গিল্টএজ্ মার্কেটের অবস্থা খুব সুন্দর ছিল; গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিসমূহ অত্যন্ত চড়া দরে বিক্রী হইয়াছিল; পক্ষান্তরে গভর্ণমেণ্ট অল্প সুদে কর্জ্জ করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ট্রেজারি নূতন লোন বাহির করিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল; গভর্ণমেণ্টের বাজার-সম্ভ্রম অর্থাৎ ক্রেডিটও উপনীত হইয়াছিল চরম অবস্থায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯২৬ সনের হেমন্ত ঋতু হইতে আবার ভাটা পড়িয়া যায়। সাড়ে তিন টাকার "রুপি পেপারের" দাম একেবারে ৬৩ টাকায় নামিয়া যায়; ১৯৪৫-৫৫ লোনের দাম ১১০ টাকা হইতে আবার ১০০ টাকায় পৌঁছে। এই অবস্থার—কারণ কি? স্যার বেসিল ব্লাকেটের কার্য্যনীতি তো পরিহার করা হয় নাই। তবুও আবার ভাটা পড়ার কারণ কি? ব্যাপারটী রীতিমত সমঝিয়া দেখার দরকার।

গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ইহার কৈফিয়ৎস্বরূপ বলা হইতেছে, ১৯২৬ সনের অবস্থা নিতান্ত অস্বাভাবিক হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থা বেশীদিন টিঁকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, টাকার সিকিউরিটিগুলি লণ্ডন মার্কেটের গিল্ট-এজ্ সিকিউরিটিসমূহের তুলনায় অত্যন্ত চড়াদরে বিক্রী হইতেছিল; সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত টাকার সিকিউরিটি এবং ষ্টার্লিং সিকিউরিটির মধ্যে সমতা আসিতে বাধ্য। তৃতীয়তঃ, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের অযথা প্রচারের ফলে টাকার সিকিউরিটিগুলি এমন অস্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। এই সমস্ত প্রচারের ফলে এবং আনুষঙ্গিক উদ্ভট কল্পনার ফলে টাকার সিকিউরিটির দর চড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত বাজে কৈফিয়তে লাভ কি? ইহার মধ্যে আংশিক সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা প্রকৃত ব্যাপার নহে।

গভর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক কারণেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষে যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিত, এবং অন্যান্য দেশে প্রচলিত মানের সহিত ভারতবর্ষে সমান মান প্রচলিত থাকিত তবেই রুপি সিকিউরিটির সহিত ষ্টার্লিং সিকিউরিটির সমতা রক্ষার কথা আসিত। পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষে মাত্র গোল্ড বুলিয়ন ষ্টাণ্ডার্ড প্রচলিত আছে; অর্থাৎ মাত্র বিনিময়ের ব্যাপারে সোনার চলন আছে। গভর্ণমেণ্ট সোনার সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থাও করেন নাই। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক কারেন্সির সহিত আমাদের কারেন্সির তেমন নিবিড় যোগাযোগ সাধিত হয় নাই। এহেন অবস্থায় ভারতের সিকিউরিটি ষ্টার্লিং সিকিউরিটি বা অন্যান্য আন্তর্জ্জাতিক সিকিউরিটির সহিত সমান দরে বিক্রী হওয়া আবশ্যক, এই উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত এবং অশোভনও বটে। লণ্ডনের বাজারে এবং নিজের এলাকার মধ্যে ভারতের এই ক্রেডিট কমিয়া গিয়াছে। ইহার জন্য গভর্ণমেণ্ট আবার রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণের উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন।

প্রকৃত কারণ কি?

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি মার্কেটের এই যে নিশ্চল অবস্থা

ইহার জন্য প্রকৃত পক্ষে দায়ী কে? গভর্ণমেণ্ট ক্রেডিট্ সম্বন্ধে বাধা প্রদান করিয়া স্বয়ং এই অবস্থা আনয়ন করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট আঠারো পেন্স অনুপাত স্থির করিয়াছেন এবং এই অনুপাত রক্ষা করিবার জন্য ট্রেজারি বিল বিক্রয় করিয়া পেপার কারেন্সি রিজার্ভে বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটি সমূহ বিক্রয় করিয়া ক্রমাগত কারেন্সির সঙ্কোচ সাধন করিয়াছেন। ফলে দেশের ক্রেডিট্ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, রুপি সিকিউরিটি এবং ষ্টার্লিং সিকিউরিটির মধ্যে সমতা রক্ষার দরকার এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রুপি সিকিউরিটির মূল্য কমাইয়া দিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, মার্কেটের অবস্থা না বুঝিয়া অবৈজ্ঞানিকের মত নূতন লোন বাহির করিয়াছেন। এই লোন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের কথায় এবং আশ্বাসে জনসাধারণের বিশেষ আস্থা আছে মনে হয় না। পঞ্চমতঃ, গভর্ণমেণ্টের সহিত ব্যাঙ্কারদের মতান্তর ঘটিয়াছে। একস্চেঞ্জ্, অর্থ এবং গিল্টএজ্ মার্কেটে ট্রেজারির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ব্যাঙ্কারদের মনে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারি বিলের কার্য্যকলাপের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আইনের পুঁথিতে ১৮ পেন্স রেসিও লিপিবদ্ধ করার সময়ে যাহারা গভর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল এমন কি তাহারাও গভর্ণমেণ্টের নিন্দা করিতেছে। তাহারাও বলিতেছে মাত্র একস্চেঞ্জের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব এবং কারেন্সির তত্ত্বাবধান করিতেছেন, ক্রেডিটের দিকে গভর্ণমেণ্টের আদৌ লক্ষ্য নাই। গভর্ণমেণ্ট রপ্তানি-বৃদ্ধির দিকেও মনোনিবেশ করিতেছেন না। সরকার পক্ষ কেবল মাত্র ভারতের আর্থিক অবস্থার অধিকতর সঙ্কোচ সাধন করিতেছেন; ব্যাঙ্কগুলি বাধ্য হইয়া ষ্টার্লিংএর হিসাবে বিক্রয় করিয়া লণ্ডন হইতে পুঁজি সংগ্রহ করিতেছে। এতদুদ্দেশ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হার বাড়ায় ৭% পর্য্যন্ত; অথচ এতদূর হার চড়াইবার মত আর্থিক অবস্থা ছিল না; এবং ব্যাঙ্ক মহলের অবস্থা অনুসারেও এইরূপ হার-বৃদ্ধি সমীচীন হয় নাই। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা অনুসারে ৭% হার করা হইলেও এখনও এই হার অব্যাহত রাখার বাস্তবিকই কোন কারণ নাই; কারণ গত ৪ মাস ধরিয়া আন্তর্জ্জাতিক পুঁজির বাজারসমূহে সুদের হার কমিয়া আসিতেছে। গভর্ণমেণ্ট, ষ্টার্লিং সিকিউরিটি, রৌপ্য বিক্রয়, পেপার কারেন্সি সিকিউরিটি ইত্যাদি নানা উপায়ে কারেন্সি সঙ্কুচিত করিয়া আসিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজনাতিরিক্ত ট্রেজারি বিলও বিক্রয় করিতেছেন। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট ৯ মাসের জন্য ট্রেজারি বিল বাহির করিয়াছেন; ইহাদ্বারা কেবল মাত্র ব্যাঙ্কগুলিকে প্রলুব্ধ করা হইতেছে। কারণ ব্যাঙ্কগুলি লণ্ডন হইতে ৩%, ৩॥% হারে কর্জ্জ করিয়া ভারতবর্ষে ৫% হারে ট্রেজারি বিল ক্রয় করিয়া লাভবান হইতেছেন। এই নীতি দ্বারা গভর্ণমেণ্ট দেশের অর্থের বাজারের নিয়ন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু এই কৃত্রিম উপায়ের ফল কখনই ভাল হইতে পারে না। এর কুফল ইতিমধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এই মত কেবল যে ভারতের অর্থনীতিবিদগণই পোষণ করিতেছেন তাহা নহে, ভারতে যে সমস্ত ইউরোপীয় ব্যাঙ্কার এবং ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহারাও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন।

এখন উপায় কি? প্রতিবিধান কোথায়? প্রতিবিধান কিরূপে হইতে পারে তাহা স্থির করার পূর্ব্বে ব্যাপারের গুরুত্বটা আরও সমঝিয়া দেখার দরকার। উপস্থিত অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন না হইলে যাহারা গভর্ণমেণ্টকে কর্জ্জ দান করিয়াছে তাহাদের তো অসুবিধা হইবেই পক্ষান্তরে গভর্ণমেণ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন সব চেয়ে বেশী। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টের দারুণ আর্থিক দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের ক্রেডিট ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাই সে দিন গভর্ণমেণ্টকে লণ্ডনের বাজারে এত চড়া হারে সুদ দিয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হইল যে তাহাতে আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন কোন জাতিরই বোধ হয় স্বীকৃত হওয়া উচিত নয়। গত বৎসর ভারতবর্ষেও শতকরা আট আনা হারে সুদ বাড়াইয়া মাত্র ১২ কোটী টাকা ঋণ মিলিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট ঋণ চাহিয়াছিলেন কিন্তু প্রায় ইহার দ্বিগুণ। সুতরাং উপস্থিত অবস্থার আশু প্রতিকার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; নতুবা গভর্ণমেণ্ট দারুণ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন। গভর্ণমেণ্ট

নয়া পুঁজির সংস্থান তো করিতে পারিবেই না, অধিকন্তু কর্জ্জ পরিশোধ করাও গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

প্রতিকারের উপায়

বর্ত্তমানে যে সাংঘাতিক অবস্থা আছে তাহার প্রতিকার অবশ্যই করা যাইতে পারে। ১৯৩০—৩১ সনে ৬ কোটী টাকা ঋণ পরিশোধ করার কথা। গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ নূতন ঋণ গ্রহণ করিয়া এই ৬ কোটী টাকা কমাইতে পারেন; এবং দ্বিতীয়তঃ কর্জ্জ পরিশোধের জন্য এই নির্দ্দিষ্ট অর্থ সিকিউরিটি ক্রয়ে নিয়োজিত করিতে পারেন। মোট কথা গভর্ণমেণ্টকে বাজারের হালচাল বুঝিয়া ঠিক সেই অনুসারে চলিতে হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট কেবল মাত্র প্রথম রীতি অনুসারেই কাজ করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৫, ১৯২৬ এবং ১৯২৭ সনে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির দাম সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছিল; সুতরাং গভর্ণমেণ্টকে বাজারের অবস্থার দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখিতে হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে সে সুদিন আর নাই। এক্‌স্‌চেঞ্জের অজুহাতে এমন কার্য্য-নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে যে, তাহার ফলে গিল্টএজ্‌ সিকিউরিটির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এখন অন্য প্রকার কার্য্য-নীতি অবলম্বন করিয়া ইহার প্রতিকার সাধন করিতে হইবে।

স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট আশা করিয়াছিলেন যে, নিয়মিত ভাবে রাজস্ব তহবিল হইতে ঋণ পরিশোধ হইতে থাকিলে লাভজনক ব্যাপারের জন্য নূতন কর্জ্জের প্রয়োজন কমিয়া তো যাইবেই, সঙ্গে সঙ্গে নূতন কর্জ্জ গ্রহণ করিবার খরচও কমিয়া যাইবে। যে অর্থ কর্জ্জ পরিশোধের জন্য ব্যয় করা হইবে তাহার কিয়দংশ যদি উন্মুক্ত বাজারে সিকিউরিটি খরিদ করিবার জন্য নিয়োজিত করা যায়, তাহা হইলে গিল্টএজ্‌ মার্কেটের অবস্থা ভাল হইবে এবং নূতন কর্জ্জ সংগ্রহ করাও সহজ হইয়া পড়িবে। যাহারা ভারতের গিল্টএজ্‌ মার্কেটের অবস্থা ভাল করিয়া জানেন, তাহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, এই মার্কেটে যদি এক কিংবা দুই কোটী টাকা ফেলা যায় তাহা হইলে অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইবে।

ভারতের জনসাধারণের হাতে ৪০০ কোটী টাকার উপর সিকিউরিটি আছে বটে, কিন্তু এই সমস্ত সিকিউরিটির অতি অল্পই বাজারে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। অধিকাংশ সিকিউরিটির মালিকই সিকিউরিটির কারবার করে না বা নিতান্ত ভয় না পাইলে তাহাদের টাকা তুলিয়া লইতে উদ্যত হয় না। এই সমস্ত সিকিউরিটির মধ্যে কিয়দংশ অবশ্য বাজারে নীত হইতে পারে এবং ঐ সমস্ত সিকিউরিটির বাজারদরের উঠানামাও চলিতে পারে। কিন্তু উহাদের পরিমাণ উর্দ্ধপক্ষে ১০ কোটী টাকার বেশী কোন কালেই হইতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট ৬ কোটী টাকা লইয়া আসরে নামিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এখন মাত্র ২ কোটী টাকা ব্যবহার করিলেই চলিবে। এবং এই অল্প টাকাতেই গিল্টএজ্‌ মার্কেটের স্বাস্থ্য ফিরিয়া যাইবে। ব্যাঙ্কার এবং অন্যান্য কয়েকটি লোকের সহিতও গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ সহযোগ বিশেষভাবে অভিপ্রেত।

মোট কথা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে শুধু বিনিময় ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। এই পুরাতন পলিসি এ যুগে একেবারে অচল। বিনিময়ের মত ক্রেডিট্‌ রক্ষার দিকেও গভর্ণমেণ্টকে তুল্যরূপে অবহিত হইতে হইবে। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টের কেবল দুইটি বিষয়ে নজর আছে; (১) স্বর্ণবিন্দুতে এক্‌সচেঞ্জ রক্ষা এবং (২) ভারত সচিবকে আবশ্যকীয় অর্থ প্রদান। এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি গভর্ণমেণ্টের দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র ক্রেডিট্‌ নষ্ট হইয়া যায়;—যদি গভর্ণমেণ্ট আবশ্যকীয় পুঁজির সংস্থান করিতে অসমর্থ হয়,—যদি দিনের পর দিন ধরিয়া গভর্ণমেণ্ট ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হিমসিম খাইতে থাকেন,—এই জন্য যদি গভর্ণমেণ্টকে ভিক্ষুকের মত অযথা চড়া সুদ দিয়া ট্রেজারি বিল দ্বারা ঋণ গ্রহণ করিতে হয় তবুও গভর্ণমেণ্টের চৈতন্য হয় না। গভর্ণমেণ্ট এখন যেমন অস্বাভাবিক অনুপাত দেখাইতে তৎপরতা দেখাইতেছেন, ক্রেডিট রক্ষার জন্য উঁহার তেমনি তৎপরতা দেখাইতে গর্ব্ব অনুভব করা উচিত।

ট্রেজারি বিল নীতির পরিবর্ত্তন

এই সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারি বিল নীতির পরিবর্ত্তন সাধন। গভর্ণমেণ্ট ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ট্রেজারি বিল বাহির করিতে পারেন; ইহা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত; কিন্তু এই ট্রেজারি বিল দ্বারা পুঁজির বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অত্যন্ত নিন্দার্হ। গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কের সুদের চেয়েও ১% বেশী সুদের ব্যবস্থা করিয়া ব্যাঙ্কারগণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করিয়া থাকেন। ট্রেজারি বিলের চড়া সুদের হারের জন্য দেশীয় ব্যাঙ্কার এবং ইনসিউরেন্সগুলির পক্ষে পুঁজি খাটান অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই ট্রেজারি বিল যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাহির করা হয় তাহা হইলে ট্রেজারি বিল অর্থের বাজারে অত্যন্ত সুফল প্রসব করিতে পারে। গভর্ণমেণ্ট যদি ব্যাঙ্কারগণের স্বার্থ নষ্ট না করিয়া এবং নিজের ক্রেডিট্ বজায় রাখিয়া ট্রেজারি বিল বাহির করেন তাহা হইলে সকল দিক্ বজায় থাকে। ট্রেজারি বিল সম্পর্কে একটি অবাধ মার্কেটের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যাহাতে ঐ বিলের প্রচলনের সময় উহার নির্ব্বিঘ্নে ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে।

বৈদেশিক ঋণের অর্থনীতি এবং নীতিকথা

উপসংহারে ভারতের বৈদেশিক ঋণের অর্থনীতি এবং নীতিকথার উল্লেখ প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষ যদি বিলাতের অধীন না থাকিত তাহা হইলে বৈদেশিক ঋণ সম্বন্ধে কোনরূপ অসুবিধাই উপস্থিত হইত না। ভারতবর্ষ যখনই লণ্ডনের বাজারে কর্জ্জ সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হয় তখনই সন্দেহ উপস্থিত হয়—আর এই সন্দেহ নিতান্ত অমূলকও নয় যে, ভারতবর্ষ অধীন দেশ বলিয়া বিলাত ভারতের স্বার্থে নজর না রাখিয়া আপন সুবিধা করিয়া লইতেছে। সুদের হার চড়াইয়া দিয়াই যে বিলাত সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহা নহে, ভারতবর্ষকে ঋণ প্রদান করিয়া বিলাত ভারতবর্ষকে বিলাতী জিনিষ ক্রয়েও বাধ্য করিতেছে। বিলাতের দর অন্যান্য দেশের তুলনায় অতিরিক্ত হইলেও ভারতবর্ষকে বাধ্য হইয়া বিলাতী জিনিষই ক্রয় করিতে হইতেছে। এই সন্দেহের জন্য ভারতের বৈদেশিক ঋণ সম্পর্কে আলোচনায় এত উষ্মতা ও দ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদেশিক ঋণের জন্য ভারতবর্ষকে আরও অনেক প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, যথাঃ—(১) দেশে উপযুক্ত অর্থ থাকিতেও লণ্ডনের বাজারে কর্জ্জ গ্রহণ। গভর্ণমেণ্ট যে নির্দ্দিষ্ট অনুপাত বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহার জন্য লণ্ডনের পাওনা শোধের জন্য ভারতবর্ষকে বাধ্য হইয়া লণ্ডনেই ঋণগ্রহণ করিতে হয়। (২) লণ্ডনের পুঁজিওয়ালারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন সদাসর্ব্বদা সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকে। তাহারা মনে করে উপস্থিত যে শাসন-তন্ত্র কায়েম আছে তদ্দ্বারাই মাত্র তাহাদের ভারতবর্ষে নিয়োজিত পুঁজি অটুট থাকিতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষকে তাহাদের কর্জ্জের খাতিরে চিরদিন পরাধীন করিয়া রাখাই ইহাদের উদ্দেশ্য। অধিকন্তু ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের গন্ধ পাইলেই তাহারা নূতন কর্জ্জের উপর অত্যন্ত চড়া হারে সুদ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। (৩) বিলাতে অবসর-প্রাপ্ত ভারতীয় সিভিলিয়ানগণ সর্ব্বদা ভারতের বিরুদ্ধে হীন প্রচার-কার্য্যে লিপ্ত। এই সমস্ত প্রচার কার্য্যের ফলেও ভারতের ক্রেডিট্ নষ্ট হইয়া যায়। (৪) ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড ইণ্ডিয়া অফিসের উপদেষ্টা এবং নিয়ামকরূপে বিরাজমান। ইহার উপদ্রবে ভারতবর্ষ কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ভারতবর্ষ বহুদিন যাবৎ তারস্বরে ইহার প্রতিবাদ জানাইয়া আসিতেছে বটে; কিন্তু কোনই ফল হইতেছে না। (৫) ভারত গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া অফিসের প্রভাবশূন্য হইয়া বা নির্দ্দেশ ব্যতীত যেমন কিছুই করিতে পারেন না, ইণ্ডিয়া অফিসও তেমনি ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের মতের বিরুদ্ধে এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না।

দুনিয়ায় লণ্ডনই একমাত্র পুঁজির কেন্দ্র নহে

ভারতবর্ষকে যদি বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করিতেই হয়, তবে এই কর্জ্জ গ্রহণ সম্পর্কে নীতির পরিবর্ত্তন করিতে হয়। প্রথমতঃ, জাতীয় ঋণের জন্য একটা কাউন্সিল গঠন করিতে হইবে। সকল প্রকার ঋণ, বিশেষতঃ বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের

সময় এই কাউন্সিলের নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতে হইবে। এই কাউন্সিলটী সকল সময়েই দেশের ক্রেডিট অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট রহিবে। দ্বিতীয়তঃ, ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে ভারত-বর্ষের পক্ষে মাত্র লণ্ডনের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার রেওয়াজ পরিহার করিতে হইবে। অতঃপর কর্জ্জ গ্রহণের সময় ভারতবর্ষকে ডলার-লোন গ্রহণের জন্য নিউইয়র্কের সহিত এবং ফ্রাঁ-লোন গ্রহণের জন্য প্যারির সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে হইবে। ফ্রান্স আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। অতীতে প্যারির আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার পক্ষে অনেক বাধাবিঘ্ন ছিল। বর্ত্তমানে ফ্রান্স গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে ফ্রান্সে বিপুল নয়া পুঁজির সংস্থান আছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের মাত্র একজন উত্তমর্ণ আছেন, আর এই উত্তমর্ণ তেমন বন্ধুভাবাপন্ন নহেন। সুতরাং এই উত্তমর্ণের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া নিউইয়র্কের এবং প্যারির পুঁজির বাজারে কর্জ্জ সংগ্রহের চেষ্টা করা ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনকই হইবে বলিয়া মনে হয়।

বিচিত্র ভবিষ্যতের অধিকারী ভারত

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, গভর্ণমেণ্ট, ব্যবসায়ী, রাজ-নীতিবিদ্ সকলেরই মাথা এক সঙ্গে মিলাইয়া জাতির অর্থ-নৈতিক বনিয়াদ যাহাতে দৃঢ় হয় এমন ব্যবস্থা করা আবশ্যক। লক্ষ্য রাখিতে হইবে ভারতবর্ষের যাহাতে সর্ব্বা-ঙ্গীণ মঙ্গল সাধিত হয়, ভারতের উৎপাদন-ক্ষমতা যাহাতে বাড়ে, এবং নয়া পুঁজির সংস্থান যাহাতে দেশের মধ্যেই মিলিয়া যায়। ভারতবর্ষের অবস্থা প্রকৃত পক্ষে মার্কিণেরই অনুরূপ। ভারতে কাঁচা মাল অপর্য্যাপ্ত। এদেশেও মজুরির হার সস্তা এবং মজুরও মিলে যথেষ্ট পরিমাণে। শিক্ষা দিলে ভারতের মজুর কার্য্যদক্ষতায় যে কোন দেশের মজুরের সম-কক্ষ হইতে পারে। এদেশে জমি আছে প্রচুর; ঘরবাড়ী নির্ম্মাণের মাল মশলারও অভাব নাই। ধন উৎপাদনের উপকরণ যথেষ্ট রহিয়াছে। পুঁজিরও অভাব নাই। যদি সমস্ত জমাট বাঁধা, বাক্সে বন্ধ করা এবং অন্যান্য প্রকারে অচলীকৃত পুঁজি বাহির করা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষে প্রচুর কলকারখানা কায়েম করা যাইতে পারে। বিক্রয়ের জন্যও ভারতকে ভাবিতে হইবে না। কারণ দুনিয়ার এক-পঞ্চমাংস অধিবাসী ভারত ভূমির বাসিন্দা। সুতরাং ভারতের সম্মুখে এক বিচিত্র ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ভারতের এতগুলি সুবিধা থাকিতে, ভারতে নূতন শিল্পযুগের সূচনা হইতে বাধা কি? দেখিতে গেলে আমেরিকা ছাড়া এত সম্পদের মালিক আর কোন দেশই নয়। ভারতের জনসাধারণ এবং রাষ্ট্র যদি এক যোগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যে এমন অবস্থা আসিতে পারে যখন এই বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ এবং তৎসম্পর্কে আলোচনা নিতান্ত অবান্তর বিষয় হইয়া পড়িবে। মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে মার্কিণ অধমর্ণ দেশ হইতে উত্তমর্ণ দেশে পরিণত হইয়াছে। সুবিধা পাইলে ভারতবর্ষও তাহার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ তো করিতে পারিবেই, সঙ্গে সঙ্গে নূতন পুঁজিরও সংস্থান করিতে পারিবে এবং আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে সমর্থ হইবে।

সৎসঙ্গ (পাবনা)

দেশের যতপ্রকার আর্থিক সমস্যা হইতে পারে সে সকলের একযোগে শ্রেষ্ঠ উপায়ে সমাধান করার উদ্দেশ্যে সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠা। এ পর্য্যন্ত যতস্থানে যতপ্রকারে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে, তাহা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে নাই। কারণ যে কোন একটী সমস্যা যে কোন অন্য একটী সমস্যার সহিত অতি নিগূঢ়ভাবে সম্বদ্ধ—যে কোন একটী যে কোন অন্য একটীর নিরপেক্ষ নহে। বিশেষতঃ আর্থিক সমস্যা এফিসেন্সি নামক জিনিষটীর উপর অত্যন্ত বেশী নির্ভর করে। কিন্তু এই এফিসেন্সি জিনিষটী যদিও কোন মানদণ্ডে মাপা যায় না, তথাপি ইহা যে সকল তথ্যের উপর নির্ভর করে সেগুলিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—আধ্যাত্মিক, মানসিক ও দৈহিক। সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠান এই আধ্যাত্মিক এফিসেন্সিও মানসিক এবং দৈহিক এফিসেন্সির মত অত্যাবশ্যক বলিয়া

মনে করে ও সেইজন্য এই তিনেরই যাহাতে উন্নতি হইয়া অর্থ সমস্তার পূর্ণাঙ্গ সমাধান করা সম্ভবপর হয় তাহারই চেষ্টা করিতেছে। দারিদ্র্যকে তাড়াইবার জন্য সৎসঙ্গ যে সকল আয়োজন করিয়াছে ও শীঘ্রই করিতেছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

১। সৎসঙ্গ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।—যে সকল অর্থ-নৈতিক কর্ম্ম সৎসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছে বা করিবে তাহার আর্থিক সংস্থানের জন্য গোড়ায়ই এই ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক অত্যন্ত কম সুদে দরিদ্র কৃষক ও গ্রাম্য শিল্পীদিগকে এবং সৎসঙ্গের বিভিন্ন বিভাগকে টাকা ধার দিয়া তাহাদের কার্য্যের সাহায্য করিতেছে।

২। সৎসঙ্গ রিনোভেশন ফাণ্ড।—এই ফাণ্ডে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, সকলেই মাসিক আয় হইতে যৎ-সামান্য মাত্র অর্থ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত উদ্বৃত্ত করিয়া একটা স্থায়ী আয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারে। ইহাতে যাহাদের আয় অতি সামান্য তাহারা সঞ্চয় ত শিখিবেই পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে কো-অপারেটিভ সোসাইটী, ইনসিওরেন্স অথবা অ্যানুইটি ইহার যে কোনটী হইতে অধিক লাভবান হইবে।

৩। তপোবন আদর্শ বালকবালিকা ও মহিলাবিদ্যালয় এবং কলেজ।—আদর্শ শিক্ষা দ্বারা আদর্শ মানুষ গঠন করা তপোবনের উদ্দেশ্য।

৪। সৎসঙ্গ বিশ্ববিজ্ঞান-কেন্দ্র।—দেশের অর্থবৃদ্ধি করিতে হইলে নিত্য নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োজন। তাহারই জন্য বিশ্ববিজ্ঞান-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা।

৫। সৎসঙ্গ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্।—দেশীয় বনজাত উদ্ভিদ্ হইতে নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কার করা হইয়াছে এবং বাজারে বিক্রী হইতেছে।

৬। সৎসঙ্গ মেক্যানিক্যাল ও ইলেট্রিক্যাল ওয়ার্কসপ। —নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা নির্ম্মাণ, নলকূপ খনন, ষ্ট্রাকচারাল ওয়ার্ক ও ইলেকট্রিক্যাল ইন্‌ষ্টলেসন ইত্যাদি সস্তায় নানারূপ ইঞ্জিনিয়ারিং কনট্রাক্ট গ্রহণ করা এবং সর্ব্বোপরি নানারূপ নূতন নূতন শিল্পাদি দ্বারা দেশকে ছাইয়া ফেলা এই বিভাগের উদ্দেশ্য।

৭। সৎসঙ্গ ক্ষীরোদা স্মৃতি প্রেস।—সৎসঙ্গের মুখপত্র, পাক্ষিক পত্রিকা সৎসঙ্গী প্রকাশিত হইতেছে এবং কয়েক খানি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। সৎসঙ্গ কলাকুটীর।—আদর্শ কলাবিদ্যার প্রসা সাধন দ্বারা মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তিসাধন করা ও আর্থিক সচ্ছলত বৃদ্ধি করা ইহার উদ্দেশ্য।

৯। সৎসঙ্গ মহিলা সমিতি।—নারীজাতিকে বিবি কুটীর শিল্পের সাহায্যে স্বাবলম্বী ও নানারূপে শিক্ষিত করিয় তোলাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য।

১০। সৎসঙ্গ সমাজ-সংস্কার বিভাগ।—বিবাহ পদ্ধতি আমূল সংস্কার সাধন ইহার উদ্দেশ্য।

১১। আধ্যাত্মিক বিভাগ।—দৃঢ় ইচ্ছা ও মানসি শক্তিসম্পন্ন মানুষ নির্ম্মাণই ইহার উদ্দেশ্য।

এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্যবিভাগ, ধাত্রীবিদ্যালয় ইত্যাদি আর নানাবিধ বিভাগ আছে।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (সৎসঙ্গ)

শ্রীনিকেতনে কৃষি

আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন আকারে বেকার-সমস্যা শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় এ বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন এবং যাহাতে ভদ্র বেকার যুবকগণ হাতেকলমে কৃষিকার্য্য শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বীরভূম জিলার সুরুল অঞ্চলে একটি আদর্শ কৃষিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

কেবল জমি চাষ করিয়া কি করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা যায় ইহাই শ্রীনিকেতনে একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয় নহে। শ্রীনিকেতন হইতে এরূপ শিক্ষারই চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে সমাজের মধ্যে গ্রামের কৃষিজীবন ঠিক প্রকৃত স্থলে বিরাজিত হইতে পারে, যাহাতে বাস্তব জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য আসে। শ্রীনিকেতন কৃষিফার্ম্ম দ্বারা গ্রামবাসীকে শিখান হইতেছে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিলে কিরূপে শস্যের প্রসার হইতে পারে, সার প্রয়োগ হিসাব মত করিতে পারিলে কিরূপে ক্ষেত্রে সুফল

ফলে, পালা করিয়া চাষ করিলে ফসলের কিরূপ খাদ্য বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়ে নূতন প্রেরণা দেওয়া হইতেছে। কেবল তাঁহাই নহে যাহাতে ভাল বীজের প্রচার গ্রামের মধ্যে হয় সেজন্য বীজ বিতরণ কার্য্যও চলিতেছে। কৃষি-কার্য্যের সহিত গোপালনের বিশেষ যোগ রহিয়াছে। সে বিষয়েও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে ভাল গোবংশের বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য প্রজনন কার্য্যের জন্য ভাল ষাঁড়ের ব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে গোজাতির উপযোগী ভাল খাদ্য যাহাতে সহজলভ্য হয় তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হাঁস মুরগীর পালনকার্য্যে আমাদের বেকার মধ্যবিত্ত লোকের অনেক সমস্যা মিটিতে পারে, সেই আশায় ইঁহারা হাতে কলমে উক্ত বিষয় শিখাইবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। পল্লীর কৃষির সহিত কুটীর শিল্পের, বিশেষতঃ বয়নশিল্পের বেশ যোগ আছে। যাহাতে গ্রামে গ্রামে লুপ্তপ্রায় রেশম শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় তাহার জন্য রেশম চাষের ও নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য আদর্শ ফার্ম্ম ইঁহারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যা শিখিবার জন্য অনেক আবেদনকারীর দরখাস্ত আসিয়া পড়িয়াছে। বীরভূম জিলাতে এখনও অনেক তাঁতীর বাস। কিন্তু তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। যাহাতে তাঁতীকুলের আবার সুদিন আসে সেই আশায় ইঁহারা এই জিলাতে আঠারটি কেন্দ্র ও জিলার বাহিরে পাঁচটি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সবগুলির দেখাশুনার ভার সম্পূর্ণভাবে ইহারা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা বিশেষ আশার কথা সন্দেহ নাই। চর্ম্মকার বা মুচীদের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে ভাল করিয়া চর্ম্ম শোধন ও নির্ম্মাণ হইতে পারে তাহার জন্য একটি ট্যানারী স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে চর্ম্মশোধন, নির্ম্মাণ, জুতা তৈয়ারী সব সাধ্যমত শিখান হইতেছে। যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্য্যকরী শিক্ষার সহিত বিস্তার লাভ করে তাহার জন্য শিক্ষাসত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শিশুগণকে বাল্যকাল হইতে এমন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যাহাতে শিক্ষা ও আনন্দ উভয়েরই প্রসার হয়। তাহাদের ছেলে বেলা হইতে বাগানের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যাহাতে প্রকৃতি হইতে ও গ্রামের পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে শিশুগণ শিক্ষালাভ করে তাহার সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে স্বাভাবিক বুদ্ধির স্ফুরণ হইয়া থাকে। বালকদিগকে লেখাপড়া, অঙ্ক, সেলাই প্রভৃতির সহিত রন্ধন ও উদ্যান রচনা শিক্ষা সমভাবেই দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে কি খেলাতে, কি গানে কি অপরাপর কার্য্যে সর্ব্বত্রই ভিতরকার প্রাণের প্রেরণা যাহাতে প্রকাশ পায় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করা হইয়া থাকে। পল্লীসংস্কারের সব রকম প্রণালীর সহিত আবার পরস্পর মিলন সূত্র গ্রথিত আছে। গ্রাম্য জরীপ, সমবায় সমিতিগুলি, সমবায় প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য ব্যাঙ্ক, সমবায় ভাণ্ডার, সেচকার্য্যের জন্য স্থাপিত সমিতি প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানগুলিই পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে ও প্রত্যেকে পরস্পরের সহিত কার্য্যের ও চিন্তার আদানপ্রদান করিতেছে। বালক বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয়, সমাজ হিতসাধনব্রতীদিগের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, ব্রতী দল গঠন, লাইব্রেরীর সাহায্যে গ্রামে গ্রামে শিক্ষাপ্রচার, ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতার ব্যবস্থা গ্রামে গ্রামে সুব্যবস্থার প্রচেষ্টা, ম্যালেরিয়া দমনের সমিতি স্থাপন, গ্রামে ধাত্রী বিদ্যাশিক্ষার্থ সুব্যবস্থা করণ, দুর্ভিক্ষ নিবারণ প্রভৃতি যাবতীয় গঠনমূলক কার্য্যের পত্তন ও প্রসার উক্ত বিশ্বভারতী হইতে হইতেছে।

(কৃষক)

পাট-শিল্পের দুর্দ্দিন

কলিকাতায় গানি ট্রেড্ অ্যাসোসিয়েশান ইণ্ডিয়ান জুটমিলস্ অ্যাসোসিয়েশানকে সম্প্রতি যে চিঠি দিয়াছেন তার মর্ম্ম এইরূপ :—

"পাটের দর ক্রমাগতই কম্‌ছে। পাটের বিক্রী কম, সেইজন্যে আমাদের কাছে অনেক মাল জমে গেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে যথেষ্ট লোকসান দিয়েছে। আপনারা উৎপাদন কমাবার জন্য হপ্তায় ৬০ ঘণ্টার জায়গায় ৫৪ ঘণ্টা মিল চালাবার বন্দোবস্ত করলেন। জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর—এই তিন মাস, মাসে এক হপ্তা ক'রে উৎপাদন বন্ধ করবার বন্দোবস্ত করলেন,—কিন্তু তা সত্বেও পাটের দর বাড়ছে না। বিক্রীও ত নেই। এই বেলা

উৎপাদন আরও কমিয়ে বাজারটাকে চাঙ্গা করা দরকার। তা না হলে পাট-শিল্প ও ব্যবসার ভীষণ সর্ব্বনাশ হবে। আর একটা কথা, উৎপাদন কমাবার জন্তে যে পন্থা নেওয়া হয় তা বেশীদিন স্থায়ী হওয়া দরকার ও একেবারে ভেবে-চিন্তে অবলম্বন করা উচিত। অবস্থার উন্নতির জন্তে ছোটখাট উপায় একটু একটু ক'রে অবলম্বন ক'রে তার ফল দেখবার অপেক্ষা করলে দারুণ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া হবে। যখন ৫৪ ঘণ্টার নিয়ম করা হ'ল তখনই তিন মাসের প্রত্যেক মাসে ১ হপ্তা ক'রে কাজ বন্ধ করবার বন্দোবস্ত করলে অবস্থা এত খারাপ হতো না, দরের যেটুকু বৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল তা আরও কমে যেত না। খুচরা খুচরা বন্দোবস্ত করলে ক্রেতারা কিন্‌তে যায় না—ভাবে দর আরও কম্‌বে। আমাদের মত ব্যবসায়ীদেরও অসুবিধে, কারণ দর এক একবার ওঠবার মত হ'য়ে আবার আরও বেশী নেমে যায়।

দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাঁটা

বিলাতের লেবার গবর্ণমেণ্টকে অনেক সমালোচনা সইতে হচ্ছে এই কারণে যে, তাঁরা বেকার সমস্যার কোন উপায় করতে ত' পারছেনই না, বরং তাঁদের সময়ে বেকারের সংখ্যা হু হু ক'রে বেড়ে গেছে। আত্মসমর্থনের জন্য লেবার গবর্ণমেণ্ট বল্‌ছেন যে, এর জন্য দায়ী গবর্ণমেণ্ট নন্‌, এর জন্য দায়ী পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে, এই কারণে বিলাতেও দেখা দিয়েছে। এরকম জগদ্ব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেবার কারণ কি? জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে বিলাতের ইলেক্‌ট্রিকাল অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশান' একটা রিপোর্ট বের করেছেন। তাঁদের মত এই যে, জিনিষপত্রের দাম কম্‌তি হওয়ার জন্তেই এই মন্দার সৃষ্টি হয়েছে। আর, জিনিষ-পত্রের দাম কম্‌বার কারণ—ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১৯২৯ সনের জানুয়ারী হতে যত সোনা উৎপন্ন হয়েছে তার অধিকাংশই নিজ নিজ দেশে টেনে নিয়েছে, এই জন্তে অন্যান্য দেশের কেনাবেচার জন্তে যত মুদ্‌'-সৃষ্টির দরকার তা হ'য়ে উঠ্‌ছেনা।

এই মতামতের মধ্যে কিছু সত্য থাকতে পারে। কিন্তু এটা একেবারে অভ্রান্ত মনে করা চলে না। যুক্তরাষ্ট্র সোনা টান্‌ছে বেশী, অথচ সেখানে ৫০।৬০ লাখ বেকার কেন? বিলাত তত বেশী সোনা টান্‌তে পারে নি, অথচ বিলাতের বিজলী-শিল্প সমৃদ্ধি-সম্পন্ন কেন? উপরি উক্ত মত মেনে নিলে এ দুটা প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত হয়।

বিলাতের সংরক্ষণ বনাম অবাধবাণিজ্য মামলা

বিলাতের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিভিন্ন দল কি রকম চেষ্টা করছে তা ভেবে দেখবার জিনিস। দিন কয়েক আগে বিলাতের মজুর সঙ্ঘগুলার কংগ্রেসের 'কর্ম্মসভা' (কাউন্সিল) প্রকাশ করেন যে, তাঁরা সাম্রাজ্যের ভেতর অবাধ "বাণিজ্যনীতির পক্ষপাতী। অর্থাৎ তাঁরা চান যে, সাম্রাজ্যের নানা দেশ ও রাজ্যের মধ্যে বিনা মাশুলে পণ্য দ্রব্যের আদানপ্রদান চলুক, কিন্তু সাম্রাজ্যের ভেতর থেকে বাইরে বা বাইরে থেকে ভেতরে মাল ঢুক্‌তে গেলে চড়া হারে মাশুল দিয়ে ঢুক্‌তে হবে। তাঁদের মত এই যে, এই পন্থা অবলম্বন না ক'রলে বিলাতের শিল্পগুলা উন্নত হবে না, সেগুলার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কোন প্রতীকার হবে না। বিলাতের জনকয়েক ব্যাঙ্কার দিনকয়েক আগে একটা ইস্তাহার জারি করেন। তাতে তাঁরা বলেন যে, সাধারণতঃ তাঁরা সম্পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য-নীতির পক্ষপাতী হলেও, বিলাতের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা এমন যে, এখন অবাধ বাণিজ্যনীতি কেবল সাম্রাজ্যের মধ্যে চালিয়ে বাইরের প্রতিযোগীদের হাত থেকে সাম্রাজ্যের শিল্পগুলাকে রক্ষা করলে বিলাতের ও সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা ভাল হ'তে পারে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, বিলাতের মজুররা ও অনেক ব্যাঙ্কারাও একই পথের পথিক। বিলাতের বিখ্যাত শিল্পপতি লর্ড মেলবেটও এই দলে।

শুধু তাই নয়, বিলাতের রক্ষণশীল দলের মধ্যেও একটা নূতন দল দেখা দিয়েছে, তার নাম হচ্ছে 'এম্পায়ার ফ্রি পার্টি।' লর্ড বিভারব্রুক এই দলের নেতা। এই দলও

চান যে সাম্রাজ্যের সীমানার ভেতর অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসৃত হোক্।

রক্ষণশীল দলের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত ষ্ট্যান্‌লি বল্ডুইন কিন্তু ঐ পন্থা অবলম্বন করতে চান না। তিনি বলেন, বিলাতের যে শিল্পগুলাকে বেশী প্রতিযোগিতার সঙ্গে যুঝ্‌তে হচ্ছে, সংরক্ষণশুল্ক বাড়িয়ে তাদের বাঁচাতে রাজী আছি, সাম্রাজ্যের ভেতর মাল আদান প্রদানের জন্যে শুল্কের হার কমাতেও রাজী আছি, কিন্তু সাম্রাজ্যের মধ্যে একেবারে অবাধ বাণিজ্যনীতি চালাতে মোটেই রাজী নই।

স্যার্ যোশিয়া ষ্ট্যাম্প ও শ্রীযুক্ত ফিলিপ স্নোডনও ঐ নীতির বিরোধী। স্যার্ যোশিয়া বলেন যে, বিলাতের সঙ্গে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান কমে নি। তা ছাড়া, সাম্রাজ্যের দেশগুলার বাণিজ্যের সাহায্য করতে হবে মানে এই নয় যে, ইয়োরোপের দেশগুলা থেকে আমদানির পথ বন্ধ করতে হবে। এটাও দেখা দরকার যে, ইয়োরোপের মাল আসার পথ বন্ধ করলে ইয়োরোপের দেশগুলাও শুল্কহার বাড়িয়ে বিলাতী মাল রপ্তানির পথে বাধা দিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারে।

সাম্রাজ্যের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে আরও একটা প্রধান কথা আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, ডোমিনিয়নগুলা এমন কি ভারতবর্ষও, শুল্কের প্রাচীর তুলে স্ব স্ব শিল্পের উন্নতি করতে সচেষ্ট। এরা বিলাতের শিল্পগুলার খাতিরে হয়তো ব্যাঙ্কের হার কিছু কমাতে পারে। কিন্তু তাই ব'লে যে এরা সাম্রাজ্যের মধ্যে মাল আদান প্রদানে বাধা দেবার জন্যে মোতায়েন শুল্কপ্রাচীর একেবারে ভেঙ্গে দিতে চাইবে, তা মনে হয় না।

চাষবাসের উন্নতিতে বিলাতী গবর্ণমেণ্ট

বিলাতে কৃষির অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। গত কয়েক বছরের মধ্যে ১ লাখ লোক চাষবাসের কাজ ছেড়ে দিয়েছে, ১০ লাখ একর জমি চাষের কাজ হতে ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য কাজে লাগানো হয়েছে।

বিলাতের গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মনোভাব যেন এই যে, বিলাতে কৃষির উন্নতি না হবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। বিলাতের মত কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার পৃথিবীতে আর কটা আছে? তা ছাড়া খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের যোগ্য যথেষ্ট জমিও বিলাতে আছে। তবে, বিলাতে চাষের উন্নতি কেন হবে না?

চাষের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট এখন কি কি পন্থা অবলম্বন করছেন তার কিছু আভাস দেওয়া যাচ্ছে:—

(১) বিলাতে চাষের কাজে লাগবার জন্য উন্মুখ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। গবর্ণমেণ্ট তাদের ভরণ পোষণের উপযোগী ছোট ছোট জমি জোগাড় ক'রে দিতে চেষ্টা করছেন। জমিদারেরা যদি সহজে জমি দিতে না চান তার জন্য বাধ্যতামূলক আইন তৈরীর চেষ্টাও হচ্ছে।

(২) মুর্গী, শূকর, হাঁস ইত্যাদি পালন ও শাকসব্জী তরীতরকারীর উৎপাদন বাড়াবার জন্যও গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করছেন।

(৩) চাষ যাতে আরও "বিস্তৃতরূপে" হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক চাষীর কারবার যাতে আরও "বৃহদাকারে" চলে এবং চাষীরা যাতে এক একটা বিশেষ জিনিষের উৎপাদনে "শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন" করে, সে দিকে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সচেষ্ট। কারণ বৃহদাকার কারবার চালানো আর এক এক জিনিষের চাষে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করাই আধুনিক চাষে লাভবান হবার প্রধান পথ।

(৪) চাষীদের বাসস্থানের উন্নতি-সাধনও গবর্ণমেণ্টের অন্যতম লক্ষ্য।

(৫) কৃষি-গবেষণার প্রয়োজনীয়তা গবর্ণমেণ্টের নজর এড়ায়নি।

(৬) চাষের মাল বাজারে ফেলবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এক একটা স্থানীয় বিভাগে চাষীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত এক একটা বোর্ড স্থাপিত করাতে চান এবং তার জন্য প্রস্তাবিত আইনও পার্ল্যামেণ্টে পেশ করা হয়েছে। কি দরে কি পরিমাণে বাজারে মাল ফেলা হবে তা এই সব বোর্ড ঠিক করে দেবে। এই সব বোর্ড যাতে খাদকদের ওপর অত্যাচার না করে তার জন্য খাদকদের কমিটি তৈরী হবে। খাদক কমিটির সঙ্গে কোন বোর্ডের সঙ্ঘর্ষ বাধলে তার মীমাংসার ভার একটা অনুসন্ধান সমিতির

হাতে দেওয়া হবে। তা ছাড়া বোর্ড যে সব কার্য্য-প্রণালী স্থির করবেন তা পার্ল্যামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই।

জাপানের লোক-সমস্যা

জাপানের লোকসমস্যা এখন বেশ গুরুতর। জাপানের বিস্তার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্‌সাস নামে একটী প্রদেশের চেয়ে বেশী নয়। অথচ জাপানকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্দ্ধেক লোকবল পুষতে হয়। প্রতি বছরে জাপানে ১০ লাখ লোকের বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ ১০টী লাখ লোকের খাওয়া পরা থাকার বন্দোবস্ত করার দরকার হয়। ইতিমধ্যেই জাপানে ১৫ লাখ লোক বেকার বসে আছে। এখন জাপান এত লোকের খাওয়া পরার বন্দোবস্ত কি করে করবে এই হল সমস্যা।

একটী উপায় ছিল কতক লোক বিদেশে চালান দেওয়া। দক্ষিণ আমেরিকায় ও প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটী দ্বীপে এই লোক চালানি কাজ চলছেও। কিন্তু চালানের পরিমাণ একটু বাড়লেই যাদের দেশে পাঠানো হচ্ছে তারা তা বন্ধ করে দেবে। তা ছাড়া বাইরে জাপানীদের পাঠালেই ত হল না, তাদের অর্থ-সাহায্যও করা দরকার। সেও বড় সোজা ব্যাপার নয়। মাঞ্চুরিয়াতে চালান দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেখানে চীনাদের সঙ্গে ভীষণ প্রতিযোগিতা চলছে। চীনাদের পীত নদী বড় খাম খেয়ালী—নদীর উপকূলে দেশগুলায় কোন বছরে অজন্মা, কোন বছরে নদী বাড়ার জন্য ভীষণ জলপ্লাবন। এই উপদ্রব সহ্য করতে না পেরে পীত নদীর ধারের চীনারা দলে দলে মাঞ্চুরিয়াতে ঢুকেছে। চীনাদের খাওয়া পরার খরচা খুব সামান্য—জাপানীদের খরচার দশভাগের একভাগ মাত্র, এই জন্য চীনাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জাপানীরা মাঞ্চুরিয়াতে কাজ জোটাতে পারে না। আর একটা দেশ আছে সাইবীরিয়া। সাইবীরিয়াতে জাপানীদের পাঠানো যদি রুশ গবর্ণমেণ্টের অনভিপ্রেত নাও হয়, তবু জাপান গবর্ণমেণ্ট তাতে সহজে মত দেবেন না; কারণ তা হলে জাপানীরা বলশেভিক তত্ত্ব আয়ত্ত করে ফেলবে এই ভয় আছে।

কাজেই জাপানীদের বাইরে যাবার জায়গা নেই। কিন্তু তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই। জাপানে শিল্পের উন্নতি হয়েছে বটে কিন্তু আরও হওয়া দরকার। বিজলীর ব্যবহার বাড়ানো দরকার। শিল্পগুলাকে আরও কেন্দ্রীভূত করা দরকার। আরও শিল্পোন্নতি হলে জাপানীরা দেশের মধ্যেই যথেষ্ট কাজ পাবে, তখন খেতে না পাওয়ার জন্যে বিদেশে আর ছুটতে হবে না। জাতির জনবলই জাতির প্রধান সম্পদ্। তখন এই জনবলকে দেশের বাইরে পাঠানো মূর্খামি বলেই বিবেচিত হবে।

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত
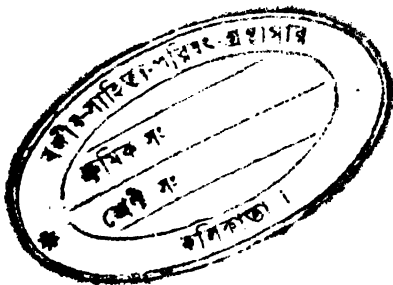
উইণ্ড মিল প্ল্যাণ্ট

[জনৈক ভদ্রলোক কলিকাতায় উইণ্ড মিল প্ল্যাণ্ট (বায়ু-চালিত কল) বসাইতে চান। ইনি মৈমনসিংহে থাকেন। ইঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তার মর্ম্ম নীচে দেওয়া গেল।—শ্রীসুধাকান্ত দে]

প্রঃ—আপনি কলিকাতায় আসিয়াছেন কি উদ্দেশ্যে ?

উঃ—উদ্দেশ্য এখানে উইণ্ড মিল প্ল্যাণ্ট চালানো যায় কি না দেখা। দেখুন, আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত এই জিনিষটা লইয়া পরীক্ষা পর্য্যন্ত হয় নাই। কোন বড়লোক যদি পরীক্ষার মানসে শুধু এইটা কিনিয়া একবার ইহার ফলাফল নিজ চোখে দেখেন ও আর দশজনকে দেখান তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, জার্ম্মেণীর মত আমাদের দেশেও ইহার বহুল প্রচলন হইবে।

প্রঃ—জার্ম্মেণীতে ইহার কি খুব চল ?

উঃ—খুব চল। ট্রেণে যাইতে আমি বহু স্থানে দেখিয়াছি এই কল রহিয়াছে।

প্রঃ—আমার ত ধারণা ছিল যে ক্রুড অয়েল ইঞ্জিন জার্ম্মেণী ও অন্য সকল সভ্যদেশে প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

উঃ—অয়েল ইঞ্জিন অবশ্য সকল রকম কাজের পক্ষেই উপযোগী। কিন্তু যেখানে অয়েল ইঞ্জিন না হইলেও চলে সেখানে এই কল ব্যবহার করাই লাভজনক। বস্তুতঃ হইতেছেও তাহাই। জার্ম্মেণীতে ইহা অনেক স্থানে অয়েল ইঞ্জিনকে স্থানচ্যুত করিয়াছে।

প্রঃ—উইণ্ড মিল তা হলে সব স্থলে অয়েল ইঞ্জিনকে হটাইতে পারে না।

উঃ—না, তা পারে না। নামেই প্রকাশ যে বাতাস ছাড়া এই মিল চলিতে পারে না। এখন, বাতাসের গতিবিধি ও পরিমাণ সর্ব্বদাই অনির্দ্দিষ্ট। যেখানে কাজের ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে ও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করিয়া দিতে বাধ্য সেখানে উইণ্ড মিল কোন কাজে আসিবে না।

প্রঃ—উইণ্ড মিল কি সব সময়ে চলে না ?

উঃ—না, বাতাসের উপর নির্ভর করিতে হয়।

প্রঃ—তবে ত বড়ই অসুবিধা। সব রকম বাতাসে মিল চালানো যায় কি ?

উঃ—একেবারে বাতাস না থাকিলে মিল চলিবে না। আবার খুব বেশী বাতাস থাকিলেও মিল চলিবে না। এই দুই সময় বাদে অন্য সকল সময়ে মিল চলিবে।

প্রঃ—বেশী বাতাস, অল্প বাতাস বলিতে কি বুঝেন ?

উঃ—ঘণ্টায় ৬০ মাইল যে বাতাসের বেগ, সে ত ঝড়। সেই ঝড়ে মিল চালানো অসম্ভব। সাধারণতঃ বাতাসের বেগ ২৫ মাইলের বেশী হইলে মিল চলে না। ঘণ্টায় ৫ মাইল হইতে ২৫ মাইলের ভিতর বেগ থাকিলেই কলের পক্ষে যথেষ্ট।

প্রঃ—বাতাসের জন্য যদি এতখানি চাহিয়া থাকিতে হয়, তবে আর লোকে আপনার এই কল কেন কিনিতে চাহিবে ? আপনার এই কলের জন্য দেখিতেছি সর্ব্বদা আলিপুরের মিটিওরলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

উঃ—তা' কেন? একেবারে বাতাস না থাকার অবস্থা আমাদের খুব কম হয়। বাহিরে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দেখুন যথেষ্ট বাতাস বহিতেছে। বাতাসের ১০।১২ মাইল বেগ সাধারণ ঘটনা। আর বর্ষা কাল ব্যতীত ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ সর্ব্বদাই কিছু দেখা যায় না। সুতরাং বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে এমন অনেক দিন পাওয়া যায় যখন কল বেশ রীতিমত চলিবে। সাধারণ কলগুলি যত ঘণ্টা চলে তার চেয়ে যে কম ঘণ্টা চলিবে, তার কোন কারণ দেখিতে পাই না।

প্রঃ—কিন্তু ধরুন, কখনো বাতাস ১০ মাইল বেগে চলে, কখনো ২০ মাইল—বেগের তারতম্য ঘণ্টায় ঘণ্টায় হইতে পারে ত? তা হইলে, আগে থেকে কখনই ঠিক করিয়া বলা যায় না যে, সারাদিনে কতখানি কাজ হইবে।

উঃ—তাতেই বা কি আসে যায়? ধরুন আপনি কয়েক মণ গম পিষিয়া লইতে চান। সন্ধ্যা বেলা দেখিলেন বাতাস বহিতেছে। কলে গম দিলেন। ভোর বেলায় উঠিয়া দেখিলেন নীচে রাশীকৃত আটা পড়িয়া রহিয়াছে। সমগ্র রাত্রিতে কখনই যথেষ্ট বাতাস থাকিবে না, এমন হইতে পারে না। বাতাস বেশী বা কম থাক্, আপনার আটা তৈরী হইয়া থাকিবে।

প্রঃ—বুঝিলাম। কিন্তু আমাদের দেশে এই উইণ্ড মিল চালাইবার আপনি এরূপ পক্ষপাতী কেন, বলিবেন কি?

উঃ—উইণ্ড মিল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, সকল প্রকার অবস্থাতে ইহা ব্যবহার করা চলে না। কিন্তু আমাদের দেশের কুটীর শিল্পের পরিপোষকরূপে ইহা চমৎকার কাজ করিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, এই মিলের সাহায্যে নানাপ্রকার ছোট ছোট শিল্প গড়িয়া তোলা যায়, অথচ বৈদ্যুতিক শক্তির অথবা ক্রুড় অয়েল ইঞ্জিনের সাহায্য লইলে খরচা এর চেয়ে বেশী পড়িবে। উইণ্ড মিল সস্তা।

প্রঃ—উইণ্ড মিল সস্তা কেন বলিতেছেন?

উঃ—উইণ্ড মিল সস্তা ত নিশ্চয়ই, তা ছাড়া অন্য কতক-গুলি সুবিধাও আছে। অন্য যে কোন কলই চালাইতে যান তা চালাইবার খরচা আছে—তেল বা বিদ্যুতের জন্য পয়সা খরচ করিতে হইবে। কিন্তু বাতাস কিনিবার কথা আপনাকে ভাবিতে হইবে না। বাতাস ঈশ্বর আপনাকে অমনি দিতেছেন। তারপর এই কলে ধোঁয়া নাই, আওয়াজ নাই। এ দুটা বড় কম লাভ নয়।

প্রঃ—ধোঁয়া ও আওয়াজের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কল চালাইবার খরচও লাগে না বটে, কিন্তু তাতে কি খরচা খুব বেশী কমিয়া যায়?

উঃ—বেশীকমের কথা ছাড়িয়া দিন। খরচার যদি অল্প লাঘবও হয়, সেটা কি ব্যবসায়ীর পক্ষে কম কথা? আরও একটা কথা মনে রাখিবেন। অল্প করিয়া খরচ সংক্ষেপ হইলে প্রতিদিনের সঞ্চয়টা যোগ দিলে বৎসরে তা অনেক হইয়া দাঁড়ায়। উইণ্ড মিলের এটা যে একটা মস্ত সুবিধা তা স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রঃ—কিন্তু অনিয়মিতভাবে কল চলা?

উঃ—হাঁ, সেটা একটা অসুবিধা বটে। কিন্তু তার আর কোন উপায় নাই। আপনাকে যখন বাতাসের উপর নির্ভর করিতে হইবে, তখন এই অসুবিধা ভোগ করিয়া যে সব শিল্প চালানো সম্ভব সেই সব শিল্পই চালাইতে হইবে।

প্রঃ—আপনি দয়া করিয়া এরূপ কয়েকটি শিল্পের নাম করুন।

উঃ—ময়দা বা আটা তৈরী, প্রিণ্টিং প্রেস, হোসিয়ারি মিল, স'মিল ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, চাল, ময়দা, আটা, গেঞ্জি ইত্যাদি তৈরীর পক্ষেই ইহার উপযোগিতা সব চেয়ে বেশী।

প্রঃ—উইণ্ড মিল প্ল্যাণ্টের দাম ও খাড়া করা বাবদ্ খরচার একটা খস্ড়া জানিতে পারি কি?

উঃ—উইণ্ড মিল প্ল্যান্ট উদ্দেশ্য অনুসারে তিন প্রকারের হইতে পারে :—

(১) ১ সেট প্রাইম্ মুভার (বাতাস অনুসারে ৫ অশ্বশক্তি পর্য্যন্ত) ৫০০৲
তুলিবার খরচ ... ৫০৲

মোট ৫৫০৲

(২) বৈদ্যুতিক সেট ১ কে ডব্লিউ
৩২ ভোল্ট ... ৯৮০৲
১৬ ব্যাটারি ... ২০০৲
তুলিবার খরচ ... ৫০৲

মোট ১২৩০৲

(ইহার মধ্যে ইলেক্‌ট্রিক ডাইনামো, সুইচ্ বোর্ড, অটোমেটিক ডাইনামোর খরচ ধরা হইয়াছে)

(৩) জল পাম্পিং সেট, পাম্পসহ ৬০০৲
তুলিবার খরচ ... ৫০৲

মোট ৬৫০৲

প্রঃ—আপনি কি এই তিন প্রকার প্ল্যান্টই আমাদের দেশে চালাইতে চান ?

উঃ—না, তা চাই না। আমাদের দেশের জলবায়ুর অস্থিরতা ইয়োরোপের চেয়ে বেশী এবং বাতাসের গতিবিধি সম্বন্ধে এখনও আমরা সুনিশ্চিত হই নাই। সেজন্য প্রথম নং উইণ্ড মিল প্ল্যান্ট ব্যবহারের আমি পক্ষপাতী; যদিও কোন কোন স্থানে অন্য প্ল্যান্ট লইয়াও চেষ্টা হইয়াছে। যেমন ধরুন, বোলপুরে বিশ্বভারতীতে। সেখানে জল তুলিবার জন্য এক সেট জলের পাম্পিং প্ল্যান্ট বসানো হইয়াছিল। তা এখনও আছে বোধ হয়।

প্রঃ—কিন্তু আপনি ত মাত্র ৫ অশ্বশক্তির উল্লেখ করিলেন।

উঃ—এটা একটা খস্‌ড়া মাত্র। আপনি ১০, ১৫ বা ততোঽধিক অশ্বশক্তির কলও কিনিতে পারেন। কিন্তু দাম সেই অনুপাতে বেশী পড়িবে।

প্রঃ—আচ্ছা, উইণ্ড মিল প্ল্যান্ট আমাদের দেশে তৈরী করা যায় না ? তৈরী করা বিশেষ শক্ত কি ?

উঃ—মোটেই শক্ত না। জার্ম্মেণীতে থাকা কালে আমার পরিচিত এক কৃষক কাঠ দিয়া প্ল্যান্টের পাখা তৈরী করিয়াছিল। লোহায় তৈরী প্ল্যান্টের চেয়ে তা কোন অংশে খারাপ হয় নাই। আমি মৈমনসিংহে মোটর গাড়ীর টুক্‌রা দিয়া একটি কল নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছি। আশা করি কৃতকার্য্য হইব।

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন, উইণ্ড মিল চালাইলে আমাদের দেশের উপকার হইবে ?

উঃ—তাতে আর সন্দেহ কি ? যাঁর টাকা আছে এমন একটি লোকও যদি আজ অগ্রসর হইয়া কোথাও উইণ্ড মিল প্ল্যান্ট স্থাপন করেন, তবে দশ বৎসরের মধ্যে এই প্ল্যান্ট বহুল আদৃত হইবে এবং কুটীর শিল্পের এক নয়া ধারার প্রবর্ত্তন করিবে। মফঃস্বলে ইহার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। আমি দেশহিতৈষী ব্যক্তি ও ব্যক্তিসঙ্ঘকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে আহ্বান করিতেছি।
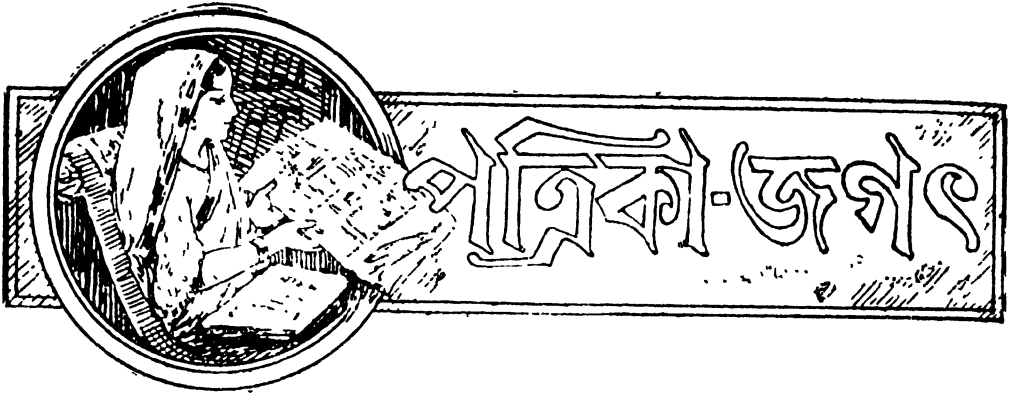
"ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ"

লীগ্ অব্ নেশনসের অন্তর্গত ইণ্টারন্যাশনাল লেবার আফিসের মুখপত্র। মাসিক। যুক্তরাজ্যে জর্জ্জ এলেন অ্যাণ্ড আনউইন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বৎসরে ২৪ শি।

মার্চ্চ ১৯৩০। পৃঃ ৩১৫-৪৭২।

ক। (১) যুক্তরাষ্ট্রে মজুর বিবাদে সালিশীর আদেশ—ডক্টর এডুইন ই হ্বিটে। কোন আদালত যদি ব্যক্তিবিশেষকে অথবা কোন দলকে কোন কাজ করিতে অথবা কোন কাজ হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করে তাকে ইন্‌জাংশন কহে। যুক্তরাষ্ট্রে অনেক প্রকার দলাদলির ঔষধ এই ইন্‌জাংশন। গত ৫০ বৎসর ধরিয়া যুক্তরাষ্ট্রে এই ইন্‌জাংশন মজুর বিবাদ মিটাইতে ক্রমিক বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য মজুরসঙ্ঘ সমূহ ইহা আদালতের পক্ষে অবৈধ ও অতিরিক্ত ক্ষমতা বলিয়া দাবী করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইন্‌জাংশন একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। তবে ইন্‌জাংশন ব্যবহার যাহাতে অন্যায়ভাবে না হয় সে বিষয়ে আজও চেষ্টা চলিতেছে।

(২) যুক্তরাজ্যে মনিবদের বেকার পোষণের অতিরিক্ত ব্যবস্থা—নিউ-ইয়র্কের ইনডাষ্ট্রিয়েল রিলেশনস্ কাউন্সিলার মেরি বি নেলসন ও আন্তর্জ্জাতিক মজুর আফিসের গবেষণা বিভাগস্থ ই জে রিচেস। বেকার বীমায় গ্রেট বৃটেনের অধিকাংশ শ্রমিক উপকৃত হইতেছে। কিন্তু কতকগুলি কারখানা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় সাহায্য শ্রমিকদের পক্ষে যথেষ্ট নহে, অতএব কারবার ও মজুরদের উন্নতির জন্য আরও সাহায্য দরকার। একটি বিষয় দ্রষ্টব্য এই যে, বর্ত্তমান সাহায্য-ব্যবস্থায় উপযুক্ত লোকেরা বেশী সাহায্য পায়, অনুপযুক্ত লোকেরা পায় না।

প্রবন্ধ এই দুইটি মাত্র। এই দুই প্রবন্ধে ৮০ পৃঃ গিয়াছে। ইহার পর রিপোর্ট ও তদন্ত।

খ। (১) পারিবারিক ভাতার প্রথা: আধুনিক গতি ও উন্নতি। ২২ পৃষ্ঠা জুড়িয়া ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্ম্মেণী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোহ্বাকিয়া প্রভৃতি ইয়োরোপীয় দেশসমূহ ও অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউ-জীল্যাণ্ডের পারিবারিক ভাতা প্রণালী পরীক্ষিত হইয়াছে।

(২) ভারতের কৃষি ও গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান।

(৩) মালয় দেশে মজুরের অবস্থা ও মজুর কি প্রকারে সংগ্রহ করা হয়?

গ। তথ্যতালিকা সংগ্রহ।

(১) কর্ম্মপ্রাপ্তি ও বেকার।

(২) জীবন ধারণ খরচা ও খুচরা দরের সূচী সংখ্যা।

(ঘ) গ্রন্থপঞ্জী।

(১) আন্তর্জ্জাতিক ও বিভিন্ন দেশের মজুর আইন (১৯২৮ ও ১৯২৯)।

(২) গ্রন্থ-প্রকাশ। সু।

"ন্যাশেস্ পলমল ম্যাগাজিন" (মে, ১৯৩০)

ভবিষ্যতের ঘরবাড়ী, মজুর ও পল্লী

৫০ বছর পরে জগতের সভ্যতম দেশগুলার ঘরবাড়ী সহর ও পল্লী কি রূপ নেবে সে সম্বন্ধে মে মাসের ন্যাশেস পলমল্ ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। লেখক,

বিলাতের পার্ল্যামেণ্টের সদস্য লেফ্‌টেনাণ্ট কমাণ্ডার জে এস কেনওয়ার্দ্দি।

আধুনিক জগতের প্রধান প্রধান সহরগুলা (যেমন লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, বার্লিন, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি) কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকর্ম্মের জন্যই ব্যবহৃত হয় না, লোকের বাসস্থানও সহরের মধ্যেই থাকে। কিন্তু কেন্‌ওয়ার্দ্দি বল্‌ছেন যে, এখন এই সব সহরের বাণিজ্য-কেন্দ্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে বাড়ী স্থাপনের যে রকম ধুম দেখা যাচ্ছে আর আধুনিক যানবাহনের যে রকম দ্রুত উন্নতি হচ্ছে তাতে মনে হয় যে ভবিষ্যতে সহরগুলার মধ্যে বাসোপযোগী গৃহ আর থাক্‌বে না। বসতবাড়ীগুলা থাক্‌বে সহরের বাইরে ও সহর থেকে অনেক দূরে। সেখান থেকে লোক দলে দলে আস্‌বে সহরে কাজ করতে। আবার দিনের কাজ শেষ হয়ে গেলে তারা সন্ধ্যেবেলা দলে দলে সহরের বাইরে নিজ নিজ আবাসস্থলে ফিরে যাবে।

তারা আসা-যাওয়া করবে তিন রকম যানে: এরোপ্লেন, মোটর ও বিদ্যুৎচালিত টিউব রেলওয়ে। কেন্‌ওয়ার্দ্দি ব'লছেন যে, এখন মোটর আর রেলে যে রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে ঐ তিন প্রকার যানেরও সেইরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যেতে পারে। কিন্তু তা যে হবেই তার কোন মানে নেই। ভবিষ্যতে এমনও হতে পারে যে, সাধারণের সুবিধার জন্যে এই তিন প্রকার যানই গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হবে।

সহরের গড়ন হবে কেমন? কেনওয়ার্দ্দি বলেন যে, সহরের সর্ব্বত্র প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী দেখা দেবে। জমির দাম অত্যন্ত বাড়্‌বে, সেই জন্য প্রত্যেক টুক্‌রা জমি যতদূর সম্ভব কাজে লাগাবার চেষ্টা হবে। এই কারণে বাড়ীগুলা খুব উঁচু হবে। মাটীর ভেতরও ঘর তৈরী চল্‌তে থাক্‌বে। বাড়ীগুলা যাতে আরও শক্ত ও সুন্দর হয় সে দিকেও চেষ্টা চল্‌তে থাক্‌বে। পাথর বা ইট দিয়ে বাড়ী তৈরীর প্রথা উঠে যাবে। ইস্পাত বা কংক্রিটের ফ্রেমের ওপর বাড়ীগুলা উঠ্‌বে। স্বাস্থ্যের জন্য আলোর প্রয়োজনীয়তা আজকাল সকলেই বুঝ্‌ছেন—এই কারণে বাড়ীগুলা মোটা কাচ দিয়ে নির্ম্মিত হবে, যাতে সূর্য্যের কিরণ সহজেই বাড়াতে প্রবেশ করতে পারে। প্রত্যেক বাড়ীতে সমতল ছাদ থাক্‌বে—তাতে বাগান তৈরী হবে, তা ছাড়া সমতল ছাদ বড় হ'লে এরোপ্লেন থেকে নামা ওঠার খুব সুবিধে হবে। বাড়ীগুলা খুব উঁচু হবে বটে, কিন্তু প্রত্যেক ৪।৫ তলা অন্তর ঘরগুলাকে পিছু হটিয়ে সাম্‌নে ছাদ রাখা হবে। এর ফলে বাড়ীগুলা দেখ্‌তে সুন্দর হবে, আর ওগুলার ভেতর হাওয়া আর আলো আরও বেশী পরিমাণে খেল্‌তে পারবে। বাড়ীগুলার নীচের তলায় কোন ঘর থাক্‌বে না—বাড়ীগুলা ইস্পাতের থামের ওপর দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। গাড়ীঘোড়া শুধু রাস্তা দিয়েই যাতায়াত ক'রবে তা নয়—বাড়ীর তলা দিয়েও যাতায়াত ক'রবে—অর্থাৎ বাড়ীগুলার নীচের তলাও রাস্তার সামিল গণ্য করা হবে। এই বন্দোবস্ত করতে হবে দু কারণে—প্রথমতঃ গাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত বাড়্‌বে, শুধু রাস্তা দিয়ে চলাচল ক'রলে তাদের গতি খুব দ্রুত হতে পারবে না; আর, হাওয়া ও আলো যাতে ভাল ক'রে খেলে তার জন্যও এই বন্দোবস্ত কর'তে হবে।

সহরের বাইরে যারা থাক্‌বে তারা প্রত্যেক পরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ বাড়ীতে থাক্‌বে না। পৃথক্ পৃথক্ বাড়ীতে থাকা অসুবিধাজনক ও ব্যয়বহুল ব'লে একেবারেই উঠে যাবে। অনেক পরিবার মিলে এক একটা বড় বাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন ফ্ল্যাটে থাক্‌বে। প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গে একটী সাধারণ রান্নাঘর, খেলার মাঠ, সাঁতারের পুকুর, প্রভৃতি থাক্‌বে।

সাংসারিক কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাট মেয়েদের ঘাড় থেকে অনেকটা নেমে যাবে। কাপড় কাচা, ছেলে মানুষ করা, রান্না করা বাসনকোসন ধোওয়া প্রভৃতি সব কাজই বিশেষজ্ঞদের হাতে গিয়ে প'ড়বে। কিন্তু প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে এই রকম বিশেষজ্ঞ রাখা সম্ভব হবে না। এই জন্য অনেকগুলা পরিবার মিলে একটা একটা বড় বাড়ীতে থাক্‌তে আরও বাধ্য হবে।

রান্নার জন্য কয়লার ব্যবহার একেবারে উঠে যাবে। কয়লার জায়গায় দেখা দেবে বৈদ্যুতিক উনুন। এর ফলে ধোঁয়ার প্রাদুর্ভাব ক'মে যাবে—স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে যথেষ্ট।

ছোট ছোট টুক্‌রা টুক্‌রা জমি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কৃষক পরিবার কর্ত্তৃক চাষ উঠে যাবে। প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের চাষ চল্‌বে জগতের কেবল সেই সেই জায়গায় যেখানে লক্ষ লক্ষ বিঘা উন্মুক্ত প্রান্তর প'ড়ে আছে। সহরের আশে পাশে যে সব পল্লী আছে সেগুলাতে কেবল ফল-ফুল শাক-সব্জী ও দুধ উৎপাদন চল্‌তে থাক্‌বে। পল্লীগুলাতেও বড় বড় বাড়ীর ফ্ল্যাটে থাকার প্রথা চলিত হবে। পল্লী হতে কুটীর ও প্রধান চাষ-আবাদ যদি উঠে যায় তা হ'লে এখন যে রকম পল্লীগ্রাম দেখা যায় সে রকম পল্লীগ্রাম ভবিষ্যতে আর দেখা যাবে না। কিন্তু তাতে শোক করবার কিছু নেই। কারণ, পল্লীর ঐ ধরণের পরিবর্ত্তন হ'লে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়্‌বে বই কমবে না।

মাছের ব্যবসারও পরিবর্ত্তন দেখা দেবে। সামান্য পুঁজি নিয়ে ছোট ছোট নৌকার সাহায্যে মাছ ধরার প্রথা উঠে যাবে। তার জায়গায় দেখা দেবে লক্ষ লক্ষ টাকার পুঁজি-ওয়ালা বড় বড় কোম্পানী ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছ ধরার জাহাজ। শি।

"দি চেম্বার অব্‌ কমার্স জার্ণ্যাল"

(ক) ১১ই এপ্রিল, ১৯৩০

অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক দুরবস্থা

অষ্ট্রেলিয়ায় পূর্ব্বে গম এবং পশম অত্যন্ত চড়া দরে বিক্রী হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া বিস্তর ঋণ গ্রহণও করিয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া খরচপত্র করিয়াছে অতিরিক্ত পরিমাণে। কিন্তু বর্ত্তমানে গম এবং পশমের বাজার দর নামিয়া যাওয়ায় এই দেশে দারুণ আর্থিক দুরবস্থা দেখা দিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার সরকারী ঋণের সুদের হার কমিয়া গিয়াছে। এই হার ৬½% হইতে ৫¾% পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। তবে এখন অবস্থা যদিও অনেক ভাল, এবং নিম্নতম কোঠা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তবুও লণ্ডনের বাজারে অষ্ট্রেলিয়ার বাজার-সম্ভ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং যাহারা অষ্ট্রেলিয়ান্‌ সিকিউরিটির উপর কর্জ্জ দাদন করে তাহাদের পক্ষে বিশেষ সমঝিয়া চলা দরকার। আবার কর্জ্জ-দাদনকারীদেরই যে শুধু হুসিয়ার হওয়ার দরকার তা' নয়; যে সকল বিলাতবাসী অষ্ট্রেলিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য চালায় তাহাদেরও সামাল দিয়া চলিতে হইতেছে। কারণ অষ্ট্রেলিয়া বিলাতী মালের খরিদ্দার দেশ হিসাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া বিলাতের নিকট অজস্র অর্থ ধার করিয়াছে বলিয়া উহাকে এত বিলাতী জিনিষ ক্রয় করিতে হইতেছে। গত ১০ বৎসরের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া বিলাতকে সুদ এবং সিঙ্কিং ফাণ্ড বাবদ্‌ যত অর্থ প্রদান করিয়াছে তাহার চেয়ে ৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড বেশী ঋণ করিয়াছে। এত বেশী ঋণ গ্রহণ করিবার ফলে অষ্ট্রেলিয়াকে এখন গাদা গাদা বিলাতী মাল ক্রয় করিতে হইতেছে, বিলাতের জাহাজ, ষ্টীমার প্রভৃতি মাল-পত্রে বোঝাই করিতে হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার উৎপন্ন-দ্রব্যের দর কমিয়া যাওয়ায় বিনিময় ব্যাপারে অষ্ট্রেলিয়াকে হিমসিম খাইতে হইতেছে; লণ্ডন এবং অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা ব্যাপারে অষ্ট্রেলিয়াকে দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সিড্‌নি এবং মেলবোর্ণ সহরে যে ১০০ পাউণ্ড মূল্যের বিল ভাঙ্গাইতে হইবে লণ্ডনে তাহার বাজার দর মাত্র ৯২ পাঃ ১২ শিঃ ৬ পেঃ; ৯০ দিন পরে এই দাম ৯১ পাঃ দাঁড়াইবে।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে বিলাতে স্বর্ণ প্রেরণ

বিনিময় ব্যাপারের দুরবস্থা নিবারণের জন্য সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া বিলাতে অনেক সোনা পাঠাইবার মতলব করিয়াছে। প্রকাশ, মোটের উপর ২৪,৭০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সোনা পাঠাইবার কথা স্থির হইয়াছে, এবং বহুৎ সোনা ইতিপূর্ব্বেই বিলাতে চালান গিয়াছে। বাণিজ্য-সাম্য (ব্যালান্স অব্‌ ট্রেড্‌) রক্ষা করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ স্কুলিন্‌ অনেক আমদানি দ্রব্যের উপর ৫০% হারে শুল্ক বসাইয়াছেন এবং অনেক জিনিষের আমদানি নিষিদ্ধও করিয়াছেন। এই নয়া আইনটি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিবার সময় প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, এক্‌সচেঞ্জ্‌ শোধরাইতে অসমর্থ হইয়া বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি অনুরোধ জানাইয়াছে যে, বিদেশের ক্রেডিট নষ্ট করা ছাড়া উপায় নাই; সুতরাং আমদানি বাণিজ্যে

বাধাদান নীতি অবলম্বন করা হউক। বিরুদ্ধবাদী দলের ডেপুটী নেতা এই নয়া আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, দুনিয়ার ইতিহাসে অর্থঘটিত ব্যাপারে এমন দুঃসাহসের উদাহরণ আর কখনও দেখা যায় নাই। আইন তো পাশ হইল; এখন অভিপ্রেত ফললাভ হইবে কি না তাহা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলিতে পারে। ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে অষ্ট্রেলিয়ার শুল্ক-রাজস্ব ১২,০০০,০০০ পাউণ্ড কম হইয়াছে; ফলে বিলাতের সহিত বাণিজ্যে অষ্ট্রেলিয়ার ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। মোটের উপর অষ্ট্রেলিয়া এই নূতন আইন পাশ করিয়া ভাল করে নাই। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে খরচ কমাইবার চেষ্টা করিলে বেশ ভাল হইত। তবে আসল কথা হইতেছে এই যে, উৎপাদনের ব্যয় কমাইতে চেষ্টা করিলেই মঙ্গল হইত সব চেয়ে বেশী।

সম্প্রতি লণ্ডন সহরে ব্যাঙ্ক অব্ অষ্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান্ উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিগত সভার অধিবেশনেও উপরিউক্ত মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া দুনিয়ার বাজারে অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ডের পশম অত্যন্ত চড়া দরে বিকাইতেছিল। ফলে ঐ দুই দেশে পশম অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত এই অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য এই দুই দেশের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। কারণ এখন চাহিদার চেয়ে যোগান দাঁড়াইয়াছে বেশী। চড়া দরের জন্য লোকে পশম আর সেরূপ ব্যবহার করিতে চাহিতেছে না। পশমের স্থলে এখন নকল রেশম ব্যবহারের দিকেই লোকের বেশী ঝোঁক দেখা যাইতেছে। সুতরাং পশমের উৎপাদন খরচা কমাইতে হইবে, নতুবা আর কোন উপায় নাই। অষ্ট্রেলিয়ার বিচিত্র সূর্য্যতাপ, লক্ষ লক্ষ একর উর্ব্বর ভূখণ্ড, পশম, গম, মাংস, ফল, এবং ডেয়ারিজাত দ্রব্য নিশ্চয়ই অষ্ট্রেলিয়াকে অন্ততঃ পক্ষে অন্যান্য দেশের মত সস্তায় পশম উৎপাদন করিতে সাহায্য করিবে। তবে যতদিন পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া আপন রপ্তানি বাড়াইতে পারিতেছে না ততদিন পর্য্যন্ত আমদানি কমান ছাড়া উপায় নাই, অষ্ট্রেলিয়ান্ গবর্ণমেণ্ট এই নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন।

(খ) ১০ই এপ্রিল, ১৯৩০

আমেরিকার অর্থ-নৈতিক সমস্যা

অষ্ট্রেলিয়া আপন অর্থনৈতিক দুরবস্থা সামাল দিয়া লইবার জন্য টারিফ্ দেওয়ালের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া যাইতেছে। আমেরিকার পক্ষে কিন্তু এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভবিষ্যতে আমেরিকার সম্মুখে এক নূতন সমস্যা উপস্থিত হইবে দেখা যাইতেছে। আমেরিকা যদি বিদেশের মালের উপর অত্যন্ত চড়া দরে শুল্ক বসায় তাহা হইলে আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তবে যদি আমেরিকা ১৯২৯ সনের চেয়ে বিদেশে অধিকতর কর্জ্জ দাদন করে তবে অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইতে পারে। আমেরিকা এবং ইয়োরোপের বড় বড় দেশগুলির রপ্তানি বাণিজ্যের অবস্থান্তর এই একই কারণে ঘটিয়াছে, দেখা যাইতেছে। ১৯১৪ সন হইতে ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত আমেরিকার আমদানির চেয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি হইয়াছে ৫,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই ১৫ বৎসরের মধ্যে আমেরিকাকে ঠিক এই পরিমাণ অর্থ দুনিয়াকে কর্জ্জ দাদন করিতে হইয়াছে। এইজন্য আমেরিকাকে বিদেশের সিকিউরিটিসমূহ ক্রয় করিতে হইয়াছে; লড়াইয়ের আগে বিদেশে যে সমস্ত আমেরিকান্ সিকিউরিটি ছিল তৎসমুদয় পুনরায় ক্রয় করিতে হইয়াছে এবং মিত্রপক্ষকে ঋণদান করিতে হইয়াছে।

১৯২০ সনের আগষ্ট মাস হইতে ১৯২৭ সনের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত আমেরিকায় ৩৪৯,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সোনার ষ্টক বৃদ্ধি হয়। ইহার ফলে ১৯২২ সনের মাঝামাঝি হইতে ১৯২৮ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত আমেরিকার ব্যাঙ্ক ক্রেডিট্ অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়া ২,৯০০,০০০,০০০ পাউণ্ডে পরিণত হয়। এই অর্থের কিয়দংশ বিদেশী সিকিউরিটি ক্রয় করিবার জন্য ব্যয় করা হয়। ১৯২৩ সনে এইরূপ সিকিউরিটি ক্রয় ৫৩,৫০০,০০০ পাউণ্ডেরও কম দেখা যায়; কিন্তু ১৯২৪ সনে সিকিউরিটি ক্রয় দাঁড়ায় একেবারে ২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড; ১৯২৭ সনে ৩১২,০০০,০০০

পাউণ্ডেরও উপর এবং ১২২৮ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত দাঁড়ায় প্রায় ৩৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৯২৯ সনে কিন্তু এই সিকিউরিটি ক্রয় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে; এই সনে মোটের উপর ১৫১,০০০,০০০ পাউণ্ড কম সিকিউরিটি কেনা হইয়াছে। আমদানি বাণিজ্যে বাধা প্রদান সত্ত্বেও যে আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্য সমান তালে চলিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ আমেরিকা অজস্র অর্থ বিদেশে কর্জ্জ দাদন দিয়াছিল।

আমেরিকার নিকট বিদেশীদের ঋণের বহর ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু আমেরিকা ধার দেওয়ার সময়ে পূর্ব্ব ঋণের সুদস্বরূপ প্রতি ডলার হইতে কিছু অংশ কাটিয়া লইতেছে। সুতরাং আমেরিকান্ মাল খরিদ করিবার সময়ে বিদেশীদের ডলারের মূল্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। ক্রমে এখন এমন অস্বাভাবিক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, আমেরিকা আর পূর্ব্বেকার হারে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট্ প্রদান করিতে পারিতেছে না। সুতরাং আমেরিকা আর পূর্ব্বের হারে বিদেশী সিকিউরিটি খরিদ করিতে পারিবে না। এদিকে আমেরিকার বাজারে এই সমস্ত বিদেশী সিকিউরিটি না বিক্রী হইলে আমেরিকা তাহার রপ্তানি বাণিজ্য এবং আমদানি বাণিজ্যে স্বেচ্ছা-স্থাপিত বাধাবিঘ্ন সমূহ (টারিফ) রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমেরিকা যদি তাহার রপ্তানি বাণিজ্য অটুট রাখিতে চায় তাহা হইলে তাহার পক্ষে বিদেশী জিনিষ ক্রয় বৃদ্ধি করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। ম।

১। দি ইভ্‌লিউশন অব্‌ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল অর্গ্যানিজেশন (মজুর সংগঠনের বিবর্ত্তন), বি এফ্‌ শীল্ডস্‌। পিট্‌ম্যান। পৃঃ ২৯৬। ১০ শি ৬ পে।

মলাটের পৃষ্ঠায়

এই কেতাবখানিতে যে সকল বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে, সে সকলের ধারাবাহিক ইতিহাস সমষ্টি হিসাবে ইহাকে গণনা করিলে ভুল হইবে। ইহাতে সমসাময়িক অবস্থার বিভিন্ন সমস্যা উত্থাপন করা হইয়াছে মাত্র। মলাটের পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহাতে মজুর-সংগঠনের বিবর্ত্তন বুঝিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং ব্যবসায়-সঙ্ঘ, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালনা, ব্যবসাগত দক্ষিণা ও নিম্নতম মজুরি, ভোকেশনাল উপদেশ, শিল্প শিক্ষা ও শিল্প সম্পর্কীয় হিতসাধন ইত্যাদির সমসাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে খুব প্রাঞ্জল ও দরকারী আলোচনা স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থকার ১৯২৬-২৭ সনে ডাব্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতাগুলিকেই ঘষিয়া মাজিয়া ও আধুনিক কাল পর্য্যন্ত টানিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই বক্তৃতাগুলির হরেক রকম শ্রোতা ছিল—কেহ শিল্পপতি, কেহ ট্রেড্‌ ইউনিয়নিষ্ট, কেহ সরকারী চাকুরো, কেহ শিল্প সংগঠক ছাত্র বা শিক্ষক।

কেতাবের দোষগুণ

বলা বাহুল্য, যে সব শ্রোতা শ্রীযুক্ত শীল্ডসের বক্তৃতাগুলিতে আসিয়াছিল, তাদের অভাব অভিযোগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থকারকে বক্তৃতাগুলি তৈরী করিতে হইয়াছিল। সে জন্য এক প্রবন্ধের সহিত অন্য প্রবন্ধের সামঞ্জস্য থাকিবে এরূপ আশা করা যায় না। প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ত্তমান শিল্প-সংগঠনের কতকগুলি বিশেষত্ব ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শিল্প-মিলনের কথা আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু এই দুইটি পরিচ্ছেদের সহিত অন্যান্য পরিচ্ছেদের কোন সম্পর্ক নাই। এই কেতাবের প্রধান গুণ অথবা প্রধান দোষ এই যে ইহা বর্ণনা-বহুল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শিল্প-মিলন পরিচ্ছেদটিতে কোন্‌ কোন্‌ প্রভাবে মিলন আন্দোলন পরিস্ফুট হইয়াছে তার এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, বিভিন্ন প্রকারের মিলনও বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কিন্তু এ কথাটা কোথাও স্পষ্ট করিয়া দেখান হয় নাই যে, শিল্পের প্রকৃতি এবং তৎকালীন অবস্থার উপরও তার রূপটা কম নির্ভর করে না। আরও একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে র‍্যাশানালিজেশনের কথা আজ প্রত্যেক ইংরেজ চিন্তাবীরের মাথায় ঢুকিয়াছে, তার নামমাত্র এই কেতাবে পাওয়া যায় না।

ট্রেড্‌ ইউনিয়ান সম্বন্ধেও গ্রন্থকারের ঐরূপ বিরূপতা দেখা যায়। তিনি কচিৎ উহার কথা তুলিয়াছেন। মজুর-সংগঠন সম্পর্কে ট্রেড বোর্ড ও নিম্নতম দর সম্বন্ধে তাঁকে আলোচনা করিতে হইয়াছে। কিন্তু ট্রেড্‌ ইউনিয়ন আন্দোলনকে বাদ দিয়া এই দুইয়ের আলোচনা চলিতে পারে না। সমষ্টিগতভাবে দর কষাকষির ফলে একটা নিম্নতম দর নির্দ্দিষ্ট হইবে ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য হইবার নাই। ঐ দরের ফল ভাল হইবে না মন্দ হইবে তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বিষয়ের উপর। ইহাও সত্য যে, আইনতঃ নিম্নতম দর স্থির পদার্থ বলিয়া স্বেচ্ছানির্ণীত দরের চেয়ে বেশী অসুবিধা ভোগ করিতে পারে। কিন্তু

নিম্নতম দর উর্দ্ধতম দর কিনা (পৃঃ ১৯৬) সে আলোচনা করিবার সময় বহুকাল হইল অতীত হইয়া গিয়াছে।

২। প্রোস্‌পেক্‌তিহ্ব্‌ একোনোমিখে (ভবিষ্যতের অর্থনীতি) ১৯২৯। জিওর্জিও মর্ত্তারা। বোকোনি বিশ্ববিদ্যালয়, মিলান। ১৯২৯। পৃঃ ৪৯৮।

দুনিয়ার বাণিজ্যের কতকগুলি খুব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (ইহার মধ্যে হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক শক্তি, ভাড়া, সিক্কা ও ফিনান্সও আছে) উৎপাদন, খাদন, বিদেশী বাণিজ্য, দর ইত্যাদি সম্বন্ধে অধ্যাপক মর্ত্তারা প্রতি বৎসর একটা করিয়া ফোর্‌কাষ্ট বাহির করিয়া থাকেন। ১৯২৯ সনেও তার ব্যত্যয় ঘটে নাই। এই কেতাব নবম বারের বাণী বহন করিয়া বাহির হইয়াছে। এই কেতাবকে যত রাজ্যের অঙ্ক ও তথ্যতালিকারাশির সমষ্টিমাত্র বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। তথ্যতালিকা ত আছেই, তাছাড়া আছে অধ্যাপক মর্ত্তারার সুযুক্তিপূর্ণ বহু ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব। সেই দিক্‌ হইতে প্রতি বৎসরের বিবরণই মূল্যবান্‌।

কয়লা নামক অধ্যায়ে বিভিন্ন কয়লার খনি আয়তনের অবস্থা ও বাজারে প্রতিযোগিতা করিবার পক্ষে কোন্‌ রপ্তানিকারক জিলার কিরূপ সুবিধা তার তুলনামূলক আলোচনা স্থান পাইয়াছে। দুনিয়ায় উৎপাদিত তাবৎ কয়লার পরিমাণ ১৯২৮ সনে ১৩১.৫ কোটি টন—ইহার মধ্যে লিগনাইট্‌কে কয়লায় রূপান্তরিত করিয়া ধরা হইয়াছে। এই পরিমাণ ১৯১৩ সনে ছিল ১১৬ কোটি টন। অর্থাৎ বৃদ্ধিটা ১৩.৪% এর বেশী হয় নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, (১) জল ও তৈল হইতে আরও ৩০ কোটি টন অধিক শক্তি পাওয়া যাইতেছে (২) বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এক্ষণে অনেক কারবারে আগের চেয়ে কম কয়লা লাগে। ১৯০০ সনে মোট উৎপন্ন শক্তির ৯০% আসিত কয়লা হইতে; ১৯১৩ সনে ৮৪%; ১৯২৭ সনে মাত্র ৬৪%। ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে সাবসিডি বর্ত্তমান রহিয়াছে, কয়লার টানও স-লীল (ইল্যাষ্টিক) নহে; সুতরাং মনে হয়, অধিকাংশ রপ্তানিকারী জেলার কয়লার দর লাভজনক থাকিবে না। ভৌগোলিক অবস্থা প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও পোল্যাণ্ডে মজুরির হার নীচু, তার এফিসেন্সিও বাড়িতেছে, আর জার্ম্মেণীতে অনেক খরচা করিয়া র‍্যাশানালিজেশনের দরুণ যে টাকা বাঁচান হইয়াছিল, তার সবটাই খাইয়া ফেলিয়াছে কয়লার খনির মজুরদের চড়া মজুরি। বৃটিশ কয়লা-ব্যবসার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ১৯১৩-২৮, এই কয় বৎসরে বৃটেনের আদায় ৪.৯ কোটি টন কমিয়া গিয়াছে. পরন্তু ঐ সময়ে ইয়োরোপ মহাদেশের উৎপাদন বাড়িয়াছে ৬.৭ কোটি টন।

১। "নোট্স অন ম্যালথাস' প্রিন্সিপলস্ অব্ পোলিটিক্যাল ইকনমি" (ম্যালথাসের অর্থশাস্ত্র কেতাবের সমালোচনা), ডেভিড্ রিকার্ডো। হল্যাণ্ডার এবং গ্রেগরি এই বইখানি ভাষ্য সমেত বাহির করিয়াছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, লণ্ডন। ১৯২৮। পৃঃ ৩৬৪। ২২শি ৬পে।

২। "ট্রেড্ অ্যাণ্ড ক্রেডিট্" (বাণিজ্য ও বাজার-সম্ভ্রম), আর জি হট্রে। লংম্যান্স্। ১৯২৯। পৃঃ ১৮৯। ১০ শি ৬ পে।

৩। "ইয়োরোপা" (ইয়োরোপ সম্বন্ধীয় বার্ষিকী)। ইহার সহিত দি ইয়োরোপা ইয়ার বুকও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম ভাগ, ইয়োরোপের এন্সাইক্লোপিডিয়া। দ্বিতীয় ভাগ, ইয়োরোপের প্রধান ব্যক্তিগণ। সম্পাদক—মাইকেল ফার্ব্বম্যান। ইয়োলো পাবলিকেশন্স্ লিমিটেড্, লণ্ডন। ১৪৲ টাকা।

৪। "ফ্রীডম্ অব্ এসোসিয়েশন" (সম্মিলন স্বাধীনতা) প্রথম ভাগ—তুলনামূলক বিশ্লেষণ। ১৫১ পৃঃ। ২ শিঃ। দ্বিতীয় ভাগ—গ্রেট বৃটেন, আইরিশ ফ্রী ষ্টেট, ফ্রান্স, বেলজিয়াম লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস্ ও সুইট্‌স্যারল্যাণ্ড। ৪২৫ পৃঃ। ৫ শি। তৃতীয় ভাগ—জার্ম্মেনী, অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারি, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, লাড্‌ভিয়া, ডেন্মার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন। ৫২৩ পৃঃ। ৫ শি। চতুর্থ ভাগ—ইতালি, স্পেন, পর্ত্তুগাল, গ্রীস্, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া। ৪১৬ পৃঃ। ৫ শি। পঞ্চম ভাগ—যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ল্যাটিন আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান। ৪৬০ পৃঃ। ৫ শি।

একত্রে ২০ শি।

এইগুলি ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিস্ হইতে প্রকাশিত।

৫। "প্রভিনসিয়েল ফিন্যান্স" (প্রাদেশিক অর্থ-ব্যবস্থা), ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যাকমিলান কো, লণ্ডন। ১৯২৯। পৃঃ ৩৬৭+১০। ১০ শি ৬ পে।

৬। "এ হিষ্টরি অব্ ইণ্ডিয়ান ট্যাক্সেশন" (ভারতীয় করের ইতিহাস)। ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যাক্‌মিলান অ্যাণ্ড কো, লণ্ডন। ১৯৩০। পৃঃ ৫৪১+৮। ১২ শি ৬ পে।

আমেরিকার বাড়্‌তি পণ্য নিবারণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম, এ, বি, এল

এ বৎসর পাটের বাজারে বাড়্‌তি হওয়ায় পাট-চাষীদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। গত বৎসর আমেরিকাতেও গমের বাজারে বাড়্‌তি দেখা দেয় ও তাহার ফলে গমের দর পড়িয়া যাইতে থাকে। ইহার ফল দারুণ দুঃখময় হইবে ভাবিয়া আমেরিকান্ কংগ্রেস ১৯২৯ সনের জুন মাসে "এগ্রিকাল্‌চারাল্ মার্কেটিং অ্যাক্ট" নামে এক আইন পাশ করেন। এই আইন অনুসারে "ফেডারেল ফার্ম বোর্ড" নামে একটী বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; দেশ ও বিদেশের বাজারে কৃষিজাত পণ্য লাভে বেচার বন্দোবস্ত করিবার ভার এই বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়। এই বোর্ডের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কৃষিজাত পণ্য ধারাবাহিক ভাবে বাজারে চালান দিতে হইলে শৃঙ্খলীকরণ, পুঁজি ও প্রাকৃতিক সুবিধা আবশ্যক হয়। ব্যাপকভাবে শৃঙ্খলীকরণ না হইলে উৎপাদন যুক্তি-যুক্ত বা "র‍্যাশানালাইজ" করা বা বাজারে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ফেলা চলে না। নানা কারণে আমেরিকায় কৃষি শৃঙ্খলীভূত হইয়া উঠে নাই; আইন পাশ করিয়া ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের হাতে এই ভারটী দেওয়া হয়। ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের মেম্বারগণকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রেসিডেন্ট হুভার তাই বলেন, "নানা কৃষি-সমস্যা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা ও সেগুলি সমাধানের উপায় স্থির করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া চাই; উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা কৃষকদিগকে দিয়া করাইতে হইবে; বাজারে মাল ফেলিবার জন্য স্থায়ী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মালিক হইবে চাষীরা ও শাসন থাকিবে তাহাদিগেরই হাতে। এই উপায়েই আমরা আমাদের আর্থিক ব্যবস্থায় চাষীদিগকে শিল্পীদিগের সমান সুযোগ দিতে সমর্থ হইব।"

মাথায় আছে ফেডারেল ফার্ম বোর্ড,—কর্জ্জ দিবার জন্য অর্দ্ধ অর্ব্বুদ ডলার এই প্রতিষ্ঠানের হাতে আছে। ইহার নীচে কার্য্যনির্ব্বাহক সমবায়গুলি,—বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের বিভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহক সমবায় প্রতিষ্ঠান আছে, যথা গম, তুলা, তামাক প্রভৃতি। তার নীচে আছে আবার অনেকগুলি স্থানীয় সমবায়-সঙ্ঘ,—এইগুলি ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া কৃষকদিগকে সাহায্য করে।

ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের তাঁবে ৫০,০০,০০,০০০, ডলার আছে, তাহা হইতে পৃথকভাবে কোন কৃষককে কর্জ্জ দেওয়া হয় না। কর্জ্জ দেওয়া হয় প্রথমতঃ জাতীয় সঙ্ঘ (কার্য্য-নির্ব্বাহক সমবায়)গুলিকে; এই সঙ্ঘগুলি আবার কর্জ্জ দেয় স্থানীয় সমবায় সমিতিগুলিকে। এরূপ ভাবে কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করার উদ্দেশ্য হইতেছে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নততর করিয়া তোলা এবং সমবায় সমিতিগুলির সভ্যদিগকে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে শস্যের পরিবর্ত্তে ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অধিকতর কর্জ্জ পাইতে সাহায্য করা।

কিন্তু যদি কৃষককুল অধিক সংখ্যায় সমবায় সমিতিগুলির সভ্য না হয়, তবে ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের চাষীদের সাহায্য করিয়া আর্থিক উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা বিফল হইবে। সুতরাং বোর্ডকে "ষ্টেবিলাইজেশন্ কর্পোরেশন" (বা "মূল্য-স্থিরীকরণ সঙ্ঘ") নামে এক অভিনব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। "এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টের" দফা ৯ অনুসারে ফেডারেল ফার্ম বোর্ড "মূল্য-স্থিরীকরণ সঙ্ঘে"র সাহায্যে কোন কৃষিজাত পণ্যের যতটা ইচ্ছা ক্রয় করিয়া রাখিতে পারে, এমন কি প্রয়োজন হইলে যে কোন পণ্যকে কোণ-ঠাসা করিতেও পারে। তবে অ্যাক্টে একথাও আছে "ষ্টেবিলাইজেশন্ কর্পোরেশনের" দেখা

আবশ্যক যে, লোকসান না হইয়া মুনাফাই হয়; পক্ষান্তরে দর অত্যধিক চড়িয়া গেলে সাধারণ গৃহস্থের ক্ষতি করিয়া মাল আটকাইয়া রাখাও ষ্টেবিলাইজেশন কর্পোরেশনের উচিত নয়।

ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন শক্তি নাই; উহা মাত্র কৃষকগণকে বাড়তি উৎপাদন হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারে। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, যেসব চাষী ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন পণ্য অত্যধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে রত হয় তাহাদিগকে বোর্ড কর্জ্জদান বা কোন প্রকার সাহায্য না করিলেই সেই সব কৃষক বাধ্য হইয়া উৎপাদন সংযত করিবে। কিন্তু বোর্ডের পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব, কেননা যদি বোর্ড কৃষকগণকে বলে যে, "জানিয়া শুনিয়াও যখন তুমি বাড়তি উৎপাদন করিয়াছ তখন তোমাকেই ইহার ক্ষতি সহিতে হইবে," তাহা হইলে কৃষক উত্তর দিবে যে, "এই বাড়্‌তি সমস্যা না থাকিলে ত' ফেডারেল ফার্ম বোর্ড কায়েম করার কোন প্রয়োজনই থাকিত না; বাড়্‌তি সম্বন্ধে কি করিতে হইবে আইনেই তাহা বলা আছে এবং এই জন্যই আইন করা হইয়াছে।" কৃষিজাত পণ্যের সুশৃঙ্খলভাবে বিতরণে যাহা আবশ্যক তাহার চেয়ে অধিক বা গৃহস্থের যাহা আবশ্যক (ডোমেষ্টিক্ রিকোয়ারমেন্টস্) তাহার চেয়ে যাহা অধিক, মার্কেটিং অ্যাক্ট অনুসারে তাহাই বাড়্‌তি। সুতরাং ইহা বোঝা যাইতেছে যে, এই অ্যাক্ট অনুসারে যত খরচাই হউক বাড়্‌তি নিঃশেষিত করাই ষ্টেবিলাইজেশন কর্পোরেশনের মূল কর্ম্ম। সে জন্য যদি লোকসানও হয় তবে সরকার তাহা বহন করিবেন। মোটামুটি ইহাই এগ্রিকালচারাল্ মার্কেটিং অ্যাক্টের ভাবার্থ।

নিউ ইয়র্কে ষ্টান্‌ডার্ড-ষ্টেটিস্‌টিকস্ কোম্পানী ফেডারেল ফার্ম বোর্ড সম্বন্ধে একটি মেমোরেণ্ডাম্ প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাতে এই বোর্ডের কার্য্য পরিধি সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যাইবে। এই মেমোরেণ্ডাম্ অনুসারে এই বোর্ডের কার্য্যকারী হইতে ৫।১০।১৫ বৎসর কি আরও অধিক সময় লাগিবে। এই মেমোরেণ্ডাম্ হইতেই জানা যায় যে, সাধারণ ব্যাঙ্ক হইতে ৬% সুদে কর্জ্জ লইতে হয়, কিন্তু সমবায়গুলি মাত্র প্রায় ৩½% সুদে অপর্য্যাপ্ত সরকারী টাকা পাইতে পারিবে; কিন্তু সরকারী টাকা কেন্দ্রীয় সমবায় সঙ্ঘগুলির হাত দিয়া স্থানীয় সমবায় সঙ্ঘগুলি পাইবে এবং তাহাদিগের মারফৎ কৃষককুল পাইবে, সুতরাং এই হাতফেরের ফলে সুদের হার বাড়িয়া গিয়া প্রায় সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হারের অনুরূপ হইবে। সেই হেতু ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না।

এই মেমোরেণ্ডামে আরও জানা যায় যে, "অর্ডারলি মার্কেটিং" (সুনিয়ন্ত্রিতভাবে মাল বাজারে ফেলাই) বোর্ডের লক্ষ্য অর্থাৎ কোনরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে বোর্ড নারাজ—যথা, ষ্টেবিলাইজেশন করপোরেশনের সাহায্য গ্রহণ করিতে বোর্ড একেবারেই নারাজ। আপাততঃ স্পেকুলেশন কমান, বিতরণে অপচয় রোধ ও বাড়তি সংযমন—এইগুলি বোর্ডের প্রধান কার্য্য।

এইবার এগ্রিকাল্‌চারাল্ মার্কেটিং অ্যাক্টের ফল কি হইয়াছে একটু দেখা যাউক।

১৯২৯ সনের ১৫ই জুন এগ্রিকাল্‌চারাল্ মার্কেটিং অ্যাক্ট পাশ হইবার এক মাসের মধ্যেই ফেডারেল্ ফার্ম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহার ফলে গমের আড়তে জুন হইতে আগষ্ট মাসে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা যায়—এক এক দিনে ছয় হইতে আট সেণ্ট পর্য্যন্ত দর চড়িয়া যায়। মোট কথা এই কয় সপ্তাহের মধ্যেই বুশেল্ প্রতি গমের দর পঞ্চাশ সেণ্ট চড়ে; ইহার কারণ সরকারের ষ্টেবিলাইজেশন্ পলিসি সম্বন্ধে নানা জনরব উঠে। এই জনশ্রুতির ফলে দর বাড়ার সময়েও কৃষকগণ গম বিক্রয় করে নাই—ভবিষ্যতে অধিকতর চড়া দরে বিক্রয় করিবে বলিয়া ধরিয়া রাখিল। সরকারী কৃষি বিভাগও দর চড়িবার আশা করিয়া কৃষকদিগকে ভবিষ্যতের জন্য গম ধরিয়া রাখিতে উত্তেজিত করিল। সে সময় গমের দর বুশেল প্রতি ১.৫০ ডলার হইয়াছিল। সরকারী দর অভিজ্ঞদের মতে এটা ছিল গমের পক্ষে অন্যায় রকমের কম দর। ফেডারেল ফার্ম বোর্ডও সরকারী দর-অভিজ্ঞদের কথায় বিশ্বাস করিয়া গম ধরিয়া রাখিতে কৃষকদিগকে উৎসাহিত করেন। দুঃখের বিষয় ইঁহারা সকলেই ভুল অনুমান করিয়াছিলেন। ওয়াল ষ্ট্রীটে

অক্টোবর মাসে দুর্য্যোগ উপস্থিত হইলে সকল শিল্পেই চাহিদা কমিতে থাকে ও বেকার সংখ্যা বাড়িয়া যায়, এবং সেই হেতু সকল পণ্যের দর পড়িয়া যায়। সুতরাং গমের দরও নামে। অধিকন্তু ক্যানাডার "গম-কোটের" হাতে পূর্ব্ব বৎসরের অনেক গম মজুত ছিল; অষ্ট্রেলিয়াও আর্জেন্টিনাতেও গমের বাজারে দুর্য্যোগ দেখা দেয়। সুতরাং এই তিনটী দেশই দুনিয়ার বাজারে গম বেচিবার চেষ্টা করিতে থাকে। অধিকন্তু আমেরিকার বাজারেও ছিল অপর্য্যাপ্ত গম। তাই গমের দর পড়িতে থাকিলে চাষীরা বলিতে লাগিল যে, "গমের দর যখন ১.৫০ ডলার ছিল তখন সরকার গম ধরিয়া রাখিবার হুকুম দেন, এখন দর যখন দাঁড়াইয়াছে ১.২৫ ডলার তখন কি করিতে সরকার মনস্থ করিয়াছেন?" অবশেষে ২৮শে অক্টোবর ফেডারেল ফার্ম বোর্ডকে স্বীকার করিতে হইল যে, এই ১.২৫ ডলার দরটা সত্যই গমের পক্ষে বড় অল্প। এবং এরূপ অবস্থায় যাহাতে গম উৎপাদকদিগকে বাধ্য হইয়া এই নরম দরে বিক্রয় করিতে না হয় তাহার এক উপায় স্থির করিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে, গম উৎপাদক সমবায় সঙ্ঘ মারফৎ গমের উপরে বুশেল্ প্রতি এক পাউণ্ড পঁচিশ ডলার হিসাবে কর্জ্জ দিবেন। সুতরাং নরম দরে গম বিক্রয় করিয়া দিবার আর কোন হেতু রহিল না। যে হেতু চাষীরা গম জমা রাখিয়াই গমের পূর্ণ বাজার মূল্যটা কর্জ্জ করিতে পারিবে। এইরূপভাবে সরকারী টাকা কর্জ্জ করিবার পর যদি দর পড়িয়া যায় তাহা হইলে সরকার যদি ইচ্ছা করেন গম লইতে পারেন; আর যদি দর চড়িয়া যায় তাহা হইলে গম বিক্রয় করিয়া সরকারী ঋণ পরিশোধ করিবার পর লাভের অংশটা কৃষক নিজেই রাখিতে পারিবে। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, "কত সরকারী টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইবে বোর্ড সে বিষয়ে কোন সীমা নির্দ্দেশ করিবেন না। আপাততঃ ইহার জন্য ১০,০০,০০,০০০ ডলার রাখা হইয়াছে। প্রয়োজন বুঝিলে বোর্ড আরও অধিক টাকার জন্য কংগ্রেসের নিকট আবেদন করিবেন।" মনে হইতে পারে যে, সরকার যখন গম না বেচিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য আবশ্যক অনুরূপ টাকা কর্জ্জ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন আর দর পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষেত্রে কিন্তু তাহা হয় নাই; দর আরও পড়িতে থাকে এরূপ হইবার কারণ দুইটী: (১) টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইতে থাকে এক মাত্র গম-উৎপাদক সমবায় সঙ্ঘগুলিকে, এবং (২) সরকার কখনও বিক্রয় দর স্থির করিয়া দিতে পারেন না, সমস্ত দুনিয়া তাহা স্থির করে। সুতরাং দর নামা রোধ করিবার জন্য ফেডারেল ফার্ম বোর্ডকে নূতন উপায় বাহির করিতে হয়। সমবায় সঙ্ঘগুলির সভ্যদিগের নিকট হইতে বুশেল প্রতি ১.২৫ ডলারে গম ক্রয় করিবার জন্য এবং বাজার হইতে বাজার দরে ক্রয় করিবার জন্য ফেডারেল ফার্ম বোর্ড ফারমারস্ ন্যাশানাল গ্রেণ কর্পোরেশনগুলিকে কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করেন। এ পর্য্যন্ত এই কর্পোরেশনগুলির বাড়তি পণ্য বিক্রয় করাই ছিল প্রধান সমস্যা, কিন্তু দর অস্বাভাবিক পড়িয়া যাওয়ায় ইহাদিগকে বাড়তি খরিদ করিতে নিয়োগ করা হইল। উৎপাদক হিসাবে কৃষক হইতেছে বিক্রেতা; কিন্তু চলতি দরে বিক্রয় করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া সেই কৃষকই হইয়া পড়িল খরিদ্দার। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, খরিদ্দার হইয়া দর চড়াইয়া দিয়া পরে নিজেদের মাল বিক্রয় করিবে। পেশাদার স্পেকুলেটাররা এইরূপই করিয়া থাকে। কিন্তু ফল হইল উল্টা—গমের বাজার-দর নামিতে থাকে। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, সে সময়ে দর ছিল দুই প্রকারের—একটী বাজার-দর এবং অপরটী সরকারী দর। শুধু বাজার-দরই নামিয়া চলিয়াছিল, বাজার-দর এবং সরকারী দরের মধ্যে প্রায় ১৮ সেণ্টের তফাৎ ছিল। সুযোগ বুঝিয়া স্পেকুলেটারগণ বাজার দরে গম খরিদ করিয়া সমবায় সঙ্ঘগুলিকে সরকারী দরে বিক্রয় করে। এবং মোটা মুনাফা মারিয়া বসে।

এই অকূল পাথারে পড়িয়া ফেডারেল ফার্ম বোর্ডকে ১১ই ফেব্রুয়ারী গ্রেট্ ষ্টেবিলাইজেশন করপোরেশন কায়েম করিতে বাধ্য হইতে হয়। কাজ আরম্ভ করিবার জন্য ১০০,০০,০০০ ডলার সরকারী টাকা এই সঙ্ঘের হাতে দেওয়া হয়। ঐ টাকা দিয়া ষ্টেবিলাইজেশন করপোরেশন শিকাগোর গমের আড়তে "মে ফিউচারস্" ক্রয় করিতে থাকে। এইভাবে ভবিষ্যৎ গম ক্রয় করায় লোকে অভিযোগ করে যে সরকার স্পেকুলেশনে মাতিয়া উঠিয়া-

ছেন। সরকার এই অভিযোগের প্রতিবাদ স্বরূপ বলেন যে তাঁহারা স্পেকুলেশনে মাতেন নাই, যে হেতু ষ্টেবিলাইজেশন কর্পোরেশন যে সকল ভবিষ্যৎ চুক্তি করিয়াছেন, সে সকল চুক্তির মাল গ্রহণ করিতে সরকার প্রস্তুত এবং গ্রহণ করিবার আশাও রাখেন। এবং বাজার দর সুবিধা মত হইলে সেই কেনা মাল বেচিয়া দিবেন; সরকার আরও বলেন যে, বাজার হইতে যতটা পরিমাণ গম সরাইয়া ফেলা আবশ্যক হইবে ততটা পরিমাণ এই সঙ্ঘ সরাইয়া ফেলিবেন এবং সে জন্য যত টাকা লাগুক না কেন সরকার সমস্তই বহন করিবেন।

সে সময়ে গমের বাজারের অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল এইরূপ :—(১) গম জমা রাখিয়া বাজার অপেক্ষা চড়া হারে কর্জ্জ দেওয়ার ফলে সরকারকে দেয় ঋণের পরিমাণ হইয়াছিল বহুশত টাকা এবং এই ঋণের টাকাটা পরিশোধ করিবার অক্ষমতার জন্য সেই সব গম সরকারের হাতে যাইবার সম্ভাবনাই হইয়াছিল বেশী।

(২) সমবায় সঙ্ঘগুলি সরকারী টাকার দর স্থির রাখিবার জন্য লোকসান দিয়াও প্রচুর পরিমাণে গম খরিদ করিয়াছিল বলিয়া সেই সব গমও সরকারের হাতে যাইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছিল।

(৩) গ্রেণ ষ্টেবিলাইজেশন করপোরেশন শিকাগো গমের আড়তে ভবিষ্যৎ ক্রয়ের চুক্তি করিয়াছিলেন বলিয়া ফসলী বৎসরের শেষে ১০,০০,০০,০০০ বুশেল্ গম সরকারের হাতে যাইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছিল।

(৪) অনুরোধ করা ছাড়া উৎপাদন সংযত করিবার কোথাও কোনরূপ চেষ্টা দেখা যায় নাই।

মোট কথা ফেডারেল ফার্ম বোর্ডের অবস্থা ক্রমশঃই বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছিল। যদিও ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, গ্রেণ ষ্টেবিলাইজেশন কর্পোরেশন দর নামা রোধ করিবার জন্য যত প্রয়োজন ততটা গম খরিদ করিবে, তথাপি এরূপ ঘোষণা করিবার মাত্র পাঁচ দিন পরেই নর্থ ডেকোটার সরকারকে বোর্ড নিম্নলিখিতরূপ তার পাঠাইয়াছিলেন :—

"উৎপাদকদিগের সহানুভূতি মা পাইলে এই সমস্যা সমাধান অসম্ভব হইয়া পড়িবে। দুনিয়ায় অপর কোন শিল্প ভবিষ্যৎ বাজারের সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া এরূপ অন্ধ ভাবে উৎপাদন করে না, হয়ত আপনার দেশের উৎপাদকগণ বলিয়া বসিবে যে, কম উৎপাদন করিয়া কি প্রকারে কাজ চালাইবে। কিন্তু তাহারা যদি পাঁচ বুশেলের স্থলে চার বুশেল উৎপাদন করিয়াই বেশী টাকা পায় (এবং আমাদিগের বিশ্বাস যে তাহারা তাহা পাইবে) তবে বাড়তি উৎপাদন করিয়া বাজার নষ্ট করিতে যায় কেন? ষ্টেবিলাইজেশন করপোরেশনের হাতে এই বৎসরের (সিজন) শেষে ১০,০০,০০,০০০ বুশেলের অধিক গম নিঃসন্দেহে থাকিবে। সুসঙ্গত দর পাইবার কোন উপায় অবলম্বিত হইবে ভাবিয়া যদি কৃষকেরা আরও বাড়তি উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে তবে তাহারা ভুল করিয়া বসিবে।"

কৃষকদিগের গম চাষের জমির পরিসর কমাইবার জন্য ফেডারেল ফার্ম বোর্ড সরকারের নামে কৃষিধনবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার জন কুলটারকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করেন।

এগ্রিকাল্চারাল্ মারকেটিং অ্যাক্টের প্রথম ধাক্কাটা গমের বাজারে এমনি ভাবেই লাগিয়াছিল। গমের দর ক্রমশঃ পড়িয়া যাইতে থাকিল; ফেডারেল ফার্ম বোর্ড মনে করিয়াছিলেন যে, এই পতনের গতি রোধ করিতে না পারিলে দেশব্যাপী একটি সঙ্কট উপস্থিত হইবে। অক্টোবর মাসের ষ্টক বাজারের দুর্য্যোগের ফলে শিল্প-জগতে একটা বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। নানা প্রতিষ্ঠান শিল্প-জগতের এই দুর্য্যোগ প্রতিবোধ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। কৃষি পণ্যের দর অত্যধিক ওঠা নাগার প্রতিরোধ করিবার সেরূপ কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই ফেডারেল ফার্ম বোর্ড এই কার্য্যটী গ্রহণ করেন।

গমের দর নামিতে দেখিয়া বহু অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী বলিয়াছিলেন যে দর ৭৫ সেণ্ট পর্য্যন্ত নামিতে পারে। দর নামিতে দেওয়াই হয়ত বুদ্ধিমানের কার্য্য হইত, কেন না তাহা হইলে অনেক কৃষককেই সাহায্যের জন্য সমবায় সঙ্ঘগুলির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে হইত। এবং গমের দর ৭৫ সেণ্ট হইলে আমেরিকার বাড়্তি অংশটা দুনিয়ার বাজারে বিক্রয় হইয়া

যাইতে পারিত। দর এরূপ নামিয়া যাওয়ার জন্য চাষী বাধ্য হইয়াই গম চাষের জমির পরিমাণ খাট করিয়া ফেলিত।

কিন্তু তুলার বেলায় বাড়তি ক্রয় করিবার জন্য ষ্টেবিলাই-জেশন করপোরেশন কায়েম করিবার প্রয়োজন হয় নাই, তবে সমবায়গুলির হাত দিয়া সরকারী টাকা তুলার উপরে ১৬ সেণ্ট হিসাবে কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এরূপভাবে কর্জ্জ দেওয়ায় গমের মতন তুলার দরও নামিয়া যায়। সরকার বাজারদর ১৬ সেণ্ট ধরিয়া কর্জ্জ দিলেও খোলা বাজারে তুলা বিক্রয় হইতেছিল ১৫ সেণ্ট হিসাবে। সুতরাং গমের মত তুলার ক্ষেত্রে বোর্ডকে সরকারী টাকায় তুলা খরিদ করিবার জন্য সমবায় সঙ্ঘগুলিকে কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়। গম ও তুলা ছাড়া বার্লি মধু চাউল পশম তামাক আঙ্গুর প্রভৃতি কৃষিজাত পণ্যকে ফেডারেল ফার্ম বোর্ড সাহায্য করিয়াছেন।

নরম বাজারে পণ্য যাহাতে বিক্রয় করিতে না হয় সেজন্য প্রাইভেট ব্যাঙ্ক বাড়্তি পণ্য জমা রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেয়। এরূপ ব্যক্তিগত কারবারে ঝুঁকিটা থাকে ঋণ-দাতা ও ঋণগ্রহণকারী উভয়ের উপরেই। কিন্তু কৃষক যখন সরকারের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করে তখন কৃষককে কোন ঝুঁকি লইতে হয় না, কেন না প্রাইভেট ব্যাঙ্কের মত সরকার আইন আদালত করিয়া খাতকের নিকট হইতে টাকা উসুল করিতে পারেন না। অর্থাৎ ঝুঁকি-বিশিষ্ট এবং ঝুঁকিহীন কর্জ্জের তফাৎ এইখানে বর্ত্তমান। অতএব যেরূপ ভাবে সরকারী টাকা চাষীদিগকে কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে প্রথা অব্যাহত থাকিলে ঋণের বহরটা বাড়িয়াই যাইবে এবং তাহার ফলে সরকারী তহবিলে টান পড়াও আশ্চর্য্য নহে। তাহা ছাড়া সরকারী টাকায় দর নিয়ন্ত্রণের এরূপভাবে যত অধিক চেষ্টা করা যাইবে চাষীদিগের মধ্যে বাড়্তি উৎপাদনের লোভ ততই অধিক দেখা যাইবে। ফেডারেল ফার্ম বোর্ড এই কথাটা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন।

বাংলার পাট-সমস্যার এক দিক্

বর্ত্তমান সময়ে পাটের বাজারে এইমাত্র সমস্যা হইতেছে "যত পাট তত কাটতি নাই"। তবে তুলা ও চিনির ব্যবসাতে এদেশকে যতটা বেগ পাইতে হয় পাটের বেলায় তত পাইতে হয় না। দুনিয়ার বাজারে বাংলার পাট একচেটিয়া জিনিষ। ইহা বাজারে চালাইবার জন্য কোন প্রকার প্রতিযোগিতায় পড়িতে হয় না, অথবা বাণিজ্য সংরক্ষণের দিক্ দিয়াও কোন কিছু করিবার দরকার হয় না। কোন দিক্ দিয়া যখন কোন প্রকারের বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা নাই তখন এ ব্যবসার উন্নতি সুনিশ্চিত হওয়াই উচিত ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় দুনিয়ার চাহিদা সব সময় ঠিক থাকে না, কখনো কম কখনো বেশী হয়। বর্ত্তমানে কিছু কাল ধরিয়া এই চাহিদা কিছু কিছু মন্দীভূত হইয়াছে। দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য যখন জোর্‌সে চলে তখন পাট হইতে প্রস্তুত মালেরও খুব কাটতি হইয়া থাকে; কারণ বহুপ্রকার মাল চালাইবার জন্য চট অথবা বস্তায় প্যাক করা দরকার হয়। যখন এই সমস্ত চলাচল কমিয়া আসে তখন মাল প্যাক করার দরকারও কমিয়া যায়; ফলে পাট হইতে প্রস্তুত মালের কাটতিও কমে। বর্ত্তমানে ইহাই হইল সমস্যা। দুনিয়া-ব্যাপী ব্যবসায় একটা মন্দা দেখা দিয়াছে। এই মন্দার জের ভারতে আসিয়া পড়ায় এবং দেশের আভ্যন্তরীণ কতকগুলি অনিবার্য্য কারণেও পাট হইতে প্রস্তুত মালের চাহিদা দেশে বিদেশে তেমন বেশী হইতেছে না।

১৯২৯ সনের ১লা জুলাই তারিখে কলিকাতার পাট-ব্যবসায়ীদের ও কলওয়ালাদের একটী সভায় স্থির হয় যে, পাটকলে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ৬০ ঘণ্টা করিয়া কাজের ব্যবস্থা করা হইবে। তখন আশা ছিল দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের গতি অচিরে এতটা ফিরিবে যে, সপ্তাহে বাড়্তি কয় ঘণ্টা খাটাইয়া ফালতু মাল নিঃশেষ করা সহজ

হইবে, এমন কি চট প্রভৃতির চাহিদা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাটের কাট্তি বাড়িবে। দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত সে আশা সফল হয় নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসরেই চট্ ও বস্তার কাট্তি ক্রমাগত বাড়িতেছিল। সম্ভবতঃ সেইজন্য জুট মিল্‌স্ এসোসিয়েশন ভবিষ্যতে পাটের বাজারে যে মন্দা পড়িতে পারে তা ভাবিয়া দেখেন নাই। যখন সভা করিয়া মিলের কাজের ঘণ্টা বাড়াইয়া দেওয়া হয় তখনই দুনিয়াব্যাপী পাটের ব্যবসার মন্দাভাব দেখা দিয়াছে, পরে সে মন্দা বাড়িবে না এমন কোনও কারণ বর্ত্তমান ছিল না। তারপর ১২ মাসে পাট কলগুলিতে এত মাল জমিয়া গিয়াছে যে, তাহা কাটান যাইতেছে না। বর্ত্তমানে চাহিদা এতদূর নামিয়াছে যে, কাজের ঘণ্টা আগের মত (সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা) থাকিলে উৎপন্ন মাল আরও গোলাজাত হইয়া পড়িয়া থাকিত। গানি ট্রেড্ এসোসিয়েশন জুট মিল্‌স্ এসোসিয়েশনকে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, বর্ত্তমানে গোলামজুত মালের পরিমাণ ২৮ কোটি গজ। গত বৎসরে পাটকলে মজুরদের ধর্ম্মঘট না হইলে পরিমাণ আরও ৬½ কোটি গজ বেশী হইত।

বাজারে মাল বেশী অথচ চাহিদা কম। কাজেই মূল্য অসম্ভব রকম পড়িয়া গিয়াছে। মূল্য শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। চট ও বস্তার ব্যবসায়ীরা বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যবসা গুটাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছে। যারা বাজারে আছে তাঁরাও কোন মতে টিঁকিয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে পাটের অথবা পাটে প্রস্তুত মালের যে মূল্য পাওয়া যায় তাহাতে পাট-শিল্পে লাভের আশা দুরাশা মাত্র। বর্ত্তমান অন্ধকার বটে, কিন্তু সম্মুখে আরও বিপদের সম্ভাবনা আছে। বর্ত্তমানে বাজারের যা অবস্থা তাহাতে শীঘ্র যে মাল বিক্রী হইয়া যাইবে তার আশা নাই। ইহার পরে যদি বাজার দর আরও পড়িয়া যায় তবে কলগুলিকে মাল উৎপাদনের প্রকৃত খরচা অপেক্ষাও কম মূল্যে মাল ছাড়িতে হইবে। আরও ভাল দামের আশায় বসিয়া থাকিবার সাহস কে করিবে?

মূল্য যে আরও পড়িয়া যাইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ গত সভায় কাজের সময় সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা হইতে ১লা জুলাই থেকে ৫৪ ঘণ্টায় ফিরাইয়া আনিবার কথা ছিল; ঠিক সেই সময় হইতে পাটের বাজার দর আরও পড়িয়া যাইতে থাকে। কাজের ঘণ্টা প্রস্তাব মত কমাইলে উৎপাদন মাত্র ১০% কমিতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থায় উৎপাদনকে চাহিদার অনুযায়ী করিতে হইলে কাজের ঘণ্টা আরও কমানো দরকার। এই নূতন প্রস্তাব মত কাজের ঘণ্টা কমাইয়া দিলেও গুদামের মাল কোন মতেই সাবাড় হইবে না, বরং আরও এত মাল উৎপন্ন হইবে যে, চাহিদা মিটানোর পর যথেষ্ট মাল বাঁচিবে ও পুরাতন গুদামজাত মাল আরও বাড়িয়া যাইবে। যতদূর অনুমান করা যায় তাহাতে মনে হয় ১৯৩০ সনে বিদেশে পাট ও পাটজাত মালের রপ্তানি ৬০ কোটি টাকার বেশী হইবে না। অথচ গত বৎসরে ৯০ কোটি টাকার রপ্তানি হইয়াছিল। এক বৎসরে পাটের ব্যবসায় এই ৩০ কোটি টাকা হ্রাস বড় সোজা কথা নয়। তবে পাট-কলওয়ালাদের একটা সুবিধা আছে। তারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একত্রে লড়িতে পারে। ১লা জানুয়ারী হইতে উৎপাদন কমান হইবে স্থির হইয়াছে। দরকার হইলে আরও কমাইতে পারিবে।

কিন্তু দরিদ্র চাষীদের অবস্থার কথা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। সাধারণতঃ তারা তাদের কৃষিজাত মাল হইতে বেশী লাভ করিতে পারে না। এই সমস্ত মাল বিক্রয়ের সময় তাদের বেশীর ভাগ ক্রেতার খুসীর উপর নির্ভর করিতে হয়। তাদের নিজেদের কোন সুনিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘ নাই; এমন কি, তাদের কোন প্রকার ভবিষ্যতে প্রাপ্য সঙ্গতিও নাই। পর পর দুই বৎসর পাটের বাজারের অবস্থা এত খারাপ যাওয়ার পর ১৯৩০ সন বাস্তবিকই তাদের পক্ষে ভীষণ হইয়া দাঁড়াইবে। দুনিয়াব্যাপী চাহিদার মন্দা ভাবের ফল তাদের উপরেই বেশী বর্ত্তিবে। উৎপাদন কমাইবার প্রস্তাবেও তাদের কম লোকসান হইবে না। বাঙ্গালার চাষীরা বেশীরভাগ পাটের উপরই নির্ভর করে, সুতরাং বাঙ্গালার চাষীর ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ঘন তমসাচ্ছন্ন।

ভারতের চিনির ব্যবসায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
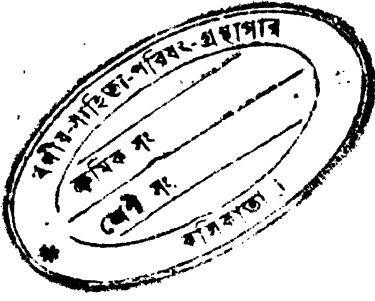
শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম্, এ

সমুদ্রপথে বিদেশ হইতে চিনি আমদানি

বিদেশ হইতে ভারতে চিনি এবং গুড় আমদানির পরিমাণ আলোচ্য সনে ৮৬৮,৮০০ টন (মূল্য ১৫৮৬ কোটি টাকা), পূর্ব্ব বৎসর ৭২৫,৮০০ টন (মূল্য ১৪৫০ কোটি টাকা)। আলোচ্য বর্ষের মত এত গুড় ও চিনি ভারতবর্ষে আর কখনও আমদানি হয় নাই। এই আমদানি মাত্র বৃটিশ ভারতের বন্দরগুলির ভিতর দিয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া দেশীয় রাজ্যের বন্দরগুলি দিয়াও বিদেশ হইতে গুড় এবং চিনি আমদানি হইয়াছে। প্রধানতঃ কাথিওয়াড়ের বন্দর দিয়াই আমদানি হইয়াছে। সমস্ত বন্দর দিয়া একত্রে আলোচ্য সনে মোট আমদানি হইয়াছে ১২৬,৫২৮ টন। যবদ্বীপ হইতেই আমদানি হইয়াছে খুব বেশী। এই দ্বীপ হইতে ১৯২৭-২৮ সনে আমদানি হয় ৬৯২,২০০ টন এবং আলোচ্য সনে ৮৫০,৮০০ টন। বীটের চিনির আমদানি কমিয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে এই চিনি আসিয়াছিল ১৮,০০০ টন; এবং আলোচ্য সনে ৮,৪০০ টন। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশগুলিতে যবদ্বীপ হইতে চিনি আমদানির পরিমাণ কিরূপ বাড়িয়াছে নিম্নের তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে :—

প্রদেশ		১৯২৮—২৯ টন	১৯২৭—২৮ টন
বঙ্গদেশ	...	৩৪৮,৬৮২ (৪১%)	২৮৯,৬০০ (৪১·৭৮%)
বোম্বাই	...	১৯৩,৪৪৬ (২৩%)	১৫৯,০০০ (২৩%)
সিন্ধুদেশ	...	২০৬,৮৭৩ (২৪%)	১৪৮,১০০ (২১·৩৬%)
মাদ্রাজ	...	৬২,৩০০ (৭%)	৫১,১০০ (৭·৩৭%)
ব্রহ্মদেশ	...	৪০,৪৬৫ (৫%)	৪৫,৪০০ (৬·৫৫%)

আলোচ্য সনে ৮,৪০০ টন বীট চিনি আমদানি হইয়াছে, ইহার পূর্ব্ব সনে আমদানি হইয়াছিল ১৮,০০০ টন। আলোচ্য সনে রুশিয়া হইতে একরত্তি চিনিও ভারতভূমিতে আসে নাই, অথচ, ১৯২৭-২৮ সনে রুশিয়া হইতে চিনি আসিয়াছিল কমসে কম ১১,৯০০ টন। আলোচ্য সনে হাঙ্গেরী ২,১০০ টন এবং বিলাত ৩,৩৯০ টন চিনি এদেশে পাঠাইয়াছে। নিম্নের তালিকায় লড়াইয়ের আগের (১৯১৩-১৪ সনের) চিনি আমদানির সহিত ১৯২৩-২৪ সন হইতে ১৯২৮-২৯ সন পর্য্যন্ত ৬ বৎসরের চিনি আমদানির তুলনা করা গেল :—

সকল প্রকারের চিনি আমদানি

যে দেশ হইতে আমদানি হয়	১৯১৩-১৪ (লড়াইয়ের আগে) টন	১৯২৩-২৪ টন	১৯২৪-২৫ টন	১৯২৫-২৬ টন	১৯২৬-২৭ টন	১৯২৭-২৮ টন	১৯২৮-২৯ টন
বিলাত	৯০০	১০০	২০০	৬,৩০০	৯,২০০	৪০০	৪,৮০০
সিংহল	১০০	৫০০	১,১০০	১,৩০০	২,১০০	২,৮০০	৪,০০০
যবদ্বীপ	৫৮৩,০০০	৩৬৮,৩০০	৪৮০,২০০	৬৫৬,৯০০	৬১১,৭০০	৬৯২,২০০	৮৫০,৮০০
মরিশাস	১৩৯,৬০০	১,৩০০	১৩৩,০০০	১৯,১০০	১০০	...	...
ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেণ্ট	২,৯০০	২,৯০০	২৯০০	২,২০০	১,১০০	১,২০০	২,১০০

যে দেশ হইতে আমদানি হয়	১৯১৩-১৪ (লড়াইয়ের আগে)	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
	টন	টন	টন	টন	টন	টন	টন
চীন ও হংকং	১,৫০০	৫,৮০০	২,৬০০	২,২০০	৩,১০০	৩,১০০	২,১০০
মিসর	১০০	৭০০	২০০	৩০০	...	...	...
জাপান	১০০	...	...	...	...	১০০	৩০০
জার্ম্মাণি	৭০০	৫,১০০	২১,৭০০	১,৫০০	৪৯,২০০	১,৬০০	৩০০
অষ্ট্রিয়া }	৭৪,০০০	৬,৩০০	১,৫০০	২,০০০	৯,৮০০	৩০০	...
হাঙ্গেরী }		১১,৫০০	১২,০০০	১৯,১০০	২৫,৯০০	২,৩০০	২,১০০
নেদারল্যাণ্ডস্	...	৩০০	১০০	৮০০	৩,৭০০	৭০০	১,৬০০
বেলজিয়াম	...	২,১০০	৬,৫০০	৬,৮০০	১৩,৮০০	১,১০০	৪০০
চেকোস্লোভাকিয়া	...	৫,৩০০	৫,১০০	১০,৩০০	২৮,৮০০	১,১০০	৪০০
ইতালি	...	৫০০	৯০০	১,২০০	৩,৭০০	২০০	...
মার্কিণ	...	৩০০	৬০০	২,১০০	১৫,৫০০	৫০০	২০০
অন্যান্য দেশ	১০০	৫০০	২,৪০০	৫০০	৪৯,২০০	১৮,৯০০	১,০০০
	৮০৩,০০০	৪১১,৫০০	৬৭১,০০০	৭৩২,৬০০	৮২৬,৯০০	৭২৫,৮০০	৮৬৮,৮০০০
মূল্য টাকা (লাখ)	১৪,২৯	১৪,৭৮	২০,৩৭	১৫,২০	১৮,৩৭	১৪,৫০	১৫৮৬

(ঘ) স্থলপথে চিনি আমদানি

সীমান্তবর্ত্তী দেশগুলি হইতে শাদা রিফাইন্ড্ চিনি ভারতে আদৌ আসে নাই। কাথিওয়াড়ের বন্দরগুলিতে অনেক বিদেশী চিনি আমদানি হয় এবং বীরগ্রাম ও ধানধুকা হইয়া বৃটিশ ভারতে চালান যায়। আলোচ্য সনে এই ধরণের চালানি চিনির পরিমাণ ৭৮,৭৮০ টন।

(ঙ) পুনরায় রপ্তানি

আলোচ্য সনে বৃটিশ ভারত হইতে চিনির পুনঃ রপ্তানি কমিয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে এই ধরণের রপ্তানির পরিমাণ ১৯৮১০ টন (মূল্য ৫৫,৩২,০০০ টাকা), ১৯২৮-২৯ সনে ১০,১৮০ টন (মূল্য ২৩,৩৫,৩৫,৩০০৲)। নিম্নের তালিকায় ১৯২৬—২৭, ১৯২৭—২৮ এবং ১৯২৮-২৯ সনের চিনি রপ্তানির পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

বৃটিশ ভারত হইতে পুনরায় চিনি রপ্তানির তালিকা

	পরিমাণ			মূল্য		
	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
চিনি, ১৬নং ডাচ্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড	টন	টন	টন	টাকা	টাকা	টাকা
বিলাতে	...	২০১	...	৭	৪০.১৭৮	...
ইরাকে	১,৬১২	১,৯৯৯	৫৬০	৪,৩০,০৬৬	৫,৬২,২১০	১,২৭,৮৯৭

	পরিমাণ			মূল্য		
	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
চিনি, ১৬নং ডাচ্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড	টন	টন	টন	টাকা	টাকা	টাকা
আরবে	২,৫৯০	৭,৫৯০	১,৯০৩	৭,৩৬,০০৭	২০,৭৭,৪৩৯	৩,৯৪,৮৮৮
বাহেরিণ দ্বীপপুঞ্জে	২,৪৪৯	২,৯৮৩	২,২৪৩	৭,৬৬,৯৪৯	৯,২৭,০৭০	৪,০৬,৪০৮
পারস্যে	২,০৮৯	২,২০০	৫৪৪	৫,৯২,৮২৫	৫,৭১,১১১	১,০৫,৩০২
সিংহলে	৬১০	১৯৯	১,০৭৩	১,৩৭,৫৫০	৫৯,৭২০	২,৬৬,৪৭১
কেনিয়া জাঞ্জিবার ও পেম্বাতে	১,৯৪৮	১,৯৪৫	২,৩৮৯	৫,০৬,৯০৮	৫,৭৫,৪০৭	৬,৮৫,৪২২
অন্যান্য দেশে	৭০৮	২,৬৭৬	১,৪৭০	১,৯২,০০৫	৭,১৬,৮৭৭	৩,৪৮,৮৫৭
মোট	১২,০০৬	১৯,৭৯৩	১০,১৮২	৩৩,৬৩,৩১৭	৫৫,৩০,০১২	২৩,৩৫,৩৪৫
১৫নং ও তার নীচ ডাচ্ চিনি	...	১৯	...	...	২,০২০	...
মোট চিনি	১২,০০৬	১৯,৮১২	১০,১৮২	৩৩,৬৩,৩১৭	৫৫৩২,০৩২	২৩,৩৫,৩৪৫

(চ) স্থলপথে শাদা চিনি রপ্তানি

আলোচ্য সনে মোট ১,০০৬,৩০০ মণ (৩৬,৯৬৬ টন) চিনি রপ্তানি হইয়াছে, ১৯২৭—২৮ সনে হইয়াছিল ৯৩৯, ৯৮০ মণ (৩৫,৫৩০ টন)। ব্রহ্মদেশ এবং ভারত এই উভয় দেশের সীমান্তবর্ত্তী দেশগুলিতে রপ্তানির হিসাব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(ছ) চিনির ব্যবহার

আলোচ্য সনে ভারতে দেশের লোক কি পরিমাণে চিনি ব্যবহার করিয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া হইল:—

	টন
১৯২৮ সনের ১লা এপ্রিল তারিখে মোট মজুত চিনির পরিমাণ ...	৬২,৯৮০
ভারতে উৎপন্ন চিনি ...	১৬৭,০৫০
সমুদ্র-পথে ভারত হইতে শাদা ও লালচে চিনি রপ্তানি ...	৮৬৮,৮০০
কাথিয়াওয়াড় হইতে স্থলপথে আমদানি ...	৭৮,৭৮০
মোট	১,১৭৭,৬১০

বাদ	টন
বিদেশী রিফাইন করা চিনি সমুদ্রপথে পুনঃ রপ্তানি	১০,১৮০
ভারতে প্রস্তুত চিনি সমুদ্রপথে রপ্তানি ...	৬৪০
স্থলপথে রিফাইন্ করা চিনির রপ্তানি ...	৩৬,৯৭০
১৯২৯ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে মজুত মালের পরিমাণ ...	১১৩,০০০
মোট	১৬০,৭৯০

ভারতে ব্যবহৃত চিনি ... ১,০১৬,৮২০

পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে { ১৯২৬-২৭ সনে ৯০০,০০০ টন; ১৯২৭-২৮ সনে ৯৫১,৫০০ টন }

(৩) ঝোলাগুড়

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ যবদ্বীপ হইতেই ঝোলাগুড় আমদানি হইয়া থাকে। ১৯২৭-২৮ সনে যবদ্বীপ হইতে ভারতে ৯৭,১১০ টন আমদানি হইয়াছিল, (৪০,৩৫,৩০০৲ টাকা মূল্যের) কিন্তু ১৯২৮-২৯ সনে আমদানি কমিয়াছে। এই সনে আমদানির পরিমাণ ৬৮,৫৮০ টন (২৩,৩১,৫৬০৲ টাকা মূল্যের)। ভারতে ঝোলাগুড় প্রস্তুতের পরিমাণ আলোচ্য সনে ১২০,০০০ টন, এবং ইহার আগের সনে ১২৫,০০০ টন। সম্প্রতি ঝোলাগুড়ের দর কিছু চড়িয়াছে। ইহাতে ভারতীয় চিনির ফ্যাক্টরি এবং সংশোধনাগার-গুলির খুব সুবিধা হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বে ঝোলাগুড়ের

দর কমিয়া যাওয়ায় এইগুলির অবস্থা খুব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

(৪) মিষ্টান্ন দ্রব্য

বিদেশ হইতে আমদানি মিষ্টান্নের মধ্যে প্রধানতঃ জ্যাম ও জেলিই প্রধান। এই দুই চিজ, ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছে ১৯২৭-২৮ সনে ১,৪৫১ টন (২৭,৫৬,৮৬০৲ টাকা মূল্যের) এবং আলোচ্য সনে ১,৪৩৭ টন (২৬,৭৬,৪৩০৲ টাকা মূল্যের)। ভারতে প্রস্তুত কন্‌ফেক্‌শনারি বা মিষ্টান্ন-দ্রব্যের মধ্যে মাত্র ৪১,১৮৫ টাকা দামের ৫১·৭ টন আলোচ্য সনে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সনে এই চিজ রপ্তানি হইয়াছিল ৩০,৩৯০ টাকা দামের ৩৯ টন।

আলোচ্য সনে বিদেশ হইতে ভারতে স্যাকারিণ আমদানি হইয়াছে—১,১২,৬৫২ টাকা মূল্যের ২৯,৬১২ পাউণ্ড; ১৯২৭-২৮ সনে আমদানি হয় ৬৮,০৩৭ টাকা মূল্যের ১৭,৯৫১ পাউণ্ড।

রাষ্ট্রের ব্যয়

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ, তত্ত্বনিধি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয়

সমাজে প্রতিনিয়তই যদি একজন আর একজনের ধনসম্পত্তি লুট করে, সুনাম ও সম্ভ্রমের হানি করে, ব্যক্তিগত অধিকারে বাধা দেয়, এবং রুচি ও আদর্শ অনুযায়ী চলার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটায়, তাহা হইলে সকলেরই জীবনে বিকাশ-লাভে অন্তরায় ঘটে। দেশের ভিতরে লোকে যদি নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী চলিয়া জীবনকে বিকশিত করিয়া তুলিবার অধিকার না পায়, তাহা হইলে সমাজের ভিতরে বিশৃঙ্খলা আসে, এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি অসম্ভব হয়। সেইজন্য বাহিরের শত্রুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা যেমন রাষ্ট্রের প্রধান কাজ, তেমনি সমাজের ভিতরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাও উহার একটি মুখ্য কর্ত্তব্য। সকল সভ্য দেশেই রাষ্ট্র এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মানুষ এখনো সভ্যতার যে স্তরে রহিয়াছে, তাহাতে পরস্পরের পক্ষে পরস্পরের অধিকারকে আক্রমণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় নাই। তাই প্রতি দেশে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার খরচ মোট ব্যয়ের তুলনায় নিতান্ত কম নয়, এবং উহা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই কর্ত্তব্য করিবার জন্য প্রতি দেশেই রাষ্ট্রকে তিনটী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য লইতে হয়, যথা (১) পুলিশ, (২) বিচার ও (৩) কারাগার। দেশের ব্যবস্থাপক সভা আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তির অধিকার নির্দ্দেশ করে, অথবা সীমারেখা টানিয়া সংযত করিয়া দেয়। সমাজে পরস্পরের অধিকারে যদি হস্তক্ষেপ না হইত, তাহা হইলে মানুষের জীবন আরও সুখের হইত, সামাজিক উন্নতি আরও দ্রুতগতিতে চলিত। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায়, প্রতি দেশেই এমন কতকগুলি নরনারী থাকে—যাহারা হয় ক্ষমতাগর্ব্বে, নয়তো লোভ বা হিংসার বশে, অথবা সামাজিক অনৈক্য সহ্য করিতে না পারিয়া কিংবা অন্য কোন কারণে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজেদের এবং অপরের জীবনের প্রগতিতে বাধা দেয় ও সমাজে বিশৃঙ্খলা আনে। পুলিশের কাজ হইল এই সব বে-আইনী কাজ যাহাতে সমাজে না হইতে পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকা, এবং এরূপ কাজ হইলে তদন্ত করিয়া আইন-ভঙ্গকারীকে বিচারার্থ আনয়ন করা। বিচারবিভাগের কর্ত্তব্য, আইনভঙ্গ হইয়াছে কিনা তাহা

বিচার করিয়া দোষীকে শাস্তি প্রদান করা। শাস্তির বিধান করিয়া দোষীর উপর প্রতিশোধ লওয়াই সমাজের লক্ষ্য নহে। শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্য আইন-ভঙ্গকারীকে ভবিষ্যতে বে-আইনী কাজ হইতে নিবৃত্ত করা, এবং আইন অমান্য করিতে উন্মুখ ব্যক্তিকে নিশ্চেষ্ট করিয়া দেওয়া।

শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কারাগারে আবদ্ধ রাখাই নিয়ম। প্রাচীন ইয়োরোপে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইত, নয়তো ক্রীতদাস করিয়া রাখা হইত। কাজেই কারাগারের ব্যয় লইয়া তখনকার রাষ্ট্রের মাথা ঘামাইতে হয় নাই। বর্ত্তমান যুগের ব্যবস্থার তুলনায় মধ্যযুগের কারাগার-ব্যবস্থাও অত্যন্ত নিম্ন স্তরের মনে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে ইয়োরোপীয় কারাগারের সংস্কার আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে। বর্ত্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্র ইয়োরোপীয় আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এখন কারাগারের ব্যবস্থা যেমন-তেমন করিলে চলে না। কয়েদীর স্বাস্থ্য ও কর্ম্মক্ষমতা অটুট রাখিয়া তাহার সদ্‌বুদ্ধিকে জাগাইয়া তুলিতে হয়। সে মুক্ত হইলে যাহাতে সমাজের অনুমোদিত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে সেরূপ শিক্ষাও তাহাকে দিতে হয়।

যে কোনো দেশে 'শান্তি ও শৃঙ্খলা'র খাতে খরচের পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানতঃ সমাজের জনবল, নরনারীর নৈতিক জীবন, পৌর আদর্শ, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, অধিবাসীর সংস্থান ও সমাজের গড়নের উপর। যে দেশ শিল্প-প্রধান, যে স্থানের অধিকাংশ নরনারী অসৎ, নৈতিক জীবনে অনুন্নত, পৌর কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিমুখ, সেই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার খাতে ব্যয় স্বভাবতঃই বেশী হইবে। আর যে সমাজের অধিকাংশ লোক এই সকল দোষ হইতে মুক্ত সেই সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা কম। সুতরাং ব্যয়ও অল্প। এই সব কারণ ব্যতীতও কোনো বিশেষ কারণে কোনো দেশে এই খাতে ব্যয় বাড়িতে বা কমিতে পারে। কাজেই বিভিন্ন দেশের 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' রক্ষার ব্যয়ের তুলনামূলক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ঐ সব দেশের পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে খাঁটি তথ্য জানা আবশ্যক। শুধু মাথাপিছু ও প্রতিবর্গ মাইল হিসাবে খরচের তুলনা করিয়া দেখিলে অসম্পূর্ণ জ্ঞানই লাভ হইবে।

ভারতের ব্যয়

ভারতবর্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয় কোন্ বৎসরে কত হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে:—

দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয়

ভারতবর্ষ

	আইন ও বিচার ব্যয়	পুলিশ	মোট ব্যয়
১৮৬১-৬২	১,৮৯,৯৯,০০০৲	২,১৪,৯১,০০০৲	৪,০৪,৯০,০০০৲
১৮৭১-৭২	২,৯১,৪৮,০০০৲	২,২২,০৯,০০০৲	৫,১৩,৫৭,০০০৲
১৮৮১-৮২	৩,২৩,২৮,০০০৲	২,৫৫,৩৯,০০০৲	৫,৭৮,৬৭,০০০৲
১৮৯১-৯২	৩,৭৩,৯৭,০০০৲	৩,৮৬,৮৬,০০০৲	৭,৬০,৮৩,০০০৲
১৯০১-২	৪,৩৯,৩৯,০০০৲	৪,০৩,৭০,০০০৲	৮,৪৩,০৯,০০০৲
১৯১১-১২	৫,৭৩,৭১,০০০৲	৬,৯০,৪৫,০০০৲	১২,৬৪,১৬,০০০৲
১৯১৩-১৪	৬,১০,৬৬,০০০৲	৭,২৯,৭৫,০০০৲	১৩,৪০,৪১,০০০৲
১৯১৪-১৫	৬,৪৬,৬২,০০০৲	৭,৮৫,৫৫,০০০৲	১৪,৩২,১৭,০০০৲
১৯১৫-১৬	৬,৫৯,৪৭,০০০৲	৮,০৩,০৪,০০০৲	১৪,৬২,৫১,০০০৲
১৯১৬-১৭	৬,৫৯,০২,০০০৲	৮,১৩,৬৩,০০০৲	১৪,৭২,৬৫,০০০৲

	আইন ও বিচার ব্যয়	পুলিশ	মোট ব্যয়
১৯১৭-১৮	৬,৭০,৫২,০০০৲	৮,৪২,৫৬,০০০৲	১৫,১৩,০৮,০০০৲
১৯১৮-১৯	৭,২৮,৮৪,০০০৲	৯,১৬,৪৬,০০০৲	১৬,৪৫,৩০,০০০৲
১৯১৯-২০	৭,৯২,৭৬,০০০৲	১০,২৭,৫২,০০০৲	১৮,২০,২৮,০০০৲
১৯২০-২১	৯,২২,২৮,০০০৲	১২,০২,৩৯,০০০৲	২১,২৪,৬৭,০০০৲
১৯২১-২২	৭,৭৯,৮৯,০০০৲	১২,৮৪,০৩,০০০৲	২০,৬৩,৯২,০০০৲

সব দেশেই সামরিক ব্যয়ের তুলনায় আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার খরচ কম। ভারতবর্ষের মোট ব্যয়ের শতকরা কত অংশ সামরিক খাতে এবং কতটা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার খাতে ব্যয় হইয়াছে তাহা নীচের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে—

	১৮৭১-৭২	১৮৯১-৯২	১৯০১-২	১৯১১-১২	১৯১৩-১৪	১৯২১-২২
সামরিক ব্যয়	৩৩·৪%	২৬·৫%	২৮·৯%	২৬·৫%	২৫·৬%	৩০·৬%
শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যয়	১০·৬%	৮·৬%	৯·৪%	১০·৭%	১০·৮%	৮·৬%

এই দুই খাতে ব্যয় কি হারে বাড়িয়াছে তাহার আঁচ পাওয়া যাইবে ১৮৭১-৭২ সনের খরচের সহিত ১৯২১-২২ সনের খরচের তুলনা করিলে। ১৮৭১-৭২ সনের ব্যয়কে যদি ১০০ ধরা যায় তাহা হইলে ১৯২১-২২ সনের সামরিক ব্যয় হয় ৪৭৯ এবং ঐ বৎসর শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতের খরচ হয় ৪০২।*

শাসন বিভাগের ব্যয়

শাসন বিভাগের ব্যয়কে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—

(১) সাধারণ শাসন। ইহার মধ্যে পড়ে শাসন-কর্ত্তাদের বেতন ও ভাতা, দপ্তরখানার (সেক্রেটারিয়েটের) ও সিভিল সার্ভিসের (শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের) ব্যয়, ব্যবস্থাপক ও কর্ম্মসভার খরচ।

(২) রাজনৈতিক, যেমন অপর দেশে গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের বেতন ও সরঞ্জাম খরচ, করদ ও মিত্র রাজ্যে রেসিডেন্ট ও পোলিটিক্যাল এজেন্টদের ব্যয়।

(৩) কর-সংগ্রহ।

এই সব দফায় ভারতবর্ষে কি রকম ব্যয় হয় তাহা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :—

	১৮৬১-৬২	১৮৯১-৯২	১৯১৩-১৪	১৯২১-২২
সাধারণ শাসন ব্যয়	১,৪৮,৪২০০০৲	১,৭৯,১৩০০০৲	২,৯৭,৫৫০০০৲	১১,০৩,৭০০০০৲
রাজনৈতিক ব্যয়	২৪,২০০০০৲	৭৬,৭৭০০০৲	১,৭৩,৮৮০০০৲	২,২৫,৬২০০০৲
কর-সংগ্রহের ব্যয়	৪,২৬,২৬০০০৲	৬,৯১,৭০০০০৲	৯,৭৮,৪৩০০০৲	১২,৭৪,৩৪০০০৲
	৫,৯৮,৮৮০০০৲	৯,৪৭,৬০০০০৲	১৪,৪৯,৮৬০০০৲	২৬,০৩,৬৬০০০৲

ভারতবর্ষে ৬০ বৎসরে শাসন-বিভাগের ব্যয় প্রায় পাঁচগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এই অস্ত বৃদ্ধি যে কেবল এই ভারতবর্ষেই হইয়াছে তাহা নহে, সকল দেশেই শাসন-বিভাগের ব্যয় বাড়িয়াছে। ইহার প্রধান কারণ রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য-বৃদ্ধি। গত ১৫০ বৎসরে সকল দেশেই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়া শাসন-ব্যয়ও

* জি ফিণ্ডলে সিরাজ প্রণীত "দি সায়েন্স অব্ পাব্লিক ফিনান্স" গ্রন্থ হইতে গৃহীত। পৃঃ ৬২০-৬২১।

বাড়িতেছে। শাসনব্যয় শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার চেয়ে দ্রুত গতিতে বাড়িয়াছে।

রাষ্ট্রের ঋণ

আয়ের দ্বারা ব্যয় মিটাইতে না পারিলেই ব্যক্তির মত রাষ্ট্রকেও ঋণ করিতে হয়। রাষ্ট্রের ঋণের দরকার হয় অস্থায়ী কোন প্রয়োজনে, যুদ্ধে অথবা জনহিতকর কোন কাজে খরচ বাৎসরিক রাজস্ব হইতে মিটানো না গেলে। ঋণের কতক অংশ দেশের ধন-সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হয়। ইহাকে কেজো (প্রোডাকটিভ) ঋণ বলা যাইতে পারে। আর যে অংশ সেজন্য ব্যয় হয় না অর্থাৎ বিলাসিতা, যুদ্ধ ইত্যাদিতে ব্যয় হয় তাহাকে অকেজো ঋণ বলা হয়। কেজো কাজে যেসব টাকা সরকার ধার করিয়া খরচ করেন তাহার আয় হইতে অকেজো দেনা শোধ হয়। ভারতের কেজো ও অকেজো দেনার হিসাব পাওয়া যাইবে নীচের তালিকায়—

	১৮৬১-৬২	১৮৯১-৯২	১৯১৩-১৪	১৯২১-২২
কেজো ঋণ	১,৪২,৫১০০০৲	৫.৭৮,৩৬০০০৲	১২,৯১,২০০০০৲	১৮,৯৫,০৯০০০৲
অকেজো ঋণ	৫,১৯,১০০০০৲	৪,৩১,৫২০০০৲	২,২৭,৩৫০০০৲	১৭,০১,৯৬০০০৲
মোট	৬,৬১,৬১০০০৲	১০,০৯,৮৮০০০৲	১৫,১৮,৫৫০০০৲	৩৫,৯৭,০৫০০০৲

গত যুদ্ধের পর হইতে প্রায় সকল দেশেই এই খাতে খরচ বাড়িয়া গিয়াছে। ইয়োরোপের দেশগুলিতে অকেজো ঋণের দায় যে শীঘ্র মিটিবে তাহা মনে হয় না। ভারতেও যুদ্ধের ঠিক আগে মোট ব্যয়ের শতকরা ১'৮ অংশ ছিল অকেজো ঋণ আর যুদ্ধের পরে উহা বাড়িয়া হইয়াছে ৭'১%। ভারতের কেজো ঋণের পরিমাণও যুদ্ধের ঠিক আগে ছিল ১০'৪%, পরে হইয়াছে ৭'৯%।

সাবান-শিল্প

ভারতে ৪ কোটি টাকার সাবান

এদেশে বহুদিন যাবৎ গাত্র পরিষ্কার ও বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্য নানাবিধ পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রিঠার দ্বারা মূল্যবান বস্ত্র ও ধাতব অলঙ্কার পরিষ্কার করা হয়। সাজিমাটি ও কদলী পত্র ভস্ম দ্বারা অতি অল্পকাল পূর্ব্বেও গ্রাম্য ধোবারা কাপড় ধুইত। সরিষার খৈল, মসুর ডাইল প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য অঙ্গ ও কেশ-মার্জ্জনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সাবান-শিল্প শ্রীবৃদ্ধি লাভ করাতে ঐসকল পদার্থের ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে। সাবান আধুনিক যুগের দ্রব্য হইলেও ভারতে এক প্রকার মোটা সাবান বহুদিন যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মুসলমান রাজত্বের শেষ ভাগে ও ইংরাজ আমলের প্রথমাংশে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এরূপ সাবান-নির্ম্মাণের বিবরণ পাওয়া যায়। আধুনিক সাবান-শিল্পে বাঙ্গালীই অগ্রণী। ঢাকা ও চট্ট-গ্রামের সাবান এক শতাব্দী পূর্ব্বেও দেশীয় ব্যবসায়ে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। ঢাকার উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম শ্বেত বস্ত্র নির্ম্মাণের সহিত ঢাকাই সাবানের সম্পর্ক ছিল। বর্ত্তমান জগতে সর্ব্বত্রই সাবানের ব্যবহার ক্ষিপ্রগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে; ভারতেও পাইতেছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সাবান আমদানি হইত; এখন তাহা কিঞ্চিৎ ন্যূন ২ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বিদেশ হইতে যত টাকা মূল্যের সাবান আমদানি হয়, ভারতেও প্রায় সেই পরিমাণ সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতে সাবান কাট্তির পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি টাকা। ভারতে সাবান-শিল্পের প্রসার-বৃদ্ধির যথেষ্ট

অবসর আছে। বিদেশের বড় বড় সাবান-প্রস্তুতকারিগণ ভারতের দিকে প্রতিনিয়ত লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন।

স্বদেশী আন্দোলন ও মহাযুদ্ধ

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালা দেশে সাবান-শিল্পে নব প্রাণ সঞ্চারিত হয়। ঐ সময়ে কতকগুলি সাবান কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিদেশী সাবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে থাকে। যদিও কতকগুলি কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে, তথাপি বিগত মহাযুদ্ধের সময়, যখন বিলাতী সাবান আমদানি প্রায় বন্ধ ছিল, তখন আবার নূতন উদ্যমে বাঙ্গালী সাবান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে।

সাবানের প্রকার-ভেদ

গুণানুসারে নানা শ্রেণীর সাবান বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। মোটামুটি হিসাবে ধরিতে গেলে সেগুলি দুই প্রকারের—(১) বস্ত্রাদি ধুইবার উপযোগী। (২) গাত্র পরিষ্কার করিবার উপযোগী। কাপড় ধোয়া সাবানের যে অনেক উপ-শ্রেণী আছে তাহা সকলেই জানেন। গুড়া সাজিমাটি অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চলের উত্তম ঊষর মৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ঢেলাবল, বার প্রভৃতি বিভিন্নরূপ সাবানের গুণ বিভিন্ন। কিন্তু সবগুলিই বস্ত্রাদি ধুইতে ব্যবহৃত হয়। সুবিখ্যাত সানলাইট সাবান এই শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ সাবান। বঙ্গের নির্ম্মলিন সাবান ইহার সমকক্ষ হইয়াছে।

গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহৃত ও গায়ে মাখা সাবানের কতিপয় গুণ থাকা দরকার। তাড়াতাড়ি যথেষ্ট ফেনা উৎপাদন ও ফেনা বেশ মোলায়েম হওয়া দরকার। গায়ে মাখা সাবানের ফেনায় যাহাতে চামড়া মসৃণ ও স্নিগ্ধ রাখে তাহার উপর নজর রাখা প্রয়োজন। প্রসাধনের সাবানের মধ্যে ট্রান্সপ্যারেণ্ট গ্লিসারিণ সোপ অনেকে পছন্দ করেন। তৈজস পত্র, গৃহের মেজ, আসবাব প্রভৃতি ধোয়া ও বস্ত্ররঞ্জন করার জন্য বিবিধ প্রকারের সাবান আছে।

সাবান নির্ম্মাণের উপকরণ

সাবানকে মোটামুটি ভাবে ক্ষার সহ তৈল চর্ব্বির সংমিশ্রণ বলা যায়। ভারতে সাবান প্রস্তুত করিবার তৈলের অভাব নাই। নারিকেল, মহুয়া, তিল, চিনাবাদাম, তুলাবীজ, পোস্তদানা, সর্ষপ ও পুন্নাল—এ সমস্তই সাবান তৈরীর উপযোগী; কিন্তু ইহাদের গুণাগুণের প্রভেদ আছে। মহুয়া ও নারিকেল তৈলে কঠিন ও চিনাবাদাম ও তিল তৈলে নরম সাবান প্রস্তুত হয়। নারিকেল তৈলের সাবানে যথেষ্ট ফেনা হইয়া থাকে। বস্তুত তৈল কঠিন হইয়া যাওয়ার উপর সাবান প্রস্তুতের সফলতা নির্ভর করে। বিদেশীয় তৈলসমূহের মধ্যে ইউরোপীয় অলিভ এবং আফ্রিকা দেশীয় পাম তৈল উৎকৃষ্ট উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রাণিজ স্নেহ অর্থাৎ চর্ব্বি বহু পরিমাণে সাবান নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। এতদ্দেশে সাবানের জন্য যে চর্ব্বি ব্যবহৃত হয় তাহা কসাইর দোকান হইতে পাই। ভারতে সচরাচর মৃত গো-মহিষাদি হইতে চর্ব্বি নিষ্কাশিত হয় না। এটি একটি প্রকাণ্ড অপচয়।

মৎস্যের তৈলও সাবান প্রস্তুতের একটি প্রধান উপাদান। পশ্চিম উপকূলে যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্য-তৈল প্রস্তুত হয়। তৈল অথবা চর্ব্বি ব্যতীত সাবানের অন্য উপাদান ক্ষার। পূর্ব্বে সাবান প্রস্তুতে বার্জ্জিকা ক্ষারচূর্ণ বেশী প্রযুক্ত হইত। এক্ষণে কষ্টিক সোডাই সাবান প্রস্তুতের ক্ষার উপাদান। সাবানের কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্য উপরি উক্ত দুই শ্রেণীর মূল উপাদান ব্যতীত অন্য কয়েকটী দ্রব্য আবশ্যক হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সোডিয়াম সিলিকেট, সোডা ছাই, কাগজের মণ্ড, সোপষ্টোন অন্যতম। ইহাদিগকে ফিলিং মেটিরিয়াল বলে এবং সাবানের প্রকৃতি অনুসারে এক বা অন্য দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। সাবান সুরভিত ও রঞ্জিত করিবার জন্য নানাবিধ স্বভাবজ ও কৃত্রিম গন্ধ ও বর্ণ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

কলে ও হাতে তৈরী সাবান

আজকালকার উচ্চ শ্রেণীর সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে নানা প্রকার মাল মসলা ও জটিল কলকজাদি আবশ্যক হয়। আধুনিকতম সাবানের কারখানায় হাতে খুব কম কাজ করিতে হয়। উপাদানসমূহ ফুটাইবার পাত্রে

খুব সস্তা দরে যে সকল গায়ে মাখা সাবান বিক্রয় হয় সেগুলি বর্ণ ও গন্ধযুক্ত সাবান ধোয়া সাবান ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ঠাণ্ডা প্রণালীতেও উত্তম সাবান প্রস্তুত করা যায়। তাহা আমাদের দেশের কুটীর-শিল্পের উপযুক্ত; কারণ কলকব্জার বাহুল্য নাই। শুদ্ধ নারিকেল তৈল অথবা উপযুক্ত মাত্রায় নারিকেল তৈল ও চর্ব্বি সংমিশ্রণ করিয়া সামান্য উত্তাপে গলাইয়া লইয়া তাহাতে ক্ষার দ্রবণ যথোপযুক্ত অনুপাতে সংযোগ করিতে হয়। যতক্ষণ না মিশ্রণ ঘোলবৎ হইয়া উঠে ততক্ষণ উহা নাড়া দরকার। পরে তাহাকে ২।১ দিন রাখিয়া দিলে সাবান জমিয়া যায় ও জমিবার পূর্ব্বে মিশ্রণ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সাবান ভালভাবে জমিয়া গেলে উহাকে কাটিয়া ছাপ মারিয়া লওয়া যায়। কেহ কেহ এরূপ সাবান আজকাল প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট লাভ করিতেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা অর্থাগমের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। (পল্লীমঙ্গল—নারায়ণগঞ্জ)

চড়ানো হইতে আরম্ভ করিয়া সাবান একেবারে প্যাক হইয়া বাহির হইয়া আসা পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ প্রায় কলে সম্পন্ন হয়। কলিকাতার পূর্ব্বাংশে, ঢাকা ও নানা ক্ষুদ্র সহরে কাপড় ধোয়া অথবা বাঙ্গালা সাবানের কারখানা আজকাল বেশ চলিতেছে। সর্ব্বপ্রকার সস্তা তৈল ও চর্ব্বি এবং অপরিশুদ্ধ কষ্টিক সোডা ইহার প্রধান উপাদান। তৈল অথবা তৈল ও চর্ব্বির মিশ্রণ বড় বড় লোহার কড়ায় গরম করিয়া তাহাতে ক্ষার দ্রবণ যোগ দিয়া ৭।৮ ঘণ্টা ধরিয়া ফুটান দরকার। এক শ্রেণীর উপাদানের আধিক্য হইলে আর এক শ্রেণীর উপাদান যোগ করিয়া সমীকরণ করা সাধারণ নিয়ম। আগুন হইতে উঠাইয়া সাবান ঠাণ্ডা হইলে আবার তাহাকে গরম করিয়া চীনামাটী, খড়ি, সাজি ক্ষার অথবা অন্য কোন কলেবর-বৃদ্ধির মসলা সংযোগ করিয়া নরম অবস্থায় থাকিতে মাটির ছাঁচে ঢালিয়া কিংবা হস্ত দ্বারা ইচ্ছামত আকার প্রদান করা যায়।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সভা ও ভারতীয় নাবিক

শ্রীকামাখ্যা চরণ বসু, এম, এ, বি, এল

শিল্প-কারখানার শ্রমিকগণের কার্য্যকালের পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে নাবিকদিগের অবস্থা পৃথক। সেজন্য ১৯২৯ সনের ওয়াশিংটন কনফারেন্সে স্থির হয় যে, পর বৎসর জেনোয়ায় সমুদ্র ও নদী প্রভৃতি জলপথের সর্ব্ববিধ নাবিকদিগের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটি সভা আহূত হইবে। উক্ত প্রস্তাবানুসারে ১৯২০ সনে জেনোয়ায় শ্রমিক সভার একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় যে সমস্ত প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে অবশ্য জাহাজ যখন সমুদ্রের উপর চলিতে থাকিবে তখন নাবিকদিগের কার্য্যকাল সপ্তাহে কয় ঘণ্টা করিয়া হইবে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু অনেক বাদানুবাদের পরও সে সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হয় নাই।

অপর যে দুইটী দরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রথমটীতে বলা হয় যে, প্রত্যেক দেশে নাবিকদিগের চাকরী যোগাড় করিয়া দিবে জাহাজের মালিক, নাবিকদিগের সঙ্ঘ, অথবা গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত আফিস। দ্বিতীয় প্রস্তাবটীতে জাহাজ-ডুবি হইলে জাহাজের মালিক কর্ত্তৃক সেই জাহাজের নাবিকদিগকে দুই মাসের পুরা বেতন দিবার কথা ধার্য্য হইয়াছে। অন্য এক প্রস্তাবে বেকার নাবিকদিগের জন্য বীমার ব্যবস্থা করিতে বলা হয়। এই সভায় যে যে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে তাহার সবগুলি ভারতীয় নাবিকদিগের সম্বন্ধে ঠিক খাটে না; কারণ নৌ-বাণিজ্য ব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক উন্নত। সেই জন্য ভারতীয় নাবিকদিগের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন। তবে জাহাজ-ডুবি দ্বারা যে সকল ভারতীয়

নাবিক বেকার হইবে তাহাদিগের সাহায্যের জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে বাঙ্গালা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ব্রহ্মের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহের সহিত পরামর্শ করেন ; সকলেই সভার প্রস্তাবানুযায়ী কোন কিছু ব্যবস্থা করিতে অসম্মতি জানান। এপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই ; তবে ইণ্ডিয়ান মার্চ্চেণ্ট শিপিং অ্যাক্ট (ভারতীয় বাণিজ্যের নৌ-বিধি) পরিবর্ত্তন করিবার কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

এখানে বলা দরকার যে, সর্ব্বপ্রথমে ভারত সরকার যখন উপরোক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদিগকে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, তখন তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের দরকার নাই। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এবং কলিকাতার শিপিং মাষ্টার ঐ মতে মত দিয়া বলেন যে, উপস্থিত যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে জাহাজের মালিক ও নাবিক উভয়েই বেশ সন্তুষ্ট আছে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট বলিলেন যে, নাবিকদিগের চাকরী সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা আছে তাহাতে ভালভাবেই কাজ চলিতেছে, অতএব আর কোন নূতন ব্যবস্থার আবশ্যকতা নাই।

কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরে একটী সরকারী তদন্ত কমিটি বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচনা করেন। তাঁহারা যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে বর্ত্তমান ব্যবস্থার অনেক দোষ বাহির হইয়া পড়ে। ১৯২৬ সনে জেনেভার কনফারেন্সে ভারতীয় নাবিকদের প্রতিনিধি মঃ দাউদ তৎকালীন বেকার-সমস্যার গুরুত্বের প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, উপরোক্ত সরকারী তদন্ত কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ না করার জন্যই এই বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি নাবিকদিগের কার্য্যকাল, মাহিনা, এবং তাহাদিগের চাকরী যোটাইয়া দিবার জন্য যে দালালি প্রথা আছে, এই সমস্ত বিষয় সভায় উপস্থাপিত করেন।

উক্ত কমিটি বেকার নাবিকদিগের জন্য যে বীমার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা গবর্ণমেণ্টের মতে মোটেই কার্য্যোপযোগী নয়, এবং পরে ব্যবস্থা পরিষদেও উহা নামঞ্জুর হয়।

জেনোয়া কনফারেন্সে অল্পবয়স্ক নাবিকদিগের কার্য্য ও ডাক্তারী পরীক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন।

কেবল নাবিকদিগের কথা আলোচনা করিবার জন্য জেনেভায় ১৯২৬ সনে দ্বিতীয় বার এক আন্তর্জ্জাতিক সভা হয়। তাহাতে নাবিকদিগের কার্য্য সম্বন্ধে যে সকল ব্যবস্থা আছে তাহা এক স্থানে বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব এ পর্য্যন্ত তিনটি দেশ গ্রহণ করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নৌ-ব্যাপার সাধারণ শ্রমিকদিগের ব্যবস্থা হইতে অনেকটা পৃথক। সে জন্য আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সভা ১৯২০ সনে একটী মেরিটাইম কমিশন বসান। এই কমিশনে জাহাজের মালিক ও নাবিক উভয়েরই প্রতিনিধিরা স্থান পাইয়াছেন, কিন্তু একমাত্র জাপানের প্রতিনিধি ছাড়া আর সমস্ত প্রতিনিধিই ইউরোপীয়। ইহাতে ভারতীয় প্রতিনিধিরও স্থান হওয়া উচিত, নহিলে ভারতীয় নাবিকদিগের স্বার্থ-রক্ষা সম্বন্ধে উদাসীনতা ঘুচিবে না।

তুলা-শিল্পে বোম্বাই, ল্যাঙ্কাশিয়ার ও জাপান

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন)

(১)

ভারতীয় ব্যবসায়ে মন্দার কারণ

পৃথিবীময় ব্যবসায়-বাণিজ্য মন্দা পড়িয়াছে। কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষের বাজারে বিকি-কিনি মন্দা পড়িয়াছে ; ফলে দেশের ধনিক, শ্রমিক, কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, দালাল সকলেই এই বিশ্বব্যাপী বাজার-মন্দায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের এই অবস্থা দেখিয়া এদেশীয় অর্থনীতিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা ও বিদেশীয় শাসকেরা ইহার কারণ নিরূপণ করিতে বিবিধ ও বিচিত্র তথ্যের অবতারণা

করিতেছেন। সরকারী অর্থসচিব ইহাকে বিশ্বব্যাপী ও বিশেষভাবে মার্কিণ রাজ্যের বাজার-মন্দার ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জগতের বাজারে মাল উদ্‌বৃত্ত হইয়াছে, শিল্পসামগ্রী স্বল্প প্রস্তুত হইতেছে, কাঁচামালের চাহিদা হঠাৎ কমিয়াছে। তাঁহার মতে ভারতের উপর যে টাকায়-আঠারো পেনির এক্সচেঞ্জ চাপানো হইয়াছে তাহা এই বাজার-মন্দার কারণ নহে। কিন্তু এদেশের বণিকরা বিশ্বব্যাপী বাজার-মন্দাকে ইহার জন্য আংশিকভাবে দায়ী করিয়াও ভারতের এই মন্দার জন্য আঠার পেনির একসচেঞ্জ প্রবর্ত্তনকেই দায়ী করিয়া থাকেন। রপ্তানি হইতে আমদানির আধিক্য, ধর্ম্মঘটের প্রসার, শ্রমিক-সমস্যা, কৃষকের অর্থাভাব-জনিত ক্রয় করিবার শক্তি-হ্রাস, কাপড়ের কলের দুর্দ্দশা প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারের জন্য তাঁহারা আঠার পেনি একসচেঞ্জকেই দায়ী করেন। সরকারী অর্থসচিব বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে একসচেঞ্জ-প্রশ্ন পুনরুত্থাপন করা চলে না, এবং তাঁহারা যথাসাধ্য এই রেটেই একসচেঞ্জ চালাইতে চেষ্টা করিবেন। দেশে সোনার টাকা ও সোনার রিজার্ভ প্রবর্ত্তিত না হইলে, এরূপ অস্বাভাবিক একসচেঞ্জ রেট জুলুম করিয়া চালাইলে বাজারের অবস্থার উন্নতি হওয়া কঠিন।

বোম্বাইয়ের সংরক্ষণ

বাজার-মন্দার ফলে ভারতের কাপড়ের কলগুলি বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে বোম্বাইয়ের কলগুলিতে প্রায় সাড়ে এগার কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে। প্রায় ছয় কোটি টাকা লিকুইডেশনে গিয়াছে এবং ৮১টি মিলের স্থানে ৭৩টি মিল দাঁড়াইয়াছিল। অল্প কিছুকালের মধ্যে চারিটি কল প্রায় এক কোটি টাকার বাবদ দেউলিয়া হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বাহিরে অন্যান্য কলে লাভের গণ্ডা শতকরা ৪ হইতে ৩এ নামিয়াছে। ভারতের কাপড়ের কলের প্রধান প্রতিযোগী বর্ত্তমানে জাপান। নূতন বাজেট অনুসারে বিলাতী মালে ১৫% ও অন্য বিদেশী মালে ২০% শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে। তাহাতে আশা করা গিয়াছিল যে, বোম্বাই ও পশ্চিম ভারতে কলের কিছু সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু বিলাতী সুতা যে সব কলে ব্যবহার করিত তাহাদের সম্বন্ধে দেশময় যে বিরুদ্ধতা জাগিয়াছে তাহার ফলেও কলওয়ালারা ব্যতিব্যস্ত হইতেছেন। দেশী সুতায় দেশী কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক কলই ব্যগ্র হইয়াছেন। বিলাতী মূলধনওয়ালা কলের বিপদ ঘনাইতেছে।

ইংল্যাণ্ড হটিতে চায় না

বাজারে গুজব ইংল্যাণ্ড হারিবে না। ল্যাঙ্কাশিয়ারের মিলওয়ালারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। ইহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ৭০টি কল একজোট হইয়াছে। ব্যাঙ্কের সহিত তাহারা টাকা লেনদেনের সুব্যবস্থা করিতেছে। দেশে সুতার কাপড় ব্যবহারের জন্য ভীষণভাবে প্রপাগাণ্ডা চলিতেছে। ইংরাজ মহিলাদিগকে তিনটি করিয়া সুতির পোষাক কিনিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, এমন কি পোষাকের ফ্যাশান বদলাইয়া যাহাতে বেশী কাপড় লাগে তাহার জন্যও চেষ্টা হইতেছে।

ম্যাঞ্চেস্টারের প্রতিযোগী জাপান

ম্যানচেষ্টার বাণিজ্য-সঙ্ঘের ভারতীয় অংশের বার্ষিক প্রতিবেদন হইতে আমরা জানিতে পারি ভারতের সহিত ল্যাঙ্কাশিয়ারের বাণিজ্যের ক্রমশঃই অধোগতি হইতেছে। ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান। ১৯১৩ সনে ইংলণ্ড হইতে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের (৪০ কোটি টাকার উপর) কাপড়চোপড় আসে। ১৯২৭ সনে ৩,১১ লক্ষ পাউণ্ড ১৯২৮ সনে ৩,০৪ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯২৯ সনে ২,৬১ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল আসে। অধোগতিটা বেশ স্পষ্ট।

বিলাত হইতে এদেশে বিস্তর সুতা আসে। সুতার পরিমাণ কমিতেছে; মাঝে দাম বাড়িয়াছিল, কিন্তু পরে কমিতে আরম্ভ করে।

	ওজন	দাম
১৯২৩	৩,৭৪ লক্ষ পাউণ্ড	১৩ লক্ষ পাউণ্ড

	ওজন	দাম
১৯২৭	২,১৬ লক্ষ পাউণ্ড	২,২০ লক্ষ পাউণ্ড
১৯২৮	২,১৭ „	২,৪০ „
১৯২৯	২,১৪ „	২,৪০ „

জাপানের নিজের জাহাজ আছে; ভারতের নিজের জাহাজ নাই বলিলেই চলে। জাপানের তিনটি বড় কোম্পানী চীন-জাপানে ভারতের যে তুলা যায় তাহাই চালান দেয়; এছাড়া বিলাতে যে তুলা ভারত হইতে যায় তাহারও শতকরা পনের ভাগ জাপানীরা চালান দেয়।

জাপান ভারতে কিরূপভাবে তাহার স্থতা ও কাপড় চালান দিতেছে তাহার নমুনা :—

	স্থতা (লক্ষ পাউণ্ড)	কাপড় (লক্ষ গজ)
১৯১২-১৩	৪	৫৯
১৯২৬-২৭	২,৬৬	২৪,৩৬
১৯২৭-২৮	১,৭০	৩২,৩০
১৯২৮-২৯	৭৬	৩৫,৭৩
১৯২৯ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)	৫৩	২৬,৫১

(২)

ইণ্টারন্যাশানাল কটন ফেডারেশন (আন্তর্জ্জাতিক তুলা-সঙ্ঘ) হইতে মিঃ আর্ণো পিয়ার্স এর ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিবেদন খানি ছোট ছোট অক্ষরে ৩০০ পৃষ্ঠার বই; দাম ২১ শিলিং। এই বিরাট গ্রন্থখানি ভারতের প্রত্যেক অর্থনীতিবিদের পাঠ করা উচিত। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নীচে দেওয়া গেল :—

এশিয়া বনাম ইয়োরোপ—শ্রেষ্ঠত্বে

বিগত ইয়োরোপীয় যুদ্ধের পর হইতে এশিয়ায় কাপড়ের কলের সংখ্যা ও প্রসার কিরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সাধারণতঃ কাহারো চোখে পড়ে না। এই অসম্ভব দ্রুত বিস্তারের ফলে আজ কাপড়ের বাজার এমন মন্দা—সর্ব্বত্র উদ্বৃত্ত মালে গুদাম বোঝাই। এশিয়ার এই বস্ত্রশিল্পের দ্রুত প্রসারে ল্যাঙ্কাশিয়ারের বস্ত্র-ব্যবসায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

গত পনের বৎসরে বয়ন-শিল্পের প্রসার যে বেশী হয় নাই তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।—

	মোট স্পিণ্ড্লের সংখ্যা		মোট বৃদ্ধি
	১৯১৪	১৯৩০	
জাপান	২৪,১৪,৫৪৪	৬৮,৩৭,০০০	৪৪,২২,৪৫৬
চীন	৩,০০,০০০	৩৬,৯৯,০০০	৩৩,৯৯,০০০
ভারতবর্ষ	৬৩,৯৭,১৪২	৮৮,০৭,০০০	২৪,০৯,৮৫৮

১৯১৪ হইতে এ পর্য্যন্ত ১,০২,৩১,৩১৪ স্পিণ্ড্ল বাড়িয়াছে।

এক কোটির উপর স্পিণ্ড্ল এশিয়ার কলে চলিতেছে দেখিয়া কেহ যেন উৎফুল্ল না হন। কারণ এই সকল স্পিণ্ড্লের কার্য্যকরী শক্তি ইয়োরোপীয় স্থতার কলের স্পিণ্ড্ল হইতে অনেক কম।

এশিয়ার এক কোটি দুই লক্ষ স্পিণ্ড্ল বিলাতের মাত্র বিশ লক্ষ স্পিণ্ড্লের তুল্য। এদেশের শ্রমিকদের অল্প বেতনের ফলে এরূপ অকেজো কলকব্জাকে বজায় রাখা সম্ভব-পর হইয়াছে। সেইজন্য ভারতের কলে প্রস্তুত স্থতার দাম বেশী হয় না। জাপানে শ্রমিক-আইন না থাকায়, সেখান-কার কলে তাহারা দু দফা কাজ করায়। তাহারা বলে একটা কলকে যত পার তত খাটিয়ে নাও, তারপর অকেজো হইয়া গেলে নূতন কল কেনো; ইতিমধ্যে কলে যে সব বৈজ্ঞানিক উন্নতি হয় তাহা কারখানায় প্রবর্ত্তন না করিলে প্রতিযোগিতার বাজারে টেঁকা দায়। ইহার ফলে জাপানের কারখানায় অত্যন্ত আধুনিক কলকব্জা দেখা যায়, স্থতা ভাল হয়, কাপড়ও প্রচুর হয়। ভারতের কাপড়ের কল অধিকাংশই মান্ধাতার আমলের। তবে ভারতের বস্ত্র-ধনিকরা বর্ত্তমানে সরকারী সংরক্ষণ-নীতির কিঞ্চিৎ সহায়তা পাইতেছেন। এক্ষণে চল্লিশ নম্বরের স্থতার কাপড় পর্য্যন্ত তাঁহারা বিদেশী প্রতিযোগিতাকে ডরান না।

ম্যানেজিং এজেণ্টের সার্থকতা

অধিকাংশ কল ম্যানেজিং এজেণ্টদের দ্বারা পরিচালিত।

পূর্ব্বে যাঁহারা প্রথম কল খুলিতেন তাঁহারাই ম্যানেজিং এজেণ্ট হইতেন এবং লাভ লোকসান না দেখিয়া মোট বিক্রয়ের উপর তাঁহাদিগকে একটা অংশ দেওয়া হইত। কিন্তু যুদ্ধের পর বহু বৎসর লাভের ভাগ না পাওয়ায় অংশী-দারগণ পূর্ব্বের ঐ প্রথা পরিবর্ত্তিত করিতেছেন। বর্ত্তমানে মুনাফার উপর ম্যানেজিং এজেণ্টদের অংশ দেওয়া হয়।

ম্যানেজিং এজেণ্টদের প্রধান কাজ সময় মত কলের টাকা সরবরাহ করা। কারণ ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কের সুবিধা খুব কম মিলই পায়। বোধ হয় ভাল মিলকে টাকা দিতে কোনো ব্যাঙ্ক কার্পণ্য করে না। তবে বোম্বাইয়ের কলগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইলে এই শ্রেণীর ম্যানেজিং এজেণ্টের প্রয়োজন হইবে না।

মিঃ পিয়ার্স বলেন, বর্ত্তমানে ভারতীয় মিলগুলি ভারতের চাহিদা পূরণ করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু শীঘ্রই সে দিন আসিতেছে। গত কয়েক বৎসর হইতে পূর্ব্ব এশিয়া এমন সব কলকব্জা ক্রয় করিতেছে, যাতে সামগ্রী প্রস্তুত হয়। মিঃ পিয়ার্স দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, ভারতবর্ষ ল্যাঙ্কা-শিয়ারের সর্ব্বাপেক্ষা মোটা খরিদ্দার ছিল, কিন্তু যেই সে রাজস্ব-বিষয়ে স্বাধীনতা পাইল অমনি তাহার গুরুর বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। তিনি বলেন যে, ল্যাঙ্কাশিয়ারের ভবিষ্যৎ মিহি কাপড়ের উপর। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতে তাহার চাহিদা খুব কম।

চাই অর্থনীতির সহায়তা

শিল্পের সহিত ব্যবসায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শিল্প আজকাল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে; যে যত সূক্ষ্ম সুদৃঢ় কর্ম্মক্ষম কলকব্জা আবিষ্কার করিতে পারিবে বা সেই শ্রেণীর যন্ত্র সরবরাহ করিয়া শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারিবে লাভ তাহারই। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ভারতীয় মিল ও জাপানী মিলের কাপড়চোপড়। কিন্তু বিচক্ষণ বণিক কেবলমাত্র তাঁহার কলকব্জার উপর নির্ভর করেন না; বাজার জানা বা বোঝা অর্থনীতির একটা মস্ত জিনিষ। সেই অর্থনীতি বিজ্ঞানও আজ ধনিক ব্যবসায়ীর সহায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প-ধনিক কলকব্জার ইঞ্জি-নিয়ারিং ও অর্থনীতি সামান্যই বোঝেন। জাপানের ব্যবসায়ী বা বণিকরা অর্থনীতি বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ে নামিয়াছে। জাপানী বণিকরা জগৎজোড়া অর্থ-নৈতিক সমস্যা অধ্যয়ন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়া-ছেন। সেই জ্ঞান তাঁহারা বস্ত্র-শিল্পে প্রয়োগ করিয়া ভারতকে অভিভূত করিতেছেন।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

(দ্বিতীয় বৎসর)

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের দ্বিতীয় বৎসর অক্টোবর মাসে শেষ হইবে। প্রথম বৎসরে ৮টি অধিবেশন হইয়াছিল ও সর্ব্বমোট ৯ জনে তাঁদের গবেষণার ফলে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে ৭টি অধিবেশনে ৭টি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। নিম্নে একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইল।

প্রথম অধিবেশন। পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি, এ এফ, আর, ইকন্, এস্। রায় মহাশয় তাঁর প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি ব্যাঙ্কিং তদন্ত সমিতির নিকট ইংরাজীতে লিখিয়া পেশ করিয়াছিলেন। সকল পোষ্টাফিস্ হইতে টাকা তুলিবার সুবিধা দেওয়া প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যকরী সমস্যা লইয়া পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে তর্কপ্রশ্ন হয়। স্থান ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। ফেব্রুয়ারী মাস।

দ্বিতীয় অধিবেশন। আর্থিক দিক্ হইতে খদ্দরকে দেখা—শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্, এ, বি, এল্।

তৃতীয় অধিবেশন। মহাত্মা গান্ধীর অর্থ-নৈতিক মতামত। ঐ। খদ্দরের স্বপক্ষে ওকালতীর উত্তরে প্রথম প্রবন্ধ রচিত। দত্ত মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন খদ্দরের উপকারিতা কি এবং বর্ত্তমান যুগে কেন খদ্দর অবলম্বনের বাধা হইবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রধানতঃ ইয়ং ইণ্ডিয়ায় ও কিছু কিছু অন্যত্র প্রকাশিত মহাত্মা গান্ধীর রচিত লেখা হইতে তাঁর অর্থ-নৈতিক মতামত সংগ্রহের ও আলোচনার চেষ্টা হইয়াছে। লেখক প্রসঙ্গতঃ অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার মহাশয়ের মতামত উদ্ধৃত করিয়া তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন, কেন মহাত্মাজীর মতের তুলনায় সরকার মহাশয়ের মত অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত। উভয় প্রবন্ধ মার্চ্চ মাসে ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পঠিত হইয়াছিল।

চতুর্থ অধিবেশন। বোম্বাই ও তুলাশুল্ক—শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্, এ, বি, এল। বহু তথ্য-তালিকা ও অঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, (১) জাপানের বিরুদ্ধে অধিকতর শুল্কে জাপান গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে বোম্বাইয়ের লাভ হইবে না, ল্যাঙ্কাশিয়ার বিনিময়ের নূতন হারের দরুণ ৫% বেশী শুল্ক দিয়াও লাভবান্ হইবে, (২) জাপান তার আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থা এত দৃঢ় ও উন্নত করিয়াছে যে, জাপানের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ কমাইয়া দিলে আমরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইব—বোম্বাই বিশেষ করিয়া মারা পড়িবে, (৩) শুল্ক-বৃদ্ধির প্রয়োজন ত ছিলই না, ১১% শুল্কও তুলিয়া দিবার সময় হইয়াছে—অবাধ বাণিজ্য ছাড়া বোম্বাইয়ের নিজ গৃহ সংস্কারের ইচ্ছা কোন দিন হইবে না। এই অধিবেশন ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ১৩ই এপ্রিল হইয়াছিল।

পঞ্চম অধিবেশন। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সালতামামি—শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্ এ, বি এল্। এবং ঋদ্ধি গঠন—ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, ডি এল্। সালতামামিতে ধনবিজ্ঞান পরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, লক্ষ্য ও কার্য্য-বিবরণী স্থান পাইয়াছে। ডক্টর সেনগুপ্ত বলিয়াছেন যে, ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য রাষ্ট্রের বিনাশের কারণ, তাহা দূর করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার মতে ভারতের মুক্তির পথ র‍্যাশানালিজেশন নয়, ন্যাশান্যালিজেশন। অন্য সকল দেশকেও ঐ পথে আসিতে হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

এটি বিশেষ অধিবেশনরূপে ২১শে জুন, শনিবার ২০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ যোগীশচন্দ্র সিংহ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক অমূল্যচরণ উকীল, বাণেশ্বর দাস ও অন্যান্য অনেকে আলোচনায় যোগদান করেন। আলোচনা এক ঘণ্টারও বেশী হইয়াছিল। পরিশেষে ডাঃ সেনগুপ্ত মহাশয় সকলের প্রশ্ন ও আলোচনার যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করেন।

ষষ্ঠ ও ৭ম অধিবেশন। সাইমন কমিশনে উপস্থাপিত আর্থিক ব্যবস্থা সমস্যা—শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, এম্ এ। সাইমন রিপোর্টে লেটন সাহেব যে ফিস্‌ক্যাল্ ব্যবস্থার কথা তুলিয়াছেন, তাহার স্বরূপ কি এবং তাহা কতদূর টেঁকসই সুধীশ বাবু তাহাই দেখিয়াছেন। ভারতের প্রাদেশিক রাজস্ব মোটের মাথায় ৮৮ কোটি দাঁড়ায়। অথচ রাষ্ট্রের গৌণ-কর্ম্মের জন্য ক্রমাগত বেশী টাকার দরকার হইতেছে, ভবিষ্যতে ১২০।১২৫ কোটি টাকা নহিলে চলিবে না। এই টাকা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? রাষ্ট্রের মুখ্য ব্যয়ের জন্য ভাবিতে হইতেছে না, টাকা বাড়িতেছে, কিন্তু গৌণ ব্যয়ের জন্য বাড়িতেছে না। ইহাই হইল সমস্যা। লেটন এই সমস্যা সমাধানের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন।

বিষয়টি দুইটি অধিবেশনে বিবৃত ও আলোচিত হইয়াছিল। প্রথম দিন বিবৃতিতে ও দ্বিতীয় দিন আলোচনাতে গিয়াছিল। পরিষৎ নিম্নপ্রকার ব্যবস্থা অনুমোদন করেন (১) ভূমি রাজস্ব বাদে কৃষি আয় কর দ্বারা টাকা উঠানো অসঙ্গত নহে, (২) আয় করের নিম্নতম সীমা ২,০০০ টাকার কম হওয়া উচিত নয়, বরং বেশী হওয়া উচিত, কিন্তু ঊর্দ্ধ আয়বিশিষ্ট লোকদিগের নিকট হইতে আরও বেশী কর আদায় করা যাইতে পারে, (৩) ডেথ্ ডিউটি বা মরণের পর রাষ্ট্র কর্ত্তৃক আয়ের একটা অংশ দাবী অযৌক্তিক নহে।—দুটি অধিবেশনই ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে হয়, প্রথমটি ১০ই আগষ্ট, দ্বিতীয়টি ১৭ই আগষ্ট তারিখে।

চিত্র-পরিচয়

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, পি এইচ্ ডি

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য ও উহার মুখপত্র "আর্থিক উন্নতি"র পরিচালক ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্ এ, বি এল্, পি আর এস্, পি এইচ্ ডি মহাশয় বিলাতের রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্সে আমন্ত্রিত হইয়া শীঘ্রই লণ্ডন যাত্রা করিতেছেন। আমরা তাঁহার মনোনয়নে যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন বঙ্গের এই কৃতী সন্তান অধিকতর সাফল্য ও গৌরবমণ্ডিত হইয়া সুস্থদেহে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। "আর্থিক উন্নতি"র জন্মাবধি ইনি উহাকে আপনার স্নেহচ্ছায়ায় রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ স্থাপনের ব্যাপারে ইনিও একজন প্রধান উদ্যোগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। পরিষদের বহু অধিবেশন তাঁহার ভবনে হইয়াছে। বিবিধ বিষয়ের অসংখ্য মূল্যবান্ গ্রন্থপূর্ণ তাঁহার একটি সুবৃহৎ লাইব্রেরী আছে। এই লাইব্রেরীর অর্থ-নৈতিক শাখায় কয়েক হাজার টাকার অতি উৎকৃষ্ট পুস্তকসকল কেনা হইয়াছে। গত ৩।৪ বৎসরে এই শাখা দ্রুতবেগে প্রসার লাভ করিয়াছে। অর্থশাস্ত্রের জটিল সমস্যামূলক অনেক গ্রন্থ ডাঃ লাহার গ্রন্থাগারে স্থান পাইয়াছে। পরিষদের গবেষক ও সভ্যদিগের পড়াশুনার জন্য ডাঃ লাহা তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা পুস্তকাদি ধার দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, পরিষৎ ও পত্রিকা তাঁহার নিকট সর্ব্বপ্রকারে ঋণী।

ডাঃ লাহার পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা দেশবিদেশে আদৃত হইয়াছে। ইয়োরামেরিকার অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ মহলে তাঁহার নাম সুপরিচিত এবং তাঁহার প্রণীত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী এবং সম্পাদিত ইংরেজী পত্রিকা জগতের সর্ব্বত্র গুণী ও রসগ্রাহীদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।

লাহা মহাশয় বাংলার শিল্পোন্নতি প্রচেষ্টাতেও অগ্রণী। তিনি প্রেমচাঁদ জুট মিলস, হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী, গৌহাটি ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশ্যন, বর্দ্ধমান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, পাটিয়া টী কোম্পানী লিমিটেড, বঙ্গীয় কো-অপারেটিভ্ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্ প্রভৃতি নানাবিধ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছেন। প্রাণকিষণ লাহা কোংর অন্যতম অংশীদাররূপে ও হৃষীকেশ অয়েল মিলের অন্যতম স্বত্বাধিকারীরূপে ইনি কৃতকার্য্যতার সহিত ব্যবসা-কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এ ছাড়া কলিকাতার বাহিরে অবস্থিত বিস্তীর্ণ জমিদারীর কার্য্যও ইঁহাকে দেখিতে হয়।

ইনি কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের একজন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি (১৯২৪-২৮) ও ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসমিতির সভাপতি (১৯২৫-২৮), এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং সমিতির সদস্য (১৯২৯-৩০) ছিলেন। ইনি বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের অবৈতনিক সম্পাদক, কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্টের কমিশনার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং বিশ্বভারতীর কোষাধ্যক্ষ। সরল অমায়িক ব্যবহারের দ্বারা ইনি বহুলোকের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ তাঁহার বর্ত্তমান মনোনয়নে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।
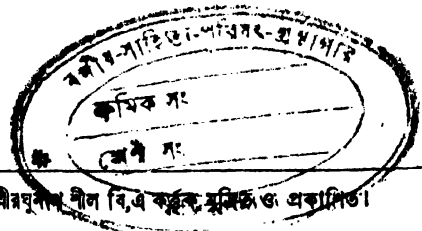
১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল বি,এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা

(১৯২১ সনের হিসাব)

মোট হিন্দুর	...	শতকরা ১২
,, মুসলমানের		,, ২·৪
,, হিন্দু পুরুষের	...	,, ২৫·৪
,, মুসলমান ,,	..	,, ৪·৩
,, হিন্দু মেয়ের		,, ৪·৩
,, মুসলমান ,,	...	,, ·৪

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ১৩৭৪।

মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৪৪,২৭১।

বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়স সম্পন্ন (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক, বালক-বালিকার সংখ্যা ৩,৮২,৭১৩। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালক-বালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) ১৯২৫ সনে ৪৭,০০৬। বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৩, ৩৫,৭০৭।

স্বাস্থ্য

হাজার করা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩৭·৯।

হাজার করা মৃত্যুর হার হিন্দুর মধ্যে (১৯২৩ সনে ২৭·৩ এবং মুসলমানের মধ্যে ৩০·৪।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—৪৪,৮১৩ ১৯২২—৬০,২১৪
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫— ২,১০৭ ১৯২২— ৮৬৬
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫— ৪৩৩ ১৯২২— ৮৬

শিশু-মৃত্যু

(১০ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু	...	২৪০·০
স্ত্রী ,,	...	২৪১·১

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা	৮

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	..	৭৪৩
কুষ্ঠরোগী		৪১৫
অন্ধ	...	১৩৫৫
হিন্দু বিধবা		৯২,৯১১
মুসলমান বিধবা	..	১,০৪,২১৮

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমিরাজস্ব	...	৮,৭৯,৩৪
ষ্ট্যাম্প	...	৫,৯৪,৮৯০
আয়কর	..	৭৪,৬৯১
আবগারী	...	২,১৬,৯০৯
আফিম্	...	৭১,০০১
অন্যান্য	...	৯,২০০
পথকর ও পাব্লিক্ সেস্	...	১,৪৭,৩১৬
মোট	..	১৯,৯৩,৩৪৯

(৮) মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদবাদ জেলার পরিমাণ ফল ১৩,৭০,২৪০ একর। সহরের সংখ্যা ৭ এবং গ্রামের সংখ্যা ১,৯৬৭। মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনে) ৪,২৯,৭০০ একর, অর্থাৎ মাথাপিছু [illegible] একর। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৫·৩৭ ইঞ্চি। গাইগরু ও স্ত্রীমহিষের সংখ্যা ২,৫ ,১৪৪। ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ১,৯৫,৭৯৭। লাঙ্গলের সংখ্যা ১,০৭,৫৮৩।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৪৮,৩২,৬১৩ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ২৩,০৪,৮৭৫ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	...	১২,১৪,১০৪
১৮৮১	...	১২,২৬,৭৯০

১৮৯১	...	১২,৫০,৯৪৬
১৯০১	...	১৩,৩৩,১৮৪
১৯১১	...	১৩,৭২,২৭৪
১৯২১	...	১২,৬২,৫১৪

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৫,৬৮,৭৯০ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ৬,৭৬,২৫৭। প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা ৫৯৫।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা

(১৯২১ সনের হিসাব)

মোট হিন্দুর		শতকরা ১০·৯
„ মুসলমানের	...	„ ৩·৭
„ হিন্দু পুরুষের	...	„ ১৮·৯
„ মুসলমান „	...	„ ৭·১
„ হিন্দু মেয়ের	...	„ ২·৮
„ মুসলমান „	...	„ ·৪

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ১,১৩৪।

মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৩৮,১২২।

বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সসম্পন্ন (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালক-বালিকার সংখ্যা ৩,৩০,৩৮০।

বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালক-বালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) ১৯২৫ সনে ৩৮,৮৪৭।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালক-বালিকার সংখ্যা ২,৯১,৫৩৩।

স্বাস্থ্য

হাজার করা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৪২·০।

হাজার করা মৃত্যুর হার হিন্দুর মধ্যে (ঐ সনে) ২৭·২ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৬·৩।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—৪৩,৩৫৭ ১৯২২—২৪,৪৬৯
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫— ২,২৭৬ ১৯২২— ৫৪৪
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫— ১,০৪৫ ১৯২২— ২৮৪

শিশু-মৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু	...	২৩৬·৩
স্ত্রী শিশু	...	২৩০·৯

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা	...	১২

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	...	১,০০৫
কুষ্ঠরোগী	...	৭১৫
অন্ধ	...	১,৩৫৩
হিন্দু বিধবা	...	৩৪,০৭৭
মুসলমান „	...	৭১,২৩২

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমিরাজস্ব	...	১০,১১,৭৪৫৲
ষ্ট্যাম্প	...	৪,৭১,৬৩৮৲
আয়কর	...	১,৬২,৯১০৲
আবগারী	...	২,২৫,৪১৮৲
আফিম্	...	৫৯,৯০২৲
অন্যান্য	...	২,২৬৮৲
পথকর ও পাব্‌লিক সেস্		১,৬০,৫২৪৲
মোট		২০,৯৪,৪০৫৲

(৯) খুলনা

খুলনা জেলার পরিমাণ ফল ৩০,৪৭,৬৮০ একর। সহরের সংখ্যা ৩ এবং গ্রামের সংখ্যা ২০০৮। মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনে) ৭,৬১,১০০ একর, অর্থাৎ মাথা পিছু ½ একর। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৭২·৬১ ইঞ্চি। গাইগরু ও স্ত্রীমহিষের সংখ্যা ২,৮৯,৭৩৪। ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ৩,৩২,৬২৬। লাঙ্গলের সংখ্যা ১,৭১,১৫৩।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৯৩,১৬,৬৯৯ মণ। ১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৯০,১৮,১৬২ মণ।

জনসংখ্যা

১৮৭২	...	১০,৪৩,৫৪৭
১৮৮১	...	১০,৭৫,৫১১
১৮৯১	...	১১,৭৭,৪৫২
১৯০১	...	১২,৫৩,৫৪৩
১৯১১	...	১৩,৬২,৪১৬
১৯২১	...	১৪,৫৩,০৩৪

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৭,২৬,৪৬১ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ৭,২২,৮৮৭। প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা ৩০৭।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা

মোট হিন্দুর	...	শতকরা ১৪'২
" মুসলমানের	...	" ৭'১
" হিন্দু পুরুষের	...	" ২৪ ৮
" মুসলমান "	...	" ১৩ ১
" হিন্দু মেয়ের	...	" ২'৭
" মুসলমান "	...	" '৪

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ১৯৪২।

মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৫৯,০৫০।

বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়স-সম্পন্ন (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ৪,০৯,৮৫৬।

বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) ১৯২৫ সনে ৭৪,৮৭৪।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৩,৩৪,৯৮২।

স্বাস্থ্য

হাজার করা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ২৯'২।

হাজার করা মৃত্যুর হার হিন্দুর মধ্যে (ঐ সনে) ২২'১ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৪'৫।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—২১,২৩৪ ১৯২২—২০,১৭৯
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫—৩,৫০১ ১৯২২—১,৯৯৭
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫—১৯৩ ১৯২২—২৬

শিশু-মৃত্যু

(১০ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু	...	২৩৫ ০
স্ত্রী "	...	২২১'৬

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা	..	১১

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	.	৭৫৯
কুষ্ঠরোগী	...	১৩৭
অন্ধ	...	৯০১
হিন্দু বিধবা	...	৭৯,৭৫৮
মুসলমান "	...	৫৬,৩৮১

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমিরাজস্ব		৭,২০,৪৫৩৲
ষ্টাম্প	...	৬,৭০,২৮৮৲
আয়কর	..	৪২,৮৭০৲
আবগারী	.	৮০,৮১১৲
আফিম্	...	৩৮,১০৮৲
অন্যান্য	...	২০৩৲
পথকর ও পাবলিক্ সেস্	...	২,৪০,২২৭৲
মোট	...	১৭,৯২,৮৬০৲

শ্রীসুকুমার মিত্র

বাংলার শিক্ষা

১৯২৮-২৯ সনের সরকারী বিবরণ

(ক)

মোট শিক্ষায়তনের সংখ্যা	...	৬৫,৪১৩
পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা	...	৬৩,৩৫৪
মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	...	২৬,২৫,২২২
পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা	...	২৫,০৭,৭১২
কলেজের সংখ্যা	...	৬৮

উচ্চ বিদ্যালয়	...	১০৮৬
মধ্য বিদ্যালয়	..	১৮৭৪
প্রাথমিক বিদ্যালয়	...	৫৭,৬৫৬
বিশেষ বিদ্যালয়	..	৩,২২৬
সরকার-চালিত	..	৩১৭
ডিঃ বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি চালিত		৪ ৩৭৯
সাহায্য-প্রাপ্ত	..	৪৯,৬৮৬
সাহায্যশূন্য	...	৯,৫২৮

(খ)

শিক্ষার মোট ব্যয়	...	৪,৩৩,৯৮,১০৯৲
পূর্ব্ব বৎসরে	...	৪,১৪,৭২,৭৩৫৲
প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে	...	১,৫৩,০৪,৩৮৫৲
ফী হইতে	...	১,৭৮,৩৪,৬৮০৲
মিউনিসিপ্যালিটি হইতে	...	১০,০২,৬২১৲
জেলাবোর্ড হইতে	...	১৭,২৩,৩৩৪৲
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দান হইতে	...	৭৫,৩৬,৯৮৯৲
স্বর্গীয় ডাঃ এইচ্ ষ্টিফেনের দান	...	২৭,৭০০৲
গবর্ণমেণ্টের আর্টস্ কলেজকে দান	...	১,২৯,০০০৲
বে-সরকারী কলেজের জন্য	...	২,৯৯,৭৬২৲

প্রাথমিক শিক্ষা

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী	...	১৫,৬১,৩০৭
বালিকা	...	৭০,৪৫০
হিন্দু শিক্ষার্থী	.	৭০৪,০৯২
মুসলমান "	...	৮৪২,৭৯৪
ব্যয়	...	৬৬,৪২,৩৫২৲

মুসলমান শিক্ষা

মোট মুসলমান শিক্ষার্থী	...	১৩,০৪,৩৭৬
গত বৎসরে	...	১২,৩৫,৭০৬
ছাত্র	...	১০,৪১,৫৭২
ছাত্রী	...	২,৬২,৮০৪

স্ত্রী-শিক্ষা

শিক্ষায়তনের সংখ্যা	...	১৬,৭৯৮
ছাত্রী	...	৪,২৩,০০৫
বালকদের স্কুলের ছাত্রী ধরিয়া	..	৪,৯১,০০০
হিন্দু	...	২,১৮,১৯৬
মুসলমান	...	২,৬২,৮০৪
বিদ্যালয় বাড়িয়াছে ১ বৎসরে	.	৮৩৪
ছাত্রী বাড়িয়াছে	..	১৮,৯৮০

কলিকাতার বহির্ব্বাণিজ্য

(জুন, ১৯৩০)

পূর্ব্ব মাসের তুলনায় বহির্ব্বাণিজ্যের আমদানি মূল্য ৫·৫৫ কোটি টাকা হইতে ৪·১৫ কোটি টাকায় নামিয়া গিয়াছে। রপ্তানির উন্নতি হইয়াছে। মূল্য ৭·৪৩ কোটি টাকা হইতে ৭·৬০ কোটিতে উঠিয়াছে। তবে পূর্ব্ব বৎসরের জুন মাসের তুলনায় আমদানি-রপ্তানি উভয়ের মূল্য যথাক্রমে ৯৪ লক্ষ এবং ১·৩৯ লক্ষ টাকা কম।

গত বৎসবের জুন মাসের তুলনায় প্রধান প্রধান পণ্যের আমদানির হ্রাসবৃদ্ধি এইরূপ :—

		লক্ষ টাকা
সুতির মাল	...	৭৮ (—৭)
কল-কব্জা ও মিল	...	৫১ (—৮)
খনিজ তৈল	...	৩৯ (+৯)
লৌহ ও ইস্পাত	...	৩০ (—১০)
অন্যান্য ধাতু	...	১৮ (সমান)
চিনি	...	১৫ (—১৭)
লোহা-লক্কড়	...	১১ (—৩)
বিজলীসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি	...	১০ (—৩)

সুতরাং দেখা যাইতেছে আলোচ্য মাসে কলিকাতার বিদেশী মাল আমদানির অবস্থা খুব শোচনীয়। এক খনিজ তৈলের আমদানির অবস্থা কিছু ভাল দেখা যায়, নতুবা অন্যান্য সমস্ত মালের আমদানি মূল্যই অল্প-বিস্তর কমিয়া গিয়াছে। সুতির মালের ব্যবসাও অত্যন্ত ঢিলা ছিল। আমদানি কাপড়ের পরিমাণ যদিও ২৬ মিলিয়ন গজ হইতে ৩২ মিলিয়ন গজ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে কিন্তু সর্ব্বপ্রকারের কাপড়ের বাজার দর অসম্ভব রকম কম থাকায় মূল্য ৬৭ লক্ষ টাকা হইতে ৬২ লক্ষ টাকায় নামিয়া গিয়াছে। কল-কব্জা ও

মিলের আমদানি ৮ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। আমদানি মালের মধ্যে একমাত্র খনিজ তৈলের আমদানি কিছু বাড়িয়াছে। ইহার কারণ আলোচ্য মাসে আজেরবাইজান (দক্ষিণ রুশিয়া) হইতে বহু পরিমাণে কেরোসিন তৈল এবং ওলন্দাজ বোর্ণিও হইতে লুব্রিকেটিং অয়েল আমদানি হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাতের দফায় আমদানি কমিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ আলোচ্য মাসে গ্যালভানাইজ্ড্ পাটি ও প্লেট ছাড়া আর সমস্ত মালেরই আমদানি খুব কমিয়া গিয়াছে। চিনির আমদানিও ভয়ানকরূপে কমিয়াছে। আলোচ্য মাসে ইহার আমদানি মূল্য ১৭ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে আবার পরিষ্কার চিনির আমদানি ১৭ হাজার টনের স্থানে আলোচ্য মাসে মাত্র ১৩ হাজার টন হইয়াছে, মূল্যও ২৮ লক্ষ টাকা হইতে ১৫ লক্ষ টাকায় নামিয়া গিয়াছে।

রপ্তানি

১৯২৯ সনের জুন মাসের তুলনায় প্রধান প্রধান পণ্যের রপ্তানির হ্রাসবৃদ্ধি এইরূপ :—

		লক্ষ টাকা
পাট হইতে প্রস্তুত মাল	...	৩০৯ (−৮৮)
কাঁচা পাট	...	১১৫ (−২৭)
তিসি	...	৭৭ (+৩৫)
চা	...	৪৭ (−১৪)
গালা	...	৪১ (−২৪)
শস্য, ডাল ও ময়দা	...	২৯ (+২৯)
হাইড্ ও স্কিন	...	২৮ (−৬)
পিগ্ লৌহ	...	২৩ (−২)

দেশের আমদানি ব্যবসার ন্যায় রপ্তানি ব্যবসার অবস্থা সমভাবে মন্দা থাকার দরুণ আলোচ্য মাসে দেশের রপ্তানি তেমন সুবিধাজনক হয় নাই। তিসি এবং শস্য, ডাল ও ময়দার ঘরে যেটুকু বাড়তি দেখা যায়, অন্যান্য ব্যবসার পড়্তির তুলনায় তাহা যথেষ্ট বলা যাইতে পারে না। চট ও থলের বাজার দর খুব কমিয়া যাওয়াতে আলোচ্য মাসে পাট হইতে প্রস্তুত মালের দাম এত অসম্ভব কমিয়া গিয়াছে। যেটুকু রপ্তানি হইয়াছে, তাহার মধ্যে চটের প্রায় সমস্তটাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং থলের সমস্তটা অষ্ট্রেলিয়া লইয়াছে। কাঁচা পাটের প্রায় সমস্তটা জার্ম্মাণিতে গিয়াছে। ইহার বাজার দরও খুব কম থাকার দরুণ মোট রপ্তানি মূল্যও অনেক কমিয়া গিয়াছে। বিলাতে তিসির চাহিদা খুব বেশী থাকার দরুণ আলোচ্য মাসে তিসির রপ্তানি বেশ্ বাড়িয়াছে। অন্যবারের মত আলোচ্য মাসেও বিলাত ভারতের চায়ের এবং যুক্তরাষ্ট্র গালা ও চামড়ার প্রধান খরিদ্দার ছিল। আলোচ্য মাসে এক চাউলের রপ্তানি খুব বাড়িয়া যাওয়ার দরুণই, শস্য, ডাল ও ময়দার রপ্তানি মূল্য এত বেশী দেখা যাইতেছে। আর এই চাউলের প্রধান খরিদ্দার ছিল মৌরিশাস্। অন্য বারের মত আলোচ্য মাসেও পিগ্ লৌহের প্রধান খরিদ্দার ছিল জাপান।

বিলাতী বস্ত্রের অবস্থা

(১) আমদানি হ্রাস

১৯৩০ সনের জানুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় যত বিলাতী কাপড় আমদানি হইয়াছে বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, কলিকাতায় গত জানুয়ারী মাসে ১৪,০,৭৫,০০৮ খণ্ড কোরা বস্ত্র আমদানি হইয়াছিল এবং গত জুন মাসে সেই স্থলে ১০,৪৩,৯৮০ খণ্ড বস্ত্র আমদানি হইয়াছে

ধোয়া বস্ত্র জানুয়ারী মাসে আমদানি হইয়াছে ৮,৬৩৯৮৫ খণ্ড এবং জুন মাসে সেই স্থলে ৪,৮৩,৪৮২ খণ্ড আমদানি হইয়াছে। রঙ্গীণ বস্ত্র জানুয়ারী মাসে ৬,০৭,৯১১ খণ্ড আমদানি হয় এবং জুন মাসে ৩,৬৪,০১৪ খণ্ড আমদানি হইয়াছিল।

(২) কলিকাতায় বিলাতী বস্ত্র

১৬ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় যত বিলাতী বস্ত্র আমদানি হইয়াছে ও ১৯২৯ সনে ঐ সপ্তাহে যত বিলাতী বস্ত্র আমদানি হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্থান	১৯২৯ সন	১৯৩০ সন
কলিকাতা	১৬৪৭৮০০০ গজ	২৫৪৩০০০ গজ
বোম্বাই	৩৮৪৫০০০ গজ	১১৫০০০ গজ
মান্দ্রাজ	৪০৮০০০ গজ	৫৩৬০০০ গজ
	ধোয়া কাপড়	
কলিকাতা	৩৭১২০০০ গজ	১৮২৭০০০ গজ
বোম্বাই	৬৯৮০০০ গজ	৬৩১০০০ গজ
মান্দ্রাজ	২৭৭০০০ গজ	৭৭৫০০০ গজ
	রঙ্গীণ কাপড়	
কলিকাতা	২৫৫৬০০০ গজ	১৮৯৯০০০ গজ
বোম্বাই	৩৭৫৬০০০ গজ	৯০৩০০০ গজ
মান্দ্রাজ	১৭৪০০০ গজ	২৬০০০০ গজ

দেশী জাহাজ কোম্পানী

দি বেঙ্গল বর্ম্মা ষ্টীম নেভিগেশান্ কোম্পানী লিমিটেড্ নামক যৌথ কারবারটি চট্টগ্রামে কতিপয় অভিজ্ঞ ও অক্লান্ত-কর্ম্মী হিন্দুমুসলমান ব্যবসায়ী সুন্দররূপে পরিচালিত করিয়া অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদানে সমর্থ হইয়াছেন। বলা বাহুল্য বিদেশী বিপক্ষ কোম্পানীগুলির নানা প্রকার প্রতিযোগিতা ও বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও এই কোম্পানী যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে—তাহার মূল কারণ দেশবাসীর সর্ব্বপ্রকার সাহায্য এবং কোম্পানীর পরিচালক ও কর্ম্মচারী-দের সততা ও কর্ম্মশক্তি। এই কোম্পানী বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত নিজেদের জাহাজে যাত্রী ও মাল আনয়ন ও প্রেরণের কার্য্য করিতেছেন। ভবিষ্যতে অন্যান্য লাইনেও এই কোম্পানীর জাহাজ চলিবে। আমরা বাংলা দেশের এই একমাত্র দেশী জাহাজ কোম্পানীর অংশ খরিদ করিতে ও দেশী কোম্পানীতে যাতায়াত করিতে জনসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি।

(দেশের বাণী—নোয়াখালী)

কাগজের ও কাপড়ের মিল

শুনা যাইতেছে যে চট্টগ্রামে একটি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী খুলিয়া কাগজ প্রস্তুতের মিল স্থাপন করিয়া একটি কারবার চালাইবার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। মিঃ যশোদা কুমার মজুমদার নামক জনৈক ভদ্রলোক জার্ম্মাণি হইতে কাগজ প্রস্তুত করা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগেই এই কারবার স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।

পূর্ব্ব কালে বাঙ্গালার অনেক স্থানেই দেশীয় নিয়মে কাগজ প্রস্তুত হইত। বিদেশী কাগজের আমদানির সঙ্গে সঙ্গে তাহা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বহু মুসলমান কাগজ প্রস্তুত করিয়া ও কাগজের ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহা-দিগকে কাগজি বলা হইত। আজ কাল আর তথায় কোন কাগজ প্রস্তুত হয় না। তাহাদের বংশধরগণও এখন আর সেই ব্যবসা করে না, তাহারা সেই শিল্প বর্ত্তমানে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে কাগজের চাহিদা যে প্রকার বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে চট্টগ্রামে অনায়াসে একটি কাগজের কল চলিতে পারে। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মে। বাঁশ কাগজ প্রস্তুতের একটা প্রধান উপকরণ। অতএব চট্টগ্রামে কাগজের মিল চালাইতে কোন প্রকার বেগ পাইতে হইবে না। ব্যবসা হিসাবে যে ইহা একটি লাভের কারবার তাহাতেও কোন ভুল নাই।

চট্টগ্রামে একটী কাপড়ের কল স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে, তাহার জন্যে স্থান সংগ্রহ করিয়া ঘর বাড়ী প্রস্তুত করা হইতেছে। ক্যানভাসারগণ মফঃস্বলে বাহির হইয়া অংশ বিক্রী করিতেছে। প্রত্যেক অংশের মূল্য মাত্র ২৫ টাকা।

আমাদের নোয়াখালী যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিয়া গেল। কিছু দিন পূর্ব্বে এখানে দুইটি নারিকেল তৈলের কল স্থাপনের কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। একটি পুঁজি-পাটা লইয়া অগাধ সলিলে লোপ পাইয়াছে, আর একটি নিজের নাম বজায় রাখিয়া তৈলের কল স্থাপনের কল্পনা ভুলিয়া গিয়া বর্ত্তমানে মহাজনি ও অন্যান্য খুঁটিনাটি কারবার করিয়া কোনরূপে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছে।

(নোয়াখালী হিতৈষী)

দুগ্ধ-সমস্যা

গত ১৮ই মে রায় পঞ্চানন মজুমদার বাহাদুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে মালদহ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক গৃহে একটী সভা আহূত হয় এবং সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় স্থির হয় যে, ১০,০০০৲ মূলধনে মালদহ কো-অপারেটিভ্ মিল্ক ইউনিয়ন লিঃ স্থাপন করা হইবে। প্রত্যেকটী অংশের মূল্য ১০৲ টাকা। তন্মধ্যে ৫৲ টাকা ও ভর্ত্তি ফি ১৲ টাকা আবেদন পত্র সহ উক্ত ইউনিয়নের সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট জমা দিতে হইবে।

বর্ত্তমানে সহরের সন্নিকটে ৩টী গ্রাম্য যৌথ দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি স্থাপন করিয়া গত ডিসেম্বর মাস হইতে প্রত্যহ খাঁটি গো-দুগ্ধ সহরবাসীদিগকে সরবরাহ করা হইতেছে। শীঘ্র আরও কয়েকটী গ্রাম্য দুগ্ধ সমিতি স্থাপন করিয়া যাহাতে সহরবাসী সকলে খাঁটি দুগ্ধ পাইতে পারেন তাহার চেষ্টা করা হইতেছে।

এই সহরের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি এইরূপ সমবায় সমিতির সাহায্যে সহরবাসীর এই অভাবটী দূর করা যায়, তাহা হইলে দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। এই সহরে কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহাতে খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহের প্রতি প্রত্যেক শিক্ষিত ও দেশ-হিতৈষী লোকের দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। সংক্রামক রোগের বীজাণুদ্বারা যাহাতে দুগ্ধ সংক্রামিত না হইতে পারে সেই জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের অনুমোদিত মূল্যবান্ পাত্রে দুগ্ধবহন কার্য্য সম্পাদন করা হইতেছে। ইহা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসার বিষয়। যাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টায় এই অনুষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

শ্রীসত্যগোপাল দাস (মালদহ-সমাচার)

স্বদেশী ভাণ্ডার

নোয়াখালী টাউনের কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত উৎসাহী যুবক "ইউনিয়ন ষ্টোরস্" নামে একটী স্বদেশী দোকান খুলিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা অভয় আশ্রম, দুর্গাপুর খাদিমণ্ডল, খাদিপ্রতিষ্ঠান হইতে খাঁটি খদ্দর আনাইয়া যতদূর সম্ভব শস্তা দরে খদ্দর এবং বঙ্গলক্ষ্মী ও ঢাকেশ্বরী মিলের কাপড় বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহারা স্বদেশী মনোহারী জিনিষাদি রাখার ব্যবস্থা করিবেন। এই সহরে খাঁটি দেশী জিনিষের একটী দোকান একান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা এই অভাব দূর করার চেষ্টা করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

(দেশের বাণী—নোয়াখালী)

রাস্তা-ঘাটের অবস্থা

(১) ফরিদপুর সহর

ক্রস্‌রোড মেরামতের জন্য ১৪২৲ টাকা, সাউথ্ সার্কুলার রোডের জন্য ৬০৩৲, জুবিলী ট্যাঙ্ক রোডের জন্য ২৭৬৲ টাকা, উকীলপাড়া রোডের জন্য ২৬০৲ টাকা, সোয়ারীঘাটা রোডের জন্য ৯২৲ টাকা, লোন আফিস রোডের জন্য ৬৪৲ টাকা, সেণ্ট্রাল রোডের জন্য ৩২৩৲ টাকা, থানা রোডের জন্য ২৯৬৲ টাকা, মেলা রোডের জন্য ১৪০৲ টাকা, ডায়গোনাল রোডের জন্য ৫৮৲ টাকা, এবং কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীটের জন্য ৩৪২৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

দক্ষিণ ফরিদপুর রোড হইতে মোল্লা কমরদ্দির বাসা পর্য্যন্ত তিন ফুট প্রশস্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য ৪৬২৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কুটীবাড়ী রোড পাকা করিবার জন্য ৪৬৫৲ টাকা এবং কবরখানা রোড পাকা করিবার জন্য ৪৯৩৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

এস্‌ব্যাঙ্ক রোড কিছুটা পাকা করিবার জন্য বাবু রসিক লাল গুহ, প্যারী ধুপী প্রভৃতি আবেদন করিয়াছিলেন। ঐ আবেদনকারীদের অঙ্গীকৃত দান ১৫০৲ টাকা দিলে ঐ রাস্তা ৫০০ শত ফুট পাকা করিবার জন্য কাজ আরম্ভ হইবে এবং ঐ কাজের জন্য ৪০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ফরিদপুর মিউনিসিপালিটীর মধ্যে টেপাখোলায় বহু ভদ্রলোক এবং নানা শ্রেণীর লোক বাস করেন। পাটপশার পরগণার মালিক জমিদারদিগের ৩টী কাছারীও এখানে আছে। উক্ত ৩টী জমিদারী কাছারী এবং মহাজন প্রভৃতি

স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ হইতে প্রভূত ট্যাক্স আদায় হয়। মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত টেপাখোলা-বানিয়াপাড়া রোড দুই বৎসরের অধিককাল নদীতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের সহরে ও রেল ষ্টীমার ষ্টেশনে যাতায়াত এবং যানবাহনাদি যোগে মালামাল আমদানি রপ্তানির উহাই একমাত্র রাস্তা ছিল। উক্ত রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাতায়াতের অসুবিধা হওয়ার বিষয়ে বহু আবেদন নিবেদন করার পর মিউনিসিপ্যালিটী হইতে স্থানীয় মহাজনপট্টির পশ্চিম মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে কিছু কিছু মাটী কিছুদিন হইল ফেলা হইয়াছে। কিন্তু উহাতে দুই দিকের রাস্তার সহিত কোন যোগাযোগ হয় নাই। শুক্না কালে পাটের আফিসের উপর দিয়া কোনরূপে চলাচল করা গিয়াছে। বর্ত্তমানে উক্ত মাঠের মধ্যে এবং মহাজনপট্টির গলির মধ্যে ১॥০ হইতে ২ ফুট পরিমাণ জল কাদা। উহার উপর দিয়াই চলাফেরা করিতে হয়। (ফরিদপুর-হিতৈষী)

(২) বরিশাল সহর

স্থানীয় পুরাতন বাজারে নূতন বাজার অপেক্ষা দ্রব্যাদি বেশী আসে; কিন্তু বাজারের মধ্যে প্রবেশ করার উপযুক্ত রাস্তা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। দুটি সাধারণ পথে ঢুকিয়া রাস্তাহীন স্থান দিয়া যাতায়াত করিতে লোকের ভীড়ের মধ্যে কে কার গায়ের উপর পড়ে অথবা পদদলিত হয় তাহার ঠিক নাই। পুরাতন বাজারের অবস্থার উন্নতি করা আবশ্যক। তাহা না করিলে পুরাতন বাজার কালক্রমে শ্রীহীন হইবে। আমরা পুরাতন বাজারের উন্নতি কামনা করি। পুরাতন বাজারের মৎস্য-ক্রেতাদের রাস্তার কষ্টের একশেষ। একদল পাকা পোস্তার উপরে বসিয়া মৎস্য বিক্রয় করে; সেই সাধারণ পথটুকুর মধ্যে আর একদল মৎস্যের ঝুড়ি রাখিয়া বিক্রয় করিতে বসে। সেখানে ভয়ানক ভীড়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া সহজে মৎস্য ক্রয় করা যায় না। যাহারা পথের মধ্যে বসে তাহাদের ও শৌল, কই, খলিসা ও মাগুর মৎস্য বিক্রেতাদের মধ্যে যে জায়গা সময় সময় খালি পড়িয়া থাকে, তথায় এক দল ইলিশ মৎস্য বিক্রেতাকে স্থান করিয়া দিলে সুবিধা হইতে পারে। এ বিষয় বাজারের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারিগণের নিকট বুঝাইয়া বলা হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই।

(কাশীপুরনিবাসী—বরিশাল)

(৩) কাল্না (বর্দ্ধমান)

কাল্নার রাজবাটীর পশ্চিমে যে গয়লাপাড়া রাস্তাটী আছে উহা বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের। ঐ রাস্তার অবস্থা অতিশয় খারাপ হইয়াছে। যানবাহনাদি দূরের কথা, পাদচারীদের কাদা ভাঙ্গিয়া যাতায়াতও দুরূহ। রাজসরকার হইতে ঐ রাস্তা মেরামত হয়। এবার ঐ রাস্তা মেরামত না হওয়ায় লোকের কষ্টের অবধি নাই। শুনিতেছি রাজসরকার হইতে মাল মসলা পাইলে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের কষ্ট দূরীকরণের মানসে ঐ রাস্তা মেরামত করাইয়া দিবেন। ইহা যদি সত্য হয়, তবে উহা যত শীঘ্র সম্পন্ন হয় ততই ভাল। আমরা এ বিষয়ে মহারাজাধিরাজকুমার সাহেবের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কাল্না মিউনিসিপ্যালিটীর ১ ও ২ নং ওয়ার্ডের বাউণ্ডারি রাস্তা, যাহা ভাদুড়ীপাড়া মহল্লাস্থিত কাল্না বিশ্বম্ভর প্রেসের নিকট হইতে ঘটক পাড়ায় গিয়া লক্ষ্মণ পাড়া রাস্তার সহিত মিশিয়াছে, উহার কতকাংশ কাঁচা। এই বর্ষায় যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে যানবাহনাদি দূরের কথা, মনুষ্য-চলাচলও দুষ্কর। এরূপ রাস্তা মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে কলঙ্কবিশেষ। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের কি এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িবে না?

(পল্লীবাসী—কাল্না)

(৪) নোয়াখালী—বাঁধ চাই

আজ কয়েক দিন হইল, টাকার অভাবে, বিশেষতঃ বৃষ্টি ও জোয়ারের দরুণ বাঁধের কার্য্য স্থগিত ছিল। ইতিমধ্যে বাঁধ কমিটি ও জনসাধারণের কয়েকটী সভাতে বাক্‌বিতণ্ডার দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, যে প্রকারেই হউক টাকা সংগ্রহ করিয়া উক্ত বাঁধের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেই হইবে। এই বাঁধের জন্য অনুমান ৭ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটীর প্রতিশ্রুত

এক হাজার ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রতিশ্রুত দুই হাজার, বাকী ৪ হাজার টাকা জনসাধারণ হইতে চাঁদা উঠাইয়া ও বাঁধ কমিটির পক্ষে কতিপয় বিশিষ্ট লোক স্থানীয় কোনও ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া আপাততঃ বাঁধের কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে স্থির হইয়াছে।

অদ্য প্রাতঃকাল হইতে জনসাধারণ উৎসাহের সহিত চাঁদা সংগ্রহের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মফঃস্বল ও টাউনের কতিপয় ভদ্রলোক হইতে অদ্যই বার শ টাকার উর্দ্ধে চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

(৫) কাঁথি—জলপথের ব্যবস্থা

(ক) কাঁথিতে মোটর বোট

কলিকাতা হইতে জলপথে মোটর বোটে কাঁথিতে মাল আমদানি ও রপ্তানির সুবিধাদির বিষয় অবগত হইবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতার মোটর ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী একখানি বড় মোটর বোট লইয়া কাঁথি আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকল অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ক্যানেল পথে এই মোটর বোটে মাল আমদানি রপ্তানি করা হইলে উহাতে ক্যানেল মাশুলাদিতে অনেক ব্যয় পড়িবে। যদি সমুদ্রপথে কালীনগর পর্য্যন্ত আসিয়া, পরে ক্যানেল পথে কাঁথি পর্য্যন্ত ঐ বোট যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে অনেকটা কম ব্যয় হইতে পারে বটে, কিন্তু উত্তাল-তরঙ্গময় সমুদ্রপথে সব সময়, বিশেষতঃ দক্ষিণা হাওয়ার দিনে ঐ মোটর বোট যাতায়াত করা নিরাপদ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ বহুদিন পূর্ব্বে যখন হোর'মলার কোম্পানী কাঁথি হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত জলপথে ষ্টীমার দ্বারা যাত্রী ও মাল লইয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহারা ঐ ভীষণ বিপদ-সঙ্কুল সমুদ্রপথে ষ্টীমার লইয়া যাতায়াতে সাহসী না হইয়া ক্যানেল পথেই উহা চালাইয়াছিলেন। ইহাতে অত্যধিক ব্যয়ের জন্য তাঁহাদের সেই যাত্রী ও মালবাহী ষ্টীমার সার্ভিসও অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। এ অবস্থায় ইঁহাদের ঐ চেষ্টা কতদূর কৃতকার্য্য হইবে তাহা বলা যায় না। যাহাই হউক এই মোটর বোট দ্বারা যদি নিরাপদে ও সাধারণের সুবিধাজনকভাবে মাল আমদানি ও রপ্তানির ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে উহা স্থায়ী হইবার আশা করা যায়।

(নীহার—কাঁথি)

(খ) পারাপারে আরও বোট চাই

সুদক্ষ দাঁড়ী-মাঝি, উপযুক্ত ইজারাদার ও পারাপারের উপযোগী সাজ-সরঞ্জামযুক্ত উত্তম বোটের দ্বারা এই ঘাটের পারাপারের সুব্যবস্থা না হইলে, সমুদ্রপথ পারাপার হওয়া ভীষণ বিপজ্জনক। আমরা অবগত হইলাম, বর্ত্তমানে এই ঘাটে ১৬।১৭ খানি বোটের স্থলে ৯।১০ খানি মাত্র বোট পারাপার-কার্য্যে নিযুক্ত করায়, ইহার উপর শ্রীক্ষীরোদ বড়াই, শ্রীভীম দাস, সেখ নসরৎ প্রভৃতি ঘাটের কয়েকজন প্রাচীন ও সুদক্ষ মিঞাদের বোটগুলি এই ঘাটের পারাপার কার্য্য হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়ায় এখন সাধারণের পারাপার কার্য্যে নানা অসুবিধা ঘটিয়াছে এবং আশঙ্কাও জন্মিয়াছে। এই জীবন-মরণ-সমস্যাজনক দুর্গম সমুদ্রপথের পারাপার ব্যাপারে এমন খামখেয়ালীর গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিয়া অবিলম্বে প্রতিকার করিবার জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি। অধিকাংশ সময় দেখা গিয়াছে যে, এই ভাদ্র মাসেই উক্ত ঘাটে পারাপার কালে অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটিয়া বহুসংখ্যক নরনারীর অকালে সলিল-সমাধি ঘটিয়াছে। এ অবস্থায় এখন সত্বর এই ঘাট-পারাপারের সুব্যবস্থার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি পতিত হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।

(নীহার—কাঁথি)

(৬) রাধার ঘাটে গাড়ীর মাশুল

বহরমপুরের অপর পারে ভাগীরথী তীরে রাধার ঘাটে পারের মাশুল আদায় করিবার জন্য খেয়াঘাটের ডাককারীদিগের আস্তানা আছে। যে সকল লোক এবং যানবাহন খেয়া নৌকায় পার হয়, সেই স্থানে তাহাদের নিকট হইতে মাশুল আদায় করিয়া লওয়া হয়। অনেকে গো-যানে আসিয়া রাধার ঘাটে নামিয়া পরপারে যাইয়া থাকেন।

গো-গাড়ী পার করাইবার আবশ্যক হয় না। যাঁহারা সেই দিন বা পরদিন ফিরিয়া আসেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য গো-গাড়ী রাধার ঘাটেই থাকে, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরোহীরা নামিয়া পারে চলিয়া যান এবং গাড়োয়ান তাহার খালি গাড়ী লইয়া ফিরিয়া যায়। এই সকল গো-গাড়ীর গাড়োয়ানদের নিকট হইতে এতদিন কোনওরূপ মাশুল আদায় করা হইত না, কিন্তু কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে এই সকল গাড়ীর গাড়োয়ানদিগকে প্রত্যেক গাড়ীর জন্য ৵০ দুই আনা হিসাবে মাশুল দিতে হইতেছে। এইরূপ মাশুল আদায়ের অধিকার খেয়াঘাটের ডাককারী-দিগের আছে কিনা আমরা জানি না। জেলা-বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশানুসারে এইরূপ মাশুল আদায় করা হইতেছে কিনা তাহাও আমরা অবগত নহি। মোটরবাসের সংখ্যাধিক্যবশতঃ একেই ত দরিদ্র গাড়োয়ানদিগের উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, তাহার উপর যদি তাহাদিগকে খেয়াঘাটের নিকট উপস্থিত হইলেই ৵০ দুই আনা করিয়া মাশুল দিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে যে বিব্রত হইতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। যে সকল মাল বোঝাই গো-গাড়ী পারে যায় না, সেই সকল গো-গাড়ীর মাল পরপারে লইয়া যাওয়া হয়, সুতরাং সেই সকল গো-গাড়ীর গাড়োয়ানদিগকে পারের কড়ি দিতেই হয়। কিন্তু যে সকল খালি গাড়ী রাধার ঘাটে উপস্থিত থাকিয়া অপর পার হইতে আগত মাল বোঝাই লইয়া থাকে, সেই সকল গাড়ীর গাড়োয়ানদিগকে অনর্থক ৵০ আনা করিয়া মাশুল দিতে হয়। মাল নৌকায় পার করিয়া দিয়া খেয়াঘাটের বর্ত্তমান মালিকগণ যথারীতি মাশুল আদায় করিয়া লন। সুতরাং গাড়োয়ানগণের নিকট আবার ৵০ করিয়া আদায় করিবেন কেন? আর যে সকল গাড়ীর আরোহীরা নামিয়া গঙ্গাপার হন, গাড়ী পার হয় না, সে সকল ক্ষেত্রে ত আরোহীরাই মাশুল দিয়া গঙ্গা পার হন, সে সকল গাড়ীর গাড়োয়ানরাই বা মাশুল দিবে কেন?

(কান্দীবান্ধব—মুর্শিদাবাদ)

ধানগাছে পোকার উপদ্রব

শ্রীযুক্ত এম সুবাদার আলী ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার চন্দ মহাশয় জানাইতেছেন, ঢাকা জিলার অন্তর্গত পং ভাওয়াল মধ্যে কাপাসিয়া থানাধীন বহু স্থানে গত বারের বোরোধান গাছের মধ্যে পাখা-শক্ত, কাল রঙ্গের এক প্রকার পোকা আসিয়া সমস্ত ধান গাছের পাতার রস শোষণ করিয়া খাইয়া ফেলিত। এই পোকা কিছুদিন ধানগাছে থাকিলে গাছের রং শাদা ও গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়িত। অল্প দিনে ইহার বংশ বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে সমস্ত বোরো জমি নষ্ট করিয়া আশু ধানে ধরিয়াছিল। তাহাও ঐ ভাবে পোকার অত্যাচারে নষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ সব পোকা অত্যধিক পরিমাণে শাইল বা আমন জমিতে লাগিয়াছে। উপর্য্যুপরি দুইটি ফসল একেবারে নষ্ট হওয়ায় লোকে বর্ত্তমান ফসলটির দিকে চাহিয়াছিল। কিন্তু ইহাও নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

গোসাপ-ধ্বংসে দেশের ক্ষতি

কতকগুলি লোক ব্যবসার খাতিরে এদেশের গোসাপ-গুলি মারিয়া তাহার চামড়া নিয়া যাইতেছে। ফলে দেশে সর্পের উপদ্রব ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রায়ই নানাস্থান হইতে সর্পের উপদ্রবের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং নিজেরাও আজকাল বেশী পরিমাণে সাপের চলাচল দেখিতে পাইতেছি। গোসাপ অন্যান্য সর্পের ডিম ও ছোট ছোট বাচ্চা খাইয়া ফেলে, কাজেই যেখানে গোসাপ বেশী, সেখানে অন্যান্য সর্পের উপদ্রব খুব কম। এমন কি গোসাপ থাকিলে অন্য সর্প সেখানে থাকিতেও ভয় পায়। গোসাপ ২।৩ জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। আইনের বিধান মত নাকি বড় ও কাল বর্ণের গোসাপগুলি মারিতে নিষেধ আছে; কিন্তু হলদে বা লাল রংয়ের মধ্যমাকৃতি গোসাপগুলি আইনের সীমাবহির্ভূত বলিয়া প্রত্যহ বহু গোসাপ ধ্বংস হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে এই জাতীয় গোসাপগুলিই অন্য সর্প নষ্ট করে বেশী। ব্যবসার দরুণ দেশে একটা হিংস্র জীবের অত্যাচার বাড়াইয়া দেওয়া মোটেই সঙ্গত মনে

হয় না। আরও ২।৪ বৎসর এ ভাবে গোসাপ ধ্বংস হইলে এ দেশে অন্যান্য সর্পের উপদ্রবে চলাফিরা অসম্ভব হইবে।

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

কলিকাতার বাজার দর

কলিকাতার বাজারে সরিষার তৈল ॥১০ সের, নারিকেল তৈল ॥০ সের, ময়দা ৵০ সের, ঘৃত ১॥০ সের। সুতরাং কলিকাতার বাজারে অনেক জিনিষের দর নামিয়াছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় গোয়াড়ী (নদীয়া) বাজারে ঐ সকল দ্রব্যের কোনটার দর কমে নাই ; কিন্তু কলিকাতা বাজার চড়িলে সেই দিন হইতে গোয়াড়ী বাজারে দ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যায়। ইহা কম দুঃখের কথা নহে। এ বিষয়ে একটা প্রতিকার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আশা করি সহরবাসী এই বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। দরিদ্র অধিবাসীদের পক্ষে ইহা বড়ই কষ্টের কারণ হয়। (বঙ্গরত্ন)

প্রাথমিক শিক্ষা-কর

প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাশ হইলে জমিদার এবং কৃষকের নিকট যে কর আদায় করা হইবে তাহাতে মোটের উপর কত টাকা হইবে—মিঃ ফজলাল হক্ ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে এক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে শিক্ষা-মন্ত্রী মিঃ নাজিম উদ্দীন বলেন—জমিদারগণের নিকট হইতে ২৮,৬৭০০০ টাকা এবং কৃষকগণের নিকট হইতে ৮৩,০৮,০০০ টাকা—মোট ১,১১,৭৫,০০০ টাকা পাওয়া যাইবে।

(পল্লীবাসী)

ভারতে বিলাতী মূলধন

বিলাতের 'ফিনান্সিয়্যাল টাইমস্' ভারতে বৃটিশ মূলধন কিরূপ খাটিতেছে তাহার একটা তালিকা প্রকাশ করিয়াছে। তাহা এই ঃ—

(১) সরকারী ষ্টার্লিং ঋণ	...	২৬,১০	লক্ষ পাউণ্ড
(২) গ্যারাটি দেওয়া রেলওয়ে ঋণ		১২,০০	,, ,,
(৩) বৃটিশ যুদ্ধ ঋণ	...	১,৭০	,, ,,
(৪) স্থানীয় ঋণ	...	১,০০	,, ,,
(৫) ভারতে যে সব কোম্পানী আছে		৭,৫০	,, ,,
(৬) ভারতের বাহিরে কোম্পানী		১০.০০	,, ,,
মোট		৫৮ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড	

অর্থাৎ প্রায় ৭৯০ কোটি টাকা। শ্রীযুত বিড়্লার হিসাব মতে ভারতে ১৩৫০ কোটি টাকা বৃটিশ মূলধন খাটিতেছে; সরকারী পক্ষের মুখপাত্র সার জর্জ্জ সুষ্টার সাহেব বলেন ৫০০ মিলিয়ন পাউণ্ড,—টাইমস্ পত্রিকার হিসাবের চেয়ে প্রায় ৮৩ মিলিয়ন পাউণ্ড কম।

ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ

ভারত গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৬৲ টাকা সুদে ২৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ঋণ পাইয়াছেন।

৫ কোটি টাকার উপর পেন্সন

বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টে মিঃ অষ্টিন্. ভারতের পেন্সন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যে জবাব পাইয়াছেন তাহার মর্ম্ম আমরা নিম্নে দিতেছি। গত বৎসর (৩১শে মার্চ্চ ১৯৩০) কত লোককে কত টাকা দেওয়া হইয়াছিল সেই হিসাব প্রদত্ত হইতেছে—

সামরিক		সংখ্যা	পাউণ্ড
সামরিক কর্ম্মচারী (সমর ও অন্যান্য সামরিক বিভাগে)		৩৭৯৩	১,৭৫৬,১৪৮
ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস		৫৬৯	৩৩১,৫১৩
রয়েল ইণ্ডিয়ান মেরিণ্		১১৫	৫৬.০১৭
পুরাতন ইণ্ডিয়ান নেভি		১	৮৮
মোট		৪৫০৮	২,১৪৩,৭৬৬
বিবিধ			
সিভিল সার্ভিস	...	৭৫৬	৬৭৭,৪৩৭
হাইকোর্টের জজ	...	৩৯	৪৩,৫৫৬
বেঙ্গল পাইলট	...	৩৩	১১,৮০২
মান্দ্রাজের বিশপ	...	২	১,২২৬
অন্যান্য	...	২৪২৩	৯৫৭,২০৪
মোট		৩২৫৩	১,৬৯১,২২৫
সর্ব্ব মোট		৭৭৬১	৩,৮৩৫,৯৯১

অর্থাৎ ৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৭৮ টাকা।

চারি মাসে বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা

(এপ্রিল—জুলাই)

	১৯২৯	১৯৩০	১৯২৯ সনের তুলনায় হ্রাস-বৃদ্ধি	
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা	শতকরা
রপ্তানি ...	১০৪.২০	৮৬.১৯	−১৮.০১	−১৭.৩%
পুনঃ রপ্তানি	২.৬২	১.৯১	− .৭১	−২৭.১%
মোট রপ্তানি	১০৬.৮২	৮৮.১০	−১৮.৭২	−১৭.৫%
আমদানি	৮১.৩৫	৬৩.৪৮	−১৭.৮৭	− ২২%
মোট রপ্তানি হইতে মোট আমদানি বাদ	২৫.৪৭	২৪.৬২		

গত বছরের তুলনায় বিগত ৪ মাসে ভারতবর্ষের রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাট্‌তি পড়িয়াছে প্রায় পৌনে উনিশ কোটি টাকা, অর্থাৎ এই টাকাটা আমরা বাহিরে মাল বেচিয়া পাই নাই; আর আমদানি বাণিজ্যে ঘাট্‌তির পরিমাণ পৌনে আঠার কোটি টাকার চেয়েও অনেক বেশী, অর্থাৎ বিদেশের বণিকেরা আমাদের কাছে ঐ মূল্যের পণ্য বেচিতে সমর্থ হয় নাই। কোন্ দেশের বণিকেরা কি পরিমাণ মাল আমাদের কাছ থেকে কম লইয়াছে অথবা কোন্ দেশের বণিকেরা আমাদের কাছে কত কম মাল বেচিয়াছে এবং তাহার কারণ কি, তাহা প্রত্যেক অর্থশাস্ত্রের ছাত্রের তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এখানে শুধু একটা কথা প্রণিধানযোগ্য। তাহা এই যে, আমদানি রপ্তানিতে ঘাট্‌তির পরিমাণ প্রায় সমান সমান হইলেও শতকরার দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে যে, আমদানি এবং পুনঃ রপ্তানি বেশী রকম জখম হইয়াছে। অর্থাৎ আমরা যে অনুপাতে অন্য দেশকে আমাদের মাল কিনাইতে সমর্থ হইয়াছি, তার চেয়ে কম অনুপাতে তাদের কাছ থেকে মাল কিনিয়াছি অথবা কিনিয়া আবার পাঠাইয়াছি।

এ গেল বণিকদের পণ্যের হালচাল। এ ছাড়া বণিকেরা ধনরত্ন দেওয়া নেওয়া করিয়াছে। নীচে গত ৪ মাসের বাণিজ্যের একটা হিসাব খতিয়ান (ব্যালান্স অব্ ট্রেড্) দেওয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ১৯২৮ ও ১৯২৯ সনের হিসাবটাও তুলনার জন্য দেওয়া হইল :—

	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা
ভারতীয় পণ্য রপ্তানি (বেসরকারী)	+১০৮ ০৭	+১০৪ ২০	+৮৬'১৯
ভারতীয় পণ্য পুনঃ রপ্তানি (বেসরকারী	+২'৬০	+২'৬২	+১'৯১
বিদেশী পণ্য আমদানি (বেসরকারী)	—৭৮'৯৫	—৮০'৮৮	—৬২'৯৯
পণ্যের ব্যালান্স অব্ ট্রেড্ (বেসরকারী)	+২১ ৭২	+২৫'৯৪	+২৪'১১

	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা
সোনা ,,	—৭'০২	—৫'৬৬	—৬'৮৫
রূপা ,,	—৬'৪৪	—৩'৯২	—৪'৯১
সিক্কা নোট ,,	—'১২	—'০৩	—'০৭
ধনরত্নের ব্যালান্স অব্ ট্রেড্ (বেসরকারী)	—১৩'৫৮	—৯'৬১	—১১'৮৩
মোট দৃশ্য ব্যালান্স অব্ ট্রেড্ ,,	+১৮'১৪	+১৬'৩৩	+১৩'২৮
কাউন্সিল বিল, ষ্টার্লিং ক্রয় ও যুক্তরাজ্যকে অন্যান্য দফায় গবর্ণমেণ্টের টাকা প্রেরণ	—১১'৭০	—'৪১	—৬'৩৫
ভারতে লণ্ডনের উপর ষ্টার্লিং বিক্রয় হেতু দেয়	—		
গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটির রূপান্তরে	+'৩৬	+'১৬	+৪
গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি সম্পর্কিত ভারতীয় সুদের হাতচিঠি	—'১২	—'১১	—'১০
টাকা প্রেরণ বাবদ্ ব্যালান্স	—১১'৪৬	—'৬৮	—৬'৪১

উপরের হিসাবের আমদানি অঙ্কের সহিত আগের দেওয়া আমদানির গরমিল দেখা যাইবে। তার কারণ এই যে, পরবর্ত্তী হিসাবে ষ্টেট্ রেলওয়েদের আনীত রেলওয়ে মালের দরটা বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই দর ১৯২৮, ১৯২৯ ও ১৯৩০ সনের ঐ ৪ মাসে ছিল যথাক্রমে ৯৫, ৪৭ ও ৪৯ লাখ টাকা।

টাকা প্রেরণ বাবদ্ ব্যালান্স বা অদৃশ্য ব্যালান্স অব্ ট্রেডের প্রথম দফায় কাউন্সিল বিল ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও আছে—(১) ভারতে ষ্টার্লিং ক্রয় ও (২) স্থানীয় শাসক ইত্যাদি লণ্ডনে ও সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের নামে ষ্টার্লিং লোন প্রচলিত করিয়া তার টাকার জামিনে যে টাকা শাসক ইত্যাদিকে ধার দেওয়া হয়।

১৬ লাখ টন কয়লা উঠিয়াছে (জুলাই)

প্রতি মাসে ভারতের কয়লার খনিগুলি হইতে কত কয়লা তোলা হয় ? কত কয়লাই বা পাঠানো ও ডেস্‌প্যাচ্‌ করা হয়, নীচের তালিকা হইতে সে সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

দেশের নাম		জুন, ১৯৩০ উঠানো টন	জুন, ১৯৩০ পাঠানো টন	জুলাই, ১৯৩০ উঠানো টন	জুলাই, ১৯৩০ পাঠানো টন
আসাম	..	৩০,৭২৭	২৯,৩১৩	২৯,০৭৭	২৭,৭৪৭
বেলুচিস্থান	.	৫৪৫	৯১২	৭২১	১,১১৫
বাংলা—রাণীগঞ্জ	...	৪,৭২,৯১৭	৪,৪১,৭১৬	৪,৪৭,১৫৫	৩৯৮,০৪৭
বিহার ও উড়িষ্যা					
রাণীগঞ্জ	...	৬৯,৮০২	৬৮,৬১২	৫৫,৫১৭	৫১,৮৬২
ঝরিয়া	...	৮,১৫,৪৭৬	৭,১৫,০৩৮	৭,৩৪,০২০	৬,২০,৫৬৭
বোকারো	...	১,৮৭,৭৭৯	১,৮২,৬৩১	১,৬৫,৮১৭	১,৫৯,৭৯৫
গিরিধি	...	৪৫,১৯০	৪০,৩৫৬	৪০,৯৫৯	৩৯,২৬৭
জৈয়ন্তী	...	৩,৬৯৯	২,৮৭০	২,০৭২	১,২০৮
দালতনগঞ্জ	...	১৫৭	—	১১৪	—
হিঙ্গির রামপুর (সম্বলপুর)		২,৭৬৪	২,০০০	২,৭৯২	২,১৯৩
করণপুর	...	৪৭,৫১৩	৪৭,৩৪৫	৩৯,৬২৮	৪০,৪৪১
মোট	...	১,১,৭২,৩৮০	১০,৫৮,৮৯২	১০,৪০,৯১৯	৯,১৫,৩১৩
মধ্য প্রদেশ					
পেঞ্চ উপত্যকা	...	৫৭,৯৪৫	৫৩,৫৮৭	৫৫,৭৩৯	৫৫,৪০২
চন্দ	...	১৫,৭১৬	১৬,০৭৬	১৬,৩০২	১৬,১০৮
মোট	...	৭৩,৬৫১	৬৬,৬৬৩	৭২,০৪১	৬৫,৫১০
পাঞ্জাব	...	৩,৪৩০	৩,৫৯৭	৭২৭	১,১৯০
সর্ব্ব মোট	..	১৭,৫৩,৬৬০	১৬,০১,০৯৩	১৫,৯০,৬৪০	১৪,০৮,৯৪২

বলা বাহুল্য, কয়লা-সম্পদে বিহার-উড়িষ্যা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এক ঝরিয়াতেই প্রায় মোট উত্তোলিত কয়লার অর্দ্ধেক উঠে। বাংলার রাণীগঞ্জে তার অর্দ্ধেক উঠে। অর্থাৎ এ দু'য়ে মিলিয়া বার আনা কয়লা যোগায়। তারপর বোকারো ১½/২ লাখ টন যোগায়। আর কোন কয়লার খনিই টনের কাছাকাছি আসে না।

প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্যের রপ্তানি (১৯৩০)

ভারতের খনিজ দ্রব্যসমূহ বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এই রপ্তানি মালগুলির মধ্যে পিগ্‌ লৌহ, পিগ্‌ সীসা, ম্যাঙ্গানিজ্‌, টীন, উলফ্রাম্‌ এবং কয়লাই প্রধান।

(ক) গত বৎসর পিগ্ লৌহ রপ্তানি হইয়াছিল ৪৪৯,০০০ টন, এবারে ৫৬৮,০০০ টন। জাপান প্রধান খরিদ্দার বটে, কিন্তু বিলাতের চাহিদা বাড়িয়াছে ৫,৫০০ টন হইতে ৭১,০০০ টনে। এই পিগ্ লৌহের মোট রপ্তানি মূল্য ২৬০ লক্ষ টাকা।

(খ) পিগ্ সীসার প্রধান খরিদ্দার বিলাত। ইহার মোট রপ্তানি ১'৪ মিলিয়ন্ টন, তন্মধ্যে শুধু বিলাত লইয়াছে ১ মিলিয়ন্ টন। জার্ম্মাণি তাহার ক্রয় ৩,০০,০০০ টন হইতে ১,৩৬,০০০ টনে নামাইয়া দিয়াছে। এই পিগ্ সীসার মোট রপ্তানি মূল্য ২৪৩ লক্ষ টাকা।

(গ) ম্যাঙ্গানিজ্ ওরেরও প্রধান খরিদ্দার বিলাত। আলোচ্য বৎসরে প্রকৃত পক্ষে বিলাতের চাহিদা ১,৬৭,০০০ টন হইতে ২,৯২,০০০ টনে পৌঁছিয়াছে। তাহার পরেই ফ্রান্স—চাহিদা ২,০৮,০০০ টন। তারপর বেলজিয়াম, ১,৭৭,০০০ টন। এই সমস্ত রপ্তানি বোম্বাই ও বাঙ্গালা হইতে প্রায় সমভাবে গিয়াছে। মোট রপ্তানির মূল্য ১৯৬ হইতে ২২৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

(ঘ) টীনের রপ্তানি ২,৬০০ টন হইতে ৩,৩০০০ টনে উঠিয়াছে, মূল্য ৬৪ লক্ষ টাকা।

(ঙ) উলফ্রামের রপ্তানিও খুব বাড়িয়া গিয়াছে—ছিল ৮০০ টন, হইয়াছে ১,৮০০ টন। ইহার প্রধান খরিদ্দার বিলাত।

(চ) দস্তা ও স্পেল্টারের রপ্তানি একটু কমিয়াছে। মোট রপ্তানি ১'৩ মিলিয়ন্ হন্দর।

সর্ব্বপ্রকার ধাতু ও ওরের মোট রপ্তানি মূল্য আলোচ্য সনে ১০'৩ কোটি টাকা।

(ছ) অভ্রের রপ্তানি ৯৬,০০০ হন্দর হইতে ১,১৪,০০০ হন্দরে উঠিয়াছে। রপ্তানি মূল্য ৯০ লক্ষ টাকা হইতে ১০৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

(জ) কয়লার রপ্তানি যদিও ৬,৩৮,০০০ টন হইতে বাড়িয়া ৬,৮৫,০০০ টন হইয়াছে, তবু মূল্য সেই ৭১ লক্ষ টাকাই আছে। সিংহল ও হংকং বেশীর ভাগ কিনিয়াছে। আলোচ্য সনে হংকংএর চাহিদা ১,৩০,০০০ টন হইতে ১,৭২,০০০ টন দাঁড়াইয়াছে।

বোম্বাইয়ে মোটর গাড়ী তৈরী

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে আমেরিকার জেনারেল মোটরস কর্পোরেশন এক কারখানা খুলিয়াছে। এই কারখানায় প্রতিদিন দেড়শ' করিয়া মোটর গাড়ী তৈরী হইতে পাবে। বর্ত্তমানে ইহারা আমেরিকা হইতে মোটরের সমস্ত অংশ আনাইয়া গাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছে। শুনা যায় ইহাদেব মূলধন ৩৩১ কোটি টাকা।

যুক্তপ্রদেশে চিনির কারখানা

ভারতে এককালে ছোট ছোট চিনির কারখানা ছিল। বর্ত্তমানে সেগুলি মৃতপ্রায়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কতক চেষ্টা হইয়াছিল। ১৯১০ সনে যুক্তপ্রদেশের পিলভিতে একটি চিনির কারখানা খোলা হয়। ঐ কারখানায় গড়ে দৈনিক ১০০ হইতে ১৫০ টন চিনি প্রস্তুত হইত। কারখানাটি আধুনিকতম কলকব্জা আনাইয়া বড় আকাবে ফাঁদা হইয়াছে। এখন এই কলে দৈনিক ৫৫০ টন পর্য্যন্ত চিনি প্রস্তুত হইবে।

আগ্রায় নূতন ব্যাঙ্ক

আগ্রা সহরে সম্প্রতি সামন্তরাজ ব্যাঙ্ক নামে এক ভারতীয় ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে।

ভারতীয় রেলের আয়-ব্যয়

বাজেটের যখন খসড়া করা হয়, তখন রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন যে, ১৯২৯-৩০ সনে ভারতীয় রেলের আয় হইবে ১০৬½ কোটি এবং খরচ হইবে ৯৫¼ কোটি টাকা। সুতরাং তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন হাতে ১১¼ কোটি টাকা বাঁচিবে। কিন্তু নানা কারণে তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। গত বৎসরে কয়লা ও তূলা ছাড়া রেলপথ দিয়া বেশী মাল যাওয়া আসা করে নাই। গত বৎসব উত্তর ভারতে শস্য তেমন হয় নাই বলিয়া রপ্তানি কম হয়; কিন্তু বাজারে চাহিদাও ছিল কম। আমদানি মালও বেশী যাওয়া আসা করে নাই, কারণ লোকের কিনিবার শক্তি ফুরাইয়াছে। ফলে রেলওয়ের আয় হয় ১০৫ কোটি টাকা, খরচ হয় ৯৮ কোটি। উদ্বৃত্ত হয় ৭ কোটি। ইহা হইতে

ষ্ট্রাটেজিক রেলওয়ের—অর্থাৎ যে রেলওয়ে দেশরক্ষা করিবার নিমিত্তই কেবল নির্ম্মিত হইয়াছে—তার জন্য ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার ঘাটতি পূরণ করিতে হয়। সরকারী-ভাণ্ডারে ৬,১২ লক্ষ টাকা দিবার কথা ছিল; কিন্তু রেলওয়ের থাকে মাত্র ৫.২৬ লক্ষ। সুতরাং রেলওয়ের রিজার্ভ ভাঙ্গিয়া ৮৬ লক্ষ দিতে হয়; নইলে ভারত-সরকারের খরচ কুলায় না।

১৯৩০-৩১ সনের প্রস্তাবিত বাজেটে সরকার দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদের আয় হইবে ১০৮ কোটি ও ব্যয় হইবে ১০০ কোটি টাকা। হাতে থাকিবে ৮ কোটি; ইহার মধ্যে ১,০০ লক্ষ টাকা যাইবে ষ্ট্রাটেজিক বা সামরিক রেলপথে; ৫৭৪ লক্ষ সরকারী সাধারণ ব্যয় বাবদ যাইবে। অবশিষ্ট ৩৪ লক্ষ রিজার্ভে যাইবে। কিন্তু এবারকার মালপত্রের চলাফেরার অবস্থা যেরূপ মন্দা তাহাতে খুবই সন্দেহ হয় যে, এই বাজেটের খাঁই পূরণ হইবে। গত বৎসরে রেলওয়ে প্রসারের জন্য ২৪ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়; আগামী বৎসরে পৌনে সতের কোটি টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা।

ভারতের বাহিরে বস্ত্র-শিল্পে লড়াই

১৯১১-১২ সনে বিলাত হইতে ভারতে ২৯,৭৯০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানি হয়। সে বৎসর জাপানী কাপড় আসিয়াছিল ১০ লক্ষ গজ। ১৯২৮-২৯ সনে অর্থাৎ ৭ বৎসর পরে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বিলাতী কাপড়ের আমদানি কমিয়া ঐ বৎসর ৪.৫৭০ লক্ষ গজ হইয়াছে, কিন্তু জাপানী কাপড় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া ঐ বৎসর ৩,৩৭০ লক্ষ গজ হইয়াছে। এই তো গেল আমদানির কথা। আমাদের দেশজাত কাপড় হংকং, চীন, দ্বীপসমূহে ও পারশ্য প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইত। এই রপ্তানি আশ্চর্য্যরূপে কমিয়া গিয়াছে।

দেশ	১৯১৯-২০ টাকা	১৯২৬-২৭ টাকা
হংকং	৬৮,৪০০,০০০৲	১০,২৫৪,০০০৲
চীন	৭৯,৩৩০,০০০৲	১৩,০০০,০০০৲
দ্বীপসমূহ	২০,৬২০,০০০৲	১৬,৭৫২,০০০৲
পারশ্য	১৪,৪৪৫,০০০৲	—

এই অঙ্কগুলি হইতে বুঝা যায় যে, বিদেশে ভারতের কাপড়ের ব্যবসায় হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। জাপানই যে এই বাণিজ্য কাড়িয়া লইতেছে তাহা নিঃসন্দেহ।

মান্দ্রাজের বহির্ব্বাণিজ্য

(জুন, ১৯৩০)

১৯২৯ সনের জুন মাসের তুলনায় ১৯৩০ সনের জুনে মান্দ্রাজের সমুদ্রবাহী মোট বিদেশী বাণিজ্যের মধ্যে আমদানিতে ৩৯.৯ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানিতে ১,৬৪,৯৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। ১৯২৯ সনের জুন মাসের তুলনায় এ বৎসরের জুন মাসের আমদানি রপ্তানির হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

আমদানি—

চিনি	...	+৪,৩৯,৭৩৭৲	টাকা
চাউল	...	—২,০২,৯৮৩৲	„
কল-কব্জা ও মিল	...	—৩,৪০,০৫৭৲	„
লোহ ও ইস্পাত	...	—৭,৭৬,২০৬৲	„
কেরোসিন তৈল	...	—৩,২৮,৫৭৭৲	„
রবারে প্রস্তুত মাল	...	—৩,৫০,৭২২৲	„
পাকান ও আল্‌গা সূতা	...	—৯,৮৯,৪১৯৲	„
সূতির কাপড়-চোপড়	...	—১১,৩৬,৮৬৬৲	„

রপ্তানি—

কফি	...	+১৪,৫৭,০৯২৲	টাকা
ট্যান অথবা ড্রেস-করা গরুর চামড়া	...	+২,৮৪,২৪০৲	„
দড়াদড়ি (প্রস্তুত)	...	—৩,৮৪,৭৮৬৲	„
ট্যান অথবা ড্রেস করা ছাগলের চামড়া	...	—৫,০৬,৪৩৫৲	„
কাঁচা রবার	...	—৩,৬৮,৩৩৯৲	„
ক্যাষ্টর বীজ	...	—৮,৮৭,৪২৯৲	„
চীনাবাদাম	...	—৮৯,১৬,২৬৮৲	„
লাক্ষা	...	—১০,৩৫,৬৫৪৲	„
চা	...	—৩২,৬৫,০৩৫৲	„
কাঁচা তূলা	...	—১২,৮৫,৯৭০৲	„
রঙ্গীণ অথবা ছাপা সূতির কাপড়-চোপড়	...	—৫,৮৩,৩৬১৲	„

বোম্বাইয়ে ১ কোটি টাকার ঘাট্‌তি

প্রকাশ এ বৎসর বোম্বাইয়ের রাজস্বে ১ কোটি টাকা ঘাট্‌তি পড়িবে। অর্থাৎ ঘাট্‌তির পরিমাণ বাজেট-নির্দ্দিষ্ট আয়ের ২০%।

১৩ হাজার লোক বেকার

বোম্বাই সহরে ৭টি মিল বন্ধ হইয়াছে। তাহাতে ১৩ হাজার লোক বেকার দাঁড়াইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্রের দোকান

বোম্বাই কর্পোরেশ্যনে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, সহরের যাবতীয় বিলাতী বস্ত্রের দোকানের লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া হউক।

মধ্যপ্রদেশে ৪৬ লক্ষ টাকা আয়-হ্রাস

আইন-অমান্য আন্দোলনের ফলে সরকারের আয় ৪৬ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্ট্রেশন ইত্যাদি বাবদ্।

২,৫০০ শ্রমিকের অন্ন মারা গেল

মুঙ্গেরে পেনিনসুলার টোব্যাকো ফ্যাক্টরীর ৪,৫০০ শ্রমিকের মধ্যে ২,৫০০ শ্রমিককে জবাব দেওয়া হইয়াছে।

লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনে কার ইজ্জৎ কত ?

(১) পিগ্ আয়রণ

দেশের নাম	১৯১৩ হাজার টন	১৯২৮ হাজার টন	১৯২৯ হাজার টন
যুক্তরাষ্ট্র	৩০,৬৫৩	৩৮,৬১২	৪২,৯৬৪
জার্ম্মাণি	১৯,০০০	১১,৮০৪	১৩,৪০১
ফ্রান্স	৫,১২৬	১০,০৯৭	১০,৪৪১
গ্রেটবৃটেন	১০,২৬০	৬,৭১৭	৭,৭০১
বেলজিয়াম্	২,৪৪৫	৩,৯০৫	৪,০৯৬
রুশিয়া	৪,৫৬৩	৩,৩৭২	৪,৩১৫
লুক্সেমবুর্গ	...	২,৭৭০	২,৯০৬
সা'র	...	১,৯৩৬	২,১০৫
জাপান	২৩৯	১,৩০০	১,৫০০
ভারতবর্ষ	২০৪	১,০১৬	১,৩৫০
মোট	৭৭,৭১৪	৮৮,৩৮৬	৯৮,০৮০

(২) ইস্পাত

দেশের নাম	১৯১৩ হাজার টন	১৯২৮ হাজার টন	১৯২৯ হাজার টন
যুক্তরাষ্ট্র	৩১,৩০১	৫০,৬৬৫	৫৫,০৩৪
জার্ম্মাণি	১৮,৬৩২	১৪,৫১৭	১৬,২৪৬
ফ্রান্স	৪,৬১৪	৯,৩৮৭	৯,৬৬৬
গ্রেটবৃটেন	৭,৬৬৪	৮,৬৬২	৯,৮১০
বেলজিয়াম্	২,৪২৮	৩,৯৩৪	৪,১৩২
রুশিয়া	৪,১৮১	৪,১৭৩	৪,৮৯৭
লুক্সেমবুর্গ	...	২,৫৭২	২,৭০২
সা'র	...	২,০৭৩	২,২০৯
জাপান	...	১,৮০০	২,২০০
ভারতবর্ষ	...	৬০০	৫৭০
মোট	৭৪,৬৮৭	১০৯,৭৪৮	১১৯,০৪০

দুনিয়ার কয়লা

দেশের নাম		১৯১৩ হাজার টন	১৯২৮ হাজার টন	১৯২৯ হাজার টন
যুক্তরাষ্ট্র	...	৫১৭,০০০	৫২২,৬২৩	৫৪৬,১২৬
যুক্তরাজ্য	...	২৯২,০০০	২৪১,২৮৩	২৬০,৮৩৮
জার্ম্মাণি	...	১৪০,৭০০	১৫০,৮৭৬	১৬৩,৪৩৭
ফ্রান্স	...	৪৪,০০০	৫২,৪২৯	৫৪,৯২২
জাপান	...	২৩,৩০০	৩৩,৫২৮	৩২,১০০
পোল্যাণ্ড	...	৪১,০০০	৪০,৬১৮	৪৬,২১৪
বেলজিয়াম্	...	২২,৮০০	২৭,৫৪৩	২৬,৯৩১
বৃটিশ ভারত	...	১৬,৫০০	২১,৬৬০	২২,৫০২
রুশিয়া	...	২৯,১০০	৩৪,৬২৭	৪০,২০০
চেকো-শ্লোভাকিয়া	...	১৯,৪০০	১৪,৫৬০	১৬,৭৫০
দক্ষিণ আফ্রিকা	...	৮,২০০	১২,১৬৮	১২,৬২২
সা'র	...	১২,১০০	১৩,১০৭	১৩,৫৭৯
ক্যানাডা	...	১৩,৫০০	১২,৪২০	১২,১৮০
নেদারল্যাণ্ডস্	...	১,৯০০	১০,৯২০	১১,৬১৩
অন্যান্য দেশ	...	৪০,৮০০	৫১,০০০	৫১,০০০
মোট	...	১,২২২,৩০০	১,২৩৯,১৮২	১,৩১১,১১৪

দুনিয়ায় পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ও খাদন

	১৯২৯	১৯২৮
	টন	টন
দুনিয়ায় ক্রুড্ পেট্রোলিয়াম্	২০,১২,১১,০০০	১৮,১৪,২৬,০০০
পেট্রোলিয়ামজাত তবল পণ্য খাদন	১৭,০০,০০,০০০	১৫,০০,০০,০০০

কোন্ দেশ কি পরিমাণ পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করে

দেশের নাম		১৯২৯ টন	১৯২৮ টন
যুক্তরাষ্ট্র	·	১৩,৭৫,০০,০০০	১২,১৯,৪১,০০০
ভেনেজুয়েলা	...	১,৯৩,০০,০০০	১,৫৬,৬৭,০০০
রুশিয়া	...	১,৩৮,০০,০০০	১,১৭,৬৮,০০০
মেক্সিকো	...	১৫,০০,০০০	৭৪,৮৫,০০০
পারশ্য	...	৫৭,৭০,০০০	৫৬,৮১,০০০
রুমানিয়া	...	৪৭,০০,০০০	৪২,৬৯,০০০
ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডীজ	..	৪৭,০০,০০০	৩৯,৭১,০০
কলম্বিয়া	·	২৮,০৪,০০০	২৮,০২,০০০
পেরু	..	১৮,৫০,০০০	১৫,৯৭,০০
আর্জেন্টিনা	·	১৩,০০,০০০	১৩,২৯,০০
ভারতবর্ষ	...	১২,১২ ০০০	১২,০০,০০
ত্রিনিদাদ		১১,০০,০০০	১০,৬২,০০০

চারি মহাদেশে কত তূলা জন্মে ?

দেশের নাম		আয়তন		উৎপাদন	
		১৯২৯—৩০	১৯২৮—২৯	১৯২৯—৩০	১৯২৮—২৯
		হাজার একর		হাজার বেল (১ বেল=৪৭৮ পাঃ)	
বুলগেরিয়া	·	১১	১১	৪	৪
যুক্তরাষ্ট্র ...	..	৪৫,৯৮১	৪৫,৩৪১	১৪,৯১১	১৪,৪৭৮
মেক্সিকো ...	..	৪৭৫	৫০২	২১৫	২৭৮
আমেরিকা মোট	...	৪৬,৪৫৬	৪৫,৮৪৩	১৫,১৫৪	১৪,৭৫৬
কোরিয়া	...	৪৫৯	৫০১	১৩৮	১৫০
ভারতবর্ষ ...	...	২৩,৫১৬	২৫,০০৩	৪,৩৫২	৫,১৩১
সিরিয়া ও লেবানন	...	১১১	১৯	৭	৪
এশিয়া মোট		২৪,১০৬	২৫,৫২৫	৪,৫৯৭	৫,২৮৫
রুশিয়া ..		২,৫৫৯	২,২৭০	১,৪৫১	১,১৩৫
আলজিরিয়া ...		১৪	১১	৮	৬
মিসর ...	...	১,৯১২	১,৮০৫	১ ৬৫০	১,৬২৬
উগাণ্ডা ...	...	৬৮৪	৬৯৯	—	১৬৪
ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড	..	২০	২০	৮	৭
ইঙ্গ-মিসরীয় সুদান	...	৩৬৮	২৮৪	১৬২	১৪২
আফ্রিকা মোট	..	৩,৩১৪	২,১২১	১৮৭৮	১,৭৮১
সর্ব্ব মোট	...	৭৫,৪৪৮	৭৫,৭৭২	২২,১২৪	২২,৯৬০

দুনিয়ায় ৫০ লাখের উপর মোটরকার উৎপাদন

	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
উৎপাদন				
দুনিয়ার মোট	৪৮,৯২,৭৯৭	৫০,৩৫,২০৪	৪১,৫৮,৯৬৬	৫২,০৩,২৩৯
হ্রাস-বৃদ্ধি		+২.৯%	−১৭.৪%	+২৫.১%
আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র ও				
ক্যানাডা) তৈরী	৯০.৫%	৮৯.৫%	৮৬.১%	৮৮.৪%
কাটতি				
দুনিয়ার মোট	৪৮,৯২,৭৯	৫০,৩৫,২০৪	৪১,৫৮,৯৬৬	৫২,০৬,২৩৯

দেখা যাইতেছে যে, দুনিয়ার বাজারে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া জুটিয়াছে। ভবিষ্যতে মোটরকার আরও বেশী বিকাইবার অবকাশ রহিয়াছে। সেই বাজারে আমেরিকার শক্তি-পরীক্ষা হইবে। ১৯২৯ সনে আমেরিকার জয় হইয়াছে। কারণ দুনিয়ায় ৬২,৯০,০০০ মোটরগাড়ী তৈরী হইয়াছিল, তন্মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা ৮৯% তৈরী করিয়াছে।

মোটর গাড়ী—৩০ লাখ টাকা জরিমানা

গত বৎসর ইংলণ্ড ও ওয়েল্সে বেহিসাবী মোটরগাড়ী চালাবার অপরাধে ২,০১,৩১৫ পাউণ্ড (৩০ লক্ষ টাকা) জরিমানা আদায় হইয়াছিল।

দুনিয়ায় আকাশ-পথের পরিমাপ

এরিয়েল রুট বা আকাশ-পথকে মাপা হইয়াছে। নিম্নের তালিকা হইতে উহা বুঝা যাইবে :—

দেশের নাম		১৯২৬		১৯২৮	
		কিলোমিটার	শতকরা	কিলোমিটার	শতকরা
ইয়োরোপ	...	৪৮,৩১০	৬৭.৯	৭০,৭৯৯	৫৫.৬
আফ্রিকা	...	১,৭১৫	২.৪	৩,০৯৫	২.৪
এশিয়া	...	৩,০২৯	৪.৩	৬,৮৩৫	৫.৪
আমেরিকা	...	১২ ৮৪১	১১ ০	৪১,১১১	৩২.২
অষ্ট্রেলিয়া	...	৫,২৫৮	৭ ৪	৫,৬০৭	৪.৪
মোট	...	৭১,১৫৩	৯০০.০	১২৭,৪৪৮	১০০ ০

উপরি উক্ত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, দুই বৎসরে আফ্রিকার স্থান পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে. এশিয়া কিঞ্চিৎ উন্নতি করিয়াছে, অষ্ট্রেলিয়া ও ততোধিক ইয়োরোপ অবনত হইয়াছে, [কিন্তু আমেরিকা আশ্চর্য্যরকম উন্নতি দেখাইয়াছে। সোজা কথায় পাল্লা চলিতেছে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এবং অনতিদূর ভবিষ্যতে আমেরিকা যে ইয়োরোপকে ছাড়াইয়া যাইবে তাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই।

বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনী

১৯৩০ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী নৌবাহিনীর বিভিন্ন খাতে দুনিয়ার দেশগুলির অবস্থা নিম্নরূপ ছিল :—

(ক) তৈরী হইয়া গিয়াছে—

	বৃটিশ সাঃ	যুক্তরাষ্ট্র	জাপান	ফ্রান্স	ইতালি	সোভিয়েট্	জার্ম্মাণি
ব্যাট্ল্ শিপ	১৬	১৮	৬	৯	৪	৪	৭
ব্যাট্ল্ ক্রুজার	৪	—	৪	—	—	—	—
ক্রুজার	৫৪	১৪	৩৭	১৭	১৩	৪	৭
ক্রুজার মাইনলেয়ার্স	১	—	৩	—	—	—	—
আর্ম্মারড্ কোষ্ট ডিফেন্স হেবসেল্স ও মণিটার	৩	১	—	—	—	—	—
এয়ার ক্র্যাফট কেরিয়ার্স্	৮	৩	৫	১	১	—	—
ফ্লোটিলা লীডার্স্	১৬	—	—	৯	২০	—	—
ডেষ্ট্রয়ার্স্	১৫৪	৩০৯	১০৬	৫৮	৬৩	৩২	১৩
টর্পেডো বোট	—	—	—	৭	৪০	৬	১৬
সাব্‌মেরিণ	৫৩	১২২	৬৪	৫২	৪৩	১৫	—
স্লুপ্	৩১	—	—	৮	২২	৪	—
কোষ্ট্যাল্ মোটর বোট	৬	—	৩	৩	৬৯	২৫	—
সান বোট ও ডেস্প্যাচ হেবসেল্	—	১১	৪	৪৫	৭	২	৩
রিহ্বার গান বোট	১৮	১০	৯	১১	২	৬	—
মাইন স্থইপার	৩৩	৪২	১২	২৬	৪৪	২০	২৭

(খ) তৈরী হইতেছে—

	বৃটিশ সাঃ	যুক্তরাষ্ট্র	জাপান	ফ্রান্স	ইতালি	সোভিয়েট্	জার্ম্মাণি
ব্যাটল্ শিপ	—	—	—	—	—	১	১
ব্যাটল্ ক্রুজার	—	—	—	—	—	—	—
ক্রুজার	৮	১৮	৪	৪	১০	২	২
ক্রুজার মাইনলেয়ার	—	—	১	১	—	—	—
আর্ম্মারড কোষ্ট ডিফেন্স হেবসেল্স ও মণিটার	—	—	—	—	—	*	—
এয়ার ক্র্যাফ্‌ট কেরিয়ার	—	১	১	১	—	*	—
ফ্লোটিলা	৩	—	—	১৬	৩	*	—
ডেষ্ট্রয়ার	২৬	—	১৩	৬	৮	*	—
টর্পেডো বোট	—	—	—	—	—	*	—

	বৃটিশ সাঃ	যুক্তরাষ্ট্র	জাপান	ফ্রান্স	ইতালি	সোভিয়েট	জার্ম্মাণি
সাবমেরিণ	১৬	৫	৭	৪৭	১৪	*	—
স্লুপ্	১১	—	—	৪	—	*	—
কোষ্ট্যাল্ মোটর বোট	—	—	—	৭	৪	*	—
গান বোট ও ডেস্প্যাচ ভেসেল্	—	—	—	—	—	*	—
রিভার গান বোট	১	—	১	—	—	*	—
মাইন্ সুইপার	—	—	—	—	—	*	—

(গ) তৈরী করিবার কল্পনা হইয়াছে—

বৃটিশ সাম্রাজ্যে শূন্য। যুক্তরাষ্ট্রে ক্রুজার ৫ খানা, ডেষ্ট্রয়ার ১২ খানা, সাবমেরিণ ১ খানা (১৯৩০—৩১)। জাপান ১ খানা ক্রুজার মাইন্ লেয়ার (১৯৩১—৩২)। ফ্রান্স (১৯৩০) শূন্য। ইতালি (১৯২৮—২৯) শূন্য। জার্ম্মাণি (১৯২৮) শূন্য। সোভিয়েট কিছু ঘোষণা করে নাই।

মার্কিণে ৬০ কোটি টাকার বেতার

গত বৎসর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ৬০ কোটি টাকার বেতার যন্ত্র ও উহার সাজ-সরঞ্জামাদি নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিয়াছে।

রুশিয়ায় পশুর চর্ব্বি হইতে সাবান

রুশিয়ার গবর্ণমেণ্ট দেশের অর্থ বৃদ্ধি করিবার জন্য মরা কুকুর ও বিড়ালকে কাজে লাগাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, মৃত কুকুর ও বিড়ালের দেহ সিদ্ধ করিয়া যে চর্ব্বি পাওয়া যায়, তাহা হইতে সাবান তৈয়ারী করা হইতেছে। একটা বিড়ালের মৃত দেহ হইতে ২॥০ ছটাক এবং কুকুরের মৃতদেহ হইতে প্রায় আধ সের চর্ব্বি উৎপন্ন হইতে পারে। ষ্টেটফর সিণ্ডিকেট নামক একটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পশুপক্ষীর মৃতদেহ হইতে সাবানের জন্য বৎসরে ৫০,০০০ টন এবং মজুরদের আহারের জন্য ৫০,০০০ টন চর্ব্বি সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

(বঙ্গরত্ন—কৃষ্ণনগর)

মধ্য এশিয়ার নবজীবন

দক্ষিণ তুর্কিস্থান হইতে উত্তরে সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত ২,১৮০ মাইল দীর্ঘ এক রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় ৩৩ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া গত এপ্রিল মাসে এই রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। ১৯২৮ সনে নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। মধ্য-এশিয়ার কাজাক, উজবেক, তাজিক প্রভৃতি জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে একই অবস্থায় আছে। পৃথিবীর নানা দেশের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু ইহারা আজও যাযাবরের ন্যায় বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই রেলওয়ে হওয়াতে তাহাদের মধ্যে সভ্যতার নবজীবন প্রবেশ করিবে। ইতিমধ্যেই তাহারা বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া বহুসংখ্যক গ্রাম ও সহরের পত্তন করিয়াছে।

তুর্কিস্থানে তুলা জন্মে, কিন্তু তাহা রপ্তানি করা সম্ভব ছিল না। সাইবেরিয়াতে গম ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠের জন্ম, তাহাও সর্ব্বত্র প্রেরণ করা সুবিধাজনক ছিল না। এই রেলপথ নির্ম্মিত হওয়াতে শত সহস্র মাইল দীর্ঘ জমিতে তুলা ও ধানের চাষ আরম্ভ হইবে। জগতে এখন যত তুলা ও ধান জন্মে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জন্মিবে। ইহাতে রুশিয়া ধনশালী হইবে, অসভ্য জাতিসকল উন্নত হইবে।

(সঞ্জীবনী)

জাপানে ঘোর ঝঞ্ঝা

জাপানের উপর দিয়া আবার একটা ভীষণ ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। প্রবল বাত্যায় বহু স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নাগাসাকি অঞ্চলেরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বাত্যার

* চিহ্নিত ঘরগুলের অঙ্ক জানা যায় নাই।

বেগ ঘণ্টায় ১১১ মাইল পর্য্যন্ত হইয়াছিল। গত ১৮ই জুলাই শুক্রবার এই দুর্ঘটনা ঘটে। কেহ কেহ মনে করেন যে, অন্ততঃ এক শত লোক সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া মরিয়াছে। ৮ খানি ক্ষুদ্র ষ্টীমার এবং ৮৩ খানি মোটর বোট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অনুমান এই যে, স্থলভাগের উপরও শত শত লোক মারা গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ১৬০০ খানি গৃহপতনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত হাজার হাজার বাড়ী কোন না কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ২ কোটি ইয়েনের কম হইবে না। তোকিও হইতে ২০শে জুলাই যে সংবাদ প্রেরিত হয়, তাহার মর্ম্ম এই—পূর্ব্ববর্ত্তী সংবাদে ক্ষতির যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কম পক্ষে চারি হাজার বাড়ী পতিত হইয়াছে এবং ১০ হাজার বাড়ীর কিছু না কিছু ক্ষতি হইয়াছে। অল্প দিন হইল কোরিয়াতে বন্যা হইয়া গিয়াছে। এখনও কোরিয়া সে ক্ষতি সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে আবার ঘূর্ণীবাত্যায় তাহার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। কমপক্ষে ২০ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে।

(বঙ্গবাসী)

বিলাতে বেকার-বৃদ্ধি

গ্রেট বৃটেনে কর্ম্মহীন বেকার লোকের সংখ্যা দিন দিন হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট দেশের শাসনভার হাতে লইবার পর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, বেকার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পূর্ব্বের দুই গুণ। মিঃ জে এল গার্ভিণ ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, আগামী ডিসেম্বর নাগাদ বিলাতে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াইবে বিশ লক্ষ। কিন্তু ডিসেম্বরের পাঁচ মাস বাকী থাকিতেই প্রকৃতপক্ষে বেকার-সংখ্যা বিশ লক্ষ ছাপাইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি সম্প্রতি 'অবজারভার' পত্রে আনন্দপ্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বেকার-বৃদ্ধি দেশের সমৃদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া আনন্দ নহে, তাঁহার গণনা মিলিয়াছে,—ইহাই আনন্দের কারণ। এই আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের হিসাবেই দেখা যায়, বিলাতে প্রকৃতপক্ষে বেকার দাঁড়াইয়াছে ২৩ লক্ষ ১১ হাজার। বিলাতের এই বেকার-বিভ্রাটে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি শুধু চিন্তিত নহে, উৎকণ্ঠিতও হইয়াছেন। আবার একদল আছেন, তাঁহারা পূর্ব্বের নজীর দেখাইয়া দেশবাসীকে বলিতেছেন,—এখনও তেমন উৎকণ্ঠার কারণ উপস্থিত হয় নাই। নয় বৎসর পূর্ব্বে ১৯২১ সনের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছিল, তখন বেকার-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল প্রায় পঁচিশ লক্ষ,—ইহাই তাঁহাদের নজীর। বিলাতে গবর্ণমেণ্টকেই লোকে এই অবস্থার জন্য দায়ী করিতেছে এবং গবর্ণমেণ্টও প্রাণপণে প্রতিকারের উপায় করিতেছেন। বিলাতের এই বেকার লোকদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু ভারতে যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, তাহার প্রতিকারের বা প্রতিষেধের জন্য কোন ব্যবস্থাই কেহ করিতেছে না।

বিলাতে বেকারের অবস্থা

বিলাতে বেকার-সমস্যা রাজনৈতিক মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। সরকারকে নিম্নলিখিত হারে বেকারগণের জন্য ব্যয় করিতে হইতেছে :—

	পাঃ	শিং	পেঃ	
প্রতি সেকেণ্ডে	২	৬	৪	(প্রায় ৩৫৲টাকা)
„ মিনিটে	১৪০			(২, ১০০৲টাকা)
„ ঘণ্টায়	৮,৩৫৪			(১,২৫,৩১০৲টাকা)
„ দিনে	২২০৩১০			(৩৩,০৭,৫০০৲টাকা)
„ সপ্তাহে	১,৫৪৩৫০০			(২৩,১৫,২৫০০৲টাকা)
„ বৎসরে	৮০,৪৮২,৫০০			(১২০৭,২৩,৭৫০০৲টাকা)

লণ্ডন মন্ত্রণা-সভার সভ্য

বাঙ্গালা—৫ জন

সার পি, সি, মিত্র ; মিঃ জে, এন, বসু ; মিঃ এ এইচ, গজনবী ; মিঃ এ, কে, ফজলাল হক ; ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা।

মাদ্রাজ—৫ জন

রাইট্ অনারেবল শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ; সার সি, পি, রামস্বামী আয়ার ; সার এ, পি, পাত্র ; দেওয়ান বাহাদুর এ, রামস্বামী মুদালিয়ার ; দেওয়ান বাহাদুর এম, রামচন্দ্র রাও।

বোম্বাই—৭ জন

সার চিমনলাল শীতলবাদ ; মিঃ এম, আর, জয়াকর ; খাঁ বাহাদুর হাফিজ হিদায়েৎ হোসেন ; মিঃ এম, এ, জিন্না ; সার ফিরোজ সেথনা ; সার কাওয়াসজি জাহাঙ্গীর (ছোট) ; রাও বাহাদুর সিদ্দেপ্পা তোতাপ্পা কামব্লি।

পাঞ্জাব—৬ জন

রাজা নরেন্দ্রনাথ ; সর্দ্দার উজ্জ্বল সিংহ ; সর্দ্দার সম্পুর সিংহ ; সার মহম্মদ সফি ; চৌধুরী জফরউল্লা খাঁ ; ডোমেলির রাজা কাপ্তান সের মহম্মদ খাঁ।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ— ২ জন

সার মহম্মদ আবদুল কোয়াউম ; সার সা নাওয়াজ খাঁ।

যুক্ত প্রদেশ—৫ জন

সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু ; মিঃ সি, ওয়াই চিন্তামণি ; মৌলানা মহম্মদ আলি ; ছত্রির নবাব ; ডাক্তার সাফাৎ আমেদ খাঁ।

মধ্যপ্রদেশ—২ জন

অনারেবল মিঃ এস, বি, তাম্বে ; ডাক্তার বি, এস, মুঞ্জে।

বেহার ও উড়িষ্যা—২ জন

দারভাঙ্গার মহারাজা ; সার সুলতান আহম্মদ।

আসাম—১ জন

মিঃ চন্দ্রধর বড়ুয়া।

সিন্ধু—১ জন

গোলাম মুর্ত্তাজা খাঁ ভট্টু।

ব্রহ্ম—৪ জন

ইউ, বা, পে ; ইউ, ওহন ঘাইন ; ইউ অং থিন ; মিঃ অস্কার ডি, গ্লানভিল।

সমস্ত ভারতের—৮ জন

দেওয়ান চিমনলাল (শ্রমজীবী) ; রাও বাহাদুর আর শ্রীনিবাসন (খৃষ্টান) ; ডাঃ বি, আর, আম্বেদকার (অনুন্নত শ্রেণীর) ; লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল এইচ, এ, জে গিড্‌নী (এংলো ইণ্ডিয়ান) ; সার হিউবার্ট কার ; মিঃ টি, এফ্‌, গেভিন জোন্স ; মিঃ সি, ই, উড ইয়োরোপীয়) ; এইচ, এইচ, আগা খাঁ (খোজা সম্প্রদায়)।

স্ত্রীলোক—২ জন

পাঞ্জাবের সার মহম্মদ সফির কন্যা শ্রীমতী সা নাওয়াজ ; মাদ্রাজের মন্ত্রীর পত্নী শ্রীমতী সুব্বারায়ান।

জমিদার—২ জন

মাদ্রাজের পালাকেমিডির রাজা ; রাজকৃষ্ণচন্দ্র।

রাজন্যবর্গ—১৬

আলোয়ারের মহারাজা ; বড়োদার গাইকোয়াড় ; ভূপালের নবাব ; বিকানীরের মহারাজা ; ঢোলপুরের রাজা ; কাশ্মীরের মহারাজা ; নওয়া নগরের মহারাজা ; পাতিয়ালার মহারাজা ; রেওয়ার মহারাজা ; সাংলির অধিপতি ; সার প্রভাশঙ্কর পত্তনি ; সার মনুভাই মেহতা ; সর্দ্দার সাহেবজাদা সুলতান আমেদ খাঁ ; নবাব সার মহম্মদ আকবর হাইদারী ; সার মির্জ্জা মহম্মদ ইস্মাইল ; কর্ণেল কে, এন, হকসার।

ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটীর মন্তব্য

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল :—

১। মিঃ কে, সি, দে, সি-আই-ই (সভাপতি)
২। খাঁ বাহাদুর হেমায়েৎউদ্দীন আহম্মদ
৩। ডাঃ জে, সি, সিংহ
৪। রায় বদ্‌রিদাস গোয়েঙ্কা বাহাদুর, সি-আই-ই, এম-এল-সি
৫। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, পি-এইচ-ডি
৬। খাঁ বাহাদুর মৌলবী আজিজুল হক, এম-এল-সি
৭। রায় শশধর ঘোষ বাহাদুর
৮। বাবু যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (সেক্রেটারী)

কমিটি যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে, বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৮৩ জন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই প্রদেশে কৃষিকার্য্যের উপযোগী যত জমি আছে তাহার শতকরা ৮৬ ভাগে কৃষিকার্য্য চলিতেছে। কৃষিকার্য্যের জন্য আর বেশী জায়গা এই প্রদেশে পাওয়া যাইবে না।

কৃষিকার্য্যের উপযোগী জমির চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রায় ৬০ লক্ষ লোক ৯ কোটি ৬০ লক্ষ বিঘা জমি চাষ করিতেছে। অর্থাৎ প্রত্যেক চাষীর গড়ে ১৬ বিঘা জমি আছে। ইহা কম নয় ; কিন্তু উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ খুবই কম। যাহা উৎপন্ন হয় তাহাতে কৃষকের পরিবারের নিত্যনৈমিত্তিক খাওয়া পরার ব্যয়ই চলে না।

কমিটি মনে করেন, ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়াইয়া দিলে অথবা সহজে ধার পাইবার ব্যবস্থা করিলেই কৃষকের অভাব মোচন হইবে না। ইহার সঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয়ে চোখ রাখিতে হইবে। নানা প্রকার উন্নত ধরণের প্রণালী দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ-বৃদ্ধির চেষ্টা না করিলে কেবল ব্যাঙ্কের সাহায্যে ও সহজে ধার পাওয়ার ব্যবস্থা দ্বারা কিছুই হইতে পারে না।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে,—বাঙ্গালা দেশে এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার যাহাতে প্রচুর টাকা জমা হইতে পারে এবং যে টাকা কৃষিকার্য্যের সাহায্যার্থ দীর্ঘদিনের জন্য ধার দেওয়া যাইতে পারে।

কমিটি মনে করেন যে, বাঙ্গালা দেশে সমবায় প্রণালীতে গঠিত জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক, ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক দ্বারা বিশেষ কাজ হইতে পারে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত সমবায় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক আছে সেগুলিতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। সহজে টাকা ধার পাইলে লোকে তাহা লইয়া গিয়া যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে। সমবায় ব্যাঙ্ক দ্বারা তাহা নিবারিত হইতে পারে। কারণ এই ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুসারে চলিতে হইলে কেহই যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারিবে না, অথচ প্রয়োজনীয় টাকা ধার পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমানে সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে পৃথক করিয়া জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ প্রয়োজন বাঙ্গালা দেশে নাই।

কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার জন্য কোনও সু-ব্যবস্থিত বাজার বাঙ্গালা দেশে নাই। ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কেবল চা বিক্রয়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু অপরাপর শস্যাদির জন্য তেমন কিছুই নাই। ইহাতে কৃষি ব্যবসায়ীদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। তাহারা উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

ইহার প্রতিকারকল্পে কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সরকারী অনুমোদিত গুদাম (লাইসেন্সড্ ওয়ার হাউস) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাতে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে। পাটের দাম যাহাতে অকস্মাৎ একেবারে পড়িয়া না যায় এবং বৎসরের সকল সময় প্রায় সমান থাকে তজ্জন্য

আইন করিয়া এক "ভবিষ্যৎ বাজার" (ফিউচারস্ মার্কেট) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই বাজারের বিশেষত্ব এই থাকিবে যে, আজ পাট বিক্রয় করিলেও ভবিষ্যতে যদি মূল্য বেশী হয়, তবে কৃষক তাহার অংশ পাইবে।

কমিটি বিবেচনা করেন,—বাঙ্গালা দেশের মধ্যে যে সমস্ত কারবার চলে তাহার জন্য উপযুক্ত সর্ত্তে ধার পাওয়ার সুবিধা খুব কম। ইহাতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

যৌথ কারবারগুলির কথা উল্লেখ করিয়া কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহারা উপযুক্ত পরিমাণে টাকা পায় নাই। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ইহাদিগকে প্রয়োজন অনুসারে টাকা ধার দেয় না।

প্রয়োজন অনুসারে টাকা দিয়া সাহায্য করিতে সমর্থ কোনও প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালা দেশে নাই বলিয়াই বাঙ্গালার শিল্পবাণিজ্য-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। যৌথ কারবারের ভিত্তিতে গঠিত ব্যাঙ্ক দ্বারাই এরূপ স্থলে সাহায্য হইতে পারে। তবে সেরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে কিছু সময় লাগিবে। যতদিন তাহা সম্ভবপর না হয়, ততদিন সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন। এমন অনেক শিল্প আছে যেগুলি অর্থাভাবে বিলুপ্ত হইতেছে। সেগুলিকে অগোণে সরকারী সাহায্য দেওয়ার জন্য আইন পাশ করা কর্ত্তব্য। মাদ্রাজ, বিহার-উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে এরূপ আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। তদপেক্ষা ব্যাপক ব্যবস্থা বাঙ্গালা দেশের জন্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কমিটি মনে করেন যে, ১৯১২ সনে আইন প্রণীত হওয়ার পর হইতে সমবায় আন্দোলন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহাতে কাজ কম হয় নাই। ১৯২৪ সন হইতে পাট-চাষীদিগকে উপযুক্ত মূল্য দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। তজ্জন্য বিক্রয় সমিতি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সেগুলির কার্য্য উপযুক্ত পথে চলিতেছে বলিয়া কমিটি মনে করেন না। খুব শীঘ্র এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দ্বারা তদন্ত করান দরকার বলিয়া তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন।

মহাজনী প্রথার নিন্দা করিয়া কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন। সমবায় সমিতি এবং লোন আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহাতেও মহাজনদিগের ব্যবসায় নষ্ট হয় নাই। তাহারা এখনও কোন কোন স্থলে মাসে শতকরা ৩৲ টাকা হিসাবে সুদ গ্রহণ করিতেছে। এরূপ মহাজনের সংখ্যা যাহাতে হ্রাস পায় তজ্জন্য আইন করা প্রয়োজনীয়।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। কমিটি বলেন, কেবল অংশীদারগণের স্বার্থরক্ষার বিধান করিলেই চলিবে না, আমানতকারিগণের স্বার্থও দেখিতে হইবে।

যাহাতে লোকের মনে টাকা খাটাইবার প্রবৃত্তি জন্মে এবং কেহ ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিয়া না দেয়, তজ্জন্য পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ককে আরও কয়েকটি সুবিধা দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

বঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটীসমূহের আত্মপরীক্ষা আবশ্যক

(ক) সরকারী লোক্যাল অডিট (স্থানীয় হিসাব পরীক্ষা) বিভাগের ১৯২৮-২৯ সনের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, বঙ্গের অনেক মিউনিসিপ্যালিটীর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। সংক্ষেপে তাহার কয়েকটী প্রধান কারণ উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে:—(১) আগামী বৎসর কিরূপ ব্যয় হইবে তৎসম্বন্ধে অবিবেচনাপ্রসূত বজেট ধার্য্য করা, (২) ট্যাক্স আদায় সম্বন্ধে যথোচিত তত্ত্বাবধানের অভাব ও যাহারা যথাসময়ে ট্যাক্স না দেয় তাহাদিগকে উহা দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আইনানুমোদিত উপায় অবলম্বন না করা, (৩) মিউনিসিপ্যালিটী সহরবাসীদের জন্য যে যে প্রকার সেবা বা কাজ করেন তাহার সবগুলির জন্য যথোপযুক্ত বা কিছুমাত্র ট্যাক্স না লওয়া এবং (৪) আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা। কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটীকে কর্ম্মচারীর তহবিল তছরুপ এবং প্রতারণার জন্যও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে।

(খ) বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যান অবৈতনিকভাবে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনেকেই নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনান্তে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম্ম দেখিয়া থাকেন। যাঁহাদের যথেষ্ট অবসর না থাকে অথবা যাঁহারা ঐ সকল কাজের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে

না পারেন তাঁহাদের ঐ সকল দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করা অন্যায় বলিয়া মনে করি।

(গ) বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যালিটীসমূহের যে আয়ব্যয় হইয়াছে তৎসম্বন্ধে হিসাব-পরীক্ষক ১৯২৮-২৯ সনে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, বহু মিউনিসিপ্যালিটীর আর্থিক অবস্থা অতি খারাপ। নিয়ম আছে যে, দুই মাসে যে টাকা খরচ হয় প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটী সে টাকা হাতে রাখিবেন। অনেক মিউনিসিপ্যালিটী এই নিয়ম পালন করে নাই।

(ঘ) (১) মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ঋণের টাকা গবর্ণমেণ্টের দান ও জল কলের বাবদ্ আদায় করা চাঁদায় মোট ১৪,৭৮১ টাকা মিউনিসিপ্যালিটীর হাতে ছিল, আর তখন ঠিকাদারের পাওনা ছিল ২০ হাজার টাকা। বিশেষ বিশেষ ফণ্ডে তখন ১০,৩৩০৲ টাকা ছিল। কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা পোষ্ট্যাল সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখার নিয়ম। তাহা না রাখিয়া মিউনিসিপ্যালিটী ২,৫০০ টাকা খরচ করিয়া ফেলে এবং ১০,৩৩০ টাকা হইতেও ৩৫৭৫ টাকা খরচ করে। এদিকে মিউনিসিপ্যালিটীর তখন ২৭ হাজার টাকা পাওনা আদায় বাকী। বস্তুতঃ, ১৯২৮ সনের মার্চ্চের শেষে মিউনিসিপ্যালিটীর হাতে কোন টাকা ছিল না, জলের কলের ফণ্ডের চাঁদার টাকা ভাঙ্গিয়া খরচ চলিত।

(২) ১০ বৎসর ধরিয়া ট্যাক্স দিতেছে না অথচ হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটী তাহার উপর ওয়ারেণ্ট বাহির করিতেছেন না। অনেক টাকা খরচ করিয়া মাঝে মাঝে মামলা করা হয়। (৩) দেবহাটার ১২ জন কমিশনারের মধ্যে ৭ জনই ট্যাক্স ঠিক্ সময়ে দেন নাই। মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানও ট্যাক্স দেন নাই। (৪) কাটোয়ার মিউনিসিপ্যালিটীর অনেক কমিশনারও ট্যাক্স দিতেছেন না। ইঁহাদের মধ্যে একজনের নিকট ১৫০ টাকা বাকী। (৫) বালীর দুইজন কমিশনার এবং মিউনিসিপ্যালিটীর কয়েকজন কর্ম্মচারী অনেকদিন ট্যাক্স দেন নাই। (৬) বর্দ্ধমানের একজন কর্ম্মচারী ট্যাক্স দিতেছেন না। (৭) বাজিতপুরে একজন কমিশনার ৪ কিস্তির ও আর একজন কমিশনার ৫ কিস্তির ট্যাক্স দেন নাই। (৮) বগুরা জেলার সেরপুরে ৬ জন কমিশনার ও ভাইস-চেয়ারম্যানের নিকট ট্যাক্স বাকী আছে।

(৯) প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট রংপুর মিউনিসিপ্যালিটীকে ৬ হাজার টাকা দেন। এই টাকা মিউনিসিপ্যালিটী খরচ করিতে না পারিয়া একজন ঠিকাদারের নিকট হইতে রসিদ লিখাইয়া লন যে, স্কুলের বাড়ী তৈয়ার করার মালমশলা সরবরাহের জন্য তাহাকে ৬ হাজার টাকা দেওয়া হইল। রসিদের তারিখ হইল ১৯২৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ। পর বৎসর পর্য্যন্ত এই বাড়ী তৈয়ার আরম্ভ হয় নাই।

(১০) নিয়ম এই যে, গবর্ণমেণ্ট যদি কোন মিউনিসিপ্যালিটীকে কোন কাজের জন্য ঋণ দেন তবে সে কাজের পর যদি টাকা উদ্বৃত্ত হয় তবে তাহা গবর্ণমেণ্টকে ফিরাইয়া দিয়া ঋণের পরিমাণ কমাইয়া লইতে হইবে। হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটী ১৯০৬ ও ১৯১৪ সনে দুইবার যে ঋণ লন তাহা হইতে যথাক্রমে ১৪,৪৫৯৲ ও ২৫৬,৭০৬৲ উদ্বৃত্ত হয়। এই টাকা ফেরৎ না দিয়া উহা জলের কলের কাজে ব্যয় হয়। চেয়ারম্যান পত্র দিয়া একথা গবর্ণমেণ্টকে জানান। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন নাই।

(ঙ) জমাখরচের যে খসড়া করা হয় তাহা ঠিক হয় না; ঠিকমত ট্যাক্স আদায় করা হয় না। যাহারা ট্যাক্স দেন না, তাহাদিগকে কঠিন সাজা দেওয়া হয় না, কাজ করাইয়া লইয়া টাকা দেওয়া হয় না, আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়।

রিপোর্ট পাঠ করিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলাম। আমরা স্বরাজ পাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি এবং তাহার আশাও দেখা দিয়াছে। আজ না হয় দুইদিন পরে স্বরাজ আমাদের করায়ত্ত হইবেই। কিন্তু স্বরাজের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান মিউনিসিপ্যালিটী পরিচালনায় আমরা যেরূপ আচরণ করিতেছি ও কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিতেছি তাহাতে আমাদের অযোগ্যতাই প্রকটিত হইতেছে। ইহা দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিতান্ত দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। আশা করি দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে পতিত হইবে এবং তাঁহারা স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দিতে সচেষ্ট হইবেন। (পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্

বাঙ্গালায় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ১৯২৭-২৮ সনের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়,—এই বৎসরের শেষে বাঙ্গালার অন্যূন ৮৮টি জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন ছিল। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ৭৮টি। আলোচ্য বৎসরে যে নূতন ১০টি জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হইয়াছে, তাহার মধ্যে কাশীমবাজার এবং মহিষাদল এই দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুইটীই বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ জমিদারীসমূহের শ্রেণীভুক্ত। বাঙ্গালার রেভিনিউ বোর্ডের অধীন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের এলাকাভুক্ত এই সব জমিদারীর খাজনা ও সেস বাবদে মোট হাল পাওনা ৬২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা; বকেয়া পাওনা মোট ৯৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। তাহার মধ্যে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আদায় করিয়াছেন ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। অর্থাৎ হাল পাওনা সবই আদায় হইয়াছে এবং বকেয়া পাওনারও কিছু আদায় হইয়াছে, ধরা যাইতে পারে। জমিদারীসমূহের মোট ঋণের পরিমাণ ১ কোটির উপর ৫ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস কিছু ঋণ পরিশোধও করিয়াছেন; তাহা ছাড়া, এই সব জমিদারীর খরচাও কমাইয়াছেন অনেক। মোটের উপর, সরকারী রিপোর্ট হইতে বুঝা যায়,—গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে এই সব জমিদারীর কাজ চলিতেছে ভাল এবং তাহার ফলে, ক্রমেই তাহাদের ঋণ পরিশোধ হইতেছে, কাজেই অবস্থাও ভাল হইয়া দাঁড়াইতেছে। (বঙ্গবাসী)

ইউনিয়ান বোর্ডের সার্থকতা

ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হওয়ায় আমাদের পল্লীগ্রামে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে; বোধ হয় এই কথা পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। বোর্ড হইতে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার উন্নতি, চিকিৎসালয় স্থাপন দ্বারা রোগের চিকিৎসা, জলাশয় খনন বা নলকূপ স্থাপন দ্বারা পানীয় জলের অভাব দূর করা, রাস্তা নির্ম্মাণ ও মেরামত করিয়া যাতায়াতের সুবিধা করা, ড্রেন খনন দ্বারা মাঠের জল-নিকাশ করিয়া শস্যাদি সৃজনের সুবিধা করা, পয়ঃপ্রণালী ও আবর্জ্জনাদি পরিষ্কার করিয়া স্থানবিশেষে ডোবা ইত্যাদি ভরাট করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি করা যাইতে পারে। যে ইউনিয়নে যত বেশী আয়-বৃদ্ধির সুবিধা আছে বোর্ডের উদ্যমশীল সভ্যগণ সেখানে তত নানা প্রকারের উন্নতিজনক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পল্লীবাসীর সুবিধা করিতে সমর্থ হন। আয় না থাকিলে সেখানে কোনও উন্নতি বা সুবিধাজনক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। জিলা বোর্ড বা গবর্ণমেণ্ট তেমন সাহায্য করিতে পারেন না বলিয়াই ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে আপন পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে হয়। ট্যাক্স ও চাঁদা দ্বারা বোর্ডের আয় হয়। বোর্ড স্থাপনের পূর্ব্বে দফাদার ও চৌকীদারগণের বেতন ও পোষাকাদির খরচ ব্যতীত গ্রামবাসিগণকে আর কোনও ব্যয় বহন করিতে হইত না। বোর্ড স্থাপন হওয়ার পর উক্ত ব্যয় ব্যতীত আরও অনেক বেশী ব্যয় বহন করিতে হয়। এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিয়া ইহার বিনিময়ে অনেক সুখ সুবিধা পাওয়া যাইতেছে। অনেকেই ব্যয়-বাহুল্যের জন্য মহকুমায় যাইয়া কম দাবীর মোকদ্দমা স্থাপন করিতে পারেন নাই, ইউনিয়ন কোর্ট ও বেঞ্চ স্থাপন হওয়ায় সে বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতব্যাপী যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেস কমিটী ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জন সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করেন নাই। কেহ কেহ ইউনিয়ন বোর্ড বর্জ্জনের ও ইউনিয়ন রেট বন্ধ করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইউনিয়ন বোর্ডে থাকিয়া আমরা নিজেদের যে সকল সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া নিতে পারি, বোর্ড বর্জ্জনের ফলে সেই সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। (পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

বৌলতলী ইউঃ বোর্ড

(১৩৩৭ সনের আনুমানিক আয়ব্যয়ের বাজেট)

আয়

(১ম খণ্ড)

পূর্ব্ব বৎসরের তহবিল	...	৮৫৲
৩৭ (ক) ধারানুযায়ী ট্যাক্স	...	৯১৮৲

আদায় খরচ ও ক্ষতিপূরণ	...	১০২৲
		১১০৫৲

(২য় খণ্ড)

৩৭ (খ) ধারানুযায়ী ট্যাক্স	...	১৫০৲
খোয়ারের খাজানা	...	১০৲
জিঃ বোর্ড সাহায্য	...	৫০৲
জিঃ বোঃ হইতে স্কুল বাবদ	...	১৪৪৲
পরোয়ানা জারী বাবদ	...	১০৲
৪১ ধারানুযায়ী দণ্ড	...	৫৲
বেঞ্চের আয়	...	৪০৲
কোর্টের আয়	...	৮৪৲
		৪৯৩৲
মোট	...	১৫৯৮৲

ব্যয়

(১ম খণ্ড

১জন দফাদার মাসিক ১০৲ হিঃ		
৭জন চৌকিদার মাসিক ৭৲ হিঃ বেতন	...	৭০৮৲
পোষাকাদির মূল্য	...	৫৫॥৵০
কেরাণীর বেতন ১২৲ হিঃ	...	১৪৪৲
ট্যাক্স আদায়ের খরচ	...	১০২৲
		৯৮৯॥৵০

(২য় খণ্ড)

ট্যাক্স আদায়ের খরচ	...	১৫৲
রাস্তা নির্ম্মাণ	.	৫৫৲
রাস্তা মেরামত	...	৬৫৲
ড্রেনের উন্নতি	..	৫২৲
স্কুল	...	১৯২৲
কচুরী পরিষ্কার	..	৫০৲
বোর্ড আফিসের খরচ	...	২০৲
বেঞ্চের খরচ	...	১২৲
কোর্টের খরচ	...	২০৸৵০
পরোয়ানা জারীর খরচ	...	১০৲
অনাদায়ী টাকার ক্ষতিপূরণ	...	৫৮॥০
হাতে মজুত	...	৮৫৲
		৬০৮।৵০
মোট		১৫৯৮৲

মাধবদী ইউনিয়ন বোর্ড

(১৩৩৬ সনের আয়ব্যয়ের হিসাব)

আয়

পূর্ব্ব বৎসরের তহবিল	...	১৯৮৫৻৮
খোয়ার হইতে আয়	...	৭৲
৩৩ ধারানুযায়ী জেলা বোর্ডের দান	...	১০৮৲
৪৫ ধারানুযায়ী জেলা বোর্ডের দান	...	৮১॥০
স্থানীয় চাঁদা আদায়	...	২৬১০৲
৪১ ধারানুযায়ী জরিমানা আদায়	...	১৯॥০
ইউনিয়ন বেঞ্চ হইতে আয়	...	২৭০॥০
ইউনিয়ন কোর্ট হইতে আয়	...	৩১৪৸৶
সমন জারী ফিস	...	২৮৲
অগ্রিম আদায়	...	৪৫২॥০
চৌকীদারের নিকট হইতে জরিমানা আদায়		২৮৸০
সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে সুদ	...	৫৫॥/৫
টিউব ওয়েল কনট্রাকটার হইতে ফেরৎ পাওয়া যায়		৮০॥০
নকল ফিস	...	৵০
বোর্ড স্কুল শিক্ষকের নিকট হইতে মনিঅর্ডার ফিস আদায়	...	১৵০
হালটের উপরের একটী গাছ কাটিবার ব্যয়		৸০
৩৭ক ধারানুযায়ী রেট আদায়	...	১৭১৫।৵০
৩৭ক ধারানুযায়ী রেট আদায়	...	৩০৩।৵০
		৮০৫২॥/৭

ব্যয়

চৌকীদারদের বেতন	...	১৩২৯৵৩
দফাদারের তৈল খরচ	...	৬৲

পোষাক খরচ ...	৫০৶৯
কেরাণীর বেতন ...	১৮০৲
রেট আদায় খরচ ...	১৫০৲
জিনার্দ্দি রাস্তার জন্য জেলা বোর্ডকে দেওয়া হয়	২৫০০৲
ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা নির্ম্মাণ ...	২৬৫৲
রাস্তা মেরামত ...	১৫১॥৩
জল সরবরাহ ...	১০৭২॥০
কূয়া মেরামত ...	২৫।৵০
জেলা বোর্ড স্কুলের শিক্ষকের বেতন ...	১০৮৲
প্রাথমিক শিক্ষা ...	৪৬৲
স্বাস্থ্যোন্নতি ...	৪৭।০
ইউনিয়ন বেঞ্চের খরচ ...	৬৬।৶০
ইউনিয়ন কোর্টের খরচ ...	৫৬৵৬
সমন জারীর ফিস ...	২৮৲
অগ্রিম দেওয়া হয় ...	৪৫॥০
জরিমানা পাঠান হয় ...	২৮৸০
বিবিধ প্রকারের খরচ ...	১১২॥৶৬
	৬৬৭৫॥/৩
তহবিলে রহিল ...	১৩৭৭৻৪
	৮০৫২॥/৭

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

সনমানিয়া ইউঃ বোর্ড

(১৩৩৬ সনের আয়)

পূর্ব্ব বৎসরের তহবিল ...	৮৫৸৶৩ পাই
খোয়ারের আয় ...	৭৪৲
৩৭ ধারানুযায়ী ইউনিয়ন রেট ...	১৬২৮৲
৩৩ ধারানুযায়ী স্কুলের জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্য	৩৫৬।৵০
৪৫ ধারানুযায়ী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্য	৮০॥৵০
গভর্ণমেন্টের সাহায্য ...	১৫০৲
স্থানীয় সাহায্য (চাঁদা) ...	২৩৭৲
ইউনিয়ন বেঞ্চের বাবদ আয় যথাঃ—	
(১) জরিমানা ...	১৩৩৲
(২) নকল ফিস ...	১১৲
ইউনিয়ন কোর্টের আয়, যথা :—	
(১) কোর্ট ফিঃ ...	৫১৩॥৶০
(২) নকল ফিঃ ...	৭॥৶০
(৩) ডিক্রির দাখিলী টাকা ...	১৪৮।০
সমন জারীর ফিস ...	১৭৲
বিবিধ প্রকারের আয়, যথা :—	
পাস বহির সুদ ...	॥১০
মোট	৩৪৪৩৵১০

১৩৩৬ সনের ব্যয়

কর্ম্মচারীর বেতন ...	১৯২৲
দফাদার ও চৌকীদারের বেতনাদি ...	৯৩৫।৶০
ট্যাক্স আদায়ের খরচ ...	১০৮৲
আড়াল ঘোষার রাস্তা মেরামত ...	৮১৸৵০
২টী পুল নির্ম্মাণ ...	৩৫৯।/০
জল সরবরাহ, যথা :—	
(১) চর সনমানিয়া মৌজা—	
(২) ইন্দারা—১টী	
আঠার কাহালিয়া মৌজায় ইন্দারা ১টী ...	৬০২।/০
(৩) ১৩৩৫ সনের নির্ম্মিত মামুদি ও মৃজানগর	
মৌজার ইন্দারার বাকী টাকা শোধ ...	৬০৲
ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের স্কুলের বাবদ খরচ ...	৩৮৩৻৩
ইউনিয়ন বোর্ডের স্কুলের সাহায্য ...	১৪০৲
ইউনিয়ন বেঞ্চের ব্যয়—	
(১) নকল করণের পারিশ্রমিক ...	৭॥০
(২) বাদীর ক্ষতিপূরণ ...	১০৲
(৩) ফরম রেজিষ্ট্রারী ইত্যাদি ...	২২৸৵০
ইউনিয়ন কোর্টের ব্যয়—	
(১) নকল করণের পারিশ্রমিক ...	৬৵০
(২) ডিক্রির দাখিলী টাকা ফেরৎ ...	১৪৮।০
(৩) ফরম রেজেষ্ট্রারী ইত্যাদি ...	২৮৸৶০
সমন জারী ...	১৭৲
বিবিধ খরচ—	
(১) চেয়ার খরিদ ২ খানা ...	১১।০

(২) স্বায়ত্ত শাসন পত্রিকার চাঁদা	...	৩৷৹
(৩) পঞ্চায়েৎ পত্রিকার চাঁদা	...	২৵৹
(৪) ঢাকা যাতায়াত খরচ	...	২৫৻৩
ফরম রেজিষ্ট্রারী, কাগজ, কালি কলম ডাকখরচ ইত্যাদি	...	৮০।৵৹
		৩২২৩৮৴৬
উদ্বৃত্ত তহবিল		২১৯৷৷৭
সর্ব্ব মোট		৩৪৪৩৷৵১

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

বোম্বাইয়ের মিলসমূহের অবস্থা

বোম্বাইয়ে অনেকগুলি কাপড়ের কল আছে। এগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত কর যায়। যথা—(১) স্বদেশী মিল। এই শ্রেণীর মিলগুলি দেশীয় মূলধনে স্থাপিত হইয়া দেশীয় লোক দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। (২) বিদেশী মিল। এই শ্রেণীর মিলগুলি দেশী ও বিদেশী উভয়বিধ মূলধনে স্থাপিত হইয়া বিদেশী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এই সমস্ত মিলে বিলাতী সূতা দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। এগুলিকে বয়কট করা উচিত বলিয়া বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আদেশ দিয়াছেন।

এই বয়কটের ফলে বিদেশী পরিচালিত মিলগুলির অবস্থা মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। কাপড় বিক্রয় হইতেছে না দেখিয়া বিগত ২১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ১৯টী মিল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রায় ৫০০০০ শ্রমিক বেকার হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্ত মিল খুলিবে বলিয়া আশা করা যায় না।

কোন্ কোন্ মিল বয়কট করা উচিত তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বোম্বাই কংগ্রেস কমিটী একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বিদেশী কর্ত্তৃক পরিচালিত ২৪টী মিলের নাম আছে। ইতিমধ্যে কথা উঠিয়াছে যে, উক্ত মিলের মালিকগণ যদি কংগ্রেসের প্রদত্ত সর্ত্ত মানিয়া লন তাহা হইলে একটা আপোষ মীমাংসা হইতে পারে এবং বয়কট প্রত্যাহারের ব্যবস্থা হইতে পারে।

বোম্বাই কংগ্রেস কমিটি নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি উপস্থিত করিয়াছেন :—

(১) বিদেশী মিলের মূলধন শতকরা অন্ততঃ ৭৫৲ টাকা হিসাবে ভারতবাসীর নিকট লইতে হইবে।

(২) এই সমস্ত মিলের যে সকল ডাইরেক্টার থাকিবেন তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ ভারতবাসী হওয়া চাই।

(৩) ভারতবাসীর মধ্য হইতে মিলসমূহের সমস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। কেবল বিশেষ কাজের জন্য যেস্থলে ভারতবাসী দ্বারা কাজ চলে না, সেই স্থলে দুই একজন বিদেশী লোক নেওয়া যাইতে পারে।

(৪) মিলের ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন তৎসমস্তই ভারতবাসীর নিকট হইতে ক্রয় করিতে হইবে। যে জিনিষ এদেশে পাওয়া যায় না, কেবল সেই জিনিষই বিদেশীর নিকট হইতে কিনিতে পারা যাইবে।

(৫) এই সমস্ত বিদেশী মিলের পক্ষ হইতে সকল সময়েই ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর সহিত কারবার করিতে হইবে।

(৬) এই সমস্ত মিলের ম্যানেজিং এজেন্টের সহিত যাহাদের কোন না কোন প্রকার সম্পর্ক থাকিবে তাহারা কিছুতেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য করিতে পারিবে না, গবর্ণমেন্টের পক্ষাবলম্বন করিতে পারিবে না এবং ইচ্ছা করিয়া জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না।

এই সমস্ত বিধি অনুসারে কাজ করিতে সম্মত হইলে বিদেশী পরিচালিত মিলগুলিকে কংগ্রেসের "বয়কট তালিকা" হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

সৎকার্য্যে দান

ভবানীপুরের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী জগন্নাথ প্রসাদ আরিয়া গত ৫ই জুলাই তারিখে মটরগাড়ী চাপা পড়িয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উইলের বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, তিনি নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়া গিয়াছেন :—

১। কলিকাতা আর্য্য সমাজে ২৫০০০৲

২)	কলিকাতা আর্য্য সমাজ বালিকা বিদ্যালয়ে	২৫,০০০৲
৩ ।	কাশী টি, এ, বি, স্কুলে	১৫,০০০৲
৪ ।	কানপুরের টি, এ, বি, কলেজে	১৫,০০০৲
৫ ।	কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে	১০০,০০০৲
৬ ।	অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য	৩,০০০৲
৭ ।	দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্র ও একটি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে	১৫,০০০৲
৮ ।	কাশীতে একটী নূতন স্কুল নির্ম্মাণের জন্য	২০০,০০০
৯ ।	দুইটী ভ্রাতষ্পুত্রকে পড়ার জন্য	৫০,০০০৲
১০ ।	হরিদ্বার গুরুকুলে	৫০,০০০৲
১১ ।	বৃন্দাবন গুরুকুলে	১৫,০০০৲
১২ ।	কুন্দ সভায়	২৫,০০০৲

(কাশীপুরনিবাসী)

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দারভাঙ্গার মহারাজের দান

দারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ কামেশ্বর সিং বাহাদুর তাঁহার পিতা স্বর্গীয় সার রামেশ্বর সিংহের স্মৃতি-রক্ষার্থ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকায় কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করা হইয়াছে। তাহা হইতে প্রতি বৎসর যে আয় হইবে, সেই আয় দ্বারা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৈথিলী ভাষা চর্চ্চার বন্দোবস্ত করা হইবে, একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইবে এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে গবেষণার ব্যবস্থা করা হইবে।

শিল্প-শিক্ষার সুযোগ

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ জানাইয়াছেন যে, যদি কোন বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট কোন ভাল কারখানায় ডাক্তারী তুলা ও ফিনাইল ইত্যাদি তৈয়ারী করা শিখিতে চান, তবে তাঁহারা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। ছাত্রটি কোন পারিশ্রমিক পাইবেন না, কবে চাকুরী পাইবেন এমন সর্ত্তও করা হইবে না। ৪০।১এ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে ডিরেক্টর অব্ ইন্ডাসট্রীস্ এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা

অষ্টবিংশ অধিবেশনে গৃহীত কয়েকটী প্রস্তাব

(১) বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সমাজের ঘোর অনিষ্টকর পণপ্রথা-নিবারণ ও সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ব্যাপারে ব্যয়সঙ্কোচ অবশ্য-করণীয় বলিয়া সভা ঘোষণা করিতেছেন।

(২) বঙ্গদেশীয় চারি শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে এবং ভারতের বিভিন্নপ্রদেশের সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক আদানপ্রদান প্রচলন সমগ্র ভারতের কল্যাণের জন্য বাঞ্ছনীয় ও একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া এই সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(৩) কায়স্থসমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে সংস্কৃত ও হিন্দীভাষা শিক্ষা, সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চা, আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা ও অর্থকরী বিবিধ পাশ্চাত্য শিল্পবিজ্ঞানাদি কলাবিদ্যা শিক্ষা অতি আবশ্যক বলিয়া এই সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(৪) এই সভা কায়স্থ মহিলাগণের শিক্ষার বহুল বিস্তার অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন।

(৫) এই সভা কায়স্থমাত্রকেই স্বদেশী দ্রব্য ও খদ্দর ব্যবহার, স্বদেশী ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় মনোযোগ, মাদক দ্রব্য পরিহার, প্রতি ঘরে চরকা প্রবর্ত্তন এবং স্বদেশী শিল্পের উন্নতি-সাধনে একান্ত চেষ্টা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

(৬) এই সভা নারীদের রক্ষাকল্পে ও দুর্ব্বৃত্তগণের দমনের জন্য সর্ব্বপ্রকার শক্তিপ্রয়োগ করিতে হিন্দুমাত্রকেই বিশেষতঃ কায়স্থসমাজকে আহ্বান করিতেছেন।

(৭) দুঃস্থ কায়স্থ বালকবালিকা ও নিরাশ্রয়া কায়স্থ-বিধবাগণের ভরণপোষণ ও বৃত্তিনির্ব্বাহের জন্য ভাণ্ডারের আবশ্যকতা এই সভা ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন এবং এই ভাণ্ডারের সাহায্য করিবার জন্য কায়স্থমাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

(৮) কায়স্থ স্বেচ্ছাসেবক গঠন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অধীনে ও তত্ত্বাবধানে কায়স্থ-

জাতির সর্ব্ববিধ সেবার জন্য একটী কায়স্থ-স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করা বিশেষ আবশ্যক। এ বিষয়ে চেষ্টা ও ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সভার সভ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু মহাশয় সম্পাদক এবং ৩ জন ছাত্রসভ্য লইয়া একটী সাব কমিটী গঠন করা হউক।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আয়-ব্যয়ের একজাই হিসাব

(১৩৩৬ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত)

জমা

বার্ষিক চাঁদা খাতে	...	২৭৬১৲
প্রচার খাতে	...	৮৫৮৲
বিজ্ঞাপন খাতে	...	৭৮॥০
পুস্তক বিক্রয় খাতে	...	৪০॥০
ডাক মাশুল ওয়াপোষ	...	৭৭/০
প্রবেশিকা	...	১৪৯৲
পত্রিকার বার্ষিক মূল্য	...	৯৬৲
পত্রিকা নগদ বিক্রয়	...	৮॥৴০
চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার	...	১১৲
চিত্রগুপ্তপূজা খাতে	...	৪৮২৲
পত্রিকা খাতে	...	১০০৲
		৪৬৭১॥৶০

খরচ

বেতন খাতে	...	৪৫৮৲
ডাক খরচ খাতে	...	৫৬২॥৶১০
পত্রিকা খাতে	...	১৩২৫৻৫
বিবিধ মুদ্রণ	...	১১৮৻১০
দপ্তর সরঞ্জাম	...	৪২।/১৫
পাথেয় খাতে	...	৪২/১০
চাঁদা আদায় কমিশন	...	১৯০॥৶০
সভ্য করার কমিশন	...	১০৭৲
প্রচার খাতে	...	৬৩০৲
বার্ষিক অধিবেশন খাতে	...	৫৫।৴১৫
সাহায্য খাতে	...	১৫৲
চিত্রগুপ্ত পূজা খাতে	...	২৫৫৴৫
বিবিধ বাবদ	...	১০৴০
		৪৮১১৸/১০
একজাই জমা	...	৪৬৭১।৶০
পূর্ব্ব তহবিল	...	৩৪৪।৴১৫
		৫০১৬/১৫
বাদ একজাই খরচ	...	৪৮১১৸/১০
		২০৪।৫

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের হিসাব

(১৩৩৬ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত)

জমা	...	১০০০৲
পূর্ব্ব তহবিল	...	৫২১৯৴৪ পাই
		৬২১৯৴৪
বাদ খরচ		০
		৬২১৯৴৪

বিতং

মজুদ—

১। রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নামে ৩½ সুদের জি, পি, নোট (১৮৫৪।৫৫) ২২২৩৩৮ নং ১ খানা—১০০৲

২। ৩½ সুদের জি, পি, নোট (১৮৫৪।৫৫) ২২২৩৪০ নং ১ খানা— ১০০০৲

৩। ৬৲ সুদের ১৯২৬ সালের ৩০২৮৮২ নং ওয়ারবণ্ড ১ খানা— ৫০০৲

৪। শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় নামীয় ৩½ সুদের (১৮৪২।৪৩) ২০২৯৭ নং

১ খানা জি, পি,
নোট— ১০০০৲
ইম্পিরিয়াল সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে শ্রীযুক্ত
কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের
নামে — ১৫০৭।৶৬

৪৭০৭।৶৬ পাই

হাওলাত ... ৫১১॥৵১০ পাই

দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের হিসাব
(১৩৩৬ সাল)

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে শতকরা বার্ষিক ৬৲ সুদের ১৯৩২ সালের ০০১৭০২ নং ওয়ারবণ্ড ১ খানা (এই বণ্ড কোষাধ্যক্ষ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত ছিল)। ৫০০৲

১৩৩৭ সালের আনুমানিক আয়ব্যয়ের খসড়া

জমা

বার্ষিক চাঁদা	...	৩০০০৲
প্রবেশিকা	...	১৫০৲
পত্রিকার বার্ষিক মূল্য	...	১০০৲
বিজ্ঞাপন	...	২০০৲
ডাকমাশুল ওয়াপোষ	...	১০০৲
প্রচার বাবদ	...	১০০০৲
আজীবন সভ্যের চাঁদা	...	২০০৲
চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের সুদ	...	৩০০৲
দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের সুদ		১৫০৲
চিত্রগুপ্ত পূজা	...	৩০০৲
		৫৫০০৲

খরচ

বেতন	...	৬০০৲
চাঁদা আদায়ের কমিশন	...	২০০৲
সভ্য করার কমিশন	...	২০০৲
ডাক খরচ	...	৬০০৲
প্রচার খাতে	...	১৫০০৲
পত্রিকা খাতে	...	১২০০৲
দপ্তর সরঞ্জাম	...	৫০৲
পাথেয়	...	৫০৲
বিবিধ মুদ্রণ	...	১০০৲
চিত্রগুপ্ত পূজা	...	২৫০৲
সাহায্য	...	১০০৲
বিবিধ	...	৫০৲
চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের হাওলাত শোধ	..	৫০০৲
		৫৪০০৲

লোক-গণনা ও বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ

হিন্দু মিশনের গত পাঁচ বৎসর-ব্যাপী অবিশ্রান্ত প্রচারের ফলে বাংলা বিহার ও আসাম প্রদেশে হিন্দু-সমাজ বহির্ভূত অন্যূন দশ লক্ষ অধিবাসী আজ বহুল পরিমাণে হিন্দু আচার, অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মমত পালন করিতেছে এং হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে। আগামী ১৯৩১ সালে ১লা জানুয়ারী হইতে লোক-গণনা আরম্ভ হইবে। যাহাতে ঐ সময়ে ইহাদের নাম, জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, উপাধি প্রভৃতি হিন্দুর বৈশিষ্ট্যানুযায়ী আদমসুমারীর বহিতে যথারীতি লিপিবদ্ধ হয় তজ্জন্য সর্ব্বত্রই হিন্দুদিগকে বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে।

হিন্দুসমাজে একজাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য এবং প্রত্যেক শ্রেণীকে হীনতা বা অস্পৃশ্যতাবোধক বর্ণ ও উপাধি বর্জ্জন করাইয়া গোরবাত্মক বর্ণ ও উপাধিতে ভূষিত করার জন্য হিন্দুমিশন গত ৫ বৎসর যে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন বর্ত্তমান আদমসুমারীতে তাহারও সাফল্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই বিষয়েও কালবিলম্ব না করিয়া বিভিন্নশ্রেণীর হিন্দুকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

হিন্দু-মিশনের বিভিন্ন প্রদেশস্থিত কেন্দ্রসমূহে উপরোক্ত উভয় উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই বহুদেশ-বিস্তৃত বিরাট কার্য্য সমগ্র হিন্দু সমাজের সহায়তা ব্যতীত সুসম্পন্ন হইতে পারে না। মাত্র ৩ মাস কালের মধ্যে ইহা সম্পন্ন করিতে হইবে। এজন্য বহু অর্থব্যয় ও লোক নিয়োগ

করিতে হইবে। এই কার্য্যে আমরা সকল হিন্দুপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। হিন্দুসভা হিন্দুসঙ্ঘ হিন্দু-সম্মিলন, হরিসভা, রামকৃষ্ণ মিশন, সেবাশ্রম, সেবাসমিতি, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে আমাদের এই প্রার্থনা বিশেষভাবে জানাইতেছি।

স্বামী সত্যানন্দ,
সভাপতি, হিন্দু-মিশন,
ঢাকা হিন্দু-মিশন।

স্যর ম্যালকল্‌মের শুল্ক-নীতি

স্যর ম্যালকল্‌ম্ রবার্টসন্ কয়েকদিন আগে পর্য্যন্ত আর্জ্জেন্টিনাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজদূত ছিলেন। তিনি সম্প্রতি বিলাতের সংরক্ষণ-নীতি সম্বন্ধে গোটাকয়েক কথা বলেছেন যা ভেবে দেখ্‌বার মত। তিনি বিলাতের ডোমিনিয়ানগুলা নিয়ে "আর্থিক জোট" বাঁধিবার পক্ষপাতী। অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলির মধ্যে আর্থিক আদান-প্রদানের পথে সংরক্ষণ-শুল্কের বাধা অপসারিত করা হোক্। বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলা নিয়ে একটা স্বাবলম্বী ও আত্ম-প্রতিষ্ঠ আর্থিক সঙ্ঘ গড়ে উঠুক এবং বাইরের প্রতিযোগিতা থেকে বিলাতের ও ডোমিনিয়ানগুলার শিল্পগুলাকে উচ্চ শুল্ক-প্রাচীরের সাহায্যে রক্ষা করা হোক্—এই কার্য্যপ্রণালীর তিনি পক্ষপাতী। তত্ত্বের দিক্ থেকে তিনি ঐ মতের পক্ষপাতী বটে কিন্তু তিনিই আবার দেখাচ্ছেন যে, কার্য্যতঃ ঐ নীতি অনুসরণ করা নিতান্ত সোজা নয়, বরং অনেক দিক্ থেকে বিলাতের স্বার্থের বিরোধী। যেমন, আর্জ্জেন্টিনাতে বিলাতের নানা স্বার্থ। ইংরেজেরা সেখানে ৫০।৬০ কোটি পাউণ্ড টাকা খাটাচ্ছে আর সেই মূলধনের সুদ ভোগ করছে। যারা সুদ ভোগ করছে তারা বিলাতের গবর্ণমেণ্টকে আয়কর হিসেবে মোটা টাকা দিচ্ছে। যে ১৬ হাজার মাইল রেলপথ ইংরেজের তাঁবে আর্জ্জেন্টিনাতে চলে, সেই রেলপথের যা কিছু ইঞ্জিন লোহালক্কড় প্রভৃতি দরকার হয় তা বিলাত থেকেই নেওয়া হয়। তাতেও বিলাতের অনেক লোক প্রতিপালিত হয়। তা ছাড়া, ইংরেজ আর্জ্জেন্টিনাতে নানা ট্রাম কোম্পানী, গ্যাস কোম্পানী, জলসরবরাহের কোম্পানী চালিয়ে, বন্দর খুলে খাল বিল খুঁড়ে অজস্র পয়সা রোজগার করে। যে সব জাহাজে আর্জ্জেন্টিনার মাল যাওয়া আসা করে তার অর্দ্ধেক ইংরেজের। তা ছাড়া, বিলাত আর্জ্জেন্টিনা হ'তে যথেষ্ট গম ও গোমাংস আমদানি করে। আর্জ্জেন্টিনা সাম্রাজ্যের বাহিরে ব'লে বিলাত যদি সংরক্ষণনীতির বিস্তার ক'রে এই আমদানি করা খাদ্যের ওপর উচ্চ শুল্ক বসায়, তা হ'লে বিলাতে খাদ্যের দর বাড়বেই। তার কারণ গবাদি পশু প্রতিপালন ও শস্য উৎপাদনে আর্জ্জেন্টিনার যে সব সুবিধা আছে, তা বিলাতের নেই। আর্জ্জেন্টিনার জল হাওয়া এমন যে পশুগুলা সহজেই মোটাসোটা হয়, তাদের জন্যে বাড়ীঘর করবারও দরকার হয় না। আর্জ্জেন্টিনাতে শস্য উৎপাদন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে নয়, প্রকাণ্ড প্রান্তরে হ'য়ে থাকে, এজন্যে উৎপাদনের খরচা খুব কম পড়ে। বিলাতের চাষীদের আর্জ্জেন্টিনার চাষীদের প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বিলাত যদি আর্জ্জেন্টিনা হ'তে আমদানি করা খাদ্যের উপর কর বসায়, তা হ'লে বিলাতে যে কেবল খাদ্যের দর চড়্‌বে তা নয়, অধিকন্তু বিলাতের বাজারে আর্জ্জেন্টিনার বিক্রয় বন্ধ কর্‌লে, আর্জ্জেন্টিনা তার আবশ্যকীয় জিনিষপত্র বিলাত থেকে না কিনে বিলাতের প্রতিযোগীদের কাছ থেকে কিন্‌তে আরম্ভ কর্‌বে। এই সব কথা আলোচনা ক'রে স্যর্ ম্যালকল্‌ম্ বলেন, বিলাত ও আর্জ্জেন্টিনার বাণিজ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করা ত উচিত নয়ই, বরং যাতে বিলাতের ও আর্জ্জেন্টিনার আর্থিক সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর হয়, সেই চেষ্টায় শীগ্‌গির আর্জ্জেন্টিনার সঙ্গে বিলাতের নূতন আর্থিক সম্বন্ধ কায়েম করা দরকার। আর্জ্জেন্টিনাকে বিলাতের সাম্রাজ্যের বাইরে বলে না গণনা করে, সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হিসাবেই বিবেচনা করা উচিত।

এখানে বেশ একটা মজার জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। স্যর্ ম্যালকল্‌ম্ মুখে বলছেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্যকে আর্থিক হিসাবে আরও একতাবদ্ধ কর, সংরক্ষণশুল্কের প্রাচীর খাড়া ক'রে অন্য দেশগুলাকে আরও দূরে সরিয়ে দাও।" কিন্তু বৃটিশ-আর্জ্জেন্টিনার আর্থিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গভীর

অভিজ্ঞতা থাকায় বল্‌ছেন, "আর্জ্জেন্টিনা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে বটে, কিন্তু তা হ'লেও ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখ্‌তে হবে, তা না হ'লে যে বিলাতের সর্ব্বনাশ।" আর এই দু'কথার সামঞ্জস্য রাখ্‌বার জন্যে বল্‌ছেন, "আর্জ্জেন্টিনা সাম্রাজ্যের বাইরে হ'লেও তাকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে করা উচিত।"

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে কেবল আর্জ্জেন্টিনার সঙ্গেই বিলাতের আর্থিক ঘনিষ্ঠতা আছে তা নয়। অন্যান্য নানা দেশের সঙ্গে বিলাতের মোটা টাকার আদানপ্রদান হয়। সেই ব্যবসা-বাণিজ্য যদি বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়, তা হ'লে যে যুক্তি দিয়ে স্যর্ ম্যালকল্‌ম্ আর্জ্জেন্টিনাকে আর্থিক হিসাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত গণ্য কর্‌তে ইচ্ছুক, সে যুক্তিতে বিলাতের সহিত বেশী ব্যবসা-বাণিজ্য করে এ রকম প্রত্যেক দেশকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিবেচনা কর্‌তে হয়। আর তাই যদি কর্‌তে হয়, তা হ'লে সংরক্ষণ-প্রাচীর উঁচু করা একেবারে স্থগিত রাখ্‌তে হয়, অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্য-নীতি চালাতে হয়। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, স্যর্ ম্যালকল্‌মের মাথায় অবাধ বাণিজ্য-নীতির কথাটাই খেল্‌ছে। কিন্তু সমসাময়িক আর্থিক চীৎকারকে সমর্থন কর্‌তে হবে বলেই তিনি বল্‌ছেন যে, তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে আর্থিক হিসাবে ঘনিষ্ঠতর করবারই পক্ষপাতী।

ভারতীয় তুলা সম্বন্ধে লর্ড ষ্ট্যান্‌লি

লর্ড ষ্ট্যান্‌লি দিন কয়েক আগে ভারতে সফরে এসেছিলেন। সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারে এম্পায়ার কটন্ গ্রোয়িং অ্যাসোসিয়েশানের বার্ষিক সভায় তিনি ভারতীয় তুলা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন।

তিনি বলেন যে, 'সাক্কার ব্যারেজ স্কীমের' ফলে ৩৩ লক্ষ ৫৯ হাজার একার জমিতে জল-সরবরাহের বন্দোবস্ত হবে। এই জমিতে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হবে।

কিন্তু খাল-প্রণালী সৃষ্টি করার জন্য জমির দাম বেড়েছে, প্রজারাও জমি বেচ্‌তে চাইছে না। এতে গভর্ণমেণ্টের ভারি অসুবিধা। জমিগুলা সমান সমান টুকরায় ভাগ ভাগ করে তাদের ভেতর দিয়ে জল চালালে প্রত্যেক জমিতে কতটা জল নিচ্ছে তা হিসেব করা ও সেই মত টাকা আদায় করা সম্ভব হয়। কিন্তু জমির দর বাড়ার জন্য ও প্রজাদের অনিচ্ছার দরুণ গভর্ণমেণ্ট জমি কিন্‌তে বেগ পাচ্ছেন।

বড় বড় কৃষিক্ষেত্র যেমন সস্তায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মাল উৎপন্ন করতে পারে ও গবেষণার জন্য টাকা ঢালতে পারে, ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র তা পারে না। এই জন্য তিনি বলেন যে, বড় বড় কৃষিক্ষেত্র চালাবার জন্য ২।১টা যৌথ কোম্পানী খোলা বাঞ্ছনীয়। এই সব বড় কৃষিক্ষেত্র ছোট চাষীদের সুদৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে।

ভারতের কাপড়ের ব্যবসা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ল্যাঙ্কাশিয়ার ও ভারতীয় কল-ওয়ালারা একজোট হ'লে উভয়ের সমান শত্রু জাপানকে ভারতের বাজার থেকে তাড়াতে পারে।

ভারতে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদনের চেষ্টা চল্‌ছে। উৎকৃষ্ট তুলা ভারতে উৎপন্ন হ'লে তা বাইরে যেতে না দিয়ে ল্যাঙ্কাশিয়ারেরই কেনা উচিত—এ কথা তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন।

আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সঙ্ঘের নববিধান

আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সঙ্ঘ নানাভাবে জগতের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করছেন। তাঁদের একটা কার্য্যপ্রণালী হচ্ছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে নিয়মকানুন বেঁধে দেওয়া। সভ্য রাষ্ট্রগুলা সেই নিয়মকানুনগুলা মানবেন বলে স্বীকার করতে পারেন, না-ও পারেন। কিন্তু ঐরূপ নিয়মকানুন বাঁধার সার্থকতা এইটুকু যে, তাতে বোঝা যায় মজুরদের সম্বন্ধে এক একটা বিষয়ে সভ্য-জগৎ কতটা অগ্রসর হ'তে রাজী। সম্প্রতি কয়েকটা নতুন আইন-বাঁধার খবর পাওয়া গেছে; যেমন,—

(১) জগতের নানা দেশে লোককে অল্পবিস্তর জোর ক'রে খাটানোর প্রথা প্রচলিত আছে। জোর করে খাটিয়ে নেওয়ার প্রথা উঠিয়ে দেবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সঙ্ঘ সচেষ্ট। কিন্তু তাঁরা ঐ প্রথা একেবারে রহিত করতে নারাজ। একেবারে রহিত করার চেষ্টা তাঁরা ৫ বছর

বাদে করবেন। কিন্তু এখন তাঁরা ঐ প্রথাকে নানা নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে গণ্ডীবদ্ধ ক'রতে চান। নিয়মগুলা এই রকম :—

সাধারণের উপকারার্থ জোর ক'রে খাটানো চল্‌তে পারে—কোন ব্যক্তিবিশেষের সুবিধার জন্য খাটানো চল্‌বে না। সাধারণের উপকারার্থ জোর ক'রে খাটানো চল্‌বে, সে সম্বন্ধেও নিয়মকানুন হয়েছে। 'নেটিভ'দের জোর ক'রে খাটানো চল্‌বে, যদি (ক) স্বাধীন কাজে তারা যে মাইনে পায় তাদের সেই মাইনে দেওয়া হয়; (খ) তাদের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না হয়, এবং গৃহে ফিরে যেতে কোন বাধা না দেওয়া হয়; (গ) দুর্ঘটনা বা রোগে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়; (ঘ) মোট বহানো হলে—বছরে ৬০ দিন ও দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশী খাটানো না হয়। পুরুষ ছাড়া নারীদের জোর ক'রে খাটানো চল্‌বে না। পুরুষদেরও ১৮ থেকে ৪৫এর মধ্যে বয়স হওয়া চাই আর তারা ছাত্র বা শিক্ষক যেন না হয়।

কয়েক প্রকারের শ্রম বাধ্যতামূলক হলেও তাদের জোর করে খাটানো ব'লে আদবেই ধরা হ'বে না যেমন :—(ক) বাধ্যতামূলক অস্ত্রধারণ; (খ) যে সব কাজ সাধারণ নাগরিক জীবনের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত; (গ) যে সব কাজ দণ্ডস্বরূপ বিচারালয় কর্ত্তৃক চাপানো হয়েছে; (ঘ) বিশেষ প্রয়োজনে যে সব কাজ (এর এক একটী তালিকা দেওয়া হয়েছে) আদায় করা হয়েছে; (ঙ) কয়েকটী ছোট খাটো সাম্প্রদায়িক কাজকর্ম্ম।

(২) আফিসের কর্ম্মচারীদের জন্য কয়েকটী নিয়ম বাঁধা হয়েছে; যেমন—তাদের হপ্তায় ৪৮ ঘণ্টা বা দিনে ৮ ঘণ্টার বেশী খাটানো চল্‌বে না। যতক্ষণ কাজ করা চল্‌ছে কেবল ততটুকুই কাজের সময় বলে গণ্য হবে না। যতক্ষণ কর্ম্মচারীরা তাদের প্রভুদের হুকুম তামিল করবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে সেটুকুও কাজের ঘণ্টা বলে ধরা হবে। যদি সাপ্তাহিক ৪৮ ঘণ্টার মাত্রা লঙ্ঘন করা না হয় তা হলে দিনে ৮ ঘণ্টার জায়গায় ১০ ঘণ্টাও খাটানো চলে। যারা মার্চেন্ট আফিস, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ বা পোষ্ট আফিসে কিংবা শাসনকার্য্য-সম্পর্কিত কোন আফিসে কাজ করে অথবা শিল্প ও বাণিজ্যের মিশ্রিত আফিসে কাজ করে, তারা এই নিয়মের সুবিধা ভোগ করবে। যারা হোটেল, হাঁসপাতাল বা থিয়েটারে কাজ করে তারা এ সুবিধা ভোগ করবে না। যারা হোটেল হাঁসপাতাল বা থিয়েটারে কাজ করে তাদের কাজকর্ম্মের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য সঙ্ঘ সভ্যদের অনুরোধ জানাচ্ছেন। এই সব অনুসন্ধান চল্‌লে, এবং তার ফলে সঙ্ঘের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ মালমশলা ও তথ্য জড় হলে তখন সঙ্ঘ বিচার করবেন যে, উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মঙ্গলের জন্য আদবে নিয়ম দরকার কিনা, আর যদি দরকার হয় তা কি প্রকারের হবে।

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত

বিলাতী বীমাকারী শ্রমিকদের মধ্যে বেকার

বিলাতের মিনিষ্ট্রী অব্ লেবার জুন মাসের শেষাশেষি হিসাব করিয়াছিলেন যে, মিলের শ্রমিকদের মধ্যে যাহাদের জীবনবীমা করা আছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪২.২% জন বেকার রেজিষ্টারীতে নাম দিয়াছিল। গত দুই মাসে এই অবস্থা আরও মন্দ হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। কটন ব্যবসায়ের যে হিসাব অফিস আছে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে বৃটিশ সূতা প্রায় ৫০.৬০% কমিয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের আড়তদারদের অবস্থাও ভাল নয়; সর্ব্বত্রই লোক কমান হইতেছে।

ম্যান্‌চেষ্টার গার্জ্জেন (জুলাই ১৯৩০) বলেন যে, এই মন্দা বাজারের প্রধান কারণ হইতেছে ভারতের অশান্তি। ভারতই ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বড় খরিদ্দার। এ ছাড়া চীনে এক্সচেঞ্জের অবস্থা খারাপ হওয়ায় ব্যবসা মন্দা পড়িয়াছে। মিশরে কিছুকাল মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে; সেই অশান্তির মুখে ব্যবসায় অগ্রসর হইতে পারে না। অষ্ট্রেলিয়া নিজেদের আর্থিক অবস্থা ভাল করিবার জন্য অস্থায়ী ভাবে শুল্ক আইন করিয়াছে। এ ছাড়া অন্যান্য দেশেরও ক্রয়ের শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। ইহার উপর মিশর ও মার্কিণ রাজ্যের চেষ্টায় তুলার বাজারের দর ঠিক থাকে নাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতায় গত কয়েক মাসে বিলাতী মালের সামান্যই চাহিদা ছিল। বোম্বাইয়ের অবস্থা তদ্রূপ। করাচী ও মান্দ্রাজ হইতে কতকগুলি ছোট ছোট অর্ডার গিয়াছিল।

তবে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা মোটেই নিশ্চেষ্ট নাই; তাহারা যাহাতে দেশে ও বিদেশে তাহাদের মাল কাটে তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাজার মন্দা

সম্প্রতি বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী ও রাজস্ব-সচিব বলিয়াছেন যে, এক্ষণে ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা যে মন্দা হইয়াছে তাহার কারণ কোন এক বিশেষ দেশে নিবদ্ধ নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার কারণ বিদ্যমান।

অল্পদিন হইল বৃটিশ ইলেকট্রিক্যাল ও ম্যানুফ্যাকচারিং সভা জনৈক প্রতিনিধিকে ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন, তিনি সচিবদিগের উল্লিখিত উক্তি সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বৃটেনের অপেক্ষা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জার্ম্মাণি ব্যবসায় মন্দা হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে বেকার লোকের সংখ্যা ৫০ লক্ষ এবং জার্ম্মাণিতে ৩০ লক্ষ।

তূলা-ব্যবসায়ে ইংরেজের মস্তিষ্ক-চালনা

গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করিবার জন্য ফেডারেশন অব্ মাষ্টার কটন স্পিনার্স এসোসিয়েশন এক বিশেষ সাব-কমিটি বসান। ঐ সাব-কমিটির রিপোর্ট গত ৩১শে জুলাই তারিখে ম্যাঞ্চেষ্টারে ফেডারেশনের এমার্জেন্সি কমিটি কর্ত্তৃক বিবেচিত ও অনুমোদিত হইয়াছে। সাব-কমিটির সারমর্ম্ম নীচে দেওয়া গেল।

তূলা বদ্‌লাও

গবর্ণমেণ্ট কমিটি টেক্‌নিক্যাল উন্নতির কি কি সম্ভাবনা থাকিতে পারে, সে কথা পাড়িয়াছেন ও বলিয়াছেন যে, ল্যাঙ্কাশিয়ারের শর্ট ষ্টেপ্‌ল্ড কটন ব্যবহারে আরো অবহিত হওয়া উচিত, দুনিয়ার বড় বড় বাজারে এশিয়াস্থ উৎ-পাদকদের সঙ্গে টক্কর দিতে গেলে এ ছাড়া পথ নাই।

এ কথায় মনে হয় যেন ল্যাঙ্কাশিয়ার ব্যবসায়ের এদিক্‌টা একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছে। কিন্তু তা সত্য নয়। ল্যাঙ্কাশিয়ার যদিও উচ্চ শ্রেণীর মাল প্রস্তুত করিতেই চিরকাল অভ্যস্ত, তবু সকল সময়েই কতকগুলি প্রতিষ্ঠান শর্ট ষ্টেপ্‌ল্‌ড্ কটন হইতে উৎপাদিত মাল লইয়াই কারবার করিয়া আসিয়াছে।

নীচু দরের জিনিষের বেলায় চড়া মজুরি, কমানো কাজের ঘণ্টা, করভার ও সামাজিক সেবার দামটা উঁচু দরের জিনিষের বেলার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর—কারণ এ সবে উঁচু দরের চেয়ে নীচু দরেরই বেশীভাগ মারা যায়। ফেডারেশনের সভ্যেরা এদিকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প।

স্পিণ্ড্‌ল বদ্‌লাও

রিপোর্টে এও বলা হইয়াছে যে, এখন ল্যাঙ্কাশিয়ারে সাধারণতঃ মিউল ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু যদি তার পরিবর্ত্তে রিং স্পিণ্ডল্ ব্যবহার করা হয়, তবে শর্ট-ষ্টেপ্‌লড কটন ব্যবহার করা সহজ হইবে। এ বিষয়ে লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ প্রাচ্য দেশগুলিতে, ল্যাঙ্কাশিয়ারের চেয়ে অনেক বেশী রিং স্পিণ্ড্‌ল ব্যবহার হয়। তার কারণ, প্রথমতঃ মিউল স্পিনিংএ যত পটু শ্রমিকের দরকার হয়, রিং স্পিণ্ডলে তার চেয়ে ঢের কম পটু লোকে কাজ চলে; দ্বিতীয়তঃ, মিউল স্পিনিংএর উপযুক্ত শ্রমিক সহজলভ্য নয়; তৃতীয়তঃ, মোটা কাউণ্ট ব্যবহার করিলে স্পিণ্ড্‌ল প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে ও প্রতি পাউণ্ডে মজুরি খরচ কম পড়ে।

রিং ফ্রেমের বৈজ্ঞানিক নির্ম্মাণপ্রণালী ক্রমাগতই উন্নতি-লাভ করিতেছে, তাতে ক্রমাগত এফিসেন্সি বাড়ায় সর্ব্বত্র মিউল স্পিণ্ড্‌ল রিং স্পিণ্ডলের কাছে পরাজিত হইতেছে। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১৯১৪ সনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত রিং স্পিণ্ডলের সংখ্যা ৬০·৬% বাড়িয়াছে, ১৭,৬০ ৭০৬ হইতে ২৮,২৮,৮৬৪ হইয়াছে।

কল বদ্‌লাও

হাই স্পীড উইভিং মেশিনারি ব্যবহার করিয়া কতটা অপচয় নিবারণ করা যায় সর্ব্বদা তার পরীক্ষা চলিতেছে। হাই ড্র্যাফ্‌ট স্পিনিং ও হাই স্পীড্ উইভিং অনেক মিলেই এক সঙ্গে অবলম্বিত হইয়াছে। হাই ড্র্যাফ্‌টিং রিং স্পিনিংএ

বেশী কার্য্যকর হইয়াছে। অন্যান্য দেশে সে জন্য উহার ব্যবহার বাড়িতেছে।

বৃটিশ কটন ইনডাষ্ট্রী রিসার্চ্চ এসোসিয়েশন বহুক্ষণ এই সব বিষয় লইয়া গভীরভাবে মাথা ঘামাইতেছে, ল্যাঙ্কশিয়ারকে বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর জয়লাভ করানো ইহার ধ্যান-ধারণা।

লুমের উন্নতি চাই

অটোমেটিক ও সেমি-অটোমেটিক লুম প্রচলন করিয়া ম্যানুফ্যাক্‌চারিংএ কতটা কি উন্নতি করা যাইতে পারে, তা লইয়া কটন স্পিনারস্‌ অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স এসোসিয়েশনের সহযোগে অনেক পরীক্ষা হইতেছে।

একাকারের দোষগুণ

বিভিন্ন বিভাগে একাকার চলিতেছে বটে, কিন্তু শুধু এই উপায়েই বিস্তর অপচয় নিবারিত হইবে বলিয়া ফেডারেশন মনে করেন না। তবে এইরূপ একাকারের ক্রয় ও বিক্রয় ভাগে অনেক উন্নতি হয়ত করা যাইতে পারে। এককর্ত্তৃত্বে গুরুতর বিষয়ে চট্‌ করিয়া মত ঠিক করা একটা মস্ত সুবিধা বটে।

গবর্ণমেণ্ট কমিটি বলেন, মাল বাজারে ফেলার প্রণালী উন্নত করা চাই, সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন খর্‌চাও কমা চাই, তবে দরকারমাফিক সাহায্য করা হইবে। ইহাতে ফেডারেশনের কাজের কোন মূল্য থাকিবে না।

উৎপাদন খর্‌চা

খরচ যথাসাধ্য কমাইয়া মালের টান বাড়ান যায় কি না, ইহা সব চেয়ে বড় সমস্যা, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। গবর্ণমেণ্ট কমিটি বলিতেছেন, "ল্যাঙ্কাশিয়ারকে নিজের পথ বাছিয়া লইতে হইবে। বাণিজ্য হারাইতে পারে, তার মজুরি ও জীবনযাত্রার হার নামাইতে পারে অথবা খর্‌চা কমাইয়া ও উন্নতপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তার মজুরি ও জীবনযাত্রার ধারা অব্যাহত রাখিতে পারে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান, মনিব ও মজুর একযোগে স্থির করুন, তাঁরা কি করিবেন।

তাঁরা আরও বলিয়াছেন, "প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির চেয়ে ল্যাঙ্কাশিয়ারের তূলার জিনিষে উৎপাদন খর্‌চা বেশী। যদি ঐ প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হয়, তবে শিল্পের সকল বিভাগেই খর্‌চা কমাইতে ও এফিসেন্সি বাড়াইতে হইবে।"

আমরা সবরকম উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, মজুরের শ্রমশক্তির দর নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কাজের ঘণ্টা এবং তঙ্খার হার দ্বারাই উৎপাদন খরচাকে নিয়মিত করা চলে, কিন্তু ও দুইয়ের উপর আমাদের কোন হাত নাই।

বাহ্য বাধাবিঘ্নের কথা

আভ্যন্তরিক যে সব কারণে বাণিজ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, রিপোর্টে তা আলোচনা করা হইয়াছে; কিন্তু যে সব বাহ্য কারণকে আমরা মূলতঃ বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ বলিয়া মনে করি ও যেগুলির উপর আমাদের শাসন চলে না, সেগুলি সম্বন্ধে রিপোর্ট নীরব। এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গবর্ণমেণ্ট মোটেই পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই:—

(ক) আমরা যে সব দেশে বাণিজ্য করি সেই সব দেশে ও নিজ দেশে ইন্‌ফ্লেশন ও ডিফ্লেশনের প্রভাব।

(খ) রূপার দরের অভূতপূর্ব্ব পতন ও তজ্জন্য আমাদের বাণিজ্যিক ক্ষতি, বিশেষ করিয়া চীনে ও ভারতে।

(গ) প্রতিযোগী দেশসমূহে দীর্ঘতর কাজের সময়।

(ঘ) সাম্রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে আমাদের তূলা রপ্তানি বাণিজ্যের বিরুদ্ধে টারিফ্‌ বাধা।

(ঙ) অন্য সব দেশের চেয়ে গ্রেট বৃটেনের গুরুতর করভার।

(চ) স্বদেশে ম্যানুফ্যাকচারের দরে ও খুচরা দরে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

উপরোক্ত কারণগুলি যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন বাণিজ্যের উত্থান আশা করা অন্যায় হইবে।

বোর্ডিং চালানো ব্যবসার একদিক্

[আমাদের দেশে সম্প্রতি হোটেল পরিচালনা বেশ জোর্‌সে চলিতেছে। গত কয়েক বৎসরে অনেকগুলি হোটেল বেশ উঁচু ষ্টাইলে খোলা হইয়াছে। কিন্তু মেস্ ও বোর্ডিংয়ের রেওয়াজ হইয়াছে অনেক দিন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কি না তা খুঁজিয়া দেখা দরকার। বর্ত্তমানে কোন একটি বোর্ডিংয়ের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তার মর্ম্ম নীচে দেওয়া গেল।—শ্রীসুধাকান্ত দে।]

প্রঃ।—আপনি এই বোর্ডিং কতদিন যাবৎ চালাইতেছেন?

উঃ।—আমরা নূতন আসিয়াছি। গত জুন মাস হইতে ইহার লিজ্ নেওয়া হইয়াছে।

প্রঃ।—আপনাদের আগে কার হাতে ছিল?

উঃ।—প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের—এটা একটা ল' কলেজের মেস্ ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক দিন চালাইয়া কিছুকাল আগে ছাড়িয়া দেন। অন্য একটি ভদ্রলোক দু এক বৎসর চালাইয়া আর চালাইতে পারেন না।

প্রঃ।—না চালাইতে পারিবার হেতু কি?

উঃ।—বিশ্ববিদ্যালয় কেন ছাড়িয়াছেন জানি না। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করা হইয়াছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভাড়া বাবদ্ ২৫০৲ টাকা আসিত। সে টাকা বন্ধ হইয়াছে। হয়ত আর্থিক সঙ্কটই এত বড় বাড়ীখানা না রাখিতে পারার কারণ।

প্রঃ।—কেন, এ বাড়ীতে ভাড়া কি জোটে না? এর কোঠাগুলিতে ত বেশ হাওয়া বাতাস ও আলো খেলে দেখিতেছি। চারিদিকে ফাঁকা জায়গাও প্রচুর। ভাড়া যদি নিয়মিত পাওয়া যায় তবে বাড়ী রাখা বিশেষ কঠিন নয়।

উঃ।—তা বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া সর্ব্বদা আদায় হওয়াই মুস্কিল। আজকালের ত কথাই নাই। আজকাল কলিকাতার সর্ব্বত্র অনেক হোটেল বোর্ডিং হইয়াছে—একটা অন্যটার সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতেছে। সমস্ত বৎসর ধরিয়া সবগুলিতে লোক থাকা চাই, প্রত্যেক লোকের কাছ থেকে নিয়মিত ভাড়ার টাকা আদায় হওয়া চাই এবং আয় বুঝিয়া ব্যয় করা চাই, তবেই ত লোকসান না দিয়া বা লাভ করিয়া বোর্ডিং চালানো সম্ভবপর হয়।

প্রঃ।—আপনি বলিলেন বোর্ডিং ও হোটেলগুলি পরস্পর প্রতিযোগিতা করিতেছে। কিন্তু এও ত ঠিক যে বোর্ডিং প্রভৃতিতে বাস করে এমন লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। বোর্ডিংয়ের সংখ্যা বেশী জোরে বাড়িতেছে, না তাতে থাকিবার লোকের সংখ্যা বেশী জোরে বাড়িতেছে, তা আমার পক্ষে বলা শক্ত বটে, কিন্তু আপনারা ত সেটা বুঝিয়াই কাজ করিয়া থাকেন।

উঃ।—সে প্রকার কোন ভরসা না থাকিলে আমরাই বা এ ব্যবসায়ে নামিব কেন? আমরা ত নিছক্ পরোপকার-প্রবৃত্তির বশে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই,

ব্যবসা চালাইয়া লাভবান্ হইবার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই চেষ্টা।

প্রঃ—ভাল, ব্যবসা চালাইতে গিয়া এ কয় মাসে কি বুঝিলেন?

প্রঃ—দেখুন, এই ক' মাসের ফলাফলের উপর কোন সিদ্ধান্ত খাড়া করা যায় না। মেস্ ও বোর্ডিংয়ের বৎসরগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়—(১) পূজার আগে পর্য্যন্ত, (২) পূজার পর হইতে সেশন আরম্ভ অবধি।

প্রঃ—এরূপ ভাগের সার্থকতা কি?

উঃ—পূজার আগে পর্য্যন্ত জিনিষপত্রের যে দর থাকে, পূজার পর তা কমিয়া যায়। সেজন্য এ দুভাগে হিসাবের আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা যাইবে। পূজার আগে বেশী খরচ করিতে হয়। সেই একই প্রকার খাওয়া খাওয়াইতে পূজার পরে খরচ অনেক কম পড়ে। এই গেল ১নং সুবিধা। আর ২ নং সুবিধা হইল এই যে, পূজার পর হইতে পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ বেশী আসে বলিয়া কতকটা স্থায়ী বোর্ডার বেশী জোটে। তাতে একটা নির্দ্দিষ্ট আয় লাভ হয়। বলা বাহুল্য, মেস্ বোর্ডিং চালাইতে হইলে আমাদিগকে প্রধানতঃ ছাত্রদের উপর নির্ভর করিতে হয়।

প্রঃ—আপনি এই পূজার আগে পর্য্যন্ত কি বুঝিলেন?

উঃ—পূজার আগে পর্য্যন্ত আমাদিগকে মোটামুটি ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। প্রতি মাসে ৫০৲ টাকা গচ্চা গিয়াছে।

প্রঃ—প্রতি মাসে ৫০৲ টাকা গচ্চা দিয়া বোর্ডিং চালানো! তা আপনাদের আয়ব্যয়ের নমুনাটা কিরূপ? বর্ত্তমানে বোর্ডার কয়জন? সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বোর্ডার কত হয়, আর এ কয় মাসে গড়েই বা কয়জন ছিল?

উঃ—এই বোর্ডিংএ ৪০ জনের স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে ২১।২২ টাকা করিয়া নিয়া থাকি। এই কয় মাসে গড়ে ৩০ জন বোর্ডার ছিল বলা যায়, উর্দ্ধসংখ্যা ৪০ জন উঠিয়াছে। অতএব মাসিক আয় আমাদের গড়ে দাঁড়াইয়াছে ৬০০ টাকার উপর। ব্যয় করিয়াছি—বাড়ী ভাড়া বাবদ্ ২৫০৲ টাকা, বোর্ডারদের খাওয়া খরচ ৩০০৲ টাকা, ১০৲ টাকার কমে একজন লোককে খাওয়ানো যায় না, আর এষ্টাব্লিশমেণ্ট খরচ, বিজলী বাতি ইত্যাদি বাবদ্ ১০০৲ টাকার উপর। সুতরাং গড়ে মাসিক ক্ষতির পরিমাণ ৫০৲ টাকা।

প্রঃ—এই ক্ষতি সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিবেন কি?

উঃ—গোড়াতে আমাদের একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। যিনি বাড়ীটা লইয়াছেন, তিনি মাসিক ২৫০৲ টাকা ভাড়া দিতে রাজী না হইলেও বাড়ীটা পাইতেন। বাড়ীওয়ালার দিক্ হইতে এত বড় একটা বাড়ী এক মাস ফেলিয়া রাখাও সমূহ ক্ষতি, ৬ মাস হইলে ত দেড় হাজার টাকার ক্ষতি। সে ক্ষতি সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং এ বাড়ীর লিজ্ না লইলে পরে ইহাই আরও কম ভাড়ায় পাইবার সম্ভাবনা ছিল। যাক্ তার ত আর কোন চারা নাই। কিন্তু আমরা যদি সারা বৎসর ধরিয়া ৪০ জন বোর্ডার রাখিতে পারি, তবে আমাদের আয় হয় ৮০০৲ টাকার উপর, খরচ ৭৫০৲ টাকা, পূজার পর ৭০০৲ টাকায় চলে। অর্থাৎ পূজার পরে মাসে ১০০৲ টাকা করিয়া লাভের স্বপ্ন দেখিতেছি। তা ছাড়াও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইবে।

প্রঃ—যথা?

উঃ—যথা, অন্য অনেক বোর্ডিংয়ে যেরূপ, আমরাও এখানে যথা ইচ্ছা খাওয়ার প্রথা পরিবর্ত্তন করিব। দেখুন, বোর্ডিংয়ের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি, সব বোর্ডারের রুচি বা ইচ্ছা একরূপ নয়। কেহ হয়ত রোজ রোজ মাংস, মাছ, ডিম, চা ইত্যাদি খাইতে চান ও খাইবার সামর্থ্য তাঁর আছে; অন্য কেহ খাওয়ার জন্য সামান্য মাত্র ব্যয় করিতে চান, আমরা তাঁর কাছে যা চাই, তা অপব্যয় বলিয়া মনে করেন। আমরা এই দুই প্রকার লোকেরই অভাব পূজার পর হইতে মিটাইতে চাই। যিনি দু'পয়সা চার পয়সার খাইতে চান, তাঁকেও খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট করিব, যিনি ভোজন-বিলাসী তাঁরও তৃপ্তি হইবে।

প্রঃ—কিন্তু তাতে আপনার মনে হয় না কি যে লোকেরা খাওয়ার খরচ কমাইয়া দিবে ও আপনার আরও ক্ষতি হইবে ?

উঃ—মোটেই না। যারা নিজেরা উপার্জ্জন করে, তাদের পয়সার মায়া থাকিতে পারে। কিন্তু স্কুল কলেজে পড়া ছেলেছোকরার দল পয়সার মায়াটা এখন পর্য্যন্ত করিতে শিখে নাই। যদি শিখিত তবে দেলখোস্ কেবিনে লাভ করা দুরে থাকুক, উহা পরিচালনা করা কঠিন হইত।

প্রঃ—আচ্ছা আপনারা যে প্রত্যেকের কাছ থেকে ২১।২২ টাকা নেন, এতো ইচ্ছা করিয়াই কিছু বেশী নেন।

উঃ—আজ্ঞে হাঁ। সারা বছর বোর্ডার পাই না সে ত দেখিতেই পাইতেছেন। আমাদের বেশী না নিলে চলে না। লাভটা আমাদের খাওয়া হইতেই আসে।

প্রঃ—দেখুন, এই বোর্ডিংয়ে কতকগুলি অসুবিধা আমার চোখে পড়িতেছে, যা আপনাদের দুর করা উচিত। ১ নং, এক একটা ঘরে আপনারা বড় অতিরিক্ত লোক ঠাসিয়াছেন। অধিকাংশ ঘরেই ৩ জন, অথচ ২ জন হইলে ভাল, ১ জন হইলে উত্তম হইত। ২ নং, তাতে ঘরে মাত্র ৩টি খাট পড়িবার জায়গা থাকে। কিন্তু প্রত্যেককে ১টা চেয়ার ও ১টা টেবিলও অন্ততঃ দেওয়া উচিত। ৩ নং, খাটগুলি কাঠের না হইলে ভাল হইত, বড় ছারপোকা হয়, স্প্রিংয়ের খাটে শুইতে আরাম। ৪ নং, পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান সর্ব্বদা অপরিষ্কার থাকে, বোর্ডাররা বাড়ীর যেখানে সেখানে থুথু, পানের পিচ্, ময়লা ইত্যাদি ফেলে, চাকরে রোজ ঘর ঝাঁট দিয়া ও মুছিয়া যায় না। এগুলি বড় বড় অসুবিধা, দুর করা দরকার। ছোটগুলির কথা না বলিলেও চলিবে।

উঃ—এক একটা ঘরে বেশী লোক পোরার কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু উপায় নাই। আপনাকে বলিয়াছি খাওয়া হইতেই আমাদের লাভ। সুতরাং বোর্ডার বাড়ানোর প্রবৃত্তি আমাদের স্বাভাবিক। চেয়ার ও টেবিল দেওয়া উচিত বটে, কিন্তু দেখুন এ বাড়ীর ৪০ বৎসর বয়স, এ বাড়ীতে না ছিল বিজলীর আলো, না চেয়ার টেবিল। আমরা বহুকাল পরে প্রথম চূণকাম করাইয়াছি, ১০০৲ টাকা ডিপোজিট দিয়া বিজলীর বাতি আনাইয়াছি। আমরা রাখিতে পারিলে আরও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা রাখি। খাটের বন্দোবস্তও বদ্‌লানো কঠিন হইবে না। কিন্তু আপনার ৪ নং অসুবিধার প্রতিবিধান করা আমাদের সাধ্য নয়। আপনি জানেন না, কিন্তু মেথর দুবেলা আসিয়া পায়খানা ও প্রস্রাবের জায়গা পরিষ্কার করিয়া যায়। ৮টা পায়খানা, তবু পায়খানা পরিষ্কার থাকে না। আর থুথু, পানের পিক্, ময়লা ইত্যাদি যেখানে সেখানে ফেলিতে নিষেধ করিলে কেহ ত শুনিবেই না, উল্টে আমাকে দু'কথা শুনিতে হইবে। উপায় কি বলুন! চাকর দিয়া ঝাঁট দেওয়ানো আমি পূজার পর হইতে তদারক করিব।

প্রঃ—এই বোর্ডিংয়ের ম্যানেজারি করিয়া আপনি কত পান জানিতে পারি কি ?

উঃ—খাওয়া খরচ লাগে না। তা ছাড়া মাসিক ২০৲ টাকা।
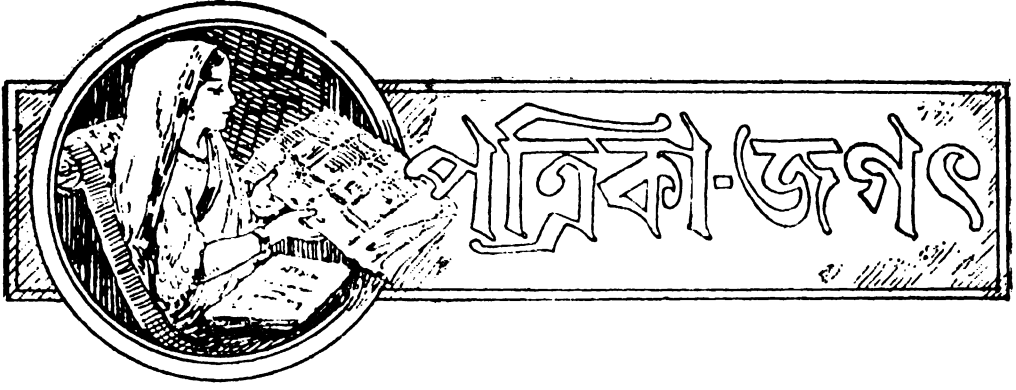
"দি টাইমস্ ট্রেড অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সাপ্লিমেণ্ট"

(১২ই এপ্রিল্ ১৯৩০)

(ক)

সুইডেনের ব্যাঙ্কিং প্রথা

সেকালের ব্যাঙ্ক

সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটীর নাম রাইখ্স্ বাঙ্ক। দুনিয়ায় এইটীই এখন প্রাচীনতম ব্যাঙ্ক। ১৬৫৬ সনে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৬১ সনে সর্ব্বপ্রথম নোট বাহির করে। খুব সম্ভব ইহার পূর্ব্বে আর নোট বাহির হয় নাই। নোট অতিরিক্ত পরিমাণে বাহির করার জন্য নোটের দাম কমিয়া যায়, নোটের পরিবর্ত্তে মুদ্রা পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে নোট বাহির করা বন্ধ হইয়া যায়। কিছুদিন পরে নোট বাহির করা কিছুকালের জন্য একদম স্থগিত থাকে। ১৭২৬ সনে রাইখস বাঙ্ক আবার নোট বাহির করে। ১৬৬৮ সনে এই ব্যাঙ্কটী ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাঙ্করূপে পরিণত হইবার পর আমানত রাখা ও লগ্নি করা চলিতে থাকে। ব্যাঙ্কটী দেশের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবসায়ে পুঁজি দাদন দিতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে এইটীই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। লণ্ডনের স্বর্ণকারগণ ১৬৬৮ সনের পূর্ব্বে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্কার বলা চলে না।

১৭০৯ সনের রাইখ্স্ বাঙ্কের আমানতী ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যায়। ১৭৪০ সন হইতে প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া এই ব্যাঙ্কটী সুইডিস্ গবর্ণমেণ্টের নোট বাহির করিতে থাকে। সুইডেন এই সময়ে লড়াইয়ে ব্যাপৃত ছিল,—এই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গাদা গাদা নোট বাহির করা দরকার হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সুইডেনে দারুণ আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হয়। কারণ কাগজের নোট ভাঙ্গাইয়া মুদ্রা পাওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। মুদ্রা-ঘটিত ব্যাপারে সুইডেন দেশই প্রকৃতপক্ষে কালের হিসাবে দুনিয়ায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। লড়াইয়ের আগে এবং পরে ইয়োরোপ যে সমস্ত ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইয়াছে এবং ঘামাইতেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুইডেন সে সমস্ত ব্যাপারের আংশিক মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

১৭৭৩ সনে ষ্টকহলম্ সহরে প্রথম বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে আরো দুইটী সহরেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সুইডেন দেশে রীতিমত ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ করে। এই সময়ে এক বিলাত ছাড়া আর কোন দেশই এই ধরণের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কারবারে লিপ্ত হয় নাই। নেপোলিয়ানের লড়াইয়ের আমলে এই সব সুইডিস্ ব্যাঙ্কের দফা রফা হইয়া যায়। এই সমস্ত সুইডিস্ ব্যাঙ্ক কেবল দুনিয়ার প্রথম অ-বৃটিশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নহে, প্রকৃতপক্ষে এইগুলিই দুনিয়ার প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্যাঙ্ক এই ধরণের প্রথম ব্যাঙ্ক বলিয়া লোকের যে ধারণা উহা ভ্রান্ত ধারণা।

এই সকল সুইডিস্ ব্যাঙ্ক ডিস্কোণ্টের্ণা নামে পরিচিত

ছিল। ১৮১৭ সনে এগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। ইহারই কিছুকাল পরে আধুনিক সুইডিস্ ব্যাঙ্কসমূহ জন্মলাভ করে। ১৮৩০ সনে সুইডেনে প্রথম আধুনিক ধরণের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অল্প পরে আরো পাঁচটা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কগুলি স্কট্‌ল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কগুলির অনুকরণে স্থাপিত এবং পরিচালিত হইতে থাকে। ইহার পর একটার পর একটা ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে থাকে; পঞ্চম দশকে এ ধরণের ব্যাঙ্ক সব চেয়ে বেশী স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে নোট বাহির করার রেওয়াজ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ক্রমে এমন কতকগুলি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইল, যেগুলি আদৌ নোট বাহির করিত না। ১৯০৪ সনে সব ব্যাঙ্কের নোট বাহির করিবার ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হয়। এই সময় হইতে ব্যাঙ্কগুলির কর্ম্মপন্থাও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ১৯০৮ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত সুইডিস্ ব্যাঙ্কসমূহ এইভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

ব্যাঙ্কের পরিভাষা

ব্যাঙ্ক-ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে গুটিকয়েক পরিভাষা সম্‌ঝিবার দরকার আছে। সচরাচর তিন প্রকারের ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদিগকে লোক্যাল্ রেজিন্যাল্ এবং ইণ্টার্-রেজিন্যাল্ এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। লোক্যাল্ ব্যাঙ্কের কারবার একটীমাত্র স্থানে বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে সীমাবদ্ধ; রেজিন্যাল্ ব্যাঙ্ক ঐরূপ একটী বিশেষ প্রদেশ, দেশ বা কারখানা অঞ্চলে কারবার চালায়; ইণ্টার্-রেজিন্যাল্ ব্যাঙ্কের এলাকা আরো বড়; সাধারণতঃ দেশের বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া ইহার কারবার চলে।

বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুইডেনে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কসমূহ প্রচলিত ছিল; এগুলি সেখানে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী একটী প্রদেশ বা জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত এবং কোন ব্যাঙ্কই নিজের নির্দ্দিষ্ট এলাকা ছাড়াইয়া কারবার চালাইতে পারিত না। এই প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলি ছাড়া ছোট বড় অনেক সহরে বহু লোক্যাল্ ব্যাঙ্ক ছিল।

সুইডিস্ ব্যাঙ্কের একাল

বর্ত্তমানে সুইডেনে ব্যাঙ্কিং প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ১৯০৩ সন হইতে ব্যাঙ্কগুলিরও একাকার করিবার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া এই মিলন-কাণ্ড চলিয়াছিল—মাত্র কয়েক বৎসর আগে, ইহা থামিয়া গিয়াছে। এক বিলাত ছাড়া অন্য কোন দেশেই এমন ঘটনা ঘটে নাই। ফী সনে অন্ততঃ দুটি করিয়া মিলন ঘটিয়াছে; কোন কোন সনে ১০।১৫ বার পর্য্যন্ত মিলন হইয়াছে। অনেকগুলি মিলনে দেশের ঢের উপকার হইয়াছে। মিলনের ফলে গোটা সুইডেনে যত ব্যাঙ্ক আছে তার অর্দ্ধেকের কারবার এখন ৩টী বড় বড় ইণ্টার্-রেজিন্যাল্ ব্যাঙ্কের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই ৩টীর নাম স্বৈনস্কা হাণ্ডেল্‌স্ বাঙ্কেন স্কাণ্ডিনাহ্বিস্কা, ক্রেডিটা ক্লিবোলাগেট ও গ্যোটেবোর্গস্ বাঙ্ক। এই তিনটীর মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যাঙ্কটীই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। গোটা সুইডেন দেশে ২৭০টী শাখাকার্য্যালয় স্থাপন করিয়া ইহা এক বিরাট কারবার চালাইতেছে। এই তিনটীর পরেই ষ্টকহল্মস্ এন্‌স্‌কিল্ডা ব্যাঙ্কের স্থান। ব্যাঙ্কটী ষ্টকহল্মের একটী লোক্যাল্ ব্যাঙ্ক; ইহার কারবার অত্যন্ত বিস্তৃত। এই চারিটী ব্যাঙ্ক সুইডেনের "বিগ্‌ফোর" অর্থাৎ "চারিটী সেরা ব্যাঙ্ক" রূপে পরিচিত। বিলাতে এমনি "বিগ্‌ফাইভ্" অর্থাৎ "পাঁচটী বাছা বাছা ব্যাঙ্ক" আছে। এই চারিটী বাছা বাছা সুইডিস্ ব্যাঙ্ক সুইডেনের ৬০% ব্যাঙ্ক-ব্যবসা চালাইতেছে। বিলাতের সেরা পাঁচটী ব্যাঙ্কের মত সুইডেনের ব্যাঙ্ক-চতুষ্টয় ততটা সর্ব্বগ্রাসী নয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এখনও যথেষ্ট স্থান আছে। সুইডেনে ৩০টী বাণিজ্যিক কমার্স্যাল ব্যাঙ্ক আছে। সেকেলে রেজিন্যাল্ ব্যাঙ্কগুলি এখনও অনেক কাজ চালাইতেছে। আরো ৩টী ইণ্টার্-রেজিন্যাল্ ব্যাঙ্ক এবং কয়েকটী লোক্যাল্ ব্যাঙ্ক সুইডেন মুল্লুকে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সুইডেনের ব্যাঙ্ক-ব্যবসা সুসম্পন্ন করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তিন শ্রেণীর ব্যাঙ্কই সুইডেন দেশে বিরাজমান। সুইডেন দেশের ব্যাঙ্কসমূহের মিলনপর্ব্ব একরূপ সামাধা হইয়া গিয়াছে; কারণ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি

ছাড়া আর মিলন ঘটিবার যো নাই; এবং যতদূর সম্ভব আর মিলন ঘটিতে দেওয়া হইবে না।

আজকাল সুইডেনে ১০০০ ব্যাঙ্কিং অফিস আছে; অর্থাৎ প্রত্যেক ৬০০০ সুইডেনবাসীর জন্য একটী করিয়া ব্যাঙ্কিং অফিস্। বিলাতের অনুপাত এর চেয়ে বেশী; কিন্তু অন্য কোন অ-বৃটিশ দেশে এই অনুপাত দৃষ্ট হয় না।

সুইডিস্ ব্যাঙ্কের কারবারের পরিচয়

এতক্ষণ পর্য্যন্ত সুইডিস্ ব্যাঙ্কের গঠনের কথা বলা হইল। এখন উহার কারবার সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। প্রথমতঃ আমানত সম্বন্ধে আলোচনা করার দরকার। যদি কোন বিলাতী ব্যাঙ্কার সুইডিস্ ব্যাঙ্কের আমানত সম্বন্ধে তদন্ত করেন তবে চেকের অল্পতা দেখিয়া তাঁহার তাক্ লাগিয়া যাইবে। বিলাতে ব্যাঙ্কের মোট আমানতের ৬০% শুধু চেক; পক্ষান্তরে সুইডিস্ ব্যাঙ্কের চেকের হিস্যা মাত্র ১২%। অর্থাৎ সুইডেনে চেকের চলন খুব কম। খুব সম্ভব সুইডেনে মাত্র ২৫% দেনা চেক্ দ্বারা পরিশোধ হয়। সুইডিস্ ব্যাঙ্কের হিসাবপত্রের বহর কিন্তু খুব বেশী। বিলাতে ব্যাঙ্কের মাত্র দুইটী হিসাব থাকে চল্‌তি হিসাব ও আমানতের হিসাব, পক্ষান্তরে সুইডিস্ ব্যাঙ্কের কমসে কম পাঁচটী হিসাব,—চল্‌তি হিসাব, ১৪দিনের নোটিশ, সেভিংস্‌এর হিসাব, এক হইতে ছয় মাসের নোটিশ এবং চার মাসের নোটিশ।

এই সমস্ত হিসাবপত্রের মধ্যে চল্‌তি হিসাব ছাড়া আর সমস্তই রীতিমত নোটিশ-সাপেক্ষ। তবে সাধারণতঃ অল্প পরিমাণ পুঁজি তুলিতে হইলে চাহিবামাত্র দেওয়া হয়। সেভিংস্ বিভাগেও পুঁজি তোলা সম্বন্ধে তেমন কড়াকড়ি নাই। যদিও সাধারণতঃ খুব বেশী টাকা তুলিতে দেওয়া হয় না। আমানতকারী ৪,০০০ ক্রোনারের বেশী তুলিতে পারে না। সুইডিস্ ব্যাঙ্কের ৪র্থ এবং ৫ম প্রকার আমানতের পরিমাণই সব চেয়ে বেশী। ব্যাঙ্কের ৬০% কারবার এই দুই প্রকারের। এবং এ দুটাই সুইডিস্ ব্যাঙ্ক-জগতের মেরুদণ্ডস্বরূপ। সুইডেনে এইরূপ নানা ধরণের আমানত রাখিবার সুবিধা দিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর এবং ভিন্ন ভিন্ন রুচির আমানতকারী যাতে আকৃষ্ট হয় তার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে জন প্রতি ব্যাঙ্কে আমানতের হারে সুইডেন বিলাত ছাড়া আর সমস্ত দেশকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে।

সুইডিস্ ব্যাঙ্কের লাভের হার

আরহ্বিং ফিশার আমানতের লাভের হারের ভেলোসিটি অর্থাৎ "গতিবেগ" মাপিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সুইডেন ছাড়া অন্য কোন দেশের কিছু হিসাবপত্র পাওয়া যায় না। সুইডেনে বিভিন্ন ধরণের আমানতের লাভের হার এইরূপ:— চল্‌তি হিসাব—১৫; ১৪ দিনের নোটিশ ৬; সেভিংস্ হিসাব—০·৯; ১ হইতে ৬ মাসের নোটিশ এবং ৪ মাসের নোটিশ—০·৪।

অন্যান্য দেশের মধ্যে এক মার্কিণ দেশের আমানতের গতিবেগ সম্বন্ধে কিছু কিছু হিসাবপত্র মিলে; এই দেশে ডিম্যাণ্ড ডিপোজিটের (দর্শনী-আমানতের) উপর লাভের হার ৩০ এবং টাইম্ ডিপোজিটের (মুদ্দতী-আমানতের) উপর লাভের হার ২। সুতরাং দেখা যাইতেছে সুইডেনে লাভের হার খুব নীচু, বিশেষতঃ ১ হইতে ৬ মাস এবং ৪ মাসের নোটিশ-বিশিষ্ট আমানতের পক্ষে হারটা অত্যন্ত নীচু; অথচ এই দুই খাতেই ব্যাঙ্কে সব চেয়ে বেশী পুঁজি আছে। সুইডেনের ব্যাঙ্কসমূহে গচ্ছিত পুঁজির মধ্যে সেভিংস্‌এর হিস্যা সব চেয়ে বেশী। এ বিষয়ে সুইডেনের জোড়া মেলা ভার। এই ধরণের গচ্ছিত পুঁজি আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে অত্যন্ত চড়া হারে সুদ যোগাইতে হয়। ৪র্থ এবং ৫ম প্রকার গচ্ছিত পুঁজির জন্য সুইডিস্ ব্যাঙ্কের সুদের হার ৪% এবং সেভিংস্‌এর উপর ৩½%। সুতরাং সুইডেনে ব্যাঙ্কের আমানতী সুদ এবং লগ্নির উপর ধার্য্য সুদের হারের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত কম, গড়ে ২½% মাত্র। এত কম ব্যবধান দুনিয়ায় আর কোন দেশে নাই।

সুইডেনে গচ্ছিত পুঁজির পরিমাণও বেশী এবং এই গচ্ছিত পুঁজির নড়চড় বড় একটা হয় না। এই বিপুল স্থির পুঁজি দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বন্ধকী এবং বিলের পরিবর্ত্তে দেয়

মোট কর্জ্জের অর্দ্ধেক শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত আছে। তা ছাড়া মোট লগ্নির ২৫% ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল সিকিউরিটিরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং সুইডেনের ব্যাঙ্কের মোট লগ্নির প্রায় ৭০% শিল্পকার্য্যেই নিয়োজিত হয়। সুইডেনবাসী সাধারণতঃ শিল্পসম্পর্কিত কোম্পানীর শেয়ার বা বণ্ড ইত্যাদি ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক; উহারা সরাসর ব্যাঙ্কেই জমা রাখা পছন্দ করে। সুতরাং সুইডেনের ব্যাঙ্কগুলি সঞ্চয়ী জনসাধারণ এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দালালের কাজ করিতেছে।

নয়া সুইডেনের শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক

আজকাল কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। বর্ত্তমানে সুইডেনবাসী শেয়ার এবং বণ্ড খরিদ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। ১৯২০ সন হইতে সুইডিস্ ব্যাঙ্ক-সমূহে আমানতের পরিমাণ কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই নিম্নগতি প্রায় শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ব্যাঙ্কের আমানত কমিয়া যাওয়ায় কলকারখানা-গুলির বিশেষ কিছু ক্ষতি হইতেছে না; কারণ কলকারখানা সমূহের পুঁজির প্রয়োজন দ্রুতগতিতে কমিয়া আসিতেছে; সুইডিস্ শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের বনিয়াদ গাড়া পর্ব্ব শেষ হইযাছে; প্রতিষ্ঠানগুলি আপন আপন ঋণ ক্রমশঃ শোধ করিয়া দিতেছে। অনেকের সমস্ত দেনা শোধ হইবার পর বেশ লাভ হইতেছে। কোন কলকারখানায় চিরদিন ধরিয়া নূতন পুঁজির দরকার হয় না, এমন সময় আসে যখন নূতন পুঁজি আর মোটেই প্রয়োজন হয় না। সুইডিস্ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ এই অবস্থায় আসিয়া পৌছিতেছে। সুইডেনে এখন পুঁজির আধিক্য ঘটিয়াছে। সুইডেন ক্রমশঃ যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজি বিদেশে চালান দিতেছে, পুঁজির রপ্তানির পরিমাণও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। অর্থাৎ আমানতের পরিমাণ কমিয়া আসিলেও সুইডিস্ ব্যাঙ্কগুলি দেশের অভাব পূরণ করিয়া বিদেশে যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজি চালান দিতে সমর্থ হইতেছে।

এই সমস্ত ব্যাঙ্ক কেবল গচ্ছিত অর্থ হইতেই যে লগ্নি কারবার চালায় তাহা নহে; আপন আপন পুঁজিও ইহাদিগকে কর্জ্জ দিতে হয়। গচ্ছিত অর্থের চেয়ে ইহাদের মূলধনের পরিমাণ অনেক বেশী। লড়াইয়ের আগে এই দুই পুঁজির অনুপাত ছিল ১:২·৫। লড়াইয়ের পর শিল্প-প্রচেষ্টা ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে এবং ব্যাঙ্কগুলিকে মূলধনের পরিমাণ বাড়াইতে হইয়াছে। এখন ঐ অনুপাত দাঁড়াই-য়াছে ১:৪। বিলাতের ব্যাঙ্কের চেয়ে সুইডেনের ব্যাঙ্কসমূহে গচ্ছিত অর্থের অনুপাতে পুঁজির পরিমাণটা অনেক বেশী।

দি রাইখ্স্ বাঙ্ক

সুইডেনের রাইখ্স বাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের পক্ষে ব্যাঙ্কারের কার্য্য করিয়া থাকে। দরকার হইলে যে কোন ব্যাঙ্ক ইহার নিকট ধার লইতে পারে। অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকটও ধার লওয়া হয়। সুতরাং সুইডেনে খোলা মুদ্রার বাজারের দরকার নাই। রাইখ্স্ বাঙ্কের সুদ দিয়া, আমানতী হিসাব রাখিবার অধিকারও আছে বটে, কিন্তু প্রায়ই সে অধিকার কাজে খাটান হয় না। এই ব্যাঙ্ক পরিচালনের ভার ন্যস্ত আছে সুইডিস্ পার্ল্যামেণ্ট উপর। গবর্ণমেণ্ট ডিরেক্টার সভায় চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন। রাইখ্স্ বাঙ্ক পরিচালন সম্বন্ধে পার্ল্যামেণ্ট হইতে একটী বিশেষ স্থায়ী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটিকে ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বলা চলে।

সুইডেনে ব্যাঙ্কসমূহ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে; কারণ খুব হুঁসিয়ারির সহিত রক্ষণশীল ব্যবস্থায় পরিচালনা হয়। ১৯২০ সনের দুর্যোগে বহুৎ ক্ষতি হয়; গবর্ণমেণ্টকে অনেক ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়া দিতে হয়, কিন্তু সে একটী সাময়িক দুর্ঘটনা মাত্র। সুইডেনের ব্যাঙ্কগুলি আবার পুরাতন এবং পরিচিত নীতিতে ব্যবসায় নিযুক্ত হইতেছে। দেশের লোক-সংখ্যার অনুপাতে ব্যাঙ্কগুলি বেশী হারে কারবার করে, কিন্তু দ্রুতগতিতে সম্প্রসারণের যুগ চলিয়া গিয়াছে। সেভিংস্ ব্যাঙ্কগুলি পুঁজির ব্যবসায় নিযুক্ত হওয়ায় এবং লোকে এখন সরাসর শেয়ার বণ্ড ইত্যাদি ক্রয় করিতে থাকায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছে। ইহা এক পক্ষে সুলক্ষণই বলিতে হইবে; কারণ অতঃপর সুইডিস্ ব্যাঙ্কগুলির কারবার নিরাপদে চলিতে আরম্ভ করিবে।

(খ)

সুইডেনের আর্থিক উন্নতি

কারণ চতুষ্টয়

শিল্প-বাণিজ্য জগতে আজকাল সুইডেন দেশটী একটী শক্তিরূপে পরিচিত। দেশের বর্ত্তমান অভাবনীয় উন্নতির কারণ চারিটি। অমূল্য কাষ্ঠ-সম্পদ্, উৎকৃষ্ট লোহা, জলশক্তি এবং সুইডেনবাসীর মগজের ঘী সুইডেনকে বড় করিয়া তুলিয়াছে।

ব্যবসা-জগতে সুইডেনের কৌলিন্য

লড়াইয়ের পরে সুইডেনের আর্থিক উন্নতি খুব দ্রুতগতিতে হইয়াছে ইহা সত্য বটে, কিন্তু গোড়াতেও অর্থাৎ লড়াইয়ের আগেও সুইডেন নিতান্ত রামা-শ্যামা ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীতে গুষ্টাহ্বাস্ অ্যাডোলফাসের অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে সুইডেনের রাজনৈতিক প্রভাব চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সুইডেনের আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের বনিয়াদ গাড়া হয়। এই সুইডিস্ নেপোলিয়ানের রাজত্বকালে, পিল্লপতি লুইস্ ডি, গিয়ার ফিন্স্প্যাংএ লোহালক্কড় এবং কাঁসার কারখানা স্থাপন করেন। এখানে এখন বড় বড় মেটালার্জির কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং এই সমস্ত কর্ম্মশালায় সুবিখ্যাত ষ্টীম্-টার্ব্বাইনসমূহ প্রস্তুত হয়। লোহার খনিগুলি আছে সব বার্গসল্যাজেনে। সুইডেনের বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত লোহা এই খনিগুলি যোগাইয়া থাকে।

যুক্তিপ্রয়োগ নীতি

সুইডেনের উন্নতির আর একটী কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে যুক্তিপ্রয়োগ নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। সুইডিস্ ম্যাচ কর্পোরেশ্যানের জগৎ-জোড়া কার্য্যকলাপ কাহারও অবিদিত নহে। বিগত দশকে মিঃ আইহ্বর্ ক্রুগার ইহার গঠন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "যুক্তিপ্রয়োগ" নীতি সুইডেনে নূতন বস্তু নয়; প্রায় একশ' বছর ধরিয়া সেখানকার ভূমিতে উহা বাড়িয়াছে। প্রায় ৫০ বছর আগে নোবেল প্রাইজের সৃষ্টিকর্ত্তা আলফ্রেড্ নোবেল্ এই নীতি প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

বংশের ধারা ও স্বাধীনতা

সুইডেনের শিল্পপ্রচেষ্টায় যুক্তিপ্রয়োগ নীতি ছাড়া আরও দুইটী লক্ষ্য করিবার বস্তু আছে। কারখানা পরিচালনে বংশগত কৃতিত্বের ধারা দেখা যাইবে। শিল্প-ব্যবসায়ের ধুরন্ধরগণের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত তাল রাখিয়া চলাফেরা করিবাব স্বাধীনতা রহিয়াছে।

সুইডেনের লৌহশিল্প

এই সমস্ত ব্যবস্থার গুণে সুইডেনের লৌহ-শিল্প এখনো দুনিয়ায় আপনার শ্রেষ্ঠ আসন বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রায় তিন শ' বছর আগে সুইডেন ইয়োরোপের সেরা লোহার দেশরূপে পরিচিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার দরুণ সুইডেনের এই বিরাট শিল্পটী কাহিল হইয়া পড়ে। কাঠের কয়লা এবং অপরিষ্কৃত লোহার দাম বাড়িয়া যাওয়ায় এইরূপ হইয়াছিল। বৈদ্যুতিক শক্তি এবং যুক্তিপ্রয়োগ নীতির বলে সুইডেন আবার তাল সামলাইয়া লইয়াছে। দুনিয়ার সর্ব্বত্র এখনো সুইডেনের লোহার আদর; বিশেষতঃ যেখানে পয়লা নম্বরের লোহার চাহিদা বেশী সেখানে সুইডেনের বাণিজ্য-সম্ভ্রম অটুট রহিয়াছে।

কারখানা-জাত লোহা ছাড়া খনিজাত অপরিষ্কৃত লোহাও সুইডেনের আর একটী মস্ত পণ্যদ্রব্য। ১৯০১ সনে উত্তর সুইডেনের লোহার খনিসমূহের সহিত বাল্টিক সাগরের এবং পশ্চিম মহাসাগরের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। পরে এই সমস্ত রেলপথে বৈদ্যুতিক শক্তিও প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুইডেনের লোহা জার্ম্মাণির রূঢ় উপত্যকায় প্রেরিত হইতেছে। কিছু কিছু লোহা বিলাতেও যায়। লড়াইয়ের আগে সুইডেন হইতে ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন পর্য্যন্ত অপরিষ্কৃত লোহা রপ্তানি হইয়াছিল। লড়াইয়ের পর রপ্তানি আরো বাড়িয়াছে। ১৯২৯ সনে রপ্তানির পরিমাণ ১১০ লক্ষ টন।

কাঠ, পাল্প্ ও কাগজ

কাঠ শিল্প সুইডেনের আর একটী প্রয়োজনীয় শিল্প। এই শিল্পেও লৌহ-শিল্পের মত যুক্তিপ্রয়োগ নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে কাঠ হইতে পাল্প্ তৈরী সুইডেনের আর একটী বড় শিল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাঠ শিল্প এবং পাল্প্ শিল্প দু'চারটী বড় বড় কর্পোরেশ্যন, পরিবার এবং ছোট খাটো প্রাইভেট্ ফার্ম্মের হাতে ছিল। কিন্তু এইগুলির মিলন বা একাকারই এখন রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঠ রপ্তানি ১৯১৩ সনের রপ্তানি ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই বটে, কিন্তু কাঠজাত শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি বাড়িতেছে। পাল্প্ বা কাষ্ঠ-মণ্ড রপ্তানি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৩ সনে ৮৫০,০০০ টন কাষ্ঠ-মণ্ড রপ্তানি হইয়াছিল; ১৯২৯ সনে রপ্তানির পরিমাণ হইয়াছে ১,৭০০,০০০ টন। এই সময়ের মধ্যে কাগজ রপ্তানি ২১০,০০০ টনএ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছাপাখানার অক্ষর রপ্তানি লড়াইয়ের পূর্ব্বের চেয়ে ৩ গুণ বাড়িয়াছে।

সুইডেনের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্রোত

ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ১৯০৫-১৯১৪ দশ বৎসরে যে প্রকার ছিল, লড়াইয়ের পরের দশ বৎসরেও সে প্রকার হইয়াছে—উন্নতিটা যেন আরও দ্রুত। ১৯২১ সনে দুনিয়ার সর্ব্বত্র যে বাণিজ্য-হ্রাস দেখা দেয় তাহাতে সুইডেনকেও যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। বেকার-সমস্যা সুইডেনের পক্ষেও দারুণ হইয়া উঠে। ১৯২৪ সন পর্য্যন্ত সুইডেন বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য বিষম বিব্রত হইতে থাকে। ১৯২৪ সনে ইয়োরোপে সুইডেনই সর্ব্বপ্রথম স্বর্ণমানে ফিরিয়া আসে—১৯২২ সনেই সুইডেন ডলারের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অন্য সব দেশের আগে মুদ্রার স্থিতীকরণে সমর্থ হওয়ায় ১৯২১ ও তৎপরবর্ত্তী সনসমূহের দারুণ ক্ষতি সত্ত্বেও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পূর্ণ উদ্যমে চলিতে থাকে, সেজন্য ১৯২৫ সনের পর হইতে সুইডেন অভূতপূর্ব্ব উন্নতির পথে ধাবমান হইয়াছে। ১৯২৮ সনে কাঠ, কাগজ এবং পাল্পের কারখানাসমূহে এবং লোহার খনিগুলিতে মজুর-বিভ্রাট ঘটিলেও ১৯২১ সনের পর প্রত্যেক পাঁচ বৎসরে সুইডেনের ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নততরই হইয়াছে দেখা যায়। সুইডেনের শিল্পগুলিকে প্রধানতঃ বিদেশে মাল রপ্তানির উপরই নির্ভর করিতে হয়, সুতরাং ১৯২৫ সনের পর হইতে সুইডেনের শিল্পসমূহ যে কিরূপ উন্নতি করিয়াছে তাহা রপ্তানি অঙ্ক হইতেই বেশ মালুম হইবে। সুইডেনে জাহাজও তৈরী হইতেছে দেদার। নিম্নে রপ্তানির হিসাব প্রদত্ত হইল :—

রপ্তানি	১৯২৬	১৯২৯
কাঠ (হাজার ষ্টাণ্ডার্ড)	৯১০	১,১৭০
কাষ্ঠমণ্ড (হাজার টন)	১,৩০০	১,৭০৫
কাগজ ও কার্ডবোর্ড (হাজার টন)	৪১০	৪৭৮
অপরিষ্কৃত লোহা (হাজার টন)	৭,৬৬০	১০,৯২০
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য (১০ লাখ ক্রোনার)	২২১	২৪৮
জাহাজ (১০ লাখ ক্রোনার)	২	২৩
দেশলাই (হাজার টন)	৪১	৪৯
পাথর (১০ লাখ ক্রোনার)	১৩	২৫

বর্ত্তমান অবস্থা

বিগত বসন্তকাল হইতে সুইডেনের রপ্তানি বণিকেরা বিদেশ হইতে মালের অর্ডার কিছু কম পাইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-মন্দাতে এইরূপ ঘটিয়াছে। এই একই কারণে বিদেশের এক্সচেঞ্জগুলিতেও কতকগুলি সুইডিস্ শিল্প-কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য কমিয়াছে। অন্যান্য সুইডিস্ কোম্পানীর শেয়ারের দাম পূর্ব্ব সনের তুল্য রহিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-হ্রাসের দরুণ সুইডেনের মাল উৎপাদন এবং মজুরদের কর্ম্মের সংস্থান কিরূপ হইবে তাহা এখনই নির্ণয় করা শক্ত। ক্রেডিট্ ব্যালান্স্ সুবিধাজনক হওয়ায় বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সুইডেন বিদেশে কিছু কিছু পুঁজিও ঢালিতেছে। সুতরাং সুইডেন একটী ছোটখাটো পুঁজি-রপ্তানিকারী দেশে পরিণত হইয়াছে। সুইডিস্ শিল্পদ্রব্যের

চাহিদা যদি আরও কমিয়া যায়, তবু সুইডেন এই লগ্নিকরা পুঁজিদ্বারা তাল সামলাইয়া লইতে পারিবে।

চাষবাসের দুরবস্থা

মোট কথা, লড়াইয়ের পর হইতে সুইডেনের শিল্প-ব্যবসার অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। কিন্তু কৃষির অবস্থা দাঁড়াইয়াছে ঠিক উল্টা। সুইডেন ও গোটা পশ্চিম ইয়োরোপের কৃষির এক গতি। কৃষিজাত দ্রব্যের দর কমিয়াছে বটে, কিন্তু উৎপাদনের খরচা সঙ্গে সঙ্গে কমাইতে না পারায় অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। বাজারের অবস্থা মন্দা থাকা সত্ত্বেও সুইডেন কিন্তু গম উৎপাদনে খুব মনোনিবেশ করিয়াছে। জান্তব পদার্থের বাজার বেশ ভাল; লড়াইয়ের আগের চেয়ে সুইডেন হইতে মাখন এবং শূকর-মাংস বেশী রপ্তানি যাইতেছে।

সুইডেনের গবর্ণমেণ্ট বরাবর শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে নানা প্রকারে সাহায্য এবং উৎসাহ দান করিয়া আসিতেছেন। বেকার মজুরদিগকে অল্প বেতনে অন্যত্র নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; মজুরদিগকে সরকারী সাহায্য দেওয়া সম্বন্ধে কড়াক্কড় নিয়ম করার ফল ভাল হইয়াছে। কোন কোন শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য সুইডিস্ রাষ্ট্র আদৌ সংরক্ষণ-শুল্ক বসান নাই; এ জন্য দেশের মধ্যে যথেষ্ট বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে।

সুইডেন গবর্ণমেণ্ট অবাধ প্রতিযোগিতাকে সুইডেনের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করিতেছেন; রাষ্ট্র স্বয়ং নানাপ্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে; মজুরদের জীবনযাত্রা এবং কর্ম্মপ্রণালী উন্নততর করিবার জন্য নানা প্রকার পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে; রাজস্ব নীতি সম্বন্ধে রাষ্ট্র খুব হুঁসিয়ার হইয়াচলিয়াছে এবং শিল্প-প্রচেষ্টা ও শিল্প পরিচালন সম্পর্কে কম হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

শ্রীমন্মথনাথ সরকার

১। "প্রটেক্সন্ অব্ ওয়ার্কার্স্ অপারেটিং মেটাল-ওয়ার্কিং প্রেসেস্" (মেটাল-ওয়ার্কিং প্রেসগুলির চালনায় নিরত কর্ম্মীদিগের রক্ষা-সমস্যা)। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক দপ্তর, জেনেহ্বা। ১৯৩০। ৮+১২৩ পৃষ্ঠা। ৫ শিলিং; ১·২৫ ডলার।

যন্ত্র-শিল্পে দুর্ঘটনা লাগিয়াই আছে। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এরূপ দুর্ঘটনা নিবারিত হয়, অথবা তাহার সম্ভাবনা কমে, তাহা লইয়া গবেষণায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক দপ্তর আপনার শক্তি নিয়োগ করিতেছেন। আলোচ্য-গ্রন্থটী এই দুর্ঘটনা-নিবারণী সিরিজের তৃতীয় গ্রন্থ। প্যারিসের বিভাগীয় শ্রমিক পরিদর্শক শ্রীযুক্ত মার্শেল ফ্রোআ এই রিপোর্টটীর খস্ড়া প্রস্তুত করেন। গবেষণার জন্য শ্রমিক দপ্তর কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা মুখবন্ধে বলা হইয়াছে। ধাতুর উপর কার্য্যকারী প্রেসগুলিতে সাধারণতঃ যন্ত্র চলিতে আরম্ভ করিবার পরই অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ফ্রোআ সংখ্যা-তালিকার সাহায্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রেসগুলিতে শতকরা ৮৩টা দুর্ঘটনা হয়, "গার্ড" একবারে না থাকার দরুণ বা সুচতুর "গার্ড" না থাকার জন্য। নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে :—

(১) কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যহ প্রেস্গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা।

(২) যে সকল কল-কব্জা চালক-শক্তি স্থানান্তরিত করে, (ট্র্যান্সমিউট্স মোটিভ্ পাওয়ার)—যথা, বেল্ট্ অ্যাণ্ড ফ্লাই-হুইল্ ইত্যাদি—সেগুলিকে বেড়া দিয়া ঘেরিয়া রাখা।

(৩) অসময়ে স্খলন (ট্রিপিং বা রিপিটিং) রোধ করিবার উপায় অবলম্বন করিতে সকল প্রেসকে বাধ্য করা।

কর্ম্মীদের রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে :—

(১) অটোমেটিক্ ফিডিং ইন্ অ্যাণ্ড থ্রোইং আউট্ ওয়ার্ক—কর্ম্মীদের তাহা হইলে বিপদজনক স্থানে হাত দিতে হইবে না।

(২) লিমিটেশন অব্ র‍্যাম ষ্ট্রোক্ (অকস্মাৎ আঘাত বাঁচোয়া)।

(৩) প্রেসগুলির মুখে কাজ যোগের জন্য হাত কল।

(৪) স্থায়ী 'গার্ড' নিয়োগ।

(৫) মভেব্‌ল্ গার্ড (ভ্রাম্যমাণ গার্ড)।

(৬) সুইপ্ এওয়ে গার্ড (নজর দিবার গার্ড)।

(৭) ট্রিপিং গার্ড (স্খলন গার্ড)।

(৮) ভালভাবে ও ভাল স্থানে প্রেস বসান।

এই সব প্রতিবিধানের কথা এই কেতাবে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করিলে দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের প্রেস ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং বিভিন্ন দেশের সতর্কতার পন্থা বা "সেফ্টী ডিভাইস্"ও বিভিন্ন। শ্রমিক দপ্তর সে কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই কেতাবটী নানা যন্ত্রের চিত্রে

পূর্ণ; সুতরাং বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। যে কেহ দুর্ঘটনা নিবারণ বিষয়ে মাথা ঘামাইতেছেন, তাঁহার পক্ষে এটী একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। কারখানা তদারকদার যন্ত্রের মালিক, যন্ত্র-নির্ম্মাতা প্রভৃতিও এই কেতাব পাঠে উপকৃত হইবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

২। ইক্‌নমিক্ কন্‌ডিশন্‌স্ ইন্ ইণ্ডিয়া (ভারতের আর্থিক অবস্থা)। লেখক শ্রী পি, পদ্মনাভ পিল্লাই। প্রকাশক জর্জ্জ রুট্‌লেজ্ এণ্ড্ সন্স্ লিঃ, লণ্ডন। ১৯২৮। পৃঃ ৩৩০+১০।

বইখানাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—

(১) ভারতের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন।
(২) শিল্পের চাহিদা।
(৩) কৃষির উন্নতি।
(৪) ভূমি ও শ্রমিক সমস্যা।
(৫) শিল্প।
(৬) বৃহদাকারের ধনোৎপাদন।
(৭) কাপড়ের কল।
(৮) লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন।
(৯) শ্রমিক সমস্যা।
(১০) শিল্প ও পুঁজি।
(১১) রাষ্ট্র ও শিল্প।

ভারতের শিল্পের কোন্ ধারায় পুষ্টিলাভ করা উচিত তাহা লইয়া অর্থশাস্ত্রীরা নানাপ্রকার মত পোষণ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, কারখানা-শিল্প ভিন্ন গতি নাই; অন্য কেহ কেহ প্রচার করিতেছেন যে, কারখানা-আপদ্ দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া কুটীর-শিল্পের প্রবর্ত্তনই মঙ্গলজনক। শ্রীযুক্ত পিল্লাই মহাশয় এই সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া উপরোক্ত কোনও দলে ভিড়িয়া যান নাই। তিনি বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে আর্থিক তথ্য লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন ও ভারতে কোন্ শিল্পনীতি অনুসৃত হওয়া উচিত তাহা আলোচনা করিয়াছেন। এই বইখানার আলোচনা-প্রণালী হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, শ্রীযুক্ত পিল্লাই মহাশয় বস্তু-তান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রী।

তিনি তথ্য ঘাঁটিয়া দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান ভারতের নিশ্চিন্ত গতি কারখানা-শিল্পের দিকে। এখন এর মোড় ফিরানো সহজ নয়, উচিতও নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, কৃষির উন্নতিকেও অবহেলা করিলে চলিবে না। তবে ভারতের আর্থিক উন্নতির অন্তরায়ও কম নাই, যথা:—সময়ের অপব্যবহার, গবর্ণমেণ্টের ব্যয়বাহুল্য নীতি, বাল্যবিবাহ ও বাল্যমাতৃত্ব প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থা, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পীড়াসমূহ, অপুষ্টিকর খাদ্য, শারীরিক পরিশ্রমের অমর্য্যাদা। এই সব অন্তরায় সত্ত্বেও অপর দেশে অনুসৃত উৎপাদন প্রণালী চোখ বুঝিয়া অনুসরণ করা উচিত কিনা চিন্তার বিষয়। হয়তো বা ঐ সব প্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন দরকার হইতে পারে। সব দিক্ বজায় রাখিয়া ধনোৎপাদন-প্রণালী আবিষ্কার করিতে হইলে সাহসী, গভীর চিন্তাশীল, অভিজ্ঞ, বস্তুতান্ত্রিক গবেষণার প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত পিল্লাই মহাশয় সে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক অর্থশাস্ত্রীকে এই কেতাবখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়
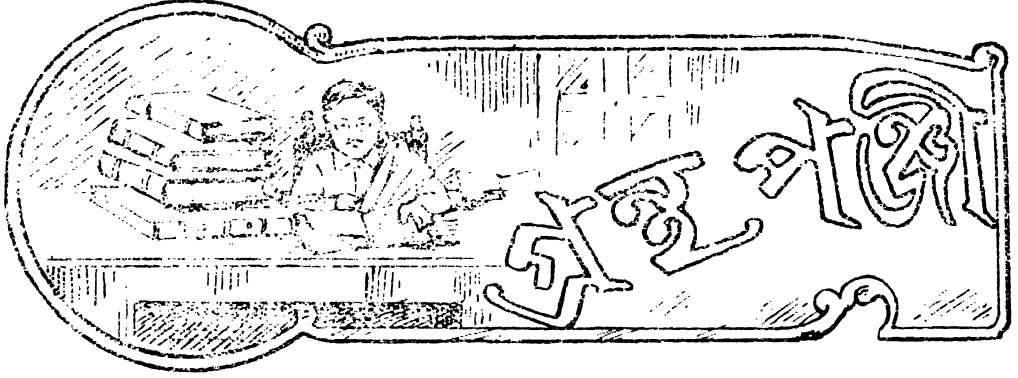
১। "দি কো-অপারেটিব্ মুব্‌মেণ্ট ইন রুশিয়া ডিউরিং দি ওয়ার। কনজিউমারস কো-অপারেশন।" (যুদ্ধকালীন সমবায় আন্দোলন। খাদকদের সমবায়), দক্ষিণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক ইউজিন এম্ কেডেন। "ক্রেডিট অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল কো-অপারেশন" (সাউকারি এবং কৃষি সমবায়), খার্কোব্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্র ও সংখ্যাবিজ্ঞানের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক আলেক্সেস্ এন্ এণ্টসিফারোব্। ইয়েল বিশ্ববিদ্যায় প্রেস, নিউ হেভ্‌ন্। ১৯২৯। পৃঃ ১৬+৪২০। ১৮ শি।

২। "প্রিমিটির ইক্‌নমিক্‌স্ অব্ দি নিউজীল্যাণ্ড মাওরি" (নিউজীল্যাণ্ড মাউড়ির আদিম অর্থকরী), রেমণ্ড ফার্থ। জর্জ্জ রুট্‌লেজ, লণ্ডন। ১৯২৯। ২৫ শি।

৩। "দি কোল ইন্‌ডাষ্ট্রী অব্ দি এইটিন্‌থ্ সেঞ্চুরি" (অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়লার ব্যবসায়), টি এস্ অ্যাস্‌টন ও জে সাইক্‌স্। ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস। পৃঃ ২৬৮। ১৪ শি।

৪। "প্রটেক্‌শন অব্ ওয়ার্কারস অপারেটিং মেটালওয়ার্কিং প্রেসেস্" (ধাতব কাজের প্রেসে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের রক্ষার কথা)। ইণ্টারন্যাসনাল লেবার অফিস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। জেনেভা, ১৯৩০। ৮+১২৩ পৃঃ। ৫ শি।

৫। "দি রিমেকিং অব্ ভিলেজ্ ইণ্ডিয়া" (ভারতীয় গ্রামের পুনর্নির্ম্মাণ), এফ এল্ ব্রেইনে। এইচ্ মিলফোর্ড, লণ্ডন। পৃঃ ২৬২। ৫ শি।

৬। "রিপোর্ট অব্ দি ইন্‌ভেষ্টিগেশনস্ অন্ দি ম্যানুফ্যাকচার অব্ পিকিং ব্যাণ্ডস" (পিকিং ব্যাণ্ড তৈরী সম্বন্ধে রিপোর্ট), বি এন দাশ এম এ ও ইউ এন দত্ত। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্প-দপ্তরখানা হইতে দি বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বুলেটিন নং ৪৪। বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট্ বুকডিপো, কলিকাতা। ১৯৩০। ।৶০ আনা।

৭। "ইন্‌ভেষ্টিগেশন্ ইনটু দি অ্যাপ্লিকেশন অব্ রেনা (আমুরা রোহিতুখা) অয়েল ইন্ সোপ-মেকিং" (সাবান তৈরীতে রেনা তৈলের প্রয়োগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান), বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শিল্প-রাসায়নিক আর এল দত্ত ও সহকারী রাসায়নিক তিনকড়ি বসু। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্প-দপ্তরখানা হইতে প্রকাশিত। বুলেটিন নং ৪৬। বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট্ বুক ডিপো, কলিকাতা। ১৯৩০। ।৵০ আনা।

৮। দি পোষ্ট-ওয়ার আন-এমপ্লয়মেণ্ট প্রব্লেম (যুদ্ধের পরবর্ত্তী বেকার-সমস্যা), হেনরি ক্লে। ম্যাকমিলান কো। ১৯২৯। পৃঃ ১০+২০৮।

পাশ্চাত্য দেশে অধিকার-বোধের ক্রম-বিকাশ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ

(১)

প্রত্যেক সমাজে "অধিকার" সম্বন্ধে লোকের ধারণা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। "অধিকার" সম্বন্ধে আধুনিক ভাবের স্ফুরণ হইতে আধুনিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও সমাজ-হিত অনুষ্ঠান উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজ-হিত-সাধনের মূলতত্ত্বে উপনীত হইতে হইলে সমাজবাসীর অধিকার সম্বন্ধে আধুনিক মতাবলী জানা আবশ্যক। আমরা এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

অধিকার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতির নূতন ধারণার পরিচয় লাভ করিতে যাইয়া দেখা যায় যে, এই নব জাগরণের পশ্চাতে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান: ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভূম্যধিকার লইয়া বিবাদ; ইয়োরোপের প্রধান জাতিগুলির মধ্যে কল-কারখানার সৃষ্টি; বিগত দেড়শত বৎসর-ব্যাপী রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও সাধারণতন্ত্রের আন্দোলন; ভাবের আদান প্রদানের জন্য নূতন নূতন উপায় অবলম্বন; গমনাগমনের সুবিধার সৃষ্টি; নূতন দেশে বসতিস্থাপন; সাম্যবাদের প্রচার; ধন-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি; শ্রমিক সঙ্ঘের উৎপত্তি ও শক্তিসঞ্চয়; জনহিতসাধন-কল্পে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি, ইত্যাদি। এই ঘটনাগুলিতে অনেক উৎকট ভাব, চিন্তা ও কল্পনার, উদ্দাম কার্য্যকারিতার, যুক্তির ও অযৌক্তিকতার, বীরত্বের ও ভীরুতার, এবং সহযোগের ও বিবাদের নিদর্শন পরিস্ফুট আছে বটে, কিন্তু সমাজ-সংস্কার ও সমাজ হিতসাধন সম্বন্ধে ঐ সকল ঘটনার ভিতর দিয়া একটি প্রচ্ছন্ন নূতন তত্ত্বের আভাষ সর্ব্বদা পাওয়া যায়। মানুষের "অধিকার" সম্বন্ধীয় ভাবকে কেন্দ্র করিয়াই সমাজ-সংস্কার ও সংগঠনের ঐ নূতন তত্ত্ব বিকাশলাভ করিতেছিল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে এক ঘোষণা প্রচারিত হয়। এডমাণ্ড বার্ক এই ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করায় টমাস পেইন্ ফরাসী ঘোষণার সমর্থন করিয়া স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে টমাস্ জেফারসন্ মানুষের অধিকার সম্বন্ধে নূতন ভাব উপনিবেশগুলিতে প্রচার করিতেছিলেন; এর চরম পরিণতি হইয়াছিল উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা ঘোষণায়। এইরূপ ঘোষণা ও প্রচারের ফলে পাশ্চাত্য দেশবাসীর মনে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে নূতন ভাবের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্ত্তীকালে ক্রমশঃ উক্ত ভাবের বিকাশ হইতে থাকে। আধুনিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও সমাজ-হিত-প্রতিষ্ঠানগুলিকে মানুষের অধিকার সম্বন্ধীয় নূতন ভাবের জীবন্ত মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করা চলে। সমাজ-সংস্কার আন্দোলন দ্বারা অধিকারের নূতন ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যা চলিতেছে। আধুনিক সমাজ-হিত-প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের অধিকার-সম্বন্ধীয় প্রাচীন মতের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া নূতন অর্থ ও ভাব প্রচার করিতেছে; ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্ত্তে সামাজিক স্বার্থের আদর্শ গ্রহণ করিতেছে। সামাজিক আন্দোলন সমাজের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, উহা বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ ধারণ করিতেছে। কখন বা দাস-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন-যুদ্ধে, কখন বা সাম্যতন্ত্রের প্রচারে, কখন বণিক-শ্রমিকের কলহে, কখন বা সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র স্থাপনে, কখন হয়ত ব্যবস্থাপক সভায় শ্রমিকের দৈনিক কার্য্যকাল নিরূপণে উহা ব্যক্ত হইতেছে। আবার প্রতীচ্যের বাহিরে কোথাও বা সামাজিক আন্দোলনের প্রকাশ দেখা যাইতেছে, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের চেষ্টায়, অসবর্ণ বিবাহের আইনে, বিধবা-বিবাহ প্রচলনের আগ্রহে, বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির একীকরণ প্রচেষ্টায়, স্বরাজলাভের উৎসাহে, উপকূল সংরক্ষণ প্রস্তাবনায় বৈদেশিক মূল ধনের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা স্থিরীকরণের যুক্তি অবলম্বনে, সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণের কল্পনায় এবং বহুবিধ পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শ গ্রহণে। যে ভাবেই সামাজিক আন্দোলন প্রকাশ পাউক না কেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রে অধিকারের সমস্যাটা বর্ত্তমান আছেই।

অধিকারের নূতন আদর্শ গ্রহণ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা আদর্শের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা পাশ্চাত্য জাতির অভিপ্রায়।

(২)

কিন্তু অধিকার সম্বন্ধে যে চিরদিন মতভেদ ও বিরোধ চলিতেছে ও চলিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজা মনে করেন, ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকারের বলে তিনি রাজত্ব করেন, সুতরাং প্রজাদিগের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে সে বিদ্রোহ নিবারণের অধিকার তাঁহার আছে। প্রজা মনে করেন, রাজার রাজত্ব সম্পূর্ণ প্রজার সম্মতির উপর নির্ভর করিতেছে; রাজা যদি প্রজার সম্মতি না লইয়া কর ধার্য্য করেন, তাহা হইলে রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার অধিকার তাঁহার আছে। শ্রমিক বলেন, জীবন-ধারণের উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভের অধিকার তাঁহার আছে। ধনিক বলেন, তাঁহার ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তিনি কাহাকেও দিতে পারেন না। অভিজাত বলেন, তাঁহার বংশগত মর্য্যাদার অধিকার তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সাধারণ বলেন, সমাজে তাঁহার স্থান কাহারও নিম্নে নহে; তাঁহার অধিকার কাহারও অপেক্ষা কম নহে, ইত্যাদি। চিরকাল অধিকার সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ চলিতেছে। কিন্তু আজ বিভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও সমাজ-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ভিতর দিয়া অধিকারের পরিচয় নূতনভাবে পাওয়া যাইতেছে। এ পরিচয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভালরূপে পাওয়া যায় নাই। ফরাসী দার্শনিক তুর্গোৎ মানুষের অভাব ও অধিকারের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সম্বন্ধ যে কি করিয়া আসিল তাহা বিচার করেন নাই। ইনি ভগবানের উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া খালাস পাইয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, ভগবান মানুষকে অভাব দিয়াছেন ও ঐ অভাব মিটাইবার জন্য তাকে শ্রম করিতেই হইবে এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন—এইরূপে তিনি কাজ করাটা প্রতি মানুষের অধিকারভুক্ত করিয়াছেন। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান অধিকারের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে না। ব্ল্যাকষ্টোন তাঁহার কমেণ্টারিজ্ এ অধিকার সম্বন্ধে আর এক প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা অনুসারে সমাজ অথবা রাষ্ট্র চুক্তির ফল মাত্র, সুতরাং মানুষ জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ত্তানুযায়ী কতক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। এই স্বাধীনতার কিয়দংশ জনসাধারণের হিতের জন্য সমাজের বা রাষ্ট্রের কাছে অর্পিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ অধিকার আখ্যা প্রাপ্ত হয়; অথবা অর্পিত জন্মগত স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তিকে অপরাপর যে সকল সুবিধা প্রদান করেন, সেগুলিকে অধিকার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এ ব্যাখ্যা কতক পরিমাণে গ্রহণীয়, সম্পূর্ণরূপে নহে; কেন না সমাজ বা রাষ্ট্র যে চুক্তির ফল তাহা আজ কেহ স্বীকার করেন না। সামাজিক অঙ্গীকারবাদ বা সোশ্যাল কন্‌ট্রাক্ট থিওরি আজ একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(৩)

আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের লেখকগণ অধিকারের সঙ্গত ব্যাখ্যা দানে সমর্থ হইয়াছেন। ফোক-ওয়েজ (লোকের ধরণধারণ) নামক গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ লেখক অধ্যাপক সুমনের বলেল, অধিকার দেশাচার বা লোকাচার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা জীবন-সংগ্রাম ক্রীড়ার নিয়ম-স্বরূপ। অধিকার সম্বন্ধে মানুষের ধারণা চিরকাল একরূপ থাকে না। অধিকারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সভ্যতার সৃষ্টি হয় নাই, সভ্যতার ফলে অধিকারের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ আদিকাল হইতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহা হইতেই প্রকারান্তরে অধিকারের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের জনৈক খ্যাতনামা ইতিহাস-লেখক বলেন, জনসাধারণের সমর্থন হইতে অধিকার উৎপত্তি লাভ করে; ইহা অতীতে যেমন সত্য ছিল এখনও তেমনই সত্য। এ ব্যাখ্যায় অধিকারের প্রকৃত তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে বুঝা যাইতেছে যে, অধিকার সমাজের দেওয়া জিনিষ; জনসাধারণ যাহা সমর্থন করে না তাহা অধিকারের আমলে আসিতে পারে না।

(৪)

অধিকার সম্বন্ধে একদা হাক্সলি যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম এই :—

মানুষ নিতান্ত অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। সভ্য সমাজে শিশু যে কাহারও পদতলে দলিত হইয়া মারা যায় না, তার কারণ শিশুর সুকৃতি নহে, শিশুর আত্মীয়দের স্নেহ ও মমতা এবং সমাজের ব্যবস্থিত আইনই শিশুকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করে। শিশু এমন কিছু করিয়া পৃথিবীতে আসে নাই যে, লোকে বাধ্য হইয়া তাহার লালন-পালনের ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। সমাজে এইরূপ বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে বলিয়াই শিশু লালিত, পালিত ও শিক্ষিত হয়। শিশু বড় হইয়া উপার্জ্জন করে, ধন-সম্পত্তির মালিক হয়; কিন্তু এ বিষয়েও সমাজের সহায়তা ভিন্ন সে কিছু করিতে পারে না। সমাজ মানুষকে উপার্জ্জনের এবং সম্পত্তির অধিকারী হইবার অধিকার প্রদান করে বলিয়াই সে স্বীয় অধিকারের গৌরব করিয়া থাকে। সমাজ সমর্থন করিলে বলবান্ দুর্ব্বলের সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে পারে; সমাজের সমর্থন নাই বলিয়াই একের সম্পত্তি অপরে জোর করিয়া হস্তগত করিতে পারে না এবং করিলেও উহাতে অধিকার বর্ত্তে না।

(৫)

তবেই দেখা যাইতেছে, অধিকার জিনিষটা সমাজের সৃষ্টি। সমাজ যাহা সমর্থন করে না তাহা অধিকার পদ-বাচ্য হইতে পারে না। সমাজে বাস করিয়া সমাজের অমতে জোর করিয়া 'অধিকার' লাভ করা চলে না। দুর্ব্বল সমাজে এরূপ অধিকার সম্ভবপর হইলেও সমাজ সবল হইয়া উঠিলেই ইহার অবসান হইতে পারে। সমাজের বিগত ও বর্ত্তমান অভিজ্ঞতায় যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া প্রতিপন্ন ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার বাহিরে কেহ অধিকার পাইতে পারে না। সমাজের অভিজ্ঞতায় চৌর্য্য, দস্যুতা, নরহত্যা প্রভৃতি শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; সুতরাং চোর, দস্যু, নরহন্তা প্রভৃতির শাস্তির ব্যবস্থা সমাজ করিয়াছে; সমাজের অননুমোদিত কার্য্যের কর্ত্তা সমাজদ্রোহী আখ্যায় অভিহিত হইয়া নিন্দিত হইতেছে। সুতরাং মানুষ সমাজে বাস করিয়া সমাজের অনুমতিক্রমে যে সব সুবিধা ভোগ করিতে পায়, মাত্র সেগুলিই অধিকার পদ-বাচ্য। সমাজ শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে যাইয়া ভুল করিতে পারে এবং এই ভ্রমের জন্য সমাজ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে পারে। তথাপি সমাজের সমর্থিত ভ্রান্ত মতই আইনে কিংবা দেশাচারে বা লোকাচারে পরিণত হইয়া লোকের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যতদিন ভ্রমের সংশোধন না হয়, ততদিন অধিকারের পরিবর্ত্তন হয় না। আবার ভ্রম সংশোধিত হইলে লোকের অধিকার সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা হয়। সুতরাং যে কোন বিষয়েই হউক, অধিকারকে চিরস্থায়িরূপে গ্রহণ করা চলে না। অধিকার পরিবর্ত্তনশীল। প্রাচীন সমাজে লোকের যে সকল অধিকার ছিল, আজ তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ সমাজ-হিত সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস অন্যরূপ হইয়াছে; অনেক নূতন সামাজিক অভাবের ও সমস্যার উৎপত্তি এবং উহাদের পূরণের ও সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাচীন অধিকারের পরিবর্জ্জন ও নূতন অধিকারের আগমন ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতেও এরূপ হইবার সম্ভাবনা। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের অধিকারেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সমাজের সমর্থন ব্যতিরেকে উহা হইতে পারে না। মানুষ পরস্পরের সহিত নানারূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করে; ইহার ফলে তাহাদের সামাজিক জীবনের উদ্ভব হইয়াছে। কোন মানুষ যদি সমাজের বাহিরে একাকী বাস করে, তবে তাহার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে না, সে যাহা খুসী তাহা অবাধে করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন দশজনে একত্র হইয়া বাস করে, তখন প্রত্যেকের অপর নয় জনের দিকে চাহিয়া সংযম অবলম্বন করিতে হয়; পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকলে মিলিয়া যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করে, প্রত্যেককে তাহা মান্য করিয়া চলিতে হয়। যদি কেহ নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে অপর নয় জন মিলিয়া তাহাকে শাসন করিয়া থাকে; নিয়ম-ভঙ্গকারী নয় জনের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াইবার সামর্থ্য রাখে না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সঙ্ঘের কল্যাণে কতক পরিমাণে খর্ব্ব করিতে হয়; সুতরাং সমাজবাসীর সামাজিক জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে তাহার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়া থাকে।

মানুষের সামাজিক জীবন আছে বলিয়া তাহার অধিকার-অনধিকার সম্বন্ধে বিচার আবশ্যক হয় এবং সমাজই তাহার বিচার করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যুগে যুগে লোকের অধিকার পরিবর্ত্তিত হয়। সমাজই এই পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া থাকে। নূতন অভিজ্ঞতা অনুসারে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে যাইয়া সমাজ প্রাচীন অধিকারের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন ও নূতন অধিকারের সৃষ্টি সাধন করিতে পারে।

(৮)

বেন্থাম্ মনে করিতেন রাষ্ট্রের অনুমতি ব্যতীত অধিকার উৎপত্তিলাভ করিতে পারে না। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। অপরাপর সামাজিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা রাষ্ট্রের প্রতিপত্তি অধিক থাকায় অধিকার সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ বিচারের ভার রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু রাষ্ট্র যাহা খুসী তাহা বিচার না করিয়া অতীত অভিজ্ঞতার এবং সমাজ-প্রদত্ত কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং অধিকারকে সমাজের কর্ত্তৃত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা চলে না। রাষ্ট্র ও সমাজ এক জিনিষ নহে; এক না হইলেও রাষ্ট্রকে সমাজ হইতে স্বতন্ত্র করা যায় না। রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্গত। সুতরাং যাহা সমাজদ্বারা সমর্থিত ও সমাজের পক্ষে বিধেয় বলিয়া গণ্য না হয় তাহা অধিকার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু সমাজের সকল অধিকার এক শ্রেণীর নহে। ইন্দ্রিয়-ভোগের অধিকার বিদ্যালাভের অধিকার হইতে স্বতন্ত্র। সেনা-বিভাগে প্রবেশাধিকার ও ভূম্যধিকার এতদুভয়ের মধ্যে তফাৎ অনেক। এক অধিকার অপর অধিকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। সমাজ-হিত বিশ্বাসের সাহায্যে অধিকারের বিচার হয়। হয়ত এক প্রকার অধিকার বর্ত্তমান থাকার ফলে সমাজে গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে, পক্ষান্তরে অপর এক প্রকার অধিকারের ফলে সমাজ উপকৃত হইতেছে। এ স্থলে শেষোক্ত অধিকার প্রথমোক্ত অধিকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সমাজ-মঙ্গলের আদর্শ সকলের কাছে সমান না-ও হইতে পারে, কাজেই সমাজ-মঙ্গল সম্বন্ধে সকলের বিশ্বাস এক না হওয়ারই কথা। বস্তুতঃ, দেশের ও সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্নরূপ বিশ্বাস দেখা যায়। এজন্য অধিকারের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে সকলে একমত হয় না। এক সম্প্রদায় যে অধিকারকে সমাজের পক্ষে হিতকর মনে করেন, হয়ত অপর এক সম্প্রদায় সে অধিকারকে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া গণ্য করেন। এক সম্প্রদায় প্রাচীন রীতি-নীতির পক্ষপাতী, অপর এক সম্প্রদায় হয়ত উহার বিরোধী। এক সম্প্রদায় বিশেষ কোন নূতন অধিকার দ্বারা সমাজের ও দেশের উন্নতি হইবে বলিয়া মনে করেন, অপর এক সম্প্রদায় হয়ত ঐরূপ অধিকার দ্বারা সমাজের ও দেশের অপকার সাধিত হইবে ভাবিয়া উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। সমাজ-হিত সম্বন্ধে শ্রমিকের যেরূপ বিশ্বাস ধনিকের বিশ্বাস সেরূপ নহে; ধনিকের যেরূপ বিশ্বাস হয়ত জনসাধারণের বিশ্বাস সেরূপ নহে। ঈশ্বরবাদী সমাজ-হিত সম্বন্ধে যে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করেন, নিরীশ্বর-বাদীর হয়ত সে বিশ্বাসে আস্থা নাই। ফাণ্ডামেণ্টালিষ্ট খৃষ্টান সমাজের পক্ষে যাহা মঙ্গলকর মনে করেন হয়ত মডার্নিষ্ট খৃষ্টান তাহা করেন না। ভূম্যধিকারী ও প্রজার বিশ্বাসের সমতা নাই; শাসকের ও শাসিতের বিশ্বাসের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জ্ঞানী ও অজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক, সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্যবাদী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসে আস্থাবান, সর্ব্বত্র এরূপ দেখা যায়। সমাজ-মঙ্গল বা দেশোন্নতি সম্বন্ধে বিশ্বাসের সমতা না থাকায় অধিকার লইয়া দলে-দলে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বা জাতিতে-জাতিতে বিরোধ চলিতে পারে। তাই প্রতি সমাজে বা দেশে একদল রক্ষণশীলরূপে এবং অপর দল উন্নতিশীলরূপে দেখা দিতেছেন। কিন্তু অধিকারের মূলে সমাজ-হিতের বিশ্বাস বর্ত্তমান।

শিক্ষা দীক্ষা ও নূতন অভিজ্ঞতা লাভের ফলে মানুষের বিশ্বাস যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়; কাজেই অধিকারও যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আজ সভ্য জগতের কোন লোক, সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতি আপন অধিকারকে চিরস্থায়ী সত্যরূপে বা স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। মহত্তর আদর্শের উপরে নীচ আদর্শ বেশী দিন

দাঁড়াইতে পারে না। প্রতিপক্ষের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রবল পক্ষ বহু দিন আপন অধিকার বজায় রাখিতে পারেন; কিন্তু প্রতিপক্ষ যে চিরদিনই দুর্ব্বল থাকিবে তাহা বলা যায় না। জনসাধারণের অধিকার সাম্প্রদায়িক অধিকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কোন কারণে ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বৃহত্তর সমাজের স্বার্থ অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রাখিতে পারেন, কিন্তু এ অধিকার আজ সভ্যজগতে সমর্থিত ও বিধিসঙ্গত বলিয়া গণ্য হয় না। আজ সম্পত্তিশালী ব্যক্তি হয়ত ইহা ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছেন যে, সম্পত্তির উপর তাঁহার অধিকার চিরস্থায়ী নহে। সম্পত্তি যদি দেশ বা সমাজ-মঙ্গলের প্রতিকূল হয়, তবে উহা সমাজকে উৎসর্গ করা যাইতে পারে।

সমাজে যে সকল অধিকার প্রচলিত আছে, জন-সাধারণের হিতের জন্য প্রয়োজন অনুসারে উহাদের রক্ষণ, পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধন কিংবা নূতন অধিকারের সৃষ্টি-সাধন, সমাজ-সংস্কারের ও সমাজ সংগঠনের অন্যতম কার্য্য। প্রজাস্বত্ব আইন, বিধবা-বিবাহ আইন, আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ আইন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলন, বিদ্যালয় স্থাপন, স্বরাজলাভের প্রচেষ্টা, কারখানা আইন, মজুর-সঙ্ঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কংগ্রেসের অধিবেশন, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ সমিতি, নারী রক্ষা সমিতি, পল্লী-উন্নতি সমিতি প্রভৃতির প্রত্যেকটিই কোন না কোনরূপে ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা সমাজ-সম্পর্কীয় অধিকারের ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট। একের অধিকার বৃদ্ধি করিতে যাইয়া যখন অপরের অধিকার খর্ব্ব করা আবশ্যক হয়, তখন উদার ও অনুদার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু উন্নতিশীল সমাজে এ বিরোধ বেশী দিন স্থায়ী হয় না। যে অধিকার ন্যায়ের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার জয় অবশ্যই হইয়া থাকে। উন্নত সমাজে রক্ষণশীল সম্প্রদায় ক্রমশঃ উদার-নীতির পক্ষপাতী হইয়া সত্যের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন, ইহা উন্নতিশীল জাতির উন্নতির ও সজীবতার একটি প্রধান লক্ষণ।

(৭)

সমাজের বিশেষ অবস্থায় সম্প্রদায় অথবা শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিতে পারে; পূর্ব্বে হয়ত ঐরূপ আপত্তি উঠিবার কারণ ঘটে নাই। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার আছে কিনা তৎসম্বন্ধে একদিন পাশ্চাত্য জগতে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এখন সভ্য জগতে ইহা মীমাংসিত হইয়াছে যে, শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন করিবার অধিকার আছে। আজ শ্রমিকদের অধিকার সম্বন্ধে নূতন প্রশ্নও উঠিয়াছে। একটি প্রশ্ন এই,—যেহেতু শ্রমিকদের সহায়তা ব্যতীত ধনিকগণ ধন-উৎপাদনে সমর্থ নহেন, সুতরাং ধনিকদের ব্যবসার পরিচালনায় শ্রমিকদের হাত থাকিবে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে যে একদিন ধনিকগণ শ্রমিকদিগের অনুকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। দুই চারিটি দৃষ্টান্তও মিলিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে আধুনিক কল-কারখানার সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রমিকদের এবম্প্রকার অধিকার-বৃদ্ধির পক্ষে প্রশ্ন উঠিবার আবশ্যকতা দেখা যায় নাই। ভবিষ্যতে শ্রমিকগণের অধিকার বৃদ্ধির পক্ষে কি প্রশ্ন উঠিবে, তাহা আজ নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; কিন্তু প্রশ্ন যে উঠিবে, ইহা অবধারিত। উন্নত পাশ্চাত্য সমাজগুলিতে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, লাম্পট্য ও ব্যাভিচার দ্বারা সমাজ-নীতিকে কলুষিত করিবার অধিকার স্ত্রী বা পুরুষের আছে কি না? উত্তর হইয়াছিল—নাই। ইহার ফলে অনেক স্থানে নূতন আইনের বলে গণিকাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করার চেষ্টা হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, মদ্যপান দ্বারা সমাজের দুর্নীতি ও অপরাধের বোঝা ভারি করিবার অধিকার যুক্তরাষ্ট্রবাসীর আছে কিনা? উত্তর হইয়াছিল—নাই। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ভোলষ্টেড্ অ্যাক্টএর উৎপত্তি ও মদ্যপানের বিরুদ্ধে আইন প্রচলিত হয়। আজ যুক্তরাষ্ট্রে প্রশ্ন উঠিয়াছে, যে সকল অধিবাসী সমাজের গলগ্রহস্বরূপ অথবা যাহারা পুরুষানুক্রমে সমাজ-বিগর্হিত কর্ম্মের পুনঃ পুনঃ অভিনয় দ্বারা সমাজে অশান্তির মাত্রা বাড়াইতেছে, তাহাদের বংশবিস্তারের অধিকার আছে কিনা? এ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা একমত না হইলেও কোন কোন প্রদেশে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে অপ্রকৃতিস্থ ও স্বভাব-অপরাধীদের

বংশ-বিস্তারের বিরুদ্ধে আইন এবং ঐ শ্রেণীর লোকদের সন্তান-উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে; যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণ উক্ত ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছেন। আজ সুপ্রজনন-বিদ্যার আলোচনার ফলে পাশ্চাত্য-জগতে বংশ-বিস্তারের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমাজের নূতন অভিজ্ঞতা লাভের ফলে অধিকার সম্বন্ধে নূতন প্রশ্নের সৃষ্টি হয়।

(৮)

আজ বংশ বিস্তারের অধিকার সম্বন্ধে জাতিগত প্রশ্নও উঠিতেছে। প্রশ্নটি এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উহার উল্লেখে ক্ষতি নাই। প্রশ্নটি এই,—জগতে সকল জাতির বংশ-বিস্তারের অধিকার আছে কিনা? উত্তর হইতেছে, ধরাতলে যে সকল জাতি নিকৃষ্ট, তাহাদের বংশ-বৃদ্ধির অধিকার থাকা সঙ্গত নহে, কারণ নিকৃষ্ট জাতিরা বংশ-বৃদ্ধি দ্বারা পৃথিবীর দুঃখ-দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পৃথিবীতে শ্বেত জাতিই উৎকৃষ্ট; সুতরাং কেবলমাত্র এই জাতিই পৃথিবীতে বাস করিবার অধিকারী! নিকৃষ্ট জাতিগুলিকে তবে কি উপায়ে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদূরিত করা যায়? উপায় দুইটি। প্রথম উপায়, শ্বেতজাতির রক্ত-মিশ্রণ দ্বারা নিকৃষ্ট জাতিগুলিকে ক্রমশঃ শ্বেত জাতিতে পরিণত করা। কিন্তু এ কার্য্য সহজ নহে। অ-শ্বেত নিকৃষ্ট জাতির লোক সংখ্যা এতই অধিক যে, উহাদিগকে ক্রমশঃ শ্বেত জাতিতে পরিণত করিয়া তুলিতে বহু সময় ও যত্ন আবশ্যক হইবে। সুতরাং এ উপায় সমীচীন নহে। দ্বিতীয় উপায়, নিকৃষ্ট জাতির উৎপাদিকা শক্তির বিলোপ সাধন করা। কিন্তু এ কার্য্যে নিকৃষ্ট জাতি স্বীকৃত হইবে কেন? কৌশলে এ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। নিকৃষ্ট জাতিগুলিকে বুঝাইতে হইবে, যদিও এ জন্মে তাহাদের সন্তান লাভের আশা নাই, কিন্তু মৃত্যুর পর যখন তাহারা পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে, তখন তাহাদের ও শ্বেত-জাতির মধ্যে পার্থক্য থাকিবে না। এইরূপে, জন্মান্তরবাদের সাহায্য গ্রহণ এবং সঙ্গে সঙ্গে কতক অর্থ প্রদান দ্বারা নিকৃষ্ট জাতির লোকদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদের সন্তান-উৎপাদিকা শক্তির বিলোপ সাধন পূর্ব্বক পৃথিবীতে কেবলমাত্র শ্বেতজাতির বসতির অধিকার সৃষ্ট করিতে হইবে! এই কল্পনা বিকৃতমস্তিষ্ক-প্রসূত অথবা ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালের ফল নহে, ইহার জন্য পাশ্চাত্য-জগতে বেশ একটু প্রচার-কার্য্য বা প্রোপাগ্যাণ্ডা চলিতেছে। মাঝে মাঝে এ সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে আলোচনা হইতেছে, কোন কোন অধ্যাপক পুঁথিও লিখিতেছেন। ফুরিয়ে দ'আলবে তাঁহার রচিত দি ইনফ্রা অ্যাণ্ড দি সুপার ওয়ার্লড এবং কোয়া হেবেডিমাস নামক গ্রন্থে সন্তান-উৎপাদিকা শক্তির বিনাশ দ্বারা যে অপকৃষ্ট জাতিগুলির ধ্বংস সাধন করা যাইতে পারে তৎ সম্বন্ধে আভাস দিয়াছেন। পাশ্চাত্য জাতির উর্ব্বর মস্তিষ্কে অনেক কল্পনা স্থান পায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, শক্তিশালী জাতির উদ্ভট কল্পনাও কালে প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইতে পারে। সুতরাং অধিকার সম্বন্ধে শ্বেত বনাম অ-শ্বেত সমস্যাটাকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না, উহাতে ভাবিবার ও শিখিবার উপাদান রহিয়াছে।

(৯)

আজ দেড় শতাব্দী যাবৎ পাশ্চাত্য জগতে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে যে দাবী চলিতেছে অথবা দাবীর পূরণ হইতেছে, তন্মধ্যে প্রধানগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রতিকূল অবস্থা হইতে জন-সাধারণের মুক্তিলাভের অধিকার। এ অধিকার-বোধ যে প্রাচীন সমাজে ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু সম্প্রতি উহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ প্রাণ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান-বিশারদগণ দেখাইতেছেন যে, মানুষের উন্নতির প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে বিদূরিত করা হইলে, তাহার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। অসভ্য-জাতির উন্নতির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়, তাহার প্রতিকূল প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টন। যদি কোন অসভ্যকে শৈশবকাল হইতে সভ্যতার আবেষ্টনের ভিতর যত্নপূর্ব্বক লালন-পালন ও শিক্ষাপ্রদান করা হয়, তবে তাহার মানসিক বিকাশ

দ্রুতবেগে হয়, প্রকৃতপক্ষে সে সভ্য-পদবাচ্য হইয়া থাকে। সভ্য-সমাজে কোন কোন শ্রেণীর লোক এমনই প্রতিকূল আবেষ্টনের মধ্যে লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হয় যে, তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিতে পারে না। সমাজকে সবল করিয়া তুলিতে হইলে, তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে প্রতিকূল অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। জন-সাধারণের উন্নতি হইলে, সমাজের উন্নতি হয়, ইহাতে সমাজেরই স্বার্থ। তাই আজ সভ্য-সমাজে জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অনুকূলে নানা-প্রকার বিধি প্রচলিত হইতেছে। অনেক কু-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য-সমাজে দাসত্বপ্রথা আর বর্ত্তমান নাই। কারখানা আইনে কারখানা-আবেষ্টনের উন্নতি সাধন দ্বারা শ্রমজীবীদের উন্নতির পথ মুক্ত করা হইতেছে। কিন্তু আজ পাশ্চাত্য শ্রমজীবীদের চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, সমাজে বাস করিয়া উত্তমরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, যে পরিমাণ আয় আবশ্যক, তাহা লাভ করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। এই দাবীর ফলে স্থানে স্থানে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের সর্ব্বনিম্ন বেতন আইন দ্বারা ধার্য্য করা হইয়াছে। পুরুষ শ্রমজীবীদের সর্ব্বনিম্ন বেতন সম্বন্ধেও যাহাতে ঐরূপ আইন প্রচলিত হয়, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বত্র আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের অন্যান্য উদ্দেশ্যও আছে; যথা,—শ্রমজীবীদের কার্য্যস্থলে স্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি-সাধন, তাহাদের বাসস্থানের উন্নতি-সাধন ইত্যাদি। শ্রমজীবীদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অনুকূল দাবীগুলি লইয়া কোন কোন স্থানে প্ল্যাটফর্ম্ম অব্ ন্যাশনাল্ মিনিমাম্ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই আন্দোলন একদিন শ্রমজীবীদের উন্নতির অনুকূলে আইন প্রবর্ত্তন করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

(১০)

দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মীদের বিশ্রাম-লাভের অধিকার। এ অধিকার আজ সকল সভ্য সমাজই মানিয়া লইতেছেন। সমাজ দেখিতেছে, উদর পোষণের জন্য মানুষের সকল শক্তি ব্যয়িত হইলে তাহার বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। মানুষের সভ্যতার অনেকাংশ তাহার বিশ্রাম-লাভের ফল স্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছে। দরিদ্র কর্ম্মীদিগকে উপযুক্ত বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া হইলে তাহারা অবসর সময়ে আত্মোন্নতি সাধনপূর্ব্বক সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে। বিশেষতঃ, পরিশ্রমের পর উপযুক্ত বিশ্রামের সুযোগ না পাইলে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, ভগ্নদেহ লইয়া মানুষ পরিবারের বা সমাজের বিশেষ কোন উপকারে আসিতে পারে না। সুতরাং আধুনিক পাশ্চাত্য জাতির শ্রমজীবীদিগের বিশ্রামের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দৈনিক কার্য্যকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছেন। এক শতাব্দীর মধ্যে শ্রমিকদের কার্য্যকাল পনর, ষোল, ঘণ্টা হইতে আট, নয় ঘণ্টায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন কোন স্থানে বিশ্রাম-কাল আরও বৃদ্ধি করিয়া দৈনিক কার্য্যকাল ছয় ঘণ্টায় নামাইবার জন্য শ্রমজীবীদের দাবী চলিতেছে।

(১১)

তৃতীয়তঃ, বিদ্যালাভের অধিকার। শিক্ষার মত মনুষ্যত্ব-বিকাশের উপায় যে আর কিছু নাই, ইহা আজ সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতেছে; জনসাধারণের শিক্ষা-লাভের অধিকার উন্নত সমাজগুলিতে সমর্থিত হইতেছে। ফলে, পাশ্চাত্য দেশে অবৈতনিক নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন জনসাধারণেরও অনেক কর্ত্তব্য আছে, এ ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে।

(১২)

চতুর্থতঃ, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের অধিকার। মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে ক্রীড়া প্রবৃত্তি অন্যতম। এই প্রবৃত্তি সুপথে পরিচালিত না হইলে, কুপথে ধাবিত হইতে পারে; কাজেই জনসাধারণের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা সমাজের কর্ত্তব্য। ক্রীড়াক্ষেত্র, উদ্যান, নির্দ্দোষ নাট্যালয়, সঙ্গীতালয়, সচ্চিন্তা ও সদালাপ সমিতি, সামাজিক মিলনক্ষেত্র প্রভৃতি স্থাপন দ্বারা মানুষের ক্রীড়া প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া সমাজকে পাপ ও

অপরাধ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত রাখা যাইতে পারে। নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা দ্বারা সমাজবাসীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা যায়, সুতরাং তাহাতে সমাজেরই মঙ্গল হইয়া থাকে। এই অধিকারের যৌক্তিকতা সকল সভ্য জাতিই গ্রহণ করিয়াছেন।

(১৩)

পঞ্চমতঃ, স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার। বহু লোক এক স্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করিলে স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নানা প্রকার অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই অবস্থার জন্য সঙ্ঘ অথবা সমাজ দায়ী। সমাজের কর্ত্তব্য, প্রতিকূল অবস্থার বিলোপ সাধন দ্বারা সমাজবাসীর স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখা। সকল সভ্যদেশেই নাগরিক সমিতি বা মিউনিসিপালিটি নগরবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার সমর্থন করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই স্বাস্থ্যরক্ষা-কার্য্য নগরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা, সংক্রামক ব্যাধির প্রশমন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে বিস্তার লাভ করিতেছে। আবাস-গৃহের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক পাশ্চাত্য সমাজ সচেষ্ট আছেন। অনেক সমাজ-হিতৈষী মনে করেন, ধনী, দরিদ্র প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিবার অধিকার থাকা আবশ্যক। আবাস-গৃহ সম্বন্ধে সমাজের এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যাহাতে কেহ স্বাস্থ্যরক্ষার একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শের গণ্ডীর বাহিরে বাস করিতে না পায়। উন্নত পাশ্চাত্য সমাজ-গুলিতে উক্ত ব্যবস্থা ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে। এতদ্বারা জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার সমর্থিত হইতেছে।

আজ শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সমাজের দায়িত্ব স্বীকৃত হইতেছে। আজিকার শিশুরাই কিছুকাল পরে সমাজের প্রতিনিধি হইবে, সুতরাং ভবিষ্যৎ সমাজের মঙ্গলের জন্য শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে সমাজে নানাপ্রকার শিশু-হিত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে। অধিকন্তু শিশুরা যাহাতে ব্যাধিমুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে তৎসম্বন্ধে সু-প্রজনন-বিদ্যার নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য-পদ্ধতি নিরূপণের চেষ্টা চলিতেছে। দুরারোগ্য ঘৃণিত ব্যাধিক্লিষ্ট, দুর্ব্বল ও উন্মাদ রোগগ্রস্ত পিতামাতার সন্তান লাভের অধিকার খর্ব্ব করার সঙ্কল্প হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন প্রদেশে বিবাহপ্রার্থী পুরুষ ও স্ত্রীলোককে তাহাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সন্তোষকর নিদর্শনপত্র প্রদর্শন করিয়া বিবাহের অনুমতি লাভ করিতে হয়। বিবাহে সকলের অধিকার আছে, এ কথা আজ উন্নততর পাশ্চাত্য সমাজে স্বীকৃত হইতেছে না। আজ সভ্যতার উৎকর্ষ হেতু সামাজিক নীতির উৎকর্ষ অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছে, ইহার ফলে সভ্য-সমাজ অপরাধীদিগের অধিকার কতক পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আজ প্রশ্ন উঠিতেছে, অপরাধের জন্য সমাজ দায়ী নহে কি? মানুষ আপনা-আপনি অপরাধী হয় না, সমাজে প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় এবং অপরাধ পূর্ব্বাবধি প্রচলিত থাকায় নূতন অপরাধীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমাজের এই ব্যাধির জন্য সমাজই দায়ী; অপরাধী ব্যাধিক্লিষ্ট সমাজেরই সন্তান। সমাজের পক্ষে আপন সন্তানকে একবারে পরিত্যাগ করা সঙ্গত নহে। সমাজের নিকট অপরাধীর কতক দাবী আছে, ঐ দাবী গ্রাহ্য করা উচিত। এবম্বিধ আলোচনা ও আন্দোলনের ফলে অপরাধীর প্রতি সামাজিক অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইয়াছে। অনেক স্থান হইতে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে, অপরাধীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, কারাগারের সংস্কার সাধনদ্বারা অপরাধীদের স্বাস্থ্যের ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধনের চে া চলিতেছে। ঋণের জন্য কারাদণ্ডের ব্যবস্থা অপ্রচলিত এবং অপরাধীকে শারীরিক যন্ত্রণা প্রদান পাশবিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অপরাধীকে মানুষের নৈতিক উৎকর্ষের ফল কতক পরিমাণে ভোগ করিতে দেওয়া হইতেছে। দরিদ্রদের দুঃখ প্রশমন পক্ষেও উন্নত সভ্যসমাজ একবারে উদাসীন নহেন। সমাজের সহানুভূতি ও অনুকম্পা-লাভে তাহাদের কতক অধিকার আছে, উন্নত সমাজ ইহা স্বীকার করিতেছেন।

(১৪)

ষষ্ঠতঃ, সামাজিক জীবনে পুরুষের মত স্ত্রীলোককেও

সকল বিষয়ে সমান অধিকার দান। উন্নত পাশ্চাত্য সমাজে এ সম্বন্ধে মতভেদ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বেও এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ ছিল এবং স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে অনেক স্থানেই পুরুষরা অনুদার মতের পোষকতা করিতেন। শিক্ষিতা পাশ্চাত্য রমণীদের বহু চেষ্টার ফলে স্ত্রী-জাতির আত্ম-বিকাশের পথ অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে নারী প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তার পদ লাভ করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে স্ত্রী-জাতির অধিকার লাভের চেষ্টা আরও জয়যুক্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(১৫

এ পর্য্যন্ত আমরা সমাজে ব্যক্তির অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তাই বলিয়া সমাজের অধিকার অবহেলার বিষয় নহে; বরং উহার প্রয়োজনীয়তা এত অধিক বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে যে, উহাকে অগ্রাহ্য করিয়া আজ ব্যক্তির অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে না। আজ সভ্য জগতে ব্যক্তির অধিকার সমাজের অধিকারের নিম্নে স্থান পাইতেছে। উভয়প্রকার অধিকারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, সমাজের অধিকারই প্রাধান্য লাভ করিতেছে। সমাজ সুস্থ ও সবল না হইলে, সমাজবাসীর মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না, সুতরাং সমাজের স্বাস্থ্য ও শক্তির রক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনের জন্য সভ্য-জগতে বিধিমত চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টার ফলে সমাজের অধিকার বিভিন্ন দিকে প্রকাশ পাইতেছে। সমাজের স্বার্থ অগ্রাহ্য করিয়া আজ কোন ব্যক্তি অধিকার-বিশেষের অধিকারী হইতে পারে না। তবে, সমাজের স্বার্থ কি, তাহা বিশেষরূপে প্রণিধানের বিষয়। সমাজের স্বার্থ প্রকৃষ্টরূপে স্থিরীকৃত না হইলে ব্যক্তির স্বার্থ অন্যায়রূপে বিদলিত হইতে পারে। কাল্পনিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, ধনিকদের সঞ্চিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়ত সমাজ-স্বার্থের অনুকূল নাও হইতে পারে। জনসাধারণের হস্ত হইতে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ভার কাড়িয়া লওয়া বিধেয় কিনা, তৎসম্বন্ধে সকল সভ্য-সমাজ এখনও একমত হইতে পারেন নাই; ভবিষ্যতেও হইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিশেষরূপ বিচার না করিয়া খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিলে ব্যক্তি ও সমাজ এতদুভয়ের স্বার্থেরই হানি হইতে পারে। অকারণে ব্যক্তির স্বার্থের বিদলন সমাজ-স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না; আবার সমাজ স্বার্থকে বিদলিত করিয়া ব্যক্তির স্বার্থকে বড় করিয়া তুলিলে সমাজের এবং পরোক্ষে ব্যক্তির অবনতি ঘটে। প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ ও ব্যক্তি এতদুভয়ের স্বার্থের মধ্যে সন্ধি বা সামঞ্জস্য স্থাপনই সমাজ সংস্কার বা সংগঠনের একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু সন্ধির আদর্শ, সর্ব্বসাধারণের বা সমাজের মঙ্গল, কোন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থরক্ষা নহে। সন্ধি-স্থাপনে সমাজ-স্বার্থের নিকট ব্যক্তির স্বার্থ পরাজয় মানিতে বাধ্য।

এই সমাজ-মঙ্গল আদর্শকে লক্ষ্য করিয়াই সমাজের অধিকার উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিতেছে। যে সব লোক নানাভাবে সমাজের অনিষ্ট সাধন করে, আত্মরক্ষার্থে তাহাদিগকে বিদূরিত করা সমাজের অভিপ্রায়। প্রাণনাশের পরিবর্ত্তে অধিকারের খর্ব্বতা সাধন দ্বারা অনিষ্টকারীর হস্ত হইতে সমাজ অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীর অধিকারের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন বা প্রাণদণ্ড এখনও অনেক স্থানে সমর্থিত হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে সকল সভ্য সমাজে প্রত্যেক লোকের জীবন-ধারণের অধিকার স্বীকৃত হইলে অপরাধীর প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে সমাজের অধিকার কতকটা খর্ব্ব হইবে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে মানব-সভ্যতার নৈতিক আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া সমাজই স্বেচ্ছায় নিজের অধিকার কতকটা খর্ব্ব করিতে প্রস্তুত হইবে, আশা করা যায়। সুতরাং সভ্য-সমাজের অধিকার উত্তরোত্তর নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত হইলেও কোন কোন বিষয়ে উহা হ্রাসও হইতে পারে। সমাজ আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতিকল্পে ঘৃণিত ব্যাধি-পীড়িতের, দেশ বা সমাজদ্রোহীর, নরহত্যাকারীর, দস্যুতস্করাদির, দুর্নীতিপরায়ণের বা মদ্যপায়ীর অধিকার খর্ব্ব করিবার অধিকার রাখিলেও সমাজের এবম্প্রকার কার্য্যের মূলে যথেচ্ছচারিতা থাকিতে পারে না। প্রত্যেক লোক সুস্থ, সবল, মেধাবী, কর্ম্মঠ, নীতি-পরায়ণ, দেশভক্ত ও মানবহিতৈষী রূপে গড়িয়া উঠিয়া যাহাতে দেশের ও জগতের

কল্যাণে আপনাকে নিয়োজিত করিতে পারে, কেবলমাত্র ইহার জন্যই সমাজের অধিকার-বৃদ্ধির আবশ্যকতা ও স্বার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমাজ-স্বার্থ এতদুভয়ের মধ্যে আপাততঃ বিরোধ উপস্থিত হইলেও অবশেষে ব্যক্তির চরম স্বার্থ ও সমাজ মঙ্গলের চরম আদর্শের মধ্যে প্রভেদ নাই। ব্যক্তির চরম স্বার্থ,—ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ; সমাজ-মঙ্গলের চরম আদর্শও ব্যক্তির চরম বিকাশ সাধন। ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ সাধনের জন্য ব্যক্তির ন্যায্য ও যথোচিত অধিকারের বৃদ্ধি সাধন সমাজের পক্ষে কর্ত্তব্য। এই অধিকার বৃদ্ধি দ্বারা সমাজেরই প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। প্রত্যেক লোকের চরম দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের চেয়ে সমাজের পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয় কিছু থাকিতে পারে না।

ফরাসী দেশের কিঞ্চিৎ পরিচয়

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম, এ

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র

ফ্রান্সের বিদ্যালয়গুলিতে বিদেশী ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৩ সনে ফ্রান্সে বিদেশী ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৫,৫৫৯ জন; ইহার মধ্যে প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত ৩,৬৫১ জন। ১৯২৭ সনে এই দুই স্থানে পড়ুয়ার সংখ্যা যথাক্রমে ১৪,১২৯ এবং ৭,২১৫এ পরিণত হইয়াছে। প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-সংখ্যা ২৬,১০০ জন। ইয়োরোপে এত বড় বিশ্ববিদ্যালয় আর নাই। সরকারী রাজস্ব তহবিল হইতে ১০০০ জন বিদেশী ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান করা হইয়া থাকে। সিতে য়ুনিভার্সিডের নামক হষ্টেলের ১,৩২৫টী কক্ষে এখন বিদেশী ছাত্রগণ বাস করে। এই হষ্টেলে নানাপ্রকার খেলাধুলার বন্দোবস্তও আছে।

শিল্প-বিপ্লব ও উৎপাদন

লড়াইয়ের পরে প্রায় সমস্ত দেশেই শিল্প-বিপ্লব দেখা দেয়। ফ্রান্সও তাহা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। ফ্রান্সে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ১৯২০ সনে সর্ব্বনিম্ন সীমায় উপনীত হয়। লড়াইয়ের পূর্ব্বে ১৯১৩ সনে ফ্রান্সে কয়লা এবং লোহা উৎপন্ন হইয়াছিল প্রায় ৪৩০ লক্ষ টন। ঐ সনে মিশ্রিত লোহা এবং ইস্পাত উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ৯০ লক্ষ এবং ৬০ লক্ষ টনের কাছাকাছি। ১৯২০ সনে এই চারিটী জিনিষের উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৪০ লক্ষ, ১৪০ লক্ষ, ৪০ লক্ষ এবং ৩০ লক্ষ টন। ১৯২০ সন হইতে ফ্রান্সের উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৭ সনে মিশ্রিত লোহা এবং ইস্পাতের উৎপাদন প্রায় ১৯১৩ সনের অনুরূপ। কয়লা এবং লোহার উৎপাদন কিন্তু ১৯১৩ সনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ১৯২৭ সনে এই দুই জিনিষের উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৫২৫ লক্ষ এবং ৪৪০ লক্ষ টন।

মোটর এবং নকল রেশম, ফ্রান্সের আর দুইটী উল্লেখযোগ্য শিল্প। এই দুইটী শিল্পও ক্রমশঃ উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে। নিম্নের তালিকা দুইটী হইতে এই দুই শিল্প সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে:—

ফ্রান্সের মোটর-শিল্প

সন	প্রস্তুত গাড়ীর সংখ্যা
১৯০৫	১৪,০০০
১৯১৩	৪৫,০০০
১৯২৩	১,১০,০০০
১৯২৫	১,৭৭,০০০
১৯২৭	১,৯১,০০০

ফ্রান্সের নকল রেশম উৎপাদন

সন	টন
১৯০৫	২,৯০০
১৯২২	২,৮৫০
১৯২৩	৪,০০০
১৯২৪	৬,০০০
১৯২৫	৬,৫০০
১৯২৬	৭,৫০০

ফ্রান্সের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২৭ সনে ফ্রান্সের বহির্ব্বাণিজ্য ২২% বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৯ সনে ফ্রান্সের বহির্ব্বাণিজ্য সবচেয়ে কম ছিল। তাহার পর হইতে বহির্ব্বাণিজ্যের গতি ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে থাকে। নিম্নে ফরাসীর বিভিন্ন সনের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব প্রদত্ত হইল :—

সন	আমদানি	রপ্তানি
	টন	টন
১৯১৩	৪৪২,২০৩,৩৬০	২২০,৭৪৫,১৩০
১৯১৯	৩৮৪,৪৭১,৬৫৫	৫৫৫,৩০০
১৯২০	৫০৬,৩৭৯,২৬৪	১২৮,৫৫২,৩৮০
১৯২১	৪০০,৬২১,০২০	১৬৯,৭৫০,২১০
১৯২২	৫২৪,১৮২,০১০	২২৬,৪৮৮,৫৭০
১৯২৩	৫৪৮,৬৪৬,৮২৫	২৪৯,০৯৮,৬৫০
১৯২৪	৫৬৫,৯১৩,৬৩৪	২৯৩,৮৭০,৯০২
১৯২৫	৪৭৯,৪৩২,৫০২	৩০৩,৮৭১,১৭৪
১৯২৬	৪৫৩,৯৩৯,৮৬০	৩২৫,৪৮৫,০৪০
১৯২৭	৭৯৩.৫৪,৯৪৬৯	৩৮০,৫১৯,৫৬৩

ফ্রান্সের বন্দরসমূহে যত জাহাজ প্রবেশ করিয়াছিল, এবং যাহা হইতে মাল খালাস হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের মোট টনেজ ১৯১৩ সনে ৬০,৬১৮,০০০ এবং ১৯২৭ সনে ১২১,৪১২,০০০।

ফরাসী উপনিবেশসমূহের উন্নতিবিধান

সাগরপারের ফরাসী সাম্রাজ্যের (উত্তর আফ্রিকা এবং সংরক্ষিত দেশসমূহ লইয়া) মোট আয়তন ৫,০০৩,৫০০ বর্গ মাইল। রুশিয়া-সম্বলিত গোটা ইউরোপ হইতে ফরাসী উপনিবেশ সাম্রাজ্যের আয়তন ১,০৯৫,০০০ বর্গ মাইল বেশী। ফরাসী উপনিবেশগুলিকে কাজে লাগান হইতেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। ১৯২৭ সনে উত্তর আফ্রিকা ফ্রান্স-মাতার চরণতলে [illegible],০০০,০০০ টন ফসফেট্ অর্ঘ্য যোগাইয়াছে (গোটা দুনিয়ার ফসফেটের অর্দ্ধেক)। ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় ঐ সনে ৭,০০০,০০০ টন তৈলবীজ এবং ৪৫০,০০০ টন চিনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুই চীজের উৎপাদক দেশ হিসাবে দুনিয়ায় ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার স্থান দ্বিতীয়। মাদাগাস্কার দ্বীপে ১৫,০০০ টন গ্রাফাইট্ উৎপন্ন হইয়াছে (দুনিয়ায় তৃতীয়)। ইণ্ডোচীনে চাউল উৎপন্ন হইয়াছে ৭,০০০,০০০ টন (দুনিয়ায় ৪র্থ) ফরাসীর অধীন দেশসমূহের আমদানি এবং রপ্তানির পরিমাণ ১৯১৩ সনে ৮০০,০০০ ০০০ ডলার হইতে ১৯২৭ সনে ১,২০০,০০০,০০০ ডলারে পরিণত হইয়াছে।

লড়াইয়ের ফলে ফ্রান্সের বিধ্বস্ত অঞ্চলের ক্ষতিপূরণ বাবদ্ ফ্রান্স ১৯২৭ সন নাগাদ ৭৬,৬০০,০০০,০০০ ফ্রাঁ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে যুদ্ধবিজিত আলসাস এবং লোরেন অঞ্চল হইতে ফ্রান্স অনেক সম্পদ্ আহরণ করিয়াছে ১৯১৩ সনে এই দুই প্রদেশ হইতে ফ্রান্স তৈল উত্তোলন করিয়াছিল ৪৭,০০০ টন ; ১৯২৭ সনে উত্তোলন করিয়াছে ৭০,০০০ টন ; পটাশ পাইয়াছিল ১৯১৩ সনে ৩০০,০০০ টন, ১৯২৭ সনে পাইয়াছে ২,৩০০,০০০ টন। নদী তীরস্থ ষ্ট্রাসবুর্গ বন্দরে জাহাজ হইতে মাল উঠানামা করিয়াছিল ১৯১৩ সনে ১,৯৮০,০০০ টন, ১৯২৭ সনে ৫,৭৭৩,০০০ টন।

ফ্রান্সে গুরু করভার

ইয়োরোপে বিলাতই সব চেয়ে বেশী কর-প্রপীড়িত দেশ এ সম্বন্ধে ফ্রান্সের স্থান বিলাতের পরেই। নিম্নের তালিকা

দুনিয়ার ট্যাক্স-পীড়িত কয়েকটী দেশের ট্যাক্সের হার প্রদত্ত হইল :—

বিলাতে	ট্যাক্সের	হার	জাতীয়	আয়ের	২০·১%
ফ্রান্সে	„	„	„	„	২০%
জার্ম্মাণিতে	„	„	„	„	১৮·৪%
সুইডেনে	„	„	„	„	১৭·১%
মার্কিণে	„	„	„	„	১০·৯%

যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সিকিউরিটির উপর নির্ভর করে এবং যাহাদের আয় ২,৪০০ ডলার হইতে ৬,২০০ ডলারের মধ্যে, এইরূপ তিনটী সন্তান-বিশিষ্ট লোককে আপন আয়ের যথাক্রমে নিম্নলিখিত অংশ ট্যাক্স প্রদান করিতে হয় :—

	পরিবারের হার			ট্যাক্সের হার
ফ্রান্সে	১৩·২%	...	...	২০·৯%
জার্ম্মাণিতে	৬·২%	...	...	১৪·২%
বেলজিয়ামে	৭·০%	...	...	১২·৩%
বিলাতে	২·৬%	...	...	৭·২%
ইতালিতে	১১·৫%	...	...	১৭·৮%

৬২,০০০ ডলার আয়ের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর অত্যন্ত চড়া হারে ট্যাক্স দিতে হয়। এই ট্যাক্স মৃত্যুকর নামে অভিহিত। এই ট্যাক্স আবার ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনকে ভিন্ন ভিন্ন হারে দিতে হয়। নিম্নের তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের মৃত্যুকরের পরিচয় দেওয়া হইল :—

		পুত্রকন্যা বা পৌত্র পৌত্রীকে	ভ্রাতা ভগিনীকে	কুটুম্ব বা সম্পর্কহীন ব্যক্তিকে
ফ্রান্সে	...	১৫·৯৬%	৩২·২৭%	৩৫%
জার্ম্মাণিতে	...	৬%	১৮%	৩০%
বেলজিয়ামে	...	৫·০২%	২১·৬১%	৪৩·২০%
বিলাতে	...	৭%	১১%	১৬%
ইতালিতে	...	০	০	৪০%

বণ্ড হইতে প্রাপ্ত সুদ ট্যাক্স লইয়া কমাইয়া দেওয়া হয়। বণ্ডের সুদ ট্যাক্সের দরুণ কমে—

ফ্রান্সে	...	১৮%
জার্ম্মাণিতে	...	১০%
মার্কিণে	...	৫%
সুইজারল্যাণ্ডে	...	২%

১,০০০,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের ইমারতের জন্য অগ্নি-বীমার প্রিমিয়ামের উপর ট্যাক্স দিতে হয়—

প্যারিসে	...	২২৬ ফ্রাঁ
বুয়েনস আরাসে	...	৬০ „
নিউইয়র্কে	...	৫০ „
মাদ্রিদে	...	৩৫ „
রোমে	...	৩২·৫০ „
লণ্ডনে	...	৪ „

ফ্রান্সে হোটেলের উন্নতি

হোটেলগুলিকে সাহায্যপ্রদানের জন্য ফ্রান্সে "ক্রেদেত্ নাশ্যেনাল হোতেলিয়ের" বলিয়া একটী ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান আছে। ১৯১৯ সন হইতে ১৯২৭ সনের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় হোটেলগুলিতে অনেক ঘরবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। ৩০ হাজারের অধিক কামরা নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে বা আধুনিক কায়দায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ফ্রান্সে ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য "অফিস্ ন্যাশিনাল্ দ্য তুরিজম্" নামে আর একটী প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানটীর নিকট ফ্রান্সের ২,৬০০টীরও উপর আরামদায়ক হোটেলের খবর পাওয়া যাইবে। এই সমস্ত হোটেলে দৈনিক ২ ডলারের বেশী খরচ লাগে না।

প্যারি সহরে যাত্রী চলাচল

১৯১৩ সনে প্যারি সহরে ট্রামগাড়ী এবং মোটর বাসে যাত্রী যাতায়াত করিয়াছিল, ৭৩২,০০০,০০০ জন; ১৯২৮ সনে যাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে, ১,০৬৬,০০০,০০০ জন।

১৯১৯ সন হইতে ট্রামগাড়ী এবং মোটর বাসে যাত্রী চলাচল "সোসিয়েতে দ্য ট্রাঁসপোর্ত আঁ কম্যঁ" নামক

প্রতিষ্ঠানটী কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। প্যারি সহরের চতুর্দ্দিকে ৬০ মাইল ব্যাসার্দ্ধ পরিমিত স্থান এই প্রতিষ্ঠানটীর এলাকাভুক্ত।

ফ্রান্সের রাস্তা-সড়ক দুনিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ফ্রান্সের মত এত বেশী রাস্তা-সড়ক দুনিয়ায় আর কোন দেশে নাই। প্রতি ১০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে কোন্ দেশে কত মাইল সড়ক আছে, নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

ফ্রান্স	...	১১৫ মাইল
বিলাত	...	১১০ ,,
জার্ম্মাণি	...	৬৮ ,,
মার্কিণ	...	৬২ ,,
ইতালি	...	২৩ ,,

ফ্রান্সে মোটর গাড়ীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। নিম্নে বৃদ্ধির তালিকা দেওয়া হইল :—

সন		মোটর গাড়ীর সংখ্যা
১৯০০	...	৩,০০০
১৯১০	...	৫৩,৬০০
১৯২০	...	২৬০,২৪০
১৯২৭	...	৯৭৬,৬৪৬

১৯২৭ সনে ফ্রান্সের উপনিবেশসমূহে ৭৪০০০ খানি গাড়ী ব্যবহৃত হইয়াছে।

ফ্রান্সে বিমানপোতের রেওয়াজ বৃদ্ধি

ফ্রান্সে হাওয়ায় হাওয়ায় মাল এবং যাত্রী চলাচল দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। মাত্র দুইটী বিমানপথে (লা বুর্জ প্যারি এবং মারিঞ্যানে—মার্সেলে) যাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বাড়িয়াছে। ১৯২৩ সনে এই দুইটী বিমান-পথে যাত্রী যাতায়াত করিয়াছিল ১৪,০৫৭ জন; ১৯২৭ সনে যাত্রী চলিয়াছে ৪০,৫৯১ জন। ১৯২১ সনে মাত্র লাবুর্জ ষ্টেশন হইতে মাল চালান গিয়াছিল এবং মাল আসিয়াছিল ২৪,০০০,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের। ১৯২৭ সনে এই ষ্টেশনে মাল চলাচলের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ২৭৬,৪৩০,০০০ ফ্রাঁ।

ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় ভ্রমণের সুবিধা

১৯১৯ সন হইতে ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় ভ্রমণের সৌকর্য্যার্থ একটী আদর্শ প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হইয়াছে এবং ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতি বিধান করা হইতেছে। বর্ত্তমানে আলজিরিয়ায়, ডিউনিসে, মরোক্কোয় এবং সাহারা মরুভূমির অভ্যন্তর প্রদেশে ৪৪টী "ত্রাঁস আঁত লাতিক্" হোটেল স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত হোটেল মোটর-পথের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত রহিয়াছে। এই জন্য ২৮০খানি মোটর গাড়ী মোতায়েন রহিয়াছে। এই সমস্ত মোটর গাড়ী ১৯২৭—২৮ সনে ভ্রমণ করিয়াছে কমসে কম ৯০০,০০০ মাইল।

ফ্রান্সে জিনিষের দর

অন্যান্য দেশের তুলনায় ফ্রান্সে জিনিষপত্রের খুচরা দর অনেক কম। স্বর্ণমানে পরিবর্ত্তিত করিলে দেখা যায় অন্যান্য দেশের চেয়ে ফ্রান্সের খুচরা দর প্রায় ২৫% কম। ১৯২৭-২৮ সনে বেলজিয়ামে খুচরা দর প্রায় ফ্রান্সের তুল্য। বর্ত্তমানে বিলাতেই খুচরা দর সব চেয়ে বেশী। ইহার নিম্নেই মার্কিণ এবং জার্ম্মাণি। ১৯২৬ সনে ফ্রান্সের খুচরা দর কিছু চড়িয়া গিয়া বেলজিয়ামের দরের অনেক উপরে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৯২৭ সনের প্রারম্ভ হইতে দর কমিতে থাকে। ১৯২৮ সনে এই দরের ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি প্রতীয়মান হইতেছে।

মোটর গাড়ীর ভাড়ায় ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের স্থান

ফ্রান্সে মোটর গাড়ীর ভাড়াও সবচেয়ে কম। বিলাত এ বিষয়েও সকলকে হারাইয়া দিয়াছে। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজধানীতে প্রতি কিলোমিটারে মোটর গাড়ীর কিরূপ ভাড়া আদায় করা হয়, তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

রাজধানীর নাম		সেণ্ট
প্যারি	...	৫·৫
ব্রুসেলস্	...	৬·২

অস্লো	...	৬·৮
কোপেন হেগেন্	...	৮
আমষ্টার্ডাম্	...	৮·২
রোম	...	৮·২
ভিয়েনা	...	৮·৪
মাদ্রিদ	...	১০·২
ষ্টক্হলম	...	১০·৯
বার্লিন	...	১২·১
লণ্ডন	...	১৪·৮

জীবনযাত্রার খরচ সম্বন্ধে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ

ফ্রান্সে জীবিকানির্ব্বাহের খরচও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ হইতে অনেক কম। দুধ এবং রুটি এই দুইটাই ইয়োরোপের মানুষের প্রধান খাদ্য। এই দুইটী চীজ্ই ফ্রান্সে অসম্ভবরকম সস্তা। নিম্নে ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের দুধ এবং রুটির দর দেওয়া হইল :—

দুধের দর (লিটার প্রতি)

		সেণ্ট্
প্যারি	...	৬·৮
ষ্টক্হলম	...	৬·৯
ভিয়েনা	...	৭
রোম	...	৭
জুরিখ্	...	৭·১
বার্লিন	...	৭·৮
বুয়েনস্ আরাস্	...	৮·৪
নিউইয়র্ক	...	৯
কোপেনহেগেন্	...	৯·১
লণ্ডন	...	১৩·৭

রুটির দর (প্রতি কিলোগ্রাম)

		সেণ্ট্
প্যারি	...	৮
লণ্ডন	...	৮·৮
রোম	...	৯·৯
আমষ্টার্ডম্	...	১০
মাদ্রিদ্	...	১০·৫
বার্লিন	...	১৮
ফিলাডেলফিয়া	...	১৯
ষ্টক্হলম	...	১৯·৫
অস্লো	...	২২
ভিয়েনা	...	২৩

বাঙ্গালার পাট, পাটের চাষী ও ব্যবসায়ী

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম, এ, বি, এল

১। কত পাট জন্মিয়াছে

প্রদেশের নাম	কত একরে পাট বুনিয়াছে		কত বেল পাট জন্মিয়াছে (১ বেল = ৪০০ পাউণ্ড)	
	গত বৎসর	এ বৎসর	গত বৎসর	এ বৎসর
বঙ্গদেশ (কুচবিহার সুদ্ধ)	৩০,২০,৩৬৫	৩০,৬২,৩০০	৯২,৬৪,২০০	৯৯,৬৬,০০০
বিহার ও উড়িষ্যা	২,৩৮,০০০	২,৩৮,০০০	৭,৬৯,৪০০ *	৬,৭০,০০০
আসাম	১,৫৬,৬০০	১,৮৫,৩০০	৩,৫১,৬০০	৫,৯৫,০০০
মোট	৩৪,১৪,৯৬৫	৩৪,৮৫,৬০০	১,০৩,৮৫,২০০	১,১২,৩১,০০০

* নেপাল ধরিয়া

২। পাটের দরুণ বাঙ্গালার ৬০ কোটি টাকা ক্ষতি চাষীর ক্ষতি ২০ কোটি টাকা

গত কয়েক মাস ধরিয়া পাটের দর ক্রমাগত নামিয়া যাইতেছে। মফঃস্বলে এক্ষণে পাটের দর মণ প্রতি ২॥০ হইতে ৩॥০ টাকা। কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত সমিতিকে বলিয়াছিলেন যে, পাটের উৎপাদন খরচা ৬৲ টাকার কাছাকাছি। আর বেশী পাট বুনার ফলে চাষী আজ তার খরচার অর্দ্ধেকও উঠাইতে পারিতেছে না।

অনুমান করা হইয়াছে যে, এ বৎসর মোট ৬,৬০,০০,০০০ মণ পাট জন্মিবে। ইতিমধ্যে এর এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ বাজারে ফেলা হইয়া গিয়াছে। পাটের বাজার প্রতিদিন নামিতেছে, সুতরাং বাকী পাট কি দরে বিকাইবে এখন বলা বড় শক্ত। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বর্ত্তমান দরেই বাকী পাটের সবটা বিকাইবে, তবু পাট-চাষীদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ কোটি টাকা।

বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি দেখাইয়াছেন যে, প্রধানতঃ পাট চাষের উপরই বাঙ্গালার চাষী তার আয়ের জন্য নির্ভর করিয়া থাকে, পাটের দরে তারতম্য ঘটিলে সব চেয়ে বেশী কষ্ট ভোগ করে তারাই। বর্ত্তমান নীচু দরে তাদের ভীষণ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তারা খাজনা পর্য্যন্ত দিতে অপারগ হইয়াছে।

চাষীর ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস

রায়তের ক্রয়-ক্ষমতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ফলে পীসগুড্‌স্ ও অন্যান্য দ্রব্যের কাট্‌তিও কমিয়াছে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থলে অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে, পীস্‌গুড্‌স্ বণিকেরা সেই সেই স্থলে এক পয়সার মালও বেচিতে সমর্থ হইতেছে না। ইহার উপর কংগ্রেস পিকেটিং ত আছেই।

কাঁচা পাটের দর পড়িয়া যাওয়ায় পাটে প্রস্তুত দ্রব্যের দরও ভয়ানক রকম পড়িয়া গিয়াছে। ৯ পোর্টার হেসিয়ান মাত্র ৮৷৷০ আনায় বিকাইতেছে, গত ১৫ বৎসরের মধ্যে এত কম দরে আর কখনও বিকায় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বেও পাটে প্রস্তুত দ্রব্যের বর্ত্তমান বাজার দর নীচু বলিয়া বিবেচনা করা হইত।

ব্যবসায়ীর ক্ষতি ৪০ কোটি

পাট ও পাটে প্রস্তুত দ্রব্যের দর নামার অর্থ যে দেশের কিরূপ গভীর আর্থিক ক্ষতি তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। গত বৎসরে মোট পাট দ্রব্যের রপ্তানির হিসাব নিম্নরূপ :

হেসিয়ান	প্রায়	১৮০ কোটি গজ
পাটের ব্যাগ	,,	৬০ ,, ,,
কাঁচা পাট	,,	৪৫ লক্ষ বেল্

১৯২৯ সনে পাট ও পাটে প্রস্তুত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া মোট টাকা পাওয়া গিয়াছিল ৯০ কোটি। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, এ বৎসরেও ঐ পরিমাণ রপ্তানি যাইবে, তবে বর্ত্তমান বাজার দরে পাওয়া যাইবে ৪০।৪৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ বাঙ্গালার আয় ৪০ কোটি টাকা কমিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশীও হইতে পারে।

রাজস্ব-হ্রাস ও বেকার-বৃদ্ধি

২৩শে জুন ইণ্ডিয়ান্ জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীকে লিখিত পত্রে গানি ট্রেড্‌স্ এসোসিয়েশন লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালার আয় কমার অর্থ একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা, অন্যদিকে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় রাজস্ব হ্রাস।

পাটের দর পড়িয়া যাওয়ায় কলিকাতার আর্থিক ক্ষতিটা প্রণিধান-যোগ্য। পাটচাষীরা সাক্ষাৎ ভাবে বেশী ভুক্তভোগী হইলেও, ব্যবসায়ী কেহই রেহাই পাইবে না। মিলের ম্যানেজিং এজেণ্ট, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও দালাল প্রত্যেকের আয় ৫০% কমিয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ীরা এক্ষণে ক্রমাগত ব্যয়-সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইতেছে, সুতরাং অনেককে কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাইয়া দিতে হইয়াছে। ইহাতে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়িবে তা আর বিচিত্র কি ?

কারণ কি ?

মনে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হয় যে, পাট ব্যবসার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ কি ? দুনিয়া-ব্যাপী একটা বাণিজ্যিক ভাঁটা দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু তার ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া

দিলে চলিবে না। গোটা দুনিয়া যতটা চায় এবার তার চেয়ে বেশী পাটের ফসল হইয়াছে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু সেটা একটা এমন কিছু নূতন ঘটনা নয়, এর আগেও বড় রকম ফসল হইয়াছে, কিন্তু এ রকম অবস্থা কোন কালেই হয় নাই। কলিকাতায় পাট হইতে প্রস্তুত দ্রব্য রাশীকৃত মজুত পড়িয়া রহিয়াছে, সেজন্য ঐ সব দ্রব্যের দর অনেক নামিয়া গিয়াছে। পাটের দর নামার এটা একটা হেতু। পূর্ব্বে যখনি ফসল বেশী হইয়াছে মিলওয়ালারা বেশী দরে উৎপাদিত দ্রব্য বেচিতে পারিত বলিয়া, যখন তখন পাট কিনিয়া ফেলিত, পড়িয়া থাকিত না,—কিন্তু এক্ষণে তাদের জিনিষের যথোচিত দর না পাওয়ায় মিলওয়ালারা পাট কিনিতেছে না।

৩। উপায় কি ?

এখন কথা হইতেছে, বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উদ্ধারের উপায় কি ? বলা বাহুল্য, বিভিন্ন বৈদ্যের মত এক প্রকার হইতে পারে না। তা ছাড়া পাট-ব্যবসায়ে চাষী হইতে আরম্ভ করিয়া মিলওয়ালা পর্য্যন্ত বহুপ্রকার লোকের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। এই সকল স্বার্থ পরস্পর প্রতিকূল না হইলেও, যিনি যে স্বার্থরক্ষার প্রয়াসী তিনি সেই দিক্ হইতেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

(ক) "মিলের উৎপাদন কমাও"

ক্লাইব্ ষ্ট্রীটের জনৈক ব্যবসায়ী বলিয়াছেন, "প্রতীকারের পথ আছে। তা হচ্ছে, যাতে পাটে প্রস্তুত দ্রব্যাদির দর চড়ে, তার চেষ্টা করা। অর্থাৎ মিলগুলির উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া দাও ও এখন যে মাল মজুত হইয়া আছে, তা যেমন করিয়া পার বেচিয়া ফেল। জুট্ মিলস্ এসোসিয়েশনের সভ্যেরা গত কয়েক মাস ধরিয়া তিনবার চেষ্টা করিয়াছেন নিজেদের উৎপাদন কমাইবার জন্য, কিন্তু তবু দর উঠে নাই। আমার মনে হয়, উৎপাদন কমাইবার সংকল্প করিয়াও তাঁরা যে গানি বাণিজ্যকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, সেইজন্য ঐরূপ হইয়াছে। দরকার পাটের মিলওয়ালারা তেজের সহিত এখন একটা নীতি অনুসরণ করেন। তাঁরা বলুন যে, ভবিষ্যতে তাঁরা একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বেশী পাট মজুত রাখিতে দিবেন না এবং বর্ত্তমানের মজুত পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট ভাবে কমাইয়া দিবেন, তবেই ক্রেতাদের বিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে।

"আগষ্ট মাসে হেসিয়ান্ ষ্টকের কিছু হ্রাস ঘটিয়াছিল, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে আরও কমিয়া যাইবে, কিন্তু এই কয় মাসে সব চেয়ে বেশী হেসিয়ান্ রপ্তানি হয় ও সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নবেম্বর মাসে পূজা ইত্যাদি ছুটী থাকায় কম সময় কাজ হয়।

"আগামী মার্চ্চের পর হেসিয়ান কাপড় সব শেষ হইয়া যাইবার কথা, কিন্তু মার্চ্চ মাসের পর মিলগুলি কি করিবে না করিবে নিশ্চিত না জানায় ক্রেতারা বড় রকমের ক্রয় করিতে সাহসী হইতেছে না। বর্ত্তমান সময়ে ৫৪ ঘণ্টা কল চালাইয়া উৎপাদিত পাটের দ্রব্য হজম করিবার মত শক্তি দুনিয়ার নাই। মার্চ্চ মাসের শেষ অবধি মিলগুলি সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা করিয়া খাটিবে, কিন্তু মার্চ্চের শেষে যদি তারা সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা খাটিবার সংকল্প করে, তবে উৎপাদন ৩৫% বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং কাজের ঘণ্টা সম্বন্ধে তারা কি নীতি অবলম্বন করিবে পাটের কলওয়ালাদিগকে তা অবিলম্বে বলিয়া দিতে হইবে।" [ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, ১৩ সেপ্টেম্বর]

(খ) "চাষীকে বল ফসল কমাইতে"

ইণ্ডিয়ান্ জুট্ মিলস্ এসোসিয়েশনের সভ্য এক মিলের কোন কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন : 'মিলের অতি-উৎপাদন মোটেই সমস্যা নয়। মিলগুলি কম করিয়া চালাইলে ও পণ্যদ্রব্য কম উৎপাদন করিলে পাট-সমস্যার সমাধান হইবে না। পাটের কলওয়ালারা তেজের সহিত একটা নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেও কিছু হইবে না। পাটে প্রস্তুত পণ্যের কাট্‌তির সহিত তাল রাখিবার জন্য জুট্ মিলস্ এসোসিয়েশন তিন তিনবার কাজের ঘণ্টা কমাইয়া দিয়াছেন, তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি দর নামা বন্ধ হয় নাই।

"এবারকার মত এত পাটের ফসল খুব কমই দেখা

গিয়াছে। আবার এ বছরেই বাণিজ্যিক ভাঁটা দেখিতে পাইতেছি। এই দুয়ের মিলনে অনেক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। দুনিয়া যত খাট কাজে লাগাইতে পারে, পাট হইয়াছে তার চেয়ে বেশী এবং পাটের দর যতদূর সম্ভব নীচে নামিয়া গিয়াছে। এই দর উৎপাদন খরচারও নীচে নামিয়া গিয়াছে, যদিও আমি মনে করি না যে দরটা খরচার অর্দ্ধেক দাঁড়াইয়াছে।

"উৎপাদনের প্রকৃত খরচাটা কি তা লইয়া মতভেদের অবকাশ আছে। তা ছাড়া এই খরচেরও সময় অনুসারে উঠানামা আছে। ভাঁটা আরম্ভ হওয়ার পর হইতে সব রকম খরচাই কমিয়া যাইতেছে, সুতরাং ব্যাঙ্কিং তদন্ত সমিতি যে হিসাব পাইয়াছিলেন—মণ প্রতি ৬৲ টাকা, এক্ষণে তার চেয়ে কম খরচে পাট উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা।

"বর্ত্তমান সমস্যার একমাত্র সমাধান হইল এই যে, আগামী বৎসরে রায়তকে কম পাটের ফসল তৈরী করিতে হইবে। যদি সে তা না করে, তবে তার আর উদ্ধারের আশা নাই, তার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি বাণিজ্যে জোয়ার আসে ও পাটে প্রস্তুত পণ্যের টান বাড়িয়া যায়, তবে তার কপাল ফিরিয়া যাইবে।

"পাটকলগুলি যদি তাদের উৎপাদন কমাইয়া দেয়, তবে তাদের পাটের টান আরও পড়িয়া যাইবে অর্থাৎ রায়ত আরও কম দরে পাট বেচিতে বাধ্য হইবে। তাতে তার কি সুরাহা হইবে? প্রকৃতপক্ষে পাটকলগুলি এ বৎসর বেশী পাট কিনিয়া দেশের উপকারই করিতেছে।

"দুনিয়ার বাজারে ভাঁটা লাগিয়াছে, সকল পণ্যই অল্প বিস্তর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে, পাটেরও দুঃখের বোঝা বহিতে হইবে। কলিকাতায় রাশীকৃত পাট হইতে প্রস্তুত দ্রব্য মজুত পড়িয়া রহিয়াছে. সেইজন্য ঐ সব দ্রব্যের দর অনেক কমিয়া গিয়াছে। পাটের দর নামার এটা একটা হেতু। এই কথা স্বীকার করা যায় যদি ইহার সঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্যটুকু জুড়িয়া দেওয়া হয়: এ বৎসর বড় বেশী পাটের ফসল উৎপাদন করা হইয়াছে। এত বেশী ফসল ইহার পূর্ব্বেও হইয়াছে সত্য, কিন্তু বেশী ফসল ও দুনিয়া-ব্যাপী বাণিজ্যিক ভাঁটা আর কখনো একসঙ্গে হয় নাই।

"রায়তকে কেমন করিয়া কম পাটের ফসল জন্মাইতে প্রবুদ্ধ করা যাইতে পারে, সে এক বিষম সমস্যা। গবর্ণমেণ্ট বা আর কেহ এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবে, মনে হয় না।" [ষ্টেট্‌সম্যান, ১৪ সেপ্টেম্বর]

(গ) চাষী ঠকিতেছে

আজ কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের অবস্থা সমান দুর্দ্দশাপন্ন। বোম্বাইয়ে তুলা-সমস্যা, আর বাঙ্গালায় পাট-সমস্যা। বাঙ্গালার, বিশেষতঃ কলিকাতার যে কি দুর্দ্দিন উপস্থিত তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পাটের দর নামিয়া হইয়াছে প্রতি বেলে ২৯৲ টাকা, হেসিয়ানের (৯ পোর্টার) দর প্রতি ১০০ গজ ৮৷৷০ আনা, আর এক পক্ষ কাল পূর্ব্বের তুলনায় পাটের অংশের দর ৭০% হইতে ৮০% পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

পাটের কথা ধরা যাক্। ২৯৲ টাকা বেল যে পাট তাহা প্রথম শ্রেণীর পাট হওয়া চাই, শিকড় কাটা থাকা চাই এবং ষ্টীমারে কলিকাতায় আনীত প্রেস্ করা পাকা পাট। ইহাতে গ্রামে পাট চাষীর ভাগে গিয়া দাঁড়ায় মণ প্রতি ৩৲ টাকা। ব্যাঙ্কিং তদন্ত সমিতি বলিয়াছেন, পাট উৎপাদন খরচা ৬৲ টাকা। সুতরাং চাষীরা একুনে ২০৲ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

[ইণ্ডিয়ান্ ফিন্যান্স]

৪। বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে পাটের চিন্তা

পাট লইয়া আমাদের দেশে ২।৩ বৎসর যাবৎ বেশ ভাবা সুরু হইয়াছে। পাট ফসল কমানো সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস্ কমিটির চেষ্টা ও প্রপাগাণ্ডার কথা সকলের মনে থাকিতে পারে। কলিকাতার ও বাঙ্গালার অন্য বিভিন্ন স্থানের মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক কাগজে পাট লইয়া মাথা ঘামানোর পরিচয় সর্ব্বদাই পাইতেছি। বিভিন্ন প্রকার মত ও চিন্তাবলীর সহিত বাঙ্গালীর ছেলে মানসিক যোগাযোগ কায়েম করিলে উপকৃত হইবে। তথ্য ও অঙ্কমূলক বহু লেখা এ বিষয়ে প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন। অর্থশাস্ত্রের শিক্ষক ও পড়ুয়ারা চাষী, রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পপতি, দালাল, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার

লোকের সহযোগে পাট সম্বন্ধে যথার্থ অর্থনৈতিক সাহিত্য সৃষ্টি করুন। শুধু তাহাতে পাট-সমস্যার সমাধান হইবে না বটে, কিন্তু পাটের বা পাটের পণ্য উৎপাদনে কার দায়িত্ব কতখানি ও কোন্ পথে সমস্যার সমাধান হইবে সে সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত মিলিবে।

(ক) পাট-ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের সমস্যা

বর্ত্তমানে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের চট, থলিয়া প্রভৃতি প্রতি বৎসর হাতে তৈয়ারী হয়। পূর্ব্ববঙ্গে বাখরগঞ্জ জেলায়, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায় এবং ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় কাপালিক-গণের মধ্যে হাতে চট তৈয়ারীর ব্যবসা এখনও প্রচলিত আছে। এতদ্ভিন্ন উত্তরবঙ্গে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে মেয়েরা অবসর সময়ে এই কাজ করিয়া থাকে। মিলের তুলনায় ইহার দর সস্তা হওয়ায় বোম্বাইয়ের বাজারে তুলা বস্তাবন্দী করিবার জন্য এই চটই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টাকুতে জনপ্রতি এক সের সুতা কাটিতে পারে। ইহার মধ্যে বাখরগঞ্জ জেলায় থলিয়াই বেশীর ভাগ তৈয়ারী হয়। মহাজনেরা কারিকরগণকে পাট সরবরাহ করে এবং থলিয়া বিক্রয়েরও ভার লইয়া থাকে। কারিকরগণ দিনে ১০।১২ ঘণ্টা কাজ করিয়া ২৭" × ১২" ইঞ্চি মাপের ৩ খানা করিয়া থলিয়া তৈয়ারী করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের দৈনিক আয় হয় ।০ হইতে ।৵০ আনা, অর্থাৎ মাসে ৭॥০ টাকা হইতে ১০৲ টাকা।

আজকাল পাটের থলিয়া ও চট ব্যতীত আমদানি রপ্তানির পণ্যদ্রব্য চালান দেওয়া চলে না, কারণ ইহা অপেক্ষা দৃঢ় অথচ সস্তা বস্তাবন্দী করিবার বা মুড়িবার দ্রব্য আর নাই। এই কারণে জগতের ব্যবসাক্ষেত্রে স্বীয় প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বাংলা দেশের পক্ষে পাট এক অমোঘ অস্ত্র। অবশ্য পাশ্চাত্যের প্রত্যেক দেশেই পাট উৎপাদন করিবার বা পাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই। এখন পর্য্যন্ত যে সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই তাহার কারণ,—প্রথমতঃ পাট চাষের পক্ষে অনুকূল জলবায়ুর অভাব, দ্বিতীয়তঃ পাটের দর বিশেষ সস্তা। ফলে পাটের জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশকেই বাংলার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

বাংলার রপ্তানি-বাণিজ্যে পাটের ব্যবসা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এক কলিকাতা বন্দর হইতেই ১৯২৭-২৮ সনে ৮২॥০ কোটি টাকার কাঁচা পাট ও থলিয়া, চট প্রভৃতি তৈয়ারী মাল রপ্তানি হইয়াছে। কাজেই পাট চাষের ফলাফলের উপর বাংলার আর্থিক অবস্থার উন্নতি অবনতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। ইহার সহিত বাংলার জনসাধারণের সুখদুঃখ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলিয়াই বর্ত্তমানে পাটের বাজারে মন্দার ফলে দেশময় হাহাকার উঠিয়াছে।

পাটের এই বিপুল চাহিদার প্রধান কারণ, ইহা সকল রকম সুতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা, অথচ ইহার ব্যবহার নানাবিধ। পাটের আঁশ সরু ও উজ্জ্বল বলিয়া কম্বল, কার্পেট প্রভৃতি গৃহ-সজ্জার সামগ্রী তৈয়ার করিতেও ইহার ব্যবহার হয়; পশমের জামা কাপড়ে পাট ভেজাল দেওয়া চলে; প্যাক করিবার সুতা, দড়ি কাছি প্রভৃতি পাটে তৈয়ার হয়। বিশেষতঃ, পাটের কোন অংশ ফেলা যায় না বলিলেই চলে। পাটের গোড়ার দিকটা কাগজের কলে এবং অপর অব্যবহার্য্য অংশ নকল রেশম প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। জার্ম্মাণ দেশে রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষের সাহায্যে পাটে পশমের ন্যায় এক প্রকার নরম সুতা প্রস্তুত হইতেছে এবং পশমের সঙ্গে এই সুতা মিশাইয়া "সার্জ্জ" কাপড় তৈয়ারী হইতেছে। ইহা ছাড়া, ওভারকোট, সোয়েটার প্রভৃতি গরম জামা সাধারণতঃ পাট-মিশানো পশমে তৈয়ারী।

এই ভাবে নূতন নূতন ব্যবহারের উপযোগিতা যেমন আবিষ্কৃত হইতেছে, বিদেশে পাটের চাহিদাও তেমনি বাড়িতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমাদের কাঁচা পাটের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭৬৮,০০০ টন; যুদ্ধের সময় ইহা প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের রপ্তানির পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নিম্ন-লিখিত তালিকায় গত তিন বৎসরে এদেশ হইতে মোট পাট রপ্তানির পরিমাণ পর পৃষ্ঠায় দেখান গেল :—

	১৯২৬—২৭	১৯২৭—২৮	১৯২৮—২৯
কাঁচা পাট (টন)	৭০৭,৭৮২	৮৯১,৯০৭	৮৯৭,৮৬৩
ঐ মূল্য (কোটি টাকা)	২৬·৭৮	৩০·৬৬	৩২·২৬
সূতা (হাজার পাউণ্ড)	৩·০৭৮	৬·৩১৫	৪ ৮০১
ঐ মূল্য (লক্ষ টাকা)	৮·০৪	১৩·২৭	১০·২১
থলিয়া (টন)	৪২৮,১৭৬	৪৪৪,৫৬৮	৪৭৬,৫৬৬
ঐ মূল্য (কোটি টাকা)	২৪·০৮	২৩·২৭	২৪·৯৩
চট প্রভৃতি (টন)	৪২৬,০১১	৪৩২,৫১৫	৪৭২,১৭৩
ঐ মূল্য (কোটি টাকা)	২৮·৪৫	২৯ ৯৪	৩১·৩৪
মোট তৈয়ারী মাল (টন)	৮৬০,৬৯৩	৮৮৪,৭২৫	৯১১,৫০৪
ঐ মূল্য (কোটি টাকা)	৫৩·১৮	৫৩·৫৬	৫৬ ৯০
মোট কাঁচা ও তৈয়ারী মালের মোট মূল্য (কোটি টাকা)	৭৯·৯৩	৮৪·২২	৮৯·২৪

১৯২৬-২৭ সনে রপ্তানি পাটের উপর আদায়ী শুল্কের পরিমাণ ছিল ১,৭২ কোটি টাকা; ১৯২৮-২৯ সনে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২,১১ কোটি টাকা। পাশ্চাত্যে আমাদের কাঁচা পাটের খরিদ্দারগণের মধ্যে জার্ম্মাণিই সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন দেশীয় খরিদ্দারগণের গত তিন বৎসরের চাহিদা হাজার টন হিসাবে দেখান গেল :—

	১৯২৬—২৭	১৯২৭—২৮	১৯২৮—২৯
জার্ম্মাণি	১৮৩	২৫০	২৬০
গ্রেট ব্রিটেন	১৭৩	২২২	২০২
ফ্রান্স	৯০	১০৯	১১০
যুক্তরাষ্ট্র	৮৭	৮৪	৯৪
বেলজিয়াম	৪৪	৪৯	৫৫
ইতালী	৪৫	৪৯	৬১
স্পেন	৩৩	৪৫	৪৩
জাপান	৯	১১	১২
মিশর	৬	১২	১২
অন্যান্য দেশ	৩৮	৬১	৪৯
মোট রপ্তানি	৭০৮	৮৯২	৮৯৮

এই ত গেল বাহিরের চাহিদা। এ ছাড়া দেশের পাটকলগুলির কাঁচা পাটের চাহিদাও কম নহে। প্রতি-বৎসরে রপ্তানির ও ভারতীয় চট কলগুলির জন্য সাধারণতঃ প্রায় ৮৫ লক্ষ গাঁইট পাট প্রয়োজন হয়। ইহার প্রত্যেক গাঁইটে ৫ মণ করিয়া থাকে। ১৯২৮-২৯ সনের রপ্তানির হিসাবে দেখা যায় যে, উক্ত ৮৫ লক্ষ গাঁইটের মধ্যে ৫০½ লক্ষ গাঁইট রপ্তানি হইয়াছিল। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানে গড়ে প্রায় ৩৫ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট এদেশের মিলগুলিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনেও দেশের ভিতর বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ গাঁইট লাগিয়া থাকে। সুতরাং প্রতিবৎসর কাঁচা পাটের মোট চাহিদার পরিমাণ গড়ে ৯০ লক্ষ গাঁইট ধরা যাইতে পারে। ১৯২৫ হইতে ২৭ সন পর্য্যন্ত তিন বৎসরে দেশে যথাক্রমে ৯০,১২০ ও ১০০ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইতেছে।

উপরে গড়পড়তা হিসাব ধরা গেল, কিন্তু বৎসরের মোট পাট চাষ বা উহার চাহিদা কি পরিমাণ হইবে তাহার নিশ্চয়তা খুবই কম। যুদ্ধবিগ্রহাদি ত আছেই, তাহা ছাড়া চট কলের চাহিদার প্রায়ই ব্যতিক্রম ঘটে। ১৯১৭-১৮, ১৯১৯-২০ এবং ১৯২৬-২৭ সনের মত মিল কখনও কখনও বৎসরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট খরিদ করে। আবার কখনও বা ১৯২২-২৩, ১৯২৪-২৫ সনের মত হাল সন খরিদ কমাইয়া মজুদ্ পাটের সাহায্যেই কল চালায়। চাষীরাও পূর্ব্ববৎসরের পাটের বাজারের অবস্থা অনুসারে চাষের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সাধারণতঃ, কোনো বৎসর পাটের দর পড়িয়া গেলে তৎপর বৎসর চাষের পরিমাণ কমিয়া যায়, আবার দর চড়িয়া গেলে পর বৎসর তেমনি চাষও বৃদ্ধি পায়। কাজেই পাটের চাহিদার যে অবস্থা চাষের অবস্থাও তদ্রূপ। উভয়েরই বিশেষ কিছু স্থিরতা নাই। সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে বৎসরে দুইবার—জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ও সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পাট চাষের ফলাফলের আনুমানিক হিসাব প্রকাশ হয় সত্য; কিন্তু এই হিসাব এরূপ অনির্ভরযোগ্য এবং

দেশের জল-বায়ুর অবস্থা এরূপ অনিশ্চিত যে, পাটের মরশুমের শেষ দিকে কি পরিমাণ পাট বাজারে পাওয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। ব্রিটিশভারতের চাষের জমির মধ্যে শতকরা ১·৩ ভাগে পাটের চাষ, আর মোট পাটের জমির শতকরা ৮৫ ভাগই বাংলা দেশে। পাটের বাজারের উপর পাট চাষ অনেকাংশে নির্ভর করে বলিয়াই ১৯২৬ সনের মন্দা বাজারের ফলে পর-বৎসর পাটের জমি শতকরা ১২ ভাগ হ্রাস পায়। সেই সময় পাট চাষের জমির পরিমাণ হয়, ৩১,৭৪,০০০ একর।

পাটের বাজারের সহিত পাট চাষের এই যে সম্বন্ধ ইহার মূলে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক নীতি বা যুক্তিসিদ্ধ প্রণালী নাই। অথচ এইরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে, ইহা হইতে ফললাভ করিবার উপায় তো নাই-ই পরন্তু অনেক স্থলে অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এইরূপ নীতি দ্বারা পরিচালিত না হওয়ায় বাংলার অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ কৃষককুল চাষের মজুরী পর্য্যন্ত না পাইয়া অসহায় ভাবে ক্ষতি সহ্য করে। পাট উৎপাদন ও চালান দেওয়া নিয়ন্ত্রিত করিবার কোনো ব্যবস্থা না থাকার ফল বাংলা দেশকে হাড়ে হাড়ে ভোগ করিতে হয়, কারণ পাট বাংলার কৃষকগণের প্রধান অবলম্বন হওয়ায় এই ব্যবসায়ে লোকসান হইলে সমগ্র বাংলার অর্থ-নৈতিক জীবন বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। বর্ত্তমানে পাটের বাজারে যে দারুণ মন্দা চলিয়াছে এবং তজ্জন্য দেশে যে অর্থের অনটন ঘটিয়াছে, উল্লিখিত নিয়মের অভাব তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। (ভাণ্ডার)

(খ) দেশের অবস্থা

বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। কেবল এই দেশেই নয়, অন্যান্য দেশেও ব্যবসা-বাণিজ্যের এই ঘাত-প্রতিঘাত অনুভূত হইতেছে ও হইবে। বয়কটের ফলে ল্যাঙ্কাসায়ার ও ম্যাঞ্চেষ্টারের মিলগুলি বন্ধপ্রায়, হাজার হাজার লোক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে এদেশের অবস্থাও ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ের মিলগুলিও একে একে বন্ধ হইয়া যাইতেছে, ফলে সহস্র সহস্র লোকের অন্ন-সংস্থানের উপায় রুদ্ধ হইতেছে। অন্য সব ব্যবসায়ের অবস্থাও তথৈবচ। দেশের এরূপ অবস্থা আরও কিছু দিন চলিলে এদেশের লোকের যে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে তাহা ধারণাতীত। সে দিন ভারতীয় বণিক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সাধারণ অধিবেশনে শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ খৈতান দেশের এই দুরবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রীযুত খৈতান বিশেষ করিয়া পাটের ব্যবসায়েরই উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন এবং চাহিদা কম থাকায়, উপরন্ত বিদেশী বর্জ্জনের প্রতিক্রিয়ায় চাহিদা আরও কমিয়া যাওয়ায় পাট-চাষীদের লাভ হওয়া দূরে থাকুক মজুরীও পোষাইতেছে না। পাট বাঙ্গালার বিশিষ্ট সম্পদ্। কৃষক-কুলের আর্থিক দুরবস্থা সাময়িকভাবে পাটের প্রসাদেই দুরী-ভূত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজ পাটের ব্যবসায়েরও অবস্থা এরূপ শোচনীয় হওয়ায় কৃষককুলের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে।

ইহার ফলে শুধু এদেশের অশিক্ষিত ও দরিদ্র কৃষক-গণেরই যে লোকসান হইল তাহা নহে, ইহার ক্রিয়া আরও অনেক দূরে গিয়া দেশ-বিদেশের সর্ব্ববিধ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি করিবে। বাঙ্গালা দেশে কৃষকের সংখ্যাই অধিক। এই লোকসানের ফলে ইহাদের কিনিবার শক্তি কমিয়া যাইবে এবং প্রতি বৎসর যত টাকার বিবিধ জিনিষ ইহারা কেনে তাহা কিনিতে পারিবে না। সেই মাল বাজারে পড়িয়া থাকিবে, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং সমগ্র বাঙ্গালার গৃহে গৃহে হাহাকার উঠিবে।

বর্ত্তমান পাটের দুরবস্থা অনেকটা কৃষকদের নিজেদের বুদ্ধির দোষে। কাঁচা টাকার লোভে অতিরিক্ত পাট চাষই তাহাদের সর্ব্বনাশের কারণ। সরকারও ইচ্ছা করিলে বর্ত্তমান দুরবস্থার অনেকটা প্রতীকার করিতে পারেন। অন্যান্য দেশেও এরূপ অবস্থায় সরকারই সকল দিক্ সামলাইয়া লন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বাজারের অবস্থা পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে ব্যবসায়ি-গণ আরও কিছু দিন মাল আটকাইয়া রাখিতে পারে তজ্জন্য

অনেক টাকা ঢালিয়াছিলেন। মিশরেও তূলার বাজার অত্যন্ত নামিয়া গেলে সরকার হইতে তূলার ন্যূনতম দাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখানেও সরকার সামর্থ্য অনুসারে অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে ইহার প্রতীকার হয়। পাটের উপরই বাংলার আর্থিক অবস্থার উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। কাজেই বাংলাকে রক্ষা করিতে হইলে এ বিষয়ে একটা বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। নচেৎ বাঙ্গালীর আর উপায় নাই। পাটের যথোপযুক্ত মূল্য না হওয়া পর্য্যন্ত পাট আটকাইয়া রাখিতে আমাদের জমিদার ও ধনী মহাজনেরাও বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। এরূপ আশা আমরা করিতে পারি না কি? (পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

পাটের বাজার ও দেশের অবস্থা

এদেশের লোকদিগের খাজানা, ট্যাক্স, দেনা আদায় ও সংসারিক অন্যান্য খরচপত্রের একমাত্র সম্বল পাট। ধান কম দিয়া যাহারা বেশী জমিতে পাটের চাষ করিয়াছিল, তাহাদের অন্যান্য খরচ-ত দূরের কথা খোরাকীর টাকাও পাটের দ্বারা হওয়ার উপায় নাই। কাজেই সকল দিকেই এবার ভীষণ দুরবস্থা ঘটিবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। মহাজনের ঘরে টাকার আমদানি না হইলে ধার কর্জ্জ পাওয়ার উপায় নাই। ঘরে ধান থাকিলে অন্ততঃ দুমুঠা খাইবার পথ ছিল। কিন্তু জমিতে না বুনিলে ধান ত আর উঠানে গজায় না? ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া লোভের বশে সমস্ত জমিতে পাট বুনিয়া এবার কর্ম্মফল ভাল রূপেই ভুগিতে হইবে। (পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

(গ) পাটের দর

বলিতে গেলে পাট বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি। এই পাটের চাহিদা ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়ায় অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হওয়ায় পাটের দর আজ কয় বৎসর যাবৎ কমিয়া যাইতেছে। এবার পাটের দর অত্যন্ত কম দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে বার লক্ষ বিঘা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। অনুমান, এই বার লক্ষ বিঘা জমিতে প্রায় ১ কোটী ১৫ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হইবে। এদেশের পাটের কলসমূহে ৫০ লক্ষ গাঁটের অধিক পাটের আবশ্যক হইবে না, এবং বিদেশেও অনুমান ৪০ লক্ষ গাঁট পাট রপ্তানি হইতে পারিবে। অবশিষ্ট ২৫ লক্ষ গাঁট পাট এদেশের গুদামসমূহে মজুত থাকিবে। গত বৎসরেরও অবিক্রীত প্রায় ৩৫ লক্ষ গাঁট পড়িয়া রহিয়াছে। মোটের উপর তাহা হইলে প্রায় ৬০ লক্ষ গাঁট পাট এই বর্ষের শেষে অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। এদিকে পাটের দর অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। শুনা যায়, উৎকৃষ্ট পাটের দর এখন প্রতি মণ ৪৲ টাকা কি ৪॥০ টাকা, নিম্নে ২৲ টাকা। বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রতি মণ পাট উৎপন্ন করিতে কৃষককে বিঘা প্রতি প্রায় ৮৲ টাকা ব্যয় করিতে হয়। তাহা হইলে দুই টাকা হইতে পাঁচ টাকা মণকরা পাট বিক্রয় করিয়া কৃষকের কি অবস্থা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

(সঞ্জয়—ফরিদপুর)

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার নূতন প্রস্তাব

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস

আমাদের দেশে যখন শতকরা ৮০।৯০ জন কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী, তখন যদি সমগ্র দেশটাকেই কৃষক ও শ্রমজীবীর দেশ বলি, কিছু অন্যায় হয় না কিন্তু এত বড় একটা দেশে কৃষক ও শ্রমজীবীদের শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা নাই। এ দেশে ধনী দরিদ্রের গড় আয় দৈনিক ⁄১০ পয়সা মাত্র। এর থেকে ধনীর আয় বাদ দিলে, গরীবের আয় গড়পড়তা দৈনিক ৴১০ পয়সার বেশী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। দেশের কি শোচনীয় অবস্থা! এদের শিক্ষার জন্য যে সব স্কুল

কলেজ আছে, সেগুলিকে শিক্ষা-কেন্দ্র না বলিয়া গরীবের নিষ্পেষণ-যন্ত্র বলা উচিত। এই নিষ্পেষণ কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষার নামে, বেতন, পুস্তকের দাম, পরীক্ষার ফী বাদে ও নানা-প্রকারে দরিদ্র শ্রমিকের বক্ষের রক্ত জল করিয়া দিতে হয়। তাহার ফল এই যে, শিক্ষার্থী ছাত্রের একবেলার ভাতের উপরও ডালের ছিটার অভাব পড়ে এবং দুধের ফোঁটা জলে মিলাইয়া যায়। তাই আজ বাঙ্গালার ছাত্রদের মুখে দীপ্তি নাই, শরীরে সামর্থ্য নাই। অভিভাবকদের কষ্টও কেহ দেখে না। নিজের মুখের গ্রাস না জুটিলেও পুত্রের জামা কাপড় ও পুস্তকের দাম জোটাইতে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় যুগান্তর আসিতেছে। এ সময়ে এই বিষয়টা বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। যদি মধ্য ইংরাজী বা মধ্য বাঙ্গালা পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার শেষ সীমা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বাধ্যতামূলক শিক্ষার নীতি শিক্ষণীয় বিষয়গুলি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, যা' তা' কতকগুলি বিষয় ছাত্রদের কণ্ঠস্থ করাইয়া লওয়ার নাম শিক্ষা নয় এবং সেই সঙ্গে দেশকে সভ্য বা অলোকপ্রাপ্ত করিবার অজুহাতে তাহাদের জাতীয় জীবনের প্রতি বিদ্বেষ উপ্ত করাও হিতকর নয়। কাজে কাজেই দরিদ্র শ্রমজীবীদের কঠোর শ্রমার্জ্জিত অর্থের অংশ গ্রহণ করিয়া শিক্ষার মধ্যে এমন সব ব্যবহারিক ও কার্য্যোপযোগী মূল্যবান বিষয়ের মিশ্রণ দিতে হইবে যাহাতে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষায় প্রাথমিক ক্ষতিটা জীবনের মূলধন বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে।

এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যখন আমরা বিনা বেতনে সাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিতে পারিব, তখনই বুঝিব যে, দেশ হইতে অবিদ্যা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিরূপ শিক্ষা দিতে হইবে তাহা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। ণত্ব-ষত্ব, সন্ধি-সমাস, ধাতু-প্রত্যয় দ্বারা প্রাথমিক ছাত্রদিগকে বিব্রত করা আমি একে-বারেই উচিত মনে করি না। আদালতে, ব্যবসায় বাণিজ্য কেন্দ্রে হ্রস্ব "ই", দীর্ঘ "ঈ"-এর বালাই নাই, ণত্ব-ষত্বের দ্বন্দ্বও নাই, অথচ দলিল পত্র মুসাবিদা করিতে আইনত কিছু বাধে না, বা বড় বড় ব্যবসায় পরিচালনা করিতে বুদ্ধির অভাবও লক্ষিত হয় না। এজন্য মধ্য ইংরাজী ও মধ্য বাঙ্গালার পাঠ্য-তালিকার মধ্যে ব্যাকরণের স্থান না রাখাই ভাল।

ব্যাকরণ ভাষার উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য। শিল্পী বা স্থপতিকে পুত্তলি নির্ম্মাণ করিয়া পরে ইচ্ছামত বসনভূষণে সজ্জিত করিতে হয়, সেইরূপ ভাষার কায়া গঠিত করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি তন্মধ্যে কারুশিল্পের অন্বেষণ করিবেন। আমরা প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে এই চিরন্তন নীতির অনুসরণ করি না। অক্ষর পরিচয়ের পর বর্ণ-যোজনা শেষ হইতে না হইতে ছাত্রের দপ্তরে ব্যাকরণ কায়েমী স্বত্ব লাভ করে। মনে হয় লিখন পঠন বা বাক্যের অর্থাগম কিছুই নয়, ব্যাকরণই মুখ্য উদ্দেশ্য। ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি ইত্যাদি সম্বন্ধেও ঐ কথা। বয়োবৃদ্ধি সহকারে, উপযুক্ত জ্ঞানলাভ না হইলে কখনই এই সমস্ত শিশু-পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য নয়।

এই শিক্ষার ভার দেশের লোকের হাতেই থাকুক, বা গবর্ণমেণ্টের হাতেই থাকুক, শিক্ষার মূলনীতির সংশোধন করিতেই হইবে। শিক্ষা যেন তাহাদের জীবিকার সহায়ক হয়, তাহাদের বিশ্ব-বিশ্রুত দারিদ্র্যের হন্তা, তাহাদের দৌর্ব্বল্যের যষ্টি এবং জীবনপথের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী হয়। এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালকদের প্রকৃত প্রাথমিক শিক্ষার একটী পরিকল্পনা সর্ব্বসাধারণের সমালোচনার জন্য লিপিবদ্ধ করিলাম :—

প্রাথমিক বিদ্যালয়

১ম ও ২য় শ্রেণী — ছাত্রের বয়স ৫ হইতে ৭ বৎসর

শিক্ষাকাল	শিক্ষণীয় বিষয়
প্রাতে ৬টা হইতে ৯টা	বর্ণপরিচয়, লিখন পঠন ও ধারাপাত।
বৈকালে ১টা হইতে ৩টা	মৌখিক পাঠ—ছাত্রের নাম, পিতৃ-মাতৃ পরিচয়, গ্রাম, থানা, ডাকঘর, জেলা ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়।
বৈকালে ৩টা হইতে ৪টা	উদ্যানে বৃক্ষাদির যত্ন, বৃক্ষে জলদান ও খেলা ইত্যাদি।

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী — ছাত্রের বয়স ৭ হইতে ১০ বৎসর

শিক্ষাকাল	শিক্ষণীয় বিষয়
প্রাতে ৬টা হইতে ৯টা	কৃষি, স্বাস্থ্য, পশুপালন ও গৃহশিল্প-বিষয়ক একখানি সরল সাহিত্য ও শুভঙ্করী।
বৈকাল ১টা হইতে ৪টা	(১) মৌখিক পাঠ—নিজ নিজ গ্রামের পরিচয়,—কয়টী পাড়া, কত অধিবাসী, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম; গ্রামের আয়তন, উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। গ্রাম হইতে ডাকঘর, থানা, রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশন কত দূরে, কিরূপে যাওয়া যায়, ডাকঘরে থানায়, ষ্টেশনে কি কাজ হয় তাহাদের উপকারিতা কি, ইত্যাদি। (২) গৃহশিল্প—চরথা, পাটের দড়ি পাকান ইত্যাদি। (৩) বৃক্ষলতা ও ছাগল, হাঁস ইত্যাদির যত্ন; ড্রিল ও খেলা।

৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণী — ছাত্রের বয়স ১০ হইতে ১২ বৎসর

শিক্ষাকাল	শিক্ষণীয় বিষয়
প্রাতে ৬টা হইতে ৯টা	(১) কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, পশুপালন, রোগনিরাময়, বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক অবস্থান, আবহাওয়া, নদ-নদী, রাস্তা-ঘাট, যান-বাহন, রেল ষ্টীমার, ব্যবসায় বাণিজ্য, উৎপন্ন দ্রব্য, আচার-ব্যবহার, রাজা-প্রজা, জমি-জমা, জাতীয় রীতিনীতি, সমাজ-ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়-সম্বলিত উপযুক্ত সাহিত্য। (২) সহজ ইংরাজী ও হিন্দী শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক। (৩) শুভঙ্করী।
বৈকাল ১টা হইতে ৪॥টা	(১) পত্রদলিল-লিখন; ভারতবর্ষ ও সম্ভব হইলে অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে মোটা-মুটি উপদেশ। স্বগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা দেশের বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবনী; সমাজ গঠন ও শাসন, সামাজিক ক্রিয়াদি, সামাজিক ঐক্য, সরল ও ধার্ম্মিক জীবন-যাপনের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে মৌখিক পাঠ। (২) চরখা কাটা, বসিবার আসন, সতরঞ্চ ও বস্তা বুনন। (৩) ড্রিল ও খেলা—উল্লম্ফন, দীর্ঘ লম্ফন, দৌড় ইত্যাদি। (৪) বাগানের কাজ—ঘাস তোলা, কোপান, জল দেওয়া শস্য-সংগ্রহ ইত্যাদি।

প্রত্যেক জেলার উপযোগী করিয়া পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে হইবে। একখানি পুস্তক আসমুদ্র হিমাচলে পঠিত হইবে না। প্রত্যেক পুস্তকে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইবে। তবে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীতে যে সমস্ত মৌখিক শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে সে বিষয়ে শিক্ষকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একখানি সাধারণ পুস্তক রচিত ও প্রতি বিদ্যালয়ে বিতরিত হইতে পারে।

পাঠশালাটী প্রত্যেক গ্রামের কেন্দ্রস্থলে হওয়া উচিত এবং স্থানীয় পরিচালকগণ এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে ১/ হইতে ৫/ বিঘা জমির মধ্যে বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটী করিয়া উদ্যান থাকে ও গ্রামের কামার, কুমার, ছুতার, দর্জ্জি ও তাঁতির কারখানা বিদ্যালয়ের সন্নিকটে হয়। ছাত্রেরা যেন বিদ্যালয়ে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত শিল্পগুলির সহিত পরিচিত ও তৎসম্বন্ধে উৎসাহিত হইতে পারে। তাহাদের শিক্ষা যেন লিখন পঠনেই পর্য্যবসিত না হয়। সংসারের নানাবিধ কার্য্য

আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতেই যে তাহারা বিদ্যালয়ে আসে, সেই ধারণা যেন তাহাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় পরিদর্শকের মধ্যে কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সংখ্যাধিক্য থাকাই বাঞ্ছনীয়। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে নিজ প্রস্তুত সূতার কাপড় পরিতে বাধ্য করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে এরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে ছাত্রেরা দিন দিন স্বাবলম্বন শিক্ষায় আগ্রহশীল হয়। পাঠ্য-পুস্তকের সংখ্যা যত কম হয় ততই মঙ্গল এবং প্রত্যেক পুস্তক যেন শেষ পর্য্যন্ত অধীত হয়।

কুটীর-শিল্প

বর্ত্তমান কল-কারখানার যুগে কুটীর-শিল্পের কোন আশা-ভরসা নাই, এইরূপ ধারণা আমরা অনেকে পোষণ করি। বাহির হইতে দেখিলে এইরূপ ভাবিবারও যে কোন হেতু নাই, ইহা বলা যায় না। ইয়োরোপ অঞ্চলে কল-কারখানার প্রবর্ত্তনের ফলেই ত কুটীর-শিল্প প্রায় লোপ পাইয়াছে। আমাদের দেশের গৃহ-শিল্পগুলিও ত বিদেশীয় কলের পণ্যের প্রভাবেই নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ সকল অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু গৃহ-শিল্পের কোন্ দুর্ব্বলতার জন্য আমাদের দেশে এবং অন্য দেশেও আজ তার এই দুরবস্থা, ইহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

সহসা মনে হয় বড় বড় কারখানার শক্তি বুঝি তাহাদের বিরাটকায় কলের মধ্যেই নিহিত আছে। কিন্তু একটু ভাবিলে বুঝা যাইবে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারখানার শক্তি তার বড় বড় কলে ততটা নয়, যতটা মানুষের সমবায়ে। কারখানার আশ্রয়ে বহু লোক একসঙ্গে কাজ করে। কারখানার পরিচালকেরা বহু লোককে একত্র কাজ করাইতে পারেন বলিয়া শিল্প-উৎপাদনে ও উৎপন্ন শিল্পের বিক্রয়ে যে সুবিধা পান, একক যাঁহারা কোন জিনিষ তৈয়ারী করিতে যান তাহার শতাংশের একাংশও তাঁহারা পান না। কারখানার মালিকেরা যে দ্রব্য শিল্পে পরিণত হইবে তাহা বহুপরিমাণে একসঙ্গে কেনেন বলিয়া একটা বিশেষ দরে পান। বাজারের খুচরা, এমন কি সাধারণ পাইকারী দর অপেক্ষা এই দর অনেক সস্তা। বহু টাকা তাঁহারা খাটান বলিয়া ব্যাঙ্ক হইতে অল্প সুদে প্রয়োজনমত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন। উৎপন্ন শিল্পের পরিমাণ বেশী হয় বলিয়া তাহার বিক্রয়ের সুবন্দোবস্তও তাঁহারা সহজে করিতে পারেন। ইহার উপর অল্প বিশৃঙ্খলায় বেশী ক্ষতির সম্ভাবনার জন্য ইঁহাদিগকে সুশৃঙ্খল পরিচালনের দিকে সর্ব্বদা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। কারখানার শিল্পে এই সুশৃঙ্খলাকে আধুনিকেরা ইংরাজীতে র‍্যাশানালিজেশন বলেন। এই সুশৃঙ্খলার ফলে কারখানার শিল্পে অপচয় নিবারিত হয় এবং উৎপন্ন শিল্পও ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করে। যে-সকল দেশে কল-কারখানার প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে; সে-সকল দেশে মানুষের শ্রেষ্ঠ মেধা ইহার সেবায় রত রহিয়াছে। এতগুলি কারণের সমবায়ে—শুধু বড় বড় কলের জন্য নহে—কারখানা আজ শিল্প-উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে।

কুটীর-শিল্পে এ সকলের একটি সুবিধাও নাই। বস্তুতঃ, কুটীর-শিল্পের দুর্ব্বলতা তাহার বড় যন্ত্রের অভাবে ততটা নয়, যতটা তাহার বিচ্ছিন্নতায়। একই শিল্পের শিল্পীদিগের মধ্যেও এখানে প্রায় কোন সম্বন্ধ নাই। প্রত্যেকে নিজের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জিনিষ কেনেন; বাজারের খুচরা দর সেজন্য দিতে হয়। অধিকাংশের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কোন সম্বন্ধ নাই; নিকটবর্ত্তী মহাজনের নিকট হইতে অত্যধিক সুদে টাকা ধার করিতে হয়। ইহার উপর গৃহ-শিল্পের যন্ত্রের ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা ও যত্ন নাই। গৃহ-শিল্পেরও যে উন্নতি সম্ভব, এ কথা ইঁহারা জানেন বলিয়াও বোধ হয় না। এই সকল কারণে—শুধু কলের বা বড় যন্ত্রের অভাবে নয়—কুটীর-শিল্প আজ প্রায় মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কল-কারখানায় যে সুবিধাগুলি আমাদের প্রধান বলিয়া

মনে হয়,—কাঁচা মাল সস্তা দরে কিনিতে পারা, উৎপন্ন শিল্পের বেচিবার ভাল বন্দোবস্ত ও অল্প সুদে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা—তাহার সকলগুলিই কুটীর-শিল্পেও সম্ভব। সমবায় সমিতি ও সমবায় ব্যাঙ্কের সাহায্যে কুটীর-শিল্প এই সকল সুবিধাই পাইতে পারে। বলা বাহুল্য, সমবায়ের দ্বারা, কুটীর-শিল্পের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইবে না। নিজের শিক্ষা, শক্তি ও ইচ্ছা অনুযায়ী তখনও শিল্পী পরিবার-পরিজনের সাহায্যে শিল্প সৃষ্টি করিবেন। কিন্তু তিনি তখন বিচ্ছিন্ন থাকিবেন না। সহকর্ম্মিগণের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষ সুবিধা মত মূল্যে পাইবেন; প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ অল্প সুদে সমবায় ব্যাঙ্ক তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সরবরাহ করিবে; ভাল বাজারে তাঁহাদের প্রত্যেকের উৎপন্ন শিল্প বিক্রয় হইবে। সমবায়ের সাহায্যে কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্য গবেষণা ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থাও হইতে পারিবে। ইহা করিতে পারিলে কুটীর-শিল্প কলকারখানার শিল্পের নিকট নিজের শক্তিতে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

কেহ হয়ত বলিবেন, যে সমবায় কলকারখানায় সহজে সম্ভব হইয়াছে, কুটীর-শিল্পের সহিত তাহাকে এত কষ্ট করিয়া জুড়িয়া গৃহ-শিল্পকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করার প্রয়োজন কি? এই কথার দুই উত্তর আছে। এক উত্তর এই যে, মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়া গৃহ-শিল্প কলকারখানার শিল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে। কলকারখানায় মনুষ্যত্ব বিকাশে এখন যে-সকল বাধা আছে, তাহাও ক্রমশঃ দূর হইতে পারে। দ্বিতীয় উত্তর, ইহা আমাদের দেশের পক্ষে বেশী উপযোগী। বস্তুতঃ প্রধানতঃ এই কারণে—কেবল গৃহশিল্প ভাল বলিয়া নহে—আমরা ইহা পুনর্জীবিত করিতে চাহিতেছি। ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসার এই পথে যেরূপ সহজ হইবে, কলকারখানার পথে সেরূপ হইবে না। কলকারনায় বদ্ধ ঘরে দীর্ঘ পরিশ্রম করিতে হয়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আমাদের জলবায়ু তাহার অনুকূল নয়। আমাদের দেশের লোকের জমির সঙ্গে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ও অতি নিবিড়। উদ্ভিদ ঐশ্বর্য্যে গরীয়ান সকল দেশেই ভূমির সঙ্গে মানুষের এইরূপ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। কারখানার ভাল শ্রমিক হইতে হইলে জমির সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। ইয়োরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীরা দুই বড় ভাগে বিভক্ত: এক ভাগ সহরে থাকে, কারখানায় কাজ করে; অন্য ভাগ গ্রামে থাকে, চাষের মজুরী করে। আমাদের দেশে যে চাষী সেই শিল্পী; যে শিল্পী তাহারও, প্রায় সকল ক্ষেত্রে, কিছু না কিছু চাষের কাজ আছে। শতকরা প্রায় নব্বই জনের জমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বহু লোকে এই যোগ ছিন্ন করিতে না পারিলে কারখানার শিল্পের সমধিক উন্নতি ভারতে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল আমাদের দেশে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এখনও আমাদের কারখানার শ্রমিক সস্তা হইলেও দক্ষ নহে। জমির সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিতে না পারা ইহার অন্যতম কারণ, কারখানার মালিকেরা নিজেরা একথা বলিয়াছেন।

আমাদের দেশে কুটীর-শিল্পের উপযোগিতার একটি দৃষ্টান্ত দিব। অনেকের ধারণা, হাতে কাপড় বুনা আমাদের দেশে শিল্প হিসাবে এখন গণনার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু এখনও আমরা যত কাপড় ব্যবহার করি তার অন্ততঃ সিকি ভাগ আমাদের তাঁতিরা হাতে প্রস্তুত করেন। বাকী অংশ প্রায় সমভাগে এদেশের মিল ও বিদেশ হইতে সরবরাহ হয়। আমাদের দেশে যত কাপড় তৈয়ারী হয় তাহার পাঁচভাগের দুইভাগ এখনও তাঁতে প্রস্তুত হয়। দৈন্য, অজ্ঞতা ও নানা অসুবিধা সত্বেও এখনও যদি এক বস্ত্র-বয়ন হইতে আমাদের দেশের প্রায় ২৮ লক্ষ লোক নিজেদের জীবিকা সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে সমবায়ের সাহায্যে কি হইতে পারে তাহা অনুমান করা অসাধ্য নহে।

কুটীর-শিল্পে বাংলা ও অন্য প্রদেশে বোধ হয় খুব বেশী পার্থক্য নাই। বস্ত্র-বয়ন আমাদের প্রদেশেও প্রধান গৃহ-শিল্প। প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের জীবিকা ইহার উপর অনেকটা নির্ভর করে। কাঁসা ও পিতলের বাসন নির্ম্মাণ, কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত, চর্ম্মশোধন প্রভৃতি গৃহ-শিল্পও বহুলোকের জীবিকার সংস্থান করে। কিন্তু অর্থ, শিক্ষা ও একতার অভাবে কোন গৃহ-শিল্পই উত্তরোত্তর উন্নত হইতেছে না। যে সকল শিল্পের আদর ও চাহিদা বৈচিত্র্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে, হাতে বা ছোট কলে তাহা করিতে পারিলে

মিলের চাইতে সুবিধা আছে। মিলে বা বড় কারখানায় এক এক প্রকারের বহু পরিমাণ জিনিষ অপেক্ষাকৃত সহজে প্রস্তুত করা যায়। হাতে বা ছোট কলে অসংখ্য প্রকারের স্বল্প পরিমাণ জিনিষ অল্পায়াসে তৈয়ারী হইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বক্ষেত্রেই যে কলকারখানা সুবিধাজনক তাহাও নহে। কাপড়ের আদর বৈচিত্র্যের উপর কতকটা নির্ভর করে বলিয়া আজ পর্য্যন্ত মিলের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ তাঁত ভারতবর্ষে চলিতেছে। বস্তুতঃ, এক অর্থে মিল ও তাঁতে কোন প্রতিযোগিতা এখন নাই। আমাদের তাঁতিরা প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ কোটী পাউণ্ড (প্রতি পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সের) দেশীয় মিলের সূতা কাপড় প্রস্তুত করিতে ব্যবহার করেন। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও কি শিল্প, কি শিল্পী, কাহারও অবস্থা আশানুরূপ উন্নত নহে।

বাংলায় কতকগুলি সমবায় শিল্প-সমিতি আছে, ১৯২৭-২৮ সনের বিবরণী অনুসারে বাংলায় প্রায় তিন শত সমবায় তন্তুবায় সমিতি আছে। ইহাদের সভ্য-সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার, কার্য্যকারী মূলধনের পরিমাণ সাড়ে তিন কোটী টাকার কিছু উপর। অন্যান্য শিল্পের সাহায্যের জন্যও কোন কোন স্থানে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের দ্বারা গৃহশিল্পসমূহের কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু যতটা প্রয়োজন তাহা এখনও হয় নাই। সমাবায় নীতির সহিত, মনে হয়, শিল্পীদিগের অন্তরের যোগ স্থাপিত হয় নাই। সমবায় সমিতিগুলি যেন কতকটা বাহিরের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। সমবায় আন্দোলনে অত্যধিক সরকারী প্রভাব হয়ত ইহার জন্য কতকটা দায়ী। কিন্তু সমবায় শিল্পীদিগের নিজস্ব প্রাণের বস্তু না হইলে কুটীর-শিল্পসমূহ তাহাদের পূর্ব্বশক্তি ফিরিয়া পাইবে না।

আমাদের দেশের গৃহ-শিল্পের অন্যতম প্রধান অসুবিধা, আমাদের যাঁহারা বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে বড়, তাঁহাদের সঙ্গে ইহার প্রায় কোন সম্বন্ধ নাই। বাংলার শিল্পবিভাগের কর্ত্তা কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত বিবরণীতে লিখিয়াছেন:—"বাংলায় যাঁহারা গৃহ-শিল্পে রত তাঁহারা দক্ষ বটে, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে ইঁহাদের সম্পর্ক অতি কম; সামাজিক বিষয়েও ইঁহারা অন্য শ্রেণীর মত অগ্রগামী নন। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় গৃহশিল্পের প্রস্তুতপ্রণালী হইতে নিজেদেরকে সর্ব্বদা দূরে রাখিয়াছেন। ইহার সহিত তাঁহাদের যতটুকু সম্বন্ধ তাহা মহাজন বা ব্যাপারী হিসাবে, শিল্পী হিসাবে নহে।" পুরুষানুক্রমে নানাবিধ কুটীর-শিল্পে যাঁহারা রত, তাঁহাদিগকে যেমন শিক্ষায় ও অন্য সকল বিষয়ে উন্নত হইবার জন্য সর্ব্ববিধ সুবিধা দেওয়া কর্ত্তব্য, সেইরূপ বিজ্ঞানের সাধনায় যাঁহারা নিযুক্ত তাঁহাদিগেরও, সকলের না হউক অনেকের, গৃহশিল্পের উৎকর্ষে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। কুটীর-শিল্পেও বিজ্ঞানের দান কলকারখানার মতই আবশ্যক। পরিশ্রম যাহাতে লাঘব হয়, উৎপন্ন শিল্প গুণে ও পরিমাণে যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, তাহার জন্য কুটীর-শিল্পেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিয়ত প্রয়োজন। যে শক্তি সহরের বড় বড় কারখানার সৃষ্টি করিয়াছে, সেই শক্তি ক্রমশঃ অনুসন্ধানের ফলে গ্রামে গ্রামে গৃহশিল্পের ছোট যন্ত্র পরিচালনে কেন একদিন ব্যবহৃত হইতে পারিবে না, তাহার কি কোন সঙ্গত কারণ আছে?

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান বটে; কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, শিল্পে ইহা সর্ব্বদা সকলের নীচে পড়িয়া থাকিবে। একদিন ছিল যখন ভারতবর্ষ শুধু কৃষিতে নয়, শিল্পেও বড় ছিল। আর যুগপৎ কৃষি ও শিল্পপ্রধান হইতে হইলে কুটীর-শিল্পের পথই, মনে হয়, আমাদিগের পক্ষে প্রশস্ত। (পল্লী-স্বরাজ)

পাঞ্জাবে শিল্পের অবস্থা

শ্রীইন্দুভূষণ সেন

হাতে চালানো তাঁত

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ১৯২৮—২৯ সনে এই শিল্পের অবস্থা বিশেষ মন্দ ছিল না। হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা প্রত্যেক বৎসরই হ্রাস হইয়া আসিতেছে; এবং কলের তাঁতের প্রতিযোগিতায় এই শিল্প যে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে সেরূপ আশা করা যায় না। আধুনিক উন্নত শ্রেণীর কলকব্জার প্রচলন ও শক্তিশালী বিক্রয়-সমিতি গঠিত হইলে এই শিল্পের উন্নতি সাধিত হইতে পারে। আলোচ্য বর্ষে জলন্ধরের কতিপয় তাঁতী ও অমৃতসরের একটি যুবক কয়েকটি কলের তাঁত বসাইয়াছেন এবং লুধিয়ানার একটি প্রধান কারখানায়ও কতকগুলি কলের তাঁত বসান হইবে স্থির হইয়াছে।

মোজা গেঞ্জি বোনা

বস্ত্রবয়নশিল্পের চেয়ে এই শিল্পের অবস্থা পাঞ্জাবে অনেক ভাল ছিল। চীন, জাপান ও ইয়োরোপের কতিপয় দেশের প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও আলোচ্য বর্ষে এই শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। একটি বড় কারখানাতে কলে চালিত জ্যাকার্ড ও গোল নিটিং মেশিন স্থাপন করা হইয়াছে। ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণিতে এই শিল্পের আধুনিক উৎপাদন-প্রণালী অধ্যয়ন করিবার জন্য একটি উৎসাহী যুবা ইয়োরোপ যাত্রা করিয়াছেন। লুধিয়ানার কতিপয় কারখানার অধিকারী উন্নত ধরণের কলকব্জা বসাইয়াছেন ও কলে চালিত তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধির কল্পনা করিতেছেন। শিয়ালকোটের স্পোর্টস হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী তাঁহাদের কারখানা কলে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পশম-শিল্প

ইয়োরোপের কয়েকটি কারখানার মালিকেরা 'ডাম্পিং' নীতি অবলম্বন করা হেতু ও ইতালী ও বেলজিয়াম হইতে প্রতিকূল এক্সচেঞ্জের হারে সস্তা মাল আমদানি করার দরুণ পশম শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অমৃতসরের মেসার্স কে, বি, গোলাম সাদিব এণ্ড সন্স একটি প্রসিদ্ধ কারপেট তৈয়ারীর কারখানার মালিক। কিছুদিন হইল এই কারখানায় কার্পেট তৈয়ারীর জন্য একটি সূতাকাটার কলও বসানো হইয়াছে।

তৈলের কল

এই শিল্পের অবস্থা মোটের উপর বেশ লাভজনক। অমৃতসর ও আরাফোয়ালাতে দুইটি নূতন মিলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। লুধিয়ানার একটি বরফের কলের সঙ্গে একটি তৈলের কলও সংযুক্ত হইয়াছে। পঞ্জাবপ্রদেশে তৈলের কলগুলি যে পরিমাণে তৈল উৎপাদন করিতে পারে তাহা চাহিদার অনুপাতে যথেষ্ট নহে। লাভের সহিত আরও অধিকসংখ্যক কল চালান যাইতে পারে।

খেলার সাজসরঞ্জাম তৈরী

শিয়ালকোটের খেলার সরঞ্জাম তৈয়ারীর শিল্পটি অধুনা বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও ইহার বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ব্যবসায়ের প্রসার এত হইয়াছে যে এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহকরা যাইতেছে না। দুইটি কারখানা খেলার সরঞ্জাম বিক্রয়ের জন্য লণ্ডনে কতিপয় স্থায়ী দোকান খুলিয়াছেন। হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, মোট উৎপন্ন মালের শতকরা ৭৪ ভাগ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহে রপ্তানি হইয়া থাকে।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

মেজর বামনদাস বসু, আই, এম, এস্

কার্ত্তিক—১৩৩৭
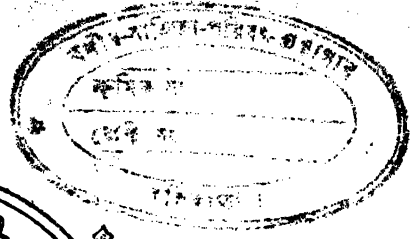
৫ম বর্ষ—৭ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
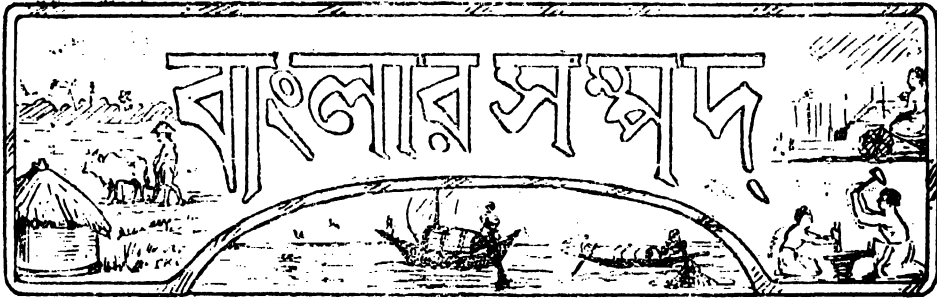
আদর্শ গ্রাম

বাংলার পল্লীগ্রামগুলি ক্রমশঃ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। সহরের আকর্ষণে ও গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায় পল্লীর সম্পন্ন ও সমর্থ লোকগুলি গ্রাম দেশ ছাড়িয়া সহরে চলিয়া যাইতেছে, ইহা সত্য; কিন্তু পল্লীগ্রামগুলিকে সংস্কার করিয়া আদর্শ গ্রামে পরিণত করিতে পারিলে উহা আর জনশূন্য থাকিবে না। যাঁহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাঁহারা গ্রামে থাকেন তাঁহাদের চেষ্টায়ই পল্লীগ্রামের উন্নতি হইতে পারে। আমরা নিম্নে পল্লীর দুর্দ্দশার কতকগুলি কারণ ও তাহা নিবারণের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি। গ্রামবাসিগণ এ বিষয়ে অবহিত হইলে পল্লীর কল্যাণ সাধিত হইবে :—

১। পল্লীতে উপার্জ্জনের সুবিধা নাই। পল্লীগ্রামের প্রধান ও প্রথম অভাব তথায় উপার্জ্জনের সুবিধা নাই। পূর্ব্বে সাধারণতঃ গ্রামগুলি স্বাবলম্বী ছিল—নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কৃষিজীবী, আর উচ্চশ্রেণীর লোকজন নানাবিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া গ্রামেই বসবাস করিত। গ্রামের ক্ষেতে ধান আর অন্যান্য শস্য জন্মিত এবং জনসাধারণের অন্ন-সংস্থান হইত। এখনকার মত পাটের ফসলে পল্লী-গ্রামের সমস্ত কৃষিজমি আবদ্ধ থাকিত না। গ্রামের তাঁতি গ্রামের কাপড় যোগাইত, ঘরে ঘরে চরকা ছিল, গ্রামের আবশ্যকীয় কাপড়ের সূতা গ্রামেই উৎপন্ন হইত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে বিদেশী বণিকের পাটের চাহিদায় ও কল কারখানার প্রতিযোগিতায় গ্রামের কৃষি ও শিল্প উভয়ই দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইয়াছে। ইহার প্রতীকারকল্পে গ্রামকে আবার স্বাবলম্বী হইতে হইবে। পাটের চাষ কমাইয়া ধান্য ও আবশ্যকীয় রবি শস্যের আবাদ করিতে হইবে। এইরূপ

সাধারণের আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য গ্রামে উৎপন্ন হইলে গ্রামের কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইবে এবং গ্রামবাসিগণকে উপার্জ্জনের জন্য আর বিদেশে যাইতে হইবে না।

২। গ্রামে শিক্ষার অভাব। গামবাসিগণের শিক্ষার অভাব গ্রামের অবনতির দ্বিতীয় কারণ। গ্রামবাসিগণের নিরক্ষরতার জন্য সাধারণতঃ সরকারের দোষ দেওয়া হয়। ইহা স্বাভাবিক। সরকার দরিদ্র জনসাধারণের নিকট হইতে প্রচুর ট্যাক্স নিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার প্রতিদানে উহাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন না—ইহাতেই জনসাধারণ সরকারের নিন্দা করিয়া থাকে। এ যাবৎ দেখা গিয়াছে পল্লীগ্রামে যত স্কুল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রায় সকলই জনসাধারণ বা দানশীল ব্যক্তিদের চেষ্টায় স্থাপিত। বিদ্যালয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য করেন বটে, কিন্তু তার শোধটি তুলিয়া লন পরিদর্শন ও নিয়ম কানুনের কড়াকড়ি করিয়া। সুতরাং শিক্ষার সুযোগের জন্য সরকারের দিকে চাহিয়া না থাকিয়া গ্রামবাসিগণের নিজেদের এজন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আজকাল এমন গ্রাম নাই যেখানে ৫।১০ জন সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোক বেকার বসিয়া নাই। তাহারা যদি একটু উদ্যোগী হইয়া গ্রামের নিরক্ষর ব্যক্তিগণকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন তবেই গ্রামের নিরক্ষরতা দূর হইবে। গ্রামের অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন লোকের উচিত ইহাদিগকে উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য দান করা।

৩। গ্রামের স্বাস্থ্য। বর্ত্তমান কালে বাংলার পল্লীগুলি প্রায়ই স্বাস্থ্যহীন। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। কালবশে পল্লীগুলি শ্রীহীন ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দুরন্ত ব্যাধির আবাসস্থল হইয়া পড়িতেছে। প্রতি গ্রামে ডাক্তারী বা কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে এবং উপযুক্তসংখ্যক ডাক্তার বা কবিরাজ গ্রামে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিলে রোগের প্রতিকার হইতে পারে। সর্ব্বোপরি গ্রামবাসিগণকে স্বাস্থ্যনীতির প্রাথমিক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে শিক্ষিত করিতে হইবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, খাদ্যাখাদ্য বিচার, বিশুদ্ধ জল আলো ও বায়ু সেবনের উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে পল্লীবাসিগণকে শিক্ষিত করিবার জন্য বর্ত্তমান কালোপযোগী আলোক-চিত্র ও বক্তৃতাদির সহায়তা নেওয়া যাইতে পারে।

৪। গ্রামের জল-সংস্কার। পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব গ্রামের অবনতির আর একটি প্রধান কারণ। পূর্ব্বে প্রতি গ্রামে বহু পুষ্করিণী ছিল এবং সর্ব্বদা নূতন পুষ্করিণী খনন করা হইত। এক্ষণে নূতন পুষ্করিণী তো হয়ই না, পুরাতন পুকুরগুলিও সব শুষ্ক ও পঙ্কিল হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামদেশে বাড়ী করিতে হইলেও এখন আর কেহ পুকুর কাটিতে চান না, তৎপরিবর্ত্তে নলকূপ বসাইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন। পুষ্করিণী বাড়ীর শোভা, গ্রামেরও শোভা। পশুপক্ষী পুষ্করিণীর জল ইচ্ছা হইলেই পান করিতে পারে। নলকূপে সে সুবিধা নাই। পুষ্করিণীর মাছ বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। পুষ্করিণীর জল হইতে নিকটবর্ত্তী চাষের জমিতে সেচের কাজ চলিয়া থাকে। উৎকৃষ্টরূপে খনিত হইলে পুষ্করিণীর জল সুপেয় ও উপকারী। গ্রামবাসিগণ সমবেত হইয়া পুরাতন পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার ও নূতন পুকুর খনন করিলে গ্রামের জলকষ্ট দূর হইতে পারে। পল্লীগ্রামের কষ্টের আর একটি কারণ এই যে, কচুরী পানায় বাংলার সমস্ত খাল বিল ডোবা পুকুর ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার ফলে পানীয় জল পাওয়া কষ্টকর হইয়াছে, মাছের অভাব ঘটিয়াছে, চলাচলের পথ নষ্ট হইয়াছে এবং গ্রামবাসিগণের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে। অনেক প্রকার অনুসন্ধান গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে কচুরী পানা তুলিয়া পুড়িয়া ফেলানো ব্যতীত ইহা দূর করিবার অন্য উপায় নাই। গ্রামবাসিগণের চেষ্টা ব্যতীত এই কার্য্য হইতে পারে না। যাহার জমিতে কচুরী পানা আছে তাহার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, সকলে উদ্যোগী হইয়া ঐ কচুরী নিঃশেষ করিতে হইবে।

৫। গ্রামে চলাচলের অসুবিধা। পল্লীগ্রামে চলাচলের অসুবিধা ক্রমেই বৰ্দ্ধিত হইতেছে। পূর্ব্বে গ্রামের লোকের রাস্তাঘাট সংস্কার করার উপর বেশ ঝোঁক ছিল; এখন গ্রামে লোকই থাকিতে চায় না, সুতরাং রাস্তাঘাটের উপরও কাহারো নজর নাই। গ্রামবাসিগণ একত্র হইয়া

গ্রামের রাস্তা সংস্কারে মনোযোগী না হইলে এই অভাব দূর হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে গ্রামের সকল লোকই যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন তাহাতে একের চেষ্টায় কখনও এই সব কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

পল্লীবাসিগণের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত গ্রামের উন্নতি কখনও সম্ভব হইবে না। এইজন্য সরকারী সাহায্যের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন নিজের চেষ্টায়ই উন্নতি লাভ করিতে পারে প্রত্যেক জাতি ও সমাজ সেইরূপ নিজের উদ্যমেই বড় হইয়া থাকে। পল্লীর উন্নতিকল্পেও সেইরূপ আত্মনির্ভরশীল হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। জাতিগত উদ্যমহীনতা ও অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাবই আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। আমরা বিদেশীর আদর্শে তাহাদের কতকগুলি দোষ অনুকরণ করিতে বেশ শিখিয়াছি, কিন্তু তাহাদের গুণগুলি আয়ত্ত করিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য দেশের গ্রামগুলি পল্লীবাসিগণের চেষ্টায় সহরে পরিণত হইতেছে। অর্থাৎ সহরে লোকে যে সকল সুখ সুবিধা ভোগ করে গ্রামবাসিগণ গ্রামে থাকিয়াই সে সকল সুযোগ সুবিধা করিয়া লয়। আমাদের পল্লীবাসিগণেরও সেইরূপ উদ্যম থাকিলে পল্লীগ্রামগুলি আবার স্বাস্থ্য শ্রী ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিবে। (পল্লীমঙ্গল—নারায়ণগঞ্জ)

মুর্শিদাবাদের রেশম-শিল্প বিপন্ন

রেশমের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার বহু লোক জীবিকার্জ্জন করে। অর্থাভাবে এই শিল্পের দারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এক 'কাহন' গুটিপোকা পাঁচ সিকা হইতে ২৲ বিক্রয় হইত, এখন টাকায় ৪।৫ কাহন গুটি পাওয়া যাইতেছে। যাহারা রেশমের কাপড় বুনিত তাহারা তাঁত বন্ধ করিয়া দিয়া বেকার বসিয়া আছে। (পল্লীবাসী—কালনা)

অন্ন-সমস্যা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী

ফরিদপুরের সরকারী কৃষি আফিসে কয়েকটী ভদ্র-সন্তানকে নিজ হাতে জমি চাষ করান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যদি তাহারা কৃতকার্য্য হয়, তবে তাহাদের প্রত্যেককে গবর্ণমেণ্ট খাস মহাল হইতে চাষ করিবার জন্য ২০ বিঘা জমি দেওয়া হইবে এরূপ প্রলোভন দেওয়া হইয়াছে। স্যার পি, সি, রায় ফরিদপুরে যাইয়া তাহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। বাংলার প্রত্যেক জেলায় গবর্ণমেণ্ট হইতে এইরূপ বন্দোবস্ত করা দরকার। এইরূপ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ভদ্রসন্তানগণ যদি নিজ হাতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন, তবে পল্লীগ্রামে নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিয়াই তাহা করিতে পারেন। শিক্ষিত যুবকগণ চেষ্টা করিলে কৃষির উন্নতি সাধনও সম্ভবপর হইবে। একটুকু মাথা খাটাইলে গতানুগতিক প্রথা ছাড়িয়া নানাপ্রকার লাভজনক কৃষিকার্য্যদ্বারাও আয়ের পন্থা করা যাইতে পারে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় গালার চাষ বেশ সফল হইয়াছে। অন্যান্য জেলায় তাহা হইতে পারে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। শুধু ধান ও পাট চাষের উপর নির্ভর না করিয়া দুই এক বিঘা জমিতে বাগান করা যাইতে পারে। কলা গাছ লাগাইলে এক বৎসরেই তাহার ফল হয়। একটা কলা গাছে বৎসরে অন্ততঃ ॥০ আনা আয় হয়। নারিকেল, সুপারি, খেজুর প্রভৃতি গাছও বাড়ীর চারিধারে এবং ক্ষেতের আলে রোপণ করা যাইতে পারে। ইহারা বেশী জায়গা নষ্ট করে না বা অন্য ফসলের বিশেষ ক্ষতি করে না। এই প্রকারের বাগিচা হইতেও বৎসরে ৪০০৲।৫০০৲ টাকা সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। এ জিলার কৃষকগণ শুধু পাটের দিকেই চাহিয়া থাকে। শিক্ষিত যুবকগণ কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কৃষকগণও তাহাদের কৃষিপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিবে এবং তাহা দ্বারা দেশের বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে।

(ফরিদপুর হিতৈষিণী)

চৌমুহনী সেল সাপ্লাই কোম্পানী

গত চার বৎসর যাবৎ নোয়াখালীর প্রসিদ্ধ বাজার চৌমুহনীতে সেল এণ্ড সাপ্লাই নামক একটী কোম্পানী

প্রতিষ্ঠিত হইয়া খুব বিরাট ভাবে পাট ও ধানের কারবার করিয়া আসিতেছিল। ইহার অনেক শেয়ার মফঃস্বল এবং সহরে বিক্রয় হইয়াছে। ইহার সেক্রেটারী ছিলেন মৌলবী আবদুল গোফরাণ ও ম্যানেজার ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ সাহেব। বাহির হইতে আমরা এই কোম্পানীর উচ্চবেতনে কর্ম্মচারী নিয়োগ ও কাজের আড়ম্বর দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, বাস্তবিকই বুঝি চৌমুহনীতে একটা বিরাট দেশীয় যৌথ কারবারের সৃষ্টি হইল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে ইহা অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই বা বুঝিবার সুযোগও পাই নাই। আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম যে, কোম্পানী আজ পর্য্যন্ত ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্দ্ধে লোকসান দিয়াছে এবং কর্ম্মকর্ত্তাগণ সমস্ত কর্ম্মচারী বিদায় দিয়া কারবার গুটাইবার উদ্যোগে আছেন।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

চট্টগ্রামে কাগজের কলের প্রস্তাব

অর্থাভাবে এবং অর্থ উপার্জ্জনের উপায়ের অভাবে আজ আমাদের দেশের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে আমরা দেশে বসিয়া দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাই না; অথচ আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য বহু জিনিষ আমরা বিদেশ হইতে ক্রয় করি এবং বিদেশীরা এইরূপে আমাদের দেশ হইতে বহু অর্থ লইয়া যায়। কেন এমনটি হয় একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এদেশের বহু পতিত জমিতে এবং বড় বড় বনে জঙ্গলে যে সমস্ত দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মায় সেগুলি যদি নানা প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রয়োজন মত ব্যবহার করা যায় তবে বহু লোকের অন্নকষ্ট দূর করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে। এই সব বিষয় আমরা একবারও ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি না। শ্রীহট্ট, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও আরাকানের বনে জঙ্গলে এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বাঁশ জন্মে যে তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত করিলে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহ করিয়া বিদেশে রপ্তানি করাও সম্ভব হইতে পারে। অথচ বনের বাঁশ বনেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গোটা ভারতবর্ষে যে চারি পাঁচটি কাগজের কল আছে তাহার প্রায় সবগুলিই বিদেশী দ্বারা পরিচালিত।

আমি জার্ম্মাণিতে কাগজের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছি। দেশে ফিরিয়াও গত ৪।৫ বৎসর যাবৎ বহু কাগজের কলে কাজ করিয়া অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমার স্বদেশহিতৈষী দেশবাসী যদি আমাকে তাঁহাদের সাহচর্য্য ও সহানুভূতি দানে উৎসাহিত করেন তবে ঐরূপ কাজে অবতরণ করিতে পারি। কাগজের কলের দ্বারা আয় যথেষ্ট হয় এবং বহু নিকটস্থ লোকের অভাব দূর করাও খুব সম্ভবপর হয়।

আমাদের দেশে প্রায় শতকরা ৯৯ জন লোক অশিক্ষিত, তবুও বাৎসরিক একলক্ষ বিশহাজার টন (এক টনে ২৭ মণের কিছু বেশী) কাগজ বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানি হয়। ভারতবর্ষে বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত পাঁচটি বড় কাগজের কল আছে। ঐগুলিতে বৎসরে ৩৫ হাজার টন কাগজ তৈয়ার হয়। ঐ সব কলের মালিকেরা ১৬।১৭ হাজার টন ওজনের কাগজ তৈয়ার করিবার মত পাল্প্ নরওয়ে ও সুইডেন হইতে আমদানি করে, বাকী ১৮।২০ হাজার টন কাগজই কেবল আমাদের দেশীয় বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত হয়। গত ১৯২৮-২৯ সনে সর্ব্বসুদ্ধ তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যের কাগজ ও বোর্ড আমাদের দেশে আমদানি হইয়াছে। যে সব দেশ হইতে বেশী পরিমাণে কাগজ আসিয়াছিল নিম্নে তাহাদের নাম, কাগজের পরিমাণ ও মূল্য দেওয়া গেল :—

দেশ	হন্দর	টাকা
বৃটিশ সাম্রাজ্য	৯৫৮,৯৫৭	১,২৫,১৪,০০০৲
জার্ম্মাণি	২,৩২,২০৯	৪৩,৭০০০০৲
নরওয়ে	২,৩১,৯০২	৩৭,৩৭,০০০৲
অষ্ট্রীয়া	১,৯২,৪৫৬	৩০,৩৪,০০০৲
হল্যাণ্ড	২,০৬,০৮০	২৫,০২০০০৲
সুইডেন	১,৩৫,৮২৮	২৪,৫২,০০০৲
আমেরিকা	৯৩,৩৫০	৮,৩৩,০০০৲
জাপান	৮৩,৪৭৫	৭,৫০,০০০৲

এই অবস্থায় যদি আমাদের দেশের বত্রিশ কোটি লোকের প্রত্যেককে শিক্ষা দিতে হয় তাহা হইলে শীঘ্রই কত কাগজের আবশ্যক হইবে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাহা হইলে বিদেশীকে আমাদের আরও কত টাকা দিতে হইবে তাহা হিসাব করিতেও ভয় হয়। এই সুযোগে তাহারাও নিজ ইচ্ছা মত দাম বাড়াইতে থাকিবে। আমরা কি তবে চিরদিন ভিক্ষুক হইয়া থাকিব? আমাদের কি চিরকাল হাত পাতিয়াই থাকিতে হইবে?

টিটাগড় ও বেঙ্গল পেপার মিলের হিসাব দেখিলে জানা যায় যে, কাগজের ব্যবসায়ে বেশ লাভ আছে। দমদমের কাছে যে বোর্ড মিল আছে তাহা সরকারকেই সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারে না।

আমাদের লক্ষ্য এই যে, প্রথমে আমরা ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে অধিষ্ঠানটি বাড়াইয়া তুলিব। প্রথমে কার্ডবোর্ড হইতে আরম্ভ করিয়া তারপর প্যাকিং ও সর্ব্বশেষে লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ তৈয়ার করা হইবে। ১৯২৮।২৯ সনের আমদানির হার দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, তের লক্ষ টাকা মূল্যের ১০ হাজার টন ষ্ট্রবোর্ড এবং ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের পাঁচ হাজার পাঁচশত টন অন্যান্য বোর্ড আমদানি হইয়াছে। কলিকাতা মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন সহরেই প্রায় অর্দ্ধেক ষ্ট্রবোর্ড ও চারি ভাগের তিন ভাগ অন্যান্য বোর্ড আমদানি হয়।

আমরা এই কলটি চট্টগ্রামে বসাইতে চাই, কারণ যে যে সুবিধা থাকিলে কাগজ-শিল্পের বিস্তার সত্বর ও সুনিশ্চিত হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে চট্টগ্রামে তার প্রায় সবগুলিই পাওয়া যাইতে পারে। যেখানে সারা বৎসর পরিষ্কার জল পাওয়া যায়, যেখান হইতে কয়লা ও কাঠ সত্বর সরবরাহ করিতে পারা যায় ও যেখান হইতে ইচ্ছামত মাল আমদানি ও রপ্তানি করা যায় অর্থাৎ সমুদ্র-তীরে এইরূপ কোন স্থানে কাগজের কল হওয়া উচিত। চট্টগ্রামের পাহাড়ে যথেষ্ট বাঁশ জন্মে; আর কলিকাতা রেঙ্গুন ও মান্দ্রাজে জাহাজে করিয়া মাল আমদানি ও রপ্তানি করিবারও সুবিধা আছে। ভারতবর্ষে যত কাগজ ব্যবহার হয় তাহার প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ এই সহরেই আমদানি হয়।

সহৃদয় দেশবাসীর প্রতি আমাদের আবেদন যেন তাঁহারা এইরূপ একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে সহায়তা করিয়া জাতীয়তার এই দুর্দ্দিনে বহু নিরন্ন বাঙ্গালীর ভরণপোষণের উপায় করিয়া দেন। পাকা ব্যবসায়ী এবং গণ্যমান্য ভদ্রলোক দ্বারা এই কারবারটি চালিত হইবে। এইরূপ দেশপ্রাণ লোকের অদম্য চেষ্টায়ই সম্প্রতি চট্টগ্রাম হইতে রেঙ্গুণ যাইবার একটি স্বদেশী ষ্টীমার কোম্পানী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপনারা কি সামর্থ্য মত কয়েকটি শেয়ার কিনিয়াও সাহায্য করিতে পারিবেন না? তিনিই প্রকৃত দেশহিতৈষী যিনি তাঁর দেশবাসীর দারিদ্র্য ও অন্নাভাব দূর করিবার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেন। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই যদি এবিষয়ে দৃষ্টি রাখেন তবে আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব।

শ্রীযশোদাকুমার মজুমদার,
পেপার ইঞ্জিনিয়ার (জার্ম্মেনি)
(ত্রিপুরাহিতৈষী)

বরিশালের অর্থকথা

(১) লাল রংয়ের মিঠাই

বরিশালের ফেরিওয়ালাগণ লাল রংয়ের মিঠাই লইয়া রাস্তায় রাস্তায় লোকের বাড়ী কিংবা বাসায় যাইয়া বিক্রয় করে, অশিক্ষিত লোকেরা লাল রং দেখিয়া কিনিয়া খায়। ভয়ানক বিপদের কথা—রংয়ের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ থাকে! অবোধ লোকেরা উহা উদরস্থ করিয়া ব্যারামে ভোগে। ইহা নিবারণের কি কোনও উপায় নাই?

(২) পোষ্টাফিস

বরিশাল কালীবাড়ী, আমানতগঞ্জ ও ফকিরবাড়ী পোষ্টাফিসের খিরকি দ্বারে অনেক লোক কে কাহার কার্য্য অগ্রে করিয়া লইতে পারে তজ্জন্য গণ্ডগোল করে। বারেন্দায় স্থান আছে, বসিবার বন্দোবস্ত নাই। লোকেরা কতক্ষণ দাঁড়াইয়া কষ্টভোগ করিতে পারে? তজ্জন্যই অগ্রে কাজ সারিয়া যাওয়ার জন্য জেদ করে। কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতীকার-কল্পে কোনও প্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন কি?

(৩) জঙ্গল পরিষ্কার

স্থানীয় জজ কোর্টের দক্ষিণে জমিদার মিঃ ব্রাউন সাহেবের অধীনে ভাড়াটিয়া বাড়ীর সীমানায় বেড়ের পাশে অত্যন্ত জঙ্গল হইয়াছে। স্থানীয় পেরেরা সাহেবের বাড়ীর মধ্যে অনেক ঝাড় জঙ্গল গজাইয়াছে, তাহার দূষিত হাওয়া টাউনহলে ঢুকিতেছে। পুলিশ হাঁসপাতালের পূর্ব্বদিকে জঙ্গল হইয়াছে। এইরূপ সহরের ভিতর নানাস্থানে জঙ্গল উঠিয়াছে। ঐ সকল স্থান পরিষ্কার করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

(৪) কলেরার প্রকোপ

বরিশাল সহরের ফকিরবাড়ী রোডে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে, ভীষণ কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়াছে। ৩।৪ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। সকলেরই সাবধানে থাকা উচিত। মিউনিসিপালিটি ঐ রোডের অপরিষ্কার স্থানগুলি উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে রাখিলে পাড়ার উপকার হইবে।

(৫) কুকুরের উপদ্রব

বরিশালের প্রায় সমস্ত রাস্তাতেই লোকদের কুকুরের মারামারির উপদ্রবের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। সিভিল কোর্টের নিকটবর্ত্তী রাস্তাসমূহে কোন সময় কাহাকে কামড়ায় তাহার নিশ্চয়তা নাই। সিভিল কোর্টে অনেক পক্ষ ও সাক্ষী আসিয়া থাকে।

(৬) শ্রীবৃদ্ধি

স্থানীয় বিবির মহল্লার পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে কয়েকখানি বিশ্রী মুসলমানের হোটেল ছিল, সেগুলি স্থানান্তরিত হইয়াছে, তৎস্থলে উকিল শ্রীযুত মৌলবী হাসেমালী খাঁয়ের বৈঠকখানার দালান উঠিতেছে, তাহার উত্তর পার্শ্বে অফিসার্স কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের দালান উঠিবে এবং সহরের মধ্যস্থানের বিশ্রী স্থানগুলি সুশ্রী হইবে।

(৭) রাস্তার কষ্ট

বরিশাল মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত ব্যারিষ্টার মিঃ পি এল, রায়ের বাসার পার্শ্বে ও পাষাণময়ী কালীবাড়ীর রাস্তার ও অনেক রাস্তার ইট জাগিয়া উঠিয়াছে, বহুলোক পায় হোছট খাইয়া দুঃখ পায়। একটি স্ত্রীলোক বড়ই কষ্ট পাইয়াছে, তাহার পা জখম হইয়াছে। ঐ সকল গলি ও রাস্তা মেরামত করিয়া লোকের কষ্ট নিবারণ করা উচিত বলিয়া মনে করি।

(৮) ধর্ম্মরক্ষিণী সভার ১৩৩৬ সনের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী

আলোচ্যবর্ষে ধর্ম্মরক্ষিণীর দুই বার সাধারণ সভার ও ৪ বার কার্য্যকরী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সভার চাঁদার পরিমাণ ১৭৬৲।

সভার অন্তর্ভুক্ত কামিনীসুন্দরী চতুষ্পাঠী

বাইশরসির জমিদার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার মাতৃদেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত এই চতুষ্পাঠীর পরিচালনার জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া বার্ষিক ৬০০৲ছয়শত টাকা সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। প্রধানতঃ তাঁহারই সাহায্যে চতুষ্পাঠী চলিতেছে। প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত ও অপরাহ্নে ৪॥ ঘটিকা হইতে সভাগৃহে চতুষ্পাঠীর কার্য্য সম্পন্ন হয়। চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, সাংখ্য ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। অসমর্থ উপযুক্ত ছাত্রদিগকে মাসিক কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে ৮ জন ছাত্রকে খাওয়ার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে। এই বর্ষে চতুষ্পাঠীর ছাত্র-সংখ্যা ২৫ জন ছিল, এবং কলাপ আদ্য ১১ জন, কাব্য আদ্য ২ জন, পুরাণ আদ্য ২ জন, কলাপ মধ্য ৩ জন, কাব্য মধ্য ৩ জন, মোট ২১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে :—

কলাপ আদ্য ১ম বিভাগ—১। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২য় বিভাগ—২। শ্রীমতী বিজনবালা সেনগুপ্ত, ৩। শ্রীকনকলতা বসু, ৪। শ্রীনির্ম্মলপ্রভা ঘোষ, ৫। শ্রীঅমৃতলাল হালদার। কলাপ মধ্য ২য় বিভাগ—

১। শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ বসু। কাব্য মধ্য ২য় বিভাগ—১। শ্রীজলধর শীল। কাব্য আদ্য ১ম বিভাগ—১। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন মজুমদার। ২য় বিভাগ—২। ব্রজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী। পুরাণ আদ্য—১। শ্রীমতী নমিতা দেবী, ২। শ্রীমতী লীলা দেবী। স্মৃতি আদ্য—১। শ্রীপার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তী।

সভার অন্তর্ভুক্ত সারস্বত বালিকা-বিদ্যালয়

হিন্দু পরিবারের বালিকাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের জন্য বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষার সহিত যতদুর সম্ভব যোগ রাখিয়া বালিকাগণ স্বধর্ম্মের ও গার্হস্থ্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয় সকল শিক্ষা করিয়া যাহাতে প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীতে অভিভাবকগণের অনুরাগ প্রতিপন্ন হওয়ায় বালিকাগণ যাহাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য গতবর্ষ হইতে নূতন পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে যথা :—

৬ষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া এরূপভাবে পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যাহাতে অভিভাবকগণ ইচ্ছা করিলে বালিকাদিগকে অন্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরবর্ত্তী শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিতে পারেন। ৭ম শ্রেণীতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত যাহাতে ছাত্রীর সংস্কৃত ব্যাকরণের গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট আদ্য পরীক্ষা দিতে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ৮ম, ৯ম, ১০ম শ্রেণীতে যথাক্রমে গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট পুরাণের আদ্য মধ্য উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য, যথা—বাল্মিকী রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্-ভাগবত প্রভৃতির নির্ব্বাচিত অংশ এবং গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি পড়ান হইয়া থাকে। এতৎসঙ্গে বাংলাভাষা, ধাতৃবিদ্যা, চিকিৎসা, শিল্প, চিত্র ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের মধ্যে এমত বহু ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মেয়েদিগকে উচ্চশিক্ষা দিতে অভিলাষ করেন। আমরা তদ্রূপ উচ্চ শিক্ষারই পক্ষপাতী যে শিক্ষা পাইয়া মেয়েরা ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারে এবং হিন্দু নারীর কর্ত্তব্য পরিজ্ঞাত হইয়া গৃহকে শান্তিময় করিয়া গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা হইতে পারে। পুরুষের শিক্ষণীয় বিষয় হইতে মেয়েদের বহুবিষয় স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা বিদ্যালয়সমূহে প্রায়শঃ তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। এই সকল চিন্তা করিয়া বালিকা-দিগকে এইভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এক্ষণে জন-সাধারণের সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি পাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। বর্ত্তমান বর্ষে বালিকার সংখ্যা প্রায় ২৫০।

সুখের বিষয় বর্ত্তমান বর্ষে এই বিদ্যালয় হইতে ৪টী বালিকা ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ৩টী উত্তীর্ণ হইয়াছে: শ্রীমতী বিজনবালা সেন, শ্রীমতী কনকলতা বসু, শ্রীমতী নির্ম্মলপ্রভা ঘোষ। ২টী বালিকা পুরাণের আদ্য পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের নাম—শ্রীমতী নমিতা দেবী, শ্রীমতী লীলা দেবী।

প্রথম বর্ষের ফল দেখিয়া প্রত্যেকেই উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, আশা করি এই সকল শ্রেণীতে ক্রমশঃই বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে।

বিদ্যালয়ে ৮ জন শিক্ষক ও ৬ জন শিক্ষয়িত্রী শিক্ষকতার কার্য্য করিতেছেন।

ধর্ম্মরক্ষিণী সভার ১৩৩৬ সনের বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব

আয়

ধর্ম্মরক্ষিণীর বার্ষিক চাঁদা	১৩৮৲
বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে চাঁদা	২৩৲
কামিনীসুন্দরী চতুষ্পাঠীর সাহায্য (বাবু রমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী)	৬০০০৲
ডেলাইটের তৈল ইত্যাদি খরচ বাবদ খরচা	
বাদ লোন অফিসে টাকা গচ্ছিত তাহার সুদ	১৫৲
হাওলাত আদায় শ্রীযুক্ত শশীভূষণ রায়	৩৲
বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে চাঁদা আদায়	২৯১॥৴০
সরস্বতী পূজা উপলক্ষে চাঁদা আদায়	৬১॥৵০
সংস্কৃত পরীক্ষার চাঁদা	১২৲
	১১৯৪।/০

ব্যয়

ধর্ম্মরক্ষিণী সভার নানাবিধ ব্যয়	৩৪৻৬
কামিনীসুন্দরী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বৃত্তি	৩৬০৲
কামিনীসুন্দরী চতুষ্পাঠীর ছাত্র বৃত্তি	১৭২৷৵৯
চতুষ্পাঠীর নানাবিধ খরচ	৪৷৵৯
পুস্তক খরিদ	৮৶৹
সভার বার্ষিক উৎসব ও লক্ষ্মীনারায়ণ পূজার খরচ	২০৷৶৹
কীর্ত্তনের বাবদ ব্যয়	১৫৬৲
বক্তার জন্য ব্যয়	১০৪৷৶৹
উৎসব উপলক্ষে নানাপ্রকার ব্যয়	৪৯৻৩
সভার পিওনের বেতন	১০২৸৶৹
সভা পরিষ্কার করা বাবদ ভুঞ্জমালীর বেতন	৫৲
ছোট চৌকি খরচ	১৩৲
সরস্বতী পূজার ব্যয়	৬২৶৯
সংস্কৃত পরীক্ষা উপলক্ষে ব্যয়	১৬৻৬
মোট	১১১০৸৶৬

(কাশীপুর নিবাসী—বরিশাল)

জলকষ্ট নিবারণ

জেলা মালদহের অধীন খরবা, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার এলাকায় ভয়ানক জলকষ্ট হইয়াছে। জলাভাবে ধান্যাদি প্রায় শুষ্ক হইতেছে। বৃষ্টির অভাবে ভাদই ধান্য মারা গিয়াছে এবং জলাভাবে পাট পচান বন্ধ আছে, পাটও শুষ্ক হইতেছে। এই সমস্ত দুঃখ নিবারণ জন্য বিরুয়া ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ মহিউদ্দীন আহম্মদ এম, এ, বি, এল মহোদয় উদ্যোগী হইয়া সুদূর মহানন্দা নদী হইতে একটী ডারা খনন করাইয়া উক্ত থানার অন্তর্গত ভবানীপুর বহোর, কাপায় চণ্ডীপুর, ঘয়োট, ভক্তিপুর, আজারমণি ইত্যাদি প্রায় ২৫।৩০ খানি গ্রামের কতক পরিমাণে জলকষ্ট নিবারণ করাইয়াছেন। এইরূপ চাঁচল রাজ ষ্টেট হইতে ও হরিশ্চন্দ্রপুর ষ্টেট হইতে কর্তৃপক্ষগণ উদ্যোগী হইয়া আরও ২।১টী ডারা খনন করাইয়া দিলে বহু প্রজার জলকষ্ট নিবারণ হইত। (মালদহ সমাচার)

বর্দ্ধমানের আর্থিক ভাঙ্গনগড়ন

(১) কালনায় জলের কল

অদ্য কালনা মিউনিসিপ্যালিটীর জলের কলের বিষয় আলোচনার জন্য এক সভ হইবে। প্রকাশ এই যে কালনার গেয়া ঘাট ৩০ বৎসরের জন্য বন্ধক রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে ৬০ হাজার টাকা ঋণ লওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট ৩৩ হাজার টাকা সাহায্য করিবেন এবং বাকী ৭ হাজার টাকা স্থানীয় ভদ্র লোকগণের নিকট হইতে চাঁদা তোলা হইবে। এই জলের কল হইতে কালনা সহরের সর্ব্বত্র জল-সরবরাহ করা হইবে এবং তজ্জন্য উপস্থিত যে স্থানে নলকূপ আছে তাহার নিকটেই আর একটী ৭ইঞ্চি মোটা নলকূপ বসান হইবে।

যদি এক লক্ষ টাকা খরচ করা হয় তবে ঐ টাকা সব মাটীতে না গাড়িয়া গঙ্গা হইতে জল লইয়া ফিল্টার করিয়া দিলেই ভাল হয় নাকি? কারণ নলকূপের স্থায়িত্ব কতদিন তাহা এখনও ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। নলকূপ একবার খারাপ হইলে বহু টাকা সেই সঙ্গেই মাটীতে পোতা থাকিয়া যাইবে না কি? আর যদি ঐরূপ স্কীমই গ্রহণ করা হয় তবে উপস্থিত যে ইঞ্জিন বয়লার বা ট্যাঙ্ক আদি আছে উহা বাতিল হইয়া যাইবে। যে ২টী ট্যাঙ্ক এক্ষণে ব্যবহৃত হইতেছে উহা হাল্কা জিনিষ, বেশী জলের চাপ বহু দিন সহ্য করিবে না নিশ্চয়ই।

আর একটা কথা যে মিউনিসিপ্যালিটী এত বড় একটী স্কীম গ্রহণ করিতে যাইতেছেন অথচ যাহারা ঐ বিষয়ের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট করদাতাদের একবার মতামত গ্রহণ করা হইল না।

এই জলের কল হইলে উহার বার্ষিক খরচ অনুমান ১০।১২ হাজারের কম হইবে না। ঐ টাকার জন্য নিশ্চয়ই কর ধার্য্য হইবে। উপস্থিত কালনার সমস্ত ব্যবসায় মন্দা, কোন রকমে লোকে দুবেলা অন্ন যোটাইতেছে। যে ট্যাক্স আজ করদাতাগণকে দিতে হইতেছে তাহাতেই তাহারা জর্জ্জরিত। তাহার উপর আবার করভার চাপিলে লোকে দিতে পারিবে ত? যে সহরে

বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সমেত লোক সংখ্যা ৮০০০ মাত্র, সেই সহরে বাৎসরিক ১০।১২ হাজার টাকা (রানিং কষ্ট.) খরচ জোগাইতে মাথাপিছু ১॥০ হারে ট্যাক্স জোগাইবার ক্ষমতা করদাতাদের আছে ত ?

হয় ত দেশের জনকতক বড়লোকের ইহাতে সুবিধা হইতে পারে এবং ট্যাক্স জোগাইতে কষ্ট না হইতে পারে ; কিন্তু সংখ্যায় অধিক মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকেরা কি ঐ শ্বেতহস্তী পোষণ করিবার মত ক্ষমতা রাখে বলিয়া সহরের কর্ত্তৃপক্ষগণ মনে করেন ?

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জলের কলের স্কীম গ্রহণ করার পরেই যে "ড্রেনেজ" স্কীম গ্রহণ করিতে হইবে তাহার জন্য সহরের "মা বাপেরা" তৈয়ারী আছেন ত ?

নিজের বল বুঝিয়া যদি লোকে কাজে নামে তবে তাহাতে পশ্চাদপদ হইতে হয় না ; কিন্তু নিজের বল সম্বন্ধে বিবেচনা না করিয়া কাজে নামিলে প্রায়ই বিফল হইতে হয়। শুধু তাহাই নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা শক্তিরও অপব্যয় হয়। এজন্যই আমরা মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণকে একটু অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শিক্ষিত ও বিজ্ঞেরাই আজ সহরের কর্ণধার। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন "যে কাজ করিয়া ভাবা" অপেক্ষা "ভাবিয়া কাজ করা" ভাল। (পল্লীবাসী—কালনা)

(২) কালনায় জলের কল

গত সংখ্যায় জলের কল সম্বন্ধে লিখিবার পর আমরা জানিলাম যে, গভর্ণমেণ্ট হইতে যে ১ লক্ষ টাকার জলের কলের স্কীম গ্রহণ করাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। উপস্থিত যে জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা আছে তাহার ক্রমশঃ সম্প্রসারণ করাই উদ্দেশ্য। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ উক্তরূপ ব্যয়বাহুল্যযুক্ত স্কীম গ্রহণ না করিয়া বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা সহরবাসীর প্রকৃত হিতৈষীর কার্য্যই করিয়াছেন।

(৩) ভবিষ্যৎ কালনা

গঙ্গার জল এবার অন্য বার অপেক্ষা বেশী বাড়িয়াছে। এখনও জল কমা সুরু হয় নাই, ইহারই মধ্যে পাথুরিয়া মহলের মোড়ে যে শালের রলা বাঁশ দিয়া বাঁধা হইয়াছিল তাহার কতক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাঁধনের ভিতর দিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। ফলে ইহারই মধ্যে ২।৪ চাপ মাটী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জল কমা আরম্ভ হইলে যে কি হইবে তাহা বলা যায় না।

যদি পাথুরিয়া মহলের মোড়ের রাস্তাটী ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে গঞ্জে গাড়ী যাতায়াত একদম বন্ধ হইবে। পুরাতন গঞ্জ, ডালহারা মহল, মহিষমর্দ্দিনী তলা প্রভৃতির মহাজনগণ ইহারই মধ্যে নিভুজি ও পুরাতন হাটে আড়ত স্থাপন করিয়াছেন।

ভবিষ্যতে পুরাতন গঞ্জে গাড়ী যাতায়াত বন্ধ হইলেই নিভুজি ও পুরাতন হাট ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে। ফলে ব্যবসাদার ও কয়াল, মুটীয়া, গাড়োয়ান প্রভৃতি ঐ অঞ্চলে গিয়া বসবাস করিলে মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্স ও গোগাড়ীর লাইসেন্স বাবদ বহু টাকা আয় ঘাটতি পড়িবে।

ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই ষ্টীমার কোম্পানী পুরাতন হাটে ষ্টীমার ষ্টেশন খুলিয়াছেন।

আজ নয় বৎসর হইতে নিভুজি ও পুরাতন হাটকে মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে, অথচ এখনও সে বিষয়ে কাজ কিছুমাত্র অগ্রসর হইল না।

যদি কালনাকে বজায় রাখিতে হয় তবে অবিলম্বে নিভুজি ও পুরাতন হাটকে কালনা মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত করিবার যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়া আছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা আবশ্যক।

গঙ্গার ভাঙ্গনের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এবৎসর গঞ্জ রক্ষা পাইলেও ভবিষ্যৎ যে ভাল নয় তাহা দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই বুঝেন। যাহাতে মিউনিসিপ্যালিটি বজায় থাকে এবং সহরের যে সমস্ত উন্নতির প্রস্তাব চলিতেছে তাহা সাধিত হয় তাহার জন্যও এবিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা এজন্যই মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ ও সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে চেষ্টিত হইতে অনুরোধ করি।

(৪) কৃষি-সংবাদ

(ক) এবার আমন ধানের আবাদ একরূপ ভালয় ভালয় শেষ হইল। জলের টান না পড়িলে এবারকার ফসল ভাল হইবারই সম্ভাবনা। পাটের দর যাহা উঠিয়াছে তাহাতে আবাদ খরচ উঠিবে না। ফলে চাষীর এবার সমূহ লোকসান। এবারে চাষী যে শিক্ষা পাইল তাহাতে যদি ভবিষ্যতে আর পাটের চাষ না করে তবেই এ শিক্ষা সার্থক হইবে।

(খ) এবারকার আমন ধানের আবাদ একরূপ শেষ হইল। জলের টান বড় কোথাও নাই। এখন শেষ রক্ষা হইলেই মঙ্গল।

পাটের এবার আর দর নাই। কালনা মোকামে ৩৷৷০ টাকা পাটের দর। কাজেই অনেক পাট-চাষী এবার আর জমি হইতে পাট কাটিয়া খরচ বাড়াইবে না। জমির পাট হয় ত বা জালানি কাষ্ঠের কাজ করিবে।

ধানেরও দর নাই। ইহার উপর আউশের আমদানি হইলে দর একেবারেই নামিয়া যাইবে। যে সকল চাষী এবার আখের চাষ করিয়াছে তাহারা এ বৎসর কিছু লাভ পাইতে পারে।

মহকুমায় আলুর চাষ বড় কম নহে, কিন্তু বৎসর বৎসর পোকা ধরিয়া বহু আলু নষ্ট হইয়া চাষার ক্ষতির কারণ হইতেছে। সরকারী কৃষি-বিভাগে লিখিয়াও ইহার প্রতিকারের কোন চেষ্টাই হয় নাই। আগামী আলুর চাষের সময় কৃষি-অভিজ্ঞের সহায়তা আলু-চাষীমাত্রেই কামনা করে।

জলপাইগুড়ির আর্থিক খবর

(১) দেবীগঞ্জে বৃষ্টি

জনসাধারণের দীর্ঘদিনের আকুল প্রার্থনার পর এ অঞ্চলে কিছু বৃষ্টিপাত হইয়াছে। ৬ই ভাদ্র রাত্রিতে প্রায় ৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় এবং তারপর ১০।১২ দিন যাবৎ প্রায় প্রতি দিন অল্পাধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বৃষ্টি অনেক কম হইলেও আবাদের উপযোগী বৃষ্টি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বিলান জমি ব্যতীত ডাঙ্গা জমি আবাদের মত বৃষ্টি না হইলেও দুঃখের কারণ নাই। আবাদের সময় প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিলান জমিই সম্পূর্ণ এখন আবাদ হইতে পারিবে না। চারি আনা—বড় জোড় ছয় আনা পরিমাণ ভূমিতে এবার হৈমন্তিক ধান্য রোপণ চলিতে পারে আশা করা যায়। যাহা আবাদ হইবে নিতান্ত অসময়ের জন্য তাহার ফলনও নিতান্ত কম হইবে। মোটের উপর এবারকার আবাদের অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক।

(২) পাট

পাটের মূল্য ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে পাট কাঁচি মণ ৩৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত বিকাইত, বর্ত্তমানে তাহা ২৷৷০ টাকার বেশী দরে বিকায় না।

(৩) স্বাস্থ্য

দেবীগঞ্জ বন্দর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে বেয়ারাম পীড়ার প্রাদুর্ভাব বড় বেশী। প্রায় প্রতি বাড়ীতে রোগী; আবার অনেক বাড়ীতে সকল লোকই একযোগে শয্যা আশ্রয় করিয়াছে। পথ্যাপথ্য দিবার বা ঔষধপত্র আনিবার লোকেরও অভাব।

(৪) সহরের স্বাস্থ্য

এবার সহরের অনেক পাড়ায় ড্রেন পরিষ্কার করিয়া জল-চলাচলের ব্যবস্থা না হওয়ায় অনেক বাসার জল বৃষ্টির পর বাহির হইতে পারিতেছে না। ফলে, বহুজন সহরবাসীর স্বাস্থ্যহানির কারণ হইতেছে। এ বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য।

(৫) সহরের পায়খানা

সে দিন আমরা দেখিতে পাইলাম নূতন পাড়ায় ৪ কাঠা জমিতে দুইখানা বাসা তৈয়ার হইতেছে এবং এই বাসায়

পায়খানা শয়ন ঘরের সহিত লগ্ন এবং ৩৪ হাত দূরেই আর একটী শয়ন ঘর। পায়খানা তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটীর অনুমতি লইতে হয়। এই পায়খানা তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটী অনুমতি দিয়াছিলেন কি? এরূপ স্থলে অন্ততঃ স্যানিটারী প্রিভি যাহাতে স্থাপিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য।

(৬) প্রবল বর্ষা

বর্ষা নামিয়াছে। গত বৃহস্পতিবারে করলা নদীতে ভীষণ ভাবে জল বাড়িয়া দুই ধারে ধোপাপট্টি, বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখ, হাঁসপাতাল প্রভৃতি স্থানে জল উঠিয়াছিল। তৎপরদিন শুক্রবারে জল বাড়িয়া বাজারের মধ্যে জল উঠিয়াছিল।

(৭) বন্যার দৃশ্য

গত বৃহস্পতিবার করলার জল বাড়িয়া দুইপাশে কিছুদূর পর্য্যন্ত জল উঠে কিন্তু শুক্রবার দিবস ভোর হইতে জল আরও বেশী বাড়িতে থাকে; ফলে ধরধরা পুল হইতে রায়কতপাড়ার ৺কালীবাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় হাটু জল হয়, মেডিক্যাল স্কুলের সম্মুখে এবং নর্দ্দার্ণ বেঙ্গল, জলপাইগুড়ি টী কোম্পানী লিমিটেডের অফিসের সম্মুখে কোমড় পর্য্যন্ত জল হয়। দিনবাজারের পুল হইতে থানা পর্য্যন্ত নদীর ধারের রাস্তা জলে ডুবিয়া যায়, আর্য্য নাট্য সমাজ প্রাঙ্গণ ডুবিয়া ঘরে জল উঠে। লোহার পুলের নিকটে শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন চন্দ মহাশয়ের বাসার নিকট হইতে দোলনা পুল পর্য্যন্ত সমস্ত মাঠ জলমগ্ন হয়। নিকটবর্ত্তী বাসাসমূহে হাঁটুজল উঠে। এই জলদৃশ্য দেখিবার নিমিত্ত বহু জনসমাগম হয়। হাঁসপাতাল ও জেলখানার সম্মুখে নৌকা চলাচল দেখা গিয়াছিল। মধ্যাহ্ন হইতে জল নামিতে আরম্ভ হয়।

(৮) সোনাহারে অনাহারে আত্মহত্যা

সোনাহার গ্রামে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। জনৈক বৃদ্ধা খাদ্য-সংগ্রহে অনন্যোপায় হইয়া শেষে আত্মহত্যা করিয়া সকল অভাবের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে। সোনাহার গ্রামের মৃত পেল্লা বর্ম্মণের বিধবা স্ত্রী ভুন্দু বর্ম্মণী গত ৩০শে জুলাই তারিখে রাত্রিতে তাহার বাড়ীর নিকট পাটক্ষেতে একটি জিকা গাছে ফাঁসি লটকাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। উক্ত বিধবার বয়স অনুমান ৬০।৭০ বৎসর। বৃদ্ধার ৩টী ছেলে আছে তাহারা মজুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এ বৎসর লোকের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে পয়সা দিয়া কেহ মজুর রাখে না। বৃদ্ধা ধার কর্জ্জ করিয়া লোকের বাড়ী চাহিয়া কিছু দিন হইতে অতিকষ্টে অর্দ্ধাহারে অনাহারে জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া আহার সংগ্রহ করিতে না পারিয়া একরূপ অনাহারে দিন যাপন করিতেছিল। প্রকাশ যে, ঘটনার তিনদিন পূর্ব্ব হইতে বিধবাটী উপবাসে দিন কাটাইয়াছে।

(৯) আবাদ

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর নিতান্ত অসময়ে সামান্য বৃষ্টিপাত দেখিয়াও জনসাধারণের একটু আশা জন্মিয়াছিল যে, কিছু ধান্য রোপণ হয়তো চলিবে। কিন্তু সে আশা প্রায় বিলুপ্ত। দশ বার দিন যাবৎ আবার প্রখর রৌদ্র দেখা দিয়াছে। জমিতে যে জল জমিয়াছিল তাহা শুকাইয়া যাইতেছে। জমির জল শুকাইয়া যাওয়ায় রোপণ-কার্য্যে বাধা জন্মিয়াছে এবং যে সমস্ত জমিতে রোপণ হইয়াছে তাহাতে চারা জলাভাবে লাল হইয়া যাইতেছে। ডাঙ্গা ও সহরী জমিতে এবার রোপণ মোটেই চলিবে না। দহলা জমির মধ্যে যেগুলি বড় বড় বিলের একেবারে তলদেশে অবস্থিত অর্থাৎ যে সমস্ত বিলান জমিতে অন্যান্য বৎসর অতিরিক্ত জল থাকাতে আবাদ চলিত না সেগুলিতে এবার কিছু রোপণ-কার্য্য হইতে পারে মাত্র। যে সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছে তাহাও দেবীগঞ্জ এলাকার সর্ব্বত্র সমান ভাবে হয় নাই দেখা যায়। অনেক স্থানে জমিতে মোটেই জল জমে নাই। এবার আবাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া জনসমাজ বিপদ গণিতেছে।

(১০) ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ

বেয়ারাম পীড়া এবার ক্রমশই বিস্তার লাভ করিতেছে। যাহারা ভাল ছিল তাহারাও একে একে বিছানায় আশ্রয় লইতেছে। এবার জ্বর বড়ই যন্ত্রণাদায়ক দেখা যায়। চিকিৎসক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এবারকার প্রায় চৌদ্দ আনা রোগী ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত। বেয়ারামের তাণ্ডবলীলার দৃশ্যে জনসাধারণের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে।

(১১) পূজার গাড়ী

গতকল্য সকালে পূজার বাজার গাড়ী স্থানীয় রেল ষ্টেশনে পৌছিয়াছিল। সারাদিন কেনা বেচা করার পর রাত্রে বায়স্কোপ দেখাইয়া, শেষরাত্রে চলিয়া গিয়াছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল, বি সরকারের গহনার দোকান, পাঞ্জাব সোপ ফ্যাক্টরী, এলুমিনিয়মের দোকান, আর খান দুই কাপড়ের দোকান গাড়ীতে ছিল। দর্শকের সংখ্যা এবার বড় কম, ক্রেতাতো আরও কম। মানুষের আর্থিক অসচ্ছলতাই ইহার প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ, বাজার গাড়ীর মালের দাম এখানকার তুলনায় মোটেই সস্তা নহে। তারপর এখানে পাওয়া যায় না এমন কোন জিনিষও গাড়ীতে নাই।

কেনার মধ্যে দেখিলাম এলুমিনিয়মের জিনিষ লোকে কিছু কিছু কিনিতেছে। বিলাতী যত আপদ আমাদের পাইয়া বসিয়াছে, এই এলুমিনিয়ম তার মধ্যে একটি। তামা পিতল, কাঁসা কিনিলে যা হোক কিছু মূল্যবান্ জিনিষ মানুষের ঘরে থাকিয়া যায়; তার পরিবর্ত্তে প্রায় সমান দাম দিয়া এই সকল খোলা খাপড়ার মত জিনিষ লোকে কিনিতেছে; দুরদৃষ্ট আর কারে বলে?

বাজার গাড়ীর উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা কি আমার বুঝিতে অক্ষম। গাড়ী আসে হুজুগ হয়, কিন্তু কেন আসে?

(ত্রিস্রোতা—জলপাইগুড়ি)

পূজার বাজার

কলিকাতার বাজারে এবার পূজার ভিড় নাই বলিলেই হয়। অন্য বার এমন সময় কলিকাতার দোকানসমূহে খরিদ্দারের বিপুল ভিড় লাগিয়া থাকে; সহরের লোক ত' আছেই, তাহার উপর মফঃস্বল হইতেও লোক আসিয়া পূজার বাজার করিয়া যায়। পূজার একমাস পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ পূজার বাজার জমিয়া উঠে। এবার বোধনের বাদ্য বাজিয়াছে, পূজার আর মাত্র কয়দিন বাকী, কিন্তু এখনও বাজারে ভিড় নাই। সহরে যেমন মফঃস্বলেও ঠিক তেমনি অবস্থা। ম্যালেরিয়ার পীড়নে বাঙ্গালার প্রজাকুল প্রাণহীন প্রায়। আধিব্যাধির নিত্য নিপীড়ন ত' আছেই, তাহার উপর বন্যাদি বিপত্তিরও অভাব নাই। এবার পাটের বাজার একেবারেই মন্দা; পূজার বাজার মন্দার তাহাও একটা কারণ। পাট-চাষীরা পাট বেচিতে পারে নাই বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। এদিকে কাপড় পোষাক ও অন্যান্য বিবিধ পণ্যের ব্যবসায়ীরাও খরিদ্দার পাইতেছে না বলিয়া চোখে সরিষার ফুল দেখিতেছে। সারা বৎসরের বেচা-কেনায় যাহা না হয়, এক পূজার বাজারেই তাহা হইয়া থাকে। কিন্তু এবার সেই পূজার বাজারই বন্ধ। সুখের বিষয়, এই মন্দা বাজারেও যে সামান্য বেচা-কেনা হইতেছে, তাহাতে বিদেশী দ্রব্যের স্থান নাই।

(বঙ্গবাসী)

কলিকাতায় বাড়ী-ভাড়া

প্রজাসমিতির উদ্যোগে গত রবিবার টাউন হলে এক সভা হইয়াছিল; বাড়ী ভাড়ার উচ্চহারের প্রতিবাদ করাই ইহার উদ্দেশ্য। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। খাঁ বাহাদুর আসাদুজ্জমান, মৌলানা আক্রাম খাঁ, ডাক্তার মরেণো প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, বাড়ী-ভাড়ার হার কমাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা

হিসাবে ভাড়ার হার কমাইয়া দেওয়া হউক, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। ডাক্তার মরেণো প্রস্তাব করিয়াছিলেন,—"কলিকাতার বাড়ী ভাড়ার উচ্চ হারের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টকে ঐ বিষয়ে অবিলম্বে তদন্ত করিতে অনুরোধ করা হউক।" এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তদন্ত করিবেন কি? ইতিমধ্যেই দুই পক্ষের দুই মতের সুর উঠিয়াছে। ভাড়াটিয়ারা বলিতেছেন,—সকল জিনিষেরই যখন দাম কমিয়াছে তখন বাড়ীর ভাড়াই বা কমিবে না কেন? বাড়ীওয়ালার দল বলিতেছেন, আমরা অন্য কাজে টাকা খাটাইলে যে হারে সুদ পাইতাম, বাড়ী ভাড়া হইতে তাহাও পোষায় না, অতএব আমরাই বা ভাড়া কমাইতে যাইব কেন? ফলে, দেখা যাইতেছে,—টান ও যোগানের নীতিই কেবল এই সমস্যার মীমাংসা করিতে সমর্থ। গরজ লইয়া কথা। ভাড়াটিয়ারা যদি বাড়ী ছাড়িয়া উঠিয়া যায়, তাহা হইলেই বাড়ীওয়ালারা ভাড়া কমাইবার কথা ভাবিয়া দেখিবেন, নতুবা নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি আইন করিয়া ভাড়ার হার কমাইয়া দেন, তাহা হইলেও তাহা যে কাজের হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। তবে আমাদের মনে হয়, বাড়ীওয়ালারা বিশেষ জেদ ধরিলে ভুল করিবেন। কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে এবং আরও নানা স্থানে বহুসংখ্যক নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে ও হইতেছে। সে সব বাড়ীর ভাড়ার হার অপেক্ষাকৃত অল্পও বটে। বাড়ীওয়ালাদের বিশেষ জেদ দেখিলে অনেক ভাড়াটিয়াই সেই সব বাড়ীতে উঠিয়া যাইবে। তখন অনেক বাড়ীই যে খালি পড়িয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা বড়লোক, তাঁহারা না হয় কিছু দিন বাড়ী খালি ফেলিয়া রাখিতে পারেন; কিন্তু তাহাই বা কত দিন? মধ্যবিত্ত বাড়ীওয়ালাদের বাড়ী-ভাড়া বন্ধ হইলে কষ্টভোগ অবশ্যম্ভাবী। বাড়ীওয়ালারা যদি ভাড়ার হার সামান্য কিছুও কমাইয়া দেন, তাহা হইলেও ভাড়াটিয়ারা সন্তুষ্ট হইবে এবং তাঁহাদের আয় বিশেষ কমিয়া যাইবে না।

(বঙ্গবাসী)

বাংলায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর হিসাব

নিম্নের তালিকায় বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর হিসাব পাওয়া যাইবে। জলে ডোবা ও সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। ১৯২৯ সনে কতকগুলি জেলায় প্রবল বন্যা না হওয়াই এই সংখ্যা-হ্রাসের কারণ বলিয়া মনে করা যায়।

আত্মহত্যা :—	১৯২৮	১৯২৯
পুরুষ	১,২৪১	১,২৯০
স্ত্রীলোক	১,৯২৬	১,৯৩৩
শিশু	৫৫	৩৪
	৩,২২৫	৩,২৫৭

জলে ডুবিয়া :—	১৯২৮	১৯২৯
পুরুষ	১,১৫৮	৯৬৭
স্ত্রীলোক	১,০৩৯	৮৭২
শিশু	৬,৮১৫	৬,৪৩৭
	৯,০৩২	৮,২৭৬

সর্পাঘাতে :—	১৯২৮	১৯২৯
পুরুষ	১,৫১৭	১,৩৬৪
স্ত্রীলোক	১,৮৭১	১,৫১১
শিশু	১,০১১	৮১৪
	৪,৩০৯	৩,৭০৯

বন্য বা মত্ত পশুদ্বারা নিহত :—	১৯২৮	১৯২৯
পুরুষ	৮৫	৪৮
স্ত্রীলোক	৪৫	১৩
শিশু	১১১	৮৬
	২৩৮	১৪৭

অট্টালিকা হইতে পতনে :—	১৯২৮	১৯২৯
পুরুষ	১৩৫	১৩৩

স্ত্রীলোক	৩১	৫৬
শিশু	৫৩	৫১
	২২৫	২৪০
অন্যান্য কারণে :—	১৯২৮	১৯২৯
পুরুষ	১,১৪৮	১,০৮১
স্ত্রীলোক	৫১১	৫০৯
শিশু	৫৮৯	৫৩৩
	১,২৪৮	২১২৩
মোট সংখ্যা :—	১৯২৮	১৯২৯
পুরুষ	৫,২৮১	৪,৮৮৩
স্ত্রীলোক	৫,৪২৯	৪,৯১৪
শিশু	৮,৬৫৪	৭,৯৫৫
	১৯,৩৬৪	১৭,৭৫২

শান্তিপুর মিউনিসিপালিটি

নদীয়া জেলার শান্তিপুর অনেকদিন হইতেই একটি মিউনিসিপাল টাউন বলিয়া পরিচিত। একজন সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন,—"শান্তিপুর মিউনিসিপালটির এলাকায় প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের বাস। তাহার মধ্যে করদাতার সংখ্যা মোটামুটি পাঁচ ওয়ার্ডে দশ হাজার। বে-সরকারী চেয়ারম্যানের শাসনে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই এই মিউনিসি-পালিটির কাজ চলিয়া থাকে। কিন্তু ইহার সকল কাজেই অব্যবস্থা এত অধিক যে, তাহার আলোচনাও শান্তিপুরবাসীর পক্ষে কলঙ্কজনক। এমন উপেক্ষিত মিউনিসিপাল সহর বোধ হয় এদেশে আর কোথাও নাই। রাস্তাঘাট সংস্কারা-ভাবে জীর্ণ; রাত্রিতে আলোর ব্যবস্থা নাই, রাস্তাঘাট পরিষ্কার হওয়াত দূরের কথা, পায়খানা পরিষ্কারও রীতিমত হয় না। কোথাও একদিন, কোথাও দুইদিন অন্তর ময়লা সাফের ব্যবস্থা। মেথরেরা তাহাও করে না; তাহাদের খেয়াল মত কোথাও ৪ দিন কোথাও ৫ দিন অন্তর এক একবার দেখা দিয়া থাকে। ফলে, তোলা পায়খানার পচা ময়লার দুর্গন্ধে পথে চলা দায়। তাহার পর ক্রমেই সহর জঙ্গলে ভরিয়া উঠিতেছে। মিউনিসিপালিটির এ সব দিকে একেবারেই দৃষ্টি নাই। চোর-পুকুরে ছিপে মাছ ধরিতে দেওয়া হইবে কিনা, তাঁহারা তাহার মীমাংসা করিতেই ব্যস্ত। চোরপুকুর মিউনিসি-পালিটির 'রিজার্ভ ট্যাঙ্ক'; বহু লোক নিত্য এখান হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া থাকে। ছিপে মাছ ধরিতে দিলে চার পচার ফলে পুকুরের জল খারাপ হইবে এবং সেই জল পানের ফলে বহু লোক ব্যাধিগ্রস্ত হইবে, ইহা নিশ্চয়। ছিপের ভাড়া বাবদ মিউনিসিপালিটির যে সামান্য আয় হয়, এতগুলি লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে তাহার লোভ কি ত্যাগ করা চলে না? এণ্টিম্যালেরিয়া সোসাইটিরও আর সাড়া-শব্দ নাই। পূর্ব্বে তাহারা ড্রেণে ও ডোবায় কিছু কিছু কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিতেন, দুই একটা বন-জঙ্গলও কাটিতেন, তাহাতে প্রকৃতই কিছু উপকার হইত। কিন্তু এখন তাঁহারাও মিউনিসিপালিটির কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সহরের স্বাস্থ্য-সুখের গঙ্গা-যাত্রার সুগমতা-সাধনে সহায়তা করিতে কৃতসংকল্প! হাতে হাতে তাহার ফলও ফলিয়াছে। শান্তিপুরে এবার বর্ষার প্রারম্ভ হইতেই পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে পীড়িতের আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষাই সকল মিউনিসিপালিটির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

(বঙ্গবাসী)

ঢাকা মেল ট্রেন দুর্ঘটনা

কলিকাতা হইতে ৭২ মাইল দূরে বাণপুর ও দর্শনা রেল ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক ভীষণ শোচনীয় রেল দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ৭নং আপ ঢাকা মেল রাত্রি ১০-২৪ মিনিটের সময় শিয়ালদহ হইতে গোয়ালন্দের দিকে যাত্রা করে। এই মেল ট্রেণখানা বাণপুর দর্শনার মধ্যে একটা খালের উপরিস্থিত পুলের উপর দিয়া যখন অগ্রসর হইতে থাকে তখন সহসা ইঞ্জিন ও কয়েকখানা গাড়ী লাইনচ্যুত হয় এবং একখানা গাড়ীর কতকাংশ পুলের উপর হইতে খালের জলে পড়িয়া যায়। আর কয়েকখানা গাড়ী উল্টাইয়া যায়। রাত্রি তখন ১টা, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার। বিপন্ন ও আহত যাত্রিগণের চীৎকারে পার্শ্ববর্ত্তী

গ্রামের লোক দলে দলে আলো লইয়া অগ্রসর হয়। তাহারা আসিয়া বহু যাত্রীকে উদ্ধার করে। এ পর্য্যন্ত চারিজন হত এবং ৫৪ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। নিমজ্জিত গাড়ীখানা উদ্ধার করিবার চেষ্টা চলিতেছে। উহা উত্তোলিত হইলে পরে জানা যাইবে যে আরও কেহ হত হইয়াছে কি না। সংবাদ পাইবামাত্র কলিকাতা হইতে ডাক্তার এবং রেল-কর্ম্মচারিগণও ঘটনাস্থলে গিয়া আহতদের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। কিরূপে এই দুর্ঘটনা হইল এখনও তাহা জানা যাই।

যে ৫৪ জন আহত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৩৯ জনের আঘাত সামান্য। ইহাদিগকে তখন ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহারা যাহার যেখানে যাইবার কথা সেখানে চলিয়া যান। বাকী ১৫ জনের আঘাত অপেক্ষাকৃত বেশী। উহাদিগকে হাঁসপাতালে পাঠান প্রয়োজন হয়। ঘটনাস্থলেই ইহাদিগকে ঔষধ দিয়া ৮ জনকে কাঁচড়াপাড়া হাঁসপাতালে, ২ জনকে কলিকাতা ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে ও ৫ জনকে রাণাঘাট হাঁসপাতালে পাঠান হয়।

কাঁচড়াপাড়া হাঁসপাতালে যাঁহারা গিয়াছেন তাহাদের নাম ও ঠিকানা—(১) মৌলবী সাদত আলী খাঁর বাড়ীর সিরাজুদ্দীন আহাম্মদ, ১৩নং ওয়ালী উল্লা লেন, কলিকাতা। (২) লালসা, হাসানবাদ পোঃ নাগনগর (গ্রাম) ঢাকা। (৩) শেখ বরবাড়ী সাধু শেখরকান্দি, ঢাকা। (৪) ঢাকা গেণ্ডারিয়ার রাখালচন্দ্র রায়। (৫) রাখালচন্দ্র রায়ের পত্নী মৃণালিনী রায়। (৬) এন, দে, ঠিকানা জানা নাই। (৭) ঢাকা জেলার মালক্ষীর শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ গুহের পত্নী শ্রীযুক্তা মোক্ষদা সুন্দরী গুহ। (৮) যশোহর জেলার শ্রীপুর গ্রামের রোস্তম।

সরকারী তদন্ত

এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে রেলওয়ের প্রধান সরকারী ইনস্পেক্টর ও নদীয়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করেন। ইনস্পেক্টার রিপোর্ট দিয়াছেন যে, পূর্ব্ব হইতে এইরূপ ট্রেণ ধ্বংসের কল্পনা করা হইয়াছিল। ফিস্ প্লেট উঠাইয়া ফেলা হইয়াছিল। শেষ খবরে জানা যায় যে, ৪ জন হত এবং ৪২ জন আহত হইয়াছে।

(পঞ্চায়েৎ)

ঢাকা জেলা বোর্ড

আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর জেলাবোর্ডের সাধারণ অধিবেশনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও আলোচিত হইবে:—

১। ১৯৩০-৩১ সনে কালাজ্বর নিবারণের জন্য জিলা স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীর স্কীম।

২। পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের স্কীম আলোচনা।

ঢাকা জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানের পশু-চিকিৎসা "স্কীম"

জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এই সম্পর্কে একটি বর্ণনা বিগত পঞ্চায়েৎ কনফারেন্সে দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন গো-জাতির অবনতির মুখ্য কারণ চারিটী, যথা—

(১) রোগ (২) অপকৃষ্ট প্রজনন, (৩) অনুপযুক্ত ও অপুষ্টিকর আহার, (৪) অস্বাস্থ্যকর গো-শালা।

জিলা বোর্ড সমগ্র জিলার বার লক্ষ আট চল্লিশ হাজার একশত চারিটী গরুর জন্য মাত্র চারিটি গো-চিকিৎসক রাখিয়াছেন। মহামারীতে যখন প্রতি দিন শত শত গরু মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন চিকিৎসক আসিতে না আসিতেই গোশালা শূন্য হইয়া যায়। রিণ্ডার পেষ্ট, হিমরেজিক সেপটিসেমিয়া ও অন্যান্য মহামারী নিবার্য্য ব্যাধি। বিজ্ঞান বলিতেছে টীকা দ্বারা এই সকল রোগ হইতে পশুকুলকে রক্ষা করা যায়। অথচ চিকিৎসকের অভাবে আমাদের ঐশ্বর্য্য গোধন মৃত্যুর কবলগত। রয়েল কৃষি কমিশন একবাক্যে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ২৫,০০০ পশুর জন্য অন্ততঃ একজন পশুচিকিৎসক নিযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য। সেই নিয়মে ঢাকা জিলায় অন্ততঃ ৫০ জন চিকিৎসকের প্রয়োজন। ৪ জন পশুচিকিৎসক দ্বারা জিলার পশুচিকিৎসা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

প্রত্যেক পশু-চিকিৎসকের জন্য জিলা-বোর্ড গড়ে বার্ষিক ১৭০০৲ টাকা ব্যয় করেন। কাজেই মাসিক ব্যয় হয় ১৫০৲ টাকা। প্রত্যেক থানার এলাকায় এক একজন চিকিৎসক রাখাই মুখ্য স্কীম; কিন্তু অর্থাভাবে তিনটি থানা লইয়া বর্ত্তমান কার্য্য আরম্ভ করা স্থির হইয়াছে। প্রত্যেক থানায় গড়ে দশটি ইউনিয়ন বোর্ড ধরিলে তিন থানায় ৩০টি ইউনিয়ন হইবে। ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক বোর্ডকে মাসিক ৫৲ হারে দিতে হইবে। জিলা বোর্ডও এই কার্য্যে সাহায্য করিবেন। প্রজনন কার্য্যের জন্য একটি ষাঁড়ও রাখা হইবে। গবর্ণমেণ্ট এইজন্য মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য করিবেন। সমস্ত পশু চিকিৎসকের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য জিলার উপর একজন ইন্‌স্পেক্টার থাকিবেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার বেতন ও যাতায়াতের খরচ বহন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। জিলা-বোর্ড আফিস ও সাজসরঞ্জাম দিবেন। গোধন জাতির প্রধান সম্পদ্। উহার উন্নতি না হইলে এ দেশের উন্নতি সম্ভবপর নয়। গোধনের সংখ্যা-হ্রাসে ও দুর্ব্বলতায় একদিকে যেমন কৃষি কার্য্যের অবনতি ঘটিতেছে, অন্যদিকে বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাবে লোকের জীবনী-শক্তিও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, শিশুমৃত্যুর হারও বর্দ্ধিত হইতেছে। এদিকে মনোযোগী হওয়া দেশের লোকের প্রধানতম কর্ত্তব্য।

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

চা'র দর

(১১৷১২ আগষ্ট, ১৯৩০)

বাগান	মোট বাক্স	গড় দর	গত বৎসরের ঐ নং গড় দর
অমরাবতী	৮৬	×	
আমবাড়ী	১৬২	৷৷১১	৷৷/৯
আনন্দপুর	৪০	৷৷১০	৷৶০
আঞ্জুমান :—			
(মাকরাপাড়া)	৫৯	৷৷১১	৷৶৯
ইষ্টার্ণ	৬৫	৷৷১	৷৷/১১
কমলা	১৫৯	৷৷২	৷৶১
কোহিনুর	৯১	৷৷৮	৷৷/৮
কাঁটালগুড়ি	৬৮	৷৷/৩	
খয়েরবাড়ী	৯১	৷৷/০	৷৷৶১
গৌরনিতাই	২২	৷৷০	৷৵১১
গোপালপুর	১৮৫	৷৷৭	
গুরজংঝোরা	৭৫	৷৷৯	
গুড উইল	৭২	৷৵১১	
চামুর্চ্চি	৭০	৷৷৶১	৷৷৵১১
চনিয়াঝোরা	৮৭	৷৷১১	৷৷৶৫
জলঢাকা	১২৬	৷৷৪	৸৭
জলপাইগুড়ি	১২৪	৷৷৮	৷৷৶৪
ডায়না	১১৮	৷৷১০	
ঢেকলাপাড়া	৮০	৷৷৵৩	
দেবপাড়া	১৬৯	৷৷০	
নস্কালবাড়ী	৮০	৷৷০	৷৶১
নদীয়া	৯০	৷৷১১	
নর্দ্দারণ বেঙ্গল	৮১	৷৷২	৷৷২
নিউ আসাম	১১১	৷৷/২	৷৷৯
নর্থ ইষ্টার্ণ	৪৮	৷৵০	
পলাশবাড়ী	১৪১	৷৷৭	
	২৮	৷৵৫	
	১৩১	×	
বাতাবাড়ী	১১৪	৷৵৬	৷৷১১
বেঙ্গল ডুয়ার্স	৭৯	৷৷৪	৷৷/৫
ভাণ্ডাপুর	৬৭	৷৷৯	
ভুটান ডুয়ার্স :—			
(বীরঝোর)	৩৩	৷৶৩	
মনমোহিনীপুর	৭২	×	৷৷৵১
মালহাটী	৪৭	৷৵৭	
রামঝোড়া	১১৬	৷৷৪	
রহিমাবাদ	৯৬	৷৷/২	৷৷৵৭
লক্ষ্মী	৭১	৷৷৶১	৷৷/১০
শিকারপুর	৮১	৷৷/৩	
সারদা	১৩৪	৷৷/৬	৷৷৶৮, ৷৷৶২
সরস্বতীপুর	৭	৷৶০	

(ত্রিস্রোতা)

কলিকাতার বাজার দর

আটা ময়দা (প্রতিমণ)

পেটেণ্ট ময়দা	...	৬॥০—৬॥৵০
মিহি	...	৬৷০—৬৷৵০
গৃহস্থী	...	৬৲—৬৵০
বি আটা আসল	...	৬৷০—৬৷৵০
২নং আটা	...	৫৸০—৫৸৵০
আটা এস মার্কা	...	৫॥৵০—৫৸০
আটা ৩নং	...	৪৷০—৪৷৵০
সুজি	...	৬॥০—৬॥৵০

চাউল (প্রতিমণ)

দাদখানি	...	৮৲—৮৷০
বালাম	...	৬॥০—৬৸৵০
পাটনাই সিদ্ধ	...	৫॥০—৫৸৵০
বাঁকতুলসী	...	৬৷৵০—৬৸৶০
নাগরা	...	৪৸৵০—৫
কাজলা	...	৩॥৵০—৪৷৵০

ডাইল (প্রতিমণ)

মুগ	...	৮৷৵০
ছোলা	...	৫॥৵০
কলাই	...	৪৷৵০—৫॥৵০
অড়হর	...	৪৸০—৪৸৵০
মটর (সাদা)	...	৫৷০
মসুর	...	৬॥০—৬॥৵০
খেসারী	...	৪॥০—৪॥৵০
পোস্ত দানা	...	১৯॥০—২০৲

তৈল (প্রতিমণ)

সরিষার তৈল খাঁটি (রাধাকৃষ্ণ মার্কা)

এক গাড়ীর দর	...	২০॥০
ঐ মণের দর	...	২১৲
ঐ খুচরা	...	২৩৲
কাণপুর	...	২১৲—২২৲
মিশ্রিত	...	১৭॥০—২০৲
নারিকেল তৈল	...	১৮৲—১৮॥০
রেড়ীর তৈল	...	১৪৲—১৫৲
কেরোসিন হাঁস মার্কা	...	৫৸১০
বানর মার্কা	...	৮৴০
হাতিমার্কা	...	৬৷৶০
ভিক্টোরিয়া	...	৫৸৶০
রাণীমার্কা	...	৬॥০

ঘৃত (প্রতিমণ)

মটকী	...	৭৫৲
শ্রীমার্কা	...	৮০৲
খুর্জ্জা	...	৭৪৲
ভারতী	...	৭৩৲
সিকোয়াবাদ—খুরজা মার্কা	...	৭১৲
লক্ষ্মী	...	৭১৲
বাদাসাগর	...	৬৯॥০

মসলা (প্রতিমণ)

হলুদ মছলীপত্তনী	...	১০॥০—১১৲
সুপারী জাহাজী	...	১২৲—১৪৲
সুপারী দেশী	...	২০॥০—২১৲
লঙ্কা	...	১৯৲—২১৲
গোল মরিচ	...	৭০৲—৭১৲
জিরা	...	৩২৲—৪২৲
ধনে	...	৫৲—৭॥০
খয়ের	...	১৯৲—২৪৲
সাগুদানা	...	৮৷০

চিনি মিছরি

মিছরি	...	৮॥০—৯৲
সাদা জাভা	...	৮৸৶০
লাল জাভা	...	৮৶
হিন্দুস্থান পিটি	...	৯৵০

লবণ (প্রতি প্রতি ১০০ মণ)

হামবার্গ	...	৭৩৲

স্পেনিস পেশাই	...	৬৭৲
ঐ খুচরা	...	৶৹—৶৫
এডেন করকচ	...	৬০৲

সোণা রূপা

সোণা (প্রতিতোলা)

ইংলিশবার	...	২১—১৪—৬
টাকশাল	...	২১—৯—৩
বড়াল	...	২১—৮—৬
চীনাপাত	...	২১—৭—০

রূপা—পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	...	৪৭—১৫—০
খুচরা	...	৪৮—৫—০

করগেট ও লৌহ

২২ গেজ করগেট	সিট দর	১১॥৶৹	হন্দর
২৪ গেজ করগেট	„	১০॥৶৹	„
২৪ গেজ আর, পি, ডি	„	১৩।০	„
২৬ গেজ „	„	১৪৲	„
জয়েষ্ট কড়ি	„	৭।০	„
টি বরগা	„	৭।০	„
পাটী	„	৭।৶০	„
বল্টু	„	৭৶০	„
কাটাতার	„	১০৸০	„
মটকা	„	॥৶০	পিস

সেরপুর টাউন

সেরপুর হইতে জামালপুর যাওয়ার রাস্তাটী নন্দীর বাজারের নিকটে নদীর জলস্রোতে ভাঙ্গিয়া ও স্থানে স্থানে ধ্বসিয়া গিয়া লোক যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে এবং পাকা পুল ২।১টী ভগ্ন হইয়াছে। বড় পুলটী কখন ভাঙ্গিয়া পড়ে ঠিক নাই। পারস্থ গ্রামগুলি জলমগ্ন। ধান, পাট, তরি-তরকারী লোপ। এবার বেগুন, মূলা, আলু, ইত্যাদি দুর্ঘট হইবে। এরূপ বন্যা ব্রহ্মপুত্রে আর দেখা যায় নাই, তবে ১৩০৮ সনে একবার জল হইয়াছিল, সেই জল রাস্তার উপর দিয়া গড়াইয়াছিল মাত্র।

একটী শৃগাল ক্ষিপ্ত হইয়া ইতিপূর্ব্বে এক রাত্রিতে একটি লোককে কামড়াইয়াছে। ৩।৪ দিন হইল আদালতের একজন পিয়নের পিঠে কামড়াইয়াছে। পিয়নগণ উক্ত শৃগালটীকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

টাউনের স্বাস্থ্য ভাল নহে। জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রায় ঘরে ঘরেই হইতেছে, তবে তেমন মারাত্মক নহে। কলেরাও ২।১টি হইতেছে। এখন হইতেই সকলের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

এবার জিনিষের মূল্য কম, কিন্তু টাকার অভাব খুব বেশী। পাটের মূল্য ৩৲।৪৲ টাকা। এই জন্যই টাকার অভাব ইহা ভুল। ইহা অনেক পূর্ব্ব হইতেই উপলব্ধি হইতেছে। বাওয়া ফসলের অবস্থা ভালই দেখা যায়।

(শান্তিবার্ত্তা—জামালপুর)

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল

আজকাল সকলেই জানেন এবং অনুভব করিতেছেন, খাঁটি খাদ্যদ্রব্য, বিশেষতঃ ঘৃত, তৈল কিরূপ দুষ্প্রাপ্য। অনেকের বিশ্বাস কলিকাতা এবং অন্যান্য বড় সহরে ভিন্ন মফঃস্বলে এখনও খাঁটি জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা যে কত ভুল তাহা মফঃস্বল সহর ও গ্রামগুলির স্বাস্থ্য দেখিলেই অনুভব করা যায়। মফঃস্বলের মৃত্যুহার কি ভীষণ! আজ কলেরা, কাল বসন্ত, পরশু বেরিবেরি, তারপর ম্যালেরিয়া তো সারা বছরই আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি একদিন রাজবাড়ী হাটের সময় রাজবাড়ী ছিলাম। জনৈক বন্ধু বলিলেন "আসুন রাজবাড়ীর হাট দেখবেন।" মস্ত বড় হাট! লোকের সংখ্যা ৪।৫ হাজারের কম ছিল না। আমি একটা উঁচু টিলার উপর দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। সেই ৪।৫ হাজার লোকের মধ্যে, বলতে দুঃখ হয়, একখানা তাজা মুখ দেখতে পেলাম না। প্রত্যেক মুখ শুষ্ক, রুগ্ন, বিবর্ণ।

এদের এ অবস্থা কেন? আমাদের মনে হয় এদের এ অবস্থার মূলে এদের দারিদ্র্য এবং খাঁটি খাদ্যের অভাব। খেতে পায় না! আর যা পায় তাও অস্বাস্থ্যকর! অথচ এরাই দেশের মূলধন! এদের নিয়াই দেশ!

আশার কথা দেশের দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে। দারিদ্র্যের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, মানুষের মত হইয়া বাঁচিবার ইচ্ছা জাতির আসিয়াছে। দিকে দিকে তাহারই পরিচয় পাই।

প্রত্যেক লোকের যেমন খাঁটি জিনিষ পাইবার ইচ্ছা আসিয়াছে, তেমনি মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিরও এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমরা আনন্দের সহিত গত বৎসর হইতে ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটির ভেজাল বন্ধের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি রাজবাড়ী মিউনিসিপ্যালিটিও ভেজাল বন্ধের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু মাদারীপুর মিউনিসিপ্যালিটি এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ। ইহা তাহাদের পক্ষে লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। আরও লজ্জার কথা তাহাদের এ বিষয়ে উদ্যোগী হইবার ইচ্ছার অভাবের মূলে নাকি মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষের কাহারও কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থ বিরাজমান। অভিযোগ মিথ্যা হইলে মাদারীপুর মিউনিসিপ্যালিটির অবিলম্বে প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য এবং কেন তাহারা এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ তাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। মিউনিসিপ্যালিটি জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। উহা জনসাধারণ দ্বারা জনসাধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত।

তৎপর এই ভেজাল বন্ধের চেষ্টায় ফরিদপুর জেলা বোর্ডও পশ্চাৎপদ নহে। গত সপ্তাহে আমরা ঐ প্রতিষ্ঠানের ঐ প্রচেষ্টার উপকারিতা ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে একখানা চিঠি প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম এই জেলার সর্ব্বত্রই জেলা বোর্ড হইতে প্রেরিত স্বাস্থ্য-পরিদর্শকগণ যথাসাধ্য এই পাপ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন এবং ভাঙ্গা, মাদারীপুরের অন্তর্গত মাতবরের চর, জাজিরা, শিবচর প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষভাবে সফলকাম হইয়াছেন। আরও জানা গিয়াছে সাধারণ গ্রাম্য দোকানদার ও ছোট ব্যবসায়ীদিগকে চাপ দেওয়াতে তাহারা বলে তাহারা যে সকল মহাজনের নিকট হইতে মাল আনে তাহাদের নিকট ভাল মাল পায় না, ফলে তাহাদের খারাপ জিনিষই আনিতে হয়। আমাদেরও মনে হয় ছোট ব্যবসায়ী অপেক্ষা বড় ব্যবসায়িগণকে পূর্ব্বে শায়েস্তা করা দরকার।

মাদারীপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত চর মুগুরিয়া বাজারের বড় ব্যবসায়িগণ মাদারীপুর মহকুমার বাজিতপুর, মুস্তফাপুর, আমগাঁ, রাজৈর, খালিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে তৈল ঘী ইত্যাদি চালান দেয়। সে সকল স্থানের ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণের ভেজাল মালসমূহের জন্য তাহারাই দায়ী। কিন্তু তাহারা মিউনিসিপ্যালিটির "বট বৃক্ষের" তলে বাস করে। মাদারীপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে আমরা এবিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

(ফরিদপুর হিতৈষিণী)

মাদারিপুরে রোগ নিবারণ

মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত শিবচর, জাজিরা, মাতবরেরচর থানার অধিবাসিবর্গের নিবেদন এই যে, জিলা বোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগ এইসকল থানায় স্বাস্থ্য আফিস স্থাপন করিয়া অশিক্ষিত পল্লীবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। পূর্ব্বে এতদঞ্চলের অধিবাসীরা যাহারা চর অঞ্চলে বাস করিয়া থাকে তাহারা ওলউঠা ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় একমাত্র ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু ভগবান-প্রদত্ত বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা ঐ সকল রোগ নিবারণের চেষ্টা করিত না। এজন্য প্রতি বৎসর ওলাউঠা ও বসন্ত রোগে বহু লোক-ক্ষয় হইত। কিন্তু গত ৩ বৎসরের চেষ্টায় এই সকল থানার ভারপ্রাপ্ত স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টার বাবুগণের অত্যন্ত পরিশ্রমে এই রোগ নিবারণকল্পে বিশেষ চেষ্টা দ্বারা সুফল দর্শিয়াছে। গ্রাম্য লোকের সহায়তা পাইলে এই রোগ যে অল্প সময়ের মধ্যেই নিবারণ করা যায় এ জ্ঞান আমাদের অনেকের ভিতরেই এখন আসিয়াছে। সংপ্রতি জিলার স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী ডাক্তার সরকার কতিপয় হাট ও বাজারে ভেজাল তেল ও আটাকা খাদ্য দ্রব্য মিঠাই প্রভৃতি যাহাতে বিক্রয় না হয় তাহার জন্য যে সুব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে আমরা খুব প্রীত হইয়াছি। দুষ্ট ব্যবসায়িগণ যাহাতে অখাদ্য কুখাদ্য বিক্রয় করিয়া আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট না করিতে

পারে; এজন্য সর্ব্বদাই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজনীয়। চরসামাইল উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে গত মঙ্গলবার ৫ই আগষ্ট তারিখে ডাক্তার সরকার স্বয়ং থানার ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীদের সহিত আলোক-চিত্র সাহায্যে অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ সভায় প্রায় ৫০০ শত পুরুষ স্ত্রী ছেলে ও মেয়ের সমাগম হইয়াছিল। শিবচর এবং মাতবরের চর থানার অন্তর্গত প্রত্যেক জনবহুল পল্লীতে এইরূপ বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীঅর্জ্জুনচন্দ্র মণ্ডল,
শ্রীব্রজবাসী মণ্ডল
শ্রীরসিকচন্দ্র ভক্ত

(ফরিদপুর হিতৈষিণী)

ঔষধে ভেজাল

সকল জিনিষেই যখন ভেজাল প্রবেশ করিয়াছে, তখন ঔষধেই বা তাহা না করিবে কেন? পথ্যে ভেজালের প্রতিকার সম্বন্ধে সরকারপক্ষের তেমন চেষ্টা দেখা যায় না; কিন্তু ঔষধে ভেজালের প্রতিকার সম্বন্ধে তাঁহাদের তৎপরতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। স্বয়ং সপারিষদ গবর্ণর-জেনারেল ঔষধে ভেজাল নিবারণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণরের নিকট চিঠি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ এলাকামধ্যে ঔষধের ভেজাল নিবারণের জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করেন। সঙ্গে সঙ্গেই এসম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এদেশে ব্যবহৃত বহু ঔষধের ভিতরেই বহু পরিমাণে ভেজাল থাকে, ফলে, রোগীরা ঔষধের পূরা ফল পায় না। খাদ্য অপেক্ষা ঔষধের ভেজাল যে আরও অনিষ্টকর, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ঔষধের ভেজাল নিবারণের জন্য অবিলম্বেই উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ভেজাল দেওয়া ঔষধ এদেশে আমদানি বন্ধ করিবার বা এদেশে ভেজাল দেওয়া ঔষধ তৈয়ারী বন্ধ করিবার কোন আইন নাই বলিয়া শুনা যায়। কমিটি যদি এরূপ কোন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কাজ সহজ হইবে বটে, কিন্তু দেশের লোকের কোন উপকারই হইবে না। ভারতে এখন অনেক ঔষধ তৈয়ারী হইতেছে, পরন্তু বৃটিশ মেডিকেল কাউন্সিল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী উপাধির মূল্য স্বীকারে অসম্মত হওয়ার পর হইতে এদেশের বহু চিকিৎসকই বিলাতী ঔষধ বর্জ্জন করিয়াছেন। ফলে বিলাতী ঔষধের কাটতি যে খুবই কমিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতে ঔষধের ভেজাল নিবারণের চেষ্টার সহিত বিলাতী ঔষধ বর্জ্জনের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাহা আমরা জানি না। যদি থাকে, তাহা অস্বাভাবিক নহে; পরন্তু তদন্তের ফলে সত্যই যদি ঔষধের ভেজাল বন্ধ হয়, তাহা হইলে, ভারতবাসীর ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট হইবে না, ইহাও সত্য। কার্য্যতঃ কিছু হইবে কিনা, ইহাই সমস্যা।

(বঙ্গবাসী)

গোয়াড়ী সহরে গোয়ালাদের উৎপাত

গোয়াড়ী সহরে গোয়ালারা বহুদিন হইতে রামরাজত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি সহরের হেলথ অফিসার মহোদয় গোয়ালার দুধ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরীক্ষায় জানা যায়, যে সকল গোয়ালার দুধ টাকায় ৬ সের দরে বিক্রয় হয়, তাহাদের দুধে ৫ ভাগ জল ও এক ভাগ দুধ, আর যাহারা টাকায় ৫ সের দুধ বিক্রয় করে তাহাদের এক ভাগ দুধে চারি ভাগ কাহারও বা তিন ভাগ জল। কোন গোয়ালার দুধে জল তিন ভাগের কম দেখা যায় নাই বলিয়া প্রকাশ। কয়েকবার জল দিতে নিষেধ করার পর গোয়ালাদের দুধ ফেলিয়া দেওয়া আরম্ভ হইল। তখন গোয়ালাদের টনক নড়িল। তাহার পর গোয়ালারা কেহ কেহ খাঁটি দুধ আনিতে বাধ্য হইল। তাহাদের কেহ কেহ চালাকী করিয়া দুধে পালো মিশাইয়া আনিতে চেষ্টা করিল। পরীক্ষায় তাহাও ধরা পড়ায় অনন্যোপায় হইয়া তাহারা সকলে একটি সভা করিয়া সিদ্ধান্ত করিল, যখন আমাদের জল দেওয়া দুধ গোয়াড়ীতে বিক্রয় হইবে না, তখন আমরা ধর্ম্মঘট

করিয়া দুধ বন্ধ করিলে বাধ্য হইয়া জল দেওয়া দুধ সহরে বিক্রয়ের সম্মতি পাওয়া যাইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা গত শনিবার হইতে গোয়াড়ীতে এক জোটে দুধ বিক্রয় বন্ধ করিয়াছে। সহরের লোকেরা বলে, দর বেশী নাও দুধে জল দিও না। সে কথায় গোয়ালারা কর্ণপাত করে না। কারণ তাহারা সহরে জলদুধ বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিয়া থাকে।

বঙ্গরত্ন)

জুয়াখেলার অশান্তি

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এতদঞ্চলে বিশেষতঃ রসলপুর রাস্তায় মুকুন্দপুর মাণিকপুর, বসন্তিয়া প্রভৃতি স্থানে পথের উপর ও বালী রাস্তায় মীর্জ্জাপুর, নায়েব হাট প্রভৃতি স্থানে ডোঙ্গা, তেতাসী প্রভৃতি জুয়াখেলার ব্যাপদেশে দুর্দ্দান্ত জুয়াড়ীরা দিন দু'পরেও পথযাত্রীদের, বিশেষতঃ লাটের যাতায়াতকারীদের নিকট হইতে জোর করিয়া টাকাকড়ি, জিনিষপত্র এমন কি ছাতা ও গাত্র বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত অবাধে কাড়িয়া লইতে থাকায় লোকে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল এবং পথিক সাধারণের ঐ সকল পথে যাতায়াত করা বিষম আতঙ্কজনক হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় কাঁথির ভূতপূর্ব্ব পুলিশ ইন্সপেক্টার রাইমোহন বাবু বিশেষ পরিশ্রমে ও দক্ষতার সহিত এখানে গ্যাং কেশ পরিচালনার দ্বারা দুর্ব্বৃত্তদের সম্পূর্ণরূপ দমন করায় ঐ অশান্তি একেবারে দুরীভূত হইয়াছিল। সম্প্রতি কিছুদিন হইল আবার রসলপুর রাস্তার ঐ সকল স্থানে এবং মীর্জ্জাপুর ও নায়েব হাট প্রভৃতি স্থানে জুয়াড়ীরা খুব জাঁকজমকের সহিত তেতাসী প্রভৃতি জুয়াখেলার আড্ডা পাতিয়া বসিয়া নিরীহ পথিকদের প্রতারিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত শনিবার বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সাগরদ্বীপের বামুয়াখালী লাটের হরিপদ শীট নামক এক রোগী কাঁথি দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার জন্য পেটুয়াঘাট হইতে বালী রাস্তায় আসিবার কালে নায়েবহাটের নিকট ৩।৪ জন দুর্ব্বৃত্ত জুয়াড়ী তেতাসী খেলার অছিলায় তাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক একটি টাকা কাড়িয়া লইয়াছে এবং তাহাকে মারপিট করিয়া তাহার হারিকেনটিও ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। লোকটি চীৎকার করায় উহাকে প্রহার ও গাত্রবস্ত্রাদি কাড়িয়া লইবার ভয় দেখাইয়া ভাগাইয়া দিয়াছে।

গত শনিবার অপরাহ্নে ডাক্তারখানায় ঐ ব্যক্তি আমাদের নিকট ঐ সমস্ত কথাই বলিয়াছে। যাহা হউক অঙ্কুরেই ঐ অশান্তি দমনের বিশেষ ব্যবস্থা না হইলে উহা গুরুতর আকার ধারণ করিবে। এ অবস্থায় অবিলম্বে এ বিষয়ের বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া উহার দমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

(নীহার—কাঁথি)

রাস্তার দুরবস্থা

বীরভূম জেলা বোর্ডের শৈথিল্যবশতঃ না অর্থাভাবে জানি না—সিউড়ী হইতে আহম্মদপুর দিয়া দাসকল গ্রাম পর্য্যন্ত ডিঃ বোর্ডের রাস্তার অবস্থা আজ অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সিউড়ী হইতে আহম্মদপুর পর্য্যন্ত সে রাস্তার অবস্থা মন্দের ভাল এবং আহম্মদপুর হইতে লাভপুর পর্য্যন্ত এই রাস্তাটুকু ভাল না হইলেও অচল নয়। কিন্তু লাভপুর হইতে কীর্ণাহার পর্য্যন্ত রাস্তার অবস্থা একেবারেই খারাপ। আর কীর্ণাহার হইতে দাসকল গ্রাম পর্য্যন্ত এই রাস্তা আর রাস্তা নাই, তাহাতে গরুর গাড়ী, মানুষ চলা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার কারণ প্রায় ২॥ বৎসর হইতে এই রাস্তায় মাটী কাঁকর বালি ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে পড়িতেছে না। মাঝে মাঝে দৈবাৎ যাহা পড়ে তাহা ঢিপি বাঁধাই থাকে, রাস্তায় ছড়ানো আর হইয়া উঠে না। এবৎসর স্থানে স্থানে সামান্য যে কাঁকরগুলি পড়িয়াছে তাহা এখনো ঢিপি বাঁধা আছে, জলে ঝড়ে অর্দ্ধেক ধুইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া এই রাস্তার ছোট ছোট সাঁকোগুলির অধিকাংশ বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই রাস্তায় কীর্ণাহার ও জুবুটীয়া গ্রামের মধ্যস্থানে মতিসায়ের বাজারের পূর্ব্বদিকে সিকি মাইল দূরে অর্থাৎ ২৭ মাইল পোষ্টের শেষাংশে নিমড়া গ্রামের সীমানায় ছোট ছোট দুইটি সাঁকো ছিল। ২।৩ বৎসর হইতে মেরামতের

অভাবে তাহা অচল হইতে বসিয়াছিল। এক্ষণে মাটী ভরাট করিয়া সাঁকো দুইটীকে বুজাইয়া লোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সাঁকো ২টী বন্ধ হওয়ায় প্রায় ১৫০।২০০ শত বিঘা জমির জল-সেচ বন্ধ ও জল-নিকাশের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনুন্নত অধঃপতিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত দরিদ্র কৃষককুলের নিকট এই ১৫০।২০০ শত বিঘা জমির ফসলের মূল্য কতখানি কর্তৃপক্ষগণের তাহা স্মরণ রাখা উচিত। এই জমিগুলির জল নির্গমের পথ নিরুদ্ধ হওয়ায় এই দারুণ বর্ষায় ঐ জমিগুলির ধান্য পচিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আবার জলের অনাটন হইলে জল-সেচের অভাবে ধান্যগুলি মরিয়া যাইতে পারে। অচিরে এই সাঁকো দুইটীর মেরামতের ব্যবস্থা না হইলে বহুসংখ্যক কৃষক দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমরা এ বিষয়ে ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সেখ ভিকু, সেখ খোদানেয়াজ, কাজি বিলাতহোসেন, আবদুলরব, আবদুররহমান, ও অন্যান্য—সর্ব্ব সাং নিমড়া।

(বীরভূম-বার্ত্তা)

রূপসা খেয়া

খুলনা সহরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনসমাগম হয় রূপসা খেয়ায়। কে, বি, রেলে যাতায়াতের জন্য অনেক লোক এই পথে পার হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু যাহাদের গায়ের রক্ত জল করা পয়সা লইয়া ডিঃ বোর্ড আজ লাভবান সেই সমস্ত নিরীহ যাত্রিগণের সুখদুঃখের প্রতি দেশের লোক হইয়াও যে ইহাদের সুদৃষ্টি নাই, এই স্বদেশী যুগে স্বায়ত্ত শাসনের রাজ্যে ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি আছে? এই বর্ষাকালে একহাঁটু কাদাজল ভাঙ্গিয়া আসিয়া খেয়ার নৌকায় উঠিতে হয়। শীতকালে শীতে জড়সড় হইয়া জুতা খুলিয়া কাপড় উর্দ্ধদেশে তুলিয়া পূর্ব্বপারে নামিতে হয়। এত চেষ্টা করিয়াও পূর্ব্বপারে একটা পুলের ব্যবস্থা হইল না। যাহারা হোমরা চোমরা বা বোর্ডের কর্তৃপক্ষ তাহাদের জন্য পৃথক্ নৌকার ব্যবস্থা থাকে, জল কাদা হইলে মাঝিরা কোন সময় স্কন্ধে করিয়া কোন সময় কোলে করিয়াও পার করে বা নৌকা টানিয়া তীরে উঠাইয়া দেয়, তাঁহারা সহজে জুতা পায়ে নামিতে পারেন, কিন্তু গরীবের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। টাকা যায় কোথায়? শিক্ষা সম্বন্ধে বা ইউনিয়ন বোর্ডে একটি পয়সা দেওয়া হইল না। সাধারণের যাতায়াতের সুবিধাজনক কোন কার্য্য করা হইল না, অথচ "টাকাগুলি যেতেছে জলের মত।" এ কেমন কথা? বর্ত্তমান দেশ কালে সাধারণের অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখাই ত কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য। কিন্তু খুলনা শ্মশান ও খেয়া ঘাটের অসুবিধা দূরীকরনার্থে বহু চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু উহা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া আছে। আমরা বিষয়টির প্রতি আমাদের ডিঃ বোর্ডের কর্ণধারদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

(খুলনাবাসী)

পল্লীসংস্কার সমিতির প্রচেষ্টা

১। কাঁচড়াপাড়া দাতব্য চিকিৎসালয় স্থানান্তরিত করণ ও উন্নতির জন্য তাহা যাহাতে ইউনিয়ানের মধ্যস্থানে স্থাপিত হয় সেজন্য আগামী ১৩।৯।৩০ (২৭শে ভাদ্র) শনিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় এক অধিবেশন হইবে।

২। ঘোষপাড়া দোলঘাটা নামক স্থানে গঙ্গা নদীর ভাঙ্গন ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। বীরপাড়া চড় নামক স্থানের অধিবাসিগণের ঘর বাড়ী ও ক্ষেত্রস্থিত ফসল সমস্তই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অনেকেই গরু বাছুর ছাড়া সমস্তই মা-গঙ্গা আত্মসাৎ করিতেছে।

৩। কাঁচড়াপাড়া ঘোষপাড়া নামক নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের যে পাকা রাস্তা আছে তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। লোকের গাড়ী উল্টাইয়া প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা। রাস্তার মধ্য স্থানে এক হাঁটু গর্ত্ত।

শ্রীললিতমোহন পাল
সম্পাদক,
ঘোষপাড়া ইউনিয়ন পল্লীসংস্কার সমিতি,
(বঙ্গরত্ন—গোয়াড়ী)

ভারতের সম্পদ্‌-নির্ণয়

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল

চাষবাসের কথা

(১) আখের চাষ

১৯২৮-২৯ সনে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসর অবধি ৫ বৎসরের গড় ধরিলে ভারতে যতখানি আয়তন জুড়িয়া আখের চাষ হয় তার ৫০·২% যুক্তপ্রদেশে রহিয়াছে। বাংলা দেশে এই পরিমাণটা মাত্র ৭·১%।

যুক্তপ্রদেশে।—অবস্থা অনুকূল হওয়ায় এবার বেশী আয়তন জুড়িয়া আখের চাষ হইয়াছে। ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ হইতে আরম্ভ করিয়া এপ্রিলের গোড়া অবধি চাষ চলিয়াছে। এপ্রিলের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল, তৃতীয় সপ্তাহে একদম বৃষ্টি হয় নাই। চতুর্থ সপ্তাহে মাঝে মাঝে পরিমাণমত বৃষ্টি হইয়াছে। মের প্রথম সপ্তাহ বৃষ্টিহীন গিয়াছে, দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধারণতঃ ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি এবং তৃতীয় সপ্তাহে মীরাট, আগ্রা ও রোহিলখণ্ড বিভাগে ছাড়া ছাড়া ভাবে পস্‌লা বৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক স্থান হইতে খবর আসিয়াছে যে অঙ্কুরের অবস্থা ভাল, কিন্তু শস্যে পোকা লাগিয়া ও গরম বাতাস বহিয়া ক্ষতি হইতেছে। আগাছা বাছা ও সার দেওয়ার কাজ সন্তোষজনক হইয়াছে। এখনকার অবস্থা গাছের তাড়াতাড়ি বাড়িবার পক্ষে অনুকূল এবং উৎপন্ন শস্য বেশ বাড়িতেছে। ৮৫% ফসল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

গত বছরে অনুমান করা হইয়াছিল যে ১৩,৬৭,০০০ একর জুড়িয়া আখের গাছ লাগান হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পরিমাণটি শেষ অবধি ১৬,৪৮,৯২৮ একর দাঁড়ায়। বিশেষ বিশেষ জমিদারের কাছে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাতে মনে হয় এবার আনুমানিক ১৪,১৫,০০০ একরে ফসল হইবে।

বাংলা দেশে রোপণের সময়ে পশ্চিম ও উত্তর বাংলার কোন কোন স্থলে বৃষ্টির অভাবে ক্ষতি হইয়াছে, তাছাড়া অন্য সর্ব্বত্র অবস্থা অনুকূল ছিল। মে মাসে ভাল বৃষ্টি হওয়ায় চারাগাছগুলি বাড়িতে পাইয়াছিল, কিন্তু তারপর অতি-বৃষ্টিতে ফসলের (বিশেষতঃ মৈমনসিংহ জেলায়) ক্ষতি হইয়াছে। মোটের উপর বর্ত্তমান অবস্থাটা মন্দ নয়।

গত বৎসর অনুমিত শস্যের ক্ষেত্রের পরিমাণ ছিল ১৯৭,৯০০ একর। কিন্তু প্রকৃত আয়তন হইয়াছিল ১৯৭,৬০০ একর। এবারে যা খবর পাওয়া গিয়াছে তাতে অনুমান হয়, ১৯৫,৫০০ একরে এই শস্য জন্মিবে।

(২) তিল শস্যের প্রথম পূর্ব্বাভাস (১৯৩০-৩১)

১৯২৮-২৯ সন অবধি পূর্ব্ব ৫ বৎসরে মধ্যপ্রদেশে প্রতি বৎসর (বেরার সংযুক্ত) ভারতের মোট তিল শস্যের ৯·১% জন্মিয়াছে। মান্দ্রাজে জন্মিয়াছে ১২·৭%। আর যুক্তপ্রদেশে অমিশ্রিত তিলের পরিমাণ প্রায় ৪·৫%।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে।—নরসিংপুরে আগের দিকে এবং ওয়ার্ধা, চন্দা ও যোট্‌মলে শেষের দিকে খরিদ তিল বোনা হইয়াছে। অন্য সর্ব্বত্র রোপণ ঠিক সময়ে হইয়াছে। এক নাগপুর ও অমরাবতী ছাড়া অন্য সব জায়গায় অনুকূল অবস্থা পাওয়ায় অঙ্কুর ভাল হইয়াছে। ঐ দুই জায়গায় আবার রোপণ করিতে হইয়াছে। এখনও রবি তিল বপন আরম্ভ হয় নাই। গত বছর যা অনুমান করা হইয়াছিল এবারের অনুমান তার চেয়ে ১৫% কম, কিন্তু প্রকৃত ফলনের চেয়ে ৭% বেশী।

গত বছরের আনুমানিক ফলন	৬,২৩,৫৯৪ একর
„ „ প্রকৃত „	৪,৯৫,৮৬৪ „
এ বছরের আনুমানিক „	৫,৩১,৯২৪ „

মান্দ্রাজে—জুলাইয়ের শেষ অবধি রোপণ

১৯২৯ প্রকৃত হিসাব	৩৫৯,৯০০০ একর
১৯৩০ আনুমানিক „	৩৭৯,৪০০

প্রধানতঃ ভিজাগাপটাম্, পূর্ব্ব গোদাবরী, অনন্তপুর, চিঙ্গলিপুট ও দক্ষিণ আর্কট জনপদসমূহে বেশী বেশী একর বোনা হইয়াছে। মে মাসে রোপণকালে যথেষ্ট বৃষ্টি পাওয়া এর কারণ।

যুক্তপ্রদেশে।—জুলাইয়ের মাঝামাঝি হইতে রোপণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ায় কাজের ক্ষতি হইয়াছে ও রোপণ-কার্য্য এখনও চলিতেছে। সুতরাং কত প্রকার রোপণ হইবে তার আনুমানিক হিসাব দেওয়াও সম্ভবপর নয়। সব জায়গায়ই অঙ্কুর ভাল হইয়াছে।

(৩) বাদামের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাস (১৯৩০-৩১)

গোটা ভারতে যতখানি স্থান জুড়িয়া বাদাম চাষ হয় তার ৮৬% মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশ অঞ্চলে অবস্থিত। ঐ সব স্থান হইতে যে খবর পাওয়া গিয়াছে, তা হইতে আনুমানিক পূর্ব্বাভাসের খসড়া তৈরী হইয়াছে। মান্দ্রাজের প্রধান বাদাম শস্য সম্বন্ধে সংবাদ এখনো আসে নাই, গ্রীষ্মকালকার ও আগেকার দিকের হিসাবটা জানা গিয়াছে।

গত বৎসর ১৭,৪৭,০০০ একরে বাদাম বোনা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। এ বৎসরের অনুমিত ফলন ১৯,৩৯,০০ একর। অর্থাৎ ১১% বৃদ্ধির আশা করা যায়।

রোপণের সময় অবস্থা অনুকূল ছিল এবং শস্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভালই দেখা যাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের হিসাব নিম্নরূপ :—

প্রদেশ	১৯৩০-৩১ (আগষ্ট, ১৯৩০) একর	১৯২৯-৩০ (আগষ্ট,১৯২৯) একর	হ্রাস(—) বৃদ্ধি(+) একর
মান্দ্রাজ (গ্রীষ্ম ও প্রথম ফলন)	২,৫২,০০০	১,৯৪,০০০	+৫৮,০০০
বোম্বাই (দেশী রাজ্য সুদ্ধ)	১১,১২,০০০	৯,৫৪,০০০	+১,৫৮,০০০
ব্রহ্মদেশ	৫,৭৫,০০০	৫,৯৯,০০০	—২৪,০০০

১৯২৮-২৯ অবধি গত পাঁচ বৎসরের বাৎসরিক রোপিত জমির গড় পরিমাণ :

মান্দ্রাজ	...	৫৭.৭%
বোম্বাই	...	১৭.৭%
ব্রহ্মদেশ	...	১০.৭%

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত সংবাদ সংক্ষেপে এই :

মান্দ্রাজে—মের শেষ অবধি গ্রীষ্ম শস্য রোপা হইয়াছে ৭০,০০০ একরে। গত বৎসর ঐ সময়ে পরিমাণ ছিল ৬১,০০০ একর। আশা করা যায় যে, এবার স্বাভাবিক ফলন হইবে, অর্থাৎ ৬৩,০০০ টন ফসল পাওয়া যাইবে। গত বৎসর পাওয়া গিয়াছিল ৫৫,০০০ টন। জুলাইয়ের শেষ অবধি সালেম ও কোয়েম্বাটোর জিলায় অনুমান ১৮২,০০০ একরে প্রথম বাদাম রোপা হইয়াছে, গত বৎসর এই সময়ে পরিমাণ ছিল ১৩৩,০০০ একর। ৩৭% বৃদ্ধি। এটা ঘটিয়াছে মে মাসে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া। অনুমিত ফসলের পরিমাণ—

১৯২৯	...	৬৬,০০০ টন
১৯৩০	...	৮৬,০০০ „

বোম্বাইয়ে—১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তারপর যায় নাই। অনুমিত আয়তন ১১,১২,০০০ একর (দেশী রাজ্যসমূহে ২,৭৩,০০০একর) ; গত বৎসরের তুলনায় ১৭% বৃদ্ধি। বৃদ্ধির দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—(১) ভাল দর পাওয়ার দরুণ শস্যের আদর বাড়িয়াছে ও (২) তুলা-রোপার আয়তন কমিয়া গিয়াছে। রোপণ-কার্য্য সাধারণতঃ জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে আরম্ভ হইয়া জুলাইয়ের শেষ অবধি চলিয়াছিল। গুজরাতের নিম্নভূমিতে অত্যধিক জলবৃষ্টিতে ও কর্ণাটকের অনাবৃষ্টিতে শস্যের কিছু ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্য সর্ব্বত্র শস্যের অবস্থা ভাল।

ব্রহ্মদেশে—রোপিত আয়তন ৪% কমিয়া গিয়াছে। বেশ বৃষ্টি হইয়াছে এবং এপর্য্যন্ত শস্যের অবস্থা ভাল বলা যায়।

(৪) তুলা চাষের ১নং পূর্ব্বাভাষ, ১৯৩০-৩১

ভারতের সমগ্র তুলা আয়তনের খবর পাওয়া যায় নাই, মাত্র ৭৬·৫%এর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জুলাইয়ের শেষে অথবা আগষ্টের গোড়ার দিকে তুলার ফসলের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

আয়তনের পরিমাণ

১৯২৯ সনের পরিশোধিত হিসাব ১,৫৮,২৯,০০০ একর

১৯৩০ সনের আনুমানিক হিসাব ১,৪৮,৭৫,০০০ ,,

সুতরাং হ্রাসটা ৬%

১৯২৮-২৯ অবধি বিগত ৫ বৎসরের গড়পড়তা প্রাদেশিক তুলা ফলনের আয়তন (প্রতি বৎসর) নিম্নরূপ :

বোম্বাই—২৯·২%
মধ্য প্রদেশ ও বেরার—২৯·২%
পাঞ্জাব—১০·১%
মান্দ্রাজ—৯·৫%
যুক্ত প্রদেশ—৩·৩%
ব্রহ্মদেশ—১·৪%
বঙ্গদেশ—০·৩%
বিহার ও উড়িষ্যা—০·৩%
আসাম—০·২%
আজমীর মারওয়াড়—০·২%
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—০·১%
হায়দ্রাবাদ—১৩·৭%
মধ্যভারত—৫%
বড়োদা—২·৯%
গোয়ালিয়র—২·৪%
রাজপুতানা—১·৬%
মহীশূর—০·৩%

বপনকালে অবস্থা সাধারণতঃ অনুকূল ছিল এবং ফসলের অবস্থা মোটের উপর ভাল বলিতে হইবে। বিভিন্ন প্রদেশে কত একারে গত ৩ বৎসর ধরিয়া তুলার ফসল হইয়াছে, তা দেখানো যাইতেছে।

প্রদেশ অথবা দেশীয় রাজ্য	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০	১৯২৮-২৯
	হাজার একর	হাজার একর	হাজার একর
বোম্বাই দাক্ষিণাত্য (দেশী রাজ্য ধরিয়া)	১৩,৪২	১৬,২৩	১৬,৬৫
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৪৮,১৬	৫১,০৪	৪৮,১০
পাঞ্জাব (দেশী রাজ্য ধরিয়া)	২৩,১০	২৩,০১	২১,৯৯
মান্দ্রাজ	২,৫৯	২,৩৪	২,২৯
যুক্ত প্রদেশ (রামপুর ধরিয়া)	৯,৪৩	৭,৫৬	৫,৪৮
ব্রহ্মদেশ	৩,৪১	৩,২৪	৩,৫৪
বাঙ্গলা (দেশী রাজ্য ধরিয়া)	৭৭	৭৬	৭৭
বিহার ও উড়িষ্যা	৬৬	৬৫	৭৫
আসাম	৪২	৪৩	৫৫
আজমীর মারবাড়	১৪	১০	১৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৬	১২	১২
দিল্লী	৩	২	১
হায়দ্রাবাদ	১৯,১৪	২৬,১৬	২৬,৫৩
মধ্য ভারত	১০,৭৮	১১,৯৭	১১,৮৪
বড়োদা	৫,৯৮	৪,৩০	৩,৮৩
গোয়ালিয়র	৬,৩৩	৬,৪৫	৪,৭৯
রাজপুতানা	৪,১৫	৩,৮৩	৩,৭০
মহীশূর	৮	১১	৯
মোট	১৪৮,৭৫	১৫৮,২৯	১৫২,০১

তুলা-শক্তিতে কোন্ দেশের কিম্মৎ কতখানি তা উপরের তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে। অবশ্য আয়তনই সবখানি নয়, উৎপাদনের পরিমাণটাও সঙ্গে দেখা দরকার। কিন্তু উভয় দিক্ হইতেই মধ্য প্রদেশ ও বেরার, পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই দাক্ষিণাত্য, মধ্যভারত ও যুক্তপ্রদেশকে তুলার দেশ হিসাবে উচ্চ আসন দিতে হইবে। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রধান তুলার উৎপাদনকারী দেশগুলি লাগালাগি হইয়া আছে। উত্তর, মধ্য ও পূর্ব্ব ভারত জুড়িয়া এই তুলার দেশ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

তুলার আবার শ্রেণী-বিভাগ আছে। সেই শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে তুলার ফসল নিম্নরূপ হইয়াছে :

তুলার শ্রেণীভেদ	১৯৩০-৩১ হাজার একর	১৯২৯-৩০ হাজার একর
১। উম্‌রা—		
(ক) খান্দেশ	১২,১০	১৩,৩৬
(খ) মধ্য ভারত	১৭,১১	১৮,৪২
(গ) বর্শি ও নগর	১২,৯৩	২০,৫৬
(ঘ) হায়দ্রাবাদ গাওরাণী	৭,০৪	৭,৮১
(ঙ) বেরার	৩১,৪৫	৩৩,৪১
(চ) মধ্য প্রদেশ	১৬,৭১	১৭,৬৩
মোট	৯৭,৩৪	১১১,১৯
২। ধোলারা	১,৯৫	১,৫৫
৩। বাংলা-সিন্ধু		
(ক) যুক্ত প্রদেশ	৯,৪৩	৭,৫৬
(খ) রাজপুতানা	৪,২৯	৩,৯৩
(গ) সিন্ধু-পাঞ্জাব	১৫,৭০	১৪,৫১
(ঘ) অন্যান্য	৭২	৭০
মোট	৩০,১৪	২৬,৭০

বোম্বাইয়ে।—পুরা খবর পাওয়া যায় নাই, শুধু দাক্ষিণাত্যের প্রাথমিক ফসলের কথা জানা গিয়াছে (৬%)। ১লা আগষ্ট অবধি ফসলের বহরটা (দেশীয় রাজ্যগুলি ধরিয়া) ১৩,৪২,০০০ একর, দেশীয় রাজ্যে ৩,০০০ একর। গত বৎসরের এই সময়কার ফসলের চেয়ে ১৭% কম। হ্রাসটা সর্ব্বত্র ঘটিয়াছে কতক তুলার দর কমিয়া গিয়াছে বলিয়া, আর কতক বিচালীর দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ জোয়ার ও বজরার চাষ বেশী হইয়াছে বলিয়া। দক্ষিণ মধ্য দাক্ষিণাত্যে এপ্রিল ও মে মাসে, উত্তর দাক্ষিণাত্যে জুন মাসের শেষে বপন-কার্য্য আরম্ভ হয়। অঙ্কুরের অবস্থা ভালই হইয়াছে এবং তাড়াতাড়ি বাড়িতেছে। কিন্তু দক্ষিণ মধ্য দাক্ষিণাত্যে পোকায় শস্য নষ্ট করিতেছে এবং আরো বৃষ্টিরও দরকার বটে। শ্রেণী অনুসারে আয়তনের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

উমরা	একর
খান্দেশ	১২,১০,০০০
বর্শি ও নগর	১,১৫,০০০
কুমণ্ডা-ধারওয়ার	১৬,০০০
পশ্চিমা ও দক্ষিণা	১,০০০

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে।—অনুমিত বপন আয়তন ৪৮,১৬,০০০ একর (শুধু বেরারে ৩১,৪৫,০০০ একর)। গত বৎসরের চেয়ে ৬% কম)। তুলার দর কমা এর কারণ। জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইলেও, বর্ষা নামিয়াছে জুনের শেষ দিকে। জুলাই মাসে ভারি রকম বৃষ্টি হইয়াছে। বেরারে গোড়ার দিকে বৃষ্টি না হইলেও জুলাইয়ের শেষে সময়মত বৃষ্টি পাওয়া গিয়াছিল। অনুকূল অবস্থায় রোপণ কার্য্য হইয়াছে এবং অঙ্কুর প্রায় সর্ব্বত্র ভাল হইয়াছে—রোপণের পর কোন কোন জিলায় ঘোরতর বৃষ্টি হওয়ায় কোন কোন স্থানে পুনরায় রোপণ দরকার হইয়াছে। আগাছা বাছাই বেশ হইতেছে। এখন পর্য্যন্ত ফসলের অবস্থা ভালই মনে হইতেছে।

পাঞ্জাবে।—বিভিন্ন জিলা হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাতে অনুমান হয় ২৩,১০,০০০ একর আয়তনে তুলা চাষ হইয়াছে (দেশী রাজ্যগুলিতে ২½ লক্ষ একর)। এই সময়ে গত বৎসরের পরিমাণ ছিল ২৩,০১,০০০ একর।

বৃটিশ পাঞ্জাবে—

আমেরিকান তুলা	৭,৫৯,০০০ একর
দেশী তুলা	১৩,২৬,০০০ ,,

সকাল সকাল বপন করিবার মত অনুকূল অবস্থা ছিল না। কিন্তু সাধারণতঃ খালগুলি হইতে যথেষ্ট জল পাওয়া গিয়াছে। জুলাই মাসে সুবৃষ্টি হওয়ায় ফসলের উপকার হইয়াছে। স্বাভাবিক পরিমাণের ৯১% পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস। কোন কোন জিলার স্থানে স্থানে পোকায় শস্য নষ্ট করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

মান্দ্রাজে।—জুলাইয়ের শেষ অবধি অনুমিত আয়ের পরিমাণ ২,৫৯,০০০ একর—গত বৎসরের এই সময়ের চেয়ে ১১% বেশী। বৃদ্ধিটা প্রধানতঃ ঘটিয়াছে দাক্ষিণাত্যে (পশ্চিমা ও দক্ষিণার দেশ) ও সান্নকারন্ধয়ে (কোকনদার

দেশ)। কারণ—রোপণকালে সুবৃষ্টি। দক্ষিণ ও মধ্য জিলাগুলিতে (কাম্বোডিয়ার দেশ) আয়তন কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। গত বৎসরের শস্য এখনও জমিতে পড়িয়া আছে, পেষ্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী সেপ্টেম্বরে তোলা হইবে। দ্বিতীয় বার তোলার ফল স্বাভাবিক হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রেণী অনুসারে আয়তনের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

তিন্নেহ্বেল্লি, সালেম, কাম্বোডিয়া		১,৬১,০০০
পশ্চিমা ও দক্ষিণা	...	৬০,০০০
কোকনদা	...	১৯,০০০
অন্যান্য	...	১৯,০০০

যুক্তপ্রদেশে।—অনুমিত রোপণের আয়তন ৯,৪৩,০০০ একর (রামপুরের ১৩,০০০ একর ধরিয়া) গত বৎসর এই সময়কার পরিমাণ ছিল ৭,৫৬,০০০ একর। এ বছর ২৫% বাড়িয়াছে। কয়েকটী স্থানে ছাড়া বপন যথাসময়ে আরম্ভ হইয়াছিল এবং সারা জুলাই ধরিয়া চলিয়াছিল। ঐ সময়ে বৃষ্টিপাত হয়। সর্ব্বত্র অঙ্কুর ভাল হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। চাষবাসের কার্য্যও ভালভাবে চলিয়াছে।

ব্রহ্মদেশে।—অনুমিত আয়তনের পরিমাণ ৩,৪১,০০০ একর, গত বৎসর এই সময়ের পরিমাণের চেয়ে ৫% বেশী। প্রোম পাকোক্কু, মেইকতিলা ও মাইয়গাইনে সকাল সকাল রোপণ আরম্ভ হয়। অন্যত্র যথাসময়ে রোপণ হইয়াছিল। শস্য ভাল হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভাল হইবে আশা করা যায়।

বাঙ্গালা দেশে।—এই বৎসরের আয়তন ৭৭,০০০ একর, গত বৎসরের ৭৬,০০০ একর। সময়মত বৃষ্টিপাত না হওয়াতে মৈমনসিংহ ও ত্রিপুরায় অবস্থা অনুকূল ছিল না। অন্যত্র অবস্থা ভাল বলিয়া খবর আসিয়াছে। এখন অতি-বৃষ্টির দরুণ মৈমনসিংহে ভাল ফসল হয় নাই, তা ছাড়া অন্য সব জায়গায় ফসলের অবস্থা ভাল।

শ্রেণী অনুসারে আয়তনের পরিমাণ :—

বাংলা সিন্ধু	...	৬,০০০ একর
কুমিল্লা	...	৭১,০০০ „

বিহার ও উড়িষ্যায়।—অবস্থা অনুকূল ছিল। শস্যের অবস্থাও মন্দ নয় বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

আসামে।—মোটের উপর অবস্থা অনুকূল থাকায় ফসল মন্দ হইবে না বলিয়া মনে হয়। কোন কোন স্থানে অনাবৃষ্টি ও পোকার উপদ্রবে শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

আজমীড় ও মারবাড়ে।—ফসলের অবস্থা ভাল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।—মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টি হইয়াছে, আর এপ্রিল মাসে গড়পড়তার বেশী বৃষ্টি হইয়াছে। যথাসময়ে রোপণকার্য্য আরম্ভ হয়।

দিল্লীতে।—সুবৎসর মনে হইতেছে ও সাধারণতঃ ফসলের অবস্থা ভালই মনে হয়।

হায়দ্রাবাদে।—গত বছরের চেয়ে আয়তনের পরিমাণ ২৭% কম। কোন সময় বৃষ্টি অনিশ্চিত থাকায় ও যথেষ্ট না হওয়ায় এই হ্রাস ঘটিয়াছে। জলের অভাবে কোন কোন স্থানের ফসল খারাপ হইয়া গেলেও ফসলের অবস্থা ভালই। দুটি জিলায় ছোট স্থান হইতে পোকায় শস্য নষ্ট করিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে।

শ্রেণী অনুসারে আয়তনের পরিমাণ :—

উমরা—

হায়দ্রাবাদ-গাওরাণী	...	৭,০৪,০০০ একর
বর্শি ও নগর	...	১১,৭৮,০০০ „
পশ্চিমা ও দক্ষিণা	...	১৬,০০০ „
কোকনদা	...	১৬,০০০ „

মধ্য ভারতে।—গত বৎসরের চেয়ে ১০% কম ফসল হইবে। এখনও বপনকার্য্য চলিতেছে।

বপনের বিস্তৃত হিসাব

		১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০
		একর	একর
ইন্দোর	...	৫,৯৮,০০০	৬,৬১,০০০
ভোপাল	...	২,৬৬,০০০	৩,০৬,০০০
বাঘেলখণ্ড	...	১০,০০০	২,০০০
বুন্দেলখণ্ড	...	১৭,০০০	১৬,০০০

মালব ...	১,০১,০০০	১,০০,০০০
দক্ষিণ দেশীয় রাজ্যসমূহ	৮৬,০০০	১,১৫,০০০
মোট	১০,৭৮,০০০	১১,৯৭,০০০

বড়োদায়।—গত বৎসরের চেয়ে ৩০% জমিতে চাষ হইয়াছে।

শ্রেণী অনুসারে হিসাব :

ব্রোচ ...	৪,০৩,০০০
ধোলারা ...	১,৯৫,০০০

গোয়ালিয়র।—কোন কোন স্থলে রোপণ দেরীতে আরম্ভ হইলেও অঙ্কুর ভাল হইয়াছে। এখনও চাষবাসের কার্য্য চলিতেছে।

রাজপুতানায়।—গত বৎসরের শোধিত হিসাবের চেয়ে ৮% বেশী।

বপনের বিস্তৃত হিসাব

	১৯৩০-৩১ একর	১৯২৯-৩০ একর
বিকানীর	৫৬,৪৩৪	২১,৯৪২
শিরোহি	৭০০	৪২০
ঝালোয়ার	৩০,৫৯৭	২৬,৪৭১
মারওয়াড়	৩৫,০০০	৪৬,০৫০
মেওয়ার	১,৪০,৬৮২	১,৫১,৯১৮
ডুঙ্গারপুর	অজ্ঞাত	১,০৬৫
বান্সবরা	৭০০	৮০০
প্রতাপগড়	৮,২০৫	৫৫,৭৭
কুশলগড়	২৮৯	২২৫
শাহপুর	৪,৫৬২	৩,৯৮৯
টঙ্ক	৩১,৯৫২	৩২,৪১৬
বুন্দি	১২,০৭০	৫,২১৩
কিষণগড়	৫,০১৫	৫,৪৫৩
জয়পুর	২৫,২৯৪	২৬,৪৪৯
আলোয়ার	৯,২৬০	৩,৬৮৮
কোটা	৩৬,৮১৪	২৯,৩৬২
করাউলি	১,৮৬৭	২,১৭৩
ভরতপুর	১০,৮৪১	১১,০৮৮
বোলপুর	৯,৭২৮	৮,৫২৯
মোট	৪,১৫,০০৮	৩,৮২,৮০২

মহীশূরে।—শ্রেণী অনুসারে আয়তনের পরিমাণ :—

কুমণ্ডা ধারওয়ার ...	৪,০০০ একর
কাম্বোডিয়া ...	২,০০০ একর
অন্যান্য ...	২,০০০ একর

ভারতে জলসেচের ব্যবস্থা

১৯২৬-২৭ সনে জলসেচের ব্যবস্থা নিম্নরূপ ছিল :—

ক্যানাল বা খালের দ্বারা—২,৪৬,৬৭,৮১৩ একর

পুকুর দ্বারা—৫৫,৬৫,২৬৫ একর।

কুয়া দ্বারা—১,২০,০৬,৪৬২ একর।

অন্যান্য দ্বারা—৫৫,৪৫,০৯৩ একর।

সরকারী প্রচেষ্টা দ্বারা সেচিত জমির আয়তন গড়ে —১৯১৮-২০, ২⅓ কোটি একরের কিছু বেশী ; ১৯২৫-২৬ ২৮ কোটি একরের বেশী। পুঁজিপাটার উপর নিট আদায় ৬·৪৭%।

গবাদি পশুর আদমসুমারি

১৯২৫-২৬ সনে বেলুচিস্থান বাদে গোটা ভারতের গৃহপালিত কেজো পশুর সংখ্যা :

গাই ও ষাঁড়	১২ কোটির উপর
মহিষ	৩ কোটির উপর
ভেড়া	২·৩ কোটির উপর
ছাগল	প্রায় ৪ কোটি
ঘোড়া ও পনি	১৭ লাখের উপর
খচ্চর	৭০,০০০
গাধা	১৪·১ লাখের উপর
উট	৫ লাখের উপর

অতএব মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে ভারতে প্রতি তৃতীয় ব্যক্তির ১টি করিয়া ষাঁড়, একাদশ ব্যক্তির একটি করিয়া মহিষ, চতুর্দ্দশ ব্যক্তির একটি করিয়া ভেড়া, অষ্টম

ব্যক্তির একটি করিয়া ছাগল, ১৯৮তম ব্যক্তির একটি করিয়া ঘোড়া, পৌনে ৫ হাজার তম ব্যক্তির একটি করিয়া খচ্চর, ২৩৫তম ব্যক্তির একটি করিয়া গাধা এবং ৬৫০তম ব্যক্তির একটি করিয়া উট আছে।

হাজার কোটি টাকার পশু-সম্পদ্

মোটামুটি ভাবে গড়ে যদি ১টি গাই কি ষাঁড়ের দাম ১৫০৲ টাকা, মহিষের ১০০৲ টাকা, ভেড়ার ২৫৲ টাকা, ছাগলের ৩০৲ টাকা, ঘোড়ার ৪০০৲ টাকা, খচ্চরের ১০০৲ টাকা, গাধার ৫০৲ টাকা, উটের ৮০৲ টাকা হয় তবে ভারতীয় এই সব পশু-সম্পদের মূল্য দাঁড়ায় :—

গাই বলদ—	১৮০০	কোটি টাকা
মহিষ	৩০০	"
ভেড়া	৫৭·৭	"
ছাগল	১২০	"
ঘোড়া	৬৮	"
খচ্চর	·৭	"
গাধা	৭½	"
উট	৪	"
মোট	২৩৫৮	"

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই গড়টা শক্ত সমর্থ জানোয়ারদের মূল্য। কত জানোয়ার অসমর্থ, রুগ্ন অথবা বাচ্চা জানা নাই। যদি ধরা যায় আধা আধি এইরূপে বাদ দিতে হইবে তবে ভারতের এই প্রকার পশু-সম্পদের মূল্য দাঁড়ায় ১১৭৯ কোটি টাকা। হিসাবের ভুলচুকের জন্য ১৭৯ কোটি টাকা ছাড়িয়া দিলে হাজার কোটি টাকা দাঁড়ায়। অতএব বলা যাইতে পারে যে, ভারতের এই পশু-সম্পদের মূল্য উর্দ্ধ সীমায় ১৫০০ কোটি টাকা ও নিম্ন সীমায় হাজার কোটি টাকা।

ভারতের বন-সম্পদ্

১৯২৬-২৭ সনে ভারতের মোট বনের আয়তন ছিল ২½ লক্ষ বর্গ মাইলের কিছু বেশী। তন্মধ্যে রিজার্ভ বন (ক) ১ লক্ষ বর্গ মাইলের উপর ও শ্রেণী বিভাগ না করা বন (খ) ১½ লক্ষ বর্গ মাইলের উপর। রিজার্ভ বন বলিতে কাঠ ইত্যাদি রক্ষার জন্য ও জল যোগাইবার জন্য যে বন সরকারী খরচে থাকে তাকে বোঝায়। কোন্ দেশের বন-সম্পদ কিরূপ তা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে (১৯২৬-২৭ সনের হিসাব) :—

	ক বর্গ মাইল	খ বর্গ মাইল	মোট বর্গ মাইল
১। ব্রহ্মদেশ	২৯,০৬১	৯৩,৮০৫	১,২২,৮৬৬
২। ফেডারেটেড্ শান ষ্টেট	৩,০৬৭	২১,৫৪১	২৪,৬০৮
৩। আসাম	৬,১০৮	১৪,৪৮৭	২০,৫৯৫
৪। মধ্য প্রদেশ ও বেরার	১৯,৬৪৮	...	১৯,৬৪৮
৫। মান্দ্রাজ	১৮,৯৫৪	৩৩২	১৯,২৮৬
৬। বোম্বাই (সিন্ধু ধরিয়া)	১৩,৭১০	...	১৪,৯৩১
৭। বাঙ্গালা	৫,২৮১	৩,৪৪৫	১০,৫২৯
৮। পাঞ্জাব	১,৫৩০	৫৯৭	৫,৫৩৩
৯। যুক্ত প্রদেশ	৫,১৭০	৩৫	৫,২০৯
১০। বিহার ও উড়িষ্যা	১,৭৯৮	৩	৩,০২৫
১১। আন্দামান	৫২	২,১৬৮	২,১৯০
মোট	১০৫,৫৮৮	১৩৬,৮৬৩	২৫০,১১০

৩০ কোটি টাকার খনিজ সম্পদ্

১৯২৮ সনে ভারতীয় খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও দামের মোটামুটি হিসাব এইরূপ :—

কয়লা—২·২৫	কোটি	টন=·৬৬	কোটি	পাউণ্ড=৮·৮৮	কোটি	টাকা
পট্রোলিয়াম—৩০½	কোটি গ্যালন=·৪৩		"	" =৫·৬০	"	"
ম্যাঙ্গানিজ্ ওর—·০৯৮	"	টন=·২৩	"	" =৩·১২	"	"
সীসা—·০৫	"	" =·১৭	"	" =২·৩৫	"	"

সোণা—'০৪	কোটি	আঃ='১৬	কোটি	পাউণ্ড	=২'২০	কোটি টাকা
যন্ত্র তৈয়ারীর মসলা—'৯৭	,,	টন='১১	,,	,,	=১'৫০	,, ,,
রূপা—'৭৪	,,	আঃ='০৯	,,	,,	=১'২৫	,, ,,
লবণ—'১৫	,,	টন='০৮	,,	,,	=১'১৫	,, ,,
অভ্র—'০০৬	,,	হন্দর='০৭	,,	,,	=১'০০	,, ,,
দস্তা ওর—'০০৮	,,	টন='০৬	,,	,,	= '৮৫	,, ,,
লৌহ ওর—'২১	,,	,,='০৪	,,	,,	= '৫৫	,, ,,
তামা ওর—'০০৩	,,	,,='০৪	,,	,,	= '৫২	,, ,,
টীন ওর—'০০৩	,,	,, '০৩	,,	,,	= '৪৫	,, ,,
মোট		২'১৭ ,, ,,			= ২৯'৪২	,, ,,

অন্যান্য খনিজের দাম মোটামুটি অর্দ্ধ কোটির উপর ধরা যাইতে পারে। অতএব ভারতীয় খনিজ সম্পদের মোট মূল্য ৩৯ কোটি টাকা।

ভারতবর্ষের ১২ রকম ফসলের হিসাব

কত একর জমিতে এক এক শ্রেণীর ফসল জন্মে, কোন্ ফসলই বা কি পরিমাণ জন্মে, এই দুই প্রশ্নের জবাব মিলিবে নীচের তালিকা হইতে।

		১৯২৭-২৮		১৯২৮-২৯	
		রোপিত জমি	আদায়ী ফসল	রোপিত জমি	আদায়ী ফসল
		একর	টন	একর	টন
১।	চাউল	৭½ কোটির উপর	৫¼ কোটির উপর	৮½ কোটি	প্রায় ৩¼ কোটি
২।	গম	৩¼ কোটির উপর	প্রায় ৭৮ লক্ষ	৩¼ কোটি	৮৫ লক্ষ
			চিনি (গুড়)		
৩।	আখ	২৯½ লক্ষের উপর	৩২⅔ লক্ষ	পৌনে ২৬ লক্ষ	২৭⅔ লক্ষ
৪।	তিসি	৩৩ লক্ষের উপর	প্রায় ৩½ লক্ষ	৩১½ লক্ষ	৩¼ লক্ষের উপর
৫।	রাই ও সরিষা	৫৯ লক্ষ	৮½ লক্ষ	৬৮½ লক্ষ	৯ লক্ষ
৬।	তিল	৫৫½ লক্ষ	৫¼ লক্ষের উপর	৫৪¼ লক্ষের উপর	৪¼ লক্ষের উপর
৭।	বাদাম	৫৪½ লক্ষ	প্রায় ২৭½ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৮০½ লক্ষ
৮।	তুলা	প্রায় ২½ কোটি	প্রায় ৫৯⅔ লক্ষ বেল	প্রায় ২⅔ কোটি	৫৬⅔ লক্ষ বেল
৯।	পাট	৩৩¼ লক্ষ	১ কোটির উপর বেল	৩১¼ লক্ষ	৯৯ লক্ষ বেল
১০।	চা	৭½ লক্ষের উপর	৩৯ কোটি পাঃর উপর	৭'৭ লক্ষ	৪০⅔ কোটির উপর
১১।	রবার	১½ লক্ষের উপর	২'৬ কোটি পাঃ	১⅔ লক্ষ	প্রায় ২'৭ কোটি পাঃ
১২।	নীল	৬০½ হাজার	প্রায় ১১ হাজার হন্দর রং	৬৬'৭ হাজার	১১½ হাজার হঃ উপর

১৯২৬-২৭ সনে গোটা ভারতে মোট ২২,৬০,১২,২০৭ একর জমি চষা হইয়াছিল।

৮০০ কোটি টাকার শস্য-সম্পদ্

এই ১২ রকম ফসলের ১৯২৯-৩০ সনের প্রথম আনুমানিক হিসাবটা ধরিয়া প্রত্যেকের দাম কত হয় তা নীচে দেওয়া যাইতেছে:—

১।	চাউল	৩ কোটি টন=গড় ৬৲ টাকা মণ হিসাবে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা
২।	গম	১ কোটি টন=গড় ১০০৲ টাকা টন হিসাবে ১০০ „ „
৩।	আখ	৩০ লাখ টন=গড় ১০৲ মণ হিসাবে ৮২½ কোটি টাকা
৪।	তিসি	৫¾ লাখ টন=গড় ৮৲ হন্দর হিসাবে ৬ „ „
৫।	রাই ও সরিষা	১০¾ লাখ টন=গড় ৩৲ হন্দর হিসাবে ৬½ „ „
৬।	তিল	৫¾ লাখ টন=গড় ১০৲ হন্দর হিসাবে ১০¾ কোটি টাকা
৭।	বাদাম	৫৬¾ লাখ টন=গড় ৭৲ হন্দর হিসাবে ৭৯ „ „
৮।	তুলা	৬০ লাখ বেল=গড় ২০০৲ বেল হিসাবে ১২০৲ „ „
৯।	পাট	১ কোটি ১২ লাখ বেল=গড় ৩৫৲ বেল হিসাবে ৪০ কোটি টাকা
১০।	চা	৪০ কোটি পাঃ=গড় ॥৵০ পাউণ্ড হিসাবে ২৫ কোটি টাকা
১১।	রবার	২½ কোটি পাঃ=গড় ১৲ পাউণ্ড হিসাবে ২½ „ „
১২।	নীল	১৪½ হাজার হন্দর=গড় ২৫০ হন্দর হিসাবে ৪০ হাজার টাকা
		মোট প্রায় ১০৭২½ কোটি টাকা

এর মধ্যে হিসাবের ভুল বলিয়া কিছু অংশ বাদ দিতে হইবে, তাছাড়া কিছু শস্য অপচয় যায় তাও মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং বাদসাদ দিয়া মোটামুটি ভারতের মাঠে মাঠে ৭৫০।৮০০ কোটি টাকার ফসল ফলে একথা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে।

চাষীরা কত পায় ?

এই ৮০০৲ কোটি টাকার সবটাই চাষীরা ঘরে তুলিতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। ঋণ বাবদ অনেক চাষীর শস্য মাঠ হইতেই একেবারে মহাজনের ঘরে চলিয়া যায়। যা থাকে তা হইতেও কতক মহাজনের নিকট অথবা অন্যত্র বেচিয়া তার কতকাংশ দিয়া দিতে হয়। চাষীর কপালে শেষ পর্য্যন্ত যা থাকে তার একভাগ যায় আগামী ফসলের জন্য বীজ ইত্যাদি কিনিতে, কতকাংশ নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিতে, আর কতকাংশ সঞ্চয়ের খাতে। এক একটী প্রদেশ লইয়া এই বিভিন্ন মহালে কোন্ দেশের চাষী কিরূপ ব্যয় করে অবিলম্বে তার অনুসন্ধান হওয়া কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত সমিতির মতে বাঙ্গালার চাষীর ঋণের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা। এই হিসাবটা কিছু অতিরঞ্জিত মনে করিলেও ঐ অনুপাতে গোটা ভারতের চাষীদের ঋণের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকার কম হইবে না ইহা নিশ্চিত। তারপর অন্ততঃ পক্ষে ৩০০ কোটি টাকা বীজ ইত্যাদির জন্য ও ১০০ কোটি টাকা নিজের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিবার জন্য ব্যয়িত হয়। এ হিসাবে সঞ্চয়ের ঘরে শূন্য পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে চাষীরা বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সমবায় সমিতির হিসাব মতে ৩০।৩২ লাখ টাকার আমানত সমবায় সমিতিগুলি পাইয়া থাকে। তন্মধ্যে কৃষি সমবায়ে ২০ লাখ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। সমগ্র টাকার তুলনায় এই পরিমাণ যারপর নাই সামান্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে সমবায় সমিতিগুলি প্রায় ৩ কোটি টাকার কাছাকাছি

ঋণ দেওয়া হয়, তন্মধ্যে কৃষি সমিতি হইতে যায় প্রায় ১ কোটি টাকা। এর অর্থ বেশ পরিষ্কার। অর্থ এই যে, এ দেশের চাষী এমন অবস্থায় রহিয়াছে যে, তার পক্ষে কোন রকম উন্নততর চাষের প্রণালীর কথা ভাবাও সোজা নয়। চাষী ভাল করিয়া খাইতে পরিতে যেখানে পায় না, সেখানে সঞ্চয় করিবে কোথা হইতে? অথচ এই সঞ্চয় ব্যতীত তার ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার দ্বিতীয় আর কোন পন্থা নাই।

উপরে বলা হইয়াছে যে, নিজের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিবার জন্য চাষীদের হাতে থাকে ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু ১০০ কোটি টাকারও সবখানি তরা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিতে ব্যয় করে কি না সন্দেহ। ছেলেমেয়ের বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উৎসব, বেমারাম পীড়া ইত্যাদি হাজারো রকম খরচের দাবী সকলের আগে মিটাইতে হয়। মিটাইবার পর ৭০।৭৫ কোটি টাকা হাতে থাকে যথেষ্ট। ২৪।২৫ কোটি ভারতীয় চাষীকে এই ৭০।৭৫ কোটি টাকায় দিন গুজরাণ করিতে হয়। অন্য আয়ের পথ আছে কি নাই তা সম্প্রতি না ভাবিয়া বলিতে হয় ফসল বেচিয়া সম্বৎসরের জন্য প্রত্যেক চাষী গড়ে ৩৲ টাকা মাত্র খাওয়া পরার জন্য ব্যয় করিতে পায়। অর্থাৎ মাসে ।০ আনা মাত্র। দৈনিক ১৷৷০ পাইয়ের কিছু বেশী। চাষী ঋণ করিবে না ত করিবে কে?

ভারতীয় জমির প্রকার-ভেদ

বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জরীপ করা আয়তন কত, কতখানিতে চাষ করা হয়, কতখানি অচষা রহিয়াছে, বনের আয়তন কি, কতখানি জায়গা জুড়িয়া সেচের বন্দোবস্ত আছে, তার একটা মোটামুটি আভাষ দিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। হিসাবটা ১৯২৭-২৮ সনের।

	আয়তন কোটি একর	চষা জমি কোটি একর	অচষা জমি কোটি একর	বন কোটি একর	সেচ কোটি একর
বাঙ্গালা	৫'২৬	৪'৯১	১'৬৭	'৪৬	'১৩
বোম্বাই (সিন্ধু ধরিয়া)	৯'৭৫	৩'২৩	২'৬৬	'৯২	'৩৯
মান্দ্রাজ	৯'১৭	৩'৩৮	৩'৩৭	১'৩১	'৯১
যুক্তপ্রদেশ	৭'২৬	৩'৫১	২'০৭	'৯৩	'৫৫
পাঞ্জাব	৬'৫৫	২'৫৭	২'৮০	'২১	১'৩৯
ব্রহ্মদেশ	১৫'৫৭	১'৭৪	১১'০৯	২'০৩	'১৪
বিহার ও উড়িষ্যা	৭'১৫	২'৪৩	১'৫৩	'৭৩	'৫২
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৮'৩৯	২'৪৯	১'৯৩	১'৬৪	'১১
আসাম	'৮৬	'২২	'৫৪	'০৪	'০৯
মোট	৭৪'৬১	২২'৩৯	৩০	৮'৭০	৪'৩২

আয়তনের দিক্ হইতে ব্রহ্মদেশ প্রথম, বোম্বাই দ্বিতীয়, মান্দ্রাজ তৃতীয়, (বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রায় সমান সমান এবং ব্রহ্মের চেয়ে প্রায় ৬ কোটি একর কম), মধ্যপ্রদেশও বেরার চতুর্থ (বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ঠিক নীচেই), যুক্তপ্রদেশ পঞ্চম, বিহার ও উড়িষ্যা ষষ্ঠ (যুক্তপ্রদেশ ও বিহার-উড়িষ্যা প্রায় সমান সমান ও ব্রহ্মের অর্দ্ধেক), পাঞ্জাব সপ্তম (অল্প নীচে), বাঙ্গালা অষ্টম (অল্প নীচে এবং ব্রহ্মের প্রায় এক তৃতীয়াংশ), আসাম নবম ও অত্যন্ত ছোট দেশ।

কিন্তু চষা জমি, অচষা জমি বা বন, সেচের দিক্ হইতে প্রদেশগুলির স্থান অত্যন্ত বিভিন্ন। চষা জমিতে দেশগুলির স্থান এই: বাঙ্গালা, যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই (এই তিন দেশ পরস্পর প্রায় সমান ও বাঙ্গালার চেয়ে ১ কোটির উপর একর কম), পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বিহার

ও উড়িষ্যা (সমান সমান হইলেও যুক্তপ্রদেশের চেয়ে ১ কোটি একর কম), ব্রহ্মদেশ (যুক্তপ্রদেশের অর্দ্ধেক), আসাম (ব্রহ্মদেশের ⅙ ভাগ)।

অচষা জমির সম্পর্কে আবার দেশগুলিকে অন্যভাবে সাজাইতে হয়। ব্রহ্মদেশ, মান্দ্রাজ (ব্রহ্মের ⅓ অংশেরও কম), পাঞ্জাব, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ (পার্থক্য অল্প এবং মান্দ্রাজের চেয়ে ১ কোটির উপর বা প্রায় ১ কোটি বেশী), মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা (বড় পশ্চাতে নয়), আসাম (বিহার উড়িষ্যার প্রায় ½)।

বনে ব্রহ্মদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মান্দ্রাজ প্রথম শ্রেণীতে। যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই (কাছাকাছি) এবং বিহার উড়িষ্যা দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

সেচের সহিত দেশগুলির চষা জমির কোন সম্পর্ক আছে কি ? বোধ হয় না। পাঞ্জাবে সেচপ্রাপ্ত জমির আয়তন সব চেয়ে বেশী, অথচ চষার বেলায় পঞ্চম ও অচষার বেলায় তৃতীয় স্থান। মান্দ্রাজ সেচে দ্বিতীয় হইলেও চষাতে তৃতীয় ও অচষাতে দ্বিতীয়। যুক্তপ্রদেশ সেচে তৃতীয়, চষাতে দ্বিতীয়, অচষাতে পঞ্চম। বিহার উড়িষ্যা সেচে চতুর্থ (যুক্তপ্রদেশের প্রায় সমান), চষাতে সপ্তম, অচষাতে অষ্টম। বোম্বাই সেচে ৮ম, চষাতে ৪র্থ, অচষাতেও ৪র্থ। অন্য দেশগুলিতে সেচের পরিমাণ সব চেয়ে কম, অথচ চষাতে বাঙ্গালা প্রথম, অচষাতে ৭ম, ইত্যাদি।

অতএব (১) চষা জমির সহিত অচষা জমির কোন সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ যে প্রদেশে বেশী চষা জমি আছে, সেই প্রদেশেই সব চেয়ে কম অচষা জমি থাকিবে এমন কোন কথা নাই। এখানে শতকরার কথা ধরা হইতেছে না, কিন্তু দেশগুলির আয়তন বিভিন্ন বলিয়া চষা ও অচষা জমির পরিমাণ একে অন্যকে নিয়ন্ত্রিত করে না। (২) যে দেশে যত বেশী সেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে, সে দেশে তত বেশী চষা জমি থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। অর্থাৎ সেচের জল একমাত্র চাষের উপজীব্য নহে ; বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য নৈসর্গিক কারণে জমির চাষ-যোগ্যতা হ্রাস-বৃদ্ধি পাইতে পারে।

চষা-অচষা জমির তত্ত্বকথা

চষা জমি মানে যে জমিতে বীজ সত্য সত্য বপন করা হইয়া থাকে। অচষা জমি বলিতে দুই শ্রেণীর জমি বুঝিতে হইবে—

(১) যে জমি চাষযোগ্য অথচ যাতে চাষ করা হয় না।

(২) যে জমি চাষযোগ্য নয়।

যে জমি চাষযোগ্য নয়, তা লইয়া এখন মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। চাষযোগ্য অনেক জমি যে পড়িয়া থাকে তা লইয়া রীতিমত আলোচনা এখনো সুরু হয় নাই। অথচ এদিকে যে কি বিশাল নিবারণযোগ্য অপচয় হইতেছে, তা বলিবার নয়। নিম্নের তালিকা হইতে তার কিছু আভাষ পাওয়া যাইবে :—

	মোট অচষা কোটি একর	চাষযোগ্য কোটি একর	চাষের অযোগ্য কোটি একর
বাঙ্গালা	১'৬৭	'৬৪	১'০৩
বোম্বাই	২'৬৬	'৬৮	১'৯৮
মান্দ্রাজ	৩'৩৭	১'৩৩	২'০৪
যুক্তপ্রদেশ	২'০৭	১'০৭	১'০০
পাঞ্জাব	২'৮০	১'৫৪	৮'২৬
ব্রহ্মদেশ	১১'০৯	৫'৯৮	৫'৪১
বিহার ও উড়িষ্যা	১'৫৩	'৭২	'৮১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১'৯৪	১'৪৬	'৪৯
আসাম	'৬৪	'২৭	'২৭

ভারতে অচষা জমির মোট আয়তন মোটামুটি ৩০ কোটি একর, চষা জমির ২২ কোটি একরের বেশী। কিন্তু এই ৩০ কোটি একরের মধ্যে ১৫½ কোটি একরের উপর চাষ-যোগ্য। এই জমি চাষ না হওয়ায় ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর বিপুল ক্ষতি সহ্য করিতেছে, ভারতের চাষীরা সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ভারতীয় সম্পদের দাম ৮০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ২২ কোটি একর

হইতে যদি ৮০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়, তবে ১৫২ কোটি একর হইতে আর ৫৫০ কোটি আন্দাজ টাকা পাওয়ার আশা করা যাইত। কিন্তু বৎসরে এই ৫৫০ কোটি টাকা নষ্ট হইতেছে।

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান চাষবাসের প্রণালীতে এই ক্ষতির কথা ধরা হইয়াছে। কিন্তু এ প্রণালী মোটেই উন্নত নয়। উন্নত প্রণালীতে চাষ করিলে, চাষকে র‍্যাশানালাইজ করিলে ও ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইয়া শিল্পরীতি অবলম্বন করিলে ভারতের গোটা চাষযোগ্য জমি হইতে যে অল্পকাল মধ্যে ১৩৫০ কোটি টাকার স্থলে ২৭০০ কোটি টাকার ফসল পাওয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। খুব কম করিয়া ধরিয়া এই ২৭০০ বা ৩০০০ কোটি টাকার হিসাব। কিন্তু তাতেই ভারতীয় অপচয়ের পরিমাণ ২০০০ কোটি টাকা দাঁড়ায়। যে দেশের লোক দুবেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না সে দেশে এ দৃশ্য আর কত কাল দেখিতে হইবে?

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের জনবল, আয়ব্যয়, আমদানি রপ্তানি*

(১) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (ফেডারেল)

আয়ব্যয় :

১৯২৯, ৩০শে জুন অবধি প্রকৃত,		
মোট সাধারণ আদায়	৪০৩,৩২,৫০,২২৫ ডলার	(=১১১০ কোটি টাকা)
মোট ব্যয়	৩৮৪,৮৪,৬৩,১৯০ ,,	(=১০৬০ ,, ,,)
১৯৩০ অনুমান মোট সাধারণ আদায়	৪২৪,৯২,২৩,০০০ ,,	(=১১৭০ ,, ,,)
মোট ব্যয়	৪০২,৩৬,৮২,০০০ ,,	(=১১০৫ ,, ,,)
১৯৩১ অনুমান মোট সাধারণ আদায়	৪২২,৫৭,২৮,০০০ ,,	(=১১৬০ ,, ,,)
মোট ব্যয়	৪১০,২৯,৩৯,০০০ ,,	(=১১৩০ ,, ,,)

আমদানি রপ্তানি :

১৯২৯, সোণা রপ্তানি	১১,২২,৯১,০০০ ডলার	(=২৮ ,, ,,)
,, আমদানি	৬,৯৪,০০,০০০ ,,	(=১৮ ,, ,,)
রূপা রপ্তানি	৮,৬৪,০৬,০০০ ,,	(=১৬ ,, ,,)
,, আমদানি	৩৩,৬৮,২৮,০০০ ,,	(=৮৪ ,, ,,)
১৯২৮-২৯ পণ্য রপ্তানি	৫২৮,৪০,০০,০০০ ,,	(=১৪৫০ ,, ,,)
,, আমদানি	৪২৯,২০,০০,০০০ ,,	(=১১৮০ ,, ,,)

লোকবল :

১৯২০ (সেন্সাস) সাদা	৯,৪৮,২০,৯১৫	১লা জুলাই, ১৯২৬ অনুমান মোট	১১,৭১,৩৬,০০০
নিগ্রো	১,০৪,৬৩,১৩১	,, ১৯২৭ ,, ,,	১১,৮৬,২৮,০০০
অন্য রং	৪,২৬,৫৭৪	,, ১৯২৮ ,, ,,	১২,০০,১৩,০০০
মোট	১০,৫৭,১০,৬২০		

---

* টাকার হিসাবটাকে একটা মোটামুটি হিসাব বলিয়া ধরিতে হইবে, কড়া ক্রান্তি ধরিয়া একেবারে নির্ভুল হিসাব দিবার চেষ্টা করা হয় নাই।—আঃ উঃ সঃ

(২) ফ্রান্স (গোটা রাষ্ট্র)

আয়ব্যয় :

বছর	বিষয়	পরিমাণ	একক	টাকায়
১৯২৮	রাজস্ব	৪২৪৯,৬৬,১৬,১৭৬	ফ্রাঁ	(=৫৭০ কোটি টাকা)
	ব্যয়	৪২৪৪,৪৯,৪৮,৭৬০	"	(=৫৬৯ " ")
১৯২৯	রাজস্ব	৪৫৪৩,০৭,১৭,৩৪৮	"	(=৬০০ " ")
	ব্যয়	৪৫৩৬,৬১,৩০,৫০৩	"	(=৫৯৯ " ")
১৯৩০	রাজস্ব	৪৮৭২,২১,০৩,৯৭৬	"	(=৬৫০ " ")
	ব্যয়	৪৮৬৬,৫৯,১৬,৬৯৩	"	(=৬৪৯ " ")

আমদানি রপ্তানি :

বছর	বিষয়	পরিমাণ	একক	টাকায়
১৯২৮	আমদানি	৪,৯৩,৩৯,৪০৭	টন	
		৫৩৪৩,৫৫,৫২,০০০	ফ্রাঁ	(=৭১৫ " ")
	রপ্তানি	৪,১১,২৫,৯৩০	টন	
		৫,১৩৭,৪৭,২৯,০০০	ফ্রাঁ	(=৬৮৫ " ")
১৯২৯	আমদানি	৫,৯৪,৪৭,১৯৫	টন	
		৫৮২৮,৪৬,২৪,০০০	ফ্রাঁ	(=৭৮৫০ কোটি টাকা)
	রপ্তানি	৩,৯৮,৮৮,৭৭৫	টন	
		৫০০৭,২৩,৪৮,০০০	ফ্রাঁ	(=৬৭০ " ")

লোকবল :

বছর	বিষয়	সংখ্যা
১৯২১	সেন্সাস	৩,৯২,০৯,৫১৮
	বিদেশী	১৫,৫০,৪৫৯
১৯২৬	সেন্সাস	৪,০৭,৪৩,৮৯৭
	বিদেশী	২৫,০৫,০৪৭

(৩) জার্মাণি

আয়ব্যয় :

সময়	বিষয়	পরিমাণ	একক	টাকায়
৩১ মার্চ্চ, ১৯২৭-২৮	সাধারণ আয়	৯৫৩,২৭,০০,০০০	রে-মা	(=৬৪০ কোটি টাকা)
	রেলওয়ে বণ্ড (ডয়েস্ স্কীম)	৬০.৫৪,০০,০০০	"	(= ৪০ " ")
	ইন্‌ডাষ্ট্রীয়েল ডিবেঞ্চার	২৭,৪৬,০০,০০০	"	(= ৩২ " ")
	মোট	১০৪১,২৭,০০,০০০	"	(=৭১২ " ")
	সাধারণ ব্যয়	৮৪১,৬৬,০০,০০০	"	(=৫৭০ " ")
	ডয়েস্ স্কীম	১৭৭,৯২,০০,০০০	"	(=১২৫ " ")
	মোট	১০১৯,৫৮,০০,০০০	"	(=৬৯৫ " ")

৩১ মার্চ্চ ১৯২৮-২৯ সাধারণ আয়—	১০০২,৯২,০০,০০০	রে-মা	(=৬৭৫ কোটি টাকা)।
ডয়েস্ স্কীম	৬৫,৮২,০০,০০০	„	(= ৪৫ „ „
ইন্-ডিবেঞ্চার	২৯,৯৭,০০,০০০	„	(= ২১ „ „)
মোট	১০,৯৮,৭১,০০,০০০	„	(=৭৪১ „ „)
সাধারণ ব্যয়	৯৬৬,৭৩,০০,০০০	„	(=৬৫০ „ „)
ডয়েস্ স্কীম	২১৭,৮৪,০০,০০০	„	(=১৪০ „ „)
মোট	১১৮৪,৫৭,০০,০০০	„	(=৭৯০ „ „)
৩১ মার্চ্চ ১৯২৯-৩০ সাধারণ আয়— অনুমান	১০০৭,৯১,০০,০০০	„	(=৬৭৬ „ „)
ডয়েস্ স্কীম	৬৬,০০,০০,০০০	„	(= ৪৬ „ „)
মোট	১১০৩,৯১,০০,০০০	„	(=৭২২ „ „)
সাধারণ ব্যয়	৮৫৮,৮৬,০০,০০০	„	(=৫৫৫ „ „)
ডয়েস্ স্কীম	২৫০,০৫,০০,০০০	„	(=১৭০ „ „)
মোট	১১০৩,৯১,০০,০০০	„	(=৭২৫ „ „)

আমদানি রপ্তানি :

১৯২৭ আমদানি	১১২০,৬১,০০,০০০	মার্ক	(=৭৫০ কোটি টাকা)
রপ্তানি	৮১০,০০,০০,০০০	„	(=৫৪৫ „ „)
১৯২৮ আমদানি	১২০১,১০,০০,০০০	„	(=৮০৫ „ „)
রপ্তানি	৯২২,৮৯,০০,০০০	„	(=৬২০ „ „)

লোকবল :

১৬ জুন ১৯২৫ সেন্সাস ৬,৩১,৭৮,৬১৯

(৪) গ্রেটবৃটেন

আয়ব্যয় :

৩১ মার্চ্চ ১৯২৮ প্রকৃত আয়	৮৪,২৮,২৪,৪৬৫	পাঃ	(=১১০০ কোটি টাকা)
„ ব্যয়	৮৩,৮৫,৮৫,৩৪১	„	(=১০৯০ „ „)
৩১ মার্চ্চ ১৯২৯ „ আয়	৮৩,৬৪,৩৪,৯৮৮	„	(=১০৮৫ „ „)
„ ব্যয়	৮১,৮০,৪০,৫২৫	„	(=১০৫০ „ „)
৩১ মার্চ্চ ১৯৩০ প্রকৃত আয়	৮১,৪৯,৭১,০০০	„	(=১০৪৮ „ „)
„ ব্যয়	৮২,৯৪,৯৪,০০০	„	(=১০৮০ „ „)

আমদানি রপ্তানি :

১৯২৮ মোট আমদানি	১১৯,৫৫,৯৮,৪১৩	পাঃ	(=১৫৬০ কোটি টাকা)
বৃটিশ পণ্য রপ্তানি	৭২,৩৫,৭৯,০৮৯	„	(= ৯৮০ „ „)

বিদেশী ও উপনিবেশ পণ্য

রপ্তানি	১২,০২,৮৩,২৪৪	„	(= ১৬০	„	„)
মোট রপ্তানি	৮৪,৩৮,৬২,৩৩৩	„	(= ১১৪০	„	„)
১৯২৯ মোট আমদানি	১২২,১৫,৯১,০৬২	„	(= ১৬৫০	„	„)
বৃটিশ পণ্য রপ্তানি	৭২,৯৫,৫৪,৯৬৭	„	(= ৯৮০	„	„)
বিদেশী ও উঃ রপ্তানি	১০,৯৭,৪১,৭৫৯	„	(= ১৪৫	„	„)
মোট রপ্তানি	৮৩,৯২,৯৬,৭২৬	„	(= ১১২৫	„	„)

লোকবল :

১৯২১, ১৯ জুন, সেন্সাস	৪,২৯,১৯,৭১০
১৯২৭ অনুমান	৪,৪১,৮২,০০০
১৯২৮ „	৪,৪৩,৭৫,০০০
১৯২৯ „	৪,৪৫,০৪,০০০

(৫) বেলজিয়াম

আয়ব্যয় :

১৯২৯	রাজস্ব	১১৫১,০০,৮৯,০০০	ফ্রাঁ	(= ১৫০ কোটি টাকা)
	ব্যয়	১০৩৪,০৬,৯৫,০০০	„	(= ১৩৫ „ „)
১৯৩০	রাজস্ব	১০০৯,৬৬,৩২,০০০	„	(= ১৩২ „ „)
	ব্যয়	৯৭৫,৫৪,১২,০০০	„	(= ১২৫ „ „)

আমদানি রপ্তানি :

১৯২৮	আমদানি	৩৪১৪,০৬,৯১,০০০	ফ্রাঁ	(= ৪৬৫ কোটি টাকা)
	রপ্তানি	৩০৯৫,৪৪,৪০,০০০	„	(= ৪১৫ „ „)
১৯২৯	আমদানি	৩৫৫১,০১,১৮,০০০	„	(= ৪৮৫ „ „)
	রপ্তানি	৩২২৩,৪৫,৪৯,০০০	„	(= ৪৩০ „ „)

লোকবল :

৩১শে ডিসেম্বর	১৯২০	সেন্সাস	৭৪,৬৫,৭৮২
„	১৯২৮	অনুমান	৭৯,৯৫,৫৫৮

(৬) ইতালি

আয়ব্যয় :

৩০ জুন ১৯২৮-২৯	রাজস্ব	২০০৭,১০,০০,০০০	লিরা	(= ১৮০ কোটি টাকা)
	ব্যয়	১৯৫৭,৪০,০০,০০০	„	(= ১৭৫ „ „)
„ ১৯২৯-৩০	রাজস্ব	১৯২২,৬০,০০,০০০	„	(= ১৭২ „ „)
অনুমান	ব্যয়	২০১১,৭০,০০,০০০	„	(= ১৮১ „ „)

আমদানি রপ্তানি :

১৯২৮	আমদানি	২১,৯২,০৪,০০,০০০	লিরা	(=১৯৭ কোটি টাকা)
	রপ্তানি	১৪৫৫,৯০,০০,০০০	,,	(=১৩১ ,, ,,)
১৯২৯	আমদানি	২১৩৫,৩০,০০,০০০	,,	(=১৯২ ,, ,,)
	রপ্তানি	১৪৮৮,৬৪,০০,০০০	,,	(=১৩৩½ ,, ,,)

জনবল :

১	ডিসেম্বর	১৯২১	সেন্সাস্	৩,৮৭,৫৫,৫৭৬
১	জানুয়ারী	১৯২৮	,,	৪,০৭,৮৩,০০০
,,	,,	১৯২৯	,,	৪,১১,৬৯,০০০

(৭) জাপান

আয়ব্যয় :

৩১শে মার্চ ১৯২৮-২৯	রাজস্ব	২০০,৫৬,০৯১,০০০	ইয়েন	(=২৫১ কোটি টাকা)
	ব্যয়	১৬৮,১০,৬১,০০০	,,	(=২১৫ ,, ,,)
১৯২৯-৩০	রাজস্ব	১৮১,৫৮,৫৫,০০০	,,	(=২২৫ ,, ,,)
	ব্যয়	১৬৮,১০,৬১,০০০	,,	(=২১৫ ,, ,,)

আমদানি রপ্তানি (সোণারূপা বাদ) :

১৯২৮	আমদানি	২১,৯৬,৩১,০০০	পা:	(=২৯৫ ,, ,,)
	রপ্তানি	১৯,৭১,৯৫,০০০	,,	(=২৬০ ,, ,,)
১৯২৯	আমদানি	২২,১২,০০.০০০	,,	(=৩০০ ,, ,,)
	রপ্তানি	২১,৪৮,০০,০০০	,,	)=২৮৫ ,, ,,)

লোকবল :

১	অক্টোবর	১৯২৫	সেন্সাস	৫,৯৭,৩৬,৮২২
১	,,	১৯২৯	,,	৬,২৯,৩৮,২০০

(৮) কানাডা

আয়ব্যয় :

৩১শে মার্চ ১৯২৭-২৮	নিট রাজস্ব	৪২,২৭,১৭.৯৮৩	ডলার	(=১১৫ কোটি টাকা)
	ব্যয়	৩৩,৬১,৬৭,৯৬১	,,	(= ৯৫ ,, ,,)
১৯২৮-২৯	নিট রাজস্ব	৪৫,৫৪,৬৩,৮৭৪	,,	(=১২৫ ,, ,,)
	ব্যয়	৩৫,০৯,৫২,৯২৪	,,	(= ৯৮ ,, ,,)

আমদানি রপ্তানি :

১৯২৭-২৮	রপ্তানি	১২৫,৭৪,৫৬,২৯৭	ডলার	(=৩৪৫ কোটি টাকা)
	আমদানি	১১০,৮১,৫৬,৪৬৬	,,	(=৩০৫ ,, ,,)

১৯২৮-২৯	রপ্তানি	১৬৮,৮৭,৭৭,০৭৫ ডলার	(=৩৮০ কোটি টাকা)
	আমদানি	১২৬,৫৬,৭৯,০৯১ „	(=৫৪৫ „ „)

জনবল :

১৯২১	সেন্সাস	৮৭,৮৮,৪৮৩
১৯২৯	অনুমান	৯৭,৮৬,৮০০

(৯) অষ্ট্রেলিয়া (কমনওয়েলথ)

আয়ব্যয় :

১৯২৭-২৮	রাজস্ব	৭,৬৬,৭০,২২২ পাঃ	(=১০০ কোটি টাকা)
	ব্যয়	৮,৯৭,৩৭,৪০০ „	(=১২৫ „ „)

আমদানি রপ্তানি :

১৯২৭-২৮	আমদানি	১৪,৭৯,৪৪,৯৭০ পাঃ	(=১৯০ কোটি টাকা)
	রপ্তানি	১৪,৩২,১৬,০৭০ „	(=১৮৭ „ „)
১৯২৮-২৯	আমদানি	১৪,৩৬,২৮,০৩৩ „	(=১৮৮ „ „)
	রপ্তানি	১৪,৪৭,৮০,১৭৫ „	(=১৮৯ „ „)

জনবল :

৪ এপ্রিল	১৯২১	সেন্সাস	৫৪,৩৫,৭৩৪
৩০ জুন	১৯২৯	অনুমান	৬৩,৭৩,২১৯

(১০) দক্ষিণ আফ্রিকা

আয়ব্যয় :

১৯২৭-২৮	রাজস্ব	৩,০০,৯৪,০০৪ পাঃ	(=৪০ কোটি টাকা)
	ব্যয়	২,২৮,৪০,৭৬৮ „	(=৩০ কোটি টাকা)
	লোন এঃ ঐ	১,১২,৫১,৩৩৬ „	(=১৪ „ „)

আমদানি রপ্তানি (সোণারূপা বাদ) :

১৯২৮	আমদানি	৭,৯০,৮৭,৬৫৮ পাঃ	(=১০৫ কোটি টাকা)
	রপ্তানি	৭,৮০,৬০,৮৫৪ „	(=১০৪ „ „)

জনবল :

১৯২১	সেন্সাস	ইয়োরোপীয়ান	১৫,১৯,৪৮৮
		অন্য	৫৪,০৯,০৯২
		মোট	৬৯,২৮,৫৮০
১৯২৬	সেন্সাস	ইয়োরোপীয়ান	১৬,৭৬,৬৬০

যুক্তরাজ্যের প্রতি মাসের আমদানি রপ্তানি

মাসিক গড়		আমদানি হাজার পাঃ	রপ্তানি হাজার পাঃ
১৯২০		১৪২,৪৯১	১১১,২০৬
১৯২১		৮১,৫৪৮	৫৮,৬১৭
১৯২২		৭৪,৯৫০	৫৯,৯৫৯
১৯২৩		৮১,৪৭৪	৬৩,৯৩৮
১৯২৪		৯৪,৭৮৯	৬৬,৭৪৭
১৯২৫		৯৭,২২৩	৬৪,৪৪৮
১৯২৬		৯২,৯৮৯	৫৪,৪২১
১৯২৭		৯১,২৮২	৫৯,০৯০
১৯২৮		৮৯,৭১৬	৬০,২৮৬
১৯২৯		৯২,৬৫৪	৬০,৭৯৬
১৯২৯	এপ্রিল	৯৩,৭৯২	৬০,২৪৪
,,	মে	৯৩,০২০	৬৭,৪৬৭
,,	জুন	৮১,৮৮২	৪৯,৮৯৩
,,	জুলাই	৮৫,৫৮১	৬৬,৫২০
,,	আগষ্ট	৯১,৯৭৩	৬৩,০৪৫
,,	সেপ্টেম্বর	৯১,৬৩৩	৫৫,১০৪
,,	অক্টোবর	১০১,১৫০	৬৪,৫৮৯
,,	নবেম্বর	৯৯,৯৮১	৬৩,১২৫
,,	ডিসেম্বর	৯৮,৬৩৭	৫৮,৪৩০
১৯৩০	জানুয়ারী	৯৩,৬৮০	৫৮,২৬২
,,	ফেব্রুয়ারী	৭৯,৫৬৩	৫১,৯২৪
,,	মার্চ্চ	৮৫,৬৬০	৫৩,৯৪৬
,,	এপ্রিল	৭৬,০৭৮	৪৬,৮৬১

উপরের তালিকা হইতে পরিস্ফুট হইবে যে, ইংরেজের আমদানিতে খুব উঠা পড়া হইলেও সাধারণতঃ ইংরেজকে আমদানির উপর বেশী পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। শেষ তিন মাসে বাণিজ্য কিছু মন্দা পড়িয়াছে। গত এপ্রিলের তুলনায় এ এপ্রিলে মাল কেনা কম হইয়াছে, কিন্তু তার একটা কারণ খুঁজিতে হইবে রপ্তানি-হ্রাসে। বস্তুতঃ, যুক্তরাজ্যের রপ্তানি বাণিজ্য ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে। ইহা ইংরেজের পক্ষে আশঙ্কার কথা। দুনিয়ার তামাম বাজারে ইংরেজের মালের কাটতি কমিয়াছে (বাজার-বিশেষে বাড়িয়াছে কি না তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই) অর্থাৎ ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বী রপ্তানিকারক দেশগুলির কাছে পরাজিত হইতেছে।

দুনিয়ার তুলার জমি

(১) যুক্তরাজ্যের কৃষি বিভাগ হইতে খবর আসিয়াছে যে, অনুমান করা যায় ১৯৩০ সনের ১লা জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ৪,৫৮,১৫,০০০ একর পরিমাণ জমিতে তুলা চাষ হইয়াছে। গত বৎসরের এই সময়ের চেয়ে ৩% কম। উৎপাদিত তুলার পরিমাণ এইরূপ :—

১৯৩০ অনুমান ৫০০ পাঃ ১,৪৩,৬২,০০০ বেল
(=৪০০ পাঃ ১৭৯৫২০০০ বেল)

১৯২৯ শোধিত শেষ ৫০০ পাঃ ২,৪৮,২৮,০০০ বেল
(=৪০০ পাঃ ১,৮৫,৩৫,০০০ বেল)

(২) রোমের আন্তর্জ্জাতিক কৃষি পরিষদের খবর হইতে জানা যায় যে, ১৯৩০-৩১ সনে ঈজিপ্টে প্রাকৃতিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল। জুনের গোড়ায় ফসলের অবস্থা মন্দ নয়। আগামী কয়েক মাস অবস্থা অনুকূল থাকিলে ১৯২৯-৩০ সনের মত এবারও সুবৎসর হইবে আশা করা যায়। অনুমিত তুলা ৪০০ পাঃ ২০,৬২,০০০ বেল হইবে। উগাণ্ডাতে ১৯২৯-৩০ সনের আনুমানিক হিসাব ৪০০ পাঃ ১,২০,০০০ বেল। ১৯২৮-২৯ সনের চেয়ে ৪১% কম ও গত ৫ বৎসরের গড়ের চেয়ে ২৩% কম।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যে মন্দা

(ক) রপ্তানিতে ১৪৯½ কোটি টাকার ক্ষতি

(১) ওয়াশিংটনের বাণিজ্য বিভাগ জানাইতেছেন যে, জুন মাসের রপ্তানি পরিমাণ ২৯,৯০,০০,০০০ডলার ছিল। গত বৎসর জুন মাসে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৯,৩০,০০০০০ ডলার। সুতরাং এই বৎসর রপ্তানির পরিমাণ ৯,৪০,০০,০০০ ডলার কমিয়াছে।

(২) এই সনের প্রথমার্দ্ধে ২০৭,৯০,০০,০০০ ডলার

মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি হয়। ইহা গত সনের বৎসরার্দ্ধের চেয়ে ৫৪,৩০,০০,০০০ ডলার কম।

(খ) সওয়া ১৫৪ কোটি টাকার আমদানি হ্রাস

এই সনে প্রথম বৎসরার্দ্ধের আমদানির মূল্য ১৭৩,৫০,০০,০০০ ডলার। গত সনের চেয়ে ৫৫,০০,০০,০০০ ডলার কম। জুন মাসে আমদানির মূল্য ছিল ২৫০০০০০০০ ডলার। ইহার মধ্যে ১,৩৯,৩৮,০০০ ডলার মূল্যের সোণা ও ২৭,০৭,০০০ ডলার মূল্যের রূপা ছিল।

২৯'৯ কোটি ডলার মূল্যের রপ্তানির মধ্যে ২৬,০০০ ডলার মূল্যের সোণা ও ৩৩,৩৬,০০০ ডলার মূল্যের রূপা ছিল।

বিলাতে বেকারের সংখ্যা-বৃদ্ধি

এ বৎসর ১০ই জুলাই পর্য্যন্ত প্রায় বিশ লক্ষ বেকার লোকের নাম রেজেষ্টী করা হইয়াছে। এই সংখ্যার মধ্যে সম্পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ১২,০৬,২০০; কিছুদিনের জন্য বেকার হইয়াছে এইরূপ লোকের সংখ্যা ৬,৪১,৪০০; সাময়িক কোন কাজ জোটাইয়া কোনরূপে সংসার চালাইতেছে এইরূপ লোকের সংখ্যা ৯২,৩০০০। মোট সংখ্যা ১৯,৩৯,০০০। এই সংখ্যা গত সপ্তাহের সংখ্যার চেয়ে ৬৪৪৬ এবং গত বৎসরের সংখ্যার চেয়ে ৮,০৩,২৩৬ বেশী। এই বেকার জনসংখ্যার মধ্যে ১৬,৯৪,৯০০ জন পুরুষ, ৪৮,৩০০ জন বালক, ৪,৫৪,৮০০ জন স্ত্রীলোক ও ৪১,৯০০ জন বালিকা।

গ্রেটব্রিটেনের জন-সংখ্যা

বৎসর (৩০ জুন)	ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌স্	স্কটল্যাণ্ড	মোট
১৯২৫	৩,৮৮,৯০,০০০	৪৮,৯৩,০০০	৪,৩৭,৮৩,০০০
১৯২৬	৩,৯০,৬৭,০০০	৪৮,৯২,০০০	৪,৩৯,৬৪,০০০
১৯২৭	৩,৯২,৯০,০০০	৪৮,৯৫,০০০	৪,৪১,৪২,০০০
১৯২৮	৩,৯৪,৮২,০০০	৪৮,৯৩,০০০	৪,৪৩,৭৫,০০০
১৯২৯	৩,৯৬,০৭,০০০	৪৮,৯৭,০০০	৪,৪৫,০৪,০০০

ভারতে জার্ম্মাণির বাণিজ্য-প্রচেষ্টা

ভারত ও জার্ম্মাণির মধ্যে আমদানি ও রপ্তানির ব্যবসা চালাইবার জন্য এক্সপোর্ট ডিয়ানষ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড নামে একটী জার্ম্মাণ কোম্পানী ইণ্ডো-জার্ম্মাণ প্রডাক্ট কর্পোরেশন নামে একটি ভারতীয় কোম্পানীর সহিত একযোগে বোম্বাই সহরে কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এই ভারতীয় কোম্পানীটী ভারতে জার্ম্মাণির মাল বিক্রয়ের ভার লইবে। ইঁহারা আশা করেন যে, বৎসরে জার্ম্মাণি হইতে ৪০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের তৈয়ারী মাল আমদানি ও ভারত হইতে ৮০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের কাঁচা মাল রপ্তানি করিতে পারিবেন। ইণ্ডো-জার্ম্মাণ প্রডাক্ট কর্পোরেশন ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন। ইঁহারা ভারতের সর্ব্বত্র কারখানা খুলিবার আয়োজন করিতেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র রুশিয়া কিনিতেছে কম

১৯৩০ সনের জানুয়ারীতে সোভিয়েট সরকার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ১২৪,২০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করেন। মে মাসে ক্রয়ের অঙ্ক কমিয়া ৩০,৯৮,০০০ পাউণ্ড দাঁড়ায়। জুন মাসে আরও কমিয়াছে। অনেকে সন্দেহ করেন যে, বিলাত হইতে রুশের মাল-ক্রয় বৃদ্ধি ইহার একটি কারণ।

খদ্দর আন্দোলনের প্রসার

বস্ত্র-শিল্পই বাংলার, তথা ভারতের সর্ব্বপ্রধান কুটীর শিল্প। ভারতের শিল্প-ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব কত তাহা নিম্নলিখিত তথ্য হইতেই বুঝা যাইবে। সমগ্র ভারতের জন্য এখন বৎসরে মোটামুটি ১৮০ কোটি টাকার কাপড় আবশ্যক হয়। ইহার মধ্যে ৬০ কোটি টাকার কাপড় আসে ম্যাঞ্চেষ্টার, জাপান, জার্ম্মাণি, হলাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে; ৬০ কোটি টাকার কাপড় ভারতের বিভিন্ন কলগুলি হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে; অবশিষ্ট ৬০ কোটি আসে আমাদের দরিদ্র তন্তুবায়গণের ঘরের তাঁত হইতে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান যুগের কল কারখানার প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যেও আমাদের দেশের তাঁতিরা, মহাজন, পাইকার, দালাল প্রভৃতির দ্বারা লুণ্ঠিত প্রতারিত হইয়াও এবং আত্মরক্ষার্থ কোনও প্রকারে সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়াও সমগ্র ভারতের ⅓ অংশ বস্ত্র যোগাইতে সমর্থ হইয়াছে। এখনও ভারতের কয়েক লক্ষ দরিদ্র তাঁতি বিরাট মূলধনপুষ্ট ও সঙ্ঘবদ্ধ কলওয়ালাদের সহিত বীরের মত লড়িতেছে; এবং আরও আনন্দ ও গৌরবের বিষয় এই যে, প্রতিবৎসরই তাঁতের শিল্পের ক্রমশঃ প্রসার হইতেছে। ভারতের উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড় ভারতের বাহিরেও বহুস্থানে যাইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের তাঁতিরা মহাজন, পাইকার, দালালের নিকট নানাপ্রকারে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগকে সহরের দালাল পাইকারের নিকট অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে কলের সুতা খরিদ করিতে হয়। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার দুইজন সুতা-ব্যবসায়ী এভাবে বহুলক্ষ টাকার মালিক হইয়াছে। বাংলার প্রতি জেলায়ই এজাতীয় ব্যাপার চলিতেছে সন্দেহ নাই।

বিগত আট নয় বৎসর হইতে বাংলার ও ভারতের বস্ত্রশিল্পে খদ্দরের প্রচলন হইয়াছে। ইহারও ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। বিগত বৎসর সমগ্র বাংলা দেশে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার খাদি বিক্রয় হইয়াছে। সহস্র সহস্র তাঁতি ও কাটুনী এখনই ইহা দ্বারা প্রতি-পালিত হইতেছে। বাংলার শতকরা ৮০ ভাগ খাদিই বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম বিভাগে প্রস্তুত হইতেছে। এখানেও কোন প্রকারের সমবায়ের ব্যবস্থা না থাকায় দরিদ্র কাটুনী ও তাঁতিরা প্রতারিত হইতেছে। যে সময়ে জাপানের পাইকারী বাজার দর প্রতিমণ ১১৲।১২৲, ঠিক সে সময়েই দরিদ্র কাটুনীদিগকে ২০৲।২২৲ মণ দরে কাপাস কিনিতে হইতেছে। তাঁতিদেরও যাহা পাওয়া উচিত ছিল তাহা পাইতেছে না। দরিদ্র কাটুনীদিগের নিকট আজগুবি লাভে কাপাস বিক্রয় করিয়া ফেণীর একজন তুলার বড় ব্যবসায়ী এক বৎসরের মধ্যেই কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া পাকা গুদাম তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। যে খদ্দরের থান ফেণী বা নিজামপুরে ৪৸০ হইতে ৫৲ টাকার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাই ব্যবসায়ী-দের অনুগ্রহে ২।৩ বার হাতফের হইয়া কলিকাতার বাজারে ৫৲ টাকা হইতে ৭৷৷০ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। ফলে শিল্পী ও ক্রেতা উভয়েই প্রতারিত হইতেছে এবং সস্তায় বাজারে ফেলিতে পারিলে খদ্দর শিল্পের যতদূর প্রসার হইত বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা হইতে পারিতেছে না।

সমগ্র ভারতে এইক্ষণে বৎসর এক কোটি টাকারও অধিক দামের খদ্দর উৎপন্ন হইতেছে। অন্ধ্র প্রদেশের সূক্ষ্ম

খদ্দর, কাশ্মীরের পশমী খদ্দর হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার বস্ত্রই চরকায় কাটা সুতা হইতে প্রস্তুত হইতেছে। এই শিল্প যে কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা মহাত্মা গান্ধীর স্থাপিত "অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশনের সহিত সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিশুদ্ধ খাদি-উৎপাদন-কেন্দ্রের নামের তালিকা হইতেই বুঝা যাইবে :—

কাশ্মীর :—

(ক) অল্ ইণ্ডিয়া স্পিনারস্ এসোসিয়েশন, কাশ্মীর ব্রাঞ্চ শ্রীনগর।

(খ) কাশ্মীর স্বদেশী ষ্টোরস্ ঐ।

পাঞ্জাব :—

(ক) অল্ ইণ্ডিয়া স্পিনারস্ এসোসিয়েশন আদমপুর, দোয়াবা সেণ্ট্রাল ষ্টোরস্, জলন্ধর জিলা।

(খ) লালা হামারাজ দীননাথ—ভুলালা, ভায়া বিয়াস্।

যুক্তপ্রদেশ :—

(ক) গান্ধী আশ্রম মীরাট্।

(খ) চিরঞ্জি লাল প্যারী লাল, হাপুর, মীরাট।

(গ) শুদ্ধ খাদি ভাণ্ডার, ধামপুর, বীজনোর জিলা।

রাজস্থান :—

(ক) অল ইণ্ডিয়া স্পিনারস্ এসোসিয়েশন, রাজস্থান ব্রাঞ্চ (শার্টিং ও ডবল সুতি কোটিংএর জন্য) জোহারি বাজার জয়পুর।

(খ) মদন খাদি কুটির—কারোলি, রাজপুতানা (ধুতি, শার্টিং, কোটিংএর জন্য)।

মন্দ্রাজ :—

(ক) অল ইণ্ডিয়া স্পিনারস্ এসোসিয়েশন তামিলনাডু ব্রাঞ্চ, তিরুপুর এস আই রেলওয়ে।

(খ) কাঙ্গু খদ্দর কোম্পানী লিমিটেড্ তিরপুর।

(গ) অল ইণ্ডিয়া স্পিনারস্ এসোসিয়েশন সূক্ষ্ম খাদি ডিপো, চিকাকোল, বি এন্ রেলওয়ে।

(ঘ) অল ইণ্ডিয়া স্পিনারস এসোসিয়েশন অন্ধ্র ব্রাঞ্চ মসলিপটম। ছাপা ও রং-করা ভাল কাপড় পাওয়া যায়।

বিহার উড়িষ্যা :—

(ক) অল ইণ্ডিয়া স্পিনারস্ এসোসিয়েশন, বিহার ব্রাঞ্চ, মজঃফরপুর।

(খ) গান্ধী কুটির, মধুবাণী, দ্বারভাঙ্গা।

আসাম :—

(ক) ইন্দ্রসেন পাঠক, বরপেটা, আসাম (এণ্ডি, মুগা, তসর ইত্যাদি)।

বাঙ্গালা :—

(ক) শুদ্ধ খাদি ভাণ্ডার, ১৩২।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

(খ) খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, ঐ।

(গ) অভয় আশ্রম, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ঐ।

(ঘ) খাদি মণ্ডল, ঐ।

(ঙ) প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ।

(চ) বিদ্যাশ্রম, শ্রীহট্ট। (ভাণ্ডার)

স্বদেশী সভা

১। সাব কমিটির প্রস্তাব

ফেডারেশান অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যাণ্ড ইনডাষ্ট্রি কমিটি নিজ নিজ সমস্ত সভ্য এবং ভারতীয় জনসাধারণকে যত বেশী সম্ভব ভারতীয় মাল ব্যবহার করিবার জন্য এবং অভারতীয় অথবা আংশিকভাবে ভারতীয় মালের ব্যবহার কমাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বিদেশী কাপড় আমদানি বন্ধ করিবার ও তৎপরিবর্ত্তে স্বদেশী কাপড় চালাইবার জন্য কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া একটি সাবকমিটি গঠন করেন (১৯মে ১৯৩০)। কথা থাকে এজন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে এবং কিরূপে স্বদেশী দ্রব্য তৈরী ও বণ্টনে উৎসাহ দিয়াও অত্যন্ত লাভের প্রচেষ্টাকে দমন করা যায় সে বিষয়ে সাবকমিটি অনুসন্ধান করিবেন। সাব কমিটির সভ্যদের নাম :—

১। লালা শ্রীরাম (প্রেসিডেণ্ট)।

২। শ্রীযুক্ত জি, ডি, বিড়্লা।

৩। স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস।

৪। স্যার সি, ভি, মেহতা, কে সি এস আই।

৫। শ্রীযুক্ত আম্বালাল সারা ভাই।
৬। শ্রীযুক্ত কস্তুর ভাই লাল ভাই
৭। শ্রীযুক্ত লালজি নারাণজি

২। কংগ্রেসের সহিত রফা

ফেডারেশুন যেমন স্বদেশী সভার খসড়া তৈরী করিয়াছিলেন, ২০শে জুন তারিখে তেমনি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটিতেও সভা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী পণ্ডিত মতিলাল নেহ্রু ও আমেদাবাদ কলওয়ালাদের মধ্যে পরস্পর কথোপকথনের ফল বলা যাইতে পারে। পণ্ডিত নেহ্রুর তথা কংগ্রেসের সহিত উক্ত কলওয়ালাদের যে বন্দোবস্ত হয় তার মর্ম্ম সংক্ষেপে এইরূপ:

১। কলওয়ালারা "খাদি"র প্রতিযোগী কোন প্রকার কাপড় তৈরী করিতে পারিবে না বা তাহাদের কলে প্রস্তুত কোন প্রকার কাপড়ের নামকরণ খাদি করিতে পারিবে না।

২। প্রত্যেক সভ্য কলওয়ালা উৎপন্ন দ্রব্যের ৪০% সভার হাতে বিক্রয়ের জন্য দিবেন। ১৯৩০ সনের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কলওয়ালারা কাপড়ের জন্য ১২ই মার্চ্চ হইতে বর্ত্তমানে প্রচলিত বাজার-দরের মধ্যে যেটা সর্ব্বনিম্ন তাহাই আদায় করিতে পারিবেন, অতঃপর কাপড়ের দর বাঁটিয়া দেওয়া হইবে ও কাপড়ের রকমারি কমাইতে হইবে।

৩। সভার নিয়মাবলীর মধ্যে ২ (২) ও ৪ সর্ত্ত ছাড়া অন্যগুলি পরিবর্ত্তন করা যাইবে।

স্বাক্ষরকারীদের নাম:—চমনলাল জি পারেখ, সাকারলাল বালাভাই, অম্বালাল সারাভাই, নারাণ ভাই জীবনলাল, কস্তুরভাই লালভাই, বোপটলাল হরিলাল নাগরী, ভুলাভাই জে দেশাই, মতিলাল নেহ্রু।

৩। স্বদেশী সভা

১। সভার উদ্দেশ্য

(ক) ভারতে তৈরী কাপড়চোপড় উৎপাদনে উৎসাহদান, বিক্রয় ও বণ্টনের সুব্যবস্থা।

(খ) খাদির (হাতে কাটা সূতায় হাতে বোনা কাপড়) সম্পূর্ণ সংরক্ষণ।

(গ) দেশের জনসাধারণকে ভারতে প্রস্তুত কাপড় চোপড় ন্যায্য দরে পাইতে সাহায্য করা।

(ঘ) কাপড়ের উৎকর্ষ যাহাতে স্থায়ী হয় ও বৃদ্ধি পায় তাহা দেখা।

২। (১) (ক) কাপড়ের কলকারখানার অধিকারী কোম্পানী, যৌথ কোম্পানী, (খ) (ক) (গ) ও (ঘ) ভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সভ্য, (গ) দেশী কাপড় ব্যবসায়ী মহাজন অথবা সমবেত সঙ্ঘ, (ঘ) কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ—এই লইয়া সভা।

(২) (ক) (ক) ও (গ) জাতীয় সভ্য তাঁহাদের তৈরী কাপড়ের উপর খাদি ছাপ বা খাদি বা ঐ রকম নামাকরণ করিতে পারিবেন না। (খ) নিজ নিজ কলে প্রস্তুত কাপড় চোপড় যাহাতে বাজারে খাদি নামে না চলে সে বিষয়ে (ক) শ্রেণীর সভ্যকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (গ) অনুমোদিত নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি মাত্র বিশেষ কাপড় চোপড় (ক) শ্রেণীর সভ্যেরা নিজ নিজ কলে প্রস্তুত করিতে পারিবেন। যে সব সভ্য খাদির সম শ্রেণীভুক্ত মোটা কাপড় বুনিতেছে, তিন মাসের মধ্যে তাহাদের উক্তরূপ কাপড় বোনা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। বিশেষ কারণে সভা এই সময় বাড়াইতে পারিবেন। মিলগুলির ইচ্ছামত ড্রিল সাটিন, তসর, টুইল, রঙ্গীণ কাপড়, রঙ্গীণ তুলার কাপড়, কম্বল, মলিদা এবং গালিচা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) কার্য্য পরিচালনার জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে।

(৪) সভার কোন সভ্য নিজ কলে প্রস্তুত কাপড়ের পাড় অথবা খোলে বিদেশী সূতা বা রেশম ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তবে কাহারও কণ্ট্রাক্ট পূরণ বাকী থাকিলে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইবে।

(৫) দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ করিয়া যে মাল উৎপন্ন হইবে—

(ক) শ্রেণীর সভ্যগণ তার ৪০% সভাকে খুচরা বিক্রয়ের জন্য দিবেন। মূল্য নগদ দেওয়া হইবে এবং ১২ই

মার্চ্চ হইতে অক্টোবরের শেষ অবধি সময়ের মধ্যে যে দর সর্ব্বনিম্ন তাহাই তাঁরা পাইবেন। এই সময়ের পরে দর আবার ঠিক করিয়া দেওয়া হইবে।

(৬) ২ (৫) সর্ত্ত পূরণ না হইলে সভ্যকে লাভের অংশ হইতে কিছুটা এবং মোট মালের মূল্য শতকরা ৫ ভাগ পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হইবে।

(৭) (ক) শ্রেণীর সভ্যকে খুচরা বিক্রয়ের জন্য কলে প্রস্তুত সব মালের সঠিক বিবরণ সভার নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৮) (ক) শ্রেণীর প্রত্যেক সভ্যকে যতদূর সম্ভব দেশী মাল ব্যবহার করিতে হইবে।

৪। সভ্যদের পদত্যাগের ও সভা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নিয়ম।

৫। যে সব কলে বয়ন ও সুতা কাটা দুইই হয় তাদের প্রত্যেক তাঁতের উপর ১৷৹ টাকা হারে একটা ফি আদায় করা হইবে। তা ছাড়া এক এক মিলে যত তাঁত আছে তার ৪০ গুণের অধিক টাকুর প্রতি হাজার টাকুতে ২০ টাকা হারে অতিরিক্ত ফী আদায় করা হইবে। যে মিলে শুধু বয়নকার্য্য হয়, তাহার নিকট হইতে মাত্র ৸৹ আনা এবং যে মিলে শুধু সুতা কাটা হয় তার প্রতি হাজার টাকুতে ২০৲ চাঁদা আদায় হইবে। মহাজন বা সঙ্ঘের প্রবেশ ফী ৫০৲ টাকা।

৬। সভার মারফতে বাজারে বিক্রীত মালের অর্থ হইতে কিয়দংশ সভা-পরিচালনা কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

৭। কোন্ মিলে কি প্রকার কাপড় বয়ন করা চলিবে সভা তাহা স্থির করিয়া দিবেন। সভ্যরা পরস্পর বয়ন বিনিময় করিতে পারিবেন।

৮। নির্দ্দেশমত মাল সরবরাহ করিতে না পারিলে সভ্যের কলের অসামঞ্জস্য পরীক্ষা করিবার অধিকার সভার থাকিবে।

৯। সভ্যদের ভিতর বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা।

১০। ভারতীয় কাপড়ের মূল্য ও উৎকর্ষ অব্যাহত রাখিবার জন্য ও বিদেশী কাপড় যাহাতে স্বদেশী বলিয়া না চলে সেজন্য

(ক) সভা মালের নমুনা সংগ্রহ করিতে, মালের বিস্তৃত বিবরণ নির্দ্দেশ করিতে, বাজার হইতে খুচরা ও পাইকারী মূল্যের সংবাদ গ্রহণ করিতে এবং মাল বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট, বাজার, দোকান ইত্যাদি রাখিতে পারিবেন।

(খ) সভা এ বিষয়ে যথোচিত তথ্য হিসাব ষ্ট্যাটিষ্টিক প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(গ) সভা কোন বিষয়ে প্রচার করা সমীচীন মনে করিলে প্রচার করিতে পারিবেন।

১১। সভা কংগ্রেস ও অন্যান্য স্বদেশী কাপড়ের প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ করিতে রাজী আছেন।

ভারতীয় মিলে ধর্ম্মঘট

এই বৎসর ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে ভারতের মিলগুলিতে সর্ব্বসুদ্ধ ৪৫টী ধর্ম্মঘট হয়। এই ধর্ম্মঘটগুলিতে সর্ব্বসুদ্ধ ৭৪,২৮২ জন শ্রমিক যোগ দেয়। ১৫,৮২,০২৮টি কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মঘটের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে বাঙ্গালা দেশে। বোম্বাইয়ে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা বাঙ্গালা দেশের ধর্ম্মঘটের সংখ্যার চেয়ে কম। বাঙ্গালা দেশের ধর্ম্মঘটগুলিতে যত শ্রমিক যোগ দেয় বোম্বাইয়ের ধর্ম্মঘট-গুলিতে তাহার অর্দ্ধেকেরও কম শ্রমিক যোগ দিয়াছে। কিন্তু বোম্বাইয়ের মিলগুলিতে বাঙ্গালাদেশের মিলগুলির চেয়ে প্রায় ৳ অংশ বেশী কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ ধর্ম্মঘটই কাপড়ের কলে হয়।

৪০% ধর্ম্মঘট ঘটিয়াছিল ব্যক্তি-বিশেষকে কর্ম্মে নিয়োগ করা লইয়া, বাকীগুলির কারণ অন্যরূপ।

এই ধর্ম্মঘটগুলির মধ্যে যে ২৯টী মীমাংসিত হইয়াছিল, তার মাত্র ৩টীতে শ্রমিকেরা সম্পূর্ণ জয়লাভ করে, ১৭টীতে সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হয়, বাকীগুলিতে আংশিক জয়লাভ করে।

বিভিন্ন রেলওয়ের উন্নতিসূচক প্রস্তাবের নমুনা

(১) সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

গত পয়লা আগষ্ট মাদ্রাজে সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ের অ্যাড্‌ভাইসরি কমিটীর একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

ঐ সভায় আলোচিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্যবসায়ীদিগের কূপন টিকেট

ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সার্কুলার কূপন টিকেট দেওয়া হইবে। প্রত্যেক কূপন বইতে ছয় মাইল করিয়া ৪৮০টি ও ১ মাইল করিয়া ১২০টী কূপন থাকিবে।

রেলের কামরার উন্নতি

এখনও যে সমস্ত "ব্রড গেজ" লাইনে উচ্চ শ্রেণীর কামরায় রাত্রিতে আলোর বন্দোবস্ত করা হয় নাই সেই-গুলিতে শীঘ্রই আলো দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইবে।

কামরা হইতে পাইখানায় যাইবার রাস্তায় ছোবড়ার মাদুর দেওয়ার প্রস্তাবটী অনুমোদিত হয় নাই।

জল খাওয়াইবার ব্যবস্থা

তাঞ্জোর জংসনে টিফিনে চা, রুটী, মাখন ও আলু সরবরাহের চেষ্টা করা হইবে। ইণ্ডিয়ান রিফ্রেসমেণ্ট রুমে বোতলে করিয়া মাখন-তোলা দুধ বিক্রয়ের চেষ্টা করা হইবে।

কড়াইকুড়ি ষ্টেশনটী জংশনে পরিণত করিবার এষ্টিমেটে একটি ইণ্ডিয়ান রিফ্রেসমেণ্ট রুম তৈয়ারীর হিসাবও ধরা হইয়াছে। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান রিফ্রেসমেণ্ট রুমের অন্য কোন সাময়িক বন্দোবস্ত করা হইবে না।

ট্রেণ সারভিস্

৮৭৯নং ও ৮৬৪নং প্যাসেঞ্জার ট্রেণ দুইটীকে রাবণ সমুদ্রম্ ও তিরুমায়ম ষ্টেশনে থামাইবার বন্দোবস্ত করা হইবে। ত্রিচিনপল্লী ও মান-মাদুরা ষ্টেশন দুইটীর মধ্যে একটি থ্রু ট্রেণ চালাইবার চেষ্টা করা হইবে।

(২) বি বি অ্যাণ্ড সি আই রেলওয়ে

২১শে জুলাইয়ের ৬৪তম সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়।

বোম্বাই সেণ্ট্রাল ষ্টেশন

চেয়ারম্যান আশা দিয়াছেন যে, আগামী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বোম্বাই সেণ্ট্রাল ষ্টেশন খোলা হইবে। দূরের যাত্রীরা ঐ খান হইতে উঠিবে ও ওখানে আসিয়া পৌছিবে। স্থানীয় ও মফঃস্বল যাত্রীদের জন্য আগামী মার্চ্চ বা এপ্রিল অবধি কোলাবাই টারমিনাস্ থাকিবে। ঐ সময়ের মধ্যে চার্চ্চগেট ষ্টেশনের সংস্কার শেষ হইবে বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী গণনা

ব্রড ও মিটার গেজে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের একটি গণনা লওয়া হয়। তাতে বেশ সন্তোষজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মেলা উপলক্ষে মাশুল হ্রাস

খোজা ও পুষ্কর মেলা উপলক্ষে মাশুল হ্রাস করা হইয়াছিল। কিন্তু উহা ঠিক হয় নাই। লোকের আর্থিক সঙ্কট হেতু এই মাশুল হ্রাসের দরুণ যাত্রীর সংখ্যা আশানুরূপ বাড়ে নাই।

ভ্রমণ ট্রেণের ব্যবস্থা

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কাশ্মীর যাত্রীদের জন্য আগামী মাসে একটি এক্সকারশন স্পেশালের বন্দোবস্ত করা হইবে।

পণ্যদ্রব্য সন্দেশ বিতরণ

প্রধান প্রধান পণ্যদ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়। কোন্ ব্যাপারী সেগুলির কারবার করে ইত্যাদি বিষয় দেশের বণিক ও ক্রেতাদের জ্ঞাত করিবার জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তিকাসকল প্রণয়ন করা হইবে।

(৩) বেঙ্গল অ্যাণ্ড নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে

এই রেলওয়ের পরামর্শ সমিতির ২৬শে জুলাই তারিখের অধিবেশনে প্রধান আলোচিত বিষয়গুলি এই :

(ক) মজঃফরপুর প্যালেজাঘাট হইতে সোণাপুর সাবন হাটি আরও বেশী ট্রেণ দিতে হইবে।

(খ) মশারক শাখার ষ্টেশনে বিজলী পাখার বন্দোবস্ত চাই।

(গ) মহেন্দ্রুঘাটে ষ্টীমারের ব্যবস্থা দরকার।

(ঘ) সমস্তিপুরে হিন্দু খানাঘর বসাইতে হইবে।

(ঙ) ভিড় ও তজ্জন্য অতিরিক্ত ট্রেণ চাই।

(৪) জি আই পি রেলওয়ে

৭ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে এই রেলওয়ের অ্যাডভাইসরি কমিটির ৭ম অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে।

পুনা এক্সপ্রেস ট্রেণে রিফ্রেসমেণ্ট ষ্টল

এ সম্বন্ধে যথাযোগ্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ছাত্রদের পাশ দেওয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে উপস্থিত হইবার জন্য যেসব ছেলেকে ট্রেণে আসিতে হয়, তারা মাশুল-হ্রাসের দাবী করিতে পারে। তা দেওয়া হইবে।

গোরাড়ি ষ্টেশনের সম্মুখে রাস্তার দুরবস্থা

৬০ ফুটের মধ্যে ১০ ফুট রেলওয়ের এলাকায়। রাস্তাটা খারাপ। রেলওয়ে নিজ এলাকার অংশটুকু সংস্কার করিবে ও বাকীটার জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে লিখিবে। বুকিং অফিসে প্রবেশের পথে আলোর বন্দোবস্ত করা হইবে।

প্রাদেশিক ভাষায় টাইম টেব্‌ল

১৯২৫ সন হইতে আরবি ও হিন্দীতে ও পরে উর্দ্দুতেও টাইম্ টেব্‌ল মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। উর্দ্দু টাইম্ টেব্‌ল বেশী বিক্রী হয় না বলিয়া ক্ষতি হইতেছে, উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

কুরলা-মানখুর্ড শাখা লাইন

(ক) কুরলা মানখুর্ড প্ল্যাটফর্ম্মের উপর কুরলা ষ্টেশনে বুকিং আফিস্ চাই।

(খ) গোবন্দী ও মানখুর্ড ষ্টেশনদ্বয়েও ঐরূপ আফিস্ দরকার।

(গ) গোবন্দী ও মানখুর্ডের প্ল্যাটফর্ম্ম উঁচু করিয়া দিতে হইবে।

(ঘ) গোবন্দী ও মানখুর্ডে আরো ভাল আলোর বন্দোবস্ত করা চাই।

(ঙ) ঐ দুই স্থানে বেঞ্চ ও ছায়াযুক্ত স্থান দরকার।

(চ) ট্রেণের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে।

(ছ) প্ল্যাটফর্ম্ম বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দিতে হইবে।

(জ) গোবন্দীতে ট্রেণ আরও বেশীক্ষণ দাঁড় করাইতে হইবে।

চেয়ারম্যান বলেন, বেঞ্চের বন্দোবস্ত হইবে; কিন্তু টাকার অভাবে আর কিছু করা সম্ভবপর হইবে না।

ট্রেণের বাঁশীতে কাজের বিঘ্ন

পুনা সহরের বাসিন্দারা বরাবর অভিযোগ করিয়া আসিয়াছেন ট্রেণের চড়া আওয়াজ তাঁদের কানে লাগে। নানা পরীক্ষার পর নূতন ধরণের বাঁশীর আয়োজন করা হইয়াছে, আওয়াজ বেশী হইবে না।

ট্রেণ হ্রাস

কতকগুলি ট্রেণের যাতায়াত বন্ধ করা হইয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আদ্‌মী

[দিল্লী হইতে ফিরিবার পথে ট্রেণে একজন পেশোয়ারীর সহিত দেখা। তাঁর সহিত আমার বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তাহার কোন কোন অংশের মর্ম্ম নীচে দেওয়া গেল।—শ্রীসুধাকান্ত দে]

প্রঃ—আপনি কোথায় যাইতেছেন ?

উঃ—কলিকাতায়।

প্রঃ—সেখানে কি করেন ?

উঃ—আমাদের জুতার কারবার আছে।

প্রঃ—আপনারা কলিকাতায় কত দিন আছেন?

উঃ—অনেক দিন। আমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে বাবা কলিকাতায় বাস করিতেছেন। ৪০ বৎসর হইবে।

প্রঃ—আপনার বয়স কত ?

উঃ—২২ বৎসর।

প্রঃ—মাত্র ২২ বৎসর! আপনাকে দেখিলে মনে হয় ৩৫।৩৬ বৎসরের কম নয়।

উঃ—বাবু, আমাকে কি দেখিতেছেন? বাঙ্গালার জল বাতাসে আমার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের ১২ বৎসরের বালককে দেখিলে আপনি অবাক্ হইয়া যাইবেন। ট্রেণের ছাদে গিয়া তার মাথা প্রায় ঠেকিবে। ইয়া চওড়া। ৪৫।৪৬ ইঞ্চি তার বুকের ছাতি। এই ট্রেণের দরজা অতি সহজে ঘুষি মারিয়া ভাঙ্গিয়া দিবে। [illegible] বৎসরের পেশোয়ারী বালকের হাতে বন্দুক থাকিলে তার গুলি হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। এমন [illegible] তার লক্ষ্য।

প্রঃ—বটে ? আচ্ছা, পেশোয়ারীরা কি খাইয়া গায়ে এত তাকৎ সঞ্চয় করে বলিতে পারেন ?

উঃ—প্রথমতঃ দেখুন সেখানকার জল-বাতাস অতি উৎকৃষ্ট। আপনি যাহাই খান সহজে হজম হইয়া যাইবে, সর্ব্বদা ক্ষুধার উদ্রেক হইবে। তারপর আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতি ফল ও মাংসাদি খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত শস্তা। এক পয়সা আঙ্গুরের সের আর ৶০—।০ আনায় দুম্বার মাংসের সের বিকায়। সুতরাং আমাদের যে এরূপ শরীর থাকিবে ও এত বল হইবে, তা আর বিচিত্র কি ?

প্রঃ—ভাল, একটা পেশোয়ারী কতখানি খাইতে পারে?

উঃ—বাহিরে গিয়া তার শরীর যদি খারাপ হইয়া না গিয়া থাকে, তবে সে অক্লেশে ২০।২৫ সের মাংস গলাধঃকরণ করিতে পারে। আর ফলফলাদির ত কথাই নাই। আপনি দেখিবেন যেন তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে।

প্রঃ—আপনি নিজে কত খাইতে পারেন?

উঃ—আমার কথা ছাড়িয়া দিন। আমাকে কলিকাতার বাবু বলিয়া পেশোয়ারীরা ঠাট্টা করে। পেশোয়ারে গেলে আমি না পারি এই রকম দাড়ি কামাইতে, না পারি বাঁকা সিঁথি কাটিতে। দাড়ি রাখিতে হয়। আমার পেটে ৫ সের পর্য্যন্ত ছাগ-মাংস বেশ সহজে হজম হয়।

প্রঃ—আপনারা গরু খান না ?

উঃ—বাবুজী, আমাদের পরিবারে গরু খাইবার রেওয়াজ

নাই। এরূপ পরিবার উত্তর ভারতে বিরল নয়। বাস্তবিক পক্ষে উত্তর ভারতে শতকরা ২ জন মুসলমানও গরু খায় কি না সন্দেহ। অথচ বাঙ্গালা দেশের মুসলমানরা গরু খাওয়া লইয়া কেন এত কোলাহল করে বুঝিতে পারি না।

প্রঃ—আপনি সম্প্রতি পেশোয়ার হইতে আসিতেছেন ত? পেশোয়ারের কিরূপ অবস্থা দেখিলেন বলুন।

উঃ—সর্ব্বত্র একটা অসন্তোষের ভাব যেন দেখিলাম। কিন্তু পেশোয়ার সম্বন্ধে ঠিক ধারণা আপনাদের কাহারও নাই। ইংরেজদের অধিকৃত অংশ সমস্তই সমতল। কিন্তু তা ছাড়াও ঢের উঁচু উঁচু পাহাড় আছে। ঐই সব পাহাড়ে পেশোয়ারীরা বাস করে। এগুলি দুর্গম। ইংরেজ এখানকার বাসিন্দাদের দ্বারা সর্ব্বদা উত্যক্ত হইয়াও তাহাদের কোনরূপে শায়েস্তা করিতে পারে নাই। লান্তি কোটাল প্রভৃতি স্থান-বিশেষে সতর্কভাবে জীবন-যাপন করিতে হয়। দিনের বেলা ৮টা হইতে ৫টার মধ্যে ঘরের বাইরে যাওয়া যায়, তার পরে যাওয়া নিষেধ। অনেক সময় "আর্ম্মার্ড কার"এ (রক্ষিত মোটর) পর্য্যন্ত বাহির হওয়া নিরাপদ নয়। পেশোয়ারীরা অব্যর্থ গুলির আঘাতে টায়ার ফাটাইয়া দেয়।

প্রঃ—এরূপ অত্যাচার করিয়া তাদের কি লাভ হয়? তারা কি আফগান প্রজা, না কোন শাসনেরই ধার ধারে না?

উঃ—ওয়াজিরি ও মাসুদেরা নাদির খাঁর শাসন মানে না। এরা নিজ নিজ দলপতি বা সৈয়দের আদেশ অনুসারে চলাফেরা করিয়া থাকে। ইংরেজদের প্রজার উপর অত্যাচার করার অর্থ এই যে, বৃটিশ-শাসিত ভারত হইতে এরা প্রায়ই ভারতীয়দের ধরিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রাণে মারে না। টাকা পাইলে সেই লোক বা লোকদের ফিরাইয়া দেয়। তবে ইংরেজদের উপর এদের ক্রোধ আছে বটে। অত্যন্ত দুর্গম স্থানে থাকে বলিয়া ইহাদের যথোচিত শাসন করিতে পারা যায় না।

প্রঃ—পেশোয়ার হইতে জালালাবাদ, কাবুল কতদূর?

উঃ—পেশোয়ার বাজার হইতে জালালাবাদ দেখা যায়। কাবুলও বেশীদূর নয়।

প্রঃ—কাবুলে যাওয়া নিরাপদ কি?

উঃ—আপনি একা গেলে আপনাকে গুপ্তচর সন্দেহে মারিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু পরিচিত কোন পেশোয়ারীর সহিত আপনি অক্লেশে কাবুলে যাইতে পারেন।

প্রঃ—কিন্তু কাবুলে যাওয়ার উপায় কি?

উঃ—উটের গাড়ী আছে।

প্রঃ—কিন্তু পথে পথে সরাইখানা আছে কি? রাত্রিতে থাকিব কোথায়?

উঃ—সে বিষয়ে আপনাকে ভাবিতে হইবে না। এই ওয়াজিরি ও মাসুদেরা অত্যন্ত অতিথি-বৎসল। আপনি যদি হিন্দু হন তবে সংগ্রহ করিয়া আপনাকে দধি চিড়া খাওয়াইবে, সর্ব্বপ্রকার যত্ন করিবে। আপনি যদি মুসলমান হন ত বলিবে তোমাকে দুই দিন আমার বাড়ীতে থাকিতে হইবে। যদি আপনি আপত্তি করেন ত সে বলিবে, কি! তুমি কি আমার গ্রামের নাম হাসাইতে চাও? এস তবে ছুরি মারিয়া শেষ করিয়া দিই। অগত্যা আপনাকে থাকিতেই হইবে। সেই দুই দিন তার গৃহে মহা উৎসবের আয়োজন হইবে, সৈয়দেরা নিমন্ত্রিত হইবে।

প্রঃ—ওয়াজিরি ও মাসুদেরা কি খুব হিংস্র প্রকৃতির।

উঃ—দেখুন হিংস্র কাহাকে বলে জানি না। ১২ বৎসর হইতে প্রত্যেক ওয়াজিরি বালককে বন্দুকে অব্যর্থ-লক্ষ্য হইতে হয়। যে তা হইতে পারে না তাকে আগে মারিয়া ফেলা হইত, এখন ইংরেজের ভয়ে সে প্রথা তিরোহিত হইয়াছে; কিন্তু সে সমাজে নিন্দিত অবস্থায় থাকে। বুঝিতেই পারিতেছেন ছেলেবেলা হইতে বন্দুক ছোড়া অভ্যাস করিতে হয়। তারপর আমরা দোস্তি করিতে যেরূপ দুর্ব্বলতা করিতে সেইরূপ। যে আমার দুষমণ তাকে কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করি না, আর যে আমার দোস্ত তার পায়ের

ধুলা পর্য্যন্ত চাটিয়া খাইতে রাজী আছি। এ আমি বাড়াইয়া বলিতেছি না। ওয়াজিরি ও মাসুদেরা যেমন দুর্দ্দান্ত, তেমনি সরলপ্রকৃতির। মিষ্ট কথা বলিলে, মিষ্ট ব্যবহার করিলে গোলাম হইয়া থাকে। এমন কি ধন, গরু, জরু দিয়াও সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শত্রুতা করিলে তার আর রক্ষা নাই। তার সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে। আপনাকে একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিতেছি। ধরুন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ক্ষেতের আল কাটিয়াছে। খবর পাইয়া সে ছুটিয়া আসিবে এবং তৎক্ষণাৎ তার বুকে ছুরি বসাইয়া দিবে। কিন্তু সে যদি তার অনুমতি লইয়া আল কাটিত, তবে কিছুই বলিত না। আপনি কোন গৃহস্থের বাড়ী হইতে না বলিয়া আঙ্গুর পাড়িয়া লইলে আপনাকে খুন করিয়া ফেলিবে। কিন্তু আপনি তার কাছে চাহিলে সে সাদরে আপনাকে বাগানে লইয়া যাইবে ও পয়সা না লইয়া আঙ্গুর দিবে।

প্রঃ—আপনি জাতে কি?

উঃ—আমি সৈয়দ ওয়াজিরি।

প্রঃ—আপনারাই সমাজের হর্ত্তাকর্ত্তা বুঝি? আপনাদের খুব মানে?

উঃ—সমাজের মধ্যে সৈয়দেরাই অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। সাধারণ লোকেরা সৈয়দদের যত মানে আফগান আমীরকেও তত মানে না। সৈয়দের কথায় ইহারা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত থাকে।

প্রঃ—আপনাদের লোকদের আর কোন বিশেষত্ব আছে কি?

উঃ—আমাদের দেশে মদ, তামাক, পান নিষিদ্ধ। কেহ খাইলে তাকে গাধার পিঠে উল্টা করিয়া চড়াইয়া, অর্দ্ধেক মাথা মুড়াইয়া, এক গালে চুণ ও এক গালে কালি মাখাইয়া সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করান হয়।

প্রঃ—এটা বুঝি আপনাদের সামাজিক শাস্তির ব্যবস্থা?

উঃ—হাঁ। অনুরূপ শাস্তিও দেওয়া হয়।
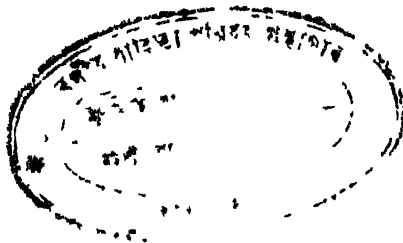
"লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্স জার্ণাল"—মে, ১৯৩০

ল্যাটিন আমেরিকার সহিত বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্য

মেক্সিকোর উত্তর সীমানা হইতে কেপ হর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ল্যাটিন আমেরিকা নামে পরিচিত। আয়তনে এই ভূভাগ বিলাতের ৮০ গুণেরও বেশী, কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা মাত্র ৯৫,০০০,০০০ অর্থাৎ গ্রেটবৃটেন এবং উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের মিলিত লোকসংখ্যার দ্বিগুণের কিছু বেশী। ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সনের সংখ্যা দৃষ্টে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গোটা দুনিয়ার আমদানি বাণিজ্যের ৭॥% এবং রপ্তানি বাণিজ্যের ৯॥% ল্যাটিন আমেরিকায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। আর বিলাতের হিস্তায় পড়িয়াছে দুনিয়ার আমদানি বাণিজ্যের ১৫॥% ও রপ্তানি বাণিজ্যের ১১%।

ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে ফ্যাক্টরি-শিল্প আদৌ নাই বলিলেই চলে। এই সমস্ত দেশে কারখানাজাত দ্রব্য আসে প্রধানতঃ ইয়োরোপ এবং উত্তর আমেরিকা হইতে। ল্যাটিন আমেরিকার আমদানি দ্রব্যের অর্দ্ধেক এই ধরণের চিজ। রপ্তানির মধ্যে শস্য, মাংস এবং খাদ্য দ্রব্য প্রধান। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্ত্তী দেশসমূহ হইতে প্রধানতঃ টিন, তামা, নাইট্রেট্ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য আমদানি হইয়া থাকে।

লড়াইয়ের আগে ল্যাটিন আমেরিকায় বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্য খুব জোরেই চলিয়াছিল। কিন্তু লড়াই বাধিবার পর অর্থাৎ ১৯১৩ সন হইতে মার্কিণ এই বাজার ক্রমাগত দখল করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

নিম্নের তালিকায় লড়াইয়ের আগে এবং পরে উত্তর আমেরিকার সহিত বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্য বিলাতের গোটা ব্যবসা-বাণিজ্যের শতকরা কি হারে চলিয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া হইল :—

	বিলাতে আমদানি (শতকরা)	বিলাতজাত দ্রব্য রপ্তানি (শতকরা)
১৯১৩	৯·০৬	৯·৫৯
১৯২৮	১০·১০	৯·৬৬
১৯২৯	১০·৩৪	৯·৬০

এক আর্জ্জেন্টিনাই ১৯১৩ সনে আমদানির ৫·৫৩% এবং ১৯২৯ সনে ৬·৯২% গ্রহণ করিয়াছে। ঐ দেশের রপ্তানির হিসাবও ঐ দুই সনে যথাক্রমে ৪·৩১% এবং ৪·১৯%। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বিলাতের আমদানি বাড়িলেও রপ্তানি কিন্তু সেই ১৯১৩ সনের অনুরূপই রহিয়াছে।

১৯১৩ সনে দেখা যায় জনপ্রতি হিসাবে বিলাতী জিনিষ আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে আর্জ্জেন্টিনার স্থান সর্ব্বোচ্চ। এখানে জনপ্রতি আমদানি ৩ পাঃ ৬ পেঃ; ইহার পরেই নরওয়ের স্থান। এই দেশে জনপ্রতি আমদানির মূল্য ২ পাঃ ৯ শিঃ ১১ পেঃ। ১৯২৮ সনেও আর্জ্জেন্টিনার স্থান সর্ব্বোচ্চ ছিল; কিন্তু ১৯২৯ সনে আর্জ্জেন্টিনা একেবারে ৪র্থ স্থানে নামিয়া গিয়াছে। এই সনে আর্জ্জেন্টিনার জনপ্রতি আমদানি ২ পাঃ ১২ শিঃ ১০ পেঃ। নরওয়ে (৩ পাঃ ১০ শিঃ ৭ পেঃ), দেন্মার্ক (৩ পাঃ ৮ পেঃ) এবং হল্যাণ্ড (২ পাঃ ১৬ শিঃ ৩ পেঃ) আর্জ্জেন্টিনাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

বৃটিশ ও ল্যাটিন আমেরিকার বাণিজ্যের মূল্য

নিম্নে যে তালিকাটী দেওয়া হইল উহা দেখিলে বিলাতের সহিত ল্যাটিন আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য কি ভাবে চলিতেছে তাহা বুঝা যাইবে। যুদ্ধে নিযুক্ত দেশগুলি লড়াইয়ের ধাক্কা সামলায় ১৯২৪ সনে। এই সন হইতে দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা দাঁড়ায়। তালিকায় বুঝিবার সুবিধার জন্য ১৯১৩ সন, ১৯২৪ সন এবং ১৯২৯ সনের হিসাব দেওয়া হইল।

	১৯১৩	১৯২৪	১৯২৯
বিলাতে আমদানি	(১০ লক্ষ পাঃ)	(১০ লক্ষ পাঃ)	(১০ লক্ষ পাঃ)
আর্জ্জেন্টিনা হইতে	৪২'৫	৭৯'০	৮১'৪
চিলি "	৫'৪	১০'৭	১০'৫
ব্রাজিল "	১০'০	৪'৮	৭'৩
পেরু "	৩'২	৯'৮	৬'৫
বলিভিয়া "	২'৩	৫'২	৬'০
উরুগোয়ে "	২'৭	৫'৪	৫'৬
কোষ্টারিকা "	১'৪	২'৩	৩'২
মেক্সিকো "	১'৯	৫'৮	২'৭
কলাম্বিয়া "	১'১	১'৫	২'১
*ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশ হইতে	১'৬	২'১	২'০
মোট	৭২'১	১২৬'৬	১২৭'৩

বিলাতজাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে	(১০ লক্ষ পাঃ)	(১০ লক্ষ পাঃ)	(১০ লক্ষ পাঃ)
আর্জ্জেন্টিনায়	২২'৬	২৭'২	২৯'১
ব্রাজিলে	১২'৫	১৩'৬	১৩'৪
চিলিতে	৬'০	৫'৪	৯'২
উরুগোয়ায়	২'৯	৩'২	৩'৭
কলাম্বিয়ায়	১'৭	২'৭	৩'২
মেক্সিকোতে	২'২	২'৪	২'৫
ভেনিজুয়েলায়	০'৮	১'৮	২'৫
পেরুতে	১'৫	২'৭	২'০
*ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে	২'৮	৪'৪	৪'২
মোট	৫৩'০	৬৩'৪	৬৯'৪

প্রধান প্রধান পণ্য দ্রব্য

১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২৪ হইতে ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত ল্যাটিন আমেরিকা হইতে যে অধিকতর জিনিষ আমদানি হইয়াছে তাহা নয়, দর চড়িয়া যাওয়ায় আমদানি দ্রব্যের দাম বেশী হইয়াছে। পক্ষান্তরে রপ্তানি কিন্তু মূল্যহিসাবেও কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৮ সনে বিলাতে মোট আমদানি দ্রব্যের দাম ১২০,৭০০,০০০ পাঃ; ঐ সনে বিলাত হইতে রপ্তানির মূল্য ৬৯,৪০০,০০০ পাঃ। বিলাতের আমদানি দ্রব্যের প্রায় ৬% জিনিষ অন্যান্য দেশে পুনরায় রপ্তানি হইয়াছে।

ল্যাটিন আমেরিকা হইতে বিলাতে রপ্তানি

	১৯১৩ টন	১৯২৮ টন	হ্রাস বা বৃদ্ধি
ঠাণ্ডা জমান গো-মাংস	৩৮০,০০০	৫৩১,৯০০	+১৫১,৯০০
টিন বোঝাই গো-মাংস এবং গোমাংসের সার	১৫,৭০০	৪৮,৯০০	+৩৩,২০০

* গোয়াতেমালা, হন্দুরাস (বৃটিশ ছাড়া), সালভাদর, নিকারুগুয়া, পানামা, ইকুয়াদোর এবং প্যারাগোয়ে। ইহা ছাড়া ভেনিজুয়েলা হইতে রপ্তানি হইয়াছে এবং কোষ্টারিকা এবং বলিভিয়ায় কিছু কিছু বিলাতী মাল রপ্তানিও হইয়াছে।

	১৯২৩	১৯২৮	হ্রাস বা বৃদ্ধি
	টন	টন	
জমান ছাগ এবং ভেড়ার মাংস	৬৬,৯০০	১১৩,৪০০	+৪৬,৫০০
গম	৭৭৬,১০০	১,২৩০,৯০০	+৪৫৪,৮০০
ভুট্টা	১,৯৪৩,৯০০	১,২৩৬,৪০০	−৭০৭,৫০০
তুলা	৪৫,১০০	৫৫,৯০০	+১০,৮০০
টিন	২৪,৬০০	৬১,৬০০	+৩৭,০০০
মসিনা	২২৬,০০০	৩০৭,৩০০	+৮১,৩০০
ভেড়ার লোম	৪২,৩০০	৪৭,১০০	+৪,৮০০
রবার	১৮,০০০	২,৪০০	−১৫,৬০০

আর্জ্জেন্টিনা সম্বন্ধে ১৯১৯ সনের হিসাব পাওয়া গিয়াছে। নিম্নের তালিকায় আর্জ্জেন্টিনা হইতে বিলাতে গম এবং ভুট্টা আমদানির হিসাব দেওয়া হইল—

	গম (টন)	ভুট্টা (টন)
১৯১৩	৭৩৭,৮১০	১,৯৪২,৭০০
১৯২৫	৫৯৮,০০০	৮৩৯,০০০
১৯২৬	৫৯৬,০০০	১,২৫৪,৫০০
১৯২৭	৯৭২,৬০০	১,৭৮২,০০০
১৯২৮	১,২২০,০০০	১,২৩৪,১০০
১৯২৯	২,২৬৮,৯০০	১,২১০,১০০

আর্জ্জেন্টিনা হইতে বিলাতে ভুট্টা আমদানি ১৯১: সনেই সবচেয়ে বেশী হইয়াছে। ১৯০৯ হইতে ১৯১২ সন পর্য্যন্ত ৪ বৎসরের প্রতি বৎসর গড়ে ১,১০০,০০০ টন ভুট্টা আমদানি হইয়াছিল।

বলিভিয়া হইতে বিলাতে অপরিষ্কৃত এবং জমান টিন আমদানি দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ১৯২৯ সনের হিসাবও মিলিয়াছে। এই সনে ল্যাটিন আমেরিকা হইতে ৭০,৪০০ টন টিন আসিয়াছে, অর্থাৎ ১৯১৩ সনের প্রায় ৩ গুণ।

বিলাত হইতে ল্যাটিন আমেরিকায় রপ্তানি

	১৯১৩	১৯১৮	হ্রাস
কয়লা	৬,৯০৮,৯০০ টন	৪,৭৭৭,৪০০ টন	২,১৩১,৫০০
সুতির কাপড়	৬৩৭,৪৫২,০০০ গজ	৪২৫,৬৭৭,০০০ গজ	২১১,৭৭৫,০০০
মেশিনারি	৮৪,৮০০ টন	৫২,০০০ টন	৩২,৮০০
লোহালক্কড়	৬০৮,৯০০ টন	৬০৪,১০০ টন	৪,৮০০

বিলাত হইতে ১৯২৮ সনে ল্যাটিন আমেরিকায় যে মূল্যের জিনিষপত্র রপ্তানি হইয়াছে তাহার মধ্যে এই চার জিনিষ ৪৫% ।

বিলাতে ল্যাটিন আমেরিকা হইতে আমদানি দ্রব্যের বিশদ বিবরণ।

ল্যাটিন আমেরিকা হইতে আমদানি দ্রব্যের মধ্যে গোমাংসই সর্ব্বপ্রধান। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, ১৯২৮ সনে ঠাণ্ডা জমান গোমাংস ৫৩১,৯০০০ টন আমদানি হইয়াছে; মোট দাম ২৭,৩৫৩,০০০ পাউণ্ড। বিলাতের মোট জমান এবং ঠাণ্ডা গোমাংস আমদানির মধ্যে ল্যাটিন গোমাংস ৮৪%। আর্জ্জেন্টিনা একাই ৪৩২,২০০ টন ঠাণ্ডা গোমাংস, ৩৮,৪০০ টন জমাট গোমাংস পাঠাইয়াছে। বাদ বাকী পাঠাইয়াছে উরুগোয়ে এবং ব্রাজিল। ১৯২৮ সনে আর্জ্জেন্টিনা, উরুগোয়ে এবং ব্রাজিল হইতে ৪৮,৯০০ টন

টন বোম্বাই গোমাংস (জিহ্বা সমেত আসিয়াছে আর্জ্জেন্টিনা হইতে ৩৯,২০০ টন); মূল্য ৪,৬৪৪,০০০ পাউণ্ড। জমাট ছাগ-মাংস এবং ভেড়ার মাংস আসিয়াছে ১১৩,৪০০ টন, মূল্য ৬৮১,৯০০ পাঃ। আর্জ্জেন্টিনা পাঠাইয়াছে ইহার দুই-তৃতীয়াংশ; বাকী এক-তৃতীয়াংশ আসিয়াছে উরুগোয়ে এবং চিলি হইতে।

আমদানি দ্রব্যের মধ্যে মূল্য হিসাবে গোমাংসের পরেই শস্য প্রধান। ১৯২৮ সনে অর্জ্জেন্টিনা হইতে ১,২২০,০০০ টন গম আমদানি হয়। গোটা বিলাতের গম আমদানির ইহা এক-চতুর্থাংশ। চিলি এবং উরুগোয়ে হইতে আসে ১০,৯০০ টন অর্থাৎ ল্যাটিন আমেরিকা হইতে আসে মোট ১,২৩০,৯০০ টন, দাম ১৩,৯৬৪,০০০ পাঃ। ১৯২৯ সনে আর্জ্জেন্টিনা গম পাঠাইয়াছে ২,২৬৮,৯০০ টন অর্থাৎ বিলাতের মোট আমদানি গমের ৪১%। গম ছাড়া ময়দাও ঐসমস্ত দেশ হইতে বিলাতে আসে। ১৯২৮ সনে আর্জ্জেন্টিনা হইতে গম আমদানির পরিমাণ ৪১,০০০ টন, মূল্য ৪০৮,০০০ পাঃ। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া অর্জ্জেন্টিনা হইতে বিলাতে গম আমদানি ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৯১৩ সনে মাত্র ৯,৬০০ টন আমদানি হয়; এবং ১৯২৪ সনে আমদানি হয় ১৫,০০০ টন। ১৯২৯ সনে আমদানি হইয়াছে ৩৮,০০০ টন অর্থাৎ ১৯২৮ সনের চেয়ে ৩,০০০ কম। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বিলাতে যত ভুট্টা আমদানি হয়, তাহার তিন-চতুর্থাংশ আসে আর্জ্জেন্টিনা হইতে। ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সনে আর্জ্জেন্টিনা হইতে ভুট্টা আমদানি হয় ১,২৩৪,০০০ টন এবং ১,২১০,০০০ টন, মূল্য যথাক্রমে ১১,০১৫,০০০ পাঃ এবং ১০,৫৩৫,০০০ পাঃ। ১৯২৮ সনে বিলাতে এই আমদানি হইয়াছে সমস্ত দেশ হইতে ৩৭২,৪০০ টন। ইহার মধ্যে আর্জ্জেন্টিনা এবং চিলি হইতে আসিয়াছে ১১৯,৯০০ টন; মূল্য ১,২৪৮,০০০ পাঃ।

আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, ল্যাটিন আমেরিকা বিলাতের সর্ব্বপ্রধান কলা-সরবরাহকারী দেশ। কলাম্বিয়া কোষ্টারিকা, হন্দুরাস এবং ব্রাজিল হইতে বিলাতে কলা আসে। ১৯২৮ সনে এই কয় দেশ বিলাতের মোট আমদানির দুই-তৃতীয়াংশ যোগাইয়াছে। মোট আমদানির পরিমাণ ৮,৬১৮,০০০ ছড়া, মূল্য ৩,৬০৭,০০০ পাঃ। ইহার মধ্যে আবার কলাম্বিয়া সকলের উপরে। এই দেশ বিলাতে কলা পাঠাইয়াছে ৩,৯৭৭,০০০ ছড়া।

১৯২৯ সনে বিলাত আর্জ্জেন্টিনার মাখনই খাইয়াছে ২,৫৩৭,০০০ পাঃ (১৫,১০০ টন)। কফি ল্যাটিন আমেরিকার আর একটি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। ১৯২৮ সনে এই অঞ্চল হইতে বিলাতে ২,২৭৫,০০০ পাঃ মূল্যের ১৫,৩০০ টন কফি আমদানি হইয়াছে। অপরিস্কৃত চিনিও আসিয়াছে ১৪৮,৬০০ টন, মূল্য ১,৮৬৯,০০০ পাঃ। এসমস্ত চিনির দুই-তৃতীয়াংশ যোগাইয়াছে পেরু। ইহা ছাড়া ১৯২৮ সনে ব্রাজিল হইতে ১২,১০০ টন শুপারি আসিয়াছে। এই শুপারির মূল্য ৬১৭,০০০ পাঃ।

ল্যাটিন আমেরিকা হইতে বিলাতে যে সমস্ত কাঁচা মাল আমদানি হয় তাহার মধ্যে টিনই প্রধান। ১৯২৮ সনে আমদানি হইয়াছিল ৬১,৬০০ টন, ১৯২৯ সনে হইয়াছে ৭০,৪০০ টন। মূল্য যথাক্রমে ৭,৮৮০,০০০ পাঃ এবং ৭,৮৮৫,০০০ পাঃ। ১৯২৯ সনে টিনের দর পড়িয়া যাওয়ায় মূল্য কমিয়াছে। এই সমস্ত টিনের ৯০% বলিভিয়া হইতে আসিয়াছে। ১৯২৮ সনে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ৪৭,১০০ টন ভেড়ার লোম আসিয়াছে, দাম ৭৯৫৮০০০ পাঃ। ১৯২৯ সনে আসিয়াছে ৩৫,২০০ টন, মূল্য ৫,৬০০,০০০ পাঃ। ভেড়ার লোম প্রধানতঃ আর্জ্জেন্টিনা, উরুগোয়ে এবং চিলি হইতে আসিয়াছে। ১৯২৮ সনে বিলাতের মোট ভেড়ার লোম আমদানির ১৩৷৷% দক্ষিণ আমেরিকা যোগাইয়াছিল। ১৯২৯ সনে যোগাইয়াছে মাত্র ৯৷৷%। ভেড়ার লোমের পরেই তুলার স্থান। ১৮২৮ সনে তুলা আমদানি হইয়াছিল ৫০,৯০০ টন, মূল্য ৬৪১১০ পাঃ। পেরুই যোগাইয়াছে দুই-তৃতীয়াংশ; অর্থাৎ ১৯২৮ সনে বিলাতের মোট তুলা আমদানির ৮½%।

বিলাতে আর্জ্জেন্টিনা হইতেই সব চেয়ে বেশী মসিনা আমদানি হয়। ১৯২৮ সনে বিলাতে এই দেশ হইতে মসিনা আমদানি হইয়াছে ২৯৯,০০০ টন (বিলাতেই মোট মসিনা আমদানির ৮৬%)। এই মসিনার মূল্য ৪,৬৫৪ পাঃ।

উরুগোয়ে, ভেনিজুয়েলা, ব্রাজিল, চিলি প্রভৃতি দেশ হইতেও বিলাতে অল্প পরিমাণে মসিনা আমদানি হইয়াছে। ১৯২৯ সনে কিন্তু আর্জ্জেন্টিনা হইতে মসিনা আমদানি কমিয়াছে। এই সনে মোট আমদানি হইয়াছে ১৯,৯০,০০০ টন অর্থাৎ বিলাতের মোট মসিনা আমদানির ৭০%।

এ ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা বিলাতকে চামড়াও যোগাইতেছে। ১৯২৮ সনে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বিলাতে ১,০৬৪,০০০ পাঃ মূল্যের ৮,৪০০ টন চামড়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে আর্জ্জেন্টিনা যোগাইয়াছে ৫,৫০০টন। মাংস প্রস্তুতের সময় চামড়া ভিন্ন আরও অনেক চিজ্ প্রস্তুত হয়। যথা, অপরিষ্কৃত ট্যালো; এই দ্রব্য ১৯২৮ সনে বিলাতে আসিয়াছে ১৭,৬০০ টন, ইহার মূল্য ৬৯৩,০০০ পাঃ। ইহা ছাড়া পরিষ্কৃত ট্যালো, ওলিয়ো মার্গারিণ এবং ওলিয়ো অয়েল আসিয়াছে ১৪,২০০ টন, এগুলির মূল্য ৬৮৯৩,০০০ পাঃ। অধিকাংশ অপরিষ্কৃত ট্যালো এবং সমুদয় ওলিয়ো মার্গারিণ আর্জ্জেন্টিনা হইতে রপ্তানি হইয়াছে।

ল্যাটিন আমেরিকা হইতে বিলাতে সামান্য পরিমাণে কারখানাজাত দ্রব্যও আমদানি হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে চিলি হইতে ১৯২৮ সনে ৪৯,৬০০ এবং ১৯২৯ সনে ৫১,০০০ টন তামার বার আমদানিই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিলাতের মোট তামা আমদানির উহা এক-তৃতীয়াংশ, মূল্য যথাক্রমে ৩,২৬৩,০০০ পাঃ এবং ৪,০৪৩,০০০ পাঃ। পরিষ্কৃত পেট্রোলিয়াম আমদানি হইয়াছে ১৯২৮ সনে ৮২,৯১৫,০০০ গ্যালন, মূল্য ১,৪৮৬,০০০ পাঃ। ইহার মধ্যে মেক্সিকো পাঠাইয়াছে ৯৭%; বাকী ৩% পাঠাইয়াছে পেরু। নাইট্রেট অব্ সোডা দক্ষিণ আমেরিকার আর একটী উল্লেখযোগ্য আমদানি দ্রব্য। চিলি হইতে ১৯২৮ সনে এই চিজ্ আসিয়াছে ৬৮,৩০০ টন, দাম ৭২৮,০০০। বিলাতের মোট নাইট্রেট অব্ সোডা আমদানির উহা ৮৮% অংশ অধিকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া আর্জ্জেন্টিনা হইতে ট্যান্ করিবার সহায়ক নানাপ্রকার এক্স্ট্র্যাক্ট আমদানি হইয়াছে। আমদানির মূল্য ৬৬৫,০০০ পাঃ (২৫,৭০০ টন)।

বিলাত হইতে ল্যাটিন আমেরিকায় মাল রপ্তানি

বিলাত হইতে ল্যাটিন আমেরিকায় যে সমস্ত দ্রব্য রপ্তানি হয় তাহার মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যই প্রধান। এই ধরণের চিজ রপ্তানির পরিমাণ ৯০%। বাকী মালের মধ্যে কয়লা রপ্তানি হয় ৫%। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কাপড়ই প্রধান। ১৯২৮ সনে বিলাত ল্যাটিন আমেরিকার দেশ-সমূহে ১৭,১৫৮,০০০ পাঃ মূল্যের ৩৬৭,৯৮১,০০০ বর্গ গজ বস্ত্র রপ্তানি করে। বিলাতের মোট বস্ত্র রপ্তানির ইহা ৯॥%। আর্জ্জেন্টিনায় রপ্তানি পরিমাণ ১৪৮,৯২২,০০০ বর্গ গজ, মূল্য ৫,৩৯০,০০০ পাঃ। ১৯২৯ সনে বিলাত হইতে ল্যাটিন আমেরিকায় বস্ত্র রপ্তানি ৩% বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু মূল্য হ্রাস পাইয়াছে কিঞ্চিদধিক ৪%। কার্পাস বস্ত্রের পর পশমী বস্ত্রের স্থান। ১৯২৮ সনে এই চিজ রপ্তানি হইয়াছে ২৩,৮১৭,০০০ বর্গ গজ, মূল্য ৫,১৩৬,০০০ পাঃ। ১৯২৮ সনে বিলাত হইতে ল্যাটিন আমেরিকার বড় বড় ১১টী দেশে সূতা রপ্তানি হইয়াছে ৫,২৯১,০০০ পাঃ, দাম ২,২৭০,০০০ পাঃ।

১৯২৮ সনে বিলাত হইতে দক্ষিণ আমেরিকার লোহালক্কড় রপ্তানির পরিমাণ ৬০৪,০০০ টন, দাম ৯,২৭১,০০০ পাঃ। ১৯২৯ সনে আর্জ্জেন্টিনায় ১০৯,০০০ টন ইস্পাতের রেল এবং ১০৮,০০০ টন লোহার পাত রপ্তানি হইয়াছে (১৯২৮ সনের চেয়ে ইস্পাতের রেল ১৫,০০০ টন কম এবং লোহার পাত ৫,০০০ টন বেশী)। আর্জ্জেণ্টিনা এবং ব্রাজিল ১৯২৯ সনে বিলাত হইতে ৫৭,০০০ টন পাত গ্রহণ করিয়াছে, ১৯২৮ সনে গ্রহণ করিয়াছিল ৪৭,০০০ টন।

মেশিনারি আর একটি উল্লেখযোগ্য রপ্তানি দ্রব্য। ১৯২৮ সনে এই জিনিষ রপ্তানির পরিমাণ ৫২,০০০ টন, মূল্য ৪,৮৭৬,০০০ পাঃ। নিম্নের তালিকায় বিলাত হইতে ল্যাটিন আমেরিকায় মেশিনারি রপ্তানির পরিচয় দেওয়া হইল:—

	ওজন		মূল্য	
	১৯২৮	১৯২৯	১৯২৮	১৯২৯
	টন	টন	পাঃ	পাঃ
কৃষিকার্য্যের যন্ত্র	২,৭৩০	২,৭৭০	২০৫,৯০০	২২৩,৮০০

বৈদ্যুতিক যন্ত্র	৫,০০০	৩,০০০	৭৭৩,৮০০	৪৯৭,১০০
প্রাইম মুভার্স	৩,৮৬০	৪,০০০	৪০৭,১০০	৪২৬,৯০০
বয়নযন্ত্র	৫,৫৬০	৪,৮৭০	৬১৫,১০০	৫১৩,২০০

১৯২৯ সনে বিলাত হইতে ল্যাটিন আমেরিকায় ৭১০,০০০ পাঃ মূল্যের রেলওয়ে ইঞ্জিন রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৮ সনে ইঞ্জিন রপ্তানি হইয়াছিল ১,০৪০,০০০ পাঃ মূল্যের। ১৯২৮ সনে আর্জ্জেন্টিনা, চিলি, ব্রাজিল, পেরু এবং উরুগোয়ে দেশে বিলাত হইতে ১,৩৩৬,০০০ পাঃ মূল্যের বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি রপ্তানি হইয়াছে।

১৯২৮ সনে বিলাত হইতে ল্যাটিন আমেরিকায় কয়লার রপ্তানি হয় ৪,৭৭৭,০০০ টন, মূল্য ৪,১৬৭,০০০ পাঃ; আর্জ্জেন্টিনা গ্রহণ করে ২,৬৫৯,০০০ টন, এবং ব্রাজিল গ্রহণ করে ১,৭৫১,০০০ টন। ১৯২৯ সনে কয়লা রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে ২৬০,০০০ টন; মূল্য বাড়িয়াছে ৩৫০,০০০ পাঃ।

আর্জ্জেন্টিনার আমদানি বাণিজ্যে বিলাতের স্থান

১৯১৩ সনে আর্জ্জেন্টিনার রপ্তানি বাণিজ্যে বিলাতের অংশ ছিল ৩১%। ১৯২৭ সনে এই অংশ কমিয়া গিয়া দাঁড়ায় ১৯.৪%। ১৯১৩ সনে বিলাতের নীচেই স্থান ছিল জার্ম্মাণির এবং জার্ম্মাণির অংশ ছিল ১৬.৯%। ১৯২৭ সনে জার্ম্মাণির অংশ দাঁড়াইয়াছে ১১.৩%। পক্ষান্তরে মার্কিণের অংশ ১৯১৩ সনে ১৪.৭% হইতে ১৯২৭ সনে ২৫.৪%এ পরিণত হইয়াছে। ১৯২৭ সনে আর্জ্জেন্টিনার মোট আমদানির পরিমাণ ৮৫৬,৮০০,০০০ স্বর্ণ পিসস্ (প্রায় ১৭০,০০০,০০০ পাঃ)। ইহার মধ্যে লোহালক্কড় আমদানি ১৯,৩০০,০০০ পাঃ। বিলাত হইতে লোহালক্কড় আমদানি ১৭.৭%, মার্কিণ হইতে ৪৭.৮%। ১৯১৩ সনে লোহালক্কড় আমদানি হইয়াছিল বিলাত হইতে ৩৭.৩% এবং মার্কিণ হইতে ১৮.৬%।

১৯২৭ সনে আর্জ্জেন্টিনায় বস্ত্র আমদানি হয় ১২,৪০০,০০০ পাঃ; বিলাত পাঠায় ৩২.৬%, ইতালি ২৫.৭% এবং মার্কিণ ১৫.৮%। পক্ষান্তরে ১৯১৩ সনে এই তিন অঙ্ক ছিল যথাক্রমে ৪১.৬, ২২.৭ এবং ১.৪%। এই সনে জার্ম্মাণি বিলাতের প্রবল প্রতিযোগী ছিল; কারণ, জার্ম্মাণির অংশ ছিল ১৫.৯%। ১৯২৭ সনে জার্ম্মাণি অনেক দূরে নামিয়া গিয়াছে। কারণ, এই সনে জার্ম্মাণির অংশ মাত্র ৪.৮%।

আর্জ্জেণ্টিনায় নানাপ্রকার কেমিক্যাল দ্রব্য এবং ঔষধপত্রও যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। ১৯২৭ সনে আর্জ্জেণ্টিনা এই সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করে ৫,৮০০,০০০ পাঃ মূল্যের। বিলাতের রপ্তানি বাণিজ্যের এ সম্বন্ধে কিছু উন্নতি হইয়াছে। কারণ ১৯১৩ সনে আর্জ্জেণ্টিনার এই সমস্ত দ্রব্য আমদানির মধ্যে বিলাতের অংশ ছিল ১৮.৯%; কিন্তু ১৯২৭ সনে দাঁড়াইয়াছে ২৭.৯%। প্রথমে ফ্রান্সই ছিল সকলের সেরা (২১.৬%); কিন্তু ১৯২৭ সনে ফ্রান্সের অংশ দাঁড়াইয়াছে ১৬.৫%। ১৯২৭ সনে আর্জ্জেণ্টিনায় ৪,৬০০,০০০ পাঃ মূল্যের পশমী কাপড় আমদানি হইয়াছে; ইহার মধ্যে বিলাতের অংশ ৪৯.৫% এবং ফ্রান্সের ২৪.২%। ১৯১৩ সনে পশমী কাপড় আমদানিতে বিলাতের ভাগ ছিল ৫০%, জার্ম্মাণির ২২.৫% এবং ফ্রান্সের ১৪.৯%।

কাচের জিনিষ, চিনেমাটীর জিনিষ ইত্যাদি রপ্তানি সম্বন্ধে বিলাত হারিয়া গিয়াছে এবং ফ্রান্স জিতিয়াছে। জার্ম্মাণি এখনও সব চেয়ে বেশী মাল পাঠাইতেছে বটে; কিন্তু উহার ব্যবসা কমিয়াছে। ১৯২৭ সনে আর্জ্জেণ্টিনায় মোটের উপর এই সমস্ত দ্রব্য আমদানি হইয়াছে ১,৫০০,০০০ পাঃ মূল্যের। ইহার মধ্যে বিলাত পাঠাইয়াছে ১৫.৩%, ফ্রান্স ১৭.৮% এবং জার্ম্মাণি ৩৯.২%। ১৯১৩ সনে এই তিন দেশের অংশ ছিল যথাক্রমে ১৯.৫%, ১৩.৭% এবং ৪২.৯%। ১৯২৭ সনে আর্জ্জেণ্টিনা রং খরিদ করিয়াছে ১,০০০,০০০ পাঃ মূল্যের। বিলাত হইতে আসিয়াছে ৪০.৩%; ১৯১৩ সনে বিলাত হইতে আসিয়াছিল ৪২.৮%। পক্ষান্তরে মার্কিণের রপ্তানি ১৯১৩ সনে ১১.৩% হইতে ১৯২৭ সনে ২৯.৮%এ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্কিণ সৌভাগ্যবান্ হইয়াছে জার্ম্মাণির সর্ব্বনাশ করিয়া। কারণ জার্ম্মাণির রপ্তানি ১৯১৩ সনে ৩৮.৮% হইতে ১৯২৭ সনে ১৫.৭%এ পরিণত হইয়াছে।

আর্জ্জেণ্টিনায় কয়লা সরবরাহ ১৯১৩ সনের মত ১৯২৭ সনেও বিলাতই করিয়াছে ৮১.৭%; তবে মার্কিণ হইতেও

কয়লা আমদানি বাড়িতেছে ; কারণ, ১৯১৩ সনে মার্কিণের অংশ ছিল ১·৪%, কিন্তু ১৯২৭ সনে এই অংশ দাঁড়াইয়াছে ১০%।

উরুগোয়েতে বিলাতী রপ্তানি বাণিজ্যের কাহিল অবস্থা

১৯২৭ সনে উরুগোয়েতে মোট ৮১,৮০০০,০০০ পিসস্ অর্থাৎ প্রায় ১৭,০০০,০০০ পাঃ মূল্যের মাল আমদানি হয়। ইহার মধ্যে বিলাতের অংশ ১৫·১%; ১৯১৩ সনে বিলাতের অংশ ছিল ২৪·৪%। মার্কিণের অংশ ১৯১৩ সনে ছিল ১২·৯%, কিন্তু ১৯২৭ সনে দাঁড়াইয়াছে ৩০·৪%। বিলাতের মত জার্ম্মাণিরও কপাল ভাঙ্গিয়াছে; কারণ জার্ম্মাণি ১৫·৫%এর ভাগীদার হইতে ১৯২৭ সনে ১০·৮%এর ভাগীদারে পরিণত হইয়াছে। বস্ত্র, সৌখীন জিনিষ, গৃহ প্রস্তুতের উপকরণ ইত্যাদি পণ্য সম্বন্ধে বিলাত এখনও সকলের উপরে রহিয়াছে। তবে অন্যান্য বিষয়ে মার্কিণই অগ্রণী হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাজিলেও তথৈবচ

১৯২৮ সনে ব্রাজিলের মোট আমদানি বাণিজ্যের মূল্য ৯০,৭০০,০০০ পাঃ; বিলাতের অংশ ২১·৫%, মার্কিণের ২৬·৬% এবং জার্ম্মাণির ১২·৫%। ১৯১৩ সনে অংশের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৪·৫%, ১৫·৭% এবং ১৭·৫%।

১৯২৮ সনে ব্রাজিলে মোটর গাড়ীর আমদানিই সব চেয়ে বেশী (৬,৩০০,০০০ পাঃ মূল্যের)। মার্কিণের অংশ ৯৫·৭%। মোটরের পরেই বস্ত্রের স্থান। মোট আমদানির পরিমাণ ৫,০০০,০০০ পাঃ। ইহার মধ্যে বিলাত হইতে আমদানি ৩,৫০০,০০০ পাঃ অর্থাৎ ৭০%; ১৯১৩ সনেও বিলাতের অংশ এইরূপই ছিল। ১৯২৮ সনে ব্রাজিলে কয়লা আমদানি হয় ৩,১০০,০০০পাঃ মূল্যের; বিলাতের অংশ ৯০·৬%। ১৯১৩ সনে বিলাতের অংশ ছিল ৮৭·১%। বিলাত হইতে সূতা আমদানি কিছু কমিয়াছে। ব্রাজিলের মোট সূতা আমদানি ১,৪০০,০০০ পাঃ; তন্মধ্যে বিলাতের অংশ ৬৯·৬%। ১৯১৩ সনে ৭৫·৬%। পক্ষান্তরে মার্কিণ ১৯১৩ সনে ০·৭% হইতে ১৯২৮ সনে ১৯·৬%এ প্রমোশান পাইয়াছে। ব্রাজিলের মোট পশম আমদানি হইয়াছে ১,৪০০,০০০। বিলাত হইতে পশম আমদানি বাড়িয়াছে; কারণ ১৯১৩ সনে বিলাতের অংশ ছিল ১৯·১% এবং ১৯২৭ সনে দাঁড়াইয়াছে ২৩·৫%। ব্রাজিল দেশে লোহালক্কড়ও আমদানি হইয়া থাকে। নিম্নের তালিকা দুইটীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ব্রাজিলে লোহালক্কড় আমদানির পরিচয় দেওয়া হইল :—

লৌহ এবং ইস্পাতের তার

১৯২৮ সনে আমদানির পরিমাণ ৮৩,০০০ মেট্রিক টন, মূল্য ১,২০০,০০০ পাঃ।

	১৯১৩ শতকরা	১৯২৯ শতকরা
বিলাত	২·৭	৮·৩
জার্ম্মাণি	৫০·৭	৩৬·২
বেলজিয়াম	১৩·৩	২৬·১
মার্কিণ	৩০·৪	২১·২

রেল, ফিস্‌প্লেট ইত্যাদি

১৯২৮ সনে আমদানির পরিমাণ ১১৩,০০০ মেট্রিক টন, মূল্য ১,২০০,০০০ পাঃ।

	১৯১৩ শতকরা	১৯২৯ শতকরা
বিলাত	৫·৩	২২·৮
বেলজিয়াম	২২·৯	৪৩·৪
ফ্রান্স	৩৫·৬	৬·৫
মার্কিণ	১৭·৮	২১·০

চিলির বেলাতেও একই কথা

লড়াইয়ের পর চিলিও বিলাতী জিনিষপত্র তেমন লইতেছে না। ১৯২৮ সনে চিলিতে বিদেশী মাল আমদানির মূল্য ৩০,০০০,০০০ পাঃ এর কাছাকাছি। ইহার মধ্যে বিলাতের অংশ ১৭·৭% (১৯১৩ সনে ৩০%), মার্কিণের

৩০·৭% (১৯১৩ সনে ১৬·৭%), এবং জার্ম্মাণির ১৩·৯% (১৯১৩ সনে ২৪·৬%)। ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং ইতালির রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সকল প্রকার আমদানি চিজের মধ্যে কাপড় এবং পশমী দ্রব্যই প্রধান। বিলাতের অংশ ২৭·৩%, ১৯১৩ সনে ৫৭·৫%। ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম রীতিমত টেক্কা মারিয়াছে। এই দুই দেশের অংশ ১৯১৩ সনে ৮·৯% এবং ৭·২% হইতে ১৯২৮ সনে যথাক্রমে দাঁড়াইয়াছে ২৩% এবং ২০·৮%। ব্রাজিলের অনুরূপ চিলি মার্কিণ হইতেই ৯৫% মোটর গাড়ী খরিদ করিয়াছে। মোট মোটর গাড়ী খরিদের পরিমাণ ৮৯০,০০০ পাঃ, তন্মধ্যে বিলাতের ভাগ্যে জুটিয়াছে মোটে ৭,০০০ পাঃ।

সূতা (৪৪০,০০০ পাঃ) সম্বন্ধে চিলির বিলাতের সঙ্গে কারবার হইয়াছে বেশী; কিন্তু এ সম্বন্ধে বিলাতের কারবার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯১৩ সনে বিলাতের ভাগ ছিল ৮৯·৩%, ১৯২৮ সনের ভাগ ৭৩·৫%। পক্ষান্তরে মার্কিণ ১৯১৩ সনের ১% হইতে ১৯২৮ সনে ৯ ৫% পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ১৯২৮ সনে চিলির রেলওয়ের রেল আমদানির মূল্য ৩৬০,০০০ পাঃ। বিলাতের অংশ ১৫%, ১৯১৩ সনে বিলাতের অংশ ১২·৮%; মার্কিণের অংশ ১৯১৩ সনে ছিল ৫৩·১%, ১৯২৮ সনে ৬৭·১%। লোহা এবং ইস্পাতের বার সম্বন্ধে বেলজিয়াম মার্কিণ এবং বিলাতের স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। এ সম্বন্ধে হিসাব নিম্নের তালিকায় পাওয়া যাইবে:

	১৯১৩ শতকরা	১৯২৮ শতকরা
বেলজিয়াম	৩৩·৪	৫১·২
বিলাত	১২·৪	১০·৯
মার্কিণ	২৭·৪	১৭·৩
জার্ম্মাণি	২৬·৬	১৬.৬

১৯২৮ সনে চিলিতে আহারোপযোগী তেল আমদানি হইয়াছে ৬৫০,০০০ পাঃ মূল্যের। বিলাত পাঠাইয়াছে ৩৯·৩%, ১৯১৩ সনে বিলাতের রপ্তানি মাত্র ১·৫%। পক্ষান্তরে, মার্কিণের অংশ ১৯১৩ সনে ৫১·৫% হইতে ১৯২৮ সনে মাত্র ২·৯% দাঁড়াইয়াছে। ইতালি এবং স্পেন একত্রে ১৯১৩ সনে পাঠাইয়াছিল ৩৫·৯% এবং ১৯২৮ সনে পাঠাইয়াছে ৪৬·০%। বিলাতী তেল প্রধানতঃ সোয়াবিনের এবং ইতালি-স্পেনীয় তেল জলপাইয়ের। চিলি দেশে ১৯২৮ সনে কয়লা আমদানি হইয়াছে ১৪০,০০০ পাঃ মূল্যের, ১৯১৩ সনে আমদানি হইয়াছিল ৭৯০,০০০ পাঃ মূল্যের। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে মাত্র চিলিই কয়লা-সম্পদের অধিকারী সেইজন্য চিলি বর্ত্তমানে কয়লা সম্বন্ধে আর পরমুখাপেক্ষী নয়। ১৯২৮ সনে এই দেশের আমদানি কয়লার মধ্যে বিলাত দুই-তৃতীয়াংশের ভাগীদার।

পেরু দেশেও বিলাতের পসার কমিতেছে

১৯২৮ সনে পেরুর আমদানি বাণিজ্য মোট ১৩,৭০০,০০০ পাঃ; বিলাতের অংশ ১৬·২%, মার্কিণের ৪১·৯% এবং জার্ম্মাণির ১০·২%। ১৯১৩ সনে এই তিন অঙ্ক যথাক্রমে ২৬·৬%, ২৮·৮% এবং ১৭·৩% ছিল। মোট বস্ত্র আমদানি ১,৩৫০,০০০ পাঃ। বিলাতের অংশ ৩৯·৫%; ১৯১৩ সনে ৫৪·৭% ছিল। পক্ষান্তরে, মার্কিণের অংশ ৫·৬% হইতে ১৯·৫%এ উঠিয়াছে। ইতালিও পেরু দেশে বস্ত্র ব্যবসায়ে আপনার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। (১৯১৩ সনে ১০·৯% এবং ১৯২৮ সনে ১৩·২%)। ১৯২৮ সনে চিলিতে পশমী বস্ত্র আমদানির পরিমাণ ৪৯০,০০০ পাঃ। বিলাতের অংশ ৪৭·৬% (১৯১৩ সনে ৪৭·২%); ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণির একত্রে ২৮·৬% (১৯১৩ সনে ২৮%)। পশমী বস্ত্রের পরেই লোহালক্কড়ের স্থান; মোট আমদানি ১,৫১০,০০০ পাঃ। মার্কিণই প্রধান রপ্তানিকারক; মার্কিণের অংশ ১৯১৩ এবং ১৯২৮ সনে যথাক্রমে ৪৪% এবং ৪৪·৪%। মার্কিণের পরেই বিলাতের অংশ ১৯১৩ সনে ২৫·৬%, ১৯২৮ সনে ১৯·৪%। জার্ম্মাণি এবং বেলজিয়াম হইতে রপ্তানি বাড়িতেছে। এই দুই দেশের অংশ ১৯২৮ সনে যথাক্রমে ১৭·১% এবং ১৩·২%; ১৯১৩ সনে ছিল ১৫·৯% এবং ১১·২%।

পিকিং ব্যাণ্ড (চামড়ার ফিতা) শিল্প

রিপোর্ট অন্ দি ইন্‌ভেষ্টিগেশনস্ অন্ দি ম্যানুফ্যাক্‌চার অব্ পিকিং ব্যাণ্ডস্ (চামড়ার ফিতা তৈরী প্রণালীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান) ; শ্রীযুক্ত বি, এম দাস ও ই, এন্ দত্ত। কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো ; ১৯৩০। ।৶০ আনা।

ভারতবর্ষ একটী বিরাট বয়ন-শিল্পের দেশ। বয়ন-শিল্পের উপযোগী কাঁচামালপাট, এবং তুলা, এদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চটকল, কাপড় এবং সূতার কলের সংখ্যাও এদেশে নিতান্ত কম নয়। বাঙ্গালা দেশে ৯০টী চটকল চলিতেছে এবং গোটা ভারতবর্ষে কাপড়ের কলের সংখ্যা ৩২৫। আরো ১৮টী কাপড়ের কল নির্ম্মিত হইতেছে। ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলেও এক একটী কাপড়ের কল আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত কলের উপযোগী যাবতীয় সরঞ্জাম বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। এই সব সরঞ্জাম অনেক দেশে তৈরী করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ চামড়ার ফিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ফিতা দুই প্রকারের, পিকিং ব্যাণ্ড্ এবং ষ্ট্রাপ্। এই দুই বস্তু বাঙ্গালা দেশেই তৈরী হইতে পারে। আলিপুরের সরকারী গবেষণাগারে এ সম্বন্ধে গবেষণা করা হইয়াছে।

পিকিং ব্যাণ্ড্ এবং ষ্ট্রাপ্ প্রধানতঃ বিলাত এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশ হইতে ভারতে আসে। ১৯২৯ সনে এই বস্তু আমদানি হইয়াছে প্রায় ৮ লাখ টাকার। নিম্নের তালিকায় ৫ বৎসরের আমদানির হিসাব দেওয়া হইল :

		টাকা
১৯২৩-২৪	...	৭,৮৩,৯০৯
১৯২৪-২৫	...	৯,৪৬,২৫১
১৯২৫-২৬	...	৬,৮৩,০১৩
১৯২৬-২৭	...	৮,৯০,২৩০
১৯২৭-২৮	...	৮,৩৭,১৯৪

বাঙ্গালা দেশে পিকিং ব্যাণ্ড্ প্রস্তুত করা সম্বন্ধে বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট্ হইতে অনুসন্ধান করা হইয়াছে। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশিত হইল।

প্রত্যেক তাঁতের জন্য দুইটী করিয়া চামড়ার ফিতা দরকার। তাঁত চলিবার সময় এই ফিতার উপর খুব জোর পড়ে, সুতরাং শীঘ্রই উহা নষ্ট হইয়া যায়। ১৯২৭ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ভারতে ১৫৮,১২৪ খানি তুলার এবং ৫১,০৬১ খানি চটের তাঁত, একুনে মোট ২,০৯,১৮৫ খানি তাঁত ছিল। কলিকাতার চটকলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে একটী ফিতা গড়ে ৫০ দিন যায়। সুতরাং যদি বছরে ২৫০ দিন কাজ হয়, তবে প্রত্যেক তাঁতের জন্য ১০টী ফিতার প্রয়োজন হইবে; এবং ২০৯,১৮৫টী তাঁতের জন্য বৎসরে গড়ে ২২৫ টন ফিতার দরকার হইবে।

রীতিমত কার্য্যকরী হওয়ার জন্য ফিতার কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার। ফিতা শক্ত হওয়া দরকার এবং সহজে দুমড়িয়া যাওয়া চাই। ফিতা নরম হইলে সহজে ছিঁড়িয়া যায়, এবং কাজেরও অসুবিধা হয় ; কারণ নূতন ফিতা না লাগান পর্য্যন্ত তাঁতটী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে। আবার যদি ফিতা আটাযুক্ত হয় তাহা হইলে ফিতা গলিয়া কাপড়ে বা চটে দাগ লাগিয়া যায়। সুতরাং কলওয়ালারা এই ফিতা ক্রয় সম্বন্ধে খুব হুঁসিয়ার ; তাহারা জানাশুনা জিনিষই ক্রয় করিতে ভালবাসে ; কাজ পণ্ড হইবে বলিয়া নূতনের দিকে বড় একটা ঘেঁসিতে চায় না। কাপড় এবং চটকলের তত্ত্বাবধানকারীরা প্রায়ই ইয়োরোপীয়। এবং ইয়োরোপেই ইঁহারা শিক্ষা পাইয়াছেন ; সুতরাং বয়ন-

শিল্পের আদিম কাল হইতে ভারতে বিদেশে প্রস্তুত ফিতাই ব্যবহৃত হইতেছে। কী সন ভারত এইরূপে প্রায় ৯ লাখ টাকা বিদেশকে যোগাইতেছে।

বিলাত এবং ইয়োরোপের ষাঁড়ের চামড়া হইতে খুব সম্ভব সর্ব্বোৎকৃষ্ট পিকিং ব্যাণ্ড্ প্রস্তুত হয়। কলওয়ালারা অনেক সময় চুলওয়ালা ফিতাই পছন্দ করে, আর এই ফিতা ইয়োরোপীয় ষাঁড়ের চামড়া ছাড়া হওয়ার উপায় নাই। ভারতীয় ট্যানারির পক্ষে এই ধরণের ফিতা বেশী তৈরী করা অসম্ভব ; কারণ ভারতীয় ষাঁড়ের অত লোমও নাই, চামড়াও তত পুরু নয়। তবে পাঞ্জাব এবং সংযুক্ত প্রদেশের ষাঁড়ের চামড়া অনেক পুরু; এই দুই প্রদেশের ষাঁড়ের চামড়া হইতে চুলওয়ালা ফিতা প্রস্তুত হইতে পারে।

মহিষের চামড়া হইতেও পুরু ফিতা প্রস্তুত হয়। ভারতীয় বয়ন মিলগুলিতে মহিষের চামড়ার ফিতা অনেক ব্যবহৃত হয়।

মহিষ ভারতের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, এবং ইহার চামড়া হইতে সুন্দর পিকিং ব্যাণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে। যদি উপযুক্তরূপ চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে মহিষের চামড়া হইতে বিক্রয়যোগ্য পিকিং ব্যাণ্ড ভারতীয় ট্যানারিসমূহে বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে।

পূর্ব্বে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সাহায্যে চামড়া ট্যান করা হইত। ওক গাছের ছাল এই প্রক্রিয়ার সর্ব্বপ্রধান মশলা-রূপে ব্যবহৃত হইত। এখন ক্রোম চামড়াই বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয়। ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পৃথক। পিকিং ব্যাণ্ড্ এই ক্রোম চামড়া হইতেই প্রস্তুত হয়।

বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট চারটী প্রণালীতে ক্রোম চামড়া তৈরী করিয়াছে। এই চারটী প্রণালীকে এ, বি, সি, এবং ডি, নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই চার ধরণের চামড়া প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন চটকলে এবং আলিপুর টেষ্ট হাউসে উহার প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হয়। আলিপুর পরীক্ষাগারে এই সমস্ত ফিতার সহিত বৈদেশিক ফিতার তুলনামূলক পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, এই সমস্ত ফিতার শক্তিই বেশী হইয়াছে। বৈদেশিক ফিতার শক্তি যেখানে ৪৪৮৭ হইয়াছে, সেই স্থানে এ, বি, সি, এবং ডি শ্রেণীর ক্রোম চামড়ার ফিতার শক্তি যথাক্রমে ৫৫৬৮, ৬৪২৮, ৬৪৮৩ এবং ৫৫৫৬ দাঁড়াইয়াছে।

এই চার শ্রেণীর চামড়া প্রস্তুতের খরচ পাউণ্ড প্রতি ১১৩ পাই হইতে ২৮৶৩ পাই পর্য্যন্ত পড়িতে পারে। ডি শ্রেণীর চামড়া উৎপাদনের খরচ অত্যন্ত বেশী; সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় ক্রোম্ চামড়া উৎপাদন করা যাইতে পারে না। এ, বি এবং সি শ্রেণীর চামড়ায় বিক্রয়-মূল্য পাউণ্ড প্রতি ২৲ টাকা হইতে ২॥০ টাকা। তৈরীর খরচ গড়ে যদি ১॥৶৯ পাই ধরা যায় এবং বিক্রয়-মূল্য যদি ২৲ টাকা হয় তাহা হইলে সমস্ত খরচপত্র বাদ দিয়া বেশ লাভ থাকিবে। সুতরাং বাঙ্গালা দেশে এ, বি, এবং সি প্রক্রিয়ায় পিকিং ব্যাণ্ড শিল্প বেশ চলিতে পারে।

এই তিন শ্রেণীর মধ্যে 'সি' প্রক্রিয়া অনুসারে চুলওয়ালা ফিতা প্রস্তুত হইতে পারে, 'বি' প্রক্রিয়ায় উত্তম ফিতা প্রস্তুত হইবে এবং 'এ' প্রক্রিয়ায় শস্তা অথচ চলনসই ফিতা প্রস্তুত হইবে।

শ্রীমন্মথনাথ সরকার

১। "ইণ্ডিয়েন উণ্টের্ ব্রিটিশের্ হারশাফ্‌ট" (বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষ), অধ্যাপক টি হোরোহ্বিট্‌ৎস্। টুাবনের, লাইপ্‌ৎসিগ। ১৯২৮। ১৩৬ পৃঃ।

২। "ডাস্ হ্বের্কট্যাটিগে ইণ্ডিয়েন" (মজুরদের ভারত), কে শ্রাডের ও এরিক্ষে ফুর্টহ্বেয়াঙ্গলের। ডায়চের টেক্সটিলা-র্বাইটের্‌ফেরবাণ্ড, বার্লিন। (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৯২৮। পৃঃ ৪৪২।

৩। "ইণ্ডিয়েন" (ভারতবর্ষ), এ নোবেল। ফেরাইন ডায়চের ইন্‌জেন্সিয়রে, বার্লিন। ১৯৩০। ১৯৮ পৃঃ।

৪। "বিল্ডিং রিসার্চ" : বুলেটিন নং ৭—হট সিমেণ্ট ; স্পেশ্যাল রিপোর্ট নং ১৫—দি করোশন অব্ ষ্টীল বাই ব্রীজ অ্যাণ্ড ক্লিকার কংক্রীটস্" (বাড়ী তৈরী লইয়া গবেষণা : ৭নং বুলেটিন—তরল সিমেণ্ট ; বিশেষ বুলেটিন নং ১৫—বাতাস ও কংক্রীটে ইস্পাতের ক্ষয় ও মরিচা)। ডিপার্ট-মেণ্ট অব্ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইন্‌ডাষ্ট্রীয়েল রিসার্চ, লণ্ডন। ১৯৩০।

৫। "হাউ টু এণ্ড আন্‌এমপ্লয়মেণ্ট" (বেকার সমস্যার সমাধান কি করিয়া করা যায়), টমাস্ সার্জ। জন বেল সন্‌স্ অ্যাণ্ড ড্যানিলস্‌সন, লণ্ডন। ১৯৩০। ১০+৪৮ পৃঃ। ১ শি।

৬। "দি ইকনমিক্‌স অব্ সেফ্‌গার্ডিং" (সংরক্ষণের অর্থনীতি), আলেক্‌জেণ্ডার রায়সে। আর্ণেষ্ট বেন, লণ্ডন। ১৯৩০। ৩০৪ পৃঃ।

৭। "ট্রাষ্ট অ্যাণ্ড কর্পোরেশন প্রব্লেমস্" (সঙ্ঘ ও কর্পোরেশনের সমস্যা), হেনরি সিগেগার ও চার্লস এ গুলিক। হার্পার, নিউইয়র্ক। ১৯২৯। ১২+৭১৯ পৃঃ।

৮। "সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেণ্ট ইন্ আমেরিকান্ ইন্‌ডাষ্ট্রী" (আমেরিকান্ শিল্পে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরি-চালনার কথা)। টেলর সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক এইচ্ এস্ পার্সন। হার্পার, নিউইয়র্ক। ১৯২৯। ১৯+৪৭৯ পৃঃ।

৯। "হ্বেজ্ পেমেণ্ট প্ল্যান্‌স দ্যাট্ রিডিউস্‌ড প্রডাক্‌শন কষ্টস্" (কি প্রণালীতে মজুরি দিলে উৎপাদন খরচা কমিয়া যায়)। সম্পাদক কর্ণেল হুগো ডিমার। ম্যাক্‌গ্রহিল পাবলিশিং কো, শিকাগো। ১৯৩০। ২৭২ পৃঃ।

১০। "ইন্‌ট্রোডাক্‌শন টু এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্‌স্" (কৃষি অর্থনীতির 'প্রথম ভাগ')। সম্পাদক সেবা এল্ড-রিজ। ক্রোয়েলের সামাজিক পুস্তকাবলীর অন্তর্গত। টমাস্ ওয়াই ক্রোয়েল, নিউইয়র্ক। ১৯৩০। ১৯+৪১২ পৃঃ।

১১। "ইকনমিক ডেহ্বেলপ্‌মেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া" (ভারতের আর্থিক বিকাশ) হ্বি, অ্যান্‌ষ্টি। লংম্যান্‌স, লণ্ডন। ১৯৩০। ৫৮১ পৃঃ। ২৫ শি।

১২। "দি ব্রেড্ অব্ বৃটেন" (বৃটেনের রুটি), এ এইচ্ হার্ষ্ট। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস। ১৯৩০। ৭৯ পৃঃ। ২ শি. ৬ পে।

১৩। "ফরেন্ ইন্‌হ্বেষ্টমেণ্টস্" (বিদেশে টাকা খাটানো)। ১৯২৮ সনের হ্যারিস্ ফাউণ্ডেশনের বক্তৃতাবলী ; বক্তাগণ : (১) ষ্টকহলমের অর্থশাস্ত্র অধ্যাপক গুষ্টাহ্ব কাসেল, (২) লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্‌সের ব্যাঙ্কিং ও সিক্কার অধ্যাপক থিওডোর ই গ্রেগরী, (৩) ওয়াশিংটনের ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ ইকনমিক্‌সের কাউন্সিল মেম্বার রবার্ট ই কুচ্‌জিনস্কি, (৪) হেন্‌রি কিট্‌রেজ নর্টন (গ্রন্থকার)। শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রেস। ১৯২৯। ৯+২৩২ পৃঃ। ১৫ শি।

"একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্রে"র ভূমিকা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

(১)

এই বইয়ের নামে আছে তিন শব্দ ("ও" বাদে) : (১) একাল, (২) ধনদৌলত আর (৩) অর্থশাস্ত্র।

"একাল" বলিলে সাধারণতঃ আমি বুঝি "শিল্পবিপ্লব" (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রেভলিউশ্যন) আর তাহার পরবর্ত্তী যুগ। গোটা উনবিংশ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীর এই কয় বৎসর তাহার অন্তর্গত। এই যুগের দুনিয়াটাকেই কখনো কখনো বলিয়া থাকি "বর্ত্তমান জগৎ"। শিল্পবিপ্লব দুনিয়ায় দেখা দেয় সর্ব্বপ্রথম বিলাতে। ১৭৭৬ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশ পঁচিশ বৎসরে শিল্পবিপ্লব তাহার প্রথম অধ্যায় প্রকটিত করে। ফরাসী-জার্ম্মাণ সমাজের পক্ষে এই অধ্যায় ১৮৩০-৪৮ সনের কথা।

আর এক অর্থেও আমি "একাল" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। সে ১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী যুগ। ১৯০৫ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী এশিয়াকে (আর ইয়োরামেরিকাকেও) মান্ধাতার আমলের জগৎ বিবেচনা করা আমার দস্তুর।

এই দুই "একালের" কোনোটাই বর্ত্তমান গ্রন্থের "একাল" নয়। তবে স্থানে স্থানে তাহার ছায়াও আছে। ১৯১৪-১৮ সনের লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগকেই এই বইয়ে প্রধানতঃ "একাল" ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। যে সকল তথ্য ও তত্ত্ব এই বইয়ে ঠাঁই পাইয়াছে তাহার তারিখ অবশ্য প্রায় সবই ১৯২৫ সনের পরবর্ত্তী। মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তা বিষয়ক অন্যান্য বিদ্যার মতন ধনবিজ্ঞান বিদ্যার আসরেও এই সন-তারিখের মামলা আর যুগ-বিভাগ যার পর নাই মহত্ত্বপূর্ণ। কাজেই "একাল" আর "সেকাল" যখন যে অর্থেই ব্যবহৃত হউক না কেন সর্ব্বদা সন-তারিখটার দিকে চোখ রাখিলে ল্যাঠা চুকিয়া যাইবে।

অন্যান্য অনেক বিদ্যার মতন ধনবিজ্ঞান বিদ্যারও দুই বিভাগ স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এক বিভাগকে বলিব "কর্ম্মকাণ্ড", অপর বিভাগের নাম দিতেছি "জ্ঞান-কাণ্ড" (তত্ত্বাংশ)। ধনবিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ডকে এক কথায় বলিয়াছি "ধনদৌলত"। ইহাই বইয়ের নামের দ্বিতীয় শব্দ। আর জ্ঞানকাণ্ডের নাম দিলাম "অর্থশাস্ত্র"। বইয়ের নামের তৃতীয় শব্দই এই।

বলিয়া রাখা ভাল যে সাধারণতঃ আমি ধনবিজ্ঞান = অর্থশাস্ত্র সমঝিয়া থাকি। "অর্থশাস্ত্র" শব্দটা প্রাচীন ভারতের মার্কামারা। "ধনবিজ্ঞান" শব্দটা তাজা ভারতের নয়া গড়া। তবে "সেকেলে" সংস্কৃত সাহিত্যের অর্থশাস্ত্র বিদ্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান আর ধনবিজ্ঞান এই তিন বিজ্ঞানেরই মাল প্রচারিত হইত। বস্তুতঃ কৌটিল্য-প্রচারিত "অর্থশাস্ত্র"-গ্রন্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মালই বেশী আছে। কাজেই পুরাণা শব্দ ব্যবহার করিলে বর্ত্তমান জগৎ-মাফিক ধনদৌলত বিষয়ক বিদ্যার মাল চাপা পড়িবার সম্ভাবনা। এই কারণে আমার দস্তুর "অর্থশাস্ত্র" শব্দটা বর্জ্জন করা, আর শিক্ষা-বিজ্ঞান, চিত্ত-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান ইত্যাদি "বিজ্ঞানে"র মতন ধন-বিজ্ঞান শব্দ কায়েম করা। যাহা হউক শব্দের মার-প্যাঁচে বেশী-কিছু আসে-যায় না। শব্দের অন্তর্গত বস্তুটা সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ আর সতর্ক থাকিলেই হইল। "অর্থশাস্ত্র" সরস শব্দ। ইহার বিরুদ্ধে নিরেট আপত্তির কোনো কারণ নাই। নয়া অর্থে পুরাণা শব্দ চালাইলে ক্ষতি দেখি না।

প্রথমেই একটা গোলযোগের কথা উঠিতেছে। যদি ধনবিজ্ঞান = অর্থশাস্ত্র বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে ধন-বিজ্ঞানের মতন অর্থশাস্ত্রেরও কর্ম্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ড থাকিবে। তাহা হইলে "অর্থশাস্ত্র"কে "ধনবিজ্ঞানের" "জ্ঞানকাণ্ড"মাত্ররূপে চিহ্নিত করিয়া রাখা চলে না। অথচ বর্ত্তমান গ্রন্থের নামে এইরূপ বে-আইনি চালাইয়াছি। তাহা সমঝিয়া রাখা ভাল।

ধনবিজ্ঞান বা অর্থশাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ড ("অ্যাপ্লায়েড্ ইকনমিক্স্") কি চীজ? এই কাণ্ডে আমার রেওয়াজ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর বিদ্যা আলোচনা করা। প্রথমতঃ, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কর্ম্ম-পরিচালনা। "হাতে কলমে" কাজ, কিষাণ-কুলী-কেরাণীর আটপৌরে জীবন, শ্রমিক-ধনিকের "মাথার ঘাম", যন্ত্রপাতির আর যানবাহনের সেবা; গ্যাস-বিদ্যুৎ-কলকব্জার পাঁচন তৈয়ারি, ফ্যাক্টরি-ব্যাঙ্ক-বীমা ইত্যাদির আফিস চালানো, কারখানা-কর্ম্মকেন্দ্রের হিসাব-পত্র রাখা, বাজার হাঁটাহাঁটি, দালাল-পাড়ায় দর কষাকষি ইত্যাদি বস্তু এই কর্ম্মপরিচালনার অন্তর্গত। এক কথায় ইহার নাম ব্যবসা-সংগঠন ("বিজনেস অর্গ্যানিজেশ্যন")। কর্ম্মকাণ্ডের দ্বিতীয় কথা অর্থনৈতিক আইনকানুন। সংসারে আইনকানুনের অর্থ রাষ্ট্রনৈতিক গলাবাজি, সভাসমিতি পার্ল্যামেণ্টে বক্তৃতা মারা, হাতাহাতি আর লড়ালড়ি। "ইকনমিক পলিসি" বা অর্থনৈতিক রাষ্ট্রকৌশল কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক অর্থকৌশল অথবা আর্থিক কর্ম্মকৌশল, কিংবা রাষ্ট্রিক অর্থনীতি অথবা আর্থিক রাজনীতি এই ধরণের একটা কিছু নামে কর্ম্মকাণ্ডের দ্বিতীয় কথা বুঝানো যাইতে পারে।

এইবার ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বকথা, জ্ঞানকাণ্ড, দর্শন বা "থিয়োরি।" তত্ত্ব, দর্শন, থিয়োরি কাহাকে বলে? যেখানে যেখানে তথ্যের বা ঘটনার "ব্যাখ্যা" দেখিতে পাই সেই খানেই আছে এই সকল চীজ। ধনদৌলত বিষয়ক তথ্য বা ঘটনার "ব্যাখ্যার" নাম ধনবিজ্ঞানের থিয়োরি বা তত্ত্বকথা। "ব্যাখ্যা" আবার কি? ঘটনাটা কেন ঘটিল এই বিষয়ের চর্চ্চা অথবা ঘটনাটা "কিরূপে" অর্থাৎ "কেমন করিয়া" ঘটিল এই বিষয়ের চর্চ্চা। অতএব যাঁহা "কেন?" অথবা "কিরূপে?" তাঁহা ব্যাখ্যা, তাঁহা তত্ত্ব, তাঁহা দর্শন, তাঁহা জ্ঞানকাণ্ড।

ধনবিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ডকে বলিয়াছি অর্থশাস্ত্র (বর্ত্তমান গ্রন্থের নামের জন্য)। এই অর্থশাস্ত্র তাহা হইলে কী কী ব্যাখ্যা অর্থাৎ কোন্ কোন্ "কেন?" আর কোন্ কোন্ "কিরূপে?" লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করে? ইহার আলোচ্য বিষয় নিম্নরূপ:—

দুনিয়ার ধনদৌলত বাড়িতেছে না কমিতেছে? অমুক দেশটা আর্থিক হিসাবে বড় হইল কেন? এই পল্লীর লোকজন দলকে দল চাষ ছাড়িয়া গরু চরাইতে ঝুঁকিতেছে কেন? এই দেশকে অমুক দেশের সমান সম্পদশীল করিয়া তুলিবার কোন উপায় আছে কি? অর্থাৎ দেশ বিদেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করা ধনবিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ডের কাজ। জগৎ জোড়া উন্নতি-অবনতি, দেশ-জোড়া উন্নতি-অবনতি, আর্থিক-জীবন বিষয়ক কোনো কোনো অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের উন্নতি অবনতি, এই সমুদয়ের কার্য্যকারণ অথবা ক্রমান্বয় অথবা আকার-প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া ধনবিজ্ঞান "থিয়োরি"-শীল হয়। এক কথায় এই দর্শন বা তত্ত্বকে "আর্থিক উন্নতি"-তত্ত্ব বলিতে পারি।

ধনবিজ্ঞানের একটা সঙ্কীর্ণতর তত্ত্বাংশও আছে। তাহার মামলা নিম্নরূপ:—লোকেরা শতকরা ৭৲ সুদ না দিয়া ১৮৲, ২৫৲, ৪৫৲ পর্য্যন্ত চড়া হারে সুদ দেয় কেন? ভেটকি মাছের দর কলিকাতায় আজ ৷৶০ আনা সের, কাল ১৶০ সের এরূপ দাঁড়ায় কেন? সস্তায় ভাল বাড়ী ভাড়া পাওয়া কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে অসম্ভব কেন? লণ্ডনে কেমন করিয়া দুধের দর এত সস্তা হইল? মজুরির হার বাড়ে কমে কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব "ভ্যালু" বা মূল্য-তত্ত্বের বিভিন্ন কথা। মূল্য-তত্ত্বই আমার বিবেচনায় ধনবিজ্ঞানের আসল জ্ঞানকাণ্ড।

ফরাসী, জার্ম্মাণ আর ইতালিয়ান মহলে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বভোক্তারা বিস্তৃততর ব্যাখ্যাকাণ্ডে বেশী নজর দেয়। সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রের ব্যাখ্যার রেওয়াজ বেশী বিলাতে আর আমেরিকায়। অবশ্য একদম পুরাপুরি "জাতিভেদ" কায়েম করিবার দরকার নাই। ফ্রান্সে জার্ম্মাণিতে আর ইতালিতে "আর্থিক উন্নতি"তত্ত্ব জোরের সহিত আলোচিত হয় সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া "মূল্যতত্ত্ব" বাদ পড়ে না। আবার ইংরেজ মার্কিণদের পঠন-পাঠন-গবেষণায় মূল্যতত্ত্বের দিকে ঝোঁক বেশী সন্দেহ নাই। কিন্তু "আর্থিক উন্নতি"-তত্ত্বেও এই সকল আসরে চর্চ্চা চলে বিস্তর।

বর্ত্তমান গ্রন্থের কথাবস্তুকে নিম্নলিখিত কাঠামে ফেলিলে ধনবিজ্ঞানের চৌহদ্দিটা সহজেই ধরা পড়িবে:—
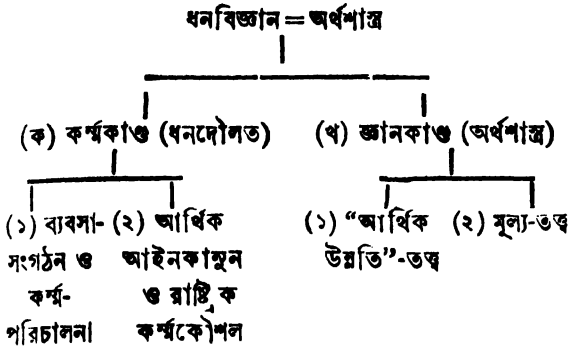
বিদ্যা হিসাবে ধনবিজ্ঞানকে এই মোটা মোটা চার শাখায় বাঁটিয়া লওয়া গেল। এইবার এই বিদ্যার আলোচ্য বস্তুর কথা বলিব। বস্তু আর কিছুই নয়,—ইহা ধনদৌলত। ইহারই কথা কর্ম্মকাণ্ডের আসল কথা।

ধনদৌলত সংসারে নানা আকারে দেখা দেয়। ধন-বিজ্ঞান বিদ্যা এই বিভিন্ন আকার মাফিক বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের জন্য ধন-বিজ্ঞান বিদ্যার কর্ম্মক্ষেত্র পাঁচ স্বতন্ত্র জনপদে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। বস্তু হিসাবে সেই পাঁচ বিভাগের নাম নিম্নরূপ :—

(১) কৃষি বিষয়ক ধনবিজ্ঞান। (২) শিল্প বিষয়ক ধন-বিজ্ঞান। (৩) বাণিজ্য বিষয়ক ধনবিজ্ঞান। বাণিজ্য শব্দে একমাত্র কেনাবেচা বা দোকানদারি বুঝিতে হইবে না। অন্তর্ব্বাণিজ্য আর বহির্ব্বাণিজ্য ছাড়া যান-বাহন, ব্যাঙ্কিং, বীমা, বিনিময়, টাকার বাজার ইত্যাদি-ঘটিত লেন-দেনও বাণিজ্যের অন্তর্গত। (৪) সমাজ-বিষয়ক ধনবিজ্ঞান। লোকবল, নরনারীর স্বাস্থ্য, পল্লী-নগরের বা "পুরজনপদে"র সার্ব্বজনিক স্বার্থ, পারিবারিক আয়ব্যয়, বেতন, মজুরির হার, বাঁচামরার মাপকাঠি, আয়ের পরিমাণ হিসাবে জাতিভেদ, লোকজনের কর্ম্মদক্ষতা ইত্যাদি-সংক্রান্ত তথ্য ও তত্ত্ব এই বিভাগের বিভিন্ন দফা। (৫) রাষ্ট্র-বিষয়ক ধনবিজ্ঞান। সকল প্রকার আর্থিক আইন-কানুন এই বিভাগে পড়ে। জমিজমা, মজুর-চাষী, টাকাকড়ি, চেক, হুণ্ডি, কোম্পানী-সঙ্ঘ, শুল্ক, ফ্যাক্টরি-শাসন ইত্যাদি সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ত আছেই। তাহার উপর আছে রাজস্ব ব্যবস্থা বিষয়ক এক বড় দফা।

এই পাঁচ বিভাগের প্রথম তিনটাই ধনদৌলতের গোড়ার কথা বা প্রাণের কথা। কিন্তু তিনটার প্রত্যেকের সঙ্গেই মানুষের সুখদুঃখ, নরনারীর জীবনবত্তা সুজড়িত। কাজেই চতুর্থ-বিভাগের আলোচ্য বিষয়গুলার উদ্ভব। তাহা ছাড়া এই সব-কিছুই রাষ্ট্রের ইচ্ছা, রাষ্ট্রের সু-কু, রাষ্ট্রের গতিভঙ্গীর উপর অনেক বিষয়ে নির্ভর করে। কাজেই পঞ্চম বিভাগও আপনাআপনি আসিয়া জুটে।

কি "বিদ্যা"ক্ষেত্রের চার বিভাগ, কি "বস্তু"ক্ষেত্রের পাঁচ বিভাগ সবই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক সময়েই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। জ্ঞানকাণ্ডের তরফ হইতে কর্ম্মকাণ্ডে উঁকিঝুঁকি মারা আর জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনায় কর্ম্ম-কাণ্ডের অবতারণা করা হরদম ঘটিয়া থাকে। আবার কৃষিবিষয়ক অর্থকথার সময় রাসায়নিক কারখানার কথা পাড়া অথবা ধান ভান্‌তে ব্যাঙ্কের গীত গাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর রেলজাহাজের আর্থিক আলোচনায় পল্লী-নগর-বন্দরের বাড়্‌তি-ঘাট্‌তি জরীপ করাও সর্ব্বদাই প্রাসঙ্গিক। তবে তর্কবিজ্ঞানের তরফ হইতে ধনবিজ্ঞানের সীমানাগুলা ঝর্‌ঝরে রূপে বুঝিয়া রাখিবার জন্য এই "চতুষ্টয়" আর "পঞ্চাঙ্গ" দাগ দিয়া রাখা গেল মাত্র। "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থে এই সবের সঙ্গেই মোলাকাৎ হইবে।

ধনদৌলতই এই বিদ্যার আলোচ্য বস্তু। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে "প্রদীপের নীচেই অন্ধকার"। কাজেই অন্ধকারের চর্চ্চাটাও আলোক-বিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু। অর্থাৎ দারিদ্র্য, দরিদ্র নরনারী, দরিদ্রের ক্রন্দন, দারিদ্র্যের সীমানা ও মাপকাঠি, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই আর দারিদ্র্য-নির্ব্বাসন ইত্যাদি সব-কিছুই ধনবিজ্ঞানের "চতুষ্টয়ে" আর "পঞ্চাঙ্গে" হামেশা আলোচিত হইবার কথা। ধনবিজ্ঞানকে এই কারণে "অন্ধকারে"র তরফটা হইতে "দারিদ্র্য-বিজ্ঞান" বিবেচনা করা আমার দস্তুর। সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল বলিলে দারিদ্র্যকে জুতাইয়া দুরস্ত করাই আমি বুঝিয়া থাকি। সংসারে,—মায় বিলাত, জার্ম্মাণি, আমেরিকা আর ফ্রান্সেও,—গরীব লোকই গুনতিতে বেশী পুরু। "একালের

ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থে তাই দুনিয়ার দারিদ্র্য ফাঁকে ফাঁকে অনেক ছাপ মারিয়াছে।

ধনবিজ্ঞানের আসর বিপুল। এই বিপুল আসরের এ কোণে ও কোণে আমাকে অনেক সময়েই সামান্য আসন পাতিতে হইয়াছে; কখনো বা দুচার মিনিটের জন্য কখনো বা দুচার ঘণ্টার জন্য। রচনাগুলা নানা উপলক্ষ্যে নানা আকারে নানা ভাষায় বাহির হইয়াছে। ঘটনাচক্রে কোনো কোনো প্রবন্ধ বা বইয়ের "নামে" হয়ত ধনবিজ্ঞানের গন্ধ পাওয়া যায় না। কাজেই এই সূত্রে সবগুলা এক ঠাঁইয়ে রাখিয়া দেখিলে পাঠকের হয়ত কিছু সুবিধা হইবে।

(২)

অন্যান্য অনেক-কিছুর সঙ্গে সঙ্গে ধনবিজ্ঞান চর্চ্চাও সুরু করি স্বদেশী আন্দোলনের পুষ্টিকল্পে। ১৯০৭ সনে মালদহে "জাতীয় শিক্ষাসমিতি" কায়েম করা হয়। তাহার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে "বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা" নামে একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। এই বক্তৃতায় অবশ্য ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সব-কিছুই ছিল। ধনবিজ্ঞান ইহার একমাত্র বা প্রধান রস জোগায় নাই। তবে জীবনের এই গোড়ার অর্থনৈতিক দস্তুরও যে ছিল তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। ১৯০৭ সনেই "নব্যভারত" মাসিকে বাহির হয় "স্বদেশ-সেবক"। তাহাতেও আর্থিক ঝাঁজ ছিল কিছু-কিছু।

১৯১০ সনে ইংরেজিতে একখানা বই (১৯৩ পৃষ্ঠা) বাহির করি,—"ইকনমিক্স্" (ধনবিজ্ঞান) নামে। ইহা ছিল বিদেশী গ্রন্থকারদের বিভিন্ন কেতাবের সংক্ষিপ্ত সার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বি-এ অনার বা এম-এ পরীক্ষার জন্য এই বই উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিত—খবর পাইয়াছি। বইটা বোধ হয় গোটা দুয়েক সংস্করণে দেখা দেয়। মতলব ছিল এই বইকে বনিয়াদ করিয়া বাংলায় একটা বড় গোছের ধনবিজ্ঞান বিষয়ক বই লেখা। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই বিশ বৎসরেও তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এই বইয়ের ভিতর "সেকালে"র আডাম স্মিথ, রিকার্ডো আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল ত ছিলই। তবে একালের মার্কিণ ওয়াকার, ইংরেজ মার্শ্যাল আর ফরাসী জিদ্ এই তিন মূর্ত্তির সঙ্গেই পাঠকগণের কুটুম্বিতা কায়েম করানো ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য। তখনকার দিনে জিদ্ ভারতে সুপরিচিত ছিল না। আর একটা বিশেষত্বও উল্লেখযোগ্য। বেজ্‌হট নামক ইংরেজ ধনবিজ্ঞান-রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান-পণ্ডিতের মুদ্রা, ব্যাঙ্কিং, টাকার বাজার ইত্যাদি-বিষয়ক রচনা হইতে এই বইয়ের জন্য অনেক মাল সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই সূত্রে ডেনমার্কের পিয়ার্সন প্রণীত ধনবিজ্ঞান গ্রন্থের মুদ্রাতত্ত্ব-বিষয়ক তথ্যও কিছু কিছু আত্মসাৎ করি। তাহা ছাড়া ধনবিজ্ঞানের যুক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনারও প্রয়াস এই কেতাবে আছে। এই জন্য ইংরেজ কেইন্‌স্-প্রণীত ধনবিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণাপ্রণালী-সংক্রান্ত গ্রন্থটিকে চুষিয়া প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ভারতীয় এবং অন্যান্য টাকাকড়ি বিষয়ক আলোচনায় যে কেইন্‌স নামজাদা ইনি সেই কেইনস্ নন,—ইনি তাঁহার পিতা।

১৯১১ সনে রামরাখাল ঘোষ-প্রকাশিত "গৃহস্থ" মাসিকের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ সুরু হয়। এই সূত্রে তিন চার বৎসর ধরিয়া ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত "বিশ্বশক্তি"র আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক তথ্য আর তত্ত্বও বাংলা ভাষায় কিছু কিছু চর্চ্চা করিবার সুযোগ ঘটে। আর্থিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলার মফঃস্বলকে খানিকটা আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রতিষ্ঠাশীল করিবার দিকে তখন বিশেষ চেষ্টা ছিল। পল্লী-চর্চ্চা সে যুগের একটা বড় কথা।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জার্ম্মাণ পণ্ডিত ফ্রেডরিক লিষ্ট-প্রণীত "ডাস নাট্‌সিওনালে সিষ্টেম ডার পোলিটিশেনয়ো-কোনোমী (স্বদেশী ধনবিজ্ঞান) গ্রন্থ তর্জ্জমার মতলব আঁটি। তখন অবশ্য জার্ম্মাণ ভাষা জানিতাম না। এই বই হইতেছে পৃথিবীর সকল দেশেরই স্বদেশী আন্দোলনের বেদ-বাইবেল-কোরাণ বিশেষ। কিন্তু ১৯১২ সনের পূর্ব্বে এই বই বাংলায় তর্জ্জমা করিবার সময় বা সুযোগ পাই নাই। তর্জ্জমাও আবার হোমিওপ্যাথিক "ডোজে" চলিয়াছে। ১৯১৫ সনের শেষাশেষি বইয়ের ঐতিহাসিক অংশ মাত্র শেষ করিতে পারি। অধ্যায়গুলা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে "গৃহস্থ", "উপাসনা", "প্রবাসী", "প্রভাতী" ইত্যাদি মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়া গিয়াছে। "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি"

এই ছিল বিভিন্ন অনুবাদ-প্রবন্ধের সাধারণ নাম। বইয়ের আকারে বাহির হইবার জন্য এই রচনা সম্প্রতি যন্ত্রস্থ।

"বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা" নামক প্রবন্ধ-বক্তৃতার পর নানা উপলক্ষ্যে নানা প্রকার প্রবন্ধ-বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার অন্যতম সমষ্টির নাম "সাধনা" (২০০ পৃষ্ঠা, প্রথম সংস্করণ ১৯১২)। ইহার ভিতর "দেশের লোক কাহারা" "নিম্নশ্রেণীর অধিকার" ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তাহা ছাড়া "বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা"ও ইহার অন্তর্গত।

এই পর্য্যন্ত গেল ১৯১৪ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের আধুনিক অর্থনৈতিক সমস্যা সংক্রান্ত লেখাপড়ার ফিরিস্তি। ১৯১১ সনে এলাহাবাদে মেজর বামনদাস বসু এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র বসু এই দুইজনের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। তাঁহারা তাঁহাদের পাণিনি-কার্য্যালয়ের সংস্রবে ইংরেজি তর্জ্জমার সাহায্যে প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য প্রচারের কাজে যশস্বী। দেখা গেল যে, হিন্দু দর্শনের সাংসারিক বা আধিভৌতিক অংশগুলা তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে এক-প্রকার বাদ পড়িয়াছে। তবে তাঁহাদের বাড়ীতেই শুক্রনীতি বইটা ছিল। ফলতঃ ইংরেজিতে শুক্রনীতি তর্জ্জমার ভার লইয়া বসুভ্রাতাদের পরিবারে প্রবেশ করিলাম। ১৯১২-১৩ সনে মূলের সটীক অনুবাদ (৩০৬ পৃষ্ঠা) বাহির হয়। আর ১৯১৩-১৪ সনে বাহির হয় শুক্রনীতির ভূমিকাস্বরূপ "পজিটিভ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোসিঅলজি" (হিন্দু সমাজতত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি) নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (৩০০ পৃষ্ঠা)।

শুক্রনীতি-সংক্রান্ত বই দুইটা ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার আসরে বিশেষরূপেই উল্লেখযোগ্য। এই সাহিত্য ঘাঁটাঘাঁটি করিতে গিয়া প্রাচীন হিন্দু বিজ্ঞানের আকর-তত্ত্ব, রত্নতত্ত্ব, রসায়ন, উদ্ভিদ্-তত্ত্ব, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ, জীবজন্তু-তত্ত্ব ইত্যাদি নানাপ্রকার বস্তুনিষ্ঠ বিদ্যার সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতকে কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের তরফ হইতে "বাজাইয়া" দেখিবার সুযোগ ঘটে। কাজেই আর্থিক ভারতের "সেকাল"কে আর্থিক দুনিয়ার ইতিহাসে যথোচিত আসন দিবার সুযোগও সৃষ্ট হইতে থাকে। অধিকন্তু মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে দুনিয়ার পণ্ডিত মহলে যে সকল "প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য" ভেদনীতি প্রচলিত ছিল তাহার বিরুদ্ধেও মত পুষ্ট হইতে সুরু করে। এই মত ক্রমশঃ যে আকার-প্রকারে পরবর্ত্তী কালে দেখা দিয়াছে তাহার প্রভাবেই আজ-কালকার প্রবর্ত্তিত বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ চলিতেছে আর "সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল" প্রচারিত হইতেছে। সুতরাং শুক্রনীতি-"চক্র"টা প্রাচীন ভারতের অর্থশাস্ত্র আর আর্থিক ইতিহাস বিষয়ক চর্চ্চা মাত্র নয়। ইহা বর্ত্তমান জগৎকে মেরামত করিয়া অথবা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পুনর্গঠিত করিবার প্রয়াসে আর নয়া বাংলার গোড়াপত্তন ফেলিবার কাজেও প্রচুর রসদ জোগাইয়াছে। "হিন্দু সমাজতত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি" প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে বিদেশ-পর্য্যটনে বাহির হই নাই, এই কথাটা অবান্তরভাবে উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।

আর এক কথা। শুক্রনীতির তিলক কাটিয়াই পরবর্ত্তী কালে,—১৯২৮ সনে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ কলিকাতায় দেখা দিয়াছে। শুক্রাচার্য্যের এক বুখ্নি এই পরিষদের ললাটে বিরাজ করিতেছে, যথা :—

"জীবামি শতবর্ষং তু নন্দামি চ ধনেন বৈ।"

(শুক্র, ৩।১৭৬)

পরিষদের আর একটা মন্তরও শুক্রই জোগাইয়াছেন। সেটা নিম্নরূপ :—

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্বর্থো ন কস্যচিৎ।
অতোঽর্থায় যতেতৈব সর্ব্বদা যত্নমাস্থিতঃ॥
অর্থাদ্ ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চাপি ভবেন্ নৃণাম্॥"

(শুক্র, ৫।৩৮)

কাজেই যুবক বাংলার ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা শুক্রাচার্য্যের শক্তিযোগে অন্যতম উদ্দীপনা পাইয়াছে।

১৯০৭ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত আগাগোড়া সব সময়েই "জাতীয় শিক্ষার" সংস্রবে পল্লীতে শহরে কিষাণ-কারিগর আর মধ্যবিত্ত ইত্যাদি শ্রেণীর উপযোগী ছোটখাটো টেক্‌-নিক্যাল পাঠশালা কায়েম করিতে হইত। অথবা নতুন ধরণের অর্থকরী বিদ্যার বিস্তার-কল্পে লোকমত গড়িয়া

তুলিতে হইত। "শিক্ষা-বিজ্ঞান" গ্রন্থাবলীর ভিতর এই আর্থিক লোকশিক্ষার চিহ্নোৎও আছে। অধিকন্তু বুকার ওয়াশিংটন প্রণীত আত্মজীবনচরিত গ্রন্থ "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" নামে তর্জ্জমা করিয়া মার্কিণ মুলুকের টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাপদ্ধতিও সেকালের বাংলা দেশে যৎকিঞ্চিৎ প্রচার করিয়াছিলাম (১৯১২-১৪)। ধনবিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্গে কৃষিশিল্পের আবহাওয়ায় এই সকল অর্থকরী শিক্ষার চর্চ্চা ঘনিষ্ঠরূপেই সম্বদ্ধ।

(৩)

প্রথম বারকার বিদেশভ্রমণ সুরু হয় ১৯১৪ সনের এপ্রিল মাসে। এই পর্ব্ব খতম হইয়াছে সাড়ে এগার বৎসর পরে,—মাত্র সেদিন ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। এ এক বিপুল যুগ বিশেষ। এই যুগেও আবার অন্যান্য অনেক-কিছুর সঙ্গে সঙ্গে ধনবিজ্ঞান সাধনায় সময় দিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ, লড়াইয়ের যুগ। "বর্ত্তমান জগৎ" নামক ভ্রমণ সাহিত্যের (প্রায় ৩,৫০০ পৃষ্ঠা) প্রথম দুই খণ্ড ("মিশর" ও "ইংরেজের জন্মভূমি") লড়াই বাধিবার পূর্ব্বেকার রচনা। পরবর্ত্তী চার খণ্ড ("বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র," "ইয়াঙ্কিস্থান," "জাপান" আর "চীন") লড়াইয়ের ভরা জোয়ারে লেখা। এই সকল খণ্ডের প্রত্যেক অধ্যায়ই ১৯১৮ সনের পূর্ব্বে, অর্থাৎ লড়াই শেষ হইবার পূর্ব্বে কিংবা সম-সম কালে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কোনো কোনোটা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে ১৯২৭-২৮ পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়াছে।

এই বইগুলির চার আনা অংশ ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত। এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক আর অর্থশাস্ত্রী এই তিন গোত্রের লোকজনের সঙ্গে মোলাকাৎ এই সকল রচনার অন্যতম বিশেষত্ব। তাহা ছাড়া কারখানা, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, ব্যাঙ্ক, কৃষিক্ষেত্র, মজুরজীবন, শিল্প-বাণিজ্য-বিদ্যালয়, অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক গবেষণা ও পঠন-পাঠন ইত্যাদি দফায় "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভরপুর। বি, এ, এম্, এ ক্লাসের ধনবিজ্ঞানবিষয়ক সাধারণ পাঠ্যপুস্তকে যে ধরণের মাল থাকে এই সকল বইয়ে তাহা হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র ধরণের মাল খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আজকাল ভারতে পরলোকগত ইংরেজ পণ্ডিত মার্শ্যাল-প্রণীত "ইণ্ডাষ্ট্রী অ্যাণ্ড ট্রেড" আর "মানি, ক্রেডিট অ্যাণ্ড কমার্স" বই দুইটা প্রচারিত হইতেছে। লড়াইয়ের যুগে এই বই দুইটা বাজারে দেখা দেয় নাই। এই দুই বইয়ের প্রায় আধাআধি বা ছয় আনা হইতে দশ আনা যে ধরণের অর্থকথা লইয়া লিখিত, "বর্ত্তমান-জগৎ" গ্রন্থাবলীর আর্থিক অধ্যায় সমূহকে মোটের উপর সেই গোত্রের অন্তর্গত করা চলে। "বিজ্‌নেস অর্গ্যানিজেশ্যন" অর্থাৎ ব্যবসা-সংগঠন নামক বিদ্যার নানা তথ্য এই সকল অধ্যায়ে আসিয়া জুটিয়াছে। আস্‌সোআন-আলেক্‌জান্দ্রিয়া, ম্যান্‌চেষ্টার-লীডস্, নিউইয়র্ক-শিকাগো-সানফ্রান্সিস্‌কো, তোকিও-ওসাকা, হ্যাংকাও-সাংহাই ইত্যাদি পুরজনপদকে বস্তুনিষ্ঠ কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের সাহিত্য-সংসারে আনিয়া খাড়া করিতে সচেষ্ট ছিলাম। লড়াইয়ের সময়কার টাকার বাজার, ব্যবসায়িক লেনদেন ইত্যাদিও যৎকিঞ্চিৎ পরিবেষণ করিয়াছি।

ছেলেবেলায় যে সব ইংরেজ লেখকের বই পড়া গিয়াছিল বিলাতে আসিয়া "গরু-খোঁজা" করিয়া প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় করিয়াছিলাম। তাঁহাদের অনেকেই এখন মারা গিয়াছেন। কানিংহাম, মার্শ্যাল, আস্লুইন, এজোআর্থ ইত্যাদির সংস্পর্শে আসা গিয়াছিল। আজকাল যাঁহারা নামজাদা হইতেছেন তখন তাঁহাদের কেহই আসর জমাইতে পারেন নাই। একালের পিণ্ড তখনও "ছোক্‌রা" মাত্র। বিলাতী অভিজ্ঞতার একটা কথা বেশ কাজে লাগিয়াছে। বড় বড় কারখানার মালিক-পরিচালকেরা মার্শ্যালকেও "আনাড়ি" বিবেচনা করিত। বই লেখালেখি আর বই মুখস্থ করা জিনিষটাকে "কেজো" লোকেরা যে নেহাৎ তুচ্ছজ্ঞান করে বিলাতী ফ্যাক্টরির গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে এই তথ্য জবররূপে মালুম হইয়াছিল। ভারতে আমরা ছাপার হরপে লেখা জিনিষকে,—বিশেষতঃ ইংরেজ পণ্ডিতদের লেখা রচনাকে,—বেদবাক্য সমঝিতে অভ্যস্ত ছিলাম, এখনও বোধ হয় অনেকটা আছি। এই অবস্থায় অর্থশাস্ত্রের নামজাদা পণ্ডিতগুলাকে নকড়া ছকড়া রূপে বিবৃত দেখিবার সুযোগ পাওয়া বে-সে আধ্যাত্মিক টনিক

বা সালসা নয়। এই সালসা কিঞ্চিৎ-কিছু অল্পপরিমাণে সেবন করিলে ধনবিজ্ঞানের কোনো তথাকথিত সত্য বা সূত্রকে অতি-কিছু রূপে সম্মান করা সম্ভবপর হয় না। অর্থশাস্ত্রের সকল সত্যই তোমার আমার রামা শ্যামার সকলেরই বিচারসাপেক্ষ—যথার্থ কার্য্যক্ষেত্রের কষ্টিপাথরে কষিলে যেটার যতটুকু টেকসই দাঁড়ায় মাত্র সেটার ততটুকুই সত্য,—এই ধারণা ফুটিয়া উঠে। বিলাতের কারখানায়-কারখানায় এই হিসাবে নবজীবনের খোরপোষ বিস্তর জুটিয়াছে। ধনবিজ্ঞানে "বস্তুনিষ্ঠা"র যথার্থ সূত্রপাত হইয়াছিল বিলাতে।

বিলাতী অভিজ্ঞতার আর একটা কথাও ধনবিজ্ঞান গবেষণার আসরে মহত্ত্বপূর্ণ। একালের মন্ত্রিপ্রধান রামজে-ম্যাকডোন্যাল্ড তখনকার দিনে ছিলেন একজন মজুর-নায়ক মাত্র। ঘটনাচক্রে বিলাত-প্রবাসের সময়ে তাঁহাকেই অন্যতম পথ-প্রদর্শকরূপে পাইয়াছিলাম। কাজেই মজুর-চোখে বিলাত-দর্শন ঘটিবার ব্যবস্থা ছিল প্রচুর। "সোশ্যালিজ্‌ম", সমাজ-তন্ত্র বা অর্থনৈতিক রাষ্ট্র-নিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ও তত্ত্বকথার সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ ঘটিয়াছিল নিবিড়রূপে। বর্ত্তমান জগতের এই নবীনতম দর্শনে "যথার্থ" হাতে খড়ি এই প্রথম (১৯১৪)।

(৪)

লড়াই যখন থামে থামে এমন সময় আমেরিকার "জার্ণ্যাল অব্‌ রেস-ডেহেবলপ্‌মেণ্ট" নামক ত্রৈমাসিকে প্রবন্ধ লিখিবার ডাক পড়ে। তাহাতে লিখি "আমেরিকানিজেশ্যন ফ্রম দি ভিউপয়েণ্ট অব্‌ ইয়ং এশিয়া" (১৯১৮)। মার্কিণ মুল্লুকের মজুর-সমস্যা আর লোক-আমদানি সংক্রান্ত আইন এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ইয়োরোপ হইতে আমদানি-করা শ্লাভ, ল্যাটিন আর ইহুদি জাতীয় কিষাণ-মজুরদের আর্থিক জীবনকে এশিয়া হইতে আমদানি-করা চীনা, জাপানী আর "হিন্দু" (ভারতীয়) কিষাণ-মজুরদের আর্থিক জীবনের সঙ্গে এক নিক্তির ওজনে তুলনা করা ছিল উদ্দেশ্য। তাহার অল্প দিন পরেই,—১৯১৯ সনে অর্থশাস্ত্র-সংক্রান্ত একটা প্রবন্ধের তলব আসে "জার্ণ্যাল অব্‌ ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল রিলেশ্যনস" নামক ত্রৈমাসিক হইতে। বস্তুতঃ, আমি তখন এই পত্রিকার অন্যতম লেখক-সম্পাদক। প্রধান সম্পাদক ছিলেন ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট চিত্তবিজ্ঞান-পণ্ডিত ষ্ট্যান্‌লি হল। পত্রিকাটা প্রকাশিত হইত ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে। যে প্রবন্ধটা লিখিয়াছিলাম তাহার আলোচ্য বিষয় "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ফেটার্স অব্‌ ইয়ং চায়না" (যুবক চীনের আন্তর্জ্জাতিক শৃঙ্খল)। চীনদেশের খনিতে, রেলপথে, আর অন্যান্য আর্থিক লেনদেনে বিদেশী পুঁজি কত রকমারি একৃতিয়ার চালাইতেছে তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধের আসল কথা। অনুন্নত দেশমাত্রের পক্ষে উন্নত দেশসমূহ হইতে পুঁজি আমদানির কুফল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। মজার কথা, বিদেশী পুঁজির অপর দিক্‌ দেখাইয়াছি ১৯২৪ সনে আর্থিক ভারতের জন্য বর্ত্তমান কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার সময় (মডার্ণ রিভিউয়ে প্রকাশিত "স্কীম অব্‌ ইকনমিক ডেহেবলপ্‌মেণ্ট ফর ইয়ং ইণ্ডিয়া" প্রবন্ধে)। মার্কিণ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ দুইটা "ফিউচারিজম্‌ অব্‌ ইয়ং এশিয়া" (যুবক এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা) গ্রন্থে (লাইপৎসিগ, ১৯২২, ৪১০ পৃষ্ঠা) সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পিট্‌সবার্গ এবং অন্যান্য মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল।

আধুনিক কালে মজুর আমদানি-রপ্তানি আর পুঁজি আমদানি-রপ্তানি আর্থিক দুনিয়ার দুইটা বড় তথ্য। এই দুই শ্রেণীর চলাচল বা গতিবিধি বর্ত্তমান জগতের অর্থনৈতিক আন্তর্জ্জাতিকতা পুষ্ট করিতেছে। মাল-চলাচলের মতন লোক-চলাচল আর টাকাকড়ির চলাচলও একালের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপুল আকার ধারণ করিয়া থাকে। আগেকার দিনে,—কোনো কালে পল্লী ছিল আর্থিক জীবনের কেন্দ্র। কখনো কখনো,—কোথাও কোথাও,—আর্থিক কেন্দ্র নগরের চৌহদ্দির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকিত। পরে কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের লেনদেন, চলাফেরা, বিনিময় ও বাজার-ব্যবস্থা সুবিস্তৃত জনপদ বা "দেশে"র চতুঃসীমার ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। আজকালকার লেনদেন আর বাজার-ব্যবস্থা বিশ্বজোড়া হইয়া পড়িয়াছে। এই "বিশ্ব-কেন্দ্র" আর্থিক

জাবনের ("ওয়ার্লড ইকনমি"র) বিজ্ঞানবস্তু পুঁজি-চলাচল আর মজুর-চলাচলের সঙ্গে সুজড়িত।

নবীনতম বিশ্বকেন্দ্র ধনবিজ্ঞানই আমেরিকায় প্রবাস-কালের একমাত্র অর্থশাস্ত্র-গবেষণার সামগ্রী ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ভারত-কেন্দ্র,—বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতীয়,—ধনবিজ্ঞানের গবেষণায়ও সময় দিতে হইয়াছে। আমেরিকা ছাড়িবার পূর্ব্বেই এই বিষয়ের তিনটা প্রবন্ধ তিন মুল্লুকে বাহির হয়। প্রথমতঃ ইতালিয়ান ভাষায় রোমের "জার্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিহ্বিস্তা দি স্তাতিস্তিকা" নামক মাসিকে প্রকাশিত হয় প্রাচীন হিন্দু শিল্পি-"শ্রেণী" আর বণিক-"শ্রেণীর" বৃত্তান্ত (১৯২০)। এই প্রবন্ধ পরে পুণা হইতে প্রকাশিত "জার্ণ্যাল অব্ দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিক সোসাইটি" ত্রৈমাসিকে বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ফিলাডেলফিয়ার "আনাল্‌স্ অব্ দি আমেরিকান আকাডেমী অব্ পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স" ত্রৈমাসিকে (১৯২০)। প্রবন্ধের কথাবস্তু ছিল হিন্দু-রাষ্ট্রের রাজস্ব-ব্যবস্থা। প্রবন্ধ দুইটা লাইপৎসিগে প্রকাশিত "পোলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশুন্‌স্ অ্যাণ্ড থিয়োরীজ্ অব্ দি হিন্দুজ্" গ্রন্থে (১৯২২, ২৫৬ পৃষ্ঠা) স্থান পাইয়াছে। "হিন্দু-রাষ্ট্রের গড়ন" নামক বইয়েও (১৯২৬, ৩৮০ পৃষ্ঠা) এই দুই প্রবন্ধের কিছু কিছু গুঁজিতে পারিয়াছি।

তৃতীয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় শুক্রনীতির ধনবিজ্ঞান। আমেরিকায় থাকিতে থাকিতেই ১৯২০ সনে এইটা লেখা হয়। ছাপা হয় ১৯২১ সনে মডার্ণ-রিহ্বিউয়ে। সেই বৎসরই "পজিটিভ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব্ হিন্দু সোসিঅলজি" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগে এই রচনা স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় ধনবিজ্ঞানের যুক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পরবর্ত্তী কালে (ইতালিতে প্রবাসের সময়) লেখা হইয়াছিল। সেটা ১৯২৭ সনে "ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোআর্টার্লি" ত্রৈমাসিকে বাহির হইয়াছে। তাহার কথাও এই সূত্রে বলিয়া রাখিলাম।

ইয়াঙ্কিস্থানের আবহাওয়ায় গোটা দুনিয়াকেই পাকড়াও করিয়াছিলাম। কাজেই এই আবেষ্টনে আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক রসদই জুটিয়াছে। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগ ছিল প্রচুর। তাহার ফলে অনেক তরফ হইতে অনেক-কিছুই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। অর্থশাস্ত্রের তরফ হইতে মাত্র একটা বড় শক্তির কথা এইখানে বলিব। সে হইতেছে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ বা অঙ্ক-শ্রেণীর কথা। মার্কিণ মুল্লুকের যেখানে-সেখানে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের ছড়াছড়ি দেখিয়াছি। নৃতত্ত্ব ও চিত্তবিজ্ঞান হইতে সুরু করিয়া রেল-তত্ত্ব ও তেল-তত্ত্ব পর্য্যন্ত বিদ্যারাজ্যের সকল মহলে,—সকল গলিঘেঁাচেই—ঝালে ঝোলে অম্বলে,—সর্ব্বত্রই পাইয়াছি অঙ্করাশি। আমেরিকান ফ্যাক্টরিতে, আমেরিকান ব্যাঙ্কে, আমেরিকান বীমা-ভবনে, আমেরিকান বেপারী-সৌধে,—আর ইস্কুল লাইব্রেরী ইত্যাদির ত কথাই নাই,—আগে অঙ্কময় তথ্য অথবা তথ্যে ভিজানো অঙ্ক, তাহার পর অন্যান্য যা হয় কিছু,—বক্তৃতা, সমালোচনা, বাদানুবাদ, তর্কপ্রশ্ন। এই ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্-প্রীতি মার্কিণ মুল্লুকে যত দুনিয়ার আর কোথাও আজ পর্য্যন্ত তত পরিমাণে নজরে আসে নাই। সুতরাং সহজে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌কে মার্কিণ বিদ্যা সমঝিয়া রাখা আমার দস্তুরে দাঁড়াইয়াছে। আর ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের মাহাত্ম্যে যে চিন্তাপ্রণালীকে নিরেট ও কর্ম্মঠ করিয়া তোলা সম্ভব সেই বিষয়ে ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। আমেরিকায় বহুদিন ধরিয়া লোকজনের সঙ্গে,—বিদ্যাক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে,—ঘনিষ্ঠরূপে গা ঘেঁশাঘেঁশি না করিলে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের গৌরব যথোচিত উপলব্ধি করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। আমেরিকার নিকট ইহা আমার একটা বড় ঋণ।

(৫)

১৯২০ সনের শেষাশেষি মার্কিণ মুল্লুক ছাড়িয়া ফ্রান্সে আসিয়া ঘর করি। "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর জের চলিতে থাকে। ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সনের ভিতর ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, সুইটসার্ল্যাণ্ড ও ইতালি এই পাঁচ দেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় অন্যান্য কথার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ভ্রমণ-সাহিত্যও প্রকাশিত হইয়াছে। রচনা-গুলা এখনো গ্রন্থাকারে বাহির হয় নাই এক "সুইটসার্ল্যাণ্ড" (১৯২৯) বাদে। এই সকল লেখায় "যুদ্ধের পরবর্ত্তী

আর্থিক ইয়োরোপের টাকাকড়ি, শিল্পনিষ্ঠা, বাণিজ্য-কানুন, মজুর-আন্দোলন ইত্যাদি তথ্যের দিকেই নজর বেশী পড়িয়াছে।

ধনবিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্যসৃষ্টির এই তালিকায় প্যারিসে বসবাস (১৯২০-২১) এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানকার "সোসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিক" নামক ফরাসী ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এই শ্রেণীর পণ্ডিত-সঙ্ঘের ভিতর সর্ব্ব-প্রাচীন। সোসিয়েতের প্রেসিডেণ্ট ব্যাঙ্কার সেনেটার রাফায়েল-জর্জ্জ লেহ্বি নিজ প্রস্তাবে আমাকে তাঁহাদের সভ্য করিয়া লন। সঙ্গে সঙ্গে আর এক জন প্রেসিডেণ্ট, ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব-সচিব ঈভ গীয়ো ভারতীয় ধনবিজ্ঞান-সেবীদের সঙ্গে ফরাসী ধনবিজ্ঞান-সেবীদের আত্মিক যোগাযোগ কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে একখানা চিঠি দেন। সেই চিঠি পুণার পূর্ব্বোল্লিখিত ভারতীয় ধনবিজ্ঞান পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে (১৯২১)। "ফিউচারিজ্ম" গ্রন্থের এক অধ্যায়েও ফরাসী-ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তা-বিনিময়ের এই আমন্ত্রণকে ঠাঁই দিয়াছি।

চাঁদা দিলেই বিলাতের "রয়্যাল ইকনমিক্ সোসাইটির" মেম্বর হওয়া যায়। কিন্তু প্যারিসের সোসিয়েতে চাঁদার লোভে মেম্বর-সংখ্যা বাড়াইতে চেষ্টা করে না।

ফরাসী "সোসিয়েতে" জবরদস্ত "স্বাধীনতার" উপাসক। আর্থিক জীবনে রাষ্ট্রের সঙ্গে অ-সহযোগ চালানো ইঁহাদের মূলমন্ত্র। এই মন্তরটা সমাজ-বিজ্ঞানের পারিভাষিকে "লেস্সে ফেয়ার" নামে পরিচিত। কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে "স্বাধীনভাবে" "স্বাভাবিক ভাবে" যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহাই ঘটিতে দাও,—সরকারী হস্তক্ষেপ নিবারণ কর,—রাষ্ট্রকে দূরে রাখ,—অর্থনৈতিক আইনকানুনের বালাই হইতে আর্থিক জীবনকে বাঁচাইয়া চল,—ইত্যাদি বুখ্নি হইতেছে কট্টর "লেস্সে-ফেয়ার"-পন্থীদের গোড়ার কথা। এই মতের ধনবিজ্ঞান বিলকুল রাষ্ট্রহীন এইরূপ বলিলেই অবস্থাটা যথোচিত বিবৃত হইতে পারে। ফলতঃ "সোসি-য়েতের" পণ্ডিতেরা সোশ্যালিজ্মের যম।

"স্বাধীনতার" এই গর্ত্তে পড়িয়া ভ্যাবাচাকা খাই নাই, বরং এই আওতায় মাস দশেক কাটাইবার ফলে যথেষ্ট আত্মিক উপকারই হইয়াছে। ধনবিজ্ঞানের জ্ঞান-কাণ্ড বা তত্ত্বাংশ (থিয়োরি) কতখানি আর কর্ম্মকাণ্ড কতখানি তাহা প্যারিসের আবহাওয়ায়ই পরিষ্কার হইয়া আসিল। কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে "সোসিয়েতের" পথ ও হদিশগুলা হজম করা সম্ভবপর হইল না। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে ষোল আনা স্বাধীনতার সেবকেই পরিণত হইলাম। আর ষোল আনা স্বাধীনতার সেবক হওয়ার অর্থ ই হইতেছে শেষ পর্য্যন্ত "ক্লাসিক" মতের উপাসক হওয়া। এই "ক্লাসিক" মত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে আর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজ-ফরাসী গবেষকদের প্রচারিত মাল। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ইতিহাসে ক্লাসিকতার, স্বাধীনতা-নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ প্রচারক ইংরেজ-ইহুদি ডেহ্বিড্ রিকার্ডো। ঘটনাচক্রে ফ্রান্সে আসিয়া ইংরেজ-ভক্ত হইয়া পড়িলাম।

ফ্রান্সের সকল ধনবিজ্ঞানসেবীকে এই "সোসিয়েতের" দলের লোক বিবেচনা করিলে ভুল বুঝা হইবে। ফরাসী পার্ল্যামেণ্টে আর গবর্ণমেণ্টে যাঁহারা মাতব্বর-স্থানীয় তাঁহাদের অনেকেই এই দলের লোক নন। পণ্ডিতদের ভিতর অধ্যাপক জিদ্ এই দলের বাহিরে। তাঁহার সম্পাদিত "রেহ্বিয়ু দেকোনোমী পোলিটিক" নামক দ্বৈমাসিক ধন-বিজ্ঞান পত্রিকায় "সোসিয়েতে"র স্বাধীনতা প্রচারিত হয় না। "সোসিয়েতে"-বিরোধী পণ্ডিত ও রাষ্ট্রিকদের সঙ্গেও আত্মিক যোগাযোগ আমার বেশ ছিল। বস্তুতঃ জিদের পরামর্শেই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকাল্টি হইতে বক্তৃতা করিবার জন্য আমার নিকট সরকারী নিমন্ত্রণ আসে। ফ্রান্সে ধনবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন আইন-ফ্যাকাল্টির অন্তর্গত।

দেখা যাইতেছে যে, এক-চোখো ভাবে অর্থশাস্ত্রের সংসারে পর্য্যটন করিবার সুযোগ বা দুর্যোগ ঘটে নাই। ফরাসী আবহাওয়ায় থাকিতে থাকিতেই ধনবিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ড হইতে পুরাপুরি ফারাক করিয়া ফেলিলাম। কর্ম্মকাণ্ডকে চলিতে দিলাম মোটের উপরে এক কথায় "সোশ্যালিজ্মের",—সমাজতন্ত্রের, রাষ্ট্র-নিষ্ঠার, অর্থ-নৈতিক আইন-কানুনের,—পথে। আর জ্ঞানকাণ্ডের জন্য মগজটাকে খোলা রাখিলাম "ক্লাসিকতা" আর স্বাধীনতার

আকাশ-বাতাসে। একদিকে চলিতে থাকিল "পথ"; আর—একদিকে,—ঠিক উল্টাদিকে চলিতে থাকিল "মত"। তবে অন্যান্য জগতের মতন আর্থিক জগৎও জটিল এবং বিচিত্র। একবগ্‌গা সোশ্যালিজ্‌মের জোরে কর্ম্মকাণ্ডও চলে না, আবার একবগ্‌গা স্বাধীনতার জোরে জ্ঞানকাণ্ডও চলে না। "পথে" হাঁটিতে হাঁটিতে অভিজ্ঞতার দৌলতে "মত" বা তত্ত্ব রূপান্তরিত হয়,—আবার "মতে"র পাল্লায় পড়িয়া "পথ"ও আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। "মতে" আর "পথে" লুকাচুরি খেলা আর মাঝে মাঝে কোলাকুলি অবশ্যম্ভাবী।

ধনবিজ্ঞানের "মত" বা তত্ত্বাংশ ওজনে খুবই কম। ইহার মূলসূত্রগুলা আঙ্গুলে গণা যায়। আর এই সূত্র কয়টা আজও যে আকার-প্রকারে বাজারে চলিতেছে সেই সবের আসল স্রষ্টা রিকার্ডো। সাধারণতঃ লোকেরা ইংরেজ আডাম স্মিথকে আধুনিক ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার জন্মদাতা বলিয়া থাকে। কিন্তু আডাম স্মিথের রচনায় এই সকল মূলসূত্রের সহিত মোলাকাৎ ঘটে না বলিলেই চলে। তাঁহার লেখা হইতে "প্রত্নতত্ত্বে"র অনুসন্ধান চালাইয়া এই সকল সূত্র-মাফিক দুএকটা ক্রিয়াপদ, বিশেষণ বা ঐ জাতীয় শব্দ বা শব্দাংশ ঢুঁড়িয়া বাহির করা সম্ভব। কিন্তু তাহাতে সূত্র-প্রচারকের কীর্ত্তি ফুটিয়া উঠে না। সেই কীর্ত্তি পুরাপুরি রিকার্ডোর প্রাপ্য। রিকার্ডো অর্থনৈতিক জ্ঞানকাণ্ডের সকল বিভাগেই কেবল বনিয়াদ মাত্র নয় প্রকৃত প্রস্তাবে খাঁটি ইমারত গড়িয়া গিয়াছেন। আজকাল,—মায় "চিত্তবিজ্ঞানে"র তরফ হইতেও সেই ইমারতগুলাই সাজাইয়া গুছাইয়া সমৃদ্ধিশালী করা হইতেছে। আডাম স্মিথকে একদম ভুলিয়া গেলেও বর্ত্তমান যুগে ধনবিজ্ঞান-সেবীদের কোনো ক্ষতি হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু রিকার্ডোকে বাদ দিলে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা এক পাও চলিতে পারে না। রিকার্ডো-সূত্রই নবীনতম অর্থশাস্ত্রের প্রাণ।

তত্ত্বহিসাবে ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু আমার বিবেচনায় "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। সেই "একম্" হইতেছে মূল্যতত্ত্ব (ভ্যালু)। মজুরি কে মজুরি, ব্যাঙ্কের সুদ-ডিস্কাউণ্ট কে সুদ-ডিস্কাউণ্ট, বীমাকোম্পানীর প্রিমিয়াম-চাঁদার হার, রেল-জাহাজ-ট্রামের মাসুল, নুণ তেলের বাজার-দর, বাড়ীভাড়া, ডাক্তারের ফী ইত্যাদি সব-কিছুই ভ্যালুতত্ত্বের অন্তর্গত। ধনবিজ্ঞানকে এক কথায় মূল্যবিজ্ঞান বলা চলে। যেখানে "ভ্যালু"র আলোচনা নাই সেখানে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ নাই। হয়ত সেখানে ধনবিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ড প্রচুর পরিমাণেই আছে। "ভ্যালু"র চর্চ্চা বাদ দিয়া ধনবিজ্ঞানে গবেষণা চালানো সম্ভব। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে তত্ত্বভোজী বা জ্ঞানযোগী হইতে হইলে মূল্যতত্ত্বে প্রবেশ করিতেই হইবে। এই মূল্য-তত্ত্বের ভিত্তি ফরাসী পারিভাষিকে "লেস্‌সে ফেয়ার" বা স্বাধীনতা। রিকার্ডোর পারিভাষিকে তাহা "নেচ্যর" (প্রকৃতি, স্বধর্ম্ম), "ন্যাচ্যর্যাল" (স্বাভাবিক, স্বধর্ম্ম-মাফিক), "ন্যাচ্যর্যাল লিবার্টি" (স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতা), "ন্যাচ্যর্যাল ট্র্যাফিক" (স্বাভাবিক গতিবিধি), ইত্যাদি।

ভ্যালু বা মূল্য বস্তুটা মানুষের সমাজে সহজ সরল মান্ধাতার আমলেও ছিল আর একালের জটিলতাপূর্ণ ধনদৌলতের ব্যবস্থায়ও আছে। সুতরাং মূল্যতত্ত্ব প্রাচীন বা আদিম মানব সম্বন্ধেও খাটে, আবার বর্ত্তমান জগৎ সম্বন্ধেও খাটে। কিন্তু সভ্যতার জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা নয়া চীজ দেখা দিয়াছে। তাহার নাম টাকাকড়ি। উন-বিংশ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীতে এই টাকাকড়ি রকমারি আকার ধারণ করিয়াছে। ধাতুজ টাকা, কাগজী টাকা, ব্যাঙ্ক নোট, চেক ইত্যাদি নানা রঙের মুদ্রার মারফৎ সকল প্রকার মূল্য কষা হইয়া থাকে। টাকার সাহায্যে যাঁহা মূল্য কষাকষি তাঁহা দাম, দর, কিম্মৎ, ইত্যাদির উদ্ভব। কাজেই মূল্যবিজ্ঞানের অপর পিঠ দাঁড়াইতেছে দাম-বিজ্ঞান ও টাকা-বিজ্ঞান (বা মুদ্রা-তত্ত্ব)। অর্থাৎ ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বাংশে দ্বিতীয় বস্তু হইতেছে টাকাকড়ির জ্ঞানকাণ্ড। এই তত্ত্বেও রিকার্ডোর মতই আজও সংসারে চলিতেছে।

সভ্যতার বহর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে লেনদেন, আমদানি-রপ্তানি, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য, মাল-চলাচল, লোক-চলাচল আর পুঁজি-চলাচল খুব বাড়িয়া গিয়াছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী এই সব চলাচলের প্রভাবে যারপর নাই চঞ্চল। মূল্য বা ভ্যালু বস্তুটা একালে একমাত্র কোনো নির্দ্দিষ্ট এক পল্লী, শহর বা দেশের ভিতরকার লেনদেনের ভিতরই আটক নয়। আমদানি-রপ্তানির

হার,—কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের আন্তর্জ্জাতিক উঠানামা, দেশে দেশে শস্তা-মাগ্‌গির তুলনা ইত্যাদি দফা মূল্য-তত্ত্বের আখড়ায় আসিয়া হাজির হইয়াছে। ফলতঃ ধনবিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ডে আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন-তত্ত্ব তৃতীয় কথা। এই তৃতীয় তত্ত্বের কোঠেও রিকার্ডো আজ পর্য্যন্ত অমর। এই সকল কারণে "ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট" আর "গ্রীটিংস্ টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" বইয়ে রিকার্ডোকে জগদ্‌গুরুরূপে প্রচার করিয়াছি (১৯২৫-২৭)।

যাহা হউক ফ্রান্সে রিকার্ডোকে "আবিষ্কার" বা পুনরাবিষ্কার করিলাম (১৯২০-২১)। ফরাসী "সোসিয়েতে"র আবেষ্টনে চিন্তা-প্রণালীতে গোঁজামিল ঢুকিবার আর সুযোগ পাইল না। পূর্ব্বে যে সকল কথা উড়ু-উড়ুভাবে মাথায় ছিল সেই সকল কথা এই আবহাওয়ায় মগজে স্থায়ী ঘর করিয়া বসিল।

(৬)

এইবার আড্ডা গাড়িলাম জার্ম্মাণিতে। জার্ম্মাণ সমাজ হইতে বর্ত্তমান ভারতের অর্থ-কথা আলোচনা করিবার ডাক পড়িল। তিনটা প্রবন্ধ তিন পত্রিকায় বাহির হইয়াছে: (১) যুবক ভারতের সমাজ-দর্শন (ডী সোৎসিয়ালে ফিলজফী য়ুঙ্-ইণ্ডিয়েন্‌স্—ডায়চে রুণ্ডশাও, বার্লিন, ১৯২২)। (২) ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য (এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট রিভিউ, বার্লিন, ১৯২২)। এই প্রবন্ধে মার্কিণ, জাপানী ও জার্ম্মাণ এই তিন জাতির ভারত-ব্যবসা তুলনা করা হইয়াছে। (৩) ডী ইণ্ডুষ্ট্রীয়ালিজীরুং ইণ্ডিয়েন্‌স্ (ভারতে শিল্পকারখানার প্রসার)। "ফারাইণ ডায়চার ইঞ্জেনিয়রে" নামক জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার-পরিষদের পত্রিকায় (১৯২৪) এই রচনা বাহির হইয়াছে। এই পরিষদের সঙ্গে নানা ভারত-সন্তানের যোগাযোগ কায়েম করিয়া দেওয়া ছিল বার্লিন প্রবাসের অন্যতম কাজ।

"বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়ান অধ্যায়-গুলা যথারীতি চলিতেছিল। অর্থাৎ লোহালক্কড়, গ্যাস-বিজলী, ব্যাঙ্ক-বীমা ইত্যাদির সঙ্গে মাখামাখি "যথাপূর্ব্বং তথা পরম্" এইরূপ বুঝিতে হইবে। একটা বড় কথা "কমার্শ্যাল নিউজ" (বাণিজ্য সংবাদ) নামক পত্রিকা চালানো (১৯২২-২৩)। ভারতবাসীকে,—বিশেষতঃ বাঙালীকে, বহির্ব্বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করা ছিল এই প্রয়াসের মতলব। ইণ্ডো-অয়রোপেয়িশে হাণ্ডেল্‌স্‌গেজেলশাফ্‌ট নামক আধা-ভারতীয় আধা-জার্ম্মাণ ব্যবসায়ী কোম্পানীর দৌলতে এই কাগজ চলিত। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন কোম্পানীর কর্ণধার। কোম্পানী আজও খাড়া আছে।

১৯২৩ সনের নবেম্বর মাসে জার্ম্মাণি ছাড়িয়া সুইট্‌-সার্ল্যাণ্ডে কর্ম্মশালা কায়েম করি। এখানকার মেয়াদ ছিল মাত্র মাস ছয়েক। তাহার পর ইতালিতে দুই তিনবারে আট দশ মাস। ইহার ভিতর কয়েক বার আবার অষ্ট্রিয়ায় ও জার্ম্মাণিতে মুসাফিরি করিতে হইয়াছে। অবশেষে ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ভেনিসে বোম্বাইমুখো জাহাজ ধরি। এই পৌনে দুই বৎসর ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চায় মোটের উপর জার্ম্মাণ আবহাওয়ার জেরই চালাইয়াছি বলিতে হইবে। সুইস তথ্য, সুইস ব্যাখ্যা, সুইস চোখে ইয়োরোপ চাখা, আর ইতালিয়ান ভাষা ও মুসোলিনির ছায়া সবই লেখালেখির উপর ছাপ ফেলিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ফ্রান্স ছাড়িবার পরবর্ত্তী চার বৎসরকে আত্মিক হিসাবে জার্ম্মাণ প্রবাসের যুগই সমঝিয়া থাকি।

১৯২৪-২৫ সনে অনেকগুলা অর্থনৈতিক রচনা ভারতীয় মাসিক-সাপ্তাহিক-দৈনিকে বাহির হইয়াছে। মাইসোর ইকনমিক জার্ণাল, বম্বে ক্রনিক্‌ল, মডার্ণ রিভিউ, ফোরাম, ওয়েলফেয়ার, ক্যালকাটা রিভিউ, ইত্যাদি নানা কাগজে এই সকল লেখা ঠাঁই পাইয়াছে। এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা চিত্তরঞ্জনের "ফরওয়ার্ড" প্রকাশ। তাহার কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু লিখিলেন নিয়মিত লেখক হইবার জন্য। এই সুযোগে "বিশ্বকেন্দ্র অর্থশাস্ত্রে"র চর্চ্চা ভারতে সুবিস্তৃতরূপে,—সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া—চালাইবার পথ খুলিয়া গেল। ফলতঃ বিদেশ প্রবাসের শেষ দেড় দুই বৎসর ভারতীয় পাঠক মহলে বর্ত্তমান জগতের নবীনতম ধনদৌলতের কথা প্রচার করিতে পারিয়াছি। টাকাকড়ির তত্ত্বকথা, সোভিয়েট রুশিয়ার

সরকারী ব্যাঙ্ক, জার্ম্মাণির মুদ্রা-পতন, বল্কান অঞ্চলের ভূমিবিধান, ফ্রান্সের টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল, ইতালির শিল্পনিষ্ঠা, ভিয়েনার বণিক-সঙ্ঘ, বিলাতের জমিজমা, জার্ম্মাণি-ফ্রান্সের সমাজ-বীমা, ডলার পাউণ্ড সম্বন্ধ, নয়া তুর্কীর আর্থিক গঠন, জাপানের মজুর আন্দোলন ইত্যাদি"ওয়ার্ল্ড্-ইকনমি"-সংক্রান্ত তথ্য ভারতের মহলে মহলে পরিবেষণ করা গিয়াছে। এই সবই পরে "ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট" (মান্দ্রাজ, ১৯২৬, ৫১৮ পৃষ্ঠা) নামে গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে। ইহার ভিতর আর্থিক ভারতকে বিশ্বকেন্দ্র ধনবিজ্ঞানের মাপজোকে ফেলিয়া জরীপ করিবার প্রয়াসও আছে। এই গ্রন্থে প্রকাশিত দুইটা প্রবন্ধ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য :—(১) "দি মেথডলজি অব্ রীসার্চ ইন ইকনমিক্‌স্",—ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-প্রণালী (মডার্ণ রিভিউ, ১৯২৪), (২) "এ স্কীম অব্ ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেন্ট ফর ইয়ং ইণ্ডিয়া" (মডার্ণ রিভিউ, ১৯২৫)—এইটা বাংলায় বাহির হইয়াছে সুবর্ণবণিক্ সমাচারে (১৯২৯)। বর্ত্তমান গ্রন্থে—"একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্রে"ও ইহা অন্যতম অধ্যায় ("সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল")। এই সময়েই বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কায়েম করিবার জন্য প্রস্তাব-প্রবন্ধ "প্রবাসী"তে (১৯২৫) বাহির হইয়াছিল।

১৯২৩-২৪এর মাস ছয়েক কাটিয়াছিল সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে। এই আওতায় অর্থনৈতিক সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতম চিহ্ন দুইখানা বাংলা তর্জ্জমাগ্রন্থ। একখানা জার্ম্মাণ পণ্ডিত এঙ্গেলস্ প্রণীত আর একখানা ফরাসী পণ্ডিত লাফার্গ প্রণীত। দুই-ই "ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা" বিশেষ। দুই-ই প্রাচীন মানবের আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-সম্বন্ধীয় রচনা। দুই-ই ধনবিজ্ঞানের আসরে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। জার্ম্মাণ কেতাবকে "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" (১৯২৬, ৩৪৪ পৃঃ) নামে, আর ফরাসী বইটাকে "ধনদৌলতের রূপান্তর" (১৯২৮, ৩১৬ পৃঃ) নামে বাংলায় হাজির করিয়াছি। গ্রন্থাকারে বাহির হইবার পূর্ব্বে এই বই দুইটার সকল অধ্যায় অন্যান্য রচনার মতনই দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। অনুবাদ দুইটার ভূমিকার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কি সাহিত্য-ক্ষেত্রে, কি সমাজ বিজ্ঞানে, কি রাষ্ট্র-নীতিতে সকল বিষয়েই বিশ্বকেন্দ্র, জগৎ-জোড়া, দুনিয়া-মন্থনকারী লেখাপড়া ১৯০৭ সন হইতেই চলিতেছে। ধনবিজ্ঞানের আসরেও কি "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলী, কি মার্কিণ প্রবাসের মজুর-চলাচল আর পুঁজি চলাচল বিষয়ক প্রবন্ধাবলী, সবই তুলনামূলক ও "বিশ্বগ্রাসী" বিশ্বশক্তির বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই "ওয়ার্ল্ড্-ইকনমি" "বিশ্ব-দৌলত" "বিশ্বসম্পদ" বা বিশ্বকেন্দ্রী আর্থিক ব্যবস্থার কথা আমার নিকট নতুন কিছু নয়। কিন্তু যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, "জার্ম্মাণির কুল্টুর মন্থন করিয়া ধনবিজ্ঞানের জন্য তুই ভারতে কী কী মাল আমদানি কর্‌লি?" তাহা হইলে জবাব দিব, "হ্বেল্ট-হ্বির্টশাফ্‌ট"। এই শব্দটা জার্ম্মাণ ধনবিজ্ঞানসেবী আর এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ও অন্যান্য "কেজো" মহলে হরদম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর লেখাপড়ার আসরে এই বিশ্ব-দৌলতের চর্চ্চাও হয় বিস্তর। কাজেই হ্বেল্টহ্বির্টশাফ্‌টলিখেস্ আর্খিহ্ব" (বিশ্বদৌলত গ্রন্থাগার) নামক কীল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যাপক হার্মস্-সম্পাদিত ত্রৈমাসিকটা বগল-দাবা করিয়া বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিয়াছিলাম (১৯২৫ সেপ্টেম্বর)।

(৭)

এইবার ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চার তৃতীয় যুগ। ১৯২৬ সনে প্রথমে কায়েম হইল "আর্থিক উন্নতি" মাসিক, পরে "জার্ণ্যাল অব্ দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স" (ত্রৈমাসিক)। এক দুই করিয়া লেখাপড়ায় সহযোগী জুটিতে লাগিল। ১৯২৮ সনে তাঁহাদেরই উৎসাহে খাড়া হইল বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ। সহযোগীদের নাম হইল "গবেষক" (রীসার্চ ফেলো)। ১৯২৯ সনে আবার দেশ ছাড়' ছাড়' এমন সময় বীরেন বলিলেন :—"আবার একটা কাগজ চালাইতে চাই।" জবাব দিলাম :—"বেশ, চালাও।" "ইণ্ডিয়ান কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী" নামে ইহা চলিতেছে। ইহার সঙ্গে আত্মিক যোগ রাখিতে হইয়াছে। চালাইতেছেন সহযোগীরা।

এই কয় বৎসরের বাংলা লেখা ও বক্তৃতাগুলা দুইখণ্ডে

বাহির হইতেছে :—(১) "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" (বর্ত্তমান গ্রন্থ)। (২) "নয়া বাঙ্গালার গোড়াপত্তন" (এই বইয়ের আধাআধি অর্থনৈতিক)। বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রায় আগাগোড়াই বিশ্বকেন্দ্রী আর্থিক ব্যবস্থার কথায় ভরা। দ্বিতীয় গ্রন্থের অর্থকথা ভারতবিষয়ক অথবা দুনিয়ায় আর্থিক ভারতের বর্ত্তমান স্থান ও ভবিষ্যৎ গতি বিষয়ক।

ধনবিজ্ঞানবিষয়ক নিম্নলিখিত বইগুলা ১৯২৬ সনে ও তাহার পরবর্ত্তী কালে বাহির হইয়াছে :—

(১) "ইকনমিক ডেহ্বেলপমেণ্ট" (মান্দ্রাজ, ৫১৮ পৃঃ, ১৯২৬)।

(২) "দুনিয়ার আবহাওয়া" (২৮০ পৃঃ, ১৯২৬): কতকগুলা অধ্যায়ে আর্থিক তথ্য আছে।

(৩) "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" (৩৮০ পৃঃ, ১৯২৬): কয়েক অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার বিবরণ আছে।

(৪-৬) "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর: (ক) জাপান (৫০০ পৃঃ, ১৯২৭), (খ) চীন (৪৪৫ পৃঃ, ১৯২৭), (গ) সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড (৭৫ পৃঃ, ১৯২৯)।

(৭-৮) অনুবাদ গ্রন্থ দুইটা (পূর্ব্বোল্লিখিত)।

(৯) "গ্রীটিংস্ টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" (১৮২ পৃঃ, ১৯২৭): আর্থিক ভারতের নানা কথা মোলাকাৎ ও বক্তৃতার আকারে বিবৃত।

(১০) "দি পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ সিন্স ১৯০৫" (মান্দ্রাজ, ৪০৪ পৃঃ, ১৯২৮): মুদ্রা, রাজস্ব, শুল্ক, ভূমিবিধান ইত্যাদি নানাবিধ অর্থশাস্ত্রবিষয়ক আলোচনা ইহার অন্তর্গত।

(১১) "দি প্রেশার অব্ লেবার আপন কনষ্টিটিউশ্যন অ্যাণ্ড ল" (শাসন-প্রণালী ও আইন-কানুনের উপর মজুরের প্রভাব),—১০নং বইয়ের মজুর-সম্পর্কিত অংশ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত (বেনারস, ৫৫ পৃঃ), ১৯২৮।

(১২) "কম্পারেটিভ পেডাগজিক্‌স্ ইন্ রেলেশ্যন টু পাবলিক ফিনান্স অ্যাণ্ড ন্যাশন্যাল ওয়েলথ" (দুনিয়ার মাপে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা,—রাজস্ব ও ধনদৌলতের হিসাব), ১৩৩ পৃষ্ঠা, ১৯২৯।

প্রথম আটখানা সবই বিদেশে লেখা (১৯২৬ এর পূর্ব্বে)।

১৯২৬-২৯ এর ভিতর যে সকল ইংরেজী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার কোনো কোনোটার নাম নিম্নরূপ :—

(১) শিপিং অ্যাণ্ড রেলওয়ে পলিসীজ্ ইন্ ইকনমিক লেজিসলেশ্যন (জাহাজ ও রেলের অর্থনীতি), ১৬পৃঃ।

(২) "দি ল' অ্যাণ্ড দি কাল্টিভেটর,—দি এক্‌জাম্পল্ অব্ ফ্রান্স (ফরাসী চাষীর আইন ব্যবস্থা), ১৮ পৃঃ।

(৩) "টাইপ্‌স্ অ্যাণ্ড টেণ্ডেন্‌সীজ্ ইন্ আমেরিকান ব্যাঙ্কিং (মার্কিণ ব্যাঙ্কের ধরণ-ধারণ), ৩৬ পৃঃ।

(৪) "দি রীমেকিং অব্ দি রাইখ্‌সবাঙ্ক অ্যাণ্ড দি বাঁক দ ফ্রাঁস (জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের নোট-ব্যাঙ্ক দুইটার পুনর্গঠন), ৪০ পৃঃ।

(৫) "কম্পারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম্ অ্যাণ্ড দি ইকুয়েশনস অব্ অ্যাপ্‌লায়েড ইকনমিক্‌স্ (শিল্পনিষ্ঠায় তুলনা-সাধন ও অর্থনৈতিক কর্ম্মকাণ্ডের সাম্যসম্বন্ধ), ১০ পৃঃ।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৮)

১৯২৯ সনের মে মাসে আবার সমুদ্র-পাড়ি ঘটিয়াছে। এই দ্বিতীয় বারকার প্রবাসে লেখা কয়েকটা রচনা নিম্নরূপ :

(১) ইণ্ডিয়েন্‌স্ এণ্ট্‌হ্বিকলুঙ্ ইম্ ফার্গ্‌লাইখ ৎসু অয়রামেরিকা (ইয়োরামেরিকার তুলনায় বর্ত্তমান ভারতের জীবন-বিকাশ), "ডায়চে রুণ্ডশাও", বার্লিন (১৯৩০)।

(২) ফার্গ্‌লাইখেণ্ডার ইণ্ডুষ্ট্রিয়ালিস্‌মুস্ (শিল্পনিষ্ঠার বিশ্বরূপ), "ফোর্শুঙ্গেন উণ্ড ফোর্ট্‌শ্রিট্টে", বার্লিন (১৯৩০)।

(৩) ইস্তিতুৎসিঅনি পলিতিকে এ সচ্যালি দেল আন্তিক পপল ইন্দিয়ান (প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ-ব্যবস্থা), "আনালি দি একনমিয়া", মিলান (ইতালি) ১৯৩০।

(৪) আস্পেত্তি এ প্রব্‌লেমি দেল্লা মডার্ণা একনমিয়া ইন্দিয়ানা (আধুনিক আর্থিক ভারতের স্থিতি ও সমস্যা) "আনালি দি একনমিয়া", মিলান (১৯৩০)।

(৫) ৎসোল পোলিটিক ইন ইণ্ডিয়েন (ভারতের শুল্ক-নীতি), "ভির্ণব্যর্গার ৎসাইটুঙ্" (১৯৩০)।

(৬) র‍্যাশন্যালিজেশ্যন ইন্ ইণ্ডিয়ান কটন মিল্‌স,

য়েলওয়েজ, ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড আদার এণ্টারপ্রাইজেস্ (ভারতের নানা শিল্প-বাণিজ্যে যুক্তিযোগ)।

(৭) ইণ্টার্ণাট্‌সিওনালার হ্বারেণ-কার্কেয়ার উণ্ড কুল্টুর-আউষ্টাউশ ইন্‌ ডার ইণ্ডিশেন হ্বির্টশাফ্‌টস-গেশিষ্টে (ভারতীয় আর্থিক ইতিহাসে আন্তর্জ্জাতিক মাল-ও-ভাব-বিনিময়) ফাও-ডে-ই, বার্লিন।

ইত্যাদি।

নয়া প্রবাসের এই দেড় বৎসর প্রায় ষোল আনাই অর্থনৈতিক গবেষণায় ও পর্য্যটনে কাটিয়াছে। কি বিলাত, কি ফ্রান্স, কি জার্ম্মাণি, কি চেকোশ্লোহ্বাকিয়া, কি সুইটসার্ল্যাণ্ড, কি অষ্ট্রিয়া, কি ইতালি, সর্ব্বত্রই ঢুঁড়িয়াছি যন্ত্রপাতির আবহাওয়া, বীমা-ব্যাঙ্কের বেপারী আর চাষ-আবাদের মাতব্বর। জেনেহ্বায় মাস চারেক ধরিয়া "লীগ অব নেশ্যন্‌স্" আর "আন্তর্জ্জাতিক মজুর কর্ম্মকেন্দ্র" এই দুই প্রতিষ্ঠান তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া দেখিবার সুযোগ জুটিয়াছে। এই দুই ডিহির আবহাওয়ায় সবই বিশ্বদৌলত—বলা বাহুল্য। সঙ্গে সঙ্গে জেনেহ্বার বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২৯-৩০) আর ইতালির দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে (মিলানে আর পাদোহ্বায়), আর্থিক ভারত বিষয়ক বক্তৃতার নিমন্ত্রণও রক্ষা করিয়াছি। অন্যান্য অনেক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার ফুরসুৎ জুটিয়া উঠে নাই।

পরে এই বৎসরের মার্চ্চ হইতে ব্যাহ্বেরিয়ার শিক্ষা-সচিবের নিয়োগপত্রে মিউনিকের টেক্‌নিশে হোখ্‌শুলে (টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠানে এক বৎসরের মেয়াদে অধ্যাপনা করিতেছি। "ডায়চে আকাডেমী" নামক জার্ম্মাণির নবগঠিত পরিষৎ এই বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-সচিবের দপ্তরের সঙ্গে "সাংসারিক" কথাবার্ত্তা চালাইয়া এই পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। সপ্তাহে চার ঘণ্টা করিয়া জার্ম্মাণ ভাষায় বক্তৃতা দিতে হয়। আলোচ্য বিষয়, "আর্থিক ভারত ও বিশ্ব-দৌলত।" গ্রীষ্মের বক্তৃতাবলী শেষ হইয়া গিয়াছে। নবেম্বরে সুরু হইবে শীতের "সেমেষ্টার।" ষ্টুটগার্ট, বার্লিন, লাইপৎসিগ ইত্যাদি কেন্দ্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটকা বক্তৃতার নিমন্ত্রণও আছে। গ্রীষ্মে ছিল য়েনা, কীল ইত্যাদি কেন্দ্রে।

ইতিমধ্যে যুবক ভারতের অর্থশাস্ত্র বিষয়ক এক গ্রন্থ জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এই জন্য দেশ-বিদেশের ধনবিজ্ঞানসেবীর নিকট মালমশলা মাগিয়া চিঠি ঝাড়িয়াছি। "ইণ্ডিয়ান ইকনমিক থট সিন্স ১৯০৫" নামে এই চিঠি ছাপা হইয়াছে। ক্রমশঃ দেখিতেছি এই বই বিদেশে বসিয়া লেখা বোধ হয় একপ্রকার অসম্ভব। এই বইয়ের ভিতর বাংলা দেশের তরফ হইতে অন্ততঃ গোটা শয়েক লেখকের নাম গুঁজিতে পারিলে সুখী হইতে পারি।

মিউনিকের বক্তৃতায় তুলনামূলক শিল্পনিষ্ঠার "ইকুয়েশন" (সাম্য-সম্বন্ধ)গুলা ধনবিজ্ঞানের প্রত্যেক কোঠে কষিয়া বাহির করিতেছি। এই সাম্য-সম্বন্ধ প্রত্যেক কোঠেই প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর অন্তর্গত :—

(১) "ক"-দেশ (১৯৩০) = ন × "খ"-দেশ (১৯৩০)।

"ন" এখানে ০·১, ০·২, ০·৫, ০·৯, ১, ২, ৩, ৪, ২৫,... ইত্যাদি হইতে পারে।

(২) "ক"-দেশ (১৯৩০) = ত × "ক"-দেশ (১৯০৫)
= থ × "ক"-দেশ (১৮৮৫)
= ইত্যাদি।

"ত" আর "থ" এখানে ০·১......২৫...... ইত্যাদি হইতে পারে।

(৩) "ক"-দেশ (১৯৩০) = "খ"-দেশ (১৯০৫)
= "গ"-দেশ (১৮৮৫)
= "ঘ"-দেশ (১৮৭০)
= ইত্যাদি।

প্রথম শ্রেণীর সাম্য-সম্বন্ধে বুঝা যায়, কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে জগতের এক দেশ আর এক দেশের তুলনায় অর্থ-দক্ষতা হিসাবে কতগুণ বড় বা কত পরিমাণ ছোট। দ্বিতীয় শ্রেণীর বক্তব্য হইতেছে যে, যে কোনো দেশ তাহার নিজ অতীতের তুলনায় খানিকটা বাড়িয়াছে অথবা কমিয়াছে। এই বাড়া-কমার পরিমাণ অঙ্কের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব। তৃতীয় শ্রেণীর সাম্যে বুঝা যায়, একটা অনুন্নত দেশ কোনো উন্নততর দেশের তুলনায় কত বৎসর পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আর্থিক ভারতকে পিটাইয়া দুরস্ত

করিবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর সাম্য-সম্বন্ধই বিশেষ দামী। এই তিন শ্রেণীর অর্থনৈতিক সাম্য আবিষ্কার করিবার জন্য প্রথমেই দরকার দেশবাসীর মাথা পিছু আর দেশায়তনের মাইল প্রতি কৃষিশিল্পবাণিজ্যের গড়গুলা খাড়া করা। সাম্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে গড়ে গড়ে।

প্রত্যেক সাম্য-সম্বন্ধই রেখা-তরঙ্গের সাহায্যে ছবি আঁকিয়া ধরিয়া রাখা সম্ভব। কিন্তু বহুসংখ্যক "কার্ডে"র পাল্লায় পড়িলে অত্যধিক জটিলতা আসিয়া জুটিতে পারে। "ইণ্ডেক্স্ নাম্বার" বা সূচী-সংখ্যার সাহায্যেও মাপজোক-গুলা চালানো যায়। কিন্তু কড়ায়-ক্রান্তিতে তুলনা সাধন সম্ভবপর হয় না।

এই সকল সাম্য-সম্বন্ধের কথা "ইকনমিক ডেহ্বেলপমেণ্ট (১৯২৬) বইয়ের এখানে-ওখানে ঠারে-ঠোরে বলা আছে। "কম্পারেটিভ পেডাগজিকস্" (১৯২৯) বইয়ে ইহার যৎ-কিঞ্চিৎ দাগ আছে। বৎসর দেড় দুই ধরিয়া এইগুলা সকল প্রকার আর্থিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার চেষ্টায় আছি। "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থেও তাহার অতি সামান্য সঙ্কেত মাত্র স্থানে স্থানে রাখিয়া গিয়াছি।

(৯)

ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চায় বর্ত্তমান ভারত লড়াইয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরে বড় বেশী হাত দেখায় নাই। ১৯০৫-৯ ছিল যুবক এশিয়ার জন্মকাল। তখন ভারতে চলিতেছিল স্বদেশী আন্দোলন। দাদাভাই নওরোজি, মহাদেও রাণাডে, রমেশ দত্ত এই তিন জন রাষ্ট্রিক পণ্ডিত ছিলেন সেকালে ভারতীয় অর্থ-নৈতিক চিন্তার "ত্রিবীর"। রাষ্ট্রনৈতিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় নবপ্রসূত যুবক ভারত প্রধানতঃ এই ত্রিবীর-নির্দ্দিষ্ট পথেই চলিত। সেকালের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক তাহার সাক্ষী। ১৯১০-১৪ এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া স্বদেশী আন্দোলনের ধারা,—রাষ্ট্রনৈতিক ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার জেরই চলিতেছিল। এই যুগকে সহজে মোটের উপর "গোখ্‌লের যুগ" বলিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে যুবক ভারতের কোনো কোনো মহলে দু-একখানা ইস্কুল কলেজের টেক্স্‌ট বুক জাতীয় ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক বই লিখিবার খেয়াল দেখা যায়। কেহ কেহ আর্থিক ক্ষেত্রে স্বাধীন অনুসন্ধান-গবেষণায়ও আনন্দলাভ করিত। তবে এই যুগের অনুসন্ধান-গবেষণায় প্রত্নতত্ত্ব বা প্রাচীন ভারতের জীবনকথাই ছিল আলোচনার বড় কথা।

তারপর বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র আর তাহার পরবর্ত্তী যুগ। ১৯১৫-১৮ সনে মহা-লড়াইয়ের সুযোগে ভারতের স্বদেশী আন্দোলন ফুলিয়া উঠিতেছিল। শিল্প-কারখানার প্রসার অথবা প্রসারের চেষ্টা এই যুগের মস্ত কথা। গবর্মেণ্টও বাধ্য হইয়া ভারতের শিল্পনিষ্ঠা বাড়াইবার দিকে অগ্রসর হয়। দেশে-বিদেশে ভারতীয় আর্থিক রচনা গ্রন্থাকারে কিছু কিছু বাহির হইতে থাকে। দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকের অর্থনৈতিক সাহিত্যেও খানিকটা উচ্চাঙ্গের আলোচনা-প্রণালী দেখা দেয়। ১৯২০-২৪ হইতেছে ভারতে সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বজনিক (ডেমক্রাটিক) শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তনের যুগ। জনসাধারণের এক্তিয়ার ছিল অবশ্য নেহাৎ ফোঁটা ফোঁটা। অপর দিকে চলিতেছিল গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অ-সহযোগ লড়াই। ভারতের ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চায় এই পাঁচ বৎসর বিশেষ উল্লেখের সামগ্রী। এতদিন পর্য্যন্ত ধন-বিজ্ঞান-চর্চ্চা,—হয় একমাত্র না হয় প্রধানতঃ—রাষ্ট্রিক মহলে সীমাবদ্ধ ছিল। লড়াইয়ের পরবর্ত্তী প্রথম বৎসর পাঁচেকের ভিতর একসঙ্গে অনেক অ-রাষ্ট্রিককে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক-প্রবন্ধ-লেখক বা গ্রন্থকাররূপে দেখিতে পাই। যদি বলি যে এতদিনে সুরু হইল ভারতে মাষ্টারী বা টুলো ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা, তাহা হইলে অবস্থাটার যথার্থ বৃত্তান্ত দেওয়া হয়। এই ইস্কুলমাষ্টার বা টুলো পণ্ডিত মহাশয়েরা সকলেই পুরাপুরি অ-রাষ্ট্রিক ধাঁজের লোক অথবা ষোল আনা "আকাডেমিক', পারিষদিক অথবা বিজ্ঞানসম্মত মতামতের প্রচারক কিংবা এইরূপ গবেষণার প্রবর্ত্তক এরূপ বলা চলে না। তবে পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা এতদিনে ধনবিজ্ঞানের "রীসার্চে" নাক গুঁজিতে ঝুঁকিলেন এই কথাটাই ১৯২০-২৪এর বড় কথা।

তার পরের পাঁচ বৎসরই (১৯২৫-২৯) যুবক ভারতের ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চায় সব্‌সে সেরা। পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরে গবেষণা-প্রীতি আত্মপ্রকাশ করে। সেই গবেষণা-প্রীতির "প্রথম সুফল"ই এই যুগের লক্ষ্য করিবার বস্তু। এই যুগে

আলোচনার ক্ষেত্র বাড়িয়াছে, আলোচনা-প্রণালী উন্নত করিবার দিকে আগ্রহ জন্মিয়াছে, লেখকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে পত্রিকা-পরিষৎ ইত্যাদির সাহায্যে সঙ্ঘবদ্ধ গবেষণার সুযোগ কিছু কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, সাধারণ দৈনিক-মাসিকেও এই সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণতর নজর পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রিক এবং অ-রাষ্ট্রিক দুই মহলেই বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী মত ও পথের আলোচনা এবং প্রচার দেখা দিয়াছে। কিষাণ, মজুর, কেরাণী, বেপারী, সাংবাদিক ইস্কুলমাষ্টার, কংগ্রেস-কর্ম্মী ইত্যাদি দেশের নানা শ্রেণীর নরনারী ভেড়ার পালের মতন কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিয়া চলা বন্ধ করিয়াছে। দেশোন্নতির বা আর্থিক উন্নতির কোনো পথকে স্বদেশ-সেবার একমাত্র পথ সমঝিয়া রাখা এই যুগের আর দস্তুর নয়। যুবক ভারতের অর্থনৈতিক চিন্তা এক বিচিত্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ১৯৩০ সনে চলিতেছে দেশ-ব্যাপী সমাজ-বিপ্লব। পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের অনেক কিছুই আগামী পাঁচ বৎসরে বহুবিধ শাখা-প্রশাখায় প্রসার লাভ করিবে সম্ভাবনা আছে। আশাও করা যায়।

তবে এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, ১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী যুবক ভারত অন্যান্য চিন্তাক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর যতটা সম্বর্দ্ধনা লাভ করিতে পারিয়াছে ধনবিজ্ঞানের গবেষণা ও সাহিত্যসৃষ্টি ক্ষেত্রে ততটা পারে নাই। বস্তুতঃ আজও যুবক ভারতের ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা দুনিয়ায় অজ্ঞাত এই কথা বলিলেই ঠিক বলা হয়। ভারত সন্তানের লেখা দু একখানা বইয়ের এক আধ কাঁচা সমালোচনা বা সংবাদ হয়ত ইয়োরোপ-আমেরিকার কোনো কোনো ধনবিজ্ঞান-পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। আর কোনো কোনো ভারত-সন্তানের লেখা প্রবন্ধও হয়ত দুএকটা উচ্চশ্রেণীর বিদেশী কাগজে ভারতীয় চিন্তার সাক্ষ্য দিয়াছে। কিন্তু এই সবের পরিমাণ এত কম যে, ১৯৩০ সনের বিজ্ঞানদুনিয়া যুবক ভারতকে ধনবিজ্ঞানসেবীরূপে এক প্রকার চিনে না। এই সংবাদে যদি যুবক ভারতের রাষ্ট্রিক ও অ-রাষ্ট্রিক মহলে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক কর্ত্তব্যজ্ঞান কথঞ্চিৎ জাগিয়া উঠে তাহা হইতে ১৯৩৫ সনে যে যুগ সুরু হইবে তাহা গৌরবময় হইবারই কথা।

এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি একবার ডাকঘর হইতে হারাইয়া যায়। তাহার পর "ছাপাখানার সয়তান" আসিয়া প্রথম দেড় অধ্যায়ের মাল লোপাট করে। তাহা পূরণ করা আর সম্ভবপর হইল না। কিন্তু শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরীর ভাবুকতায় শেষ পর্য্যন্ত বই বাহির হইল। তিনি বিগত চার পাঁচ বৎসরের ভিতর একে একে আমার পাঁচখানা বই প্রকাশ করিলেন। তাঁহার নিকট এবং ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার নিকট আমার সাহিত্য-চর্চ্চা অনেক প্রকারে ঋণী। এই দুই বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বইয়ের ভূমিকা খতম করিতেছি। বিশেষ সুখের কথা তাঁহারা দুই জনেই "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র"-প্রদর্শিত পথে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতেছেন।
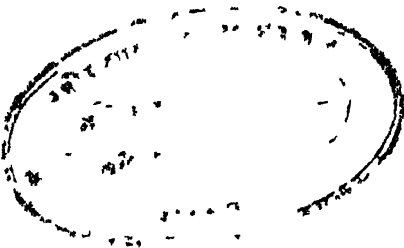
বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

শোক সংবাদ

পরিষদের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইয়া গিয়াছে আশ্বিন হইতে। গোড়াতেই এবার একটি দুঃসংবাদ দিতে হইতেছে। আমাদের প্রথম সভাপতি ৺মেজর বামনদাস বসু মহাশয় অকস্মাৎ তাঁর এলাহাবাদস্থ ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছু কাল যাবৎ তিনি ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু তখন আমরা বুঝিতে পারি নাই যে তিনি এত শীঘ্র আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও তিনি আমাদের সঙ্গে পত্রব্যবহার করিয়াছিলেন, পরিষদের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পরিষৎ যে তাঁর কত আদরের ছিল, তা আজ অনুভব করিতেছি।

মনে পড়ে, স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের ৪৫ নং পুলিশ হাসপাতাল রোডস্থ ভবনে। তার কিছুদিন আগে ধনবিজ্ঞান পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে (১৩৩৫, আশ্বিন)। তাঁকে প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করামাত্র তিনি গবেষণাধ্যক্ষ মহাশয়কে লিখিলেন, "তোমাদের যখন হুকুম, তখন ত হইয়াই আছি।" তারপর তিনি শুধু গবেষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবার জন্য অসুস্থ শরীর লইয়াও এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় নামিয়া আসেন। সরকার মহাশয়ের ভবনে তিনি যে প্রীতি, যে দরদের সঙ্গে প্রত্যেক গবেষকের লেখাপড়া ও অন্যান্য বিষয়ের খোঁজ-খবর লইতেছিলেন, আজও তা মনে করিলে আনন্দ হয়। তাঁর সহিত গবেষকদের এই প্রীতির সম্বন্ধ বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। পরিষদের সদস্যেরা তাঁকে কত বার কত রকমে উত্যক্ত করিয়াছে, বহু বিষয়ের জন্য চিঠিপত্র লিখিয়াছে, তিনি প্রতি বারে সেই সব চিঠির উত্তর সযত্নে দিয়াছেন, প্রত্যেক চিঠিতে তাঁর হৃদয়ের প্রীতি প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি পরিষদের প্রত্যেকের সঙ্গে সমবয়স্কের মত ব্যবহার করিতেন, জবরদস্ত সভাপতিগিরি চালাইতেন না, বাঙ্গালা দেশের ভবিষ্যৎ গবেষণা-অনুসন্ধানের বিষয় উজ্জ্বল চোখে উৎসাহের সহিত আলোচনা করিতেন এবং গবেষকদের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। অসুস্থ থাকার দরুণ তিনি আমাদের মধ্যে বেশী বার আসিতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি তিনি অতি সহজে সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তাঁর এই অকালমৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎও নিজের ক্ষতির পরিমাণ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন। "আর্থিক উন্নতি"র পাঠক পাঠিকারা জানেন যে তাঁরই উৎসাহে ও প্ররোচনায় পরিষৎ "বাণিজ্যিক ভূগোল" সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁর যে শেষ চিঠি পাইয়াছি তাতেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি যা কিছু নোট সারাজীবন ভরিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন তার সমস্তই পরিষদ্‌কে ব্যবহারের জন্য দান করিয়াছেন। এ ছাড়াও নানা প্রকার গবেষণার ফন্দী তিনি আমাদের বাৎলাইয়া দিয়াছেন।

তাঁর অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, গবেষকদের প্রত্যেকে গিয়া অন্ততঃ কিছুকাল "পাণিনি অফিসে" কাটাইয়া আসেন। কোন কোন গবেষক স্থির করিয়াছিলেন, এই পূজাব ছুটিটা তাঁর ওখানে কাটাইবেন। কিন্তু হায়! তার আগেই তিনি চলিয়া গেলেন। এই সাহচর্য্যে গবেষকেরা যে বিশেষ উপকৃত হইতেন, তা বলা বাহুল্য মাত্র।

গত ১০ নবেম্বর তারিখে পরিষৎ শোকসন্তপ্ত চিত্তে তাঁর মৃত্যুতে আপনাদের বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন ও তাঁর পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে সান্ত্বনা জ্ঞাপন করেন। আমরা ভবিষ্যতে তাঁর জীবন-কথা কিছু কিছু প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। আপাততঃ এই মৃত মহাত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া নিরস্ত হইতেছি। তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক।

পরিষদের নূতন সভাপতি

ডক্টর স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি অত্যন্ত অসুস্থ, তথাপি পরিষদের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি-বশতঃ এই ভার গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছেন। জন্মাবধি পরিষৎ তাঁর কাছে নানা ভাবে ঋণী রহিয়াছেন। তিনি যে এক্ষণে ইহাকে আপনার স্নেহচ্ছায়ায় রক্ষা করিবেন ইহা সমুচিত হইয়াছে। এই জ্ঞান পরিষদের সদস্যদিগকে নব বলে বলীয়ান্ করিবে। পরিষৎ আচার্য্য শীল মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সুখী। আমরা ঐকান্তিক প্রার্থনা করি তিনি শীঘ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠুন।

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল বি,এ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ—১৩৩৭ ৫ম বর্ষ—৮ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

বাংলার কথা—তথ্যসঙ্কলন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
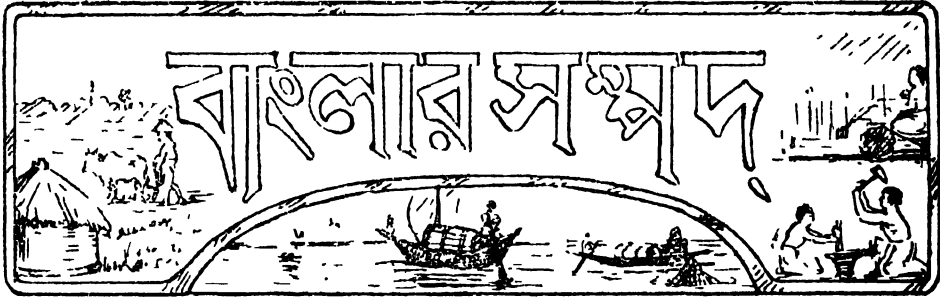
(১০) যশোহর

যশোহর জেলার বিস্তৃতি ১৮,৬১,৭৬০ একর। সহরের সংখ্যা ৩ এবং গ্রামের সংখ্যা ৩,৬১০। মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনে) ১০,২৮,৫০০ একর অর্থাৎ মাথা পিছু ½ একর। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬২'৩৭ ইঞ্চি।

গাই গরু ও স্ত্রী মহিষের সংখ্যা ৩,২২,৩৫২। ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ৪,৪৪, ২৭৫। লাঙ্গলের সংখ্যা ১,৭৭,০২৮।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৪৪,৪১,৭৪৫ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৭০,০৫,২৩২ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	...	১৪,৩৯,২৪৯
১৮৮১	...	১৯,২২,৯১৬
১৮৯১	...	১৮,৮৮,৮২৭
১৯০১	...	১৮,১৩,১৫৫
১৯১১	...	১৭,৪৩,৩১১
১৯২১	...	১৭,২২,২১৯

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৬,৫৬,৩৪৩ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ১০,৬৫,৫৫৫। প্রতি বর্গ মাইলে জন-সংখ্যা ৫৯৪।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সনে)

মোট হিন্দুর	...	১২'৪
" মুসলমানের	...	৪'৬

মোট হিন্দু পুরুষের	...	২১'৭
„ মুসলমান „	...	৮'১
„ হিন্দু মেয়ের	...	২'৬
„ মুসলমান „	...	'৫

শিক্ষা

১৯২৫ সনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা১৭২৬। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৬২,২৫৯। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসরবয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ৪,৩২,০৭০। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসরবয়স্ক) ১৯২৫ সনে ৬৫,৬৪৬। বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৩,৬৬,৪২৪।

স্বাস্থ্য

হাজার করা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩২'১। হাজার করা মৃত্যুর হার ঐ সনে হিন্দুর মধ্যে ২৫'৫ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৬'৬।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—৪৪,৬১৬
	১৯২২—৩৫,০০২
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫—৫,০১২
	১৯২২—৩,৮৬১
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫—৫৭২
	১৯২২—৮২

শিশু-মৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু	...	১৮৮'৯
স্ত্রী „	...	১৮৯'৪

ডাক্তারখানার সংখ্যা ২০

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	...	১,৬২৮
কুষ্ঠ রোগী	...	২২৬
অন্ধ	...	১,২৮৭
হিন্দু বিধবা	...	৯৬,২৭৬
মুসলমান „	...	১,০৩,৮৮৬

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমি রাজস্ব	...	৮,৭৪,১৭৩৲
ষ্ট্যাম্প	...	৭,০৮,৮৫২৲
আয়কর	...	৫৩,২০০৲
আব্গারী	...	১,৩৮,০১০৲
আফিং	...	৫৩,৮২১৲
অন্যান্য	...	৮১২৲
পথকর ও পাব্লিক্ সেস্	...	২,০৬,৫৯৩৲
মোট		২০,৩৫,৪৬১৲

(১১) ২৪-পরগণা

২৪ পরগণা জেলার বিস্তৃতি ৩১,০০,১৬০ একর।

সহরের সংখ্যা ২৮ এবং গ্রামের সংখ্যা ৩,৩৯৯।

মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনে) ৮,০৭,৮০০ একর।

মাথা পিছু কর্ষিত জমি ⅗ একর।

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬৩'৬৯ ইঞ্চি।

গাই গরু ও স্ত্রী-মহিষের সংখ্যা ২,৯৮,৫২৪।

ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ৩,৯২,৪৬৫।

লাঙ্গলের সংখ্যা ১,৭০,৬৭৮।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৭৬,৫৫,৩৮৪ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৭৭,৪৮,৭৪৫ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	...	২২,১৪,৪৫৭
১৮৮১	...	২৩,০৩,০৭৮
১৮৯১	...	১৮,৯১,২৮৩
১৯০১	...	২০,৭৮,৩৫৯
১৯১১	...	২৪,৩৪,১০৪
১৯২১	...	২৬,২৮,২০৫

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ২৩,৩০,৬৪৬ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ১১,১৮,৮৫২। প্রতি বর্গ মাইলে জন-সংখ্যা ৫৪১।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সনে)

মোট হিন্দুর	...	১৫'৩
,, মুসলমানের	...	৯'২
,, হিন্দু পুরুষের	...	২৫'৮
,, মুসলমান ,,	...	১৬'৬
,, হিন্দু মেয়ের	...	২'৮
,, মুসলমান ,,	...	'৫

শিক্ষা

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা (১৯২৫ সনে) ২,৮৬৩।

মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ১,০৯,৪৮৪।

বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ৬,৫৬,৮৮৭।

বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) (১৯২৫ সনে ১,৭৮,৭৩০।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৪,৭৮,১৫৭।

স্বাস্থ্য

হাজার করা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ২১'৮, হাজার করা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২৩'৯ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৯'৫।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—৪,০৫৭ ১৯২২—৩৬,৭৩৩
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫—৯,২৩১ ১৯২২—৬,৫২৪
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫—৯,৬৭৭ ১৯২২—৭২৪

শিশু-মৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু—২৪৬'৫

স্ত্রী „ —২২৩'৭

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা ... ৪৭

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা—১,৫৮৯

কুষ্ঠরোগী—৫১৩

অন্ধ—২,০৯০

হিন্দু বিধবা—২,২৯,১১৪

মুসলমান বিধবা—৮১,৫৮৫

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমিরাজস্ব	...	১৮,৪৮,২৩৪৲
ষ্ট্যাম্প	...	১৪,৩১,৯৮৮৲
আয়কর	...	১,০০,৬৮৫৲
আবগারী	...	১৫,৩৪,২৫৩৲
আফিং	...	৪,৪৯,৫১০৲
অন্যান্য	...	৮০,৩৯৫৲
পথকর পাব্‌লিক্ সেস্	...	৪,৫৬,২২৩৲
মোট		৫৯,০১,২৮৮৲

(১২) বাখরগঞ্জ

বাখরগঞ্জ জেলার বিস্তৃতি ২৯,৫২,৯৬০ একর।

সহরের সংখ্যা ৬ এবং গ্রামের সংখ্যা ২,৯৩৪।

মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনে) ১৬,৭৩,৩০০ একর।

মাথাপিছু কর্ষিত জমি ৪/৫ একর।

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৯১'৩ ইঞ্চি।

গাইগরু ও স্ত্রীমহিষের সংখ্যা ৪,০৬,০৬৮।

ষাঁড়, বলদ, পুং মহিষের সংখ্যা ৪,১৮,২২৬।

লাঙ্গলের সংখ্যা ২,৪৪,৯৩৯।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউল ১,৯৬,৮৬,৭৩০ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউল ১৯,৩৯,৯১২ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	...	১৮,৮৪,৬৯৭
১৮৮১	...	১৮,৯৭,৮৪৭
১৮৯১	...	২১,৫৩,৯৬৫
১৯০১	...	২২,৯১,৭৫২
১৯১১	...	২৪,২৪,৭৮২
১৯২১	...	২৬,২৩,৭৫৬

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৭,৫৪,৪৬০ ও মুসলমানের সংখ্যা ১৮,৫১,২৩৯। প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা ৭৫২।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১)

মোট হিন্দুর	...	২১·৮
„ মুসলমানের	...	৭·২
„ হিন্দু পুরুষের	...	৩৬·৮
„ মুসলমান „	...	১৩·৫
„ হিন্দু মেয়ের	...	৬·১
„ মুসলমান „	...	·৫

শিক্ষা

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা (১৯২৫ সনে) ৪,৭৯৪। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ১,৪৩,৭৫৬। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালক-বালিকার সংখ্যা ৭,২২,০৪৩।

বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক, ১৯২৫ সনে) ১,৫৮,৩৪৪।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৫,৬৩,৬৯৯।

স্বাস্থ্য

হাজারকরা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩১·৮। হাজারকরা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২১·১ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৭·৮।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—৩৪,৩৬৭ ১৯২২—৩৯,৯০৩
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫—৮,৫২৪ ১৯২২—৩,৩৭৩
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫—৫১৭ ১৯২২—৩০

শিশু-মৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু—২৩৪·০

স্ত্রী শিশু—১৫৯·৬

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা—৩৪

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	...	১,৫৯৯
কুষ্ঠরোগী	...	১৬৩
অন্ধ	...	১,৩১৩
হিন্দু বিধবা	...	৯০,৭৯৩
মুসলমান „	...	১,১২,২৭৩

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমিরাজস্ব	২২,৭০,৬২২৲
ষ্ট্যাম্প	১৩,৬৫,৯৮২৲
আয়কর	১,৪৯,৪৪৪৲
আবগারী	১,৫৭,৬৮৭৲
আফিং	১,০৮,৪৪৫৲

অন্যান্য	১,৩২,০৩৩৲
পথকর ও পাবলিক সেস্	৪,২১,০৫৬৲
মোট	৪৬,০৬,৮৬৯৲

শ্রীসুকুমার মিত্র

কলিকাতার বাজার-দরের সূচী সংখ্যা

ভারতের আমদানি রপ্তানির বাজার টলমল করিতেছে। আজ সমগ্র পৃথিবীর বাজার মন্দা; ভারতবর্ষের আন্দোলন ইহার জন্য কতখানি দায়ী তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। ভারতের মত একটা খরিদ্দার বিগড়াইলে যে অনেক দোকানীই অসুবিধাগ্রস্ত হইবেন তাহা বুঝা যাইতেছে। জিনিষপত্রের পাইকারী দাম কমিয়াছে। কলিকাতায় ১৯১৪ সনের যুদ্ধের পূর্ব্বের বাজার দর ১০০ ধরিয়া লইলে বর্ত্তমানে তাহা নিম্নরূপ দাঁড়ায়:—

	সেপ্ঃ ১৯২৯	জানু, ৩০	এপ্রি, ৩০	মে,৩০
তরকারী	১২৮	১১১	১০৩	১০৪
ডাল	১৫৫	১৪৪	১২৯	১২০
চিনি	১৬৪	১৪৩	১৫৫	১৫৬
চা	১২৯	১২৮	১১৯	১১৭
তৈল বীজ	১৭৫	১৬০	১৩৮	১৩৮
পাট	৯০	৮৪	৮৪	৭৫
পাটের জিনিষ	১২২	৯৭	৯৭	১০০
তুলা	১৪৬	১১২	১০৫	১০৫
বস্ত্র	১৬১	১৫০	১৫০	১৪৭
চামড়া	১০৯	১০৬	৯৮	৯৫
অন্যান্য সামগ্রী	১৪৩	১৩১	১২৩	১২১

বাংলার দুধ

বাংলাদেশে দুগ্ধের অভাবে শিশু ও প্রসূতিরা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে এবং অধিক বয়স্কেরা নির্জীব হইয়া পড়িতেছে। দুগ্ধের স্থান অধিকার করিয়াছে বিদেশ হইতে আগত ঘন, বোতলপূর্ণ, অসার ও বাসি মণ্টমিশ্রিত দুগ্ধ। ১৯২৯ সনে ২,৮০,০০০ টাকার কনডেনসড মিল্ক এই দেশে আসিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতায় প্রতিদিন গড়ে তিন হাজার মণ দুগ্ধের আমদানি হয়। ৮০০ মণ শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে এবং ২৫০ মণ হাওড়া হইয়া আইসে। কলিকাতায় ১৫,০০০ দুগ্ধবতী গাভী আছে। সহরে ৩০০০ মণ গো ও মহিষ দুগ্ধ সহরতলী হইতে পাওয়া যায়। কলিকাতার লোক-সংখ্যার অনুপাতে এই ৩০০০ মণ দুগ্ধ কিছুই নহে। ইহাতে জন প্রতি ১ ছটাকের বেশী দুগ্ধ খাওয়ার সুবিধা হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ততঃ অর্দ্ধ সের করিয়া দুগ্ধ পান করিলেও ৫০০,০০০ মণ দুগ্ধ আবশ্যক হয়। ব্যাপক-ভাবে বাঙ্গালা দেশের কথা আলোচনা করিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে পশুতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত গশিপ বলিয়াছেন যে, এই দেশে প্রতি গরু তিন ছটাক মাত্র দুধ দেয় এবং প্রতি বঙ্গবাসী দৈনিক ১ ছটাক দুধও খায় না। কথায় বলে—দুধে ঘিয়ে বাঙ্গালীর শরীর। দুধ ও ঘৃত এখন বাঙ্গালী চোখেও দেখে না। সর্ব্বত্রই এক দর, টাকায় ৩৷৪ সের—সে দুগ্ধেরও অধিকাংশই জলমিশ্রিত, বাসি এবং রোগজীবাণু-পূর্ণ। এ জাতির যে প্রতিবৎসর ৩ লক্ষ লোক যক্ষ্মার কবলে পড়ে ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? দেশের ছাত্রদের খাদ্য-তালিকায় মেসে ও বোর্ডিং-এ কোথায়ও দুধের উল্লেখ নাই, কারণ দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য। শিশু ও প্রসূতিরাও দুগ্ধাভাবে মৃতপ্রায়।

বাঙ্গালাদেশের কয়েকটী জেলায় যথা পাবনা, রাজসাহী ও ঢাকার কয়েকটী স্থানে প্রচুর দুগ্ধ—অনেক সময় টাকায় ১৬৷২০ সের পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে দুগ্ধ-সংরক্ষণ চেষ্টা করিতে হইবে।

(ভাণ্ডার)

চিনি ও গুড়

পৃথিবীতে যে পরিমাণ চিনির প্রয়োজন তদপেক্ষা প্রায় ১০ দশ লক্ষ টন অধিক চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। অনুমান ২'৭৫ কোটি টন চিনি উৎপন্ন হইবে। ইহার মধ্যে ১৯২৮ সনে কলিকাতা ৩,৬৭,৬৭৪ টন চিনি আমদানি করে; মূল্য ৫,৫৯,৫২,১২৮৲ টাকা। তৎপূর্ব্ব বৎসরে মাল ছিল কম (৩,৪৮,৫৮৫), কিন্তু মূল্য ছিল বেশী ৬,০০,৩৩,৯৫০৲

টাকা। ইয়োরোপ হইতে বীট চিনির আমদানি কমিয়া আসিয়াছে। অনেক চেষ্টায় মাত্র ৬,৩৩৯ টন আসিয়াছিল; কিন্তু ইহার চাহিদা নাই। বিদেশী আমদানি গুড়ের পরিমাণ ৫৯,৪৭৪ টন।

৫১/২ কোটি টাকায় ৩১/২ লক্ষ টন চিনি আমদানি

১৯২৯-৩০ সনের বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য বিবরণীতে প্রকাশ:—

গত বৎসরের প্রথম ভাগে লীগ্ অব নেশানস্ কর্ত্তৃক যে আন্তর্জ্জাতিক সভা আহূত হইয়াছিল তাহার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল দুনিয়াব্যাপী চিনির ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অসুবিধা দূরীকরণ। কিন্তু সে অধিবেশন দুনিয়ার চিনির উৎপাদন সীমাবদ্ধতা অথবা মূল্য স্থিরকরণ বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন নাই। গত বৎসরে যতদূর সম্ভব চিনির দর পড়ার পরেও আলোচ্য বৎসরে হন্দর পিছু আরও প্রায় এক টাকা করিয়া দাম কলিকাতার বাজারে পড়িয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

বাঙ্গালা হইতে সওয়া ২ কোটি টাকার চাউল রপ্তানি

১৯৩০ সনের মার্চ্চ মাসে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে বাংলাদেশ হইতে ১,২০,০২১ টন (মূল্য ২,৩৯ লক্ষ টাকা) চাউল রপ্তানি হয়। সিংহল, বাল্পিন দ্বীপেই চালান বেশী হয়। চালের রপ্তানি বাড়িয়াছে, তাহার কারণ বাংলার সিদ্ধ চাউলের দাম ব্রহ্মদেশ ও আসামের চেয়ে কম। সরকারী অনুমান যে এ বৎসরে ৩০,০৮,৪৯,০০০ টন চাউল অর্থাৎ গত পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে শতকরা ৪% কমিবে। ১৯২৮ সনে চাউলের দর ছিল ২১২৸০ টন। গত বৎসরে হয় কিঞ্চিদধিক ১৯৯ টন।

বর্ত্তমানে চাউলের ও ধানের দর খুব কমিয়াছে। বর্দ্ধমান বীরভূম জেলায় ২৷৵০, ২৷০ টাকার বেশী দর উঠিতেছে না। অথচ বর্ষাকালে ৪৲ টাকার উপরেও উঠিয়াছিল।

দেড় কোটি গাঁইট পাট

	একর ১৯২৯	একর ১৯৩০	গাঁইট ১৯২৯	গাঁইট ১৯২৩
বঙ্গদেশ	৩,০,২০,৩৬৫	৩০,৬২,৩০০	৯২,৬৪,২০০	৯১,৯৬.০০০
বিহার উড়িষ্যা	২,৩৮,০০০	২,৩৮,০০০	৭৫৯,৪০০	৬৭০,০০০
আসাম	১,৫৬,৬০০	১,৮৫,৩০০	৩৫১,৬০০	৫৯৫,০০০
মোট	৩৪,১৪,৯৬৫	৩৪,৮৫,৬০০	১০,৩,৮৫,২০০	১,১২,৩১,০০

বাংলা, বিহার-উড়িষ্যা ও আসামে গত বৎসরের চেয়ে এ বৎসরে ৮,৪৫,৮০০ বেল বা গাঁইট অধিক পাট প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বলে এখনো ৩৭ লক্ষ গাঁইট পাট মজুত রহিয়াছে; আগামী বৎসরে পৃথিবীর মোট চাহিদা ৯০ লক্ষ গাঁইটের অধিক হইবে বলিয়া ভরসা হয় না। অথচ এ বৎসরের ও গত বৎসরের পাট মিলাইয়া মোট পাটের গাঁইট ১৫২ লক্ষ অর্থাৎ ৬০ লক্ষ গাঁইট পাট আগামী বৎসরের জন্ত উদ্‌বৃত্ত থাকিবে। বাংলার আর্থিক অবস্থা সঙ্কটময়। পাট বিক্রয়ে চাষীর টাকা হইলে তবে জমিদারের খাজনা মহাজনের টাকা, সমবায় ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ, সৌখীন জিনিষ বিক্রয়। একটি চাষের দুরবস্থায় বাংলার নানা কোঠায় আঘাত লাগিবে।

পাটের দরের উত্থান-পতন

পাটের দর কম থাকা সত্ত্বেও গত বৎসর (১৯২৯-৩০) পাঁচ লাখ বেল বা গাঁইট কম পাট রপ্তানি হইয়াছিল।

স্পেন, ব্রাজিল ও জাপান ছাড়া সকল খরিদ্দারই কম মাল লইয়াছিল। জার্ম্মাণি ছিল পাটের বড় খরিদ্দার, সে লইয়াছিল ২½ লাখ গাঁইট কম, বিলাত লইয়াছিল ২ লাখ গাঁইট কম। গত বৎসর বৈশাখ মাসে পাটের স্থানীয় দর ছিল ৫ মণী গাঁইটের ৬৯৲ টাকা; আষাঢ় মাসে হয় ৬২৲; আশ্বিনের মাঝামাঝি সময়ে ৫৯৲ টাকা দাঁড়ায় এবং কমিতে কমিতে গত ফাল্গুনে হয় ৪৫৲। বর্ত্তমানে পাটের দাম ৩৲ টাকা মণ অর্থাৎ ১৫৲ গাঁইট!

১৯২৯-৩০এ গড়পড়তায় রপ্তানি পাটের দাম ছিল ৫৯৸/১০, তার পূর্ব্ব বৎসরে ৬৪৻৪ পাই। বিলাতে এই পাটের দর ২২ পাউণ্ড ৫ শিলিং (৩০০৲ টাকা) হইতে ৩২ পাউণ্ড ১০ শিলিং (৪৫৫ টাকা) গাঁইট ছিল।

পাটে প্রস্তুত দ্রব্যের ব্যবসায়ে ক্ষতি

গত পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে প্রায় ২½ কোটি অধিক গানি থলে রপ্তানি হয়; কিন্তু এত বৃদ্ধি সত্ত্বেও দাম তিন কোটি টাকার উপর কম পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়া জাভা থলের বড় খরিদ্দার ছিল; অষ্ট্রেলিয়া ১·৭ কোটি ও জাভা ·৫ কোটি থলে কম লইয়াছিল। অপর দিকে হংকঙ ১·৬ কোটি, বিলাত ·৮ কোটি, জাপান ·৭ কোটি, বেলজিয়াম ·৫ কোটি থলে বেশী আমদানি করিয়াছিল। গানি চট ৮·৩ কোটি গজ অধিক রপ্তানি হয়। কিন্তু দর কম বলিয়া ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা কম পাইয়াছিল। হেসিয়ান চট রপ্তানি হয় ৯·৬ কোটি গজ; গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে এত হেসিয়ান রপ্তানি হয় নাই। অথচ দাম কম হইয়াছিল প্রায় ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা।

পাটের সংবাদ

বিগত জুলাই মাসে নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে যত মণ পাট রপ্তানি হইয়াছে তার হিসাব:—

	জুলাই	
	১৯৩০	১৯২৯
নারায়ণগঞ্জ	২৬০৪৬৮	৩৩৯৯৪৪
ধলেশ্বরী সার্ভিস	১২৩৪১	১৫৪১১
ভৈরব	২২৬০১	১৮৯২
চাঁদপুর	১১৫৪৯৪	১০৮৭৬৪
খুলনা	৬৭৪৮	১০৬০৮
মাদারীপুর	২১৬১৩০	১৭০১১৫
সিরাজগঞ্জ	২৪৯৯১	৪৬৭২৬
জগন্নাথগঞ্জ	১১৪৬৫৬	১১০৫৫৯
পদ্মা ষ্টীমার ষ্টেসন	৩২২৫৭	৩৭২৫২
আসাম ষ্টেসন	৩৬৭৯২	৪২০৬৯
ভায়া ফুলছরি	৭৭৩৬৫	৪২৩৫৮
ভায়া শান্তাহার	১৪৩৫৭০	১৬২২৪৩
ভায়া পার্ব্বতীপুর	১৫৬৭৯৪	১৩৮৯৩৪
ভায়া শান্তাহার-পার্ব্বতীপুর সেক্সন	৬৮৬৪২	৭৬৬১৮

পাটের দর

পাটের দর ক্রমশই নামিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে ২৲ টাকা হইতে ৪৲ মণ দরে স্থানীয় বাজারে পাট বিক্রীত হইতেছে। মাড়োয়ারী বণিক্‌গণই আজকাল বেশী পাট খরিদ করিতেছেন। ইয়োরোপীয় ব্যবসায়িগণ আবশ্যক মত খরিদ করেন। এই ২।৩৲ টাকা মণ দরে পাট বেচিবার জন্যও বেপারিগণকে আফিসে আফিসে ঘুরিয়া হয়রাণ হইতে হয়। কেহই আগ্রহ করিয়া পাট কিনিতে চায় না। মফঃস্বলের অবস্থা আরও শোচনীয়। মফঃস্বলে অধিকাংশ খরিদ্দারই বসিয়া আছে। পাট বেচিতে না পারাতে গৃহস্থের ঘরে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। দর এখন ক্রমেই নামিতেছে। এতদ্দেশে পাট উৎপন্ন করিতে মণ প্রতি কমপক্ষে ৬৲।৭৲ খরচ পড়ে। এখনে ২৲।৩৲ টাকা দরে পাট বিক্রয় করিয়া লোকেয় যে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

দেশের অবস্থা

পাটের দর না থাকাতে এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে দেশের অবস্থা অত্যন্ত

শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে দুর্ভিক্ষ বলা যায় না, কারণ দ্রব্য প্রচুরই পাওয়া যায়। কিন্তু লোকের হাতে পয়সা না থাকাতে কেহ উহা কিনিতে পারে না। এদেশে একেইত বেকার-সংখ্যা অনেক, তাহাতে বর্ত্তমানে জন কয়েক চাকুরীয়া ব্যতীত আর সকলেই বেকার বসিয়া আছে। উকীল মোক্তার ডাক্তার কবিরাজ ব্যবসায়ী এই সকল স্বাধীন ব্যবসায়ীর অনেকেই এখন বেকার। ব্যবসায়ের ঢং বজায় আছে বটে কিন্তু আয় সকলেরই কমিয়া গিয়াছে। এখনও ২৲ মণ দরে কিছু কিছু পাট বিক্রীত হইতেছে। গৃহস্থেরা উহা বেচিয়া যাহা সামান্য অর্থ পায় তাহা খরচ করিতেছে। কিন্তু যে দিন পাট বিক্রয় শেষ হইবে তখন আর হাতে পয়সা আসিবে না। তখন যে কি অবস্থা হইবে তাহাই চিন্তনীয়।

(পল্লীমঙ্গল—নারায়ণগঞ্জ)

পাটের বাজার

গবর্ণমেন্টের কৃষি-বিভাগের প্রকাশিত বিবরণে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে ৯৯ লক্ষ ৬৬ হাজার গাঁইট, বিহারে ৬ লক্ষ ৭০ হাজার গাঁইট এবং আসামে ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে। স্থূল বিচারে দেখিতে গেলে বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বঙ্গদেশে উৎপন্ন পাটের তুলনায় অতি কম। মোটামুটি হিসাবে পাটের একটী গাঁইটে ৪ শত পাউণ্ড বা প্রায় পাঁচ মণ পাট থাকে। এই হিসারে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশ বিহার ও আসামে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ মোট ৫ কোটি ৬১ লক্ষ ৫৫ হাজার মণ। বঙ্গদেশের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাট জন্মে। এবার এই জেলায় ১ কোটি ২৫হাজার মণ পাট জন্মিয়াছে। ইহার পরেই ঢাকা, তথায় এবার ৬৬ লক্ষ ১৫ হাজার মণ পাট জন্মিয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রতি মণ পাট উৎপাদন করিতে ছয় টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে পাটের মূল্য সাধারণতঃ প্রতি মণে তিন টাকার অধিক হইবে না, সুতরাং প্রতি মণে তিন টাকা হারে লোকসান হিসাব করিলে ৫ কোটি ৬১ লক্ষ ৫৫ হাজার মণে মোট ১৬ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা অথবা মোত্তফরকা হিসাবে প্রায় ১৭ কোটি টাকা লোকসান হইবে।

পাটের কলের শ্বেতাঙ্গ স্বত্বাধিকারিগণ প্রধানতঃ পাট ক্রয় করিয়া থাকেন। কৃষকেরা যাহাতে অধিকতর পাট উৎপন্ন করে তাহার জন্য ইঁহারা প্রচার কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইলেই ইঁহারা সস্তা দরে পাট ক্রয় করিয়া অধিক লাভ করিয়া থাকেন। বহুদিন হইতে এই প্রকারে ইঁহারা প্রতি বৎসর পাটকল হইতে বহু অর্থ লাভ করিয়া আসিতেছেন। কোন কোন পাটকলে শতকরা দুইশত হইতে আড়াইশত টাকা পর্য্যন্ত লভ্যাংশও প্রদত্ত হইয়াছে। পাটচাষীর নিকট হইতে এই প্রকারে অল্প মূল্যে পাট ক্রয় করিয়া ইঁহারা এই লভ্যের পরিমাণ বাড়াইতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না। পাটকলসমূহের অংশীদিগের মধ্যে একমাত্র স্যার ডানিয়েল হ্যামিল্টন বলিয়াছিলেন যে, যখন আমি শতকরা দুই শত টাকা লভ্য পকেটে করিয়া লইয়া যাই, তখন সত্য সত্যই বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধনগ্ন ও অর্দ্ধভুক্ত কৃষকের কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মাথা নীচু হইয়া আসে।

পাটের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে কৃষকগণের পরিণামে যে এই প্রকার দুরবস্থা হইবে ইহা অনুমান করিয়াই বহুদিন হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কৃষকগণকে পাট চাষ কমাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন।

ভারতীয় পাটকল সমিতির জনৈক সদস্য পরামর্শ দিতেছেন যে, পাটের চাষ কমাইয়া দেওয়াই এইরূপ বিপদের প্রতিকারের একমাত্র উপায়। পাটের চাষ ত ভবিষ্যতে কৃষক কমাইবে; কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে তাহার যে সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা হইতে কি প্রকারে সে ত্রাণ পাইবে? পাটকল সমিতি বা পাটকলের সকল সাহেবই তদ্বিষয়ে নীরব।

ইঁহারা ত বহুদিন ধরিয়া পাটের কলের বহু লভ্য ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইঁহারা পাটচাষী কৃষকের জন্য এ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করেন নাই। বর্ত্তমান

বৎসরের উৎপন্ন পাট অন্ততঃ উৎপাদন-মূল্যে ক্রয় করিয়া ইঁহারা কোনও সমবায় ভাণ্ডারে অন্ততঃ একটি বৎসরের জন্য জমা রাখিবার বন্দোবস্ত করুন। পরে আগামী বৎসরে পাট চাষ হ্রাস করিবার জন্য যদি চেষ্টা করা যায় তবে এ বৎসরের মজুত পাটের মূল্য আগামী বৎসর নিশ্চয়ই বর্দ্ধিত হইবে। তখন এই মজুত পাট ছাড়িয়া দিলে আর লোকসানের সম্ভব থাকিবে না।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রবিবার আলবার্ট হলে পাটচাষী কৃষকের দুর্দ্দশার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য একটী সভার অধিবেশন হয়। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই সভার সভাপতি হন। এই সভা হইতে লাট সাহেবের নিকট একটি ডেপুটেশন পাঠান স্থির হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার আবদার রহিম, মিঃ এ, কে ফজলাল হক, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, মিঃ এ, সি চৌধুরী, লেঃ শ্রীযুক্ত বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়, শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিরলা, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান, মিঃ এম, পি, গান্ধী, মিঃ এইচ, পি, বাগারিয়া ও মিঃ আর, এন ঠাকুর এই ডেপুটেশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কোন সদস্যের পাট চাষ সম্বন্ধে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। পাটচাষী কৃষকগণের দুই চারি জনকে এই ডেপুটেশনের সদস্য করা উচিত ছিল।

যাহাতে গবর্ণমেণ্ট বিনা সুদে বা অল্প সুদে পাটচাষী কৃষকগণকে ঋণদান করেন, ডেপুটেশনের সেই বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

(হিতবাদী)

পাটের সূতা

বাজারে পাটের সূতায় প্রস্তুত শাড়ী, জ্যাকেট, ব্লাউস্ ইত্যাদি জামা কাপড় প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। এগুলি দেখিতে সিল্কের মত। প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই দুপয়সা লাভ করিতেছে, কিন্তু পাটচাষীদের লাভ দূরে থাক লোকসান বহিতে হইতেছে। সম্প্রতি ইন্‌ডাষ্ট্রীয়েল ও কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট হইতে চেষ্টা হইতেছে। কৃষকেরা যাহাতে নিজেরা পাট হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে কিংবা দশ বিশ জনে মিলিয়া বা নিজেরা সূতা দ্বারা সতরঞ্চ, আসন ইত্যাদি বুনিয়া উচ্চলাভে বিক্রয় করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে কৃষকদিগকে চরকা দেওয়া হইতেছে এবং প্রদর্শনী দ্বারা স্থানে স্থানে পাট হইতে কিভাবে সূতা প্রস্তুত হয় এবং সতরঞ্চ আসন ইত্যাদি কি ভাবে করিতে হয় এবং সূতা কিভাবে রং করিতে হয় তাহা দেখানো হইয়াছে। নওগাঁ মহকুমার বুড়ীদহে কেন্দ্র করিয়া সম্প্রতি কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

বাংলার লৌহের কদর

১৯২৯-৩০ সনে বাংলা বিহারের প্রধান তিনটী লোহার কারখানায় ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন পিগ আয়রণ বা মোটা লোহা প্রস্তুত হয়। তৎপূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে উৎপন্ন লোহা প্রায় ৩৩ হাজার টন কম হইয়াছে। গত বৎসরে বিদেশে প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫,৬৮,৭৩৩ টন লোহা রপ্তানি হইয়াছিল। গত বৎসরের বিশেষত্ব এই যে, গ্রেট বৃটেন ৫,৫২২ টন হইতে একেবারে ৭১,২৬৭ টন লোহা লইয়াছিল। মার্কিণ রাজ্য বাংলা দেশের ৮৬,০৫৯ টন লোহা লয়। জাপান প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টন গ্রহণ করে। জার্ম্মাণি ছুচ, আলপিন হইতে আরম্ভ করিয়া ইঞ্জিন মোটর প্রভৃতি হাজার রকমের লোহার জিনিষ নির্ম্মাণ করিয়া এদেশে পাঠাইতেছে। জার্ম্মাণি বাংলার লোহার মোটা খরিদ্দার।

বাংলা হইতে ম্যাঙ্গানিজ্ ওর রপ্তানি (১৯২৯-৩০)

বাংলা হইতে মোট ম্যাঙ্গানিজ ওরের চালান ৩৯৮,৪৭১ টন (মূল্য ১১৬ লক্ষ টাকা) হইতে বাড়িয়া ৪৪১,৫৬৭ টন (মূল্য ১২৮ লক্ষ টাকা) হইয়াছে। মোট রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক বিলাতে গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বিলাতের মোট চাহিদা ১১৫,৭০০ টন হইতে ১৫৬২৪৪ টন পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। তারপর বেশী মাল লইয়াছে বেলজিয়াম।

পূর্ব্ব বৎসরের ১১৩০১০ টনের স্থানে বেলজিয়াম আলোচ্য সনে লইয়াছে ১২৯২৪৪ টন। তারপর ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র কিছু কম পরিমাণে লইয়াছে। এরা এ ধাতুর বড় বড় খরিদ্দার বটে।

বাংলার যানবাহনে অসুবিধা

(১) গাড়ীতে পোকা

সান্তাহার-লালমণিরহাট সেকশনে গাড়ীতে এক রকম পোকা হাজারে হাজারে উড়িয়া বেড়ায় ও প্যাসেঞ্জারদের এত উত্যক্ত করে যে, তাহারা অত্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যেরূপ আলোর বন্দোবস্ত আছে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতেও ঐরূপ বন্দোবস্ত করার দরকার। অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতেও সুইচ্ টিপিয়া আলো নিভান যায় এমন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ইন্টার ও থার্ড ক্লাশের গাড়ীতে ফ্যানের ব্যবস্থা থাকিলেও ঐ সকল পোকা তাড়ান যাইতে পারে। ঐ সকল পোকার কামড়ে বহুসংখ্যক লোক অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে।

(ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ)

(২) পাবনা মোটর এসোসিয়েশন

পাবনার বিভিন্ন মোটর কোম্পানীগুলি গত চারি মাস হইল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া "পাবনা অটোমবাইল এসোসিয়েশন" নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কোম্পানীগুলির সমুদয় কার্য্য এখন একমাত্র এই এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পাবনা হইতে ঈশ্বরদী রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর ভাড়া যথাক্রমে ১৲ টাকা ও ৮০ আনা নির্দ্ধারিত হয়। ইতিমধ্যে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় ভাদ্র মাসের প্রথমে ঈশ্বরদীর রাস্তা খারাপ হইয়া উঠে। তখন উক্ত রাস্তা মোটর যাতায়াতের পক্ষে নিরাপদ নহে, ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার এইরূপ ঘোষণা করেন। মোটর এসোসিয়েশন এই কারণে ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া যথাক্রমে ১৲ ও ১।০ করেন। এখন রাস্তা মেরামত শেষ হইয়াছে এবং ডিঃ বোর্ড ইহা নিরাপদ ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু মোটর এসোসিয়েশন ভাড়া কমান নাই। সাধারণের পক্ষ হইতে এজন্য এসোসিয়েশনকে অনুরোধ করা হইয়াছে, কিন্তু রাস্তা খারাপের সুযোগ লইয়া তাঁহারা যে ভাড়া বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এখন ব্যয়-বৃদ্ধির কারণ দেখাইয়া সেই ভাড়া আর কমাইতে স্বীকার করেন না। লোকের এই দুরবস্থার সময় এসোসিয়েশন যদি এই ভাড়া চালাইতে থাকেন তবে সাধারণের পক্ষে ইহা শুধু দুর্ব্বহ হইবে না, অত্যাচারও হইবে। পাবনা হইতে ঈশ্বরদী যাতায়াতের অন্য উপায় নাই। মোটর কোম্পানীগুলি এখন সঙ্ঘবদ্ধ। এসোসিয়েশন যদি মনে করেন এই উভয় প্রকারের সুযোগ লইয়া তাঁহারা যা খুসী করিবেন তবে তাহা অত্যন্ত বিসদৃশ হইবে। এসোসিয়েশন একদিকে যেমন নিজেদের জন্য এক একটি করিয়া সুবিধা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছেন, অন্য দিকে সাধারণের সুবিধার জন্য যদি সেইরূপ যত্নবান হইতেন তবেই ঠিক হইত। কিন্তু তাঁহারা সেইরূপ করিতেছেন না। পূর্ব্বে বাড়ী হইতে যাত্রী উঠাইয়া লইবার জন্য তাঁহারা ভাড়ার অতিরিক্ত কিছু লইতেন না; কিন্তু এখন সে নিয়ম উঠাইয়া দিয়া ভাড়া বাদেও অতিরিক্ত চারি আনা লইতেছেন, ইহা সঙ্গত নহে।

(সুরাজ—পাবনা)

(৩) কাঁথি-বেলদা মোটর ট্র্যান্সপোর্ট

এখানে যাত্রিবাহী মোটরের সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে উহার সুবন্দোবস্ত ও সুশৃঙ্খলার অভাবে এক দিকে যাত্রিসাধারণের যেমন অসুবিধা ঘটিতেছিল, অন্যদিকে তেমনি কোম্পানীগুলিও কোনরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছিল না। এই উভয় অসুবিধা নিবারণের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি সকল মোটর কোম্পানী সম্মিলিত হইয়া "কাঁথি-বেলদা মোটর ট্রান্সপোর্ট" নামে এক সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার দ্বারা উহার সুপরিচালনে ব্রতী হইয়াছেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে এবং পরিচালনাধীনে এক পদ্ধতিতে সকল মোটর শৃঙ্খলার সহিত চলিবে এবং যাত্রি-সাধারণের সকল প্রকার অভাব অসুবিধার প্রতিকার করা হইবে। আমরা অবগত হইলাম এই প্রতিষ্ঠানের সহিত স্থানীয় সকল শ্রেণীর

লোক সংস্থষ্ট রহিয়াছেন। তাহাতে এবার এইটী স্থায়ী হইবার আশা করা যায়।

(নীহার—কাঁথি)

(৪) নেত্রকোণা মদন মোটর লঞ্চ

এই বেকার সমস্যার দিনে নেত্রকোণার কতিপয় উৎসাহী যুবক "সরযূ মোটর লঞ্চ সার্ভিস" নামে এক ক্ষুদ্র লঞ্চ সার্ভিস খুলিয়াছেন। ইহাদ্বারা জলপথে নেত্রকোণা হইতে মদন ও নেত্রকোণা হইতে গোগবাজার যাতায়াতের বেশ সুবিধা হইয়াছে। জনসাধারণ এই মোটর লঞ্চ সার্ভিসকে বেশ উৎসাহ প্রদান করিতেছেন এবং গয়নার নৌকাসমূহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(ময়মনসিংহ সমাচার)

নোয়াখালিতে যৌথ ব্যবসায় প্রচেষ্টা

(১) নোয়াখালি প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোম্পানী

নোয়াখালি প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোম্পানীর ২য় বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন গত ১৬ই সেপ্টেম্বর কোম্পানীর অফিস গৃহে হইয়া গিয়াছে। ১৯২৯ সনে এই কোম্পানীর যাবতীয় খরচ বাদে ৫৫৬৸৴১ পাই লাভ দাঁড়াইয়াছে।

(২) মিল প্রেস

নোয়াখালি মিল-প্রেসের অষ্টম সাধারণ বার্ষিক সভার অধিবেশন কোম্পানীর অফিস গৃহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৯২৯ সনে এই কোম্পানীর সর্ব্ববিভাগে ও চৌমুহনী শাখায় মিলিয়া মোট ৪,৯২০৸৴৩ লাভ দাঁড়াইয়াছে। এই বৎসরের জন্ম কোম্পানী ১৪৲ টাকা হারে মুনাফা দিয়াছে এবং ৩৬৮৶ আনা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা হইয়াছে।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঙ্ক

গত ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঙ্কের ২য় বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক ২য় বর্ষেই শতকরা ১০৲ টাকা মুনাফা দিয়াছে। আর্টিকেল অব্ এসোসিয়েশনের নিয়মানুযায়ী লাভের শতকরা ৫৲ টাকা হিন্দুদের উন্নতিকল্পে দেওয়া হইয়াছে।

(৪) জয়লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক

জয়লক্ষ্মী ব্যাঙ্কের ৩য় বার্ষিক সভার অধিবেশন গত ১৪ই সেপ্টেম্বর হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক অংশীদারগণকে ১৯২৯ সনের জন্ম শতকরা ১২৲ টাকা মুনাফা দিয়াছে।

(৫) বৈশ্য বারুজীবী ব্যাঙ্ক

বৈশ্য বারুজীবী ব্যাঙ্কের ২য় বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১৯২৯ সনে এই ব্যাঙ্ক অংশীদারগণকে শতকরা ৮৲ টাকা মুনাফা দিয়াছে। স্বজাতির উন্নতিকল্পে আর্টিকেল অব্ এসোসিয়েশনের নিয়মানুযায়ী শতকরা ১০৲ টাকা হারে ২৩০০ টাকা লাভের উপর এই কোম্পানী ২৩০ টাকা দান করিয়াছে।

(৬) নোয়াখালি লোন অফিস

নোয়াখালী লোন অফিস এই জিলার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ব্যাঙ্ক। এই কোম্পানী ১৯২৯ সনে অংশীদারগণকে শতকরা ৫০৲ টাকা মুনাফা দিয়াছে।

(দেশের বাণী—নোয়াখালি)

ময়মনসিংহের সড়ক

(১) মিউনিসিপ্যালিটীর যে রাস্তাটী নূতন বাজারের দক্ষিণ দিকস্থ গরুর খোঁয়াড়ের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত বিমলা সেন নায়েব নাজিরের বাসার ধার দিয়া শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন দে সরকার মহাশয়ের বাসার সম্মুখ দিয়া ডিঃ বোঃ রোডে মিলিয়াছে সেই রাস্তাটী সংস্কার করা দরকার। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে এই রাস্তার কয়েক জায়গায় খানকয়েক ইট পাতিয়া ও ৫০।৬০ হাত স্থানে খোয়া পুতিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। এই রাস্তাটী দিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর ময়লার গাড়ী সমস্ত চলাফেরা করিয়া থাকে এবং বহু লোকও চলাচল করিয়া থাকে। এই

রাস্তাটীর প্রতি এইরূপ ঔদাসীন্যের কারণ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রাস্তা সংস্কারের নমুনা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রাস্তার দুই ধারে ড্রেনের মাটী রাস্তার কিনারায় থাকায় রাস্তার মধ্যস্থানে জল আবদ্ধ হইয়া থাকে। এই মাটীগুলি সরাইয়া নিলেও অনেকটা কাজ হয়। আমরা এই রাস্তার মধ্যস্থিত গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীকে আরও কিছু খোয়া মঞ্জুর করিয়া রাস্তাটা মেরামত করার বন্দোবস্ত করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

(২) এই সহরে শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাসার নিকট হইতে রেল লাইনের ধার দিয়া পচাপুকুরের পারে যাওয়ার একটী রাস্তা আছে। এই রাস্তা দিয়া বহু লোক ও গাড়ী ঘোড়া যাতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু রাস্তাটী এরূপ কদর্য্য যে ইহাতে চলাচল করা অত্যন্ত কষ্টকর। এই রাস্তাটীর আশু সংস্কার আবশ্যক।

আঠারবাড়ী পল্লীশ্রী ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

(১) ডিরেক্টারগণের রিপোর্ট

পাটের জন্য দুরবস্থা

ভগবানের কৃপায় ব্যাঙ্কের ৪র্থ বর্ষ অতীত হইল। বিগত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ব্যাঙ্ক ৪র্থ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ১লা এপ্রিল হইতে ৫ম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

সূচনা

এই অঞ্চলে পাট প্রধান ফসল; বিশেষতঃ উহাই অর্থাগমের একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। আলোচ্য বৎসরে অসময়ে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের দরুণ এ অঞ্চলে পাট অতিশয় কম জন্মিয়াছে; তদুপরি যে পরিমাণ পাট জন্মিয়াছিল তাহারও উপযুক্ত মূল্য কৃষকগণ পায় নাই। পাট জন্মাইতে যে খরচ হইয়াছিল তদপেক্ষা কম দরে পাট বিক্রী করিয়া তাহারা ক্ষতি স্বীকারে বাধ্য হইয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের খাতকগণ (অধিকাংশই কৃষক শ্রেণীর) তাঁহাদের দেয় সুদ বা আসল প্রায় কোন টাকাই পরিশোধ করিতে পারেন নাই। অর্থাভাবে গৃহে গৃহে বিষম বিপদের আশঙ্কা পরিলক্ষিত হইয়াছে। কাজেই এ অবস্থায় যে সকল খাতক স্বেচ্ছায় ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধ করিতে না পারিয়াছেন, ব্যাঙ্কের প্রচারিত উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ কার্য্যকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদিগকে কোনপ্রকার পীড়াপীড়ি করা হয় নাই। কাজেই ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ অন্যান্য বৎসরের তুলনায় আশানুরূপ হইতে পারে নাই। আলোচ্য বৎসরের ন্যায় অর্থাভাব অশীতিপর বৃদ্ধগণও তাঁহাদের জীবনে দেখেন নাই এরূপ প্রকাশ। কাজেই আমানতকারিগণকে প্রচুর অর্থ ফেরৎ দিতে বাধ্য হইয়াও আমরা যে খাতকগণকে এই বিষম বিপদকালেও যথাসম্ভব সহায়তা এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছি তাহা আমাদের ব্যাঙ্কের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। খাতকগণ ব্যাঙ্কের অধমর্ণ হইলেও তাহারাই ব্যাঙ্ক পোষণের সমস্ত রস যোগাইয়া থাকেন। এই রসের উৎসকে সজীব রাখিতে আমরা সচেষ্ট ছিলাম। যাহাতে ভবিষ্যতের আশা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে তাহাও আমাদের লক্ষ্য ছিল। কাজেই দেশব্যাপী এই দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ লাভ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে আশা করি তাহা অবস্থাবিদ্ ব্যক্তিরা অপ্রচুর মনে করিবেন না।

মূলধন

আদায়ী মূলধন পূর্ব্ববৎ ৪১৩০০৲ টাকাই রহিয়াছে।

আমানত

আলোচ্য বৎসরের শেষ তারিখে মোট ১,৮৮,৩৭৩৮০ আনা আমানত ছিল। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩০৯২৫৶০ আনা আমানত হ্রাস পাইয়াছে। এই দুর্ব্বৎসরে আমানত যে এতদপেক্ষা আরও হ্রাস পায় নাই তাহাই সৌভাগ্যের বিষয়। অর্থাভাবের দরুণ আমানতকারিগণ সকল ব্যাঙ্ক হইতেই নিজ নিজ জরুরী প্রয়োজনে প্রচুর অর্থ ফেরৎ লইতে বাধ্য হইয়াছেন। আলোচ্য বৎসরে অর্থাভাবের প্রপীড়নেও আমানতকারিগণ এই ব্যাঙ্কের প্রতি যথেষ্ট

সৌজন্য, সহানুভূতি এবং সহযোগিতা প্রদর্শন করিয়া ব্যাঙ্কের স্থায়িত্বকে সুদৃঢ় করিয়াছেন। ব্যাঙ্ককে সহায়তা করার জন্য তাঁহাদের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

দাদন

আলোচ্য বর্ষের শেষ তারিখে ২১৪১৮০৲ টাকা দাদনে ছিল অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা ১৯৮৫৲ টাকা অধিক দাদন ছিল। খাতকগণের বিপদ্কালে আমরা যতদূর সম্ভব দাদন করিয়াছি। কিন্তু অর্থাভাবে আরও অধিক দাদন করিয়া তাঁহাদের কষ্ট লাঘব করিতে পারি নাই বলিয়া আমরা আন্তরিক দুঃখিত। দেশে যখন অর্থাভাব ঘটে তখনই জনসাধারণের দুঃখ লাঘবের জন্য ব্যাঙ্কের সুযোগ উপস্থিত হয়। নিয়মিত অল্প সুদে দাদন করিয়া জনসাধারণের কষ্ট উপশম তখন একমাত্র ব্যাঙ্ক বা লোন আফিস কর্তৃকই সম্ভব হয়। এতদঞ্চলের ব্যাঙ্ক বা লোন আফিসগুলি আলোচ্য বর্ষে উপরোক্ত ভাবে বহুলোকের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

সুদ

আলোচ্য বর্ষে মোট সুদ আদায় মাত্র মঃ ২০৭৮৭৸৶৫ পাই। পূর্ব্ব বৎসরে আরও কম পরিমাণ টাকা দাদনে থাকা সত্ত্বেও এই বাবদ আদায় হইয়াছিল মঃ ৩১২১৯৸৴৫ পাই।

লাভ ও ক্ষতি

সর্ব্বপ্রকার খরচ বাদে এ বৎসর মঃ ৩৬২৭৶/১১ পাই নিট লাভ দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ প্রাপ্য সুদ খাতকগণ এই দুর্ব্বৎসরে পরিশোধ করিতে না পারাতে এত কম লাভ হইয়াছে।

ডিভিডেণ্ড বা লভ্য বিভাগ

উপরোক্ত নিট্ লভ্য ৩৬২৭৶/১১ পাই এবং পূর্ব্ব বৎসরের নিট্ লভ্য হইতে লভ্য সমতাকারী তহবিলে নীত মঃ ৬৮২৷৶৮ পাই মধ্যে ৫০২৸৴১ পাই আনিয়া মোট ৪১৩০৲ টাকা আদায়ী মূলধন ৪১৩০০৲ টাকার উপর শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে অংশীদারগণকে লভ্য বিতরণ করা আমরা প্রস্তাব করি।

রিজার্ভ ফণ্ড

রিজার্ভ ফণ্ডে মঃ ১৩১০০৲ টাকা সঞ্চিত আছে।

বিল্ডিং ফণ্ড

বিল্ডিং ফণ্ডে মঃ ৪০০০৲ টাকা জমা আছে।

লভ্য সমতাকারী তহবিল

এই তহবিলের মোট ৬৮২৷৶৮ পাই হইতে আলোচ্য বর্ষে ডিভিডেণ্ড বা লভ্য বিতরণের জন্য ৫০২৸৴১ পাই খরচ করিলে এই তহবিলে ১৭৯৷৶৭ পাই মাত্র থাকিবে।

শাখা আফিস

বিষম দুঃসময় বিধায় নবস্থাপিত ঈশ্বরগঞ্জ শাখায় ইচ্ছা সত্ত্বেও কোন কার্য্যাদি করা সম্ভব হয় নাই।

ম্যানেজিং এজেণ্টগণ

এই দুর্ব্বৎসরেও ব্যাঙ্কের ক্রেডিট ও প্রেস্টীজ সম্পূর্ণরূপে বাহাল রাখিয়া লভ্য বিতরণের ব্যবস্থা করায় ম্যানেজিং-এজেণ্টগণের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহাদের সুচারুরূপে কার্য্য পরিচালনা প্রণালী ব্যাঙ্ককে ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছে।

ডিরেক্টার বোর্ড

আলোচ্য বর্ষে ডিরেক্টার সভার ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল।

(২) ম্যানেজিং এজেণ্টগণের মন্তব্য

ভগবানের কৃপায় ব্যাঙ্কের ৪র্থ বর্ষ বিদায় লইয়াছে। বড়ই বিপদাকীর্ণ বৎসর গিয়াছে। চতুর্দ্দিকের অর্থাভাবহেতু সাতিশয় সতর্কতার সহিত ব্যাঙ্কের কার্য্যাদি পরিচালনা

করিতে হইয়াছে। জেলার আর্থিক অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, ভারতের রাজনৈতিক আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন, তদুপরি প্রকৃতির অত্যাচারে শস্য দুরবস্থাপন্ন, এইরূপ সঙ্কটময় বৎসরের অবসান ঘটিল। এই একটী বৎসর অতিক্রম করিতে এক যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছে। খাতকগণ, আমানতকারিগণ, ডিরেক্টারগণ এবং ব্যাঙ্কের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মিলিত শুভেচ্ছায় এবং সহযোগিতায় সন্তর্পণে আলোচ্য বৎসর অতিবাহিত করা গিয়াছে।

দেশময় অর্থাভাব না ঘটিলে ব্যাঙ্কের আশানুরূপ লাভ না হওয়ার কারণ ছিল না। কেন না গত কয়েক বৎসরের ফলাফল দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আদায়ী সুদের তুলনায় অতি অল্প টাকাই সুদ বাবদ অনাদায়ী থাকে। সুদ আদায়ের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে ত্রুটি হয় নাই। আমরা ডিরেক্টার বোর্ডের অভিপ্রায়ানুযায়ী খাতকগণের প্রীতি এবং ব্যাঙ্কের লাভ এই উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছি।

ঢাকায় নূতন মোটর লঞ্চ

ওয়ান রুপি লিমিটেড্ কোম্পানীর "ভারতবর্ষ" লঞ্চ নদীবক্ষে যাত্রী নিয়া যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। এই লঞ্চখানাই উক্ত কোম্পানীর কার্য্যাবলীর প্রাথমিক নিদর্শন। এ উপলক্ষ্যে গত ৫ই নভেম্বর বুধবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় উক্ত লঞ্চখানা ঢাকা সহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়া নদীবক্ষে বিচরণ করিয়াছে। কোম্পানীর ডিরেক্টারগণের এই কর্ম্ম-সাফল্যে আনন্দিত হইয়াছি।

(পঞ্চায়েৎ)

গুলি সূতার কল

"ত্রিপুরা হিতৈষী"তে প্রকাশ, "ত্রিপুরা জেলার গল্লাই নিবাসী শ্রীবঙ্গচন্দ্র পাল মহাশয় ক্রমাগত ৮ বৎসরের চেষ্টায় একটি গুলিসূতা তৈরীর কল আবিষ্কার করিয়াছেন। এই গুলিসূতা বাজারে চলতি গুলিসূতার তুলনায় কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। সিঙ্গার কলেও এই সূতায় নাকি কাজ চলিতে পারে। পাল মহাশয়ের বয়স বর্ত্তমানে ৫৫ বৎসর। তাঁহার লেখাপড়া বিদ্যা বেশী নহে। সারাটা জীবন নিভৃত পল্লীতে এসব কলকব্জা তৈরী নিয়াই নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর নিজের বিষয় সম্পত্তি সব অবহেলায় দেনার দায়ে নষ্ট হইয়াছে। স্ত্রী-পুত্র ও গ্রামবাসী তাঁহাকে পাগল বলিয়া অবহেলা করিয়াছে; কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হন নাই। গুলিসূতার কল ছাড়া তাঁর তৈরী আরও অন্যান্য গৃহশিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি আছে; সেগুলি খুব নিপুণভাবে তৈরী। এই গুলিসূতার কলে প্রতিদিন ৬।৭ ঘণ্টার কাজে ৩০০।৪০০ গুলিসূতা উৎপাদন করা যায়।" দেশীয় শিল্পকার্য্যের উৎসাহদাতৃগণের উক্ত পাল মহাশয়কে সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

(বীরভূমবার্ত্তা)

গভর্ণমেণ্টের ঋণদান

পাটের দর কমিয়া যাওয়াতে বাঙ্গালাদেশের চাষীদের বড় ক্লেশ হইয়াছে। এই দুঃসময়ে গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগকে নিম্নলিখিতরূপ ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

মুর্শিদাবাদ জেলা	...	৩৫৪০০৲
ঢাকা জেলা	...	৪৭০০০৲
ময়মনসিংহ জেলা	...	৪৭০০০৲
মালদহ জেলা	...	২৭০০০৲
বাখরগঞ্জ জেলা	...	৫০০০০৲
রংপুর জেলা	...	২০০০০৲
বগুড়া জেলা	...	৩০০০০৲
রাজসাহী জেলা	...	৪০০০০৲
ত্রিপুরা জেলা	...	৪০০০০৲
		৩,৩৬,৪০০৲

ভারতীয় রাজস্বের এক টুকরা

ভারতীয় রাজস্ব এই বৎসর (১৯৩০) ও গত বৎসর (১৯২৯) এপ্রিল-মে-জুন মাসে কিরূপ ছিল তাহার একটি তুলনামূলক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হাজার টাকা

	১৯২৯	১৯৩০
জমির খাজনা	৯,১৯,৮৩	৯,২৫,৯৬
লবণ কর	১,৭৭,৪৮	১,৭০,১৪
ষ্ট্যাম্প কর	৩,৯৩,৭১	৩,১৬,৯৩
শুল্ক আয়	১২,১১,৭৬	১২,১১,৩৫
আয়কর	১,৩০,২০	১,০৬,৪০
বনকর	৬৮,৭৬	৫৭,৩৯
আফিং	৫০,৩৪	৭৮,৪৪

ভারতীয় কাষ্টম্ রাজস্ব

লবণ বাদে ভারতের মোট স্থল জল ও স্থল কাষ্টম রাজস্ব বাবদ প্রতি বৎসর ভারত সরকার ৫০৷৫৫ কোটি টাকা অর্থাৎ মাসে ৪৷৫ কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। নীচের তালিকা হইতে তার কিছু আভাষ পাওয়া যাইবে :—

(হাজার টাকায় হিসাব)

১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১ (অনুমান)	জুলাই ১৯২৮	জুলাই ১৯২৯	জুলাই ১৯৩০	এপ্রিল-জুলাই ১৯২৮	এপ্রিল-জুলাই ১৯২৯	এপ্রিল-জুলাই ১৯৩০
৫০,১৬,৮৮	৫২,০১,৯৮	৫৫,৪৮,৬০	৪,১৯,৬৮	৪,০৩,৯৫	৩,৮৩,২৬	১৫,৪৮,৭৬	১৬,২৭,৫৪	১৬,১৫,৪৬

কাষ্টম্ বিশ্লেষণ

কিন্তু কাষ্টম রাজস্ব বলিলে কি বুঝায় ?

জল ও স্থল কাষ্টম বলিয়া মোটামুটি যে দুইটা বড় ভাগ করা হইয়াছে তা ত বুঝিতে হইবেই, তা ছাড়া নিম্নলিখিত দফাগুলিও উহার অন্তর্গত।

১। মোটর স্পিরিটের উপর এক্সাইজ শুল্ক।

২। কেরোসিনের উপর এক্সাইজ শুল্ক।

৩। রূপার উপর এক্সাইজ শুল্ক।

৪। গুদাম ঘর ও হোয়ার্ফ বাবদ খাজনা আদায়।

৫। বিবিধ।

জল কাষ্টম রাজস্বকে তিন মোটা ভাগে ভাগ করিয়া দেখানো হইয়া থাকে। যথা :—

১। আমদানি হইতে রাজস্ব।

২। রপ্তানি হইতে রাজস্ব।

৩। বিবিধ সামুদ্রিক খাতে প্রাপ্ত রাজস্ব।

বলা বাহুল্য আমদানি জল কাষ্টম হইতে প্রাপ্ত রাজস্বই পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। লবণ বাদে ভারতীয় কাষ্টম রাজস্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এই খাত হইতে আসে। অর্থাৎ ন্যূনাধিক বৎসরে ৫০ কোটি ও মাসে ৩ কোটি টাকা এই দফা বাবদ আদায় হইয়া থাকে। গত ৩ বৎসরে এই সব খাতে নিম্নরূপ আদায় হইয়াছে :—

(হাজার টাকায় হিসাব)

	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১ (অনুমান)	জুলাই ১৯২৮	জুলাই ১৯২৯	জুলাই ১৯৩০	এপ্রিল-জুলাই ১৯২৮	এপ্রিল-জুলাই ১৯২৯	এপ্রিল-জুলাই ১৯৩০
সামুদ্রিক কাষ্টম :									
আমদানি	৪০,৯২,০৬	৪০,৭১,৩৬	৪৪,০৪,৫৯	৩,৩৬,২১	৩,১৫,২৪	৩,০৩,৬২	১২৭৫৯২	১২৪৪৪৫	১২৬৬২৪
রপ্তানি	৫,৫৮,২৮	৬,২২,২১	৫,৫৫,১৯	৩৯,৮৭	৪২,৭৮	৩৪,০৪	১,৫১,০৯	১,৯৪,৯৮	১,৫৫,৭২
বিবিধ	১৬,৩৭	১২,১৫	১৬,৪১	১,১৪	১,২০	৭৮	৪,৭৮	৪,৫৬	৩,৫৪
স্থল কাষ্টম	৯৮,৮৩	১,১৪,০১	৮০,৩৩	২৪,২৫	১১,৩৬	১১,৫৯	৩০,৪৭	৫৩,৩৭	৪০,৮৬
মোটর স্পিরিট	১,৫৬,১৮	২,৭৮,৮৯	৩,২৪,০০	১১,৬৩	২৫,৬৫	২৩,৬১	৫৪,৮৬	৯৬,৯৫	৯৯,৩৪
কেরোসিন	৯২,৭০	৯৮,৩৫	১,৫০,১৮	৬,১৩	৭,৭৯	৯,২০	২৯,৮৬	৩২,১৫	৪৬,০৬
রূপা	...	...	১৫,০০	...	..	...	...	...	২,০৭
গুদাম ভাড়া	৫০	৬০	৫,৯০	৪	৪	৫	১৬	১৬	২১
বিবিধ	৪,৯৬	৪,৪১		৪১	২৯	৩৭	১,৬২	১,৪২	১৪৬

উপরের অঙ্ক হইতে বুঝা যাইবে সামুদ্রিক আমদানি-কাষ্টমের অনেক নীচে রপ্তানি-কাষ্টমের স্থান, আর স্থল কাষ্টমকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিলে বেশী দোষের হইবে না। কারণ সামুদ্রিক রপ্তানি-কাষ্টমের পর কেরোসিন এক্সাইজ শুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব। এই দফা বাবদ্ রাজস্ব ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে।

জল-কাষ্টমের রকমারি

এই গেল কাষ্টম সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয়। কিন্তু জল কাষ্টম হইতে লব্ধ রাজস্বের অনেক রকমারি আছে।

প্রথমতঃ আমদানি কাষ্টম সব কিছু আর এক রকম নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য হইতে বিভিন্ন প্রকার ভাবে শুল্ক আদায় করা হয়। যথা—

(ক) সংরক্ষণের বাহিরে বিশেষ ডিউটি (অ) লিকার (এল, বিয়ার, পোর্টার, সিডার এবং অন্যান্য পচান লিকার), বৎসরে ২০।২৫ লাখ টাকা হয়, স্পিরিট ও লিকার, বৎসরে ২ কোটি টাকার কিছু উপর হয়; মদ্য, বৎসরে ১৪।১৫ লাখ টাকার রাজস্ব হয়। (আ) চিনি—পৌনে আট হইতে ৯½ কোটি টাকা উসুল হয়। (ই) তামাক—২ কোটি ২½ কোটি টাকা উসুল হয়। (ঈ) কয়লা কোক ও পেটেন্ট জ্বালানি কাঠ—আদায় বৎসরে ৬ হইতে ৭½ লাখ টাকা। (উ) ব্লক টিন—বৎসরে ৬ হইতে পৌনে আট লাখ টাকা। (ঊ) খনিজ তৈল—পৌনে ২ কোটি হইতে ২ কোটি টাকা অবধি বাৎসরিক আদায়। (ঋ) গোলাগুলি বারুদ, মিলিটারি ষ্টোর—৫।৬ লাখ টাকা বৎসরে। (৯) মোটরকার ও সাইকেল ১ কোটি টাকা বৎসরে। (এ) রূপার তাল, মুদ্রা, শিট ও প্লেট (শিল্পজাত নয়)—১৭ লাখ হইতে ১ কোটি টাকা বৎসরে। (ঐ) কৃত্রিম রেশম ইয়ার্ণ ও সূতা ৭ হইতে ১০ লাখ টাকা। (ও) তুলার ইয়ার্ণ ও সূতা ৪৫।৪৬ লাখ টাকা। (ঔ) রেশম সংমিশ্রণ ৭।৮ লাখ টাকা। (অ) পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট (সাদা বাদ)—১০।১১ লাখ টাকা। (অআ) অন্যান্য দ্রব্য—২ হইতে ১০ লাখ টাকা অবধি।

(খ) ২½% শুল্ক বসাইয়া প্রাপ্ত রাজস্ব—ছাপাখানার যন্ত্রপাতি, হ্বিনিগার ও অন্যান্য দ্রব্য ২৪ হইতে ৩৪ হাজার টাকা অবধি বৎসরে।

(গ) ১০% শুল্ক বসাইয়া প্রাপ্ত রাজস্ব (অ) ধাতু—(লোহা ও ইস্পাত), ৪০।৪৫ লাখ টাকা। (আ) রেলওয়ে প্ল্যাণ্ট ও রোলিং ষ্টক, ২০।২১ লাখ টাকা। (ই) অন্যান্য দ্রব্য, ২৮ হইতে ৫৪ হাজার টাকা পর্য্যন্ত।

(ঘ) ১৫% শুল্ক বসাইয়া প্রাপ্ত রাজস্ব—(অ) খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য (ময়দা, চিনি, ভিনিগার ছাড়া অন্যান্য গ্রেন ও পাল্‌স বাদ), পৌনে দুই কোটি টাকা। (আ) ধাতব ওর্‌ ব্যতীত শিল্পজাত নয় এমন কাঁচা মাল ও দ্রব্য ৭০।৭৫ লাখ টাকা। (ই) সম্পূর্ণ অথবা প্রধানতঃ শিল্পজাত দ্রব্য যথা, কাট্‌লারি ও হার্ডওয়েয়ার (ইলেক্ট্রো-প্লেটেড্‌ বাদ), যন্ত্রপাতি (সঙ্গীত যন্ত্র বাদ), প্রায় ১½ কোটি টাকা; লোহা ও ইস্পাত ব্যতীত অন্যান্য ধাতু, ৭৫।৮০ লাখ টাকা; ইয়ার্ণ এবং টেক্সটাইল ফেব্রিক (কৃত্রিম রেশম ইয়ার্ণ তুলার ইয়ার্ণ ও রেশম শিল্প বাদ), ১½ কোটি হইতে পৌনে দুই কোটি টাকা পর্য্যন্ত; নিউমেটিক রবার টায়ার ও টিউব, ৩০।৪০ লাখ টাকা; অন্যান্য ৪ কোটি টাকার উপর। (ঈ) বিবিধ, ৬০।৬৫ লাখ টাকা।

(ঙ) ৩০% শুল্ক বসাইয়া প্রাপ্ত রাজস্ব (অ) রেশম পীস্‌গুড্‌স ও রেশমের অন্যান্য শিল্প, ৮০ হইতে ৮৭ লাখ টাকা পর্য্যন্ত। (আ) অন্যান্য দ্রব্য ১ কোটি টাকা।

(চ) সংরক্ষণ অর্থাৎ ভারতীয় শিল্প রক্ষা করিবার জন্য বহিরাগত তদ্রূপ দ্রব্যের উপর শুল্ক চাপাইয়া প্রাপ্ত রাজস্ব। (অ) লোহা ও ইস্পাত—অতিরিক্ত কর চাপানো যায়, বৃটিশ উৎপন্ন, ৪০।৫০ লাখ টাকা; অবৃটিশ, ৬৫।৭৫ লাখ টাকা; অতিরিক্ত কর চাপানো যায় না, ১ কোটি টাকার উপর। (আ) কাগজ ও মনোহারী, ২৮।২৯ লাখ টাকা। (ই) তুলার পীস্‌গুড্‌স (৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩০ হইতে) প্লেন গ্রে ও অন্যান্য (৪ঠা এপ্রিলের পূর্ব্বে), ৬।৭ কোটি টাকা। (ঈ) দিয়াশলাই, ১০ হইতে ২৫ লাখ টাকা পর্য্যন্ত।

(ছ) গবর্ণমেণ্ট ষ্টোরস্ (ষ্টেট্ রেলওয়ে কর্ত্তৃক আমদানি ধরিয়া)। (অ) সংরক্ষণ শুল্ক বসানো যায়, লোহা ও ইস্পাত, অতিরিক্ত কর বসানো যায়, বৃটিশ (৩ হইতে ৬ লাখ টাকা), অবৃটিশ (২ হইতে ৩ লাখ টাকা), অতিরিক্ত কর বসানো যায় না (১½ হইতে ৬ লাখ টাকার উপর)। (আ) কাগজ ও মনোহারী, ১½ লাখ টাকার কম বেশী। (ই) রেলওয়ে প্ল্যাণ্ট ও রোলিং ষ্টক (সংরক্ষিত নয়), ৫ লাখ টাকা। (ঈ) অন্যান্য, ৪০।৪৫ লাখ টাকা। এই সব বাবদ ১৯৩০-৩১ অনুমান, ৪৭½ লাখ টাকা।

দ্বিতীয়তঃ রপ্তানি কাষ্টম রাজস্বও ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য হইতে আদায় করা হয়। পাট (কাঁচা ও শিল্প), চাউল, কাঁচা হাইড্‌ ও স্কিন, গবর্ণমেণ্ট ষ্টোর রপ্তানি বাবদ শুল্ক আদায়ী করা হইয়া থাকে। তিন বৎসরে পাট হইতে আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

(হাজার টাকায় হিসাব)

	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	জুলাই ১৯২৮	জুলাই ১৯২৯	জুলাই ১৯৩০	এপ্রিল-জুলাই ১৯২৮	এপ্রিল-জুলাই ১৯২৯	এপ্রিল-জুলাই ১৯৩০
কাঁচা	২,১১,৫১	১,৯৮,৮৫	৪,২০,৫২	১১,২০	৯,৪০	৮,১৯	৪১,৩২	৪১,৯৩	৩৩,৭২
শিল্প	২,১০,৪৮	২,৬৭,৪০		১৮,৩৫	২৩,২৩	১৭,৯৩	৫৭,০৫	৯৩,৭৩	৬৫৭১

চাউল হইতে আদায় হইয়াছে ৯৯,৪৫ (১৯২৮-২৯) ১,২০,৪৭ (১৯২৯-৩০) ৯৬,২৬ (১৯৩০-৩১ অনুমান) হাজার টাকা; ১৯৩০ সনের জুলাইয়ের আদায় ৫,৫৯,০০০৲ টাকা এবং বিগত ৪ মাসের আদায় ৪৩,১৫০০০৲ টাকা। হাইডস্ ও স্কিনস্ হইতে পাই ৩৫।৪০ লাখ টাকা; জুলাই মাসে ২,৩৩,০০০৲ টাকা ও গত ৪ মাসে ১৩,৬৮,০০০৲ টাকা পাইয়াছি।

বিবিধ সামুদ্রিক কাষ্টম হইতে বৎসরে ১২।১৩ লাখ টাকা আদায় হয়, জুলাই মাসে হইয়াছে ৭৮ হাজার এবং গত ৪ মাসে ৩½ লাখ টাকার উপর।

ভারতীয় রাজস্বে কাষ্টমের স্থান

ভারতীয় রাজস্ব-তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে উহা চিরিয়া দেখা দরকার। প্রথমতঃ জানা চাই রাজস্ব কত আদায় হয়। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন খাতে প্রাপ্ত রাজস্ব উঠানামা করে কি না, করিলে কি কি কারণে করে তাহা

সম্যক্ অনুসন্ধান করা দরকার। তৃতীয়তঃ রাজস্ব কোথা হইতে আদায় হইতেছে এবং তার ভারটা কোথায় গিয়া পড়িতেছে তাও অনুধাবন করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। রাজস্ব সম্বন্ধে ইহাই প্রথম পাঠ। এই প্রথম পাঠ সমাপ্ত না করিয়া ভারত বা প্রাদেশিক কোন গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-প্রণালীর সমালোচনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। রাজস্বের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে তার জন্য কাঠ-খড় পোড়াইতে হয় বিস্তর। একথা প্রত্যেক স্বদেশসেবী বাঙালীর ছেলেকে মনে রাখিতে অনুরোধ করি।

মোটামুটি ভারতের বাৎসরিক রাজস্ব ১৩০।১৩৫ কোটি টাকা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তন্মধ্যে কাষ্টম বাবদ পাওয়া যায় ৫০।৫৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ভারত সরকারের তহবিলে আসিয়া প্রায় ৪০% টাকা জমা হয় শুধু কাষ্টম রাজস্ব হইতে। সুতরাং রাজস্ব সম্পর্কে কাষ্টমের ইজ্জৎ বড় কম নয় বুঝা যাইতেছে।

ভারতীয় বন্দর সম্বন্ধে পুস্তক

ভারত সরকারের রেলপথ-বিভাগের প্রধান পাব্লিসিটি অফিসার ভারতের বন্দরগুলি সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেছেন। লণ্ডনে ও নিউইয়র্কে ভারতীয় রেলপথ সম্বন্ধে বিউরো খোলা হওয়ার পর হইবে ভারতের বন্দর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়াছে। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে রপ্তানি ও আমদানিকারী ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা হইবে।

ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাপড়ের হিসাব

ভারত সরকার বৃটিশ ভারত ও মিত্ররাজ্যে উৎপন্ন কাপড়ের যে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তার মর্ম্ম এই :—

গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর মার্চ্চ মাসে কোরা ও শাদা কাপড় ২,১০,০০,০০০ গজ বেশী উৎপন্ন হইয়াছে। মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ৪০,৫০,০০,০০০ গজ বেশী শাদা কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য কাপড় অপেক্ষা ধুতি কাপড়ই অধিক উৎপন্ন হইয়াছে।

মোট শাদা কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে

সন		গজ
১৯২৯-৩০	...	২,৪১,৮৯,৮০,০০০
১৯২৮-২৯	...	১,৮৯,৩২,৬৮,০০০
১৯২৭-২৮	...	২,৩৫,৬৫,৫৪,৮০৫

১৯২৮-২৯ সনে দীর্ঘকাল ধর্ম্মঘট চলিয়াছিল। বিস্তৃত তুলনামূলক অঙ্ক নীচে দেওয়া গেল।

	১৯৩০ মার্চ্চ হাজার গজ	১৯২৯ মার্চ্চ হাজার গজ
শাদা ও কোরা কাপড়	৭২,২৩৩	৫৩,৪৪১
শার্টের কাপড় প্রভৃতি	৪৮,৮২২	৪৮,০৮০
খাদি	৮,৪৫৫	৭,১২৫
ড্রিল,জিন ইত্যাদি	৯,৩৫২	৮,৯৫৫
টিক্লথ	৬,৬৭৭	৭,৭৪৬
চাদর	৪,৯৬০	৪,০০১
প্রিণ্টার	২,০৮৩	১,৬৮৯
তাঁবুর কাপড়	৫৯০	৫৩০
ক্যাম্বি্র	৩২৭	২৫৭
অন্যান্য	৩,৪৯৫	৪,০৭৬
মোট	১৫৭০৯৬	১৩৫৯০১
রং কোরা কাপড়	৫৬৬১০	৫৫১৮০
	২১৩৭১২	১৯১০৮৪

পৌনে ৯৪ লাখ টাকার রেল খুলিবার প্রস্তাব

ই আই রেলে কানপুর ও টুণ্ড্লা ষ্টেশনের মধ্যে একটি মাত্র লাইন থাকায় কতগুলি অসুবিধা অনেক দিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। ৯৩ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া উক্ত ষ্টেশন দুইটীর মধ্যে আরও একটী লাইন বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

কানপুর ও টুণ্ড্‌লার দুরত্ব ১৪১ মাইল। প্রতি মাইলে ৬৬,২৮০ টাকা হিসাবে সর্ব্বসমেত ৯৩,৮২,৪৩৭ টাকা খরচ হইবে। এই টাকার মধ্যে মূলধন হইতে ৮৮,৩১,৯৬৫ ডেপ্রিসিয়েশন ফাণ্ড হইতে ৪,৬২,৩১০৲ টাকা ও রেভিনিউ হইতে ২,৫৪,৪৩৭৲ টাকা লওয়া হইবে ও ১,৬৬,২৭৫ টাকা ধার করা হইবে। এই স্কীম অনুযায়ী বার্ষিক ৫,১১,৫০০ টাকা কম ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। উপরোক্ত মূলধনের উপর শতকরা ৫'৭৯ লাভ পাওয়া যাইবে।

চাষের জন্য সরকারী সাহায্য

বাঙ্গালা, বিহার, আসাম, এবং ব্রহ্মদেশে ধান চাষের উন্নতির জন্য ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে। সিমলায় ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের গবর্ণিং বডির বৈঠক বসিয়াছিল। তাহাতেই এই টাকা দেওয়া স্থির হয়। বিহারে আখ চাষের জন্যও টাকা দেওয়া হইয়াছে। ৫ বৎসরে মোট ২০ লাখ টাকা ব্যয় করা হইবে।

পৌনে আট হাজার ফ্যাক্টরীতে সওয়া পনের লাখ খাটুয়ে

ভারতীয় ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট অনুসারে যে সকল ফ্যাক্টরী সরকারী কর্ম্মচারীরা তত্ত্বাবধান করেন তাহার সংখ্যা ১৯২৮ সনে ছিল ৭,৮৬৩; ১৯২৭ সনে ছিল ৭৫১৭। ফ্যাক্টরীর কর্ম্মীর সংখ্যা কিছু হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২৭ সনে যেখানে দৈনিক গড়ে ১৫,৩৩,৩৮২ জন কাজ করিত ১৯২৮ সনে সেখানে ১৫,২০,৩১৫ জন কাজ করিয়াছিল।

যন্ত্র-নিষ্ঠায় ভারত

ভারতবর্ষে যে ক্রমশঃ শিল্পনিষ্ঠা বাড়িতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কলকব্জার আমদানি দেখিয়া। ১৯২৯-৩০ সনে ১৮২২ লক্ষ টাকার, ১৯২৮-২৯ সনে ১৮৩৬ লক্ষ টাকার, ১৯২৭-২৮ সনে ১৫,৯৩ লক্ষ টাকার কলকব্জা আমদানি হইয়াছে। এই কলকব্জার মধ্যে বয়নশিল্পের কলকব্জা ৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার এবং তন্মধ্যে কটন মিলের সাজ-সরঞ্জামই ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকার; পাট কলের সরঞ্জাম ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার। পশমী কাপড় বানাইবার কলকব্জা আসে ৫½ লক্ষ টাকার। ধোলাই ও রং করিবার কল আসে ৩ লক্ষ টাকার। কলকব্জা প্রধানতঃ আসিয়াছে বিলাত হইতে—১৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার; জার্ম্মাণি ও মার্কিণদেশ প্রত্যেকে দুই কোটি টাকার মাল পাঠাইয়াছিল। জার্ম্মাণি ক্রমশঃই আমদানিতে আগাইয়া চলিয়াছে। মার্কিণ দেশ কিছু পিছনে পড়িয়াছে। বেলজিয়াম ১৭ লক্ষ টাকার কলকব্জা পাঠাইয়াছিল।

জ্বালানি কাঠ বনাম কয়লা

অনুমান মাথাপিছু চার পাউণ্ড বা দুই সের জ্বালানিকাঠ বা কয়লা রন্ধনাদি কার্য্যে দৈনিক লাগে। এ হিসাবে ভারতের ৩১ কোটি লোকের জন্য বৎসরে ২০ কোটি টন জ্বালানি সামগ্রী প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে ১৯১৯ সনে ৭,৫৭,৭২৭ টন জ্বালানি কয়লা বিক্রয় হইয়াছিল। অবশিষ্ট ১৯ কোটি ৬০ লক্ষ টন জ্বালানি উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল বন জঙ্গল ও ঘুঁটে হইতে। ঘুঁটে ব্যবহার হওয়ায় চাষের সার কম পড়ে। কয়লা বহনের রেলভাড়া খুব বেশী, তাছাড়া গ্রাম অঞ্চলে রাস্তাঘাট এমন কদর্য্য যে সহর বা ষ্টেশন হইতে গাড়ী করিয়া কয়লা লইয়া যাইতেও বিস্তর খরচ পড়ে। কয়লার ভাড়া কমিলে ও পথঘাট ভাল হইলে, কয়লার ব্যবহার বাড়িবে। তবে একটা কথা এই যে, গাছ কাটিলে পুনরায় গাছ হয়, কিন্তু কয়লার খনি শেষ হইয়া গেলে আর হয় না। সুতরাং স্বল্পমূল্যে যাহাতে জ্বালানি কাঠ সরবরাহ হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং বনে যাহাতে ছোট গাছের যত্ন হয় সে জন্য আইন থাকা চাই।

ভারতে জাভার গুড় ও চিনি

জাভা এতদিন ভারতে চিনিই পাঠাইয়াছে। ভারতে যত চিনি উৎপন্ন হয় তাহার সাতগুণ আসে জাভা হইতে। বর্ত্তমানে গুড়ও আসিতেছে। ভারতের লোকে প্রচুর

গুড় ব্যবহার করে; এইবার গুড়ের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা সুরু হইল। আমদানি চিনির উপর শুল্ক ৪॥০ হইতে ৬৲ করা হইয়াছে। কিন্তু গুড়ের উপর শুল্ক নাই। এখানেও শুল্ক বসাইবার কথা কোথাও কোথাও হইতেছে।

ল্যাঙ্কাশিয়ার হইতে ৫৫।০ কোটি বর্গ গজ কাপড় আমদানি

১৯৩০ সনের প্রথম পাঁচ মাসে লাঙ্কাশিয়ার হইতে ৫৫,২৭,৭৫,১০০ বর্গ গজ কাপড় ভারতে আসে; গত বৎসর (১৯২৯) ঐ সময়ে আসিয়াছিল ৬৬,৫২,৩৯,৫০০ বর্গ গজ; অর্থাৎ ১৬·৯% হ্রাস পাইয়াছে। জুন হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত বর্জ্জননীতি জোরে চলিয়াছিল; এই কয় মাসে বাণিজ্য কিরূপ হ্রাস পাইয়াছে তাহার তালিকা এখনও পাওয়া যায় নাই। এই বর্ষের অবস্থা আরও শোচনীয় বলিয়া মনে হয়।

ভারতীয় বাণিজ্য হ্রাস পাইয়াছে

গত বৎসরের সহিত এ বৎসরের ভারতীয় বাণিজ্য তুলনা করিয়া দেখানো যাইতেছে।

	জুন ১৯৩০ লক্ষ টাকা	মে ১৯৩০ লক্ষ টাকা	জুন ১৯২৯ লক্ষ টাকা
১। আমদানি মালের মূল্য	১৩,৮৭	১৭,৯১	১৬,৫২
২। রপ্তানি মালের মূল্য	২০,৭১	২১,৮৫	২৬,৭১
৩। সোণা আমদানি	২,৫২	১,৭৭	১,০০
৪। রূপা আমদানি	১,২২	১,৪৬	১,১৩
৫। বিদেশী বাণিজ্যে ভারতে ব্যালেন্স	৩,১১	৯৩	৮,১৯
৬। ভারতবর্ষ হইতে সরকারী ফণ্ড রপ্তানি	১০	২,৬৫	১৩

ভারতে বীমার প্রসার

সন.	মোট যত টাকার বীমা হইয়াছে
১৯১৫	৩·২০ কোটি টাকা
১৯২০	৫·১৭ ” ”
১৯২৫	৮·১৫ ” ”
১৯২৬	১০·২৫ ” ”
১৯২৭	১২·৭৭ ” ”
১৯২৮	১৫·৫০ ” ”

চৌদ্দ বৎসরে বীমার পরিমাণ প্রায় ৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ৩৩ কোটি লোকের ১৫½ কোটি টাকা বীমার অর্থ ১৯২৮ সনে জন প্রতি বীমার পরিমাণ ।৵১০ আনারও কম। ইহা দ্বারা বুঝা যায় কত অল্প লোকে ভারতে বীমা বুঝিয়া থাকে। সোজা কথায় এদেশে বীমার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এখনো পড়িয়া রহিয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে সমবায়ের প্রসার

যুক্তপ্রদেশের সমবায় সমিতিগুলির ১৯২৮-২৯ সনের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বর্ষে উক্তপ্রদেশে অজন্মা হওয়ার কারণে কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে, অপরপক্ষে অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি দেখা গিয়াছে এবং সমবায়-কর্ম্মীদিগের শিক্ষা কতক পরিমাণে প্রসার লাভ করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বয়স্থদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৯ হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য ৩টী বিদ্যালয় আছে।

আলোচ্য বর্ষে নানা বিষয়ে যে সকল কাজ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি উল্লেখযোগ্য :—

১। প্রতাপগড় জিলায় স্থানে স্থানে উন্নততর প্রণালীতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করার ফলে যথেষ্ট সুফল লাভ

হইয়াছে এবং অন্যান্য জিলাতেও ইহার অনুকরণে কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

২। স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে প্রায় ১০০টী সমিতিতে পল্লীসংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

৩। আগ্রায় কতকগুলি তাঁতিকে উন্নততর ঠকঠকি তাঁতের ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতে ইহা হইতে যথেষ্ট সুফল লাভ হইবে।

৪। তাঁতিদিগকে সতরঞ্চির রং পাকা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং তাহাদের কার্য্য ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করার ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির মোট লাভ ২,১৫,৭০৩৲ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২,০১,৮০২৲ হইয়াছে, এবং সংরক্ষিত তহবিল ৮·৪৬ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮·৮৮ লক্ষ হইয়াছে।

প্রাথমিক অকৃষি ঋণদান সমিতিগুলির সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ৬৩ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৭ হইয়াছে এবং সভ্য-সংখ্যা ১৫,১০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৭,৪০৩ হইয়াছে। এই বৎসরে বোম্বাইএর স্যার লালুভাই শ্যামলদাসের সভাপতিত্বে জৌলপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা হইতেছে এই প্রদেশের সমবায় সমিতিগুলির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান যুক্তপ্রদেশের কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন স্থাপনা।

(ভাণ্ডার)

বোম্বাইয়ের মোটরগাড়ী নির্ম্মাণ প্রণালী

বোম্বাইতে মোটরকার তৈরী করিবার জন্য একটি প্রকাণ্ড কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। ইহারা মোটরের অংশ আনিয়া গাড়ী বানাইতেছে। এই কারখানা হওয়ায় কলিকাতা বন্দরে মোটর গাড়ী আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। গত বৎসর বোম্বাইতে ৩৬৪ খানি গাড়ী (মূল্য ৯,০৮,৫২৪৲ টাকা) এবং ১৬০ খানি বড় লরী (মূল্য ২,৭৯,২৫৪৲ টাকা) আমদানি হইয়াছিল। ইহার অধিকাংশই উত্তর-ভারত ও কলিকাতার জন্য। উত্তর-ভারতের অনেক শহর এখন মোটরের টায়ার বোম্বাই হইতে কিনিতেছে; ইহাতে কলিকাতার ব্যবসা মন্দা হইয়াছে। জার্ম্মাণি হইতে ৩৩ খানি গাড়ী আসিয়াছে। এ বৎসরের মোটর কারবারে এটা বিশেষত্ব। মোট আমদানি ৬৪৩ খানি মোটর সাইকেলের মধ্যে বিলাত হইতে ৬১৪ খানি আসিয়াছে। গত বৎসর ৫৮৩ খানি মোটর সাইকেলের মধ্যে ৫৪০ খানি বিলাত হইতে আসিয়াছিল।

গোয়ালিয়র কৃষি বিভাগের প্রচেষ্টা

গোয়ালিয়র কৃষি বিভাগ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতেছেন :—

(১) নূতন শস্য প্রবর্ত্তন।

(২) স্থানীয় শস্যের উন্নতিসাধন।

(৩) কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি।

(৪) ফসলের পোকা ও ব্যাধি নিবারণের জন্য অনুসন্ধান।

(৫) শ্রমহ্রাসকর যন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তন।

(৬) গোজাতির উন্নতি।

(৭) কলের লাঙ্গলের সাহায্যে আড়া জমি ভাঙ্গা।

(৮) গভীর কূপ খনন।

(৯) গো-ব্যাধি চিকিৎসা।

উপরিউক্ত বিষয়সমূহ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে সম্পাদিত হইতেছে :—

(১) কেন্দ্রীয় ফার্ম। (২) আদর্শ গ্রাম।

(৩) জেলার প্রচার কার্য্য; প্রধান কার্য্য, উত্তম বীজ সরবরাহ।

(৪) কৃষি-গবেষণা-বীক্ষণাগার) রাসায়নিক ও উদ্ভিজ্জ বিষয় লইয়া আলোচনা) । (৫) বৃষ পালন। (৬) কৃষি ইঞ্জিনীয়ারিং। (৭) পশু-চিকিৎসা বিভাগ।

বয়ন-শিল্পে মহীশূর

মহীশূর রাজ্য ক্রমশই বস্ত্রশিল্পে অগ্রসর হইতেছে। বর্ত্তমানে মহীশূর রাজ্যে ১,১৫,০০০ একর জমিতে তুলার চাষ হইতেছে। রাজ্যে তাঁতির সংখ্যা ৫২,০০০। ইহারা

মোটা কাপড় বুনে। সরকারী বয়ন বিভাগ হইতে গ্রামের এইসব তাঁতিকে ভাল তাঁত যোগাইয়া ভাল কাপড় বুনাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই স্থানে দশটি কল-চালিত তাঁতের কারখানা আছে। মহীশূর সরকারের ইচ্ছা এই যে, কাঁচা মাল বাহিরে রপ্তানি না যায় এবং দেশের লোক কৃষির সময় ছাড়া অন্য সময়ে অবসরমত শিল্পের কার্য্য করে। বিদেশে মহীশূরের কার্পেটের কদর দিন দিন বাড়িতেছে।

বাংলা ও আসামে ৩৭ কোটি পাউণ্ড চা

১৯২৯-৩০ সনে আসাম ও বাংলায় যে পরিমাণ চা উৎপন্ন হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে তেমন আর কখন হয় নাই। গত বৎসরে চা হইয়াছিল ৩৪·১ কোটি পাউণ্ড এবারে হইয়াছে ৩৭·৯ কোটি পাউণ্ড। চা-করগণ মহা উৎসাহে প্রচুর সার দিয়া চা-বাগিচার উন্নতিসাধন করিয়াছেন। উৎপাদনের দিক্ হইতে এবার তাঁদের সুবৎসর; কিন্তু বাজার মন্দা, চাহিদা কম, দর উঠে নাই। সাধারণ চা আট আনা পাউণ্ডের বেশী ওঠে নাই। চা বেশী উৎপন্ন হওয়ায় ভাল চায়ের দরও বাড়ে নাই।

কলিকাতার বন্দর হইতে পৌনে ১৭ কোটি টাকার চা রপ্তানি

কলিকাতার বন্দর হইতে ১৬ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের ২৪,৭৩,৫২,৬৭৬ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়; গত বৎসর ১৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ২৩ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছিল। চট্টগ্রাম হইতে ৮ কোটি পাউণ্ড চা যায়;—এই বন্দর হইতে এ বৎসরে কিছু কমরপ্তানি হইয়াছে। উপকূল দিয়া প্রায় ১ কোটি ২৮½ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়। চায়ের বাড়তি মার্কিণ রাজ্য লয়; তাহার পরিমাণ ৪৬ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতীয় শিল্পীরা ইহার কোনো সদ্ব্যবহার করেন না।

চায়ের বীজ সংগ্রহে বিভিন্ন দেশ

চায়ের বীজের চাহিদা বাড়িতেছে—২৭৭ টন হইতে ৩৩৫ টন হইয়াছে। ইহার কারণ অর্জ্জিনা (আমেরিকা) ১২৩ টন, সুমাত্রা ৭৪ টন এবং জাভা ৬১ টন বীজ লইয়াছিল। ইহারাই এখন ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

জাভা হইতে ২২ লক্ষ পাউণ্ড চা আমদানি

বিদেশ হইতে ভারতে চা আসে। গত বৎসরে ২১ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানি চায়ের মধ্যে জাভা হইতে আসিয়াছিল প্রায় ২২ লক্ষ পাউণ্ড।

ভারতের চা কারা খায়?

চায়ের প্রধান খরিদ্দার ইংলণ্ড—কলিকাতার রপ্তানির শতকরা ৭৮% ভাগ সেখানে যায়; রুশিয়া গত বৎসর চা লইয়াছিল। মার্কিণরাজ্য পূর্ব্বের চেয়ে বেশী চা পান করিতেছে; কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় আমদানি পূর্ব্বের চেয়ে কম।

ইংরেজ ৫৬ কোটি পাউণ্ড ভারতীয় চা পান করিয়াছে

ইংলণ্ডে ১৯২৯ সনের এপ্রিল মাসে চা-এর উপর শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হয়। বিলাতে মোট চা-এর আমদানি ৫০·৯ কোটি পাউণ্ড হইতে ৫৬·১ কোটি পাউণ্ডে উঠে। ইহার মধ্যে ভারতীয় চা ছিল ৩০·৮ কোটি পাউণ্ড; সিংহলের চা যায় ১৫·৩ কোটি পাউণ্ড; জাভা ও সুমাত্রা হইতে ৮·৬ কোটি পাউণ্ড গিয়াছিল।

চা-বাগিচায় ১০ হাজার শ্রমিক

গত বৎসর চা-বাগিচায় শ্রমিকের অভাব হয় নাই; বরং যে সব জেলা হইতে কুলি সংগৃহীত হয় সেই সেই স্থানে অন্নাভাব হওয়ায় প্রচুর শ্রমিক আসিয়াছিল। অস্থায়ী ভাবে প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে লাগানো হইয়াছিল। টী-সেস-কমিটি ভারতে চা-এর প্রচার বাড়াইবার জন্য পৌনে আটলক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ইয়োরোপে প্রচারের জন্য ৫০ হাজার পাউণ্ড বরাদ্দ করিয়াছেন। এছাড়া আরও একলক্ষ টাকা ভারতের মধ্যে খরচ করিতে পারা যায় বলিয়া কমিটী ঠিক করিয়াছেন। গত

ৎসর ভারতবর্ষের মধ্যে ৫·৫ কোটি পাউণ্ড ব্যবহার ইয়াছিল। আমেরিকায় চা-এর বিজ্ঞাপনের জন্য ৮,০০০ লার (প্রায় ২৫ হাজার টাকা) রাখা হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশের চা রপ্তানি

অন্যান্য দেশের মধ্যে সিংহল গত বৎসর ২৫·২ কোটি াউণ্ড রপ্তানি করে; জাভার রপ্তানি ১৩·৬ কোটি পাউণ্ড সুমাত্রা ·৩ কোটির জায়গায় ২·২ কোটি রপ্তানি করে। ীন গত পূর্ব্ববৎসর প্রায় ·৬ কোটি পাউণ্ড ভারতীয় চা আমদানি করিয়াছিল। কিন্তু গত বৎসরে করে ১২ হাজার পাউণ্ডেরও কম। চীনে কত চা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

আসামে চা-শিল্পের অবস্থা

১৯২৯ সনে আসামের উৎপাদন সন্তোষজনক হওয়া ত্ত্বেও চায়ের বাজার বড় সুবিধার ছিল না।

ভারতীয় পুঁজিওয়ালারা ক্রমেই চা-শিল্পে মনোনিবেশ করিতেছে। তবে দর কম হওয়ায় এবং অদূর ভবিষ্যতে র উঠিবার কোন সম্ভাবনা না থাকায় ছোট খাটো পুঁজি-ওয়ালাদেরই মুস্কিল। চা-বাগিচায় আরও অনেক কুলির রকার। কুলি আমদানি আর সেরূপ হইতেছে না। দশবিদেশের বাজার মৌজুত চায়ে ভরিয়া আছে। সেই জন্য র পাওয়া যাইতেছে না।

৯৯৩টি চা-বাগিচা

আলোচ্য সনে আসামে মোট চা-বাগিচার সংখ্যা ৯৯৩টি ছল। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ৯৮০টী। ইহার মধ্যে ভারতীয়দের তাঁবে ২৪৫টী ছিল। কাছাড়ে ১টী, দরংএ ৪টী, নওগাঁয় ১টী, শিবসাগরে ৩টী, এবং লক্ষ্মীপুরে ৪টী নূতন বাগিচা খোলা হইয়াছিল। কামরূপ জেলায় ৬টী বাগানে কান কাজ হয় নাই।

৪ লাখ একর জমিতে চা

চা বাগিচাগুলির মোট আয়তন ৪,২৭,১৯৮ একর হইতে ৪,২৯,৬০৫ একরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন বাগিচার পরিমাণ ফল ৯,৭৯৮ একর, এবং ৭,৩৯১ একরের বাগিচা পরিত্যক্ত হইয়াছে। নওগাঁ এবং কাছাড় জেলা ছাড়া অন্য সব জেলাতেই আবাদ বাড়িয়াছে। তবে চা সংগ্রহ করা হইয়াছে অনেক কম জমিতে। ১৯২৮ সনে চা সংগৃহীত হইয়াছিল ৪,০৩,৯০৬ একর জমি হইতে; কিন্তু ১৯২৯ সনে চা সংগ্রহ করা হইয়াছে ৩,৯৮,৯৯২ একর জমি হইতে অর্থাৎ ১৯২৯ সনে ৯২·৯% জমি হইতে চা সংগ্রহ করা হইয়াছে। ১৯২৮ সনে চা সংগ্রহ করা হইয়াছিল ৯৪·৫% জমি হইতে। ভারতীয়দের তাঁবে চা আবাদের পরিমাণ ৪৫,৬৬৮ একর।

আসামে ১৬ লাখ একর জমি চা-করদেয়

চা-এষ্টেটগুলির অধীনে মোট জমির পরিমাণ ১৯২৮ সনে ছিল ১৬,২৯,৫২৪ একর এবং ১৯২৯ সনে দাঁড়াইয়াছে ১৬,৪৮,১৮১ একর; ইহার মধ্যে চায়ের আবাদভুক্ত জমির হিস্যা ২৬·১%। ভারতীয় চা-করদের অধিকার-ভুক্ত জমির পরিমাণ ২৩২৮৯৫ একর।

৫½ লাখ কুলি খাটিয়াছে

১২২৮ সনে চা বাগিচাগুলিতে গড়ে কুলির সংখ্যা দৈনিক ৫,৪৩,৯২০ জন। ১৯২৯ সনে দৈনিক ৫,৫৭,৪৮৪ জন; ইহার মধ্যে স্থায়ী বাগিচায় খোদ কুলির সংখ্যা ৪,৮০,২৪১ জন, বাহিরের স্থায়ী কুলির সংখ্যা ৩৫,১৮৮ জন, এবং অস্থায়ী বাহিরের কুলির সংখ্যা ৪২,০৫৫। পূর্ব্ব বৎসরের কুলির সংখ্যা যথাক্রমে ৪,৬৮,৩৯১, ৩৩,৩৬৮ এবং ৪২,১৬১ জন।

পৌনে ২৬ কোটি পাউণ্ড চা

আলোচ্য সনে আসাম প্রদেশে মোট কালো চা ২৫,৮০,২৮,২৭৮ পাউণ্ড এবং সবুজ চা ৯,১২,৪৩৬ পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের উৎপাদন যথাক্রমে ২৪,৫৩,১৯,৮৩৩ পাউণ্ড এবং ৭,০১,১৭৪ পাউণ্ড। অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের মোট ১,২৯,১৯,৭০৭

পাউণ্ড বেশী চা উৎপন্ন হইয়াছে। একমাত্র কাছাড় ছাড়া অন্য সমস্ত জেলাতেই চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বন্যার জন্যই কাছাড়ের ক্ষতি হইয়াছে। ১৯২৮ সনের মত ১৯২৯ সনেও শ্রীহট্টে ২টী এবং কাছাড়ে একটী বাগিচায় সবুজ চা প্রস্তুত হইয়াছে। আলোচ্য সনে গোটা আসাম প্রদেশে চা উৎপাদন বাড়িয়াছে প্রায় ৪০%। ৯ বৎসরের মধ্যে এমন উৎপাদন ঘটে নাই।

আলোচ্য সনে চায়ের দর খুব কম ছিল। দর-হ্রাসের কারণ (১) এ বৎসরে অতিরিক্ত চা উৎপন্ন হইয়াছে। (২) অনেক চা-ই ইতিপূর্ব্বে মৌজুত ছিল; চায়ের চাহিদাও খুব কম ছিল। কতকগুলি বাগিচা উৎপাদনের খরচাও তুলিয়া লইতে পারে নাই।

১৯২৮-২৯ সনে ভারতের কফি-শিল্প

(ক) কফি কোথায় জন্মে ?

কফি-শিল্প প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে সীমাবদ্ধ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, কুর্গ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিন প্রভৃতি অঞ্চলে কফির আবাদ হয়। নিম্নে মাদ্রাজের শিল্পবিভাগীয় ডিরেক্টার, কুর্গের ল্যাণ্ড রেকর্ডস ও এগ্রিকালচারের ডিরেক্টার এবং মহীশূর সরকার দ্বারা প্রকাশিত তালিকা হইতে কফির বৃত্তান্ত দেওয়া হইল।

এই তালিকা অসম্পূর্ণ; কারণ ১০ একরের কম জমি-বিশিষ্ট বাগিচার হিসাব ইহাতে দেওয়া হয় নাই।

(খ) পৌনে ২ লক্ষ একরে ৩,৩৫৭টি বাগান

আলোচ্য সনে মোট বাগিচার সংখ্যা ৩,৩৫৪টি, জমির পরিমাণ ২,৭৪,০০২ একর। পক্ষান্তরে ১৯২৭-২৮ সনে বাগিচার সংখ্যা ছিল ৩,৩১৫টী এবং জমির পরিমাণ ২,৭৩৮০৪ একর। ইহার মধ্যে আলোচ্য সনে কফির আবাদ হইয়াছিল ১৬০,৮৪৮ একর জমিতে এবং ১৯২৭-২৮ সনে ১৫৬,১৭৬ একর জমিতে। আলোচ্য সনে ৮,০৭৩ একর জমিতে নূতন করিয়া কফির আবাদ হইয়াছে এবং ৩,৪০১ একর জমিতে আবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং ১৯২৭-২৮ সনের তুলনায় এই সনে কফির আবাদ-বৃদ্ধির পরিমাণ ৪,৬৭২ একর।অর্থাৎ ৩%।

(গ) কোন্ স্থানে কত কফি জন্মে ?

১৯২৭-২৮ সনের মোট কফি আবাদের মধ্যে মহীশূরে আবাদ হইয়াছে ৫২%, মাদ্রাজ এবং কুর্গে ২৩%, কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুরে ২%।

(ঘ) পৌনে তিন কোটি পাউণ্ড কফি

আলোচ্য সনে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংশোধিত কফি উৎপন্ন হইয়ছে মোট ২,৭৭,৫৮৬৩৩ পাউণ্ড; পূর্ব্ব সনে হইয়াছিল ৩,৫৫,৬৩,৩২১ পাউণ্ড। প্রদেশ হিসাবে একর প্রতি উৎপাদন—ত্রিবাঙ্কুরে ২৩৯ পাউণ্ড (৪৫২ পাউণ্ড), কুর্গে ২২৯ পাউণ্ড (২২২ পাউণ্ড), মহীশূরে ২০৭ পাউণ্ড (২২১ পাউণ্ড), মাদ্রাজে ১৩৭ পাউণ্ড (৩৩১ পাউণ্ড) এবং কোচিনে ৬৭ পাউণ্ড (১২৪ পাউণ্ড)। বন্ধনীর মধ্যে ১৯২৭-২৮ সনের উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল।

(ঙ) ৯৪,৮৪৫ কুলি খাটিয়াছে

১৯২৮-২৯ সনে কফি ক্ষেত্রগুলিতে দিন প্রতি মজুর খাটিয়াছে ৯৪,৮৪৫ জন; ইহার মধ্যে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত কুলির সংখ্যা ৯৪৮৬৫ জন (৬৩৮৩৮ জন বাগিচার কুলি ৪৪,৭৪৪ জন বাইরের কুলি) সাময়িক ভাবে নিযুক্ত কুলি ৩১,০২৭ জন। ১৯২৭-২৮ সনে স্থায়ী কুলি ৯১,৩৫৩ জন (৪৩,৭৫১ জন বাগিচায় এবং ১৭,৭৫৯ জন বাইরের) এবং সাময়িকভাবে নিযুক্ত কুলি ২৯,৮৪৩ জন।

(চ) আমদানি-রপ্তানি

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ জাভা, সিংহল, এবং ষ্ট্রেট্স্ সেটল মেন্ট্স্ হইতে কফি আমদানি হয় এবং মস্কট প্রদেশ, ইরাক এবং বাহরিণ দ্বীপপুঞ্জে পুনঃ রপ্তানি হয়।

প্রায় ২ লাখ হন্দর কফি রপ্তানি

১৯২৪-২৫ সনে ভারত হইতে মোট ২,৪২,০০০ হন্দর কফি বিদেশে চালান যায়। তারপর রপ্তানি ক্রমশঃ হ্রাস

পাইতে থাকে। ১৯২৫-২৬ সনে এবং ১৯২৬-২৭ সনে রপ্তানি হয় যথাক্রমে ২,০৫,০০০ হন্দর এবং ১,৫০,০০০ হন্দর। ১৯২৬-২৭ সনে হঠাৎ বাড়িয়া রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৭৭,০০০ হন্দর। ১৯২৮-২৯ সনে আবার কমে। এই সনে কফি জাহাজ বোঝাই হইয়াছে ১,৯৮,০০০। পূর্ব্বের মত ভারতীয় কফি বিলাত এবং ফ্রান্সে চালান গিয়াছে। এই দুই দেশে চালানের পরিমাণ ৭৫,৩৮৬ এবং ৬৫,৫৩৩ হন্দর হইতে কমিয়া যথাক্রমে ৪০,৭৭৭ এবং ৫৬,১৫৭ হন্দরে পরিণত হইয়াছে। জার্ম্মাণি, নেদার-ল্যাণ্ডস্, নরওয়ে ও বেলজিয়াম—এই কয়টী ইয়োরোপীয় দেশেও ভারতের কফি রপ্তানি হয়। এই সমস্ত দেশেও রপ্তানি হইয়াছিল যথাক্রমে ৩৩০০০, ৩০০০০, ১৬,০০০ এবং ১০,০০০ হন্দর; কিন্তু কমিয়া রপ্তানি দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৩,০০০, ১৫,০০০, ১৪,০০০, এবং ৭,০০০ হন্দর। ইরাক এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও রপ্তানি কমিয়াছে। কেবলমাত্র বাহেরিণ দ্বীপপুঞ্জে রপ্তানি বাড়িয়াছে ২,০০০ হন্দর।

জুন এবং জুলাই মাস কফির সময়। ১৯২৮-২৯ সনে এই সময়ে কফি রপ্তানি হইয়াছিল ১৩৮২৭৩ হন্দর; পক্ষান্তরে ১৯২৭-২৮ সনে এই সময়ে রপ্তানি হয় ২৬১,৫২৩ হন্দর।

(ছ) বিভিন্ন দেশের কফি-উৎপাদন

নিম্নের তালিকায় প্রদেশ হিসাবে পাঁচ বৎসরের কফি-উৎপাদনের বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইল :—

(অ) আয়তন

প্রদেশ বা রাজ্য	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
	একর	একর	একর	একর	একর
মাদ্রাজ	৩৪,২৮৫	৩৫,৪৩০	৩৭,১৭৩	৩৮,১৫৯	৩৯,০৭৪
কুর্গ	৩২,৪৬৪	৩৪,৮৩১	৩৫,০৪৯	৩৫,২১৩	৩৬,৬০৯
মহীশূর	৭২,৮৩৬	৭৫,৪৫১	৭৬,৩২৪	৭৯,৭৫৬	৮৩,২২২
ত্রিবাঙ্কুর	৮৭৯	৮৪৭	৮২৭	৭২৯	৭৮৫
কোচিন	২,৩৮৪	২,৩২২	২,২৩৯	২,২৫৬	২,১৫৮
ভারতে মোট	১৪২,৭৯৮	১৪৮,৮৮১	১৫১,৬১২	১৫৬,১৭৬	১৬০,৮৪৮

(আ) ফসলের পরিমাণ

প্রদেশ এবং রাজ্য	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
মাদ্রাজ	৯,৬৬৯,২৮৯	৪,৫২৫,৭৯৬	৬,৯১৪,৯৭০	১১,৫৩৩,১৬৪	৪,২৮৭,৩০২
কুর্গ	৮,৪৮৭,৬৫৮	৪,৮৭০,৩৪৩	১০,৬০২,২৮০	৭,৫৮৮,৭৯৮	৭,৭০৭,১২০
মহীশূর	১১,৭৩১,৫৬২	১২,৫৩৭,৭২৪	১৬,২০১,৯২০	১৫,৮১৩,৩০৬	১৪,৯৪৬,৪০৬
ত্রিবাঙ্কুর	১৭২,৭৫২	৭৯,৬০০	২০৫,৩৫২	৩৫১,৭১৩	১৭৭,৩৯৮
কোচিন	৪১৪,৩৮২	৯৩,৩১৪	৩৫৭,৪৭৩	২৭৬,৪০০	১০০,৪০৭
ভারতে মোট	৩০,৪৭৫,৬৪৪	২২,১০৬,৭১৭	৩৪,২৮১,৯৯৫	৩৫,৫৬৩,৩২১	২৭,৭৫৮,৬৩৩

স্বদেশী দেশলাই

সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে স্বদেশী দেশলাইয়ের তালিকা দেওয়া হইল :—

১। নিউ সুন্দরবন ম্যাচ ফ্যাক্টরী, মার্কা আরতি। ম্যানেজিং এজেন্ট কর কোম্পানী, ৪ লায়নস রেঞ্জ, কলিকাতা।

২। বঙ্গীয় দেশলাই কার্য্যালয়। ১০৭, উল্টাডিঙ্গি মেন রোড, কলিকাতা। মার্কা স্বাধীনতা, ডায়মণ্ড, স্বস্তিক, লাট্টু ও হরিণ।

৩। ঈশান্তি ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোং। ৪৬নং মুরারী পুকুর রোড। মার্কা কালী, থ্রি ডিয়ার্স, লেডী।

৪। করিমভাই ম্যাচ কোং। ৩১ ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড, উল্টাডিঙ্গি। মার্কা, হরিণ, তারাবাই।

৫। কলিকাতা ম্যাচ ফ্যাক্টরী। ৩৮১ রসা রোড। মার্কা ড্যানসিং গার্ল, রূপসী।

৬। হায়দারী ম্যাচ কোং। ১৫০ বেলিয়াঘাটা মেন রোড। মার্কা রাধাকৃষ্ণ, বলরাম, পাঞ্জা, ফ্লাগ, জয়ন্তী, হ্যাপী হোম, ডারলিং।

৭। ক্রাউন ম্যাচ ফ্যাক্টরী। ১২ পোলক ষ্ট্রীট।

৮। ধরমসী কোং। ১৯ দমদম রোড। মার্কা ন্যাশনাল ফ্লাগ।

৯। পাইওনিয়ার ম্যাচ ফ্যাক্টরী। ১৬ দমদম রোড। মার্কা তবলা।

১০। ভাগীরথী ম্যাচ ফ্যাক্টরী। ১ নং যোগীন বসাক ষ্ট্রীট। ময়রাডাঙ্গা, বরাহনগর।

১১। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ম্যাচ ফ্যাক্টরী। ক্যানাল ইষ্ট রোড, কলিকাতা।

১২। রামপুরিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরী। ৩৪ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা।

১৩। প্রসন্ন ম্যাচ ফ্যাক্টরী। ওয়ারী, ঢাকা।

১৪। লুসিফার লিঃ। রাজবাড়ী, ঢাকা।

১৫। জলপাইগুড়ি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল লিঃ। জলপাইগুড়ি।

১৬। এম এস মেটা। ৬৫ এজরা ষ্ট্রীট। মার্কা ইউনিয়ান জ্যাক, টু ফ্লাগস্, টু লায়নস, এলিফ্যাণ্ট।

১৭। আদমজী হাজী দাউদ কোং। রেঙ্গুন। মার্কা কক, কাউহেড, সিপ্পার।

১৮। মহালক্ষ্মী ম্যাচ ফ্যাক্টরী। লাহোর।

১৯। বেরিলি ম্যাচ ওয়ার্কস। ইউ, পি, বেরিলি।

২০। গুজরাট ইসলাম ম্যাচ ফ্যাক্টরী ম্যানুফ্যাকচার অব্ সিটী, ষ্টার, পাইরোটেকনিক, ফুজি। কাঙ্গাড়ী রোড, আমেদাবাদ। মার্কা পিজিয়নস, সারস, পিকক, ষ্টীমশিপ, চরকা, ডিয়ার।

(বঙ্গরত্ন)
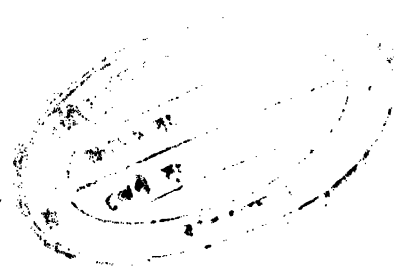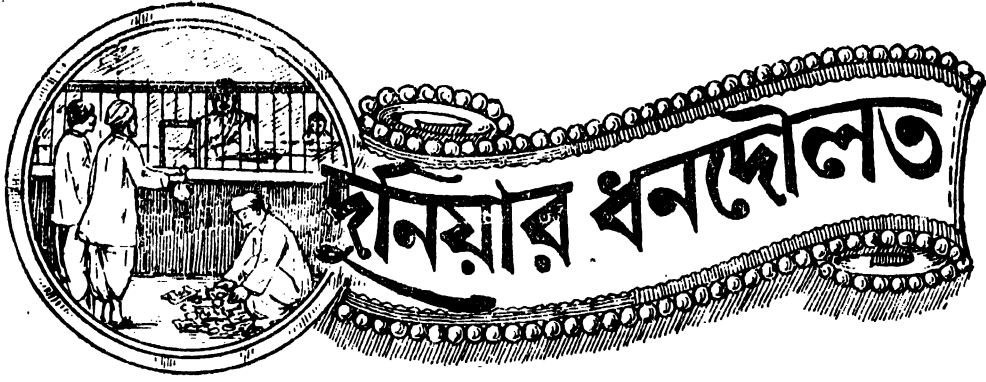
মাথাপিছু জীবন বীমার পরিমাণ

দেশের নাম		জীবন বীমার পরিমাণ
আমেরিকা	...	৩,০০০৲
ক্যানাডা	...	১,৯০০৲
অষ্ট্রেলিয়া	...	১,৩০০৲
নিউজিল্যাণ্ড	...	১,১০০৲
ইংল্যাণ্ড	...	৭৫০৲
অষ্ট্রিয়া	...	৭০০৲
নরওয়ে	...	৫০০৲
সুইডেন	...	৪৫০৲
হল্যাণ্ড	...	৪০০৲
ডেনমার্ক	...	৩৫০৲
জাপান	...	২০০৲
ভারত	...	৬৷৹

মার্কিণ মুল্লুকে 'শ্রেণী বীমা'র প্রসার

পাশ্চাত্য জগতে 'শ্রেণী বীমা'র রেওয়াজ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। মার্কিণ দেশে এই ধরণের বীমা যে কিপরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নিম্নের মাপজোক হইতে কিছু কিছু টের পাওয়া যাইবে।

১৯১২ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে মার্কিণে শ্রেণী বীমার পরিমাণ ছিল ১৩,০০০,০০০ ডলার। ১৯২৮ সনের ১লা জানুয়ারীতে এই বীমার পরিমাণ দাঁড়াইছে ৮,০০,০০,০০০ ডলারেরও উপর। কয়েকটী কারণে এই নূতন ধরণের বীমার রেওয়াজ বাড়িয়া চলিয়াছে।

মার্কিণ এবং ক্যানাডার জনসাধারণের নিকট এই বীমা অতি প্রিয় বস্তু হইয়াছে। সাধারণতঃ মালিককেই এই বীমার পলিসি করিতে হয়। চাকুরেয়র এক বৎসরের বেতন পলিসির মোট পুঁজি বলিয়া ধরা হয়। কাজ করিতে করিতে চাকুরেয়র গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলে পোষ্যবর্গকে এই বীমার অর্থ দেওয়া হয়। সমস্ত চাকুরেয়কে এক জোট করিয়া মাত্র একটি পলিসি কায়েম করা হয়। ইহার জন্য কোনরূপ স্বাস্থ্য-পরীক্ষার দরকার হয় না। বার্ষিক বেতনের ১% প্রিমিয়াম ধরা হয় এবং তাহাও আদায় করা হয় বৎসরে মাত্র একবার।

জাপানী বাণিজ্যের দৌড়

(১) আমদানি (১৯২৮)

তূলা

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন*)
মার্কিণ	...	২৪৫,৯২৬,০০০
বৃটিশ ভারত	...	২৩২,২৬৬,০০০
চীন	...	৪৯,৫৭৮,০০০
মিশর	...	১৭,৭২২,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৪,৪২৮,০০০
মোট		৫৪৯,৯৪১,০০০

পিগ্ লোহা

বৃটিশ ভারত	...	১২,৯২৯,০০০
কোয়াংটাং	...	৮,৫৪৫,০০০

* ১ ইয়েন = ১।৴৪ পাই

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
চীন	...	১,৪৬৩,০০০
মার্কিণ	...	১,১৬৮,০০০
জার্ম্মাণি	...	৫০৭,০০০
বিলাত	...	৪৫০,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১৮৮,০০০
মোট		২৫,২৫৪,০০০

রেল ও ফিস্ প্লেট্

জার্ম্মাণি	...	২,১৬২,০০০
মার্কিণ	...	১.০৯৬,০০০
ফ্রান্স	...	৬৬৪,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১১০,০০০
মোট		৪,০৩৪,০০০

অন্যান্য লোহা

মার্কিণ	...	৩৬,৯৭২,০০০
বিলাত	...	৩২,১৮১,০০০
জার্ম্মাণি	...	২৭,০৭৩,০০০
বেলজিয়াম	...	৭,৭১৭,০০০
সুইডেন	...	২,১৪৪,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	...	৭০৬,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১৩,২৯৯,০০০
মোট		১২০,০৯৪,০০০

ভেড়ার লোম

অষ্ট্রেলিয়া	...	১০৫,২৩৮,০০০
আর্জ্জেন্টিনা	...	২,৮৩২,০০০
বিলাত	...	১,৪৪৭,০০০
চীন	...	১,২৭৬,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১,০৬১,০০০
মোট		১১১,৮৫৬,০০০

কাঠ

মার্কিণ	...	৮৪,৯২৬,০০০

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
এশিয়াটিক রুশিয়া	...	১২,৮১০,০০০
ক্যানাডা	...	৬,৮৮০,০০০
শ্যাম	...	২,৫৬০,০০০
চীন	...	৮৭৬,০০০
ওলন্দাজ ভারত	...	৮৫৯,০০০
অন্যান্য দেশ	...	২,০৯১,০০০
		১১১,০০৮,০০০

ডায়নামো ও ট্র্যান্সফর্ম্মার

মার্কিণ	...	৪,২৭৬,০০০
জার্ম্মাণি	...	১,৫৯৮,০০০
বিলাত	...	১,০১১,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৫৪৮,০০০
		৭,৪৩১,০০০

মেশিনারি

মার্কিণ	...	৩০,০৪৬,০০০
বিলাত	...	২৫,১০৩,০০০
জার্ম্মাণি	...	১৩,১৪৭,০০০
সুইজারল্যাণ্ড	...	৪,০৯০,০০০
ফ্রান্স	...	১,৯৮৪,০০০
সুইডেন	...	১,৫২৮,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৮,৮৭২,০০০
		৮৪,৭৭৩,০০০

গম

ক্যানাডা	...	৩১,৭৪০,০০০
মার্কিণ	...	১৫,৯০৩,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	...	৯,৭১০,০০০
চীন	...	৫,৪৭৪,০০০
কোয়াংটাং	...	৪,৮৫৭,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১০০,০০০
		৬৭,৭৮৭,০০০

চিনি

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
কোয়াংটাং	...	৬৩,৭০২,০০০
কিউবা	...	৯৪৩,০০০
ফিলিপাইন	...	১৯৯,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১১৩,০০০
		৬৪,৯৫৮,০০০

কয়লা

কোয়াংটাং	...	২৩,২৮৮,০০০
চীন	...	৬,৫১৭,০০০
ফ্রেঞ্চ ইণ্ডোচীন	...	৪,৬৬৪,০০০
এশিয়াটিক রুশিয়া	...	১,৩৯১,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১১৩,০০০
		৩৬,৯৭৫,০০০

ধান ও চাউল

শ্যাম	...	১৬,২৪০,০০০
ইণ্ডোচীন	...	১১,৫৫৮,০০০
মার্কিণ	...	৩,৩৬০,০০০
বৃটিশ ভারত	...	২,০৪৬,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৪৬৬,০০০
		৩৩,৬৭২,০০০

মোটর গাড়ী ও মোটর গাড়ীর সরঞ্জাম

মার্কিণ	...	২৯,৩৫৩,০০০
ক্যানাডা	...	১,৫৬৭,০০০
বিলাত	...	৪৬৪,০০০
ফ্রান্স	...	৪১৯,০০০
ইতালি	...	২৫৯,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১৭৯,০০০
		৩২,২৪৪,০০০

কেরোসিন তৈল

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
মার্কিণ	...	১৪,৯৬৪,০০০
ওলন্দাজ ভারত	...	১৩,৪৮৮,০০০
অন্যান্য দেশ	...	২,২৩২,০০০
		৩০,৬৮৬,০০০

রবার ও গাটাপার্চ্চা

ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেলমেণ্ট	...	১৯,৫৬৪,০০০
বৃটিশ ভারত	...	৬,৫৭৮,০০০
ডাচ ইণ্ডিজ	...	১,২২০,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৫৩২,০০০
		২৭,৮৯৫,০০০

নানাপ্রকারের তন্তু (তূলা ছাড়া)

ফিলিপাইন	...	১৪,০৪৯,০০০
চীন	...	৯,৩১১,০০০
বৃটিশ ভারত	...	৩,৮৮৮,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৫৭২,০০০
		২৭,৮২১,০০০

তৈল বীজ

চীন	...	১৩,১৭২,০০০
কোয়াংটাং	...	৪,৯৮৮,০০০
বৃটিশ ভারত	...	৩,২০৮,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৪৫১,০০০
		২১,৮২১,০০০

কাগজ নির্ম্মাণের জন্য পাল্প্

ক্যানাডা	...	৬,২৫০,০০০
নরওয়ে	...	১,৫১৭,০০০
মার্কিণ	...	১,২৮৯,০০০
সুইডেন	...	১,১৫৬,০০০

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
জার্ম্মাণি	...	২৮৮,০০০
বিলাত	...	২৮১,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৬৬৯,০০০
		১১,৪৫৪,০০০

চামড়া

চীন	...	৫,৯৮৯,০০০
মার্কিণ	...	৩,১৮৩,০০০
কোয়াংটাং	...	৩৯৬,০০০
বিলাত	...	২৬৩,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৬৪৩,০০০
		১০,৪৭৪,০০০

যৌগিক রং

জার্ম্মাণি	...	৬,৮০৯,০০০
সুইজারল্যাণ্ড	...	১,৫০০,০০০
মার্কিণ	...	৯৩১,০০০
ফ্রান্স	...	৩৮৬,০০০
অন্যান্য দেশ	...	২৯৫,০০০
		৯,৯২৪,০০০

ঘড়ি

সুইজারল্যাণ্ড	...	৭,০০৪,০০০
মার্কিণ	...	৭৭১,০৪০
অন্যান্য	...	১২৬,০০০
		৭,৯০৩,০০০

চামড়া

মার্কিণ	...	৩,৩৯১,০০০
বৃটিশ ভারত	...	২,২৮২,৫০০
বিলাত	...	১,১১৭,০০০
জার্ম্মাণি	...	৪৯২,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৪২৮,০০০
		৭,৭১৩,০০০

ছাপার কাগজ

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
বিলাত	...	২,২৭৫,০০০
সুইডেন	...	১,১০৩,০০০
জার্ম্মাণি	...	১,০৩৮,০০০
নরওয়ে	...	৩৭১,০০০
হল্যাণ্ড	...	৩০৬,০০০
মার্কিণ	...	২৬৮,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১৫৮,০০০
		৫,৫২৩,০০০

(২) রপ্তানি (১৯২৮)

রেশম

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
মার্কিণ	...	৬৮৭,৪৬৪,০০০
ফ্রান্স	...	৩৪,৯৮২,০০০
বিলাত	...	৩,৭১৬,০০০
ক্যানাডা	...	৩,১১২,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	...	২,০৩৫,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১,৩৮৪,০০০
		৭৩২,৬৯৭,০০০

তুলার কাপড়

চীন	...	১৫৮,৪৯৭,০০০
বৃটিশভারত	...	৭০,১৮৫,০০০
ওলন্দাজ ভারত	...	৩৯,২৭৫,০০০
মিশর	...	১৭,৬৩৭,০০০
হংকং	...	১৭,৪৬৪,০০০
কোয়াংটাং প্রদেশে	...	১৫,০৭৩,০০০
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	...	৬,৭৯৭,০০০
ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেল্‌মেণ্ট	...	৩,৫১৯,০০০
তুরস্ক	...	২,৯৭০,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	...	২,৩৯১,০০০

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
আর্জ্জেন্টিন্	...	২,১৭৪,০০০
কেপ কলনি	...	২,০৯৬,০০০
শ্যাম	...	১,৩৫৯,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১২,৭৭৩,০০০
		৩৫২,২১৭,০০০

রেশমী কাপড়

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
অষ্ট্রেলিয়া	...	২৮,৩১৪,০০০
বৃটিশ ভারত	...	১৭,০৭৩,০০০
মার্কিণ	...	১৫,৪০৬,০০০
ক্যানাডা	...	১২,৫৮৯,০০০
ফ্রান্স	...	১০,০৪১,০০০
বিলাত	...	৯,৭৩০,০০০
কেপ কলনি	...	৬,৩০২,০০০
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	...	৩,৯০১,০০০
চীন	...	৩,৫২৯,০০০
ওলন্দাজ ভারত	...	৩,৩৯২,০০০
ষ্ট্রেট্স্ সেটেলমেণ্ট	...	২,৫০৬,০০০
হংকং	...	২,২৫১,০০০
কোয়াংটাং প্রদেশ	...	২,২৪০,০০০
আর্জ্জেন্টিনা	...	২,১৩৮,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১৪,৬৪২,০০০
		১৩৪,০৫৯,০০০

পরিষ্কৃত চিনি

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
চীন	...	৩১,৬২০,০০০
কোয়াংটাং প্রদেশ	...	৩,৭১০,০০০
এশিয়াটিক রুশিয়া	...	২,২৩৭,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৮৪৬,০০০
		৩৮,৪১৪,০০০

চীনামাটির দ্রব্য

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
মার্কিণ	...	১৩,৭৯৩,০০০
ওলন্দাজ ভারত	...	৪,৮২২,০০০
বৃটিশ ভারত	...	২,৪৫৬,০০০
চীন	...	২,০৬৮,০০০
কোয়াংটাং প্রদেশ	...	১,৪৭৬,০০০
ক্যানাডা	...	১,৪২০,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	...	১,১৭২,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৭,৪৩৩,০০০
		৩৪,৬৪২,০০০

নানাবিধ বয়নজাত দ্রব্য

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
বৃটিশ ভারত	...	১০,৬৪১,০০০
বিলাত	...	৬,৪২৫,০০০
ফিলিপাইন	...	৩,৫৮২,০০০
মিশর	...	২,১১১,০০০
ওলন্দাজ ভারত	...	১,৭৩৬,০০০
চীন	...	১,৫৭৩,০০০
কেপ্ কলনি	..	১,৩৪২,০০০
কোয়াংটাং প্রদেশ	...	৯১১,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৪,৯৭৬,০০০
		৩৩,৩০১,০০০

তুলার সূতা

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
বৃটিশ ভারত	...	৯,১৮১,০০০
চীন	...	৮,১০৯,০০০
হংকং	...	৪,১৯৪,০০০
ওলন্দাজ ভারত	...	৮২৪,০০০
কোয়াংটাং প্রদেশ	...	৭৭০,০০০
মিশর	...	৬১৮,০০০
অন্যান্য দেশ	...	২,১৯০,০০০
		২৫,৮৯৪,০০০

কাগজ

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
চীন	...	১৫,৮৯০,০০০

দেশের নাম	মূল্য (ইয়েন)
কোয়াংটাং প্রদেশ …	৩,৮৪০,০০০
হংকং …	১,৭৭৪,০০০
মার্কিণ …	১,৩২০,০০০
অন্যান্য দেশ …	২,৮৪৬,০০০
	২৫,৬৭২,০০০

গম

চীন …	১৮,৬১৮,০০০
কোয়াংটাং প্রদেশ …	৫,৩৩৩,০০০
অন্যান্য দেশ …	৭৬৬,০০০
	২৪,৭১৮,০০০

টিন ও বোতলের খাদ্য

মার্কিণ …	১১,২৮৫,০০০
বিলাত …	৬,৫৬১,০০০
অন্যান্য দেশ …	৫,১৮৪,০০০
	২৩,০৩১,০০০

কাঠ

চীন …	৪,৪৯৭,০০০
বৃটিশ ভারত …	৩,০৭২,০০০
কোয়াংটাং প্রদেশ …	১,৯২৮,০০০
বিলাত …	১,৭৫৫,০০০
অষ্ট্রেলিয়া …	১,৭৪২,০০০
ওলন্দাজ ভারত ..	১,১৭৭,০০০
অন্যান্য দেশ …	৩,৭৯০,০০০
	১৭,৯৬৪,০০০

জলজ পদার্থ

দেশের নাম	মূল্য (ইয়েন)
হংকং …	৫,৪৮০,০০০
চীম …	৫,১৬৭,০০০
কোয়াংটাং প্রদেশ …	২,২২৫,০০০
মার্কিণ …	১,৬৭৪,০০০
হাওয়াই …	১,০২৬,০০০
ষ্ট্রেট্স্ সেটেল্মেণ্ট …	৮০৩,০০০
অন্যান্য দেশ …	৯৯৭,০০০
	১৭,৩৭৫,০০০

লৌহজাত দ্রব্য

কোয়াংটাং প্রদেশ …	৩,২১৮,০০০
চীন …	২,৭১৯,০০০
বৃটিশ ভারত …	২,৪৯৮,০০০
ওলন্দাজ ভারত …	১,৫০৪,০০০
এশিয়াটিক রুশিয়া …	৮৭৭,০০০
ফিলিপাইন …	৭৯৫,০০০
হংকং …	৭৯৪,০০০
অন্যান্য দেশ …	১,২৭৪,০০০
	১৩,৬৮৩,০০০

কাচের জিনিষ

বৃটিশ ভারত …	৩,৮৩৪,০০০
চীন …	২,৬৯০,০০০
ওলন্দাজ ভারত …	১,৬৯৭,০০০
ফিলিপাইন …	১,১৫৪,০০০
অন্যান্য দেশ …	৩,৫৬৫,০০০
	১২,৯৪১,০০০

রকমারি রেশম

ফ্রান্স …	৬,১১১,০০০
মার্কিণ …	৩,৫৫৯,০০০
ইতালি …	১,৮৩৭,০০০
অন্যান্য দেশ …	১,০৩৯,০০০
	১২,৫৪৭,০০০

টুপি

বিলাত …	২,৬৩৯,০০০

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
মার্কিণ	...	১,৮০০,০০০
চীন	...	১,৫৩৫,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৬,২১৯,০০০
		১২,১৯৪,০০০

চা

মার্কিণ	...	৯,২৮৮,০০০
ক্যানাডা	...	১,৪৬৮,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১,০৯১,০০০
		১১,৮৪৮,০০০

খেলনা

মার্কিন	...	৩,৬৭০,০০০
বৃটিশ ভারত	...	১,২৭৭,০০০
বিলাত	...	৯৩৫,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৫,১১৬,০০০
		১১,০০০,০০০

মেশিন ও মেশিনের অংশ

কোয়াংটাং প্রদেশ	...	৪,৯৬৪,০০০
চীন	...	৩,৯২৪,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১,৭১৬,০০০
		১০,৬০৪,০০০

সীম (বীন)

বিলাত	...	৪,৮৮৮,০০০
মার্কিণ	...	৩,০১০,০০০
অন্যান্য দেশ	...	২,৫০১,০০০
		১০,৪০০,০০০

ল্যাম্প এবং ল্যাম্পের অংশ

মার্কিণ	...	২,৬১৫,০০০
চীন	...	১,৪০৬,০০০

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
কোয়াংটাং প্রদেশ	...	৯০৪,০০০
ওলন্দাজ ভারত	...	৯০১,০০০
অন্যান্য দেশ	...	২,৫৪১,০০০
		৮,৩৭০,০০০

মাছ এবং তিমির তৈল

হল্যাণ্ড	...	২,৪৪৬,০০০
বিলাত	...	১,৪৩১,০০০
জার্ম্মাণি	...	১,০১৩,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৩,২৭০,০০০
		৮,১২০,০০০

জুয়েলারি

বৃটিশ ভারত	...	২,৮১৩,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৫,২০৪,০০০
		৮,০১৭,০০০

বোতাম

বিলাত	...	১,২৪৭,০০০
চীন	...	১,২৪১,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৫,১৬৪,০০০
		৭,৬৫৩,০০০

শুক্‌না গাছ ইত্যাদি

মার্কিণ	...	৬,৫১৮,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৯৬৯,০০০
		৭,৪৮৪,০০০

সিমেণ্ট

ওলন্দাজ ভারত	...	২,৩৬৭,০০০
ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেল্‌মেণ্ট	...	১,২৭৪,০০০
ফিলিপাইন	...	১,০৭৫,০০০
অন্যাম্য দেশ	...	২,১৬৮,০০০
		৬,৮৮৫,০০০

উদ্ভিজ্জাত চর্ব্বি ও তৈল

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
মার্কিণ	...	২,৫০১,০০০
বিলাত	...	৯৪৯,০৫০
অন্যান্য দেশ	...	২,৫৭০,০০০
		৬,০২২,০০০

গাম টায়ার

চীন	...	২,৩৪০,০০০
ওলন্দাজ ভারত	...	১,৫৮১,০০০
ষ্ট্রেট্‌স্ সেটেলমেণ্ট	...	৯৩৪,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৮৬৭,০০০
		৫,৭২৪,০০০

পিতল

বৃটিশ ভারত	...	২,৬৮৩,০০০
চীন	...	২,০৩০,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৮৬২,০০০
		৫,৫৭৬,০০০

কর্পূর

মার্কিণ	...	২,৪১৩,০০০
বৃটিশ ভারত	...	১,৪৪৮,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১,৫৮৫,০০০
		৫,৪৪৭,০০০

রেশমী রুমাল

মার্কিণ	...	১,৫১৯,০০০
বৃটিশ ভারত	...	৮৮৯,০০০
অন্যান্য দেশ	...	২,৭৯৬,০০০
		৫,২০৪,০০০

বুরুশ

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
মার্কিণ	...	২,৯৮৪,০০০
বিলাত	...	৮২২,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১,৩১০,০০০
		৫,১১৮,০০০

দেশলাই

হংকং	...	৩,০৪৯,০০০
অন্যান্য দেশ	...	২,০৬৮,০০০
		৫,১১৭,০০০

লোহা

কোয়াংটাং	...	২,৬৬৩,০০০
চীন	...	১,২০৩,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৯৭৯,০০০
		৪,৮৪৬,০০০

টুপির রং

মার্কিণ	...	১,১৬২,০০০
বিলাত	...	৯৭১,০০০
ফ্রান্স	...	৮৯৯,০০০
জার্ম্মাণি	...	৭৯৮,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৮৮৫,০০০
		৪,৭১৭,০০০

বিয়ার (মদ)

চীন	...	১,৬০০,০০০
কোয়াংটাং	...	১,০৭৮,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১,৭৩৩,০০০
		৪,৪১২,০০০

আইসিন(?) গ্লাস

ফ্রান্স	...	৭৫৪,০০০
মার্কিণ	...	৬০৩,০০০
অন্যান্য দেশ	...	২,৭৮৪,০০০
		৪,১৪২,০০০

মেন্থল ক্রিষ্ট্যাল

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
মার্কিণ	...	১,৮৩৬,০০০
ফ্রান্স	...	৭৫০,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১,৩২৬,০০০
		৩,৯১৪,০০০

তোয়ালে (তুলার)

বৃটিশ ভারত	...	৭২০,০০০
অন্যান্য দেশ	...	২,৬৭০,০০০
		৩,৩৯৫,০০০

পশমী কাপড়

চীন	...	১,৫৫৫,০০০
কোয়াংটাং	...	১,৪০৯,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৩৭৫,০০০
		৩,৩৪০,০০০

কাপাসের কম্বল

চীন	...	৬০১,০০০
বৃটিশ ভারত	...	৫৮৭,০০০
অন্যান্য দেশ	...	১,৫৯৭,০০০
		২,৭৮৭,০০০

ছাতা ও প্যারাসোল

চীন	...	১,২৫৪,০০০
কোয়াংটাং	...	৯০৮,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৩৫৪,০০০
		২,৫১৭,০০০

সাবান

দেশের নাম		মূল্য (ইয়েন)
কোয়াংটাং প্রদেশ	...	৯২৭,০০০
চীন	...	৯০৬,০০০
অন্যান্য দেশ	...	২৫৪,০০০
		২,০৮৮,০০০

পেপারমেণ্ট তেল

ফ্রান্স	...	১,২৮২,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৭৯৩,০০০
		২,০৭৫,০০০

ধান ও চাউল

ক্যানাডা	...	৫১৫,০০০
অন্যান্য দেশ	...	৭৬২,০০০
		১,২৭৭,০০০

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে জার্ম্মাণ নাইট্রেট সার

বহুদিন হইতে জার্ম্মাণির বন্দরসমূহ হইতে বিস্তর নাইট্রোজেন ইয়োরোপের উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলে প্রেরিত হইয়া আসিতেছে। সাগর পারের ভিন্ন ভিন্ন দেশেও জার্ম্মাণি নাইট্রোজেন রপ্তানি করিয়া থাকে। হাম্‌বুর্গ বন্দর এবিষয়ে সকলের উপরে টেক্কা মারিয়াছে। জার্ম্মাণির নাইট্রোজেনের বহির্ব্বাণিজ্য স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম নাইট্রেট সার এই বন্দর হইতে চালান যাইতেছে। এই বন্দরের মারফতে ১৯২৮ সনে ৬৩১,০০০ টন নাইট্রেট সার রপ্তানি হইয়াছিল এবং গত বৎসর (১৯২৯ সন) ৬০১,০০০ টন গিয়াছে। ইয়োরোপের মধ্যে ফ্রান্স সব চেয়ে বেশী জার্ম্মাণ নাইট্রেট গ্রহণ করে। ইয়োরোপে অন্যান্য দেশের মধ্যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া (ডেন্মার্ক সমেত), এবং বাল্টিক সাগরের পারের দেশসমূহ উল্লেখযোগ্য। ইয়োরোপের বাইরে জাপান সব চেয়ে বেশী নাইট্রেট সার গ্রহণ করে। কিছুদিন হইতে সুদূর প্রাচ্যের এই ছোট্ট দেশটী কৃষিকার্য্যে 'যুক্তি-প্রয়োগের' দিকে যথেষ্ট মনোনিবেশ করিয়াছে। ফলে এই দেশটি জার্ম্মাণ নাইট্রেট সারের প্রধান বৈদেশিক খরিদ্দারে পরিণত হইয়াছে। ১৯২৮ এবং

১৯২৯ এই উভয় সনেই জার্মাণি হইতে প্রায় ১,৯০,০০০ টন নাইট্রোজেন সোডা এই দেশে চালান গিয়াছে। চীন দেশেও জার্মাণ নাইট্রেট সারের আদর ক্রমশঃ বাড়িতেছে। তবে চীন এখন জাপানেরও অনেক পশ্চাতে। জার্মাণি এই দুই দেশে নিজের জাহাজে নাইট্রেট সার চালান দিয়া থাকে। জার্মাণির সুবিখ্যাত জাহাজ কোম্পানী হামবুর্গ-আমেরিকা লাইনের পূর্ব্ব-আফ্রিকাগামী জাহাজসমূহ এই কার্য্যে যোতায়েন রহিয়াছে।

অ-ইয়োরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে জাপানের পর মার্কিণের স্থান। কিন্তু মার্কিণ জাপানের অর্দ্ধেক গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে মধ্য আমেরিকা, ব্রাজিল এবং ভারতের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু ইহাদের অংশ অকিঞ্চিৎকর।

দক্ষিণ আফ্রিকার ১৮ কোটি পাউণ্ডের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯২৯ সনে য়ুনিয়ন অব্ সাউথ আফ্রিকার বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ ১৮,১১,৮৪,৩২০ পাউণ্ড। ইহা পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে প্রায় ·৪৫ কোটি পাউণ্ড অধিক। য়ুনিয়নের বহির্ব্বাণিজ্য প্রায় ১০৫টি দেশের সহিত, তন্মধ্যে ইংলণ্ড প্রধান। সেখান হইতে ৩·৩ কোটি পাউণ্ডের মাল আসে; মার্কিণ রাজ্য দ্বিতীয়, প্রায় ১·৫ কোটি পাউণ্ডের মাল সে পাঠায়। জার্ম্মাণি তৃতীয়, প্রায় ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের মাল পাঠায়। ইহার পর ক্যানাডা। তাহার পরেই ভারতবর্ষ ২৫,০২,৫০৫ পাউণ্ডের মাল য়ুনিয়নে পাঠাইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে যে সব মাল যায় তাহার তালিকা ও মূল্য প্রদত্ত হইল:

খাদ্যদ্রব্য ...	৭,১৮,২৫৫ পাঃ
সুতা, বস্ত্র, পোষাক ...	১৪,১৭,২৩৫ „
তৈল, মোম, রং ইত্যাদি	২১৮,৭৩৫ „
কাঠ, বেত ইত্যাদি ...	১,০২,৯৯৬ „

চায়ের বাজারে দক্ষিণ আফ্রিকার নয়া দান

দক্ষিণ আফ্রিকায় চায়ের পরিবর্ত্তে ঐ অঞ্চলজাত এক প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ উহা বুশ্ চা নামে অভিহিত। প্যারাগুয়ে এবং ব্রাজিল দেশেও জার্ব্বামেট্ নামক এক প্রকার পদার্থ চায়ের স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দক্ষিণ আফ্রিকার চীজ দক্ষিণ আমেরিকার জার্ব্বামেটের জুড়িদার। চা এবং কফিতে ক্যাফেন্ নামে পরিচিত এক ধরণের মাদক দ্রব্য বর্ত্তমান। বুশ্ চায় এই মাদক দ্রব্য নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা এই পদার্থ পরম পরিতোষের সহিত পান করিয়া থাকে। অন্যান্য দেশেও এই পদার্থ অল্পবিস্তর রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহার রপ্তানি সম্বন্ধে সরকারী দপ্তর হইতে প্রকাশিত হিসাব ভিন্ন অন্য কোন হিসাবপত্র পাওয়ার উপায় নাই। নিম্নে ১৯২৫ সন হইতে ১৯২৮ সন অবধি বুশ্ চা রপ্তানির সরকারী হিসাব প্রদত্ত হইল:—

	ওজন (পাউণ্ড)	মূল্য
১৯২৫	৩,১২১	৯৩ পাঃ (=৪৫৩ ডলার)
১৯২৬	৪,৩৬০	১৭১ „ (৮৩২ „)
১৯২৭	৫,১৪৮	১৯৭ „ (=৯৫৯ „)
১৯২৮	১২,১৮৬	৫৬৬ „ (=২,৭৫৪ „)

(১ পাঃ=৪·৮৬৬৫ ডলার)

থলে পুনঃরপ্তানিতে সিঙ্গাপুরের ইজ্জৎ

১৯২৯ সনে বৃটিশ মালয় রাজ্যে ২৫,৩৬,৩২১ ডলার মূল্যের ১,১৬,২৬,২০০ খানি থলে রপ্তানি হয়। ইহার মধ্যে পুনঃরপ্তানি হয় ২০,১৫,৪৯৫ ডলার মূল্যের ১,০৪,৪৬,৫০০ খানি থলে। বাকী ১১,৭৯,৭০০ খানি থলে মালয় দেশেই বিক্রী হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সিঙ্গাপুর বন্দরটী থলে পুনঃরপ্তানির একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে সরাসর সাইগন, ব্যাঙ্কক ও ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বন্দরসমূহে থলে রপ্তানি করিলে জাহাজ ভাড়া বেশী লাগে। কিন্তু কলিকাতা হইতে প্রথমতঃ সিঙ্গাপুরে রপ্তানি করিয়া পরে সিঙ্গাপুর হইতে ঐ সমস্ত বন্দরে থলে পাঠাইলে ভাড়া কম লাগে। সেইজন্যই সিঙ্গাপুর থলে পুনঃরপ্তানির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মালয় দেশের থলে ব্যবসায় দশজন ব্যবসায়ীর হাতে আছে। এই সমস্ত ব্যবসায়ীর মধ্যে প্রতিযোগিতা এমন ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে যে,

কয়েকজন ব্যবসায়ী মাত্র খরচাটি তুলিয়া লইয়া মাল বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। উহারা কেবল জাহাজ কোম্পানীর প্রদত্ত রিবেট হইতে দু'পয়সা লাভ করে। মাত্র একবার ব্যবহৃত হইয়াছে এমন ধরণের পুরাতন গোটা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থলের মালয় দেশে বেশ কাটুতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

চেকো-শ্লোহ্বাকিয়ার প্রচেষ্টা

১৯২৯ সনে এই দেশের পাইকারী সমবায় সমিতিটী ৪৬৪,৭৭৫ কুইণ্ট্যাল কৃষিদ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল। ইহার মধ্যে দোকানদারদের নিকট হইতে কেনা হয় শতকরা ৪২ ভাগ এবং কৃষি-সমবায় সমিতি ও কৃষকের নিকট হইতে বাকী শতকরা ৫৮ ভাগ কেনা হয়। ১৯২৮ সনে পাইকারী সমবায় সমিতি এবং কেন্দ্রীয় ক্রয় সমিতি—এই দুইটি সমবায় সঙ্ঘের মধ্যে এক চুক্তি হয়। তদনুসারে এই উভয় সঙ্ঘ মিলিত হইয়া একটি মিলিত কমিটি নিযুক্ত করে। এই চুক্তিই যে সমবায়ী ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই দেশে গত বৎসর মোট ৩০০ নূতন সমবায় সমিতি হইয়াছে। এই দেশের ঋণ সমিতিগুলি সংখ্যায় খুব বেশী। এইরূপ সমিতি চেকো-শ্লোহ্বাকিয়ায় ৯৮২০টি আছে। তাহাদের আমানতী দায়িত্বের সমষ্টি প্রায় ২০,০০,০০০ ক্রোনেন। ইহাদের অংশলব্ধ মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে।

চেকোশ্লোহ্বাকিয়ায় ১০৬টি বিজলী সমিতি আছে। এইরূপ সমিতি হওয়ায় অনেক নূতন নূতন জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা হইতেছে। ডেয়ারি সমিতিগুলিও বেশ উন্নত হইতেছে। গত বৎসর এই সমিতিগুলি ৩২ গাড়ী মাখন, ২১ গাড়ী পনির এবং প্রায় ৫৫,০০,০০০টি ডিম বিক্রয় করিয়াছে।

চেকোশ্লোহ্বাকিয়ার বিক্রয় সমিতিগুলির বিক্রয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

(ভাণ্ডার)

মোটর-সম্পদে মার্কিণ, ক্যানাডা ও হাওই দ্বীপ

প্রশান্ত মহাসাগরের হাওই দ্বীপে প্রত্যেক ছয়জন লোকের একখানি মোটরকার আছে। মার্কিণ রাষ্ট্রে প্রত্যেক পাঁচ জনের (৪·৯) ও ক্যানাডায় প্রত্যেক আট জনের (৮·২) একখানি করিয়া মোটরকার আছে। ১৯১৯ সনে ক্যানাডার ১,১৯৩,৮৮৯ খানি গাড়ী ছিল; ১৯২৮ সনের চেয়ে ১,১৭,০৭০ খানি বা শতকরা ১০·৯% গাড়ী বাড়িয়াছিল।

দুনিয়ার স্বর্ণ-সংগ্রাম

গোটা দুনিয়ায় বর্ত্তমানে সোনা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য দারুণ প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। প্রত্যেক দেশই এসম্বন্ধে প্রত্যেক দেশকে প্রতিযোগিতার চক্ষে দেখিতেছে। বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের ফলে সমস্ত দেশের স্বর্ণমান-প্রথা একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু লড়াই শেষ হইবার পর সমস্ত বড় বড় দেশ আবার স্বর্ণমানে ফিরিয়া আসিয়াছে। সর্ব্বশেষে জাপানে পর্য্যন্ত স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দুনিয়ার বড় বড় দেশগুলির জাতীয় ব্যাঙ্কসমূহে এখন কি পরিমাণ সোনা জড় হইয়াছে এ সম্বন্ধে জাপানের সরকারী রাজস্ব-বিভাগীয় দপ্তর হইতে সম্প্রতি একটি মাপজোক বাহির হইয়াছে। উহাতে ১৯২৯ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত সময়ের হিসাব আছে। নিম্নের তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের মৌজুত সোনার তুলনামূলক পরিচয় দেওয়া হইল। সোনার মূল্য ডলারে দেওয়া হইল। নিম্নের অঙ্কগুলি দশ লক্ষ গুণ করিয়া বুঝিতে হইবে।

দেশের নাম	১৯২৯	১৯২১	১৯১৩
মার্কিণ	৪,০০৮	৩,৯৭৭	১,২৯০
বিলাত	৭৪৮	৭৪২	১৭০
ফ্রান্স	১,৫৪৫	৯৫৪	৬৭৯
জাপান	৫৪১	৫৪২	৬৫
জার্ম্মাণি	৫২৭	৪৪৪	২৭৯
ইতালি	২৭২	২৩৯	২৬৫
স্পেন	৪৫৯	৫০২	৯২

দেশের নাম	১৯২৯	১৯২৭	১৯১৩
আর্জ্জেন্টিনা	৫০৭	৫২৭	২৫৬
হল্যাণ্ড	১৭৮	১৬১	৬১
ব্রাজিল	১৫১	১০১	৫৩
বেলজিয়াম	১৪২	১০০	৫৯
বৃটিশ ভারত	১২৮	১১৯	১২৪
অষ্ট্রেলিয়া	১২৬	১০৫	২২
সোভিয়েট রুশিয়া	১৪২	৯৭	৭৮৭
সুইট্‌জারল্যাণ্ড	১০৩	১০০	৩৩
ক্যানাডা ...	৭৭	১৫২	১১৭

উপরের তালিকায় যে হিসাব দেওয়া হইল তাহা সমস্ত দেশের পক্ষে প্রায় একই সময়ের হিসাব। তবে আর্জ্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের হিসাব ১৯২৯ সনের আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্তের এবং সোভিয়েট রুশিয়ার হিসাব ১৯২৯ সনের অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্তের।

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে মার্কিণের স্থান সকলের উপরে। দুনিয়ার ৪১% সোনা মার্কিণ দেশে জড় হইয়াছে।

তালিকার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, লড়াইয়ের আগের চেয়ে বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক দেশেই মৌজুত সোনায় ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অনেক দেশে আইন করিয়া স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন একরূপ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থান-বিশেষে আবার স্বর্ণমুদ্রার শাসনকার্য্য সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের অথবা জাতীয় ব্যাঙ্কের তাঁবে আনা হইয়াছে। মৌজুত সোনা বৃদ্ধি পাইবার প্রধান কারণ এই দুইটি।

ভারতের বস্ত্র-শিল্প

ইন্টারন্যাশনাল কটন ফেডারেশনের সম্পাদক মিঃ আর্ণো এস পিয়ার্স ভারতের বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত তাঁহার পরিভ্রমণ শেষ করিয়া যে রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন তার কিছু কিছু অংশ ইতিপুর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে। এক্ষণে আরও কিছু দেওয়া যাইতেছে।

১৯১৪ সনের চেয়ে অধুনা সূতা কাটিবার টেকোর মোট সংখ্যা ১,০২,৩১,৩১৪ বাড়িয়াছে। কিন্তু চীন, জাপান ও ভারতবর্ষে টেকোর সংখ্যা লোক-সংখ্যার অনুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ার দরুণ যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর ইয়োরোপের বস্ত্র-ব্যবসায়িগণ একরূপ নিঃশঙ্কচিত্ত ছিল। কিন্তু টেকোর সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা এই শিল্পের যথার্থ বিস্তার অনুমান করা যায় না। মিলসমূহের মাল-উৎপাদনের ক্ষমতা অর্থাৎ দৈনিক কত ঘণ্টা কল চলে, সাবেক টেকো ও যন্ত্রপাতি হইতে এইসকল কলে ব্যবহৃত টেকো ও যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

এই উপায়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উপরোক্ত ১,০২,৩১,৩১৪ সংখ্যক টেকো বৃদ্ধি কার্য্যতঃ ল্যাঙ্কাশিয়ারের ২,২০,০০,০০০ টেকোর সমতুল্য। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণা এই যে প্রাচ্য দেশসমূহে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে মজুর পাওয়া যায় বলিয়া ইয়োরোপের ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট লাভজনকভাবে ঐ সব দেশে ব্যবসায় চালাইতে পারে না। কিন্তু ইহাই প্রধান কারণ নহে। বস্তুতঃ ভারত ও চীনের মজুরদের চেয়ে ইয়োপের মজুরদের কার্য্যক্ষমতা বেশী। জাপানে মজুরের বেতন প্রায় ইয়োরোপের সমান; কিন্তু কার্য্যক্ষমতায় জাপানের মজুর ইয়োরোপের সমকক্ষ। অধিকন্তু বয়নশিল্পে জাপান ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশ হইতেই উন্নত।

ভারত ও জাপান

ভারতের বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে যাইয়া মিঃ পিয়ার্স বলিয়াছেন, এরূপ মিল খুব কমই আছে যাহাতে কেবলমাত্র সূতাই কাটা হয়। প্রায় সমস্ত মিলেই সূতাকাটা, বস্ত্রবয়ন, ব্লিচিং ও রঞ্জন একসঙ্গে হইয়া থাকে। ভারতে এমন কতকগুলি মিল আছে যেগুলি উৎপাদন-ক্ষমতায় ও উৎপন্ন সূতার প্রতি পাউণ্ডের মূল্য-হিসাবে পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিলসমূহের সহিত তুলনীয় হইতে পারে।

মোটের উপরে ভারতীয় মিলসমূহের কলকব্জা এত আধুনিক ও উন্নত যে কতিপয় শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মিলের মালিকগণ লেখককে এই মর্ম্মে আশ্বাস দিয়াছেন যে, ৪০নং পর্য্যন্ত সূতার কাপড়ের ব্যবসায় বিশেষতঃ সম্প্রতি ট্যারিফের অতিরিক্ত শুল্কের ব্যবস্থা হওয়াতে তাহারা ল্যাঙ্কাশিয়ারের প্রতিযোগিতাকে একটুও ভয় করেন না। ৪০ অপেক্ষা অধিক নম্বরের সূতার মিহি কাপড়ের ব্যবসা সম্পর্কেও বিশেষ ভয়ের কারণ আছে বলিয়া তাহারা মনে করেন না।

ভারতে কাপড়ের কলের মজুর

মজুরের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া মিঃ পিয়ার্স বলিয়াছেন যে, বোম্বাইয়ে মজুরদিগের মধ্যে শতকরা মাত্র ২০ জনকে স্থায়ী মজুর বলা যাইতে পারে। কিন্তু বোম্বাইয়ের উত্তরাঞ্চলে এই শতকরা হার আরও বেশী। মজুরগণ একই কলে কতদিন কাজ করে তাহার ঠিক

খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু মোটের উপর অনুমান করা যায় যে, গড়ে প্রত্যেক শ্রমিক একই কলে ৬ হইতে ৮ মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করে। প্রায় সব শ্রমিকই বিবাহাদি উপলক্ষে মাঝে মাঝে তাহাদের গ্রামে যাইয়া থাকে—অনেকে বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ক্ষেতে কাজ করিবার জন্ত দেশে যায়। শ্রমিকের সংখ্যা এইরূপে প্রায়ই কমে ও বাড়ে; এই হেতু জাপানের স্তায় এই দেশেও যাহাতে নূতন লোককে শিক্ষা দিয়া শ্রমিকরূপে ভর্ত্তি করা যাইতে পারে এইরূপ বিশেষ শ্রমিক শিক্ষালয় স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

তিনি বলেন যে, ভারতের—বিশেষতঃ বোম্বাই মিলের—মজুর বেশীর ভাগই কাজের অনুপযুক্ত। উহাদের দেহ ক্ষীণ, এবং ইহারা প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। যতদূর জানা যায়, ইহারা নিতান্ত নিম্নপ্রণালীতে জীবন যাপন করে এবং প্রায়ই—নারিকেলের তাড়ি খাইয়া থাকে। ইহাদের কোন শিক্ষা কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই। ইহারা এত অসাবধান যে প্রায়ই মিলের কাঁচামাল ও অন্তান্ত দ্রব্যের অপচয় ঘটায়। স্বভাবতই ইহাদিগের মধ্যে শ্রমশীলতা, রীতিপরায়ণতা ও সঞ্চয়শীলতা নাই। এই শ্রেণীর শ্রমিক দ্বারা কোন শিল্প-কেন্দ্রই পরিণামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সম্পাদন করা মিলের মালিকদিগের কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের অভিভাষণ

গত ১লা আগষ্ট তারিখে বেঙ্গল ন্তাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সে'র ত্রৈমাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নে তাঁহার অভিভাষণের কোন কোন অংশের মর্ম্ম দেওয়া গেল:

বর্ত্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে দারুণ দুর্য্যোগ তাহা হইতে কি করিয়া অব্যাহতি পাওয়া যায় তাহা লইয়া আলোচনা করা এবং কয়েকটী হদিস বাতলানো যাইবে। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে গবর্ণমেণ্ট নূতন ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাঘটিত আদান-প্রদান সমস্তই এক্সচেঞ্জের উপর নির্ভর করিতেছে। সময়ে সময়ে এই এক্সচেঞ্জের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রতিকারের এক নম্বর উপায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খোলা বাজারের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সরকারী ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা; অর্থাৎ সিকিউরিটিসমূহের বিপরীত বাজার দর দেখিলেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা ক্রয় করিয়া লওয়ার দরকার। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু আদৌ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ফলে গবর্ণমেণ্টের বাজার-সম্ভ্রম নষ্ট হইয়াছে। রাজস্ব সচিব বলিতেছেন যে, বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে সরকারী খরচ বাড়িয়া যাইতেছে এবং গবর্ণমেণ্ট সুদের হার চড়াইয়া দিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্ত এই—রাজনৈতিক আন্দোলন কি জন্ত এবং কি পরিমাণে গবর্ণমেণ্টকে কর্জ্জ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে? ধনিগণ গবর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস হারাইয়া অন্ত ব্যাপারে টাকা খাটানোই অধিকতর নিরাপদ বিবেচনা করিতেছেন কি? না, গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিবার জন্ত লোকে গবর্ণমেণ্টকে ঋণদান করিতে অস্বীকৃত হইতেছে? গবর্ণমেণ্ট যে নূতন কর্জ্জ গ্রহণ করিতেছেন তাহার সুদের হার অযথা বেশী হইয়াছে। এই মত কোন কোন বিলাতী খবরের কাগজেই প্রচারিত হইয়াছে।

এদেশে নয়া কর্জ্জ পাওয়া যাইবে না, গবর্ণমেণ্টের এইরূপ ধারণা সত্য নহে। বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কের সুদের হার অত্যন্ত চড়া; এ সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট অল্পদিনের মেয়াদে ট্রেজারি বিলের পরিবর্ত্তে ৫৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং ভারতের জনসাধারণ যে গবর্ণমেণ্টকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতেছে না ইহা বলা চলে না।

এই নয়া সরকারী কর্জ্জ সম্বন্ধে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত ১৪,৯০ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। উহার মধ্যে ট্রেজারি বিল বাবদ ৬১৩ লক্ষ টাকা, ১৯৩০ সনের বণ্ড বাবদ ৪০০ লক্ষ টাকা; এবং নগদ ৪৭৭ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। কর্জ্জের কারণ এই যে, গবর্ণমেণ্টকে এই সনে ১৯৩০ সনের ১৫ কোটি টাকার বণ্ড এবং ৫৭ কোটি টাকার ট্রেজারি বিল শোধ করিতে হইবে, এ জন্ত গবর্ণমেণ্টের নগদ ৭৪ কোটি টাকা আবশ্যক।

রাজস্ব-সচিব মহাশয়ের মতে মার্চ্চ হইতে জুলাইয়ের প্রথম পর্য্যন্ত দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ সঙ্গীন ছিল। অথচ ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই ট্রেজারি বিলের বিক্রয় সর্ব্বোচ্চ সীমায় উঠে এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ দ্রুত-বেগে গবর্ণমেণ্টের খাজাঞ্চিখানায় টাকা জমা হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ মার্চ্চ মাস হইতে জুলাই মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত সিকিউরিটিসমূহের দাম আদৌ কমিয়া যায় নাই। মার্চ্চ-মাসের গোড়ায় বরং উন্নতি দেখা গিয়াছিল। এ সত্ত্বেও রাজস্ব সচিব গাহিয়া বেড়াইতেছেন, পুঁজিপতিদের সিকিউ-রিটির উপর আস্থা কমিয়া গিয়াছে এবং রাজনৈতিক আন্দোলন ইহার জন্য দায়ী। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্ট সিকিউ-রিটির পশ্চাদ্বর্ত্তী সিকিউরিটিসমূহের উপর পুঁজিপতিদের আস্থা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইলেও গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব সিকিউরিটিসমূহের উপর তাহাদের আস্থা সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কর্জ্জগ্রহণ-প্রণালী ইহার জন্য দায়ী। রাজস্বসচিব যদি ভারতবাসীর নিকট হইতে কর্জ্জ আদায় করিতে চান তাহা হইলে তাঁহাকে রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এবং শক্ত বনিয়াদের উপর সরকারী ক্রেডিট-নীতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। বড়ই দুঃখের বিষয় সরকারের বর্ত্তমান ক্রেডিট্‌নীতিতে এই দুই বস্তুরই নিতান্ত অভাব। গবর্ণমেণ্টের কর্জ্জ পরিশোধ ব্যাপারটিও বৈজ্ঞানিক উপায়ে হওয়া দরকার। এ সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞানসেবীরা অনেক হদিস বাতলাইয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ফলে সরকারী রাজস্ব-নীতি প্রকৃত অর্থনৈতিক পন্থায় চলিতে পারে নাই; এবং অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, রাজস্ব সচিব চড়া হারে সুদ দিতে স্বীকৃত হইলেও প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান সিকিউরিটিসমূহও আবার ভীষণ ধাক্কা খাইয়াছে। এই ধাক্কার তাল সামলাইতে অনেক সময় লাগিবে; এমন কি তাল সামলানো অসম্ভবও হইতে পারে। ব্যাঙ্ক এবং ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীগুলি এই নূতন সরকারী কর্জ্জের তিলমাত্র অংশভাগী হইবে না, বাধ্য হইয়া এইরূপ পণ করিতেছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান ছাড়া উপায় নাই।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং ৬% সুদ দিতে কবুল করিতেছেন; মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির এবং বেসরকারী ব্যবসাদারদের অবস্থা যে কি দাঁড়াইয়াছে তাহা অনুমেয়। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ কায়েম করার এবং জনসাধারণের হিতকর কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠানের জন্য পুঁজিপাটা আর কোথায় মিলিবে? গবর্ণ-মেণ্টকে যদি আপন রাজস্ব-সমস্যা এবং ভারতের অন্যান্য সমস্যা সমাধান করিতে হয় তবে তাঁহাকে দেশের প্রতিনিধিবর্গের নিকট দায়িত্বসম্পন্ন হইতে হইবে। এ ছাড়া আর অন্য গতি নাই।

বাঙ্গালার পাটের ব্যবসায়টী মাটী হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার কারণ একপক্ষে চাষীদের অজ্ঞতা, অপর পক্ষে জুট মিলের মালিকগণের আত্মঘাতী ঔদ্ধত্য। সারা বৎসর ধরিয়া কৃষকদিগকে পাটের আবাদ কম করিবার জন্য বলা হইয়াছিল। তবুও জুটমিলগুলিতে মজুরদের খাটিবার সময় বাড়াইয়া দেওয়ায় জন্য জিদ করা হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মিলওয়ালাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে কার্য্যকাল বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সকলেই এখন ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছে। সকল শ্রেণীর মিলওয়ালারা এখন একজোট হইয়া উৎপাদন কমাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। মিলওয়ালারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারায় ঐরূপ সম্ভব হইল। পক্ষান্তরে কৃষকগণ এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে জানে না। তাহাদের কাণ্ডজ্ঞান খুব কম। সুতরাং তাহারা আত্মরক্ষা করিতে অপারগ হইয়াছে। পাট-শিল্পের নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং লক্ষ্য হইবে অধিকাংশ মানুষের সর্ব্বোচ্চ হিতসাধন। স্বরাজপ্রাপ্ত ভারত বা স্বরাজপ্রাপ্ত বাঙ্গালার এইটাই হইবে সর্ব্বপ্রথম ধান্ধা। কিন্তু বর্ত্তমানে পাটের আবাদ কমানোই প্রথম কর্ত্তব্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মগজে প্রথম এই চিন্তার আবির্ভাব হয়। মিলওয়ালারা তখন দেশবন্ধুর এই মোসাবিদার বিষম বিপক্ষতাচরণ করে। মিলওয়ালারা এখন নিজেরাই ভীষণভাবে উৎপাদন কমাইতেছে। সুতরাং এখন তাহারা আর চাষীদিগকে পাটের আবাদ অব্যাহত রাখিতে বলিতে পারে না। আবাদ কমানো অর্থনীতি-বিরুদ্ধ নহে। যোগান ও চাহিদা—এইটাই

অর্থনৈতিক জগতের সর্ব্বপ্রধান বিধি। আবাদ কমান ব্যাপারে এই অতি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক নিয়মই পালন করা হইবে। অন্যান্য দেশে এইরূপ কঠিন অবস্থায় রাষ্ট্র স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিয়া পাটের আবাদ কমাইয়া দিত বা ইহার আনুষঙ্গিক উপদ্রবগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা করিত। কোন গবর্ণমেণ্টই এইরূপে দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যবসাটি মাটী হইয়া যাইতে দিত না এবং দেশের অধিকাংশ লোকের মঙ্গল সম্বন্ধে এরূপ অমার্জ্জনীয় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে পারিত না। অবস্থা যখন এমন দাঁড়াইয়াছে তখন দেশের স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া আর উপায় কি? আশা করা যায় ইঁহারা নিশ্চয়ই এসম্বন্ধে উদাসীন রহিবেন না। বাঙ্গালার লোক একেই তো দুর্দ্দশাগ্রস্ত; তাহার উপর আবার পাটের দাম কমিয়া যাওয়ায় তাহাদের দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়াছে। এদিকে অবহিত হইতে হইবে।

নিখিল ভারত ডাক ও আর, এম, এস্ ইউনিয়নের বাৎসরিক বিবরণী (১৯২৮-২৯)

আলোচ্য বৎসরে ডাকপিওন ও নিম্ন গ্রেডের ডাক কর্ম্মচারীদের বেতনের হার পরিবর্ত্তিত করা হয়। মেল গার্ডগণ এত দিন যাবৎ ওভারসিয়ার ও শাখা পোষ্টমাষ্টারদের সমান বেতন ভোগ করিয়া আসিতেছিল। আলোচ্য বৎসর হইতে তাহাদের বেতন ডাক্পিওনের সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাণার প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বেতনের কোন প্রকার সন্তোষজনক পরিবর্ত্তন হয় নাই, বরং কোন কোন স্থলে তাহাদের বেতনের হারের পরিবর্ত্তন বিপরীত দিকে হইয়াছে। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, বিভাগের যে সমস্ত অতিরিক্ত কর্ম্মচারী বিভাগের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে এবং একমাত্র যাহাদের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে ডাকের কার্য্য বিস্তার করা সম্ভব হইয়াছে এবারে তাহাদের বেতন বাড়ান হয় নাই। ইউনিয়ন পুনঃ পুনঃ গবর্ণমেণ্টকে এই সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য তাগিদ দিয়াছে। টাউন ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা, নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের নিয়োগের পূর্ব্বে পরীক্ষা প্রচলন, কেরাণীদের চাকরী পাকা হইবার পূর্ব্বে পরীক্ষা-গ্রহণ ইত্যাদি কারণে অধিকাংশ সভ্য অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

সভ্য-সংখ্যা

১৯২৯ সনের ৩১শে মার্চ্চ ইউনিয়নের সভ্য-সংখ্যা ছিল ২৮,৭৩৩ জন।

আর্থিক অবস্থা

১৯২৯ সনের ১লা এপ্রিল ওপেনিং ব্যালান্স ছিল ৫,৭৪৪৶২ পাই। আলোচ্য বৎসরে মোট আয় ৭,১০৫৶৩ পাই, এবং মোট খরচ ৭৯৫১৸৯ পাই হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য বৎসরে লোকসানই দেখা যাইতেছে। এই লোকসান পূরণ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব বৎসরের অতি কষ্টে অর্জ্জিত লাভের টাকা হইতে ৮৪৬৷৵৬ পাই বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। অতএব বৎসর শেষে ব্যালান্স কমিয়া ৪৮৯৭৷৶৮ পাই দাঁড়ায় এবং ইহার মধ্যে ২৬৮৪৷০ আনার ক্যাস সার্টিফিকেট কিনিয়া রাখা হয়। মোট লাভের ৬৩৪৷৵০ আনা পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তের শাখা অফিস পূর্ব্বে অগ্রিম দিয়াছে। পাঞ্জাবের শাখা এই অসময়ে ইউনিয়নের খুব উপকার করিয়াছে। পাঞ্জাব হইতে আবশ্যকমত অর্থ না আসিলে ক্যাস সার্টিফিকেটগুলি ভাঙ্গাইয়া অভাব পুরাইতে হইত এবং তাহাতে সুদ প্রভৃতির দিক্ দিয়া ইউনিয়নের অনেক অর্থ নষ্ট হইত।

বাৎসরিক অধিবেশন

ইউনিয়নের সভার বাৎসরিক অষ্টম অধিবেশন ১৯২৮ সনের ২৪শে, ২৫শে, ২৬শে, এবং ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রেঙ্গুনে বসে। মিঃ ইউ, প টান বার-এট-ল, এম্-এল্-সি রিসেপ্শান কমিটির সভাপতি ছিলেন, এবং মিঃ মির্জ্জা মোহাম্মদ রাফি বার-এট-ল এম্-এল্-সি অধিবেশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

উপস্থিত সভ্যসংখ্যা নিম্নরূপ :—

বাঙ্গালা ও আসাম	...	২০
বোম্বাই	...	১৩

মাদ্রাজ	...	১০
যুক্ত প্রদেশ	...	৪
পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	...	৪
মধ্য ভারত	...	২
বিহার ও উড়িষ্যা	...	৩
ব্রহ্ম দেশ	...	৮২
		১৩৮

এই অধিবেশনের জন্য মোট খরচ হইয়াছিল ৩,৪২৭।৶৬ পাই।

সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের পরীক্ষা, রিজার্ভ কেরানী-দের চাকরী পাকা করিবার পূর্ব্বের পরীক্ষা, একাউন্টেন্টদের পরীক্ষা, সহর ইন্‌স্পেক্টরদের কার্য্য নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ের খুঁটিনাটি ধরিয়া অনেক তর্কবিতর্কের পর মনোমত মীমাংসা হইয়াছিল। তা ছাড়া ঠিক হয় যে, এই বিভাগের সমস্ত অভাব অভিযোগ সর্ব্বদা গবর্ণমেন্টের দৃষ্টিগোচর করিবার জন্য ইউনিয়ন হইতে একটা ডেপুটেশন বসান হইবে। নিখিল ভারত ইউনিয়নের এবং বিভিন্ন জেলার শাখাগুলির কার্য্য-পরিচালনের জন্য যে সমস্ত নিয়ম কানুনের খসড়া পূর্ব্বে করা হইয়াছিল এই অধিবেশনে তাহা কায়েম করিয়া কাজে লাগান হয়। সমস্ত প্রাদেশিক শাখার সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ ছাড়া ইউনিয়নের পত্রিকা "জেনারেল লেটার" যাহাতে সমস্ত সভ্য ও প্রাদেশিক শাখাগুলি হইতে চাঁদা দিয়া লওয়া হয় সেই ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইহার পূর্ব্বে এই পত্রিকা সমস্ত প্রাদেশিক ও জেলা শাখায় এবং কাউন্সিলরকে বিনামূল্যে প্রদান করা হইত। ইউনিয়নের খরচ যোগাইবার জন্য নিয়ম করা হয় যে প্রত্যেক প্রাদেশিক ও জেলা শাখা এবং কাউন্সিলের সদস্য "জেনারেল লেটার" পত্রিকা বাৎসরিক দেড় টাকা চাঁদা দিয়া লইবেন। বাজেট এষ্টিমেটে এই দফায় ১০০৲ টাকা উঠিবার কথা ছিল; কিন্তু কার্য্যতঃ ১১৪॥৯ পাইএর বেশী উঠে নাই।

বাঙ্গালা ও আসাম শাখা হইতে "লেবার" নামক একটী পত্রিকা প্রচার করা হয়। ডাক-কর্ম্মচারীদের হিতকর ব্যাপার সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা এই পত্রিকায় আলোচিত হয়।

বাঙ্গলা, বোম্বাই, বিহার, মাদ্রাজ এবং যুক্ত প্রদেশের শাখাগুলি হইতে "জেনারেল লেটার" ইংরাজী ভাষা বাদে প্রদেশের নিজ নিজ ভাষায়ও প্রচারিত হইয়া থাকে।

মিউচুয়াল বেনিফিট ফণ্ড

মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে প্রাদেশিক শাখায় মিউচুয়াল বেনিফিট ফণ্ড আছে। পাঞ্জাব ফণ্ডের দিন দিন উন্নতি হইয়াছে এবং ইহার বর্ত্তমান অবস্থা খুবই ভাল।

স্পেশাল রিজার্ভ ফণ্ড

রেঙ্গুন কনফারেন্সে রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা কেন্দ্রীভূত করা সাব্যস্ত হয়।

কার্য্যকলাপ

গত নিখিল ভারত অধিবেশনে একটা নূতন ডেপুটেশন কায়েম করা স্থিরীকৃত হয়। এই ডেপুটেশনের কার্য্য হইবে ডিরেক্টার জেনারেল অব পোষ্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের মারফতে শিল্প এবং মজুর বিভাগের ব্যবস্থাসচিবকে ইউনিয়নের উদ্দেশ্য এবং সভ্যদের অভাব অভিযোগ সবিস্তারে বর্ণনা করা। ইহার কয়েকটা বিষয় নিম্নরূপ :—

(ক) সিলেক্‌শন গ্রেড পরীক্ষা।

(খ) রিজার্ভ ক্লার্কের পরীক্ষা।

(গ) একাউন্টেন্টদের পরীক্ষা এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি।

(ঘ) টাউন ইন্সপেক্টার নিয়োগ।

(ঙ) বন্যার জন্য গুজরাট ও কাথিওয়ারের পীড়িত কর্ম্মচারীদের নিকট অগ্রিম জমা টাকার উদ্ধার।

(চ) চিফ্‌ ক্লার্ক এবং সর্টার পদের প্রচলন।

(ছ) বার্গা এলাউন্সে।

নিম্নলিখিত আরও কতকগুলি অভাব অভিযোগে ইউনিয়ন আলোচ্য বৎসরে হাত দিয়াছিলেন :—

(ক) সিগনালারদের ওভারটাইম এলাউয়েন্স।

(খ) ব্রহ্মদেশের ডাক এবং আর, এম, এস কর্ম্মচারীদের বিনামূল্যে বাসস্থান।

(গ) রিজার্ভ কেরাণীদের ফ্রী কোয়ার্টারস্।

(ঘ) পোষ্টম্যানদের ষ্টেশনারী সরবরাহ।

(ঙ) অফিসিয়েটিং চাকরী সাব্যস্তের পর বেতনের নির্দ্দিষ্ট হার।

(চ) নিম্নতম শ্রেণীর কর্ম্মচারীবের বাসগৃহের ভাড়া এ্যালাউয়েন্স।

(ছ) ডাকঘরের ও আর, এম, এস্ কর্ম্মচারীদের বেতনের সমতা।

(জ) গ্রেডেশন্ লিষ্টের শ্রেষ্ঠতা।

(ঝ) অভিজ্ঞ পিওনকে আর, এম, এস্ ইন্স্পেক্টর নিযুক্ত করা।

(ঞ) গ্রাজুয়েট এবং আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের উচ্চতর পদে প্রমোশন।

(ট) নিম্নতম চাকর বাকরদের ছুটীর বেতন।

(ঠ) কেরাণীদের বাসস্থান।

(ড) ডাকএবং আর, এম, এস্ বিভাগের কর্ম্মচারীদের পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনবর্গের বিভাগীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইবার দাবী।

ভারতীয় চা ও টী সেস কমিটী

চা-এর বাজার খুবই মন্দা। যে পরিমাণ চায়ের কাট্‌তি হইতে পারে ১৯২৮ সনে তাহার চেয়ে ৪·৩ কোটি পাউণ্ড চা বেশী উৎপন্ন হইয়া গুদামজাত হয়। সেই জন্য স্থির হয় যে, ১৯২৯ সনে ৫·৭ কোটি পাউণ্ড চা কম প্রস্তুত করা হইবে। কিন্তু এবিষয়ে কাজ হইতেছে কিনা সন্দেহ। কারণ প্রতিনিয়তই দেখা যাইতেছে যে, বাগিচার উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার জন্য কৃত্রিম সারের চাহিদা বাড়িতেছে এবং নূতন নূতন জমিতে প্লানটেশন হইতেছে। সরকারী প্রতিবেদন অনুসারে গত দশ বৎসরে ৯২,০০০ একর পুরাতন জমিতে চা চাষ বন্ধ হয়। কিন্তু তাহার স্থানে ১,৮০,০০০ একর নূতন জমি আবাদও হয়। সুতরাং চাহিদার চেয়ে যোগান বেশী হইবে।

ভারতবাসীরা গড়ে চা খুব কম খায়—মাথাপিছু মাত্র বৎসরে ·১৪ পাউণ্ড বা এক ছটাক। বাৎসরিক গড় এক পোয়া করিতে পারিলে বিস্তর বিক্রয় ভারতেই হইবে। এই জন্য ভারতের নানাস্থানে প্রচারকার্য্য চলিতেছে। রেলে বাজারে সাইন বোর্ড দেওয়া হইয়াছে। চা'র দোকানে প্রায় ৪২৫০ ডজন ছাপমারা পেয়ালা পিরীচ দান করা হইয়াছে।

গত বৎসর ৩৪১টি খুচরা চা-এর ষ্টল ও পাতা-বিক্রয়ের জন্য ১৩৭৩টি চা-এর দোকান খোলা হইয়াছিল। ৪৫৮৫৩৩ পাউণ্ড ওজনের চা-এর অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল। আর প্রায় চারি হাজার ডজন পয়সা-প্যাকেট চা বিক্রয় হয়। চা-এর ব্যবহার যাহাতে বাড়ে তার জন্য টী সেস কমিটী দেশবিদেশে খুবই চেষ্টা করিতেছে। ১৯৩০-৩১ সনে চা-এর প্রচারের জন্য কমিটী ৭½ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছে। আমেরিকায় চা প্রচারের জন্য ৪০০০০ পাউণ্ড ও তথাকার রন্ধন ও গৃহস্থালী শিখাইবার স্কুলে শিক্ষা দিবার জন্য আরও ১০০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিবে স্থির করিয়াছে।

বহুকাল যাবৎ ভারতীয় চা কোম্পানীদের চা বিষয়ে একচেটিয়া ছিল। কিন্তু অধুনা ওলন্দাজ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর চা-বাগিচা খোলা হইয়াছে। সুমাত্রা জাভার চা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে গিয়া আজ ভারতীয় চা-এর ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। রুশিয়া বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে চাএর খরিদ্দার ছিল। গত বৎসর এ বিষয়ে চেষ্টা হয়। কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। রুশিয়ার ন্যায় অত বড় রাজ্যটি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। সুমাত্রার ৯০,০০০ একর চা-এর বাগিচা আজ ভারতীয় চা-এর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং টী-সেস-কমিটি যদি বিশেষ চেষ্টা না করে তবে এই প্রতিযোগিতায় আত্ম-রক্ষা করা দায় হইবে।

যবদ্বীপে চা শিল্পের অবস্থা

গত ২৫শে জুলাই তারিখে লণ্ডন সহরে "এ্যাংলো ডাচ প্ল্যাণ্টেশানস অব্ জাভা" নামধেয় সুবৃহৎ চা কোম্পানীর উনত্রিংশ সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে কোম্পানীর তথা গোটা যব দ্বীপের

চা-শিল্পের মোটামুটি অবস্থার কথা জানিতে পারা যায়। নিম্নে বক্তৃতায় সারাংশ প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য সনে কোম্পানী মোটের উপর ১৪,৩৬৪,৯৪৭ পাউণ্ড চা উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য সনের উৎপাদন ২,৫৫,২৫৮ পাউণ্ড কমিয়াছে। কোম্পানীর তাঁবে মোট ২২,৫৫৯ একর জমিতে চায়ের আবাদ হইয়াছে। আলোচ্য সনে একর প্রতি চায়ের ফসল দাঁড়াইয়াছে ৬৩৬ পাউণ্ড। পূর্ব্ব বৎসর ফসল দাঁড়াইয়াছিল ৬৪৭ পাউণ্ড।

উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণ এই যে, গত বৎসর জুন মাস হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত যবদ্বীপে দারুণ অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। চা উৎপাদন কমিলেও দুর্ভাগ্যক্রমে দর মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। গত বৎসর প্রথম প্রথম চায়ের দর একটু চড়ে বটে কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দর আবার নামিয়া যায়; বৎসরের শেষে চা-শিল্পের ভীষণ দুর্য্যোগ যেন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

দুর্য্যোগ হইতে নিস্তার পাইবার উপায় চা শিল্পের নিজের হাতেই আছে। বড় বড় চা কোম্পানীগুলি জোট বাঁধিলেই এই দুর্য্যোগ কাটিয়া যাইতে পারে। কারণ গোটা দুনিয়ার চায়ের আবাদ অধিকাংশই বাঘাবাঘা কোম্পানীগুলির করায়ত্ত। কোম্পানীগুলি এই পরম সত্যটী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তাই গত বৎসর এক চীন ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত দেশের চা-কোম্পানী একই জোট হইয়া উৎপাদন-হ্রাসের জন্য চেষ্টা করে। চীন বাদ পড়ায় তেমন কিছুই ক্ষতি হয় নাই; কারণ চা-শিল্পে চীনের স্থান এখনও অনেক নীচে। মোট কথা ১৯৩০ সনে যাহাতে ১৯২৯ সনের চেয়ে কম চা উৎপন্ন হয় কোম্পানী-গুলি এমন ব্যবস্থা করিয়াছে। উৎপাদন হ্রাস করায় ফলও পাওয়া গিয়াছে।

চায়ের দর আর কমিতে পারে নাই, দর একরূপ নিশ্চল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আলোচ্য সনে এ্যাংলো ডাচ্ কোম্পানীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ১১·৩ পেন্স অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ০·৩৫ পেঃ কম; উৎপাদনের খরচা পাউণ্ড প্রতি ৮·১৩ পেঃ অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে কিছু বেশী। জমিতে সার দেওয়ার নূতন নূতন ব্যবস্থা করায় খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর কোম্পানীটী উহার মোট উৎপাদনের অর্দ্ধেক চায়ের চুক্তি করিয়া ১ শিঃ ৩ পেঃ হিসাবে দর ঠিক করিয়া লয়; ইহাতে কোম্পানীর সুবিধা হইয়াছে। অনাবৃষ্টি-জনিত ক্ষতি সত্ত্বেও জাভার চা প্রথম শ্রেণীর চা-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। জাভার চা ক্রমেই ভাল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জাভার চা বলিয়া লেবেল আঁটিয়া অনেক সময় বিস্তর রদ্দি মাল চালান দেওয়া হইতেছে। ইহাতে বিদেশের বাজারে জাভার চায়ের খুব দুর্ণাম রটিতেছে।

এই চা কোম্পানী শুধু ১৯২৯ সনের জন্য সমঝৌতা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। ১৯৩০ সনেও এই কোম্পানী দুনিয়ার অন্যান্য কোম্পানীর সহিত সমঝৌতা স্থাপন করিয়াছে। তাই প্রথমে এই কোম্পানী ১৬,০০০,০০০ পাউণ্ড চা উৎপাদন করিবে স্থির করিলেও শেষ পর্য্যন্ত ১৩,০০০,০০০ পাউণ্ড চা উৎপাদন করিবে স্থির করিয়াছে। মোটের উপর কোম্পানীটী যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে বলিতে হয়।

ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সের কার্য্যসূচী

বৃটিশ সাম্রাজ্যের দুনিয়াব্যাপী ঘর সামলাইবার জন্য লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সের অধিবেশন হইতেছে। এই কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য এবং কার্য্যসূচী সম্বন্ধে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড কিছুদিন হইল এক পূর্ব্বাভাষ দিয়াছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই ঘরোয়া বৈঠকে সাম্রাজ্যভুক্ত উপনিবেশ এবং অধীন দেশসমূহের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মঙ্গলের দিকে নজর রাখিয়া কর্ম্মপদ্ধতিসমূহ নির্দ্ধারিত হইবে। আলোচ্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ:—

১। উপনিবেশ এবং অধীন দেশসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ।

২। দেশরক্ষা সম্পর্কে পররাষ্ট্র-নীতি।

৩। অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের মীমাংসা।

সাম্রাজ্যের ভিতরকার ব্যাপার সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির ক্ষমতা এই কন্‌ফারেন্সে নির্দ্ধারণ

করা হইবে ; ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ এবং অধীন দেশগুলির মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য প্রস্তাবিত আদালত স্থাপনের কথাবার্ত্তা হইবে। সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয়তাও এই কন্‌ফারেন্সে নির্দ্ধারিত করা হইবে। মোট কথা ১৯২৬ সনের সাম্রাজ্যিক মহাসভার রিপোর্টের সংশোধন, পরিবর্দ্ধন ইত্যাদিই কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য। জাতীয়তা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে বিবাহিত নারীর পদমর্য্যাদা সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইবে। এই সাম্রাজ্যিক মহাসভার অধিবেশনে রাষ্ট্রের গঠন সম্বন্ধে একটা ওলট-পালট ঘটিবে বলিয়া মনে হয়। দেশরক্ষা সম্পর্কে সাধারণতঃ শান্তিস্থাপনের দিকে এবং আপোষে বিবাদ নিষ্পত্তি করার দিকে নজর রাখা হইবে। যুদ্ধোপকরণ হ্রাস ইত্যাদি বিশেষভাবে আলোচ্য।

মোটামুটি নিম্নলিখিত আর্থিক বিষয়গুলি কনফারেন্সে আলোচিত হইবে :—

(ক) গোটা সাম্রাজ্যের সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য পুঁজি খাটানো, শাখা-শিল্প সংস্থাপন ইত্যাদি, ট্যারিফ্ পরিবর্ত্তনের সুফল এবং কুফল, সাম্রাজ্যিক শুল্কে পক্ষপাতিত্বের গণ্ডী এবং ফলাফল ; কার্টেল, সঙ্ঘ ইত্যাদি।

(খ) গাদায় গাদায় ক্রয় করিবার প্রথা এবং মূল্য স্থিরীকরণ।

(গ) ট্রেড কমিশনার সার্ভিস, প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা সাম্রাজ্যিক ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ।

(ঘ) বিদেশে নানারূপ মীমাংসা চুক্তি ইত্যাদি।

(ঙ) ইম্পিরিয়াল ইকনমিক কমিটি, এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড, ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের অতীত এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি।

(চ) কৃষি-গবেষণায় সহযোগিতা। তুলার আবাদ, বনজ-সম্পদ, খনিজপদার্থ।

(ছ) শিল্প গবেষণা এবং শিল্পদ্রব্যের গুণ রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বা ওস্তাদগণের বিশেষ বিশেষ সভা-সমিতি।

(জ) যানবাহন, মাল এবং যাত্রি-চলাচল ইত্যাদি। এতৎসম্পর্কে ইম্পিরিয়াল শিপিং কমিটি, দি ওভারসিজ মেকানিক্যাল ট্র্যান্সপোর্ট কাউন্সিল, ভিন্ন ভিন্ন জাহাজ কোম্পানী, সমুদ্রের তলবাহী রেডিও ব্রডকাষ্টিং, পোষ্টাল এবং নিউজ সার্ভিস ইত্যাদির কার্য্যাবলী এবং বিমান যাতায়াতের উন্নতি সম্বন্ধেও আলোচনা হইবে।

বাণিজ্য-জাহাজ সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির আইন বিধিবদ্ধ করার ক্ষমতাও এই কন্‌ফারেন্সের আলোচনার বিষয়।

সাম্রাজ্যিক বৈঠকে বল্ড্‌ুইনের অভিমত

ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সের কার্য্যনীতি সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ ষ্ট্যান্‌লি বল্ড্‌ুইন স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার অভিমতের সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে মোটামুটি দুইটি জিনিষ নিষ্পন্ন হইবে। বিলাতের বর্ত্তমান সরকারী অর্থনীতি উপনিবেশগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত বিরাজমান রাখিয়াছে; প্রথমতঃ কন্‌ফারেন্সে কিছুতেই এই ব্যবস্থার নড় চড় হইতে দেওয়া হইবে না। দ্বিতীয়তঃ অবিলম্বে বিলাত এবং উপনিবেশসমূহের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত খরচ বিলাত এবং উপনিবেশসমূহ বহন করিবে। বিলাত এবং উপনিবেশসমূহের মধ্যে অর্থ নৈতিক এবং ব্যবসা-বাণিজ্য-ঘটিত সমস্ত ব্যাপার এই প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইবে। যতদূর সম্ভব গোটা বৃটিশসাম্রাজ্যকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত একক রাষ্ট্রে পরিণত করাই এই সাম্রাজ্যিক মহাসভার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে।

বিলাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক কাজ করা বাকী রহিয়াছে এখনও সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই। গোটা সাম্রাজ্যের বহির্ব্বাণিজ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য বিলাতী গবর্ণমেণ্ট একটী আমদানি সমিতি গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। মিঃ বল্ড্‌ুইনের মতে এইরূপ একটী আমদানি সমিতি স্থাপনের চেয়ে অন্য উপায়ে কাজ করিলে খুব বেশী সুফল ফলিতে পারে। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা এবং কার্য্য-বিভাগ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তবে বিলাতে জিনিষপত্রের দর বাধিয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ করিলে গম আমদানি প্রভৃতি বিষয়ে উপনিবেশ

গুলির অনেক সুবিধা হইবে ; অনেক দেশ নিশ্চয়ই বিলাতের চেয়ে কম দরে জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে থাকিবে। উপনিবেশগুলি সরাসর সেই সমস্ত দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়া লাভবান হইবার সুযোগ পাইবে।

স্বাধীনতা-প্রয়াসী দক্ষিণ আফ্রিকা

সুবিখ্যাত জেনারেল হার্টজগ ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আফ্রিকা হইতে বিদায়ের প্রাক্‌কালে ইনি সাউথ আফ্রিকান ইউনিয়নের মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

ইনি বলিয়াছেন যে, ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সের বিগত অধিবেশনে ডোমিনিয়নগুলিকে স্বাধীনতা প্রদানের কথা স্থিরীকৃত হয় ; ইউনিয়ন পার্লিয়ামেন্টেও স্বাধীনতার অনুমোদন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কনফারেন্সে এ সম্বন্ধে আবার আলোচনা করা হইবে।

কনফারেন্সের অর্থনৈতিক দিক্ আলোচনার কালেও জেনারেল হার্টজগ ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই স্বাধীনতার কথাই তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে উপনিবেশসমূহের সহযোগিতা উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করিতেছে। "উপনিবেশগুলিকে যতই না কেন অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়া হউক, উহা কখনই স্বাধীনতার সমকক্ষ নয়। জাতির পক্ষে স্বাধীনতাই মুখ্য উদ্দেশ্য ; অর্থনৈতিক সুবিধা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। তাই বলিয়া অর্থনৈতিক সুখ সুবিধা ফেলিয়া দিবার বস্তু এমন বলিতেছি না। জাতির সুখ-সম্পদ্ অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরেই দণ্ডায়মান। সুতরাং কনফারেন্সে উপনিবেশসমূহের আর্থিক উন্নতি বিধানেরও চেষ্টাচরিত্র চলিবে। বিলাত এবং উপনিবেশসমূহের মধ্যে এমন স্থায়ী বাণিজ্যব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করা হইবে যাহাতে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হয়। এর জন্য উপনিবেশগুলিকেও নিজেদের মধ্যে রফা করিতে হইবে ; উপনিবেশগুলিকে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিতে হইবে।

"অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত জাহির করিয়াছেন। তবে বিলাতের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট খোলাখুলিভাবে যে কার্য্য-পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন আমি সে সম্বন্ধে সকলকেই অবহিত হইতে বলি। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উপনিবেশসমূহের উৎপন্ন পদার্থ সম্পর্কে পক্ষপাত নীতি পরিহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কার্য্যতঃ যদি ইহা ঘটে তবে অনেক উপনিবেশকে আপন আপন শুল্কনীতির ওলট-পালট করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

সর্ব্বশেষে জেনারেল হার্টজগ অত্যন্ত জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, বিলাত এবং উপনিবেশসমূহের মধ্যে যে কোন প্রকার নূতন বাণিজ্য-ব্যবস্থাই কায়েম করিতে চেষ্টা করা হউক না কেন, যাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীন অস্তিত্বে কোন বিঘ্ন ঘটে এমন ব্যবস্থা কখনই দক্ষিণ আফ্রিকা বরদাস্ত করিবে না।

অবাধ-বাণিজ্যবাদীদের ঘোষণা

বিলাতের বড় বড় ব্যাঙ্কারগণ একত্র মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অর্থনীতি পরিবর্ত্তনের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন। অন্য পক্ষে বিলাতের অবাধবাণিজ্যের পক্ষপাতী দল জাতীয় স্বার্থের অনুকূল অর্থনীতি কায়েম করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এতদর্থে ইহারা সম্প্রতি বিলাতের সুবিখ্যাত মর্ণিং পোষ্ট পত্রিকার সম্পাদকের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী দলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আছেন :—লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত হেনরি বেল। লোহা এবং কয়লাখনির মালিক স্যার হিউ বেল ; পাবলিশার স্যার আর্ণেষ্ট বেন্ ; ভাইকাউণ্ট কাউড্রে, লিভার ব্রাদার্স এবং চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত এফ ডি'আর্সি কুপার ; ধনবিজ্ঞানবিৎ শ্রীযুক্ত হ্যারল্ড কক্স ; সমর দপ্তরের রাজস্ব বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্থায়ী প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা স্যার চার্লস্ হ্যারিস ; ভাইকাউণ্ট লিভার হিউম, ধনবিজ্ঞানবিদ্ ম্যালেট ; চার্টার হাউসের জনৈক গবর্ণর ডি, টমাস ই, পেজ, পাবলিক কোম্পানীসমূহের ডিরেক্টার স্যার আলেকজাণ্ডার রোজার।

নিম্নে পত্রখানির মূল বক্তব্য প্রদত্ত হইল :—

"আমাদের ধারণা রাষ্ট্র কর্তৃক আর্থিক ব্যাপারগুলি নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিলে বিলাতের সর্বনাশ হইবে; বিলাতের সম্পদ্ যে অর্থনৈতিক খুঁটাগুলির উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে সেগুলি সমূলে উৎপাটিত হইবে। এইরূপ ব্যবস্থায় বিলাতের জাতীয় অভিমান ক্ষুণ্ণ হইবে, জাতীয় চরিত্র অবনমিত হইবে। যদি নিতান্তই রাষ্ট্রকে এইরূপ হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইতে হয় তবে সে চেষ্টা সঙ্কীর্ণতম গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকা কর্ত্তব্য।"

ইংরেজের বহির্ব্বাণিজ্য-সঙ্কট

বর্ত্তমানে গোটা দুনিয়া জুড়িয়া বেকার-সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। বৃটিশ চেম্বার অব্ কমার্স এর অ্যাসোসিয়েশন এই বেকার-সমস্যার কারণ, প্রতিবিধান এবং বর্ত্তমান গুরুতর অবস্থা সম্বন্ধে একটী প্রয়োজনীয় বিবরণী প্রকাশ করিয়াছে। উহাতে প্রকাশ—

বিলাতের শিল্পজাত দ্রব্যের বিদেশী বাজার মাটি হইয়া গিয়াছে। ব্যবসা বহাল রাখিবার জন্য অনেক কারখানাওয়ালাকে ক্ষতি স্বীকার করিয়া মালপত্র বিক্রয় করিতে হইতেছে। কোম্পানীগুলির মৌজুত পুঁজি শেষ হইবার উপক্রম হইয়াছে; সুতরাং উহাদের আর্থিক অবস্থা কাহিল। কারখানাওয়ালারা শীঘ্রই ব্যবসা বন্ধ করিবে বলিয়া মনে হয়।

ক্ষতির কারণ

নিম্নলিখিত কারণে ব্যবসায় ক্ষতি হইয়াছে :—

(ক) বিলাতের বাজারে সংরক্ষণ-নীতির অভাব।

(খ) উৎপাদনের অতিরিক্ত খরচা ও তজ্জন্য মালপত্রের মূল্যবৃদ্ধি।

অনেক দেশে বৈদেশিক দ্রব্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসাইয়া নয়া নয়া শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে অথবা পুরাতন শিল্প-সমূহের উৎপাদন বাড়ানো হইয়াছে। ইহার ফলে ঐ সমস্ত দেশে বিদেশী জিনিষের আমদানি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বিলাতের সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হইয়াছে। কারণ, ঐ সমস্ত দেশে বিলাতের বাজার একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিরপেক্ষ বাজারগুলিতে এবং খোদ বিলাতেও প্রতিযোগিতা বাড়িয়াছে।

চেম্বার হইতে বিলাতের ব্যবসা-হ্রাসের আরও কয়েকটা কারণ দর্শানো হইয়াছে :—

(১) বিলাতের খরচপত্র বৃদ্ধি।

(২) রাষ্ট্র এবং পার্ল্যামেণ্ট হইতে নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি। নিত্য নূতন আইনকানুন প্রণয়নের ফলে উৎপাদনের খরচা আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

(৩) মালপত্র চালান দেওয়ার খরচা বৃদ্ধি।

(৪) বেকার বীমা আইনের যথেষ্ট প্রয়োগ।

(৫) ইয়োরোপের বন্দরে বন্দরে কম জাহাজ ভাড়ার রেওয়াজ।

(৬) ট্রেড্ইউনিয়নগুলির হস্তক্ষেপের ফলে উৎপাদনের খরচা বৃদ্ধি।

(৭) সমুদ্রের তলগামী তার এবং ডাক খরচার অসামঞ্জস্য।

প্রতিকারের প্রধান উপায় স্বদেশী আন্দোলন

অনেকের বিশ্বাস বিলাতের বাজার বিলাতী কল-কারখানাওয়ালাদের মুঠার ভিতরে আনিতে পারিলে কলকারখানাগুলি পুরাদমে চলিতে থাকিবে। কারখানাগুলি পুরাদমে চলিতে পাইলে মাল-উৎপাদনের খরচাও কমিয়া যাইবে, ফলে অনেক প্রকার শিল্পদ্রব্য বিদেশে প্রতি-যোগিতা-মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে।

এইরূপে দেশের বাজার করায়ত্ত হইলে আরও অনেক সুবিধা হইবে। কারখানায় উৎপন্ন মালের উপর ট্যাক্স ইত্যাদি প্রদান করিতে হয়; এই ট্যাক্স, চাঁদা ইত্যাদি প্রদান করিতে হয় বলিয়া বিলাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির খরচ আরও বাড়িয়া যায়। উৎপাদন বেশী হইলে ট্যাক্স, চাঁদা ইত্যাদির হারও কমিয়া যাইবে। বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে দেশী জিনিষ ব্যবহৃত হইতে থাকিলে এই ট্যাক্স্ এবং অন্যান্য খরচা অনেকের ঘাড়ে চাপিবে এবং ফলে

প্রত্যেক্যের ভার লঘু হইবে। বেকার বীমার তহবিলেও অনেক অর্থ সঞ্চিত হইতে পাইবে। বিদেশী জিনিষপত্র আমদানি হইতে থাকিলে উহাদের উপর ট্যাক্স্ বসাইয়াও বাহিরের খরচার অনেক সংস্থান হইবে।

সংরক্ষণ-নীতির কবলে

সংরক্ষণ নীতির হাত হইতে রক্ষা পাইলে দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়িয়া যাইবে, এই ধারণা মিথ্যা নহে। বৃটিশ চেম্বার অব্ কমার্স ও এইরূপ মত পোষণ করেন। তবে এই "খোলা দুয়ার" নীতি আপাততঃ আদর্শরূপেই থাকুক্। বর্ত্তমান অবস্থায় উহা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। এখন দুনিয়ার সমস্ত দেশ চড়া হারে সংরক্ষণ-শুল্ক বসাইয়া দিয়াছে। বিলাতই দুনিয়ার একমাত্র অবাধ বাণিজ্যের দেশ; সুতরাং বিলাতের পক্ষেও সংরক্ষণ নীতির অন্তরালে আত্মগোপন করা ছাড়া উপায় নাই।

উৎপাদন-খরচা কমাও

শিল্প-ব্যবসা-ক্ষেত্রে ইয়োরোপের অনেক দেশ বিলাতের প্রবল প্রতিযোগিরূপে দণ্ডায়মান। ঐ সমস্ত দেশের সুবিধা এই যে, তাহারা সস্তায় মাল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের মোটা অংশ যে ক্রমে এইসমস্ত দেশের করায়ত্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিলাতে মাল উৎপাদনের খরচ সাধারণতঃ ঐ সমস্ত দেশের চেয়ে বেশী। চেম্বারের মতে বিলাতকে উৎপাদনের খরচা হ্রাস করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। নতুবা বিলাতের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

যুক্তিপ্রয়োগের সু ও কু

আজকাল সকলের মুখে "যুক্তিপ্রয়োগ" নীতির কথা শুনা যায়। কিন্তু "যুক্তিপ্রয়োগ" যে কি চীজ্ তাহা বুঝা কষ্টকর। সস্তায় ভাল মাল উৎপাদন করিতে হইলে যে যে উপা অবলম্বনের প্রয়োজন ঐগুলিই সরল ভাষায় র‍্যাশ-নালিজেশান বা যুক্তি প্রয়োগ নামে অভিহিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট বুদ্ধি খাটাইয়া এই নীতি প্রয়োগ করিলে সুফল ফলিতে পারে। বর্ত্তমানে কারখানাগুলিতে প্রয়োজনানুরূপ লোকজন খাটানো হইতেছে না। এ অবস্থায় মাল উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে গেলে উৎপাদন-খরচাই বাড়িয়া যাইবে। মোট কথা, সকল প্রকার শিল্পে যুক্তিপ্রয়োগ করা চলে না; আর মাত্র যুক্তিপ্রয়োগ দ্বারাই কোন দেশের সাধারণ সমৃদ্ধি বাড়ানো যাইতে পারে না।

অন্যান্য দেশের তুলনায় বিলাতে মাল উৎপাদনের খরচ বেশী হওয়ার কারণ এই যে, বিলাতে অন্যান্য দেশের চেয়ে ট্যাক্সের হার বেশী। নানাপ্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্যও বিলাতকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। আবার ইয়ো-রোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে বিলাতে মজুরির হারও অনেক বেশী।

নয়া প্রণালীতে চা খাওয়া

বিলাতের জনৈক খাদ্যতত্ত্বজ্ঞ নূতন ধরণের চা প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। নূতন প্রক্রিয়াটি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

"জল যেমন ফুটিয়া উঠিবে অমনি তাহা চায়ের পাতার উপর ঢালিতে হইবে। এই চায়ের পাতাগুলিও আবার আর একটি গরম পাত্রে রাখা চাই। চা রীতিমত ফুটন্ত জলে ফুটানো দরকার, কিন্তু ঠাণ্ডা পাত্রে চা রাখিয়া তাহার উপর ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিলে জল আর প্রকৃত ফুটন্ত অবস্থায় থাকে না। চায়ের মধ্যে কতকগুলি পদার্থ আছে যা চাকে সুগন্ধ দান করে। জল রীতিমত ফুটন্ত অবস্থায় না থাকিলে চায়ের এই উপাদানগুলি নিষ্কাশিত হয় না।

"পাঁচ মিনিট কাল চা ফুটাইলেই যথেষ্ট। এই সময়ের মধ্যে ক্যাফেন্ বা অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া আসিবে। পাঁচ মিনিট পরে চা হইতে ট্যানিন্ এবং নানাপ্রকার বিস্বাদ পদার্থ বহির্গত হয়। পাঁচ মিনিটের বেশী সিদ্ধ করিলে চায়ের সুগন্ধও কমিয়া যায়। সুতরাং ৫ মিনিট সিদ্ধ করিবার পর আবার একটা গরম পাত্রে চা ঢালিবে।

"ইহার পর দুধ দিতে হইবে। একটু আধটু ট্যানিন বাহির হইয়া আসা সম্ভব। তাহা দুধের গুণে নষ্ট হইয়া

যাইবে। ট্যানিন নষ্ট করিয়া ফেলা আবশ্যক। কারণ ট্যানিনে হজম শক্তির ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে।

"চিনিও দেওয়া যাইতে পারে। চিনি চাকে অধিকতর পুষ্টিকর করিয়া তুলে। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মত আবার অন্যরূপ। উঁহাদের মতে চিনি চায়ের পুষ্টিকারিতা শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলে।

"এখন জল সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা বলা দরকার। অত্যধিক "নরম" হইলে চা হইতে অনেক বিস্বাদ পদার্থ বাহির করিয়া আনে; আবার অত্যধিক "শক্ত" হইলে অনেক বাঞ্ছনীয় উপাদান বাহির হইতে পারে না। সুতরাং চায়ের জল হওয়ার দরকার কিছু 'শক্ত' বা কিছু 'নরম'।

"পেশাদার চা-ওয়ালারা সাধারণতঃ সাড়ে তিন আউন্স জলে ছয় পেনির সমান ওজন-বিশিষ্ট চা প্রয়োগ করিয়া থাকে। চায়ের পরিমাণ ইহার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী হওয়া আবশ্যক।"

ইংরেজের জন্মভূমিতে দুগ্ধ-আন্দোলন

কিছুদিন যাবৎ পাশ্চাত্য দেশসমূহে একটি বিশেষ আন্দোলন দেখা দিয়াছে; ঐ সকল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলিতেছেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দুগ্ধই মাংসাদি অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। রাস্তা-ঘাটে, পার্কে ও থিয়েটারে বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে—"আরও দুধ খাও ও তাজা হও।" স্বাস্থ্য-তত্ত্ববিদেরা বলিতেছেন, এক সের দুগ্ধে যে পুষ্টিকর উপাদান আছে এক কুড়ি ডিমেও তাহা নাই। সর্ব্বত্র রব উঠিয়াছে লাল রুটি (ব্রাউন ব্রেড), প্রচুর শাকসব্জী এবং দুগ্ধ খাও, আর বৈদ্যের কড়ি জোগাইতে হইবে না। স্কুলে ও কলেজে, ডাক্তারখানায় ও হাঁসপাতালে দুগ্ধের ব্যবহার প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্যও আবিষ্কৃত হইতেছে। ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে এই দুগ্ধ-পানের আন্দোলন কিভাবে প্রসার লাভ করিতেছে এই প্রসঙ্গে তাহার কিছু আভাষ দিতে চেষ্টা করিব।

বিলাতের ১৯২৮ সনের স্বাস্থ্য-রিপোর্টে (মিনিষ্ট্রী অব হেল্‌থ রিপোর্ট ফর ১৯২৮) দেখা যায় যে, ঐ বৎসর মোটে ৬৭,০০০ দুগ্ধের দোকান পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৫৫৪২টী দোকানের দুগ্ধ অর্থাৎ শতকরা ৮·৮ দুগ্ধ একেবারে মানুষের ব্যবহারের অনুপযুক্ত। বারমিংহামের স্বাস্থ্য পরিদর্শক আরো বলিয়াছেন যে, তিনি ৭৪৪টী গোশালা পরিদর্শন করেন, তন্মধ্যে ৮০টী গোশালার গরু প্রায়ই যক্ষ্মারোগগ্রস্ত। রিপোর্টে দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে যে, শতকরা ৮ ভাগ দুগ্ধে যক্ষ্মারোগের জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। দুগ্ধের এই অবস্থা দেখিয়া স্বাস্থ্যবিদ্‌গণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। চেষ্টা চলিতেছে যে, প্রতি মিউনিসিপ্যালিটি দুগ্ধের সরবরাহের ভার নিজ হাতে লইবেন। দি লোক্যাল অথরিটিজ এনেব্লিং বিলের সাহায্যে মাংস, দুগ্ধ ও রুটির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সহর-রক্ষকেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

স্কটল্যাণ্ডে এই দুগ্ধ আন্দোলন বিশেষভাবে শিক্ষাবিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাস্থ্যবিভাগ এবং ল্যাঙ্কাশিয়ার শিক্ষা সমিতি একযোগে ছাত্রদের মধ্যে দুগ্ধ সেবন প্রচলনে অবহিত হইয়াছেন। ল্যাঙ্কাশিয়ারে ২০,০০০ হাজার ছাত্রকে পরীক্ষা করা হইতেছে। তন্মধ্যে ১০,০০০ ছাত্রকে কাঁচা দুগ্ধ পান করান হইয়াছে এবং ৫০০০ ছাত্রকে বীজাণু-মুক্ত দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে এই পরীক্ষা-কার্য্য চলিতেছে এবং সত্বরই উহার ফলাফল সাধারণের গোচরীভূত হইবে। শিক্ষা-বিভাগ পরে অভিভাবকগণকে লইয়া পরামর্শ-সভা ডাকিবেন এবং যাহাতে পরীক্ষিত সিদ্ধান্তগুলি প্রতি গৃহে প্রতিপালিত হয় তাহার জন্য যথাবিধি চেষ্টা করিবেন। (ভাণ্ডার)

লাহোরে এশিয়ার নারী-সম্মেলন

মাদ্রাজের ২৭শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, প্রস্তাবিত এশিয়ার নারী-সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ সম্প্রতি একটী তথ্যপূর্ণ 'বুলেটিন' প্রকাশ করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে উক্ত সম্মেলন সম্পর্কে আরও অনেক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বুলেটিনে' ভারতের নরনারীগণকে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

এশিয়ার দেশসমূহের নারীদিগকে ভারতবর্ষে এক সম্মেলনে সমবেত করার প্রয়োজনীয়তা ভারতের নারীগণ উপলব্ধি করেন এবং তাঁহাদের এই প্রস্তাব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জ্ঞাপন করেন। যথেষ্টসংখ্যক উৎসাহপ্রদ উত্তর আসায় সম্মেলন করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিমণ্ডলীকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য জোর আয়োজন চলিতেছে এবং সম্মেলনের কার্য্য-তালিকা তৈয়ারী হইতেছে।

সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ বিবেচনা করেন যে, ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এমন নহে বা এমন হইবে না, যাহাতে সম্মেলনের অধিবেশনে বাধা উপস্থিত হইবে বা প্রতিনিধি-মণ্ডলীকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে।

১৯৩১ সনের ২৩শে জানুয়ারী হইতে ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত লাহোরে সম্মেলন বসিবে।

সম্মিলনের উদ্দেশ্য

(১) একই প্রাচ্য সভ্যতার সদস্য রূপে এশিয়ার নারী-গণের মধ্যে একতা-বোধ জাগ্রত করা।

(২) প্রাচ্য সভ্যতার গুণাবলী (সরলতা, দর্শন, শিল্প, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, মাতৃত্বের সম্মান, আত্মিক অনুভূতি) নির্দ্ধারণ, যাহাতে ঐগুলি জাতির ও পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য সংরক্ষিত হয়।

(৩) প্রাচ্য সভ্যতার বর্ত্তমানে যে সকল ত্রুটি (স্বাস্থ্য-হীনতা, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, শ্রমিকদের অল্প পারিশ্রমিক, শিশুমৃত্যু, বিবাহ প্রথা) পরিলক্ষিত হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও তাহা দূর করার চেষ্টা।

(৪) পাশ্চাত্য প্রভাবসমূহের মধ্যে যাহা এশিয়ার উপযোগী (শিক্ষা, পরিচ্ছদ, স্বাধীনগতি, সিনেমা, কলকব্জা) তাহা গ্রহণ।

(৫) এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নারীগণের অবস্থার (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত) অভিজ্ঞতা বিনিময় দ্বারা পরস্পরকে শক্তিশালী করা।

(৬) পৃথিবীর শান্তি-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য।

পালেষ্টাইন, সিরিয়া, সিংহল, নেপাল, জাপান, ব্রহ্মদেশ, ইরাক, শ্যাম, ইন্দো-চীন, মালয়, পারস্য ও বেলুচিস্থান হইতে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিপূর্ণ উত্তর আসিয়াছে।

ভারতীয় মহিলাদের স্বাক্ষরিত যে আমন্ত্রণপত্র এশিয়ার দেশসমূহে প্রেরিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ অনেক দেশে প্রকাশিত হইয়াছে। (খাদেম—কলিকাতা)

বাঙ্গালী মুসলমান গৃহস্থের পাটচাষ

[ঢাকা জিলার বিক্রমপুরনিবাসী এক মুসলমান চাষীর সহিত আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তার কোন কোন অংশের মর্ম্ম নীচে দেওয়া যাইতেছে।—শ্রীসুধাকান্ত দে।]

প্রঃ—তুমি কলিকাতায় কি কাজ করিয়া খাও?

উঃ—আজ্ঞে, আমি দপ্তরীর কাজ করি।

প্রঃ—বাড়ীতে তোমার জমাজমি আছে কি? থাকিলে কত আছে এবং তাতে তুমি কি বুনিয়া থাক জানিতে চাই।

উঃ—আমার নিজস্ব আট বিঘা জমি আছে। ইহাতে সাধারণতঃ পাট ও সরিষা বুনিয়া থাকি। এছাড়া আরও কিছু জমি ভাগে আছে। তা হইতে অল্প স্বল্প চা'ল, কলাই ইত্যাদি পাই।

প্রঃ—তুমি বলিলে পাটের জন্য তোমার ৮ বিঘা জমি আছে?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ।

প্রঃ—ইহাতে তুমি কি কেবল পাটই বুনিয়া থাক? ধান বোন না কেন?

উঃ—ঐ জমিতে দুই ফসল পাই—(১) পাট, (২) সরিষা। ধান এবং পাট একই সময় বোনা হইয়া থাকে। সুতরাং পাট বুনি বলিয়া ধান বুনিবার আর জো থাকে না। কিন্তু এই শীতকালে আর একটা ফসল পাই—সরিষা।

প্রঃ—আচ্ছা এই দুই ফসলে তোমার গোটা বছরের কতটা সময় যায়?

উঃ—পাট ও সরিষা বৎসরের ৯ মাস কাল ক্ষেতে থাকে। বাকী তিন মাস অর্থাৎ মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ক্ষেত অমনি পড়িয়া থাকে, কোন ফসল হয় না।

প্রঃ—এই তিন মাস কোন ফসল লাগাইবার চেষ্টা কর না কেন?

উঃ—কি ফসল লাগাইব? এই তিন মাসের যে কোন প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে তা আমাদের জানা নাই।

প্রঃ—তোমার ৮ বিঘা জমি হইতে এ বৎসর কত পাট পাইয়াছ এবং সাধারণতঃ কত পাট পাও?

উঃ—৮ মণ।

প্রঃ—৮ মণ পাট জন্মাইতে তোমার খরচ পড়ে কত?

উঃ—শুধু পাট জন্মাইবার খরচ ৩ দফা—(১) নিড়ানি, (২) চাষ, (৩) পাট কাটা।

১ম দফায় খরচ হয়	৪৲
২য় দফায়	১৲
৩য় দফায়	৩৲
	৮৲

প্রঃ—নিড়ানির খরচ দেখিতেছি বড় বেশী পড়ে। এর মানে কি? নিড়ানিতে এর চেয়ে কম খরচ পড়ে বোধ হয়।

উঃ—আজ্ঞে না, নিড়ানিতে অর্থাৎ ক্ষেত বাছিতে ও চাষের উপযোগী করিতে মেহনৎ বহুৎ। আমার ক্ষেতের জন্য ৮টা 'জনে'র দরকার হয়। আর এই সময় সকল চাষীই মজুর খুঁজিয়া বেড়ায় বলিয়া তারা সুযোগ বুঝিয়া দাঁও মারিতে চায়। সুতরাং

'জন' না পাইলে আমারই ক্ষতি বলিয়া অন্য সময়ের চেয়ে বেশী মজুরি দিয়াও আমাকে 'জনে'র সন্ধান করিতে হয়। ৪৲ টাকা আমি বেশী বলি নাই।

প্রঃ—তুমি বলিতেছ চাষে তোমার ১৲ টাকা খরচ হয়। বীজের জন্য কত খরচ কর? সারের জন্যই বা কত খরচ হয়?

উঃ—আজ্ঞে পাটের বীজ আমাদের কিনতে হয় না। আগের বৎসরের বীজ জীয়ানো থাকে। সারের জন্যও বিশেষ ভাবিতে হয় না।

প্রঃ—তুমি বলিলে যে, পাট কাটার খরচ ৩৲ টাকা। কিন্তু গোলাজাত করিবার খরচ ইহার মধ্যে ধরিয়াছ কি?

উঃ—আজ্ঞে না। আমরা সাধারণতঃ পাট গোলাজাত করি না। মহাজনের সহিত আগে থেকে কথাবর্ত্তা থাকে, মহাজন আসিয়া ক্ষেত হইতে পাট তুলিয়া লইয়া যায়।

প্রঃ—বুঝিলাম। তবে দাঁড়াইল এই যে, তোমার ৮মণ পাট জন্মাইতে ৮৲ টাকা খরচ হয়। তাহা হইলে মণপ্রতি তোমার মাত্র ১৲ টাকা খরচ পড়ে?

উঃ—আজ্ঞে এই হিসাবে ১৲ টাকায় ১ মণ পাট জন্মানো যায় বলিয়া মনে হইবে বটে; কিন্তু পাট ও চাষ সম্পর্কে আমার অন্যান্য খরচের দফা ভুলিয়া যাইবেন না। আমাকে দুইটা চাকর রাখিতে হইয়াছে একটির তঙ্খা ৬৲ টাকা অন্যটির ৪৲ টাকা। দেশে চাকর পাওয়া অত্যন্ত মুস্কিল। সেই চাকরকে খাটানো তার চেয়েও মুস্কিল। তার কাছ থেকে কাজ পাইতে হইলে খোসামোদ করিয়া করিয়া হয়রাণ হই। বাস্তবিক যত দুরবস্থা আমাদের, চাকরগুলি আমাদের চেয়ে ঢের আরামে আছে। যা হোক চাকরের খাতে ত এই এক কিস্তি খরচা; তারপর বলদ পালিবার ও লাঙ্গল ঠিক রাখিবার খরচ আছে। আমাদের প্রতিদিনের খোরপোষের খরচের কথাটাও ধরিতে ভুলিয়া যাইবেন না।

প্রঃ—দুটা চাকর কি তোমার পাটরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়?

উঃ—না ঘরের কাজও করে। কিন্তু পাট অনেক যত্নে পাহারা দিয়া রাখিতে হয়। সেজন্য মেহনৎটা কম নয়। আর আমি আমার পাট দুই ক্ষেত হইতে পাই বলিয়া দুটা লোকেরও দরকার আছে।

প্রঃ—কিন্তু তুমি একথা অস্বীকার কর না যে, এই সব খরচের কতকটা পাটের জন্য না হইলেও তোমাকে করিতে হইত অর্থাৎ তুমি যদি মোটেই পাট না বুনিতে তবু তোমাকে বর্ত্তমান খরচের অনেকটা করিতে হইত। বর্ত্তমান খরচের কতটা তোমার নিজের জন্য আর কতটা পাটের জন্য তা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু শুধু পাটের জন্য তোমার প্রতি মণে ১৲ টাকা খরচ হয় যদি বলি, তবে বোধ হয় বেশী ভুল হইবে না, কি বল?

উঃ—আজ্ঞে না। মণ প্রতি ১ টাকার বেশী কখনো খরচ হয় না—৸৶০/৸৵০ আনা হইতে ১ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

প্রঃ—এই গেল তোমার খরচের কথা। আচ্ছা, পাট বেচিয়া তুমি কত পাও?

উঃ—বাবু, এবারকার কথা আমাদের আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। এবারে পাটের জন্য আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

প্রঃ—এবারকার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। অন্যান্য বার কিরূপ পাও?

উঃ—মণ প্রতি ৮।১০।১২ টাকা করিয়া মিলে। গত বৎসর ৮ মণ পাট বেচিয়া অতি স্বচ্ছন্দে ৮০।৮৫ টাকা ঘরে তুলিয়াছিলাম।

প্রঃ—এবারে কত পাইয়াছ?

উঃ—এবারে ৮ মণ পাট ২॥০ টাকা দরে বেচিয়া ২০৲ টাকা পাইয়াছি।

প্রঃ—কিন্তু পাট বেচিয়া তোমার খরচ বাদে হাতে রহিল কত?

উঃ—১২৲।১৩৲ টাকা।

প্রঃ—এই টাকা ত তোমার লাভের সামিল। তবে কেন বলিতেছ তোমার পাট বুনিয়া ক্ষতি হইয়াছে?

বলিতে পার, তোমার অন্যান্য বৎসরের মত লাভ হয় নাই ?

উঃ—বলেন কি মহাশয়, আমার ক্ষতি হয় নাই! আমার যে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! আমার লাভ হইবার কথা ছিল ৭০৲।৭৫৲ টাকা অর্থাৎ মাসে অন্ততঃ ৬৲ টাকা ঘরে বসিয়া উপার্জ্জন হইবার কথা। সেখানে আমি পাইতেছি মাত্র মাসে টাকা খানেক। ইহাকে ক্ষতি বলিবেন না ত ক্ষতি বলিবেন কাহাকে ?

প্রঃ—ইহাতে যে অত্যন্ত কষ্ট হইবে তা বুঝিতেছি। কিন্তু ১৲ টাকা লাভটা কি তোমার লাভ নয় ? তুমি যদি ১ টাকা খাটাইয়া মাসে ১৫ উপার্জ্জন কর তবে কি তুমি বলিতে পার না যে তুমি মাসে টাকায় ৫ পয়সা লাভ করিতেছ ? তুমি বলিতেছ, পাটে তোমার ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু আমি বলি, পাটে তোমার ক্ষতি হয় নাই, লাভই হইয়াছে। তবে বলিতে পার বটে, অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এ বৎসরের লাভের পরিমাণ সামান্য।

উঃ—মহাশয়, আপনি আমাদের অবস্থাটা সম্যক্ বুঝিতেছেন না, তাই একথা বলিতেছেন। পাট ও সরিষা এই দুই ফসল হইতে আমি বৎসরে মোটামুটি ৮০।৯০ টাকা ঘরে আনিতে পারিব বলিয়া আশা করি। সে জায়গায় এবার পাইলাম মাত্র ২০।২৫ টাকা। ৮০।৯০ টাকায় যে সংসার চালাইয়াছি, তা ২০।২৫ টাকায় কি করিয়া চালানো যায়, ভাবিয়া দেখুন দেখি। তার চেয়ে আমি যদি কিছু জমিতেও অন্ততঃ ধান বুনিতাম তবে ঘরের খাবারটা ক্ষেত হইতে উঠিয়া আসিত। এতটা ভাবিতে হইত না।

প্রঃ—আচ্ছা, ধান না বুনিয়া এই পাট বুনিবার ঝোঁকটা তোমাদের এত প্রবল কেন ?

উঃ—কারণ, পাটে সাধারণতঃ খুব বেশী লাভ হয়। যেখানে পাট বুনিয়া আমরা স্বচ্ছন্দে সারা বৎসরের চাল ডাল সংগ্রহ করিয়াও অন্য দু পাঁচটা বাবুগিরি করিবার পয়সা পাই, সেখানে কে আর ধান বুনিবার জন্য বেশী আগ্রহ দেখাইবে ?

প্রঃ—ভাল, এবার ত দেশে ধান চাল এবং অন্যান্য জিনিষপত্রও শস্তা হইয়াছে, তবে তোমাদের দুর্দ্দশাটা অন্ততঃ যতটা হইবার কথা ছিল তার চেয়ে কিছু কম হইয়াছে ত ?

উঃ—তা হইতে পারে। কিন্তু আমরা তা বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের দুর্দ্দশাটাই আমাদের বেশী চোখে পড়িতেছে।

প্রঃ—পাট বুনিবার সময় এবার বুঝিতে পারিয়াছিলে কি যে পাটের দর এত নামিয়া পড়িবে ?

উঃ—আজ্ঞে না।

প্রঃ—কি কারণে পাটের দর এত নামিয়া গেল বলিতে পার ? তোমরা কি এবার প্রত্যেকে খুব বেশী পাট বুনিয়াছ ?

উঃ—দর কমার কারণটা বলিতে পারি না। পাটের ফসল এবার ভাল হইয়াছে সত্য, কিন্তু পাট যে অন্যান্য বারের চাইতে খুব বেশী বুনিয়াছি, তা ত মনে হয় না।

প্রঃ—পাটের এই দর কমার কথা কখন জানিলে ?

উঃ—যখন মহাজন পাট কিনিতে আসিল।

প্রঃ—মহাজন কখন পাট কিনিতে আসে ? আর পাটের দরই বা কি ভাবে স্থির হয় ?

উঃ—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে মহাজন একবার ক্ষেতে আসিয়া বলিয়া যায় যে, যা বাজার দর থাকে তাতেই পাট বিক্রী করিতে হইবে। বেশী দরের অপেক্ষায় অবশ্য থাকা যায়। গোড়াতে পাটের দর ছিল ২৲ টাকা, তখন আমি বেচি নাই। তারপর ২॥০ টাকা হইতেই আমি অল্পদিন হইল বেচিয়া ফেলিয়াছি। কারণ, পাটের দর যে আর বাড়িবে, তা মনে হয় না।

প্রঃ—আচ্ছা, তুমি এ বৎসর পাট না বেচিয়াও থাকিতে পারিবে ত ?

উঃ—তা পারিতাম বৈকি। "এ বৎসর পাট বেচিব না"

বলিয়া গোলাজাত করিয়া রাখিলেই চলিত। তবে তাতে অনেক হাঙ্গামা; সব চেয়ে বেশী ভয় আগুনে পাটের গোলা পুড়িয়া যাইবার। তারপর চুরি আছে। পাটের গোলা সর্ব্বদা চৌকী দিয়া রাখিতে হয়। আমি অত ঝঞ্ঝাট সহিতে পারিব না বলিয়া বেচিয়া দিয়াছি।

প্রঃ—ভাল। তুমি ত সম্প্রতি তোমার গ্রামের অবস্থা নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছ। তোমার কি মনে হয় অধিকাংশ চাষী নিজেদের পাট বেচিয়া দিয়াছে, না গোলাজাত করিয়া রাখিয়াছে?

উঃ—আপনি যদি এই সময়ে একবার গ্রামগুলি ঘুরিয়া আসেন ত দেখিবেন অনেক ঘরেই ভাল ভাল পাট জমা হইয়া রহিয়াছে। চাষীরা এ বছর পাট বেচিবে না। আমার ত মনে হয় প্রতি গ্রামে এরূপ চাষীর সংখ্যাই অনেক যারা তাদের গোটা পাট অথবা কতকাংশ আগামী বৎসরের জন্য মজুত করিয়া রাখিয়াছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে পাট ধরিয়া রাখা যায় না, কারণ সম্বৎসরের জীবিকার জন্য পাটের উপর নির্ভর করিতে হয় এমন চাষীর সংখ্যা কম নয়। অনেকে আবার মহাজনের ঋণশোধ করিয়া দিতে বাধ্য থাকে। সুতরাং তাদের নীচু দরে বিস্তর পাট বেচিতে হয়।

প্রঃ—আগামী বৎসর তোমার কি মনে হয় যে চাষীরা পাট কম বুনিবে?

উঃ—এ বৎসর চাষী যা শিক্ষা পাইয়াছে তাতে সেইরূপ সম্ভাবনা আছে বটে।

প্রঃ—চাষ ভিন্ন তোমার অন্য আয়ের পথ আছে কি? ঋণ করিযাছিলে কি?

উঃ—আজ্ঞে না, ঋণ করি নাই। চাষ ছাড়া আয়ের পথ ছিল বলিয়াই রক্ষা, নইলে মরিতে হইত।

প্রঃ—দেখ, একটা জিনিষ বুঝিতে পারি না। তোমাদের যখন সুবৎসর থাকে, পাট হইতে অথবা চাষ হইতে ৮০।৯০ টাকা পাও তখন সব টাকাটাই খরচ কর, অথচ ২০।২৫ টাকা পাইলে তাহাতেই আবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হও। দুর্দ্দিনের জন্য টাকা সঞ্চয় কর না কেন?

উঃ—আজ্ঞে, সুদিন আল্লার দোয়া, আর দুর্দ্দিন আল্লার মর্জ্জি। জমাইয়া করিব কি? সংসার আমার চলিয়া যাইবেই—তা চাষ হইতে ২০।২৫ টাকা পাই আর ৮০।৯০ টাকা পাই।
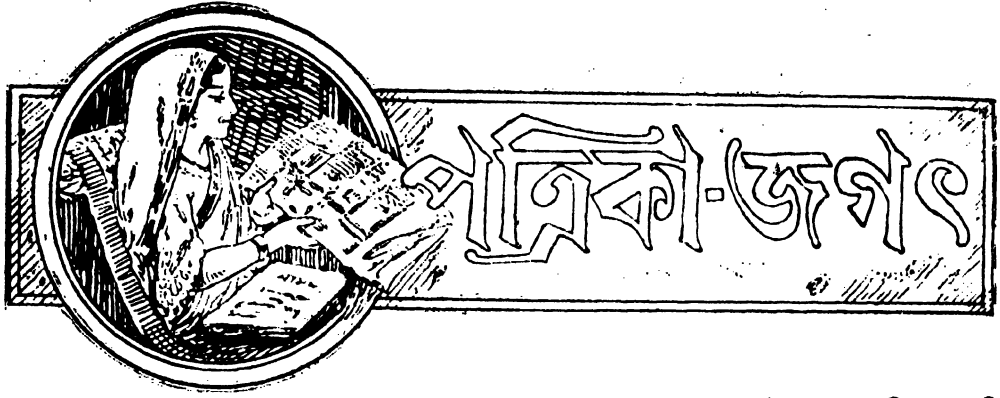
"আমেরিকান্ ইকনমিক রিভিউ" (জুন, ১৯৩০)

সংরক্ষণশুল্ক ও মার্কিণ শ্রমিক সঙ্ঘ

মার্কিণ শ্রমিকদের একটী সঙ্ঘ মোতায়েন্ আছে; নাম, 'আমেরিকান ফেডারেশ্যান অব্ লেবার'। ১৮৮১ সনে এই সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। সংরক্ষণশুল্ক বসানোর সম্বন্ধে এই সঙ্ঘের মনোভাবটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক্।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'সংরক্ষণ বনাম অবাধ বাণিজ্য' সমস্যা নিয়ে আমেরিকার রাজনৈতিক ও অন্যান্য দলের মধ্যে বেশ সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। মার্কিণ শ্রমিক সঙ্ঘ দলাদলিতে যোগ না দিয়ে দূরে থাকা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। তখনকার অনেক শ্রমিক-নেতার ধারণা ছিল যে, সংরক্ষণশুল্ক কলকারখানাওয়ালাদের, আর অবাধ বাণিজ্য শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপোষক।

১৯০৬ সনে সঙ্ঘের মনোভাব একটু বদ্‌লে গেল। সঙ্ঘ বল্‌লেন, "সংরক্ষণশুল্ক বা অবাধবাণিজ্য,—কোন বিশেষ মতের সঙ্গে আমরা মত মেলাতে চাই না, কিন্তু এমন যখন দেখব যে, সংরক্ষণশুল্ক অবলম্বন কর্‌লে কোন বিশেষ শিল্প বহিরাক্রমণ ভাল ক'রে রোধ করতে পারে আর ফলে শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত হয়, তখন সংরক্ষণশুল্ক সমর্থন করতে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না।"

এই ভাবেই দিন চল্‌ছিল। কিন্তু ১৯২৮ সনের নবেম্বর মাসে আরও একটু পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া গেছে। ঐ সময়ে নিউ ইয়র্ক সহরে "সংরক্ষণবাদী মার্কিণ শ্রমিক" নামে উক্ত সঙ্ঘের মধ্যেই একটা দল গ'ড়ে ওঠে। এর সভ্য-সংখ্যা আড়াই লাখ,—সমগ্র সভ্য-সংখ্যার শতকরা ৮ বা ৯ অংশ মাত্র। সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ম্যাথিউ ওল্ এর সভাপতি। যে সব ট্রেড ইউনিয়ান দেখ্‌ছে যে, বিদেশ হতে মাল এসে তাদের শিল্পের অবস্থা খারাপ ক'রে শ্রমিকদের অবস্থা খারাপ করছে, প্রধানতঃ সেইসব ট্রেড ইউনিয়ানই এই নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছে।

এই নতুন প্রতিষ্ঠান চেষ্টা কর্‌লে কি সঙ্ঘের সংরক্ষণ-শুল্ক-সম্বন্ধীয় নীতিটা বদ্‌লে যাবে? প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত লাইল্ ডাব্লিউ কুপার বলেন যে, সে সম্ভাবনা কম। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘকে বোঝানো চাই যে সংরক্ষণ শুল্কের সাহায্যে অধিকাংশ মজুরের আর্থিক অবস্থা উন্নত করা সম্ভব হবে, অন্ততঃ তাদের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা বজায় থাকবে, তবেই সঙ্ঘকে স্বমতে আন্‌তে পার্‌বে। কিন্তু লেখক সমগ্র সঙ্ঘের মত বদ্‌লানো সম্ভব হবে ব'লে মনে করেন না। তাঁর মত এই যে, আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমেই বাড়্‌ছে বলে সংরক্ষণশুল্কের প্রতি অত্যধিক আসক্তি কম্‌তে পারে; তাছাড়া, যে সব শিল্প শুধু সংরক্ষণশুল্ক পাচীলের আড়াল পেলে বাঁচতে পারে সেগুলি খোলা আবহাওয়ায় বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সয়ে টিঁকে থাক্‌তে পার্‌বে না, তাদের সংখ্যা ক্রমাগত কমে যাবে; অধিকন্তু, যে সব শিল্পের রপ্তানি-বাণিজ্য বেশী—যেমন ব্যাঙ্কিং—সেগুলি সংরক্ষণশুল্ক বিশেষ পছন্দ করে না। সংরক্ষণশুল্কের প্রতি মার্কিণদের অত্যধিক আসক্তি ছিল; কিন্তু লেখক মনে করেন যে, এই সব কারণে তার একটা প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই আরম্ভ হবে। সুতরাং সংরক্ষণশুল্কের পক্ষপাতী প্রতিষ্ঠানের সফল হবার আশা কম। লেখক নতুন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল বলে মনে করেন না। (শি)

"ইকনমিক জার্ণ্যাল" (জুন, ১৯৩০)

সোহ্বিয়েট রুশিয়ার আর্থিক নীতি

রুশিয়ায় সোহ্বিয়েট শাসন স্থাপনের সময় লেনিন পুরাপুরি ধনসাম্যবাদ চালাতে ও পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করতে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু দিন কয়েক পরে, দেশ তখনও তৈরী হয়নি বুঝে তিনি পিছু হট্‌তে বাধ্য হন, এবং নানা বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে চাষবাস করা ও কেনাবেচা করা বে-আইনী নয়, এই মর্ম্মে এক নতুন আর্থিক নীতি জারি করেন। অনেকে তখন ভেবেছিলেন যে, বুঝি বা ধনসাম্যবাদ ছেড়ে রুশিয়া পুঁজিতন্ত্রের দিকে আবার যাত্রা সুরু করলে। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত ক্যালবিন বি হুবার বলছেন যে, সে আশা সুদূরপরাহত। রুশিয়া ধনসাম্যবাদ স্থাপনে বদ্ধপরিকর, কেবল অবস্থা-বৈগুণ্যে তা পারছে না। এর উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখাচ্ছেন যে, ১৯২৯ সনের শেষের দিকে চাসবাসকে ব্যক্তিগত ব্যাপার না রেখে সম্পূর্ণ সরকারী ও সাধারণের ব্যাপার ('কালেকৃটিভাইজেশান্') করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়; সে জন্য সম্পন্ন কৃষকদের ওপর যথেষ্ট বল-প্রয়োগ হয়, তাদের চাষবাসের অনেক সাজ-সরঞ্জাম কেড়ে নেওয়া হয়, কৃষিজাত জিনিষের কেনাবেচা একেবারে বন্ধ থাকে। যারা ভোট দেবার অধিকারী তাদের টিকিট দেওয়া হয়; সেই টিকিট দেখালে তবে গবর্মেণ্টের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা যায়। এ ত গেল চাষের কথা। যারা ব্যক্তিগতভাবে দোকান চালাচ্ছিল তাদের দোকান বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, তাদের মালপত্র সরকার নিয়ে যায়। লেনিন শেষ নীতিতে কাজের শ্রেণী-অনুযায়ী মাহিনা নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু সে নীতি রদ্ করে ব্যবস্থা হয় যে, কারখানার মজুরদের অর্জ্জিত অর্থ সমান ভাবে বণ্টিত হবে, না হয় প্রয়োজনানুযায়ী ভাগ করা হবে।

এই ভাবে ষ্টালিন ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ পুরাপুরি কমিউ-নিজ্‌ম্ চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই বছরের (১৯৩০) গোড়ার দিকে,—যখন তাঁরা অনেকটা কৃতকার্য্য হয়েছেন,—তাঁরা স্থির করলেন যে, উৎপাদন-প্রণালী ও উৎপন্ন ধনসম্পদ্ সর্ব্বসাধারণের ব্যাপার করা (কালেকটি-ভাইজেশান্) বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা যখন অল্প, তখন জোর-জবরদস্তি করে দ্রুত অগ্রসর না হওয়াই ভাল, বরং একটু পিছু হটে পরে আস্তে আস্তে অগ্রসর হলেও চল্‌বে। এখন ধান ছাড়া আর সব কৃষিজাত জিনিষ নিয়ে কেনাবেচা করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইউক্রেন আর ককেসিয়া, এই দুই দেশ শস্য-উৎপাদনে প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে,—এই দুই জায়গা বাদে অন্য জায়গায় চাষারা এখন নিজেদের লাভের জন্য ফসল উৎপাদন করতে পারে।

সুতরাং রুশিয়া আবার একটু পিছু হটেছে। কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক বলেন যে, এ পিছু হটা নামমাত্র। রুশিয়া পুরাপুরি কমিউনিজ্‌মের জন্য পাগল। সুযোগ পেলেই রুশিয়া আবার সেদিকে এগুবে।

স্থানবদ্ধ শিল্প-সমাবেশের সুফল

বস্ত্র-শিল্প, লৌহ-শিল্প, কয়লা-শিল্প—প্রত্যেকটির স্ব-স্ব-প্রধান নানা ফার্ম্ম বা কোম্পানী আছে। প্রত্যেক ফার্ম্ম বা কোম্পানীর অধীনে এক বা ততোহধিক ফ্যাক্টরী চল্‌ছে।

এক শিল্পের অন্তর্গত অনেকগুলা ফার্ম্ম স্থান-বিশেষে বদ্ধ হলে, ইংরেজীতে তাকে বলে "লোক্যালাইজেশান্ অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্"। এই "লোক্যালাইজেশানে"র সুবিধা অনেক। কারখানাওয়ালাদের মধ্যে নানারকম আলোচনা চালানো সম্ভব হয়; মজুরেরা এক কারখানায় কাজ হারালে অন্য কারখানায় কাজ পেতে পারে; কলকারখানার আওতায় সাধারণ অভাব মেটাবার জন্য অনেক ছোট খাটো কারখানা ও দোকান গড়ে উঠতে পারে।

কিন্তু 'লোক্যালাইজেশানে'র একটা দোষ এই যে, এতে বেকার সমস্যাটাকে তীব্র করে। কথাটা উল্টে বলাও চলে যে, একই স্থানে নানা শিল্পের সমাবেশ হলে বেকার সমস্যা হ্রাস হয়।

যেখানে শিল্পের বৈচিত্র্য সেখানেই নানা শিল্পের আবির্ভাব হয় বলে বেকার কমে। বেকার কমবার অপর এক কারণ এই যে, কোন স্থানের শিল্পজীবনে বৈচিত্র্য থাকলে সেখানকার কারখানাওয়ালাদের মধ্যে নতুন নতুন

লাইনে যাবার সাহস ও ক্ষমতা বেশী হয়। অন্য একটা কারণ এই যে, শিল্পজীবনের বৈচিত্র্য থাকাতে সেই স্থানটি নানাভাবে জাতির আর্থিক জীবনের সঙ্গে জড়িত থাকে, এবং সেইজন্য নানা প্রকারের শিল্প-বাণিজ্যকে সেই স্থানে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

যেখানে শিল্প-জীবনের বৈচিত্র্য বেশী সেখানে কোন শিল্পের অবস্থা খারাপ হলে মজুরেরা সে শিল্প ছেড়ে অন্য শিল্প অবলম্বন ক'রে আগের মত রোজগার না করুক, অন্ততঃ প্রাণটা বাঁচাতে পারে। যেখানে নানা শিল্পের অবস্থান সেখানকার মজুরদের গতিশীলতাও বেশী, অর্থাৎ এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে যাবার জন্য যে উদ্যম ও সাহস দরকার হয় তাও বেশী।

একটি প্রবন্ধে এই সব কথা আলোচনা করবার পর শ্রীযুক্ত আলেন বলেন যে, স্থানে স্থানে এমনভাবে নানা শিল্পের সমাবেশ করা কর্ত্তব্য যে, যতদূর সম্ভব জাতির শ্রম-শক্তির অপচয় নিবারিত হয়। শি।

"ইকনমিকা"

লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স অ্যাণ্ড পোলিটিক্যাল সায়েন্সের মুখপত্র। বৎসরে সাধারনতঃ তিনবার করিয়া বাহির হয়—মার্চ্চ, জুন এবং নবেম্বরে। বাৎসরিক মূল্য ৭ শি ৬ পে। পৃষ্ঠা থাকে শ'খানেক। লিখিয়া থাকেন "স্কুলে"র কর্ম্মচারী ও ছাত্র প্রভৃতিরা। সম্পাদকগণের নাম:—(১) স্যর উইলিয়াম্ বিবারিজ্, (২) অধ্যাপক এইচ জে লাস্কি, (৩) অধ্যাপক টি ই গ্রেগরি। ১৯৩০ সনের মার্চ্চ সংখ্যার প্রবন্ধাবলী:

১। "চেষ্টা বা প্রয়াসের মাপে আয়-টানের স-লীলতা (ইল্যাষ্টিসিটি)"। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রিক অর্থনীতির অধ্যাপক লায়োনেল রবিন্‌স্ বলিতেছেন যে, "কোন্ কোন্ সর্ত্তে লোকে টাকা উপার্জ্জন করিবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করিতে হইলে আরোহ-প্রণালীতে স-লীলতার অনুসন্ধান করিতে হইবে, অবরোহ-প্রণালীর ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে।"

২। "আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ও ক্রেডিট্ সৃষ্টি সম্বন্ধে মন্তব্য", লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স লেক্‌চারার স্যর আর্ণেষ্ট ক্যাসেল। "আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কে যদি কতকগুলা শক্তিশালী জাতি নিজেদের রিজার্ভ ব্যালান্স রাখিয়া সোনা হারাইতে প্রস্তুত না থাকে, তবে এই আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের ক্রেডিট্ নীতি শেষ পর্য্যন্ত ঐ সব ব্যাঙ্ক দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে।"

৩। "স্বেচ্ছা-পত্র সম্বন্ধে বৃটিশ স্বাধীনতা (রিজার্ভেশনস্)" এইচ্ লউটেরপাখ্ ট্, এল্-এল্-ডি। ৩৬ পৃষ্ঠার দীর্ঘ প্রবন্ধ। ১৯২৯ সনের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রেট বৃটেন "পার্ল্যামেণ্ট কোর্ট অব ইণ্টারন্যাশনাল জাষ্টিসে"র আর্টিকেল ৩৬ এর অপ্‌শনাল ক্লজ্ সহি করিয়াছে, অবশ্য বাদসাদ দিয়া। এই বাদসাদ্ অংশগুলি লইয়া আলোচনা করা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

৪। "ইকনমিক ওয়েলফেয়ার" (আর্থিক হিতসাধন) এফ সি বেন্‌থাম। "আজকাল বড় বড় অর্থশাস্ত্রীরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, অর্থশাস্ত্রের পঠিতব্য বিষয় হইল "আর্থিক হিতসাধন"। শুধু তাই নয়, ঐ আর্থিক হিতসাধন আর্থিক মান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কতকগুলি লোক বা দলের সহিত অন্য কতকগুলির তুলনাতেই হোক্, বা একটা লোকেরই বিভিন্ন সময়ের তুলনায় হোক, বা একটা লোক-সে এখন যা তার সঙ্গে যা হইতে পারিত তার তুলনায় হোক্, সর্ব্বত্রই ঐ মানের কথা।" লেখক এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছেন। "ক'এর আয় যদি "খ'এর আয়ের দ্বিগুণ হয়, তবে আর রক্ষা নাই। অমনি হিতসাধনবাদী অর্থশাস্ত্রীরা ধরিয়া বসিবেন "খ"এর চেয়ে "ক"এর বেশী আর্থিক হিত হইতেছে (অবশ্য আয়ের নিম্নগ প্রান্তিক উপযোগিতা হেতু ঠিক দ্বিগুণ হইতেছে না)। তাঁদের মাথায় একথা আসে না যে, এটা কল্পনা, সত্য নাও হইতে পারে। অল্প টাকা পাইয়াও "খ" যতটা সন্তুষ্ট হইতে পারে, "ক"এর বেশী টাকা পাইয়াও তার চেয়ে কম সন্তুষ্ট থাকা অসম্ভব ব্যাপার নয় (সন্তোষ = স্যাটিস্‌ফ্যাক্‌শন)। হেতুটা চরিত্রগত হইতে পারে, এমন কি হজমের শক্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে। হিত-বাদী অর্থশাস্ত্রীরা যদি মানুষে মানুষে এই সব পার্থক্যকে মোটেই আমল না দেন, তবে তাঁরা ভুল অনুমান করিবেন, সন্দেহ নাই।

"তারপর ধর "ক"কেই যদি বিভিন্ন সময়ে ধরা যায়, তবে কি নিশ্চিত কিছু বলা যায়? তার প্রকৃত আয় যদি দ্বিগুণ হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তার চারিদিকের লোকের আয় যদি তিন গুণ হয়, তবে সে দ্বিগুণ জিনিষপত্র কিনিতে পারিলেও সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। তা ছাড়া তার নূতন নূতন অভাব বোধ হইতে পারে—বেশী দামে নূতন মোটর গাড়ী কিনিয়া তার বিব্রত হইবার সম্ভাবনাও আছে।" ইত্যাদি।

৫। শিক্ষা ও বিপক্ষ-মতাবলম্বিগণ। উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র-চিন্তা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ। ই ই রিথ্।

"দি জার্ণাল অব্ পোলিটিক্যাল ইকনমি"

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক মুখপত্র। দু'মাস অন্তর বাহির হয়। সম্পাদক জ্যাকব বিনার ও এফ্ এইচ নাইট্। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপকেরাই চালাইয়া থাকেন। প্রতি সংখ্যায় ১২৫ বা ততোঽধিক পৃষ্ঠা থাকে। বাৎসরিক মূল্য ৪ ডলার। ৩৮ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। ১৯৩০ আগষ্ট সংখ্যার প্রবন্ধাবলীর নাম:

১। "ইংল্যাণ্ডে ব্যাঙ্ক আমানতের গতিবেগ," লায়োনেল ডি এডি এবং ডোনাল্ড হ্বিবার। এক ব্যক্তি ডেট্রয়টের ইন্‌বেষ্টমেন্ট রিসার্চ কর্পোরেশনের, অন্য ব্যক্তি অধ্যাপক। ৩১ পৃষ্ঠার দীর্ঘ প্রবন্ধ। লেখকেরা গতিবেগের নিম্নলিখিত ফর্ম্মুলা বাৎলাইতেছেন (গতিবেগ = গ)

$$\text{গ} = \frac{\text{মাসিক ডেবিট বা প্রত্যর্পণ}}{\text{গড় আমানত}} \cdot \frac{\text{বৎসরে গড়পড়তা কাজের দিন}}{\text{মাসে গড়পড়তা কাজের দিন}}$$

২। "আডাম স্মিথের সময়াবধি ইংরেজের বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক তত্ত্বাবলী," জ্যাকব বিনার। এই আর্থিক ইতিহাসে (ইহা শেষ অংশ) ৫৪ পৃষ্ঠা গিয়াছে।

৩। "ব্যাঙ্ক নোটের স-লীলতা (ইল্যাষ্টিসিটি)", এল-ডব্লিউ মিন্টস্।

৪। "কৃষির সহিত ব্যবসা-বুদ্ধির সম্পর্ক," এডউইন গ্রয়ে (ইডাহো বিশ্ববিদ্যালয়)।

"বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘ পত্রিকা"

বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘের মুখপত্র। চৈত্র, আষাঢ়, আশ্বিন ও পৌষ এই ৪ মাসে ৪ সংখ্যা বাহির হয়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। ১৫নং হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ৩।০।

শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় (৫৪ পৃষ্ঠা) নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে:

১। লোন অফিস ও ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটির মতামত।

২। মান্দ্রাজ ব্যাঙ্ক তদন্তের ফলাফল—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সেন, এম-এ।

৩। বিহার-উড়িষ্যার ব্যাঙ্ক তদন্ত—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ।

৪। বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটির প্রস্তাব—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ।

৫। বাংলার বাণিজ্য-বার্ত্তা।

৬। সংগ্রহ ও সংবাদ।

৭। সঙ্ঘ প্রসঙ্গ।

পত্রিকার এই প্রথম বৎসর চলিতেছে।

"ইণ্ডাষ্ট্রি"

সেপ্টেম্বর, ১৯৩০। পূজার বিশেষ সংখ্যা। পৃষ্ঠা আছে ৫৬।

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ:

(১) শিল্প-সম্পর্কিত সেন্সাস।

(২) খদ্দর তৈয়ারী (২২ পৃষ্ঠা)। সকল দিক্ হইতে খদ্দরের ব্যবসা-মূল্য যাচাই করিবার চেষ্টা।
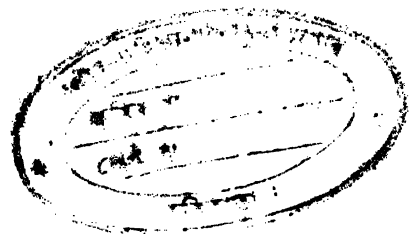
পাঞ্জাবের চাষীদের ঋণভার

জাতীয় অর্থবিজ্ঞানের মেরুদণ্ড

ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা হইতে দেশের অবস্থা জানা যায়। সেই জন্য ইয়োরোপে বণিকদের অভ্যুদয়ের পর হইতে এক শ্রেণীর অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত শ্রমিক ও দরিদ্র পরিবারের আয়-ব্যয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের পূর্ণ জীবনের চিত্র অঙ্কণ করিয়া আসিয়াছেন। সেই হইতে ইয়োরোপে এক নূতন শক্তি জাগ্রত হইয়াছে। সেই শক্তি বর্ত্তমানে "শ্রমিক শক্তি" নামে সুপরিচিত। ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহা লইয়া অনেক গবেষণা হইয়াছে, এবং মাথা পিছু ব্যক্তির আয় কত তাহা লইয়া মতভেদের চূড়ান্ত হইয়াছে। কিন্তু যথার্থভাবে ব্যক্তির বা পরিবারের অবস্থা কি তাহা জানিতে না পারিলে সমষ্টি সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করা সম্ভব নহে। সেই জন্য ভারতীয় অর্থবিজ্ঞানের একটা বড় দিক্ হইতেছে ইন্‌টেন্‌সিব্ ষ্টাডি অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, জাত, পেশা, ইত্যাদি লইয়া গ্রাম সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ। সেই তথ্য সংগ্রহের উপর 'জাতীয়' অর্থবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। অর্থবিজ্ঞানের অপর দিক্‌টা আন্তর্জ্জাতিক; তাহার কথা সম্প্রতি তুলিতেছি না।

পারিবারিক আয়ব্যয় সংগ্রহের পূর্ব্বতন প্রচেষ্টা

পাঞ্জাবের সমবায় বিভাগের কর্ত্তা ডার্লিং সাহেব ঐ প্রদেশের চাষীদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন; ইতিপূর্ব্বে কোনো প্রদেশের চাষীদের সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। কেতাবের নাম "পাঞ্জাব পেজেণ্ট ইন্ প্রস্‌পারিটি অ্যাণ্ড ডিস্‌ট্রেস্।" পূর্ব্বে পাঞ্জাবে ও অন্য অন্য প্রদেশে কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র। ১৮৭৬ সনে প্রথম প্রতিবেদন (রিপোর্ট) প্রকাশিত হয় হোসিয়ারপুর জেলার ৬১টি গ্রামের ঋণভার সম্বন্ধে। ১৮৭৮ সালের দুর্ভিক্ষের পর পাঞ্জাবের নানা স্থান হইতে ২২৩টি পরিবারের আয়-ব্যয়ের তথ্য সংগৃহীত হয়। ১৮৯৬ সনে মিঃ থরবার্ণ পাঞ্জাবের শাহপুর, গুজরাণবালা ও শিয়ালকোট জেলার বারটি গ্রামের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করেন। শ্রীযুক্ত থরবার্ণ 'মুসলমান ও পাঞ্জাবের মহাজন' সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৯১৯ ও ১৯২০ সনে হোসিয়ারপুর জেলায় দুইটি গ্রাম সম্বন্ধে দুইখানি বই লেখা হয়। পাঞ্জাবের বাহিরেও এইরূপ তথ্য সংগ্রহ হইয়াছে। সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে পাঞ্জাবের চাষীদের সম্বন্ধে ডার্লিং কি বলিয়াছেন তাহাই বলিতেছি।

সমবায়-সেবীর সুযোগ

পাঞ্জাবে সমবায়-আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে সমবায় বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা বিশদরূপে জানিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। সে সময়ে ২,১০৬টি ঋণদান সমিতির ৫৫,৩০৮ জন সদস্যের মূলধন, ঋণ প্রভৃতির তথ্য তাঁহার হস্তগত হয়। ডার্লিং সাহেবের বিশ্বাস শিক্ষিত কর্ম্মচারীদের দ্বারা সংগৃহীত এই সব তথ্য অতিরঞ্জিত নহে।

আট-একারী জমীদার

গ্রামের হিসাব করিতে গিয়া গড়পড়তা হিসাব করা ঠিক নহে। কারণ একই গ্রামের মধ্যে জমীদার, প্রজা, অস্থায়ী

চাষী, মজুর থাকে। তাহাদের সকলের অবস্থা সমান নহে। জমীদার অর্থাৎ যাহার নিজ জমি আছে, এমন লোকদেরও সকলের অবস্থা সমান নহে। সেইজন্য ৮ একর বা ২৫ বিঘার মত যাহাদের জমি আছে তাহাদের এক শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। এই আট-একারী জমীদারের সংখ্যাই বোধ হয় বার আনি। তবে জমির গুণ, সেচের ব্যবস্থা, বৃষ্টির পরিমাণ প্রভৃতি নানা দফা এই সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেইজন্য যেখানে বৃষ্টি বেশী বা সেচের ব্যবস্থা ভাল সেখানে গড়ে চাষী জমীদারের জমি হইতেছে ২ হইতে ৫ একার; আবার মরুময় জেলায় ৬০ হইতে ৮৪ একার জমিও এক একজনের থাকে। সুতরাং সমস্যা এক রকমের নহে এবং এই বিচিত্র সমস্যার সমাধানও এক প্রকার হইতে পারে না। তবে পাঞ্জাবে বাংলাদেশের ন্যায় জমীদারি প্রথা নাই; সেখানকার অধিকাংশ কৃষকই জমীদার।

ঋণ-কবলিত পাঞ্জাবী চাষী

৪৩,১৩৩ জন জমীদারের আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে:

শতকরা ১৭ জন মাত্র অঋণী।

মোট ঋণ ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা।

বন্ধকী ঋণ ৬৭ লক্ষ টাকা।

প্রত্যেক ঋণগ্রস্ত জমীদারের গড় ঋণ ৪৬৩৲ টাকা, বার্ষিক খাজানার ১২ গুণ।

পাঞ্জাবের চাষীদের মধ্যে শতকরা কয়জন অঋণী তা লইয়া আলোচনা হইয়াছে। ডার্লিং সাহেবের অনুসন্ধানানুসারে কোনো জেলাতেই শতকরা ২৬ জনের বেশী অঋণী নহে; দুইটি জেলায় শতকরা ৫ জন চাষী ছাড়া আর সব ঋণগ্রস্ত।

অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনায় দেখা যায় যে, পাঞ্জাবের অবস্থা অতি শোচনীয়। যথা:

১৮৭৪ সনে মধ্য-প্রদেশে শতকরা ৬০% অঋণী।

১৮৮৮ সনে আগ্রা জেলার প্রজার " ২২% "।

১৮৯৪ সনে নাগপুরের আঠার হাজার প্রজার শতকরা ৪০% অঋণী।

১৯০১ সনে বড়োদা রাজ্যে ৪০% অঋণী।

১৯০৭ সনে ফরিদপুর জেলার চাষীদের ৫৫% অঋণী।

১৯১৯ সনে মহীশূর রাজ্যের ২৪,৩৫০ জন সমবায়ীর ৩৭% অঋণী।

উপরি উক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, পাঞ্জাবের কৃষক খুব বেশী ঋণী। বোম্বাইয়ের অবস্থাও তদ্রূপ; ১৯০১ সনে দুর্ভিক্ষ বৈঠকের প্রতিবেদনানুসারে সেখানকার চাষীদের শতকরা ৮০ জন ঋণভারে প্রপীড়িত ছিল।

পাঞ্জাবের মোট ঋণের শতকরা ৩৭ কোথায়ও বা ৫০ ভাগ বন্ধকী ঋণ, কোনো কোনো জেলায় ৬০; মোটামুটি সকল শ্রেণীর ঋণের অর্দ্ধেক হইতেছে বন্ধকী। পাঞ্জাবে কৃষকের জমি বন্ধক দেওয়া কঠিন। কারণ কুড়ি বছর পরে অ-চাষীর নিকট বন্ধকী জমির মূল্য নাকচ হইয়া যায়। বিশ বছরের শেষে কৃষককে বন্ধকী জমির জন্য কোনো টাকা দিতে হয় না;—চাষী জমি ফিরিয়া পায়। এই আইনকে "ল্যাণ্ড অ্যালিএনেশন অ্যাক্ট" বলে। এই আইনের ফলে মহাজনের পক্ষে বিনা বন্ধকে বা অস্থির বন্ধকে টাকা দেওয়া খুবই কঠিন। সমবায়ে তাহাদের অভাব সর্ব্বদা মিটে না। মহাজনের কাছে তাহাদের যাইতেই হয়। অ-চাষী মহাজন বন্ধকের অসুবিধা জানিয়াও টাকা ধার দেয়; কারণ কুড়ি বছরের মধ্যে সে আসল ও সুদ পোষাইবার মত ব্যবস্থা করিয়াই টাকা ধার দেয়। জমি বন্ধক দেওয়া চাষী সমাজে নিন্দনীয়; যদি কেহ জানে যে, অমুকে তাহার জমি বন্ধক দিয়াছে, তবে সমাজে তার ইজ্জৎ নষ্ট হয়। তাহার পক্ষে টাকা ধার পাওয়া মুস্কিল হয়। সেই জন্য লোকে জমি বন্ধক না দিয়া টাকা ধার করে; বিনা বন্ধকে টাকা ধার করিতে সুদ বেশী দিতে হয়। টিপ সহি করিলে টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু বন্ধক দিতে হইলে অনেক হাঙ্গামা ও জানাজানি হয়, রেজিষ্টারী আফিস যাইতে হয়, ইত্যাদি।

এখন দেখা যাক পাঞ্জাবে গড় ঋণের পরিমাণ কিরূপ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে গড়ে জমীদার বা কৃষকের ঋণ হইতেছে ৪৬৩৲ টাকা। কিন্তু অন্য জায়গার সহিত তুলনা না করিলে পাঞ্জাবী চাষীর ঋণের যথার্থ স্বরূপ বুঝা যাইবে না।

(১) ১৮৯৬ সনে গৃহীত ৯ খানি গ্রামের ঋণগ্রস্ত লোকের গড় ঋণ ৫৮২৲ টাকা

(২) ডার্লিং সাহেবের গৃহীত ৪৩,৭৩৩ জন কৃষকের ঋণ ৪৬৩৲ টাকা।

পাঞ্জাবের বাহিরে ঋণের ভার তুলনীয়। আহ্‌মদনগরে ৩৭১৲ টাকা; ফরিদপুরের ঋণগ্রস্ত চাষীর ১২১৲ টাকা; বড়োদায় প্রতি জমায় ৪৫০৲ টাকা; মারাঠী গ্রামের পরিবার পিছু ২২৫৲ টাকা; আজমীঢ়-মেরবার সমবায়ীদের মধ্যে ৩৭৯৲ টাকা; বাংলাদেশে চারি হাজার সমবায়ীর মধ্যে ১২০৲ টাকা; এবং মহীশূরের প্রায় পঁচিশ হাজার সমবায়ীর মধ্যে প্রত্যেক ঋণগ্রস্ত সমবায়ীর ঋণ ছিল ২৭৩৲ টাকা। নানা সময়ে, নানা স্থানে, নানা ভাবে এই তালিকা-গুলি প্রস্তুত হইয়াছিল; বর্ত্তমানে ইহাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য বেশী নয়। তবে ইহা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, পাঞ্জাবের চাষীদের অবস্থা আদৌ ভাল নয়। অনেকে অনেক সময়ে বলেন, যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই সেখানকার চাষীদের অবস্থা বাঙ্গালার চাষীদের অবস্থা হইতে ভাল। পূর্ব্বোল্লিখিত তালিকা তাহা প্রমাণ করে না। তবে একথাও ঠিক যে, বাঙ্গালার চাষীদের অবস্থা তালিকা-বর্ণিত অবস্থা হইতে অনেক খারাপ।

খাজানা বনাম ঋণ

সমগ্র পাঞ্জাবে কৃষকের ঋণ খাজানার বার গুণ। খাজানা ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। সুতরাং ঋণ ৫৫ কোটি টাকা দাঁড়ায়। বন্ধকী ঋণ প্রভৃতি লইয়া সমগ্র ঋণ কমসেকম ৭৫ কোটি টাকা বা খাজানার প্রায় সাড়ে পনের গুণ। খাজানা বাদ দিয়া চাষীর বৎসরে যাহা থাকে তাহার প্রায় তিন গুণ ঋণ সে সর্ব্বদা বহন করে! কিন্তু এ ভাবে গড় হিসাবে ব্যক্তির যথার্থ অবস্থা বুঝানো যায় না। সেই জন্য ইহাকে অন্যভাবে দেখা যাক্। যেমন (১) বড় জমির কৃষক ও (২) ছোট জমির কৃষক অর্থাৎ যাহার জমি আট একারের মধ্যে।

	সংখ্যা	শতকরা অ-ঋণী	বন্ধকের অনুপাত	কত ঋণ	খাজানার কয় গুণ ঋণ
বড় চাষী	২৫,৮৪০	১৮	৪০	৫৭০৲	১০
ছোট চাষী	১৭,১৮০	১৭	৪০	৩১০৲	২৭

বড় চাষী বা জমীদারের ঋণ ৫৭০৲ বা খাজানার দশ গুণ। ছোট চাষীর ঋণ ৩১০৲ বা খাজানার ২৭ গুণ। বড় চাষীর বড় ঋণ, কিন্তু ছোট চাষীর ঋণের ভার আছে।

৯০ কোটি টাকার ঋণে পাঞ্জাবী কৃষিজীবী

জমীদার বা কৃষক ছাড়া চাষী-প্রজাও পাঞ্জাবে আছে; তাহাদের সংখ্যা বার হাজারের অধিক নহে। ইহাদের ঋণ আছে। জমীদার, কৃষক, চাষী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কৃষিজীবীর মোট ঋণ প্রায় ৯০ কোটি টাকা।

ডার্লিং সাহেব পাঞ্জাবের অনুপাতে সমগ্র বৃটিশ ভারতের কৃষকদের ঋণের সম্বন্ধে একটা অনুমান করিয়াছেন। পাঞ্জাবের চাষী জন-সংখ্যায় সমগ্র ভারতের চাষী-সংখ্যার $\frac{১}{১২}$ মাত্র; সুতরাং ভারতের চাষীদের ঋণ দাঁড়ায় ১,০৮০ কোটি টাকা। তিনি মোটামুটি ৬০০ কোটি টাকা ধরিয়াছেন; কেন যে কম ধরিয়াছেন তাহার কারণ দেখান নাই। ডার্লিং সাহেব এই অঙ্ক দেখিয়া আতঙ্কিত হন নাই, কারণ প্রুশিয়ার চাষীদের ও মার্কিণ চাষীদের ঋণ ইহাদের অনুপাতে অনেক বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ ভাবে তুলনা চলে না এবং তুলনা করা উচিতও নহে। মার্কিণ বা প্রুশিয়ান্ চাষীর আয় পাঞ্জাবী চাষীর চেয়ে ঢের বেশী, সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১। "থিওরি অব্ লোকেশ্যন অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্" (স্থান-মাহাত্ম্যে শিল্পের অবস্থা-তত্ত্ব)। মূলতঃ ছেবারের এই কেতাব জার্ম্মাণীতে ১৯০৯ সনে প্রকাশিত হয়। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক কার্ল জোআশিম্ ফ্রিড্রিক পি-এইচ্ ডি, ভূমিকা ও আলোচনাসহ প্রকাশ করিয়াছেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস। ১৯২৯। পৃঃ ৩৩+২৫৬। ৩ ডলার।

২। "দি থিওরি অব্ ইন্টারেষ্ট, অ্যাজ্ ডিটারমিন্‌ড্ বাই ইম্‌পেশেন্স টু স্পেণ্ড ইনকাম অ্যাণ্ড অপরচুনিটি টু ইন্‌বেষ্ট ইট্" (লোকে তাড়াতাড়ি নিজ আয় খরচ করিয়া ফেলিতে চায় এবং টাকা খাটানোর সুযোগও একটা ধর্ত্তব্য বিষয় বটে; এই দুই কারণে সুদ কিরূপে স্থির হয় তৎবিষয়ক তত্ত্ব), ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক আর্বিং ফিশার। ম্যাকমিলান কো, নিউ ইয়র্ক। ১৯৩০। পৃঃ ২৭+৫৬৬। ২৫ শি।

৩। "ডী ড্রাই নাশ্যিওনাল্যোকোনমিয়েন।" গেশিক্টে উণ্ড সীষ্টেম ড্যের্ লেহ্‌রে ফোন ড্যের্ হ্বির্ট্‌শাফ্ট্। (জাতীয় অর্থশাস্ত্রের ত্রিধারা। অর্থশাস্ত্রঘটিত শিক্ষার তত্ত্ব ও প্রয়োগ)। ছের্ণার সোম্বার্ট। ডুঙ্কের উণ্ড হুম্‌ব্লোট, মুনখেন ও লাইপৎসিগ। ১৯৩০। পৃঃ ১২+৩৫২। ১৫ রে-মা।

৪। "এণ্ডে ড্যেস কাপিটালিস্‌মুস?" (পুঁজি-নিষ্ঠার কি শেষ দিন আসিল?) অ্যাডোল্‌ফ হেবার। ম্যাক্স হুবের, মুনখেন। ১৯৩০। ১০৩ পৃঃ। ২½ রে-মা।

৫। "ডী হ্বির্টশাফ্‌ট্ ড্যের্ শেকোশ্লোহ্বাকাই" (জেকোশ্লোহ্বাকিয়ার অর্থতত্ত্ব), বুর্খার্ড ফোন ড্যের ডেকেন। ডুঙ্কের উণ্ড হুম্‌ব্লোট, মুনখেন ও লাইপৎসিগ। ১৯২৮। পৃঃ ৮+৩৬৮। ১২'৫০ রে-মা।

৬। "আমেরিকা কঙ্কারস্ বৃটেন" (আমেরিকা বৃটেনকে হারাইয়া দিয়াছে), লাড্‌হ্বেল ডেনি। আর্থিক লড়াইয়ের বিবৃতি। আলফ্রেড্ এ ক্লফ্, লণ্ডন ও নিউ ইয়র্ক। ১১+৪২৯+১৬ পৃঃ। ১২ শি ৬ পে।

৭। "ইণ্টারন্যাশনাল কটন ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স অব্ দি কনজাম্পশন অব্ কটন ফর্ দি হাফ্-ইয়ার এণ্ডিং ৩১ জানুয়ারী, ১৯৩০, অ্যাণ্ড ষ্টক্‌স অব্ কটন ইন্ স্পিনার্স্ হ্যাণ্ডস্ অন্ ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩০, হ্বিথ্ প্রিবিয়াস্ ইয়ার্স্ ফিগার্স্ ফর্ কমপ্যারিজন (৩১ জানুয়ারী, ১৯৩০ অবধি ৬ মাসে গোটা দুনিয়ায় কত তুলা খরচ হইয়াছে ও ১ ফেব্রুয়ারী অবধি স্পিনারদের হাতে কত তুলা মৌজুত ছিল তার হিসাব নিকাশ তত্ত্ব)। ইণ্টারন্যাশন্যাল ফেডারেশ্যন অব্ মাষ্টার কটন স্পিনার্স্ অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স্ এসোসিয়েশনস্, ম্যাঞ্চেষ্টার। ১৯৩০। ২৮ পৃঃ।

৮। "ফরেষ্টস্ অ্যাণ্ড ম্যানকাইণ্ড" (বনভূমি ও মানব-জাতি), চার্লস্ ল্যাথ্রোপ প্যাক ও টম গিল্। ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক। ১৯৩০। ১০+১৫০ পৃঃ। ১২ শি ৬ পে।

৯। "মার্জারস্ ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রী" (শিল্পে একাকার)। ন্যাশন্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কনফারেন্স বোর্ড, নিউ ইয়র্ক। ১৯২৯। ১৪+২০৫ পৃঃ। ৩ ডলার।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সালতামামি

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল

পরিষদের পশ্চাতে ইতিহাস

ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা দেশে ধনবিজ্ঞান-বিদ্যার চর্চ্চার জন্য নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান কায়েম আছে। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে মোটামুটি দেখা যাইবে যে, গোড়ায় ইহাদের আরম্ভ সামান্য ভাবেই হয়। ১৯৩০ সনের লণ্ডনের রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটি বা আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশনের স্বরূপ দ্বারা গোড়াকার প্রচেষ্টার তৌলমাপ করিলে অন্যায় করা হইবে। আজ পৃথিবীর এমন কোন সভ্য দেশ নাই যেখানকার অর্থশাস্ত্রীরা ইহাদের কোনটার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গৌরব বোধ করিবে না।

আমাদের এই প্রতিষ্ঠান মাত্র ২১ মাস যাবৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ইয়োরামেরিকার শক্তিশালী পরিষদ্ সমূহের সহিত এর তুলনা করিতে যাওয়া ঠিক হইবে না। যাঁরা ঐসব প্রতিষ্ঠানের কথা মনে করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন ও ভাবেন, "তারা কোথায় আর আমরা কোথায়!" তাঁদের এই কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। পরিষদের জীবন মাত্র সুরু হইয়াছে, ভবিষ্যতে ইহা কোন মূর্ত্তি গ্রহণ করিবে এক্ষণে বলা সম্ভবপর নহে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইয়োরামেরিকান প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত ইহার যে বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে তার কিছু কিছু আভাষ দিতে চাই।

সাধারণতঃ ইয়োরামেরিকায় আগে দেখা দিয়াছে পরিষদ্, সর্ব্বশেষে আসিয়াছে পত্রিকা। পরিষদের কার্য্যাবলী বুলেটিন, পুস্তিকা, ইত্যাদিরূপে প্রকাশ হইতে হইতে যখন দেখা গিয়াছে যে, একটা পত্রিকা না হইলে চলে না, তখন পত্রিকা দেখা দিয়াছে। পত্রিকার অর্থ অনেকগুলি লোক একসঙ্গে বিভিন্ন বিভাগে যা লেখাপড়া করিতেছে তা পরিমাণে ততখানি হইয়া উঠিয়াছে যতখানির জন্য পত্রিকারূপ বিশেষ বাহনের দরকার হয়। কিন্তু আমরা বাঙ্গালা দেশে গোড়াতে পরিষদের সাহায্য ব্যতিরেকেও আড়াই বৎসর ধরিয়া এক পত্রিকা চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। পত্রিকার গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচারকর্ত্তা আমরা নহি। কিন্তু ব্যাপারটা ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক সভ্য দেশে স্ব স্ব ভাষায় ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বাহিরে হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে কোন বিদ্যার চর্চ্চাই এ পর্য্যন্ত তেমন ভাবে মাতৃভাষায় হয় নাই। ছেলেবেলা হইতে বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়া বিদ্যা আয়ত্ত করাই ত এক কসরৎ বিশেষ। তারপর সেই বিদ্যাকে সহজ সরল করিয়া মাতৃভাষায় প্রকাশ করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তা আপনাদের প্রত্যেকেরই বোধগম্য হইবে। কিন্তু পরিষদ্ তথা "আর্থিক উন্নতি" সেই ব্রত সাধন করিবার জন্যই নামিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় আর্থিক চর্চ্চা ও আর্থিক সাহিত্যের সৃষ্টিই ইহার সাধনার বিষয়। "আর্থিক উন্নতি" আজ ৪ বৎসরেরও বেশী চলিতেছে, কিন্তু উহাতে এ পর্য্যন্ত একটিও ইংরেজী হরফ ব্যবহৃত হয় নাই। ইংরেজ, ফরাসী বা জার্ম্মাণ তাদের গ্রন্থে ও পত্রিকায় অন্য ভাষার কথা যে কারণে নিজেদের হরফ ছাড়া অন্য হরফে প্রকাশ করিতে চায় না; আমরাও সেই কারণে সর্ব্বত্র বাঙ্গালা টাইপের মর্য্যাদা দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু ইহার ভিতরকার কথা হইতেছে ধনবিজ্ঞান বিদ্যাকে সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালা ভাষার কাঠামো দিয়া তৈরী করা।

প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠার ও বৎসরে ৯৬০ পৃষ্ঠার মাল বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঁটিয়া দেওয়া সোজা কথা নয়। প্রথমতঃ আমাদের দেশে আর্থিক সাহিত্যের সৃষ্টি কিছুই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাও যা কিছু হইয়াছে অধিকাংশই ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। রীতিমত ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় লেখার প্রবর্ত্তন বাস্তবিক "আর্থিক উন্নতি" ও

পরিষদের কীর্ত্তি বলিলে অন্যায় হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, "আর্থিক উন্নতি"র মারফতে যখন বাঙ্গালা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইল তখন মুষ্টিমেয় কয়েকটি মাত্র যুবক শুধু একটা আদর্শের জন্য দুরন্ত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। আজও সে সংখ্যা যে খুব বাড়িয়া গিয়াছে তা নয়, কিন্তু এক্ষণে এ কথা বিশ্বাস করা শক্তও বটে আর আশ্চর্য্যজনকও বটে যে মাত্র ২।৩টি লোক অসীম সাহসে ভর করিয়া তাঁদের "আর্থিক উন্নতি"রূপ তরণীখানি ভাসাইয়াছিলেন। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পূরণ করিবার নিমিত্ত তাঁদের কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইত আপনারা একবার কল্পনা করিয়া লউন। আজ পরিষদে ৭।৮ জন গবেষক অনবরত কাজ করিতেছেন, বাহিরের লেখকের সংখ্যাও ২।১ জন করিয়া বাড়িতেছে। কিন্তু তখন মাত্র অদম্য আশা ও উৎসাহ সম্বল করিয়া সকল বাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে হইয়াছিল।

এই সম্পর্কে আমাদের গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ও "আর্থিক উন্নতি"র বর্ত্তমান ডিরেক্টার ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের একজন ধরিয়াছিলেন হাল, অন্যজন তরণী বাহিতেছিলেন। "আর্থিক উন্নতি" ও ধনবিজ্ঞান পরিষদ আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া যে দেশমাতার সেবা করিতে সমর্থ হইতেছে ও দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে ইহার মূলে রহিয়াছেন ঐ দুই ব্যক্তি। বঙ্গদেশে আর্থিক চর্চ্চার ইতিহাস লিখিবার সময় যেদিন আসিবে সেদিন এঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। অধ্যাপক সরকার সব্যসাচীর ন্যায় একই কালে ধনবিজ্ঞানের বহু বিভিন্ন শাখায় কলম চালাইয়াছেন ও তাঁর সহকর্ম্মীদের হাতে করিয়া মানুষ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর ডক্টর লাহা এই পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানকে বাহিরের সর্ব্বপ্রকার আঘাত ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

পরিষদের জন্ম ও কার্য্যপ্রণালী

১৩৩৫ সনের আশ্বিন, ইংরেজী ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাসে পরিষদের জন্ম হয়। বলা বাহুল্য, পরিষদের কল্পনাটা অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের মাথায় আগে হইতেই ছিল। ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকা বাহির হয়। তার কিছুকাল আগে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু পরিষদের একটা অনুষ্ঠানপত্র তিনি বিদেশে থাকিতে ইতালি হইতেই "প্রবাসী"পত্রে ছাপাইয়াছিলেন। ১৩৩৪ সনে বর্ত্তমান লেখকেরও ঐরূপ একটি প্রস্তাব "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হয়। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে যে, বিষয়টি কিছু কাল ধরিয়া কোন কোন মগজে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল।

পরিষৎ কেন ১৩৩৫ সনে জন্ম লাভ করিল, তার আগে করিল না, এই প্রশ্নের সার্থকতা আছে এই জন্য যে, উহার জবাব হইতেই আমাদের চিন্তা ও কার্য্যের একটা ধারার পরিচয় লাভ করা যাইবে। পূর্ব্বে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ আমরা কি এ বিষয়ে প্রতীচ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের পথই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি না আমাদের ধারা বিভিন্ন? —এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, (১) আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্ম উল্টাভাবে হইয়াছে, আগে আসিয়াছে পত্রিকা, তারপর পরিষৎ, তারপর পুস্তিকা ও গ্রন্থ, ইত্যাদি; (২) আমরা প্রথম ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাতৃভাষায় আরম্ভ করিয়াছি—অন্য দেশের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক হইলেও আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার দরুণ ইহা সহজসাধ্য নহে; (৩) মাসে ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া ও বৎসরে ৯৬০ পৃষ্ঠা করিয়া আমরা ৪½ বৎসরে প্রায় ৪,৫০০ পৃষ্ঠার আর্থিক সাহিত্য বিতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি—পৃষ্ঠা-সংখ্যার দিক্ হইতে সাধারণতঃ বিদেশী কোন পত্রিকা এতখানি মাল দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করে না; (৪) অথচ প্রতীচ্য দেশগুলির তুলনায় আমাদের খাটিবার লোক অনেক কম।

যিনি অবহিতভাবে পরিষদের বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন পরিষদের উদ্ভব ও বিকাশের পক্ষে বাধা কি ছিল। মুষ্টিমেয় লোক হঠাৎ বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। মাতৃভাষায় দরদী সহজে পাওয়া যায় না। ২।১ জন দরদী যদি বা জুটে, মাসের পর মাস

অনলসভাবে তৎপরতার সহিত খাটিবার লোক পাওয়া ভার। এরূপ অবস্থায় কিসের উপর নির্ভর করিয়া পরিষৎ গড়িয়া তোলা যায়? যেমন তেমন ভাবে পরিষৎ খাড়া করিলে তার অস্তিত্বই বা কতদিন থাকিবে? সেইজন্য প্রকৃতির বীক্ষণাগারে একটি বিশেষ গবেষণা বা এক্সপেরিমেন্টের দরকার ছিল। লোক চাই। খাঁটি লোক চাই। অর্থাৎ যে কাজে ফাঁকি দিবে না। নিজেই নিজের কড়া খবরদারি করিবে, দিনের পর দিন মাসের পর মাস, তিল তিল করিয়া আপনার শ্রমে যত্নে ও ভালবাসায় বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া আর্থিক সাহিত্যটাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে বলিয়া পণ করিয়া বসিবে, অন্যের সাহায্য পাওয়া যাক্ বা না যাক্। আপনার পথ আপনি কাটিয়া চলিবে। এমন লোক পাওয়া খুব সোজা নয়। মনে রাখিতে হইবে পত্রিকা ও পরিষদের জন্য এ পর্য্যন্ত যাঁরা প্রাণপাত খাটিয়াছেন তাঁরা তাঁদের পরিশ্রমের জন্য এক পয়সাও পান নাই। অর্থাৎ খাটিলে যে আর্থিক উন্নতি হইবে তার কোন সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। যশের ভাগও প্রায় শূন্য। কারণ বাঙ্গালায় আর্থিক সাহিত্য রচনা করিলে তা মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের মাত্র পড়িবার সম্ভাবনা, আর ইংরেজীতে লিখিলে তা গোটা ভারতবর্ষের লোক ত পড়িবেই, ভারতবর্ষের বাহিরেও বিভিন্ন প্রতীচ্য দেশে সম্মান লাভের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং কে বোকার মত বাঙ্গালায় আর্থিক তত্ত্ব প্রচার করিতে যাইবে? এমন লোক চাই যে মাতৃভাষাকে যথার্থ প্রাণের সহিত ভালবাসে, যে ইহার ভাব-দৈন্যে ব্যথিত হয় ও সে জন্য সমস্ত প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া মাতৃভাষাতেই আপনার চিন্তারাশি প্রকাশ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এমনতর ব্রতী না পাইলে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ জন্মলাভ করিত না। পরিষদের সৌভাগ্য যে এরূপ কয়েকজন ব্রতীকে লাভ করিয়াছে। কিন্তু ব্রতীরও পরীক্ষা হওয়া দরকার। অধ্যাপক সরকার মহাশয় তাই সহকর্মী পাওয়া মাত্রই পরিষৎ খাড়া করেন নাই। তাঁরা তাঁর সহিত কিছুকাল কাজ করিবার পর তিনি যে পরিষৎ সৃষ্টি করিতে ভরসা পাইয়াছিলেন ইহা যথোচিত হইয়াছে।

পরিষদের একটা কার্য্যপ্রণালী স্বীকৃত হইয়াছে। ঠিক স্বীকৃত হয় নাই, গড়িয়া উঠিতেছে। পরিষদের বৈশিষ্ট্য বলিয়া যা বিবৃত করিয়াছি, তা হইতেই এই কার্য্যপ্রণালীর অথবা গবেষণা-প্রণালীর একটা সন্ধান পাওয়া যাইবে।

বলা বাহুল্য, পরিষৎ গবেষক তৈরী করিয়া গবেষণার কার্য্য আরম্ভ করেন নাই। যাঁরা বিনয় বাবুর সহিত একযোগে "আর্থিক উন্নতি"র জন্য খাটিতেছিলেন তাঁদের 'হাতে খড়ি' আগেই হইয়া গিয়াছিল। এই জন্যই পরিষদের প্রথম সমিতিতে ইঁহাদিগকে একেবারে গবেষক বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ পরিষৎ তৈরী মাল হাতে পাইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, বলা যাইতে পারে। পরিষৎ সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই, তাঁরা কোন্ কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য হাতে লইয়াছেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, সে কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য কোন্ প্রণালী বা কোন্ কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন? দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাব আগে দিব।

ইংরেজীতে যাকে বলে মেথডোলজি বাঙ্গালায় তা তর্কশাস্ত্র, প্রণালীতত্ত্ব ইত্যাদি রূপে তর্জ্জমা করা যাইতে পারে। অর্থশাস্ত্রের তর্কপ্রণালী বা গবেষণা-প্রণালী কিরূপ? প্রথমতঃ প্রশ্ন হইতে পারে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিতেছে কি না? দ্বিতীয়তঃ, কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা আছে কি না?

পশ্চিমাদের দেশে এমন কোন বিদ্যা নাই যা লজিক বা তর্কশাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলে না। একটা ইমারত গড়িতে হইলে কাঠ, খড় হইতে আরম্ভ করিয়া ইট, সুড়কি পর্য্যন্ত দরকার হয়। কিন্তু সমস্ত মালমসলা একত্র জড়ো করিলেই আর কিছু কোঠাবাড়ী পাই না। মালমসলার যথাযথ ব্যবহার জানা চাই ও যথাযথভাবে কাজে লাগাইবার শক্তি ও অভ্যাস অর্জ্জন করা চাই। নচেৎ মালমসলার কোন সার্থকতা থাকে না। বিদ্যা সম্বন্ধেও ঐ কথা। বিদ্যাকে খাড়া করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট পরিমাণ উপকরণ অর্থাৎ তথ্য চাই। তারপর সেই উপকরণকে বাছিবার, সাজাইবার ও যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার অভিজ্ঞতা

ও শিক্ষা অর্জ্জন করিতে হইবে। তার জন্য দরকার তর্ক-বিদ্যার সাহায্য। বস্তুতঃ পশ্চিম দেশে প্রত্যেক শাস্ত্র বা বিদ্যা একটা মেথডোলজি মানিয়া ত চলেই, উপরন্তু সেখানে মেথডোলজিকেও বিশিষ্ট বিদ্যারূপে মর্য্যাদা দেওয়া হইতেছে। ধনবিজ্ঞানের তর্ক বা গবেষণাপ্রণালী লইয়া সেখানে নিয়ত বহু লোকে মাথা ঘামাইয়া থাকে। কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে না, কেন করিতে হইবে বা না হইবে, তা লইয়া বহু তর্ক ও কথা কাটাকাটির বিরাম আজও হয় নাই। নানা মুনি নানা প্রকার পথের কথাও বলিয়া থাকেন।

বলা বাহুল্য, মূলতঃ তর্ক বা গবেষণা-প্রণালীটা এক হইলেও ঝোঁক দেওয়ার রকমের উপর তার বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকটিত হয়। আর সেজন্যই ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়। একই প্রকার তথ্যরাশি সম্মুখে রাখিয়া কেহ বলিতেছেন, অবাধ বাণিজ্য নীতিই দেশের পূর্ণ উন্নতির একমাত্র পথ, অন্য কেহ বলিতেছেন, সংরক্ষণ যদি না অবলম্বন কর শীঘ্র গোল্লায় যাইবে। কেহ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব বাড়াইবার প্রয়াসী, অন্য কেহ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়-গান করিতেছেন। কেহ বা সামাজিক সাম্যবাদের গুণগানে মুখর, অন্য কেহ পুঁজিবৃদ্ধি ভিন্ন জগতের উন্নতির আর উপায় দেখেন না। কেহ বা সমবায়কে, অন্য কেহ মজুর-সঙ্ঘকে যুগান্তকারী বলিয়া বিবেচনা করেন। আর উদা-হরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, আর্থিক মতবাদের ধারা বহুপথে ধাবিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এর কোন্ পথ বাছিয়া লইয়াছে? কোন বিশেষ পথ বাছিয়া লইয়াছে কি?

যদি বলি পরিষৎ কোন পথ বাছিয়া লয় নাই তবে কিছুই বলা হইল না। সত্য কথাটা এই যে, আমরা কোন বাঁধা পথে চলিতে চেষ্টা করিতেছি না। আমরা নিজেরাই একটা পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছি। অর্থাৎ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ বাঙ্গালার আর্থিক সাহিত্যকে যেমন নানা দিক্ দিয়া পুষ্ট করিতে চায়; তেমনি ঐ বিদ্যার চর্চ্চার জন্য এক নূতন ভঙ্গীর গবেষণাপ্রণালী, একটা নব্য-ন্যায় দান করিতে চায়।

কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া বলা যাক্। ধনবিজ্ঞানের মেথডোলজিটা ভৌগোলিক সীমা দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে না ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে—এ প্রশ্ন মনে সহজেই উদিত হইতে পারে। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, আমেরিকান, ইতালীয়, জাপানী ইত্যাদি জাতিরা কি ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের এক এক বিশিষ্ট মূর্ত্তির সৃষ্টি করিতেছে, না দেশ-নির্ব্বিশেষে এক এক বিশেষ ব্যক্তির তাঁবে এক একটি স্কুল গড়িয়া উঠিতেছে? পরিষদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা এই কথা বলিলেই জন্মিবে যে, এই প্রশ্নটাও আমরা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় বলিয়া মনে করি। সে জন্য কতকগুলি মাত্র উদা-হরণ হইতে কোন সিদ্ধান্ত খাড়া না করিয়া খোলা মনে ইহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছি।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ মেথডোলজিটাকে বাজাইয়া লইতে চাহিতেছে। তার অর্থ এ নয় যে, আমরা ইতিমধ্যে আর সব কাজ বন্ধ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া আছি। তার অর্থ এই যে, আমরা নব নব সত্য আবিষ্কার করিতে যেমন ইচ্ছুক, পুরাতন সত্যগুলিকেও তেমনি বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে চাই। কোন্ দেশে কোন্ সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে অথবা কে তাহা আবিষ্কার করিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করি না। আমরা সত্যকে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা মর্য্যাদা দিতে প্রস্তুত আছি।

সুতরাং কিছু আগে গবেষণা-প্রণালী সম্বন্ধে যে দুইটি প্রশ্ন করিয়াছি, তার দ্বিতীয়টির, কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা আছে কিনা তার, কোন জবাব আপাততঃ না দিলেও চলিবে। আমাদের পথ চলিতে চলিতে তা মিলিবে বলিয়া মনে করি।

পরিষদের নব্য ন্যায়

কোন পীরই আমাদের শেষ পীর নয় বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীর নয়। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ মৃত বা জীবিত কোন আর্থিক চিন্তাবীরের কাছেই আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহে, কারও চিন্তাপ্রণালী দ্বারা পরিচালিত হইতে ইচ্ছুক নহে। এর অর্থ এ নয় যে, আমরা দুনিয়ার সমস্ত অর্থ-

শাস্ত্রীর দানকে অস্বীকার করিতেছি। বরং ঠিক তার উল্টা। আমরা সকল প্রকার আর্থিক চিন্তার ধারার সহিত প্রত্যেক গবেষকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা আবশ্যক বলিয়াই ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। আমাদের কথা এই যে, আর্থিক সত্যের উদ্‌ঘাটনের জন্য চিন্তার রাজ্যে ছোটবড় বিচার করিলে চলিবে না। সমগ্র আর্থিক সাহিত্যের ইতিহাস আয়ত্ত করিতে হইলে দেশে দেশে, কালে কালে যে সব চিন্তাস্রোত বহিয়া গিয়াছে সেগুলির খোঁজ লইতে হইবে। সেজন্য দিক্‌পাল অর্থশাস্ত্রীকে যথোচিত সম্মান দিতে আমাদের যেমন বাধে না, বর্ত্তমানে অখ্যাতনামা কোন অর্থশাস্ত্রীর তত্ত্বালোচনা করিতেও সেইরূপ লজ্জা বোধ হয় না। সেজন্য দেখা যাইবে পরিষদের মুখপত্রে রিকার্ডোর বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রের একাংশের তর্জ্জমার পাশে কোন অপ্রসিদ্ধ ইংরেজ বা আমেরিকানের মতের সারাংশও উদ্ধৃত হইয়াছে।

ব্যক্তির মত দেশ সম্বন্ধেও আমাদের কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। দেশ-বিশেষের প্রতি প্রীতি বা আসক্তি বশতঃ তার অর্থশাস্ত্রকেও বিশেষ মর্য্যাদা দিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমরা কাজে প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা প্রতি ব্যক্তির মত প্রতি দেশকেও সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতে চাহি। তাতে কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ দেশ টেঁকে আর কোন্ ব্যক্তি বা দেশ টেঁকে না, তা লইয়া মাথা ঘামানো আমরা প্রয়োজন মনে করি না। খোলা দুনিয়ার খোলা হাওয়ায় আমরা সর্ব্বত্র শিক্ষানবিশী করিতে প্রস্তুত আছি ও যেখানে সত্যকে দেখিয়াছি মনে করিব সেখানে তাকে স্বীকার করিবার সাহস আমাদের আছে। আমাদের গবেষণা-প্রণালী কোন বিশেষ মত, বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ দেশকে সমর্থন করিবার জন্য নহে অথবা খণ্ডন করিবার জন্যও নহে। পরিষদের পথ সর্ব্বদা সত্যের ইঙ্গিতে নির্দ্দিষ্ট হইবে। অথচ ব্যক্তির বা জাতির যা বিশেষত্ব, আর্থিক সাহিত্যে বিশেষ দান, তা কোথাও পরিত্যক্ত হইবে না।

সত্য বটে, পরিষৎ আপনার গবেষণা-প্রণালী আপনিই খুঁজিয়া বাহির করিতেছে, কিন্তু আরোহ ও অবরোহ প্রণালীর কোনটাই আমরা পরিত্যাগ করি নাই। 'বিশেষ হইতে নির্ব্বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছা আমরা যেরূপ কার্য্যকর মনে করি, নির্ব্বিশেষ হইতে বিশেষে পৌঁছাও আমরা তদ্রূপ আবশ্যক মনে করি। চিন্তার এই দুই ধারাকেই আমরা কাজে লাগাইতেছি। ভবিষ্যতে এই দুয়ের কোন্‌টাকে বেশী ব্যবহার করিব অথবা কোনটাকে একেবারে পরিত্যাগ করা সমীচীন মনে করিব কি না তা পূর্ব্ব হইতেই এক্ষণে বলিয়া দিতে সক্ষম নহি। আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা দ্বারা এ প্রশ্নেরও মীমাংসা করিতে চাহি।

অন্যান্য বিদ্যার মত ধনবিজ্ঞানও সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। কিন্তু এ জগতে সোজাসুজিভাবে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ কোথাও সম্ভব নয়। প্রত্যেক সত্য, তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়ানোর দরকার আছে, অনেক প্রকার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এ কথাটাকে বিশেষ মর্য্যাদা দিয়াছে। পশ্চিমা পণ্ডিতেরা বহু কাল যাবৎ তাঁদের লেবরেটরি বা বীক্ষণাগারে পরিশ্রম করিবার পর হয়ত তত্ত্ববহুল মোটা মোটা গ্রন্থ-প্রকাশে সমর্থ হইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হইবে, পরিষদের তত্ত্বাংশ সৃষ্টি এখনও আরম্ভ হয় নাই। এই সব পশ্চিমা পণ্ডিতের মতামত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া বা অন্য প্রকারে প্রকাশ করা আমরা আমাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু তত্ত্ব বা সত্য সম্বন্ধে এখনও আমাদের কিছুকাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই।

পরিষৎ তত্ত্বকে বস্তুনিষ্ঠভাবে গড়িয়া তুলিতে চায়, বস্তুনিরপেক্ষভাবে নয়। প্রাচীন ও নবীন, এশিয়ার, আফ্রিকার, ইয়োরামেরিকার, তত্ত্বসমূহকে আমরা মাতৃভাষায় আকার দিতে সমুৎসুক; কিন্তু তাতেই আমাদের গবেষণা-কার্য্য সম্পন্ন হইল বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা রিকার্ডো, আডাম স্মিথ, ম্যালথাস্‌কে বঙ্গভাষায় তর্জ্জমা করিতেছি, টৌসিগ্, জিদ্, সেলিগ্‌ম্যান, মার্শ্যাল, পিগু, মর্ত্তারা, হার্ম্মস্ ইত্যাদি দিক্‌পালগণের ও বিভিন্ন দেশের বর্ত্তমান চিন্তার ধারাবলী আমাদের মুখপত্রের মারফৎ ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঁটিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি।

কিন্তু ইহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এই সব চিন্তা-ধারার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও প্রণালী অনুসন্ধানও আমাদের কর্ত্তব্য হইলে কি হইবে, এগুলিও মুখ্য নয়।

ইমারতকারী যেমন তার মসলা ব্যবহার করে আমরাও তদ্রূপ আমাদের এই সব প্রচেষ্টাকে আমাদের ভাবী তত্ত্ব বা সত্যের মালমসলারূপে ব্যবহার করিতে অভিলাষী।

বস্তুতঃ, তত্ত্বকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে চাই বলিয়াই আমরা উপকরণ বা তথ্য, দৃষ্টান্ত, অঙ্ক, তালিকা ইত্যাদিকে বিশেষ মর্য্যাদা দিতে অভ্যাস করিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে তত্ত্ব কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে তা আমরা এখনও জানি না। কিন্তু আমরা ইহা জানি যে, সম্মুখে এক প্রকারের বহু উপকরণরাজি জড়ো করা থাকিলেও প্রণালীর বিভিন্নতা হেতু বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বা সত্যে পৌছান সম্ভবপর হয়। সে জন্য আমাদের লব্ধ সিদ্ধান্ত বা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে উপকরণ সাহায্যে তা যথার্থভাবে করা যাইবে সে সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষ অবহিত হইতে হইয়াছে।

আমাদের মুখপত্র "আর্থিক উন্নতি"তে এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহার বিভিন্ন অধ্যায়সমূহ বিভিন্ন প্রকারের মালমসলার সংগ্রহে ও প্রকাশে নিযুক্ত রহিয়াছে। আমরা এই উপকরণ মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত প্রকারে ভাগ করিয়াছি।

১। বাংলার সম্পদ্—বাঙ্গালার কিষাণ, কারিগর, জেলে, মুচি, মাঝি, তাঁতি, দোকানদার, হাটুয়া, আড়তদার, জোতদার, জমিদার, আমদানি রপ্তানির ব্যবসায়ী, কেরাণী, মজুর, খালাসী, অধুনিক ব্যাঙ্ক বাণিজ্য শিল্পের প্রবর্ত্তক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর আর্থিক জীবনযাত্রার তথ্যাবলী এই অংশে প্রকাশিত হয়।

২। আর্থিক ভারত—সমগ্র ভারতের এবং ভারতীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের আলোচনা থাকে।

৩। দুনিয়ার ধনদৌলত—বাঙ্গালা ও ভারত ভিন্ন দুনিয়ার অন্য সকল স্থান সম্বন্ধে আধুনিক আর্থিক ঘটনা ও বিষয় সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা স্থান পায়।

৪। ব্যক্তি ও সঙ্ঘ—সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সকল প্রকার প্রচেষ্টার কথা এখানে দেখা যাইবে। দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্কার, মহাজন, ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, কারখানা পরিচালক, ধনবিজ্ঞান-দক্ষ পণ্ডিত, রাজস্ব সচিব, শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি-শিক্ষার ধুরন্ধর ইত্যাদি ব্যক্তিগণের অথবা প্রতিষ্ঠানের গতিবিধি, কার্য্যকলাপ, কথাবার্ত্তা, পরিচয়, বিশেষত্ব লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়।

৫। মোলাকাৎ—বিভিন্ন আর্থিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার নরনারীর সহিত মেলামেশা ও সাক্ষাৎভাবে কথোপকথনের ফলাফল মোলাকাতের আকারে প্রকাশিত হয়।

৬। পত্রিকা-জগৎ—ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালীয়, রুশ, জাপানী, তুর্ক, মার্কিণ, ইংরেজী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত কৃষি শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক ও ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক পত্রিকার সূচী, সারাংশ ও কোন কোন সময় বিস্তৃত প্রবন্ধের ভাবার্থ বাহির করা চলে।

৭। সমালোচনা—পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত আর্থিক গ্রন্থ, পুস্তিকা, বিবরণী ইত্যাদির ছোট বড় সমালোচনা।

৮। গ্রন্থপঞ্জী—আর্থিক জীবন বিষয়ক দেশী-বিদেশী গ্রন্থের ধারাবাহিক তালিকা।

যাঁরা পশ্চিমাদের আর্থিক পত্রিকা সমূহের খবরাখবর রাখেন, তাঁরা বুঝিতে পারিবেন যে, উপরের ৮ দফার মধ্যে সমালোচনা, পত্রিকা-জগৎ ও গ্রন্থপঞ্জী সর্ব্বত্রই আছে। কিন্তু বাকী ৫ দফাকে আমরা কতকটা নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারি। আপনারা যদি বৈশাখ মাসে প্রকাশিত বিগত বৎসরের সূচীপত্র লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়া দেখেন ত বুঝিতে পারিবেন আমাদের পরিষদের মুখপত্র প্রতি বৎসর কতখানি বিপুল মাল বাঙ্গালীর কাছে বিতরণ করিতেছে।

এই শ্রেণীভেদের মর্ম্ম-কথাটা আপনাদের একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বক্তৃতা ও প্রবন্ধপ্রীতি

প্রতি মাসে পরিষদের মুখপত্র "আর্থিক উন্নতি"তে গোড়ার দিকে যথাক্রমে বাঙ্গালা, ভারত, দুনিয়া, ব্যক্তি ও সঙ্ঘ, মোলাকাৎ ইত্যাদি অধ্যায়ে আর্থিক তথ্যগুলি বাঁটিয়া দেওয়া হইতেছে। শেষ অংশ প্রবন্ধের জন্য ব্যয়িত হয়। বিভিন্ন মাসের "আর্থিক উন্নতি" হাতে লইলে দেখা যাইবে, এই অংশের পরিমাণ অধিকাংশ সময়েই অর্দ্ধেকের কম হইয়া থাকে। "আর্থিক উন্নতি" খুলিয়া প্রথমেই জুয়াখেলা, বন্যা, মোটর-দুর্ঘটনা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কখনো কখনো চোখে পড়ে বলিয়া কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁদের মতে ইহাতে পত্রিকার শুধু সৌন্দর্য্যের অভাব হয় না, পত্রিকা-পরিচালকের রসবোধের অভাবও সূচিত হয়। লোকে প্রথমেই এমন কিছু পড়িতে চায় যা ভাল লাগে। কিন্তু আর্থিক উন্নতির প্রথম দিক্‌কার অধিকাংশ পাতা জুড়িয়াই এমন সব মাল ঠাসিয়া দেওয়া হয় যাতে পাঠকের পড়িবার ইচ্ছা বৃদ্ধি না পাইয়া কমিয়া যায়। প্রথমেই এত আঁক-জোক এত কাটা কাটা সংবাদ সকলের পক্ষে প্রীতিকর না হওয়া বিচিত্র নহে।

কিন্তু বাঙ্গালা দেশে প্রবন্ধ-প্রীতিটাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। যেন গণ্ডা গণ্ডা প্রবন্ধ বাহির করাই একমাত্র কাজ হওয়া উচিত। প্রথমতঃ বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এই স্রোতের গতি ফিরাইয়া দিতে চায়। বাঙ্গালীর ছেলের মনে তথ্য-তালিকা আঁকজোক ইত্যাদি বুঝিবার ও সংগ্রহ করিবার যে ভীতি সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে, তা দূর করিয়া দিতে চায়। তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা ও মমত্ববোধ না জন্মিলে তথ্য লইয়া সচেতনভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। আর সে প্রবৃত্তি ভিন্ন প্রকৃত তত্ত্ব বা সত্য নির্ণয় অসম্ভব। সেইজন্য সকলের আগে প্রতি ধনবিজ্ঞানসেবীর মনে আমরা তথ্য-সংগ্রহের একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা জাগ্রত করিয়া দিতে চাই। দ্বিতীয়তঃ, গণ্ডা গণ্ডা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ কোন দেশে কোন কালে একসঙ্গে বাহির হয় না। প্রত্যেক ধনবিজ্ঞান-সেবককে পদে পদে এই কথা মনে রাখিতে হয় যে, তার তত্ত্ব বা সত্য আকাশকুসুম মাত্র নয়, তার প্রতি চেষ্টা শক্ত ও নির্ম্মম তথ্যবহুলতারূপ ভিত্তির উপর প্রোথিত। বহু উদাহরণ সংগ্রহ, বহু পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা আগে চাই। তবেই না প্রবন্ধ দেখা দিবে। তবেই না সে প্রবন্ধের মূল্য থাকিবে।

বুঝা যাইবে, প্রবন্ধকে আমরা অমর্য্যাদা করি না, বরং তার মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিতে চাই। প্রবন্ধ-রচনা সাধনা-সাপেক্ষ ইহাই আমাদের মত। ফাঁকি দিয়া রাতারাতি ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা গড়িয়া তুলিবার কল্পনা পরিষদের নয়। বহু পরীক্ষা, বহু ধৈর্য্য ও অবিচলিত চিত্তে অপেক্ষা করিবার ক্ষমতা পরিষদের আছে। অন্য দিকে, পরিষৎ বাঙ্গালা দেশের আর্থিক চিন্তা-দৈন্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, সেজন্য পীড়া বোধ করে। আমাদের দেশে অর্থশাস্ত্রকে গড়িয়া তুলিবার মত যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া লজ্জিত হইবার কিছু নাই। পরিষৎ সে কথা স্বীকার করিতে লজ্জা পায় না। কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে তথ্য সংগ্রহে যত্নবান্ না হওয়াটাকে লজ্জার বিষয় মনে করে বলিয়াই "আর্থিক উন্নতি"র এত পৃষ্ঠা জুড়িয়া এত তথ্যরাশি প্রকাশিত হয়। প্রতি মাসে এতখানি তথ্য হাজির করিয়া পরিষৎ ও "আর্থিক উন্নতি" কি আপনাদের একটুও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জনের দাবী করিতে পারে না?

পরিষৎ প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধ-প্রীতি যেরূপ বর্জ্জন করিয়াছে, বক্তৃতাকেও সেরূপ দূরে রাখিয়াছে। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, অদ্যাবধি পরিষদের ১২টি* অধিবেশন হইয়া গেলেও প্রকাশ্য ভাবে বক্তৃতার আয়োজন আমরা এই প্রথম করিয়াছি। বক্তৃতার শক্তি বা ফলাফল সম্বন্ধে আমরা অন্ধ এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। যুক্তিপূর্ণ সুকথিত বক্তৃতাকে আমরা আমাদের মতামত প্রচার করিবার এক বিশেষ অস্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকি। তথাপি একথা আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি না যে, বক্তৃতার মোহ সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে খুব বেশী।

---

* ইহার পর আজ অবধি আরও ৫টি অধিবেশন হইয়াছে। আঃ উঃ সম্পাদক।

অনেক সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বক্তৃতার স্রোতের ভিতর কোথায় তলাইয়া গিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না।

সেইজন্য আমাদের গবেষণাধ্যক্ষ মহাশয় গোড়া হইতেই পরিষদের জন্য সেমিনার বা স্কুল প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। একথা আমাদের একবারও ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে লেখাপড়া করাই পরিষদের একমাত্র উদ্দেশ্য। টেবিলের চারিদিকে গোল হইয়া বসিয়া যখন যে যা পড়াশুনা করিয়াছে তাই আর দশজনকে শুনাইয়াছে। তারপর পরস্পর তর্ক, আলোচনা ও প্রশ্ন দ্বারা কার্য্য সমাধা হইয়াছে। আমাদের নিজ নিজ বিদ্যার্জ্জনই যথেষ্ট নয়। নিজের সুপ্রণালীবদ্ধ চিন্তারাশি দান করাও যথেষ্ট নয়। সেই চিন্তারাশিকে আরও দশজনের সমালোচনারূপ কষ্টিপাথরে ঘষিয়া লওয়া পরিষৎ গবেষণার এক বিশেষ অঙ্গরূপে গণনা করিয়া আসিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা বলা দরকার। ধনবিজ্ঞানকে আমরা অন্য সমস্ত বিদ্যা-নিরপেক্ষ বিবেচনা করি না। পরিষৎ সে ভাবে ইহা আলোচনাও করে নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং, রসায়ন, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব ইত্যাদি নানাবিধ বিদ্যার সহিত ধনবিজ্ঞানকে সর্ব্বদা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় রাখিতে হয়। পরিষৎ এই নীতি কাজে লাগাইবার প্রয়াসী। ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, ডাক্তার, ইত্যাদি যদি ধনবিজ্ঞানসেবীর সহায়তা না করে, তবে তার পক্ষে অনেক সময় সত্য সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয় না। পরিষৎ বস্তুনিষ্ঠ ধনবিজ্ঞান বলিতে ইঁহাদের সহযোগে অর্থশাস্ত্রের চর্চ্চাকেই বুঝিয়া থাকে।

মফঃস্বলের ইজ্জৎ বাড়িয়াছে

'এটা একটা বড় শহর। ইহার কথা ফলাও করিয়া লেখ। ওটা একটা গণ্ডগ্রাম মাত্র, উহার বিষয় দু' কথায় সারিয়া দাও' এ মনোভাব পরিষদের নয়। তথ্য সম্পর্কে পরিষৎ সকল কালকে, সকল দেশকে ও সকল পাত্রকে তুল্যরূপ কুলীন বলিয়া বিবেচনা করে। বিস্তীর্ণ জনপদ দ্বারা কোন আর্থিক সত্য প্রমাণিত হয়, আর ক্ষুদ্র স্থান দ্বারা তা খণ্ডিত হয়, এ শিক্ষা পরিষদের নহে। পরিষদের পক্ষে প্রতি ব্যক্তি মূল্যবান্, প্রতি স্থান মূল্যবান্। আর্থিক উন্নতির বাংলার সম্পদ্ শীর্ষক অধ্যায় ঘাঁটাঘাঁটি করিলে এ কথার প্রচুর প্রমাণ মিলিবে।

আমাদের কাছে পূর্ব্বপশ্চিম ভেদ নাই, শাদা কালো ভেদ নাই। আমরা চাই খাঁটি ও নীরেট তথ্য। তা যেখানে পাইব সেখান হইতেই সংগ্রহ করিব। তথ্য চাই, আরও তথ্য চাই, এই আমাদের বুলি।

বস্তুতঃ, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ও তৎপূর্ব্বে "আর্থিক উন্নতি" বাঙ্গালা দেশের লোকের চোখের সামনে এক নূতন জগৎ খুলিয়া দেখাইয়াছে। এ জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, তা নয়। কিন্তু এ চোখে এর পূর্ব্বে ইহাকে আর কেহ দেখে নাই। পৃথিবীর বিখ্যাত অর্থ-নৈতিক পত্রিকা-সমূহের পাশে বাঙ্গালার বিভিন্ন মফঃস্বল পত্রিকার বাণীও স্থান পাইতেছে, দেশবিদেশের বিভিন্ন চিন্তার সহিত মফঃস্বলের সর্ব্বপ্রকার চিন্তাস্রোতের খোঁজ লওয়া হইতেছে। ইহার অর্থ ও সুদূর অথবা অদূর উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথাটা আপনাদের একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

পরিষৎ দেশের সত্যকার আর্থিক পরিচয় লাভ করিতে চায়। তাই বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রসমূহের মারফতে রাশীকৃত আর্থিক মালমসলা জোগাড় হইতেছে। বাঙ্গালার হাটবাজার, বাজার দর, রাস্তা-ঘাট, খাল-দরিয়া-নদী, পশুপক্ষী, মৎস্য, কীট-পতঙ্গ, ডক-বন্দর, রেল ষ্টীমার-মোটর-গাড়ী (ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী) নৌকা, পাল্কী, এরোপ্লেন ইত্যাদি যানবাহন, খাদ্য-পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ পেশা, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, জন্ম-মৃত্যু হার, কুলীমজুর, চাষ ও চাষী, কারখানা-শিল্প, কুটীর-শিল্প, বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি আইন-কানুন, আয়-ব্যয়, ঘরবাড়ী, ঝড়বৃষ্টি, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, দুর্ঘটনা, জেল, জেলের কয়েদী, শেয়ার বাজার, যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যাঙ্কিং, বীমা, পেন্সন-ভাতা, জেলাবোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, ইউনিয়াম বোর্ড, মিউনিসিপালিটি, জলসেচ, পয়ঃপ্রণালী, শস্য-সম্পদ্, বনজঙ্গল, খনি-সম্পদ্, সমবায়, শিক্ষা, পল্লীসংস্কার, যৌথ কারবার, অনুষ্ঠান-

প্রতিষ্ঠান, আমোদ উৎসব* ইত্যাদি বিষয়ে রাশি রাশি তথ্য সংগৃহীত করিয়া পরিষৎ প্রকৃত বাঙ্গালা দেশকে আবিষ্কার করিতে চাহে। এ বাঙ্গালা কল্পিত বাঙ্গালা নহে। দেশকে চিনিবার পক্ষে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর উপায় কিছু আছে কিনা জানি না।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ দেশকে তন্ন তন্ন খুঁজিয়া তথ্য আনিয়া হাজির করিতেছে, যাতে বাঙ্গালীর ছেলে তার নিজ দেশের স্বরূপটা উপলব্ধি করিতে পারে। দেশকে ভাল করিয়া না জানিলে দেশ-সেবা সম্ভবপর হয় না। পরিষৎ সেই দেশ-সেবার পথ সুগম করিয়া দিতে চায়। অন্য দিকে, এই তথ্যরাজির উপর ভর করিয়াই আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থশাস্ত্র গড়িয়া উঠিবে।

আমরা এই সুযোগে আজ মুক্তকণ্ঠে বাঙ্গালার যে সব মফঃস্বল পত্রিকা আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। "আর্থিক উন্নতি" ও পরিষদের এই এক সৌভাগ্য যে, বাঙ্গালার অসংখ্য পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। মফঃস্বলের বাণী আমাদিগকে সর্ব্বদাই উদ্দীপিত করিয়াছে ও নব নব সত্যের সন্ধানে প্রেরণা দিয়াছে।

পরিষদের উদ্দেশ্য কি ?

আশা করি এতক্ষণ যাবৎ যা বলিয়াছি তাতে পরিষদের বিশিষ্টতা আপনাদের নিকট কতকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আপনারা এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিয়া থাকিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন পরিষদের উদ্দেশ্য কি।

এক কথায়, সত্যের সন্ধান বা আবিষ্কার ও সে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পরিষৎ জন্ম লাভ করিয়াছে। যদি বলা হয়, "বাপু হে! অনেক ত লম্বা চওড়া কথা কহিতেছ। কিন্তু বল দেখি পরিষৎ কি দেশের দারিদ্র্য-দুঃখ নির্ব্বাসন করিয়া দিবে? না শত শত নিরন্ন লোকের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবে? তা যদি না দেয় ত আজিকার মত দুর্দ্দিনে পরিষদের কথা কহিতে আসিও না।" তবে তার উত্তরে আমাদিগকে স্বভাবতঃই নিরুত্তর হইয়া থাকিতে হয়। কারণ বিদ্যা আর শিল্প এক জিনিষ নহে। ধনবিজ্ঞান বিদ্যা চর্চ্চা করিলে মানুষের রাতারাতি ধনী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ধনশালী হইবার পথ অন্য। অন্য সকল বিদ্যার মত ধনবিজ্ঞানও কার্য্যকারণ নির্ণয় করিতে পারে, কোন্ পথ অবলম্বনে কি ফল হইবে তার আভাষ দিতে পারে অথবা কার্য্যকারণ বিশ্লেষণ করিতে পারে, কিন্তু ধন সৃষ্টি করিতে পারে না। ফট্‌কা বাজারে এক ঘণ্টায় লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মার্শ্যালের অত বড় মহাভারত-তুল্য বহিগুলিকে সারাদিন ধরিয়া নিঙ্‌ড়াইলেও একটা পয়সা বাহির হইবে না। কিন্তু তাই দ্বারাই কি মার্শ্যালের বিচার হইবে?

আমরাও দেশের আর্থিক উন্নতির অভিলাষী। জ্ঞান বশতঃ নির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রার কথা বিশিষ্ট বিদ্যা বলিতে পারে মাত্র। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সত্যের মর্য্যাদা আর অর্থের মর্য্যাদা এক বস্তু নহে। ধনবিজ্ঞানসেবীর বিশেষত্ব এই যে, সে অর্থকেও বিদ্যার তরফ্ হইতে বিশিষ্ট মর্য্যাদা দিতে সমর্থ হইয়াছে। "দারিদ্র্য পুণ্য নহে, দারিদ্র্যকে পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা প্রত্যেক নরনারীর কর্ত্তব্য। অর্থের অবহেলা দ্বারা পারমার্থিক লাভ হয় না।"—এই ধরণের বাণী ধনবিজ্ঞান প্রচার করিয়া থাকে। মানুষের জীবন-গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার পক্ষে এ সবের দাম বড় কম নয়। বিদ্যারূপে ধনবিজ্ঞান সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে সত্যের দিকে ফিরাইয়া দিতেছে, ইহা কি আর্থিক সমৃদ্ধির চেয়ে ছোট জিনিষ?

বিদ্যা-চর্চ্চায় আনন্দ আছে। শুধু বিদ্যার জন্য বিদ্যার আদর করার সার্থকতা অস্বীকার করি না। যে দেশ বিদ্যার যথেষ্ট সম্মান করিতে শিখিয়াছে, বিদ্যাচর্চ্চার জন্য এমন অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট যে বিদ্যার বেপারীরা নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া পরার ভাবনা না ভাবিয়া

* বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জনপদ হইতে প্রকাশিত বিশেষ করিয়া সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিকে এবিষয় প্রণিধান করিতে অনুরোধ করি। আঃ উঃ সম্পাদক।

বিদ্যার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারে, সে দেশ আধ্যাত্মিকতায় ছোট না বড় আপনাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। একটা মাত্র দেশের উদাহরণ দিব। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা বিশেষ জড়বাদী বলিয়া জানি। কিন্তু সেখানকার ধনী লোকেরা বিদ্যা-চর্চ্চার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। এক ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্র যুদ্ধে গিয়া মারা গেল। তাঁর অগাধ বিষয়-সম্পত্তি কে ভোগ করিবে? ভদ্রলোক অমনি উইল করিয়া পুত্রের নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া করিয়া ফেলিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে এক এক বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। বলিলেন, "কুছ্ পরোয়া নাই, যত টাকা লাগে দিব, কিন্তু একেবারে সরেস লোকটি চাই।" দেখিতে দেখিতে ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল। ষ্ট্যানফোর্ডের গম ও অন্যান্য খাদ্য-শস্য লইয়া গবেষণা সমস্ত জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে। রকাফেলারের টাকায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম ও বিকাশ লাভ করিয়াছে। ফোর্ড তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ডে একবারে কোটি কোটি টাকা দিতেও ইতস্ততঃ করেন না। কার্ণেগী এনডাওমেণ্টের ফাণ্ড জগতে কার কাছে অবিদিত? শিক্ষার জন্য, ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য, বিশ্বব্যাপী মৈত্রী স্থাপনের জন্য, স্বদেশের ও বিদেশের বহু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বদেশে ও বিদেশে কার্ণেগী কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কোন কোন আমেরিকান্ প্রচুর পরিমাণ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে, কিন্তু অর্থের এই প্রকার সদ্ব্যবহার তাদের দেশে বিরল নয়। বিদ্যার মন্দির গড়িতে ও অন্য বহু প্রকার সদনুষ্ঠানে ধনী আমেরিকান্ অর্থব্যয় করিতে কৃপণতা করে না। অথচ এই সব আমেরিকান্ ভাল করিয়া জানে বিদ্যা-মন্দির অর্থ-উপার্জ্জনের স্থান নয়, বিদ্যা আর অর্থ অর্জ্জন এক জিনিষ নয়। তবু কেন তারা পরাঙ্মুখ হয় না এইরূপে অর্থ-ব্যয় করিতে? এই কথাটা আমি আমার দেশের প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আমেরিকার সম্বন্ধে যা বলিয়াছি পশ্চিমা বড় বড় দেশ সম্বন্ধেও সে কথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য বটে।

আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিরা এদিকে একবার মনোযোগ দিবেন কি? ধনের সহযোগ ব্যতীত কোন দেশ কোন কালে তার জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্বেষণে রত হইতে পারে না; উন্নতি করা ত দূরের কথা। বিদ্যার সাধনা যাঁরা করিয়া থাকেন তাঁরা চিরকাল সর্ব্বদেশেই দরিদ্র হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁরা জ্ঞান-বিতরণের ভার লইতে পারেন না যদি তাঁদের নিজ নিজ খাওয়া-পরার চিন্তায় অষ্টপ্রহর ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। তাতে তাঁদের সত্যের অনুসন্ধান শুধু খর্ব্ব হয় না, বিকৃত হইবারও সম্ভাবনা। এই বিনাশ হইতে তাঁদের রক্ষা করা কি জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না? এ জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার চেয়ে বড় কোন জিনিষ আছে কি না জানি না। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার সুযোগ ও সুবিধা সৃষ্টি করা রূপ ব্রত আমাদের দেশের ধনিগণ যেদিন হইতে পালন করিতে আরম্ভ করিবেন সেইদিন হইতে আমাদের এই বাঙ্গালা এক বৃহত্তর ও মহত্তর বাঙ্গালায় পরিণত হইবে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ আপনাদের বিশেষ স্নেহ ও মনোযোগ দাবী করিতে পারে। আমরা বিদ্যারূপে বিদ্যার চর্চ্চাকেই একমাত্র ব্রত বলিয়া মনে করি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, ডাক্তার, ইত্যাদির সহযোগে ধনবিজ্ঞানসেবীর অগ্রসর হওয়ার আবশ্যকতা পরিষৎ স্বীকার করে। অর্থাৎ দেশের আর্থিক উন্নতিও আমাদের লক্ষ্য।

পরিষৎ কোন্ কাজের ভার লইয়াছে?

১। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এক নব্য ন্যায় স্থাপন করিবার কল্পনা করে।

২। পরিষৎ সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের অর্থশাস্ত্রকে যাচাই করিয়া লইতেছে। দেশ বা ব্যক্তি সম্বন্ধে তার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই।

৩। পরিষৎ বলে আর্থিক দিক্ হইতে প্রতি ব্যক্তি মূল্যবান্, প্রতি স্থানের দাম আছে। সে জন্য কোন ব্যক্তি বা স্থানের আর্থিক কথা তার কাছে তুচ্ছ নয়।

৪। পরিষৎ বাঙ্গালা দেশকে নূতন করিয়া আবিষ্কার

করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মফঃস্বলের ইজ্জৎ বাড়িয়াছে।

৫। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ও নবীন সকল প্রকার আর্থিক মতবাদের ধারার সহিত বাঙ্গালীর ছেলেকে পরিচিত করিয়া দেওয়া পরিষৎ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। সেজন্য এক দিকে রিকার্ডো, আডাম, স্মিথ, ম্যালথাস্ প্রভৃতি চিন্তাবীরদের চিন্তারাশি যেমন আমরা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, অন্য দিকে দেশ-বিদেশের অর্থশাস্ত্রীর মতামতও দফায় দফায় বাঁটিয়া দিতেছি।

৬। ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রত্যেক গবেষক ধনবিজ্ঞান বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে এরূপ বিপুল তথ্যরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন যে, অর্থানুকুল্য পাইলে ৮ জন গবেষকের প্রত্যেকে ৫০০ পৃষ্ঠার এক একখানি গ্রন্থ অক্লেশে প্রকাশ করিতে পারেন।

৭। পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষায় বি-এ ও এম-এ ক্লাসের ধনবিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের ভার লইয়াছেন।

৮। পরিষৎ অর্থশাস্ত্রের পরিভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন।

সেমিনার বা স্কুল প্রণালীতে লেখা-পড়া চালানোর কথা ইতিপুর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ১৩৩৫-৩৬ সনে আলোচিত বিষয়গুলির নাম ও আলোচকের নাম নীচে দেওয়া যাইতেছে:

১। ভারতবর্ষে বীজ-তৈল কারখানার ভবিষ্যৎ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ বি-এল্।

২। সার্ব্বজনিন স্বাস্থ্যের অর্থকথা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র উকিল, প্যারিসের "বিদেশী" রোগতত্ত্ব পরিষদের সভ্য, ন্যাশনাল মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউট।

৩। মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের সহিত পরিষদের তদানীন্তন ৫ জন গবেষকের আলোচনা।

৪। বহির্ব্বাণিজ্যে বাঙ্গালী—ডক্টর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি-এস (প্যর্ডু), বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার, ডিরেক্টার ইণ্ডো-অয়রোপা ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড্ (হাম্বুর্গ)।

৫। কয়লার খনির মজুর—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ বি-এল।

৬। বাঙ্গালায় কাপড়ের কলের ব্যবসা—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ অধিকারী, কেশবলাল ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল সীণ্ডিকেটের ডিরেক্টর।

৭। কলিকাতা বন্দর ও কিং জর্জ্জেস্ ডক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ বি-এল।

৮। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি-এ, এফ-আর-ইকন-এস্ ও বর্ত্তমান লেখক।

৯। বর্ত্তমান কৃষি-সমস্যা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, কৃষি-বিদ্যালয়, চুঁচুড়া।

আপনারা এই বিষয়-নির্ব্বাচন হইতেই বুঝিতে পারিবেন, পরিষৎ কত বিভিন্ন দিক্ হইতে ধনবিজ্ঞানের আলোচনার চেষ্টা করিতেছে। এই অধিবেশনগুলি প্রায় সবই ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের বাসভবন ৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে হইয়াছিল। সেজন্য পরিষৎ তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে।

উপরের লেখাগুলি সম্বন্ধে প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রায় প্রতি মাসেই একটা করিয়া অধিবেশন হইয়াছে অর্থাৎ পরিষৎ অনলসভাবে লেখাপড়া চালাইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় এই যে, তৃতীয় ও ষষ্ঠ অধিবেশন বিশেষ স্মরণীয়। তৃতীয় অধিবেশনের ফলে মেজর বসু মহাশয় তাঁর অনেক পুথিপত্র পাণ্ডুলিপি পরিষৎকে দান করেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে পরিষৎ আর্থিক ভূগোল সঙ্কলনে ব্যাপৃত আছেন। তিনি এজন্য পরিষৎকে ৫০০৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁর চিকিৎস-সম্বন্ধীয় নোটগুলি অধ্যাপক অমূল্যচন্দ্র উকিল মহাশয় ও রসায়ন-সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী হাজারিবাগের অধ্যাপক হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদন করিতেছেন। পরিষৎ মেজর বসু মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। দ্বিতীয় স্মরণীয় ঘটনা এই যে, ৬ষ্ঠ অধিবেশনের দিন দর্শনাচার্য্য ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। শুধু উপস্থিত ছিলেন না, প্রবন্ধ-পাঠের পর তিনি তাঁর অমূল্য কথা আমাদের বলেন। আমরা পরিষদের তরফ্ হইতে এজন্য ও পরিষদের জন্মাবধি তিনি যে অশেষ প্রকারে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া আসিতেছেন সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে এ বৎসর এ যাবৎ যা পড়াশুনা হইয়াছে তাও উল্লেখ করিতেছি।

১। পোষ্ট আফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি-এ, এফ-আর-ইকন-এস্।

২। খদ্দরের আর্থিক সম্ভাবনা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল।

৩। মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক মতামত— ঐ।

৪। বোম্বাই ও তুলাশুল্ক—বর্ত্তমান লেখক।

৫। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সালতামামি—বর্ত্তমান লেখক।

৬। ঋদ্ধিগঠন—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল।*

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ, তত্ত্বনিধি মহোদয় 'টাকার কথা' আগেই লিখিয়াছেন। তাঁর এ পুস্তক সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি তিনি 'রাজস্বের কথা' নামক গ্রন্থ-রচনায় ব্যাপৃত আছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ইয়োরোপে আর্থিক চিন্তার ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্ত্তমান লেখক রিকার্ডোর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি নামক পুস্তকের তর্জ্জমায় ব্যাপৃত আছেন, শীঘ্রই প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবে। পরিষৎ হইতে আডাম স্মিথ ও ম্যাল-থ্যাসেরও অনুবাদ হইতেছে। পূর্ব্বে যে প্রত্যেক গবেষক ৫০০ পৃষ্ঠার বহি অক্লেশে বাহির করিতে পারেন বলিয়াছি, তা বাদ দিয়া পরিষদের অন্যান্য গ্রন্থের আভাষ দেওয়া হইল। কিন্তু এখানে ইহা উল্লেখ করিলে অবান্তর হইবে না যে, ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় অন্যতম গবেষক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের সহযোগে "দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক" নামক প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

এ গেল গ্রন্থের কথা। পরিষৎ ৬ খানি ইংরেজী ও ৩ খানি বাংলা পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, পুস্তিকা, বুলেটিন, ইত্যাদি প্রকাশ করা আমরা মোট ৩।৪ মাস যাবৎ আরম্ভ করিয়াছি। ভবিষ্যতে এদের সংখ্যা অনেক বাড়িবার সম্ভাবনা আছে।

বাংলা পুস্তিকা

১। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, তত্ত্বনিধি, বি-এ।

২। ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকতা—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল্।

৩। স্বল্পস্থায়ী কর্জ্জ সমস্যা—বর্ত্তমান লেখক।

৪। কারখানা শিল্প বনাম কুটির শিল্প—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল্।

৫। শিল্প ব্যাঙ্ক ও মরিস্ প্ল্যান—বর্ত্তমান লেখক।

৬। বাংলার বন্দর ও কিং জর্জ্জেস্ ডক—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ বি-এল।

৭। ঋদ্ধিগঠন—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডি-এল।

ইংরেজী পুস্তিকা

১। মেকী টাকা ধরিবার উপায়—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়।

২। অটোমোবিল বাণিজ্যে কিস্তিবন্দী বিক্রয়ঃ অধ্যাপক সেলিগ্ম্যানের লেখা—বর্ত্তমান লেখক।

৩। ঝরিয়ায় কয়লার খনির মজুর—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল।

৩। খদ্দরের আর্থিক কথা— ঐ।

৪। পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং তদন্ত সমিতি—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ।

৫। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুসৃত গবেষণা-প্রণালী—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল্।

৬। তুলাশুল্ক ও তার ফলাফল—বর্ত্তমান লেখক।

---

* আরও একটি বক্তৃতা এ বৎসর হইয়াছে—শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন বিশ্বাস, এম-এ মহাশয় সাইমন কমিশনে উপস্থাপিত আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুইটি অধিবেশনে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁর প্রবন্ধাবলী "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত হইবে।—আঃ উঃ সম্পাদক।

স্বদেশ ও বিদেশের সহিত যোগ-স্থাপন

আমরা বাঙ্গালা দেশের মফঃস্বলের সহিত একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। মফঃস্বল হইতে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলীর জবাব পরিষৎ "আর্থিক উন্নতি"র মারফৎ দিয়া আসিতেছেন।

ভারতের নানাস্থান হইতে ও বিদেশের প্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞান-সেবী ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা উৎসাহ ও প্রশংসাবাণী লাভ করিয়াছি। অনেকেই আমাদের সহিত পত্র ও পুস্তকাদি বিনিময়ে সমুৎসুক ইহা জানাইয়াছেন। কেহ কেহ ইতিমধ্যেই তাঁদের পত্রিকা, গ্রন্থ ইত্যাদি পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। লীগ্ অব্ নেশনস্ও আমাদের নিয়মিতভাবে পত্রিকা ও বুলেটিন ইত্যাদি এবং সমালোচনার জন্য গ্রন্থাদি পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতীয় ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট, অধ্যাপক ও ছাত্রমহল দ্বারা আমরা নানা প্রকারে উপকৃত হইয়াছি। পরিষদের তরফ্ হইতে আমি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দেশবাসীর প্রতি নিবেদন

সর্ব্বশেষে আমি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ হইতে দেশবাসীর নিকট একটা কথা করজোড়ে নিবেদন করিতে চাই। আমরা এ যাবৎ যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাতে বলিতে পারি যে, পরিষদের বিপুল সম্ভাবনা সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। চাই আপনাদের সকলের দরদ। চাই আপনাদের সকলের সহানুভূতি। আপনারা জানেন হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সকল প্রকার পাঠ্যপুস্তক উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। বি-এ, এম-এ'র পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে তাঁরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। স্বয়ং নিজাম গবর্ণমেণ্ট তাঁর বিপুল শক্তি ও অর্থবল লইয়া এই আন্দোলনের পোষকতা করিতেছেন। গুরুকুলে হিন্দীভাষায় ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা প্রকার গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। সেখানেও পশ্চাতে রহিয়াছে অর্থশালী এক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই দুই প্রতিষ্ঠান কয়েক বৎসর ধরিয়া যা করিয়া আসিয়াছেন বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ তার চেয়ে অল্পকালের মধ্যে বেশী পরিমাণ কাজ করিয়াছে। অথচ আমাদের পিছনে না আছে শক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট, না কোন বিত্তশালী প্রতিষ্ঠান।

শুধু তাই নয়। ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বা গুরুকুলে যাঁরা মাতৃভাষায় ধনবিজ্ঞানের বা অন্য বিদ্যার চর্চ্চা করিতে-ছেন, তাঁরা প্রত্যেকে বেশ মোটা রকমের বৃত্তিভোগী। অর্থাৎ ভাত-কাপড়ের চিন্তা তাঁদের করিতে হয় না। সে ভার বহিবার পাত্র আছে। তাঁরা নিশ্চিন্ত চিত্তে সমস্ত সময় ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চায় নিয়োগ করিতে সমর্থ। কিন্তু বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকদিগকে উদয়াস্ত অন্নচিন্তায় ছুটাছুটি করিতে হয়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর এমন অবসর কম মিলে যখন নিভৃতে বিদ্যা-চর্চ্চার সুযোগ করিতে পারেন। ইহারি মধ্যে—এই সংগ্রাম, কষ্ট, অন্নচিন্তার মধ্যে—তাঁহাদিগকে ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চাকে গড়িবার জন্য আরও কষ্ট, আরও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। জিজ্ঞাসা করি কিসের জন্য? মাতৃভাষা ও স্বদেশকে পুষ্ট করিবার কল্পনায় কোন বাধাকে তাঁরা বাধা বলিয়া মানিতে চাহেন না। এই ত্যাগস্বীকারের জন্য তাঁরা কি আপনাদের কাছে বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি দাবী করিতে পারেন না?

আমাদের গৌরব এই যে, এতখানি সহায় সম্বলহীন হইয়াও আমরা ওস্‌মানিয়া বা গুরুকুলের নিকট পরাজিত হই নাই। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি ভবিষ্যতে আমাদের এই পরিষৎ অধিকতর কাজ করিতে পারিবে। দেশবাসীর নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, তাঁদের আশ্রয় ও সাহায্যে বাঙ্গালা দেশের আর্থিক উন্নতির নব নব পথ আবিষ্কৃত হোক্। সঙ্গে সঙ্গে এই পরিষৎ নব নব সত্যের সন্ধানে যাত্রা করুক। ইহা দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক।*

---

* বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে ২১শে জুন (শনিবার ২০ নং ষ্ট্রাণ্ড রোডে) ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত।

মোটর-প্রীতিতে ইয়োরোপ ও আমেরিকা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ

আমেরিকায় বৎসরে ২৩ লাখ মোটর বৃদ্ধি

আমেরিকায় মোটরের সংখ্যা ২২½ লাখ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডীজএ ১৯৩০ সনের ১লা জানুয়ারী মোট ২,৮৬,১২,১৩৬ খানা মোটর গাড়ী ও ১,৩৪,৬২৪ খানা মোটর সাইকেল রাস্তায় চলিয়াছিল। আমেরিকান অটোমোবিল পত্রিকায় (বিদেশী সংখ্যা) প্রকাশ যে, ১৯২৯ সনে মোটরের সংখ্যা ১৯২৮ সনের চেয়ে ২৩,০৮,২১০ খানা বেশী অর্থাৎ মোটর গাড়ীর বৃদ্ধি ১১·৩%।

নিম্নলিখিত তালিকায় কয়েক বৎসরের বৃদ্ধির তুলনামূলক হিসাব দেখান যাইতেছে :—

১৯২৯ সন হইতে ১৯৩০ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ২৩,০৮,২১০...১১·৩%

১৯২৮ সন হইতে ১৯২৯ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১৪,৯৪,০১৯.. ৬·০%

১৯২৭ সন হইতে ১৯২৮ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১৩,৮৩,৬৬৩...৫·৯%

১৯২৬ সন হইতে ১৯২৭ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ২৩,৩৮,৭১১।

মোটরের সংখ্যা ২॥ কোটি

১৯৩০ সনে যুক্তরাষ্ট্রে চলতি মোটর গাড়ীর সংখ্যা ২০,৭০,০৭৯ খানা বাড়িয়াছে। উক্ত সনের ১লা জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বসমেত ২,৬৫,৬৪,৬৫৯ খানা মোটরগাড়ী, ট্রাম এবং বাস্ রাস্তায় চলিয়াছে। এবৎসর মোটর-সংক্রান্ত গাড়ীর সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে যত বাড়িয়াছে বহু বৎসর আর তেমন বাড়ে নাই। এই বৎসর ২॥ কোটির উপর গাড়ী রেজিষ্টারী করা হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ২,৪৪,৯৪,৫৮০।

যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরেও কোন কোন দেশে খুব বেশী বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সমষ্টির দিক্ হইতে সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের প্রায় সমান ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে আলোচ্য বৎসরেই প্রথম চলনশীল গাড়ীর মোট সংখ্যা ২০ লাখের উপর উঠিয়াছে। এ বৎসর মোট ২,২৩৮,১৩১ খানা বাড়িয়া সর্ব্ব প্রকারের মোটর গাড়ী সর্ব্বসমেত ২০,৪৭,৪৭৭ খানা রাস্তায় চলিয়াছে। এখানকার এই আশাতীত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্যানাডা, আর্জ্জেন্টিনা, ব্রাজিল; চিলি, মেক্সিকো এবং অন্যান্য জনপদেও মোটর-সংখ্যা বিশেষ ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে।

আমেরিকার অন্যান্য দেশে ২০ লাখ মোটর গাড়ী

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বাদ দিয়া শুধু পশ্চিম মহাদেশে কোন্ বৎসরে কত গাড়ী রেজিষ্টারী করা হয় তাহার হিসাব নীচে দেওয়া গেল :—

১৯৩০	...	২০,৪৭,৪৭৭
১৯২৯	...	১৮,০৯,৩৪৬
১৯২৮	...	১৫,৬০,৪৪১
১৯২৭	...	১৩,৮৩,৬৬৩
১৯২৬	...	১১,৩৭,৩৫৩
১৯২৫	...	৯,২৪,৬০৬

সুতরাং দেখা যাইতেছে যুক্তরাষ্ট্র বাদ দিয়া আমেরিকায় গত ছয় বৎসরে মোটর গাড়ীর সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশী বাড়িয়াছে। ঠিক সেই সময় যুক্তরাষ্ট্রে চলতি গাড়ী বাড়িয়াছে নিম্নরূপ। ১৯২৫ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে গাড়ীর সংখ্যা ছিল ১,৭৭,৪০,২৩৬ খানা আর ১৯৩০ সনের ১লা জানুয়ারী সেই সংখ্যা বাড়িয়া ২৬৫,৬৪,৬৫৯ হইয়াছে।

ইয়োরোপে ৪৬॥ লাখ মোটর গাড়ী

গোটা ইয়োরোপে ১৫ লাখের উপর মোটর গাড়ীর চলন বাড়িয়াছে। ১৯৩০ সনের ওয়ারল্ড মোটর সেন্সাসএ ইয়োরোপের সর্ব্ব প্রদেশের মোটরের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ, গোটা মহাদেশে মোট ৪৬,৪৯,৭৯৩ খানা মোটর গাড়ী ও ২১,৫৭,৭১৮ খানা মোটর সাইকেল চলিতেছে। গত বৎসরের চেয়ে মোট ৫,১১,৭৭৭ খানা মোটর গাড়ী ও ২,৮০,৬৯৯ খানা মোটর সাইকেল বেশী হইয়াছে। মোটর গাড়ীর বৃদ্ধির হার শতকরা ১২·৪ এবং মোটর সাইকেলের বৃদ্ধির হার শতকরা ১৪·৯, আমেরিকান অটোমোবিল পত্রিকায় এইরূপ প্রকাশ।

আমেরিকান অটোমোবিল (বিদেশী সংখ্যা) পত্রিকায় প্রকাশ গত বৎসর ইয়োরোপের পরীক্ষিত চলনশীল মোটর গাড়ীর সংখ্যা ৪১,৩৮,০১৬ এবং ঐরূপ মোটর সাইকেলের সংখ্যা ১৮,৭৭,১১৯খানা।

সওয়া তন লাখ নূতন গাড়ী

আলোচ্য বৎসরের প্রথমে যে এষ্টিমেট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, গত বৎসরে সমগ্র ইয়োরোপে মোটর-সংক্রান্ত গাড়ী বিক্রয় অসম্ভবরকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। সযত্নে গৃহীত হিসাব হইতে জানা যায় যে, ১৯২৯ সনে বিক্রী মোট ৮,৩১,০০০খানা মোটর-সংক্রান্ত গাড়ীর মধ্যে ৬০৬,০০০ খানা গাড়ী ও ২,২৮০০০ খানা ট্রাক্ ছিল। উপরোক্ত সংখ্যাগুলি সত্য হইলে ইহাই প্রমাণ হয় যে, ১৯৩০ সনের রেজিষ্ট্রেশন অনুসারে গোটা ইয়োরোপে ৩,২০,২২৩ খানা মোটর গাড়ী রাস্তায় নূতন চালান হয়। পূর্ব্ব বৎসরে (১৯২৮) ঠিক ঐ সময়ে ২,২৫,০০০ খানা নূতন গাড়ী রাস্তায় চালান হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যতই দিন যাইতেছে ততই ইয়োরোপে নূতন গাড়ীর উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছে। মোট বিক্রয়ের এষ্টিমেটের একটা তুলনামূলক হিসাব নীচের তালিকায় দেখান হইয়াছে।

	গাড়ী	ট্রাক	মোট
১৯২৯	৬০৩,০০০	২২৮,০০০	৮৩১,০০০
১৯২৮	৫৫৯,০০০	১৬৩,০০০	৭২২,০০০
বৃদ্ধি	৪৪,০০০	৬৫,০০০	১০৯,০০০

এই মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকারের মোটর-সংক্রান্ত গাড়ীর আলাদা আলাদা হিসাব না পাওয়া যাওয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর গাড়ীর তুলনামূলক সংখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কোন কোন বিভাগের মোটর বাস্ ও ট্রাকের হিসাব একত্রে দেওয়া হইয়াছে। আবার কোন কোন বিভাগের মোটর ও ট্যাক্সী গাড়ীর হিসাব একত্রে পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন বিভাগে সমস্ত প্রকারের গাড়ীর হিসাব এক সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত প্রদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর গাড়ীর বৃদ্ধির তুলনামূলক সংখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়। এই সমস্ত অসুবিধা সত্বেও ১৯৩০ সনের সেন্সাস হইতে জানা যায় যে, গত বৎসরে ইয়োরোপে ৬,৫০,৮৭৬ খানা গাড়ী, ১১৭,৬৭৯ খানা ট্রাক্ এবং ৬৬৯৫ খানা বাস্ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি ঠিক খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হইত তবে এই সমস্ত সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইত সন্দেহ নাই।

মোটর-মাপে ইয়োরোপ

বর্ত্তমানে ইয়োরোপের আটটী দেশের প্রত্যেকটিতে কম পক্ষে ১০০,০০০ মোটর গাড়ী আছে। ইহার মধ্যে ১৯৩০ সনের ১লা জানুয়ারী হল্যাণ্ডে ৯৮,৪২৮ খানা সর্ব্বপ্রকারের মোটর গাড়ী ছিল। ডেন্মার্কের গত বৎসরেই এই সংখ্যা ছিল। ১৯২৮ সনেই ফ্রান্সের সংখ্যা ১০ লাখ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার সংখ্যা ১২ লাখের উপর। আলোচ্য বৎসরে জার্ম্মাণির মোটর-সংখ্যা এই প্রথম ৬,০০,০০০এ উঠিয়াছে। ইতালির সংখ্যা গত বৎসরেই ২,০০,০০০ ছাড়াইয়া গিয়াছে। ১৯২৯ সনে স্পেনের সংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, ১৯৩০ সনের পূর্ব্বেই মোটরের সংখ্যা ২,০০,০০০এর কোঠায় উঠিয়াছে। গোটা ইয়োরোপের মধ্যে মোটর-সংক্রান্ত গাড়ী বিষয়ে স্পেনের স্থান পঞ্চম ধরা হইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও ইতালির পরেই স্পেনের স্থান)। সুইডেনের স্থান ৬ষ্ঠ ও বেলজিয়ামের স্থান ৭ম।

ভারতের চিনির ব্যবসায়*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম-এ

জাভা ও কিউবা

যবদ্বীপের চিনি-শিল্প

অন্যান্য দেশের মধ্যে জাভা হইতেই ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চিনি আমদানি হইয়া থাকে। সুতরাং ভারতের চিনি আমদানি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে জাভার পরিচয় লওয়া একান্ত আবশ্যক। ১৯২৮ সনে যবদ্বীপের চিনি-উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল :—

প্রকার	এ্যাসোসিয়েটেড্ মিলসমূহ (মেট্রিক টন)	নন্-এ্যাসোসিয়েটেড্ মিলসমূহ (মেট্রিক টন)	মোট (মেট্রিক টন)
সর্ব্বোৎকৃষ্ট			
হেড্ চিনি	১,৭৫৯,৮৭৬	১৬৭,৩৭৭	১,৯২৭,২৫৩
সর্ব্বোৎকৃষ্ট নরম চিনি	৭,০৫২	১,২৪১	৮,২৯৩
হেড্ চিনি ১৬ এইচ্	৭৪৭,২৯৪	৩২,৭১৪	৭৮০,০০৮
মাস্কোভাডোস্	১০২,৯৮৩	—	১০২,৯৮৩
মোলাসেস্ চিনি	১০২,৬৫৮	৬৩,৪১০	১৬৬,০৬৮
ব্যাগ চিনি	১৬৫	১৩	১৭৮
চ্যানেল নরম চিনি		১,৪৭৪	১,৪৭৪
মোট	২,৭২০,০২৮	২৬৬,২২৯	২,৯৮৬,২৫৭

অন্যান্য সনের মোট উৎপাদন { ২,৩৯৭,৭৫৩ মেট্রিক টন ১৯২৭ সনে
১,৯৯১,৫৩৩ মেট্রিক টন ১৯২৬ সনে

১৯২৮-২৯ সন জাভার পক্ষে একটী বিশেষ বৎসর। ঐ বৎসর জুন মাস হইতে চিনি গুদামজাত করা আরম্ভ হয়। জাভার চিনি-শিল্পের ইতিহাসে এমনটী আর ঘটে নাই। ১৯২৮ সনের তৈরী চিনি ১লা এপ্রিল অবধি ৬৫৬,৫৫০ টন বিক্রয় হয়, দর ছিল একশত কিলোগ্রাম ১৫ হইতে ১৬ গিল্ডার। আলোচ্য সনের প্রথমে একশত কিলোগ্রাম ১৫½ গিল্ডার দরে বিক্রী হইয়াছে। ক্রেতাগণ এত চড়া দরে ক্রয় করিতে অসম্মত হওয়ায় ১৭ই জুলাই তারিখে দর ১৩ গিল্ডার করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে অবস্থা আরো খারাপ হইয়া পড়ে। ১,৩০০,০০০ টন মাল মৌজুত পড়িয়া থাকে ; দরও খুব নামিয়া যায়। জাভার চিনি-শিল্পিগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারেন যে, প্রাচ্যের বাজারে তাঁহাদের মাল বিকাইবে না। তখন ইঁহারা সুয়েজ খালের পশ্চিমে চিনি বেচিতে চেষ্টা করেন। ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রথম দফাতেই ১০০,০০০ টন শাদা চিনি বিক্রয় হয় এবং ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২৭৭,০০০ টন বিক্রী হয়। দর ফী একশত কিলোগ্রামে এক হইতে দেড় গিল্ডার কমাইয়া দেওয়া হয়। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে অবশিষ্ট মৌজুত চিনি জনৈক ইয়োরোপীয় রপ্তানিকারকের নিকট বিক্রয় করা হয়। এই দফায় বিক্রয় হয় ২৬৮,০০০ টন, এবং স্থির হয় যে, মাল জাহাজে করিয়া এশিয়ায় প্রেরিত হইলে ১২½ গিল্ডার এবং ইয়োরোপে পাঠাইলে ১১ গিল্ডার লওয়া হইবে।

এপ্রিল মাস হইতে ১লা জুলাই পর্য্যন্ত লাল চিনির দর ছিল প্রতি একশত কিলোগ্রাম ১৪ গিল্ডার। তারপর দর ১৩ গিল্ডারে নামে ; কিন্তু এই দরে মাল কাটে মাত্র ৫০০ টন। ১৮ই জুলাই দর বাঁধিয়া দেওয়া হয় ১২½ গিল্ডার, এবং গোটা বৎসর এই দরই বাহাল রাখা হয়। কেবল সুয়েজ খালের পশ্চিমে বিক্রয়ের জন্য দর ২½ গিল্ডার

---

* এই প্রবন্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ "আর্থিক উন্নতি''র ভাদ্র সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল।

কমাইয়া দেওয়া হয়। একজন জাপানী রপ্তানিকারকের নিকট ১২⅞ গিল্ডার দরে ৬৫০০০ টন বিক্রয় করা হয়; এবং স্থির হয় যে, এই রপ্তানিকারক জাপান বা সাংহাই বন্দরে মাল চালান দিলে তাহাকে আরও ⅛ গিল্ডার কমাইয়া দেওয়া হইবে।

বিলাতে ট্যারিফ পরিবর্ত্তনের জন্য ম্যাস্কোভাডো চিনি বিক্রয়ের সুবিধা ঘটে, এবং এই লুপ্তপ্রায় চিনি আবার বাজারে দেখা দেয়। সুয়েজের পশ্চিমে ৯⅞ গিল্ডার দরে প্রায় ১২০,০০০ টন এই জাতীয় চিনি বিক্রয় হয়।

যবদ্বীপ হইতে ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাস হইতে ১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কিভাবে চিনি চালান গিয়াছে তাহা নিয়ের তালিকা হইতে টের পাওয়া যাইবে :—

যবদ্বীপ হইতে চিনি রপ্তানি

	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
	মেট্রিক টন	মেট্রিক টন	মেট্রিক টন
	২৭,৫৭৪	৫৫,২৩৪	৯৫,৫৮৫
	১৮০,১২৯	২১২,২৬২	২৯৩,৯৩৪
জুলাই	৩০১,০৯৯	২৯৩,৬৫৬	২৬১,৫৬৬
আগষ্ট	২১৬,৮৯৫	২৪৬,১৪৮	২৬০,৫৬৬
সেপ্টেম্বর	২৭৯,৮৭৮	২৯৬,৩৪৪	২২৫,২৯১
অক্টোবর	১৬৯,৬৪১	২২৭,৬৫৯	৩০৮,৯৯০
নবেম্বর	১৫৫,১৪৪	১৫৩,৮৯৪	৩২৬,৭২৬
ডিসেম্বর	১১২,৭০৩	১৮৫,১৫১	২৯৫,৯০৩
জানুয়ারী	৮৩,১০২	১৫৮,০৮৫	২১৬-৩৩৭
ফেব্রুয়ারী	৯৪,৫৪৬	১২০,২৮১	১৮৮,৭১০
মার্চ্চ	৯৫,৮৪০	১২৯,০৭২	১৫৮,২৭২
এপ্রিল	৩৬,০৭৪	৫৬,০৮০	৩২,০০৫
মোট	১,৭৫২,৬২৫	২,১৩৩,৮৬৬	২,৬৬৩,৮:৫

পূর্ব্ব সনের চেয়ে এবৎসর ইয়োরোপে ২১৪,০০০ টন, আমেরিকায় ৬,০০০ টনের উপর, কলম্বো সমেত ভারতবর্ষে ২৬৫,০০০ টন, চীন এবং হংকংএ ২৩৫,০০০ টন এবং নিউজীল্যাণ্ডে ২০,০০০ টন বেশী চিনি চালান গিয়াছে। পক্ষান্তরে জাপানে জাভা চিনির আমদানি কমিয়াছে ২২০,০০০ টন। জাপানের আমদানি-হ্রাসের কারণ ফর্ম্মোজাদ্বীপে অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি-উৎপাদন।

(ক্রমশঃ)
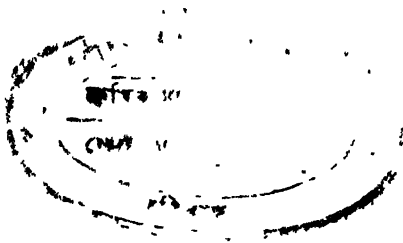
১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল বি,এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পৌষ—১৩৩৭ | ৫ম বর্ষ—৯ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৬

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমাব দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

বাংলার কথা—তথ্য-সঙ্কলন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৩) ফরিদপুর

ফরিদপুর জেলার পরিমাণফল ১৬,৬৪,৬৪০ একর। সহরের সংখ্যা ৪ এবং গ্রামের সংখ্যা ৩,৩৫৯। মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনে) ১১,৭৮,২০০ একর। অর্থাৎ মাথা পিছু মাত্র ১/২ একর। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৭৩'২৪ ইঞ্চি। গাই গরু ও স্ত্রী মহিষের সংখ্যা ২,৭১,৭৫৩। ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ৪,১৬,৩৫০। লাঙ্গলের সংখ্যা ১,৬০,১৪৬।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৫৪,৫২,১২৫ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১,০১,০৭,৩৯৮ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	...	১৫,৬০,৩৩৭
১৮৮১	...	১৬,৯৭,৬৩৫
১৮৯১	...	১৮,২৩,৭১৫
১৯০১	...	১৯,৩১,৯৪৩
১৯১১	...	২১,৪৫,৯৫১
১৯২১	...	২২,৪৯,৮৫৮

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুব সংখ্যা ৮,১৫,৬৩৪ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ১৪,২৭,৮৩৯। প্রতি বর্গমাইলে জন-সংখ্যা ৯৪৯।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা

		শতকরা
মোট	হিন্দুর	১৫'৪ জন
"	মুসলমানের	৩'৩ "
"	হিন্দু পুরুষের	২৬'৪ "
"	মুসলমান "	৬'২ "
"	হিন্দু মেয়ের	৪'৩ "
"	মুসলমান "	'৩ "

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ২৫৪৫। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৮২,৫৪১। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ৬,০৯,৮৩১। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) ১৯২৫ সনে ৯৪,২০৯। বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৫,১৫,৬২২।

স্বাস্থ্য

হাজার করা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩২·২।
হাজার করা মোট মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২১·০ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৩·৬।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—৪৩,২০২ ১৯২২—৩২,৮২১
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫—৫,৫৩৮ ১৯২২—২,২০৫
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫—১৬৫ ১৯২২—৮৯

শিশু-মৃত্যু

(১০ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু	...	২০৫·৮
স্ত্রী শিশু	...	১৯১·২

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা	...	২৩

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	...	১,৯২৩
কুষ্ঠরোগী	...	২৯৪
অন্ধ	...	১,৬৯৮
হিন্দুবিধবা	...	১,০৪,১৪৯
মুসলমান বিধবা	...	১,৩৩,৭৬৮

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমি রাজস্ব	...	৬,০০,৬৮৫৲
ষ্ট্যাম্প	...	১০,২৪,৩৬২৲
আয়কর	...	১,৩০,১৪৯৲
আবগারী	...	১,৪৬,২৪১৲
আফিম্	...	৪৩,০৪৯৲
অন্যান্য	...	১২,০৫৮৲
পথকর ও পাবলিক সেস	...	১,৬৫,৬০৩৲
মোট		২১,২২,১৪৭৲

(১৪) ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলার পরিমাণফল ৩৯,৯৯,৩৬০ একর।
সহরের সংখ্যা ৮ এবং গ্রামের সংখ্যা ৭,৩৪৬।
১৯২৪ সনে মোট কর্ষিত জমি ২২,৩৯,৯০০ একর।
অর্থাৎ মাথা পিছু মাত্র ½ একর। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৮৬·৮৪ ইঞ্চি।
গাই গরু ও স্ত্রী মহিষের সংখ্যা ৮,৭১,১৮৭।
ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ১২,০২,৯৩৩।
লাঙ্গলের সংখ্যা ৫,০৫,৬৯৯।
১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১,৮৬,০২,৯১২ মণ।
১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১,৯৯,৫৫,১২৫ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	...	২৩,৫৪,৭৯৪
১৮৮১	...	৩০,৫৮,৩২২
১৮৯১	...	৩৪,৭৩,১৮৬
১৯০১	...	৩৯,১৮,১০২
১৯১১	...	৪৫,৩১,৭৩০
১৯২১	...	৪৮,৩৬,৪২২

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ১১,৭৪,০১৫।

মোট মুসলমানের সংখ্যা ৩৬,২৩,৭১৯।

প্রতি বর্গমাইলে লোক-সংখ্যা ৭৭৬।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা

		শতকরা
মোট হিন্দুর	...	১২·৪ জন
" মুসলমানের	...	২·৮ "
" হিন্দু পুরুষের	...	২০·৫ "
" মুসলমান „	...	৫·১ "
" হিন্দু মেয়ের	...	৩·২ "
" মুসলমান „	...	·২ "

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪,২১৬।

মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ১,৪৬,২২৫।

বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ১৪,৫১,১৭২।

বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) ১,৩৮,১২৮ (১৯২৫ সনে)।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ১৩,১৩,০৪৪।

স্বাস্থ্য

হাজার করা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ২৬·৫।

হাজার করা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২৬·৮ এবং মুসলমানের মধ্যে ২২·৮।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—৭১,০২২ ১৯২২—৭০,৯৬৭
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫—২৬,৬৬২ ১৯২২—৬,৫২৪
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫—১,০৮০ ১৯২২—১,১২১

শিশু-মৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজারকরা গড়)

পুং শিশু—১৭৪·৮

স্ত্রী „ —১৮৩·৫

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা ... ৩৫

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা—৯৯৭

কুষ্ঠরোগী—১,৪৮৬

অন্ধ—২,৬১৬

হিন্দু বিধবা—১,৩৩,৭৩৭

মুসলমান বিধবা—২,১৮,৯৫৩

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমিরাজস্ব	...	৮,৭৫,১৩০৲
ষ্ট্যাম্প	...	২২,৯১,৭৩৫৲
আয়কর	...	১,৬৭,২০৬৲
আবগারী	...	৬,০০,৭৮২৲
আফিং	...	৫৪,৩৮৫৲
অন্যান্য	...	২,৫৮০৲
পথকর পাব্‌লিক সেস্	...	৪,৪৪,৮৩৮৲
মোট		৪৪,৩৬,৬৯২৲

(১৫) ঢাকা

ঢাকা জেলার পরিমাণফল ১৭,৭৭,২৮০ একর।

সহরের সংখ্যা ২ এবং গ্রামের সংখ্যা ৪,৭৩৫।

মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনে) ১৩,০৯,০০০।

মাথাপিছু কর্ষিত জমি ⅓ একর।

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৭৪·২৪ ইঞ্চি।

গাইগরু ও স্ত্রীমহিষের সংখ্যা ৪,৯১,০৮৬।

ষাঁড়, বলদ, পুং মহিষের সংখ্যা ৪,৪৩,৯৮০।

লাঙ্গলের সংখ্যা ২,২৩,৮৭০।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৬৩,৪০,৬৬০ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১,১৭,৩০,৮৩৩ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	...	১৭,৭৯,৯২৪
১৮৮১	...	২০,৩৫,৬৫৬
১৮৯১	...	২৩,৯৫,৪৩০
১৯০১	...	২৬,৪৪,৪৩৫
১৯১১	...	২৮,৮৭,৪৯২
১৯২১	...	৩১,২৫,৯৬৭

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ১০,৬৮,৯৪২।

ঐ সনে মোট মুসলমানের সংখ্যা ২০,৪৩,২৪৬।

প্রতি বর্গমাইলে জন-সংখ্যা ১,১৪৮।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা

		শতকরা
মোট হিন্দুর	...	১৭·১ জন
" মুসলমানের	...	৩·৭ "
" হিন্দু পুরুষের	...	২৮·৩ "
" মুসলমান "	...	৭·৫ "
" হিন্দু মেয়ের	...	৬·৪ "
" মুসলমান "	...	·৪ "

শিক্ষা

১৯২৫ সনে মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২,৯৯১।

মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ১,৩৯,৯৬৩।

বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সের (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ৮,৮৬,২৮২।

বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) ১৯২৫ সনে ১,২৮,১৬৬।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৭,৫৮,১১৬।

স্বাস্থ্য

হাজারকরা মোট জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ২৯·৪।

হাজারকরা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২৩·১ এবং মুসলমানের মধ্যে ২১·৯।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—৪৮,২৬৭ ১৯২২—৪৮,০৫৬
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫—১১,৭২৮ ১৯২২—৫,০৫২
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫—৩৭৪ ১৯২২—৮২৪

শিশু-মৃত্যু

(দশ বৎসরের হাজারকরা গড়)

পুং শিশু—২০০·০

স্ত্রী " —১৮৪·২

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা ... ২৮

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা—২,৪৭৪

কুষ্ঠরোগী—৬৭৫

অন্ধ—২,২৪০

হিন্দু বিধবা—১,২৬,৩৩৯

মুসলমান বিধবা—১,৪২,৭৪১

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমিরাজস্ব	...	৫,৭০,১২২৲
ষ্ট্যাম্প	...	১৫,২৪,৯১৫৲
আয়কর	...	৩,৬৩,২৭৭৲

আবগারী	...	৪,৩১,৫৩১৲
আফিং	...	৮০,৩৭৬৲
অন্যান্য	...	১০,৯১৮৲
পথকর ও পাবলিক সেস		১,১৯,৪৭৫৲
মোট		৩৩,০০,৬৪৪৲

শ্রীসুকুমার মিত্র

বাঙ্গালার কার্পাস শিল্প*

বাঙ্গালায় কার্পাস বড়ই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ১৮৭৭ সনের বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বাঙ্গালায় মাত্র ১,৬২,০০০ একর জমি কার্পাস চাষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৮৯৫।৯৬ সনের প্রাদেশিক এগ্রিকালচারেল ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ রিটার্ণে কার্পাস চাষে ১,৮৯০০০ একর জমি দেখান হইয়াছে। বাঙ্গালার চাষযোগ্য জমির তুলনায় ইহা অকিঞ্চিৎকর বলিতে হইবে।

চট্টগ্রাম, কটক, দ্বারভাঙ্গা, মেদিনীপুর, মানভূম, লোহারডগা, ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে এখনও প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন করা যায় বটে কিন্তু বর্ত্তমানে কেবল পার্ব্বত্য চট্টগ্রামেই ব্যবসায়ের জন্য কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে।

১৮৯১ সনের আদমসুমারী রিপোর্ট দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, বাঙ্গালায় ১০,৯২,৫৭৭ লোকের জীবনোপায় কার্পাস ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালার মোট লোক-সংখ্যার $\frac{১}{৭০}$ অংশের অধিক লোক যে ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে তাহা অধঃপতিত মনে করা যাইতে পারে না।

বাঙ্গালায় যুগী, জোলা, তাঁতী, ধুনীয়া, প্রভৃতির মোট সংখ্যা সমস্ত অধিবাসীর $\frac{১}{৩৫}$ অংশ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ব্যবসায়ীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ কেমন করিয়া হইতে পারে? এতৎ নিদর্শনকল্পে আমাদিগের বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের প্রাদেশিক রিপোর্ট সমূহের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বঙ্গে ৪৫টি জিলা। নিম্নে প্রত্যেক জেলার কার্পাস ব্যবসায়ের উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইল।

বর্দ্ধমান—সদর, রাণীগঞ্জ কিংবা কালনায় কোন কারবার নাই। কাটোয়ার তাঁতীরা কার্পাসের ব্যবসায় করিয়া থাকে। য়ুরোপীয় সুলভ বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় তাহাদের ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে। বহুসংখ্যক তাঁতী তাঁত ছাড়িয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছে। ২।১টি পরিবারে মাত্র তাঁতের প্রচলন পরিলক্ষিত হয়।

বীরভূম—কিছুদিন পূর্ব্বে কার্পাস ব্যবসায়ে বীরভূম যে প্রচুর গৌরব লাভ করিয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে লয় পাইয়া যাইতেছে।

বাঁকুড়া—এই জেলায় ৮০০ পরিবার কার্পাস ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছে।

মেদিনীপুর—দেশীয় কার্পাসের উন্নতির দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহার সম্পূর্ণ অধঃপতিত অবস্থা।

হুগলী—কার্পাস ব্যবসায়ীর সংখ্যা পূর্ব্ব সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছে।

হাবড়া—উলুবেড়িয়ায় কার্পাস ব্যবসায় অতি অল্প-মাত্রায় চলিতেছে।

২৪ পরগণা—সদর ও বসিরহাটে অনুমান ৪,০০০ লোক মাত্র কার্পাসের ব্যবসায় করে। তাঁতীদের অধিকাংশই পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া কৃষিকার্য্যে প্রবেশ করিয়াছে।

নদীয়া জেলায় অতি অল্পসংখ্যক তাঁতী ও জোলার বাস। তাহারা কেবল কৃষকদের ব্যবহার্য্য বস্ত্র বয়ন করে। বিলাতী সুলভ বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতা রক্ষা করিতে না পারিয়া তাহারাও দিন দিন ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতেছে।

মুর্শিদাবাদ—কার্পাস ব্যবসায়ের অবস্থা বড়ই শোচনীয়।

যশোহর—তাঁত ব্যবসায়ীরা নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক ব্যবসায়ী পৈতৃক বিষয় রক্ষা করিয়া আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কার্পাস ব্যবসায়ের অবস্থা শোচনীয়।

* স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক ১৩০৭ সনে লিখিত। আঃ উঃ সম্পাদক।

খুলনা—যুগী, জোলা, তাঁতীর মোট সংখ্যা ৩২৭০৩। ইহাদের অতি অল্প লোকই ব্যবসায় রক্ষা করিতেছে।

রাজসাহী—তাঁতের অবস্থা শোচনীয়। অল্পকালের মধ্যেই ৩,৩৪০টী তাঁতের স্থলে ১,০১৩টী দৃষ্ট হইতেছে।

দিনাজপুর—শতকরা ৫ জন ব্যবসায়ী পৈতৃক ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে।

জলপাইগুড়ি—তাঁতীর সংখ্যা ৪,০৬২ জন মাত্র।

দার্জ্জিলিং—শিলিগুড়িতে মাত্র ৩৭৩ জন তাঁতী আছে।

রঙ্গপুর—দেশীয় কার্পাসের অবস্থা ভাল নহে।

বগুড়া—তাঁতী ও জোলার সংখ্যা মোট ২,৫৫৩, তন্মধ্যে মাত্র ২০০ লোক ব্যবসায় রক্ষা করিয়া চলিতেছে।

পাবনা—১৮৭১ সনের তুলনায় ১৮৯১ সনের আদম-সুমারীতে ব্যবসায়ীর সংখ্যা বিস্তর ন্যূন দৃষ্ট হইয়াছে। অনেকে য়ুরোপীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না ভাবিয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র এবং নূতন ব্যবসায় করিতে অনিচ্ছুক তাহারাই কষ্টে সৃষ্টে পৈতৃক ব্যবসায় রক্ষা করিয়া গামছা ও নেংটী বিক্রয় করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেছে।

ঢাকা—১৮৭১ সনে ১৮,০০০ লোকে ব্যবসায় করিতে-ছিল। ১৮৯১ সনে অনুমান ১৫,০০০ লোকে ব্যবসায় চালাইয়াছে।

ময়মনসিংহ—নওয়া, কাটাখালী এবং সতাল প্রভৃতি স্থানে অনুমান ৫০ ঘর ও বাজিৎপুরে অনুমান ৪০ ঘর যুগী, জোলা, তাঁতীতে ব্যবসায় চালাইতেছে।

ফরিদপুর—কার্পাস ব্যবসায় ভালরূপ চলিতেছে না। সদরে মাত্র ৭৮টী মুসলমান পরিবার কর্তৃক ব্যবসায় রক্ষিত হইয়াছে।

বাখরগঞ্জ—কার্পাস ব্যবসায়ে কত লোক লিপ্ত আছে তাহা অনুমান করা যায় না। মতিয়া বস্ত্রের ব্যবসা এ জেলায় ভাল চলিতেছে। থাকৃতি বস্ত্র উপযুক্ত সহানুভূতির অভাবে ভাল চলিতেছে না।

মুঙ্গের—বিগত আদমসুমারীতে প্রদর্শিত সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ লোকেও প্রকৃত ব্যবসায় করে কিনা সন্দেহ। দিন দিনই সংখ্যা কমিতেছে।

ভাগলপুর—ব্যবসায়ীর সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে।

পূর্ণিয়া—জোলা, তাঁতী ও পলিয়ার সংখ্যা ১২০০ শতের বেশী নহে।

মালদহ—দেশীয় কার্পাসের এখানে বিশেষ আদর নাই। বৈদেশিক শিল্পের প্রসারই ইহার একমাত্র কারণ।

সাঁওতাল পরগণা—তাঁতী, জোলা প্রভৃতি বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা অন্যান্য লাভজনক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কটক, বালেশ্বর ও পুরী—বিগত আদমসুমারী রিপোর্টে বিশ হাজারেরও উপরে তাঁতীর সংখ্যা দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যবসায়ীর সংখ্যা অবগত হওয়া যায় নাই।

খন্দমল—অনুমান ৫০০ জন জাতীয় ব্যবসায়ী বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত আছে।

অঙ্গুল—সমস্ত লোক-সংখ্যার হিসাবে তাঁতী শতকরা দুই জনের অধিক নহে। প্রকৃত ব্যবসায়ীর সংখ্যা নিরূপিত হয় নাই।

হাজারীবাগ—এ জেলার এক-তৃতীয়াংশ কৃষক কার্পাসের চাষ করে। তুলা পিঁজিয়াও বহু স্ত্রীলোক জীবিকা অর্জ্জন করে। কিন্তু প্রকৃত তাঁত-ব্যবসায়ী জোলারা তাঁত ছাড়িয়া কর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

পালামৌ—গত আদমসুমারী রিপোর্টে প্রদর্শিত সংখ্যার অর্দ্ধাংশ লোকও নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত নহে। অধিকাংশই কৃষি-কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে।

মানভূম—প্রকৃত ব্যবসায়ীর সংখ্যা নির্ণয় করা হয় নাই।

সিংহভূম—২৫০৯০ সংখ্যক যুগী ও তাঁতীর মধ্যে, মাত্র ৩২৬৯ জন নিজ ব্যবসায় করে।

বর্ত্তমান এই উন্নতির যুগেও যাহারা নিতান্তই রক্ষণশীল এবং পৈত্রিক ব্যবসা রক্ষা করিয়া 'মাকু' বা তাঁতটীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহারা সমাজের চক্ষে কিছু অবহেলিত হইয়াই আছে। যাহারা একটী ক্ষুদ্র মুদীদোকান বসাইয়া ২ সের ৪ সের চাল ডালও অন্ততঃ বিক্রয় করিতেছে তাহারাও তাহাকে হেয় বলিয়া সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতে চেষ্টায় ত্রুটি করিতেছে না। আর যাহারা পায়ের উপর পা তুলিয়া পৈত্রিক ধনের সুদ খাইতেছে বা দু' চারিটী পাস দিয়া রাজ-

দরবারে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের ত কথাই নাই। এইরূপে স্বজাতির সহানুভূতিশূন্যতা পরন্তু নিগ্রহ আশঙ্কাও দেশী বস্ত্রব্যবসায় লোপ করিবার একটী কারণ দাঁড়াইয়াছে। (সৌরভ—ময়মনসিংহ)

অনশন-ক্লিষ্ট ও ব্যাধিপীড়িত বাংলা

[১]

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সহর ও মফঃস্বল হইতে অনাহার, অনশন ও অভাবের নিদারুণ বার্ত্তা পাইতেছি। দু' বেলা পেট ভরিয়া খাওয়া দূরে থাকুক অনেকে এক প্রকার অনশনেই দিনযাপন করিতেছে। ক্ষুধার তাড়নায় কেহ কেহ লতাপাতা ও অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া উদরপূর্ণ করিতেছে। রাজসাহী, ঢাকা, রংপুর প্রভৃতি জেলার কোন কোন কৃষক দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়া সকল দুঃখের অবসান করিয়াছে। নিম্নে মাত্র কয়েকটি শোচনীয় সংবাদ দেওয়া হইল :—

১। এইরূপ প্রকাশ যে, রাজসাহী জেলার চরঘাটের অধীন বেজরি গ্রামে দুই ভাই পৃথক বাটীতে বাস করিত। দুই জনেরই অবস্থা খারাপ, তন্মধ্যে ছোটটার কয়েক মাস ধরিয়া এক বেলা মাত্র আহার জুটিতেছিল। বড় ভাই একদিন শুনিল যে, তাহার ছোট ভাই স্ত্রী-পুত্র সহ দুই দিন খাইতে পায় নাই। সে স্ত্রীকে লুকাইয়া এক সের চাউল ছোট ভাইয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দেয়। উহা সিদ্ধ হইতেছে এমন সময় বড় ভাইয়ের স্ত্রী শুনিল, তাহার স্বামী চাউল দিয়াছে। সে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিল। ছোট ভাই বাড়ী আসিয়া স্ত্রী-পুত্রের কান্না ও সকল ঘটনা শুনিয়া একটী ঘরে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিল। তাহার স্ত্রীও স্বামীর পন্থা অনুসরণ করে। বড় ভাই ফিরিয়া আসিয়া ছোট ভাইয়ের বাড়ীতে যায়, ব্যাপার দেখিয়া যখন শুনিল তাহার স্ত্রী ইহার মূল, তখন একখানা কাস্তে লইয়া সে তাহার স্ত্রীকে খুন করে ও পরে আত্মহত্যা করে। এক সের চাউলের জন্য চারিটি লোকের প্রাণান্ত হইয়াছে।

২। ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমায় রায়ওলা গ্রামের অধিবাসী বন্দে আলী নামক একব্যক্তি খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

৩। ময়মনসিংহ জেলার চিনাখালী গ্রামের তামেজ প্রামাণিক নামক একব্যক্তি অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

৪। "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় ঢাকা পাইকপাড়ার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—পাট বিক্রয় না হওয়াতে চাষীদের দুর্দ্দশার অবধি নাই। কিছু দিন আগে একজন মুসলমান চাষী ও তাহার পত্নী একই কালে এবং একই স্থানে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। ছেলেমেয়েদের অন্ন-সংস্থান করিতে না পারাই নাকি এই দম্পতির শোচনীয় আত্মহত্যার কারণ।

৫। ২৪শে অক্টোবর "ফ্রী প্রেস" রাজসাহী হইতে এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, রাজসাহীতে আর্থিক সঙ্কট ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। চৌঘাট ও লালপুরার অধিবাসীরা মিলিত হইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। তাহাতে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য গ্রামবাসীরা প্রার্থনা জানাইয়াছে। রায়তগণ খাজানা দিতেছে না, তাহাদের সামর্থ্য নাই। ফলে জমীদারগণও বিপদে পড়িয়াছেন। অনশনের কষ্টে জনৈক কৃষক আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৬। রংপুর গাইবান্ধা হইতে সংবাদ আসিয়াছে—"দামোদর নিবাসী একটী গরীব মুসলমান গত ৩১শে অক্টোবর ক্ষুধার জ্বালায় ফাঁসি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। মমদুয়ার নিবাসী জনৈক মুসলমান গৃহস্থ কোনরূপে পরিবার প্রতিপালন করিতে না পারিয়া বাহিরের ঘরে যাইয়া গলায় ফাঁসি দিয়াছিল, তাহার স্ত্রী টের পাইয়া গলার রজ্জু বটি দ্বারা কাটিয়া দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করে।"

ইহা ছাড়া অন্যান্য জেলা হইতেও লোকের অন্নাভাবের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পাবনা এবং বালুরঘাটেও দুর্ভিক্ষ আসন্ন হইয়াছে।

পাটের দর হ্রাস পাওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার অধিবাসিবৃন্দের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ ও বগুড়ার অবস্থাই অধিকতর শোচনীয়। এই

সমস্ত জেলার কোন কোন অধিবাসী অনাহারে জীবন যাপন করিতেছে।

ঢাকা জেলার নানা স্থান হইতেও আমরা প্রতিনিয়ত আর্ত্তনাদের সংবাদ পাইতেছি। জীবনের জ্বালা কত দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিলে মানুষ আত্মঘাতী হওয়ার সঙ্কল্প করে তাহাই আজ বিশেষভাবে ভাবিবার বিষয়। এমনি কতলোক যে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিতেছে কে তাহার খোঁজ লয়? অবিলম্বে যদি ইহার প্রতিকারের উপায় না করা হয় বাঙ্গালীর বাঁচিবার সাধ্য থাকিবে না। (পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

[২]

পূজার ছুটিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটী জেলা পরিভ্রমণ করিয়া বুঝা গেল সর্ব্বত্রই দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত। আমাদের ধারণা ছিল, যে সমস্ত জিলাতে পাট অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় শুধু সেই জিলাগুলিই বুঝি পাটের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় অর্থাভাবে পড়িয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। যে সমস্ত জেলাতে পাট খুব অল্প জন্মে কিংবা আদৌ জন্মে না সেই সমস্ত জেলাতেও অর্থাভাব। রাজা, মহারাজা, জমীদার, তালুকদার, উকীল, মোক্তার ও ব্যবসায়ীদের ভাগ্যরেখা এবৎসর অসাধারণ দীন দরিদ্র কৃষকদের ভাগ্যরেখার অনুরূপ।

পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন জমীদার এবং রাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বার্ষিক বিদায় বন্ধ করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন ইহা শুধু এই বৎসরের জন্য; উশুল-আমদানি হইলে আগামী বৎসর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বার্ষিক প্রদত্ত হইবে। অনেকে নিত্যনৈমিত্তিক পারিবারিক বিগ্রহের ভোগারতিতে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছেন। মধ্যবিত্তদের মধ্যে কেহ কেহ বার্ষিক শারদীয়া পূজা তুলিয়া দিয়াছেন, অনেকে অতিকষ্টে ধার কর্জ্জ সংগ্রহ করিয়া পূজা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। কেহ কেহ প্রতিমা গড়াইয়া বিনা পূজায় দশমীর অনেক পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

বর্দ্ধমান হইতে বীরভূম জেলায় যাই। এই জেলায় পাটের চাষ খুবই কম, কিন্তু হাহাকারের সীমা নাই। বীরভূম পার হইয়া সাঁওতাল পরগণার অধীন দুমকা জেলাস্থিত পাকুড় রাজবাড়ীতে যাই। রাজবাড়ীটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশ অভাবগ্রস্ত। রাজার খরচে পরিচালিত হাইস্কুলের শিক্ষকগণ রীতিমত বেতন পাইতেছেন না।

রাজসাহী জেলার দীঘাপাতিয়ার এক কাছারী শেওড়াফুলীতে। কাছারীর ম্যানেজার বলিলেন শুধু শেওড়াফুলীর বাজারের আয়ের দ্বারা কাছারী চলিতেছে, অন্যান্য আয় বন্ধ। হুগলী জেলার উত্তরপাড়া জমীদার-প্রধান স্থান। সকলেই ব্রাহ্মণ। এক জমীদার অপর এক ব্যক্তির নিকট বলিতেছেন, "লোকে মনে করে, যে দেশে খুব পাট জন্মে সেই পূর্ব্ববঙ্গই বুঝি শুধু অর্থাভাবে পড়িয়াছে, আমাদেরও যে পাটের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান তাহা অনেকে ভাবে না।"

কলিকাতা সহরে দেওয়ালীর আলো এবার উজ্জ্বলভাবে জ্বলে নাই। বরিশাল গেলাম। কলসকাঠিতে তিন পয়সা জোড়া নারিকেল বিক্রী হইতেছে বটে অর্থাৎ টাকায় একুশ জোড়া, কিন্তু কলসকাঠির জমিদারদের বাড়ীতে খাজানা আদায় নাই। যদিও এই জেলা ধান্যপ্রধান তথাপি বিগত বর্ষে অজন্মার দরুণই নাকি এই বিপদ উপস্থিত।

হেমনগরের রাজবাটীতে প্রতি বৎসর ২রা আশ্বিন তারিখে বাইশ হাজার কি চব্বিশ হাজার টাকা আদায় হয়, এবার হইয়াছে মাত্র আড়াই হাজার। শুনা যায় গৌরীপুর ষ্টেটে পাঁচলক্ষ টাকা অনাদায়, তদুপরি রাজকোষ হইতে দুই লক্ষ টাকা প্রজাবর্গকে প্রায় বিনাসুদে দাদন করা হইয়াছে। দেশের শিক্ষকগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র চলিয়া গিয়াছে, যাহারা আছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের বেতন বাকী পড়িয়াছে। চাঁদাদাতাগণের চাঁদা বন্ধ, অনেক স্কুলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বন্ধ।

মুরাপাড়ার বাবুদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, তাঁহার বাড়ীতে এবৎসর দুর্গাপূজা হইয়াছে বটে, কিন্তু দুর্গোৎসব হয় নাই। উৎসবের প্রধান অঙ্গ যাত্রাভিনয় বন্ধ হইয়াছে এবং সামাজিক বিপ্রবর্গের ও অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের জন্য "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ব্যাপারে বাধা পড়িয়াছে। লুচি কচুরি

রসগোল্লার ব্যাপারটী স্থগিত হইয়া গেল। ভাওয়ালের রাজষ্টেট হইতে বার্ষিক বৃহৎ সাহায্য প্রদানে বিলম্ব হইতেছে বিধায় পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সুবৃহৎ বার্ষিক অধিবেশন স্থগিত রহিয়াছে। কবে সাহায্য আদায় হইবে এবং কবেই বা অধিবেশন হইবে তাহা অনির্দ্দিষ্ট।

মোট কথা, কি ধনী, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ কি রাজা কি প্রজা সকলেরই সমান অবস্থা। জামালপুর অঞ্চলের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ মনে হয়। অথচ সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে এই জামালপুর মহকুমার তুল্য লোন অফিস ও ব্যাঙ্ক মফস্বলের আর কোথাও নাই—বোধ হয় ভারতবর্ষের ভিতরই নাই। দেখা যাক্ পাট ব্যতীত অপরাপর ফসলের দ্বারা উম্বুল আমদানি কি পরিমাণ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, বেদান্তশাস্ত্রী
(শান্তিবার্ত্তা—জামালপুর)

[৩]

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মনোহরদী থানার অধীন ১নং লেবুতলা ইউনিয়নে কৃষককুলের ভয়ানক অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে। বিগত ফাল্গুন মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না। এই বৎসর অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিতে আউশ ধান মোটেই জন্মে নাই। যে ২০৲ মণ ধান্তের জমি চাষ করিয়াছিল সে মাত্র ৩৴।৪৴ মণ ধান্ত পাইয়াছে। আশা ছিল যে পাট বিক্রয় করিয়া জীবন রক্ষা হইবে; কিন্তু পাটও গড়ে প্রত্যেকের অর্দ্ধেকের কম হইয়াছে। বর্ত্তমানে এখানে পাটের দর প্রতিমণ ২॥০-৩৲ তিন টাকা মাত্র। ক্ষুধার তাড়নায় কৃষকগণ উক্ত মূল্যেই পাট বিক্রয় করিতেছে। আশ্বিন মাস অতীত হইবার পূর্ব্বেই অনেক কৃষকের পাট বিক্রয় শেষ হইয়াছে। তৎপরে কৃষকগণ যে কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে জানি না। স্থানীয় মহাজনগণের হাতে টাকা না থাকায় কোন কৃষকই এক পয়সা ঋণ পাইতেছে না। বর্ত্তমানে এখানে হাহাকার উঠিয়াছে। রাত্রে কেহ যদি ভাত পাক করিয়া পাকের ঘর হইতে বাহির হয়, লোকে তাহাও চুরি করিয়া নিয়া যায়। মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় নানারূপ অখাদ্য ভোজন করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। পেটের পীড়া আমাশয় ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়াছে। মানুষ এইরূপ অখাদ্য ভোজন করিলে মহামারি উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই।

মহম্মদ আলী
সেক্রেটারী, দাইড়ের পার কোঃ অঃ ব্যাঙ্ক
নরেন্দ্রপুর, ঢাকা।
(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

[৪]

মফঃস্বলের অবস্থা এবার বড়ই শোচনীয়। ঢাকা-ময়মনসিংহের উপর এবার যেন অভিসম্পাত। পূজায় কেহ নূতন বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া নিয়া যাইতে পারে নাই। এত অর্থাভাব আমরা দেখি নাই। অনেকেই দুবেলা খাইতে পায় না। প্রতি গ্রামে শতকরা ৯৯ খানা বাড়ীতে খোরাকীর সংস্থান নাই। পাটের দর মাত্র ২॥০-৩৲ হওয়ায় তদ্দ্বারা কোনক্রমে ধান খরিদ করিয়া খাইতেছে। জমীদার তালুকদারের খাজানা একেবারে বন্ধ। ইহারা সদর খাজানার কিস্তীর টাকা কোনক্রমে কর্জ্জ করিয়া আষাঢ় ও আশ্বিন মাসে দাখিল করিয়াছেন। এখন ব্যাঙ্কগুলির দ্বারও বন্ধ, কর্জ্জ দিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। পৌষের প্রকাণ্ড কিস্তির টাকা জমীদারগণ কোথা হইতে দিবেন?

আমি এবার বঙ্গে ঢাকা জিলায় ও ময়মনসিংহের দক্ষিণাংশে স্বয়ং প্রজাগণের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি। সর্ব্বত্রই লোকে আমার নিকট তাহাদের দুঃখের কাহিনী বলিয়াছে। কচিৎ ২।১ জন ধনাঢ্য ব্যক্তির বদান্যতায় লোক রক্ষা পাইতেছে। কোন কোন ব্যক্তির বাড়ী গত হাঙ্গামার সময় লুণ্ঠিত হইলেও তাঁহারা বিপন্ন গ্রামবাসিগণকে নিজ ক্ষেত হইতে ধান্ত কাটিয়া আনিতে অনুমতি দিয়া ইহাদের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। সম্প্রতি কৃষিঋণ দিবার জন্ত কতক টাকা প্রতি ইউনিয়ন বোর্ডে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার নিয়মাবলী এত কঠোর যে ইহাদ্বারা সাধারণের উপকার হইবে না। তারপর ভূম্যধিকারিগণকেও রক্ষা করিতে হইবে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ইঁহারা এক পয়সাও

আমদানি করিতে পারেন নাই—কর্জ্জও পাইবেন না। কাজেই হয় গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে কর্জ্জ দিন, নতুবা জানুয়ারী কিস্তির সদর খাজানা রেহাই দিন। "ময়মনসিংহ ল্যাণ্ড লর্ডস্ এসোসিয়েশন" এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করুন, নতুবা ভূম্যধিকারিগণ কহিতেও পারে না সহিতেও পারে না। সকলেই হৈমন্তিক ধান্যের দিকে চাহিয়া আছেন। তাতেই বা কি হইবে? প্রজাগণ নিজের ধান্য না রাখিয়া তালুকদারের প্রাপ্য চুক্তি বর্গা ধান্য দিবে কি?

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

[৫]

প্রায় দুইমাস হইল উলিপুর থানার চারিপাশের গ্রামের, বিশেষতঃ ধরলা নদীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের নরনারী দলে দলে এতদঞ্চলে থানায় ও বাড়ী বাড়ী অন্ন ও বস্ত্রপ্রার্থী হইয়া ঘুরিতেছে। অন্যান্য বৎসর এসব নরনারীর অধিক অংশই প্রতিবেশী গৃহস্থের বাড়ী মজুরি বা কাজ করিত। তাহাতেই তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত। এই সব দলে অপরিণতবয়স্ক ও পথশ্রমাশক্ত শিশু হইতে অসূর্য্যস্পশ্যা ব্রীড়াবনতমুখী কুলবধূ ও অবনতকটি শীর্ণকায় বৃদ্ধবৃদ্ধাও রহিয়াছে।

এ বৎসর এ অঞ্চলের জমীদার, জোতদার, মহাজন সকলেই নিঃসম্বল। অধুনা পাটের মূল্য অসম্ভবরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। দেশে অর্থ নাই, অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্যও অপ্রত্যাশিতভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেহই অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় কার্য্যেও মজুর রাখিতে পারে না। কোন কোন পরিবার ২।১ দিন সম্পূর্ণ অনাহারে কাটাইতেছে। কেহ বা সারাদিন ঘুরিয়া কিছু খাদ্যদ্রব্যও সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আহারের অনুপযোগী দ্রব্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। ফলে আরও ভীষণ বিপদকে আহ্বান করিয়াছে। একেত বিগত ভূমিকম্পের ফলে কূপাদি পানীয় জলাশয় নষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ পানীয় জলের নিতান্ত অভাব হইয়াছে; তদুপরি অনাহার, কুখাদ্য ও অখাদ্য ভক্ষণের ফলে প্রবলভাবে কলেরা একই সময় বিভিন্ন গ্রামে দেখা দিয়াছে। প্রত্যহই অসংখ্য লোকের এই পীড়ার আক্রমণ ও অভাবনীয় মৃত্যুর ভয়াবহ সংবাদ আসিতেছে।

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, হেড্ মাষ্টার,
উলিপুর হাই স্কুল।
(রঙ্গপুর দর্পণ)

[৬]

রঙ্গপুর জেলার সাদুল্যাপুর থানার এলাকাধীন দামোদরপুর গ্রামে রামরতন সরকারের বাটী অবস্থিত। রামরতনের বয়স ৭০ বৎসর, সে অল্প বেতনে ৺ভবানীপ্রসাদ মৈত্র মহাশয়ের বিধবা পত্নীর জমীদারির তহশীলদারি করিত। কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃগীরোগে মৃত্যু ঘটে। এক বৎসরের মধ্যে তাহার তিনটী কন্যা বিধবা হইয়া তাহাদের সন্তানসন্ততিসহ রামরতনের বোঝা বৃদ্ধি করিয়াছে। রামরতনের পোষ্য ব্যক্তিগণের সংখ্যা সম্প্রতি সাকল্যে ১৬টী। ধার কর্জ্জ করিয়া কোনদিন অনশনে কোনদিন অর্দ্ধাশনে রামরতন পরিবারবর্গকে এতকাল কোনরূপে জীবিত রাখিয়াছে। কিন্তু আর ধার কর্জ্জ পাওয়ার কোন উপায় না দেখিয়া রামরতন গত ১৫ই কার্ত্তিক ফাঁসি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। গ্রামের জোতদার, মহাজন, কৃষক সকলেই আজ রিক্তহস্ত। শতকরা ৭৫টী পরিবারের দু'বেলা অন্ন জোটে না। কেহ কেহ দুই তিন দিন পরেও আহার্য্য পাইতেছে। মহাজনগণ পাটের মরসুমে টাকা পাইবে মনে করিয়া সুদের আশায় শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত হাত-ছাড়া করিয়াছে। জোতদার জমীদারগণ চিরঋণী। তাহাদের দুর্দ্দশার অবধি নাই। সুতরাং এই সঙ্কটময় কালে কে কাকে রক্ষা করে?

মূল কারণ কোথায়?

সাদুল্যাপুর থানার এই অঞ্চলটীতে কাতুলী, কচুয়া, নাউসী, ছোট দামুয়া, বড় দামুয়া প্রভৃতি কয়েকটি বিল আছে। অথচ বিলগুলির জলনিকাশের প্রণালী নাই। গ্রামগুলি একটু নীচু জায়গায় অবস্থিত বটে। পূর্ব্বে রেল লাইন, দক্ষিণে লোকাল বোর্ডের রাস্তা, পশ্চিমে ডিষ্ট্রিক্ট

বোর্ডের রাস্তার দ্বারা এই অঞ্চল বেষ্টিত। সুতরাং বর্ষাকালে পার্শ্ববর্ত্তী উঁচু গ্রামগুলির জল গড়াইয়া এই সকল গ্রামকে ডুবাইয়া ফেলে, এবং ঐ জল সম্বৎসর থাকিয়া যায়। চৈত্র বৈশাখ মাসে কিছু জমি শুষ্ক হওয়ার পরই বীজ বপন করা হয় বটে, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে উল্লিখিত প্রকারে জল জমিয়া ঐ সকল শস্য অদৃশ্য করিয়া ফেলে। আর কৃষকগণের গৃহে সারাটি বৎসর করুণ ক্রন্দন থাকিয়া যায়। অপর দিকে বিলের ঘাস আবর্জ্জনা পচিয়া কার্ত্তিক মাস হইতে এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে। পাঠকগণ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে একবার যদি এই স্থানে আসিয়া অনুসন্ধান করেন তবে দেখিতে পাইবেন প্রতি গৃহে ম্যালেরিয়া, কলেরা অথবা টাইফয়েড জ্বর বা রক্তামাশয় রোগে ২।৪ জন শয্যাগত আছে। রামরতনের অল্পবয়স্ক ২টী পুত্র কিছু জমিতে ধানের আবাদ করিয়াছিল তাহাও জলে ডুবিয়া গিয়াছে। শস্যগুলি রক্ষা পাইলে রামরতন অস্বাভাবিকভাবে নিজে জীবন ত্যাগ করিত না। গ্রামগুলি শ্মশান হইতে চলিল। দিনের পর দিন কবরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রতীকারের উপায়

এক মাইল দীর্ঘ একটি ড্রেন কাটিয়া ঘাঘট নদীর সঙ্গে কাতুলী বিল সংযোগ করিয়া দিলে ১০।১৫ হাজার অধিবাসীর জীবন-রক্ষার উপায় হইতে পারে। উপরে যে বিলগুলির নাম করিলাম, ঐগুলি পরস্পর পাশাপাশিভাবে অবস্থিত। সুতরাং একটি ড্রেন দ্বারা বিলগুলির জল-নিকাশের বন্দোবস্ত হইতে পারে। প্রণালী কাটাইবার জন্য গ্রামবাসিগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক প্রার্থনাপত্র দাখিল করিয়াছিল, হুকুম এখনও জানা যায় নাই। হাজার হাজার বিঘা জমি এক মাইল দীর্ঘ একটি প্রণালীর অভাবে অনাবাদে পড়িয়া রহিয়াছে। স্থানান্তর হইতে যে সকল গৃহস্থ দলে বলে আসিয়া বাড়ী করিয়াছিল, কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দেখা গেল তাহাদের অধিকাংশ কবরের নীচে গিয়াছে। অবশিষ্ট ২।১ জন তৈয়ারী বাড়ী ছাড়িয়া দেহের জীর্ণ কঙ্কাল কখানি লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

শ্রীশারদাগোবিন্দ চাকী,
পোঃ কামারপাড়া, জেলা রঙ্গপুর।
(রঙ্গপুর দর্পণ)

[৭]

আমরা নারায়ণগঞ্জ সব্‌ডিভিসনের অধীন রায়পুরা থানার অন্তর্গত রাধানগর ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকাস্থিত অন্নকষ্ট-ক্লিষ্ট লোকসমূহের একটী তালিকা পাঠাইলাম। আশা করি দেশবাসীর দৃষ্টি ও সাহায্য আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইব।

পীরপুর গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান আমকাঁটালের সময় সস্তায় কাঁটাল, আলু, ইত্যাদি খরিদ করিয়া নিজেদের ও ছেলেপিলেদের ক্ষুধা দূর করিতেছিল। এখন সেইগুলির অভাব হওয়ায় এবং কাজকর্ম্ম না পাইয়া বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকিতে বাধ্য হওয়ায় তাহারা ভীষণ কষ্টে পড়িয়াছে। গত বৎসর পাটের দর ভাল ছিল না, বন্যার দরুণ ধান্যাদি ফসলও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অতিবৃষ্টির জন্য কোন ফসলই ভাল হইতে পারে নাই। নিম্নভূমির ধান ও পাট ক্ষেতগুলি জলে নষ্ট হইয়া যায়। তাই দেশে দারুণ অর্থাভাব ও অন্নাভাব। গত বৎসর পর্য্যন্ত এদিকের মজুরদের দিন-মজুরীর পরিমাণ ছিল ৸৹ আনা; আবার ফসল নেওয়া ও তৈয়ার করার সময় তাহা ১॥৹-২৲ টাকা হইত। এবার সেই মজুরী ।৹ আনা ৶৹ আনাতে নামিয়াছে। উপরন্তু অর্থাভাবে লোকে কাজ করাইতেছে না। শ্রমিকগণ এবং অনেক ভদ্র পরিবারও অনশনে অনেক দিন কাটাইয়া দিতেছে। অনেকে মনে করিয়াছিল যে, আশু ধান্য ও পাট কাটার সময় শ্রমিকেরা দু'পয়সা অর্জ্জন করিয়া দিন কাটাইতে পারিবে, কিন্তু সে আশায়ও ছাই পড়িয়াছে। ধান্যের অবস্থা ভাল না হওয়ায় কৃষকগণ নিজেরাই উহা কাটিয়া নিয়াও নিজেদের অভাব দূর করিতে পারিতেছে না। আর পাটের পরিমাণ ও দর নেহাৎ কম হওয়ায় পাট কাটার সময়ও কৃষকগণ

টাকা খরচ করিয়া অন্ত লোক খাটাইতে পারিতেছে না। লোকের এরূপ অন্নাভাব ঘটিয়াছে যে, তাহা চক্ষে না দেখিলে উপলব্ধি হয় না। যাহাদের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বেশ সুন্দর ছিল, উপবাসে আজকাল তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগীর মত দেখায়।

যদি গবর্ণমেণ্ট এ সব লোকের অবস্থা অবগত হইয়া গ্রামে গ্রামে কেন্দ্র করিয়া কোন কাজের পন্থা বাহির করিয়া লোক খাটাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন অথবা অভাবগ্রস্ত পরিবারে খাদ্যাদি বিতরণ কিংবা ঋণ দান পূর্ব্বক ২।৩ বৎসরের কিস্তিতে আদায় করিতে পারেন, তবে অনেক লোক জীবন সংগ্রামে হয়ত টিঁকিয়াও যাইতে পারে। দেশবাসিগণ যদি কিছু কিছু সাহায্য করেন তাহাতেও অনেকের উপস্থিত কষ্ট কথঞ্চিৎ বারণ হইতে পারে। এই তালিকায় অনেক স্ত্রীলোকের নাম আছে, তাহারা অন্নের জন্য চিড়া ও চাউল তৈয়ার করিয়া দিন যাপন করিত; কিন্তু তাহাদেরও সেই কাজ এখন না থাকায় ও তাহারা পুরুষের ন্যায় কাজ করিতে না পারায় অধিকতর কষ্টে পতিত হইয়াছে। এ ছাড়া গ্রামের অনেক ভদ্র পরিবার নীরবে উপবাস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম তালিকায় তুলিয়া তাঁহাদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে সাহসী হই নাই। মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকসকলও এই দুই বৎসর যাবৎ ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ও অন্য প্রকার আদায় উসুল না হওয়ায় বিষম অভাব ও অসুবিধায় দিন কাটাইতেছে। নচেৎ তাহারাও অনশন-ক্লিষ্ট লোকদিগকে কথঞ্চিত সাহায্য করিতে পারিত।

অনশনক্লিষ্ট লোকের তালিকা

গ্রাম পীরপুর

পরিবারের কর্ত্তার নাম	পোষ্যের সংখ্যা	উপার্জ্জনক্ষম লোকের সংখ্যা
নিমচরণ নমঃশূদ্র	৯	২
সীতারাম নমঃশূদ্র	৩	২
মথুরচন্দ্র দে	৪	১
মহানন্দ ঘোষ	৫	২
ছায়াদ বাস্তকর	৭	১
হরকিশোর নমঃশূদ্র	৮	৩
হরিচরণ নমঃশূদ্র	৬	১
৺রবিদাসের স্ত্রী	১	১
সেক আমিরুদ্দিন	৭	১
ছমিরুদ্দিন	৬	১
আবদুল—পিতা ৺দুঃখাই	৬	কুষ্ঠরোগী
সেক বাছির	৮	২
আবদুল—পিতা বাছির	৭	১
ছোবান	৬	১
জবেদালি	৯	৩
ছুনরুদ্দি	৪	১
আজম	৪	১
জমির	৮	১
রেগমত আলি	৬	৩
ছবু	৫	...
নাগরালি	৫	১
৺সাছুনীর স্ত্রী	৩	...
৺খয়েরদীর স্ত্রী	৪	...
ওয়াজদ্দি বাস্তকর	১০	১
তোয়াজদ্দি বাস্তকর	৮	১
৺ছলিমের মেয়ে	৪	১
হাজারী	৭	১
আসক বাস্তকর	৫	১
চান্দেআলি বাস্তকর	৫	১
৺ছিডুর পুত্র	৩	...
ডিডু বাস্তকর	৫	১
দলিল	৪	১

শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত
শ্রীশ্রীনাথ রায়, বি, এ
সাং পীরপুর, পোঃ রায়পুর, ঢাকা।
(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

[৮]

যতদূর দেখিলাম এবং বিশ্বস্তসূত্রে যতদূর অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি, এতদ্দেশের ব্যক্তিমাত্রই অভাবগ্রস্ত। কেবল পাটের টাকার উপরই এতদ্দেশের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। পাটের টাকা দ্বারাই মালিকের খাজানা, মহাজনের ঋণ এবং অন্নবস্ত্রের সমাধান হইয়া থাকে। কিন্তু পাটের মূল্যের অল্পতা প্রযুক্ত সকলের মুখেই হাহাকার ধ্বনি। পাটের টাকা দ্বারা মনিবের খাজানা বা মহাজনের দেনা দেওয়া দূরের কথা, কেহ অর্দ্ধাশনে, কেহ অনশনে, কেহ বা দিনান্তে একবার, কেহ বা দুই দিনে একবার আহার করিয়া কষ্টভোগ করিতেছে। ছেলেপিলের কাতর ক্রন্দনে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। অভাবের পীড়নে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। কেহ বা চিকিৎসার অভাবে রোগের কঠোর নিষ্পেষণে দুর্ব্বহ জীবন ত্যাগ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিতেছে। অর্থাভাবে কাহারও বা পরিধানে কাপড় নাই। কে কাহার খবর রাখে? এদিকে আবার মালিকের খাজানার জন্যও তাড়া পড়িয়াছে। কোন জিনিষপত্র ধারে বা বাকীতে পাওয়া যাইতেছে না এবং টাকা পয়সা ধার বা কর্জ্জও পাওয়া যাইতেছে না। হাট বাজারেও নির্ব্বিঘ্নে জিনিষপত্র বেচা-কেনা করা যাইতেছে না। নানা প্রকার অত্যাচার ও জুলুম হইতেছে। কাজেই দেশের বড়ই সঙ্কট সময় উপস্থিত হইয়াছে। টোক ইউনিয়নের নয়ানবাজার, ইসলামপুর, মালুঘাটেকী, মহরটুক ও ঘোষেরকান্দি প্রভৃতি স্থানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডাঃ শশিভূষণ দাস, মেম্বর, টোক ইঃ বোর্ড
(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

[৯]

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত হোমনা ও দাউদকান্দি থানার অধীন ১নং চন্দনপুর ইউনিয়ন-স্থিত চালিভাঙ্গা, নলচর, ফরাজিকান্দি মৈনারচর, বরইয়াকান্দি ও ১নং বড়কান্দা ইউনিয়ন-স্থিত মুদারকান্দি, আড়ালীয়াপুরের চর ইত্যাদি গ্রামগুলি মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রামস্থ জমিগুলি নীচু এবং গ্রামগুলির চতুর্দ্দিকেই ছোট বড় নদী। গত বৎসর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বন্যায় এ অঞ্চলের ফসলও প্রায়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষেও বর্ষার জল পূর্ব্বেই আসিয়া পড়ায় ফসলগুলি অপরিণত অবস্থাতেই আংশিক ভাবে নদীর জলে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল। অনেক স্থলেই কৃষকেরা পাটের উপর নির্ভর করে। এবার সেই পাটের ২॥০, ৩৲ টাকা দর। তাহাও আবার উপরি উক্ত কারণে কানী প্রতি ১ মণ ১॥০ মণের বেশী হয় নাই। বিক্রী করিয়া যে যাহা পাইয়াছিল সঙ্গে সঙ্গেই উদরান্নের সংস্থানের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে। ধান্য নদীর প্রবল স্রোতে বর্ষার প্রারম্ভেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কেরোধান রোপণ করিবার সময়, কিন্তু এতদঞ্চলের লোক-সমূহের অর্থাভাব ও অন্নাভাব হেতু অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনতিবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য না পাইলে কি খাইয়া উহা রোপণ করিবে ও অন্যান্য কৃষি কার্য্য সমাধা করিবে? ধার কর্জ্জ মোটেই মিলিতেছে না। পূর্ব্বের ঋণের সুদ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। দিনের পর দিন অভাবের মাত্রা ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। অনেকেই অনাহারে, অর্দ্ধাহারে বা অখাদ্য খাইয়া কোনও প্রকারে জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

(ত্রিপুরা হিতৈষী)

[১০]

সঞ্চয় ও অর্থসঙ্কট

বাঙ্গালা দেশের নানা স্থান হইতে যে দারুণ অর্থকষ্টের সংবাদ আসিতেছে তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেরই উদ্বিগ্ন হইবার কথা। এবার পাটের দর না থাকায় লোকের হাতে পয়সা আসে নাই, তদুপরি সকল ব্যবসা-বাণিজ্যই মন্দা হওয়াতে লোকের দুর্দ্দশা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। অভাবের দরুণ এবার কেহ কাহাকেও টাকা পয়সা দিতে পারে না—জমীদারের খাজানা, মহাজনের সুদ, ব্যবসায়ীর বাকী আদায় হইতেছে না। যাহারা দিতে পারে না তাহাদের তো কথাই নাই, যাহাদের হাতে কিছু পয়সা

আছে তাহারাও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া কাহাকেও কিছু দিতেছে না। মহাজন ঋণদান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সরকারের আয়ও কমিয়া গিয়াছে। সরকারকেও বাধ্য হইয়া খরচ কমাইতে হইতেছে। অর্থের অভাবে স্কুল কলেজে সাহায্য-দান বন্ধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট অঞ্চলের পত্তনিদারগণ জমীদারের খাজানা দেয় নাই। ১৪৪ জন পত্তনিদারের মহাল নীলামে বিক্রয় করিবার জন্য জমীদারগণ দরখাস্ত করেন। তদনুসারে কালেক্টর নোটিশ দিয়াছেন। জমীদারের খাজানা না দেওয়াতে উপরিউক্ত পত্তনি মহালগুলি নীলামে বিক্রয় হইবে। কেবল বালুরঘাট নহে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই এই অবস্থা।

অনেক জমীদার তালুকদার এবার সদর খাজনার টাকা আদায় করিতে পারিতেছেন না। এই তো দেশের অবস্থা। এখন ইহার প্রতীকারের উপায় কি? পাটের দর যে এবারই কমিল, ভবিষ্যতে কমিবে না, এমন কোন কথা নাই। এবার তবু খাদ্য দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত সুলভ আছে। ভবিষ্যতে উহারও দাম বাড়িতে পারে। দেশের এই দুর্দশার কারণ ও উহার প্রতীকারের উপায় এখন হইতেই চিন্তা করা উচিত।

গত ২০।২৫ বৎসরে এই দেশে পাটের মূল্য বাবদ্ বহু শত কোটি টাকা—বোধ হয় বহু সহস্র কোটি টাকা এদেশের কৃষকের হস্তে আসিয়াছে। তাহা সত্বেও এদেশের কৃষক নিঃস্ব। ইহার কারণ কি? আমাদের মনে হয় কৃষকের এই দুর্দশার প্রধান কারণ তাহাদের শিক্ষার অভাব। শিক্ষার অভাবে কৃষক সঞ্চয় করিতে জানে না—হাতে পয়সা আসিলেই তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে। বিদেশ হইতে যে টাকা পাটের বাবদ তাহারা পায় উহা সমস্তই বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া আবার বিদেশে পাঠাইয়া দেয়। কৃষকদিগকে সঞ্চয়ের অভ্যাস শিক্ষা দিতে পারিলে এই অবস্থার কিছু প্রতীকার হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় কৃষক ও শ্রমিকদিগের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ঐরূপ কোন চেষ্টা হয় না। ব্যাক, সমবায় সমিতি, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ও লাইফ ইনসিওরেন্স প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মত সঞ্চয়ের উপায়গুলি এ দেশের লোকের মধ্যে প্রচলিত করিতে না পারিলে দেশের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারপূর্ণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। সরকার, দেশের নেতৃবৃন্দ ও যাঁহারা জনসাধারণের হিত কামনা করেন তাঁহারাই এবিষয়ে সমবেত চেষ্টা করিয়া এখনও দেশের কল্যাণ সাধন করুন। এদেশে বহু সমবায় সমিতিই স্থাপিত হইয়াছে—কিন্তু সমবায় আন্দোলনের উপকারিতা অনেক স্থলে কৃষকগণ বুঝিতে পারিয়াছে কিনা তাহাতেও সন্দেহের অবসর আছে। সমবায় আন্দোলন খুব জোরের সহিত প্রচলন করিতে পারিলে এই সময়ে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে। এই সঙ্গে জীবন বীমা ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ডদ্বারা সঞ্চয় শিক্ষা দিতে পারিলে কৃষকের দুর্গতি দূর হইবে। (পল্লীমঙ্গল—নারায়ণগঞ্জ)

কো-অপারেটিভ্ পাট ক্রয় বিক্রয় সমিতি বন্ধ

বঙ্গদেশের কো-অপারেটিভ্ সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রারের আদেশ অনুসারে নিম্নলিখিত কো-অপারেটিভ্ সেল এণ্ড সাপ্লাই সোসাইটিগুলি লিকুইডেশানে গিয়াছে :—

১।	চৌমুহনি	জিলা নোয়াখালি
২।	কিশোরগঞ্জ	" ময়মনসিংহ
৩।	নারায়ণগঞ্জ	" ঢাকা
৪।	নেত্রকোণা	" ময়মনসিংহ
৫।	সিরাজগঞ্জ	" পাবনা
৬।	সরিষাবাড়ী	" ময়মনসিংহ
৭।	ময়মনসিংহ	" ময়মনসিংহ
৮।	আখাউরা	" ত্রিপুরা
৯।	চাঁদপুর	" ত্রিপুরা
১০।	আলমডাঙ্গা	" নদীয়া

বালুরঘাটে পাট বুননে কো-অপরেটিভ্ ব্যাঙ্ক

বালুরঘাটের ২৪শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, রাজসাহী বিভাগের কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীর সহকারী রেজিষ্ট্রারের ব্যবস্থামতে বালুরঘাট সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্

ব্যাঙ্ক পাটের সূতাকাটা ও বুনন বিভাগ খুলিয়াছেন। এই বিভাগ খুলিবার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, এতদ্দ্বারা কৃষকরা অবসরকালে কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে। এই ব্যাঙ্ক হইতে "ধর্ম্মগোলা" স্থাপন করিবার চেষ্টাও চলিতেছে।

পাটের রূপান্তর প্রচেষ্টা

বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের শিল্পবিভাগ দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতীকার-উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে ডিমনষ্ট্রেশন পার্টি পাঠাইয়া নূতন ধরণের পাটের সুতলী দড়ি প্রস্তুত করা শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেছেন। উহা প্রতি মণ ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। এবং ঐ পার্টি সুতলী দড়ি হইতে তাঁতের সাহায্যে চট, থলিয়া ও বিবিধ প্রকারের সুরঞ্জিত এবং সুচিত্রিত আসন প্রস্তুত করা শিক্ষা দিতেছেন। চরকার সাহায্যে এক একজন লোক একদিনে ✓৩ সের হইতে ✓৪ সের পর্য্যন্ত সুতলী দড়ি প্রস্তুত পূর্ব্বক দৈনিক ১৲ হইতে ১৷৹ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিতে পারিবে। ঘরের মেয়েরাও অবকাশ কালে ঐ সুতলী দড়ি তৈয়ার করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়া সংসারের অসচ্ছলতা দূর করিতে পুরুষের সাহায্য করিতে পারে।

সুতলী দড়ি হইতে চট, থলিয়া, খাটের ছাউনি, বিবিধ সুরঞ্জিত আসন ইত্যাদি তৈরীর জন্য যাহাতে ঘরে ঘরে এক একটী তাঁত স্থাপিত হয় ও প্রত্যেক গৃহস্থ অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, তজ্জন্য ঐ ডিমনষ্ট্রেশন পার্টি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ✓২ সের অথবা ✓৩ সের ওজনের ঐ রূপ এক একটী আসন ২৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। এক দিনের চেষ্টায় একটি লোক তাঁতের সাহায্যে নিজের ক্ষেত্রজাত পাটের সুতলী দড়ি হইতে ঐরূপ আসন প্রস্তুত করিয়া দৈনিক ৩৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা অবাধে রোজগার করিতে সমর্থ হইবে।

নওগাঁ মহকুমার মান্দা থানার এলাকায় বুড়ীদহ নামক স্থানে ঐ পার্টি প্রায় ৩।৪ মাস থাকিয়া তত্রত্য কৃষকদিগকে শিক্ষা দান করিয়া সম্প্রতি নওগাঁ মহকুমার সদরে আসিয়া শিক্ষা দান-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। নওগাঁয়ে ঐরূপ একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা হইতেছে। যদি প্রত্যেক গ্রাম হইতে ২।৩ জন করিয়া লোক উক্ত বিদ্যালয়ে গিয়া পাট হইতে সুতলী দড়ি ও নানাবিধ আসন তৈয়ারী করিতে শিক্ষা পায় এবং গ্রামে ফিরিয়া গিয়া চরকা ও তাঁত স্থাপন করিয়া কারবার আরম্ভ করে, তাহা হইলে পাট-চাষী কৃষকদের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে মহা উপকার হইবে।

দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহ্‌মদ

পাটচাষীর অর্থাগমের নূতন পন্থা

দেশের এই দুরবস্থার মধ্যেও একটি সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, কৃষকগণ সময়োপযোগী বৃত্তি অবলম্বন করিতে শিখিয়াছে। এবার পাটের দর না থাকায় গৃহস্থগণ অনন্যোপায় হইয়া নানাবিধ ব্যবসা অবলম্বন করিতেছে। যাহাদের বাড়ী বিল বা নদীর নিকট তাহারা মাছ ধরিয়া ও বিক্রী করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার কৃষকগণ এবার প্রায় সকলেই তাঁতের কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এখানে নকল খদ্দর নামে পরিচিত এক প্রকার কাপড়ের বিরাট কারবার চলিতেছে। মিলের মোটা সুতায় প্রস্তুত ধুতি, সাড়ী, থান, চাদর প্রভৃতি কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে খদ্দর নামে পরিচিত হইয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রী হইতেছে। এতদিন বিলাতী এবং জাপানী সুতাই বেশী চলিতেছিল, এক্ষণে স্থানীয় মহাজনগণ দেশী সুতা আমদানি করাতে দেশী সুতা দ্বারাই এই কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। একটী গৃহস্থ পরিবার একখানা উন্নত ধরণের তাঁতে প্রতি সপ্তাহে ২০।২৫ খানা ধুতি বা সাড়ী বয়ন করিতে পারে। উহাতে ১৭।১৮ টাকার সুতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কাপড় বিক্রী করিয়া পায় ৩০।৩২৲ টাকা। সুতরাং কৃষকগণ প্রতি সপ্তাহে মজুরী বাবদ প্রায় বিশ টাকা পাইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রতিদিন ৪।৫ হাজার টাকার এইরূপ কাপড় চালান হইতেছে। এই ব্যবসায়ে ও ইহা উৎপন্ন করিতে প্রায় ২৫।৩০ হাজার লোক ব্যাপৃত আছে। বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটের দিনে ইহা কম কথা নহে। এই সকল তাঁতে যদি দেশী সুতা ব্যবহৃত হয় তবে এই শিল্পের উৎসাহ দান করাই কর্ত্তব্য। (পল্লীমঙ্গল)

পাটের রপ্তানি

১৯২৯ সনের ১লা জুলাই হইতে ১৯৩০ সনের ৩০শে মার্চ পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে মোট ৩,৭৬৮,২৯৯ বেল পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৯২৮-১৯২৯ সনের এই সময়ে রপ্তানি হইয়াছিল ৪,০৯০,১৫১ বেল।

প্রধান রপ্তানি-কারকদের নাম ও পাটের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

রেলি ব্রাদার্স	৯,৩,৭১৩ বেল
বিড়লা ব্রাদার্স	৫৯২,৭৬১ „
আর ষ্টিল এণ্ড কোং	২৩১,৭৪৭ „
জি এণ্ড এম, ফগট্	১৭০,১৮৯ „
জি ও হেণ্ডারসন এণ্ড কোং	১৫২,২৮৯ „
ই ডি সেশুন এণ্ড কোং	১৪৯,১৫২ „
জে সি ডিউফাস এণ্ড কোং	১৪১,৬২১ „
এস্ এম এন মুল	১৩৮,১৭২ „
হরি সিং নেহাল চাঁদ	১১২,৪৭৩ „
ব্ল্যাক্উড্, ব্ল্যাক্উড্ এণ্ড কোং	৭৬,৯৯৮ „
লুড্লো জুট কোং	৯১,৯৯৮ „
ময়দিয়াল কাসেরা এণ্ড কোং	৯১,৯৩৭ „
বেকার গ্রে এণ্ড কোং	৬৯,৯১৭ „
জেম্‌স ফট্ এণ্ড সন্স	৬৩,৪৬১ „
ম্যাকরিড্ এণ্ড কোং	৬০,১৬১ „
দি চিটাগঞ্জ কোং	৫৮,৬২১ „
এম লি কাইসা	৫৮,৩৫৪ „
আর ডি রামকিষণ দাস	৫৬,৭৬৫ „
ডি এল মিলার এণ্ড কোং	৫২,৪১৭ „
স ওয়ালেস্ এণ্ড কোং	৪২,২৫৪ „
জেম্‌স্ ফিন্‌লে এণ্ড কোং	৩৮,০১৫ „
বি কে লোধা এণ্ড কোং	৩৪,৮৪৩ „
আর রয়াট মুল	২৯,৭৯৩ „
জি এম্ আর্ এল গোটি	২৭,৩২২ „
ইল আর্ এণ্ড কোং	২৫,৫৪৪ „

(ময়মনসিংহ সমাচার)

কলিকাতায় পাটের দর

আমদানি	...	৪০,০০০/ মণ
রপ্তানি	...	৩৫০০০/ „
মজুত	...	৫৩২০০০/ „
গত বৎসর এই সময় মজুত ছিল		৭৫৭০০০/ „
ইয়োরোপীয়ান জুটের মূল্য		৫৲
ভারতীয় পাটের		৪৸০
পাকা বেলের দর		২৯।০
লাইটনিংস		২৬৲

পাটের মূল্যবৃদ্ধি

বহু ক্রেতার আমদানি হওয়ায় অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে পাটের বাজার বেশ চড়া হইয়াছে এবং অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আমদানি বাড়িয়া গিয়াছে। পাটের দর মণকরা ৪৲ হইতে ৫৲ টাকা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোট ৫ লক্ষ ২০ হাজার মণ পাট আমদানি হইয়াছে। গত বৎসর এ সময়ে মোট ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার মণ পাট আমদানি হইয়াছিল।

(জনমত—জলপাইগুড়ি)

চাষের নয়া ব্যবসা

বাঙ্গালায় কৃষির উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার নাম হইয়াছে,—বাঙ্গালা কৃষি সমুন্নতি কোম্পানী। কলিকাতা ৮৪ নং ক্লাইব ষ্ট্রীটে কোম্পানীর আফিস। সেখান হইতে কোম্পানীর পরামর্শ-দাতা শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরযুক্ত এক নিবেদনপত্র প্রচারিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই,—"কবি-বর্ণিত সুজলা সুফলা বাংলাদেশে গ্রামগুলি দিন দিন শ্রীহীন শ্মশানে পরিণত হইয়া জাতিকে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। ঘরে ও বাহিরে আত্ম-রক্ষায় অক্ষম বংশের দুলালগণ বেকার অবস্থায় জীবনের সুখশান্তি ভুলিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তির বিষাদ জন্মাইতেছে। এ সমস্যার সমাধান করিবে তাহারাই, যাহাদের লইয়া গ্রাম।

পতিত জমি, বিস্তৃত ডাঙ্গাভূমি এরূপই লোকাভাবে, অর্থাভাবে শ্মশান হইয়াছে—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টির ফলে ফসল ফলাইয়াও চাষী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তার ঋণ মিটে না। কেন এমন হয়? কিসে চাষীর এ সর্ব্বগ্রাসী দুরবস্থা আসে? ইহাই প্রধান সমস্যা, ইহারই প্রতীকারার্থে পতিত জমি আবাদ করিতে হইবে, জঙ্গলা ডাঙ্গাভূমিকে উর্ব্বরা, শস্যপ্রসূ করিতে হইবে, কৃষাণের বেকার অবস্থা ঘুচাইতে হইবে। তবেই এ শোক-তাপদীর্ণ চাষীর হাহাকার থামিবে। জমি চাষের যাঁহাদের সুবিধা হয় না তাঁরা, এবং পতিত জঙ্গলা ডাঙ্গাভূমির মালিকেরা স্ব স্ব জমির বিস্তারিত বিবরণ আমাদিগকে জানাইলে আপাততঃ অনুর্ব্বর জমিতে মালিকের স্বত্ব বজায় রাখিয়া শস্য উৎপাদন করিবার উপায় ও সুব্যবস্থা আমরা করিয়া দিতে পারিব। জমির মালিকদের নিকট হইতে পত্র পাইলে আমরা বিশেষ বিবরণের তালিকা পাঠাইব।" কালনা মহকুমার পূর্ব্বস্থলী ও কালনা থানায় বহু ডাঙ্গা ও জঙ্গলা জমি পড়িয়া আছে। জমির মালিকগণ একটু চেষ্টা করিয়া দেখুন না। যদি জমিগুলির উদ্ধার হয় তবে একদিকে যেমন আয়ের পথ খুলিবে, অপর দিকে জঙ্গল কমিয়া গেলে দেশ ম্যালেরিয়ার হাত এড়াইবে।

(পল্লীবাসী—কালনা)

কৃষিকাজে ভদ্রলোক চাই

বিগত ৫ই কার্ত্তিক বুধবার দিবস ফুলপুর থানার অন্তর্গত লাউটিয়া, বাড়ীপাড়া, নলদীঘী, বাড়ীপুথিরা, কামুহারী, মাইলোড়া, বাট্টা, উত্তরপাড়া, হরিয়াগাই, কলহরি, শাখরাটি, চং নয়াপাড়া, রায়জান, পাখারিয়া, বাদরাকান্দা, টাউ, তারাকান্দা ইত্যাদি গ্রামসমূহের অধিবাসী মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভদ্রলোকবৃন্দ বাট্টা এম ই স্কুল প্রাঙ্গণে বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে এক বিরাট সভার অধিবেশন করিয়া এবং সকলে একমত হইয়া স্বহস্তে হল চালনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত লাউটিয়া নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবীদাস মজুমদার ও হরিয়াগাই নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চৌধুরী এবং বিশিষ্ট কায়স্থ শ্রেণীর মাইলোড়া নিবাসী স্থানীয় জজ কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বিশ্বাস, রায়জান নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ ধর ও কামুহারী নিবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বিশ্বাস এবং ক্ষত্রিয় শ্রেণীর বাট্টা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ রায় প্রমুখ মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত সভায় বিধবা-বিবাহ ও নিম্ন শ্রেণীর জলাচরণ বিষয়েও দুইটি রিজলিউশন পাশ হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও সভা করিয়া এই সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত সিদ্ধান্ত করিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কামুহারী

(ময়মনসিংহ-সমাচার)

নারী-শিক্ষার প্রসার

গার্লস হোম অনাথ বালিকা ও দরিদ্র ছাত্রীদের ফ্রি আবাস ও শিক্ষাগার। হোমের পালিতা "কন্যারা" হোম ফণ্ড হইতে খাওয়া পরার ও চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয় পাইয়া থাকে। সকল জেলার সকল জাতি-ধর্ম্মের বালিকাকে গ্রহণ করা হয়।

১। অনাথ—যাদের রক্ষণাবেক্ষণের কেহ নাই—সকল সময়ে হোমে ভর্ত্তি হইতে পারে। ৩ বছরের কম বয়সের বা বিকলাঙ্গ কাউকে গ্রহণ করা হয় না। কেহ পৌছাইয়া দিলে যাতায়াত খরচ দেওয়া হয়।

২। দরিদ্র—যারা উচ্চ প্রাইমারী পাশ করিয়াছে বা হাই স্কুলের ৪র্থ মানে ভর্ত্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, অথচ অসহায় অবস্থার জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত, এমন দরিদ্র ছাত্রীরাও হোমের "কন্যা" রূপে ভর্ত্তি হইতে পারে। কন্যার অভিভাবককে এগ্রিমেণ্ট দিতে হয়।

আগামী ডিসেম্বর মাসে ৬টী নূতন "কন্যাকে" হোমে গ্রহণ করা হইবে। ইহাদের মধ্যে ৩টিকে উচ্চ শিক্ষার জন্য, ২টীকে (ঢাকা বা কলিকাতায়) ধাত্রী বা নার্সিং শিক্ষার জন্য ও একটীকে শ্রীরামপুর উইভিং স্কুলে "বয়নবিদ্যা" শিক্ষা দিবার জন্য মনোনীত করা হইবে। হোমের "হিন্দু কন্যাদের" জন্য হিন্দু বোর্ডিংএ পৃথক বন্দোবস্ত আছে।

হোমের ছাপান ফর্ম্মে দরখাস্ত করিতে হইবে এবং দরখাস্ত ৩০শে নবেম্বর পৌঁছান চাই। মনোনীতা বালিকাকে ২৮শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্ত্তি হইতে হইবে।

মিসেস্, এ, কে, খোন্দকার
সেক্রেঃ, গার্লস হোম, জলপাইগুড়ী।

মেলা চাই না

রঙ্গপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার অধীন সুন্দরগঞ্জ থানার নিকট তাজহাট কাছারির পূর্ব্ব দিকে ২।৩ বৎসর যাবৎ প্রতি কার্ত্তিক মাসে একটি মেলা বসিয়া থাকে। মেলাটি ১ মাস কাল স্থায়ী হয়। মেলার বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ এই :

(১) এই মেলা উঠাইয়া লওয়ার জন্য মেলার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বহু আবেদন করা হইয়াছিল—কিন্তু মেলার কর্ত্তৃপক্ষ উহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

(২) মেলাটী সুন্দরগঞ্জ বন্দরের সমীপবর্ত্তী একটী বৃহৎ পল্লীর মধ্যভাগে অবস্থিত। পল্লীবাসিগণের মতের বিরুদ্ধে এই মেলা বসান হইয়াছে।

(৩) বেশ্যাদের অশ্লীল সঙ্গীত, ব্যভিচার-দুষ্ট-নীতি, বিগর্হিত কথোপকথন, পল্লীর নীরবতা ও শান্তিভঙ্গ করিয়া অশান্তি উৎপাদন করে।

(৪) মেলার উত্তরে যে নদীটী অবস্থিত, মেলা আরম্ভ হইলে উহাতে যাইবার পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় পল্লীবাসীর জলকষ্টের পরিসীমা থাকে না।

(৫) মেলার ফলে স্থানীয় স্ত্রীপুরুষের মাঠে মলমূত্র পরিত্যাগের অসুবিধা হয়।

(৬) মেলায় জুয়াখেলা ও বেশ্যা-সমাগমে লোকের অর্থহানি ও নৈতিক অধঃপতন হইতেছে। আমরা এতদ্বিষয়ে স্থানীয় সার্কেল সেনিটারী ইন্‌স্পেক্টার ও জেলাবোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মেলার কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের প্রতিকূলে মেলা পরিচালিত না করিয়া মেলা বন্ধ করিয়া দিউন। (রঙ্গপুর-দর্পণ)
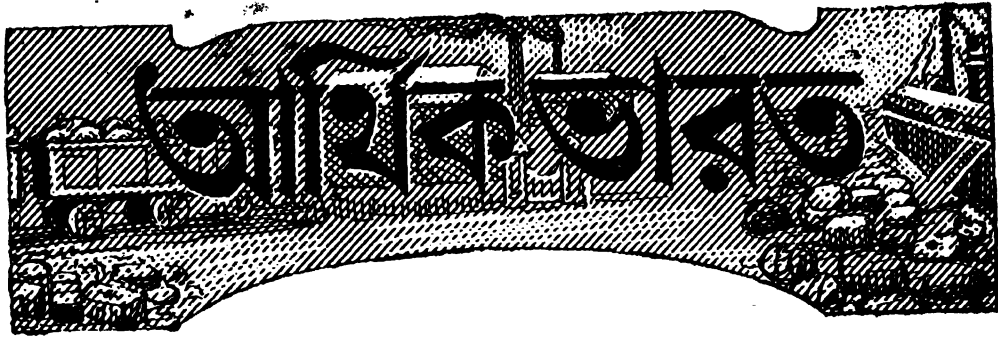
ভারতীয় শিল্প-দ্বন্দ্বের এক কাচ্চা

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল

ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল ডিস্‌পিউটকে বাঙ্গালায় শিল্পঘটিত দ্বন্দ্ব বা সংক্ষেপে শিল্প-দ্বন্দ্ব নাম দেওয়া গেল। এই দ্বন্দ্ব ষ্ট্রাইক্‌, হরতাল, লক্‌আউট, ইত্যাদি নানা আকারে দেখা দেয়। কখনো মজুরদের দাবী-দাওয়া, কখনো মনিবদের কার্য্য-পদ্ধতি (মজুরি কমানো, র‍্যাশানালিজেশন, ইত্যাদি), কখনো বা রাজনৈতিক কি সামাজিক কারণে এই সব দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ফলাফলও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে,—কখনো মজুর জেতে, কখনো শিল্পপতি জেতে, কখনো উভয়ে আপোষে নিষ্পত্তি হয়। বলা বাহুল্য, যেমন ট্রেড্‌ ইউনিয়ান-পন্থীর পক্ষে তেমনি শিল্প-ধুরন্ধরের পক্ষে দ্বন্দ্বশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন থাকা দরকার। মনিব-মজুরের সম্পর্ক বিশ্লেষণ, স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন দিক্‌ হইতে আলোক ফেলিয়া এই জটিল সমস্যার আলোচনায় বহু পশ্চিমা পণ্ডিত ব্যাপৃত আছেন। আমাদের দেশে এই দ্বন্দ্ব ক্রমেই গুরুত্বে বাড়িতেছে, মজুর-শক্তি ক্রমাগত বলসঞ্চয় করিতেছে এবং দ্বন্দ্বশাস্ত্রকে কোন ভারতীয় কারবারীর এক্ষণে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। শিল্পোন্নতির পক্ষে এদিকে যথোচিত মনোযোগকেও যুবক ভারতের ব্যবসার অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখিতে হইবে। বস্তুতঃ, এই দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা আর্থিক সংগ্রামের একটা রূপ হইলেও ইহার প্রভাব রাজনৈতিক জগতে পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং সম্পদ্‌ বণ্টন সম্বন্ধে নেতাগণের মনে বিপ্লব আনয়ন করিতেছে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা দেশে অন্য বহু বিষয়ের ন্যায় এই দ্বন্দ্বশাস্ত্র লইয়াও কেহ আলোচনা করিতে অগ্রসর হন নাই। আমরা এখানে ভারতীয় শিল্প-দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাষ মাত্র দিব।

বিগত ৬ মাসের (এপ্রিল-ডিসেম্বর) ভারতীয় দ্বন্দ্বসমূহের প্রতি মাসের একটা সাধারণ বিবৃতি এইরূপ :

	এপ্রিল ১৯৩০	মে ১৯৩০	জুন ১৯৩০	৩০ জুন পর্য্যন্ত ১৯৩০	জুলাই ১৯৩০	আগষ্ট ১৯৩০	সেপ্টেম্বর ১৯৩০	৩০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১৯৩০
মাসারম্ভে আরব্ধ দ্বন্দ্ব	৬	৩	৩	৬	...	১	...	...
নূতন দ্বন্দ্ব আরম্ভ	১৫	১৫	১৭	৪৭	১০	১০	১২	৩২
দ্বন্দ্বের অবসান	১৮	১৫	২০	৫৩	৯	১১	১০	৩০
মাসান্তে আরব্ধ দ্বন্দ্ব	৩	৩	...	...	১	...	২	২
কত লোক সংশ্লিষ্ট ছিল	৪১,৫১০	৩৪,৬৪৭	২৭,৫১১	৮৭,৫৫০	৫,৫৭৬	১৬,৯৮৮	৬,২৯৩	[illegible],৯৫৭
কত দিন নষ্ট হইয়াছে	২২৫,৬৩৯	২২৮,৪৭৮	৫২,২২৮	৫০৬,৩৪৫	১০,০১৩	৪৮,৫২১	১২,৫১৯	৭১,৭৫৩

	এপ্রিল ১৯৩০	মে ১৯৩০	জুন ১৯৩০	৩০ জুন পর্য্যন্ত ১৯৩০	জুলাই ১৯৩০	আগষ্ট ১৯৩০	সেপ্টেম্বর ১৯৩০	৩০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১৯৩০
ফলাফল :—								
সফল	৩	২	৫	১০	৩	৩	১	৭
আংশিক সফল	৩	৩	২	৮	...	...	২	২
বিফল	১২	১০	১৩	৩৫	৬	৮	৭	২১
অমীমাংসিত	৩	৩	...	...	১	...	২	২

গত ৬ মাসের শিল্প-দ্বন্দ্বের সম্বন্ধে প্রথমেই চোখে পড়িবে যে প্রথম ৩ মাসে দ্বন্দ্বটা যত ঘোরতর আকারে দেখা দিয়াছিল শেষের ৩ মাসে তত ঘোরতর হয় নাই। ৩০শে জুন অবধি ৮৭½ হাজারের উপর লোক সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, আর দিন নষ্ট হইয়াছিল ৫ লাখের উপর। কিন্তু পরবর্ত্তী তিন মাসে সংশ্লিষ্ট লোকের সংখ্যা ⅓ ও নষ্ট দিনের সংখ্যা ⅐ (প্রথম ৩ মাসের তুলনায়)। দ্বিতীয় জিনিষ যা চোখে পড়িবে তা হইতেছে এই যে, অধিকাংশ দ্বন্দ্বের ফলই বিফলতা হইয়াছে। বহু লোক দ্বন্দ্বে জড়াইয়া পড়িয়াছে, অনেক কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে, হয়ত মজুরি অভাবে অনেক পরিবারকে প্রায় অনশনে কাটাইতে হইয়াছে, তথাপি শেষ পর্য্যন্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। বলা বাহুল্য, এই সব দ্বন্দ্বে বিফলতার অর্থ অধিকাংশ সময়েই মজুরদের বিফলতা অর্থাৎ মজুরদের বেশী ভুগিতে হইয়াছে। পরাজয়ের কারণগুলি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিবার সময় আসিয়াছে।

কোন্ কোন্ ব্যবসায়ে কতগুলি দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, তাহাতে কত লোক সংশ্লিষ্ট ছিল এবং ঐ উপলক্ষে কতগুলি দিন নষ্ট হইয়াছিল তা নীচের তালিকা হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে :

	১লা এপ্রিল—৩০শে জুন			১লা জুলাই—৩০শে সেপ্টেম্বর		
শিল্প	দ্বন্দ্বের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট লোক	নষ্ট দিন	দ্বন্দ্বের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট লোক	নষ্ট দিন
তুলার কল ও পশমের কল	২১	২৯,৬৩১	১৮৫,২১২	১৩	১৪,৩৮২	৪৩,১২৪
পাটের কল	৫	৬,৭০০	২৬,১০০	২	৫,৩০০	১৪,৯৫০
এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা	৪	৩৯২	৩,৯৮৮	১	২৬	৫২
রেলওয়ে ও রেলওয়ে কারখানা	৫	৩৯,২৮২	১৫৩,৭৫৪	১	৩১১	২,৪৮৮
খনি	১	২০০	১,৯০০	...	...	...
অন্যান্য—বিবিধ	১৭	১১,৩৪৫	১৫৩,৩৯১	১৫	৫,৯৩৮	১০,৪৩৯
	৫৩	৮৭,৫৫০	৫০৬,৩৪৫	৩২	২৫,৯৫৭	৭১,০৫৩

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে শুধু দ্বন্দ্বের সংখ্যা দেখিয়া লোক বা দিন সম্বন্ধে কোন ধারণা করা চলে না। তুলার কলে প্রথম ৩ মাসে পৌনে দু'লাখের বেশী দিন নষ্ট হইয়াছে, রেলওয়েতে হইয়াছে ১½ লাখের কিছু উপরে; একের দ্বন্দ্বের সংখ্যা ২১, অন্যের ৫, অথচ একে লোক সংশ্লিষ্ট ছিল প্রায় ৩০ হাজার, অন্যে প্রায় ৪০ হাজার; একটি মাত্র খনির দ্বন্দ্বে ১৯০০ দিন নষ্ট হইয়াছে। শেষ ৩ মাসেও এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এবং রেলওয়েও রেলওয়ে কারখানায় দ্বন্দ্বের সংখ্যা ১ হইলেও দ্বিতীয়টিতে অনেক লোক লিপ্ত ছিল, অনেক বেশী কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে।

এই দ্বন্দ্বের গুরুত্ব কিছু বুঝা যাইবে যদি প্রতি শিল্পদ্বন্দ্বে কত লোক লিপ্ত হইয়াছিল এবং কত দিন নষ্ট হইয়াছিল তার হিসাব করিলে। নীচে সেই হিসাব দেওয়া গেল।

	প্রথম ৩ মাসে		দ্বিতীয় ৩ মাসে	
	লোক	দিন	লোক	দিন
তুলার কল ও পশমের কল	১,৪১১	৮,৮১৯'৬	১,১০৬'৩	৩,৩১৭'২
পাটের কল	১,৩৪০	৫,৪২০	২,৬৫০	৭,৪৭৫
এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা	৯৮	৯৯৭	২৬	৫২
রেলওয়ে ও ঐ কারখানা	৭,৮৫৬'৪	৩০,১৫০'৮	৩১১	২,৪৮৮
খনি	২০০	১,৯০০		
অন্যান্য	৬৬৭'৩	৯,০২৩	৩৯৫'৯	৬,৯৫৯
	১৬৫১'৯	৯,৫৫৩'৬	৮১১'১	১,৯৭০'৫

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রথম ৩ মাসে লোক বা দিনের দিক্ থেকে রেলওয়ে ও রেলওয়ে কারখানা প্রথম, তুলার কল দ্বিতীয় ও পাটের কল তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে ; আর দ্বিতীয় ৩ মাসে পাটের কল প্রথম, তুলার কল দ্বিতীয় ও রেলওয়ে তৃতীয় দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালার এই তিনটী শিল্পকেই বিশেষভাবে দ্বন্দ্ব পোহাইতে হয়, একথা বলা চলে। বস্তুতঃ তুলার কল ও পাটের কল গত ছয় মাস ধরিয়াই শিল্প-দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র রহিয়া গিয়াছে,—যদিও প্রথম ৩ মাসের তুলনায় দ্বিতীয় ৩ মাসে মোট সংশ্লিষ্ট লোক ½ মাত্র ও মোট নষ্ট কাজের দিন ½ এর কিছু বেশী এবং সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট লোক ও নষ্ট কাজের দিনের সংখ্যা কমিয়াছে, তথাপি পাটের কলে বিপরীত কাণ্ড ঘটিয়াছে। ইহা প্রণিধানযোগ্য।

কোন্ কোন্ শিল্পে কি কি কারণে এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল এবং তার ফলাফল কি হইয়াছিল তা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	কিসের দাবী					ফলাফল			
	মজুরি	বোনাস্	ব্যক্তিগত	ছুটি ও কাজের ঘণ্টা	অন্যান্য	সফল	অংশতঃ সফল	বিফল	অমীমাংসিত
তুলা ও পশমের কল	১০+৪	১+...	৪+১	...+...	৬+৬	২+৩	৪+...	১৫+৮	...+২
পাটের কল	১+১	...+...	৪+...	...+...	...+১	২+...	...+...	৩+২	...+..
এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা	১+...	...+...	১+১	১+...	১+...	১+...	১+...	২+১	...+...
রেলওয়ে ও রেলওয়ে ঐ	৪+১	...+...	...+...	১+...	...+...	১+...	২+...	২+১	...+...
খনি	১+...	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...	১+...	...+...
অন্যান্য—বিবিধ	১০+৯	...+...	৪+৪	...+...	৩+২	৪+৪	১+২	১২+৯	...+...
	২৭+১৫	১+...	১৩+৮	২+...	১০+৯	১০+৭	৮+২	৩৫+২১	...+২

প্রথম ৩ মাস ও দ্বিতীয় ৩ মাসের একত্রে যোগ করিয়া দেখানো হইয়াছে। গত ৬ মাসে অনেকগুলি দাবী সম্পূর্ণ অথবা অংশতঃ পূরিত হইয়াছে কিন্তু অধিকাংশ দ্বন্দ্বই যে বিফলে গিয়াছে তা উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। দাবীর মধ্যে মজুরির জন্য দ্বন্দ্বটাই সব চেয়ে বেশী। ইহা স্বাভাবিক বটে। ব্যক্তিগত কারণে দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতীয় শিল্পদ্বন্দ্বের প্রায় বারো আনা অংশকে এই দুই খাতে ফেলা যায়। বোনাস্ বা ছুটি ও কাজের ঘণ্টা সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব করিবার মর্ম্ম ভারতীয় কারখানার মালিক বা মজুর এখনো বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দিক্ হইতে দ্বন্দ্বের হিসাব লওয়া গেল, এক্ষণে শিল্প-দ্বন্দ্বে কোন্ প্রদেশের হাত কিরূপ থাকিতেছে তা দেখা যাউক।

	১লা এপ্রিল-৩০শে জুন			১লা জুলাই-৩০শে সেপ্টেম্বর		
	দ্বন্দ্বের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট লোক	নষ্ট দিন	দ্বন্দ্বের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট লোক	নষ্ট দিন
আসাম	৬	৩,০০০	৬,৩০০	৬	৩,৭০০	৩,৯০০
বাঙ্গালা	১২	১৯,০৫২	৮৬,৩৭৪	৫	৪,০০৮	১১,১৫৩
বিহার-উড়িষ্যা	৩	৫১২	৪,২৫৮	...	...	...
বোম্বাই	২০	৩৮,১৯৮	১৮৭,৮৪৫	১৮	১৪,৮১১	৪২,১৫৪
ব্রহ্মদেশ	২	৪,৮৫০	৯০,০০০	১	২৬০	২৬০
মধ্যপ্রদেশ	...	...	...	...	...	...
দিল্লী	২	১১,৩৮৮	৬২,৬৯০	...	...	...
মাদ্রাজ	৭	৭,৫৪৮	৫৬,৮৭০	১	২,৯০০	১০,১৫০
পাঞ্জাব	...	...	...	...	...	...
যুক্তপ্রদেশ	১	৩,০০২	১২,০০৮	১	২৭৮	৩,৩৩৬
	৫৩	৮৭,৫৫০	৫০৬,৩৪৫	৩২	২৯,৯৫৭	৭১,০৫৩

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, বোম্বাই, বাঙ্গালা এবং মাদ্রাজ এই তিন দেশই শিল্প-দ্বন্দ্বের প্রধান রঙ্গভূমি; তারপর যুক্তপ্রদেশের নাম করা যায়। কিন্তু তিন প্রধান দেশের মধ্যে বোম্বাই সকল দিক্ দিয়াই শীর্ষদেশে অবস্থিত। প্রথম ৩ মাসে ৫৩টি দ্বন্দ্বের মধ্যে ২০টি বা ৩৭ ৭%এবং দ্বিতীয় ৩ মাসে ৩২টির মধ্যে ১৮টি বা ৫৬'২৫% বোম্বাইয়ে সংঘটিত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট লোকের বেলায় প্রথম ৩ মাসে বোম্বাই ৪৩'৭%, বাঙ্গালা ২১'৮%, মাদ্রাজ ৮%; দ্বিতীয় ৩ মাসে বোম্বাই ৫০%, বাঙ্গালা ১৪'৩%, মাদ্রাজ ১০'৫%। নষ্ট দিনের বেলায় প্রথম ৩ মাসে বোম্বাই ৩৭%, বাঙ্গালা ১৬.৫%, মাদ্রাজ ১১'২% এবং ব্রহ্মদেশ ১৭'৯%; আর দ্বিতীয় ৩ মাসে বোম্বাই ৬০%, বাঙ্গালা ১৫'৪%, মাদ্রাজ ১৪'৩%।

এক্ষণে গড়ে প্রতি প্রদেশে কত লোক লিপ্ত হইয়াছিল ও কত দিন নষ্ট হইয়াছিল দেখা যাক্।

	প্রথম ৩ মাস		দ্বিতীয় ৩ মাস	
	লোক	দিন	লোক	দিন
আসাম	৫০০	১,০৫০	৬১৬'৬	৬৫০
বাঙ্গালা	১,৫৮৭'৭	৭,১৯৭'৮	৮০১'৬	২,২৩১'৮
বিহার-উড়িষ্যা	১৭০'৬	১,৪১৯'৩	...	...
বোম্বাই	১,৯০৯'৯	৯,৩৯২'২	৮২২'৮	২,৩৪১'৯
ব্রহ্মদেশ	২,৪২৫	৪,৫০০	২৬০	৩৬০
মধ্যপ্রদেশ	...	...	...	...
দিল্লী	৫,৬৯৪	৩১,৩৪৫	...	...
মাদ্রাজ	১,০৭৮'৩	৮,১২৪'৩	২,৯০০	১০,১৫৩
পাঞ্জাব	...	...	...	...
যুক্তপ্রদেশ	৩,০০২	১২,০০৮	২৭৮	৩,৩৩৬

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, গড়পড়তা হিসাব মোট হিসাবের সহিত মিলিতেছে না। গড়পড়তা হিসাবে প্রথম ৩ মাসে দিল্লী লোক ও দিনে প্রথম, শুধু প্রথম নয়, বোম্বাই দ্বিতীয় হইলেও বোম্বাইয়ের চেয়ে অনেক উপরে; একটু পরেই বাঙ্গালা ও মাদ্রাজ—বাঙ্গালার লোক বেশী, মাদ্রাজের দিন বেশী; দ্বিতীয় ৩ মাসে মাদ্রাজ প্রথম, তার অনেক নীচে যুক্তপ্রদেশ, তারপর কিছু নীচে কাছাকাছি বোম্বাই এবং বাঙ্গালা। অতএব মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, ৬ মাসের মোট হিসাবে শিল্প-দ্বন্দ্বে বোম্বাই প্রথম স্থান অধিকার করিলেও গড়ে প্রথম নহে। বলা বাহুল্য, গড় দ্বারা কোন প্রদেশের শিল্প-দ্বন্দ্বের বহুলতা বা অল্পতার প্রমাণ হয় না।

কোন্ প্রদেশে কি কারণে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল ও তার ফলাফল কি হইয়াছিল, তার বিবরণ এই :

	কিসের দাবী								
	মজুরি	বোনাস্	ব্যক্তিগত	ছুটি ও কাজের ঘণ্টা	অন্যান্য	সফল	অংশতঃ সফল	বিফল	চলিতেছে
আসাম	৪+৬	...+...	১+...	...+...	১+...	২+১	১+২	৩+৩	...+...
বাঙ্গালা	৭+২	...+...	৪+২	১+...	...+১	৩+...	...+...	৯+৫	...+...
বিহার-উড়িষ্যা	১+...	...+...	...+...	১+...	১+...	...+...	২+...	১+...	...+...
বোম্বাই	৮+৫	১+...	৪+৬	...+...	৭+৭	২+৫	২+...	১৬+১১	...+২
ব্রহ্মদেশ	১+...	...+...	১+...	...+...	...+১	১+১	...+...	১+...	...+...
মধ্যপ্রদেশ	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...
দিল্লী	২+...	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...	২+...	...+...	...+...
মাদ্রাজ	৩+১	...+...	৩+...	...+...	১+...	২+...	...+...	৫+১	...+...
পাঞ্জাব	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...
যুক্তপ্রদেশ	১+১	...+...	...+...	...+...	...+...	...+...	১+...	...+১	...+...
মোট	২৭+১৫	১+...	১৩+৮	২+...	১০+৯	১০+৭	৮+২	৩৫+২১	...+২

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা

১। অক্টোবর, ১৯৩০

দি ইণ্ডিয়ান্ ট্রেড্ জার্ণাল আমাদের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে অক্টোবর ও এপ্রিল-সেপ্টেম্বর মাসের তথ্য প্রকাশ করিয়াছে। এই অঙ্কগুলি লইয়া কিঞ্চিৎ নাড়াচাড়া করিলে আমদানি রপ্তানি সম্বন্ধে অনেক সমস্যা বাঙ্গালীর ছেলের মস্তিষ্কে উদিত হইবে।

এক মাসে ৮ কোটি টাকার উপর রপ্তানি ও ৬½ কোটি টাকার আমদানি হ্রাস পাইয়াছে।

১৯৩০ সনের অক্টোবর মাসের বাণিজ্য-বার্ত্তা এইরূপ :

	১৯২৯	১৯৩০	হ্রাস বা বৃদ্ধি	
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা	%
রপ্তানি	২৫·৬৩	১৭·৬৯	−৭·৯৪	−৩১·০%
পুনঃ রপ্তানি	·৬৩	·৪৬	− ·১৭	−২৭·০%
মোট রপ্তানি	২৬·২৬	১৮·১৫	−৮·১১	−৩০·৯%
আমদানি	১৯·২৪	১২·৭৮	−৬·৪৬	−৩৩·৬%
আমদানির চাইতে রপ্তানি বেশী	৭·০২	৫·৩৭	−	−

দেখা যাইতেছে অক্টোবরে আমদানি বাণিজ্য (৩৩'৬%) রপ্তানি বাণিজ্যের চেয়ে (৩১%) কিছু বেশী ঘায়েল। কিন্তু টাকার পরিমাণের দিক্ থেকে শুধু দেখিলে বলিতে হয়, ইতিমধ্যে যদি দেশের মধ্যে সেই পরিমাণ মাল সৃষ্টির ক্ষমতা না জন্মিয়া থাকে, তবে রপ্তানির দরুণ প্রায় ৮ কোটি টাকা ও আমদানির দরুণ প্রায় ৬½ কোটি টাকার বেচাকেনা বন্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতীয় বাজারে বিদেশী বণিকেরা যেমন ৬½ কোটি টাকার মাল বেচিতে পারে নাই, ভারতীয় বণিকেরাও তেমনি বিভিন্ন দেশের বাজারে ৮ কোটি টাকার মাল বেচিতে পারে নাই।

আমদানি রপ্তানির খাতে প্রতি মাসে একই দ্রব্যের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। আবার হ্রাস-বৃদ্ধিও এক প্রকার হয় না। এই কথাটি মনে রাখিয়া অক্টোবরের আমদানি রপ্তানির কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করা যাক্।

আমদানি রপ্তানি বিশ্লেষণ

আমদানির খাতে গম ও কেরোসিন তৈল বেশী টাকার কেনা হইয়াছে, আর হার্ডওয়্যার, সিগারেট, বৈদ্যুতিক ব্যতীত প্রাইম মুবার, বীট চিনি সুদ্ধ ১৬ ডি এস ও তার উপরের চিনি (পরিমাণে বেশী আমদানি হইলেও), কেরোসিন ছাড়া অন্যান্য খনিজ তৈল, লোহা বা ইস্পাতের শীট্ ও প্লেট না বসানো মূল্যবান্ প্রস্তর, ইস্পাতের বার, মোটরকার, কটন ইয়ার্ণ, গ্রে কটন পীস্‌গুডস্, সাদা কটন পীস্‌গুডস্, কালার্ড কটন পীস্‌গুডস্, সিল্ক পীস্‌গুডস্, উলের পীস্‌গুডস্, তুলা ও কৃত্রিম রেশমের পীস্‌গুডস্ কম টাকার কেনা হইয়াছে। এই সব জিনিষের জন্য কত টাকা বেশী বা কম দেওয়া হইয়াছে নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে:—

জিনিষ		যত টাকা বেশী
গম	...	১৩,৩৭,৩০৮৲
কেরোসিন তৈল	...	১৮,৯৫,৯৮৮৲
জিনিষ		**যত টাকা কম**
হার্ডওয়্যার	...	১৩,৭৬,১২৯৲
সিগারেট	...	৭,৯৪,৮৬২৲
প্রাইম মুবার	...	১৭,০১,২৫০৲
চিনি	...	১৪,৪৬,০১৭৲
খনিজ তৈল	...	১১,৪১,৯৫০৲
শীট ও প্লেট	...	৩৬,৬৯,৩৭১৲
মূল্যবান্ প্রস্তর	...	১১,৬২,৮৩১৲
বার	...	৮,৫৫,১০৩৲
মোটরকার	...	৯,০৭,১০৭৲
কটন ইয়ার্ণ	...	১৫,৬১,৯৩৮৲
ঐ গ্রে পীস্‌গুডস্	...	১,২৬,৫৭,৫২২৲
ঐ সাদা "	...	৪৬,২৪,৫৮৯৲
ঐ রঞ্জিত "	...	৮১,৮৩,৮৬৪৲
রেশমের "	...	১৯,০৬,৩৬১৲
পশমের "	...	১৪,১৬,৬১৭৲
তুলার ও কৃত্রিম রেশমের		১৭,০৬,৪৪১৲

এ ছাড়াও যে অন্য আমদানি দ্রব্যের জন্য আমরা কম টাকা দিই নাই তা নয়,—তবে এগুলিই প্রধান। আমদানি কম পরিমাণে করিয়াছি বলিয়াই যে কম টাকা দিয়াছি তাও নয়। কোন কোন দ্রব্য ১৯২৯ সনের অক্টোবরের তুলনায় বেশী পরিমাণে আমদানি করিলেও কম টাকা দিয়াছি আর কতকগুলি অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে আমদানি করিয়াও বেশী টাকা দিয়াছি। প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রধান কয়েকটীর নাম:

	পরিমাণ কত বেশী	দর কত কম
চিনি	+২৮,২৪০ টন	—১৪,৪৬,০১৭৲
বুট ও সু	+৩৫,৬৪৬ জোড়া	—৩,৪৮,৫১২৲
মসলা ইত্যাদি	+৩৮৫ হন্দর	—৫০,৪৭৬৲
কাঁচা তুলা	+২৮২ টন	—৮১,৬৪৭৲
সিমেণ্ট	+৬১০ টন	—৩৯,২৪২৲

দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর কয়েকটি:—

মাছ	—১ হন্দর	+২৫,০১০৲
অভ্র	—৪ হন্দর	+৩,৫২০৲

অন্য পক্ষে রপ্তানির খাতে গম কফি ইত্যাদি বেচিয়া বেশী টাকা এবং কাল চা, চাউল, চীনাবাদাম (পরিমাণে বেশী হওয়া সত্ত্বেও), তিসি, লাক্ষা (পরিমাণে বেশী হওয়া

সত্ত্বেও) কাঁচা পশম, কাঁচা স্কিন, ট্যান করা হাইড্, কাঁচা পাট, কাঁচা তুলা (পরিমাণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও), কটন পীস্গুডস্, পাটের গানি ব্যাগ, গানি কাপড় ইত্যাদি মাল বিদেশের বাজারে বেচিয়া কম টাকা পাইয়াছি। কোন্ জিনিষের বাবদ কত টাকা বেশী বা কম পাইয়াছি দেখানো যাইতেছে।

জিনিষ		যত টাকা বেশী
গম	…	৯,৫৮,৯৩৮৲
কফি	…	৭,০৯,৮২৩৲
জিনিষ		**যত টাকা কম**
কাল চা	…	৯৭,০২,৪৮৫৲
চাউল	…	৩৫,৯৮,২১৪৲
চীনাবাদাম	…	১৮,৯৯,৫৭০৲
তিসি	…	৪৮,৫৯,১৬০৲
লাক্ষা	…	২৩,৪২,২৮৮৲
কাঁচা পশম	…	২৯,৪৫,২১০৲
কাঁচা স্কিন	…	১৯,৩৪,০২৫৲
ট্যান করা হাইড্	…	১১,৪২,০০৫৲
কাঁচা পাট	…	২,৫৮,০৭,৬৮২৲
কাঁচা তুলা	…	১০,৭৭,০২২৲
তুলার পীস্গুড্স	…	১৬,৮০,৭১৯৲
পাটের গানি ব্যাগ	…	৫৯,৫৯,৭৯১৲
পাটের গানি কাপড়	…	১,০২,২১,০৩৩৲

অন্য কোন কোন রপ্তানি দ্রব্য হইতেও আমরা কম টাকা পাইয়াছি, কিন্তু উপরি লিখিত পণ্যগুলি প্রধান। আমদানির মত রপ্তানিতেও আমরা কোন কোন দ্রব্য পরিমাণে বেশী পাঠাইলেও কম টাকা পাইয়াছি, আবার কোন কোন দ্রব্য কম পাঠাইয়া বেশী টাকা পাইয়াছি। দ্বিতীয় দফায় উল্লেখযোগ্য পণ্য নাই, কিন্তু বেশী মাল পাঠাইয়া কম টাকা পাওয়ার কয়েকটি উদাহরণ এই :

	পরিমাণ কত বেশী	দর কত কম
চাউল	+১১,০৫২ টন	−২,৩২,৯৭০৲ টাকা
গরুর কাঁচা হাইড্	+৩২৭ „	−১,৭৩,৫১৫৲ „
কাপোক	+৮২৬ হন্দর	−১৪,৫৬০৲ টাকা
কাঁচা তুলা	+৭,৮০৯ টন	−১০,৭৭,০২২৲ „
লাক্ষা	+৭০৫ হন্দর	−২৩,৪২,২৮৮৲ „
পিগ্ লোহা	+৬,০৮৯ টন	−১,৮০,৭৩৬৲ „
কাঁচা শণ	+২,৫৯১ হন্দর	−২১,৩৯২৲ „

মনে রাখিতে হইবে যে তুলনাটা সর্ব্বত্র ১৯২৯ সনের অক্টোবর মাসের সহিত করা হইয়াছে।

২। ছয় মাসের হিসাব—এপ্রিল-সেপ্টেম্বর

যদিও অক্টোবর অবধি ৭ মাসের ভারতীয় বাণিজ্যিক লেনদেনের হিসাব পাওয়া গিয়াছে, বিগত ছয় মাসের হিসাবই নীচে দেওয়া হইতেছে। এই আঁকজোক হইতে ভারতীয় বাণিজ্যের অবস্থার গতি সম্বন্ধে আন্দাজ করা সহজ হইবে।

রপ্তানিতে ৩৫১/৩ কোটি ও আমদানিতে ৩৩১/২ কোটি টাকার ঘাটতি।

ছয় মাসের আমদানি রপ্তানির হিসাব এই :

	১৯২৯	১৯৩০	হ্রাস বা বৃদ্ধি	
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা	%
রপ্তানি	১৫৬·৭২	১২২·৬১	−৩৪·১১	−২১·৮%
পুনঃরপ্তানি	৩·৭৪	২·৫২	−১·২২	−৩২·৬%
মোট রপ্তানি	১৬০·৪৬	১২৫·১৩	−৩৫·৩৩	−২২·০%
আমদানি	১২০·৯১	৮৭·৪১	−৩৩·৫০	−২৭·৭%
আমদানির চাইতে রপ্তানি বেশী	৩৯·৫৫	৩৭·৭২	—	—

উপরের অঙ্কগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে অর্দ্ধ বৎসরে ঘাটতিটা রপ্তানির (২২%) চেয়ে আমদানিতে (২৭·৭%) অনেক বেশী। কিন্তু টাকার হিসাবে আমদানির চেয়ে রপ্তানিতে ঘাটতি বেশী। আমরা বিদেশে গত বৎসরের ৬ মাসের তুলনায় এ বৎসরের ৬ মাসে ৩৫·৩৩ কোটি টাকার জিনিষ কম বেচিয়াছি। আর বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ ভারতে ৩৩১/২ কোটি টাকার মাল কম বেচিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : (১) গত বৎসরের অক্টোবরের তুলনায় এ বৎসরের অক্টোবরের আমদানি রপ্তানির শতকরা হ্রাসের

মধ্যে যতটা তফাৎ গত বৎসরের ৬ মাসের তুলনায় এ বৎসরের ৬ মাসের আমদানি রপ্তানির শতকরা হ্রাসের মধ্যে তার চেয়ে বেশী তফাৎ, যদিও টাকার দিক্ থেকে উভয় দফা প্রায় সমভূমিতে রহিয়াছে।

(২) (ক) গত বৎসরের অক্টোবরের রপ্তানির দর ছিল ২৫·৬৩ কোটি টাকা, এই অনুপাতে এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের রপ্তানির দর হইতে পারিত ১৫৩·৭৮ কোটি টাকা। সে স্থলে রপ্তানি দাঁড়াইয়াছিল ১৫৬·৭২ কোটি টাকা, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর অবধি ৬ মাসে গড়ে প্রতি মাসে অক্টোবরের চেয়ে বেশী মাল বেচা হইয়াছিল (গড়টা ২৬·১২ কোটি টাকা)। এ বৎসর অক্টোবরের রপ্তানির দর ছিল ১৭·৬৯ কোটি টাকা। এই অনুপাতে এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের রপ্তানির দর হইতে পারিত ১০৬·১৪ কোটি টাকা সে স্থলে রপ্তানি দাঁড়াইয়াছে ১২২·৬১ কোটি টাকা, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর অবধি ৬ মাসে গড়ে প্রতি মাসে অক্টোবরের চেয়ে বেশী মাল বেচা হইয়াছে (গড়টা ২০·৪৩৫ কোটি টাকা) এবং এবারের অক্টোবর তুলনায় গত বৎসরের অক্টোবরের চেয়ে ঢের খারাপ।

(খ) গত বৎসরের অক্টোবরের মোট রপ্তানির দর ২৬·২৬ কোটি টাকা। এই অনুপাতে এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের রপ্তানির দর হইত ১৫৭·৫৬ কোটি টাকা। সে স্থলে মোট রপ্তানি দাঁড়াইয়াছিল ১৬০·৪৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর অবধি ৬ মাসে গড়ে প্রতি মাসে অক্টোবরের চেয়ে বেশী মাল বেচা হইয়াছিল (গড়টা ২৬·৭৪৩ কোটি টাকা)। এ বৎসর অক্টোবরে মোট রপ্তানির দর ছিল ১৮·১৫ কোটি টাকা। এই অনুপাতে এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের মোট রপ্তানির দর হইতে পারিত ১০৮·৯০ কোটি টাকা। সে স্থলে মোট রপ্তানি দাঁড়াইয়াছে ১২৫·১৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর অবধি ৬ মাসে গড়ে প্রতি মাসে অক্টোবরের চেয়ে বেশী মাল বেচা হইয়াছে (গড়টা ২০·৮৫৫ কোটি টাকা) এবং এবারের অক্টোবর মাসটা গত বৎসরের তুলনায় খারাপ।

(গ) গত বৎসরের অক্টোবরের আমদানির দর ছিল ১৯·২৪ কোটি টাকা। এই অনুপাতে এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের আমদানির দর হইতে পারিত ১১৫·৪৪ কোটি টাকা। সে স্থলে আমদানি দাঁড়াইয়াছিল ১২০·৯১ কোটি টাকা, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর অবধি ৬ মাসে গড়ে প্রতি মাসে বিদেশ হইতে বেশী মাল কেনা হইয়াছিল (গড়টা ২০·১৫ কোটি টাকা)। এ বৎসর অক্টোবরের আমদানির দর ছিল ১২·৭৮ কোটি টাকা। এই অনুপাতে এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের আমদানির দর হইতে পারিত ৭৬·৬৮ কোটি টাকা। সে স্থলে আমদানি দাঁড়াইয়াছে ৮৭·৪১ কোটি টাকা, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর অবধি ৬ মাসে গড়ে প্রতি মাসে অক্টোবরের চেয়ে বেশী মাল বিদেশ হইতে কেনা হইয়াছে (গড়টা ১৪·৫৭ কোটি টাকা)।

উপরের হিসাব নিকাশের সাদা অর্থ এই যে, গত বৎসরের প্রথম ৬মাসের তুলনায় এ বৎসরের প্রথম ৬ মাসের আমদানি রপ্তানির বাজার অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়িয়াছে, পরন্তু এই অবনতিটা অক্টোবরে আরও বেশী পরিমাণে দেখা দিয়াছে। আশঙ্কা হয়, ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য দিন দিন অধম হইতেছে।

৩। ব্যালান্স অব্ ট্রেড্ (বাণিজ্য তৌল)

এই সঙ্গে ভারতের সমগ্র বাণিজ্য ব্যাপারটার একটা খতিয়ান দেওয়া যাইতেছে। ইহার সহিত ১৯২৮ ও ১৯২৯ সনের ৬ মাসের বাণিজ্য-ব্যাপারও তুলনা করিয়া দেখানো হইতেছে।

	এপ্রিল—সেপ্টেম্বর		
	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা
ভারতীয় পণ্য রপ্তানি (বেসরকারী)	+১৫৮'৫৮	+১৫৬'৭২	+১২২'৬১
বিদেশী পণ্য পুনঃ রপ্তানি ঐ	+৩'৮৫	+৩'৭৪	+২'৫২
বিদেশী পণ্য আমদানি ঐ	—১১৯'৮৮[1]	—১২০'০০[1]	—৮৬'৬৬[1]
পণ্য সম্পর্কে হাতে থাকে ঐ	+৪২'৫৫	+৪০'৪৬	+৩৮'৪৭
সোণা (বেসরকারী)[2]	—৮'৩২	—৭'৩৭	—১১'৫২
রূপা ঐ[2]	—৮'১৭	—৫'৫১	—৬'৯৫
সিকা নোট ঐ	—'১৩	—.৩	—'৭
সোণারূপা বাণিজ্যে হাতে থাকে ঐ[2]	—১৬.৬২	—১২'০১	—১৮'৫৪
দৃশ্যমান বাণিজ্যাবশেষ	+২৫'৯৩	+২৭'৫৫	+১৯'৯৩
কাউন্সিল বিল, যুক্তরাজ্যে প্রেরয়িতব্য ষ্টার্লিং ও অন্যান্য সরকারী মুদ্রাক্রয়	—১৩'২৯	—৪'৪৮	—৬'৩৫
লণ্ডনের উপর দাবী করা ষ্টার্লিং ট্রান্সফার ভারতে বিক্রয় করিয়া	..	...	+১১
সরকারী সিকিউরিটি প্রেরণ বাবদ্	+'১১	—'১৮	+'০৪
গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি সম্পর্কিত ভারতের উপর দাবী করা সুদের ড্রাফ্ট বাবদ্	—'১৯	—'১৭	—'১৬
ফাণ্ড প্রেরণ বাবদ্ হাতে	—১৩'৩৭	—৪'৮৩	—৬'৩৬

বৃটিশ ভারতের মোটর গাড়ী কিস্মৎ

বৃটিশ ভারত প্রায় ২ লাখ মোটর গাড়ীর অধিকারী। ১৯৩০ সনের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়া গিয়াছে তাহাতে বৃটিশ ভারতে মোট ১,৯২,৬৯০ খানা সর্ব্বপ্রকারের মোটর গাড়ী রেজেষ্টারি করা হইয়াছে। কি প্রকার মোটর গাড়ীতে বৃটিশ ভারতের কোন্ দেশ কতটা ধনী তা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

১ ঐ ক' বৎসরে কোম্পানী-পরিচালিত সরকারী রেলওয়েগুলি যথাক্রমে ১'১৫ কোটি, '৯১ কোটি ও '৭১ কোটি টাকার রেলওয়ে মাল আনিয়াছিল—এই অঙ্কগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২ বাণিজ্যাবশেষে পড়ে না এমন দ্রব্য বাদ পড়িয়াছে।

	মোটরকার (ট্যাক্সি সুদ্ধ) সংখ্যা	মোটর সাইকেল (স্কুটার ও অটোহুইল সুদ্ধ) সংখ্যা	ভারি মোটর গাড়ী (লরী, বাস ইত্যাদি) সংখ্যা	মোট সংখ্যা
১। বাঙ্গালা, কলিকাতা ধরিয়া	৩০,৩০৮	৪,৫৫২	৩,৬৯৬	৩৮,৫৫৬
২। মান্দ্রাজ সহর	১১,৩৪৪	২,৮৭৬	১,৭১১	১৫,৯৩১
মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি (সহর বাদে)	৭,০৬১	১,৭৭৭	৬,৩৯২	১৫,২৩০
মোট মান্দ্রাজ	১৮,৪০৫	৪,৬৫৩	৮,১০৩	৩১,১৬১
৩। বোম্বাই সহর	১২,৬৪০[১]	৮৮০	৯৮০	১৪,৫০০
বোম্বাই প্রেসিডেন্সি (সহর ও সিন্ধু বাদে)	৯,৪৩০[১]	১,০২০[১]	১২৫[১]	১০,৫৭৫
সিন্ধু	৩,৫৮০	১,০৩৫	১৫৪	৪,৭৬৯
মোট বোম্বাই	২৫,৬৫০	২,৯৩৫	১,২৫৯	২৯,৮৪৪
৪। পাঞ্জাব	১০,৬৫৭	৩,৯৪৫	৫,৭৬৬	২০,৩৬৮
৫। যুক্তপ্রদেশ	১১,০৮৭	৩,২৭৫	৫,০৪৩	১৯,৪০৫
৬। ব্রহ্মদেশ	১০,২৫৮[২]	১,২৪৩[২]	৬,৩৮১[২]	১৭,৮৩২[২]
৭। বিহার-উড়িষ্যা	৭,৬২০	১,১২৩	১,৭৮১	১০,৫২৪
৮। মধ্য প্রদেশ	৪,৫৯০	১,০৩৫	২,১৬৫	৭,৭৯০
৯। দিল্লী	৫,০৯০	১,০২৫	৮৮৭	৭,০০২
১০। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	২,০৩৭	১,৬৫৭	১,২৬৪	৫,৬৫৮
১১। আসাম[৩]	২,০৭৩	৩০২	১,৪৫৩	৩,৮২৮
১২। আজমীঢ় মারবাড়	৪৩৮	১৩২	১৫২	৭২২
মোট	৯২৮,৮৬৩	২৫,৮৭৭	৩৭,৯৫০	১৯২,৬৯০

১৯২৯ সনের কয়লা

উৎপাদন

উৎপন্নের পরিমাণ ...	২,৩৪.১৮,৭৩৪ টন
দর ...	৮,৯৩,৫৯,১২৪ ৲ টাকা
টন প্রতি গড় দর (খাদের মুখে)	৩৸৵০
নিযুক্ত লোকের সংখ্যা	১,৭৯,৬০৭
প্রতি লোকে অনুমান কত কয়লা উৎপাদন করে	১৩০ টন

খাদন

মোট লোকবল ...	৩২,১৯,০৭,০০০
উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ ...	২,৩৪,১৮,৭৩৪ টন
কয়লা আমদানি ...	২,১৮,৭৫৯ "
কয়লা রপ্তানি ...	৭,৬৬,২৩২ "
আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশী	৫,৪৭,৪৭৩ "
দেশের ব্যবহারেব জন্য থাকে	২,২৮,৭১,২৬১ "
প্রত্যেক লোকে ব্যবহার করে	০·০৭ "

(দি ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ জার্ণাল)

১ ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৩০ অবধি। ২ ১৯৩০, জুন অবধি। ৩ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ অবধি।

পাঞ্জাবে গমের ব্যবসা

অষ্ট্রেলিয়া হইতে এক মণ গম কলিকাতায় আনিতে ভাড়া বাদে খরচ হয় আট আনা। এদেশে পাঞ্জাবে বেশী গম হয়। সেখান হইতে গম যদি রেলে কলিকাতায় আনা যায়, তবে প্রায় ১৷৷০ টাকা রেলভাড়া লাগে। আর যদি করাচি পর্য্যন্ত রেলে গম পাঠাইয়া তারপর জাহাজে বোম্বাই ঘুরাইয়া কলিকাতায় আনা যায়, তবে মাশুল অত্যধিক পড়িয়া যায়। কারণ পাঞ্জাবের বাণিজ্য-কেন্দ্র লায়ালপুর হইতে করাচীর রেলগাড়ীর ভাড়া প্রায় দশ আনা। ইহার ফলে অষ্ট্রেলিয়ার গমে বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে, পাঞ্জাবী গম কৃষকদের ঘরে পচিতেছে। রেলের ভাড়া কমাইয়া দিবার জন্ত আমরা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স গবর্ণমেণ্টের রেলবিভাগের সদস্য স্যর রেণীর নিকট আবেদন উপস্থিত করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট গত ১৭ই নবেম্বর জানাইয়াছেন যে, এই অবিক্রীত গম বিক্রয় করিয়া ফেলার সুবিধার জন্ত গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে করাচী পর্য্যন্ত গমের ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, রেলভাড়া কমাইয়া দেওয়াতে শীঘ্রই মজুদ গম বিক্রয় হইয়া যাইবে, সুতরাং আগামী বৎসর ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রেলের ভাড়া কম রাখিলেই চলিবে। তারপর আবার রেলভাড়া পূর্ব্ববৎ করা হইবে। রেলের ভাড়া কমাইয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট মঙ্গল বিধান করিলেন; কিন্তু ২৮শে ফেব্রুয়ারীর পর পূর্ব্ববৎ ভাড়া বেশী করার প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি না। ভাড়া পূর্ব্ববৎ বেশী করিলে যে কারণে এখন কমাইয়া দেওয়া হইল, সেই কারণ পুনরায় উপস্থিত হইবে, বরং তখন কেবল অষ্ট্রেলিয়ার গমই লোকে কিনিবে, পাঞ্জাবের গম আর বিক্রয় হইবে না। (সঞ্জীবনী)

চায়ের ফলন কিরূপ হইবে ?

৬ অক্টোবর, ১৯৩০, তারিখে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশন লণ্ডনস্থ এসোসিয়েশনকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার করিয়াছে ঃ

আপার আসাম—গত মাসে ভাল ফসল হয় নাই। ভবিষ্যতে শীঘ্র ভাল হইবার আশা নাই। জল-বাতাসের খবর ভাল নয়। ব্যবসা বাধা পাইয়াছে।

মধ্য আসাম—গত মাসে ভাল ফসল হয় নাই। ভবিষ্যতে শীঘ্র ভাল হইবার আশা নাই। জল-বাতাস প্রতিকূল নয়।

নিম্ন আসাম—গত মাসে ফসল প্রত্যাশিতের কোঠার নীচে ছিল। নিকট ভবিষ্যতের ফসল আশাপ্রদ। মাস ধরিয়া বৃষ্টি কম হইয়াছে। গত বৎসরের চেয়ে এবারে ফলন অনেক কম।

উত্তর কাছাড়—গত মাসে ফলন প্রত্যাশিতের নীচে ছিল। নিকট ভবিষ্যৎ মন্দ নয়। বাতাস গরম।

দক্ষিণ কাছাড়—রিপোর্ট নাই।

পূর্ব্ব ডুয়ার্স—গত মাসে ফলন ভাল হয় নাই। নিকট ভবিষ্যৎ মন্দ নয়। গরম ও শুক্না হাওয়া ফলনে বাধা জন্মাইতেছে।

পশ্চিম ডুয়ার্স—গত মাসে ফলন প্রায় প্রত্যাশিত। বাতাস অত্যন্ত গরম। মশকের কামড়ে ক্ষতি হইতেছে।

শ্রীহট্ট—গত মাসে ফলন প্রায় প্রত্যাশিত। ভবিষ্যৎ মন্দ নয়। বাতাস প্রতিকূল নয়।

দারজিলীঙ্—গত মাসে ফলন অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে। নিকট ভবিষ্যৎ ভাল নয়। ঠাণ্ডা এবং ভিজা বাতাস ফলনে বাধা দিতেছে। শুষ্কতা বেশী ও পাতাকে বাধা দিতেছে।

টেরাই—গত মাসে ফলন প্রায় প্রত্যাশিত ছিল। নিকট ভবিষ্যৎ মন্দ নয়। বাতাস প্রতিকূল নয়। মশার কামড় আছে।

২৪২ কোটি গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট গত মার্চ্চ মাসের এবং গত মার্চ্চ মাসে যে সরকারী বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের, ভারতীয় তুলার কলসমূহে সূতা এবং কাপড় উৎপাদনের একটী হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবরণীতে দেশীয় রাজ্যসমূহের সূতা এবং বস্ত্র উৎপাদনের হিসাবও দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় গত মার্চ্চ মাসে কোরা এবং ধোলাই কাপড় ২১,০০০,০০০ গজ এবং

আলোচ্য বর্ষে মোট ৪০৫,০০০,০০০ গজ বেশী বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছে। কাপড়চোপড়ের মধ্যে ধুতি খুব বেশী বাড়িয়াছে, অন্যান্য কাপড় সেরূপ বাড়ে নাই। ১৯২৯-৩০ সনে মোট বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে ২,৪১৮,৯৮০,০০০ গজ; ১৯২৮-২৯ সনে ১,৮৯৩,২৬৮,০০০ গজ, এবং ১৯২৭-২৮ সনে ২,৩৫৬,৫৫৪,৮০৫ গজ। ১৯২৮-২৯ সনে ধর্ম্মঘট ইত্যাদির জন্য উৎপাদন এত কম হইয়াছিল। নিম্নে বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইল:

	মার্চ্চ ১৯৩০ হাজার গজ	মার্চ্চ ১৯২৯ হাজার গজ
ধোওয়া ও কোরা		
ধুতি	৭২,২৩৩	৫৩,৪৪১
শার্টিং ইত্যাদি	৪৮,৮২২	৪৮,০৮০
খাদি ইত্যাদি	৮,৫৫৫	৭,১২৫
ড্রিল ও জিন	৯,৩৫২	৮,৯৫৫
টি-ক্লথ ইত্যাদি	৬,৬৭৭	৭,৭৪৬
চাদর	৪,৯৬০	৪,০০১
প্রিণ্টার	২,০৮৩	১,৬৮৯
তাঁবুর কাপড়	৫৯০	৫৩০
ক্যাম্বিস্ ইত্যাদি	৩২৭	২৫৭
অন্যান্য	৩,৪৯৫	৪,০৭৬
মোট	১৫৭,০৯৬	১৩৫,৯০১
রঙীন	৫৬,৬১৬	৫৫,১৮৩
সকল প্রকার	২১৩,৭১২	১৯১,০৮৪

বৎসরের হিসাব

	১৯২৯-৩০	১৯২৮-২৯
ধোওয়া এবং কোরা ধুতি	৭৭৬,০২৭	৫৬৪,১৫৪
শার্টিং ইত্যাদি	৫৮৫,২১৬	৪৭৪,২২১
খাদি ইত্যাদি	১২৪,৬৩৪	৯৩,৬৮৩
ড্রিল ও জিন	১০০,২৯৭	৭৬,৩০৬
টি-ক্লথ	৯০,৬৬৫	৭৫,৪৮৮
চাদর	৬৬,০৪০	৫৬,৬৮১
প্রিণ্টার	১৯,৪৬৪	২২,৪৭১
তাঁবুর কাপড়	৭,৬২৯	৬,৯৩৫
ক্যাম্বিস্	৩,৫৮৯	৪,৬০১
অন্যান্য	৪১,৩৫৭	৩৫,০১৫
মোট	১,৮১৪,৯২১	১,৪০৯,৫৯২
রঙীন	৬০৪,০৫৯	৪৮৩,৬৭৬
সকল প্রকার	২,৪১৮,৯৮০	১,৮৯৩,২৬৮

তুলার কলের কুলি

ভারতের মিলসমূহের কুলিদের অবস্থা সর্ব্বত্র একরূপ নহে। বোম্বাই অঞ্চলে শতকরা ২০ জন কুলি মাত্র স্থায়ীভাবে কলে কাজ করে। পশ্চিমাঞ্চলে এই শতকরা হার বোম্বাইয়ের চেয়ে বেশী। একই কলে কুলিরা কতদিন ধরিয়া 'লাগাড়ে' হইয়া কাজ করে তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে বোম্বাই অঞ্চলে এই সময় ৬ হইতে ৮ মাসের বেশী নয়। সমস্ত কুলি সময়ে সময়ে পারিবারিক পূজা-পার্ব্বণ বা বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষ্যে আপন আপন পল্লীবাসে ফিরিয়া যায়। কেহ কেহ আবার ফসল কাটার সময়ে দেশে চলিয়া আসে। এই জন্য সব সময়েই নূতন নূতন কুলি আমদানির বিরতি নাই। ইহাতে অসুবিধা নিতান্ত কম হয় না। এই অসুবিধাটা দূর করিতে হইলে জাপানের মত এদেশেও নয়া কুলিদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় খোলার দরকার।

ভারতীয়, বিশেষতঃ বোম্বাই অঞ্চলের, কুলিরা একদম আনাড়ি। এই সমস্ত কুলির শরীরের অবস্থা নিতান্ত কাহিল। ইহারা পেট ভরিয়া উপযুক্ত আহার পায় না। ইহাদের কাণ্ডজ্ঞানও খুব অল্প, কারণ প্রায় সকলেই তাড়িখোর। শিক্ষা দীক্ষাও এদের আদৌ নাই; ইহাদের মনে কোনরূপ উচ্চ আশাও জাগে না; অসাবধানও ইহারা যৎপরোনাস্তি; এবং প্রায়ই মিলের মালপত্র এবং কাঁচা মাল অযথা নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহারা সকলেই অলস প্রকৃতির। কুলিদের যেখানে এইরূপ অবস্থা সেখানে কোন শিল্পকেন্দ্রই বেশীদিন ধরিয়া সমৃদ্ধির ভাগী হইতে পারে না। সুতরাং মালিকদিগকে মজুরদের উৎকর্ষ সাধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে; নতুবা অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।
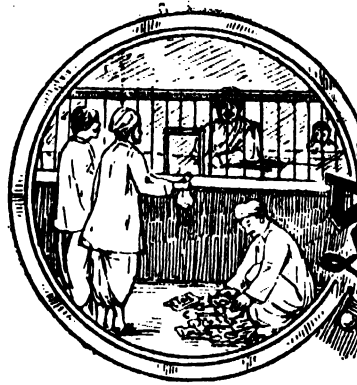
গ্রেট বৃটেনের আয়-ব্যয়ের আঁকজোক

নীচে ১৯২৯-৩০ সনে কি কি বাবদ্ কত টাকা পাওয়া গিয়াছিল এবং কোন্ দফায় কত খরচ হইয়াছিল তার হিসাব দেওয়া গেল।

(১) আয়:—

দফা	হাজার পাউণ্ড	হাজার টাকা
১৯২৯ সনের ৩১ মার্চ্চ হাতে ছিল	৬,২৫২	৮৩,৩৬০
সাধারণ রাজস্ব:		
আয়কর	২৩৭,৪২৬	৩,১৬৪,৪৮০
উপরি কর (আগের পাওনা উপরি কর সুদ্ধ)	৫৬,৩৯০	৭৫১,৮৬৬
সম্পত্তি কর	৭৯,৭৭০	১,০৬৩,৬০০
ষ্ট্যাম্প	২৫,৬৭০	৩৪২,২৬৬
অতিরিক্ত মুনাফা কর ও কর্পোরেশ্যন মুনাফা ট্যাক্স	২,২৫০	৩০,০০০
জমি ট্যাক্স	৮৮০	১১,৭৩৩
কাষ্টমস্	১১৯,৮৮৮	১,৬০২,৫০৬
আবগারি	১২৭,৫০০	১,৭০০,০০০
মোটরগাড়ী শুল্ক	৪,৯২০	৬৫,৬০০
পোষ্ট আফিস্ (নিট্)	৯,২০০	১২২,৬৬৬
রাজকীয় জমি	১,২৯০	১৭,২০০
বিবিধ কর্জ্জ	৩২,৬৪০	৪৩৫,২০০
বিবিধ:		
সাধারণ	১০,৪৩৩	১৩৯,১০৬
বিশেষ	২৫,৯৩২	৩৪৫,৭৬০
	৭৩৪,১৮৯	৯,৭৮৯,১৮৬*
নিজে নিজে মিলিয়া যায় আয় ব্যয়		
পোষ্ট আফিস্	৫৮,৯০০	৭৮৫,৬৬৬
রোড ফাণ্ড	২১,৮৮২	২৯১,৭৬০
	৮০,৭৮২	১,০৭৭,০৯৩*
ল্যাণ্ড সেট্‌লমেণ্ট ফ্যাসিলিটিস্ অ্যাক্ট অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি সৃষ্টি দ্বারা উত্তোলিত	১৬৩	২,৩০৩
সুয়েজ খাল শেয়ার	৫	৬৭
	১৬৮	২,৩৭০
সর্ব্ব মোট	১,০৬৫,৭১০	১৪,২০৯,৬৭০*

অর্থাৎ মোট ১০৬½ কোটি পাউণ্ড বা ১৪২১ কোটি টাকা।

* টাকার ঘরগুলিতে যোগফলে গরমিলের কারণ ১ পাউণ্ডকে ১৩⅓ টাকার সমান বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এইরূপে হিসাবটা মোটামুটি শুদ্ধ বুঝিতে হইবে। কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

আঃ উঃ সম্পাদক।

(২) খরচ ঃ

সাধারণ খরচ ঃ

জাতীয় ঋণের সুদ ও তত্ত্বাবধান	৩০৭,২৫২	৪,০৯৬,৬৯৩
স্থানীয় ট্যাক্সেশন খাতে দেয়	১৩,৩১৪	১৭৭,৫২০
উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড কোষাধ্যক্ষকে	৫,৫২৬	৭৩,৬৮০
অন্যান্য কনসলিডেটেড্ ফাণ্ড সারবিস্	৩,৩১২	৪৪,১৬০
স্থলসৈন্য ভোটে	৪০,৫০০	৫৪০,০০০
জলসৈন্য ভোটে	৫৫,৭৫০	৭৪৩,৩৩৩
আকাশসৈন্য ভোটে	১৬,৭৫০	২২৩,৩৩৩
কাষ্টম্‌, আবগারি ও আন্তর্দ্দেশিক রাজস্ব ভোটে	১২,০২৫	১৬০,৩৩৩
	৭০০,৯৬৪	৯,৩৪৬,১৮৬*
১৯২৮ সনের নয়া সিঙ্কিং ফাণ্ড	৪৭,৭৪৮	৬৩৬,৬৪০
নিজে নিজে মিলিয়া যায় আয়ব্যয়		
পোষ্ট অফিস	৫৮,৯০০	৭৮৫,৬৬৬
রোড ফাণ্ড	২১,৮৮২	২৯১,৭৬০
	৮০,৭৮২	১,০৬৭,০৯৩*
পুরাণা ঋণশোধ বা ক্রয়ের জন্য চালান	২২৫,২৭২	৩,০০৩,৬২৬
স্থায়ী ঋণের জন্য বন্দোবস্তের পর ন্যাশনাল সেবিংস সার্টিফিকেট দরুণ সুদ	৪,৮১৯	৬৪,২৫৩
১৯৩০ সনে কোষাধ্যক্ষের হাতে	৬,১২৫	৯৪,৬৬৬
	১,০৬৫,৭১০	১৪,২০৯,৬৭০*

দেশ-বিদেশের তুলাশিল্পের মজুরদের দুরবস্থা

গত জুলাই মাসে ল্যাঙ্কাশিয়ার এবং ল্যাঙ্কাশিয়ারের আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে ১৮ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক মজুরদের মধ্যে বেকার ছিল ৪৩·৯%। বিলাতে উৎপাদিত বস্ত্র ৫০% হইতে ৬০% কমিয়া গিয়াছে। দুনিয়ার অন্য দেশেও কার্পাস-শিল্পের অবস্থা প্রায় এইরূপ।

মার্কিণ দেশে ৭৯% মিলে মজুরের সংখ্যা কমাই দেওয়া হইয়াছে। মাত্র ২১% মিলে লোকজন পূর্ব্ব বাহাল আছে।

ভারতের সংরক্ষণ-শুল্কের ফলে এবং জাপান দে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাপানের কার্পাস-শিল্পের যথে ক্ষতি হইয়াছে। এজন্য গত এপ্রিল, মে এবং জুন মা জাপানকে খুব বেশী ভুগিতে হয়। জাপানকে বস্ত্র উৎপাদ ২৭·২% কমাইতে হয়।

ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের অবস্থা অন্যান্য দেশের ম মারাত্মক না হইলেও এই দুই দেশেও বেকার সমস্য উপস্থিত হইয়াছে।

১৯২৯ সনের প্রথম ভাগে জার্ম্মাণিতে বেকারসমস্য সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। বর্ত্তমা সনেও জার্ম্মাণিতে বেকার সমস্যা পূর্ব্বের আকার ধার করিয়াছে। গত মে মাসে অবস্থা সব চেয়ে সঙ্গী হইয়াছিল। মে মাসের হিসাবে প্রকাশ জার্ম্মাণি বেকার মজুরদের হার ১১·৪% এবং অল্প সময় কাজ করি পায় এমন মজুরের হার ৩৬·৯%

পোলাণ্ডে তুলাশিল্পের অবস্থা কিছু ভাল; তবে গ এপ্রিল মাসে দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ৭৩ জন মজু সপ্তাহে মাত্র চার দিন বা তার চেয়েও কম সময় কা করিতে পাইয়াছে।

সুইট্জারল্যাণ্ডের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। গ মে মাসে তুলার কলে কাজ করিতে ইচ্ছুক মজুরের সংখ্য গত এপ্রিল মাস বা ১৯২৯ সনের মে মাসের সংখ্যার চে বেশী।

জার্ম্মাণির বেকার-সমস্যার ভীষণতা

১৯২৯ সনের তুলনায় বর্ত্তমান সনে জার্ম্মাণিতে বেকারে সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ১৯২৯ সনের জুন মা এই দেশে বেকার ছিল ১৩,০০,০০০, কিন্তু ১৯৩০ সনে জুন মাসে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৬,০০,০০০। বেকা

* ৬৭১ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য। আঃ উঃ সম্পাদক

বৃদ্ধি পাওয়ায় জার্ম্মাণির সরকারী খাজাঞ্চিখানায় ঘাট্‌তি হইয়াছে যৎপরোনাস্তি। সরকারী রাজস্ব-বিভাগ আগে থেকে আন্দাজ করিতে না পারায় এই ঘাট্‌তির জন্য হিমসিম খাইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে বেকার মানুষদের সংস্থান করা জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ঘাট্‌তি পূরণ করিবার জন্য জার্ম্মাণ রাষ্ট্র চোখে অন্ধকার দেখিতেছে।

আমেরিকার পেট্রলে ক্ষতি-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা

পেট্রল তৈল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়; এজন্য অনেক ক্ষতি হয়। দুনিয়ায় এইরূপে কি পরিমাণ পেট্রল নষ্ট হইতেছে তাহা নির্ণয় করা বড় শক্ত। মার্কিণ দেশে সম্প্রতি এই ক্ষতি নির্ণয়ের চেষ্টা চলিতেছে। ঐ দেশে ৮,০০০ গ্যালন পেট্রল ধরে এইরূপ ৫টি ট্যাঙ্ক লইয়া পরীক্ষা হইতেছে। ট্যাঙ্কগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন রংএ রঞ্জিত করা হইয়াছে। একটি ট্যাঙ্ক আবার এ্যাসবেষ্টাসের আবরণে মোড়া। এই সমস্ত ট্যাঙ্কের সাহায্যে পেট্রল অপচয়ের পরিমাণ নির্ণীত হইবে।

বিলাতে সওয়া দুই লক্ষাধিক মোটরযান

বিলাতী মোটর-শিল্প ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। তবে এ পর্য্যন্ত বিলাত আমেরিকার পশ্চাতে পড়িয়া আছে বটে। ১৯২৯ সনে বিলাতে ২,৩৮,৮০৫ খানি (১৯২৮ সনে ২,১১,৮৭৭ এবং ১৯২৭ সনে ২,১১,৭৮০) মোটরযান নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে মোটরগাড়ীর সংখ্যা ১,৮২,৩৪৭ খানি এবং ব্যবসায়োপযোগী লরীর সংখ্যা ৫৬,৪৫৮ খানি। ১৯২৯ সনে এই শিল্পে মোট ২,৭১,৩২৫ জন লোক মোতায়েন ছিল, এবং প্রত্যেকের সাপ্তাহিক মজুরির হার ছিল ৮১ শি ৬ পে। পক্ষান্তরে ১৯২৮ সনে মজুরের সংখ্যা ছিল ২,৫৪,১৫০ জন এবং সাপ্তাহিক মজুরি ছিল ৭৭ শি ৩॥ পেঃ।

১৯২৯ সনে বিলাত হইতে ৪২,০২১ খানি মোটরগাড়ী রপ্তানি হইয়াছে; ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সনে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৫,৬৯৬ খানি এবং ৩২,৭৭৭ খানি। ১৯২৯ সনে রপ্তানি মোটর গাড়ীর মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৮,৪৩৯,১৫৭ পাঃ অর্থাৎ ১৯২৮ সনের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী, তবে ১৯২৭ সনের চেয়ে কিছু কম। সাম্রাজ্যের দেশগুলি ৩৬,১৪১ খানি অর্থাৎ রপ্তানির ৮৬% গ্রহণ করিয়াছে।

বেলজিয়ামের মোটর বাজারে আমেরিকা ও জার্ম্মাণি

১৯২৮ সনে বেলজিয়াম দেশে মোটরগাড়ী বিক্রয় হইয়াছে ২০,০০০ খানার উপর। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক গাড়ীই আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। আমেরিকা খোদ বেলজিয়াম দেশে কারখানা ফাঁদিয়া এই সমস্ত গাড়ী তৈরী করিয়াছে। আলোচ্য সনে ইতালিয়ান গাড়ী বিক্রয়ে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

জার্ম্মাণি বেলজিয়ামের মোটর গাড়ীর বাজার হাত করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক ভারি গাড়ী সরবরাহ করাই জার্ম্মাণির উদ্দেশ্য। জার্ম্মাণ এবং বেলজিয়ান গাড়ী-নির্ম্মাতারা বহুল পরিমাণে চলনসই মোটর গাড়ীর অংশাদি বিক্রয় করিবে বলিয়া যুক্তি পরামর্শ আঁটিয়াছে। ১৯২৯ সনে আমেরিকা বেলজিয়ামে ১২ রকমের ভ্রমণোপযোগী নয়া মোটর গাড়ী পাঠায় এবং বাজারে এইগুলির বেশ কাট্‌তি হয়, তবে হেমন্তকালে এই দফায় গাড়ী বিক্রয়ে মন্দা পড়িয়াছে। আমেরিকার এজেন্টগণ সে সময়ে হালকা গাড়ী এবং ভারি ভারি লরী বিক্রয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিল।

নিউজীল্যাণ্ডে দেশবিদেশের হরেক রকম গাড়ী

১৯৩০ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত নিউজীল্যাণ্ড দ্বীপে মোট ১,৫২,৬০৯ খানি মোটর গাড়ী রেজেষ্টারি করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ফোর্ড গাড়ীর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। নিউজীল্যাণ্ডে ফোর্ড গাড়ীর সংখ্যা ৩৬,৯৬৫ খানি অর্থাৎ মোট গাড়ীর ২৪·২২%। ১৯৩০ সনের ফেব্রুয়ারী অবধি ১২ মাসে এই দ্বীপে মোটর গাড়ী বিক্রী হইয়াছে ২১,১৪৬ খানি; ফোর্ডের হিস্সা ৩,৫৪২ খানি অর্থাৎ ১৬·৭৫%। ফোর্ডের পরেই সেভ্রলের স্থান; এই শ্রেণীর মোটর গাড়ীর সংখ্যা ১৫,০৮১, এবং মোট বিক্রয় হইয়াছে

৩০০২; তাহার পরে ডজ্, মোট সংখ্যা ১০,৬৩৩, মোট বিক্রয় ৮৭৮; ডজের পরে বুইক্, মোট সংখ্যা ১০,৬৬৬, মোট বিক্রয় ৫৭০ খানি। ইসেক্স গাড়ীর সংখ্যা ৮,০৪৭ খানি; আলোচ্য সনে ইসেক্স্ গাড়ী খুব বেশী বিক্রী হইয়াছে; মোট বিক্রয়ের সংখ্যা ১,৬৬৩। হুইপেট্ গাড়ী ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে; এই গাড়ীর সংখ্যা ৭,৯৫৩ এবং মোট বিক্রয় ১৩৪৯ খানি।

বিলাতী মোটর-নির্ম্মাতাদের মধ্যে অষ্টিন কোম্পানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিউজীল্যাণ্ড্ দ্বীপে এই কোম্পানীর স্থান ৭ম; মোট অষ্টিন্ গাড়ীর সংখ্যা ৫,৬২০ এবং মোট বিক্রয় ১,৭৩০ খানি। ষ্টুডিবেকার ৮ম; মোট সংখ্যা ৫,৩৮৭, মোট বিক্রয় ২৪৯। মরিস ৯ম, মোট সংখ্যা ৩৮৮৪, মোট বিক্রয় ৯৪৪ খানি।

নিউজীল্যাণ্ড্ দ্বীপে ১৯২৯ সনে যত মোটর গাড়ী আমদানি হইয়াছে তাহার মধ্যে বিলাতের হিস্যা ১৭½%, কানাডার ৪৬%; মার্কিণের ৩৬½% এবং ইয়োরোপের ½%। বিলাতী গাড়ীর আমদানি বাড়িয়াছে।

সমস্ত দেশের গাড়ীর দর কমিয়াছে; ১৯২২ সনে বিলাতী গাড়ীর দর ছিল গড়ে ৫৪৭ পাঃ; কিন্তু ১৯২৯ সনে দর দাঁড়াইয়াছে ১৭২ পাঃ। কানাডার দর নামিয়াছে ১৭০ পাঃ হইতে ১২৬ পাঃএ; মার্কিণের ২০২ পাঃ হইতে ১৬১ পাঃ এ; এবং ইয়োরোপের ৩২৪ পাঃ হইতে ২৫২ পাঃএ। ১৯২৮ সনের তুলনায় ১৯২৯ সনে মাত্র বিলাতী গাড়ীরই গড় দর কমিয়াছে। বিলাত হইতে বহুল পরিমাণে "খোকা" গাড়ী আমদানি হওয়াতেই বিলাতী গাড়ীর গড় দর কম প্রতীয়মান হইতেছে।

মোটর জগতে নব উদ্ভাবনা

বিলাতের "মেটালর্জিষ্ট্রা" (ধাতু বিশারদ) বৃটিশ মোটর নির্ম্মাতাদের জন্য গাড়ীর এক নয়া মোসাবিদা দিয়াছেন। এই নয়া গাড়ী বহুদিন কার্য্যোপযোগী থাকিবে। ১৯৩১ সনে এইরূপ কয়েকখানি নূতন গাড়ীর মডেল বাজারে বাহির হইবার সম্ভাবনা।

মোটর-নির্ম্মাতাদের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ একপ্রকার অ্যালুমিনিয়াম-মিশ্রণ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মিশ্রিত অ্যালুমিনিয়াম খাঁটি অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে হালকা অথচ ইস্পাতের চেয়ে শক্ত। এই মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত করিবার প্রণালী অতি সতর্কভাবে গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে। এই বিচিত্র ধাতু কিছুতেই ক্ষয় হইয়া যাইবে না। কারখানা-ওয়ালারা অক্লেশে ইস্পাতের পরিবর্ত্তে এই চীজ্ ব্যবহার করিতে পারিবে। ইহার ফলে গাড়ী অত্যন্ত হালকা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মজবুতও হইবে যৎপরোনাস্তি।

বিলাতে মোটর গাড়ীর জন্য একপ্রকার নয়া ইস্পাতও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ইস্পাত এমন শক্ত যে ফাইল অস্ত্রেরও সাধ্য নাই ইহার গায়ে দাগ দেয়। এই নূতন ইস্পাত দ্বারা একখানি ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট তৈরী করিয়া বিলাতী গাড়ীতে জুড়িয়া দেওয়া হয়। গাড়ীখানি যৎপরোনাস্তি প্রতিকূল অবস্থায়ও প্রায় ১০,০০০ মাইল দৌড়িয়া আসে। এই লম্বা দৌড়ের পরও দেখা যায় ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্টের ইস্পাত ঠিক যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে, একটুও ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় নাই।

ট্যাঙ্গানিয়াকার আমদনি রপ্তানি (১৯২৯)

আলোচ্য বর্ষে ট্যাঙ্গানিয়াকার ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়িয়াছে। কিন্তু আবহাওয়া ও পঙ্গপালের দরুণ দেশের ফসল নষ্ট হইয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

১৯২৮ সনে (মুদ্রা ছাড়া) মোট আমদানি হইয়াছিল ৩,৭৩৭,৩৫৮ পাঃ মূল্যের দ্রব্য, আলোচ্য সনে হইয়াছে ৪,২৮৫,৯৫২ পাঃ মূল্যের। সুতরাং আলোচ্য সনে আমদানি ১৪·৭% বাড়িয়াছে; পক্ষান্তরে ১৯২৭ সনের তুলনায় ১৯২৮ সনে আমদানি বাড়িয়াছিল মাত্র ১·৭৮%। ১৯২৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ডার-এস্-সালামে যে শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল তাহার ফলে কতক আমদানি বাড়িয়াছে এবং কতক বাড়িয়াছে আফ্রিকাবাসীদের খাদ্যদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায়। বড় বড় এষ্টেটগুলিতে অনেক আফ্রিকা-বাসী কাজ করে; ১৯২৯ সনে অনাবৃষ্টিজনিত অজন্মার দরুণ প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতে হয়।

নিম্নে ১৯২৭, ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সনের ব্যবসাবাণিজ্যের

হিসাব দেওয়া হইল। এই তালিকায় গৃহস্থালীতে ব্যবহার্য্য সোনারূপা ব্যতীত অন্য সোনারূপা ধরা হয় নাই; তবে গবর্ণমেণ্টের আমদানি ধরা হইয়াছে বটে। গবর্ণমেণ্টের আমদানি এইরূপ—১৯২৭, ৫৭০,৮৭৯ পাঃ; ১৯২৮, ৪৬৯,৫০৯ পাঃ; ১৯২৯, ৫২,৭৩৭ পাঃ।

	১৯২৭ পাঃ	১৯২৮ পাঃ	১৯২৯ পাঃ
আমদানি	৩,৬৭২,০৬৪	৩,৭৩৭,৩৫৮	৪,২৮৫,৯৫২
রপ্তানি	৩,৪৪০,৫৭৬	৪,০৫০,৫৯৪	৩,৯৮৮,৩৬৫
স্থানান্তরে প্রেরিত	১,৪৯৩,০১০	২,০৬১,০৭৮	২,৫৩১,২০৫
মোট	৮,৬০৫,৬৫০	৯,৮৪৯,০৩০	১০,৮০৫,৫২২

আমদানি বাণিজ্য

দ্রব্যের নাম	১৯২৭ পাঃ	১৯২৮ পাঃ	১৯২৯ পাঃ
তুলার কাপড়	৯৪৪,৯১৫	৯২৮,২৫২	৯০৩,৩৮৪
তুলার কম্বল	৬১,০০৫	৬০,৯৬৫	৭১,৩০৬
খাদ্য দ্রব্য	৩৬৭,৪১১	৩৮২,৮২৬	৪৮৪,৮০৩
বাড়ী তৈরীর মাল মস্‌লা	২৭০,৯৩৮	২১৯,২০২	২৯২,৭৮৬
কেরোসিন	৭২,৯৪৬	৮১,৮১২	৮৭,২৬০
মোটর স্পিরিট	৯৩,৩০৪	১০৫,৩৬২	১৫০,১৯৭
তামাক	২৮,৬৭৫	৩৫,৩৫৩	৩৪,৫৬৯
স্পিরিট	৪০,৬৮৪	৪৭,৩৭৩	৪৭,৪২৬
কলকব্জা	১৭১,১৩৩	২২০,৪৯৮	২৬৪,৬১৬
লোহা লক্কড়	২৯৭,১১০	২৩৫,৬৮৬	২২৭,০৩৬
পাটের থলে ও চট	৫১,৫৫৯	৬০,৭১৬	৪৬,১৪০
সিগারেট	৪৯,৪০৫	৬০,৭৯৬	৭৫,১১৬
মদ ও বিয়ার	৩৬,৮১১	৩৭,৫৫২	৪৩,৯২৫
মোটর গাড়ী ও লরী	১২৭,৬৬০	১৩০,২৭০	১৭৮,৫৯৭

"ম্যানেজিং এজেণ্টে"র পরমায়ু শেষ

ভারতবর্ষের অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান ম্যানেজিং এজেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত। পূর্ব্বে মাল বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ শতকরা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক পাইত। কিন্তু এখন এইরূপ রেওয়াজ নাই বলিলেই হয়। এখন মাত্র নিট্ লাভের উপরই ম্যানেজিং এজেণ্টগণ আপনাদের পারিশ্রমিক পাইতে অধিকারী।

অধুনা বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা এই ম্যানেজিং এজেণ্টদের উপর একেবারে বাঁকিয়া বসিয়াছে। উহারা বলিতেছে যে, এই অনাবশ্যক প্রতিষ্ঠানের কোন দরকার নাই। ভারতভূমিতে ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পুঁজি সরবরাহ করিতে নারাজ। সেইজন্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ম্যানেজিং এজেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। কিন্তু অবস্থাপন্ন মিলগুলির পুঁজির জন্য বিশেষ কোন চিন্তার কারণ নাই। অদূর ভবিষ্যতে বোম্বাই সহরের মিল এক-জোট হইতেছে। একজোট হওয়ার পর এই সমস্ত মিল সর্ব্বপ্রথমেই ম্যানেজিং এজেণ্টদের হাত এড়াইবে। ইহাতে খরচপত্র অনেক কমিয়া যাইবে বলিয়া অংশীদারদেরও সুবিধা হইবে।

সমবায় উৎসবে
শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের বাণী

বিগত ৩১শে অক্টোবর শনিবার সিউড়িতে সমবায় উৎসব উপলক্ষ্যে বীরভূম সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তাগণ সিউড়ি বাজারে এক সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও বীরভূম সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহোদয় যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার কোন কোন অংশের মর্ম্ম নিম্নরূপ :—

আজকের এই উৎসব শুধু এখানে নয় সমগ্র পৃথিবীর ছোট বড় সকল জায়গায়—ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি সকল স্থানেই হচ্ছে। তাতেই বুঝতে হবে, ইহার কিছু মূল্য আছে। সমবায় শক্তিতে অনেক দেশ বড় হয়েছে, অনেক গরীব লোক ধনী হয়েছে। এই যে সঙ্ঘশক্তি, ইহাতে উকীল, মোক্তার, ব্যবসায়ী সকলেরই যোগদান করা উচিত। শুধু বি-এ, এম-এ বাবুরাই যে এই সঙ্ঘশক্তির কথা বোঝেন তা নয়, সকলেই বুঝতে পারেন। বীরভূমে চৌদ্দ বৎসরে যে কাজ হয়েছে তা বেশী নয়। যেখানে শিক্ষার প্রসার কম সেখানে ইহার উন্নতিও কম। এজন্য শিক্ষিত লোকের দরকার। অশিক্ষিত স্থানে শিক্ষিত লোকগণ সমবায় চেষ্টায় শিক্ষার প্রচার করতে পারেন। যেখানে শিক্ষিত লোক বেশী সেখানে এর প্রসারও বেশী। যেখানে দেশের লোক এর জন্য জীবন ঢেলে দিয়েছে সেখানে এর দ্বারা দেশেরও উন্নতি হয়েছে।

অনেকে বলেন গবর্ণমেণ্টের অফিসার কম বলে সমবায় সমিতির বেশী প্রচার হয় না। একথা ঠিক নয়। শিক্ষিত লোক যেখানে মরিয়া হয়ে নামে, যেখানে তারা সমস্ত শক্তি ঢেলে দেয়, সেখানেই প্রকৃত কাজ হয়। সমবায় জিনিষটা কি তা বোঝা অতি সহজ। এ আর কিছুই নয়, এক জোটে কাজ করা। এতে ভেল্কীবাজি কিছুই নাই। যারা দুর্ব্বল, যারা গরীব তারাও এক জোটে কাজ করলে অনেক কিছু করতে পারে।

রেজেষ্টারীকৃত সমিতিদ্বারা না হউক অনেকগুলি লোকের সমবেত চেষ্টার ফলে আমি নিজেও খুব উপকৃত হয়েছি।

এফ্‌, এ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আমি যখন রুড়কী কলেজে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ইচ্ছা করলাম, তখন আমার সিলেট-বাসীরা অনেকে আমাকে বিলাত যাওয়ার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। অবশ্য আমি সে টাকা সুদ সমেত তাদের ফিরিয়ে দিয়েছি। তখন আমি এই সাহায্য না পেলে কিছুতেই বিলাত যেতে পারতাম না। তাঁদের এইরূপ সাহায্যে পরেও কেহ কেহ বিলাত গিয়েছেন।

জেলার লোক যদি একজোটে কাজ করে, তাদের জয় হয়। দলাদলি সব স্থানেই আছে। এখানেও আছে, তবে এই দেশে বেশী। ইহা কেন হয়? লোকে কিছু-না-কিছু না করে থাকতে পারে না, জেলায় জেলায় লোকের করবার মত কাজ ও প্রতিষ্ঠান খুব কম আছে, কাজ না থাকলেই লোকে দলাদলি করে। ইউনিয়ন বোর্ডেও দলাদলি আছে বটে, কিন্তু রাস্তা করা, পুকুর কাটা প্রভৃতি কাজে তারা ব্যস্ত থাকতে পারে। সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে লোকে প্রায় সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকে। হাইস্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও সমবায় সমিতি থাকা কর্ত্তব্য।

আমি যখন এ জেলায় ও বাঁকুড়া জেলায় গেলাম তখন গ্রামে গ্রামে মরা পুকুর দেখে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পেতাম "ঈশ্বর আমাদের উপর নির্দ্দয় এবং তাঁর ইচ্ছায় আমাদের এই দুর্দ্দশা"। সেখানে দেখতাম কেহ মাথা নাই, মাথা করতে হলেই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া চাই, অর্গানিজেশন চাই, শুধু মাথাতেও হবে না। তখন সমিতি করবার চেষ্টা করি, তাতে বীরভূমে প্রায় হাজার পুকুরের পঙ্কোদ্ধার হয়। তারপর বাঁকুড়া গিয়েও সমিতি রেজেষ্টারী করে সেখানে টাকার ব্যবস্থা করি। টাকা না হলে ত কোন কাজ হয় না, সমিতি রেজেষ্টারী করলে ব্যাঙ্ক হতে টাকা পাওয়া যায়, তখন কতক চাঁদা ও কতক ব্যাঙ্ক হতে টাকা লওয়ার সুবিধা হয়। ব্যাঙ্ক রেজেষ্টারী করলে অনেক স্থান হতে সেখানে টাকা আসে। হরিদ্বারের উপর থেকে যেমন একটু একটু জল এসে গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয় তেমন চতুর্দ্দিক থেকে ব্যাঙ্কে টাকা এসে জমা হয়।

আমি ছেলেবেলা শুনতাম আমাদের দেশে এক নাথ ছিল, তার অনেক টাকা ছিল, সে টাকা মাটীতে পুতে রাখত ও মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালে তুলে নিজেই গুনে আনন্দ উপভোগ করত। যাঁরা টাকা না খাটিয়ে শুধু মাটীতে পুতে রাখে বা আবদ্ধ করে রাখে তারা মূঢ়। টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখলে টাকা বৃদ্ধিও হয় এবং পাঁচ জনের উপকারও হয়। হরিদ্বারের কাছে যদি শিব ঠাকুর গঙ্গার জল বন্ধ করে রাখতেন তা হলে যেমন দেশের কোন উপকার হত না তেমন যে লোক নিজের টাকা বন্ধ করে রাখে তাতে তার নিজেরও উপকার হয় না, দেশের লোকও তাতে উপকৃত হয় না। যদি শিক্ষিত লোকগণ গোয়ালা, মুচি, দোকানদার, কাঁসারী প্রভৃতির মধ্যে এই সমবায় নীতি বুঝিয়ে দেন তবে তারা উপকৃত হতে পারে। ব্যাঙ্কের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ নদী যেমন জলাভাবে শুকিয়ে যায় সেরূপ ব্যাঙ্ক ফেল হতে পারে। এজন্য চাই সততা।

যিনি যে ব্যবসা করুন সমিতি করে করা উচিত। অনেক স্কুলে সমিতি আছে শান্তিনিকেতনেও আছে। ছেলে বুড়া ছোট বড় সকলে সমিতি করে বীরভূমকে বঙ্গদেশের আদর্শে পরিণত করুন। বারাসতে গোয়ালারা সমিতি করে বেশ লাভবান হয়েছে। এখন সমিতি থেকে গরুর ডাক্তার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ লোক রাখা হয়েছে। সমিতি করলে টাকা পাওয়ারও সুবিধা বিশেষজ্ঞের উপদেশ পাওয়ারও সুবিধা। বীরভূমে দুটি ধান্য ক্রয় বিক্রয়ের সমিতি হয়েছে, অল্পমূল্যে ধান রেখে আক্রার সময় বেশী মূল্যে বিক্রয় করবার সুবিধা হবে। কলিকাতায় ধানের গোলা করবার সমিতি হয়েছে।

সমবায় সমিতি করে বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, দেন্মার্কে আর কেহ গরীব নাই। সেখানে প্রত্যেকের বাড়ীতে মোটর গাড়ী এবং শিক্ষিত লোক আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার চেয়ে এই সব দেশের অবস্থা বেশী স্বচ্ছল। ইংলণ্ডে যে ডিম বিক্রয় হয় তা দেন্মার্কের সমবায় সমিতি হতে আসে।

বাংলাদেশে সমবায়

১৯২৮-২৯ সনের বার্ষিক রিপোর্টে, সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার মহোদয় কৃষি-ঋণ সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের শোচনীয় অবস্থার তুলনায় আলোচ্য বৎসরের ফলাফল মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক।

সর্ব্বজাতীয় সমিতির মোট সংখ্যা আলোচ্য বৎসরের মধ্যে ১৮,১০৭ হইতে ১৯,৮৭৭ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সভ্যসংখ্যাও ৬৭৫,৯৫৯ হইতে ৭০৬,৫৭২ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আজকাল প্রায় সকল বড় বড় সরকারী আফিসে ও কোম্পানীতে, সুপরিচালিত ঋণদান সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিলে সঞ্চয় এত অধিক হইয়াছে যে, ঋণদানের সুদের হার হ্রাস করিয়া শতকরা ছয় টাকায় নামাইয়া দেওয়াও সম্ভব হইয়াছে। কলিকাতার বাহিরে প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্যান্য সমিতিও সভ্যদের অশেষ উপকার করিয়াছে।

বঙ্গীয় সমবায়-সংগঠন সমিতির প্রচার বিভাগের সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের যে কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, আশা করা যায়, পল্লী-সমবায়ী সাধারণের মধ্যে সমবায়-নীতির প্রচার ও প্রভাব বিস্তারে তাহা বিশেষ কার্য্যকর হইবে।

পল্লী-সমিতি ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি সভ্যদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রতি সমধিক মনোযোগ দিয়াছেন; শিক্ষা-সম্পর্কে সমবায় সমিতিগুলির ব্যয়ের কোনো হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু উহার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। সমবায়ী মাত্রেই প্রাথমিক শিক্ষাসম্বন্ধে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে এবং সামান্য অর্থ-সঙ্গতি লইয়া স্বীয় চেষ্টায় যথাসম্ভব করিয়া যাইতেছে।

দুগ্ধ সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কলিকাতা দুগ্ধসমিতির সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমিতির অপূর্ব্ব সাফল্যে দুগ্ধ সমবায় আন্দোলন অনেক প্রসার-লাভ করিয়াছে। এই বৎসর শুধু কলিকাতা নহে, অন্যান্য অনেক অঞ্চলেও এই প্রচেষ্টার সাফল্য লক্ষিত হইয়াছিল।

বাংলার বিশিষ্ট 'সেচ সমবায়' আন্দোলন এই বৎসর ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই সমিতিগুলি প্রধানতঃ বর্দ্ধমান বিভাগেই,—এবং আলোচ্য বর্ষে অনূন ২৪৫টি নতুন সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। এখন এই শ্রেণীর সমিতির মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭৭৩ এবং ইহাদের এলাকাভুক্ত সিঞ্চিত জমির পরিমাণ প্রায় ১,৩০,০০০ বিঘা। সমিতিগুলির অধিকাংশই পুরাতন বাঁধ ও সেচের জন্য নির্ম্মিত জলাশয়ের সংস্কার-কার্য্যে নিয়োজিত।

আলোচ্য বর্ষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম জিলার সমবায় উপনিবেশ সংস্থাপনের উদ্যোগ।

ইহার মোটামুটি পরিকল্পনা এই যে, ভূমিহীন কৃষকদের লইয়া সমবায় সমিতি গঠিত হইবে। এই সব সমিতিকে জমি ইজারা দেওয়া হইবে। সমিতি এই জমির বন্ধকী-সূত্রে জমি-ক্রয়োপযোগী এবং আবাদের ব্যয় নির্ব্বাহোপ-যোগী অর্থ ঋণ পাইতে পারিবে। ক্রমে উৎপন্ন ফসল হইতে এই ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে।

আলোচ্য বর্ষের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতির কার্য্যারম্ভ। দার্জ্জিলিং সমিতি কিছু কাল পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। এবৎসর ইহা প্রাথমিক কার্য্যাবলী শেষ করিয়া সঙ্কল্পিত কার্য্যে হাত দিয়াছে। এই সকল সমিতির উদ্দেশ্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বাসের উপযোগী গৃহনির্ম্মাণে সাহায্য করা। উপযুক্ত জমি ও যথাসম্ভব অর্থ সাহায্য করিয়া সভ্যদের গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইবে এবং সভ্যগণ উহা কিস্তিবন্দীতে পরিশোধ করিয়া দিবেন।

শিল্পবিভাগে একটি কেন্দ্রীয় শিল্পসমিতি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই নবসংগঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিল্প-সমিতির হাতে কলিকাতার কেন্দ্রীয় বিক্রয় ভাণ্ডারের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। এযাবৎ উহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় সংগঠন সমিতির পরিচালনাধীন ছিল। এই কেন্দ্রীয় বিক্রয় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল, সমবায়জাত কুটীর-শিল্পের বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা এবং সাধারণ সকল প্রকার কুটীর-শিল্পেরই বিক্রয়ে সাহায্যদান। প্রতিষ্ঠান ব্যয় বাবদ ৩০০০৲ টাকা এবং ৭॥ টাকা সুদে ৫০,০০০৲ টাকা ঋণ ব্যতীত বার্ষিক ১২,০০০৲ টাকা তিন বৎসরের জন্য মঞ্জুর হইয়াছে।

বঙ্গীয় সমবায় রেশম সমিতি উন্নতিলাভ করিতেছে এবং রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের মতে উপযুক্ত সাহায্য লাভ করিলে ইহা বাঙ্গালার রেশম শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি-বিধানে সমর্থ হইবে।

আলোচ্য বর্ষে সমবায় সমিতিসমূহের উদ্যোগে পল্লীস্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্পর্কেও যথেষ্ট কাজ হইয়াছে। এই সকল সমিতির মূল কার্য্যনীতি এই—অংশলব্ধ মূলধন, চাঁদা ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মারফৎ প্রাপ্ত সরকারী সাহায্যে জঙ্গল পরিষ্কার পুষ্করিণী ও ডোবায় কেরোসিন ইত্যাদি ঢালিয়া যথাসম্ভব ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি বিতাড়নের চেষ্টা। এবিষয়ে সমিতি পল্লীবাসী মাত্রেরই বাসভূমির স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধানে যথেষ্ট সুযোগ দিয়া থাকে। এই জাতীয় সমিতির সংখ্যা আলোচ্য বৎসরের মধ্যে ৫৫১ হইতে ৬৬২ তে দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সভ্যসংখ্যাও ১৩,৬৬৬ হইতে ১৫৬২০ হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই কলিকাতা অ্যান্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটির দ্বারা অনুপ্রাণিত। আলোচ্য বর্ষে মোট ছয়টি নারী সমবায় সমিতি ছিল। তন্মধ্যে তিনটিই প্রেসিডেন্সী বিভাগে।

বিশ্বভারতী পল্লীসংস্কার সমিতির পরিচালিত অনেক সমিতিতে যথেষ্ট কাজ হইয়াছে। বোধ হয় এই জাতীয় সমিতির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বরিশালের পাঁজিপুথিপাড়া সমিতি। গ্রামে চলাচলের উন্নতিবিধানে ইহা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছে। একটি বিদ্যালয় ও একটি হাঁসপাতাল ইহার চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পঞ্চায়েৎ মণ্ডলী পল্লীর অনেক মামলা বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়াছে। রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের মতে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি আন্দোলনের প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। বেতনভোগী ও অবৈতনিক কর্ম্মীদের সাহায্যে ম্যাজিকলণ্ঠন যোগে প্রচারকার্য্যের জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ও বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের শিক্ষাদান ও সংগঠন করিয়া সমিতি অশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের কার্য্য মোটের উপর উন্নতির দিকেই চলিয়াছে এবং আলোচ্য বর্ষে ইহার কাজ ভালই হইয়াছে।

এই বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বাংলার বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক সমবায় সম্মিলনের অধিবেশন। কলিকাতায় বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স এবং বগুড়ায় প্রাচীন সমবায়ী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং নদীপুরের রাজা কর্ত্তৃক উদ্বোধিত রাজসাহী বিভাগীয় কনফারেন্সের অধিবেশন হয়; শ্রীনিকেতনে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের উদ্বোধনে বর্দ্ধমান বিভাগীয় সমবায় কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধনী বক্তৃতা অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

(ভাণ্ডার)

পাটের দর কি প্রকারে বৃদ্ধি হইবে ?

গত বৎসরের পাট উদ্বৃত্ত আছে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ মণ। এই বৎসর যে ফসল উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৫ কোটি ৬০ লক্ষ মণ। এবার মোট পাটের পরিমাণ ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ মণ। উপরোক্ত মালের মধ্যে এই বৎসর পাটকলের এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য আন্দাজ ৪ কোটি ২৫ লক্ষ মণ মালের আবশ্যক হইবে। সুতরাং ৩ কোটি ১০ লক্ষ মণ পাট জমা থাকিয়া যাইবে। যত মাল আবশ্যক তার চেয়ে অনেক বেশী মাল উৎপন্ন হওয়াতে পাটের দর এত কমিয়া গিয়াছে এবং কৃষকগণ বিপদে পড়িয়াছে।

পাটের দর না বাড়িলে শুধু কৃষক নহে, সমস্ত বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। পাটের দর বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া বাঙ্গালার গবর্ণর আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু এই আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করিয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। সুতরাং আমাদের নিবেদন এই যে, প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহার প্রতিবেশী কৃষকদিগকে বুঝাইয়া নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিতে বলিবেন :

১। পাটের দর অন্ততঃ পক্ষে মণপ্রতি ৭৲ টাকা না হইলে কেহ পাট বেচিবেন না।

২। উপরোক্ত দর পাইলেও কেহ যেন একসঙ্গে

বেশী মাল বিক্রয় করিয়া না ফেলেন। যাঁহার ১০/০ মণ পাট আছে তিনি যেন এই বৎসর ৫/০ মণের বেশী বিক্রয় না করেন। প্রত্যেক গৃহস্থ যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, এই বৎসর যে মাল উৎপন্ন হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেকের বেশী বিক্রয় করিবেন না, তাহা হইলে উক্ত অর্দ্ধেক মাল বিক্রয়ের দ্বারাই তাঁহারা লাভবান হইবেন। আর দর বাড়িলে যদি সকলেই বেচিতে থাকেন তাহা হইলে খুব সম্ভব পুনরায় দর কমিয়া যাইবে এবং পুনরায় এইরূপ শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইবে।

৩। এই বৎসর যে কৃষক যে পরিমাণ জমিতে পাট বুনাইয়াছে, আগামী বৎসর সে তাহার সিকি পরিমাণের বেশী জমিতে পাট বুনিবে না। তাহা হইলে এই বৎসরের উদ্বৃত্ত পাটের জন্য আগামী বৎসর খুব বেশী দর পাওয়া যাইবে।

যে সমস্ত স্থানে পাট চাষ হয় সেই সব জিলার প্রত্যেক জমীদার-তালুকদার, উকীল-মোক্তার, আলেম-ফাজেল, ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বর প্রভৃতি প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যেন এই ইস্তাহারের মর্ম্ম সমস্ত গৃহস্থকে সভা সমিতি করিয়া এবং ঢোল সোহরতের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়া দেশের দুর্দ্দশা মোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

পি, সি, রায়
এ, কে, ফজলুল হক
মোহাম্মদ আকরাম খাঁ

পাটের চাষী বনাম কারবারী

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় ভারত গবর্ণমেন্টের অস্থায়ী অর্থসচিব মিঃ জুক্‌স্‌কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তার কোন কোন অংশের মর্ম্ম নিম্নরূপ:

পাটচাষীর দুর্দ্দশার কারণ:—

"আসল ঘটনা এই যে, কয়েকটী বৃহৎ ইয়োরোপীয় পাট রপ্তানির কারবারী বহু পাট বিক্রয় করিবার চুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আমি হাওয়ার্থ কোং নামে এক ইয়োরোপীয় পাটের দালাল কোম্পানীর রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১৯শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হয়, তাহাতে বলা হয়—"পাটের বেলারগণ বেশীর ভাগই পূর্ব্বের বেশী দামের চুক্তিতে বিক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি মত পাট যোগাইতেছেন। কাজেই বর্ত্তমান দাম দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব—তবুও তাঁহারা কেবলই আরও দাম কমাইতে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। ইয়োরোপীয় 'বেলার' ও ইয়োরোপীয় মার্কা-যুক্ত ভারতবর্ষীয় বেলারগণ কম দামে প্রচুর পরিমাণে পাট বিকিকিনি করিতে চুক্তিবদ্ধ..." ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৪ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সময়ের রিপোর্টে ঐ কোম্পানী বলিতেছেন—"ইয়োরোপীয় বেলারদের বিশেষ কোন ব্যবসায় নাই; কারণ অধিকাংশ 'বেলার'ই কম দামে পাট বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ।"

পাটের দাম কমাইতে চেষ্টিত এই ব্যবসায়ীরা যখন চাষীদের পাট ধরিয়া রাখার সঙ্কল্পের দরুণ নিরাশ হইয়া পড়িতেছিল, তখনই বাঙ্গালা সরকার তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া আপ্যায়িত করিলেন।

এ বিষয়ে ভারত সরকারের কোন প্রকার দায়িত্ব আছে কিনা তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকার বলেন,—

"এ বিষয়ে ভারত গবর্ণমেন্টের কোনও কর্ত্তব্য নাই—একথার মূলে যৌক্তিকতা নাই। বৎসর বৎসর ভারত গবর্ণমেন্ট পাট রপ্তানির শুল্ক হইতে চারি কোটি টাকার উপর আয় করিয়া থাকেন। যদি এই শুল্কের হার বাঁধা না হইয়া পাটের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে হইত, তবে বাঙ্গালার চাষীদের দুরবস্থার গুরুত্ব আপনারা আরও ভাল ভাবে অনুভব করিতে পারিতেন।......ভারত গবর্ণমেণ্ট বলিয়া থাকেন যে, পাট উৎপাদন বাঙ্গালা দেশের একচেটিয়া বলিয়া শুল্ক বস্তুতঃ ক্রেতাগণের দ্বারাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আসলে পাট একচেটিয়া হইলেও, চাষীদের ক্রেতাগণকে উহাদের ইচ্ছামত দরে পাট ছাড়িয়া দিতে হয়। তাহাতে বুঝা যায় যে, চাষীরাই প্রকৃতপক্ষে এই শুল্ক দিয়া থাকে—ক্রেতারা নয়। যে কৃষকেরা প্রতি বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্টকে চারি কোটি টাকা দিয়া আসিতেছে, তাহারা যদি বিপদাপন্ন হইয়া আবেদন করে, তাহার উত্তর নিশ্চয়ই আরেও একটু ভাল হওয়া উচিত ছিল।

কি করা উচিত ?

"১৭ই অক্টোবরের পরামর্শ-সভায় প্রায় সকল শ্রেণীর পাট-ব্যবসায়ী মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে একমত হন :—

(১) অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর ;

(২) উৎপন্ন পাটের অনুপাতে সম্ভব হইলে সরকার চাষীদিগকে টাকা ধার দিবেন ;

(৩) আগামী বৎসরে পাটের চাষ কমাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৪) যত শীঘ্র সম্ভব, সেণ্ট্রাল জুট কমিটী প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

চাষীদের দুরবস্থা

"ক্ষুধা-প্রপীড়িত চাষীরা জলের দামে তাহাদের পাট বিক্রয় করিতেছে। অনুমানে বোধ হয় তাহারা ইতিমধ্যেই অর্দ্ধেকের বেশী এ বৎসরের উৎপন্ন পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে এবং আগামী দুই মাসের মধ্যে বাকী পাট বিক্রয় বন্ধ করিতে না পারিলে সমস্তটাই বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। ইহার ফলে কেবল যে এ বৎসরের জন্য তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা নয়, সস্তায় পাট কিনিয়া ক্রয়-কারীরা এবার যে সুবিধা পাইয়াছে, তাহাতে আগামী বৎসর চাষীরা চাষ কমাইয়াও কোন মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারিবে না।...সরকার বিলম্ব করিয়া চাষীদিগকে অত্যন্ত দুর্দ্দশার মধ্যে ফেলিয়াছেন।"

কৃষকের দুর্দ্দশার প্রতিকার

সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স গৃহে পাট-ব্যবসায়-সংক্রান্ত সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের একটী সভা হয়। ঐ সভায় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অর্থ-নৈতিক সদস্য ও কৃষিবিভাগের মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি আলোচনার প্রারম্ভে যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

গত ১৭ই অক্টোবরের সম্মিলনে পাট-ব্যবসায়ীরা যে সিদ্ধান্তে প্রায় একমত হইয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্মের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, প্রথমতঃ, পাটের বাড়তি হইয়া যে দুর্দ্দশার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রতীকার এখনই করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, পাটের উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে বৈষম্য হওয়ায়ই যে এই দুর্দ্দশা, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ, কোন উপায়ে পাট-উৎপাদন কমাইতে না পারিলে কেবলমাত্র স্বাভাবিক উপায়ে এই বৈষম্য দূর হইবে না। চতুর্থতঃ, এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যাহা পাট-ব্যবসায়ের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমান দুরবস্থার মত অবস্থার সৃষ্টি না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। দুইটী উপায়ে এই দুর্দ্দশার প্রতীকার হইতে পারে—সাময়িক সাহায্য করিয়া পাট-চাষীদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা, এবং একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করা।

সাময়িক সাহায্যকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যাহাতে কৃষক পাটের মূল্য না বাড়া পর্য্যন্ত পাট ধরিয়া রাখিতে পারে, তেমন অর্থসাহায্য করা ; দ্বিতীয়তঃ যাহাতে এবৎসরের মত বে-হিসাবী ফসল উৎপাদন করিয়া দুর্দ্দশায় না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে একমাত্র সরকারই উপযুক্ত কাজ করিতে পারেন।

ভারত সরকারের অস্থায়ী অর্থসচিব বলিয়াছেন, এ ব্যাপারে তাঁহাদের কোনই হাত নাই। শ্রীযুক্ত সরকারের মতে তাঁহার এ উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট আসলে সব কাজ নিষ্পন্ন করিলেও অর্থের জন্য তাঁহাদিগকে ভারত-সরকারের কাছে যাইতে হইবে। যদি প্রয়োজন হয়, অধিক সংখ্যক নোট্ প্রচলন করিয়াও ইহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। যদিও ইহাতে কিছু ক্ষতি হইতে পারে, তবুও ইহাতে পাটের দর চড়িবে। শ্রীযুক্ত সরকার আশা করেন যে, ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত-সরকার বাঙ্গালা সরকারকে উপযুক্ত ঋণ দিতে কার্পণ্য করিবেন না। সম্ভবতঃ ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কই তাঁহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে ঐ টাকা ধার দিতে সক্ষম।

সাময়িক সাহায্যের দ্বিতীয় উপায় সম্বন্ধে অর্থাৎ আগামী

বৎসরে পাট উৎপাদন কমাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গালা সরকার যাহা করিয়াছেন তাহা পর্য্যাপ্ত নয়। শুধু হ্যাণ্ড-বিল ছাপাইয়া বিলি করিলে অশিক্ষিত জনসাধারণ তাহার কিছুই বুঝিবে না। এজন্য সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলির—যথা, জমীদার ও প্রজা সমিতিগুলির এবং ডিষ্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডগুলির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক জেলায় কতটা পাট-চাষের প্রয়োজন, পাটের স্থানে অপর কিসের চাষ করিয়া লাভবান্ হওয়া যায়—এসকল কথাও প্রচার করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্থায়ীভাবে পাটের উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, স্থায়ী প্রতিষ্ঠানটির নাম যাহাই হউক, তাহার গঠন এমন হওয়া চাই, যাহাতে পাটচাষী ও অনুরূপ ব্যবসায়ী সকলেই একমত হইয়া কার্য্য করিতে পারে। পাটের বাজারের অবস্থা আরও ভাল করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও উপায় থাকিবে। ভারতবর্ষে ও বাহিরে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজার তৈয়ারী করার ও বাড়াইবার সকল পথই ইহা অনুসন্ধান করিবে এবং কাঁচা পাট ও পাটের দ্রব্যের উৎপাদন ও বর্ত্তমান পরিমাণের হিসাব রাখিয়া উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রচার করিবে। ইহা চাষীকে আথিক সাহায্য দিবার এবং অতিরিক্ত পাট ধরিয়া রাখিবার মত উপায় সৃষ্টি করিবে।

ব্রাজিল ও মার্কিণের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার দেখাইয়া দেন যে, এইরূপ দুরবস্থায় সে সকল দেশে কৃষকেরা সরকার হইতে কিরূপ সাহায্য পাইয়াছিল। এই সম্মিলন যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা যেন ব্যর্থ না হয় এবং সরকার এই অভূতপূর্ব্ব সমস্যার সমাধানে সাহস দেখাইবেন, এই আশা করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

শ্রীযুক্ত সরকারের উপরোক্ত প্রস্তাব ব্যতীত শ্রীযুক্ত ব্যাগেরিয়া আরও একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটী এই: কলিকাতায় যে পাট আমদানি হইবে, তাহার উপর গবর্ণমেন্ট মণ প্রতি দুই আনা হারে সেস্ ধার্য্য করুন। ইহাতে বৎসরে ৬০ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হইবে। সেই টাকার উপর ৬ কোটি টাকা ঋণ উঠান যাইবে এবং সেই টাকা হইতে দরিদ্র পাটচাষীকে কর্জ্জ দেওয়া হইবে। ঐ টাকা কর্জ্জ পাইয়া চাষীরা পাট ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে এবং পাটের দর না উঠা পর্য্যন্ত পাট ছাড়িবে না। এ সমস্তই হইল প্রস্তাব,—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার স্বপ্ন দেখা! দেখা যাউক, আসল কাজ কতদূর অগ্রসর হয়।

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

ময়মনসিংহ জেলা কৃষক সমিতির অধিবেশন

গত ৯ই কার্ত্তিক রবিবার দিবস উপরি উক্ত সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে:

১। কৃষি-কার্য্যাদির উন্নতির জন্য এক বা ততোঽধিক গ্রাম লইয়া পল্লী কৃষক সমিতি গঠন করা।

২। সামান্য সুদে টাকা ধার পাইবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

৩। প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের প্রস্তাব করা।

৪। ইউনিয়ন বোর্ড ও ইউনিয়ন বেঞ্চ ও কোর্টের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে সম্যক ব্যবস্থা করা।

৫। যাহাতে পাটের দর বৃদ্ধি হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা।

৬। গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতি ও জল-সরবরাহের উপায় করা।

৭। যাহাতে দেশের প্রচলিত মক্তবগুলির উন্নতির জন্য গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তদ্বিষয়ে আলোচনা করা।

চাই বৃটিশ ভারতে সুদৃঢ় বাণিজ্য-নীতি

বিলাতে ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সের অধিবেশন উপলক্ষ্যে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে একটি পরামর্শ সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ঐ সমিতি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের নিকট একটী বিবরণী পেশ করিয়াছে। বিবরণীটী ইম্পি-রিয়াল কনফারেন্সে বিবেচিত হইয়াছে। উহাতে বিলাতের শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জাহাজ-সম্পর্কিত কারবারীদের মতামত ও পরামর্শ বা প্রস্তাবসমূহ স্থান পাইয়াছে।

কমিটির নাম বৃটিশ প্রিপ্যারেটরি কমিটি

চেম্বার অব্ শিপিং অব্ দি ইউনাইটেড্ কিংডম, ফেডারেশুন অব্ বৃটিশ ইণ্ডাষ্ট্রিজ এবং অ্যাসোসিয়েশন অব্ বৃটিশ চেম্বার্স অব্ কমার্স এই তিনটি প্রতিষ্ঠান লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছে। গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-বিধান এই সাম্রাজ্যিক মহাসভার মুখ্য উদ্দেশ্য; কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরেই সাম্রাজ্যের প্রগতি নির্ভর করিতেছে। নিম্নে সমিতির মূল বক্তব্য প্রদত্ত হইল :

"বৃটিশ সাম্রাজ্য ১৪ কোটি বর্গমাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত। ৪৫ কোটি ১০ লক্ষ নরনারী এই সাম্রাজ্যের অধিবাসী। এই সাম্রাজ্যে খাদ্যোপযোগী বস্তুর এবং শিল্পোপযোগী কাঁচামালের অভাব নাই। কিন্তু সাম্রাজ্য-জাত উপকরণ-সম্ভার সর্ব্বাধিক কাজে লাগাইতে হইলে গোটা সাম্রাজ্যের একটা সুনিয়ন্ত্রিত এবং সর্ব্বানুমোদিত সরল বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক সত্তা

"সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য-বিশারদগণ একত্র হইয়া এমন একটা নীতি উদ্ভাবন করুন যে তাহা স্থায়ী ও কার্য্যকরী হয়। তাহা হইলেই আপনা হইতে সাম্রাজ্যের অংশগুলি পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

"গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্য একটি অখণ্ড আর্থিক সত্তা লইয়া বিশ্বের দরবারে হাজির থাকুক, এরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা বহু লোকে অনেক দিন ধরিয়া পোষণ করিয়া আসিতেছেন বটে; কিন্তু উহা এতদিন যাবৎ আদর্শ মাত্র ছিল, সুযোগ এবং সুবিধার অভাবে কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

"প্রতিষ্ঠানত্রয় কার্য্যের খুঁটিনাটি ও প্রণালী সম্বন্ধে একমত হইতে না পারিলেও মূলনীতি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ঘটে নাই। সাম্রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি কিসে হইবে সে বিষয়ে উপস্থাপিত রিপোর্টসমূহ পরীক্ষা করিবার পর কমিটি নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন।

১। সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-বৃদ্ধি

"সাম্রাজ্য শুধু বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্যের মস্ত বড় বাজার নয়, বর্ত্তমানে মোট বৃটিশ রপ্তানির ৪৫% সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্রী হইতেছে। সাম্রাজ্যের কাঁচা মালের সংস্থান এত বিপুল যে বিলাতের শিল্প-ব্যবসা যে কত গুণে বাড়ানো যাইতে পারে তাহা এখন ধারণা করাই যায় না।

"কেবল বিলাতী স্বার্থের দিকে চাহিয়া এ আলোচনা করিলে চলিবে না। সাম্রাজ্যের অপরাপর অংশও যাহাতে সমৃদ্ধির ভাগীদার হইতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ নীতিটা সাম্রাজ্য-বাণিজ্য-নীতি হওয়া চাই। এক বা অধিক অংশের হুকুম মতে সকলের জন্য অবলম্বিত নীতি হইলে চলিবে না। সাম্রাজ্যের প্রতি অংশের যথার্থ আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে পরস্পর অবাধ বাণিজ্যিক লেনদেনের সম্পর্ক অব্যাহত রাখিতে হইবে। প্রতি অংশের উন্নতির সহিত গোটা সাম্রাজ্যের শুভাশুভ জড়িত রহিয়াছে।

দুনিয়ার ধনদৌলত-বৃদ্ধি লক্ষ্য

"গোটা সাম্রাজ্যের পক্ষে এই যে নয়া বাণিজ্য-নীতি অনুসৃত হইতে যাইতেছে ইহার লক্ষ্য যে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-বৃদ্ধি তাহা নয়; সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াইবার জন্যও চেষ্টা করা হইবে। ইহার ফলে সাম্রাজ্যভুক্ত সমস্ত দেশগুলিই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে; উহাদের ক্রয়-শক্তি বাড়িয়া গিয়া গোটা দুনিয়ারই কল্যাণ সাধিত হইবে।

২। সাম্রাজ্যিক অর্থনৈতিক নীতি

"গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্যের তরফে একটি সাধারণ অর্থ-নৈতিক নীতির কথা বাতলান খুব সোজা, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এই বিরাট সাম্রাজ্যের

মধ্যে নানা প্রকার সমস্যা রহিয়াছে ; এই সমস্তের বিরুদ্ধে একটি সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নীতির মোসাবিদা স্থির করিতে হইলে রীতিমত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দরকার। এজন্য বাহিরের সাহায্যও আবশ্যক এবং বাহিরের মধ্যে জাতি-সঙ্ঘের অর্থনৈতিক বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ সাম্রাজ্যকে অন্যান্য অনেক দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতে হইতেছে। এ অবস্থায় লীগের অর্থনৈতিক সমিতির মিলিয়া মিশিয়া এবং রীতিমত অনুসন্ধানাদি করিয়া কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করা সাম্রাজ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

কমিটির সুপারিশ

প্রকৃতপক্ষে কেমন করিয়া অনুসন্ধানাদি করিতে হইবে তৎসম্পর্কে পরামর্শ-সমিতি কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন। নিম্নে এই সুপারিশের মর্ম্মার্থ লিখিত হইল :

"(ক) উপযুক্তরূপ অনুসন্ধান এবং পরামর্শাদি করার জন্য সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি যোগ্য প্রতিষ্ঠান কায়েম করিতে হইবে।

"(খ) এতদর্থে একটি স্থায়ী সেক্রেটারিয়েট গঠন করিতে হইবে। সাম্রাজ্যের সকল অংশ হইতে সদস্যগণ এই সেক্রেটারিয়েটে যোগদান করিবে। এই অর্থনৈতিক সেক্রেটারিয়েটে সকল প্রকার অনুসন্ধান করা হইবে; তথ্যাদি সঙ্কলন করা হইবে; এবং এই প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবে।

"(গ) মোটের উপর এই স্থায়ী সাম্রাজ্যিক অর্থনৈতিক সমিতি কোন প্রকার রাজনৈতিক দলাদলির ধার ধারিবে না। নির্ব্বাত দীপের ন্যায় এই প্রতিষ্ঠান স্থির ধীর ভাবে সাম্রাজ্যিক ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত থাকিবে। এই প্রতিষ্ঠান-কর্তৃক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সমস্ত প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত গোলযোগেরও নিষ্পত্তি হইবে।

"(ঘ) মালিক শ্রমিক প্রভৃতি যে-কোন অর্থনৈতিক অবস্থারই প্রতিনিধি হউক না কেন সকলেই এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবার অধিকারী হইবে। তবে প্রত্যেককেই উপরের ঐ সমস্ত সুপারিশ অনুসারে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতে দেওয়া হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক এই সেক্রেটারিয়েটে আসিয়া কেবল যে তাহাদের আপন আপন স্বার্থ-মাফিক আলোচনা করিয়া যাইবে তাহা হইবে না। প্রত্যেকে মাত্র আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সহায়তা করিবার অধিকারী হইবে।

বিলাতী বাণিজ্য-সঙ্কটে সাম্রাজ্য ভরসা

সাম্রাজ্যের স্থান সম্বন্ধে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ডের উক্তির ২।১টি টুকরা এইরূপ :

বিলাতের মোট ব্যবসা-বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ সাম্রাজ্যের ভিতর সম্পন্ন হয়; ইয়োরোপে এক-তৃতীয়াংশ বাণিজ্য হয় ; বাকী এক-তৃতীয়াংশ জগতের অন্য সমুদয় দেশের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ত্তমানের ভয়াবহ বেকার-সংখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, বিলাতের ব্যবসা বাণিজ্য আরও বাড়ানো দরকার। এই ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াইতে হইলে অনেক চুক্তি, অনেক সমঝৌতা দরকার হইবে; কিন্তু প্রত্যেক চুক্তিই এমনভাবে হওয়া চাই যে, তাহাতে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া না পড়ে। সাম্রাজ্য-ভুক্ত উপনিবেশগুলি স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে; বিলাতকেও হয়তো একদিন ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সাম্রাজ্যভুক্ত সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত বিলাতের সহিত সম্পর্ক থাকা হেতু তাহারা কিরূপ সুখ সুবিধা ভোগ করিয়াছে। এই সাম্রাজ্যে যে অসীম প্রাকৃতিক সম্পদ্ রহিয়াছে তাহার যথাযথ ব্যবহার করিতে পারার উপর নিখিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অঙ্গের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তাহাও সকলের ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

বিলাতী বাণিজ্য-হ্রাসের কারণ

ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব্ কমার্সের বিগত ষাণ্মাসিক সভার অধিবেশনে চেম্বারের প্রেসিডেণ্ট যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে গোটা দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে

অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য স্থান পাইয়াছে। ১৯৩০ সনের প্রথম ছয় মাসে বিলাতের কার্পাস শিল্পের অত্যন্ত খারাপ অবস্থা গিয়াছে। বিলাতের জাতীয় জীবনে এমন দুঃসময় আর দেখা দেয় নাই। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংরক্ষণশুল্কের ফলে ভারতে বিলাতের বস্ত্র-ব্যবসায় একেবারে পঙ্গু হইতে বসিয়াছে। বেকারের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্য হ্রাসের দুইটি বড় কারণ হইতেছে (১) সরকারী খাজাঞ্চিখানার অযৌক্তিক কার্য্যকলাপ; (২) গোটা দুনিয়ার বাণিজ্য-হ্রাস। গোটা দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে বিলাতের সুবিধা হইবে না।

দুনিয়ার আমদানি রপ্তানিতে ভাঁটা

গোটা দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট বলেন যে, অন্যান্য দেশেরও বিলাতের মত অবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিনমাসে মার্কিণের উৎপাদন পূর্ব্ব বৎসরের প্রথম তিনমাসের ৮৯·৫% মাত্র; জার্ম্মাণি এবং কানাডার অনুপাত যথাক্রমে ৯৮·৩% এবং ৮৪·৩%। ছোট খাটো দেশগুলির অবস্থা আরো শোচনীয়। পোলাণ্ডের অনুপাত ৮৩.৩%। বিলাতে কিন্তু উৎপাদন ২% বাড়িয়াছে। জাপানে উৎপাদন বাড়িয়াচে ১·৪%। সোভিয়েট রুশিয়া সকলের উপর টেক্কা মারিয়া উৎপাদন বাড়াইয়াছে ৩৪·১%। মোটামুটি বলা যায় প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় বিলাতের উৎপাদন-ক্ষমতা মন্দ নয়।

উৎপাদনের বেলায় যাহা হউক, দুনিয়ার আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ কিন্তু কমিয়া গিয়াছে। দুনিয়ার ৪৮টী বড় বড় দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ১৯২৯ সনের প্রথম তিন মাসের তুলনায় ১৯৩০ সনের প্রথম তিন মাসের বহির্ব্বাণিজ্য দাঁড়াইয়াছে ৯০·৬%। বিলাতের বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থাও প্রায় এইরূপ (৯০·১%)। সকল দেশেই আমদানির চেয়ে রপ্তানির ঘাটতি বেশী হইয়াছে। জিনিষপত্রের দর কমিয়া যাওয়া ইহার একটি কারণ।

দুনিয়ার সম্পদ্ কমে নাই

গোটা দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য হ্রাস পাইল কেন? দুনিয়ায় কি অজন্মা দেখা দিয়াছে, না দুনিয়ার উৎপাদন-ক্ষমতা অটুট রহিয়াছে। দুনিয়ার শস্য-সম্পদ্ খনিজ সম্পদ্ ইত্যাদি সমস্তই প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু এত সম্পদ-বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে সর্ব্বসাধারণে তাহার ভাগ লইতে পারিতেছে না, তাহার জন্য দায়ী মুদ্রাঘটিত অব্যবস্থা বা ব্যবস্থার অভাব। দেশে দেশে মুদ্রা-ব্যবস্থায়, বিনিময়-ব্যবস্থায় নানা প্রকার গলদ রহিয়াছে। এই অযৌক্তিক ব্যবস্থাসমূহের ফলে অষ্ট্রেলিয়ায় দারুণ অর্থসঙ্কট উপস্থিত। আমেরিকার লেনদেনের কারবার অচল। স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিলাতের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; অন্যদিকে রূপার দর কমিয়া যাওয়াতেও বিলাতের ক্ষতি হইতেছে। শুল্ক-প্রাচীরে আহত হইয়া বিলাতের ব্যবসা-বাণিজ্য কাহিল হইতেছে। এই শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া দেওয়ার জন্য জেনেভা সহর হইতে কত ওকালতি করা হইল, কত বক্তৃতা দেওয়া হইল, তবু কেহ কর্ণপাত করিল না। বাস্তবিক এই শুল্ক-ব্যবস্থা অনেকের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বিলাতের ঘোরতর অসুবিধা সত্য; কিন্তু শুল্ক-প্রাচীর-রক্ষিত দেশগুলিরও সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হইতেছে।

সাম্রাজ্যিক অবাধবাণিজ্য সম্পর্কে ম্যাক্‌ডোনাল্ড

বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত সমস্ত দেশ এবং উপনিবেশ পরস্পরের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনে মুক্তদ্বার নীতি অবলম্বন করুক অনেকে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি বিলাতের একটি শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে রামজে ম্যাকডোনাল্ড এই সাম্রাজ্যিক অবাধ বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের মনোভাব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাম্রাজ্যিক অবাধ বাণিজ্য অশ্বডিম্বের মত অলীক পদার্থ। যাঁহারা এই অসম্ভব নীতি চালাইবার জন্য আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের এইরূপ করিবার বাস্তবিক কোন হেতু নাই। প্রকৃত

পক্ষে কোন উপনিবেশ পার্লামেন্টের কোন সদস্যকে ইহার জন্য ওকালতি করিতে অনুরোধ করে নাই। উপনিবেশগুলি নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী শিল্প-বাণিজ্য চালাইবার পক্ষপাতী এবং কাজেও তাহাই করিতেছে। কোন উপনিবেশই সাম্রাজ্যিক অবাধ বাণিজ্য-নীতির পক্ষপাতী নয়। যে দলই শাসনযন্ত্র পরিচালনা করুক না কেন, বিলাতী পার্লামেন্টের এমন ক্ষমতা নাই যে জোর করিয়া এই নীতি উপনিবেশে চাপাইয়া দিবে। অনেকের ধারণা শ্রমিক গবর্ণমেন্ট উপনিবেশ লইয়া মাথা ঘামান না এবং উপনিবেশগুলির উপর তাঁহাদের কোন প্রভাব নাই। ইহা ভ্রম মাত্র। উপনিবেশগুলি বিলাতের সহিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা স্থাপন করিতে চাহিলে এমন নীতি অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে বিলাত এবং উপনিবেশ উভয়েরই সুবিধা হয়; ম্যাক্‌ডোনাল্ড বলেন, এ কাজে গবর্ণমেন্টই সব চেয়ে যোগ্য সন্দেহ নাই।

সাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া

গত ১১ই জুলাই তারিখে অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য এবং শুল্কসচিব শ্রীযুক্ত জি, ই, ফেণ্টন অষ্ট্রেলিয়ার পার্ল্যামেণ্টে বলেন যে, সাম্রাজ্যে অবাধ-বাণিজ্য চালাইবার আন্দোলন পরিহার করা কর্ত্তব্য। বিলাতী পার্লামেন্টের অনেক সদস্যও স্বীকার করিয়াছেন যে, বিলাত অষ্ট্রেলিয়াকে শুল্কজনিত কোন সুবিধা প্রদান করিতে নারাজ; অথচ অষ্ট্রেলিয়া বিলাতকে এমন অনেক সুবিধা ভোগ করিতে দিয়াছে। বাণিজ্য সচিব মহাশয় আশা করেন যে, ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে শুল্ক-বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ার প্রতি সুবিচার হইবে।

বাঙ্গালায় বয়ন-শিল্পের নয়া উত্তম

[নারায়ণগঞ্জের প্রসিদ্ধ তাঁত-নির্ম্মাতা সরকার অ্যাণ্ড সন্সের অধিস্বামীর সহিত "বাংলার বাণী" (ঢাকা) নামক পত্রিকার প্রতিনিধির কথোপকথনের মর্ম্ম ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া তা নীচে ছাপিলাম। মাধবদীর এই নূতন শিল্প-প্রচেষ্টা আর্থিক ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আঃ উঃ সম্পাদক।]

প্রঃ—বিগত অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কাগজপত্রে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মাধবদী বাজার ও তৎসন্নিকটস্থ অঞ্চল বাঙ্গালার ম্যানচেষ্টার নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে সে স্থান সম্বন্ধে কাগজপত্রে কিছু দেখিতেছি না। আপনি কিছু খবর দিতে পারেন ?

উঃ—বর্ত্তমানে আমরাই সেখানে তাঁত সরবরাহ করি। আন্দোলনের সময়কার মাধবদীর সঙ্গে এখনকার মাধবদীর রাতদিন তফাৎ—বয়নশিল্প সেখানে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। দিন নাই, রাত নাই, যখনই সে অঞ্চলে যাওয়া যায়, কেবলই তাঁতের ঠকাঠক শব্দ। মনে হয় ভারতের বয়ন-শিল্প বুঝি আবার আপন গৌরবে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

প্রঃ—কত মাইল ব্যাপিয়া তাঁত বসানো হইয়াছে ?

উঃ—মাধবদী বাজারের উত্তরে ৪ মাইল, পূর্ব্বে ২ মাইল অর্থাৎ মেঘনা নদী পর্য্যন্ত, দক্ষিণে ৫ মাইল অর্থাৎ ছাওয়াল-বামনী নদী পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ৪ মাইল অর্থাৎ লক্ষ্যা নদী পর্য্যন্ত।

প্রঃ—কতগুলি তাঁত কাজ করিতেছে এবং কত লোকের জীবিকার সংস্থান হইতেছে ?

উঃ—১ হাজার তাঁতে অনুমান ৫ হাজার নরনারী কাজ করিতেছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, এই ৫ হাজার নরনারীর অধিকাংশই অন্য জেলায় অথবা এই জেলারই অন্য স্থানে পরগাছার মতন জীবন যাপন করিত। এখানে ৫ হাজারের মধ্যে অন্ততঃ ২ হাজার স্ত্রীলোক, ভিক্ষুক অথবা বিধবা। ইহারা তাঁতের নলী জড়াইবার কাজ করে; ১ হাজার অল্পবয়স্কা বালিকা ঘরকন্নায় মায়ের সাহায্য করিত, অথবা খেলা-ধুলায় দিন কাটাইত—এখন তাহারা সুতার টানা দেয়; বাকী ২ হাজারের অধিকাংশই ১২ বৎসর হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক। তা'দের কেহ বাপমায়ের আদরে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কেহ বাপের উপর খাইত। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রেণী-বিভাগটা মোটামুটিভাবে করা হইল।

প্রঃ—আচ্ছা, এখানকার উৎপন্ন কাপড়ের মোটামুটি একটা ধারণা আমাকে দিতে পারেন ?

উঃ—মাধবদী গ্রামে প্রতি সোমবারে ১টী হাট বসে। প্রতি হাটে প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকার তাঁতের কাপড় বিক্রী হয়। সুতরাং বৎসরে কম পক্ষে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকার কাপড় এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং মাধবদীর বাজারে বিক্রয় হয়।

প্রঃ—যারা তাঁত চালায় তাদের আয় হয় কিরূপ ?

উঃ—২টী বালক বুননের কাজে থাকিলে এবং ১টী ৮।৯ বৎসরের বালিকা টানার কাজে থাকিলে মাসে ৫০৲।৬০৲ রোজগার করিতে পারে; এবং ২টী ভিক্ষুক অথবা বিধবা নলীর কাজে মাসে ১১৲।১২৲ টাকা রোজগার করিতে পারে। মোটের উপব ঐ অঞ্চলের ৫ হাজার লোক তাঁতে খাটিয়া মাসে ৬০ হাজার টাকা অর্থাৎ বৎসরে ৭।০ সওয়া সাত লক্ষ টাকা রোজগার করিতেছে।

প্রঃ—এই রোজগারের দিক্ বিবেচনা কবিয়াই কি ঐ অঞ্চলের লোকে তাঁতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, না আরও কিছু আর্থিক স্বার্থ ইহাতে আছে ?

উঃ—বাংলার প্রতি পল্লীতেই বহু নরনারী পর্‌গাছার মতন অন্যের কাঁধে ভর দিয়া জীবনযাপন করে। কিন্তু এই অঞ্চলের লোক তাঁতের কল্যাণে এখন কর্ম্মঠ হইয়া উঠিয়াছে। ফলে মজুরির হার বাড়িয়া গিয়াছে এবং ভিক্ষুকেরা ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছে। সে-অঞ্চলে গেলে এখন আর ভিক্ষুক বড় একটা দেখা যায় না।

প্রঃ—আপনার জানা আছে কি কোথাও লোকে তাঁত চালাইয়া প্রতিযোগিতার দরুণ টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই ?

উঃ—এই অঞ্চলে এমন একটি ক্ষেত্রও আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই। তাঁত কিনিয়া কেহ কেহ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কারণে চালায় নাই, কিন্তু চালাইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই এমন একটি দৃষ্টান্তও আমি জানি না।

প্রঃ—এই সব তাঁতে যে সূতা ব্যবহৃত হয় সে সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?

উঃ—যারা তাঁত চালায় তা'রা বলে যে তা'রা ৮০ আনি দেশী ও ।০ আনি বিলাতী সূতা ব্যবহার করে; কিন্তু আমার মনে হয় আধাআধি গোছের দেশী ও বিলাতী সূতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রঃ—তাঁত-শিল্পের বিশেষ কোন সুবিধা আছে বলিয়াই কি এ স্থানে বয়ন-শিল্প দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে ?

উঃ—বিশেষ কোন সুবিধা তো দেখি না। আমার বরং মনে হয়, অনেক স্থানের চেয়ে এই স্থানে নানা রকম অসুবিধাই রহিয়াছে। মাধবদীর প্রায় ৬ মাইল উত্তরে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের জিনারদী ষ্টেশন এবং ৩ মাইল পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জ-ভৈরব ষ্টিমার লাইনের ভঙ্গারচর ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে যাতায়াতেরও কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই। মাল ষ্টেশনে নেওয়ার খরচ খুব বেশী লাগে। সন্নিকটে সূতার কোন মিল নাই। কাপড় কাটতির স্থানও বহু দূরে। তবু এখানেই এই শিল্প জাগিয়া উঠিয়াছে। এমন বহু অসুবিধা সত্ত্বেও যদি বয়ন-শিল্প এখানে উন্নতি লাভ করিতে পারে তবে বাংলার সর্ব্বত্র কেন পারিবে না বুঝিতে পারি না।

প্রঃ—এই কাপড়ের কোথায় বেশী কাটতি ?

উঃ—সাধারণতঃ পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও আসামেই ইহার কাটতি বেশী। তাঁতের মোটা কাপড় (খদ্দর নামে পরিচিত) সাধারণতঃ কলিকাতায় যায়।

প্রঃ—এখানে কি কি কাপড় তৈয়ারী হয় ?

উঃ—লুঙ্গি, চারখানার সাড়ী, গামছা, তোয়ালে, মশারীর কাপড়, শীতের মোটা চাদর ইত্যাদিই বেশী হয়। সম্প্রতি দুপ্তারা নামক স্থানে তোয়ালে এবং কাঞ্চন নামক স্থানে আলপাকার চাদরও হইতেছে।

প্রঃ—এখানে কিভাবে তাঁত বিস্তৃতি লাভ করিল তাহার একটু ইতিহাস বলিবেন কি ?

উঃ—স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে (১৯০৫-৬ সন) এক ব্যক্তি হেটারস্লি তাঁত আনয়ন করেন এবং নিজ খরচে অন্য একজনকে চালাইতে শিখান। সেই সময় হইতেই ইহা অল্পবিস্তর প্রচলিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় যখন বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন ইহার চাহিদা বাড়ে। ১৯২১-২ সনে এক ব্যক্তি জাপানী নমুনার তাঁত তৈয়ারী করিতে সক্ষম হন। ইহা চিত্তরঞ্জন তাঁত নামে খ্যাত হইয়া বর্ত্তমানে অনেক উন্নত হইয়াছে। মাধবদীতে ইহার বেজায় কাট্‌তি।

প্রঃ—এই তাঁতের বিভিন্ন অংশ কোথায় তৈয়ারী হয়?

উঃ—তাঁতের মাকু ছাড়া আর সমস্তই স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানায় ঢালাই করিয়া তৈয়ারী করা হয়।

প্রঃ—এ বিষয়ে আপনার আর কোন বক্তব্য আছে কি?

উঃ—মাধবদীর বয়ন-শিল্পীদের একটী ইউনিয়ন খাড়া করিয়া কি ভাবে ভারতের বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস হইয়াছিল তাহা ক্রমাগত প্রচারের দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হইবে। অভয়াশ্রম কিংবা খাদিপ্রতিষ্ঠানের একটী কেন্দ্র করিয়া চরকার প্রচলন করিতে হইবে। এজন্য ম্যাজিক ল্যান্‌টার্ণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। উপরি উক্ত ২টী কার্য্য করিতে পারিলে সেই অঞ্চলে এক নবযুগের সূচনা হইবে।*

* এ সম্বন্ধে অথবা অন্যান্য স্থানের অনুরূপ উদ্যম সম্বন্ধে কেহ কিছু লিখিয়া পাঠাইলে তা পত্রিকাস্থ করা যাইতে পারে। পাঠক পাঠিকাদিগকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ করা যাইতেছে। আঃ উঃ সম্পাদক।

হেবেল্টহ্বির্টশাফ্‌টলিখেস্‌ আর্খিহ্ব্‌ (য়ুলি, ১৯৩০)

যুক্তরাষ্ট্রের চাষীদের অধিকৃত এসোসিয়েশনসমূহ কিরূপে শস্য বাজারে আনিয়া ফেলে—জে এফ্‌ বুথ।

যুক্তরাষ্ট্রের চাষীদের সমবায়-কৌলিন্য

যুক্তরাষ্ট্রে অর্দ্ধশতাব্দীর উপর ধরিয়া চাষীরা শস্য বাজারে ফেলিবার জন্য সমবায় সমিতিসমূহ মোতায়েন রাখিয়াছে। উৎপাদকদের লইয়া যে সব সমিতি গঠিত সেগুলি বৎসরে প্রায় ৬৫ কোটি বুশেল শস্য নাড়াচাড়া করিয়া থাকে। তা ছাড়া চাষীদের দরকারী জিনিষপত্র যোগাইবার ব্যবসাটাও অনেক পরিমাণে করে। সমবায়-বদ্ধভাবে যে শস্য বাজারে ফেলা হয় তার অধিকাংশ চালাচালি করে স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন চাষীদের এলিবেটর বা শস্যোত্তোলক। এগুলির সংখ্যা ৪,০০০। সম্প্রতি কয়েক বৎসর এই সব সমিতির কার্য্য-পরিধি বাড়াইবার জন্য বেশ চেষ্টা চলিতেছিল। ১৯২৯ সনে ফেডারেল ফার্ম্ম বোর্ড স্থাপনের পর হইতে স্থানীয় ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানকে একত্র করিয়া জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। আলোচনার সুবিধার জন্য এই সব সমিতিকে নিম্নলিখিত ৪ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ (১) স্থানীয় শস্যোত্তোলক সমিতি, (২) লাইন অর্থাৎ শ্রেণী শস্যোত্তোলক সঙ্ঘ ও সম্মিলন, (৩) বিক্রয় এজেন্সি এবং (৪) গম পুল বা সঙ্ঘ।

বাজারে ফেলিবার সমস্যার কিরূপে উদ্ভব হইল ?

গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের লোকবল সাধারণতঃ দেশের পূর্ব্বার্দ্ধভাগে জমায়েৎ হইয়াছিল, তখন চাষীদের জোট বাঁধিবার কথা উঠে নাই। ঘরের ফসল ঘরেই থাকিত অথবা কাছাকাছি শহরে চালান যাইত। কিন্তু ওহিও এবং মিসিসিপি নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী জনপদসমূহের সহিত যত লেনদেন বাড়িতে লাগিল তত বাজার-সমস্যা দেখা দিতে লাগিল।

একদিকে দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, অন্যদিকে কতকগুলি অনুষ্ঠান ও প্রথা গড়িয়া উঠিতেছিল,—পরবর্ত্তী কালে চাষীরা এ সব লইয়া অনেক কঠোর সমালোচনা করিয়াছে। এই যুগে যারা বাসস্থাপন করিতেছিল তাদের গোটা দৃষ্টি ও মনোযোগ চাষের ও বাড়ীতৈরীর দিকেই ছিল, অন্য দিকে মনোযোগ দিবার সময় ছিল না, টাকা ত ছিলই না। সুতরাং তাদের হাল-হাতিয়ার যোগাইত অন্যে, এবং বাজারে নিয়া শস্য বেচিবার জন্যও তাদের অন্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। পূর্ব্ব প্রান্তে আফিস্‌ গাড়িয়া এই প্রকার কাজের জন্য ধীরে ধীরে অনেকগুলি বড় বড় কোম্পানী গড়িয়া উঠিয়াছিল। চাষীরা কিন্তু এগুলির প্রতি সদয় ছিল না। তারা ভাবিত তাদের শ্রমের ফল অন্যেরা খাইতেছে, "সংকীর্ণ জন্মভূমি"র কোন উপকার হইতেছে না ; তারা আরও ভাবিত যে, এই সব কোম্পানী বেশী শক্তিশালী বলিয়া দর-কষাকষির বেলায় যতটা ন্যায্য পাওনা তার চেয়ে বেশী আদায় করিয়া লইত। এই মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া চাষীরা বেশ সরবে ক্রেডিট্‌ প্রতিষ্ঠান, হাল-হাতিয়ার কোম্পানী, রেলবোর্ড, মার্কেটিং এজেন্সি এবং পরে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে অভিযোগ করিতে লাগিল। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, এই সময়ে আমেরিকার ঘরোয়া যুদ্ধ হইতেছিল এবং তাতে বিগত

মহাযুদ্ধের মত চাষীদিগকে অনেক প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

ফলে চাষীদের ধারণা জন্মিল যে, এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাইবার উপায় হইতেছে একত্র জোট বাধা। নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠান গোতায়েন হইতে লাগিল। অন্য পাঁচটা বিষয়ের মত আর্থিক ক্ষেত্রেও এ ঢেউ পৌঁছিল। এ সময়ে শস্য বাজারে ফেলিবার জন্য যে সব ব্যক্তিগত কারবার ছিল, চাষীরা তাদের সম্বন্ধে নানা রকম অভিযোগ আনিয়া নিজেরা সমবেত হইয়া কাজ করিবার জল্পনা করিতে লাগিল।

গোড়াকার ইতিহাস

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হ্বিস্‌কন্‌সিন রাষ্ট্রে শস্য কেনাবেচার উদ্দেশ্যে প্রথম সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়। অন্ততঃ এর আগেকার কোন সমিতির সম্বন্ধে কোন দলিল পাওয়া যায় না। একদল চাষী মিলিত হইয়া একটি উত্তোলক তৈরী করে। এই সময়ে এইরূপ আরও সমিতি হয়ত গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তাদের কোন লিখিত ইতিহাস নাই। উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকেই মাত্র পরবর্ত্তী সমিতিগুলির কথা জানা যায়। ঐ সময়ের পর প্রত্যেক বৎসর অনেকগুলি করিয়া উত্তোলক নির্ম্মিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর আগে এ আন্দোলনটা স্থায়ী মূর্ত্তি লাভ করে নাই।

প্রথম দিক্‌কার উত্তোলক সমিতিসমূহ মাত্র আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন ব্যক্তিগত কোম্পানীগুলি এদের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিকূল আচরণ করিত। লাইন বা শ্রেণী উত্তোলক কোম্পানীগুলি বিশেষ করিয়া শত্রুতা করিয়াছিল। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অংশের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা বয়কট ইত্যাদি বিফলতার একমাত্র কারণ নয়। অনভিজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা, খারাপ পরিচালনা, রাজনৈতিক প্রভাব ও অন্যান্য কারণ কম প্রবল ছিল না।

১৯০২ সন অবধি চাষীদের উত্তোলক আন্দোলন উঠা-নামার ভিতর দিয়া গিয়াছে। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে ও সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছিল, কিন্তু ঠিক পরে সপ্তম শতকের শেষের দিকে ও অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে অবস্থা অনেক খারাপ হইয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তী আন্দোলন নবম শতকে উর্দ্ধে ও শতাব্দীর শেষের দিকে নিম্নে গিয়াছিল।

১৯০২ সনে মোড় পরিবর্ত্তন

কিন্তু ১৯০২ সনে একটি ঘটনার পর হইতে এই আন্দোলন যেন নবজীবন লাভ করিল। ঘটনাটি এই :— ঐ সনে দু' তিনটি কোম্পানী শিকাগো বাজারে চাষীদের উত্তোলক সমিতিগুলির কাছে কাজ চাহিয়া বসিল ও তাদের সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। দেখাদেখি শিকাগো ও অন্যান্য স্থলে অনেক কোম্পানী সমিতির কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে দেখা গেল যে, চাষীদের উত্তোলক ব্যবসার জন্য কর্মিশন কোম্পানীগুলির নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গেল। এর পর ১৫ বৎসরের মধ্যে কয়েক হাজার চাষীদের উত্তোলক সৃষ্টি হইল। ১৯২০ সনে এই সংখ্যা উর্দ্ধতম সীমায় পৌঁছিল,— উত্তোলক সমিতির সংখ্যা দাঁড়াইল ৫,০০০। পরে অকৃতকার্য্যতা ও একীকরণ হওয়ায় এই সংখ্যা কমিয়া ৪,০০০এ দাঁড়াইয়াছে।

স্থানীয় উত্তোলকের বর্ত্তমান অবস্থা

১৯২৮ সনে যুক্তরাষ্ট্র কৃষি-বিভাগের কৃষি অর্থনীতি বিউরোর সমবায় নীতিতে বাজারে ফেলা বিষয়ক ডিবিশন ১৫০০ সমিতি পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি তথ্য আবিষ্কার করে। এই সমিতিগুলি প্রধানতঃ ওহিও, ইণ্ডিয়ানা, ইলিনয়িস্‌, আইওআ, নেব্রাস্কা, কংসাস্‌, মিন্নেসোটা, মিসৌরি ও উভয় ডাকোটায় অবস্থিত। মিশিগান, ওক্লাহোমা, হ্বিস্‌কন্‌সিন্‌, কোলোরাডো, মণ্টানা ও অন্য কতকগুলি রাষ্ট্রেরও প্রত্যেকটিতে অল্পসংখ্যক করিয়া এইরূপ সমিতি রহিয়াছে। ১৯২৬-৭ সনের ফসল ঋতুতে ব্যবসার কথা ঐ দেড় হাজার সমিতি হইতে এই জানা যায় যে, চাষীদের উত্তোলক সমিতিসমূহ যে শস্য লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছে, তার পরিমাণ ৫৫ কোটি বুশেলের কাছাকাছি ও দাম

৫০ কোটি ডলার। ঐ বৎসরে উত্তোলক-প্রতি শস্যের পরিমাণ নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

১ নং তালিকা। যুক্তরাষ্ট্রের চাষীদের উত্তোলকসমূহ কর্ত্তৃক ক্রীতবিক্রীত শস্যের গড় পরিমাণ ও বিক্রয় মূল্য, ১৯২৬-৭ :

শস্য	পরিমাণ (বুশেল)	দাম (ডলার)
গম	৬৬,৯৩৫	৮৩,৫৬১
কর্ণ	৪৭,৪১৭	৩১,২৩০
ওট্স্	৩০,৩৬৮	১১,৮৩১
রাই	২,৫৭৩	২,২৩৭
বার্লি	৫,০৮২	৩,০৯৪
ফ্ল্যাক্স্	২,৭০৭	৫,৬৪৫
অন্যান্য	৬,৬০০	৮৭০
মোট	১৫৫,৭৪২	১৩৮,৪৭০

মনে রাখা দরকার যে, অধিকাংশ স্থলে চাষীদের উত্তোলক সমিতি ফসলের ব্যবস্থা করা ছাড়া চাষীদের কাছে বীজ, সার এবং ময়দা, কয়লা, ফার্টিলাইজার, বেড়া দিবার মাল, বাঁধিবার সূতা, কাঠ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি চাষীর পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্যাদিও বিক্রয় করিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকার দ্রব্যের পরিমাণ ফসলের পরিমাণের চেয়েও বেশী হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় তালিকায় উত্তোলক প্রতি ব্যবসা-মাত্রা দেখানো হইতেছে।

২ নং তালিকা। যুক্তরাষ্ট্রের চাষীদের উত্তোলক কর্ত্তৃক অধিকৃত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির গড় দাম ও আপেক্ষিক অনুপাত, ১৯২৬-৭ আয়তন (প্রতি উত্তোলকে কত ডলার) :

দ্রব্যাদি	বাসন্তী গম	শীত গম	কর্ণ বেল্ট	নরম গম	প্রশান্ত উপকূল	মোট আয়তন
কয়লা	৭,৭৩২	৮,০৬০	১১,১৯৭	২০,৭১৫	৩,০৭২	১০,৩৯৭
টোয়াইন	১,৮৩৬	৯৪৬	১,৩৬৫	১,০৯৮	১,২২২	১,৩৪০
কাঠ	২৯৪	২,৪৯৯	২,৪৪৭	৭৪০	৩৯৬	১,৬৭০
মেসিনারি	৬৩৮	১,৫২৯	১,৩০৪	২,৬০৭	৮৬২	১,২৯৭
আটা ও খাদ্য	৪,৪৭৪	১৩,৩৭৭	৯,৩৬৫	২৯,৪২১	৪,১৮৬	১০,৮২৯
গাই বলদ	৪,৩০১	১১,২১৫	২৯,০০৩	২২,৪৩৬	৩,৬২৫	১৭,৯৬২
বিবিধ	১,০৪৩	৫,০৬৭	৫,১৫৪	১৩,১৭৪	৬,২৭৯	৪,৯৯০
মোট	২০,৩১৮	৪২,৬৯৩	৫৯,৮৩৫	৯০,১৯১	১৯,৬৪২	৪৮,৫৮৫

মধ্য পশ্চিম রাষ্ট্রগুলিতে নরম গম আয়তনে ও কর্ণ বেল্টে সব চেয়ে বেশী বৈচিত্র্য দেখা যায়। নরম গম আয়তন বলিতে ওহিও, ইণ্ডিয়ানা, মিশিগান, আর কর্ণবেল্ট বলিতে নেব্রাস্কা, দক্ষিণ ডাকোটা মিন্নেসোটা, মিসৌরী ও ওহিও'র অন্তঃপাতী লাগালাগি অংশসমূহকে বুঝিতে হইবে। এই সব স্থলে চাষীরা প্রায়শঃ বিভিন্ন প্রকার ফসল ও গাইবলদ উৎপাদনে যত্নবান। শস্য, বিচালি, ফল, তরিতরকারী, গো-মহিষ দুধ, ডিম প্রভৃতি হইল তাদের প্রধান উৎপাদন সামগ্রী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলির কম বেশ সমাবেশ দেখা যাইবে। যে সব স্থলে একমাত্র ফসল ফলে সে সবের চেয়ে এই সব জায়গায় খাদ্য, বীজ, সার ও অন্যান্য দ্রব্য বেশী পরিমাণে কেনা হয়। সুতরাং এই সব দ্রব্য দেখিয়া বলিয়া দেওয়া যায় কোন্ ক্ষেত্রে উৎপাদন-বৈচিত্র্য কত বেশী।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তোলক-সমিতিগুলির মধ্যে একটার সহিত অন্যটার কোন সম্বন্ধ নাই। ৩নং তালিকা হইতে অংশীদার ও সুবিধা-গ্রহণকারীদের সংখ্যা জানা যাইবে।

৩নং তালিকা। যুক্তরাষ্ট্রের চাষীদের উত্তোলক সমিতি-সমূহের অংশীদার ও সুবিধা গ্রহণকারীদের সংখ্যা, পরি-শোধিত পুঁজিপাটা এবং কারখানা ও সাজসরঞ্জামের দাম ১৯২৬-৭ :

আয়তন	অংশীদার		সুবিধা-গ্রহণকারী		গড় শোধিত পুঁজিপাটা (ডলার)	কারখানা ও সাজ-সরঞ্জামের গড় দাম (ডলার)
	উত্তোলক	প্রতি উত্তোলকের গড়	উত্তোলক	প্রতি উত্তোলকের গড়		
বাসন্তী গম	২১৯	১০৭	১৭৪	১৮০	১১,৪৬৯	১৬,৩১০
শীত গম	১৭৩	১২২	১০০	২৬১	১৭,৫১৬	১৬,৯৪৫
কর্ণ বেল্ট	৩৬৭	১৩৭	২৪৬	২৮১	১৮,৯০২	১৮,৩৭১
নরম গম	৯৬	১৩৭	৬৩	৩৪৬	২১,১৪৯	১৯,৩৬০
প্রশান্ত উপকূল	২৮	৭৯	১৭	১৩২	২২,৩৩৮	২৭,৪৭২
মোট আয়তন	৮৮৩	১২৫	৬০০	২৫১	১৭,১০৫	১৭,৯৭৩

প্রত্যেক উত্তোলকের গড়ে অংশীদার ১২৫ ও সুবিধা-গ্রহণকারী তার দ্বিগুণ। এই অনুপাতে ৪,০০০ সমিতির অংশীদারের সংখ্যা ৫ লাখ ও সুবিধা-গ্রহণকারীর সংখ্যা ১০ লাখ হওয়া উচিত। কম করিয়া ধরিলে ৪½ লাখ অংশীদার ও ৯ লাখ সুবিধা-গ্রহণকারী আছে, এ অনায়াসে বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক সমিতির গড়ে ১৭,০০০ ডলারের বেশী পুঁজি আছে ও কারখানা ও সাজসরঞ্জামের দাম ১৭,০০০ ডলারের বেশী। সমুদায় চাষীর উত্তোলকগুলির দাম ৬½ কোটি ডলার বলিয়া অনুমান করা হয়। মোটের মাথায় উত্তোলকগুলির সাধারণ আর্থিক অবস্থা ভালই বলিতে হইবে,—নিট্ উদ্বৃত্তির পরিমাণ বেশ বেশী।

পূর্ব্বোল্লিখিত জরীপের ফলে দেখা গিয়াছে যে ৬২% উত্তোলক ডিবিডেণ্ড সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে, ৭৩% সভ্যদিগকে সুবিধাগ্রহণ বাবদ্ ডিবিডেণ্ড দিয়া থাকে, ৬৯% প্রত্যেক সভ্য একটি ভোট দিবে এই ব্যবস্থা বাহাল করিয়াছে, ৭৭% সভ্য কতদূর অংশ লইতে পারে তার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, আর ৯৭% সম্পূর্ণ চাষি-শাসিত বলিয়া দাবী করে।

সাধারণতঃ অংশীদার ও অনংশীদার উভয়ের নিকট হইতে শস্য কেনা হয়। কোন কোন স্থলে, বিশেষ করিয়া বাসন্তী গম আয়তনে, শস্য গুদামজাত করা হয়। কর্ণ বেল্ট ও নরম গম আয়তনে অনেক পরিমাণ শস্য সোজাসুজি আটার কল এবং খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারীদের নিকট বিক্রয় করা হয়, আর কঠিন গম ও বাসন্তী গম আয়তনে অধিকাংশ শস্য কমিশন-এজেন্সির মধ্যস্থতায় বাজারে বিক্রয় করা হয়। শস্য তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করিবার জন্য স্থানীয় ক্ষেতে বোঝাই করা হয় অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দিবার বা পৌছিবার পর বিক্রয়ের কথা থাকে।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

(১) ষ্টেট বা রাষ্ট্র সমিতি। এগুলি সরাসরি ফসল লইয়া কারবার করে না, বাণিজ্য-বিষয়ক বিধিনিষেধ, ভাড়া, কর ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে স্থানীয় সমিতিসমূহের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিয়া থাকে। জিলা ও বাৎসরিক সভায় বিভিন্ন স্থানীয় সমিতির লোকদের একত্র করা ইহার এক ধান্দা। ঐ সব সমিতির স্বার্থ সর্ব্বপ্রকারে পুষ্ট করাই ইহার উদ্দেশ্য।

(২) উত্তোলক সমিতিগুলি স্থায়ী সমিতি। এগুলিকে সংহতভাবে কাজ করাইবার ও জোট বাঁধাইবার জন্য মাসে মাসে চেষ্টা হইয়াছে। এই চেষ্টাগুলি মোটামুটি নিম্নলিখিত ৩টী প্রধান আকারে দেখা দিয়াছে।

(ক) লাইন বা শ্রেণী উত্তোলক সমিতি ও সম্মিলন। লাইনে বিভিন্ন সমিতিগুলির অস্তিত্ব একটী কেন্দ্রীয় সমিতিতে ডুবাইয়া দেওয়া হয়, আর সম্মিলনে (ফেডারেশন) সমিতিগুলির স্থানীয়ত্ব বজায় থাকে। বিভিন্ন সমিতির অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপকে একটি কেন্দ্র হইতে সুনিয়ন্ত্রিত করা এই

প্রকার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সম্ভবতঃ ১৯০৩ সনে এই প্রকার প্রতিষ্ঠান প্রথম উদ্ভূত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কানাডায় ইহা বিশেষ সফল হইলেও যুক্তরাষ্ট্রে তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই।

(খ) সমবায়-শস্য বিক্রয় এজেন্সি বা কমিশন কোম্পানী। ১৮৭০ সন হইতেই ভিতর ও বাহির বাজারে শস্য বেচাকেনা নিয়ন্ত্রিত করিবার আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি একটি বাদে পর পর উঠিয়া যায়। ১৯১৫ সনে হাচিনসনে (কংসাস) ফার্ম্মারস্ কো-অপারেটিব্ কমিশন কোম্পানী স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই প্রকৃত পক্ষে আন্দোলন স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। এক্ষণে অন্ততঃ ১০টি এইরূপ এজেন্সি চলিতেছে।

৪নং তালিকা। যুক্তরাষ্ট্রের ৮টি সমবায় শস্য কমিশন এজেন্সি যে পরিমাণ শস্য নাড়াচাড়া করিয়াছে, ১৯২৪-৫—১৯২৭-৮ (হাজার বুশেলে হিসাব) :

এজেন্সি	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
ইকুইটি ইউনিয়ান গ্রেণ কো	৩,৩২৪	৩,৮৬৩	৪,৬৫০	৬,০৯৯
ফার্ম্মার্স ইউনিয়ান জবিং এসোসিয়েশন	৬,০০০	—	—	৪,১৮২
ফার্ম্মারস ইউনিয়ান টারমিনাল	—	৮০০	৭০০	৮,০০০
ন্যাশনাল গ্রেণ কমিশন কো	৬৩১	৪৬৬	৬৪৯	১,৩৬০
রুরাল গ্রেণ কো	—	—	—	৩,২৫০
দি ফার্ম্মার্স কো-অপারেটিব কমিশন কোম্পানী	৬,১৮৭	৪,৫২৬	৭,০৯৫	৫,২৩১
দি মিশিগান এলিবেটর এক্সচেঞ্জ	৫,৩৯৫	৫,০১১	৬,২২৬	৬,৬৮৯
ইউনিয়ান ইকুইটি এক্সচেঞ্জ	—	—	৩,৫০০	১,২৫০
মোট	২১,৫৩৭	১৪,৬৬৬	২২,৮২০	৩৬,০৬১

৫নং তালিকা। যুক্তরাষ্ট্রের সমবায় শস্য কমিশন এজেন্সি যত উত্তোলক ও চাষীর হইয়া কাজ করিতেছে, ১৯২৮ :

এজেন্সি	কোন বৎসর মোতায়েন	উত্তোলক পৃষ্ঠপোষক: অংশীদার	অন্যান্য	মোট	কত চাষীর কাজ করে
ইকুইটি ইউনিয়ান গ্রেণ কো	১৯১৬	৫০	১৩০	১৮০	৭,৫০০
ফার্ম্মার্স ইউনিয়ান জবিং এসো	১৯১৮	১৮২	১৮	২০০	৭,০০০
ফার্ম্মার্স ইউনিয়ান টারমিনাল এসো	১৯২৫	৭০০	১৩৩	১৩৩	১০,০০০
ন্যাসনাল গ্রেণ কমিশন কো	১৯২০	নেব্রাস্কা ফার্ম্মার্স ইউ	১২৫	১২৫	৪,০০০
রুরাল গ্রেণ কো	১৯২৫	১৫০	৬০	২১০	৫,০০০
দি ফার্ম্মার্স কো-অপ কমিশন কো	১৯১৫	৬০	৫০	১১০	৪,০০০
দি মিশিগান এলিবেটর এক্সচেঞ্জ	১৯২০	৭৬	৭২	১৪৮	২৫,০০০
ইউনিয়ান ইকুইটি এক্সচেঞ্জ	১৯২৬	৭	৪০	৪৭	১,৫০০
	মোট	৫২৫	৬২৮	১,১৫৩	৬৪,০০০
	গড়	৬৬	৭৮	১৪৪	৮০০০

(গ) গম "পুল" বা মৌজুত রাখিবার আন্দোলন। গম যদি সুবিধামত মৌজুত করিয়া রাখা যায় তবে তার দর বাড়ানো আর শক্ত নয়। গম কেন, সকল রকম ফসলের চাষীদের মনোভাব এইরূপ। এই প্রকার প্রতিষ্ঠান কবে প্রথম মোতায়েন হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না, ১৯০৩-৪ সন হইতেই ইহার প্রভাব বাড়িতেছে। ১৯১৯ সনে ওক্লাহোমা ও কংসাসের চাষীরা এই প্রকার প্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়া সফল হইবার পর থেকে এর শক্তি বাড়িয়াছে। নীচের তালিকা হইতে সে সম্বন্ধে কিছু আভাষ পাওয়া যাইবে।

৬ নং তালিকা। যুক্তরাষ্ট্রের গম পুলে কি পরিমাণ শস্য নাড়াচাড়া করিয়াছে, ১৯২১-২২—১৯২৭-২৮

(হাজার বুশেল)

এসোসিয়েশন	ঠিকানা	প্রতিষ্ঠার তারিখ	১৯২১-২	১৯২২-৩	১৯২৩-৪	১৯১৪-৫	১৯২৫-৬	১৯২৬-৭	১৯২৭-৮
আরিজোনা গ্রেণ গ্রোয়ার্স এসো	ফিনিক্স, আরিজোনা	১৯২২	—	—	—	—	—	—	—
কালিকোর্ণিয়া ফার্ম্ম বায়ার্স এক্সচেঞ্জ	সানফ্রান্সিস্কো, কালিকোর্ণিয়া	১৯২২	—	১,২৯৬	২,৩৪৫	—	—	—	—
সেণ্ট্রাল ষ্টেট্‌স সফট হুইট্ গ্রোয়ার্স	ইণ্ডিয়ানাপোলিস, ইণ্ডিয়ানা	১৯২৪	—	—	—	১,৫২৪	৩,১৫৮	৪,১৭৭	২,২২৫
কোলারাডো হুইট্ গ্রোয়ার্স এসো	ডেনবার, কোলারাডো	১৯২২	—	৯০	১,৩০২	১,১৯২	৫৮৪	—	—
ইদাহো হুইট্ গ্রোয়ার্স এসো	আমেরিকান ফলস, ইডাহো	১৯২০	২,১৮৯	৪২৪	—	—	—	—	—
কংসাস কোঅপারেটিব্ হুইট্ মার্কেটিং এসো	হ্বিচিটা, কংসাস	১৯২৪	—	—	—	—	—	৪,০৫৫	২,৪৬৫
কংসাস হুইট্ গ্রোয়ার্স এসো	" "	১৯২১	—	২,৩৩৬	২,০৫৩	৬,১৩৮	২,৬৩২	—	—
মিন্নেসোটা হুইট গ্রোয়ার্স কোঅপ মার্কেটিং	মিন্নিয়াপোলিস, মিন্নিসোটা	১৯২৩	—	—	৫১৩	১,৭১৩	১,৩৪২	৭৯৮	৫৬৯
মণ্টানা হুইট্ গ্রোয়ার্স এসো	লিউসিটন, মণ্টানা	১৯২১	—	৬,০৪৮	৪,৩৯০	১,৫৫১	—	—	—
নেব্রাস্কা হুইট্ গ্রোয়ার্স এসো	হেষ্টিংস, নেব্রাস্কা	১৯২২	—	৩৯৭	৫৫০	১,২০৩	৬৬২	৮১৮	৬০০
নর্থ ডাকোটা হুইট্ গ্রোয়ার্স এসো	গ্রাণ্ড ফোর্ক, নর্থ ডাকোটা	১৯২২	—	২,৯৮২	২,১০০	৩,৮২৮	৩,২০৩	১,৩০০	২,৪৪৬
ওক্লাহোমা হুইট্ গ্রোয়ার্স এসো	এনিড, ওক্লাহোমা	১৯২১	—	২,৯৬১	৪,৫৬১	৬,২৮১	২,৮০১	২,৪৩৭	১,৪৪৮
ওরগণ কোঅপারেটিব্ গ্রেণ গ্রোয়ার্স	পোর্টল্যাণ্ড, ওরগণ	১৮২১	৩,৭২৭	২,৩৭৫	৩,৫০০	—	—	—	—
সাউথ ডাকোটা হুইট্ গ্রোয়ার্স এসো	এবার্ডিন, সাউথ ডাকোটা	১৯২৩	—	—	৫৩৪	২,০৪৮	২,১০০	১২৩	২,০৫৮
টেক্সাস হুইট্ গ্রোয়ার্স এসো	আমারিনো, টেক্সাস্	১৯২২	—	২১৯	১,২১০	২,৪২৯	৩৪২	৩,৩৮৪	৫৫৪
ওয়াশিংটন হুইট্ গ্রোয়ার্স এসো	স্পোকেইন, ওয়াশিংটন	১৯২২	৫,৪৫৮	২,৭৫০	৪,০৮৬	—	—	—	—
মোট			১১,৩৭৪	২১,৮৭৮	২৭,১৪৪	২৭,৯০৮	১৬,৮২৪	১৭,৬৯৩	১২,৩৬৫

কলিকাতায় চলাফেরা (সেকালে আর একালে)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। ১৯৩০। পৃঃ ॥০+১৩৮+১৪। মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

চলাফেরায় নীতি

হিতৈষণা গ্রন্থাবলীর ৩১ নং রূপে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এ ধরণের পুস্তক বেশী আছে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। কিছু কাল পূর্ব্বে "আর্থিক উন্নতি"তে ফুটপাথ সম্বন্ধে কয়েকটি নিবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাছাড়া প্রায়ই, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালায়, রাস্তাঘাট ও যানবাহন সম্পর্কিত তথ্য এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে। কোন একটি জাতিকে চিনিতে হইলে সকলের আগে যে জিনিষটা মানুষের মনে ছাপ দেয় তা হইতেছে তার রাস্তাঘাট ইত্যাদিতে অনুসৃত নীতি। বলা বাহুল্য, এই নীতি একটি মাত্র অনুশাসন বা উপদেশ নয়। লোক ও মাল চলাচলের সুবিধার জন্য যানবাহন সুনিয়ন্ত্রিত করা চাই রাস্তাঘাট, খাল-দরিয়া পরিস্কৃত থাকা চাই, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটিলে তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা থাকা চাই। আরো অনেক কিছু চাই,—রাস্তাঘাটের তদারককারীদের অনলস কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, নাগরিক বুদ্ধি ও সেই বুদ্ধির ক্রমাগত চর্চ্চা, প্রয়োজনমত অর্থ-সংগ্রহ ও সেই অর্থ যথোচিতভাবে খরচ করিবার মত প্রবৃত্তি, চলাচলকারীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানুগত্য স্বভাব বা শিক্ষালব্ধ হওয়া চাই। তারপর এই প্রত্যেকটা "চাই"কে আবার বহুভাগে চিরিয়া দেখানো যাইতে পারে চলাফেরার নীতি জিনিষটা কি।

বস্তুতঃ, একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে চলাফেরা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বহুতর আলোচনা আমাদের দেশে হওয়া উচিত। ঠাকুর মহাশয়কে এইরূপ আলোচনার অন্যতম পথপ্রদর্শকরূপে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। তিনি অবশ্য চলাফেরাকে সকল দিক্ হইতে বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে তাঁর পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে।

কলিকাতার চলাফেরা লইয়া দুইপ্রকারে কেতাব লেখা চলে। প্রথমতঃ, সেকালের অর্থাৎ লেখকের বাল্যকালের কলিকাতার সহিত বর্ত্তমান কলিকাতার তুলনা করিয়া। দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতার সহিত ভারতীয় অন্য নগরের, যথা বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর ইত্যাদির অথবা ইয়োরামেরিকার অগ্রসর দেশগুলির বিভিন্ন নগরের চলাফেরার তুলনা করিয়া। ক্ষিতীন বাবু প্রথমোক্ত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কেতাবখানা লিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তিনি এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন যা লিখিয়া না রাখিলে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব হইত। সে দিক্ হইতে বঙ্গবাসী তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে বাধ্য হইবে।

দ্বিতীয় প্রকারে কলিকাতার চলাফেরা বর্ণিত হইবার জন্য ভাবী লেখকের অপেক্ষা করিতেছে। সে কার্য্যে অভিজ্ঞ কেহ প্রবৃত্ত হইলে ভাল হয়।

কেতাবের বিষয় নির্ব্বাচন

কেতাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর লেখা হইয়াছে :

আবর্জ্জনা অপসারণ।

আবর্জ্জনার রেলগাড়ী।

বাকী আবর্জ্জনা।

গ্রন্থকারের ভূমিকাটুকু প্রণিধানযোগ্য। একস্থানে বলিতেছেন, "...এখনকার কালে তিন বেলা ধূলাকাদা-রহিত আলকাতরা-ঢালা পাথরে মোড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট দেখিয়া; এবং কনেষ্টবলদিগের এক ইঙ্গিতে সমস্ত গাড়ীঘোড়ার সারি মুহূর্ত্তের মধ্যে থামিয়া যাওয়া, বাম দিক্ ছাড়িয়া ডান দিকে গেলেই ধরপাকড়ের ব্যবস্থা, এই সমস্ত দেখিয়া অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ধূলাকাদায় পরিপূর্ণ চারিদিকের আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালে পূর্ণ রাস্তাঘাট, এবং মহা মহা ধনীদিগের কথায় কথায় চৌঘুড়ি আটঘুড়ি গাড়ী স্বেচ্ছামত ডাইনে বাঁয়ে হাঁকাইয়া গিয়া বাবুয়ানি দেখানো, আর মোসাহেবদের নিকট বাহবা পাইবার জন্য গাড়ীর সম্মুখে পথিক বা কনষ্টেবল যে-কেহ পড়িবে তাহাকে বেদম প্রহার করিয়া অকুতোভয়ে গাড়ী হাঁকাইয়া যাওয়া, আজকালকার ছেলেপিলেরা এ সমস্ত কিছুতেই কল্পনাতেই আনিতে পারে না...।" (পৃঃ ১-২)। এই একটি বাক্যে সেকালের সমাজ-চিত্র চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ গ্রন্থকার সেকালের হইয়াও সর্ব্বদা চোখ কাণ খুলিয়া সেকাল ও একালের ব্যবস্থাকে তুলনা করিয়া যা ভাল বুঝিয়াছেন তা ভাল বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁর গ্রন্থের সর্ব্বত্র এই তথ্য-প্রীতি প্রকটিত।

কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের অকর্ম্মণ্যতা ?

অনেকে বর্ত্তমান কর্পোরেশ্যনের শাসন-ব্যবস্থার বহুতর গলদ দেখাইয়া বলেন, একালে আমরা বহুতর অসুবিধা ভোগ করিতেছি। আমরা যতটা আশা করি ততটা সুখস্বাচ্ছন্দ্য হয়ত পাইতেছি না, অর্থাৎ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় আরো অনেক উন্নতির অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে সেকালে এর চেয়ে ভাল কিছু ছিল। যথা :

১। সেকালে প্রতি গৃহস্থের ঘরে গাভী ও গাড়ীঘোড়া ছিল বটে, কিন্তু "অন্যান্য শতবিধ আবর্জ্জনার সঙ্গে গোয়াল ও আস্তাবল হইতেও যথেষ্ট আবর্জ্জনা সংগৃহীত হইত।...বাড়ীর সমস্ত আবর্জ্জনাই ফটকের সম্মুখে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইত।...গোময় প্রভৃতি...এক কোণে পচিতে দেওয়া হইত।...আমাদের গোয়ালের এককোণে এই প্রকার পচা গোবরে সাদা সাদা পোকা বিজবিজ করিতেছে ......। ময়লা গাড়ীর সংখ্যাও আজকালকার মত এত বেশী ছিল না, আর মোটরলরীরও কোন বন্দোবস্ত ছিল না।" ময়লা গাড়ী ভাগাভাগি করিয়া ময়লা সরাইবার পর "বাকী-পড়া আবর্জ্জনার জ্বালায় গৃহবাসীরা উত্যক্ত হইয়া উঠিতেন।" কর্ম্মচারীদের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া কোন ফল হইত না। আর "আজকাল আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য কেবল স্থান ও কাল যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, অধিকাংশ স্থলেই খাঁজকাটা লৌহের গোল বা চতুষ্কোণ মাথাখোলা বাক্স রাখা থাকে,...সুপ্রশস্ত রাস্তাগুলির পাদ-পথের ধারে তাঁহারা (স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ) গর্ত্ত করিয়া তাহা পাকা গাঁথিয়া তাহার মধ্যে ঐ সকল আবর্জ্জনা রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন,...লৌহ-নির্ম্মিত ঢাকারও ব্যবস্থা থাকে, যাহাতে তাহার ভিতরে জল প্রবেশ করিতে না পারে।" ৫ মিনিটের মধ্যে লরি উত্তোলক যন্ত্রের সাহায্যে আবর্জ্জনা গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। (পৃঃ ৩-৬)।

২। সেকালে আপার সার্কুলার রোডের আবর্জ্জনার "রেলগাড়ী পূর্ণ করিবার সময় কাক-চিলের কি উপদ্রব, আর কি দুর্গন্ধ! ঐ রাস্তার পশ্চিম ধারে যে সকল ভদ্রলোকের বাসগৃহ ছিল, সে সমস্ত গৃহ ঐ আবর্জ্জনা-ভোজী কাক চিল এমন কি শকুনির উপদ্রবে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল...। সে সমস্ত গৃহের সার্সি ত দিবারাত্র বন্ধ করিয়া রাখা হইত; আবার যখন রেলগাড়ী লইয়া যাইতে যাইতে পরস্পরের মধ্যে ঢকাঢক ধাক্কা লাগিত" তখন আবর্জ্জনার অনেক অংশ মাটিতে পড়িত বলিয়া "সার্কুলার রোডটি দুর্গন্ধে অগম্য হইয়া উঠিত।" আজকাল আবর্জ্জনা ঢালাঢালির কাজ ৫।১০ মিনিটে শেষ হয়, তারপর সমস্ত বোঝাই গাড়ীর উপর কেম্বিস্ ঢাকা দেওয়া হয়, কাক-চিল শকুনির উপদ্রব দূর হইয়াছে। (পৃঃ ৭-৯)।

৩। সেকালে ঘোড়ার গাড়া ও বলদ-গাড়ী আবর্জ্জনা তুলিয়া লইবার পর অবশিষ্ট আবর্জ্জনার জন্য অতিশয় দুর্ভোগ ভুগিতে হইত। "বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে...মলয় বায়ু...সেই সমস্ত আবর্জ্জনার গুঁড়া বহিয়া আনিয়া চক্ষুকর্ণ ভরিয়া দিত। ...সমস্ত পথ নাকে কাপড় দিয়া চলিতে হইত।...শরৎকালে জলে ভিজিয়া, পরক্ষণে রৌদ্রে শুকাইয়া দিবানিশি যে দুর্গন্ধ বাহির করিত, তাহা বোধ হয় নরককেও হার মানাইত। সেই দুর্গন্ধের ফলে ঝাঁকে ঝাঁকে নীলমাছির আমদানি হইয়া টাইফয়েড্, কলেরা প্রভৃতি ভীষণ রোগসমূহের সৃষ্টি ও বিস্তার করিত।" (পৃঃ ১০-১১)।

আর পুথি বাড়াইবার প্রয়োজন দেখি না। বর্ত্তমান কর্পোরেশ্যন যে বহু বিষয়ে বহু উন্নতি লাভ করিয়াছে তার আরও প্রমাণ এই কেতাব হইতে পাওয়া যাইবে। আর পাওয়া যাইবে কলিকাতার যানবাহনের, কতক আদব কায়দা ও পোষাক পরিচ্ছদের ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

গ্রন্থকার গ্রন্থখানি ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে উৎসর্গ করিয়াছেন। ভূমিকায় লিখিত তাঁর সুরে সুর দিয়া আমরাও বলি, "প্রাচীন সম্প্রদায় যদি তাঁহাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তাহা হইলে স্থানীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহের পক্ষে উহা যথেষ্ট সাহায্য করিবে নিঃসন্দেহ।" আমরাও আশা করি এই কাজে আরো অনেকে অগ্রসর হইবেন। কেতাবখানা প্রত্যেক স্বদেশ-সেবীর পড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য।
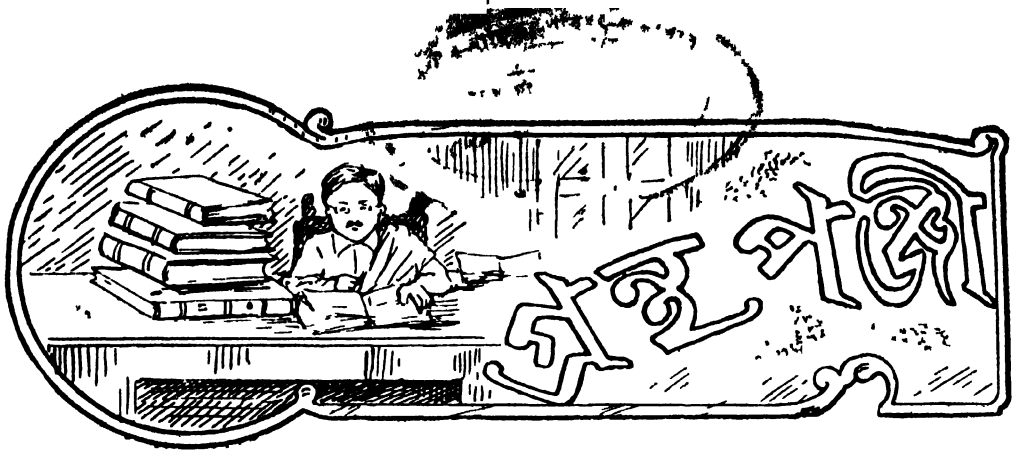
শ্রীসুধাকান্ত দে

১। "দি ফার্ম এক্সপোর্ট ডিবেঞ্চার প্ল্যান" (চাষীর উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি সম্পর্কিত ডিবেঞ্চারের মোসাবিদা), জোসেফ ষ্ট্যান্‌ক্লিথ্ ডেবিস্। কালিফোর্ণিয়াস্থ ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত খাদ্য গবেষণা মন্দির কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৯২৯। পৃঃ ১০+২৭৪।

২। "হ্যোট'স্ রং হ্বিথ আন্‌এমপ্লয়মেন্ট ইন্‌সিওরেন্স" (বেকার-বীমার গলদ্ কোথায়?) রোনাল্ড সি ডেবিসন। লংম্যানস্ গ্রীন, লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, টোরোণ্টো। ১৯৩০। পৃঃ ৭৩। ২ শি. ৬ পে।

৩। "টেন থাউজ্যাণ্ড স্মল লোন্‌স্। ফ্যাক্টস্ অ্যাবাউট্ বরোআর্‌স ইন্ ১০৯ সিটিস্ ইন্ ১৭ ষ্টেট্‌স্" (দশ হাজার ছোটখাটো কর্জ্জ। ১৭টি রাষ্ট্রের ১০৯টি শহরের অধমর্ণদের সম্বন্ধে তথ্য-তালিকা), লুইস্ এন্ রবিন্‌সন ও মড্ ই ষ্টিয়ার্ণস। স্মল লোন সিরিজ্। রাসেল সেজ্ ফাউণ্ডেশন। নিউ ইয়র্ক। ১৯৩০। ১৫৯ পৃঃ। ২ ডলার।

৪। "দি পোষ্ট-হ্বার আন্‌এমপ্লয়মেণ্ট প্রব্লেম" (যুদ্ধের পরবর্ত্তী বেকার সমস্যা), ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক অর্থনীতির অধ্যাপক হেনরি ক্লে। ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কো, লণ্ডন। ১৯২৯। পৃঃ ১০+২০৮। ৮ শি. ৬ পে।

৫। "রেলওয়ে অ্যাণ্ড সীপোর্ট ফ্রেইট্ মুব্‌মেন্ট" (রেল ও বন্দরের ভাড়া সম্বন্ধে আন্দোলন), জর্জ্জ বার্কেলি। বৃটিশ ও আমেরিকান্ প্রথার উদাহরণসহ ও স্যর এড্ওয়ার্ড গ্রিগ্ লিখিত ভূমিকা সহ। ক্রসবি লকউড্ অ্যাণ্ড সন, লণ্ডন। ১৯৩০। পৃঃ ২২১।

৬। "রুশিয়ান কো-অপারেশন এব্রড। ফরেন্ ট্রেড্ ১৯১২-২৮" (বিদেশের সহিত রুশিয়ার সহযোগিতা। ১৯১২-২৮ সনের বহির্ব্বাণিজ্য) এন্ ব্যারাউ। পি এস কিং অ্যাণ্ড সন, লণ্ডন। ১৯৩০। পৃঃ ৯৫। ২ শি. ৬ পে।

৭। "ডী ক্রাইসিস্ ইন্ ডোব্ ফোক্‌সহ্বির্টশাফ্‌ট্‌স-লিহ্‌রে" (সামাজিক অর্থনীতি শাস্ত্রের সঙ্গীন বিপদ্), ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ওথ্মার স্পান। ডুঙ্কের উণ্ড হুমব্লোট, মুনখেন ও লাইপৎসিগ্। পৃঃ ৬০। রে-মা ৩।

৮। "দি ইকনমিক আসপেক্টস অব্ হিষ্টরি অব্ দি সিভিলিজেশন অব্ জাপান" (জাপানী সভ্যতার ইতিহাসের আর্থিক ধারাবলী), য়োসাবুরো তাকেকোশি। জর্জ্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন্, লণ্ডন। ১৯৩০। প্রথম ভাগ—২৯+৫৫৫ পৃঃ; দ্বিতীয় ভাগ—১৬+৫৬৬ পৃঃ; তৃতীয় ভাগ—১৫+৪৩৬ পৃঃ।

৯। "ডাস্ আগ্রারপ্রোব্লেম ইম্ নয়েন ইয়োরোপা" (নব ইয়োরোপের চাষ সমস্যা), ডক্টর সীগ্‌ফ্রীড্ ষ্ট্রাকোশ। পল প্যারি, বার্লিন। ১৯৩০। ৪০৪ পৃঃ।

১০। "ফ্যাক্টরি লেবার ইন্ ইণ্ডিয়া" (ভারতের কারখানার মজুর), আহম্মদ মুখ্‌তার। রাও বাহাদুর এস ই রঙ্গনাথন কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সহ। আন্নামালৈ বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্পর্কিত লেখকদের প্রণীত আর্থিক গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক। মাদ্রাজ। ১৯৩০। পৃঃ ১০+৩২৮।

১১। "আফ্‌টার হ্বার্কিং আওয়ার্স। দি এন্‌জয়মেণ্ট অব্ লিজার" (কাজের পর ছুটি উপভোগ), সিডনি ডার্ক। হডার অ্যাণ্ড ষ্টাউটন। ১৯২৯। ২৫৪ পৃঃ।

পল্লীলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠান

দেশের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একটি প্রতিষ্ঠান মোতায়েন করা হইয়াছে। নিম্নে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য—পল্লীর দিকে মুখ ফিরাও

আধুনিক কালে মানুষ সহরের দিকে বেশী মাত্রায় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেশের কল্যাণের কামনায় আবার সকলের পল্লীমুখী হওয়া দরকার। কিন্তু বর্ত্তমানে পাড়াগাঁগুলি বাসের অযোগ্য শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং পাড়াগাঁগুলিকে আবার ঢালিয়া সাজিতে হইবে। পল্লীলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠান এই পল্লীসংস্কার কাজে ব্রতী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এতদর্থে কিছুদিন হইতে এই প্রতিষ্ঠান পল্লীলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ নামে একটী ব্যাঙ্কও স্থাপন করিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক হইতে পল্লীর পুনর্গঠনে অর্থসাহায্য পাওয়া যাইবে।

পল্লীর গলদ কোথায় ?

বর্ত্তমানে দুনিয়ার এক বীভৎস ছবি লোকের চোখের সাম্‌নে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার জন্য দায়ী দুনিয়ার প্রচলিত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চোখ ধাঁধিয়া দিয়াছে। সর্ব্বনেশে উচ্চাকাঙ্ক্ষার[১] বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে আজ সহরমুখো। পাড়াগাঁয়ের মাটি সকল সম্পদের মূলাধার; ঐ মাটির ভিতরে অনন্ত কৃষিসম্পদ্ লুকাইয়া রহিয়াছে; পাড়াগাঁয়ের হাটে বাজারে মণিকাঞ্চন ছড়াইয়া রহিয়াছে; পল্লীই স্বাস্থ্য এবং সুখের চিরন্তন নিকেতন। এ সব কথা লোকে বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। নগরের চাকচিক্য ও বাহ্য সৌন্দর্য্যে দিশাহারা হইয়া লোকে পল্লী ছাড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।[২] কাজেকাজেই সহরগুলিতে আজ মানুষের বেজায় ভিড়। লোক-সংখ্যার অনুপাতে সহরে কাজের অভাব; সুতরাং সহরের প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রে আজ দেখিতে পাওয়া যায়; বেপরোয়া প্রতিযোগিতা।[৩] এ ছাড়া সহরের বিলাসিতা, জীবন-ধারণের উপযোগী জিনিষপত্রের দারুণ দুর্ম্মূল্যতা, মানুষকে পিষিয়া মারিতেছে। এখানে মানুষ মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখায় না; সৎ সংসর্গের বিশেষ অভাব; অন্য পক্ষে কুসঙ্গী অহরহ পাপের পঙ্কিল পথে টানিয়া লইয়া যাইতে চায়। সমাজের আঁস্তাকুড়রূপী এই সহরে, ভগ্নস্বাস্থ্য মানুষ জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। সহুরে মানুষের আর্থিক দৈন্য তো আছেই, নৈতিক জগতেও সে দেউলিয়া হইয়া বসিয়া আছে। সহরের তো এই অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে পাড়াগাঁগুলির অবস্থাও সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। পাড়াগাঁগুলি ক্রমে উহাদের বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছে। পাড়াগাঁয়ের মানুষ সহরমুখো হওয়ায়, সহরের বিলাসিতা এবং দুর্নীতি পাড়াগাঁয়ে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। পাড়াগাঁয়ের সাধারণ লোকদের মধ্যে চিন্তা করিবার শক্তি নাই, নূতন কিছু করিবার প্রবৃত্তি নাই। পল্লীবাসীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার দিকেও কাহারও ইচ্ছা বা আগ্রহ নাই। সুতরাং গেঁয়ো মহাজন, ফড়িয়া, দালাল, মোড়ল, আইন আদালত, ঘর-ছাড়া জমীদারের নায়েব-গোমস্তা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগ, মনের সুখে পল্লীবাসীর রক্ত-শোষণ করিয়া চলিয়াছে। সমগ্র দেশ এইরূপে রসাতলে যাইতে বসিয়াছে, অধর্ম্মের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে।

---

১ উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি দোষের ? সর্ব্বনেশে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাহাকে বলে ? আঃ উঃ সম্পাদক।

২ সহরে শিল্প-বাণিজ্য ও কল্‌কারখানার অবস্থানহেতু কাজের সুবিধা একটা মস্ত বড় আকর্ষণের বস্তু, একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আঃ উঃ সম্পাদক।

৩ সম্ভবতঃ সহরের চেয়ে গ্রামে কাজের অভাব বেশী। আঃ উঃ সম্পাদক।

দুনিয়া কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। এই বিধানগুলি না মানিবার দরুণই মানুষের দুঃখকষ্ট বাড়িয়া চলিয়াছে। এই দুঃখ-কষ্টের জন্য দায়ী মানুষ নিজে, কোন বহিঃশক্তি নয়। জাতির প্রত্যেকে যতদিন না সুখী ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত সকলে আপন পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে না শিখিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। পাড়াগাঁয়েই অধিকাংশ লোকের বসতি; এই পাড়াগাঁই জাতির হৃদয়ে শোণিত সঞ্চারিত করিতেছে। জনসাধারণ এবং নেতাদের মধ্যে নাড়ীর সংযোগ স্থাপিত হওয়া চাই; নতুবা জাতীয় ঐক্য সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে এই সাধারণ লোকের উদর-পূর্ত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে; উহাদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। যাহারা পরের গলগ্রহ, যাহাদের পেটে অন্ন নাই, তাহারা স্বাধীন চিন্তা করিবে কেমন করিয়া? তাহারা নিজের উন্নতির জন্য জীবনযুদ্ধে অগ্রসরই বা হইবে কেমন করিয়া? অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিলে সকল সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানের চিন্তাবীরগণ এই সহজ সত্যটী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমান আর্থিক ব্যবস্থা দুঃখের কারণ

বিদেশ হইতে শিল্পদ্রব্য আমদানি করায় দেশের সম্পদ্ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ইহার গতি রোধ করিতে হইলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কলকারখানা এবং ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। গাদায় গাদায় মাল উৎপন্ন করিয়া দেশের অভাব পূরণ করিতে হইবে। দেশবাসীর ভাতের যোগাড়ও করিতে হইবে। কিন্তু বিদেশী প্রতিযোগিতার মুখে সরকারী সাহায্য ব্যতীত শিল্প-প্রতিষ্ঠান কায়েম করিবার উপায় নাই। বিদেশী শিল্পগুলি সরকারী অর্থ-সাহায্যে ভুঁড়ি মোটা করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু তথাকথিত শিল্পপ্রধান দেশেরই বা অবস্থাটা কি? ঐ সমস্ত দেশও আজ বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া চোখে সরিষার ফুল দেখিতেছে। দুনিয়ার অগ্রগামী দেশগুলিও ক্রমে বুঝিতে পারিতেছে যে, বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতির রথচক্রতলে মানবতা নিষ্পেষিত হইয়া মরিতেছে। বিজ্ঞানের যাদুমন্ত্রে দুনিয়ায় নূতন নূতন সম্পদের রাস্তা খোলসা হইয়া যাইতেছে সত্য, কিন্তু মানুষের ক্রমবর্দ্ধনশীল অভাবের চাহিদা ঘুচিতেছে না।* এই বিসদৃশ ব্যাপারের কারণ কি? বর্ত্তমান শিল্পব্যবস্থা তথা আর্থিক ব্যবস্থাই ইহার জন্য দায়ী। বর্ত্তমান শিল্প-ব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে এমন নীতি যাহার ফলে মুষ্টিমেয় মানুষ প্রাচুর্য্যের অধিকারী হইতেছে; আর অধিকাংশ দারুণ অভাবগ্রস্ত দাসানুদাসে পরিণত হইতেছে। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। প্রতিভা আপন মনে আপন রাস্তা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা সমীচীন নয়। লেখাপড়া শিখিলে টাকা রোজগার হইবে এই ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্দ্দশা চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক এবং গবেষকগণের পক্ষে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানুষদের কল্যাণ-সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

ব্যাধির প্রতীকার

বড় বড় মিল এবং ফ্যাক্টরি স্থাপন করিতে পারিলে বেকার-সমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে। তাহাতে পুঁজির দরকার। পুঁজিবাদ কিন্তু গোঁড়া হইতে সাধারণের নিকট অপ্রিয় বস্তু। বুদ্ধিজীবী এবং শারীরিক পরিশ্রমকারী এই উভয় প্রকার শ্রমিকদের মধ্যেই পুঁজির বিরুদ্ধে যেরূপ মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে পুঁজি-পতিদের দফারফা হইবার সম্ভাবনা। কারণ পুঁজিবাদের পশ্চাতে যে আর্থিক এবং নৈতিক দাসত্ব বিরাজমান তাহা আর কেহই বরদাস্ত করিবে না। সাম্য, স্বাধীনতা এবং স্বাবলম্বন, সকলেরই কাম্যবস্তু। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দারুণ পরিপন্থী। ইহা ক্রমাগত মানুষের মধ্যে বৈষম্য এবং বিবাদের বীজ

* ইহা ভাল না মন্দ? আঃ উঃ সঃ।

শোষণ করিতেছে। সামান্য বেতনের প্রলোভন দেখাইয়া ইহা মানুষকে অলস এবং দাসে পরিণত করিতেছে, মানুষের ভিতরকার স্বাবলম্বন-স্পৃহা, আত্মসম্মান-বোধ নষ্ট করিয়া দিয়া মানুষকে অ-মানুষে পরিণত করিতেছে। ইহার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া মানুষ স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার প্রণালী ছাড়িয়া দিয়া ইহার শরণাপন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু ইহা আদৌ মানুষের অভাব পূরণ করিতে পারিতেছে না। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদিগকেও লাভের বখরা দিয়া কার্য্য পরিচালনে সহায়তা করিতে দেওয়ার রেওয়াজ আছে বটে, কিন্তু এইরূপ কো-অপারেটিভ কন্সার্ণের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। উহাতে দশলাখ ভাগের একভাগ মানুষের সংস্থানও হইতে পারে কিনা সন্দেহ। পুঁজিপতি এবং বিশেষজ্ঞগণ লাভের বেলায় এবং কর্তৃত্ব-ব্যাপারে অন্য কাহাকেও ভাগ দিতে নারাজ। বড় বড় ফ্যাক্টরি এবং মিল স্থাপনের আর একটী দোষ এই যে, ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে গাদায় গাদায় মাল উৎপন্ন হওয়ায় নির্ব্বাণোন্মুখ কুটির-শিল্পগুলির দফারফা হইবার উপক্রম হইয়াছে। মিল অঞ্চলগুলিতে কুলি মজুররা ঘ্যাঁসাঘেঁসি করিয়া বাস করে। এই সমস্ত বস্তীতে বাস করার ফলে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সামাজিকতা গড়িয়া উঠিতে পারে না, নৈতিক স্বাস্থ্যও অধোগতি প্রাপ্ত হয়। আজকালকার অর্থনীতিবিদগণ সকলেই অল্পবিস্তর সমাজ-তন্ত্রবাদী। ইঁহারা কলকারখানার শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে আংশিক ফল মাত্র লাভ হইবে, মূল ব্যাধির কিছুই প্রতীকার হইবে না। সুতরাং শিল্প-ব্যবস্থা আবার ঢালিয়া সাজিতে হইবে। কুটির-শিল্পের মত ছোট ছোট ব্যক্তিগত কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। এই সমস্ত কারখানার উদ্দেশ্য হইবে মোটা মোটা লাভের অঙ্ক নয়। মানুষ যাহাতে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দৈনন্দিন অভাব পূরণ করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে জীবন যাপন করিতে পারে তাহাই হইবে এই নয়া শিল্পব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে সামাজিক এবং আর্থিক ব্যবস্থায় যে ঘোর বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, এই নয়া ব্যবস্থাই তাহা বিদূরিত করিবার প্রশস্ত উপায়। এই নয়া ব্যবস্থা ভাব-বাদীর স্বপ্ন-বিলাস নহে; ইহা স্বর্ণপ্রসূ মধ্যম পন্থা। কেবল মাত্র কুটীর-শিল্পের উপর নির্ভর করিলে বর্ত্তমানে চলে না, আবার আধুনিক কলকারখানা পরিচালনা-পদ্ধতিও বহু দোষ-দুষ্ট। গোটা দুনিয়াকে আজ শিল্পবহুল করিবার চেষ্টা চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানাসমূহে যুক্তি প্রয়োগনীতিরই জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে কারখানার মজুরদের দুর্দ্দশা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। এই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিলে আধুনিক শিল্প-কায়দার সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীন সত্তা এবং স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার সংযোগ স্থাপিত হইয়া দুনিয়া সম্পদশালী হইয়া উঠিবে, গোটা দুনিয়ায় শান্তি এবং মিলনের সুর বাজিয়া উঠিবে।

আত্মবিশ্বাসে গরীয়ান মানুষই মানুষ নামের উপযুক্ত। এই ধরণের মানুষের ধ্রুব লক্ষ্য হইবে স্বাবলম্বন; আর সে হইবে শারীরিক শ্রমের মর্য্যাদায় বিশ্বাসবান। প্রতিদিন-কার জীবনযাত্রায় স্বাবলম্বী হইতে শিখিলে মানুষের পৌরুষ বাড়িয়া যায়, বাস্তবিক পক্ষে ন্যায়তঃ অপরের শ্রমলব্ধ ধনে ভাগ বসাইয়া ভুঁড়ি মোটা করিবার অধিকার কোন মানুষেরই নাই। নিজের হাতে গড়া জিনিষের বাস্তবিকই একটি মোহিনী শক্তি আছে। আর ইহাতে মানুষের নৈতিকতাও বাড়িয়া উঠে। এই সমস্ত ধর্ম্মের কাহিনী এবং আদর্শবাদ আধুনিক জড়বাদী মানুষের কাছে ভাল নাও লাগিতে পারে। কিন্তু নিতান্ত লাভক্ষতির হিসাবের দিক্ দিয়াও দেখা যায় যে, মানুষ এইরূপে স্বাবলম্বী হইতে শিখিলে তাহার সুবিধাই হইবে। কারণ সকলেই যদি প্রয়োজন-মাফিক জিনিষপত্র নিজে নিজে তৈরী করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে আর তাহাকে বাজারদরের উঠা-নামা বা বাজারের অন্যান্য কেলেঙ্কারীর জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

বেকার-সমস্যায় গতিরোধ

বেকার-সমস্যা যেন আধুনিক সমাজের একটী পুরাতন ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক সহর আজ বেকার লোকের সংখ্যায় ভরপুর। সহরের সাধ্যও নাই যে এই সমস্ত লোকের কর্ম্মের সংস্থান করিয়া দিতে পারে। তবুও কিন্তু সকলেই সহরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। শিক্ষিত

ভারতবাসী এখনও নগর-রাক্ষসের বেদীমূলে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে, চিরদিনের ত্রাণকারিণী পল্লী-লক্ষ্মীর প্রতি ভুলক্রমেও চাহিয়া দেখিতেছে না। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় কারিগর-শ্রেণীর মানুষ এবং দোকানদারগণ পাড়াগাঁয়ে থাকিয়াই স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে শিল্প-ব্যবসার এখনও প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। শিল্প ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতবর্ষের মত প্রকাণ্ড উর্ব্বর দেশে সমস্ত অধিবাসীরই মাত্র কৃষিকার্য্যের দ্বারা অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে পারে। জমি জায়গা কম হইয়া গিয়াছে। খণ্ড বিখণ্ড হইয়া আকারে ছোট হইয়া গিয়াছে, এবং জমির উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি কথার কথা মাত্র। রীতিমত অনুসন্ধান করিয়া যে এই সত্যে উপনীত হওয়া গিয়াছে এমন কথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না। এই বিরাট দেশে এখনও বহু জমি অনর্থক পড়িয়া আছে। এই সমস্ত পতিত অঞ্চলে চাষবাস করিলে জমিবিহীন মানুষদের সমস্ত দুঃখকষ্ট ঘুচিয়া যাইবে। কৃষি-কার্য্য যে কি চীজ তাহা অনেকেই বোঝেন না। এই ব্যবসায় সব চেয়ে অল্প মূলধনে চলিতে পারে, এবং ইহাতে আয়াসও সব চেয়ে কম। অথচ লাভের বেলায় ইহা চা শিল্পকেও হার মানাইতে পারে। ইহাতে আর একটি সুবিধা এই যে, বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ভয় নাই।

পল্লীর শ্রী ফিরাও

বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের মতে "পাড়াগাঁয়ে অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, জীবন নাই, শিক্ষার আলোক নাই, মার্জ্জিত রুচি নাই, ইত্যাদি"। এই উক্তি যে সত্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পাড়াগাঁকে আবার ঢালিয়া সাজিতে পারিলে পাড়াগাঁয়ের মূর্ত্তি ফিরিয়া যাইবে। বাঙ্গালার পল্লীজীবন নূতন যুগের সংস্পর্শে আসিলে যে কি মূর্ত্তি ধারণ করিবে তাহার আভাষ ইতি মধ্যেই পাওয়া যাইতেছে। এই নয়া যুগের পল্লীই একালের সাধারণ মানুষের অভাব মিটাইতে সমর্থ হইবে। বর্ত্তমান অন্নসমস্যার কঠিন আঘাতে বাঙ্গালীর মনোভাব আবার পল্লীমুখী হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতার বাহন কলম, বুলি-কপচান এবং বড় বড় কলকারখানার মুরদ বেশ বোঝা গিয়াছে। মানুষের অভাব পূরণ করিবার পক্ষে এইগুলি প্রয়োজনমাফিক নয়। সুতরাং মানুষকে আবার প্রাচীন পল্লী-সভ্যতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইতেছে। বর্ত্তমানের ধ্বংসোন্মুখী পল্লীগ্রাম অবশ্য আধুনিক মানুষের সমস্ত অভাব পূরণ করিতে পারিবে না। এর জন্য পল্লীগ্রাম-গুলির রূপান্তর সাধনের দরকার। শিক্ষিত এবং উদ্যোগী কর্ম্মিগণ, উপযুক্ত অর্থ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে বাস্তবিকই পল্লীগ্রামগুলির অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। মোট কথা বর্ত্তমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাধির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে পল্লী গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করা ছাড়া উপায় নাই। এই পথেই সবচেয়ে কম বাধা, আর এইটাই প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের পথ। আজকাল অনেক সমর্থ মানুষ বেকার হইয়া বসিয়া আছে। অসংখ্য সমর্থা নারী অলসভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। পুঁজি এবং অন্যান্য প্রাথমিক জিনিষপত্র সরবরাহ করিতে পারিলে এই সমস্ত নরনারী দ্বারা সমাজের অনেক হিত হইতে পারে। এইরূপ বেকার নরনারী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশী দৃষ্ট হয়। বড় লোক যারা তাদের তো কথাই নাই; তথাকথিত ছোট লোকদেরও চলিবার ফিরিবার মতো রাস্তা আছে। মুস্কিলের ব্যাপার এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে লইয়া। এই সম্প্রদায়ের কর্ম্মহীন নরনারীকে অক্লেশে নানাপ্রকার কুটির-শিল্পে এবং কৃষিকার্য্যে মোতায়েন করা যাইতে পারে। কৃষিকার্য্য করিতে হইলেই যে খাটো কাপড় পরিয়া এক হাঁটু কাদা জলে গড়াইতে হইবে তাহা নয়। উদাহরণস্বরূপ আমেরিকার কৃষকদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক একজন আমেরিকান কৃষকের অবস্থা এত উন্নত যে ভারতের বড়ঘরের মানুষের পক্ষেও তাহা লোভনীয় হইতে পারে।

দশে মিলি করি কাজ

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখন ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে এই যে, সকলে মিলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে উল্লিখিত

ব্যাপারটী কার্য্যে পরিণত করা যাইবে না। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভূম্যধিকারী শ্রেণীই বাঙ্গালার সামাজিক জীবনের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় এই সম্প্রদায় আজ ধ্বংসের পথে যাইতে বসিয়াছে। আজ বিশেষ করিয়া এই শ্রেণীর লোকেরই "পল্লীলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠানের" সহিত যোগাযোগ স্থাপনের দরকার। ইহাতে দুই কুলই রক্ষা পাইবে। প্রথমতঃ, এই সম্প্রদায় ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের প্রজাগণও নূতন জীবন লাভ করিবে। দেশের লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু জনসাধারণের পেটের ভাতের যোগাড় করিয়া দেওয়া এবং তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তোলার চেয়ে আর মহত্তর কার্য্য কি হইতে পারে? পল্লীলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠান এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া নিম্নলিখিত মোসাবিদাটী সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছে।

মোসাবিদা

প্রতিষ্ঠান দুই শাখায় বিভক্ত হইবে। (১) নানাস্থানে জমিহীন ও অসহায় লোকদের জমি সরবরাহের জন্য আদর্শ উপনিবেশ স্থাপন এবং (২) ধ্বংসোন্মুখ পল্লীগুলির সংস্কারের জন্য আদর্শ গ্রাম্য সমাজ স্থাপন। উপনিবেশ এবং গ্রাম্য সমাজসমূহ একটী কেন্দ্রীয় বোর্ডের তাঁবে রহিবে।

কেন্দ্রীয় বোর্ড

এই প্রতিষ্ঠান ২০০০ বিঘা জমি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে। এই জমি সংলগ্ন অর্থাৎ একই স্থানে হওয়া চাই। ২০০০ বিঘার মধ্যে ২০০ বিঘা লইলেই কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হইবে। কেন্দ্রীয় বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগ থাকিবে,—যথা, ব্যাঙ্ক, বীমা, কৃষিশিক্ষা, এবং কুটির-শিল্প-শিক্ষা, গুদাম এবং বাজার বিভাগ, বিক্রয়-ডিপো, এজেন্সি, মাল চালানের বিভাগ, শিক্ষা ও প্রকাশ এবং পত্রিকা বিভাগ; লাইব্রেরি, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ক, দাতব্য-চিকিৎসালয়, ব্যায়াম, ক্রীড়া, গীত বাদ্য ইত্যাদির ব্যবস্থাও থাকিবে। বাকী জমি ২৫ বিঘা হারে ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে বিলি করা হইবে।

প্রত্যেক বিভাগের মাথায় একজন করিয়া বিশেষজ্ঞ থাকিবেন। বিশেষজ্ঞগণকে ঔপনিবেশিক বা গ্রাম্য মেম্বরদের মত, কৃষি শিল্প ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে। বিশেষজ্ঞগণকে কতকগুলি সর্ত্ত মানিতে হইবে।

খরচপত্র যতদূর সম্ভব কমাইবার জন্য সকলকেই সকলের সহিত কাজে সহযোগিতা করিতে হইবে। হাল হাতিয়ার, জল-সরবরাহ, গো-মহিষ, মালচালান ইত্যাদি ব্যাপার খুব কম খরচে চালানো যায়, যদি সকলে মিলিয়া জোট বাঁধিয়া কাজ করিতে পারে।

জল-সরবরাহ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় বোর্ড হইতে পুষ্করিণী, ড্যাম্, কিংবা টিউব্‌ওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইবে। ঐগুলির সহিত এঞ্জিন-পাম্প যোগ করিয়া, নল লাগাইয়া, প্রণালী কাটিয়া বিভিন্ন জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। এই ব্যবস্থার জন্য যে পুঁজি লাগিবে, এবং কাজ করাইবার জন্য যে খরচা পড়িবে তৎসমুদয় ঔপনিবেশিক বা মেম্বরদের নিকট হইতে হারাহারি ভাবে আদায় করা হইবে। এক একটি জমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করার চেয়ে এই ব্যবস্থায় অনেক অল্প ব্যয় হইবে।

উপনিবেশবাসীদের ও অন্যান্য লোকের ক্ষেত্রজাত ফসল ও অন্য পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়-বিভাগ, গুদাম ঘর, এজেন্সি ইত্যাদি খোলা হইবে। ঔপনিবেশিকদিগকে অল্প সুদে কর্জ্জ এবং অগ্রিম দাদন দেওয়া হইবে। ইহাতে সুবিধা হইবে এই যে, মালপত্র বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ পাওয়া যাইবে ও পরে বাজার দেখিয়া সুবিধা দরে বিক্রয় করা চলিবে।

আড়ৎদার, সুচতুর মহাজন, দালাল প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী জীবগণ আর কৃষকদের সর্ব্বনাশ করিবার সুবিধা পাইবে না। জমিজমা আবাদ, মাল চালান প্রভৃতি কার্য্যও এইরূপভাবে প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশ অনুসারে পরিচালিত হইবে।

মোট কথা এই সমস্ত উপনিবেশে সবচেয়ে অল্প পরিশ্রমে কিরূপে সর্ব্বোচ্চ লাভ হইবে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা হইবে। ফসল-নির্ব্বাচন, কর্ম্মপন্থা বা মোসাবিদা স্থির করার

উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ, নানা প্রকার ফল-বৃক্ষ, ঔষধের উপযোগী নানাপ্রকার তরুগুল্ম, বা তন্তুবিশিষ্ট ফসল্ ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধান, ডাইল, গম ইত্যাদি ফসলের আবাদ অপেক্ষা এই-সমস্ত আবাদে খাটুনি কম অথচ লাভ বেশী। ফসল নির্ব্বাচন ছাড়া আবাদের আরও একটি দিক্ আছে; তাহা আবাদের হাল-হাতিয়ার নির্ব্বাচন। উপযুক্তরূপ হাল-হাতিয়ার নির্ব্বাচন করিতে পারিলে শ্রমের যথেষ্ট লাঘব হইবার সম্ভাবনা। ভদ্রলোকগণ এই সমস্ত পন্থা অবলম্বন করিলে কৃষিকার্য্যে যথেষ্ট লাভবান্ হইতে পারেন। ইহাতে কোন ভদ্রলোকেরই মানের লাঘব হইবে না। পয়সাকড়ি রোজগারই যাঁদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁরা খাদ্য শস্য কম উৎপন্ন করিয়া অন্যান্য লাভজনক আবাদে মন দিতে পারেন। শিল্পসম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একজন ডাক্তার এবং একজন পশুচিকিৎসক হওয়া চাই।

উপনিবেশ

পূর্ব্বোক্ত আদর্শ অনুসারে দেশের সর্ব্বত্র সুবিধা পাইলেই একটীর পর একটী করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে। পুরাতন গ্রাম লইয়া গ্রাম্য সমাজ পুনর্গঠনের চেয়ে খোলা এবং পতিত জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন বেশী সহজসাধ্য। আপন আপন গাঁয়ে যাঁহাদের জমি নাই বা জমি পাওয়ারও উপায় নাই, তাঁহারা উপনিবেশসমূহে আসিতে পারেন। নিম্নে উপনিবেশ এবং ঔপনিবেশিকের নিয়মাবলী দেওয়া হইবে।

গ্রাম্য সমাজ

বাংলার ধ্বংসোন্মুখ গ্রামগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য কতকগুলি আদর্শ গ্রাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটী সমাজ খোলা হইবে। প্রত্যেক সমাজে অন্ততঃ দশজন মেম্বর থাকা চাই। এই সমস্ত সমাজের নিয়মকানুন প্রায় উপনিবেশের অনুরূপ হইবে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে কিছু কিছু ব্যতিক্রম হইতে পাবে। যাঁহারা স্বগ্রামের আগাছাপরিপূর্ণ, জঙ্গল-বহুল বা জলা কি পোড়ো জমি সকল শস্য-সম্পদে বিভূষিত দেখিতে চান, যাঁহারা অস্বাস্থ্যকর পাড়াগাঁকে আবার স্বাস্থ্যকর ও বাসের উপযুক্ত করিয়া লইতে চান, তাঁহারা অবিলম্বে এই সমস্ত সমাজের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

ভবিষ্যতের আশা

কৃষিকার্য্যের মধ্যে নানাপ্রকার ফলফুল, মসলা ইত্যাদির আবাদ করিতে সময় নিতান্ত কম লাগে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ফল পাইতে তিন হইতে ছয় মাস, ক্ষেত্রবিশেষে আবার তিন হইতে ছয় বৎসর সময়ও লাগিয়া থাকে। নারিকেল, সুপারি এবং খেজুরের আবাদই সবচেয়ে ভাল। এই সমস্ত গাছ তিন হইতে ছয় বৎসর সম্পূর্ণ বাড়ে। এই সব গাছ সহজে মরে না, অথচ ইহাতে বিঘা প্রতি লাভ হয় প্রায় ১০০৲ টাকা এবং পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত সমান তালে ফল দিয়া যায়। কিন্তু এগুলির আবাদে সঙ্গে সঙ্গেই ফসল পাওয়া যায় না। গাছ লাগাইবার পর গো-পালন। সূতাকাটা, সূতাবোনা, সূতা রঙ্গানো, রুটি তৈরী করা, কামার, ছুতারের কাজ ইত্যাদি নানাপ্রকার গৃহশিল্প দ্বারা বা খুচরা ব্যবসাদি করিয়া আবাদকারী পেটের ভাতের যোগাড় করিয়া লইতে সমর্থ হইবে। মোট কথা যদি কোন পরিবার ২৫ বিঘা জমি লইয়া এইরূপ কৃষিকার্য্যে এবং কুটির শিল্পে মনোনিবেশ করে তাহা হইলে ৮।১০ জনের পেটের ভাতের যোগাড় অক্লেশে হইতে পারে। কারণ মাত্র কৃষিকার্য্যেই ২,৫০০৲ টাকা লাভ হইবে। এই ২৫ বিঘা জমি আবাদ করিবার জন্য ২৫০০৲ টাকা মূলধন অবশ্য দরকার হইবে। কৃষিকার্য্যের মত এমন লাভ আর কোন ব্যবসাতে আছে?

তিনটী সুবর্ণ সুযোগ

যাহারা বেকার হইয়া বসিয়া আছে বা যাহাদের বেতন বা মজুরিতে পোষায় না তাহাদের সম্মুখে এই প্রতিষ্ঠান তিনটী সুবর্ণসুযোগ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

(১) আদর্শ উপনিবেশসমূহের অধিবাসী হইয়া কৃষি-কার্য্যে কুটির শিল্পে বা কৃষিজাত এবং কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে রত হইয়া মাসিক ২৫০।৩০০৲ টাকা রোজগারের পথ খোলসা করিয়া লও।

(২) গ্রাম্য সমাজের মেম্বর হইয়া ঐরূপ আয়ের উপায় করিয়া লও বা অন্ততঃ পক্ষে

(৩) অবিলম্বে পল্লীলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠানের অর্গানাইজার শ্রেণীভুক্ত হও। অর্গানাইজারকে পাড়াগাঁগুলি পুনর্গঠিত করিতে হইবে; ক্ষেত্রজাত ফসল এবং কুটিরশিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত উপায়ে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; গ্রাম্য সমিতির মেম্বর যোগাড় করিতে হইবে এবং ঔপনিবেশিক আমদানি করিতে হইবে। অর্গানাইজারগণ মাসিক ১০০৲ টাকা ভাতা পাইবে; মালপত্র যাহা যোগাড় করিবে তাহার মূল্যের ৩% কমিশন পাইবে; বা প্রত্যেক ঔপনিবেশিক, গ্রাম্য সমাজের মেম্বর বা অর্গানাইজার যোগাড় করার জন্য ১০৲ টাকা পারিশ্রমিক পাইবে।

প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী

১। ঔপনিবেশিকগণকে এবং গ্রাম্য সমাজের সদস্য-দিগকে উপযুক্ত পরিমাণ জমি এবং ঋণ প্রদান করা হইবে। ঋণ এবং জমির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল।

২। সমস্ত সদস্য ঔপনিবেশিক এবং অর্গানাইজারকে প্রথমতঃ ১০৲ চাঁদা দিয়া প্রতিষ্ঠানের মেম্বর-শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। এইরূপ মেম্বরদিগকে 'কর্ম্মী মেম্বর' এই আখ্যা প্রদান করা হইবে। যাঁহারা এইরূপ কোন কাজ করিবেন না অথচ ১০৲ টাকা বা তদতিরিক্ত চাঁদা প্রদান করিবেন তাঁহাদিগকে অবৈতনিক মেম্বর বলা হইবে।

৩। মেম্বর হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যেক কর্ম্মী মেম্বরকে ১০০৲ টাকা মূল্যের পল্লীলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের শেয়ার গ্রহণ করিতে হইবে এবং অংশের টাকাটা সম্পূর্ণরূপে এক কালে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে।

৪। অর্গানাইজার ছাড়া অন্যান্য সমুদয় কর্ম্মী মেম্বরকে বাসগৃহ প্রস্তুত করিবার ও গাঁয়ে থাকিয়া কাজ আরম্ভ করিবার জন্য মাথাপিছু প্রয়োজনীয় মূলধনের এক-চতুর্থাংশ সংগ্রহ করিতে হইবে। বাকী টাকা প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের মারফতে আস্তে আস্তে প্রদান করিবে। নেহাৎ অপারগ হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে 'কনসেশান' দেওয়া হইবে।

৫। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য মাল গুদামজাত করা, ক্রয় বিক্রয় করা, সমস্তই ষ্টোর্স এ্যাণ্ড্ মার্কেটিং ডিপার্ট-মেণ্ট হইতে করা হইবে এবং লব্ধ অর্থ সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে আমানত করা হইবে। ব্যাঙ্ক অবস্থা বুঝিয়া টাকা দাদন করিবে।

৬। সর্ব্বপ্রকার কর্জ্জের জন্য ব্যাঙ্ক ন্যায্য সুদ পাইবে এবং ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদির জন্য ব্যাঙ্ককে কিছু কিছু কমিশন দিতে হইবে।

৭। গোড়া হইতেই ঔপনিবেশিকের ও গ্রাম্য সমাজের সদস্যের অধিকারভুক্ত জমিজমার সহিত প্রতিষ্ঠানের জমি-জমার পার্থক্য থাকিবে না।

৮। ঋণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অধমর্ণের জমিজমা এবং অন্যান্য সমস্তপ্রকার সম্পত্তি ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক থাকিবে এবং অধমর্ণকে ব্যাঙ্ক এবং প্রতিষ্ঠানের মিলিত প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে হইবে।

৯। সকলের উপকারার্থ গৃহীত ঋণের জন্য সমবায় নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক অধমর্ণকেই একা ও সকলের সহিত একযোগে দায়ী থাকিতে হইবে।

১০। জমিজমা হস্তান্তরের সময় প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ ক্ষমতা থাকিবে।

১১। মাসিক ১০০৲ টাকা বেতন পাইতে হইলে প্রত্যেক অর্গানাইজারকে ১২ জন ঔপনিবেশিক, ১২ জন গ্রাম্য সমাজের সদস্য বা ১২ জন অর্গানাইজার যোগাড় করিয়া দিতে হইবে কিংবা পূর্ব্বোক্ত ফসলাদি বিক্রয় করিয়া ৪০০০৲ টাকা যোগাড় করিয়া দিতে হইবে। ইহা না করিতে পারিলে তাঁহার পারিশ্রমিক হারাহারি ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

১২। প্রত্যেক অবৈতনিক মেম্বর প্রতিষ্ঠান হইতে কন্‌সেশান রেটে খাদ্য শস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র ক্রয় করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর সে মেম্বরশিপের চাঁদার ৯% মূল্যের জিনিষ বিনামূল্যে পাইবে।

উপনিবেশের অবস্থান

উপনিবেশ গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান মাত্র, সুতরাং এমন স্থানে ইহা স্থাপন করিতে হইবে যেখানে পাড়াগাঁয়ের সমস্ত সুবিধা মিলে। আপাততঃ মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের নিকটে একটী উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে। ঝাড়গ্রামে ৫ বৎসর হইল একটী মহকুমা খোলা হইয়াছে। বি, এন রেলওয়ের ঘাটশিলার ৪টি ষ্টেশন পরে এই স্থানটী। এই স্থানে ধান এবং বাহাদুরি কাঠ প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে। কাছেই রেল থাকায় জিনিষপত্র পাঠাইবার কোন অসুবিধা নাই, আবার টাটানগর, খড়্গপুর, কলিকাতা নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ক্ষেত্রজাত জিনিষপত্র বিক্রয়েরও সুবিধা হইবে। স্থানটীতে যাইতে হইলে হাওড়া হইতে ৪ ঘণ্টা এবং খড়্গপুর ও টাটানগর হইতে আড়াই ঘণ্টা সময় মাত্র লাগে। ঝাড়গ্রাম ষ্টেশন হইতে স্থানটী ২।৪ মাইলের মধ্যে। মোটরগাড়ী, ঘোড়া সমস্তই অক্লেশে যাইতে পারিবে। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে ভদ্রমহোদয়গণের দ্বারা পরিচালিত বড় বড় কার্য্য আছে। সমস্ত কার্য্যই খুব উন্নত। সহর নিকটে থাকায় ভদ্রলোকদের পক্ষে বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। কারণ সকলেই অক্লেশে জ্ঞান এবং সভ্যতার সহিত যোগাযোগ রাখিতে পারিবে।

প্রতিষ্ঠানটী আরও অনেক স্থানে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টায় আছে, যথা, গড়িয়া, সোনারপুর, পলতা, ডায়মণ্ডহারবার, পোর্টক্যানিং, বহরমপুর, রাণাঘাট, দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট, বারাসত, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, ত্রিপুরা, বর্দ্ধমান, বীরভুম, পুরুলিয়া এবং সাঁওতাল পরগণা।

কি পরিমাণ খরচ পড়িবে ?

ব্যাঙ্কের পুঁজির সহিত মেম্বারশিপের ফি, প্রতিষ্ঠানের চাঁদা, শেয়ার বিক্রয়ের টাকা ইত্যাদি যোগ করিলে কেন্দ্রীয় বোর্ডের কোনই অর্থকষ্ট হইবে না। ব্যাঙ্কের পুঁজিও বাড়াইতে হইবে। এর জন্য লম্বা মেয়াদে ডিপজিট এবং ডিবেঞ্চারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সেণ্ট্রাল বোর্ডের আবশ্যকীয় খরচ-পত্র

ব্লক ক্যাপিটাল (থোক পুঁজিপাটা	টাকা
ঝাড় গ্রামের নিকট ২০০০ বিঘা জমি (২০০ বিঘা সেণ্ট্রাল বোর্ডের নিজের জন্য)	১০,০০০৲
২০ বিঘায় বেড়া দিবার খরচ	৫০০৲
১০টি লোকের আস্তানা (কাঠের বেড়া, খড়ের ছাউনি) আফিস, লাইব্রেরী, হাঁসপাতাল ইত্যাদি	২,০০০৲
ষ্টোর হাউস, গুদাম ইত্যাদি	৪,০০০৲
গোশালা, বাহিরের ঘর ইত্যাদি	২০০৲
ট্যাঙ্ক, ড্যাম বা টিউবওয়েল, এঞ্জিন পাম্প, উচ্চ চৌবাচ্চা, পাইপ, জলসরবরাহের ড্রেণ ইত্যাদি	৫,০০০৲
হাল-হাতিয়ার	৫০০৲
৫ জোড়া বলদ	৫০০৲
আসবাব, বই, ঔষধ ইত্যাদি	৩০০৲
রাস্তা, সড়ক, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কস	২,০০০৲
কার্য্যকরী মূলধন (ঔপনিবেশিকদের জন্য)	২০,০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড, প্রত্যেক ঔপনিবেশিকের ৫০০৲ টাকা হিসাবে	৫,০০০৲
মোট	৫০,০০০৲

প্রত্যেক ঔপনিবেশিকের খরচ

ব্লক ক্যাপিট্যাল (থোক পুঁজিপাটা)	
জমি ২৫ বিঘা	১২৫৲
বাড়ী, গোশালা, বাইরের ঘর ইত্যাদি	৫০০৲
ভাড়ায় গুদাম, ষ্টোরহাউস ইত্যাদির ব্যবস্থার জন্য বেড়া	৫০৲
হাল-হাতিয়ার	৫০৲
২টি দুগ্ধবতী গাই	২০০৲
ভাড়ায় বলদ	—

জল সরবরাহ, রাস্তা, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কস ইত্যাদির জন্য ব্যক্তিগত খরচা	১০০৲
	১০২৫৲
কার্য্যকরী মূলধন	টাকা
আবাদের খরচ (৫ বিঘা চাষের জন্ত থাকিবে)	১০০০৲
খুচরা ব্যবসা, গৃহশিল্প ইত্যাদির জন্ত কাঁচামাল	২০০৲
	২২২৫৲
ট্র্যান্সপোর্ট, মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস্ ইত্যাদির শেয়ার বাবদ	২৫৲
	২২৫০৲
মৌজুত তহবিল	৫০০৲
	২৭৫০৲

গ্রাম্য সমাজের দরুণও প্রায় এইরূপ খরচ পড়িবে।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি,
জেনারেল সেক্রেটারী।
৭৭।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ভারতের চিনির ব্যবসায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম, এ

নিম্নের তালিকায় জাভা দ্বীপের তিন বৎসরের চিনি রপ্তানির হিসাব দেওয়া হইল (এপ্রিল হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত সময়ের হিসাব):—

যে দেশে রপ্তানি	১৯২৮-২৯ (টন)	১৯২৭-২৮ (টন)	১৯২৬-২৭ (টন)*
হল্যাণ্ড	১১২৫৮	৩৪৯৯১	৫৪
বিলাত	২২১৭৬	১৩৬৪৮	১
জার্ম্মাণি	৯৪২৬	৩২৯১৯	১০
ফ্রান্স	৭৯৯৬৫	৩৯৭৬৯	২৮৪১
বেলজিয়াম	১৯১৮৫	৮২০৬	৫০০
সুইডেন	৬০২৫	...	...
গ্রীস	৪০০২	৭০১৮	...
নরওয়ে	৮৫০	...	...
ইতালী	৩০০৬	৩০১	...
পোর্ট সৈয়দ	২৩৫২৪৯	৬১৪৫৭	৬৪১৭
ডানজিগ	...	১০০০	...
মিসর	২১০১৮	...	...
মালটা	১০০০	...	...
ইয়োরোপে মোট	৪১৩৯৫২	১৯৯১০৯	১০৩২৩
মার্কিণ, আটল্যানটিক উপকূল	১০৭১	...	...
মার্কিণ, প্রশান্ত উপকূল	৫২৫৬	২০০	...
আমেরিকায় মোট	৬০২৭	২০০	...
এডেন	১৪০৯	১২৯৫৬	৩২৭৭
আফ্রিকা	৩৪৮৬	১৪৫১	২০০
আরব	২৭৬	৩৮০	৩২১
সিঙ্গাপুর	৯২,৩৪২	৮৪,১৯৭	৮১,০৬৩
পেনাং	২৭,১০৫	২৩,২৪০	২২,৯৯৯
বিটিশ মালয়	২,৮৫৮	১০০	...
ব্রিটিশ ভারত	১,১০৯,৫০১	৮৪৪,৩৬৩	৮০৩,০৪৬
শ্যাম	৩০,৮১৬	৩৪,৮৭২	৩২,৭১৬

* ১০১৬ কিলোগ্রাম—১ টন।

হংকং	৩০৫,৩০০	১৯৪,৮৩১	১৯৪,০০৪
চীন	৩১৬,৫৬১	১৯১,৮২৩	১৫২,২৪৪
জাপান ও ফর্মোজা	২২৭,৬৭৭	৪৪৯,২১৯	৪০৬,৫২২
কোরিয়া ও ডাইরেন	২৯,৩৪৩	২৭০	৪,০৯২
অষ্ট্রেলিয়া	৬২২	৩২১	৭৫
নিউজীল্যাণ্ড	৫০,৩৩৩	২৯,৯২১	১০০
সাইগন	৯,৭২৮	৭,৫৩৪	১,৭০০
ব্লাডিভষ্টক	৩,২০৫	৪,৯০০	৩,৮৮০
বৃটিশ নর্থ-বোর্ণিও	৩৮৭	৩০	৩০
ফিলিপাইন	৮১৭	১৬৫	...
পলিনেশিয়া	১,০৭৪	৫	...
পারস্য	...	২০০	...
অন্যান্য দেশ	৪০৭	৩১০	৩,১১২
প্রাচ্যে মোট	২,২২৫,৩৪৭	১,৮৮১,০৬৮	১,৭০৯,৩৮১
সর্ব্ব মোট	২,৬৪৫,৬২৬	২,০৮০,৫৭৭	১,৭১৯,৭০৪

(খ) কিউবা দ্বীপের চিনি-শিল্প

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিউবা দ্বীপের চিনি-উৎপাদন ১৯২৮ সনে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কিউবার প্রেসিডেণ্টের ঘোষণা অনুসারে এই সনে মাত্র ৪,০০০,০০০ টন চিনি উৎপাদন করা হইয়াছে। ১৯২৫, ২৬-২৭ এবং ১৯২৭-২৮ সনে এই দ্বীপের চিনি-উৎপাদন দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৪,৫০৮,৫২১, ৪,৮৮৪,৬৫৮ এবং ৫,১২৫,৯৭০ টন। তবে পুরাণো ফসলের জেরস্বরূপ ১৯২৮ সনে ২৫০,০০০ টন চিনি উৎপন্ন হয়। মোট এই ৪,২৫০,০০০ টনের মধ্যে মার্কিণ ব্যতীত অন্যান্য দেশে ৬০০০০০ টন জাহাজযোগে রপ্তানি করা হয়। ১৯২৮ সনে মার্কিণ মুলুকে কিউবা হইতে চিনির রপ্তানি হইয়াছে ২৬৩১১২৮ টন; ১৯২৭ সনে ৩১৯৮১৫৯ টন এবং ১৯২৬ সনে ৩৭,১০,১২৫ টন। ক্যানাডা দেশেও কিউবা হইতে চিনি রপ্তানির বহর কমিয়াছে। ১৯২৮ সনে ক্যানাডায় রপ্তানির পরিমাণ ৪৪,২২৪ টন, পক্ষান্তরে ১৯২৭ এবং ১৯২৬ সনে রপ্তানি হইয়াছিল যথাক্রমে ৫৭,৩৫০ এবং ৮২,০৩০ টন। বিলাতে কিন্তু কিউবা হইতে চিনি আমদানি বাড়িয়াছে। ১৯২৬, ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সনে বিলাতে কিউবা হইতে চিনি রপ্তানির পরিমাণ যথাক্রমে ৪১৬,১৬৮ টন, ৫৯১,৭৭৪ টন এবং ৮২৯,২১৬ টন। ১৯২৮ সনে কিউবা হইতে ভারতবর্ষে কোন চিনি আসে নাই। সুদূর প্রাচ্যেও রপ্তানি কমিয়াছে; কারণ ১৯২৬ সনে এই অঞ্চলে কিউবা চিনি আমদানি হইয়াছিল ১৯৬,৯৫৭ টন, কিন্তু ১৯২৮ সনে আমদানি হইয়াছে মাত্র ১৩,৮০০ টন।

১৯২৮-২৯ সনে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। এই সনের মোট উৎপাদন ৩১,৫৮৮,০০০ মেট্রিক টন। এই চিনির মধ্যে অনেক চিনি কাটে নাই। এই জন্য ১৯২৯-৩০ সনের প্রথমে মৌজুত চিনি দাঁড়ায় ৪,৭৬১,৯০০ টন। ১৯২৯-৩০ সনে দুনিয়ার মোট চিনির পরিমাণ ৩১,৬৯০,০০০ মেট্রিক টন। চিনি এত বেশী উৎপন্ন হইয়াছে যে, দুনিয়ার চিনি-শিল্পের অগ্রগতিকে বর্ত্তমানে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চিনির দাম এখন যৎপরোনাস্তি সস্তা; সুতরাং আশা আছে যে, লোকে এখন খুব চিনি খাইতে থাকিবে। যব দ্বীপে ৬ মাস ধরিয়া অনাবৃষ্টির জন্য ইক্ষু ভাল হয় নাই। সুতরাং মনে হয়; এবার জাভার চিনি উৎপাদন শতকরা ১০ হইতে ১২ পর্য্যন্ত হইবে। দাম পড়িয়া যাওয়ায় কিউবা দ্বীপেও চিনির উৎপাদন কম হইবার সম্ভাবনা। ১৯৩০ সনের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় চিনির দাম সবচেয়ে বেশী কমিয়া যায়। এই সময়ে কলিকাতায় চিনির দাম দাঁড়ায় মণকরা ৮।১০ পাই। ১৯২৯ সনের অক্টোবর হইতে ১৯৩০ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত জাভায় চিনি-উৎপাদন পূর্ব্ববর্ত্তী সনের আলোচ্য কয় মাসের তুলনায় অনেক কম দাঁড়ায়। ১৯৩০ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে জাভায় চিনি মৌজুত ছিল প্রায় ৭০০,০০০ টন। রৌপ্যের দর কমিয়া যাওয়ায় চীনের বাজারেও চিনির ব্যবসা কমিয়াছে। মোট কথা যবদ্বীপে এখন অনেক চিনি মৌজুত আছে। কিন্তু দর জাভার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে কি না সন্দেহের বিষয়।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

আর্থিক জরীপের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

গত ১৫ই জুন, ১৯৩০, তারিখে বেত্‌কা (ঢাকা) ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "আর্থিক উন্নতির" সম্পাদককে একখানা চিঠি লিখেন। চিঠির ভাবার্থ এই যে, "বর্ত্তমান সেন্সাসের সুযোগে একটি ইকনমিক সার্ভে বা আর্থিক জরীপ করিয়া লওয়া দরকার। সেজন্য একটা প্রশ্নপত্র চাই।" সম্পাদক মহাশয় সেই পত্র জার্ম্মাণি হইতে পরিষদের নিকট পাঠাইয়া দেন। তদনুসারে ঐরূপ একটা প্রশ্নপত্র তৈরী করিয়া গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে বেত্‌কায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম অধিবেশন

পরিষদের তৃতীয় বৎসরের প্রথম অধিবেশন ৩০ নবেম্বর, ১৯৩০, ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইয়া গিয়াছে। উপরোক্ত প্রশ্নপত্র লইয়া আলোচনা করা অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিল। প্রশ্নপত্রের খসড়া তৈরী করিয়াছেন শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে। আলোচনা করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বসু ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার। আলোচনার ফলে প্রশ্নপত্রে কিঞ্চিৎ যোগ বিয়োগ করা হয়।

প্রাপ্তি স্বীকার

(ক) মেজর বামনদাস বসু প্রণীত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

স্বর্গীয় মেজর বামনদাস বসু মহাশয় আমাদের প্রথম সভাপতি ছিলেন, এই হিসাবে তাঁর প্রণীত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত পুস্তকসমূহ পরিষদের লাইব্রেরীতে রাখিবার জন্য সেগুলি চাহিয়া পাঠানো হইয়াছিল। তদুত্তরে তাঁর সুযোগ্য পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু মহাশয় পরিষৎকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন:

(১) কালচার—মেজর বামনদাস বসু। (২) ডায়েবেটিস্ মেলিটাস—মেজর বসু (ডাক্তার ললিতমোহন বসু সম্পাদিত)। (৩) ষ্টোরি অব্ সাতারা—মেজর বসু। (৪) হিষ্টরি অব্ এডুকেশন ইন্ ইণ্ডিয়া আণ্ডার দি রুল অব্ দি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—ঐ। (৫) রুইন্ অব্ ইণ্ডিয়ান ট্রেড অ্যাণ্ড ইন্‌ডাষ্ট্রিজ—ঐ। (৬) দি কন্‌সলিডেশন অব্ ক্রশ্চান পাওয়ার ইন্ ইণ্ডিয়া—ঐ। (৭) মাই সোজোর্ণ ইন্ ইংল্যাণ্ড—ঐ। (৮) সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণ—ব্রিগস্। (৯) হিষ্টরি অব্ নাদির শা—জেম্‌স ফ্রেজার। (১০) হিষ্টরি অব্ শাহ আলম্—ডব্লিউ ফ্রাঙ্কলিন। (১১) হিষ্টরি অব্ রেইন অব্ টিপু সুলতান—কর্ণেল মাইল্‌স। (১২) প্রাইবেট জার্ণাল অব্ মার্ক্‌ইস অব্ হেষ্টিংস। (১৩) ডেকয়টী ইন্ এক্সসেলসিস্ অর স্প্যলেশন অব্ আউধ বাই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—মেজর বার্ড। (১৪) এম্পায়ার ইন্ এশিয়া। হাউ উই কেম্ বাই ইট্। এ বুক অব্ কনফেশনস্—ডব্লিউ এম্ টরেন্স। (১৫) দি গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া আণ্ডার এ বুরোক্রেসী—জন ডিকিন্সন। (১৬) দি নেটিব্ ষ্টেট্‌স। (১৭) দি ষ্টেট্ অ্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া আণ্ডার ইট্‌স নেটিব্ রুলার্স। (১৮) দি কোম্পানী অ্যাণ্ড দি ক্রাউন—অনারেবল টি যে হোবেল টারনো। (১৯) এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ আওয়ার ফিন্যান্‌সিয়েল রিলেশনস উইথ ইণ্ডিয়া—মেজর উইঙ্গেট। (২০) থটস অন্ দি পলিসি অব্ দি ক্রাউন টুওয়ার্ডস ইণ্ডিয়া—জন এস লুডলো। (২১) অরিজিন অব্ দি পিণ্ডারীজ্ [৮ হইতে ২১ পর্য্যন্ত 'ভারতীয় ইতিহাস' সিরিজের অন্তর্গত]। (২২) হিষ্টরি অব্ বৃটিশ অকুপেশন অব্ ইণ্ডিয়া। (২৩-২৪) দি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল প্ল্যাণ্টস, চারিভাগ প্লেট্‌স বহি সহ।

এই উপলক্ষ্যে পরিষদের পক্ষ হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে। তাঁর বদান্যতা সকলের অনুকরণীয়।

(খ) কার্ণেগী প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক শান্তি পরিষদের সহিত যোগাযোগ

কিছু কাল পূর্ব্বে কার্ণেগী এনডাওমেণ্ট ফর ইণ্টারন্যাশনাল পীস নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত মারে বাট্‌লার মহাশয়কে পরিষদের তরফ হইতে তাঁদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তদুত্তরে তিনি পরিষৎকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন :

১। ডিবিসন অব্ ইণ্টারকোর্স অ্যাণ্ড এডুকেশন (শিক্ষা ও সহযোগ বিভাগ)—

(১) এডুকেশনাল এক্সচেঞ্জ হ্বিথ জাপান; (২) ফর্ম্মার সেনেটর বার্টনস্ ট্রিপ টু সাউথ আমেরিকা, ১৯১৫—অটো শোয়েনরিখ্; (৩) হাইজীন অ্যাণ্ড হ্বার; (৪) রুশিয়া, দি রিবলিউশন অ্যাণ্ড দি হ্বার—ক্রুশ্চান এল্ লাণ্ডে; (৫) সাউথ আমেরিকান অপিনিয়নস্ অন্ দি হ্বার: চিলি অ্যাণ্ড দি হ্বার; দি এটিচিউড্ অব্ ইকোয়াডোর; (৬) রিলেশনস্ বিটুইন্ ফ্রান্স অ্যাণ্ড জার্ম্মাণি—আঁরি লিক্‌তেন বের্গের; (৭) দি রুড় কন্‌ফ্লিক্ট। [এই বিভাগে প্রকাশিত ১৯টি কেতাবের মধ্যে বাকী ১২টি আর ছাপা নাই।]

ইণ্টারন্যাশনাল কনসিলিয়েশন—আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী : (১) দি জেপানীজ ল অব্ ন্যাশানিলিটি অ্যাণ্ড দি রাইট্‌স্ অব্ ফারমার্স্ ইন্ ল্যাণ্ড আণ্ডার দি লজ্ অব্ জেপান; (২) এলিহু রুট্‌স্ সার্বিসেস্ টু ইণ্টারন্যাশনাল ল; (৩) প্ল্যান্‌স্ অ্যাণ্ড প্রোটোকোল্‌স্ টু এণ্ড হ্বার; (৪) দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স অ্যাণ্ড ডয়েস্ অ্যানুইটি; (৫) আমেরিকান্ আইডিয়েল্‌স্ ডিউরিং দি পাষ্ট হাফ্ সেঞ্চুরি; (৬) ডিপ্লোমেটিক রিলেশন্‌স বিটুইন দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ অ্যাণ্ড জেপান, ১৯০৮-১৯২৪। (৭) ইয়োরোপীয়ান্ সিকিউরিটি; (৮) দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স অ্যাণ্ড দি সীষ্টেম অব্ ম্যাণ্ডেট্‌স্; (৯) দি অ্যাড্‌ভাইসরি অপিনিয়নস্ অব্ দি পার্ম্মানেণ্ট কোর্ট অব্ ইণ্টারন্যাশনাল জাষ্টিস্; (১০) দি ট্রেণ্ড অব্ ইকনমিক রেষ্টোরেশন সিন্স দি ডয়েস্ রিপ্যারেশন সেট্‌লমেণ্ট; (১১) ফাইনাল প্রোটোকোল অব্ দি লোকার্ণো কনফারেন্স ১৯২৫, অ্যাণ্ড দি ট্রিটিজ বিটুইন ফ্রান্স অ্যাণ্ড পোল্যাণ্ড, অ্যাণ্ড ফ্রান্স অ্যাণ্ড জেকোশ্লোবাকিয়া; (১২) প্রেজেণ্ট কনডিশনস্ ইন্ রুশিয়া, ১৯২৫; (১৩) দি ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব প্যাসিফিক্ রিলেশন্‌স্; (১৪) দি ফোর্থ ইয়ার অব্ ইণ্টারন্যাশনাল কোর্ট অব্ জাষ্টিস্; (১৫) ডিস্‌আর্ম্মামেণ্ট অ্যাণ্ড আমেরিকান্ ফরেন্ পলিসি; (১৬) ট্রিটি মেকিং পাওয়ার আণ্ডার দি কনষ্টিটিউশন অব্ জেপান; (১৭) দি প্রব্লেম অব্ মাইনরিটিজ্; (১৮) দি পোলিটিকাল ডক্ট্রিন অব্ ফ্যাসিজ্‌ম্; (১৯) অ্যান অলটারনেটিব্ ইউস্ অব্ ফোর্স; (২০) অবজার্ভেশনস্ ইন্ ঈজিপ্ট, প্যালেষ্টাইন অ্যাণ্ড গ্রীস্; (২০) দি শ্লেভারি কনবেনশন অব্ জেনেবা; (২২) মেমরেণ্ডাম্ টু দি জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট; (২৩) দি নিউ জার্ম্মাণি; (২৪) দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স অ্যাণ্ড ট্রিটিজ্ ফর দি এভয়ডেন্স অব্ হ্বার; (২৫) দি ল অন্ বুলগেরিয়ান্ ন্যাশানালিটি; (২৬) দি সিক্সথ্ ইণ্টারন্যাশনাল অব্ আমেরিকান্ ষ্টেট্‌স; (২৭) দি ফিউচার অব্ নিউট্রালিটি; (২৮) দি প্যাক্ট অব্ প্যারিস্; (২৯) পোষ্ট হ্বার ট্রিটিজ অব্ সিকিউরিটি অ্যাণ্ড গ্যারাণ্টি; (৩০) দি পোষ্ট-হ্বার মুবমেণ্টস্ টু রিডিউস্ ন্যাবাল আর্ম্মামেণ্টস্; (৩১) দি অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ প্রোজেক্ট ফর লিমিটেশন অব্ আর্ম্মামেণ্ট; (৩২) পলিসি অব্ দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ অ্যাণ্ড আদার নেশনস্ হ্বিথ রেস্পেক্ট টু দি রিকগ্‌নিশান অব্ দি রুশিয়ান সোবিয়েট গবর্ণমেণ্ট, ১৯১৭-১৯২৯; (৩৩) কেমিক্যাল হ্বারফেয়ার—ইট্‌স পসিবিলিটিস্ অ্যাণ্ড প্রবেব্‌লিটিস্; (৩৪) দি প্র্যাক্‌টিক্যাল হ্বার্কিং অব্ দি লীগ অব্ নেশন্‌স্: এ কংক্রীট এক্‌জাম্পল্; (৩৫) দি প্রব্লেম অব্ অষ্ট্রো-জার্ম্মাণ ইউনিয়ান; (৩৬) দি এম্‌বার্গো রিজলিউশনস্ অ্যাণ্ড নিউট্রালিটি; (৩৭) দি সোবিয়েট সিকিউরিটি সীষ্টেম; (৩৮) দি রিপ্যারেশন সেট্‌লমেণ্ট; (৩৯) দি পার্ম্মানেণ্ট কোর্ট অব্ ইণ্টারন্যাশনাল জাষ্টিস্—আমেরিকান্ অ্যাক্‌সেশন অ্যাণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্টস্ টু দি ষ্ট্যাটিউট্; (৪০) অবজার্বেশনস্ অন প্রেজেণ্ট ডে রুশিয়া; (৪১) বৃটিশ আর্বিট্রেশন পলিসিজ্; (৪২) দি এইটথ্ ইয়ার অব্ দি পার্ম্মানেণ্ট কোর্ট অব্ ইণ্টারন্যাশনাল জাষ্টিস্;

(৪৩) দি কিয়োতো কনফারেন্স অব্ দি ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ প্যাসিফিক রিলেশন্‌স; (৪৪) দি সোবিয়েট অ্যাণ্ড রিলিজন। [২০০-২৬১ পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে]।

২। ডিবিসন অব্ ইণ্টারন্যাশনাল ল (আন্তর্জ্জাতিক আইন বিভাগ)—প্যাম্ফলেট বা পুস্তিকা সিরিজ:

(১) আর্বিট্রেশনস্ অ্যাণ্ড ডিপ্লোমেটিক সেটেলমেণ্টস্ অব্ দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স; (২) লিমিটেশন অব্ আর্মামেণ্ট অন্ দি গ্রেট লেক্‌স; (৩) সিগনেচার র‍্যাটিফিকেশনস্, অ্যাডিসন্‌স অ্যাণ্ড রিজার্বেশন্‌স টু দি কনবেনশনস্ অ্যাণ্ড ডিক্লারেশনস অব্ দি ফার্ষ্ট অ্যাণ্ড সেকেণ্ড হেগ পীস্ কনফারেন্সেস্; (৪) ফাইনাল অ্যাক্টস্ অব্ দি ফার্ষ্ট অ্যাণ্ড সেকেণ্ড হেগ পীস্ কনফারেন্সেস, টুগেদার উইথ দি ড্রাফট্ কনবেনশন অন্ এ জুডিশিয়েল আর্বিট্রেশন কোর্ট; (৫) দি হেগ কনবেনশন অব্ ১৯০৭ কনসার্ণিং দি রাইট্‌স অ্যাণ্ড ডিউটিস অব্ নিউট্রাল পাওয়ার্স ইন্ ন্যাবাল ওয়্যার; (৬) ডকুমেণ্টস রেসপেক্টিং দি লিমিটেশন অব্ আর্ম্মামেণ্টস; (৭) দি এফেক্ট অব্ ডিমক্রেসি অন্ ইণ্টারন্যাশনাল ল; (৮) ডকুমেণ্টস রিলেটিং টু দি প্রগ্রাম অব্ দি ফার্ষ্ট হেগ পীস কনফারেন্স; (৯) দি হেগ কোর্ট রিপোর্টস; (১০) দি কনসর্টিয়াম; (১১) কনষ্টিটিউশনাল গবর্ণমেণ্ট ইন্ চায়না; প্রেজেণ্ট কনডিশনস অ্যাণ্ড প্রস্‌পেক্টস্। (১২) দি নিউ আস্পেক্টস অব্ ইণ্টারন্যাশনাল ল। [এই বিভাগে ৫১ খানা পুস্তকের মধ্যে বাকীগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে]।

৩। ডিবিসন অব্ ইকনমিক্‌স্ অ্যাণ্ড হিষ্টরি (অর্থশাস্ত্র ও ইতিহাস বিভাগ)-প্রিলিমিনারি ইকনমিক ষ্টাডিজ অব্ দি ওয়্যার (যুদ্ধ সম্বন্ধে আর্থিক পঠন-পাঠন, প্রথম ধাপ):

(১) ওয়্যার অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব্ দি রেলওয়েজ ইন্ দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স অ্যাণ্ড গ্রেট বৃটেন; (২) ইকনমিক এফেক্টস অব্ দি ওয়্যার আপন উইমেন অ্যাণ্ড চিলড্রেন ইন্ গ্রেট বৃটেন; (৩) ডিরেক্ট কষ্টস অব্ দি প্রেজেণ্ট ওয়্যার; (৪) বৃটিশ ওয়্যার অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন; (৫) গবর্ণমেণ্ট কনট্রোল অ্যাণ্ড অপারেশনস অব্ ইনডাষ্ট্রি ইন্ গ্রেট বৃটেন অ্যাণ্ড দি ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স ডিউরিং দি ওয়ার্ল্ড ওয়্যার। (৬) গবর্ণমেণ্ট ওয়্যার কণ্ট্রাক্টস (মোট সংখ্যা ২৫ খানা, বাকীগুলি ছাপা নাই)। =মোট ৬৯ খানা+১৯৩০ সনের ইয়ার বুক।

আর্থিক জরীপের প্রচেষ্টা

পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গ্রাম বা ইউনিয়নের আর্থিক জরীপের জন্য বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ এক প্রশ্নপত্রের খসড়া তৈরী করিয়াছেন। এই প্রশ্নপত্র অবলম্বন করিয়া যিনি সকলের চেয়ে ভাল জরীপ পাঠাইতে পারিবেন তাঁকে পরিষৎ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করা যাইতেছে।

নিয়মাবলী:

১। এই জরীপের দুটি ভাগ থাকিবে। প্রথম ভাগে প্রশ্নপত্রগুলির যথাযথ উত্তর দিতে হইবে। দ্বিতীয় ভাগে প্রথম ভাগে সংগৃহীত তথ্যরাজি হইতে নিজ তত্ত্ব বা গবেষণার ফল সন্নিবিষ্ট হইবে।

(ক) প্রত্যেক পরিবার বা ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্যগুলি বিশেষ চেষ্টায় নিজের হাতে যথার্থতঃ পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

(খ) তথ্য ও তত্ত্ব একত্রে পরিষদের নিকট বিচারার্থ পাঠাইতে হইবে।

২। কোন কল্পিত ব্যক্তি বা পরিবারের কাহিনী অথবা ব্যক্তি বা পরিবারের অপ্রকৃত তথ্য গ্রাহ্য হইবে না। খাঁটি সত্য কথা চাই। উত্তর সম্পর্কে পুনরায় কোন প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলে এক সপ্তাহ মধ্যে জবাব দেওয়া চাই।

৩। যে কেহ প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন।

৪। পুরস্কার-প্রার্থী ব্যক্তিকে আগামী ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে। আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক।

(১) আবেদনকারীর নাম, (২) পেশা, (৩) কোন্ গ্রামে (বা শহরে) কতদিন আছেন, (৪) পড়াশুনা কতদূর হইয়াছে, (৫) যে স্থানের তথ্য দিতে ইচ্ছা করেন তথায় কত পরিবার ও কত লোক আছে?

আবেদনপত্র পৌঁছিলে পরিবার বা লোকাসুপাতে তত্তগুলি প্রশ্নপত্র পূরণ করিয়া পাঠাইবার জন্য ২০শে চৈত্র সকলের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হইবে। সুতরাং সাবধানে গণনা করিতে হইবে।

৫। আগামী ২৫শে শ্রাবণের মধ্যে এই জরীপ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সহঃ সম্পাদক বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ,
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌,
কলিকাতা।

"জরীপ"গুলি ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে।

৬। আগামী আশ্বিন মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে পুরস্কৃত ব্যক্তির নাম প্রকাশিত হইবে। টাকা কার্ত্তিক মাসের শেষে প্রেরিত হইবে।

৭। পরিষদের বিচারফল চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

দ্রষ্টব্য: সহর, গ্রাম বা সহরের অংশ-বিশেষ ধরিয়া জরীপ করিলেও চলিবে।

শ্রীসুধাকান্ত দে,
সহঃ সম্পাদক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ।

ভারতীয় রাজস্বের ভবিষ্যৎ

(শ্রীযুক্ত লেটনের যুক্তি)

শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, এম-এ

[ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ পার্লামেণ্ট সাইমন কমিশনকে নিযুক্ত করেন। রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনকে সাহায্য করিবার জন্য লণ্ডন "ইকনমিষ্ট"'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত লেটন মনোনীত হন। কমিশনের রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীযুক্ত লেটনের সিদ্ধান্তগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। মোটামুটিভাবে কমিশনও ঐগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নে শ্রীযুক্ত লেটনের সিদ্ধান্তের মর্ম্ম দেওয়া হইল]।

(১)

যে কোনও দেশের শাসন-পদ্ধতির সহিত রাজস্ব-ব্যবস্থার সম্বন্ধ অতি নিকট। একতন্ত্র রাষ্ট্রে (ইউনিটারি ষ্টেটে) যেরূপ রাজস্ব ব্যবস্থা হইবে সম্মিলিত রাষ্ট্রে (ফেডারেল ষ্টেটে) সেরূপ হইবে না। বস্তুতঃ, সম্মিলিত রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এবং বিবিধ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির মধ্যে পরস্পর সম্পর্কটা কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম দ্বারা নিরূপিত হয়। রাষ্ট্রের মুখ্য কর্ত্তব্যগুলি (যেমন শান্তি ও শৃঙ্খলা, রাষ্ট্ররক্ষা প্রভৃতি কাজ) সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং গৌণ কর্ত্তব্যগুলি (যেমন শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত থাকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অধিকার এইরূপে বণ্টন করার দরুণ রাজস্বেরও এইরূপ একটা বণ্টন দরকার হইয়া পড়ে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা দাবী করা খুবই স্বাভাবিক। এই সব বিভিন্ন কার্য্যের সুপরিচালনের জন্য এবং প্রতিনিয়ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে সঙ্ঘর্ষ না হয় সেই জন্য রাজস্ব সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা থাকা খুবই দরকার।

আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি সম্মিলিত তন্ত্রানুযায়ী হইবে, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। সাইমন কমিশনও তাঁহাদের রিপোর্টে এইরূপ মত প্রকাশ

করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লেটন তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া তদনুযায়ী রাজস্ব-ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২)

ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার কথা বলিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত লেটন বর্ত্তমান ব্যবস্থার দোষগুণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি দেখাইয়াছেন যে, অন্ত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের লোকেরা গরীব হইলেও পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাহাদের সমষ্টিগত আয়ের যে পরিমাণ অংশ রাষ্ট্রের মুখ্য কর্ত্তব্যের জন্ত খরচ করা হয়, ভারতেও ঠিক সেই পরিমাণ অংশ খরচ করা হয়; কিন্তু গৌণ ব্যয়ের বেলায় সে কথা খাটে না; ঐ সব দেশের তুলনায় আমাদের দেশে সমষ্টিগত আয়ের খুব কম পরিমাণ অংশ রাষ্ট্রের গৌণ কার্য্যে ব্যয় করা হয়। অথচ, বর্ত্তমান সভ্যতার একটি বিশেষত্ব হইল রাষ্ট্রের মুখ্য কার্য্যের তুলনায় গৌণ কার্য্যের জন্ত খুব বেশী টাকা খরচ করা। শ্রীযুক্ত লেটনও জোর দিয়া বলিয়াছেন, আমরা গৌণ কার্য্যের জন্ত কি পরিমাণ টাকা খরচ করিতে পারিব তাহার উপর ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতি অনেকটা নির্ভর করিবে।

তাহার পরে শ্রীযুক্ত লেটন দেখাইয়াছেন, অন্যান্ত দেশের তুলনায় আমাদের দেশে এখনো রাজস্ব-বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইংল্যণ্ড ও জাপানে গোটা দেশের সমগ্র আয়ের শতকরা ২০৲ টাকা অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ রাজস্বরূপে আদায় হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজস্বের পরিমাণ সমগ্র আয়ের এক-দশমাংশেরও কম। কাজেই রাষ্ট্রের গৌণ কার্য্য—যাহাকে জাতি-সংগঠনের কার্য্য বলা যাইতে পারে—সুপরিচালনা করিবার জন্ত যদি আরও বেশী টাকার দরকার হয়, তাহাতে চিন্তিত হইবার কারণ নাই; কারণ, প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত টাকাটা নূতন কর বসাইয়া কিংবা পুরাতন কর বাড়াইয়া তোলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক খুব গরীব, সুতরাং নূতন করবৃদ্ধির চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই—ইহা শ্রীযুক্ত লেটন স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এমন অনেক লোক আছে যাহারা তাহাদের আয়ের তুলনায় খুব কম কর দিয়া থাকে। নূতন এবং বর্দ্ধিত কর যদি এরূপভাবে বসানো যায় যে, তাহাতে দেশের গরীব লোকের উপর চাপ পড়িবে না, অথচ প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুযায়ী কর আদায় করা যাইবে, তাহা হইলে এই নূতন করবৃদ্ধির প্রস্তাবে অনেকের আপত্তি থাকিবে না বলিয়া শ্রীযুক্ত লেটন আশা করেন।

রাষ্ট্রের কোনো কোনো বিভাগে প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করা হয়, এবং কোনো কোনো বিভাগে টাকার অপচয় হয়, ইহা শ্রীযুক্ত লেটন অস্বীকার করেন নাই—এই সব গলদ দূর করিবার উপায়ও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি খুব জোর করিয়াই বলিয়াছেন যে, এই সব সংস্কার সাধিত হইলে যে টাকা বাঁচিবে ভারতবর্ষের জাতিসংগঠনী কার্য্যের জন্ত তাহা যথেষ্ট হইবে না। বাকী টাকা নূতন এবং বর্দ্ধিত কর বসাইয়াই তুলিতে হইবে।

প্রয়োজনীয় টাকা তুলিবার পক্ষে বর্ত্তমানে ভারতীয় শাসন এবং রাজস্ব-ব্যবস্থায় কি কি বাধা আছে, শ্রীযুক্ত লেটন অতঃপর তাহা আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, নূতন কর বসাইবার ক্ষমতা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ও ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সভ্যগণের এবং (বিশেষ বিশেষ অবস্থায়) প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও বড়লাটের আছে। ব্যবস্থাপক সভা এবং ব্যবস্থাপরিষদের সভ্যেরা অনেক সময়েই নূতন কর বসাইতে রাজী হন না—কারণ, কর বসানো ছাড়া সংগৃহীত টাকা খরচে তাঁহাদের প্রকৃত কোনো ক্ষমতা নাই। অতিরিক্ত কর বসাইয়া জনসাধারণের বিরাগভাজন হইতে তাঁহাদের আপত্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। অপর দিকে, গবর্ণর এবং গবর্ণরজেনারেলের হাতে কর বসাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহারা সব সময়ে লোকমতের বিরুদ্ধে নূতন কর বসানো সমীচীন মনে করেন না।

দ্বিতীয়তঃ, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড ব্যবস্থামত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে যে যে রাজস্ব দফা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত ক্রমবর্দ্ধনশীল, কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের হাতে রক্ষিত রাজস্বের

অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল। *কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি নিয়া এবং বিশেষ উপলক্ষে অসম্মতি সত্ত্বেও তাঁহাদের আয় যতটা বাড়াইতে পারেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি কিংবা অসম্মতিতে তাহা অপেক্ষা অনেক কম পারেন। অথচ অন্যান্য সম্মিলিত রাষ্ট্রের ন্যায় আমাদের দেশেও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপর রাষ্ট্রের মুখ্য কর্ত্তব্যগুলির মাত্র ভার ন্যস্ত আছে; অধিকাংশ গৌণ কার্য্য—জাতি-সংগঠনী কার্য্য—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের টাকার তত বেশী দরকার না থাকিলেও যথেষ্ট পরিমাণ টাকা তাহাদের ভাগে পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির টাকার বিশেষ টানাটানি থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগের কপালে অপেক্ষাকৃত অল্প টাকা পড়িয়াছে। বর্ত্তমান রাজস্ব-ব্যবস্থার ইহাই হইল সর্ব্বপ্রধান গলদ। শ্রীযুক্ত লেটন কিরূপে ইহার সমাধান করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

তৃতীয়তঃ, মেষ্টন কমিটির নির্দ্দেশমত কোনো কোনো প্রদেশের প্রতি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পক্ষপাত হওয়ার দরুণ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপক সভাসমূহের অধিকাংশ সময় এবং চিন্তা তাহার সংস্কারের জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। ইহার ফলে উপরোক্ত অসুবিধাগুলি থাকা সত্ত্বেও যতটা নূতন রাজস্ব আদায় হইতে পারিত ততটা হয় নাই।

বর্ত্তমান ব্যবস্থার এই সব দোষ দেখাইয়া শ্রীযুক্ত লেটন ভবিষ্যৎ সংস্কার কিরূপ হওয়া দরকার তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে ভবিষ্যৎ রাজস্বের সুব্যবস্থা করিতে হইলে নিম্নলিখিত তিনটী মূলসূত্র মানিয়া লইতে হইবে:

(১) রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব যাহাদিগকে দেওয়া হইবে, সংগৃহীত অর্থ-ব্যয়ের ক্ষমতাও তাহাদেরই থাকিবে।

(২) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পরস্পরের কর্ত্তব্য এবং ক্ষমতা যেরূপে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে তাহার সহিত পরিমিত রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতারও সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

এবং (৩) ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কোনও পক্ষপাতিত্ব দেখানো হইবে না।

(৩)

ইহার পর শ্রীযুক্ত লেটন কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের আয়ব্যয়ের প্রধান প্রধান দফাগুলি লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের ১৯২৯-৩০ সনের আয়ব্যয়ের একটা হিসাব দাখিল করিয়াছেন। সাইমন কমিশনের মতানুযায়ী শ্রীযুক্ত লেটন ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বাদ দিয়াছেন।

---

* বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের নিম্নলিখিতরূপ রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা আছে:

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট—(১) দেশী ও বিদেশী বাণিজ্যের উপর শুল্ক (২) আয় কর (৩) লবণ কর (৪) আফিং কর।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট—(১) ভূমি রাজস্ব (২) আবকারী (৩) ষ্ট্যাম্প কর (৪) বর্দ্ধিত আয়করের একটি সামান্য অংশ (৫) রেজিষ্টারী ফী।

ইহা ব্যতীত রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টের লাভের কতক অংশ এবং পোষ্টআফিস ও টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত লাভ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ভাণ্ডারে যায়; এবং জলসেচ, বন প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগের লাভ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ১৯২৯-৩০ সনের হিসাব

আয়		কোটি টাকা	ব্যয়		কোটি টাকা
বাণিজ্য কর	...	৪৭'৯১	রাষ্ট্র রক্ষা	...	৫২'১০
আয় কর	...	১৪'৭৫	ঋণশোধ (সুদ সমেত)	...	১০'১৯
লবণ কর	...	৬'০০	সাধারণ শাসন-ব্যয়	...	১০'২০
অন্যান্য কর	...	১'০৯	পোষ্ট আফিস প্রভৃতি চালাইতে লোকসান		'৩৯
মোট কর	...	৬৯'৭৫	কর আদায়ের খরচ	...	৩'৩২
রেলওয়ে	...	৬'০০	সিভিল ওয়ার্কস্	...	২'৪১
আফিং	...	২'৩৫	পেনসন	...	২'৪৮
টাঁকশাল	...	২'৩৫	অন্যান্য খরচ	...	'৪৭
নজরানা (ট্রিবিউট্‌স্)	...	'৭৪	ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন করায়		
অন্যান্য বাবদ	...	১'১৭	শ্রীযুক্ত লেটনের হিসাব-মাফিক ভারতের লাভ		১'০০
মোট	...	৮২'৩৬	মোট	...	৮২'৩৬
ব্রহ্মদেশ ভারতের সহিত			ব্রহ্মদেশ ভারতের সহিত সংযুক্ত		
সংযুক্ত থাকিলে ভারতের মোট আয়		৮৮'২২	থাকিলে ভারতের মোট ব্যয়	...	৮৮'২২

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের হিসাব (১৯২৯-৩০)

আয়		কোটি টাকা	ব্যয়		কোটি টাকা
ভূমি রাজস্ব	...	২৯'৯৪	ভূমি রাজস্ব এবং		
আবকারী	...	১৮'১৩	সাধারণ শাসন-ব্যয়	...	১৪'০৮
ষ্ট্যাম্প্‌স্	...	১৩'৬৪	পুলিশ	...	১০'৬৭
রেজিষ্টারী	...	১'৪০	জেল-আদালত	...	৭'২৬
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নূতন			ঋণ-শোধ	...	৩'৪৩
কর বসানোর ফলে আয়	...	'৩৯	পেনশন	...	৩'৬০
			শিক্ষা	...	১১'৩০
মোট কর	...	৬৩'৫০	স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা	...	৫'৭৩
বনবিভাগ	...	১'১১	কৃষি ও শিল্প	...	৩'২৪
সেচ বিভাগ	..	২'৮০	সিভিল ওয়ার্কস্	...	৯'৩৮
বিবিধ	...	১০'৭২	বিবিধ	...	৮'৩২
মোট	...	৭৮'১৩	মোট	...	৭৭'০১
ব্রহ্মদেশ লইয়া	...	৮৮'২৫	ব্রহ্মদেশ লইয়া	...	৮৬'৯৬

অতঃপর শ্রীযুক্ত লেটন গত ১০ বৎসরের আয়ব্যয়ের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এ কয়বৎসরে আয়কর, লবণ শুল্ক এবং রেলওয়ে হইতে প্রাপ্ত লাভ প্রায় একই অবস্থায় থাকিলেও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয়বৃদ্ধির কোনো ব্যাঘাত হয় নাই; কারণ এই সময়ের মধ্যে বাণিজ্য-কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব শতকরা ৬০ এরও বেশী বাড়িয়াছে; এবং ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য যেরূপ দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে, তাহাতে একথা একরূপ জোর করিয়াই বলা যায় যে, মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণে বাধা পাইলেও রাজস্বের এই দফায় আয় ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। অন্যান্য দফাতেও যে কিছু কিছু না বাড়িবে তাহা নয়। সব দিক্ বিবেচনা করিয়া শ্রীযুক্ত লেটন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ১৯৪০ সনে ব্রহ্মদেশ সহ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয় প্রায় ১০০ কোটি টাকা দাঁড়াইবে—এবং তাহাও পাওয়া যাইবে কোনো প্রকার নূতন কর না বসাইয়া। তাহার পরে তিনি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন যে, ভবিষ্যতে মোট ব্যয় না বাড়িবারই সম্ভাবনা, এমন কি, কমিতেও পারে। কাজেই আগামী দশ বৎসরে সব খরচ মিটাইয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে, সন্দেহ নাই।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। গত দশ বৎসরের আয়ব্যয়ের তুলনা করিলে মনে হয় যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের আয় বিশেষ কিছু বাড়িবে না, অথচ ব্যয় প্রায় ৪০।৫০ কোটি টাকা বাড়িয়া যাইবে। আয় না বাড়িবার প্রধান কারণ, ভূমিরাজস্বের অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ভাব। বাংলা ও বিহারে এবং যুক্তপ্রদেশ ও মান্দ্রাজের কতক কতক অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকাতে এই দফা-জাত রাজস্ব মোটেই বাড়িতেছে না; তা ছাড়া শ্রীযুক্ত লেটন দেখাইয়াছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকিলেও ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় কতকগুলি কারণে ভূমি-রাজস্ব অনেক পরিমাণে একরূপই থাকিতেছে। কোনো কোনো প্রদেশে সাময়িক বন্দোবস্তের মেয়াদ ৩০ হইতে ৪০ বৎসরে বদলান হইয়াছে। কোথাও বা পুরাতন বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিবার সময়ে রাজস্ববৃদ্ধির উচ্চতম সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে; উদাহরণস্বরূপ শ্রীযুক্ত লেটন মান্দ্রাজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; সেখানে রাজস্ব নূতন বন্দোবস্তে পুরাতন ব্যবস্থার চেয়ে শতকরা ১৮¾ বেশী বাড়ানো যায় না। তৃতীয়তঃ, রাজস্বের পরিমাণ ভূমিমূল্যের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশের চেয়ে বেশী না হয় এই মর্ম্মে কোনো কোনো প্রদেশে আইন পাশ হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে রাজস্বের পরিমাণ ভূমিমূল্যের শতকরা ৪০ এর উপর হইতে পারিবে না। এই সব কারণে প্রায় সকল প্রদেশেই ভূমিরাজস্বের পরিমাণ খুব কম বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ, শ্রীযুক্ত লেটন বলেন যে, ১৯১২-১৪ সনের তুলনায় ১৯২৭-২৯ সনে জিনিষপত্রের দাম শতকরা ৪১ বাড়িলেও, এই কয় বৎসরে ভূমি-রাজস্ব বাড়িয়াছে মাত্র শতকরা ৭½ হিসাবে। শ্রীযুক্ত লেটন এমনও সন্দেহ করেন যে, আদায়ের খরচ বাদ দিলে খুব সম্ভব দেখা যাইবে যে, এই দফা হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টের দিক্ হইতে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, কিন্তু ভূমিজীবী—চাষী অথবা জমীদার—সেই পরিমাণে লাভবান্ হইতেছে।

ভবিষ্যতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ যে আবগারী বিভাগ হইতেও এখনকার চেয়ে বেশী রাজস্ব লাভ করিবেন সে বিষয়ে শ্রীযুক্ত লেটন বিশেষ সন্দিহান। সেচ বিভাগ হইতে যথোপযুক্ত রাজস্ব আদায় হইতেছে না। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড ব্যবস্থার পর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে যে নূতন কর বসাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে মোট আয়ব্যয়ের তুলনায় তাহা এত কম যে, তাহা হিসাবের বাহিরে রাখিলেও চলে। কেবল ষ্ট্যাম্প বাবদ গত বৎসর রাজস্ব কিছু বাড়িয়াছিল, এবং ভবিষ্যতেও বাড়িবে বলিয়া আশা করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের মোট আয় যে বিশেষ বাড়িবে না তাহা একরূপ জোর করিয়াই বলা চলে।

অথচ ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রদেশে জাতি-সংগঠনী কার্য্যাবলী ক্রমশঃই বাড়াইতে হইবে। ভারতবর্ষকে স্বাস্থ্যে, শিক্ষায় কৃষিশিল্পে, উৎপাদন-ক্ষমতায় অন্যান্য সভ্য দেশের সমান করিতে হইলে এ বিষয়ে কার্পণ্য করিলে চলিবে না।

শ্রীযুক্ত লেটনের মতে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের ব্যয় এই কারণে ৪০।৫০ কোটি বাড়াইতে হইবে। কিন্তু এই অতিরিক্ত টাকা কোথা হইতে আসিবে?

(৪)

উক্ত সমস্যার সমাধান করিতে হইলে নূতন কর না বসাইয়া উপায় নাই। অন্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে করভার খুব লঘু, তাহা শ্রীযুক্ত লেটন আগেই দেখাইয়াছেন; কিন্তু ভারতের অধিকাংশ লোকই যে খুব গরীব তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন; এই জন্য নূতন কর যাহাতে অপেক্ষাকৃত ধনীরা দেন সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত বলিয়া মনে করেন। তিনি নিম্নোক্ত ছয় প্রকার উপায়ে রাজস্ব-বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়াছেন:

(১) আয়করের নিম্নতম সীমা আরও নামাইয়া এবং করের হার বাড়াইয়া বহুল পরিমাণে রাজস্ব বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। বার্ষিক ২০০০৲ টাকা কিংবা ততোঽধিক আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বর্ত্তমানে সাধারণ আয়কর দিয়া থাকেন। অতি-আয়করের নিম্নতম সীমা ৫০,০০০ টাকা। শ্রীযুক্ত লেটনের মতে ইহাতে অনেক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে রাজস্ব লওয়া হইতেছে না, তাহার ফলে রাষ্ট্রের আয় বাড়িতেছে না। বার্ষিক ৫,০০০৲ হইতে ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর বর্ত্তমান করের হারকেও শ্রীযুক্ত লেটন খুব নীচু বলিয়া মনে করেন। তৃতীয়তঃ, কেহ বিদেশে ব্যবসায়ে টাকা খাটাইয়া যদি লাভবান হন, বর্ত্তমান আয়কর আইন অনুসারে তাহাকে এই লাভের টাকার উপর কোনও কর দিতে হয় না; শ্রীযুক্ত লেটন ভবিষ্যতে এই প্রকার লাভকে আয়কর আইনের কবলে আনিতে চান। বর্ত্তমান ব্যবস্থার এই দোষ তিনটি দূর করিতে পারিলে রাজস্বের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে।

(২) বর্ত্তমানে কৃষি-আয়ের উপর কোনও কর দিতে হয় না। জমীদারেরা ভূমিরাজস্ব দেন বটে, কিন্তু ভূমি রাজস্বের স্থিতিশীলতার জন্য জমির আয়ের তুলনায় এই রাজস্বের পরিমাণ খুব অল্প এবং জমির উৎপাদনশক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু অতিরিক্ত লাভের যথোপযুক্ত অংশ হইতে রাষ্ট্র বঞ্চিত হইতেছে, ইহা পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে। কোনো কোনো প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় এবং অন্যান্য প্রদেশে কতকগুলি ভিন্ন কারণে ভবিষ্যতে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বাড়িবে না, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত; কিন্তু ভূমি- রাজস্বের বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করা সুসাধ্য নহে, রাজনৈতিক কারণে সে চেষ্টা করাও বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না বলিয়া শ্রীযুক্ত লেটন মনে করেন। কাজেই এই অবস্থায় কৃষি-আয়ের উপর কর বসাইয়াই রাজস্ব-বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইতিহাসের নজীর হইতে শ্রীযুক্ত লেটন তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন খুঁজিয়াছেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কৃষি-আয়ের উপর কর ধার্য্য ছিল—যদিও সেই সময়ে ভূমির আয় হইতে আহৃত রাজস্বের অনুপাত বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে কৃষি-আয়ের উপর কর বসাইলে খুব অন্যায় হইবে না। তাহা ছাড়া এই কর বসানোর ফলে দেশে পরোক্ষভাবে শিল্পোন্নতিরও সম্ভাবনা আছে। কারণ বর্ত্তমানে ভূমি-রাজস্ব ছাড়া জমির উপর আর কোন কর দিতে হয় না বলিয়া অনেকেই তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ জমিতে লাগাইয়া থাকেন। ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদির দরুণ আয়কর দিবার ভয়ে অনেকেই অতিরিক্ত টাকা এই সব কাজে খাটান না। শ্রীযুক্ত লেটন মনে করেন তাঁহার প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গৃহীত হইলে কর এড়াইবার কোনো পথ থাকিবে না; এবং বর্ত্তমানে যে পরিমাণ টাকা কর এড়াইবার জন্য শিল্প-বাণিজ্যে না খাটিয়া জমি কেনায় এবং কৃষি কাজে খাটে তাহা দেশের শিল্প-কারখানার জন্য ব্যয়িত হইতে পারিবে।

(৩) তামাকের ব্যবহার আজকাল বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। বিদেশী সিগারেটের উপর সংরক্ষণ শুল্ক বসানোর ফলে ভারতবর্ষেই যথেষ্ট সিগার ও সিগারেট তৈরী হইতেছে; কয়েকটি বড় বড় কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই তামাকের উপর যদি কর বসানো যায় এবং তাহা এই কারখানাগুলি হইতে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়, তবে অল্প আয়াসে অনেক টাকা তোলা যাইতে পারে। যদি

সিগারেটের ব্যবহার পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতগতিতে আরও বাড়িয়া চলে, তাহা হইলে দশ বৎসর পরে এই কর বাবদ বার্ষিক ৫ কোটি টাকা পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

(৪) তামাকের ন্যায় দেশী দিয়াশলাইয়ের ব্যবসাও সংরক্ষণ-শুল্কনীতির সাহায্যে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। শুল্ক অতি উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমান বৎসরের হিসাবমত এই দফা বাবদ গবর্ণমেণ্টের আয় হইয়াছে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা। অথচ ১৯২২ সনে এই দফা বাবদ গবর্ণমেণ্টের আয় ছিল ১৭২ লক্ষ টাকা। শ্রীযুক্ত লেটনের মতে এই হিসাব হইতে দেশী শিল্পের কত উন্নতি হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। এই শিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার জন্য ১৯২৮ সনে ট্যারিফ বোর্ড নিযুক্ত হয়; বোর্ড দেশী দিয়াশলাইয়ের উপর যথোপযুক্ত কর বসাইবার পক্ষে রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন; শ্রীযুক্ত লেটনও ট্যারিফ বোর্ডের এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার হিসাবমত এই দফা বাবদ প্রায় ৩ কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে।

(৫) ইহা ব্যতীত শ্রীযুক্ত লেটন প্রতি রেলওয়ে এবং ষ্টীমার ষ্টেশনে মালের উপর সামান্য পরিমাণ কর বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে মালের আমদানি রপ্তানির উপর কর বসানোই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে কোন কোন প্রদেশে ২১টি মিউনিসিপ্যালিটি বাহির হইতে আমদানি রপ্তানি মালের উপর কর বসাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত লেটন এই ব্যবস্থার একটু পরিবর্ত্তন করিয়া আন্তর্প্রাদেশিক কর বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন (ইহা বর্ত্তমান আইনে হইবার সম্ভাবনা নাই)। শ্রীযুক্ত লেটনের হিসাবমতে এই নূতন কর দ্বারা ৬ হইতে ১০ কোটি পর্য্যন্ত টাকা পাওয়া যাইতে পারে।

(৬) সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত লেটন গ্রাম্য করের হার বাড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে করের যে হার ছিল এখন সেই হার বজায় রাখিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলিয়া শ্রীযুক্ত লেটন মনে করেন না।

(৫)

কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ নূতন করগুলি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত লেটন তাহা প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু এই অতিরিক্ত টাকা কিরূপে ভাগ করিলে সকলের প্রতি সুবিচার হইতে পারে, সে বিষয়গুলি তিনি পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছেন। যে প্রদেশে যত রাজস্ব আদায় হয় তাহার সমস্ত সেই প্রদেশের প্রাপ্য এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের জন্য যত টাকা দরকার তাহা প্রত্যেক প্রদেশ চাঁদা করিয়া দিবে—অনেকের মতে আমাদের দেশে রাজস্ব-বণ্টনের ব্যবস্থা এইরূপ হওয়াই উচিত। মিঃ মণ্টেগু ও লর্ড চেমস্‌ফোর্ড তাঁহাদের রিপোর্টে অনেকটা এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত লেটন নিম্নলিখিত কারণে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যদি কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র বিশেষ কারণে সম্মিলিত হয় এবং তারপর সম্মিলিতভাবে কাজ করে, তবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন-ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্র চাঁদা করিয়া টাকা দিলে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু তথাপি পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত খুব কম দেশেরই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রশাসন করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ শ্রীযুক্ত লেটন আমেরিকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমেরিকায় যখন ১৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র সম্মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত করে তখন তাহারা যাবতীয় রাজস্ব নিজেদের হাতে রাখিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য শুধু চাঁদার ব্যবস্থাই করে নাই; বাণিজ্যশুল্কের আয় গোড়া হইতেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের জন্য আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের ভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে না দিয়া যদি প্রত্যেক প্রদেশের হাতে দেওয়া হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রের আন্তর্প্রাদেশিক বাণিজ্যে খুব বাধা উপস্থিত হইবে।

আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের একটি বড় রকম প্রভেদ আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশ (ষ্টেট) সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল; এবং যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হওয়ার পরেও তাহাদের স্বাধীন সত্তা অনেকাংশেই বজায় রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের

পূর্ব্বে যাহাই হউক, বর্ত্তমানে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের বন্ধন হইতে যথাসম্ভব মুক্তি লাভ করিতে চলিয়াছে। আমেরিকাতেই যখন বিভিন্ন প্রদেশের চাঁদায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে শাসন ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয় নাই, তখন ভারতবর্ষেও যে সে ব্যবস্থা অগ্রাহ্য হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এমন কি মিঃ মণ্টেগু ও লর্ড চেম্‌সফোর্ডও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মত বদলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তাঁহারা রাজস্বের কতকগুলি দফা বিশেষভাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে এবং অন্য কতকগুলি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে দিয়া সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

চাঁদা দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত লেটন আর একটি গুরুতর আপত্তি তুলিয়াছেন। যাঁহারা এইরূপ প্রস্তাব করেন তাঁহারা ধরিয়া লন যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংগৃহীত যাবতীয় রাজস্বে সেই সেই প্রদেশের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু এই ধারণা যে কত ভিত্তিহীন শ্রীযুক্ত লেটন তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ, বাণিজ্য-শুল্ক। বাণিজ্যশুল্ক সাধারণতঃ প্রধান প্রধান বন্দরগুলিতেই আদায় হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বন্দর নাই; আর সকল বন্দরেই সমান অনুপাতে পণ্য দ্রব্যের চলাচল হয় না। কাজেই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় যে সব প্রদেশে বাণিজ্য-শুল্ক আদায় হয় কেবল সেই সেই প্রদেশের এ টাকা পাইবার কথা। অথচ এই শুল্কের কিছু টাকা এমন প্রদেশের লোকেও দিতেছে যেখানে বন্দর নাই,—শুল্কের টাকা সেখানকার শাসন-ব্যয়ের ভার একটুও লঘু করে না। কেবল তাহাই নহে। বন্দরবিশিষ্ট প্রদেশে শুল্কাধীন সকল পণ্য-দ্রব্যেরই ব্যবহার হয় না—অথচ প্রস্তাবিত ব্যবস্থার ফলে সেই প্রদেশের লোকেরা এই সব পণ্যদ্রব্য মোটেই ব্যবহার না করিয়াও এবং কাজেই কোনও রকম শুল্ক না দিয়াও শুল্কের কতক উপস্বত্ব অন্যায়ভাবে লাভ করে। বাণিজ্যশুল্ক যদি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য হয় তাহা হইলে এই সব অসুবিধা এবং অবিচার হয় না, কেন না কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমস্ত রাষ্ট্রব্যাপক।

আয়করের বেলাতেও ঠিক এই কথা খাটে। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কারখানা এক প্রদেশে কিন্তু হেড্‌ অফিস অন্য প্রদেশে,—এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও খুব বিরল নহে। বীমা, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি বড় বড় কোম্পানীর শাখা অফিস প্রায় সব প্রদেশেই আছে। কিন্তু আয়কর আইনের নিয়ম অনুসারে সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের আয়-কর হেড্‌ অফিস হইতে সংগৃহীত হয়; অথচ যে আয়ের উপর কর নেওয়া হইল সেই আয়টা কেবল হেড্‌ আফিসেরই নহে, অন্য প্রদেশে অবস্থিত শাখা আফিসেরও বটে; শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বেলায় মোট আয়ের খুব কম অংশেই হেড্‌ আফিসের দাবী থাকে। কাজেই যে কারখানাজাত মাল বিক্রী করিয়া কোম্পানীর লাভ হয়, সে কারখানা যদি অন্য প্রদেশে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে যে প্রদেশে কোম্পানীর হেড্‌ অফিস সেই প্রদেশ অন্যায়ভাবে কোম্পানীর আয়ের উপর কর বসাইয়া টাকা পাইবে; কিন্তু যে প্রদেশে কারখানা অবস্থিত, সেই প্রদেশ এই টাকার কিছুই পাইবে না।

এবিষয়ে আরও একটা ভাবিবার কথা আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আর্থিক সম্পদ্‌ পরস্পরের অবস্থার উপর নির্ভর করে। করাচী কিংবা বোম্বাইয়ের বড় বড় জাহাজ ও ব্যবসায় কোম্পানীগুলির আগামী বৎসরের লাভ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে এই বৎসর সুদূর পাঞ্জাবে কিংবা আসামে কিরূপ ফসল হইয়াছে তাহার উপর; বর্ত্তমান ব্যবস্থায় পাঞ্জাবে কিংবা আসামে প্রচুর ফসল হইলে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য অনেক পরিমাণে বাড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহার ফলে প্রাপ্ত আয়কর এবং বাণিজ্যশুল্কের অতি সামান্য অংশই পাঞ্জাব কিংবা আসামের লোকেরা পাইবে।

(ক্রমশঃ)
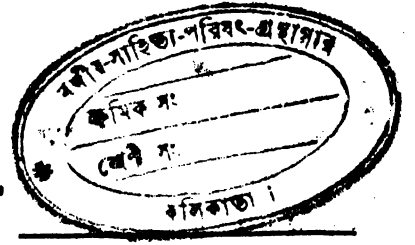
১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল বি,এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাঘ—১৩৩৭ ৫ম বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

বাংলার কথা—তথ্যসঙ্কলন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
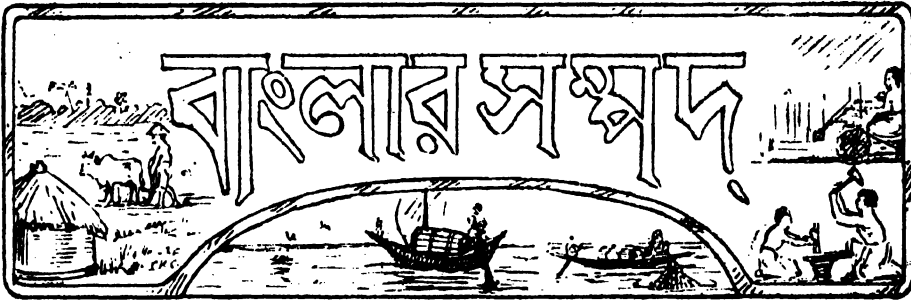
(১৬) ত্রিপুরা

ত্রিপুরা জেলার পরিমাণফল ১৫,৯৯,৩৬০ একর।

সহরের সংখ্যা ৩ এবং গ্রামের সংখ্যা ৪,০১৫।

মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনের হিসাবানুসারে) ১০,৯২,৭০০ একর অর্থাৎ মাথাপিছু ½ একর।

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৮২'০১ ইঞ্চি।

গাই গরু ও স্ত্রী মহিষের সংখ্যা ৩,৮৮,৩৯৭।

ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ৪,২৮,১০৯।

লাঙ্গলের সংখ্যা ২,২৮,৩৪২।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১,১০,২৩,১৬৫ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১,২৪,৭২,৬৫৩ মণ।

জন-সংখ্যা

১৮৭২	...	১৪,৪৭,৫[illegible]
১৮৮১	...	১৫,৬৪,১৩১
১৮৯১	...	১৭,৮২,৯৩৫
১৯০১	...	২১,১৭,৯৯৯
১৯১১	...	২৫,০০,৮৭২
১৯২১	...	২৭,৪৩,০৭৩

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৭,০৭,৫৫৭ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ২০,৩৩,২৪২।

প্রতি বর্গ মাইলে জন-সংখ্যা ১,০৭২।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সন)

		শতকরা
মোট হিন্দুর সংখ্যা	...	১৭'৫ জন
" মুসলমানের "	...	৫'৫ "

মোট হিন্দু পুরুষের	...	৩০৩ জন
" মুসলমান "	...	১০৫ "
" হিন্দু মেয়ের	...	৪'১ "
" মুসলমান "	...	'৬ "

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪,২৩০।

মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ১,৪০,৫০৯।

বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সসম্পন্ন (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ৮,১১,১৯২।

বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) ১৯২৫ সনে ১,৫০,২৫০।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৬,৬০,৯৪২।

স্বাস্থ্য

হাজারকরা জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ২২'২।

হাজারকরা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২০'৩ এবং মুসলমানের মধ্যে ১৭'১।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—২৯,৯০২ ১৯২২—২৯,৪৮০
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫— ৫,৪২৪ ১৯২২— ৫,৩৩৪
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫— ১২৪ ১৯২২— ১০৩

শিশু মৃত্যু

(১০ দশ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু	..	১৬৪'৮
স্ত্রী শিশু	...	১৪৬'৮

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা	...	২২

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	...	২,১৩৬
কুষ্ঠরোগী	...	৪৯৫
অন্ধ	...	১,৫৯৫
হিন্দু বিধবা	...	৭২,৯২৮
মুসলমান "	...	১,১৯,৯৯৩

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমি রাজস্ব	...	১০,৯৯,৩৫৪৲
ষ্ট্যাম্প	...	১৬,৫৭,১২৪৲
আয়কর	...	১০,৯৮৮৲
আবগারী	...	২,৪১,৭০৬৲
আফিং	...	৩৭,৯২৩৲
বিবিধ	...	৬৭,২২৫৲
পথকর ও পাবলিক সেস্		২,৫০,৯৮৩৲
মোট		৩৪,৬৩,৪০৩৲

(১৭) চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার পরিমাণফল ১৫,৯৪,৮৮০ একর।

সহরের সংখ্যা ২ এবং গ্রামের সংখ্যা ৮৬৮।

মোট কর্ষিত জমি (১৯২৪ সনে) ৬,২২,৮০০ একর, অর্থাৎ মাথাপিছু ½ একর।

গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১১৩'৩৮ ইঞ্চি।

গাই গরু ও স্ত্রী মহিষের সংখ্যা ২,০৮,১৪৫।

ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ২,৬২,৩৭৮।

লাঙ্গলের সংখ্যা ১,৫৩,১১৪।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৭২,৬৯,০৯৪ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৬৯,৪৭,৬৯৪ মণ।

জনসংখ্যা

১৮৭২	...	১১,৯৭,০০৯

১৮৮১	...	১২,৩৩,৯৩৮
১৮৯১	...	১২,৯০,১৬৭
১৯০১	...	১৩,৫৩,০৮১
১৯১১	...	১৫,০৮,৪৩৩
১৯২১	...	১৬,১১,৪২২

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৩,৬৩,৮৯৫ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ১১,৭৩,২০৫।

প্রতি বর্গমাইলে জন-সংখ্যা ৬৪৩।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা (১৯২১ সন)

		শতকরা
মোট হিন্দুর	...	১৬·৬ জন
" মুসলমানের	...	৪·২ "
" হিন্দু পুরুষের	...	৩০·২ "
" মুসলমান "	...	৮.৪ "
" হিন্দু মেয়ের	...	৩·২ "
" মুসলমান মেয়ের	...	·৩ "

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩,১৭৩।

মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৯৫,৭৭৩।

বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সসম্পন্ন (৬ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক) বালকবালিকার সংখ্যা ৪,৮২,৬৮৫।

বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬-১৫ বৎসরের) ১৯২৫ সনে ১,১০,৪৩৬।

বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকার সংখ্যা ৩,৭২,২৪৯।

স্বাস্থ্য

হাজার করা জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩০·৪।

হাজার করা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২২·৪ এবং মুসলমানের মধ্যে ২৫·১।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু { ১৯১৫—২৯,৭৩৯; ১৯২২—৩৫,৯২৪

কলেরায় মৃত্যু { ১৯১৫—২,৬৭০; ১৯২২—৫০৫

বসন্তে মৃত্যু { ১৯১৫—১,৬৫৩; ১৯২২—৮৫৩

শিশু মৃত্যু

(১০ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু	...	১৭৪·২
স্ত্রী "	...	১৬৫·০

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা	...	১৭

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	...	১,১৭৭
কুষ্ঠরোগী	...	১৭৯
অন্ধ	...	৮৯৯
হিন্দু বিধবা	...	৪৩,৬১০
মুসলমান বিধবা	...	৯৬,৬৯৪

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমি রাজস্ব	...	১০,৮৩,৬৯৯
ষ্ট্যাম্প	...	৯,৫৩,৪১১
আয়কর	...	১,১৮,৫৫৫
আবগারী	...	১,২৩,৩৪৪
আফিং	...	৯৫,৮৫৬
বিবিধ	...	২২,৫৬৬
পথকর ও পাব্লিক সেস্		২,১৮,১৫৯
মোট		২৬,১৫,৫৯০

(১৮) নোয়াখালী

নোয়াখালী জেলার পরিমাণফল ১০,৬৬,২৪০ একর। সহরের সংখ্যা ১ এবং গ্রামের সংখ্যা ১,৭১৮। মোট কর্ষিত

জমি (১৯২৪ সনে) ৭,৩৮,৮৬০ একর, অর্থাৎ মাথাপিছু ½ একর। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১১৪'২২ ইঞ্চি।

গাই গরু ও স্ত্রী-মহিষের সংখ্যা ১,৭৭,৯০৭।

ষাঁড়, বলদ ও পুং মহিষের সংখ্যা ২,০৪,৪৯৩।

লাঙ্গলের সংখ্যা ১,০৯,৫২০।

১৯১৩-১৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১০৮,৭৪,৮৮০ মণ।

১৯২৩-২৪ সনে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১,৩৩,২৩,৯০৫ মণ।

জনসংখ্যা

১৮৭২	...	৮,৪১,২৪৭
১৮৮১	...	৮,২১,৬২৩
১৮৯১	...	১০,০৯,৬৯৩
১৯০১	...	১১,৪১,৭২৮
১৯১১	...	১৩,০৩,৪৪১
১৯২১	...	১৪,৭২,৭৮৬

১৯২৩ সনে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৩,২৯,১৩৭ ও মোট মুসলমানের সংখ্যা ১১,৪২,৪৬৮।

প্রতি বর্গমাইলে জন-সংখ্যা ৯৭২।

শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা

মোট হিন্দুর	...	শতকরা ১৬'২ জন
„ মুসলমানের	...	„ ৪'২ „
„ হিন্দু পুরুষের	...	„ ৩০'২ „
„ মুসলমান	...	„ ৮'৪ „
„ হিন্দু মেয়ের	...	„ ৩'২ „
„ মুসলমান মেয়ের	...	„ '৩ „

শিক্ষা

১৯২৫ সনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২,১৭৬। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯২১ সনে) ৮১,৫৭৮। বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়সসম্পন্ন (৬-১৫ বৎসরের) বালক-বালিকার সংখ্যা ৪,৫৯,৫৭৬। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ে এমন বালকবালিকার সংখ্যা (৬-১৫ বৎসরের) ১৯২৫ সনে ৯৩,৩৮৮। বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালক-বালিকার সংখ্যা ৩৬৬,১৮৮।

স্বাস্থ্য

হাজার করা জন্মের হার (১৯২৩ সনে) ৩২'০। হাজার করা মৃত্যুর হার (ঐ সনে) হিন্দুর মধ্যে ২১'৩ ও মুসলমানের মধ্যে ২৫'৬।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	১৯১৫—১৮,৬০৭ ১৯২২—২৪,১৯৬
কলেরায় মৃত্যু	১৯১৫—৫,০৮২ ১৯২২—৪,৬৭৭
বসন্তে মৃত্যু	১৯১৫—৫২৭ ১৯২২—১২২

শিশু-মৃত্যু

(১০ বৎসরের হাজার করা গড়)

পুং শিশু	...	১৫৮'৪
স্ত্রী „	...	১৫৩'১

ডাক্তারখানা

ডাক্তারখানার সংখ্যা	...	১৬

সমাজের আশ্রিত

কালা ও বোবা	...	১,০৬৮
কুষ্ঠরোগী	...	৬৪
অন্ধ	...	৬৯৩
হিন্দু-বিধবা	...	৩১,৩৯৬
মুসলমান-বিধবা	...	৬৮,৭৭৯

রাজস্ব (১৯২০-২১)

ভূমি রাজস্ব	...	৮,৫৭,১২৪৲
ষ্ট্যাম্প	...	৮,০৯,৪৯১৲

আয়কর	...	৪১,৪৬৯৲
আবগারী	...	২৮,৬৮৯৲
আফিং	...	২০,০৫৭৲
বিবিধ	...	৭৪,৬০২৲
পথকর ও পাবলিক্ সেস্		১,৯৩,৪৩৪৲
মোট		২০,২৪,৮৬৬৲

শ্রীসুকুমার মিত্র

বাঙ্গালার কার্পাস-শিল্প*

(১)

দেশীয় শিল্পের উন্নতির দিনে দেশীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা সকলেই যথেষ্ট উন্নত অবস্থায় ছিল। তখন সকলেরই কোঠাবাড়ী ছিল এবং সুখে ও স্বচ্ছন্দভাবে বাস করিত। অনেককেই ৬ মাসের অধিক কাল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত না। ৬ মাস কার্য্য করিয়া যে উপার্জ্জন হইত তাহাতেই বৎসরের বাকী ৬ মাস বসিয়া খাইয়াও যথেষ্ট অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত। অনেক তন্তু-ব্যবসায়ী দেশীয় ধনবান লোকের নিকট নির্দ্দিষ্ট বেতন বা দাদন লইয়াও কার্য্য করিত। কাজেই তাহাদের অর্থাভাবের সম্ভাবনা ছিল না। উড়িষ্যা প্রদেশের তন্তুবায়দিগের নির্দ্দিষ্ট জায়গীর ছিল। পছন্দমত বস্ত্র যোগাইয়া সময় সময় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াও লইত।

এখন অধিকাংশ ব্যবসায়ী পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য লাভজনক কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। কেহবা পৈতৃক অর্থে দোকানপাট করিয়াও প্রভূত সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে। কেহবা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বিশিষ্ট রাজকার্য্যেও নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা এখনও তাঁত ছাড়িতে পারে নাই তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এমন কি, দ্বিতীয় অবলম্বন ব্যতীত তাহাদের জীবিকা-অর্জ্জনের পথই সুগম নহে। কারণ বর্ত্তমান সময়ে একটা তাঁতে রোজ ৶০ কি ।০ আনার অধিক উপার্জ্জন করা যায় না। তাহা এক ব্যক্তির দৈনন্দিন ব্যয়-নির্ব্বাহের পক্ষেও যথেষ্ট নহে। অনেক ধনী তাঁতীকে উপযুক্ত বেতন-দ্বারা কার্য্যকারক রাখিয়া ব্যবসা চালাইতে ও স্বদেশের উন্নতি করিতে সময় সময় শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেরূপ লোকের সংখ্যা বিরল।

দেশীয় শিল্পের অবস্থা শোচনীয় হইলেও বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের কোন কোন জেলায় এখনো বস্ত্রবয়ন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। যে সকল স্থানে এখনও কলিকাতা হইতে মাল রপ্তানি করা সহজসাধ্য নহে সে সকল স্থানে—উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা অঞ্চলে এখনো পূর্ব্বরীতি অনুসৃত হইতেছে। সে সকল নিজ পারিবারিক অভাব মোচনের জন্য মাত্র। চট্টগ্রাম ত্রিপুরা, প্রভৃতি স্থানে মগ, গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতি ও উড়িষ্যা, ছোটনাগপুরের অসভ্যজাতীয় অধিবাসীরা বিলাতী অপেক্ষা দেশী বস্ত্রেরই অধিক আদর করিয়া থাকে। তাহারাও ব্যবসায়ের জন্য বস্ত্রবয়ন করে না, নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বস্ত্রবয়ন করিয়া থাকে মাত্র।

বিলাতী কলজাত বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে দেশীয় বস্ত্র ব্যবসা অনেক পরিমাণে বিলোপ-প্রাপ্ত হইলেও বঙ্গে ফরাসডাঙ্গা, শ্রীরামপুর, শান্তিপুর, সাতক্ষীরা, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার বস্ত্রশিল্প নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ নহে। এইসকল স্থানে চাষ করিলে কার্পাসও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা যাইতে পারে।

ঢাকার মস্‌লিন ব্যবসা ধ্বংস পাইলেও শ্রীযুক্ত ই, ডব্লিউ কলিন্‌স তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন, বিলাতী সূতায় সাধারণ রকমের মস্‌লিন প্রস্তুত করিতে পারে, ঢাকাতে এখনো এরূপ ৫০০ ঘর ব্যবসায়ী আছে। ২১টী পরিবার আজও এমন আছে যারা সুপ্রসিদ্ধ ঢাকাই মস্‌লিনই প্রস্তুত করিতে পারে। ঢাকার অনেক প্রাচীন তাঁতী পরিবারের নবীন বংশধরগণ তাঁত ছাড়িয়া সোণারূপার ব্যবসা ধরিয়াছেন। আর কিছুদিন পরে এই সব তাঁতীর স্বর্ণ-ব্যবসায়ী পুত্রগণ "তাঁত," "মাকু" প্রভৃতি জাতীয় ব্যবসায়-সূচক শব্দগুলি নেহাৎ বিদেশী শব্দ বলিয়া মনে করিবেন।

* ১৩০৭ সনে স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার কর্তৃক লিখিত। আঃ উঃ সম্পাদক।

শান্তিপুর এখন ডুরাই কাপড়ের জন্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ১৮৯৮ সনে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার কাপড়ের মধ্যে কেবল ২৫০০০ টাকার কাপড় নিজ জেলায় কাটিয়াছিল এবং বাকী সমস্তই বিদেশে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল।

ফরাসডাঙ্গা আজও নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

পাবনা কার্পাস-শিল্পে বাঙ্গালার একটী প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। ছোটধুন ও দোগাছির তাঁতীরা পরিষ্কার ধুতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কলিন্‌স বলেন য়ুরোপীয় শিল্পের অভ্যুত্থানে পাবনার শিল্প-ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। পাবনা জেলায় সলঙ্গা, রাধানগর, তাঁতীবাঁধ, প্রভৃতি গ্রামে প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হয়। সদল্যাপুর, নিশ্চিন্তপুর, আমিনাপুর এবং শিবপুরের জোলারা সূতার ব্যবসাও করিয়া থাকে। "পাবনাই পাড়" কাপড় ইহাদেরই প্রস্তুত। এই সকল বস্ত্রের সূতা বোম্বাই বা য়ুরোপীয় নহে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডীয় ভ্রমণকারী ফিচ্ শ্রীরামপুরে কার্পাস-শিল্পের উন্নতি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর অত্যুন্নত স্থান বর্ত্তমান শতাব্দীতে অবনতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামপুরে কার্পাস তুলার ব্যবসা একেবারেই নাই, রেশমের কারবারই অধিক। শ্রীরামপুরের রেশমী বস্ত্র বোম্বাই প্রদেশে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কার্পাসের ব্যবসা এখন একপ্রকার বিনাশোন্মুখ। তথাপি সাতক্ষীরার ধুতি, চাদর, সাটী এবং চারখানার নাম আজও বিলুপ্ত হয় নাই। বাজারে ঐ সকল জিনিষ প্রচুর সম্মান লাভ করে।

রঙ্গপুরের বাকরা এবং ভাগলপুরের গালিচা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বীরভূমে আজকালও রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কুমিল্লার "ময়নামতি" বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। টীপরাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত পাহাড়িয়া তুলা ও কার্পাস-সংযুক্ত ময়নামতির চারখানা বর্ত্তমান সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান প্রতিযোগিতাক্ষেত্রেও প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়াছে।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত বাজিৎপুরের সুপ্রসিদ্ধ গোলাবতন সাটী এখন একরকম অপ্রাপ্য। কিশোরগঞ্জের উড়নি ও তদ্ভাব বৈদেশিক আমদানি মালের তুলনায় অতুলনীয় হইলেও সহানুভূতির অভাবে তাহা উপযুক্তরকমে উৎপন্ন হইতেছে না। এখনও যে দুই একখানা প্রস্তুত হয় তাহা এক টাকা হইতে দশ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এক সময়ে কিশোরগঞ্জ এবং বাজিৎপুরে দিনেমার এবং ইংরাজ কোম্পানীর কার্পাসের কুঠি ছিল। এখন তাহা জনপ্রবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বেহার প্রদেশে পাটনা, গয়া, সারণ এবং দ্বারভাঙ্গাই তৎপ্রদেশজাত শিল্প-দ্রব্যের কেন্দ্রস্থল। ঐ সকল স্থানে মতিয়া নামে এক প্রকার মোটা বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা দরিদ্র কৃষকেরা শীতকালে ব্যবহার করিয়া থাকে। মতিয়া ব্যতীত ককৃতী নামে আর এক প্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্রও প্রস্তুত হয়। দিনাজপুরের তোয়ালে, ঝাড়ুনি, মেজ-আচ্ছাদন ইত্যাদি য়ুরোপীয়দিগের দ্বারা সমাদরে গৃহীত হয়। পাবনার মস্‌লিন মন্দ নহে। বিহার প্রদেশের শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট।

উড়িষ্যার অন্তর্গত গুল নগরের মস্‌লিন তদ্দেশীয় ধনবান্ গৃহস্থের আদরের জিনিষ, কটকে তাহা উচ্চদরে বিক্রী হইয়া থাকে। ১৮৯০ সনে ৩০০০০ টাকার মস্‌লিন বিক্রয় হইয়াছিল। প্রতিখণ্ড আট আনা হইতে কুড়ি টাকা মূল্যে পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়।

ছোট নাগপুরের নানা স্থানে মজবুত দোসূতী প্রস্তুত হয়।

(২)

বঙ্গের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাসজাত বস্ত্র মস্‌লিন। বঙ্গদেশের যাবতীয় মস্‌লিন অপেক্ষা ঢাকাই মস্‌লিন উৎকৃষ্ট এবং আদরণীয়। ঢাকাই মস্‌লিনের শিল্পনৈপুণ্য এত সূক্ষ্ম যে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ১ গজ প্রশস্ত ২০ হস্ত লম্বা একখানা মস্‌লিন জড়াইয়া একটী অঙ্গুরীর ছিদ্রদ্বারা ফেলিয়া দেওয়া যায়।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে "দিল্লী দরবারে" ৩০ হস্ত দীর্ঘ ও

২ হস্ত প্রশস্ত একখণ্ড মস্‌লিনের ওজন ৪।৫ তোলা হইত এবং তাহা ৪।৫ শত টাকা মূল্যে পর্য্যন্ত বিক্রয় হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও তাহার নির্ম্মাণ একেবারে বন্ধ ছিল না। ডাঃ টেলর[১] লিখিয়াছেন ১৮৪০ সনেও একখানা ষোল শত গ্রেণ (৯ তোলা) ওজনের মস্‌লিন ১০ পাউণ্ড (১০০৲ টাকা) পর্য্যন্ত দরে বিক্রী হইয়াছে। এখন এরূপ সূক্ষ্ম শিল্পের আদর কে করিবে? করিলেও এরূপ শিল্পী বোধ হয় ঢাকাতে আজকাল বিরল।

ঢাকাতে আরও নানা রকমের মস্‌লিন প্রস্তুত হয়। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গতি, সবরতি, ঝুনা, আবরুয়া, সরকার, সবনম, আলী প্রভৃতি বস্ত্র ঢাকার সূক্ষ্ম শিল্পের নিদর্শন। ঐ সকল নামের বিশেষ কোন অর্থ নাই। আবরুয়া জলে ফেলিলে জলের সহিত মিশিয়া থাকে; জল হইতে না তুলিলে তাহা কাপড় বলিয়া জানা কঠিন। সবনম্‌ বস্ত্রও শিশির পাতের সময় ঘাসের উপর রাখিলে মুহূর্ত্তমধ্যে ঘাসের সহিত মিশিয়া যায় এবং ঘাস বলিয়া ভ্রম হয়। সবনম্‌ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ পরীক্ষা করিতে একখানা সবনম্‌ বস্ত্র ধুইয়া ঘাসের উপর রাখিয়াছিলেন। একটা গরু নাকি ঘাস খাইতে খাইতে ঐ বস্ত্রখানাও উদরস্থ করিয়াছিল।

ঢাকার বুটাতোলা মস্‌লিন কাসিদা নামে পরিচিত। কাসিদা এক সময়ে বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক পারস্য, মিসর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে নীত হইত এবং তদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষদের পাগড়ীর জন্য সাদরে গৃহীত হইত। ডাঃ টেলরের সময় ঢাকায় বৎসরে প্রায় ২০০০০ বিশ হাজার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কাসিদা বহু প্রকারে হইয়া থাকে, এবং গুণানুসারে ঐ সকল বস্ত্রের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। প্রতি খণ্ড ১০৲ হইতে ৫০৲ পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রী হইয়াছে। কাসিদা রেশম-মিশ্রিত। কেবল সূতাদ্বারা যে কাসিদা প্রস্তুত হয় তাহা চিকন্‌ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত মস্‌লিনের নাম জামদানী। ঢাকাতে নানাপ্রকারের জামদানী প্রস্তুত হইত, যথা—করেলা তোড়াদার, বুটিদার, তেরছা, জলবায়, পান্নাহাজরা, ছাওয়াল, দুবলিজাল মেল, ইত্যাদি। ঢাকাই জামদানী বিহারে অনুকৃত হইয়াছে। মস্‌লিনের যে সকল ছিট প্রস্তুত হইত তাহা নন্দনসাহী, আনারদানা, কবুতারখোপ, সাকুতা, পাছাদার, কুশিদার প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত।

ঢাকাই মস্‌লিনের উপাদান—সূতা উক্ত জেলার অন্তর্গত ধামরাই নামক স্থানে প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরাই তূলা পিঁজিয়া ঐ সূতা কাটিত। সূতা কাটার কল আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে আর সেরূপ শ্রমস্বীকার কেহ করিতেছে না।

ঢাকাই বস্ত্র ব্যতীত ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরে, সিমলাই ও পাবনাই বস্ত্র লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ফরাসডাঙ্গার ধুতি, সাটী, উড়নী বিশেষ উল্লেখযোগ্য; কিন্তু তাহার অধিকাংশই বিলাতী সূতায় প্রস্তুত। শান্তিপুরের কাপড় নদীয়া জেলার অনেক স্থানে প্রস্তুত হয়; এই কাপড় খুব পাতলা এবং সুন্দর বুটা ও ফুলের জন্য পরিচিত। পাবনাই কাপড় বেশ শক্ত এবং মসৃণ। সিমলাই বস্ত্রের মসৃণতা ব্যতীত অন্য কোন গুণ নাই।

সাধারণ লোকের পরিধানের জন্য ভারি কাপড় মতিয়া এবং গজী বেহারে উৎপন্ন হয়। তাহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। এই সকল বস্ত্র খুব গরম এবং শক্ত। ইহা দ্বারা লেপ, র‍্যাপার, জ্যাকেট, সামিয়ানা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পরিধানের বস্ত্ররূপেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মতিয়ার থানে ১০ গজ হইতে ৪০ গজ পর্য্যন্ত কাপড় থাকে। মতিয়ার সূতা তদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণই প্রস্তুত করিয়া থাকে। ২০ হাত লম্বা একখানা কাপড়ে ২১/২ সের তূলাই যথেষ্ট। মতিয়া বস্ত্রের গজ সাধারণতঃ ⁄১০ আনা ।০ আনা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

বিখ্যাত খাকতি কাপড় খাকতি নামক তূলা হইতে প্রস্তুত হয়। ঐ কাপড়ের রং পীতবর্ণ। ঐ তূলা চাম্পারণ মজঃফরপুর এবং দ্বারভাঙ্গায় উৎপন্ন হয়। দ্বারভাঙ্গাই ঐ কাপড়ের আমদানিস্থল। ৪০ গজ খাকতি বস্ত্রের মূল্য গুণানুসারে ৫৲ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

১ টোপগ্রাফি অব্ ঢাকা।

এই বস্ত্র খুব পাতলা এবং মজবুত, ইহাদ্বারা সুন্দর গ্রীষ্মবাস প্রস্তুত হইয়া থাকে। উপযুক্ত সহানুভূতির অভাবে থাকতি একরকম লুপ্ত হইবার পথে অগ্রসর হইয়াছে।

(৩)

জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে "ফতা" প্রস্তুত হয়। ইহা স্ত্রীলোকেরাই পরিধান করিয়া থাকে। ফতা খুব ভারি এবং শক্ত হইয়া থাকে। এক এক থানে ১৫—৩০ গজ বস্ত্র থাকে। এতদ্ব্যতীত নিত্য পরিধানের জন্য সাধারণ বস্ত্র প্রায় সকল স্থানেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ছোটনাগপুরে কোমরবন্ধের জন্য যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহাকে কারিয়া বলে। কারিয়া বেশ মজবুত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী।

পাহাড়িয়া তুলায় টীপরারা যে শাদা পাড় মোটা বস্ত্র প্রস্তুত করে তাহার নাম পাছড়া। তাহা এক একখানা ৩৲ হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয়। তোয়ালের ন্যায় উৎকৃষ্ট বিছানার চাদরও পাহাড়-অঞ্চলের টীপরাগণ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

বিহারের সুজনী ও আসন প্রসিদ্ধ। দড়ি এবং শতরঞ্চও বিহারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছোট ছোট গালিচা সেই দেশে দড়ি নামে অভিহিত হয়। বিহারের গালিচা এবং শতরঞ্চ খুব শক্ত। রঙ্গপুরেও এক সময়ে উৎকৃষ্ট শতরঞ্চ প্রস্তুত হইত। বর্ত্তমান সময়ে রঙ্গপুরের কারবার লোপ পাইয়াছে। সুলতানগঞ্জ, সারণ, আরঙ্গাবাদ, আরা সাসেরাম, মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থানেও অধুনা শতরঞ্চ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আয়তন, ওজন এবং শিল্পনৈপুণ্য হিসাবেই এই সকল জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সাধারণ রকমের এক একখানা গালিচা ॥০ আনা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। ভাল গালিচা ৸০ আনা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত সের দরে চলিতে পারে। গালিচার কারবারও বাঙ্গালায় ভাল চলিতেছে না। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কার্পেটের আমদানি-বাহুল্যে ও জেলখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের বহুল প্রচলনে বাঙ্গালায় কার্পেটের শিল্পনৈপুণ্যও রহিত হইয়াছে।

নেয়ার, রশি প্রভৃতি বিহারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিজ পাটনাতেই ৩০।৪০ ঘর নেয়ার-ব্যবসায়ী আছে। দ্বারবঙ্গের মধুবাণীতেও নেয়ারের কারবার আছে। নেয়ার ও রশি তাম্বু, চন্দ্রাতপ, মশারি প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সূতা ও রেশমের সংমিশ্রণে এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত হয় তাহা বাপ্তা নামে পরিচিত। বাপ্তা সকল দেশেই প্রচলিত আছে। ইহা দ্বারা স্বল্পব্যয়ে উৎকৃষ্ট কোট প্রস্তুত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট বাপ্তা তসরের ন্যায় দেখায়। বাপ্তা ঢাকা, ভাগলপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। বাপ্তারও প্রকার-ভেদ আছে, যথা—হাম্মাম, ডিমটী, সান, জঙ্গলখাসা, গলাবন্ধ ইত্যাদি। মশারির কাপড়ও বাঙ্গালার অনেক স্থলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাঙ্গালার কার্পাসশিল্প সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও দেশীয় শিল্প আজ পর্য্যন্ত একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। উপযুক্ত সহানুভূতি এবং সাহায্য পাইলে তাহার পুনরুত্থানের আশা আকাশ কুসুম কল্পনা হইবে না।

মিঃ টেলারি দেশীয় শিল্প-রক্ষার্থে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "আমার মতে ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের পথ দুইটী (১) দেশীয় জনসাধারণের ঐকান্তিক চেষ্টা (২) দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও বৈদেশিক শিল্পের পরিহার। মিঃ টেলারি শেষোক্ত মতটীকেই সমধিক ফলদায়ক বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মত সর্ব্বথা সমীচীন। এতদ্বিষয়ে দেশীয় ধনকুবেরগণের সহানুভূতিকেই আমরা একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করি। অন্যথা দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার-সাধন সুদূর-পরাহত হইবে।

শিল্প-বিজ্ঞানে বোম্বাই চিরকাল ভারতের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। স্বর্গীয় রাও বাহাদুর রাঞ্ছোরলাল ছোটালালের স্বদেশ-হিতৈষণার প্রথম উদ্যমে ভারতবর্ষে প্রবল হাস্য-কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রাঞ্ছোরলাল আহামেদাবাদে ১০০ তাঁতে ও ৫০০০ হাজার চরকায় একটি ক্ষুদ্র কল সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পান। লোকের হাস্য-

পরিহাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই ধনকুবের তাঁহার চেষ্টা বলবতী রাখিতে চেষ্টা করেন এবং দশ বৎসরের চেষ্টায় তাহাতে সফলকাম হইতে সমর্থ হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সেই পুরুষসিংহের চেষ্টায় আহামেদাবাদে "স্পিনিং এণ্ড উইবিং কোম্পানীর" কল স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ এই কল ৫০টী তাঁত ও ২৫০টী চরকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করে। বর্ত্তমানে তাহাতে ৩২০০০ চরকা ও ৬৮৮টী তাঁত চলিতেছে। এইরূপে ছোটালালের "স্পিনিং এণ্ড উইবিং কোম্পানীতে" এখন দুইটী কল চলিতেছে। ঐ দুটী কলে বর্ত্তমানে ৭২০০০ চরকা ও ১৫৬৩টী তাঁত চলিতেছে এবং উক্ত কোম্পানীর অনুকরণে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেখানে আরও ২৮টী কল, ৩৫৩৭ তাঁত ও ৩২৬০০০ চরকা লইয়া পরিচালিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকা অর্জ্জিত ও পরিবার প্রতিপালিত হইতেছে।

আহামেদাবাদের কলের কাপড় এখন সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বাঙ্গালায় কি এমন সহৃদয় মহাত্মা কেহই নাই যিনি বাঙ্গালার এই পতনোন্মুখ শিল্পের প্রাণরক্ষা করিয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধন এবং বুভুক্ষু স্বদেশবাসীর জঠরজ্বালা নিবারণ করিতে অগ্রসর হইতে পারেন ?

ঢাকেশ্বরী কটন মিল

ঢাকেশ্বরী কটনমিলের ১৯২৯ সনের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, এই মিলটি ইতিমধ্যেই অংশীদারগণকে শতকরা ৬।০ টাকা লভ্য দিতে সমর্থ হইয়াছে।

বর্ত্তমানে মিলে ৪০৮ খানি তাঁত ও ২,২২৪টি টাকু চলিতেছে, এবং প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২,২০০ জোড়া ধুতি ও সাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। আরো নূতন তাঁত আনাইবার জন্য অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মিলে মোট ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৫০৬ টাকা লাভ হইয়াছে। তন্মধ্যে যন্ত্রপাতির ক্ষয়জনিত ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত ৯৯ হাজার ৮ শত ৫২॥৵০ হাতে রাখিয়া, আয়-করের জন্য ২০ হাজার টাকা রাখিয়া এবং অন্যান্য খরচ ও মিলের উন্নতিকল্পে ২৮৩৫২৶৪ পাই বাদ দিয়া লাভ ১০৬৬৩৩৲ হইয়াছে। ইহা হইতে এই কোম্পানীর আর্টিকেল অনুযায়ী শতকরা ১৫৲ হিসাবে রিজার্ভ ফণ্ডের জন্য ২৪৯৫০ টাকা রাখিতে হইয়াছে। এই টাকা বাদ দিয়া নিট মুনাফা ১৪১৩৮১ টাকা হইয়াছে। ইহার সহিত গত বৎসরের নিট মুনাফা যোগ করিয়া ৩৮৩৭৫৯৲ টাকা হইয়াছে। ইহার মধ্যে শতকরা ৬।০ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হইয়াছে। কাজেই বাকি মুনাফার টাকা বর্ত্তমান বর্ষের হিসাবে জমা হইবে। কাপড়ের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় মিলে ডবল শিফট্ করা হইয়াছে। এখন দুই দফায় মিল দিনরাত চলিতেছে। ঢাকেশ্বরী মিলের কাপড় সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। এবং এই কলে কেবল নিজেদের তৈরী সূতাই ব্যবহৃত হয়। মিলের শ্রমিকদের জন্য খুব ভাল বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। যথেষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থাও আছে। মিলের কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন, বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকগণ বেকার সমস্যায় বিব্রত ; তাহারা মিলে হাতে কলমে কাজ শিখিলে জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম হইবে ; তাই মধ্যবিত্ত ভদ্র-সন্তানের বাসোপযোগী করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয়ে তাঁহারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

(বাংলার বাণী—ঢাকা)

ঢাকায় ঋণদানের প্রস্তাব

ঢাকার ২রা নবেম্বরের খবরে প্রকাশ, পাটের মূল্য হ্রাস হওয়ায় কৃষকগণ বিপন্ন হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য ঢাকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, সার্কেল অফিসারগণ জিলা বোর্ডের সহকারী সভাপতি ও সদর লোকাল বোর্ডের সহকারী সভাপতিকে এক সভায় আহ্বান করেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, বপন কার্য্যের সুবিধার জন্য কৃষকগণকে ঋণস্বরূপ বীজ-শস্য প্রদান করা উচিত। স্থির হইয়াছে, বর্ত্তমানে বীজ শস্য অনাবশ্যক, কারণ প্রায় সমুদয় ক্ষেত্রে চাষ হইয়াছে এবং সেগুলিতে আবাদ হইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমানে বীজ-শস্য প্রদানের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। অতঃপর স্থির হয় আগামী ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে বীজ-শস্য প্রদান করা আবশ্যক হইতে পারে। উপস্থিত ব্যক্তিগণ এইরূপ

অভিমত প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমানে কৃষি-ঋণ প্রদান করা অধিকতর আবশ্যক। বিপন্ন লোকদিগকে কিরূপ সাহায্য প্রদান করা আবশ্যক, অনুসন্ধান করিয়া সে সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট জিলা বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছেন। মোটামুটিভাবে স্থির হইয়াছে যে, কেবল ঢাকা জিলার বিপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য ১৫ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ টাকা আবশ্যক হইবে।

(নোয়াখালী হিতৈষী)

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি

বাঙ্গালা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি ৪০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিতেছেন। এই টাকার জন্য নাকি শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ দিতে হইবে এবং সমপরিমাণ ৪০টী ষাণ্মাসিক কিস্তিতে মিউনিসিপ্যালিটি এই টাকা ও সুদ পরিশোধ করিবেন।

(ঢাকাপ্রকাশ)

ঢাকার রাস্তা

ঢাকার রাস্তা এমনই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় না মিউনিসিপ্যালিটি বলিয়া কোন বস্তু ঢাকাতে আছে। কোন্ রাস্তার নাম করিব? বড়, মাঝারি, ছোট, অলি গলি, সবই বে-মেরামত অবস্থায় রহিয়াছে। রাস্তা সম্বন্ধে এতটা উদাসীনতা শোভন নহে।

রাস্তার কোথাও পাথর-কুচি উঠিয়া গিয়াছে। মেরামত করিবার সাধ্য না থাকে, ঢিলগুলি কুড়াইয়া নিবার ব্যবস্থা হউক। কোন কোন রাস্তায় এত ধূলা জমিয়াছে যে, ধূলায় পা বসিয়া যায়। একটী রাস্তায় দেখা গেল ছেলেরা বালতি বোঝাই করিয়া রাস্তার ধূলা সংগ্রহ করিতেছে। জানি না ওদের কি কাজে তা লাগিবে! রাস্তায় জল দেওয়া কি একেবারে বন্ধ হইয়াছে?

রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার জন্য লোক থাকে; কিন্তু তাহাদের কাজকর্ম তদ্বির করিবার কেহ আছে কি? ঢাকার অনেক রাস্তায়ই দেখা যায় মাটির রং সবুজপানা কতকটা ঘাসের চূর্ণবৎ। গরু, ঘোড়া, ছাগল, কুকুর এসবের যাবতীয় ময়লা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া রাস্তার সর্ব্বত্র থাকে, এবং তাহারই উপর দিয়া গাড়ী, মোটর যাতায়াত করিয়া ক্রমে তাহা চূর্ণ করিয়া মাটিতে মিশাইয়া দেয়। এসব ঝাঁট দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। এজন্য লোক থাকিলেও তদ্বির নাই। রাস্তার ত এই দশা, এর উপর বাস্, লরি, মোটর, টেক্সি যাতায়াতের ঘটা আছে; ফলে রাস্তা চলাচল অসম্ভব হইয়া পড়ে। ঘরবাড়ীর জানালা দিন দিন ধূসরবর্ণ হইতেছে। এ সবের প্রতীকারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি কিছু চেষ্টা করিতেছেন কিনা জানিতে ইচ্ছা করি। রাস্তাঘাটের এই অবস্থা যে অতি সত্বরই অর্থাৎ বসন্তের পূর্ব্বেই সহরে বসন্ত ডাকিয়া আনিবে (টাইফয়েড্ ত আছেই) তাহাতে সন্দেহ নাই।

(বাংলার বাণী—ঢাকা)

নারায়ণগঞ্জের আর্থিক তথ্য

(১) মোটরের দৌরাত্ম্য

সহরের রাস্তায় মোটরের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। মোটর-চালকেরা এত অসাবধানে মোটর চালায় যে, প্রায়ই নিরীহ পথযাত্রীর জীবন বিপন্ন হইয়া থাকে। টেক্সী-চালকগণের অবহেলায় অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ইহারা অতিরিক্ত বেগে গাড়ী চালায়, রাস্তায় লোক থাকিলে সরিবার জন্য হর্ণ্ দেয় না, বা লোকের জীবন বিপন্ন দেখিলেও ঠিক সময়ে গাড়ী থামায় না। রাস্তায় মোটর চলার ফলে রাস্তাগুলি অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। মোটরগুলি যাহাতে সংযত হইয়া রাস্তায় চলে সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

(২) ষ্টীমার ষ্টেশন প্রয়োজন

ধলেশ্বরী সার্ভিসের ষ্টীমার ঢাকা হইতে ছাড়িয়া বুড়ীগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদী দিয়া মাণিকগঞ্জ অভিমুখে যাইয়া থাকে। বর্ত্তমানে বুড়ীগঙ্গা নদীর মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়াতে এই ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জের সংলগ্ন কুমরিয়া ভাঙ্গা খাল বা শীতলক্ষা খালের মধ্য দিয়া ধলেশ্বরীতে পড়িয়া থাকে। যদিও ষ্টীমার-

খানা নারায়ণগঞ্জ সহরের গা ঘেঁষিয়া যায় তথাপি উহা নারায়ণগঞ্জের কোথাও থামে না। নারায়ণগঞ্জ হইতে মাণিকগঞ্জ যাইতে হইলে ঢাকা যাইয়া ষ্টীমারে চড়িতে হয়। স্থানীয় শীতললক্ষার মাথায় একটি ষ্টেশন খুলিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ববার যখনই এই পথে ধলেশ্বরী সার্ভিস চলিয়াছে, তখনই শীতললক্ষায় একটি ষ্টেশন করা হইয়াছে। আশা করি এবারও অবিলম্বে শীতল লক্ষার মাথায় ধলেশ্বরী সার্ভিসের একটি ষ্টেশন স্থাপন করা হইবে।

(৩) খাদ্যদ্রব্যের মূল্য

স্থানীয় বাজারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যাদি অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার কিছু সুলভ। পুরাতন বালাম চাউলের দর কমিয়া মণ প্রতি ৫৲ হইয়াছিল। এখন আবার বৃদ্ধি হইয়া ৬৲ হইয়াছে। চাউলের দর আবার কমিবে বলিয়া ব্যবসায়িগণ বলিতেছেন। ডাইল প্রভৃতির দর এবার বেশ কমিয়াছে। কলিকাতায় নাকি মিষ্টি দ্রব্যের দর কমিয়াছে, কিন্তু এখানে এখনো কমে নাই। অথচ কলিকাতা অপেক্ষা এখানে দুধের দর অনেক সস্তা। দোকানদারগণ অতিরিক্ত লাভের আশায় মিষ্টি দ্রব্যের দর কমায় না। এ বিষয়ে একটু আন্দোলন হইলে দর কমিতে পারে। মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ একটু কড়া নজর রাখিলে জিনিষও খারাপ হইতে পারে না।

(৪) মিউনিসিপ্যাল সংবাদ

স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি বড় বড় রাস্তায় কতকগুলি বড় আলো দিয়াছেন, ইহাতে জনসাধারণের বেশ সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু আরও কয়েকটি স্থানে এইরূপ বড় আলো দেওয়া আবশ্যক। নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুল ও টেলিগ্রাফ আফিসের সম্মুখ দিয়া বহু লোক যাতায়াত করিয়া থাকে। ঢাকা-যাত্রী সমস্ত মোটর গাড়ীও ঐখানেই অবস্থান করে। এখানে একটী বড় আলো দেওয়া একান্ত আবশ্যক। আশা করি কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এখানে একটি বড় আলো দিয়া জনসাধারণের অসুবিধা দূর করিবেন।

(৫) মর্গেন বালিকা বিদ্যালয়

স্থানীয় মর্গেন বালিকা বিদ্যালয় মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। মিউনিসিপ্যালিটি এই স্কুলের গৃহাদি দান করিয়াছেন এবং ইহাকে মাসিক সাহায্য করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এই স্কুলটিকে হাই স্কুলে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

(৬) বাজার দর

বালাম চাউলের দর বর্ত্তমানে ৫।০।৫।।০। কিছুদিন পূর্ব্বে চাউলের দর বেশ কমিয়াছিল এখন আবার একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাল প্রভৃতির দর একটু সুবিধা। তরকারী বেশ পাওয়া যায়। মাছও ইতিমধ্যে দিনকয়েক খুব সস্তায় পাওয়া গিয়াছিল, এখন আবার দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। দুধ বেশ পাওয়া যায়, দরও খুব বেশী নহে। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার খাদ্য দ্রব্যের দর মোটের উপর অপেক্ষাকৃত কম।

(৭) ঢাকায় যাতায়াতের অসুবিধা

কিছুদিন যাবৎ রাস্তা মেরামতের জন্য মোটর বাস্‌গুলি বন্ধ আছে। ইহাতে জনসাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। রেল গাড়ীতে ভিড় খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এদিকে রেল কর্ত্তৃপক্ষ সিরাজগঞ্জ মেল ট্রেন দুইখানি তুলিয়া দিয়া যাত্রিগণের অত্যন্ত অসুবিধা করিয়াছেন। প্রাতে ১০টা ৮ মিনিটে নারায়ণগঞ্জ হইতে সিরাজগঞ্জ মেল লইয়া যে ট্রেন যাইত, উহাতে ঢাকার আফিস আদালতে যাহাদের কাজ তাহারা যাইতে পারিত। আবার রাত্রি ৮টা ১০ মিনিটে ঐ সিরাজগঞ্জ মেল ট্রেন ঢাকা হইতে ছাড়িয়া নারায়ণগঞ্জে আসিত। এই দুইখানা ট্রেন না থাকায় অনেক লোকের খুবই অসুবিধা হইতেছে। প্রাতে লোক্যাল ৯টা ২২ মিনিটের পরে ১১টা ৪৮ মিনিটে পুনরায় ট্রেন পাওয়া যায়; আবার সন্ধ্যা ৬টা ১৪ মিনিটের

পরে রাত্রি ৯টায় পুনরায় ট্রেন। এই দুইটি সময়ের মধ্যে এক একখানা ট্রেন থাকা একান্ত আবশ্যক। সিরাজগঞ্জ মেলে এই সুবিধা ছিল। এখন ঐ সময়ে অন্ততঃ এক একখানা লোক্যাল ট্রেন না দিলে লোকের বড়ই অসুবিধা হইবে।

(৮) পানীয় জলের অভাব

স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির জলের কলসমূহে ভাল জল সরবরাহ হয় না। অধিকাংশ বাড়ীতেই জলের কল নাই। যে সকল বাড়ীতে কল আছে তাহাতেও যথেষ্ট জল পাওয়া যায় না। তিন নম্বর ওয়ার্ডে মোটেই জলের কল নাই। তিন নম্বর ওয়ার্ডে জলের কল স্থাপন করিবার জন্য সরকার হইতে এক লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাও এ যাবৎ কাজে লাগান হয় নাই। ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের কলগুলিতে যাহাতে অধিক পরিমাণে জল-সরবরাহ হয় তজ্জন্য বহুদিন আন্দোলন চলিতেছে; কিন্তু কার্য্যতঃ এপর্য্যন্ত জলের কোনই উন্নতি হয় নাই। পানীয় জলের অভাবে লোকের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। আমরা এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। জনসাধারণ যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ পানীয় জল পাইতে পারে অবিলম্বে সেরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত।

(পল্লীমঙ্গল—নারায়ণগঞ্জ)

ষ্টেশনে পানীয় জলের অভাব

গত ২০শে ভাদ্র শনিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় কোন কার্য্যোপলক্ষে টঙ্গি রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় দেখিলাম ৮।১০ জন প্যাসেঞ্জার এ, বি, আর ট্রেন হইতে নামিয়া পানীয় জলের জন্য বিশেষ ব্যস্ত। ষ্টেশনস্থিত জলের বন্দোবস্তের স্থানে উক্ত প্যাসেঞ্জারগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও জল না পাইয়া ষ্টেশনের কর্ম্মচারীদের নিকট ইন্দারা হইতে জল উঠাইবার জন্য বালতি ও দড়ি চাহিয়াছিল। তৎপর ষ্টেশনের পশ্চিম দিকে মুসলমানদের জুম্মার মসজিদের নিকট যে কূপ আছে সে স্থানে প্যাসেঞ্জারগণ যাইয়া জলপানে সুস্থ হন। দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত ষ্টেশনে পানীয় জল রাখার বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও পানীয় জল নিয়মিতভাবে রাখা হয় না। এমতাবস্থায় অনবরত প্যাসেঞ্জারগণ পানীয় জলের অভাবে কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। আরও অসুবিধা টঙ্গি ষ্টেশনে মুসলমানদের কোন দোকান নাই।

এম, এস, এ, মুন্সী (টঙ্গী)

ডাকের ব্যবস্থা

মুন্সীগঞ্জ ডাকঘর হইতে বিক্রমপুরের অনেক ডাকঘরে ডাক রওয়ানা করার নিয়ম ছিল। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া নারায়ণগঞ্জ ডাকঘর হইতে বিক্রমপুরের ঐ সকল ডাকঘরে ডাক প্রেরণ করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নৌকাযোগে নারায়ণগঞ্জ হইতে ডাক প্রেরণ করিতে হয়। ফলে অনেক বিলম্বে বিক্রমপুরে ডাক পৌঁছে। ব্রাঞ্চ অফিসগুলিতে এত বিলম্বে ডাক পৌঁছায় যে ডাক পিয়নেরা প্রতিদিন ডাক বিলি করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ইহাতে প্রাপকগণের যথেষ্ট অসুবিধা ও ক্ষতি হইতেছে।

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

পাট ও প্রতীকার

(ক)

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় নারায়ণগঞ্জেও বিষম অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জ বঙ্গদেশের মধ্যে পাটের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এখানে প্রতি বৎসর প্রায় দশ কোটি টাকার পাটের কারবার হইয়া থাকে। এই দশ কোটি টাকা গৃহস্থ কৃষক, পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত কর্ম্মচারী প্রভৃতি এবং জমীদার মহাজন ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর মধ্যে বণ্টিত হয়। এবার পাটের দর না থাকাতে উক্ত দশ কোটির এক-চতুর্থাংশ টাকাও দেশের লোকের হাতে আসিবে কিনা সন্দেহ। এই কারণে দেশের সর্ব্বত্র দারুণ অভাব লক্ষিত হইতেছে। কৃষকগণ পাট বেচিয়া বরাবর জমীদারের খাজানা, মহাজনের ঋণ শোধ করে—এবার কেহ কাহাকেও এক পয়সাও দিতেছে না, পাট

বেচিয়া যাহাকিছু পায় তাহাদ্বারাই কোনরূপে সংসার খরচ নির্ব্বাহ করিতেছে। সরকারী কর্ম্মচারিগণ ব্যতীত জমীদার, তালুকদার, মহাজন, উকীল, মোক্তার, কৃষক, শ্রমিক সকলেই এখন অর্থাভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ঋণ ব্যতীত জমীদারের সদর খাজানা দেওয়ার উপায় নাই,—মহাজনের হাতে টাকা না থাকাতে ঋণও পাওয়া যায় না। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেক পরিবার তালুকের আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; তাহাদের অবস্থা এবার একান্ত শোচনীয়। দোকানদারের অবস্থাও তদ্রূপ। বাকী বকেয়া আদায় নাই, তদুপরি কেনা বেচাও খুবই কম। অন্যত্র যাহাই হউক এতদঞ্চলে পাটের দর না থাকাতেই দেশের এই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

অর্থাভাবে কৃষকগণ পাট প্রায় বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। স্বার্থপর খরিদ্দারগণ পল্লীগ্রামে প্রচার করিয়াছে পাটের দর আরও কমিবে; ভয়ে কৃষকগণ নামমাত্র মূল্যে পাট বেচিতেছে। এখনও কৃষকগণ পাট বিক্রয় করিয়া কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করিতেছে; কিন্তু শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। আগামী আমন ধান উঠিলে কৃষকদের অন্নের সংস্থান হইবে, কিন্তু সাধারণের দুঃখ দূর হইবে না, বরং তাহা তীব্রতর হইবে। দেশের মধ্যে টাকা আদান প্রদান বন্ধ করিবার একটা সুর উঠিয়াছে। যাহারা জমীদার, মহাজন বা অপরাপর পাওনাদারের প্রাপ্য কিছু কিছু পরিশোধ করিতে পারে তাহারাও ভবিষ্যতের বিপদ আশঙ্কায় হাতের টাকা খরচ করিতেছে না। কেহ কাহাকেও কিছু দিতে সম্মত না হওয়াতে দেশের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে তাহা সকলেরই চিন্তনীয়।

আবার এক শ্রেণীর লোক পল্লীগ্রামের নিরক্ষর কৃষকদের মধ্যে এই কথাও প্রচার করিতেছে যে, গান্ধী আন্দোলনের ফলে এদেশের লোক বিদেশী জিনিষ—বিশেষভাবে বিলাতী বস্ত্র খরিদ করিতেছে না, উহার ফলে বিদেশী বণিকগণ এদেশের কৃষিজাত দ্রব্য এবং পাট খরিদ করিতেছে না; সুতরাং গান্ধী আন্দোলনই দেশের বর্ত্তমান দুঃখ-কষ্টের মূল। কিন্তু বিদেশী বণিকগণ এবার পাট কিনিতে বিরত হয়েন নাই, বরং পাটের দাম অত্যন্ত সস্তা হওয়ায় কোন কোন কোম্পানী আরও বেশী করিয়া পাট খরিদ করিয়া উচ্চহারে বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত লাভবান হইতেছেন। অল্প মূল্যে পাট খরিদ করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হওয়াই তাহাদের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য। সুতরাং এই সুযোগে তাহারা অপ্রত্যাশিত লাভ করিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আসল কথা—প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ উৎপন্ন হইলে তাহার মূল্য কমিবেই—পাটও প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়াই দর এত কমিয়া গিয়াছে। এদেশের কৃষকগণ যত দিন এই সহজ সত্য উপলব্ধি করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম না হইবে, ততদিন কৃষকের ও দেশের দুরবস্থা দূর হইবে না। যাহারা কৃষকের ও দেশের মঙ্গলকামনা করেন, তাহারা অনতিবিলম্বে কৃষকদিগকে আসল কথা বুঝাইয়া তাহাদের ভ্রম দূর না করিয়া অপর একটা ভুল ধারণা জন্মাইয়া দিলে দেশের আরও অনিষ্ট হইবে এবং কৃষকের একেবারে সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। পূর্ব্বে আন্দোলনের ফলে দেখা গিয়াছে কৃষকগণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পাটের দর কমিয়া গেলেও পাট চাষ কমায় না—মনে করিয়াছিল অন্যে চাষ কমাইলে দর বৃদ্ধি হইলে আমি দুপয়সা রোজগার করিয়া লইব। এবারকার ন্যায় আগামী বারেও যদি অতিরিক্ত পাট উৎপাদিত হয় তবে দেশের কি অবস্থা হইবে তাহা সকলেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য এবং যাহাতে উহা না হইতে পারে সে জন্য কৃষকদিগকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া দেশের প্রত্যেক হিতকামী ব্যক্তির সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

(পল্লীমঙ্গল—নারায়ণগঞ্জ)

(খ)

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এ দেশে পাটের চাষ কমাইবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু নানাকারণে সেই আন্দোলন সফল হয় নাই। পাট একমাত্র বঙ্গদেশেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীর চাহিদার অনুপাতে পাট

উৎপাদন করিতে পারিলে পাটের উপযুক্ত দর পাওয়া যাইতে পারে। এজন্য সরকারের সাহায্য প্রয়োজন। প্রতি বৎসর পাট বুনিবার প্রাক্কালে মজুত পাটের হিসাব ও আগামী বর্ষে কি পরিমাণ পাট প্রয়োজন হইতে পারে তাহার খাঁটি হিসাব প্রকাশিত হইলে এবং উহা কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। পাটের চাহিদা বৃদ্ধি করিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা উচিত। বর্ত্তমানে আনুমানিক ৫ কোটি মণ পাট উৎপাদিত হয়—তন্মধ্যে ভারতীয় মিলগুলিতে সওয়া দুই কোটি মণ ব্যয় হয়। বিদেশে চালান হয় ২ কোটি মণ এবং দেশের মধ্যে বাকি ৭৫ লক্ষ মণ পাট ব্যয়িত হয়। ফসলের পরিমাণ উক্ত হিসাব মত উৎপন্ন না হইলেই দরের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। উক্ত পরিমাণ পাট উৎপাদিত হইলে দর প্রতি মণ দশ টাকার কাছাকাছি থাকিতে পারে। পাটের চাহিদা বৃদ্ধি করিবার জন্য দেশের মধ্যে পাট-শিল্প—যথা দড়ি, চট, থলে, বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিলে পাটের দর বৃদ্ধি পাইবে। যৌথভাবে পাটের ব্যবসার ও পাট শিল্পের প্রসার করিতে পারিলে অনেক বেকারের অন্ন সংস্থান হইতে পারে, কৃষকের অবসরকালে কাজ জোটে এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়। এই সব কাজ করিবার জন্য দেশের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার।

প্রত্যেক ব্যবসায় দেখা যায় যাহার মাল সেই উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে; কিন্তু পাট ব্যবসায় ঠিক বিপরীত। ইহাতে ক্রেতা মালের মূল্য নির্দ্ধারণ করে। ইহার কারণ পাটের ব্যবসা কতগুলি অর্থশালী ও শক্তিশালী লোকের এক চেটিয়া। তাহারা এমন সঙ্ঘবদ্ধ যে দেশের ও বিদেশের সমস্ত বাজার তাহাদের হস্তগত। জমি হইতে পাট উঠিবামাত্র নামমাত্র মূল্যে তাহারা তাহাদের আবশ্যকীয় পাট কিনিয়া ফেলে, কৃষকও পেটের দায়ে তখনই পাট বেচিতে বাধ্য হয়। কৃষকগণ যদি কিছুদিন পাট ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হয় তবেই ক্রেতাগণ দর বেশী দিতে স্বীকৃত হয়। এই জন্য স্থানে স্থানে পাট মজুত রাখিবার জন্য গুদাম করিলে ও কৃষকদিগকে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য আবশ্যকীয় খরচ যোগাইতে পারিলে পাটের দর বৃদ্ধি হইতে পারে। সরকার যদি মুর্সুমের সময় কৃষকদিগকে কিছু কিছু ঋণ দেন তবে কৃষক পাট ধরিয়া রাখিতে পারে। পাটের দর বৃদ্ধি হইলে দেশের সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়।

(পল্লীমঙ্গল-নারায়ণগঞ্জ)

(গ)

কৃষকগণ পাটে অত্যধিক অর্থ পাওয়া যাইবে ভাবিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাট বপন করিয়াছিল। যদি তাহারা বৎসরের খাওয়ার ধান্য আবাদ করিয়া অবশিষ্ট জমিতে পাট বপন করিত তবে আজ আর তাহাদিগকে পরপ্রত্যাশী হইতে হইত না। জমীদারের খাজানা, মহাজন ও লোন অফিসের সুদ যোগাইতে তত বেগ পাইতে হইত না। তাহারা সে দিকে লক্ষ্য না করার দরুণই আজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ১০ জনে ১০৲ টাকা করিয়া কর্জ্জ লইতেছে।

বিগত এপ্রিল মাসে এক দেওয়ানগঞ্জ বাজারেই নগদ ১৫,০০০৲ পনর হাজার টাকার চটি জুতা, আয়না, চিরুণী, রুমাল, এসেন্স ইত্যাদি এবং ৪৫০০০৲ টাকার কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ত অন্যান্য জিনিষ আছে, সেগুলির হিসাব আমরা এখনও পাই নাই। অধিকাংশ বিবাহের দরুণ।

বিবাহের পাল্কী ভাড়া বাদ্যকরের টাকা যাহা বাকী ছিল তাহা পাট বিক্রয় করিয়া দিবে বলিয়া তখন আশ্বাস দিয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে পাটের বাজার দেখিয়া তাহারা প্রমাদ গণিল। ইউনিয়ন কোর্টে পাওনাদারেরা টাকা আদায়ের জন্য নালিশ করিল। ইত্যাদি। সুতরাং যাহা খাইয়া জীবন ধারণ করা যায় তাহার অর্থাৎ ধানের আবাদ করিয়া বাঙ্গালার এই 'নাই নাই খাই খাই' শব্দ দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া লাগা উচিত। পাট খাইয়া কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না। কাজেই লক্ষ মণ পাট ঘরে থাকিলেও জলের দরে বিক্রয় না করিলে অভুক্ত অবস্থায় থাকিতে হইবে। কিন্তু যদি ধান ঘরে থাকে তবে তাতে চিড়া মুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া খাইয়া নিজেদের জীবনও

বাঁচান যাইবে এবং বিক্রয় করিলেও উহার উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যাইবে।

(শান্তিবার্ত্তা—জামালপুর)

বিক্রমপুরের আর্থিক জীবন

(১)

মিরকাদিম ষ্টীমার ষ্টেশন

কমলাঘাট (মিরকাদিম) বিক্রমপুরের উত্তর দিকের একটি বিশিষ্ট ব্যবসায়-কেন্দ্র। এই ষ্টীমার ষ্টেশনে বহু মাল আমদানি হয় এবং বহু যাত্রীও এই ষ্টেশনে যাতায়াত করে। তথাপি এই ষ্টীমার ষ্টেশনের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বেই একবার এই ষ্টেশনটিতে আলো দিবার বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এত বড় একটি ষ্টেশনে যাত্রীদের বিশ্রাম-কক্ষ নাই। মেয়েরা খোলা জায়গায় বসিয়া থাকেন—পুরুষরাও তাই।

এত বড় একটী ব্যবসায়-কেন্দ্রেও মেল ষ্টীমার ধরে না। কারণ গোয়ালন্দ ও চাঁদপুর হইতে ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জ যাওয়ার পথে এখানে ভিড়িলে কয়েক মিনিট বিলম্ব হওয়ার কথা। মেল না ভিড়িবার দরুণ ব্যবসায়ীদের বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। ব্যবসায়ীরা এবং জনসাধারণও পুনঃ পুনঃ মেল ভিড়াইবার জন্য কোম্পানীকে অনুরোধ করিয়াছেন। ফল হয় নাই। যখন কিছুতেই কোন ফল হইল না, তখন কমলাঘাট ও মিরকাদিমের ব্যবসায়িগণ স্থির করিলেন তাঁহারা আর মালপত্র এই ষ্টীমার কোম্পানীর ষ্টীমারে আনাইবেন না। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁহাদের যাবতীয় মাল প্রায় ২ মাস যাবৎ ভাগ্যকুলের কুণ্ডু বাবুদের ষ্টীমারে আনিতেছেন। এর ফলে প্রকাশ, ষ্টীমার কোম্পানীর প্রায় ৪০ সহস্র টাকা লোকসান হইয়াছে। এবং তাহারই টানে কোম্পানীর তরফ হইতে সাহেব আসিয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের অভিযোগ কি করিলে দূর হয় তাহা জানিতে চাহেন। ব্যবসায়ীরা যে সকল অভিযোগ দূর হওয়া আবশ্যক বলিয়া জানাইয়াছেন তন্মধ্যে—

১। মেল ষ্টীমার ভিড়িবে।

২। শতকরা দশটাকা হিসাবে মালের ভাড়া কমিবে।

৩। বিশ্রাম-কক্ষের ব্যবস্থা হইবে।

৪। আলোর সুবন্দোবস্ত হইবে।

ষ্টীমার কোম্পানীর তরফ হইতে নাকি বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের অভিযোগ সব মিটিলে তাহারা ভবিষ্যতে অন্য ষ্টীমারে মাল দিতে পারিবেন না, আই, জি, এস্ এন, ষ্টীমারেই দিবেন, এই সর্ত্ত লিখিয়া দিতে হইবে। ব্যবসায়ীরা এই অসঙ্গত সর্ত্তে স্বীকৃত হন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, আমরা এমন কোন সর্ত্ত করিতে পারিব না।

(বাংলার বাণী—ঢাকা)

(২)

সোণারং গ্রাম

বিক্রমপুরের মাঝখানে সোনারং গ্রাম অবস্থিত। এখানে স্রোতস্বিনী পদ্মা বা ধলেশ্বরীর আক্রমণের ভয় নাই। এখানে বৈদ্যের সংখ্যাই বেশী, ব্রাহ্মণের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়; কায়স্থ এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। কয়েক ঘর কুম্ভকার আছে।

এই গ্রামে একটী হাই স্কুল, একটী বালিকা বিদ্যালয় পোষ্ট ও টেলিগ্রাম অফিস বর্ত্তমান আছে এবং একটী দাতব্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে। এই ঔষধালয়ের দ্বারা সোণারংয়ের ও অন্যান্য অনেক গ্রামের পীড়িত ও আর্ত্তের নিত্য সেবা হইয়া থাকে। দালান বালাখানা যথেষ্ট এই গ্রামে আছে। দেখিয়া মনে হয় যে, গ্রামটী সমৃদ্ধিশালী, কিন্তু ভিতরের খবর যিনি জানেন তিনিই বলিবেন যে, অধিকাংশ লোকেরই অবস্থা সচ্ছল নয়। অনেক ছেলে বি, এ, পাশ করিয়া বেকার অবস্থায় বসিয়া আছে। গ্রামে সজীবতা বলিয়া একটা জিনিষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা কিছু সজীবতা তাহা জন কয়েক স্থানীয় কুম্ভকারের মধ্যে দেখা যায়।

লোকাল বোর্ড

এখানে লোক্যাল বোর্ডের অধীনে অনেক পুল আছে। প্রায় সবগুলিই মেরামতের অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম

হইয়াছে। লম্বায় প্রায় ১১০ হাত একটী পুল জলাশয়ের উপর দিয়া স্থাপিত। ১৯১২ সনে যখন বিক্রমপুরের ভিতর দিয়া বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর পরিচালনা হইয়াছিল, তখন তাহাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই পুল স্থাপিত হইয়াছিল। এই পুল লোকাল বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীন। সংস্কার অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। রাস্তা-ঘাটের অবস্থাও শোচনীয়।

শিল্প

গবর্ণমেন্টের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিপার্টমেণ্ট জন কয়েক ডিম্‌-নেষ্ট্রেটার পাঠাইয়া কয়েকজন মেয়েকে তাঁতে তোয়ালিয়া, সাড়ী, সুজনী তৈয়ার করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখন তাহাদের সাহায্য ছাড়াই এই গ্রামে ৮।৯ খানা তাঁত বসিয়াছে। মেয়েরা সুন্দর সুন্দর তোয়ালিয়া সুজনী ও ছিটের কাপড় তৈরী করিতেছে।

রিজার্ভ পুস্করিণী

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সোণারংয়ের বিখ্যাত "বড় পুষ্করিণী" ৺রত্নেশ্বর সেন মহাশয়কে ৯৯ বৎসরের মিয়াদী ইজারা দেন। উদ্দেশ্য ছিল এই পুষ্করিণীকে রিজার্ভ পুকুর করা হইবে, শুধু গ্রামবাসীদিগকে পানীয় জল সরবরাহ করিবার জন্য। দুঃখের কথা এই জলাশয়ে প্রত্যহ বহুলোকে স্নান করে; কলুষিত বস্ত্র, কাঁথা, থালা বাটী ধৌত করে। যাহারা ইজারা নিয়াছেন তাহারাও এই দোষে দোষী। আর একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রতি বৎসর দুইটী বৃহৎ নালা কাটিয়া পচা খালের অপরিস্কৃত জল আনিয়া পুকুরটীতে ভর্ত্তি করা হয়। নইলে জলাশয়ের মৎস্য মরিয়া যাইবে। বৎসর বৎসর বহু মৎস্য এই জলাশয় হইতে বিক্রী হয়। যে খাল হইতে জল আনা হয় তাহাতে ৫০ টী পায়খানা বর্ত্তমান।

স্বাস্থ্য

এখানকার স্বাস্থ্য এখন পর্য্যন্ত বেশ ভালই আছে। দুগ্ধ ⁄১০, ⁄০ সের বিক্রী হইতেছে। মৎস্য বিশেষ পাওয়া যায় না।

টঙ্গীবাড়ীর হাট

টঙ্গীবাড়ীতে খুব বড় হাট আছে। সোণারং হইতে মাত্র ১ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। এখানে গাঁজা ও আফিংয়ের দোকান বর্ত্তমান। কিন্তু বিক্রী অনেক কমিয়া গিয়াছে।

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

(৩)

নদীর কৃপায় আর্থিক রূপান্তর

বিক্রমপুরের অধিবাসীরা পদ্মা ও ধলেশ্বরীর অত্যাচারে কিরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়ে এবং কত প্রকারের যাতনা ভোগ করে তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের উপলব্ধি করা কঠিন। দস্যু তস্করে বাস্তভিটা চুরি করিতে পারে না। গৃহদাহে অথবা ঝড়ে দাঁড়াইবার স্থানের অভাব হয় না। নদী ভাঙ্গায় সত্য সত্যই মানুষকে পথে দাঁড়াইতে হয়। নদীতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বিক্রমপুরে বাসোপযোগী স্থানের অভাব ঘটিয়াছে। এক কানি বাড়ীর উপযুক্ত ভূমির মূল্য ২০০০৲ টাকা হইতে ৪০০০৲।৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মধ্যবিত্ত ভদ্র-লোকগণ বাড়ী করিতে অসমর্থ হইয়া অনেকে দেশত্যাগী হইয়াছে। কেহ কেহ পরের বাড়ীতে বাড়ীর মালিকের অনুগ্রহে অস্থায়িভাবে বাস করিতেছে। কিন্তু অস্পৃশ্য জাতীয় লোকদিগকে অনুগ্রহ করিয়াও কেহ স্থান দেয় না। ইহারা সাধারণতঃ দীন দরিদ্র এবং নিরক্ষর। ধলেশ্বরীর তীরে ছটফটিয়া গ্রামে এইরূপ প্রায় ২০০ ঘর ঋষি, নমঃশূদ্র, ধীবর ও মুসলমান ছিল। ৭।৮ বৎসর যাবৎ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গ্রামটি এবার প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। হত-ভাগ্যদের বাড়ী ঘর যখন ১০।১৫ মিনিট বা আধ ঘণ্টার মধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হইবার উপক্রম হয় তখন ইহাদের কি দুর্দ্দশাই না উপস্থিত। সম্মুখে ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে ধলেশ্বরী প্রবাহিতা, পশ্চাতে সমগ্র বিক্রমপুর বর্ষার জলে নিমজ্জিত। অনন্যোপায় হইয়া যে যেখানে পারে আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করে। কিন্তু ঋষিরা চর্ম্মের ব্যবসায়

করে বলিয়া তাহাদিগকে কেহ স্থান দেয় না। এইরূপ এক পরিবার অন্ত স্থানাভাবে এক পুলের উপর থাকিয়া বর্ষা কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিল। কয়েক পরিবার বাদসাহী দরজা নামক একটি রাস্তার উভয় পার্শ্বে বাঁশের মাচার উপর ঘর বাঁধিয়া কিছুদিনের মত থাকিবার স্থান করিয়াছিল। বর্ষা অন্তে স্থান সংগ্রহ করিতে পারিলেই ইহারা চলিয়া যাইত। ৫।৭ বৎসর এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এ বৎসর বাদসাহী দরজার পার্শ্বে ৭।৮ ঘর নমঃশূদ্র ও ঋষি অস্থায়ী ভাবে তাহাদের চালা তুলিয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যাহারা ছিল তাহারা চলিয়া গিয়াছে। বাদসাহী দরজারও মাত্র৫।৬ শত গজ অবশিষ্ট আছে। তথাপি ঢাকা জেলা বোর্ড এই ৭।৮ ঘর দরিদ্র অধিবাসীদিগকে তিন দিনের মধ্যে চলিয়া যাইবার জন্ত নোটীশ দিয়াছে। অন্তথা তাহারা ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইবে।

মুন্সীগঞ্জ-শ্রীনগর রাস্তা আবদুল্লাপুর বাজার হইয়া ছটফটিয়া গ্রামের উত্তর দিক্ দিয়া তালতলা গিয়াছে। এই রাস্তার দুই মাইল পরিমাণ অংশ এখন নদী-গর্ভে। বাদসাহী হালট এই রাস্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ছটফটিয়া গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত। ছট্‌ফটিয়ার দরিদ্র অধিবাসিগণ বাদসাহী দরজার উভয় পার্শ্বে তাহাদের চালা তুলিয়াছে—মুন্সীগঞ্জ-শ্রীনগর রাস্তার পার্শ্বে নহে। ইহারা জেলা বোর্ডের রাস্তা অধিকার করে নাই, রাস্তার পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

তথাকথিত বাদসাহী হালট দৈর্ঘ্যে আধ মাইলেরও কম ছিল। ১৯১৭ সনের পূর্ব্বে ঐ স্থানে রাস্তার কোন চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল না।

এই রাস্তা উদ্ধারের জন্ত মোকদ্দমা করিয়া জেলা বোর্ড হারিয়া গেলে পর রায় প্যারীমোহন বসু বাহাদুর নিজের প্রতিপত্তিতে ইহার কিয়দংশ উদ্ধার করেন। রায় বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে জেলা বোর্ডের প্রদত্ত ১২০০৲ টাকা দ্বারা ১৯১৭ সনে বাদসাহী দরজা নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাস্তার পার্শ্বস্থিত ভূমির উপর জেলা বোর্ডের কোন অধিকার নাই বা ছিল না। উহার পাশের কোন বৃক্ষাদি জেলা বোর্ড কোন দিন নেয় নাই। এই অবস্থায় রাস্তার পার্শ্বে আশ্রয়হীন ব্যক্তিরা আশ্রয় গ্রহণ করিলে জেলা বোর্ড কেন তাহাদিগকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিতে প্রস্তুত তাহা বুঝা যায় না।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ
দ্বিপাড়া, ঢাকা।
(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

মহিলা শিল্প প্রদর্শনী

ঢাকা সহরে সম্প্রতি দুইটী মহিলা শিল্প প্রদর্শনী হইয়া গেল। একটী দীপালী সঙ্ঘের মহিলাদের উদ্যোগে ও অপরটী গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতির প্রচেষ্টায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। দুইটী প্রদর্শনীতেই নানাবিধ শিল্প-সম্ভারের সমাগম হইয়াছিল; মহিলাদের হাতের নানারকম সূচীকর্ম্ম পুতুল, মালা, মিষ্টান্ন, জামা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার জিনিষের সমাবেশে প্রদর্শনীস্থল সুসজ্জিত হইয়াছিল। দীপালি সঙ্ঘের মেয়েদের লাঠিখেলা প্রশংসনীয়। সূতাকাটা প্রতিযোগিতায় অনেক মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। সময়োপযোগী ও শিক্ষামূলক বক্তৃতাদির ব্যবস্থাও হইয়াছিল। উপযুক্ত শিক্ষা ও উপদেশ পাইলে মহিলাদের কর্ম্মমন্দির যে উত্তরোত্তর উন্নত হইবে তাহার আভাস বেশ পাওয়া গিয়াছে।

(ঢাকা প্রকাশ)

ঢাকার মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা

ঢাকার দাঙ্গার অবসান হইয়াছে। সহরের শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দাঙ্গার সময় সেই যে হিন্দুরা মুসলমান গাড়োয়ানের গাড়ীতে চড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেই অবধি আর তাহারা বড় একটা মুসলমানের গাড়ীতে চড়িতেছে না। মুসলমান রাজমিস্ত্রীদিগকেও হিন্দুরা আর বেশী নিযুক্ত করিতেছেন না। দেশেও অর্থাভাব লাগিয়াই আছে। এই সকল কারণে ঢাকাবাসী অনেক মুসলমানের দারুণ অর্থাভাব ঘটিয়াছে। তাহারা পূর্ব্বের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কেহ নাপিত, কেহ পানওয়ালা, কেহ বা মিঠাই-বিক্রেতা হইয়াছে।

(বাংলার বাণী—ঢাকা)

গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী

	পূর্ব্ববঙ্গবাসী	পশ্চিমবঙ্গবাসী
বেঙ্গল সিবিল সার্ভিস	৬৫ জন	৪৭ জন
বেঙ্গল জুডিসিয়াল সিবিল সার্বিস	১৭৬ জন	১০০ জন
পুলিস বিভাগ (ইন্‌স্পেক্টরের উর্দ্ধতন পদ)	১১ জন	৭ জন

বাংলা দেশে ফৌজদারি মামলা

বাংলা দেশে ১৯২৮ সনে দায়রা মামলা করিবার জন্ত ২১ জন সেশনস্ জজ ও ১৪ জন অতিরিক্ত সেশনস্ জজ নিয়মিত কাজ করিয়াছিলেন। নয় জন নিম্নতন জজকে অতিরিক্ত সেশনস্ জজের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাঁহারা আটটি জেলায় ১৫৫টি মামলার বিচার করেন। বিভিন্ন জেলায় দায়রা কাজের জন্ত এগার জন অস্থায়ী অতিরিক্ত সেশনস্ জজ ছিলেন।

বাংলা দেশে সকল শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা ছিল ৪৩৯ ; এ ছাড়া অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ৬০৫ জন। নোয়াখালীতে একজন স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট একশ' দিন ধরিয়া ২৮৬টি মামলা নিষ্পত্তি করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ৪৩৯ জন ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে ২৭৬ জনের প্রথম শ্রেণীর, ১৩৫ জনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ও ২৮ জনের তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল। মফঃস্বলে ৫৭২ জন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট লইয়া ১১৮টি বেঞ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯২৮ সনে ৪,২৪,১৩২টি অপরাধের শুনানি হয় ; ১৯২৭ সনে ছিল ৪,২২,৫৬৩। সুতরাং বাড়িয়াছে। উপরিউক্ত অপরাধের মধ্যে ৩,৪৮,১৩৯টি সত্য বলিয়া প্রকাশ। ইহার মধ্যে ৩,০১,৪৯০টির বিচার হয়। অর্থাৎ প্রায় ১,২০,০০০ অভিযোগের বিচার হয় নাই।

বাংলার দুর্দ্দিন

শুল্ক-বিভাগের প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে, কলিকাতার বন্দরে গত বৎসরের আগষ্ট মাসের চেয়ে ১৯৩০এর আগষ্ট মাসে তিন কোটি টাকার উপর আমদানি কম হইয়াছে। রপ্তানির দশাও তথৈবচ। রপ্তানির মূল্য ৬ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা কম হইয়া ৭ কোটি টাকা দাঁড়ায়। সমগ্র বাংলা দেশে আজ বিকিকিনির অবস্থা অতি শোচনীয়। জিনিষপত্রের দাম খুবই কমিয়া গিয়াছে, এমন কি খরচা পর্য্যন্ত উঠিতেছে না। নিম্নে আমরা ১৯২৯ সনের আগষ্ট মাসের সহিত ১৯৩০ সনের আগষ্ট মাসের আমদানি রপ্তানির তুলনা করিতেছি :—

আমদানি	১৯৩০ আগষ্ট	১৯২৯ আগষ্টের তুলনায়
সূতার মাল	৮৭ লক্ষ টাকা	১,৬৪ লক্ষ টাকা কম
কলকব্জা	৫৩ ,, ,,	৫ ,, ,, ,,
তৈল খনিজ তৈল	৪৮ ,, ,,	৪ ,, ,, ,,
চিনি	৩৫ ,, ,,	৩৫ ,, ,, ,,
লৌহ ও ইস্পাত	৩৪ ,, ,,	১৫ ,, ,, ,,
অন্তান্ত ধাতু	১৬ ,, ,,	১ লক্ষ ,, অধিক
বৈদ্যুতিক মাল	১২ ,, ,,	১ ,, ,, ,,
লোহালক্কড়	১১ ,, ,,	৭ ,, ,, কম
রপ্তানি		
পাটের জিনিষ	২,৯৬ ,, ,,	২,৪৫ ,, ,, ,,
চা	১,৮০ ,, ,,	১,২০ ,, ,, ,,
পাট	৫৮ ,, ,,	৭৯ ,, ,, ,,
তিসি	৩৮ ,, ,,	৪২ ,, ,, ,,
চামড়া	২৫ ,, ,,	২১ ,, ,, ,,
লাক্ষা	১৪ ,, ,,	৩৮ ,, ,, ,,
লোহা	১৪ ,, ,,	১১ ,, ,, ,,
শস্ত, ময়দা	১৩ ,, ,,	১৪ ,, ,, ,,

যে তিন কোটি টাকার কম রপ্তানি হইয়াছে, তাহার মধ্যে বস্ত্র ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার ঘাটতির জন্ত দায়ী। যেথানে গত পূর্ব্ব বৎসরে আগষ্ট মাসে ৯·২ কোটি গজ কাটা কাপড় আসিয়াছিল, সেখানে এ বৎসরে ঐ মাসে আসে ৩·৭ কোটি গজ ; দামও ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকার স্থলে ৭৩ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। এই পৃথিবীব্যাপী মন্দা বাজারের দিনে চাষীরাই সব চেয়ে বেশী কষ্ট পাইতেছে।

ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যে কত টাকা নিয়োজিত রহিয়াছে ?

যানবাহনাদির কোম্পানীসমূহের প্রদত্ত মূলধন ২০ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে রেলপথ ও ট্রামপথের হিস্যা ১৫ কোটি টাকা। বোম্বাইয়ে ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ও বাংলা দেশে ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা রেল ও ট্রামে খাটে।

ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প কোম্পানীর প্রদত্ত মূলধন ৯০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে—

১৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা বা ১৬% জনমঙ্গল কার্য্যে খাটিতেছে

৬ ,,	২৮ ,,	,,	এজেন্সীতে খাটিতেছে
৩ ,,	৯৮ ,,	,,	তামাকুর কারবারে
৪ ,,	১ ,,	,,	ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে
৩ ,,	৫০ ,,	,,	চুণ, সিমেণ্ট প্রভৃতি কার্য্যে
৫ ,,	২ ,,	,,	লৌহের কারবারে
২ ,,	৬৫ ,,	,,	ছাপাখানা, পুস্তক প্রকাশ, মনোহারী দোকানপত্রে
২ ,,	৪২ ;,	,,	কেমিক্যাল ও ঔষধাদি প্রস্তুতের কারবারে
১ ,,	৪০ ,,	,,	সাবান, বাতি ইত্যাদিতে।

কতকগুলি কারবারের হিস্যা

সমগ্র প্রদত্ত মূলধনের সিকি পরিমাণ তুলা, কাপড়, পশম, রেশম প্রভৃতির কারখানায় খাটিতেছে। এই খাতে ৭১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা নিযুক্ত আছে। ইহার মধ্যে বোম্বাইয়ে ৩১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা বা ৪৪% মূলধন খাটিতেছে। অধিকাংশ বয়নশিল্পে, বাংলাদেশে প্রধানতঃ পাটের কলে। এখানে ২৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা মূলধন খাটিতেছে।

নিম্নে কোন্ কোন্ ব্যবসায়ে কত মিল চলিতেছে তাহার একটা তালিকা প্রদত্ত হইল :

	কারবার	সংখ্যা	প্রদত্ত মূলধন
১।	কাপড়ের কল	২৮৯	৪০,৪৮ লক্ষ টাকা
২।	তুলা চাপা ঠাসার কল	১১১	২,৫০ ,, ,,
৩।	পাটের কল	৬১	১৬,৫১ ,, ,,
৪।	পাট চাপা, ঠাসার কল	২৮	১,৭১ ,, ,,
৫।	রেশম, পশম শণের কল	২২	২,৬০ ,, ,,
৬।	কাগজের কল	১০	৯৬ ,, ,,
৭।	চালের কল	৮৫	২,২৯ ,, ,,
৮।	ময়দার কল	২৫	১,২১ ,, ,,
৯।	কাঠ চিরাই কল	১৯	৮৩ ,, ,,
১০।	তেলের কল	৪৮	২,১২ ,, ,,
১১।	অন্যান্য মিল ও চাপা কল	৪৪	৩১ ,, ,,
		৭৪২	৭১ কোটি ৫৪ লক্ষ

চা-কফি প্রভৃতির বাগিচাতে ১২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা খাটিতেছে; ইহার মধ্যে বাংলাদেশে চা-বাবদ্ ১০ কোটি ৫ লক্ষ টাকা নিযুক্ত আছে। আসামের চা-বাগিচার আফিস কলিকাতায়।

খনিজ শিল্পের কারবারে ৪০ কোটি টাকা খাটিতেছে। ইহার মধ্যে প্রায় সিকি ভাগ বা ১০ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বাংলাদেশে কয়লার খনিতে আবদ্ধ। প্রায় পৌনে এগার কোটি টাকা লোহের কারবারে খাটিতেছে; পেট্রোলিয়ামে ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা খাটিতেছে, প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশে।

ভারতে বিদেশী মূলধন

বিদেশী মূলধনের আফিস সব বিদেশে। এই শ্রেণীর কারবারের সংখ্যা ছিল ৮৬১টি। ইহাদের প্রদত্ত মূলধন ৬৫২,৩০২,০০০ পাউণ্ড; এছাড়া ১২৫,৬৯০,০০০ পাউণ্ডের ডিবেঞ্চার ছাড়িয়াছিল। ইহার মধ্যে রেলওয়ে ও ট্রাম ওয়ের মূলধন ছিল প্রায় ৩·৩ কোটি পাউণ্ড ও ডিবেঞ্চার ৩৮,৩৭৬,০০০ পাউণ্ড মূল্যের। এছাড়া কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়ের জন্য ২৬,১২২,০০ পাউণ্ড ও পাট কলের জন্য ২,৮৩৪,০০০ পাউণ্ড উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ ভারতের সোণার খনিতে যে সব কোম্পানী কাজ করে তাহার সবই প্রায় বিলাতী কোম্পানী; তাহাদের প্রদত্ত মূলধন ১,৯৫২,০০০ পাউণ্ড। মহীশূরের বিখ্যাত কোলার স্বর্ণ খনিতে বহুকাল যাবৎ কাজ চলিতেছে; বর্ত্তমানে প্রায় ৬০০ ফুট নীচে কাজ হইতেছে। মহীশূর সরকার রাজস্ব পাইয়া থাকেন।

বহু বিদেশী কোম্পানী এদেশে কাজ করে, তাহাদের সামান্য কাজ ভারতে হয়; সুতরাং ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে পৃথক হিসাব নিকাশ পাওয়া যায় না। বিশেষভাবে যে সব ব্যাঙ্ক ও জাহাজ কোম্পানী পৃথিবীব্যাপী কারবার করে তাহাদের কতখানি কাজ ভারতে হয় তাহার সঠিক বিবরণ পাইবার উপায় নাই।

ভারতে যৌথকারবারের প্রসার

১৯৩০ সনের আগষ্ট মাসের শেষাশেষি ভারত সরকার কর্ত্তৃক ভারতে যৌথকারবারের প্রতিবেদন ১৯২৭-২৮ প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতে বৃটিশ ভারত ছাড়া মহীশূর বড়োদা, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর ও ত্রিবাঙ্কুরের যৌথকারবারের তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১৯২৭-২৮ সনে সমগ্র ভারতে ৬২৬টি যৌথকারবার রেজিষ্টারী করা হয়। ইহার মধ্যে বৃটিশ ভারতে ৫৩১ ও দেশীয় রাজ্যে ৯৫টি অবস্থিত। আলোচ্য বর্ষে গত পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে প্রায় শতকরা ১৮% হারে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেজিষ্ট্রেশন বাবদ সরকার প্রায় ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। গতপূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে আলোচ্য বর্ষে রেজিষ্টার্ড মূলধন শতকরা ৯% কম, কিন্তু প্রদত্ত টাকা ৯৫% অধিক। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে ভারতে যৌথকারবারগুলি কি ভাবে চলিতেছে তাহার আভাষ নিম্নের তালিকা হইতে পাওয়া যাইবে।

বৎসর	সংখ্যা	মূলধন (লক্ষ টাকা)	প্রদত্ত মূলধন
১৯১৩-১৪	৩৫৬	৬৬,৯২	৭৭
১৯১৯-২০	৯৪৮	২,৮১,৭৬	১,৫৮
১৯২০-২১	১০৩৯	১,৪৮,০৪	৩,১৫
১৯২১-২২	৭১৭	৮০,৮৪	১,৯০
১৯২২-২৩	৫৯৬	৩৪,৪২	১,৪৮
১৯২৩-২৪	৪৩০	২৬,৫০	৬৭
১৯২৪-২৫	৪১৬	২১,২৩	৮৬
১৯২৫-২৬	৪৭২	৩০,০৬	৫৭
১৯২৬-২৭	৫২৯	১৯,৩৯	৪৪
১৯২৭-২৮	৬২৬	১৯,৫৭	৮৬

উক্ত তালিকার মধ্যে ১৯১৯-২০ সন হইতে বড়োদা, গোয়ালিয়র এবং ইন্দোরের, ১৯২০-২১ হইতে ঐ সব ও ত্রিবাঙ্কুরের এবং ১৯২১-২২ হইতে ঐসব ও হায়দ্রাবাদের যৌথ-কারবারের সংখ্যা ধরা হইয়াছে।

গত ১৯২৭-২৮ সন পর্য্যন্ত ভারতে ১৩৭৯৭টি শেয়ার-গঠিত কোম্পানী রেজিষ্টারি করা হয়। ইহার মধ্যে মাত্র ৫,৮৩১টি বা শতকরা ৪২%টি উক্তরূপে বাঁচিয়াছিল। অবশিষ্ট কোম্পানীগুলি হয় ফেল মারিয়াছে না হয় আদৌ কার্য্য আরম্ভ করে নাই।

বর্ত্তমানে গোটা ভারতের যৌথকারবারের অবস্থা নিম্নের তালিকায় বুঝা যাইবে।

বৎসর	কারবারের সংখ্যা	মূলধন	প্রদত্ত মূলধন
		(লক্ষ টাকা)	
১৯২৩-২৪	৫,২১১	৬,৯০,৫৬	২,৬৫,৩৩
১৯২৪-২৫	৫,২০৪	৬,৬৫,৯৭	২,৭৫,৫৩
১৯২৫-২৬	৫,৩১১	৬,৫১,০৩	২,৭৭,২৮
১৯২৬-২৭	৫,৫৩৫	৬,৪০,১৫	২,৭৭,০৩
১৯২৭-২৮	৫,৮৩১	৬,৩০,৭২	২,৭৬,৬১

আলোচ্য বর্ষে যৌথকারবার সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি প্রণিধানযোগ্য :

(ক) ৬২৬টি নূতন কোম্পানী ১৭'৫৭ কোটি টাকা মূলধন লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে মাত্র ৮৬ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল।

(খ) বিশ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া পাঁচটি কোম্পানী আদালতের আদেশে পুনর্গঠিত হইয়াছিল।

(গ) ৩৩৫টি কোম্পানী (২৩'৭৩ কোটি টাকার মূলধন) দেউলিয়া হইয়াছিল; ইহাদের বাবদ ৭'৩৪ কোটি টাকা উঠিয়াছিল।

(ঘ) ৪৯টি কোম্পানীর মূলধন ৮'০৫ কোটি টাকা বর্দ্ধিত করা হয়; ২৬টি কোম্পানীর মূলধন ১১'৫৩ কোটি টাকা কমানো হয়।

(ঙ) ১,১৩০টি কোম্পানীর প্রদত্ত মূলধন ৯'৪৩ কোটি টাকা বাড়ানো হয় ও ১৮৮ কোম্পানীর ৩'৩৭ কোটি টাকা কমানো হয়। প্রদত্ত মূলধনের মধ্যে বাংলা দেশ ২'১২ কোটি টাকা তুলিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্ক লোন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষে ২৫ কোটি টাকা মূলধন প্রদত্ত হয়। ইহার মধ্যে বোম্বাইয়ের অংশ শতকরা ৩৪, বাংলার ৩৩। সুতরাং বাংলা পিছাইয়া নাই। রেজিষ্টারি মূলধন ও প্রদত্ত মূলধনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির ভিতর। ১৯২৭-২৮ সনের শেষে ভারতে ৮৬টি দেশী বীমা কোম্পানী ছিল; ইহাদের সমগ্র মূলধন ৫০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা; ইহার মধ্যে বিক্রয় বা বিলি হইয়াছে ১০ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা; প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

ভারতবর্ষে চারি শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আছে : (১) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, (২) এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক (৩) যৌথ ব্যাঙ্ক (৪) কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। এ ছাড়া বিস্তর বে-সরকারী ব্যাঙ্ক আছে। সম্প্রতি এই চারি প্রকার ব্যাঙ্কের টাকার লেনদেন হইতে দেশের আর্থিক গতিটা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্।

৫॥ কোটি টাকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

১৯২৭ সনের তুলনায় ১৯২৮ সনে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে সরকারী বা পাবলিক জমা অধিক হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তি-গত জমা কমিয়াছে। ব্যক্তিগত জমা কমার অর্থ এই যে লোকে অল্প সুদে ব্যাঙ্কে টাকা ফেলিয়া রাখিবার হেতু পাইতেছে না, সেইজন্য বোধ হয় উহা শিল্পাদি কর্ম্মে লাগাইতেছে।

৩১শে ডিসেম্বর	মূলধন (হাজার টাকা)	রিজার্ভ (হাজার টাকা)	সরকারী বা পারিবারিক আমানত (হাজার টাকা)	ব্যক্তিগত আমানত (হাজার টাকা)	ক্যাশ ব্যালেন্স (হাজার টাকা)
১৯২৪	৫,৬২,৫০	৪,৮০,০৮	৭,৫০,২৬	৭৬,৭১,২২	১৫,৬০,২৬
১৯২৫	৫,৬২,৫০	৪,৯২,৭৩	৫,৪৬,৪৪	৭৭,৮৩,৩৩	১৭,৪৬,৮২
১৯২৬	৫,৬২,৫০	৫,০৯,৫০	৬,৪৫,৩৬	৭৩,৮৯,৭০	২০,৯০,১০
১৯২৭	৫,৩২,৫০	৫,২৪,০৭	৭,২০,২৩	৭২,০৭,২২	১০,৮৮,৬৫
১৯২৮	৫,৩২,৫০	৫,৩৯,২২	৭,৯৪,৮৬	৭১,৩০,৪৪	১০,৫৭,৫৮

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের ৮৫ কোটি টাকা ভারতে

আঠারটি একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক এদেশে কার্য্য চালাইতেছে। ১৯২৮ সনে ইহাদের প্রদত্ত মূলধন ছিল ১৮·৮ কোটি পাউণ্ড; ভারতে জমা হইয়াছিল ৫·৩ কোটি পাউণ্ড। এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে: (ক) যে সব ব্যাঙ্কের কাজ অধিকাংশই ভারতে হয়; (খ) যে সব ব্যাঙ্কের অধিকাংশ কারবারই বিদেশের সহিত। ১৯২৮ সনে 'ক' শ্রেণীর ছয়টি ব্যাঙ্কে মূলধন ও রিজার্ভ ছিল ২০,৬০৩ হাজার পাউণ্ড। ভারতের বাহিরে আমানতের পরিমাণ ৬৮,৬৫১ হাজার পাউণ্ড; ভারতে আমানত ৫০,০৫,২৫ হাজার টাকা; ক্যাশ ব্যালেন্স ভারতের বাহিরে ৯,৩৭০ হাজার পাউণ্ড, ভারতে ৫,৬৫,৮৫ হাজার টাকা।

'খ' শ্রেণীর ১২টি এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কের মূলধন ও রিজার্ভ ১৬৭,৩২০ হাজার পাউণ্ড; ভারতের বাহিরে আমানত ১,২৯০,১২৩ হাজার পাউণ্ড। ভারতে আমানত ২১,০৮,৬১ হাজার টাকা। ক্যাশ ব্যালেন্স ভারতের বাহিরে ২২৭,২৫১ হাজার পাউণ্ড; ভারতে ২,৩৯,৭২ হাজার টাকা। বিদেশী এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কে ভারতের ক্যাশ ব্যালেন্সের পরিমাণ ক্রমান্বয় কমিতেছে। ভারতীয় ব্যাঙ্কের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা-বৃদ্ধি ইহার একটি কারণ হইতে পারে।

১২।০ কোটি টাকার ৭৪টি যৌথ ব্যাঙ্ক

১৯২৮ সনে ভারতে যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৭৪টি। ইহার মধ্যে ২৮টির মূলধন ৫ লাখ ও তদূর্দ্ধ টাকা; ৪৬টি ব্যাঙ্কের মূলধন এক হইতে পাঁচ লক্ষের মধ্যে। ১৯২৮ সনে এই ৭৪টি ব্যাঙ্কের মোট মূলধন ছিল ১২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, আমানতে জমা ছিল ৬৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এবং ক্যাশ ব্যালেন্স ছিল ৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাক। এই যৌথ ব্যাঙ্কগুলিতে গচ্ছিত জমার অঙ্ক ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে।

১৯২৮ সনের সরকারী প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে মাত্র সাড়ে দশ কোটি ও একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কে আট কোটি টাকা ক্যাশ ছিল। ব্যাঙ্কের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লোক বা প্রতিষ্ঠান টাকা ধার লয়, কিন্তু শতকরা ১৩% ও ১১% হারে টাকা রাখা নিরাপদ নয়। একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক মাত্র ১১% হারে টাকা রাখিয়াছিল। হঠাৎ প্রয়োজনে বিলাত হইতে টাকা আনা মুস্কিল বলিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হইতে হয়।

নিম্নে কোন্ ব্যাঙ্ক কোন্ বৎসর কি অনুপাতে ক্যাশ টাকা হাতে রাখিয়াছিল তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

বৎসর	ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক	একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক ক	একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক খ	ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক ক	ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক খ
১৯১৯	৩১	৩৫	৬৭	২১	২৪
১৯২০	৩০	৩০	৫৮	২৩	১৮
১৯২১	১৯	২৮	৪৩	২০	১৩
১৯২২	২১	১৯	৩৩	২০	১৭
১৯২৩	১৮	১৯	২৭	১৭	১৯
১৯২৪	১৮	২০	৩১	২১	১৩
১৯২৫	২১	১৩	১৫	১৯	২০
১৯২৬	২৬	১৪	১৭	১৫	২৪

১৯২৭	১৪	১১	১৪	১৩	১৫
১৯২৮	১০	১১	১১	১৩	১৫

১৯ কোটি টাকার সমবায় ব্যাঙ্ক

চতুর্থ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক হইতেছে সমবায় ব্যাঙ্ক; এগুলি ১৯১২ সনের সমবায় অ্যাক্ট অনুসারে রেজিষ্টার্ড। গত পাঁচ বৎসরে এই ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে বাড়িয়াছে তাহা নিম্নে দেখানো হইল। 'ক' যে সব সমবায় ব্যাঙ্কের মূলধন ৫ লক্ষ বা তদূর্দ্ধ টাকা ও 'খ' যে সব ব্যাঙ্কের মূলধন ১ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষের মধ্যে।

বৎসর	'ক' শ্রেণী ব্যাঙ্কের সংখ্যা	'ক' শ্রেণী মূলধন ও রিজার্ভ (হাজার টাকা)	'ক' শ্রেণী আমানত ও ধার (হাজার টাকা)	'খ' শ্রেণী ব্যাঙ্কের সংখ্যা	'খ' শ্রেণী মূলধন ও রিজার্ভ (হাজার টাকা)	'খ' শ্রেণী আমানত ও ধার (হাজার টাকা)
১৯২৪-২৫	৮	৬৯,২৬	৪,৫১,৪১	৯৩	১,৭৩,২৩	৮,০৩,৭৬
১৯২৫-২৬	১০	৯০,৬২	৫,৩৭,৮৩	১০৪	২,০২,৮৪	৯,২৯,৮১
১৯২৬-২৭	১২	১,১২,৫৪	৭,০০,৬৫	১১৯	২,২৪,৭৪	১১,৯৭,৬৯
১৯২৭-২৮	১৬	১,৪৯,৮২	৮,৮৩,৫৬	১২৫	২,৪৭,৩৪	১৩,১৬,৩৬
১৯২৮-২৯	১৮	১,৬৩,৩৪	৯,০১,৪৯	১৪০	২,৭৭,০৭	১৪,৮৬,৮৮

ভারতীয় ব্যাঙ্কের হিসাব

প্রথম তিন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা :

	হেড্ অফিস	শাখা
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক	৩	১৬৭
একচেঞ্জ ব্যাঙ্ক	১৮	৮৬
যৌথব্যাঙ্ক	১৩৩	৪২১
মোট	১৩৬	৬৭৪
সমবায় ব্যাঙ্ক		১৫৮

ব্যাঙ্ক ফেলের বিবরণ

১৯১৯ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ভারতে কতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছিল তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বৎসর	ফেলপড়া ব্যাঙ্কের সংখ্যা	শেয়ার বিক্রয় (লক্ষ টাকা)	প্রদত্ত টাকা (লক্ষ টাকা)
১৯১৯	৪	৬,৪৭	৪,০৩
১৯২০	৩	৭,৬৮	৭,২৫
১৯২১	৭	৫,৮১	১,২৫
১৯২২	১৫	২৭,২৬	৩,৩০
১৯২৩	২০	৯,৯২,৩৬	৪,৬৫৪৭
১৯২৪	১৮	২৬,৪৬	১১,৩৪
১৯২৫	১৭	২৫,৪২	১৮,৭৬
১৯২৬	১৪	৭,০৬	৩,৯৮
১৯২৭	১৬	৬,৮৮	৩,১০
১৯২৮	১৩	৩১,৬৬	২৩,১২

গত দশ বৎসরের মধ্যে ১৯২৩ সনে ব্যাঙ্কের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বৎসর ছিল; তার পরেই ১৯২৮ সন। শেষোক্ত বৎসরে বাংলার বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, বোম্বাইয়ের শিলোত্রি ব্যাঙ্ক ও মার্চ্চেন্টস্ ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাবের ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্কের সর্ব্বনাশ বিশেষভাবে শোচনীয়।

ভারতীয় রেলওয়ের অগ্রসর কার্য্যপ্রণালী

গত বৎসর (১৯২৯) ভারতীয় রেলওয়ে বিভাগে বহু উন্নতি হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের রেলওয়ে লাইন ও ষ্টেশন লইয়া সমস্যার আর শেষ নাই। নদীর গতি পরিবর্ত্তন হেতু ঘাট নিত্যই স্থানান্তরিত করিতে হইতেছে। সরকার সেই জন্য প্রত্যেকটি নদী ঘাটের স্থান পরিবর্ত্তনের বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই তথ্যগুলি কাজে লাগিবে। এ ছাড়া এই সব অঞ্চলের আকাশ-ফটো গৃহীত হইয়াছে;

এরোপ্লেনে করিয়া এই ফটোসমূহ লওয়া হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে কয়েকটি পুরাতন সেতুর সংস্কার ও রেল ষ্টেশনের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ট্রেণ গমনাগমনের সুবিধার জন্য আসানসোল হইতে সীতারামপুর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় সেট আপ্ লাইন প্রস্তুত হইয়াছে। গয়া হইতে মোগলসরাই পর্য্যন্ত ডবল লাইন পাতা হইয়াছে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে লাইন নূতন করিয়া বসানো ও স্লিপার বদলানোর কাজ বিশেষভাবে চলিয়াছে। অনেকগুলি সেতু নির্ম্মিত হয় এবং পাঁচটী ষ্টেশনে ইণ্টারলকিং সিষ্টেম প্রবর্ত্তিত হয়। বোম্বে-বড়োদা ও মধ্য ভারত রেলওয়েতে কিছু কিছু রেল লাইন নূতন করিয়া বসানো হয়; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অটোমেটিক সিগনাল বা পাথার ব্যবস্থা। এই সব ব্যবস্থার ফলে আকস্মিক বিপদের সংখ্যা হ্রাস হইবে বলিয়া মনে হয়।

নর্থ-ওয়েষ্ট-রেলওয়েতেও অনেক উন্নতি হইয়াছে, বিশেষ ভাবে কতকগুলি সেতুর সংস্কার উল্লেখযোগ্য, যেমন ঝেলাম সেতু ও শতদ্রু সেতু।

ইংল্যাণ্ডের বাজারে ভারতীয় চায়ের পরাভব

আজ ওলন্দাজের অধিকৃত জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপ চায়ের বাজারে ভারত ও সিংহলের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। বিলাতের বাজার সস্তা ওলন্দাজী চায়ে ভরিয়া গিয়াছে। ইহার এক কারণ সিংহল ও ভারতীয় চায়ের উপর শুল্ক রাখিয়া বিলাতে চায়ের শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া। ভারতীয় চা-আমদানি হইতে আয় হইল বটে, কিন্তু সস্তা ওলন্দাজী চা বিনা শুল্কে বিলাতে প্রবেশ করিতে পারিয়া ভারতীয় চাকে গলা টিপিয়া মারিতেছে। ওলন্দাজেরা নিজের দেশে চায়ের অবাধ প্রবেশ করিতে দেয় না।

জাভায় বৎসরে ১৬ কোটি পাউণ্ড ওজনের চা উৎপন্ন হয়। ইহার সিকি হল্যাণ্ড গ্রহণ করে; অবশিষ্ট বার আনি বিলাতের বাজারে জমায়েৎ হইয়াছে।

আমেরিকায় চায়ের প্রচার

আমেরিকায় চা প্রচারের কথা আগে বলা হইয়াছে। প্রায় ৩০০ রন্ধন বিত্তালয়ে এবিষয়ে রীতিমত কার্য্য চলিতেছে এই প্রচার-কার্য্যের সহায়তায় আমেরিকায় চারিশত দৈনিক কাগজ লাগিয়াছে; মেয়েদের চারিখানা বড় বড় পত্রিকার সহযোগিতা লাভ করিয়া চায়ের প্রচার ভালই হইতেছে। ভারতীয় চায়ের নাম, তাহাদের গুণগ্রাম এই সব কাগজে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। এ ছাড়া আমেরিকায় প্রায় পনের হাজার হাই স্কুলের গৃহস্থালী বিজ্ঞানের ক্লাসের মধ্য দিয়া চায়ের প্রচার চলিতেছে। ইহার ফলে প্রায় ১৫ লক্ষ ছাত্রীর নিকট চায়ের কথা প্রচারিত হইতেছে। প্রচারের ফল ফলিতেছে। আমেরিকায় আফিসে ব্যাঙ্কে পূর্ব্বে যেখানে চা ছিল না, সেখানে বৈকালী চায়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

সিংহলের চা রপ্তানি

সিংহলের চেম্বার অব্ কমার্স সেখানকার চায়ের বাজারের একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯২৯ সনে সিংহলে ২৫১,৫২২,৬১৭ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়; তৎপূর্ব্ব বৎসর হইতে প্রায় ১৫ কোটি পাউণ্ড অধিক। সেখানকার চায়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল:

চায়ের রপ্তানি (১৯২০-১৯২৯)

	মোট রপ্তানি	স্থানীয় নীলাম	স্থানীয় গড় দাম
	পাঃ	পাঃ	টাকা
১৯২০	১৮৪,৮৪৬,৬৮৩	৮৮,৮৩৫,৩৪৮	০'৪৩
১৯২১	১৬২,৩৪৭,৩৫৩	৭৪,৪১৫,০৮৮	০'৭০
১৯২২	১৭১,৩৯২,২৪৯	৭৪,৯০৭,৫৮২	০'৮৫
১৯২৩	১৮৩,৫০১,৯২৮	৮২,৯৫৬,৮৫২	১'০২
১৯২৪	২০৩,৬৮০,০১৩	৯৫,৬১৩,৭২৯	১'০৪
১৯২৫	২০৯,৪৯৩,৫৩৬	১০০,৯৫৯,০৭৬	০'৯৬
১৯২৬	২১৬,০৮৮,৮৬২	১০৫,২৭৭,৩১০	০'৯৯
১৯২৭	২২৭,০৯১,৮৬২	১১৩,২৭১,৭৭৮	০'৯১
১৯২৮	২৩৬,৪৭৮,০৮৮	১১৭,৯৪০,৫৬৯	০'৮৫
১৯২৯	২৫১,৫২২,৬১৭	১৩২,৮০৫,৬৪৪	০'৮১

রুশের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধির ফলে সেখানে চায়ের চাহিদা বাড়িবে বলিয়া বিশ্বাস।
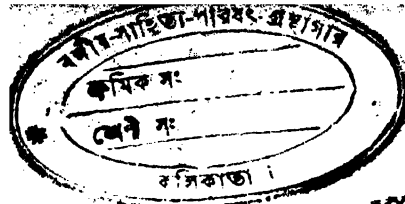
দুনিয়ার শিল্পাদির অবস্থা (১৯২৮)

শিল্পোন্নতির মাপজোঁক

শিল্প-জগতে যুদ্ধের ধাক্কা সামলাইতে দশ বৎসর লাগিয়াছে। ১৯১৮ সনে শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন যুদ্ধের পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী হইয়াছিল। মার্কিণ-রাজ্যের নিরবচ্ছিন্ন (১৯২১ সনে ছাড়া) উন্নতি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পগত উৎপাদন ১৯২৩-২৪ এর তুলনায় নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮ (৯ মাস)
সাধারণ সূচীসংখ্যা	১০৮	১০৬	১০৯
নির্ম্মাণ শিল্প	১০৮	১০৬	১১০
খনিজ „	১০৭	১০৭	১০৩

সকলপ্রকার শিল্পের মধ্যে মোটর গাড়ীর শিল্পই সবার সেরা স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯২৭ এর তুলনায় অটো-মোবিল শতকরা ৩৮·৬% হারে ও টায়ার ১৮% হারে, লৌহ ও ইস্পাত ১৬·১% হারে, পেট্রোলিয়াম ১৪% হারে এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ১১% হারে বাড়িয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে (১৯২৮) গ্রেটবৃটেনের রপ্তানি বাণিজ্য-ঘটিত শিল্পের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় মন্দা থাকে—নূতন কয়েক-টির অবস্থা সন্তোষ-জনক দাঁড়ায়। জার্ম্মাণির কিঞ্চিৎ অবনতি হইয়াছে, বিশেষ করিয়া বয়ন ও ধাতব শিল্পে। ফ্রান্সে অকস্মাৎ সমস্ত শিল্পে আশ্চর্য্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। ইতালিতে বৎসরের শেষের দিকে বড় বড় শিল্পে পুনর্জ্জীবন ঘটিয়াছে। বেলজিয়াম অনুকূল বাণিজ্য রক্ষা এবং কোন কোন দিকে বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৯১৩ সনের তুলনায় বিভিন্ন দেশের শিল্পজাত উৎপাদনের সূচীসংখ্যা নীচের তালিকায় দেওয়া যাইতেছে :

	মার্কিণ	বৃটেন	জার্ম্মাণি	ফ্রান্স	ইতালি	বেলজিয়াম
১৯১৩	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১৯১৯	১১৭	১০০	৫৩	৫৭	৮৩	৪৫
১৯২১	৯৭	৬৩	৭৮	৫৫	৬৯	৫৪
১৯২৩	১৫২	৮৪	৫৬	৮৮	৯১	৮৪
১৯২৫	১৫৬	৮৬	৯৪	১০৮	১৩০	৮৬
১৯২৭	১৬০	৯২	১১৭	১০৯	১১৪	১১৬
১৯২৮	১৬৪[১]	৮৮[২]	১১৫[৩]	১৩৪[৪]	...	১২৪[৫]

১ দ্বিতীয় ৩ মাস, ২ প্রথম ৩ মাস, ৩ ডিসেম্বর, ৪ ডিসেম্বর, ৫ প্রথম ৬ মাস।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-জগতে যুক্তি-প্রয়োগ নীতি

দেশে দেশে আজ একরূপ শিল্পের বিভিন্ন কলওয়ালা বুঝিতেছেন যে, প্রতিযোগিতায় বাঁচিতে হইলে শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও ধনিকরা বুঝিতেছেন যে, মিত্রতা, চুক্তি, সন্ধি ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯২৮ সনে লিনোলিয়াম, জ্বালানি তেল, নিকেল, দস্তা প্রভৃতি বিষয়ে নানাপ্রকার কার্টেল মোতায়েন করা হইয়াছে। পশ্চিমে বয়ন-শিল্পের (তুলার) অবস্থা আশাপ্রদ নহে।

তুলা-শিল্প

১৯২৮ সনে তুলা-শিল্পের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। বৎসর ধরিয়া, বিশেষতঃ গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্রে ভাঁটা চলিতেছিল। বৃটিশ শিল্পও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে, এবং পুনর্গঠন ও একাকার চলিতেছে। জার্ম্মাণিতে ১৯২৭ সনের তুলনায় উৎপাদন কম হইয়াছে, প্রধানতঃ ঘরোয়া টান কমিয়া গিয়াছে বলিয়া। ফরাসী দেশে ১৯২৭ সনের তুলনায় শিল্পের অবস্থা খারাপ বলিতে হইবে। কিন্তু ইতালি বহু কষ্টে রপ্তানি বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। বেল-জিয়ামে বৎসরের প্রথমাংশে অবস্থা বিশেষ অনুকূল ছিল না, কিন্তু শেষের দিকে অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছিল। চেকো শ্লোবাকিয়া সম্বন্ধেও ঐ কথা।

ভারতে মজুর-সমস্যা ও চীনের অস্বাভাবিক অবস্থাহেতু জাপানের বাজারে মাল ফেলার কৃচ্ছ্রতা এশিয়ায় তুলা-শিল্পের উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে,—যুদ্ধের পর আজ অবধি এশিয়ায় কলকব্জার প্রসার দ্বিগুণ হইয়াছে ও তুলার খাদন ৭০% বাড়িয়াছে, আর সেই সময়ে ইয়োরোপে তা ১০% কমিয়াছে।

ম্যাঞ্চেষ্টারস্থ ইণ্টারন্যাশনাল কটন ফেডারেশনের প্রকাশিত গণনা হইতে জানা যায় যে, ৩১শে জুলাই, ১৯২৮ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে ২·৫৩ কোটি বেল তুলার খাদন হইয়াছে। ইহা গত বৎসরের তুলনায় ১.৪% কম ও ১৯১৩ সনের তুলনায় ১১% বেশী। বিভিন্ন মহাদেশে খাদনের পরিমাণ এইরূপ :

বাৎসরিক খাদন

বর্ষের শেষ তারিখ

	৩১ আগষ্ট ১৯১৩	৩১ জুলাই ১৯২৫	৩১ জুলাই ১৯২৭	৩১ জুলাই ১৯২৮
	(কোটি বেল)		(কোটি বেল)	
ইয়োরোপ	১.২৬	.৯৭	১.০৩	১.০৯
এশিয়া ...	.৩৭	.৬২	.৭৩	.৬৫
আমেরিকা	.৬৫	.৭০	.৭৯	.৭৭

পৃথিবীর কোন্ দেশে কত কলের চরকা (স্পিণ্ডল) আছে, তাহার হিসাব দেওয়া যাইতেছে।

	৩১ আগষ্ট ১৯১৩	৩১ জুলাই ১৯২৪	৩১ জুলাই ১৯২৭	৩১ জুলাই ১৯২৮
ইয়োরোপ—	(কোটি)	(কোটি)	(কোটি)	(কোটি)
গ্রেটবৃটেন	৫.৫৬	৫.৬৭	৫.৭৩	৫.৭১
জার্ম্মাণি	১.১১	.৯৪	১.০৮	১.১১
ফ্রান্স	.৭৪	.৯৩	.৯৫	.৯৭
ইতালি	.৪৬	.৪৫	.৫০	.৫২
রুশিয়া	.৭৬[১]	.৭২	.৬৯	.৭৩
মোট ইয়োরোপ	৯.৯৫	১০.০২	১০.৩৬	১০.৪৯
এশিয়া—				
ভারতবর্ষ	.৭০	.৭৯	.৮৭	.৮৭
জাপান	.২৩	.৪৮	.৫৯	.৬২
চীন	...	.৩৩	.৩৫	.৩৫
মোট এশিয়া	.৮৩	১.৬০	১.৮২	১.৮৪

১ পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ড বাদে।

মার্কিণরাজ্য	৩.২১	৩.৭৭	৩.৬৭	৩.৫৫
মোট আমেরিকা	৩.৪৯	৪.১১	৪.১৩	৪.০১

পশম

যে সব কারণে পশম-শিল্প আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তার কয়েকটি এই : (১) ইয়োরোপে অবস্থা ভাল হইয়াছে, (২) যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুতবেগে খাদন বাড়িয়াছে, (৩) সুদূর প্রাচীতে ইয়োরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদের কদর বাড়িয়াছে। এক্ষণে ইহা যুদ্ধের পূর্ব্বেকার চেয়ে উন্নত হইয়াছে। ১৯২৮ সনের গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পের অবস্থা একপ্রকার থাকিলেও, শেষের দিকে উৎপাদনে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি লক্ষিত হয়; গ্রেটবৃটেন ও জার্ম্মাণিতে এখনও অবস্থাটা ভাল হয় নাই; ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকো-শ্লোবাকিয়া ও ইতালিতে বেশ সন্তোষজনক অবস্থা।

কাঁচা রেশম

১৯২৮ সনে কাঁচা রেশমের উৎপাদন ১৯২৭ সনের অনুরূপ ছিল।

কাঁচা রেশমের উৎপাদন

(কোটি কিলোগ্রাম)

	১৯১৩	১৯২২	১৯২৪	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
মোট	২'৭৩	৩'১৬	৩'৯১	৪'২১	৪'৬৬	৪'৬৮
জাপান[১]	১'২১	১'৮৮	২'৪৫	২'৭৯	৩'২১	...
চীন[১]	'৮৫	'৮০	'৭৭	'৮৮	'৭২	...
ইতালি	'৩৫	'৩৭	'৫২	'৩৮	'৪৪	...

জাপান গোটা রেশম বহির্ব্বাণিজ্যের ⅔ অংশ আপনার করতলগত করিয়া রাখিয়াছে। ১৯২৮ সনে তার রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রধানতঃ যুক্তরাজ্যের অভিমুখে। বর্ত্তমান কালে যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র দুনিয়ার রেশমের ⅘ অংশ যায়। ইয়োরোপে যুদ্ধজনিত দারিদ্র্যের ফলে রেশমের উৎপাদন ও ব্যবহার দুই-ই কমিয়াছে।

কৃত্রিম রেশম

১৯২৮ সনে কৃত্রিম রেশম-শিল্প আরও উন্নতি লাভ করিয়াছে। নব নব প্রণালীতে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন ও ক্রমাগত উৎকৃষ্ট কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের ফলে বাজারে প্রতিযোগিতা দেখা দেয় ও তাতে সাত বৎসরে দর ৫০% পড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কালে খাদনের পরিমাণ বৎসরে ২৫% হারে বাড়িয়া চলিয়াছে। ক্রমাগত ভাল কৃত্রিম রেশমের টান যেমন বাড়িতেছে, উহার উৎপাদনও তেমনি বাড়িতেছে। বিশেষ ভাবে যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন বাড়িতেছে; ১৯২৮ সনে যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ার মোট উৎপাদনের ২৪%এর কাছাকাছি দিয়াছে। তার পরেই জার্ম্মাণির স্থান। ১৯২৭ সনের তুলনায় ৩০% বাড়িয়াছে। গ্রেট বৃটেনের উৎপাদনও প্রণিধানযোগ্য। ইতালি তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেও তার উৎপাদন অল্পই বাড়িয়াছে। ফ্রান্সে নূতন কয়েকটি কারখানা খোলা হইয়াছে এবং হল্যাণ্ড, সুইট্‌স্যার-ল্যাণ্ড বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেও এই শিল্প শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছে।

কৃত্রিম রেশম উৎপাদন

(কোটি কিলোগ্রাম)

	১৯১৩	১৯২৩	১৯২৫	১৯২৭	১৯২৮[২]
মোট	১'১০	৪'৪০	৮'৫০	১৩'২৯	১৫'৮০
যুক্তরাষ্ট্র	'০৭	১'৬৪	২'৩৪	৩'৪১	৪'০৮
জার্ম্মাণি	'৩৫	'৫৯	১'১৭	১'৮২	২'৩৮
গ্রেট বৃটেন	'৩০	'৭৪	১'২৭	১'৭৬	২'২৯
ইতালি	'০১	'৪৫	১'২৭	২'২৬	২'৩০
ফ্রান্স	'১৫	'৩৪	'৭০	১'৩৬	১'৮৩
হল্যাণ্ড	...	'১১	'৪০	'৭৩	'৯০
সুইট্‌স্যারল্যাণ্ড	...	...	...	'৪০	'৬০

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে অটো-

১ জাপান ও চীনের পরিমাণটা রপ্তানির। ২ সন্নিকর্ষ।

মোবিল শিল্পের উন্নতি। সাত বৎসরে উৎপাদন ৫০% হারে বাড়িয়াছে, যদিও ১৯২৭ সনে খারাপ গিয়াছে। মার্কিণ রাজ্য বর্ত্তমানে পৃথিবীর শতকরা ৮০% খানি মোটর গাড়ী বানাইতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তার হিস্সা প্রায় বার আনি। যুক্তরাষ্ট্রের অটো-গাড়ী উৎপাদন এইরূপ :

১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
৪২৬৬ হাজার	৪২৯৮ হাজার	৩৩৯৫ হাজার	৪৩৫৭ হাঃ

জাহাজ নির্ম্মাণ

জাহাজ নির্ম্মাণ পশ্চিমের একটা বড় শিল্প; লক্ষ লক্ষ লোক তাতে নিযুক্ত থাকে। কোটি কোটি টাকার সামগ্রী ইহার জন্য ক্রীত হয়। ভারত এই শিল্প হইতে বঞ্চিত।

১৯২৭ সনের চেয়ে ১৯২৮ সনে মোট টনেজ প্রায় শতকরা ১৬% হারে বেশী। বাণিজ্যের জন্য কোন বৎসর কত জাহাজ ও একশ' টনের উপর কত জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	হাজার টন	সংখ্যা
১৯১৩	৩,৩৩৩	১৭৫০
১৯১৯	৭,১৪৪	২৪৮৫
১৯২৩	১,৬৪৩	৭০১
১৯২৭	২,২৮৬	৮০২
১৯২৮	২,৬৬১	৮৩০

১৯১৩ সনের তুলনায় ১৯২৭ ও ২৮ সনে কোন দেশে কত টন জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে তার তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

	১৯১৩	১৯২৭	১৯২৮
	(হাজার টন)		
গ্রেট বৃটেন	১,৯৩২	১,২২৫	১,৪৪৩
জার্ম্মাণি	৪৬৫	২৯০	১৭৮
হল্যাণ্ড	১০৪	১২০	১৬৭
ডেন্মার্ক	৪১	৭২	১৪৪
যুক্তরাষ্ট্র	২২৮	১২৪	৯১
ইতালি	৫০	১০১	৫৮

বৈদ্যুতিক শক্তি

বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার ও ব্যবহার বাড়িতেছে। কয়লা তেল সস্তা হওয়া সত্ত্বেও জল-চালিত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনেই মনোযোগ বেশী গিয়াছে। মার্কিণ রাজ্য এ বিষয়ে অগ্রণী। কানাডা ইহার পরে। রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি আলোচ্য বর্ষের বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু। জার্ম্মাণি হইতে সিন্থিটিক মিথিলিক আলকোহল নাইট্রেট কয়লা হইতে সিন্থিটিক পেট্রল, পটাস প্রস্তুত উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বিভিন্ন দেশের শক্তি ব্যবহার
(কোটি অশ্বশক্তি)

ইয়োরোপ	...	১'৩৫
উত্তর আমেরিকা	...	১'৭০
এশিয়া	...	'২২
অন্যান্য মহাদেশ	...	'১০

রাসায়নিক শিল্প

১৯২৮ সনে দুনিয়ার রসায়ন-শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। কয়লা ও আলকাতরার হাইড্রোজেনেশনের ফলে ১০ লক্ষ পাউণ্ড সিন্থেটিক পেট্রল পাওয়া গিয়াছে। ১৯২৯ সনে সম্ভবতঃ ইহা দ্বিগুণিত হইয়াছে। পটাশের উৎপাদনও বাড়িয়াছে ২০ লাখ টন। বৃটিশ রাসায়নিক শিল্প দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিতেছে, বিশেষ করিয়া সালফিউরিক এসিড, আলকালি, এমোনিয়া ও সোডা উৎপাদনে কৃতিত্ব দেখা যাইতেছে। ফ্রান্স ও ইতালিতে সিন্থিটিক এমোনিয়া ও রাসায়নিক সার শিল্পের উন্নতি হইয়াছে।

দুনিয়ার চিনি

খাদ্য-শিল্পের মধ্যে চিনির ৫% উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার মত। বীট চিনি হ্রাস পাইলেও ইক্ষু চিনির বৃদ্ধি হইয়াছে।

	১৯২৭-২৮ (টন)	১৯২৮-২৯ (টন)
মোট উৎপাদিত চিনি	২,৫২,১৭,৫৪৯	২,৬৫,৩৬,১০০
ইক্ষু চিনি	১,৬২,৫৫,৫৪৯	১,৭৭,৭৮,১০০
কিউবা	৪০,১১,৭১৭	৪৯,০০,০০০
জাভা	২৩,৫৯,০৫০	২৯,৪৪,২০০
বৃটিশ ভারত	৩২,২১,০০০	২৯,০০,০০০
হাবানা	৮,০৩,৫৭০	৮,৩০,০০০
ফর্ম্মোসা ও জাপান	৬,৯১,২৩০	৭,৫০,০০০
ফিলিপাইন দ্বীপ	৫,৯৬,০৩৩	৬,৭৫,০০০
পোর্টোরিকো	৬,৬৮২,৬৪	৬,২০,০০০
বীট চিনি	৮৯,৬২,৩৮১	৮৯,৫৮,০০০
রুশিয়া ও উক্রেইন	১৪,৭১,৩২০	১৪,৩০,০০০
জার্ম্মাণি	১৫,৫৫,৪৫০	১৬,৫৫,০০০
চেকোশ্লোভাকিয়া	১২,৫৩,১৬৩	১০,৭৫,০০০
ফ্রান্স	৮,৬৩,২০৬	৮,৬০,০০০
পোল্যাণ্ড	৫,৬৬,৫১৫	৭,০০,০৫০
যুক্তরাষ্ট্র	৯,৬৫,২৪১	৯,২৫,০০০

দর ও জীবন-ধারণের খরচা

স্থির সিক্কা প্রবর্ত্তনকারী দেশগুলিতে পাইকারী দর ১৯২৭ এর চেয়ে ১৯২৮এ বেশী উঠানামা করিয়াছিল। পাইকারী দরের সূচীসংখ্যা এইরূপ (১৯২৬=১০০)

	যুক্তরাষ্ট্র (বিউরো অব্ লেবার)	ইংল্যাণ্ড (বোর্ড অব্ ট্রেড্)	ফ্রান্স (স্তাতিস্ত জেন)	জার্ম্মাণি (ষ্টাটিষ্ট বাইথ্সআম্ট)	ইতালি (বাখি)
১৯১৩	৬৯'৮	১০০	১০০	১০০	১০০
১৯২৬	১০০	১৪৮	৭০৩	১৩১	৬০৩
১৯২৭	৯৫'৪	১৪১	৬১৬	১৩৭	৪৯৫
১৯২৮ জানুয়ারী	৯৬'৩	১৪১'১	৬০৬'৭	১৬৮'৭	৪৬৩
,, ফেব্রুয়ারী	৯৬'৪	১৪০'৩	৬০৮'৮	১৩৭'৯	৪৬১
,, মার্চ্চ	৯৬	১৪০'৮	৬২২'৮	১৩৮'৫	৪৬৪
,, এপ্রিল	৯৭'৪	১৪২'৯	৬২৩'৮	১৩৯'৫	৪৬৪
,, মে	৯৮৬	১৪৩'৬	৬৩২'৩	১৪১'২	৪৬৫
,, জুন	৯৭'৬	১৪২'৬	৬২৬	১৪১'৩	৪৬২
,, জুলাই	৯৮'৩	১৪১'১	৬২৩'৮	১৪১'৬	৪৫৩
,, আগষ্ট	৯৮'৯	১৩৯'৩	৬১৭	১৪১'৫	৪৫৬
,, সেপ্টেম্বর	১০০'১	১৩'৭৬	৬১৯'৯	১৩৯'৯	৪৫৮
,, অক্টোবর	৯৭'৮	১৩৭'৯	৬১৮	১৪৬'১	৪০৩
,, নবেম্বর	৯৬'৭	১৩৭'৯	৬২৫'৭	১৪০'৩	৪৬৬
,, ডিসেম্বর	৯৬'৭	১৩৮'৩	৬২৩'৮	১৩৯'৯	৪৬৪
মিডিয়াম বা মধ্য	৯৭'৭	১৪০'৩	৬২০'৬	১৪০	৪৬২

জীবনধারণের খরচা (আদর্শ = ১০০)

	যুক্তরাষ্ট্র	গ্রেট বৃটেন	ফ্রান্স	জার্ম্মাণি	ইতালি
	১৯১৪	১৯১৪	১৯১৪	১৯১৩-১৪	১৯১৪
ডিসেম্বর ১৯২৭	১৭৫	১৬৮	৪৯৮	১৫১	৫৩১
মার্চ্চ ১৯২৮	...	১৬৪	৫০৭	১৫০'৬	১৪৫*
জুন ,,	১৭৯	১৬৫	১০৫*	১৫১'৪	১৪৫*
সেপ্টেম্বর ,,	..	১৬৬	১০৫*	১৫২'২	১৪৩*
ডিসেম্বর ,,	...	১৬৭	১০৮*	১৫২'৭	১৪৭*

রুশ-ইংরাজ সমঝোতা

ইংরাজদের সহিত রুশিয়ার বাণিজ্য-বিষয়ে রফা হইয়াছে। ইংরাজ জানাইয়াছেন প্রাক্‌বিপ্লবযুগে রুশ সরকার যেসব টাকা ধার করিয়াছিলেন তাহা একেবারে নাকচ্ করা ঠিক হইবে না। রুশ দূত জানাইয়াছেন রুশ পূর্ব্ব দেনা সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবেন না একথা কখনো বলেন নাই।

ভারতে জার্ম্মাণ ব্যবসায়ী

জার্ম্মাণি ভারতের বয়কট আন্দোলনের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। বিপুল আয়োজনে তাহারা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। ভারতে বৎসরে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার শিল্পজাত সামগ্রী পাঠাইবার আর এখান হইতে বহু কোটি টাকার কাঁচা মাল রপ্তানি করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহারা ভারতীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য পাইবেন বলিয়া আশা করেন, ভারতের নানা স্থানে ফ্যাক্টরী খুলিবেন।

যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রল কোম্পানী একাকার

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রলিয়ামের বাজার খুবই নরম। রুশ, পারস্য, ব্রহ্মদেশ পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে তাহার বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ; সুতরাং অনেকগুলি তৈল কোম্পানী একত্র হইয়া রাজ্যের মধ্যে মাল বিক্রয়ের বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন।

* স্থিত কেলার পর স্বর্ণ সূচী সংখ্যা।

স্বদেশনিষ্ঠ কর্ম্মবীর মেজর বামনদাস বসু

মেজর বামনদাস বসু সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন কয়েকখানা বড় বড় বইয়ের লেখক হিসাবে। কিন্তু এই বই লেখালেখির ভিতরে, পশ্চাতে ও উপরে ছিল তাঁহার বিপুল স্বদেশ-নিষ্ঠা আর চূড়ান্ত স্বদেশ-সেবকের অদ্ভুত কর্ম্মপটুত্ব। বাঙ্‌লাদেশে, বাঙ্‌লার বাহিরে আর ভারতের বাহিরে যে কয়জন ভারতসন্তান আজ বিশ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া স্বদেশসেবার নানা কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে মোতায়েন আছেন মেজর বসু ছিলেন তাঁহাদের প্রথম শ্রেণীর অন্যতম।

যুবক ভারতের বহুসংখ্যক বাঙালী-অবাঙালী চিন্তাশীল ও কর্ম্মনিষ্ঠ লোক মেজর বসুর সংস্পর্শে আসিয়া আত্মিক হিসাবে লাভবান হইয়াছেন। মেজর বসুকে নানা সদনুষ্ঠানের ও তাজা তাজা আন্দোলনের উৎস হিসাবে শ্রদ্ধা করেন যুবক ভারতের অনেক লোক। এই সূত্রে তাঁহাকে নিজের পরম আত্মীয় বিবেচনা করাও অনেক ভারতবাসীর দস্তুর।

মেজর বসু যৌবনেই চাকরি ছাড়িয়াছিলেন। এই চাকরি ছাড়ার সঙ্গেও তাঁহার স্বদেশানুরাগ সুজড়িত।

সর্ব্বদাই মেজর বসুর মাথায় দেশোন্নতি-বিষয়ক দুএকটা নতুন নতুন চিন্তা বা কর্ম্মপ্রণালী খেলা করিত। এই জন্য সর্ব্বদাই তিনি উৎসাহশীল, কর্ম্মপটু ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যুবার ধান্ধায় থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনই কোনো যুবা দুএকটা ছোট বড় মাঝারি নতুন কাজের বরাত না পাইয়া ফিরিয়াছে কিনা সন্দেহ। বরাত-মাফিক কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছে কয়জন সেকথা স্বতন্ত্র।

তাঁহার দাদা শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে তিনি এলাহাবাদে পাণিনি আফিস কায়েম করেন। এই কার্য্যালয়ের আসল কাজ ছিল প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ইংরেজি ভাষার সাহায্যে প্রচার করা। কিন্তু মেজর বসুর নিজ গবেষণার প্রধান বস্তু ছিল বর্ত্তমান ভারত। উনবিংশ শতাব্দীর "আধুনিক" ভারতীয় চিকিৎসকগণ কোন্ কোন্ কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার ইতিহাস সঙ্কলন করার দিকে তাঁহার একটা বড় ঝোঁক ছিল। এই ঝোঁকের ভিতরও তাঁহার স্বদেশনিষ্ঠা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ-প্রচারিত আর ভারতের অন্যান্য গাছগাছড়ার ওষুধ-গুণ আলোচনা করিয়া তিনি ও তাঁহার মারাঠা বন্ধু কীর্ত্তিকার ভারতীয় চিকিৎসা-পণ্ডিত ও ওষুধ-ব্যবসায়ীদের জন্য সুবিস্তৃত গবেষণার ক্ষেত্র খুলিয়া দিয়াছেন।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও শিক্ষাবিষয়ক ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি বিস্তর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রের গবেষণায় তাঁহাকে অদ্বিতীয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। তাঁহাকে "দুহিয়া" লইতে পারিলে এক সঙ্গে দশ বার জন পণ্ডিত বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাস রচনায় যশস্বী হইতে পারিতেন। তাঁহার নিজের লেখা যে কয়খানা বই বাহির হইয়াছে সেই সব ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অনেকেই বিদ্যাক্ষেত্রের আর কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য নয়া নয়া হদিশ পাইবেন। তাঁহার কোনো কোনো রচনার সঙ্গে রমেশ দত্ত প্রণীত বর্ত্তমান ভারত বিষয়ক রচনাবলীর তুলনা করা চলে। কিন্তু বামনদাস বসু আর রমেশ দত্ত পুরাপুরি এক গোত্রের লেখক নন। দুয়ে প্রভেদ প্রচুর।

মেজর বসুর সঙ্গে আমার অতি নিকট যোগাযোগ ছিল। সেকালে তাঁহার বাড়ীকেই আমি নিজের বাড়ী বিবেচনা করিতাম। প্রথমবারকার প্রবাসকালে তাঁহার সঙ্গে চিঠি-পত্র চলিত সর্ব্বদা। প্রত্যেক চিঠিই কাজের চিঠি।

দুঃখের কথা একটাও বাঁচাইয়া রাখি নাই। ১৯২৫ সনের শেষের দিকে দেশে ফিরিয়া তাঁহাকে সেই ১৯১১-১৪ সনের উৎসাহশীল ভাবুকতাময় স্বদেশনিষ্ঠ আন্তরিকতাপূর্ণ মেজর বসুই দেখিয়াছিলাম। এই কথা অন্যান্য বহুলোকের সম্বন্ধেই বলিতে পারি না। মেজর বসুর বিশেষত্ব যারপর নাই সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

একালের কয়েকজন উৎসাহী করিৎকর্ম্মা যুবাদের জন্য মেজর বসুর সঙ্গলাভ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এই অনুরোধ তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। যুবাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার জন্য আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন কাজের বরাত দিবার জন্য তিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া এলাহাবাদ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এই সামান্য সঙ্গলাভেও যুবারা একজন শ্রেষ্ঠ স্বদেশনিষ্ঠ কর্ম্মবীরের জীবন স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

দ্বিতীয়বারকার প্রবাসেও মেজর বসুর অনেক চিঠি পাইয়াছি। সবই কাজের কথায় ভরা। এবারও কোনো চিঠি রাখি নাই। মেজর বসুর সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবে না এইজন্য বিশেষ কষ্ট পাইতেছি।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

মিউনিক, জার্ম্মাণি, নবেম্বর ১৯৩০

প্রেসিডেন্সী বিভাগীয় কুটীর-শিল্প কমিটীর রিপোর্ট

১৯২৬ সনে আগষ্ট মাসের ২৮শে ও ২৯শে তারিখে রাণাঘাটে প্রেসিডেন্সি বিভাগীয় প্রথম সমবায় সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ

"এই কনফারেন্স বঙ্গদেশের প্রয়োজনীয় কুটীর-শিল্পগুলির উন্নতি-বিধানকল্পে ও তাহাদের উৎসাহবর্দ্ধন করিবার উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে সমবায় সমিতি স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিতেছেন এবং এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে কনফারেন্স প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গদেশের লুপ্তপ্রায় কুটীর-শিল্পগুলির অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য সভাপতি মহাশয় একটি কমিটি নিযুক্ত করুন এবং কমিটিকে অনুরোধ করা হউক যে, যাহাতে সত্বর গঠনমূলক কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে তজ্জন্য কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির নিকট তিন মাসের মধ্যে দাখিল করেন।"

উক্ত প্রস্তাব অনুসারে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে যে স্থানে মিটিং হইবে তথাকার স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণকে কমিটির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার অধিকার দান করা হয়।

১। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী (সভাপতি)

২। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৩। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৪। মৌলবি উকিলুদ্দিন খন্দকার

৫। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নিত্যচরণ নাগ (ইনি কোন মিটিং হইবার পূর্ব্বেই মারা যান)

৬। শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়

৭। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ

৮। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ (সম্পাদক)।

কমিটি কলিকাতায় ২টি, জিয়াগঞ্জে ১টী, শান্তিপুরে ১টি, বাগেরহাটে ১টি এবং মালদহে ১টী মিটিং করেন। কোনো কোনো স্থানে স্থানীয় সরকারী ও বে-সরকারী কয়েকটী ভদ্রমহোদয়কে কমিটির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

কার্য্য-প্রণালী

কমিটি মনে করেন যে, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কুটীর-শিল্প বিষয়ে যথেষ্ট পুঁথি আছে, সুতরাং ঐরূপ পুঁথি বাড়াইয়া কোন ফললাভ হইবে না। কমিটি নিম্নলিখিত শিল্প নির্ব্বাচন করিয়া অনুসন্ধান করা স্থির করেনঃ ১। রেশম, ২। কাংস্য, ৩। বস্ত্র (বিশেষ করিয়া শান্তিপুরী বস্ত্র), ৪। বাগেরহাট বয়ন-শিল্প, ৫। লাক্ষা।

কমিটির অনুসন্ধানের ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১। রেশম

গত বিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের এই বহু প্রাচীন শিল্পের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। রেশমের রপ্তানি এক

প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যদিও ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে অনূ্যন ৬২১,৭১০ পাউণ্ড রেশমের সূতা রপ্তানি হইয়াছিল, এক্ষণে আমাদের দেশ হইতে রেশমের ছাঁট বিদেশে রপ্তানি হইয়া পুনরায় আমাদের দেশে ফিরিয়া আসে ও নানা আকারে বর্দ্ধিত মূল্যে বিক্রয় হয়। যে সকল ইয়োরোপীয় কোম্পানী পূর্ব্বে রেশম রপ্তানি করিত তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে এবং এই শিল্পটি বঙ্গদেশে প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, নিম্নলিখিত প্রতিবন্ধকগুলি রেশম-শিল্পের উন্নতির পথে অন্তরায়, এমন কি শিল্পটীর ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে: ১। বিদেশের সহিত ঘোরতর প্রতিযোগিতা। ২। উন্নতর যন্ত্রপাতির অভাব। ৩। যথেষ্ট মূলধনের অভাব। ৪। চাহিদার অভাব। ৫। সম্মিলিত চেষ্টার অভাব। ৬। সরকারী সাহায্যের অভাব। ৭। বহরমপুর ও ভাগলপুর সিল্ক ইন্‌ষ্টিটিউটে বিদেশী রেশমের (সূতার) ব্যবহার।

উক্ত প্রতিবন্ধকগুলি দূর করিবার উপায়:

১। অধিক পরিমাণে রোগমুক্ত বীজ সরবরাহ করা হউক। সরকারের তরফ হইতে এ বিষয়ে কতক ব্যবস্থা হইয়াছে, যথা পিয়াসবাড়ি, অমৃতি, বহরমপুর, কামারপুর, মিরগঞ্জ এবং কলিঠা এই ৬টি স্থানে ৬টি বীজতলা ও অন্যান্য ৮টি স্থানে রেশম চাষের ক্ষেত্র করা হইয়াছে। পিয়াসবাড়ি, ও বহরমপুরে রেশম চাষ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্কুল আছে, ও তথায় ছাত্রদিগকে বৃত্তি দেওয়া হয়। রেশম বিভাগে গবর্ণমেন্ট বৎসরে ২,২০,০০০৲ ব্যয় করেন এবং রেশম চাষ হইতে বৎসরে প্রায় ৭০,০০০৲ আয় হয়। অতএব গবর্ণমেন্ট বৎসরে মাত্র দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ইহা যথেষ্ট নয়। রোগমুক্ত বীজ সরবরাহ করার কাজ গবর্ণমেন্টের হাতে থাকা উচিত এবং সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করা উচিত।

২। রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য যাহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সমবেত চেষ্টা হয় তদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি করা যাইতেছে (ক) মালদহ ইউনিয়নকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র প্রদেশের জন্য একটি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ সিল্ক ইউনিয়ন স্থাপিত হউক ও স্থানে স্থানে তাহার শাখা বিস্তার করা হউক এবং (খ) পলু উৎপাদনকারী ও সূতা কাটুনীদিগের সমবায় সমিতি স্থাপন করার জন্য বিশেষ চেষ্টা হউক ও রেশম বয়ন সমিতি স্থাপন করা হউক এবং এই সকল সমিতি মালদহ সিল্ক ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হউক।

৩। উন্নততর যন্ত্রপাতির বহুল প্রচারের জন্য ইউনিয়নের হস্তে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ, অনূ্যন ১০,০০০৲ দান করা হউক।

৪। তৈয়ারী মালের কাটতির জন্য (ক) কেন্দ্রীয় আড়ত সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল ডিপোকে পুরামাত্রায় ব্যবহার করা উচিত (কমিটি ইতিমধ্যে ঐরূপ একটি আড়ত স্থাপন করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন) এবং (খ) প্রত্যেক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে নির্দ্ধারিত সর্ত্তে রেশমের সূতা এবং বস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য ষ্টল খুলিয়া সেন্ট্রাল ও অপরাপর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে রীতিমত প্রচারকার্য্য চালান উচিত।

৫। অন্যান্য সভ্যদেশের মত এদেশের রেশম-শিল্পকে অর্থ সাহায্য দিয়া রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য।

৬। সূতা পাকাইবার কার্য্য আরম্ভ করিবার উপযোগী যন্ত্রপাতি এখনো বসান হয় নাই, এই অজুহাতে বহরমপুরের সরকারী রেশম বয়ন বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার সময়ে বিদেশী সূতা ব্যবহার করা হয়। দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথে ইহা একটি গুরুতর অন্তরায়। অবিলম্বে উপযুক্ত যন্ত্রাদি প্রবর্ত্তন করিয়া বিদেশী রেশমের সূতার ব্যবহার বন্ধ করা কর্ত্তব্য। দেশের রেশম বয়ন বিদ্যালয়গুলিতে শুদ্ধ দেশী সূতা ব্যবহার করা উচিত। ভাগলপুরের রেশম বয়ন বিদ্যালয়েও যে সকল বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় তাহার অধিকাংশ বিলাতি সূতার। উক্ত বিদ্যালয়েও বিদেশী সূতার ব্যবহার যত শীঘ্র সম্ভব বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। কাংস্য

নদীয়া জেলার অধিকাংশ কাঁসা পিতলের বাসনপত্র ই-বি-রেলওয়ের মুর্শিদাবাদ শাখা লাইনের উপর মুড়াগাছা

নামক ষ্টেশনের দুই মাইলের ভিতর ধর্ম্মদহ, বাহিরগাছি, সারক এবং সাধাপাড়া নামে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামে তৈয়ারী হয়। পূর্ব্বে এই শিল্পটী কংস-বণিক-শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহা নানা নিম্ন-শ্রেণীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে। উল্লিখিত গ্রামগুলি ছাড়া নবদ্বীপ, মেহেরপুর, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, এবং অন্যান্য আরো কয়েকটী স্থানেও অল্পবিস্তর এই শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নবদ্বীপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মাল তৈয়ারী হয়। ধর্ম্মদহের কারিগরগণ নানা গড়ন, নক্সা ও আকারের বাটি, থালা, রেকাবি, চামচ ও হাতা এবং অন্যান্য ছোটখাট সামগ্রী ব্যতীত, জল খাইবার গ্লাস, পাউলি, ফেরো প্রভৃতি তৈয়ারী করায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। এই সামগ্রীগুলি ৭ ভাগ তাম্র ও ২ ভাগ রাঙ্‌ মিশ্রিত ধাতু দ্বারা অথবা স্থানীয় কিংবা কলিকাতার বাজারে ক্রীত পুরাতন ভাঙ্গা বাসনপত্র হইতে প্রস্তুত হয়। প্রথমটীকে রাঙ্‌ তামা বলা হয়, ইহাই খাঁটি কাঁসা; দ্বিতীয়ের নাম খুট, ইহা তত খাঁটি নহে। মালয় পেনাং-এর সি-এস কোম্পানীর প্রস্তুত টিন মণ প্রতি ১২৫৲ হইতে ১৬০৲ দরে বিক্রয় হয় এবং তাম্র মণ প্রতি ৩৯৲ হইতে ৪০৲ দরে বিক্রয় হয়। যে দুই প্রকার কাঁসা ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে প্রথমটী অধিক উজ্জ্বল, সাদা, এবং মোলায়েম হয়, এবং তাহার দরও বেশী। ধর্ম্মদহ এবং বাহির-গাছির কারিগরগণ প্রধানতঃ জল খাইবার পাত্র, যথা, গ্লাস, এবং পাউলি প্রস্তুত করে। এই সামগ্রীগুলি পিটিয়া তৈয়ারী করা হয় না, ঢালাই করিয়া করা হয়। ইহা তৈয়ার করিতে পালিস ও নক্সার কাজ অনুসারে ঢালাই হইতে মাল তৈয়ারী হইয়া বিক্রয় হওয়া পর্য্যন্ত মণ প্রতি ৫০৲ হইতে ৭০৲ মজুরি লাগে; ইহা ছাড়া মধ্যবর্ত্তী দালালের লাভ মণ প্রতি ৬৲। তৈয়ারী মাল মহাজনের নিকট অগ্রিম বিক্রয় হইয়া থাকে এবং মহাজন সময়ে সময়ে নিজে দর বাঁধিয়া অর্ডার দেয়। একজন কারিগর ৫ জন লোকের সাহায্যে ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৫।৬ সের মাল প্রস্তুত করিতে পারে। ঢালাই কাজে ৫।৬ জন লোক লাগে এবং কোঁদা, চাঁচা, পালিস করা প্রভৃতি কাজের জন্য ৩ জন লোক লাগে। ইহাদের প্রতিদিনের মজুরি ঢালাই কাজের জন্য ।৵০ হইতে ৸০, কুঁদিবার জন্য ৸৵০, চাঁচিবার জন্য ৶৵০, পালিস করার জন্য ৸০ আনা এবং পাত করিবার জন্য ।৶০ করিয়া পড়ে। সারক, সাধনপাড়া, এবং নবদ্বীপে বাটি প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। এই সকল স্থানে কারখানার মালিকগণ ৪ জন লোকের সাহায্যে প্রতিদিন ১০ সের মাল তৈয়ারী করিতে পারে এবং প্রতি সেরে বড় বাটির জন্য ১৵০ আনা, মাঝারি বাটির জন্য ১।০ এবং ছোটগুলির জন্য ১৸০ করিয়া মজুরি পায়। ইহা ছাড়া সে ৸০ আনা করিয়া কয়লার খরচ এবং ৵১০ জলপানি পায়। এই বাটিগুলি উৎকর্ষ, গড়ন, নক্সা, ও মাপের তারতম্য অনুসারে সের প্রতি ৩৲ হইতে ৬৲ টাকা করিয়া বিক্রয় হয়। এই দর অর্ডারি মালের। বাজারে যে মাল বিক্রয় হয় তাহার দর অপেক্ষাকৃত কম।

সাধারণ বাটি তৈয়ারী করিবার জন্য মহাজন কার-খানাওয়ালাকে বড় মাপের বাটির জন্য মণ প্রতি ২৮৲ করিয়া এবং মাঝারিগুলির জন্য ৩০৷৷০ আনা করিয়া দেয়। ইহা হইতে যে ঢালাই করে সে পায় মণ প্রতি ।৵০ হইতে ৸০ আনা, যে পালিস করে সে পায় ৸৵০, যে কোঁদাই করে সে পায় ৶৵০, যে চাঁচে সে পায় ৶৵০, যে পাত করে সে পায় ।৶০।

সচরাচর আড়তদার বা মহাজন কারখানাওয়ালাকে কাঁচা মাল এবং অগ্রিম টাকা দিয়া দেয় এবং কার-খানাওয়ালা দৈনিক বেতন দিয়া লোক নিযুক্ত করিয়া মাল প্রস্তুত করে। তৈয়ারী মালের পরিমাণ অনুসারে মজুরি স্থির হয়। দিনে গড়ে ১০ সের করিয়া মাল তৈয়ারী হয়।

উপরে যে দর দেওয়া হইল তাহা প্রায় সকল স্থানেই সমান, যে যে স্থানে সামান্য প্রভেদ আছে তাহা এত সামান্য যে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। নবদ্বীপের পরে মেহের-পুরে উৎকৃষ্ট থালা প্রস্তুত হয়। শান্তিপুরে জল খাইবার পাত্র, গ্লাস, ফেরো প্রভৃতি তৈয়ারী হয়, কিন্তু পরিমাণ অল্প। রাণাঘাটে হুকার বৈঠক তৈয়ারী হয়, তবে ইহার

অধিকাংশই পিতলের। কৃষ্ণনগরে স্বল্প পরিমাণে পাউলি গ্লাস, প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।

নিযুক্ত মূলধন

এই ব্যবসায়ে কত অধিক পরিমাণে মূলধন খাটে তাহা শুনিলে অনেকে বিস্মিত হইবেন। এক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই যে সেই অপরিহার্য্য, অধ্যবসায়ী ও বহু নিন্দাভাজন মহাজনই কারিগরের পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহাকে তাহার কাজের জন্য নিন্দা না করিয়া বরং প্রশংসা করাই উচিত। যদি মহাজনগণ কারিগরদিগের কাজ চালাইতে সাহায্য না করিত তাহা হইলে কলকারখানার আবির্ভাবে যেমন বহু কারিগর একেবারে লোপ পাইয়াছে ইহারাও তদ্রূপ লোপ পাইত, ইহা সুনিশ্চিত। বহু কারিগরের একদা সুখের ও রমণীয় বাসস্থান আজ পরিত্যক্ত বিজনভূমি হইয়া পড়িয়া আছে, গৃহবাসিগণ দারিদ্র্যের তাড়নায় যে কোন উপায়ে অন্ন-সংস্থান করিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়া যে যেখানে পারিয়াছে চলিয়া গিয়াছে। যে সকল যন্ত্রপাতির কল্যাণে এই গৃহগুলি একদিন সুখ ও সৌন্দর্য্যের আধার হইয়াছিল এবং যে যন্ত্রপাতি একদিন পবিত্রতা ও প্রাচুর্য্যের নিদর্শন ছিল, আজ সেই সকল যন্ত্রপাতি অনাদৃত হইয়া অন্ধকারে গৃহকোণে পড়িয়া আছে কিংবা বালকদিগের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমবায় প্রণালীর দ্বারা দরিদ্র কারিগরদিগকে সাহায্য করার চেষ্টা হইলেও নানা ত্রুটি ও ভ্রান্তির জন্য তাঁহাতে বিশেষ কোনো ফল হয় নাই। ইহার কারণ প্রধানতঃ মূলধনের অভাব। শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হইবে, কিন্তু যে দরিদ্র কারিগর দিনে ১৲ টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না, মহাজনের নিকট তাহাকে চিরস্থায়ী ভাবে ৫০৲ অগ্রিম পাইতে দেখা গিয়াছে; এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে উপযুক্ত কারিগর ভাল বাটি তৈয়ারী করিতে পারে সে মহাজনের নিকট চিরস্থায়ী ভাবে ১৫০০৲ অগ্রিম পাইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও মহাজনের ব্যবসা গত ৩০ বৎসর যাবৎ বেশ ভালই চলিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই লোকগুলিকে সমবায় মণ্ডলীর ভিতর আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল যে, দশ জন কারিগরকে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে অন্ততঃ ১০,০০০৲ মূলধন প্রয়োজন, এবং তজ্জন্য সে চেষ্টা ত্যাগ করা হইল। কি কারণে অধ্যবসায়ী মহাজনের স্থান সমবায় আন্দোলন গ্রহণ করিতে পারে নাই ইহা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সমবায় সমিতির কার্য্যপ্রণালী হইতে মহাজনের কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহাজন লাভের প্রত্যাশায় সাহস করিয়া ক্ষতির ঝুঁকি স্বীকার করে, সমবায় প্রতিষ্ঠানকে ইহার গঠন-প্রণালীর জন্যই বাধ্য হইয়া বিশেষ সতর্কভাবে কাজ চালাইতে হয়। কুটীর-শিল্পের ক্ষেত্রে যে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি সন্তোষজনক হয় নাই, আমাদের মতে ইহাই তাহার প্রধান কারণ।

মুর্শিদাবাদ জিলার কাংস্য-শিল্পের অবস্থাও ঐ একই প্রকারের। এই শিল্পের বিদেশের সহিত কোন প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা নাই, কারণ বিদেশে প্রস্তুত কাংস্য দ্রব্য বাজারে আসে না, তথাপি বিদেশী সস্তা এ্যালুমিনিয়মের সামগ্রীর পরোক্ষ প্রতিযোগিতা কাংস্য শিল্পের প্রবল অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

৩। বয়ন-শিল্প (শান্তিপুর)

প্রধানতঃ কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় প্রেসিডেন্সি বিভাগের বয়ন-শিল্পের বহু অবনতি ঘটিয়াছে; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, এই গৃহশিল্পটীকে রক্ষা করা ও ইহার উন্নতি করার এখনো যথেষ্ট সুযোগ আছে। সমগ্র বঙ্গদেশে নক্সাপাড় ও উৎকৃষ্ট বুনানীর শান্তিপুরী শাড়ীর এখনো যথেষ্ট চাহিদা আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে শান্তিপুরে একটি সাধারণ সভায় সমবেত জনমণ্ডলীর অধিকাংশ লোকের নিম্নলিখিত মতগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়ঃ—

(১) শান্তিপুরে বয়ন-শিল্পের স্পষ্ট অবনতি দেখা যাইতেছে।

(২) প্রাচীন হাতফেলা মাকু ঠকঠকি মাকুর সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়াছে।

(৩) যদিও ঠকঠকির প্রবর্ত্তন হইতেছে তথাপি ভবি

এবং বিশেষ করিয়া জ্যাকার্ডের প্রবর্ত্তন না হইলে নক্সা পাড়ের উৎকর্ষ হইতে পারে না।

(৪) অধিকাংশ তাঁতি মহাজনের কবলে গিয়া পড়িয়াছে। মহাজন তাহাদিগকে টাকা ধার দেয়, সূতা যোগায় এবং তাহাদের তৈয়ারী মালের মূল্য নির্দ্ধারণ করে।

(৫) তাঁতিদিগকে ঠকঠকি তাঁত, ডবি ও জ্যাকার্ড ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে টাকা ধার দিবার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন করা উচিত।

(৬) তাঁতিদিগকে প্রাচীন তাঁত ও তাহার সরঞ্জামাদি হইতে মূল্যবান ঠকঠকি, ডবি ও জ্যাকার্ড প্রভৃতি যোগাইবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(৭) শান্তিপুর বয়ন-শিল্প সমিতির কার্য্যের উৎসাহ-বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য।

(৮) শান্তিপুরে একটি জেলা বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত এবং বয়নশিল্প সমিতির সহিত ইহার সহযোগিতা করা উচিত।

আমরা উপরোক্ত মতগুলির সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

৪। বয়ন-শিল্প (বাগেরহাট)

বঙ্গদেশে বাগেরহাট কো-অপারেটিভ উইভিং ইউনিয়ন একটি সম্পূর্ণ নূতন ও অনন্যসাধারণ প্রচেষ্টা। বাগেরহাট হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী কান্দাপাড়া গ্রামে দুইজন অসহযোগী উকিল মৌলবি উকিলুদ্দিন খন্দকার এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ গুহ কর্ত্তৃক এই কার্য্য আরব্ধ হয়। ক্যানানোরের মালের অনুকরণে হস্তচালিত তাঁতে কোট এবং সার্টের কাপড় প্রস্তুত করায় ইহার কার্য্যের সূচনা হয়। শীঘ্রই দেখা গেল যে, হস্তচালিত তাঁত যন্ত্রচালিত, তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। তজ্জন্য যন্ত্রচালিত তাঁত প্রবর্ত্তন করা স্থির হইল। কিন্তু যাতায়াতের পথের অভাবে ইহার [illegible]র নানা অসুবিধা হইতে লাগিল। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বাগেরহাট ষ্টেশনের নিকটে ইহাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। যখন এই কমিটি উক্ত কারখানা পরিদর্শন করেন তখন দেখা যায়, বাগেরহাট ইউনিয়নের যথেষ্ট অর্থকষ্ট যাইতেছে। কমিটি ইতিমধ্যে রেজিষ্ট্রার ও বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির নিকট অবিলম্বে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেন ও তাহা মঞ্জুর হয়। সে সময়ে কারখানায় ১২ খানি তাঁত চলিতেছিল। কমিটি এই প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্য-কারিতা সম্বন্ধে আস্থাবান। ইহাকে জীবিত রাখিবার জন্য দুইটি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন: (১) উপযুক্ত সর্ত্তে আর্থিক সাহায্য এবং (২) ইহার তৈয়ারী মালের কাটতির সুব্যবস্থা। প্রথম বিষয়ের ব্যবস্থা রেজিষ্ট্রার এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক করিতেছেন এবং দ্বিতীয় বিষয়টির ব্যবস্থা সেণ্ট্রাল সেল্ ডিপোর (এক্ষণে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়্যান্ কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সোসাইটী লিমিটেড্) দ্বারা হইতেছে।

৫। লাক্ষা

এক্ষণে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই লাক্ষার চাষ হইতেছে। কিন্তু ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা এক প্রকার অজ্ঞাত ছিল। শ্যামগঞ্জ ও সুফী থানা লাক্ষা চাষের প্রধান কেন্দ্র। এই স্থানে চাষীরা তাহাদের প্রায় সমস্ত ভাল ভাল জমি কুল চাষে লাগাইয়াছে। যে শ্রেণীর লোক চাষ করিতেছে, তাহারা ফসল বৃদ্ধি করা কিংবা তাহার রকমের উন্নতি করা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহে। এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট কিংবা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটির তরফ হইতে বর্ত্তমান চাষের পদ্ধতির উন্নতি করা কিংবা কাঁচা মাল পাইকারি বিক্রয়ের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। চাষীরা তাহাদের উৎপন্ন মাল দিনকার দিন নিজেরাই বিক্রয় করে কিংবা সাধারণতঃ হাটের দিনে মহাজনদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। মহাজনগণ উহা কারিগরদিগের নিকট বেশী লাভে বিক্রয় করিবার জন্য গুদামজাত করিয়া থাকে। স্থানীয় লোক-কর্ত্তৃক অধিক পরিমাণে গালার তাল—যাহাকে সচরাচর চাপরা বলে—প্রস্তুত করিয়া পাইকারি বিক্রয়ের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি যুক্তপ্রদেশের ও বিহারের কতকগুলি মহাজন সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড় জেলার কোটালপুকুর নামক স্থানে এই বিষয়ে কিছু-

দুর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যদি সমবায় রীতিতে কাঁচা মাল গুদামজাত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে চাষীদের অধিক পরিমাণে লাভ হইবার সম্ভাবনা।

রেশম বিভাগের ন্যায় শিক্ষিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া এই বিষয়ে একটি বিভাগ খুলিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। এই কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য হইবে চাষীদিগকে বিজ্ঞানসম্মত উপদেশ প্রদান করা—কি উপায়ে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি ও উৎকর্ষসাধন করা যায় এবং শীতাতপের আতিশয্য হইতে ফসল রক্ষা করা যায়। চাষীদিগের ধারণা যে ইহা একপ্রকার অসম্ভব।

এক্ষণে এই স্থানে যে গালার চাপরা প্রস্তুত হয় তাহা বিদেশে রপ্তানি হইবার জন্য কলিকাতায় যায়। যদি খেলনা বা অপরাপর প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য কিছু পরিমাণে চাপরা এই স্থানে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে ইহা দ্বারা বহু লোক কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে।

মন্তব্য

কুটীর-শিল্পের উন্নতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অধিক কিছু বলা বাহুল্য। কিন্তু যাহাতে কুটীর-শিল্পগুলি কলকারখানার সহিত ও বিদেশী পণ্য দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে অজস্র গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রয়োজনানুসারে অর্থসাহায্যদ্বারা ইহাদের উৎসাহ-বর্দ্ধন করা প্রয়োজন। সমবায় রীতিতেও ইহাদিগের সুগঠন ও অর্থ-সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু কারিগরদিগের মধ্যে সমবায় সমিতি স্থাপন করা বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। ইহাদিগের পরম্পরাগত কুসংস্কার এবং ঔদাসীন্য, এবং যদিও মহাজনগণ তাহাদের বহু ত্রুটি সত্ত্বেও অনেকগুলি শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তথাপি তাহাদের বিরোধী স্বার্থ প্রভৃতি বাধার কথা বিবেচনা করিতে হইবে। শিক্ষার বিস্তার দ্বারা এবং ধৈর্য্য ও স্থিরতার সহিত গঠন কার্য্য করা দরকার। বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির এ বিষয়ে যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিতে তৎপর হওয়া উচিত। দ্বিতীয় প্রয়োজন, সমবায় সমিতি স্থাপন করা হইলে উহাদের যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসাহায্য করা। আরম্ভে কিছু লোকসান হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু পরিণামে যে সুফল পাওয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর একটি বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব করা উচিত নয়—পরিশ্রম লাঘব করিবার উপযোগী যন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তন। মাল কাটতির জন্য কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় আড়ত খুলিয়া এবিষয়ে কিছু বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আশা করি যে, ইহার ফলে এই প্রদেশের কুটীর-শিল্পগুলির প্রকৃত সাহায্য হইবে। আমাদের মতে সমবায় সমিতিগুলি লুপ্তপ্রায় শিল্পসমূহের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিনা সুদে উপযুক্ত পরিমাণে ঋণ পাওয়া উচিত।

কুটীর-শিল্প প্রচারের নূতন প্রস্তাব

রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য

আমি প্রথম কতগুলি শিল্পে—উপস্থিত রেশম বয়ন ও কাংস্য শিল্পে—মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিতে চাই। মালের উৎকর্ষের চেয়ে সস্তা দরে শীঘ্র এবং প্রচুর পরিমাণে কাটতি হয়। আমাদের সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা হওয়া উচিত যে, যে সামগ্রী আমরা প্রস্তুত করি তাহা যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে প্রস্তুত করা। যে স্থানে আমরা মাল পাঠাইতে চাই, তথাকার চাহিদা কিরূপ তাহাও বুঝিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে শিক্ষার জন্য আমাদিগকে বিদেশে লোক পাঠাইতে হইবে। মাল প্রস্তুত করিবার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানা চাই। সম্প্রতি আমি একটী কাগজে পড়িতেছিলাম যে, আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের মূলে রহিয়াছে তাহার যন্ত্রপাতি। আমাদের হাতের তৈয়ারী মাল লইয়া বিদেশের কলের তৈয়ারী মালের সহিত প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব। এই সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিতে যন্ত্রপাতির বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত।

তাহার পরে মাল প্রস্তুত করিবার উন্নততর প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত কেন্দ্রে বিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। প্রথম প্রথম ছাত্র আকর্ষণ করিবার জন্য বৃত্তি দিতে হইবে।

তৃতীয় প্রয়োজন—তৈয়ারী মালের শীঘ্র কাটতির ব্যবস্থা করা। ইহার জন্য আমি প্রস্তাব করি যে, যাঁহারা পৃষ্ঠপোষক হইবেন ও এইসকল সামগ্রী সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবেন, কলিকাতার ও মফঃস্বলের এইরূপ সওদাগর-দিগকে লইয়া একটি সভা স্থাপিত হউক। ইঁহাদিগের উৎসাহপূর্ণ সহায়তা ও সাহায্য ব্যতীত একমাত্র সেণ্ট্র্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়ান কলিকাতাতে স্থাপন করিয়া তাহা দ্বারা আমাদের মালের যথোচিত পরিমাণে কাট্তি করা সম্ভব নহে। এই সওদাগরেরা আমাদিগের দ্রব্যাদির প্রতি সাধারণের অনুরাগ উৎপাদন করিতে পারেন। মফঃস্বলের সহরে এবং সবডিভিসনে সম্ভব হইলে স্থানীয় সওদাগর ও ব্যবসায়ীদিগের তত্ত্বাবধানে আমাদের এজেন্সি খোলা উচিত, এবং আমাদের সামগ্রীগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্ম সারা দেশময় সোৎসাহে প্রচারকার্য্য করা উচিত।

আমাদের প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির তত্ত্বাবধানে আমাদের একদল সুশিক্ষিত ও সুগঠিত বেতনভুক্ কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে। যতই উদ্যমশীল হউন না কেন কোন অবৈতনিক কর্ম্মীর দ্বারা এই সকল কাজ বেশী দিন হওয়া সম্ভব নহে। যদি বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতিকে ইহার নামের যোগ্য এবং ইহার কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার উপযোগী একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে ইহার তহবিলে যথেষ্ট অর্থ দিতে হইবে।

আমি প্রস্তাব করি যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ফণ্ড নামে একটী ফণ্ড খুলিবার উদ্দেশ্যে এই প্রদেশের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে গ্রাম্য সমিতি-গুলি ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়নগুলি পর্য্যন্ত প্রত্যেক সমবায় প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ লাভের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ দান করা উচিত। এই ফণ্ড বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি অথবা এই প্রদেশের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির ও অন্যান্য ব্যবসাদারদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ এই উদ্দেশ্যে গঠিত কোন সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। এই সভা সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী সভা হইবে এবং কোন কৃতী ব্যবসাদার ইহার সভাপতি হইবেন। কিন্তু যদি এই পরিকল্পনার মূলনীতি গৃহীত হয় তাহা হইলে এই সকল ছোটখাট বিষয় পরে স্থির করা যাইতে পারে। প্রত্যেক সমবায় প্রতিষ্ঠান এই ফণ্ডে আইন অনুসারে দান করিতে বাধ্য থাকিবে এবং সেই ভাবেই আইন সংশোধিত করিতে হইবে। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের গড়পড়তা লাভ বৎসরে ১,৫০,০০০৲। প্রায় ১০০টীর অধিক কেন্দ্রীয় সমিতি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের বৎসরে গড়ে ৩,০০০৲ লাভ হয়। প্রায় ২০,০০০ গ্রাম্য সমিতি, সসীম দায়িত্বযুক্ত সমিতি ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়ন আছে। আমার মনে হয় ইহারা প্রতি বৎসরে ৫৲ করিয়া দিতে পারে।

যদি এই লাভের অষ্টমাংশ (যদিও আমি এর চতুর্থাংশ দিবার প্রস্তাব করি) এই ফণ্ডে দান করা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বৎসরে আমরা মোটামুটি ১,৫০,০০০৲ পাই। ১০ বৎসরে এই ফণ্ডে ১৫,০০,০০০৲ হয়। আমি যে কার্য্য-প্রণালীর প্রস্তাব করিয়াছি ইহার সুদ হইতেই তাহার খরচ উঠিয়া যায়। অধিকন্তু এই তহবিল চিরকাল বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আমরা এই কার্য্যপ্রণালীর খরচ যোগাইবার পরেও অন্যান্য উপযুক্ত শিল্পকে অর্থ-সাহায্য করিতে পারিব। একটী বিনষ্ট হইয়া গেলে অপর কাহারও কোন আর্থিক ক্ষতি হইবে না, কারণ এই ফণ্ড বহু প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ লইয়া গঠিত একটি স্বতন্ত্র ফণ্ড হইবে। ইহা সরকারী অডিটার দ্বারা পরীক্ষিত হইবে। আমি আশা করি আমার সহযোগী সমবায় কর্ম্মিগণ দেশের সার্ব্বজনীন উন্নতির জন্য তাঁহাদের লাভের অংশ ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যদি এই প্রস্তাব সমগ্র ভারতবর্ষে গৃহীত হয় তাহা হইলে আমরা কত বৃহৎ কার্য্য না করিতে পারি। আমাদের দেশের শিল্পের উন্নতি আমার জীবনের স্বপ্ন। আমার সহকর্ম্মীরা এই গুরুতর বিষয়ে মনোযোগ করিলে আমি চরিতার্থ হইব। আশা করি, আগামী জিয়াগঞ্জ কনফারেন্সে এই বিষয়টীর মীমাংসা হইবে এবং তাহা হইলে আমাদের দেশের শিল্পের একটী নূতন যুগের সূচনা হইবে।

(ভাণ্ডার)

বিহার ও উড়িষ্যা প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির বিবরণী

প্রথম ভাগ

পল্লী অঞ্চলের ঋণগ্রহণ এবং ঋণের বহর

১। ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য—

(ক) আবাদ, অশন-বসন এবং বাসগৃহ নির্ম্মাণ, বাৎসরিক খাজানা পরিশোধ।

(খ) চাষ-আবাদের হালহাতিয়ার, জানোয়ার ইত্যাদি হাতে রাখা।

(গ) সামাজিক ক্রিয়াকলাপ।

(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি এবং রক্ষা।

(ঙ) সুদসমেত পুরাতন ঋণ পরিশোধ।

২। (১) মোট ঋণ এবং (২) বাৎসরিক ঋণের তুলনা-মূলক বিবরণ।

(১) মোট ঋণের প্রত্যেক টাকার
- (ক) চারি আনার হিসাব,
- (খ) দুই আনার হিসাব,
- (গ) আড়াই আনার হিসাব,
- (ঘ) তিন আনার হিসাব,
- (ঘ) পাঁচ আনার হিসাব।

(২) বৎসরে যে টাকা কর্জ্জ করা হয় তাহার ফী টাকার
- (ক) ছয় আনার হিসাব,
- (খ) দেড় আনার হিসাব,
- (গ) দুই আনার হিসাব,
- (ঘ) আড়াই আনার হিসাব,
- (ঙ) চারি আনার হিসাব।

৩। যে সে উপায়ে ঋণ গৃহীত হয় তাহার পরিচয়।

(ক) পাড়াগেঁয়ে মহাজনই কৃষকদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্জ্জ-দাদনকারী।

(১) এই মহাজন জাতিতে প্রধানতঃ বেণিয়া, দোকানদার। দোকানদারীর সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা কর্জ্জের ব্যবসা করে। সাধারণতঃ এই বেণে নিজের তহবিল হইতেই টাকা ধার দেয়; ইহার পুঁজির পরিমাণ ৫০০৲ টাকা বা তাহারও নিম্ন হইতে উর্দ্ধ পক্ষে ৫০,০০০৲ টাকা বা তাহারও বেশী। সচরাচর ইহাদের কোন গচ্ছিত পুঁজি নাই; এবং সহরের বড় বড় মহাজনের নিকটও ইহারা হাত পাতে না।

(২) অন্যান্য জাতির লোকেরাও এখন এই কর্জ্জ-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে।

(৩) কোন কোন রায়তও ক্রমে ক্রমে সুদখোর মহাজনে পরিণত হইতেছে; পুরুষ বা স্ত্রীলোক—যে কেহ কিছু পুঁজি সঞ্চয় করুক না কেন, সকলেই সাধারণতঃ এই ব্যবসায়ে টাকা নিয়োজিত করিয়া থাকে।

(খ) বিদেশী কর্জ্জ দাদনকারী। ইহাদের সংখ্যা যে খুব বেশী তা নয়; বিহার উড়িষ্যার পাড়াগাঁ অঞ্চলে যে লেনদেনের কারবার হয় তাহার ১% মাত্র ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তবুও ইহাদের অত্যাচার দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। একে তো ইহাদের সুদের হার অত্যন্ত বেশী; তাহার উপর টাকা আদায় করিবার জন্য, ইহারা অকথ্য জুলুমবাজী করিয়া থাকে। এই সমস্ত বিদেশী মহাজনদের মধ্যে কাবুলীরাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য; নেহাৎ গরীব লোকদিগকেও ইহারা ধার দিয়া থাকে; তবে সাধারণতঃ শীতকালে অত্যন্ত চড়া দরে গরম কাপড়চোপড়ই ধারে বিক্রয় করিয়া থাকে। কলিকাতা বা অন্যান্য সহরবাসী ধনী কাবুলী মহাজনেরা ইহাদিগকে টাকা এবং কাপড়চোপড় সরবরাহ করিয়া থাকে। কাবুলীদের পরেই গোঁসাইদের স্থান। এই গোঁসাইপ্রভুরা সমবায় সমিতির মেম্বর হইয়া টাকা সংগ্রহ করে; পরে সে টাকা অত্যন্ত চড়া সুদে পল্লীবাসীদিগকে ধার দিয়া থাকে। সময় সময় ইহারা আপন-আপন গ্রামের ছোটখাটো মহাজনদের নিকট হইতেও টাকা সংগ্রহ করিয়া আনে।

(গ) সমবায় ঋণদান সমিতি। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান এখনও পাড়াগাঁ অঞ্চলে তেমন সুবিধ করিতে পারে নাই। পাড়াগাঁয়ের কর্জ্জ ব্যবসায়ে ইহাদের হিস্যা বর্ত্তমানে মাত্র ২%; তবুও গত ২৫ বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ পসার বৃদ্ধি করিতেছে।

(ঘ) গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্ট পাড়াগাঁয়ের কৃষকদিগকে

নানা উপায়ে ঋণ দান করিয়া থাকে; গবর্ণমেণ্টের সুদের হার সবচেয়ে কম। কি কি উপায়ে গবর্ণমেণ্ট পল্লীবাসী রায়তদিগকে কর্জ্জদাদন করিয়া থাকে নিম্নে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইল:—

(১) দি ল্যাণ্ড ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট লোন্‌স্ অ্যাক্‌ট্

ভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে কর্জ্জ দাদনের জন্য এই আইনটী বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কর্জ্জ সাহায্য সাধারণতঃ জমির মালিকদিগকেই দেওয়া হইয়া থাকে; তবে ছোট নাগপুরে কোন কোন সম্প্রদায়ের রায়তগণকেও দেওয়া হয়। এই কর্জ্জ দাদন অত্যন্ত সাবধানে করা হয়; রীতিমত তদন্ত করিয়া তবে গবর্ণমেণ্ট কর্জ্জ দাদন করে; এজন্য বেশ বিলম্ব হয়। গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট তারিখে কর্জ্জ আদায় করিয়া থাকে। এই সব কারণে কর্জ্জ অনেকের ভাগ্যেই পড়ে না। গত পাঁচ বৎসরে মাত্র ৩২ লাখ টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে।

(২) এগ্রিকাল্‌চারিষ্টস্ লোন্‌স্ অ্যাক্ট্

কৃষকদিগকে ঋণদান সম্বন্ধীয় এই আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কর্ষণযোগ্য জমির মালিকদিগকে হালের গো-মহিষ, বীজ, এবং অন্যান্য জিনিষ ক্রয়ের জন্য এবং অভাবের সময় সাহায্য করিবার জন্য কর্জ্জ দিয়া থাকে। এই ঋণ সাধারণতঃ তাগাভী নামে পরিচিত। বর্ত্তমানে এই ঋণদান সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি করা হইতেছে। কারণ মাত্র অনাবৃষ্টি বা বন্যার সময় এই ঋণ দেওয়া হইতেছে, তাহাও অল্পদিনের মেয়াদে। কমিটির মতে এই ঋণ আদৌ অভাব অনুযায়ী নহে। বর্ত্তমানে জমির দাম যেরূপ তাহাতে কৃষকদিগকে একর প্রতি ১০৲ টাকা ঋণ দান করা অক্লেশে চলিতে পারে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট একর প্রতি আড়াই টাকা পর্য্যন্ত ঋণ দেয় এবং কোন ক্রমেই ঋণের বরাদ্দ ৫৲ টাকার বেশী বাড়ায় না। সুতরাং কৃষকদিগকে বাধ্য হইয়া অন্যান্য মহাজনদের দ্বারস্থ হইতে হয় এবং চড়া হারে সুদ স্বীকার করিয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। এই সমস্ত সরকারী ঋণ আবার এক ফসল, বা দুই ফসল কাটিবার পরই আদায় করিয়া লওয়া হয়; অথচ, এই দুই ফসলের পর কৃষকদের দুর্দ্দশার লাঘব প্রায়ই হয় না। ছোটখাটো কৃষকদের অনেক সময় যে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যায় সে দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় না। এই কর্জ্জ প্রদানের রীতির আর একটী দোষ এই যে, হালের গো-মহিষ কিনিবার জন্য মোটেই ঋণ দেওয়া হয় না; অথচ এই গো-মহিষের অভাবেই চাষীদের সময় সময় কষ্ট ভোগ করিতে হয় অত্যন্ত বেশী।

গবর্ণমেণ্ট এই দুই আইনের বলে বিহার-উড়িষ্যার রায়তদিগকে মোটের উপর বৎসরে ৯ লাখ টাকা কর্জ্জ দিতেছেন; অথচ সমগ্র প্রদেশের জমিদার ছাড়া কেবল রায়তদের ঋণের বহর ১৩৪ কোটি টাকা; এবং ফী বৎসরে এই কৃষককুল ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে ৩৩ কোটি টাকা।

৪। সুদের হার

খাদ্যশস্য ঋণ গ্রহণের জন্য উড়িয়াভাষীদের অঞ্চলে সুদের হার ২৫% এবং অন্যান্য অঞ্চলে ৫০%। বীজ ঋণের জন্য সুদের হার ইহার দ্বিগুণ। সাধারণতঃ আট মাসের মধ্যে এই ঋণ শোধ দিতে হয়, নতুবা রায়তদিগকে চক্রবৃদ্ধি সুদ যোগাইতে হয়। জুলাই মাসের দিকে কর্জ্জ দেওয়া হয় এবং রায়তগণ শোধ দেয় জানুয়ারী মাসের দিকে; সুতরাং অধমর্ণগণ ঋণ-শোধকালে শস্যের দরের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য অনেকটা সুবিধা পায়। উড়িষ্যা অঞ্চলে সুদের হার ২৫% বা তার চেয়ে কিছু বেশী; ছোট নাগপুরে ৩৭½%; মুঙ্গের এবং ভাগলপুরের দক্ষিণাংশে সাধারণতঃ এই হার বর্ত্তমান। বিহারের অন্যান্য অঞ্চলে সুদের হার কম—সাধারণতঃ ১৮¾% দেখা যায়। মোট কথা গরীব এবং মূর্খ রায়তগণই চড়া হারে সুদ দিয়া থাকে; শিক্ষা এবং সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুদের হারও কমিতে দেখা যায়। সমবায় সমিতিগুলিও অঞ্চল-বিশেষে যে হারে সুদ প্রচলিত তাহার সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে; ছোট নাগপুরে সমবায় সমিতিগুলি প্রচলিত সুদের হারের অর্দ্ধেক হারে সুদ আদায় করিয়া থাকে; উড়িষ্যায় প্রচলিত হারের ⅔ অংশ এবং বিহারে ¾ আদায় করিয়া থাকে। সমগ্র প্রদেশের

রায়তগণ মোটের উপর ২০% হারে সুদ দিয়া থাকে। উড়িষ্যার কৃষকগণ বৎসরে সুদ দিয়া থাকে দেড় কোটি টাকা; ছোটনাগপুরের চাষীরা ৫ কোটি টাকা এবং বিহারের রায়তগণ ২০ কোটি টাকা দেয়।

বড় বড় কর্জ্জদাদনকারীর সংখ্যা ২,৫০০

এই প্রদেশে ২,৫০০ পাড়াগেঁয়ে সুদখোর মহাজন ইনকাম ট্যাক্স্ প্রদান করিয়া থাকে; ইহাদের প্রত্যেকের পুঁজির পরিমাণ ২০ হাজার টাকা হইতে ১ লাখ টাকা পর্য্যন্ত। সাধারণতঃ এই মহাজনগণ পাড়াগাঁ অঞ্চলেই কর্জ্জ প্রদান করিয়া থাকে; এবং প্রধানতঃ জমিদারগণই ইহাদের খাতক। বিহার-উড়িষ্যার জমিদারদের মোট ঋণের পরিমাণ ২৪ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে বড় বড় মহাজনদের নিকট ঋণ ১০ কোটি টাকা; সহুরে, পুঁজি-পতিদের নিকট ঋণ ৯ কোটি টাকা; এবং পাড়াগেঁয়ে মহাজনদের নিকট ঋণ ৫ কোটি টাকা। বড় বড় মহাজনেরা জমিদারদিগের নিকট হইতে সাধারণতঃ ১৪% হারে সুদ আদায় করিয়া থাকে।

পাড়াগাঁ অঞ্চলে কর্জ্জ করিবার অসুবিধা

পাড়াগেঁয়ে মহাজনগণ অতিরিক্ত হারে সুদ আদায় করে ইহা সত্য বটে, তবে অল্পদিনের মধ্যেই টাকা আদায় করিবার জন্য ইহারা পীড়াপীড়ি করে না; প্রয়োজন মত কর্জ্জ ইহাদের নিকট অক্লেশে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া যায়। মহাজনগণ অনেক সময় অবস্থানুসারে আপন প্রাপ্য টাকার অনেক অংশ রেহাইও দেয়। যতদিন পর্য্যন্ত রায়তগণ ঋণের বহর না কমাইতেছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত উহারা অন্ততঃ পক্ষে সুদের টাকা কিস্তিতে কিস্তিতে পরি-শোধ করার অভ্যাস না অর্জ্জন করিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত এই গেঁয়ে মহাজনগণ ফসল উৎপাদনের প্রধান সহায়ক রূপেই বিরাজমান রহিবে।

৭। মোট ঋণের পরিমাণ

গোটা প্রদেশের পল্লী অঞ্চলের মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৫৫ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে জমিদারদের ঋণ ২৪ কোটি টাকা; অন্যান্য শ্রেণীর ঋণ ২ কোটি টাকা; সুতরাং সাধারণ কৃষকদের ঋণ ১২৯ কোটি টাকা। এই বিরাট ঋণের মধ্যে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির মেম্বরদের হিস্যা অতি অল্প; অথচ এই সমিতিগুলির মেম্বর-সংখ্যা কমসে কম আড়াই লাখ।

রায়তদের ঋণের হিস্যা মোট বাৎসরিক ঋণের ২৫½% এবং সমিতিগুলির ৩২%।

৮। জামিনবিশিষ্ট ও জামিনবিহীন দেনা

জমিদার-শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর লোকজনের দেনার শতকরা ৪০ ভাগ জমিজমা বন্ধক লইয়া দেওয়া হইয়াছে; গোটা প্রদেশে বন্ধকের মেয়াদ গড়ে ছয় বৎসর। জমিদারদের পক্ষে জমিজমা জামিনবিশিষ্ট ঋণের পরিমাণ ৮৫%।

বাকী ৬০% কর্জ্জের জন্য জমি ছাড়া সমস্ত সম্পত্তি জামিন আছে। প্রধানতঃ বৎসরের শেষে জমির ফসলের উপর এই সমস্ত কর্জ্জ আদায় করা হয়। উড়িষ্যার ২০০৲ টাকার নীচেকার ঋণ এবং ছোট নাগপুর ও বিহারের ৪০০৲ টাকার কম ঋণ হ্যাণ্ডনোটের উপর প্রদত্ত হয়। উড়িষ্যায় ২০৲ টাকার কম এবং ছোট নাগপুর বিহারে ৪০৲ টাকার কম ঋণ কেবল মহাজনের খাতায় লিখিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। মোট কথা জামিন লওয়া না লওয়া সমস্তই মহা-জনের উপর নির্ভর করে; এবং ওই জামিনের স্বরূপ নির্ভর করে অধমর্ণের বাজার সম্ভ্রমের উপর।

৯। বন্ধকী জমির উপর মহাজনের হস্তক্ষেপ

এক চম্পারণ এবং সারণ জেলা ছাড়া অন্য কোথাও মহাজনগণ বন্ধকী জমির উপর বড় একটা হস্তক্ষেপ করে না, রায়তরা নিজেদের মধ্যে জমিজমা হস্তান্তরিত করে। মহাজনদের হাতে জমি গেলে জমির অবনতিই হয়; কারণ মহাজনগণ সাধারণতঃ খাজানা লইয়া জমি লাগাইয়া দেয় এবং এই খাজানার পরিমাণ উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেকের কম নয়। কৃষকগণ এইরূপ জমির চাষআবাদে প্রায়ই যত্ন লয় না।

১০। ঋণগ্রহণের ফলাফল

ঋণভারের জন্য অধমর্ণের কোনরূপ কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না এবং ক্ষুধার তাড়নাও তাহাকে সহ্য করিতে হয়। ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে ঋণভার লঘু করিবার জন্য অধমর্ণ রায়ত অনেক সময় উত্তমর্ণের কাজ করিয়া দেয় এবং হালের গো-মহিষ ভাড়া দিয়া জমিও চষিয়া দেয়। তবে ঋণের জন্য রায়তদের উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিবার যে কোন অসুবিধা হয় ইহা কমিটি বিশ্বাস করে না। লিন্‌লিথ্‌গো কমিশন যে সঙ্কোচ-প্রাপ্ত বাজারের বর্ণনা করিয়াছিল, কমিটির মতে বিহার উড়িষ্যা সম্বন্ধে তাহা খাটে না।

অধমর্ণ রায়তকে অনেক সময় ক্ষেতের ফসল সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে হয় বটে, আর এই ফসল পরে বিক্রয় করিলে লাভ হইত ইহাও সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া বাদ বাকী ফসল বিক্রয় সম্বন্ধে রায়তের লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় না, আর বাজার চড়িবার আশায় বসিয়া থাকিলে সব সময় লাভই যে হয় ইহার কোন মানে নাই; অনেক সময় দর পড়িয়াও যায়। এই প্রদেশের অধিকাংশ স্থানেই দাদন-প্রথা নাই; দারুণ ঋণগ্রস্ত রায়ত অনেক সময় উত্তমর্ণেরই নিকট আইনতঃ না হইলেও ন্যায়তঃ বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলেও সে সেই অঞ্চলের তদানীন্তন দর হইতে বঞ্চিত হয় না।

১১। ঋণ পরিশোধের উপায়

রায়তগণের তথা সমগ্র প্রদেশবাসীর উপর অতিগুরু ঋণভার পতিত হইয়াছে; এই জগদ্দল পাষাণের চাপ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে গোটা প্রদেশের প্রাপ্য সমুদয় ধনসম্পদের নিয়োগ অবশ্যকর্ত্তব্য; কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ রায়তগণের উপর যে গুরু ঋণভার আপতিত হইয়াছে তাহার কিছুই লাঘব হইবে না, যতদিন পর্য্যন্ত না প্রচলিত সুদের হার কম হইতেছে। বিহার অঞ্চলে সুদের হার যদিও অনেকটা কম, ১৮¾%, তবুও কয়েক বৎসরের মধ্যে মাত্র সুদের দরুণই বিহারী কৃষকের ঋণভার যে কে সেই হইয়া দাঁড়াইবে।

কৃষকদের ঋণমোচনের উদ্দেশ্যে স্যার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার ১৯০৬ সনে একটি সরকারী মোসাবিদা খাড়া করেন; কিন্তু ১৯১২ সনে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। কৃষকগণ ইহাতে লাভবান হইতে পারে নাই। কিস্তিবন্দি অনুসারে নিয়মিত ভাবে কৃষকগণ ঋণ শোধ দিতে অপারগ হওয়ায় তাহাদিগকে চড়া সুদে নূতন করিয়া ঋণ করিতে হইয়াছিল। মোটকথা সাময়িক অভাব পূরণ করিবার জন্য কৃষকদিগকে ঋণ করিতে হইবে। সুদের হার যদি চড়া থাকে, তাহা হইলে কৃষকগণ ঋণজাল হইতে কখনই মুক্তি পাইবে না। সুতরাং যেমন করিয়াই হউক কৃষকদিগের ঋণ মোচন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; নতুবা পুঁজি নিয়োগ করিয়া এই প্রদেশের সম্পদ্‌বৃদ্ধির কোনই উপায় দেখা যায় না।

দ্বিতীয় ভাগ

সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যাবলী

১। কার্য্য-ব্যবস্থা

(ক) বিহার অ্যাণ্ড উড়িষ্যা প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ এই প্রদেশের সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষদেশে দণ্ডায়মান হইয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির সহিত সাধারণ পুঁজির বাজারের যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। এই ব্যাঙ্কের মোট কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৬৬½ লাখ টাকা এবং ইহার প্রধান কার্য্য ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিকে পুঁজি সরবরাহ করা। এই পুঁজি (১) প্রাপ্ত মূলধন, (২) প্রাথমিক সমিতি, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সর্ব্বসাধারণের গচ্ছিত অর্থ এবং (৩) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক-প্রদত্ত ক্যাশ ক্রেডিট লইয়া গঠিত। এই ব্যাঙ্ক প্রদেশের বাহিরে অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০½ লাখ টাকা খাটাইতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে। সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলিকে প্রয়োজনানুরূপ পুঁজি সরবরাহ করিবার পক্ষে ব্যাঙ্কটির কখনো অনটন হইবে না; কিন্তু ইহার একটা দোষ এই যে, লম্বা মেয়াদে ঋণদানের মত বেশী পুঁজি ইহার নাই।

(খ) এই প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সহিত ৬৬টী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট আছে এবং এই সমস্ত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মোট মূলধন ২,২৭ লক্ষ টাকা। কর্জ্জ দাদন করাই ইহাদের প্রধান ব্যবসা ; এই কর্জ্জদাদনই ইহাদের সহিত সংযুক্ত প্রাথমিক সমিতিগুলির পুঁজি-সংস্থানের সর্ব্বপ্রধান উপায়। প্রথম অবস্থায় এই সমস্ত সমিতি মোটের উপর এই প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের উপরই নির্ভর করে ; পরে অবশ্য সর্ব্বসাধারণের গচ্ছিত অর্থ দ্বারা ইহাদের পুঁজির সংস্থান হয়।

(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির পরই প্রাথমিক সমিতিগুলির স্থান ; এইগুলি সংখ্যায় প্রায় ৯,০০০ এবং ইহাদের মেম্বরের সংখ্যা ২½ লাখেরও উপর।

২। কর্জ্জের লম্বা মেয়াদ বনাম অল্পদিনের মেয়াদ

সমবায় সমিতিগুলি ক্রমে ক্রমে মেয়াদ বাড়াইতেছে। নিম্নলিখিত কতকগুলি ব্যাপারে ইহা বেশ টের পাওয়া যাইতেছে। (ক) ১৯২২-২৮ সন পর্য্যন্ত সাত বৎসরে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির কর্জ্জদাদনের পরিমাণ ৫১'৭১ লক্ষ টাকা হইতে ৭৫'৪৯ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে ; কিন্তু ঋণদানের জন্য কার্য্যকরী মূলধন ৫৫% হইতে কমিয়া ৩৪% হইয়াছে। অন্য পক্ষে বৎসরের শেষে আদায়যোগ্য কর্জ্জের পরিমাণ ১৯২২ সনে ৭৯'৪০ লাখ টাকা ছিল ; ১৯২৮ সনে উহা দাঁড়াইয়াছে ২,০৫'২৪ লক্ষ টাকা। কার্য্যকরী মূলধনের শতকরা হিস্যার প্রায় কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, বরং কিছু বাড়িয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই সাত বৎসরের মধ্যে কর্জ্জের মেয়াদ দুই বৎসরেরও কম হইতে বাড়িয়া গিয়া প্রায় তিন বৎসরে পরিণত হইয়াছে।

(খ) কর্জ্জ গ্রহণের উদ্দেশ্য হইতেও টের পাওয়া যাইতেছে যে, মেয়াদ বাড়িতেছে। ১৯২৩ সনে অল্পদিনের মেয়াদী ঋণের (আবাদ, খাজানা, ছোটখাটো ব্যবসায়, এবং ভরণ-পোষণ) শতকরা হিস্যা ছিল ৪৯'১ ; কিন্তু ১৯২৬-২৮ সনে গড়ে এই হিস্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৫। এই একই সময়ের মধ্যে মাঝারি মেয়াদী ঋণ (গো-মহিষ খরিদ এবং সামাজিক ব্যাপারে ব্যয়ের জন্য) ১৫'১% হইতে ১৭'৫% এ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং লম্বা মেয়াদী ঋণ (ঋণ পরিশোধ, জমিজমার পুনরুদ্ধার, জমিজমা ক্রয় এবং জমির উন্নতি-বিধান, মোকদ্দমা ইত্যাদি) দাঁড়াইয়াছে ৩১'৭% হইতে ৪৩'৫%। সুতরাং লম্বা মেয়াদী ঋণের দিকেই ক্রমশঃ ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

(গ) এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ এই যে, বিহারের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকরী মূলধনের ১৯%, ছোট নাগপুরের ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকরী মূলধনের ২৫% এবং উড়িষ্যার ব্যাঙ্ক-গুলির কার্য্যকরী মূলধনের ৪৬% অর্থাৎ গোটা প্রদেশের ২৮% মূলধন সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলিতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তিন বৎসরের মধ্যে এই সমস্ত টাকা পরিশোধিত হইবে না।

কমিটি এতদ্‌সম্পর্কে রেজিষ্ট্রারের ১৯১৫ সনের সার্কুলারের উল্লেখ করিয়াছে। উহাতে লেখা আছে যে, বীজ, খাদ্য শস্য, আবাদের খরচ এবং অন্যান্য খরচপত্র সঙ্কুলানের জন্য কর্জ্জ এক বৎসরের মধ্যে, মৃত এবং জীবিত পশু খরিদ, ঘরবাড়ী ক্রয়, সামাজিক দায় এবং ছোটখাটো দেনা পরিশোধের জন্য কৃত ঋণ দুই বা তিন বৎসরের মধ্যে, এবং জমির উন্নতিবিধান, জমি ক্রয় এবং বড় বড় দেনা পরিশোধের জন্য কর্জ্জ চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে শোধ করিতে হইবে। কমিটি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্জ্জের মেয়াদ বাড়াইবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটির বিবেচনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্জ্জের মেয়াদ দুই হইতে পাঁচ বৎসর এবং তৃতীয় শ্রেণীর দেনা কম পক্ষে পাঁচ বৎসর এবং ঊর্দ্ধ পক্ষে পনর বৎসর পর্য্যন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সুবিধাজনকও বটে।

৩। দেয় কর্জ্জ প্রয়োজনানুরূপ কিনা ?

১৯২৮ সনে কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলি মেম্বরদিগকে মোট ৬৪'৪৬ লক্ষ টাকা যোগাইয়াছে। মেম্বর প্রতি দেয় কর্জ্জের পরিমাণ ২৮৲ টাকা। কমিটি মাপজোঁক করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক মেম্বরের বাৎসরিক ঋণের পরিমাণ ৪২৲ টাকা। সুতরাং ঋণদান সমিতিগুলি যে, যথেষ্ট পরিমাণ কর্জ্জ যোগাইয়াছে ইহা বলা যায় না।

সমিতিগুলি মেম্বরগণের অভাব পূরণ করিতে পারিতেছে না; মোটের উপর মেম্বরদের দুই-তৃতীয়াংশ দেনা সমিতিগুলি সরবরাহ করিতেছে।

৪। ঋণভার বাড়িতেছে না কমিতেছে?

কমিটি ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষ্য নজিরাদি ঘাঁটিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সাধারণের ঋণভারের কিছুই লাঘব হইতেছে না। সমিতির মেম্বরদের অবস্থাও তথৈব চ। যাহারা মেম্বর হয় নাই তাহাদের অবস্থা ভীষণ শোচনীয়। সমিতিগুলির নিকট মেম্বরদের ঋণের পরিমাণও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে।

৫। সমিতিগুলির সুদের হারের পরিচয়

নিম্নে সমবায় সমিতিগুলির সুদের হারের পরিচয় প্রদত্ত হইল:

	সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্জ্জ গ্রহণের সুদের হার	প্রাথমিক সমিতিগুলির কর্জ্জ গ্রহণের সুদের হার	রায়তের কর্জ্জ গ্রহণের সুদের হার
বিহার	৬	১১½	১৪
ছোটনাগপুর	৬	১২½	১৬¾
উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূলের জেলাসমূহ	৭	১১½	১৫¾

উপরের এই তালিকায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ রায়তের পক্ষে সমবায় সমিতির কর্জ্জ দাদনের সুদ অত্যন্ত বেশী। বর্ত্তমানে সমিতিগুলির সুদের হার প্রায় ১৫%। কমিটির মতে এই হার ১০%এ পরিণত করা কোনমতেই সম্ভবপর নয়। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির সময়ে সময়ে যথেষ্ট টাকার দরকার হয়। এই সাময়িক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে বহুল পরিমাণে অল্প মেয়াদবিশিষ্ট কর্জ্জ আদায় করা দরকার। এই জন্য ইহাদিগকে সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদের হার কমাইতে হইবে; কারণ প্রচলিত ৪½% হার খুব বেশী। সঙ্গে সঙ্গে সহুরে পুঁজির স্রোত বন্ধ করিতে হইবে। এই সমস্ত সহুরে পুঁজি কৃষকদিগের নিতান্ত দরকারের সময়েও মাত্র ৩% সুদে লগ্নি করিবার জন্য অন্যত্র বাজার ঢুঁড়িয়া বেড়ায়।

সহুরে পুঁজি রোধ করিবার পক্ষে একটী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হইতেছে এই যে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিকে "মুদ্দাই হুণ্ডি" লইবার ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে। কতদিনের জন্য এই হুণ্ডি বলবৎ থাকিবে তাহা প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে স্থির করিতে হইবে। হুণ্ডিওয়ালাদের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় তাহার দায়িত্ব প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে গ্রহণ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার আর একটী সুবিধা এই হইবে যে, হুণ্ডিগুলি কারেন্সি নোটের মত ব্যবহৃত হইয়া মুদ্রার বাজারে সচ্ছলতা আনয়ন করিবে।

ব্যাঙ্কগুলির ঋণগ্রহণ এবং ঋণপ্রদানের মধ্যে ব্যবধান হইতে মুনাফা তৈরী হয় এবং এই মুনাফার দ্বারা লভ্যাংশ, মৌজুত তহবিল এবং অন্যান্য খরচপত্র সমস্তই সঙ্কুলান করা হয়। উপরের ঐ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে এবং ব্যাঙ্কের মুনাফা-বণ্টন সম্বন্ধে খুব সতর্ক হইয়া চলিলে বর্ত্তমান ব্যাঙ্কগুলির ঋণগ্রহণ এবং ঋণপ্রদানের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান আর থাকিবে না।

৬। লম্বা মেয়াদী লগ্নি কারবারের ভবিষ্যৎ পুঁজি

(ক) সাধারণ রায়তের পক্ষে

সমবায় সমিতিগুলি শস্য উৎপাদন সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে কর্জ্জ প্রদান করিয়া কৃষি-ব্যাঙ্কের কার্য্য করিয়া থাকে। অন্য পক্ষে আবার ঋণ পরিশোধ জমিজমার উন্নতিবিধান নূতন জমি ক্রয় ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য কর্জ্জ প্রদান করিয়া এইগুলি বন্ধকি ব্যাঙ্কের (মর্টগেজ ব্যাঙ্ক) স্থানও অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কমিটি এই দুই কাজ পৃথক পৃথকভাবে চালাইবার পক্ষে রায় দিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা প্রাথমিক সমিতিকে যে দ্বিধা বিভক্ত হইতে হইবে তাহা নয়। কমিটির মতে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির দুইটি পৃথক পৃথক কার্য্যবিভাগ থাকিবে, একটি মাত্র লম্বা মেয়াদের কর্জ্জ সম্বন্ধে হিসাবপত্র রাখিবে, অপরটি অন্যান্য লগ্নি

কারবার পরিচালন করিবে। এই জন্য পৃথক পৃথক রেজিষ্টার রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কমিটির বিবেচনায় রায়তদিগের প্রয়োজন-মাফিক লম্বা মেয়াদের কর্জ্জ প্রদান করিতে হইলে দুই বৎসরের জন্য ৩০ লাখ টাকার এবং আরও তিন বৎসরের জন্য ২০ লাখ টাকার প্রয়োজন। কমিটি ডিবেঞ্চার সাহায্যে এই অর্থের সংস্থান করিতে বলিতেছেন। পুঁজি তোলা, লাগান, অর্থের দেখা শুনা, প্রাপ্য পরিশোধ ইত্যাদি সমস্তই প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের হাতে থাকিবে। ডিবেঞ্চার-হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা সম্বন্ধে একটী বোর্ড অব্ ট্রাষ্টীজ গঠন করিতে হইবে। এই নূতন ডিবেঞ্চারে সর্ব্ব সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, দরকার হইলে গবর্ণমেণ্টকেও কিছু কিছু বণ্ড খরিদ করিতে হইবে বা কয়েক বৎসরের জন্য সুদ সম্বন্ধে জামিন থাকিতে হইবে। প্রথম কয়েক বৎসরের জন্য বোর্ড অব্ ট্রাষ্টিজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হওয়া উচিত।

প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক প্রয়োজন মত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিকে টাকা যোগাইবে এবং সেই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলি প্রাথমিক সমিতিগুলির মারফতে প্রকৃত ঋণগৃহীতার হাতে কর্জ্জ পৌছিয়া দেওয়ার ভার গ্রহণ করিবে। প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট ½% এর বেশী সুদ আদায় করিতে পারিবে না; সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ঐরূপ প্রাথমিক সমিতির নিকট সুদ আদায় করিবে ২% এবং মেম্বরদিগকে প্রাথমিক সমিতি সুদ যোগাইবে উর্দ্ধপক্ষে ১%, ডিবেঞ্চারগুলি বাহির করিতে হইবে ৬% সুদে (কমিটির মতে এই সুদের হার পরে কমান হইবে)। সুতরাং অধমর্ণকে মোটের উপর সুদ যোগাইতে হইবে ৯½%। এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিলে রায়তদের ঋণভার অনেক লঘু হইয়া পড়িবে।

রায়তদের দেনা পরিশোধ ছাড়া সমবায় সমিতিগুলিকে জমির উৎকর্ষ-সাধনের জন্যও পুঁজি যোগাইতে হইবে। প্রথমতঃ ছোটনাগপুর মালভূমিতে ছোট ছোট জল-প্রণালী প্রতিষ্ঠা করা দরকার। বাকী প্রদেশের সর্ব্বত্র পাওয়ার পাম্প্ এবং কূপ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আগামী দশ বৎসরের জন্য মাত্র এই সমস্ত ব্যাপারের জন্যই টাকা খরচের দরকার। কমিটির মতে অন্ততঃ এর জন্য ২৫ লাখ টাকার দরকার। ল্যাণ্ড ইম্প্রুভমেণ্ট অ্যাক্ট অনুসারে গবর্ণমেণ্ট যদি ৬¼% হারে কর্জ্জ প্রদান করিতে থাকে এবং এই আইন কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে খরচ আরও কমিতে পারে। এই অর্থ তুলিবার জন্য সমিতিগুলিকে ডিবেঞ্চার বাহির করিতে হইবে।

(খ) জমিদারদিগের পক্ষে

কমিটির মতে সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কগুলির জমিদারদিগকে ঋণদান করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। কারণ জমিদারগণ লম্বা মেয়াদে অনেক টাকা ধার চাহিয়া বসিবে। ফলে এই দাঁড়াইবে যে, মাত্র কয়েকজন বড় বড় মক্কেলের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে যাইয়া ব্যাঙ্কগুলির পুঁজি নিঃশেষ হইবে, সর্ব্বসাধারণ কোনই সুবিধা পাইবে না। সুতরাং এতদর্থে নয়া প্রতিষ্ঠান কায়েম করা দরকার। ইহা একটী বন্ধকী কারবারের ব্যাঙ্কের সামিল হইবে, এবং ইহার প্রধান আড্ডা বসিবে পাটনা সহরে। ৪টী বিভাগীয় সদরে ইহার ৪টি শাখা থাকিবে। গোড়ায় এই প্রতিষ্ঠানের সরকারের তাঁবে থাকা বাঞ্ছনীয়; কারণ প্রথমতঃ একমাত্র গবর্ণমেণ্টেই ইহার পুঁজির সংস্থান করিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের তাঁবে থাকিলে ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের সুবিধা হইবে; তৃতীয়তঃ এই ব্যবস্থায় অনেক মক্কেল জুটিবার সম্ভাবনা। এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টারদের সভা প্রধানতঃ প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং বোর্ডের মেম্বরগণ দ্বারাই গঠিত হইবে। রেভিনিউ বোর্ডের একজন মেম্বর এই ডিরেক্টর সভার চেয়ারম্যান্ হইবেন। বিভাগীয় কমিশনার প্রত্যেক বিভাগের ডিরেক্টার সভার সভাপতি থাকিবেন। মোটামুটি রেভিনিউ বিভাগের অফিসারদিগকেই এই প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত করিবার কথা স্থির হইয়াছে। ইহাতে সুবিধা এই হইবে যে, এই সমস্ত কর্ম্মচারী জামিন প্রয়োজন-মাফিক কি না, অধমর্ণ ঋণ গ্রহণ করিবার অধিকারী কি না ইত্যাদি বিষয় নিরূপণ করিতে পারদর্শী হইবেন। আবার যদি কার্য্যবশতঃ কোন জমিদারি ব্যাঙ্কের তাঁবেই আসে তাহা হইলে সেই জমিদারি

পরিচালনার কার্য্য সম্বন্ধেও ইঁহাদের দ্বারা অনেকটা সুবিধা হইবে।

প্রত্যেক ঋণগ্রহীতাকে এই নয়া ব্যাঙ্কের শেয়ার খরিদ করিতে হইবে। তাহারা শেয়ারের একটী নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে; ব্যাঙ্ক পরিচালনে তাহাদেরও হাত থাকিবে। এই নয়া ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কমিটি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ঋণগ্রহীতা যে টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিবে অন্ততঃ তাহার ১০% শেয়ার রূপে থাকা চাই; আর এই শেয়ারের টাকা একেবারেই আদায় করিয়া লওয়া চাই। গবর্ণমেণ্ট ৫ লাখ টাকা মূলধনে এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবেন। ক্রমে ইহার মূলধন ৫০ লাখ টাকা পর্য্যন্ত করা হইবে; এবং ইহার শেয়ারের দাম ১০৲ টাকা ধার্য্য হইবে। শেয়ারের পুঁজি পরে আদায় করিবার জন্য ফেলিয়া রাখা সুবিধাজনক হইবে না। কারণ ব্যাঙ্ক যদি ফেল মারে তবে অধমর্ণদের জন্যই মারিবে; সুতরাং দেউলিয়া অধমর্ণ যে শেয়ারের টাকা দিতে পারিবে সে ভরসা কম। কার্য্যকরী মূলধন বাড়াইবার জন্য প্রাপ্ত মূলধনের বিশগুণ দামের ডিবেঞ্চার বাহির করা যাইতে পারে। এই সমস্ত ডিবেঞ্চার একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শোধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৫ এবং ২৫ বৎসর এই দুই সময়ের শেষে ডিবেঞ্চার শোধ করিবার ব্যবস্থা করা ভাল। এই সমস্ত ডিবেঞ্চার এমন হওয়া উচিত যাহাতে বাজারে রীতিমত উহার ক্রয়বিক্রয় চলে। এই সমস্ত ডিবেঞ্চার যাহাতে ট্রাষ্টিদের জামিনরূপেও গ্রাহ্য হইতে পারে এমন ব্যবস্থাও হওয়া দরকার।

২½% সুদের ব্যবস্থা করিলেই ব্যাঙ্কের খরচপত্রের সংস্থান হইয়া যাইবে। সুতরাং ৬% যদি ডিবেঞ্চারের সুদ ধরা যায়, তাহা হইলে অধমর্ণকে সুদ যোগাইতে হইবে মোটের উপর ৮½%।

কর্জ্জ-প্রদানের সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন সীমা নির্দ্দেশও দরকার। কারণ ইহার ফলে এই ব্যাঙ্ক সমবায় সমিতি-গুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। আবার ব্যাঙ্কের পুঁজিপাটা মাত্র দু'দশজন বড় বড় জমিদারের সিন্দুকে গিয়া জমিবে না।

স্বদেশী শিল্পের উৎসাহ

স্বদেশী শিল্পকে উৎসাহ দিবার জন্য কলিকাতায় একটি স্বদেশী লীগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া একটি সাময়িক কমিটী গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন—স্বদেশী লীগের সাহায্যে কতকগুলি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। প্রথমতঃ ভারতের, বিশেষভাবে বাঙ্গলার, অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য আমাদের নানারূপ উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের কোন্ জেলায় কি পরিমাণ বিদেশী এবং স্বদেশী জিনিষ ব্যবহৃত হয়, কোন্ স্থানে কিরূপ শিল্পের উন্নতি সম্ভব ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত কোন ধারণা বা হিসাব নাই। এই সব জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য হইবে স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান। দ্বিতীয়তঃ ভারতের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা চাই যাহাতে দেশের পূর্ণ স্বার্থ রক্ষিত হয়। তারপর স্বদেশী লীগের আর এক কাজ হইবে উল্লিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে দেশময় বুলেটিন বিজ্ঞাপনী, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রচার করা। তাহাতে উৎপাদনকারী ও ক্রেতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইবে। যদি সংকল্প কার্য্যে পরিণত করা যায় তবে ভারতে বিভিন্ন শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে। অল্প মূলধনে যদি গৃহে গৃহে কলের তাঁত স্থাপন করা যায়, তবে তাহাতে বস্ত্র-সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। এই সকল তাঁত মিলের সহিত অনায়াসে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে, অথচ খরচও বেশী পড়িবে না। এই সব কাজের জন্য একনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ কর্ম্মী চাই।

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গঠনমূলক কার্য্যের উপর বিশেষ জোর দিয়া বলেন—প্রস্তাবিত স্বদেশী লীগের বিভিন্ন বিভাগ থাকিবে। এক এক বিভাগ হইতে এক এক প্রকার কাজ করিতে হইবে। প্রচারের দিকে বিশেষ জোর দিতে হইবে। এইরূপে কাজ করিতে পারিলে

বিদেশী জিনিষকে বাধ্য হইয়া স্থান ছাড়িয়া দিতে হইবে। এইরূপ কার্য্যে কোন দলাদলি থাকিলে চলিবে না। সকলকে সমস্ত মতভেদ ভুলিয়া স্বদেশী শিল্পোন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু বলেন, জাতীয় আন্দোলনে গঠন-মূলক কার্য্য অপরিহার্য্য। স্বদেশী অর্থ শুধু খদ্দর নহে, শুধু বস্ত্রও নহে। আমাদের সকল প্রকার স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন করিতে হইবে। ছোট ছোট কল বসাইয়া ক্ষুদ্র আয়তনে বহু শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। স্বদেশী দ্রব্যের নামে যে অনেক প্রকার জুয়াচুরি চলিতেছে তিনি তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। এজন্য চাই মানুষ ও অর্থ। মানুষ হইলেই অর্থ আসিবে। এখন আর দেরী করিবার সময় নাই।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার একটি সাময়িক সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়া বলেন—স্বদেশী লীগের সর্ব্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত বুলেটিন, পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপনী ইত্যাদি প্রচার এবং উৎপাদনকারী ও ক্রেতাদের মধ্যে যোগ স্থাপন করা।

নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া একটি সাময়িক কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি প্রস্তাবিত লীগের গঠন ও কর্ম্মপদ্ধতি এবং নিয়মকানুন রচনা করিবেন। সদস্যগণের নাম—শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ললিত মোহন দাস, ডাঃ প্রমথনাথ বানার্জ্জি, সত্যানন্দ বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ সুবোধ বসু, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, ডাঃ হরিশ সিংহ, ডাঃ সুহৃদ মিত্র, আনন্দজি হরিদাস, সুবোধ রায় ক্যাপ্টেন এন এন দত্ত, সত্যরঞ্জন বকসী, তুলসীচরণ সারোগী, সুরেশ ভট্টাচার্য্য এবং কিরণশঙ্কর রায় সম্পাদক।

ভারতের আর্থিক দুরবস্থা

বোম্বাই সহরে মাড়োয়ারী বণিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ যোশী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজকাল দেশে যে আর্থিক অসচ্ছলতা উপস্থিত হইয়াছে, তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাহার সমালোচনা করিয়া বলেন, এই জন্য সরকারের নব প্রবর্ত্তিত বাট্টা নীতিই সমধিক দায়ী। এ সম্পর্কে বড়লাট কলিকাতার এসোসিয়েটেড্ চেম্বার অব্ কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে যাহা বলিয়াছেন, তাঁর সমস্তটা ভারতের অর্থনীতিবিদ্ ও ব্যবসায়িগণ স্বীকার করেন না। জগতের আর্থিক অসচ্ছলতায় ভারতের ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু ভারতের আর্থিক অসচ্ছলতার আরও অনেক কারণ আছে। তাঁর বক্তৃতার কয়েকটি কথা এইরূপ: বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনকে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। এই আন্দোলন মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশের কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান বাট্টা নীতিতে ভারতের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইংলণ্ড ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ, এমন কি মার্কিণ ও জাপান পর্য্যন্ত ইহাতে উপকৃত হইয়াছে। অর্থনীতির প্রত্যেক ছাত্রই অবগত আছেন, উচ্চহারে বাট্টা নীতি প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাতে আমদানির সুবিধা হয়। তাই ইয়োরোপীয় বণিক সভা বর্ত্তমান বাট্টা-নীতি বিশেষভাবে সমর্থন করিতেছে। ইহাতে ভারতের দ্রব্যাদি রপ্তানির বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এই জন্য গত ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই বাট্টা নীতির তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। তখনই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল ইহাতে দেশের কৃষি-ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের সর্ব্বনাশ হইবে। সেই ভবিষ্যদ্বাণী শেষ সত্যে পরিণত হইয়াছে। অথচ সে কথা খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করিবার মত সাহস সরকারের নাই। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতের কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগের অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহার এক কারণ ভারতীয় কৃষকদিগের মাল আটক রাখিবার শক্তি ক্রমে ক্রমে বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অধিকন্তু বর্ত্তমানে বাট্টা নীতির জন্য এই দেশের ধনসম্পত্তি অজ্ঞাতসারে অথচ দ্রুত গতিতে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। এই ভাবে যদি আমাদিগের ঋণভার বাড়িয়া যায় তাহা হইলে আমরা এক দেউলিয়া জাতিতে পরিণত হইব।

বর্জ্জননীতি ও স্বদেশী আন্দোলনের একটা ভাল ফল এই হইয়াছে যে, ভারতীয় শিল্প একটা নূতন অনুপ্রেরণা পাইয়াছে। জাতীয় জাগরণের সহিত স্বদেশী দ্রব্যোৎপাদনকারীরা দ্রব্য বিক্রয় করিবার একটা সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছে। তাহাতে বিদেশ হইতে আর নূতন মাল, বিশেষতঃ বস্ত্র, তেমনভাবে আমদানি হইতেছে না। এই বর্জ্জননীতির জন্য ভারতের অন্যান্য শিল্পও জাগিয়া উঠিতেছে। অন্যদিকে এই বর্জ্জননীতি আমদানির সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

নূতন ডাক টিকেট

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে নূতন দিল্লী সহর স্থাপনের জন্য যে সমারোহ হইবে তাহাতে ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের প্রতিনিধিগণ আগমন করিবেন। এই সম্পর্কে কয়েক রকম নূতন ডাকটিকেট বিক্রয় হইবে। এই মাসে সমগ্র ভারতে যত ডাক টিকেটের প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ টিকেট প্রচলন করা হইবে।

এক পয়সার টিকেট—পুরাণ কেল্লার ছবি থাকিবে।

দুই পয়সার টিকেট—যুদ্ধ স্মৃতি তোরণের ছবি।

এক আনার টিকেট—কাউন্সিল গৃহ।

দুই আনার টিকেট—বড় লাটের গৃহ।

তিন আনার টিকেট—ভারত গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিয়েট।

এক টাকার টিকেট—ঔপনিবেশিক স্তম্ভের ছবি থাকিবে।

যে কোনও ডাকঘরে এই টিকেটের জন্য আবেদন করিলে ক্রয় করিতে পারা যাইবে, কেবল শাখা পোষ্ট আফিসে ইহা বিক্রয়ার্থ থাকিবে না। সাধারণ ডাক টিকেটের পরিবর্ত্তে ইহা প্রচলিত হইবে।

ভেষজানুসন্ধান সমিতি

এদেশের ঔষধাদির ভেজাল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এদেশের দেশীয় ভেষজ পদার্থে ও বিদেশ হইতে আমদানি পদার্থে যে প্রচুর পরিমাণ ভেজাল চলে, তাহা সকলেই জানেন। ইহার বিশেষ অনুসন্ধান ও ভেজাল নিবারণের ব্যবস্থার প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট এইউদ্দেশ্যেই এই কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুরবস্থা

সম্প্রতি বাঙ্গালার জনৈক বার্ত্তাশাস্ত্রবিৎ শ্রীযুক্ত এন, এম মজুমদার ইয়োরোপের বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া বহু স্থানের কাজ কারবার দেখিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই বৎসর তিনি ইংলণ্ডে বিষম পরিবর্ত্তন দেখিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি কখনও ইংলণ্ডের ব্যবসায়ের এরূপ দুর্দ্দশা দেখেন নাই। সেখানকার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন। গ্রেট বৃটেনকে রপ্তানি-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। সকল পণ্যের রপ্তানিই হ্রাস পাইয়াছে।

কেন এমন হইল, তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে লোকের পুঁজিপাটা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। কোটি কোটি টাকার বারুদ পেট্রল ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সে টাকাটা এই জনসমাজ হইতেই আসিয়াছে। কেহ কেহ এই যুদ্ধের সময় কিছু টাকাও করিয়া লইয়াছে; কিন্তু মোটের উপর ইহার ফলে লোকের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে। এখন জন-সমাজের আর পূর্ব্বের ন্যায় জিনিষ কিনিবার ক্ষমতা নাই। গ্রেট বৃটেনের লোক করভারে আক্রান্ত। তথায় করের হার এখনো পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রহিয়াছে। রণ-ঋণের বোঝা, সমর-অবসানের ব্যয়, রণতরী নির্ম্মাণ আর সর্ব্বোপরি এই বেকারদিগের পোষণজনিত ব্যয় ইত্যাদি কারণে তথাকার লোকের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের খরিদ্দারগণ এখন দারিদ্র্যভারে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর চীনরাজ্যে কয়েক বৎসর ধরিয়া মহা হাঙ্গামা লাগিয়াই আছে, ভারতেও হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্তু কেবল যে গ্রেট বৃটেনের বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়াছে তাহা নহে,—ইয়োরোপের অন্যান্য বহু দেশে এবং মার্কিণেও বাণিজ্যের অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। কেবল ফ্রান্সে এই দুর্গতি এত তীব্রভাবে উপস্থিত হয় নাই। তাহার কারণ, ফরাসীরা যুদ্ধ জনিত ক্ষতিপূরণের যে টাকা পাইয়াছে

তাহা তাহারা বেশ হিসাব করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনকার্য্যে নিয়োজিত করিতেছে। আসল কথা এই যে, ফ্রান্স এখন তাহার কল-কারখানাগুলি চালিয়া একেবারে হালফ্যাসানে সাজাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও আজকাল ফ্রান্সকে এই পৃথিবীব্যাপী মন্দার বাজারের দুর্ভোগ পোহাইতে হইতেছে। ফ্রান্সবাসী উহা হইতে একেবারে নিস্তার পায় নাই।

শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয় বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে কল-কারখানার উন্নতি এবং সুব্যবস্থা-সাধনের ফলে পণ্য অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে; সে পরিমাণ মালের খরিদ্দার নাই। অনেক মাল অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেছে। কাজেই জিনিষের মূল্য কমিয়া যাইতেছে, কেবল যে শ্রমশিল্পজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস পাইতেছে তাহা নহে, কৃষিজ পণ্যের এবং খনিজ পণ্যের মূল্যও হ্রাস পাইতেছে, যথা চিনি, চা, পাট, ডাইল, কলাই, রৌপ্য, রবার, তামা, সীসা ইত্যাদি। এই সকল জিনিষ এখন উৎপাদক ও বিক্রেতাদিগের দোকানে প্রচুর পরিমাণে মজুত রহিয়াছে। এদিকে দিন দিন উহার বাজার নরম হইতেছে বলিয়া লোকে আর উহা ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। উদাহরণস্বরূপ শ্রীযুক্ত মজুমদার কার্পাসের সঞ্চয়ের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কার্পাসের সঞ্চয় ছিল (মিলের সঞ্চয় বাদে) প্রায় ২০ লক্ষ গাঁইট, আর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে উহার সঞ্চয় হইয়াছে ৫০ লক্ষ গাঁইট। এইরূপে রবার, চা, চিনিও বিস্তর মজুদ রহিয়াছে। কাজেকাজেই পণ্যমূল্য হ্রাস পাইতেছে।

নিখিল এশিয়া শিক্ষা সম্মিলন

কাশীতে বিগত ২৭শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চারি দিন ধরিয়া নিখিল-এশিয়া শিক্ষা-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় এক সহস্র প্রতিনিধি এবং চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানের বহু প্রতিনিধি উক্ত সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। কাশীর রাজা সম্মিলনের উদ্বোধন করেন।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রাধাকিষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, "প্রাচ্য খণ্ড বা এশিয়া খণ্ড আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী এবং পাশ্চাত্য খণ্ড বা ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থূল পার্থিব সম্পদের অধিকারী। মানবজাতির এই দুই অংশের মিলন না ঘটিলে জগতের সমস্ত অভাব অভিযোগ দূরীভূত হইবে না।"

ইহার পর সম্মিলনকে কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই সমস্ত বিভাগে দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল।

শেষ দিনের সভায় চীনের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কে, এম, ওয়াং সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহাতে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধ্যাপক-বিনিময়-কার্য্য চলিতে পারে, শ্রীযুক্ত ওয়াং তাহার জন্য প্রস্তাব করেন। সম্মিলনে বহুসংখ্যক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এই সম্মিলন উপলক্ষে শ্রীমতী এনি বেশান্ত, শ্রীযুক্ত ভগবান দাস, ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহম্মদ, শ্রীমতী আনিয়া বেগম প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলাগণ সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় শেষ দিনের সভায় বলেন,—শিক্ষা-সমস্যা কোন জাতি-বিশেষের একচেটিয়া সমস্যা নহে, ইহা সমগ্র মানবজাতির সমস্যা। শিক্ষিত ব্যক্তি বিশ্ব-মানবের বন্ধু, সমগ্র বসুধাই তাহার পরমাত্মীয়। জগতের মধ্যে যে বিদ্বেষ, ভ্রাতৃবিরোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দূর করাই শিক্ষিতগণের কর্ত্তব্য।

শ্রীমতী এনি বেশান্ত "প্রাচীন ভারতে শিক্ষার আদর্শ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রায় ২০ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শেষাদ্রি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি-রূপে গণ-শিক্ষা সম্বন্ধে যে একটী সারগর্ভ সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

এই সম্মিলনের সঙ্গে একটী শিক্ষাপ্রদর্শনী বসিয়াছিল। বহুসংখ্যক লোক তাহা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

চীন দেশের প্রতিনিধিগণ কয়েকখানি চৈনিক চিত্র আনিয়াছিলেন। সেগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

বোলপুর বিশ্বভারতীর জাপানী যুযুৎসু শিক্ষক যুযুৎসু ক্রীড়া এবং অন্যান্য মল্লক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

চীনদেশের প্রতিনিধিগণ চীন দেশে নিখিল-এশিয়া শিক্ষা-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

দুনিয়াব্যাপী মূল্য-হ্রাস

১৯২২ সনে জেনেভা সহরে অর্থনৈতিক সম্মেলন বসে। সমিতিতে স্থির হয় যে, দুনিয়ার সর্ব্বত্র স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইবে। কারণ বিনিময়ের টান অনুসারে মুদ্রা বাহির করিতে গেলে স্বর্ণমান ছাড়া তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবার উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিনিময়ের উঠানামা ঘুচিবে না ও তজ্জন্য আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের দারুণ অসুবিধা হইবে। কারণ বিনিময়ের উপরেই আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য নির্ভর করে। বিনিময়ে স্থিরতা না থাকিলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার হয় না। কিন্তু একটীমাত্র দেশ বা রাষ্ট্রের পক্ষে এইরূপ অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়। এই জন্য সম্মেলন দুনিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে সাবধান হইতে উপদেশ দেন যেন কেহ বিনিময়ে অযথা পরিবর্ত্তন না আনয়ন করে; অর্থাৎ যেন সোনার ক্রয়শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি না ঘটে। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে দুনিয়ার প্রায় সর্ব্বত্র স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু দুনিয়ায় মালপত্রের দরের সাম্য সম্পাদিত হয় নাই।

মূল্য-হ্রাসের কারণ

সাধারণের বিশ্বাস কলকারখানায় 'যুক্তি প্রয়োগ' দ্বারা গাদায় গাদায় মাল উৎপাদনের ফলে জিনিষপত্রের দামে বৈলক্ষণ্য দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই মতের কোন মূল্য নাই। কারণ মাল উৎপাদন বাড়ানো আজ নূতন ব্যাপার নয়। অনেক বৎসর ধরিয়া মালপত্র বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। দুনিয়ার লোক-সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে ১% হারে, আর জিনিষপত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে ৩% হারে। সুতরাং জিনিষপত্রের মূল্য-হ্রাস অনেক আগ থেকেই আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মূল্যহ্রাস মাত্র সেদিনের ব্যাপার।

জিনিষপত্রের মূল্য-হ্রাস হওয়ায় মালপত্র গাদায় গাদায় জমিয়া উঠিতেছে, বিক্রী হইতে পারিতেছে না। মাল-উৎপাদনকারীরা দর না পাওয়ায় মাল জমাইয়া রাখিতে বাধ্য হইতেছে। উপযুক্ত পরিমাণ মুদ্রা না থাকাতেই এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। এখন দরকার আরও মুদ্রার।

সোনার পরিমাণ বাড়াও

মাল উৎপাদন তো বাড়িয়াই চলিতেছে। এখন উপায় কি? একমাত্র উপায় সোনার ষ্টক বাড়ানো আর সেই সোনা হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া বাজারে ফেলা। তবেই মালপত্রের দামের স্থিরতা হইবে। দুনিয়ায় এই জন্য সোনার উৎপাদন ৮% বাড়াইতে হইবে, আর সোনার রিজার্ভও এই অনুপাতে বাড়াইতে হইবে। সমস্ত দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ সোনার ষ্টক অনেক দেশেই নাই; সুতরাং ঐ সমস্ত দেশে মুদ্রার অভাব দাঁড়াইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্রের দামও কমিয়া গিয়াছে যৎপরোনাস্তি। একমাত্র সোনাই এই মূল্য-হ্রাস নিবারণ করিতে পারিবে।

স্বর্ণাভাবের কারণ

মহাযুদ্ধের দরুণই দুনিয়ার নানাদেশে স্বর্ণাভাব ঘটিয়াছে। দুনিয়ার অধিকাংশ সোনা মার্কিণ, ফ্রান্স এবং আর্জ্জেন্টিনা দেশে জমা হইয়াছে। এই তিনটী দেশ যথেষ্ট কারিগরি খাটাইয়া আপন আপন দেশে এইরূপ সোনা জমা করিয়া রাখিয়াছে। ফলে দুনিয়ার অন্যান্য দেশগুলি কারেন্সির প্রয়োজনানুরূপ সোনা সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। কাজেই জিনিষপত্রের দামের স্থিরতা সম্পাদিত হইতে পারিতেছে না। ১৯২৮ সন পর্য্যন্ত তিন বৎসরে সোনার অভাব অনেকটা সহনীয় ছিল; ১৯২৯ সনে এই অভাব একেবারে ১০০% এ গিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই জন্যই

জিনিষপত্রের দাম এমন অভাবনীয়রূপে সস্তা হইয়া পড়িয়াছে।

দরের হ্রাস-বৃদ্ধিতে অসুবিধা

জিনিষপত্রের দরের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ধনের বিলি-ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। জিনিষপত্র সস্তা হইয়া গেলে যারা পুঁজি খাটাইয়া পয়সা উপায় করে তাদের সুবিধা হয় ষোল আনা; কিন্তু মরে যারা গতর খাটাইয়া পেটের ভাতের যোগাড় করে তারা। সমাজে গোলযোগও উপস্থিত হয় তুমুলভাবে। কারণ জিনিষের দাম কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর কিছু মজুরদের মজুরির হার কমে না। মজুরির হার কমে আস্তে আস্তে। সুতরাং লাভের অঙ্কের উপরে টান পড়ে সর্ব্বাগ্রে। যে সমস্ত কলকারখানার পুঁজি অল্প, সেগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই পটল তোলে বা কাহিল হইয়া পড়ে। এই সমস্ত কারখানার কুলিরাই সর্ব্বাগ্রে বেকার হইয়া পড়ে। দু'চারটি কারখানার কুলি বেকার হইলে ক্রমে অন্যান্য কারখানাতেও তার ধাক্কা গিয়া লাগে। ক্রমে সব স্থানে লাভের ঘরে শূন্য পড়ে। কুলিদের বেতনের হার কমিতে থাকে; শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়া অবস্থা আরও সঙ্গীন করিয়া তোলে।

উপায় কি?

মূল্য-হ্রাসজনিত এই যে বাণিজ্য-হ্রাস, ইহার প্রকৃত প্রতিকারের উপায় কি? এইরূপ বাণিজ্য-হ্রাস হইলে আপনা-আপনিই সস্তা ক্রেডিটের ব্যবস্থা করিয়া তাল সামলানো হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় স্থায়ী ফললাভ অসম্ভব। দুনিয়ার সমস্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি মিলিত হইয়া বুদ্ধি খাটাইয়া তাহাদের কারেন্সি পরিচালনা করে এবং হুঁসিয়ার হইয়া সোনা লইয়া কারবার করে তবেই স্থায়ী ফললাভ হইতে পারে, নতুবা নহে।

ধোপার পাট

[মায়ারপুর রোড (আলিপুর)এ জনৈক বন্ধুর ভবনে এক ধোপার সহিত আমাদের যে কথাবার্ত্তা হয় তার কোন অংশের মর্ম্ম নিম্নরূপ।]

প্রঃ—তোমার বাড়ী কোথায় ?

উঃ—মজঃফরপুর।

প্রঃ—তুমি বাঙ্গালা দেশে কবে আসিয়াছ ?

উঃ—ছেলেবেলায় আসিয়াছিলাম। তারপর বরাবর আছি, অবশ্য মাঝে মাঝে বাড়ীতে গিয়াছি ?

প্রঃ—তোমার বয়স কত হইবে বলিয়া আন্দাজ কর ? সিপাহী বিদ্রোহ দেখিয়াছ বলিয়া মনে পড়ে কি ?

উঃ—আজ্ঞে না। সিপাহী বিদ্রোহ আমি দেখি নাই। বোম্বাইয়ে যখন খুব প্লেগ লাগিয়াছিল সেই বৎসর আমি বাঙ্গালাদেশে আসি। তখন আমি যুবক।

প্রঃ—প্রথমে তুমি কোথায় কাজ করিয়াছিলে ?

উঃ—আমি দাৰ্জ্জিলীঙে সাহেবদের কাপড় ধুইতাম। তারপর কয়েক বৎসর হইল আমি কলিকাতার এই অঞ্চলে আসিয়াছি ও সাহেবদের এবং বাবুদের কাপড় ধুইতেছি।

প্রঃ—আচ্ছা এই কাপড় ধুইয়া মাসে তোমার হাতে কত করিয়া লাভ থাকে বলিতে পার ?

উঃ—বাবু, লাভের কোন স্থিরতা নাই। কোন মাসে হয়ত ৫০।৬০ টাকা লাভ করি, আবার কোন মাসে হয়ত কিছুই লাভ হয় না।

প্রঃ—সে কি রকম ? কোন মাসে একেবারেই লাভ হয় না, এমন কি হইতে পারে ?

উঃ—কেন পারবে না ? এই দেখুন না, গত মাসে আমার এক ৪০৲ টাকার গাহেক ছাড়িয়া গিয়াছে। তাতে গত মাসে আমার এক পয়সাও লাভ হয় নাই। অথচ তার আগের মাসে ৬০৲ টাকা লাভ পাইয়াছিলাম।

প্রঃ—তোমার আয়ব্যয়ের একটা খতিয়ান দাও দেখি।

উঃ—আমার প্রথম দফা খরচ পড়ে কাপড় কাচিবার জন্য তিনজন সহকারী রাখিয়াছি বলিয়া,—একজনকে ২৫৲ টাকা দিতে হয়। এই তিনজনের পিছনে আমার মোটা ৪০৲ টাকা যায়। তাছাড়া এদের খাওয়া খরচ ও আমার খাওয়া খরচ এবং ঘরভাড়া আছে। কাপড় ধুইবার সরঞ্জাম—কাঠ কয়লা, সোডা, সাজিমাটি ইত্যাদি বাবদ্ খরচ করিতে হয়। এইরূপ মাসে আমার মোট খরচ প্রায় ৮০৲ টাকার কাছাকাছি দাঁড়ায়। এই ৮০৲ টাকার উপরে যা কিছু উপাৰ্জ্জন করিতে পারি তাই আমার নিট্ লাভ। এই লাভ বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।

প্রঃ—আচ্ছা আগেকার কালের তুলনায় তোমরা আজকাল কি কম উপাৰ্জ্জন কর ? যদি কর, কেন কর ?

উঃ—বাবু, তখন জিনিষপত্রের—কয়লা, সাজিমাটি ইত্যাদির দর অনেক কম ছিল। সুতরাং তখন দুই পয়সায় বেশ সাফ কাপড় কাচা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু এখন তা অসম্ভব। অথচ দুই পয়সার জায়গায় ৪ পয়সা লই বলিয়া যেমন কম লোকে কাপড় কাচিতে দেয়, তেমনি যারা কাচিতে দেয় তারাও কম কাপড় দিয়া থাকে।

প্রঃ—আচ্ছা, কলিকাতার অলিতে গলিতে কাপড় কাচা ও পরিষ্কার করার দোকান হইয়াছে বলিয়া তোমাদের ক্ষতি হইয়াছে কি ?

উঃ—মনে হয় না। কারণ ঐ দোকানগুলি শেষ পর্য্যন্ত ত আমাদের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। বরং ঐ প্রকার দোকানের সহিত ধোপারা চুক্তি করিয়া লইয়া লাভবান্ই হইতেছে।

প্রঃ—দেশে তোমার ক্ষেত খামার কিছু আছে কি?

উঃ—আজ্ঞে না।

প্রঃ—সে কি কথা! তোমাদের দেশের ত দেখি প্রত্যেকের কিছু না কিছু জায়গা-জমি থাকে। তোমার নাই কেন ?

উঃ—ছেলে বয়সে আমার বাবা মারা যান এবং মাথার উপর অভিভাবক না থাকায় মা আমাদের অন্যত্র লইয়া যান। সে সময় যে জায়গা-জমি ছাড়িয়া গিয়াছিলাম তা আর ফিরিয়া পাই নাই।

প্রঃ—দেশে তোমার এখন কে আছে ?

উঃ—আমার দুইটী কন্যা আছে।

প্রঃ—তোমার ছেলে নাই ?

উঃ—আজ্ঞে না।

প্রঃ—তবে ত তুমি এখানে যা উপার্জ্জন কর সবই তোমার থাকিয়া যায়, অন্য কারও ভাবনা তোমার ভাবিতে হয় না।

উঃ—ভাবিতে হয় বৈ কি। আমার তিন কন্যা, তিন জনেরই বিবাহ দিয়া চুকিয়াছি; কিন্তু ছোট দুইজন বাড়ীতে আছে। তাদের ও তাদের স্বামীদের ভরণপোষণের ব্যয় আমাকেই বহন করিতে হয়।

প্রঃ—কেন ?

উঃ—আপনি আমাদের দেশের নিয়ম জানেন কি না জানি না। আমাদের দেশে মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার রীতি থাকিলেও যথেষ্ট বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত মেয়ে বাপের বাড়ী থাকে, শ্বশুর বাড়ী যায় না। আমার মেয়ে দুটি ছোট বলিয়া আমার বাড়ীতেই আছে। আর জামাইরাও ছোট, তাই তাদের দেখিতে হয়।

প্রঃ—মাসে মাসে তুমি কত টাকা করিয়া পাঠাও ?

উঃ—যে মাসে যেমন পারি। যা লাভ করি তার প্রায় সবটাই পাঠাইয়া দিয়া থাকি।

প্রঃ—তোমার ঋণ আছে কি ?

উঃ—আছে বৈ কি। মেয়েদের সাদি দিতে ঋণ করিয়াছিলাম। এখন ঋণের পরিমাণ ২০০৲ শতের কম হইবে না।

প্রঃ—সুদ দিতে হয় ?

উঃ—তা আর দিতে হয় না ? মাসে শতকরা ২৲ টাকা।

প্রঃ—কার নিকট ধার লইয়াছ ?

উঃ—দেশে মহাজনের নিকট।

প্রঃ—আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে তুমি বলিতেছিলে কাপড় কাচার জন্য তিনটা লোক রাখিয়া তুমি মাসে প্রায় ৪০৲ টাকা খরচ কর। কিন্তু তুমি দেশ হইতে তোমার মেয়ে জামাইদের আনাইয়া লইয়া এই কাজে বহাল কর না কেন ? এই খরচটা ত তাহ'লে বাঁচিয়া যায়।

উঃ—বাবু যে কি বলেন! আমি তা করিতে যাইব কেন ? আমার কি সম্ভ্রম-জ্ঞান নাই ? যে সব ধোপা পয়সার লোভে নিজেদের স্ত্রী বোন ও বধূদের লোকচক্ষুর সম্মুখে লইয়া কাপড় কাচায় আমরা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করি না। কলিকাতা শহরে আমাদের দেশের অনেক ধোপা এরূপ অনাচার করিতেছে বটে, কিন্তু আমি তা পছন্দ করি না।

প্রঃ—শুধু কলিকাতার দোষ দিতেছ কেন ? আগ্রা এবং দিল্লীতে দেখিয়াছি যমুনার তীরে তীরে বহু ধোপা তাদের বাড়ীর মেয়েদের লইয়া কাপড় কাচিতেছে।

উঃ—তা সত্য বটে। সহুরে ধোপাদেরই এই দশা। কিন্তু আমরা সে শ্রেণীর নহি। আমরা মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত মর্য্যাদা বজায় রাখিব, আমাদের মেয়েদের মুখ অন্য লোকে দেখিতে পাইবে না।
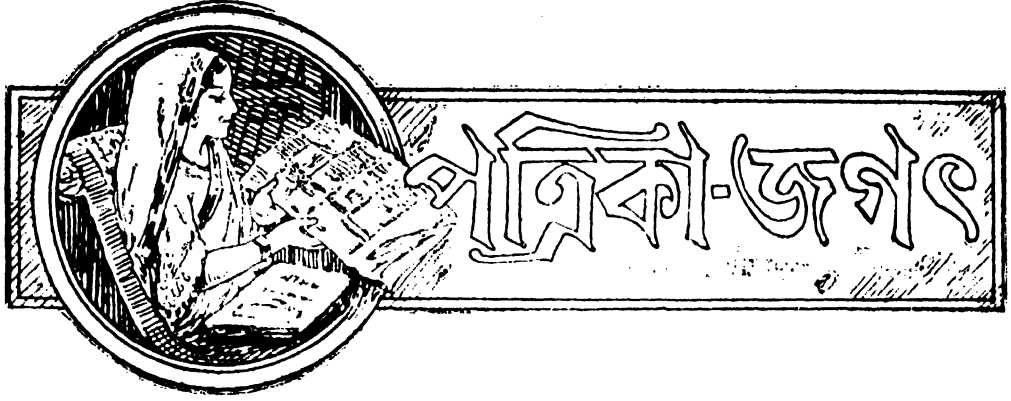
"জার্ণাল অব্ দি ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল এসোসিয়েশন"

সম্পাদকীয় অফিস কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অবস্থিত। আমেরিকান্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল এসোসিয়েশনের মুখপত্র। এই এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৯ সনের ২৭শে নবেম্বর। এসোসিয়েশনের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তাদের নাম:

সভাপতি ম্যালকল্‌ম সি রোর্টি

সহঃ সভাপতি (১) ডোনাল্ড আর বেল্‌চার

(২) আর্থার আর ক্র্যাথোর্ণ

(৩) ডব্লিউ র‍্যাণ্ডল্ফ বার্গেস্

(৪) ব্রাডফোর্ড বি স্মিথ

(৫) আর এইচ কোট্‌স্

(৬) এডওয়ার্ড এল থর্ণডেক

সম্পাদক-কোষাধ্যক্ষ উইলফোর্ড আই কিং

"চাপ্টার"ও জিলা সম্পাদক—

অষ্টিন (টেক্সাস) চাপ্টার

ক্যারল ডি সিম্‌সন, টেক্সাস বিশ্ব-বিদ্যালয়, অষ্টিন, টেক্সাস

বোষ্টন চাপ্টার

রস্‌ওয়েল এফ্ ফেলপ্‌স্, ম্যাসাচুসেট্‌স্ শ্রম ও শিল্প-বিভাগ, বোষ্টন, ম্যাসাচুসেট্‌স্

শিকাগো চাপ্টার

এইচ বি ষ্টেয়ার, ইলিনিওস বেল টেলিফোন কো, শিকাগো, ইলিনিওস্

ক্লীব্‌ল্যাণ্ড চাপ্টার

ডি সি ইলিয়ট, মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক, ক্লীব্‌ল্যাণ্ড, ওহিও

কলম্বাস (ওহিও) চাপ্টার

হ্যারি এস্ উইল, কলম্বাস, ওহিও

লোস্ এঞ্জেলেস্ চাপ্টার

জে সি ক্লাণ্ডেনিন, লোস্ এঞ্জেলেস্, কালিফোর্ণিয়া

সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো চাপ্টার

মেরিল কে বেনেট, খাদ্য গবেষণা মন্দির, ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়, কালিফোর্ণিয়া

আয়তনের প্রতিনিধি ও জিলা সেক্রেটারী—

ডেট্রয়ট ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ

লেষ্টার কে কির্ক, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাক্‌সিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী, ডেট্রয়ট, মিশিগান

পিট্‌স্‌বার্গ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ

জর্জ্জ এ ডয়েল, বেল টেলিফোন কো, পিট্‌স্‌বার্গ, পেনসিলভ্যানিয়া

ওয়াশিংটন ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ

টমাস বি রোডস্, ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ড, ওয়াশিংটন

পত্রিকা-সম্পাদক ফ্রান্স আলেক্‌জাণ্ডার রস্

সমালোচনা-সম্পাদক লিও হোলফ্যান

সহযোগী-সম্পাদক (১) এডমাণ্ড ই ডে

(২) হেস্‌লি সি মিচেল

(৩) হিলিয়াম এফ্ ওগবার্ণ

(৪) হ্বাণ্টার এফ্ হিলকক্স

পত্রিকার ২৫তম ভাগ চলিতেছে, সংখ্যা ১৭১। প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক রূপে এবং বাৎসরিক চাঁদা ৬ ডলার। সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সংখ্যায় পৃষ্ঠা আছে ১৪১।

পত্রিকার মোটা ৩টা বিভাগ হইতেছে :

১। প্রবন্ধ
২। নোট্‌স্
৩। সমালোচনা

প্রবন্ধাবলীর রকম

সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত ২।১টি প্রবন্ধ এইরূপ :

(১) মেজারিং জয়েন্ট কজেশন—একাধিক কারণ নিরূপণ করিবার উপায়,—আণ্ড্রু টি কোর্ট। ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক সম্বন্ধ বিশ্লেষণের বেলায় অনেক ক্ষেত্রে "জয়েন্ট কজেশনের" ক্রিয়া দেখা গিয়াছে। লেখক এক ধরণের "ফর্ম্যাল এম্পিরিক্যাল" সমীকরণ বাহির করিয়াছেন, তাহাতে এই "কজেশনের" সাপজোঁক চলে। একটি সমীকরণ এই :

$$\text{ক}_১ = \text{অক}_২ + \text{আক}_৩ + \text{ই}^{\text{ক}_২} + \text{ঈ}^{\text{ক}_৩} + \text{উক}_২^{\text{ক}_৩} + \text{প}।$$

এখানে $\text{উক}_২^{\text{ক}_৩}$ যুক্ত ক্রিয়া দেখাইতেছে।

এজেকিয়েল এবং বাউঘ নামক দুই জন নামজাদা সংখ্যা-শাস্ত্রবিদের সহিত লেখকের এ বিষয়ে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, "মেডিকো-অ্যাকচুরিয়েল" মরণশীলতা অনুসন্ধান (১৯১৬) হইতে (১) "কম্পাউণ্ড এলিমেন্ট অ্যানালিসিস্" (তাঁর অবলম্বিত প্রণালী), (২) প্রচলিত মাল্‌টিপল্‌ কো-রিলেশ্যন ও (৩) বয়স বাদ দিয়া "কো-রিলেশ্যন"—এই তিনের মধ্যে তাঁর প্রণালীর উৎকৃষ্টতা ধরা পড়ে। এই তিনের সংখ্যা-বিজ্ঞানসম্মত ফলাফল নিম্নরূপ :

	র দৃষ্ট	র পরিশোধিত
কম্পাউণ্ড এলিমেন্ট অ্যানালিসিস্	'৯৭৬	'৯৭৩
প্রচলিত মাল্‌টিপল্‌ কো-রিলেশ্যন	'৮৫৪	'৮৪২
বয়স বাদে কো-রিলেশ্যন	'৮৪৪	'৮৩৬

আলু লইয়া পরীক্ষাতেও (অর্থাৎ কতটা ফসল আশা করা যায় তাহাতে) তাঁর প্রণালীটি উৎরাইয়াছে।

$\text{ক}_১$ = মেইন আলুর ফসল আদায়

$\text{ক}_২$ = আগষ্ট পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত (জুলাইয়ের ডবল)

$\text{ক}_৩$ = ১ আগষ্ট হইতে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত, ধরিয়া ১৯২৮ সনের সমীকরণ (গতিবেগটাকে বাদ দিলে) এইরূপ দাঁড়ায় :

$$\text{ক}_১ = ১৫.৮৪\text{ক}_২ + ৫৯.০৭\text{ক}_৩ - .২৭৫৮\text{ক}_২^২ - ১,৫০০\text{ক}_৩^২ - ৪:২৪২৪\ \text{ক}_২\ \text{ক}_৩ + ১২৫.৫$$

$$\text{র} = .৯৪$$

(২) "১৬৫০ সন হইতে চীন মহাদেশে লোকবল কতটা বাড়িয়াছে এবং বর্ত্তমান লোক-সংখ্যা কত তা লইয়া এক পশ্চিমার মাথা ঘামানো," কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্বাল্টার এফ্‌ হ্বিলকক্স। এই প্রবন্ধটি আন্তর্জ্জাতিক সংখ্যা পরিষদের তোকিয়ো অধিবেশনে পঠিত হয় (সেপ্টেম্বর, ১৯৩০)। এই ভদ্রলোক ১৯২৮ সনে বর্ত্তমান পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন—"১৯১০ সনে চীনের লোক-সংখ্যা।" অর্থাৎ বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি এ বিষয়ে খাটিতেছেন। এই 'কয়েক বৎসর' ৮।১০ বৎসরও হইতে পারে।

প্রথম সমস্যা, ১৯১০ সনের সেন্সাসকে বিশ্বাস-যোগ্য মনে করা যায় কি না? লেখক বলিতেছেন, নানাপ্রকার ভুল-চুক শোধরাইলে লোকবল এইরূপ দাঁড়ায় (কয়েকটি স্থানে):

প্রদেশ	গৃহের সংখ্যা লাখ	অনুমিত লোকবল লাখ	গৃহ প্রতি লোক
চিহ্‌লি	৫২.০৮	৩০০.০০	৫.৮
চেকিয়াঙ	৩৮.৮৮	১৫০.৭০	৩.৯
কিয়াংসি	৩৪.৪০	১৬৮.৯০	৪.৯
কিয়াওচাও	১৭.৭২	৯৯.২০	৫.৬
মোট	১৪৩.০৮	৭১৮.৮০	৫.০

এই প্রথা অবলম্বন করিয়া লেখক গোটা চীনদেশের জন্য নিম্নলিখিত লোকবল আন্দাজ করিতে সমর্থ হইয়াছেন (১৯৩০ সন)—

প্রদেশ	গৃহের সংখ্যা (হাজার)	প্রতি গৃহে ৫.০ জন লোক ধরিয়া লোকবল (হাজার)
উত্তর চীন	১৫,০৯৫	৭৫,৪৭৫

চিহ্‌লি	৫,২০৮	২৬,০৪০
শান্টাঙ	৫,৩৮০	২৬,৯০০
শান্‌সি	১,৯৯৩	৯,৯৬৫
সেন্‌সি	১,৬০৫	৮,০২৫
কান্‌সু	৯০৯	৪,৫৪৫
মধ্য চীন	২৫,৮৭৮	১২৯,৩৯০
কিয়াংসু	৩,১৪৮	১৫,৭৪০
আনহুল	৩,১৪৮	১৫,৭০৫
হোনান	৪,৬৬২	২৩,৩১০
হুপে	৪,৫৩৩	২২,৬৬৫
স্‌জেচোয়ান	১০,৩৯৪	৫১,৯৭০
দক্ষিণ চীন	২৩,৫৬৬	১১৭,৮৩০
চেকিয়াঙ্‌	৩,৮৮৮	১৯,৪৪০
ফুকিয়েন	২,৩৭৯	১১,৮৯৫
কিয়াংসি	৩,৪৪০	১৭,২০০
হুনান	৪,২৮৮	২১,৪৪০
কিয়াওচাও	১,৭৭২	৮,৮৬০
য়ুন্নান	১,৫৭২	৭,৮৬০
কোয়াংসি	১,১৭৫	৫,৮৭৫
কোয়াংটাঙ	৫,০৫২	২৫,২৬০
আসল চীন	৬৪,৫৩৯	৩২২,৬৯৫
বহিঃস্থ জিলাসমূহ :		
সিংকিয়াঙ্‌	৪৬৭	২,৩৩৫
মাঞ্চুরিয়া	২,৫৮০	১২,৯০০
ফেঙ্গটিয়েন	১,৬০০	৮,০০০
কিরিন	৭৩৯	৩,৬৯৫
হাইলুঙকিয়াঙ	২৪১	১,২০৫
মঙ্গোলিয়া		১,৮০০
তিব্বৎ		২,০০০
মোট বহিঃস্থ জিলাসমূহ		১৯,০৩৫
চীন, সর্ব্ব মোট		৩৪১,৭৩০

এই গেল ১৯৩০ সনের লোকবল। ১৬৫০ সনে চীনের লোকসংখ্যা কত ছিল? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কয়েকটি মুনির মত নিম্নরূপ :

		কোটি
সাচাবোফ	...	২.১
রকৃহিল	...	৫.৫
মার্টিনি	...	৫.৯
হ্বিলিয়াম্‌স্‌	...	৬.০
চাঙ্‌-হেন-চেন	...	৬.৬
গাওয়েন	...	৬.৯
পার্কার	...	৭.৭
চাঙ্‌-হেন-চেন (২য় বার)		১০.০
মার্টিনি (২য় বার)		২০.০

লেখক বলিতেছেন ৭ কোটি। চীনের লোকবল বৃদ্ধি তাঁর মতে এইরূপ হইয়াছিল :

সন		আসল চীনের লোকবল কোটি
১৬৫০	...	৭·০
১৭১০	...	১৪·০
১৮৫০	...	৩৪·২
১৯১০	...	৩৪·২
১৯৩০	...	৩৪·২

অবশ্য এটা তাঁর কল্পিত সিদ্ধান্ত মাত্র।

সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য রয়না তৈলের উপযোগিতা

বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলে নানা জাতীয় ফলবান্ ও অন্যবিধ প্রয়োজনীয় গাছপালা দৃষ্ট হয়। এই সব গাছের ছাল, ফুল, ফল এবং বৃক্ষজাত অন্যান্য বস্তু নানাপ্রকার শিল্প এবং ঔষধের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রয়না অর্থাৎ পিত্তিরাজগাছ (আমুরা রোহিতুকা) ঠিক এই ধরণের একটী গাছ। পূর্ব্বে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে দেখা যাইত। এখনও বাঙ্গালার কয়েকটী জেলায় পাড়াগাঁ অঞ্চলে লোকের বাড়ীর আশে পাশে, এবং পোড়ো জমিতে এই গাছ শত শত দেখা যায়। পক্ষিকুল এই গাছের বংশ-বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। উহারা এই গাছের ফল খাইয়া আটিটা যেখানে সেখানে ছড়াইয়া রাখে, তাহা হইতে এই গাছ জন্মে।

কেরোসিন তৈলের ব্যবহারের পূর্ব্বে রয়না ফলের তৈল প্রদীপে জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। এখন আর প্রয়োজন না থাকায় এই তৈল-প্রস্তুত একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালার আর্থিক ক্ষতি ত হইয়াছেই, লোকেরও একটী উপার্জ্জনের পন্থা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে লোকে অবসর সময়ে এই তৈল নিষ্কাশন করিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া লইত। সম্প্রতি বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট সরকারী শিল্প-গবেষণাগারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এই তৈল চর্ব্বি এবং অন্যান্য তৈলের সহিত মিশাইয়া সাবানের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

রয়না বৃক্ষ চির-সবুজ; সুতরাং এই বৃক্ষ অভিনব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অধিকারী। গৃহের বা বাগানের সৌন্দর্য্য-বিধানের জন্যও লোকে এই গাছ লাগাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অনেক জঙ্গলে এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। যুক্তপ্রদেশের গোণ্ডা জঙ্গলের নদীর তীরবর্ত্তী জলা নিম্নভূমিতে, সিকিম তেরাই অঞ্চলে ৬০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ পর্ব্বতে, আসাম, শ্রীহট্ট, কাছাড়, চট্টগ্রাম, উত্তর ও পূর্ব্ব ব্রহ্মদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত ৩০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ ঢালু পর্ব্বত-গাত্রে, কোঙ্কন প্রদেশের অন্তর্গত পশ্চিম ঘাট গিরিমালার চির-হরিৎ বনভূমিতে, উত্তর কানারা এবং তাহার দক্ষিণাঞ্চলে, সিংহলের জলাভূমিতে, আন্দামান ও মালকা দ্বীপপুঞ্জে এই গাছ সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভিজা মাটিই যখন রয়না গাছ জন্মাইবার পক্ষে প্রশস্ত, তখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালা দেশে এই গাছ বেশ জন্মিবে। পশ্চিম বঙ্গের শুষ্ক জেলাগুলি ছাড়া এই গাছ বাঙ্গালার আর সর্ব্বত্র জন্মিতে পারে। যশোহর, খুলনা এবং ২৪ পরগণার কোন কোন স্থানে এই গাছ যেখানে সেখানে দেখা গিয়া থাকে।

রয়না গাছ তৃতীয় বৎসর হইতে ফলবান্ হয়; তখন গাছ লম্বায় প্রায় ৮ ফুট হয়। তবে ১০ বৎসর বয়স হইতেই গাছে ফলন হয় বেশী। মাটির গুণ, আবহাওয়ার অবস্থা, গাছের অবস্থান ইত্যাদি নানা কারণে ফলনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বৎসরে মাত্র একবার ফলন হয়। বাঙ্গালা দেশে নবেম্বর ডিসেম্বর মাসে এই গাছে ফুল হয় এবং মার্চ্চ মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

রয়না ফল থোকায় থোকায় ধরিয়া থাকে। ইহা গোলাকার, মধ্যের ব্যাস ১ ইঞ্চি হইবে। ফলটী প্রথমে সবুজ থাকে, তারপর হলদে এবং পাকিবার সময় বাদামী

রং ধারণ করে। সাধারণতঃ এই ফলের ২।৩টী বীচি হয়; কোন কোন সময়ে মাত্র ১টী বীচি এবং সময়-বিশেষে আবার ৪টী বীচিও দেখা যায়। পাকা ফলের বীজের রং ঈষৎ লাল আভা-বিশিষ্ট। ফল পাকিয়া গেলে ফাটিয়া যায়; বীজগুলি গাছতলায় ছড়াইয়া পড়ে। গো মহিষে এই বীজ বিষাক্ত বলিয়া খায় না।

বীজগুলি আকারে ক্ষুদ্র; প্রায় পৌনে এক ইঞ্চি লম্বা, ওজনে ০·৭ গ্রাম। ১২০০।১৩০০ বীজ একত্র করিলে ওজনে ১ সের দাঁড়ায়। বীজের উপরিভাগে শক্ত, ভঙ্গুর, পাতলা এবং কালো রংয়ের একটী খোসা থাকে। উপরের এই খোসা ভাঙ্গিয়া শাঁস ছাড়াইয়া লইতে পারা যায়; তবে কিছু শাঁস খোসার সঙ্গে থাকিয়া যায়। শাঁস প্রায় খোসার সমান; রং ঘোলাটে হল্‌দে; উহার উপরে আবার একটী বাদামী ছাল। ছুরি দিয়া এই ছাল ছাড়াইয়া লইতে পারা যায়। এই শাঁস হইতেই তৈল পাওয়া যায়; কিন্তু শাঁসে তৈল সম্বন্ধে কোনরূপ আভাস পাওয়া যায় না। শাঁসটী কিছু শক্ত বটে। শুক্‌না শাঁস রীতিমত চূর্ণ করিতে পারা যায়।

গোটা বীজের প্রায় ৮৬% শাঁস, খোলাটা মাত্র ১৪%। খোলাটী ভীষণ শক্ত বলিয়া অধিকাংশ তৈলই শাঁসের সঙ্গে চলিয়া আসে। খোলায় খুব অল্প পরিমাণ তৈল লাগিয়া থাকে। সুতরাং খোলা ছাড়াইবার জন্য সেরূপ কোন মারামারি আবশ্যক করে না। আবার এই বীজের খইল বিষাক্ত বলিয়া গো-মহিষের খাদ্য-হিসাবে অনুপযোগী; সুতরাং খইলে যদি কিছু কিছু খোলা থাকিয়াও যায় তাহা হইলেও কোন ক্ষতি হয় না।

খুব হিসাব করিয়া তৈল বাহির করিয়া দেখা গিয়াছে, শাঁসের মধ্যে তৈলের পরিমাণ ৫৬·২%; সুতরাং খোলাযুক্ত শুষ্ক বীজ হইতে ৪৩·২% তৈল পাইবার সম্ভাবনা।

বীজের মধ্যে খাঁটি জলের ভাগও খুব অল্প; গোটা বীজের জলীয় ভাগ ৯%। ঘানি কিংবা অন্য কোন প্রকার পাড়াগেঁয়ে রীতিতে তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে রীতিমত শুকাইয়া লওয়া দরকার। তৈলের মধ্যে জল থাকিলে পচিয়া যাইতে পারে। শুকাইবার কাজ বাষ্পদ্বারা উষ্ণীকৃত ঘরে কিংবা রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে চলিতে পারে। পল্লীবাসীদের পক্ষে শেষোক্ত উপায়টাই প্রশস্ত। ফল যখন মার্চ্চের শেষে পাকে তখন শুকাইয়া লইতে কোনই অসুবিধা হইবে না। কারণ, এ সময়ে বৃষ্টি কদাচিৎ হইয়া থাকে। ফল কুড়াইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে শুকাইবার ব্যবস্থা করা ভাল; নতুবা ফল পচিয়া যাইতে পারে। ফল না শুকাইলে খোলা ভেদ করিয়াও পোকা প্রবেশ করে, এরূপ দেখা গিয়াছে। শাঁসের সঙ্গে রৌদ্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকা চাই; এইজন্য খোলা সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইবার দরকার নাই। উপরের খোলা অল্প-বিস্তর ভাঙ্গা থাকিলেই রৌদ্রের তাপ ভিতরে প্রবেশ করিয়া শাঁসকে শুকাইয়া ফেলিবে। শুকাইবার পর শাঁসগুলি কিছু সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

বীজ শুষ্ক হইবার পর উহাকে কোন মিলে সুন্দররূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হয়; তারপর উহাকে কলে দিয়া তৈল বাহির করিয়া লইতে হয়। প্রতি ইঞ্চিতে ১০টী করিয়া ছিদ্র আছে এমন মিলে ফেলিয়া তারপর তাহা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ২ টন চাপবিশিষ্ট ছোট হাইড্রলিক প্রেসে তৈল নিষ্কাশনের জন্য দেওয়া যাইতে পারে। দেশী ঢেঁকির সাহায্যেও বীজ চূর্ণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বীজ অল্প হইলে দেশীয় পাথরের যাঁতাও চলিতে পারে। বীজের পরিমাণ বেশী হইলে এগুরানার মিল দ্বারা বীজ চূর্ণ করার প্রয়োজন হয়। দেশীয় ঘানি ব্যবহার করিলে শাঁস চূর্ণ করার দরকার নাই। চাপ এবং চাপের সঙ্গে শাঁস পরিষ্কার করিয়া লইলেই যথেষ্ট।

দেশে সাধারণতঃ মাটির পাত্রে অথবা কটাহে বীজ ভাজিয়া লইয়া ভাজা বীজ ঢেঁকি দ্বারা চূর্ণ করিয়া ৫।৬ ঘণ্টা জলে সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ বীজ থিতাইলে উপরে তৈলের সর ভাসিয়া উঠে। এই তৈল অত্যন্ত সাবধানে তুলিয়া লওয়া হয়। দেখা গিয়াছে ৪।৫ সের বীজ হইতে ১ সের পরিমাণ তৈল পাওয়া যায়; অর্থাৎ বীজ হইতে ২২·৫% তৈল পাওয়া যায়। এই দেশী প্রক্রিয়ায় বীজ হইতে মাত্র অর্দ্ধেক তৈল নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে হাইড্রলিক প্রেসের সাহায্যে ৩৮% তেল পাওয়া যাইতে পারে; অর্থাৎ খোলা-

বিশিষ্ট গোটা বীজের ৩৪'৬% তৈল পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় দেশীয় প্রথার তুলনায় ৫০% অধিক তৈল পাওয়া যাইতে পারে। শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় তৈলও অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়া থাকে।

টাটকা রয়না তৈলের রং গাঢ় লাল; উহা ঘোলাটে ধরণের; গন্ধ সেরূপ তীব্রও নয়, খারাপও নয়। তৈল থিতাইলে বেশ পরিষ্কার হয়; এবং তলদেশে শক্ত চর্ব্বি জমে। এই চর্ব্বির রং তৈলের রংয়ের মত তত গাঢ় নয়। নিম্নে টাট্‌কা তৈলের বৈজ্ঞানিক পরিচয় প্রদত্ত হইল:—

স্পেসিফিক্ গ্র্যাবিটি ২৯'৫° "সি"	০'৯০১৬
রিফ্র্যাক্‌টিব্ ইন্‌ডেক্‌স্	৮২
এ্যাসিড্ ব্যালু	২৪'৯৪
স্যাপোনিফিকেশান্ ব্যালু	১৯৮'২৭
আয়োডিন্ ব্যালু	১২৬'৭৩
টিটার টেষ্ট	৩৭'৫° "সি"

যে সমস্ত তৈল বা বসা হইতে সাবান প্রস্তুত হয় তাহা সাধারণতঃ শক্ত হইয়া থাকে। সাবানের এই দোষ দূর করিবার জন্য মসিনার তৈল মিশান হয়। মসিনার তৈলের পরিবর্ত্তে রয়নার তৈল ব্যবহার করা চলে। রয়না তৈলে প্রস্তুত সাবানের রং শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় না। রয়না তৈলের সাবান গুদামজাত করিয়া দেখা গিয়াছে ৯ মাস পর্য্যন্ত কোন বিকার হয় নাই।

রয়না তৈলের সাহায্যে সুন্দর মোল্ডেড্ সাবান প্রস্তুত হইতে পারে। শতকরা ৫ হইতে ২৫ ভাগ পর্য্যন্ত রয়না তৈল মিশাইয়া ১০ দফা সাবান প্রস্তুতের তালিকা দেওয়া হইল:

১নং

	শতকরা ভাগ
ট্যালো	৩৮
মহুয়া তৈল	১৬
বাদাম তৈল	১৬
তুলার বীজের তৈল	১৫
রেড়ীর তৈল	৫
রয়না তৈল	৫
রোসিন	৫

২নং

	শতকরা ভাগ
ট্যালো	৩৫
মহুয়া তৈল	২৫
বাদাম তৈল	১২
তুলার বীজের তৈল	১৬
রয়না তৈল	৮
রোসিন	৪

৩নং

	শতকরা ভাগ
ট্যালো	৪০
মহুয়া তৈল	১২
বাদাম তৈল	১৬
রেড়ীর তৈল	৫
তুলার বীজের তৈল	১৫
রয়না তৈল	৮
রোসিন	৪

৪নং

	শতকরা ভাগ
ট্যালো	৪১
মহুয়া তৈল	২০
বাদাম তৈল	১০
তুলার বীজের তৈল	১০
রেড়ীর তৈল	৫
রয়না তৈল	১০
রোসিন	৪

৫নং

	শতকরা ভাগ
ট্যালো	৩৯
মহুয়া তৈল	১৫
বাদাম তৈল	২০
তুলার বীজের তৈল	১০
রয়না তৈল	১২
রোসিন	৪

৬নং

	শতকরা ভাগ
ট্যালো	৩৮

	শতকরা
মহুয়া তৈল	১৫
বাদাম তৈল	১৫
তুলার বীজের তৈল	৮
রেড়ীর তৈল	৫
রয়না তৈল	১৫
রোসিন	৪

৭নং

ট্যালো	৫৩
তুলার বীজের তৈল	২৫
রয়না তৈল	১৮
রোসিন	৪

৮নং

ট্যালো	৪২
মহুয়া তৈল	১৫
বাদাম তৈল	২০
রয়না তৈল	২০
রোসিন	৩

৯নং

ট্যালো	৩৬
মহুয়া তৈল	১২
বাদাম তৈল	১৫
তুলার বীজের তৈল	১০
রয়না তৈল	২৫
রোসিন	২

১০নং

	শতকরা
ট্যালো	৪৫
বাদাম তৈল	১৫
তুলার বীজের তৈল	১২
রয়না তৈল	২৫
রোসিন	৩

বর্ত্তমানে অনেক রয়না ফল অযথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সাবান প্রস্তুতকারকগণ এই তৈলের উপযোগিতা সম্বুঝিতে পারিলে এই ক্ষতি হইতে দেশ অব্যাহতি পাইতে পারে। সম্প্রতি ত্রিপুরা দরবার আপন এলাকাভুক্ত বন-জঙ্গলে রয়না গাছ কাটা নিষেধ করিয়া দিয়াছে। অতঃপর ত্রিপুরাবাসী কেহই আর এই কাঠ কাটিয়া জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না। ত্রিপুরা দরবারের এই ব্যবস্থা যে যুক্তিযুক্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্যবস্থার ফলে ত্রিপুরা দরবারের একটি আয়ের পথ উন্মুক্ত হইল। ত্রিপুরার জঙ্গল-জাত রয়না ফল হইতে তৈল-শিল্প কায়েম হইলে অনেক ত্রিপুরাবাসীরও অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইবার সম্ভাবনা। কারণ ফল-আহরণ এবং ফল হইতে তৈল নিষ্কাশন এই উভয় কার্য্যের জন্যই অনেক লোকের দরকার হইবে।

আমরা উপরের তথ্যটুকু বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্প দপ্তর হইতে প্রকাশিত "ইন্‌বেষ্টিগেশন ইন্‌টু দি অ্যাপ্লিকেশন অব্ রয়না (আমুরা রোহিতুকা) অয়েল ইন্ সোপ্-মেকিং" (ডক্টর আর এল দত্ত, ডি, এস্‌সি ও তিনকড়ি বসু বি এস্‌সি প্রণীত) ৪৬ নং বুলেটিন হইতে সঙ্কলন করিয়া দিলাম। আশা করি, দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবে ও কেহ কেহ ইহা লইয়া আলোচনা ও কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

শ্রীমন্মথনাথ সরকার

১। "দি হ্বার্লড্‌স্ পপুলেশন প্রব্লেম্‌স অ্যাণ্ড এ হ্বাইট অষ্ট্রেলিয়া" (দুনিয়ার লোকবল-সমস্যা ও শ্বেত অষ্ট্রেলিয়া), এইচ এল হ্বিলকিন্‌সন। পি এস্ কিং, লণ্ডন। ১৯৩০। ১৭+৩৩৪ পৃঃ।

২। "র‍্যাশানালিজেশন অ্যাণ্ড আন্‌এমপ্লয়মেণ্ট, অ্যান্ ইকনমিক ডাইলেমা" (যুক্তিপ্রয়োগ-নীতি ও বেকার, একটি আর্থিক ধাঁধাঁ), জে এ হব্‌সন। জর্জ্জ আলেন অ্যাণ্ড আন্‌হ্বিন্। ১৯৩০। ১২৮ পৃঃ।

৩। "ফুড্ সাপ্লাই ইন্ রুশিয়া ডিউরিং দি হ্বার্লড-হ্বার" (বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে রুশিয়ায় খাদ্য-সংগ্রহ)। সম্পাদক, পি বি ষ্ট্রুবে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অধ্যায় লিখিয়াছেন। যথা, অর্গ্যানিজেশন অ্যাণ্ড পলিসি (সংগঠন ও নীতি), কে আই ৎসেইটসেব্ ও এন্ বি ডলিন্‌স্কি; ফুড্ প্রাইসেস্ অ্যাণ্ড দি মার্কেট ইন্ ফুড্‌ষ্টাফ্‌স্ (খাদ্যের দর ও খাদ্যদ্রব্যের বাজার), এস্ এস্ ডেমোস্থেনোব্। কার্ণেগী এন্‌ডাউমেণ্ট ফর্ ইণ্টারন্যাশনাল পীসএর উদ্যোগে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, নিউ হেব্‌ন। ২১ শি। ২৭+৪৬৯ পৃঃ।

৪। "দি সেল্‌স্ ট্যাক্স ইন্ ফ্রান্স" (ফ্রান্সে বিক্রয় কর), কার্ল এস্ শুপ্। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস্, নিউ ইয়র্ক। ১৫+৩৬৯ পৃঃ। ২৫ শি।

৫। "অ্যান্ ইকনমিক হিষ্টরি অব্ অষ্ট্রেলিয়া" (অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক ইতিহাস), পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডওয়ার্ড শান্। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যা-লয় প্রেস। ১৮ শি। পৃঃ ১৪+৪৫৬

৬। "পাটের চাষ", শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ। মোহাম্মদী বুক এজেন্সি, ৯১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ১৩৩৭। মূল্য ৫০ আনা। পৃঃ ।০+৭৪+গ।

৭। "দি থিওরি অব্ কলেকটিব্ বার্‌গেনিং। হিষ্টরি, অ্যানালিসিস্ অ্যাণ্ড ক্রিটিসিজ্‌ম্ অব্ দি প্রিন্সিপাল থিওরিস্ হুইচ্ হ্যাব্ সট্ টু এক্সপ্লেন্ দি এফেক্টস্ অব্ ট্রেড্ ইউ-নিয়ান্‌স্ অ্যাণ্ড এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশনস্ আপন দি ডিষ্ট্রি-বিউশন অব্ দি প্রডাক্ট অব্ ইনডাষ্ট্রী।" (একযোগে বাজারে কেনাবেচার তত্ত্বকথা। প্রধান প্রধান যে সব তত্ত্ব দ্বারা শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টনের উপর মজুরসঙ্ঘ ও মনিবসঙ্ঘের প্রভাব ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে সেগুলির ইতিহাস, বিশ্লেষণ ও সমালোচনা।) ডব্লিউ এইচ্ হুট্। পি এস কিং অ্যাণ্ড সন, লণ্ডন। ১৯৩০। ৭+১১২ পৃঃ।
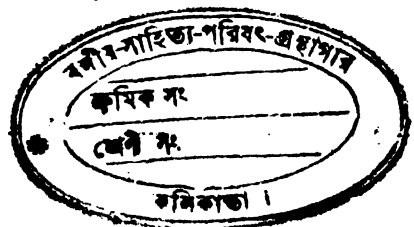
দেশ-বিদেশের মাপে ভারতীয় গম

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম-এ, বি-এল্

গমের চাষ (১৯২৯-৩০)

১৯২৯-৩০ সনের গমের ফসলের সম্পূর্ণ খবর পাওয়া গিয়াছে। ভারতে যত একর জুড়িয়া গমের চাষ হয় তা: ৯৮%এর উপর অংশের খবর আসিয়াছে। সুতরাং আঁকজোঁক প্রায় নির্ভুল হইবার সম্ভাবনা।

(ক) আয়তন

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	হ্রাস (–) ; বৃদ্ধি (+)
	হাজার একর	হাজার একর	হাজার একর
পাঞ্জাব*	১১,২৯৯	১১,৩২১	+২২
যুক্তপ্রদেশ*	৭,২১৮	৭,২৯৮	+৮০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার*	৩,৩১০	৩,০৯৪	–২১৬
বোম্বাই*	২,৫০৩	২,৪৬৯	–৩৪
বিহার ও উড়িষ্যা	১,২১২	১,২০০	–১২
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১,০৫৬	১,০৫৭	+১
বাঙ্গালা	১২৩	১২৬	+৩
দিল্লী	৫১	[illegible]	–১৮
আজমীঢ় মারবাড়	৩১	২৯	–২
মধ্য ভারত	১,৮৬১	১,৭৭৩	–৮৮
গোয়ালিয়র	১,০২১	৯৪৩	–৭৮
রাজপুতানা	১,০৯৫	৯০১	–১৯৪
হায়দ্রাবাদ	১,১০২	১,০২৬	–৭৬
বড়োদা	৮৮	৭৩	–১৫
মহীশূর	৩	৪	+১
	৩১,৯৭৩	৩১,৩৪৭	–৬২৬

* দেশীয় রাজ্যসমেত মোট।

(খ) উৎপাদনের হিসাব

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	১৯২৮-২৯ হাজার টন	১৯২৯-৩০ হাজার টন	হ্রাস (—); বৃদ্ধি (+) হাজার টন	একর প্রতি উৎপাদন ১৯২৮-২৯ পাঃ	১৯২৯-৩০ পাঃ
পাঞ্জাব*	৩,৪২৩	৪,২০৮	+৭৮৫	৬৭৯	৮৩৩
যুক্তপ্রদেশ*	২,৫০০	৩,৩৪২	+৮৪২	৭৭৬	১,০২৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার*	৫৪১	৬১৭	+৭৬	৩৬৬	৪৪৭
বোম্বাই*	৪৯৯	৫৪৬	+৪৭	৪৪৭	৪৯৫
বিহার ও উড়িষ্যা	৫১৩	৫১৫	+ ২	৯৪৮	৯৬১
উত্তর-পশ্চিম সীঃ প্রদেশ	২৩১	২৪৮	+১৭	৪৯০	৫২৬
বাঙ্গালা	৩২	৩৩	+ ১	৫৮৩	৫৮৭
দিল্লী	৮	১০	+ ২	৩৫১	৬৭৯
আজমীঢ়-মারবাড়	৮	১১	+ ৩	৫৭৮	৮৫০
মধ্য ভারত	২৯৪	২৭৭	—১৭	৩৫৪	৩৫০
গোয়ালিয়র	১৯৩	১৭৮	—১৫	৪২৩	৪২৩
রাজপুতানা	১৯৩	২৪০	+৪৭	৩৯৫	৫৯৭
হায়দ্রাবাদ	১৪৪	১০৭	—৩৭	২৯৩	২৩৪
বড়োদা	১১	২০	+ ৯	২৮০	৬১৪
মহীশূর	১	১	...	৩৮৪	৪১৩
মোট	৮,৫৯১	১০,৩৫৩	+১,৭৬২	৬০২	৭৪০

উপরে গমের আয়তন ও ফসলের হিসাব সম্বন্ধে দুইটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই দুইটি তালিকাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

কিঞ্চিৎ আলোচনা

১৯২৮-২৯ সনের তুলনায় ১৯২৯-৩০ সনে একরের পরিমাণ কমিয়াছে ২%, কিন্তু মোট ফসল প্রায় ৮৬ লাখ টন (=৪ কোটি কোয়ার্টার; ১ কোয়ার্টার=৪৮০ পা.) হইতে ১ কোটি টনের (=৪·৮ কোটি কোয়ার্টারের) উপর উঠিয়াছে অর্থাৎ ২০% বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের জমিতে যে গভীর (ইন্‌টেন্‌সিব্‌) চাষের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে, এ বৎসরের গম ফসল তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

একর প্রতি ফসল আদায়ের পরিমাণ ধরিয়া বিচার করিলে ১৯৩০ সনে দেশগুলিকে এই ভাবে সাজাইতে হয়,—(১) যুক্তপ্রদেশ (১০২৬ পা), (২) বিহার উড়িষ্যা (৯৬১), (৩) আজমীঢ় মারবাড় (৮৫০), (৪) পাঞ্জাব (৮৩৩), ইত্যাদি। কিন্তু ১৯২৮-২৯ সনের তুলনায় ১৯২৯-৩০ সনে একর প্রতি উৎপাদন সব চেয়ে বাড়িয়াছে (১) বড়োদায়, (২) রাজপুতানায়, (৩) আজমীঢ়-মারবাড়ে, (৪) যুক্তপ্রদেশে, (৫) পাঞ্জাবে, ইত্যাদি। সোজা কথায় ইহার অর্থ এই যে, সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতি

* দেশীয় রাজ্যসুদ্ধ।

বৎসর এক একর হইতে যে পরিমাণ গমের ফসল পাওয়া যায় তাহাই শেষ কথা নহে। ভারতীয় ফসলের মাত্রা আরও বাড়ানো অসম্ভব নহে। ১৯২৯-৩০ সনে ভারতে একর প্রতি ৭৪০ পা গমের ফসল পাওয়া গিয়াছে। ১৯২১-২২ সনে পাওয়া গিয়াছিল ৭৮১ পা, তা ছাড়া আর কখনো এ বৎসরের মত এত ফসল পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ঐ যে এক বৎসর ৭৮১ পা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, তাতে জোর্‌সে বলা চলে ভারতীয় গম ফসলের সম্ভাবনা অফুরন্ত।

গম সব চেয়ে বেশী জন্মায় পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে। এই দুই দেশকে গমের দেশ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, উভয়ে একত্রে গোটা ভারতের তিন-চতুর্থাংশের বেশী ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে। উত্তর ভারতে ইহাদের সহিত মধ্যপ্রদেশ, বিহার উড়িষ্যা জুড়িয়া দিলে ও বোম্বাইকে টানিয়া আনিলে গম উৎপাদনকারী দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশগুলিকে পাওয়া যায়। ইহারা একত্রে যুক্তপ্রদেশের প্রায় আধাআধি ফসল উৎপাদন করে। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে উ-প-সীমান্ত প্রদেশ, মধ্য ভারত, গোয়ালিয়র, রাজপুতানা, হায়দ্রাবাদ—ইহারা একত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশগুলি যত গম উৎপাদন করে তার ৬০%। ৬৫% মাত্র উৎপাদন করে। বাকী দেশগুলির মধ্যে আজমীড়-মারবাড় ও বাঙ্গালায় একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও মোট আদায় অকিঞ্চিৎকর।

৩·২ কোটি একরে সওয়া দশ কোটি টন গমের ফসল

১৯২০-২১ সনে ভারতে গম চাষ হইয়াছিল ২.৬ কোটি একরে। আজ (১৯২৯-৩০) এই আয়তন দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৩.১ কোটি একর। দুই বৎসর ক্রমাগত বাড়িয়া ১৯২২-২৩ সনেই আয়তন ৩ কোটি একরে দাঁড়াইয়াছিল। তারপর কখনো কিঞ্চিৎ হ্রাস কখনো কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৪-২৫ সনে প্রায় ৩.২ কোটি একর এবং ১৯২৭-২৮ সনে ৩.২ কোটি একরের উপর হইয়াছিল।

ফসলের পরিমাণও সওয়া ৬ কোটি (১৯২০-২১) হইতে সওয়া ১০ কোটি (১৯২৯-৩০) টনের উপর উঠিয়াছে। কিন্তু একর বৃদ্ধির সহিত ফসলের পরিমাণ-বৃদ্ধির বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায় না। যথা,

(কোটি টনে হিসাব)

	১৯২০-২১	১৯২২-২৩	১৯২৪-২৫	১৯২৭-২৮	১৯২৯-৩০
গম ফসল	৬¼	১০½	৯	৭¾	১০¼

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, একরের দিক্ হইতে ১৯২৭-২৮ সন সর্ব্বোপরি হইলেও ফসলের দিক্ হইতে উহা অনেক নীচে। অর্থাৎ ভারতীয় ফসলের পরিমাণ শুধু কর্ষিত একরের উপর নির্ভর করে না। বেশী জমি চষিলে বেশী ফসল নাও পাওয়া যাইতে পারে। আবার কম জমি চষিয়াও খুব বেশী ফসল পাওয়া যাইতে পারে। কৃষিতত্ত্ববিদ্, রাসায়নিক ও ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া দিতে পারেন, কি কি কারণে ভাল ফসল হইল বা হইল না। বৃষ্টি, শীতাতপ, পোকাও সার ফসলের ভালমন্দ ও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু তাহাই সব নয়। বিভিন্ন বিদ্যার বেপারীকে নানা দিকে অনেক মাথা ঘামাইয়া সুবৎসর, দুর্ব্বৎসরের ঠিকুজি লিখিয়া দিতে হইবে। কৃষি-শাস্ত্রে আমাদের হাতে খড়ি পর্য্যন্ত হয় নাই। সুতরাং কৃষি অর্থনীতিতে পোক্ত হইবার কল্পনা করা সম্প্রতি দুরাশা মাত্র। বাঙ্গালীর ছেলেকে অবিলম্বে অবহিত হইতে হইবে।

গম আমদানি রপ্তানির বিবরণ

গোটা ভারতের লোকের পক্ষে গম প্রধান খাদ্যশস্য নয়। যদি হইত তবে জনপ্রতি গড়ে দুই বেলা আধ সের গম ধরিলে ৩২ কোটি লোকের জন্য মোটামুটি ৫ কোটি টন গমের ফসল উৎপাদন করা প্রয়োজন হইত। কিন্তু সাধারণতঃ বৎসরে ১ কোটি টনেরও কম গম ভারতের মাটিতে জন্মে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ভারতের প্রয়োজন ঐ এক কোটি হইতেই মিটে। ভারত হইতে গম রপ্তানি হয় বটে, ভারত বিদেশ হইতে গম আমদানিও করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু সাধারণতঃ বিদেশে ৩।৪ লাখ টনের বেশী গম যায় না, আর বিদেশ হইতে ৫।৭ লাখ টনের বেশী আসে না। অতএব, হরেদরে দাঁড়ায় এই যে, ১ কোটি টন গমই ভারতের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা

করিতে হইবে। বাকী ৪ কোটি টন গমের অভাব অন্য ফসলের দ্বারা মিটে। বাঙ্গালীরা ৫।৬ কোটি লোকে মিলিয়া সাধারণতঃ ভাতই খাইয়া থাকে। তাতে প্রায় ১ কোটি টন গম বাঁচিয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে মান্দ্রাজী ও অন্যান্য দ্রাবিড় জাতিদের মধ্যে ভাতের রেওয়াজ বেশী, তাতেও প্রায় ২ কোটি টন গমের খাদন নিবারিত হয়। যুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি উত্তর-ভারতীয় দেশে ভাতের একেবারে প্রচলন নাই বলা চলে না, অনেকে ভাত খায় —অবশ্য অল্পমাত্রায় এবং একবেলা। কিন্তু উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ যুক্তপ্রদেশে, গমের চেয়েও বাজ্‌রা ফসল বেশী উপ্ত হয় এবং উহাকে প্রধান খাদ্যশস্য বলিয়া বিবেচনা করিলে দোষ হইবে না। এইরূপে ১ কোটি সওয়া কোটি টন গমের সাশ্রয় হইবে, তাতে আর বিচিত্র কি?

মাস ধরিয়া গত ৫ বৎসরে ভারত হইতে সমুদ্রপথে নিম্নলিখিত পরিমাণে গম রপ্তানি হইয়াছে :

মাস	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
	টন	টন	টন	টন	টন
এপ্রিল	৭০০	৪০০	৫,৯০০	৩০০	২০০
মে	৩,৮০০	১,৭০০	১০,২০০	২০০	৭০০
জুন	৩৯,৪০০	৭৬,৫০০	৬৩,১০০	৩০০	৪৮,০০০
জুলাই	৫৫,৭০০	১৩০,৯০০	২৫,১০০	১,১০০	...
আগষ্ট	২৫,৮০০	৩৭,৯০০	৫,৭০০	৬,৯০০	...
সেপ্টেম্বর	৪,২০০	১৫,২০০	৮০০	২,২০০	...
অক্টোবর	১৪,০০০	১৭,৩০০	৯০০	২০০	...
নবেম্বর	১৬,৮২০	১৪,৮০০	৪০০	২০০	...
ডিসেম্বর	৬,৩০০	২,০০০	৩০০	৫০০	...
জানুয়ারী	৭,১০০	১,০০০	১,৫০০	৫০০	...
ফেব্রুয়ারী	১,৪০০	১,০০০	৪০০	৪০০	...
মার্চ্চ	৭০০	১,০০০	৪০০	২০০	...
মোট	১৭৫,৯০০	২৯৯,৭০০	১১৪,৭০০	১৩,০০০	

সাধারণতঃ জুন জুলাই মাসেই বিদেশে বেশী গম বিক্রয় হয়, যদিও ১৯২৯-৩০ সনে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল। মোটামুটি বলা চলে, জুন, জুলাই, আগষ্টে এক বড় কিস্তি মাল বিদেশে যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট এক কিস্তি দ্বিতীয় বার সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নবেম্বরে যায়। সুতরাং বিদেশে গম-বিক্রয়ের সীজ্‌ন বা ঋতু বলিতে জুন-অক্টোবর, এই ৫ মাসকে বুঝিতে হইবে।

যে যে দেশে ভারতীয় গমের ফসল গিয়াছে তাদের ঠিকানা :

(হাজার টনে)

দেশের নাম	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১ জুন অবধি
যুক্তরাজ্য	১৪১	২৫১	৭৬	৭	৯
বাকী ইয়োরোপ	২৩	৪২	১৮	২	...

দেশের নাম	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১ জুন অবধি
ঈজিপ্ট	৪	...	৯	...	৪০
এশিয়াস্থ তুরস্ক,* আরব ও পারস্য	৩	৩	৯	২	...
অন্যান্য দেশ	৫	৪	৩	২	...
মোট	১৭৬	৩০০	১১৫	১৩	৪৯

ইংরেজ আমাদের রপ্তানি গম ফসলের বড় খরিদ্দার। মিশর সম্প্রতি সকলের উপর টেক্কা মারিয়াছে। কিন্তু কত দিন এ অবস্থা বজায় থাকিবে বলা যায় না।

গম আমদানির হিসাব এই :

(হাজার টন)

যে দেশ হইতে আসিয়াছে	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১ (জুন অবধি)
অষ্ট্রেলিয়া	৪০	৬৯	৫২৯	৩৩৬	১৯
কানাডা	...	...	১৫	৭	
আর্জ্জেন্টিনা রিপাবলিক	...	...	১০	৬	
মোট (অন্য সব দেশসুদ্ধ)	৪০	৬৯	৫৬২	৩৫৭	২৩

আমদানির দিকে আমরা অষ্ট্রেলিয়ার গম সব চেয়ে বেশী আমদানি করিয়া থাকি। বিগত দুই বৎসরে এই আমদানি বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দেশ-বিদেশের মাপে ভারত

	১৯২৯		১৯৩০	
দেশের নাম	একর (হাজার)	টন (হাজার)	একর (হাজার)	টন (হাজার)
যুক্তরাষ্ট্র	৬১,১০৩	৮০৫,৭৯০ বুশেল (=২১,৫৯৪)	৫৯,০২৪	৮৩৭,৭৬১ বুশেল (=২২,৪৪০)
কানাডা	২৪,৮৯৫	১০,৩০৬	২৪,৮৯৫	১০,৩০৬
অষ্ট্রেলিয়া	১৪,১৭১	৪,২৭২ (১৯২৮-২৯)	১৪,৫০০	৩,৩৪৭ (১৯২৯-৩০)
আর্জেণ্টিনা	২০,০৮০	৮,২৩৩ (,,)	১৬,১৯১	৩,৬৮১ (,,)
ফ্রান্স	১২,৭৫০		১২,৯৯০	
ইতালি	১২,১৭২		১১,৯০০	
স্পেন	১০,৪৭৮		১০,৫৩১	
রুমানিয়া	৬,৭৬৪		৭,১২২	

* ইরাক্, স্মার্ণা, সীরিয়া ধরিয়া।

আলজিরিয়া	৩,৭৯৫	৩,৬২০
পোল্যাণ্ড	৩,৪৪০	৩,৫৩০
বুলগেরিয়া	২,৬১৭	২,৮৯৯
ফরাসী মরক্কো	২,৮৪৩	২,৭৫৭
চেকো শ্লোভাকিয়া	২,০২৩	২,১১১
টিউনিস্	১,৭৩০	১,৭৩০

একর হিসাবে ইয়োরোপে ফ্রান্সের স্থান সর্ব্বোচ্চ, ঠিক তার নীচেই ইতালি। কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে কিবা আয়তনে, কিবা ফসলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র শুধু শীর্ষস্থানে অবস্থিত নয়, অন্য সকল দেশ হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। সৌভাগ্যের বা দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়, যুক্তরাষ্ট্রের অর্দ্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী আয়তন-বিশিষ্ট। কানাডা তৃতীয় বটে, কিন্তু কানাডার জমির আয়তন যুক্তরাষ্ট্রের ২/৫ অংশ মাত্র। আর্জেণ্টিনা কানাডার ১/৩ অংশ ও অষ্ট্রেলিয়া কানাডার অর্দ্ধেকের বেশী ও ফ্রান্স ইতালি কানাডার প্রায় আধাআধি আয়তনে গম উৎপাদন করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষ ফসলী জমির আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রের অর্দ্ধেকের বেশী হইলেও ফসলের উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের অর্দ্ধেকের চেয়ে কম দাঁড়ায়। যথা,

	একর	টন
যুক্তরাষ্ট্র	৫.৯ কোটি (প্রায়)	২.২ কোটি
ভারতবর্ষ	৩.১ „ ৫২.৫%	১ কোটি ৪৫.৫%

দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের গম ফসলের জমি যুক্তরাষ্ট্রের ৫২.৫% হইলেও ফসলের পরিমাণ মাত্র ৪৫.৫%। ইহা হইতে ফস্ করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ, দেখা যাইবে যে, এক জায়গায় ভারতের সহিত যুক্তরাষ্ট্রেরও মিল আছে। ভারতবর্ষের মত যুক্তরাষ্ট্রেও ১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে জমির পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়া থাকিলেও ফসলের পরিমাণ বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ ১৯৩০ সন না ধরিয়া ১৯২৯ সনের সহিত ভারতের তুলনা করিলে ভারতীয় গম ফসলের উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হার মানিবে না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রণিধান করিতে হইবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ১১।১২ কোটি লোকের জন্য প্রায় ৬ কোটি একরে ২.২ কোটি টন গমের দরকার হয়, আর ভারতবর্ষে ৩৩ কোটি লোকের জন্য ৩ কোটি একরে ১ কোটি টন গম লাগে (আপাততঃ দুই দেশের গমের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিতেছি না)। সুতরাং মোটামুটি বলা চলে—যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি লোক ৪ টন গম বৎসরে পায়, আর ভারতবর্ষে প্রতি লোক বৎসরে মাত্র ১/৩৩ টন গম পায়।

অর্থাৎ আমেরিকার প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরে প্রতি ভারতবাসীর ৬ গুণেরও বেশী গম ভক্ষণ করিয়া থাকে।

এই হিসাবটা অন্য প্রকারেও পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতি ভারতবাসীর যদি গমই প্রধান খাদ্য-শস্য হইত তবে ৫ কোটি টন গম লাগিত, আর আমরা পাইতেছি ১ কোটি টন বা তার চেয়েও কম। অর্থাৎ ১/৫ অংশ গম মাত্র আমাদের কপালে জুটিতেছে।

কথা হইতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্র হইতে গম ত বিদেশেও রপ্তানি যায়। যায় বটে, কিন্তু পরিমাণে এমন বেশী কিছু নয়। তজ্জন্য কিছু বাদ দিয়া যদি ধরা যায় যে, প্রতি যুক্তরাষ্ট্রবাসী বৎসরে ১/৫ টন গম পায়, তবু সে প্রতি ভারতবাসীর ৫ গুণ গম খায়, এ সিদ্ধান্ত অসমীচীন হইবে না।

গম খাদ্য ফসল বলিয়া ও বেশী খায় বলিয়া একজন আমেরিকানের সঙ্গে একজন ভারতবাসীর এত পার্থক্য কি না তাহা স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ বলিতে পারেন। কিন্তু যদি ভারতীয় জনগণের শক্তি ও কার্য্যক্ষমতা বাড়াইবার উপায় এই বেশী পরিমাণে গম-ভক্ষণ হয়, তবে অচিরে দেশমধ্যে এই আন্দোলন উপস্থিত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন দেশে যে গম জন্মিতেছে তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা ও কিরূপে

এই গমের ফসল উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তার হদিস্ বাৎলাইয়া দেওয়া। এজন্ত বহু দেশসেবক রাসায়নিক কর্ম্মীর প্রয়োজন আছে। তৃতীয় প্রয়োজন দেশে গমের ক্ষেত্র ও গমের উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানো। কিন্তু এর সমস্তটাই নির্ভর করিতেছে স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ গমের সম্বন্ধে কি রায় দেন তার উপরে। আমেরিকায় ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গম ও অন্যান্য খাদ্য শস্য লইয়া কত না গবেষণা হইতেছে, আর আমাদের মত ব্যাধি-ক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে তা আরম্ভই হয় নাই। এ দিকে পথ দেখাইবার জন্য কেহ অগ্রসর হইবেন না কি ?

ভারতীয় রাজস্বের ভবিষ্যৎ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, এম, এ

প্রত্যেক প্রদেশে প্রাপ্ত করের সমস্তটা সেই প্রদেশকে দিয়া কেবল চাঁদায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা করিলে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতি কিরূপ অসম ব্যবহার করা হয়, তাহা শ্রীযুক্ত লেটন নিম্নলিখিত তালিকাদ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন :—

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংগৃহীত প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় রাজস্বের পরিমাণ (১৯২৮-২৯)

(লক্ষ টাকায় হিসাব)

রাজস্বের দফা	মাদ্রাজ	বোম্বাই	বাংলা	যুক্তপ্রদেশ	পাঞ্জাব	বিহার ও উড়িষ্যা	মধ্যপ্রদেশ	আসাম	মোট*
(ক) প্রাদেশিক—									
ভূমিরাজস্ব	৫২৫	৪৮৫	৩২৭	৬০৪	২৭৮	১৭৪	২১৯	১১৭	২,৭২৯
আবকারী	৫৫৯	৩৯২	২২৫	১৩১	১২১	১৮৯	১২৩	৬৬	১,৮০৬
ষ্ট্যাম্প	২৫১	১৬৮	৩৫৫	১৭৩	১২১	১১০	৭০	২২	১,২৭০
বর্দ্ধিত আয়করের একটি অংশ	৫	...	...	...	৪	৫	২	৭	২৩
সেচ বিভাগ	১৮৩	৬৬	—১	৮৫	৩৭৪	২১	...	...	৭২৮
বন বিভাগ	৬২	৭৩	৩১	৬২	৩৫	১১	৫৪	৩৮	৩৬৬
বিবিধ	১৬৮	৩৩৮	১৬০	৯০	১৮২	৬৮	৬৮	২৪	১,০৯৮
মোট	১,৭৫৩	১,৫২২	১,০৯৭	১,১৪৫	১,১১৫	৫৭৮	৫৩৬	২৭৪	৮,০২০

* শ্রীযুক্ত লেটনের তালিকায় ব্রহ্মদেশ ও সান ষ্টেটের অঙ্ক বাদ দেওয়া হইয়াছে; মোট সংখ্যায় সেজন্য কিছু পার্থক্য দেখা যাইবে।

(খ) কেন্দ্রীয়—									
বাণিজ্য-শুল্ক	৪৬৯	১,৯২১	১,৮৫০	...	৯	...	...	২৩	৪,২৭২
আয়কর	১৩১	৩১৭	৬১৫	৯০	৬১	৯১	৩৩	১৫	১,৩৫৩
লবণ কর	১৪৮	১৫৮	১৭৬	...	...	...	...	...	৪৮২
আফিং	...	...	...	৩২৭	...	...	...	...	৩২৭
বিবিধ	১৯	৮৮	৩৬	৫	৩১	৩	৩	১	১৮৬
মোট	৭৬৭	২,৪৮৪	২,৬৭৭	৪২২	১০১	৯৪	৩৬	৩৯	৬,৬২০

এই তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, কতকগুলি প্রদেশে, যেমন বিহার ও উড়িষ্যায়, বাণিজ্যশুল্ক একেবারেই আদায় হয় না, আয়-করও খুব কমই পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত লেটন উদাহরণস্বরূপ বাংলা দেশের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন এবং লোকসংখ্যা এবং রাজস্বের দিক্ হইতে বাংলার সহিত বিহারের তুলনা করিয়া প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অসমতা দেখাইয়াছেন। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ, বিহারের ৩ কোটি ৪০ লক্ষ; অথচ বাংলায় সংগৃহীত প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় যাবতীয় রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ৩৮ কোটি টাকা, কিন্তু বিহারে উভয় প্রকার রাজস্বের মোট পরিমাণ ৭ কোটিরও কম। সুতরাং নিজ নিজ সীমানার মধ্যে যে রাজস্ব আদায় হইবে, প্রত্যেক প্রদেশকে যদি শুধু তাহারই উপর অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমষ্টিগত ভারতের কোনো উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

চাঁদা দেওয়ার ব্যবস্থার সমর্থক মতবাদিগণ ভারতীয় রাষ্ট্র-পদ্ধতিতে প্রদেশগুলিকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা করিতে চান; আবার বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা বিভিন্ন প্রদেশের স্বাধীন সত্তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। শেষোক্ত দলের মতে ভারতে গৃহীত রাজস্বের সমস্তটাই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য; তবে তাহা হইতেই একটা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশকে তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে,—এই পর্য্যন্ত। শ্রীযুক্ত লেটন এই প্রস্তাবে রাজী হন নাই, কারণ ইহা নিশ্চিত যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে টাকা দিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না;—প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট কিরূপভাবে এই টাকা খরচ করেন, তাহারও তত্ত্বাবধান করিতে চাহিবেন। ইহার ফলে যে শাসন-ব্যবস্থার সৌকর্য্য সাধিত হইবে না, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে এতদিন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টই প্রায় সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট যে এতদিন কেবল রাষ্ট্রশাসনের মুখ্য ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন এবং গৌণ ব্যাপারে খুব কম হাত দিয়াছেন, সে কথাও শ্রীযুক্ত লেটন উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। রাষ্ট্রের গৌণ কর্ত্তব্যসমূহ—যাহা জাতিগঠনের সহায়ক, ভারতবর্ষের মত বিশাল রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট দ্বারা তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। আমেরিকা, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের প্রদেশে প্রদেশে ভারত-বর্ষের মত ভাষাগত, ভাবগত, ইতিহাসগত পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের গৌণ কার্য্যগুলি প্রদেশগুলির হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই একদিকে যেমন রাষ্ট্রশাসন এবং রাজস্ব-ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশের সম্পূর্ণ অধিকার মানিয়া লওয়া যায় না, অন্যদিকে তেমনি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকেও এই কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে।

প্রত্যেক প্রদেশকে তাহার প্রয়োজনীয় টাকায় সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া উচিত কিনা, অতঃপর শ্রীযুক্ত লেটন তাহা আলোচনা করিয়াছেন। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, পূর্ব্ববর্ণিত দ্বিতীয় প্রস্তাবের সহিত এই প্রস্তাবের পার্থক্য আছে। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে প্রয়োজনীয় টাকা ভাগ করিয়া দেওয়ার ভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের হাতে থাকে; কিন্তু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট এই টাকা ভাগ করিবার সময় যে নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা রাখিবেন না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার কোনও উপায়

নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে ব্যবস্থা অন্যরকম। প্রত্যেক প্রদেশের কত টাকা প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম আছে; সেই নিয়মানুযায়ী টাকা ভাগ করিবার আইনানুমোদিত ব্যবস্থা করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের একটা প্রধান উদ্দেশ্য; এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা কিংবা খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে না।

কোন কোন প্রদেশ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহাদের উপর কিছু অবিচার করা হয়, তাহা স্বীকার করিয়াও শ্রীযুক্ত লেটন এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন; ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য, এবং এই উপায়ে ছাড়া অন্য কোন প্রকারে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহা বিশেষ আলোচনা করিয়াই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কোন্ প্রদেশের কত টাকা দরকার, তাহা বলা খুবই শক্ত। এ বিষয়ে অনেক কথা ভাবিবার আছে। তবে মোটামুটিভাবে লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনের পরিমাণ যাচাই করিলে খুব অন্যায় হয় না। অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রদেশের প্রতি অবিচারের যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতিরোধের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট-দ্বারা সংগৃহীত কয়েকটি নূতন কর বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

নূতন কর হইতে সংগৃহীত সমস্ত টাকা লোক-সংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন প্রদেশকে ভাগ করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে আরও ক'একটা আপত্তির কথা শ্রীযুক্ত লেটন উল্লেখ করিয়াছেন। অল্পলোকবিশিষ্ট অথচ অপেক্ষাকৃত উন্নতিশীল প্রদেশের অধিবাসীরা যদি মনে করে যে, প্রদত্ত নূতন করের খুব কম অংশ তাহারা পাইবে, তাহা হইলে তাহারা দুই প্রকারে তাহাতে বাধা দিবে; প্রথমতঃ তাহারা এই করগুলি বসাইবার সময় খুব আপত্তি করিবে এবং আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া অশান্তি বাড়াইবে; দ্বিতীয়তঃ কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতিসাধন করিবার আগ্রহ সেই প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে; কারণ তাঁহারা বুঝিবেন যে, তাঁহাদের নূতন আয় হইতে যে করের আদায় হইবে তাহার খুব কম পরিমাণ টাকাই তাঁহারা তাঁহাদের প্রাদেশিক উন্নতির কাজে ব্যয় করিতে পাইবেন। ইহার ফলে এক দিকে যেমন নূতন কর হইতে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা আদায় না হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকিবে, অন্যদিকে তেমন দেশের শিল্পবাণিজ্যেরও খুব বেশী ক্ষতি হইবে।

নীতির দিক্ হইতে এই ব্যবস্থা সমর্থন করা যায় না। প্রত্যেক প্রদেশের নিজ নিজ সীমানার ভিতর যে পরিমাণ আর্থিক উন্নতি হয়, তজ্জনিত লাভ হইতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা যে খুবই অন্যায় এবং অবিচারমূলক, শ্রীযুক্ত লেটন তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন।

আরও একটা দিক হইতে শ্রীযুক্ত লেটন বিষয়টীর আলোচনা করিয়াছেন। বহু লোকবিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত কম উন্নতিশীল প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট নূতন কর হইতে প্রাপ্ত টাকা সাবধানে ব্যয় করিতে যত্নবান হইবেন না। তাহার কারণ এই যে, এই টাকার অধিকাংশই অন্য প্রদেশ হইতে আদায় হইবে; সেই সব প্রদেশের উপর তাঁহাদের খুব বেশী দরদ না থাকিবারই কথা। ফলে অমিতব্যয়িতা প্রশ্রয় পাইবে।

এই সব কারণে শ্রীযুক্ত লেটন ভারতের যাবতীয় রাজস্বকে নিম্নলিখিত চারিটি ভাগে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন:

(ক) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব আয়; এই রাজস্ব আদায় এবং ব্যয় করা সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে;

(খ) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব আয়; এই রাজস্ব আদায় এবং ব্যয় করা সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে;

(গ) প্রত্যেক প্রদেশ দ্বারা সেই প্রদেশে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব ব্যয়; এবং

(ঘ) ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের লোক-সংখ্যানুযায়ী বিতরণ।

(৬)

আয়কর বাড়ানো সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লেটনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে উপরোক্ত

প্রথম দফা হইতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের ১৬½ কোটি বাড়্তি আয় হইবে; আফিং হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব কমিয়া গেলে এই বাড়্তি ১৪½ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।

অপর দিকে দশ বৎসর পরে দেশ-রক্ষার ব্যয় বর্ত্তমানের তুলনায় ৭ কোটি টাকা কমিয়া যাইবে; ইহা ছাড়া অন্য কতকগুলি বিষয়েও কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যয় যে বর্ত্তমানের চেয়ে কিছু বাড়িবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; এই সব বিবেচনা করিয়া এবং অবস্থাবিশেষে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অতিরিক্ত কিছু টাকার দরকার হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া শ্রীযুক্ত লেটন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের এই বর্দ্ধিত আয় হইতে মাত্র প্রায় ১২ কোটি টাকা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন।

আয়কর হইতে প্রাপ্ত টাকায় কর-প্রদানকারী প্রদেশের সম্পূর্ণ অধিকার নাই, এ কথা বলিলেও আয়করের অন্ততঃ কিছু অংশে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির অধিকার আছে, তাহা তিনি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বাংলা ও বোম্বাই প্রভৃতি শিল্পবাণিজ্যে উন্নত প্রদেশগুলি বর্ত্তমানে তাহাদের আয়করের কোনও অংশ ফিরিয়া পায় না; এই জন্য তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত লেটন ইহাদের দাবী কতকটা মিটাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে প্রদেশবাসীদের ব্যক্তিগত যাবতীয় আয়ের উপর যে কর আদায় করা হয়, তাহার অর্দ্ধেক সেই প্রদেশকে দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আয়কর বাবদ প্রায় ১৫ কোটি টাকা আদায় হয়। তন্মধ্যে ব্যক্তিগত আয়ের উপর করের পরিমাণ ৯ কোটি; তাহার অর্দ্ধেক ৪½ কোটি। ১০ বৎসর পরে ইহা ৬ কোটিতে দাঁড়াইবে, আশা করা যায়। এই ৬ কোটি টাকা উপরোক্ত তৃতীয় দফায় পড়িবে।

শ্রীযুক্ত লেটন প্রসঙ্গক্রমে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলির আয় বাড়াইবার আর একটি উপায় এ স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন; প্রত্যেক প্রদেশে সংগৃহীত যাবতীয় আয়কর ছাড়া আরও একটি কর বসাইবার প্রস্তাব কোনো কোনো প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লেটন এই প্রস্তাবে আপত্তি করার বিশেষ কারণ দেখেন না; তবে তাঁহার মতে এই অতিরিক্ত করের মোট পরিমাণ বিভিন্ন প্রদেশে প্রাপ্ত আয়করের অর্দ্ধেকের বেশী যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। যদিও এই কর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক আদায় হইবে, তবু ইহার পরিমাণ নির্ভর করিবে প্রাদেশিক ব্যবস্থার উপর; কাজেই ইহা উপরোক্ত দ্বিতীয় দফায় পড়িবে।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের বাড়্তি ১২ কোটি টাকা আয়ের বাকী ৬ কোটি শ্রীযুক্ত লেটন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলিকে লবণ কর বাবদ দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্ত্তমানে লবণ করের সব টাকাই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট পান; কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় এই টাকা যদি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না বলিয়া শ্রীযুক্ত লেটন মনে করেন।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের নিজস্ব আয়ের আরও একটু অদল-বদল করিবার প্রস্তাব শ্রীযুক্ত লেটন করিয়াছেন। আবগারী বর্ত্তমানে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের অধীন ব্যাপার হইলেও বিদেশী মদের উপর তাঁহাদের কোনও অধিকার নাই; এই জন্য অনেক সময় কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের মধ্যে এই বিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কোনো প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট যদি মদ্যপান নিবারণনীতি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে হয় ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য-শুল্কনীতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে, এই বিবেচনা করিয়া শ্রীযুক্ত লেটন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিদেশী মদের উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট শতকরা ৩০৲ টাকার বেশী শুল্ক বসাইতে পারিবেন না; এবং ইহার উপর প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে তাহাদের নিজেদের ইচ্ছা এবং প্রয়োজন মত অধিকতর শুল্ক বসাইবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবে। ইহাতে যেমন প্রত্যেক প্রদেশকে আবগারী নীতিতে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইবে, তেমনি তাহাদের আয় বাড়াইবারও একটা সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে।

এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের যে ক্ষতি হইবে, শ্রীযুক্ত লেটন তাহা অন্য এক উপায়ে পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ষ্ট্যাম্প বাবদ যে টাকা

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট পান তাহা দুই প্রকার; আইন আদালতে বিচার সম্পর্কীয় এবং ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কীয়। ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় প্রায় সব দেশেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকে। আমাদের দেশেও মোটামুটিভাবে এই কথা খাটে। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও এই বিষয়ে যে ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয় তাহা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়; কিন্তু তাহার আয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ভোগ করেন। ইহাতে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। হিল্টন ইয়ং কমিশনের প্রস্তাবমত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যখন 'চেক'এর উপর ষ্ট্যাম্প উঠাইয়া দিলেন, তখন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কোনো ক্ষতি হইল না,—কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির আয় অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য শ্রীযুক্ত লেটন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হউক, কারণ তাহা হইলে কেবল যে শাসনসৌকর্য্যই হইবে তাহা নহে, বিদেশী মদের উপর কর কমাইয়া দেওয়াতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি হইবে, ব্যবসা-ষ্ট্যাম্প হইতে প্রাপ্ত টাকার দ্বারা তাহার পূরণ হইয়া যাইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত লেটন নূতন কর বণ্টন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। চাষের আয়ের উপর যে কর আদায় হইবে তাহার সমস্তটাই করদাতা প্রদেশকে দেওয়া তাঁহার মতে যুক্তিসঙ্গত। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে এই টাকা যে তাহাদিগকে দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। করের হার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইলেও ভূমিরাজস্ব-নীতির সহিত চাষের উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এবং এই আয়কর হইতে প্রাপ্ত সমস্ত টাকাই প্রাদেশিক নীতির উপর নির্ভর করিবে,—এই টাকা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে দেওয়ার পক্ষে ইহাও একটা যুক্তি। কিন্তু শ্রীযুক্ত লেটন পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, এই কর আদায়ের সুব্যবস্থার জন্য আদায়ের ভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকা উচিত। কাজেই ইহা উপরোক্ত তৃতীয় দফার অন্তর্গত হইবে।

আন্তর্প্রাদেশিক করগুলি সম্বন্ধে কিন্তু অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে; আদায়ের ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে লইতে হইবে—এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাকে এই বিষয়ে যথোপযুক্ত আইন করিবার অধিকার দিতে হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত লেটন চতুর্থ দফা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দিয়াশলাই, সিগারেট প্রভৃতির উপর নূতন কর বসানো হইবে; সেই টাকা এবং উপরোক্ত বিদেশী মদ এবং লবণ করের টাকা দিয়া তিনি একটি প্রাদেশিক 'ফণ্ড' প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। দশ বৎসর পরে এই 'ফণ্ড'এর বার্ষিক আয় প্রায় ১৪ কোটি টাকা হইবে। শ্রীযুক্ত লেটন মনে করেন, এই টাকাটা প্রত্যেক প্রদেশের মধ্যে লোক-সংখ্যানুযায়ী ভাগ করিয়া দিলে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনের যেমন মর্য্যাদা-রক্ষা হয়, তেমন অল্প-লোক-বিশিষ্ট প্রদেশের উপরও কোনরূপ অবিচার হয় না; কারণ এই 'ফণ্ড'এর অন্তর্গত যাবতীয় কর সকল প্রদেশ হইতে লোক-সংখ্যানুযায়ী আদায় হইবে। তারপর এই ব্যবস্থার ফলেই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র প্রদেশগুলি তাহাদের নানাপ্রকার উন্নতির জন্য নিজ ক্ষমতাতিরিক্ত কিছু বেশী টাকা পাইবে।

এই নূতন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির অবস্থা দশ বৎসর পরে এইরূপ দাঁড়াইবে:

	কোটি টাকা
(ক) দফানুযায়ী	
(১) তাহাদের বর্ত্তমান বৎসরের আয়	৭৮
(২) আয়করের উপর অতিরিক্ত কর	৩
(৩) আন্তর্প্রাদেশিক কর	৮
(গ) দফানুযায়ী—	
(১) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত আয়কর বাবদ	৬
(২) চাষের আয়ের উপর কর	৫
(ঘ) দফানুযায়ী—	
প্রাদেশিক 'ফণ্ড'	১৪
মোট	১১৪

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের অবস্থা দশ বৎসর পরে এইরূপ দাঁড়াইবে :—

আয়	কোটি টাকা
বাণিজ্য শুল্ক	৫৪
আয় কর	১৪
ব্যবসা ষ্ট্যাম্প	২
রেলওয়ে	৬
বিবিধ	৫½
মোট	৮১½
ব্যয়	
দেশ রক্ষা	৪৫
ঋণ	১০
সাধারণ শাসন-ব্যয়	১৩
আদায় খরচা	৩
সিভিল ওয়ার্কস	২½
বিবিধ	৩½
বাড়্‌তি আয়	৪½
মোট	৮১½

(৭)

অতঃপর শ্রীযুক্ত লেটন প্রাদেশিক 'ফণ্ড' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই 'ফণ্ড'এর টাকার উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করেন, সেজন্য তিনি একটি আন্তর্প্রাদেশিক রাজস্ব সমিতি গঠন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসচিবগণকে লইয়া এই সমিতি গঠন করা হইবে; 'ফণ্ড'এর অন্তর্গত করগুলির কোনোরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রথমে তাহা এই সমিতিতে আলোচনা করিবার পর যদি দেখা যায় যে, অন্ততঃ তিনজন প্রাদেশিক রাজস্বসচিব প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের পক্ষে মত দিয়াছেন, তবে কেন্দ্রীয় রাজস্ব-সচিব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে প্রস্তাবটী উত্থাপন করিবেন, এবং পরিষদের নির্ব্বাচিত সভ্যগণের ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটী আইনে পরিণত হইতে পারিবে। প্রাদেশিক 'ফণ্ড' হইতে কোন কর বাদ দেওয়া কিংবা কোন নূতন কর 'ফণ্ড'এর অন্তর্গত করা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লেটন একটি বিশেষ ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন। ব্যবস্থাপরিষদের সভ্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ এবং দুই-তৃতীয়াংশ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্য একমত হইলে এই প্রকার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত লেটন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে ঋণ-গ্রহণ ব্যাপারে কিছু স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না, তাহা গোড়াতেই শ্রীযুক্ত লেটন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবারণ, সমগ্র ভারতের টাকার বাজারে সুনাম রক্ষা করা, ঋণ-শোধের বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, প্রভৃতি কারণে ঋণ-গ্রহণ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইলে কমিশন কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সম্মিলিত তন্ত্রের কোনও তাৎপর্য্য থাকে না। এই সব কথা বিবেচনা করিয়া শ্রীযুক্ত লেটন একটি আন্তর্প্রাদেশিক ঋণ-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজস্ব-সমিতির ন্যায় এই ঋণ-সমিতিও বিভিন্ন প্রদেশের এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসচিবগণকে লইয়া গঠিত হইবে। কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কখন কত টাকা ঋণ করা দরকার, এবং সে জন্য কি কি ব্যবস্থা করা দরকার, এই সমস্ত বিষয় এই সমিতি আলোচনা করিবেন, এবং এই সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি পাইলে, ঋণ-গ্রহণের ব্যবস্থা করার ভার এই সমিতির উপর দেওয়া হইবে। ভবিষ্যতে এই সমিতি অষ্ট্রেলিয়ার ঋণ-সমিতির ন্যায় এই বিষয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন, শ্রীযুক্ত লেটন এই আশা করিয়াছেন।

(৮)

শ্রীযুক্ত লেটন তাঁহার রিপোর্টের শেষভাগে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের সহিত বৃটিশ ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্কের কথা আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-

গঠনে দেশীয় রাজ্যগুলির কি স্থান হইবে, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। ইহারা সম্মিলিত ভারতীয় রাষ্ট্রের এক একটী বিশিষ্ট অংশ হইবে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন; সাইমন কমিশনও এই আদর্শকে মানিয়া লইয়াছেন; কিন্তু যতদিন তাহা না হয় ততদিন উভয় দল হইতে নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া একটি বৃহত্তর ভারত-সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব কমিশন করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, বৃটিশ ভারতের সহিত এই দেশীয় রাজ্যগুলির রাজস্ব ব্যাপারেও একটি সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়া দরকার। দেশীয় রাজ্যগুলি অভিযোগ করেন যে, বাণিজ্যশুল্কের উপর তাঁহাদের কোনও হাত না থাকাতে এবং এই শুল্কের টাকা তাঁহারা কিছুই না পাওয়াতে তাঁহারা অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। শুল্কাধীন পণ্যদ্রব্যের বর্দ্ধিত মূল্য হইতে তাঁহারা রেহাই পাইতেছেন না; কাজেই তাঁহারা দাবী করিতেছেন যে, রাজস্ব-বণ্টনের সময় তাঁহাদিগকেও এই বাণিজ্যশুল্কের কিয়দংশ দেওয়া হউক। ইহার উত্তরে এ কথা বলা যায় যে, তাঁহারা যেমন বাণিজ্যশুল্কের কোন অংশ পান না, তেমনি দেশ-রক্ষার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্যও কিছুই দেন না; কাজেই মোটামুটিভাবে এক দিকে তাঁহাদের ক্ষতি যেমন হইয়াছে, অন্যদিকে তাঁহারা তেমনি লাভবান হইতেছেন।

কিন্তু শ্রীযুক্ত লেটন স্বীকার করিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে উভয় পক্ষের লাভক্ষতি সমান সমান থাকিলেও ভবিষ্যতে সেরূপ থাকিবে না, কারণ তাঁহার হিসাবমত বাণিজ্যশুল্কের টাকা যেমন ক্রমশই বাড়িবে, দেশরক্ষার ব্যয় তেমন ক্রমশই কমিয়া যাইবে;—কাজেই শুল্কের অংশ না পাওয়াতে দেশীয় রাজ্যগুলির যে পরিমাণ ক্ষতি হইবে, দেশরক্ষার খরচ না দেওয়াতে সেই পরিমাণ লাভ হইবে না। এই অবস্থায় কি করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত লেটন কমিশন কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বৃহত্তর ভারত-সমিতির উপরেই মীমাংসার ভার দিয়াছেন।

* * * * *

শ্রীযুক্ত লেটনের প্রধান প্রধান প্রস্তাবগুলি যথাসম্ভব তাঁহার ভাষানুযায়ী বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। মাঝে মাঝে তাঁহার প্রস্তাবগুলিকে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিবার জন্য এমন অনেক কথা ব্যবহার করিয়াছি, যাহা তিনি ব্যবহার করেন নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার যুক্তির অথবা বক্তব্য বিষয়ের প্রতি অবিচার করা হয় নাই।*

ব্যাঙ্ক ফেলের মর্ম্ম-কথা—আধুনিক মার্কিণের দৃষ্টান্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল

সংবাদপত্রের মারফৎ জানা যায় যে, গত ৯ বৎসরে আমেরিকায় প্রায় ৫,৬০০টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত ধরা হইয়াছে ১,৭০০,০০০,০০০ ডলার। ৮।১০টি ব্যাঙ্ক ছাড়া প্রায় সকলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ছিল বলিয়া প্রকাশ। ছোট ছোট সহর বা প্রদেশে ইহাদের কারবার চলিত। শতকরা ৯০টি ব্যাঙ্ক ১০ হাজারের চেয়ে কম লোক-বিশিষ্ট জনপদে অবস্থিত ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহর প্রদেশে যে সব লোক ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখে, সাধারণতঃ তাহারা অল্প পয়সার মানুষ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তাহারা সামান্য যাহা-কিছু উপায় করে, তাহা হইতেই কিছু উদ্বৃত্ত করিয়া সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং এতগুলি সহরে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের দুয়ার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় কত লোককে যে নিঃস্ব হইতে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু এত-

* বিগত সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের এক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক বিবৃত প্রথম দিনের বক্তৃতার মর্ম্ম। আঃ উঃ সম্পাদক।

গুলি ব্যাঙ্ক শীঘ্র লালবাতি জ্বালিল কেন? এই ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া কারবার করিতেছে এবং গোড়ার দিকে যে পরিচালনায় ত্রুটী দেখা গিয়াছিল তাহাও নহে। অথচ সেই সব পরিচালকবৃন্দ থাকা সত্ত্বেও যে এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল হইল, ইহার হেতু কি?

এই সব ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইবার অনতিপূর্ব্বে আমেরিকায় রিয়েল-ষ্টেটের (স্থাবর সম্পত্তির) বাজারে "বুম্" দেখা দেয়; এই "বুমের" সহিত ব্যাঙ্ক-ফেলের গভীর যোগ আছে। "বুমে"র সময় এক একটা সম্পত্তির দর দুই তিন গুণ হইয়া গিয়াছিল। যে সম্পত্তি সাধারণ অবস্থায় হয় ত ৫০০০ ডলারে বিক্রয় হইত, সেই সম্পত্তি সেই বুমের বা বাজার-স্ফীতির সময় ১০,০০০, ২০,০০০, এমন কি ৪০,০০০ ডলার মূল্যে পর্য্যন্ত বিকাইয়াছে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দাবী করা মাত্র আমানতের টাকা মিটাইয়া দিতে বাধ্য বলিয়া স্থাবর সম্পত্তিতে বা স্থাবর সম্পত্তি-সংক্রান্ত সেকিউরিটিতে উহার টাকা খাটানো যুক্তি-সঙ্গত নহে। তাই প্রত্যেক দেশেই আইন করিয়া এ বিষয়ে ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সংহত করা হইয়াছে। আমেরিকার ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণ যে সে কথা জানিতেন না, এমন মনে করিবার হেতু নাই। সুতরাং স্থাবর সম্পত্তির বাজারে বুম উপস্থিত হওয়াতে ব্যাঙ্ক কিরূপে আহত হইয়াছে, তাহা বুঝা সহজ নহে।

একটা উদাহরণ দিয়া উভয়ের যোগসূত্রটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ধরা যাউক, ফ্লোরিডা প্রদেশে জন মিলজন নামে এক ভদ্রলোক বাস করেন; বুমের পূর্ব্বে নিজস্ব বলিতে তাঁহার ছোট একখানি বাড়ী ছিল। যখন বাড়ী-ঘরের দর চড়িয়া যাইতেছিল, তখন তিনি স্বীয় বাড়ী-খানি বেশ মোটা দরে বিক্রয় করিয়া দিলেন এবং ব্যবসা করিয়াও কিছু লাভ করিলেন। ফলে দেখা গেল যে, তাঁহার কাছে ৭৫,০০০ ডলার মূল্যের দুকেতা স্থাবর সম্পত্তির দলিল ও নগদ ৪০,০০০ ডলার আছে। তিনি এখন একখানি বৃহৎ অট্টালিকা ভাড়া খাটাইবার জন্য তৈরী করিতে মনস্থ করিলেন ও হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, ইহাতে মোট ১২৫,০০০ ডলার খরচা হইবে। সুতরাং দলিল ও এই অট্টালিকা ধরিয়া তাঁহার সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইবে ২০০,০০০ ডলার। তাই তিনি এই বৃহৎ অট্টালিকা ও দলিল বন্ধক দিয়া (ফার্ষ্ট মর্টগেজ) ১১৫,০০০ ডলার ঋণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ব্যাঙ্ক কখনই স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া আমানতের টাকা হইতে এই মোটা টাকাটা ঋণ দিবে না। কিন্তু ব্যাঙ্কের একটা বিভাগ আছে যাহা সাধারণতঃ দলিল-দস্তাবেজ লইয়া কারবার করে। এই বিভাগ তখন জন মিলজনকে হাঁকাইয়া না দিয়া এমন একজন লগ্নীদার বা ইন্‌বেষ্টর জুটাইয়া দিবে যে ফার্ষ্ট মর্টগেজ রাখিয়া ৮% সুদের বণ্ড ১১৫,০০০ ডলার দিয়া গ্রহণ করিবে। এই বণ্ডগুলি ব্যাঙ্কই ট্রাষ্টী হিসাবে রাখিয়া দিবে। এই টাকা পাইয়া যখন জন অট্টালিকা তুলিতে আরম্ভ করিবে তখন বুমের চরম অবস্থা, তাই ফ্লোরিডার সকল স্থানেই এইরূপ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা তুলিবার হিড়িক পড়িয়া যাইবে। রেলপথে এত মাল যাতায়াত করিবে যে, রেলের মালিকগণ রেলের মাশুল বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইবেন। সময় বুঝিয়া বাড়ীঘর তৈয়ারীর মালমশলার দরও চড়িবে, রাজমিস্ত্রী, ছুতার মিস্ত্রী প্রভৃতিকেও মজুরি অধিক দিতে হইবে। এই সব কারণে অট্টালিকা তুলিতে যাহা খরচ হইবে বলিয়া জন মনে করিয়াছিলেন দেখিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ পড়িবে এবং সে বৎসর তৈরী শেষ করিতেও পারিলেন না। সুতরাং পরবর্ত্তী বৎসরে বাড়ী-ভাড়ার যখন মরশুম পড়িয়া যাইবে সে সময়ে তিনি কিছুই পাইবেন না,—গোটা বৎসরের ভাড়াটা তাঁহার লোকসান যাইবে। এদিকে খাজানা ও সুদ মিটাইবার সময়ও আসিতেছে, তাঁহার নিজের খরচাও বাড়িয়া যাইতেছে, অধিকন্তু অট্টালিকা সাজাইবার জন্য আসবাবপত্রও খরিদ করা চাই। বাড়ীটা যখন তৈয়ারী হইল তখন দেখা গেল মোট খরচা হইয়াছে ১৫৬,০০০ ডলার। এক বৎসরের সুদ, খাজানা, বীমা, আসবাবপত্র, নিজের খরচা প্রভৃতি মিলাইয়া মোট খরচার পরিমাণ দাঁড়াইল ১৮৬,০০০ ডলার। দলিল দস্তাবেজ বন্ধক রাখিয়া ৫% হিসাবে ব্যাঙ্ককে দস্তরি দিয়া জন মোট ১০৯,০০০ ডলার পাইয়াছিলেন। আর তাঁর হাতে নগদ ছিল ৪০,০০০ ডলার। সুতরাং ব্যাঙ্কের কাছে জন ৩৭,০০০ ডলার মোট ধারেন {১৮৬,০০০—(১০৯,০০০+

৪০,০০০)}। ইতিমধ্যে অস্থাবর সম্পত্তির বাজারে মন্দা দেখা দিয়াছে। বুম হওয়ার ফলে দেখা গেল যে, এত অধিক নতুন অট্টালিকা উঠিয়াছে যে, ঐ ব্যবস্থা হইতে আর বড় বেশী লাভ পাওয়া যায় না। অবশ্য নানা রকম বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক এই ফ্লোরিডা প্রদেশেই দুদিন আমোদ-আহ্লাদ করিয়া যাইবার জন্য আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। মোটর গাড়ীর বাজারেও এই সময়ে বুম দেখা দেয়; সুতরাং যাত্রী (টুরিষ্ট)-দের অনেকেই নিজের মোটর গাড়ী চড়িয়াই দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক টুরিষ্ট পূর্ব্ব হইতেই শীত ঋতুর জন্য কয়েকখানা কামরা বা ছোটখাটো বাড়ী ভাড়া করিতেন, এইটাই ছিল রেওয়াজ। বাড়ীর মালিকও সহজে সমস্ত সিজ্‌নের জন্য কামরা ভাড়া না লইলে ভাড়া দিতেন না। কিন্তু বুমের পর সকলই বদলাইয়া গিয়াছে। লোকে এখন মোটর চড়িয়া দুদিন এক স্থানে থাকিয়া অপর কোন স্থানে আবার দুদিন বেড়ানোই পছন্দ করিতে শিখিয়াছে। সুতরাং গোটা সিজ্‌নের জন্য ঘর ভাড়া করিতে কেহ চাহে না। পক্ষান্তরে ভাড়াটীয়া বাড়ীর সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া '২ দিনের জন্য ঘর ভাড়া দিব না' এ কথাও কোন গৃহপতি বলিতে পারেন না; যা পাওয়া যায় তাহাই লাভ। পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। তখন বাড়ীওয়ালা বৎসরের গোড়াতেই আঁচ করিতে পারিতেন, তাঁহার সে বৎসর কত আয় হইতে পারে। কিন্তু বুমের পর আর পূর্ব্ব হইতে আয়টা হিসাব করা যায় না। সুতরাং জন মিলজনের আয়েরও কোন হদিস্ পাওয়া যায় না। কিন্তু খাজানা ও বণ্ডের সুদ বাবদ তাঁহাকে বাৎসরিক ১০,০০০ ডলার আন্দাজ দিতে হয়। ব্যাঙ্কের কথার উপর নির্ভর করিয়া লোকে জন মিলজনের বণ্ড বন্ধক রাখিয়াছে বলিয়া স্বভাবতঃই ব্যাঙ্ক চাহিবে না যে এই বণ্ডের সুদের টাকাটা বাকী পড়ে; সুতরাং সুদের টাকাটা উসুল করিবার জন্য ব্যাঙ্ক জনকে সাহায্য করিবে। প্রত্যেক বৎসরের গোড়ায় সাধারণতঃ মনে হইবে যে, গত বৎসরটা দুর্বৎসর গিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে জন বাড়ী ভাড়া দিয়া একটা আয় করিতে পারিবে এবং তখন খরচা বাদ দিয়াও ব্যাঙ্কের ঋণের কিঞ্চিৎ অংশ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু "কালস্য কুটিলা গতিঃ"। তাই জন ঋণ শোধ ত করিতে পারিলই না, অধিকন্তু ব্যাঙ্কের নিকট আরও ধার করিতে থাকে। যখন ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইল তখন দেখা গেল যে, জনের নিকট ব্যাঙ্কের পাওনা ৫১,০০০ ডলার। ইহার বদলে ব্যাঙ্কের কাছে জনের দলিল-দস্তাবেজ জমা আছে। কিন্তু বন্ধকী টাকা না দিয়া ব্যাঙ্ক তাহার একটী পয়সাও গ্রহণ করিতে পারে না। অথচ যখন বাজারে সেই বন্ধকী দলিল বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা গেল, তখন বাজারে সেরূপ দলিল প্রচুর পরিমাণে থাকায় বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া গেল, তাহাতে বন্ধকী টাকা পরিশোধ করাই দায় হইয়া উঠিল। বুম সুরু হইলে, জনের ৭৫,০০০ ডলার মূল্যের সম্পত্তির দর দ্বিগুণ তিনগুণ দাঁড়াইয়াছিল এবং জন যদি তাহার কল্পিত বাড়ীটী তৈয়ারী করিতে পারে, তাহা হইলে একটা মোটা আয় বাঁধা হইয়া যাইবে, সে সময়ে এ কথা ভাবা স্বাভাবিকই ছিল। তাহাকে ঋণ গ্রহণের সুবিধা করিয়া দিয়া তাহার এই মতলব হাসিল করিতে সাহায্য করার মধ্যে কিছু ত্রুটি থাকিতে পারে, ব্যাঙ্ক সে সময়ে তাহা ভাবিতে পারে নাই। অবশ্য ব্যাঙ্ক জন্‌কে বাড়ী সম্পূর্ণ করিতে ও সুদ-খাজানা দিতে যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল তাহা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া দেয় নাই সত্য, কিন্তু ব্যাঙ্ক এরূপ এক ব্যক্তিকে ঋণ দিয়াছিল যাহার অ্যাসেট বলিতে ছিল একমাত্র স্থাবর সম্পত্তি। ব্যাঙ্কের উদ্যোগে অনেকেই জনের বণ্ড খরিদ করিয়াছিলেন। বুমের পরে যখন বাজার মন্দা হইল তখন ইঁহাদের অনেককেই ঘায়েল হইতে হইয়াছিল। সুতরাং ইঁহাদিগকেও তখন ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। ইঁহারা তখন এই বণ্ডই আবার "কোল্যাটার‍্যাল সেকিউরিটি" রাখিয়া ব্যাঙ্কের কাছ হইতে টাকা কর্জ্জ করেন। ব্যাঙ্ক যখন দেউলিয়া হইল, তখন দেখা গেল, এই উভয়বিধ ঋণের জন্য ব্যাঙ্কের হাতে ১৩,০০০ ডলার মূল্যের বণ্ড জমা আছে। সুতরাং ব্যাঙ্ক যদিও বলে যে, স্থাবর সম্পত্তিতে টাকা লাগায় নাই, তবু কার্য্যতঃ দেখা যাইবে যে, ব্যাঙ্ক জন মিলজনের অট্টালিকার উপর নজর রাখিয়া ৬৪,০০০ ডলার ঋণ দিয়াছে।

এইরূপভাবে উদাহরণের পর উদাহরণ দিয়া বুঝান যাইতে পারে যে, কি স্থাবর সম্পত্তি, কি ষ্টক, কি অন্যবিধ পণ্য, ইহাদের কোনটার দর যদি এক সময়ে খুব চড়িয়া যায় তবে তাহা ব্যাঙ্ককেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঘায়েল করে। যখন বাজারে দুর্য্যোগ দেখা দেয় তখন ষ্টকের দর ভয়াবহরূপে পড়িয়া যায়; ষ্টক-বুমের সময় অনেকেই ব্যাঙ্কের কাছে ষ্টক কোল্যাটার‍্যাল সেকিউরিটি হিসাবে জমা রাখিয়া টাকা কর্জ্জ লয়; যখন ষ্টকের বাজারে মন্দা দেখা দিল তখন এই সব ব্যাঙ্ক ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিল যে, কোল্যাটার‍্যাল সেকিউরিটিগুলি উহারা যে হারে লইয়াছে বাজার-দর তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

আর একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। ধরা যাউক, উইলিয়াম বয়েড একজন পাকা দালাল। যে সময়ে তাহাকে টাকার জন্য ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল, সে সময়ে নিঃসন্দেহভাবে বলা চলিত যে বয়েডের কিম্মৎ ১,৫০০,০০০ ডলার। এই বুমের বাজারে সে একটা সম্পত্তি ৫৫,০০০ ডলার মুনাফা রাখিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিল; কিন্তু সম্পত্তিটি তখন হস্তান্তরিত হইতে পারিল না, উহা সময়সাপেক্ষ হইয়া রহিল। বিক্রয়টির শেষ নিষ্পত্তি না হওয়ায় ক্ষণকালের জন্য তাহাকে কিছু টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইল; ব্যাঙ্ক লোকটির প্রতিপত্তি দেখিয়া ৪০,০০০ ডলার ঋণ দিয়া বসিল। ইতিমধ্যে কিন্তু বাজারে মন্দা দেখা দিয়াছে; সুতরাং বিক্রয়ের নিষ্পত্তি হইল না। অর্থাৎ বিক্রয়টা সম্পূর্ণ হইল না। ফলে শেষ পর্য্যন্ত বয়েড্ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। ব্যাঙ্কের হাতে তখন বয়েডের ঋণ বাবদ এক টুকরা প্রতিজ্ঞাপত্র মাত্র আছে, তাহার মূল্য কিছুই নয় বলিলেই চলে।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্ক ঋণদান সম্বন্ধে বাজার-দরের উপরই নির্ভর করে। বাজার-দরটা ব্যাঙ্কারের কাছে কম্পাসের কাঁটার মত। যখন কেহ ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়, ব্যাঙ্ক কষিয়া দেখে সেই সময়ে সেই সেকিউরিটি বা বন্ধকী মাল বা সেই ব্যক্তির কিম্মৎ কি। যদি কেহ বলে যে "বাপু হে, গত বৎসর এই সম্পত্তির দর এত ছিল, আগামী বৎসর ইহার দর এত হইবে, অতএব এই সম্পত্তির উপর এত টাকা ঋণ পাইতে পারি" তখন ব্যাঙ্কার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া বসিবে, "বাপু হে, এখন এ সম্পত্তিটির দর কি বলত?" অবশ্য এ কথা সত্য যে, বাজার-দরের কষ্টি-পাথরে কষিবার রীতি না থাকিলে ব্যাঙ্কের পক্ষে ক্রেডিট্ দেওয়া শক্ত হইয়া পড়ে। সাধারণ অবস্থায় বা নর্ম্ম্যাল অবস্থায় বাজার-দরকেই ক্রেডিটের ভিত্তি করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু অসাধারণ অবস্থায়ও তাহা করিলে চলিবে কি? বাজার-দরটা যখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি অস্বাভাবিকরূপে চড়িতে থাকে, তখন শুধু বাজার-দরের উপর নজর রাখিয়া কর্জ্জ দিলে চলিবে না। দর অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকিলে লোকে ফট্‌কা খেলায় বেশী মন দেয়। সে সময়ে একটা সম্পত্তির দর কি তাহা ভাবিয়া কেহ খরিদ করিতে যায় না—তখন হিসাব করিতে থাকে ভবিষ্যতে ইহার কি দর হইতে পারে। যদি এই খরিদ করা সম্পত্তিটি স্থাবর সম্পত্তি হয়, কি ষ্টক হয়, তাহা হইলে হয় ত এত দর দিয়া খরিদ করিয়া বসিবে যে পরে ২% কি ১% আয় হওয়াও কঠিন হইয়া পড়িবে। তখন লোকে বর্ত্তমানের বাস্তবতাকে তুড়ি মারিয়া ভবিষ্যতের মরীচিকাকেই আঁকড়াইয়া ধরে। নর্ম্ম্যাল বাজার-দর ও অস্বাভাবিক বাজার-দরের মধ্যে ভেদরেখা টানা বিশেষ শক্ত নয়। দর সর্ব্বদাই ওঠা-নামা করে, কিন্তু এই ওঠা ও নামার একটা মাত্রা আছে। দর যদি কেবলই বাড়িয়া যাইতে থাকে ও অত্যন্ত তাড়া-তাড়ি বাড়ে, তবে বুঝিতে হইবে যে, বাজারে বুম দেখা দিয়াছে। সুতরাং যখন স্থাবর সম্পত্তির বাজারে বুম দেখা দিল, তখন ব্যাঙ্কারদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল; তখন বাজার-দরের উপর নির্ভর করা মোটেই উচিত ছিল না; ২।৩ বৎসরের গড় দরের উপর নির্ভর করাই বুদ্ধি-মানের কাজ হইত। এবং তাহা হইলে এতগুলি ব্যাঙ্ককে আজ লালবাতি জ্বালিতে হইত না। ফ্লোরিডা প্রদেশের স্থাবর সম্পত্তির বুম সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য, কিউবার চিনি বুম এবং ষ্টক বুম সম্বন্ধেও তাহা সত্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সব সুদ্ধ প্রায় ৫,৬০০টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয় নয় বৎসরে। ইহাদের মধ্যে ১,০০০টির কারবার ছিল আইওয়া, জর্জ্জিয়া ও ফ্লোরিডা অঞ্চলে, আর

প্রায় ৩,৫০০টির কারবার ছিল সাউথওয়েষ্টার্ণ সাউথইষ্টার্ণ মিড্‌লওয়েষ্টার্ণ ও নর্থওয়েষ্টার্ণ ষ্টেটসমূহে। এই সব প্রদেশেই জমি বুম দেখা দেয়। এই বুমের জন্যই প্রধানতঃ এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই বুম চলিয়া যাইবারও অনেক পরে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে: ১৯২৫ সনে ফ্লোরিডা প্রদেশে বুম যখন চরমে উঠিয়াছিল তখন মাত্র একটি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে ঠিক বুমের সময় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ ফেল হয় না, বুম শেষ হইয়া যখন মন্দা দেখা দেয় তখনি ব্যাঙ্কের মরণ-বীণা বাজিয়া উঠে। ইহাই স্বাভাবিক। লোকের যখন কোন ভীষণ ব্যাধি হয় তখনি সে মরে না। শরীরে বিষ প্রবেশ করিবার অনেক পরে মৃত্যু আসে। আমানতকারীদের টাকা ফেরৎ দিবার ক্ষমতা ব্যাঙ্কের না থাকিলেও ব্যাঙ্ক অনেক কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু যখনই সেই আমানতে টান পড়ে তখনই ব্যাঙ্ককে দুয়ার বন্ধ করিতে হয়।

এই সব প্রদেশে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইবার আরও একটা হেতু আছে। যতগুলি ব্যাঙ্ক থাকিলে ঠিক লাভজনক ভাবে কারবার চালান যাইতে পারিত, এদিকে তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাঙ্ক ছিল। ইহার জন্য দায়ী করিতে হয় 'কণ্ট্রোলার অব্ দি কারেন্সি'কে। কেন না ব্যাঙ্ক কায়েম করিতে দেওয়া না দেওয়ার কর্ত্তা তিনি। সুতরাং তিনি যদি সুব্যবস্থা করিতেন তবে অনেক দুঃখের হাত এড়ান যাইত। দেশের মধ্যে যদি ২।৪টিও দুর্ব্বল ব্যাঙ্ক থাকে, তবে সেগুলি দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে বিপদ-জনক। দেখা গিয়াছে, এরূপ দুর্ব্বল ব্যাঙ্ক ফেল হইলে সাথে সাথে অনেকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কও দুয়ার বন্ধ করিতে বাধ্য হয়; কেন না এক আধটা ব্যাঙ্ক ফেল হইলেই স্বভাবতঃ লোকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু বুম—বিশেষ করিয়া স্থাবর সম্পত্তি-সংক্রান্ত বুম—ও পরিচালকগণের অজ্ঞান্ত ভুলচুক হওয়া সত্ত্বেও যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক না থাকিত তাহা হইলে এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল হইত কি না সন্দেহ।

এই সব দেউলিয়া ব্যাঙ্কের ৬০% এরও বেশীর মাত্র ২৫,০০০ ডলার পুঁজি ছিল এবং যে যে স্থানে তাহাদের কার-বার ছিল সেই সেই স্থানের জনসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১০০০ মাত্র ছিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া অনেকে বলেন যে, স্বাধীন ব্যাঙ্ক না থাকিয়া এদেশে যদি কেবলই শাখা ব্যাঙ্ক থাকিত তাহা হইলে এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন ব্যাঙ্কিং প্রথা যে এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেলের জন্য দায়ী তাহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ফ্লোরিডা প্রদেশে প্রায় ৩৬০০ বা ৩৭০০ ব্যাঙ্ক গত নয় বৎসরে ফেল করে। এই ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের পরিমাণ প্রায় ৬,০০০,০০০,০০০ ডলার। আর এই সময়ে নিউ ইংল্যাণ্ড ও নিউ জার্সি প্রদেশের ব্যাঙ্কসমূহে মোট আমানত ছিল ৮,৫০০,০০০,০০০ ডলার। এই উভয়বিধ ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত স্বাধীন স্থানীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। তবু এই নয় বৎসরে নিউ ইংল্যাণ্ড ও নিউ জার্সিতে মোটে ১৮টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়। সুতরাং আমেরিকার ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাই যে দায়ী একথা বলা চলে না। প্রত্যেক ব্যবস্থাতেই ভাল ও মন্দ আছে। শুধু মন্দ দিক্‌টাই দেখিলে চলিবে না, ভাল দিকেও নজর দিতে হইবে। নয় বৎসরে আইওয়ায় ৫২৮টি, জর্জ্জিয়া ও ফ্লোরিডায় ৪৯৯টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়, অথচ কনেক্‌টিকাটে ২টি এবং ভার্মণ্ট ও নিউহ্যাম্পশায়ারে মাত্র ১টি ব্যাঙ্ক ফেল হয়।

অনেকে বলেন যে, ব্যাঙ্ক-পরিচালক-মণ্ডলীর সাধুতার অভাবেই এতগুলি ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কোন না কোন ভুলচুক হইয়াছিল। হয় ত আর একটু সতর্ক হইলে গোলযোগ হইত না, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদিগের প্রতি অসাধু অপবাদ দেওয়া চলে না।

সমাজতন্ত্রবাদী বার্ণার্ড শ

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল্

আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে বার্ণার্ড শ'র নাম সুপরিচিত। বার্ণার্ড শ'কে কিন্তু শুধু সাহিত্যিক বলে ধরলে ভুল করা হ'বে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক জীবনের কোন্ ভাবে কি পরিবর্ত্তন করলে মানুষের উন্নতির সম্ভাবনা বাড়ে, এ নিয়ে তিনি যথেষ্ট মাথা খেলান। আর্থিক উন্নতিকে সুসাধ্য কর্‌বার জন্য ভবিষ্যৎ সমাজের গড়ন কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ'র ধারণা বুঝ্‌তে হ'লে তাঁর "দি ইণ্টেলিজেণ্ট উয়োম্যানস্ গাইড্ টু সোশ্যালিজম্ অ্যাণ্ড ক্যাপিট্যালিজম্" নামক বইখানা বিশেষ সাহায্য কর্‌বে। এই বই প্রথম বেরোয় ১৯২৮ সনে। ১৯২৮ সনের মধ্যেই এর চার বার পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক হয়। ১৯২৯ সনে একটা সাধারণ সংস্করণ বেরোয়। ১৯৩০ সনে আবার পুনর্মুদ্রণ হয়। এ থেকেই বোঝা যাবে যে, বইখানা খুবই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। সাদা কথায় চট্ করে সমাজতন্ত্রবাদের মূলমন্ত্র বোঝাবার চেষ্টা বইখানার পাতায় পাতায় জাজ্বল্যমান রয়েছে। বইখানার ভেতরকার কথার সঙ্গে বাংলার ধনবিজ্ঞান-সেবীদের পরিচয় হওয়া বিশেষ দরকার। এই জন্য আমরা শ'র বক্তব্যটা সংক্ষেপে কয়েকটী প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা করবো। এইখানে এটাও জানিয়ে রাখা দরকার যে, শ'র প্রত্যেকটী মতের সঙ্গে যে আমাদের মিল আছে তা নয়। তাঁর প্রত্যেকটী কথাই যে ধনবিজ্ঞান-সম্মত তাও মনে করিনে। তাঁর বক্তব্য তাঁরই ধরণে জানাবার চেষ্টা করবো।

কোন আর্থিক ব্যবস্থা চিরকেলে নয়

বর্ত্তমান সমাজে ধনবিভাগের একটা প্রণালী আছে। আমাদের মজ্জাগত ধারণা এই যে, ধনবিভাগের এই প্রণালীটা মানুষের সমাজে চিরকাল ছিল, আছে ও থাক্‌বে।

বার্ণার্ড শ বল্‌ছেন, "না, সমাজে চিরন্তন, স্থায়ী বা অবিনশ্বর বলে কিছু নেই। সব সময়েই সমাজের অবস্থা বদ্‌লাচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আইনকানুনও বদ্‌লাচ্ছে। আইন কানুন জিনিষটাই ত' সমাজের পরিবর্ত্তনশীল জীবন বোঝ্‌বার একটা নিখুঁত মাপবিশেষ। আগেকার কালে আইনে এমন সব কাজ করতে বারণ করা হ'তো, যাতে এখন ভ্রূক্ষেপও করা হয় না; আবার আজকাল এমন সব কাজ বারণ করা হয়, যে সব বিষয়ে মানুষের এক সময়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। অর্থাৎ সমাজের ব্যবস্থা সমাজের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই বদ্‌লাচ্ছে। এমন কি আমাদের আর্থিক অবস্থা—আমরা যেটাকে মোটামুটি অনেকটা স্থায়ী বলে মনে করি, সেটাই কি—সব সময়ে এক ভাবে থাকে? মোটেই থাকে না। বছরে বছরে পার্ল্যামেণ্টে ঝুড়ি ঝুড়ি আইন তৈরী হচ্ছে। তার ফল কি হচ্ছে? কত লোকের আর্থিক অবস্থা যে কত ভাবে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে তা কল্পনাও করা যায় না। এই সব কারণে সমাজের বর্ত্তমান আর্থিক প্রণালীকে চিরকেলে ব্যবস্থা বলে মনে কর্‌বার কারণ নেই।

সমাজের অবস্থা যখন দিবারাত্র বদ্‌লাচ্ছেই, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ব্যবস্থা করাও অনুক্ষণ দরকার হচ্ছে, তখন আমাদের কর্ত্তব্য এমন সব আইনকানুন বা সামাজিক ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা, যাতে মানুষের উন্নতি হ'তে পারে, আর যে সব জিনিষ মানুষের উন্নতির পথে বাধা দেয় সেগুলা অপসৃত হ'তে পারে।

বর্ত্তমান সমাজের ধনবিভাগ-নীতি মানুষের উন্নতির পথে একটা বাধা। ধনী ও দরিদ্রের ভেদ বা ধনসাম্যের অভাব মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশের পরিপোষক নয়। এ ধারণা এক সময়ে সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এক সময়ে জনকয়েক বড় কবি বা দার্শনিকই এই চিন্তায় পাগল ছিলেন। কিন্তু আজকাল গোটা সমাজ-দেহে এই ধারণা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে যে, ধনবিভাগের একটা শ্রেষ্ঠ নীতি এই কারণে দরকার যে, যে নীতি এতদিন সমাজে চলছিল তা সমাজের উন্নতির বিশেষ পরিপন্থী।

শ্রেষ্ঠ নীতি ত চালাতে হ'বে। কিন্তু তা কি রকম হওয়া দরকার? শ বলেন যে, এ সম্বন্ধে প্রত্যেককে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে হ'বে। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করা এই কারণে দরকার যে, যদি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তেই আমরা পৌছুই তা হ'লেও সত্য পথ অনুসন্ধানের আগ্রহ ও চেষ্টা থাক্‌লে, প্রকৃত সিদ্ধান্ত

হাতের কাছে এলে তাকে চিনে নিতে দেরী হ'বে না। আর প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে চিন্তা করা ও নিজ মত গঠন করা দরকার এই জন্য যে, আমাদের ব্যক্তিগত মতামতই শেষ পর্যন্ত জনমত গড়ে থাকে, আর এই জনমতই আইন-কানুন, পুলিশ, জেল, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে চালিয়ে থাকে। সুতরাং সমাজকে একটা বিশেষভাবে গড়তে হ'লে স্বাধীন ও সুচিন্তিত ব্যক্তিগত মতামত গড়ার কথা ভুললে আদবেই চলবে না।

ধনসম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা

সমাজে ধনসম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা সর্ব্বদাই চলছে। কাজেই 'ধনসম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা হ'বে কিনা' তা নিয়ে মতের কোন পার্থক্য হ'তে পারে না। মতের পার্থক্য হ'তে পারে শুধু এই নিয়ে যে, কে কতখানি এবং কি সর্ত্তে পাবে?

অনেকের ধারণা যে যেহেতু টাকা সঞ্চয় করা যেতে পারে, সেইজন্য ধনসম্পদও সঞ্চয় করা যেতে পারে। কিন্তু তা সত্যি নয়। আমাদের ভোগ্য জিনিষগুলা কিছু চিরকাল স্থায়ী নয়। সেগুলা কয়দিন মাত্র টেঁকে, তারপর নষ্ট হ'য়ে যায়। ধরা যাক্, একজন একশ' খানা রুটি তৈরী ক'রলে, আর তা দিয়ে দৈনিক একখানা করে রুটি খরচ করবার দাবী কিনলে। এখানে সে যাকে রুটি বেচছে, তার ঘাড়ে রুটিগুলা যতদিন টেঁকে ততদিনের মধ্যে সেগুলা খরচ করবার দায়িত্ব চাপানো হচ্ছে। সুতরাং যে সঞ্চয় করলে সে একজনের ঘাড়ে খরচ করার দায়িত্ব চাপিয়ে তবে সঞ্চয়ের সুযোগ পেলে। এইজন্যে শ বলেন যে, ব্যয় ছাড়া সঞ্চয় নেই। এক জন সঞ্চয় করছে বললেই বুঝ্তে হ'বে যে, আর একজন সঞ্চিত জিনিষ খরচ করছে। শ বলেন যে, কোন জাতি কখনও একেবারে কর্ম্মহীন হয়ে থাকতে পারে না। কারণ খাওয়া পরার ও অন্যান্য ভোগের জিনিষ কিছু চিরকালের জন্যে জমানো যায় না। একদিকে উৎপাদন, ও অপরদিকে ভোগ দুই-ই পাশাপাশি চলে।

কে কত পাবে?

দেখা গেল যে, সমাজে ধনোৎপাদন ও ধন-বিতরণ দুই-ই একই সঙ্গে সব সময়ে হচ্ছে। এই ধন-বিতরণ এখনই বা কি প্রণালীতে হচ্ছে ভবিষ্যতেই বা কি প্রণালীতে হওয়া উচিত

বর্ত্তমান অবস্থা নিম্নপ্রকার। হয়তো একজনের পোষ্য খুব বেশী, কিন্তু তাকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হ'বে; আর একজনের পোষ্য খুব কম, কিন্তু তার এত রসদের যোগান আছে যে, সে পাঁচশ' লোকও খাওয়াতে পারে। বর্ত্তমান সমাজের আর্থিক গড়ন যে আইনকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সেই আইনে এই প্রকার ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়েছে। আর সেই আইন আরো বল্ছে যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি যদি দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে তার আহার্য্য কেড়ে নেয় তা হলে সে শাস্তি পাবে।

কিন্তু আইন জিনিষটা মানুষেরই হাতে গড়া জিনিষ দরকার হ'লে ইচ্ছামত এর অদলবদল করা চলে। তার চেষ্টাও হচ্ছে। যার বেশী সম্পদ্ তাদের ভাগ থেকে কিছু সম্পদ্ বেশী হারে খাজানার সাহায্যে আদায় ক'রে নেওয়া হচ্ছে, আর তা গরীবদের দেবার চেষ্টা হচ্ছে নানা উপায়ে, যেমন বৃদ্ধ বা বিধবাদের জন্যে সরকার থেকে মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত, বেকারদের জন্যে ভাতার আয়োজন, ইত্যাদি।

এতে ক'রে কয়েকটী আধুনিক সভ্য দেশে, প্রাচুর্য্যের পাশে চরম অভাবের দুর্দ্দশা ভোগ করার সম্ভাবনা হয়তে কিছু পরিমাণে দূর হয়েছে। কিন্তু ধনীদের কাছ থেকে বেশী হারে খাজানা আদায় করে গরীবদের ভাতার বন্দোবস্ত করাই শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত বলে মেনে নেওয়া চলতে পারে না। ধন-বিতরণের আরো ভালো বন্দোবস্ত হওয়া দরকার।

বলা যেতে পারে, "কেন? এতো অতি সোজা কথা যার যত টাকা আছে, সে সেই পরিমাণ ভোগ করুক না।' এটা আমাদের প্রশ্নের উত্তরই নয়। টাকা জিনিষটা মানুষ সোজাসুজি ভোগ করতে পারে না। ভোগ করবার জিনিষ পাবার কতটা অধিকার আছে, তারই নিদর্শন হচ্ছে টাকা। কাজেই ভোগ্য পদার্থের বিতরণটা যদি ন্যায্যভাবে ক'রতে হয়, তবে যার যত টাকা আছে সেইটাকেই স্থায়ী বন্দোবস্ত বলে মেনে নিলে চল্‌বে না। টাকার বিতরণটার উপরও হস্তক্ষেপ করতে হ'বে।

(ক্রমশঃ)

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীরঘুনাথ ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ...

ফাল্গুন—১৩৩৭

৫ম বর্ষ—১১শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৬

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমাব দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
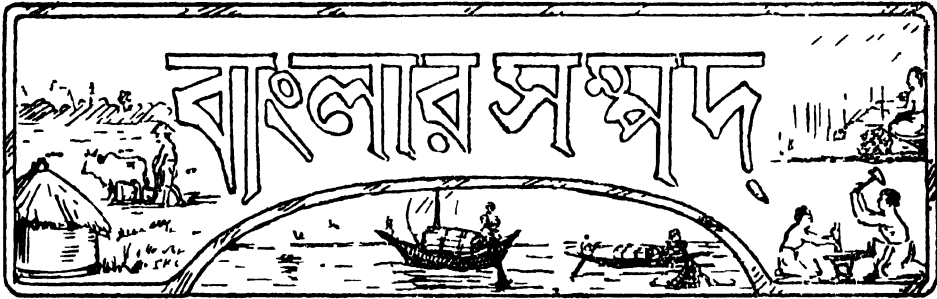
জলপাইগুড়ির আর্থিক খবর

ফালাকাটা মেলা

এই মেলা শ্রীপঞ্চমী হইতে আরম্ভ করিয়া দোল পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রায় দেড় মাস কাল বিদ্যমান থাকে। মেলার চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত মাঠের সন্নিকটে মুজনাই নামক একটী প্রশস্ত নদী প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত নদীর সাহায্যে দূরবর্ত্তী জেলাসমূহ হইতেও ব্যবসায়িগণ ইচ্ছা করিলে বড় বড় নৌকাযোগে মালপত্র আমদানি রপ্তানি কবিতে পারেন।

মেলায় ঘোড়া, গরু এবং ভুটিয়া কুকুর ইত্যাদি আমদানি হইলে তাহাও বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে।

এই মেলার সঙ্গে একটি কৃষি ও পশু-প্রদর্শনী থাকে।

উন্নত প্রকারের কৃষিজাত দ্রব্যাদি দেখাইতে পারিলে পুরস্কার বিতরণ করা হইয়া থাকে।

এই মেলাতে একটি পশুহাটী স্থাপনের উত্তম ব্যবস্থা হইয়াছে। ঘোড়া, গরু, ছাগ, মহিষ, কুকুর ইত্যাদি আমদানি হইবে। অতি সন্নিকটে নদী থাকায় পানীয় জলেরও অভাব নাই।

জল্পেশ্বর মেলা

জেলা জলপাইগুড়ির অন্তর্গত জল্পেশ্বর নামক স্থানে ১৯৩১ সনেব ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৫ দিনের জন্য একটী মেলা বসিয়াছে।

স্থানীয় উত্তর-বঙ্গ রেলওয়ে ষ্টেশন জলপাইগুড়ি হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে বি, ডি, রেলওয়ের ভোটপট্টী ষ্টেশন হইতে দেড়ক্রোশ এবং বার্ণিশ জংশন হইতে চারিক্রোশ দূরে জল্পেশ্বর অবস্থিত। উল্লিখিত ষ্টেশনসমূহ হইতে সুন্দর সড়ক মেলাস্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ সড়কে সকল সময়ে মোটর বাস্ যাতায়াত করিয়া থাকে। প্রতি বৎসরই একদিকে

ঢাকা, গোয়ালন্দ, কুচবিহার, রংপুর ইত্যাদি এবং অপরদিকে দার্জ্জিলিং, ভুটান প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে ব্যবসায়িগণ এই মেলায় আসিয়া থাকে।

মেলাতে ঘোটক, ছাগ, কুকুর, বলদ, গাভী প্রভৃতি পশু, পশমী, রেশমী, সুতি প্রভৃতি নানাপ্রকার বস্ত্র ও তৈয়ারী পোষাক, দোসুতি, সতরঞ্চ, ভোটদেশীয় কম্বল, কস্তুরী, চামর, মধু, মোম ও মৃগচর্ম্ম ইত্যাদি, কাঁসা ও পিতলাদির বাসন, কাষ্ঠের জিনিষ ও নানাপ্রকার মনোহারী দ্রব্য আসিয়া থাকে।

গত চারি বৎসর হইতে এই মেলার সঙ্গে একটী কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। সেখানে নানাদেশের উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত নানাপ্রকারের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয় এবং সেই সকল দ্রব্যের নির্ম্মাণ-প্রণালী ও উন্নত কৃষি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কার্য্য দেখান ও তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিশেষ আকর্ষণের জন্য গত বৎসর লোক-সমাগম অনেক বাড়িয়াছিল এবং এ বৎসর আরও বেশী বাড়িবার সম্ভাবনা।

জলপাইগুড়ির শিল্প

জলপাইগুড়ি জেলার সর্ব্বপ্রধান গৃহশিল্প হইতেছে বস্ত্র-বয়ন। সদর, তেঁতুলিয়া, ময়নাগুড়ি ও বোদা থানার ১৯টি গ্রামে বস্ত্র-বয়ন অধিক পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; তার মধ্যে পাহাড়পুর তেঁতুলিয়া, কৃষ্ণনগর, গৌরগড়, বাল্লির-পাড়া এবং বৌলিয়া প্রধান।

প্রায় ১৭৫০টি দেশী তাঁতে বার্ষিক প্রায় ৮ লক্ষ টাকার বিলাতী সুতার কাজ হয়; উৎপন্ন মালের মূল্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। ১৪৷৷০ হইতে ২৪ নম্বরের সুতাই বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৫০ নম্বরের সুতাও কখন কখন ব্যবহৃত হয়। মাড়োয়ারী মহাজন অথবা অন্য ফড়িয়ার নিকট হইতে অতি উচ্চ মূল্যে এবং উচ্চ সুদে সুতা কিনিতে হয় বলিয়া বয়নকারীর লাভ বিশেষ কিছু থাকে না। দৈনিক ৭৷৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া মাসে ১৫৲।১৬৲ টাকা উপার্জ্জন করাও কষ্টকর হইয়া পড়ে। উচিত মূল্যে সুতা সরবরাহ করিতে পারিলে বয়ন-শিল্পের যে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফোতা, লুঙ্গি, চাদর, গামছা এ জেলার প্রতি হাটে, বিশেষতঃ বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ, ময়নাগুড়ি এবং তেঁতুলিয়ার হাটে কেনাবেচা হইয়া থাকে। এই সকল মোটা জিনিষের চাহিদা খুব বেশী; রংপুর এবং দিনাজপুরে কিছু মাল চালান হয়।

দেবীগঞ্জ ও বোদা অঞ্চলের কৃষক-রমণীগণ অবসর সময়ে চট বুনিয়া থাকে; ডোমারে চটের কারবার বেশ বড় কারবার। ফড়িয়াগণ নানাস্থান হইতে এই চট সংগ্রহ করিয়া ডোমারে মহাজনদের নিকট বিক্রয় করে। মহাজনগণ এইসকল মাল অন্যত্র চালান দেয়। ক্ষেতের পাট ও অবসর সময়ের পরিশ্রম দ্বারা যে গৃহ-শিল্পটী চলিতেছে তাহার মূল্যও অনেক টাকা।

এবার পাটের দর নাই; কতক পাট চটে পরিণত করিলে কাঁচা পাট অপেক্ষা বেশী দাম পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই, এদিকে চেষ্টা করিতে দোষ কি? সব পাট অবশ্য চটে পরিণত করা সম্ভবপর হইবে না; কিন্তু কতক তো হইবে। তাই বা মন্দ কি? ইহাতে বেকার-সমস্যারও কথঞ্চিৎ সমাধান হইবে।

পচাগড় এবং রাজগঞ্জ থানায় আকের গুড় এবং চিনি তৈয়ারী হয়। তবে চিনি তৈয়ারী প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

ডুয়ার্সের নানাস্থানে এড়ি বয়ন হয়। সহরে একটী কারখানায় উৎকৃষ্ট দিয়াশলাই হয়। সহরে চা বাগানের চুপড়ি কিছু কিছু তৈয়ারী হয়। উদ্যম থাকিলে কাজটীকে বহু বিস্তৃত করা যাইতে পারে। বিড়ি তৈয়ারীও বহুল পরিমাণে হইতে পারে।

দিনবাজারের দোকানদারের অসুবিধা

জলপাইগুড়ি সহরে দিনবাজার পুরাতন ও একমাত্র বাজার। সহরের লোক-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। তৎসঙ্গে ইহার আয়ও খুব সম্ভব বাড়িয়াছে। কিন্তু দোকানদারদের নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলি দূর করা একান্ত বাঞ্ছনীয়:—

১। পায়খানা। দোকানদারদের সংখ্যানুপাতে ৪টী

প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট একটী পায়খানা আদৌ যথেষ্ট নয়। তদুপরি পায়খানায় যাইবার পথ কর্দ্দমাক্ত, আবর্জ্জনাপূর্ণ ও দুর্গম। অন্যদিকে প্রকোষ্ঠগুলি ২৪ ঘণ্টায় একবার পরিষ্কার হয় বলিয়া সর্ব্বদাই ময়লাযুক্ত থাকে। প্রস্রাবখানা ত নাই বলিলেই চলে। এতবড় বাজারে সবেমাত্র একটী প্রস্রাবখানা!

২। রাস্তা। রাস্তাগুলি স্থানে স্থানে ভাঙ্গা, আবর্জ্জনা-পূর্ণ ও অপরিষ্কার! ছোট ছোট ইট ও পাথরগুলি হা করিয়া আছে। ইহার উপর বৎসরে একবার মাটী ফেলা হয় কিনা সন্দেহ। অন্য দিকে রাস্তাগুলি তেমন প্রশস্তও নয়। তদুপরি গরুর উৎপাত। সুতরাং ক্রেতা-বিক্রেতার যে কি অসুবিধা হয় তাহা ভুক্তভোগীরাই অবগত আছেন।

৩। ড্রেন। ড্রেনগুলি স্থানে স্থানে ভাঙ্গা, অপরিষ্কার, দুর্গন্ধময়। ড্রেনগুলি প্রত্যহ অন্ততঃ একবার পরিষ্কার হওয়া উচিত। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় সপ্তাহে একবারও ভালরূপে পরিষ্কার হয় কিনা সন্দেহ। এইরূপ দুর্গন্ধময় ড্রেনের পার্শ্বে বসিয়া অনেক দোকানদার শাকসব্জী বিক্রয় করে। ঐ সকল দোকানদারের যে নানারূপ রোগ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

৪। জলকূপ। বাজারে একটী জলকূপ আছে। উহা বাজারের এক পার্শ্বে মিঠাইয়ের দোকানের সম্মুখে অবস্থিত। শুনা যায় যে, মিউনিসিপ্যালিটীর আদেশানুসারে জল উঠাইয়া উহার পার্শ্বে স্নান বা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ধোয়া নিষিদ্ধ। স্থায়ী দোকানদারদের (যাহারা দোকানে স্নান আহার করে) অনেক অসুবিধা হয়। এত বড় বাজারে আরও ২।১টী জলকূপের বিশেষ প্রয়োজন।

৫। বাতি। বাজারে আলোর বন্দোবস্ত নাই বলিলেই চলে। সারা বাজারে ৪।৫টী "লাইট-পোষ্ট" দেখা যায়। আলোগুলি নিবু নিবু অবস্থায় জ্বলে। পাঁচ হাত দূরে পর্য্যন্ত আলো হয় না।

৬। টিনসেড। টিনসেডের ভিতরে ভালরূপ খোলা বাতাস চলাচল করে না—যদিও সেডের স্থানে স্থানে টিন ঝুলাইয়া আলো-বাতাস আনার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ২।১টি দোকানদার দিনের বেলাতেও আলো জ্বালাইয়া দোকান করে। রাত্রিতে সেডের স্থানে স্থানে কয়েকটি বাতি দিলে ভাল হয়। রাস্তাগুলি প্রায় অপরিষ্কার থাকে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়,
জলপাইগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক।

পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত চাই

পচাগড় অঞ্চলের অন্তর্গত মিরগড় গ্রামে দুইটী, আমতলায় একটী এবং যতনপুখরিতে একটি—এই মোট চারিটি ডিঃ বোর্ডের কূপ রহিয়াছে। কিন্তু আজ বহুদিন যাবৎ কূপগুলি মেরামত করা হইতেছে না। অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, স্নান করা ও কাপড় ধোওয়া জল কূপের ভিতর প্রবেশ করিয়া কূপের জলকে পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু উপায়ান্তর নাই বলিয়া গ্রামের লোক তাহাই পান করিতেছে ও রোগে ভুগিতেছে। কয়েক দিন হইল প্রায় ৮০ জন গ্রামবাসী ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান মহাশয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিবার জন্য এক দরখাস্ত করিয়াছে।

মফিজদ্দিন আহাম্মদ,
সেক্রেটারী মিরগড় কো-অপারেটিভ সোসাইটি।
(জনমত—জলপাইগুড়ি)

জলপাইগুড়ি সহরের বাজার-দর

(১) আমরা খবর পাইতেছি জলপাইগুড়ি ছাড়া অন্যান্য জেলায়—পল্লীগ্রামের তো কথাই নাই, সহরেও—খাদ্য দ্রব্যের দাম আশাতীতভাবে কমিয়া গিয়াছে। অন্যান্য স্থানে ঢেঁকি-ছাটা ভাল চাউলের মণ ৬৲ টাকার উর্দ্ধে নাই, কিন্তু জলপাইগুড়ি সহরে কলের চাউলের মণ ৭৷৹ টাকা হইতে ৮৷৷৹ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। (জনমত)

(২) বিগত পৌষ মাসে জলপাইগুড়ি সহরে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কমানোর জন্য এক সভা হইয়াছিল। সহরের পারিপার্শ্বিক হাট-বাজারে জিনিষপত্রের মূল্যের তুলনায় সহরে জিনিষপত্রের মূল্য অনেক বেশী। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য উক্ত সভায় একটী সাব-কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই সাব-কমিটী কারণ

অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবেন। জলপাইগুড়ি সহরে একমাত্র ব্যবসাদার স্থানীয় মাড়োয়ারী সম্প্রদায়। সকলে অনুমান করেন যে, এই সম্প্রদায়ই ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী। সভায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

(৩) সভার নির্দ্ধারণ

১। জলপাইগুড়ির অধিবাসীরা এক জনসভায় সমবেত হইয়া নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে, বাংলার অন্যান্য জেলাসমূহের এবং এই জেলার মফঃস্বলের খাদ্য দ্রব্যের মূল্যের তুলনায় জলপাইগুড়ি সহরে খাদ্য-দ্রব্যাদির মূল্য অধিক থাকার কোন কারণ নাই। সুতরাং এই সভা জলপাইগুড়ি জেলার সর্ব্বশ্রেণীর ব্যবসায়ীকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার সুযোগ লইয়া অতিরিক্ত লাভের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য-দ্রব্যাদির দর বাড়াইয়া না রাখেন। তাঁহারা যেন ন্যায্য খরচ ও লাভ লইয়া ন্যায্য দরে খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করেন।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া একটী সাব-কমিটি গঠিত হয়। তাঁহারা খাদ্য দ্রব্যাদির বাজার-দর এবং কি কি কারণে খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য কমিতেছে না তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন এবং কোন ব্যবসায়ী অন্যায় লাভ করিয়া থাকিলে তাহা রিপোর্ট করিবেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মহলানবিশ, (সভাপতি)
,, তনসুখ রায় মহেশ্রী
,, প্রহ্লাদচাঁদ আগরওয়ালা
,, যোগেশচন্দ্র দত্ত (সেক্রেটারী)
,, সুরেশচন্দ্র পাল
,, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, হোকম আহম্মদ হোসেন

এই কমিটি ইচ্ছা করিলে আরও সভ্য যোগ করিয়া লইতে পারিবেন।

৩। উপরোক্ত সাব-কমিটি বাজার-দর কমাইবার জন্য উপায় স্থির করিবেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

(জনমত—জলপাইগুড়ি)

নূতন হাট

জিলা জলপাইগুড়ির অধীন আলিপুর দুয়ারের অন্তর্গত চকাকেতি গ্রামে খয়েরবাড়ী হাট ও কামসিং গ্রামে কামসিং হাট নামে দুইটি নূতন হাট বসিয়াছে। বিগত ২১ অগ্রহায়ণ রবিবার প্রথম হাট বসিয়াছিল।

(ত্রিস্রোতা—জলপাইগুড়ি)

খদ্দর উৎপাদনের চেষ্টা

প্রায় দুই মাসে সাতাইশটি বাড়ীতে তৈরী সাড়ে কুড়ি সের সূতায় ৩২৪ তিনশত চব্বিশ হাত এবং খরিদা ১া০ মণ সূতায় অনুমান ৬৪০ হাত, মোট ৯৬৪ হাত ধুতি ও থান কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে বোঝা যায় যে, আমাদিগের এই প্রতিষ্ঠানটী শৈশব অবস্থায় কি প্রকার উন্নতি করিতেছে। দুঃখের বিষয় যাঁহারা প্রথম অবস্থায় এই কার্য্যে উৎসাহ দিয়াছিলেন বা কাজ করিবেন বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন নাই। মহিলা সমিতি ও ইহার কয়েকজন কর্ম্মীর চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটী বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এখন সামান্য চেষ্টা করিলেই ইহাদ্বারা এই ঘোর অর্থ-সঙ্কটের দিনে অনেকের অন্ন-সংস্থানের উপায় হইতে পারে।

অল্পদিনের এই প্রতিষ্ঠানটি ৬।৭টী গরীব তাঁতীর অন্ন সংস্থান ও কয়েকটী বাঙ্গালী ও অনেকগুলি মাড়োয়ারী দরিদ্র স্ত্রীলোক কাটুনীর কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছে।

সহরে বাঙ্গালীদের বাড়ীতে অনূ্যন ২০০ শত চরকা আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের নিকটে আশানুরূপ সূতা পাওয়া যাইতেছে না। এ বিষয়ে মাড়োয়ারী বাড়ীর লোকেরা অনেকটা অগ্রসর। প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া সূতা কাটিলেই যেখানে প্রত্যেক পরিবার নিজেদের সূতায় প্রস্তুত কাপড় পরিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারেন এবং এইভাবে সংসারেরও কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারেন তখন প্রত্যেকেরই কিছু করিয়া সূতা কাটা উচিত।

শ্রীসীতানাথ প্রামাণিক

(ত্রিস্রোতা—জলপাইগুড়ি)

মণ্ডল ঘাটে ধান্যের দর

বর্ত্তমান সময় প্রতিমণ ১।০ সিকা হইতে ১৷৷০ দেড় টাকা দরে ধান্যের ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কূপ

জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে জেলার স্থানে স্থানে যে সকল পাইপের কূপ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলির প্লাটফর্ম্ম বাঁধান হয় নাই। ইহাতে কূপের নিকটে জল জমিয়া থাকায় ও কাদা হওয়ায় জল দূষিত হইয়া পড়ে।

(জনমত—জলপাইগুড়ি)

বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে

১৯২৯-৩০ সনের আয়ব্যয়ের বিবরণ নিম্নরূপ :

আয়

১৯২৯-৩০	১৯২৮-২৯
২৭·৩৮ লক্ষ টাকা	২৫·৩২ লক্ষ টাকা

ব্যয়

১৪·৪০ লক্ষ টাকা	১২·৬২ লক্ষ টাকা

মাল-সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই আয় বাড়িয়াছে।

মাল মাশুলের আয়

২০·৬৪ লক্ষ টাকা	১৮·৫৭ লক্ষ টাকা

দোমহনী হইতে লাটাগুড়ি পর্য্যন্ত লাইন রিলে করায় আয় ১·২১ লক্ষ টাকা।

তিস্তার ক্ষতির পরিমাণ ১,১০,০০০ টাকা।

ডিবিডেণ্ট

আলোচ্য বর্ষে শতকরা ১১৲ লভ্যাংশ বিলি হইয়াছে।

১৯৩০ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় ২·২৬ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে। বৎসরের বাকী কয়েক মাসে আয় কম হইবে বলিয়া আশঙ্কা।

(ত্রিস্রোতা—জলপাইগুড়ি)

রংপুরে কৃষকের অবস্থা

রংপুর জেলার প্রধান আবাদ তামাক ও পাট। এই তামাক ও পাট বিক্রয় করিয়া এ জেলার লোক জমির খাজানা, মহাজনের ঋণ শোধ করিয়া বৎসরের কাপড় ও ছয় মাসের পেটভাতা চালায়। এ জেলায় যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়, তাহাতে শতকরা আশী ঘর কৃষক ছয় মাসের বেশী পেটভাতা চালাইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়ায় জমিদারগণ নানা উপায়ে জমির খাজানা বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট পোষ্টাল বিভাগের যাবতীয় দ্রব্যের হার, ষ্ট্যাম্প, কোর্টফি, ও রেজিষ্ট্রেশান ফি বাড়াইয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইউনিয়ান বোর্ড স্থাপন ও চৌকিদার, দফাদারগণের বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে চৌকিদারী ট্যাক্সের হার বাড়িয়া গিয়াছে। কোম্পানী ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। ডিঃ বোর্ড ভেলুয়েশনের দ্বারা পথকর অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই সব ভারি বোঝা কৃষকের উপর আছেই; তারপর আবার শিক্ষা নামক বোঝাও তৈয়ার হইতেছে কৃষকের জন্য। এ দিকে কিন্তু কৃষকের প্রাণ আই-ঢাই। বর্ত্তমানে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় কৃষক দুর্দ্দশার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। এত দিন জমিজমা রেহেন বন্ধক রাখিয়া গরুবাছুর, আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া অনশনে অর্দ্ধাশনে কাল কাটাইতে হইয়াছে। আজ তাহারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমদ্বারা লক্ষ ধান্যের দেখা পাইলেও তাহাদের কষ্টের অবসান হইতেছে না। এ নিদারুণ শীতেও তাহাদের পরিধানে কাপড় নাই, শয়নের বিছানা নাই। শীত সহ্য করিতে করিতে তাহাদের শরীর হইয়াছে কঙ্কালসার, ম্যালেরিয়ার আকরভূমি। তাহারা পয়সার অভাবে সুচিকিৎসিত হইতেও পারিতেছে না।

এতদিন পর্য্যন্ত জমিদার, মহাজন, কাবুলী ও চৌকিদারকে কৃষকগণ এক পয়সাও দিতে পারে নাই। "ঘরে ভাত হইলে দিব" এই আশ্বাসবাণী দ্বারা তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া আসিতেছিল। এখন যেই ঘরে ভাত হইয়াছে আর অমনি সকলে চাপিয়া ধরিয়াছে। এতদ্দর্শনে কৃষকের

শ্বাসরোধ ঘটিয়াছে। যে ধান দ্বারা নিজেরই ছয় মাসের পেটভাতা চলে না, তাহা বিক্রয় করিয়া কয় দেবতাকে থামান যায়? আর সে ধানের বাজারও ত মন্দা।

কৃষকের এই ভীষণ দুর্দশার ও বিষম সমস্যার সমাধানের আশু ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমার মনে হয় বালুরঘাটের ন্যায় এখানেও সঙ্গীন অবস্থা হইবে। সময় থাকিতে প্রতীকারের ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানের কাজ। কাবুলী ও মহাজনের নালিশ বন্ধ করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, এবং অনিবার্য্য নালিশের টাকা সম্পূর্ণ এক সঙ্গে ডিক্রী না দিয়া কিস্তি করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব পাশ করা উচিত।

কাবুলীগণ যখন বহুদিন ধরিয়া এক টাকার কাপড় তিন টাকায় বিক্রয় করিয়া এ দেশের বহু অর্থ শোষণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন, মহাজনগণ যখন চক্রবৃদ্ধি আদায় করিয়া নিজেরা ধনশালী হইয়াছেন, জমিদারগণ বন্দোবস্তের পর বন্দোবস্ত করিয়া দ্বিগুণ ত্রিগুণ কর বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের বিলাসিতা সম্পাদন করিয়াছেন, তখন কৃষকের এই সঙ্কটসময়ে সকলের দৃক্‌পাত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

গবর্ণমেণ্টের অধীনে যাঁহারা চাকুরী করিতেছেন, তাঁহাদের আজ চিন্তার কারণ নাই। কারণ তাঁহাদের বাসাখরচ এক টাকার স্থানে ছয় আনা দাঁড়াইয়াছে। টাকা প্রতি দশ আনা আমানত জমিতেছে। তাই গবর্ণমেণ্টের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, কৃষকের উপর শিক্ষাকর না বসাইয়া কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস করিয়া শিক্ষাব্যয় চালাইবার জন্য একটি তহবিল গঠন করা হউক।

খোন্দকার আছিরুদ্দীন আহম্মদ,
শিক্ষক, তুষভাণ্ডার হাই স্কুল।
(রংপুর-দর্পণ)

রংপুর দুর্ভিক্ষে সাহায্য-প্রার্থনা

এবার এতদঞ্চলে আউশ ধান একরূপ মোটেই জন্মে নাই; যাহা কিছু জন্মিয়াছিল তাহাও অসময়ে বর্ষা আসিয়া ডুবাইয়া দিয়া গিয়াছে। আশ্বিন মাসের ভীষণ বর্ষা আমন ধানের চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিয়া যায় নাই। চাষিগণ ২।১ মণ পাট যাহা পাইয়াছিল তাহা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া দুই এক দিনের ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছে।

ফলে রংপুর জেলার সাঘাটা থানার জুমারবাড়ী ইউনিয়নের বেঙ্গারপাড়া, ঝগড়েরপাড়া, জটিয়ারপাড়া, আবদুল্লাপাড়া, বাদিনারপাড়া, আমদিরপাড়া, জুমারবাড়ী, চাঁদপাড়া, কাঠুর, কুন্দপাড়া, বসন্তেরপাড়া, মামুদপুর, দাহচড়া, মেহটি, বাজিতনগর, কামারপাড়া প্রভৃতি গ্রামসমূহে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই অন্নাভাবে ৫।৬টি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। উপবাস-ক্লিষ্ট পরিবারের হাহাকার, ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের মর্ম্মভেদী চীৎকার আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া তুলিয়াছে।

(দৈনিক বসুমতী)

কলেরার প্রকোপ

উলিপুর থানার গুণাইগাছা ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত ২০।২২টি গ্রামে গত আশ্বিন মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত যার পর নাই ভয়াবহ কলেরা হইয়া গেল। এরূপ বহু-গ্রামব্যাপী মহামারী ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

(রংপুর-দর্পণ)

মেলায় গণিকা

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া উত্তরবঙ্গের মেলাসমূহে গণিকা আমদানির বিষয়ে বাঙ্গালার যাবতীয় সংবাদপত্রে বিশদ আলোচনা চলিতেছে। কি ভাবে প্রকাশ্য মেলায় সামান্য অর্থলালসায় নির্লজ্জভাবে ব্যাধি-ক্লিষ্ট এই সকল গণিকাকে ব্যবসা করিতে দেওয়া হয় এবং কি ভাবেই বা তদ্দ্বারা নিরক্ষর কৃষক-সাধারণের সন্তান-সন্ততিগণ গণোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়, এবং উহার চিকিৎসার অভাবে অকালে মৃত্যুকে বরণ করে, কেহ কেহ বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

এ কয়েক বৎসর মেলাতে গণিকা ও জুয়া খেলার আমদানি একটু কমিয়াছিল, এবার দুর্ভিক্ষ এবং অর্থসঙ্কটের দিনেও আবার ইহা পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে। রংপুর জেলার

বামনডাঙ্গার মেলাতে সেদিন বীভৎস দৃশ্য পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। আবার উক্ত জেলার সুন্দরগঞ্জ গ্রামে একমাস-কাল-স্থায়ী যে একটি মেলা বসিয়াছিল তাহাতেও বহুসংখ্যক ব্যাধিক্লিষ্ট গণিকা তাহাদের কদর্য্য ব্যবসায় পরিচালন করিয়াছে।

উক্ত মেলার সন্নিকটবর্ত্তী তারাপুর চর, বিরহিম এবং ডাংঘাট প্রভৃতি গ্রামে এই সময় ভয়ানক কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

শ্রীশশিভূষণ দাস
(রংপুর-দর্পণ)

পারঘাটে যাত্রীর অসুবিধা

কুষ্টিয়া এবং পাবনা সহরের মধ্যে দূরত্ব মাত্র ৭।৮ মাইল। এই দুই সহরের মধ্যে গোরাই ও পদ্মা নদী অবস্থিত। কিন্তু ষ্টিমার সার্ভিস না থাকায় পাবনা হইতে কুষ্টিয়ায় যাইতে হইলে মোটরে ঈশ্বরদী যাইয়া তথা হইতে ট্রেনে যাইতে হয়। ইহা বহুসময়সাপেক্ষ এবং ইহাতে অর্থ-ব্যয়ও যথেষ্ট। মোটর ভাড়া ১৲ এবং ট্রেন ভাড়া ৸৵০, একুনে ১৸৵০ খরচ লাগে। কিন্তু যদি কেহ পদব্রজে কুষ্টিয়া যাইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহার মাত্র ৴১০ ছয় পয়সা খরচ পড়ে; পাবনা হইতে কুষ্টিয়া যাতায়াতের পথ অতি সুন্দর; কিন্তু খেয়া পারের সুব্যবস্থা না থাকায় যাতায়াতে খুবই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। গত সনে পদ্মা নদীতে বাজিতপুর ঘাটের খেয়া কেদার নামে এক ব্যক্তি বন্দোবস্ত লইয়াছিল। সে সর্ব্বসময়ের জন্য ঘাটে দুইখানা করিয়া নৌকা রাখিত এবং প্রতি নৌকায় ২ জন করিয়া পাটনী রাখিত। এক পার হইতে একখানা নৌকা ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই অপর পার হইতে অন্য নৌকাখানা ছাড়িত; তাহাতে যাত্রীদের খেয়াঘাটে অযথা সময় নষ্ট করিতে হইত না। ভদ্রলোকের সহিত কেদারের ব্যবহারও ভাল ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত খেয়াঘাট ত্রৈলোক্য পাটনী নামক এক ব্যক্তি বন্দোবস্ত লইয়াছে। তাহার ব্যবহার ভদ্রলোকের সহিত বড় সুবিধাজনক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সে এবৎসর উক্ত খেয়াঘাটে মাত্র একখানা নৌকা এবং একজন পাটনী রাখিয়াছে। অত বড় পদ্মা নদী, তাহাতে যদি এক খেয়া না পাওয়া যায় তবে ২॥ ঘণ্টা ৩ ঘণ্টা কাল কোন প্রকার ছায়াহীন বালিচরের উপর বসিয়া সময় কাটাইতে হয়। সেখানে খেয়াযাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য কোন প্রকার বন্দোবস্ত নাই, কেবল ৩।৪ মাইলব্যাপী ভয়ঙ্কর বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। এমন জানা গিয়াছে যে, বিকাল বেলা কোন কোন দিন খেয়া বন্ধও থাকে।

নানা কারণে যাত্রীদিগকে ও ভদ্রলোকদিগকে বিশেষ অসুবিধা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। অথচ এই সমস্ত অসুবিধা না থাকিলে যাতায়াত করিতে শতকরা ৯৫ জন যাত্রী এই ঘাটে পার হয় এবং এটা একটা লাভজনক ঘাটও হইতে পারে।

শ্রীকিশোরীমোহন পাল
(সুরাজ—পাবনা)

পাবনায় অন্নকষ্ট

বর্ত্তমান বর্ষে শস্যাদি উৎপন্ন না হওয়ায় আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া খাদ্যের সংস্থান করিতে না পারিয়া কেহ কেহ অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে ২।১ দিন অতিবাহিত করিতেছি। অনেকেরই পরিধেয় বস্ত্র নাই, শীত-নিবারণের কোন উপায় নাই।

সোনাউল্লা ফৌজদার, ভাসা প্রামাণিক, আরি বক্স প্রামাণিক প্রভৃতি ৫৯ জন মুসলমান, সাং মনোহরা ও যুগনিবাড়ী, ষ্টেঃ উল্লাপাড়া। সাহেবচাঁদ প্রভৃতি ৫ জন মুসলমান সাং গাঁড়াদহ। এবং

বনমালী দত্ত, যুধিষ্ঠির দত্ত প্রভৃতি ৮ জন হিন্দু সাং যুগনিবাড়ী ও মরিচা ষ্টেশন উল্লাপাড়া।

(সুরাজ-পাবনা)

রাজসাহীর শিল্প

রাজসাহী জেলার সর্ব্বপ্রধান শিল্প হইতেছে কাঁসাপিতলের কাজ। নাটোর মহকুমার কানাইখালি, পালুয়াপাড়া, বুধপাড়া ও কলসগ্রামে এই কাজ চলিয়া থাকে।

প্রতি বৎসর কাঁসা, পিতল ও ভরণের প্রায় ৬৩৩০ মণ জিনিষ প্রস্তুত হয়,—মূল্য সাড়ে তিন হইতে চার লক্ষ টাকা।

কানাইখালি ও পলুয়াপাড়াতে ১৬ জন বৈরাগী কাঁসার নানাপ্রকারের চামচ তৈয়ারি করে। তৈয়ারি মালের গড়ন, পালিশ অতি সুন্দর, চাহিদাও খুব বেশী। বুধপাড়া ও কলমে নানাবিধ দ্রব্য তৈয়ারী হয়; কারখানার সংখ্যা যথাক্রমে ৪২ এবং ৪৪।

রাজসাহীর মটকা প্রসিদ্ধ, কিন্তু এই ব্যবসায় ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে রাজসাহী জেলায় মটকার সূতা তৈয়ার হইত, এখন চারঘটে ও নবা থানায় সামান্য কিছু মটকা হয়। বৎসরে প্রায় পঞ্চাশ মণ সূতার কাজ হয়, তার মধ্যে মাত্র একমণ এই জেলায় জন্মে আর বাকী ৪৯ মণ আসে মালদহ হইতে। ৫০ ঘর লোক ৬৪ খানা তাঁতে প্রায় ১৫০০ জোড়া কাপড় বোনে, মূল্য প্রায় ৪৫০০৲ টাকা।

কেশবপুর ভেড়িপাড়া গ্রামে ১৪।১৫ ঘর পশ্চিমা লোক কম্বল তৈয়ারী করে, এক একখানি কম্বলের দাম চার টাকা হইতে বার টাকা পর্য্যন্ত। বৎসরে প্রায় ৫০০ খানা কম্বল হয়।

এ জেলার বস্ত্র-বয়ন শিল্প অধিক বিস্তৃত নহে। বৎসরে প্রায় ৮০,০০০ টাকার মাল প্রস্তুত হয়।

সদরে সিপাইপাড়া ও নাটোর, নলপুর গ্রামে চামড়া পাকা করা জুতা তৈয়ারী হয়। কারিকর পশ্চিমা মুচি; জুতার পরিমাণ বাষিক ১৮০০ জোড়া।

পাঁচ ছয় বৎসর হইল রাজসাহী সহরে ষ্টিল ট্রাঙ্ক, সুটকেস, বাক্স ইত্যাদি তৈয়ারী হইতেছে।

বাবলা কাঠে গরুর গাড়ীর চাকা অনেক স্থানে তৈয়ারী হয়।

জেলার সর্ব্বত্রই আকের গুড় তৈয়ারী হয়, কিছু কিছু মিস্রিও তৈয়ারী হইয়া থাকে।

রাণীগঞ্জের অনুকরণে সম্প্রতি ভালোরে টালি তৈয়ারী আরম্ভ হইয়াছে।

(ত্রিস্রোতা—জলপাইগুড়ি)

মালদহের শিল্প

মালদহ জেলা কাঁসা-পিতলের কাজের জন্য বিখ্যাত। রাজসাহী বিভাগে মালদহই এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার কারবার চলিতেছে। উৎপন্ন মাল রাজসাহী, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী জেলায় ও বহুদূরবর্ত্তী জেলায় চালান হয়। নানাবিধ বাসনপত্র ছাড়া, বিভিন্ন রকমের অস্ত্রাদি তৈয়ারী হয়। ইংরাজ-বাজার, কলিগ্রাম, নবাবগঞ্জ, শঙ্করবাটী, চর জোত প্রতাপ, মাজপাড়া, বিলপার, আজাইপুর প্রভৃতি স্থানে বহু কার-খানায় বহু লোক এই কাজে নিযুক্ত আছে।

শিবগঞ্জ থানার ৫টি গ্রামে ৫৬টি পরিবার ১১২ খানা তাঁতে বৎসরে প্রায় ৪১০০ খানা শুদ্ধ রেশমী সাড়ী বুনিয়া থাকে, মূল্য প্রায় ৭০,০০০ টাকা।

খরবা, কালিয়াচক এবং শিবগঞ্জ থানার ৯টি গ্রামে ২৯৯ খানা তাঁতে মোটা সুতার কাপড়, বিছানার চাদর এবং মশারির কাপড় বুনান হয়। উৎপন্ন মালের মূল্য প্রায় ৯০,০০০ টাকা।

মালদহে আর এক প্রকার কাপড় তৈয়ারী হয়, তাহার নাম কাটারী কাপড়। টানায় শুদ্ধ রেশম ও পড়নে কার্পাস-সূত্র ব্যবহার করা হয়। কাটারি কাপড় নাকি দেখিতে অতি সুন্দর। এই কাজে ৬৪টি পরিবার ৬০ খানা তাঁত চালায়।

সম্প্রতি গুঁছা রেশম ও মটকা হইতে সূতা কাটিবার জন্য এক প্রকার নূতন চরকা কয়েকটী গ্রামে ব্যবহৃত হইতেছে।

হায়দারপুর গ্রামে ২২টি লোক চামড়া পাকা করা আরম্ভ করিয়াছে।

(ত্রিস্রোতা—জলপাইগুড়ি)

সাইকেল

সন্ধ্যার পর আলো ব্যতিরেকে সাইকেলের চলাচল আইন-নিষিদ্ধ। এ সহরেও সময় সময় দেখিয়াছি এই আইন কিছু সময়ের জন্য প্রচণ্ডভাবে খাটান হইয়া থাকে। তারপর যথা পূর্ব্বং তথা পরং।

অনেকেই সন্ধ্যার পর ভ্রমণ-শেষে বাঁধের রাস্তা দিয়া ফেরেন, ঐ সময় আলোহীন সাইকেলের শব্দ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভ্রমণকারিগণ যথেষ্ট বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকেন। অন্যান্য রাস্তায়ও ঐভাবেই সাইকেল চলে।

রাস্তা সংস্কার

ষ্টেশনে যাইবার বাঁধ রাস্তা এতকাল পরে নব কলেবর ধারণ করিয়াছে। এই অসংস্কৃত রাস্তাটির জন্য বহু অসুবিধাই ভোগ করিতে হইয়াছে। অন্যান্য খটমটে গর্ত্ত-যুক্ত রাস্তাগুলির উপরও মাঝে মাঝে দৃষ্টি পড়িলে পথিকগণ উপকৃত হইতে পারে।

পূজা, রথযাত্রা বা সেইরূপ কোন উৎসব উপলক্ষে রাস্তায় লোক-চলাচল একটু বেশীই হইয়া থাকে। সহরে মোটর বাসের কমতি নাই এবং ঐ সব সময়ে চলাচলও করে সকল রাস্তা দিয়াই। অতি বড় বিরাট দেহ লইয়া অল্পপরিসর রাস্তায় যাতায়াত করিলে অসুবিধার সৃষ্টি হয় যথেষ্ট।

গত মহাষ্টমীর রাত্রে দেবী দর্শন করিবার জন্য সহরের রাস্তায় মেয়ে ও বালকবালিকার ভীড় দেখা গিয়াছিল। কুতুবপুরে দেবী দর্শন করিয়া অনেকগুলি মেয়ে ও বালক-বালিকা ভীড় কম বলিয়া বাঁধ রাস্তায় ফিরিতেছিল—সেই সময় একটি বাস ঐ পথে সকলের ভীতি উৎপাদন করিয়া বেগে চলিতেছিল। দূর হইতে আলো দেখিয়াই ছেলেমেয়েদের ভিতর গেল-গেল রব পড়িয়া যায়। অনেকে বাঁধের নীচের গর্ত্তে ও জঙ্গলে সর-সর করিয়া নামিয়া পড়ে।

এস্থানে ম্যালেরিয়া কিরূপ বাড়িয়া যাইতেছে তাহা ভুক্তভোগী সহরবাসী সকলেই জানেন। এরূপ অবস্থায় গলি উপগলিগুলি পরিষ্কার করা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। সারা গলি ধরিয়া নর্দ্দমার ময়লাগুলি ছোট ছোট ঢিপে পরিণত হইয়া রাস্তা সংকীর্ণ করিয়া চলিয়াছে। তারপর বাড়ীর যে সব ছোট নর্দ্দমা মিউনিসিপ্যালিটির বড় নর্দ্দমায় আসিয়া পড়িয়াছে সে সবের অবস্থা আরও খারাপ। কোনটি বা বোজা, কোনটার উপরের কাঠটা ভাঙ্গা, একধারে পা দিলেই ঢেঁকির মত উঠিয়া পড়ে। আবার অনেক সময় পায়খানার জল বা বাড়ীর জল নর্দ্দমায় না পড়িয়া রাস্তা দিয়া বহিয়া যায়।

ট্রেন

রাত্রি ১টার ও ভোর রাত্রির ডাউন ও আপ দুইটি ট্রেনই ১৫ই অক্টোবর হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা যাত্রীদের আমনুরায় বদলী হইয়া সরাসর নূতন লাইনে যাইবার যথেষ্ট সুবিধা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে বদলী করিবার জায়গা আর একটি বাড়িয়াছে অর্থাৎ আমনুরা ও ঈশ্বরদীতে গাড়ী বদল করিতে হইবে। ঈশ্বরদীতে গাড়ী বদল করিবার সময় রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। একটি ট্রেন ধরিতে না পারিলে পুরা ২৪ ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হইবে। ভোরের গাড়ীতে মফঃস্বলবাসী মালদহে মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া ফিরিয়া যাইতে পারিত। বেলা ১২টার গাড়ীতে আসিয়া মামলা মোকর্দ্দমা করা সম্ভব নয়। ১২টার গাড়ীর সময় কিছু আগাইয়া কোর্ট ট্রেণ করিয়া দেওয়া যায় না কি?

(মালদহ-সমাচার)

ত্রিপুরায় প্রজাগণের দুর্দ্দশা

উত্তর ত্রিপুরা প্রজাহিতসাধন সমিতির সেক্রেটারী মৌলবী আফসার উদ্দিন ভূঁইয়া বঙ্গীয় গবর্ণরের চীফ সেক্রেটারীকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন (ডিসেম্বর ১৯৩০)।

গত ২০ বৎসর কাল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর থানার অধীন ক্রোরা, বরিশাল, চুণ্ডী, চাপৈর, দুবলি, পাইকপাড়া চুটিয়াতা, প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসিগণ অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতেছি। প্রতি বৎসর বন্যায় আমাদের সকল ফসল নষ্ট হইয়া যায়। বন্যা সরিয়া যাইবার পর আমাদের এবং আমাদের গরু বাছুরগুলির খাইবার কিছুই থাকে না। আমাদের এই দুর্দ্দশার প্রধান প্রধান কারণ এই:—

(১) তিতাস নদী ক্রমে ভরাট হইয়া যাওয়ার ফলে এই সকল স্থানে প্রতি বৎসরই বন্যা হইয়া থাকে।

(২) এ বি রেলের কর্তৃপক্ষগণ যথোপযুক্ত পুলের ব্যবস্থা না করিয়া রেল লাইন নির্ম্মাণ করাতে এখানকার জল-নিকাশের স্বাভাবিক পথগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় মৎস্যজীবিগণ তাহাদের স্বার্থসাধনের জন্য নদী হইতে কচুরীপানা সরাইতে বাধা দিতেছে।

উল্লিখিত কারণে আমরা আমাদের গৃহ-পালিত পশুগুলি সহ অনাহারে মরিতে বসিয়াছি। তাহার উপর প্রতি বৎসর আমাদের কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও সরকার আমাদিগকে ঋণদানে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন।

যাহাতে শীঘ্র আমাদের দুর্দ্দশার মোচন হয়, সেজন্য আমরা আবার সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আমরা এরূপ প্রস্তাব করিতেছি যে, আমাদের জমিতে যে স্বত্ব আছে, সরকার তাহা কিনিয়া লউন। তাহার দ্বারা আমাদের যে কিছু মূলধন সংগ্রহ হইবে, তাহার সাহায্যে আমাদের এবং আমাদের শিশুসন্তানদের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিব।

আমরা বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলে কাতরভাবে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। যদি আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করা না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে খাজানা এবং অন্য সকল করপ্রদান বন্ধ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। (দৈনিক বসুমতী)

স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি

দৌলতপুর গ্রামবাসীর আন্তরিক চেষ্টায় তথায় সম্প্রতি একটী স্বাস্থ্যসমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতি-সাধন করা, যথা, বাগান পরিষ্কার, খানা-ডোবা প্রভৃতির দূষিত জল নিকাশের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। (খুলনাবাসী)

খুলনা-বাগেরহাট লাইট রেলওয়ে

রূপসায় মালগুদাম না থাকার জন্য সন্ধ্যা ৬-২০ মিনিটের ট্রেনখানি কোনদিনই যথাসময়ে যায় না—কোন কোন দিন দুই ঘণ্টা বিলম্বও হয়। কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয় রূপসায় একটা মালগুদাম করিয়া সন্ধ্যার ষ্টীমারে যে সমস্ত মাল আসে তাহা পর দিন পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হউক, আর না হয় খুলনায় ত মালগুদাম আছে, খুলনা হইতে যাহাতে সন্ধ্যার ষ্টীমারে অধিকসংখ্যক মাল রূপসায় পাঠান না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক। গাড়ীতে রাত্রিতে আলো থাকে না। কোন কোন ক্রু যাত্রীদের সহিত অসদ্ব্যবহার করে।

সেচ সম্বন্ধে তথ্য-নির্ণয়ের চেষ্টা
ময়ূরাক্ষীর খাল

শিউড়ীর উত্তর-পশ্চিমে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত খাটাঙ্গী নামক স্থান হইতে ময়ূরাক্ষী নদীতে খাল কাটিয়া ময়ূরাক্ষীর জল লইয়া গিয়া ধানগ্রাম, রণপুর, তিলপাড়া, ধল্লা, রঙ্গাইপুর, দেরপুর, বাতাসপুর, ভালাস, ঘাটতোর প্রভৃতি স্থানের জমি সেচ করার যে প্রস্তাব চলিতেছিল, তাহার প্রতিবাদ করিয়া কান্দী সবডিভিসনের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে সরকার বাহাদুরের নিকট উপর্য্যুপরি কয়েকখানা দরখাস্ত করা হয়।

গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কান্দী মহকুমার অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগের মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট কলিকাতা মোকামে উপস্থিত হইয়া ময়ূরাক্ষী নদী হইতে খাটাঙ্গীর নিকট দিয়া খাল খনন করিয়া জল অন্য দিকে লইয়া গেলে কান্দী মহকুমার অধিবাসিগণের কি ভীষণ সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে তাহা বিবৃত করেন। পক্ষান্তরে উক্ত খাল খননের সমর্থকগণ এই মর্ম্মে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, ময়ূরাক্ষী ও তাহার শাখাপ্রশাখার জল দ্বারা অতি সামান্য পরিমাণ জমির সেচ হইয়া থাকে ও উক্ত খাল খনন দ্বারা কান্দী মহকুমার বস্তুতঃ কোন ক্ষতি হইবে না। উক্ত খাল দ্বারা দেড় লক্ষ বিঘা জমির সেচকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয় আশ্বাস দিয়াছেন যে, আপাততঃ উক্ত ক্যানেলের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়ার আশা কম। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, ক্যানাল সম্বন্ধে আর কোনও কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে উপযুক্ত

তদন্ত হইবে। যদি তদন্তে প্রকাশ পায় যে, ময়ূরাক্ষী নদী ও তাহার শাখা নদীর দ্বারা যে পরিমাণ জমি সেচ হইয়া থাকে প্রস্তাবিত খালের জল দ্বারা তদপেক্ষা অধিক জমির সেচ হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে সরকার বাহাদুর বহু টাকা ব্যয় করিয়া ঐ খাল খনন করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। প্রকৃত পক্ষে ময়ূরাক্ষী নদী ও তাহার শাখা নদী সকলের জল দ্বারা এক্ষণে কান্দী মহকুমার অনূন দুই লক্ষ বিঘা জমি সেচ হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত খালের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের তরফের হিসাব মতে ৬০,০০০ একর বা প্রায় এক লক্ষ আশী হাজার বিঘার অধিক জমি সেচ হইবে না। সুতরাং কান্দী মহকুমার প্রায় দুই লক্ষ বিঘা জমির সেচ নষ্ট করিয়া অন্যত্র তদপেক্ষা কম জমির সেচের ব্যবস্থা করা সরকার সমীচীন বিবেচনা করেন না। প্রস্তাবিত খাল খনন দ্বারা মহকুমার অধিবাসিগণের যে কি ক্ষতি হইবে ও উক্ত নদীর জল হইতে প্রকৃত পক্ষে কি পরিমাণ জমির সেচ হইয়া থাকে তাহা প্রমাণ করা এক্ষণে আমাদের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে ঐ নদীর জল হইতে কি পরিমাণ জমির সেচ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ জলাভাবের বৎসর উক্ত নদী বাঁধাইয়া যে সকল স্থানের জমিতে সেচ হইয়া থাকে তাহার একটা বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগের মাননীয় সদস্য মহোদয়ের গোচরীভূত করিতে হইবে। এ জন্য আমরা কান্দী মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইউনিয়নের মধ্যে কোন্ গ্রামের কত জমির সেচ ঐ নদীর জল হইতে পাওয়া যায় তাহার সঠিক তদন্ত করিয়া একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া কান্দী সাবডিভিশনাল এসোসিয়েসনে প্রেরণ করেন।

(কান্দীবান্ধব-মুর্শিদাবাদ)

নদীর উপর সেতু চাই

কান্দী হইতে রাধারঘাট পর্য্যন্ত জেলাবোর্ডের যে রাস্তা আছে তাহাতে পিচ দেওয়া হইতেছে। রাধারঘাট হইতে কান্দী আসিবার পথের কিয়দংশে পিচ দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত পথে পিচ দেওয়া হইলে যান চলাচলের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে এবং রাস্তাও ভাল থাকিবে। সমগ্র রাস্তায় পিচ দিতে কত ব্যয় হইবে তাহা আমরা জানি না। তবে আমরা এই সম্পর্কে একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। সকলেই জানেন রাধারঘাট হইতে কান্দী আসিতে হইলে রণগ্রামের নদী পার হইয়া আসিতে হয়। বর্ষার কয়েক মাস এবং তৎপরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত রণগ্রামের নদী পার হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রণগ্রামের নদীর উপর একটি সেতু নির্ম্মাণ করাইবার সংকল্প নানা কারণে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কান্দী দিয়া রেলওয়ে ট্রেন যাইবে এইরূপ ধারণা অনেক দিন পর্য্যন্ত অনেকের মনেই ছিল। সে আশা এখন আর নাই। কাজেই রণগ্রামের নদীর উপর সেতুর প্রয়োজনীয়তা এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন। আমাদের মনে হয় রাস্তায় পিচ দেওয়া অপেক্ষাও এই কার্য্যটির প্রয়োজনীয়তা অধিক।

(কান্দীবান্ধব-মুর্শিদাবাদ)

মাড়গ্রাম সংবাদ

মাড়গ্রাম ও সাহাপুর উভয়ের সম্মিলিত অবস্থার নাম মাড়গ্রাম। কোন অংশ মাড়গ্রাম ও কোন অংশ সাহাপুর তাহা মাড়গ্রামের অনেকেই জানিত না, সেটেল্‌মেণ্টের কৃপায় এখন লোকে তাহা জানিতে পারিয়াছে। মাড়গ্রামে প্রায় ২৬০ ঘর ও সাহাপুরে ২৯০ ঘর লোকের বাস। এই গ্রামে ৬ ছয় খানি বড় বড় কাপড়ের দোকান আছে, তাহারা স্বর্ণ, রৌপ্য ও তন্নির্ম্মিত অলঙ্কারও বিক্রয় করে। ৬।৭ খানি বেণেতি মসলার দোকান আছে, তথায় ঘৃত, ময়দা ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি সর্ব্বদা পাওয়া যায়। একখানি মনিহারি দোকান আছে, সে দোকানে লোহার সকল রকম আবশ্যকীয় জিনিষও পাওয়া যায়। গ্রামখানি এ জেলার মধ্যে রেশম ব্যবসার একটী প্রাচীন কেন্দ্র। এখানে রেশমের ত্রিবিধ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ পলু পোকা, বা গুটি পোকার জাতক কর্ম্ম

সম্পাদন, গুটি পোকা হইতে সূতা প্রস্তুত এবং বস্ত্র বয়ন। রেশমের ব্যবসা অনেকেই করিয়া থাকে,—অমৃতসহর, মান্দ্রাজ এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের মহাজনদের সহিতও ইহাদের রেশমের কারবার আছে। এখানকার মহাজনগণ যখন ইনকাম ট্যাক্স অফিসে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের হিসাব দাখিল করিয়াছিল তখন দেখা গিয়াছিল যে, আড়াই লক্ষ টাকার সূতার কাপড় ও বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকার সূতা বিক্রয় হইয়াছিল। এ বৎসরও সেই রকম বিক্রয় হইয়াছে। এ বৎসর বিলাতী কাপড় আমদানি হয় নাই। পার্শ্ববর্ত্তী ৭।৮ ক্রোশ দূর হইতে প্রত্যহই অনেক লোক ক্রয়বিক্রয় উপলক্ষে এখানে আসিয়া থাকে। অনেক সময় গ্রামখানি জনকোলাহলে মুখরিত হইয়া থাকে। গ্রামে একটী মধ্য ইংরাজী স্কুল, একটী বালিকা বিদ্যালয় ও দুইটী এল, পি স্কুল, একটী ডাক্তারখানা ও একটী ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস আছে। কেবল একটী হাটের অভাব ছিল। নিকটবর্ত্তী ৩।৪ মাইলের মধ্যেও কোন স্থানে হাট নাই। নিকটবর্ত্তী শুকলিয়া গ্রামখানিতে অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্তবংশীয় প্রাচীন জমিদার আছেন, তাঁহারাও অনেক সময় হাটের অভাব অনুভব করিয়া থাকেন।

গ্রামে "গোপীনাথ সমিতি" বলিয়া যুবকগণের একটি সমিতি আছে। সমিতি-গৃহে অনেকগুলি পুস্তক আছে। এই সমিতির সদস্যগণ শিক্ষিত ও ভদ্রসন্তান। ইঁহাদের মধ্যে মুসলমান ভদ্র-সন্তানও আছেন। ইঁহারা কখনও কখনও কংগ্রেস দলভুক্ত হয়েন। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যে সর্দ্দা আইন পাশ হওয়াতে ইঁহারা কংগ্রেসের উপর কিছু বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। এই সকল যুবক গ্রামের বারবিঘা নামক স্থানে হাট বসাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। সপ্তাহে ২ দিন অর্থাৎ সোমবার ও বৃহস্পতিবারে হাট বসিবে। বিক্রেতাগণকে আহ্বান করা হইতেছে। হাটের জন্য ২ খানি চালা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রত্যেকখানি ৪০ হাত লম্বা। ভবিষ্যতে এই হাট হইতে যাহা লাভ হইবে তাহা স্কুল ফণ্ডে দেওয়া হইবে। এ বৎসর এখানকার ধানের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নহে, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত জলাভাব ছিল। এক রকম পোকায় অনেক ধান্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

(কান্দীবান্ধব-মুর্শিদাবাদ)

বীরভূম শিল্প-প্রদর্শনী

বীরভূম শিল্প-প্রদর্শনীর (চলিত কথায় বড়বাগানের মেলা) সময় আগত প্রায়। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এ বৎসর মেলায় দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য ষ্টলের ব্যবস্থা নূতন রকমের হইবে। যাহাতে বীরভূমজাত দ্রব্যাদির এবং শিল্পের প্রাচুর্য্য মেলায় হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে। জনরব সত্য হইলে আনন্দের কথা।

২।১ বৎসর পূর্ব্বে প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের একটা আনুমানিক হিসাব বাহির হইয়াছিল। সেই হিসাব পাঠে জানা যায় মেলায় বিদেশী মাল, চপ্-কাটলেট, চা ও সিগারেটের কাট্‌তি বেশী, দেশী মালের বিক্রী খুব কম।

মেলার মধ্যে শিক্ষাপ্রদ একজিবিট যে সামান্য কিছু থাকে একথা সত্য। কিন্তু গেম অব্ ট্রিক্ ও স্কিল সংক্রান্ত খেলা, থিয়েটার, সার্কেস ও বায়োস্কোপের আয়োজন এত মনোহরণ করে যে শিক্ষিত অশিক্ষিত বেশীর ভাগ লোকই ঐ দিকে যায়। কাজেই কার্য্যক্ষেত্রে মেলার ভিতরের ষ্টলের মধ্যে বসন্তের টীকার উপকারিতা, ম্যালেরিয়ার মশার অপকারিতা এবং বিচিত্র রকমের ধান্যাদি বীজের পরিচয় দিবার জন্য যে সব আয়োজন থাকে, তাহার প্রতি নজর দিবার লোক অল্পই মিলে।

এবার মেলায় বীরভূমের শিল্প-উন্নতির জন্য প্রোপাগ্যাণ্ডা করা হইবে, এবং জনসাধারণকে কিছু কিছু সুশিক্ষা দিবার আয়োজন করা হইবে।

শিক্ষার নব আন্দোলন

শ্রীরামপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত

১। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।—ছাত্রেরাই জাতির তথা দেশের মেরুদণ্ড। আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্র পল্লীবাসী। আবার পল্লীর সংস্কার ও সংগঠন না হইলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। সুতরাং ছাত্রজীবনেই দেশের

ছাত্রগণের সম্মুখে পল্লী-সমস্যা উপস্থাপিত করিয়া তাহার বাস্তব সমাধানের মধ্য দিয়া সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশোপযোগী শিক্ষণীয় বিষয়ের অধ্যাপনা দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে উন্নত প্রণালীতে পল্লীজীবন যাপনের ইচ্ছা জাগাইয়া তোলা দরকার। এ স্কুলের ছাত্রগণের ব্রত পল্লীসেবা-পরায়ণ ও স্বাবলম্বী হইয়া যতদূর সাধ্য দেশের ও দশের সেবা করা।

২। উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়।—পল্লীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও আর্থিক উন্নতিতেই পল্লীর উন্নতি। কিরূপে উক্ত সর্ব্ববিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায় তাহাই চিন্তা করিয়া এ স্কুলের শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এখানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযোগী যাবতীয় বিষয়ের অধ্যাপনা ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়:

(১) স্বাস্থ্যরক্ষা—নিজ ও সাধারণ।

(২) রোগীর শুশ্রূষা ও প্রাথমিক প্রতিবিধান।

(৩) সঙ্ঘবদ্ধভাবে ও সমবায় প্রণালীতে সাধারণের হিতকর কার্য্য করা। যথা—ম্যালেরিয়া নিবারণ, বিশুদ্ধ পানীয়জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(৪) শ্রমের মর্য্যাদা জ্ঞান।

(৫) সর্ব্ববিধ বয়ন-শিল্প, সূতায় পাকা রং করা, চরকায় সূতাকাটা, ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, কাপড় কাচা, সাবান প্রস্তুত, ছাতা প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্পের মধ্যে যে কোন একটী।

(৬) উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য।

(৭) ব্যবসায়।

(৮) কুসংস্কার-বর্জ্জন।

(৯) নীতি ও ধর্ম্ম।

(১০) সঙ্গীত ও অভিনয়-কৌশল।

(১১) ব্যায়াম, খেলাধুলা ও নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ।

(১২) সর্ব্বোপরি স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ বড় করিয়া দেখা।

সুলতানপুর আদর্শ পল্লী; সুলতানপুরই উক্ত সর্ব্ববিধ শিক্ষণীয় বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩। শিক্ষাপদ্ধতি।—কোন কাজ নিজ হাতে করিয়া সেই সেই বিষয়ের জ্ঞানার্জ্জন—এই হইতেছে এখানে শিক্ষার মূলনীতি। এখানে ছাত্রদিগকে সর্ব্ববিধ শারীরিক শ্রমের কাজ করিতে হয়, সেই জন্য কোন কাজই আমাদের নিকট হীন বা ঘৃণ্য নহে।

৭। শিক্ষার ব্যয়।—এখানে ছাত্রদের জীবন-যাত্রার প্রণালী খুব সাধারণ। ছাত্রেরা যাহাতে বিলাস-বিমুখ ও কষ্ট-সহিষ্ণু হয় এ বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষকেরই দৃষ্টি আছে। ছাত্র ও শিক্ষকেরা একত্রে ছাত্রাবাসে অবস্থান করেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় প্রকার ছাত্রাবাসই আছে। বোর্ডিং খরচ মাসিক গড়ে ৬৲। ইহা ছাড়া জলখাবার, তেল, ধোবা ইত্যাদি বাবদ কিছু খরচ আছে। বিদ্যালয়ের বেতনের হার বিভাগীয় অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায়।

৮। স্কুলে ছাত্রগণের আয়।—শিল্প ও কৃষি বিভাগে ছাত্রগণ যাহা উৎপন্ন করে তাহার লাভের অংশ তাহারা নগদ পায়। এইরূপে অনেক ছাত্র মাসে ২৲।৩৲ উপার্জ্জন করিতে পারে। অধিক সময় কাজ করিলে তাহাদিগকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য গরীব ছাত্রদিগকে স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা দেওয়া।

৯। কেবল শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা।—বিদ্যালয়ে কেবল শিল্প ও কৃষি শিক্ষার্থীও ভর্ত্তি করা হয়। এরূপ শিক্ষার্থীকে কোনও রূপ বেতন দিতে হয় না। তবে যন্ত্রাদি যাহাতে নষ্ট না করে তজ্জন্য ৫৲ জমা রাখিতে হয়। শিক্ষা শেষ হইলে ও যন্ত্রাদি কিছু নষ্ট না করিলে এই টাকা শিক্ষার্থীকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। কেবল শিল্প-শিক্ষার্থীর অনেকে মাসে ৬৲।৭৲ পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে। শিল্প-শিক্ষার্থী বৎসরে যে কোন সময়ে ভর্ত্তি হইতে পারে, তবে মৌখিক শিক্ষার সুবিধার জন্য জানুয়ারী ও জুলাই মাসে ভর্ত্তি হওয়া আবশ্যক।

(বীরভূম-বাণী)

দাসকল গ্রাম বাণী-মন্দির

বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী নান্নুর থানার অধীন দাসকল গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে শীঘ্রই মধ্য ইংরেজী শ্রেণীতে উন্নীত করিবার জন্য উক্ত গ্রাম-নিবাসী এই

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ উদ্যোগী হইয়া গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। মধ্য ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে কৃষি ও শিল্প বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

আশুতোষ বাবু আজীবন শিক্ষা, শিল্প ও কৃষি বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে গ্রামে শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষ্য করিয়া অসীম বিরাগ ও সমালোচনার মধ্যেও ইংরেজী ১৮৮৪ সনে উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আশুতোষ বাবু বিদ্যালয়টির জন্য দশ কাঠা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন, বিদ্যালয়ের গৃহ ও আসবাবপত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং পানীয় জলের জন্য বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে একটি সুন্দর কূপ খনন করাইয়াছেন। বিদ্যালয়টি গ্রামের দক্ষিণে, মাঠের মধ্যে, সুন্দর উচ্চস্থানে, রেল ষ্টেশনের অতি নিকটে, ডিঃ বোর্ডের রাস্তার উপর অবস্থিত।

এই বিদ্যালয়ের প্রভাবে গ্রামে আজ অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের আবির্ভাব হইয়াছে।

বীরভূমে নারীশিক্ষা

বীরভূম জেলা নারী-শিক্ষায় বড়ই পশ্চাৎপদ মনে হয়। আমার যতদূর জানা আছে এ পর্য্যন্ত একটি হিন্দু বালিকাও এ জেলা হইতে ম্যাট্রিক পাশ করে নাই। পূর্ব্ব বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এবং কোন কোন জেলাতে দুইটি করিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। হিন্দু বালিকারা প্রতি বৎসর ম্যাট্রিক পাশ করিতেছে। এ জেলাতে এমন একটি বিদ্যালয় নাই যেখানে বালিকাদিগকে ইংরেজী, বাঙ্গালা, সঙ্গীত, কুটির-শিল্প ও ব্যায়াম প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। সিউড়ী সদরে বালিকাদিগের জন্য একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত ও তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত জি, এস, দত্ত আই সি এস মহাশয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এ স্থান ত্যাগের পর হইতে স্কুলটি কোন প্রকারে চলিতেছে। ঐ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এক্ষণে বিদ্যালয়টিকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

শ্রীসরোজিনী সরকার

সিউড়ী ম্যালেরিয়া-নিবারণী সঙ্ঘ

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জি, এস, দত্ত আই-সি-এস মহাশয়ের সভাপতিত্বে সিউড়ীতে একটি ম্যালেরিয়া-নিবারণী সঙ্ঘ বা এসোসিয়েসন হইয়াছে। এই সঙ্ঘের অন্তর্গত নিম্নলিখিত ৪টি কমিটি গঠিত হইতেছে সঙ্ঘ এই কমিটিগুলির কর্ম্মসূচীর মধ্য দিয়াই ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা, ম্যালেরিয়া যাহাতে সহজে মানুষকে আক্রমণ না করিতে পারে সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক উপদেশ প্রচার, ও অবরুদ্ধ জলের ডোবাতে কেরোসিন প্রয়োগ ইত্যাদি কার্য্য করিবে।

ওয়ারর্কিং কমিটি

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জি, এস, দত্ত, আই-সি-এস

সেক্রেটারী—ডাঃ বিধুভূষণ দাস, এম-বি

সেণ্টার কমিটি

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জে, এ, হাইড (সিবিল সার্জ্জন)

সেক্রেটারী—ডাঃ বিধুভূষণ দাস, এম-বি

চার্ট কমিটি

সভাপতি—ডাঃ জে, এ, হাইড (সিবিল সার্জ্জন)

সেক্রেটারী—ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-বি, ডি-টি-এম, ডি-পি-এইচ

প্রপাগ্যাণ্ডা কমিটি

সভাপতি—ডাঃ ইউ, এন, ঘোষ, এম-বি

সেক্রেটারী—শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী

সহরে ইতিমধ্যেই দুই স্থানে চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে ও রোগীদিগের চিকিৎসা হইতেছে। যাহাতে নিতান্ত দরিদ্র রোগীরা সঙ্ঘের নিকট হইতে বিনা পয়সায় সাগু, চিনি ও বার্লি পায় সেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বেচ্ছায় এই পথ্য-সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অর্থ-সংগ্রহের দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত থাকায় সঙ্ঘ তাঁহার উপর অর্থ-সংগ্রহের ভার দিয়াছেন।

যাহাতে সিউড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামেও নিয়মিতরূপে সঙ্ঘের চিকিৎসকগণ যাইয়া রোগীদের চিকিৎসা করেন, সে ব্যবস্থা হইতেছে। ইতিমধ্যে সহরে কয়েক জায়গায় ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ম্যালেরিয়া নিবারণের বিষয়ে সাধারণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং কয়েকটি পল্লীতে শতাধিক ব্যক্তিকে চিকিৎসা করা হইতেছে। সহরের চিকিৎসা-কেন্দ্র দুইটিতে বহু রোগী চিকিৎসিত হইতেছে।

ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব

শীত আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে কাঁথি মহকুমার অনেক পল্লীতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ঘরে ঘরে অনেক লোক উহাতে আক্রান্ত হইতেছে। কাঁথি সহরের পার্শ্ববর্ত্তী দারুয়া, হরিপুর, মহিষামুণ্ডা প্রভৃতি গ্রামে সম্প্রতি ম্যালেরিয়ার বিষম প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেক স্থলে গৃহসুদ্ধ লোক শয্যাগত হওয়ায় ঔষধ-পথ্য পর্য্যন্ত যোগাইবার লোকাভাব ঘটিয়াছে।

পল্লীগ্রামে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক সেই সকল স্থানে বাড়ীর চারিধারে কড়াই, মটর, খেসারী, অরহর প্রভৃতি ডাল, কলাই শুঁটি, সীম তুলাগাছ এবং আলফালফা নামক শুঁটি জাতীয় গাছের চাষ করিলে সেই বাড়ীর লোককে ম্যালেরিয়ায় আক্রমণ করিতে পারে না। ককেশাস্ এবং মিশর প্রদেশের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বহু স্থানে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পরীক্ষার পর উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে।

এখন এতদঞ্চলের বহু স্থানে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং নানা প্রকার শুঁটি জাতীয় কলাই চাষেরও সময় আসিয়াছে। সুতরাং এ সময়ে ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত প্রত্যেক স্থানেরই অধিবাসিগণকে গৃহ-সংলগ্ন বাস্তু ও উদ্বাস্তুতে নানারূপ কলাই এবং তুলা চাষ করিয়া এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

(নীহার—কাঁথি)

বিগত শরৎ কাল হইতে পটাশপুর থানার বামুনদা, কাণপুর, জামবাড় প্রভৃতি পল্লীতে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর এমন তাণ্ডব লীলা চলিয়াছে যে, উক্ত গ্রামসমূহের আবাল-বৃদ্ধ বহু নরনারীকে উহার কবলে পড়িয়া অকালে প্রাণ হারাইতে হইতেছে। এক একটি গ্রামে ন্যূনপক্ষে ২০।২৫ জন হইতে ৫০।৬০ জন পর্য্যন্ত অধিবাসীকে ইহাতে ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইতেছে। যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, তথায় অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, গ্রামগুলি জঙ্গলাকীর্ণ, যাতায়াতের সুবিধা নাই, বৃষ্টি নামিতে না নামিতেই রাস্তা-ঘাটগুলি জল-কাদায় পরিপূর্ণ হইয়া যাতায়াতের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। যে সকল পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ তাহা পার্শ্ববর্ত্তী গাছপালার দ্বারা ভরিয়া যায় এবং নিয়মিত রৌদ্র ও বাতাস খেখিতে পায় না। সুতরাং সেগুলি ম্যালেরিয়ার বিষাক্ত বাষ্প সঞ্চিত হওয়ার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। এর উপর পানীয় জলেরও ঐরূপ দুর্দ্দশা। তা' ছাড়া পথে ঘাটে যেখানে সেখানে পল্লীবাসীদের মল-ত্যাগের কদভ্যাসের ফলে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু অতিমাত্রায় ছড়াইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এতদঞ্চলের যে কতদূর সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বলিবার নহে।

(নীহার—কাঁথি)

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব

ভগবানপুর থানার ইটাবেড়িয়া ও পাথরবেড়িয়া গ্রামে সম্প্রতি ওলাউঠায় লোক মারা যাইতেছে। আমরা সংবাদ পাইলাম যে, পটাশপুর থানায় কলেরা রোগীর শবদেহ পোড়াইতে না পারিয়া খালের ধারে ফেলিয়া দেওয়ায় নাকি খালের উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামে কলেরা ছড়াইয়া পড়িতেছে। (নীহার—কাঁথি)

চালের কল বন্ধ

২০শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে বাণিজ্যের বাজারে মন্দা হওয়ার জন্য মেদিনীপুরে ছয়টি চালের কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। (নীহার—কাঁথি)

শস্যের অবস্থা

এতদঞ্চলের মাঠের ধান্য কাটা প্রায় শেষ হইতে বসিয়াছে। অনেক স্থলে ধান্য ঝাড়ানও চলিয়াছে।

আমরা অনেক স্থান হইতে সংবাদ পাইতেছি যে, লোকে এ বৎসর যে পরিমাণ ধান্ত ফসল জন্মিবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ফসলও জন্মে নাই। জালপাই মহালে এবং কোথাও কোথাও অতি সামান্ত স্থানে গড়পড়তায় বিঘা প্রতি ৮।৯ মণ ধান্ত জন্মিয়াছে, কিন্তু অন্ত স্থানসমূহে গড়ে ৫।৬ মণের অধিক শস্ত জন্মে নাই। তবে এ বৎসর খড় খুব উৎপন্ন হওয়ায় খড়ের অভাব সম্পূর্ণরূপ দুর হইবে এবং খড় যথেষ্ট শস্তা হইবে আশা করা যাইতেছে।

(নীহার—কাঁথি)

জলনিকাশ চাই

এতদঞ্চলের গভীর মাঠসমূহে এখনো যথেষ্ট জল আছে। এই জলের আর কোন দরকার নাই। এখন বৃষ্টি ও বাতাসে ধান গাছগুলি মাঠে জলশায়ী হইয়াছে। সুতরাং মাঠের জল সত্বর বাহির করিয়া না দিলে ঐরূপ জলে পড়িয়া খড়গুলি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এ অবস্থায় উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানেল আদি জলনিকাশী খালগুলি দ্বারা সত্বর ঐ জল নির্গত করিয়া দিবার সুব্যবস্থা হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।

খেয়া নৌকাডুবী

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বেলা প্রায় ৮॥০টার সময় হলদী নদীতে নবঘাট নামক স্থানে খেয়া নৌকাডুবী হইয়া প্রায় ৭০।৮০ জন লোক বিপন্ন হইয়াছিল। সে সময় নদীতে খুব জলের টান ছিল। নদীর মাঝখানে নৌকাটি জলমগ্ন হওয়ায় আরোহীরা বিপন্ন হয়। শুনা যায়, একজন স্ত্রীলোক ও একজন বালক জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই দিন নরঘাটের নিকটবর্ত্তী রাধাগঞ্জ বাজারের দিন ছিল। এই জন্ত বহুলোক প্রত্যেক বারে জমা হয়। একটী মাত্র খেয়ানৌকায় এতগুলি লোক পার হওয়া অসম্ভব জানা সত্বেও খেয়ার মালিক একাধিক নৌকা পাঠান নাই। জলমগ্ন হইবার পর আর একখানি খেয়ার নৌকা পাঠাইয়া পরপারের যাত্রীদিগকে লইতে গেলেন। কিন্তু বিপন্নদের কিছু ব্যবস্থা হইল না। বাজারের নিকটবর্ত্তী অন্যান্ত নৌকার দ্বারা যাত্রীদের প্রাণ রক্ষা হইল। প্রত্যেক বারে দক্ষিণ তীর হইতে যাইবার সময় ৮।১০টী গরু ও ১০।১২ জন লোক লইয়া যাইতেছিল। ইহাতে নৌকা কাদায় পিচ্ছিল হওয়ায় মানুষের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকা কঠিন হইয়াছিল। অথচ সেই কাদার উপর মানুষকে বসিতে হইতেছিল।

এই নরঘাট খেয়ায় গরু ও ঘোড়া প্রভৃতি পার করিবার জন্ত একটী চাপ আছে। তাহাতে গরু পার করায় নৌকাটী মানুষের পার হওয়ার উপযুক্ত থাকে না। আর হাটবারে অন্ততঃ ২।৩ খানি খেয়ানৌকা না দেওয়ায় এইরূপ বিপদের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি এই নৌকার ক্ষমতানুযায়ী লোক লইত, তাহা হইলে এই বিপদের সম্ভাবনা হইত না। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ বিপদ না ঘটে ও নৌকাটী গরু-বাছুর দ্বারা পিচ্ছিল না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। আমি পূর্ব্ববর্ত্তী খেয়ায় নদী পার হইয়া ঘটনার সময় নরঘাটে জলযোগ করিতেছিলাম।

শ্রীবিশ্বনাথ আদক, ডাক্তার,
বর্দ্ধমানরাজ দাতব্য চিকিৎসালয়
সুজামুঠা, কাজলাগড়।

পেটুয়াঘাটের পারাপার

সুন্দরবন আবাদাদির জন্ত এতদঞ্চলের বহুসংখ্যক নরনারীকে প্রতিনিয়ত রসলপুর নদীর মোহনাস্থ পেটুয়াঘাট হইতে ক্ষুদ্র বোটের দ্বারা বিস্তীর্ণ ও বিপদ-সঙ্কুল সমুদ্র-পথ পার হইয়া সুন্দরবনে যাতায়াত করিতে হয়। অল্পদিন পূর্ব্বে এই ঘাটে পারাপার সম্বন্ধে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও যাত্রিসাধারণের নানা অসুবিধা ছিল।

এক্ষণে ঘাটের উন্মুক্ত সাগরতটে একটি টিকিট ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে। একটি স্বতন্ত্র কক্ষে টেবিল চেয়ার আদি দিয়া একটি অফিস ঘরও করা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই উন্মুক্ত স্থানে যাত্রীদের একটু মাথা গুঁজিবার আশ্রয় স্থানও না থাকায় শীত, বর্ষা ও রৌদ্রে দুর্ভোগের অন্ত থাকিত না। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যাত্রীদের বিশ্রাম করিবার ও টিকিট কাটিয়া লইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই প্রকার টিকিট

প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত করার পূর্ব্বে বোটের উপর টিকিট দিবার সময় যাত্রীদের মধ্যে যে একটা তাড়াহুড়া ও বিভ্রাট ঘটিত তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে।

তারপর ঘাটে তীরের নিকট অনেকটা স্থান হাঁটু পর্য্যন্ত, কখন বা কোমর পর্য্যন্ত জল কাদা ভাঙ্গিয়া বোটে উঠিতে ও বোট হইতে নামিয়া তীরে আসিতে যাত্রীদের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদের বিষম ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা দ্বারা তীর হইতে বোটে উঠিবার ও বোট হইতে নামিয়া আসিবার বিশেষ ব্যবস্থা হওয়ায় সকলেরই—বিশেষতঃ বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক যাত্রীদের বহু দিনের একটা বিষম ক্লেশ ও অসুবিধা দূর হইয়াছে।

প্রত্যেক বোটে উপযুক্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানীয় জল, ফিনাইল এবং ওলাউঠার প্রতিষেধক দু'একটা ঔষধ সর্ব্বদাই রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং বোটে পচা মাছ ও শুকা আদি আনা সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে।

কোন বোটে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী একটা লোকও বোঝাই হইতে পারে না; পূর্ব্ব হইতে টিকিট কাটিয়া এবং আরোহী বোঝাই দিয়া, একখানি বোটে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক আরোহী হইলেই সেখানিকে ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাধারণতঃ ধান চাষ ও ধান কাটার মরসুমে পেটুয়াঘাট দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক যাত্রী সুন্দরবনে যায়। এই বৎসর এই ধান কাটার সময় বহুসংখ্যক লোক পেটুয়াঘাট দিয়া কাকদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে গিয়াছে। এজন্য এবার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত ৫ খানি বোট অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিয়া এবং ঘাটের ডে-লাইট ছাড়া আরও অতিরিক্ত ৫।৬টী গ্যাস লাইট ঘাটে রাখিয়া ঐ সমস্ত যাত্রী পার করাইতে হইয়াছে।

বর্ত্তমানে পেটুয়াঘাটে যে কয়েকখানি বোট পারাপার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই নূতন। তা ছাড়া বর্ত্তমান ইজারাদার নগেন্দ্র বাবু যাত্রী পারাপারের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার সুবিধাজনক অভিনব ধরণের একখানি বোট নূতন তৈয়ারী করিয়া পারাপার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই বোটখানির দুই-তৃতীয়াংশ নীচের দিকে বাদ দিয়া আরোহীদের বসিবার স্থান করা হইয়াছে। সাধারণ বোটে যেখানে আরোহীদের বসিবার স্থান আছে, এই নূতন বোটে তদপেক্ষা প্রায় একহাত নিম্নে আরোহীদের বসিবার স্থান করায় এবং বোটের তলদেশ অপেক্ষাকৃত চেপ্টা করায় উহাতে সহসা কোন দুর্য্যোগ উপস্থিত হইলেও বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা অল্প। তারপর বোটখানিতে জানালা ও খড়খড়ি দেওয়া থাকায় এবং স্ত্রীলোক আরোহীদের জন্য পৃথক পর্দ্দার ব্যবস্থা থাকায় বোটখানি সকল যাত্রীর পক্ষেই বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে।

এই ঘাটে এখন একটী প্রধান অভাব রহিয়াছে পানীয় জলের। সুন্দরবনের কোথাও ত বিশুদ্ধ পানীয় জল পাইবার উপায় নাই। কাজেই পেটুয়াঘাট হইতে প্রত্যেক বোটে পানীয় জল লইতে হয়; কিন্তু পেটুয়াঘাটের নিকটবর্ত্তী কোথাও বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় আমাদের মনে হয়, পেটুয়াঘাটের নিকটে একটা নলকূপ বসাইয়া বোটসমূহে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিলে সুন্দরবন-যাত্রী অসংখ্য নরনারীর একটি মহৎ উপকার করা হয়। (নীহার—কাঁথি)

শান্তি কৈ?

সারা জগতে আজ বাজার মন্দা। সমস্ত জিনিষের মূল্যই কমিতেছে; চাহিদা নাই, কারণ লোকের খরিদ করিবার মত সামর্থ্য নাই। এই মন্দার ভাব হইতে ভারতবর্ষও অব্যাহতি পায় নাই। তাহার উপর বিলাতী বর্জ্জন ত আছেই। প্রভূত পাট জন্মাইবার জন্য ও বিদেশের চাহিদা না থাকায় দর নাই। ধান্যও এবার ভারত এবং ব্রহ্মে প্রভূত পরিমাণে হইয়াছে। কাজেই ধান্যের দরও এবার খুব নামিয়া গিয়াছে। গমের অবস্থাও ঐরূপ।

খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য কমিলে সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক সমস্ত জিনিষের দর কমিতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের কাজের মজুরী কম করিতেই হইবে। নতুবা লোকে কাজ করাইবার পয়সা পাইবে কোথায়? শ্রমিকের পারিশ্রমিক কমিলে এখন কষ্ট হইবে না, কারণ তাহার আহার্য্য দ্রব্য সে সস্তায় পাইবে।

কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে খাবার ।৵০ আনা হইতে ॥০ আনা সের দরে বিকাইতেছে। কাঁচা মালের দর কম; কাজেই কম দরে মাল বেচিয়াও দোকানদারের লাভ হইতেছে। শুধু কলিকাতা বা হাওড়া বলিয়া নহে, মফঃস্বলেরও বহু স্থানে এইরূপ দর আপনা হইতেই কমিয়া গিয়াছে। মাছ, তরিতরকারী, চাল, ডাল, ঘী, ময়দা, তেল, মসলা প্রভৃতি সমস্ত জিনিষের দরই কমিয়াছে। আজ কালনায় যে প্রচেষ্টা হইতেছে, ইহা খাদকগণের পক্ষে সুখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কম হওয়ার ফলেও কি প্রকৃত পক্ষে লোকে সুখ পাইবে?

সারা জগতের বাজারে টান নাই। ব্যবসায় বাণিজ্য সব মন্দা। জিনিষপত্র সস্তা হইলেও সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে। অনেকের আয়ের পথ—ব্যবসায়, চাকুরী প্রভৃতি গিয়াছে। কাজেই জিনিষের দর কমিলেও দেশের লোকের সুখশান্তি যে আর ফিরিয়া আসিতেছে না ইহা সুস্পষ্ট।

(পল্লীবাসী—কালনা)

দর কমিল

গত ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখে মিউনিসিপ্যাল চেয়ার-ম্যান কবিরাজ বীরেন্দ্রকুমার মল্লিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় আহর্য্য-বস্তুর মূল্য কম হওয়ায় শ্রমিকগণের পারিশ্রমিকের হার কম করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। নিম্নলিখিত হারে পারিশ্রমিক দেওয়া স্থির হইয়াছে।

রাজমিস্ত্রী (৮ ঘণ্টা কার্য্যের জন্য)	...	৸৵০
পুঃ মজুর ”	...	॥৵০
স্ত্রী ” ”	...	॥/০
ঘরামী (৬ ঘণ্টা কার্য্যের জন্য)	...	॥০

ইহা ব্যতীত প্রত্যেকে ৫১০ হিঃ জলপানি পাইবে। জলযোগের জন্য উক্ত কার্য্যকাল হইতে ছুটী পাইবে না।

কোড়া কুলি (৬ ঘণ্টা—৮টা হইতে ২টা)		।৶০
উত্তরে কুলি (দুই বেলা কাজের জন্য)	...	॥৶১০
তবলদার (৮টা হইতে ১২টা)	...	॥১০

(পল্লীমঙ্গল—কালনা)

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য-নির্দ্ধারণ

গত ২১।১২।৩০ তারিখে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল অফিসে কালনার জনসাধারণ লইয়া কালনার খাদ্য দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যে বিচার-সভা হইয়াছিল তাহাতে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য স্থিরীকৃত হয়।

যে সকল খাদ্য দ্রব্যের মূল্য সভায় আলোচিত হয় ও জনসাধারণ কর্ত্তৃক মূল্যের যে হার গৃহীত হয় তাহার বিবরণ :—

১। বড় টাটকা কোটা মাছের সের ॥৵০
২। বড় টাকটা আস্ত মাছের সের ॥০ আনা
৩। মাঝারি পোনা ও টাটকা মাছের সের ।৵০ আনা
৪। চুনা মাছের সের ।০ আনা
৫। পাঁটার মাংসের সের ॥৵০ আনা
৬। দুগ্ধের ওজন ৮০ তোলায় সের ও প্রত্যেক সেরের মূল্য ১০ আনা।
৭। মিষ্টান্ন—ভাল ছানার সন্দেশ প্রত্যেক সের ৸০

ঐ মাঝারি	...	॥০ আনা
পানতুয়া	...	॥০ আনা
রসগোল্লা	...	।৵০ আনা

৮। ভাল ঘৃতে পাক করা লুচি কচুরী সিঙ্গারা ॥৵০ আনা
৯। বেগুন উর্দ্ধপক্ষে ... /০ আনা

(পল্লীবাসী-কালনা)

রাস্তার দুরবস্থা

কালনা ষ্টেশন রোড হইতে যে মিউনিসিপ্যাল অফিস রোড বাহির হইয়া রাজার বাজারের উত্তর দিয়া মিশন হাউস পর্য্যন্ত গিয়াছে উহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। ঐ রাস্তায় স্থানে স্থানে বড় বড় গর্ত্ত হইয়াছে, সে কারণ যানবাহনাদির চলাচল বিপদ-সঙ্কুল হইয়াছে। এবারকার বজেটে যদি রাস্তা মেরামতের জন্য আর টাকা না থাকে তবে অন্ততঃ "প্যাচ" মেরামত করা আবশ্যক।

(পল্লীবাসী—কালনা)

রাস্তায় ধূলা

কালনা মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তাগুলিতে টপিং দেওয়ার ফলে রাস্তাগুলি ধূলায় পরিপূর্ণ। তাহার উপর রাস্তা দিয়া কম্‌সে কম ১০।১২ খানি মোটরকার ও বাস্ যাতায়াত করিতেছে। ফলে রাস্তার ধারে যাঁহাদের বাড়ী তাঁহাদের ত দুর্গতির সীমা নাই, পথিকদেরও নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম। এই ধূলার মধ্যে হেন রোগবীজাণু নাই যাহা বর্ত্তমান নাই। সহরবাসীর স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও অন্ততঃ বড় বড় রাস্তাগুলিতে অবিলম্বে জল দিবার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। একটী মোটর-চালিত জল দিবার গাড়ী মিউনিসিপ্যালিটীর অবিলম্বে খরিদ করা উচিত। আজ কাল জল পাইবার কষ্ট নাই, তাহার উপর ঐ গাড়ীতে যদি পাম্প্ ফিট করা থাকে তবে সহরের কোন স্থানে আগুন লাগিলে দমকলের ন্যায় জল দিবার কার্য্যও চলিবে। এরূপ একটী আবশ্যকীয় জিনিষের জন্য আগামী বাজেটে টাকার বণ্টন আমরা আশা করিতে পারি না কি? রাস্তা তৈয়ারী করাও যেমন একটী কাজ তাহা রক্ষা করাও তেমনি দরকার।

(পল্লীবাসী-কালনা)

বাজার দর

ধান চাউল সস্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাল কলাই ময়দা চিনি, তৈল লবণ, হলুদ সুপারী ও মসলাদি যাবতীয় নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষের দর হ্রাস পাইয়াছে এবং দিন দিন ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। এখন সহর অপেক্ষা মফঃস্বলে সকল জিনিষই বেশ সস্তা দেখা যাইতেছে। মফঃস্বলে ধান চাউল ত যথেষ্ট সস্তা রহিয়াছে, তা' ছাড়া আজকাল কলিকাতা প্রভৃতি ব্যবসায়-কেন্দ্রসমূহ হইতে অনেকেই নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষসমূহ আনাইয়া মফঃস্বলে বেশ ব্যবসায় চালাইতেছে। ফলে সহর অপেক্ষা মফঃস্বলে যাবতীয় নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষই বেশ সুবিধা দরে পাওয়া যাইতেছে। এমন কি সহরের বাজারের সহিত তুলনা করিলে জিনিষ-বিশেষে মণ প্রতি ৩।৪৲ টাকারও বেশী তফাৎ দেখা যায়। এরূপ হইবার প্রধান কারণ কি তাহা চিন্তা করিলে মনে হয় যে, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সকল জিনিষের দরই যথেষ্ট সস্তা হইয়াছে—মফঃস্বলের ব্যবসায়ীরা সস্তা দরে সেই সমুদয় জিনিষ আনাইয়া ও অতি সামান্য মাত্র লাভ রাখিয়া সুবিধা দরে ছাড়িয়া দেওয়ায় শীঘ্র শীঘ্র তাহা কাটিয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের ব্যবসায় একরূপ চলিয়াছে। কিন্তু সহরের বাজারে সঙ্ঘবদ্ধভাবে জিনিষের দর একইরূপ ধরিয়া রাখায় ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত মন্দীভূত হইয়াছে এবং নানা কারণে লোক আর সহজে সহর বাজারে আসিতে চাহিতেছে না। একে ত দেশের অর্থ-সঙ্কটের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে, তারপর ঐরূপ দর ধরিয়া রাখার জন্য অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। লোকে যেখানে একটু সস্তা পায় সেইখানেই ক্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে সহর বাজারের ব্যবসায়ীদের যে বেশীর ভাগই ক্ষতি হইতেছে, এখন সে বিষয়ের চিন্তা করিয়া সকলের কার্য্য করা উচিত।

(নীহার—কাঁথি)

শস্যমূল্য ও খাজানা

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ ধান চাউলের উচ্চ মূল্য থাকায় কোন কোন ভূম্যধিকারী বা জমীদার এই শস্য-মূল্য বৃদ্ধির দোহাই দিয়া প্রজাগণের খাজানার টাকার উপর অতিরিক্ত কিছু কিছু খাজানা বৃদ্ধি করিয়াছেন। এখন শস্য-মূল্য আশাতীত কমিয়া যাইতেছে। এমন কি বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে ধান্যের মণ ||৵০ আনা পর্য্যন্তও নামিয়াছে। বিভিন্ন জেলার সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, বালুরঘাটে ||৵০ আনা, বীরভূমে ৸৵০ আনা হইতে ১৵০ আনা এবং বর্দ্ধমানে ১।০ আনা হইতে ১৸০ আনা মণ দরে ধান্য বিক্রয় হইতেছে। এ ছাড়া ধান, পাট, ডাল, কলাই, তরী-তরকারী আদি দেশের সর্ব্ববিধ উৎপন্ন দ্রব্যই এখন যথেষ্ট সস্তা হওয়ায় দেশের সকল স্থানেই একটা দারুণ অর্থ-সঙ্কট দেখা দিয়াছে। এ অবস্থায় যে সকল জমীদার শস্য-মূল্য বৃদ্ধির জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রজাদের খাজানার টাকার উপর কিছু কিছু অতিরিক্ত খাজানা বৃদ্ধি করিয়াছেন, এখন এই

শস্যমূল্য-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বর্দ্ধিত খাজানাটাও কমাইয়া দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় নহে কি ?

(নীহার—কাঁথি)

দেশের দুরবস্থা

অজন্মা হইলে বা খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িলে দুর্ভিক্ষ হয়। দেশে ফসল সুপ্রচুর—অনেক খাদ্যদ্রব্যের দাম এত কমিয়া গিয়াছে যে, গত ২৫ বৎসরের মধ্যে এমন কমে নাই। অথচ দেশে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, লোকে অনাহারে আত্মহত্যা করিতেছে, দেশব্যাপী হাহাকার উঠিয়াছে। চাল, আটা, তেল, শাকসব্জী তরীতরকারী সব সস্তা, বস্ত্র তৈজস প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যও সুলভ হইয়াছে। দিনাজপুরে ধানের মণ ৷৵০, বীরভূমে ৸৶০ আনা হইতে ১৵০, বর্দ্ধমানে ১৷০ হইতে ১৸০, অথচ লোকে হাহাকার করে কেন ? আসল কথা,—ফসল হইলেই পয়সা হয় না, ফসল দামে বিক্রয় হওয়া চাই। রপ্তানি বন্ধ হওয়াতে ফসলের দাম পড়িয়া গিয়াছে, গরীব চাষী বাজার উঠা পর্য্যন্ত ফসল ধরিয়া রাখিতে পারে না—তাহার জমীদারের খাজানা আছে, মহাজনের পাওনা আছে, নিজের খরচা আছে, এই সকল তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মিটাইতেই হইবে—যখন চাহিদা নাই, তাহাকে জলের দরে মাল ছাড়িয়া দিতে হইবে। বেপারী বা ব্যবসাদারেরও ঘরে পয়সা নাই, সে মহাজনের কাছ হইতে টাকা ধার করিয়া মাল ক্রয় করে—তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা না বেচিলে, মহাজনের সুদের ভারে আসল ছাপাইয়া যায়, কাজেই তাহাকে পড়তা ধরিয়া মাল বেচিতে হয়। তাহার ফলে সস্তা পাইল অ-চাষী বা ভোক্তা ; অথচ ব্যবসা মন্দা হওয়াতে ভোক্তার ঘরেও এমন পয়সা নাই যে কিনিয়া পেট ভরিয়া খায়। সুতরাং ফসল সস্তা হওয়াতে লাভ কাহারও হইল না। চাষী মাল বেচিয়া গণিয়া দেখিল, তাহার চাষে যে খরচা হইয়াছে, তাহা উঠে নাই ; জমীদারের খাজানা ও পাওনাদারের পাওনার গণ্ডা দিতে তাহার জমি বাঁধা পড়িল, —যে ধান চাষ করিয়াছে, সে পেটে খাইবে কি, তাহার জমিতেই টান পড়িল। পাটচাষীর আরও দুরবস্থা—সে পাটও বেচিতে পারিল না, পেটেও খাইতে পাইল না। এই জন্য দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। এই আর্থিক অসামঞ্জস্য যে সহজে দূর হইবে, তাহা বোধ হয় না। সরকার ধান-চাষের কথা কিছু বলেন নাই, তবে পাট চাষ আগামী বৎসর কমাইতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আগে অল্প সুদে ঋণ দিয়া চাষীকে বাঁচাইতে হইবে, তাহার পর চাষ কমাইবার কথা বলিলে সে কথা সে ভাবিয়া দেখিবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের উদ্যম

ডাঃ বি, এন, দে ইঞ্জিনিয়ার এখন কলিকাতা কর্পোরেশনের স্পেশাল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতেছেন। নিজের তত্ত্বাবধানে কলকব্জা বসাইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্যালয়ের এবং কয়েকটি রাস্তার আলো সরবরাহ করিবার উপযুক্ত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য তিনি একটি প্রস্তাব দিয়াছিলেন। গত সোমবার দিন করপোরেশনের সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ডাঃ দে বলিয়াছেন যে, আপাততঃ তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। আজকাল প্রতি বৎসর বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে ১২·৫৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। ডাঃ দে বলেন যে, তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিলে প্রতি বৎসর এ কার্য্যের জন্য করপোরেশনের ৪·৮৭ লক্ষ টাকার বেশী ব্যয় হইবে না এবং মোটের উপর কর্পোরেশনের ৭·৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হ্রাস হইবে।

ট্রাম কোম্পানীর বাস

কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী তাঁহাদের মোটর বাস বিভাগ উঠাইয়া দিতেছেন। ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে কলিকাতার পথে আর ট্রাম কোম্পানীর বাস চলিতে দেখা যায় না। কেবল যে বাসগুলি হাওড়ায় যায়, তাহা আরও কিছুদিন চলিবে। এই বাসগুলির সম্বন্ধে যে কনট্রাক্ট আছে, তাহার মিয়াদ ফুরাইলে এইগুলিও বন্ধ হইয়া যাইবে।

কেন হঠাৎ ট্রাম কোম্পানী তাঁহাদের মোটর বাস ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিতেছেন,—ইহা স্বাভাবিক প্রশ্ন। কোম্পানী তাঁহাদের বিজ্ঞাপনে ইহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, বাসের ব্যবসায়ে তাঁহাদের লাভ হইতেছিল না, লোকসানই হইতেছিল। প্রকাশ, কোম্পানীর লোকসান হইয়াছে ৩৫০০০ পঁয়ত্রিশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। সকলেই ব্যবসায় করে লাভের জন্য; কাজেই কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা যেমন বুঝিয়াছেন যে, বাসের ব্যবসায়ে তাঁহাদের লাভ না হইয়া লোকসান হইতেছে, অমনই তাঁহারা উহা বন্ধ করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন। লোকসানের কারণ কি তাহা লইয়া আমাদের মাথাব্যথার প্রয়োজন নাই; ট্রাম কোম্পানী বিলাতের কোটিপতি ধনকুবেরদের টাকায় গঠিত। সুতরাং বাসের কারবারে তাঁহাদের কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিবারও কিছু নাই। কিন্তু ইহা হইতে কলিকাতার এদেশী বাস-ব্যবসায়ীদের কিছু শিক্ষা করিবার আছে। ঘুঁটেকে পুড়িতে দেখিয়া গোবরের হাসির যেমন মূল্য নাই, ট্রাম কোম্পানীর বাস বন্ধ হইল বলিয়া দেশী বাস-ব্যবসায়ীদের উল্লাসও তেমনি নিরর্থক। মোটর বাসের বাড়াবাড়িতে যাত্রীদের যে অনেক সুবিধা হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই সব বাসের ত্রুটিও বহু। আমরা আশা করি কলিকাতার বাস সিণ্ডিকেট এই অবসরে কলিকাতার বাস সার্ভিসের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির সংশোধনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে ভুলিবেন না।

(বঙ্গবাসী)

বাঙ্গালার রাজস্ব

১৯৩০-৩১ সনের প্রথম ভাগে সরকারী তহবিলে ১,৯৪,৭৮,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। এবৎসর আয়ের অঙ্কে মোট ১০,৮৫,৬৪,০০০ টাকা জমা হইবে বলিয়া মনে হয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ অনুমান হয় ১১,৭৩,৩০,০০০ হাজার টাকা। কাজেই দেখা যাইতেছে, গত বৎসর এই সময় রাজস্বের পরিমাণ সম্বন্ধে যে হিসাব করা গিয়াছিব, তাহা হইতে ৮৭ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িতেছে।

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দফায় এইরূপ ঘাটতি হইবে,—

ভূমি রাজস্ব	৯·১৮
আবগারী	৪২·৫০
ষ্ট্যাম্প	২৬·৩৫
রেজিষ্ট্রেশন	৯·০০
বন বিভাগ	৩·৭৯
আমোদ-কর ইত্যাদি	২·২৫
বিচার বিভাগ	২·৩৪
	৯৫·৪১

তবে অন্যান্য দফায় আয় কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই তাহা ধরিলেও ঘাটতির পরিমাণ ৮৭ লক্ষ ৬৬ হাজারই দাঁড়ায়।

হ্রাসের কারণ

এই হ্রাসের প্রধান কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা অবস্থা। এই সম্পর্কে পাটের অত্যধিক মূল্য হ্রাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার ফলে বাঙ্গালার অধিবাসীদের ক্রয় করিবার শক্তি বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। আবগারী, ষ্ট্যাম্প, বন, রেজিষ্ট্রেশন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি বিভাগে ইহার সম্যক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

পক্ষান্তরে গত কয়েক বৎসর গবর্ণমেণ্টকে পুলিশ এবং জেল বিভাগে খরচের পরিমাণ বাড়াইতে হইয়াছে। তবে, অন্যান্য বিভাগে ব্যয়-সঙ্কোচ করাতে এই ক্ষতি পূরণ হইয়া গিয়াছে।

আগামী বৎসরের বাজেট তৈয়ারী হইতেছে। আগামী বৎসর গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা কিরূপ হওয়ার সম্ভাবনা তাহা ব্যবস্থাপক সভায় ঘোষণা করা হইবে। তবে, ইহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছে যে, ১৯৩০-৩১ সনে যেরূপ ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইয়াছে, ১৯৩১-৩২ সনেও সেইরূপ এবং সম্ভবতঃ আরও কঠোরভাবে করা হইবে।

ভারতীয় চায়ের কিস্মৎ

১৯২৯ সনের ভারতীয় চা সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্যপূর্ণ বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দুই ভাগ—প্রথম ভাগে প্রতিবেদন ও দ্বিতীয় ভাগে তালিকাসমূহ স্থান পাইয়াছে। প্রকাশিত সন্দেশ হইতে কোন কোন বিষয় নীচে আলোচনা করা যাইতেছে।

চা-চাষের ক্রমোন্নতির হিসাব

১৮৮৫ হইতে ১৯২৯ সন অবধি চায়ের আয়তন ও ফলন ভারতবর্ষে কিরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তা নীচের তালিকা দুইটি হইতে কিছু বুঝা যাইবে।

আয়তন (একর)

	১৮৮৫-৯ গড়	১৮৯০-৪ গড়	১৮৯৫-৯ গড়	১৯০০-৪ গড়	১৯০৫-৯ গড়	১৯১৭	১৯২১	১৯২৯
ব্রহ্মদেশ	৭৬	৭২০	১,২৩৩	১,৪৮৬	১,৬১৭	২,৭৯৯		
আসাম	২১১,৩০১	২৪৯,০৯৫	৩০৬,৯৭৭	৩৩৮,২৫০	৩৪২,৮৮৫	৩৯৯,৬৯০	৪১৭,২০০	৪২৯,৬০৫
বাঙ্গালা	৭৩,১৬৯	৯৫,৬২৫	১১৮,৪৫২	১৩৫,০৯৭	১৩৯,৩৯২	১৬৭,৭১৩	১৭৭,৩২১	১৯৫,২৬৯
বিহার উড়িষ্যা	...	...	...	...	...	২,১৭৮	২,১৫৬	৪,০৭৪
যুক্ত প্রদেশ	৮,৩৪৫	৮,৬২১	৮,০৩৬	৮,০৮৩	৭,৯৯৯	৭,৮৫৪	৬,৫৩৩	৬,০৪৭
পাঞ্জাব	৮,৭৯৪	৯,০৬৮	৯,৮৯৫	৯,৬১০	৯,৪০৩	৭,৪৯৮	৯,৭৭০	৯,৭০২
মান্দ্রাজ	৫,৫৫৮	৫,৩৮৫	৭,০১৬	৭,২৬৩	১২,০০৪	৩৫,৬০০	৪২,৪৯৬	৬৬,৮৭৮
কুর্গ	...	...	...	...	...	...	...	৪১৫
ত্রিপুরা	...	...	...	...	...	...	৪,৮৩১	৭,৮৯৫
ত্রিবাঙ্কুর	৩,৩৫২	৭.১৮৬	১৫,৮৮২	২৪,৯৩১	২৬,৯৯৮	৪৩,৭৫৬	৪৮,৬৯৯	৬৫,৩৯৭
মহীশূর	...	...	...	...	...	...	...	৩,২৬৪
কোচিন	...	...	...	...	...	...	...	২৯৬
মোট	৩১০,৫৯৫	৩৭৫,৫০০	৪৬৭,২৯১	৫২৪,৭২০	৫৪০,২৯৮	৬৬৭,০৮৮	৭০৯,০০৬	৭৮৮,৮৪২

উৎপাদন (পাউণ্ড)

	১৮৮৫-৯ গড়	১৮৯০-৪ গড়	১৮৯৫-৯ গড়	১৯০০-৪ গড়	১৯০৫-৯ গড়	১৯১৭	১৯২১	১৯২৫	১৯২৯
ব্রহ্মদেশ	১,৮৮৪	২৫,৫৮৪	৬৭,৬৬১	৬২,৯৮৬	১০৬,৫৪৪	১০৯,৬২৪			
আসাম	৬৬,৬৭৭,৩৭৩	৮৯,১৫৭,৭৪২	১১০,৮৫৩,১১৯	১৪১,১০৫,৭৪৯	১৬৩,৯৭৫,০৪৬	২৪৫,৬২৩,৯১৬	১৮১,৫০২,৭০৪	২২৫,১৮৪,৯২৭	২৫৮,৯৪০,৭১৪
বাঙ্গালা	১৯,৩৭৬,৫৯৭	২৯,১৮৬,৩১৭	৩৯,২১৩,৯৮৩	৪৮,৭০৭,৭৯৪	৫৯,০৭৩,৫৭৩	৯১,৮৫২,৮৫৬	৫৮,৭৫৩,৬৮৭	৮৪,৭১৮,৮২৮	৯৫,০১০,০০৬
বিহার উড়িষ্যা	...	...	...	...	...	৩০৯,২০৮	১৭২,৫৫৬	২৮৭,৪১৩	৮৫৩,২১৬
যুক্তপ্রদেশ	১,৬৩৪,১৯০	১,৮৯৪,৫১৩	২,০৪০,৬৫৮	২,২৯৯,৪৮৬	২,২৫৫,১৯২	২,২৯০,০৫৭	১,০৩৬,২৫৯	১,৬৮৯,১৭৩	১,৪৮৮,৮৪২
পাঞ্জাব	১,৬৩৪,০৭৪	১,৭৯৯,৬০৩	২,১৫৪,৬৮৫	১,৯৩৩,৯৩১	১,৩৫১,৭৫১	১,০৫০,২১৯	১,৪০৫,৯০০	১,৮১০,০৭৬	১,৯৩০,১০০
মান্দ্রাজ	৯৩৫,৩৬৯	১,০৯৫,৫৯০	৫৩৮,৭৬২	১,১৭১,৫৯৪	৩,৬১৭,৯৭২	১০,৩৯৫,২১২	১১,৫২১,৮৩৬	২১,১১৩,০৬১	২৭,৬৩০,০৪৯
কুর্গ	...	...	...	...	...	...	...	১১৬,৫০৬	১৬৯,০২২
ত্রিপুরা	...	...	...	...	...	...	২৪,০০০	৫৬০,৫৬৮	১,৪০২,৭২৫
ত্রিবাঙ্কুর	৩৪২,৭১৮	১,৭৩৫,৮০৩	৩,৫০৫,৯৩৮	৬,১০৭,৪২৯	১২,০০৬,১৫৫	১৯,৬৬৫,২৪৬	১৯,৮৭৬,৭৬২	২৮,০৭৫,১১৯	৩০,৫৪৩,৬৯৭
মহীশূর	...	...	...	...	...	...	...	...	৩০.৯৩৯
কোচিন	...	...	...	...	...	...	...	...	৫৫,০৭৪
মোট	৯০,৬০২,২০৫	১২৪,৮৯৫,১৫২	১৫৮,৩৭৪,৮০৬	২০১,৩৮৮,৯৬৯	২৪২,৩৮৬,২৩৩	৩৭১,২৯৬,৩৩৮	২৭৪,২৬৩,৭৭১	৩৬৩,৫০৬,৫৭১	৪৩২,৯৯৭,৯১৬

আয়তন ও ফসলের কথা

বিগত ৪৫ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতের চা-আয়তন বাড়িয়াছে ২½ গুণ, কিন্তু ফলন বাড়িয়াছে ৪½ গুণ। অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, আগে যে পরিমাণ জমি চষিলে ১০০ পা. চা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এখন তা চষিয়া ১৯০ পাউণ্ডের চেয়েও বেশী চা পাওয়া যাইতে পারে। সোজা কথায় ৪৫ বৎসরে চা চাষের গভীরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উপরের তালিকাদ্বয় হইতে বুঝা যায় যে চা-চাষে আসামের স্থান সকলের উপরে। আসামে চায়ের আয়তন গোটা ভারতের চা-আয়তনের ৫৬%এর চেয়ে বেশী, কিন্তু ফলনের বেলায় আসামে ৬৬%এর বেশী হয়। আসামের পর বাঙ্গালার স্থান হইলেও বাঙ্গালার চা আয়তনে আসামের ⅓ ও ফলনে প্রায় ⅓ (১৯২৯)। ১৯২৯ সনে আয়তন হিসাবে তারপরেই মান্দ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুর (উভয়ের ভিতর তফাৎ কম), কিন্তু ফলনে ত্রিবাঙ্কুর মান্দ্রাজকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। চা-চাষে ত্রিবাঙ্কুরের দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। যুক্তপ্রদেশে আয়তন কমিয়াছে, পাঞ্জাবে বাড়িয়াছে; ফলনেও

তাই,—বাস্তবিক পক্ষে পাঞ্জাব চায়ের ব্যাপারে যুক্ত-প্রদেশের অগ্রবর্ত্তী। ব্রহ্মদেশের চায়ের হিসাব আর লওয়া হয় না।

বিভিন্ন জিলায় উৎপাদিত একর প্রতি চায়ের পরিমাণ সমান নহে। নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে ১৯২৯ সনে কোন্ জিলায় প্রতি একরে কত চা (কালো ও সবুজ) তৈরী করা হইয়াছে ঃ

		একর প্রতি পা
মাদুরা	...	৯০৩
লখিমপুর	...	৮১৪
জলপাইগুড়ি	...	৭০৫
দরং	...	৬৮৬
নদিয়া	...	৬৫১
শিবসাগর	...	৬১৮
মালাবার	...	৬০৮
কোয়েম্বাটোর	...	৬০০
ত্রিবাঙ্কুর	...	৫৯৫
নওগাঁ	...	৫৮২
শ্রীহট্ট	...	৫৭৪
কাছাড়	...	৫২৩
নীলগিরি	...	৫১২
পূর্ণিয়া	...	৪৬৫
কোচিন	...	৪৪৮
কুর্গ	...	৪০৭
গোয়ালপাড়া	...	৩৯১
দার্জিলীঙ্	...	৩৯০
ত্রিপুরা	...	৩১৭
চট্টগ্রাম	...	৩১৬
কামরূপ	...	২৯৮
দেরাদুন	...	২৮১
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	...	২৭০
কাজরা	...	২০০
রাঁচি	...	১৪৮
আলমোড়া	...	১২০
মহীশূর	...	৭৩
গাঢ়োয়াল	...	৬০
তিন্নেহেবেলি	...	৫০
হাজারিবাগ	...	৩৬
ওয়েটেড্ বা তুলিত গড়		৬১১

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, আসামকে চায়ের দেশ বলিয়া বর্ণনা করিলে অত্যুক্তি হইবে না।

গোটা ভারতের আয়তন ও ফলনে বিগত ১০ বৎসরে কিরূপ তারতম্য ঘটিয়াছে তার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত সূচী সংখ্যা হইতে পাওয়া যাইবে ঃ

[দশ বৎসরের গড় ১৯০১-১৯১০ = ১০০]

	তারতম্য	
	আয়তন	উৎপাদন
১৯১৫	১১৮	১৬৩
১৯১৬	১২১	১৬২
১৯১৭	১২৪	১৬৩
১৯১৮	১২৭	১৬৭
১৯১৯	১২৯	১৬৫
১৯২০	১৩১	১৫১
১৯২১	১৩৩	১২০
১৯২২	১৩২	১৩৬
১৯২৩	১৩৩	১৬৪
১৯২৪	১৩৪	১৬৪
১৯২৫	১৩৬	১৫৯
১৯২৬	১৩৮	১৭২
১৯২৭	১৪১	১৭১
১৯২৮	১৪৫	১৭৭
১৯২৯	১৪৭	১৯০

বিগত ১৫ বৎসর ধরিয়া আয়তনটা ২।১ বৎসর বাদে ক্রমাগত বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু উৎপাদন বিভিন্নপ্রকার উঠানামার ভিতর দিয়া বাড়িয়াছে।

এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত তালিকাটি প্রণিধানযোগ্য (১৯২৯ সনের হিসাব) :

জিলা ও রাজ্য	৩১ ডিসেম্বর চা-বাগানের সংখ্যা	কত আয়তনে চা-জন্মান হয়	কত আয়তন চা-করদের আছে
আসাম	৯৯৩	৪২৯,৬০৫	১,২১৮,৫৭৬
বাঙ্গালা	৩৩৮	১৯৫,২৬৯	২৭৯,১০৭
বিহার উড়িষ্যা	২৩	৪,০৭৪	১০,৬৬০
যুক্তপ্রদেশ	৩৮	৬,০৪৭	২১,৫৬৯
পাঞ্জাব	২,৪৭৭	৯,৭০২	৫২৮
মান্দ্রাজ	৬৫৪	৬৬,৮৭৮	৯১,৭০৯
কুর্গ	১	৪১৫	৮১২
বৃটিশ ভারত	৪,৫২৪	৭১১,৯৯০	১,৬২২,৯৩১
ত্রিপুরা	৫০	৭,৮৯৫	৫৩,২৬৫
ত্রিবাঙ্কুর	১২২	৬৫,৩৯৭	৫০,৫৯৫
মহীশূর	১৫	৩,২৬৪	৮,৩২৩
কোচিন	৩	২৯৬	৭৩৪
	৪,৭১৪	৭৮৮,৮৪২	১,৭৩৫,৮৪৮

চা-বাগানের কুলি

১৯২৯ সনে চা-বাগানগুলিতে কত কুলি কাজ করিয়াছিল তা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। চা-বাগানের কুলিকে ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) স্থায়ী বাগানের কুলি, (২) স্থায়ী বাহিরের কুলি, (৩) অস্থায়ী বাহিরের কুলি। এই তিন শ্রেণীর কুলির সংখ্যাই দেখান হইতেছে।

	১ সংখ্যা	২ সংখ্যা	৩ সংখ্যা
আসাম	৪৮০,২৪১	৩৫,১৮৮	৪২,০৫৫
বাঙ্গালা	১৮২,৬৫৬	৫,৬৮৪	৮,৫৫৯
বিহার উড়িষ্যা	১,২০৫	৮৪১	৮৫৬
যুক্তপ্রদেশ	২,০২৯	৬৯২	১,১৫০
পাঞ্জাব	৭১৭	২,৭৩৯	৭,৫৩৯
মান্দ্রাজ	৩৩,০৬২	২৯,৫৯২	৮,১৯৮
কুর্গ	৫১৫	৬২	৪৩
বৃটিশ ভারত	৭০০,৪২৫	৭৪,৭৯৮	৬৮,৪০০
ত্রিপুরা	৪,৯২৫	১,২৪৬	৮৭৩
ত্রিবাঙ্কুর	৭১,০৫৬	১,৫৭৩	২,৯৯৮
মহীশূর	২,১২৫	৮০৫	৭৫০
কোচিন	৪০৬	৯২	...
মোট ভারত	৭৭৮,৯৩৭	৭৮,৫১৪	৭৩,০২১

আসাম কুলির মজুরি (মাসিক)

	পুরুষ	স্ত্রী	বালকবালিকা
১৯২৪-২৫	১০৸১০ পাই	৯৶৪ পা	৫৸৩ পা
১৯২৫-২৬	১১॥৵৭ পাই	৯৷৴৭পা	৫॥৫ পা
১৯২৬-২৭	১১৷৵১ পাই	৯॥৫ পা	৫৸৵০
১৯২৭-২৮	১২৷৫ পাই	১০৷৵৮ পা	৬৷৵৬ পা
১৯২৮-২৯	১৩৵৩ পাই	১০৷৵৩ পা	৬॥৵১০ পা

নিয়োজিত পুঁজিপাটার পরিমাণ

চা-ব্যবসায়ে নিয়োজিত জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীগুলির পুঁজিপাটা সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে :

বৎসর	ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত সংখ্যা	ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত পরিশোধিত পুঁজি (১,০০০ টাকা)	যুক্তরাজ্যে ও অন্যত্র রেজিষ্ট্রীকৃত সংখ্যা	যুক্তরাজ্যে ও অন্যত্র রেজিষ্ট্রীকৃত পরিশোধিত পুঁজি (১,০০০ টাকা)	মোট সংখ্যা	মোট টাকা (১০০০)	মোট পাউণ্ড (১০০০)
১৯২৫-২৬	৪০৬	৯,৮৮,৪৯	১৬৬	২২,৬৫৮	৫৭২	৪০,০৯,৫৬	৩০,০৭২
১৯২৬-২৭	৪৩২	১০,৭৫,২৩	১৮৬	২৬,১০০	৬১৮	৪৫,৫৫,২৩	৩৪,১৬৪
১৯২৭-২৮	৪৫৫	১১,২৪,৬৩	১৮৩	২৬,১২২	৬৩৮	৪৬,০৭,৫৬	৩৪,৫৫৭
১৯২৮-২৯	৪৭৫	১১,৯০,৯৬	১৮৮	২৬,৫৪৩	৬৬৩	৪৭,৩০,০৩	৩৫,৪৭৫
১৯২৯-৩০	৪৯৫	১২,৪৩,২৭	১৮৯	২৯,৯৮১	৬৮৪	৫২,৪০,৭৪	৩৯,৩০৬

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে ভারতীয় চায়ের ব্যবসায় কত টাকা ঢালা হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর পুঁজিপাটার পরিমাণ কিরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে।

ভারতীয়েরা কত চা খায় ?

নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে ভারতবাসীরা প্রতি বৎসর কি পরিমাণ চা পান করিয়া থাকে।

	কোটি পাউণ্ড
১৯২০-২১	৪'৪
১৯২১-২২	৩'১
১৯২২-২৩	২'৯
১৯২৩-২৪	৪'৭
১৯২৪-২৫	৪'৪
১৯২৫-২৬	৪'৬
১৯২৬-২৭	৪'৯
১৯২৭-২৮	৪'৩
১৯২৮-২৯	৫'৭
১৯২৯-৩০	৬'৫

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা

১। ডিসেম্বর, ১৯৩০

১৯৩০ সনের ডিসেম্বর মাসের বাণিজ্য-বার্ত্তা এইরূপ :

	১৯২৯	১৯৩০	হ্রাস বা বৃদ্ধি	
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা	%
রপ্তানি	২৩'৩৭	১৬'৪২	—৬'৯৫	—২৯'৭
পুনঃ রপ্তানি	'৭৩	'৩৪	— '৩৯	—৫৩'৪
মোট রপ্তানি	২৪'১০	১৬'৭৬	—৭'৩৪	—৩০'৫
আমদানি	১৭০'৩	১১'৫৭	—৫'৪৬	—৩২'১
আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশী	৭'০৭	৫'১৯	—	—

১৯২৯, ডিসেম্বরের তুলনায় ১৯৩০, ডিসেম্বরে আমদানির খাতে কোন্ জিনিষের জন্য কত টাকা বেশী বা কম দেওয়া হইয়াছে তা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :

জিনিষ	যত টাকা বেশী
কাঁচা তুলা	৪১,৫০,৮০৯৲
কেরোসিন তৈল	১৫,১৭,৭৭০৲
অন্যান্য খনিজ তৈল	১২,১৬,১৪৭৲
	যত টাকা কম
চিনি	৪২,৩৮,৫০৭৲
সিগারেট	৫,৯০,০২৬৲
ছুরি কাঁচি	১১,৫৪,০৭৮৲
বৈদ্যুতিক ভিন্ন অন্যান্য প্রাইম্ মুবার	১০,০০,১০৭৲
শীট্ ও প্লেট (লোহা বা ইস্পাত)	১৭,৯৩,৭৮৮৲
মোটর কার	১৪,১১,৬৩৫৲
তুলার ইয়ার্ণ	২৭,০৯,১৬৯৲
ঐ ধূসর পীস্গুড্স্	১,৩৬,৯৫,১৭৮৲
ঐ সাদা ঐ	৪৪,২৪,১৯২৲
ঐ রঙ্গীন ঐ	৬১,১৬,৮৬৯৲
রেশমের ঐ	৮,৯২,৫০১৲
পশমের ঐ	৩,২৫,১২১৲
তুলা ও কৃত্রিম রেশমের পীস্গুড্স্	৯,৯০৩৮১৲

কোন কোন দ্রব্য বেশী আমদনি করিলেও কম টাকা দিয়াছি, আবার কোন কোনটা কম আমদানি করিয়াও বেশী টাকা দিয়াছি। যথা,

	পরিমাণ কত বেশী	দর কত কম
খেজুর	+৪৯৮ টন	—২১৯৪৪৪৲ টাকা
গম	+৭,৩১৪ ,,	—২৭,৪২৫৲ ,,
লোহার বার	+৮৭ ,,	১৪,৮৮৮৲ ,,
রেশম ও অন্যান্য দ্রব্য-মিশ্রিত জিনিষ	+৭০,৫৫৩ গজ	—৯৩,৪২৯৲ ,,
চর্ব্বি তৈল	+১,১৫৭ গ্যালন	—৫৪,২৫৪৲ ,,
কাগজ	+১১,০৮৩ হন্দর	—২,৮৩,৫৭৬৲ ,,

রপ্তানির খাতে কোন্ জিনিষের বাবদ্ কত বেশী বা কম পাইয়াছি তা নীচের তালিকায় দেওয়া যাইতেছে :

জিনিষ		কত টাকা বেশী
কাল চা	...	২৬,০৮,০৫৪
প্যারাফিন মোম	...	৬,২৭,৩৬৪
গমের আটা	...	৩,৯১,১৫৫
		কত টাকা কম
চাউল	...	১৬,৪৭,৪৩৭
বাদাম	...	১৫,৮০,১৩৯
তিসি	...	১৮,৭২,০৮০
লাক্ষা	...	৩৫,৬৫,৪০৩
কাঁচা পশম	...	২৭,৯৫,৪৬০
ম্যাঙ্গানিজ ওর	...	১২,১৫,৪৪০
কাঁচা স্কিন	...	১২,৪১,০৭১
কাঁচা পাট	...	১,৩৭,৬৯,২৫১
কাঁচা তুলা	...	৯৫,১৫,৭৫৪
পাটের গানি থলে	...	৮৯,৬৬,৬৩৪
ঐ ঐ কাপড়	...	১,৯৫,৫৭,২৬৪

কোন্ দ্রব্য বেশী রপ্তানি করিয়া কম টাকা এবং কম রপ্তানি করিয়া বেশী টাকা পাইয়াছি তার হিসাব :

	পরিমাণ কত বেশী বা কম	দর কত বেশী বা কম
নোনা শুকনা মাছ	+২,৪৬৯ হন্দর	−১,২৭,৩১২৲
চাউলের তুষ	+৬,০৫০ টন	−১,৬৯,৮৭৯৲
শুক্না ও নোনা ফল ও তরী তরকারী	−২৫৬ টন	+১৫,৪১৭৲
আকাঁড়া চাউল	+১৮,০৭৩ ,,	−১৬,২৮,৪২১৲
খইল	+৮,২৩০ ,,	−১,৭৭,৭৪৮৲
কাঁচা রবার	+২৯১,৬৮৫ পা	−৪,১০,১৪৮৲
বাদাম	+১৫,৯২৪ টন	−১৫,৯০,১৬৯৲
কাঁচা তুলা	+১০,৬০০ ,,	−৯৫,১৫,৭৫৪৲

২। নয় মাসের হিসাব (এপ্রিল-ডিসেম্বর)

বিগত ৯ মাসের আমদানি-রপ্তানির হিসাব এই :

	১৯২৯	১৯৩০	হ্রাস বা বৃদ্ধি	
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা	%
রপ্তানি	২৩২'৫১	১৭৩'৫২	−৫৮'৯৯	−২৫'৪
পুনঃ রপ্তানি	৫'৬৫	৩'৮০	−১'৮৫	−৩২'৭
মোট রপ্তান	২৩৮'১৬	১৭৭'৩২	−৬০'৮৪	−২৫'৫
আমদানি	১৭০'৬৮	১২৩'৬৭	−৫৬'০১	−৩১'২
	৫৮'৪৮	৫৩'৬৫	—	—

৯ মাসে আমরা বিদেশে মাল বেচিয়া প্রায় ৬১ কোটি টাকা কম পাইয়াছি। আর বিদেশী বণিকেরা ঐ সময়ে ভারতে ৫৬ কোটি টাকার কম মাল বেচিতে সমর্থ হইয়াছে।

৩। বাণিজ্য তৈল

	এপ্রিল-ডিসেম্বর (কোটি টাকা)		
	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
ভারতীয় পণ্য রপ্তানি (বেসরকারী)	+২৪১'০৯	+২৩২'৫১	+১৭৩'৫২
বিদেশী পণ্য পুনঃ রপ্তানি (ঐ)	+৬'১৩	+৫'৬৫	+৩'৮০
বিদেশী পণ্য আমদানি (ঐ)	−১৮০'৯৬[১]	−১৭৮'৪২[১]	−১২২'৭৫[২]
পণ্য সম্পর্কে হাতে থাকে (ঐ)	+৬৪'২৬	+৫৯'৭৪	+৫৪'৫৭
সোণা (ঐ)[৩]	−১৪'১২	−১০'৭৫	−১২'৩৩

	এপ্রিল-ডিসেম্বর (কোটি টাকা)		
রূপা (ঐ)*	—১০·২৫	—৭·৩৮	—৭·৭৪
সিক্কা নোট (ঐ)	·১৩	+·০১	—·০৭
সোণা রূপা বাণিজ্যে হাতে থাকে (ঐ)	—২৪·৫০	—১৮·১২	—২০·১৪
দৃশ্যমান বাণিজ্যাবশেষ	+৩৯·৭৬	+৪১·৬২	+৩৪·৪৩
কাউন্সিল বিল, যুক্তরাজ্যে প্রেরয়িতব্য ষ্টার্লিং ও অন্যান্য সরকারী মুদ্রাক্রয়	—২৮·০২	—১৯·৪৩	—৭·২৬
লণ্ডনের উপর দাবীকরা ষ্টার্লিং ট্রান্সফার ভারতে বিক্রয় করিয়া	...	...	+৩·১৪
সরকারী সেকিউরিটি প্রেরণ বাবদ	+·০২	—·২২	—·০২
গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সেকিউরিটি সম্পর্কিত ভারতের উপর দাবী করা সুদের ড্রাফ্‌ট বাবদ	—·২৯	—·২৭	—·২৭
কাগু প্রেরণ বাবদ্ হাতে	—২৮·২৯	—১৯·৯২	—৪·৪১

ভারতীয় রেলওয়ের দুর্ব্বৎসর

বিগত দুই বৎসরের তুলনায় ১৯২৯-৩০ সনকে রেলওয়ের পক্ষে খারাপ বলিয়া মনে করিতে হইবে। নীচের তালিকা হইতে ভারতীয় রেলওয়েসমূহের আয়-ব্যয়ের একটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

	হাজার টাকা	
	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০
(১) (ক) স্থূল আয়	১,০৪,৩৩,৭৪	১,০২,৭০,২৯
(খ) সাবসিডি দেওয়া কোম্পানী হইতে অতিরিক্ত মুনাফা	৩৮,৮৪	৫৮,৭১
(গ) ডিপ্রিসিয়েশন (আয়ব্যয়) ও রিজার্ভ ফণ্ডের সুদ	১,০৬,২০	১২৭,৬৬
(ঘ) অন্যান্য বিবিধ রেল আয়	১১,৫৭	২১,৪৬
মোট আদায়	১,০৫,৯০,৩৫	১,০৪,৭৮,১২
(২) (ক) খরচা (আয়ব্যয় বাদে)	৫৪,৮২,৭০	৫৫,৫৮,৯৫
(খ) আয়ব্যয়	১১,৯৯,৭৫	১২,৫৮,৯৮
(গ) কোম্পানীসমূহকে দত্ত অতিরিক্ত মুনাফা	১৫৯,১৪	১,৫১,৯৮
(ঘ) জমি ও কোম্পানীর জন্য সাবসিডি	২,৯১	৪,৩৯
(ঙ) সুদ	২৯,৩২,৯৬	৩০,৪৬,০৬
(চ) বিবিধ রেলওয়ে খরচা	৩১,৯৫	৫৪,১২
মোট	৯৮,০৯,১১	১,০০,৭৪,৪৮
(৩) মোট লাভ	৭,৮০,৯৪	৪,০৩,৬৪
(৪) (ক) রেলওয়ে রাজস্ব হইতে সাধারণ রাজস্বে দেয় (তিন কোটির উপরে রেলওয়ের অতিরিক্ত মুনাফার ⅕ সুদ্ধ)	৫,২৩,২০	৬,১১,৮৬
(খ) রেলওয়ে রিজার্ভ ফণ্ডে অন্তরিত অতিরিক্ত রাজস্ব	২,৫৭,৭৪	...
(গ) সাধারণ রাজস্বে দেয় টাকা মিটাইবার জন্য রেলওয়ে রিজার্ভ ফণ্ড হইতে অন্তরিত	...	২,০৮,২২
মোট	৭,৮০,৯৪	৪,০৩,৬৪

অর্থাৎ গত বৎসর যেখানে ৭·৮ কোটি টাকার উপর লাভ হইয়াছিল, এবার সেখানে ৪ কোটি টাকার কিছু বেশী

লাভ হইয়াছে। প্রতি বৎসর রেলওয়ের লাভের অঙ্ক হইতে একটা মোটা টাকা গবর্ণমেণ্টকে নজর দিতে হয়। গত বৎসর ৫'২৩ কোটি ও এবৎসর ৬'১২ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই টাকাটা মোটামুটি ৬ কোটির সমান। অন্যান্য বৎসর এই টাকাটা দিয়াও ২ কোটি ২½ কোটি টাকা রেলওয়ে রিজার্ভ ফণ্ডে জমা থাকে; কিন্তু এ বৎসর ঐ ৬ কোটি টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিবার জন্য উল্টিয়া রিজার্ভ ফণ্ড হইতে ২ কোটি টাকার কিছু উপরে ভাঙ্গিতে হইয়াছে। ইহা হইতেই অবস্থা বুঝা যাইবে।

রেলওয়েতে নিয়োজিত পুঁজিপাটা

১৯২৯-৩০ সনে সর্ব্বপ্রকার রেলওয়েতে মোট পুঁজিপাটা খাটানো হইয়াছে ৩২'২১ কোটি টাকার। তন্মধ্যে সরকারের তাঁবে থাকা রেলওয়ের জন্য খরচ হইয়াছে ৩০'১৮ কোটি টাকা। বিগত কয়েক বৎসরের এই প্রকারের খরচটা দেখানো যাইতেছে:

	পূর্ব্বের খোলা লাইন			নূতন লাইন	মোট
	কারখানা ষ্টোর ও সাধারণ খরচা সুদ্ধ	রোলিংষ্টক	মোট		
	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা	কোটি টাকা
১৯১৩-১৪	৯'৩০	৭'৩১	১৬'৬১	১-৮৬	১৮'৪৭
১৯২৫-২৬	৯'৪৪	৫'৮০	১৫'২৪	৪'০১	১৯'২৫
১৯২৬-২৭	১৬'৭৪	৪'১৩	২০'৮৭	৬'২৭	২৭'১৪
১৯২৭-২৮	১৭'২১	৫'৩৭	২২'৫৮	২'৮৬	৩২'৪৪
১৯২৮-২৯	১২'৪৭	৩'৯৮	১৬.৪৫	৮'৯৬	২৫'৪১
১৯২৯-৩০	১৮'১২	৫'৫৫	২৩'৬৭	৬'৫১	৩০'১৮

১৯২৯-৩০ সনে লাইনের দৈর্ঘ্য

১৯২৯-৩০ সনে লোক ও মাল চলাচলের জন্য ৮১২'০৭ মাইল রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। তন্মধ্যে

৫'—৬" "গেজ" ৩২৬'৫০ মাইল
৩'—৩⅜" " ৪১২'০৮ "
২'—৬" ও ২'—০" " ৭৩'৪৯ "

নূতন লাইন খুলিবার উদ্যম

১৯২৯-৩০ সনের ৩১ মার্চ্চ অবধি মোট ২২১'৭ মাইল নূতন লাইন খুলিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে

	...	মাইল
৫'—৬"	...	৯৩'০০
৩'—৩⅜"	...	১১৫'৭৭
২'—৬"	...	১৩'০০

১৯২৯-৩০ সনে যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে তার শেষে মোট ১২৫৭'৫৭ নূতন লাইন তৈরী হইতেছিল। যথা

	...	মাইল
৫'—৬"	...	৭৩০'৭৭
৩'—৩⅜"	...	৪৫৭'৫১
২'—৬" ও ২'—০"	...	৬৯'২৯

ল্যাঙ্কাশিয়ারের ভবিষ্যৎ

পূর্ব্বে ইয়োরোপ, বিশেষতঃ ল্যাঙ্কাশিয়ারই দুনিয়ার কাপড় যোগাইয়াছে। ক্রমে প্রাচ্য জগতেও তুলা-শিল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। ইয়োরোপ হইতে বহুল পরিমাণে কাপড়ের কল প্রাচ্য দেশগুলিতে চালান গিয়াছে ও যাইতেছে। ইহার ফলে ইয়োরোপ প্রাচ্যজগতে আপন বাজার হারাইতে বসিয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষও যে বস্ত্র-শিল্পে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভের পর হইতেই ভারত ল্যাঙ্কাশিয়ারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। অবস্থা এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, ভারতবর্ষ আর ল্যাঙ্কাশিয়ারের তোয়াক্কা রাখিতেছে না। রক্ষণ-শুল্কের বলেই ভারত এই সুবিধা করিয়া লইয়াছে। এখন মিহি কাপড় বয়নের উপর ল্যাঙ্কাশিয়ারের যা কিছু আশা ভরসা; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবাসী এখন মিহি কাপড়ের পক্ষপাতী নহে। অবস্থা যখন এমন দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক এবং রাজস্ব-ঘটিত স্বাতন্ত্র্যলোপের যখন কোন আশা নাই, তখন বিলাতের পক্ষে এই দারুণ অবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়া তদনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর উপায় কি ?

জার্ম্মাণিতে কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয়-সমস্যা

জার্ম্মাণির রাইফিসেন সঙ্ঘের সম্পাদক ব্যারন ম্যাগ্‌নাস্ ফোন ব্রাউন মহাশয় কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয়-সমস্যা এবং কৃষি সমবায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। তার কোন্ কোন অংশের মর্ম্ম নিম্নরূপ :

জার্ম্মাণির সমগ্র কৃষিজাত পণ্যের মূল্য ১৩০০ কোটি মার্ক (১ মার্ক—৸৵০ আনা) তন্মধ্যে জার্ম্মাণ কৃষকেরা মোট ৪০০ কোটি মার্ক মূল্যের কৃষিজাত দ্রব্য ব্যবহার করে। জার্ম্মাণির অন্যান্য লোক তাহা হইলে ৯০০ কোটি মার্ক মূল্যের দ্রব্য ব্যবহার করে। কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের খুচরা বাজার-দর ধরিতে গেলে দেখা যায় যে, কৃষক মাত্র ঐ খুচরা বাজার-দরের শতকরা ৫০ ভাগ পায়। কারণ অপর অংশ দোকানদার, আড়তদার, কল-ওয়ালা (অর্থাৎ যাহারা ময়দা প্রস্তুত করে, অথবা রুটী তৈয়ারী করে). বাহকশ্রেণী (যথা রেল, ষ্টীমার) প্রভৃতিরা পায়। জার্ম্মাণির কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের এই একটী বড় সমস্যা (অর্থাৎ কৃষক মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ পায়, তার বেশী পায় না)। কৃষকের প্রাপ্য অংশ যদি শতকরা ৫০ হইতে ৬০এ বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা হইলে জার্ম্মাণ কৃষকদের আয়ের সমষ্টি ১৮০ কোটি মার্ক বাড়িবে।

সমগ্র জার্ম্মাণির কৃষকেরা প্রতি বৎসর তাদের কৃষি ঋণের জন্য মোটের উপর ১২০ কোটি মার্ক সুদ দেয়। সুতরাং এই ফসল-বিক্রয় সমস্যাটী খুব সরল মনে হইলেও ইহা বেশ জটিল, কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। এই সমস্যার সমাধান সহজ অথবা অচিরসাধ্য নহে। কিন্তু অন্যান্য দেশের কৃষির ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, সমস্যাটী খুব বেশী দুরূহ নহে। ডেনমার্কে গত ১৯২৮ সনে ঐ দেশের জনসাধারণ কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য যে টাকা খরচ করিয়াছিল তাহার কত অংশ চাষীরা পাইয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :

দ্রব্যের নাম	কৃষকের শতকরা অংশ
স্বদেশে বিক্রীত মাখন	৯০

দ্রব্যের নাম	কৃষকের শতকরা অংশ
শূকরের মাংস	৭০
ডিম	৭৮
ইংলণ্ডে বিক্রীত মাখন	৮২
„ শূকর মাংস	৭৩
„ ডিম	৮৮

উত্তর আমেরিকার রাজ্যগুলিতে কৃষিজাত দ্রব্যের যে বাজার-দর পড়ে তাহার শতকরা ৬০ ভাগ কৃষক পাইয়া থাকে। অবশ্য ২।১ জায়গায় ইহার তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, এবং কৃষকের প্রাপ্য অংশ শতকরা ৩০ ভাগও হয়, আবার শতকরা ৭০ ভাগও হয়। অধ্যাপক ব্রিকম্যান অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কৃষকের প্রাপ্য অংশের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

দ্রব্যের নাম	খুচরা বাজার-দরের মধ্যে কৃষকের শতকরা প্রাপ্য অংশ
ফল, শাকসব্জী প্রভৃতি	৩০
দুগ্ধ	৪০
মাংস	৪৫
গবাদি পশু	৫৫
ডিম	৬৯
মাখন	৭৫

জার্ম্মাণির কৃষিদ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধে সমবায় এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সঙ্ঘের করণীয় অনেক কাজ আছে। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

যত প্রকার কৃষিকার্য্য আছে, তাহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। কৃষিদ্রব্য বাজারে উপস্থিত করিতে যাহাতে অপেক্ষাকৃত কম খরচ হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। তারপর কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, রেল কোম্পানী, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির সহিত এক-যোগে কাজ করিয়া এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে গেলে যে অর্থের দরকার তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি কলকারখানা গুদাম প্রভৃতি স্থাপন করিতে হইবে। এইসব কলকারখানা হইলে কৃষকের প্রাপ্য অংশ অনেক বেশী হইবে। অবশ্য দেখিতে হইবে যে, এই সব কাজ করিতে গিয়া যেন বেশী সুদে টাকা ধার করা না হয়; কারণ তাহা হইলে কৃষকের অবস্থা ভাল না হইয়া বরং খারাপ হইবে।

কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধে জার্ম্মাণ সমবায় তত বেশী অগ্রসর হয় নাই। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে জার্ম্মাণি ও অন্যান্য দেশের কৃষিদ্রব্যের কত ভাগ সমবায় সমিতি কর্ত্তৃক বিক্রীত হয় তাহা বুঝা যাইবে:

দুধ ও মাখন

দেশ	সমবায় সমিতির বিক্রয়
জার্ম্মাণি	২২—২৫%
ডেন্‌মার্ক	৮৬%
ফিন্‌ল্যাণ্ড	৯১%
নিউজিল্যাণ্ড	১০০%
অষ্ট্রেলিয়া	৯১%

শস্য

দেশ	সমবায় সমিতির বিক্রয়
জার্ম্মাণি	১৫%
কানাডা	৭০%

দেশ-বিদেশের আয়তন ও লোকবল

বিগত ২৬ ফেব্রুয়ারী ভারতের লোক-গণনা হইয়া গিয়াছে। এ সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের আয়তন ও লোকবলের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মহাদেশের আয়তন

বিভিন্ন মহাদেশের ও তদন্তর্গত প্রধান প্রধান দেশের আয়তন নীচে দেখানো যাইতেছে:

হাজার কিলোমিটার (=·৩৮৬১ বর্গ মাইল)

আফ্রিকা	…		২৯,২১০
দক্ষিণ আফ্রিকা	…	১,২২৩	
মিশর	…	১,০০০	

বেলজিয়ান কঙ্গো	…	২,৩৮৫	
বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা	…	১,১৬১	
কেনিয়া	…	৫৮৩	
মৌরিশাস্	…	১'৯	
উগাণ্ডা	…	২৪৫	
সুদান	…	২,৬২৮	
আমেরিকা	…		৪১,১৫২
উত্তর আমেরিকা	…		১৯,৪২০
কানাডা	…	৯,৫৪৩	
যুক্তরাষ্ট্র	…	৭,৮৩৯	
মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকো			২,৭৯৭
কিউবা	…	১১৯	
গুতেমালা	…	১১০	
হাইতি	…	২৬	
মেক্সিকো	…	১,৯৬৯	
নিকারাগুয়া	…	১৫১	
দক্ষিণ আমেরিকা	…		১৮,৯৩৫
আর্জেন্টিনা	…	২,৭৯৭	
বোলিভিয়া	…	১,৮৩৪	
ব্রাজিল	…	৮,৫১১	
চিলি	…	৭৫২	
কলম্বিয়া	…	১,১৯৬	
ইকোয়াডোর	…	৩০৭	
পেরাগুয়ে	…	৪৫৮	
পেরু	…	১,৩৮৬	
উরুগুয়ে	…	১৮৭	
ভেনিজুয়েলা	…	১,০২০	
এশিয়া	…		২৬,৭০৪
আফগানিস্থান	…	৬৩৫	
আরব	…	২,৬০০	
ভুটান	…	৫২	
চীন	…	১১,০৮১	
বৃটিশ ভারত	…	২,৮২৬	
দেশী রাজ্য	…	১,৮৪২	
জাপান	…	৩৮২	
নেপাল	…	১৪০	
পারস্য	…	১,৬৪৫	
শ্যাম	…	৫১৮	
তুরস্ক	…	৭৬২	
ঐ এশিয়াস্থিত	…	৭৩৯	
সিংহল	…	৬৬	
মালয়	…	৭১	
হঙ্কং	…	১'১	
ফিলিপাইন	…	২৯৬	
ইন্দো চীন	…	৭৩৮	
কোরিয়া	…	২২১	
ফর্ম্মোসা	…	৩৬	
ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারত		১,৯০০	
ইরাক্	…	৩০২	
প্যালেষ্টাইন	…	২৩	
সিরিয়া	…	২০০	
ইয়োরোপ	…		২৬,৬০৬
জার্ম্মাণি	…	৪৬৯	
অষ্ট্রিয়া	…	৮৪	
বেলজিয়াম	…	৩০	
বুলগেরিয়া	…	১০৩	
ডেন্মার্ক	…	৪৩	
স্পেন	…	৫১২	
ফিনল্যাণ্ড	…	৩৮৮	
ফ্রান্স	…	৫৫১	
গ্রীস	…	১২৭	
হাঙ্গেরি	…	৯৩	
আইরিস ফ্রী ষ্টেট	…	৭০	
আইস্ল্যাণ্ড	…	১০৩	
ইতালি	…	৩১০	
নরওয়ে	…	৩২৪	
নেদারল্যাণ্ডস্	…	৩৪	
পোল্যাণ্ড	…	৩৮৮	

পর্তুগাল	...	৯০
রুমাণিয়া	...	২৯৫
যুক্তরাজ্য	...	২৪৩
ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস্‌	...	১৫১
স্কটল্যাণ্ড	...	৭৭
সুইডেন	...	৪৮৮
সুইজারল্যাণ্ড	...	৪১
চেকোশ্লোভাকিয়া	...	১৪০
ইয়োরোপীয় তুরস্ক	...	২৪
রুশিয়া	...	২১,১৭৬
যুগোশ্লাভিয়া	...	২৪৮
ওশেনিয়া	...	৮,৫৫৮
অষ্ট্রেলিয়া	...	৭,৭০৪
নিউজিল্যাণ্ড	...	২৬৯
ফিজি	...	১৯

পৃথিবীর মোট স্থলভাগ =১৩২,৩৩০

মহাদেশের লোকবল

নীচে লোকবল গণনার দুইপ্রকার নমুনা দেওয়া যাইতেছে। প্রথম প্রকার শেষ সেন্সাস বা লোকগণনার ফল, আর দ্বিতীয় প্রকার শেষ সরকারী অনুমানের ফল। সংখ্যাগুলি হাজার গুণ করিয়া বুঝিতে হইবে :

	বিগত লোকগণনা				সরকারী অনুমান	
	সন	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	সন	সংখ্যা
আফ্রিকা	...	...	...	...	১৯২৮	১৪৩,০০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯২১	৩,৫৩৭	৩,৩৯২	৬,৯২৯	১৯২৯	৭,৮৯৫
মিশর	১৯২৭	...	...	১৪,১৬৯	১৯২৮	১৪,৩১৯
সুদান	১৯২১	...	...	৪,৮৫৩	১৯২৮	৬,৪৬৯
টাঙ্গানিয়াকা	১৯২১	২,০২৩	২,১০১	৪,১২৪	১৯২৮	৪,৭৭০
আমেরিকা	...	...	...	...	১৯২৮	২৪২,৯৫০
উত্তর আমেরিকা	...	...	...	...	১৯২৮	১৩০,৭৪২
কানাডা	১৯২১	৪,৫৩০	৪,২৫৮	৮,৭৮৮	১৯২৯	৯,৭৯৬
যুক্তরাষ্ট্র	১৯২০	৫৯,৯০১	৫১,৮১০	১০৫,৭১১	১৯২৮	১২০,০১৩
মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকো	...	...	...	...	১৯২৮	৩২,৪২৬
কিউবা	১৯১৯	১,৫৩১	১,৩৫৮	২,৮৮৯	১৯২৮	৩,৫৯১
মেক্সিকো	১৯২১	৭,০০৪	৭,৩৩১	১৪,৩৩৫	১৯২৮	১৫,০৪৮
দক্ষিণ আমেরিকা	...	...	...	...	১৯২৮	৭৯,৭০০
আর্জেন্টিনা	১৯২৮	...	...	১০,৯২২	১৯২৯	১১,১৯৫
বলিভিয়া	...	...	...	...	১৯২৮	৩,০০০
ব্রাজিল	১৯২০	১৫,৪৪৪	১৫,১৯২	৩০,৬৩৬	১৯২৮	৩৯,১০৪
চিলি	১৯১৯	১,৮৬৬	১,৮৮৮	৩,৭৫৪	১৯২৯	৪,৩৬৪
পেরু	...	...	...	...	১৯২৭	৬,১৪৭

	বিগত লোকগণনা				সরকারী অনুমান	
	সন	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	সন	সংখ্যা
এসিয়া	...	...	...	...	১৯২৮	১,০৪০,২১০
আফগানিস্থান	...	...	...	...	১৯২৮	৭,০০০
আরব	...	...	...	...	১৯২৮	৭,০০০
ভুটান	...	...	...	...	১৯২৮	২৫০
চীন	...	...	...	...	১৯২৮	৪৫৮,৭০০
বৃটিশ ভারত	১৯২১	১২৬,৭১৬	১২০,১০৭	২৪৬,৯২০ }	১৯২৮	৩৩৩,৫০০
দেশী রাজ্য	১৯২১	৩৭,১২৩	৩৪,৮১৬	৭১,৯৩৯ }		
জাপান	১৯২৫	৩০,০১৩	২৯,৭২৪	৫৯,৭৩৪	১৯২৯	৬২,৯৩৮
নেপাল	...	...	...	...	১৯২৮	৫,৬০০
পারস্ত	...	...	...	...	১৯২৮	৯,০০০
শ্যাম	১৯২০	৪,৫৯৯	৪,৬০৮	৯,২০৭	১৯২৮	১০,২৮৪
তুরস্ক	১৯২৭	৬,৫৬৪	৭,০৮৪	১৩,৬৪৮	১৯২৮	১৩,৮৫০
(তন্মধ্যে এসিয়ায়	১৯২৭	...	...	১২,৬০৮	১৯২৮	১২,৮০০)
সিংহল	১৯২১	২,৩৮২	২,১১৭	৪,৪৯৯	১৯২৮	৫,৪২২
ইন্দো-চীন	১৯২৬	...	...	২০,৬৯৯	১৯২৮	২১,৫০০
কোরিয়া	১৯২৫	১০,০২১	৯,৫০২	১৯,৫২৩	১৯২৮	২০,৩০০
জার্ম্মাণি	১৯২৫	২,০৫৩	১,৯৪১	৩,৯৯৩	১৯২৬	৪,২৪২
ওলন্দাজ পূর্ব্বভারত	১৯২০	২৪,৫৫৬	২৪,৭৯৫	৪,৯৫১	১৯২৭	৫২,৮২৫
(জাভা	১৯২০	১৭,১৬৪	১০,৮২০	৩৪,৯৮৪	১৯২৭	৩৭,৪৩৪)
ইরাক্	...	...	...	...	১৯২৮	৩,৩০০
প্যালেষ্টাইন	...	...	...	...	১৯২৮	৯০০
ইয়োরোপ	...	...	...	...	১৯২৮	৫২৬,০৫০
জার্ম্মাণি	১৯২৫	৩০,১৯৭	৩২,২১৪	৬২,৪১১	১৯২৮	৬৩,৬০৩
অষ্ট্রিয়া	১৯২০	৩,০৮২	৩,৩৪৪	৬,৪২৬	১৯২৯	৬,৬৯৪
বেলজিয়াম	১৯২০	৩,৬৭৩	৩,৭৯২	৭,৪৬৫	১৯২৮	৭,৯৯৬
স্পেন	১৯২০	১০,৩৪১	১০,৯৯৭	২১,৩৩৮	১৯২৮	২২,৬০২
ফ্রান্স	১৯২৬	...	...	৪০,৭৪৪	১৯২৮	৪১,০৪০
গ্রীস	...	...	...	...	১৯২৮	৬,২৪৯
হাঙ্গারি	...	...	...	...	১৯২৮	৮,৬০৪
আইরিশ ফ্রীষ্টেট	...	...	...	...	১৯২৮	২,৯৪০

	বিগত লোকগণনা				সরকারী অনুমান	
	সন	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	সন	সংখ্যা
ইতালি	১৯২১	১৯,০৯০	১৯,৬২১	৩৮,৭১১	১৯২৮	৪১,৫০৮
নরওয়ে	...	...	...	...	১৯২৯	২,৮৯১
পোল্যাণ্ড	১৯২১	১৩,১৩৪	১৪,০৫৯	২৭,২০১	১৯২৯	৩০,৭৩০
যুক্তরাজ্য	১৯২১	২১,১০০	২৩,০৭৬	৪৪,১৭৬	১৯২৯	৪৫,৮৯১
(ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস্	১৯২১	১৮,০৭৫	১৯,৮১১	৩৭,৮৮৬	১৯২৮	৩৯,৪৮২
স্কটল্যাণ্ড	১৯২১	২,৩৪৮	২,৫৩৫	৪,৮৮৩	১৯২৯	৪,৮৯৭
উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড	১৯২৬	৬০৮	৬৪৯	১,২৫৭	১৯২৮	১,২৫০)
সুইডেন	১৯২০	২,৮৯৮	৩,০০৬	৫,৯০৪	১৯২৮	৬,১০৫
সুইট্জারল্যাণ্ড	১৯২০	১,৮৭১	২,০০৯	৩,৮৮০	১৯২৮	৪,০১৯
চেকোশ্লোভাকিয়া	১৯২১	৬,৫৫৯	৭,০৫৪	১৩,৬১৩	১৯২৮	১৪,৫৩৫
তুরস্ক	...	...	১,০৪১	...	...	১,০৫০
রুশিয়া	১৯২৬	৭১,০৪৩	৭৫,৯৮৩	১৪৭,০২৮	১৯২৮	১৫৩,৯৫৬
যুগোশ্লাভিয়া	১৯২১	৫,৮৯৪	৬,১২৪	১২,০১৭	১৯২৮	১৩,২৯০
ওশেনিয়া					১৯২৮	৯,৫০১
অষ্ট্রেলিয়া	১৯২১	২,৭৬৩	২,৬৭৩	৫,৪৩৬	১৯২৯	৬,৩৭৩

দুনিয়ার মোট লোকবল = ১,৯৬২,০০০,০০০ অর্থাৎ প্রায় ২০০ কোটি
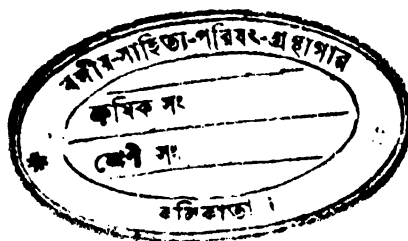
আকাশ-পথে বাঙ্গালী বৈমানিক

আগাখান ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিমান পরিবর্ত্তন না করিয়া করাচী হইতে যে ভারতবাসী আকাশ-পথে একাকী কেপ টাউনে গমন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে তিনি ৫ শত পাউণ্ড (প্রায় ৭ হাজার ৫ শত টাকা) পুরস্কার প্রদান করিবেন। এই পুরস্কার লাভার্থে শ্রীযুক্ত এ, এম, মোরাদ দমদম বিমান আড্ডা হইতে গত ২১শে ডিসেম্বর রবিবার বেলা ৮ ঘটিকার সময় দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন অভিমুখে আকাশ-পথে যাত্রা করিয়াছিলেন।

যাত্রার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মোরাদ বলিয়াছিলেন, "আমি মাত্র দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে সমগ্র ভারত নির্ব্বিঘ্নে উড়িয়া বেড়াইয়াছি। সুতরাং আমি ১৫ দিনের মধ্যে অনায়াসে কেপ টাউনে পৌছিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস করি"। শ্রীযুক্ত মোরাদ গয়া, এলাহাবাদ, দিল্লী, আলীগড় ও হায়দ্রাবাদ হইয়া করাচীতে পৌছিবেন কথা ছিল। করাচী হইতে জাস্ক, বন্দর আব্বাস, বসরা, বাগদাদ, রুতবাম ও গাজা হইয়া মিসরের রাজধানী কায়রো, কায়রো হইতে যাত্রা করিয়া সাম্রাজ্য বিমান-পথ ধরিয়া আসুউইত, আসোয়ান, ওয়াদি-রে-হালিকা খারতুম, কুসায়মা, বুলাওয়ায়ো, প্রিটোরিয়া, প্যানাপাই অতিক্রম করিয়া কেপ টাউনে পৌছিবেন কথা ছিল।

দুঃখের বিষয় বিমান পোত নষ্ট হইয়া যাওয়ার ফলে শ্রীযুক্ত মোরাদ বসরায় নামিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি ডাক বিমান যোগে করাচী পৌছিয়াছেন।

বঙ্গীয় গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষা আইন

গত চার বৎসর যাবৎ বাংলা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রচলনের চেষ্টা চলিতেছিল। গত আগষ্ট মাসের ২৬ তারিখে বঙ্গীয় গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষা বিল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্যের মতে পাশ হইয়াছে।

বাংলা দেশে ৪৬৭,০০,০০০ জন লোক বাস করে। ইহার মধ্যে হিন্দু পুরুষের সংখ্যা প্রায় ১,০৫,০০,০০০; মুসলমান পুরুষের সংখ্যা প্রায় ১,৩০,০০,০০০। হিন্দু মহিলার সংখ্যা প্রায় ১০০,০০,০০০; মুসলমান মহিলার সংখ্যা প্রায় ১,২০,০০,০০০। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৬,০০,০০০ ও মহিলার সংখ্যা প্রায় ৬,০০,০০০। এই ৪,৬৭,০০,০০০ লোকের মধ্যে প্রায় ৭০,০০,০০০ জনের বয়স ৬ হইতে ১১ বৎসর। ইহাদের সকলেরই কোন বিদ্যালয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু ঐ বয়সের মাত্র ২১,০০,০০০ বালক ও বালিকা প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ করে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ২১,০০,০০০ বালক ও বালিকার মধ্যে প্রায় ১২,৫০,০০০ জন এক বৎসর মাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপ্ত করে, ৪,০০,০০০ জন দুই বৎসর ও ২,৫০,০০০ জন তিন বৎসর মাত্র পাঠ করে। অবশিষ্ট মাত্র ২,০০,০০০ ছাত্র ও ছাত্রী চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। যাহারা এক, দুই বা তিন বৎসর বিদ্যালয়ে পাঠ করে তাহারা প্রায় সকলেই কিছুকাল পরে পুনরায় নিরক্ষর হইয়া পড়ে। কাজেই তাহাদের জন্য কৃত সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় বৃথা হয়। ৭০,০০,০০০ বালক ও বালিকাদের মধ্যে যদিও ২১,০০,০০০ জন বিদ্যালয়ে যায়, কিন্তু মাত্র ২,০০,০০০ জন যথার্থ কিছু শিক্ষালাভ করে।

বর্ত্তমানে বাংলা দেশে বালকদিগের জন্য ৪০,০০০টী এবং বালিকাদিগের জন্য ১৬,০০০টী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ইহাদের মধ্যে ৫০,০০০টী বিদ্যালয় গ্রামে অবস্থিত। মোট

৫৬,০০০টী বিদ্যালয়ে প্রায় ৬৫,০০০ শিক্ষক ও ৪০০০ শিক্ষয়িত্রী আছেন। এই ৬৯,০০০ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে মাত্র ১৭,০০০ জন ট্রেনিং পরীক্ষা পাশ করিয়া সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। অবশিষ্টের মধ্যে অধিকাংশের শিক্ষকতা করিবার যোগ্যতা নাই।

বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর প্রায় ৭৫,০০,০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট প্রায় ২৫,০০,০০০৲ টাকা দেন, জেলা বোর্ড প্রায় ৯,০০,০০০৲ টাকা দেন, ও মিউনিসিপ্যালিটীগুলি প্রায় ৬,০০,০০০৲ টাকা দেন; অবশিষ্ট প্রায় ৩৫,০০০৲ টাকা ছাত্র ও ছাত্রীদের বেতন ও চাঁদা ইত্যাদিরূপে আদায় হয়। যদি ৭৫,০০,০০০৲ টাকা খরচ করিয়াও ২১,০০,০০০ ছাত্র ও ছাত্রীর যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে কোন ক্ষোভের কারণ থাকিত না।

উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের এবং সিনিয়র ও জুনিয়র মাদ্রাসাসমূহের গ্রাম্য ছাত্রদের সংখ্যা ছাড়িয়া দিলেও বাংলা দেশের সকল গ্রামে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে অন্ততঃ ২৭,০০,০০০ বালক ও প্রায় সমান সংখ্যক বালিকাদের পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি কেবল বালকদিগের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও বালিকাদিগের এক-তৃতীয়াংশের জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলেও অন্ততঃ ৩৬,০০,০০০ বালক ও বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এখন বাংলাদেশে প্রতি ছাত্রের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বৎসরে ৪৲ টাকা খরচ হয়, যুক্তপ্রদেশে ৭৷৷০ টাকা ও পাঞ্জাবে ৯৲ টাকা খরচ হয়। বোম্বাই প্রদেশে আরো অধিক টাকা ছাত্র প্রতি খরচ হইয়া থাকে। যদি বাংলা দেশে ছাত্র প্রতি খরচ না বাড়ান হয়, তাহা হইলেও ৩৬,০০,০০০ গ্রাম্য বালক ও বালিকার জন্য ১,৪৪,০০,০০০৲ টাকা আবশ্যক হইবে।

প্রতি জেলাতে একটী করিয়া স্কুল-বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাহার সভ্য নিযুক্ত হইবেন :—

(ক) জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট,

(খ) সদর সব-ডিভিশনাল অফিসার,

(গ) জেলার স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর,

(ঘ) জেলা-বোর্ডের সভাপতি,

(ঙ) জেলা-বোর্ডের সহকারী সভাপতি,

(চ) লোক্যাল বোর্ডের সভাপতি,

(ছ) জেলা বোর্ডের সভ্যগণ জেলাতে যতগুলি মহকুমা থাকিবে তাহার সমান সংখ্যক সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন। কিন্তু কোন জেলাতেই এইরূপ সদস্যের সংখ্যা ২ জনের কম হইবে না।

(জ) জেলাতে যতগুলি মহকুমা থাকিবে তাহার সমান সংখ্যক সদস্য ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন কমিটি ও পঞ্চায়েতের সভ্যগণ মিলিত হইয়া নির্ব্বাচন করিবেন। এইরূপ সদস্যের সংখ্যা কোন জেলাতেই দুই জনের কম হইবে না।

(ঝ) জেলাতে যতগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকিবেন তাঁহারা একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। কিন্তু প্রথম চার বৎসরের জন্য শিক্ষকগণের প্রতিনিধি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(ঞ) জেলাতে যতগুলি মহকুমা থাকিবে তাহার সমান সংখ্যক সদস্য গভর্ণমেণ্ট মনোনীত করিবেন। এইরূপ সভ্যের সংখ্যা দুই জনের কম হইবে না।

ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল বোর্ড প্রতি চার বৎসর অন্তর নূতন করিয়া গঠিত হইবে; কিন্তু পুরাতন সভ্যেরা পুনর্ব্বার নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইতে পারিবেন। বিল-সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যের ভার ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল বোর্ডের উপর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল বোর্ড তাঁহাদের স্কুল পরিচালনের সকল ক্ষমতা বা কোন কোন ক্ষমতা ইউনিয়ন বোর্ড বা ইউনিয়ন কমিটী বা পঞ্চায়েতের হাতে দিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থা থাকার ফলে শিক্ষা সম্বন্ধে যথার্থ পল্লী-স্বরাজ লাভ হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে বৎসরে অন্ততঃ ১,৪৪,০০,০০০৲ টাকা আবশ্যক হইবে। এই টাকা সংগ্রহের জন্য এক শিক্ষাকর বসান হইবে। প্রত্যেক প্রজা তাহার দেয় খাজানার টাকা প্রতি সাড়ে তিন পয়সা কর দিবেন; প্রজা

তাহার খাজানার সহিত শিক্ষাকর জমিদারকে দিবেন। জমিদার যত খাজানা আদায় করেন তাহার টাকা প্রতি দেড় পয়সা নিজের তহবিল হইতে দিবেন। জমিদার প্রজার দেয় ও নিজের দেয় মোট শিক্ষাকর ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল ফণ্ডে জমা দিবেন। বাংলাদেশের জমিদারদের বৎসরে ২৮,৬৭০০০৲ টাকা শিক্ষাকর দিতে হইবে ও প্রজাদের বৎসরে ৮৩,৮,০০০৲ দিতে হইবে। যাহারা জমিদার বা চাষী নন, অর্থাৎ যাহারা ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগকেও চৌকিদারী ট্যাক্সের মত একটী শিক্ষাকর দিতে হইবে। অনুমান করা যায় যে, ব্যবসায়ী লোকদিগের নিকট হইতেও প্রায় ১০,০০,০০০৲ টাকা করিয়া প্রতি বৎসর প্রায় ১,২৩,৭৫০০৲ টাকা কর আদায়ের সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর অন্ততঃ ২৩,৫০,০০০, টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ফণ্ডগুলিতে দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং আবশ্যক হইলে ও সম্ভব হইলে উহার অধিক টাকা দিতেও প্রস্তুত আছেন, আশা করা যায় যে, এইরূপে সংগৃহীত প্রায় ১,৪৫,০০, ০০০ টাকায় বাংলাদেশের গ্রামসমূহে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কোন বাধা থাকিবে না। যে সময় হইতে শিক্ষাকর আদায় হইবে সেই সময় হইতে বোর্ডস্কুলসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হইবে, ইহা স্পষ্ট করিয়া বিলে বলা আছে।

গবর্ণমেণ্ট আবার তাঁহাদের কাজের সহায়তা করিবার জন্য একটী পরামর্শ সভা গঠিত করিবেন। এই পরামর্শ সভায় নিম্নলিখিত ১৬ জন সভ্য থাকিবেন। যথা—

(ক) শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়,

(খ) প্রতি ডিবিসনের ডিষ্ট্রিক্ট স্কুলবোর্ডসমূহ একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। অতএব বাংলা দেশের ৫টী ডিভিসন হইতে ৫ জন হিন্দু, ৫ জন মুসলমান সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

(গ) গভর্ণমেণ্ট ৫ জন সভ্য মনোনীত করিবেন। ইহাদের মধ্যে ২ জন অনুন্নত জাতির মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন।

খাজানার টাকা পিছু পাঁচ পয়সা করিয়া সেস আদায় হইবে। তাহাতে বাৎসরিক এক কোটি টাকা উঠিবে। তাহা খরচ হইবে—

১। প্রথম সাত বৎসরে স্কুল বাড়ী ১ দফা ৩৫,০০,০০০

২। ২৪ বৎসরে ১২০০০ বাড়ী ২ দফা ১,৫০,০০,০০০

৩। ট্রেনিং স্কুল তৈয়ারী ৩ দফা ১৩,৫০,০০০

৪। স্কুল বোর্ড নামক জেলায় জেলায় যে সমিতি হইবে, তাহার পাথেয় ও বাৎসরিক খরচ—৩,০০,০০০

৫। ট্রেনিং স্কুলের বাৎসরিক খরচ—৬,৩০,০০০

আমরা যদি ধরি যে, এই সমস্ত খরচ কেবল গানের আসর জমাইবার খরচ, তবে কি নিতান্ত অন্যায় কথা বলা হয়? এখন গুরু মহাশয়দের অবস্থা কি হইবে?

(ক) ২৫০০ 'তিন শিক্ষক' বিদ্যালয় (৬৩০৲ হারে) ১৫,৭৫,০০০

(খ) ২১৫০০ 'দুই শিক্ষক' বিদ্যালয় (৪২০৲ হারে) ৯০,৩০,০০০

(গ) ১১০০০ 'এক শিক্ষক' বিদ্যালয় (১৫০৲ হারে) ১৬,৫০,০০০

১,২২,৫৫,০০০

ছাত্রদের স্বাস্থ্য

কিছুদিন হইল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-মঙ্গল সমিতির ১৯২৯ সনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

সমিতির রিপোর্টে প্রকাশ, প্রতি দশ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র তিন জনের স্বাস্থ্য একেবারে নির্দ্দোষ ও তাহাদের বয়সের উপযোগী; এক জনের স্বাস্থ্য ঠিক তাহার উল্টা, তাহার দেহ প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, অল্প পরিশ্রমেই সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে। বাকী ছয় জনের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, কোন প্রকার রোগ ব্যাধির কারণেই হোক বা দৈহিক গঠন ও বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার জন্যই হোক, তাহাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি আদৌ দোষশূন্য নয়। এই দুরবস্থার কারণ নির্ণয় করিয়া রিপোর্ট সংক্ষেপে বলিতেছে যে, এই সকল ছাত্রের এক-তৃতীয়াংশের উপর এমন যে, তাহাদের শরীর কমজোর ও তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত খাদ্য পায় না।

বাকী ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রধান দোষ হৃৎপিণ্ডে, চোখে ও দাঁতে।

যে সকল ছাত্রের স্বাস্থ্য ও শরীর ভাল নয়, তাহাদের মধ্যে কয়জন কোন্ রোগ বা অসুবিধা ভোগ করিতেছে তাহার একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেখান হইয়াছে :—

যথেষ্ট খাদ্যের অভাব	শতকরা	৪০
চর্ম্মরোগ	,,	২৫.৬
কণ্ঠনালী ও শ্বাসনালীর বৃদ্ধি	,,	১৮.৫
হৃৎপিণ্ডের রোগ	,,	৪.১
প্লীহা বৃদ্ধি	,,	২
যকৃৎ বৃদ্ধি	,,	১.১
দন্তরোগ	,,	১১.৮
চক্ষুরোগ	,,	৩২.৯

পাট-সমস্যা এবং তাহার প্রতিকার

এ বৎসর সমস্ত ভারত-ব্যাপী একটা ভয়ানক অর্থ-সঙ্কট দেখা দিয়াছে। বাংলা দেশের অবস্থা শোচনীয়। জমিদার, কৃষক, উকিল, ডাক্তার, মহাজন, ব্যবসায়ী, কুলী, মজুর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের অবস্থাই অত্যন্ত খারাপ। জিনিষের মূল্য এত সস্তা হওয়া সত্ত্বেও তাহা খরিদ করিবার মত টাকা অধিকাংশ লোকেরই নাই। চাউলের দর যখন ১০৲ টাকা মণ হইয়াছিল, তখন লোকের তাহা কিনিতে তত কষ্ট হয় নাই। কারণ, তখন দেশে টাকার সচ্ছলতা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ৪৲ টাকা মণ হওয়া সত্ত্বেও চাউল খরিদ করিতে না পারিয়া বহুলোক অনশনে এবং অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে।

বাঙ্গালীর এই দুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছে প্রধানতঃ পাটের মূল্য-হ্রাস হইবার জন্য। প্রতি বৎসর পাট হইতে বাংলা দেশে প্রায় ১০০ কোটি টাকা আমদানি হইত। কিন্তু এই বৎসরে ৪০ কোটি টাকাও আসিবে না। সমস্ত পৃথিবী-ব্যাপী ব্যবসা ও বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ এবং তদুপরি এ বৎসর অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হওয়ায় পাটের দর অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। হিসাবে দেখা যায় যে, গত বৎসরের উদ্বৃত্ত মালের পরিমাণ মোট ৩৫ লক্ষ বেল (প্রতি বেলে পাকা ৫৴ মণ হয়)। এ বৎসর সরকারী অনুমান মতে মোট ১১২ লক্ষ বেল উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞদিগের মতে দেখা যায় যে, মোট ১২০ লক্ষ বেল উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ও এই বৎসরের উৎপন্ন মালের মোট পরিমাণ ১৫৫ লক্ষ বেল। এই বৎসর জুট মিলে মাত্র ৪৭ লক্ষ বেল পাটের আবশ্যক হইবে এবং ৩০ লক্ষ বেল বিদেশে রপ্তানি হইবে। সুতরাং মোটের উপরে মাত্র ৭৭ লক্ষ বেল পাট বিক্রীত হইবে এবং ৭৮ লক্ষ বেল উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে। পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার যদি উন্নতি না হয়, তাহা হইলে এই বৎসরের উদ্বৃত্ত মালের দ্বারাই আগামী বৎসরের কাজ চলিয়া যাইবে। কিন্তু কলিকাতার জুটমিল-গুলি সাধারণতঃ ২৫।৩০ লক্ষ বেল পাট মজুত রাখে। এজন্য আশা করা যায় যে, আগামী বৎসর যদি ৩০ লক্ষ বেল মাল উৎপন্ন হয় তবে তাহার জন্য এ বৎসরের চেয়ে ভাল দর পাওয়া যাইবে। কিন্তু যদি আগামী বৎসর ৩০ লক্ষ বেল হইতে বেশী উৎপন্ন হয় তাহা হইলে পাটের দর এই বৎসরের চেয়েও কম হইবে এবং দেশের অবস্থা আরও অধিকতর শোচনীয় হইবে।

এমতাবস্থায় আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে আগামী বৎসর ৩০ লক্ষ বেলের অধিক পাট উৎপন্ন না হইতে পারে। এ বৎসর ১২০ লক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং আগামী বৎসর ৩০ লক্ষ বেল উৎপন্ন করিতে হইলে এই বৎসর যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা হইয়াছে তাহার সিকি পরিমাণ জমিতে মাত্র চাষ করা কর্ত্তব্য। যদি প্রত্যেক কৃষক প্রতিজ্ঞা করে যে, আগামী বৎসর ইহার অধিক পাট চাষ করিবে না তাহা হইলে আমাদের এই আর্থিক দুরবস্থার কতকটা সমাধান হইতে পারে।

পাট বঙ্গদেশ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও জন্মে না। অথচ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পাট এবং চটের আবশ্যকতা আছে। সুতরাং বাংলার কৃষক যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে আবশ্যক অনুযায়ী পাট উৎপন্ন করে তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে পাটের উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারে। বাঙ্গালীর কোনরূপ শিল্প-

বাণিজ্য নাই, সুতরাং সকল শ্রেণীর লোককেই কৃষকের আয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। এজন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর দেখা উচিত যাহাতে আমাদের দেশের নিরক্ষর কৃষকগণ উপরের লিখিত মত পাট চাষ কমাইয়া তাহাদের নিজেদের এবং সমস্ত দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে। ইতি

(মহারাজা বাহাদুর স্যর) প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, (নবাব বাহাদুর, ঢাকা) কে, হবিবুল্লা, (মহারাজা, ময়মনসিংহ) শশীকান্ত আচার্য্য, (আচার্য্য) পি, সি, রায়, এ, কে, ফজলুল হক, আবদুল করিম, মুজীবর রহমান, মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, (ডাঃ) জে, এন মৈত্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

পাটচাষীর দুর্দ্দশায় কর্ত্তব্য কি?

বাঙ্গালার পাট-চাষীর দুর্দ্দশার কথা কাহারও অবিদিত নাই। পাটের দর পড়িয়া যাওয়ায় ইহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। যাহারা একমাত্র পাট বিক্রয়-লব্ধ অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারা এখন অতি কষ্টে দিন-যাপন করিতেছে, কেহ কেহ ঋণের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিয়াছে। এই অবস্থায় সরকার স্থির করিয়াছেন, পাটের পরিবর্ত্তে অপর শস্য উৎপাদনের জন্য চাষীদিগকে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। আগামী বৎসর যাহাতে বাঙ্গালার কৃষকেরা আর অতিরিক্ত পাট উৎপাদন করিয়া অযথা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তজ্জন্য মফঃস্বলের নানা স্থানে প্রচার-কার্য্যের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই সম্পর্কে কয়েকখানি পুস্তিকা প্রচার করা হইয়াছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে প্রকাশিত পুস্তিকাখানিতে পাটের পরিবর্ত্তে আর কোন্ কোন্ ফসল উৎপাদন করিলে চাষীরা লাভবান্ হইতে পারে তাহা বিবৃত করা হইয়াছে।

ইক্ষু

বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশে যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হয় তদপেক্ষা অনেক অধিক জমিতে ইতিপূর্ব্বে ইক্ষুর চাষ হইত। ৩০ বৎসর পূর্ব্বের হিসাব লইলে দেখা যায়, বর্ত্তমানে যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হয় তদপেক্ষা শতকরা ৭০ ভাগ অধিক জমিতে অর্থাৎ প্রায় ১৫০,০০০ একর অধিক জমিতে ইক্ষুর চাষ করা হইত। পাটের চাষ দ্বারা বেশী লাভ হয় দেখিয়া বাঙ্গালার চাষীরা ধীরে ধীরে ইক্ষুর চাষ কমাইয়া ফেলিয়াছে এবং সকলেই পাট চাষের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট উৎপাদিত হইয়া বাজার একেবারে মন্দা হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় আবার ইক্ষুর চাষ করিলে হয়ত কিছু লাভ হইতে পারে।

আজ কাল চিনি ও গুড়ের দর অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। তথাপি ইক্ষুর চাষ ক্ষতিজনক হইবে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ইক্ষুর চাষ দ্বারা প্রতি বিঘা জমি হইতে ১০০৲ টাকার ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। বিশেষভাবে পাবনা, বগুড়া, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় উত্তম ইক্ষুর ফসল হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে এই সমস্ত জেলায় যে পরিমাণ জমিতে আকের চাষ হইত এখনও সেই পরিমাণ জমিতেই আকের চাষ করা কর্ত্তব্য।

ধান

ধানের চাষও বর্দ্ধিত করা প্রয়োজন। তাহা হইলে অন্ততঃ কৃষকেরা পেটে খাইয়া বাঁচিতে পারিবে। বর্ত্তমানে প্রায় ২২,০০০,০০০ একর জমিতে ধানের চাষ হয়। আরও ১,০০০,০০০ একর বেশী জমিতে যদি ধানের চাষ হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগের বেশী বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং আরও ১,০০০,০০০ জমিতে নিঃসন্দেহভাবে ধানের চাষ করা যাইতে পারে।

বর্ষার সময়ে সাধারণতঃ অনেক জমি জলে ডুবিয়া যায়। আজকাল এরূপ জমিতে পাটের চাষ হয়। এইরূপ জমিতে আমন ধানের (যে ধান জলে জন্মে) চাষ করা কর্ত্তব্য; তারপর জল সরিয়া গেলে খেসারী, কলাই প্রভৃতির বীজ কাদার উপর বপন করিলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে।

অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে ধান, অড়হর, লঙ্কা, বেগুন, প্রভৃতির চাষ হইতে পারে। এই শ্রেণীর জমিতে ইক্ষুর চাষও করা যাইতে পারে।

রবিশস্য

নদীর চরের পলি পড়া মাটিতে ডাল, কলাই ও অন্যান্য রবিশস্য হইতে পারে। উত্তর এবং পশ্চিম বঙ্গের নানাস্থানে গম, যব প্রভৃতির চাষ ভাল হয়। উত্তর বঙ্গে তামাকের চাষ খুব লাভজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আলুর চাষও কম লাভজনক নহে। বাঙ্গালার কোন কোন জেলায় আলুর চাষ করিলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়।

সহরের নিকটবর্ত্তী স্থলে বিলাতী বেগুণের চাষ করা যাইতে পারে। এই বেগুণের ফসল খুব বেশী হয়। নিকটে বাজার থাকিলে উহা অনায়াসে বিক্রয় হইবে।

আজকাল ফুলকপি ও বাঁধাকপির চাষও আরম্ভ হইয়াছে। বাজারে এগুলি যথেষ্ট মূল্যে বিক্রয় হয়। মামুলি পাট চাষ কমাইয়া এই সমস্ত নূতন নূতন শস্য উৎপাদন করা এখন চাষীদের অবশ্যকর্ত্তব্য। এদেশের অধিকাংশ চাষীই নিরক্ষর। সকল সময়ে তাহারা স্বয়ং ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে না, তাহাদিগকে সকল কথা বুঝাইয়া দেওয়া দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের কর্ত্তব্য। ছুটির সময় গ্রামে গিয়া স্কুল কলেজের ছাত্রেরাও একার্য্যে সহায়তা করিতে পারে।

ধান ও কার্পাসের পরিমাণ

ভাদুই ধান্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের শেষ সংবাদ বিগত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। বৃটিশ ভারতে যত ভাদুই ধান্য হইয়াছে তাহার শতকরা ছয় ভাগের কিছু অধিক বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে বঙ্গদেশে মোট ৫৮১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭০০ একর ভূমিতে (এক একর তিন বিঘার কিছু অধিক) ভাদুই ধান্য রোপণ করা হইয়াছিল। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা ২২ হাজার ৬০০ একর কম ভূমিতে এই ধানের আবাদ হইয়াছিল। গড়ে প্রতি বৎসর বঙ্গদেশে যে পরিমাণ ভাদুই ধান্য উৎপন্ন হয়, গত বৎসর তাহার তুলনায় শতকরা ৭৫ ভাগ মাত্র হইয়াছিল। এ বৎসর শতকরা ৮১ ভাগ হইয়াছে, অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর শতকরা ছয় ভাগ অধিক হইয়াছে। গত বৎসর মোটের উপর ২৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৪০০ টন (এক টনে প্রায় ২৭॥০ মণ) ভাদুই ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু এ বৎসর জলবায়ু অনুকূল থাকাতে কর্ত্তৃপক্ষ অনুমান করেন যে, এবারে ২৯ লক্ষ ৭ হাজার ৩০০ টন অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগ অধিক ধান্য পাওয়া যাইবে।

কার্পাস

বঙ্গদেশে দুই প্রকার কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে, 'জলদি' ও 'নামি'। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ও ত্রিপুরা রাজ্যে "জলদি" এবং বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে 'নামি' কার্পাস উৎপন্ন হয়। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তেই যৎসামান্য কার্পাসের আবাদ আছে, অন্যান্য জেলাতে সামান্য যাহা আছে তাহা নগণ্য। গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে সরকার কর্ত্তৃক কার্পাসের ফসল সম্বন্ধে তৃতীয় আনুমানিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর 'জলদি' কার্পাস ৭৫ হাজার ৩০৭ একর জমিতে এবং 'নামি' কার্পাস ১২০৩ একর ভূমিতে আবাদ হইয়াছে। এ বৎসর ঐ দুই প্রকার কার্পাসের যথাক্রমে ৬৭ হাজার ২০৭ একর ও ৫০৩ একর ভূমিতে আবাদ হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ অনুমান করেন যে, গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর কার্পাস কিছু অল্প উৎপন্ন হইবে। তাঁহাদের হিসাব মত 'জলদি' কার্পাস ১৮ হাজার ৩৮০ গাঁট ও 'নামি' কার্পাস মাত্র ১০১ গাঁট পাওয়া যাইবে। গত বৎসর ঐ দুই প্রকার কার্পাস যথাক্রমে ২০ হাজার ২৯ গাঁট এবং ৩১৩ গাঁট উৎপন্ন হইয়াছিল (এক গাঁট তুলার ওজন পাঁচ মণ অপেক্ষা কিছু কম)।

(পঞ্চায়েৎ—ঢাকা)

কো-অপারেটিব্ জুট সেল এণ্ড সাপ্লাই সোসাইটি

চারি বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কো-অপারেটিব্ রেজিষ্ট্রার রায় যামিনী মোহন মিত্র বাহাদুরের উদ্যোগে কো-অপারেটিব্ জুট সেল এণ্ড সাপ্লাই সোসাইটিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সমবায় নীতিতে পাট উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া কৃষক ও ব্যবসায়িগণ যাহাতে

পাটের উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা। এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে ১৯টি পাট ক্রয়ের কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং কলিকাতায় একটি পাইকারী বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হয়। ইহারা গৃহস্থের নিকট হইতে পাট ক্রয় করিয়া নিজেদের মার্কা দিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করিতেছিলেন। এই কয় বৎসরে সোসাইটির সি ও এস্ মার্কার বেশ একটু সুনামও হইয়াছিল। কিন্তু পাটের ব্যবসা খুব সহজ নহে, বিশেষতঃ নূতন ব্যবসায়ীর পক্ষে পাট বেচিয়া লাভবান হওয়া সুকঠিন। তদুপরি বাজারের অস্থিরতা ও কঠোর প্রতিযোগিতার ফলে এই সকল পাট বিক্রয় সমিতি বিশেষরূপ লোকসান দিয়াছে। বেঙ্গল কো-অপারেটিব্ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন স্থানের কো-অপারেটিব্ ব্যাঙ্কগুলি এতদিন ইহাদিগকে অর্থ-সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন—এক্ষণে পাট-ব্যবসায়ে লোকসান দেখিয়া ইহারা টাকা দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। এদিকে রেজিষ্ট্রার ছুটিতে থাকায় গবর্ণমেণ্ট উক্ত সেল এণ্ড সাপ্লাই সোসাইটিগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহা দেশের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। এই সকল সমিতি দ্বারা কৃষকগণ এতদিন যে সুবিধা পাইতেছিল তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল। যে সকল লোক এই আফিসসমূহে কাজে নিযুক্ত ছিল তাহারাও বেকারে পরিণত হইল। ইহাকে দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। পাটের ব্যবসা সাধারণতঃ ইয়োরোপীয় বণিকগণের একচেটিয়া। তাহারা পৃথিবীর সমস্ত পাট-ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর যাবৎ মাড়োয়ারী বণিকগণ এবং এই কো-অপারেটিব্ সমিতিগুলি পাট-ব্যবসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াতে কৃষক-গণের কিছু সুবিধা হইতেছিল। বাঙ্গালার কৃষক ও মহাজন-দিগকে লইয়া যৌথভাবে পাটের ব্যবসা করিতে না পারিলে দেশের মঙ্গল হইবে না। কেবল ব্যবসা করিলেই চলিবে না; যাহাতে কৃষকের হস্তে উপযুক্ত অর্থাগম হয়, বেকারের গ্রাসাচ্ছাদন হয়, ভবিষ্যতের পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত হয় ও পাটচাষিগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে পাট উৎপাদন-সংরক্ষণ ও উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সভা-সমিতিতে বক্তৃতাদান করিয়া অথবা রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া দেশের যে উপকার হয় কৃষিপ্রধান দেশের কৃষকের অবস্থার উন্নতি করিতে পারিলে তদপেক্ষা বেশী ছাড়া কম উন্নতি হয় না। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সমবায় ও কৃষিবিভাগ যদি কৃষকের উন্নতির জন্য আরও বেশী মনোযোগী হন, তবে দেশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এই সমবায় সমিতিগুলি যদি কেবল মাত্র পাট খরিদ ও বিক্রয় করিয়া ব্যবসায় অর্থাগমের চেষ্টা না করিয়া মফঃস্বলের স্থানে স্থানে বিক্রয়-কেন্দ্র ও মাল ষ্টক করিবার জন্য উপযুক্ত গুদাম এবং কৃষকদিগকে আবশ্যকীয় ঋণদান করিবার জন্য সমিতি স্থাপন করিতেন তবেই দেশের অধিকতর মঙ্গল হইত এবং এই সমিতিগুলিও অকালে লুপ্ত হইত না।

যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে পুনরায় এগুলিকে সংগঠিত করা আবশ্যক। আমরা বলি সরকার অচিরে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের সহায়তায় নিম্নলিখিত কাজ-গুলি করিয়া পাটচাষীদের, তথা দেশের কল্যাণসাধন করুন।

(১) মফঃস্বলের পাট উৎপাদনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাট ষ্টক করিবার জন্য উপযুক্ত গুদাম সংস্থাপন।

(২) পাট-বিক্রয়ের এজেন্সী স্থাপন।

(৩) কৃষকের উৎপাদিত মালের অনুপাতে তাহাদিগকে ঋণদান করিবার জন্য কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটি স্থাপন।

(৪) কৃষক যাহাতে চাহিদার অধিক মাল উৎপাদন করিয়া পাটের দরের সর্ব্বনাশ না করে তজ্জন্য প্রচার করা।

(৫) দেশের মধ্যে যাহাতে কাঁচা মাল হইতে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা। পাট হইতে যদি গৃহস্থগণ দড়ি, চট, থলে এবং বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে শিখে, তবে তাহারা অবসরকালে বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতে পারে, অনেক বেকার লোকের অন্নসংস্থান হয় এবং এইরূপে পাটের দর কিছু বৰ্দ্ধিত হইতে পারে।

(পল্লীমঙ্গল—নারায়ণগঞ্জ)

মহাত্মাজীর একাদশ সর্ত্ত

১। বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৪ পেন্সে নামাইতে হইবে।

২। লবণ-শুল্ক একেবারে তুলিয়া দিতে হইবে।

৩। ভূমি-রাজস্ব-সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান আইন কোটি কোটি শ্রমশিল্পীদের পক্ষে অতি কঠোর। এই আইনের পুনঃ সংস্কার করিয়া ভূমিরাজস্ব অর্দ্ধেক করিয়া দিতে হইবে। এবং এই বিষয়টি জনপ্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপক সভার অধীনে আনিতে হইবে।

৪। মাদক দ্রব্য সেবন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

৫। বৃটিশ এবং ভারতীয় সৈন্যবল কমপক্ষে অর্দ্ধেক কমাইয়া ফেলিতে হইবে।

৬। বিদেশীদের অধিকার এবং ভারত সরকারের ঋণ সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য একটি পুরাপুরি প্রতিনিধিমূলক কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে।

৭। হাজির উপকূল-বাণিজ্য-রক্ষা বিলকে (আইনের খসড়া) ভারতগবর্ণমেণ্ট নিজের বিল বলিয়া মানিয়া লইবেন।

৮। সমস্ত বিদেশী বস্ত্রের উপর সোজাসুজি রক্ষণাত্মক শুল্ক বসাইতে হইবে।

৯। হত্যা অথবা হত্যা-চেষ্টার অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হইবে এবং রাজনৈতিক অপরাধে নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণকে দেশে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দিতে হইবে। সেইরূপ হত্যা অথবা হত্যা-চেষ্টা ছাড়া অন্যান্য সমুদায় রাজনৈতিক অপরাধের জন্য চল্‌তি মোকদ্দমাগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে; এবং ব্যবস্থাপরিষদের ৫ জন নির্ব্বাচিত সদস্য দ্বারা গঠিত কমিটির সম্মতি ব্যতিরেকে ১২৪(ক) ধারার কোন মোকদ্দমা চলিতে পারিবে না।

১০। পুলিশের গুপ্তবিভাগ (সি, আই, ডি) উঠাইয়া দিতে হইবে কিংবা ঐ বিভাগটি জনসাধারণের কর্ত্তৃত্বাধীনে দিতে হইবে।

১১। অনতিবিলম্বে নিরস্ত্রীকরণ আইনের পুনঃসংস্কার করিতে হইবে এবং কাহাকে অস্ত্র রাখার অনুমতি (লাইসেন্স) দেওয়া হইবে তাহা স্থির করার ভার প্রত্যেক জেলার জনসাধারণের এক একটি কমিটির হাতে দিতে হইবে।

ট্রান্সপোর্ট কমিটির রিপোর্ট

স্যর আর্থার গ্রিফিথ বসকাউয়েন ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ যানবাহন সম্বন্ধীয় রয়াল কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি বলিয়াছেন—ট্রাম অপেক্ষা মোটরই বড় বড় সহরের যানবাহনের কার্য্যে অধিকতর সুবিধাজনক। ট্রামকে তাঁহারা পুরাতন ও বিপজ্জনক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মোটরই হইতেছে বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত যান। এই কারণে তাঁহারা ট্রাম তুলিয়া দিয়া ক্রমশঃ তাহার স্থানে মোটর চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। পরন্তু সহরের উপকণ্ঠে বৈদ্যুতিক রেলপথ বসাইতে বলিয়াছেন। পথের ব্যয় সম্বন্ধে কমিটি বলিয়াছেন, পথের খরচ মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আদায় হইবে করদাতাদের নিকট হইতে, বাকী দুই-তৃতীয়াংশ মোটর-বিহারীদের নিকট হইতে। পথের উপর এবং মোটরের তৈলের উপর ট্যাক্স বসাইয়া কমিটি এই দুই-তৃতীয়াংশ খরচ আদায় করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

চাকুরেদের খাটিবার সময় নিরূপণ

চাকুরেদের সমিতিগুলির সহিত জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক দপ্তরের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে।

এই সমস্ত সমিতি নানা আকারের এবং নানা ধরণের হইয়া থাকে। আইনের সাহায্যে আপন আপন সুখ সুবিধা বিধানের পক্ষেও আবার নানা সমিতির নানা মত। ১৯২৬ সনে এই সমস্ত সমিতি একত্র হয় ও খাটিবার সময়, চাকুরি করিবার চুক্তি ইত্যাদি সুবিধামত করিয়া লইবার জন্য স্পষ্টাক্ষরে কতকগুলি দাবী পেশ করে।

চাকুরে সমিতিগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইবার পর শ্রমিক দপ্তর চাকুরেদের মঙ্গল-বিধানের জন্য

উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এজন্য দপ্তরের সহিত ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের রীতিমত পরামর্শ চলিতেছে। এই দপ্তরটী গোড়া হইতেই চাকুরেদের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আসিতেছে। ১৯১৯ সনের পর হইতে দপ্তর হইতে যে সমস্ত নিয়মকানুন বাহির হইয়াছে তাহাতে চাকুরেদের উপরও লক্ষ্য আছে। বেকার-সমস্যা, উপনিবেশ স্থাপন, মাতৃমঙ্গল, কার্য্য-বিরতি, সামাজিক বীমা ইত্যাদি ব্যাপারে নিয়মকানুন করিবার সময় দপ্তর চাকুরেদের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ১৯২১ সনের আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাপ্তাহিক বিশ্রামের ব্যবস্থা করিবার জন্য বলা হয়।

গোড়া হইতেই চাকুরে সমিতিগুলি খাটিবার সময় নিরূপণ করিয়া দিবার জন্য শ্রমিক দপ্তরের নিকট আবেদন করে। ফলে ১৯২৯ সনের অধিবেশনে এ সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা করিয়া একটি প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হয়।

শ্রমিক দপ্তরের বিগত জুন অধিবেশনে গবর্ণমেণ্ট-সমূহের উত্তর পাওয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান অধিবেশনে খাটিবার সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটি মোসাবিদাও খাড়া করা হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক কমিশন

বিগত আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক কন্‌ফারেন্সের প্রারম্ভে খাটিবার সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানাদি করিবার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছে। ৬৮ জন সদস্য লইয়া কমিশনটি গঠিত হইয়াছে (৩৪ জন গভর্ণমেণ্ট প্রতিনিধি, ১৭ জন মালিকদের প্রতিনিধি এবং ১৭ জন মজুরদের প্রতিনিধি)। কমিশন পূর্ব্বোক্ত মোসাবিদা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া একটি নিয়মাবলী প্রকাশ করে। নিয়মাবলীটি গৃহীত হইয়াছে।

নিয়মাবলীটি নিম্নলিখিত সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরেদের উপর প্রযুক্ত হইবে:

(ক) ব্যবসা-বাণিজ্য, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সার্ভিস, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগ;

(খ) অফিসের কার্য্যে নিযুক্ত চাকুরেগণ;

(গ) দোআঁশলা ব্যবসা-বাণিজ্য।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না:

(ক) রোগী, দুর্ব্বল, দুঃস্থ এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকদিগের সেবালয় এবং চিকিৎসালয়সমূহ;

(খ) হোটেল, রেস্তরাঁ, বোর্ডিং, ক্লাব, কাফে এবং অন্যান্য ভোজনালয়;

(গ) থিয়েটার প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের স্থান।

প্রত্যেক দেশে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই নিয়মাবলী হইতে রেহাই দেওয়া উচিত:

(ক) যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মাত্র এক পরিবার-ভুক্ত লোকজন কাজ করে;

(খ) শাসক-সম্প্রদায়ের অফিসসমূহ;

(গ) যাহাদের উপর কার্য্য-পরিচালনের ভার কিংবা বিশ্বস্ত কার্য্যভার ন্যস্ত আছে;

(ঘ) অফিসের বাহিরে কার্য্য করে এমন ভ্রমণশীল কর্ম্মচারী এবং প্রতিনিধি।

হপ্তায় ৪৮ ঘণ্টা কাজ

এই নিয়মাবলীতে চাকুরেদের জন্য সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা এবং দিনে মাত্র ৮ ঘণ্টা খাটিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ৮ ঘণ্টা খাটুনি মানে মালিকের কাজের জন্য দৈনিক ৮ ঘণ্টা প্রস্তুত হইয়া থাকা। তবে স্থানীয় অবকাশ, কারখানা ভাঙ্গিয়া যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারের জন্য ক্ষতিপূরণ উদ্দেশ্যে আট ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় খাটাইয়া লওয়া যাইতে পারিবে। ইহা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের স্থায়ী এবং অস্থায়ী অন্য ব্যবস্থাও মানিয়া লইতে হইবে।

তত্ত্বাবধানকারী, কারখানা-পরিদর্শক, শিক্ষানবীশ বা সহায়তাকারীদের জন্য এই আট ঘণ্টার নিয়ম খাটিতে পারে না। দোকানপত্র পরিচালন ব্যাপারেও আট ঘণ্টার রেওয়াজ থাকিবে না। এছাড়া আরও অনেক অস্থায়ী কাজে আট ঘণ্টার অতিরিক্ত খাটুনি মানিয়া লইতে হইবে। পচনশীল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়, মালপত্রের ষ্টক গ্রহণ, আমদানি

হিসাবপত্র দাখিল, নিকাশ, শেষ তমাদির দিবস ইত্যাদি ব্যাপারে আধ ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় খাটান ছাড়া উপায় নাই।

বৎসরের মধ্যে কোন্ কোন্ দিনে বা কোন্ কোন্ সময়ে অতিরিক্ত খাটুনির দরকার হইবে, তৎসম্বন্ধে রীতিমত নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। এই সমস্ত আইন-কানুন শ্রমিক এবং মালিক উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই যাহাতে প্রকৃত অনুসন্ধানাদি হয় এবং আন্দাজ-মাফিক আইনকানুন প্রবর্ত্তিত হয় এমন ব্যবস্থাও শ্রমিক কন্‌ফারেন্সের এই নিয়মাবলীতে স্থান পাইয়াছে।

দুনিয়ার সর্ব্বত্র দৈনিক আট ঘণ্টার প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। ১৯২৯ সনে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে মজুরদিগের খাটুনির সময় আট ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ১৯৩০ সনের অধিবেশনে অফিসের কেরাণী এবং অন্যান্য চাকুরেদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের পার্ল্যামেণ্টগুলি আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক মহাসভার এই উপদেশ মানিয়া চলিলে হয়।

শ্রমিক দপ্তরের অন্যান্য প্রচেষ্টা

আফিসের কেরাণী ইত্যাদি ছাড়া অন্যান্য ২য় শ্রেণীর চাকুরেদের জন্যও শ্রমিক দপ্তর মাথা ঘামাইতেছে। এজন্য শ্রমিক কন্‌ফারেন্স সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির নিকট তিন দফা সুপারিশ পেশ করিয়াছে। প্রথম দফায় হোটেল, রেস্তরাঁ এবং এইরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাকুরেদের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। যে সমস্ত দেশে এই জাতীয় চাকুরেদের জন্য কোন বিধি-ব্যবস্থা নাই, সেই সমস্ত দেশে এই সমস্ত চাকুরেদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। যে সমস্ত দেশে এই জাতীয় চাকুরেদের খাটিবার সময় সম্বন্ধে আইন কানুন বিধিবদ্ধ আছে, সেই সমস্ত দেশেও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে অনুসন্ধান করিতে বলা হইয়াছে। এই উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রগুলিকে চার বৎসরের মধ্যে বিশদ বিবরণ শ্রমিক দপ্তরের নিকট পেশ করিতে হইবে। যদি কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তোষজনক বিবরণ না মিলে তাহা হইলে শ্রমিক-দপ্তর আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক কন্‌ফারেন্সে সেই সমস্ত ব্যাপার উত্থাপন করিবে।

দ্বিতীয় দফায় থিয়েটার প্রভৃতি সাধারণের আমোদ-প্রমোদ প্রতিষ্ঠানের চাকুরেদের কার্য্যকাল সম্বন্ধে সুপারিশ করা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রকে এজন্য রীতিমত অনুসন্ধান করিয়া চার বৎসরের মধ্যে সমস্ত ব্যাপার শ্রমিক দপ্তরে পেশ করিতে বলা হইয়াছে। এক্ষেত্রেও বিবেচনা করিয়া কোন কোন বিষয় শ্রমিক কন্‌ফারেন্সে উত্থাপন করা হইবে।

তৃতীয় দফা রুগ্ন, সামর্থ্যহীন, দুঃস্থ, মানসিক বিকারগ্রস্ত-দের সেবালয়, এবং চিকিৎসালয়ে মোতায়েন চাকুরেদের সম্বন্ধে। এক্ষেত্রে শ্রমিক দপ্তর পূর্ব্ব দুই দফার মত ব্যবস্থা করিবে স্থির করিয়াছে।

শ্রমিক কন্‌ফারেন্সে এই সমস্ত প্রস্তাব রীতিমত ভোট লইয়া গৃহীত হইয়াছে। সাধারণতঃ শ্রমিক প্রতিনিধি এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ একত্র হইয়া ভোটাধিক্যে এই সমস্ত প্রস্তাব পাশ করিয়া লইয়াছেন।

আগামী বৎসর আবার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে আরও একটী প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইবে। সেইবার কলকারখানার শিশু-মজুরদের বয়স স্থির করা হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক কন্‌ফারেন্সে এই সমস্ত বিষয় উত্থাপন করা ছাড়া শ্রমিক দপ্তর আরও কয়েকটী প্রয়োজনীয় ব্যাপার সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতেছে; যথা :—

দোকান বন্ধ করা সম্বন্ধে আইন, ফার্ম্মের প্রতিনিধি, ভ্রমণকারী এজেণ্ট ইত্যাদি চাকুরেদের বেতন পরিশোধের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা, চাকুরিতে লাগাইবার ভিন্ন ভিন্ন ধরণের চুক্তি ইত্যাদি। যাহাতে এই সমস্ত ব্যাপারে একই ধরণের আইনকানুন সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হয় শ্রমিক দপ্তর সেইজন্য চেষ্টা করিতেছে।

মুসলমান মিঠাইওয়ালার রোজনামচা

[কোন একটি চায়ের দোকানে একজন মুসলমান মিঠাইওয়ালার সহিত আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল তার মর্ম্ম নীচে দেওয়া যাইতেছে।—শ্রীসুধাকান্ত দে।]

প্র :—দেখিতেছি, তুমি কেক লইয়া ফিরি করিতে বাহির হইয়াছ। এই কেক্ কি তুমি নিজে তৈরী করিয়াছ?

উ :—আজ্ঞে, আপনারা যত কেক্ খাইয়া থাকেন তার অধিকাংশই আমরা মুসলমানরা করিয়া থাকি। যদি জাত যাইবার ভয় করিয়া থাকেন, তবে যতদিন কেক্ খাইতেছেন ততদিন জাত গিয়াছে।

প্র :—না, না, জাত যাওয়ার কথা হইতেছে না। কিন্তু তুমি কি বলিতে চাও কেক্ তৈরীর ব্যবসাটা প্রধানতঃ মুসলমানদের হাতে?

উ :—আজ্ঞে হাঁ, আমার তাই মনে হয়।

প্র :—তোমার বাড়ী কোথায়?

উ :—হাওড়া-আমতা রেলওয়ে জানেন ত? আমার বাড়ী সেই আমতা।

প্র :—তোমার স্ত্রীপুত্র কি এখানে তোমার কাছে রাখিয়াছ?

উ :—আজ্ঞে না, তারা সব দেশে রহিয়াছে। তবে আমার এক ভাইপো আমার কাছে কাজ শিখিয়া এখন এখানে আলাদা মিঠাইয়ের কারবার চালাইতেছে।

প্র :—তুমি এই প্রকার কেক্ তৈরী করিয়া বেচিতেছ কত বৎসর যাবৎ?

উ :—প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ।

প্র :—তুমি বাড়ী ঘরে যাও না কি?

উ :—প্রায়ই যাই। এই অল্প দিন আগেও বাড়ী হইতে আসিয়াছি।

প্র :—আচ্ছা, তুমি এই প্রকার কেক্ বেচিয়া মাসে কত টাকা উপার্জ্জন কর?

উ :—প্রত্যেক মাসে কিছু এক রকম উপার্জ্জন হয় না। তবে মোটামুটি প্রতি মাসে সমস্ত খাইখরচা বাদে হাতে গোটা পঞ্চাশেক টাকা থাকে।

প্র :—পঞ্চাশ টাকা! একি বাড়ী ভাড়া বাদে?

উ :—আজ্ঞে হাঁ।

প্র :—তবে ত দেখিতেছি তুমি মিঠাই বেচিয়া ভালই আছ।

উ :—আজ্ঞে সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যদি এই টাকা না পাই তবে একাজ করিব কেন?

প্র :—তোমাকে কি এজন্য খুব খাটিতে হয়?

উ :—এই দেখুন না ভোর ৬টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত খাটিয়াছি। তারপর স্নান করিয়া ভাত খাইয়া এই ফিরি করিতে বাহির হইয়াছি। এই কেক্গুলি আমার সমস্ত দিনের মেহনতের ফল।

প্র :—তুমি বাড়ী ভাড়া কত দাও?

উ :—৩৬৲ টাকা। কিন্তু এই সব টাকাটাই আমার ঘাড়ে পড়ে না। কারণ, আমার ঘরে আরো ৮।১০ জন লোক থাকে, তারা প্রতিদিন আমাকে ৵০ আনা করিয়া দেয়।

প্র :—কেক্ তৈরীতে সাহায্য করিবার জন্য তোমার লোকজন নাই ?

উ :—আছে বই কি। টাকা দিয়া লোক রাখিতে হইয়াছে।

প্র :—তোমার এই কেক্ ইত্যাদির জন্য তুমি কোন্ কোন্ জিনিষ ব্যবহার কর ?

উ :—আজ্ঞে ছানা, চিনি, ময়দা কিস্‌মিস, বাদাম ইত্যাদি।

প্র :—দৈনিক তোমার নিজের খাওয়া-পরার খরচ কত পড়ে বলিতে পার ?

উঃ—দিন ॥০ আনার কমে চলে না বাবু। সাধারণতঃ ॥০ আনার বেশীই পড়ে। ॥৵০ আনা ৸০ আনা হইল সাধারণ খরচ। কখনো কখনো ১৲ টাকা খরচ করি।

প্রঃ—এই খরচ বাদে মোটামুটি তোমার হাতে ৫০৲ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। এই টাকা দিয়া তুমি কি কর ? কোথাও জমাও কি ?

উঃ—বাবু, জমাইবার অবসর কোথায় ? এই টাকার অধিকাংশই খরচ করিয়া ফেলিতে হয়। বাড়ীতে লোকজন আছে।

প্রঃ—দেশে তোমার ক্ষেত খামার নাই ?

উঃ—আজ্ঞে আছে।

প্রঃ—তাতে কোন্ কোন্ ফসল পাও ?

উঃ—ধান, সরিষা, ডাল, পাট। এবছর পাটে ত দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। সেই জন্য ঠিক করিয়াছি আগামী বৎসর হইতে আর পাট বুনিব না।

প্রঃ—আচ্ছা, এই সব ফসল হইতে তোমাদের রোজকার খরচ চলে না ?

উঃ—আজ্ঞে না, সমস্ত অভাব মিটে না। কিনতে হয়।

প্রঃ—আচ্ছা চাষবাস করিতে তোমাদের কত খরচ হয় ?

উঃ—চাষ আমরা নিজেরা করি না। আমরা ভাগে চাষ করি, অর্থাৎ অন্যদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া চাষ করাইয়া লই। খরচটা তারা পোষায়। সেজন্য ফসল পায়। আমরা বাকীটা পাই।

প্রঃ—তোমরা নিজেরা চাষ কর না কেন ?

উঃ—সে অনেক হেঙ্গামের ও খরচের ব্যাপার। পরিবারে চাষ করিতে পারিবার মত সমর্থ লোক নাই। থাকিলেও সকল সময় সুবিধা হইয়া উঠে না।

প্রঃ—বুঝিলাম তোমাকে নিজের উপার্জ্জনের টাকা দেশে পাঠাইতে হয়। কিন্তু ৫০৲ টাকাই কি সেখানে দরকার হয়।

উঃ—আজ্ঞে, আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন অন্যান্য খরচও আছে।

প্রঃ—যেমন ?

উঃ—বেয়ারাম-পীড়া, বিয়া-সাদি, উৎসব ইত্যাদি। অনেক সময় এই সব বাবদ ঋণ পর্য্যন্ত করিতে হয়। সে ঋণ শোধ করিতে করিতে হাতে আর কি থাকিতে পারে ?

প্রঃ—আচ্ছা তোমার ছেলেপিলেদের কিছু লেখাপড়া শিখাও নাই ? এখনো তারা পড়িতেছে কি ?

উঃ—আজ্ঞে কিছু কিছু লেখা পড়া শিখাইয়াছিলাম। অল্প অল্প লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। কিন্তু এখন আর পড়ে না।

"পল্লীমঙ্গল"—নারায়ণগঞ্জ

মধ্যবিত্ত

বঙ্গদেশ বর্ত্তমানে যে অর্থসঙ্কট ও রাজনৈতিক ঝটিকাবর্ত্তের মধ্য দিয়া চলিয়াছে তাহাতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। অথচ এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শিক্ষায়, দীক্ষায়, চরিত্রে ও শক্তিতে সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র সর্ব্বত্রই এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বঙ্গদেশে জাতিগঠন করিয়াছে। তাহাদিগকে বাদ দিলে বঙ্গদেশের গৌরব করিবার বিশেষ কিছু থাকে না, ইহা ধ্রুব সত্য। ইহারা নিঃস্বার্থভাবে চিরকাল এই জাতির সেবা করিয়া আসিয়াছে। মধ্যবিত্ত-সন্তান বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও অপরাপর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ জননী বঙ্গভাষার সেবা করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে রামমোহন, কেশব চন্দ্র, বিবেকানন্দের দান বাঙ্গালার ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। শিক্ষা ও জ্ঞানান্বেষণে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও স্যার আশুতোষের নিকট বাঙ্গালী জাতি চিরকাল ঋণী থাকিবে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ চন্দ্র, যতীন্দ্র মোহন, বাঙ্গালীকে জগৎবাসীর সমক্ষে মহান্ করিয়া তুলিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মধ্যবিত্ত-সন্তান।

দেশসেবার জন্যই ইঁহারা দেশসেবা করিয়াছেন—বর্ত্তমানকাল-প্রচলিত সাম্প্রদায়িক স্বার্থলাভের জন্য ইঁহারা দেশের সেবা করেন নাই। দেশের জন্য, জাতির জন্য ইঁহারা হৃদয়ের রক্ত দিয়াছেন। প্রতিদানে ইঁহারা পাইয়াছেন লাঞ্ছনা উপহাস, দারিদ্র্যের নির্ম্মম পীড়ন। কালের গতিতে বাঙ্গালার সকল জাতি মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। মধ্যবিত্তের মাথা লইবার জন্য তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বলিতেছেন, "মধ্যবিত্তেরা এতদিন আমাদের সমস্ত অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে, এখন উঁহাদিগকে সকল ক্ষেত্র হইতে দূর করিয়া দেও"। জমীদার বলিতেছেন, "মধ্যবিত্তের জন্য আমরা আমাদের নেতৃত্ব হারাইয়াছি, ইহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে আমাদের প্রাধান্য বজায় থাকিবে না"। প্রজা বলিতেছেন, "মধ্যবিত্ত আমাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, ইহাদিগকে সরাইয়া দেও"। সরকার বলিতেছেন, "মধ্যবিত্তেরাই সকল অনিষ্টের মূল, ইহারা আন্দোলন আলোচনা করিয়া দেশমধ্যে অশান্তির বীজ বপন করিয়াছে, ইহাদের শক্তি হ্রাস করিতে হইবে"।

কিন্তু কেহই একথা তলাইয়া দেখিবেন না, পৃথিবীতে যোগ্যতমেরই শ্রেষ্ঠত্ব-লাভ হইয়া থাকে। কৃত্রিম বন্ধনে বাঁধিয়া যোগ্যতমকে কেহ পশ্চাতে রাখিতে পারে নাই। তাই দেখিতেছি ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন—সর্ব্বত্রই মধ্যবিত্তের শ্রেষ্ঠ আসন। ইহারা চিরকাল লাঞ্ছনা উপেক্ষার মধ্য দিয়াও গৌরবের উন্নত শির সকলের উপরে তুলিয়া রাখিয়াছে। সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রতি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট। কিন্তু যে দিন আসিতেছে তাহাতে মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে। শিক্ষা ও সামর্থ্যের প্রতিদানে এতদিন মধ্যবিত্ত সরকারী চাকুরিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছে

এক্ষণে যোগ্যতা উপেক্ষা করিয়া মধ্যবিত্তকে সেই ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের স্থান নাই, কারণ তাহারা এতদিন আপন স্বার্থ চিন্তা করেন নাই। এক্ষণে নানা দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে। এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে। তাহাদিগকে আপন অধিকার বজায় রাখিতে হইবে। দিকে দিকে যে নব আশা আকাঙ্ক্ষা, নূতন জীবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আসন করিয়া লইতে হইবে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শিক্ষাদীক্ষায়, জ্ঞানকর্ম্মে, উদ্যমউৎসাহে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে; কিন্তু চারি দিকের বিপুল আক্রমণে মধ্যবিত্তের মধ্যে একটা অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছে। এই অবসাদ দূর করিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। মধ্যবিত্তের শক্তি আছে তাহারা আপন প্রচেষ্টায়ই জগতের সভায় আপন প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিবেন। জাতির নবজীবনের উদ্বোধন-কালে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আপনার অধিকারলাভে পরাঙ্মুখ হইবেন না, ইহাই আমাদের নিবেদন।

"ময়মনসিংহ সমাচার"

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে সকলের পশ্চাতে তাহা সুবিদিত। বাঙ্গালার পাল ও সাহা সম্প্রদায় ব্যতীত আর কোনও হিন্দু বা মুসলমান ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালার বড় বড় সহর বন্দর ও বাণিজ্য-কেন্দ্রে ব্যবসায়ের ছোট বড় সকল হাটেই ভিড় দেখিতে পাই ইউরোপীয়, ভিন্ন দেশীয় বা অবাঙ্গালী অন্যান্য ভারতীয়গণের।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বসতি ইহা এদেশের সর্ব্বজনবিদিত প্রবাদবাক্য। তাহা সকলের জানা থাকা সত্ত্বেও এই দিক্‌টায় বাঙ্গালীর অসাফল্যের কারণ কি ভাবিয়া দেখা দরকার। দেশে যে ঘোর অর্থ-সঙ্কট ও বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহাতে অর্থাগমের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থাকে অবহেলা করিলে কিছুতেই চলিবে না। জীবন-সংগ্রামে উপযুক্ততার জয় অবশ্যম্ভাবী। কি কি গুণ থাকিলে বাঙ্গালী ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উপযুক্ততা-লাভ করিতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে কি কি কারণে বাঙ্গালী ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা-লাভে অসমর্থ হয়। বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তি কোন অংশেই অন্য প্রদেশবাসীদের চেয়ে হেয় নয়। ধনী লোকেরও বাঙ্গালা দেশে অভাব নাই। তথাপি বাঙ্গালী এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা-লাভে কেন সমর্থ হয় না?

এই অসাফল্যের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে একটী কারণ এই দেখিতে পাই যে, ব্যবসায়-কার্য্যকে শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালী চিরকালই হেয় চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। ইহা অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর লোকের কার্য্য, এইরূপ একটা ধারণা বাঙ্গালী ভদ্রসমাজে মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। প্রাণের সহিত কোন কার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিলে—শুধু দায়ে ঠেকিয়া করিতেছি এরূপ ভাব পোষণ করিলে সে কার্য্যে অসাফল্য নিশ্চিত।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, যাহারা জীবনের অন্য কোন ক্ষেত্রে অকৃতকার্য্য হন এইরূপ বাঙ্গালীই এপর্য্যন্ত ব্যবসায়ে যোগদান করিয়া আসিতেছেন। কাজেই এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সাফল্য-লাভের আশা কতদূর করা যাইতে পারে?

তৃতীয় কারণ বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষ। স্কুল কলেজের বর্ত্তমান শিক্ষাদ্বারা ছাত্র-সমাজ বিলাসী ও শ্রম-বিমুখ হইয়া পড়ে। স্কুল ছাড়িয়া বাহির হওয়ার পরে বাঙ্গালী যুবকগণ সর্ব্বপ্রকার শ্রমসাধ্য ও সহিষ্ণুতার কার্য্যের পক্ষেই অযোগ্য হইয়া পড়ে। বিশেষ একাগ্রতার সহিত কার্য্যে লাগিলেও স্বাভাবিক অসামর্থ্যতাহেতু তেমন উন্নতি করিতে পারে না।

চতুর্থ কারণ এই যে, বাঙ্গালী ভদ্র যুবকগণ যে বয়সে ব্যবসায়ে নামেন তখন তাহাদের পক্ষে অর্থ উপার্জ্জন আশু প্রয়োজনীয়। এক একটী বৃহৎ পরিবারের প্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব আসিয়া তাহাদের স্কন্ধে এরূপ চাপিয়া বসে যে,

লাভের জন্ম অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। যাহারা বংশ পরম্পরাক্রমে ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন তাহাদের ছেলেপিলেরা জন্ম হইতেই ব্যবসায়ের ধারা পদ্ধতি দেখিয়া শুনিয়া এমন একটা স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা নিয়া কার্য্যে নামে যাহার সহিত প্রতিযোগিতা করা বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানগণের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

পঞ্চম কারণ সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের অভাব। সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় এই গুণ দুইটীর বাঙ্গালী চরিত্রে নিতান্ত অভাব। আমরা রাতারাতি বড় মানুষ হইয়া যাইতে চাই। প্রথমেই বড় মূলধন নিয়া একটা সুবৃহৎ বাড়ীতে ফিটফাট বহুমূল্য সাজসরঞ্জাম সহ বড় ষ্টাইলে একটা কারবার খুলিয়াই আমরা চাই খুব তাড়াতাড়ি লাভবান হইতে। কিন্তু অন্য প্রদেশ-বাসীদের বেলায় কি দেখিতে পাই? আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি যে, আজ যাঁহারা কোটিপতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা একটা ঘটী ও একখানা লাঠি নিয়া রিক্ত হস্তে এই প্রদেশে আসিয়াছিলেন। এবং মাথায় মোট বহিয়া সামান্য একটা ব্যবসায় ধরিয়া ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ইঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা বাঙ্গালীদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। সততার অভাব বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে অসাফল্যের অন্যতম কারণ। বিশ্বাস ও সততাই ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উন্নতির মূলমন্ত্র। এই দুই বিষয়েও বাঙ্গালী চরিত্রের দোষ অনেক কার্য্যে প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙ্গালার গৌরব বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের পূর্ব্বতন পরিচালনা-ব্যাপারে ও ভূতপূর্ব্ব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের মূলে এই দোষই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। বাঙ্গালী পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারে না এবং কাহাকে ঠকাইয়া কে অগ্রে বড় লোক হইবে তাহার চেষ্টা করাই বাঙ্গালী চরিত্রের মহা দোষ। তাই বাঙ্গালায় অনেক যৌথ কারবারের পতন হইয়াছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতে হইলে বাঙ্গালী চরিত্রের এই কলঙ্ক দূর করিতে হইবে। দেশের মধ্যে নৈতিক আদর্শে যাহারা শ্রেষ্ঠ, এই শ্রেণীর লোক ব্যবসায়ে নামিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে না পারিলে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর উন্নতি সুদূরপরাহত।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর জাতিগত যে কয়টী দোষের জন্য ব্যবসায়ে উন্নতি হয় না, তাহার আলোচনা করা হইল ইহা ব্যতীত মূলধনের অভাব, পুরাতন ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকের সহযোগিতা ও সহানুভূতির অভাব প্রভৃতি আরও অনেক কারণ আছে। কিন্তু সেগুলির উপর নিজেদের কোন হাত নাই। যে সমস্ত দোষ ইচ্ছা করিলে নিজের সংশোধন করিতে পারা যায় আমরা তাহারই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে আজ দলে দলে চরিত্রবান সুশিক্ষিত ও কর্ম্মঠ তরুণগণের চাকুরীর মোহ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য ছেলে বেলা হইতে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ছেলেদিগকে শ্রমসাধ্য কার্যে অভ্যস্ত করানো, যাহাতে শিক্ষা-শেষে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া তাহাদের কোন অসুবিধায় পড়িতে না হয়।

"জাগরণ"—কুষ্টিয়া

ক্ষুধা বনাম রাজনীতি

বাংলা দেশের আর্থিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছে। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর, বগুড়া বালুরঘাট, যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। এই অঞ্চলের পল্লীবাসীদের সাহায্যের জন্য কলিকাতায় একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। ইঁহারা দেশবাসীর নিকট অর্থ চাহিয়াছেন। সাধারণের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিয়া যাঁহারা দরিদ্রকে সাহায্য করেন তাঁহাদের কার্য্য প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসাধারণ যাহাতে দারিদ্র্যের কবলে পতিত না হয় তাহার জন্যই ও সকলের চেষ্টা করা উচিত। রোগ হইলে তাহার প্রতিকার অপেক্ষা যাহাতে রোগ না হয় তাহার জন্য যত্ন লওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এক দল লোক বলেন যে, ইংরেজ চলিয়া যাইলেই এ দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হইয়া যাইবে আমাদের দেশের লোক অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজনীতিজ্ঞগণ আইন করিয়াই হউক অথবা অন্য উপায়েই হউক বিদেশীর শোষণকে রহিত করিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন ইঁহাদের জবাবে এই প্রশ্ন মনে উঠে যে, ইংলণ্ড, আমেরিকা

জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশও স্বাধীন, তাহাদের দেশের লোকই ত সে দেশের রাজকার্য্য চালায়; কিন্তু সে সব দেশেও কেন বেকার অবস্থায় লোক বসিয়া থাকে, ইংল্যণ্ড ও ওয়েলস্‌এ কেন এক বৎসরে ২৭ জন অনাহারে মারা যায় (ষ্টেটস্‌ম্যান, ৬ই সেপ্টেম্বর)। বিলাতে কেন লোক বেকার হয়? এ প্রশ্নের জবাবে এদেশীয় রাজনীতিজ্ঞগণ বলিবেন যে, ভারতের বয়কট আন্দোলনই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু এই বয়কট আন্দোলনের পূর্ব্বেও বিলাতে ১৫,০০,০০০ লক্ষের অধিক বেকার ছিল, জার্ম্মাণিতে প্রায় ৩০,০০,০০০ লক্ষ ও আমেরিকাতেও তদনুরূপ লোক বেকার হইয়া বসিয়া আছে।

ইংরেজ যদি এদেশ হইতে চলিয়া যায় তবে কতক লোক বড় লোক হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দরিদ্র দরিদ্রই থাকিয়া যাইবে। ইংরেজ এদেশে আসিবার পূর্ব্বে ভারতের আর্থিক অবস্থা যাহা ছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই, তখন টাকাকড়ির চলন ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, জিনিষের বিনিময়ে জিনিষ পাওয়া যাইত—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। এখন পৃথিবীর সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, বিজ্ঞানবলে পৃথিবীর জাতিসমূহ আজ পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে উন্নত, এ অবস্থায় ইংরেজ আমলের পূর্ব্বের অবস্থায় ভারতকে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। মোটর উঠাইয়া গরুর গাড়ীর প্রচলন যেমন সহরে সম্ভব নহে, তেমনি সহর ভাঙ্গিয়া পল্লীতে পরিণত করাও সম্ভব নহে। বিজ্ঞানকে অর্থবলে ক্রীতদাস করিয়া মুষ্টিমেয় লোক পৃথিবীর জনসাধারণকে শোষণ করিতেছে, ভারতও এই শোষণ হইতে অব্যাহতি পায় না। ইংরেজ চলিয়া যাইলেই যে ভারতবাসী ভারতবাসীকে শোষণ করিবে না এমন কথা বলা চলে না। তাহার কারণ অন্যান্য স্বাধীন দেশের মুষ্টিমেয় লোক জনসাধারণকে শোষণ করে। সেজন্য কি ভাবে জনসাধারণকে মুষ্টিমেয় লোকের হস্তের শোষণ হইতে রক্ষা করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। স্বরাজী কলিকাতা কর্পোরেশন, মফঃস্বলের স্বরাজী জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অর্থশালী লোকগণই অধিকাংশ সুখ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব সেই স্বরাজেই আমাদের প্রয়োজন যে স্বরাজ দরিদ্রের দারিদ্র্য ঘুচাইয়া দিবে।

বাংলার পাট বিশেষ সম্পদ্‌। সেই পাটের মূল্য নাই বলিয়াই সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর লোক আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতেছে। পাট বেশী দামে বিক্রী হইলে চাষীর ঘরে টাকা থাকিত না, দালাল, বেলার প্রভৃতির ঘরে বহু টাকা জমিয়া যাইত। চাষী পাট বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইত, তাহা দিয়া আবার প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষ খরিদ করিত, ইহাতে তাহার টাকা হাতে জমিতে পারিত না। বৎসরের পর বৎসর অনশনে অর্দ্ধাশনে থাকিয়া একসঙ্গে কিছু পাইলে মানুষের খরিদের প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়—দারিদ্র্যের অবসান হয় না, তাহা যেন বাড়িয়াই চলে। পূর্ব্বাপেক্ষা মানুষের প্রয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে, চাষীও সে অতিরিক্ত প্রয়োজনের হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। অতএব সর্ব্বাগ্রে দরকার, চাষীকে যেন কেহ শোষণ করিতে না পারে তাহা করা। চাষী হইতেছে আমাদের অর্থোৎপাদনকারী, অতএব তাহাকে শোষণ হইতে রক্ষা করিলে আমাদেরও আর্থিক দুর্গতি দূর হইবে, দারিদ্র্যে সাময়িক সাহায্যের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতেও হইবে না।

বঙ্গীয় কৃষক-সমস্যা

আজকাল অনেক সংবাদ-পত্রে ও সভা সমিতিতে বঙ্গীয় কৃষকের বিষয় লইয়া বেশ একটু আলোচনা চলিতেছে। এবার পাটের মূল্য নাই বলিয়া কৃষকেরা রিক্তহস্ত, ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও কপর্দ্দকবিহীন। তাহাদের এই অভাবের ফল যে কেবল তাহারাই ভোগ করিতেছে, এমন নহে। সত্য সত্যই যদি তাহারা শুধু ভুগিত তবে তাহাদের দুঃখ-দৈন্যের বিষয় সভা সমিতিতে সংবাদপত্রাদিতে কদাপি আলোচিত হইত না। তাহাদের নীরব অশ্রু তাহাদের বক্ষেই মিলিয়া যাইত, এমন কি তাহাদের উচ্চবিলাপও কাহারও কর্ণগোচর হইত কিনা সন্দেহ। জমীদার, তালুকদার, মহাজন, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী,

শিল্পী, কবি, গ্রন্থকার, সম্পাদক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মোল্লা, মৌলবী ইত্যাদি যাহাদিগকে "নাংলা চাষা" বলিয়া নাসিকা-কুঞ্চনে দূরে সরিয়া যাইতেন আজ সেই "নাংলা চাষাদের" লাঙ্গলজাত পাটের মূল্য নাই বলিয়া ঐ সব উচ্চপদস্থ ব্যক্তি-গণও চক্ষে সরিষা ফুল দেখিতেছেন। তাই আজ তাহারা দরদী সাজিয়া আত্মদৈন্য ঢাকিয়া কৃষকের হইয়া সভা সমিতিতে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা দিতেছেন, সংবাদপত্রের একাধিক পূর্ণস্তম্ভ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেছেন। আজ যদি নিরক্ষর কৃষকগণ মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, আমাদের অভাবের জন্ত আজ তো সভা সমিতি করিতেছ, আমরা ৩০৲ টাকা মণ দরে পাট বিক্রয় করিয়া কয়টি টাকা হাতে রাখিতে পারিয়াছিলাম? কার্ত্তিক আসিতে না আসিতে তো আমাদের পাটের টাকা তোমাদের নামে ব্যাঙ্কে জমা হইয়াছিল। আমরা চিরকালই তো এইরূপ রিক্তহস্ত। তখন তাহারা কি উত্তর দিবেন?

যাহারা সতত পাড়াগাঁয়ে বসবাস করে, "নাংলা চাষাদের" সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ রাখে, তাহারাই একমাত্র নিরক্ষর সরল সাধু কৃষকের বিষয় সম্যক অবগত আছেন। তাহারা বেশ বুঝিতে পারেন উল্লিখিত সুহৃদবর্গ কাহার জন্ত সভা করিতেছেন আর কাহার জন্তই বা লেখনী-ধারণ করিতেছেন। আজ নিজেদের অন্নে বালি পড়িতেছে বলিয়াই না তাহারা সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে তৎপর? এবার চাষার হাতে পাটের টাকা নাই, তাই জমীদারের খাজানা নাই, মাচরা নাই, নজর নাই, সেলামী নাই, বাজে আদায় নাই, পক্ষান্তরে খেমটা নাচ, থিয়েটার, যাত্রা ইত্যাদি স্বেচ্ছাচারিতার পথ রুদ্ধ। তাই জমীদার-তালুকদার প্রজার দরদী সাজিয়া সভা সমিতিতে যোগদান করিতেছেন। উল্লিখিত কারণে কি টাকায় ৵০ আনা সুদে চক্রবৃদ্ধি সুদ সহ মহাজনের সম্যক টাকা আদায় হয় না, সুতরাং ব্যাঙ্কে জমা নাই, ছেলেমেয়ের বিবাহ নাই, এমন কি তমাদি খাজানার নালিশ করিতে হাতে টাকা নাই, সুতরাং মহাজন বিরূপ। উকিল মোক্তার মক্কেলের আশায় কুণ্ডলাকার ধূম উদ্গীরণ করিতেছেন, আর শনৈঃ শনৈঃ রাস্তার উপর শ্যেন-নয়নে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেছেন; কেহ বা নিজের দৈন্য ঢাকিয়া কাল্পনিক ভাবে কৃষকের দুঃখেরই ব্যাখ্যা করিয়া পত্রিকার স্তম্ভ পূর্ণ করিতে-ছেন। চাষার টাকা নাই, ব্যবসায়ীর ব্যবসায় নাই, শিল্পীর শিল্পদ্রব্য অচল গ্রন্থকারের পুস্তক বিক্রী হয় না। সম্পাদকের সম্পাদিত পুস্তক পত্রিকা চলে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ নাই। মোল্লা মৌলবীর ওয়াজ হেদায়েত নাই। পক্ষান্তরে সমাজের সকলই অচল—বুঝি বা অচিরে সকলই চির অচল হইয়া যাইবে; এখন ভাবিয়া দেখ যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তোমাদের হস্ত রুদ্ধ, যাহাদের বসিবার জন্য তোমাদের লম্বা পিড়ি, যাহাদের খাদ্যের জন্য কদর্য্য অন্ন, যাহাদের চলিবার জন্য তৃতীয় শ্রেণী, বসিবার জন্য বাহিরের বারেন্দা, তাহাদের স্থান কোথায়,—তাহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় না তোমারা।

পাটের চাষ করিয়া বঙ্গীয় কৃষকগণ কয়েক বৎসর বেশ দুই পয়সা বিক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু কাকমুখে পিষ্টক দেখিয়া যেমন ধূর্ত্ত শৃগাল নানা ছল বাক্যে মূর্খ কাকের মুখ হইতে পিষ্টক আত্মসাৎ করিয়াছিল, সেইরূপ উল্লিখিত ব্যক্তিগণ, মূর্খ কৃষককে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের গ্রাস ভাগাভাগি করিয়া আত্মসাৎ করে নাই কি?

আজ যাহাদের জন্ত সুহৃদবর্গ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে সেই কৃষকশ্রেণী আজকাল তত নিরুপায় নহে। তাহারা খাদ্য পাওয়ার জন্ত প্রায় মোটেই চিন্তা করে না। মোটা ভাত, অভাবে দুই বেলার স্থলে এক বেলা, অন্নাভাবে ফল ফলারি, আলু ইত্যাদি খাইয়া জীবন-ধারণে তাহারা অভ্যস্ত। এবৎসর যেমন পাটের টাকার অভাবে রিক্তহস্ত, অত্যধিক দরে পাট বিক্রয় করিয়াও তাহারা তালুকদার, জমীদার ও মহাজনকে দিয়া ততোঽধিক রিক্তহস্ত ছিল, তখন জমীদার মহাজনের পাওনা একেবারে নিঃশেষ করিয়া দিত। আশা করিত অভাবে ফি টাকায় দুই আনা সুদ দিলেই তো পাইব, চিন্তা কি? কিন্তু এখন দেখে মহাজন যদি একবার নেয় তবে আর দিবে না। সুতরাং ভবিষ্যতের পাওয়ার আশায় নিরাশ বলিয়া বরং এ বৎসর পূর্ব্বের ন্যায় নিঃশেষ করিয়া আর মহাজন জমীদারকে দিতেছে না, ভবিষ্যতের জন্ত কিছু সঞ্চয় রাখিতেছে।

সুতরাং সুহৃদবর্গের চিন্তা পরার্থপরতার জন্য নহে স্বার্থপরতায় পূর্ণ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আজ যদি কৃষক কলম ধরিতে জানিত, মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে সমর্থ হইত, তবে তাহারা চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিত,—বাপু হে আজ তোমরা যে আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া লোক-সমাজে সে কথা উচ্চ গলায় গাহিয়া ফিরিতেছ, আমরা কিন্তু এই দুঃখ কোন দিন আসলেই আনি না। নিরর্থক তোমরা আমাদের উপর কেন মিথ্যা দোষারোপ করিতেছ? আমরা খাদ্যের কাঙ্গাল নহি এবং বর্ত্তমানের জন্য চিন্তাও করি না; কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তায় আমরা অস্থির। আজ যে আমরা তোমাদের দুয়ারে হাতে গলে বাঁধা, ঋণজালে আকণ্ঠজড়িত সেই জাল ছেদন করিয়া দাও। দেখিবে আমরা সোণার বাঙ্গালার যেই কৃষক সেই কৃষক। আমাদের খাওয়া পড়ার জন্য চিন্তা নাই।

আমাদের উপর দয়া করিবে কি? ভাদ্র হইতে পৌষ পর্য্যন্ত আমাদের সারা বৎসরের অর্জ্জিত ধন তোমাদিগকে দিয়া যখন আমরা মাঘের শেষ হইতে ছেলেমেয়ে লইয়া তোমাদের দুয়ারে দাঁড়াই তখন তোমরা আমাদের পক্ষে দয়ার অবতার সাজিয়া দুই আনা মূল্যের একখানা কাগজে আমাদের বাম হাতের বৃদ্ধ অঙ্গুলির একটি টিপ লইয়াই ৪৲ টাকা দিয়া থাক। তখন আমরা বাস্তবিকই তোমাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া সহস্র সহস্র সেলাম দিয়া চলিয়া যাই; কিন্তু যখন শ্রাবণ মাসের শেষ হইতে আমাদের গৃহে টাকার মধুর বাদ্য বাদিত হয় তখন আমাদের টিপসই-যুক্ত কাগজখানা লইয়া তোমরা উপস্থিত হও এবং ৪৲ টাকার পরিবর্ত্তে ১০৲ টাকা ও তদুপরি প্রতি টাকায় ৵০ আনা হারে সুদ কাগজে দেখি, তখন আমাদের আত্মারাম শুকাইয়া যায়। আমাদের জ্ঞাতসারেই যে তোমরা এরূপ না কর তাহা নহে, কিন্তু নিজের পেটের জ্বালায় ছেলেমেয়ের কান্না-কাটায় বাধ্য হইয়া তোমাদের কথাই স্বীকার করিয়া থাকি। পরিশেষে আমাদের পাটের টাকায় তোমাদের পাওনা না মিটিলে আমাদের অভাব দেখিয়া তৎসঙ্গে আরও কিছু সংযুক্ত করিয়া ১০০৲ টাকার একখানা রেহানী খত লিখাইয়া লও। আমরা সরল প্রাণে বিশ্বাস করি, তোমরা আমাদের পৃষ্ঠপোষক, আমাদের মাতব্বর আমাদের চেয়ে যখন শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত সুতরাং আমাদের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক, অতএব তোমরা আমাদের ক্ষতিজনক কিছুই করিবে না। কিন্তু ২।৪ বৎসর অতি-বাহিত হইতে না হইতে যখন আমাদের সম্পত্তির মূল্য হইতে তোমাদের সুদ আসল বহুগুণ বাড়িয়া যায়, তখন নিরুপায় হইয়া কখন স্বেচ্ছায় কখন অনিচ্ছায় আমাদিগের কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি তুলিয়া দিয়া আমাদের যথাসর্ব্বস্ব তোমরা লইয়া যাও। তোমাদের এই দয়া ছাড়িয়া দাও, আমাদের চক্ষের জল পড়িতে থাকে পড়ুক, তোমরা দয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিও না। যাহা করিয়াছ তাহাতেই আমরা তোমাদের দাসানুদাস হইয়া গিয়াছি।

গত বৈশাখ হইতে দয়ার অবতার কুসীদজীবিগণ তাহাদের হাত গুটাইয়া বসিয়াছে, এরূপ গুটাইবার কারণ কতক তাহাদের ইচ্ছাকৃত কতক তাহাদের অনিচ্ছাকৃত। গত আষাঢ়ী ধান্য পর্য্যাপ্ত হয় নাই বলিয়া অধিকাংশ কৃষক পাট বিক্রয় করিয়া চাউল ক্রয় করিয়াছিল। সুতরাং তাহারা মহাজনকে তৎপূর্ব্বের ঋণ বিশেষ কিছু শোধ দিতে পারে নাই। সুতরাং কোন কোন মহাজন দায়ে ঠেকিয়া হাত গুটাইতেছেন, আবার কেহ কেহ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সন্দর্শন পূর্ব্বক হাত গুটাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং বিগত বৈশাখ হইতে তাহাদের স্বাভাবিক অনুগ্রহ কৃষকের উপর হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনাও নাই। নাই কেন? কৃষকের পাটের দর নাই, অদূর ভবিষ্যতে যে হইবে সেরূপ আশাও নাই; সুতরাং ১৲ টাকা দিয়া ১০০৲ টাকা লইবার সুযোগ নাই, অতএব দয়াও নাই।

আমরা পাড়াগাঁয়ে বাস করি, কৃষকের গতিবিধি, অবস্থা বেশ জানি সুতরাং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ও তাহাদের কার্য্যকলাপে পরস্পর সংযোগে থাকিয়া বেশ বুঝিতে পারি যে, বর্ত্তমানে কৃষকগণ দায়ে পড়িয়া কিছু শিখিয়াছে, তাহারা এবার তাহাদের সদাশয় সুহৃদবর্গের চোখ রাঙ্গানীতে বা মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া আর আর বৎসরের ন্যায় হাত খালি করিয়া দেনা শোধে মনোযোগী হয়

নাই; পক্ষান্তরে পূর্ব্ব ঋণ এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে বর্ত্তমানে কৃষকের আয়ের সম্পূর্ণ দিলেও তাহাদের জঠরানল নির্ব্বাপিত হইবে না। বিশেষতঃ দিলে যখন পুনরায় পাইবার আশা নাই এবং দারুণ ফাল্গুন হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত তাহাদের কি উপায় হইবে ইত্যাদি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কৃষকও যাহা পাইতেছে তাহা হাত-ছাড়া করিতেছে না। সুতরাং কৃষকদের বর্ত্তমানে চিন্তা নাই, চিন্তা সুহৃদবর্গের।

বর্ত্তমানে কৃষকদের চিন্তা নাই সত্য, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের যে কি উপায় হইবে সে বিষয়ে প্রায় সকলেই নীরব। সভা-সমিতিতে বা সংবাদপত্রে তাহার মোটেই উল্লেখ দেখিতে পাই না। অদূর ভবিষ্যৎ কৃষকের পক্ষে যে কিরূপ অন্ধকার তাহা বর্ণনার অসাধ্য, ভাবনার অতীত। বিগত ১৩৩২ সনে পাটের দর ৩০৲ টাকা পাইয়া নিরক্ষর কৃষকগণ যে কি করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাহারা ভবিষ্যতেও ৩০৲ টাকা মণ দরে পাট বিক্রয়ের আশায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা সুদে সহস্র সহস্র টাকা ঋণ করিয়াছিল। এইরূপ ঋণ করিয়া কেহ কেহ বাড়ী ঘর করিয়াছে, কেহ ছেলেমেয়ের বিবাহ দিয়াছে, আবার কেহ কেহ দুই চার বিঘা জমিও খরিদ করিয়াছে। যে জমির পাখীর দর ১০০৲ টাকা, ৩০ মণ পাট হওয়ায় সেই জমি ৭০০৲, ৮০০৲ টাকা দরে কৃষক ক্রয় বিক্রয় করিয়াছে। আশা ছিল পাখী প্রতি ১০/০ মণ পাট হইলে ৩০৲ টাকা দরে এক বৎসরেই ৩০০৲ টাকা বিক্রয় হইবে। সুতরাং সহজেই ঋণ শোধ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের সকল আশায়ই ছাই পড়িয়াছে, পাটের দর আর ৩০৲ টাকা হইল না। ৩০৲ টাকার স্থলে ৩৲ টাকা হইয়াছে, চাষের খরচ পোষায় না, ঋণ শোধ দিবে কোথা হইতে?

অতএব তাহারা যে ঋণ করিয়াছিল তাহা এখন অপরিশোধনীয়। বঙ্গে প্রায় সকল কৃষকই এই ঋণজালে জড়িত, ঋণের চিন্তায় জীবন্মৃত। মহাজন এবৎসর বসিয়া রহিল, না হউক তমাদি পর্য্যন্ত কিছুই করিল না। কিন্তু শেষ সময়েও কি বসিয়া থাকিবে? তাহাদের জমি বাড়ী ঘর দরজা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দ্বারা টাকা আদায় করিয়া লইতে কি বিরত থাকিবে?

বঙ্গের প্রায় চৌদ্দ আনা লোক কৃষিজীবী। অবশিষ্ট দুই আনা লোক জমীদার, তালুকদার, মহাজন ইত্যাদি। সুতরাং চৌদ্দ আনা লোক জমা জমি শূন্য হইয়া যে বেকার হইয়া পড়িবে না তাহা কে বলিবে? আর যে দেশের চৌদ্দ আনা লোক বেকার সে দেশের যে কি অবস্থা হইবে তাহা বিশেষ চিন্তনীয়।

তবে এই চৌদ্দ আনা লোকের রক্ষার পথ যে একেবারে নাই তাহা নহে। কিন্তু উহা সাধারণের হাতে নাই। একমাত্র গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে বঙ্গের কৃষক রক্ষা পাইতেও পারে। প্রজা-সাধারণ যে হারে ঋণ করিয়াছে সেই হারেই যদি আদায় করা হয় তবে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি ব্যাঙ্কের হারে শতকরা বার্ষিক ৩৲।৪৲ টাকা সুদে ডিক্রী দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে কৃষকগণ কতকটা বাঁচিতে পারে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব, শিক্ষক, মাছিমপুর।

১। ভারতে পরদেশী ব্যাঙ্কের বনিয়াদ, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্‌-এ, বি-এল্‌। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, কলিকাতা। ১৯৩১। পৃঃ ১২০+৯।

কেতাবখানি প্রধানতঃ ৩টি ভাগে বিভক্ত—সংজ্ঞা, সমস্যা, সমাধান। ব্যাঙ্কিংএর মত জটিল একটা বিষয়কে কত হাল্কা ভাবে লেখা চলে তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত এই পুস্তক। বাস্তবিক অর্থনীতি সম্বন্ধে এত সহজ বর্ণনায় পূর্ব্বে বহি লেখা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। গ্রন্থকার শুধু তত্ত্ব বা তথ্য খাড়া করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বক্তব্য বিষয়কে সর্ব্বত্র নানা প্রকার উদাহরণের দ্বারা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি।

আরম্ভটা বেশ হইয়াছে। সংজ্ঞা প্রকরণে সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে স্বর্ণ বিনিময় মান (পৃঃ ৩৪-৫১)। সংজ্ঞার দিক্‌টা আরো বিস্তৃত করা চলিত। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়াই শুধু সেই সব বিষয় আলোচনা করিয়াছেন যা পরে তাঁর কেতাবে উঠাইতে হইয়াছে। অন্ততঃ এই অংশটুকু অতি অনায়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনি পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইতে পারে।

কিন্তু কেতাবের আসল কথা হইল সমস্যা ও সমাধান। সমস্যাটা সংক্ষেপে এই : ভারতের প্রায় ছয় শ কোটি টাকার বহি(আমদানি রপ্তানি)র্বাণিজ্য চলে ১৮টা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের মারফৎ। এই ছয় শ কোটি টাকার বাণিজ্য চালাইবার জন্য মজুদ চাই ৭৫ কোটি টাকা। ১৯২০ থেকে ১৯২৮ পর্য্যন্ত এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির ভারতে গৃহীত আমানতের পরিমাণ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন সময়ে "আমানতের পরিমাণ ৭৫ কোটি টাকাও অতিক্রম করে গিয়েছিল।" গ্রন্থকারের মতে নানা দফায় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আয় ১·২৫ কোটি, আর ব্যয় ৯ লক্ষ টাকা। সুতরাং মোট আয় দাঁড়ায় ১·১৬ কোটি টাকা (পৃঃ ৭৪)। এ ছাড়াও ৫০।৬০ লক্ষ টাকা আয় হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সোজা কথায় আমাদের বহির্ব্বাণিজ্য এই ব্যাঙ্কগুলির একচেটিয়া অধিকারে থাকায় ওগুলা যেমন বেশী লাভ করিতেছে তেমনি তজ্জন্য নানা প্রকারে ভারতের স্বার্থহানি হইতেছে। এর প্রতীকারের উপায় কি ?

সমাধান অধ্যায়ে এই প্রতীকারের কথা চিন্তা করা হইয়াছে। সংক্ষেপে মোটামুটি এই বলা চলে, এই সব ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আইন পাশ করা দরকার—এই হইল গ্রন্থকারের মত। তিনি বিভিন্ন সভ্য দেশের নজীরও দেখাইয়াছেন (পৃঃ ৮৯-৯১)। এই সম্পর্কে বি টি ঠাকুরের ভারতীয় ব্যাঙ্ক নিয়ামক সমিতি ও অন্যান্য প্রস্তাব, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (৯৯-১০৪ পৃঃ) ইত্যাদিও আলোচিত হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এক্সচেঞ্জ কারবারের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তি (পৃঃ ১১৩-১১৪), ভারতে বিল বাজার (পৃঃ ১১৪-১১৯), পুরাদস্তুর দেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক (পৃঃ ১১০) প্রণিধানযোগ্য।

বলা বাহুল্য, এরূপ একটি বিষয়ে মতভেদ অনিবার্য্য। গ্রন্থকারের সকল মত সকলের পক্ষে মানিয়া লওয়া সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, গ্রন্থকার এই বিষয়টিকে বাঙ্গালী পাঠক সমাজের চোখের সামনে ধরিয়া যথার্থ উপকার করিয়াছেন। তাঁর নিজের সমাধান-প্রণালী চিত্তাকর্ষক হইয়াছে ও বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং বিশেষজ্ঞগণের অনেক ভাবিবার খোরাক জুটাইবে।

২। পাটের কথা। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ। মোহাম্মদী বুক এজেন্সি, কলিকাতা। ১৩৩৭। ৸৹ আনা। পৃঃ ৭৪+গ।

এই পুস্তিকাখানিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে : পাটের চাষ, বিক্রয়, কলিকাতার বাজার, কাঁচা পাট, ঐ বেলের বাজার, ঐ ফটকা বাজার, পাটের দর, পাট কল, হেসিয়ান বাজার, শেয়ার বাজার, জুট মিল এসোসিয়েশন, জুট সেল সোসাইটি, পাট ও ভারত সরকার, পাট চাষ করা কি উচিত ?

ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "৭৫ বৎসর পূর্ব্বেও পাট ব্যবসায় বাঙ্গালীদের হাতেই ছিল এবং পাট বিক্রয়ের সমস্ত লাভের টাকাই বাঙ্গালী পাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ...পাটের ব্যবসায় সমস্তই পরহস্তগত। ... পাট চাষের উন্নতি ও পাট ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা বাঙ্গালীর আর্থিক উন্নতি বহু পরিমাণে হওয়া সম্ভবপর। ... বোম্বাই প্রদেশে তুলার চাষ এবং বস্ত্র-শিল্পের গুরুত্ব যেরূপ, বঙ্গদেশে পাটের কুটির শিল্প প্রভৃতি প্রচলনের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব সেইরূপ বেশী।"

"পাট চাষ করা কি উচিত ?" অধ্যায়ে কিরূপভাবে বুঝিয়া শুনিয়া পাট চাষ করা উচিত তার নির্দ্দেশ আছে।

পরিশিষ্টে ১৯২২ (!) সনের পাটের বাজার দর, ১৮৯৫-১৯৩০ পর্য্যন্ত পাটের জমির আয়তন ও ফসলের পরিমাণ, কলিকাতার যে সব জুট মিলের শেয়ার খরিদ ও বিক্রয় হয় তাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

বহিখানি মোটের উপর সময়োচিত ও তথ্যপূর্ণ হইয়াছে। পাটের বাজার লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনাই এই কেতাবের উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে, অন্যান্য দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই।

শ্রীসুধাকান্ত দে

৩। নিম তৈল এবং সাবান প্রস্তুতে উহার ব্যবহার

বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের শিল্প বিভাগ হইতে শিল্প-সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় পুস্তিকা বাহির হইতেছে। সম্প্রতি উক্ত বিভাগ হইতে নিম তৈল এবং সাবান প্রস্তুতে উহার ব্যবহার সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। নিম্নে উহার সারাংশ প্রদত্ত হইল :

ভারতবর্ষে বনেজঙ্গলে পথেঘাটে, বাড়ীর আশেপাশে নিমগাছ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের বিশ্বাস নিমগাছের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, কারণ নিমবৃক্ষ বায়ু-সংশোধক। এই গাছের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল নিম তৈল রূপে পরিচিত। নিম তৈলের রং হরিদ্রাভ বাদামী ; তৈল জমিলে গাঢ় বাদামী রং ধারণ করে। তৈলে রশুনের মত দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহার কতকগুলি রোগ-বিনাশক গুণ আছে এবং এ্যান্টিসেপ্টিকরূপে ইহা ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে নিমফল জন্মে প্রচুর ; কিন্তু ঔষধ প্রস্তুতে অতি সামান্য নিম তৈল ব্যবহৃত হয় বলিয়া ফি বৎসর প্রচুর নিমফল নষ্ট হইয়া যায়। কেবল যুক্তপ্রদেশ এবং অন্য দু একটী প্রদেশে সামান্য পরিমাণে নিমতৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই স্বদেশী নিমতৈল নিতান্ত অপরিস্কৃত অবস্থাতেই রহিয়া যায়। সাবান প্রস্তুতের জন্যও এ তৈল তেমন প্রস্তুত হয় না। মাত্র ঔষধি সাবান প্রস্তুতের জন্য জনকয়েক সাবান-প্রস্তুতকারক ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষ হইতে এই তৈলবীজ একেবারে রপ্তানি হয় না বলিলেই চলে। ভারত এবং সিংহল হইতে নিমবীজ আমদানি করিয়া তৈল প্রস্তুত করা যায় কি না এ সম্বন্ধে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট একবার তদন্ত করেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্ররোচনায় একটি বিলাতী সাবান প্রস্তুতের ফার্ম্ম নিমের বীজ এবং তৈল লইয়া পরীক্ষা চালায়। পরীক্ষায় দেখা যায় নিমতৈলজাত চর্ব্বি হইতে খারাপ বাদামী রংয়ের সাবান প্রস্তুত হইতে পারে। এই ফার্ম্মটী আরও মত প্রকাশ করে যে, বীজ গোড়াইয়া তৈল বাহির করিবার সময় অসহনীয় দুর্গন্ধ বাহির হয়। সুতরাং কোন সহরের এলাকার মধ্যে নিম তৈলের কারখানা চালান অসম্ভব ব্যাপার। এই রিপোর্ট পাইবার পর ইনষ্টিটিউট হইতে আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখা হয় এই দুর্গন্ধ নিবারণ করা যায় কি না ; কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট শেষে বাধ্য হইয়া এই মত প্রকাশ করে যে, ইয়োরোপে নিমবীজ বা নিমতৈল আদৌ কাটিবে না।

ভারতবর্ষের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ঘানিতে তৈল ভাঙ্গান হয়। এর জন্য বীজ পোড়াইবার

দরকার নাই। ভারতবর্ষে সহরের সংখ্যা অল্প। তৈলের কল স্বচ্ছন্দে পাড়াগাঁ অঞ্চলে বা ফাঁকা ময়দানের ধারে বসান যাইতে পারে। সুতরাং ইয়োরোপের মত অসুবিধা ভারতবর্ষে উপস্থিত না হইবার সম্ভাবনা। মোট কথা ভারতবর্ষে সাবান প্রস্তুতকারকগণ যদি নেক নজর করেন তবে নিম তৈলের রীতিমত কারখানা বসান চলিতে পারে।

এইরূপে নিম তৈল শিল্প কায়েম হইলে এদেশে অর্থাগমের একটী দুয়ার খুলিয়া যাইবে। সাধারণতঃ দেখা যায় তিনটী সুবিধা হইতে পারে।

প্রথমতঃ, দেশের একটী অবান্তর অথচ প্রচুর জন্মে এমন চিজ হইতে প্রচুর ধনাগম হইবে;

দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় সাবান-শিল্পের পক্ষে শক্ত সাবান তৈরির একটী মস্ত বড় উপাদান দেশের চৌহদ্দির মধ্যে মিলিয়া যাইবে—ভারতে এই ধরণের উপাদান বড় একটা পাওয়া যায় না;

তৃতীয়তঃ, অনেক বেকার মানুষের কাজ জুটিয়া যাইবে।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ লেবরেটরি হইতে দেখা গিয়াছে, অন্যান্য চর্ব্বি এবং তৈলের সহিত সংমিশ্রণে নিম তৈল হইতে সুন্দর ধোপাখানার এবং ঘরকন্নার কাজের উপযোগী সাবান প্রস্তুত হইতে পারে।

নিম্নে কয়েকটী প্রয়োজনীয় তালিকা দেওয়া হইল:

নিমফলে তৈলের পরিমাণ

ভারতজাত নিমফলের খোলা ৫৫·৩% এবং শাঁস ৪৪·৭%। শাঁসের মধ্যে চর্ব্বির ভাগ ৪৮·৯% অর্থাৎ গোটা ফলের ২৩·৫%। সিংহলজাত নিমফলের খোসা এবং শাঁসের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৪·২% এবং ৪৫·৮%। এই শাঁসের চর্ব্বির পরিমাণ ৫৯·২৫% অর্থাৎ গোটা ফলের ৩১%।

কনষ্ট্যাণ্টস্

স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ১৬° 'সি'	...	০·৯১৪২
স্যাপোনিফিকেশান ভ্যালু	...	১৯৬·৯
আয়োডিন্ ভ্যালু	...	৬৯·৬
টিটার	...	৪২°"সি"

উপরের এই কনষ্ট্যাণ্টগুলির স্বরূপ দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছে নিম তৈল হইতে সুন্দর শক্ত সাবান তৈরী হইতে পারে। অথচ শক্ত সাবানের উপযোগী উপাদান ভারতভূমিতে বিরল। সাবান প্রস্তুতের পক্ষে ভারতবর্ষজাত উদ্ভিজ্জ উপাদানের অধিকাংশই নরম সাবানের উপযোগী। ওয়েব সাহেবের আই-এন-এস্ ফ্যাক্টরের মাপে দেখা গিয়াছে নিম তৈলের কাঠিন্য ১২৭। নিম্নে আরও কয়েকটী ভারতবর্ষজাত তৈলের কাঠিন্যের পরিচয় দেওয়া হইল:—

সাবানের উপাদান		আই-এন্-এস্ ফ্যাক্টর
নারিকেল তৈল	...	২৫০
ট্যালো	...	১৫০
বোন্‌গ্রিজ	...	১৪০
মহুয়া তৈল	...	১২৮+

সুতরাং দেখা যাইতেছে কাঠিন্য হিসাবে নিম তৈল মহুয়া তৈলের কাছাকাছি।

শ্রীমন্মথনাথ সরকার
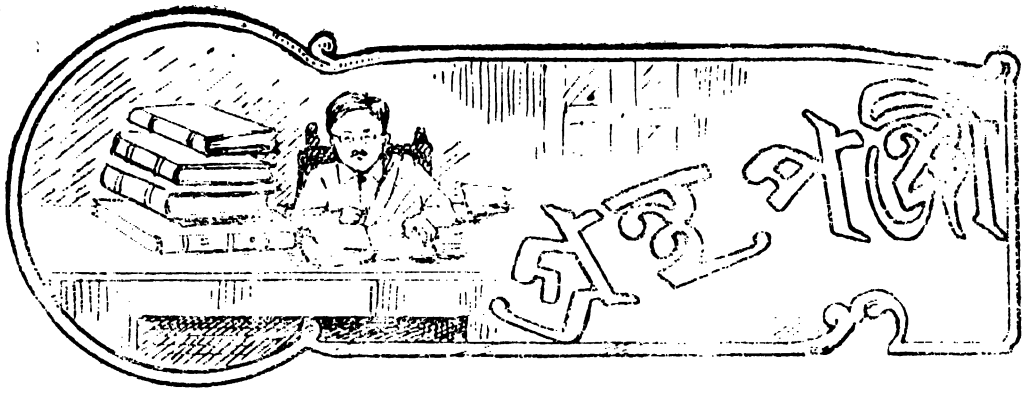
১। "ইকনমিক্‌স অব্ মডার্ণ ইন্‌ডাষ্ট্রি। অ্যান্ ইনট্রোডাক্‌শন ফর বিজিনেস্ ষ্টুডেণ্টস্"। (আধুনিক শিল্পের অর্থ-কথা। ব্যবসায়ী ছাত্রদের জন্য লিখিত প্রথম পাঠ।) পার্সি ফোর্ড। লংম্যান্‌স্ গ্রীন, লণ্ডন। ১৯৩০। ৮+২৪৮ পৃঃ।

২। "লাইফ অ্যাণ্ড লেবার ইন্ এ সাউথ গুজরাট্ বিলেজ" (একটি গুজরাটী গ্রামের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য শিল্পাদি) বি সি মুখটিয়ার। সি এন্ বকীল সম্পাদিত। লংম্যান্‌স্ গ্রীন্, কলিকাতা। ১৯৩০; ২০+৩০৪ পৃঃ।

৩। "নিহোন নোগিও রোন" (জাপানে চাষ)। শিরোষি নসু। তোকিয়ো। ১৯২৯। ৩৩২ পৃঃ।

৪। "পভার্টি অ্যাণ্ড দি ষ্টেট্" (রাষ্ট্র ও দারিদ্র্য), গিলবার্ট শ্লেটার। কনষ্টেবল, লণ্ডন। ১৯৩০। ৭+৪৮০ পৃঃ।

৫। "ইণ্টারন্যাশনাল কনট্রোল অব্ র মেটিরিয়েল্‌স্" (কাঁচা মালের আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ), বি বি ওয়ালেস্ ও এল্ আর্ এডমিনিষ্টার। দি ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ ইকনমিক্‌স্ অব্ দি ব্রুকিংস ইন্‌ষ্টিটিউশন, ওয়াশিংটন। ১৯৩০। ১৫+৪৭৯ পৃঃ। ৩·৫০ ডলার।

৬। "ভারতে পরদেশী ব্যাঙ্কের বনিয়াদ" শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম-এ, বি-এল্। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, কলিকাতা। ১৯৩১। পৃঃ ৯+১২০।

সংরক্ষণ বনাম অবাধ বাণিজ্য

১। সাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্য

রাইট্ অনারেব্‌ল সি-এ-ম্যাককার্ডি, কে-সি'র মত :

রিচার্ড কব্‌ডেন ও তাঁর বন্ধুরা জগতে অবাধ বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অনেক লড়াই করিয়াছিলেন। তাঁদের মনের কথাটা এই ছিল যে, দেশে দেশে পরস্পর দ্রব্য-বিনিময়ে যদি কোন বাধা না থাকে তবে প্রত্যেক দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, জগতে মৈত্রী স্থাপিত হইবে। সংরক্ষণ-বাদীরাও কব্‌ডেনের উদ্দেশ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

এম্পায়ার ক্রুসেড্ (সাম্রাজ্যের জন্য জেহাদ্ ঘোষণা) তার চেয়ে ছোট বিষয় লইয়া মাথা ঘামায় না: বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের সকল প্রকার বাধা দূর করিয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। দুনিয়ায় একে একে যখন সবাই সংরক্ষণবাদী বনিয়া যাইতেছে, যখন টারিফের পর টারিফ্ দেওয়াল খাড়া করা হইতেছে, তখন বৃটিশ কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশগুলি যদি পরস্পর সাহায্য না করে তবে কেমন করিয়া চলিবে?

আর্থিক নীতি হিসাবে যতটা সম্ভব হইতে পারে এবং মূল্যটা খুব বেশী না দিতে হইলে আমিও অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী। কিন্তু ঐ নীতির খাতিরে আমি দেশকে বিপন্ন করিতে প্রস্তুত নই। কিন্তু সাম্রাজ্যিক অবাধ বাণিজ্যিক নীতির ফলে বৃটিশ বাণিজ্য কি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, না তাতে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশ সমৃদ্ধ হইবে? এই নীতি অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের বর্ত্তমান ফিস্‌ক্যাল প্রথা কি পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে?—এ সব প্রশ্নের জবাব দরকার। কিন্তু দেশের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি তার ফিস্‌ক্যাল প্রথার উপর নির্ভর করে, একথা ভাবা ভুল। বস্তুতঃ ফিস্‌ক্যাল প্রথা সাফল্য বা বিফলতার একটি মাত্র কারণ—তা আবার বড় কারণ নয়—এ ছাড়া অন্য অনেক কারণ আছে।

ব্যক্তির ভাগ্যে জাতির ভাগ্য

দেশে দেশে যে বাণিজ্য তা দেশস্থ বণিক্‌দের লেনদেনের সমষ্টি মাত্র। বণিক্-বিশেষের সফলতা বা বিফলতা কিসে হয়, এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে জাতীয় সমৃদ্ধির কথা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বৎসরের প্রতি সপ্তাহে প্রতি দিন হাজার হাজার কোম্পানীর মন্ত্রণা সভায়, ডিরেক্টার-দের বোর্ডে, অংশীদারদের কনফারেন্সে ও বিভিন্ন বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারীদের পরামর্শ সভায় গোটা দেশ জুড়িয়া কত প্রকার কার্য্য-তালিকা স্থির হইতেছে, সিদ্ধান্ত করা হইতেছে—এর উপরেই ত ব্যবসার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কোন্ নীতি অবলম্বিত হইবে, ব্যবসা বাড়ান হইবে কি না, ইত্যাকার বিষয়গুলি চট করিয়া স্থির করিতে হয়, এর জন্য কত টাকা, কত অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও শক্তি না থাকা দরকার হয়। যা স্থির হইয়া যায় প্রতিদিন তাই কাজে খাটাইবার জন্য হাজার হাজার কর্ম্মচারী পটুতা বা অপটুতার সঙ্গে খাটে। তারপর বছরের শেষে এই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান-গুলির কার্য্যকলাপ যদি খতাইয়া দেখি ত কি দেখিব? দেখিব কতকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের কাজ বেশ ভাল করিয়া চালাইয়াছে, অনেক লাভ করিয়াছে, ২০%, ৩০% অথবা ৫০% ডিবিডেণ্ড বণ্টন করিয়াছে, আর অন্যদিকে কোটি কোটি টাকা অনুপযুক্ততা ও অপটুতা হেতু নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বাপর এ দু'রকম প্রতিষ্ঠানই ত এক ফিস্‌ক্যাল প্রথার অধীন হইয়াছে, রেটিং ও কর-প্রথা অথবা জলবায়ুর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আসল কথা, দেশের আর্থিক সংস্থান, যানবাহনের এফিসেন্সি কাঁচা মালের প্রাচুর্য্য, কলকারখানার আধুনিকত্ব, সংগঠন-ক্ষমতা, সাহস, প্রেরণা ও আত্মবিশ্বাস শিল্পী ও

ব্যবসায়ীর পক্ষে যতটা গুরুত্ববিশিষ্ট, ফিসক্যাল প্রথা ততটা নয়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও পটু ব্যক্তিই আশাতীত লাভ করে। অন্যে লাল বাতি জ্বালায়। কেউ কি ভাবিতে পারেন যে, হেনরি ফোর্ড অবাধ-বাণিজ্য-বিশিষ্ট ইংলণ্ডে আপন সমৃদ্ধি সৃষ্টি করিতে পারিতেন না, অথবা কোটেরা, উইলেরা ও কোর্টাউল্ডেরা যুক্তরাষ্ট্রে বিফল হইতেন? অবাধ বাণিজ্য কি, আর সংরক্ষণই কি, কোনটাই দেশের ব্যবসায়ে তাঁটার সকল রকম দাওয়াই বাৎলাইতে পারে না। সংরক্ষণ টারিফ যে ব্যবসায়ের উন্নতিতে কোন বাধা জন্মাইতে পারে না, তার জলন্ত দৃষ্টান্ত আমেরিকা।

যুক্তরাষ্ট্রের চমৎকার দৃষ্টান্ত

সাম্রাজ্যের অবাধ বাণিজ্যের অর্থ বিভিন্ন দেশগুলি পরস্পর সহযোগিতা করিবে ও একে অন্যের সমৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। সহযোগিতাই মূল কথা, ফিস্‌ক্যাল নীতির পরিবর্ত্তন যদি করিতে চাওয়া হয় তবে তা এই জন্য যে একপক্ষ বা অন্যপক্ষ অথবা উভয়ে ঐরূপ পরিবর্ত্তন না করিলে পরস্পরের স্বার্থে আঘাত লাগে ও সহযোগিতা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্য জেহাদের মর্ম্ম-কথাটা সঙ্ক্ষেপে এই: ঠিক যুক্তরাষ্ট্রের মত আমরাও চাই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রত্যেক দেশ আরও ভাল বাণিজ্য, মজুরি এবং উচ্চতর জীবন ধারণের সুযোগ পাক্। গত ৫০ বছরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্য বহু পরিমাণে বাড়িয়াছে। লোকবল যে হারে বাড়িয়াছে তার চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি জাতীয় ধন বাড়িয়াছে। গত ৩০।৪০ বৎসর যুক্তরাষ্ট্রে মজুরি উপার্জ্জন করা লোকের সংখ্যা দুইগুণ হইয়াছে, কিন্তু মজুরি বাড়িয়াছে ছয় গুণ অর্থাৎ প্রতি শ্রমিকের মজুরি ৩ গুণ বাড়িয়াছে। আজ আমেরিকার শ্রমিক এদেশের শ্রমিকের চেয়ে গড়ে ২।৩ গুণ বেশী উপার্জ্জন করিতেছে। চাষবাসই ছিল আমেরিকার প্রধান অবলম্বন, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র আজ দুনিয়ার সব সে সেরা শিল্পী দেশ, দুনিয়ার অন্য সমস্ত দেশ একত্রে যত শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে একা যুক্তরাষ্ট্র তার চেয়ে বেশী করে। যুক্তরাষ্ট্রের মোট লোকবল দুনিয়ার মোট লোকবলের ৬½%, কিন্তু তারা দুনিয়ার ৫০% ম্যানুফ্যাকচার করিতেছে। কিন্তু তাদের উন্নতির গতি আজও থামে নাই। ২০ বৎসর বাদে বাদে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানুফ্যাকচারে উন্নতি নিম্নরূপ:

১৮৬৯ সনে '৩ কোটি ডলার মূল্যের মাল
১৮৮৯ সনে '৯ কোটি ডলার মূল্যের মাল
১৯০৯ সনে ২ কোটি ডলার মূল্যের মাল
১৯২৯ সনে ৬ কোটি ডলার মূল্যের মাল

কেমন করিয়া এ সম্ভব হইল? গ্রেট বৃটেন এককালে দুনিয়ার কারখানাস্বরূপ ছিল, আর আজ তার তাঁত বন্ধ, কয়লার খনিতে কাজ হয় না, ১০ লক্ষ লোক বেকার। কারণটা কি? হয় আমাদের প্রাকৃতিক বাধা রহিয়াছে, নতুবা ঐশ্বর্য্যের উপকরণগুলি হাতের কাছে পাইয়াও আমরা কাজে লাগাইতে পারিতেছি না।

তুলনায় সমালোচনা

এই দুই জাতির আর্থিক সংস্থানটা একবার জরীপ করিয়া দেখা যাক্। মোটামুটিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৩০ লক্ষ বর্গ মাইল, আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের ১ কোটি ৪০ লক্ষ বর্গ মাইল। বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী ধনী। উৎপাদনের কোঠায় বৃটিশ সাম্রাজ্যে দুনিয়ার ৭১% সোণা, ৪৩% টিন, ৮৮% নিকেল, ৫৮% রবার, ৯৯% পাট, ৬২% তালজাত দ্রব্য, ৪৪% পশম রহিয়াছে। কিন্তু বিকাশের বেলায় দুই দেশে বিষম পার্থক্য রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে ৬০% জমিতে চাষ হইতেছে, আর সাম্রাজ্যে মাত্র ১০%এ চাষ চলে। উপানবেশগুলিতে চাষের তারতম্য ১% (অষ্ট্রেলিয়া) হইতে ৩% (নীউজীল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা) পর্য্যন্ত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্পত্তি বিপুল, কিন্তু মানুষের শক্তি আজও অবিকশিত রহিয়া গেল।

যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যথার্থ খবর আমাদের খুব কম লোকে রাখে। এদেশের চেয়ে ওদেশে মজুরির হার ২।৩ গুণ এ খবর ত আশ্চর্য্য করিয়া দেয়। যারা জানে শোনে তারা বলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গ্রেটবৃটেনের তুলনা? প্রাকৃতিক

সংস্থান তাদের কত বেশী, জায়গা কত বিপুল, পর্ব্বত কত উঁচু, হ্রদগুলি কি গভীর, ইত্যাদি। কিন্তু তা বলিলে চলিবে কেন? উঁচু পাহাড় বা গভীর হ্রদের কম্‌তি আছে কি? যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্য এ সব বিষয়ে অনেক বেশী ধনী।

কিন্তু একথা সহজে প্রমাণ করা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের উঁচা হারে মজুরি, ঐশ্বর্য্যের দ্রুত বৃদ্ধি ও তজ্জন্য সমৃদ্ধি সব কিছুর একটি মাত্র কারণ আছে। গ্রেটবৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ (উৎপাদন সেন্সাস দ্রষ্টব্য) বলে যে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাঁচা মাল দাও ও সম-পরিমাণ মনুষ্যশ্রম প্রয়োগ কর—দেখিবে যুক্তরাষ্ট্রে ৩ গুণ ফল পাওয়া যাইবে। বুট ও শু ব্যবসায়ে উভয় দেশ ম্যাসাচুসেট্‌সের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, ঐ যন্ত্রগুলি একই শক্তিতে চালিত হয়, কিন্তু কাঁচামালে লোক খাটাইয়া দুদেশে অত্যন্ত ভিন্ন ফল পাওয়া যায়; যুক্তরাষ্ট্রে ফী হপ্তায় প্রতি কারিগর ৩ পা ১০ শি মূল্যের জিনিষ তৈরী করে, আর যুক্তরাজ্যে সে ঐ সময়ে মাত্র ১ পা ৭ শি ৪ পে মূল্যের জিনিষ তৈরী করিতে সমর্থ হয়। ফিস্‌ক্যাল প্রথা, আয়তন বা সংরক্ষিত বাজারের ফলে মজুরের উৎপাদন-শীলতায় এতটা পার্থক্য রাখিতে পারে না।

আমেরিকা শ্রেষ্ঠ কিসে?

শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত রূপ ঐশ্বর্য্যসৃষ্টিতে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের হেতু কাঁচা মালের দর, যানবাহনের সুযোগ বা বাজার সংরক্ষণে নয়। কাঁচা মাল ফ্যাক্টরীতে আনিবার পর সেন্সাস লওয়া হয়, মানুষের শ্রমে ঐ কাঁচা মালের দাম কতটা বাড়িল ইহা দেখাই উদ্দেশ্য। যুক্তরাষ্ট্রের কারিগর ৩ গুণ বেশী ধনোৎপাদনে সমর্থ, সেইজন্য সে বৃটিশ মজুরের চেয়ে মজুরিও পায় ৩ গুণ বেশী। গোটা আমেরিকার বিশ্বাস এই যে, উৎপাদন বাড়াইতে পারিলে মজুরি আপনি বাড়িবে এবং মজুরি বাড়িলে মুনাফা বাড়ে। এই কথা বৃটিশ মজুর সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। আমেরিকানের চারিদিকের হাওয়ায় মধ্যে রহিয়াছে একটা অপরাজেয় সুখবাদ। সে মনে করে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশের নাগরিক সে, তার অগ্রগতি কোন কিছুতেই প্রতিহত হইবে না। গত ৫০ বৎসরের ইতিহাস তার এই ধারণা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছে।

আটলান্টিকের এপারে আমরা যে কোন অভিজ্ঞতা বা সামর্থ্য বা সংগঠন শক্তির অভাবে হটিয়া যাইতেছি, তা নয়; আমাদের মত দুনিয়ার আর কোন দেশ শিল্পগত আবিষ্কার ও উন্নতিতে এতখানি দান করে নাই। বিশ্বাসের অভাবে ও উচ্চ আদর্শের অভাবে আমরা দুনিয়ার বিভিন্ন বাজারে পরাজিত হইতেছি। প্রধান মন্ত্রীও সেদিন বলিলেন, "জাতি যে ভাবে চিন্তা করে ও অনুভব করে, তাতেই শেষ পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক নির্ণীত হয়।" লোকে কি ভাবে তারই উপর ব্যবসার উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে, একথা ভুলিলে চলিবে না।

সাম্রাজ্য জেহাদের নীতিও আশা, বিশ্বাস ও খাটিবার নীতি। বৃটিশ সাম্রাজ্যে সমৃদ্ধিলাভের সকল উপকরণই রহিয়াছে। দরকার কেবল বৃহত্তর বাজার ঢুঁড়িয়া বাহির করার আমাদের মাল বিক্রীর জন্য এবং পুরা সময় কাজ আমাদের বেকারদের জন্য। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত দেশ পরস্পর সহযোগিতা করিলে তা সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে।

২। সাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্য?

রাইট্ অনারেব্‌ল সার হার্ব্বার্ট স্যামুয়েল জি-সি-বি, জি-বি-ই, এম্-পি'র মত:

লর্ড বীভারব্রুক তাঁর নয়া জেহাদ্ ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁর নিজের কথা এই: "আমরা সাম্রাজ্যের চারিদিকে টারিফ দেওয়াল গাঁথিয়া দিতে চাই, বাহির হইতে যা কিছু পণ্য আমদানি হয় করভার বসাইব, কিন্তু রাজা জর্জ্জের অধীন সব দেশ ও সব জাত অবাধভাবে বাণিজ্যিক লেনদেন চালাইবে।"

আচ্ছা, সাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্য বলিবার অর্থটা কি? বরং সাম্রাজ্যে সংরক্ষণ বলিলে বেশী সঙ্গত হইত। বাস্তবিক এই নীতিতে অবাধ বাণিজ্যের চেয়ে সংরক্ষণের এলাকাই বাড়িয়া যাইবে। গ্রেট বৃটেনকে বিদেশ হইতে আনীত প্রত্যেক আমদানি দ্রব্যের উপর নূতন করিয়া শুল্ক বসাইতে

হইবে; ক্রাউন কলোনিগুলিকেও তাই করিতে হইবে। ডোমিনিয়ানসমূহ ও ভারতবর্ষ যদি গ্রেট বৃটেন বা সাম্রাজ্যের অন্য স্থল হইতে আনীত দ্রব্যাদির উপর টারিফ উঠাইয়াও দেয় তবু যে পরিমাণ বাণিজ্য টারিফের হাত থেকে নিস্তার পাইবে তার চেয়ে ঢের বেশী এই প্রথম টারিফ শুল্কের অধীন হইবে। সুতরাং এম্পায়ার প্রোটেকশন না বলিবার হেতুটা কি? অবাধ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য মধ্যে পণ্যের অবাধ লেনদেন এ কথাগুলির উপরেই জোর দেওয়া হয়। এ যেন চিনি মিশাইয়া কুইনাইন গেলা আর কি।

ডোমিনিয়ানসমূহ ও ভারতবর্ষ

পলিসি হিসাবে সাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্য প্রত্যেক ইংরেজের অনুমোদিত হইতে পারে। অন্য সব কারণের চেয়ে ভারতীয় তূলা-শুল্ক যে ল্যাঙ্কাশিয়ারের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার বড় কারণ, তাতে সন্দেহ নাই। কাল ভারত ঐ শুল্ক উঠাইয়া দিলে ল্যাঙ্কাশিয়ার আনন্দে নৃত্য করিবে। আমাদের বয়ন, হোসিয়ারী ও বুট শিল্পীরা যদি বিনা শুল্কে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ও কানাডায় তাদের মাল পাঠাইতে পারে তবে তাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না। আর কোনও জাত যে ঐ সব বাজারে আসিয়া তাদের মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবে এমন ভয় তাদের নাই। তারা যে প্রত্যেক দেশের বাজারে সব রকম জিনিষে অন্যদের উপর টেক্কা দিতে পারিবে এমন কেহ আশা করে না—জাপানের অগুন্তি সস্তা তূলার কাপড় অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অত্যুন্নত মোটরকার বা টাইপরাইটারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সোজা নয়; এমন আরও অনেক ক্ষেত্রে হার মানিতে হইতে পারে; কিন্তু সাধারণভাবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, উৎপাদন পটুতা ও ক্রয়-সুগমতা হেতু গ্রেটবৃটেন সাম্রাজ্যের বাজারে বিশেষ লাভবান হইতে পারে।

কিন্তু ভারতের বা ডোমিনিয়ানসমূহের শিল্পীরা তাতে কি সন্তুষ্ট হইবে? চারিদিকে যদি সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি ও শিল্পপ্রসার ন্যায়সঙ্গত ও কুশল বলিয়া একবার স্বীকার কর তবে ভারত বা ডোমিনিয়ানগুলিকেই বা তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবে কিরূপে? সাম্রাজ্য জেহাদীর কথা এই, ডিট্রয়েটে তৈরী মোটরকার কিনিও না, বার্ম্মিংহামে তৈরী মোটরকার কিন, জার্ম্মাণি বা বেলজিয়াম হইতে ইস্পাত না কিনিয়া টাইনসাইড হইতে কিন। তবে ভারতবর্ষ যদি বলে, ল্যাঙ্কাশিয়ারের হাত হইতে আমাদের বাজারকে রক্ষা করিতে হইবে বা অষ্ট্রেলিয়া যদি বলে আমাদের বাজার একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চাই, তবে ত বলিবার কিছুই থাকে না। বিদেশীর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য ইংরেজের যদি সংরক্ষণ অবলম্বন ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে আর্থিক দিক্ হইতে ভারতীয় বা অষ্ট্রেলিয়ানেরও তা দরকার বলিয়া মানিতে হইবে। এই আর্থিক বিচার যে অন্য কোনপ্রকার বিচার দ্বারা খণ্ডিত হইবে এমন মনে হয় না এবং না মজুরেরা না গবর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা চালিত হইবে।

গ্রেট বৃটেনের স্বার্থের জন্য, কতকটা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের স্বার্থরক্ষার জন্যও বটে, সাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্য বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সাম্রাজ্যের অন্য সবাই এই ভাবের ভাবুক, একথা মনে করিবার কোন হেতু নাই।

গ্রেট বৃটেনের কাষ্টম টারিফ চাই

আরও একটা কথা। "সাম্রাজ্যের চারিদিকে টারিফ দেওয়াল গাঁথিয়া দিতে হইবে।" তার মানে, সাম্রাজ্যের বাহির হইতে যত জিনিষ আমদানি হয়, শিল্পজাত দ্রব্যই হোক্ বা খাদ্য দ্রব্য হোক বা কাঁচা মাল হোক—সব কিছুর উপরেই কাষ্টম শুল্ক বসাইতে হইবে। শিল্পজাত বিদেশী দ্রব্য আমদানির জন্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের বিশেষ মাথা-ব্যথা নাই, কারণ তাতে তাদের বাণিজ্যের পরিমাণ বেশী নয় এবং বৃটিশ বাজারে তাদের কারোই অদূর ভবিষ্যতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এইরূপ নীতি গ্রহণ করিলে গ্রেট বৃটেনের বাণিজ্য, শিল্প ও স্বাচ্ছন্দ্যের কি পরিবর্ত্তন ঘটিবে?

সাম্রাজ্যের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচা মালের উৎপাদন আশ্চর্য্য রকম বাড়িয়া গিয়াছে, উৎকর্ষও বাড়িয়াছে। তাতে গ্রেটবৃটেন বিশেষভাবে লাভবান্ হইয়াছে। জেহাদীরা এই কথাটার উপর বিশেষ জোর দেন। কথাটা সত্য

এবং বিন্দুমাত্র সংরক্ষণের সাহায্য না লইয়াও যে দেশের উন্নতি হইতে পারে তার প্রমাণ। কিন্তু তবু প্রকৃত কথাটা এই যে, যুক্তরাজ্যের প্রধান যোগান আসে বিদেশী রাজ্যগুলি হইতে। সে কথা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

স্বদেশে ভোগ করিবার জন্য রক্ষিত আমদানি (১৯২৮)

	বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে	তুনিয়ার রাজ্যগুলি হইতে	মোট
	কোটি পাঃ	কোটি পাঃ	কোটি পাঃ
খাদ্যদ্রব্য	১৮·৭	৩১·৬	৫০·৩
কাঁচা মাল	৭·১	১৯·৭	২৬·৮
	২৫·৮	৫১·৩	৭৭·১

অতএব শুধু এই দু' দফায় ৫০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যে শুল্ক বসানো হইবে। অধিকাংশই এ পর্যান্ত কর দেয় নাই। আর এগুলি হয় আমাদের শিল্পীদের নয়ত খাদ্য হিসাবে লোকেদের কাজে লাগিয়াছে। কতদিনে এই ৫০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের এই সব দ্রব্য সাম্রাজ্য হইতে যোগাড় করা সম্ভব হইবে? এদিকে যতদিন তা না হয়, ততদিন আমাদের সব আমদানি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

দরের কথা

সংরক্ষণ-বাদী মাত্রেই বলিয়া থাকেন যে, সংরক্ষণের ফলে জিনিষপত্রের দর চড়িবে না। দর চড়িবে কি চড়িবে না এই হইল আসল কথা। আর্থিক কারণে চারিদিকেই যদি জিনিষপত্রের দর নামিতে থাকে ও তখন করভার চাপানো যায়, তবে আগের চেয়ে দর না বাড়িতে পারে বটে, কিন্তু সস্তা হইবার সম্ভাবনাটা নষ্ট হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে সেফ্‌গার্ডিং ডিউটিগুলি বসানো সম্পর্কে কতকগুলি পণ্যের ঐ অবস্থা হইয়াছে। পাইকারী সব দরই পড়িয়া গিয়াছে। যেখানে কর বসে নাই সেখানে জিনিষটি সস্তা হইয়াছে। যেখানে বসিয়াছে সেখানে কম সস্তা হইয়াছে অথবা আগের দর বজায় রহিয়াছে। আগের চেয়ে ক্রেতা বেশী দর না দিতে পারে, কিন্তু সেফ্‌গার্ডিং না থাকিলে তাকে যত দিতে হইত এখন তাকে তার চেয়ে বেশী দিতে হইতেছে। এইটে ক্ষতি।

কখনো কখনো এইরূপ যুক্তি দেখানো হয় যে, খাদ্য-দ্রব্যের বেলা যে দরটা দেওয়া হয় তার এতটা অংশ দালালের পকেটে অথবা রুটির বেলায় কলওয়ালার পকেটে যায় যে, আমদানি শস্যের উপর কর বসাইলে এদের পকেটেই আগে টান পড়িবে, খুচরা দর বাড়িবে না। বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের মধ্যে বোঝাপড়া থাক্ বা না থাক্, দেশের মধ্যে উৎপাদক হইতে আরম্ভ করিয়া খাদক পর্য্যন্ত আগে যত লোক ছিল এখনও তত লোকই ত থাকিবে। তাদের পেটও ভরা চাই। বরং সংরক্ষণের বলে যোগান কমে ও প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতর হয় বলিয়া, দরের অংশরূপে অত্যধিক মুনাফা আদায় করা সহজ হয়, এমন দেখা গিয়াছে।

আরও এক যুক্তি এই যে, সংরক্ষণের ফলে বাজার স্থির থাকে, তাতে বিভিন্ন শিল্পাগারসমূহকে অনিয়মিতভাবে কাজ করিতে হয় না, পুরা সময় কাজ করিতে পারে, উৎপাদনে কম খরচা পড়ে, সুতরাং দর বাড়ার পরিবর্ত্তে কমার সম্ভাবনা হয়। অনিয়মিত কাজের চেয়ে পুরা সময় কাজে যে অনেক অপচয় নিবারণ হয় তা কেউ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু সেটা হইল সংগঠনের প্রশ্ন—পণ্যের টানের বহর কি, আর সংগঠনই বা কিরূপ? সংরক্ষণ নয়, র‍্যাশা-নালিজেশন বা যুক্তিপ্রয়োগ হইল সমস্যা।

সংরক্ষণ সত্ত্বেও শিল্প সুগঠিত না হইতে পারে, উৎ-পাদনের বহু উপায় এক সঙ্গে অবলম্বিত হইতে পারে, একত্র মাল উৎপাদনের সুবিধার দিকে চোখ না থাকিতে পারে, কাজ অনিয়মিত হইতে পারে এবং চড়া দর ধার্য্য না করিলে বেশী মুনাফার আশা না থাকিতে পারে। অন্যদিকে অবাধ বাণিজ্যেও শিল্প যদি সুগঠিত হয়, প্রণালী কুশল হয়, টান অনুসারে উৎপাদন-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা

হয়, ফ্যাক্টরিতে পুরা সময় কাজ হয় তবে দর না চড়াইয়াও মোটা হারে মুনাফা লাভ হইতে পারে। বৃটিশ মোটর-কার শিল্পের জন্য ৩৩⅓% টারিফ্ বসাইয়াও, ব্যবসাটাকে সুগঠিত করা সম্ভবপর হয় নাই। আমেরিকায় মজুরদের চড়া মজুরি দেওয়া সত্ত্বেও তার স্বদেশী মোটর কারের জন্য একজন ইংরেজকে একজন আমেরিকানের চেয়ে অনেক বেশী দাম দিতে হয়। অন্যদিকে কোন রকম টারিফ্ না থাকা সত্ত্বেও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির উৎপাদন ইংরেজের দেশে সুগঠিত ব্যবসারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মোট কথা যুক্তিপ্রয়োগ হইল এক বস্তু, সংরক্ষণ হইল অন্য বস্তু—একে অন্যের উপর নির্ভর করে না।

পরন্তু, একদিক্ হইতে দেখিতে গেলে সংরক্ষণ-প্রথা যুক্তি-প্রয়োগের বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। উৎপাদনটা যদি ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত করার ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়া যায় তবে তার একটা বিপদ্ও আছে। এইরূপে সম্পূর্ণ একিয়ারি (মনোপলি) প্রতিষ্ঠা করা সহজ হইয়া পড়ে, আর একিয়ারিগুলি সমাজের মঙ্গলের দিকে না চাহিয়া অথবা সমাজের ক্ষতি করিয়া নিজেদের আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। যুক্তিপ্রয়োগ মানে পটুতর উৎপাদন, পুরা সময় কাজ, কম খরচা, জিনিষপত্রের কম দর—যুক্তি প্রয়োগের প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু এই অধিকতর পটুতা যখন খাদকের হিতার্থে ব্যয়িত না হইয়া শুধু উৎপাদকের লাভের জন্য ব্যয়িত হয়, বাজারটাকে সম্পূর্ণ নিজের করতলগত রাখিয়া ইচ্ছামাত্র লাভের মাত্রা বাড়ানো হয়, তখন ঐ যুক্তিপ্রয়োগই ঘোরতর অকল্যাণের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই অকল্যাণের একমাত্র ঔষধ অবাধ বাণিজ্য। দর খুব যদি চড়াইয়া দাও, বিদেশ হইতে মাল আসিয়া প্রতিযোগিতা করিবে। জাতীয় একিয়ারি অসম্ভব নয়, কিন্তু দুনিয়া জোড়া একিয়ারি কঠিন ব্যাপার। টারিফ্ ঘেরিয়া বাজার বন্ধ করিয়া রাখ, উৎপাদকেরা মিলিয়া নিরঙ্কুশভাবে যাচ্ছে তাই করিতে পারে। সংরক্ষণ ও যুক্তিপ্রয়োগ একত্রে বিপজ্জনক বটে।

সুতরাং একথা বলা চলে না যে, টারিফের ফলে জিনিষ-পত্রের দর চড়িবে না।

চড়া দরের ফল

পার্ল্যামেণ্টে আইন পাশ করিয়া বিদেশী দ্রব্য মাত্রের উপর টারিফ বসাইয়া কৃত্রিম উপায়ে দর চড়াইলে তার ফল হইবে :

১। গোটা দেশের জীবনধারণের খরচা বাড়িবে। লক্ষ লক্ষ লোক দারিদ্র্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। জিনিষ-পত্রের দরটা তাদের কাছে জীবন-মরণের সমস্যা। পার্ল্যামেণ্ট এবং সমাজ প্রাণপণে দারিদ্র্যের সহিত নানা প্রকারে যুঝিতেছে। রাহা খরচা বাড়াইবার অর্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক দারিদ্র্য বাড়ানো।

২। বর্ত্তমান বৃটিশ জমিজমার কানুন যতদিন বজায় থাকিবে, ততদিন খাদ্যদ্রব্যের দর স্থায়ী ভাবে বাড়াইয়া দেওয়ার অর্থ খাজানা বাড়াইয়া দেওয়া। লোকেদের কাছ থেকে যে চড়া দর আদায় করা হইবে, তার একটা অংশ অন্ততঃ জমিদারের পেটে যাইবে বর্দ্ধিত খাজানা হিসাবে।

৩। ঐ নীতি সফল হইলে, ইংরেজ গমের চাষ বাড়াইতে প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিবে। একত্র উৎপাদন প্রণালীতে (কানাডা ও আর্জ্জেন্টিনায় অবলম্বিত হইয়াছে) অনেক সস্তায় গমের যোগান সম্ভব হয়। ১৯২৯ সনের ১৮ ডিসেম্বর কৃষি-সচিবের পার্ল্যামেণ্টে প্রদত্ত জবাব হইতে জানা যায় যে, বৃটিশ চাষ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির মোট মূল্যের ৪·৩% গমের বাবদ্ আর অন্যান্য শস্য বাবদ্ মাত্র ৫·৬%। যেখানে শিল্পটি সব চেয়ে কার্য্যকরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেখান হইতে উহা সরানো সমীচীন হইবে না।

৪। কাঁচা মালের দর চড়িলে আমাদের শিল্পীদের অসুবিধা হইবে। দুনিয়ার বাজারে তাদের ভীষণ প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিতে হইতেছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া তুলার অবস্থা বিশেষ খারাপ হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরে সাম্রাজ্যের মধ্যে তুলার উৎপাদন অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে, তথাপি ⅞ ভাগ তুলা আমাদের বিদেশ হইতেই আনিতে হয়। সেই তুলার উপর কর চাপাও, দেখিবে সাহায্য করিবার পরিবর্ত্তে ল্যাঙ্কাশিয়ারের ব্যবসার আরও সর্ব্বনাশ করিবে। উদাহরণ বাড়াইয়া লাভ নাই।

একথা ভুলিলে চলিবে না যে, শিল্প-দ্রব্য বলিয়া যার সংজ্ঞা দিতেছি তা অন্য বহু ব্যবসার পক্ষে কাঁচামাল স্বরূপ। রোলিং মিলে ইস্পাতের প্লেট পাকা মাল, কিন্তু জাহাজ শিল্পে উহা কাঁচা মাল মাত্র। স্পিনারের পক্ষে ইয়ার্ণ উৎপন্ন দ্রব্য হইলেও উইভারের পক্ষে কাঁচা মাল। সস্তা বিদেশী চামড়া বৃটিশ ট্যানারির পক্ষে ক্ষতিকর, কিন্তু বুট ফ্যাক্টরির পক্ষে বরস্বরূপ। ইত্যাদি।

অতএব এই নীতির ফলে কিরূপ আর্থিক বিপদ্ আসিবে, তা সহজেই অনুমেয়। গ্রেট বৃটেনের ভৌগোলিক সংস্থান এরূপ যে, টিঁকিয়া থাকিবার জন্যই রপ্তানি বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। যদি এই দ্বীপের প্রত্যেক একর জমি যতদূর সম্ভব ভাল করিয়া চষা হইত, তবু আমাদের খাদ্য ও কাঁচা মালের বেশীর ভাগই বাহির হইতে আমদানি করিতে হইত। আর এগুলি শোধ করিবার একমাত্র প্রধান উপায় হইতেছে রপ্তানি। আমাদের রপ্তানি বাজার যদি বন্ধ হইয়া যায়, দেশের শিল্পোন্নতি অব্যাহত রাখা ত দূরের কথা, লোকবলকে খাওয়ানো ও পরানো অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। সাম্রাজ্য জেহাদ আমাদের অপরিত্যাজ্য রপ্তানি বাণিজ্যের দুইটি অনিষ্ট সাধন করিবে:

১। দেশের ভিতর উৎপাদন-খরচা বাড়াইয়া দিয়া বিদেশের বাজারে বাজারে সস্তায় মাল বেচা অসম্ভব করিয়া ফেলিবে।

২। আমদানি কমাইয়া দিয়া তার পরিবর্ত্তে যে রপ্তানি যায় তাও কমাইয়া দিবে। বিদেশীর কাছ থেকে যদি কিনিতে না চাও ত তার কাছে বেচিতেও পারিবে না।

বৃটিশ বাণিজ্য ও বিদেশী বাজার

জেহাদকারীরা সাম্রাজ্যের বাহিরের বাজারগুলিকে যথোচিত ইজ্জৎ দিতে প্রস্তুত নন। লর্ড বীভারব্রুকের উক্তি এই: "অনেক দেশ আমাদের কাছ থেকে কোন মাল না কিনিয়াও আমাদের কাছে ক্রমেই বেশী বেশী মাল রপ্তানি করিতেছে।" অর্থনৈতিক দিক্ হইতে উহা সম্ভব হইতে পারে না। সাম্রাজ্যে ও সাম্রাজ্যের বাহিরে প্রধান প্রধান সমস্ত বাজারে বৃটিশ পণ্য রপ্তানির হিসাব নিম্নরূপ:

বৃটিশ পণ্য-রপ্তানি (১৯২৮)

সাম্রাজ্যের ভিতরে

	শিল্পদ্রব্য (কোটি পাঃ)	মোট (কোটি পাঃ)
বৃটিশ ভারত	৭'৮২	৮'৩৯
অষ্ট্রেলিয়া	৫'১৬	৫'৫৬
আইরিশ ফ্রী ষ্টেট্	২'১২	৩'৫০
ক্যানাডা	২'৮২	৩'৪৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	২'৮৩	৩'১৭
নিউজীল্যাণ্ড	১'৬৬	১'৯৩
মোট বৃটিশ সাম্রাজ্য (প্রোটেক্টরেট ও ম্যাণ্ডেটেড্ টেরিটরি ধরিয়া)	২৭'৫৭	৩২'৭৭

বিদেশী বাজারে

	শিল্পদ্রব্য	মোট
যুক্তরাষ্ট্র	৩'৫২	৪'৬৭
জার্ম্মাণি	২'৮০	৪'০৯
আর্জেন্টিনা	২'৮২	৩'১২
ফ্রান্স	১'৩৯	২'৫২
নেদারল্যাণ্ডস্	১'৬৬	২'১৮
বেলজিয়াম	'৯২	১'৭০
ব্রাজিল	১'৩৬	১'৬০
চীন	১'৪২	১'৫৭
জাপান	১'৩৮	১'৪৫
ইতালি	'৭৫	১'৪৩
মোট সমস্ত বিদেশী রাজ্য	৩০'৩২	৩৯'৫৯

বিদেশে ৪০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের পণ্য বিক্রয় করার গুরুত্বটা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। কত লোকের কাজ যোগান সম্ভব হইয়াছে, অন্নবস্ত্র ও অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মিলিতেছে, গোটা দেশটা সমৃদ্ধ হইতেছে।

আধুনিক অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে যে, কয়লা রপ্তানি আমাদের দেশের একটা বড় ব্যাপার। কিন্তু বিভিন্ন দেশের তুলনাকালে বাণিজ্যের সেই সেই শাখার কথা বিবেচনা করা দরকার যাদের বেলায় সকলের অবস্থা তুল্যমূল্য। খনিজ পদার্থে কোন দেশ ধনী, কোন দেশের বা বিলকুল কোন সম্পদ্ নাই। শিল্পজাত দ্রব্যের বাণিজ্যে লোকবলের অনুপাতে বৃটিশ রপ্তানি অন্য যে কোন দেশের চেয়ে বেশী। শুধু তাই নয়, কয়েক বৎসর ধরিয়া হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে, মাথা পিছু রপ্তানির বাড়্‌তিটা অন্য যে কোন দেশের চেয়ে বেশী, অথচ আমাদের শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছে ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে ও এই সময়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের আমাদিগকে ছাড়াইয়া যাইবার কথা।

স্যর হেনরি পেজ্ ক্রফ্‌ট একজন কট্টর সংরক্ষণবাদী। পার্ল্যামেণ্টে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বোর্ড অব্ ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট ১৯২৯, ২৫শে জুলাই যে জবাব দিয়াছেন তার উপর নির্ভর করিয়া নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায়:

মাথা পিছু সম্পূর্ণ অথবা আংশিক শিল্প দ্রব্য রপ্তানি

	১৮৮০			১৯২৮			বৃদ্ধি		
	পা	শি	পে	পা	শি	পে	পা	শি	পে
ফ্রান্স	১	১৯	৪	৬	৫	৯	৪	৬	৫
জার্ম্মাণি	১	১৬	১০	৬	১৪	৬	৪	১৭	৮
যুক্তরাষ্ট্র		১০	১	৫	৩	৪	৪	১৩	৩
যুক্তরাজ্য (আইরিশ ফ্রী ষ্টেট সমেত)	৫	১৪	২	১১	৯	৯	৫	১৫	৮

৫০ বৎসর আগেকার অবস্থা যদিও আমাদের আর নাই, তথাপি অন্যান্য দেশের তুলনায় লোকবলের অনুপাতে আমাদের শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে এবং ঐ সময়ের মধ্যে আমাদের বাণিজ্যের বাড়্‌টা অন্য সব দেশের চেয়ে বেশী দাঁড়াইয়াছে।

এই সম্বন্ধে আরও একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। ১৯২৯ সনে দুনিয়ায় যত জাহাজ তৈরী হইয়াছে তার টনেজের ৫৫% ইংরেজের জন্মভূমিতে হইয়াছে। আর গোটা দুনিয়ার সমস্ত দেশ একত্রে বাকী ৪৫% তৈরী করিয়াছে। সোজা কথায়, বৃটেন যদি দুনিয়ার যে কোন জায়গা হইতে সব চেয়ে সস্তা দরে মাল কিনিতে না পারিত, তবে এত জাহাজ তৈরী করা সম্ভব হইত না।

"অবাধ বাণিজ্য বিশ্বজনীন নহে, অতএব—"

ভিন্ন ভিন্ন দেশ যদি আমাদের মালের উপর টারিফ্ না বসাইত, তবে আমাদের বাণিজ্যের পরিমাণ যে আরও বেশী হইত তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য দেশের পণ্যের উপর করভার চাপাইলেই যে ক্ষতি নিবারিত হইবে না, বরং দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে। বাণিজ্য হচ্ছে দুই জাতের মধ্যে পরস্পর মালের অবাধ আদান-প্রদান। এক তীরে বাধা দাও বাণিজ্য কমিয়া যাইবে, অন্য তীরে বাধা দিলে সে বাণিজ্য আরও হ্রাস পাইবে। একথা সত্য নয় যে, আমরা যদি অন্য দেশের পণ্যাদির উপর কর চাপাই বা চাপাইব বলিয়া ভয় দেখাই, তবে সেই সব দেশ অমনি আমাদের পণ্য অবাধে তাদের দেশে প্রবেশ করিতে দিবে। সংরক্ষণবাদী কোন দেশই অন্য সংরক্ষণবাদী দেশে বিনা করে পণ্য বেচিতে সমর্থ হয় নাই। এ বিষয়ে আমাদের সুবিধাই বেশী রহিয়াছে।

সাম্রাজ্যের দাবী

সাম্রাজ্য জেহাদের পক্ষে একটা কথা বলিবার এই আছে যে, উপায়গুলি যতই ক্ষতিকর হোক, উদ্দেশ্যটি অতি মহৎ। সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃটিশ কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশ ও রাজ্যগুলিকে একসূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত করা। সমগ্র জগতের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য সমস্ত ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও যে একটি বিশেষ দান, তা কেউ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, টারিফ্ দেওয়াল তুলিয়া সেই উদ্দেশ্যের সাধন কতটা হয়।

সাম্রাজ্য সংরক্ষণ নীতি অনুসৃত হইলে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির দর যে বাড়িয়া যাইবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার মনে হয় না যে, তাতে বৃটিশ জনগণের সাম্রাজ্যবাদের উপর ভক্তি বাড়িবে। ঘরের গিন্নী যদি দেখেন যে, সব রকম খাদ্যদ্রব্যের দর চড়িয়া গিয়াছে এবং তাঁকে বুঝান হয়

যে, সাম্রাজ্যের উন্নতি ও ঐক্যের জন্য এইরূপ হইয়াছে, তবে তাঁর সাম্রাজ্যপ্রীতি নিশ্চয় উছলিয়া উঠিবে না। খাদ্যে কর চাপাইয়া সাম্রাজ্য-ভক্তি পুষ্ট করা চলে না।

অষ্ট্রেলিয়া বা ক্যানাডাও যে সাম্রাজ্য-বর্দ্ধনের অজুহাতে নিজ নিজ স্বার্থ খর্ব্ব করিবে, তা মনে হয় না।

সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যস্থ লোক

লর্ড বীভারব্রুক বলিতেছেন, "সাম্রাজ্যের মধ্যে আমরা যারা ইংরেজী ভাষায় কথা বলি, তাদের জাতি এক, রাজা এক, দৃষ্টি এক প্রকারের," অতএব আর্থিক ঐক্যও আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, সাম্রাজ্যের ⅘ অংশ লোকবল জাতিতে ইংরেজ নয়, তাদের ভাষা ইংরেজী নয়, তাদের জাত এক নয় অথবা দৃষ্টি একপ্রকারের নয়।

কোটি কোটি এশিয়াবাসী ও আফ্রিকাবাসীর শুভেচ্ছার উপর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। যদি এরা মনে করে যে, ক্ষমতা ও লাভই শাসক জাতির একমাত্র লক্ষ্য, তাদের হিত লক্ষ্য নয়, তবে এই জেহাদের বিরুদ্ধে অ-শ্বেত জাতিদের বিরোধিতা সহজেই অনুমেয়। যেই টারিফ দেওয়াল বৃটিশ সাম্রাজ্যের চারিদিকে তুলিয়া দেওয়া হইবে, অমনি সাম্রাজ্যস্থ বহু কোটি লোকের ধারণা জন্মিবে যে, তাদের আর্থিক দাসত্বের ব্যবস্থা করা হইতেছে। সংরক্ষণ-বাদের বিপক্ষে এ যুক্তি অকাট্য।

অতএব দেখা যাইতেছে, লর্ড বীভারব্রুকের বাণিজ্য-নীতির দুইটি প্রস্তাবের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ সাম্রাজ্যের ভিতরে অবাধ বাণিজ্য বাঞ্ছনীয় হইলেও কার্য্যতঃ সম্ভব নয়, আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বাহিরে সংরক্ষণ-স্থাপন বাঞ্ছনীয়ও নয় কার্য্যকরও নয়।

ভারতের কাঁচা চামড়ার উপর রপ্তানি-শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব

চামড়া পালিশ শিল্প (ট্যানিং ইণ্ডাষ্ট্রি)

ভারত অপর্য্যাপ্ত কাঁচা চামড়া উৎপাদন করে, কিন্তু ইহার প্রয়োজন ও চাহিদা খুবই কম। সুতরাং উৎপাদিত অধিকাংশ মাল কাঁচা অবস্থাতেই হউক অথবা ট্যান করিবার পর বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। বিদেশে ভারতীয় কাঁচা চামড়ার চাহিদাও কম নয়। কিন্তু মূল্য বেশী আদায় করিতে হইলে ও দেশের শিল্পোন্নতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয় চামড়া যথাসম্ভব ট্যান্ করিয়া বিদেশে রপ্তানি করাই যুক্তিসঙ্গত।

ভারতের চামড়া পালিশ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই বেশী হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও অনেকগুলা ট্যানারী আছে। এ ছাড়া কানপুর প্রভৃতি কতকগুলা সহরেও অনেক ট্যানারী দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র ভারতের এক-তৃতীয়াংশ ট্যানারী মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে অবস্থিত। মান্দ্রাজের প্রায় ৫০০ শত ট্যানারীর মধ্যে ২০০টীতে কাঁচা চামড়া ট্যান করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত ট্যানারীতে মজুরও খাটে ঢের। ইহার মধ্যে এক শ্রেণীর মজুর শুধু মৃত জন্তুর চামড়া সংগ্রহ করিয়া ট্যানারীতে সরবরাহ করিয়া থাকে। এই শিল্প মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বৎসরে ১২ হইতে ১৩ কোটি টাকার মাল উৎপাদন করে (স্থানীয় কাট্তি ধরিয়া) এবং বেশীর ভাগ ভারতীয় পরিচালনায় ও ভারতীয় টাকায় চলে।

শিল্পের জাতীয় ও সামরিক প্রয়োজনীয়তা

বিগত যুদ্ধের সময় এই ভারতীয় শিল্পের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। সে সময়ে সাম্রাজ্যের ও মিত্র পক্ষের চামড়ার চাহিদা এক রকম ভারতই যোগাইয়াছিল।

চামড়া শিল্পের সামরিক মূল্য ও জাতীয় আবশ্যকতা কতখানি তাহা বিগত যুদ্ধের সময় বুঝা গিয়াছিল। তখনি

জানা গিয়াছিল যে, এই শিল্পকে বিদেশীয় প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা কতখানি দরকার। এই শিল্পের উন্নতিতে যে শুধু জাতীয় সম্পদ্ বাড়িবে তাহা নয়, সরকারও ইহা হইতে কম সাহায্য পাইবেন না। শিল্পটী বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে যদি ধ্বংস পায় তাহা হইলে ইহাকে গড়িয়া তোলা সহজ হইবে না।

রপ্তানি-শুল্ক

যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং পরে এদেশের চামড়া-শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতায় খুব ভুগিয়া উঠিয়াছে। হাইড্ প্রধানতঃ জার্ম্মাণি এবং স্কিন মার্কিণ দেশে রপ্তানি হইত।

নানা রকম অসুবিধার বিষয় বিভিন্ন বাণিজ্য-সঙ্ঘ গবর্ণমেন্টের কানে তুলিলে, গবর্ণমেণ্ট এদেশ হইতে বিদেশে প্রেরিত সমস্ত কাঁচা চামড়ার উপর শতকরা ১৫৲ টাকা হারে একটা রপ্তানি শুল্ক ধার্য্য করিলেন। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন দেশে ট্যানারীতে ব্যবহারের জন্য চামড়ার চালান গেলে উক্ত শুল্ক হইতে শতকরা ১০৲ হারে রিবেট দেওয়া স্থির হয়।

এই নয়া আইন বহু দেশের পক্ষে তেমন রুচিকর হয় নাই। সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন চলিতে লাগিল। যে গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশের শিল্প-সংরক্ষণ-কল্পে শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে রপ্তানি শুল্ক ধার্য্য করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন, সেই গবর্ণমেণ্টই আবার ১৯২৩ সনের মার্চ্চ মাসে উক্ত আন্দোলনের ফলে শুল্ক কমাইয়া শতকরা ৫৲ টাকা হারে (রিবেট বাদ দিয়া) নূতন রপ্তানি শুল্ক কায়েম করিলেন।

এই শুল্ক কমানোর বিরুদ্ধে দেশের চামড়া-শিল্পের তরফ হইতে বহু আপত্তি ও শুল্ক পুনরায় বাড়াইবার জন্য বহু অনুরোধ সত্ত্বেও ১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসে দ্বিতীয় বারের ধার্য্য শুল্কের হার শতকরা ৫৲ টাকাও গবর্ণমেণ্ট তুলিয়া দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু লেজিস্লেটিভ্ এসেম্ব্লি এই শুল্ক তুলিয়া দিবার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ায় পূর্ব্ববৎ ৫৲ টাকা হারেই শুল্ক বজায় থাকে।

১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসে এসেম্ব্লির জনৈক সভ্য এই শুল্ক তুলিয়া দিবার প্রস্তাব আনয়ন করেন, কিন্তু এসেম্ব্লি সে প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ফিস্ক্যাল কমিশন এবং ট্যাক্সেশন এনকোয়ারি কমিটি

ফিস্ক্যাল কমিশন রিপোর্টে সর্ব্বত্র এই রপ্তানি-শুল্কের বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন বলেন, এই শুল্ক নাকি উৎপাদনকারীদের পক্ষে ক্ষতিজনক হইয়া পড়িয়াছে, আর এই শুল্কের ফলে নিম্নস্তরের চামড়ার ব্যবসার সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ভারতীয় ট্যানারীগুলাতে সাধারণতঃ উচ্চ স্তরের চামড়ার কাজ হয়। রপ্তানি-শুল্ক সত্ত্বেও সেগুলা বিদেশে কাটানো সহজ। এ দেশের মত গোটা দুনিয়ার বাজারেও নিম্নস্তরের চামড়ার দাম পড়িয়া যায়; ফলে ঐ চামড়া-সংগ্রহ লাভজনক মনে না হওয়ায় একেবারে উঠিয়া যাওয়ার মত হয়। কমিশন আরও বলেন যে, রপ্তানি শুল্কের দরুণ মূল্য কমিয়া যাওয়ায় মৃত পশুর গাত্র হইতে চামড়া তুলিয়া লইতে তেমন তৎপরতা আর দেখা যায় না, ফলে অনেক ক্ষেত্রে চামড়া পচিতে আরম্ভ করে ও এই ভাবে দেশের অনেক সম্পদ্ নষ্ট হইয়া যায়।

ট্যাক্সেশন এনকোয়ারি কমিটি ১৯২৪-২৫ সনের রিপোর্টে বলিয়াছেন:—

"ভারতের চামড়া-শিল্পের যতখানি উন্নতি আশা করিয়া রপ্তানি শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছিল, ততখানি উন্নতি দেখা যায় না। বরং যুদ্ধের পূর্ব্বের সময়ের তুলনায় ভারত হইতে চামড়া রপ্তানি প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে; আর যাহা রপ্তানি হইয়াছে তাহার অধিকাংশ জার্ম্মাণিতে গিয়াছে। ফিস্ক্যাল কমিশনের নির্দ্দেশানুযায়ী ভারতের চামড়া-শিল্পের সংরক্ষণ-কল্পে রপ্তানি-শুল্ক কায়েম না করিয়া আমদানি-শুল্ক কায়েম করা উচিত ছিল।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে রপ্তানি-শুল্ক তুলিয়া দিবার পক্ষে তিনটী যুক্তি দেখানো হইয়াছে:

(১) যে উদ্দেশ্যে শুল্ক কায়েম করা হইয়াছিল তাহা সিদ্ধ হয় নাই।

(২) এই শুল্ক চামড়া ব্যবসায়ের, বিশেষতঃ নিম্নস্তরের চামড়ার, ক্ষতি করিয়াছে।

(৩) চামড়া শিল্পের সংরক্ষণকল্পে রপ্তানি-শুল্ক তুলিয়া আমদানি-শুল্ক কায়েম করায় অধিক সুফল পাওয়া যাইবে।

এই যুক্তিগুলি সম্বন্ধে একে একে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

শুল্কের উদ্দেশ্য বিফল হয় নাই

চামড়ার উপর যখন রপ্তানি-শুল্ক কায়েম করা হয়, তখন দুনিয়াব্যাপী চামড়ার বাজারের অবস্থা বড় নামিয়া গিয়াছিল। সে বাজার অনেক দিন যাবৎ আর উঠে নাই। ১৯২০ সনের সেপ্টেম্বরে লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লিতে কমার্স মেম্বর ভারতের চামড়ার ব্যবসা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন :

"১৯২০ সনের প্রথম হইতে দুনিয়াব্যাপী চামড়া-ব্যবসার মন্দা ভাব সুরু হইয়া এক্ষণে তাহা ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে। তাহার হাওয়া ভারতের গায়েও বিশেষভাবে লাগিয়াছে এবং শুধু এই জন্যেই কাঁচা চামড়ার চালানেই হউক অথবা দেশের চামড়া-শিল্পের বৃদ্ধির দিক্ দিয়াই হউক ভারতে শুল্কের ফল ভাল হয় নাই।"

১৯২১ সনের মার্চ্চ মাসে তিনি আবার বলিয়াছেন, "বিদেশী এক্সচেঞ্জ পড়িয়া যাওয়ায় এবং জার্ম্মানি ও অষ্ট্রিয়া হইতে চামড়ার চাহিদা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বাণিজ্যে সাধারণ ভাবে মন্দা দেখা দিয়াছে।"

শুল্ক যখন প্রথম কায়েম করা হয় তখন বিলাতে লড়াইয়ের উদ্বৃত্ত ট্যান করা চামড়া বহু পরিমাণে গোলা-জাত ছিল। সেগুলি যে কোন মুহূর্ত্তে বাজারে ছড়াইয়া পড়িবার ভয় ছিল। ফলে ট্যান করা চামড়ার বাজার তখন যথাসম্ভব পড়িয়া যায়। এই অবস্থা স্বভাবতঃই কাঁচা চামড়ার বাজারেও অল্পবিস্তর দেখা দেয়। এ ছাড়া তখন ইয়োরোপ ও আমেরিকার অনেকগুলি ট্যানারী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় চামড়া ব্যবসাকে ভুগিতে হয়। এই মন্দা রপ্তানি-শুল্ক-জাত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া বিদেশী বণিকেরা গবর্ণমেণ্টের মত বদলাইতে সমর্থ হয়।

ডাঃ পরাঞ্জপে এবং অনারেব্‌ল সর্দ্দার যোগেন্দ্র সিং বলিয়াছেন, "যুদ্ধের পূর্ব্বের এবং পরের ফলাফলের দরুণ বাজার মন্দা চলিতেছে। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে কোন সিদ্ধান্ত খাড়া করা চলে না। বরং এ সময়ে ভারতের চামড়া-শিল্পের উন্নতি-সাধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগা দরকার। এখন কোনমতে রপ্তানি-শুল্ক পরিত্যাগ করা উচিত নয়"। (ট্যাক্সেশন এনকোয়ারি রিপোর্ট, ১৩০ পৃষ্ঠা)।

রপ্তানি-শুল্ক ক্ষতিজনক নহে

সকল রকম চামড়ার ব্যবসাতে দুনিয়াব্যাপী মন্দা দেখা গিয়াছে। নিম্নস্তরের চামড়ার ব্যবসাও খারাপ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? আর এ কথাও কোন মতে সত্য নয় যে, ভারতবাসীরা শুধু উচ্চশ্রেণীর চামড়া নিজেদের জন্য রাখিয়া নিম্নস্তরের চামড়া সমস্তটা বিদেশে রপ্তানি করে।

প্রকৃত পক্ষে বিদেশে নিম্নস্তরের চামড়া বিশেষভাবে কোন কালে রপ্তানি হয় নাই, হইতেছেও না। বরং দেশী ট্যানারীগুলাই এই প্রকার চামড়া বেশী ব্যবহার করে। "উত্তর বিভাগের (মাদ্রাজের ট্যানারীতে) অনেক চামড়া-ব্যবসায়ী এবং মধ্য বিভাগের কতকগুলি ট্যানারী এমন সমস্ত চামড়া ব্যবহার করে যাহা কলিকাতার রপ্তানি ব্যবসায়ীরা বাজে বলিয়া ফেলিয়া রাখেন" (একাউণ্ট অব্ ওয়ার্কস এণ্ড এ্যাকটিভিটিস্ অব্ দি ডিপার্টমেণ্ট অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ, মাদ্রাজ, ১লা জানুয়ারী, ১৯২৬, ৯৫পৃঃ, ২য় প্যারা)।

মূল কথা, সমস্ত কাঁচা চামড়ার বাজার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় ট্যানারীগুলা যেমন উচ্চস্তরের চামড়া খরিদ করে, তেমনি নিম্নস্তরের চামড়াও অনেক পরিমাণে খরিদ করিয়া থাকে ; কিন্তু বিদেশীরা তাহাদের ট্যানারীর জন্য শুধু উচ্চস্তরের চামড়াই খরিদ করিয়া থাকে।

মৃত পশুর গায়ে চামড়া পচার কথা কতদূর সত্য বলা যায় না। কারণ দেশে এমন অনেক ট্যানার আছে যাহারা অনেক খারাপ ছিদ্রযুক্ত এমন কি অপরিষ্কার চামড়া লইয়া ট্যান করিয়া থাকে। তাহারা কাঁচা চামড়ার লোম ও মাংসের কুচি বাহির করিয়া সেগুলিও বিক্রয় করিয়া দু'পয়সা রোজগার করে।

রপ্তানি-শুল্কের প্রয়োজনীয়তা

শিল্পের উন্নতির জন্য রপ্তানি শুল্ক তুলিয়া আমদানি শুল্ক কায়েম করিতে বলা হইয়াছে। সে বিষয়ে বিচার করিতে গেলে আগে দেখা উচিত দেশের আমদানি কি রপ্তানি কোনটা বেশী। এ বিষয়ের হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ অতি সামান্য। কয়েক বৎসরের হিসাব নীচে দেখান গেল :—

		রপ্তানি মূল্য (টাকা)	ফিনিশ্‌ড্‌ চামড়া ও বুট প্রভৃতি চামড়ায় প্রস্তুত জিনিষের আমদানি মূল্য (টাকা)
১৯২৫-২৬	ট্যান্‌ করা চামড়া	৬,৯৭,৫৩,৬৭৫৲	
	কাঁচা চামড়া	৭,২৩,৩৮,২৬৩৲	
	মোট	১৪,২০,৯৯,৯৩৮৲	৯৫,৫৩,৩০৭৲
১৯২৬-২৭	ট্যান করা চামড়া	৭,৩৭,৬৯,০৫০৲	
	কাঁচা চামড়া	৭,১৭,৫৪,৬৯৩৲	
	মোট	১৫,৫৫,২৩,৭৪৩৲	১,১৬,৮৫,৯৯৩৲
১৯২৭-২৮	ট্যান করা চামড়া	৯,০৭,২৬,৮২২৲	
	কাঁচা চামড়া	৮,৭৪,২৪,৪৮৮৲	
	মোট	১৭,৮১,৫১,৩১০৲	১,৩১,২৭,২০৫৲
১৯২৮-২৯	ট্যান করা চামড়া	৯,৩০,৭৪,৪৯৩৲	
	কাঁচা চামড়া	৯,৪৬,৮৪,৩৫৫৲	
	মোট	১৮,৭৭,৫৮,৮৪৮৲	১,৩২,১০,৬৮৪৲

উপরোক্ত আমদানি মালের প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ কাঁচা চামড়া ছিল। সুতরাং গড়ে মোট রপ্তানির ১/২৮ ভাগ চামড়া এদেশে আমদানি হইয়াছে।

তবে যদি চামড়া দুর্ম্মূল্য করিয়া দেশের লোকদিগকে দেশী চামড়া ব্যবহার করিতে বাধ্য করা দরকার হয়, তাহা হইলে অবশ্য আমদানি-শুল্ক কায়েম করা আবশ্যক। কিন্তু দেশের চাহিদা ও কাটুতি এত অল্প যে, দেশের উৎপন্ন চামড়ার মোটা অংশই বিদেশে রপ্তানি করা প্রয়োজন হয়। সুতরাং এখন দেখিতে হইবে, এই চামড়া কাঁচা অবস্থায় বিদেশে রপ্তানি করা লাভজনক না ট্যান করিয়া অথবা চামড়ার জিনিষ প্রস্তুত করিয়া রপ্তানি করা ভাল। দেশে যদি চামড়া হইতে নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত করা সম্ভব হয় তাহা হইলে এই প্রকারের মালের রপ্তানিতেই বেশী লাভ হয় সন্দেহ নাই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক কায়েম করিলে দেশের কোন স্বার্থই সিদ্ধ হইবে না। দেশের এই শিল্প সংরক্ষণ করিতে হইলে যতদূর সম্ভব রপ্তানি শুল্ক বাড়ান দরকার।

উপরি উক্ত হিসাব হইতে বিদেশী চামড়া ও চামড়ায় নির্ম্মিত মালের আমদানির স্বল্পতা ছাড়াও আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করা দরকার। দেশের রপ্তানির মধ্যে মূল্য হিসাবে কাঁচা চামড়ার চেয়ে ট্যান করা চামড়া রপ্তানির স্থান অনেক উচ্চে ও সেই জন্য উহা বেশী লাভজনক।

ভারতীয় হাইড্‌ ও স্কিনের একচেটিয়া ব্যবসা

ট্যারিফ কমিশন এনকোয়ারি কমিটি যদিও এদেশের স্কিন (বিশেষতঃ ছাগলের চামড়া) ব্যবসার একচেটিয়াত্বের

কথা স্বীকার করিয়াছেন, তবু কাঁচা হাইডের বিষয়ে তাঁহারা ভারতের একচেটিয়াত্ব স্বীকার করেন নাই। সেইজন্য রপ্তানি শুল্ক তুলিয়া দিবার কথা তাঁহারা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এ উক্তি সত্য নয়। ফিস্ক্যাল কমিশন রপ্তানি শুল্ক তুলিয়া দিবার পক্ষে বলিতে গিয়াও একস্থানে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, শতকরা ১৫ টাকা রপ্তানি শুল্ক সত্ত্বেও ভারতীয় উচ্চ স্তরের হাইডের দুনিয়ার বাজারে বেশ চাহিদা দেখা গিয়াছে। মোট কথা এদেশের চামড়া ছাড়া দুনিয়ার বাজার চলিতে পারে না। যদি দুনিয়া ভারতের কাঁচা চামড়া না-ও কেনে তাহাকে ভারতের ট্যান করা চামড়া কিনিতে হইবেই।

চামড়া-শিল্পে সাম্রাজ্য

কেহ কেহ বলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশ চামড়া শিল্পের প্রতি উদাসীন। তবে ইহা লইয়া ভারতের এত মাথা ব্যথা কেন? সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশ যাহা করিবে ভারতকেও যে তাহাই করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

অনেক বড় বড় লোক ভারতের চামড়া-শিল্পের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি শুল্ক কায়েম করা উচিত বলিয়াছেন। এই প্রকারে এ শিল্প সংরক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইলে কাঁচা চামড়া সুন্দররূপে ট্যান করিয়া অথবা উহাতে নানা প্রকারের সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালান দিয়া বেশী মূল্য আদায় করিতে পারা যাইবে। ইহা ছাড়া দেশে শিল্প-বৃদ্ধি হইলে দেশের বহুসংখ্যক মজুর কারখানায় চাকুরী পাইবে, দেশের বেকার-সমস্যার কতকটা সমাধান হইবে। সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশে এ শিল্প বাড়াইবার সুবিধা না থাকিলেও ভারতের সুযোগ ভারত কেন ছাড়িবে? সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি দেশেও যদি এ শিল্প বাড়িবার সুযোগ পায় তাহা হইলে যুদ্ধের সময়ে সাম্রাজ্যের যে কোন দেশ ইহা হইতে উপকৃত হইতে পারে।

সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশ গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সুবিধা তেমনভাবে গ্রহণ করে নাই। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য তাহাদের সে সুবিধা তুলিয়া দিয়া পুনরায় শতকরা ১৫৲ টাকা হারে রপ্তানি-শুল্ক কায়েম করা। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশকে শতকরা ১০৲ টাকা হারে যে রিবেট দিবার আইন আছে তাহাও রদ্ করা উচিত।

ভারতের চামড়া-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইলে তাহাতে সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের যত উপকার হইবে কাঁচা চামড়া রপ্তানিতে তত হইবে না। কারণ ভারতের ট্যান করা চামড়ার এবং হাইডের অধিকাংশ বিলাতে রপ্তানি হইয়া যায়, সেখান হইতে আবার সেগুলি নানা দেশে রপ্তানি হয়। ভারতের কাঁচা চামড়া নানা দেশে ভারত হইতেই বরাবর রপ্তানি হইয়া যায়; ফলে পুনঃ রপ্তানির লভ্যাংশ বিলাত ভোগ করিতে পারে না। নীচে যে চামড়া রপ্তানির হিসাব দেখান হইয়াছে তাহা হইতে খাঁটি অবস্থা বুঝা যাইবে:—

বৎসর	যে দেশে রপ্তানি হইয়াছে	কাঁচা চামড়ার রপ্তানি-মূল্য (টাকা)	ট্যান-করা চামড়ার রপ্তানি-মূল্য (টাকা)
১৯২৩-২৪	বৃটিশ সাম্রাজ্য	৭,২৮,১৪১	২,৯৩,৬৭,২৬২
	অন্যান্য দেশ	২,৯৫,৫৪,৩৬৬	২৩,১০,৬০৯
১৯২৪-২৫	বৃটিশ সাম্রাজ্য	৭,৩৫,৫৭৮	৩,১৫,৩৫,৪৬১
	অন্যান্য দেশ	৩,২৩,৮৮,৫৫৮	১৯,৩৮,৩৪৫
১৯২৫-২৬	বৃটিশ সাম্রাজ্য	২৪,০৫,৪১৯	২,৮৮,৫৩,৬৭১
	অন্যান্য দেশ	২,৯৬,৫২,২৭৪	১৫,৬৪,৩৫০
১৯২৬-২৭	বৃটিশ সাম্রাজ্য	১০,৫৮,৩৬৫	২,৬৯,৪৫,৪৮৯
	অন্যান্য দেশ	২,৪৬,৮০,১৬৪	১৬,৩৬,২৬৭
১৯২৭-২৮	বৃটিশ সাম্রাজ্য	৩৩,৫৮,০৭৬	৩,৮৫,২৪,৫১০
	অন্যান্য দেশ	৩,৫১,৩১,০৫৪	২৬,৫২,৩৩৯
১৯২৮-২৯	বৃটিশ সাম্রাজ্য	১৬,২৪,৬১৪	৩,৯৩,৩৩,৬৪৪
	অন্যান্য দেশ	৩,৮৯,১৮,১৬৯	৪৬,৬৫,২২৯

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাঁচা চামড়ার মোট রপ্তানির শতকরা ৫ ভাগ এবং ট্যান করা চামড়ার শতকরা ৯০ হইতে ৯৫ ভাগ চামড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে যায়। ট্যান করা চামড়ার অধিকাংশ বিলাতেই যায়।

মান্দ্রাজের চামড়া ট্যানিং

অনেকের ধারণা মান্দ্রাজের ট্যানারীগুলিতে চামড়া ভাল ট্যান করা হয় না, তথায় কাঁচা চামড়া সুধু লেবুর রসে ডুবাইয়া ট্যান করা চামড়া আখ্যা দিয়া বিদেশে রপ্তানি করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু মান্দ্রাজের ট্যানারীগুলির ভিতর ঘুরিয়া দেখিলে সেখানকার চামড়া ট্যান করিবার ব্যবস্থা নিন্দনীয় বলা যায় না। তবে সেখানে চামড়া রং করা হয় না। এই ট্যান করা চামড়া রপ্তানি হইয়া গেলে বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ রুচি ও পছন্দ মত রং করিয়া লয়। মান্দ্রাজের ট্যানারীতে চামড়া রং না করারও কতকগুলি কারণ আছে। প্রথম কারণ, দেশের মধ্যে রঙ্গীন চামড়ার চাহিদা তেমন বেশী নাই। দ্বিতীয় কারণ, যে যে দেশে চামড়া রপ্তানি হইবে সেখানকার ব্যবসার প্রতি কেন্দ্র হয়ত বিভিন্ন ধরণের রং পছন্দ করিবে এবং সে পছন্দও পরিবর্ত্তনশীল। এখন এই সমস্ত রংয়ের চাহিদা আলাদা ভাবে মিটাইতে গেলে বর্ত্তমান সাদা চামড়ার ব্যবসার তুলনায় তাহা একটা খুচরা ব্যবসায় পরিণত হইয়া যাইবে। একবার রঙ্গীন চামড়ার ব্যবসা আরম্ভ করিলে আর সাদা চামড়া চালাইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। দেশের উৎপন্ন মাল বিদেশে কাটাইতে বেশ বেগ পাইতে হইবে। এ ছাড়া যে যে দেশে চামড়া চালান যাইবে সেই সেই দেশ ভারতীয় রঙ্গীন চামড়ার কাট্‌তি বেশী হইবে মনে করিয়া মালের উপর নূতন করিয়া উচ্চহারে আমদানি শুল্ক কায়েম করিয়া দিবে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ভারতীয় ট্যানারীতে প্রস্তুত চামড়া রং না করিয়াই বিদেশে রপ্তানি করা যুক্তিসঙ্গত।

মান্দ্রাজের ট্যানারী হইতে ট্যান করা চামড়াকে সরকার কাঁচা মালের সামিল বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তথাপি ভারতের কাঁচা চামড়ার সব চেয়ে বড় খরিদ্দার জার্ম্মাণি মান্দ্রাজের ট্যান করা চামড়াকে কাঁচা চামড়ার মধ্যে না ফেলিয়া ট্যান করা চামড়ার শ্রেণীর মধ্যেই ফেলিয়াছে। তৈয়ারী চামড়া বলিয়া ইহার উপর মোটা রকমের আমদানি শুল্কও কায়েম করিয়া রাখিয়াছে। অথচ কাঁচা চামড়ার উপর তাহারা কোন প্রকার আমদানি শুল্ক আদায় করে না।

বাণিজ্যের গতি

ভারত হইতে কাঁচা চামড়া ও ট্যান করা চামড়া রপ্তানির পরিমাণ নীচে দেওয়া গেল :—

	কাঁচা চামড়া টন	ট্যান করা চামড়া টন
যুদ্ধের পূর্ব্বে—		
১৯১০-১১	৪২,৬০০	৭,৫৬৬
১৯১১-১২	৪৭,২৮৫	৮,৮১৭
১৯১২-১৩	৮৮,২১৬	১১,৬৬৩
১৯১৩-১৪	৫৫,৭৮৭	৮,৭০১
যুদ্ধের পরে—		
১৯১৯-২০	৫৭,৭৩৮	২৪,০২২
১৯২০-২১	১৮,৪৪৩	৪,০৭৪
১৯২১-২২	২৫,৩৯০	৬,৩১৪
১৯২২-২৩	২৩,৯৪৮	৯,৯৫২
১৯২৩-২৪	২৭,৮৭৫	১৩,১৯৪
১৯২৪-২৫	২৯,২০৭	১৩,০৪৯
১৯২৫-২৬	২৮,৪১৩	১২,১০৯
১৯২৬-২৭	২৭,৯০৪	১১,৩৩৫
১৯২৭-২৮	৪০,৬৬৪	১৫,৭৬০
১৯২৮-২৯	৩৭,৩৪৭	১৬,৩৯৭

যুদ্ধ-সমাপ্তির ঠিক পর বৎসরে অর্থাৎ ১৯১৯-২০ সনে কাঁচা ও ট্যান করা চামড়ার ব্যবসা আশাতীতরূপে বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার পরে দুই বৎসর চামড়ার ব্যবসায় দুনিয়াব্যাপী মন্দা দেখা যায়। ১৯২২-২৩ সন হইতে আবার অল্প অল্প করিয়া ব্যবসার গতি ফিরিতে আরম্ভ করে।

যুদ্ধের পূর্ব্বের চেয়ে পরে কাঁচা এবং ট্যান করা চামড়ার মোট টনেজ অনেক কম। ইহার কারণ যুদ্ধের সময় সামরিক চাহিদার দরুণ এবং বেশী মূল্য আদায়ের লোভে বহুসংখ্যক গো-মহিষাদি মারিয়া চামড়া লওয়া হয়। পরে গো-মহিষের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় চামড়া পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। রপ্তানি-শুল্ক ইহার কারণ নহে। তারপর গো-মহিষের সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পাইলে রপ্তানি অল্প অল্প বাড়িয়াছে। এই কারণেই শেষ দুই বৎসরের রপ্তানি বেশী হইয়াছে।

কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ার কথাও সত্য নয়। কারণ উপরি উক্ত হিসাব হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাণিজ্যের অবস্থা ফিরিবার পর হইতে প্রতি বৎসরই কাঁচা চামড়ার রপ্তানি কিছু কিছু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। কাঁচামাল বিদেশে বেশী রপ্তানি না হইয়া দেশের ট্যানারিতে আনাই রপ্তানি-শুল্ক কায়েম করিবার উদ্দেশ্য।

যুদ্ধের পূর্ব্বের চেয়ে ১৯২২-২৩ সনের পর হইতে ট্যান করা চামড়ার রপ্তানি অনেক বেশী হইয়াছে। রপ্তানি-শুল্ক কমাইয়া যে টুকু রাখা হইয়াছিল তাহাতেই চামড়া শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে কতকটা রক্ষা করিয়াছে। কাঁচা ও ট্যান করা চামড়ার রপ্তানির অনুপাত পাশাপাশি দেখান যাইতেছে :

	কাঁচা চামড়া %	ট্যান করা চামড়া %
১৯১০-১১	৮৫	১৫
১৯১১-১২	৮৪	১৬
১৯১২-১৩	৮৮	১২
১৯১৩-১৪	৮৬	১৪
১৯১৯-২০	৭১	২৯
১৯২০-২১	৮২	১৮
১৯২১-২২	৮১	১৯
১৯২২-২৩	৭০	৩০
১৯২৩-২৪	৬৮	৩২
১৯২৪-২৫	৬৯	৩১
১৯২৫-২৬	৭০	৩০
১৯২৬-২৭	৭১	২৯
১৯২৭-২৮	৭২	২৮
১৯২৮-২৯	৭০	৩০

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যুদ্ধের পূর্ব্বে মোট রপ্তানি ১০০ টন চামড়ার ভিতর ১২ হইতে ১৬ অথবা গড়ে ১৪ টন ট্যান করিয়া বিদেশে পাঠান হইয়াছে, বাকী ৮৬ টনই কাঁচা চামড়া। ১৯২১-২২ সনে ট্যান করা চামড়ার রপ্তানি শতকরা ১৯ টনে উঠে এবং ঠিক তার পরের বৎসরে এই সংখ্যা ৩০ টনে এবং ১৯২৩-২৪ সনে ৩২ টনে উঠে। এই সময় হইতেই বাণিজ্যের একটু উন্নতি দেখা যায়। রপ্তানির এই বাড়তি যদিও প্রধানতঃ চাহিদা-বৃদ্ধির দরুণ হইয়াছে, তবু কাঁচা চামড়ার অনুপাতে ট্যান করা চামড়ার রপ্তানি-বৃদ্ধির একটি কারণ শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে রপ্তানি-শুল্ক। রপ্তানি-শুল্কের এই হার বজায় রাখিলে দেশের চামড়া শিল্প দিন দিন বাড়িয়া যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ১৯২৩ সনের মার্চ্চ মাসে চামড়ার রপ্তানি-শুল্ক শতকরা ২৫৲ টাকার পরিবর্ত্তে ৫৲ টাকায় কমাইয়া দেওয়াতে ১৯২৪-২৫ সন হইতে ট্যান করা চামড়ার রপ্তানির অনুপাত কিছু কিছু কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯২৮-২৯ সনে হঠাৎ ট্যান করা চামড়ার অনুপাত বাড়িয়া ৩০এ উঠিয়াছে। এই বৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করা কঠিন।

যে সমস্ত কাঁচা মাল বিদেশে চালান হয় কাষ্টমস্ হইতে প্রায়ই তাহার খুব নিম্নহারে শুল্ক-নিরূপণ-কারক মূল্য (লো টারিফ্ ভ্যালুয়েশন) নির্দ্ধারিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১৯২৭-২৮ সনে "আরসেনিকেটেড্ র হাইড্"এর রপ্তানি কালে মূল্য ধরা হয় পাউণ্ড প্রতি ছয় আনা। অথচ বাজারে এই প্রকারের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর চামড়াও কম পক্ষে তের আনা পাউণ্ড হিসাবে বিক্রী হয়। আর এক প্রকার নুণমাখা গরুর চামড়ার উপর শুল্কনির্দ্ধারক মূল্য মাত্র চারি আনা ধরা হয়, বাজারে তাহার মূল্য কমসে কম সাত আনা। এইরূপে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে হার স্থির থাকিলেও মালের প্রকৃত মূল্যের শতকরা ২½ টাকার বেশী রপ্তানি-শুল্ক আদায় হয় না। ইহাতে, বিশেষতঃ গত বৎসরের মত দুনিয়াব্যাপী চামড়ার চাহিদা বাড়িলে

দেশের চামড়া-ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয় এবং বিদেশী বণিকেরা অল্প মূল্যে ভারতের কাঁচামাল লইয়া যায়।

আমেরিকার নজীর

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথমতঃ ভারত হইতে ট্যান করা চামড়া খরিদ করিত। তারপর তাহারা ভারত হইতে শুধু কাঁচা চামড়া লইয়া নিজের দেশের চামড়া শিল্পের উন্নতি করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল। বিদেশের ট্যান করা চামড়া দেশের মধ্যে আসিয়া যাহাতে নিজেদের চামড়ার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না পারে সেই জন্য তথায় বিদেশের ট্যান করা চামড়ার উপর অতিরিক্ত উচ্চহারে আমদানি শুল্ক কায়েম করা হইল। এইভাবে সে দেশের চামড়া শিল্প দুনিয়ার বাজারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে যখন দেখা গেল যে, বিদেশী প্রতিযোগিতায় দেশের শিল্পকে কোনমতে হটাইতে পারিবে না, তখন আমদানি-শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইল। ভারতকেও এই পথে চলিতে হইবে।

অতিরিক্ত মালের ব্যবহার

ভারতবর্ষে যে পরিমাণে কাঁচা চামড়া উৎপন্ন হয়, এখানকার চাহিদা অথবা কাটতি সে পরিমাণে নাই। সুতরাং অতিরিক্ত মাল নষ্ট না করিয়া যে যে দেশে এ মালের চাহিদা আছে সেই সেই দেশে মাল রপ্তানি করিলে কিছু পয়সা ঘরে আসিতে পারে। এখন কথা হইতেছে যে, দেশের চামড়া কাঁচা অবস্থাতেই বিদেশে চালান দেওয়া ভাল, কি ট্যান করিয়া চাহিদামত নানা দেশে রপ্তানি করা যুক্তিসঙ্গত। কাঁচা চামড়া অপেক্ষা ট্যান করা চামড়ার মূল্য সব দেশে অপেক্ষাকৃত বেশী সন্দেহ নাই। আর দেশে যখন চামড়া ট্যান করিবার ব্যবস্থাও রহিয়াছে তখন চামড়া ট্যান করিয়া বিদেশে চালান দিলে কিছু বেশী পয়সা ঘরে আনা যায়। সুতরাং এরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই।

অবনতির কারণ অনুসন্ধান

স্যর চার্লস্ ইনেস্ তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "বুট্ প্রভৃতি তৈরী করিবার জন্য মাদ্রাজ ট্যানারিতে উচ্চ শ্রেণীয় ট্যান্ করা চামড়ার মোটেই চাহিদা নাই।"

বিদেশে চাহিদা কমিয়া গিয়াছে বলিয়াই এদেশের চামড়া শিল্পে এমন কি কাঁচা চামড়ার ব্যবসায় এত মন্দা লাগিয়াছে। কিন্তু এ মন্দা বেশী দিন থাকিতে পারে না, কারণ শীঘ্র হোক্ দেরীতে হোক্, চাহিদা বাড়িবে ইহা সুনিশ্চিত। চামড়া শিল্পের প্রধান শত্রু বিদেশী বিক্রেতাগণ। সুতরাং চাহিদা বাড়িলেই এদেশের চামড়া-শিল্পের উন্নতি হইবে একথা নিশ্চয় বলা যায় না, বরং চাহিদা বাড়িলে প্রতিযোগিতা আরও ভীষণ হইবার সম্ভাবনা। কারণ বিদেশী ট্যানারিগুলি অক্লেশে ভারতের সমস্ত কাঁচা চামড়া লইয়া নিজেদের শিল্পের উন্নতি করে; আর ভারত নিজের মাল পরকে দিয়া নিজের ট্যানারির জন্য যথোপযুক্ত কাঁচামাল খুঁজিয়া পায় না!

কখনো কখনো জার্ম্মাণ প্রভৃতি বিদেশী বণিকেরা ভারতের কাঁচা চামড়া নিজেদের দেশে ট্যান করিয়া লইয়া আসে ও বাজার-দর অপেক্ষা অনেক সস্তায় তাহা ছাড়িতে থাকে। ইহাতে এদেশের শিল্প কতকটা জখম হইয়া যায়। তারপর তাহারা আমাদের দেশে আসিয়া ইচ্ছামত কাঁচা চামড়া লুটিয়া শুধু শিল্পের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, দেশের শিল্পটিকে সমূলে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে। এরূপ অবস্থায় উচ্চহারে রপ্তানিশুল্ক কায়েম করা ছাড়া আর কি উপায় আছে?

এদেশে ট্যান করা উচ্চ স্তরের চামড়াগুলি নাকি স্থায়ী হয় না, শীঘ্র শুকাইয়া যায়। এদেশের অনেক ট্যানারির সহিত বিলাতের খরিদ্দারদের বহুকাল যাবৎ লেনদেন ও চিঠিপত্র লেখালেখি হইতেছে, কিন্তু এ বিষয়ে কখনো কোনরূপ অভিযোগ শুনা যায় নাই।

কাঁচা স্কিনের উপর রপ্তানি-শুল্কের প্রয়োজনীয়তা

কাঁচা হাইডের মত ভারতের কাঁচা স্কিনও বিদেশী প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট ভুগিয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতের যে সমস্ত স্কিন পূর্ব্বে শুধু দেশীয় ট্যানারিগুলিতে আসিত,

এক্ষণে রপ্তানি-শুল্ক কমাইয়া দেওয়াতে সে সমস্ত বিদেশীর কবলে গিয়া পড়িতেছে। তাহাতে দেশের ট্যানারিগুলার রীতিমত কাজে বাধা পড়িতেছে।

রপ্তানি-শুল্ক কেন দরকার ?

(১) ইহাদ্বারা করদাতাগণের উপর নূতন কর না চাপাইয়া বিনা ক্লেশে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইবে। (২) দেশের চামড়া শিল্প শ্রীবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব লাভ করিবে। ফলে দেশের জাতীয় সম্পদ্ বাড়িবে, বহুসংখ্যক কুলি মজুর মিস্ত্রি প্রভৃতির অন্ন জুটিবে।

অনেকে বলেন, রপ্তানি-শুল্ক বজায় থাকিলে অথবা বাড়াইলে দেশের চামড়া-উৎপাদনকারীদেরই ক্ষতি। ইহা সত্য নয়। কারণ রপ্তানি-শুল্ক সাধারণতঃ রপ্তানি-কারীরাই দিয়া থাকে, উৎপাদনকারীরা নয়। চামড়া-রপ্তানিকারীরা সবাই বিদেশী। দুই একজন মাত্র দেশী লোক দেখা যায়, ইঁহারাও কোন না কোন বিদেশী বণিকের অধীনে কাজ করে। সুতরাং রপ্তানি-শুল্ক রদ্ করিলে এক পক্ষে দেশের চামড়া শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইবে, অন্য পক্ষে দেশের উৎপাদনকারীরা কোনরূপে লাভবান হইবে না।

রপ্তানি-শুল্ক রদ হইলে কালক্রমে উৎপাদনকারীকেই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে যদি দেশের শিল্প সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় তবে উৎপাদনকারীরাই বেশী বিপদে পড়িবে। কারণ দেশের শিল্প নষ্ট হইলে দেশের ভিতর কাঁচা চামড়ার চাহিদাও কমিয়া যাইবে, এমন কি কালে কালে উহা নাও থাকিতে পারে। তখন শুধু বিদেশী রপ্তানিকারীরা এই সমস্ত কাঁচা চামড়ার একমাত্র খরিদ্দার থাকিবে এবং কাঁচা চামড়ার জন্য নাম-মাত্র মূল্য দিতে চাহিবে*। তাহাতে উৎপাদনকারীরা উপযুক্ত মূল্য পাইবে না।

রপ্তানি-শুল্ক এবং সেস্

৫৲ টাকা হারে রপ্তানি-শুল্কই শিল্প-সংরক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। রপ্তানি-শুল্কের পরিবর্ত্তে যে নূতন সেস্ বসাইবার কথা উঠিয়াছে তাহা সমর্থন করা যায় না। প্রথমতঃ, তাহা বর্ত্তমান শুল্ক অপেক্ষা অনেক কম হইতে পারে, তাহাতে দেশের শিল্প আরও অধম হইবে। তা ছাড়া, এই সেস্ যদি সমস্ত কাঁচা হাইড্ এবং স্কিনের উপর ধার্য্য হয় তাহা হইলে এই সেস্এর টাকা উৎপাদন-কারীদেরই যোগাইতে হইবে।

তবে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি বজায় থাকিলে সেস্এ আপত্তি করিবার আর কিছু থাকে না :

(১) রপ্তানি-শুল্কে যেমন দেশের শিল্প-সংরক্ষণের সুবিধা হয় সেস্এও সেই সমস্ত সুবিধা বজায় থাকিবে।

(২) সেস্এর হার যতদূর সম্ভব উচ্চ (শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে হইলে ভাল হয়) হইবে।

(৩) হার ধার্য্য হইলে তাহা সকলের পক্ষে সমান পাকা ও কার্য্যকর হইবে, নূতন আইন ভিন্ন ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না।

(৪) এই সেস্ শুধু কাঁচা স্কিন ও হাইড্ রপ্তানির উপর প্রযোজ্য হইবে। ইহা ভারতীয় ট্যানারিগুলিতে ব্যবহৃত মাল মসলার উপর প্রযোজ্য হইতে পারিবে না।

---

* এটি একটি দুর্ব্বল যুক্তি। সাধারণতঃ স্বাভাবিক অবস্থায় টান যোগান দ্বারা দ্রব্যের দর স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, দরের ফলে টান বা যোগান নিয়ন্ত্রিত হয়।—সম্পাদক।

বাংলার আদমস্থুমারীর প্রাথমিক ফল

	পুরুষ		স্ত্রী		মোট		
	১৯২১	১৯৩১	১৯২১	১৯৩১	১৯২১	১৯৩১	শতকরা বৃদ্ধি বা হ্রাস
বাংলা (করদ রাজ্য সহ) মোট	২৪,৬৫০,৬৯৪	২৬,৪৯৫,৩৭৫	২২,৯৬৬,৪৩৩	২৪,৪৮৪,২৯২	৪৭,৫৯৭,১২৭	৫০,৯৭৯,৬৬৭	+৭·১
বৃটিশ-শাসিত বাংলা	২৪,১৫৩,৫৫১	২৫,৯৭৯,৮৮৩	২২,৫৪৬,৬৫০	২৪,০২৭,৪৯৩	৪৬,৭০০,২০১	৫০,০০৭,৩৭৬	+৭·০৮
বর্দ্ধমান	৭৩০,৩১৮	৮১২,০৪১	৭০৪,৪৫৩	৭৫৯,৬১৫	১,৪৩৪,৭৭১	১,৫৭০,৯৫৬	+৯·৪৬
বীরভুম	৪২৫,০৩৭	৪৭২,৬০৯	৪২৬,৬৮৮	৪৭৪,৮১৬	৮৫১,৭২৫	৯৪৭,৪২৫	+১১·২৩
বাঁকুড়া	৫০৯,৩৩৪	৫৫৭,৪৬৩	৫১০,৬০৭	৫৫৪,৮৭৪	১,০১৯,৯৪১	১,১১২,৩৩৭	+৯·০৫৮
মেদিনীপুর	১,৩৩৯,৬৫২	১,৪১৩,৭৩৩	১,৩২৭,০০৮	১,৩৭৭,৫৮৬	২,৬৬৬,৬৬০	২,৭৯১,৩১৯	+৪·৬৭৪
হুগলী	৫৬১,২৬৮	৫৮৮,৮২২	৫১৮,৮৭৪	৫১৭,৯৮০	১,০৮০,১৪২	১,১০৬,৮০২	+২·৪৬৮
হাওড়া	৫৩৫,১৫১	৬০০,১৬৭	৪৬২,২৫২	৪৯৯,২১২	৯৯৭,৪০৩	১,০৯৯,৩৭৯	+১০·২২
২৪ পরগণা	১,৩২৪,০৬০	১,৪৬৩,১৮০	১,১৩৪,৭৩২	১,২৪৫,৩২৯	২,৪৫৮,৭৯২	২,৭০৮,৫০৯	+১০·১৫৬
কলিকাতা	৭২৪,২৪৮	৭৮৭,৪০৩	৩৫৩,০১৬	৩৭৪,০০৭	১,০৭৭,২৬৪	১,১৬১,৪১০	+৭·৮১
নদীয়া	৭৬৪,৮১১	৭৮৮,৩০৪	৭২৯,৮৮৭	৭৪১,৪৭২	১,৪৯৪,৬৯৮	১,৫২৯,৭৭৬	+২·৩৪
মুর্শিদাবাদ	৬০৯,৮৭৮	৬৮৪,১৪৩	৬১৩,৭২৩	৬৮৬,৭১৫	১,২২৩,৬০১	১,৩৭০,৮৫৮	+১২·০৩
যশোহর	৮৯৩,৫৯২	৮৭০,৮৯০	৮২৮,৬২৭	৭৯৯,৬৮৭	১,৭২২,২১৯	১,৬৭০,৫৭৭	—২·৯৯৮
খুলনা	৭৬৫,৫৬০	৮৪৯,২৬৪	৭০৩,৪১০	৭৭২,৭১৫	১,৪৬৮,৯৭০	১,৬২১,৯৭৯	+১০·৪১
রাজসাহী	৭৭০,৫৬৬	৭৪১,২০৭	৭২৬,৭৭২	৬৮৭,৯২১	১,৪৯৭,৩৩৮	১,৪২৯,১২৮	—৪·৫৪
দিনাজপুর	৮৯৯,৮০৪	৯২২,৭৮০	৮১২,০৯১	৮৩১,৩৭২	১,৭১১,৮৯৫	১,৭৫৪,১৫২	+২·৪৬
জলপাইগুড়ি	৫০৩,৩৯৭	৫৩৪,৩৮৪	৪৩২,৮৭২	৪৪৯,২১০	৯৩৬,২৬৯	৯৮৩,৫৯৪	+৫·০৫
দার্জ্জিলিং	১৪৯,০৯৪	১৬৮,৩৩৯	১৩৩,৬৫৪	১৪৮,০০০	২৮২,৭৪৮	৩১৬,৩৩৯	+১১·৮৮
রংপুর	১,৩১৪,৫৩৫	১,৩৫৩,৫২৪	১,১৮৮,৯৬০	১,২৩৫,৮৯৩	২,৫০৩,৪৯৫	২,৫৮৯,৪১৭	+৩·৪৩
বগুড়া	৫৩৮,৯৪৭	৫৫৭,৩১৬	৫১০,০৯৫	৫২৯,১৩৭	১,০৪৯,০৪২	১,০৮৬,৪৯৩	+৩·৫৭
পাবনা	৭০৯,৪৪৩	৭৪০,৭২৪	৬৮৫,০১৪	৭০৯,১১১	১,৩৯৪,৪৫৭	১,৪৪৯,৮৩৫	+৩·৯৭
মালদহ	৫০৫,৪২২	৫২৭,৫৪৮	৫০৫,৪৬১	৫৩৫,৭৬২	১,০১০,৮৮৩	১,০৬৩,৩১০	+৫·১৮
ঢাকা	১,৫৮৮,২৫৭	১,৭৪২,৯৩৪	১,৫৬৮,৮৭৯	১,৬৯০,১৬৯	৩,১৫৭,১৩৬	৩,৪৩৩,১০৩	+৮·৭৪
ময়মনসিংহ	২,৫০৯,৮৮৫	২,৬৬২,৮২৫	২,৩২৬,৭৩৭	২,৪৫২,১৮৩	৪,৮৩৬,৬২২	৫,১১৫,০০৮	+৫·৭৫
ফরিদপুর	১,১৩২,১১৬	১,২০৪,১৬৫	১,০৮৭,১৩৪	১,১৫১,৭৭৮	২,২১৯,২৫০	২,৩৫৫,৯৪৩	+৬·১৫
বাখরগঞ্জ	১,৩৩২,৪৯৮	১,৪৯৬,২৪৩	১,২৭০,২৮১	১,৪২৪,৭১৬	২,৬০২,৭৭৯	২,৯২০,৯৫৯	+১২·২

ত্রিপুরা	১,৪০৬,৭৮৮	১,৫৯৬,৬৮২	১,৩৩৭,৮৬২	১,৫১২,৪৮৬	২,৭৪৪,৬৫০	৩,১০৯,১৬৮	+১৩'২৮
নোয়াখালী	৭৩৮,৭২২	৮৫৭,৯৩২	৭৩৪,০৬৪	৮৪৫,৭৫০	১,৪৭২,৭৮৬	১,৭০৩,৬৮২	+১৫'৬৭
চট্টগ্রাম	৭৭৭,৮৮২	৮৭১,১০৩	৮৩৩,৫৪০	৯১১,৯৮৯	১,৬১১,৪২২	১,৭৯৩,০৯২	+১১'২৭
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৯৩,২৮৬	১১৪,১১৮	৭৯,৯৫৭	৯৯,০০৮	১৭৩,২৪৩	২১৩,১২৬	+২৩'০২
করদ রাজ্য মোট	৪৭৭,১৪৩	৫১৫,৪৯২	৪১৯,৭৮৩	৪৫৬,৭৯৯	৮৯৬,৯২৬	৯৭২,২৯১	+৮'৪
কুচবিহার	৩১৫,৬২৮	৩১২,৪১৯	২৭৬,৮৬১	২৭৭,২৫৩	৫৯২,৪৮৯	৫৯০,০৭২	+০'৪০৭
ত্রিপুরা ষ্টেট	১৬১,৫১৫	২০২,৬৭৩	১৪২,৯২২	১৭৯,৫৪৬	৩০৪,৪৩৭	৩৮২,২১৯	+২৫'৫৪

ভারতে দেশলাইয়ের কারবার

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী

বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনমূলক আন্দোলনের ফলে অধুনা দেশে স্বদেশী দ্রব্যের নানা কারখানা ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। খদ্দর, দেশীয় সাবান, বিড়ী প্রভৃতি প্রতি রাস্তাতেই লোকের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কিন্তু এদেশে দেশলাইয়ের কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা সাধু প্রচেষ্টা। বিদেশী পণ্যের উপর বর্দ্ধিত হারে শুল্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট এদেশের শিল্প-প্রসারের অনেকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এতদিন সুইডেন ও জাপান ভারতের বাজারে দেশলাই রপ্তানি করিয়া বৎসরে আড়াই কোটি টাকা লইয়া যাইত। স্বদেশী দেশলাইয়ের প্রচলন হওয়ায় ক্রমে ক্রমে এই ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস হইতেছে।

ভারতে দেশলাইয়ের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। চাউল ডাইলের ন্যায় দেশলাইও লোকের নিত্য প্রয়োজনীয় পদার্থ। মূল্য সস্তা ও ইচ্ছামত জ্বালাইতে পারা যায় বলিয়া দেশলাই এখন প্রাচীন শনুকের কাঠিকে ভারত হইতে চিরতরে বিতাড়িত করিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৩ শত কোটি বাক্স দেশলাই খরচ হয়। কাজেই এরূপ একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় ও লাভজনক ব্যবসায়ের দিকে বিদেশী বণিক্ যে আকৃষ্ট হইবে, তাহা স্বাভাবিক। ভারতে বর্ত্তমানে যে কয়েকটী দেশলাইয়ের কারখানা আছে তাহার দ্বিগুণসংখ্যক কারখানা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

একটী দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপন করিতে বহু টাকার প্রয়োজন হয় বলিয়া যৌথ প্রণালীতে কারখানা স্থাপন করা ভাল। প্রতি দিন এক হাজার গ্রোস্ দেশলাই উৎপন্ন করিতে পারা যায়, এরূপ একটী কারখানা স্থাপন করিতে নিম্নলিখিতরূপ ব্যয় পড়িতে পারে :—

মেসিন ও কলকব্জা	...	৪০,০০০৲
কাঁচা মাল	...	২০,০০০৲
তৈয়ারী মসলা	...	২০,০০০৲
কাজের জন্য মূলধন	...	২০,০০০৲
মোট		১০০,০০০৲

এক গ্রোস দেশলাই তৈয়ার করিতে এক টাকার অতিরিক্ত ব্যয় পড়িবে না। শুল্ক বর্দ্ধিত হওয়ায় এক্ষণে বিদেশ-জাত দেশলাই ভারতের বাজারে ১৮০-১৸৵০ গ্রোস দরে বিক্রী হইতেছে। কিন্তু দেশজাত দেশলাই এক টাকা গ্রোস্ দরে বিক্রয় করিলে ও প্রতিদিন এক হাজার গ্রোস উৎপাদন করিতে পারিলে দৈনিক

৫০০৲ শত টাকা লাভ হয়। কাজেই ১০০,০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া এদেশে দেশলাই তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিলে বার্ষিক ১৮০,০০০৲ টাকা লাভ হইতে পারে। অতএব অংশীদারদিগকে শতকরা ৫০৲ টাকা হারে লাভ দিলেও যৌথ কারবারের কোন ক্ষতি হইবে না।

এ সময়ে যদি বঙ্গবাসী এরূপ একটী লাভজনক ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা একটী অপূর্ব্ব সুযোগ হারাইবেন। বাঙ্গালী স্বাধীন ব্যবসায়-কার্য্যে পশ্চাৎপদ, এরূপ অপবাদ বাঙ্গালী-চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালীর দেশ হইতে এই কলঙ্ক-কালিমা মুছাইবার এখনই শুভ অবসর। বাঙ্গালার বনজাত ছাতিম, পিটুলী ও বাওনা গাছের ডালে সুন্দর দেশলাইয়ের কাঠি তৈয়ারী হয়, ইহা পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইয়াছে। এই সমস্ত গাছ প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালার বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দর বনের গেয়ো গাছ দ্বারাও অতি সুন্দর দেশলাইয়ের বাক্স নির্ম্মিত হয়। গবর্ণমেণ্ট এই কারণে সুন্দরবনে তাঁহাদের দেশলাইয়ের কারখানা স্থানান্তরিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম ও আসামেও দেশলাইয়ের কাঠি তৈয়ারীর প্রচুর গাছ আছে।

প্রত্যেক বাড়ীতেও কুটীরশিল্প হিসাবে দেশলাই তৈয়ারী করা যাইতে পারে। একটী গৃহস্থের উপযোগী মেসিনের মূল্য মাত্র ৭৫৲। গ্রামের স্ত্রীলোক ও বালকেরা ইহাতে কাজ করিয়া মাসিক ১৫৲।২০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। আজকালকার এই বেকার-সমস্যার দিনে মাসিক ১৫।২০৲ টাকা উপর্জ্জন করা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। প্রত্যেক দেশ-হিতৈষীর এখন এরূপ মেসিন বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে প্রচলন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টরের সহিত পত্র-ব্যবহার করিলে আরও বিবরণ জানা যাইবে।

(বঙ্গরত্ন—কৃষ্ণনগর)

কদলীর চাষ

শ্রীরাখালদাস ভৌমিক

"আট হাত অন্তর এক হাত বাই,
কলা লাগাও চাষী ভাই ;
লাগিয়ে কলা কেটোনা পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত ;
তিন শ' ষাট ঝাড় কলা রুয়ে,
থাক গে চাষী খাটে শুয়ে।"

আট হাত অন্তর এক হাত মাটির নীচে কদলী গাছ রোপণ করিতে হয়। কদলী গাছের পাতা না কাটিলে কান্দি বড় ও কলা মোটা হয়। সাধারণতঃ ৩৬০ দিনে চাষীরা বৎসর গণনা করিয়া থাকে। এক সঙ্গে ৩৬০ ঝাড় কলা লাগাইলে গড়পড়তা প্রত্যেক ঝাড়ে ১ কান্দি করিয়া কলা কাটা যায়। আবার ধারাবাহিক-রূপে ৩৬০ দিনে ৩৬০ কান্দি কাটার পর পরবর্ত্তী বৎসরে ঐরূপ প্রত্যেক ঝাড়ে ৩।৪ কান্দি হিসাবে কলা পাওয়া যাইবে অর্থাৎ এক বৎসর অন্তর প্রত্যেক ঝাড়ে ৩।৪টী হিসাবে গাছ জন্মাইবে। এইরূপে দ্বিতীয় বৎসর হইতে রোজ ৩।৪ কান্দি হিসাবে কলা পাওয়া যাইবে। কাজেই চাষীর খাটে শুইয়া আরাম করিবার মত আয় হইবে।

প্রত্যেক ঝাড়ে ৩।৪টী করিয়া গাছ রাখিয়া অবশিষ্ট গাছ কাটিয়া ফেলিতে হয় এবং ফলবান কলা গাছ হইতে কলা, থোড় লওয়ার পর ঐ গাছ নির্ম্মূল করিয়া তুলিয়া ফেলিয়া ঝাড়ের গোড়ায় মাটি দিতে হয়। তাহাতে গাছের তেজ থাকে, ঝাড় অনেক দিন স্থায়ী হয়, কান্দি বড় হয়, কলা মোটা হয়। ৮০ হাতে ১ রশি হয়। এক রশি দীর্ঘ ও এক রশি প্রস্থ জমিতে ১/০ এক বিঘা হয় ; ৮ হাত অন্তর গাছ লাগাইলে ৮০ হাতের মধ্যে ১১টা গাছ এক

সারিতে হয়। ঐ হিসাবে প্রস্থেও ১১টা গাছ এক সারিতে হয়। সুতরাং ১১×১১=১২১টী গাছ ১/০ এক বিঘা জমিতে রোপণ করা যায়। ৩/০ তিন বিঘাতে ১২১×৩=৩৬৩টী কলার ঝাড় জন্মে। উপরের হিসাব মত প্রত্যেক দিন কলা বিক্রয় করিয়া যে আয় হয় তাহাতে ৩/০ তিন বিঘা কলার জমিতে একটা চাষীর ভাত-কাপড়ের সংস্থান স্বাধীনভাবে খাটে শুইয়া থাকিলেও হয়। কলা বিক্রয় ছাড়া কলার গাছে অন্য রকম আয়ও হয়, যথা (১) থোড় বিক্রয়। (২) কলার পাতা, ডগা পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিয়া তহাতে কাপড় কাচিলে, কাপড় খুব ফর্সা হয়, অথচ সোডায় কাপড় কাচিলে কাপড় যত শীঘ্র জীর্ণ হয় ঐ ক্ষারে কাচিলে তেমন হয় না। পাড়াগাঁয়ের ধোপারা ঐ ক্ষারের জলের ছিটা দিয়া কাপড়ের ময়লা দূর করে বলিয়া তাদের কাচা কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়। যে সকল নরম কাপড় সোডা দিয়া সিদ্ধ করা চলে না, সেই সকল কাপড় ঐ ক্ষারের ঠাণ্ডা জলে ১ দিন ভিজাইয়া রাখার পর সামান্য সাবানের সাহায্যে কাচিলে উৎকৃষ্ট ধোপ খোলে ও ময়লা সম্পূর্ণ নির্গত হয়, কাপড়ের চাকচিক্যেরও হানি হয় না, অথচ বেশী টেঁকসই হয়। (৩) লোণা মাটির সহিত ঐ ক্ষার সংযোগে সোরা ও লবণ প্রস্তুত হয়। (৪) কলা গাছের খোলা হইতে এক প্রকার সূক্ষ্ম সূত্র বাহির করা যায়। পাট জাগ দিয়া কাচার পর যেমন পাট তৈরী হয় ঐ খোলা হইতেও সেই প্রকারে সূত্র বাহির করিতে হয়। তা ছাড়া ব্যবসা বড় হইলে অন্য রকম প্রক্রিয়ায়ও সূত্র বাহির করিয়া লওয়া যায়। ঐ সূত্র খুব চক্‌চকে এবং সিল্কের অনুরূপ। একারণ সিল্কের সূত্রের সহিত মিশাইয়া উহাতে নানা রকম বস্ত্র প্রস্তুত হয়। কাশীর সিল্ক বলিয়া যে সিল্কের কাপড়ের প্রচলন আছে তাহাতে কদলীর সূত্র মিশ্রিত থাকে। তাছাড়া আজকাল সস্তা দরের যে সকল সিল্ক প্রচলিত দেখা যায় তাহার মধ্যেও ঐ সূত্রের মিশ্রণ থাকে। (৫) ফলবান কদলী গাছের মাথা খণ্ড খণ্ড করিয়া জলের সঙ্গে মিশাইয়া গরুর সানি হয়। বিশেষতঃ গরম কালে দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে ঐ সানি বা জাব খুব ভাল খাদ্য।

"ফাল্গুনে ওলা, চৈত্রে কলা"। চৈত্র মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত কলা লাগাইলে সেই বৎসর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কলার চারা বাহির হইয়া ঝাড় হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে দু'বার ঝাড়ের গোড়া কোপাইয়া ফাঁকা স্থানগুলিতে লাঙ্গল দিয়া চষিলেই চাষ হয়; উক্ত চষা ফাঁকা জমিতে হরিদ্রা, আদা, কচু, আলু বেশ জন্মে। বাঁশের বাগান করিবার ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক কলার ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বাঁশের মোথা পুতিলে কলা গাছের ছায়ায় ২।৩ বৎসরে বাঁশের বাগান প্রস্তুত হয়, এবং বাঁশ বাগান হইতে কদলীর বাগানের চেয়ে কম খরচে বেশী আয় হয়। বস্তুতঃ অল্প পরিশ্রমে কদলীর চাষে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা চলে।

(মাহিষ্য-সমাজ)

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

প্রাপ্তি স্বীকার

১। বি জি পল অ্যাণ্ড কো প্রকাশিত পুস্তকাবলী

মান্দ্রাজের পুস্তক-বিক্রেতা বি জি পল অ্যাণ্ড কো তাঁদের প্রকাশিত নিম্নলিখিত ৩ খানা পুস্তক পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

(১) দি পোলিটিক্যাল ফিলসফীজ্ সিন্স নাইনটিন ফাইভ (১৯০৫ হইতে আজ অবধি রাষ্ট্র বিদ্যার ধারা) অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

(২) ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট (আর্থিক উন্নতি) অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

(৩) দি ল অ্যাণ্ড থিওরি অব্ রেলওয়ে ফ্রেট্ রেটস

(রেলের মাশুল-সম্বন্ধীয় আইন ও তত্ত্বকথা) কল্যাণ সি শ্রীনিবাসন।

২। আন্তর্জ্জাতিক শান্তি পরিষৎ

কার্ণেগী প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক শান্তি পরিষদের সভাপতি ডক্টর নিকোলাস মারে বাট্‌লার পরিষদের জনৈক গবেষককে নিম্নলিখিত কেতাবখানি উপহার পাঠাইয়াছেন। তাহা পরিষদে দান করা হইয়াছে।

দি পাথ টু পীস (শান্তির পথ)।

৩। আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সঙ্ঘ

আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সঙ্ঘ তাঁহাদের নিম্নলিখিত দুইখানা পত্রিকা নিয়মিতভাবে পাঠাইতেছেন।

(১) ইণ্টার-ন্যাশনাল লেবার রিবিউ (আন্তর্জ্জাতিক মজুর পত্রিকা) মাসিক।

(২) ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল অ্যাণ্ড লেবার ইন্‌ফর্মেশন (শিল্প ও মজুর-ঘটিত সন্দেশ) সাপ্তাহিক।

ইঁহারা গবেষণাশীর্ষক কেতাবগুলিও পাঠাইয়া থাকেন। সম্প্রতি নিম্নলিখিত দুইখানি বহি পাঠাইয়াছেন :

(১) আন্ এমপ্লয়মেণ্ট অ্যাণ্ড পাবলিক্ ওয়ার্কস (বেকার ও জন-কাজ)।

(২) ষ্টাডিজ অন্ ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল রিলেশনস (শিল্প সম্বন্ধ লইয়া আলোচনা)।

৪। ফরাসী রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি পরিষৎ তাঁদের ১৯৩০ সনের বাৎসরিক বুলেটিন (২০৬ পৃঃ) একখণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছেন।

৫। নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি পরিষদে নিয়মিতভাবে আসিতেছে :

(১) রিবিস্তা মেনসাইলে (ইতালি) মাসিক।

(২) ডেমাগ নিউজ (জার্ম্মাণি) মাসিক।

(৩) হ্বিটশাফটলিখে মিটাইলুঙ্গেন (জার্ম্মাণি) ১০।১৫।২০ দিন অন্তর প্রকাশিত।

আমরা ইঁহাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীরঘুনাথ শীল বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
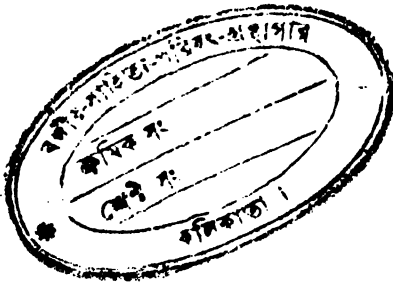
চৈত্র—১৩৩৭

৫ম বর্ষ—১২শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে:
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।
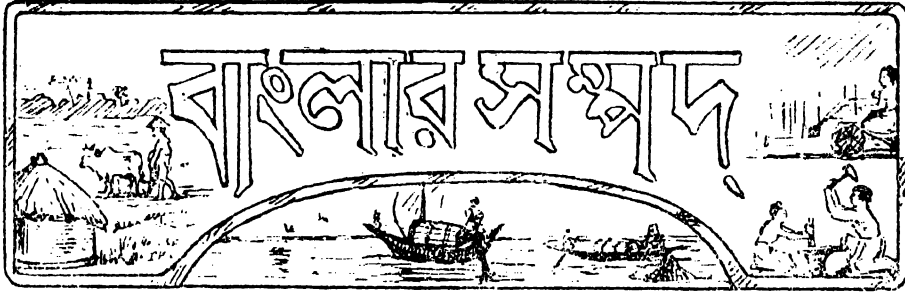
ভদ্রলোক চাষী চাই

বিগত ২৭ জানুয়ারী তারিখে নোয়াখালীর কলেক্টার নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন।

১। বঙ্গদেশীয় মহামান্য রেভিনিউ বোর্ডের মঞ্জুরিমতে "ভদ্রলোক ল্যাণ্ড সেটেল্‌মেণ্ট স্কীম" বা ভদ্রলোকদের সহিত জমি বন্দোবস্ত-বিষয়ক প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইল। ভদ্রলোকদের মধ্যে বর্ত্তমান বেকার-সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান করা এবং তাহাদিগকে কার্য্যকরী ব্যবসায়ে নিযুক্ত করাই এই স্কীমের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে ৮০০ একর জমি এই জন্য বিলি করার প্রস্তাব হইতেছে। এই প্রস্তাবের সর্ত্তগুলি নিম্নে সকলের অবগতির জন্য দেওয়া হইল।

(১) যাঁহারা কৃষিকার্য্যকে জীবিকাস্বরূপ গ্রহণ করিবেন এবং যাঁহাদের কৃষিকার্য্য-সম্বন্ধে কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা আছে, এইরূপ বেকার দরিদ্র অভাবগ্রস্ত শিক্ষিত যুবক ভদ্রলোক জমি বন্দোবস্ত পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। প্রত্যেক উপযুক্ত প্রার্থী ভদ্রলোককে নির্ব্বাচিত করিয়া ৫০ বিঘা জমি নিম্নলিখিত চুক্তিতে চাষের জন্য দেওয়া যাইবে।

(২) প্রতি বৎসর বর্গা চুক্তিতে ক্রমান্বয়ে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তোষজনকরূপে চাষ-কার্য্য চালাইতে হইবে এবং ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঐ জমিতে নিয়মিত ঘর বাড়ী নির্ম্মাণপূর্ব্বক সপরিবারে স্থায়িভাবে বসতবাস করিতে হইবে। যিনি এইরূপে বসতবাস করিবেন, তাঁহাকে বর্গার ৫ বৎসর অন্তে নয় সনা মিয়াদি সাধারণ রায়তি উপযুক্ত জমায় ও নিয়মিত চুক্তিতে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এই সময় মধ্যে নগদ লাগান, প্রজাপত্তন, হস্তান্তর বা নামান্তর কি বর্গা দিতে ক্ষমতা থাকিবে না। বর্গাচাষ কালীন উৎপন্ন শস্যের ½ অংশ বর্গাদার নিজ লভ্যাস্বরূপ নিবেন, অবশিষ্ট অংশের ½ অংশ গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব ও সেস্ স্বরূপ দিতে হইবে এবং ½ অংশ উক্ত জমির উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি পৃথক্ ফণ্ডে জমা থাকিবে। ঐ ফণ্ড হইতে জিলার কলেক্টারের আদেশ মতে জমির উন্নতিকর কার্য্যের জন্য

বর্গাদারকে কর্জ্জ দাদন করা যাইবে। বর্গাদার চাষবাসের খরচ নিজে বহন করিবেন। গবর্ণমেণ্ট তদুদ্দেশ্যে কোন সাহায্য করিবেন না। উক্ত নয় সনা বন্দোবস্ত অন্তে যদি কোনরূপ বাধা না থাকে ও যদি ইতিমধ্যে কোন চুক্তি ভঙ্গ না হয় তবে উক্ত জমিতে ভদ্রলোক রায়তের দখলীস্বত্ব জন্মিতে দেওয়া হইবে।

(৩) ২নং সর্ত্ত অনুযায়ী বর্গাদার হইতে সাধারণ রায়তিতে পরিবর্ত্তন করা হইলে বন্দোবস্তকারিগণ একটি সমবায় সমিতি গঠন করিবেন। ইহা বাধ্যতামূলক। ইহার উপাবিধি কলেক্টার রচনা করিয়া দিবেন এবং বঙ্গদেশীয় সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট যথাবিধি প্রেরণ করিবেন। খাসমহাল অফিসার বা কলেক্টার নিজ প্রতিনিধিকে এই সমিতির চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৪) যে খণ্ডে জমি দেওয়া হইবে ঐ জমির মধ্যস্থলে নিয়মবদ্ধ ও আদর্শ গ্রাম নির্ম্মাণোদ্দেশ্যে উক্ত বর্গা মিয়াদ মধ্যে পুকুর খনন ও বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইবে। উপরোক্ত সর্ত্তানুযায়ী বসবাসকারিগণকে ব্যবহারের জন্য সাধারণের পানীয় জলের একটি পুকুর খনন করিতে হইবে এবং সে স্থান কলেক্টার নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। বন্দোবস্তকারিগণ বিশৃঙ্খলভাবে বসতবাটী নির্ম্মাণ ও ডোবা ইত্যাদি খনন করতঃ ভিটি উচ্চ করিতে পারিবেন না। বসতবাটী ও ঘর ভিটি নির্ম্মাণের জন্য মৃত্তিকা খনিত পুকুর হইতে নিতে হইবে এবং যে যে স্থানে পুকুর খনন করিতে হইবে তাহা কলেক্টার নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

(৫) ১৫ই ফেব্রুয়ারী দরখাস্ত গ্রহণের শেষ দিন।

২। বঙ্গদেশীয় মহামান্য রেভিনিউ বোর্ডের মঞ্জুরি মতে "কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড সেটেল্‌মেণ্ট স্কীম" বা সমবায় প্রণালীতে জমি বন্দোবস্ত সম্পর্কীয় প্রস্তাব স্থির করা হইল। এই প্রস্তাবানুসারে জমি বন্দোবস্ত পাইতে হইলে নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। অন্যথা দরখাস্তসমূহ সরাসরিভাবে অগ্রাহ্য করা হইবে।

(১) জমিবিহীন অথবা নদী সিকস্তী লোক অথবা যাহারা কৃষিকার্য্য অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই জমিতে বসতবাস করিবেন। তাঁহাদিগকে একটি সমবায় সমিতির সভ্য হইতে হইবে। কলেক্টার সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। ২০জন এইরূপ নির্ব্বাচিত লোক পাওয়া গেলেই একটি অসীম দায়িত্ববিশিষ্ট সমবায় সমিতি রেজেষ্টারী করিয়া নিম্নলিখিত চুক্তিমতে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। খাঁটি চাষী লোকই গ্রহণ করা হইবে।

(২) প্রত্যেক সভ্যকে ৮ একর জমি ৫ বৎসর মিয়াদে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তিস্বত্বে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ঐ জমির খাজানা ঐ মহালের নির্দ্দিষ্ট হারে দিতে হইবে এবং বার্ষিক খাজানার পাঁচ গুণ সেলামী কলেক্টার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কিস্তিমতে দিতে হইবে। প্রত্যেক সভ্যকে ঐ জমিতে স্থায়িভাবে বসতবাস করিতে হইবে। প্রত্যেক সভ্য নিজ দেয় খাজানার ও সেলামীর জন্য দায়ী থাকিবেন। ঐ মিয়াদ অন্তে দখলীস্বত্ব জন্মিতে দেওয়া হইবে।

(৩) ঐ সমিতিকে যুক্তভাবে ৪০ একর জমি ২নং চুক্তির সর্ত্তমতে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এই জমির খাজানা ও সেলামী ২নং সর্ত্তের অনুরূপ হইবে এবং সমিতির সভ্যগণ যুক্ত ও পৃথকভাবে ঐ জন্য দায়ী থাকিবেন। এই জমির লভ্য সমিতির তহবিলভুক্ত হইবে এবং এই তহবিল হইতে সভ্যগণকে কর্জ্জ দেওয়া হইবে। তাহা সভ্যগণের নিজ জমির এবং এই এজমালি জমির উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে। লভ্যের অর্দ্ধেক পুকুরখনন ও সভ্যগণের বন্দোবস্তী জমির উন্নতির নিমিত্ত কর্জ্জ দাদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, অপরার্দ্ধ হইতে একটি পৃথক ফণ্ড হইবে। তাহার লভ্য হইতে সভ্যগণের জন্য ক্রেডিট বা জামিনের তহবিল, বিদ্যালয় স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও তাহার উন্নতিবিধান ও চিকিৎসার সাহায্য ইত্যাদির তহবিল গঠিত হইবে। সমিতি একটি নির্দ্দিষ্ট আকারের পুকুর খনন করিতে বাধ্য থাকিবেন। ডোবা খনন ও এলোমেলো ভাবে বসতবাটী তৈয়ার করিতে সভ্যগণের ক্ষমতা থাকিবে না। পুকুর খনন ও বসতবাটী নির্ম্মাণের স্থান কলেক্টার বা তাঁহার নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। উক্ত মিয়াদ অন্তে জমি হস্তান্তর, নামান্তর কিংবা বর্গা দেওয়া না হইলে বন্দোবস্তকারীর দখলীস্বত্ব জন্মিতে দেওয়া হইবে।

(৪) প্রত্যেক সভ্য নিজেই নিজের ব্যয় বহন করিবেন এবং অন্ততঃ একটি ৫০৲ টাকা মূল্যের অংশ খরিদ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং উক্ত টাকা প্রতি বৎসর ১০৲ টাকা হারে দিবেন এবং ভর্ত্তির ফিস্ ১৲ দিবেন। যে সভ্য সমিতির নিয়মে কার্য্য করিবেন না এবং উপরোক্ত সর্ত্ত মতে কার্য্য করিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হইবেন, সমিতি হইতে তাঁহার নাম কর্ত্তন করার ও তাঁহার পৃথক বন্দোবস্তী জমি হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়ার ক্ষমতা কলেক্টারের থাকিবে। উৎপন্ন শস্যদ্বারা সমিতির অংশের মূল্য, ভর্ত্তির ফিস্ এবং চাঁদা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৫) ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক লোক সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন না এবং জমি বন্দোবস্ত পাইবেন না।

(৬) সমিতি নিজ জমি বর্গা ও চাকরাণ-স্বত্ব ছাড়া অন্য কোন মতে পত্তন কি নামান্তর বা রূপান্তর করিতে পারিবেন না।

(৭) অন্যান্য বিষয় উপবিধিতে লেখা আছে এবং উহা খাস আফিসে পরিদর্শনার্থ পাওয়া যাইবে।

(৮) ১৫ই ফেব্রুয়ারী দরখাস্ত গ্রহণ করিবার শেষ দিন।

এই সম্পর্কে ৬ই ফাল্গুনের দেশের বাণী (নোয়াখালী) লিখিতেছেন :

গত দুই সপ্তাহ যাবৎ দেশের বাণীতে ভদ্রলোকগণের খাসমহালে জমিপ্রাপ্তি বিষয়ে জেলা কলেক্টারের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। লোকসংখ্যার হিসাবে জমি বন্দোবস্ত না দেওয়ার অনুরোধ করা ব্যতীত এ সম্বন্ধে আমরা আর কোনও প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করি নাই। দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ চলিয়া গিয়াছে। হয়ত বা অসংখ্য ভদ্রলোক প্রদত্ত সর্ত্তের উপর নির্ভর করিয়াই জমির জন্য দরখাস্তও করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সর্ত্তগুলির যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

লোক-সংখ্যার অনুপাতে জমি বন্দোবস্ত না দেওয়ার অনুরোধ এই জন্য করি যে, বিজ্ঞাপনেই বলা হইয়াছে, শিক্ষিত, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ভদ্রলোকের বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য এই বন্দোবস্ত। কাজেই শিক্ষা ও জীবন-যাপনের প্রণালীর উপরই এই বন্দোবস্তের বিচার নির্ভর করিবে—লোকসংখ্যার উপর নহে।

জমি বন্দোবস্তের প্রথম সর্ত্ত, "প্রতি বৎসর বর্গা চুক্তিতে ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তোষজনকরূপে চাষ-কার্য্য চালাইতে হইবে এবং ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঐ জমিতে নিয়মিত ঘরবাড়ী নির্ম্মাণপূর্ব্বক সপরিবারে স্থায়িভাবে বসতবাস করিতে হইবে"—এই সর্ত্তটী বাস্তবিক পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব। এই সর্ত্তের অন্তরালে আদর্শ গ্রাম বা আদর্শ উপনিবেশ স্থাপনের সুখকল্পনা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা সম্ভবপর কিনা তাহা একবারও ভাবিয়া দেখা হয় নাই। যে ভদ্রলোক জমি গ্রহণ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের মত জীবন-যাপন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই জমি গ্রহণ করিবেন। চরের মধ্যে নূতন জায়গায়—যেখানে পানীয় জল নাই, হাট বাজার নাই, ধোপা নাপিত, ডাক্তার কবিরাজ, মক্তব পাঠশালা নাই, সেখানে একজন ভদ্রলোক কি করিয়া "সপরিবারে স্থায়ী ভাবে বসতবাস" করিতে রাজী হইতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

তদুপরি, যে ভদ্রলোক জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করিবেন, তাঁহার পঞ্চাশ বিঘা জমির চাষ আবাদ, 'সপরিবারে স্থায়িভাবে বসত বাস করা' প্রভৃতির বাবদ প্রাথমিক ব্যয়-স্বরূপ অন্ততঃ পক্ষে এক সহস্র মুদ্রা হাতে করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। এক সহস্র মুদ্রা 'দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও বেকার শিক্ষিত' ভদ্রলোকের পক্ষে সাধারণ কথা নয়—ইহা কি কর্ত্তৃপক্ষ একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই?

এই অসম্ভব রকমের খরচ করিয়াও জমিতে যদি কোনওরূপ স্বত্ব থাকিত তাহা হইলেও বন্দোবস্তকারীর মনে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইতে পারিত। প্রথম চতুর্দ্দশ বৎসর বন্দোবস্তকারীকে সুবোধ বালকের মত সরকারের সমস্ত সর্ত্তগুলি নির্ব্বিবাদে মানিয়া চলিতে হইবে এবং পাঁচ বৎসর বর্গা চুক্তিতে ও নয় বৎসর মিয়াদি চুক্তিতে চাষ আবাদ করিয়া "যদি কোনওরূপ বাধা না থাকে, ও যদি ইতিমধ্যে কোনওরূপ চুক্তিভঙ্গ না হয় তবে উক্ত

জমিতে ভদ্রলোক রায়তের দখলীস্বত্ব জমিতে দেওয়া হইবে।”

কিসের আশায়, কোন লোভে শিক্ষিত, দরিদ্র ও বেকার ভদ্রলোক এই জমির বন্দোবস্ত লইবেন? প্রাথমিক প্রায় সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া, বৎসর বৎসর মাত্র চারি পাঁচ শত টাকা আয় করিয়া এবং ঐ আয়ের মধ্য হইতেই ‘সপরিবারে স্থায়িভাবে বসতবাস’ করিবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যদিও বা কেহ সরকারের বিজ্ঞাপিত কঠিনতম চুক্তিগুলি অভগ্নভাবে বজায় রাখিতে পারেন, তবুও সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর যাবৎ শিক্ষিত ভদ্রলোক দেখিতে পাইবেন, তিনি পূর্ব্বের ন্যায়ই দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত রহিয়া গিয়াছেন।

নোয়াখালীর বাঁধ

নোয়াখালীর বাঁধ-লইয়া নোয়াখালী-হিতৈষী ও দেশের বাণীতে কিছুকাল ধরিয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। এই বাঁধ-সাহিত্যের কিছু কিছু নিম্নে বিতরণ করা যাইতেছে।

(১) কোন এক কথা পুনঃ পুনঃ বলা সর্ব্বসাধারণের নিকটে বিরক্তিজনক। সুতরাং উহা সর্ব্বথাই পরিত্যজ্য। আবার কোন কোন কথা সাময়িক প্রয়োজন হেতু বারবারও বলা যাইতে পারে। সেই নীতির অনুসরণ করিয়া, আমরাও একটী কথা যদিও বহুকাল হইতে বারবারই বলিয়া আসিতেছি, তথাপি সময়ের অনুরোধে সেই কথাটী আবারও বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

নোয়াখালী একটী ক্ষুদ্র সহর। এক সময়ে ইহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভাবে, রাজকীয়, ব্যবসায়ী ও ধনী লোকদের সৌধমালার রমণীয় শোভায়, ধনধান্যের প্রাচুর্য্যে এবং অত্যুত্তম স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া অতীব গৌরবান্বিত ছিল। আজ আর সে সবের অস্তিত্ব নাই। কীর্ত্তিবিনাশক মেঘনার প্রবল প্রকোপে চিরবিলুপ্ত হইয়া মাত্র স্মৃতিটুকু বর্ত্তমান আছে। খরস্রোতা নদীর কল্যাণে আজ সেই সৌন্দর্য্যরাশি সলিল-সমাহিত হইয়াছে। যখন নদী ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সহরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তখন হইতে আমরা সহর-রক্ষার জন্য বহুবার কর্ত্তৃপক্ষ ও দেশবাসীর নিকট আবেদন নিবেদন করিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই আমাদের সেই আবেদন নিবেদনের কাণাকড়ি মূল্যও ছিল বলিয়া উপলব্ধি করে নাই। কি উপায়ে সহর রক্ষা হইবে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আসন্ন বিপদগ্রস্ত সহরের উদ্ধার হইবে, তৎসম্বন্ধে বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করিয়াছিলাম। যখন বাবু ভায়াদের প্রবল স্বার্থে বিপুল বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন সহরের সমুদয় সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন সরকার পক্ষ ও তথাকথিত বাবুভায়াদের চক্ষু ফুটিল। সহররক্ষার জন্য হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সহর রক্ষাকল্পে এক “সহর-রক্ষা কমিটী”ও স্থাপিত হইল। সরকারী সহযোগিতাও পাওয়া গেল। দেশের এই হিতকামিগণের কল্যাণে নোয়াখালী খালের মধ্যে একটী বিরাট বাঁধ প্রদত্ত হইল। ইহার ফলে বিগতসৌন্দর্য্য ও নষ্টস্বাস্থ্য সহরের রক্ষার সূচনা হইল। বাঁধ দেওয়ার পর হইতে বাঁধের প্রান্ত দেশ হইতে খাল পূরিয়া উঠিতেছিল। ইহাতে সহর রক্ষা হইল বা হইবে বলিয়া সকলেরই চিত্তে আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু চৌমোহনী ও নোয়াখালী সহরের কেহ কেহ অন্তরায় হওয়ায় বাঁধকমিটীর আদেশে ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার জল-নিকাশের জন্যে একটী খাল কাটিয়া দেন। এই বাঁধ দেওয়ার ফলে যে মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। যদিও বর্ষা ও দক্ষিণা বাতাসের প্রাবল্যে সামান্য কিছু ভাঙ্গিতেছিল, তথাপি তাহা তত মারাত্মক ছিল না। বাঁধের কল্যাণে সম্মুখের দিকে সহরের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে নদীর মধ্যে সর্ব্বত্রই স্থানে স্থানে চর পড়িয়াছিল। লোকের মনে অনেক আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল, বাঁধের উপরের দিকের জলরাশি সরাইবার জন্য দুইটী গেট হওয়ার কথা ছিল। একটী হইয়াছিল, তাহা দ্বারা বেশ আবদ্ধ জলরাশি বাহির হইয়া যাইতেছিল। যদি বাঁধের অপর প্রান্ত দিয়াও দ্বিতীয় গেটটী প্রস্তুত করা হইত, তবে আবদ্ধ জল আরও অধিক পরিমাণে বাহির হইতে পারিত। কিন্তু তাহা করিতে কর্ম্মকর্ত্তারা গই গচ্ছি করিয়া বাঁধের সর্ব্বনাশ করিলেন। বাঁধ নষ্ট হইবার ফলে সহরের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণের ভগ্নাবশিষ্ট স্থানসমূহ দ্রুতবেগে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় জনসাধারণের যেরূপ মহা ক্ষতি

হইয়াছে, বাঁধ বাঁধার পূর্ব্বে এমন ক্ষতি কাহারও হয় নাই।

বাঁধ বাঁধার পরে জলরাশি সঞ্চিত হওয়ায় চৌমোহনী ও উত্তরাঞ্চলবাসী লোকদের কি যে এমন ক্ষতি হইতেছিল, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, ও রামগঞ্জ প্রভৃতি থানার সর্ব্ব স্থান জলমগ্ন থাকিত। সেই সময় কি তদঞ্চলের লোকদের কৃষিকার্য্য ও ফসল উৎপন্ন হইত না? তখন ত কাহাকেও মরাকান্না কাঁদিতে শুনা যায় নাই।

এখন (৩রা অগ্রহায়ণ) শীত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, জোয়ারের প্রাবল্য ও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সময় পুনরায় বাঁধের কার্য্য আরম্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয়। খালের নূতন কোন স্থানে বাঁধের বৃথা চেষ্টা না করিয়া পুরাতন বাঁধের ভগ্ন অংশটী বাঁধিবার চেষ্টা করিলে অল্পায়াসে ও অল্প ব্যয়ে কার্য্য সমাধা হইবে বলিয়া আমরা খুব বিশ্বাস করি। নূতন স্থানে বাঁধ বাঁধিবার চেষ্টা করিলে কেবল যে বহু সহস্র টাকার অপব্যয় হইবে এমন নয়, তাহাতে সময়েরও অপব্যবহার হইবে। মাটী ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহের ব্যাপারেও অনেক প্রতিবন্ধক জন্মিতে পারে। অতএব যাহাতে পুরাতন বাঁধটীর ভগ্ন স্থানটী বাঁধিয়া সহর রক্ষার কার্য্য সম্পন্ন করা হয় বাঁধ কমিটী তাহার চেষ্টা করিবেন।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

(২) আমরা জানিতে পারিলাম যে, বাঁধকমিটী শীঘ্রই বাঁধের কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ইহাতে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। কারণ বাঁধের অভাবে বা পূর্ব্ব বাঁধ কাটিয়া দেওয়ার ফলে জনসাধারণের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। বর্ত্তমান বাঁধ নাকি অন্য স্থান দিয়া আরম্ভ করা হইবে। ইহা নাকি অল্প খরচ ও অল্প সময়সাপেক্ষ হইবে। যাহাই হউক আমরা কাজই চাই। যাহাতে বাঁধের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া জনসাধারণ আশু বিপদ হইতে রক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। নূতন স্থান দিয়া বাঁধের কার্য্য সুসম্পন্ন হইলেই মঙ্গল। এ সম্বন্ধে আমরা এখন আর কিছুই বলিতে চাহি না।

এই কার্য্যে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার যোগ্য বটে। এবার বাঁধের কার্য্যকারকগণ বাঁধের কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য "টেণ্ডার কল" করিয়াছেন। এইরূপে বাঁধের কার্য্য যে সুশৃঙ্খলভাবে সুসম্পন্ন হইবে, তাহা মনে হয় না। বাঁধের কর্ম্মীরা টেণ্ডার কল না করিয়া নিজেরা দেখিয়া শুনিয়া কার্য্য করাইতে পারিলে অবশ্য বাঁধের কাজ অনেকটা সুসাধিত হইত। নিজেদের কার্য্য নিজেরা দেখিয়া শুনিয়া না করিয়া কন্ট্রাক্টর দ্বারা করাইতে গেলে অনেক অসুবিধারই কারণ উপস্থিত হইতে পারে। যদি কর্ম্মীদের পক্ষে দেখিয়া শুনিয়া ও খাটিয়া কার্য্য করার অসুবিধা বোধ হয়, তবে কোন উপযুক্ত লোককে আনাইয়া লইলেই সকল দিক্ রক্ষা পাইতে পারে। টেণ্ডার কল করিয়া কাজ করাইতে অনেক সময় লাগিয়া যাইবে। কাজেই বাঁধ সম্পন্ন হইবার পক্ষে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইবার কথা।

আমরা পরম্পর ইহাও শুনিতে পাইলাম যে, বর্ত্তমান বাঁধের কার্য্য এক নূতন ভাবে আরম্ভ হইবে। এই বাঁধ নাকি এখন জলের মধ্যে না বাঁধিয়া চরের উপর দিয়া প্রথমে বাঁধা হইবে। পরে জলের মধ্যে কাজ করা যাইবে। যদি কর্ম্মীরা এই প্লানেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তবে আমরা ন্যায়ের খাতিরে কখনো ইহা সমর্থন করিতে পারি না। কারণ চরের উপর দিয়া বাঁধ বাঁধিতে যদি সংগৃহীত টাকা খরচ হইয়া যায়, তবে জলের (খাড়ির) মধ্যে বাঁধ (সেস্থলে অনেক টাকা ব্যয় হইবার কথা) না ও হইতে পারে। প্রথমে চরের উপর অতিমাত্রায় অর্থব্যয়ের ফলে জলের মধ্যের কার্য্যে টাকার অভাব হওয়া অনিবার্য্য। আমাদের মতে প্রথমতঃ জলময় (খাড়ি) স্থানটুকু বাঁধাই সঙ্গত। কারণ সেস্থলে কিছু অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করিয়াও যদি সেস্থানটুকু বাঁধা যায়, তাহা হইলে চরের উপর দিয়া বাঁধিতে যেমন অল্পায়াসে ও স্বল্পব্যয়ে কার্য্য সম্পন্ন হইবে তেমন লোকেরও উৎসাহ হইবে। টাকা পয়সা আদায়ের পক্ষে তখন আর কোনরূপ বেগ পাইতে হইবে না। কাজও সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে। প্রথমে চরের উপর দিয়া বাঁধিতে গেলে কতকগুলি টাকার অপব্যয় হইবে মাত্র। কিন্তু প্রকৃত বাঁধের কার্য্য কিছুই হইবে না। এমতাবস্থায় আমরা বাঁধের কর্ম্মকর্ত্তাগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, প্রথমে জলের

(খাড়ির) উপর দিয়া বাঁধের কার্য্য চালাইয়া ও তাহা সম্পন্ন করিয়া পরে চরের উপর দিয়া বাঁধ বাঁধিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাও অবগত করাইতেছি যে, এই কার্য্যে কোন অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ লইয়া কাজ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করি। অন্যথা অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইবে ও বাঁধের কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার অসুবিধাই ভোগ করিতে হইবে। এমন কি অর্থ-সংগ্রহ ব্যাপারেও নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। অতএব কর্ম্মকর্তাগণের পূর্ব্বাহ্ণেই অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

(৩) নোয়াখালী খালের বাঁধের কাজ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়াছে। পুরাণ বাঁধের অল্প কিছু দক্ষিণে এই নূতন বাঁধের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায় পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই এই বাঁধ দ্বারা খালের জল চলাচল বন্ধ করা যাইবে। বাঁধটীকে গতবারের ন্যায় মজবুত করিয়া তুলিতে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু বাঁধ কমিটীর তহবিলে তত টাকা নাই। দেশবাসী এই টাকার ব্যবস্থা না করিলে খালের জল চলাচলের পথ বন্ধ হইবে সত্য, কিন্তু বাঁধটী মজবুত হইবে না। জল-নিঃসরণের ব্যবস্থার জন্যও প্রায় ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইবে। এই টাকার বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে গতবারের ন্যায় এই বৎসরও বাঁধটীকে রাখা যাইবে কিনা সন্দেহ।

(দেশের বাণী)

(৪) নোয়াখালী খালে যে নূতন বাঁধের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে সে সংবাদ গত সপ্তাহের দেশের বাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। গতকল্য মঙ্গলবার দিন দেড়টায় বাঁধ 'খিলান' হইয়া গিয়াছে। 'খিলানের' পরও দুইটী জোয়ার অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাঁধের কোনও প্রকার ক্ষতি হয় নাই। বর্ত্তমানে বাঁধের উপর অংশ পনেরো হাত চওড়া, এবং দক্ষিণ দিকের খালের জল হইতে আড়াই হাত উচ্চ হইয়াছে। (দেশের বাণী)

(৫) লোকে কথায় বলে "গরীবের কথা বাসি হইলে পর ফলে।" আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিয়াছিলাম যে, যাহাতে অল্পব্যয়ে ও স্বল্প সময়ে বাঁধের কাজ সুসম্পন্ন হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঁধ-কর্ম্মিগণের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, কর্ম্মিগণ পূর্ব্বাহ্ণে আমাদের কথায় কোনও মূল্যই দেন নাই। আমরা তখন বলিয়াছিলাম যে, পূর্ব্ব বাঁধের যেটুকু স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প খরচে সেই স্থানটুকু বাঁধিয়া ফেলিলে সকল আশঙ্কা দূর হইয়া যাইবে। বাস্তবিক সেভাবে কার্য্য করিলে অল্প দিনের মধ্যেই তাহা শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান বাঁধের কার্য্য এখনও অনেক বাকী রহিয়াছে। যদিও বাঁধটীর খিলান-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তথাপি এই বাঁধকে স্থায়িরূপে রাখিবার জন্য এখনও অনেক মাটী, দীর্ঘ সময় ও বহু সহস্র টাকার প্রয়োজন। সাধারণের প্রদত্ত চাঁদা ও ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ হইতে সংগৃহীত অর্থদ্বারা বাঁধের বর্ত্তমান কার্য্য সমাধা হইয়াছে। বর্ত্তমান বাঁধের দূরত্ব (দৈর্ঘ্য) পূর্ব্ব বাঁধ হইতে অনেক বেশী হইবে। বাঁধের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তাগণ অল্প কতকদূর স্থান অল্প খরচে ও অল্প সময়ে বাঁধিয়া সহর রক্ষার উপযোগী কার্য্য না করিয়া বহু সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ কার্য্যে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া অসমীচীনতাই প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্ব বাঁধের অল্প কতটুকু ভগ্ন স্থান বাঁধাইলে অল্প খরচেই সমাধা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান বাঁধে শুক্না চরের উপর দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত স্থান বাঁধিতে হইবে। তাহাতে অর্থ ও সময় উভয়ই অতিরিক্তভাবে অপব্যয় হইবে বলিয়া মনে করি। সহরের যেটুকু স্থান বাকী আছে, আগামী ফাল্গুন চৈত্র মাস হইতে সেটুকুর অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইবে। কাজেই এই বাঁধকে টিঁকাইয়া রাখিবার জন্য ইহার প্রশস্ততাও যথোপযুক্তভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে। নতুবা কোনরূপেই এই বাঁধ টিঁকিয়া থাকিবে না।

বর্ত্তমান বাঁধের জন্য ডিঃ বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটী আজ পর্য্যন্ত একটী পয়সাও প্রদান করেন নাই। জনসাধারণ ও ইউনিয়ন বোর্ড হইতে যাহা আদায় হইয়াছিল, তাহা দ্বারাই বাঁধের কতক কার্য্য সমাধা হইয়াছে। অর্থাভাবে এখন মাটীর কাজ বন্ধ রহিয়াছে। পূর্ব্ব বাঁধে ডিঃ বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটী যে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা

দ্বারা বাঁধ ও একটী স্লুইজ গেট প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই বাঁধটী কাটিয়া না দিলে আজ সহরের এ পরিণাম হইত না। বর্ত্তমান ডিঃ বোঃ ও মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষগণ কেন যে বাঁধের কার্য্যে সাহায্য-দানে বিরত রহিয়াছেন তাহার কোনই কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।

বোর্ড-কর্ত্তৃপক্ষগণ সত্বর বাঁধের কার্য্য সম্পন্ন না করিলে যাহা বাঁধা হইয়াছে তাহা টিঁকিয়া থাকিবার পক্ষে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কেন না ফাল্গুন মাসে জোয়ারের গতি প্রবলতর হইবে এবং সেই সময়ের পূর্ব্বে বাঁধের কাজ শেষ না হইলে এক ফুৎকারেই বাঁধ উড়িয়া যাইবে। কাজেই অতি সত্বর বাঁধ ও বাকী স্লুইজ গেটের কাজ সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

(৬) ফাল্গুন মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে চৈত্রমাস আগতপ্রায়। জোয়ারের বেগ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু এখনও বাঁধের মাটীর কাজ শেষ হইল না। যদি সত্বর মাটীর কাজ শেষ করা না হয়, তবে বাঁধ টিঁকান দায় হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে যে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করা হইয়াছে, তাহাও বৃথা হইয়া যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে বাঁধের কর্ম্মকর্ত্তাগণের পক্ষে সত্বর বাঁধের কাজে মনোযোগ প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। এই ব্যাপারে করদাতাগণেরও যথেষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বাঁধের চাঁদার জন্য নোয়াখালী জেলা ইয়ংম্যান্স মোস্লেম এসোসিয়েশনের মেম্বরগণ প্রত্যহ বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া বাঁধের চাঁদা আদায় করিতেছেন। তাঁহারা দিনরাত বাঁধের জন্য যে প্রকার খাটিতেছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। মিউনিসিপ্যালিটীর করদাতাগণ উহাদের নিকট চাঁদা প্রদান করিয়া বাঁধের কাজ যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয় তৎপক্ষে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।

লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ড এ ব্যাপারে একেবারে নীরব রহিয়াছেন। ইহা কোনও সমীচীন বলিয়া মনে হইতেছে না। সহর রক্ষা না হইলে তাঁহাদেরও যে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ইহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। আশা করি লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটী সত্বর বাঁধের কার্য্যে উপযুক্তরূপ অর্থসাহায্য করিয়া করদাতাগণের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

স্থানীয় উকীল বার বাঁধের কাজের জন্য ২৫০৲ টাকা চাঁদা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা এজন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ; কিন্তু মোক্তার বার এখনও কিছুই করেন নাই।

(৭) মিউনিসিপ্যালিটীর ১৯৩১।৩২ সনের বাজেটে বাঁধের জন্য কোনও টাকার বরাদ্দ না করায় করদাতাগণ এই কার্য্যে উপযুক্তরূপ টাকার বরাদ্দ করার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর বাজেটের বিরুদ্ধে অনেকগুলি লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়াছিল। ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বিগত ৬ই মার্চ্চ মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় করদাতাগণের আপত্তিমূলক দরখাস্ত আলোচিত হয়। ফলে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ বাঁধের জন্য কিছু টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(৮) বর্ত্তমানে বাঁধের মাটীর কার্য্য ধীর ও মন্থর গতিতে চলিতেছে। মাত্র ১০।১২ জন লোকই এখন মাটীর কার্য্য করিতেছে। মাটীর কাজ শীঘ্র সম্পন্ন হওয়ার পক্ষে ইহা কখনো যথেষ্ট নহে। এই কার্য্যে আরও অধিক লোকের প্রয়োজন। বাঁধের প্রশস্ততাও সন্তোষজনকভাবে বর্দ্ধিত হয় নাই। প্রশস্ততা বৃদ্ধি না করিলে বাঁধ টিঁকিয়া থাকার পক্ষে ঘোর সন্দেহ আছে। সুতরাং মাটীর কাজে অধিকসংখ্যক লোক লাগাইয়া অবিলম্বে বাঁধের কার্য্য সম্পন্ন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

স্লুইজ গেটের দুইটী ঢাক্নী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহা মেরামত না করিলে ক্ষতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। নির্দ্দোষভাবে গেটের নষ্ট স্থানগুলি মেরামত হওয়া আবশ্যক মনে করি।

গত বৃহস্পতিবার (২০শে ফাল্গুন) রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকার সময় জোয়ারের প্রাবল্যহেতু বাঁধের স্থানে স্থানে বড় কয়েকটী বুঁদি (ছিদ্র) হইয়া বাঁধটী নষ্ট হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। বাঁধের পার্শ্ববর্ত্তী লোকদের প্রাণপণ চেষ্টায় ঐ সকল ছিদ্র বন্ধ হইয়াছে।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

নোয়াখালীতে রাস্তার দুরবস্থা

(১) নোয়াখালী জেলাটী পূর্ব্ব-বঙ্গের জেলাসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। এই জেলাটী ছোট হইলেও ডিঃ বোর্ডের এলাকাধীন বহু রাস্তাঘাট থাকার ফলে ইহা অন্যান্য জেলার তুলনায় এক সময়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। রাস্তাঘাটের প্রাচুর্য্যহেতু তখন জনসাধারণের নিরাপদে চলাচলের সুবিধা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অবধি ছিল না। কিছুকাল পূর্ব্বে সহর ত দূরের কথা মফঃস্বলের রাস্তাঘাটগুলিও সুন্দর, উচ্চ, প্রশস্ত, সুপরিষ্কৃত, নির্ভয়ে ও অবাধে গমনাগমনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সম্পূর্ণ ভাবে তাহার বিপরীত অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। কেন এইক্ষণ রাস্তাঘাটগুলির শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। জনসাধারণ রীতিমত কর দিয়াও কেন এই সকল রাস্তাঘাট দ্বারা চলাচলের সুখ-সুবিধা উপভোগ করিতে পারিতেছে না, তাহা কে বলিয়া দিবে?

পূর্ব্বে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তখন সহর কিংবা মফঃস্বলের সকল স্থানের রাস্তা-ঘাটই গমনাগমনের উপযোগী উচ্চ এবং প্রশস্ত ছিল। সেই সময় কোন রাস্তা চলাচলের পক্ষে সামান্য বিঘ্নকর হইলেই যথানিয়মে যথাসময়ে তাহা সংস্কৃত ও মেরামত হইত। কিন্তু বেসরকারী চেয়ারম্যানের আমল হইতে এই সকল রাস্তাঘাটের শোচনীয় অবনতির সূচনা দৃষ্ট হইতেছে।

আজকাল মোটরযোগে মফঃস্বলে গমনাগমন ও ভাতার বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছে। ভাতার পরিমাণ ও মোটরের খরচ অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হইয়া বোর্ডের অর্থ অপরিমিত ভাবে ব্যয় হইতেছে বলিয়াই আমাদের অনুমান। এদিকে বোর্ডের অধীন কোন কোন রাজপথ অনেক দিন পর্য্যন্ত মেরামত না হওয়ায় ও বর্ষার জলধারায় রাস্তার উপরিস্থ মাটী ক্রমশঃ ধৌত হওয়ায় রাস্তার উচ্চতা বিনষ্ট হইয়া উহা দুই পার্শ্বস্থ জমির সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। আবার কৃষকগণ রাস্তার পার্শ্বের গড় খন্দক ভরট করিয়া ও রাস্তার পার্শ্বদ্বয় কাটিয়া ছাটিয়া স্বীয় স্বীয় জমির সহিত মিশাইয়া লইয়াছে ও লইতেছে। ইহার ফলে রাস্তার পরিসরও হ্রাস-প্রাপ্ত হইতেছে। মফঃস্বলের রাস্তাসমূহের স্থানে স্থানে যে সকল ভাঙ্গনা আছে, সেই সকল ভাঙ্গনার সকলগুলির উপর দৃঢ় কোন পুলের ব্যবস্থা না হইয়া অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো প্রদান করা হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময় জনসাধারণের শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। এমন কি, অনেক সময় জীবনের আশঙ্কাজনক ঘটনাও ঘটিয়া থাকে।

আজ কয়েক বৎসর হয় দক্ষিণ হাতিয়াতে সাহেবের হাট হইতে চেঙ্গার সীমানা পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। এই রাস্তা বেশ প্রশস্ত ও উচ্চ করিয়াই প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইহার উপর দিয়া অনায়াসে গরুর গাড়ীসমূহ চলাচল করিত। আবার এই রাস্তার স্থানে স্থানে অনেকগুলি কাঠের ও পাকা পুলের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ রাস্তাটীর রীতিমত মেরামত কার্য্য না হওয়ায় রাস্তাটী সম্পূর্ণ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। রাস্তার উপরিস্থ মাটী ধৌত হইয়া গিয়া পার্শ্বদ্বয়ের নাল জমি হইতেও নীচু হইয়া গিয়াছে ও স্থানে স্থানে বিরাট গর্ত্ত হওয়ায় জনসাধারণ ও গরুর গাড়ী প্রভৃতির চলাচলের ভয়ানক অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে। এই রাস্তায় যে সকল কাঠের পুল ছিল, তাহা প্রায় সবই নষ্ট হওয়ায় জনসাধারণের গমনাগমন বিঘ্নজনক হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল ভগ্ন পুলসমূহের যথারীতি মেরামত না হইয়া মাত্র মাঝে মাঝে ২।১ খানা করিয়া কাঠ বসাইয়া দিয়া কোন রকমে লোক-চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার উপর দিয়া গরুর গাড়ী আদৌ চলিতে পারে না। বর্ত্তমানে এই রাস্তায় গরুর গাড়ীর চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

(২) রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের অল্প পূর্ব্বদিকে ভবানীগঞ্জ রোড হইতে বাহির হইয়া একটী রাস্তা মহব্বতপুর, বদরীপুর ও সোনাপুর প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রম পূর্ব্বক উত্তর দিকে দত্তের হাটের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই রাস্তাটী পূর্ব্বাপর লোকাল বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে। এই রাস্তাটী

জনসাধারণের চলাচলের পক্ষে সুবিধাজনকভাবে মেরামত করিবার জন্য বহুবার আবেদন নিবেদন ও আলোচনা করা সত্ত্বেও লোকাল বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইহার প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতেছেন না। এই রাস্তার দুই পার্শ্বেই মিউনিসিপ্যাল বসতি অবস্থিত। জনসাধারণ সেস্ ও মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স উভয়ই প্রদান করিতেছে। অথচ কেহই রাস্তাটী মেরামত করিবার কোনও চেষ্টা করিতেছেন না।

এই রাস্তায় মাঝে মাঝে প্রায় ১৫।২০টী ভাঙ্গ্না আছে। বর্ষার সময় এই রাস্তা দিয়া চলিবার সময় জনসাধারণকে ঐ সকল ভাঙ্গ্না দিয়া হাঁটু ও কোমর পরিমাণ জল ভাঙ্গিয়া চলাচল করিতে হয়। তাহাতে সাধারণকে কি যে অবর্ণনীয় কষ্ট ও লাঞ্ছনা এবং শারীরিক ও আর্থিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা অভুক্তভোগীকে বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। এই রাস্তা দিয়া দিবারাত্রি সব সময়েই শত শত নরনারী চলাচল করে। আফিসের কেরাণী, আম্লা, মোক্তার, স্কুলের বালকবালিকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, মোকর্দ্দমার অর্থী প্রত্যর্থী হাটবাজারের ব্যবসায়ী, দোকানদার, খরিদ্দার, দত্তের হাটের লোকজন, পুলিশের প্রহরিগণ এবং এই রাস্তার দুই পার্শ্বের অধিবাসিগণ ও দূরাগত জনসাধারণ সর্ব্বদাই এই রাস্তা দিয়া চলাচল করে। রাস্তার এরূপ অসুবিধার দরুণ তাহাদিগকে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগিগণ অবশ্য অবগত আছেন। বয়স্থ লোকেরা নিজ নিজ কার্য্যের গুরুত্ব হেতু কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক এ পথে চলিতে বাধ্য হইলেও ছোট ছোট বালকবালিকাগণের কি প্রকার কষ্ট ও দুর্দ্দশা হইয়া থাকে তাহা আর বলিবার নহে। সময়ে রাস্তার ভাঙ্গ্না ও গর্ত্তাদির মধ্যে পড়িয়া তাহাদের প্রাণ-নাশেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বর্ষাকালে দিবাভাগে নানা দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া চলিতে পারিলেও রজনীর গভীর অন্ধকারের ভিতর চলাচল করা দুরূহ ব্যাপার। রাস্তাটীতে একটা বাতিও নাই। বর্ষা চলিয়া গিয়াছে গড় খন্দক সবই শুষ্ক, বৎসরও অতীতপ্রায়, এ সময় রাস্তাটীর প্রতি বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষ দৃষ্টিপাত করুন। এই রাস্তাটীর স্থানে স্থানে কয়েকটা পুলের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

(৩) ডিঃ বোর্ডের রাস্তা হইতে যে একটী ক্ষুদ্র রাস্তা ছমু হাজির দরজা দিয়া পশ্চিমমুখী গিয়া জালিয়াল গ্রামের উত্তরমুখী রাস্তার সহিত মিশিয়াছে, সেই রাস্তাটী খাস মিউনিসিপ্যালিটীর। ইহারও স্থানে স্থানে কয়েকটী ভাঙ্গ্না আছে। তাহারও সত্বর মেরামত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ছমু হাজির বাড়ীর অল্প পশ্চিম দিকের লোকাল বোর্ডের রাস্তার মোড়ে একটি বাতি পূর্ব্বে ছিল; কর্ত্তৃপক্ষ এই স্থানের বাতিটী তুলিয়া লইয়া চলাচলকারী জনসাধারণের অসুবিধার মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার ২।৩ হাত অন্তরেই উত্তর দিকে একটী বিরাট ভাঙ্গ্না। অন্ধকার রাত্রিতে এই স্থান দিয়া চলাচল করা ভয়সঙ্কুল। এই স্থান ও উত্তরমুখী রাস্তার মাঝে মাঝে ৩।৪টী বাতির প্রয়োজন। এই বাতিগুলি অন্ততঃ পক্ষে কেরোসিন তৈলের হইলেও আপাততঃ চলিবে।

(৪) নোয়াখালী টাউন হইতে ডিঃ বোর্ডের যে রাস্তাটী চাপরাশির হাট ও সোনাগাজী বাজার হইয়া বড় ফেণী নদী পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার চৌদ্দ এবং পনের মাইলের মাঝখানে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পরিমিত স্থান নদীসিকস্তী হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে আজ ১০।১২ বৎসর হয় সে স্থানে চর পড়িয়া নদী অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং চর উচ্চ হইয়া আসলী জমির বরাবর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উক্ত রাস্তার উপরোক্ত ভগ্ন স্থানটী পুনঃ বাঁধান হয় নাই। ইহাতে যাতায়াতকারিগণকে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। নোয়াখালী টাউনের পূর্ব্ব দিকে জিলার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত লোক এই রাস্তা দিয়াই যাতায়াত করে। বিশেষতঃ সোনাগাজী ও বামনী থানার অধিকাংশ লোক এই রাস্তা দিয়া নোয়াখালী টাউন, চাপরাশির হাট, সোনাগাজী বাজার ইত্যাদি স্থানে নিত্য যাতায়াত করে। ছোটধলী ও মুছাপুর প্রভৃতি গ্রামবাসিগণ ধান্যাদি ফসল ও অপরাপর দ্রব্যাদি গরুর গাড়ী দ্বারা নিজ নিজ বাড়ীতে ও চাপরাশির হাট, বসুর হাট ইত্যাদি স্থানে আনা নেওয়া করে, কিন্তু রাস্তার উপরোক্ত ভগ্ন স্থানে তাহাদিগকে বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

আশা করি, সত্বর উপরোক্ত স্থানের রাস্তাটুকু পুনর্নির্ম্মিত হইবে।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

(৫) নোয়াখালী টাউন হইতে "ভবানীগঞ্জ" রোড নামে পরিচিত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের যে প্রশস্ত ও উচ্চ রাস্তা সান্তাসীতা ও মুন্সীর হাটের নিকট দিয়া লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল, তাহা ৭।৮ বৎসর হয় সাহেবের হাটের নিকট হইতে মুন্সীর হাট পর্য্যন্ত নদী সিকস্তী হইয়া গিয়াছে। উহা নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল রক্ষার পক্ষে বাঁধস্বরূপ ছিল। সিকস্তী হওয়ার পর হইতে জোয়ারের লোণা জল দ্বারা লোকের কৃষি কাজের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এখন বর্ষাকালে ঘরে জল উঠে ও পুষ্করিণীতে ময়লা ও লোণা জল প্রবেশ করে। ইহাতে লোকের স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। গ্রীষ্মকালে লোকে পানীয় জলের জন্য হাহাকার করে ও বাধ্য হইয়া দূষিত ও লোণা জল পান করিয়া কলেরা ইত্যাদি নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মরিতেছে। যে সমস্ত মধ্যবিত্ত কৃষকের খোরপোষের উপযোগী জায়গাজমি আছে, তাহারাও রীতিমত ফসল না পাওয়ায় দুই বেলা তৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পায় না। ইহাদের অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা বর্ষাকালে সদা-সর্ব্বদা ঐ অঞ্চল হইতে টাউনে যাতায়াত করেন তাঁহারা প্রায়ই গামছা পরিধান করিয়া ও পোষাক পরিচ্ছদ পুটুলী বাঁধিয়া রওয়ানা হন এবং টাউনের নিকটে আসিয়া পোষাক পরিধান করেন। পথের মধ্যে প্রকাণ্ড দেবীপুর খাল, তাহার পরিসর প্রায় ২০০ হাত ও গভীরতা ৮।১০ হাত। ঐ খাল দ্বারা লোণা জল ঢুকিয়া গ্রামবাসীদের ফসল নষ্ট করে ও টাউনের যাত্রীদের যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটায়। এ নিমিত্ত বিগত বৎসর শ্রীযুক্ত নবাব আলী পাইক নামক জনৈক দেশহিতৈষী কর্ম্মী লোকের নিকট হইতে ২।৪ পয়সা হিসাবে ভিক্ষা লইয়া ৪।৫ শত টাকা সংগ্রহ করিয়া ঐ খালে ২৫।৩০ হাত প্রস্থে একটী বাঁধ দিয়া পথিক ও গ্রামবাসীদের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু নোয়াখালীর বাঁধকমিটী ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নোয়াখালী টাউন রক্ষার মানসে হাজার হাজার লোকের কান্নাকাটি উপেক্ষা করতঃ ঐ বাঁধ কাটিয়া দিয়াছেন। অথচ যে চৌমোহনী বা টাউন রক্ষাকারী বাঁধ রক্ষার মানসে ইত্যাকার কার্য্য করিয়াছেন তাহার কোন প্রতীকার হয় নাই। ফলে উভয় বাঁধই কাটা গেল। বাঁধকমিটী বিবেচনা করিতে পারেন নাই যে, সুদূর চৌমোহনীর জল এই খাল দিয়া যাতায়াত করে না। খালটী ৫০।৬০ হাত প্রস্থ করিয়া কাটান হইল সত্য কিন্তু হাজার হাজার লোকের দৈনিক যাতায়াতের কোন বন্দোবস্ত করা হইল না। এমন কি বহু আবেদন ও নিবেদন স্বত্বেও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না।

আমি বহু লোকের নিকট অবগত হইয়াছি এবং নিজেও বিগত বর্ষায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, অনেক মেয়ে ছেলে দুগ্ধপোষ্য শিশু ক্রোড়ে লইয়া এবং লজ্জার মাথায় কুঠারাঘাত করিয়া ঐ বিস্তৃত জলরাশি কষ্টে অতিক্রম করিতেছে। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও লোকাল বোর্ডের এযাবৎ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। সম্প্রতি ইউনিয়ন বোর্ডের আপ্রাণ চেষ্টায় ঐ সমস্ত অঞ্চলের উপর দিয়া অপ্রশস্ত ও স্বল্প উচ্চতাবিশিষ্ট একটী রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে সত্য, কিন্তু তহবিলে উপযুক্তরূপ টাকা না থাকায় জোয়ারের জলকে বাধা দেওয়ার উপযুক্ত রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে না বা দেবীপুর খালে বাঁধ কি পুল দেওয়ার কোন বন্দোবস্ত হইতেছে না। যে সব অঞ্চলের রাস্তা নদী সিকস্তী হইয়াছে তাহার দক্ষিণাংশে বিস্তৃত চর পড়িয়াছে। এখন নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইলে উহা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এমতাবস্থায় উভয় কার্য্যের জন্য লোকাল বোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে গরীব ও নদীপ্রপীড়িত অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোক চিরকৃতার্থ হইবে। নদীর জল বৃদ্ধি হওয়ার সময় নিকটবর্ত্তী। সহসা বাঁধের কার্য্য আরম্ভ না করিলে শেষে আর কাজ হওয়া সম্ভব হইবে না। ইতি ১৪।২।৩১ ইং

শ্রীরোহিণী কুমার ভৌমিক

মাল যাতায়াতের অসুবিধা

বর্ত্তমান সময়ে নোয়াখালী হইতে সন্দীপ ও হাতিয়া যাতায়াতকারী কোন ষ্টীমার বা নিরাপদ যানবাহন না

থাকায় ব্যবসায়ী এবং সহরের ও তত্তৎস্থানের অধিবাসী-দের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। আজকাল সহর হইতে কেহ বরাবর সন্দ্বীপে কোন মাল পাঠাইতে পারে না। ইহাতে সন্দ্বীপের ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকদের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে। অথচ হাতিয়ায় মাল-পত্র পাঠাইতে কোনই অসুবিধা নাই। নোয়াখালী রেল ষ্টেশনে সহর হইতে সোজা সন্দ্বীপে মাল পাঠাইবার কোন বুকিংয়ের বন্দোবস্ত নাই, হাতিয়ার জন্য আছে। যদি কেহ এখান হইতে সন্দ্বীপে মাল পাঠাইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে ভায়া চাঁদপুর দিয়া হাতিয়া পর্য্যন্ত মাল "বুক্" করিয়া পরে হাতিয়ায় ঐ মাল ছাড়াইয়া পুনরায় সন্দ্বীপের জন্য "বুক্" করিতে হইবে। সেরূপ যদি কেহ ভায়া চট্টগ্রাম মাল পাঠাইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে প্রথমতঃ চট্টগ্রামে মাল বুক করিয়া পাঠাইতে হইবে। তৎপর চট্টগ্রামে ঐ মাল ছাড়াইয়া লইয়া পুনরায় "বুক্" করিয়া সন্দ্বীপ পাঠাইতে হইবে। ইহাতে মালপ্রেরক ও ব্যবসায়িগণের কিরূপ ভয়ানক অসুবিধা ও অতিরিক্তমাত্রায় অর্থব্যয় হইয়া থাকে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ ব্যবসায়িগণের পক্ষে ইহা ক্ষতিজনক।

জনসাধারণ যাহাতে নিরাপদে এখান হইতে সন্দ্বীপে সোজাসুজি মালপত্র পাঠাইতে পারে, রেল-কর্তৃপক্ষ অনতি-বিলম্বে তাহার সুব্যবস্থা ও বর্ত্তমান বিধানের পরিবর্ত্তন করুন।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

রেল-যাত্রীর অসুবিধা

(১) আমরা দেখিতেছি যে, বর্ত্তমান নোয়াখালী রেল ষ্টেশনে যে সকল আরোহী অবতরণ করেন, তাহাদের প্ল্যাটফরম হইতে বাহিরে যাওয়ার জন্য দুইটী মাত্র গেট রাখা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী ৩য় শ্রেণী ও ইণ্টার ক্লাসের যাত্রীর জন্য এবং অপরটী স্ত্রীলোক ও ১ম, ২য় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য। ইণ্টার ও ৩য় শ্রেণীর যাত্রীদিগের জন্য একটী মাত্র গেটই যথেষ্ট নহে। দিনের ৭টা ও ১০টার ট্রেণে এত অধিক পরিমাণে যাত্রী হয় যে, তাহাদিগের এক একজন করিয়া একই গেট দিয়া বাহির হইয়া যাইতে অনেক সময়ের আবশ্যক হয়। এই জন্য অনেক যাত্রীকে বাধ্য হইয়া প্ল্যাটফরমে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। আফিস আদালতের ব্যক্তিগণ কে কার আগে বাহির হইয়া আসিবে সে চেষ্টা করিতে গিয়া গেটের সম্মুখে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করিয়া তোলে। ইহার মধ্যে নিরীহ ও ভদ্রশ্রেণীর লোকদিগের কাজের তাড়া থাকিলেও বাধ্য হইয়া অনেক বিলম্বে গেট পার হইতে হয়। আর নোয়াখালীর মত ষ্টেশনে মাত্র দুইজন টিকেট কলেক্টার পর্য্যাপ্ত নহে। এখানে অন্ততঃ আরও দুই একজন টিকেট কলেক্টার আবশ্যক।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

(২) নোয়াখালী ষ্টেশনে যাওয়া ও আসার জন্য মাত্র দুইটি গেট। ট্রেণ আসিলে পূর্ব্বে গেট দুইটী খুলিয়া দিয়া যাত্রিগণের যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইত। বর্ত্তমানে একটী গেট বন্ধ করিয়া রাখা হয়। একটী গেট দিয়াই যাত্রিগণের যাওয়া যে কিরূপ সময়সাপেক্ষ তাহা ভুক্তভোগি-গণই জানেন। বেলা ১১টায় যে ট্রেণখানা আসে তাহাতে মোকর্দ্দমাকারিগণের সংখ্যাই বেশী। ষ্টেশনটী সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। মাত্র একটী গেট দিয়া টিকেট চেক্ করাইয়া বাহির হইতে যাত্রিগণের প্রায় এক ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। তৎপর দুই মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া উকীলের সঙ্গে পরামর্শপূর্ব্বক নিয়মিত সময়ে কাছারীতে হাজিরা দেওয়া তাহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। এমন কি, অনেক সময় মোকর্দ্দমা খারিজ হইয়া যাওয়ায় অনেককে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হয়।

নোয়াখালী ষ্টেশনের জন্য আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে অনেক টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়াই আমরা জানিতাম। কিন্তু নদী ভাঙ্গার অজুহাতে নাকি এতদিন পর্য্যন্ত ষ্টেশনটীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা হয় নাই। রাণিংরুম্, কর্ম্মচারিগণের বাসস্থানাদি যদি নদীতে ভাঙ্গার ভয় থাকা সত্ত্বেও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা হইলে ষ্টেশনটীকে এইরূপ হীন অবস্থায় রাখার যে কি যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতে পারে তাহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছি না। এই ষ্টেশনে ভদ্রলোকগণের কোন বিশ্রামাগার নাই।

রাত্রি দুইটার ট্রেণে কোন বিদেশী ভদ্রলোক নোয়াখালী আসিলে যে কিরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন তাহা বলাই বাহুল্য। শীত ও বর্ষায় বিশ্রামাগার অভাবে স্ত্রীলোক ও ছেলেপিলে লইয়া ভদ্র যাত্রিগণকে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। যাঁহারা রেল কোম্পানীকে এত টাকা দিয়া থাকেন তাঁহাদের প্রতি রেল কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ উদাসীনতা-প্রকাশ অন্যায় বলিয়াই মনে করি।

(দেশের বাণী—নোয়াখালী)

(৩) বিগত ইয়োরোপীয় যুদ্ধের সময় রেলওয়ে এঞ্জিন আদি যুদ্ধে নেওয়ায় চট্টগ্রাম ও লাকসামের মধ্যে যাতায়াত-কারী ১৩ আপ ও ১৪ ডাউন গাড়ী সাময়িকভাবে উঠাইয়া দেওয়া হয়, যুদ্ধাবসানে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ লেখায় ঐ দুইখানা গাড়ীর সময়ে ৭৭নং আপ ও ৮২নং ডাউন গাড়ী প্রবর্ত্তিত করায় ধূম হইতে ফাজিলপুর পর্য্যন্ত ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু মামলাকারী ও ব্যবসায়ী প্রাতে ফেণীতে আসিত এবং ফেণী ও লাকসামের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনসমূহের নিকটবর্ত্তী গ্রামের বহু মামলাকারী ইত্যাদি প্রাতে লাকসাম হইয়া ২০০নং ডাউনে নোয়াখালী ও ২৫নং আপে কুমিল্লা আখাউরা এবং ১০নং ডাউনে চাঁদপুর যাইত। অপরাহ্নে ৯৯নং আপে নোয়াখালী হইতে ৯নং আপে চাঁদপুর হইতে এবং ২৬নং ডাউনে আখাউরা কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান হইতে লাকসাম হইয়া ৮২নং ডাউনে ফিরিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে ও মধ্যরাত্রে চট্টগ্রামে পৌঁছিত। ১৯২৯ সনের ১লা জুন হইতে ঐ সকল গাড়ীর সময় পরিবর্ত্তনে হেতু ফেণী ষ্টেশনের দক্ষিণের লোক প্রাতে ফেণীতে আসিতে না পারায় গুরুতর আপত্তি হইতেছিল। সম্প্রতি ঐ ট্রেণ দুইখানা এবং ফেণী ও লাকসামের মধ্যবর্ত্তী সাটল ট্রেণ উঠাইয়া দেওয়ায় প্রাতে ফেণী আসা ও ফেণী হইতে লাকসাম যাওয়া বন্ধ হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। রেলওয়ে আয়েরও বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, অথচ প্রতিদিন অতিরিক্ত মাল-গাড়ী যাতায়াত করিতেছে; ঐ দুইখানা ট্রেণে প্রতিদিন ৩০।৪০ খানা মালগাড়ী যাতায়াত করিত। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের ১৯২৯ সনের জুনের পূর্ব্বে ৭৭।৮২ ট্রেণ দুইখানার যে টাইম-টেবল ছিল ঐ টাইম-টেব্‌ল মত পুনঃ ঐ দুইখানা গাড়ী অবিলম্বে চলার ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

(দেশের বাণী—নোয়াখালী)

(৪) রাত্রি তিন ঘটিকার সময় একটা ট্রেণ লাকসাম হইতে নোয়াখালী আসে। সেই সময় ষ্টেশনে আলো দানের কোনই ব্যবস্থা নাই। ইহাতে ট্রেণ হইতে নামিবার ও ট্রেণে উঠিবার সময় যাত্রিগণের কত যে অসুবিধা হইয়া থাকে তাহা বলিবার নহে। অন্ধকার রাত্রিতে তো কষ্টের একশেষ হইয়া থাকে।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

রাস্তায় বাতি চাই

নোয়াখালী সহরের দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অনেক বাতি উঠিয়া গিয়াছে। যেখানে বাতি দেওয়া আব-শ্যক ও যেস্থানে অন্ধকার রাত্রিতে চলাচল করিতে জন-সাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভীত সন্ত্রস্ত হইতে হয়, সে সকল স্থানেও বাতি দেওয়া হইতেছে না। এই সকল স্থানে পূর্ব্বে বাতি ছিল, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সকল স্থান হইতে কেন বাতিগুলি উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

মহব্বতপুর গ্রামে ছমদ আলী হাজির বাড়ীর পশ্চিম দিকে তেমাথার উপরে একটী বাতি ছিল। এই স্থানে একটী ভাঙ্গ্‌নাও আছে। ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে এইস্থান দিয়া চলাচল করিতে জনসাধারণকে এত কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় যে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এইস্থানে বিপরীত দিক্ হইতে আগত লোকদিগকে অন্ধকারের মধ্যে পরস্পর ধাক্কা খাইতেও দেখা যায়। কখনও বা ভাঙ্গ্‌না পার হইতে যাইয়া লোকদিগকে ঐ ভাঙ্গ্‌নার জল-কর্দ্দমের মধ্যেও পতিত হইতে দেখা যায়।

আবদুল মজিদ মিঞা প্রেসিডেন্টের বাড়ীর অল্প উত্তর দিকে রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ বৃক্ষাদির জন্য ঐস্থান এমন সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবৃত যে একাকী চলিতে স্বভাবতঃই ভয় হয়, এমন কি দুইদিক্ হইতে আগত লোকদিগের মধ্যে পরস্পর ধাক্কাধাক্কি লাগাও অসম্ভব নহে। এই স্থানেও পূর্ব্বে একটী

বাতি ছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এই স্থান হইতেও বাতিটী উঠাইয়া ফেলিয়াছেন। এই দুই স্থানে দুইটী কেরোসিনের বাতি দিলেও জনসাধারণের অসুবিধা কতকটা দূর হইতে পারে।

ডে-লাইটগুলি ঠিক সময়ে জ্বালান হয় না। কোন কোনটী সারারাত্রিতে আদৌ জ্বালানো হয় না। যেগুলি জ্বালান হয়, সেগুলি অমাবস্যার অগ্র-পশ্চাৎ অন্ধকার রাত্রিতে সন্ধ্যার বহুক্ষণ পরে জ্বালানো হইয়া থাকে। আর তৈল এত কম দেওয়া হয় যে, ডে-লাইট জ্বালাইবার কিছুকাল পরেই অনেকগুলি বাতি নিবিয়া যায়।

পানীয় জলের অভাব

(১) সহরের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অনেকগুলি দীঘি পুষ্করিণী খালের গর্ভে পতিত হইয়াছে। ইহাতে সুপেয় পানীয় জলের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে, জনসাধারণ অপরিস্কৃত জল পান করিয়া নানা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ যদি পানীয় জলের কোন সুব্যবস্থা না করেন তবে জনসাধারণ দূষিত জল পান হেতু নানা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িবে। অতএব কর্ত্তৃপক্ষ সহরের আবশ্যকীয় স্থানসমূহে আরও কয়েকটী ট্যাঙ্ক স্থাপন করতঃ আশু ব্যাধির হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হউন।

মহাম্মদ মিঞা,
ছেলামত উল্লা,
সাং মহব্বতপুর, নোয়াখালী।
(নোয়াখালী-হিতৈষী)

(২) সবেমাত্র ফাল্গুন মাস আরম্ভ হইয়াছে, ইহারই মধ্যে সহর ও সহরতলীর পুষ্করিণীসমূহের জল কমিয়া গিয়া পঙ্কিল ও নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য কীটের আশ্রয়স্থল হইয়া পড়িয়াছে। এই পঙ্কিল ও কীটবহুল জল হইতে উদরাময় আদি নানা সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। জনসাধারণ এই দূষিত জলই স্নান, পান, পাক ও অন্য কাজের জন্য ব্যবহার করিতেছে। নদী ভাঙ্গার ফলে বহু ভাল ভাল জলপূর্ণ পুষ্করিণী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন এই দূষিত জলই সর্ব্বসাধারণের একমাত্র অবলম্বন। মিউনিসিপ্যালিটী ৩।৪টী পানীয় জলের ট্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সহরবাসীর জন্য প্রচুর নহে।

উপরোক্ত ৩।৪টী ট্যাঙ্ক হইতে সহর, সহরতলী ও তদ্ব্যতীত দূরতর স্থানের লোকেরাও পানীয় জল লইয়া গিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে অনেক সময় অতিরিক্ত ভিড় হয় এজন্য আমরা আরও কয়েকটী ট্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলাম। সহরের পশ্চিম প্রান্তে কোনও ট্যাঙ্ক না থাকায় সেদিককার লোকদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সম্পর্কে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং অপেয় দূষিত জলই অনেকে পান ও ব্যবহার করিয়া থাকে।

মেথরপট্টিতে যে ট্যাঙ্কটী আছে, তাহা হিন্দু-মুসলমান সকলেই ব্যবহার করিতে আপত্তি করে।

হিন্দু-মুসলানদিগের জন্য মহব্বতপুর গ্রামে, ষ্টেশনে যাওয়ার রাস্তার যে স্থানে মেথরপট্টি হইতে রাস্তাটী যাইয়া মিলিত হইয়াছে, সেই স্থলে একটী, কালীতারা হাটে একটী এবং কাছারীর পার্শ্বে কোন স্থানে একটি, এই তিনটী ট্যাঙ্ক স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি।

জনসাধারণ যাহাতে দূষিত জল পান ও ব্যবহার করিয়া মৃত্যুকে ডাকিয়া না আনিতে পারে, সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিউন।

জনসাধারণ যাহাতে এ সময়ে পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল ফিট্‌কারী আদি দ্বারা পরিস্কার করিয়া সতত ব্যবহার করে, সেই দিকে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের ও হেল্‌থ কর্ম্মচারিগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পতিত হওয়া আবশ্যক।

লক্ষ্মীপুরে অস্বাস্থ্যকর নিয়ম

দেশের বাণী লিখিতেছেন, লক্ষ্মীপুর ইউনিয়ন বোর্ডে বেলা দশটার সময় প্রত্যেক বাড়ীর মল অপসারণ করা হয়। অবিলম্বে প্রাতে মল-পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা উচিত।

মন্তিয়ারঘোনা ফেরী

নোয়াখালী সহরের বুকের উপর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মন্তিয়ারঘোনা ফেরী। দিবারাত্রি এই ফেরী পার হইয়া বহু লোকের যাতায়াত করিতে হয়। ভাড়া জন প্রতি ৩ পাই নির্দ্দিষ্ট আছে। ভোর ৫টা হইতে রাত্রি অন্ততঃ ১০টা

পর্য্যন্ত এই ফেরীঘাটটা খোলা থাকা বিশেষ আবশ্যক। গত ১৭ই ডিসেম্বর ভোর ৭টার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে এই খেয়াঘাটে যাইয়া দেখি খেয়া নৌকার মত ছৈশূন্য ২।৩ খানা নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে, কিন্তু মাঝি কেহ তথায় নাই। উপরে খেয়া পারের জন্য ৭।৮ জন যাত্রী দাঁড়াইয়া আছে। একটী ছেলে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট ৵০ এক আনা করিয়া পাইলে পার করিয়া দিতে পারে বলিল।

কয়েকজন যাত্রী ঘাটের একটু দক্ষিণে একটী ঘরে—ঐটী নাকি ঘাট-মাঝির ঘর—যাইয়া লোক প্রতি ৯ পাই করিয়া দিতে বলিয়াও তখন পর্য্যন্ত কাহাকেও ঘাট পার করার জন্য রাজি করিতে পারে নাই। প্রত্যেক খেয়া ঘাটের উভয় পার্শ্বে প্লাকার্ড দিয়া খেয়া-পারের সময় ও রেট ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া দেওয়ার নিয়ম আছে, তথাপি নিরক্ষর ও ঠেকা লোকের এভাবে প্রতারিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

সহরের এই খেয়াটী যাহাতে ভোর ২টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ খোলা থাকে—যাহাতে ঘাট-মাঝির খামখেয়ালির দরুণ সর্ব্বসাধারণকে অসুবিধা ভোগ করিতে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। ইতি ১৭।১২।৩০ইং।

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী

(দেশের বাণী—নোয়াখালী)

তালতলা ক্রুস সাহেবের বাজার

পুরাতন আমতলী বাজার নদীতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর বাজারের দোকানদারগণ ক্রুস্ সাহেবের বাজারে আসিয়া স্থায়িভাবে দোকান-পাট সাজাইয়া প্রত্যহ দোকানদারি করিতেছে। বাজারটী স্থায়িভাবে এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই আমরা দেখিতেছি, এ বাজারে নানাবিধ গোলমাল ও অসুবিধা লাগিয়াই আছে। নোয়াখালী সহরের একমাত্র রাস্তাটীর দুইপার্শ্বে দোকান-পাট সাজাইয়া এবং ক্রেতাগণকে দোকানের চারিপার্শ্বে জড় হইতে দিয়া বিক্রেতাগণ পথচারী জনসাধারণের অসুবিধা সৃজন করিতেছে। সহরের একমাত্র রিজার্ভ দীঘিটীর জল মৎস্যবিক্রেতা, পানবিক্রেতা ও তরকারী বিক্রেতারা প্রতিনিয়ত কলুষিত করিয়া ফেলিতেছে। চালার পরে চালা উঠিয়া এই বাজারের ক্ষুদ্র স্থানটীকে ছাইয়া ফেলিয়াছে; কেরোসিনের ডিবা-সম্বল বিক্রেতাগণের অসাবধানতায় যে-কোনও সময়ে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া চালাগুলিকে ধ্বংস করিয়া সমগ্র ক্ষুদ্র সহরটীকে গ্রাস করিতে পারে। এই ত সেদিন ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে পাঁচ ছয়জন ব্যবসায়ী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং ঐ অগ্নিকাণ্ড সহরের সকল ব্যবসায়ী ও অধিবাসীকে পথের ভিখারীতে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ভূমির অসচ্ছলতার জন্যই তিন চারি দিন পূর্ব্বেও একবার এই বাজারে দুই পক্ষে মারামারি হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। আমতলী বাজারে বাজারের দক্ষিণস্থ রাস্তার দক্ষিণ অংশে বাজার হইতে দূরে গোমাংস বিক্রী হইত, কিন্তু এই বাজারে তরকারীর দোকানের অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে গো-মাংস বিক্রয় হইতেছে বলিয়া অনেক হিন্দুই ঐ সব দোকান হইতে শাক-সব্জী ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ইহাতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের আফিস কক্ষটী এই বাজারের পঞ্চাশ হাত দূরেও নয়। আগুন লাগিয়া এই আফিসের কাগজপত্র নষ্ট হইয়া গেলে কিরূপ ক্ষতি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

(দেশের বাণী—নোয়াখালী)

বাজার দর

দেশের সর্ব্বত্রই সকল প্রকার দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ধান, চাউল, তৈল, লবণ, মুড়ি, মুড়কি শাক-সব্জী, চিনি, গুড়, ময়দা, আটা, তরিতরকারী ইত্যাদি দ্রব্যমাত্রই অল্প মূল্যে বিক্রী হইতেছে। নোয়াখালী জেলার সহর অপেক্ষা মফঃস্বলে জিনিষপত্র খাদ্য-সামগ্রী আরও সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু নোয়াখালী টাউনে হাট-বাজারে ও দোকানদারদের ঘরে সকল জিনিষই "যথা পূর্ব্বং তথা পরং।" ধান, চাউল, তৈল, লবণ, মরিচ, মসলা ইত্যাদি মফঃস্বল অপেক্ষা সহরে কিছু বেশী মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। বাঙ্গালার সকল জেলাতেই সহর

মফঃস্বল সর্ব্বত্র অল্প মূল্যে ক্রয়বিক্রয় হইতেছে। অন্যত্র ধানের দর ১॥০, ১॥৵০, ১৸০ আনা। কিন্তু এখানে এখনও ধান ২৲ মূল্যে বেচাকেনা হইতেছে। চাউলের মূল্যও তদনুরূপ বা কিছু কম। সরিষার তৈল অন্যত্র প্রতি সের ।৵০ আনা, এখানে ॥৵০ আনা। কেরোসিন অন্যত্র বড় বোতল ৵০, ৵৫ পয়সা, এখানে ৵১০ পয়সা ৵১৫ পয়সা। লবণ সওয়া সের অন্যত্র /০ আনা, /৫ পয়সা, এখানে /১০ পয়সা। মুড়ি অন্যত্র ৵০ আনা ৵৫ পয়সা, এখানে ।০, ।/০ আনা। ঘৃতের মূল্য ২॥০, ৩৲ টাকা—সমভাবেই আছে। দুধের মূল্য ৶০ আনা ।০ আনা ও তদূর্দ্ধে। এই প্রকার সকল জিনিষই নোয়াখালী সহরে অন্যান্য স্থানের তুলনায় অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। যে সকল দোকানদার এইরূপভাবে এই সস্তার দিনেও অধিক মূল্য লইয়া দ্রব্যাদি বেচাকেনা করিতেছে, যদি দেশের জনসাধারণ ক্রেতৃবৃন্দ সমবেতভাবে ও দৃঢ়তার সহিত ঐ সকল দোকানদারের নিকট হইতে সওদা লওয়া বা কেনাবেচা বন্ধ করিয়া দেয়, তবে অবশ্য ঠেকিয়া শিখিয়া দোকানদারগণ পথে আসিতে পারে। জনসাধারণের পক্ষে এদিকে মনোযোগ প্রদান করা বিশেষ প্রয়োজন।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

চরের চাষাদের দুর্দ্দশা

প্রায় বৎসর দেড়েক পূর্ব্বে সন্দ্বীপের উত্তর খণ্ডে ব্রাহ্মণী নদীর তীরবর্ত্তী চরবদু ও চরলক্ষ্মী মৌজার নূতন পয়স্থি জমি, যাহাদের জমি নদী সিকস্তী হইয়াছে সেরূপ দরিদ্র প্রজার নিকট বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল। এখনো বর্ষাকালে সেসব জমিতে জোয়ারের সময় ছয় সাত হাত জল উঠে। শীতকালেও জোয়ারের জলে জমিগুলি প্লাবিত করিয়া ফেলে। মোটের উপর, আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, জমিগুলি এখনো চাষ কিংবা বাসস্থান নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ অযোগ্য রহিয়াছে। তা' সত্ত্বেও গত দুই বৎসরের খাজানার জন্য প্রজাদের উপর সার্টিফিকেট জারী হইয়াছে এবং ক্রোকী পরওয়ানাও বাহির করা হইয়াছে। বোধ হয় দরিদ্র, অক্ষম প্রজাদের সম্পত্তি নীলামে উঠিবে। এ বৎসরে চাষীদের—চাষীদের কেন জন-সাধারণেরও টাকা পয়সার যেরূপ অভাব অনুভূত হইতেছে, তাহাতে এইসব দরিদ্র প্রজারা খাজানা দিতে না পারিয়া কিরূপ বিব্রত হইয়া পড়িবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এরূপ অবস্থায় আমরা আশা করি যে পর্য্যন্ত ঐ সব জমিতে ফসল না হয় অর্থাৎ আরও দু'এক বৎসরের জন্য সার্টিফিকেট ও ক্রোকী পরোয়ানা প্রত্যাহার করা হইবে।

(দেশের বাণী—নোয়াখালী)

ফেণী খদ্দর ভাণ্ডার

১৯২৮ সনের আগষ্ট মাসে আমরা (অভয় আশ্রমের দুইজন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী) "খদ্দর ভাণ্ডার" স্থাপন করিয়াছি। এপর্য্যন্ত আমরা প্রায় সত্তর হাজার টাকার খদ্দর উৎপাদন করিয়াছি ও প্রায় (৬৫০০০৲) পঁয়ষট্টি হাজার টাকার খদ্দর বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। সুলভে বিশুদ্ধ খদ্দর বিক্রয় করিতেছি বলিয়াই এত অল্প সময়ের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ টাকার খদ্দর বিক্রয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ফেণীর ভেজাল খাদির হাত হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করিবার জন্য স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী আমাদিগকে 'বিশুদ্ধ খদ্দর উৎপাদন করি' বলিয়া একখানা প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। সেমতে আমরা জিলাবাসী খদ্দর-ব্যবসায়ী ও যাঁহারা খদ্দর ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন জানাইতেছি যে, বর্ত্তমান সময় সূতার দাম কম বিধায় আমরা নিম্নলিখিত দরে খদ্দর বিক্রয় করিতেছি :

মূল্য-তালিকা

				১নং	২নং	৩নং
(১)	৮×৪৪	পাঃ ধূতী	ধোয়া	১৸০	১॥০	১।৵০
(২)	১২×৩৬	একঃ সাদা থান	"	৪৸০	৪।০	৩৸০
(৩)	৬×৫৪	" " চাদর	"	১৸০	১॥০	১।/০
(৪)	৬×৫৪	দোঃ সাদা চাদর	"	২॥০	২।০	১৸৶০

বিনীত
শ্রীবনমালী বসাক
শ্রীকালীপ্রসাদ বসাক
(দেশের বাণী)

সাবানের কারখানা

শ্রীযুক্ত দিবাকর ভৌমিক, বি, এস-সি নগেন্দ্রকুমার চৌধুরী ও সৌরীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ফকিরতলায় নগেন্দ্র বাবুর বাসায় "পূর্ণিমা সোপ্ ওয়ার্কস্" নামে একটী সাবানের কারখানা খুলিয়াছেন। তথায় বর্ত্তমানে কাপড় ধোয়া সাবান প্রস্তুত হইতেছে। ভবিষ্যতে তাঁহারা গায়ে দেওয়ার নানাপ্রকার সাবান প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও করিবেন বলিয়া ভরসা রাখেন। কাপড় ধোয়া সাবান আমরা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। তাহা ঢাকার সাবান অপেক্ষা গুণে ন্যূন নহে। মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম।

(দেশের বাণী—নোয়াখালী)

ফরিদপুরের আর্থিক বার্ত্তা

১। কাউন্সিলে ফরিদপুরের বিষয় আলোচনা

গত আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় কাউন্সিলের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে উহাতে উত্তর ফরিদপুরের অ-মুসলমান কেন্দ্রের প্রতিনিধি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করেন এবং উত্তর প্রাপ্ত হন।

১ম প্রশ্ন। সেচবিভাগের ভার যে মন্ত্রী মহাশয়ের উপরে আছে, তিনি কি জানেন যে, ফরিদপুর জিলার চন্দনা নদী খনন করিবার স্কীম সরকারের হাতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পড়িয়া আছে?

(ক) সে স্কীমের বর্ত্তমান অবস্থা কি?

(খ) সরকার কি উহা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছুক?

উত্তর (মাননীয় স্যর আবদুল করিম গজনভী কর্ত্তৃক)

(ক) স্কীম সম্বন্ধে এখন খোঁজ খবর নেওয়া হইতেছে।

(খ) প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

পুনরায় প্রশ্ন করা হয়—কোন প্রকার কার্য্যপ্রণালী বা প্ল্যান স্থির হইয়াছে কি?

উত্তর—কোন প্ল্যান এখনও তৈয়ারী হয় নাই।

উপরোক্ত প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতে কোন করদাতা ফরিদপুরবাসীর কি মনে হয় যে, কোন দিন চন্দনা নদীর সংস্কার হইবে? যদিই হয়—শীঘ্রই হইবে? অথচ এই চন্দনা নদী শুকাইয়া যাওয়াতে যে কি হইয়াছে তাহা যে না দেখিয়াছে সে বুঝিতে পারিবে না—ভাবিতে পারিবে না। এক কথায় বলিতে গেলে চন্দনা নদী রাজবাড়ী পাংশা অঞ্চলের প্রাণ। চন্দনা শুকাইয়া যাওয়াতে রাজবাড়ী-পাংশা অঞ্চলের প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছে। ঐ নদীটি যাওয়াতে ব্যবসা ত গিয়াছেই, সঙ্গে গিয়াছে ঐ অঞ্চলের স্বাস্থ্য এবং অর্থ।

প্রতি বৎসর যে হাজার হাজার করদাতা ম্যালেরিয়ায়, কলেরায়, বেরীবেরীতে একমাত্র পাংশা ও রাজবাড়ী মহকুমায় মারা যায়, তাহার কারণ কি এই চন্দনা নদীরই দুরবস্থা নয়? কিন্তু এমন হাজার হাজার করদাতার প্রাণস্বরূপ এই নদীটীকে পুনর্জ্জীবিত করিবার স্কীমটী সরকারের হাতে পড়িয়া আছে কত বৎসর ধরিয়া? এখনও তাহার অনুসন্ধানই চলিতেছে! হায়!

আমরা রায় সাহেব অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়কে অনুরোধ করি, তিনি যেন আগামী অধিবেশনে রাজবাড়ী ও পাংশা মহকুমার গত ১০ বৎসরের মৃত্যু সংখ্যার একটি তুলনামূলক তালিকা সরকারের নিকট চাহেন এবং তাহার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পরবর্ত্তী প্রশ্ন সেস অনাদায়ে নীলামী জমীদারির সংখ্যা সম্বন্ধে।

সকলেই জানেন, ফ্রি প্রাইমারী এডুকেশন বিল পাশ হইয়া গিয়াছে। উহার ফলে একটি নূতন কর বসিল, টাকায় /৫ পয়সা। উহা ভিন্ন পূর্ব্বের রোড ও পাবলিক ওয়ার্কস সেস্ ত আছেই। সুতরাং দেশ যাইতেছে, কর নিত্যই বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার ফল কি? রায় সাহেব দেখাইতে চাহিতেছেন যে, উহার ফল বঙ্গীয় জমীদার-মণ্ডলীর ধ্বংস-সাধন। কারণ বেঙ্গল টেনেন্সি এক্টের ১৯২৯এর পরিবর্ত্তনের ফলে প্রজার উপর জমীদার মণ্ডলীর প্রায় সকল জোরেরই অবসান হইয়াছে। ফলে জমীদারের আয় কমিয়া গিয়াছে। ওদিকে প্রজা খাজানা দিক আর না দিক জমীদারকে সেস্ দিতেই হইবে। এই শিক্ষা-করের বেলাও তাহাই। ফলে জমীদার-

মণ্ডলীর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তিনি ইহা সরকারী হিসাব হইতে দেখাইতেছেন।

প্রশ্ন—রাজস্ব বিভাগের ভার যে মন্ত্রী মহাশয়ের উপর, তিনি কি অনুগ্রহ করিয়া গত ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সনে ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কতগুলি জমীদারি পথকর ও পাবলিক ওয়ার্কস্ করের অনাদায়ে নীলাম হইয়াছে তাহার একটি হিসাব দিবেন?

উত্তর—মাননীয় স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয় নিম্ন লিখিত তালিকাটী দেন।

	১৯২৮	১৯২৯
ঢাকা বিভাগ		
ঢাকা	৩০	২৮
ফরিদপুর	২৩	৩৭
ময়মনসিংহ	৬২	৫২
বাখরগঞ্জ	৭	৯
চট্টগ্রাম বিভাগ		
চট্টগ্রাম	৬৭	৭৭
ত্রিপুরা	১১	৮
নোয়াখালী	•	•
রাজসাহী বিভাগ		
রাজসাহী	১	১
দিনাজপুর	৩	২
জলপাইগুড়ি	০	০
রংপুর	০	১
বগুরা	০	২
পাবনা	২	১৩
মালদহ	০	০
সর্ব্বমোট	২০৬	২৩০

সুতরাং ১৯২৮ হইতে ১৯২৯ সনে ২৪টী বেশী জমীদারি নীলামে উঠিয়াছে।

সকল দিক্ দিয়া দেখিলে বাঙ্গালার অধিকাংশ জমীদারই যদি ধ্বংস হন তবে বাঙ্গালীর দুঃখ করিবার বিশেষ কারণ নাই। বাঙ্গালার জমীদারেরা বহুদিন পূর্ব্বে এক সময়ে বাঙ্গালা মায়ের গর্ব্বের বিষয় ছিলেন। কিন্তু সে-দিন তাঁহাদের বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। এখন যাঁহারা আছেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

সে যাহাই হউক, আমরা রায় সাহেবকে অনুরোধ করি, পর পর সেস্ বৃদ্ধির ফলে বাঙ্গালার করদাতা প্রজাদের কতটুকু লাভ হইয়াছে এবং কতটুকু ক্ষতি হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান বাঙ্গালা সরকারের নিকট তিনি যেন লন।

(ফরিদপুর-হিতৈষিণী)

২। রেল ষ্টেশনের অর্থ-কথা

ফরিদপুরের রেল ষ্টেশন স্থায়িভাবে কোথায় হইবে তাহা নিয়া বহু বৎসর যাবৎ নানা জল্পনা কল্পনা হইতেছে। কিছুতেই ইহার সমাধান হইতেছে না। ওদিকে বর্ত্তমানে গোবিন্দপুরে যে ষ্টেশন আছে, তাহারও আবশ্যক মত উন্নতি হইতেছে না। কাহারও কাহারও মত যে সহরের পশ্চিমপ্রান্তে গোয়ালচামট গ্রামে স্থায়ী ষ্টেশন হউক। এক সময়ে যখন ফরিদপুর লাইন বাড়াইয়া ভাঙ্গা দিয়া মাদারীপুর ও কালে বরিশাল পর্য্যন্ত নেওয়ার কথা হইয়াছিল, তখন গোয়ালচামটে ষ্টেশন হওয়ার যে কথা উঠিয়াছিল তাহার সার্থকতা ছিল। কিন্তু এক্ষণে যে প্রকার অবস্থা তাহাতে ফরিদপুর হইতে ভাঙ্গা হইয়া মাদারীপুর পর্য্যন্ত রেলপথ আকাশকুসুমবৎ। এদিকে গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান স্থানে রেল ষ্টেশনটি দীর্ঘকাল ধরিয়া আছে, তথায় অনেক মাড়োয়ারী ও অন্য ব্যবসায়ী বহু অর্থব্যয়ে বড় বড় গুদাম, দোকানঘর প্রভৃতি উঠাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে এবং রেলপথে মাল চালান দিতেছে। ডিঃ বোর্ডও বহু অর্থব্যয়ে সহর হইতে গোবিন্দপুর রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা প্রস্তত করিয়াছে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে সহসা বর্ত্তমান রেল ষ্টেশন উঠিয়া যাওয়ার প্রস্তাবও সমীচীন বোধ হয় না। অথচ বর্ত্তমান রেল লাইন অন্ততঃ সাবেক ষ্টেশন পর্য্যন্ত না নিলে সহরবাসিগণের অনেক অসুবিধা। বিশেষতঃ টেপাখোলার ব্যবসায়িগণের মালপত্র নেওয়ার সুবিধার জন্য পূর্ব্ব রেল ষ্টেশনের নিকটে পুনরায় রেল ষ্টেশন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তা হইলে বর্ত্তমান গোবিন্দপুরের ষ্টেশন উঠিয়া যাওয়ার কোন কারণ

নাই। অনেক সহরে ২।৩টী ষ্টেশনও আছে। গোবিন্দপুরের রেলওয়ে ব্রিজটীর পাশ দিয়া লোক-চলাচলের পথ (ফুটপাথ্) করিয়া দিলে ফরিদপুরের পশ্চিমাঞ্চল-বাসিগণের পক্ষে গোবিন্দপুর রেল ষ্টেশনে যাওয়া সহজ ও অল্প সময়সাপেক্ষ হয়। এককালে গোয়ালন্দ ঘাট ফরিদপুর উঠিয়া আসার কথা হইয়াছিল এবং তজ্জন্য বহু অর্থব্যয়ে জমি সংগৃহীত হইয়া টেপাখোলা পর্য্যন্ত বহু লাইন ও গৃহাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু পার্শ্বস্থ নদী ভরাট হইয়া যাওয়ায় ষ্টিমার চলাচলের সুবিধা হইবে না বলিয়া সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় এবং কয়েক বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত গৃহীত জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন। বর্ত্তমান ফরিদপুরের উত্তর দিকে নদী শুকাইয়া চর পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐ চরের উপর দিয়া বহতা পদ্মানদী পর্য্যন্ত রেল লাইন লইয়া যাওয়া দুষ্কর নহে। বর্ত্তমানে গোয়ালন্দ ঘাটও পরিবর্ত্তনশীল। বর্ষান্তে চরের উপর রেল পাতিয়া নদীর তীর পর্য্যন্ত নেওয়া হয়। বর্ষাকালে ঐ সমস্ত ডুবিয়া গেলে অন্যত্র ষ্টেশন নেওয়া হয়। আমাদের বোধ হয় ফরিদপুর সহরের উত্তরে মিশন হাউসের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটী স্থায়ী ষ্টেশন রাখিয়া চরের উপর দিয়া বহতা পদ্মা নদীর তীর পর্য্যন্ত লাইন নিলে, তথা হইতে মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ সবডিভিসনের অধিবাসিগণের ফরিদপুরে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইবে। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে ঐ সকল অঞ্চলের লোকদের ফরিদপুর আসা এক দুরূহ ব্যাপার। বরং কলিকাতা যাওয়া সুবিধাজনক, কিন্তু ফরিদপুর সহরে আসা মহা মুস্কিল। ফরিদপুর সহর হইতে পদ্মানদীর তীরে ষ্টিমার ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য ডিঃ বোর্ড আদৌ কোন ব্যবস্থা করেন না। যদি একটী পরিষ্কার চলতি পথও করিয়া দেন তাহা হইলে ঘোড়ার ও মোটর গাড়ী অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। যাহা হউক আমাদের প্রস্তাবমত রেল লাইন হইলে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি হইবে।

(ফরিদপুর-হিতৈষিণী)

৩। বাজার-দর

(ক) যতদূর জানা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় এবার হৈমন্তিক ধান্যের ফসল ভালই হইবে। ধানকাটা আরম্ভ হইয়াছে এবং হাজিগঞ্জ হাট প্রভৃতি অঞ্চলে নূতন চাউল ৪।৹ মণ দরে বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। সাধারণ বালাম চাউল ইত্যাদির দর এবার বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এখন নামিয়াছে এবং আশা করা যায় আমন ধান্যের ফসল উঠিলে চাউল ৪৲। ৪॥৹ দরে নামিবে।

ডাল এবার সস্তা। সাধারণতঃ চৈত্র মাসে যখন নূতন ডাল উঠে তখন মসুর ডালের মণ ৫৲ হয় এবং এই সময়ে ৯৲ ১০৲ মণ হয়। এবার যদিও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ৭৲ ৭॥৹ মণ বিকাইয়াছিল কিন্তু শীঘ্রই তাহা নামিয়া এখনও ৫৲ মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। অন্যান্য ডালের দরও অনুরূপ।

(খ) পাটের মূল্য এখনও পূর্ব্বের মতই ২॥৹ ৩৲ টাকা মণ। তবে হেমন্তের ফসল শীঘ্রই পাওয়া যাইবে তাই চাষীদের মধ্যে বিক্রয়ের উৎসাহ খুব নাই।

বালিয়াকান্দী পাটের মণ জলের দরে বিক্রয় হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতি মণ ১৲ হইতে ১॥৹ টাকা পর্য্যন্ত। স্থানে স্থানে ক্রেতার অভাব এবং দাম অসম্ভব কম হওয়ায় কৃষকের দুর্দ্দশা যে চরমে উঠিয়াছে তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

(ফরিদপুর-হিতৈষিণী)

৪। স্বাস্থ্য

(ক) প্রত্যেক বার পাট পচান আরম্ভ হইতে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কলেরা রাক্ষসী গ্রামের পর গ্রাম উৎসন্ন করিতে থাকে। এবার সেরূপ ভীষণ মারীর সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছে নাই। তবে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবের কথা জানা গিয়াছে।

(খ) পোষ্ট আফিসের অস্বাস্থ্যকর বাড়ী

ফরিদপুর পোষ্টাফিসের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে (১) গৃহটীর অভ্যন্তরভাগ অন্ধকার, (২) দেওয়াল মেঝে বই খাতায় বোঝাই, (৩) এইরূপ গৃহে ১৫।২০ জন কর্ম্মচারী দিবারাত্র কাজ করিতেছে।

এ ব্যবস্থা অস্বাস্থ্যকর। বাঙ্গালী কেরাণী হইলেও ইহারা মানুষ। ইহাদের জীবন ইহারা পোষ্টাফিসের জন্য উৎসর্গ করিয়াছে। কিন্তু এরূপভাবে প্রাণে মারিলে ইহাদের নিকট হইতে সরকার কতদিন সার্ভিস পাইবেন? সুতরাং দয়ায় না হউক আপনাদেরই সুবিধার জন্য সরকারের এই কর্ম্মচারীদিগকে স্বাস্থ্যবান্ দেখিতে তৎপর হওয়া উচিত।

৫। মইজদ্দিন বিশ্বাসের খালের বাঁধে বিপদ

আমি কলিকাতায়ই প্রায় থাকি। অল্প কয় দিন হইল বাড়ী আসিয়া নৌকাযোগে নগরকান্দা হইতে ফরিদপুর আসি। গত ৭ই ভাদ্র রাত্রি ৯টায় ফরিদপুরে পৌছি। ফরিদপুরে আসিবার পথে মইজদ্দিন বিশ্বাসের খালে কাফুরা আর বাখুণ্ডা খালে একটী করিয়া বাঁধ দেখিতে পাই। ঐ বাঁধগুলি সমস্ত খাল জোড়া। এদিকে খালে জল অত্যন্ত অল্প, স্রোত অত্যন্ত অধিক। এই অবস্থায় খাল জুড়িয়া বাঁধ থাকিলে সেই খালে নৌকা লইয়া চলা কি বিপজ্জনক তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারিবে না। একটি বাঁধে যখন আমার নৌকা পড়ে তখন আমি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ নৌকায় প্রবল ধাক্কা লাগায় উঠিয়া দেখি মাঝি কিছুতেই নৌকা ঠিক রাখিতে পারিতেছে না। ভয়বিহ্বল চিত্তে মাঝিকে সাহায্য করিতে যাইয়া আমি বিপন্ন হইয়াছিলাম। আরও কয়েকখানি নৌকা দেখিলাম তাহারা বাঁধ পার হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল এবং আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া নৌকা বাঁধ হইতে বাহির করিতে সক্ষম হইতেছিল।

পি, সি, ভৌমিক

(ফরিপুর-হিতৈষিণী)

৬। ষ্টীমার সার্ভিস

(ক) আর, এস, সিংহ ষ্টীমলঞ্চ সার্ভিসের ষ্টীমলঞ্চ "রাণী" প্রায় ৩ মাস যাবৎ চাঁদপুর হইতে সুরেশ্বর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেছিল। জনসাধারণের আগ্রহে গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম হইতে উক্ত দ্রুতগামী লঞ্চখানা চাঁদপুর হইতে ভোর ৫ ঘটিকার সময় ৩নং জেটি হইতে ছাড়িয়া নরসিংহপুর চরকুমারিয়া, কোদালপুর, ভেদরগঞ্জ, রামভদ্রপুর, কার্ত্তিকপুর, ঘড়িসার, সুরেশ্বর হইয়া বেলা ১১টায় নরিয়া পৌছিতেছে এবং দুপুর বেলা ১২টায় নরিয়া হইতে চাঁদপুরগামী যাত্রীসহ ঐ সকল ষ্টেসন হইয়া সন্ধ্যা ৬টায় চাঁদপুর পৌছিতেছে। ষ্টীমলঞ্চ "রাণী" নরিয়াতে মাদারীপুরগামী মেল ষ্টীমারের পূর্ব্বে পৌছায়। চাঁদপুর, কার্ত্তিকপুর প্রভৃতি স্থান হইতে পালং, চিকন্দী, মাদারীপুর প্রভৃতি স্থানে অতি অল্প সময়ে অপেক্ষাকৃত কম খরচে লোকের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। চাঁদপুরগামী যাত্রিগণও তারপার্শী কিংবা বহর হইয়া শীতের রাত্রিতে কষ্ট করিয়া না যাইয়া 'রাণী' লঞ্চে সন্ধ্যার সময়ই চাঁদপুর পৌছিতে পারিবেন। খরচও কম হইবে। এই লঞ্চে মহিলাগণের যাতায়াতেরও সুবিধা আছে। আমরা এই দেশীয় প্রতিষ্ঠানটীর স্থায়িত্ব ও সাফল্য কামনা করি।

(খ) বর্ত্তমানে ভেদরগঞ্জ হইতে মেসার্স আই, জি, এন কোম্পানীর যে ষ্টীমারখানা রামভদ্রপুর, কার্ত্তিকপুর, ঘড়িসার, সুরেশ্বর হইয়া বহর যাতায়াত করিতেছে, উক্ত ষ্টীমার শীঘ্রই বহর হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

(ফরিদপুর-হিতৈষিণী)

৭। মোটর সার্ভিস

(ক) কয়েকদিন হইল রাজবাড়ী হইতে বালিয়াকান্দী পর্য্যন্ত প্রত্যহ মোটর চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এতদঞ্চলের নৌকায় যাতায়াতের পথ বন্ধ থাকায় জনসাধারণ আপন আপন পরিজনাদি সঙ্গে লইয়া যাতায়াত করিতে বিশেষ বেগ পাইতেছিলেন। মোটর সার্ভিস খোলায় জনসাধারণের বিশেষরূপ সুবিধা হইবে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু জেলাবোর্ডের রাস্তার শোচনীয় দুর্গতিবশতঃ যে কোন মুহূর্ত্তেই মোটর-দুর্ঘটনা ঘটিয়া আরোহীদিগের জীবন বিপন্ন হইতে পারে। জেলাবোর্ডের এরূপ ঔদাসীন্যের কথা বহুবার সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু রাস্তার অবস্থা যথাপূর্ব্বম্।

(খ) ফরিদপুর সহর হইতে আজ ২ মাস যাবৎ ভাঙ্গা, বোয়ালমারী, চৌদ্দরশি প্রভৃতি স্থানে নিয়মিতভাবে যাত্রী লইয়া মোটর চলাচল করিতেছে। মোটরের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু ভীড় হ্রাস হইতেছে না। শীঘ্রই একটা মোটর এসোসিয়েশন হওয়ার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

(ফরিদপুর-হিতৈষিণী)

ময়মনসিংহের যৎকিঞ্চিৎ

(১) মজুরদের দুরবস্থা

এতদঞ্চলে মজুরদিগের কার্য্যাভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। যাহারা কাজকর্ম্ম করিতেছে, তাহারা দৈনিক ৵০, ৶০ আনা হিসাবে খাটিতেছে। কিন্তু প্রত্যহ তাহাও জুটে না। একমাত্র অর্থাভাব-হেতুই এরূপ অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। এই মজুর-শ্রেণীর লোকদের দুরবস্থা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। এমত অবস্থায় তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে স্থানীয় মজুরদ্বারা কার্য্য করান উচিত। এ সম্পর্কে আমরা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ও লোকাল বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(২) মৎস্য-সমস্যা

শীতকালে এই জিলার সদর ও মফঃস্বলের অনেক স্থানেই পূর্ব্বকাল হইতে বেশ মাছের আমদানি হইত এবং তাহা বেশ সস্তা দরে বিক্রয় হইত। নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ লাইন হওয়ায়, মোহনগঞ্জ ষ্টেশন হইতে সব মাছ কলিকাতা চালান হইয়া যাইতেছে। তাই এই নগরে এবং মফঃস্বলে এবার মাছের তেমন আমদানি নাই। দুধ ও মাছ বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। দুধ পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছে। এখন মাছেরও অভাব হইতে চলিল। লোক বাঁচিবে কিসে? ইহা নিবারণের কি কোন উপায় নাই? সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ এ জিলার লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা-কল্পে কিছু পরিমাণ মাছ এই জিলার জন্য রাখিয়া বাকী ভিন্ন জিলায় চালান দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলে বোধ হয় এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। ডিষ্ট্রীক্ট হেল্থ অফিসারের এরূপ ক্ষমতা আছে কিনা আমরা জানি না।

স্থানীয় ঢাকেশ্বরী লোন অফিসও কলিকাতা মাছ চালান দেওয়ার ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা কি কিছু মাছ এই নগরের জন্য রাখিয়া দিতে পারেন না?

(৩) বাজার-দর

এবার বোর ধান্যের আবাদ যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে। এতৎ অঞ্চলে বোর ধান্যের আবাদ পূর্ব্বে কখনও এরূপ হয় নাই। কাজেই আশা করা যায় যে, এবার দেশের খাদ্যাভাব হ্রাস পাইবে।

চাউল প্রতি মণ ২৸৵০ হইতে ৩৵০। ডাইল খেসারী ✓০, মসুর ✓৬, মুগ ৵৬ সের। তৈল টাকায় ✓৪ সের ছিল, বর্ত্তমানে ✓৩॥০ সের। দুধ ✓০, ✓৫ সের। ঘৃত ১।৵০ আনা হইতে ১৸০ আনা। অন্যান্য জিনিষও খুব সস্তায় বিক্রয় হইতেছে।

(৪) সেরপুর টাউন

সহরের স্বাস্থ্য আজকাল ভালই আছে।

ভাল আতপ চাউল মণ ৫৲ টাকা, সিদ্ধ চাউল ৩৲ টাকা। গব্য ঘৃত ১॥০ টাকা সের। তরিতরকারীর আমদানি প্রচুর। দুগ্ধ ✓৩ পাই, ✓৬ পাই সের দরে বিক্রয় হইতেছে। দুগ্ধ এত সস্তা বহুদিন হইল দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু পয়সার অভাবে অনেকের কিনিবার উপায় নাই।

(৫) দোকানদারদের জুলুম

(ক) গত ৩রা ৪ঠা অগ্রহায়ণ বৃষ্টি বাদলের দরুণ অধিকাংশ লোকের ঘরে ধান্য থাকা সত্ত্বেও চাউল প্রস্তুত করিতে পারে নাই। কাজেই এই সুযোগে কান্দিউড়া বাজারে দোকানদারগণ চাউলের দাম চড়াইয়া প্রতি খুচি ৸০ আনা ৸৵০ আনা অর্থাৎ প্রতি মণ ৯৲। ১০৲ টাকা বিক্রয় করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে।৶০, ॥০ আনা খুচি বা ৫॥০ টাকা ৬৲ মণ বিক্রয় হইয়াছে। একেই দেশের অর্থাভাব, তদুপরি দোকানদারগণ এইরূপ অত্যাচার করিলে দেশের লোক কিরূপে বাঁচিবে?

(খ) পাটের মূল্য-হ্রাস-হেতু এই জিলার লোকের এরূপ অর্থাভাব হইয়াছে যে, এই কয় মাস মধ্যেই এক প্রকার সব

পাট বিক্রয় করিয়াও অভাব দূর করিতে পারে নাই। এখন নূতন ধান পাকিয়াছে। ধান কাটিয়া ধান ও চাউল ২৲ হইতে ৩॥০ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিয়া অন্যান্য অভাব দূর করিতেছে। ধান বিক্রয় করিয়া ফেলিলে ভবিষ্যতে যে তাহাদের কি অবস্থা হইবে সে বিষয় চিন্তা করারও অবসর পাইতেছে না। দোকানদারগণ অল্পমূল্যে সব চাউল কিনিয়া মজুত করিতেছে। এর পর যখন কৃষকের অন্নাভাব দেখা দিবে তখন তাহারা চাউলের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত তাহাদের শোষণ করিবে। ইহা নিবারণের কি কোন উপায় নাই? দেশের কো-অপারেটিভ ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হইতে এই চাউল অল্প মূল্যে খরিদ করিয়া রাখিয়া পরে নামমাত্র লাভ রাখিয়া কৃষকদের অভাবের সময় বিক্রয় করিলে অনেকটা উপকার হইত।

(৬) মহিলা কৃষিশিল্প-প্রদর্শনী

গত ২৭শে ও ২৮শে অগ্রহায়ণ স্থানীয় সূর্য্যকান্ত টাউন হলে ময়মনসিংহ মহিলা সমিতির উদ্যোগে এক কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। মহিলাদের হস্ত-রোপিত তরি-তরকারী, হস্তনির্ম্মিত নানাবিধ কারুকার্য্য, চরকায় কাটা সূতা, মণিপুরী তাঁতে বুনা তোয়ালে, গামছা, সূচের কাজ, সেমিজ, ব্লাউজ, সার্ট, রুমাল, বিবিধ সুস্বাদু খাবার ইত্যাদি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং মহিলাগণ নিজেরা দোকান সাজাইয়া অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের দ্বারা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সহরের এক প্রান্তে প্রদর্শনী হওয়ায় মহিলাদের অনেকের পক্ষে যাওয়া সম্ভবপর হয় নাই। তবু লোক-সংখ্যা দুই দিনে নিতান্ত কম হয় নাই। প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করিয়া পুরুষদেরও প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছিল। দুই দিনই সন্ধ্যার পর কলিকাতা শিশু ও নারী মঙ্গল সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে শিশু ও নারী মঙ্গল বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই প্রদর্শনীটি এই সময়ে না করিয়া আরও কিছুকাল পরে বড় দিনের ছুটীতে স্থানীয় সিটি-কলেজিয়েট স্কুলে করিলে, সহরের ঠিক কেন্দ্র স্থানে হইত এবং সকলের পক্ষেই বেশ সুবিধাজনক হইত।

৭। রঞ্জন এজেন্সীর বিজ্ঞাপন

দেশের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যা দিন দিন যেরূপ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে তাহাতে প্রত্যেক ধনী ও মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে সহরে কিছু ভূসম্পত্তি ও বাড়ীঘর ক্রয় করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অপর দিকে সর্ব্ব বিষয়েই ব্যয়বৃদ্ধি হেতু ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই সমস্ত ঋণভার লঘু করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে ঋণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। অনেক সময়ে ক্রেতাগণ পছন্দ-মত ও নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী অর্থদ্বারা সহরে বাড়ীঘর ক্রয় করার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন না। ঋণগ্রহীতা-গণও কতকটা ঋণের বিষয় সাধারণ্যে প্রকাশের ভয়ে ও কতকটা সুযোগ-সুবিধার অভাবে অতিরিক্ত সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হন। সোনার জিনিষ রাখিয়াও আমরা খুব অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া থাকি।

ব্যবসা ও বিষয়-কার্য্য উপলক্ষে আমাদের এ জিলার ও অন্যান্য বহু স্থানের বহু ধনাঢ্য ও পদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ হওয়ায় উল্লিখিত উভয়বিধ কার্য্যে সাহায্য করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য। আমরা সামান্য কমিশন লইয়া এই সহরে বাড়ী ইত্যাদি ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া দেওয়ার এবং উপযুক্ত ভূসম্পত্তি জামিন দ্বারা অল্প সুদে ঋণ গ্রহণেচ্ছুগণকে ঋণ সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকি। যাঁহারা এই কার্য্যে আমাদের সাহায্য পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে অথবা সাক্ষাৎ করিলে সকল বিষয় বিস্তৃত-রূপে জানিতে পারিবেন।

দি রঞ্জন এজেন্সী,
"ময়মনসিংহ সমাচার" আফিস

৮। কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত কান্দিউড়া ইউনিয়ন বোর্ড

(১৩৩৬ সালের আয় ও ব্যয়ের হিসাব)

আয়

(১)	বৎসরের মোট ধার্য্য রেট	২৯১৬৵৹
(২)	পূর্ব্ব বৎসরের বাকী ৪১ ধারা মতে জরিমানা সহ মোট আদায়	২৫৬৯৸৹
(৩)	খোঁয়াড় হইতে আদায়	৫৩৲
(৪)	চাঁদা	১৫১।৹
(৫)	ডি, বি গ্রাণ্ট	১২৩৸৹
	...	২,৮৯৭৸৹
(৬)	১৩৩৫ সনের উদ্বৃত্ত	৫৩৯॥৯
		৩,৪৩৭।৯

ব্যয়

(১)	চৌকিদার দফাদারের বেতন		১,৭৩৬॥৵৬
(২)	সরঞ্জাম	...	৪২॥৵৹
(৩)	এষ্টাব্লিশমেণ্ট	...	৪১॥৵৹
(৪)	তহশীল খরচ	...	২৭৫॥৵৹
(৫)	খোঁয়াড় বাবদে	...	৩০৲
(৬)	রাস্তা	...	৮০৲
(৭)	জল	...	৮১৯।৹
(৮)	স্বাস্থ্য	...	৯৵৬
(৯)	স্কুল	...	১০৲
(১০)	বিবিধ	...	৫৮৶৩
			৩,১০৪৲

চট্টগ্রামের দাঙ্গায় ক্ষতি

চট্টগ্রামের বিগত দাঙ্গায় গবর্ণমেণ্ট পক্ষে ৪৭ হাজার ৫ শত টাকার জিনিষ নষ্ট হইয়াছে। ২১ হাজার টাকার বন্দুক ও গোলা বারুদ ৩॥৹ হাজার টাকার কর্ম্মচারীদের রূপার বাসন, ৮ শত টাকার খাকির পোষাক, ১॥৹ হাজার টাকার বাসনপত্র, ৩ হাজার টাকার ঔষধপত্র, ১৫ হাজার ২ শত টাকার তৈজসপত্র নষ্ট হইয়াছে। অস্ত্রাগার পোড়াইয়া দেওয়ায় যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা মেরামত করিতে ২॥৹ হাজার টাকা খরচ লাগিবে।

পঙ্গপালের উপদ্রব

[১]

"বাঙ্গালা ও আসামের নানা স্থান হইতে পঙ্গপালের উপদ্রবের সংবাদ আসিয়াছে। বীরভূম, পাবনা, নদীয়া ও জলপাইগুড়ির উপর দিয়া একদল পঙ্গপাল উড়িয়া গিয়াছে। তাহারা কিছু সময়ের জন্য আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। কুষ্টিয়া হইতেও অনুরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেখানে পঙ্গপাল কোন কোন শস্য-ক্ষেত্রের উপর পড়িয়াছিল। ফলে ফসল বিনষ্ট হইয়াছে। রাজসাহীর সংবাদে প্রকাশ, ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত দিয়া উড়িয়া গিয়াছে। গোদাগারী, তালোর ও নিয়ামতপুরের মাঠের শস্য নাকি পঙ্গপালের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ী হইতে সংবাদ আসিয়াছে, বলজান ও মতিয়াচর নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত মাঠের আমন ধান্য পঙ্গপালের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। আরও নানা স্থানে পঙ্গপালের দল উড়িয়া বেড়াইতেছে। তথাকার বৃদ্ধ অধিবাসীরা বলেন যে, বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে এরূপ পঙ্গপালের উপদ্রব তাঁহারা দেখেন নাই। এরূপ শস্যনাশের সংবাদ বড়ই উদ্বেগজনক।

(নোয়াখালী-হিতৈষী)

[২]

কার্ত্তিক মাসের ১লা তারিখ হইতে নবদ্বীপ সহরেয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে পঙ্গপাল আকাশপথে দেখা দিয়াছে। ৩রা তারিখ রবিবারে উক্ত সহরের উত্তর দিকবর্ত্তী মাঠে ও প্রাচীন মায়াপুরে বেলা ৯টার সময় ঐ পঙ্গপাল ভূমিতে নামিয়া যাবতীয় ফসল ও পাতালতা ভক্ষণ করিয়াছে। মাঠের ঘাসের উপরে ঐ ফড়িং এরূপভাবে বসিয়াছিল, যে দেখিয়া মনে হইয়াছিল হলুদ রঙ্গের একখানা গতরঞ্চ মাঠের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে।

[৩]

চুয়াডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী প্রায় ১৫ মাইল-ব্যাপী স্থানে পঙ্গপালের ঝাঁক বসিয়া শস্য-ক্ষেত্রের ও বৃক্ষলতাদির অনেক ক্ষতি করিয়াছে।

(বঙ্গরত্ন—গোয়াড়ী)

] ৪]

গত ৯ই কার্ত্তিক ৩টার সময় একঝাঁক পঙ্গপাল জয়পুর গ্রামের উপর দিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যাত্রা করে এবং প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী এই বিচিত্র বর্ণের পঙ্গপাল জয়পুর গ্রামের ধান্য ও পাতের (তুঁত) জমির কিছু কিছু ক্ষতি করিয়া অন্যত্র গমন করে। যে গ্রামে ইহাদের রাত্রি হয়, সে গ্রামে অবস্থিতি করে। ফলে বহু পরিমাণ ক্ষতি হয়।

(কান্দী বান্ধব—মুর্শিদাবাদ)
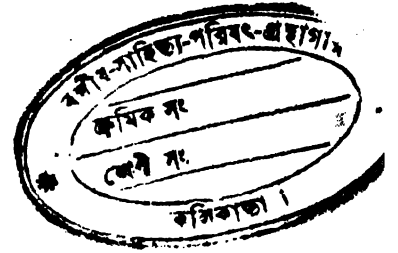
চাষবাসের কথা

গত কার্ত্তিক মাসের আর্থিক উন্নতিতে আখ, তিল, বাদাম ও তুলার প্রথম পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রত্যেক শস্য সম্বন্ধে আভাস বৎসরে ৩।৪ বার করিয়া বাহির হয়। নিম্নে তুলা, আখ এবং চাউলের শেষ পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করা যাইতেছে। তুলা ও আখের এই পূর্ব্বাভাস কার্ত্তিক মাসে প্রকাশিত আভাসের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে বাঙ্গালীর ছেলের মগজে আভাস সম্বন্ধে কিছু ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে।

ভারতীয় তুলার শেষ খবর, (১৯৩০-৩১)

১নং পূর্ব্বাভাসে মাত্র ৭৬·৫% তুলা-আয়তনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ভারতের সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে সংবাদ আসিয়াছে। ভাদুই ও রবি উভয় শস্যেরই বার্ত্তা পাওয়া গিয়াছে। তবে মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদের রবি শস্যের সংবাদ সম্পূর্ণ নয়। সম্পূর্ণ সংবাদ পাইবার জন্য এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। সেই সময়ে এই কয় স্থলের এবং অন্যান্য স্থানেরও সংশোধিত হিসাব প্রকাশিত হইবে।

মোট আয়তন দাঁড়াইতেছে ২,৩৫,৩১,০০০ একর।

গত বৎসরের পরিশোধিত হিসাব ছিল ২,৫১,৭৭,০০০।

অতএব হ্রাসটা ৬%। ১নং পূর্ব্বাভাসেও এই হ্রাস দেখা গিয়াছে।

এবারের অনুমিত ফসল ৪৮,৩৬,০০০ বেল (১ বেল = ৪০০ পা)।

গত বৎসরের শোধিত হিসাব ৪৯,৫৮,০০০ বেল।

২% হ্রাস।

অর্থাৎ আয়তনের পরিমাণ যতটা কম ফসলের পরিমাণ তত কম নয়। অন্য কথায় গত বৎসরের তুলনায় এবার গভীরতর চাষ হইয়াছে।

তুলা উৎপাদনের আয়তনের দিক্ হইতে বোম্বাই প্রথম (২৯·২%), মধ্যপ্রদেশ ও বেরার দ্বিতীয় (১৯·২%), হায়দ্রাবাদ তৃতীয় (১৩·৭%) এবং পাঞ্জাব চতুর্থ (১০·১%)। বস্তুতঃ এই চারি প্রদেশে একত্রে ভারতের ৭০%এর বেশী তুলা আয়তন রহিয়াছে।

গত বৎসরের তুলনায় এবৎসর কতখানি জায়গা জুড়িয়া তুলার ফসল হইয়াছে, কতটা ফসল হইয়াছে আর বিভিন্ন দেশে একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণই বা কি তা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	লক্ষ একর		লক্ষ বেল		একর প্রতি উৎপাদন (পাউণ্ড)	
	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০
বোম্বাই (দেশীয় রাজ্যসুদ্ধ)	৫৯.৯০	৬৫.৮৮	১২.০৫	১০.৯০	৮০	৬৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৪৭.৮৭	৫১.৭৫	১০.৬২	১১.৪৩	৮৯	৮৮
পাঞ্জাব (দেশীয় রাজ্যসুদ্ধ)	২৪.৯১	২৫.৩৬	৭.৬৬	৭.৯৯	১২৩	১২৬
মান্দ্রাজ (ঐ)	২০.৭৫	২৪.৬৭	৪.১৮	৫.১২	৮১	৮৩
যুক্তপ্রদেশ (ঐ)	৮.৪৩	৯.৩২	৩.২১	৩.৪২	১৫২	১৪৭
ব্রহ্মদেশ	৩.৫৮	৩.৩৫	.৮৭	.৬৭	৯৭	৮০
বাঙ্গালা (দেশীয় রাজ্যসুদ্ধ)	.৭৭	.৭৮	.১৯	.২১	৯৯	১০৮
বিহার-উড়িষ্যা	.৬৯	.৬৯	.১৪	.১৩	৮১	৭৫
আসাম	.৪১	.৪৪	.১৫	.১৫	১৪৬	১৩৬
আজমীড়-মারবাড়	.৩১	.৩৪	.১১	.১১	১৪২	১২৯
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	.১৩	.১৭	.০৩	.০৪	৯২	৯৪
দিল্লী	.০৪	.০৩	.০১	.০১	১০০	১৩৩
হায়দ্রাবাদ	৩৫.২৪	৩৫.৩১	৩.৮২	৪.৪৬	৪৩	৫১
মধ্যভারত	১২.৯৬	১৩.৮৮	২.০৬	২.০২	৬৪	৫৮
বড়োদা	৭.৩১	৭.৭১	১.৪০	১.২৭	৭৭	৬৬
গোয়ালিয়র	৬.১৯	৬.৩৩	১.০৩	.৮৯	৬৭	৫৬
রাজপুতানা	৫.১০	৫.০৭	.৭৩	.৬৭	৫৭	৫৩
মহীশূর	.৭২	.৬৯	.১০	.০৯	৫৬	৫২
মোট···	২,৩৫.৩১	২,৫১.৭৭	৪৮.৩৬	৪৯.৫৮	৮২	৭৯

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, উৎপাদন সম্পর্কে বোম্বাই প্রথম, মধ্যপ্রদেশ দ্বিতীয়, পাঞ্জাব তৃতীয়, মান্দ্রাজ চতুর্থ, হায়দ্রাবাদ পঞ্চম এবং যুক্তপ্রদেশ ষষ্ঠ। প্রথম তিনটি দেশকেই বিশেষ করিয়া তূলার দেশ বলা চলে। এই তিনের মধ্যে একর প্রতি উৎপাদনে পাঞ্জাব অন্য দু'য়ের উপর টেক্কা দিয়াছে। হায়দ্রাবাদ আয়তনে মধ্য-প্রদেশের প্রায় ৭০% হইলেও উৎপাদন করে মাত্র ৩০%এর কিছু বেশী। মান্দ্রাজের নীচেই মধ্য-ভারতের আয়তন (৬০%)! কিন্তু উৎপাদন করে ৫০%এর অনেক কম। তূলা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ফলে আয়তন, ফলন ও গড়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলে অনেক তথ্য লাভ করা যাইতে পারে।

কিন্তু আয়তন ও উৎপাদনই ফসল সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। ফসলের গুণাগুণ অর্থাৎ কোন্ দেশে কি ধরণের ফসল উৎপন্ন হয় তাও জানা দরকার। এক দেশ নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রচুর ফসল উৎপন্ন করিতে পারে, অন্য দেশ উৎকৃষ্ট ফসল অল্প উৎপাদন করিতে পারে। দুই দেশকে সে ক্ষেত্রে একভাবে তুলনা করা চলে না। নিম্নের তালিকায় এবৎসর ও গতবৎসর কোন্ শ্রেণীর কত তূলা কতখানি আয়তন জুড়িয়া হইয়াছে তাহা ও একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো যাইতেছে।

তুলার বিবরণ	লাখ একর		লাখ বেল (১ বেল=৪০০পা:)		একর প্রতি উৎপাদন	
	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩১	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০
উম্‌রা—						
থান্দেশ	১২'০৮	১৩'৬২	২'৯১	২'৪৫	৯৬	৭২
মধ্যভারত	১৯'১৫	২০'২১	৩'০৯	২'৯১	৬৫	৫৮
বর্শী ও নগর	২২·৯৮	২৬·২২	২·৬১	৩·৪০	৪৫	৫২
হায়দ্রাবাদ-গাওরাণি	৯·৭০	৯·১৬	১·১৪	১·২৫	৪৭	৫৫
বেরার	৩২·১২	৩৪·৪৩	৭·০৪	৭·৪৮	৮৮	৮৭
মধ্য-প্রদেশ	১৫·৭৫	১৭·৩২	৩·৫৮	৩·৯৫	৯১	৯১
মোট ...	১১১·৭৮	১২০·৯৬	২০'৩৭	২১'৪৪	৭৩	৭১
ঢোলারা—	২০·৯৫	২৪·১৫	৪·৮০	৩·৪০	৮৯	৫৬
বঙ্গ-সিন্ধু—						
যুক্তপ্রদেশ	৮'৪৩	৯'৩২	৩'২১	৩'৪২	১৫২	১৪৭
রাজপুতানা	৫'৪১	৫'৪১	'৮৪	'৭৮	৬২	৫৮
সিন্ধু-পাঞ্জাব	১৮'৮৭	২০'৩৮	৫'৭২	৫'৯৯	১২১	১১৮
অন্যান্য	'৭৫	'৭৬	'১৮	'১৫	৮৫	৭৯
	৩৩'৪৬	৩৫'৮৭	৯'৯৩	১০'৩৪	১১৩	১১৫
আমেরিকান্—						
পাঞ্জাব	৮'৩৬	৮'০৬	২'৭০	২'৪৮	১২৯	১২৩
সিন্ধু	'৬৫	'২২	'১৮	'০৫	১১১	৯১
মোট ...	৯'০১	৮'২৮	২'৮৮	২'৫৩	১২৮	১২২
ব্রোচ	১০'৯৫	১১'৯০	২'৪০	২'৪৩	৮৮	৮২
কুম্‌প্তা-ধারওয়াড়	১৩'৯৯	১৬'২৫	১'৯৮	২'৮০	৫৭	৬৯
পশ্চিমা ও উত্তরা	১৫'৫৬	১৫'০২	১'৬৫	১'৭১	৪২	৪৬
কোকনদ	১'৯৬	২'৩২	'৩৩	'৪২	৬৭	৭২
তিন্নেহ্বেলি	৪'৯২	৬'০২	১'৩৪	১'৬০	১০৯	১০৬
সালেম	১'৮১	২'৩৯	'৩৩	'৪১	৭৩	৬৯
কাম্বোডিয়া	২'৯০	৩'৮৯	১'১২	১'৪৬	১৫৪	১৫০
কুমিল্লা, বার্ম্মা ও অন্যান্য প্রকার	৫'০২	৪'৭২	১'২৩	১'০৪	৯৮	৮৮
সর্ব্ব মোট ...	২,৩৫'৩১	২,৫১'৭৭	৪৮'৩৬	৪৯'৫৮	৮২	৭৯

তুলার আয়তন ও উৎপাদনে বোম্বাইয়ের স্থান সকলের উপরে। বিভিন্ন শ্রেণীর তুলা বোম্বাইতে নিম্ন হারে হইয়াছে :

	একর	বেল
উম্‌রা—		
খান্দেশ	১,২০৮,০০০	২৯১,০০০
বর্শী ও নগর	১৪৬,০০০	১৮,০০০
ঢোলারা	২,১৮২,০০০	৪৩৬,০০০
বাংলা-সিন্ধু—		
সিন্ধু-পাঞ্জাব	২১৫,০০০	৭২,০০০
আমেরিকান্ (সিন্ধু)	৬৫,০০০	১৮,০০০
ব্রোচ—	৫,৭৭,০০০	১৪৪,০০০
কুম্‌প্তা ধারওয়াড়	১৩,৪৫,০০০	১৯২,০০০
পশ্চিমা ও উত্তরা	২,৫২,০০০	৩৪,০০০

বোম্বাইতে ঢোলারা তুলা সব চেয়ে বেশী জন্মিয়াছে—আয়তন মোট আয়তনের ৪০%এর কাছাকাছি, আর ফলন মোট ফলনের ৩০%এর কম। আয়তনে যদিও তারপর কুম্‌প্তা ধারওয়াড়ের স্থান (২৫%এর অনেক বেশী), ফলনে খান্দেশ অনেক উপরে (২৫%এর কিছু উপরে)। কুম্‌প্তা ধারওয়াড়ের ফলন (১৭%) ও খান্দেশের আয়তন (২০%এর কিছু কম)। বস্তুতঃ, বোম্বাইতে ঢোলারা খান্দেশ ও কুম্‌প্তা ধারওয়াড়ই বেশী জন্মিয়া থাকে—মোট আয়তনের ৭৫% ও ফলনের ৮৫% এই তিন প্রকার তুলা বাবদ।

পাঞ্জাবে ৮৩৬,০০০ একর জমিতে ২৭০,০০০ বেল আমেরিকান্ আর ১৬,৫৫,০০০ একরে ৪৯৬,০০০ বেল দেশী (বাংলা-সিন্ধু) জন্মিয়াছে।

	একর	বেল
মান্দ্রাজে—		
তিন্নেহেবেলি	৪৯২,০০০	১৩৪,০০০
সালেম	১৮১,০০০	৩৩,০০০
কাম্বোডিয়া	২৮৬,০০০	১১০,০০০
পশ্চিমা ও উত্তরা	৯৩৮,০০০	১১০,০০০
কোকনদ	১৬০,০০০	২৯,০০০
অন্যান্য	১৮,০০০	২,০০০
বাঙ্গালা দেশে—		
বাংলা-সিন্ধু	৬,০০০	২,০০০
কুমিল্লা	৭১,০০০	১৭,০০০

বাঙ্গালায় যদি বাংলা-সিন্ধু তুলা অনেকগুণ বাড়ান যায় তবেই রক্ষা, নহিলে বোম্বাইয়ের সঙ্গে তুলা-শিল্পে টক্কর দিতে যাওয়া সহজ হইবে না। পাঞ্জাবে অতি উৎকৃষ্ট তুলা জন্মে। বাংলা দেশে কোন অবস্থাতেই আমেরিকান্ তুলা জন্মানো সম্ভবপর কিনা তার পরীক্ষা আজও হয় নাই। বাঙ্গালী রাসায়নিক ও কৃষিবিদ্‌গণ অবিলম্বে এই দিকে মস্তিষ্ক চালনা করুন। মান্দ্রাজী তুলাও ভাল। কিন্তু মান্দ্রাজের কোন তুলাই বাংলায় জন্মে না। বাংলায় শুধু যে কম তুলা জন্মে তা নয়, ভাল তুলাও জন্মে না। ইহা বাংলার দৌর্ব্বল্যের একটী হেতু।

বিভিন্ন প্রদেশের তুলার হিস্যা

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ কত বেল তুলা খরচ করে তা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল [১ বেল = ৪০০পাঃ]।

এই তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাইবে যে, গোটা ভারতের কলে যত তুলা খরচ হয় তার অর্দ্ধেকের বেশী বোম্বাই কলগুলির জন্য দরকার হয়। দেশীয় কোন রাজ্য বাঙ্গালার সমকক্ষ নহে, অর্থাৎ বাঙ্গালার চেয়েও সেগুলির অবস্থা খারাপ। পাঞ্জাবও তথৈব চ। কিন্তু ইহাতে বাঙ্গালার সান্ত্বনার কিছু নাই। সত্য কথা এই যে, বস্ত্র-শিল্পে বাঙ্গালা বড় প্রদেশগুলির ভিতর সব চেয়ে পশ্চাৎপদ। সাদা কথায় ইহার অর্থ এই যে, বাঙ্গালা শিল্প-প্রতিভা, এঞ্জিনিয়ারিং ও রাসায়নিক জ্ঞানের বিকাশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আর্থিক উন্নতির একটা বড় খুঁটা বাঙ্গালার হাতে নাই। উপরে মাত্র ৪ মাসের হিসাব ধরিয়া দিলেও সমস্ত অবস্থাটা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বাঙ্গালা বোম্বাইয়ের এক-দ্বাদশাংশ মাত্র তুলা খরচ করিয়া সমগ্র দেশবাসীকে স্বদেশী বস্ত্র পরাইবে বলিয়া সঙ্কল্প করিলে তা হাস্যকর ব্যাপার হয় মাত্র।

	১৯৩০ সনের ডিসেম্বর মাসে যত খরচ হইয়াছে	১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসে যত খরচ হইয়াছে	১৯৩০ সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত খরচ	১৯২৯ সনের ঐ সময়ে খরচ
	বেল	বেল	বেল	বেল
বোম্বাই সহর	৬৩,৮৩২	৮২,০০৬	২০৩,১৩৭	২৮১,৭৫২
আহমদাবাদ	২৭,৬৬০	৩৩,৬৩৫	১০৭,৬৩৬	১২২,৬৩৯
বোম্বাই প্রেসিডেন্সি	১০৭,৪৩৬	১৬২,৩৯৬	৩৭৩,৩৩৯	৪৭১,৭৮৫
মান্দ্রাজ ,,	১৮,৯৫৬	১৮,৪২১	৭০,৫৩৬	৭১,৭৪৫
যুক্তপ্রদেশ	২২,১১৫	২০,০২৬	৮০,০৭৪	৭৪,৬৭২
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১০,৮০৯	১০,৯৯৪	৪০,১৫৩	৪২,০৬৫
বাংলা দেশ	৮,৩০৬	৮,৯০৬	৩০,৪০৯	৩২,৩০০
পাঞ্জাব ও দিল্লী	৭,৪০৮	৫,৯৭৭	২৫,১১৩	২২,৮৮৭
ভারতের অন্যান্য স্থান	২,৪০৮	২,০৯৯	৮,৮১৩	৭,৬২১
মোট বৃটিশ ভারত···	১৭৭,১৬৮	১৯৮,৮১৯	৬২৮,৪৩৭	৭২৩,০৭৫
দেশী রাজ্যসমূহ				
হায়দ্রাবাদ	১,৯১৪	১,৯০৯	৭,৩৯০	৬,৫৭১
মহীশূর	৩,৬৯৭	৩,৬৮৯	১৪,২৫৪	১৪,৯৭৯
বড়োদা	৫,৩২১	৫,০৯২	২১,১০০	১৭,৯৪৫
গোয়ালিয়র	৩,৯২৮	৩,৫৪৭	১৪,৪৯৬	১৪,০৭৬
ইন্দোর	৭,৫০৫	৬,৯২৮	২৮,৭৫৪	২৭,২০৯
অন্যান্য স্থান	৫,৫৯৯	৫,৫২৪	২৩,২২৭	২০,০৩৫
মোট···	২৭,৯৬৪	২৬,৭২৯	১০৯,২২১	১০০,৮১৫
সর্ব্ব মোট···			৭৩৭,৬৫৮	৮২৩,৮৯০

ভারতীয় প্রদেশসমূহের তূলা আমদানি রপ্তানি

১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে নবেম্বর অবধি ভারতের কোন্ প্রদেশ কত বেল তূলা (১ বেল=৪০০ পাঃ) আমদানি রপ্তানি করিয়াছে তার হিসাব নীচের তালিকায় পাওয়া যাইবে :—

	রপ্তানি		আমদানি	
	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০
	বেল	বেল	বেল	বেল
আসাম	২৪৫	৫	১৮১	১৭১

বাঙ্গালা	১,০৭৭	৬৩১	১১,৩৬০	৯,৮৫১
বিহার-উড়িষ্যা	১,১১৭	১,২৬৫	৪,৮১৫	৩,৯২৪
যুক্তপ্রদেশ	৭৮,৮৮৪	৯৬,৪৮৩	১৫,৪৮২	২০,৫৩৪
পাঞ্জাব	২৩৫,৮৯৫	১৩০,৮২৫	৯,৩০৮	১৩,৪১৫
সিন্ধু ও বৃঃ বেলুচিস্থান	২৮৯	২৭৪	২১৭,৫১০	১২৭,১৯০
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	১১৭,৮০২	১৭৩,৫০৯	৪,১১৬	৪,৫১৯
বোম্বাই প্রেসিঃ	১০,৭৮৯	১১,৬৬৮	২৪৮,৩৩৩	২৯৯,৫০৭
মান্দ্রাজ ,,	৯,২১৮	৯,৫৭১	৪,৬২৪	১৫,৪৪৯
রাজপুতানা	১৭,০৮৩	১৬,০০৯	১,৫৪০	১,২৮৫
মধ্যভারত	৩৪,০৮৩	৩৪,৭৩৪	৫,৯৬৩	১৬,০৯০
হায়দ্রাবাদ	২০,১৬৫	৪২,৭৬৬	...	১০২
মহীশূর	৪২৩	৩,১৬৬	৩,৩১৭	৫,৭৩২
কাশ্মীর	...	...	১৯১	১৬৭
	৫২৬,৭৪০	৫১৭,৯০৬	৫২৬,৭৪০	৫১৭,৯০৬

তিন মাসের হিসাবে পাই যে, ৫ লাখ বেলের কিছু বেশী তূলা ভারতের প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে হাতফের হয়। রপ্তানির মোটা অংশটা যায় পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশ হইতে। তা ছাড়া মধ্যভারত, হায়দ্রাবাদ, রাজপুতানা, মান্দ্রাজ যত তূলা আমদানি করে তার চেয়ে বেশী রপ্তানি করে। অন্য দিকে আমদানিকারক হিসাবে বোম্বাই ও সিন্ধুর স্থান সকলের উপরে—মোট আমদানির ৮৫% ইহারা লয়। ইহার অর্থ স্পষ্ট।

বহির্ব্বাণিজ্যে তূলা

১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩১শে আগষ্ট অবধি কত তূলা বিগত ৫ বৎসর ধরিয়া কোন্ কোন্ দেশে রপ্তানি হইয়াছে তার হিসাব:

লক্ষ বেল (১ বেল=৪০০ পাউণ্ড)

	১৯২৯-৩০	১৯২৮-২৯	১৯২৭-২৮	১৯২৬-২৭	১৯২৫-২৬
যুক্তরাজ্যে	২·৮৬	২·৩৩	২·১৫	·৮৫	১·৫৩
বাকী ইয়োরোপে	১৫·০৫	১৪·২৯	১২·৭৭	৮·৩১	১০·৩৫
চীনে	৫·৫৫	৪·৫৬	২·৬৪	২·৫৬	৫·২১
জাপানে	১৪·০৯	১৭·২২	১৩·২৬	১৫·৮২	১৯·৯৫
অন্যান্য দেশে	১·১৩	·৯৩	·৫৮	·৭৯	·৭১
মোট	৩৮·৬৮	৩৯·৩৩	৩১·৪০	২৮·৩০	৩৭·৭৫

১৯২৫-২৬ সনের তুলনায় ১৯২৬-২৭ সনে বাহিরের রপ্তানি অনেক কমিয়া গিয়াছিল। তারপর বাড়িতে বাড়িতে আবার পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। জাপান ভারতীয় তুলার সব চেয়ে বড় খরিদ্দার। যুক্তরাজ্য আমাদের কাছ থেকে অনেক টাকার তুলা নেয় বটে, কিন্তু গোটা ইয়োরোপে অনেক বেশী তুলা যায়। চীনের বাজারও আশা-প্রদ। ভারতীয় তুলার বাহিরে বেশ টান আছে বুঝা যায়।

১৯৩০ সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩১ সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রপ্তানির অবস্থা ১৯২৯-৩০এর ঐ সময়ের তুলনায় নিম্নরূপ :

	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০
যুক্তরাজ্যে	·৯৬	·৯৯
বাকী ইয়োরোপে	৩·৬২	৫ ২৮
চীনে	২ ৮২	১·১০
জাপানে	৭ ৭৩	৫ ৭৪
অন্যান্য দেশে	·২০	·১৪
মোট	১৫·৩৩	১৩·১৫

আখ চাষের হিসাব (১৯৩০-৩১)

এইরূপ অনুমান যে এ বৎসর ২৭,৭০,০০০ একরে আখ চাষ করা হইয়াছে। গত বৎসর হইয়াছিল ২৫,১৫,০০০ একরে। এ বৎসর ১০% বেশী। এ বার অনুমান ৩১,৭৮,০০০ টন গুড় পাওয়া যাইবে। গত বৎসর পাওয়া গিয়াছিল ২৭,৬১,০০০ টন। এ বৎসরে বৃদ্ধিটা ১৫%। এ বৎসরের ফসলটা ভাল হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ, গত বারের চেয়ে জমি যত বাড়িয়াছে, ফসল তার চেয়ে বেশী বাড়িয়াছে।

বিভিন্ন দেশে ফসলের আয়তন

প্রদেশ ও দেশী-রাজ্য	আয়তন (একর)			হ্রাস (−) বা বৃদ্ধি (+)	
	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০	গত ৫ বৎসরের গড়	গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর%	গত ৫ বৎসরের তুলনায় এ বৎসর%
যুক্তপ্রদেশ (রামপুর সুদ্ধ)	১৪,৮৮,০০০	১৩,৬২,০০০	১৪,৬৩,০০০	+ ৯·৩	+ ১·৭
পাঞ্জাব	৪,২৬,০০০	৩,০৭,০০০	৪,২৭,০০০	+ ৩৮·৮	− ০·২
বিহার-উড়িষ্যা	২,৮৪,০০০	২,৭৯,০০০	২,৯০,০০০	+ ১·৮	− ২·১
বাঙ্গালা দেশ	১,৯৯,০০০	১,৯৮,০০০	২,০৫,০০০	+ ০·৫	− ২·৯
মান্দ্রাজ	১,১২,০০০	১,০০,০০০	১,০৬,০০০	+ ১২·০	+ ৫·৭
বোম্বাই (দেশীয় রাজ্যসুদ্ধ)	৯২,০০০	৯২,০০০	৮৯,০০০	...	+ ৩·৪
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪৭,০০০	৫১,০০০	৪৭,০০০	− ৭·৮	...
আসাম	৩১,০০০	২৯,০০০	৪১,০০০	+ ৬·[illegible]	− ২৪·৪
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২২,০০০	২২,০০০	২৩,০০০	...	− ৪·৩
দিল্লী	৪,০০০	৩,০০০	৬,০০০	+ ৩৩·৩	− ৩৩·৩
হায়দ্রাবাদ	৩৪,০০০	৩৭,০০০	...	− ৮·১	...
মহীশূর	৩৭,০০০	৩৩,০০০	৩৩,০০০	+ ১২·১	+ ১২·১
বড়োদা	১,০০০	২,০০০	২,০০০	− ৫০·০	− ৫০·০
মোট	২৭,৭৭,০০০	২৫,১৫,০০০	২৭,৩২,০০০	+ ১০·৪	+ ০·৪

ফসলের পরিমাণ

প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য	কত গুড় পাওয়া গিয়াছে (টন)			হ্রাস (−) বা বৃদ্ধি (+)	
	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০	গত ৫ বৎসরের গড়	গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর %	গত ৫ বৎসরের তুলনায় এ বৎসর %
যুক্তপ্রদেশ	১৫,৬০,০০০	১৩,১৩,০০০	১৩,৮৭,০০০	+১৮·৮	+১২·৫
পাঞ্জাব	২,৯৬,০০০	২,০৪,০০০	৩,৩০,০০০	+৪৫·১	−১০·৩
বিহার-উড়িষ্যা	৩,০৭,০০০	৩,০৪,০০০	২,৯৯,০০০	+১·০	+২·৭
বাঙ্গালা	২,৪৮,০০০	২,২০,০০০	২,২৪,০০০	+১২·৭	+১০·৭
মান্দ্রাজ	৩,১১,০০০	২,৮৪,০০০	২,৯২,০০০	+৯·৫	+৬·৫
বোম্বাই	২,৪১,০০০	২,৩৩,০০০	২,৪২,০০০	+৩·৪	−০·৪
উ-প-সীমান্ত প্রদেশ	৫৮,০০০	৬৩,০০০	৫৯,০০০	−৭·৯	−১·৭
আসাম	৩০,০০০	২৬,০০০	৩৯,০০০	+১৫·৪	−২৩·১
মধ্য-প্রদেশ ও বেরার	৩৭,০০০	৩৬,০০০	৩২,০০০	+২·৮	+১৫·৬
দিল্লী	২,০০০	৩,০০০	৬,০০০	−৩৩·৩	−৬৬·৭
হায়দ্রাবাদ	৪৯,০০০	৩৯,০০০	...	+২৫·৬	...
মহীশূর	৩৭,০০০	৩৩,০০০	৩০,০০০	+১২·১	+২৩·৩
বড়োদা	২,০০০	৩,০০০	২,০০০	−৩৩·৩	...
মোট	৩১,৭৮,০০০	২৭,৬১,০০০	২৯,৪২,০০০	+১৫·১	+৬·৪

দেখা যাইতেছে, গত বৎসরে আখ চাষ প্রসার লাভ করিয়াছে। সাধারণতঃ একর প্রতি ১ টনের বেশী গুড় পাওয়াই স্বাভাবিক, কোথাও এক টনে গিয়া ঠেকিয়াছে। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে ফসল বাড়িয়াছে, বাঙ্গালাতেও বাড়িয়াছে। কিন্তু যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার-উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা—অর্থাৎ আখ-উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলির মধ্যে বাঙ্গালা দেশ সকলের পশ্চাতে। অথচ অতিরিক্ত পাট-উৎপাদনের কুফল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আখের মত একটা ভাল ফসলের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। সত্য বটে যুক্তপ্রদেশ বাদে অন্য সব প্রদেশ বাঙ্গালার চেয়ে খুব বেশী অগ্রসর নয়, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যুক্ত প্রদেশের সমান অর্থাৎ ১ লাখ টন গুড় বেশী উৎপন্ন হওয়া উচিত। যুক্তপ্রদেশের সহিত পাল্লা দেওয়াটা এখন স্বপ্নের অতীত।

একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আখের আয়তন মান্দ্রাজ বাঙ্গালার চেয়ে বোম্বাইয়ে আরো কম। তথাপি এই প্রদেশ বাঙ্গালার চেয়ে বেশী গুড় উৎপাদন করে। বাঙ্গালায় মোটামুটি একর প্রতি ১২ টন গুড় জন্মে। বোম্বাইয়ে ২¾ টন ও মান্দ্রাজে প্রায় ৩ টন ও যুক্তপ্রদেশে ১ টনের কিছু বেশী হয়।

বাঙ্গালার আয়তন না বাড়াইয়াও যদি মান্দ্রাজের মত উৎপাদন করা যায় তবে প্রায় ৬ লাখ টন (অর্থাৎ এখনকার প্রায় দ্বিগুণ) গুড় উৎপাদন করা অসম্ভব ব্যাপার নাও হইতে পারে। আর তাতে বাঙ্গালার স্থান দ্বিতীয়

হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে কৃষি-বিজ্ঞান-রসায়ন চিন্তাবীরদের চিন্তা করিতে আহ্বান করিতেছি।

গোটা ভারতে যে পরিমাণ জমিতে আখের চাষ হয় তার ৫১% যুক্তপ্রদেশে, ১৪·৮% পাঞ্জাবে, ১০% বিহার-উড়িষ্যায়, ৭·১% বাঙ্গালায়, ৩·৭% মান্দ্রাজে, ৩·১% বোম্বাইয়ে, ১·৬% উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, ১·৪% আসামে, ০·৮% মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে, ০·২% দিল্লীতে, ১·৩% হায়দ্রাবাদে, ১·২/ মহীশূরে, ০·১% বড়োদায়। ১৯২৮-২৯ সন পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের গড়ের উপর এই হিসাব।

চিনি আমদানির হিসাব

আমরা বাহির হইতে প্রচুব চিনি আমদানি করিয়া থা ক। নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে কোন্ দেশ হইতে কত চিনি আমদানি করি।

	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯২৯-৩০ (এপ্রিল-ডিসেম্বর)	১৯৩০-৩১ (এপ্রিল-ডিসেম্বব
পরিষ্কৃত ১৬ ডি এস ও তদুপরি (বীট সুদ্ধ)	টন	টন	টন	টন	টন
যুক্তরাজ্য	৩৬৭	৪,৮০১	৫৯,২৫৭	৪৫,৮৩৪	৮,২৬৬
জাভা	৬৯১,৯৪৪	৮৫০,৭৩২	৭৭৯,৭৩৭	৫৭২,৬৬০	৬১৩,০৩৯
মৌরিশাস্	১	২	...	...	...
জার্ম্মাণি	১,৬৪২	৩১৪	১৫,২৩৪	১৪,৪৩৪	১১,৫৯৯
বেল্‌জিয়াম	৪১০	৩২৪	১,৭৫০	১,৬৪৫	২৫৪
অষ্ট্রিয়া	৩৩৭	...	১,৩৫১	১,১৫১	...
হাঙ্গেরি	২,৩৩৭	২,১০১	৩৬,৪৯৯	২৫,৬৫৪	৪,০৩৪
চেকোশ্লোহ্বাকিয়া	১,০৮৪	৪২১	৯,৭৩১	৯,১৬৮	৩০৯
ষ্ট্রেট্‌স্ সেটল্‌মেণ্টস্	১,২৬২	৮৮১	৬১৮	৫০৭	৩৭১
চীন (হংকং সুদ্ধ)	৩,১০৭	৩০	৬,১৩৭	১,৮৭১	৩,৬১৭
কানাডা	৪০০	৯৯	...	...	...
যুক্তরাষ্ট্র	৫২	১৬	...	...	...
অন্যান্য	১৬,২২০	৮,৭৮১	২৭,৬৪৮	১১,৩৬৭	৫,৯৬৪
মোট ...	৭১৯,১৬৩	৮,৬৮,৫০২	৯৩৭,৬৬২	৬৮৮,২৮১	৬৪৭,৪৫৬
অপরিষ্কৃত					
জাভা	২২৯	৫১	১,৬৭৩	১,০৩৪	৫,৭৫৩
যুক্তরাষ্ট্র	৪০৬	২৩৬	২৪০	১৫৪	১৪৯
অন্যান্য দেশ	৫,৯৯৩[১]	১১	৯	৮	৮৬
মোট	৬,৬২৮	২৯৮	১,৯২২	১,১৯৬	৫,৯৮৮

[১] সমস্তটা কিউবা হইতে

বাদামের চাষ (১৯৩০-৩১)

গোটা ভারতে যত জমিতে বাদামের চাষ হয়, তার ৯২% মান্দ্রাজ, বোম্বাই, ব্রহ্মদেশ ও হায়দ্রাবাদে অবস্থিত। এই সব স্থানের সংবাদ হইতেই বাদাম-চাষের অনুমান করা হইয়াছে। অনুমিত মোট আয়তন ৬২,৪০,০০০ একর; গত বৎসর ছিল ৫৭,৪৮,০০০ একর। সুতরাং বৃদ্ধিটা ৯%। খোসাসুদ্ধ বাদামের পরিমাণ ২৯,৮৮,০০০ টন। গত বৎসর ছিল ২৬,৬৮, ০০০ টন। বৃদ্ধিটা ১২%। অতএব গতবারের চেয়ে এবারকার ফসল ভাল বলা চলে।

কত একর জমিতে কত টন বাদাম শস্য হইয়াছে

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	১৯৩০-৩১	১৯২৯-৩০	গত ৫ বৎসরের গড়	হ্রাস-বৃদ্ধি: গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর	হ্রাস-বৃদ্ধি: গত ৫ বৎসরের তুলনায় এ বৎসর
	একর	একর	একর	%	%
মান্দ্রাজ	৩৭,৪৬,০০০	৩২,০৯,০০০	২৮,৪০,০০০	+৭·৪	+২১·৩
বোম্বাই (দেশীয় রাজ্যসুদ্ধ)	১১,৩৯,০০০	১৩,৪৯,০০০	৯,১২,০০০	+১৪·১	+৬৮·৭
ব্রহ্মদেশ	৫,৬৪,০০০	৫,৭১,০০০	৫,২৫,০০০	–১·২	+৭·৪
হাযদ্রাবাদ	৬,৯১,০০০	৬,১৯,০০০	৩,৫৩,০০০	+১১·৬	+৯৫·৮
মোট ..	৬২,৪০,০০০	৫৭,৪৮,০০০	৪৬,৩০,০০০	+৮·৯	+৩৪·৮
	টন	টন	টন		
মান্দ্রাজ	১৬,৪৫,০০০	১৫,২২,০০০	১৩,৮৪,০০০	+৮·১	+১৮·৯
বোম্বাই (দেশীয় রাজ্যসুদ্ধ)	৯,৯৩,০০০	৮,১১,০০০	৭,২৭,০০০	+২২·৪	+৩৬·৬
ব্রহ্মদেশ	১,৮৫,০০০	১,৯০,০০০	১,৬০,০০০	–২·৬	+১৫·৬
হায়দ্রাবাদ	১,৬৫,০০০	১,৪৫,০০০	৩৬,০০০	+১৩·৮	+৫৮·৩
মোট ..	২৯,৮৮,০০০	২৬,৬৮,০০০	২৩,০৭,০০০	+১২·০	+২৯·৫

কিবা আয়তন, কিবা ফসল, সব দিকেই মান্দ্রাজ প্রথম—সমগ্র ভারতের অর্দ্ধেকের বেশী। বোম্বাই আয়তনের বেলায় মান্দ্রাজের অর্দ্ধেকের চেয়ে কম হইলেও ফসলের বেলায় অর্দ্ধেকের বেশী। অর্থাৎ বোম্বাইয়ে চাষটা বেশী গভীর হয়। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রকৃতপক্ষে বাদামের দেশ—গোটা ভারতে অনুমিত ফসলের ৯০% এই দেশ হইতে পাইবার সম্ভাবনা।

১৯২৮-২৯ সন অবধি ৫ বৎসরের গড় আয়তন প্রদেশ-গুলির পক্ষে এইরূপ: মান্দ্রাজ ৫৭·৭%, বোম্বাই ১৭·৭%, ব্রহ্মদেশ ১০·৭%, হায়দ্রাবাদ ৬·২%।

বিদেশে বাদাম রপ্তানি

আমরা দুনিয়ার বিভিন্ন হাটে বাদাম বিক্রী করিয়া থাকি। তার কিঞ্চিৎ পরিচয় এই :

	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	৯ মাস এপ্রিল—ডিসেম্বর ১৯২৯	৯ মাস এপ্রিল—ডিসেম্বর ১৯৩০
	টন	টন	টন	টন	টন	টন
ফ্রান্সে	১২৫,৪০০	১৫১,২০০	২১৬,১০০	২১০,৯০০	১৩২,৪০০	১০৬,৮০০
জার্ম্মাণিতে	৮৭,৩০০	২১৮,৩০০	২৪১,২০০	২১০,১০০	১৫১,৪০০	৭৯,৭০০
নেদারল্যাণ্ডসে	৭৬,৭০০	১১২,১০০	১৩২,৫০০	১৫৪,২০০	৯৬,৮০০	৯২,২০০
বেলজিয়ামে	৬,৪০০	১৪,৯০০	৯,৫০০	৭,১০০	৬,৮০০	১,৯০০
ইতালিতে	৫০,৩০০	৮০,১০০	১২১,৩০০	৫৪,৭০০	৫১,৭০০	৭০,৯০০
অন্যান্য দেশে	২১,৮০০	৩৬,৭০০	৬৭,৮০০	[illegible]৬,২০০	৫১,২০০	৩৫,০০০

বিভিন্ন প্রদেশের হিস্যা

	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০	১৯২৯	১৯৩০
মান্দ্রাজ	৩৪৭,৮০০	৪৭১,৬০০	৫৮৪,২০০	৫৮৩,০০০	৩৮৯,৫০০	২৭৪,৪০০
বোম্বাই	৫০,১০০	১৪১,৭০০	২০২,৯০০	১৩১,০০০	১০০,৬০০	৯১,৮০০
ব্রহ্মদেশ	...	...	১,২০০	১০০	১০০	...
অন্যান্য প্রদেশ	...	...	১০০	১০০	১০০	১০০
মোট ...	৩৬৭,৯০০	৬১৩,৩০০	৭৮৮,৪০০	৭১৪,২০০	৪৯০,৩০০	৩৬৬,৩০০

সাধারণতঃ দেশে যত বাদাম উৎপন্ন হয় তার ২৫%এর বেশী বিদেশে যায় না। মোটামুটি বলা চলে ভারতে বাদামের চাষ যেরূপ বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানিও বাড়িয়াছে, যদিও উভয়ের অনুপাত এক নয়। মান্দ্রাজ যে মোট রপ্তানির অধিক অংশটা দেখাইবে, তাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে রপ্তানি ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। ভারত হইতে বাদাম কিনিবার বিষয়ে কে সব চেয়ে বড় খরিদ্দার হইবে তা নিয়া জার্ম্মাণিতে ফ্রান্সে পাল্লা চলিয়াছে—উভয়েই আমাদের বড় খরিদ্দার। বিদেশে যত মাল রপ্তানি হয় তার অর্দ্ধেকের অনেক বেশী ইহারা লয়। ইতালি ও নেদারল্যাণ্ডস্ আমাদের বাদামের খরিদ ক্রমেই বাড়াইতেছে।

ভারতীয় ধান্যের সংবাদ (১৯৩০-৩১)

ভারতের যতটা স্থান জুড়িয়া ধান্য রোপণ করা হইয়াছে তার ৯৭% অংশের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তদনুসারে অনুমান হয়, এবার ৮,১৯,৮৬,০০০ একরে ৩,১৫,৯৪০০০ টন ধান পাওয়া যাইবে। গত বৎসর ৮,০৪,৭৯,০০০ একরে ৩,১১,৩১,০০০ টন ধান পাওয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ আয়তন বাড়িয়াছে ২%, কিন্তু ফসল বাড়িয়াছে ১%। সুতরাং এবারকার ধানের ফসল গত বারের চেয়ে ভাল হইয়াছে মনে করিবার হেতু নাই। ধানের ফসল যতটা বেশী হওয়া উচিত ছিল ততটা বেশী হয় নাই।

নীচের তালিকা দুটি হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধান্যের আয়তন ও ফসলের পরিমাণ বুঝা যাইবে।

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য		১৯৩০-৩১ একর	১৯২৯-৩০ একর	গত ৫ সনের গড় একর	হ্রাস-বৃদ্ধি: গত সনের চেয়ে %	হ্রাস-বৃদ্ধি: গত ৫ সনের গড়ের চেয়ে %
বাঙ্গালা	হৈমন্তিক (আমন)	৫০,৮২,০০০	৫০,৩১,০০০	৫১,৪৭,০০০	+১	−১·৩
	শীত (বোরো)	১,৫১,২০,০০০	১,৪৭,৯৪,০০০	১,৪৮,৪৫,০০০	+২·২	+১·৯
	গ্রীষ্ম (আউশ)	৩,৯৬,০০৩	৪,০০,০০০	৩,৯৫,০০০	−১·০	+০·৩
	মোট বাঙ্গালা	২,০৫,৯৮,০০০	২,০২,২৫,০০০	২,০৩,৮৭,০০০	+১·৮	+১·৭
বিহার-উড়িষ্যা	হৈমন্তিক	৩৮,১৯,০০০	৩৯,২২,০০০	৩৬,৪৪,০০০	−২·৬	+৪·৮
	শীত	১,০০,৬৮,০০০	১,০২,৬৬,০০০	১,০৪,৫৬,০০০	−১·৯	−৩·৭
	গ্রীষ্ম	৪১,০০০	৪১,০০০	৪০,০০০	...	+২·৫
	মোট বিহার-উড়িষ্যা	১,৩৯,২৮,০০০	১,৪২,২৯,০০০	১,৪১,৪০,০০০	−২·১	−১·৫
ব্রহ্মদেশ	...	১,২৯,১১,০০০	১,২৮,৬১,০০০	১,২৩,৬৭,০০০	+০·৪	+৪·৪
মান্দ্রাজ	...	১,১৭,০৯,০০০	১,১২,৬২,০০০	১,০৯,৯৭,০০০	+৪·০	+৬·৫
যুক্তপ্রদেশ	...	৬৭,৫৩,০০০	৬৮,৭৩,০০০	৭৩,০৭,০০০	−১·৭	−৭·৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	...	৬৭,২১,০০০	৫৮,৫৪,০০০	৬০,৬২,০০০	+১৪·৮	+১০·৯
আসাম ...	হৈমন্তিক	৭,৮৬,০০০	৭,৭৪,০০০	৮,১৭,০০০	+১·৬	−৩·৮
	শীত	৩২,৯২,০০০	৩১,২৯,০০০	৩৪,১৭,০০০	+৫·২	−৩·৭
	গ্রীষ্ম	১,৯০,০০০	১,৮৫,০০০	১,৯২,০০০	+২·৭	−১·০
	মোট আসাম	৪২,৬৮,০০০	৪০,৮৮,০০০	৪৪,২৬,০০০	+৪·৪	−৩·৬
বোম্বাই ...	হৈমন্তিক	৩৪,৪৪,০০০	৩৫,৬৭,০০০	৩৪,৯৪,০০০	−৩·৪	−১·৪
	বাসন্তী	১৭,০০০	১৮,০০০	২১,০০০	−৫·৬	−১৯·০
	মোট বোম্বাই	৩৪,৬১,০০০	৩৫,৮৫,০০০	৩৫,১৫,০০০	−৩·৫	−১·৫
কুর্গ	...	৮২,০০০	৮৩,০০০	৮২,০০০	−১·২	...
হায়দ্রাবাদ	...	৬,০২,০০০	৫,০৭,০০০	৭,৮৭,০০০	+১৮·৭	−২৩·৫
মহীশূর	...	৭,৪১,০০০	৭,২০,০০০	৭,০৫,০০০	+২·৯	+৫·১
বড়োদা	...	২,১২,০০০	১,৯২,০০০	২,০৭,০০০	+১০·৪	+২·৪
	সর্ব্ব মোট	৮,১৯,৮৬,০০০	৮,০৪,৭৯,০০০	৮,০৯,৮২,০০০	+১·৯	+১·২

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য		১৯৩০-৩১ টন	১৯২৯-৩০ টন	গত ৫ সনের গড় টন	হ্রাস-বৃদ্ধি: গত সনের চেয়ে %	হ্রাস-বৃদ্ধি: গত ৫ সনের গড়ের চেয়ে%
বাঙ্গালা	হৈমন্তিক (আমন)	২১,০৭,০০০	১৫,৮৯,০০০	১৮,৩৪,০০০	+৩২·৬	+১৪·৯
	শীত (বোরো)	৬৯,৪৩,০০০	৬৪,৫৩,০০০	৬১,০৬,০০০	+৭·৬	+১৬·৭
	গ্রীষ্ম (আউশ)	১,৫৪,০০০	১,৬০,০০০	১,৫৩,০০০	−৩ ৭	+০·৭
	মোট বাঙ্গালা	৯২,০৪,০০০	৮২,০২,০০০	৮০,৯৩,০০০	+১২·২	+১৬·৭
বিহার-উড়িষ্যা	হৈমন্তিক	১১,৬২,০০০	১৩,৩৫,০০০	১০,৫২,০০০	−১৬·০	+১০·৫
	শীত	৪৪,৩৮,০০০	৪৬,৬১,০০০	৪০,৪৮,০০০	−৪ ৮	+৯·৬
	গ্রীষ্ম	১৪,০০০	১৫,০০০	১৩,০০০	−৬ ৭	+৭·৭
	মোট বিহার-উড়িষ্যা	৫৬,১৪,০০০	৬০,১১,০০০	৫১,১৬,০০০	−৬ ৬	+৯·৮
ব্রহ্মদেশ	...	৫০,৭৩,০০০	৪৯,৮৬,০০০	৪৯,৪০,০০০	+১ ৭	+২·৭
মাদ্রাজ	...	৫০,৩৩,০০০	৫২,৫৫,০০০	৫০,৫০,০০০	−৪ ২	−০·৩
যুক্তপ্রদেশ	..	১৭,০৪,০০০	১৫,২৮,০০০	২০,২২,০০০	+১১ ৫	−১৫·৭
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	...	১৬,৬৪,০০০	১৯,০৯,০০০	১৬,৭৫,০০০	−১২ ৮	−০·৭
আসাম ...	হৈমন্তিক	১,৮৬,০০০	১,৮৭,০০০	২,১৮,০০০	−০ ৫	−১৪·৭
	শীত	১০,৫৪,০০০	১০,৭৬,০০০	১২,২১,০০০	−২·০	−১৬·৭
	গ্রীষ্ম	৮৪,০০০	৮৫,০০০	৮৫,০০০	+১·২	−১·২
	মোট আসাম	১৩,২৪,০০০	১৩,৪৬,০০০	১৫,২৪,০০০	−১·৬	−১৬·১
বোম্বাই	হৈমন্তিক	১৪,৯৬,০০০	১৪,৪০,০০০	১৫,৩৪,০০০	+৩ ৯	−২·৫
	বাসন্তী	৮,০০০	৮,০০০	১০,০০০	...	−২০·০
	মোট বোম্বাই	১৫,০৪,০০০	১৪,৪৮,০০০	১৫,৪৪,০০০	+৩ ৯	−২·৬
কুর্গ	..	৫৩,০০০	৫৩,০০০	৪০,০০০	...	+৩২·৫
হায়দ্রাবাদ	...	১,৫৬,০০০	১,৫১,০০০	৩,১৯,০০০	+৩·৩	−৫১·১
মহীশূর	...	২,১৯,০০০	২,০৯,০০০	১,৮৮,০০০	+৪ ৮	+১৬·৫
বড়োদা	...	৪৬,০০০	৩৩,০০০	৪৬,০০০	+৩৯ ৪	...
	সর্ব্ব মোট	৩,১৫,৯৪,০০০	৩,১১,৩১,০০০	৩,০৫,৫৪,০০০	+১·৫	+৩·৪

বাঙ্গালা দেশ ধনে না হোক্ ধান্যে ভরা বটে, সকলের শীর্ষদেশে অবস্থিত। এই শীর্ষস্থান কত দিন রক্ষা করিতে পারিবে সে কথা স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ গোটা ভারতে যত ধান জন্মে তার এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশী বাঙ্গালায় জন্মে, কিন্তু এ বৎসর বাঙ্গালায় ধানের ফসল খুব বেশী ভাল হইয়াছে। বিহার-উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই তিন প্রদেশ ৫০ লাখ টনের এদিক ওদিক চাল উৎপাদন করে। বস্তুতঃ, বাঙ্গালা, বিহার-উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই—এই চারি প্রদেশে গোটা ভারতের প্রায় ৮৫% চাউল পাওয়া যায়। আর এই দেশ-চতুষ্টয়ে সমগ্র ধান্য-আয়তনের ৭৫% স্থান আছে।

গোটা ভারতের হিসাব ধরিলে মোটামুটি ১ টন ধান জন্মাইবার জন্য ২⅚ একর জমি দরকার হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় ২½ একরই এক টন জন্মাইবার পক্ষে যথেষ্ট—এ বৎসর ত প্রায় ২⅓ একরে ১ টন জন্মিয়াছে। আয়তনের দিক্ হইতে আগে বিহার-উড়িষ্যা, তারপর ব্রহ্মদেশ, তারপর মান্দ্রাজ। কিন্তু ফসলের বেলায় ব্রহ্মদেশ সকলের পিছনে।

বর্ত্তমান বৎসরে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার এই যে, সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রদেশে গত বৎসরের তুলনায় ফসল কম হইলেও বাঙ্গালায় বেশী হইয়াছে।

গোটা ভারতীয় ধান্যক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রদেশের হিস্যা এইরূপ: বাঙ্গালা ২৪·২%, বিহার-উড়িষ্যা ১৬·৮%, ব্রহ্মদেশ ১৪·৭%, মান্দ্রাজ ১৬·১%, যুক্তপ্রদেশ ৮·৯%, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৭·২%, আসাম ৫·৫%, বোম্বাই ৪·২%, কুর্গ ০·১%, হায়দ্রাবাদ ১%, মহীশূর ০·৮%, বড়োদা ০·৩%। এই হিস্যাগুলি ১৯২৮-২৯ অবধি ৫ বৎসরের গড়।

দেশে দেশে চাল-রপ্তানির হিসাব

নীচের তালিকা হইতে কি পরিমাণ চাল কাঁড়া ও আকাঁড়া অবস্থায় বিভিন্ন দেশে যায় তা বুঝা যাইবে।

বৎসর	ব্রহ্মদেশ হইতে	বাঙ্গালা ও বিহার-উড়িষ্যা হইতে	মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও সিন্ধু হইতে	মোট
	টন	টন	টন	টন
১৯২৬	২০,৬২,৮০০	১,১৯,০০০	০,৬১,৯০০	২৩,৪০,৯০০
১৯২৭	১৯,৫৬,৫০০	১,১৬,৪০০	১,৫৩,৫০০	২২,২৬,৪০০
১৯১৮	১৫,০৮,৪০০	১,০৪,৫০০	১,৮০,৮০০	১৭,৯৩,৭০০
১৯২৯	১৭,৫৪,৩০০	১,২৬,০০০	১,৬৭,৩০০	২০,৪৭,৯০০
১৯৩০	২৩,১৫,৫০০	১,১৬,০০০	১,৬৮,৪০০	২৫,৯৯,৯০০

এ গেল কোন্ দেশ কত পাঠায় তার হিসাব। কোন্ কোন্ দেশে কত যায় তার হিসাব এইরূপ:

যে দেশে রপ্তানি হয়	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০
	টন	টন	টন	টন	টন
যুক্তরাজ্যে	৭৩,১০০	৫৫,১০০	৩৩,১০০	৩৭,৯০০	১,২১,৭০০
জার্ম্মাণিতে	২,৫৭,০০০	৩,১৮,২০০	২,৮২,৬০০	২,৭১,৩০০	১,৪৬,২০০
নেদারল্যাণ্ড্সে	১,০৮,২০০	৮৯,০০০	৬৫,৬০০	১,১১,২০০	৮৮,৫০০
বেলজিয়ামে	৬,৯০০	৭,১০০	৮,১০০	২৩,২০০	৪২,৯০০
আরবে	৩৮,৪০০	৫১,১০০	৪৯,৪০০	৫৬,৯০০	৪৮,৩০০
সিংহলে	৪,৩০,১০০	৪,২৬,৪০০	৪,১৫,৭০০	৪৩৬,৫০০	৪,৪৬,৮০০

ষ্ট্রেট্স্ সেট্লমেণ্টসে	২,২৮,৬০০	১,৯৭,৮০০	১৬৭,৪০০	২,০৫,৫০০	২,৯০,২০০
সুমাত্রায়	৮৫,০০০	১,২৭,৪০০	১,০০,৬০০	১,২৬,২০০	১,৪৪,৬০০
যবদ্বীপে	১,০০,৯০০	১৫,৩০০	১০,৪০০	৯৩,৯০০	১,২১,০০০
চীনে	২,৫৩,০০০	১,৫৯,৬০০	৫০,২০০	৬৫,৪০০	৬,৫৭,২০০
জাপানে	১,০৮,২০০	১,৮৬,১০০	২২,৯০০	৪,১০০	২,২০০
মৌরিশাসে	৫৩,৩০০	৬৪,৪০০	৫৮,২০০	৫২,৩০০	৫০,৬০০
কিউবাতে	১,১৯,০০০	১১৯,৪০০	৬৮,৩০০	৯০,৪০০	৯৮,৭০০
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডে	২০,১০০	১৮,৭০০	৯,৭০০	৬,৫০০	৩,২০০

সাধারণতঃ ভারতে যত চাল উৎপন্ন হয় তার মাত্র ১/৮ হইতে ১/৫ অংশ পর্য্যন্ত বিদেশে রপ্তানি হয়। রপ্তানির প্রায় ৯০% যায় ব্রহ্মদেশ হইতে। বাঙ্গালার পাট যেমন দুনিয়ার হেন রাজ্য নাই যেখানে যায় না, ব্রহ্মদেশের চালও তদ্রূপ।

চীনের কোন স্থিরতা নাই, কিন্তু ১৯৩০ সন দেখিয়া মনে হয় চীনে ভারতীয় চালের যথেষ্ট কদর আছে এবং ভবিষ্যতে চীনা বাজার দখল করিবার দিকে আমাদের মন দেওয়া উচিত। সিংহল আমাদের সব চেয়ে ভাল বড় খদ্দের। সিংহলের পরে ষ্টেট্স্ সেটল্‌মেণ্টের নাম করিতে পারি। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, কিউবাও আমাদের চাল মন্দ কিনে না। ইয়োরোপে জার্ম্মাণি এবং সম্প্রতি যুক্তরাজ্য আমাদের চাল বেশী কিনিতেছে। ভারতীয় চালের প্রতি জাপানের প্রীতি ক্রমশঃ কমিতেছে বলিয়া মনে হয়।

দেশ দেশান্তরের গম-সম্পদ্

দেশের নাম	আয়তন হাজার হেক্টার		উৎপাদন হাজার কুইণ্টাল					
	১৯২১-২৫	১৯২৮-২৯	১৯২১-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯	১৯২৯-৩০
আফ্রিকা	০	৪,৫২৫	০	৩১,৫৩০	২৮,৪৭০	৩০,৬২৪	৩০,৯৮০	৩৫,৫০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩৫৯	৩৯৯	১,৯৪০	২,৪৪০	২,১৮৯	১,৫৪৪	১,৮৮৬	২,৭৯৬
ঈজিপ্ট	৫৯২	৬৪৩	১০,০২১	৯,৮৬৫	১০,১২৬	১২,০৬৯	৮০,১৫০	১২,৩০৯
উত্তর আমেরিকা	৩৪,১৯৩	৩৩,৩৪৩	৩২০,৬৫২	২৯১,৭২৯	৩৩৬,৯৮২	৩৬৯,৬০৪	৪০৩,২৩৩	৩০১,০১৬
ক্যানাডা	৯,০৩২	৯,৭৬১	১০১,৭৯৪	১০৭,৬৩২	১১০,৮০৬	১৬০,৫৪৬	১৫৪,২৪০	৮১,৫১৭
যুক্তরাষ্ট্র	২৫,১৬১	২৩,৫৮২	২১৮,৮৫৮	১৮৪,০৯৭	২২৬,১৭৬	২৩৯,০৫৮	২৪৮,৯৯৩	২১৯,৪৯৯
মধ্য আমেরিকা	৮৬১	৫২৭	২,৯০০	২,৬১০	২,৮৮৩	৩,২৯৪	৩,০৪৭	৩,১৮৭
মেক্সিকো	৮৫১	৫১৯	২,৮৪০	২,৫৬৯	২,৮১২	৩,২৩৬	৩,০০২	৩,১৪৬
দক্ষিণ আমেরিকা	০	৯,৬১১	০	৬৪,৯১৯	৭১,৮১৫	৮০,১২১	৯৮,৬৮০	৫৩,৫০৭
আর্জেন্টিনা	৬,৫৪০	৮,১২৬	৫৫,৩৫৪	৫২,০২১	৬০,১০০	৬৫,০৯০	৮৩,৬৫১	৩৮,০৭২
ব্রাজিল	৯১	৭৬	১,১৯৫	১,৫৪৪	১,৩৭০	১,১৪৪	...	...
চিলি	৫৬৫	৬৯৪	৭,০০৯	৭,২৫৯	৬,৩৪১	৮,৩৩০	৮,০৭৭	৮,৯৭৬
এসিয়া	...	২৬,৭০০	...	১১৭,১১৫	১৫২,৪৬৮	১২১,৫০০	১০০,২০০	...
কোরিয়া	৩৫৭	৩৬২	২,৬৮৩	২,৮৬০	২,৭৮৭	২,৪৬১	২,৩৩৯	২,২৬৪
বৃটিশ ভারত	১১,৯৯৬	১২,৯৫৫	৯১,৪৪৪	৯০,০৮৩	৮৮,৩৫৫	৯১,১৭০	৭৯,১৬০	৮৬,৪৩৫
জাপান	৪৮৫	৪৮৬	৭,৩২১	৮,০৩৪	৭,৭৪০	৭,৯৫৩	৮,৩৮৬	৮,৩০০

ইয়োরোপ	...	৫৭,১৫৯	...	৫৯৩,৪৯৬	৫৭৮,৫৮৫	৫৫৮,৭৮৭	৫৯৮,৯৩৫	৫৮৮,৭০০
জার্ম্মাণি	১,৪৬৩	১,৭২৮	২৬,৮৬৭	৩২,১৭৩	২৫,৯৭২	৩২,৮০১	৩৮,৫৩৬	৩৩,৪৯৫
স্পেন	৪,২৩২	৪,২৪১	৩৮,৭৬১	৪৪,২৫১	৩৯,৮৯৮	৩৯,৪১৫	৩২,৬২৮	৪০,৬২৪
ফ্রান্স	৫,৪৬৬	৫,২-৩	৭৯,১৬৬	৮৯,৯০৫	৬৩,০৭৭	৭০,১৫০	৭৬,৫০৪	৪৭,০৫৩
ইতালি	৪,৬৭৬	৪,৯৬৩	৫৩,৯০৪	৬৫,৫৪৮	৬০,০৫০	৫৩,২৯১	৬২,২১৫	৭০,৯৪৪
যুক্তরাজ্য	৭৩১	৫৯০	১৬,৪৯৩	১৪,৪০২	১৬,৮৮০	১৫,১৭৭	১৬,৫৪৩	১৬,৫৪২
রুশিয়া	...	২৮,২৯২	...	২১৩,৭০০	২৪৯,৩০০	২১১,৮০০	২১৫,৯০০	২০১,৮০০
ওশেনিয়া	৪,১৪২	৫,৮৩৮	৩৬,৭৮৫	৩২,৭২০	৪৫,৯১৭	৩৪,৭৬৬	৪৫,৮১৩	৩৫,৯৫২
অষ্ট্রেলিয়া	৪,৩৫১	৫,৭৩৫	৩৪,৯৭৮	৩১,১৬৩	৪৩,৭৫৩	৩২,১৬৯	৪৩,৪০৯	৩৪,০২০
সর্ব্বমোট	...	১২৭,৭০০	...	১,১৩৪,২২০	১,২১৭,১২০	১,১৯৮,৭০০	১,২৮৭,৯০০	১,১২০,০০০

১ হেক্টার=২.৪৭১১ একর এবং ১ কুইন্টলে=৩.৬৭৪৩ বুশেল।

দুনিয়ায় প্রায় ১২।১৩ কোটি হেক্টার জমিতে ১২০ হইতে ১৬০ কোটি কুইন্টাল গমের ফসল উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ ৩০।৩২ কোটি একরে ৪৫০ কোটি বুশেলের কাছাকাছি গম জন্মে।

সত্য বটে ইয়োরোপে প্রায় পৃথিবীর অর্দ্ধেক গম উৎপন্ন হয়, কিন্তু একক দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র সকলের মাথায় রহিয়াছে, তারপরেই রুশিয়ার স্থান। আমেরিকার হেক্টার প্রতি উৎপাদন ৮ থেকে ১০ কুইন্টাল, আর রুশিয়ার ৭।৮ কুইন্টাল। সেইজন্য আয়তনের দিক্ থেকে রুশিয়া প্রথম হইলেও যুক্তরাষ্ট্র উৎপাদনে প্রথম। তারপরেই বৃটিশ ভারত ও ক্যানাডার স্থান, যদিও প্রকৃতপক্ষে ক্যানাডা ভারতের চেয়ে এ বিষয়ে কিছু শ্রেষ্ঠ। ভারতকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।

গম-উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকা—এসিয়াও জুড়িয়া দেওয়া চলে। কিন্তু এসিয়ার মুখ রক্ষা করিতেছে ভারতবর্ষ।

চালের বাজারে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের দান

চাল শুধু ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় না। ভারতীয় চাল-উৎপাদন-শক্তি কোন্ স্থানে অবস্থিত তা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

	আয়তন (হাজার হেক্টার)		উৎপাদন (হাজার কুইন্টাল)		হেক্টার প্রতি কত কুইন্টাল	
	১৯২১-২৫	১৯২৮-২৯	১৯২৫-২৬	১৯২৯-৩০	১৯২১-২৫	১৯২৮-২৯
আফ্রিকা	...	১,৮০০	২৭,৫০০	...	...	১২৪
ঈজিপ্ট	১৬	৪১	৬০	...	...	...
উত্তর আমেরিকা	৩৭৩	৩৯৫	৬,৭৯৯	৮,২০৯	১৯.৫	২২.৩
যুক্তরাষ্ট্র	৩৭৩	৩৯৫	৬,৭৯৯	৮,২০৯	১৯.৫	২২.৩

মধ্য আমেরিকা	...	৬৩	৮৭৫	...	...	১৫'৮
মেক্সিকো	২৯	৪৮	৬৫১	...	১৫'১	১৮'২
দক্ষিণ আমেরিকা	...	৪৬৭	৮,২৩০		...	২১'৪
আর্জেন্টিনা	৬	৫	৯৫	...	২৩'৭	২১'৭
ব্রাজিল	৪৪৭	৩৫৩	৬,৭৯৯	...	১৬'৯	২৩'৩
এসিয়া	..	৫২,৩৭৫	৮০৪,৫০০	...	...	১৫'৮
সিংহল	৩২০	৩৩৮	২,৫৪০	...	৭'১	৭'৬
কোরিয়া	১,৫৯৭	১,৫০৫	১৬,৭১৫	২৪,৯৪৫	১৭'৫	১৬'২
ফর্ম্মোসা	৫১৯	৫৮৫	১১,৬৫২	১১,৮৩৪	১৯'৪	২১'০
ভারত	৩২,৯২১	৩৩,২৩৮	৪৮০,৯৪৬	...	১৪'৯	১৪'৯
ইন্দোচীন	৪,৮৬০	৫,৪৩৮	৫৮,৪২৮	...	১১'৬	...
জাপান	৩,১১৮	[illegible],১৬৫	১০৭,৯৬৭	১০৮,০০৬	৩৩'৭	৩৪'৫
ওলন্দাজ পূর্ব্ব আফ্রিকা	৩,৩৪১	৩,৫২৬	৪৮,৮৮১	৪৮,৯৮৫	১৫'১	১৪'৮
শ্যাম	২,৫৫১	২,৪১৪	৪২,২৩৬	...	১৭'৪	১১'৮
ইয়োরোপ	...	৪৪০	১৬,৩০০	...	...	৩০'৭
স্পেন	৪৭	৪৭	৩,০৬০	...	৫৮'৭	৫৯'৭
ইতালি	১২৮	১৬৫	৬,৪১৬	৬,৭৩৩	৪২'০	৪৬ ৯
ওশেনিয়া		৯	১০৫	..	...	৩১'৬
সর্ব্বমোট ...	...	৫৫,৫৫০	৮৫৭,৩০০	...	...	১৫'৯

চাল সম্পর্কে দেখা যাইবে যে, কিবা আয়তনে কিবা উৎপাদন-শক্তিতে এসিয়া ভিন্ন অন্য মহাদেশ কয়টির মূল্য অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। এসিয়ায় গোটা পৃথিবীর চালের জমির ৮০%এর বেশী অবস্থিত ও উৎপাদনে ইহা ৯৫%এর কাছাকাছি। এসিয়ার ভিতর আবার ভারতবর্ষের অবস্থা সবসে সেরা। ভারতবর্ষ গোটা এসিয়ার ৬০%এর মত চাল উৎপাদন করে। এসিয়ায় ভারতবর্ষের পরেই জাপানের স্থান বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের ২০%এর বেশী চাল জাপানে উৎপন্ন হয় না। ভারতবর্ষ গোটা দুনিয়ার অর্দ্ধেকের চেয়ে অনেক বেশী চালের ক্ষেত্র নিজের হেপাজতে রাখিয়াছে ও অর্দ্ধেকের ঢের বেশী চাল উৎপাদন করিতেছে।
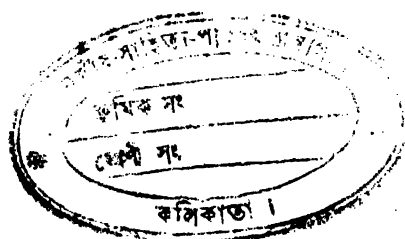
বাঙ্গালার জেলাবোর্ড

গত ১৯২৯-৩০ সনে বঙ্গদেশের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডসমূহের কার্য্যাবলী সম্পর্কে বিভাগীয় কমিশনারের রিপোর্টমূলে গভর্ণমেণ্ট এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯২৯-৩০ সনের মধ্যে ৬৮৩ জন সভ্যদ্বারা গঠিত ২৬টী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে কোন প্রকার রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক বে-সরকারী চেয়ারম্যান্ মনোনয়নের উৎসাহ-সম্পর্কে একটু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। রাজনৈতিক কারণ ছাড়া অন্য কারণে চলতি সনের প্রারম্ভেই ময়মনসিংহে একজন বে-সরকারী চেয়ারম্যান নিয়োগ করার দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী চেয়ারম্যানের ক্ষমতা-প্রভাবে বাঁকুড়া ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড ইউনিয়ন বোর্ডের প্রতি বিরুদ্ধ-ভাব প্রদর্শন করার ফলে তাঁহার স্থানে একজন বে-সরকারী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত মনোনীত চেয়ার-ম্যানের মৃত্যু হওয়ায় স্বয়ং ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটই উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। চলতি সনের শেষ ভাগে মেদিনীপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড রাষ্ট্র-নীতির আয়ত্ত থাকার অবস্থায় তথাকার চেয়ারম্যান-নিয়োগের প্রস্তাব সমর্থন করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাঁহার স্থানেও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

লোকালবোর্ডের প্রতিনিধি

লোকাল বোর্ড পরিচালন অথবা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর নির্ব্বাচন এবং আয়-ব্যয় সম্পর্কে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ৮২টী লোকালবোর্ডের মধ্যে কেবলমাত্র আসানসোল এবং দার্জ্জিলিং বোর্ডে সরকারী চেয়ার-ম্যান নিযুক্ত আছেন। পারিপার্শ্বিক কারণবশতঃ এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ স্থায়িভাবে প্রচলিত হইয়া আসি-তেছে। হাওড়া জিলার অন্তর্গত ২টী লোকাল বোর্ডের সভ্য-সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভ্যদের মোট সংখ্যা ১৩৪৩ হইতে ১৩৫৮ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা হইতেই স্থানীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের আগ্রহ বেশ প্রতীয়মান হয়।

আয়-ব্যয়ের হিসাব

১৯২৯-৩০ সনের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডসমূহের আয়-ব্যয়াদির হিসাব মতে দেখা যায়, মোট ১৪·৯ কোটি টাকা আয় এবং ১৫·২ কোটি টাকা ব্যয় হয়। আয়ের ঘরে ৭ লক্ষ টাকা কম ও ব্যয়ের ঘরে সামান্য মাত্র বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ব্যয়-সঙ্কুলনের জন্য ৪৩ লক্ষাধিক লোক হইতে চাঁদা আদায় করা হয়। তন্মধ্যে ৩১৫ লক্ষ টাকা কলিকাতার-বহিঃস্থ মিউনিসিপ্যালিটীর ২ লক্ষ লোক হইতে আদায় করা হয়।

শিক্ষা-বিভাগের কাজ

শিক্ষা-প্রচারের কার্য্যে জেলাবোর্ডগুলি এ বৎসর ৩৭৷৷ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট প্রায় ২১ লক্ষ টাকার উপর দান করিয়াছেন। একমাত্র প্রাইমারী শিক্ষা বাবদই জেলাবোর্ড হইতে ৩১·৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্য-প্রাপ্ত উচ্চ এবং নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৭৯০০ হইতে ৪৯০৯০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়সমূহে উপস্থিত বালক-বালিকার সংখ্যাও যথাক্রমে ১,৩২০,০০০ এবং ৩২১,৩০০ ছিল। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে প্রায় ২১০০ ছাত্রকে মিস্ত্রীর কাজ, কর্ম্মকারের কাজ, রঞ্জন, বুনন প্রভৃতি কার্য্য অন্যান্য নানা বিষয়ের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

গ্রাম্য "হেল্‌থ ইউনিট" প্রচলনের পূর্ব্বে ১৯২৬-২৭ সনকে "ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইয়ার" বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায়। উক্ত বৎসর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বাবদ প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তন্মধ্যে ৩৮৪ লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করেন। ১৯২৯-৩০ সনে এদিকে ব্যয়ের পরিমাণ ৩১·৭ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। সরকারী সাহায্যও ১১·১১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। সর্ব্বমোট ব্যয়ের মধ্যে ১৩·২ লক্ষ টাকা ডাক্তারি বিদ্যালয়ের পোষণে ও সাহায্যে ব্যয় করা হইয়াছে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান-সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যে ১৪·৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডদ্বারা পরিচালিত অথচ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য-প্রাপ্ত সেনিটারী ইন্‌স্পেক্টারের তত্বাবধানে গ্রাম্য হেল্‌থ ইউনিটগুলির দ্রুত বিস্তৃতি হইতেই পাব্‌লিক হেল্‌থ সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২৯-৩০ সনের শেষভাগে ৫৫৫টি থানাতে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য কতিপয় থানাতেও উহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইনানুসারে ইহার কতকগুলি দুরবস্থা দূর করিয়া কর্ম্মচারীদের কার্য্য-কলাপ যাহাতে যথাযথরূপে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

পশু-চিকিৎসা

এণ্টিরাইনডারপেষ্ট সিরামের মূল্য বাবদ প্রতি বৎসর ৭০,০০০ টাকা খরচ হইতে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডকে অব্যাহতি দেওয়ার ফলে পশু-চিকিৎসা বাবদ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ব্যয় ২১২৫০০ হইতে ১৭৮০০০ টাকা পর্য্যন্ত কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সিভিল ওয়ার্ক

গত কয়েক বৎসর যাবৎ জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড যত টাকা ব্যয় করেন যাতায়াত বিভাগের উন্নতির জন্য তদপেক্ষা কম অর্থই ব্যয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাত্র ৩৬·৫ লক্ষ টাকা পথঘাটের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। পাবলিক ওয়ার্কের জন্য অর্থব্যয়ের হার ক্রমশঃ কমিয়া ১৯২৯-৩০ সনে ৫৮·৫ লক্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৩·২ লক্ষ টাকা মাত্র পথঘাট-সম্পর্কে ব্যয় করা হয়।

জল-সরবরাহ :

১৯২৮-২৯ সনে ৮·৩ লক্ষ টাকা জল-সরবরাহের জন্য ব্যয় করা হয়। কিন্তু ১৯২৯-৩০ সনে ইহার হার কমিয়া ৭·৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

১৯২৮-২৯ সনে জল-সরবরাহের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে সাহায্য দিয়াছেন তাহার অর্দ্ধেকও ১৯২৯-৩০ সনে আদায় হয় নাই, ইহার কারণ পাবলিক একাউণ্ট কমিটি অবগত আছেন। অতএব ১৯২৯-৩০ সনে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের গঠন-কার্য্যের ব্যাঘাতেরও ইহাই একমাত্র কারণ বলা যাইতে পারে। ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রায় এক হাজারের বেশী নল-কূপ থাকা সত্বেও ১৩২টি নল-কূপ বসাইয়াছেন। ফরিদপুর এবং যশোহরের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডও যথাক্রমে ৩১৭ ও ২৪৮টি নল-কূপ বসাইয়াছেন। জল-সরবরাহের জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে সাহায্য প্রদানের ভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব ও আইনে বাধা

চেয়ারম্যান ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধিকাংশ সভ্যই উহাদের উপর গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াসী। কাজেই ১৯২৮-২৯ সনে এবং পরবর্ত্তী কতিপয় মাস যাবৎ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে এই সমস্যায় পড়িয়াছেন। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবার প্রথা ১৯২০ সনের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। যতদূর সম্ভব উক্ত নিয়মানুযায়ী জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বেশ ঐক্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কিন্তু এই প্রথার সাময়িক পরিবর্ত্তনেই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের উপর গভর্ণমেণ্টের হাত কমিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের কর্তৃত্ব ও আইনের উপর আঘাত পড়িয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে বহু বাধা থাকা সত্বেও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে উক্ত দায়িত্ব গ্রহণের

জন্য বলা হইলে তাঁহারা সানন্দচিত্তে উহা গ্রহণ করেন এবং যে সমস্ত স্থানীয় কার্য্য তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত প্রায় বন্ধ হইয়া যাইত তাহা তাঁহারা অবাধে রক্ষা করিয়াছেন।

এই সমস্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার ব্যতীত বে-সরকারী চেয়ারম্যান দ্বারা পরিচালিত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডসমূহের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে কমিশনারগণ ভাল রিপোর্ট দিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটীর রেকর্ড অপেক্ষা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রেকর্ডে প্রতি বৎসর নিয়মতান্ত্রিক উন্নতি ও প্রসারের আভাষ বাস্তবিকই অধিক দেখা যায়। বে-সরকারী চেয়ারম্যান তাঁহার ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিয়াই ক্রমে ক্রমে যেন প্রাদেশিক স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রণালীর নূতন উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ১৯৩০ সনের অক্টোবর মাসে দার্জ্জিলিংএ বে-সরকারী চেয়ারম্যানদের এক সভা হয়। উহাতে তাঁহাদিগকে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সুদক্ষ ও দায়িত্ববিশিষ্ট প্রতিনিধি বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড-সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার অবসর ঘটিয়াছে। এই কারণেই তাঁহারা মন্ত্রীর সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালার কয়েকটি রেল কোম্পানীর পরিচয়

আমরা সকলেই রেলে চড়িয়া থাকি; কিন্তু সেই রেলগুলি কত টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পরিচালক কে বা কাহারা, যাঁহারা টাকা খরচ করিয়াছেন তাঁহারা লভ্যাংশ পান কিনা—এসব খবর আমরা প্রায়ই রাখি না। নিম্নে বাঙ্গালা দেশের কয়েকটী রেলের কথা প্রকাশ করিলাম।

(১) আমোদপুর-কাটোয়া রেল—ম্যানেজিং এজেণ্ট ম্যাকলিয়ড্ এণ্ড কোং। মূলধন ১৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। প্রতি অংশের মূল্য ১০০ টাকা। অংশীদারগণ ১৯২৬ সনে শতকরা ৩৷৷০ টাকা, ১৯২৭ সনে ৩৷৷০ টাকা, ১৯২৮ সনে ৩৷৷০ টাকা ও ১৯২৯ সনে ৩৷৷০ টাকা লভ্যাংশ পাইয়াছেন।

(২) বাঁকুড়া-দামোদর রেল—ম্যানেজিং এজেণ্ট ম্যাকলিয়ড্ এণ্ড কোং। মূলধন ৩৪ লক্ষ টাকা। প্রতি অংশের মূল্য ১ শত টাকা। ১৯২৬, ১৯২৭ ও ১৯২৯ সনে শতকরা ৩৷৷০ টাকা ও ১৯২৮ সনে ৩ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) বারাসত-বসিরহাট রেল—ম্যানেজিং এজেণ্ট মার্টিন কোং। মূলধন ১৯ লক্ষ টাকা। গৃহীত ঋণ ৩ লক্ষ টাকা। ১৯২৬ সনে শতকরা ৫ টাকা, ১৯২৭ সনে ৬ টাকা, ১৯২৮ সনে ২৷৷০ টাকা ও ১৯২৯ সনে ৭৷৷০ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

(৪) বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেল—ম্যানেজিং এজেণ্ট ম্যাকলিয়ড্ এণ্ড কোং। মূলধন ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। ১৯২৬ সনে ৪ টাকা, ১৯২৭ সনে ৩৷৷০ টাকা, ১৯২৮ সনে ৩৷৷০ টাকা ও ১৯২৯ সনে ৪৷৷০ টাকা শতকরা লভ্যাংশ দিয়াছে।

(৫) দার্জ্জিলিং হিমালযান রেল—ম্যানেজিং এজেণ্ট গিলাণ্ডার আরবুথনট এণ্ড কোং—মূলধন ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গৃহীত ঋণ ১১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। গত ৪ বৎসর বার্ষিক শতকরা ১২ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিযাছে।

(৬) হাওড়া-আমতা রেল—ম্যানেজিং এজেণ্ট মার্টিন কোং। মূলধন ১৬ লক্ষ টাকা। ঋণ ৭ লক্ষ টাকা। ১৯২৬, ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনে শতকরা ১০ টাকা ও ১৯২৯ সনে ৪ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে।

(৭) হাওড়া-সিযাখোলা রেল—ম্যানেজিং এজেণ্ট মার্টিন কোং। মূলধন ৬ লক্ষ টাকা। শতকরা বার্ষিক লভ্যাংশ ১৯২৬—৮ টাকা, ১৯২৭—৮ টাকা, ১৯২৮—৩৷৷০ টাকা ও ১৯২৯—১ টাকা।

(৮) কালীঘাট-ফল্তা রেল--ম্যানেজিং এজেণ্ট ম্যাকলিয়ড্ এণ্ড কোং। মূলধন ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গৃহীত ঋণ ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ১৯২৬, ১৯২৭ ও ১৯২৮ সনে শতকরা ৩৷৷০ টাকা ও ১৯২৯ সনে ৪৷৷০ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে।

(৯) ময়মনসিংহ-ভৈরব রেল—ম্যানেজিং এজেণ্ট গিলাণ্ডার আরবুথনট কোং, মূলধন ৮৬ লক্ষ টাকা।

গৃহীত ঋণ ১৫ লক্ষ টাকা। ১৯২৬ সনে শতকরা ৫ টাকা ও পরবর্ত্তী ৩ বৎসর শতকরা ৫॥০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিয়াছে।

(১০) সারা-সিরাজগঞ্জ রেল—ম্যানেজিং এজেণ্ট গিলাণ্ডার আরবুথনট কোং। মূলধন ৯৫ লক্ষ টাকা। ১৯২৬, ২৯২৭ ও ১৯২৮ সনে শতকরা ৫।০ টাকা ও ১৯২৯ সনে ৫ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে।

বাঙ্গালার পাট-কলের লাভালাভ

আমরা আজ বাঙ্গালা দেশের কতকগুলি পাট-কলের লাভালাভের হিসাব প্রদান করিব। তাহাদের মূলধনের পরিমাণ প্রভৃতি দেখিলে ও ৩ বৎসরের লভ্যাংশের পরিমাণ জানিলে বুঝা যাইবে, আজ বাঙ্গালা দেশের পাটকলগুলির যতই দুরবস্থা হইয়া থাকুক না কেন, এরূপ অবস্থা তাহাদের চিরদিন ছিল না। এখন পাটকলগুলি মাসে মাত্র ১২ দিন চলিতেছে; ফলে মাসের বাকী ১৮ দিন শ্রমিকদিগকে একরূপ বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। তাহাদের দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মাসে ১২ দিন কল চালাইয়া যে, মাল প্রস্তুত হইতেছে, তাহারও চাহিদা নাই। কাজেই সকল পাটকলে প্রস্তুত মালের পরিমাণ এত অধিক হইয়াছে যে প্রায় সর্ব্বত্রই স্থানাভাব হইয়াছে। এ অবস্থার প্রতিকার কবে হইবে তাহা কে জানে?

(১) আদমজী জুট মিল—ম্যানেজিং এজেণ্ট হাজি আদমজী দাউদ—মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা। শতকরা ৭॥০ টাকা সুদে গৃহীত অতিরিক্ত মূলধন ১১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭ শত টাকা। গত ১৯২৮ সনে কোনরূপ লভ্যাংশ দেয় নাই; ১৯২৯ সনে শতকরা ৭॥০ টাকা দিয়াছে। ১৯৩০ সনে দেয় নাই।

(২) এল্‌বিয়ন জুট মিল—ম্যানেজিং এজেণ্ট এণ্ড্রু ইউল কোং। মূলধন ১২ লক্ষ টাকা। শতকরা ৫॥০ টাকা সুদে গৃহীত অতিরিক্ত মূলধন ৯ লক্ষ টাকা। তাহা ছাড়া বহু টাকা ঋণ লওয়া আছে। ১৯২৮ সনে শতকরা ৩০ টাকা, ১৯২৯ সনে ৪৫ টাকা ও ১৯৩০ সনে ১৫ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে।

(৩) আলেক্‌জান্ড্রা জুট মিল—ম্যানেজিং এজেণ্ট বেগ ডানলপ্ কোং। মূলধন ৬ লক্ষ টাকা। শতকরা ৬ টাকা সুদে গৃহীত অতিরিক্ত মূলধন ৯ লক্ষ টাকা। তাহা ছাড়াও বহু টাকা ঋণ লওয়া হইয়াছে। ১৯২৮ সনে শতকরা ৭০ টাকা ও ১৯২৯ সনে শতকরা ৩৫ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে। ১৯৩০ সনে এখনও কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করে নাই।

(৪) এলায়েন্স জুট মিল—ম্যানেজিং এজেণ্ট বেগ ডানলপ্ কোং। মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। শতকরা ৬ টাকা সুদে গৃহীত অতিরিক্ত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। ১৯২৮ সনে শতকরা ৩০ টাকা ও ১৯২৯ সনে ২৫ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে। ১৯৩০ সনে কোন লভ্যাংশ দেয় নাই।

(৫) এংলো ইণ্ডিয়ান জুট মিল—ম্যানেজিং এজেণ্ট ডানকান ব্রাদার্স। মূলধন ৪৯ লক্ষ ২০ হাজার ৭ শত টাকা। শতকরা ৭ টাকা সুদে গৃহীত অতিরিক্ত মূলধন ২৭ লক্ষ ৬২ হাজার ২ শত টাকা। শতকরা ৫॥০ টাকা সুদে গৃহীত ঋণ ২৫ লক্ষ টাকা। ১৯২৮ সনে শতকরা ৬৫ টাকা ও ১৯২৯ সনে শতকরা ৪৭॥০ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে। এ বৎসর কিছুই দেয় নাই।

(৬) অক্‌ল্যাণ্ড জুট মিল—ম্যানেজিং এজেণ্ট বার্ড কোং। মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। শতকরা ৭ টাকা সুদে গৃহীত অতিরিক্ত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। শতকরা ৭ টাকা সুদে গৃহীত ঋণ ১৫ লক্ষ টাকা। ১৯২৮ সনে শতকরা ৪৫ টাকা ও ১৯২৯ সনে ২৫ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে।

(৭) বালী জুট মিল—ম্যানেজিং এজেণ্ট জর্জ্জ হেণ্ডার্সন কোং। মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। শতকরা ৭ টাকা সুদে গৃহীত অতিরিক্ত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। শতকরা ৬ টাকা সুদে গৃহীত ঋণ ২০ লক্ষ টাকা। ১৯২৮ সনে শতকরা ৫০ টাকা ও ১৯২৯ সনে শতকরা ৩২॥০ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে।

(৮) বরাহনগর জুট মিল—ম্যানেজিং এজেণ্ট জর্জ্জ হেণ্ডারসন কোং। মূলধন ২ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড। শতকরা ৫ টাকা সুদে গৃহীত অতিরিক্ত মূলধন ২ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯২৮ সনে শতকরা ৭৫ পাউণ্ড, ১৯২৯ সনে ৭৫ পাউণ্ড ও ১৯৩০ সনে ১৫ পাউণ্ড লভ্যাংশ দিয়াছে।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল বাঙ্গালী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। ইহা বাঙ্গালার গৌরবের বস্তু। এই মিলের সম্বন্ধে দুই একটী অপ্রিয় কথা জানিতে পারিয়া গত ২৬শে মাঘের স্বরাজে তাহা আমরা পত্রস্থ করিয়া তৎপ্রতি মিলের পরিচালকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। মিলের সম্বন্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তাঁহারা প্রচলিত বাজার-দর অপেক্ষা তাঁহাদের কাপড়ের মূল্য কিছু বেশী পরিমাণে লইতেছেন। কলিকাতা বস্ত্র-ব্যবসায়ী সমিতির গত অধিবেশনেও এইরূপ একটী মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল। বাঙ্গালার সাধারণের স্বার্থ এই মিলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট আছে। কাজেই এই অভিযোগ সম্বন্ধে মিল-কর্ত্তৃপক্ষের কি বক্তব্য আছে তাহা সাধারণকে জানাইবার জন্য আমরা অনুরোধও করিয়াছিলাম।

মিলের কর্ত্তৃপক্ষ একখানি চিঠি লিখিয়া তাঁহাদের বক্তব্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। ইহাতে বঙ্গলক্ষ্মীর সম্বন্ধে সাধারণের যে ভ্রম উৎপাদিত হইয়াছিল তাহা দূর হইবে। তাঁহারা কলিকাতার বস্ত্র-ব্যবসায়ী সমিতির গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিবাদস্বরূপ যে পত্রখানি কলিকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও একখানি প্রতিলিপি এখানে পাঠাইয়াছেন। ঐ পত্র বাঙ্গালার কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। মফঃস্বলের লোকই বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় ভাল এবং টেঁকসই বলিয়া অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে; এজন্য আমাদের মনে হয় উক্ত পত্রখানির একটী বঙ্গানুবাদ তৎকালে বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলে সাধারণের ভ্রম হয়ত এতটা গড়াইতে পারিত না।

বঙ্গলক্ষ্মীর পরিচালকবর্গ তাঁহাদের প্রতিবাদ-পত্রে বলিতেছেন, মূল্য বেশী লওয়ার যে অভিযোগ তাঁহাদের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন। কতকগুলি প্রতিষ্ঠান কিছুদিন হইল তাঁহাদের বিরুদ্ধে স্বার্থসংস্পৃষ্ট প্রচার-কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে। তূলার মূল্য কম হওয়ায় অন্যান্য মিল যেরূপ কাপড়ের মূল্য কমাইয়াছেন তাঁহারাও সেইরূপ কমাইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ যে বঙ্গলক্ষ্মী ২০৯৫ নং অক্টোবরে ২।৶০ জোড়া ছিল, ডিসেম্বরে তাহার মূল্য কমাইয়া ২।০ জোড়া করা হয়, এবং জানুয়ারীতে তাহার মূল্য ২৶০ করা হইয়াছে। বাজারে নকল বঙ্গলক্ষ্মী ও নানা প্রকার অল্প মূল্যের খারাপ কাপড়ের আমদানি হইয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের বিশুদ্ধতা এবং টেঁকসইএর জন্য ইহা তৈরী করিতে একটু বেশী ব্যয় পড়ে এবং এই জন্য বাজারের সাধারণ কাপড়ের মূল্যের অনুপাতে ইহার মূল্য একটু বেশী হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহারা লিখিতেছেন, এই মূল্যের কথাই আসল কথা নয়। আসল কথা হইতেছে কলিকাতার বস্ত্র-ব্যবসায়ী মহাজনগণ বঙ্গলক্ষ্মী ও ঢাকেশ্বরীর কাপড় বিক্রয় করিতে চায় না। অতিরিক্ত লাভের আশায় তাহারা অল্পমূল্যের খারাপ কাপড় দোকানে বেশী পরিমাণে রাখে এবং মফঃস্বলের বস্ত্রব্যবসায়িগণকে এই কাপড় লইতে বাধ্য করে। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন, বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় তাহাদের দোকানে চাহিয়াও পাওয়া যায় না। তাঁহারা আরও লিখিতেছেন, বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় যাহাতে কম বিক্রয় হয় শুধু এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে ঐ প্রকার অসত্য ও ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রচার করা হইতেছে। বস্তুতঃ, প্রকৃত ঘটনা অন্যরূপ। সাধারণে যাহাতে প্রকৃত কথা অবগত হইয়া বঙ্গলক্ষ্মীকে প্রীতির চক্ষে দেখেন এজন্য তাঁহারা অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদ-পত্রে সমুদয় কথা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। উহা হইতে জানা যাইতেছে কলিকাতার বস্ত্র-ব্যবসায়ী মহাজনদের একটী ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া বঙ্গলক্ষ্মীকে অসত্য ভিত্তিহীন আক্রমণ সহ্য করিতে হইতেছে। প্রকৃত কথা সাধারণের নিকট অজ্ঞাত থাকায় বিশেষ ক্ষতি হইবারও আশঙ্কা হইয়াছে। কলিকাতার বস্ত্র-ব্যবসায়ী মহাজনগণ বাজে কাপড় বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত লাভের আশায় বাস্তবিকই যদি বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় কম করিয়া রাখেন এবং বঙ্গলক্ষ্মীকে বর্জ্জন করিবার জন্য বাস্তবিকই ঐরূপ কোন ষড়যন্ত্র হইয়া থাকে, তবে বঙ্গলক্ষ্মীকে রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালার সর্ব্বসাধারণকে এখনই জাগ্রত হইতে হইবে।

প্রত্যেক বস্ত্র-ব্যবসায়ী যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখে সাধারণের পক্ষ হইতে এখনই এরূপ দাবী করিতে হইবে।

এই উপলক্ষে স্থানীয় পাবনা বাজারের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাদ্বারাও বঙ্গলক্ষ্মীর পরিচালকবর্গের উক্তিই সমর্থিত হইতেছে। অধিকাংশ দোকানেই বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় সব প্রকারের উপযুক্ত পরিমাণে বাস্তবিকই পাওয়া যায় না। ২০৯৫ নং কাপড় ইহারা কলিকাতার মাড়োয়ারী মহাজনদের নিকট ২।০—২।১০ হিসাবে ক্রয় করেন। এখানে ঐ কাপড় ২।৵০ জোড়া বিক্রয় হয়।

(স্বরাজ—পাবনা)

আসাম প্রদেশে ভারতীয় ফ্যাক্টরি আইনের ১৯২৯ সনের কার্য্যবিবরণী

১৯২৯ সনে আসাম প্রদেশে মোট ফ্যাক্টরির সংখ্যা ৬১৭টী দাঁড়াইয়াছে। এই সনে ৫টী নূতন ফ্যাক্টরি খোলা হইয়াছে এবং বন্ধ হইয়াছে ৪টী।

রেজিষ্টারি করা ফ্যাক্টরিসমূহে দৈনিক কুলি হাজিরার সংখ্যা ৪৫,৮৮৪, পূর্ব্ববৎসরে ছিল ৪৭,৮৪২। সুতরাং আলোচ্য বর্ষে হাজিরা হ্রাস পাইয়াছে ১,৯৫৮। চা-বাগান-গুলিতে কুলি-হ্রাস ১,৫৩৯ এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরিতে ৪১৯।

১৯২৮ সনের ৩১শে ডিসেম্বর হইতে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ফ্যাক্টরি বিভাগ আসাম প্রদেশ পরিদর্শন করা বন্ধ করেন। ১৯২৯ সনে আসামে কোনই স্থায়ী ফ্যাক্টরি ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন না। ১৯৩০ সনের মে মাসে আসাম প্রদেশে স্থায়ী ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে। এখন দুইজন কেরাণী ইঁহার অধীনে খাটিতেছে। সুতরাং ১৯২৯ সনের যে কর্ম্মবিবরণী ইনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভিন্ন ভিন্ন জেলার ডেপুটি কমিশনারগণের প্রদত্ত তদন্ত হইতে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ঠিক বিশদ বিবরণী প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই।

আসামের ফ্যাক্টরিসমূহে স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার অনাবশ্যকতা

বাস্তবিকপক্ষে আসামের ফ্যাক্টরিগুলিতে কোন প্রকার স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত নাই। কারণ প্রথমতঃ আসাম প্রদেশের ফ্যাক্টরিগুলিতে কুলির সংখ্যা খুব বেশী নয়। দ্বিতীয়তঃ, আসামের ফ্যাক্টরিগুলি বাঙ্গালার মত ঘাঘা ঘাঘা নয়; সুতরাং গ্যাস, ময়লা ইত্যাদি সেরূপ জমা হয় না; তৃতীয়তঃ আসামের ফ্যাক্টরিগুলি খুব ফাঁকা ফাঁকা এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত। উপযুক্তরূপ পানের এবং স্নানের জল, ড্রেনের ব্যবস্থা ইত্যাদি ম্যানেজারগণই করিয়া থাকেন।

ফ্যাক্টরিতে বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা

আসামের চা-কুঠিগুলির 'বাছাই ঘরে' খুব ধূলার উপদ্রব হয়। কোন কোন চা-কুঠিতে এক প্রকার নয়া প্ল্যাণ্ট বসাইয়া ধূলা নিবারণ সম্বন্ধে খুব সুবিধা করা হইয়াছে। এই ধূলার জন্য যে কুলিদের স্বাস্থ্য কি পরিমাণে নষ্ট হয় তাহা জানিবার মত কোনরূপ তথ্যাদি মিলে নাই। কারণ কুলিরা সব সময় একই কাজে লিপ্ত থাকে না; অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যাপৃত হয়। আর এইরূপ অদল-বদল হইবার জন্য কুলিরা রক্ষাও পাইয়া থাকে।

কুলিদের মজুরি এবং সাধারণ অবস্থা

আলোচ্য সনে কুলিদের মজুরি এবং সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। এ বৎসরে মজুরি হার এবং খাটিবার সময় সম্বন্ধে ধর্ম্মঘট ইত্যাদি খুব কমই হইয়াছে। ধর্ম্মঘট কোন ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে দেখা দেয় নাই; যে কুঠিতে দেখা দিয়াছে, সেইখানে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, এবং ফ্যাক্টরির মালিক সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। দরং জেলার তেজপুর এবং মঙ্গলদই মহকুমায় ধর্ম্মঘট দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু স্থানীয় সুযোগ্য ডেপুটি কমিশনার সাহেবের চেষ্টায় তাহা নিবারিত হইয়াছে। ডেপুটি কমিশনার এ সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণী আসাম গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিয়াছেন।

চা-কুঠিগুলিতে কুলিদের খাটিবার সময়ের বিশেষ কোন নিয়মকানুন নাই। তবে কুঠির কাজের জন্য যতটুকু খাটিবার দরকার সেই হিসাবে কুলিদের কর্ম্ম হইতে প্রয়োজন-মাফিক রেহাই দেওয়া চলে। কর্ম্মবিরতি যে বিশেষ কোন শ্রেণীর কুলিদের উপরেই প্রযোজ্য তাহা নয়; সকল প্রকার কুলিদিগকেই কর্ম্ম হইতে অল্পবিস্তর রেহাই দেওয়া আবশ্যক। চা-কুঠির কুলিদের খাটিবার সময় নিয়ন্ত্রিত করা খুব কঠিন। কারণ কুঠির মালিকগণ এর জন্য কোনরূপ হিসাবপত্র রাখে না। উহাদের হাজিরাবহি দেখিয়াও ধরিবার উপায় নাই। কারণ অনেক সময় উহারা চালাকি করিয়া মিথ্যা বিবরণী প্রকাশ করিয়া থাকে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ফ্যাক্টরি বিভাগ বাঙ্গালার চা-বাগিচাসমূহে তদন্ত করিয়া এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

ফ্যাক্টরি কুলিদের বসতবাটী এবং জীবনযাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সংস্কার-কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে, এখনও তাহাই চলিতেছে; নূতন কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

ফ্যাক্টরির কুলিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা মালিকগণই করিয়া থাকে। আসামের ফ্যাক্টরিগুলি স্থানে স্থানে অবস্থিত থাকায় এ ছাড়া অন্য উপায় নাই। আর কুলিদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে মালিকদেরই সুবিধা; সেইজন্য কুলিদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মালিকগণের যথেষ্ট নজর আছে।

কুলিদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঠিক কিছু বলিবার উপায় নাই। কারণ এ সম্বন্ধে কোন ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ পাওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া জানা যায় যে, কুলিদের স্বাস্থ্য চলনসই গোছের। আলোচ্য সনে লক্ষ্মীপুরের সিভিল সার্জ্জন ফ্যাক্টরিসমূহ ১২ বার পরিদর্শন করিয়াছেন। ঐ জেলায় ডাক্তার ডব্লিউ গ্রাণ্ট্ ১০৪ বার পরিদর্শন করিয়াছেন।

নারী ও শিশুমজুরের সংখ্যা

আলোচ্য সনে আসাম প্রদেশে নারী ও শিশুমজুরের সংখ্যা যথাক্রমে ১২,৯৩৯ এবং ৭,২৩৭; ১৯২৮ সনের তুলনায় যথাক্রমে ১২০ এবং ২,০০৭ কম। চা-শিল্পে মোতায়েন কুলিদের সম্বন্ধে ঠিক বিবরণ পাওয়া মুস্কিল ব্যাপার। কারণ চা-কুঠির হাজিরা বহিতে অনেক কুলির হাজিরা বা নাম কিছুই উঠান হয় না। আলোচ্য সনে সময়াভাবে চা-কুঠির কুলিদের হিসাব দেওয়া সম্ভবপর হইল না। ১৯৩০ সনে রীতিমত হুঁসিয়ার হইয়া সমস্ত খবর লওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শিশু-মজুরদের বয়স-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা

আসাম প্রদেশে ফ্যাক্টরিগুলিতে শিশু-মজুরদের বয়স-নির্দ্ধারণের কোন ব্যবস্থা নাই। সিভিল সার্জ্জনদের দ্বারা এই কার্য্য করাইয়া লওয়া যাইতে পারে না। বাঙ্গালা দেশে ফ্যাক্টরি অঞ্চলে বহু কুলির বাস; সুতরাং ঐ সমস্ত অঞ্চলের জন্য ফ্যাক্টরি ডিপার্টমেণ্ট হইতে রীতিমত পৃথক সার্জ্জন রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত সার্জ্জনগণ ফ্যাক্টরিতে যাইয়া শিশুদের বয়স নির্দ্ধারণ করিয়া উহারা কাজের উপযুক্ত কিনা স্থির করিয়া দেন। আসামে এইরূপ কিছুরই ব্যবস্থা নাই; কিন্তু তাই বলিয়া আসামে শিশুমজুরদের উপর অন্যায় অত্যাচার করা হয় বলিয়া যে লোকের ধারণা আছে, তাহা সত্য নহে; কারণ ছেলেরা প্রায় চা-বাগানে কাজ করে; প্রকৃত কুঠিতে ছেলেরা কাজ করে না। কুঠির কাজের চেয়ে বাগানের কাজ অনেক সোজা এবং কম্ পরিশ্রম-সাধ্য।

মেশিনারি ঘিরিয়া রাখার ব্যবস্থা

চা-ফ্যাক্টরিতে ভারতীয় ফ্যাক্টরি আইনের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে ১৯২৮ সনে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, উহাতে মেশিনের চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া রাখার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এবং কি উপায়ে ঘিরিলে মেশিনে কাজ করা নিরাপদ হইতে পারে তৎসম্বন্ধেও অনেক হদ্দিস বাতলান হইয়াছে। আসাম প্রদেশে প্রায় আঠারো মাস ধরিয়া কোন স্থায়ী ইনস্পেক্টার না থাকায় এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয় নাই। তবে ডেপুটি কমিশনারগণ মেশিনে বেড়া দেওয়া সম্বন্ধে যে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা

সঙ্গে সঙ্গে পালন করা হইয়াছিল এবং উহাতে বেশী সন্তোষজনক ফলই পাওয়া গিয়াছে।

আসামে কুঠিগুলিতে নিপুণ মিস্ত্রির অত্যন্ত অভাব এবং অর্থকষ্টও আছে। বর্ত্তমানে যে ইনস্পেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কুঠিগুলিকে রীতিমত সহায়তা করিতে হইবে। প্ল্যাণ্টগুলিকে যখন তৈরী করা হয় তখন যদি প্রস্তুতকারক হুঁসিয়ার থাকে তবে আর মেশিনের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করার দরকার হয় না। এই ধরণের মেশিনের জন্য সামান্য সামান্য বেড়া দেওয়ার দরকার হয়। আসামে এই ধরণের হাল মেশিন সেরূপ নাই। তবে এখন যখন স্থায়ী ইনস্পেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন আসামের কুঠিগুলির সুরাহা হইবে বলিয়াই মনে হয়। বিদ্যুৎ লইয়া নাড়াচাড়া করিবার সময়েও ফ্যাক্টরিতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। ফ্যাক্টরি ইন্‌স্পেক্টারের উপরেই বিদ্যুৎ অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রিসিটি দেখাশুনার ভারও অর্পিত হইয়াছে। সুতরাং ফ্যাক্টরি ইনস্পেক্টার যখন ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করিতে যাইবেন তখন নিরাপদে বিদ্যুৎ পরিচালন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারিবেন।

ফ্যাক্টরিতে দৈব-দুর্ঘটনা

আলোচ্য সনে আসামের ফ্যাক্টরিসমূহে দৈব-দুর্ঘটনার সংখ্যা মোট ৮০টী। ইহার মধ্যে সাংঘাতিক ৩টী, গুরুতর ৪৪টী এবং সামান্য রকমের ৩৩টী। পূর্ব্ব সনের তুলনায় সাংঘাতিক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি ১টী, গুরুতর দুর্ঘটনা বৃদ্ধি ৪টী এবং সামান্য দুর্ঘটনা হ্রাস ১০টী। ইন্‌স্পেক্টার না থাকায় এই সমস্ত দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কোনরূপ তদন্ত করা হয় নাই। নব নিযুক্ত ইন্‌স্পেক্টার যখন ফ্যাক্টরিগুলি পরিদর্শন করিতে যাইবেন তখন নিশ্চয়ই এই সমস্ত তদন্ত তাঁহাকে করিতে হইবে।

সাংঘাতিক দুর্ঘটনার মধ্যে ১টী ঘটনা মেশিন-ঘটিত ব্যাপার। তবে এ জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ মেশিনটীতে কোন প্রকার দোষ নাই। মাত্র একটী ভীষণ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং পরক্ষণেই দেখা যায় লোকটী মেশিনের নিকট মরিয়া পড়িয়া আছে। অন্য দুইটী সাংঘাতিক ঘটনার মধ্যে (১) একজন লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে লাফ দিয়া নালা পার হওয়ার সময়। লোকটী পড়িয়া যায়, আর তার মুখে ভীষণ চোট লাগে; ঐ আঘাতেই পরে লোকটী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। (২) দ্বিতীয় ঘটনাটী এই যে, একজন কুলি গুদামে প্রবেশ করিতেছিল; সেই সময় একখানি ট্রাক্ সান্টিং করা হইতেছিল। ট্রাকের নীচে পড়িয়া লোকটী পিষিয়া মরিয়াছে।

দুর্ঘটনায় শিশুরাও বাদ যায় নাই

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, শিশুরাও এই সমস্ত দুর্ঘটনার হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত শিশু-মজুর-প্রথা রদ না হইতেছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত শিশুদিগকে তাহাদের বাপ-মার সঙ্গে খাটিতে দেওয়া হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই বীভৎস কাণ্ড ঘটিতে থাকিবে। আলোচ্য সনে সাত জন শিশু (১৫ বৎসর বয়স্ক) দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে। আরও একটী মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু ইহা ফ্যাক্টরির ঘটনা নয় বলিয়া উহা তালিকায় দেওয়া হয় নাই। কর্ম্মনিরতা জনৈক কুলি-রমণীর শিশু মাতার অনবধানতাবশতঃ তেলের ট্যাঙ্কের মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া মারা যায়। ১৫ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক কুলিদের মধ্যে আরও ৭ জন দুর্ঘটনার কবলে পড়িয়াছে। এই সমস্ত বাচ্চা কুলিদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাতে আঘাত লাগিয়াছে। ১৬ বৎসর বয়সের পর্য্যন্ত কুলিরা জখম হইয়াছে হয় খেলা করিবার সময়, না হয় তো চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময়। কিন্তু কতকগুলি বাচ্চা কুলি জখম হইয়াছে তাহাদের পরিধানের কাপড় কলে আট্‌কাইয়া যাওয়ায়। ১৫ বৎসর বা তার চেয়ে দু'এক বৎসর অধিক বয়স্ক কুলিদের মনোভাব প্রায়ই এক রকম; ইহারা সকলেই তরলমতি এবং চপল প্রকৃতির। ইহাদিগকে বেশী বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা ভীষণ অন্যায়। যেখানে মুহূর্ত্তের জন্য অসাবধান হওয়ার ফলে মানুষকে সারাজীবন অকর্ম্মণ্য হইতে হয়, সেখানে বেশী বয়সের মানুষকে নিয়োগ করাই উচিত।

ভারতের আর্থিক স্বার্থের সংরক্ষণ

[ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সহিত আমার যে কথোপকথন হইয়াছিল তার সারমর্ম্ম।—শ্রীসুধাকান্ত দে।]

প্রঃ। আপনি রাউণ্ড টেব্‌ল কন্‌ফারেন্সের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহাতে সম্ভবতঃ ভারতের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ-সমূহের মধ্যে একটা রফা বা মিলনের চেষ্টা করা হইয়াছিল।

উঃ। তা হইয়াছিল বটে। আমাদের কাজের যে প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিবার জন্য ৯টি সাব্‌-কমিটি মোতায়েন ছিল, সাব্‌-কমিটি রিপোর্ট দিলে পর সমগ্র কনফারেন্স কমিটি-হিসাবে বসিয়া তাহার আলোচনা করিত। তৃতীয় নম্বর সাব্‌-কমিটির আলোচ্য বিষয় ছিল সংখ্যা-লঘুদের কথা। অর্থাৎ ইহাতে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচক মণ্ডলী কিরূপ হইবে এবং বৃটিশ বণিক্‌ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কি ব্যবস্থা থাকিবে, তাহার কথা আছে। ইহার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং ম্যাক্‌ডোনাল্ড।

প্রঃ। ভারতে বৃটিশ বণিক্‌দের স্বার্থরক্ষার কথা লইয়া সে সময়ে এখানেও খুব আন্দোলন আলোচনা হইয়াছিল। আচ্ছা, সেখানে এ সম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা হইয়াছিল?

উঃ। সমগ্র কনফারেন্সের নিকট সাব্‌কমিটির রিপোর্ট যখন আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয় তখন প্রস্তাবটির যে আকার ছিল তাহা নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত করা যাইতে পারে: "বৃটিশ বণিক্‌ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এইরূপ একটি অনুরোধ আসিয়াছে যে, গ্রেট বৃটেন ও ভারতের মধ্যে এক বাণিজ্যিক সমঝোতা কায়েম করা হোক্‌, তাহাতে সম্রাটের ভারত-জাত প্রজাদের সমান বাণিজ্যাধিকার বৃটিশ বণিক্‌সম্প্রদায়ের থাকিবে এইরূপ অঙ্গীকার রহিবে, এবং ভারতীয়েরা যুক্তরাজ্যে অনুরূপ অধিকার পাইবে বলিয়া অঙ্গীকার থাকিবে।"

প্রঃ। রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্সের রিপোর্ট বহিতে দেখিতেছি, এই পল্লবটি তারকা-চিহ্নিত রহিয়াছে, ইহার অর্থ কি?

উঃ। এই পল্লবটি লইয়া সমগ্র কনফারেন্সে আলোচনা-কালে অনেক বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। ১৬ই জানুয়ারী তারিখে এই প্রস্তাব কনফারেন্সে আলোচিত হইবার জন্য আসে। কিছু আলোচনার পরে ইহা নিম্নলিখিত আকার ধারণ করে। "সম্মত হওয়া যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বৃটিশ বণিক্‌ সম্প্রদায়ের অধিকারসমূহ অটুট থাকিবে, এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক সমঝোতা দ্বারা বা অন্যপ্রকারে বৃটিশ বণিক্‌ সম্প্রদায়ের অধিকার ততখানি বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে যতখানি অধিকার সম্রাটের ভারত-জাত প্রজারা যুক্তরাজ্যে ভোগ করিতে পারিবে।"

প্রঃ। আপনারা ও বৃটিশ বণিক্‌ সম্প্রদায়ের প্রতি-নিধিরা কি এই পরিবর্ত্তিত দফায় সন্তুষ্ট হইলেন?

উঃ। না, আমাদের ও তাঁহাদের ভিতরে তখনো মতভেদ রহিয়া গেল।

প্রঃ। কিন্তু মতভেদের হেতুটা কি?

উঃ। আমাদের দিকে স্পষ্ট করিয়া এই কথা আমরা বলিয়াছিলাম যে, এই নীতির মূলকথার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু আমরা চাহিয়াছিলাম যে, দেশের স্বার্থটাই বড় করিয়া দেখা হোক্‌। যেখানে দেশের স্বার্থের সঙ্গে বৃটিশ বণিক্‌ সম্প্রদায়ের স্বার্থের সংঘর্ষ

হইবে সেখানে আমরা কোনক্রমেই দেশের স্বার্থকে খর্ব্ব হইতে দিব না। যেমন ধরুন ইংরাজীতে যাকে "কী ইন্‌ডাষ্ট্রী" বলে সেগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অথবা উন্নত করিবার জন্য আমাদের বিশেষ আইনের দরকার হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে বৃটিশ বণিকেরা সমতুল্য ব্যবহার পাইবার দোহাই দিলে চলিবে না। আমরা কনফারেন্সে স্পষ্ট করিয়া এই কথাই বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, তোমাদের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমানভাবে সংরক্ষিত হইবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেশের বৃহৎ স্বার্থ না আহত হইতেছে, কিন্তু দেশের মঙ্গলকে খর্ব্ব করিয়া আমরা বৃটিশ স্বার্থের প্রাধান্য স্বীকার করিতে রাজী নই। বস্তুতঃ, ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস্ পাইয়াও যদি ভারতবাসীর বাণিজ্যিক সুবিধা না বাড়ে ও ভারতের দারিদ্র্য দূর না হয় তবে ডোমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস্ পাওয়ার সার্থকতটা কি ?

প্রঃ। এ ত গেল আপনাদের কথা। কিন্তু বৃটিশ বণিক্‌দের যুক্তিটা কি ?

উঃ। বৃটিশ বণিক্‌দের পক্ষ হইতে প্রথম গোল উঠিল "বর্ত্তমান" কথাটি লইয়া। বর্ত্তমান কথাটি দ্বারা কাহাকে বুঝাইতেছে ? বৃটিশ বণিক্ সম্প্রদায়কে না অধিকার সমূহকে ? ভারত সচিব বলিলেন যে বর্ত্তমান বণিক্ সম্প্রদায়ের অধিকার-সমূহ অটুট্ রহিল। ভবিষ্যতের সম্পর্ক ভবিষ্যতে নির্ণীত হইবে। তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, সে কেমন কথা ? এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পরদিন যদি কোন বৃটিশ বণিক্ ভারতে পদার্পণ করেন তবে এই আইনের সাহায্য তিনি পাইবেন না ! তাঁহারা বলিলেন, আমরা এ যাবৎ যে অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছি, ভবিষ্যতেও ঠিক সেই ভাবে সেগুলি ভোগ করিবার ক্ষমতা আমাদের থাকা চাই। এই সব অধিকারকে আমরা কোনক্রমেই ছাড়িয়া দিতে বা ভবিষ্যতের বা বর্ত্তমান রফার অন্তর্গত করিতে রাজী নই।

প্রঃ। সুতরাং এইখানে নৌকা চরে আসিয়া ঠেকিল। কিন্তু রিপোর্টে দেখিতেছি শেষকালে উভয় পক্ষের মনঃপূত তৃতীয় এক খস্‌ড়া করা হইয়াছিল। তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইল ?

উঃ। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়া বলেন যে, বৈকালের বৈঠকের পূর্ব্বে যদি এ বিষয়ে একটি আপোষ মীমাংসা হয় তবে সেইভাবে প্রস্তাবটিকে পরিবর্ত্তিত করা হইবে। বৃটিশ বণিক্‌গণ বারে বারে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের বাণিজ্যিক অধিকারসমূহ কোন প্রকার রফা বা চুক্তির অন্তর্গত হইতে পারে না। এই সব অধিকার আপনারা অনুমোদন করুন। সরকার জোর করিয়া বলিতে পারেন, 'দেখ, অমুক কোম্পানীর ডিরেক্টারদের শতকরা ৫০ জন ভারতীয় হওয়া চাই। নহিলে উহাকে অচল করিয়া দিব।' আমরা কোনক্রমেই স্বীকার করিয়া লইতে পারি না যে, সরকারের সে কথা বলিবার ক্ষমতা আছে। আমরা চাই আমাদের (বৃটিশ বণিক্‌দের) অধিকারসমূহ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকিবে।" বৃটিশ বণিক্‌দের বক্তব্য ছিল এই যে, "এই কনফারেন্সে আমরা আপনাদের বহু প্রকার রাষ্ট্রীয় দাবীর সমর্থন করিয়াছি। যেমন সকল প্রদেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগও বাদ যায় নাই) এবং কেন্দ্রীয় শাসন যাহাতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট কয়েকটি বিষয় ব্যতীত দায়ী থাকে, সেজন্য চেষ্টা করিয়াছি। আমরা এই সমস্ত সমর্থন করিয়াছি এই বিশ্বাসে যে, আপনারা আমাদের বাণিজ্যিক অধিকারসমূহকে স্বীকার করিবেন। কিন্তু আপনারা যদি তাহা না করেন তবে আপনাদের দাবীসমূহ সমর্থন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।"

প্রঃ। এর পর কি হইল ?

উঃ। এর পর উভয় পক্ষের মধ্যে যে আপোষ রফা হইবে তার সম্ভাবনা প্রায় রহিল না। বৃটিশ বণিক্ সম্প্রদায় বলিলেন, "এ অবস্থায় কেমন করিয়া মতের মিল হইতে পারে ?" হাওয়াটা কতক ফিরিল যখন নেহ্‌রু রিপোর্টের উল্লেখ করিয়া দেখান হইল যে, প্রজা বা নাগরিক বলিতে আমাদের মতে কি বুঝায়। স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু বলিলেন, "আপনারা এত ভয় পাইতেছেন কেন ? কংগ্রেসের সহিযুক্ত নেহ্‌রু রিপোর্টে নাগরিক বলিতে কি বুঝায় একবার চাহিয়া দেখুন। আপনাদের ত এইরূপ প্রজা হইবার ও প্রজার অধিকার দাবী করিবার কোন বাধা

নাই।” স্যর তেজ বাহাদুরের কথায় কিছু ফল ফলিল। তখন এই বিষয়টি মুলতুবি থাকে। তারপর ১৯শে জানুয়ারী উভয় পক্ষে বহু বেসরকারী আলোচনার পর প্রস্তাবটি নিম্নলিখিত আকারে গৃহীত হয়, “বৃটিশ বণিক্ সম্প্রদায়ের কথায় এই মূলনীতি সাধারণভাবে মানিয়া লওয়া হইল যে, ভারত-জাত প্রজাদের এবং ভারতে বাণিজ্য করিতেছে এমন বৃটিশ বণিক্ সম্প্রদায়, হৌস্, এবং কোম্পানীর মধ্যে অধিকারগত পার্থক্য করা হইবে না এবং এই সব অধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তুল্য ব্যবহারমূলক এক যথোপযুক্ত সমঝোতা কায়েম করা হইবে।”

প্রঃ। এই রফাটা কি করিয়া সম্ভবপর হইল ?

উঃ। আপনারা রিপোর্ট পড়িয়া অথবা খবরের কাগজ হইতে জানিতে পারেন নাই এজন্য কি প্রকার কাঠখড় পোড়াইতে হইয়াছে। উভয় পক্ষের লোক নানা উপলক্ষ্যে পরস্পর মেলামেশা করিয়া পরস্পরের মনোভাব বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টিত ছিলেন। এই সব কাজ শুধু বক্তৃতা করিয়া সম্পন্ন করা যায় না, এটা আমরা গোড়া হইতেই বুঝিয়াছিলাম বলিয়া আমরা যাকে বলে সাম্‌নাসাম্‌নি বেসরকারীভাবে কথাবার্ত্তা কওয়া তাহাই বেশী অবলম্বন করিয়াছিলাম ; এবং তাহাতে ফল মন্দ হয় নাই। এই প্রস্তাব যখন কনফারেন্সে উপস্থিত করা হয়, তখন কনফারেন্স প্রায় শেষ হইয়াছে। অথচ এই একটা বিষয়ে কোন প্রকার রফা না হওয়ায় সব পণ্ড হইয়া যাইতে বসিয়াছিল। এই সময়ে কি প্রকার প্রতিকূল অবস্থার সহিত আমাদের সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল তাহা বুঝানো দুষ্কর। ভারতীয় বৃটিশ বণিক্ সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য চার্চ্চিল প্রমুখ রক্ষণশীল দলের কয়েকজন, বিলাতের কতিপয় নামজাদা খবরের কাগজ এবং বৃটিশ ডেলিগেশন সকলে এককাট্টা হইয়া লড়িতেছিলেন। এইরূপ অবস্থায় আমাদের পক্ষে ইহার বেশী আর কিছু করা সম্ভবপর হয় নাই। আমি জানি, এই প্রস্তাবটিকে আমাদের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার পক্ষে আরো অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবের ‘নিয়ন্ত্রিত’ (রেগুলেটেড্) কথাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা দরকার। কারণ ঐ কথাটার প্রয়োগের উপরেই আমাদের স্বত্ব স্বার্থের রক্ষা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। ধরুন যদি কোন ভারতীয় ব্যবসার জন্য সাবসিডি ইত্যাদির দরকার হয়, তবে তখন ইহার প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যাইবে আমরা বাস্তবিক কিছু লাভ করিলাম কি না। আশা করি, এই সমঝোতা দলিলে লিপিবদ্ধ করিবার কালে এ সম্বন্ধে সর্ত্তটি এইরূপ হইবে যাহাতে ভারতীয়গণের বিভিন্ন প্রকার আর্থিক, শিল্পসংক্রান্ত ও বাণিজ্যিক প্রচেষ্টায় কোন বাধা না ঘটে। এটি অত্যাবশ্যক ; ইহা না হইলে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্ কথার কথা মাত্র থাকিয়া যাইবে।
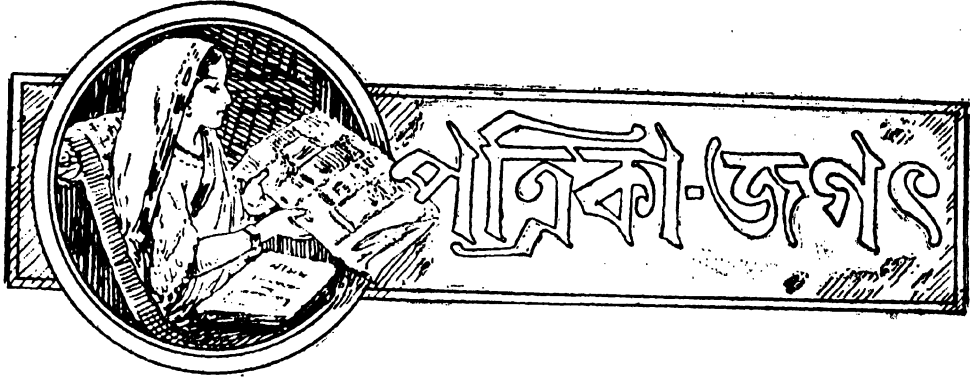
“দি ইন্‌বেষ্টরস্ রিবিউ” (৭ই মার্চ্চ, ১৯৩১)

রবারের চাষ নিয়মিত করার কথা

ভারতে ওলন্দাজ সরকারের এলাকাভুক্ত জমিতে মোটা রকমে রবার আবাদ করা হয়। সুতরং রবারের দর ওঠা-নামা করিলে ওলন্দাজ সরকারকেই বেশী বেগ পাইতে হয়। তথাপি আদিম অধিবাসীদিগের সহিত সংঘর্ষ লাগিবার ভয়ে সরকার রবার আবাদী-জমির পরিমাণ কম করিতে চাহেন না। স্যর জর্জ্জ ম্যাক্সওয়েল করের মাত্রা বাড়াইয়া আবাদী জমির পরিসর খাটো করিয়া আনিতে চাহেন; কিন্তু ওলন্দাজ সরকার সে কথাতেও কান দেন না এই কারণে যে, তাহা হইলে অবৈধভাবে রবার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রবারের জন্য আবাদী জমির পরিমাণ খাটো করিবার দিকে ওলন্দাজ সরকার মোটেই মাথা ঘামান না। অতএব তাঁহাদের সহায়তা ছাড়া আবাদী জমির পরিমাণ কম করিয়া রবারের দর চড়াইয়া দেওয়া যায় কিনা তাহা বিবেচ্য।

এ ডাব্লু ষ্টিল বলেন যে, আবাদী জমির পরিসর খাটো না করিলে ভবিষ্যতে রবার-ব্যবসায়ীদের বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। ১৯৩০ সনে আন্দাজ করা হইয়াছিল যে, ওলন্দাজ সরকারের জমি হইতে অন্যূন ৪৮১,০০০ টন রবার পাওয়া যাইবে; কিন্তু দেখা যায় যে, উৎপাদন তাহা অপেক্ষাও ১৩,০০০ টন অধিক হইয়াছে। সমস্ত দুনিয়ার রবারের যোগান অনুমানের চেয়ে ৫৩০,০০০ টন অধিক হইয়াছে। সুতরাং যদি পরে ইহা অপেক্ষা অধিক উৎপাদন নাও হয়, তবু ব্যবসাদারদিগের পক্ষে লাভ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। সিমিংটন ও সিন্‌ক্লেয়ার কোম্পানী বলেন যে, বাজার যদি ভাল না হয়, তবে মাত্র ৬৯০,০০০ টন রবার বিক্রয় হওয়াই মুস্কিল হইবে; এমন কি ১৯৩০ সনের মত ৬৭৬,০০০ টন বিক্রয় করাও কষ্টকর হইবে।

ষ্টিল্ বলেন যে, বিচক্ষণ হিসাবনবীশগণের মতে ১৯২৯ সনে রবার উৎপন্ন হইবার কথা ছিল ৮৪৩,০০০ টন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দাঁড়াইয়াছিল ৮৬১,০০ টন। বাড়্‌তি অংশটা নাকি ১৯২৮ সনের বাড়্‌তি ষ্টক্। তাঁহারাই আবার হিসাব করিয়া বসিয়াছেন যে, ১৯৩৫ সনে মোট উৎপাদন দাঁড়াইবে ১,২৯৫,০০০ টন। যদি এ কথার মধ্যে একটুও সত্য থাকে তবে আগামী কয়েক বৎসর ব্যবসায়ীদের পক্ষে বড় দুর্ব্বৎসর হইবে। সুতরাং কোন উপায়ে উৎপাদনটাকে নিয়মিত করিতে পারা যায় কিনা দেখা দরকার। হিসাবনবীশেরা হিসাব করিয়াছিলেন যে, ১৯২৯ সনে (বন্য উৎপাদন বাদদিলে) মোট উৎপাদন হইবে ৮১৩,০০০ টন। ইহার মধ্যে ১১০,০০০ টন হইবে ওলন্দাজ-অধিকৃত স্থানে। আর ১৯৩৫ সনের মোট উৎপাদন হইবে ১২৩০,০০০ টন। তার মধ্যে ৩৫০,০০০ টন হইবে ওলন্দাজ-অধিকৃত স্থানে। তাহা হইলে ওলন্দাজ-অধিকৃত স্থান ব্যতীত অন্য স্থানসমূহের উৎপাদন দাঁড়ায় ৮৮০,০০০ টন। এই হিসাবটাকে ছয় বৎসরের গড় হিসাবে ভাগ করিলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়

(১) মোট উৎপাদন		(২) ওলন্দাজ-অধিকৃত স্থানের	(৩) বাকীস্থানের উৎপাদন
১৯২৯	৮১৩,০০০	১১০,০০০	৭০৩,০০০
১৯৩০	৮৮২,৫০০	১৫০,০০০	৭৩২,৫০০
১৯৩১	৯৫২,০০০	১৯০,০০০	৭৬২,০০০
১৯৩২	১,০২১,৫০০	২৩০,০০০	৭৯১,৫০০
১৯৩৩	১,০৯১,০০০	২৭০,০০০	৮২১,০০০
১৯৩৪	১,১৬০,৫০০	৩১০,০০০	৮৫০,৫০০
১৯৩৫	১,২৩০,০০০	৩৫০,০০০	৮৮০,০০০

ওলন্দাজ-অধিকৃত স্থান বাদ দিয়া যদি যোগান খাটো করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে এই ৩ কলমের দিকে নজর রাখিয়াই করিতে হইবে। ষ্টিল সাহেব বলেন যে, পূর্ব্বাপর বৎসরের মজুত রবারের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবৎসর (১৯৩১) ৫০% উৎপাদন কমাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে মোট উৎপাদন ৭৬২,০০০ টন কমিয়া গিয়া ৫১১,০০০ টন দাঁড়াইবে। দর কিছু চড়িয়া যাইবে এবং ৫০% উৎপাদন কমানোর ফলে বড় বড় ক্ষেতগুলির উৎপাদন-খরচাও ২৫% কমিয়া যাইবে। সুতরাং চলতি বাজার-দর ৪ পেঃ হিসাবে বিক্রয় না হইয়া আমাদের অনুমান মত যদি প্রতি পাউণ্ড ৭ পেঃ দরে বিক্রয় হয় তাহা হইলে দাঁড়ায় :

৭৮১,০০০ টন ৭পেঃ দরে	২৪,৪৯২,০০০ পা
২৫% উৎপাদন-খরচা কম	৭,১১২,০০০ পা
	৩২,০০৪,০০০ পা
৭৬২,০০০ টন ৪ পেঃ দরে	২৮,৪৪৮,০০০ পা
উৎপাদন খাটো করায় লাভ	৩,৫৫৬,০০০ পা

সুতরাং ষ্টিল-প্রবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বনের ফলে শুধু রবার-আবাদী জমির পরিমাণ কমিবে না, টাকা পয়সার দিক দিয়াও মোটা লাভ হইবে। ষ্টিল বলেন, এই উপায়ে ১৯৩৪ সনে উৎপাদন নর্ম্যাল হইয়া দাঁড়াইবে। ১৯৩৫ সনের ৮৮০,০০০ টন রবার উৎপাদকগণ (উপরের হিসাব মত) যদি ২৬% আবাদ কমাইয়া দেন তাহা হইলে লাভের আশা করা অসঙ্গত হইবে না।

উৎপাদন খাটো করিলে	৬৫০,০০০ টন ৭ পেঃ দরে	৪২,৪৬৬,৬৬৬পা
যথেচ্ছ উৎপাদন করিলে	৮৮০,০০০ টন ৭ পেঃ দরে	৩২,৮৫৩,৩৩৩পা
উৎপাদন খাটো করায় লাভ		৯,৬১৩,৩৩৩পা

ষ্টিল সাহেবের কথার সারমর্ম্ম এই যে, ওলন্দাজ-অধিকৃত স্থানসমূহের কথা ছাড়িয়া দিয়াও বাকী সকলের একতাবদ্ধ হইয়া উৎপাদনের পরিমাণ খাটো করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, নতুবা ধ্বংস নিশ্চিত।

"বাঙ্গালার বাণী"—ঢাকা
বীমা-জগতে নব প্রচেষ্টা

এ দেশের বীমা-জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে বিষম ঝড় উঠিয়াছে, বোধ করি পৃথিবীর অপর কোন দেশের চেয়েই তুলনায় তার প্রকোপ কম নয়। একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে উহা বরং অনেকটা বেশী বলিয়াই মনে হয়। কেন না এদেশে তার দু'টি দিক্ চোখে পড়ে।

প্রথমতঃ, দেশী ও বিদেশী কোম্পানীর মধ্যে। দেশী কোম্পানীগুলির ভিতর সামান্য দু' চারিটি ছাড়া অধিকাংশই বিদেশী কোম্পানীদের সহিত তুলনায় আঁটিয়া উঠিতে অক্ষম। এই অক্ষমতার দোষ ঢাকিতে তাহারা দেশ-হিতৈষণা ও জাতীয় আর্থিক উন্নতি বিধানের দোহাই পাড়িতেছে; পক্ষান্তরে বিদেশী কোম্পানীগুলি তাহাদের বহুকালের আয়ত্ত পাকাপোক্ত বনিয়াদের উপর অধিষ্ঠিত থাকিয়া দাখিল করিতেছে অসংখ্য সুখ, সুবিধা ও সুযোগের নজির।

এ'র চেয়েও আবার মারাত্মক হল দেশী কোম্পানীদের নিজেদের ভিতরকার খাওয়া-খাওয়ি। পুরাতন ক্ষমতাবান্ দেশী কোম্পানী সাধারণের চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরে তাহাদের অতীতের বোনাসের ইতিহাস, বর্ত্তমানের চমকপ্রদ উন্নতির নথি-পত্র, আর নূতন কোম্পানীর ঐ সমস্ত অভাবের ঘাটতি শুধরিয়া লইতে হয় কম প্রিমিয়ামের সুযোগ দিয়া, অথবা এজেন্টদের জন্য উঁচু হারে কমিশনের বরাদ্দ করিয়া। নূতন কোম্পানীদের অবলম্বিত এ দু'টি পন্থাই যে অর্থ-

নীতির দিক্ হইতে নিজেদের ভবিষ্যতের পায়ে কুড়ুল মারা তাহা না বলিলেও বোঝা কষ্ট নয়।

অনেক সময় আবার এমনও দেখা যায় যে, কমিশনের যা চুক্তি তাহাতে এজেণ্টরা সন্তুষ্ট নন্, ফলে কোনও একটা বিশেষ কোম্পানীর কাজেই স্থায়িভাবে লাগিয়া থাকেন না এবং মাঝে মাঝে যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন করেন তাহা নিতান্তই গর্হিত। এজেণ্টদের এই সমস্ত কাজের ফলে সমগ্র ইন্‌সিওরেন্স ব্যবসায়ের সুনামের মূলে তো আঘাত লাগেই, বিশেষভাবে সাধারণের দৃষ্টিতে খাটো হইয়া পড়ে সেই সমস্ত কোম্পানী, যেগুলি চালিত হয় ভারত-বাসীর মাথাদ্বারা।

এই সমস্ত বিপত্তি এড়াইতে হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াইয়া চলিতে হইবে। অর্থাৎ হয় উপস্থিত কোম্পানী-গুলি যে সমস্ত সুবিধা-সুযোগের ব্যবস্থা করিয়াছে নবাগতদের তার চেয়েও বেশী সুবিধা সুযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে, অথবা দেশে বীমার চাহিদা বাড়াইতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে নূতন নূতন কর্ম্ম-ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে।

বীমার চাহিদা বাড়ানোর মানে,—যাহারা সাধারণতঃ বীমা করিয়া থাকেন কিংবা করিবেন তাঁহাদের আয় এবং সঞ্চয়-শক্তির বৃদ্ধি, অথবা সংখ্যার বৃদ্ধি কিংবা এই দু'য়েরই সমন্বয়।

এদেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই আজ প্রাণে প্রাণে একটি কথা স্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থার অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাদের কারো পক্ষেই আয় এবং সঞ্চয়-শক্তি বাড়ানো সম্ভব নয়। এখানে আমি মধ্যম শ্রেণীভুক্ত লোকদের কথাই বলিতেছি। আধুনিক বীমাকারীদের মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই বেশী। অথচ ইহাদের আয় এবং সঞ্চয়শক্তি বর্দ্ধিত না হইয়া বরং দিন দিন খর্ব্ব হইয়াই পড়িতেছে। তাহার প্রতিকারের কোন সহজ উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই এক্ষেত্রে বলিতে হইবে যে, এই মধ্য শ্রেণী যে বীমা ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতেছেন তাহা খুবই শক্তিহীন। আশঙ্কা হয় ভবিষ্যতে হয়তো ইহা নিস্তেজ হইয়াই পড়িবে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বীমাকারীদের সংখ্যা বাড়াইতে হইলে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভিতর বীমার প্রসার ও বিস্তৃতি আবশ্যক। কিন্তু এখানকার বাধাও বড় কম নয়।

দু'দিন আগে যাঁরা উচ্চ-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, ব্যবসায়-ক্ষেত্রের চিরস্থায়ী মন্দা এবং নানাপ্রকার বিপর্য্যয়ের গুরুতর ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া আজ তাঁরা মধ্যশ্রেণীদের স্তরে নামিয়া আসিয়াছেন। যাঁরা দু'চারজন এখনো ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপালাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হ'ন নাই, তাঁরা আবার ভারতীয় কোন প্রতিষ্ঠানে টাকা খাটাইতে রাজী নন্।

তারপর নিম্নশ্রেণী, অর্থাৎ কৃষক ও চাষী সম্প্রদায়,—মধ্যশ্রেণীর নীচে যাহাদের স্থান;—তাহাদের ভিতর বীমা-ব্যবসা আদৌ বিস্তার লাভ করে নাই। ইহাদের মধ্যে বীমার প্রয়োজনও খুব বেশী, ক্ষেত্রও প্রশস্ত। অনায়াসে বহু কোম্পানী এখানে বহু বৎসর অবাধে কাজ চালাইতে পারে।

কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে-জাতীয় বীমা প্রচলিত, দরিদ্র কৃষক এবং চাষী সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহার সহিত যুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। এমন কি সাধারণ জীবন-বীমা করাও ইহাদের ক্ষমতার বহু উর্দ্ধে।

তবে সঙ্ঘবদ্ধ-বীমার ব্যবস্থা থাকিলে হয়তো ইহাদের ভিতর কাজ হইবার আশা ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে তাহার প্রচলন হইতে এখনও ঢের দেরী।

কৃষক-শ্রেণীর ভিতর বর্ত্তমান সময়ে এজাতীয় কোন বীমার বাজার তৈরী করিয়া লইবার মত সুযোগও বড় বেশী নাই। অথচ সাধারণ ইন্‌সিওরেন্স পদ্ধতির ভিতর হইতেই এমন কোন একটা নূতন প্রণালীর বীমার উদ্ভাবন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, যাহা কৃষকশ্রেণীর পক্ষে মোটেই বেখাপ্পা হইবে না।

কৃষকশ্রেণীর লোকদের জীবনের উপর বীমা না করিয়া তাহাদের কোন প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের উপর বীমা করা চলিতে পারে।

সম্প্রতি প্রায় এক বৎসর যাবৎ মান্দ্রাজ প্রদেশের কোনও একটি কোম্পানী এইরূপ একটি অভিনব পদ্ধতির

প্রচলন করিয়াছেন। আমাদের পাঠকবর্গ হয়তো এই নব-প্রসূত কোম্পানীর কার্য্যকলাপ এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে উৎসুক হইবেন।

উক্ত কোম্পানী এই নবাবিষ্কৃত পদ্ধতির নামকরণ করিয়াছেন শস্য-বীমা।

প্রিমিয়ামের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে—নিম্নভূমির একর প্রতি দেড় টাকা এবং উচ্চ ভূমির একর প্রতি চারি আনা হিসাবে। ঐ কোম্পানী জোত এবং কৃষি উভয় প্রকার স্বত্বের উপরই বীমা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই বীমার নিয়ম এই যে, অজন্মা কিংবা শস্যের পূর্ণহানি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলে বীমাকারিগণ কোম্পানীকে যে পরিমাণ প্রিমিয়াম দিয়াছেন কোম্পানী অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ টাকা তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিবেন। আংশিক শস্যহানি হইলেও আংশিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া বীমাকারিগণ জমির উন্নতিকল্পে উৎপন্ন শস্য জামিন রাখিয়া কম সুদে কোম্পানীর নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতে পারিবেন।

শস্যহানির ফলে প্রতি বৎসরই আমাদের দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দ্দশার মর্ম্মান্তিক কাহিনী আমাদের কানে আসে। সেদিক্ হইতে দেখিলে এই নবাবিষ্কৃত পন্থাটি যে খুবই হিতকর তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

শস্য জামিন রাখিয়া কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা করিলে সত্য সত্যই কৃষকদিগের বড় উপকার করা হয়। অর্থের অনটনের সময় কৃষকেরা শস্য জামিন রাখিয়াও ঋণ গ্রহণে সমর্থ না হওয়ায়, অভাবের তাড়নায় যা-তা দামে ঘরের ফসল বিক্রী করিতে বাধ্য হয়। বাস্তবিক পক্ষে এ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান না থাকাই আমাদের দেশের কৃষকদের দুঃখ-দৈন্যের অন্যতম প্রধান কারণ।

উক্ত কোম্পানীর আরো একটি নূতন উদ্দেশ্য আছে। তাঁহারা সমস্ত দেশ জুড়িয়া "পেনি সেভিংস্ ব্যাঙ্কের" (এক আনা হারে জমা রাখার ব্যাঙ্ক) প্রতিষ্ঠা করিবেন।

কৃষকশ্রেণীর লোকদিগকে মিতব্যয়িতা শিক্ষা দিবার পক্ষে একমাত্র এইজাতীয় সঞ্চয়-পন্থা অবলম্বন করাই প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। কেন না কৃষকদের পক্ষে এক সঙ্গে কখনো বেশী টাকা জমানো সম্ভব নয়। কাজেই তাহাদের কাছে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিংবা সঞ্চয়শীলতা সম্বন্ধে লম্বা চওড়া বক্তৃতা করিয়া কোন ফল পাইবার আশা কম।

এই কোম্পানীর নিয়মানুযায়ী প্রতি সপ্তাহে এক আনা হারে জমা রাখিয়া তিন বৎসরে আমানতকারী এক থোকে দশ টাকা লাভ করিতে পারিবেন।

যাঁহারা এদেশের গ্রামবাসীদের ঘরের কথা সম্যক্ অবগত আছেন তাঁহারা ভালরূপেই জানেন সপ্তাহে এক আনা পয়সা সঞ্চয় করাই তাহাদের পক্ষে কতটা কষ্টসাধ্য।

এই অর্থ সংগ্রহ এবং নিরাপদে রক্ষা করিয়া পুনরায় সেই সঞ্চিত টাকা আমানতকারীদের প্রত্যর্পণ করার জন্য একটি পাকা রকমের প্রতিষ্ঠান থাকা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য লইয়াই উক্ত কোম্পানী এই "পেনি সেভিংস্ ব্যাঙ্কের" প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

লক্ষ লক্ষ গ্রামের ভিতর উক্ত কোম্পানীর ব্যাঙ্ক স্থাপনের এই চেষ্টা যদি সত্য সত্যই ফলবতী হয়, তাহা হইলে তিন বৎসর অন্তে দেখা যাইবে যে, এদেশের গ্রামগুলি কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়া দেশব্যাপী সর্ব্বত্র "শস্য-বীমার" প্রচলন, "পেনি সেভিংস্ ব্যাঙ্কের" প্রতিষ্ঠা এবং শস্য জামিন রাখিয়া কম সুদে "কৃষি-ঋণের" ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। যদি বাস্তবিক ইহা সম্ভব হইয়া ওঠে, তাহা হইলে এই দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের জন্য ইহা অপেক্ষা বেশী উপকারজনক আর কিছু করার আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কারক, অর্থনীতিবিদ্ প্রভৃতি দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণ বহু বৎসর যাবৎ যে সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, এগুলি সেই সমস্ত বিষয়েরই অঙ্গীভূত।

এই শুভ প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হইলে কৃষক-সম্প্রদায় এবং ক্রেতাদের মধ্যে থাকিয়া যে সমস্ত লোক দু'হাতে টাকা লুটিয়া পকেট ভর্ত্তি করিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহাদের শোষণের পথও রুদ্ধ হইবে। *

* ইন্সিওরেন্স ও ফিন্যান্স রিভিউ পত্রে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"ফ্রীডম্ অব্ এসোসিয়েশন" (দল বা সঙ্ঘ বাঁধিবার স্বাধীনতা বা অধিকার)। জেনেহবা হইতে আন্তর্জ্জাতিক মজুরসঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই নামের কেতাবখানি ৫ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বাহির হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের নাম তুলনামূলক বিশ্লেষণ, পৃঃ সংখ্যা ১৬+১৪০, প্রকাশের তারিখ ১৯২৭। মূল্য ২ শি। বাকী খণ্ডগুলির কোন্‌টিতে কোন্ কোন্ দেশের বিষয় আলোচিত হইয়াছে তা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :

২য় খণ্ড—গ্রেট বৃটেন, আইরিশ ফ্রী ষ্টেট্, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস্, সুইট্‌স্যারল্যাণ্ড; পৃঃ ১২+৪১৩; ১৯২৭; ৫শি।

৩য় খণ্ড—জার্ম্মাণি, পূর্ব্বতন অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরি, অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোহবাক গণতন্ত্র, পোল্যাণ্ড, বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ, ডেন্মার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিন্‌ল্যাণ্ড; পৃঃ ১৬+৪০৮; ১৯২৮; ৫শি।

৪র্থ খণ্ড—ইতালি, স্পেন, পর্ত্তুগাল, গ্রীস্, সার্ব্ব-ক্রোট-শ্লোভিন রাজ্য, বুলগেরিয়া, রুমাণিয়া: পৃঃ ১২+৪০৬; ১৯২৮; ৫শি।

৫ম খণ্ড—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, ল্যাটিন আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান; পৃঃ ১৬+৪৬২; ১৯৩০; ৫শি।

এই গেল বইয়ের নাম-করণ। এই প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মহাভারতের মত বিরাট বস্তুটি লইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া পাতা উল্টাইলেও লাভ আছে। আমাদের ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে কেতাবের একটা অসম্পূর্ণ ধারণা দেওয়াও সম্ভবপর নহে। প্রথম ভাগে বিষয়-বস্তুটিকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথম ভাগটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করা যাক্।

অনুসন্ধানের উৎপত্তি

ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে একত্র বা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক মজুর কনফারেন্সের কয়েকটি বৈঠকে অনেক বার নানা প্রশ্ন উঠানো হইয়াছে। ১৯১৯ সনের ওয়াশিংটন সম্মেলনে ট্রেড্ ইউনিয়ান আইন ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতায় বাধা সম্বন্ধে তর্কপ্রশ্ন করা হইয়াছিল। ১৯২০ সনে গবর্ণিং বডিকে এই প্রশ্ন লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সঙ্ঘের ডিরেক্টার হাঙ্গেরি সরকারের নিকট হইতে এক টেলিগ্রাম পান। তাহাতে তাঁকে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি যেন হাঙ্গেরিতে আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন "শ্বেত ভীতি"র জনরব ও মজুরদের নিপীড়ন করার কথার মূলে কোন সত্যতা আছে কি না। ডিরেক্টার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সঙ্ঘের তিনজন কর্ম্মচারীকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠান। ইঁহারা ফিরিয়া আসিয়া যে রিপোর্ট দেন তাহা "হাঙ্গেরির ট্রেড্ ইউনিয়ানের অবস্থা" নামক পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হয়।

১৯২০ সনের শেষে আন্তর্জ্জাতিক মজুরসঙ্ঘ স্পেনের সাধারণ মজুরদের ইউনিয়ান হইতে এই এক অভিযোগ পান যে, স্পেনিশ গবর্ণমেণ্ট মজুরদের সঙ্ঘ বাঁধার ক্ষমতার প্রতিকূল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। যেখানে গবর্ণমেণ্ট নিজে নালিশ করিতেছেন না, সেখানে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া মজুরসঙ্ঘ এ বিষয়ে কোন প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

এইরূপে ক্রমে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বাণিজ্য ব্যপদেশে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার ক্ষমতার সমস্যাটা আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সঙ্ঘের বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা দরকার। ১৯২৩ সনের অক্টোবরে গবর্ণিং বডিতে এই ধরণের একটা প্রস্তাবও পাশ করা হয়। সেই প্রস্তাব অনুসারে প্রথমতঃ সদস্য দেশসমূহে কোথায় কিরূপ স্বাধীনতা আছে তাহা লইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। সে অনুসন্ধানের ফল গবর্ণিং বডিতে ১৯২১ সনে পেশ করা হয় ও পরে মজুর-সঙ্ঘের পত্রিকায় ছাপানো হয়। গবর্ণিং বডি আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সঙ্ঘকে ঐ অনুসন্ধান আরো চালাইয়া লইতে অনুরোধ করেন। যে সব পক্ষ এই প্রকার সঙ্ঘবদ্ধতায় সংশ্লিষ্ট তাহাদের সকলের মতামত (মনিব ও মজুরদের সভায় যেগুলি প্রস্তাবরূপে গৃহীত হইয়াছে সেগুলি) লওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তারপর তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত আইনকানুনই যথেষ্ট নয়, বিভিন্ন বিচারালয়ে যেভাবে সেগুলির ব্যাখ্যা করিয়া রায় দেওয়া হইয়াছে সেগুলিও গ্রহণ করা দরকার বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং ১৯২৪ সনে দ্বিতীয় আর একটি রিপোর্ট দাখিল করা হয়, তাহাতে মনিব ও মজুরদের সভাসমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবাবলী স্থান লাভ করে। পরে আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সঙ্ঘ এই অনুসন্ধান না থামাইয়া অন্যান্য দেশেও চালাইতে থাকেন।

আন্তর্জ্জাতিক বিধি তৈরীর সম্ভাবনা

১৯২৪ সনে জাপানী মজুরদের সদস্য শ্রীযুক্ত সুযুকি আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সম্মেলনে এক প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। প্রস্তাবের সারমর্ম্ম এই যে, সঙ্ঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতার মূলনীতিকে মানিয়া লওয়া দরকার, তাহা হইলেই আন্তর্জ্জাতিক সামাজিক এক বিধানের জন্ম ও প্রসারতা সম্ভবপর হইবে (মজুর সঙ্ঘের অস্তিত্বও এই জন্য) বলিয়া মজুরদের এইরূপ স্বাধীনতাকে মানিয়া লইতে হইবে। ইতিমধ্যে আন্তর্জ্জাতিক মজুরসঙ্ঘ তাঁদের অনুসন্ধান চালাইতে থাকুন। অনুসন্ধান শেষ হইলে কোন সম্মেলনের বৈঠকে এই মূলনীতির স্বীকারসূচক এক প্রস্তাবের খস্‌ড়া উপস্থিত করা হইবে।

এইরূপে ১৯২৬ সনের আন্তর্জ্জাতিক মজুর অফিসের সম্মুখে দুইটি বক্তব্য উপস্থিত থাকিল: (১) সঙ্ঘবদ্ধ হইবার ক্ষমতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ করা, (২) আন্তর্জ্জাতিক মজুর-সম্মেলনে এমন একটি প্রস্তাবের খস্‌ড়া দাখিল করা যাতে বাণিজ্যার্থে সঙ্ঘবদ্ধতা আইনসঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হয়। অনুসন্ধান-কার্য্য চালাইবার জন্য একটি প্রশ্নপত্রের খস্‌ড়া তৈরী হইল। যে অনুসন্ধান চালাইবার কথা হইল তাহার দুই প্রধান বিভাগ এই: (১) ভিন্ন ভিন্ন দেশে সঙ্ঘবদ্ধতার অধিকার সম্বন্ধে যে সব আইন প্রচলিত আছে সেগুলি পরীক্ষা করা, (২) সাধারণভাবে এক তুলনামূলক জরীপ করা।

আন্তর্জ্জাতিক মজুর সম্মেলনে প্রশ্নপত্রটি আলোচনার্থ উপস্থাপিত করা হয়। সম্মেলনে নানা আলোচনার ফলাফল এইরূপ:

মনিবদের কথা আলোচনা করিবার জন্য নিযুক্ত কমিটি বাণিজ্যার্থ সঙ্ঘবদ্ধতার স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বড় করিয়া দেখিবার ও যুক্তভাবে কার্য্য করার অধিকারকে সঙ্কীর্ণতর করিবার পক্ষে মত দেন। অন্যদিকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতার দ্বারা কোন্ কোন্ অধিকারের কথা বলা হয়, তাহা স্পষ্টভাবে জানিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হন।

প্রশ্নপত্রের খস্‌ড়া নানা রকম পরিবর্ত্তনের পর নিম্নলিখিত আকার ধারণ করে:

১। সম্মেলন সঙ্ঘবদ্ধতার স্বাধীনতা সম্বন্ধে এক সমঝৌতা খাড়া করিবে, আপনি কি ইহার অনুমোদন করেন?

২। আপনি কি মনে করেন বাণিজ্যের জন্য এই সমঝৌতা বা সঙ্ঘবদ্ধতা ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার অধিকার রক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা উচিত হইবে?

৩। আপনি কি মনে করেন সঙ্ঘবদ্ধতার অধিকারের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা যথেষ্ট?

মজুর ও মনিবদের আইনসঙ্গত প্রথাগুলি মানিয়া

লইয়া স্বাধীনভাবে তাদের খুসীমত যে কোন সংগঠন স্বীকার করিয়া লইয়া মজুর ও মনিব হিসাবে সমষ্টিগত-ভাবে নিজেদের রক্ষা ও নিজেদের পার্থিব ও নৈতিক স্বার্থসংরক্ষণ। সঙ্ঘবদ্ধ না হইবার অধিকারও অবশ্য ইহা দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

৪। আপনি কি মনে করেন নিম্নে ট্রেড্ ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যের অধিকারের ঠিক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে ?

ট্রেড্ ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এমন সব উপায়ে নিজেদেরে উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করা যাহা রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মোতায়েন আইন-সমূহের বিরোধী নয়।

"শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মোতায়েন আইনসমূহের বিরোধী নয়" এ কথায় আপনি কি বুঝেন ?

[আইনগত স্বাতন্ত্র্য স্বীকার সম্বন্ধে ইহার পর একটু-খানি প্রশ্ন ছিল।]

৫। সমঝোতাতে আর কোন্ কোন্ কথা যোগ করিয়া দেওয়া আপনি সমীচীন বলিয়া মনে করেন ?

প্রশ্নপত্র খাড়া হইল বটে, কিন্তু সম্মেলনে উহার স্বপক্ষে ২০ ও বিরুদ্ধে ৬৬ ভোট হইল। সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধতার স্বাধীনতা আর পরবর্ত্তী সম্মেলনের এজেণ্ডায় রহিল না। কিন্তু এ বিষয়ে অনুসন্ধান-কার্য্য স্থগিত থকিল না। সেই অনুসন্ধানের ফলেই এই ৫ খণ্ড কেতাব বাহির করা সম্ভবপর হইয়াছে। এগুলির জন্য যে কিরূপ বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। শুধু সঙ্ঘবদ্ধতার সমস্যা নয়, ট্রেড্ ইউনিয়ান আইন ও ট্রেড্ ইউনিয়ান্ আন্দোলন সম্বন্ধে সকল তথ্য ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পরিচয়

প্রথম ভাগের সূচীপত্রটা নিম্নে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহা হইতে এই কেতাবের মূল্য নির্দ্ধারণের সহায়তা হইবে :

১। সোৎসিয়ালে ঠেওরি ডেস্ কাপিটালিস্‌মুস্ (পুঁজিনিষ্ঠা সম্বন্ধে সামাজিক তত্ত্ব), এডওয়ার্ড হাইমান। জে সি বি মোহ্‌র, ট্যুবিঙ্গেন। ১৯২৯। ৭+২৭২ পৃঃ।

২। এগ্রিকালচারাল কো-অপারেশন ইন ইংল্যাণ্ড। (ইংল্যাণ্ডে কৃষি-সমবায়)। হোরেস্ প্লাঙ্কেট ফাউণ্ডেশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। জর্জ রুট্‌লেজ, লণ্ডন। ১৯৩০। ৭+২৭২ পৃঃ।

৩। হ্বাট'স রঙ্ হ্বিথ্ আনএমপ্লয়মেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স (বেকার বীমার গলদ্‌টা কোথায়), রোণাল্ড সি ডেবিসন। লংম্যান্‌স, গ্রীন অ্যাণ্ড কো, লণ্ডন। ১৯৩৩। পৃঃ ৭৩। ২শি ১পে।

৪। ডী হাউপ্টঠেওরিয়েন ডের ফোল্কস্ হ্বির্ট-শাফ্‌ট্‌স্ লেহ্‌রে (সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে সাতটী তত্ত্ব), ওঠমার্ স্পান। ফেরলাগ্ ফোন কুয়েলে অ্যাণ্ড মেয়ের, লাইপৎসিগ। ১৯৩০। পৃঃ ১৬+২৩২।

৫। এ হিষ্টরি অব্ সোশ্যালিজম্ (সমাজতন্ত্রবাদের ইতিহাস), এম্ এফ্ মার্শহাম। এ অ্যাণ্ড সি ব্ল্যাক, লণ্ডন। ১৩০। পৃঃ ৮+৩২৮।

৬। দি ফ্যামিলি বাজেট এনকোয়ারি ইন্ জাপান (জাপানে পারিবারিক আয়-ব্যয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান) ১৯২৬-২৭, ডি মাৎসুদা। আন্তর্জ্জাতিক সংখ্যা বিজ্ঞান পরিষদের ১৯শ সেশন। তোকিয়ো। ১৯৩০। ৩৯ পৃঃ।

৭। দি অরিজিন অ্যাণ্ড ডেবেলপমেণ্ট অব সোশ্যাল লেজিস্‌লেশন ইন্ চায়না (চীনদেশে সামাজিক আইন কানুনের উদ্ভব ও প্রসার), ডি এইচ্ জেফারসন ল্যাঞ্চ। ইয়েনচিং বিশ্ববিদ্যালয়স্থ সমাজ-বিজ্ঞান ও সমাজ-সেবা বিভাগের তাঁবে প্রকাশিত। সম্পাদক ম্যাক্সওয়েল ষ্টুয়ার্ট। ১৯৩০।৭৩ পৃঃ।

৮। দি ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল রিহ্বলিউশন ইন্ দি সাউথ (দক্ষিণে শিল্প-বিপ্লব), ব্রাডাস মিচেল ও জর্জ্জ সিন্‌ক্লেয়ার মিচেল। জন হপকিন্‌স্ প্রেস্। বাল্টিমোর। ১৯৩০। ১৫+২৯৮।

৯। দি নিউ এডুকেশন ইন্ দি সোহ্বিয়েট রিপাবলিক (সোহ্বিয়েট গণতন্ত্রে নব শিক্ষা-প্রণালী), আলবার্ট পি পিঙ্কেহ্বিচ। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার সকলের আন্তর্জ্জাতিক পরিষদের তাঁবে প্রকাশিত। জর্জ্জ এস্ কাউণ্টস্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। জন ডে, নিউ ইয়র্ক। ১৯২৯। ১৬+৪০৩ পৃঃ।

মুনাফার কথা

(ডেভিড্ রিকার্ডো)

বিভিন্ন বিনিয়োগ [=ব্যবসায়] হইতে প্রাপ্ত পুঁজির মুনাফাগুলির মধ্যে পরস্পর একটা অনুপাত থাকে এবং ঐ সমস্ত মুনাফার একদিকে ও সম-পরিমাণে উঠানামা করিবার প্রবণতা রহিয়াছে, ইহা দেখানো হইয়াছে। মুনাফার হারে স্থায়ী তারতম্য ঘটিবার কারণটা কি, আর তার ফলে সুদের হারেই বা কেন স্থায়ী পরিবর্ত্তন হয়, তা এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আমরা [ইতিপূর্ব্বে] দেখিয়াছি যে, খাজানা-দিতে-হয়-না-এ-প্রকার পুঁজিপাটার সহযোগে যতটা শ্রম শস্য উৎপাদন করিবার জন্য দরকার হয়, তাতেই তার দর (১) নির্দ্ধারিত হয়। এও দেখিয়াছি যে, শিল্প-পণ্যাদি উৎপাদন করিতে যে অনুপাতে বেশী বা কম শ্রম প্রয়োজন হয়, সেই অনুপাতে ঐ সব দ্রব্যের দর চড়ে অথবা নামে। দর বাধিয়া দেয় যে জমিখণ্ড, তার চাষীকে খাজানা বাবদ্ উৎপন্ন ফসলের কোন অংশ দিতে হয় না, যে শিল্পী শিল্প-দ্রব্য নির্ম্মাণ করে তাকেও না। তাদের দ্রব্যাদির মোট দামটা মাত্র দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায় ; একটা হয় পুঁজির মুনাফা, অন্যটা শ্রমের মজুরি।

(১) পাঠককে এই কথা মনে রাখিতে অনুরোধ করি যে বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করিবার উদ্দেশ্যে আমি মুদ্রার দাম অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, অতএব দরের তারতম্যের কথা বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, দ্রব্যের তারতম্যের কথা বলা হইতেছে।

ধর যেন শস্য ও শিল্প-দ্রব্য সর্ব্বদা এক দরে বিকাইতেছে ; এ অবস্থায় মজুরি যে অনুপাতে নামিবে অথবা চড়িবে মুনাফা সেই অনুপাতে চড়িবে বা নামিবে। কিন্তু মনে কর যেন উৎপাদন করিতে বেশী শ্রম দরকার হয় বলিয়া শস্যের দর চড়িতেছে, এ কারণে শিল্প-দ্রব্যের দর কিন্তু চড়িবে না, ওগুলা উৎপাদন করিতে আর অতিরিক্ত পরিমাণ শ্রম দরকার হয় নাই। সে সময়ে যদি মজুরি আগের মত থাকে, শিল্পীদের মুনাফাও পূর্ব্ববৎ রহিবে। কিন্তু যদি শস্যের দর চড়ার সঙ্গে সঙ্গে মজুরিও চড়ে, আর তা নিশ্চয়ই চড়িবে, তবে শিল্পীদের মুনাফা যে নামিবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

যদি কোন শিল্পী তার পণ্যাদি সর্ব্বদা সমান মুদ্রার বিনিময়ে বেচে, ধর ১০০০ পাউণ্ডে বেচে, তবে ঐ সব পণ্য নির্ম্মাণ করিতে তার যতটা শ্রম দরকার হয় ততটা শ্রমের দরের উপর তার মুনাফা[র পরিমাণ] নির্ভর করিবে। ৬০০ পাউণ্ড মজুরি দিতে হইলে তার যত মুনাফা থাকিবে, ৮০০ পাউণ্ড মজুরি দিতে হইলে তার চেয়ে কম থাকিবে। সুতরাং যে অনুপাতে মজুরি বাড়িবে সেই অনুপাতে মুনাফা হ্রাস পাইবে। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করা চলে যে, যদি কাঁচা মালের দর চড়ে তবে চাষীকে মজুরি বাবদ্ অধিকতর খরচ করিতে হইলেও তার মুনাফার হার পূর্ব্ববৎ থাকিবে কি না। নিশ্চয়ই না ঃ কারণ তাকে যে শুধু শিল্পীর মত নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিককে বেশী মজুরি দিতে হইবে, তা নয়, তাকে বাধ্য হইয়া খাজানা দিতে হইবে, অথবা আগের সমান ফসল পাইবার জন্য অতিরিক্তসংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হইবে। কাঁচা ফসলের দরটা ঐ খাজানা বা অতিরিক্ত সংখ্যার অনুপাত অবধি মাত্র বাড়িবে, তার থেকে বাড়্তি মজুরি খরচাটা উঠিয়া আসিবে না।

যদি শিল্পী ও চাষী উভয়ে দশ জন করিয়া লোক [কাজে] লাগায়, বৎসরে জনপ্রতি মজুরি ২৪ পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ২৫ পাউণ্ড হইলে, প্রত্যেককে [মজুরি বাবদ] মোট ২৪০ পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে ২৫০ পাউণ্ড দিতে হইবে। শিল্পীকে আগের সমান পণ্য পাইতে হইলে, তার অতিরিক্ত খরচ এই টাকাতেই কুলাইয়া যাইবে, কিন্তু নূতন জমির চাষীকে সম্ভবতঃ আরো একজন অতিরিক্ত লোক রাখিতে

হইবে ও তার মজুরিতে আরো ২৫ পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইবে। পুরাণা জমির চাষীকেও এই ২৫ পাউণ্ড দিতে হইবে, তবে তা খাজানা বাবদ্। এই অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ না করিলে যদি চলিত তবে শস্যের দরও চড়িত না, খাজানাও বাড়িত না। সুতরাং একজন শুধু মজুরি বাবদ্ ২৭৫ পাউণ্ড দিবে, অন্য জন উহা মজুরি ও খাজানা, উভয়ের দরুণ দিবে, কিন্তু প্রত্যেককেই শিল্পীর চেয়ে ২৫ পাউণ্ড বেশী দিতে হইবে। এই অতিরিক্ত ২৫ পাউণ্ড দেওয়ার ফল এই হয় যে, চাষীর কাঁচা মালের দর বাড়ে ও তার মুনাফা শিল্পীর মুনাফার সমান হইয়া দাঁড়ায়। বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ববিশিষ্ট, সেজন্য এটা আমি আরো পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইব।

আমরা দেখাইয়াছি যে সমাজের আদিম অবস্থায় ভূমিজাত ফসলের দামে জমিদার ও শ্রমিক উভয়ের অল্পমাত্র ভাগ থাকে এবং যে অনুপাতে ধন বাড়ে ও খাদ্য-সংগ্রহ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া দাঁড়ায় সেই অনুপাতে এই ভাগ বাড়ে। এও দেখাইয়াছি যে, খাদ্যের চড়া দাম হেতু শ্রমিক যা পায় সে অংশের দাম বাড়িবে, তথাপি তার প্রকৃত অংশ হ্রাস পাইবে; অন্যদিকে জমিদারের অংশের দাম যে শুধু বাড়িবে, তা নয়, তার পরিমাণও বাড়িবে।

জমিদার ও মজুরের লওয়ার পর জমির যে বাকী ফসল থাকে, তা ন্যায়ত চাষীর, ও তা' থেকেই তার পুঁজির মুনাফা জোটে। একথা হয়ত বলা হইবে যে, সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদিও মোট ফসলের অনুপাতে তার প্রাপ্যটা কমিয়া যায়, তবু ঐ ফসলের দাম চড়িয়া যায় বলিয়া সে, এবং জমিদার ও মজুরও বটে, দামের দিক্ থেকে বেশীই পাইবে।

ধর, এরূপ বলা হইবে যে, যখন শস্যের দর ৪ পাউণ্ড হইতে ১০ পাউণ্ডে চড়িয়া যায়, তখন সব চেয়ে ভাল জমির ১৮০ কোয়ার্টার [শস্য] ৭২০ পাউণ্ডের পরিবর্তে ১৮০০ পাউণ্ডে বিকাইবে; সুতরাং এ অবস্থায় জমিদার ও মজুর খাজানা ও মজুরি বাবদ্ বেশী দাম পাইতেছে প্রমাণ করিতে পারা গেলেও চাষীর মুনাফার দামও বাড়িতেছে। কিন্তু তা' অসম্ভব। কেন, তাই এখন দেখাইব।

প্রথমতঃ অপেক্ষাকৃত খারাপ জমিতে শস্য জন্মানোর কাঠিন্য যে অনুপাতে বাড়িবে মাত্র সেই অনুপাতে শস্যের দর চড়িবে। আগেই দেখাইয়াছি যে, যদি দশজন লোকের শ্রমে কোন এক বিশেষ জমিতে ১৮০ কোয়ার্টার গম পাওয়া যায় ও তার দাম হয় কোয়ার্টার প্রতি ৪ পাউণ্ড বা একুনে ৭২০ পাউণ্ড; এবং যদি আরো দশজন অতিরিক্ত লোকের শ্রমে ঐ জমিতে বা অন্য কোন জমিতে আরো ১৭০ কোয়ার্টার মাত্র বেশী উৎপাদন করা যায়, তবে গমের দর ৪ পাউণ্ড হইতে চড়িয়া ৪পা. ৪শি. ৮পে. হইবে; কারণ ১৭০ : ১৮০ :: ৪পা. : ৪পা. ৪শি. ৮পে.। অন্য কথায়, ১৭০ কোয়ার্টার উৎপাদন করিতে একস্থানে ১০ এবং অন্যত্র মাত্র ৯·৪৪ জন লোক দরকার হয় বলিয়া, বৃদ্ধিটা ৯·৪৪ : ১০ বা ৪ পা. : ৪ পা. ৪ শি. ৮ পে. এই অনুপাতে হইবে। এই প্রকারে দেখানো যায় যে, যদি দশ জন অতিরিক্ত লোকের শ্রমে মাত্র ১৬০ কোয়ার্টার উৎপাদন করা যায়, তবে দর আরও চড়িয়া ৪ পা. ১০ শি. হইবে; ১৫০ কোয়ার্টার হইলে, ৪ পা. ১৬ শি. ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যখন খাজানা দিতে হয় না এমন জমিতে ১৮০ কোয়ার্টার জন্মে ও কোয়ার্টার প্রতি দর থাকে ৪ পাউণ্ড, তখন বিকাইয়াছে ... ... ৭২০ পাউণ্ডে

এবং যখন ঐ প্রকার জমিতে ১৭০ কোয়ার্টার জন্মে ও দর চড়িয়া ৪পা. ৪শি. ৮পে, হয়, তখনও বিকাইয়াছে ... ... ৭২০ পাউণ্ডে

তদ্রূপ ১৬০ কোয়ার্টার ৪পা. ১০শি. হিসাবে ৭২০ ”

এবং ১৫০ কোয়ার্টার ৪পা. ১৬শি. হিসাবে সেই ৭২০ ”

এখন বেশ বোঝা যাইতেছে যে, এই সব সমান দাম থেকে চাষীকে যদি কখনো গমের দর ৪পা. থাকায় যে মজুরি নির্দ্ধারিত হয় তা দিতে হয়, কখনো বা গমের দর বাড়িলে তদনুযায়ী দিতে হয়, তবে শস্যের দর যে অনুপাতে বাড়ে তার মুনাফার হারও সেই অনুপাতে কমিয়া যায়।

আমার মনে হয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, শস্যের যে দর-বৃদ্ধিতে মজুরের মুদ্রা-মজুরি বাড়ে, তা চাষীর মুনাফার মুদ্রা-দামে হ্রাস ঘটায়।

কিন্তু পুরাণা ও অপেক্ষাকৃত ভাল জমির চাষীর

কপালও কোন অংশে অন্য প্রকার হইবে না। তাকেও মজুরিতে বেশী খরচ করিতে হইবে এবং ফসলের দর যতই কেন বাড়ুক্ না, সেই ৭২০ পাউণ্ডই নিজের ও সর্ব্বদা সমানসংখ্যক মজুরদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে হইবে, তার চেয়ে বেশী কিছু রাখিতে পারিবে না। সুতরাং যে অনুপাতে তার মজুরেরা বেশী পাইবে, সেই অনুপাতে তার ভাগে কম পড়িবে।

যখন শস্যের দর ৪পা. ছিল, তখন ১৮০ কোয়ার্টারের সমস্তটাই চাষী পাইত এবং বেচিয়া ৭২০ পাউণ্ড পাইত। যখন শস্যের দর চড়িয়া ৪পা. ৪শি. ৮পে. হইল, তখন সে তার ১৮০ কোয়ার্টার হইতে খাজানা বাবদ্ ১০ কোয়ার্টারের দাম দিতে বাধ্য হইল, ফলে বাকী ১৭০ কোয়ার্টার হইতে সে ৭২০ পাউণ্ডের বেশী পাইল না। যখন শস্যের দর আরো চড়িয়া ৪পা. ১০শি. হইল, তখন সে খাজানা বাবদ্ ২০ কোয়ার্টার বা তার দাম দিল, আর তার রহিল ১৬০ কোয়ার্টার ও তাহা হইতেই সে আগের সেই ৭২০ পাউণ্ড পাইল।

দেখা যাইতেছে যে, একটা নির্দ্দিষ্ট অতিরিক্ত পরিমাণ ফসল পাওয়ার জন্য অধিকতর শ্রম ও পুঁজি লাগানো আবশ্যক হওয়ার ফলে শস্যের দরে যে রকম বাড়্‌তিই ঘটুক না কেন, সে বাড়্‌তি সর্ব্বদা দামে অতিরিক্ত খাজানা বা নিযুক্ত অতিরিক্ত শ্রমিকের সমান হইবে। এর ফলে সে শস্য ৪ পাউণ্ডে, ৪পা. ১০শি. বা ৫পা. ২শি. ১০পে. যাতেই বেচুক্, খাজানা শোধ করিবার পর তার ভাগে যা থাকিবে সে তার দরুণ প্রকৃতপক্ষে একই দাম পাইবে। তাই আমরা দেখিতে পাই যে চাষীর ভাগে যে ফসল থাকে তা ১৮০, ১৭০, ১৬০ অথবা ১৫০ কোয়ার্টার, যাই হোক্, সে সেজন্য সর্ব্বদা সেই ৭২০ পাউণ্ডই পায়; দরটা পরিমাণের বিপরীত অনুপাতে বাড়িয়া থাকে।

তা' হ'লে দেখা যাইতেছে যে, খাজানাটা সর্ব্বদা খাদকের ঘাড়ে চাপে, চাষীর ঘাড়ে কখনো চাপে না, কারণ তার ক্ষেতের ফসল যদি একলাগা ১৮০ কোয়ার্টার হয়, দর চড়িলে সে কম পরিমাণের দামটা নিজের জন্য রাখিবে এবং বেশী পরিমাণের দামটা জমিদারকে দিবে। কিন্তু বাদটা সে এমনভাবে দিবে যে তাতে তার সর্ব্বদা সেই ৭২০ পাউণ্ডই হাতে থাকিবে।

এও দেখা যাইতেছে যে, সব ক্ষেত্রে সেই এক ৭২০ পাউণ্ডই মজুরি ও মুনাফার মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইতেছে। যদি জমি হইতে প্রাপ্ত কাঁচা ফসলের দাম এই দামের চেয়ে বেশী হয়, তবে তা পরিমাণে যতই হোক্ না খাজানার অন্তর্গত হইবে। যদি বেশী না হয়, তবে কোন খাজানা থাকিবে না। মজুরি বা মুনাফা উঠুক্ কি নামুক্, এই ৭২০ পাউণ্ড হইতেই উভয়কে যোগাইতে হইবে। এক দিকে মুনাফা কখনো এতটা চড়িতে পারে না যে, তাতে ৭২০ পাউণ্ডের অনেকখানি গ্রাস করিয়া ফেলিবে, মজুরদের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি যোগাড় করিবার মত যথেষ্ট কিছু হাতে থাকিবে না; অন্য দিকে মজুরিও এত বাড়িয়া যাইতে পারে না যে, এই টাকা হইতে মুনাফার জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না।

সুতরাং [দাঁড়াইল এই যে] সকল অবস্থাতে, কাঁচা ফসলের দরে ও মজুরিতে এক সঙ্গে বৃদ্ধি ঘটিলে, কাঁচা ফসলের দর-বৃদ্ধির ফলে কৃষি ও শিল্পঘটিত মুনাফা হ্রাস পায়।[১] যদি খাজানা শোধ করিবার পর চাষীর হাতে যে ফসল থাকে তজ্জন্য সে অতিরিক্ত কোন দাম না পায়, যদি শিল্পী তার নির্ম্মিত শিল্পের জন্য অতিরিক্ত কোন দাম না পায় এবং যদি উভয়ে মজুরিতে অধিকতর দাম দিতে বাধ্য হয়, তবে মুনাফা বাড়িলে মজুরি নামিবে এই কথাটার প্রকৃষ্টতর প্রমাণ আর কিছু থাকিতে পারে কি?

জমিদারের খাজানার কোন অংশ চাষীকে শোধ করিতে

১ পাঠক অবগত আছেন যে সুজন্মা বা অজন্মা হেতু অথবা লোকবলের অবস্থানের হঠাৎ পরিবর্ত্তনে টানের হ্রাস-বৃদ্ধি হেতু আকস্মিক তারতম্যসমূহ আমরা গণনার মধ্যে আনিতেছি না। আমরা শস্যের স্বাভাবিক ও অবিরত দরের কথা কহিতেছি, আকস্মিক ও পরিবর্ত্তনশীল দরের কথা কহিতেছি না।

হয় না, তা সর্ব্বদা ফসলের দর দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় এবং নিশ্চিতরূপে খাদকের ঘাড়ে চাপে, তবু খাজানা নীচু করিয়া রাখায় অথবা ফসলের স্বাভাবিক দর নীচু করিয়া রাখায় চাষীর বিশেষ স্বার্থ আছে। সেও ত কাঁচা মালের এবং কতক কাঁচা মাল দিয়া তৈরী জিনিষের খাদক বটে; আর সব খাদকের সহিত একযোগে তারও স্বার্থ হইবে দর নীচু রাখা। কিন্তু শস্যের দর চড়া হইলে মজুরির পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া সে ঐ বিষয়েই বিশেষ করিয়া মাথা ঘামাইবে! ৭২০ পাউণ্ড সর্ব্বদা ৭২০ পাউণ্ডই থাকিবে, বাড়িবেও না কমিবেও না; অথচ যখনি শস্যের দর বাড়িবে তখনি তাকে ঐ টাকা হইতে অনবরত দশ জন করিয়া লোক লাগাইতে হইতেছে বলিয়া মজুরি বাবদ্ বেশী টাকা দিতে হইবে। মজুরি সম্বন্ধে আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি যে, কাঁচা ফসলের দর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরি অবশ্যম্ভাবী রূপে চড়ে। গণনার সুবিধার জন্য ৫৮পৃষ্ঠায় [আর্থিক উন্নতি, ১৩৩৬, পৃঃ ১৩৬] একটা আঁকজোক দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যদি কোয়ার্টার প্রতি গম ৪ পাউণ্ড হইলে, বাৎসরিক মজুরি দাঁড়ায় ২৪ পাউণ্ড তবে

	পা.	শি.	পে.		পা.	শি.	পে.
গমের দর	৪	৪	৮	হইলে, মজুরি দাঁড়াইবে ..	২৪	১৪	০
	৪	১০	০		২৫	১০	০
	৪	১৬	০		২৬	৮	০
	৫	২	১০		২৭	৮	৬

তারপর, মজুরদের ও চাষীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার জন্য অপরিবর্ত্তনীয় ৭২০ পাউণ্ড আছে। তা' থেকে:

	পা.	শি.	পে.		পা.	শি.	পে.		পা.	শি.	পে.
যখন গমের দর ...	৪	০	০	মজুরেরা পাইবে	২৪০	০	০	চাষী পাইবে	৪৮০	০	০
	৪	৪	৮		২৪৭	০	০		৪৭৩	০	০
	৪	১০	০		২৫৫	০	০		৪৬৫	০	০
	৪	১৬	০		২৬৪	০	০		৪৫৬	০	০
	৫	২	১০		২৭৪	৫	০		৪৪৫	১৫	০[১]

---

১ শস্যের দামে উপরি লিখিত তারতম্য ঘটিলে ১৮০ কোয়ার্টার শস্য জমিদার, চাষী ও মজুরদের মধ্যে নিম্নলিখিত অনুপাতে ভাগ হইবে:

প্রতি কোয়ার্টারের দর			খাজানা	মুনাফা	মজুরি	মোট
পা.	শি.	পে.	গমে	গমে	গমে	
৪	০	০	নাই	১২০ কোঃ	৬০ কোঃ	১৮০
৪	৪	৮	১০ কোঃ	১১১·৭	৫৮·৩	
৪	১০	০	২০	১০৩·৪	৫৬·৬	
৪	১৬	০	৩০	৯৫	৫৫	
৫	২	১০	৪০	৮৬·৭	৫৩·৩	

ঐ অবস্থায় মুদ্রা [মাপে] খাজানা, মজুরি ও মুনাফা নিম্নপ্রকার হইবে:

প্রতি কোয়ার্টারের দর			খাজানা			মুনাফা			মজুরি			মোট		
পা.	শি.	পে.	পা.	শি.	পে.	পা.	শি.	পে.	পা.	শি.	পে.	পা.	শি.	পে.
৪	০	০	নাই			৪৮০	০	০	২৪০	০	০	৭২০	০	০
৪	৪	৮	৪২	৭	৬	৪৭০	০	০	২৪৭	০	০	৭৬২	৭	৬
৪	১০	০	৯০	০	০	৪৬৫	০	০	২৫৪	০	০	৮১০	০	০
৪	১৬	০	১৪৪	০	০	৪৫৬	০	০	২৬৪	০	০	৮৬৪	০	০
৫	২	১০	২০৫	১৩	৪	৪৪৫	১৫	০	২৭৪	৫	০	৯২৫	১৩	৪

ধর গোড়ায় চাষীর পুঁজিপাটা ছিল ৩০০০ পাউণ্ড। প্রথম বারে তার পুঁজির মুনাফা ৪৮০ পাউণ্ড হইলে তা ১৬% হারে হয়। যখন তার মুনাফা কমিয়া ৪৭৩ পাউণ্ড হয়, তখন তা ১৫·৭% দাঁড়ায়।

৪৬৫	...	...	১৫·৫
৪৫৬	...	...	১৫·২
৪৪৫	...	...	১৪·৮

কিন্তু মুনাফার হার আরো বেশী নামিয়া যাইবে, কারণ মনে রাখা চাই যে, চাষীর পুঁজিপাটা হ'চ্ছে বহু পরিমাণে এই সব কাঁচা মাল,—তার শস্য, বিচালি, তার আ-মাড়াই গম ও বার্লি, তার ঘোড়া ও গরু এবং ফসল চড়িয়া যাওয়ায় এগুলার প্রত্যেকটার দর বাড়িবে। সোজাসুজি তার মুনাফা ৪৮০পাউণ্ড হইতে ৪৪৫পাউণ্ড ১৫শিলিংএ নামিবে। কিন্তু এইমাত্র যে কারণ বলিলাম সে কারণে যদি তার পুঁজিপাটা ৩০০০ পাউণ্ড হইতে ৩২০০ পাউণ্ডে বাড়ে, তবে শস্য ৫ পা. ২ শি. ১০ পে. এ বিকাইলে মুনাফার হার ১৪% এর নীচে নামিবে।

শিল্পী যদি তার কারবারে ৩০০০ পাউণ্ড লাগাইয়া থাকে, তবে মজুরি-বৃদ্ধির ফলে সে তার পুঁজিপাটা বাড়াইতে বাধ্য হইবে। তবেই সে ঐ ব্যবসা চালাইতে সমর্থ থাকিবে। পূর্ব্বে যদি তার শস্যাদি ৭২০ পাউণ্ডে বিকাইয়া থাকে, এখনও সেই দরে বিকাইতে থাকিবে। কিন্তু, পূর্ব্বে শ্রমের মজুরিতে ২৪০ পা. যাইত, এখন শস্য ৫ পা. ২ শি. ১০ পে.এ বিকাইতে থাকিলে তাতে ২৭৪ পা. ৫ শি. যাইবে। প্রথম বারে ৩০০০ পাউণ্ডের বাকী ব্যয়ে ৪৮০ পা. হইবে তার মুনাফা, আর দ্বিতীয় বারে সে মাত্র ৪৪৫ পা. ১৫শি. মুনাফা পাইবে পুঁজিপাটা বাড়াইয়াও। অতএব চাষীর মুনাফার হারে যেমন পরিবর্ত্তন হইবে, তার মুনাফাতেও সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

কাঁচা মাল চড়িয়া গেলে যার দরের অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটে না, এমন দ্রব্য খুব বিরল। কারণ, অধিকাংশ দ্রব্য তৈরী করিতেই কিছু না কিছু ভূমিজ কাঁচা মাল দরকার হয়। গম চড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তূলার জিনিষ, লিনেন এবং কাপড়ের দর চড়িবে। কিন্তু এগুলি যে কাঁচা মাল হইতে তৈরী হয় সেই কাঁচা মালে অধিকতর শ্রম ব্যয়িত হয় বলিয়াই দর চড়িবে, শিল্পী ঐ সব দ্রব্য নির্ম্মাণ করিবার জন্য যে মজুরদের নিযুক্ত করিয়াছে তাদের বেশী [টাকা] দিতে হইতেছে বলিয়া [চড়িবে] না।

সকল ক্ষেত্রে, যে শ্রম ব্যয়িত হইতেছে তার দাম বেশী দিতে হয় বলিয়া নয়, কিন্তু বেশী শ্রম ব্যয়িত হইতেছে বলিয়া পণ্যাদি[র দর] চড়ে। গহনা-পত্র, লোহা, প্লেট বা তামার জিনিষ চড়িবে না, কারণ ধরণীর পৃষ্ঠজাত কোন কাঁচামালই এগুলার নির্ম্মাণে দরকার হয় না।

হয়ত বলা হইবে যে, আমি ধরিয়া লইয়াছি যে, কাঁচা ফসলের দর যেমন বাড়িবে অমনি মুদ্রা মজুরি বাড়িবে, কিন্তু একটা অন্যটার ফল নাও হইতে পারে, মজুর কম স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। সত্য বটে, পূর্ব্বে শ্রমের মজুরি উঁচু স্তরে থাকিতে পারে, এবং তা কিছু হ্রাস করা চলিতে পারে। তা যদি হয়, তবে মুনাফার নিম্নগামিতা বাধা পাইবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর ক্রমাগত বাড়িতে থাকিলে মজুরির মুদ্রা-দর নামিবে অথবা পূর্ব্ববৎ থাকিবে, এমন কল্পনা করাও সম্ভব নহে। সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির দর স্থায়িভাবে চড়িতে পারে না, যদি না আগে বা পরে মজুরি চড়ে।

খাদ্য ছাড়া অন্যান্য যে সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিতে শ্রমের মজুরি ব্যয়িত হয়, সেগুলার দরে কোন বৃদ্ধি ঘটিলে মুনাফার উপর ক্রিয়াটা এইরূপ বা প্রায় এইরূপ হইত। এ প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিতে মজুরের বেশী দর দেওয়া আবশ্যক হইবে বলিয়া সে আরো মজুরি চাহিতে বাধ্য হইবে। আর যা মজুরি বাড়ায়, তা নিশ্চিতরূপে মুনাফা কমায়। কিন্তু ধর যেন মজুরের দরকার হয় না এমন কতকগুলা জিনিষ, রেশম, ভেলভেট, আসবাব বা অন্য কোন দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে বেশী শ্রম ব্যয়িত হইতেছে বলিয়া দরে চড়িয়া গিয়াছে, তাতে মুনাফার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না কি? কখনোই না। কারণ, মজুরি-বৃদ্ধি ছাড়া কোন কিছুতেই মুনাফার পরিবর্ত্তন ঘটে না। রেশম ও

ভেলভেট ত আর মজুরদের কাজে লাগে না, সুতরাং ওগুলা মজুরি বাড়াইতে অপারগ।

আমি মুনাফার কথা মোটামুটিভাবে বলিতেছি বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, কোন পণ্যের বাজার-দর তার স্বাভাবিক বা আবশ্যকীয় দরকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে, কারণ হয়ত নবজাত টানের ফলে যতটা দরকার তার চেয়ে কম প্রচুরভাবে তা উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু এ অবস্থা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। ঐ পণ্য উৎপাদন করিতে যে পুঁজিপাটা লাগানো হইতেছে, তা থেকে চড়া [হারে] মুনাফা পাওয়া যাইতেছে বলিয়া স্বভাবতঃ ঐ শিল্পের দিকে পুঁজিপাটা আকৃষ্ট হইবে; তারপর যেই উচিত মূলধনটা জুটিবে এবং পণ্যের পরিমাণ ঠিকমত বাড়িবে, অমনি তার দর নামিবে ও শিল্পের মুনাফাটা সাধারণ মুনাফার কোঠায় নামিয়া আসিবে। সাধারণভাবে মুনাফার হ্রাস ঘটিলেও কোন কোন বিনিয়োগের মুনাফায় আংশিক বৃদ্ধি ঘটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। এক মুনাফার সহিত অন্য মুনাফার বৈষম্য থাকে বলিয়াই পুঁজিপাটা নিয়োগ হইতে নিয়োগান্তরে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং মজুরি বাড়ার ফলে এবং বর্ত্তমান লোকবলের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইবার কৃচ্ছ্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মুনাফা সাধারণতঃ নামিতে থাকিলে ও নিম্নতর স্তরে নামিয়া স্থির হইলেও, চাষীর মুনাফা, মধ্যে কতক সময়ের জন্য, আগেকার চেয়ে উঁচু [স্তরে] থাকিতে পারে। কতক কালের জন্য বহির্ব্বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের শাখাবিশেষও অনন্যসাধারণ কারণে স্ফীতিলাভ করিতে পারে; কিন্তু একথা স্বীকার করিলেই আসল তত্ত্বটা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যায় না। আসল তত্ত্বটা হচ্চে, চড়া বা নীচু মজুরি দ্বারা মুনাফা স্থিরীকৃত হয়, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর দ্বারা মজুরি স্থিরীকৃত হয়, এবং প্রধানতঃ খাদ্যদ্রব্যের দর দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর স্থিরীকৃত হয়, কারণ অন্য সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রায় সীমাহীনভাবে বাড়ানো চলে।

স্মরণ রাখা দরকার যে, টান-যোগানের আপেক্ষিক অবস্থা অনুসারেই প্রথমে বাজারে সর্ব্বদা দরের তারতম্য ঘটে। ৪০ শি. গজে কাপড় যোগাইয়া পুঁজির প্রচলিত মুনাফা পাওয়া সম্ভব হইলেও মোটামুটি ফ্যাসানের পরিবর্ত্তনে অথবা হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে টান বাড়ায় বা যোগান কমায় এমন অন্য কোন কারণে ঐ কাপড় ৬০ শি. বা ৮০ শি এ উঠিতে পারে। বস্ত্র-নির্ম্মাতারা কিছুকাল ধরিয়া অসম্ভব মুনাফা ভোগ করিবে, কিন্তু যতক্ষণ যোগান ও টান তাদের পুরাণা অবস্থায় আবার না ফিরিয়া আসে ততক্ষণ পুঁজিপাটা ঐ শিল্পে যোগ হইতে থাকিবে; তখন কাপড়ের দর আবার স্বাভাবিক বা প্রয়োজনীয় দর ৪০ শি. এ নামিয়া যাইবে। এই প্রকারে শস্যের টান যত বার বাড়িবে ততবার উহা[র দর] এত চড়িয়া যাইতে পারে যে তা'তে চাষী তার সাধারণতঃ লভ্য মুনাফার চেয়ে বেশী মুনাফা পাইতে পারে। উর্ব্বর জমি যদি প্রচুর থাকে, শস্য উৎপাদন করিতে প্রয়োজনমত পুঁজিপাটা লাগানো হইবার পর শস্যের দর আবার তার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া যাইবে এবং আগের মত মুনাফা হইবে। কিন্তু উর্ব্বর জমি যদি প্রচুর না থাকে, যদি এই অতিরিক্ত পরিমাণ উৎপাদন করিতে যা লাগা উচিত তার চেয়ে বেশী পরিমাণ পুঁজিপাটা ও শ্রম লাগে, তবে শস্য তার পূর্ব্ব স্তরে নামিবে না। শস্যের স্বাভাবিক দর বর্দ্ধিত হইবে, এবং চাষী স্থায়িভাবে অধিকতর মুনাফা ত পাইবেই না, পরন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চড়িয়া যাওয়ায় মজুরি-বৃদ্ধির অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ তাকে বাধ্য হইয়া হ্রাসপ্রাপ্ত [মুনাফার] হারে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

সুতরাং মুনাফার স্বাভাবিক প্রবণতা হইতেছে নীচের দিকে ঝুঁকিবার। কারণ, সামাজিক ও আর্থিক উন্নতিতে যে অধিকতর খাদ্যদ্রব্য দরকার হয়, তা উত্তরোত্তর বেশী শ্রম স্বীকার না করিলে পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যবশতঃ, এই ঝোঁক, এ যেন মুনাফার মাধ্যাকর্ষণ, থাকিয়া থাকিয়া বার বার বাধা পায়। প্রথম বাধা আসে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন-সম্পর্কিত কলকব্জার উন্নতি হইতে, তারপর আসে কৃষিবিজ্ঞানে নব নব আবিষ্কার হইতে। তাতে আগে যা শ্রম দরকার হইত তার কতকটা অংশ পরিত্যাগ করা চলে এবং ফলে মজুরের গোড়াকার (=প্রাইম) আবশ্যকীয় দ্রব্যের দর কমানো সম্ভব হয়। পরন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির

দর এবং শ্রমের মজুরি বাড়িবার একটা সীমা আছে। কারণ মজুরি যেই চাষীর সমগ্র প্রাপ্য ৭২০ পাউণ্ড হইয়া দাঁড়াইবে (যেমন পূর্ব্বতন উদাহরণে), অমনি সকল প্রকার সঞ্চয়ের অবসান হইবে। তখন ত কোন পুঁজিপাটা থেকেই আর কিছুমাত্র মুনাফা পাওয়া যাইবে না এবং কোন অতিরিক্ত শ্রমও আর দাবী করা চলিবে না, সুতরাং লোকবল শেষ সীমায় গিয়া পোঁছিবে। বস্তুতঃ, ইহার বহু পূর্ব্বেই মুনাফার অতিশয় নীচু হার সমস্ত সঞ্চয় থামাইয়া দিবে এবং মজুরদের শোধ করিবার পর দেশের প্রায় সমস্তটা ফসল জমির মালিকদের ও টাইথ্ ও ট্যাক্স গ্রহীতাদের সম্পত্তি হইয়া যাইবে।

অতএব, আগেকার অত্যন্ত অসম্পূর্ণ গণনাকে ভিত্তি করিয়া পাইতেছি এই যে, যখন শস্য কোয়ার্টার প্রতি ২০ পাউণ্ড ছিল, তখন দেশের সমগ্র নিট্ আয় জমিদারের হেপাজাত হইত। কারণ তখন প্রথমতঃ ১৮০ কোয়ার্টার উৎপাদন করিতে যে পরিমাণে শ্রম দরকার হইত সেই পরিমাণই ৩৬ কোয়ার্টার উৎপাদনে দরকার হয়; যেহেতু ২০ পা. : ৪ পা. : : ১৮০ : ৩৬। তা' হলে যে চাষী ১৮০ কোয়ার্টার উৎপাদন করিয়াছিল (এমন যদি কেহ থাকে, কারণ জমির উপর লাগানো নূতন ও পুরাণা পুঁজিপাটা এমনভাবে মিশিয়া যাইবে যে এটাকে কিছুতেই চিনা যাইবে না) সে বেচিত

১৮০ কোয়ার্টার, কোঃ ২০ পা. দরে ...	৩৬০০ পা.
১৪৪ কোঃর দাম { খাজানার জন্য জমিদারকে, ৩৬ কোঃ ও ১৮০ কোঃর পার্থক্য }	২৮৮০
৩৬ কোয়ার্টার	৭২০
৩৬ কোয়ার্টারের দাম মজুরদিগকে, সংখ্যায় দশ জন	৭২০

আর মুনাফার ঘরে কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না।

আমি ধরিয়া লইয়াছি এই ২০ পাঃ দরে মজুরেরা প্রতি বর্ষে ৩ কোঃ করিয়া ভোগ করিবে অথবা ... ৬০ পা.
এবং অন্যান্য দ্রব্যের জন্য তারা ব্যয় করিবে ... ১২

প্রত্যেক মজুরে পড়ে ৭২

অতএব দশ জন মজুরে বৎসরে ৭২০ পাঃ খরচ হইবে।

এই সব গণনা আমার মূল তত্ত্বটাকেই মাত্র বুঝাইবার জন্য। বলা বাহুল্য এগুলি উদাহরণ হিসাবেই লইয়াছি এবং সমস্ত ভিত্তিটা যা-খুসী ভাবে কল্পনা করিয়া লইয়াছি। আমি যদি ক্রমবর্দ্ধনশীল লোকবলের দরকার-মাফিক শস্য পাইতে হইলে ক্রমে ক্রমে যতজন মজুর দরকার হয়, মজুরের পরিবার যতখানি ভোগ করে, ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে দেখাইতে বসিতাম, তবে ফলাফলগুলি বিভিন্ন রকম হইত, কিন্তু তাতে আমার মূল তত্ত্বটা বিপর্য্যস্ত হইত না। বিষয়টিকে সোজা করিয়া বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য বলিয়া, আমি খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর-বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করি নাই। অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর-বৃদ্ধিকে সেগুলির উপাদানভূত কাঁচা মালের দর-বৃদ্ধির ফল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং তার ফলে আবার মজুরি আরো বাড়িবে এবং মুনাফা আরো নামিবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দরের এ অবস্থাটা স্থায়ী হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চয়ের আর কোন প্রকার স্পৃহা বর্ত্তমান থাকিবে না। কারণ সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কেহ আর সঞ্চয় করিতে চায় না; আর সঞ্চয় যখন ঐরূপে নিযুক্ত হয় তখনি মুনাফার উপর ক্রিয়া আরম্ভ হয়। স্পৃহা ব্যতীত কোন সঞ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং দরের এ অবস্থা আসিবেই না। মজুর যেমন মজুরি ছাড়া বাঁচিতে পারে না, চাষী এবং শিল্পীও তেমনি মুনাফা ছাড়া টিঁকিতে পারে না। যেই মুনাফার হ্রাস হইবে, অমনি তাদের সঞ্চয়-স্পৃহা কমিয়া যাইবে। তারপর মুনাফা যখন এত নীচে নামিয়া পড়ে যে, তাদের কষ্ট স্বীকার ও পুঁজিপাটা উৎপাদন-কার্য্যে লাগানো হেতু আসন্ন বিপদ্ বা ঝুঁকির পরিবর্ত্তে যথেষ্ট আদায় করিয়া লওয়া যায় না, তখন সঞ্চয়ের স্পৃহা একেবারে লোপ পাইবে।

পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে হইতেছে যে, আমার গণনায় যেরূপ অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে তার চেয়েও মুনাফার হার নামিয়া যাইবে। কেন না, আমার কল্পিত উদাহরণে ফসলের যে দাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহাতে, চাষীর পুঁজিতে

এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলির দাম বাড়িয়াছে বলিয়া চাষীর ঐ পুঁজির দাম বাড়িয়া যাইবে। শস্যের দর ৪ পাউণ্ড হইতে ১২ পাউণ্ডে চড়িবার পূর্ব্বেই, তার পুঁজিপাটার বিনিময়-দাম সম্ভবতঃ দুইগুণ হইয়া যাইবে, ৩০০০ পাউণ্ডের জায়গায় ৬০০০ পাউণ্ড হইবে। তা হইলে তার গোড়াকার পুঁজিপাটায় যদি মুনাফা হইয়া থাকে ১৮০ পা. বা ৬%, তবে পরে তার মুনাফা প্রকৃতপক্ষে ৩% এর চেয়ে উঁচু হারে উঠিতে পারিবে না। কারণ ৩% এ ৬০০০ পাউণ্ড হইতে আসে ১৮০ পা.। তারপর এই নূতন সর্ত্তেই শুধু কোন চাষী ৬০০০ পাউণ্ড হাতে লইয়া চাষের ব্যবসায় ঢুকিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার কারণে অল্পবিস্তর অনেক বণিক্ কিছু না কিছু সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। শুঁড়ি, নিঃসারক, বস্ত্রব্যবসায়ী, লিনেনের বেপারীর কাঁচা ও পাকা মালের পুঁজির দাম বাড়িবে বলিয়া তাদের মুনাফা-হ্রাসটা আংশিকভাবে পূরিত হইয়া যাইবে। কিন্তু ছুরিকাঁচি, গহনাপত্র ও অন্য অনেক দ্রব্যের নির্ম্মাতা এবং যাদের পুঁজিপাটা আগাগোড়া মুদ্রায় পর্য্যবসিত তারা মুনাফার হারের গোটা হ্রাস-ফলটাই ভুগিবে, তাদের ক্ষতি কোন প্রকারে পূরিত হইবে না।

জমিতে বারে বারে পুঁজিপাটা লাগানো ও মজুরি-বৃদ্ধির ফলে পুঁজির মুনাফার হার যতই বৃদ্ধি পাক্ না, মুনাফার মোট পরিমাণটা বাড়িবে, এটা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ধর, ১০০,০০০ পাউণ্ড বার বার লাগাইয়া মুনাফার হার ক্রমাগত নামিয়া যাইতেছে, ২০ হইতে ১৯, ১৮ ও ১৭% এ নামিয়া যাইতেছে, তা হ'লে এমন আশা করা চলে যে, প্রত্যেক পরবর্ত্তী পুঁজিপতির মোটা মুনাফাটা সর্ব্বদা বাড়িতে বাড়িতে যাইবে; ১০০,০০০ পাউণ্ড পুঁজিপাটায় যত পাওয়া যায়, ২০০,০০০ পাউণ্ডে তার চেয়ে বেশী পাওয়া যাইবে; ৩০০,০০০ পাউণ্ডে তার চেয়েও বেশী পাওয়া যাইবে; ইত্যাদি। যতক্ষণ পুঁজি-পাটা বাড়ানো হইবে, ততক্ষণ মোট মুনাফাও বাড়িতে থাকিবে, অবশ্য বৃদ্ধির হারটা ক্রমাগত কমিয়া যাইবে। কিন্তু এই অগ্রগতি কতক কাল মাত্র সত্য থাকিবে; যথা, ২০০,০০০ পাউণ্ডে ১৯%, ১০০,০০০ পাউণ্ডে ২০% এর চেয়ে বেশী; আর ৩০০,০০০ পাউণ্ডে ১৮%, ২০০,০০০ পাউণ্ডে ১৯% এর চেয়ে বেশী। কিন্তু পুঁজিপাটা যখন বাড়িতে বাড়িতে অনেক বড় হইয়া গিয়াছে, এবং মুনাফা একেবারে নীচে নামিয়াছে, তখন আরো পুঁজিপাটা লাগাইলে মোট মুনাফা কম হয়। ধর, সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০,০০,০০০ পাউণ্ড, মুনাফার হার ৭%; তা হলে সমগ্র মুনাফার পরিমাণ হইবে ৭০,০০০ পাউণ্ড। তারপর ঐ পুঁজিপাটায় যদি আরো ১০০,০০০ পাউণ্ড পুঁজিপাটা যোগ করা যায়, ও তাতে মুনাফার হার ৬% এ কমিয়া যায়, তবে পুঁজির মালিকেরা ৬৬,০০০ পাউণ্ড বা আগের চেয়ে ৪০০০ পাউণ্ড কম পাইবে, পুঁজির সমগ্র পরিমাণটা অবশ্য ১০,০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ১১,০০,০০০ পাউণ্ডে বাড়িয়া যাইবে।

যতক্ষণ পুঁজি হইতে একটুও মুনাফা পাওয়া যায়, ততক্ষণ এমন কোন সঞ্চয় সম্ভব নয় যার দরুণ শুধু ফসল-বৃদ্ধি নয়, দাম-বৃদ্ধিও হইবে না। ১০০,০০০ পা. পুঁজিপাটা বেশী লাগাইয়া, আগের পুঁজিপাটার কোন অংশকেই অকর্ম্মণ্য বা কম উৎপাদনশীল করিয়া ফেলা হইবে না। দেশের জমি হইতে ও শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে, এবং দাম বাড়িবে। পূর্ব্বেকার উৎপাদনের পরিমাণের সহিত নূতন উৎপাদনের দামটাই শুধু যোগ হইবে না, কিন্তু জমির ফসলের শেষাংশটুকু উৎপাদন করিবার কৃচ্ছ্রতা বাড়ার দরুণ গোটা ফসলেরই একটা নূতন দাম দাঁড়াইবে। কিন্তু যখন পুঁজিপাটা জমিতে জমিতে খুব বাড়িয়া যাইবে, তখন এই বর্দ্ধিত দাম সত্ত্বেও ঐ সঞ্চয় এরূপভাবে বণ্টিত হইবে যে, আগের চেয়ে কম দাম মুনাফার অঙ্কে পড়িবে, আর খাজানা ও মজুরির জন্য যা যাইবে তা বাড়িবে। এইরূপে যখন পুঁজিপাটায় ক্রমাগত ১০০,০০০ পাউণ্ড যোগ হইতে থাকিবে এবং মুনাফার হার ২০ হইতে ১৯, ১৮, ১৭% ইত্যাদিতে নামিতে থাকিবে, তখন বাৎসরিক লভ্য উৎপাদন পরিমাণে বাড়িবে এবং অতিরিক্ত পুঁজিপাটা লাগানোতে মোট যে অতিরিক্ত দাম হইবার কথা ছিল তার চেয়ে বেশী দামের হইবে। ২০,০০০ পাউণ্ড হইতে

৩৯,০০০ পাউণ্ডেরও উর্দ্ধে উঠিবে, তারপর ৫৭,০০০ পাউণ্ডকেও ছাড়াইবে। তারপর পুঁজিপাটা যখন আমাদের পূর্ব্ব কল্পনামতে ১০ লাখে দাঁড়াইয়াছে, তখন যদি আরো ১০০,০০০ পাউণ্ড যোগ করা যায় ও মুনাফার সমষ্টি প্রকৃতই আগের চেয়ে কম হয়, তবে তা সত্ত্বেও ৮,০০০ পাউণ্ডের চেয়েও বেশী দেশের রাজস্বে যোগ হইবে। কিন্তু এ যোগটা জমিদারদের ও মজুরদের রাজস্বেই ঘটিবে; তারা অতিরিক্ত যা ফসল হইবে তার চেয়েও বেশী পাইবে এবং অবস্থা সৌকর্য্যে পুঁজিপতির পূর্ব্বতন মুনাফাতে পর্য্যন্ত ভাগ বসাইতে সমর্থ হইবে। ধর শস্যের দর কোয়ার্টার প্রতি ৪ পাউণ্ড এবং সেজন্য আমাদের পূর্ব্ব গণনামত খাজানা শোধ করিয়া দিবার পর চাষীর হাতে প্রত্যেকবার যে ৭২০ পাউণ্ড করিয়া থাকে, তার ৪৮০ পাউণ্ড সে রাখে আর ২৪০ পাউণ্ড তার মজুরদের দেয়। যখন দর চড়িয়া কোয়ার্টার প্রতি ৬ পাউণ্ড হইবে, তখন সে মজুরদের ৩০০ পাউণ্ড দিয়া নিজের হাতে মুনাফা বাবদ্ মাত্র ৪২০ পাউণ্ড রাখিতে বাধ্য হইবে: আগের সমান, তার চেয়ে বেশী নয়, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির খাদন সম্ভবপর রাখিবার জন্যই তাকে মজুরদের ৩০০ পাউণ্ড বাধ্য হইয়া দিতে হইবে। এখন নিয়োজিত পুঁজিপাটার পরিমাণ যদি এত বড় হয় যে, তা থেকে ৭২০ পাউণ্ডের লাখো গুণ বেশী পাওয়া যায় অর্থাৎ ৭,২০,০০,০০০ পাউণ্ড পাওয়া যায়, তবে গম যখন ৪ পাউণ্ড কোয়ার্টার বিকায় তখন সমষ্টিগত মুনাফা হইবে ৪,৮০,০০,০০০ পাউণ্ড। তারপর গম যখন প্রতি কোয়ার্টার ৬ পাউণ্ড তখন যদি আরো পুঁজিপাটা লাগাইয়া ১০৫,০০০ গুণ ৭২০ পাউণ্ড পাওয়া যায় অর্থাৎ ৭,৫৬,০০,০০০ পাউণ্ড পাওয়া যায়, তবে মুনাফা সত্য সত্যই ৪,৮০,০০,০০০ পাউণ্ড হইতে নামিয়া ৪,৪১,০০,০০০ পাউণ্ড বা ১০৫,২০০ গুণ ৪২০ পাউণ্ড হইবে, আর মজুরি ২,৪০,০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ৩,১৫,০০,০০০ পাউণ্ডে উঠিবে। মজুরি চড়ার কারণ এই যে, পুঁজিপাটার অনুপাতে বেশী মজুর লাগানো দরকার হইবে; প্রত্যেক মজুর আগের চেয়ে বেশী মুদ্রা-মজুরি পাইবে বটে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মজুরের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হইবে, কারণ দেশের ফসলের কম পরিমাণ অংশ সে আপনার ভোগে আনিতে সমর্থ হইবে। প্রকৃতই লাভবান্ হইবে জমিদারেরা। তারা উঁচু হারে খাজানা পাইবে; কারণ প্রথমতঃ ফসলের দাম বাড়িয়াছে, দ্বিতীয়তঃ ঐ ফসলে তাদের ভাগ অনেক বাড়িয়াছে।

অধিকতর দাম উৎপন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু খাজানা শোধের পর ঐ দামের যা বাকী থাকে তার অধিকাংশ উৎপাদকেরা ভোগ করে, আর এ'তে, শুধু এ'তে মুনাফা নির্দ্ধারিত হয়। জমি যখন অত্যন্ত উৎপাদনশালিনী, তখন মজুরি অল্পকালের জন্য বাড়িতে পারে এবং উৎপাদকেরা তাদের অভ্যস্ত প্রাপ্যের চেয়ে বেশী ভোগ করিতে পারে, কিন্তু লোকবল-বৃদ্ধির যে উৎসাহ পাইবে তার ফলে শীঘ্রই তাদের অভ্যস্ত খাদনে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু যখন খারাপ জমি আবাদের জন্য লওয়া হইবে, অথবা পুরাণা জমিতে বেশী পুঁজিপাটা ও শ্রম নিয়োজিত হইবে, তখন যে আদায় কম: হইবে সে ফলটা স্থায়ী হইবে। খাজানা-শোধের পর পুঁজিপতি ও মজুরদের মধ্যে বণ্টিত হইবার জন্য ফসলের যে অংশ থাকিবে তার বেশীর ভাগটা মজুরদের কপালে জুটিবে। প্রত্যেক লোক পরিমাণে কম পাইতে পারে, সম্ভবতঃ পাইবেও; কিন্তু চাষী যে ফসল রাখিবে তার গোটা অংশের অনুপাতে অধিকতর মজুর নিয়োজিত হইবে বলিয়া, গোটা ফসলের বেশী অংশের দামটা মজুরিতে যাইবে, ফলে কম অংশের দামটা মুনাফায় ব্যয়িত হইবে। প্রকৃতির বিধানে জমির উৎপাদিকা শক্তি সীমাবদ্ধ হইয়াছে, ঐ বিধানের বশেই পুর্ব্বোক্ত অবস্থা স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইবে।

এইরূপে দেখা যাইবে যে, আমরা যে তত্ত্বটিকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তা এই যে, যে জমি বা যে পুঁজিপাটা খাজানা প্রদান করে না, তা থেকে মজুরদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করিবার জন্য যে পরিমাণ শ্রম দরকার হয়, তারই উপর সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে মুনাফা নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং বিভিন্ন দেশে সঞ্চয়ের ফলাফল বিভিন্ন প্রকার হইবে এবং সে

ফলাফল প্রধানতঃ জমির উর্ব্বরা শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। কোন দেশ যত বড় হোক্ না, জমির উর্ব্বরা শক্তি যদি কম থাকে এবং খাদ্যদ্রব্য আমদানিতে যদি বাধা থাকে, তবে পুঁজিপাটা খুব অল্প পরিমাণ সঞ্চিত হইলেও মুনাফার হার অতিশয় হ্রাস পাইবে এবং খাজানা দ্রুতবেগে বাড়িবে। অন্য দিকে, ছোট দেশ যদি উর্ব্বর হয়, বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্য আমদানিতে যদি সেখানে কোন বাধা না থাকে, তবে প্রভূত পরিমাণ পুঁজিপাটা সঞ্চিত করিলেও মুনাফার হারে খুব বেশী হ্রাস বা জমির খাজনায় অতিশয় বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে। মজুরি-তত্ত্ব নামক পরিচ্ছেদে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মজুরি বাড়িলেই পণ্যাদির মুদ্রা-দর বাড়িয়া যাইবে না, মুদ্রা-মান সোণাকে দেশের ভিতর উৎপন্ন বলিয়াই ধরি আর বিদেশের আমদানি বলিয়াই ধরি। কিন্তু যদি তা' অন্য প্রকার হইত, যদি চড়া মজুরির জন্য পণ্যাদির দর স্থায়িভাবে বর্দ্ধিত হইত, তা হলেও তত্ত্বটির সত্যতা কিছুমাত্র কমিয়া যাইত না। তত্ত্বটি বলে যে, চড়া মজুরিতে নিয়োগকারীদের কিছু-না-কিছু কাবু করিবে, তাদের প্রকৃত মুনাফার কতকাংশ বাদ পড়িয়া যাইবে। ধর টুপি-আলা, মোজা-আলা ও জুতা-আলা প্রত্যেকে তাদের পণ্যের বিশেষ বিশেষ অংশ নির্ম্মাণের জন্য ১০ পাউণ্ড বেশী মজুরি দিল এবং টুপি, মোজা ও জুতার দর ঠিক ততটা চড়িল যতটা চড়িলে শিল্পীর ঐ ১০ পাউণ্ড খরচ উঠিয়া আসে; এতে তাদের অবস্থা কোন রকম দর-বৃদ্ধি না হইলে যা হইত তার চেয়ে কোন অংশে ভাল হইল না। যদি মোজা-আলা তার মোজা ১০০ পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে ১১০ পাউণ্ডে বেচে, তার মুনাফা আগের সমান মুদ্রাই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু এই পরিমাণ মুদ্রার বিনিময়ে সে টুপি, জুতা ও অন্য সমস্ত দ্রব্য এক-দশমাংশ কম করিয়া পাইবে এবং পূর্ব্ব-পরিমাণ সঞ্চয়ের বলে বর্দ্ধিত মজুরিতে কম সংখ্যক মজুর লাগাইতে পারিবে ও বর্দ্ধিত দরে কম পরিমাণ কাঁচামাল বেচিতে পারিবে। তার মুদ্রা-মুনাফা যদি প্রকৃতই পরিমাণে কমিয়া যাইত ও সমস্তই পূর্ব্বের দরে বিকাইত, তবে তার চেয়ে তার এখনকার অবস্থাকে ভাল বলা চলে না। অতএব, আমি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম যে, প্রথমতঃ, মজুরি-বৃদ্ধিতে পণ্যাদির দর বাড়িবে না, কিন্তু মুনাফা নামিয়া যাইবে সন্দেহ নাই; দ্বিতীয়তঃ, যদি সকল পণ্যের দর বাড়াইতে পারা সম্ভব হইত, তবু মুনাফাতে ফলটা ঐরূপই হইত এবং প্রকৃতপক্ষে যে মধ্যবর্ত্তিদ্বারা দর ও মুনাফা নির্ণয় করা হয়, তারই দাম মাত্র নামিয়া যাইত।

মধ্য এসিয়ায় বাণিজ্য-বিস্তারে বিভিন্ন জাতি

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ

প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ পর্য্যটক ডাঃ ভিলিয়াম ফিল্‌স্‌নার মধ্য এসিয়ার বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন জার্ম্মাণ পত্রিকায় একটী সুন্দর প্রবন্ধে নিজের অভিজ্ঞতাসমূহ ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণী প্রধানতঃ একদিকে আফগানিস্থান, পামীর, তিয়েনশান এবং অপর দিকে চীনের কান-সু যেস্নয়ান এবং উন্নান্ প্রদেশগুলির মধ্যবর্ত্তী দেশগুলি লইয়া লিখিত। এই সীমানার উত্তরার্দ্ধের মধ্যে বিশেষতঃ তিয়েনশান, কুয়েনলুন এবং আলতিন তাগ্ স্থানগুলি প্রায় সবই মরুভূমি আর দক্ষিণার্দ্ধের প্রায় সমস্তই তিব্বতীয় পার্ব্বত্য ভূমি—ইহার গড় উচ্চতা সাড়ে চারি হাজার মিটার।

উভয়ার্দ্ধেই যে বাণিজ্য-পথসমূহ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে তাহার সবগুলি বহু পূর্ব্বের সাবেকী রাস্তা। মরুভূমির মধ্যে উঁচু জমি এবং তিব্বতের উপত্যকা

ধরিয়া এই পথ বহু দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। দেশ-বিদেশের সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের উপায়-স্বরূপ বহুসংখ্যক পথ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একই ভাবে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

রাস্তায় বাধা বিপত্তি

তিব্বতীয় উপত্যকার বাণিজ্যপথগুলি বিপদ্‌সঙ্কুল বলা যাইতে পারে। নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উটের বহর (ক্যারাভ্যান) পথ চলে। রাস্তার মধ্যে অধিকাংশ স্থানেই উঁচু উঁচু পর্ব্বতমালা ও হ্রদ পড়ায় পথিকদিগের সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া যাইতে বেশ বেগ পাইতে হয়। মাঝে মাঝে ডাকাতের হাতেও ইহাদের পড়িতে হয়। পথিকদের সব চেয়ে বড় বিপদ এই যে, পথে জলকষ্টে প্রায় ভুগিতে হয়।

শীতকালে অতিরিক্ত বরফ পড়ায় রাস্তাগুলি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এই পথে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মালটানা পশু হয় রাস্তার অতিরিক্ত গরমে অথবা পশুরোগে মারা পড়ে। পথিকদের এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় বলিয়া পণ্যের চালানি খরচের পড়তা বেশী পড়িয়া যায়।

তারপর নানা দেশের বণিক্ একই পথে চলিলেও পরস্পরের ভাষা ও চালচলন সম্পূর্ণ আলাদা বলিয়া তাহারা একে অপরের সহিত তেমন মেলামেশা করিতে পারে না। সংস্কারের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে কতকগুলি ব্যাপার লইয়া প্রায়ই দলের পুরোহিতের সহিত গোলমাল বাধে। এইরূপে বাণিজ্যের উন্নতিতে পদে পদে বাধা পড়ে। প্রাকৃতিক্ সম্পদ্ আবিষ্কারের বেলায় এই পুরোহিতগণ যেন সর্ব্বদাই বাধা দিতে বদ্ধপরিকর।

তিব্বতের পথগুলি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ছাড়া কোন কোনটা উত্তর হইতে দক্ষিণেও গিয়াছে। এই শেষোক্ত প্রকারের বাণিজ্য-পথগুলিতে রুশিয়াবাসীর স্বার্থ বেশী। কারণ ভারতের সমতল ভূমিতে রুশীয় পণ্যের নূতন বাজার গড়িয়া তোলা রুশিয়াবাসীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

ভারতের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা

বিদেশীর এই প্রকার লোলুপ দৃষ্টি হইতে ভারতকে রক্ষা করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য। উত্তর হইতে দক্ষিণে আসার দুই একটী নির্দ্দিষ্ট পথ ব্যতীত, ভারতের উত্তর দিকের পর্ব্বতশ্রেণী যেন বিদেশীর আক্রমণের হাত হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্যই হইয়াছে। যা দুই একটী রাস্তা পাহাড়ের ভিতর দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে ভারতের মধ্যে আসিয়াছে, ইংরেজরা সেগুলির পাহারায় সর্ব্বদাই তৎপর। কারণ শুধু এই রাস্তাগুলির দ্বারাই বিদেশীর আক্রমণ সম্ভব এবং এগুলি সুরক্ষিত অবস্থায় নিজ এলেকায় রাখিতে পারিলে বিদেশের সহিত শান্তভাবে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সম্ভব হইতে পারে। এই সমস্ত রাস্তা ভারতের মধ্য দিয়া সোজাসুজি তিব্বতের উপত্যকার ভিতর যাওয়াতে ভারত ও তিব্বতের সীমান্তের কতকগুলি বড় বড় বাণিজ্য-বাজারের সহিত ভারতের ব্যবসার অনেক সুবিধা হইয়া গিয়াছে। তিব্বতের ভিতর দিয়া আরও উত্তরাভিমুখে বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে যাওয়ার দরুণ এই রাস্তাগুলি সব সে সেরা বাণিজ্য-পথ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই রাস্তাগুলির মধ্যে যে রাস্তাটী তান্‌কার হইতে লাসা পর্য্যন্ত গিয়াছে সেইটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই রাস্তাটী তিব্বতের রাজধানী কান-সু ও লাসাকে মিলাইয়া দিয়াছে। এ রাস্তাটী দার্জ্জিলিংএর উপর দিয়া যাওয়ায় ভারতের সহিত ইহার যোগাযোগ আছে। ঘোড়া, খচ্চর, তিব্বতীয় বলদ, উট প্রভৃতি সমস্ত রকম পশুই এই পথে চলিতে পারে। লাসা হইতে আর একটী প্রধান বাণিজ্য-পথ উত্তরাভিমুখে গিয়াছে, সে পথে উটের বহরই বেশী চলে। লাসা ও উর্গারের মধ্যে এই রাস্তা থাকিয়া এই দুইটী বাণিজ্যপ্রধান স্থানকে মিলাইয়া দিয়াছে। উপরি উক্ত উভয় রাস্তা দিয়াই বহু দিন হইতে বিপুল বাণিজ্যসম্ভার যাতায়াত করিতেছে। পণ্যের আদান-প্রদানের দিক্ দিয়া এই রাস্তা দুইটীর উপকারিতা খুব বেশী।

স্থলপথে মাল চালানোর নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও

জলপথে মাল চলাচলের চেয়ে স্থলপথের চালানি খরচার পড়তা অনেক সস্তা। বিশেষতঃ, ভারত হইতে চীনের উত্তর তীরে যে সমস্ত মাল চালান হয়, সেগুলির স্থলপথের চালানি খরচা সস্তা পড়ে। উদাহরণ-স্বরূপ দেখা গিয়াছে, ভারত হইতে জলপথে চীনের পারে মাল চালান দিয়া সেখান হইতে স্থলপথে কান-সু পর্য্যন্ত চালানি খরচের পড়তা ভারত-তানকার-তিয়েনশান স্থলপথের চালানি খরচা অপেক্ষা বেশী। তবে এই স্থলপথের ব্যয় সময় সময় বেশী হইতেও দেখা যায়। কারণ তিব্বত-সরকার অনেক সময় এই পথে চালানি মালের উপর খুব চড়া হারে শুল্ক আদায় করিয়া থাকেন। আবার "গোলোক" নামক একটী বিখ্যাত ডাকাতের দল তিব্বতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে বাস করে। ইহাদের কবলে পড়িয়াও সময় সময় মাল-বোঝাই বড় বড় উটের বহরকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে যে রাস্তাগুলি গিয়াছে সেগুলির অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সমস্ত রাস্তা, বিশেষতঃ পূর্ব্ব-তিব্বতীয় রাস্তাগুলির জন্য চীন খুব বেশী যত্ন লয়। কারণ এই রাস্তাগুলি, বিশেষতঃ লাসা-জাইকুণ্ডো ও লাসা-চামডো রাস্তা দুইটী দ্বারা তিব্বতের সহিত চীনের যেসুয়ান এবং উন্নান্ প্রদেশগুলির যোগাযোগ আছে। এই রাস্তাগুলি এবং লাসা-গারটক্-লে রাস্তার উপর দিয়া বৎসরের সকল সময়েই মাল-চলাচলের ভিড় প্রায় সমান থাকে। এই রাস্তাগুলি লাসা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যাওয়ার দরুণ চীন অনেকবার লাসায় নিজেদের প্রাধান্য একচেটিয়া করিতে ও বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে।

ইংরেজের প্রাধান্য

সম্প্রতি তিব্বতে চীনের প্রাধান্য অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং তাহার স্থানে বৃটিশ ভারতের প্রাধান্য বাড়িয়া উঠিয়াছে। সোহ্বিয়েট্ রুশিয়ার প্রাধান্যেও এখানে অনেকটা ভাটা পড়িয়া আসিয়াছে। রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতের বাণিজ্যের অবস্থাও অনেক বদলাইয়া গিয়াছে।

সম্ভবতঃ অল্পকালমধ্যে যেসুয়ান ও উন্নান্এর সহিত তিব্বতের বাণিজ্য পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। চীন চেষ্টা করিতেছে যে প্রকারেই হউক তিব্বতের পঁুজিতেই আবার সেখানে পাকাপাকি ভাবে ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিবে।

লাসা ও তিব্বতে চীনের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে ভারত সরকারের কোন অসুবিধা হইবে না। কারণ চীন সে দেশে সোহ্বিয়েট্ রুশিয়ার প্রভুত্ব পছন্দ করে না। আর মনে হয় যে লাসায় ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য কোন রকমে ক্ষুণ্ণ করিবার ইচ্ছা চীনের নাই, কারণ তাহা হইলে কতকগুলি অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তিব্বতের শৈল-শ্রেণীগুলি হাত ছাড়া হইয়া যাইতে পারে।

প্রাচ্য প্রদেশে ইংরেজাধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকে জার্ম্মেণিরও বোধ হয় সে ইচ্ছা আছে। অবস্থাটা একটু তলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইংরেজাধিকার এ সমস্ত স্থান হইতে তুলিয়া দিতে গেলে বড় রকমের একটা মারামারি কাটাকাটি নিশ্চয়ই হইবে এবং তাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে ইংরেজেরা যে সমস্ত সুখ-সুবিধা এখানে কায়েম করিয়াছেন তাহা সমস্তই শেষ হইয়া যাইবে। তাহাতে জার্ম্মাণ বণিকেরা যে শুধু এখানে ব্যবসায় লাগান পঁুজি হারাইবেন তাহা নয়, এই সমস্ত সীমান্ত স্থান হইতে তাঁহাদের বাণিজ্যের আশা-ভরসা চির দিনের মত নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

তা ছাড়া যে সমস্ত জাতি এই সব সীমান্তে রুশিয়ার আধিপত্য পছন্দ করে, ইংরেজাধিকার উঠিয়া গেলে তাহাদেরও বিশেষ কোন লাভ হইবে না। কারণ ব্রিটিশ ভারতকে বিধ্বস্ত না করিয়া ইংরেজের অধিকার দূর করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু ভারত বিধ্বস্ত হইলে উক্ত জাতিগুলি লাভবান্ হইতে পারিবে না।

এসিয়ার জাগরণ

এসিয়ারও জাগরণের সময় আসিয়াছে। যে সমস্ত জায়গায় কেহই কোন দিন কিছু আশা করিতে পারে নাই, এসিয়ার সেইরূপ অনেক স্থানেই বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান মাথা তুলিতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে— সিনকিয়াওএর প্রধান সহর তিহুয়াতে কলকজাসহ বড়

একটী পশমের মিল বসান হইয়াছে। কান্-সুতে শিল্প-ব্যাপারে জল-শক্তির ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। এই প্রকারে আরও অনেক স্থানে অনেক প্রকারের নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। এই সমস্ত উন্নতি দেখিয়া ধারণা হয় যে, উপরি উক্ত এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত শিল্পকেন্দ্র-গুলির সাহায্যে দেশবিদেশের সহিত পণ্যের আদান-প্রদানের খুব সুবিধা হইবে।

সুতরাং মাল-চলাচলের সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় এসিয়ার, এমন কি তিব্বতেরও শিল্প দিন দিন বাড়িয়া যাইবে। চাই কি সুদূর ভবিষ্যতে মাল-চলাচলের সাবেকী প্রণালী বদলাইয়া যাইতে পারে ও আধুনিক উপায়ে মাল চালান দিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। এই সমস্ত স্থানে রেলপথ বসাইয়া কান-সুর ভিতর দিয়া রুশো-তুর্কিস্থান রেলওয়ের সহিত এবং সিয়ান-ফুর ভিতর দিয়া চীনদেশীয় রেলপথের সহিত যোগাযোগ করিয়া মাল-চলাচলের অনেক সুবিধা করা যাইতে পারে।

জার্ম্মাণির অসুবিধা

ফিল্‌স্‌নার বলিতেছেন, জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা তিব্বতে কোনই সুবিধা করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কোন কালে যদি এখানকার কুলজা-চামী-লাঞ্চার্ড রেলওয়ে জার্ম্মাণি নিজ এলেকায় আনিয়া এ দেশের মধ্যে মাল চলাচলের ব্যবস্থা করিতে পারে, তবে তাহারা তিব্বতের উত্তর প্রান্তে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নামিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বর্ত্তমান সময়ে মধ্য এসিয়ায় রুশিয়ার সহিত ভারতের, চীনের সহিত রুশিয়ার, এবং ভারতের সহিত চীনের যেরূপ ঠোকাঠুকি চলিতেছে, তাহাতে জার্ম্মাণির শুধু তিব্বতে কেন মধ্য এসিয়ার কোন স্থানেই ব্যবসায়ে না নামা ভাল। যে পাকাপাকিভাবে বসিয়া আছে তাহাকে নাড়াইবার চেষ্টা না করাই ভাল। বিশেষতঃ সোভিয়েট্ রুশিয়া বর্ত্তমান সময়ে এই স্থানে নিজ প্রতিপত্তি কায়েম করিয়া লইতেছে। জার্ম্মাণির ধনকুবের ব্যবসায়ীরাও অবস্থা বুঝিয়া এখানে ব্যবসায়ে নামিতে সাহসী হইতেছেন না।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ ও ভারতীয় কৃষক

শ্রীকামাখ্যাচরণ বসু, এম-এ, বি-এল

১৯১৯ সনের ওয়াশিংটন কনফারেন্সে কারখানার মজুরদিগের সম্পর্কে যেসকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল ১৯২১ সনের জেনেভা কনফারেন্সে সেগুলি যাহাতে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মজুরদিগের সম্বন্ধেও খাটে সেই উদ্দেশ্যে তিনটি খসড়া প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছিল। প্রথম প্রস্তাবটী ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে, দ্বিতীয়টী শিশু-মজুর ও তৃতীয়টী সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার সম্পর্কে।

প্রথম প্রস্তাবের দ্বারা বলা হইয়াছে যে, কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে বা সেই কার্য্যের দ্বারা কৃষকদিগের যদি কোন শারীরিক অনিষ্ট হয়, তবে সাধারণ মজুরদিগের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে যে আইন আছে তাহা প্রযুক্ত হইবে।" ভারতবর্ষে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে অনেক অসুবিধা আছে। কেন না, যদি উড়িষ্যার মত অনুন্নত দেশের কৃষকদিগের ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বোম্বাইয়ের মত আধুনিক সহরের কারখানার মজুরদিগের জন্যও কোন ব্যবস্থা করা আইনতঃ সম্ভব হইবে না। এ দেশে মাত্র কলকারখানা গড়িয়া উঠিতেছে, আইনের সাহায্যে যত শিল্পোন্নতির সহায়তা করা যায় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। কারখানাগুলিকে যদি ক্ষেতের মজুরদিগের অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়,

তাহা হইলে এ দেশে শিল্পের উন্নতি সুদূর-পরাহত। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ্ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এখানে বলা অনাবশ্যক যে, শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যেমন কারখানা-আইন ইত্যাদির প্রয়োজন, তেমনই কৃষির উন্নতির জন্যও কৃষিজীবীদিগের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা দরকার। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশের শিল্প অনেকটা কৃষির উপরেই নির্ভর করে। বিশেষতঃ, ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির সুব্যবস্থা করাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।

কনফারেন্সের দ্বিতীয় প্রস্তাবটীতে বলা হইয়াছে যে, যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কৃষকদিগের অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েরা স্কুলে থাকিতে বাধ্য হইবে, সেই সময়ে তাহাদিগকে ক্ষেতের কাজ করিতে দেওয়া হইবে না। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, সকল দেশেই বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ প্রকার কোন আইন না থাকায় এই প্রস্তাবটী এদেশের পক্ষে খাটিবে না। ববং যদি এরূপ কোন প্রস্তাব করা হইত যাহাতে এদেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা মঙ্গল-জনক হইত। কেন না শিক্ষাই সকলপ্রকার উন্নতির ভিত্তি। শিক্ষা না থাকিলে কোনও আইনেরই সদ্ব্যবহার হয় না।

তৃতীয় প্রস্তাব দ্বারা কারখানার মজুরদিগের ন্যায় কৃষি-মজুরদিগকেও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। প্রস্তাবটী ভারত-গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন।

কৃষি-কার্য্যে বেকার-সমস্যা সমাধানের ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিবার প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা—এই দুইটী বিষয়ে কনফারেন্স যে মতামত দিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকট অনুরোধ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে জানা যায় নাই।

শিল্পকার্য্যে স্বাস্থ্যরক্ষা

শিল্পব্যাপারে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ এ সম্বন্ধে যে উপায় অবলম্বন করেন তাহাতে সীসা, ফস্ফরাস, বীজাণু দ্বারা দূষিত পশম প্রভৃতি শিল্পের সংস্রবে যে সকল ব্যাধি হয় তাহা হইতে মজুরদিগকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মজুরদিগের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করা হয়।

এ সম্বন্ধে ওয়াশিংটন কনফারেন্সে তিনটী প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছিল; প্রথমটীতে সীসার ব্যবসায় স্ত্রী ও শিশু শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পর্কে, দ্বিতীয়টীতে আপ্‌থ্রাক্স নামক বীজাণু দ্বারা দূষিত পশমের ব্যবসার সম্পর্কে ও তৃতীয়টীতে দিয়াশলাই তৈরীতে সাদা ফস্ফরাসের ব্যবহার নিষেধ করার সম্পর্কে।

ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথম প্রস্তাবটী অবিলম্বে গ্রহণ করেন। যদিও এ দেশে সীসার ব্যবসা এখন তত বেশী প্রচলিত নাই, তথাপি ভবিষ্যতে এ ব্যবসা বাড়িবে এই আশা করিয়া ১৯২২ সনের ফ্যাক্টরি আইনে ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী কতকগুলি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়।

ওয়াশিংটন কনফারেন্সে "আপ্‌থ্রাক্স" সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, যে দেশ হইতে ঐ বীজাণু দ্বারা দূষিত পশম রপ্তানি হইবে তথায় অথবা যে দেশে উহা আমদানি হইবে সেখানে ঐ প্রকার পশম পরিশোধনের ব্যবস্থা করা উচিত। ১৯২১ সনের কনফারেন্সে যখন পুনরায় ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় তখন ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট এই বলিয়া আপত্তি উঠান যে, মধ্য এশিয়ায় বেশীর ভাগ পশম তৈরী হয়, কিন্তু তথায় পরিশোধনের ব্যবস্থা করা দুরূহ। তবে ১৯২২ সনের কারখানা আইনে গবর্ণমেণ্টকে দূষিত পশম সংশোধনের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

সাদা সীসার ব্যবহার নিষিদ্ধ করার সম্পর্কে ১৯২১ সনের কনফারেন্সে রীতিমত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে একটী খসড়া প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট উহা মানিয়া লন নাই। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, এদেশে রাংএর কাজ ছোট খাট মিস্ত্রী দ্বারাই হয় এবং তাহাদের উপর আইনের বাঁধন বড় একটা খাটে না। ইহা ছাড়া এদেশে রাংএর কাজ কম হয়।

তবুও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে ভারত সরকার অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন কনফারেন্সের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেন।

সাদা গন্ধকের দিয়াশলাই ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে সরকারকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই; ১৯২৩ সনেই ঐ সম্বন্ধে একটী আইন পাশ করা হয়।

মজুরদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য যাহাতে প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্ট লোক নিযুক্ত করেন তাহার জন্য ওয়াশিংটন কনফারেন্সে একটী প্রস্তাব হয়। ভারত সরকার প্রস্তাবটীর সবটা গ্রহণ না করিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, উপস্থিত যে সকল কর্ম্মচারী অস্বাস্থ্যকর শিল্প পরিদর্শন করেন তাঁহাদের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হউক। সমস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এ ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে বাঙ্গালা সরকার একটী অভিনব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যে কারখানায় ১০০০ লোক কাজ করে, সেখানে একটী ডাক্তার ও ভাল ডিস্‌পেনসারী রাখিতে হইবে। তবে নিকটেই যদি কোন হাঁসপাতাল বা ডিস্‌পেনসারী থাকে এবং যদি তাহাতে কারখানা নিয়মিত চাঁদা দেয়, তাহা হইলে আর কিছু করিতে হইবে না।

১৯২৫ সনে একটী প্রস্তাবে স্থির হয় যে, মজুরদিগের কার্য্যকালে অসুস্থতার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ এই প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন এবং ক্ষতিপূরণ আইনে ঐ প্রকার সংশোধন করেন।

মজুরদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক মজুর দপ্তরে অনেক নূতন তথ্যের অনুসন্ধান ও আলোচনা চলিতেছে। তাহার মধ্যে মোট বহন করার সম্পর্কে বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিবার কথা হইতেছে। এই প্রস্তাব পাশ হইলে যে সকল স্ত্রী-মজুর কয়লার খাদে ভারি বোঝা বহিবার জন্য নিযুক্ত হয়, তাহাদিগের কষ্টের লাঘব হইবে সন্দেহ নাই।

সমাজতন্ত্রবাদী বার্ণার্ড শ'

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম্-এ, বি-এল্

কাজ বিনা ধনদৌলত হয় না

বলা হয়েছে যে, ভোগ্য জিনিষ চিরস্থায়ী নয়। ভোগ্য জিনিষ সব সময়ে ভোগ করা হচ্ছে, তার ফলে তা ক্রমাগত ফুরিয়ে আস্‌ছে। এই জন্য সব সময়ে নতুন ভোগ্য জিনিষের যোগান দরকার আর মানুষকে খাট্‌তে হয়। শ্রম বিনা মানুষ তার ভোগ্য জিনিষ পেতে পারে না।

কিন্তু শ্রম বিনা ভোগ্য জিনিষ উৎপন্ন হয় না বলে, যে যতটুকু শ্রম করছে সে ততটুকু ভোগ্য জিনিষ পাবে, এ কথা বলা চলে না। কারণ বৃদ্ধ বা শিশুদের অভাব মেটানো দরকার, অথচ তাদের শ্রমের সামর্থ্য নেই। অন্য শ্রেণীর অক্ষম লোকদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

সমাজের লোকদের মধ্যে শ্রমের ভার কি প্রণালীতে ভাগ করে অর্পণ করা হবে? নানা প্রণালী অনুসরণ করা যেতে পারে। যেমন জনকয়েকের ওপর সমস্ত খাটুনির ভারটা চাপিয়ে বাকী সকলে বিনা পরিশ্রমে একটানা অবসর ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে পারে; কিংবা সমাজের কর্ম্মঠ লোকেরা প্রত্যেকেই কাজের ভারটা সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারে, তার ফলে অবসর ও ভোগ্য জিনিষ সমানভাবে সকলের ভাগে পড়বে; কিংবা এ দুই চরম সম্ভাবনার মাঝামাঝি নানারকমে শ্রম ও অবসরের কম-বেশী ভাগাভাগি হ'তে পারে।

ইতিহাসে নানা শ্রেণীর যোঝাযুঝি দেখা যায়। একদিক্ থেকে দেখ্‌লে, শ্রমের ভারটা পরের ঘাড়ে চাপাবার, আর অবসরটা বেশী করে নিজের কোলে টান্‌বার জন্য একটা নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব যে নানা শ্রেণী ও

ব্যক্তির মধ্যে অনুক্ষণ চলেছে আর সেইটাই যে মানুষের ইতিহাসের একটা মূলসূত্র তাতে সন্দেহ নেই।

এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, কলকব্জা বেরুবার পর থেকে এই অবসর ন্যায্যভাবে ভাগ করার প্রয়োজনীয়তাটা আরও তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। কলকব্জার সাহায্যে মানুষ এখন ঢের কম সময়ে হাজার হাজার লোকের সমান কাজ করতে পারে। কাজেই উৎপাদনের জন্য বেশী পরিশ্রম করবার আবশ্যকতা কমেছে ও অবসর ভোগ করবার সুযোগ বেড়েছে। এই সুযোগটা সমাজের সকল স্তরের ও ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

ধনসাম্যবাদ

বর্ত্তমান অবতারণায় আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনবিতরণের এমন কোন পন্থা আবিষ্কার করা যাতে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল হয়। কি উপায়ে তা করা যেতে পারে সেইটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

একটা সোজা উপায় হচ্ছে ধনসাম্যবাদের প্রবর্ত্তন। ধনসাম্যবাদ জিনিষটা কি? যদি জনকয়েক সমবেত হ'য়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি পুঞ্জীভূত করে, তাদের স্বকীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে কিছু না রাখে, আর সেই সমষ্টীকৃত সম্পত্তি হ'তে যার যেমন দরকার সেই মত ব্যয় করে, তবে তখন তাদের মধ্যে ধনসাম্যবাদের প্রবর্ত্তন হয়েছে বুঝতে হবে।

ছোটখাটো ধর্ম্মসঙ্ঘে এইরকম ধনসাম্যবাদের প্রবর্ত্তন দেখা যায়। কিন্তু বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে ধনসাম্যবাদের প্রর্ত্তন সহজ নয়। কারণ ধনসাম্যবাদ চালাতে হ'লে চাই দুটা জিনিষ—প্রথম, যাদের মধ্যে তা চালানো হবে তাদের একত্র অবস্থান, দ্বিতীয়তঃ তাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয়। এক একটা দেশের জনসমষ্টির কথা ভাবলে ঐ দুটা জিনিষেরই অভাব লক্ষিত হবে, সেইজন্য তাদের মধ্যে উক্ত প্রকারের ধনসাম্যবাদের প্রবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব।

এমন কি, একটী পরিবারের মধ্যেও খাঁটি ধনসাম্যবাদ চল্‌তে পারে না। কারণ প্রত্যেক পরিবারের সকলেরই এজমালি সম্পত্তি থাক্‌লেও, প্রত্যেকেরই—অন্ততঃ বয়োজ্যেষ্ঠদের—স্ব স্ব খরচের জন্য পৃথক্ তহবিল থাকে।

তবে, এটা লক্ষ্য করা দরকার যে, আধুনিক সহরগুলাতে ধনসাম্যবাদের আবহাওয়া এসেছে। প্রত্যেক আধুনিক সহরে আলো, জল, রাস্তা ও শান্তিরক্ষার বন্দোবস্ত আছে। এই সব জিনিষের সুযোগ-সুবিধা সকলেই সমানভাবে যত ইচ্ছা ভোগ ক'রতে পারে, ইচ্ছা হ'লে নাও ক'রতে পারে। নাগরিকদের অবস্থা, চরিত্র, বিদ্যাবুদ্ধির তারতম্য যেরকমই হোক্‌না কেন, তাতে সহরবাসীদের জন্য যে সব সাধারণ ভোগ্য জিনিষের বন্দোবস্ত হয়েছে, তা ভোগ ক'রতে কোন বাধা নেই। সহরের আলো, জল প্রভৃতির জন্য সকলে তাদের সমস্ত পুঁজি জড় করে না, প্রত্যেকে অবস্থার তারতম্যানুসারে একটা কর দেয়। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করতে হ'বে যে, এই কর আদায়ের মধ্যে ঠিক ব্যবসাদারি বুদ্ধি খাটানো হয় না, অর্থাৎ ভোগ্য জিনিষগুলার কতটা কে ভোগ করতে পারবে সেটা করের পরিমাণ থেকে নির্দ্দিষ্ট করা হয় না। এক জনের দেওয়া কর যতই কম হোক্ না কেন, ইচ্ছামত সহরের আলো ও জল ভোগ করবার পক্ষে তার কোন বাধা নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক সহরগুলার মিউনিসিপ্যালিটি নাগরিকদের সুবিধা ও সেবার জন্য যে সব জিনিষের বন্দোবস্ত করেছেন তার মধ্যে ধনসাম্যবাদের বেশ একটু রেশ আছে।

ধনসাম্যবাদের সীমানা

গ্রামের লোকদের আলোর জন্য বা জলের জন্য নিজ নিজ পৃথক্ বন্দোবস্ত ক'রতে হয়। কিন্তু সহরের লোকেরা এই সবের জন্য সর্ব্বসাধারণের একটা যুক্ত বন্দোবস্ত করতে পারে। এটা একপ্রকারের ধনসাম্যবাদ তা বলা হয়েছে।

কোন্ কোন্ জিনিষ সম্বন্ধে এই শ্রেণীর ধনসাম্যবাদ খাটে? যে সব জিনিষের অভাব সকলেই বোধ করে, কেবল সেই সব জিনিষই সাধারণের টাকা থেকে যোগান দেওয়া চলে। সাধারণের টাকা থেকে যেমন রাস্তা বা সেতু তৈরী, আলো ও জলের বন্দোবস্ত প্রভৃতি করা চলে, সেই রকম সাধারণের দেওয়া টাকা থেকে সকলের যা প্রধান

আহার্য্য তা যোগাবার বন্দোবস্ত বা রেল চালাবার বন্দোবস্ত করা চলে।

কতকগুলা জিনিষ আছে যেগুলার অভাব আমরা সকলে বোধ করি না। অথচ তা সাধারণের টাকা থেকে যোগানো হ'য়ে থাকে। যেমন লাইব্রেরী, আর্ট-গ্যালারী, যাতুঘর ও চিঁড়িয়াখানা প্রভৃতি তৈরী। এ সব জিনিষের অভাব জনসাধারণের প্রত্যেকেই বোধ করে না। অথচ এ সব জিনিষ সাধারণের টাকা থেকেই যোগানো হ'য়ে থাকে। জনসাধারণের টাকা থেকেই যে এ সব হয় তা সাধারণে অনেক সময়ে বুঝ্‌তে পারে না। কারণ, খাওয়া পরার জিনিষের ওপরই অনেক কর বসানো থাকে। আর, তা অতি গরীব লোকও তাদের খাবার পরবার জিনিষ কেন্‌বার সময় দিয়ে থাকে। এই সব করের টাকার কিছু কিছু অংশ লাইব্রেরী, মিউজিয়াম প্রভৃতির জন্যও খরচ হ'য়ে থাকে। সাধারণে তা মাথা ঘামিয়ে বোঝে না ব'লেই হয়তো প্রতিবাদ করে না। বুঝলে হয়তো তারা এই ধরণের ব্যয় বন্ধ ক'রে দিতে চাইতো। যাই হোক্ সাধারণের দেওয়া টাকা থেকে সাধারণে চায় না অথচ সমাজের মুষ্টিমেয় লোকে চায় এমন গোটাকয়েক উদ্দেশ্যে টাকা খরচ করার স্বপক্ষে এইটুকু বলার আছে যে, তাতে সমাজের ও সভ্যতার কল্যাণ ও উন্নতি-সাধনে সাহায্য করা হয়।

কিন্তু যে শ্রেণীর ধনসাম্যবাদের কথা বলা হচ্ছে তার সীমানা এইখানেই। যে সব জিনিষ সাধারণের সকলে চায় তা সকলের দেওয়া টাকা থেকে যোগানো চলে। যে সব জিনিষ সকলে চায় না, তাও সাধারণের টাকা থেকে দেওয়া চলে কিছু কিছু, সভ্যতার উন্নতির জন্য। কিন্তু আরও অনেক জিনিষ আছে যা আমরা সকলেই চাই না। সেগুলা সাধারণের টাকা থেকে তৈরী করলে অনেকেই হয়তো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌তে পারে। যেমন মদ তৈরী। যাঁরা মদ পছন্দ করেন তাঁরা ছাড়া আর সকলেই সাধারণের টাকা থেকে মদ তৈরী ক'রলে ভীষণ রেগে যেতে পারেন। সেই রকম যাঁরা মাংস পছন্দ করেন না, তাঁরা সাধারণের টাকা থেকে সবার জন্য মাংসের বন্দোবস্ত হ'লে তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লাগ্‌তে পারেন। তারপর যে সব জিনিষের জন্য সাধারণের অভাব বোধ নেই, সে সব জিনিষ প্রত্যেকের জন্যই তৈরী করাও বোকামী। গ্র্যামোফোন মানুষের একটা অভাব মেটায়। তাই ব'লে সমাজের বা দেশের প্রত্যেকেই যে একটা ক'রে গ্র্যামোফোন চান, তা মোটেই সত্যি নয়। কেউ হয়তো একের বেশী গ্র্যামোফোন চাইতে পারেন, অনেকে হয়তো গ্র্যামোফোন জিনিষটা পছন্দ নাও করতে পারেন। যাঁরা গ্র্যামোফোন পছন্দ করেন না, তাঁরা গ্র্যামোফোনের বদলে হয়তো বাইসিক্‌ল্ কি টাইপরাইটার পছন্দ করতে পারেন।

যে সব জিনিষের অভাব সকলেই বোধ করে না, সেগুলা সাধারণের টাকায় এবং সমাজের প্রত্যেকের অভাব মেটাবার মত পরিমাণে তৈরী ক'রলে ভুল হবে। যে প্রণালীতে সাধারণের জন্য আলো বা জলের বন্দোবস্ত করা হয় সেটা এখানে খাট্‌বে না। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে প্রত্যেককেই সমানভাবে টাকা দেওয়া। তার পর সকলে যার যেমন যে জিনিষ ইচ্ছা কিনে নিজের সখ মেটাক্। যেমন, প্রত্যেককেই যদি পাঁচ পাউণ্ড ক'রে দেওয়া হয়, তা হ'লে এই টাকা দিয়ে নিজ নিজ সখ মত কেউ গ্র্যামোফোন, কেউ ঘড়ি, কেউ টাইপরাইটার ইত্যাদি কিন্‌তে পারে।

টাকা জিনিষটাকে সাধারণতঃ আমরা ঘৃণার চোখেই দেখে থাকি। কিন্তু টাকা জিনিষটা এমন কিছু ঘৃণ্য নয়। আমরা যেটা টাকার দোষ ব'লে মনে করি, সেটা টাকার ব্যবহারেরই দোষ। এক দিক্ দেখ্‌লে টাকার মত মানুষের উন্নতির সহায়ক জিনিষ খুব কমই আছে। কারণ, যে সব জিনিষ আমরা সকলে চাই না সেই সব জিনিষ সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে ন্যায্যভাবে বিতরণ ক'রতে হ'লে টাকার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যে সব জিনিষ প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয় নয় সেগুলার বিতরণ ন্যায়সঙ্গতভাবে ক'রতে গেলে সমাজে টাকা প্রচলিত থাকা চাই। আর টাকার বিতরণ যাতে ন্যায্যভাবে হয়, সেইটে করাও দরকার। কাজেই যে সব জিনিষ সাধারণের প্রয়োজনীয় নয় সেগুলার বিতরণে ধনসাম্যবাদ যদি চালাতে হয়, তবে টাকার বিতরণে হস্তক্ষেপ করা দরকার হ'য়ে ওঠে। (ক্রমশঃ)

মুর্শিদাবাদের একটী গ্রাম

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম্-এ,

মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত থানা রাণীনগরের অধীন কাতলামারি একটী মাঝারি ধরণের পল্লীগ্রাম। গ্রামের উত্তরে পদ্মানদী—পদ্মানদীর পরপারে রাজসাহী জেলা; দক্ষিণে কুপতলা, মুন্সীপাড়া, বংশীবদনপুর, মালীপাড়া; পশ্চিমে নিয়ামৎপাড়া, মাঝারদিয়াড়; এবং পূর্ব্বে মাদিয়া ও মোহনগঞ্জ গ্রাম। পূর্ব্বে কাতলামারি একটী বর্দ্ধিষ্ণু ও প্রকাণ্ড গ্রাম ছিল। অধুনা পদ্মার ভাঙ্গনে অনেক লোক গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে এবং গ্রামটীও আকারে ক্ষুদ্রতর হইয়া এক-তৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছে।

গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থা

গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর হইতে মুর্শিদাবাদ লাইনের (ই, বি, আর) ভগবানগোলা ষ্টেশন পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সড়কটী পূর্ব্বে কাতলামারির ভিতর দিয়া বিস্তৃত ছিল। অধুনা পদ্মার কৃপায় কাতলামারির অন্তর্ভুক্ত অংশটুকু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তবে কয়েক বৎসর হইতে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড কাতলামারি গ্রামের পশ্চিমে অবস্থিত লোকাল বোর্ডের রাস্তাটী গ্রহণ করিয়া এই সড়কের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন এবং সংস্কার করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিতেছেন। গ্রামের রাস্তা-সড়ক সমস্তই মেটে, বর্ষাকালে কর্দ্দমপূর্ণ হওয়ায় যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা সত্ত্বেও কাতলামারি নানাস্থানে যাতায়াতের একটী কেন্দ্র-বিশেষ। পশ্চিমে ভগবানগোলা রেলষ্টেশনে (১৮ মাইল দূরে) এবং পাতিবোনা ষ্টীমার ষ্টেশনে (৮ মাইল দূরে) যাইতে হইলে, এই জেলার পূর্ব্বাঞ্চলের সমস্ত যানবাহন এবং লোকজনকে এই গ্রামের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজসাহী সহরে তথা রাজসাহী জেলায় যাইতে হইলেও লোকজন এবং যানবাহনকে কাতলামারি খেয়াঘাটে পার হইয়া যাইতে হয়। রাজসাহী ধানের দেশ। মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তর মজুর তথায় ধান কাটিতে ও অন্যান্য প্রকার কাজ করিবার জন্য গমন করিয়া থাকে। বিস্তর গো-গাড়ীও ধান ক্রয় করিবার জন্য বা মুর্শিদাবাদ-জাত শাক-আলু, কলাই প্রভৃতি শস্য বদলাইয়া ধান আনিবার জন্য রাজসাহী জেলায় যায়। এই সমস্ত যানবাহন এবং কুলি-মজুরের পক্ষে পদ্মার এপারে কাতলামারিই শেষ দাঁড়াইবার আড্ডা (হল্টিং ষ্টেশন)।

কাতলামারি অঞ্চলে যান-বাহনের রকমারি সেরূপ দৃষ্ট হয় না। মান্ধাতার আমলের গো-মহিষের গাড়ীই এই গ্রামের প্রধান সম্বল। সুতরাং মাল দেওয়া-নেওয়ার কাজ প্রধানতঃ গাড়ীর সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বর্ষার কয়মাস নদীতে জল থাকে, তখন নৌকার সাহায্যেও মাল চালান দেওয়া হয়। লোক-চলাচলের ব্যাপারেও এই গাড়ী এবং বর্ষার সময় নৌকা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বর্ষার সময়, কাতলামারি হইতে নৌকাযোগে বাঙ্গালার নদীতীরবর্ত্তী সমস্ত স্থানেই যাতায়াতের সুবিধা হয়।

ইউনিয়নবোর্ড

কাতলামারি ইউনিয়নবোর্ড ৩২টী পল্লী (গ্রামের অন্তর্গত ক্ষুদ্র গ্রাম বা পাড়া) লইয়া গঠিত। খোদ কাতলামারি গ্রামে ১২টী পল্লী আছে। চৌকিদারের সংখ্যা এই গ্রামে ৮ জন। নিম্নে এই ইউনিয়ন বোর্ডের দুই বৎসরের আয় ব্যয়ের তালিকা দেওয়া হইল:

১৩৩৬ সাল

আয়	...	...	২১৬৮৸৶০
ব্যয়—			
১নং খাতে—			
২ জন দফাদারের বেতন			
মাসিক ৭৲ টাকা হিসাবে		...	১৬৮৲
১৯ জন চৌকিদারের বেতন			
মাসিক ৬৲ টাকা হিসাবে		...	১২৯৬৲
তেল খরচ	...	...	১২৲

পোষাক	...	...	৭০৸০
সেরেস্তা খরচ	...	...	৩৬৲
কেরাণীর বেতন	...	...	১২০৲
প্যাকিং খরচ	...	...	৷৷০
আদায় খরচা	...	...	১৫৪৸০
১নং খাতে মোট	...	...	১৮৫৭৲
২নং খাতে—			
স্কুল	...	...	১৪৯৲
রাস্তা খরচ	...	...	১২৩৸৴০
২নং খাতে মোট	...	...	২৭২৸৴০
সর্ব্ব মোট ব্যয়	...	...	২১২৯৸৴০
মৌজুত তহবিল	..	...	৩৯৲
			২১৬৮৸৴০

১৩৩৭ সাল (প্রস্তাবিত)

আয়—		
১৩৩৬ সালের মৌজুত তহবিল	...	৩৯৲
১৩৩৭ সালের আয়	...	২১২৭৲
খোঁয়াড়	...	১৯৪৲
মোট আয়	...	২৩৬০৲
ব্যয়—		
১নং খাতে (১৩৩৬ সালের অনুরূপ দফায়)		১৮৭২৷৷৵০
২নং খাতে—		
রাস্তা খরচ	...	১৫০৲
স্কুল	...	২৩৯৲
২নং খাতে মোট		৩৮৯৲
মোট ব্যয়	...	২২৬১৷৷৵০

আমদানি ও রপ্তানি

কাতলামারির উত্তরধারে পদ্মানদী অবস্থিত। কাতলামারির নিকট পদ্মা ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে, একটী খাত রাজসাহীর নিম্নে প্রবাহিত, একটী মধ্যে, আর একটী কাতলামারির পাশ দিয়া গিয়াছে। মধ্যেকার খাতটীই প্রধান নদী; এইটী দিয়াই বারমাস ষ্টীমার যাতায়াত করে। রাজসাহীর নিম্নে বারমাস জল থাকে বটে, কিন্তু বৎসরের অর্দ্ধেক সময় নৌ-চলাচলের উপায় থাকে না। কাতলামারির সন্নিকটস্থ খাতটীর অবস্থা আরো কাহিল,—তিন মাসের অতিরিক্ত সময় নৌ-চলাচল হয় না। শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে অনেকস্থানই শুকাইয়া যায়। পরপারের জন্য খেয়ার বন্দোবস্ত আছে; এ জন্য কয়েকখানি নৌকাও নিযুক্ত থাকে। নৌবাণিজ্য মাত্র বর্ষার কয়মাস চলে; এই সময় নৌকাযোগে সাধারণতঃ পাটই চালান যায়। কাতলামারি হইতে রাজসাহী এবং রাজসাহী জেলার অন্তর্গত চারঘাটেই বেশীর ভাগ পাট চালান যায়।

কাতলামারিতে রপ্তানি-যোগ্য ফসলের মধ্যে কলাই, নানাপ্রকার রবিশস্য, পাট, পেঁয়াজ এবং মরিচই সমধিক উল্লেখ-যোগ্য। ফি সন এই গ্রাম হইতে পাট প্রায় ৩০০০৴ মণ, কলাই ১৫০০৴ মণ, রবিশস্য ৪০০০৴ মণ, তেঁতুল ১৫০০৴ মণ, পেঁয়াজ ৫০০৴ মণ এবং মরিচ প্রায় ২৫০৴ মণ রপ্তানি হইয়া থাকে। পাট প্রধানতঃ রাজসাহী চারঘাট প্রভৃতি স্থানে বিক্রী হইয়া থাকে। তেঁতুল, কলিকাতায় চালান যায়। পেঁয়াজ এবং মরিচের প্রধান খরিদ্দার পূর্ব্ববঙ্গ। তেঁতুল, পেঁয়াজ এবং মরিচ প্রধানতঃ নিকটবর্ত্তী পাতিবোনা ষ্টীমারঘাট হইতে গ্যাঞ্জেস্ ষ্টীমার সার্ভিস যোগে চালান দেওয়া হয়।

কাতলামারি অঞ্চলে আমন ধান অদৌ হয় না বলিলেই চলে, আউশ ধান যাহা জন্মে তাহাতে লোকের ২ মাসের সংস্থান হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং ধানের জন্য কাতলামারিকে প্রধানতঃ বরেন্দ্রভূমির উপরই নির্ভর করিতে হয়। বৎসরে এই গ্রামে প্রায় ৮০০০৴।৯০০০৴ মণ ধান আমদানি হয়। অন্যান্য জিনিষপত্রের মধ্যে কাপড়-চোপড় এবং লবণের আমদানিই প্রধান। গ্রামে বৎসরে কাপড়-চোপড় আমদানির পরিমাণ কম্‌সে কম ৪০০০০৲ টাকার হইবে। লবণ আমদানির পরিমাণ প্রায় ৭০০৴ মণ হইবে।

গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে এই গ্রামে মুরগী এবং ছাগলই প্রধান। গ্রামে ফি সন মুরগী এবং মুরগীর ডিম প্রায় দেড় হাজার টাকার এবং ছাগল হাজার টাকার বিক্রয় হইয়া থাকে।

হাটবাজার ও বাজাব-দর

বাজাব এ গ্রামে এখন নাই, পদ্মাসাৎ হইযাছে। তবে গ্রামের মধ্যে কযেকটী বড বড দোকান এবং একটী বডহাট আছে। ইহা সপ্তাহে দুই দিন বসে। হাটেব গড আমদানি ও বিক্রযেব পবিমাণ এবং জিনিষেব দব নিম্নে দেওযা হইল।

জিনিষ	আমদামি	বিক্রয়	দব
বেগুন	১৫০/	১৫০	।৶০ মণ
শাক-আলু	৫০/	৫০	৸৵০ ”
মরিচ	৪০/	৫০	২৲ ”
গুড	২৫/	২০	।।৵০ ”
চাউল	৩৬/	৩৬	৬৲ ”
মাংস	১/	১/	।/০ সেব
মৎস্য	৮/	৮/	।৵০ ”
দেশী ও বিলাতী মিলেব কাপড		৫	–
তাঁতেব কাপড়	—	২০০	—

বিভিন্ন পেশা ও পেশাদাবেব আয়

কাতলমাবি গ্রামে উল্লেখযোগ্য শিল্প কিছুই নাই। নিম্নে বিভিন্ন পেশা ও পেশাদাবেব আয লিপিবদ্ধ হইল ঃ

পেশা	ঘব	মাসিক আয
মালো	১২	২৫৲
কুমাব	১১	৪০৲
কামাব	৫ (২ হিন্দ, ৩ মুঃ)	২৫৲
ছুঁতাব	৯ (৬ মঃ, ৩ হিন্দ)	৩০৲
মুচি	১	১৫
খুলু (তেলওযালা মুঃ)	২০	২০৲
ভেড়ীওযালা (কম্বল ও আসন বোনে)	৩	৩০৲

মেযেদেয পেশা

কাতলমাবি অঞ্চলেব নাবীদেব স্বাধীন সংস্থানেব জন্য ছাগল ও মুবগীই প্রধান অবলম্বন। এই দুই জানোযাব এবং মুবগীব ডিম বিক্রযলব্ধ অর্থ প্রধানতঃ নাবীদেবই হস্তগত হইযা থাকে। মুসলমান নাবীবাই এইরূপ অর্থোপার্জ্জনেব নিযুক্ত। মুসলমানেব মেযেবা অবসব সমযে মটকা ও কেঠোর সুতা পাকাইযাও অর্থোপার্জ্জন কবিযা থাকেন। তবে এইভাবে উপার্জ্জিত অর্থেব পবিমাণ মাসিক ২৲ টাকার বেশী নয। হিন্দু মেযেদেব মধ্যে এক কুমাব ছাডা আব কেহই উপার্জ্জন কবেন না।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য মোটেব উপব মন্দ নহে। পদ্মাব নিকটবর্ত্তী বলিযা এই গ্রামে ম্যালেবিযাব প্রকোপ বাঙ্গালাব অন্যান্য স্থানেব তুলনায অনেক কম। কলেবা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি কদাচিৎ দেখা দিযা থাকে। গ্রামে পাশ কবা চিকিৎসক নাই। দু'একজন হাতুডে এলোপ্যাথ আছেন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও দুই একজনে কবিযা থাকেন। কোন কোন চিকিৎসকেব পাশকবা ডিগ্রী না থাকিলেও তাঁহাবা চিকিৎসা মোটেব উপব মন্দ কবেন না। গ্রামেব স্বাস্থ্য ভাল বলিযা উপস্থিত যে কযজন চিকিৎসক আছেন, তাহাদেব দ্বাবাই কাজ চলিযা যাইতেছে।

গ্রামে ড্রেনেজেব ব্যবস্থা নাই, তবে এণ্টিম্যালেবিযা সমিতি হইতে মধ্যে মধ্যে জঙ্গল কাটা ইত্যাদি চলিযা থাকে।

গ্রামেব সামাজিকতা

কাতলামাবিতে প্রায ১১০০ শত লোকেব বাস। গ্রামে মুসলমানেব সংখ্যাই অধিক,—প্রায ৮০%। মুসলমানদেব মধ্যে ফকিব, মিঞাসাহেব, (সৈযদ) খুলু (তৈল ব্যবসাযী), পাঠান, পাঞ্জাবি (চুডিওযালা) এব সাধাবণ মুসলমান প্রভৃতি শ্রেণী দৃষ্ট হয। ফকিবেবা পেশাদাব ভিক্ষুক, মিঞাসাহেবগণ তথাকথিত মুসলমান পুবোহিত এবং গুরু সম্প্রদায। হিন্দুদেব মধ্যে ব্রাহ্মণ, কাযস্থ, মাহিষ্য, বৈশ্য সাহা, গোযালা, কুমাব, কামাব, মালো, ছুঁতাব, চামাব, মুচি, সহিস, ভেডীওযালা—এই কয জাতি দৃষ্ট হয। পূজাপার্ব্বণেব মধ্যে দুর্গাপূজাব সময যথেষ্ট ধুমধাম হইযা থাকে, এই সমযে পূজাব কযদিনেব জন্য একটী ক্ষুদ্র মেলাও বসিযা থাকে। অন্য পূজাব মধ্যে বৈশাখ মাসেব শেষে শিবপূজাব সময কিছু ধুমধাম হয।

৪৫ বি, মেছুযাবাজাব ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওবিযেণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীবঘুনাথ শীল বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।